

বিংশ শতাব্দী

ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম খণ্ড

১ম সংখ্যা আষাঢ় ১৮৮৩ হইতে ৩ষ্ঠ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৮৮৩ পর্যন্ত

বর্ণানুক্রমিক বিষয়-সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
	অ	
অন্তঃপত্র (কবিতা)	প্রিন্স সেনগুপ্ত	
অভীত (গল্প)	প্রবীণ দেব	২৮১
অনুভব (গল্প)	শঙ্করকুমার ঘোষ	৪৭১
ব্যাপক (গল্প)	রাশা ঘোষী	১০০
অপরাজিত (কবিতা)	কুমার চট্টোপাধ্যায়	৭১২
অন্য ভাষে (গল্প)	পরিষ্কল সাহা	১০৪
অভিনেতার আত্মভাষন (কবিতা)	শেখ আবদুল হক্কার	২৪৭

আ

আমাদের কথা (গল্পসংকলন)	১. ২২২, ৩০৪, ৭৪৭, ৮৬৭
আমাদের দেশের লোকের (উপন্যাস)	৬. ১১০, ২০১, ৭৪০, ৮৭০
আম একটা ছবি (গল্প)	৪০
আমের টি ছবি (গল্প)	
আমরা বড়ো (নাটক)	১০০, ২০৬
আমি কী? এমো (কবিতা)	২২৫
আমের পুত্রের বাস (কাউন্সিল)	৪৪২
আমের বৃদ্ধাশ্রম (গ্রন্থ)	৬৮৪
আমের পুত্র (কবিতা)	৭৪৮, ২৭০
আকাশ থেকে কেন্দ্র (বিজ্ঞান)	৮৭১

ইতো আশ্চর্যের লাহিত্য-বিজ্ঞান (বিজ্ঞানবিদ্যা) প্রথম বৃহদাখ্যায়

[illegible]

বিষয়

লেখক

১

সাদাসিধ জুত সেবেয়েন (গদ্যগ্রন্থ)
বনভাষ্য ও সাংকল্য বাসন (গ্রন্থ)
পাণ্ডিত্য (কবিতা)

২: শিবভোব বহুশোনাখ্যায়
বাসন সঙ্কল্য
সামিক বহুশোনাখ্যায়

বুদ্ধিক আদে জায় (চিত্র)

৩: বুদ্ধিক আদে জায়

১০২

৪: সোমের একটি কবিতা (গ্রন্থ)

৫: সোমের একটি কবিতা

৬: সোমের একটি কবিতা

৭: সোমের একটি কবিতা

৮: সোমের একটি কবিতা

৯: সোমের একটি কবিতা

১১, ১২

১০: সোমের একটি কবিতা

১১: সোমের একটি কবিতা

১৩

১১: সোমের একটি কবিতা

১২: সোমের একটি কবিতা

১৪

১২: সোমের একটি কবিতা

১৩: সোমের একটি কবিতা

১৫

১৩: সোমের একটি কবিতা

১৪: সোমের একটি কবিতা

১৬

১৪: সোমের একটি কবিতা

১৫: সোমের একটি কবিতা

১৭

১৫: সোমের একটি কবিতা

১৬: সোমের একটি কবিতা

১৬: সোমের একটি কবিতা

১৭: সোমের একটি কবিতা

১৮

১৭: সোমের একটি কবিতা

১৮: সোমের একটি কবিতা

১৯

১৮: সোমের একটি কবিতা

১৯: সোমের একটি কবিতা

২০

১৯: সোমের একটি কবিতা

২০: সোমের একটি কবিতা

২১

২০: সোমের একটি কবিতা

২১: সোমের একটি কবিতা

২২

২১: সোমের একটি কবিতা

২২: সোমের একটি কবিতা

২৩

২২: সোমের একটি কবিতা

২৩: সোমের একটি কবিতা

২৪

২৩: সোমের একটি কবিতা

২৪: সোমের একটি কবিতা

২৫

২৪: সোমের একটি কবিতা

২৫: সোমের একটি কবিতা

২৬

২৫: সোমের একটি কবিতা

২৬: সোমের একটি কবিতা

২৭

২৬: সোমের একটি কবিতা

২৭: সোমের একটি কবিতা

২৮

৮

৮: দীপেন্দ্রনাথ সেন (প্রবন্ধ)

প্রবোধকৃত দাস ব্রহ্মপাত

৯

নেপথ্য লক্ষ্মী (নাটিকা)

দুঃস্বপ্ন চিত্র

নতুন বই (পুস্তক সমালোচনা)

—

নববর্ষের শুভা (কবিতা)

ডি এইচ লরেন্স

নিরীক্ষা (কবিতা)

অমিলবরণ পল্লোপাখ্যান

নাটকীয় নাটকীয় উদ্ভাস (খেলাধুলা)

অজয় বসু

পূ

প্রজ্ঞাতির উৎস (বিজ্ঞান)

সুন্দরী সান্যাল

৩০

পাঠকের চোখে (মহামত)

—

১২৬, ৩০০

পাখির গল্প

প্রসাদ দাস

১০৭

পাঠ দিয়া ছবি (গল্প)

নজরুল হক

১৪৬

প্রাণের ভূমিকা (বিজ্ঞান)

নগিনীকান্ত চক্রবর্তী

১৪৬

পদ্মা ও ঘনুনা (গল্প)

বীরেন সরকার

১৭৮

পাতাভী কন্যা (গল্প)

৩২ হস্ত

১৮১

পদ্মাপুর কথা (বিজ্ঞান)

সুন্দরী বন্দ্যোপাধ্যায়

২৬২

প্রাচীরের অন্তরালে (গল্প)

তরুণ দে

২৬৭

পদ্মের পথে (চিত্র)

কল্যাণ বসু

৩০৪

পরিবেশ (চিত্র)

বাহন পাল

৩১০

পঞ্চক বেলার আলোয় (কবিতা)

গায়দার্স স্ট্র

৩২০

পদ্মপুত্র (গল্প)

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

৩২১

প্রাচীরের অন্তরালে (গল্প)

বহন সরকার

১৬০

প্রাচীরের অন্তরালে (গল্প)

ভাগ্যদেব ব্রহ্মচারী

৩৫৫

পদ্মপুত্র বিকিরণ ও পৌরস্ব (বিজ্ঞান)

অশোককুমার বসু

৩২২

৮

বৈষ্ণব (গল্প)

অজিতকুমার সরকার

১২

বিদিতা (ত্রিভা)

স্বপ্ন

২০, ১৩৪

বৈষ্ণব ও বসু সমীচ (গল্প)

বসু গির্জা দাস

৩৮

বৈষ্ণব পুত্র (খেলাধুলা)

বসু বসু

২১২

বায়ু (গল্প)

প্রমোদ দাস

৩৪১

বায়ু বাহিনীতে বৈষ্ণবদের প্রভাব (প্রবন্ধ)

ডঃ ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়

৪১২

বৈষ্ণব (গল্প)

সরোজ বসু

৪১৬

বৈষ্ণব (চিত্র)

বালু ভট্টাচার্য

৪১৬

বাক্য (গল্প)

বাক্য রিসম্বন্ধ (খেলাধুলা)

বিশ্বকোষ (সংগীত)

বিশ্বকোষ (কবিতা)

বোধ (কবিতা)

ভাষার বহু (কবিতা)

ভারত আবিষ্কার (কাউন)

ভারতীয় বসন্তের চর্চা (বিজ্ঞান)

ভারতীয় সংগীত রাস (সংগীত)

ভাষার বহু (কবিতা)

ভাষার বহু (খেলাধুলা)

ভাষার (চিত্র)

ভাষার বহু ও ভাষার (প্রবন্ধ)

ভাষার বহু (প্রবন্ধ)

ভাষার বহু (গল্প)

ভাষার বহু (গল্প)

ভাষার (কবিতা)

ভাষার বহু (গল্প)

ভাষার বহু (প্রবন্ধ)

ভাষার বহু (কবিতা)

ভাষার (গল্প)

ভাষার বহু (গল্প)

ভাষার (চিত্র)

ভাষার (কবিতা)

ভাষার বহু (গল্প)

ভাষার (কবিতা)

বিশ্বকোষ

বিশ্বকোষ

বিশ্বকোষ (সংগীত)

বিশ্বকোষ (কবিতা)

বিশ্বকোষ (কবিতা)

বিশ্বকোষ (কবিতা)

বিশ্বকোষ

বিশ্বকোষ (কবিতা)

বিশ্বকোষ (কবিতা)

ভাষার বহু

ভাষার বহু

ভাষার বহু

ভাষার বহু

ভাষার বহু

ভাষার বহু

ভাষার বহু

ভাষার বহু

ভাষার বহু

ভাষার বহু

ভাষার বহু

ভাষার বহু

ভাষার বহু

ভাষার বহু

ভাষার বহু

ভাষার বহু

ভাষার বহু

১০০, ২১০, ২১০, ২২০, ২২

২২

২২

২২

২২

২২

২২

২২

২২

২২

২২

[illegible]

বর্ণানুক্রমিক লেখক-সূচী

১ম সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৩ ইহতে ৬ষ্ঠ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৮৮৩ পর্যন্ত

লেখক

বিষয়

পৃষ্ঠা

অবহুত
অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়
অশ্বিনীকুমার সরকার
অশোক বুদ্ধাচী
অক্ষয় সিংহরায়
আদিত্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
অক্ষয় বসু

অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়
অক্ষয় বসু
অশ্বিনীকুমার সেনগুপ্ত
অক্ষয় সেনগুপ্ত
অমিলবরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
অমিলেন্দ্র চক্রবর্তী
অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়
অবহুত
অক্ষয় বসু

অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়
অক্ষয়কুমার সিংহরায়
অশোক বুদ্ধাচী
অমিলবরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
অশোক বুদ্ধাচী
অবহুত
অক্ষয় বসু

অমিলেন্দ্র চক্রবর্তী
আনিত্য ওয়েলস

অ

আনান্দবীর সংহার (উপন্যাস)
সত্য কুমার গুপ্ত (কবিতা)
বোরখা (গল্প)
শ্রীমদ ও কল্যাণী সত্য-জীবন (প্রবন্ধ)
বঙ্গদেশ ও বঙ্গদেশীত (সংগীত)
দান (গল্প)
কীচা জমজন্মের পরবর্ত্তন (বেলাহুলা)
রোজের গল্প (বেলাহুলা)

সত্য (কবিতা)
সত্য কাম (বেলাহুলা)
প্রভার টাইম (গল্প)
সত্য (চিত্র)

সত্য (কবিতা)
সত্য (কবিতা)
সত্য (কবিতা)
সত্য ও সত্য (উপন্যাস)

সত্য (কবিতা)
সত্য (কবিতা)
সত্য (কবিতা)
সত্য (কবিতা)

সত্য (কবিতা)
সত্য (কবিতা)
সত্য (কবিতা)
সত্য (কবিতা)
সত্য (কবিতা)
সত্য (কবিতা)
সত্য (কবিতা)
সত্য (কবিতা)

অ

ক্যানারীর গান (প্রবন্ধ)
সত্য (কবিতা)

৩৩

৩৪

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	আ	
আশা দেবী	অধ্যাপক (গল্প)	৬০৩
আশিস সান্যাল	বিবাহের আতিথ্য (কবিতা)	১২৬
	উ	
উজ্জল সেনগুপ্ত	ভীষ্মের আলাপন (চিত্র)	
	ক	
কমলাসুতি দে	কেন চোখের জলে ভিড়িয়ে দিলাম (প্রবন্ধ)	১৫১
কথক ঠাকুর	য়েডিও (গল্প)	২৫১
কে সরকার	ভারত আবিষ্কার (কাউন্সিল)	৩৫০
কল্যাণ বসু	বাহুবলী (চিত্র)	৭৬৫
	পল্লীর পথে (চিত্র)	৩৬৫
কৃত্ত	দুর্নয়নী (কবিতা)	৬৫৬
কমল সরকার	প্রাচীন ভারতীয় বাণিজ্য (শিশুপুস্তক)	১৬৩
কমলেন সেন	দুর্নিহাতাল হও (কবিতা)	২৪৬
	খ	
বসেন দত্ত	একটি শব্দের ইতিহাস (গল্প)	
	গ	
পর্ণো-দালগোয়া	দুর্নয়নী ও গল্পোজনী (অমল) ১০০, ২১০, ২৭৫, ৬২৭, ২৬৩	
গুরুদাস বসু	পতাবির্কী ইয়াং কৃতা (প্রবন্ধ)	২৮৭
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য	জীবনী (উপন্যাস)	২২৩, ৩১৩
	প্রদানের জ্বর (গল্প)	৪১১
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য	সিয়ার ও কমল (ভেত)	১৪১
	চ	
চন্দ্রনাথ ঠাকুরতা	হার্যচিত্র (কবিতা)	২২
চন্দ্রনাথ	বিচিত্রা (বিচিত্রা)	২৩, ১২৪
চন্দ্রনাথ ঠাকুরতা	ছোয়াবের আন (গল্প)	২৪৫
চন্দ্রনাথ ঠাকুরতা	কুটীর (চিত্র)	৭৪৫
চন্দ্রনাথ ঠাকুরতা	দুর্নয়, দুর্নয়াজ (উপন্যাস)	৬৫৪
চন্দ্রনাথ ঠাকুরতা	বোধি (কবিতা)	২৪৭
	ছ	
ছোয়াবের আন	তেজস্বিনী চন্দ্র (কবিতা)	২৪
ছন্দ কলিকাতা	মহাশয় হাইম্যানের গতি (কবিতা)	২২৬
ছবিচিত্র চিত্রকলা	মাজিলাও, জাতি হাত (কবিতা)	৪৫৭

ডি. এইচ. লেভেন্স

নববর্ষের নমুনা (কবিতা)

তরুণ গল্পোপাখ্যান
তরুণ মে
তারানন্দকর বন্দোপাখ্যান
তরুণ চট্টোপাখ্যান
তুষার চট্টোপাখ্যান
চাহাঙ্গনর ইচ্ছাচারী
তরুণ চট্টোপাখ্যান
তরুণ বাগচী

কচিচেলো (গল্প)
আচীতের অভ্যুদয় (গল্প)
করেক কেচিচী বক (গল্প)
মানুষ বহাঙ্গন ও ভবিষ্যৎ (প্রবন্ধ)
অপরাজিত (কবিতা)
প্রতিকলন (গল্প)
মোড়িতের ও পাকিমী দামোদর ভাবিকা (প্রবন্ধ)
স্বর্গ চতে বিলাস (গল্প)

দশন সেন
দশক
দীপেন্দ্রনাথ বন্দোপাখ্যান
দশন বন্দোপাখ্যান
হৃদয়বান
দেবীত চক্রবর্তী

কুখ্যাত (কবিতা)
পাকিমীক (গল্প)
গল্প ঠাকুর দীপক (উপন্যাস)
পরমেশ্বর কথা (বিজ্ঞান)
কাকাতিক (ছড়া)
স্বকালীন (কবিতা)

দীপেন সরকার

পত্র ও কুখ্যাত (গল্প)

দীপেন্দ্রনাথ
দশনীকাক চক্রবর্তী
দশন বন্দোপাখ্যান
দিশাই দান
দিশাই দান
দেবীত চক্রবর্তী
দেবীত চক্রবর্তী

দীপিকা ছবি (গল্প)
প্রাণের ভাবিকা (বিজ্ঞান)
প্রবন্ধ (উপন্যাস)
কাকাতিক (ছড়া)
ছন্দ (গল্প)
উপলোক (গল্প)
মোড়িত (গল্প)

প্রবোধক দান নতুন
প্রবোধ দান
প্রবোধ চক্রবর্তী

৩: দীপেন্দ্রনাথ সেন (প্রবন্ধ)
দীপেন্দ্রনাথ (গল্প)
দীপেন্দ্রনাথ (গল্প)

সংখ্যক

পৃষ্ঠা

১

২

প্রিয়মত মিত্র	বঙ্গ (গল্প)	৩১১
প্রমোদকুমার দাসগুপ্ত	শিশু থেকে বৈজ্ঞানিক (গ্রন্থ)	৪১৪
শ্যাম চন্দ্রশাস্ত্রী	আত্মজীবনী (গ্রন্থ)	৪১৪
প্রমোদ মিত্র	শিশুদের জীবন (চিত্র)	৪১২
প্রমোদ মিত্র	শিশুদের জীবন-কল্পনা (বিশ্ব-শাস্ত্র)	১৪২
পরিচয় দাস	অন্যভাবে (গল্প)	১২১
পরিচয় দাস	অন্যভাবে (কবিতা)	১৪১

১৪১

৩

কমল দাস	আত্মজীবনী, কবিতা (কবিতা)
---------	--------------------------

৪

বিজ্ঞান মিত্র	কল্প (গল্প)	৬১
বসন্ত	কাল-মাক'স ও দ্যা ক্যালিফোর্নিয়া (গ্রন্থ)	১৪০
বসন্তের চন্দ্র	শিশু (গল্প)	১৬২
বসন্তের চন্দ্র	বাস্তব (কবিতা)	২৬৬
বাসন্ত দাস	পরিচয় (চিত্র)	৪১০
বাসন্ত দাস	গমতীয় ও শাস্ত্রীয় বাস্তব (গ্রন্থ)	৪১০
বাসন্ত দাস	অন্যভাবে (চিত্র)	৬৪৬
বাসন্ত দাস	বাস্তব (গল্প)	১০০

৫

ভাস্কর দাস	কবিতার মত (কবিতা)
------------	-------------------

৬

বিশ্ব মিত্র	মোট চ্যাপ্টারের সংখ্যা (কবিতা)	১১, ১৬১, ৩১২, ৬৪৬
বিশ্ব মিত্র	মোট অন লিখিত (অন্যভাবে)	৩০, ২০১, ২৪১, ১৭২, ১২১
বিশ্ব মিত্র	কল্প-লবের ভাষা (আলোচনা)	৮২
বিশ্ব মিত্র	বাস্তবের ভাষা (কবিতা)	১১৮
বিশ্ব মিত্র	ভাস্কর (গল্প)	২০৪
বিশ্ব মিত্র	বাস্তবের ভাষা (গল্প)	৬১৬
বিশ্ব মিত্র	বাস্তবের ভাষা (গ্রন্থ)	৬২২
বিশ্ব মিত্র	ভাস্কর (কবিতা)	১৪২
বিশ্ব মিত্র	বাস্তব (আলোচনা)	১৪২
বিশ্ব মিত্র	পত্র (কবিতা)	৮২৬

প্রবেশের উপায়
 সিংহের কল
 শ্রীমদভগবদ্গীতা
 শ্রীমদভগবদ্গীতা
 শ্রীমদভগবদ্গীতা
 শ্রীমদভগবদ্গীতা
 শ্রীমদভগবদ্গীতা
 শ্রীমদভগবদ্গীতা

শ্রীমদভগবদ্গীতা
 শ্রীমদভগবদ্গীতা
 শ্রীমদভগবদ্গীতা
 শ্রীমদভগবদ্গীতা
 শ্রীমদভগবদ্গীতা
 শ্রীমদভগবদ্গীতা
 শ্রীমদভগবদ্গীতা

অজ্ঞান (উপদ্রাব)
 সেন্সর (কবিতা)
 কাব্য (উপদ্রাব)
 ভারতীয় মনোবিজ্ঞান (মনোবিজ্ঞান)
 এক উচ্চারণ (মনোবিজ্ঞান)
 ভারতীয় মনোবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান (মনোবিজ্ঞান)
 সামাজিক বাস্তবতা (মনোবিজ্ঞান)

৫

আনন্দ (মনোবিজ্ঞান)
 পাহাড়ী কন্যা (মনোবিজ্ঞান)
 চীনের একটি কবিতা (মনোবিজ্ঞান)
 দার্শনিক কবি ভগবদ্গীতা (মনোবিজ্ঞান)
 ভারতীয় মনোবিজ্ঞান (মনোবিজ্ঞান)
 নৃত্য উপদ্রাব (মনোবিজ্ঞান)

১৬৬
 ১৬৭
 ১৬৮
 ১৬৯
 ১৭০
 ১৭১
 ১৭২

১১০
 ১১১
 ১১২
 ১১৩
 ১১৪
 ১১৫
 ১১৬

বিংশ শতাব্দী প্রকাশনীর সব বই
পূর্ব পাকিস্তানে
এই ঠিকানায় পাওয়া যায়



বই-পত্র, আত্মদপুরা সিনেমা বিল্ডিং, ঢাকা-২

কথামালা

চলতি সংখ্যায়

অবধূত বিরচিত

‘উদ্ধারণপুরের ঘাট’-এর

অবধূত কৃত

নাট্যরূপ

‘উদ্ধারণপুরের ঘাট’

প্রতি সংখ্যা কথামালার মূল্য এক টাকা।

বার্ষিক গ্রাহক ঠাণ্ডা বার টাকা।

কার্যালয় : ২০, রে খ্রীস্ট, কলিকাতা-৬

ফোন : ৬৬-৪৪২৬

প্রবন্ধ পত্রিকা

॥ কৈষ্ঠ সংখ্যার সূচী ॥

রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত-পত্র

রবীন্দ্রনাথ রায়ের : ‘পঞ্চদ্বন্দ্ব’

বাসব সরকারের : ‘রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা

এ ছাড়া আছে

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ
প্রবন্ধ সমষ্টি

সর্বোচ্চ আচার্য : চার অধ্যায়

কমলার : ঘরে বাইরে

হরপ্রসাদ মিত্র : চোখে-কানে

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত : উপন্যাসে আধুনিকতা ও রবীন্দ্র

বিম্বিত দৃষ্টি : রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক উপন্যাস

সুনীল চক্রবর্তী : তিন সঙ্গী

আর, পি, ভাস্কর : ঐশ্বর্যাসিক রবীন্দ্রনাথ

প্রণবিশ সেন : গল্পগুচ্ছ মৃত্যু চিন্তা

দাম : প্রতিসংখ্যা এক টাকা

বার্ষিক গ্রাহক ঠাণ্ডা : বারো টাকা

কার্যালয় : ২০, রে খ্রীস্ট, কলিকাতা-৬

ফোন : ৪৪-৫৭২৬

সূচীপত্র

কিশ লতাখা

বই বর্ষ : ১২ সংখ্যা :

আব্দ : ১৯৮০

বিষয়

লেখক	
সম্পাদকীয়	১
প্রবোধকৃত দাস মহাপাত্র	২
অবদ্য	৬
মনি গঙ্গোপাধ্যায়	১১
রবীন্দ্রনাথ	১৭
ঈশদ সেনগুপ্ত	১৮
ভজন দাস	১৮
অচ্যুৎ চট্টোপাধ্যায়	১৮
অধিনীকৃত্য সরকার	১৯
আবদ্যের কথা	
ডঃ বীরেন্দ্রনাথ সেন (প্রবন্ধ)	
আশাপূর্ণার সংসার (উপন্যাস)	
লেডী চ্যাটার্লির লেখক (জীবনী)	
জেনে রাখা ভাল (কবিতা)	
অন্তঃপর (কবিতা)	
কবিতার মত (কবিতা)	
সহস্র বৎসর পরে (কবিতা)	
বোরখা (গল্প)	

মহাকবি (সম্রাট) এর

কয়েকখানি বিখ্যাত নাটকের উপস্থাপনা

- জুলিয়াস সিজার
 - ম্যাক্স ইউ লাইক ইট
 - ম্যাক্স অব ডেনিস
 - ম্যাক্স অব
 - দি টেম্পেট
 - এ মিড সামার নাইটস ড্রীম
 - গাথালো
 - দি টেমিং অব দি স্ক
 - রোমিও জুলিয়াস
 - ট্রিয়েলডর নাইট
 - কিং লিয়ার
 - ফ্রামলেট
- (অনুবাদ...অন্যে গুহ)
- অন্যে গুহ বগের দ্বারা দুই টাক

পরিবেশক :-

ব্রাহ্ম লাইব্রেরী

১৬২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দল হকমের আর্থিক ভিত্তির

বই বাইজিং একমাত্র

বিশেষ প্রতিষ্ঠান

★

জাগ্রত বাইজিং ওয়ার্কস

৩০/১, পূর্ব চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬।

অসিত কুমার ডাট্টাচার্য-এর
বাতাবরণ

বর্তমান বালা কাব্যে এক বিরল
বিশ্বের যোদ্ধা।

প্রচ্ছদ : অজিত গুপ্ত।

পরিবেশক : সিগনেট বুক শপ।

১২, বর্ধক চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২



আষাঢ়
১৮৮৩
৬ষ্ঠ বর্ষ
১ম সংখ্যা

বিংশ শতাব্দী

‘সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই’

ইতিহাসের দ্বারা কোন কথা নেই। আর থেকে পনের বছর আগে ভারতবর্ষ বিখ্যাত হয়েছিল। যাদের পাশে আধুনিক যুগের এই চরম অশ্রুপাতি পড়েছিল, দুর্ভাগ্যের কথা আরও তারাই ভারতবর্ষকে পানন করছেন। সেইসবের সে পানের কোন প্রাণকিত ঘটে নি। আর সেই কারণেই বোম্বের নার পনের বছর পরে ভারতবর্ষ অসংখ্য বণ্ডে বিভক্ত করার পক্ষে চলছে।

একথা আর অস্বীকার করে লাভ নেই যে, ইংরেজ আমলে যে স্বাধীনতা-প্রীতি ও চেতনা দেখা গিয়েছিল, তার ভিত্তি ছিল খুবই দুর্বল। বিশেষী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম যে দিন শেষ হল সেইদিনই এই প্রীতি বিধিল চল। ভারতবর্ষের নতুন শাসক যারা তারা নতুন প্রকারের পড়ে তুলতে বাধ্য হলেন।

পঞ্চদশ ভারতে ইতিমধ্যেই বিদ্রোহের দূর পোনা দাচ্ছে—তারার আর উত্তর ভারতের প্রাধান্য নানতের দ্বারা নয়, বিদ্রোহ জেগেছে দ্বারা পাহাড়ে—স্বতন্ত্র রাজ্য চাই। বিদ্রোহের বীজ উৎস হয়ে গেছে প্রত্যেকটি প্রান্তের রাজ্যে—হিন্দীর প্রাধান্যের বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহের জন্য রূপ বোধের ভারত সীমান্তের নবোই ভারতীয় প্রজা অন্য ভারতীয় প্রজা হাতে নিপুতীত হচ্ছে—আলাদা এগই স্বাধীনতা নিদর্শন।

একদিন দুদিনের ইতস্ততঃ পিছপাট ঘটনা নয়, দীর্ঘ এক বছর ধরে বাঙ্গালীদের উপর দাম্পত্যের কলহিতন অভিযাত্রার করা হয়েছে, হচ্ছে এবং তা যে বন্ধ হলে, তার কোন দৃশ্য দেখা দাচ্ছে না। সব থেকে আকোপের কথা সত্যি পাছাচানের নতই আর এক নিখিল বাক্য দিল্লীর মলমল অলঙ্কৃত করে রয়েছে—যিনি কেবল দর্শক এবং অন্যায়ের প্রতিরোধে অসমর্থ।

‘বিংশ শতাব্দী’ প্রাচৈনিকতা ও সাম্প্রতিকতাকে ঘৃণা করে। বাঙ্গালী অসমর্থতার প্রর তুলে হল বোলা করা আবারের উদ্দেশ্য নয়। বর্মীদের দোষ প্রর যে, যে জনকল্যাণমূলক রাজত্বের সাম্প্রতিক অন্য সাম্প্রতিকের দ্বারা উপপীড়িত হয় পুণ্য নার কলহিতনের দ্বারা সে রাজ্যে স্বাধীনতাবাদ কোথায়? ভারতীয় স্বাধীনতা তত্ত্বের অস্তিত্ব আর দৃশ্যেরের ব্যাপারে পিছপাট।

বাঙ্গালী প্রাচৈনিকতাকে ঘৃণা করে। ঘৃণা করে বলেই প্রাচৈনিকতার বিরুদ্ধে পিছপাটে চায়। অমিয়া সত্য সত্যই অসমর্থ যে বাঙ্গালী সেনাই হল ভারতের মধ্যে সেই অকল দেখানে যে কোর ভারতীয়ের পিছপাট সে ভারতীয়, প্রাচৈনিক সীমানা তার পিছপাট জ্ঞান করে না।

কিন্তু সেই দশে আনয় এই বিদ্রোহ সত্যকেও স্বীকার কর যে বাঙ্গালীও মানব এবং মানব স্বার্থেরই দ্বারা সীমা আছে। প্রের যেমন প্রের জাগিয়ে তোলে, তেমনি ঘৃণাও ঘৃণা জাগায়।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রায়ে স্বাধীনতা-প্রীতি স্বাধীনতাবাদের দ্বারা পিছপাটে হচ্ছে—আবারের প্রাচৈনিকতা বালা সেন তার ব্যতিক্রম মোক।



ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন

প্রবাসিক বাস মহাপাত্র



১৯১৪ খৃঃ। কোটালি পাতা ইউনিয়ন ইন্সটিটিউশন।
 ফুল ইন্সপেক্টর এসেছেন পরিদর্শনে। তাঁর সাথে এসেছেন
 কেবী সাহেব। ইন্সপেক্টর সাহেব সব ক্লাস ঘুরে চুকলেন
 ক্লাস দিগ্গ-এ। সাহেব ভাবছেন ছাত্রের প্রেরণ করবেন
 গভীক। করবেন যাটারের। কিন্তু সে সুযোগ আর
 সাহেবকে মিলেন না ১২ বছরের এক বালক। বালক
 আগেই প্রেরণ পূর্ণ প্রেরণ করে গেলেন সাহেবকে। এত
 দূর সেইদিন ফুল প্রাঙ্গণে কেবী সাহেবের সভাপতিত্বে
 এক জনসভা হলো। জানি-ভনী অনেকই বক্তৃতা
 মিলেন। তারপর সাধারণের জিতর থেকে কেউ কিছু
 বলতে চান কিনা। সভাপতি জানানতে চাইলে বালকফল
 থেকে উঠে ঠাঁড়ালেন একজন। বিবাহীন ঋষ্ঠ।
 সংকোচন বক্তৃতা শুধু ইংরাজী ভাষা। প্রায় এক
 ঘণ্টা বক্তৃতা মিলেন ৬ষ্ঠ শ্রেণীর বালক। সাহেব
 হতবাক। সত্যিই চমৎকৃত। এই অননু-সংবাদে বাগী

১৯৪০ খৃঃ। ভারতীয় কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ।
 হকিম ও বাহনদী ছুটি দল। একদল প্রাচীন আর
 একদল নবীন দলক। একদিকে প্যাটেল ও গান্ধীজীর
 দল অন্যদিকে নেতাজী সুভাষ বোস প্রভৃতি। নেতাজী
 চাইলেন প্যাটেল পরীক্ষার অনুপ্রিয়তা ক্লাস করতে।
 চাইলেন প্যাটেলের দ্বুভিসন্ধিকে গজ-গজিকার
 প্রকাশ করতে। ইংরাজী ভাষানালিষ্ট পত্রিকা বিনুহান
 ট্যাগোরের সম্পাদককে চাপ দেওয়া হলো প্যাটেলের
 বিরুদ্ধে প্রচার করতে। ট্যাগোরের সম্পাদক, নেতাজীর
 কথায় লাফা মিলেন। একমত হলেন। কিন্তু সম্পাদক
 চাইলেন একেবারে মূলে আঘাত দিতে। লাখা প্রমাণ
 কর্তনের আগে যদি মূলে চুড়ার আঘাত হয় তাহলে
 সব সমস্তর সমাধান হবে। সম্পাদক বলেন—গান্ধীজী
 প্যাটেলকে ভয় করেন বেশী। প্যাটেল গান্ধীজীর
 পুট। প্যাটেলের অনুপ্রিয়তা গান্ধীজীকে বাহ মিলে মর
 প্যাটেলের অজল উজ্জ্বল জগত আর গান্ধীজীর জগত।

নীতির প্রতিবাদ করতে হবে। রাজনীতির প্রতি দৃষ্টিপাত ছিল নেতাজী গোষ্ঠীর। সম্প্রদায় ও বৈতাত্যিকী গোষ্ঠীর মধ্যে হলো সংঘাত। সংবাদপত্রের পরিচালক-দলও সম্প্রদায়ের উপর ছিলেন চাপ। সম্প্রদায়িক অঙ্গপটে সবকিছু ঘেঁষে নিতে পারলেন না। বীর আকর্ষণে বলি না দিয়ে ইচ্ছা ছিলেন বহু সম্মানীয় পদকে। এঁই সম্প্রদায়কে যে ডঃ বীরেন্দ্রনাথ সেন তা হতে আমাদের অজানা নাই।

এরপর আসান এলো ঐক্যবাজার পত্রিকা থেকে। সম্প্রদায়িকদলের সত্য হলেন ডঃ সেন। কিন্তু কিছু কালের মধ্যেই সেখানে দায়িত্ব কর্তব্যচ্যুত হলো বহু। আন্দোলনের প্রথম ভাগে ডঃ সেন ছিলেন একটু নিমিত্ত। কিন্তু আন্দোলন এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছালো যেমন কর্তব্যচ্যুতের অবস্থা হয়ে উঠলো শোচনীয়। কর্তব্যচ্যুতের শোচনীয়তা পরামর্শদাতা বীরেন্দ্রনাথকে করলো বিচলিত। কর্তব্যচ্যুতের কাতর আক্ষেপে সাড়া দিলেন ডঃ সেন। কিন্তু তার আগেই ইচ্ছা হয়েছিলেন আপন আসনটিতে। গোদযোগ মিটে গেছিল অচিরেই। দায়িত্ব পক্ষ আবার আসান জানিয়েছিলেন, কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ আর ফিরে যাননি।

অতি পৈশব্য অতি কৈশোর থেকে তার মধ্যে বিপ্লবের বেনা লান ধরাছিল তা বোঝানো আরো হলো প্রতীক। সাড়া দিলেন জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে। বেঘাব হলেন জল ইতিহাস কাগ্রেণ কমিটি। বাম ও হিন্দু পন্থী কংগ্রেসের বৈষম্য আবারও পড়লেন ডঃ সেন। বিহার ছিলেন কংগ্রেসকে। -

এবার দেখা দিল বাংলা ওবা ভারত বিভাগের আন্দোলন। দেশ বিভাগের ভাবনা পলিভি অনেক আগেই অহমান করেছিলেন ডঃ সেন। অনেক আগেই ভারতের সংখ্যাগুরু নাগরিকদের স্বতন্ত্র কথা পর্যালোচনা করেছেন বীরেন্দ্রনাথ তাঁর "স্বরং বিনিদ" Problem of the Minority-তে। ১৯০৬ সালেই ডঃ সেনের ঐ বিখ্যাত বিনিদটির মৌলিকত্ব বীকার করেছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পি-এইচ-ডি, ডিগ্রী প্রদান করে। দেশ বিভাগের শোচনীয়তা চিত্রা করে প্রতিবাদ জানালেন তাঁর কণ্ঠে। পরবর্ত্তে বহু ও

ডঃ সেন সম্মিলিত ভাবে দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সতর্ক করতে সংঘবদ্ধ করতে চেষ্টা করলেন। তৎকালীন মেতাকের সম্মিলিত চিন্তাকারেব মাঝে যুগ্ম কর্তৃত্বও তিনিই দিল। কিন্তু ডঃ সেনের ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্ত্তীকালে বর্ষে বর্ষে উপলব্ধি করেছে বঙ্গালী জাতি।

বিত্তিকপ্রাণবন্তী গ্রন্থ "হিম্যান" ডঃ সেন। রাজ-নৈতিক দৃষ্টিপাতা অনন্ত সাধারণ। শুধু দেশ-বিভাগের সময় নয়। ঐ কিছু দিন আগে কেবলের কমুনিষ্ট সরকারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে বাণী তাঁর প্রকাশিত সেই পুস্তক "Paradox of Freedom" এ প্রকাশ করেছেন তা কি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হ'লি নি? ডঃ সেন বর্ষা মাসে বাসী ছিলেন।

বর্ত্তমানের রাষ্ট্রনায়কতা! বা এডমিনিস্ট্রেটর? দলারলির চাপে বা অস্ত্র কার্ণে ডঃ সেনের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন হয়ে কতজন না। কিন্তু পরামর্শ-ভারতের দায়িত্ব প্রাপ্ত-পন্থী ইংরেজরা প্রয়োজন হলো ডঃ সেনকে লক্ষ্য করে আসান জানাওন। পরামর্শ নিতেন। স্তার ট্যানলি কখনও প্রভৃতি পত্ৰবহ: প্রায় শাসনতান্ত্রিক বা পন্থিতান্ত্রিক জটিলতার ডঃ সেনে সাহায্য চাইতেন। শুধু তাই নয়, তৎকালীন বাম সিভিলিয়নদের পরামর্শ নিতে আসতেন। মিঃ স্ট্রেচার মিঃ গ্রাহাম, মিঃ রীড প্রভৃতি সুদীর্ঘ আই-সি-এলস অনেক সময় নানা বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করেছেন মাঝে মাঝে তাঁরই যে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তারে চেষ্টা করতেন না তা নয়। তখন ডঃ সেন স্বতঃস্ফুল হানি বুঝে বলতেন "So you are come to teach in my own job." সাহেবতা নিঃশব্দ হতেন।

ডঃ সেন কিছুটা যে চন্দ্রপন্থী ছিলেন তা বলা বাক্য্য। কেউ কেউ বলতেন তিনি ট্যানলিপন্থী বসন্ত: অস্ত্রার কাছ, অবিচারের কাছ, অত্যাচারী কাছে কখনও যাবা নত করেনি। তাঁর মত ভীষণ শত্রু বৃত্ত, ডেবলিগে আশ্রয়িতেন পুত্র আশকাল বিরল বীধনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে গিয়ে বহু বাধা বহু বিপত্তিক্রম করেছেন সহ্যতরনে। কোন অবস্থাতে ভেবে পড়েন নি। হুঁহুহু আগে এক মাঝে সন্তা বিয়োগে আঘাত পেয়েছিলেন প্রথম। কিন্তু সাধারণ

মত হুতাশ হয়ে পড়েন নি। সহ্যোদ্ভব কৰ্ণবান পুরুষ।

কিছুদিন পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের স্নাতকোত্তর বার্নার্ডি অধ্যাপক পদপ্রাপ্তির পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় মহলে নানা প্রতিদ্বন্দ্বি পর্বিত্বের স্রষ্টা হয়েছিল। নানা ঘটনা হয়েছিল। সবটাই জানতেন ভাল ভাবে। কিন্তু কোন দিন কারো প্রতি কোন কটাক্ষ করেন নি। কারোর স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথা বলেন নি। ভীষণ আশাবাহী। তোষামোদ, অত্যাচার বা আত্মীয় কোনটারই গুরুপতি নন। নিম্নতম কঠোর অন্তর সহ্য ছিলেন তাঁর প্রচেষ্টা শিক্ষক ডঃ জে পি মিলারী। শিক্ষকের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল পতীর বিশ্বাস ছিল প্রগাঢ়। তিনি বলতেন আবার শিক্ষক যিনি আমাকে মানুষ করেছেন তিনি যদি আমাকে নিলেই না করেন তাহলে "I do not deserve so." জা নিয়োগের সাথে তাঁর মনের দৃষ্টিভঙ্গী, স্বাভাবিক চিন্তাধারার পার্থক্য ছিল প্রবল। কিন্তু যোগ্য হাজি, যোগ্য শিক্ষকের সম্মান থেকে বঞ্চিত হলেন না। স্নাতকোত্তর বার্নার্ডি অধ্যাপক পদে নিৰ্বাচিত হলেন সর্বসম্মতি ক্রমে প্রায় ৩০ মাস আগে। কিন্তু আবার বাধা এলো। স্ট্রিকট বেকের ফরমান প্রকাশ হলো বেকীতে। মাত্র বেক মাস আগে ঐ পদে অধিষ্ঠিত হলেন, কিন্তু প্রবন্ধবোধের পূর্বেই হঠাৎ তুর্কিকশে সব অতল তলে গেল তলিয়ে।

বাহিরে কঠিন, শক্ত ও ঘৃণ ছিল সত্য, কিন্তু অন্তর ছিল অসামান্য উদার। তাঁর অন্তর সাথে একবারে এক মত ছিলো না আবার অনেকই। হাসে বা বাইরে বা ব্যক্তিগত অর্কের স্বর্গ বইত আবার সাথেই বেনী। আবারের তথাকথিত দাননীতিবাহিরের মত, হাজি বেকারের মত মতের পরিচালন লেই তিনি স্বপ্ন কিরিয়ে বা সত্য বল স্বপ্ন যেতেন না বা আত্মপ্রকাশ প্রকাশ করতেন না। তাই মতের গর্ববিল হলেও মনের দিল ছিল আবারের সাথে অতি নিবিড়। পতীকার বাস্তব সম্পূর্ণ বিপরীত মতামত দিয়েও আবার পেয়েছি কথার সম্মান। বুদ্ধি থাকলে বা সামান্যতম তথ্য থাকলেই হাজি-হাজীরা আশঙ্কিত কল পেয়েছেন। হাজি-হাজীয়েও জাশ্ব নিয়ে বেলা করার ছিলেন মোহর বিরোধী।

একটা ঘটনা মনে পড়েছে। কোন এক পরীক্ষক কোন একটি প্রশ্নের উত্তরপত্র মাত্র আধ নম্বর দিয়েছেন তখনতে গেলে তাঁকে বললেন "তোমরা কি ঈড়িপাল্লা নিয়ে নম্বর দাও? পরীক্ষক ঈড়িপাল্লায় কাজ করেন না।" ইত্যাদি। এইজন্য তাঁকে বিচার বুদ্ধি, পতীর মানবতা-বোধ আত্মকাল আদর্শের মধ্যে ক'লনের আছে?

অন্য বিদ্যাবাহী ছিলেন ডঃ সেন। বার্নার্ডি হয়েও তিনি আবারের সমাদর, মহাত্মত, পীতা উপনিষদকে কোন দিনই বিস্মৃত হন নি। আবারের বিদ্যালয়, বিবেকানন্দ ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিণীত। প্রতি কথা, বক্তৃতা, নিত্য নূতন গল্প স্রষ্টা করতেন। চমৎকৃত হতো সবাই। আলোচনার বিশিষ্ট ভঙ্গী বা আট আনা ছিল তাঁর। সাহিত্য, বর্ণন, বিজ্ঞান, গল্প, উপন্যাস বা পুরাতন বই পেলেই পাঠ করতেন পতীর আগ্রহে। ঐ ক'লিন আগে আবার চলি ছুটপাথ দিয়ে। সত্যের অনেক পুরাতন বইয়ের হোকান। আবার যেবেও যেখিনি। ডঃ সেনের সন্ধানী বুদ্ধি কিন্তু এড়িয়ে গেল না। ইংরে উঠতে গিয়ে কিয়ে এলেন। আবার অধিক। হঠাৎ দেখি পুরাতন বইয়ের হোকান থেকে স্নাতকোত্তর বার্নার্ডির প্রকৃতি বাস্তব অতি পুরাতন বই কিনলেন চল্লিশ টাকার। "এত দাম দিয়ে এই অতি অধিক বইখানা কী হয়ে সত্য?" "স্নাতকোত্তর বার্নার্ডি অধ্যাপকের কাছে স্নাতকোত্তর একখানা বই থাকবে না সে কি স্বকম কথা?" বইটা অনেক দিন খোঁজ করেছেন। হঠাৎ পেয়ে সে কি উল্লসিত হন! বেন হাজারবিধি কিয়ে গেলেন!

জীবনের প্রথম ভাগে মাত্র ২০ বৎসর বয়সে সাংবাদিক পত্র-পত্রিকার সম্পাদনা বা সাংবাদিকতাকে বেলা হিসাবে গ্রহণ করলেও শিক্ষকতার প্রতি পেশা ছিল প্রবল। কেউ কেউ বলেন "He is more a journalist than a teacher." কথাটার মধ্যে কিছু সত্য নিশ্চিত নাই তা বলছি না, তবে তিনি একবারে শিক্ষক এবং যোগ্য সাংবাদিক বললেই টিক বলা হয়। শিক্ষার প্রতি; শিক্ষকের প্রতি এবং ছাত্রের প্রতি তাঁর আন্তরিকতা ছিল প্রগাঢ়। তিনি কেবল ছাত্রবৎসল নয়, নিষ্ঠাবান শিক্ষক এবং শিক্ষক বৎসলও ছিলেন। জনহি একবার

তার গ্রামের স্কুলের এক দুঃখ শিক্ষককে কথিটি জোর করে তাকুতে চাইছিলেন। সংবাদটা এলো ডঃ সেনের কাছে। তিনি তৎক্ষণাৎ গ্রামে চলে গেলেন। বুঝিয়ে দিলেন কমিটিকে যে তাতা বা করছিলেন তা নীতি-বহির্ভূত। দুঃখ শিক্ষক কিয়ে পেলেন তার চাকরি। মনে পড়ে টিক এক বছর আগে ১৯৫৫ খ্রিঃ মেদিনীপুরের ওগরা থানা শিক্ষক ও শিক্ষা সন্মেলন হলো নেতৃত্বা নানক গ্রামে। এই সন্মেলনে কলকাতা থেকে অনেক জ্ঞানী-ভনী মহা উপস্থিত যাবেন স্থির ছিল। কিন্তু হঠাৎ বৌদ্ধের ভীষণতা পেল বেড়ে। তাই তারা মিথ্যাব্যব প্রচণ্ডতা সহ্য করে সদূর পল্লীগ্রামে বেতে পারবেন না বললেন শের দুহুটে। অথচ ডঃ সেন যে বেহু সাধারণ জ্ঞানী পাঠশালায় শিক্ষকের কথা চিন্তেছিলেন সেই বেহু নানক অনুবিধা

ভোগ করেও গ্রামবাসীদের উৎসাহ পান করতে আগো কুঠা যোগ করেন নি। শিক্ষার প্রতি শিক্ষকের প্রতি তার এই অসুখা অবিদ্যমৌর্য।

কর্মীর ডঃ সেন। অতি কৈশোর থেকেই তিনি নানা প্রতিষ্ঠান গড়েছেন। তার প্রতিষ্ঠিত 'মহাশক্তি' সেবাশ্রম' আশেও হুঃস্বপ্নের সেবার অনুনিয়োগ করে। এ ছাড়া নানা প্রদিক-কলাপ সংস্থার সাথে ছিলেন জড়িত। রূপ, ভাবের মৈত্রীসংঘের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে উচ্চ হেপেট মধ্যে প্রেম ও জীতিব বন্ধন বৃদ্ধ করতে অগ্রণ চেষ্টা করে গেছেন। এ ছাড়া সলমত নিবিশেষে ছাত্র দূর নানা সংস্থার সভাপতি এবং উপসভা ছিলেন ডঃ সেন। যথার্থ বুঝীরা বলতে কি বোঝায় ডঃ সেন তারই এক উজ্জলতম নিদর্শন।



হিলের সংসার কেবা
সংসার!

যুব-বংশী রক্তম-হিল
হান্নাঝান্নি হুওয়াটা
সংসার উপটে আপন
হাওয়া। ভূত প্রেত
মাকাল মাদ্রব দিয়া,
এত সংসার হিলখোলা
বিচিত্র হবে, তার রঙ
স্বাক্ষর্য কিলে যোরে
পল। তখন আর
কানও বকনের সংকোচ
নই, মুখে পেল সকেছ
মৌহ করা। হাড্ডাল
হকটা হকরা কবায় উপরুত ম্যাকমেড়ে নব্ব। তখন
মু মুখ ঝাঁকানো আর হুঁংখরার পালা, হিলের তখন
ত বেহিরে পড়ে।

ঐক্যকটীন্দন মিল মহারাণের হিল কিছু বেবা
বত। ৬০ হিলবানি হিল ওর গৌকখোড়াটির দুই প্রান্তে
পট বেওয়া। হরিয়ার দাগবাঝীতে দিট মুখ হিল
ঐবাত যোরে পেল। নিস্তাখ হৈব-হুবিলাক বনতঃ
টিল ব্যাপারটা, মিশিরঝী কিছু সে জন্তে হরিয়াকে হাটী
হরলেন। বহকা অমন বেলে না উঠত বহি হরিয়া,
গ্রাহলে মিশিরঝীকে ঝাঁটার চুকতে হোত না। বাতিল
হাওয়া তটকী মাছ ছিল ঝাঁটার মধ্যে, তটকী মাছ অতি
হুঁহু জানোয়ার সাহে বতকণ তটকী না হয়, ততকণ
হামকায় কাটা ছুটরে বের বা ল্যাঙ্কের আগটা যাবে।
ও সব শরীরিক বহকা ঐহিতে পারলে সওয়া যায়। কিছু
হলের মাছ তাড়াত পৌঁছে একটীবার তটকীর আভে
উঠলে তখন তার ধার কাছে বাতরাই মুলকিল। বাসে
প্রথমে বর্ষে আঘাত হানার পক্ষি হোয়েছে তার তখন,
হাস নিতে গেলে সে আঘাত নিতেই হবে বর্ষের মধ্যে,
কিন্তুভেই পরিগ্রাণ নেই।

তটকী মাছ মিশিরঝীর সঙ্গে বহকা করে বসল।



প্রতিকৃতি হিলারঙ্গের পরমর্শিতা
ঐশপূর্ণার স্মার

সংসার হুওটাও বাবা পড়েছে এক অদুত শত্রুর হাতে।
ইচকা ইচকি টানাটানির চোটে হুওটাকে বদন খালস
করে আনেন, তখন হোটে হাত ধিরে বেখেন—

বেখেন আর কি! পৌঁকের বরলে হুওটা কাটা,
হুওটা কাটার ভগায় হাত ঠেকলে তার মেলাক ঠিক থাকে।
বেবালা বেড়ে বদন বেলে অতি বহবৎ বাত সব বেরতে
লাগল। হরিয়ার বহাত ভাল যে তার কান নেই।
থাকলে নিস্তাই কান দুবানি হাতুল যোরে উঠত। হেলের
অবান অলেও আত্ম আশাতে পারে।

একজন বালাসী ভাঁড়ার বব থেকে তটকী মাছগুলো
বাহর করে বহবানি বোঝার ব্যবস্থা করছিল। এক বাতিল
মাছের এক ধারে আটকে বয়েছে মিশিরঝীর গৌক।
বহর করে সেই গৌক ছাড়ালে সেগান থেকে বালাসী
ছোঁকরা, ছাড়িয়ে মিশিরঝীকে প্রত্যাপন করতে গেল।
কে বহ। মিশিরঝী এক-টানে তাঁর হিল মুখ গৌক
হরিয়ার বুক বিকল করলেন। করে হিল-বোলসা
বেটু পাইতে লাগলেন।

একই বাবই অবন সকলেই হোয়েছেন। তবে হিলে
চোটে পেয়েছেন কেবল মাত্র মিশিরঝী মহারাণ।

পরমানন্দীকে বেঁধে মনে হোল, বন্ধ বেনী রক্ত
খাঁছনি বেয়েছেন বেন। কলে তাঁর অভ্যাগারে সেই
পথম পর্বার পাত্রে সেইটুকু আছে, তা থেকে মহাত্ম্যোক্তিটা
আর তেমন ভাবে কুটে উঠেছে না। বাইরে তেমন
পরিবর্তন দেখা গেল না, শুধু কপালের ওপর ছোট্ট ঝাঁট
একটা কালো ঝাঁব গড়িয়ে উঠেছে। বললেন,—“তুই
কুহুধের ছাল পেছে বানিসটা করে, আলা করছে। ঐ
ছোট্ট ঘরে পুরে বরফা বন্ধ করলে বকরীও মরে যাবে,
আবহা ত মায়ব। মাস্ক বসেই পোক ছাল চুলের ওপর
দিয়ে কাটল কাঁড়টা। তা আপনারা কখনে কেমন
করে ঐ ঘরে ঢোকো থেকে পরিচারণ পেলেন?”

দুহাত ছোঁড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললেন—“তাও ঐ
হরিয়া-বাবার হরার। প্রাণ পক্ষীটিকে খাঁচাছাড়া করবার
কনো খাঁচার মধ্যে ঢুকতেই হবে, এমন কোমণ্ড কথা বৈই।”
পরমানন্দীর ভেতর মহাত্ম্যোক্তি-আবহ চাকা
হোয়ে উঠল। জুতসই একখানি গার ঘরে কেললেন
তৎক্ষণাৎ—

পক্ষী যে—

পক্ষী, কাছে হোত উলাস।

তু তোড় না বন কি আশ।

পক্ষী, কাছে হোত উলাস।

অত্যাশ্চর্য কাণ্ড! হঠাৎ একটা চোজবাতি লেগে
পেল বেন। পাকী নই, ডানার নই, উড়ে যেতাবার উৎকট
সব কখনও উঁকি মারে নি মনের মধ্যে। তু উড়লাম।
কি যে ছিল পরমানন্দীর কঠে, তা ভিদিই জানেন।
‘পক্ষী যে—’ টানটি দেবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন বেন হালকা
হোয়ে পেলাম। সলাসরা ধরনীর আকর্ষণের বাইরে
পৌঁছে হাওয়ার কলে চললাম অনন্তের পানে। পথ
পরমানন্দীর কঠের সুর। সুর দিয়ে অনন্ত পর্বত পথ
বৈবে ফিলেন পরমানন্দী। ভাসতে লাগলাম সেই
অনন্তের পথে আর তনতে লাগলাম—

যে খাঁচায় আছি তার উঁ

এক নকশা লাগি আর উঁ

পিঁপড়া লে কর, উড় বা পক্ষী

বা সাগর কে পাশ।

পক্ষী কাছে হোত উলাস।

ঐহাঙ্গ্য অভ্যাগারে কভার করে কত কি তপ অপ দ্য
বারণ। করার প্রয়োজন হয় বলে তুনেছিলাম।
ঐহাঙ্গ্যকে শুধু মাত্র পলার কসবতে এ ভাবে কটা
কটা মাত্র, হোঁচড়ে হোপের মত সেই ঐহাঙ্গ্য অর্থে
করে চাপিয়ে দেওয়া যায় এ সব কে জানত! যদি
সেল, নৌকা সেল, জুত ভবিষ্যৎ বর্তমান কিছুই হইল ন
এমন কি এক হাত সামনে বসা স্বয়ং পরমানন্দী
ঐহাও হোয়ে পেলেন। হইল তুই সুর, সুর আর বর্ণ
পিঁপড়াটার আকণ লাগিয়ে যে, পাখাগুলো ছুড়িয়ে যে
তোয় ছাই বক হোয়ে উড়ে পৌঁছে থাক তাঁর কাছে।

উঁ, আউন উঁ, কর

আগ্, লাগা যে

কু যে পিঁপড়া

পাশ বতলা যে

রাখ বতলা বন কর পক্ষী

পৌঁছে উনকে পাশ।

পক্ষী কাছে হোত উলাস।

অনেকক্ষণ উড়লাম মন আকাশে, ‘উনকে প
পৌঁছতে না পারলেও এমন এক স্থানে পৌঁছে গে
বেখানে পিঁপড়া পৌঁছতে পারে না। করার কথা
কেনেছিলাম পরমানন্দীকে, প্রাণ পক্ষীকে পাঁচাছ
করাবার তথ্যটা বেহাত বসিকতা করেই বলে কে
ছিলাম। পরমানন্দী হাতে হাতে মালুম দিয়ে দিয়ে
প্রাণ পক্ষী খাঁচাছাড়া হোয়ে উড়তে থাকলে তারা
কেমন হয়, স্তম্ভ স্তম্ভ তাকিয়ে দেখলাম। বৃক্ষ-
ব্যাপারটা বুঝ হালকা হোলেনও নিভেছাল আ
ব্যাপার নয়। উড়তে যদি থাকে প্রাণপক্ষী অনন্ত মূল
অবলম্বন করে, তা হলে কুণ্ড বেননা যেমন পেছনে
থাকে, আনন্দটাটি তেমনই অকোঁড়ে হোয়ে যায়। তা
নিরানন্দের নাগালের বাইরে কোলাও যদি সেই ‘উন
থাকেন, তা হলে ‘উনকে পাশ’ পৌঁছলেই বা কি
হবে। সুর, তা সে যেমন সুরই হোক, শুধু সুর স
করে কোন পক্ষী অনিহিতকাল উড়বে। পিঁপড়া পে
ছাই বতলা বনে উড়তে থাকলেও অনন্তকাল সেই ব
সুরের আকাশে ভাসতে পারে না।

অনিবার্য পতন বোধ করা গেল না। ভয়ের চা

ক'র বাবু সবে সবে সেই কাঠের নৌকার কাঠের টাঙনের ওপর সন্নিবিষ্ট আছাড় ঘেরে পড়ল। দু'দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল। একবারে, এক প্রাণী নৌকার ওপর। ওপর দিকে ছুঁ ছুঁল বেবলায়, কবানি পালও নেই। জ্বরও অনেক ওপরে আকাশের ঘরে ফুলো মাঝি'র ঘিরেছে কে। সেই ফুলের তেতর এক মুঠি একটা হীরে মনি ফুলের চিকচিক করেছে।

ঠাণ্ডার করতে লাগল। না। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি। কই সময় চোখ বুজ থেকে আবার চোখ খেলতেই সন্দের আঁধার কেটে গেল। বেবলায়, বাজীরা সবাই ঘিরে রয়েছে। কাপড় চাপা ফেঁদা'বে বসে পড়া লম্বা গায়ে আছে আমার শিরের দিকে সে বসে উঠে বসে। কাপড়ের তেতরে থেকে খোঁ খোঁ খুঁ। ক'র বেয়ে পথ উঠেছে। অবন বিহুতে জ্বলন্ত গাওয়ায় ছুঁ তরিত পান লোকের রস থাকলেই হেরে। জ্বরীর ওখানে এক গাছ। বাছি ফুলী পাকিয়ে রয়েছে। ঐ ওখানে ক'ল তোমার বাসিন্দা লোকেরা কোলা যা পেতে পানী বুকে। বুকে' নিয়ে জ্বলেছে। উকেকেরী'র মনি মিনি'র পাটা'র ওপর বা'তন না। এর স্থান গালের মধ্যে বাসিন্দা ওপর। নিম্নই তিনি লম্বা নিম্ন। বিজ্ঞান। পরমানবী কোণার পথ। জেন, জানা নেই। ছ'রাত নৌকার ওপর কেটেছে। অবন হাতটা জ্ঞান হোয়ে ঘুমিয়ে, দ্বিতীয় হাতটা কানের সঙ্গে যুক্ত। তৃতীয় হাতে বেগে উঠে মন জীবনের খোঁজ বসে নিতে গেল। ঘিরে এক বন ফুলের। আর হাতের সব গেল কোণার। এক প্রাণী এই নৌকার ওপর। হাতের বসে বসে দিন রাত ঠাণ্ডার ঠাণ্ডার বেগে বসে' ছিল, তারা এক বন গায়ে। হাল কি রে বাবু!

ছ'রাত করে উঠল ফুলের তেতরে। সেই সবে আর ক'র আঁধার বসল। নর-বাস, জেঁড়ার গলা ওঘিরে ঠাণ্ডার বেগে। পত্নী হাতের ফুলের বেগে ফেঁদা'র নো সারা বিনটাই নৌকাওয়ালা'র নৌকা'র দিকে সবে বেগেছে। সেই ফুলের তেতর হাতের হাতের। ক'র বেগে ফেঁদা'র দ্বিতীয় হাতের হোয়েছিল। ঠিক ছিল, লম্বা

নিম্নই ঠিক লম্বা'র সময় সন্নিবিষ্ট হোয়েছিল। হোয়ে বেগেছিল, আবার সবাই ঘুমিয়ে। এক টানা বন হাত নৌকা ঘুমিয়ে থাকলে গলা ওঘিরে কাঠ হোয়েই। আসে ক'ল বাসিন্দা'র গলা হাতের। এক লোটা ক'ল জেঁড়ারী হাতের কাঠে নিয়ে ঘুম। নর'র করে বেবলায়, লোটা—উপুত ক'র। রয়েছে এক পাশে। জ্বর'র জেঁড়ারী আঁধা কয়েছিলেম, লম্বা'র পবে ক'ল জেঁড়ারী বামালো এবং তা'র ওয়া হোয়ে। তারপর পোষার সময় এক লোটা ক'ল হাতের কাঠে হোয়েছে। সবই জুড়ল হোয়ে গেছে ঘুমের হাপটে। সারা রাত জুড়ানের দাপট মন্য করে ঘুমের হাপটকে টেকানো লম্বা ক'র।

উঠে গড়ল। নিচে খেলের মধ্যে বাসিন্দা গাওয়া বগালো আছে দ্বিতীয় জলের কলী। আসে এক লোটা ক'ল জানা থাক। তারপর নৌকাওয়ালা'র খোঁজ লম্বা হোয়ে।

উঠে গাড়াতেই নর'র পড়ল নৌকার পোষার ওপর। সেই অনেক উঠতে ছোট বন'র হাতের ছোট মাটা'র ওপর হালের মাঝার হাত বেগে দ্বিতীয় হোয়ে আছে এক জেঁড়ার মুঠি। আমলের সাহেব নিম্নই ঠিক জেঁড়ার আসে। বাকী সবাই ঘুমিয়ে থাকলেও ত'কে ঠিক জেঁড়ার থাকতে হবে। একলা বসে আসে হালে। নিম্ন একলা। কি তামাক একলা ঐ মাছ'র, তা'র কেউ না আসলেও আমি জানি। হালে বসে হরিয়ার পানে দ্বিতীয় মুঠিতে তাকিয়ে আসে। কিবা আলো কিবা জেঁড়ার, ঐ কাঠেই তাকিয়ে থাকেন। আশার আসে, হরিয়া একদিন ত'কে থাকলে বেগে, কোণার পালিয়ে বেল ত'র পুর মেনের করে।

ফুলে গেল। তেঁটা, পায়ে পায়ে ঘিরে দি'কি ঘের উঠল। ওপরে। ক'র কাছাকাছি পৌঁছে বাসতে হোল। ঐ কি। আমলের দ্বিতীয় ত'র।

সেই জেঁড়ার মুঠির তেতর থেকে বাস'র গলা বেগল —“কাকে বুঝে? জমাল'কে? তা'র সবাই নেমে গেছে নৌকা থেকে, ওপ টানছে। তামার হাতটা ওপ টানে এগতে পারলে দকালে বাস'র হাতের নামতে পারব। পাতিটা হাতের না থাকলে হয়। পানি থাকলে ওঘের

উঠে আসেঃ হুবে নৌকার। তা'হলেই দুশকিল। বার-
বহিরাহ পৌছতে সেই দুখের ঘোরে থাকে।

গুণ টানছে।

চারিদিকে তাকিয়ে খাঁস কেলেতেও ছুলে সেলায়।
সমুদ্রের তেতর গুণ টেনে এগিয়ে যেমন করে। গুণ টেনে
নৌকা নিয়ে যেতে যোগে পায়ের তলায় মাটি থাকে চাই।
গাঁতরাতে গাঁতরাতে কি গুণ টানা যায়।

কোনও দিকে কিছুই নজরে পড়ল না। আকাশ
কুণো মাথানো, সমুদ্রটা যেন রেড়ির তেলের সমুদ্র, এতটুকু
নরকে ঢেকে না। বারো কপালী হুলস্থূলি পুড়িয়ে সমুদ্রের
হুকে-নেচে বেতান, তারা সবাই লুকিয়ে পড়েছে।
আকাশে সমুদ্রে জড়াজড়ি করে ঘুমিয়ে রয়েছে যেন।
কালঘুম, কালঘুমে গ্রাস করেছে বিশ্বচরাচর, কার সাধ্য
সেই ঘুমন্ত সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকবে।

ওরা কিছু শুই ঘুমন্ত সমুদ্রের হুকে গুণ টানছে। হেথা
পেল না। তাহের, হাফেলের মাথায় বাঁধা পাঁচ সাত গাছ।
হড়ি বেঁধা পেল। হড়িগুলো হাফেলের মাথা থেকে সোজা
নেমে গেছে সাগর গর্ভে, নৌকার সামনে অনেক দূরে—
কোথায় গিয়ে অল হুবেছে হড়ির ডগাগুলো। সেখানে
যরছে তারা, বারো নৌকার ওপর আবারের সবে ছিল।
আবারও হাফেল আমবাও মাত্র। তাবা নেমে গেছে রেড়ির
তেলের সমুদ্রে, নেমে নৌকা গুছ আবারের টেনে নিয়ে
চলেছে।

সমুদ্রের পানে তাকিয়ে থাকে পেল না। চোখ বুজে
নিজের পানে তাকাতো গিয়ে আরও বিশেষ পড়ে গেলাম।
সমুদ্রের চেয়ে যৌক্তিক হেথাল নিজের আসল স্থিতিটাকে।
আড়াআড়ি সিঁড়ি বেয়ে নেবে পড়লাম। বুঝ সাবধানে
হড়ি বড়া হাফেল বাল উপকৈ ডিঙির পৌছলাম নৌকার
মাকের তলায়। পৌছে অনেকটা হুকে সমুদ্রের মধ্যে
বুঁজতে লাগলাম তাহের। কোথায় কি, হড়িগুলো যে
কত আগে গিয়ে অলে নেমেছে, তা মোটে আশা করতাই
পারলাম না।

বসন্ত তেতে উঠল। ওরা আবারের ঠাঁওয়েছে কি।
ছলো খোঁড়া পলু না বকরা-বকরা আমবা যে ওরা ওদের
হাফি হাফিক টেনে নিয়ে থাকে, আর আমবা ক্যাল-ক্যাল

করে তাকিয়ে থাকবে। বল বেঁধে নেবে পেল বখন নৌকা
থেকে, তখন আবারের আনিরে পেল অ কেন। আমবা
সবাই কতি গোক। মাকি।

কামকে বরলাম ট্রাট, নিহাফেল আকসোসে বম আটকে
এল। ওদের কাছে পৌছতে পাঁচশত ওদের যোতান বার
যে আবারও হাফেল, ছলো হাফা পলু-হাফেল নই। কিছু
ওদের তখন নাগাল পাবার উপায় কি। চুপ-চাপ
হাড়িয়ে বইলাম সেখানেই, হাড়িয়ে বরবার সবে হাফতে
লাগলাম।

হঠাৎ কি যেন একটা হুপাৎ করে পড়ল হাফেল ওপর।
আর একটু হোলোই উড়িয়ে উঠেছিলাম আর কি, বুঝ
লাগলে সেলাম। তাকিয়ে ঠাঁওর করে বুঝতে পারলাম
ব্যাপারটা। মাকে মাকে এক একটা গুণ তিল পড়েছে,
নাহতে নামতে সেটা নৌকার ওপর এসে ঠেকেছে। একটু
পরই আবার লাকির উঠেছে ওপরে, আবার পড়েছে
হাড়িতে টান, টানের ডোটে নৌকা এগিয়ে চলেছে কি না
যোকা পেল না।

তাকিয়ে আছি হড়িগুলোর দিকে উর্ধ্ব মুখ করে।
হাফিক বাবে আর এক গাছ। হড়িতে তিল পড়ল, নেমে
এল প্রায় নাগালের মধ্যে, লাকিরে উঠে হু'হাতে ববে
কেললাম। বরবার সবে সবে আবার পড়ল টান, উঠে
গেলাম অনেকটা ওপরে। হুলতে হুলতে পৌছে সেলাম
জলের ওপর, পায়ের তলায় কিছু নেই। একেবারে
মহাবাহু ত্রিশকর হলা, স্বর্ণ মর্ড কোনটার সমেই
সম্বন্ধ নেই।

কতকাল কেটেছিল ত্রিশকু হোরে বলতে পারব না।
বম বম করে হাতেও মূর্তা হু'হাটায় ফিল প্রায় নদর্শন করে
টিকে বইলাম। তারপর এক সময় টেব সেলাম যে আছে
আছে জলের মধ্যে তলিয়ে বাছি। " বল কামের হাফেল,
হুক হাফেল, গলা পর্যন্ত পৌছে পায়ের তলায় কি ঠেকল।
তারপর হড়িটা এককম তিলে হোয়ে পেল। হু'পায়ের
ওপর বাকি হোয়ে বম কেললাম। হড়িটা কিছু কিছুতে
হাড়িলাম না। হড়িই তখন জীবন, জীবনটা হুই মূর্তার
মধ্যে। মূর্তা কসকালেই সব কলসা।

কবলা হবার আগেই এক কলসা তনতে সেলাম।
টিক হাড়ের কাছে কে বললে— "ঐ বমি হবে গাঁতায়

হাত। অসমি এগিছে চল সান্নিধ্যের নিকটে । হু'হাতের দুটোর বাগিরে বরা ত হু'বের কথা ।
মৌকা এসে পড়েছে । এখনই চলো পড়তে ।
বেগবার আর বরকার হোল আ । হু'হাতের দুটোর বাগিরে বরা ত হু'বের কথা ।
বরলাম হু'টী, হু'হাত চা'লু হোয়ে বেল ।
পেনে হু'বানা হাতই কতক লাগাতে বহ ।

সেই হাত হু'বানা এখন পর্যন্ত অতি বিবর্ত-বহু
আমার । তারের একখানার দ্বাৰাযে এখন আমি সঁতার
কাটি । তবে সেই সমুদ্রটার সবে এখনকার সমুদ্রটার
কোথাও একটু মিল নেই । এখনকার সমুদ্র-তখনো টা টা
করছে, এক কোটা জল নেই । এই জাবনার সমুদ্রের হুল
কিনারা বুকে পাওয়া যায় না । মনে ক'বাতোকে মনের
মত ক'বে শুনিবে বলা কিছুতেই সম্ভব নয় । জাবনার
সমুদ্র এই এক হাতের সঁতার কোনও কালেই আমাকে
কোনও স্থলে তেঁড়াতে পারবে না ।

হু'হাতে সঁতার কেটে সেই হাতে পৌঁতেছিলো মন
ওহে ক'ছে, তখনও মনের ক'বাতোকে মনের মত করে
বোঝাতে পারেনি ওহে । কোন মৌকা বেড়ে নেবে
সেলাম কলে, কেন তখন বহুত সব চাপল আমার ঘাড়ে,
কেন মন পেরিয়ে সাধন দেখাতে সেলাম ইত্যাদি
ইত্যাদি এক শ' বহুতের কৈকিরের আঁচে সমুদ্রের
মানবনে এক বলা কলে ঝড়েরেও বহুতের তেঁতে
টুটু'কিল'ম । 'ত'ত'ত' নৌকার তপক আমার বহন করে
এসাম, তখন এঁতের কাঁচের ক'র নাফাল বোলান না ।
সকলবই এই এক প্রস, বানকা অর্ধেক হাতে অজানাসমুদ্রে
কি নিয়ে পড়েছিলে কেন, তার সমুদ্র লাগে ।

সমুদ্রেই আঁঠি পর্যন্ত ডিঙিতেই বুঁজে সেলাম না,
জাবনার সমুদ্র এক হাতে সঁতার কেটে কিছুতেই
কোনও নিকে ফুলকিনারা হুঁতে পাড়লান না । সমুদ্রায়
সমুদ্র ক'ব কাটে ।

সত্যা ক'বাতো কিছু মননের কাছেরে সেলা জাবার
বলনার তেঁতা করেছি । বসেছি—কলে পড়বার ওটুকু
সব মনের কোনেও মিল না আমার । কলে পড়তে
হবে বুকে পাবলে সেই ক'বাতোকে কিছুতেই হু'হাত

পারের কলার সেই বেড়ির তেলের সমুদ্র । জাবনার
হু'হাতে চিল পড়ল, সান্নিধ্যের সমুদ্র পড়ল ।

সোফা জাপান, বুকেতে কারও এতটুকু কই হবার
ক'বা নয় । কিন্তু এত সমুদ্র কি কাঁচের সমুদ্র করতে
পারা-বাহ । মেল কেন মেতলা মেল ইচ্ছে করে মনে
ক'বনি ছুনি, কিন্তু এই হু'হাতটো বরা মনেতে সেলে
কেন ? কি মননে অর্ধেক হাতে চুপিচুপি টুটে গিয়ে
নৌকার তপ করে চুলছিলে ।

কটা কের-ক'বাহ কোগাব । জগত্যা হু'ব বুকে
কলেছিলাম । এখনও সেই হু'ব বুকেই আছি । হু'ব
হু'বে-জাবি, মৌকার ওপর পরামর্শকে ভৈরবী বে
ক'বনি হাতলেছিলে, সেইটেই বোঝ মন সত্যিকারের
ক'বনি । সাধা জীবনে আটকিতে আলটপকা বহুতলে
ক'ব বটেছে জাব পেছনে নজ নজ কাণে আছে
হু'নিমিত্ত । ক'বোর আসে কাণে না থাকলে ক'বোর
ক'ব মরা বার । 'সুতরাং আমার প্রতিটি ক'বের ভিত্তি
ভৈরবী সেই ভিডি'লতা । ভৈরবী অতি সংক্ষেপে
কলে পড়বার যেটুকু বলে ফিরিয়েলেন—'কৃত' আছে
ক'বাতো । ক'ব ক'বে । সেই-কৃতটাই ক'বে চা'লির মিলে
ক'বকার । কৃতের চিত্তে ক'বন কি মননের উত্তর হবে,
'ক'ব ক'বেই বসতে পারে ।'

সুন্দর পরামর্শকী পরম পরিভূত হোয়েছিলেন কি
আ ; তা বুকেতে পরিচিতি । আমি কিন্তু এখন পর্যন্ত
পলিয়েক সমুদ্র-বেগের আছি । অনেকটা নিত'ভাতে
আসছি বলা যায় । জীবিতের ভিত্তি কিছু মনে পেরোয়
ক'ব'না-অজানায় বে-সুতের জিহবার । বর্তমানটুকু
মিলে পরমানকে আছি । বর্তমান হোল হাতের পাঁচ,
বেইবাদি করে না ক'বনও ।

আবার দু'জনে ইংলণ্ডের
পথে পা বাড়ান। ইতালির
সেই অকলস হেঁড়ে যেতে
লগেন্সের মন চার মি। ওর
ও বোস হয় আমার মন
হাথলার জন্যই হাতী
হয়েছিল। হেসে-বেসে

লেডী চ্যাটার্জি'র বন্ধক

অনি-এলোপিক্স



চোখের কথা দেখবার তাগিদে আমি ব্যস্ত-হয়েছিলাম
ঠিকই। মূখে বাই বন্ধক-মাকে-বুকে লগেন্সের কবি
মন স্পর্শ করেছিল। আমি আপনাই করিনি এমন পরভাসে
ও এই কানায়রটুকু কেনে কেনে। সে-নিরোহিন
আমায়ই মনটুকু সিনে। এর জন্য আমি যে বিভাগিত হইছি
তা নয়। মনে হয়েছে প্রিয়-পরিবেশ থেকে অকলস হাতকে
ভোত করে ঠোঁটে দিয়ে গিয়ে ভাল করিনি। এক কথা
মনে হত বন্ধই দেখতাম লগেন্সের সাহিত্যসৃষ্টির স্রোতে
হঠাৎ ভাটার টান এসে পড়েছে।

পরবর্তী জীবনে দক্ষ ঘটনা'কার করে নিজের তুল
বন্ধুতে-পেরেছি। সেদিন-আমার-দিক-থেকে-ইংলণ্ডে
যাবার ভাগিন ছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিছু লগেন্সের
মনেও আরও কিছু কম হিছবা। ও ১১ই জুন-তারিখে
এক বছকে লিখেছিল—Sons and Lovers গড়ে
তোবার কেনে লাগলো? অবিলম্বে তোমার বজানত
চাই। এর-দ্যে আর কিছু সমালোচনা যেরকম নাকি?
সাইক্লোপলসো শুনছি প্রথমে বইটা নিতে-রাজী-হয়নি।
আমি এক লজ্জাবোধে মতো গবেষক, গবেষণা-বহু ইংলণ্ড
পর্বত প্রসারিত হয়ে। তবে কারতুক-কিছু মনেনা...
এই চিঠির মধ্যেই ওর অন্তরের তথ্যকালীন তাঁর আলোড়ন
লুকিয়ে আছে। গভীর অভিজ্ঞতা-আর বিবিধ-অনুভূতি
দিয়ে গভা, শিল্পীর অশেষ দায়বদ্ধ রকম Sons and Lovers,
কে নিয়ে লগেন্সের ভাবনার শেখ-ছিল না। পরবর্তিকে
আমরাই লিখেছিল—ইংলণ্ডের যে কোনও লেখকের চরম
কালজরী সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষমতা অসম-অনেক-কেনে।
Sons and Loversই ওর সেই কালজরী সাহিত্য, অসম-
সেই সময় ওর মনে এমন একটা ধারণা বহন-হয়েছিল।
সুতরাং সেই বই প্রকাশিত হওয়ার পর ইংলণ্ডের পাঠকের

মন, ইংলণ্ডের সাহিত্যিক-
সমাজে তার প্রতিভা
শব্দকে দেখবার জন্য ওর
পক্ষে ব্যস্ত হওয়াই স্বাভাবিক
বিশেষ কোন সমালোচনার
সংসার বার বার লিখেও
পাচ্ছিল না, না বহু-বাহুর

না পরিচায়। এই অবস্থায় ওর মত ছোট্টো মানস কলমও
সেই অকস্মিকের নির্বাচন পরিবেশে চুপ করে বসে পানতে
পারে। বিশেষ করে বসন পূর্ব অভিজ্ঞতা মোটেই
উৎসাহিত করার মত নয়। সে বাসেই হো বর এসেছিল
যে Love poems and others দ্বারা একশো কণির মত
বিক্রী-হয়েছে।

এ ছাড়াও আর একটা কারণ ছিল। সেটা হচ্ছে
আমার ডাইভোর্সের কারণ। এখানেও সেই ওর মনের
কথার সঙ্গে মনের কথার কলহ। মূখে মতই হ'ল মনের
আল বন্ধক আর মোর গলায় বন্ধক—এক মনু জীবনের
আশ্বাস-আশি তোমাকে এনে দেব, অন্তরে কিছ, এই
অসম্ভাবিক জীবনের প্রতি ওর দাবি ছিল না। হঠাৎ
আমাকে-কেবল করে একটা আশঙ্কাত ছিল। তাই
ব্যক্তিগতভাবে তথ্য করে ডাইভোর্সের কারণ আর একটা
বিশিষ্ট-কথাও ছিল ওর ইংলণ্ড প্রবাসের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ইংলণ্ডে অভাবনার অভাব হল না। আমরা দু'জন
মিসেস আর ভের্ডিত গার্সেটের অতিথি হলাম। ২১শে
জুন-তারিখে অর্থাৎ ইংলণ্ডে পৌঁছেই লগেন্স এডোয়ার্ড
গার্সেটিকে লিখন-ভাক-ওরারের কেজা পঞ্চম পাউণ্ড
আর তোমার সময়ে সঙ্গীত সমালোচনাগুলো পেয়ে
বুঝে-বুঝি হয়েছি। লগেন্স মতই ব'লী হয়েছিল।
Saturday Review, Saturday West miscer, Gozette
Academy Athenanum ইত্যাদি পত্রিকায় Sons and
Lovers সম্বন্ধে প্রশংসামূলক মতব্য পড়ার পর কোন লেখক
বা ব'লী হয়। ইংরেজ-সাহিত্যে নতুন প্রতিভাকে সেদিন
স্বীকৃতি দিতে কেউই কাপ'না করেনি। বিবৃশ মত যে
একেন্সেই ছিল না তা নয়। ওর দাবি মিলেও রসিক
দাব্য-শব্দ বিমোহিতই হয়নি, বিশিষ্টও হয়েছিল।

আকাশে নতুন দিনের সূর্যেরে আবাহনের মূহুর্তে
আদমের অ.ভালে এই বিশ্বের লুক্কিবে সাক্ষার কত
বিশ্ববর সাফাই না হইবে আরে ইতিহাসের বৃকে ।

১৯১০ সালে ইংলণ্ডের সাহিত্যাকর্ষণে ভাস্কর সেই
সূর্যের নাম ডি. এইচ. লয়েস, Sons and Lovers এর
লেখক । সাহিত্যের আসরে-সম্মানিতের স্বানতরু তখন
লয়েসকে ছেড়ে দিতে দবাই ব্যত । English Review
এর সম্পাদক অস্টিন হ্যারিসন গল্প লেখার জাগ্রিত ছিলে,
একরা পাউণ্ড নতুন লেখার প্রার্থী । এইই যথো এলো
এডোয়ার্ড মর্গের কাছ থেকে পাঁচ পাউণ্ড—Georgian
Anthology তে কবিতা প্রকাশের পারিভ্রমিক । একদিন
ইউইটভের কল্যা বর্নর পরিবেশ থেকে লণ্ডনের বিরাট
বিশ্বারে গাঁড়ির ভরে ভরে চোখ মিটমিট করে চাকপাশটা
লেখবার চেষ্টা করেছিল তরুণ লয়েস । যাবে যাত্র করে
বহরের ব্যবধান । এইই যথো কি প্রভু পট পরিবর্তনই
না হলো । হঠাৎ দেখা ফেল সাহিত্যের আসরে গাঁড়িরে
আরে সর্বসম্মানিত অর্থাৎ লয়েস, তারও ভাবা ভাবা
চোখেচমকে উঠেছে এক বিরাট বিশ্ব ।

Sons and Loversকে কেন্দ্র করে পাওয়া অম্লত প্রণয়ের
গল্পে গল্পে অবিস্মরণ্যভাবে লয়েসের বহুত্বের পরিচয়
বিজ্ঞত হচ্ছিল । গায়েট পরিবার তো ছিলই । এরপর
প্রথম না হলেও প্রথম হল জন্ মিডলটন যারে আর
ক্যাথারিন হ্যাপ্পিন্ড । Rhythm পত্রিকার মূব-সম্পাদনার
দায় লয়েসের গল্পে হৃৎকনের চিঠিগতের আশানুমান
হয়েছিল । এইবার লণ্ডনে গভিরাটা প্রসঙ্গ হল । Rhythm
পত্রিকা উঠে গিয়ে তখন চলছিল Blue Review পত্রিকার
মূব সম্পাদনা । যারের মধ্যে লয়েস সম্ভবতঃ নিজের
শৈশব আর কৈশোরকে কিছু পরিমানে খুঁজে পেয়েছিল ।
পর্যায়ের ছেলো যারে কল্যাণপন শেরে অক্সফোর্ডে পড়েছে,
শিক্ষাতে যথো নিজেই সাংবাদিক আর সাহিত্যিকের
চুপা. অর্থাৎ বাউজেনের শ্রী ক্যাথারিন হ্যাপ্পিন্ডকে
দাঁচ সাত বছর সাহচর্যের পর পরবর্তী বিশেষ
পেয়েছে । এমন অম্লত মানব অম্ল আচর্য বকন মূহুর্ত
ভরুককে লয়েসের ভাল না লাগলেই বরক অম্লার হত ।
আর ক্যাথারিন । ওকে দেখে মূহুর্ত না হবার উপায় ছিল
না । মূহুর্ত মূহুর্তী বসেই বসিছে না । সব কূলে গর

থাকে না. সব মূহুর্ত মূহুর্ত না বৃদ্ধির আলোর উল্লস ।
ক্যাথারিনের ছিল, ছিল মূল আর বৃদ্ধির মূলমন্ত্র বিশেষ
বিশ্বত মূহুর্তত লগ্নদ, অবন্য ব্যক্তিহ । আর আহার
কাছে-ও ছিল ছোট বোনের মত ।

ছোট বোনের চেয়ে আরও নিকটতম ছিল আহার
প্রিয়তমা বান্ধবী ক্যাথারিন । লণ্ডনের এই সামান্য কটা
দিনে ও ছিল আমার আর আমার সন্তানদের যথো একবার
যোগসদৃশ । কতদিন যে লুক্কিবে আমার চিঠি আর
উপহার পেঁচায়ে য়েছে । সেদিন, সেই যে দিনের স্মৃতি
আবার বৃকে ভীষণ অস্তের আঘাতের মত আঁকা আছে ।
সেদিনও ক্যাথারিন আমার পাশে ছিল । পথে গাঁড়িরে-
হিলাব অশেষর উল্লস হতে, কখন ছেলেবেলো মূহুর্তে
যাবে । ওই একবার মূযোগ যখন অভিজ্ঞতাবক মিঃ
উইকলির পাওয়া এঁড়িরে দেখা হতে পারে । কপিফের
দেখা, গাঁড়িরে হতে একটু আদর করা, দুটো কথা বলা ।
এর আসে ওই পথেই একবার দেখা হয়েছিল । আমাকে
গাঁড়িরে হতে কচি কচি কণ্ঠের কলকলসী—এই তো ছুঁনি
কিরে এসেছো, না ! কবে আমাদের বাড়িতে আগবে
বল না ! চোখের মল আড়াল করে পালিয়ে গিয়েছিলার ।
সেদিনও পথ বেয়ে ওয়া এলো, কথা বলল না, মাথা নীচু
করে আমাদের সামনে দিগে চলে গেল । যবে আসে,
একপলক আমার গানে তাকিয়েছিল । নিশাপ শিশুদের
মূহুর্তে ভয়ের হায়া যথো চমকে উঠেছিলার । ভয়, ঠিক
ভূত দেখলে যেমন হয় তেমন । সেই মূহুর্তে নিজে
সামলোতে পারি মি । ক্যাথারিন জোরে হাত না চোপে
করলে হাতো অজান হয়ে যেতাম । দাঁচের স্পর্শের মাধ্যমে
ক্যাথারিনের সেই লাভনা কোনদিন ভূপাও না ।

লণ্ডন থেকে সরে গিয়ে লয়েস কিলগেটে আসার
জমিরে বসল । ২২শে জুলাই বন্ধু Mcleodকে দেখা
চিঠিতে এই সর্বাঙ্গ ইংলও প্রবাসের চমকফার পরিচয়
আছে :

আহার যে সমালোচনাগুলো পাঠিয়ে তার জন্য
বদামার । সবসুদই নিজস্বা প্রণয়ের ভয়া । Nation
পত্রিকাও দেখলাম ।

আমাকে অবিস্মরণ্য এক কপি New Statesman

পাঠ্যাবে, আমি এমনর মনে করিতে না বিশেষ। ওদের কিছু দেখা পাঠ্যাবে ইচ্ছা আছে। পূর্বের কপি হলেও আপত্তি নেই অথবা কিনাটা। হুইট করছি বলে মনে বিরক্ত হয়ে না।

Blue Review পত্রিকার মত্ন হয়েচে—এই মাসেই।

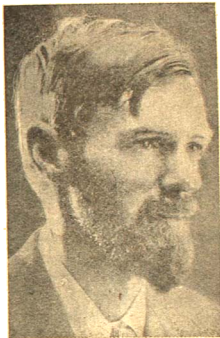
৩-শে জুলাই আমার কিলগেট জেজে সিরাসে গাব। সেখানে কিনকতক থাকবে। জুনি আসলে খুব ভাল হয়। ১ই আগস্ট নাগার আমার জার্মানী কিলে যাবো। জুনি এখানে একদিন এসে না কেন? বোধ হয় দরত পাওনি। আসলে কিন্তু খুব খুশী হতান।

এখানে প্রতিবির অভাব নেই। হৈ হুয়ার বেশ কেটে থাকে। রবিবার এডোয়ার্ড মার্স (Georgion Poetry) সম্পাদক আর Admiraltyতে উইন্ডন চার্চিলের সেক্রেটারী এসেছিল। ওই প্রধানমন্ত্রীর জেলে হাবাট অ্যান্ডহুইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। আজ ম্যার ওয়াটার ম্যালেসের সঙ্গে পরিচয় হবার কথা আছে।

এখন ছোট গল্প লেখার চেষ্টা করছি। দু'একটা কোন ক্রমে শেষ করতে পারলে হাঁক ছেড়ে বাঁচি। জার্মানীতে কিলে গিলে উপন্যাসে হাত দেব।

কিলে থাকার দিন খনিরে এসেছিল। তাইভোসের ব্যাপারে বিশেষ কিছু সুবিধা হয় নি। লরেন্স তার অন্য যে খুব চিত্তিত হয়েছিল তাও নয়। Sons and Lovers এর সাহিত্যিক দাফলা ওকে এক নতুন ক্রমে নিয়ে গিয়েছিল। প্রথমে আর তৃত্বিতে সে অসব মনুষ্য। ইন্টেলেক্ট এক অস্বাভাবিক প্রবিনের মতো স্বাভাবিক প্রবান-মন্ত্রীর জেলে সঙ্গে আসার অব্যাহত, ম্যার ম্যালেসের বত সুবিখ্যাত পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক করে—বিজেট হাটকের দারুণ না হলে লরেন্স যোগ হয় বিশ্লেষণ করতো না। এমন পৌত্তল্যকে দ্বিগ তাতে সেক্সা নষ্ট হয়। তবু, বদমায়ে লরেন্সের ব্যক্তিগত এই জড়িত জোড়ে বিশেষ কিলিত হয় নি। আন্দর্ভ ছিল লরেন্সের আত্মবিশ্বাস, তারই জোরে ও এখন অস্বাভাবিক হোয়াসকে প্রতিরোধ করেছিল।

পূর্বের, পরিচিত লরেন্সকে দিয়েই জার্মানীতে কিলে সেলাম। কিলার বেলায় ওর মনের কোণে মনে যে ছিল না তা নয়। মারীলের জেজে বাওয়ার বাবা তো ছিলই।



বিভলটন মারী লরেন্সের মনের অনেকখানি মত্ন বলেছিল। এক আন্দর্ভ, আন্দর্ভ বহুতের বহুত বাঁধা পড়েছিল মনে। পূর্বের জীবনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথাটা আন্দর্ভ মনে হবে। লরেন্সের জীবন-স্টাটকে অনেকের মারীকে ভিলেনের জড়িকার এঁকেছেন। কিন্তু সে সব অন্য কথা, অনেক পূর্বের কথা। সেদিককার সেই বহুতের মধ্যে সত্যিই কিছু বাধ ছিল না, ছিল না মনেহে কোন অবকাশ।

বিধায়ে গান গাইতে গিলে আর একজনের কথা না মনে অস্বাভাবিক হবে। বদমায়ে হাবাট এ্যান্ডহুইয়ের মত্ন সেটি সিঁইয়া এ্যান্ডহুইয়ের কথা। লরেন্সের মনের আকাশে সিঁইয়া ছিল পুরুতারা, জোরে আকাশে যে পুরুতারা ছলছল করে, স্বচ্ছের চোখে দেখা যায় স্বপ্নের অবকাশে কিন্তু আশন করে পাওয়ার অবসর মেলে না। ভালবাসা ইচ্ছা কিলে সিঁইয়ার প্রতি লরেন্সের মনোভাব হোখাণে থাকে না। লরেন্সের মন-

দুন্দুপী সিঁহিয়া, তার পায়ে অনেক অব্যক্ত অদৃশ্যের অর্থ্য পরেণ্ড উদ্ভাস্ত করে দিচ্ছে ওর স্তোম্য আর হরিণে ।

হাস্যাত্মক লেজেন্ডর বন বল না । কেন কে আনে হাস্যাত্মক ওর মোটেই পছন্দ হত না । বহুতো আবার শিত্তান্তর বসেই ওর বনে একটু ভ্রম ছিল, ছিল বহুসুখতা । সাহিত্যিক লেজেন্ডর মতের ভঙ্গিতে এই বহুসুখতাও বিকল হয় নি । ইংলন্ডে হাস্যাত্মক দেখা হাস্যাত্মক রূপ নিয়েছিল ওর *The Prussian Officer* ছাটি গল্পে । ইংলন্ডে শৌখিনেই গল্পটা বিরোধিতা গানেকটিকে । *The Prussian Officer and other shore Stories* দুইয়ের এই সুখসুখতা । *The shore in the fish* (আলেক্সান্ডার ব্লান্ডিনের *Vin ordinaire*) গল্পের মধ্যেও এই হাস্যাত্মকতার অন্তিমতা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে । বিরুদ্ধতার আঘাত এখনি করে বসে দিচ্ছেল দুজন-সম্ভাবনার দ্বার, প্রকাশিত করেছিল অদৃশ্য ছোট গল্পের প্রকৃতি লেজেন্ডর ।

অজ্ঞান-ইতিহাসে বনের হস্ত কোন আশ্রয়ের দ্বন্দ্বের আর হস্তান্তর । আদি ব্যাঙ্গের ব্যাঙ্গের হয়ে বন্য-বন্য লেজেন্ডর সৃষ্টি করে মিলানের পথ ধরলেন । ও মিলানে অনেকা সন্নিহিত । মিলানে বসেই শেষ করল *Twilight in Italy* শেষ রচনা ।

সের্গিসের কাছে ভূখণ্ডগণের ভীয়ে বর বাঁধলেন 'কেনে । গীর্ষ' আট মাসের আশ্রয় । শেলের শ্রুতি বহুভুক্ত বসেই বোধ হয় সের্গিস সাহিত্য লেজেন্ডর বেয়ে দিচ্ছেল । অথবা কারণ ছিল ওর সম্ভাবনার বেনা । চান্দ্র শীতের কাটতে পারতো না তবু, হুম্মাত সন্মত গায়ে ছেলের মত সন্তোষ অসমের কীপরে পড়তেও বসতো না । কত বয়স আদি বেনে বসেই—কবি হওয়া তোমার চাপে বৈ কিস্তি করব মত ভাবে বরা দেখছি রাতে নাচছে ।

ভেবেছিলাম সের্গিসের মধ্যেই পরিবেশে আবার জুন উষ্মে লেজেন্ডর দেখার সব দিতে শরৎ । *The rainbow* উপন্যাসের দ্রুত ভবন ওর সারা পথ আচ্ছন্ন হয়েছিল । 'sons and lovers' এর দাক্ষ্যের পর দেখেছিলাম প্রণয়ীর বিবিকার, প্রত্যয়ে গুরু লেজেন্ডর । নতুন-

সিঁহির ইদারা ছিল ওর look । পর্যায়ের অংশ্য কবিতায় । সেই স্পষ্ট বেন ডান্ডর হল ইংলন্ড থেকে স্কোর পর । ও শ্রুতি নিজেই কবিতা সন্মতের সন্তোষ হইল, আশ্রয় হইল আবার সন্মতের । ইংলন্ডে ছিল, ছেলেবেলায়ই কাছ পেয়েও যে আবার বন্যায় হইল, এই প্রত্যয়ে ওর প্রেম যেম নতুন প্রতিষ্ঠা পেল । মাতৃবেহ উপেক্ষা করে প্রেমের প্রেরণায় আবার ওর সন্নিহিত হইল, আবার বেয়ে মিলান ইউরোপের সন্মত-প্রায়ে ভবনুয়ের জীবনই—এতেই ও সন্মত আশ্রয় হইল । এরপর আশ্রয় ওর পাশে পাশে থাকতো এ সন্মতের ওর বনে আর দিরা ছিল না । এই সাহিত্যের অগ্রে সন্মত, সাংসারিক জীবনে বিদ্যমান লেজেন্ডর লেজেন্ডর দ্বারা প্যা ভাঙ্গারে এটাই আশা করেছিলেন ।

কিন্তু তা হইল । এই অস্ত্রাবেরে চিহ্নিত ও লিখল—আবার বনের বিস্ময়ে 'sons and lovers' এর সন্মত এবং অস্ত্রবিত । একটা সন্মতের ভিন্ন বয়সের উপন্যাস হবে শ্রুতি করছি । ২৭শে অস্ত্রাবেরে চিহ্নিত শ্রুতি করছি, অস্ত্র : বান্যাত্ম্যে কাহেলা আর ফ্রিডার বেনে তার ছেলেবেলায় কেন্দ্র করে গল্পটা আবার সব কাম পড় করে দিচ্ছে । অথবা আদি আর ফ্রিডা অদ্যাবার কিছ করছি ঠিকই আর তার কলই বোধহয় নতুনমান জ্ঞানিত । ভিন্সেন্টের পর্যন্ত ওর একাধিক চিহ্নিত এই জ্ঞানিত শ্রুতি । ২১শে ডিসেম্বর গানেকটিকে লিখল—উপন্যাস রচনা বিশেষ অঙ্গের হচ্ছে না ।

মতিয়াই এই দৃষ্ট আট মাস লেজেন্ডর উল্লেখযোগ্য কিছই লিখতে পারেনি । *The Sisters* এর প্রথম পাণ্ডুলিপি শেষ হতে হতে যে মাস এসে সেল, ১৯৩০ সালের মে মাস । এই সময়ের মধ্যে একটা কবিতা বা ছোট গল্প লিখেছিল বলে বনে পড়ে না । মাঝে দিব কসেক-একটা নাটক, *The Widowing of Mrs. Holroyd* নিয়ে মোটেইল । মিলেন 'কোরাল' নাটকটা আবেগিকার প্রকাশের বোধাশ্রয় করিল । সেই 'কোরাল', আর নাথ আবেগিকার 'sons and lovers' প্রথম প্রকাশের জন্য বিখ্যাত । ভরসাকের কিছ কৃত্যাত্মক অথবা ছিল । দশ বছর পরে লেজেন্ডর-বসতে শ্রুতিবেহ যে তার এই সব ক্ষেত্রে অস্ত্রবিত উপন্যাস প্রকাশের বহু-

আমেরিকা থেকে একটা পক্ষাও দি' পারিনি।
'অর্থ' প্রকাশক কোরালি' লেখক লক্ষ্যেতে কাক
দির্ঘোহল।

পরের কথা পরে বললেও চলবে। দেহিগিতে কিছু
: আমায়ে: প্রতাপ অর্থ কতের হুগোমুখি হতে হয়েছিল।
: লয়েল লিখতেই গানেটি ৭৭ পাউণ্ড পাঠিয়েছিল।
অন্যান্য : ছু'বাহু'র যে সাধায্য পাঠাছিল না তা নয়।
কিন্তু এমন করে পরের হু' চলে আর বাই কথা থাকে
সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। অর্থাত্তাৎ লয়েলের লেখার
প্রোতে হঠাৎ ভুটি পড়ার অন্যতর কারণ। ওবারে 'sons
and lovers' অল্প প্রশংসা পাঠাছিল কিন্তু অর্থ' আনতে
পারছিল না। প্রথম সংস্করণে প্রকাশকের' লোকসান
হয়েছে খবর শোনে লয়েল দুঃখে পড়ল। পরকশেই ওর
তাবল-লভার প্রকাশ। হাত-পা মেড়ে আমাকে-বোভাতে
বদল—প্রকাশক নামজাদা নয় বলেই' লোকসান হয়েছে,
লেখার সোঁবে নয়। আঁরি এগার বড় কোন প্রকাশকের
লগ্নে চুক্তি করবে। দুটো নামজাদা এক্সেস্ট-পিতার
আর কাঠি'ণ ভাউন তো আমার পরের উপন্যাস নেবার
মনো বাত।

মোট কথা ও নিজেই ব্যত হয়ে উঠেছিল। ব্যত
: হয়েছিল পরবর্তী' উপন্যাসে নিজের নৃতন চিত্রাঙ্গনা,
অভিনব হু'গোমুখিকে প্রকাশিত করার ভাগিয়ে। সেই
উপন্যাস, The Sisters (পরবর্তী' নাম The Wedding
Ring এবং শেষে আমার দেওয়া নাম The Rainbow
যে নামে আরও প্রায় দু'বছর বাকি এবং সম্পূর্ণ পুন-
লিখিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল) এর প্রথম পাঠ্যলিপি
গান্বেটের বিরূপ হস্তব্য বিজ হয়ে কেবল এসেছিল।
গান্বেটকে সোধ দেওয়া যায় না। 'sons and lovers'
এর পর আরও ভাল কিছু আশা করেছিল বেচারি।
তা হাজা সমসাময়িক কিছু সমালোচনাও এই বিরূপতার
কারণ। সেই এ'প্রল মনেই জন গোল্ডসোয়ার্থি'র
চিঠি পেয়েছিল গান্বেটি। তৎকালীন সাহিত্য স্ট্রাট
'sons and lovers' গড়ে দির্ঘোহলেন : পারি'গিরক
হু'গোমুখো তারিক করবার হত...কিন্তু প্রেমের হু'গো...
নজরাদার বিলনের চরম হু'গোমুখি'র ইব অন্ডুভাতি' আর
ঐরিক চাকল্যের পশ্চাদ্-পশ্চাদ্ বর্ণনার সময় আর কালি



বলত করার কি অর্থ তা আঁরি বুঝতে পারি না :
বিশেষ অবস্থার অভিজ্ঞতা আমায়ে' লকলেই তো ি
না কিছু আছে।' হয়তো আছে। কিন্তু জীব
হু'গোমুখিত হু'গো অভিজ্ঞতার হু'গোকে সাহিত্যে
মাধ্যমে হু'গোমুখি' করার লগ্নে পরিচর পাঠক তো ও
শোয়েছিল 'sons and lovers' এর পাভার! ছে
অলে আর হু'গোমুখি'র জো তখনও অনেক দ.
এই মৌলিক বিশেষত্বটুকু'র বিচারেই গান্বেটি ব
করেছিল। সমালোচনার উত্তরে লয়েল সোজা জাি
ছিল.....'sons and lovers'. এর দৃশ্যসূত্রে
সৃষ্টিতে যে আদমুখ পেয়েছিলাম, এখন সেই আ
আমার মগ্নানের বাইরে। অভিজ্ঞতার বৃকে অন্ডুভা
ভুটি আসো কলে হু'গো সৃষ্টি করার আর আমার অ
য়েই। এখন- আমাকে ভিন্ন ভাবে লিখতে হবে।
কি জানো, হীরে আর কালো দুটোই কার্ভনের হু'গো
সাধারণ উপন্যাসে ত'বি পায়ে হীরের ইটিহাস। নি

আমি বলি, হাঁতে কেন। কার'ন হলোই বা ক'তি কি।
অর্থাৎ আমার হাঁতে শুধু হতে পারে কিন্তু তার মর'
কথার গাথা থাকবে কার'নের ইতিহাস।

সে কথাটা লরেন্স গ্যানেটিকে তখন শশটাকরে
জানায়নি সেটা হচ্ছে—এই ভিন্ন ভাবে লিখতে গিয়ে
যদি তোমার সঙ্গে দর সম্বন্ধে ঝগড়া করতে হয় তো তাতেও
আমার আপত্তি নেই।

শশটাকরে কিছু বলেছিল এডোয়ার্ড মার্সকে।
মার্স নুহু লরেন্সের কবিতার সমালোচনাই করতো
না, তাকে কাব্যের অ, আ, ক, খ শিখা দেবার চেষ্টাও
চালিয়েছিল। লরেন্স প্রচেষ্টা বিরক্ত হলেও বিশেষ
প্রতিবাদ করত না। শেন বাবু হয়ে লিখল—কবিতার
সমালোচনা ততটা কানের ওপর নির্ভরশীল
নর, যতটা অনুভূতির ওপর।……তোমার কান যদি
কম শোনে বা একটু একঘেঁসেবির পুরুষাতি হয়, তার
জন্মে আমার কবিতাকে তুমি শোব দিতে পারোনা।
“Golden Journey to Samarkand” তোমার ওই
কানের উপযোগী বসেই তোমার ভাল লাগে। তুমি
অবশ্য বলল—আমার কানে ভাল লাগাই তো আমার
কাছে বড় কথা। উত্তরে আমি বলবো—তোমার কানকে
ভৃত্ত করবার জন্যে তো আমি লিখিনি।

হুই মার্সার—উপন্যাসে গ্যানেট আর কবিতার
মার্স—এই দুই নুভাখীর সমালোচনা থেকে মৃত্ত হয়ে
আপন ম্বাবীন সম্ভার মৃত্তভায়, জীবনবেরের তপশ্যার
আসীন হতে চাইছিল লরেন্স। নিঃশেষ জীবনের অনন্য
মুশাররের মত সাহিত্যেও মতন ভাবনা আর মতন
ভবিষ্যতকে মুশারিত করতে চাইছিল ও। নবলিগরে
প্রসারিত সাহিত্যের এই পথ মূদ্র'ম আর কু'বার এ
কথা লরেন্সের বজানো ছিল না। কিন্তু এও সে
জানতো। যে হয়তো পদক্ষেপে ভুল হয়ে, ভুলের
মান্দুলও দিতে হতে পারে কিন্তু এগিয়ে চলার ভার
থাকবে না বিশ্বদ্বায় দিয়ার রেশ। পরবর্তী আড়াই
বহুরে The Sisters নুহু The Rainbowতে মুশারিত
হবে না, আরও গভীরতর ব্যক্ত্যার ব্যক্ত হয়ে woman
in love এর মাধ্যমে।

এই বিধা আর ম্ব পায় হয়ে নবলিগরের মূদ্র'মখি
লিঙ্কার শব্দ দেখেই ও লিখেছিল :

Through the straight gate of passion
Between the bickering fire.
Where flames of fierce love tremble
On the body of fierce desire.

(কবিতা)



কোন দাখা ভাল



“আজ কেঁচেরি এখন,
বন্ধা গঁদকে আর বধ”—

শিল্পী : রেবতীকুমার

সবত তরুণের শোনে, তবু এক পতঙ্গের বক্ষা
বিশ্ববাসে পায়ারবারে অকল্পিত সেই মতন,
বিকতক্রে কিল্বকাল যৌত-বিচিত্র কল্যা
হঠাৎ সমুদ্র কতে করে যেম সন্ত হরণ

বিভব কেতব ততে করে তার সুখীর্ণ নব,
ঘ্যাঁজাঘা, আশ্বাসন, কীতি' কিম্বা হৃদ মতন
এই গুঠে—নির্মূলবিত চতুর্বি'ক, এই মৃত্ত বর
এ যেন অদৃশ্যে কারো ফেলা করে বাত্মক হাত ।

সমুদ্রই ইতিহাস, বাত্মবরে অশ্রুত বিশ্বায়
কিন্দলনা, লক্ষ্যের অস্তরালে হৃদযত্নিত তার,
পর্বতে আত্মর চিত্র, পৃথিবীর পালিতে বিস্তর
কেবলই প্রসব লব, আত্মশক্তি পতিত'নী দায়

তবু রক্ত, তবু পুত, শৌখি' বীর' ক্ষাত্রব তবু
কি আত্ম' পাল পু'বি বাউলের কণ্ঠে অতনায় ।

তথিত্যর মন্ত

জন্ম দায়

আল্পিত ঘাটি
সংক্রামের ঘাট চতন্য
এখানে পায়াক
সংক্রামের কলি প্রতিজ্ঞা
আর কত নী
সংক্রামের অহু-প্রেক্ষা
আমার বাত্মা
আরেক হৃদ্যকের বাত্মা ।

হাত-অর্ধকর খিন হোক
তোমার প্রাণে ।
বিদ্যা-ভয় বিদ্যাস হোক
তোমার প্রাণে
আমার মনু'র বীজ হোক
তোমার প্রাণে
আরেক হৃদ্যকের বাত্মা
আমার বাত্মা ॥

সহস্র বৎসর পায়

অন্য চট্টোপাধ্যায়

এক বৎসর পরে—
আমি এক হৃদয়নায়
অন্যকমে এই বাত্মা যেনে,
অন্য তখনও বহি বাত্মা যেন থাকে ।
এক পত্মাতে চরে দেখবেন তিনি,
চক্রে খিনানে আঁকা একখানি ছবি—
বিমানের যৌতা-যৌতা তার পূর্তপটে,
[এ-যৌতা বাত্ম' কিম্বা রাজনীতিমাত,
যাহাই হোক, তার ভ্রমসা অলহা বটেই ।]
সুন্দর আছেন বলে রশ্মি ঠাকুর,
হুবে তার হৃদয় উৎসব,
অন্যে তরুণ হল দৃককর হয়ে
চরে আমে সে-বুকের বিতে ।

স্বল্য সে-পটে বলে প্রাণের স্ফার,
আবেশকপিত কণ্ঠে কবি কাল বাণী :
'সে-সেয়ে বাত্ম'র থাকে পুত্ম'র মতন,
প্রাণ চাই, আত্মা চাই, চাই হৃদ বাত্ম'
বার বার বলে আমি পাইনিক কল,
সে-সেয়ে বাত্ম'র থাকে হৃদয় খিনেই,
কিনার আত্মে দতা লক্ষ্যের খিনিক,
পাশের বিস্তার হুতে পুত্ম'র বিদ্যাপ,
হাজিরের কালঘাণি সর্বশেষে প্রকট,
সে-সেয়ে শিকার করে অর্ধশক্তি দায়
সে-সেয়ে বাত্ম'র হল দিগ্ধ তরুণ বিশেষ পত্মানী,
সে-সেয়ে আমার জন্ম-নতবাণী'কর
জৌলিত কোনো প্রয়োজন ।"

এবার থেকে তেলগাইন
 অনেক হবে। মোতির
 বাসের চাক্ষুষ দেখা
 কোকেনি এ পাথে। তেল-
 গাভির কথা বলে কেউ কেউ
 —কবির থেকে কেন। গাম
 কাটা জরীয়া। বকুলের
 হাতীঃ মেঝো মেটা
 কলিমখিও খবর-খবর গা

কোনো বসে আনতাল। সেও এবার বান কাটতে গিয়েছিল,
সেই গুপ্তি মেলে।

এতদিনের পর বলা চাইবে। প্রায় সবাই বুঝে-
অবসরগ্রস্ত। 'অ'বের কাহিনী ছিল চোখ-কাকত
কত-কানোয়ার বন-বাগানে বোকাই। কিন্তু কদিন
হোকবার কাহিনী-বন অভ্যর্থক বৈকুণ্ঠে। আর পরের
পাশ পরে আসে পাণ্ডি বোকা আসে আর বাহুবল কিং।
ই থাকে কখনও বাগাবাই মৈত্রীর মতন সমরভুলে।
স্বাধা কুলে বাড়িরে। কদিনের কাহিনী আই মতন
লাগল কানে। কানে। কানে লাগল-কাহা। ন।
কিন্তু বলাই বণ মেয়ে অমাত হল পুত্র।

ଟାଣା ଓହଳେ ଆକ୍ରମଣ କରେଇ ସହ। ଟାଣିକେ
 ଘେର ଘେର, "କବିର। ତାହା ଆହାର ହେଉ ଘାବେଇ ଟାଣି
 ଦେଖେ ହତ ନା। ପୋଷାଳ ଜଣା ପୁରୁଷେ ଆହୁତି
 ଦିଅନ୍ତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ନବେ ହେଲେ ଆହ ଆହ ଦିନ।
 ଆହେଁ ବୈଦେକ ଦେଖେଇ ସହ ଘର କାଟିବେ-ଦିନ କୁହାରିବେ।
 ଘା-ଆହା।"

চাপা খণ্ডায় ধলোতে ঢাড়া। কিন্তু কপিলেশ্বর ফানে
 দিব্যের ঐক্য।

কল্পিত কিংবা এত হাংসকালের কোন কারণ খুঁজে পায়
নি। আই ব্যক্তিগতকে অভিযোজিত, "তুমি না বেবে তুমি
তুমিই হবে বেবিস - সিটি। ভাল হও বন্ধন!"

তার পরেই প্রকার নিয়ে বলে, “বেশ করেছি আমি—
ভাল করেছি। কবরের দত্ত বোঁড়ার সঙ্গে দুনিয়া খাটাই
আমার ভাল।”

सिद्धिः चेत्तदा । योगस्यापि सर्वत्र सिद्धिः प्राप्तिरिति चेत् ।



ଆଉ ଚୋଷେ-ମୁଷେ ଡୋ।
 ନରବର ଛୁଟେ ଉଠିଲି-
 ଅଧବା ଖା। ଲେଖେ ପ୍ୟା
 ବି କଲିକା। ହାକିଆପି
 ଶିବସ ହିଲ।

হাতের অঙ্ককারে বেলা
 পেত কলিয়। লেখকখান্নিকে
 কিছু বেখাতে পেত কই।
 হাত হলিয়ে হলিয়ে পং

করতে হয়। টিক বাতুষ্ট্যের স্বতন্ত্র প্রকৃতি। অতীত
বিদ্যের সুখের স্বতন্ত্র। তবে মহান বস্তু। আর বাস্তব
কতি পাতার স্বতন্ত্র ঠাণ্ডা। মাজাচাক। তবে সুখটা সুখের
অপেক্ষে বেশি হবে।

ଗ୍ରହମାନେ ଗ୍ରହବାନା ଦେଖାଯାଏ । ସାଧାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଗ୍ରହମାନି
 ଦୃଷ୍ଟି ଆସିବା ସହାୟୀ ଏହି ଗ୍ରହେ କାଢ଼ିବେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହମାନେ ଗ୍ରହ-
 ଗଣ୍ୟ । ଗ୍ରହ ଗ୍ରହେ ମହାକାଶରେ । ଏହିସବୁ ଗ୍ରହମାନେ ହୁଏତ
 ଗ୍ରହେ ଗ୍ରହମାନେ ମହାକାଶରେ ହୁଏତ ଗ୍ରହମାନେ ଗ୍ରହମାନେ
 ଗ୍ରହମାନେ ଗ୍ରହମାନେ ଗ୍ରହମାନେ ଗ୍ରହମାନେ ଗ୍ରହମାନେ ଗ୍ରହମାନେ

হুকের চুলগুলো লম্বা, লম্বা করে। কলিম ঘেমে
উঠেছে। হুকের-ভেতর থেকে হাকতে চার না হ'ল
হাকিকাকে। কোম কিছু একবার যোড়ে ছিল হারিয়ে
কেন্দর ভূর এখানে। চারপাশের এই অন্ধকারে হাকিরে
কেন্দে আর বুঝে পাওয়া যাচ্ছে না।

‘बापिना’]

ବନ୍ଧୁତ୍ବ କଳିଯୋଗ ବ୍ୟାପାର ହେଉ ଯେଉଁ ଯୋଗ ହାତ ଟିକିଯାଏ ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ସାହିତ୍ୟ ବିବିଧ ଖୁବ୍‌ଟେ । ସତ୍ତ୍ୱ ଧ୍ୟାନ ଗୋପନ ଶାଫା ଏବଂ ।

ভার ঠোঁটের দড়িইহু সেল ফলিষ-বাটি চাঁদা নড়া
ফাকিহে বাসের আশ ন। বহু বেহন। *

“ভাষার সোপান একটু নিম্ন অয়েচি।”

वि २ - विविक्त

“आप।”

‘ହୋହୋହୋ !’ - ଅସଂହ ।

SINIS ?

পৃথিবীর এতটা প্রান্ত । কখনও হানাবাট মৈদাটা ছাড়িয়ে কোলকাতা এক নাম । তারও দক্ষিণে বেয়ে গিয়ে বান কাটা মাঠ, যেমন থেকে শুরু হয়েছে বল । সুতের গরীম বনেত কোল ঘেঁষে ঘেঁষে পহেলা জল—কুল-কিনারা-হারা । সোনা চেউয়ের পান পাইতে পাইতে আকো কত দূর যে বেয়ে গিয়েছে দক্ষিণে । সেই জলের গারে গারে বালিরাঙে চোখে পড়ে স্তিকমিত্র-করা নখের বাজাঙসো । বান কাটা শেষ করে কেতার পথে নেমে ছিল কলিহুদিন কোলকাতায় ।

“সিখান থেকে বহির করেচি।”

একটুকরো হীর্ষবাস । “কই গো।”

হীর্ষবাস ?

কলিমের বিশ্বাস—এ আনন্দ নিভর ।

“তুমার বালিশের তলভা খুঁজে পেতে যেব না।”

হাতে পেরে নাড়াচাড়া করে হাকিঝাবিবি ।

“বাঁধের মাল্য, বুবি বুবি শাঁকের ছাও ভলান । হাও জামি পরিবে দি।”

টোটেও ওপরে এক কোঁটা জল এসে পড়ল । নোনতা । হবিরের সেই সোনালনের এমনি স্বাধ । আঁধারেও ঘষা কলিম খুঁজে করে হাকিঝার চোখ কোঁড়া—হাতের গলাগাগরের মতন চিক চিক করবে কিনা । খুঁজতে খুঁজতে বানি কেতের সোনালী তন্ত্র নিয়ে কলিমের চোখে বেয়ে এল হ’রবনের গাঢ় নিম্ন ।

তারপর এক সময় পাঁচার গরুর বোনা । খুঁজতে গেল । পান ফিরে শুতে গিয়ে হাতখানা ছড়িয়ে পড়ল বিছানার আর এক প্রান্ত পর্বত । চমকে উঠল কলিম । হাকিঝাকে হাতড়ে গেল না । উঠে বসল । সামনে কোলা বরফা হ’ হ’ করছে । বাইরে- কিস্কাটা জ্যোৎস্না—জৌকাঠি পেরিয়ে কিছুটা বেগনার নলে-এসে ঝকছে ।

কলিম নিম্ননা ছাফল ।

বেহিরে এল ।

হাতগার ওপরে বাঁড়াল ।

বেড়ার কোলে ঢাচা ঘুসোচ্ছে নাক ডাকিয়ে ।

গগলটা ঘুসোতে ঘুসোতে একবার ঘেঁটে

গেল । ১৩৯৯ খ্রিঃাব্দে অষ্টোত্তমাব্দে জোনাকিরা গেল

বাচ্ছে । কাক-জ্যোৎস্নার ওলে পরিহার উঠোনের কোথায় কি হুঁটিয়ে চোখে পড়ে । কেবল চোখে পড়ল না হাকিঝা ।

বারবারকাটা খোলা না ? হা হা করছে ।

কলিম নেমে এল উঠোনে ।

এসিয়ে গেল বরফার গোঁড়ার ।

বাইরের দিকে তাকাল ।

বারবারকার বাইরে থেকে মূক হয়েছ হু-দু মাঠ । ফুট-ফুটে জ্যোৎস্নার মাথা । একটু ঘুমেই মাঠের মতো গিয়ে একটা কালো ছায়াবৃত্তি চলছে ।

কলিম কিবে এল বাড়ির ভেতরে । সাগা উঠোনের ঠিক মাঝখানে এসে পাড়াল । হুঁটু কোঁড়া কাপড়ে ধরধর করে । কেউ কখনো কলিমের এত ক্রোধ দেখে নি । এখনো বেগছে না কেউ । সে নিশ্চয় না । কিন্তু পরে যদি মনে থাকে নিশ্চিত হবে নিজেই ।

সাধার খেদ খুন গোপছে । হাকী বাড়ির বিবিরা কোন দিন এমন করে রাতের আঁধারে ঘরের বার হাতে পারে নি । আর হাকিঝাবিবি—একি করল সে ? নিঃসঙ্গ অভিলার । কি করবে কিছু ঠিক করে উঠতে পারল না কলিম করেক বণ্ড । শুধু এখিক ওখিক হুঁকে পড়ল কয়েকবার হটকারিতার ঝোঁকে ।

সাঁঝালের বেঁগা তখনো হুতলী পাকিয়ে ঘুরছে গোলাবরের বেড়ার গারে গারে । কলিম এবার এসিয়ে গেল সেই দিকে । বেঁগার হুতলীতে জুবে গেল জুল করে ।

রাতি নির্জন হল আবার । বাড়ির বাইরে মাঠের বারের অর্ধেকের পাড়াঙসো বাতাস সেলে চট্টটু মক জুলে কাপছে । কি’ কি’ গোকাটা একটু বম নিয়ে ঘুর বরল আবার ।

অনেকক্ষণ কেটে গেল ।

কেন ? বেঁগার আঁড়ালে কলিম কথা হয়ে বাড়িয়ে-বাড়িয়ে কাবছিল নাকি আবার কিছু ? হবেও বা ।

বেহিরে সে এল দেখে । আর বানকাটা পান বেগুয়া টেনে গিয়েই ঘেঁগো । টানের আলোর চকচক করছে ।

নিম্ন গাছের ওপরে পাখা বেঞ্চে ঠিক হাজিরের মতন মক জুবে হুঁটি গেলল একটা মক ।

কলিম হরম্মার বাইরে পা বাড়াল।

পাখা ফাপটে নড়ে বসল পল্লুরটা অশ্বখের ডালে।

কলিম নেমে পড়ল মার্চের মধ্যে।

হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে গেল ছায়াবোঁড়ি'র ডাক।

খুব ছোঁয়েই পা ঢালিয়েছিল কলিম। কাছাকাছি হয়ে দেখে, কালো বোরখার দর্বাচ ঢাকা হুঁটিটার সতি বড় দীর। হাকিমা কি তবে পালাচ্ছে না?

দীর পথকেলে চলেছে হাকিমা। যেন কোন তাকু নাই তার সমুখ থেকে। অথচ কোন সিঁহটানও নাই। কোন দিকে কিয়ে তাকার না। কেবল সামনের দিকে হুঁটি মেলায়ো। হুরে কাকে যেন ধেঁতেই পেরেছে সে। কে যেন চলেছে তার আগে আগে—হুরে হুরে। কিন্তু বীরে বীরে—মিডান্তেই নিখের সোঁকের মতন—স্বাভাবিক পতিতে। কিন্তু কে সেই লোকটি? কলিম তো দেখতে পার না তাকে? শুধুই কি অজানা তব? অথবা সেই নিশির তাকের নয় এ তার চোখের সাক্ষর?

আজ্ঞহ পাছের কোপকোলের পাশ কাটির কাঠির মাঠের মাঝ দিয়ে বাতারা কিছুকতোবার জীবে এসে ঝড়াল এবার হাকিমা। তার স্তনকটা পেছনে থককে ঝড়াল. কলিমও। কিছুক তোবার ভিজিতে স্রোত চামখানাকে টুকরো টুকরো করে ভাঙছে। হাকিমা ঝড়িয়ে ঝড়িয়ে দেখছে তাই। আর পাটপচা ফলের গন্ধ শুঁকছে। আরেকক্ষণের। তাৎপর্য নড়ে উঠল বোরখাটা। সামনে তার সেই পথবেশাখি। অস্তুত মাহুঘটির নির্দেশ এল হুঁটি আবার। কলিম আবার হাকিমার পেছন বসল। 'হেভের বানী' শব্দ হুঁটায় চলে গেল।

বাত আর কি স্থি তাকা শব্দের ভেতর দিয়ে চলেছে হাকিমা। এবার একটু ছোঁয়ে—কিন্তু আবার কখনো বীরে। কানবনের পা খেঁবে খেঁবে হুঁটিছে—কিছুক-তোবার 'কাছাকা' ববাবর। সামনে সেই অস্তুত মাহুঘ। পেছনে কলিমুদ্দিন। আর শব্দ শব্দে চলল টাট—কিছুক-তোবার স্রোতে ভাঙতে ভাঙতে। হু এক টুকরো হাদুক। বেস মার্চের ওপরে ছায়া ফেলে টাকের ডগা দিয়ে হেলে গেল।

এক সময় টাট চলে পড়ল হুর পেছনে—চুইটি পানীটা খোঁবনে আচরকা কেঁবে উঠে বেবে গেল। হাকিমা উঠেছে তখন। উঠেছে একটা উঁচু টিলার পা বেঁবে। উঠতে উঠতে হাকিম পাছটায় তলে এসে

বারল। কোন দিকে কিয়ে তাকাল না। সামনের আকাশটা তার সাধা হয়ে এসেছে।

কলিম শিউরে উঠল।

হাকিমা তাকি করছে।

কলিম পরিচয় দেখতে পাচ্ছে—একবার কালো চুল। স্তব্ধ মার্চের মাঝখানে উঁচু টিলার ওপরে ঝড়িয়ে হাকিমা তার বোরখা খুলে ফেলছে। আকাশ মাটি কিছুকতোবার; সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তার হাকিমাবিহিকে—অবাক হয়ে।

হুরে গ্রামের মলজিহ থেকে তেলে আসে তার বৃদ্ধ চাচার কঠ—“আল্লা-হো-আব্বার—”

ভোর হয়ে এসে হুঁটি। ওখিকের আকাশ করসা হয়ে উঠেছে। সাবাটা হুমি। এখনি ঘেঁবে কেদেবে তার বোরখা-খোলা হাকিমা-বিহিকে।

কলিমের হুকের হেতবে কাপন উঠল আবার—

“আল্লা-হো-আব্বার—”

নমাজ?

না তার বৃদ্ধ চাচাও হুঁটিগ্রাথি?

হেঁসোর ঝাঁটের ওপরে কলিমের হাতের হুঁটি নক-হয় আরো। দূত পথকেলে হুঁহুন্ করে উঠে যায় টিলার ওপরে।

টিলার ওপায়ে তখন দূর্ব উঠেছে লাল হয়ে। আকাশের রঙ এসে সেপটে গেছে হাকিমার খোলা মুখে। সেই বহের ছিট এসে চোখে পড়তেই থককে ঝড়ার কলিম। অজ্ঞাত চিল হয়ে বার হাতের হুঁটো। হাটের ওপরে করে পড়া হেঁসোর শব্দে চমকে-ওঠে হাকিমা। পেরনেই তার কলিমুদ্দিন।

হাকিমার সারাটা মুখে কালো ছায়া বনে আসে—বোরখার রঙের মতন। তার অপরোধী মুখে ওপরে প্রেইয় ছাঁপ—কেমন করে এলাম এত দূরে, বহ থেকে—বেরিয়ে এলাম কেন—এখন কেন হল?

তার হুকের ওপরে ‘বহুহু’ করে কাঁপছে কলিমের বোরখা মাথোয়ার।

পায়ের কাছে হুঁটিয়ে পড়া বোরখাটা উঠিয়ে নিতে যায় ব্যত হয়ে।

হাকিমা বিবি এত স্তব্ধ। কলিম অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে হাকিমার রোহালাগা মুখখান। এখিয়ে এসে বোরখার ওপরেই পা ছাশা বেবে।

ভোমার মাথা | শেখ আবদুল জব্বার

ভোমার অত-বাত্ম্য গঙ্গী করেও

আমাকে,

বিশাল কালো তোরলের মূখোদ্গী
বিল্বের কাকনে ঢেকে দিয়ে গেলে।

শরৎকালের শেষ বিস্তার মত নিসেনে ;

অহকারের আচ্ছাদনে আমি এখন ত্রুণ :

আমার গাতির পৃথিবী হাতুসত

শবীকার করলাম তোমার এই বাঁচিরে মাথা

আর হিনিয়ে নেওয়ার কোণস,

তবু ভূমিস্থের বেগ আমার চতুর্দিকে

দার প্রত্যঙ্গের মত ভবিষ্যতের অপরাধী হাওয়া

এখনও আমার কানে কানে ফিসফাস করে।

অহকারের নির্বিক্ত মাঠে মাঠে এগার আমার

নিঃসঙ্গ অপরাধী চলাফেরা,

উপরে স্বেদের চাঁটনির মত নক্ষত্র,

যেন দিক থেকে নিঃসৃতের অহকার ভর পেয়েছে ;

ভরাবহতার

হে আচ্ছাদিত চৌহা, আমি অবসরল করছি

তোমার উচ্ছল উত্তাপের ;

পশ্চৎ পশ্চৎ, উল্লসকে

দবী, গিরি আর সমতলের—তোমার সব-তথ্যীতে তথ্যীতে

আঘাত দিয়ে চূর্মার করতে সোপানতা।

দূর বিস্তৃততার চূর্মী ভেদ করে এই আমার উচ্চশিখ

উচ্চারণ,

হাতে কেটে দাবে আবরণ, ঘেসে উঠবে অলস

আর চেউয়ের পর চেউয়ে গার হৃদয়তা

দূরে গিয়ে আলোকিত হবে,

উপত্যকা।

দবাই ঘেঁষে, তোমার নির্বাস ভোমের মধ্য দিয়ে ঘেসে ওঠা

আমার উচ্ছলে হৃদয়,

হজের আগুনে সমস্ত হৃদয়তার ক্যারে

কারো ভীত করে ভেতলে

ক্রাস্তত হৃদয়ের পঙ্খি বিবাসোক, শাশব অধিত্যকা হৃদয়ে

দার হাওয়ার হাওয়ার বেয়ে উঠছে বোঝ-গুণ্যের

দাবিরল ব্যর্থদান।

হায়্যাতিত | চিত্তর গুহঠাকুরতা

পুরষান্দুধরী হৃদ্য শব্দে আত নিকটে এসেছে

আমাকে বলছে ভেঁকে কপট মাঝর চোখ ঢেকে :

এখনো হুয়নি হায়ি ; অহকার হুয়ে চলে গেছে

আয়বত্যা কতি, এসো, গুহনেই গাশাপাশি যেবে

অহকারে ঘিশে আছে নবদাশা প্রণয়ের অংশো,

এ কেনন হৃদ্য হবে...হায়্যাতিত...; অহকার থরে

হুসলে বসেই পাশে ; হুইচোখ বেগার পেয়ালা,

হুদ্যায়ি : প্রিতম ; হুত্যাকারী বলে চাপা শব্দে।

আমাকে গুহুস ভেবে ওয়া হুদ ; তাই এই খেলা

একদিকে হুত্যা আর অন্যদিকে অহকার প্রে

এখানে বিপ্রক পথ্য, হুকে ভীত বহনের অনাদ্য

হুদ্যকে হুতু করি : এই সেহ তোমাকে দিলেম :

আমার কপট প্রেমে হুদ ওয়া। নির্বোধ প্রেয়িকা।

কুশাশা | কর্ণল সেল

আমি তাকে দেখবো না চোখের হুদয়ে।

ভোমের সত্তার হুয়ে সেপ-চাপা আরেকী আমেছে

বন্দ হুয় আমি অগোপ্যগীর উল বিহনার,

সে একাকী সকালের হুদ-প্রদার সেয়ে চুপে চুপে

হুদোরী উল্লের অসহ বোঁটা ওকারে হাওয়ার।

আমি তা তো জানবো না, বাঁচটা কখন সেয়ে বেছে।

এক কাল হুদায়িত চায়ের পেয়ালার ঘোঁরা হুপে

প্রত্যাকী প্রত্যাকী তার আমি নেবো কল্পনা কোরে :

ঐশব-পাশে শোবা যে-হুদয়ী দায়ব-কমায়

ভরল চিকন চুপ আমাকে মাতাল করা শব্দ বিলাতো

আর হত বাকাশ একে বোঁকে হুয়ে হুয়ে বেরে বিলাতো

আমার স্মা গাশা চোখে তাইই কুশাশা—সেই অনগার।

ইতালিয়ান চিত্র প্রযোজক
বিনো স লেভিস্ সস্ত্রি
যে চিত্রটির অঙ্ক বনোনিমেষ
করেছেন তার নাম 'রি
বাইবেল'।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের
পঞ্চাশজন বিখ্যাত অভিনেতা-

অভিনেত্রী মূল চরিত্রগুলিতে অভিনয়ের অল্প বনোনিমেষ
হয়েছেন, তাছাড়া সহ-চরিত্রাভিনয়ের অল্প আছেন
কয়েক মধ্য বিখ্যাত সুখরী চিত্রকারক। চিত্রটি
প্রযোজকের অল্প সময় বেলে আশান্বিত তিনটি বছর, যেখানে
হবে ৭৭ শতাংশ সময় নিয়ে এখন পর্যন্ত হয়ে ৬০০০,০০০
পাউণ্ড। ফেরের অল্প হয়তো এটি যেখানে হয়ে ছেলে
ডেলে, ইকরো ইকরো করে, যাতে লাবারণ লক্ষ
লক্ষের দিকে পুষ্টি বেলে হতাল না হয়, বেন তাই
এখনটাই তো হবার কথা, এখনটাই বুঝি হয়। বাইবেলের
কোন ঘটনারিনি নিজে চিত্রায়ণে সুনার অর্জন করেছেন
এমন প্রযোজক বা পরিচালকের সংখ্যা পৃথিবীতে কম
নয়। কিন্তু অবিকৃতভাবে সম্পূর্ণ বাইবেল, বিশ্বের খ্রীষ্টান
মানবকণের আশাযুক্ত পবিত্র গ্রন্থ, হুগালী জ্যোৎস্নার
মত চিত্রপটে রান্নাও বসন্ত মত মুটে উঠবে একের
পর এক, কাহিনীর পর কাহিনী, সত্যিও, সুবের
হুগুনায় লক্ষ চলে যাবে অন্য এক জনতে যেখানে
ফেরের প্রাণাতিরা প ডিকাতের মত হুগ, আকাশী নীলে
ভাসতে থাকে সোনাগী সব বসন্ত, হালকা মেঘের মত
পাতলা চাষও হয়ে সুবের বেকার কল্পনা, ভাবলে নিঃশব্দে
হুগ করবে রসিকজনকে। প্রযোজক লেভিসের এই
অভিনব পরিকল্পনা প্রকাশিত হবার মতো।

যাকিন হুগরাটে টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র প্রযোজক
হিগাবে অনুযায়ণ ভারতীয় হুগ ইলমাইল এন. মার্চেট
সস্ত্রি হেলে কিংবদন্তি। ত'হেলে প্রথম ভারতীয়
প্রযোজিত চিত্র "নারী লক্ষ" বর্তমান বছরে অস্কার
প্রতিযোগিতার জন্য বনোনিমেষ হয়েছে। তাছাড়া কান
চলচ্চিত্র উৎসবেও খ্রীমার্চেট প্রযোজিত চিত্রটি ভারত-

বিচিত্রা

লেখক

★

যাকিন হুগ প্রচেষ্টার ফল
হিগাবে প্রকাশিত হচ্ছে।
খ্রী ইলমাইল মার্চেট সস্ত্রি
ভারতবর্ষে ভারত-যাকিন হুগ
প্রচেষ্টার চিত্র হুগি প্রযোজনায়
কথা তাবেছেন। খ্রী মার্চেটের
অীবনে আছে বৈচিত্রের স্বাধ।

তিন বছর আগে তিনি গিয়েছিলেন আমেরিকায়,
বিজ্ঞান-সচিব হিগাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার বাসনা
ছিল বনে; অতিরেই টেলিভিশন প্রযোজনায় ব্যক্তি
হলো তাঁর, যাকিন হুগরাটে পরিচিত হলো একটি
নাম : ইলমাইল 'এন. মার্চেট'। এই কর্তৃত্বাধী
ভারতীয় হুগ আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব চলচ্চিত্র জনতে
বয়েই আহ্বার কারণ হয়ে উঠিয়েছেন।

কলে ভারত-যাকিন হুগ প্রচেষ্টার যে চিত্রগুলি নির্মিত
হবে তাতে অভিনয়ের জন্য সুখর ব্রতগরে থেকে আসবেন
অভিনেতা-অভিনেত্রীরা, এদেশের মাটিতে উঠিয়ে অভিনয়
করতে করতে তাঁরা হুগ হবেন; এদেশের নদী বন,
পাহাড়, জনপদ শহরতলী মাহু, বাতাল হুলের মত
মিহিলের হুগ চিত্রল হবে তাঁদের মনে। আর তাই
তাঁদের অভিনয় প্রাণ পায়ে চিত্রপটে, লক্ষ দৃশ্য বিশিষ্ট
অভিজুত চিত্রে স্রষ্টা জানাবে বিশ্বের এই শিল্পীদের!

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর বেত্তরাজ বর্তমান
কিবে সর্বত্রই প্রচলিত। 'যেলে যেলে মোর ঘর আছে',
মিল আছে মাহুদের আশ্বাস আশ্বাস, একথা প্রমাণের
অন্য তার কর্তের প্রযোজন বই। বিশ্বনাথি, আন্তর্জাতিক
বৈজ্ঞানিক, কত কিছুই না হচ্ছে আধুনিক পৃথিবীতে! 'চলচ্চিত্র
প্রদর্শনীর কেজেই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন?
সোথিতে রাশিয়ার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-প্রদর্শনী
বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে প্রতি বছর। বিশ্বের বিভিন্ন
শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের হুগ প্রদর্শনীর জন্য রাশিয়া অভিনবিত
হতে পারে। সুবৈশ্ব ও ভলুফেটরী এই দুই এককের
জিই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে স্থান পায়। বিশ্বের
শ্রেষ্ঠ চিত্র-বিশাষেরা শুভিক বিচারকের তার মেন।

ভাষের বিচারে যে চিত্রগুলি স্রেষ্ঠ মানোন্মীত হয় সেগুলি বিভিন্ন বিভাগে পুঙ্খপূর্ণ হয়ে থাকে। বিশ্বের প্রচলিত দেশে যেখানে আন্তর্জাতিক চলিত্রের প্রচলন সাফল্যে অগ্রগতির দৃষ্টির কারণ, সম্বন্ধ নেই।

চলিত্রের বিচারে নব্য টারভেনের কারিগরী আশ্রয় আদ্যের বিশ্বের সকার করে। বাস্তব পৃথিবীতে পড়িয়ে কি এখন কোন মানবকের লক্ষ্য পাওয়া যায় নাই-কোনওটা আশ্রয়, যে বিশ্বে শতাব্দীর টারভেন। এমন একটি মানবকের লক্ষ্য পাওয়া গেছে আদ্যের নবীর দিকে পড়ায় অরণ্যে। দুঃশাসন সাংঘাতিক প্রকল চলিত্রের অক্ষয় ভৌতুলে আদ্যের কলমে 'এল টারভেন নিগ্রেড'। প্রকলিরে দুর্ভদ্র অরণ্যে, পথে পথে বিশ্বের আর নক্ষত্র প্রকাশ্যে বেষ্টিত এক ক্ষুদ্র। এল টারভেন নিগ্রেড বাল করে দেখানো। বেড ইতিহাসের কাছে সে অরণ্যের চেহারা, অরণ্যের আদ্য। এল টারভেন আসলে একজন গভা দ্বক। সত্য পৃথিবীর আলোকেই সে ফেবেলিন ভবের প্রথম দিনে ভিত্তি জ্ঞান বাস্তব সত্যে সত্যে তাকে ডাকতে থাকে অরণ্য, পদ্মাবি পদ্মাবালি যত অ'পন মনে হয় তার। তাই বাড়ি বেড়ে পাসির আদ্যের কাছে গভীর অরণ্যে গভা হয় তার নতুন জীবন। কিন্তু বাপলফুস অক্ষরকে, পথে পথে বৃত্তকে হাতে নিয়ে এল টারভেন নিগ্রেড বালতে থাকে। আদ্য দ্বিতীয় গেছে তার পূর্বোদ্যে সব পরিচয়। সে আদ্য এল টারভেন নিগ্রেড। অরণ্যের চেহারা।

পৃথিবী থেকে ২৫ মাইল উর্ধ্ব আয়োনোফির নামে যে বিজ্ঞানায়িত স্বর বয়েছে তাই সাধারণ ভোক্তার মনকে বৃত্তব পর্বত প্রেরিত হয়ে থাকে। আয়োনোফির অধিব একপ্রকার নামে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে এই ধর সম্পর্কে বহু ত্রুটি জ্ঞান দিয়েছে। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা বিজ্ঞানিগণ এ সম্পর্কে জানিয়েছেন যে: ১০ পাউন্ড ওজনের এই কৃত্রিম উপগ্রহটি পঞ্চ নভেলর মাসে মহাকাশে প্রেরিত হয়। আয়োনোফির সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ এই উপগ্রহের স গৃহীত হয়েছে:

পূর্বে বর্ণনা ছিল এই একটি পৃথিবীর উর্ধ্ব ৫০ থেকে ৩০০ মাইল পর্বত বিস্তৃত। কিন্তু এই উপগ্রহের সাহায্যে জ্ঞান দিয়েছে যে এই একটি বয়েকশত মাইল—অক্ষত: দুঃশাসন মাইল পর্বত বিস্তৃত।

আয়োনোফিরের ওপরের দিকের একটি সত্য প্রকৃতির—এ একটি পরিবর্তনশীল নয়। কিন্তু এর সীমাবদ্ধ

একটি সাংবেদনশীল—সৌরবেগের যে কোন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এখানে হয়ে থাকে। সেখানে প্রকৃত ক্রিয়াকারণ ঘটলে এই স্বরে ভাবন হয়ে, যেভাবে যোগাযোগ বাস্তব হয়ে পড়ে।

পৃথিবী থেকে ৩৫০ মাইল উর্ধ্ব পর্বত আয়োনোফিরে যে সকল উপকরণ দিয়ে তৈরী তত্ত্বেরে প্রথম উপকরণ হচ্ছে অক্সিজেন। এই উর্ধ্ব প্রবেশে হাইড্রোজেনের-আম্লিকতা বেধা যায়।

আয়োনোফিরের ওপরের ওপরের ইলেকট্রন ও প্রোটন-সমূহের তাপমাত্রা এই স্বরের যে মাসে তারা থাকে তাইই সমান।

অধিব একপ্রকার আয়োনোফির ও উচ্চারণ সম্পর্কে তথ্য-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দশ-প্রকার স্বর সহ মহাকাশে প্রেরিত হয়। পৃথিবী এই প্রেরণে বৃত্তম বাস্তব বা অ'পন ১৫০ মাইল এবং নিকটতম বাস্তব বা অ'পন ২৭৫ মাইল। এই উপগ্রহটি এখনও পৃথিবী প্রকলি করছে; মহাকাশে প্রেরিত স্বর পর নিম্নিত ভাবে ত্রুটি স্বর বেতার স্বরের সাহায্যে তথ্য প্রেরণ করে এগেছে। এর পর এই স্বর বিকল হয়ে বাস্তব স্বর সংগ্রহ আসছে না।

৩৫ ইঞ্চি ব্যাসের ও ১০ পাউন্ড ওজনের এই উপগ্রহের সাহায্যে উল্লিখিত তথ্য বাস্তব আবেগ করছে তথ্য সগৃহীত হয়েছে—নামে বর্তনের পাশে তথ্য এই উপগ্রহটি পরিবেশন করেছে।

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা তার ওপেরী এই আয়োনোফির জানিয়েছেন যে, কৃত্রিম জ্ঞানসর্গে নামে উপগ্রহের সাহায্যে ১৯৬১ সালের নভেলর মাসে উর্ধ্বলোকে যে স্বরের উচ্চারণের লক্ষ্য পাওয়া দিয়েছিল সেই স্বরনেই কণার লক্ষ্য ১৯৬০ সালের নভেলর মাসেও অধিব একপ্রকার নামে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে পাওয়া যায়। এসকল কথা গতি বটায় ৪০ কিলোমিটার—পূর্ব অধিব বৃত্তকল্পে এই সকল কণার উৎসকেই বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। এসকল তথ্য পর্যালোচনা করে দেখাচ্ছে।

ক্যালিফোর্নিয়া মহাকাশে বাস্তবের বস্তুর প্রতিক্রিয়া নিম্নলিখিত কণার একটি স্বর সম্ভ্রতি লস এক্সেলেরে ক্যালিফোর্নিয়া শিখরিকাল থেকে উদ্ভাবিত হয়েছে। সম্ভ্রতি বস্তু কৃত্রিম ও সংবেদনশীল একপ্রকার ইলেকট্রো এনসেফালোগ্রাফ (Electro encephalographs) নামে যে স্বরটি বাস্তব হয়ে থাকে তাকে ভিত্তি করেই এই স্বরটির একটি উদ্ভাবিত হয়েছে, এই স্বরটি আকারে একটি পিরামিডের বস্তু এবং বেশ ভারি। কৃত্রিম সংবেদন স্বর লস এক্সেলেরে লক্ষ্যসমূহের উপযোগী নয়।

সংকলন অষ্টম

পতাবীর ক্যাসী সীলো-
গুলির সম্বন্ধে কৌতূহল
হাসিকামনের একমাত্র কিছু-
বাক্য কথোনি। ক্যাসী সমাজ
জীবনের সঙ্গে একমাত্র সীলো
নামক এই সামাজিক

সীলো ও ক্যাসী সমাজ-জীবন

অন্যক মুক্তাকী



charmed circle।

ক্যাসী চি বা জীবন,
সৌন্দর্য, সামাজিক জীবিত
পরিবর্তন ও রাজনৈতিক
বিবর্তনের সঙ্গে এই সীলো
গুলির অবস্থিতি যোগ
হিল। বিপ্লবের অব্যাহতি

সাংস্কৃতিক এই গোষ্ঠীগুলির নিবিড় যোগ ছিল।
ভীষ্মের রেগের ক্যাসী সমাজ জীবনে যে ভীষ্ম এবং
বিত্তের হনোভান সফাতিত করেছিল তার অব্যাহতি
প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই সীলোগুলির উদ্ভব। নৃত্য
এইসমূহ পক্ষন লাইএর সময়ে বিশেষ প্রাধান্য লাভ
করেছিল। অতীতের প্রকৃতির দিক থেকে এই
সীলোগুলির বাবিকতা তুলনা চলে বর্তমান লুপ্তভার
নামে কিংবা ইংলন্ডের Synod গুলির সঙ্গে। কিছু
ক্যাসী এই মিলন চক্রগুলির অনন্যতা বোধের এদের
বহুদুর্ভাগ্য। এদের আধাঙ্গা ছিল প্রগতিশীল রক্ষণ-
শীলতার। যে দলান্তের্যে একমাত্র ক্যাসী সমাজপ্রাঙ্গণে
সাম্প্রদায়িক হোতেন, তাঁরা আরও ঘনিষ্ঠ ঘরোয়া ও
ব্যক্তিগত মিলনভাবের আকাশের হরতো সীলোগুলিতে
এসে মিলতেন। এই মিলনকেন্দ্রগুলির বৈশিষ্ট্য ছিল
আতিথ্যেরতা ও আদম পরিবেশন। হরতো কিছু
সামাজিক মুক্ততা ও অসামাজিকতার বিরুদ্ধে একটি
সামাজিক প্রতিক্রিয়ার এদের প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল।
কিছু এদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকও ছিল। প্রাচীন ও
নবীর মিলনভাব হিসেবে সীলোগুলি একটি বিশেষ
মর্যাদার প্রতিষ্ঠিত ছিল। আলোকপ্রাঙ্গণ যে দর ক্যাসী
রমণী এই দর সামাজিক চক্রগুলিতে আধিপত্য করতেন
তাঁদের প্রকৃতি, আদম এবং সমাজের দ্বারা এই মিলন
চক্রগুলির প্রকৃতিকে প্রভাবিত করতো। এই অভিজাত
দলদ্বারা মুক্তিকে বিশেষ মর্যাদা দিতেন এবং গুলের
সামাজিক দায়িত্ব করতে জানতেন। এরা মুক্তিপ্রাপ্ত
হিসেব এবং আতিথ্যেরতার তার স্বাক্ষর রাখতেন।
সুদূরী রমণীদের এই সীলোগুলির ছিল দর রাজত্বের
বতো। এগুলি ছিল দিকে ইংরেজিতে বলা দর

পুর্বেই বিরোধ একটি সামাজিককোডে এবং বিবেচন
ক্যাসী মনকে অধিকার করেছিল। দিগন্তে নৃত্য
সামাজিক এবং সামন্তবাসী তাবদ্বারা উদ্দেশ্য দেখা
বাচ্ছিল এবং দ্বারা নৃত্য তাবদ্বা ভাবহিসেবের তাঁরা
বোধের একটি অভিন্ন মিলনকেন্দ্রের অঙ্গভাষা হিসেব।
অতীতের আদম এবং বুদ্ধিমান সামাজিক সংস্কার
মধ্য দিয়ে হাতে নৃত্য চিত্রাবস্থা জনপ্রিয়তা লাভ করে
তার অন্য সীলোগুলি ছিল একটি ইতিহাস প্রেমিত
প্রতিষ্ঠান।

এদের উদ্ভবের হেতু বোধের এই যে বিপ্লববাদিন
নামে বিশেষ প্রকৃতি, আচার ব্যবহার এবং সংস্কার
রক্ষার বিদ্যালয় থেকে গৃহক একটা কিছু করার মধ্যে।
হরতো সামাজিকতা, শিক্ষকতার দিকে একটা নৃত্য
কৌশল ফলেই এগুলি বিস্তারিত্য লাভ করতে থাকে।
হরতো তৎকালীন অভিজাত রমণীদের প্রতি আকর্ষণ
ও প্রভা এগুলির আভ্যন্তরীণ ভিত্তি এবং তাঁদের অস্বাভাবিক
এগুলির সামাজিক বিস্তারিত্যের একটি কারণ। ভব্যতা,
বুদ্ধিমান, মিলনকেন্দ্র এবং চিত্রাবস্থা আদমপ্রদান দর কিছু
সীলোগুলিকে তাদের পরিপূর্ণ রূপ দিতে সাহায্য
করেছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, সীলোগুলির মৌল
প্রকৃতি হচ্ছে অভিজাতপ্রেমীকে স্বদগলের থেকে গৃহক
ও সম্পর্কহীন রাখা। বেশকিছু ভাব্যবোধের হত্যার
এবং বিশেষ ইতিহাসের সামাজিক প্রভাব রোগ করার
প্রচেষ্টা সীলো মুক্তির মূলে নিহিত রাখ করেছিল।
ক্রান্তির ইতিহাসগত ভাব্য এবং সাহিত্যপ্রাঙ্গণের
পুনর্মুদ্রণের এদের সজান উদ্দেশ্যে দর হলেও আদমের
বতো ছিল। আসলে রাজপ্রাঙ্গণের সামাজিক প্রতিযোগী
হিসাবে ক্রান্তির অভিজাতপ্রেমী এই সম্মেলনগুলি

ভাবধারা প্রাচীরে কেন্দ্র হিসেবে একসময় কাজ করেছিল । বুদ্ধির বুদ্ধি আন্দোলনেও অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক এই প্রতিষ্ঠানগুলির একটা দৃশ্য ভূমিকা ছিল । শিল্পের আবহাওয়া বোহেমিয়ান । পূর্ব হীন অর্থ' এগুলিকে প্রসঙ্গ কুছ বললেও ভুল বলা হবে না । নৈতিক শিথিলতা এবং দুর্ক প্রের এখানে হীতি হিসাবে গৃহীত হতো। একটি সুবাহাী জীবনধারণে শিল্পের সত্যতা বিশ্বাস করতেন । তাই জীবনকে উপভোগের প্রেপ্ত উপকরণগুলির সমন্বয় এখানে হয়েছিল । অচ্যুত ব্যবহারের উৎকর্ষশাসনে দৃষ্টিভী যে স্তরকম্মায়া এসের শীর্ষে' ছিলেন তাঁদের চুলুমা ব্যানকটা ঐসের হেটাইয়া এবং প্রাচীন ভারতের সামাজিক পুষ্ঠপোষিকাদের সংসে চলে । এগুলি ছিল আভিজাত্য এবং সৌহার্যের ভিত্তিকভূমি । শূদ্র তাই নয়, বুদ্ধিকর্মীরাই বিনয়কেন্দ্র হিসেবে এগুলি ছিল অনেকটা অ্যাকাডেমির মতো । রাজনীতিকদের কাছে এগুলি প্রায় দরবারমহল-মতো । যেখানে ভবিষ্যৎ ঘটনার প্রায়পাত সম্ভব । বহু বক্তৃতার ভিত্তি রচনা করেছিল এই সালোগুলি । সংগীত ও শিল্প কলার বহুপ্রদর্শনী এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং বহু অন্তরঙ্গ জীবনশক্তি শূদ্র এগুলিকে কেন্দ্র করে গঠিত হয়েছিল । শোব', বুদ্ধি ও সৌখ্যের প্রতি স্রষ্টা জীবনের বর্নিত সুযোগ কলার জীবন গঠনকা এই শিল্পের বারুকতই পেয়েছিলেন ।

সালোগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একজন ব্যাভাষা লেখক বলেছেন, 'It was a resort not only for the fine wits who frequented the court । বহিও সালো জাতীয় আনন্দ কেন্দ্রগুলি অভিজাত কেন্দ্রিক ছিল তথাপি পরিণেমে তারা ক্রান্তের সর্ব-সাধারণের ক্ষয়ক্ষয়ের পরোক্ষ মাধ্যমে পর্বর্গিত হয়েছিল । সেই সাইন অব্য এগুলিকে সমাজব্যয়ের 'রভেডু' বলেই অভিহিত করেছেন । তিনি বলেছেন, 'It was Rendezvous of all that was most distinguished in condition and in merit, a tribunal with which it was necessary to court and whose decision upon the credit and reputation of the people of the court and the world

had great weight । বহুতঃ এখানে শূদ্র সত্যতার মনোভাবই স্ফািক্ত হোত না, কলারী সেনের গতিবর্তন এবং ভাব্যতার বান নির্ধারণে একলা এসের একটা সক্রিয় ভূমিকা ছিল । প্রোভানের অবস্থা ভাব্যর বলা যায় যে, সালোগুলি ছিল এমন একটি সামাজিক ক্ষেত্র 'where the spirit was purified, where virtue was revered ।' আভিজাত্য গুণসম্বিত এই বিশিষ্ট সম্মিলনগুলির বহাধ' প্রকৃতির বর্ণনা করতে গিয়ে আর একজন সমসাময়িকের মতব্য উদ্ধার করা যেতে পারে । তিনি বলেছেন যে সালোগুলি ছিল 'a select court, numerous without confusion, modest without constraint, learned without pride, polished without affectation ।' এই শিথিল আনন্দ চক্রগুলির বৈশিষ্ট্য তদাই সোময় এইখানে যে এগুলি অভ্যাসিক প্রবণতা থেকে ছিল একেবারেই বৃক । শূদ্রা মতিত একটি জীবন ভরণী সামাজিক বান্দুকের সামনে তুলে বরাভেই ছিল এসের সামর্থ্যতা । বুদ্ধির শূদ্রতা এবং বুদ্ধির শব্দ বুদ্ধিকে কলারী সামাজিক জীবনে ব্রুকা করার জন্যে যে পরিণেপ প্রয়োজন সালোগুলি তাই রচনা করেছিল । পরিণেপ শিল্পের প্রকৃতি বর্ণনার আরেকটি বিশিষ্ট উক্তির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে । সেটি হচ্ছে এই যে, সালোগুলি মূলত ছিল 'a nook where both the politeness and elegance of French manners and customs and independence of thought, the generous ideas of patriotism and liberty had taken refuge ।' একটি বিশিষ্ট সামাজিক বোঝা এই শোষ্ঠীগুলির মধ্য গিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল যা জীবনের সন্ধ্যা বা সমাজের সমস্যা কোনোভাবেই এড়িয়ে যায় নি ।

সালোগুলির বিশেষ প্রকৃতি বহুলাংশে নিষ্ঠুর করতো তাঁদের পুষ্ঠপোষিকাদের মনোভাবের ওপর । রায়ন জ্যামবুইসেট-ভর সালো ছিল লগিত আচলরীতির দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত । লা গ্রাফি ব্যাধাযোয়া-সেনের সালো ছিল রাজসভার একটি কুর সংকল্প । সত্যতার কেন্দ্র ছিল রায়ন বি শোষ্ঠির মিলনভূমি ।

মাদাম লেনক্সের সালোতে সৌখ্য এবং স্বাধীনতার
ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত দেখা গেল। মাদাম বি মোস্টারের
মিলনক্ষেত্রে বিশেষভাবে সামাজিক স্বাধীনতার
প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং পরিবারের মনোভাব প্রকাশ
হল। বুদ্ধিমত্তার মিলনক্ষেত্রে ছিল মাদাম বি
লেনক্সের সালো। পুষ্টির চর্চার জন্য মাদামোকে
বি লেনক্সের সালো ব্যক্তিগত স্বাধীন করেছিল। সাহিত্য
এবং মিলনক্ষেত্রে পুষ্টিসাধনা ছিলেন মাদাম
লেনক্সের। আর স্বাধীনতার কেন্দ্র ছিল মাদাম বি
লেনক্সের সালো। বিশেষভাবে লক্ষ্যীয় এই যে ক্যাসী
সামাজিক জীবনের বিবর্তন এবং সমাজ সালোপুষ্টির
বিশিষ্ট প্রকৃতি ও বিবর্তনের মধ্যে প্রতিফলিত।

মাদাম লেনক্সের সালো একটি স্বতন্ত্র আদর্শ-
ক্ষেত্র ছিল। শিল্প তার সামাজিক স্বাধীনতার জন্য বা
হ্যুতো বিনামূল্যে তার আদর্শে মিলিত হোতেন ক্রমশঃ
সামাজিক, স্বাধীনতার জন্য ও স্বাধীনতার দল।
সামাজিকের বুদ্ধিমত্তার জন্য কৃতি ছিল না। এমনিভাবে
লেনক্সের মধ্যে মাদামোকে বা আদর্শিকতাকে।

মাদাম লেনক্সের মধ্যে অদ্বৈত হোতো নির্মিত
সামাজিক উৎস। এটি প্রায় একটি স্বাধীন আদর্শ-
সাহিত্যে মূল বিচ্ছিন্ন। এই কেন্দ্রের উৎস ছিল একটি
বিশেষ সামাজিক সৌখ্যমোহ। সামাজিক অদ্বৈতের
চয়ে পুষ্টি আদর্শবৎ ছিল মাদাম লেনক্সের দল।
তার সালোটি ছিল আসলে একটি আদর্শপন্থা উপগ্রহ
বলয়। না গ্রাফ মাদামোকে সালো আদর্শ ছিল
সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। সামাজিক এবং স্বাধীনতার
সব ক্ষেত্রে মাদামোকে সালো এই ভবিষ্যতের পুষ্টি বোম
ছিল এবং সামাজিক সালোও তিনি লাভ করেছিলেন।
তার সালোটিতে মাদামোকে বিশেষ করে এই যে এইখানে
জীবনশৈলীর স্বাধীন প্রত্যক্ষণে স্বাধীন হয়েছিল।
মাদাম লেনক্সের সালোতে একটি বা বিনয়
বিন্যাসের প্রায় সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি চিত্রার পরিপক্বতা
এবং পুষ্টিসাধনার জন্য কিছুটা প্রাথমিক আদর্শের
স্বাধীন হয়েছিলেন। তার সালো কিন্তু নিজস্ব
ব্যক্তিগত, সামাজিক বা আদর্শবৎ ছিল না। সামাজিক
সমাজ, সামাজিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বিবর্তন হা

সামাজিক ও সামাজিক পুষ্টিসাধনার পরিবর্তন সালো
উৎসাহমূলক সামাজিক মিলনক্ষেত্রও ছিল। সামাজিক-
সেটের সালো তার প্রকৃতি প্রকাশ। পুষ্টিসাধনাতে তিনি পুষ্টি
এবং সালোপুষ্টি থেকে সামাজিক ও প্রকাশিত হোতো।
যদি হোক মাদাম লেনক্সের সালো পুষ্টি বুদ্ধিমত্তার
ভিত্তি চর্চাই ছিল, বুদ্ধি বুদ্ধিমত্তালাভের পুষ্টি
হয়েছিল। এই সালোর সামাজিক বিবর্তনের পুষ্টি,
সামাজিকের মিলন, বুদ্ধি স্বাধীন সমাজ এবং
ব্যবহারে স্বাধীনতার বিবর্তন একটা অভিন্ন প্রকাশ-
ছিল। সমাজ থেকে মাদামোকে এখানেই পেয়েছিলেন। তখনকার
সামাজিকের মিলন থেকে এখানেই পেয়েছিলেন। তখনকার
মিলন এই অভিন্ন উৎসের দিক থেকে এটি একটি
আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। মাদাম লেনক্স
মাদামোকে বিচ্ছিন্ন স্বাধীন এবং পুষ্টির স্বাধীন থেকে বুদ্ধি-
সাধনার জন্য বুদ্ধির সমাজের মধ্যে নিজে থেকে মাদাম
লেনক্সের সালো। স্বাধীন বুদ্ধিমত্তার কেন্দ্র করেই
তার চর্চা গড়ে উঠেছিল। তিনি একটা প্রাথমিক প্রকাশ
ছিলেন তা স্বাধীনতার জন্য না। স্বাধীনতার চর্চা
ছিল বুদ্ধিমত্তার সামাজিক সমাজের মধ্যে মাদাম লেনক্স
সামাজিক স্বাধীনতার।

সামাজিক এবং সামাজিক প্রায় আদর্শ-
পুষ্টিসাধনার মিলন স্বাধীন করে পেয়েছিলেন মাদাম
লেনক্সের সালো। তার পুষ্টি পুষ্টি হা মাদাম লেনক্সের
সালোতে। কয়েকটি মূল সামাজিক প্রায়ের ভিত্তিতে
একটি সামাজিক পরিবেশ প্রকাশ এই সালোটি নিম্নলিখিত
কাজ করেছিল। পুষ্টি স্বাধীনতার পুষ্টি উঠেছিল
মাদাম লেনক্সের, মাদাম বি লেনক্স, এবং মাদাম লেনক্সের
পুষ্টিসাধিত সালোপুষ্টি। স্বাধীনতার পুষ্টি একটি
সামাজিক উৎসাহমূলক উৎস হতে থাকে। মাদাম
লেনক্সের সালো থেকে পুষ্টির একটি মূলপ্রভাব ছিল।
মাদাম লেনক্সের সামাজিকের মিলন একটি বিশেষ
ক্ষেত্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তার ভবনে মাদামোকে স্বাধীন-
পুষ্টি এবং সামাজিকের। তার প্রকাশমূলক স্বাধীন
উৎস থেকে বাড়তে থাকে। সামাজিক ও বুদ্ধির সামাজিক
তিনি ছিলেন স্বাধীন এবং স্বাধীন অদ্বৈতবৎ। মাদাম
লেনক্সের সালোটিও একটা বিশেষ যে এখানে বহু

ইংরাজ জ্ঞানীগুণীর সমাবেশ হতেছিল। বাদাম সেকোর্সের শালোতে বহুবিচিত্র মানব ভীড় করতে থাকে—পূর্ব সমাজ প্রেরণা নহ। এর ভিত্তি ছিল স্বতন্ত্র এবং দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বহুভাষিক। এটির প্রকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে একজন সালোবিশ গভীর আবেশে মত্তা করেছেন। 'It was no longer only the elect who were admitted to her super table, but a crowd of nobility, royalty, foreigners and wealthy; quality was sacrificed to quantity, exclusive choice gave way before the claims of rank, pleasure became less an end than spectacular effect'। বাদাম সেকোর্সের শালোর এই লৌকিক প্রবলতা নিয়ে যথেষ্ট কটাক্ষ হয়েছে। বলা হয়েছে যে এই সব থেকে শালো গুলি পরিপূর্ণ হয়, 'over inflated cult'এ। কেউ কেউ আবার পরিহাসচ্ছলে মন্তব্য করেছেন 'যে শেখের দিকে সালোগুলিতে প্রাধান্য পেয়েছিল brilliant but vulgar crowd'। বাদাম দি স্তিলের শালোকে নেপলিসন একটি ক্রাবের সংশ্লিষ্ট বুলনা করেছিলেন। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অব্যর্থ তার শালোর প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল গভীর। তিনি ছিলেন রাজপ্রতিনিধির সহানুভূতি এবং সমাজপ্রধানদের বরণ্য। কিছু বিশেষ করে তার সব ক্রোধান্বিত ব্যঙ্গ ভূক্ত মানবিক বিলম্বিতভাবে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বিপ্লবের সমারোহে করার তাঁর শালোর কিছু অবদান অবশ্য ছিল। ব্যর্থ উচ্চাভিলাষই তাঁর শালো সৃষ্টির প্রকৃত উৎস। বাদাম স্যামিকউলসেটের শালোকে একথা 'the cradle of the reforms in manner's' আদ্য দেওয়া হয়েছিল। Reign of Terror এর সময় বাদাম ন্যাসামিকারের সামাজিক প্রতিপত্তি ছিল অসামান্য। যখন বিপ্লবের অবসান হতে প্রবেশ করা হয় তখন সামাজিকের দিকে ক্রান্তি সমাজের উচ্চপ্রেরণা নহ। তিনি, যোগ্যতার চেষ্টা করেছিলেন। সৌখিন্যবর্ধী ন্যাসামিকারের বৈঠকের প্রধান ছিলেন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কুটনীতিক মাতোত্রিয়ার। সৌখিন্য চর্চার পুনঃ-

পদ্ধতির এই প্রচেষ্টাটি বিনষ্ট হয় একটি সমারোহে নিষেধনামায।

বস্তুত: সালোগুলি ছিল গুরুত্বপূর্ণ এবং বুদ্ধি-জীবীদের একটি অভ্যর্থনা সমন্বিত গানের মধ্যে পরিণত হতেছিল ভাব ও উৎসাহের প্রবলতায়। কলে সালোগুলি ভেঙে যেতে থাকে। জীবনের উল্লেখ্য করা ছাড়া অন্য উৎসাহের সন্ধান করাশী মানব অব্যাহত করেছিল। একটা বহান স্মরণ—যা এতোদিন এগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল—সামাজিকতায় অভিব্যক্তির সংশ্লিষ্ট তার স্বপ্নদায়িনী হতে থাকে। পৃথকভাবে আবেশ-প্রবোধের অব্যাহত ব্যবস্থা ক্রাবের সৃষ্টির ব্যাপারে সম্ভব হতে থাকে। করাশী মানবের জীবনে গভীর সন্ধান হতে থাকে হৃত। কলে ইতিহাসের অত্যন্ত স্মারক-বিক নিরসেই শিল্পকলার প্রতি আদ্য-বস্তু করতে থাকে। অনন্যমণের প্রতিষ্ঠার নির্দ্বন্দ্ব সামাজিক পরিচ্ছন্নতারোমের দ্বারা স্মৃতি ভাঙিত স্মরণ মানব আর স্মরণ করতে চায় না। নতুন সামাজিক মনোবোধ শালোর অঙ্গ নিভৃতকৈ করু করতে থাকে। মনোবোধ ও জ্ঞানের প্রদান মানবকে বহুনিষ্ঠ এবং হরতো কিছুটা ব্যক্তিগততত্ত্ববাদীও করেছিল। কলে সালোগুলির হৃত অবনতি হতে থাকে। নতুন করাশী চিন্তা জীবনে এই আদ্য মনোবোধের বহুমুখী প্রবোধকেন্দ্রগুলির দ্বারা অঙ্গ বসেই অব্যাহত হতে থাকে। স্মৃতিস্মরণ সামাজিক সন্ধান সন্ধানের দিক থেকে অত্যন্ত স্মারকবিকভাবেই করাশী মানবের মন হরতে থাকে।

স্মৃতি সালোগুলির সন্ধান করাশী সন্ধান ইতিহাস অঙ্গালিতভাবে জড়িত। ক্রাবের সামাজিক বিপ্লব ও সন্ধানের এগুলির দ্বারা কন ছিল না। তবে মানবিক আবেশে যে এগুলির অতিমাত্রায় ছিল তার প্রদান করাশী প্রকৃতিই দেয়। অন্তর থেকে হরত বীচির এই সামাজিক আঙ্গাল চক্রেগুলি এক সময় করাশী সমাজ-প্রবোধের দ্বন্দ্ব-বর্ধন করেছিল, দ্বন্দ্ব না রেখেই ভা বলা যায়।

সুন্দর নতলের মেয়ে
কাঁদে। ঢেপে ঢেপে
নিশাথে। ঘেন চুপি-
চুপি। কপালে এখনো
সিঁড়ির চিঁচি কোটীনি।
কিছু বা হতে চলছে
যেটো। তাই বোধহয়
এনি করে কঁদতে হল,
কাহা পার।

কিছু সুন্দর সেন-
গুতার বা কাদিতে
পারেন নি। কাদিলে সুন্দর নতলের মেয়ের মত করে
কাঁদতে হতো। যদিও কাহার সূত্র দুটো বিভিন্ন।

সুন্দর নতলের মেয়ে কাহা আটকাতে ব্যর্থ
হয়েছে। কিছু সুন্দর বা তা পেয়েছিলেন। সুন্দর
আলোটা জ্বালাতে পারে নি তাই।

পুরোনো কালক সংগ্রহ করে যে দোকটা আমার
জান মৈনিকগুলো সেই নিয়ে যায়। একদিন কেন
করে রোঙ্গা থেকে একটা বাতা ফেলে দেল সে।
পুরোনো একটা এক্সারসাইজ বুক। পাতার পাতার
ভাঙ্গা গছ। ভেতরে বাংলা পোটা পোটা কালির
হুক। পড়লাম। একটা ভায়েকি মতন মনে হলো।

সেই হয়ে কিসী হয়ে সেহে কাদলগুলাদির কাছে। কিছু
একটা কীনা জানা হলো আমার। ঘেন একটা সোপন
সংবাদ। তাই বোধহয় বাতাটা কিরিরে দিতে ভেমন
উৎসাহ পাই নি।

আজ অনেকদিন পরে সুন্দরের মেয়ে সে বাতা
খাবার কথা মনে করিয়ে দিলেন মনে করিয়ে দিলে
সুন্দর মাকেও।

ভাবছি, একজন কাঁদছে সিঁচিটা হাস্যনো বেই
বলে। আর একজনের সিঁচি বোবার হং হয়েছিল
বিশ বছর আগে। সুন্দর তখন ইচ্ছার বেড়া
জিপ্সোবার আয়োজন করছে।

সেখাটা সেই সময়কার।

“আমি সুন্দর সেনগুতা, মদারের দর কিছু



আমাকে কেন্দ্র করে।
বাগা মার সব কিছুতে
নিলে আমি।

সে বসে মেয়েদের
একটা মালম করে
দম বর শীতের খঁজে
বেড়াতে হর আমাকে
তা করতে হর নি। মাকে
পেয়েছিলেন অনেকটা
ভেবনি করে। বয়সের
ব্যবধানটা আমাদের যুগে

পেছিল দু'জনের অসহ মেনামেশায়।

আমি যে বাড়ির একমাত্র মেয়ে, এই একমাত্র হওয়ার
কারণটা মার কাছেই পূর্নহিলাম। আমার পরে আরো
একজন এসেছিল, কিন্তু সে আত্মকৃত্তকের চৌকাঠ
ভিঙেপাতে পারেনি। তার চাইতেও শব্দ করে জ্ঞানার
সাকার কথা শুনতে পেয়েছিলেন না। জ্ঞানার কাকা
নাকি হুসে করে বাবাকে বলেছিলেন, সুন্দর প্রথম
আর ওই শেষ।

মা বলতেন সে জন্য দুঃখ করি না। তাকে
এবার কিরে দিবে জানাই আনবো। ছেলের হুস
হঁচবে।

আমি জানতাম বাবের ইচ্ছা তা নয়। মাকে মাকে
মাবার বিয়ের জন্য বাবা ব্যস্ত হতেন। মবের হুস
শুভীর হতো। আমার আড়ালে বাবাকে বলতেন,
সুন্দর পর হবে না অন্য কোথাও-গলে বাবে ভাবতে
পারি না।

এই বা আমাকে সম্বোধ করতেন, হুস করতেন।
প্রথম বলে হয়েছিল বুকি অসুস্থতায়।

বিলল এলে আমি গুপ্তের ঘরে গাই। বিলল সেখানে
সেই থেঙে আসে। কাইনালের গড়া নিয়ে ব্যস্ত আমি।
বিলল এসে আরো ব্যস্ত হয়ে উঠি। অল্প দূরে
অনেক কিছু ছেনে মেবার ব্যাকুলতা। মাস্টার হিসাবে
বিললের দায় বহু।

বিলল এল খানিক রাতে গুপ্ততলার মাও উঠে

৩৯

৩৯

আসেন। রোগ। আসে, তার পায়ের নত পেতাম। এখন শেখান দুনিয়া। তাই তার লক্ষ্যে একটা হয়ে গ্যা শেষ নিঃশ্বাস পর-সকারে। একদিন তো আশেই উঠলাম। একটা কাজে বাইরে এসে আমার দুখানো পড়ে গেলো। বাতাসের অন্ধকারে কখন এসে পড়িয়েছেন তিনি। ভয়ভয় করে নিঃশ্বাস নেমে গেলেন বাত। আমার মনে হলো, একটা বুকের দান মনে পড়িসে। পিছলে পিছলে নেমে গেল।

বিলম্বের সঙ্গে আমার আরো একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, সে কথাটা গুরিয়ে মাকে বুঝিয়ে দিয়েছি আগেই। তবে কী তিনি আমারে দুখানকে বাইরে দেখতে চান। পড়া ছাড়াও আমার অন্য কিছু আলোচনা শুনতে চান বুঝি সোপানে। কিন্তু এই সোপানতার আমার সার্থকতা কী। এই সব প্রাই করেছি নিজে। উত্তর মেলে নি।

মাকে মাকে এসে বসেন দুজনে চেয়ারটার। চুপচাপ উলের কাটা চালিয়ে দান। আর ওই হয়ে বুড়িয়ে বুড়িয়ে দেখেন আমাকে। বিলম্বের দিকে আমার ভেতন নজর নেই। দেখলে মনে হয়, বিলম্বের উপস্থিতিটাই ভুলে গেছেন না।

মারের এই বুড়িয়ে দেখার মধ্যে একটা আশোজনতা লক্ষ্য করি। আর তাই পিউরে উঠি। কুমারী মেরেকে ওভাবে নজর দিয়ে দেখলে আমার মনে হয়, প্রত্যেক কুমারীর সেটা লক্ষ্যের কারণ। হোক, তিনি না। মেরে আর না। এক সেরের দুটো হুশ। তাই দুটো ন। মারের অনুদান, আমার লক্ষ্য। বিশেষ করে বিলম্বের সামনে ওভাবে আত্মকে বুড়িয়ে দেখবার কী আছে।

একদিন বিলম্বের সামনে না আমার দুখটির অভাবটাও গুরিয়ে দিলেন। লক্ষ্যের আমার মাথা কাটা গেল। একটা পাতলা দুখের গ্যারে ছিল আমার। সেহ জন্মা করা সরব ছিল তাই। তবে অসামান্যতার কিছুই প্রকাশ পায় নি। কিন্তু ওভাবে একটা দুখের সামনে সাবধান করে দেওয়া উচিত হল কী। অতঃ পরে অল্প থেকে আবরণটাই ছিনিয়ে নেওয়া হলো। দুটে পালিয়ে এলাম সেখান থেকে।

এর আগেও বা আমাকে সাবধান করেছেন। সেটা

শিবিবে ফেরার জন্যে। শাসন ছিল, জন্মা ছিল না। বা আমাকে সেই জন্মা গুরিয়ে দিলেন। কিন্তু কেন!

বিলম্বের মধ্যে পিকে না যে একবারেই তাকান না, একখাটা ঠিক নয়। লক্ষ্য রাখেন বলা চলে। বিলম্ব আমার আশুদের চোখাচোখি হয়, ছোটা-বুড়িও। সেটা পড়াশোনার মাধ্যমে, তাকে কেন্দ্র করেই। কিন্তু এ সময় আমার দুখি প্রবল হয়। দুখতে পাঠ মারের উলের কাটা দেখে দান। বিলম্বের দিকে নজর আসে তার। মারের দিকে তাকাতো কেনন লক্ষ্য হয় আমার। তাঁকে অনুদান করতে লক্ষ্য।

দেখিন একটা অল্প বিশেষ জাত হলো। ভুল, পুঙ্, ভুল। আমাকে আমি কাটা বরাবর। বিলম্বের হাতের পেন্সিলটার আচরকা একটা টোকা অনুভব করলাম মাঝার। বললে, মাঝার পুঙ্ গোবর ভরা।

আচরকা না চেয়ারটা টেনে টিখারের মত একটা পুঙ্ অনুভব। দুখনেই চমকে উঠলাম। দেখলাম, উলের কাটা নিয়ে বড় ব্যস্ত না। নিবন্ধি হয়ে চেয়ে আছেন সেই দিকেই।

বিলম্বের পেন্সিলের শাসন কী মারের মনে অন্য রং গুরিয়েছে। শাসনের অঙ্গ না হয়ে অঙ্গরাস। না হয়ে কী তাই সাবধান করে দিলেন। তা হলে কী আশি-বুকে নেব যে বিলম্বের সম্বন্ধে আমার কথাটা না লক্ষ্য করে মনে নিতে পারেন নি। বিলম্বকে তাঁর লক্ষ্য না হোক, ওকে অবজ্ঞা করবার মারের এই কী স্বীতি। এখন থেকে মাকে আমি অন্য ভাবে ভাবতে শিখলাম।

পড়াতে বসে বিলম্ব সরের হিসাব কষতো না। ভুলটা না গুরিয়ে দিতেন। বড়ির কাটা বড়ির কাছে এসেই না নিলখে দুখ-বোডের কাছে গিয়ে গুঁড়াতেন। আশুদের দুখিই হাতের আমার দুখিটার মাঝার। একটু বিরতি। এই সময়টুকুর মধ্যে বিলম্ব বাইরে চলে যেতে পারতো। না আলো শিবিবে না দিয়ে আমার এসে বসতেন। দেখতাম আমার মাঝার কাছটা তখনো দান্য হয় নি।

—পড়াশোনা কেনন চলেছে।—না জানতে চাইলেন একদিন।

—ভাল।

—ও কপাটা হলো ঠেঁকা দেবার জন্য। প্রদলের ইতি। যা একটু পেলে পদচেন, নিমলকে কেনন মনে হচ্ছে।

স্বচ্ছ করে বললাম,—ওটা ভাল।

—হু, কেনন বোঝাচ্ছে।

—সেখানেই তো বুঝতে পার।

—তা বটে, কিন্তু সেখানে কী সব বোঝা যায়। হায়ের এ কথার মনে হল, তাঁর মনের একটা বৃদ্ধ বয়্য পরেছে। যা কি আমার কাছ থেকে হুঁর সরে যাচ্ছেন। তা না হলে আমাকে নিয়ে হায়ের এ জিজ্ঞাসা কেন, এ হতাশা কেন।

যা আমার বললেন, তবে যেটুকু দেখছি, তাতে তোমার মনের নানা হুঁ বয়্য পড়ে। হাউয়ের হাস অস্বাভাবিক পৌঁছে দিতে চাও হুঁ।

—হা।—প্রতিবাদ নয়, যেন বিব্রোহ করলাম আমি। এই প্রথম, তাই হুঁরুতে কীটত হলম। আমি তোমাকে সব জানিয়েছি হা। তবে তোমার এ দৃষ্টি কেন। হায়ের কাছে এগিয়ে ফেললাম। তাঁর পল্য জড়িয়ে আমায়ের হায়ের ভাবটা কিরিয়ে আনতে চাইলাম। কান্নার চোখে হাসি কোটলাম।

—তুমি আমি এক। তাই হুঁরনের ভালোতে হুঁরনেই সমান অংশদার। কিন্তু তোমার দোটা অপিকা, সেটা হুঁর তোমারই।

হা উঠে পোদেন। তার কপাটা অনেককাল ভাবলাম আমি।

আমি অন্যায়ের জন্য হায়ের বাহে রেখেছি। পামন পেয়েছি। এখন পামনের নামে হুঁরনের বধো পড়ে উঠেছে একটা দীঘল।

এর দুইদিন পরেই হা তাঁর পুরোনো বসনটি হুঁর স্বচ্ছ করে আমার কাছে পেল করলেন। আলতা পরবার পথটি হায়ের বসার। ইলাদীং হা দিকেই পরভেন। আপে আমি পরিবে দিভার। হুঁর দৃষ্টি পা আমার হায়ের। মোট আর হুঁর-আলতায় কিছু-বাগা। আলতা পরাতে লাগত হু।

কেন জানি না, এখন হায়ের কথাই আর পোত হল না। বিরতই হল। আলতা পরানো পর, সে এক হুঁটা।

হুঁর দৃষ্টি পারের দিকে এক কটা তাকিয়ে থাকতে কার ভাস লাগে। এর মধ্যে বিলম্ব আমার সময় হবে।

ভবু বলতে হল। আসের পরিবেশটার হিটেকোটা শ্বাস পেলে যেন মতে হাই। হাকে আসের হত কাহে পেতে ইচ্ছে বার।

কিন্তু হায়ের দল কিছুতেই একটু হাফাফাডি। শাফিটাকে হুঁরিয়ে এনে হাউর কাছে চলে যবে রেখেছেন। শাফিটাকে আলতার হোঁবা থেকে খাটাবার হাফাফাডি।

পারের ব্যবসে চামড়াটার চিহ্নটি কেটে হা হটা বললেন,—হুঁ হুঁ করিল। চেয়ে ল্যাখ, এখনে তোমার চাইতে আমি কত কর। চামড়া এখনো দিতে হয় মি। পুরোনো একটা উজ্জলতার মেশ টানবে চাইলেন হা।

কিন্তু আমিও হাকে অন্যভাবে ভাবতে শিখি। তখন। আর তাই আমি ভাবতে পারলাম, হা যে এটাই বলতে চাইছেন যে, আমি তাঁর মেয়ে, তাই দ ব্যাপারে তিনি হবেন আমার আদর্শ।

—তোমাকে হুঁ করলাম কখন। প্রতিবাদের গুণ আমার কথার।

—ওটা হুঁর বলতে হবে, এমন কোন কথা আর থাক।—কপাটা পেল করে হা আসের হত হুঁর করে হাসতে চাইলেন। কিন্তু আমার হবে হল, বিশ বিকট হতাশা জড়িয়ে হায়ের এ কপাটা তৈরী হয়েছে।

শেষম কিছুতেই বিনলের চোখে চোখ পড়লো আমার হুঁর ঘুরিয়ে দিল। আমার মনে হল, অনেককাল চো চেয়ে দেখছিল হায়ের অন্যায় পা হুঁটো।

হা অস্বচ্ছ হলেন। কাপড়টা যবে রেখেই বললেন—ও বিলম্ব। এসে দেখ, তোমার সবসের জাম টেন্ড্রেন। হটা আমার সারা মেয়ে যেন লক্ষ্যবস্তু শিখল। হা পালিয়ে এলাম নাচে।

বই হাফা ঘিরে যখন আমার ওপরে এলাম দেখল্য বিলম্ব যেন বেয়ে উঠেছে। ক্যানের হুঁইকটা টিপে মি এলে বিনলের হুঁবাসুখি বললাম। হা ওখানে বা আছেন। পারের রেখা হুঁটো যেন হকের আল্পনা।

বিলম্ব একটু পরেই উঠে চলে দেখ। হাফাফা

বক্তৃতা । কিন্তু চোখে চোখ পেলান না বিরলের ।
তাই কিছু জানা হল না আমার ।

যা একদিনের টাকা কেটে রেখেছিলেন । বসেছিলেন,
সেদিনের বাথার বস্ত্রাটো তোরার একটা অঙ্কুরিত মায় ।

কর্তিতা বেশী হল আমার । পরের মাস থেকে বিদল
আর আমাকে পড়াতে এল না । এবিধে পরীক্ষা সামনে ।

জানি, মাকে বলে কোন লাভ নেই । হুতো অন্য
মানুষের ব্যবস্থা করে দেবেন । কিন্তু আমিই যা সে
ব্যবস্থা যেনে বেনে কেন । হুই সেহে এক রকম, কিন্তু
মন তো হুটো ছালালা ।

বিদল আমাদের বাথার না এলেও আমাদের পাড়ার
ভার বাতারাতে বসায় রইল । এ পাড়ার দার একটি-
হেসেকে পড়াতে আসে সন্ধ্যার ।

এর আসা-না-এরা ওপরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখা
যায় । সেখানে দাঁড়িয়ে আমি অপেক্ষা করি । শব্দ
সন্ধ্যার । বিদলকে একটু দেখবো । নীচের গাভাটো
দিয়ে ও বন্দন হুতের বাগাটায় বেয়ে হাজির হয় । তখন
আমিও বই বাতায় নিয়ে দেখানো যায় । শব্দ হুটো
মাকের জন্য আমার এত বড় কর্তিতা ছোতে মের নি
বিদল । পাড়ার এই ব্যবস্থাটা আমরা দু'জনে ঠিক
করে নিয়েছি ।

যা আমাদের এই ব্যবস্থার কথা জানলেন । তাই কথা
কমিয়ে দিলেন অনেক ।

বিদল আমার লক্ষ্য । মাকের লক্ষ্য আমরা দু'জন ।
তার সে লক্ষ্য আমাকে অনুসরণ করে করে এসে পৌঁছে
বিরলের কাছে । যেন একটি হুতের হুটো বেলুনকে
বয়ে রেখে নিকেই ফেলতে চাইছেন ।

আমাদের দু'জনকে কেন্দ্র করে অনেক সোশলভতা,
অনেক শ্রাব্যবানভতা । তাই অনেক ব্যাঘাত । একটু শব্দ
জন্য, একটু কিসকিগণের কথা বদায় জন্য দু'বোনের
অপেক্ষা করতে হয় আমাদের ।

যা'র বলে বোম্বের আমাদের দারা হুতের একটা
না-পাওয়ার কেননা হুত' হয়ে ওঠে ।

এই বেননা নিয়েই একদিন ঢেকে উঠলান আমি ।
দেখলাম, পাশের জানালার মাঝের দূর । তাকিয়ে
আমাদের দিকে । বনে হল অনেকল এসে দাঁড়িয়েছেন ।
চোখে হুতের কেনন একটা ভাব । বনে হল, আমাদের

আত্মাকার কথা হুতের শেরে মাকের হুত কঠি হচ্ছে ।
আমি নানা নীচু করে চলে এলাম ।

পরীক্ষা শব্দ হল আমার । বের হবার আগে যা
আমাকে হোচ্চ শাভিয়ে যেন । বসেন, হুটো হুতের বসে
কী পাড়াতে হুতেরি ।—আমাকে তাঁর মনের মত করে
পাড়াতে বসেন । আমার হুতেরী নেড়ে হুতেরি কিরিয়ে
দেখে তবু তেরাই যেন ।

যা আস্তে বসেন,—বিদল হাড়াও মাকার অনেক
লোক আছে । আমার দু'বোকে তারাও একটু দেখুক ।
বিরলের ভক্তি কী ।

মার কাছে লক্ষ্য করতে-পিয়ে গেছি । সেটা বোম্বের
বিরলকে নিয়েই । তাই মাকের কথার হুত-হুত মন
নিয়ে বেঁটেরে এলাম ।

পরীক্ষা চলেছে হু'বেদা । বাসায় কিরতে কিরতে
শীতের সন্ধ্যাটা যেন হোচ্চ পায়ে পায়ে আমার মল
যেন । হুত থেকে দেখি আলোটা জ্বালিয়ে রেখে যা
এসে দাঁড়িয়েছেন ওপরের বারান্দায় । টেলিং-এ হু'কনুই
ভর করে তাকিয়ে আছেন পথের দিকে । মাকের উৎকণ্ঠা
আমার পরীক্ষা নিয়ে ।

মাকে পরীক্ষার অবস্থা হু'কিয়ে প্রর প্রর নিয়ে হু'টি
বিরলের কাছে । সন্ধ্যার আলোই সে এসে বসে তার হাওয়ার
বাসায় । হু'টিরে হু'টিরে তাকেও বলতে হয় সব ।

আমি আলো বদলান না আমাদের বাসায় । মাকেও
দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলান-না । বনে হল, মারা ব্যাভিটাই
ধেন অঙ্ককারে একটা ভয়ের হোচ্চা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ।

পায়ে পায়ে হু'ব হু'টিরে ওপরে উঠে এলাম ।
অঙ্ককার । মাকের মাক শব্দ পেলান না কোথাও । জরে
ভরে আলোর হু'বজটার কাছে এগিয়ে পেলান । আলোটা
জ্বালাতে যেনে বাধা পেলান,—আলো বর হু'বনা ।

মাকের শব্দ । কান্না দর কিছু কান্নার মত শোবান ।
—জার শোব,—যা আমার বললেন,—বিদল আমাদের
হু'ভনের মাকে দাঁড়াতে হাজি হয় নি ।

মাকের কণ্ঠা শুনেন বনে হল, আলোটা বেননা আমার
দুই জ্বালাতে বানা করেছেন ।

আমি ভালোম, এই ভাল, এই অঙ্ককার টুকুই ভাল ।
আমাদের হু'ভনের এই হু'হুতের' যে হু'টো হু'ব ভা
আমাদের অসুখা হয়েই থাক ।

প্রকৃতির উৎস।

১৮৪১ সালের ২৪শে

নভেম্বর প্রকাশিত হল।

অল্প-বৃদ্ধা বহুসংখ্যক নতুন

জন্ম প্রকাশিত হল এই

গ্রন্থে। মানুষ কি কোম

পরিবর্তন বা বিবর্তনের

মধ্য দিয়ে এসেছে, না

মানুষ একদিকেই তার

বর্তমান রূপ পেয়েছে—

ইত্যাদি মানস-মনের বহু

আদি প্রশ্নের সমাধান

পাওয়া গেল এই প্রবন্ধমূলক রচনাটিতে। প্রাচীন

বিজ্ঞানের কতিপয় দীর্ঘ উপলব্ধি। ডারউইন তাঁর অনুশ্র

এবং Origin of Species গ্রন্থে মানস-মনের এই আদি

প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

প্রকৃতির উৎস গ্রন্থটি মূলতঃ প্রবন্ধমূলক। প্রথম

চারটি অধ্যায়ে মানুষ কিতাবে কৃত্রিম নির্বাচন করে এবং

পরে এই প্রাকৃতিক নির্বাচন কিতাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনে

পরিবর্তিত হয় তা আলোচিত হয়েছে। এখানে নির্বাচন

বলতে জীবনযুদ্ধে স্থান, কাশ পাখি—এবং সর্বোপরি জীবন-

যুদ্ধের নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে। এবং এখানে

জারউইন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রমাণ করেছেন যে বিবর্তনের

পক্ষে কেবলমাত্র যে সমস্ত প্রাণী বহিঃকলনের পারিপার্শ্বিক

অবস্থার লক্ষ্যে সমস্ত বস্তুকে বেছে চলেতে পেরেছে তাহাই

তথ্যের বহুসংখ্যক মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে আছে।

কলম অধ্যায়ে বিবর্তনবাদের জটিল বিষয় সম্পর্কে

আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ একতরফী-প্রাণী থেকে

মানুষ পাল্ল যে অবস্থার এগে পৌঁছেছে, এটা কি দোষাতাই

কোন আকস্মিক ঘটনা বিশেষ, না কোন সুবিধিষ্ট ঘটনা।

জীবনযুদ্ধে প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বারা যে আরও পরিবর্তন

আসতে পারে, তা অত্যন্ত বিস্তারিত ভাবে মনোভাষণে

আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে। অবশিষ্ট অধ্যায়

খিনিস্টে বিবর্তনবাদকে বৃষ্টি ও প্রমাণের আলোকে

সমাধান করেছে। বিভিন্ন প্রাণী, জীবন ও বিশাল প্রাণী

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

প্রকৃতির উৎস

মুনীল সাজান

জগতের বিপত্তি চিহ্নে

মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান

তার উদ্দেশ্যে তার দৃষ্টি

প্রমাণ করেছেন। তুলন

মূলক ভাবে দেখতে গে

সর্বশেষ তিনটি অধ্যায়

সর্বশেষে মূল্য বা ম

মূল্যবাহী চিন্তাধার

টিকে ব্যাখ্যার ও

স্থাপন করেছে এই ৩

অংশটি।

বিবর্তনবাদের প্র

চিন্তাধারক রূপে ডারউইনকে চিহ্নিত করলে দু

কথা হবে। এ প্রশ্নে প্রথম প্রাণী মননে

মতই পুণ্ডরিক ও প্রাচীন। তবে তাঁরই এ-বিষয়

সুবিধিষ্ট প্রমাণের অভাব ছিল। প্রখ্যাত কথা

খীব-বিজ্ঞানী লাকার্ক এ পথের প্রথম পদিক বলা হ

পারে। ১৮০২ সালে প্রকাশিত Philosophie Zool

ogique গ্রন্থে তিনি সর্বপ্রথম এই জন্ম প্রকাশ করে

১৮১০ সালে প্রকাশিত Histoire des Animaux

Vertebres—প্রবন্ধমূলক এই কাহিনীটিতে লাক

বিবর্তনের ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক অবস্থা উদ্ভিত করলে

উপর কি অপরিণীত প্রভাব বিস্তার করে এবং বা

পরিপাক্য প্রাণী আপন বৈশিষ্ট্যগুলি কিরূপে ধরে বা

এক কক্ষক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে উত্তরোত্তর সহজ

প্রাকৃতিক জীবনযাত্রার পথে অগ্রসর হয় তা সংক্ষে

আলোচনা করেছেন। তবে প্রমাণের অভাবে তাঁর এ

নতুন চিন্তাধারা বিজ্ঞানী মহলে বিশেষ আলোড়ন জন্

পারে নি। জার্মান লায়নল্ড এংগ্রনকে উল্লেখ

Principles of Geology গ্রন্থে বিশেষ প্রাকৃতিক পরিব

দ্বারায় কথা বান পেয়েছে। এই বৃত্ত জগতের অন্তরায়

যে প্রাকৃতিক নিয়ম মানুষ, বৃত্তিক, উত্তর ইত্যাদি সম

উপর বীর পতিতে যে কাজ করে চলেছে তা অত

সুনিপুণভাবে আলোচিত হয়েছে এই গ্রন্থে। তবে বা

প্রমাণের অভাব এ গ্রন্থেরও দেখা যায়।

এই চিত্তাধারায় ধোণ্য উত্তর সাধক ছিলেন চার্লস ডাবার্ট ডারউইন। বিবর্তনশাস্ত্রের ক্ষেত্রে তিনি যা বললেন, তা খুব নতুন নয়, তবে তিনি এ ক্ষেত্রে যে মুক্তিও অগ্রগতিও করলেন, তা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও বিস্ময়কর। ডারউইনের মত অগ্রগতি যে যিনি থেকে জীবনের বিকাশ হয়েছে সেহিন থেকে পরিবর্তন চলছে এবং তারই ফলে এই সুন্দর জীব-মণ্ডলের প্রকাশ। জীবন-যুদ্ধ সকল জন্তে সকল সময়ে চলছে; যুদ্ধে হারা জয়ী হচ্ছে তারাই বংশপরম্পরায় পৃথিবীতে বেঁচে থাকছে।

এখানে জীবন যুদ্ধ বলতে পারিপার্শ্বিক অবস্থা, নতুন অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া ইত্যাদি বোঝান হয়েছে। সাধারণতঃ যখন যার যে মৌচূড় জন্মে প্রাণীর মধ্যে জীবন যুদ্ধ অস্তিত্ব পায়। তাঁর হতে বর্তমান মানব জাতির পূর্বপুরুষ—হতুমান, ডায়োডোয়া বা গায়র; এই অবস্থার পর আরও দু'একটি জর আছে—তারপর 'ম্যান'। ম্যান হতুমানের মধ্যে যে পুঙ্খভা আছে সে সম্পর্কে ডারউইন বিবর্তনের কথা কিছু বলতে পারেন নি। এই জরকে pleasing Drink বলা হয়ে থাকে।

জীবনযুদ্ধ কে জয়ী হবে—এর উত্তরে ডারউইন বলেন, যে এটা অনেকগুলো অবস্থার উপর নির্ভর করে। প্রধানতঃ জীবন যুদ্ধী নির্বাচনই এই যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের প্রধান কারণ। নির্বাচনের ব্যাপারে যেটা যায় যে, বিবর্তন প্রায় সকল সময়ে আরও উন্নততর প্রাণী বাতে গলে সেই পথে পরিচালিত হয়। যেমন সাধারণতঃ যেটা পড়ে যে 'A' type প্রাণী কখনও 'B' type প্রাণীর সঙ্গে দাঁড়ায় না। 'A' type সাধারণতঃ তার সমান মানবের গাছাকাড়ি কোন প্রাণীকে বেছে নেবে। আবার তাইয়ের দাঁড়ানের ফলে যে প্রাণী আসবে সে আবার তার মতো যেটা তার চেয়ে কোঁট উন্নততর প্রাণীকে বেছে নেবার স্ট্রী করবে। এই হল প্রাকৃতিক নির্বাচন। প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে যারা কিছুটা সির জয়ের তারা যার পড়ে আছে; তাঁর ভাষায়—'Preservation of favoured races in the struggle for existence'। এতো প্রসঙ্গ ভীতের কথা। ভবিষ্যতের কথা অবশ্য ডারউইনও স্পষ্ট করে নিশ্চয় করতে পারেন নি। তাঁর হতে প্রস্তাবিত বাস্তবিক নিয়ম বিবর্তন। এই পরিবর্তনের শেষ

নেই। এ প্রতি দুর্নিবার। এ চলার আদিও নেই অন্তও নেই। লক্ষ বছর পরে যারা আসবে তারা আশ্চর্যের সাহসের কথা ভাববে। বর্তমানেরই যেটা যাবে ম্যান আরও নিখুঁত আরও বংশোদ্ভূত হয়েছে।

১৮০১ হতে ১৮০২। এই দিনগুলি ডারউইনের জীবনের অত্যন্ত মূল্যবান সময়। প্রকৃত পক্ষে এই সময়ের অগ্রগতিও তাঁকে লক্ষ জীবন পরিচালিত করেছিল। সে সময়ে ইংলন্ডে একটি বৈদ্যকর্মী দল অতিমানবের আয়োজন করা হয়। এ অতিমানব Beagle নামে পরিচিত। এই দল-অতিমানব বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের তথ্য সংগ্রহের কাজে জোটে তার। অতিমানবী দলটি আটলান্টিক, বসিন্দ আমেরিকা, ব্রেন্ডেল, মালয় ইত্যাদি বহু দেশ বিশেষ যুগে উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ করে। ভূতত্ত্ববিদগণ ডারউইনের যে বিভিন্ন তারও সূত্রপাত হয়েছিল এই সময়।

মূল্যবান পাঠ বছরে তিনি যে সময় বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তারই সুসংগত প্রকাশ প্রকাশিত হ'ল এই। তথ্য সংগ্রহ ও পুঙ্খ প্রকাশের মধ্যে ব্যবধান ছিল প্রায় বিশ বছরের। এই ক'বছর তিনি বহুবার তাঁর সঙ্গীত তথ্য নানান রিক থেকে মুক্তি বিজ্ঞানের যারা প্রকাশ করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। নিনোব রাজির প্রেরণে প্রেরণ গভীর ভাবে মূল্যবান তথ্য পর্দাচলনা করেছেন। অতিমানবী বংশ প্রসঙ্গে এক কারণই তিনি উল্লেখ করেছেন যে, নিউটনও সালার হোপলির মধ্যে জীবিত ও সন্তুষ্ট প্রাণীর মধ্যে বেশ একটা মিল পাওয়া যায়। এবং যে সময় জীবন-যুদ্ধ তিনি এই সময় আবিষ্কার করেন তার সঙ্গে জীবিত প্রাণীর মধ্যেও কেমন মনে একটা যোগসূত্র আছে। এই তথ্যসমূহের উপর ভিত্তি করেই ডারউইনের মূল কথা রচিত।

উদ্ভিদগণের মূল চিরকালই নতুনকে গ্রহণ করতে পারেন না। ডারউইনের মতভাবে সহজে তাঁরা গ্রহণ করেন নি। তথ্যবিশেষ ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় মনে করলেন যে ডারউইন সত্য মানব সমাজের উপর এক ভাষ্যক অপরাধ করলেন। দৈব ও দৈবের হস্ত প্রাণী সম্পর্কে এতকাল যে আনুষ্ঠানিক ও ভৌতিক মতবাদ প্রচলিত ছিল তা তাঁরা আঁকড়ে ধরে গলে রয়েলেন এবং বিজ্ঞানকে



একদিন আপনার

মেনে

প্রতীক্ষা করে থাকেন একদিন এক বছর হবেন তখন আপনার বাড়িতে এসে উপস্থিত হবে—সে আপনার ঘরের বর। সেই দিনটি হবে আপনার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিনের দিন। এবং হয়ত সবচেয়ে বেশী দুরতের দিনও। সেই পরমক্ষণটি মনে আনিয়ে তখন আপনার চোখে প্রাণোদীপিত চাঁক-খাকের তো! নিশ্চয়ই থাকবে, তবে যদি আপনি আপনার মনের ক্ষুদ্র এখনই একটি ম্যারেজ এন্ডাইফেট পলিসি নেন। আপনারকে শুধু মাঝে মাঝে সাবস্ক্রাইভার বাচাতে চলে। যেমন ঘটন, মাসে মাত্র ১৫ টাকা করে সম্মানে ৩০ বছর বয়সের কোন পিতা ১০ বছর পরে তাঁর মেরেব ১০০০ টাকা সাওদার ব্যবস্থা পাকা করে বাচাতে পারেন (সে সময় তিনি বেঁচে থাকুন বা নাহি থাকুন)।

সবচেয়ে বড় কথা ৪'৯ এখনই পলিসি নেওয়া সবকরে—আপনি সঠিকভাবে যে ব্যবস্থা এখনওক করছেন জীবন বীমা। সেটিতে অনিশ্চিত ও অশান্তির করে উপরে। একটি ম্যারেজ এন্ডাইফেট পলিসির মাধ্যমে আপনি আপনার ঘরের বিশেষ উপযুক্ত ব্যবস্থা পাকা করে ফেলতে পারবেন। আপনার আগের ঘরের ভবিষ্যৎ রূপের ক্ষুদ্র এবং আপনার সামাজিক বয়স। বয়স ক্ষুদ্র এ ব্যবস্থা করে রাখা আপনার কর্তব্য নয় কি? এ সম্বন্ধে এখনই ব্যবস্থা করুন।

জীবন বীমার

কোন বিকল্প নেই



অল্প পালিগালাক করতে থাকেন। এই হলো পুরোটা ছিলেন বিশপ উইলবারফোর্স। সাম্প্রতিক কালে বিবর্তনবাদ সম্পর্ক বহু নতুন তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু ডারউইন যে মূল স্ক্রোট সন্ধান দিয়ে গেলেন তা আজও তাঁর উত্তর সাধকদের পথ নির্দেশ করে।

১৮০২ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী ইংল্যান্ডের প্রবেরির এক সুশিক্ষিত পরিবারে চালস্‌ রবার্ট ডারউইনের জন্ম হয়। জন্মের মাত্র আট বছর পরেই ডারউইন নাকে হারান। তখন থেকে বড় বোনের কাছে মানুষ হতে লাগলেন। পঞ্চদশকালে ডারউইন তাঁর জীবন স্বভাবের অত্যন্ত প্রভাব সত্ত্বে নিপুণতায় কথা শ্রবণ করেছেন। মেধাবী ছাত্র বলতে বাবোথার ডারউইন খোঁচেই তা ছিলেন না। স্কুলে মেধাতই সাধারণের সঙ্গে পড়তেন। রসায়ন শাস্ত্রের উপর তাঁর তাত্ত্বিক আগ্রহ ছিল। স্কুলের পাঠ শেষ হল। বৃহত্তর জীবনে প্রবেশ করলেন। তাঁর পূর্বপুরুষরা সবাই ডাক্তার ছিলেন। কাজেই যশের সেই বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে ডাক্তারী পড়তে পার্টন হল। তবে বিধি বিধগ। ডাক্তারী পড়া হল না।

নিপুণতায় থেকেই ডারউইন বেশ একটু জাক্‌ প্রকৃতির ছিলেন; বনে বনে ঘুরে বেড়াতেন। আর আকাশ পাতাল ভাবতেন। সংগ্রহের মেশ ঘর ছোটকাল থেকেই তাঁকে পেয়ে বসেছিল। এই বাস্তবিক ইচ্ছা বয়সেও তাঁর সন্ধান ছিল। নতুন কোন পাখি, পাণ্ডা, হুঁড়ি, সপুষ্ট হলো বৃত্ত প্রাণীও সংগ্রহ করতেন; পারস্পরিক তুলনা করতেন কোনটায় কি বৈশিষ্ট্য তা অত্যন্ত যত্নে সজ্জা দিয়ে রাখতেন।

যাবার ইচ্ছে অনুসারে ১৮২৮ সালে ডারউইন ক্রাইট কলেজে ভর্তি হলেন। ইরাসমাস ডারউইনের একান্ত কামনা তাঁর ছেলে বর্ষাধ্যক হয়। এই কলেজের পাঠ শেষ হল। তবে বর্ষাধ্যক আর হওয়া হল না। সে সময় তিনি বিশ্বের সেরা ভূতত্ত্ববিদ ও প্রাণীবিদের দিকটো সাধিত্য লাভ করেন। আর তাঁদের পরোক্ষ প্রভাবে তাঁর জীবন পথ চিত্রিত করে। কেবলমাত্র তৎকালীন প্রখ্যাত প্রকৃতিবিদ্‌ জন্ম টিওমাস ব্রেনসোন্‌ ডবিকা এ প্রসঙ্গে

সংবীহ। তাঁর চেষ্টাতেই তিনি ১৮৩১ সালে অভিযানে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

জীবন সম্পর্কে ডারউইনের বৃত্তিতকী একটু স্বতন্ত্র ছিল। তিনি বলতেন, যে মানুষ তার স্বভাববিশিষ্ট শক্তি ও চেষ্টার বলে জীবন সংগ্রাসে লব্ধি হয়; পারিপার্শ্বিক প্রভাব মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে বটে, তবে তা স্যাত্তই। প্রথম আত্মবিশ্বাসই সকল সাধল্যের মূল এবং তা কোন অবস্থা বিশেষের উপর নির্ভরশীল নয়। তাঁর লুচ বাধা ছিল যে যদি কোন বিষয়ের উপর কোন মানুষ গভীর মনসংযোগ করে তবে সে সাফল্য অর্জন করবেই। জীবন বৃত্তি *Life and Letters* এর এক কাগজার তিনি উল্লেখ করেছেন যে 'বিজ্ঞানের প্রতি প্রসাদ ভালবাসা ও অসীম বৈধি আহার সকল সাধল্যের মূল'।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ডারউইন বিভিন্ন প্রবন্ধের লব্ধি দিয়ে এই বহিঃস্বত্ব অর্জনের অসংখ্য তথ্য প্রকাশ করেন। স্থানীয় তিরাস্তর বছরে তিনি বিখ্যাত যে অমূল্য সম্পদ দিয়ে গেছেন তার মূল্যায়ন আজও যোগ্য হয় সম্ভব নয়।

১৮৪৮ সালে প্রকাশিত *The Variation of Animals and Plants Under Domestication* গ্রন্থ পৃথকভাবে আলাদা অমূল্য প্রাণী জগতের আচার আচরণ ও বংশ পরম্পরায় কিভাবে তাঁরা আপন বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রেখে লব্ধা জীবন পথে অগ্রসর হয় তা আলোচিত হয়েছে। ১৮৭১ সালে প্রকাশিত *The Descent of Man and Selection in relation to Sex*—যাবন ইতিহাসের এক অমূল্য সাধল্য।

১৮৫৮ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধের কিছুটা ছাড়া এর উপর পড়েছে। এই ঘটনাটিকে *Origin of Species* এর উপবৃত্ত প্রাণ বলি লব্ধি থেকে পারে। সন্ধিতী নিবাতন ও বিপরীতবধী প্রাণী ছিলেন যে নবাবগত বিধে স্থান করে নেবে, তার সম্পর্কে কতকগুলো বাধাবাধ্য নিয়মের উল্লেখ করা হয়েছে এখানে। *The Expression of Emotions* (১৮৭২) বিবর্তনবাদের দিক থেকে ডারউইনের বচিত সর্গশেষ গ্রন্থ

বচসাবিহীন ব্যবস্থা

মেট্রিক ওজন এখন চালু
হয়েছে। মেট্রিক একক অস্থায়ী
ধার বলা হয়। কিন্তু ভসুও সেনসেবনের
সময় বিরক্তিকর হুঁশ হিসাব করতে হচ্ছে।
—এর কারণ কি?

কারণ হ'ল মেট্রিক ওজনের সুবিধেগুলি কাজে
লাগানো হচ্ছে না। পুরানো ওজন অস্থায়ী
জিনিসপত্র চাওয়া হচ্ছে।

যেমন :

এক পোয়া — ২৩০ গ্রাম

এক পাউণ্ড — ৪৫৪ গ্রাম

পুরানো ওজন অস্থায়ী জিনিস চাওয়া হলে ও
সংস্কারের সুবিধেগুলি কাজে লাগানো যায় না।
কাজেই কেনার সময়, জিনিসপত্র পূর্ণাংখ্যায় চাওয়াই
হ'ল সঠিক পদ্ধতি।

যেমন :

২০০ বা ৩০০ গ্রাম

৪০০ বা ৫০০ গ্রাম

১০০ বা ২০০ গ্রাম

এই বকর পূর্ণাংখ্যার মাগে জিনিসপত্র চাইলে ওজন সংস্কারের
সম্পূর্ণ সুবিধেগুলি কাজে লাগানো যায়। বর্ষদিক মূল্য, মেট্রিক
ওজনে সেনসেবন করা অনেক সহজ, হিসেব করাও সোজা।

আপনার জিনিসপত্র নিম্ন

পূর্ণ **মেট্রিক** এককে

এত আগবার
ও ব্যবসায়ীরা



উভয়েরই
সুবিধে

ভারত সরকার কর্তৃক প্রচাৰিত

বেংগাল পত্রিকাতে
সঙ্গে ত্রিভঙ্গ পরিচয়
অনেক মূল্যবান কথার
কিছু সামান্য সাদৃশ্য থাকলে
ও প্রকৃতিগত ভাবে একের
মতো বৈদ্যবুদ্ধিই বোঝা।
বেংগাল ও ত্রিভঙ্গের
উৎপত্তি স্থান হওয়া এক,
কিন্তু এ নিয়েও অনেক
বতবিরোধ আছে। পাশা-

সংগীত

বাস্তবজ্ঞ ও মন্ত্রসংগীত

[বেংগাল]

অনন্ত সিংহরায়



পাশি চুরেরই চটা হয়ে এসেছে, কিন্তু বেংগাল-বোম্বের
করনিয়ন্ত্রণ বাড়ানো এবং সর্বোপরি বাস্তবজ্ঞ হিসাবে
সত্যবাদী এত বেশী যে, যাদের দ্বারা ত্রিভঙ্গ-বোম্বী অগ্রচলিত
হয়ে গেছে।

বেংগাল ও ত্রিভঙ্গ নিয়ে মতবিরোধ আছে। এসেছে
বিশেষ করে হাফিজ ভারতে অনেক দীর্ঘতাত্ত্বিক দাবী
করেন যে, পাকিস্তান কেনে বেংগাল প্রচলন হওয়ার পূর্বে
হাফিজ ভারতে বেংগাল প্রচলন ছিল। স্বাধীন হয়ে বহু
‘‘হাফিজ’’ বাস্তবজ্ঞ পাকিস্তান ‘‘ভারতলিন’’ এর সমঝোতা
বলেও অনেক দাবী করেন। আকৃতিগত সাদৃশ্য থাকলে
ও বর্তমান কালে ‘‘ভারতলিন’’ বলতে আমরা বাস্তবজ্ঞ,
ঐক্য বোধন, মতবিরোধই তার সূত্র। সূত্র হওয়া পূর্বেই
হয়েছিল, কিন্তু এর সংশোধন পরিবর্তন ও পরিবর্তন,
সর্বোপরি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এর প্রতিষ্ঠা ঐক্য বোধন
পতাকা থেকে আত্মশ্রম পতাকা পর্যন্ত করে কটি পরিবারের
প্রচেষ্টার ফলে হয়েছে। এই পরিবার করে কটির নাম
‘‘আবুজি’’, ‘‘ভারতলিন’’ এবং ‘‘ঐক্যবোধ’’। এই সব
পরিবারের লোকেরই এই পতাকা হয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-
নিরীক্ষার ফলে বেংগাল প্রকৃতিগত। উল্লেখযোগ্য এই
যে তিনটি পরিবারেরই উত্তর ইতালীর ‘‘ক্রোমানা’’ নামক
স্থানে বাসস্থান ছিল। বিভিন্ন দেশের পরবর্তী কালের
বেংগাল প্রকৃতিগত একই নামে আরো কয়েকটি পরিবারের
দায়িত্বের কথা যায়।

ক্রোমানা এই তিনটি পরিবারের প্রকৃত বেংগাল
অন্তর্গত বেংগাল অপেক্ষা উন্নততর, অর্থাৎ প্রাচীন বলা যেতে

পারে। কারণে, তা নিয়ে
অনেক আলোচনা হয়েছে।
বেংগাল প্রকৃতি এক টি
বিশেষত্ব হল এর মূল্যের
প্রচণ্ড ভাবতম। বেংগাল
সর্ব নিম্ন মূল্য ১০-২০-
আবার প্রকৃত ‘‘ঐক্য’’
মূল্য অনেক ক্ষেত্রে চার পাঁচ
লক্ষ টাকা অবধি হয়ে
থাকে। কেন এমন হবে,

অর্থাৎ বর্তমানকালের প্রকৃত বেংগাল এবং প্রাচীন
‘‘ক্রোমানা’’ বেংগাল মধ্যে ফেরে কি এমন প্রচণ্ড ভাবতম।
হতে পারে, এই নিয়ে মতবিশেষ-কল্পনা অস্ত্র নেই। ক্রোমানা
বেংগাল যে বিশেষত্বগুলি সহজে চোখে পড়ে, তা হল
এর প্রাচীনতা। বাস্তবজ্ঞ হতে পুরান হবে, সত্যবত্তাই তা
যেহে তত ভালো হবে বোধ্যে। এ ছাড়া ‘‘ক্রোমানা’’
মেই বিখ্যাত বেংগাল প্রকৃত কাহিনী যে সব কাহিনী ব্যবহার
করতেন, তা জানা গেলেও কিতাবে সে সব কাহিনী
কিতরকার রূপ শুকিয়ে নেওয়া হত, অর্থাৎ সত্যি ভাবায়
থাকে ‘‘সিদ্ধান্ত’’ করা হলে, তা কি তাহলে করা হত; আরো
জানার যায় নি। স্বাধীনপন্থা দীর্ঘকাল হয়ে গেলে ভিত্তিরে,
যোমে শুকিয়ে বাস্তবজ্ঞের কাহিনী ‘‘সিদ্ধান্ত’’ করা হয়। তাহা
নিশ্চয়ই কোন বিশেষ পদ্ধতিতে কাহিনী সিদ্ধান্ত করতেন, তা
ছাড়া হতে অথবা বাস্তবজ্ঞ করতেন একটি বিশেষ পদ্ধতি
ছিল। এ সবই ছিল তাহের পারিবারিক ‘‘বাস্তবজ্ঞ’’।
এমন কি বাস্তবজ্ঞের বেয়েবেয়ে এবং কাহিনী সেখানে হোত না,
কারণ অস্ত্র পরিবারে বিশেষ হয়ে পারিবারিক বিজ্ঞা প্রকৃত
ফলে বাস্তবজ্ঞ। এসেপের মূলমন্ত্র ও ভাবতমের
‘‘বাস্তবজ্ঞ’’ কথা এই একই মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া
যায়। তাহাড়া দীর্ঘকাল হওয়া একই পরিবারের হয়ে
একই বাস্তবজ্ঞ প্রকৃতিগত চটা হওয়ার ফলে ঐ লোকের
এমন একটা বিরাট অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিল যাতে অস্ত্র
প্রকৃতিগতকরণের অপেক্ষা ওদের অনেক বেশী স্বীকৃতি ও
প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ‘‘ক্রোমানা’’ বেংগাল বিশেষ করে
‘‘ঐক্য’’ এর ব্যাতি থাকলেও বর্তমানকালের কয়েকটি

বেহালা প্রকৃত কাব্যকলা তোলা পলীকা করে দেখা দেছে
 যে, কোন অংশেই সেগুলো 'ট্রিডি' অপেক্ষা কম নয়।
 বহু বিখ্যাত বেহালাবাহকদের গর্ভে আড়ালে রেখে উঠর
 প্রকার বেহালাই যাকিবে দেখা দেছে যে, এ বেহালাগুলোর
 স্বর আর প্রকৃত 'ট্রিডি' বা অন্যান্য 'ফ্রেম্যান' বেহালা
 স্বরের মধ্যে পার্থক্য বুঁতে পাওয়া সম্ভব হয় নি। একথাও
 বলা হয়ে থাকে যে, বেহালাই একমাত্র বাতবর বাহ বাহন-
 পদ্ধতির এবং আবহবিক কোন পরিবর্তন হয় নি—অর্থাৎ
 সেই প্রাচীন কাল থেকে আজ অবধি সে একই অবস্থায়
 আছে। একথা ঠিক নয়। পূর্বে যে, 'ব্যালান্স' অর্থাৎ
 স্লিড বা সোয়াইচের নীচে ভেতর দিকে তাবের চাপের
 প্রতিরোধক হিসাবে—যে কার্ভও ব্যবহৃত হত এখন
 বেহানে অনেক লম্বা ও নরম কার্ভও ব্যবহার করা হয়।
 থাকে ঠিকটা পূর্ণাপেক্ষা অনেক চক্কা, লম্বা এবং
 বামিকটা লিহন দিকে হুঁকিরে বেঁটায় হয়েছে। ফিকার
 বোর্ড বা বকী অনেক বড় করা হয়েছে—যাতে অতি উচ্চ
 তারারোমের স্বরগুলোও সহজেই বাজানো যায়। সোয়াইচী
 উঁচু করে বামিকটা ঝিকানো হয়েছে যাতে ছড় বেশ
 ধোরে ঢালান যায়, তিস্ত অন্য তার স্পর্শ করে না। এ
 লক্ষ্যই পূর্বের ব্যতিক্রম। তাছাড়া পূর্বে যে সুরে ঝাঝ
 হত, তার অপেক্ষা বর্তমান বেহালা অনেক চক্কা করে
 ঝাঝ হয়। বট 'ফ্রেম্যান' বেহালা বর্তমানকালে এই
 চক্কা সুরে ঝাঝতে গিয়ে সর্বমাপ সানিত হয়েছে। কোন
 কোন ক্ষেত্রে সেগুলি একেবারেই অস্বাভাবিক হয়ে গেছে।
 বেহালা যন্ত্রটিকে যেখানে '১৮ দশক' মরল মনে হলোও এর
 হুবানীতি বিভিন্ন অংশ আছে, এই অংশগুলিকে ছড়লে
 তবে সম্পূর্ণ একটি বেহালা প্রকৃত হয়।

বেহালা-পরিবারের অন্যান্য যন্ত্রের মধ্যে 'চিওলা',
 'জারোলিন'—চেলো, ডবলবাস প্রকৃতি উল্লেখযোগ্য।
 তিওলা ও বেহালাই যথো তাৎপর্য এই যে তিওলার
 স্বর ম্লান, আকৃতি একটু বড়। 'চেলো' তার চাইতেও
 ম্লানতর এবং আকৃতিতে বৃহত্তর। 'ডবলবাস' তার
 চাইতেও বড় এবং এর বাহন পদ্ধতি ভিন্ন। বেনীত
 ভাগ থেকেই 'ডবলবাস' ছড়ের পরিবর্তে আঙ্গুল দিয়ে
 আঘাত করে বাজানো হয়। বেহালা পরিবারের বিশেষত্ব
 হল—এর প্রত্যেকটি সুরেই স্বর অত্যন্ত মৃদু। বাহন

পদ্ধতির কৌশলেও ওপর নির্ভর করলেও এ সব যন্ত্রের
 কোমলতর অংশগুলি বেঁকেই তবে প্রকাশ করা যায়,
 তন্ত্রপতীর অংশগুলিও সেই স্বর স্বরুর তাৎবে প্রকাশ
 করার মত বা সুযোগ এতে আছে, তা অন্য যন্ত্র অপেক্ষা
 বেশী। যন্ত্রের পরিধি (Range & Scope) ও লভ্যমান
 অসামান্য সুরের বিভিন্ন প্রকারের প্রকাশ এতে সুবলী
 সুন্দর। ছড় ব্যবহার করে যে সুর প্রকাশ করা যায়,
 ঠিক তার পাশাপাশি তাৎবে আঘাত করে ও (plucking)
 বিভিন্ন ধরনের স্বর প্রকাশ সম্ভব। তাছাড়া অন্য যা
 অপেক্ষা একদিকে বিভিন্ন স্বর (chord and Harmonics)
 বাজানোর সুযোগও এতে অন্য যন্ত্র অপেক্ষা বেশী
 বেহালায় 'সোয়াইচ'র ওপর 'হিউট' নামক নরম ট্রান্সকার
 একটি ছোট বস্ত্র ব্যবহার করলে এ থেকে অসুত বরেন।
 বৃহৎ অসুত বস্ত্র স্বর নির্ভর হয়। এই 'হিউট' ব্যবহার
 করার সুবিধাও অন্য যন্ত্রে নাই। বেহালা পরিবারে পুঁ
 আরো কিছু যন্ত্র প্রচলিত ছিল, কিন্তু বর্তমানে সেগুলি
 অপ্রচলিত হয়ে গিয়েছে।

আমি 'ছড়' যন্ত্রে ছড়ের আকৃতি লেখকন হত, সে
 আকৃতি বহুকালে প্রচলিত ছিল। বেহালায় ছড় অন্যান্য
 ছড় যন্ত্রের ছড় অপেক্ষা সম্পূর্ণ আলাদা এবং অনেক
 উন্নততর। এই ছড়ের চেহারাও পরিবর্তনও একদিকে
 হয় নি। এর জন্য বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজ
 হয়েছে। এই ছড়ের আকৃতির তিনি চূড়ান্ত রূপ যে-
 তার নাম ফ্রান্সোয়া জুতি (১৭৪৭-১৮২৭)। দুই
 বেহালায় ছড় ওপর দিকে ঝিকানো করে দেন যাতে ছড়
 লোমশতাপ বেশ ভালোভাবে টানা থাকে এবং স্পা
 সাজই স্বর নির্ভর হয়। জুতি প্রণত 'এই যন্ত্রের হ
 আর একই অবস্থায় আঁকও চলছে।

ইতালীতে বেহালায় এত উন্নতি থেকে সূরকে
 প্রমাণিত হয় যে, বেহালা বাহনশৈলীও ইতালীতে খুব
 উন্নত ছিল। প্রত্যেকটি বাতবরের নিজস্ব বাহনশৈলী
 ক্রমোন্নতি ভিন্ন বেহালা বাতবরশৈলীও ক্রমোন্নতিও বী
 পদ্ধিতে হয়েছে। পাকাতা বেশলসুবে প্রথম সুরে
 বিখ্যাত বেহালা-বাহকদের রচনা বর্তমান পরিক্রম
 অনেক ক্ষেত্রে হালকাও মনে হয়। বর্তমান কালে
 পাকাতা বেশ বেহালাবাহন এত উন্নতি লাভ করেছে।

যে অধিক দূরে যেতে হয়। পাক্কা পড়তিতে বর্তমান ভারতের অন্ততম খ্রেষ্ট বেঙ্গালবাহক শ্রীঃমহেন্দ্রী দেহতা ওয়া পাক্কা ভবভ্রমঃের কাছিনীতে বলেছেন যে ইতালীতে একস্থানে তিনি গুণে বেঙ্গাল বাহনা ওনে ঠাঁড়িয়ে ঠাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ পোয়ার পর স্থির করেন যে নিকটই কোর বিখ্যাত বাহক বাজাচ্ছেন। যে বাড়ি থেকে সুব তেলে আসে ছিল সে বাড়ীতে অহুতি নিয়ে প্রবেশ করে দেখেন কি একটি স্থলের বিশোধী বাহনা অত্যাশ করছে। এ থেকে ওবেলের বেঙ্গাল বাহনার উন্নতির কথা সহজেই বোঝা যায়। পাক্কা ভেলে যে সব মরৎ বেঙ্গাল পিঠী পাক্কা সগৌড় ও বেঙ্গাল বাহনগীর প্রস্তুত উন্নতি সাধন করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রাচীন যুগ—কোরবী, তিকালী, ওরাচিনি,

দিয়াবিনি, পু্যপনানী (ইতালী) এনেট, লেফিয়ার, জুয়েটমার, বালিঘট (ক্রাল), গ্রন, বেঙ্গা, ঠাঁবিল, উইলহেলম জায়াত (জায়াত) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়। পরবর্তী কালে পোয়াবিনি, বারসিক, কভিনাড ডেভিত, বেলম্বলবার্জার এল্যাম, ক্রাইসলার, কুবেক, হাইমেল ও বর্তমান কালে চাংনিসেভি, আইজাকটর্প, বেঙ্গলী বেপ্তাচিন প্রভৃতির নাম অবিস্মরণীয়।

বেঙ্গালার বিশুমানী, সগৌড়-বাহন খুই হালকিলের ঘটনা। পাক্কা ভেণী বাহন বলে বেঙ্গাল প্রথমটার ভারতীয় সগৌড়ের অহুপুজ বলে বরা হত। এখন এ বস্ত্র স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভারতীয় সগৌড়ে গুঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে



"You don't see them,
you don't—but I
see them they are
hunting me down,
I must move on."

তত্ত্বা ডেঙ স্কেরা

[কাব্য নাটিকা]

রাশ বহু

০

বিন্দুক, শাসক ;
কি শূন্যের ! ব্যাঘ্রো বাবা
আলোক : হাফিয়ে কিন্দুক
সেলে ।
তুমি বিন্দুক ফুড়াও ।

[শূন্যের জনপদে তটভূমি ! শিবনে কাউ কেহা
কেওকার. কাড়। কিংকি ডাকছে। বীনা বাঁধার
সবর হ্রস্ব ও ধীর্ঘ শব্দ আসে পাতার গভীর
থেকে অবিরল সেই শব্দ শব্দের শব্দের সঙ্গে গলা
বেলাতে চায়। শূন্য অস্ত বায় বায়। বনে হয় আর
কিছন্দ শব্দে চাঁদ উঠলে শূন্য আকাশ গায়ে ও
বাতাস বিরাট ভয়ঙ্করভাবে যেতে উঠবে। আলোক
বলে আছে বাসির ওপর। তার মৌলন দ্বার নি
কিন্দু ধীর্ঘ নেই। শূন্যের নিভত আলোর তার
শূন্য বহু শূন্যের বিপরীত শব্দের মত লাগে।
আলোকের মেয়ে খেলা করছে কোণের ওপারে।
তাকে দেখা গাবে না। কিন্তু ওরা কথা বলে।
শাসকের দ্বারে ওদের বঙ্গল কণ্ঠ শূন্য পান্থর
ওড়া ওড়ি বলে বনে হয়।]

আলোক : শূন্য শূন্য

(সাড়া নেই। আলোক উঠে পড়ান।)

শূন্য শূন্য কই কোথায় গিয়েছে।

মেয়ে : এই যে এখানে

(আলোক বলল।)

আলোক : বেশী দূরে বেও না যা বনি

মেয়ে : কেন বাবা

আলোক : হাফিয়ে গাবে যে

মেয়ে : হারাবে ? কোথায় ?

আলোক : হারাবে কোথায় ? কি জানি কেউ কি জানে ?

মেয়ে : আমি হাফিয়ে গিয়েছি

আলোক : কোথায় ? কি করে ?

মেয়ে : কোথায়, কতায়।

কেহা কোণ কত কাড় শূন্যের মেয়েছে

মেয়ে : টেউগুলো এক বাপ পাক ধরে সেল

আলোক : শাসকের নিকটে যেও না বনে।

মেয়ে : কেন ?

আলোক : শাসকে করাত, টেউ অহুকার ভয়।

শাসক যে টেনে নিয়ে গাবে।

মেয়ে : কোথায় টানবে ?

আলোক : ডলার, পাতালে।

মেয়ে : কি আছে পাতালে ?

আলোক : পাতালে কিছই নেই। ভীষণ ভীষণ

মেয়ে : কি ভীষণ ?

আলোক : (বিত্ত) ভীষণ শূন্যতা

মেয়ে : শূন্যতা কি ?

আলোক : (নিঃশব্দ) কি জানি। শূন্যতা কোথায়

কোন, অন্তর

মেয়ে : জল থেকে তারাতা শাকিয়ে উঠল

হাওয়ার কিসের গহ ?

আলোক : আর্টডল

মেয়ে : আর্টডল ? কেটে সেলে

যে জন্ম হাও ?

কিসে কেটে সেলে ?

আলোক : টেউ-এর কাত

মেয়ে : কার কেটে সেলে ?

আলোক : ডোমার কাটে নি। তুমি

কিন্দুক ফুড়াও।

মেয়ে : আমি এখানে থাকবো না

যাবো ওই গায়ের ওরিকে

আলোক : বেশী দূরে যেয়ো না বনি।

মেয়ে : আমি ওই বিকে যাবো।

৪ তত্ত্বা ভেতে কেনা

এর সংসে পরিচয় হয়েছিল কি...? না...

আলোক : তোমার ক'দিন ছুটি আরও বাকি আছে ?

শিখা : চার পাঁচ দিন ।

তোমার কলসজ ? বেশ বহা তোমাদের !

আলোক : কেন কিসে বহা ?

শিখা : কত ছুটি ?

আলোক : আর বাতা দেখা

শিখা : আবারের অক্লিঙ্গ—কাইল—স্নাত্তি

আলোক : স্নাত্তি, স্নাত্তি ও কলকাতা

আলোকিত গৃহা

শিখা : বাক্তি কলকাতা হবে . কি আত্মব

এখানেও কলকাতা চানো দেবে ?

আলোক : কার্য কলকাতা,

পৃথু স্থান নয়

বহু 'কনসেপশন' ।

সে কি কলকাতা ?

শিখা : তুমি জান করবে না এখন ?

আজ কি গাঁথবো আনো...

আলোক : আবারের কথা গুলো কি ভীষণ বিপর পোনাব

শিখা : কোথায় ? কখন ?

আলোক : এখন, এখানে, এই সমুদ্রের পারে ।

কথাগুলো অর্থহীন, ইতঃতত ফেনা

কর্ত ও পাপদুর্গে হৃত হাছের হতন

কি ভীষণ অর্থহীন, বীন ।

শিখা : কেন, আমার তা

যবে হয় না কখন ।

আলোক : তা যবে হয় না কখন ?

শিখা : কখন হয় না

আলোক : কখন নির্জনে, রায়ে, বিছানায়

চোখে ঘুম আসে না এখন...

এখানে সমুদ্রের তাকে

কাউ-এর পাতার কাঁক দিয়ে

কখন জোখিনী চোখে দ্বির চোখ রাখে

তোমার তখন শিখা কি যবে হয় না,

আমরা কি অর্থহীন, অবাগব, অকলিত

হৃত হৃদয়ে ।

এমন কি কাকিভাঙ্গলো

সমুদ্রের পারে বখাব

আমরা যে তাও নই ।

শিখা : না, বৃদ্ধীকে বৃদ্ধের ভিতর নিয়ে

কখন বৃদ্ধির পাতি

ছাই পাঁপ বনেও আসে না ।

আলোক : বেঁচে গেছে শিখা

তুমি ও তোমার অজিত অন্তর, এক ।

অথবা বানানো স্বর্গে বৃন্দী ।

শিখা : নাহে, কি বলতে চাইছো ?

আলোক : বোকাতে পারবে না ।

শিখা : বোকাতে পারবে না ?

আলোক : বোকাহো যাও না ও যে বোকাহো যাবে না

বরি তুমি নিজে কখন না বোকা ।

হতই বোকাতে যাবো কালসা হবে তত

এত ভাব শব্দ সইতে পারবে না ।

শিখা : কখন গ্যাছো নি তুমি

কত হুম ও অস্পষ্ট হচ্ছে। বিন বিন ।

কত ভোগা হয়ে গেছে ।

আলোক : আমি যা বলতে চাই তাই বৃদ্ধি এই :

আবারের এ ভীষণ চারপাশে প্রত্যক্ষের হত

নিঃস্বর্গ, অথবা আনন্ডা যেন

বিশুদ্ধ পুণ্যের মধ্যে বৃদ্ধের হতন ছুটি, বৃদ্ধি

চূর্ণ হই :—আমি বোকাতে পারবো না ।

শিখা : জানিনে কি গৃহ পাও আত্মনির্গাভনে

আলোক : যেন তোমার গৃহ বাস কলকাতা

[সমুদ্রের কর্ণ কর্তে ওদের হৃদয় আরও স্পষ্ট

হয়ে ওঠে । ওয়া অসহায় । এখন ওদের ভাষা

কর্ণের যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে ।]

শিখা : বৃদ্ধী, বৃদ্ধী হই

আলোক : ওই বিকে গেছে

শিখা : ওয়া, কি ভুলো বন যে হচ্ছে দিন দিন

চারি কি তোমার কাছে ?

আলোক : চারি ? কিসের ? ঘরের !

শিখা : আমি চারি কোথায় ফেলছি !

গ্যাছো তো তোমার কাছে আছে কিনা ?

আলোক : না শিখা আমার কাছে চাৰি নেই

শিখা : আমার ঘরের চাৰি

আলোক : না শিখা আমার কাছে

চাৰি নেই

শিখা : তাহলে হুকীৰ কাছে ?

ও ঘাঁট ঘাঁট কেলে

হুকী : হুকী, হুকী

(শিখা যেন সোঁতে হুকীৰ ঘোঁতে ধারে ।

আলোক ধরে কেসে .)

আলোক : শিখা

শিখা : হুকী

হুকী থেকে মেয়ের কণ্ঠ : এই যে এখানে বা : বা

খাৰি গুলো উড়ে গেছে ।

(স্নায় শিখা প্রায় আলোকের পায়ে আছড়ে পড়ে ।

ওয়া চুপ চাপ । সন্ধ্যার স্মরণ এখন করুন । পায়ের

নখ দিয়ে বাসি হুকীতে হুকীতে শিখা বলে)

শিখা : কেন এত নিরাশ্রিত লাসে ? কেন ?

আলোক : এখানে এসেছি কেন

কেন তুমি এখানে এনেছো ?

শিখা : এসেছি বেড়াতে ।

কে জানতো তোমার পীড়ন

এমন নির্ভর হবে ?

কে জানতো সাগরের বায়ে

হুকীকে আঁকর কাঁটে ?

আলোক : হাতে হাতে কি আমার ধর ।

ঠিক থাকতে পারি না তখন ।

কথা করে শিখা : হাস করে না শিখাশি ।

শিখা : আনাকে কি কিছুই ফোঁস নেই আর ?

আলোক : আছে ! . ভা নিতে পারবে কি তুমি ?

শিখা : কি সে ?

আলোক : ভালবাসা,

ভালবাসার কখনো,

কটুকুলা ।

শিখা : তুমি ভালবাসনি কখন ।

তুমি এত আত্ম-পতন

জানবাস্ততে পারবে না কখন ।

ভালবাসা আত্ম-কিন্দীভিতে ।

আর আমি ?

অধিকার করতে গিরে অধিকৃত ।

আলোক, আলোক তুমি

সব আলো কেড়ে নিলে কেন ?

আলোক : কেন অগণিত মানুষের এত

হেসে খেসে, দুখে দুখে, বাজি দ্বন্দ্ব, টাকা, হান দিয়ে

অবধারে হুকী একটা বই কিম্বা সামাজিক সিনেমার

ভুলতে পারিলে দর । কেন এত দুর্ভিক্ষ

আমার জীবন ? কেন রয়ে ছা আমি

নির্বাণিত ? কোথাও শিকড় নেই

আকাশের মেঘের মতন এলোনেলো

কি যেন গোপন আছে—

শিখা : কি গোপন আছে ?

কিছুই গোপন নেই ।

আলোক : আমার জন্মের মূল

শিখা : আমার সে কথা ।

তুমি ভুলে যাবে না কখন ?

আলোক : ভুলে যাবো ? আমার জন্মের উদ্দেশ্য ?

ভুলে যাবো প্রথম আলোর দিকে চেয়ে

আমি তাকে দিক্কার দিয়েছি

বেরিলির মনো-আত্মনে

আত্ম থেকে কত দিন আসে

শিখা : ভুলে যাও সব ভুলে যাও

আলোক : যদি সমুদ্র হতাম তবে ভুলে যেতাম হস্ত

কখনোই হুকীতে হুকীতে, এই দিগ্ভা বর্তমানে ।

শিখা : পাসদ করে না

হুকীতে বেয়ে না তুমি

আমি তোমাকে আমি

অতীতের কোন দাম নেই

আমার পরাণ বাহা চায়

তুমি তাই, তুমি তাই

এস বলে আমি

আলোক : দেহটাকে অলৌকিক স্টেট-এক ঘোড়কে চেঁচে

চুটে হয়ে যায়

শিখা : অনেক অনেক ধরে

২ তত্ত্বা ভেত্রে কোথা

আলোক : নক্ষত্রের কাছে। তিত্বা চেয়ে নিতে

তব্বন বিশ্বাসিত, ঐক্য।

এমন বিশ্বাসিত এগেছিল কাল, অক্ষমাং।

হুত পক্ষিক। তব্বন সন্দ্রের ছোয়ায়ে বত।

এমন বিশ্বাসিত আদি কত কাল পাই নি, শিখানি

শিখা (শিক্ষিত) : এল জলে নানি

জলে নানি এল

আলোক : কাল রাতে এইখানে আমায়ের লেহ

কি বলব...কি বলব আমি

মনে হল আমি নেই অত নেই, শব্দ

সন্দ্রের শেখরানি ওঠা পড়া. সেই

নিশ্চলন নরতার আমি বেন আদিব কথক

তোমার চুলের মধ্যে পিত্তাত কোনাকি

নোবতা জলের বিশ্ব কঠাব গ্রনায় অপদ্রুপ মনি

উত্তর স্থপিত তিস বিরব নক্ষ

শিখা : পারে পাড়ি চুল করে, চুল করে

আলোক : কাল রাতে মনে হল

হুত নেয়ের কঠ : বাবা মা, তোমরা কোথাও বেড়া মনে

শিখা (জান পাবে মনে) : কোথাও বাবা না, এল

(সেদের ডাক আর শিখার আত্মমানে জান করে এল

আলোকের। হুত অপরাধীর হাসি। শিখা এখন

বিত্ত মন। ওরা চুল করে বলে আছে সন্দ্রের দিকে

চেয়ে। নক্ষের বত সন্দ্রের শব্দ। কিছু বায়ো বছর

আসের গলা শোনা ধানে।)

আলোক : শিখা আমার শিখানি

শিখা : আলোক...নক্ষরীট...হাতো

আলোক : শিখা

শিখা : আলো

আলোক : আমার যে পক্ষিক নেই

অন্যত্বনি অন্য-আলম

কে আমার বাবা, কে বা

আমি কার দালদার বীজ।

শিখা : তোমার পরিচয় তুমি

আর কিছু আমি ত ওই নে

আলোক : মোহ বেটে সেলে অন্যত্বনে নিভে গারে

তার চেয়ে বহু হার আর কিছু নেই

তুমি কির নাও।

শিখা : আমাতে কিরিতে লেনে

তোমার এমন পক্ষিক নেই

আনি আমি

হাতবো বলে এগেছি কোনো না ?

আলোক : হুতি কোথেকে কি আছে তোমার ?

শিখা : তোমার ইচ্ছার আলো

আলোক : কি বেজে উঠে লুকিয়ে ?

শিখা : তোমার অশ্রুটি পুর

আলোক : তোমার হৃদিত ঠোঁটে কিসের লক্ষ

শিখা : তুমি কোলাস

আলোক : চুলের গভীর বনে

শিখা : তোমার আত্ম কতি

হাতাবে পাখির বত,

আলোক : শিখা

শিখা : না...না

আলোক : শিখা

(বায়ো বছর আসের কঠরর মনে গেছে। শিখা
শব্দতে পায় নি।)

তুমি কি জান ?

শিখা : কিছু না তো

আলোক : তুমি কিছু শব্দতে পাও নি ?

শিখা : সন্দ্রের লাক

আলোক : আর কিছু ?

শিখা : বিশ্বর ভাবনা

আলোক : আমি বেন শব্দতে শোনা

বেরিলির মাঠে...দ্যা বেলো

শিখা : বেরিলির মাঠে দ্যা বেলো...

আলোক : সে দিন পরীক্ষা শেষ হল আমারে

শিখা : বেরিলির মাঠে...বায়োটা আর আমে

তখন চোখের হুতি

আলোক : অত্যা পুরানো বরজা পুলে সেল

শিখা : বেরিলির মাঠে

আলোক : বায়োটা বছর আগে

শিখা : কি শব্দ ছিল তুমি

এমন কি বাবাও বলেছিল

সত্যিই আলোক ?

আলোক : উড়িয়ে দরজা বাঁধা

তুমি এসে রানীর দরজা ।

দূরে নেবের কণ্ঠ : তোমরা আর ত থাৰা

(শব্দটি থেকে দিয়ে এসেছে ওয়া । ওয়া মৃদুস্বৰ্ণে)

দরজা কঠোর হচ্ছে ।)

শিখা : এয়ার এখানে এস

দূরে নেবের কণ্ঠ : যাচ্ছি, তোমরা খেওনা

আলোক : আত্ম কি ভীষণ হয় ।

কেন এত হয় ?

শিখা : নিজেই নিজেছা বেছে

আলোক : এই আনার নিয়ন্ত

শিখা : এ তোমার অভিনয়

হৃদয়ের করুণ স্পন্দ

আলোক : তোমার আনার এই কি আনার হয় ?

শিখা : আমি অনুশোচনা করি নি

আর তুমি কবে সেলে

আলোক : আনাকে করুণা করে

শিখা : বিখ্যা কথা

আলোক : কেন বিবে করেছো আমার ?

শিখা : তোমাকে করুণা করে ?

আলোক : তোমার পাবার অন্য

শিখা : খুঁটিয়ে নেবো না তুমি

আলোক : পছন্দকে দিতে, অহংকারে

বিজ্ঞানের ভাবে আত্মতত্ত্ব হতে

ঐতিশ্যের নিচে ব্যাধি ওপর, আমি

তুমির উপায় হাত

ব্যবহৃত তোমার খেলা

শিখা : শব্দ এই ? অহং, অকৃতজ্ঞ, আর কিছু নেই ?

আলোক : তাহলে পাল্লাসে কেন ?

কেন বেরিয়ে গেছে মাথা উঠে করে

ধাক্কা না, পাল্লাসে কলকাতার

ভীড়াক্রান্ত শব্দভাষা ?

কেউ চিনে না বলেই । দখলার দাবির

আমরা হারিয়ে যাবো...তাই

নিজের অভিজ্ঞ থেকে কি করে পাল্লাসে, বাঘার ?

শিখা : তুমি কি শব্দেতে চাও ?

আলোক : একটা নিম্ন শব্দ

যাতে দর উন্মুক্ত হতে পারে ।

শিখা : পারবে কি সত্য করতে ?

আম, কেন সারাদিন

তোমাকে এড়িয়ে গেছি ?

সে কি সেতারের টান ?

না, সে আরো কঠিন, নির্ভর

আলোক : জীবনের চেয়েও নির্ভর ?

শিখা : এখানেই বলা যায়, কেন না এখানে

এই ভীষণ নির্ভর আমরা দৃষ্টব্য অবস্থায়

আলোক : এবং বাস্তব, দত্ত

কেন না আমার, আমারই

পারিপার্শ্বিকতার দ্বারা নয় ।

শিখা : কালগতে আমার শরীর নিয়ে

তোলপাড় করছিলে যখন...তখন

তখনই তোমার মৃত্যু

কামনা করেছি আমি

আমার ওপরে তুমি যখন নিশ্চয়

তখন আমাকে মনে হল তুমি বিরাট কবর ।

(সন্ন্যাসীর মত ওয়ের ওপর কাঁপিয়ে পড়েছে । ওয়া

চরম্বার হয়ে গেছে । হিটকে পড়েছে আলোক ।

শব্দটিয়ে পড়ল শিখা । নোনা জলে ওয়ের শরীর

জ্বলছে । ওয়া কেন অন্য পৃথিবীর । তবু সেই সর্বস্ব

ওয়ের অসহায় চিন্তার পাতালের কণিকণ বেন)

তোমাকে রেখেছি ঢেকে ।

হৃদ্য করে, হৃদ্য করে ।

হৃদ্য, হৃদ্য বা মনি সারাব

কিরে আর কিরে আর আমার মা মনি

আলোক : কেউ কাউকে চিনি নি এককাল শিখা

কিন্তুভের চকিত আলোর এই প্রথম দেখছি

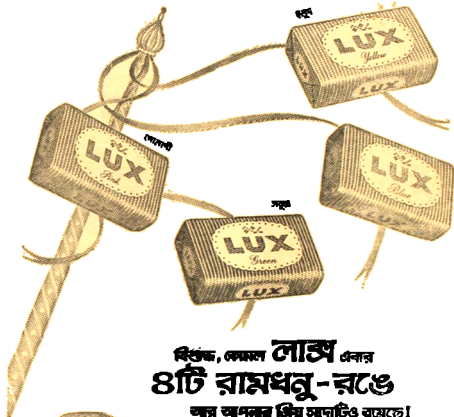
শিখা : চলে যাও, নিকটে এসো না

আমি হেরি গেছি

হৃদ্য হৃদ্য কিরে আর

নেবের কণ্ঠ : তোমরা কোথায়

আলোক : কিরে আর



বিশুদ্ধ, কোমল **লাক্স** এর
৪টি রামধনু-রঙে
 অল্প অর্থের প্রিয় সন্দেশটিও রয়েছে!

দেখুন! শাও এর চমৎকার কত সব নতুন রঙে ধরা বিস্ময়ে—
 সাধাটিও রয়েছে। প্রতিটিই আপনার প্রিয় বিশুদ্ধ লাক্স—হালকা
 স্বস্তি নিয়ে যে সাবান আপনি চিরদিনই চেয়েছেন।



মজ্জা ক্যান্ডি ব্যঙ্গ
 'আমার প্রিয় লোসে যের
 রঙের মেলা লেসেছে,
 একে অগ্নিব রচনা।—



চিত্রভাস্কর বিশুদ্ধ, কোমল সৌন্দর্য্য-সাবান

কিরে আর

(সমস্ত পাশ ধরে আসছে)

আলোক : শিখা আমি ভাবে ঘেঁষে পারি 'ন কখন
আমি তোমাকে দেখি 'মি : কখনও তো। কতকাল হল
ভালবাসা বন্ধ প্রবোজন। আমরা ভাঙিত কখন।

শিখা : তুমি চলে যাও...অন্য এক ছায়া নামে
তিনি না শুকিয়ে ফিরে কোথায় ? সহসা উঠে এল।

আলোক : এখনই আসব আমি
নিঃশব্দ নিবশ্লিষ্ট আমরা লকাই
আর কোন সর্ব নেই, বিখ্যা নেই
অন্যদের দৃষ্ণলতা
দৃষ্ণ আনন্দের।

শিখা : অবশিষ্ট কিছ নেই।
তুমি গলে যাও

বিন বন ভেঙে গেছে। এখন একলা ঘেঁষে চলে।

আলোক : দৃষ্ণ তীর্থের দিকে।
এই নিবশ্লিষ্ট আমরা ব্যতীত আর
আমাদের কিছু নেই, কেউ নেই।
অন্যদের আদৃত আমরা ভীষনের গভীর বিবালে
একটা রাগিনী যেন কোন এক গভীর গলায়।

শিখা : শুকী শুকী বা বনি আমার

আলোক : এখন গাছের নত নিরাসক্ত
ছায়া নিতে পারি।

শিখা : আমি কি দেবো তোমাণ

আলোক : তোমার স্নানতা, দীপ্তি

শিখা : আমি অন্ধকার

আলোক : অন্ধকারে পরস্পর আমরা নির্ভর
গতভেদ ছাত্তে যাবো

শিখা : আমরা কোথায় যাবো...

আলোক : অসম্ভবের দিকে

চুড়ান্তের দিকে

নৈশোদ্যের দিকে।

শিখা : আমাকে আশ্রয় দাও

আলোক : আনাকে আশ্রয় দাও

শিখা : আমাদের কণ্ঠস্বর

আলোক : নিশিত গ্রাধনা

শিখা : আমরা দৃক্তনে

আলোক : ইচ্ছা ও ইম্পিত।

এখন শিকড় যেন বহনুদর যাবে।

শিখা : বহনুদর যাবে...

নেয়ে (লৌড়ে এসে) : তোমরা এখানে ? ছাটিয়ে যাওনি
যুক্তি ? ব্যাখ্যা কত কড়ি কিন্ত এনেছি আমি

শিখা ও আলোক : চল কিরে যাই।

(সমস্ত পাশ চাই উঠেছে। ওরা তিনজন
সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে।)



‘এইখানে’ নৃশিখতা
অবাক হয়ে চারপাশে
চোখ বুলাতে লাগল।
ওর চোখ ধুঁটো যেন
স্বাভাবিকতার তুলনায়
বড় হ’ল, প্রসারিত হ’ল।
হ্যাঁ, প্রসারিত নিশ্চয়ই।
আকাশ নয়াল বা ভী,
হান্দব ভরাট হাওয়া আর
যান্ত্রিক জীবনের কঠিন
বস্ত্রপার মেওয়ে চোখ



—‘কতদিন আসে?’
বিত্ত হোল তামাল।
অত হিসেব তার মনে
নেই। তবু একটা ব্যর্থ
চেষ্টা করল সে। বয়ে,
‘ঠিক বলতে পারছি না।
তবে হুশোও হতে
পারে ভিন ন বছরও
হতে পারে। এখানের
লোকের মধ্যে তার
কোন হিসেব নেই।

ছোট্টই হয়। নৃশিখতি নৃশিখতি। হনের তুলপটা লাগানে
বাঁধা। গাথাগাণি নেই, উদ্যাবগতি নেই। মরে মরে
নির্দোষ। পুণ্ডে হানাপাণি যায়। কঠিন সোণার নিশে
আজীবন। আর আত্মবলে বাঁধা থাকা। সেই ঘোড়াটার
লাগান আছে বলে গেছে। এবং বলে যাওয়াই নয়
একটা বিরাট কাঁকা প্রান্তর সে পেয়েছে। যা কোন-
খানে বাঁধা নেই, নিষেধ নেই। হনের তুলপটা
নৃশিখতার তাই বেগমাল হয়ে অতীতপন্থী হচ্ছে। দূর
ইতিহাসের কাহিনীর একটি বিশেষী আদ্যকে সে যেন
অনুভব করতে চাইছে। সেই সঙ্গে স্রোতাক। বিত্ত;
কোন আদ্যার মাসাল না পাওয়া থাকে—স্রোতাক একটা
আছে বিকা। এই প্রসারিত কাঁকা অবদর্শ প্রান্তর,
বিলম্বিত নৃশিখলোক আর ঠিক নৃশিখাকারের মত
চারদিকে উঁচু মাটির পাহাড়। কাকর, মাটি আর
কামা। সোকে বলে, কোদকালে এখানে সোহার বনি
ছিল। এগুলো সোহা বের করে নেওয়া অসার
অর্থ। তা হয়ে ফরতো। কিন্তু এগুলো মাটির
পাহাড়টাকে জীবিতেরে ভাল। আর কি আশ্চর্য পুণ্ডে
এই একটা দর ভিনটে থাকে প্রান্তরটা বিতক। এবং
ভিনটেই ঐ নৃশিখাকারের আকার। অবাক পাশে
নৃশিখতার। সৌখিক থেকে চোখ সরিয়ে পাশে তাকিয়ে
বলে, ‘এইখানেই বৃদ্ধ হয়েছিল।’

—‘হ্যাঁ’, তামাল জান হাসল। এবং, ‘সোকে তো
তাই বলে। তামালকার ইতিহাসেও নাকি তাই লেখে।’

তবে কাহিনীটা পথর হয়ে আছে।

হ্যাঁ, কাহিনী। নৃশিখতা নৃশিখতা সে কাহিনী
অসলের মধ্যে। কর্ণ কিন্তু হানাম। সের্বাট কিন্তু
বীরব্রাহ্মক। আশিনা আর ওদমান। বিল্লীর রাজ
প্রাসাদ থেকে হুঁটি প্রাণ একটি মিলনের মিত্ত অ্য
নিরক্ষণ আশ্রয়ের সন্ধান পাশিয়ে এসেছিল। এসে শৌণ্ড
ছিল হাতেবন্দুরে। বর্তমান বার মার হেতবন্দুর
তখন হাতেবন্দুরের কামলীকায় হাতেব বী। বী
সৌখিক। ছেলের মত বৃকে তুলে নিলে ওদমানকে
বিল্লীর মাফস পাহের চরকে বিভাজ্য করার জন্যে
ওদের হুকুমের হ্র নাম নিলে, সেখিনা আর হাফের
হাফের বার বার আঝো আছে। এবং বারি আ
পরিবা। কিন্তু ইবলিশের চোখ নাকি নৃশেব আনা
কানতে চাঁটায়। তাই একদিন আশিনার হৃদস্পাত
কামাতুর হৃদসে সন্ধান সন্ধান হাতেবন্দুর এসে শৌণ্ড
তখন বর্ণীনের অভ্যাচারে বেশ সন্তুষ্ট। সেই বর্ণীনে
সৈন্য বলে হাফের বিরুদ্ধে বৃদ্ধ হাঝা। এই প্রাণ
আঝো গড়ের ভাসপাল বার মারী বৃদ্ধ হল একা
মারীর অন্বে হুঁটি পুণ্ডেরে। অব্যাহত মরল অন্বে
জন। - আর হাফের বী মরল হৃদসের হাতে। হৃদা
হৃদে কামোদ্যাবনা সেরিনাকে কলসত করতে সেল
কিন্তু লতা নারী সেখিনা শিশু পুণ্ডকালে প্রাণ্য
সলয় মরোবের কাঁপিয়ে মরলেন। না, মরলেন
বেহেতে সেলেন। যেখানে হাফের। আঝো সেখিনা

সমাদি গুলকগাছের ছায়াবৃত্তা । একাংশ বড় বড় উদ্ভিদে সাদাকাল গছাশ্রুতা ।

—‘স্মিতা আছে এসব ?’ স্মৃতিতা তাকে এসেছিল আত্মহতিনথ্যে তমালের মূলের গমনে ।

—‘হ্যাঁ, সব আছে ।’

—‘তবে চলুন না একদিন আমাকে দেখিয়ে আনবেন । কলকাতার ইঁট পাথর আর মোটর বাল মেখে চোখ পড়ে গেছে । আরই চলুন না ।’ স্মৃতিতা উঠে দাঁড়িয়েছিল কল পাথে ।

—‘একদিন ?’ তমাল ঝড়ির দিকে চেয়ে বললে, ‘এখন বেলা এগারটা ।’

—‘তাহলে কি ?’

হাসল তমাল, ‘এখান থেকে কন করে তিনমাইল পথ । তারপর গড় থেকে বাঁধ, বাঁধ থেকে সমাধি । অর্থাৎ দর-সাকুল্যে প্রায় দশমাইল । এ বেলার বাঙালী দাওয়া বডন ।’

—‘তাহলে ?’ হতান হয়ে স্মৃতিতা বলে পড়ল চোয়ারটার । বললে, ‘বাঙালী হবে না ?’

—‘না, হবে না কেন বৈকালে গাব ।’

—‘কিন্তু অতটা পথ বলছেন । হেঁটে দাওয়া কি সম্ভব হবে ?’

—‘রিম্ব করব ।’

—‘হ্যাঁ, হুব তাল হবে । বেশ একটা ঐতিহাসিক জায়গা দেখা যাবে । অথচ দেখুন—’ স্মৃতিতা বেন একদিন না যেতে পারায় পুন্যাতটাকে কথা দিয়ে ভাগিয়ে নিতে গাইয়ে । তাই হুব হুব করে বললে, ‘আমার সময় ভীষণ দারুণ সোপেছিল । তেবেছিলার হুতু তোর কোন ককসবেলো বাছি । কি আছে দেখানে যে দেখো । এসে শৌছেও বিরক্ত সেগেছে । আপনরা বলেন এটাকে পথ । আরগা কি বল জানেন ?’

—‘কি ?’ স্মৃতিতার চোখে সোখা ডাকাল তমাল ।

চি হি করে হেসে উঠল স্মৃতিতা । বলে, ‘দহরতল । এমন নোংরা, ব্যবসায়ী গুলোর কখনও পথ হয় । ভীষণ বিরক্ত সেগেছে এই বানিকটা আগে পর্বত । কিন্তু এখন বেশ লাগছে । বলে হচ্ছে স্মিতা একটা ভাল জায়গার এসেছি ।’

অতএব স্মৃতিতাকে গড় দেখাতে নিয়ে আসা । চারদিক অনন্ত ফাঁকা । একটা নরনার গাছপাশাধীন প্রান্তর বেন বৈকালের এই বিষয় রোম্বুরে গা এগিয়ে পড়ে আছে । একটাও লোকজনের হাটা নেই, বাতালে গাছপাড়ার পথ বেই এমনকি একটা পাখীও কোথাও ডাকছে না । স্মৃতিতা চারদিক সেবে হাটির পাখাডের উপরটার গিয়ে বলল । বলে, ‘বরবাদীর তো কোন নহুনা দেখছি না ।’

—‘না, কিছু নেই এখন । অনেক বছর আগের কথা । সব হাটির তলায় চাপা পড়েছে । হাতে ধখে বর্ষার হাটি হুরে গেলে হু-একটা ভাপা বন্ধুরের নল কিংবা এক আঁটা সেকালের ইঁটের টুকরো বেয়োর ।’

—‘ও !’ দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্মৃতিতা । তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল । আকাশের শেষ প্রান্তের হুটা কালচে মেরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে । ক্রমাবে ও হুটা ঘন হবে । আকাশ হাটিকে একাকার করবে । হ্যাঁ, একাকার নিশ্চই । অন্ধকারের আকাশে মিটমিট করবে তারা আর অন্ধকারের এই হাটির বুক জলেবৈনিতবে জোন্মাকী । কোনটা আকাশ কোনটা হাটি বোকা যাবে না । হুর পথ হাটি বান্দুরের পথ ভুল হয় নাকি কোন কোন রাতে । সারাগাত হুরে মরে এই প্রান্তরটার । আর—, তমাল বললে, ‘গোদা কথা অবিধি ।’ আমার তো বিশ্বাস হয় না । লোকে বলে পথভুল হলে কোন গাছেরে সে শোনে অশ্রের ব্যঞ্জন । দুরাগত যোড়ার হুরের পথ । আর হু হু বাতালে একগাণ সোলমাল কিন্তু চোখের সামনে কিছু নেই ।’

চুপচাপ আয়ো বানিককল কাটল গয়ের হু-অনের । বাতবিক এই বিরাট কঁকটা তাদের হুরের কথা শেষ করে নিয়েছে । ঐশা, তাদের মনটাকেও সমস্ত প্রান্তরটার উপর হাড়িয়ে দিয়েছে । অতএব একটা কিছু নিয়ে একাধ হওয়ার অবস্থা নেই । তাই একসর বললে তমাল, ‘চলুন রাত্রি হল ।’

—‘হ্যাঁ চলুন’, উঠল বটে স্মৃতিতা কিন্তু এই নিশ্চিনতা তাকে টেনে রাখল । মেলে ধরা সমস্ত মনটাকে গুটিতে নিতে বাওয়া গেল না । অনেকখানিই এখানে পড়ে থাকল ।

কলকাতার বি. এ. স্কুলে পড়া শেষে দুশ্শিতা। বেড়াতে এসেছে কয়েকদিনের ছুটিকে তার নিকটতম আত্মীয়ের বাড়ী। স্বকল্লল কখনও সে দেখেনি। তাই হঠাৎ খোলাে ট্রেনে চড়েই তার বিরক্ত লাগতে শুরু করেছে। ভেবেছে কিংবদন্তি। কিছু ভাবনাটা ভাবনাই হয়ে গেছে। প্রায় দুই বেসামান্যের উপায়ে আর তার একমাত্র আশ্রয় উপর পড়া বুকের দিকে চেয়ে সে কিছু করতে পারেনি। পাশের বাড়ীর তমাল সেনের সঙ্গদ্বান তাকে ভদ্র আদর্শটা এই পথটাকে দ্বা করায় ক্ষত্যা হয়েছে। নইলে, দুশ্শিতার মনে পড়ল নইলে এই পাঁচটা দিন মনে হত পাঁচ বছর। নরতো আরো একটা কথা মনে হতো সে মনে কয়েকটা গভীর পাহিরে এসেছে। এবারে পুত্র, বৃন্দো অষ্টগ্রহের পোতুর গাড়ী চলে চলে স্বাস্থ্যসুখকে ভালো করে ভালো করে। আর কি বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রের বেশভূষা কথোবাতার ছিঁচ ছিঁচ। একলা গবে বেরলেই হাঁ করে গাড়িতে পড়ল একটা মিছিল যেন। তাছাড়া আছে কয়েকটি অর্ধাচীন বয়স মেরে। বিরক্ত, বিরক্ত। একমাত্র বিরক্ত কিলবিল করে উঠেছে দুশ্শিতার চারপাশে। অথচ, দুশ্শিতা ভাবল আর তার কি ভালই না লাগছে। রাগে পুত্র বৃন্দ আসতে চায় না। হ্যারিকেনটার নিভ্র নিভ্র শিখটার একটা মিছিল আসে। সেই আসো-আবারের শব্দিল পরিবেশে দুশ্শিতার মনে মনে হল সে বহুকাল পেছিয়ে একটা ঐতিহাসিক রোমান্টিকতার অগতে পদাশ্রয় করেছে। যেখানে কাদুকীর বর-বাসান। কলমসে শোবাকের অঙ্গারগণ আর আভরণে একটি মূল্যবান মেরে আর পুত্র, পুত্রবতির শব্দ উচ্চ চোখে দুইয়া, উদ্ভত হাতি। আর মেয়েটির দাঁতেরে শব্দ আসে। ঠাঁটের কোমরে বিহাশিলার হাসি। দুশ্শিতাকে মেখে মনে সে হাসছে। ওমা, হাসি নবতো যেন মূর্ত্তে সারা হাতে ধীরে আসে ঠিকরে পড়ে। আর হাসির শব্দ নরতো যেন কাকল্যের কটি সেই হাসির শব্দ পাঠোপার দুই মূল করে ব্যাখ্যাত। মেয়েটি হাসতে হাসতে বলছে, 'চিনতে পারছ ?'

—'হুঁ, বাবু হেলাচ্ছে দুশ্শিতা, 'তুমি তো আশিনা'।

—'চুপ'! তাকাতাক দুইটা চোখে বল মেয়েটি

দুশ্শিতার। আচ্ছা, ওর হাতে গোলাপের কি মূল, পছ। বললে, 'না, ও নাম নর। আশি সেরিনা আর ঐ মেরে হলে হয়েছে অন্যের ও'র নাম জান ?' অক্লান্ত কটাক হাসল সেরিনা জরীর গরী অতি চৌকিতে বলে থাকা পুত্রবতির দিকে চেয়ে। বললে, 'ও'র নাম—' তারপর হি হি করে আবার সেই সারোপার দুই মূল হাসি হাসল, 'তুমি তো বালাপা। তোমারের শাস্ত্রে শ্বামীর নাম করতে নেই। আশি তোমার কাছে কি করে ওর নাম করি বলতো ?'

হাসি পেল দুশ্শিতার। সত্যি, ভীষণ হেসেবাম্ব। সে বললে, 'আশি জানি ও'র নাম। উনি হাকের তাই না ?'

—'হুঁ।' বিচিরভঙ্গীতে দুইয়া আশি চোখ আর বেশী গোলাপ সেরিনা। তারপর হঠাৎ উচ্চ নিয়ে দুশ্শিতার পেছনে তাকিয়ে বললে, 'উনি তোমার কে ?'

উনি। দুশ্শিতা পেছনে তাকাল। কি আশ্রয় তমাল কখন পেছনে এসে পাঁড়িয়েছে। হুঁচোখে তার উপর পড়া হাসি। দুশ্শিতার সারা মূর্ত্ত অকারণ লজ্জায় লাগ হয়ে গেল। সেখিকে চেয়ে সেরিনা এবার নিঃশব্দে হাসল, বললে, 'বুঝেছি ?'

—'না, না তুমি কিছু বোঝনি।' বলতে গেল দুশ্শিতা। কিছু, গলা দিয়ে শব্দ বেরচ্ছে না। সে দেখলো হাসছে সেরিনা। 'দুঃ' হাসছে। হাসতে হাসতে কুল হলো সে। একমাত্র গুলক কুল। সারা উপর তারপর আদর্শটা কবাই হায়া। আর একটি মিছিল দমাণি। তার সামনে টুইটর করে আকাশ মূলকলের একটি দাঁতেরা। হ্যাঁ, বহি হাকের বহি বহি। চাশীর দল এসেছে হেট্, হেট্, করে লাগল গল্প নিয়ে বাসের পাড়ের আশি চাষ করতে। কুচি কোচ শব্দ হুচ্ছে 'দুনি' করে বাসের বল হাটে গেলন করা।

দুইটা চোখে গেল দুশ্শিতার। কথার কাছের খোলা আশিনা নিয়ে দেখলো সে, না, চাশীর দল নর স্বাস্থ্য গল্প গাড়ী সার কদী চলেছে পাঠোপারের হেট্, হেট্, গবে আর ডেলবান চাকার কোচ কোচ আঙাচ্ছে। অনেক কোলা হয়ে গেছে। উঠে বল দুশ্শিতা। 'কিন্তু শ্বমটা ? দল দুইয়া। অথচ লজ্জা। লজ্জাটাও দুইয়া নাকি।

বৈকালে তমাল খাসভেই সেই শব্দের লক্ষ্যতা অকারণ পেয়ে বসল সুশ্ৰিতাকে। তার জটখিদের ত্রিদ ত্রিদ করে আঁচিটা গড়ে তোলা সুঘরে-স্বভাবিকতাকে হঠাৎ ঘেন ঠাট্টা করলে শব্দটা। বি, এ, ক্লাসের সব চাইতে উজ্জ্বল আর প্রগতিশীল মেয়েটি সজাইতে লাগল আর নমস্কার হয়ে গেল। সমস্ত মুখ লাগল আর চোখ দুটো বৃত। তমাল অন্তর লক্ষ্য করলে না। এসেই হৈ হৈ করে উঠল, 'একি এখনো কাপড় পাশ্টান নি? বেড়াতে বেরবেন না?'

—'বেড়াতে? শরীটো একটু খারাপ লাগছিল—'

—'সের্বিক। আমি রিভ ঠিক করে এলান। গড়ে দাও। অঙ্ক আপনি শরীর খারাপ করে বসে আছেন? কি হয়েছে করে?'

গড়! আকুল হয়ে উঠল সুশ্ৰিতার স্নত অন্তর। সেই ষৈ ষৈ কাঁকা প্রান্তরে বেলেয়াবা তার খানিকটা বন তাকে টানল। অকারণ লক্ষ্যতা ঝাতিরে উঠল সুশ্ৰিতা বললে, 'না, জর নর। এমনি, বাখাটা একটু তার তার ট্রেকছে। গাভান কাপড়টা পাশ্টে আসি।'

আবার দু'জনে এক রিক্সার বেঁধেখোঁষি বসে রওনা হল। না, এই ফাঁকাতে কোন লক্ষ্যতা নেই। সাদাসীল হল সুশ্ৰিতা। বললে, 'আজ শব্দ গড় নর। চলুন বাঁকের উপর গিয়ে বসন।'

—'তাই চলুন।'

কিন্তু অপাদান নবটা? সেটা গান্যাপাশি বসে চকায়। ঘটনাক্রমে হাতে হাতে জোয়ারদুই হলে উঠলে হর। নিচ্ছিন্ন নিচ্ছিন্নতর সুখোবদুখি বসে ধরধর কাঁপে। বিকেলের আকাশের রং জড় করে দু'ঘরে উপর কোঁতুকে যাবাৎ ওড়ার। আর নিচ্ছিন্নে লক্ষ্যত করে কাছাকাছি থাকার অবধন জ্বালায়। তাই একধিই দু'জনে দু'জনে কিকটকন বসে ডাবলে। 'আপানির উঁচুটা 'তুবি'র সমতলে নেমে বাঁড়ল। তমাল বললে, 'কলেজ শুলসেই তো ফিরে যাক। মিথ্যা ক'টা দিনকে এখানে বখী করে সেলে।'

—'হ্যাঁ, বখী বখন তখন কারা লক্ষ্য তোদের জন্য সে প্রস্তুত।' সুশ্ৰিতা হাসল।

—'অর্থান? তমাল সুশ্ৰিতার হাতটা তুলে দিলে।

বদলে, 'তুবি আবার ফিরে আসতে চাও এখানে?'

—'ফিরে আসতে নর। থেকে থেকেই চাই।'

—'বিশ্বাস হচ্ছে না।' তমাল কিশির্গাশি বাঁয়ে জলের দিকে চেয়ে থাকল। বনের কটি পাখর মানুসের মুখ, চোখ আর কথা। তমাল ভাবলে, সুশ্ৰিতার কোন ঘানেই তো অবিশ্বাস করার মত কিছু নেই। অতএব নিশ্চিনবার একটি শব্দ-বদল প্রাণাদ ভেদী করা চলে যেখানে-তার জ্বলমাজারীর সেকপ' টাকা আর সুশ্ৰিতার সুচারু গৃহস্থল। সব বিশি্রে একটি গায়বত নীড়।

সুশ্ৰিতাও তাই ভাবলো। জীবনের একটা বেঘনা সমস্ত মুখকে বিম্ব করবে তা কখনই হতে পারে না। বরং অবহেলাকে অবহেলা করতে পারাই মহত্তর (পশু)। এই রাতের নিচ্ছিন্নতার এখানে চলে আসার দিন কয়েক আগের ঘটনা নব পড়ল সুশ্ৰিতার। দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। জাদলার বাইরে কয়েকটি কাঁশা তারা চোখে পড়ল। আর :নে পড়ল অবনী সান্যালকে। ভাই দু'জনী সান্যাল। আজ এই মুহুর্তে কল্পনা করতে ইচ্ছে হচ্ছে তাকে। সাব ছিল কিছু নাথো কুসোরনি অবনী। তাই চুপ চুপ সরে পড়তে চলেছে। সুশ্ৰিতার যোবলীষ্ঠ চোখ আর ব্যালের হাসিনাখা ঠোঁটের দিকে সে চাইতে পারেনি। বাখা বঁচু করে একদর আড়ালে গিয়ে বৈচ্ছলে। কাশুদুখ। হিন্দীশ বগিভাল্যা হাসির ফুকান তুলেছে সৌধন অবনী সান্যালের পেছনে। যেন হাসির প্রহার উঁচিয়ে তাক্য করেছে সে তাকে। অবনী ছুটে গালিয়ে সেয়ে নিচ্ছিন্ন ভীড় প্রস্তরে। কিন্তু তারপর? হ্যাঁ, তারপর সারা বৃক ভরে বাখা মেসেছে সুশ্ৰিতার। চোখের সামনে সমস্ত সুশ্ৰিতা কুশাশাশিন হয়ে সেয়ে। আর সে অবস্থা কানার ডেলো পড়েছে। কিন্তু কেঁসেছিল কেন? এই নিচ্ছিন্ন রাতে হঠাৎ সেই প্রমটা বাখা চাক্য দিলে উঠল সুশ্ৰিতার কাছে। বনে বনে সে কতকগুলো উজ্জ্বল বঁকল। কেঁসেছিল, কারল অনেকদিন একটু একটু করে সে দু'ঘরে শব্দ গড়ে তুলেছিল। কারল, কল্লাকে এখনুর এগিরে এনেছিল যে তা ভাঙ্গতে সেলে অনেকটা ভাঙ্গতে হর। কারল, পে এতটা এগিরেছিল যে ততখানি পথ আর ফিরে আসা হয় না। ফিরে

এসেও যেটা একসঙ্গে পথ চলতে দিয়ে কেন্দ্রেই তা ফিরিয়ে নেওয়া চলে না। কারণ, তার পরিচিত জীবনটা যেটার উপর এত বেশী গুরুত্ব দিয়েছিল যে সেটা লস্কর করে রাখাটা আর উচিতের বাহা দায় না। এই কথাগুলোই একে একে বলে এসে সেল সুশ্ৰিতার। সুশ্ৰিতার হৃদয়ই হল বলত, 'বাস্তবিক ভোর অবনী সামান্য একটা ভিনিয়াস।'

—'ভিনিয়াস! কেন?'

—'কাল সে বেকুড়ার দুসের লোক।' সংকটে অবন' পড়া অবিনা হাল। বললে, 'বইলে এমন একনিষ্ঠ হব।'

—'বাস্তবিক।' কল্যাণী হৃদ্যে বড় বড় করে, 'এম, ভোর বিক' হাফা কারো দিকে চোখ তুলে চাইবে চাইবে না। যেন পৃথিবীতে তুই-ই একমাত্র আশি-অকৃতিম যেনে।'

যেয়েযে পেশনের কনকরূপে হাশির গহকে বৈ বৈ করে উঠছে। লক্ষ্যের সঙ্গে তপ্তি আর তপ্তির সঙ্গে গর্ব সুশ্ৰিতার মনে একসঙ্গে বিরোধের একাকার হয়ে গেছে। গভীরে সুশ্ৰিতা পরিভিত। অবনী সামান্য ভাসেই কলেকের বাংলা প্রকরণ। কিংবা অবনী সামান্য লব চাইতে হৃদয়ান, নহতো অবনী সামান্য কণীর একমাত্র ছেলে। তার চাইতেও অবনী সামান্য সুশ্ৰিতার বনের দ্য।

—'আজ কোথাকতে যাবে?' মোটরের স্টিয়ারিং ঘুরে শ্রুয়োল অবনী।

—'তা আমি কি জানি, প্রত্যেকটিই আমিই বলব নাকি?' সুশ্ৰিতা হৃদ্যে হৃদয়িত কুটিয়ে তুলল। হালস অবনী। বললে, 'তাইতো। তুনি না বললে যাব কোথায়!'

—'কেন তোমার নিজের ভালদাঙ্গা বলে কিছু বৈ নাকি? যেখানে তোমার ভাল লাগে সেইখানে চল।'

—'তোমার ভালদাঙ্গাভেই আমার লাগা।' গভীর সুরে বলল অবনী।

পাশাপাশি বলে থেকে পোদাল না সুশ্ৰিতার। চট করে অবনীর সামনের দিকে ঘুরে বলে বললে, 'যদি বলি নরকে!'

সেটাও 'বল' আবার কাছে। অবনীর প্রাপ্তি বলবার জন্যে উল্লেখ হল। কিন্তু তাহলে ভীষ কাথি-কাথি পোদালে কথাটা। লক্ষ্যের পক্ষে যেতে হবে। তাই বললে, 'হাজা সেখানে তাই যাব।'

—'আর যদি বলি তোমার হাফীতে একর তাহলে হৃদয় হাফিতে সুশ্ৰিতার চোখ চিকচিক করে উঠল হ্যাঁ, এইখানেই অবনী বলল। হৃদ্যে পাভুর হল তার স্টিয়ারিং-এর উপর হাতটা গিঁটল। সে সন প্যা সুশ্ৰিতার হঠাৎ। কিছু এখুদ্বি এই হৃদ্যে সুশ্ৰিতাকে সে হাফীতে নিয়ে যেতে পারে না। হৃদ্যে যাব বাক্যকে। হৃদয়াল সামান্য, নিষ্ঠাবান ত্রাফ কিছু সে কথা নয় অন্যকথা বলে পক্ষে অবনী।

যাবার চোখ হৃদ্যে ভীষ বড়। আর হৃদ্যে আ গম্ভীর। গাম থেকে চূপ বসে নয় হৃদয়াল বান ঠিক করে সেওয়া পাশীর আচার হতে একটু পা টলতে সেই হৃদ্যে বড় হয়ে যাবে। গম্ভীর হৃদ্যে পা কঠিন হবে। আর তার প্রাপ্তিও শব্দে হৃদয়াল নিয়েই পুঙ্খের ঘরে চুকে ছিল সেয়ে। হৃদ্যে আরেকের বিনের বড় ভরি হাওয়া হয়ে গেল। উপরা মনুষ্যের দব গুরের সেরা তার এই অলদন অল্লেখ্যে হাফীর কণী যদি না যাব তাহলে হাফীর আর দ কি করে? অতএব হৃদয়াল যাবুর ম্যার-না কলম্বীর। তাই অবনীর ভীষ ভর তার বাবা সুশ্ৰিতাকে এই হৃদ্যে তোমার হাফী নিয়ে সে হৃদয়াল জিনিস করবেন, 'অব' যেহেটি কে?'

অবনী হৃদ্যে বসলে, 'আমার হাফী।'

—'ও তা এখানে কেন?'

এ প্রশ্নের কি উত্তর যেনে অবনী? বাথিয়ে আ কিছু কমা যেতে পারে। কিন্তু বারার সামনে ক কথাও বাথিয়ে বলবার অবতা বৈ অবনী। হৃদ্যে ক কথা কটকে না। ভীষ অলদন যেন হবে নিজে আর সেয়ে সমস্ত, রক্ত চাপ চাপ হয়ে হৃদ্যে হাবে। হৃদ্যে পব হৃদ্যে পারবেন হৃদয়ালদন একটু চূপ থেকে পাশর পক্ষ গাল হৃদ্যে হৃদয়ালগেগ করবেন, 'যেহেটি নাম কি?'

—'সুশ্ৰিতা কল।'

—‘সেন ? ক’রা ?’

—‘না। বেবেণী’ আকাশ ভেঙ্গে পড়ার মূহুর্তমান অবস্থা হবে তখন অবনীরা। বাবা আস্তে আস্তে গুলোর ঘরে ঢুকবেন। খিল বেবেণ নথ করে। অর্থন—

—‘তবে কেন তুমি আমাকে নিজের সঙ্গে এত করে জড়ালে ?’ সব শব্দে একদিন কিয়ৎসময় করেছিল মৃদুস্বভাব বসেছিল, ‘তোমার বাবা এত দোঁড়া কেন ? এসব হানুসের কন-ব্রল্লসেই বাস করা উচিত। ঘটনব ব্যাভ্র প্রেক্ষাইতিস।’

—‘না।’ শব্দ মূখে বসেছিল অবনী, ‘প্রেক্ষাইতিস’ দর প্রেক্ষিত। আমার বাবার বাবা ছিলেন কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত। বেদোয়রতে তাঁর জীবনব্যাপী অধিত মোতো। বাবাও সেই আদর্শপন্থী। এই ভাষাতোলের মূখে নিজের স্বস্তির বক্তা চাপতে সেলে, সম্মানটাকে বাচাতে সেলে নাকি এমনি কড়া হওয়াই বাছনীর।’

—‘তবে তুমি কুলোপার হলে কেন ?’ একরূপ বিরক্তির তেজ মৃদুস্বভাব মূখে ছিল লি করে কল। ‘তাহলে আমাকে নিয়ে থাকিগটা ফেলই এই তো ?’

একবার উত্তর ফেরান অবনী। ‘মৃদু, বসেছে, কিন্তু বাবার উশ্ব কত’র চালাম একজন। তিনি আমার ঠাকুমা। বাবার না। আমার ভরগা তাঁর উপর। পা জড়িয়ে বসলে ঠাকুমা আমার জন্মে সবই করবেন। আর ঠাকুমার বত হলে—’ অন্তঃস্ব মৃদুস্বভাব নিচিহ্ন। একটি গুন্দহান নাতির এই অনুরোধ ঠাকুমা মূখ করবেন। কারণ তাঁকার চাইতে নাকি মৃদু বড়। জেলের চাইতে নাতি। তাহাজা মৃদুস্বভাব অবনী মূখে ঠাকুমার দয়াজ’তার অনেক পণ্ডির শুনেন্নে। অবনী অনেক অন্যান্যের প্রায়চিত্ত কর্তে বাঙা হাবিলাস ঠাকুমার নিম্নেই নাকি নিবৃত্ত হয়েছেন।

—‘ক’রাটা ঠাকুমার কাছে জুলায়ো না কেন এখন ?’ কিয়ৎসময় করেছিল আর একদিন মৃদুস্বভাব।

—‘কি করে জুলব ! ঠাকুমা যে কাশীতে থাকেন। মৃদুজোর সময় বছরে একবার এখানে আসেন। এবার এসে নিশাং বত করিয়ে নেন।’ অবনী নিচিহ্নের হাসি হাসল।

কিন্তু হাসিটা একদিন নির্বহভাবে নিতে সেল মৃ-

অনের ট্রিট থেকে। মৃদুস্বভাব দিন করে আর অবনীরা বাগানদাই খেল না। কলেজ আসে না অবনী। পরিচিত রেডেয়াশুলোতে না। কিংবা মৃদুস্বভাব বাঙার দরজাতেও মোটরের হর্ণ বাজে না। কি আকর্ষ লোকটা হারিয়ে সেল নাকি ? সম্ভব অনসম্ভব আংগর যোঁস নিলে মৃদুস্বভাব। পণ্ডিতদের কথাক্রমে শুনলো। কিন্তু না। বেশ করেকটা দিন কেটে সেল উঠেল আর মৃদুস্বভাব। দিন না তো যেন ভারী ভারী কতকগুলো পাখর মৃদুস্বভাব মূকের উপর ঘিরে ধীর মৃদু পতীতে হেঁটে হেঁটে সেল। তারপর একদিন হ্রাসে এসো অবনী সন্ধ্যাল। কি চোহায়া ! অবাক হয়ে থাকিয়ে থাকল মৃদুস্বভাব। চোখের কোলে কালি, মাখার চুলে ডেলবিহীন অথহতা। মূখে প্রসাদ বিষহতার হাস। হ্রাসে বা পড়ালো কিছুই কানে সেল না মৃদুস্বভাব কিংবা সে আয়ো কিছু পড়তে পারল কিনা তাও বোকা সেল না। বৈকালে কলেজের মূটার পর বরল অবনীকে মৃদুস্বভাব। বললে, ‘কি হয়েছ তোমার ?’

—‘কৈ নাতো।’ চাপতে চাইল অবনী। প্রসঙ্গটা এড়িয়ে হাসল সে। বললে, ‘কোখার ঘাবে বল।’

—‘না। কোখাও না। মাগে বল তোমার কি হয়েছে ?’ কলেজের উপরের নিজ’ন বারান্দাটার গাফিয়ে থাকল মৃদুস্বভাব। বিকেলের হং-হায়া আলোর অবনীরা মৃদুটা তাঁরপ বিখর দেখাল। কি বলতে গিয়ে থেবে গিয়ে বললে অবনী, ‘আজ কদিন বাবার পরীর মূখ ব্যাপ। ঠাকুমা এসেছেন। নবটা তাই ভাল নেই।’

আজ গলি কেনন ?’ তার তার করে শিঁড়ি ঘিরে বেবে সেল অবনী।

কিন্তু তার পরদিনই সকালে অবনী সন্ধ্যাল এল মৃদুস্বভাবের বাড়ী। বৈঠকখানার অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে বললে, ‘কাল তোমাকে নিশাং কথা বলেছিলাম। বাবা ভাল আছেন।’

—‘তবে ?’

মৃদুশ নীচু করে বসে বইল অবনী। যেন নিজেকে প্রভৃত্ত করছে সে একটা ভয়ঙ্কর মূহুর্তের জন্মে। শেষে মূখ তুলে বলল, ‘আমাকে তুমি ক’রা কর। ঠাকুমা বত মেননি।’

কে জানে কেন হঠাৎ হাঙ্গি গেল দুশ্চিন্তার। বুধ নামাল অবনী। বিব্রত সংকীর্ণিত, অপরাধী। অসার হাঙ্গিতে ভেঙ্গে পড়ল দুশ্চিন্তা। অবনী বেঁধে গেল বিশেষ অক্লান্ত হুত পাবে। আর হাসতে হাসতে হঠাৎ কান্না পেতে গেল দুশ্চিন্তার। প্রথমে বৃদ্ধ ঠেসে, তারপর চোখ ঠেসে আর শেষে কণ্ঠ ঠেসে বেঁধে আসা অব্যবস্থা করায়।

তামাল একদিন বললো 'আমি হাকে কখনো বললাম না বুধ বুধী। বললেন বল তাহলে এই হাস্যে একটা দিন ঠিক করি। তোমার কি রত?'

সেই বিকল গল্পটার বিকলের আলোর ওয়া বৃদ্ধকে বলে। দানবাসামিন।

'কিনের কি রত?'

'বৃদ্ধের যোক না যেন কিছুই। বিবের।' তামাল বুধ হাসল। অব্যবস্থাকে বুধ কোণাল দুশ্চিন্তা। বললে, 'তার আমি কিছাংনি। রতামত সেওয়ার আমিই সব নাকি। আমার বা বাবা নেই বৃদ্ধি?'

'ভাইতো।' হঠাৎ হোল যেন তামাল। বললে, 'তাহলে?' 'তাহলে আমার কি হবে না।' বুধ, হাঙ্গি মেলে বরল দারা বুধে দুশ্চিন্তা।

'দানবাসামিন' নর। সত্যি বল না কি করতে হবে।

'কিছু না আকাশ দেখ।' দুশ্চিন্তা আল্পদু দিবে পতিবের আশির হং দেখাল। হ্যাঁ, দেখার রতই আকাশ অব্যবস্থা। একগাং মেঘের মাঝে মাঝের যেন একশ হাঙ্গি জরলা। কানো কানো গানের থেকে যেন সোনার জ্যোতি বেরুচ্ছে। আর আকাশ বাধুকরী তখনই মেঘের দু'দ', মেঘের নলী কিংবা নানাজাতের দু'দাবরর পাখিরে ভুলছে আর ভাপছে। সত্যিই সে যন্ত্রাবী। তার মাঝের খেলা দেখতে দেখতে সব কথা হাঙ্গিরে যায়। সবই চিত্রা এলোমেলো হয়। এমনকি নিজের অস্তিত্বও হারায়। কি কথার আলোচনা চলছিল হঠাৎ সচেতন হলো আর হয়ে পড়ে না। লেখিকে ত্রয়ে থেকে দুশ্চিন্তা বললে, 'আজ্ঞা সেদিন-টাতেও কি আকাশের হং এখন ছিল?'

—'কোনদিন?' তামাল কিরে তাকাল দুশ্চিন্তার দিকে।

যেদিন বৃদ্ধ হতেছিল দু'দনের সঙ্গে হাকেলের দুশ্চিন্তা সেই প্রাঙ্গনস্থায় দিকে তাকিয়ে আছে।

'হবে হুতো'। বলল তামাল নির্বিকারভাবে।

...কিছু হবে হুতো নয়। সেদিনও নিজের আকাশের হং এখন ছিল। বৃদ্ধকে পারল তামাল আকাশে এই ভাঙ্গা বসটা নিয়ে। হ্যাঁ, সেই একই খেলা খেলতে আকাশ নিজের মেঘেলে বুধীতে। ওর কোন বিকা নেই বরং আরো মস্কে মেতেছে। কয়েক শ' বছর অভীতে একদিন যেমন খেলোছিল, দুশ্চিন্তার সঙ্গে এখানে বং খালা খিনসুদোর যেমন করে হং হাঙিয়ে ছিল আত্ম তের্মা ভাবে নিজেদের নিয়ে বরং আকাশ। বিশুদ্ধত ব্যতিত তার নেই, তুচ্ছতর বেঘনার হংও দেখানে না। বলা যা না, আকাশ তামালকে নিজের মন্য দিতে পারে, সি বৈরাগ্যের হং হাঙিয়ে তাকেও হুতো নির্বিকার নির্বিকার করতে পারে। তাই একলা সে একলুটে আকাশের দি ত্রয়ে পড়ি বৃদ্ধকে চাইল।...

দুশ্চিন্তা জীবনে যোগ হং কোন দিন এত বিশ্মিত হয় নি। কিস্তা অনেক কল্পনা করলেও এমন এক কল্পনা সে কখনো করতে পারে নি। অথচ সেই সেইটা বা চোখের সামনে এসে হাঙাল দেখে নির্বিকার হয়ে গেল তে হাসল অবনী দানবাসামিন। বললে, 'চিনতে পারছ না নাকি

কিছু বলতে পারল না দুশ্চিন্তা। ওর গলাটার দি দুশ্চিন্তাও যেন বোবা হয়ে গেছে। অবনী চেরায়ট বলল বললে, 'রাস হুতোটা অব্যবস্থাবিক নয় তোমার বং আমার আলটাও অব্যবস্থাবিক। তবু কৈকিৎ কি খিভেই হবে। প্রথম এসেছি। হুতো বিবাস হবে তোমার। তবু অনুবোধ মানুদুরে বিচার একদিকে কাছে না করে তার সমস্তটা মিথিয়ে দেখে করবে।' এং খাবল অবনী। পাখর হবে বাওয়া দুশ্চিন্তার দু'দনের দি ত্রয়ে হাসল সে। তারপর আমার বললে, 'সত্যি তোব পক্ষটা একদম বন্ধ করে খিভেই তোমার কাছে চলে এসে। এখন তুমি বিমুখ হলে আমার ঠিই নাই। নতুন হং সংস্কারের সঙ্গে অনেক বৃদ্ধ করে শেখকালে আমা জরলাত।'

বৃদ্ধ। হ্যাঁ, তামালও সেই কখনোই ভাবছিল এং দু'দনকে দেখে।

বিকেলের দিকে দুশ্শিতা ঢকল হয়ে উঠল। এতদূরনি তমাল এসে পড়বে। এতদূরনি অবনী আর তার সামনে। না, দুশ্শিতা কিছুতেই দখল করতে পারবে না। কিছু কেন? মনটার কাছের থেকে কোন উত্তর নেই। শূন্য মনে হল তমালকে এড়িয়ে চলাই ভাল। অনেক ভাল। তাই অবনীকে বললে, ‘আমাদের কলকাতা ফিল্ম-বার ট্রেনতো গাড়ি খটায়। চল বন্ধ একটি ঐতিহাসিক জায়গা তমালকে দেখিয়ে নিয়ে আসি। যুগ ভাল লাগবে। ঐতিহাসিক ট্রেনে বসে কলব।

—‘চল’। পরিচালনার অনশ্বে ভ্রমণ করলো অবনী সান্যাল। হ্যাঁ, সে ভীতু নয়। বিজয়ী।

সেই আকিঞ্চ কাকা প্রান্তরটার বলে শব্দের নিখাদ ছাড়ল দুশ্শিতা। তাহলে, না তমালের মতো দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ও ব্যস্ত করতে পারবে না যে দুশ্শিতা এখানে একলা আনতে পারে। অতএব, অবনীই দুশ্শিতার কি অত্যাশ্চর্য নির্ভরতা। আর কি ভাল আশ্বকের এই মিন। আকাশ, মাটি, বিকেলি গঃ।

কিন্তু হঠাৎ সব ঝান হয়ে গেল। তমাল অবাচিত

ভাবে এবং নির্ভর্য সত্যের মত সামনা সামনি দাঁড়িয়ে। দুশ্শিতা বিজ্ঞত হল, শূন্যের হং হাই হলো। আর বহু চেষ্টাতেও সামলানো গেল না। তবু দুশ্শিতা বললে, ‘আমুন, আমুন। আল্লাল করিয়ে দি। ইনি অবনী সাম্রাণ, আমাদের কলকাতার প্রকল্পের। আচ্ছ এলেন। আমরা সত্যের সাক্ষিতেই কলকাতা করে দাছি। আর এ’র নাম—’

না, অনেক কথা শোনা যায়নি। কেবল তমাল দেখলো ওয়া দুশ্শিতা ঝিল্লি করে চলে যাচ্ছে। সত্যের ট্রেন তাকাতাকি ধরতে হবে। দুটো নামের শোচন দিক শূন্য দেখা যাচ্ছে। ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে। আর সেই মতো মনে হল তমালের, অবনী! কোন অবনী? বেশদুত মনে পড়া তার সেই চির প্রতিশ্রুতি মেলেটি নরতো? তবুনি মনে পড়ল তার না, সে তো গার। জাহেবু, তবু মনে হল তমালের, যুগ। হ্যাঁ, আর একটা বৃদ্ধ হয়ে গেল নিঃশব্দে একটি মেথেকে নিয়ে দুটি শূন্যের এই পঙ্কজ প্রান্তরটার। অন্যত কাকার। বাঁহের ঐক্যমিত্তি জলার নাম। এই বিকেলি হক আলোর। আকাশের দিকে চেয়ে রইল তমাল।



[মকের পিছন দিক।

একটা সেট খাটা নো
হচ্ছে। অমিত অত্যন্ত
ব্যস্তভাবে মই বেয়ে উঠে
সেটে পেরেক পুঁতছে।
সঙ্গেস্ব ভাকে হাড়ুড়ি
বাটাণি বোধান বিচ্ছে।

কাতিক একটা দিষ্ট পড়ছে। এক পাশে স্বতপ,
বোমবেশ, নির্বল বেড়ার পারে একটা সাহের ভাল
লাগাচ্ছে। বেরীকগ তার সখীতের পাটি নিয়ে
বসেছে।

পর্দা উঠতে একটা চাপা গল্পন, কথাবার্তা, লোকজনের
হুটেপাটি বোনা যায়।]

বেবী। বেরি! স্টাট...কাটেন ওপেনিং---

[সমবেত বাত ঝংকার এবং অজিতের পেরেক পৌতার
ঠকঠক শব্দ বোনা যায়]

বেবী। আঃ। কে?

অজিত। [বেমে] যেলে কতি?

[বেবীকানের পাটি ছুপ করে। অজিত ঠকতে আরম্ভ
করে আবার।]

বেবী। স্টাট! কি হলো? কুলো বাবু...আরম্ভ করুন...

অজিত। বাবুনা ধানাত। আমার পেরেক পৌতার
অস্থিবে হচ্ছে।

কাতিক। [বেমে] আর্দ্র বাতিকগ্রস্থ! প্রোডাকশনটা
ঝোলাবে ঠিক করেছো হুটো এক সকে চালাতে
পারছো না, হাড়ুড়ি আর বেহালা?

[বহুমালা চোকে]

বহুমালা। এই যে কাতিকলা, কোবার যে কি হাযো,
তার কিছু ঠিক নেই। এটা খুঁচি ওটা নেই, ওটা
খুঁচি এটা নেই...

কাতিক। আর্দ্র বাতিকগ্রস্থ! কী হল বলবে তো?
[লিটে বঃস হারে] একপো ভাল কুলোর...পেলো...
কুলোখানা আলপনা কাটা...পেল...আলপনা; হলুৎ,
হলুৎ, নীল নীল...বাবা পাহু তোমার দিঘল এই

নেপথ্য-দর্শন

[নাটিকা]

সুরজন মিত্র

★

পাই এ সব! এ কী
পৃথিবীর মালা! যতো
সব বাতিকগ্রস্থ।

পাহু। [বেড়া ধাবতে
ধাবতে] নেনে, বেলাই
টক টক করিস না।
দিব লেব তুই কি

বুজিল?

অজিত। দিঘল! বাংলা পেরেক হাড়ার পুঁতি...
মালা। আঃ! কাতিকলা, তুমি আমার কথা ভনবে না?
কাতিক। বলে খাও ভনছি। কি হয়েছে?

মালা। কি হয়েছে মানে? একটু পরে সে আ

এখন আমি গলার বেবে কি?

অজিত। হুঁ। তাড়াহাড়ি নিয়ে আর।

মালা। কথা বলছো না তেন? কি বেবে গলার?

কাতিক। কেন, হার...

মালা। হার! আনা হয়েছে?

কাতিক। আনা হয় নি, একা একা কত দিক বেধি...

আর্দ্র বাতিকগ্রস্থ। ততোমার গলার তো একটা
হার আছে বহুমালা—

মালা। আমার গলার! এই হার পরে হালহালীর
অভিনয়, সললিকলিক করছে...

কাতিক। ও বেবীলা, বৌকে একটা মোটা হার
গড়িয়ে দিতে পারো নি? প্রোডাকশনের কাজে
লাগতো...

মালা। বাবে কথা ছাড়ো তো। এখনো কাউকে
আগাড করে আনতে বলা—

[কৃত বন্টু গোকে] =

বন্টু। এই যে এনেছি।

কাতিক। কি।

বন্টু। হুঁ। নে তাড়াহাড়ি বেঁবে কেল, আমি
পাউডার আনতে চলাম। [গ্রহান]

কাতিক। ওরে বন্টু, শোন শোন...এ সকে একটা
হলুৎ হলুৎ নীল নীল কুলো— [গ্রহান]

অজিত। [স্টাট হার্ট বেলস]

সেবী । থাক থাক তুলো বাবু, এবার সেকেন্ড সিকোয়েন্স
হেভি, ওয়ান টু...

মালা । কেন একটা ভালো হার তিনে শওনি ।
প্রডাকশানের সুবিধে হতো—কি সো, শুনতে
পাচ্ছ না ?

তুলো । বেসীহা, আপনার স্ত্রী,

সেবী । কেও, তুল করবেন না তুলো বাবু...

তুলো । আজ তুল নয়, আপনার স্ত্রী...

সেবী । কই ? হ্যাঁ, কি বলছো ?

মালা । বলছিলেন সুবি আবার কেন হাও নি একটা...

সেবী । আমি ? কেন প্রডাকশান ম্যানেজারের কাছে
যেতে পারছোনা ?

মালা । প্রডাকশান ম্যানেজার...

মলয় । [স্পটলাইট জেলে কি করছিলো] কাট কাট...
হু নবর বেসী ।

সেবী । বেসী ! মানে কি বলছো তুমি ?

মালা । উঃ শুনতেও পাও না । কাল্য হরে বাখনা
চলছো । হার ! হার !

সেবী । এখানেও গরনার বায়না ! জালালে দেখছি ।

আজ্ঞা তোমাকে নিয়ে এখন আমি কি করি বলতো ।

অজিত । [পার্শ্বক] মুকলিলের কি আছে ? মাথার
ছুটে। পেরেক ঠুকে আংটার সঙ্গে কুলিয়ে দে । দেই
টিক ঠাড়িয়ে থাকবে ।

মালা । [বেগমো কান্ডিককে দেখতে গের] কান্ডিক
—ও কান্ডিক না... [চলে যায়]

সেবী । তুলো বাবু হাত বিন ।

["অতুল আর মানব জোকে]

অতুল । আমি বলছি হবে...

মানব । কিন্তু তুমি বুঝতে পারছিল না । হবে বললে তো
আর হয় পা, এতুনি ঠেকে চারশো টাকা দিতে
হবে...

অতুল । চারশো কেন ? আর তো আড়াই খো—

মানব । মানিক আবার ! ধর তো বাথো না কিছু ।

টিকিট বিক্রি করেছি, একশো টাকা বেসী
দিতে হবে ।

অতুল । টিকিট বিক্রি করেছি পনেরটিকে ট্যাক্স

দিয়েছি । আবার ঠেকে একশো টাকা দিতে
হবে কেন ?

মানব । তোমার সঙ্গে ঠাড়িয়ে তর্ক করার মতো নয়
আমার মেই । মোট কথা পনেরটিকে ট্যাক্স দিলে
বিয়েটার গোল্পাশেকও দিতে হয় । পনেরটিকে
ধাক্কী দিয়ে কার্ড বিক্রি করলে এখেরও টাকা দিতে
হয় না । দেখিন তো বিয়েটারের মালিক বনবিহারী
বাবু স্পষ্ট আনিয়ে দিলেন । নাও, এখন যা পারো
করো...

তুলো । মাহাবনবিহারিনী পানটা কি এই সঙ্গে কালিয়ে
নেহো বেসী হা ?

সেবী । না পরে । সেকেন্ড অকোয়েলটাই দিপিট
ককন ।

অতুল । ও বনবিহারী নয়—মাহাবনবিহারী । কেবল
অর্ধছাড়া আর তর গ্রাণ বন স্পর্শ করা থাকে না ।
যতো সব কেছা ।

মানব । কেছা !

অতুল । কেছা নয় তো কি ? পকেটে টাকা নেই,
এখন একশো টাকার করমান । আমার যে এখন
পাছ । মাথার দিকটা টেনে দড়ি দিয়ে ভালো করে
পায়ের সঙ্গে বেঁধে রাখ । সেই কখন থেকে বলছি
[নিজেই বাঁধতে থাকে]

অতুল । আমার এখন আর আত্মহত্যা করা ছাড়া
উপাই নেই ।

মানব । ঠাড়াও, সেকেন্ডারী হারছো...

অতুল । সেকেন্ডারী হলোই যদি আত্মহত্যা করতে হয়
তবে আর বেসী বিন না --কিন্তু হিসের মধ্যেই
আমাদের মতো সংস্কারশীল সেকেন্ডারী খুঁজতে বেকার
দুখক হবে ।

মানব । নে, লেকচার বিনে ।

অতুল । বড়ো সাথে লেকচার আসে । বড়িটাও বিক্রি
করেছি ।

মানব । বড়ি বিক্রি করেছিল ?

অতুল । হ্যাঁ ।

মানব । তবে মাতে মাতে আমার হাতা সঠিক
. দেখছিল যে—

অতুল। তবে কাল বিক্রি করেছি, এখনো কজিতে বাণ।
এখনো নখান ভার অহতব করছি, তাই তুল হয়ে
বাচ্ছে বাব বাব...

বেবী। বাবুন বাবুন আগনি সেই তুল করলেন
তুলো বাবু—

তুলো। কেন, কেন?

বেবী। কেন আবার। বাব বাব বলছি প্রত্যন্তবাহু
বা দিলে আগনি তার উপরে কোমল পা বেবেন।
ট্রিক দিল করলেন।

পাহ। মাথায় বাতুলিটা হুঁয়ার কুঁকে যে না—

তুলো। বজ্ঞো তুল হয়ে গেছে। এবারে ট্রিক করে নিছি।
[বটু ঢোকে]

বটু। অলভব। এভাবে অশ্রয়যোগিতা করলে তো
কাজ করা চলে না। নতুন পার্টি দেখে এতের বেন
হরির দুই পক্ষে গেছে।

মানব। আবার কি?

বটু। নতুন নতুন ক্যাচাং বাব করছে। বলছে ট্রেক
ভাড়ার উপর আরো বেয়ার্লিস টাকা লাগবে।

অতুল। আরো বেয়ার্লিস টাকা? আমি নেই।

মানব। আঃ। অতুল! ধ্যানে বটু কেন?

বটু। সেট নিয়ে বিহাসপালের বরণ।

মানব। বটে? তা সেট না নিয়েই যদি বিহাসপাল
সেবা তবে তো পড়ের মাঠে নিয়েই দিতে পারি।
ট্রেক আসবো কেন?

বটু। আরো আছে। পেটে লোক তাবাস ওত
বেচার্লিস টাকা একটা। বাইকোকোন ব্যবহারের
করা চল্লিশ টাকা...

অতুল। ধন পনের টাকার তো বাজারে বাইকোকোন
পাতওয়া যায়।

বটু। বাহ। তবে বাইরের জিনিষ ট্রেকের দাঁতবার
করতে দেবে না। থাকলে শোনা, তাছাড়া লাইটে
কার্বন কম পড়তে পারে তার জন্যে বাতো টাকা।

অতুল। লাইট তো নিজেদের...

বটু। হলো। ততী রেওরাজ। তা ছাড়া প্রমটানের
উর্ট অলবে তিন টাকা বাতো আনার। এতো পেলো
অকিনিয়াল। তাছাড়া...

অতুল। আমি নেই নেই... [গ্রাহান
পাহ। (বহুকা দিয়ে বেধে) দুটো পুরিয়ে দিলি কেন?
বাটের দুটো? লোকা করে রাখ।

মানব। ওরে অতুল শোন। দুটার।

[বটু এবং মানবের গ্রাহান]
বেবী। তুলো বাবু, কী বাতা বাজাচ্ছেন? মোটেশনটা
মিলিয়ে নিম—নি সা পা মা পা নি দ্য। সা নি দ্য
পা মা পা পা মা পা রে পা। বেধে বাজান।

[অকপের প্রবেশ]

অকপ। ব্যাক ট্রেক বেডি। হলরবাহু লাইটনব ট্রিক?
বল। ডিমারে ব্যাডজাট করতে পারছি না।

অকপ। সে কি? কেন?

বল। তিনটের বেবী তো কানেকশনই পেয়ায না।
অবচ বড়ো ডিমারটা এনেছি...

অকপ। সে কি?

বল। ট্রেকের লাইট-ইনচার্জের হাতে কিছু পান বেতে
যেন নি বৃত্তি?

অকপ। মানে?

বল। আলোগুলো মাঝে মাঝে হপ হপ করে অলদে
আর নিতছে। দুবলাম লম্বা মিটিয়ে দেবার
আনঅকিনিয়াল ইচ্ছিত করছে।

অকপ। ছিঃ ছিঃ এ সমস্ত কি? কানেক বিবেলে

বল। অবশেষে কথা তাবুন অকপ বাবু। (টেটিয়ে
বরেন দ্য, তিন নবত হাতে এ্যাধার চড়িয়ে ফিন।

বরণ। (আবৃত্তি করতে করতে ঢোকে) মারামিনী
পিশাচিনী বাতুলীন এ লংসারে এসেছিল জুঁ
মার হুজবল ঘরে তক্ত পান লাতে।

অকপ। জোয়ার হিসের পাট বরণ?

বরণ। জুতা। আই বিন পুরিচারক।

অকপ। তাই হুজব করে গে বাত। - কারনিংয়ের পা
পরে বাতলে চলবে।

বরণ। ওঃ।

অকপ। খুব তাবনার কেলো।

(বিপরীত দিক দিয়ে চলে যায়)

বেবী। অদ্বিত একটু ইয়ে পাতওয়া বাবে?

অদ্বিত। না।

সেই। বল'ছিলাম ঢা—

অশ্বিত। না।

(সরোজ একটা মাপ হু'হাত সমান্তরাল করে বাইরে
খাচ্ছিল, প্রিয়তোষ বাত হয়ে ছুততে নিয়ে দাখ্য লাগে।

ওর মাপটা নড়ে যায়)

সরোজ। (চটে গিয়ে) কি ক'লি বলতো?

প্রিয়তোষ। কেন?

সরোজ। এতো কষ্ট করে মাপটা জান'ছিলাম, ঘিলে
নড়িয়ে। এখন আবার মেনে জানতে হবে।
হুতোয়।

প্রিয়তোষ। ওরে আমার কি আর মাথার ঝিক আছে?

সরোজ। কেন?

প্রিয়তোষ। খগেন আমার কী সর্বনাশ করেছে জানিস?

সরোজ। কি?

প্রিয়তোষ। কি করেনি বল? সাবায়াত জেপে
খিয়েটারেব জন্ত অমন হামী লেপাটা লিবলুখ, তার
কি দশা করেছে ভাব। (পত্রিকা দেখিয়ে) এক
কালি রক্তুর বড় এসে পড়েছে।

সরোজ। হুড়ে?

প্রিয়তোষ। বোঝ তাহলে, রক্তুর বেন বড়হুটো গুড়ে
টুড়ে এসেই হলো। ওটা হবে হয়ে এসে পড়েছে।
তারপর ত্রিমুঠিত বিক, তাকে লিখেছে নেপেটুত
বিক—

সরোজ। এঁ্যা?

প্রিয়তোষ। এ তো তবু ভালো। একটা কাবদার ছিলো
মাটা-আম্বোলনের ধারা, সেখানে লিখেছে
বেগুন ভাঙা।

সরোজ। কী?

প্রিয়তোষ। বোঝ তাহলে নাটা-আম্বোলনের ধারার
সঙ্গে ত বেগুনভাঙার মিল বার করলো কোথেকে?
ইস অমন হামী লেপাটা। পাঁচ করে বখান পড়বে
কি কেলেকারী বলতো? আমার এখন ঠাঁহতে
ইচ্ছে করছে। আমার এখন—

পাহু। মাথার ঝিকটা হাড়ুড়ি বিয়ে ঠোকা উচিত কখন
যেবে বলছি না?

প্রিয়তোষ। নরসেন। খগেনকে ধরতেই হবে।

(প্রিয়তোষ চলে যায়। সরোজ আবার মাপ নিয়ে
বেহিঁরে বাবে। মানব ও অতুল চোকে)

মানব। ভা বললে তো হবে না, বা হোক একটা ব্যবস্থা
করতেই হবে।

অতুল। মাত্র, যাতে বক বক করিস না।

মানব। আর তো সর্ম্ম নেই লোকজন আসতে শুব্ব
করেছে। এককান্দি টিকিট বিক্রি করেছে বাবে। একটা
পরশাতোরিগালাইস ঘবে নাউটে দানি ঠাটা, বেরাকু
বানানো। না না, বা হর তুই একটা কিছু কর।

অতুল। বেশ শৈল্পিক সম্পত্তি বসতে এই বসলেই বাবার
ব্লাডপ্রেসারটি গেয়েছি। চটে যাওয়া একদম বারণ।
আমাকে এই সিনকলের শিব্দে একটা বাকতে দে—

উঃ! নাটা-আম্বোলন—

মানব। তুই তাহলে কিছু পারবি না।

অতুল। না।

মানব। নরসেন।

অতুল। বেশ, মালামাল দিননে মাহু—এরই মধ্যে এ
মাসের পুরো মাইনেটাই গলে গেছে। এখন সাংমাসে
—বাকগে আমার আবার চটে যাওয়া বারণ।

(মানব অতুলের হাত থেকে কাইলটা নিয়ে নেয়।

অতুল নিখিয়ে বসে চুল আঁচড়ায়)

সেই। উত্তেজনার পিঠে অমন মিন মিন করে বাজালে
তো চলবে না জুলোবাহু। টেম্পো কোবার?
টেম্পো তুলুন—

অশ্বিত। (ওপর থেকে) সর সর মই কবে গেছে—

(মইটা প্রায় অতুলের বাড়ি পড়ে)

তুলো। (তাহম্মের গান) গুড় রে আছে বাণা ছাড়ায়ে
যেতে চার ছাড়াতে গেলে ব্যাধা বাধে।

মানব। এই টেম্পেই মালিকরা আখার কলাও করে বলে
আখরা নাটা আম্বোলন করছি—

পাহু। আর বলিস নি, এদের ভাবনা, এদের চিন্তা

(সরোজ চোকে। একটা হুঁড়ি খোর পরীক্ষা করতে
'দিয়ে হিঁড়ে বসে)

সরোজ। একেবারে পচা। হুতোয়।

মানব। আন্দর বাস্তব কেন যে ক্ষমতার অপব্যবহার
করে। ইচ্ছে করে।

। মেসখা বর্শম

মলয়। থাকবে, ইচ্ছেটা আর কোথো না। তবের
হাতে এখন।

কাতিক। (দিলে হাথ দিতে দিতে ঢোকে) এবটা
হাটির কলসী, একটা বহল। এখনো তিনটে জিনিষ
থাকি। কি যে করি।

(প্রস্থান। বিপরীত দিক দিয়ে বন্ধু ঢোকে)
বন্ধু।^১ অতুল কোথায়? এই যে। নাটক আরম্ভ হতে
হতো বেগী। অনেক লোক এসে গেছে।

মানব। নাটক বোধহয় আর আরম্ভ হবে না।

বন্ধু। যানে? ঢালাকী পেয়েছো। এতো দিনের
গ্রাম আর্থকা নাটক করবো... বুঝে রক্ত তুলে
বাটমুখ... লোকের হাতে পাবে হবে টিকিট পছন্দ,ন,
আর আশ্র বলাচো নাটক হবে না? হল ভাতি
আমার হকি পাড়ার পার্টি, শো বহু হল আমাকে
আজ রাগবে না কি?

সবাই। না না তা হয় না...
অতুল। (বাড়ের বাথার) না হয় না। হয় না তো
যাও না টাকার কোপাড় করো গে। যাও না,
মহানববিহারিনির বরবাদে... তা নয় এখানে
বেউলো বাড়ি নিয়ে লতারে আছে বাবা... উঃ!
(পেলে যায়) পাত কি? পাত কি তোমার চোখ
হুজিরে ডাওলিন ঢালাতে... উঃ!

সেবী। চিন্তাকত কোথো না অতুল, শো হবে। বাড়ি
সিকোয়েল।

মলয়। স্পট ল্যান্স... (আলোটা বেধীর হুগে চমকে ওঠে)
হামদি। নাঃ। কেথি একবার মেসখারের হতো।

(বেগিরে যায়। বন্ধু বিপরীত দিকে প্রস্থান করে।)
অতুল পাশ দিয়ে মিথগকে টানতে টানতে বহল ঢোকে)
বহল। বা বা মটোগোমারী ক্রিকট এর কাছে আর বাপ
বুলতে হবে না।

বিমল। চাইপা বা বহল। মাল'নি ব্রাজোর আট
বেথসে না নাহ খগেন হইগা হাইব পা।

বহল। বা না টুটিকে জিজ্ঞাস করিল।

বিমল। জুই কিলা গিয়া। পহের মুখে বালবাওনের
অভ্যাস তোর।

বহল। তা বুঝে যে বলাহিল, হয়ে থাক এক হাত।

বিমল। উটক।

(একটা টুল টেনে নিয়ে এসে পাঞ্জা
কাটকের প্রবেশ)

কাতিক। হাতথো হাথার পাঞ্জা। পাঞ্জা বরা শুচিয়ে
বেবো। হত সব বাতিকগ্রস্ত। আর কাঙে সমা
হামেলা বাদ্যল নে।

বিমল। ক্যান কি হইল।

কাতিক। আটিকে করছো তাই বরতোগে বাত। বাটবে
বাটতে আর কহল্য হতে গেল। টেং তো পাও ন
কতো খানে কতো গুটবেস। আশ্র বাতিকগ্রস্ত।

(টুলটা টেনে নিয়ে কাটিক কাট করে। বহল
একবার শ্রাশ করে তারপর বিমলের হাত ধরে টানে)
বহল। চল, ওহিকে বাওচা থাক।

বিমল। চল। আশ্র বাতিকগ্রস্ত। (হু'জনে হেঁ
বেগিরে যায়। বহলমালা ঢোকে)

বহলমালা। এই যে কাতিক না। কি পোষাক এনেছে
একটাও গায়ে কিট করছে না।

কাতিক। তা কি করবো বলো। 'হাতোনি' বে
অর্জয় দিয়ে তো পোষাক তৈরী হয় নি। তাহ
করা জিনিষ অমন একটু আদটু হয়েই থাকে
হানিরে শুধিরে নাও।

মালা। তা না হয় নিলাম। কিন্তু হালতীর পোষাক
যে একেবারে চল চল করছে।

কাতিক। তা কি করবো বলো। আশ্র বাতিকগ্রস্ত।
সরোষ। ভেতরের দিকে পনের আঠা পেঁটে দিলে না
হয় টান টান থাকবে।

মালা। কি যে করো তোমরা বৃদ্ধি।
(বেগিরে যেতে যাবে বেধীকাল ডাকে)

সেবী। বহলমালা, শোনো।

(হু'জনে একপাশে সরে গিয়ে কণ্ঠ বুলতে থাকে।
কাতিক বেগিরে যায়। অতুল চুকে পাত্তকে কি বলতে
যায় পাছ টেটিরে ওঠে)

পাহু। টাটিরে হাও বলতে তো আর হয় না। টাটো
কি করে।

অতুল। তেন বহলমালা?

পাহু। -জুই কি পাগল না হাকপ্যাট? একি বাড়ি

সেখাল পেয়েছিল। বড়ি টাঙালে সব স্তব্ব হিঁকৈ পড়ে
থাবে না?

(অরুণ আর পান্থ ভিতরে যায়। বিমল চুকে সরোজের
কাছে যায়)

বিমল। মালু কইনা ছিলো, বাকি সেটটাও এখনই তৈরী
কইনা রাখতে।

সরোজ। দিকটার ডেকে আনি।

বিমল। তাইলে আর ছইল না।

সরোজ। কেন?

বিমল। অসুস্থ করছে।

সরোজ। কার?

বিমল। হৃদয়ের।

মলয়। মানে?

বিমল। আলো একলগেই কটে। যখন লাগে তখন
অ্যানিভেরিকই লাগে। ওরা কালেকটর আর্ট
সইরা চর্চা করে কিনা। সবগুলি থিয়োরিটিক্যাল
পেনেট।

সরোজ। আরে টেক্কেং ভাড়া তো মিটির বেওয়া আছে।

বিমল। আরে বাপু টেক্কেং মালিক টাকা নিচ্ছে, সে
তোমার সেট বাটাই বো না। যারা বাটাইবো
তাদের হাতেও বেকিছু পড়া দরকার। মালিকের
কাছে মালিশ কইরা লাভ নাই। ভিতরে ভিতরে
আগারষ্ট্যাণ্ডিং আছে। আরে সেক্রেটারী...তুমি
এইখানে বইছা কি কর?

অরুণ। হুস্তোর...বা থাকে কপালে ..

(প্রবেশ। বিমল তাকে অস্বস্তি করে ফেঁদা
এতক্ষণ রহস্যমালকে কি বেন খোজাছিল, এবারে
হু'দনে এসিয়ে আসে)

ফেঁদা। তবে হাও।

মাল্য। কি বলছো তুমি?

ফেঁদা। আগতি কোরোবো। আগতি করলে শো হবে
না। এতগুলো লোকের আশা...

মাল্য। আমার এই দুক লিকলিকে হারটা দিয়ে
তোমার নাটকের কি হবে।

ফেঁদা। মাল্য। তোমারও হার নিয়ে দরতো নকে ওঠা
যার না, কিন্তু দেপাওয়া ওর হার অনেক।

মাল্য। হ্যাঁ না তুমি তো জানো, এইটুকু ছাড়া আর
কিছুই মেই আবার। নিজের বলতে এইটুকুও তুমি
রাখতে ধেবে না?

ফেঁদা। তোমার নিজের বলে কেন রাখবে মাল্য।

সংগঠনের এতগুলো ছেলের বেখানে দরকার হাও।

মাল্য। মেবে?

ফেঁদা। হ্যাঁ হাও।

(বহুমালা হার বুকে ধরে)

মাল্য। যেইম শর...

(আলোটা ওবের মুখে এসে পড়ে।)

মাল্য। কমিয়ে বিন। ডিম...ভিথ...

(অন্ধকারে ওরা ডেকে যায়)

মাল্য। পোনো...

ফেঁদা। আমার আর ডেকোনা মাল্য। আমাকে একটু
নির্জন বিশ্বস্তার থাকতে হাও।

(বেদাশার উপর হারটা রেখে ডিম ধরে বলে থাকে
ফেঁদা।) কাতিক ডাকে।

কাতিক। তোমার কড়োহার পেটিহার পেয়েছি বহুমালা।
এই হাও।

(হারটা বিয়ে চলে যায়। ওটা হাতে নিয়ে মাল্য ধীরে পায়ে
চলে যায় ভিতরের দিকে। পান্থ আর অরুণ ঢোকে।)

পান্থ। বেথলে তো হোলো না?

অরুণ। তা বলে? ওটা বে চাই।

পান্থ। তাই বলে তো সেখাল বড়ি বাটে ভইয়ে দিতে
পারি না।

মলয়। পান্থ। তোমার সেটের টেবিলে হুইচ লাগানো
হয়েছে?

পান্থ। হুইচ কেন?

মলয়। ওখানে আলো জ্বলে না?

পান্থ। পাপল না আনাটোরিয়াম। ওখানে মোমবাতি
থাকবে। মোমবাতির আবার হুইচ...

অজিত। হ্যাঁ। থাকবে আবার ক্যান্ডেলমে।

(টীনেম্যানের মেকআপে বহুদের প্রবেশ। পিছনে
বিমলকে দেখা যায়)

বহুদ। বেবুন তো অরুণ। আমার মেকআপটা ঠিক
হাচ্ছে কিনা।

অরুণ । তোমার কিশোর পাঠ-অরুণ ।
 অরুণ । কেন তুচ্ছ ? আই মিন লবিচোরক ।
 অরুণ । বলি বাথালী তো ।
 অরুণ । তা তো বটেই
 অরুণ । তা হলে চোনে মায়ের মেকআপ কেন ?
 অরুণ । বুঝলেই না, ওটা নিও রিয়ারলিঙ্ক ।
 অরুণ । তোমার মুহুর্ত । এক্ষুণি বুঝটা বুঝে মেন মেকআপ
 নিয়ে এসো । (প্রস্থান)
 (বিদল বীরে বীরে অরুণের কাছে এসিয়ে আসে)
 বিদল । বাংলা দেশ তোর ট্যালেন্টের ঘর বুকল না কোন
 ক রেবি ?
 অরুণ । চুপ কর, যা বুঝিল না তা নিয়ে ক্যাচ ক্যাচ
 করিস না । আরে ঐ তো প্রিরতোষ আগছে ।
 শোকাটা ইউলেক্কুয়াল । ওকেই জিজ্ঞেস করা যাক ।
 (প্রিরতোষ ঢোকে)
 অরুণ । এই যে প্রিরতোষবাবু, বাংলাদেশের হেলে অথচ
 চোনেমায়ের মেকআপ । এর মধ্যে একটা ইলুম্ এর
 গন্ধ পাচ্ছো না ?
 প্রির । পান্জি ।
 অরুণ । কি যে মিলে বেবলি ? কি মনে হচ্ছে নিও
 রিয়ারলিঙ্ক ?
 প্রির । না ।
 অরুণ । তবে একমিগট্যান রিয়ারলিঙ্ক ?
 প্রির । না
 অরুণ । তবে একসুপ্রে-মিডম ?
 প্রির । না ।
 অরুণ । তবে যোব ঘর এমকোপিলক ?
 প্রির । না ।
 অরুণ । তাও না ? তবে ?
 প্রির । ওটা ডিকারমিডম্ । (প্রস্থান)
 (সকলে হো হো করে হেসে ওঠে)
 হাবিল যতো সব হামবাপ । (দ্রুত প্রস্থান
 জীংকার করতে করতে বট্টু ঢোকে ।)
 বট্টু । ইউরেকা ! ইউরেকা !
 সকলে । কি বসো ?
 বট্টু । বাবা ।

সকলে । বাবা ?
 বট্টু । মাহুত মানা । আঘা বাবা তো নর যে
 ইমপারশিয়াল ড্যানিডাল ।
 পাহু । কি হলে বলবিতো ইতিহেট ?
 বট্টু । মাহুত বাবা এসেছিলো বিয়েটার রেখে
 আরে সেই যে ইনকাম ট্যাক্স অফিসার । বাপা
 ট্যাপার জনে তিনি খেলেন দিহাতীর লরবারে
 মিনিট পাচেত কি ওত ওত করে কণাখাতী বললে
 খাল মাহাবন দিহাতী বিপণিত বহনে কাটা
 দিহাতী হয়ে বেহিয়ে এসেন । সব প্রবলেদ লদু
 (সকলে হৈ হৈ করে ওঠে । বট্টু দ্রুত প্রস্থান)
 বেকী । ও দিকে কান বেধেন না তুলোবাবু । বোয়ানি
 দিনের বাজনা । নাদেল থাকান । বেতি-
 (অতুলের প্রবেশ)
 অতুল । মাহ কোমার ?
 (বিপন্নীত দিক দিয়ে মানব ঢোকে)
 মানব । বট্টু কোথার গেল ?
 অতুল । ওকে তো আমিও বুঝি ।
 মানা । কেন ?
 অতুল । ওর কাছে পুলিশ পারমিশনের ফাইলটা রয়েছে
 ধামা । কি পারমিশন ? পুলিশ ? কেন ?
 অতুল । আরে বাবা, নাটক সেলার করানো হয়েছে ন
 মানা । কি ? পুলিশ নাটক সেলার করবে ? কেন ? ও
 কি নাটকের অব্যারিট নাকি ?
 অতুল । ওবেদ অবজ তাই বাবেগা ।
 মানব । মা যানে আমাধের এটা তো কোনো পলিটিক
 অরগানাইজেশন নর ?
 অতুল । তা না বোক । এটি ব্রিটিশ প্রভুদের অবলা
 ১৮৫৭ সাল থেকে চলছে ।
 মানব । আমতা বহি সেলার না করাই
 অতুল । তা হলে অভিনয় করতে দেওয়া হবে ন
 অবজ কোনো রকমে একটু ছেলে বেস্তলেই সব কে
 কেটে যায় ।
 মানব । বাঃ চমৎকার ।
 অতুল । চেপে যা মাহু । হুবালা গহুমতীর খে
 এক্ষণে আইনের কোর আমেক ।

(ঠেক মানেম্বাধের স'বে কথা বলতে বলতে বটু'র
প্রবেশ)

বটু'। হাম হাম মগাই, অত রে'হান মেধেন না।
বাগ দলিগাচার ছেলে আ'হা, খাতিয়া'না অস্তরকম।
চোখ বুজে ভিতর দিয়ে চলে যাবো, দুপাশে দুখানা
পাল স্তাটাস্টাট পড়ে যাবে।

ম্যানেজার। অত গমন হচ্ছে কেন ?

মানব। কি হয়েছে ?

ম্যানেজার। আরে মগাই, পুলিশ পারমিশ্যনটা চেয়েছে
চাকি, তা গুল্লোলোক সেই থেকে টকাই টকাই
ক'য়েছেন।

অতুল। আহ! নাথার কি আর টিক আছে। চপুন
ওখিকে চলুন, বেখাছি।

(বটু'র হাত থেকে কাইলটা নিয়ে নেয়)

ম্যানেজার। হ্যা! খাছি। কর্পোরেশনের ট্যাক্স দিয়েছেন ?

মানব। কিনেই ট্যাক্স ?

অতুল। কর্পোরেশনের।

মানব। ওঃ।

ম্যানেজার। ক্যামেরার পরমিশ্যন।

অতুল। তাও হয়েছে। নিব।

ম্যানেজার। বাস মিটে গেল বাদেলা। এর অস্ত্রে এক
চোখ বাস্তাভি কেন ?

(অতুল ম্যানেজার চলে যায়)

কুলো। (গান) পাপল হইয়া বন্ধু পাপল বানাইলে...

মানব। আমি পাপল হয়ে যাব। (প্রস্থান। বটু'ও
কাছে যাত হয়ে যায়। এখন সময় কাল আবে
ফ্রত লয়ে চল... থাকে)

লরোম। চট করে হাতে হাতে কিছুই কিনা লরোম
সান্তিয়ে কেল।

(সকলে হাতে হাতে কিনিব পর সেটের যাবো নিয়ে
যায়। অল ঢেকে)

অতুল। রেডি ? কাউন্স কোয়ার গেল ?

(কাউন্সের প্রবেশ)

এই যে কাস্তিক সব রেডি ?

কাস্তিক। প্রায়।

অতুল। আবার প্রায় কেন ?

কাস্তিক। হয়ে গেছে। একবার শুধু মিলিয়ে নেওয়া।

অতুল। টিক আছে দেখে নাও। আমি কার্ট'বেলটা

দিয়ে তলি ?

(প্রস্থান)

কাস্তিক। এই ভাড়াভাড়ি...

(তাইনে বায়ে ছুটেতে থাকে। বেশ বেগে ওঠে।

অভিনেতা'না মিছেদের আরপার বাড়িয়ে যায়।

একজন একটা মাইক্রোফোন ফিট করে রেখে।

সিকটার বিড়ি টানে। প্রবটা'র বই নিয়ে বাড়িয়ে

যায়। অল এসে দর্শকের দিকে পিছনে ঘিরে

বাটকের সামনে দাঁড়ায়)

অতুল। এখানে আমাদের নাট্যস্থান শুরু হচ্ছে।

অতুলের পূর্বাংগে আমি আমার অসমিত

কৃত্যপ্ৰশাটিকে, ধাঁচা অকুঠ উৎসাহ এবং সহ-

যোগিতার আদ্যের কৃতজ্ঞতাপাশে বেঁধেছেন তাঁদের

কৃতজ্ঞ জানাচ্ছি। এই বিশেষত্বের মালিক এবং

কণ্ঠস্বর আদ্যের অনেক অনুবিৎ হুৎ করেছেন,

তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। অকুঠান শুরু হচ্ছে। এর

কণ্ঠস্বর বিচার করবেন আপনারা। সুধী জনেরা।

মহাশয়। ইয়েল রেডি ? বেবী টাট'। কার্ট'ম

ওপেনিং। কি হলো ? আঃ কি মূলিল পদা উঠে

যাচ্ছে যে ? মিউজিক...

(বেবীলাস ঘোর করে বেহালায় হুড়ি টানে। তা থেকে

আর্জনাংয়ের মতো শব্দ বেরায়)

অতুল। এ কী, হিঃ হিঃ...ত কি মিউজিক মেয়ে ছেলের

কায়ার মতো শোনাচ্ছে ?

বেবী। অল।

অতুল। কি !

বেবী। বেহালা'র তারে কি যেন ঝড়িয়ে গেছে। কাল

আটকে গেছে।

অতুল। কাল ?

বেবী। হ্যাঁ। এই বেশ। গোনার দিকে যাওয়া কি

রকম পাকে পাকে ঝড়িয়ে ধরেছে...ইল...এ কী

হোলো ? ধাঁড়ও ধাঁড়ও অল আমি খুলে দিচ্ছি...

এছবি খুলে দিচ্ছি।

(বলয়ের অসামান্যতার স্পষ্টা বুঝে বেবী হাসের বুঝে

পড়ে। ফ্রত পদা' নেমে আসে)

প্রায় পনের কুট গিচে

যেহে একটি মাচাদের উপর
বসে পড়ে রহেন। হাতের
মোমবাতিটা মাচাদের এক
কোনে পাখরের গায়ে যেদান
দিয়ে রেখে দেয়। পকেট
থেকে একটি বিড়ি বের
করে নিয়ে মোমবাতির
আগুন হাতিয়ে দেন সে।
তারপর একটু শিখরে সরে



গিয়ে পাখরের গায়ে যেদান দিয়ে বসে। তার নিজের
‘শিকড়ের’ কুলিয়া নিজে নামাচ্ছে। বিড়ি টানার কঁকে কঁকে
সেই দিকে চেয়ে দেখে সে। ধীর পরক্কেপে এক এক করে
কুলিয়া সেই অছকার ভূগভের স্বপ্ন পথ আর কাঠের
দরু শিঁড়ি দিয়ে নিজে বসে যাচ্ছে। তাদের সেই
কংকালদার সেহমুলোর দিকে চেয়ে নিউরে উঠে রহেন।
এই ধর কপিকার দ্বন্দ্ব সোকগুলোই হাতির নিঃশ্বাস
নিঃসৃততা গুণ্য করে কবচাকণ্য জাগিয়ে জ্বলবে।
বিশ্ববিশ্ব হস্তের বিনিময়ে চকলতা হেপে উঠলে
ভূগভের সেই অছকার আর প্রাণহীন পাখরের বৃকে।
এই কপ দ্বন্দ্ব সোকগুলোই তাদের হাঙ্গামীন হাত
বের হয়ে বাওয়া দরু শিকলিকে হাত দিয়ে ধরবে যেদিন,
হাঙ্গামে ধান পাখরের বৃকে ভাঙবে পাখর। জিনাবাইট
কাটাতে, মাল তুলবে।

বিড়িতে ধূর ছোয়ে একটা টান দিয়ে বিড়িটা ছুড়ে
কেলে দেয় সে। পকেট থেকে কুলালে অছানো বিড়িটা
বের করে নিয়ে সমুদা চেপে বের হবেন। যাচ্ছে হটা।
প্রথম পালির কুলিয়া এখনও উপরে উঠছে না কেন?
নিজের হসেই প্রশ্ন করে রহেন। প্যাণ্ডের পকেট থেকে
একটি বোয়ায় কুলাল বের করে নিয়ে মাথার বাঁধে।

তারপর সে উঠে দাঁড়ায়। হটাং নিচ থেকে একটি
জিনাবাইটের শব্দ ভেসে আসে। পাখরে জাপে দ্বন্দ্ব
কন্দন। পালা দড় দর—বিড়ি বিড়ি করে বলে উঠে
রহেন। এই কটা হুতোয় হুতোয়—পালায় আর দর
শেল না হুটু করায়। আবার সে বলে পড়ে। আবার

একটি বিড়ি ধরায়। ত
পালির কুলিয়া দর নি
চলে গেছে। দ্বন্দ্ব বাঁ
আছে কখন যেহে কুলি
উপর দিকে তাকিয়ে কি সে
দেখতে চেষ্টা করে সে
দ্বন্দ্ব কপ আসার যে
হাটা কিছুই দরহে পড়ে।
তার। আর দ্বন্দ্বতে প
দ্বন্দ্ব কন্ঠের কথা। নি

কুলিয়ার হে-হুয়া পোনো যাচ্ছে।

রহেন আর বেশী কিছু ভাববার সময় পায় না। নি
থেকে কুলিয়া এসে পড়ে। উপর থেকেও যেহে কুলি
এসে পড়ে। সংকীর্ণ পথ। সেই অপ্রস্তুত হাটার বা
দ্বন্দ্ব ভরকেরই গতিটা একটু স্থিতি হয়ে আসে। ত
পরেই লাফিয়ে লাফিয়ে কুলিয়া চকতে থাকে উপরে
কতি বোয়ান কুলি বেয়েদের গায়ে একটু হেপে দিয়ে
হুত পায়ে শিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে চড়ে যায়। থেকে
দ্বন্দ্ব ঘুরিয়ে আর ওদের দেখতে পায় না। রহেন দৃষ্টি
ঘুরিয়ে নিয়ে নিজের কাছে দাঁড়ানো দৃতিদলি কো
কুলির দিকে নিবড় করে। প্রথম পালির কিছু সংখ্য
কুলি হাটার একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। শাস-প্রশ্নাতে
তালে তাদের বৃকের হাঙ্গামুলো লপট হে কলে কলে
উঠে।

প্রথম পালির পালিবাবু এসে পড়ে। রহেনের কয়
এসে দাঁড়ায়। মাত দন্দর আর হ কন্দে হুটোয় নি
কন্ঠার আছে জানিয়ে দেয়। বেহেহুলিয়া নিজে বো
যাচ্ছে। তাদের কথা আর যৌন-গর্ভিত হাসি’ শ
ভেসে আসছে। রহেন উঠে দাঁড়ায়। -দৃশ্যিৎ নি
যেহে হটাং তার বসে পড়ে ক বোয়া মাল হহেহে ও
জিজ্ঞেস করা হয়নি। হটাং সে তেঁঁচিয়ে বলে উঠে
কবোয়া মাল হহেহে। উত্তরে কপ একটা শব্দ ভে
আসে—খাট।

মাত দন্দরের হেটু শাইকের প্রাণবো ‘দ্যাগা’
টিকেই কথা হহেহে পালিবাবুর বদলার জাল্যা

উপরওয়ালা কড়াক অনুমোদিত বলেই এ সংবাদটা বাবু ও জুলিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এদিকটার কাজ বন্ধ। সুতরাং এদিকটার কেও বড় একটা আসে না। সেই মাসাশিমনটাও কয়েকটা বোরা পেতে নেওয়া হয়েছে খবর বিদ্যোদনের পক্ষে স্থানটা ভাল। রমেশ হাত নম্বরের খতের দিকে যেতে যেতে একবার হাঁক দিয়ে ঘর পুতুল সিংকে। পুতুল সিং তার প্লাই। প্রায়দরই রমেশের কাছে বলে থাকে। মাকে মাকে জুলিদের কানের কাহসার হানা দেয়। কাজ মেখে এসে রিপোর্ট দেয় রমেশকে।

মাসাশিমনের দরজার এসে এক লাগি মারে রমেশ। দরজাটা কবিরে উঠে পশ্বে খুলে যায়। মোমবাতির কলি আলোকে ঘরের ভেতরটা একবার ঘেমে নেয় সে। পুতুল সিং এসে ভাক জের—বাবু। রমেশ শিখন কিরে দেখে নেয় সেই কিশোরটিকে। বোরা সব উঠাকে আচ্ছাদে কাড়কে বিছাও। হাম আতা হ্যায় ঘুমকে— বলে রমেশ চলে যায়।

প্রায় একঘণ্টা পর রমেশ কিরে আসে। সঙ্গে আসে জালির স্রাউন্ডর বেটকা মাঝ। ভলে ভেজা কালডের জুতোবোড়া খুলে ফেলে বোরার উপর বলে পড়ে রমেশ। মাথাব বঁধা গুঁহালটা টান মেয়ে খুলে ফেলে। তারপর পকেট থেকে মোট বইখানা বের করে নিয়ে জিনামাইট আর সোলার স্লিপ দেয়। বেটকা মাঝ কাসকের টুকরোটা ভাঙ করে মোংগা কড়ার পকেটে রেখে দেয়। কিন্তু সে উঁচুর নামটিও করে না। রমেশ বুকতে পারে সে কি বগতে গায় কিন্তু শৌকর বলে ওঠে সে,—কলিখ বাও, বৈঠে রতা হারি রাইয়ে। ঘর থেকেও বিনীত কণ্ঠে বলে উঠে বেটকা—বাবু।

আঁচি ফ্রোড সেও সব বাত। পিছে বোলোনা হায়। জলদি আরগা অরকা! গুণ বোরা বাল কনা গাছি, বোহিতো হ্যাঁজির মেধি দেগা কিসিকো। বলে পকেট থেকে দুটি বিড়ি বের করে একটি বেটকার দিকে হুঁড়ে বের অন্যটি নিজে গরিয়ে টানতে থাকে। বেটকা মোমবাতিটা ধরিয়ে নিয়ে উঠে পাঁড়ায়। তারপর আতে আতে বেরিয়ে ঘর সেলান থেকে।

রমেশ পাথরের মারে হেলান দিয়ে আবেশোতা অবস্থায় বিড়ি টানতে থাকে। পুতুল সিং রমেশের পাথের কাছে বলে পড়ে রমেশের একখানা পা বিশ্লেষ কোলে তুলে নিয়ে টিপতে থাকে। রমেশ বিড়িতে খুব জোরে একধর দিয়ে বিড়িটা হুঁড়ে বের বাইরে। চোখদুটো আগ্রাসে বুকে আসছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাকে মাকে চোখদুটো মেলে ধরছে বাইরের দিকে। কেও আসছে কিনা? আজকে মনটা তার এনিভেই ব্যারাস। বেশ থেকে চিঠি এসেছে স্ত্রীর। দীর্ঘদিন অর্ধশবির বেহবার বেমনাহত এক দুঃখী নারীর পজ শেরেছে সে। সে কথা মনে করে মনটা একবার বিশ্লেষিত হয়ে উঠে। চিঠির কথাগুলো স্পষ্ট মনে পড়ে—

দীর্ঘদিন তোমাকে কাছে না পাওয়ার জন্য আহত। মাকে মাকে মনের মধ্যে কামনার প্রবল ঝঞ্জে দরত ওলট-পালট করে দিয়ে যায়। সত্য করতে পারি না। অসমর্থ হয়ে উঠে। প্রভাতের নতুন দিনের শব্দতে নতুন দুঃখের আলোকে এই কথাই মনে হয়। রমতো তোমার আকর্ষক আবির্ভাবে আমার বৈচিত্র্যহীনতার ভগ্না খিনগুলো বৈচিত্র্যের হয়ে উঠবে। প্রভাতের আশা নতুন করে বৃত্তবাহ্য সবই নিশ্চল হয়ে যায় স্রাউন্ডর পলাপসে।

.....খুব দুঃখি হচ্ছে। চারিদিকে জল। স্রাউন্ডর পজকারে দুঃখির হৃদয়র পথ জরদকে আলোকিত করে তুলে। নিঃসঙ্গ একাকীতের দুঃসহ বেহবার জন্য ভায়াভার হয়ে উঠে।

রমেশ চিন্তা করতে থাকে কতদিন আগে তার মনে মেঘা হয়েছিল। দুঃখর, মা প্রায় ভিন. কহর হয়ে। গিরিভিতে এসেছিল। সেই সব পনরটি দিন সে তার কাছে ছিল। সে কাছে থাকলে প্রায় চার বছর পর। কলকাতা, পাটনা, হরপ্রসেনের হু. তিনটি স্থান, তারপর গিরিভি। ঘিরের পর চারটি বছর জীবিকার ভাঙ্কার এখানে সেখানে চলেছিল পরিক্রমা। দীর্ঘদিন নানা স্রহ আর আদ্যাকর দুঃর স্রাউন্ডর চলে এসে গিরিভি। বাবাবর দুঃখকে ইতি করে দিয়ে এখানেই হলো স্থিতি। অজ্ঞানির চাকুরি নিয়ে চলে এসেছে এখানে। আজ তিন বছর হতে চল। কিন্তু একাঙ্কেও

মন বলে না। ভবিষ্যত উদ্ভাস নয়। তাছাড়া আরে
 দুঃখোন্মত্ত ব্যাপ্তির প্রভু সন্তানরা। বনিত ভেতরে
 বলে থেকে পাথরের নিহি পুঁজা আর জিনিসটির
 হয়ে কলিঙ্গা কালো হয়ে যাচ্ছে। হীরাবিন এই
 আলোবাড়ান হীন ভূগর্ভের অন্ধকারে বলে এইভাবে
 বাজ চলালে টি. বি. অবিসার্য। বানের বিশ্ব বিশ্ব
 রক্ত দিয়ে কোম্পানীর হৌলন্ব স্বাক্ষরে পড়ছে। তারা
 প্রায় সবাই এমনি করে দুঃখোন্মত্ত ব্যাপ্তি নিয়ে যারা
 যাচ্ছে। নিরীহ বিশ্ববন্ধুরের হিগাব কে রাখে। পুঁজু
 বান্ধুরের হিগাব নিজেই সেবা ছাড়া প্রায় পক্ষাঘাতন বান্দু
 এই কলিঙ্গ ব্যাপ্তিতে তারা গেছে। তাদের দরাস
 বিস্মোমে তাদের স্মৃতি পুঁজু গৃহহীন অরহীন। এ সব
 চিন্তা করে রমেশের মনটা হয়ে যায়। এই চিন্তা পুঁজু
 আত্ম নয়। অনেক অনেকদিন সে করেছে। এবং
 নিজেদের মধ্যেও আলস্য আলোচনা করেছে। কিন্তু
 সাময়িকভাবে নিজেকে স্মৃতি-পুঁজু মানবাবরণ জন্য একটা
 অনাগত হৃদয়িতা মনটাকে ধমিয়ে দেয়। তারপর সেই
 গভীরদর্শনিক ভীষন ব্যাকার স্রোতে না জ্ঞানিয়ে দিতে
 বাধ্য হয়। উপায় নেই। ভাগ্যের সোহাই দিয়ে কিছুটা
 সাতত্যা লাভ করে ক্ষয়কে ভবিষ্যত অশুভচিন্তা হতে
 নিবৃত্ত করা হাফা আর কিছুই করার নাই।

প্রাকৃতিক নিয়মে দিন কাটছিল সেই গভীরদর্শনিক
 ভাবেই। প্রায় তিন বছর কাটিয়ে গিয়েছে। এবার এক
 নতুন চিন্তা তার জগৎকে ভাষাকাত্ত করে তুলেছে। সে
 তার স্মৃতি চিন্তা। স্মৃতির প্রতি স্মারীর যে কর্তব্য সেই
 ঐতিহ্যবাহী মত হতে সে কিছুতে হতে চলেছে।

এখানে একটা কোম্পানীর পেন্সেও সে তার স্মৃতি
 দিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু কোম্পানী তা মেনে না।
 ক্যাম্পাস থাকলে বা কি কোম্পানীর কাছের কতি হয়।
 তাই কি না অন্য কিছু।

রমেশ কার্যটি হুঁত উঠতে পারে না। তবুও তার
 বলে হয়, তা হলে এরকম চাকুরী করে লাভ কি। সমস্ত
 মনটা বিধিয়ে উঠে। একটা বিশুদ্ধ প্রভু সন্তানদের
 ছেলেও ওঠে। একটা বাঁকুনী দিয়ে উঠে বলে রমেশ।
 পাশা নিবু বাড়া ছাড়া। কথাটা পুনরুৎপাদন বলে।
 পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে নিয়ে ধরায়। বিড়িটা

বের করে সবটা দেখে নেয়। হুঁত বাড়া।

সেটকা ব্যাকার কালো গোলদাল মনটা ব্যাপ্তি
 দরজার উপকি দেয়। রমেশ চোঁচিয়ে নিজের করে
 কোন ছায়।

হাম ছাড়া—নিজের গলায় কথাটা বলে ব্যাপ্তি
 ভেতরে ঢুকে পড়ে বৈটকা। কালো গোলদাল মনটা
 থাকে দুশাটি বকবকে দাড়া গাঁত উপকি দিয়ে লুকিয়ে
 পড়ে। হাতের বলত বোমবাতিটা হুঁ দিয়ে নিভিয়ে
 দিয়ে এক কোনে বলে পড়ে সে। তারপর কোনও খেতে
 একটা শালপাতা বের করে নিয়ে একটা লম্বা আকারে
 বিড়ি তৈরি করে নিয়ে ধরায়। তারপর একগাল হুঁত
 ছেড়ে দিয়ে বলে—কণ নন্দর পাক্ষি যে গোলা উড়া মি
 চার বোরা মাল হুঁ। সাত নন্দরমে খাট ধারনে গিয়া

রমেশ কোন উত্তর দেয় না। চোপ বুকে বিড়ি
 একটা হীরা টান দেয়। তারপর নাকমুখে দিয়ে দগদগ
 করে সমস্ত দুশাটুকু ছেড়ে দিয়ে পুঁজুকে বলে, যা
 আত্ম। পুঁজু তার নিজের নিজস্ব বোমবাতি
 টুকরোটা ধরিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যায়। একটু পরেই না
 নন্দরের বিস্ফোরণ শ্রুত হয়। সমস্ত পাহাড়ে ত
 প্রতিধ্বনি দেয়া দেয়। এখানে সেখানে পাথরের টুক
 বলে পড়ে। ব্যাপ্তিভিনের বোমবাতির আলোটা এ
 ক্ষণের তাপে তাপে কাঁপতে থাকে।

পুঁজু লিঃ আবার কিয়ে আসে। তার বোনবা
 নিতে গেছে। ব্যাতি ধরিয়ে আবার সে বেরিয়ে যায়।

অনেকক্ষণ রমেশ ও বৈটকা দু'জনেই চুপচাপ থাকে
 তারপর এক সময় রমেশ প্রায় করে—লক্ষ্যে গোলা বা
 নন্দর মে। বৈটকা ব্যাতি নেড়ে সন্দ্বাতি জায়ায়। আর
 কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। বৈটকা নিতে বা ওয়া বিড়ি
 ধরিয়ে দিয়ে টান। তারপর বলে—হাম, হো বোলা
 হুঁ। তু হ্যানেজর বাবুকে বললে সে হো গামগু।

হো বোলা হুঁ হ্যার ইহনে তৌ হু গাঁহ বানা।
 দেহি হোজা হ্যার। কাপজা হ্যার...

রমেশ বৈটকার কথা শেব না হতেই বলে, আত্ম এ
 বলে-বৈটি হো আদমি কামদর দালা হ্যার।

হ্যানে, নেই মিলতা হ্যার কি করেনা। বৈট
 অন্ধকারে বলে। আত্ম, হাম, হ্যানেজর বাবুকে

হলেন। সেক্ষেত্রে উল্লের কম হবার। কোম্পানিকো
হান দর এইসাই চল্‌তা হ'য়'ত তব কাহে বেকার কাকুল
দুপেরা সেকে সর্দার রাধে গা ।

বেটকা কিছুক্ষণ চাপচাপ থাকে । তারপর উঠে
গিড়ায় । যাওয়ার দর বলে থাকে—তু' কুর্শিস করবে সে
হা থাকসা । হঠাৎ রমেশ ছেকে উঠে বোটকা মাঝিকে ।
বেটকা মাঝি ৭২'কে পাঁড়িয়ে বলে—কাহে বাবু ।

রমেশ হাতের নিভে যাওয়া বিড়িটা মোমবাতির
দীপ্তিতে বরিয়ে নিয়ে একটান দিবে বলে, দশ বাতবেবে
হাওর দেরি বেরি হ'য়'ত । হ' নন্দবেরে রোজ
দাক্ক' ওয়ার বাবসা একদকে । মাটি দাক্ক' হ'য়'ত কি
নই দেখে লেবসা । দমকা । আঙুর শোন, তারপর গলটা
গট করে বলে, তোরা লেডাকিকো একদকে ভেব
দরসা । দমকা ।

কথাটা শুনবে বোটকার কালো নুঁচটা আরো কালো
ঃ গম্ভীর হয়ে যায় । অশ্রুট ভাবে একটা শব্দ করে
লে যায় সে । একটু নুঁচ গিয়ে তিন চারটি অঙ্গুলি
গালি হুঁড়ে মারে রমেশের উদ্দেশ্যে ।

প্রায় পনের মিনিট পর কিরে আসে বোটকা তার
নুঁচী কন্যাকে সংসে নিয়ে । ব্যাগাঝিনের দরোজার

দামনে পাঁড়িয়ে রমেশকে ডাক দেয়—বাবু ।

রাত্রির গভীরতার সূচ্যোগে একটু তন্দ্রা এসেছিল
রমেশের । বোটকার ডাকে চমকে উঠে রমেশ । তারপর
বাইরের দণ্ডাবনান কালো নিটোল শ্বাস্যবতী মেয়েটির
দিকে তাকিয়ে দর কথা মনে পড়ে । গলটা পরিষ্কার
করে নিয়ে বলে সে—ইবার আও । কালো মেয়েটির
বাথটি একটু দামনের দিকে নুঁচিয়ে পড়ে । সরল
হাত দুটো দিয়ে ব্যাগাঝিনের দরজাটা ঝিকড়ে ধরে ।
বেটকা আপন ভাব্য কি মনে বলে ডাকে ।

আবা মরলা দামা কালকে জড়ানো কালো নুঁচিটা
এক পা ব্যাগাঝিনের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয় । রমেশ ওঠে
মেয়ের হাত খানা চেপে ধরে । তারপর বোটকার উদ্দেশ্যে
ছুড়ে মারে নুঁচি কথা । দেই বেটে কালো নুঁচিটা
চলে যায় । রমেশ দেই উত্তরদৈন্য কালো মেয়েটিকে
হাত ধরে বসিয়ে দেয় । তারপর ব্যাগাঝিনের দরজাটা
পা দিয়ে বন্ধ করে দেয় । ব্যাগাঝিনের সপ্ন আলোকে
মেয়েটির নত নুঁচের দিকে চেয়ে থাকে রমেশ । তারপর
হাত দুটো বাড়িয়ে দেয় তার দিকে । ঠিক সেই সময়ে
প্রচণ্ড শব্দে হ' নন্দবেরে বিস্ফোরণ সূচ্যু হয় ।
ব্যাগাঝিনের মোমবাতি আপনা থেকে নিভে যায় ।



পরের দিন দুপুর।

কিছুক্ষণ তখনও সুব-
নিদ্রায় মগ্ন। এসরামি
ওপরের ঘরে আরোখার
কাছে গেল। যেখানে,
শব্দে সুখানা তার সজ্জিতে
রান,—কীভাবে যেন তার
আর সুখা মেই একটুও,—

এমনি একটা তার তাকে যেন আরও হুগিত, আরও
স্বস্তি কহেছিল।

ওটো ভুলে নিয়ে এসরামি লিখলে,—“মনে রান
পূর্বে রানলে, অন্তরাত্মের অন্তর্ভুক্তি হয়। আমার আমি
তোমার, আবেগের মতন বিশ্বাস করব। আল, আমার
তোমার আমি বলছি, আমার কথাই বাধ্য থেকে।
এই বিশ্বাসের মধ্যস্থতা হোক তুমি!—খালি, আমার
কথাই তুমি আমার হোক না, মাত্র এইটুকুই আমি তোমার
কাছে চাই। কীভাবে তার, তোমার সুখ থেকে সবার
খালি আমার!”

ওটোই লেখাটা পড়ে বড়ি অবস্থায় তবু এসরামি
বিক ক্যাল ক্যাল করে চেয়ে বসিল; আর টিক তখনই,
এসরামি তার দুইটি লম্বা নিকের পলকহীন দুইটি মেলাল।
এক মিনিট...হু...মিনিট...তার পর ওটো নিয়ে এসরামি
আবার লিখলে,—“কথা কও। এখন তোমার সুখ কথায়
হুটবে আমার।”

লেখাটা পড়ে, গভীর আবেগ তবু, এসরামি
দুটো হাত বাড়িয়ে নিয়ে, আরোখা বললে,—“প্রভু!—
আমার কথা কর, কথা কর। তোমার শক্তি বড়
জ্ঞানক! তববানের সেওয়া তোমার এ অসীম শক্তির
বিস্তৃত, আমার মতন কৃত পোক্ত-মাকড়ের বিস্তার
করা সাজে না।...তুমিও কিছু কুলে না, যে কেবল জান
নিয়ই সুখা হতে পারে না কেউ;—জান থেকে মানুষ
বহু বেনী করেই হুগ-কট পার। তোমার শক্তি কববার
অন্তেই, আমি এ বিস্তার করেছিলুম। মনে করেছিলুম,
তোমার প্রাণে প্রেমের টেটো কুলে বিতে পারলেই, তুমি
শক্তিকারের সুখ পাবে।...কিন্তু, যেরে দেখি...আমার

সোল অর লিলিথ মেরী করেলী

অনুবাদক—হরপ্রসাদ বসোপাধ্যায়

তুমি শুঁড়িয়ে নিয়ে!।
আমার সে অতি-আগ্রহ
করা কর গ্রহ!—আর
আমি তোমার অমারা হব
না, একথা আমার আমি
তববানের নাম নিয়ে পণ
করছি।—বলে সে উপুড়
হয়ে এসরামির পায়ে ওপয়

তার পাকা চুল তবু মাথাটা রাখতে গেল।

এসরামি তাকে হু হাতে ঘরে উঠিয়ে নিয়ে ওটো নিয়ে
আবার লিখলে,—“এতে কথা চাইবার কিছু নেই, বাধ্য
হয়ে না তার মতে। তোমার বহুত আমার চেয়ে
অনেক বেশী, কাজেই মনে হয় তোমার বহুতের হুগ
এই বহুতপন্যই। বহুত আমার চেয়ে তোমাকেই এ
বিষয়ে বেশী স্থিতির কারণে। প্রেমের চেয়ে শক্তিশাল
আর কলাপগ্রহ আর বোধহয় কিছু নেই, তা আমিও
জানি, তবুও এই প্রেমের সঙ্গে আমার মতন—কাজেই
আমার সেই মত, প্রেমকে, আমি হারিয়ে বিতে চাই।...
আর তা যদি না পারি, তবে প্রেমই বহুত একদিন
আমার হারিয়ে যাবে।”

গভীর আগ্রহ তবু আরোখা লেখাটা পড়লে। আর
পড়তে পড়তে সে সেই বহুত পারলে, যে দুর্ভাগ্য এসরামির
মধ্যেও একটা যৌবনা মাথা কুলেছে। কথটা বহুত
পেরে, তার বিষয়ের অস্ত্র বসিল না।...তাবলে, এও তা
হলে সত্য?—ততকালে এসরামি সে বহু ছেড়ে নীচের
গলে গেল।

সে বিম বিকলে, সারা বাড়ীটার একটা গভীর
শক্তি দেখা দিয়েছিল। লম্বা হুগ বিরে, রাত জাগার
সজ্জি হুগ করে, কিছুক্ষণ শিরাতের বসে, তার অতি
হুগ ঘরে আর হুগে গান গাইছিল। এসরামি তখন
নিকের টেবিলে বসে মধ্যাহ্নের উপলক্ষে মত ক্রেমদিনকে
তৃতীয় রশ্মি থেকে মতল গ্রহেব রহত বের করবার বিবর
সহিধারে লিখে জানাচ্ছিল।

এই তাহে কতকগুলি কটাক্ষের পর, ওটোই সফলতারে
কড়া মাকড় পদ হল। হুগের ওটা-আবার অন্তরত্ম

সবয়ে সে লজ, কিরাতের ক'ণে যেতেই, তাকাতাড়ি গান বন্ধ করে সে বাইরের দোরখুলতে চলে গেল। অন্নব্রণ পরেই, কিরে এসে সে এসবামিকে বললে,—“ম্যাডেম ইরীণ তালিসিয়াস অ'ব'লেব বাড়ী বেড়াতে এসেছেন।”

কিরাতের প্রায় পেছনে পেছনই ইরীণ এসে ঘরে ঢুকলেন। এলরামি অলমাপ্ত চিঠি সঠিরে রেখে, চোরাচ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে, তাঁকে দাবর অভ্যর্থনা আনিবে, একটি চোরাবে বসতে হিলে। তারপর হামি মুখে কককপন করে বললে,—“এ যে অপ্রত্যাশিত অগ্রহণ!”

সহাস্যে প্রত্যাভিষান করে ইরীণ, এলরামির এগিরে দেওয়া চোরাতে বসে বললেন,—“আমি এলে আপনারা যে মনে মনে বিবস্ত্র ছাবেন না, তা বুঝতে পেরেই এখানে এসেছি আমি। আর আপাটা আমার ট্রিক উদ্দেশ্যবাহিনও নয়। জানেনই ত, আমি সাহিত্য-সেবী হওয়ায়, অনেকেই আমার পছন্দ করেন না। বাধ্য হয়েই, মইপ্রবর আবার তাঁদের লজ্জা বৃদ্ধি বৃদ্ধ চালাতে হয়। আর এইকটু কর্তব্য করতে করতে, মাঝে মাঝে যেন আমার খন বন্ধ হয়ে আসে। তখনই দরকার হয়, এমন লোকের সাহচর্য, যিনি আমার অলচ্ছক করেন না। ...তা ছাড়া, দু একটা বিবরে, আমি ট্রিক বুকে উঠতে পারছি না, সে বিবরেও আপনার পরামর্শ নিতে চাই!—অব্রত সে বকম পরামর্শ হিতে, যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে, তবেই।”

আপনার ভীত বৃদ্ধি থাকা সত্ত্বেও, যদি আপনি তা না বুঝে থাকেন, তবে আমিই কি তা আপনাকে বোঝাতে পারব?”

“কেন পারবেন না? আপনারা—পুরুষরা জদি মেয়েদের চেয়ে ‘বেশী’ বুদ্ধি করেন,—যদিও আমি তা জানি না। তবে আপনি সেই বেশী বুদ্ধির অধিকারী হয়ে, কেন আমার লজ্জা-নিরসন করতে পারবেন না? ...মাই ছোক, আপে আমার বক্তব্যটা শুুন,—আমি বিচারপ্রার্থী...না, না কিরাচ, তোমার এখান থেকে উঠে বাবার দরকার নেই। বোসে তুমি! ...ব'্যা, যা বলছিলাম। আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন লোকে আমার ‘বিব্যাক’ সাহিত্যিক বলে। তার মানে, আমি যে বই লিখি,—লোকে তা আদ্র করেই পড়ে। তার কলে,

আমার ভাল আর হয়। সেই জন্যে আমি ভাল সাজীতে বাস করতে পারি, প'ড়া গায়েতে পারি, ভাল সাধ-পোষাক করতে পারি, আর সমাধেও সে জন্যেই যেতে প্রতিজ্ঞা পাই। এমন আমার প্রব্র!—এই লামাত্র শের-মান মেখে পুতখা,—যাঁরা মেয়েদের চেয়ে মিল্লেকে বেশী জানে আর ভনী মনে করেন, তাঁরা আমার এই দৌতাব্য দেখে, দুখ্য হিলাস হিপেছারা হয়ে ভঠেন কেন?”

“হিৎসের? ...সর্বাং, আপনি বলতে চান—”

“আমি যা বলেছি, ট্রিক তাই-ই বলতে চাই। তার চেয়ে বেশীও নয়, কমও নয়। দ্ব্যন্ত লজ্জা করে থাকবেন আমি ‘দুখ্য হিলাস’ কথাটা ব্যবহার করেছি। ...আর একটা ধাঁধার আমি কেন মগেই লম্বাঘান করতে পারছি না যে,—কেন পুতখরা, মেয়েদের অগৎ কাজে বাঁধারামী করতে উৎসাহ দেন? আর তার কলে তাবা শের অবধি, পুতখের নিষ্ঠুরতার আর কাখনা মেটাবার শাস্ত্রী হয়ে পড়ে। তখন, পুতখের, সেই বর্বরতা, আর কাখনার আঙন থেকে, বেচারাের আত্মহত্যা ক'ব'বার মমত উত্তমকে ব্যর্থ করতে প্রাণপণে উঠে পড়ে লেগে যান! ...অতি পুতকাল থেকে যে সব মেয়ে, প্রতিজ্ঞা আর বদপণেছে আর আত্মকের হিনেও যারা প'ড়ে, সকলেইই এই একই নিয়তি, একই নালিশ জানবেন। আপ'ও যেহা যার, প্রায় সব কেজেই, তাঁরা ‘মেয়ের সেবা’ বেবলেই নাক সিটকোন্। যদি বা কোন কেজে, বাধ্য হয়েই সেই ‘মেয়ের সেবা’র লুপাত করতে হয়, তবে জাও বেন, অতি দারে পড়েই করে থাকেনা। প্রাণ খুলে দর্শক-করণে নয়।”

কতকটা স্মৃতিত বয়ে এলরামি বলল,—“তবে, পুতখের বিস্ত্রতে, আপনাদের আনা নালিশগুলো অস্বীকার করবার উপায় নেই। আমার মনে হয়, এর প্রধান কারণ, পুতখরা চার না যে কোন ধীলোক বুদ্ধিবীণী ছোক, বা চরিত্র বজার মেখে সতী থাকুক।”

একটু ঘেসে, ইরীণের দিকে পূর্ব বৃত্তিতে চেয়ে, এলরামি আবার বলতে লাগল,—“সতী দেবে পুতখের পকে বুদ্ধিমতী স্পর্ধা আর তিরস্কার! তার কাখন বুদ্ধিমতী মেয়ে, পুতখের চেয়ে বেশী চালাক হয় বলেই, পুতখের বিরুদ্ধি কারণ হয়। আরও একটা কারণ হচ্ছে,—মেয়েরা

ধন্য প্রতিভারী হই তখন তাহাের প্রতিভা সহ বিকেই
 আত্মপ্রকাশ করে কিছু পুস্তকের বেলায় তা হই ন।
 উদাহরণ দিই,—যনে কলম, কোন কবি, কি ভাষ্য, কি
 ভিত্তক—একো বিশেষ একটা বিকেই প্রতিভার বিকাশ
 হোবা যায়। কিন্তু অন্য বিষয়ে, সে হস্ত বোকা, বা ভয়
 ভাবে কথা কইতেই শেষে মি, কিবা সোজনমায়ে বেলা-
 বেশ। করবার কোনটাইকুই ভাব জানা দেই! আর
 যেরেবের বেলাই বেধেবন, যে কোন বুদ্ধিমত্তা মেয়ের,
 কোন এক বিকে বুদ্ধির বিশেষ দীপ্তির সঙ্গেই অস্ত্র সহ
 জনগুলোও সাধারণ ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কাজেই,
 এতে পুস্তকই যায় চটে! তখন যনে সাধনা পাবার
 আশাতেই, তারা নী বা বাহনাতীর কাছে ছুটে যায়,
 তাহেই নিরেই মজাবাতি করে। কলে, তাহেই দেই
 বেলাসের পুস্তকসহ পুস্তকহে গোছন করতে থাকে,—
 তাহেই গোছনের সুবিধা হবে বলে, পুস্তকহেই আত্মকা-
 রাহি করতে থাকে। পুস্তকসহ তাতে সুদীর্ঘ হয়, টাকার
 বলির স্থবির বানন হুলে বের: মোক অর্ধলুপ্তন, সেই
 সঙ্গে তাহেই হস্তেও ত বর্ণনা বাড়ছে।"

হেলে ইতীপ বললেন,—“কিছু আপশোষের কথা, তবু
 উরা যে মর্যাদার ধোয়াতা অর্জন করবার বিলুপ্তাও
 চেষ্টা করেন না।”

“না। আর তার কারণ, অতি বর্ষা পুরুষও, কখনও
 নিষেধ কোন খুঁড়ি দেখতে পায় না,—যেন করে নিজে
 নিষেধ আর নিষেধ।”

হুজু-ই-শীপ এলহা-যিক থেকে চেয়ে বৃহৎ বেগে ভিজান।
কহলেন,—“আব আপনি ? —আপনিও কি তাই মনে
করেন ?”

“আমি নিজেকে নিখুঁত মনে করি কি না।—সত্যি
কথা বলতে হলে ‘হ্যাঁ-ই বলতে হবে।’”

এলাহাবির কথা শুনে এবার কিয়ামত হেসে উঠলো।

ହେଉଥାଏ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ବାହାରେ ନୋହେ ଏକତ୍ରାନ୍ତର ନିଧି
ଚେତେ ଅଟେ ।

এদয়ালি আবার বলিল,—“পুরুষের মিতের আচরণ
যত বাঁধাপাই হোক, সব ক্ষেত্রেই সে মনে করে, তার সে
আবরণ সব যেকোনো দৃষ্ট করবে,—সবাই তা পছন্দ
করবে। ...এই হল আপনাতর বাঁধার প্রকৃত উদ্ভব।”

“আপনি তাহালা করছেন না ত ?”

“না। আমি আত্মকিক কথাই বলছি। ... পুত্র
 চিরকাল স্বর্গে, তবে হলে থাকলে তাহা কাজ ভালই হবে,
 কিন্তু একা হলে তা করতে পারে না। কাজেই পুত্রকে
 স্ত্রী-ভাবে কাজ করবার জন্যে অন্য একজন পুত্র বা
 মেয়ের সাহায্যে তার চাই-ই চাই। সেখানে আমি
 পুত্রদের জীবন পৌরবোধল করেছি (অন্য) তার পাশে
 থেকে কোন মেয়ে! তবু কি সে-বোঝা সেই পুত্রদের
 কাছ থেকে কোন দিন তাই বীতস্তি পায় না। এরকম
 ঘটনা বহু আছে।...আমার নিজের কথা যদি বলেন,
 তবে আমার বীকার করতেই হবে, যে আমার সমস্ত
 দামী, পৌরবোধল আবিভাব সমস্ত করেছি, এতটী হয়েছে।
 তার সহায়তা আর বৃদ্ধির জন্যে আমি বা কিছু দব
 করতে পেরেছি। মুক্তকণ্ঠে এ কথা আমি বীকার
 করছি।”

ইহাওঁ আৰু কিয়কৈ দুখনেই এলফাবিৰ এই
 ঐক্যবোধিত্তি জনে বিস্তৃত হ'ল। ইহাওঁ প্ৰৱৰ্ত্তন কৰিলে,—
 "তাৰে" আপনি নিশ্চয়ই দেখি যোৱাকৈ ভালবাসেন।"

“না, ভালবাসাটা আমার হয়ে নেই। অতঃপর
লোকে প্রেম বলতে যেকোন ভালবাসা বোঝে, আমি
তা কোনদিন লম্বাই করতে পারব না। আপনি,
অপেক্ষের ক্ষম্ভারী ভালবাসার প্রেম না হিয়ে, সুখিভিত্তি
পরিচয় দিয়েছেন আর আমার হয়ে ছয়, আপনার
বসন্তের সঙ্গেও যেকোন ভালবাসা বেশ ভাল লাগে
না। আপনার ক্ষম্ভার চাই আরও দূরী কোন বিধি—
তাই না কি ?

“ହାଁ, ତାହା ଚାହେଁ । ବିଷ ତର ହୁଏ, କୋମଳିନ ତା
ମାସକି ।”

“নিচুই পাবে।—সেজেই বুবে আগাইকে !
 মাছের প্রাণের মধ্যে যে পাথর আচ্ছাদ্য অঙ্গে,—
 তা সে ভাগই ধোঁক, আর মনই ধোঁক—তা পূর্ণ হতেই
 হবে। এ অপভ্রম বরোহা বাবদ্যর অপভ্রম বলে কোন
 কিছুই নেই জানবেন। সেই জন্য নিজেই মনের
 মধ্যে কোন একটা অচ্ছাদ্যকে উন্মাদ্য হোবার অঙ্গে,
 জেবে দেখা উচিত, তার কল পুনা—হু—অপভ্রম
 বর্তমান মনস্তাব বুঝি আমি,—অপভ্রমের অ্যাব চাকলা

ভয়ে উঠেছে ঘন। বেশ বৃকতে পারছেন যে আপন'র
বনের মুহূর্তে কাটা অ'ছে, আর সেই কাটা আপন'র
কপালে মুঠে রক্তপাত করছে।—আমি বলি, 'তবুও
সে মুহূর্ত পরে থাকুন আপনি,—তাতে কপালে কাটা
মুঠে রক্ত পড়ে ত পণ্ডক।—'

সময় সময় আপনি নিঃসঙ্কতার হাঁপিয়ে ওঠেন;
কিন্তু কলোবিজার বক্ষরই যে জাই!—কোন কিছুই
সে আধাআধি নিতে চায় না, সব হোলমানাই 'তার
পে' পেতে চায়।—তবু, আপন'র কপালবনের তপস্বী
বিবাল অ'ছে, সেও একটা আপন'র ঘুং বড় সরস।
আজকের দিনে, যা বেধা যায় ন' তাকে যেনে
সেওড়া,—বিবাল করা বড় সাধাৎপে কথা নয়!
...আমার যদি আপন'র মতন বিবাল থাকত!—'

'কেন? আপনি কি শ্রিতব্যানের অস্তিত্বে বিশ্বাস
করেন না?'

'বত দিন না তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ পাই, ততদিন তা
করি কি ক'রে?—বিশ্বাস যে করতে পারিনা!
গান্ধীজী পর-পরকার, আর পুণ্যস্থান হুং বহুপা
সে, কোন ঘণ্টেই যে হানতে পারিনা, সে সূচ-চিত্র-
মাংসময়-ব্রহ্ম সত্যিই আমারে ধাক্কা ওপর রেখেছেন।
তত দিন-না তাঁর এই বিশ্বস্ততা রহস্তের সমাধান করতে
পারি, ততদিন কেনম করে বড় গলা করে বলব,—

'গভিই তুমি আছ নাথ!'

'কেনম করে বলব—'প্রভু তুমি মঙ্গলময়,—
যেই তোমার 'সুই—সুখর?' কথাগুলো বলতে
হলতে এলগামিবেশ একটু উত্থাপ হয়ে উঠল।

তার সেই উল্লাপনাতরায় ঘুংর ফিকে মুহূর্তেই চোখে
ইরীণ বগলেন,—'শ্রীং কালের সমালোচনা করে
স্বপ্নেই হলে, যে ক্ষুদ্রক ল'হলের ব্রহ্মকণ্টক মিস এলগামি?'

'এটা যদি গভিই থাকেন, তবে আমার এ
মঙ্গলজিৎসার যে তাঁরই ক'ছ থেকে আসছে, একবার
চীকার করতে হবে?'

এই কথার কিরাং হঠাৎ বলে উঠল,—'জগতের
দমকে কিছুই ত' বিনাপ্রমাণে যেনে নিতে হয় হালা,—
সেই বিনা প্রমাণে বিশ্বাসের অস্তিত্ব মানতেই বা
হয় কি?'

'তোমার মতন কবি, আর বা'তনের মতন
সাহিত্যিকের কাছে, যা সহজ-সাধ্য আমার মতন
বৈজ্ঞানিকের কাছে তা মোটেই সহজসাধ্য নয় কিরাং!
যাক সে কথা। আমি ম্যাডেমকে যা বলছিলাম
সেইটাই শেষ করি।—বিয়ে আপনি করবেন না, তাতে
হুগিনেই আপন'র প্রেমের সব ঘোষ কেটে যাবে।—
তার পরের জীবনটা প্রচণ্ড অশান্তিতে ভরে যাবে।
আমার এই কথাটা আপনি সর্বাং মনে রাখবেন যে, যত
নিঃসঙ্কতাতেই আপনি হাঁপিয়ে উঠুন না কেন, বিয়ে
করে সঙ্গী ছোটায়েন না।'

সুহ হেসে ইরীণ দাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে বগলেন,
'কাল পার্কের ঘরোয়া মিস এন্সলওর্দের সঙ্গে আপন'র
জাইকে দেখলুম। তখন থেকে ভেবেও আমি বুকে
উঠতে পারিনি,—এরকম সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির দু'জন
মানুষ, কি করে পরস্পরের মাহর্গে সহ করতে পারে?'

সঃপ্রঃ কিরাং বলে উঠল,—'না না। তাঁর
মাহর্গে আমি মোটেই সহ করতে পারিনি, সেখ অবধি
আমার মুঠে পালিয়ে আসতে হয়েছে।—আর কোন
দিনই তাঁর সঙ্গে মিশব না আমি।'

ইরীণ সাহায্য ঘুং বগলেন,—'তোমার কথাগুলো
যত শুনী হলুম কিরাং!'

'কিন্তু আপনিই ত তাঁকে, তাঁর একজীবনমের
হুগিতে আমার মডেল করে 'প্রেম হুং কবি'কে
জাঁকতে বলেছিলেন, নহ কি?'

'হ্যাঁ, সে কথা যিহে নয়। কিন্তু তখন আমি
ধারবাই করতে পারিনি যে তুমি তাঁর মডেল হতে
রাজী হবে। আর তাছাড়া তিনি বক্ত-বাতলের
বেহটরেই ছিলিনি। তাঁর হুগিতে তোমার আত্মাকে
মুঠিয়ে তোলা, একান্ত অসম্ভব তাঁর পক্ষে। এটা
জানলুম বলেই, তাঁকে বলেছিলাম তোমার মডেল
করতে! এখন বুকে তো কেন তাঁকে এ প্রোবচনা
কিহেছিলাম?'

হেসে এলগামি বগলে,—'বুকে পারছি, এটা
একেবারেই মেয়েলী চাতুরী আপন'র।—যা সে করতে
পারে না, তাই করতে বলে তবু তু তাকে হারযাণ
করা। মেধাবী মেয়েদের, পুরুষের না পছন্দ করার।

এ-ও একটা করিণ, মনে রাখবেন!...অনেক সময়েই যেহেঁরা নেহ অনেক কিছু কিছু তার তুলনায় বেশ অনেক কম।”

“আপনি যেহেঁরা ওপর অবিচার কহছেন মিঃ এলরামি। যেহেঁরা একবার ভালবাসলে, নিঃশব্দ হয়ে তাহের সর্বকই দিয়ে বেশ, কিছু বাকী রাখে না পরে সেবার জন্তে।”

“সেটাও ত সেহের কথা। কারণ দর্শন হিলে, প্রথমতঃ অনেক খোঁই বেঙরা হয়ে যায়, দ্বিতীয়তঃ পরে সেবার মতন নিঃশব্দ আর কিছুই বাকী থাকে না। কংকেই এ খবর করাও অসুচিৎ। পুঙ্খ একবার বহিঃস্থ পথে গারে যে আপনি সম্পূর্ণ তাহেই তার আয়তালীন হয়ে পড়েছেন, তবে অল্পদিন পরেই সে আপনায় ওপর বীতশ্রদ্ধ হতে থাকবে, কারণ সে তখন আরও কিছুই জন্তে,—নতুন কিছু আরও করতে ব্যাকুল হয়, আর তা না করতে পারলে তার প্রাণে তৃষ্ণা থাকে না।...আচ্ছা, আপনি যাচ্ছেন? ...নমস্কার! ...নমস্কার!” —বলে এলরামি হাত বাড়িয়ে হিলে করকম্পনের জন্তে।

“এতটা ছুঁততা বিনয় আর বৈধ, আজ অবধি আমি আর কারো কাছ থেকে পাইনি,—পুঙ্খের কাছ থেকে ত নয়-ই। কংকেই এর জন্যে আপনি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ নিঃ!...নমস্কার!”

কিঞ্চিৎ ব্যায়েম ইহাওকে লগ্নে করে নিয়ে, সতর কোণে অবধি পৌঁছে দিয়ে এলো।

৪ ২০ ৪

ঐ সপ্তাহে ইলফ্রাকোয়ে সন্ধ্যার ওপর দিয়ে জীবন স্বপ্ন বহিতে আরম্ভ করে ছিল। তিন দিন আগে ক্রেমলিন এলরামির কাছ থেকে চিঠি পেয়েছেন, তৃতীয় রনি লম্বা। তৃতীয় রনিটি অসুস্থরূপে কর্তে মর্মান্ব্যকই যে উপদেশ দিয়েছেন, একথা ভেবে মনে মনে ক্রেমলিন বুঝে বুঝে হয়েছিলেন। সেই দিনই তিনি পঙ্খের বড় জাদলটার একটা মোটা কাপো পরণা টাঙাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এতে, এখন পরণাটা টেনে নিলে, তাঁর ‘অপুই চক্ৰ’টা সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল, আহার খুলে বিশেষ তাই ভরা আকাশের প্রতিবিম্ব আশেপাশে মতন ঢাকার ওপর প্রতিফলিত হচ্ছিল।

সকল আজ ক’দিন ধরেই সমান বেগে বয়ে যাচ্ছিল। ক্রেমলিন এই তৃতীয় দিনে, হাতালের বেশ প্রাণ সমান থাকলেও হাওড়াটা বেন আজ আগের চেয়ে গরম হয়ে উঠেছিল। কলে, হাতাসটা সন্ধ্যার কালের ওপর দিয়ে বয়ে আসা সন্ধ্যা, যেন মস্তক হাতাসের মত মনে হচ্ছিল। আর সেই হাওড়ার কেমন বেন একটা গড়কেব গরম থাকার হাঙ্গর জ্বর হয়ে উঠেছিল।

মর্মান্ব্যক নিঃশব্দ বড় মল্ল প্রহর হস্তির পতি দেববার অনোই, ক্রেমলিন জানলায় পরণা টাঙিয়ে ছিলেন, কিন্তু পরণা টাঙাবার পর থেকেই, বলে বলে কাপো দেহ আকাশ-পথে চলা কেহা কর্তে থাকার, কংকের কাক কিছুই করতে পারেন নি।

তাঁর চাকর কার্ল, কংকে প্রকাশে কদিন ধরেই যেন তরে অসুস্থ হয়ে উঠেছিল। একটানা এই স্বপ্ন আত তার লগ্নে সন্ধ্যার দাপা-দাপি বেন তাকে চকল করে তুলেছিল। সবচেয়ে বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল তার কলাকার সন্ধ্যার পানীলের পঙ্খ বেতে চক দিয়ে ঘুরে বেড়ান থেকে,—আর সেই সন্ধ্যার তালের বিরামহীন চাঁৎকার ওমতে ওমতে! হুঁহিন, সে তার লম্বির ক্রেমলিনকে জিপেল কংকেই, এই যে তিনি সাধারণ রাত সন্ধ্যার মধ্যে বলে বলে সমানে একটানা কড়ের নাক খেয়ে যাচ্ছেন, তাতে তাঁর ভয় করছে না একটুও? ক্রেমলিন তাকে বুঝিয়েছিলেন, এতকম হুঁহিন হতে পঙ্খ ত বটেই, এমন কি অতি নীচু ঢালাবরঙলোরও তিন অবধি কাপতে থাকে। কিন্তু তাতে তার কংবার কিছুই নেই! ঢালা কড়ের ঢালাটা মত তেব অবধি কড় উড়ে যেতে পারে, কিন্তু পঙ্খের বিশেষ কিছুই কতি না এতে।

কড়ের জন্তে কার্ল-এর নৈমিত্তিক কাজ বেশ বেড়ে উঠেছিল। রাত্য়াদের চিমনি, আর হাফ থেকে, কাশ রাপি কুল আর ধূসো-মালি বলে বর্গে পড়ছিল। সেগুলোকে খেঁচিয়ে লাক করে ছুঁকী করে বাইরে কেলতে গিয়ে যেখানে, একটা মত বড় কলাকার পানী, তিকে অসু-সু হয়ে তার বড় বড় পাখনা ছাযান পুখে ভড়িয়ে দিয়ে সেই আঙা-হুড় হুড়ে বলে আছে। তাকে তাড়ানোর জন্যে কার্ল ‘হু-হু-হু-উ-উ’ করে বার কতক চেঁচাল। পানীটা কিছু কার্লকে তৃপ্তপাত্ত করল না। নিঃশব্দ

মনে আপনাত জিহ্বে পাখাটা ঠোঁট দিয়ে বুটে বুটে লাকাই করে বেতে লাগল। ব্যাপার দেখে কাল' মনে কেঁপে গেল।

সৌকে রাজ্যের থেকে একে একে খুঁটি, কাঁটা, উত্তর খোঁচাবাব লম্বা লোহার শিক বার করে একটোর পর একটা পাখীটার হিকে ছুঁড়ে মারতে লাগল হু বকেই, কাছে বাংলায় কিছু সাংস হচ্ছিল না তার। লোহার শিকটারে ভব পেলে, পাখীটা বিকট কর্প বকে চোঁচোতে চোঁচোতে খুঁবে খুঁবে উড়ে গুপার হিকে উঠতে লাগল। ক্রমে পেটা কালের নৃষির বাইরে চলে গেল। তবুও কিছু ভাব সেই কর্প পর কাল' সমানে ভ্রমতে পেতে লাগল।

ছাত্রাশ্রিতও যেন শেব ছিল না কাল' সে দিন। প্রথমতঃ উত্তর বরানই তার পক্ষে দৃষ্টি হলে উঠল; বার বার কঠি আর তেল চলেও উত্তর আর কিছুতেই ধরতে চলে না। এমনি বার বার পাঁচ বার চটা করার পর বসি বা উত্তরটা সে বড়িয়ে তুলল, তবু ছাত্র থেকে তুল আর খুঁচা-বাগি পড়ার, রাজ্য করা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। এককমে রাজ্যতঃই মাতৃবের মেলাক বেশভাষার কথা,—আর কাল'র বেলাভও তাই সে দিন বিঘড়ে পেল।

যাসার ফ্রেমলিন একা দাঁড়াল। কাকেই খেতে খেতে কথা বলগার লোক না থাকায়, কবিতার বই খুলে তিনি বানি খেতেন। আজও ফ্রেমলিন কবিতায় বই-ই পড়ছিলেন তিনি। হঠাৎ একটা উজ্জ্বল নীল আলো, তাঁর সেই কবিতার বইয়ের ওপর বেলে যেতেই, চম্কে উঠে বললেন,—“এ আবার কি?”

টুক সেই সময় ঘরে ঢুকে কাল' বললে,—“খিজি বকসের একটা বিদ্রোহ হল এইমাত্র।”

কাল'র কথা শেব হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাজের একটা ওড়-ওড় শব্দ যেন হু বকে ক্রমশঃ এগিয়ে আসতে লাগল। তারপর কাথান ছোড়ার বত একটা বিকট আগুগাছ হয়ে শব্দ খেলে গেল।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ফ্রেমলিন বললেন,—“আজ রাতে জল আর বড় ছুই-ই পাশাপাশি করবে মনে হচ্ছে।

বিপদের অস্ত থাকবে না কেবলি। কাল', তুমি আজ সব হোচরখোচরো জাল করে বেবে তুমি বড় করে দিয়ে তবে তৃত থেবে। কোমটা বড় করতে যেন তুল-না-হয়।”

“হ্যাঁ, আমি এখুনি বাজি।—এই দুর্বোলের হাতেও কি আপনি গুরুত্ব বোধই থাকবে?”

“নিশ্চয়ই! —এতদিন ঘরে গুরুত্ব বলে রাস্তার পর রাস্তা কাছ করে এলেছি, আর আজ বাগ-বগি তরে কাছ বড় করে সেখান থেকে পালিয়ে আসব।—তুমি ভাবছ কেন? বিপদের কি আছে এতে?”

“না, টুক সে জন্যে বলছি না।—আমি বলতে চাই ছিলুম আপনি যখন অত উঁচুতে বসে কাছ করবেন, তখন এই রকম বিদ্রোহ চমকালে গুপ করবে না আপনাত?”

ফ্রেমলিন উঠে একটা আমলায় পরখা গরিয়ে বড়-খুঁচি গুলে বিলেন। তারপর আকাশের হিকে একবার ভাল করে চেয়ে দেখে নিয়ে কাল'কে বললেন,—“এখন যেটা হল ওটা কাঁচা আগুগাছ। কেবল না? আকাশ থেকে যেখা সবে দিয়ে আকাশকে পরিষ্কার করে দিচ্ছে? বোধহয় আর কোথাও খিজি হচ্ছিল, এই বাজটা পড়ে, ল খিজির শেষ হল।”

ফ্রেমলিনের কথাগুলো যে নিতান্ত হোকহাওয়া নয়, তা একই লক্ষ্য করে আকাশের হিকে হেলেই বোকা যেতো। আকাশে তখনও খেঁচি যেখা ছিল বটে, তা হলেও স্বর্গের বেগ অনেক কমে গেছিল। উড়ন্ত সচল মেঘের মধ্যে দিয়ে, মাঝে মাঝে এক আখটা তরাতর তিকিমিক করছিল। তাই বেবে বাজে কবার আর সময় নষ্ট না করে, তাড়াতাড়ি গুরুত্বের কেবলার জন্যে ফ্রেমলিন বাবার ঘর থেকে গেরিয়ে চলে গেলেন।

ফ্রেমলিনের চলে যাবার পানের লক্ষ ক্রমে ক্রমে কাল'র কাছে বড় থেকে বড়তর হয়ে শেব অবধি মিলিয়ে গেল। তারপর গুরুত্ব ঘরের বোর খোলা আর খোঁচ বড়র লক্ষ ভ্রমতে গেল সে। গুরুত্বের খোঁচটা যে এক দুর্ভর্তের জন্যে খোলা ছিল, সে সময় ঘরের তেরতের খোঁচ খোঁচ লক্ষটাও কাল' এর কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আবার বোর বড় হয়ে গেলে, সে লক্ষটাও

এতদিন ধরে, তাত দিনই এক ঘেরে এই পৌ-পৌ লম্বটা কাল' গুনে আসছে। তা সন্তোষ খোলা খোর দিয়ে বেরিয়ে লম্বটা যখন আরও কোর পোনাভ, কাল' তখনই যেন সেটা গুনে কেন্দ্র বিস্তার হয়ে পড়ত। আরও, এইবার যখন কোর হয়েছিল লম্বটা, তখনও কাল' কেন্দ্রি বিস্তারিত ঘোষ করেছিল। কথটা ভাবতে ভাবতে, আর নিশ্চয় মনে মাথা নাড়তে নাড়তে কাল' বাবার টেবিলটা দাঁক করল। হাসনগুলা হয়ে মেখে, কাপড় দিয়ে ভাল করে মুখে শুকনকে করে, রাগা হয়ে রেখে গিয়ে এলো। তারপর, নিজের ঘরে গিয়ে অল্পক্ষণ একটু ভিত্তি, সে তার মা'কে চিঠি লিখতে বসল।

শেষে, তার লেখা চিঠির বেশ সুন্দর ছিল। মা নাড়-পড়নোকে ভেবে বেশ আগ্রহ তরবেই, সেই চিঠি সবাইকে পড়িয়ে পোনাভন। কাজেই চিঠি পেশবার সময়, কাল' বেশ গভীর ঘনোনিবেশ করেই চিঠিগুলো লিখতো, যাতে তার চিঠির সুনাম নষ্ট না হয়।

এইভাবে কাল' যখন ঘর বিরে চিঠি লিখছিল, তখন যে মেঘগুলো আকাশ থেকে গরে যেতে যেতে আবার হয়ে ঝড়িয়ে ছিল, আকাশটা যে আবার মেঘে প্রাণ আচ্ছন্ন উঠেছিল, তা সে ঘোড়োই বুঝতে পারে নি। হঠাৎ আবার পৌ-পৌ শব্দে বাতাল নতুন করে ঝাপাঝাপ শুরু করে দিলে। স্বভেদ এই নতুন ঝাপটে প্রতি গোর-ঝানাল ঠকঠক করে কাপতে লাগল। এই সময়, বোঝাকার একটানা-বন্ধকরা যোর হড়ানু করে শব্দ করে বন্ধ হয়েই, কাল' সেই শব্দে চিঠির একপ্রত্য থেকে বেন হিটকে বেরিয়ে পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল। আর এরই প্রাণ সঙ্গে সঙ্গে, একটা সাময়িক পানীয় তৈরি কর্তৃক স্বরও পোনা বেল। যেন হল পাখীটা বেন চে'গাতে-চে'গাতে আকাশের ওপর থেকে সমুদ্রের দিকে নেবে আসছে। এই বর গুনে বিকেলে দেখা ভীষণ রশ্মি ভিজে পাখীটার কথা কালের মনে পড়ে গেল। পাখীটারে অবধি তখন, পড়কের মাথার ওপর গিয়ে বসেছিল। এ সময় বর যে তারই পে বিবনে কালের কোন সন্ধ্যাই হইল না।

হঠাৎ, অতি উজ্জল বিদ্যুতর নীল আলোর চারিদিক জরে গেল, আর তার অল্পক্ষণ পরেই ভীষণ নামে বাধ

ডেকে উঠল। পরক্ষণেই আবার দুহুলের ঘারে বিষ্টি শুরু হল।

১০০

ক্রেনলিন পথের ঘরের মধ্যে ঢুকে, গোরটা বোঝাকার মতই তেতর থেকে চাষি বন্ধ করে গিলেন। তারপর জানলার টাঙান পরগাটার তেতর দিকে ঢুকে, বন্ধ জানলার পাশা দুটো খুলে দিয়ে, বুদ্ধজঘনি খাইয়ের দিকে হুঁকিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন।

তার ঠিক মাথার ওপর এক ঠাঁক তারা দেখা গিয়েছিল। আর ঠিক সেগুলোই পরই, একটা পাড় কালো বন্ধ এর ঘেঁষ ঝড়িয়ে ছিল। ক্রেনলিন দেখলেন যেখানে লাল বন্ধের মতল প্রহটা থাকবার কথা মেঘটা ঠিক সেই জায়গাটাই কোড়া করে রেখেছে।

যদিও ঠিক থেকে আরও ঘেঁষ ঘীরে ঘীরে এগিয়ে আসছিল কাজেই, ক্রেনলিনের বুঝতে দেই হ'ল না, যে অল-স্বচ্ছ আবার যে কোন এক সময়ে পূর্ণ-গমে শুরু হয়ে বাবে। তার ইচ্ছা হতে লাগল, এই নতুন করে হল বন্ধ আরও বখাত আগে, অমৃত্যু যদি দুর্ভাগ্যবশত বন্ধেও, একবার মতল প্রহটা দেখা যেতো, তার বন্ধ-রক্তা হস্তিরেখা তার ক্রিস্টাঙ্গের চাকাটার ওপর কিছুক্ষণের অন্তরে প্রতিফলিত হত, তা হলে একবার তার প্রতিপত্তা যেবে নিতে পারতেন তিনি! এই আশা নিয়েই তিনি আকাশের দিকে চেয়ে বুদ্ধ জুলিয়ে জানলার ঝড়িয়ে বইলেন।

যাকযানের এই বন্ধ ঘরটার মধ্যে কোন আলো ছিল না। তার অশ্রুটী তিষ্ঠি, ঘরটাকে যেন এক অন্ধৃত বিহীন-অন্তাত্তিক বস্তুর মতই করে তুলেছিল। ক্রেনলিনের কিন্তু এমন দিকে দৃষ্টিপাতই ছিল না যেটাই। বোঝাকার অভ্যাস বশে, নিশ্চিত হয়েই তিনি আকাশের কালো মেঘটার ওপর নজর রেখে, সেটা নড়বার প্রতীক আর অপেক্ষা করছিলেন।

এইভাবে ঝড়িয়ে থাকতে থাকতে, মনের মধ্যে তার অতীত—এসলামির ভিত্তি দেওয়া যৌবন ময়, তখনকারে বৈশ্বা প্রাণ যৌবনের ঘটনা জলোই, এক এক করে, ছাড়াছাড়ি মতই মনেও মধ্যে মধ্যে উঠছিল।...তার কলেজের জীবন। প্রথম থেকেই নিজামের ওপর তার

প্রাণের তাঁর, বীরে বীরে, তাঁর মনের পটভাব প্রতিফলিত হতে থাকে।

মনে পড়ল, তখন সুন্দর, একহারা চেহারা তাঁর, মাথায় এক মাথা কোকড়ান চুলে ভরা, নীল সূত্র ধলের মত, চোখের ঊঁচা ছুটো,—ঘোড়ের ওপর সব মিলিয়ে, অঁই চেহারাটি তখন ঊঁচা ছিল। ব্যাঘ্রই বিভ্রান্তের চর্চা করতে ভাল লাগত তাঁর; বিন তখন ঊঁচা অলসকে খেঁচ হয়ে যেত নতুন নতুন বিভ্রান্তের পতীকা করতে করতে, অনেক সময়ই তা আনতে—নৃত্যে পারভেন না তিনি।

তাঁর এই বিভ্রান্ত-প্রীতি, কিন্তু হঠাৎই একদিন কমে গেল। আর তাঁর ভারিগা অধিকার করলে, নতুন পাওরা প্রেম। ঘোঁরনের প্রথম ভালবাসার, সর্বপ্রাণী-ভ্রাকরণ, আর সব কিছুকেই তাঁর মন থেকে হঠাৎ বিলে।

ভাল ঘরোয়, এক সুন্দরী তরুণীর সঙ্গেই তাঁর ভালবাসা হয়েছিল। দুজনেই দুজনকে প্রাণভরে ভালবেসে ছিলেন। কিন্তু হঠাৎই তলবান সে প্রেম, ছোট টেনে দিলেন। কীভাবে খুন করার অপরাধে, বলের আর আর ভাসের সঙ্গে, তরুণীও বলা পড়লেন। স্বপ্ন-বিচারালয়ের ইচারে, তাহেও সকলেরই সাইবিবিচার নির্ধারনের রাজ্য হল। সেই কারণে মত, সাইবিবিচার-মাত্রার ঘায়েই, তরুণী বিধ বেধে, আত্মহত্যা করলেন,—সাইবিবিচার বিভীকিকা থেকে মুক্তি হল তাঁর।

প্রেমিকার এ সব কথা, জেমসিন আনতেন না। তরুণী যে এক মিহিলিট বলের কর্মী, এ কথাও তাঁর জানা ছিল না।...প্রথম প্রেমের মধুর স্বপ্ন, এমনি ঘে ঘুড়ে ঘাবার পর, সেই যে তিনি রূপ বেশ থেকে চলে গেছিলেন, তারপর, আত্ম অধি, প্রবাসেই তাঁর বিন হুটো,—অবেশের কথা কুলেই গেছেন একরকম।

প্রেমিকাকে হারানোর শোকটা প্রথম প্রথম তাঁকে ছুঁই উৎসাহ কটে তুলেছিল। সেই শোক কোলবার জে, মন চলে বেবার মত আর কোন কিছু বুঝতে দিতে, এই আকাশতত্ত্ব, গ্রহতত্ত্ব নিয়ে নতুন করে এক আনন্দ করলেন। অজবিনেই, এটা নিয়ে তিনি দিন বেতে উঠলেন, যে তাঁর পরিচিতির মনে করে

এতটা যত্নাতি করছেন, এই গ্রহতত্ত্ব নিয়ে। এক এক সময়, তিনি এই গ্রহতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে করতে এতই তন্দ্রার হয়ে যেতেন যে অনেক বিন, নাওরা-বাওরায় কথা তাঁর খেয়ালই থাকত না।

এই তাহে বছরের পর বছর, পটীরে ওপর লক্ষ্য মাত্র না বেধে, একমনে তিনি গবেষণাই করে গেছেন, গ্রহ তত্ত্ব বিষয়ে। বত বিন বেতে লাগল, ততই বেন লোক-সমাজের কাছে, আরও জুজোর,—অটল হয়ে উঠছিলেন।

তারপর হঠাৎই একদিন আবিষ্কার করলেন তিনি, যে কোন এক অজাত মুহুর্তে, বাধা এসে বেধে তাঁর রাত্তির বিচার করেছে। আর তাঁর অজান্তেই, বীরে বীরে তাঁকে একেবারে অকর্ষিত,—স্বপ্নের কবে ঘিরেছে। কথাটা বুঝতে পেয়ে, প্রাণে তাঁর এই তত্ত্ব বেধে উঠল। যে কাল মুক্ত করেছেন, তা বুদ্ধি আর শেষ করে থাবার কুহুহু বিলম্ব না। তার আগেই নৃত্যের অমোঘ পরোয়ানা এসে হাবির হবে।

বহুদিন আগে, রূপ বেশ ছেড়ে প্রাচ্যের কোন এক লহরে গেছেন, সেই লহর এলারামির সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল। এলারামি যে জানী আর শুনী, অজ বিনেই, তিনি তা বুঝতে পেরেছিলেন। এই মরণ-ভয়াকুর মবার পত, এলারামির কথাই তাই মনে পড়ল তাঁর মরণ-পদ হলেন এলারামির চিঠি লিখে তাকে। তাঁরই নিজের আশ্রয় আর ইচ্ছা বৃত, তাই গেলেন এলারামি, তার মহাশক্তিমানী মরণ ঘাইরে, তাঁর বাধাকোর অগ্রগতি রোধ করে গিয়ে গেল।

আনন্দের ঝড়িয়ে, মল্ল গ্রহের বেধ বুদ্ধির প্রতীকা করতে করতে, মনের মধ্যে তাঁর অজান্তেই ঘটনাগুলি এইভাবে কুটে উঠে আবার বীরে বীরে মিলিয়ে গেল। ...হঠাৎ আকাশের বিকে চাইলেন, এই সময়, জেমসিন বেধলেন, মল্ল গ্রহের ওপর থেকে কালো মেঘটা সরতে সরতে, আরগাটা প্রায় পরিচায় করে গিয়েছে। বেধতে বেধতে, গ্রহ বেধতার কুহু লাল বৃত্তিটা, কুটে উঠলো আকাশে।—বৃত্তিত হাতে পরগাটা সরিয়ে দিয়ে, চাক্যটার পাশে ঝড়িতেই, জেমসিন বেধলেন চাক্য ওপর একটা বিবর্ণ আলোর রেখা কুটে উঠেই মিলিয়ে গেল—তার পর আবার একটা আলোর

বেশা ছুটে উঠল ঢাকার ওপর—পরক্ষণেই পেটাও মিলিয়ে গেল...

ক্রেমলিনের মনে পড়ল, মঠাণ্ডাক তাকে তৃতীয় বন্দিটা ভাল করে লক্ষ্য করতেন বলেছেন। এই বাত, ...তবে এইবার আসছে সেই তৃতীয় বন্দি! ...আগ্রহের অধীনে হয়ে, ঝুঁকে পড়ে চাকটা দেখছিলেন তিনি—ঐ—ঐ যে সেই তৃতীয় বন্দি...ট্রিক যেন এক বিশ্ব তাক্য রক্ত। ঢাকার ওপর বিদ্রোহের মত বিকে বিকে ছুটে বেড়াতে লাগল সেটা। ...অজ্ঞাত তারার সাধা বন্দি-বেশার মধ্যে মাঝে মাঝে, সেটা যেন কিসের লাল হয়ে, বাড়িল। কিন্তু বেশা বেশ, পতি তার দুর্বার! চাকটার সারা পরিধিটার যেন সেটা ছুড়ে বেড়াচ্ছিল! ...আবার তাক্য রক্তের মত টকটকে লাল হয়ে উঠল সেটা, আর পদদুর্ভেদেই তা গেল হারিয়ে।

পতীর মৈয়াদে ক্রেমলিন হার হার করে উঠলেন। মনে হল তাঁর,—“হা ভগবান! এত বার পতির বেশ, তাকে আমি অনুসরণ করব কি করে? ...এ যে অসম্ভব কাক মনে হচ্ছে!”

সত্যিই সে বন্দি সাধারণ বৃত্তিতে অনুসরণ করা যায় না। কোথায় রক্তবিশুব মত বন্দিটা প্রথম প্রতিবন্ধিত হয়েছিল, আর কোথায় গিয়েই বা মিলিয়ে গেল, তাও ট্রিক করে মনে রাখা যেন অসম্ভব তবুও ক্রেমলিন এক মনে চাকটার বিকে চেয়ে ছিলেন। ...বঠাৎ একবার বিদ্রোহ রক্তকাল, আর সঙ্গে সঙ্গে এমন এক রক্তক তীব্রোচ্ছল আলোয় প্রতিবন্ধন হল সেই চাকটার যে ক্রেমলিন আর সেবিকে চেয়ে থাকতে পারলেন না। জানলারটা বন্ধ করে দিতে গিয়ে দেখলেন, এই সময়ের মধ্যেই যেখানে আবার সারা আকাশটা ছেয়ে গেছে। কিন্তু মল্ল এহ তখনও নেবমুক্ত! নব্বয় আশার উকীল হয়ে ক্রেমলিন চাকার কাছে কিসের আসে, আবার বহি মল্ল গ্রহের বন্দি বেশা বার বলে উগ্রীয় হয়ে ঝাঁকিয়ে আপেক্য করতে লাগলেন। এক মুহূর্ত! ...তার পড়েই, আকাশ থেকে যেন একটা কলকত্র ত্রিশূল নেবে এসে, গম্বুজের মাঝার পড়ল। ...সঙ্গে সঙ্গে মাঝটা দুতাপ হয়ে ঠাণ্ড হয়ে গেল। ...ভীষণ মাঝে বাজ ছাট ডেড়ে, একটা কলকত্র আঙনের স্রোতের মতন চাকটার ওপর এসে পড়ল। ...বাড়ের বিকট আওয়াজ, আর সেই সঙ্গে একটা ভারী

মাত্তব কোন কিছু, মেঝের গড়ে মাওরার, ট্রিক যেন অল্পত কোন কিছুর আদতে পড়ার মত শব্দ ছুটে একত্রে মিলে, কি রকম সে একটা অতিভাবহ শব্দের স্পষ্ট কল তাহার তা প্রকাশ করা যায় না। ওপর থেকে, গম্বুজের তাল্লা অংশ আর তার লম্বা বেওয়াল তাল্লা কবাটা, এক সঙ্গে ঘরের মেঝের ওপর ছড়নুত করে গেল পড়ল। ...তারপর? ...তার পরই সব ঠাও!—সব নিষব্দ! ...

বাড়ের শেষ ব্যাপ্তল হয়ে কার্প ছুটে গম্বুজ ঘরের দোরদোড়ার এসে থাকা দিতে দিতে বার বার তার মনিষকে তাকছেন। শোর ভেতর থেকে চাবি বন্ধ... বাইরে থেকে এ কোর কেমন করে বোলাবোনে ঘরের লোক ভেতর থেকে না গুলে দিলে? ...

গম্বুজ বাজ পড়ার এক মুহূর্তের মধ্যে বেচারা অজান হয়ে পড়ে ছিল নিজের বিদ্যানাত ওপর। মুহূর্ত পরে, জান হতেই, দেহের অড়তা থাকা সত্তেও, তাকাতাতি উঠে, উঠানে নেবে, গম্বুজের মাঝার বিকে চাইভেই, সব কথা তার কাছে পরিভার হয়ে গেল। ...ছুটল সে, পাগলের মত, সিঁড়ি চেড়ে, গম্বুজের দিকে। দোর দোড়ার এসে হাত পা মন বোটা চাই দিতেই শোর ঠেসতে লাগল—সঙ্গে সঙ্গে ক্রেমলিনকে তাকতে লাগল। ...আবার...বার বার চোঁচা করেও তার সব চোঁচাই বুঝা হল...ভেতর থেকে কোন সাড়াই সে পেলেন না।

এবার চোঁচার বার্ব হয়ে, ছুটল সে প্রতিবেদী মেলেধের তাকতে।—শোর তাকতে যবে।—একা, সে কাজ করা নয়ব নয়।—লোক চাই—আরও দুচার জন লোক অন্তত! কল-রক্ত তখন পুরো হয়ে চলছিল। কাল, তা গ্রহের মধ্যে না এনে, বালি গারে,—বালি মাঝাতেই ছুটলো বাইরে। ...অল্প দুইই ক’জন কেসের মুঠে। তাহের সঙ্গে কার্দের আলাপও ছিল, অল্প হয়;—মুঠে মাঝে মাঝে কাছ থেকে, মনিষের ক্ষেত দাঁড়ি কিনে আনত—আলাপ সেই মুঠেই! তাহের মুঠেরে’ এসে হেঁবে-ডেকে-চেঁচিতে, সে সবাইকে কার্পির তুললে। কতকটা ব্যাপারে, অল্প কবার বৃত্তিরে দিলে তাহের। চাইল তাহের সময় সাহায্য, এই বিপক্ষে তার। এল তার। মকলেই, তার সঙ্গে বুদী মনে রাগা ঘর থেকে সাবল, হুদুল, আর উদ্বন খোঁসবার লোহার ডাওটা নিয়ে।

সবাই নবুৎ ঘরের দোর লেড়ায় এসে জড়ো হল। সবাই তারা তখন সমান উত্তেজিত, তবু কিছু কেউই, প্রথমটায়, ঘোর ভাঙে হাতী হল না, কালকে বললে—“আর একবার ভাল করে ঘোর ঠেলে ডাক দিকি।”

তারের কথা মত হুৎ হুৎ করে ঘোর দিটিং দিটিং, আবার, বাকতক কাল’ তার মনিকে ত্রাকলে। কিছু না, ভেতর থেকে কোন সাড়াই এলো না ভাতে। একজন কেলে এইবার বলে উঠল,—“নিশ্চয় হবে গেছে বাপু, তোমার মনিবদশায়।—এস, এবার তা বলে, সোটা’ ভেঙে ফেলি।”

কল’ই সর্বপ্রথম পাখরটা তুলে নিয়ে চাবির কলের আঘাত কোরে কোরে, বাঙতে লাগল। তার দেখা যেছি আরও ৫-৬-একজন এবার কাছে লেগে গেল। দ্বিটি কলক, আঘাতের পর আঘাত ঘোর কলে, ভেঙে পড়ল সোটা। কোলোটা সড়ে ছটা লঠন জোলে এনেছিল। সেই আলো ভাতে নিরে, সবাই প্রায় এক দশেই, বহুদূর করে ঘোর মধ্যে ঢুক পড়ল।

খোলা কামলা, আর মাথা তাকান নবুৎের ভেতর দিয়ে হাওয়া ঢুক, বহুৎ মধ্যে তখন বাতাসের গাওন লাগা চলছিল। ঘর ঢুকতেই, তারের হাতের ছু-নিম্নে লঠন, কড় নিতে গেল। দেশমাই জোলে যখন তারা নেভা বাড়ি ম’লাতে চাইল তখন বাকী ছোটো বাড়িতে হুল করে নিতে গেল ঘোর বাতাসে দেশলায়ের কাঠি জাল করে জলবার অগ্নেই নিতে ব্যক্তিগল। অনেক কষ্টে একটা লঠন অগ্নাল তরা,—সেইটে, সাবধানে উঁচু করে ধরে ঘরের চাব’হিকে তারা চোখ বুজিয়ে, ক্রেমলিন কোষার অগ্নেন, তাই খুঁজে দেখতে লাগল।—কিছু কই ক্রেমলিন?—পড়ে আছে দেখলে তবু ইট, চুন আর সুতকী বাবা—সাবধ কই?—আরও ভাল করে দেখতে দেখতে, কাল’ ইট-কাঠের ভূপের মধ্যে, একটা কালো কাপড়ের একাল বেহিরে বহুৎে দেখতে গেলো। কাপড়ের টুপোটা ঘিরে, কেনন বেন একটা ছাক্তিতে, কাল’ বেহারা কুখু হয়ে পলল...কেন হতে লাগল, কি দেখবে সে সেই কাপড়ের ভল্লব? ...কতকগুলো ইট, চুন সুতকী সরাতে, কালো কাপড়টার আরও বানিকটা অল বেহিরে পড়ল। তখন আর ইট সরাতে বেহী করবার থেই হইল না, তার, সে সেই বেহিরে আলো কাপড়ের অলটা ধরেই টানটানি করত আরও কতকগুলো প্রাপল পড়িতে। কাপড়ের বানিকটা অল, টান-বৈঠকার, দ্বি’কে বেহিরে এলো তার হাতে, আর তার তলার দেখা গেল পাখরের মত কোন একটা কিছু। বাড়িটা তুলে ধরে সেটা কি দেখতে দেখতেই চাকার ওপর বাড়ির আলো প্রতিফলিত হয়ে আরম্ভের প্রতিফলিত আলোর মতই, হ্রস্ববদা ভলো, ল’কনের চোখ ধাবিয়ে গিল।

উত্তেজিত কাল’, পাখরের চাকাটা ঠেলে সরাতে গিতে গেল, কিছু না, ওঠান ত’ নুৎের বদা, এক চুল নড়ান অদধি বাব না সেটাকে,—এত ভারী!...হঠাৎ পাখর বদা হাটো তার তিক্ত-তিক্ষে মনে হতেই সে হাত ছুটো বের করে, বাড়ির আলোর বহুতেই, দেখতে গেলো তাকারকে হাত ছুটো তার টক-টকে লাগ হয়ে উঠেছে! বহুৎে যেনে কাল’ ভেবে চাব’ক করে উঠল,—“হা তদবান! মনিব আলো এই পাখরের তলায়, চাপা পড়ে রয়েছে। ...এল, এল—বহু, সবাই মিলে ঘর তাই সব, এই পাখরটা—উঠিয়ে কেল এটা,—এস, এস সবাই তাকাতাড়ি করে—হ্যাঁ, এইবার—আর একটু মধ্য হাও,—ওঃ! নাঃ! তবুও, পাখরটা নড়ান গেল না।

এবার কাল’ চাব’হিকে চেয়ে দেখতে লাগল, এমন একটা কিছু আছে, যা দিয়ে পাখরটা ঠেলে কোলতে পারে। দেখতে দেখতে, মতবুৎ একটা দোহার তাকো, যেটার ছুটোলো নুৎের ওপর চাকাটা খুৎো, সেটা অদধি পড়ে রয়েছে, দেখতে গেলো সে। ভাঙাটা তুলে, তার নুৎটা চাকার তলার ঢুকিয়ে দিয়ে অল ছোটো করতাই এবার চাকাবানা যেন হালকা কিছু একটা মতই, অনাবাসে সতান গেল আর লোহার ভাঙাটা সেটার মধ্যে বেন হিঁবে বসে গেছে, বলে মনে হতে লাগল। কেন যে এরকম হল, তা নিরে মাথা ঘামাবার সময়, তখন কাল’ বা তার সর্করের ছিল না। কারণ সেই চাকা পাখরটা সরাতেই, তারা দেখতে গেলো, তারই তলার, ক্রেমলিন তিক্ত-চাপটা হয়ে পড়ে রয়েছে,—যেখানে যেম অতাল মাগসকে কেউ ভারী হুৎহুৎ নিয়ে বেত’লে চেন্টে রেখে রয়েছে। এই বীভৎস নুত বেবে কাল’ আর্জন্য করে অজান হয়ে গেল—

দেশমাই সর্বপ্রথম কাল’কে দেখান থেকে তুলে এনে, নবুৎের বাইরে, ঘোর দোড়ায়, চাতালের ওপর ভাইয়ে বিল। তারপর তারা সেই জানহারা বেহীটা দিয়ে, পরামর্শ করতে বসলো, এই পর ভাষের, আত কি করা উচিত? পরামর্শে ছিল হই, এখানে তাদের আর কিছুই করার নেই কাজেই বৃদ্ধিত কাল’কে কাঁধে তুলে নিয়ে, তারা আগাতকের মত, তাল তালের নিজেদের ছুটীয়েই নিরে চলল। বৃহতে পেরেছিল তারা, এখানে যেবে গেলো, কাল’ জান বদামাত্রই বহু পাগল হয়ে বাবে।

একজন বললে,—“ঐ পাখরের চাকারই নিশ্চয় পরতান আছে।” অপর একজন উৎসাহ করে বলে উঠল,—“আর সেটা কি বহুৎ বহুৎ, করছিল দেখ’ল?” আর একজন জেবে বললে,—“চাকার জাকার সাধাবের কি কাজ হত?”

সবাই মিলে কার্গিক নিয়ে তারা নিজেদের ছুটীয়েই পর ধরল। [ক্রেমলিন]

অজিতের রক্তচোটা,

দরচেনড়া পুতির গুণব জাফ
সকালে একটা বমকা
ঘাওয়ার ভড় বইতেই কেমন
চমকে উঠেছিলেন সন্ধ্যা।
দূর বহুঃবল সঘরে অভিট
করতে এসেছেন ব্যাকের
ছোট একটা শাখার। প্রায়
দশবারসী ম্যানেজার অক্ষর



কীট সেনা
সংস্করণ

ডেনা (ডেন) অক্ষর.....।

কিছুতেই মনে করতেন
পারছেন না সন্ধ্যা।
বাইরের বৈঠকখানা ঘরটাই
দাকার বাবুদা হল। কোন
বিকে কোন অনুবিধে না
হয় তার সম্পূর্ণ আয়োজন
অন্য কিছুক্ষণের মধ্যেই গেরে
কেলগ নীতা। দুঃখাত পা

হুটে, যান সেরে অক্ষরবাবুর পাশে বসে বাঙলা শেষ
করলেন সন্ধ্যা। সব সময় ভাসে-পাশেই ছিল নীতা—
প্রয়োজনীয় সব কিছুই এসিমে দিয়েছে। বার বড়, আর
বহু বড়ের ছেলে দুটিও সঙ্গে সঙ্গে ছিল। বেশ সঙ্গতি
সুন্দর আচার-আচরণ নীতার। বহুবারই কাছে এসেছে,
চমকে উঠতে ঘরেছে সন্ধ্যাকে। একটা ডেনা হাসির
আভাসে যেন সব সময়ই আড়াল থেকে উঠি যেতে আছে
ওর মুখে। কিছুতেই মনে পড়ছে না। কোথায় দেখেছেন
কবে দেখেছেন? আকিমে বসে ঢেঁকি করতে করতে হাতে
লাগে পেনসিল নিয়ে আনমনা হয়ে গেলেন সন্ধ্যা।
না—মনে পড়ছে না। অব্যব কালে মন বিলেন।
অক্ষরবাবু কারুণ্য এগিয়ে থরে সাহায্য করছেন।
একবার মনে হল অক্ষরবাবু কোথায় বিয়ে করেছেন
জিগেস করে দেখবেন না কি। না-বাক। শালিনতার
বাণে, বানিষটা আবার পদমর্দ্যপ্রায়ত বাধে।

অক্ষরবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন—আবার দ্বী নীতা।
—নীতা।

নীতা হাত তুলে নমস্কার করল—ঐ নমস্কারে চোঁটে
কোনে এগুটুকুটা হাসির তিলিক। আর টুক তখন
বেকেই রক্তচোটা, খরচে বরা স্বভাবের ওপর একটা বমকা
ঘাওয়ার ভড় উঠল। কেমন যেন অর্ধপূর্ণ হাসিটা—

সন্ধ্যা নাপার অকিল থেকে বেরিয়ে গেটের মুখে
দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালেন সন্ধ্যা। স্বাভি-
শক্তিটাকে একই নাক। চিত্তে চলে। ঠাকালারপার
কোথাও একই বসলে হয়। অক্ষরবাবুকে বলে এসেছেন
একই বেড়িয়ে বাসার কিরবেন।

একিক শুধিক মুখে একটা তুল সলার মাঠের বেকিতে
বসলেন সন্ধ্যা। অনন্য নাই, অন্ধকার চরে গেছে।
কিন্তু ওর মধ্যেও সকালের বেলা সেই হাসিটা স্পষ্ট দেখতে
পাচ্ছেন সন্ধ্যা। উৎস রক্তাক্ত পাতলা দুটি চোঁটে টিপে
নিটোল ছোট চিকুকে ছুটি কুক্কিত রেবাব টেউ তুলে,
আর ঐ সঙ্গে কাল কাল টানা চোবের পাক। দুটো বার

দুই কাপিয়ে—এই যে হাসি, এ খুব চেনা। বিপ্লবিত
অজ্ঞারে ক্রত গম্যতাতে বেড়িয়েছেন সন্ধ্যাপ। কৈশোর-
মৌসুমের সন্ধ্যাপের পর্বে ছুটে গিয়ে পৌঁছেছেন। মনে
হচ্ছে এখনি যেন মনে পড়বে। আর একটু ভাবলেই।
নীতার চেহারাটা ভাবছেন। পোষাকে-আপোষাকে আতি-
আভ্যন্তরীণ পাঠ্যশালা। চোখে মুখে বসন্তের সাজেই আছে,
আবার যুদ্ধের মতো সে সাজেই কাটছে একটা ছেলে-
মাস্তুর চপলতার প্রকাশ হয়ে পড়তে দেখেছেন। ঠিক
তখনই মনে হয়েছে এইবার বোধহয় জিনে ফেলা হবে।

হঠাৎ বিদ্যায় পুস্তকের মত চমকে উঠলেন সন্ধ্যাপ।
মনে পড়েছে—অমিতা। নীতা নয়, অমিতা—এখনকার
নীতা। কলেজের পাশে উঁচু পাঁচিল দিয়ে বেড়া বসন্তপুর
মহাশয় খালিক! বিভাগের কার্ট্রাসের ঘরে অমিতা।
ক্লাসের সেরা মেয়ে। সহরে কিশোর এক সাহিত্য-
প্রতিযোগিতার আয়োজিতে সন্ধ্যাপকে হারিয়ে প্রথম
স্থান অধিকার করেছিল অমিতা। প্রাইজ নেবার সময়
সন্ধ্যাপের আরও মুখের দিকে চেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন।
এই হাসি সেদিন তার স্মরণীয়। এর পর পথে বাটে
যেবা হলে আবার সেই হাসি। সন্ধ্যাপের মনে প্রথমটা
ইয়ার যোঁরা—ভারতের তখন: ইয়ার তৎপালটাল।
এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা চোখে মুখ-বিশ্ব—সর্বত্র
কিশোর এক অপূর্ণ শিখর। তখন কিছু আর মুখ জুলে
তাকিয়ে থাকতে পাওত না অমিতা। তাকিতে মুখ নিচু
করে নিতে গিয়ে খুঁটা টকটকে লাল হয়ে উঠত।
ভারতের একদিন কি ছেলে মানুষিই না... ছিঃ ছিঃ।
স্বাধীন বহুরের সন্ধ্যাপ বিশ্ব বহুর আপের কবাকুলো
লাভতে গিয়ে বোলা মাঠে বলে বেধে উঠলেন। ছিঃ ছিঃ
—কি করে আবার নীতার সাহায্যে গিয়ে লাড়বেন!
স কি জিনিস পেয়েছে? নিশ্চয়ই পেয়েছে। তা না হলে
হবন ভাবে কেউ...।

বালায় ভিরভেই হল, না কিরে উপায় কি! হাত
যেন কপটা। লাইট জেলে অজ্ঞান বাইরের বাতাসের
বাইরে করছেন চিত্তিত মুখে। সন্ধ্যাপকে সে-ই আশঙ্ক
য়ে বসলেন—কোথায় গিয়েছিলেন? তাগরাগিরা দাড়া
হব বুঝে এস...।

—কুলের মাঠে বসেছিলেন। মাথা ধরেছে।

অজ্ঞান বাইর হয়ে উঠলেন—তাহলে আর কেউ না
করে থাকে। হাতেরা সেবে নিজে করে পড়ুন। আঁধা
নীতাকে গিয়ে বলি।

একটু পরেই যেতে বসলেন সন্ধ্যাপ, পাশে অজ্ঞান বাইর।
নীতা সাহায্যে বসে পরিবেশন করছে। অজ্ঞান বাইর কিছুক্ষণ
আঁধারের গল্প চালালেন, হ্যাঁ, না উত্তরে বসে গিয়ে মুখ
নিচু করে বেধে যাচ্ছেন সন্ধ্যাপ। একবারও মুখ তোলেন
নি। ইচ্ছে করেই। অজ্ঞান বাইর এক সময় হঠাৎ বেতাল
হল সন্ধ্যাপ বেশি কথা বলছেন না। সঙ্গে সঙ্গে সজ্জিত
অবে প্রায় করলেন—মাথা ঘরাটা আরও বেড়েছে নাকি?

—এতকণে তোমার বেতাল হল। কি বকতেই
পারি জুনি।

নীতার কথা শুনে লজ্জায় অকস্মিক হয়ে পেলেন
অজ্ঞান বাইর। আর সন্ধ্যাপ নিজের অজান্তে একবার মুখ
জুলে চেয়েই অস্বাভাবিক হয়ে পেলেন। কাল কাল চোখে
দুটো মেলে পড়ে গরম দিকে চেয়ে আছে নীতা—ঠোঁটের
কোনে সেই চাপা হাসি।

কোন রকমে ঝাঙকা সোবে বাইরের ঘরে এসে
ইজিচেয়ে গেলেন কানকটাকে অঁকতে থাকা নিজের
মুখটাকে আঁড়াল করে রাখলেন সন্ধ্যাপ। ভাবতে! কি
সহজ তাইই হাসতে পারে নীতা। অতীতের একটা
ছেলেমানুষি ঘটনার সন্ধ্যাপা কি তাকে এতটুকু স্পর্শ
করে না! ছিঃ ছিঃ কি ছেলে মানুষিই না করে বসেছিলেন
সন্ধ্যাপ। আচ্ছা, এই পরিণত জীবনের কাছাকাছি
পৌঁছে ঐ সব ছেলেমানুষিগুলোর কি এমন সার্বিকতা
আছে এখন? শুধু অস্বাভাবিক সন্ধ্যাপের হাত?

কাগজের আঁড়াল থেকে সবই টের পেলেন সন্ধ্যাপ।
নীতা বলে এসেছে। বিদ্যায় যেকোনো, বসতি টাকিয়ে,
ঠোঁটের ওপর এক হাসি হল বেধে বসলেন—আবার করে
পড়ুন।

—এই বাই। আর ব্যাক্য ব্যয় না করে সোজা উঠে
গিয়ে বসতিতে বসে আশ্বাসপান করলেন সন্ধ্যাপ।

—কোন দরকার পড়লে, পাশের ঘরে আমায় হইলাম,
ভাকবেন।

—আচ্ছা। দাঁড়িয়ে বসলেন সন্ধ্যাপ। এবার কি
বলবে কে জানে।

—আলোটা নিভিয়ে দেব।

—হঁ।

ঘণ্টারি আশ্রয়ের বাইরে নীতার আবহা নৃত্তি বেধা ঘন্টিছে। নিশ্চয় মনেই যেন হাসছে। সুইচের কাছে ঝাঁড়িয়ে দৃষ্টি নিচু করে কি যেন ভাবছে চুপ করে। নিশ্চয়ই ফেলেনোয়ার সেই একদিনের ঘটনার কথাটাই—

—বসন্তপূর্ব কলোজে আপনি কি কখনও পড়তেন?

কাঁঠ হয়ে উঠে রইলেন সন্দীপ। অব্যবহিতসেই না। ও আত্মক, ওব শেখেরটা পোনার আগেই সন্দীপ ঘুমিয়ে পড়েছেন।

ঘরের আলো নিভিয়ে দ্বন্দ্ব তেজিয়ে চলে গেল নীতা। কিন্তু তাকে কি বিশ্বাস করতে পেরেছেন সন্দীপ যে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন? তারপরের তিন ঘণ্টা সন্ধ্যা সন্ধ্যা আকস্মিক যেনে চাইলেন সন্দীপ। জলখাবারের টেবিলে বসে নীতা বসন্ত নামনে নেই কথাটা পাড়লেন, বললেন—আমি এখনি আকস্মিক যাব। আজকের মধ্যেই চেকিং শেখ করে কাল সকালে জায়া করব।

অজ্ঞান বাস্তব হয়ে বললেন—সে কি। আজকের মধ্যে কি সব হবে? তাছাড়া হঠাৎ এত তাড়া-তাড়িই বা—

—হ্যাঁ আকস্মিক পৌঁছে কালই একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ সারার কথা—। আর হল। হল না। চুপচাপ চা হাতে নামনে এসে ঝাঁড়িয়েছে নীতা। —কালই যাবেন? কেন?

অসম্ভব আশ্রয় কথাই পুনরাবৃত্তি করলেন সন্দীপ। হেতু আকস্মিক কাজ আছে।

তারপরেই আকস্মিক চলে এলেন সন্দীপ। তাড়াতাড়ি কেয়ার কথা বার বার বলে বিরোধে নীতা আশ্রয় সন্ধ্যা। ভাল করে নাকি একদিনও বাতাস ঘরনি। বেকী রাত না করে সন্দীপ সন্ধ্যাবেলায় ফিরলেন। কিরতে হল। অত করে বলে কেয়ার পর না করা অন্ততঃ। অজ্ঞান বাস্তব তাগেই বাড়ি ফিরেছেন তাগেই ঘরেছে, তা'র সঙ্গে দিয়ে পর করা বাবে। তারের এই কয়েক ঘণ্টা কোন রকমে কাটিয়ে কেয়ার বাবে। আর কিছু বাড়িবাড়ি হয়ত করবে না

নীতা। অত্ন রাতে যাক্ষে হয়ত হাসবে। তা হাত্মক। ওর ঘরের দিকে না চাইলেই হল।

কিন্তু বাস্তব পৌঁছেই আত্মক হয়ে গেলেন সন্দীপ। অজ্ঞান বাস্তব নেই, ফেলেনের নিয়ে বাস্তবে বিরোধেছেন। নীতা হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন—কথা যেনেবেছেন দৃষ্টি দৃষ্টি। উনি এ'র নিয়ে বাস্তবে গেলেন। এগে পড়বেন। আপনি দৃষ্টি হাত পা ঘুরে বসুন। আমি জলখাবার আনছি।

এ ঘরনের একটা পরিষ্কারি যেনে একবারেই প্রস্তুত ছিলেন না সন্দীপ। এমন একটা নিরাশা মুহূর্তে নীতার মুখোমুখি বসতে হবে এ যেন বসন্তও করনা করেন নি। এটা কি নীতার যেক্ষাত্ত্ব বাস্তবনা নয়?

জলখাবারের টেবিলের ঝিল্লীত্ব দিকে চুপটি করে পালে হাত দিয়ে বলে আছে নীতা। সন্দীপ বেশ গভীর-চুপ বুঝে খেয়ে যাচ্ছেন। জানেন, হুট চোখেই বুঝি তাঁরই ওপর নিবন্ধ আছে। বাস্তব। নীতার লজ্জা সন্ধ্যার বাসাই না বাস্তবে পাঠে, কিন্তু সন্দীপের আছে।

একটা অসম্ভিকর দীর্ঘবতঃ যথেষ্ট সময়টা কেটে গেল। বাওরা শেখ করে ইজিচেয়ারে এসে বসলেন সন্দীপ। আশ্রয়, নীতাও আর কোন কথা বলেনি। ইজিচেয়ারে বসতেই বসন্ত একা বসে সন্ধ্যা কাটাবার অ'ব'গ করে বেবার অন্য পালের দর থেকে একটা বই নিয়ে এসে হাতে দিয়ে বললেন—তাল পর-প'য়েছে। আপনি পড়ুন—আমি রাষ্ট্রের যোগ্যক যাই।

নীতা চলে যেতেই গতির নিঃশ্বাস ফেললেন সন্দীপ। বেশ আশ্রয় করে ইজিচেয়ারে পা এগিয়ে দিয়ে বইটা খুলতে গিয়ে সন্ধ্যাবে একটা বাস্তব থেকে দোষা হয়ে বললেন। ছোট এক টুকরো তপাল করা কাগজ বস্তুর ওপর এসে পড়েছে। এবং ওটা যে কিসের কাগজ বুঝতে এতটুকু অসম্ভব হল না। সেই বিশ বছর আগেকার ফেলেন বাস্তবির বসন্ত-চিত্র। চিত্রের তাল খুলতে গিয়ে হাতটা কাগজে। ভাঙা ভাঙা কাগজ হাতে চারটি অক্ষরের রোমান্টিক একট শব্দ। সেই সঙ্গে সুখের অজ্ঞানের একটা চিত্র জলজল করছে চোখের সামনে। এতটুকু জান হলনি।

খুল-কলেশ ফেরৎ বুঝি নেমেছে। বাস্তব পাঠে

একটা বড় পোকামের ছাউনির তদার একা বই হাতে
আকাশের দিকে চেয়ে চুপটি করে ঝাঁড়িয়ে অ'নত।
পাশে এসে ঝাড়াল প্রতিযোগিতার হারিয়ে বেওয়া সেই
কলঙ্কেত হেলেনি। একটা আঁকরের বেঁচে সেও ছিল।
কিছু এখানে একাধে স্থান পেয়ে বাওয়া আশাতীত।
লক্ষ্য পেয়ে একটু তাকাতে ঝাড়াল অনিতা। চুপ চাপ
সময় কাটছে। সুদূর অকোরে খারাব দিকে তাকিয়ে।

ছেলেটিই এখনে ক'দা বললে। মোটেই বরকারি
ক'দা ন'হ। ও—।

—যেহেতু জোরে বাঁচছে, না ?

一、

—ବହୁଦଳେ ବାଧାରେ ଦେ ଆସି ।

কোন অশব্দ নেই। আরও কিছুকণ নীরবে কাটল।
ছেলেটি বললে আবার—একটু বোধহয় কমেছে।
বেহিমে গড়ি। হঠাৎ একটু ভিঁসে। কতকণ আর
ধাক্কান যায়।

—31—

—କେଉଁ ?

— ४२५ —

পাশে কিয়ে জাইতেই রাস্তা দুখের ঢালা হাদিটা আট
বন্ধ পড়ে গিয়েছিল। লোকের যায় নি।

ভাব পরেই একটা বিজয় কুর্ভ : খাতার পাতা
 ছিড়ে কাপা হাতে লেগা—ওষ বইটা একবার পড়ার
 অভিশার চেয়ে নিজে একটু পরেই আবার কিরিয়ে
 দেওয়া।

মোহাম্মদের মত বসেছিলেন সখীপ। অলসবাবু
আর তার ছেলেকেরেই হাঁক-ডাকে চরক ডাঙল।
ওরা ব্যাটার করে কিরল। দু'একটা কথা বলে অলস
বাবু ত্তেতরে চলে গেলেন। আর দুহাতে বইটা আঁককে
করে গুছ হয়ে বসে রইলেন সখীপ।

তারপরেই বিন সন্ধ্যাে চলন্ত পাকিতে বসে স্তেঘনি
তর হয়ে বসে সন্ধ্যাে অনেক কথাই ভাবছিলেন।
ভাবছিলেন—অপণিৎত বয়সের করেকটা ছেলেবাবুনি
কার্যকলাপ নিয়ে এ ছুটো বিন নীতা মাড়্যাচাড়া করে,
বেশা করে কি আনন্দ পেল। ওতে ওর লাভই থাকি।
বিবাহিত জীবনে তাকে অতীত বলে মনে হয় নি।
ভাগ্যবতী মেয়ে নীতা, তার যুগের রীত-উল্ল হাসিটুকু
তার অন্তর সম্পর্কের সাক্ষ্য বহন করে আছে সব সময়।
ওকে কিসের প্রয়োজনে সে এখনও চিঠিটা সন্ধ্যাে তুলে
রেখেছিল। যে চিঠি, সবাই বুঝিয়ে পড়ার পর অন্ধকারে
বিছান। ছেড়ে উঠে বই বেড়ে চুরি করে নিয়ে আসতে
হয়েছে সন্ধ্যাপকে। এবং শু্য যাত্রা এখন এই বুক পাতটে
সেই এক বড় কাগজের টুকরো। পড়ে আছে মনে করতই
কান হুটো। আলা করে উঠছে—সে চিঠি এতদিন কেন
তুলে রেখেছিল নীতা? ও স্বভিটুকু করে নিশিদ্ধ করে
বেওয়া উচিত ছিল। পরিণত জীবনের সঙ্গে ওটুকুকে
বহন করে নিয়ে চলার এমন কি সার্থকতা আছে।

চিট্রিটা ছিঁড়ে কেঁলাবার সঙ্গে পশ্চট থেকে বের করে
আবার একবার চমকে উঠলেন সন্ধ্যা। গোটা গোটা
অন্ধরে পরিণত হাতের আর একটি চিট্রি।

—“এটা থাক। জামি এটা আপনি চুটি করতে চাইবেম। কেন না, কিছুতেই সম্বন্ধ হতে পারেননি। তাই আপনাদের বেতে দিয়ে এক সম্বন্ধ এটা সঠিকের রাখলাম। আচ্ছা, এসব কি চুটি করলেই চুটি যায়? হয়ত এ সব শুধুমাত্র ঈশ্বরের মিত্রকে ছেলেমানুষি। তা হোক। কিন্তু যত বয়স থাকে, পড়ে কি যে হাসি পায়।, সত্যি বলুন, পায় কি না?”—

পায়। সত্যিই পায়। বেশ বুকতে পারছেন সখীপ।
কেন না। এতদূরে তিনি নীতায় যত বেশ সহজভাবে,
সহজ মনে ছাপতে পারছেন।



আধুনিক পরিবারে অভিনব সার্ফ



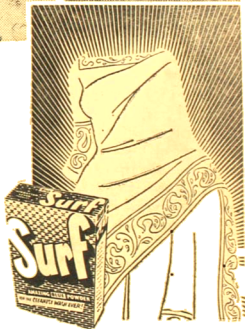
‘আমাদের আজকের জীবনে...’

যেখের গৃহিণী প্রেমা সুন্দরী বলেন

‘আমাদের আধুনিক এই জীবন ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছে।
কিন্তু জিনিষটাই, আর কালেক্ট করে আরও বেশি জিনিষ
টাই—যেখের গৃহস্থালী জিনিসের জীবনটা কেবল জি.
সুন্দরী। অভিনব। তিনি বলেন, ‘আজ এ ধরনের গৃহ
আধুনিক, উন্নত জিনিষ রয়েছে পাওয়াও হচ্ছে। এই
জিনিস সার্ফ, ব্যবহার করে সত্যিই আনন্দ হয়। তার
সাহায্যে কাপড় কাটার জন্য অসুবিধা নেই।’

‘সার্ফ’ই যেখার কেন্দ্র মতলা কাপড় চুপিয়ে সুন্দর করে
দেখানোর জন্য কাপড়কাটা কেবল ব্যবহার করা হয়।
‘তাই ব্যবহারকারী ব্যক্তি কাপড়কাটা—সার্ফ, পাউ
ডারফ, সার্ফ, সোফাস্টার, ওয়াশিং মেশিন ব্যক্তি
চুপিয়ে সার্ফ করে।’

আপনি সার্ফ ব্যবহার করেছেন? সার্ফ ব্যবহার কাপড়
কাটার ব্যবস্থা। সার্ফে সত্যিই যে—সার্ফ সার্ফ
কাটা কাপড় আবার ওয়ে অনেক জায়গা, অনেক বেশি
করা হয়। তাইতো করে আর সার্ফ সার্ফই করে।
আপনিও এখানে সার্ফ কাটাতে শুরু করুন!



সার্ফে কাপড়জামা সবচেয়ে ফরসা করে কাচে

দিল্লি পিয়ারের তৈরী

BU. 18-RS. 80

কালিঙ্গের বেঁচে একটা

কালো পিচের ঘোড়ার রাজ্য।
পাহাড়ের বুক দিয়ে বঁকে
বঁকে সলিল গতিতে লোক।
নেমে এলেছে একেবারে
শিলিগুড়ি পর্বত। রাজ্য
একটিকে সুউচ্চ পর্বত
প্রাচীর, অগ্নিকণ্ডে নেমে
গেছে পতীর বাত। তার



বেঁচে অগ্নী নীচে বেঁচে যায় ভিত্তার অবিপ্রান্ত
প্রান্তধারা। হুঁপালেই সবুজ বনানী। শাল পেগুন
আর বেঁধাক্তর ঘন সর্পিবেল, বনজ-সম্পদ আর বন্য
জানোয়ারের আকর্ষণতারে আবাসভূমি।

এইই একপাশ দিয়ে চলে বেঁচে একটা পায়ে হাঁটা
পাহাড়ী লম্ব। এখানে ওখানে ছাড়ানো ছড়ানো: বহু-
দানা কাঠের বাড়ী। অবিচালী সবই পাহাড়ী। বেশ
ছোটগাট পাহাড় আর জলসেই ছাওয়াই খেঁচা একটা
ছবির মত গড়গ্রাম—ভান, কালিপোড়া।

এখন শরৎকাল। পূর্ব তখনও অন্ধকার নি কিছু
অজ্ঞপ্রায়। সমস্ত আকাশে সাতরঙের এক অপূর্ব সমন্বয়।
পাহাড়ের গায়ে গায়ে অনাবরণে সবাব আলোক্যে বেড়ে
ওঠা নানা বড়ো পুষ্পসমার সমস্ত পাহাড়টাকে এক
অপরূপ পুষ্পশোভার মাঝিয়ে ফুলেছে। সারা গ্রামটা
এখন আনন্দের প্রাণবন্ততার উদ্গল।

জু বুধের মতো মুকলির মনে কোন আনন্দেরই
নয়। আগুন না। বড়ই সে বৃষ্টি মেলে সমস্ত প্রকৃতির
বিকে প্রাণ তবে, তার ততই মনটা তার ঘাবার ভয়ে
গর্ভে। তার বহনটা সবাই কেমন স্তব্ধ করে মাথার
হল দিয়ে মাঝিরেই নিজেই, কেমন চমৎকার জামা
চাপড় পরেছে। আর মুকলি।

আলো লাগে না মুকলির। কি অম্মা সাজবে মুকলি,
তার অন্যই বা সাজবে সে। লোকন তো আর কি
মাগবে না তার কাছে কোনদিন।

মনটা ক্রমশঃ ভারী হয়ে উঠতে থাকে তার। নির্ভ
বকে চায়ের: পাতা তরা মুড়িটা খাটিতে মাঝিয়ে বলে
তে মুকলি।

আজ এক ঘরঘর
ওপর হলো লোকন তাকে
হেঁকে চলে গেছে। এখানে
মুকলি ভেবেছিল লোকন
হয়তো মংগুর দুইনি
কাঠীতে উত্তর খাটিয়ে
পয়সা বোঝাবার জন্য।
এখন বেঁচে তাই মংগুরের
ঘরটো তো একটু বেঁকে

যাবে। সেই মজই আসতে পারছে না লোকন। মরতো
লোকনের ছেলে বয়েছে তার পেটে আর লোকন কি না
এসে পারে।

কিন্তু একদিন এলো লোকনের মৃত্যু সংবাদ। এখানে
কানাদুয়ার তারপর প্রকাত। লোকন নাকি এখন
মংগুরে জুয়া আর মদের মধ্যে ডুবে আছে। কেউ কেউ
বলে, কে একজন মেয়ে:মুখও নাকি আছে। সে আর
মুকলির কাছে আসবে না। মুকলি বিশ্বাস করে নি ওর
কথার। হয়তো তার পেয়েছিল বিশ্বাস করতে।

সেদিন মুকলির বাবা বুধ মুকলিকে ডেকে বিজ্ঞেস
করলে, লোকন এখানে তোর কাছে আসে ?

লম্বা পেলো মুকলি। বুধ ততো তাকে কোনদিন
লোকনের আশা সবচেয়ে কিছু বিজ্ঞেস করে নি। তবে
কি কথাটা বুধেরও কানে উঠেছে। কিন্তু কি বলবে সে !
লোকন তো গতিই অনেকদিন আসে নি। -

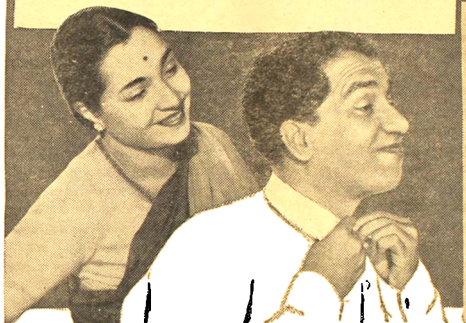
বুধ মুকলির উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললো,
কতদিন আসে নি ?

—এক মাস হবে।

বুধ আর কোন কথা না বলে পুছোন ভালিমাথা
কোটা নিয়ে বেড়িয়ে পড়লো।

কিন্তু বধন বাড়ি ফিরলো বুধ মনে হলো কে বেন
আজ চোখে কালি মেলে দিয়েছে। কোন কথা বললে না
বুধ এসে একেবারে হুপচাপ ভবে পড়লো। আর
বলারই বা কি আছে ? লোকন যে আসবে না একবারটা
মুকলিকে জানিয়ে কি লাভ। বুধ অনেক চোঁচা করেছে
লোকনকে বোঝাবার, তাকে কিহিয়ে আনবার কিন্তু
পায়ে নি বুধ, যেতে গেছে লোকনের কাছে। সত্যিই

‘যদি ভাবেন ওঁকে খুশী করা সহজ...’



‘...তবে নিশ্চয়ই আপনি ভুল করবেন’—বৌয়ের ত্রিমতা আর, আর
প্রভু বলেন। ‘কাপড় কামার বেলাতও কি উঁনি কম বুণ্ডে...!’
‘এবার অবশ্য আমি ওঁর লামা কাপড় সবই সানলাইটে কাচি—
প্রচুর কেরা হয় বলে এতে কাটাও সহজ আর কাপড়ও ধুধাবে
করসা হয়!...উঁনিও খুশী!’
‘কাপড় লামা হা-ই কাচি সবই ধুধাবে আর আলমলে করসা—
সানলাইট ছাড়া অন্য কোর সাবানেই আদার চাই না’

দুইটিই। মজার মজার কাট, কোরো
সানলাইটেই মজা কাপড়ের এক
ভাল যা কোর কোর সাবানেই নিতে
পারবে না। অগণিত ক্রাই করবেন।

সানলাইট

কাপড় কামার সঠিক যন্ত্র নয়!

বিশ্বমান নিভারের তৈরী



লোকন জ্বা আর মনের মতোই আছে নহতো যুগ্ম
মস্তিষ্ক যখনকে সবার সম্মুখে এমন অপরূপ করে তুলিয়ে
দিয়ে পাঠে।

যায়ে এক সময় কবার কবার যখন মুকলিঃ অনেকটা
লাফটা করে বললে, তাহনার কি আছে বল। লোকন
এলেই যা কি আছে না এলেই যা কি। আমার ওই এক
টুকরোটা বাগানটা আছে আর এই মূল্যবান বোতামটা।
এতে যা আর হয় তোমার আমার হৃৎকেন্দ্রে পেট বেগ তথ্য
যাবে। তারপর আমি যত্নে দেখে—

মুকলি চূপ করে থেকেছে। আর কি-ই বা বলবে
মুকলি। মেরে মা'রুয়ের কীভাবে শুণ্ড বাঁধা পরাটাই
শব্দ নয় এ কথা যখনকে কি করতে বা হেঁচকাবে।

তারপর অস্বাভাবিকভাবে এমনি করে কেটে গেল।
লোকনের চেলে এমন মুকলির পেট থেকে নেমে কোলে
এসেছে। কিন্তু লোকন আর আসেনি। ছেলে হওয়ার
পর মুকলি ভেবেছিল লোকন এইবার নিশ্চয়ই আসবে
তার ছেলেকে দেখতে। কিন্তু না—লোকন এলো না।
সেবে আবার একদিন যখন সেই পুত্রের তালিমারা কোটটা
পায়ে চালিয়ে চলল লোকনকে তার পুত্র সন্তান অঙ্গপ্রস্থের
সংসার দিতে। হঠাৎ লোকন কোন বসন্তই পারিনি
এতদিন। মুকলি আশার আর উকীলনার স্বপ্নের করতে
হাকে। যদি যখনকে সবেই লোকন ক্রিয়ে আসে—
তা'হলে?—কিন্তু না—আগের দিনের মত যখন একাই
এলো। লোকন আসেনি, আসবে না সে।

—এই মুকলি—

যখনকে ভাঙে মুকলি চমক ভেঙে তাকায় করে।

—সন্ধ্যা হয়ে গেছে তোমার মার্টের কাপ কি এখনও
শব্দ হয়নি। ছেলেটার কেঁদে কেঁদে গলাটা যে চিরে
গল, তোমার কান কি শোঁছর নি?

মুকলি চাপা তার হৃদীটা শিটে নিয়ে উঠে পাড়লো।
ভিত্তি, ছেলেটা বড় কাঁদছে। আর কাঁদতেই বা অপরূপ
ক। অনেককণ মুকলি বাঙালিতে পাবেনি তাকে।
কই কোরে হেটেই বাকী কিংলো মুকলি। হৃদীটা
ঠিক থেকে নামিয়ে বুলা হাতেই ছেলেটাকে কোলের
পর জলে নিয়ে পাগলের মত চুপ থেকে লাগলো। এই

ছেলেটিই এখন তার সম্পদ। একে নিয়েই মুকলি
বেঁচে থাকতে চলে চিরকাল।

সেদিন পিছন এলে একবার বাম মুকলির হাতে
দিয়ে গেল। মুকলি বামটা হাতে নিয়ে একটুখানি
সময় তাকালো। তাকে চিঠি দেখার মত কেই বা আছে
তবে কি লোকন তাকে চিঠি লিখেছে এতদিন পরে
সে কি তাহলে আসছে তার ছেলেকে দেখতে
উত্তেজনার মুকলির হৃদীটা টিপ টিপ করতে থাকে।
বামটা ছিঁড়ে কেলো মুকলি:—না, লোকনের চিঠি নয়।
তার ছেলের হৃৎকান কটো।

সত্যি যে তখনলোক কটো হৃৎকান পাঠিয়ে যেবেন
একথা একবারেই তাহতে পারেনি মুকলি। আজ পর্যন্ত
কত লোকই তো তার ছেলের কটো জ্বলেছে। সবাই
বলেছে ছবি পাঠিয়ে যাবে। যখনকে হোকারের টিকানো
নিরেখে। কিন্তু সে ছবি মুকলির হাতে এসে আজ
পর্যন্ত পৌঁছয়নি। এখন মুকলি বুঝেছে যে তার ছবি
তোলার ভানই শুণ্ড করেছে, মিথ্যা বল টিপেছে, কটো
কেউই তোলেনি। আর নহতো কটো জ্বলেছে কিন্তু
সে কটো মুকলিকে পাঠিয়েনি তাহলে কেউই। কিন্তু
সেদিন এক তখনলোক যখনকে হোকারে চা খেতে এসে
আগুন্য থেকেই ছেলেটার হৃৎকো ছবি জ্বলেছিল।
মুকলি আশাও করে নি যে কটো হৃৎকো পাঠিয়ে যাবে।
ছবি হৃৎকান হাতে নিয়ে মুকলি ভাঙাভাঙি উঠে গেল
যখনকে দেখাতে।

সেদিন দুপুরবেলা বাগানের কাছে আর মন বললো
না মুকলি। বরের বরজা বন্ধ করে তার বিয়ের সময়
যখনকে বেগুলা টিনের বাগুটা খুলে বললো। তারপর
এক এক করে তার থেকে বামতীর জিনিস বাইরে রেখে
একবারে তলার থেকে বার করলো একটা ছবি।
লোকন আর মুকলির এক সবে তোলা একবারা ছবি।
খয়ের পর লোকন তাকে নিয়ে কালিঙ্গা এ গিয়ে এই
ছবিখানা জ্বলিয়েছিল। মুকলি এখনে লজ্জার হাকী
হয় নি একবারেই তারপর লোকনের অনেক
কীড়াগিড়িতে কটোর হোকারে গিয়ে হৃৎকনে একলক
জ্বলিয়েছিল এই ছবিখানা। আজকে সে যিন্দগলোর
কথা তাহলে অনেক দিনের কথা এক রঙের বরের মত

মনে হয় মুকলি। এমন আর সে আসের লোকন নেই। মংপুর সুইমিং ক্যান্টিনার ঘানি টেনে টেনে মনটাও তার সুইমিংয়ের মত তেতো হয়ে গেছে।

মুকলি লোকন আর তার ছেলের কটোটা পাশাপাশি বেবে খিচিরে খেবে। সত্যিই লোকনের মূণের সঙ্গে ছেলের মূণের কি অশুর মিল। খেলেই বোকা বার এ বাপ আর এ বোটা। আর কটোটাও কি চমৎকার উঠেছে। খেলেই বেন আবার করতে ইচ্ছে করে। মুকলি উঠে গিয়ে খুবত ছেলের মূণে আলতোভাবে একটা চুম্বার।

কটো ছুটো কোলের উপর বেবে অনেকক্ষণ ভাবে মুকলি। তারপর বেবে নিলো একখানা ভালো কাপড় আর একটা আঁখা বার করে পরলো মুকলি। বহুদিনের অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থাকা মো অং'র বানিকটা পাউডার মূণে মাখলো। চোখে সন্ করে টেনে দিল কাছলেব তেপা। অবিভক্ত চুল শুণ্ডাকে বেশ ভালো করে ভুড়িয়ে ধাবলো। মাথার ভঁকে দিল লাল ছুসের স্তবক। একবার আঁরাধা নিষের মূণখানা দেখলে। মূণ্ড ছেলেটাকে একবার আঁর করলো। আঁক সে নিকেই একবার মংপুতে লোকনের কাছে যাবে। কতকবেই বা হাঁটা পথ। লজ্জার আগ্নেই কিরে আসতে পারবে। লোকনকে ছেলের কটোটা দেখিয়ে আসবে। কিন্তু ছেলেকে নিয়ে যাবে না অন্তর্যুত। বলা তো বার না কিছুই, বাকি কিছু হয়। অং'র লোকন বাকি কিরে আসে—

একটু আঁখা নিয়েই ছেলেটাকে মূণের কাছে বেবে বেড়িয়ে পড়লো মুকলি। মুকলিকে লাগতে বেবে মূণের মনেও একটু আনন্দ হয়। বলে, কোথায় বাড়িল?

মুকলি একটা বিব্যা কহা বলে, আঁক একবার অং'র বন্ধুর বাড়ী বেড়ান্ত বাবো।

মুকলি চললো মংপুর পথ বরাব। কালিকোড়া থেকে একটা লাল ইন্টের মোটর রাস্তা এঁকে ঝেঁকে আরো উপরে উঠে গেছে। মুকলি সে রাস্তা ছেড়ে দিয়ে সন্ পানে হাঁটা পথ ধরেই চলে অনেকটা মাহুঘরনের বুরি এড়িয়ে চলবে বলেই। জু'পানের ঝাল-সেগুন আর সেবজার মতো ঘিরে পথ চলতে চলতে মনটা তার হাতিয়ে বার নামা এলোমেলো চিন্তার মধ্যে। অং'র বেন তারা মুকলিকে একা পেরে ছেপ বসেছে।

মুকলি হেঁটে চলেছে। তারপর এক সময় পায়ে পায়ে কোথা গিয়ে এসে পড়লো মংপুর বাজার। মাথার বোমটাটা আরো একটু টেনে ঘিরে পায়ে কাপড়টা ভালো করে হুড়িয়ে নিলো মুকলি। বতই সে এগিয়ে আসছে ততই তার পা জ্বালা খেন আরো জ্বালা হয়ে উঠেছে।

লোকন তখন মনে সুইমিং ক্যান্টিনার কাছ সেয়ে হয়ে চুকছে। সাধা সন্ধ্যারের খাটনির পথ আঁক গুয়ের 'হুগা' পাওঘার ঘিন। তাই একটু হেটীও হয়ে গেছে। পথে আঁবার 'হাঙ্কিয়ার' শোকন থেকে বেশ বানিকটা চোলাই কথা মত খেয়ে এসেছে। আর একটা ব্যোতলও কিনে এসেছে। রায়ে বানিকটা খাবে। কাল তো আঁবার হুটুর ঘিন।

যে চুকলে মুকলি। মুকলির পায়ে মনে লোকন মূণ কিরে তারার মুকলি। একটু বেন চমকে উঠলো লোকন। সে কল্পনাই করতে পারেনি যে মুকলি এখানে আসতে পারে। লোকন একবারে উৎক্লিষ্ট হয়ে উঠে।

—কি ভাল সুই?—এখানে থাকতে এসেছিল!

আঁক এতদিন পরে এই সন্ধ্যায়। কথাই মনে মনে মুকলির চোখে কেটে জল আসে। তবু নিকেকে মংপুর করে লাগু কর্তে বলে, না, তোর কাছে থাকতে আসি নি আমি।

তারপর একটু বেবে বলে, তুই তো আর সেলি না, তাই তোর ছেলেবে ছবি দেখাতে এসেছি।

মুকলি বুকের ভেতর থেকে তার ছেলের ছবিটা বাব করে হাত বাড়িয়ে লোকনের দিকে। লোকন ছবিটা মুকলির হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে বাতিতে আঁকড় ঘেরে বলে, ওদর মরতানি হাং। আসলে ছেলের ঘোহাই ঘিরে তুই খোংখোং টাক: চাল, এই ওভে।

হুগার বাকি টাকগুলো লোকন পুঁকেট থেকে বার করে মুকলির হাতে স্তে দেয়।—এই নে—বা—ভাল এখন থেকে।

অপমানে সর্বাং ত্রিটি করতে থাকে মুকলির। টাকা শুণ্ডা হুঁকে কেসে ঘের মুকলি। মরমর হুড়িয়ে পড়ে 'হুগা' পাওঘার টাকগুলো।

লোকন ডাকিয়ে বেবে। মাহুঘর মধ্যে তার আঁকন

হলে ওঠে। পকেট থেকে মৃদন কেনা 'হাড়িয়া'র
বাড়লটা বাব করে মুকলির মাথা টিপ করে লাগ লাগ
ইয়ে বলে, বাবী - হারামখানী -

এক মুহূর্তখানেক।

মুকলি-অটোড্রপ বেহটা। মাটিতে লুটতে পড়ে। মাটি
জিনে ওঠে মুকলির লাগ উঠে রক্তে। মুকলি ওঠবার
চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না। চোখ বুজিয়েই মাটিতে
গড়গড়তে লাগলো। কোথায় গেল তার ছেলের ছবিটা।

পানের ঘর থেকে লোকনের প্রতিবেশী সমস্তকের
দা টেঁজতে টেঁজতে লোকনের ঘরে ঢুকলো, আরে—
লোকন ঘন কিছায়ে—

আলপানের আরো সবাই এসে মুকলির বেহটা
রাখারি করে নিয়ে গেল সমস্তকের ঘরে।

একটু পরে মুকলি ওঠে বলে। সমস্তক মুকলির
মাথাটা বেশ ভালো করে বেঁধে দেয়। তারের তেমন
কোন কারন নেই তবে কড়টা একটু গঠীর।

লোকনের ঘরটার দিকে মুকলি উঠাল দৃষ্টিতে তাকিয়ে
থাক। ঘরে তালাবদ্ধ। লোকন চলে গেছে। মুকলির
দুইচোখ বেরে কপেদ খাটা গড়িয়ে পড়ে। বাইরের
আবাতের থেকে তার অন্তরের আবাতটাই গড় গঠীর।
হেরে গেছে সে লোকনের কাছে। তাকে কিরিয়ে আমার
সেব চেঁটাও যাব্ব হয়েছো তার।

ওঠে পড়ে মুকলি। বাড়ী কিরতে হবে তাকে।
একাই বাজিল সে কিন্তু সমস্তকের দা হাড়লো না।
নিজে মুকলির সঙ্গে সঙ্গে চললো তাকে কালিছোড়ার
পৌছে দিতে।

পথে বেরিয়ে সমস্তকের দাকে বলে, আমার ছেলের
কটোটা গড়ে বয়েছে লোকনের ঘরে মেওয়া হলো না—
কাল, যদি কাটকে দিয়ে—নবতো আদিত—

সমস্তকের দা বাধা দিয়ে বলে, না—না, ও আমি
সমস্তককে দিই পায়েরে রেব।

অনেক হাতে লোকন ঘরে কিরলো। সমস্ত পল্লী
তখন ঘুমে অস্ত্রতন। পকেট থেকে বেশলাই বার করে
বাড়িটা আসে লোকন।

—তা, ঘরটা কি নোংরা হয়ে আছে। নিজের মনেই
ছলে লোকন।

সত্যিই ঘরটা বড় নোংরা হয়েই আছে। লোকন
খাঁটা হাতে নিয়ে একবার তাকিয়ে ঘেঁষে মেঝেটার
দিকে। তাড়া খোতলের টুকরো, ঘেঁষেই হাড়িয়ে পড়া
ঘরের উল্ল পথ, 'বপ্তা' পাওয়ার কয়েকখানি মোট, মুকলির
মাথার লাগ কুল আর তাকিয়ে কালো হয়ে বাড়তা তার
মাথার লাগ রক্ত। মোটগুলো লোকন একটি একটি
করে ঘুলে পকেটে রাখলো। বাড়িমির পরলো। তারপর
ঘরটাকে খাঁটি বিতে দাকে লোকন। হাত অনেক
হয়েছে। ঘুমে চোখ বাড়িয়ে আসছে তার।

কি ওটা।—

হঠাৎ লোকনের নজরে পড়ল একটা খটো।
কটোটা খাঁটি বিয়ে ঘরের অজান্তে অস্থানের সঙ্গে কপে
দিতে বাজিল লোকন কিন্তু কি মনে করে একবার তুলে
নিলো। খটো আবদ্ধা অন্তকার। বাড়ির বদল আলোর
ভালো করে বোঝা বাজে না কটোর খুঁটিটা। লোকন
বাড়ির কাছে এসে কুঁকে পড়লো কটোখানার ওপর।

হয়ে পড়লো। তার ছেলের ছবি। বেবানাসে একটু
আগে ঘরের মেঝের আছাড় ঘেরে হুঁড়ে কপে দিয়েছিল।
অনেকখণ্ড সময় হয়ে তাকিয়ে রইল লোকন।
ছবিটার মুকলি উপর থেকে পা পর্বত গড়িয়ে নেয়ে
এলেছে মুকলির মাথার কয়েক কটো লাগ বস্তের একটা
সক বেবা। এখন আর রক্তটা লাগ নেই, তাকিয়ে অধে
কালো হয়ে ওঠেছে ছবি খানার উপর।

আজ লোকনের চোখের পাতা দুটো ভিনে উঠলো।
ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হল
সে শুধু তার স্ত্রী মুকলিরই মাথা চোঁড়ির করে বেগ নি লয়ে
গবে সে তার নিজের পুরস্কেও বাড়িতে আছাড় ঘেরে তাবে
হত্যা করেছে। সে যেন এক মহাপাপক পুণ্ড্রহতা।

ছবিটা বুক পকেটে নিয়ে বাইরে এসে বাড়ির
লোকন। পাহাড়-পর্বত সব-বনালী সবত অগৎ এবং
সুত্রিমর। আকাশে ছায়াশায় তেজা নীল কোংহা
মেঝেরা সব গীতে যেন এসে আলোর নিরয়ে পাহাড়
কালো। লোকন চলতে ভুক করলো।

কালিকোড়া এবান থেকে কতখণ্ডই বা পথ
কিন্তু আজ তার পথের দুইখটা মনে হল বৃি
অনেকখানি।

কুশ-সম্বন্ধে কল্প সমস্ত
 ধর্মাবিধি নিম্নলিখিত কল্পিতে
 হইলে মহর্ষি বাসীকির
 কুল কাম্যার্থে বর্ণিত পূর্বাপর
 কয়েকটি ঘটনা-বিশেষের
 বিবরণ ও তাহার বিবরণ
 অপরিসার্য হইয়া পড়ে।

এই কারণে কতিপয় আধুনিক ঘটনায় আলোচনা মিত্রে
 নিবদ্ধ হইল।

মারীচ ও সুবাহ নামে দুই ব্রাহ্মসেতার উপস্থাপিত
 বিবাসিত্তি ঋষি কোন ব্যক্তি বাসীকির ব্রাহ্মসম্প্রদায় করিতে
 পারিতেন না। প্রতিবাহই এই দুই ব্রাহ্মসেতার
 ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার অঙ্গবিত্তি কথিত ব্রাহ্মসেতার
 একমাত্র বিবাসিত্তি ব্রাহ্মসেতার নিম্নলিখিত ব্রাহ্মসেতার
 সর্বোপরি আসিয়া ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার
 পরিচয় পূর্বক প্রবর্তন করিতে প্রবর্তন করিলেন।
 (আদিকাণ্ড, ১১ সর্গ) ব্রাহ্মসেতার, সেই ব্রাহ্মসেতার
 কাল নিঃসংজ্ঞাতাব্যবহিত্য সমস্ত। লোক কর্তৃক বিবাসিত্তিক
 বলিলেন।

“উনবোদ্ধপদার্থে মে তামো বাসীকিরালোচনঃ।”

ন ব্রহ্মোপাস্তাৎসম্য পশ্যামি সখ ব্রাহ্মসেতারঃ ২।

“আমার বাসীকিরালোচন ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার পক্ষ
 বর্ষ, আমি ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার সহিত তাহার ব্রাহ্মসেতার
 সাক্ষাৎ দেখিতেছি না।”

আদিকাণ্ড, ২০ সর্গ।

ব্রাহ্মসেতার এই ব্রাহ্মসেতার বিবাসিত্তি প্রত্যক্ষ কল্প
 হইলেন যে, সত্য কল্পমূল একশিত্তি ও ব্রাহ্মসেতার
 কল্পমূল ও উপস্থিত হইল। অনন্তর মহর্ষি ব্রাহ্মসেতার
 উপস্থাপিত্তি ব্রাহ্মসেতার প্রবর্তন করিতে ব্রাহ্মসেতার
 সহিত বাসীকিরালোচন করিলেন। সত্যমূল
 ব্রাহ্মসেতার হইল। ব্রাহ্মসেতার পক্ষাপাশী হইলেন। পক্ষাপাশী
 বিবাসিত্তি ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার
 করিলেন। এবং ব্রাহ্মসেতার বিবাসিত্তি ব্রাহ্মসেতার
 উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার
 ব্রাহ্মসেতার ও ব্রাহ্মসেতার নামে দুই ব্রাহ্মসেতার
 ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার

কুশ-সম্বন্ধে কল্প

[আলোচনা]

অন্যোদিত সেন



ব্রাহ্মসেতার উপস্থাপন করিবার
 চেষ্টা করিলে ব্রাহ্মসেতার
 ব্রাহ্মসেতার হইল। তাহা
 ব্রাহ্মসেতার মারীচ ভয়ে ব্রাহ্মসেতার
 ব্রাহ্মসেতার পক্ষাপাশী করিল।
 এই সময় ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার
 ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার

কল্পের ৩০ সর্গেও তাহার পুনরাবর্তন আছে।

অন্যোদিত। পরিচয় করিবার পর ব্রাহ্মসেতার
 ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার
 এবং একত্র ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার
 ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার
 ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার
 ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার
 ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার

ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার
 বিবাসিত্তিক করিবার হইলেন।

“ব্রাহ্মসেতার মে কল্পা ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার।

কল্পা ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ১৫।

ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার।

ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ১৬।

ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার।

ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ১৭।

ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার।

ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ১৮।

ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার।

ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ১৯।

ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার।

ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ২০।

ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার।

ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ২১।

ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার।

ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ২২।

ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার।

ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ব্রাহ্মসেতার ২৩।

হৃদয় পবনশ্রিত্যক্ত তুরঙ্গ বলঃ অস্বাঃ ।

ভক্তোঃ ভগ্না নৃপতয়োঃ হন্যমান বিদ্যো বহুঃ" । ২৪ ।

"আমি সেই অযোগিকা কন্যাকে বীরভক্তা (যিনি বীর বলে সেই হৃদয়ে জ্যাঃ গোপদলি করিতে পারিবেন, তিনি এই কন্যা লাভ করিবেন, এ প্রণ পণে আস্বা) করিয়া রাখিলাম । সেই কন্যা "বৌবনসম্প্রদা" হইলে, অনেক রাজা আসিয়া তাহাকে প্রার্থনা করিলে, আমি তাঁহাদিগকে অস্বাঃ এই কথা বীরভক্তা বলিয়া প্রদান করি নাই । হে মুনিশিখিল ! অনন্তর সেই সকল নৃপতি মিলিত হইয়া বিদ্যাগোপে আগমনপূর্বক পণ ভিক্ষা সাধিলেন । তখন আমি সেই সকল ভিক্ষাহু নৃপতিদিগকে সেই বৈবস্বত প্রার্থনা কওঁহিলে, তাহারা সেই বহু, উত্তেজিত বা পতিগালিতও করিতে পারিলেন না । হে মহামুনে ! আমি সেই সকল বীরবালী নৃপতিদিগের বীর অঙ্গ দেখিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলাম । হে ভগোবন ! পরে যাহা ঘটিল প্রবণ কল্পন, হে মুনিপুত্র ! অনন্তর সেই সকল নৃপতির, বৎস্কৃত আত্মাকে অস্বাদনিত বোধ করিয়া অতীব কৈঃপারিষ্টি ঘটিলেন, পত্রে জ্যাঃ গোপদলি বীর বিবরে সঙ্কটভিত্তি হইয়া পবনক্রোধ সহস্রারে বিদ্যাগোপী অবরোধ করত প্রাণদান করিতে লাগিলেন । হে মুনিশিখিল ! অনন্তর "সংসংসর পূর্ণ হইলে," আমার সমস্ত সাধন করপ্রাপ্ত হইল । তখন আমি অতীব দুঃখিত হইয়া, তপস্বী রাজা সমস্ত যৈবদগকে প্রেরণ করিলাম, তাঁহারাও পদম প্রাতি হইয়া আমাকে চতুঃপদ গৈত্র প্রদান করিলেন । অনন্তর সেই সকল পাপাজারী বীরহীন অথচ বীরবন্দিত নৃপতিরা, অস্বাদ্যগণের সহিত সেই চতুঃপদ সেন্য কতৃক হস্তবানু তইয়া অগোপনাগ হইয়া নানা দিকে গমন করিলেন ।"

আখ্যাত ৬৬ সর্গ ।

উপরিউক্ত বিবরণ হইতে পাঠাই প্রতীক্শয়ন হইয়া উঠিতেছে যে, বিবাহের পূর্বেই সীতা বৌবনসম্প্রদা হইয়াছিলেন, এবং ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, বিবাহের সময় অন্ততপকে আরও দুই বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া ছিল । শাস্ত্রে কথিত হয়, আশোকদ্বারঃবংশা তত্ত্বনী জিঃশতা নতা, অর্থাৎ প্রাপ্তদৌবনা, তত্ত্বনী বোত্বনবর্ষ হইতে জিঃশবর্ষবধতা মহু কথিয়াছেন ।

"কামনামরণ্যন্তিঃকৈবল্যে কল্পতরুতাপি ।

ন তৈঃবনায় প্রবেক্ষন্তুঃ স্তবনীনাঃ কথিচিৎ ।

মহুদর্শিতা । ৩। ১০৪

"কন্যা কল্পতরু হইয়া বাবল্লীকন গিত্ত-বৃক্ষে বাগ করে দেও ভাল, তৎকঃ তাহাকে স্তব-হীন পায়ে পশ্চাদান করিবে না ।"

উপস্থিত বয়সের নূনবয়স্ক সী পুত্রবয়ঃ গর্তাখান বিষয়ে মুনিশিখিল ২৭৩টি স্তবতে নিবেদন করিয়াছেন । যথা,—

"উনবাঃকল্পবর্ষহামপ্রাপ্তা পকবিশংগিতম্ ।

বত্যাভাতে পুমান্ গর্তী কৃক্ষিঃ স বিপত্ততে ॥

আতো যা ন তিঃকঃবেৎ ভৌবো চক্ৰপোজিতঃ ।

তদ্বাঃকত্যাভালাগঃ গর্তাখানঃ ন কারয়েৎ ॥"

শ্রীমদ্রামায়ণ, ১০ অঃ, স্কন্ধ ৪৭।৪৮

অর্থ,— "১৬ বৎসর নূনবয়স্ক হ্রাতে ২৫ বর্ষের নূনবয়স্ক পুত্র গর্তাখান করিলে, গর্ত কৃক্ষি হইয়া বিপত্তি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ পূর্বকাল পর্যন্ত গর্তঃশরে থাকিয়া উৎপন্ন হয় না । অথবা উৎপন্ন হইলে, দীর্ঘকাল জীবিত থাকে না, অথবা জীবিত থাকিলেও দুর্বলোজিত হয় । এইজন্য অতি বাল্যঃবয়স্ক স্ত্রীর গর্তাখান করিবে না ।"

মহাভারতের আদিপর্গ, ৬৭ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, তখন বৌবনবতীর পরাল্পন না করিলে কেহ বিবাহ করিত না । স্তবত্রয় বলিতে হয় যে, বিবাহ সময়ে সীতার বয়ঃক্রম নূনকরে অষ্টাবদবর্ষ এবং রামের বয়ঃক্রম তখন পঞ্চদশবর্ষ; অর্থাৎ রাম সীতা অপেক্ষ অন্তত তিন বর্ষের নূন বয়স্ক ছিলেন । পুনরায় অগণ্য-কণ্ডের ৪৭ সর্গে সীতার দ্ব্য বিরা বলান হইয়াছে যে বননির্গমন কালে, "মম তর্জী মহাতেজঃ বহুশা পকবিশংকঃ" অষ্টাবদ হি বর্ষাদি মম কল্পদি গণ্যতে । তখন আমার বয়ঃক্রম অষ্টাবদ বর্ষ এবং আমার মহাতেজঃ কাণীর বয়ঃক্রম পকবিশং বর্ষ ।"

সীতার এই স্কন্ধের কোনরূপ সুল-কিনারা ম পাইয়া অসত্য সাংখ্য-বর্ণনের শরণ লইয়াছেন এবং সৌখ্যমিলি বিহার বুঝা চেষ্টা করিয়াছেন বলতঃ তিনিই স্কন্ধোক্তাশ্রিত রাম সীতার বয়স প্রবণ করিয়ে পাবেন নাই ।

সীতা আরও কহিয়াছেন। “উদ্বিগ্না বাহন সমা
ইচ্ছানুগং নিবেশনে। ভূতানা মাহুযান্ ভোগেন
সর্বকামদুহিনী। আমি মাহুযভোগ্য বস্তনমুখার ভোগ
করত পূর্ণিমারূপা হইয়া ইচ্ছানুগবোধিতসের পূর্বে বাহন
বৎসর বাস করিয়াছিলাম। আমি কালের ১৭ সর্গেও
এই মর্মেই লিখিত আছে,—“গামত সীতয়া সার্থং
নিষাধা বহুবুত্বং সীতা,—বহুবুত্বং বাহনবর্ধানীত।”
ইতি বহবঃ। রাম সীতার সহিত বাহন বর্ধকাল বিহার
করিলেন।” অত্রোৎপন্ন বর্ধ উপস্থিত হইলে রামের বহন
হয়। এইগুলি পর্যালোচন করিলে দেখা যাইতেছে
যে, অবগত্যাকার বিবরণ অল্পবায়ী রাম বহন সীতার
পানিগ্রহণ করেন তখন তাঁহার বর্ধক্রম অত্রোৎপন্ন বর্ধ
এবং সীতার বর্ধক্রম চর বৎসর। এই দুইটি পরস্পর
বিরোধী বস্তুর মধ্যে কোনটি গ্রহণীয় এবং কোনটি
বর্জ্যীয় তাহা বিচার সাপেক্ষ। প্রথমেই বলা যাইতে
পারে, চর বৎসর বৎসর কল্পার লাভেই কল্প পরাক্রম-
শালী রাজমার্য সেন-সেনাতর হইতে মিথিলার
সমালত হইতেন, এই কথাটি কখনই বিশ্বাসযোগ্য হইতে
পারে না। আমার মনে হয়, সমাজে বহন গোষ্ঠীধানে
অক্ষর বর্ণপ্রাপ্তি এবং কল্পার একাধিবর্ধে বিভাবনা
হইলে, মাতা, পিতা এবং ঘোড়া স্রাতা এই তিন জন
নরকে পশন করে (সংবর্ত-সংহিতা), এই প্রকার প্রচলন
হইয়াছে। তখনই সমাজের উপযোগী করিয়া প্রকৃত
বৃত্তনার রূপান্তর করিবার প্রবৃত্তি হইয়াছে। পূর্বাঙ্ক ১২,
৪৪তম ও মহাভারতের বচনগুলি স্বরণ করিলে ইহাই
বলিতে হয় যে, অবগত্যাকার আত্মবিকি বর্ণনাকালি
প্রাক্ষিপ্ত না হইয়া যাইতেই পারে না। অপরাপর
পুণ্যগ্রন্থেও একই উদ্দেশ্যের বর্ণনাকালি হইয়া বিবাহের
সময়ে সীতার বহন কখন হয় এবং কখনও বা আট
বৎসর প্রেরিত হইয়াছে। অক্ষরভূতাব বৃত্তপিথিয়ান্নে,
“ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রসায়নে এত
ইতর বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মধ্যে মধ্যে নূতন
নূতন নানা বিধে বিরচিত ও সংযোজিত হইয়া
আসিয়াছে ইহা বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না।
উক্তরকর এত বহন প্রাক্ষিপ্ত হইয়াছে যে, কোন একর
প্রচলিত রামায়ণ অধ্যয়ন করিয়া আমি রামায়ণের

তাৎপর্যার্থ নিতপন করা সম্ভব কর্ণ নহা।”

মাত্রাজান বিবক্ষিত এবং নিলক্ষ হইয়া কল্প
সমস্ত হস্তকর বর্ণনা প্রাক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহার আরও
একটি আশ্চর্যমান বৃত্তান্ত উক্ত হইল। উত্তরকাণ্ডের
৪৬ সর্গে মহাতেজা অশ্বত্থা, নারদের উক্তির পুনরাবৃত্তি
করিয়া কহিয়াছেন যে, “তাৎপ সীতাকে লভ্য আনিয়া
যর সহকারে মাতার প্রারম্ভকোভাবে বলা করিয়াছিল।
মূল সংকৃত য়োক্ত উক্ত হইল,—“লভ্যমানীষ বহন
মাতের পরিরক্ষিত। ঐবামতৎ সম,খ্যাতং এব রাম
মহাবলঃ।” ৪৪ মহাবলবী রাম! এই সমস্ত বৃত্তান্ত
তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম।

যাহা হউক, বলিতে হয় যে, বহনবাস হাজার সময়
বাহের বহন ছিল সাতাশ বৎসর এবং সীতার বহন ত্রিশ
বৎসর। লভ্যকাণ্ডের ১২৬ সর্গে লিখিত আছে,—“পূর্বে
চতুর্দশ বর্ধে পক্ষমাং লক্ষ্যগ্রহঃ। তাৎপার্যঃপ্রমং
প্রাপ্য ববধে নিরতো দুমিৎ। ১। এইরূপে চতুর্দশ
বৎসর পূর্ণ হইলে পর পক্ষমী ভিত্তিতে রামচন্দ্র তৎপার্যকে
আশ্রমে উপস্থিত হইয়া, তত্ত্বিতঃ দুমিকে প্রদান
করিলেন।” অর্থাৎ রাম বহন শিখোলনে আঃবাহন
করিয়াছিলেন তখন তিনি শুভাগ্নি বৎসর বহন
পূর্ণার্পণ করিয়াছিলেন।

মুখ্য কাণ্ডের ২২ সর্গে বর্ণনামুখ্যায়ী বাহন সীতাকে
কহিতেছেন,—“যৌ মাতৌ বক্ষিতরৌবে যোঃবধিত-
মহাকৃত্য। ততঃ পরমমাতোঃ মম যঃ বরবধিঃ। ৮।
বরবধিঃ ? আমি তোমার সহিত যে সময় ভিক্ষণিত
করিয়াছিলাম, তাহার বহন মাস অতীত হইতে চলিল,
আর অবশিষ্ট দুই মাস প্রতিপালন করিব। পরে মর্দীর
নরনরলে তোমাকে আত্রোষণ করিতে হইবে।” সীতাও
হৃদয়ানুকে কহিয়াছেন,—“বর্ততে হনমোঃসো। যৌ পু-
থোঃ প্রবক্ষ্য। রাবনেন বৃণংসেন সময়ংহঃ কৃতো
মম। ৮। যে প্রবক্ষ্য। এক্ষণে এই বহন বাস চলিতেছে,
কেবল দুই মাস মাত্র অবশিষ্ট আছে, বৃণংসে রাবন
আমার সহিত এই দুই মাস সময় নির্ণীত করিয়াছে।”

মুখ্যকাণ্ড, ৩৭ সর্গ।

পশুপুরাণের পাতাল বৃত্ত, ২১ অধ্যায়ে বর্ণিত রামচন্দ্র
হইতে সংক্ষিপ্ত বিবরণ উদ্ধৃত হইল। “লক্ষণ বর্ধ

বহুকাল কালে জনকরাগ ঘূষে হরহর তথ্য করিয়া রামচন্দ্র সীতাকে প্রাপ্ত হন, তৎপরে স্বাধে বর্ষকাল পংখ্য সুখে বাস করিয়া সপ্তবিশ বর্ষ বয়সক্রমে কালে, চতুর্দশ বৎসরের অত, শিশুসন্তা পালনার্থে নির্ধাতিত হন, বনযাত্রে অসৌখ্য বর্ষ অতীত হইলে মাঘ মাসের তৃকাঠেী তিথিতে বিষ্ণু নামক মূর্ত্তে, রাবণসম্মতের অঙ্গুপস্থিতি কালে বন্যনন সীতাকে বরণ করে। বন্য মাসে অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা নবমীতে, জটীঘুও জ্যৈষ্ঠ সম্প্রতি, বানবরণকে সীতার সন্ধান প্রদান করেন। একাধনীর রাজিতে বহুমান লকার উপস্থিত হয়; সেইদিন শেষ রাজ্যে সীতার সহিত বহুমানের সাক্ষাৎ,—শ্রুতীতে রামের বিবট দংবার আনয়ন। পর দিবস, উত্তর—কাক্তনী মক্ষমুত অষ্টমী মক্ষমুত অষ্টমী তিথিতে, সূর্য্যোদয় মধ্যাকালে উপস্থিত হইলে, বিষ্ণু মূর্ত্তে শ্রীহরচন্দ্র সূত্রীবেব সহিত বক্ষিপ দিক অতিবৃষে বৃদ্ধ-বাক্সা করেন। অষ্টমী হইতে অমাবস্তা পর্য্যন্ত অষ্টদিবস শিবির সমিধানে শিল্পীতবে অবস্থান। পৌষ মাসের ত্তরপক্ষীর প্রতিপদ হইতে কৃতীয়া পর্য্যন্ত ঐশ্বর্য্যে অবস্থিতির পর বিতীষণেব সহিত রামচন্দ্রের চতুর্দশীতে সন্নিহন হয়। কয়েক দিন সমুদ্র-তীতে অবস্থানের পর, বন্যীতে সেতু আরম্ভ, অসৌখ্যীতে পরিসমাপ্তি, চতুর্দশীতে সুবেল পর্য্যন্ত দৈন্যপণের সমাবেশ পৌর্ণমাসী হইতে বিতীয়া পর্য্যন্ত তিন দিবসে ঐশ্বর্য্যপণের সপের অতিক্রম ও লভ্যপূরী অববোধ। অনন্তর মাঘ মাসের ত্তর-প্রতিপদে শ্রীহর-বৃত্ত অক্ষ রাবণ সমিধানে উপস্থিত হন। উক্ত মাঘ মাসের বিতীয়াধি অষ্টমী পর্য্যন্ত সপ্ত দিবস রাবণ ও বানবরণের লক্ষ্য-বৃত্ত হয়। কাক্তন মাস ও চৈত্র মাস বোর বৃত্ত চলে। চৈত্রমাসের ত্তর্য্য দ্বাদশী হইতে ত্তর-চতুর্দশী পর্য্যন্ত অষ্টাবশ দিবসের বিষ্ণু সমবে, রাবচন্দ্র বরদাস করেন। মাঘ মাসের ত্তরপক্ষের বিতীয়াতে ঐ, হুও আবহ, আর চৈত্র মাসের ত্তর-চতুর্দশীতে—পত্নাশীতি বিধানে—উহার পরিসমাপ্তি। মধ্য পক্ষবিশ মাস বৃত্ত হুগিত ছিল; ত্তির অপর ত্তি-সত্ততি-দিবস বৃত্ত হইয়াছিল। ঐ ত্তরচতুর্দশীতেই রাবণ নিহত হন; অমাবস্তায় দিন ত্তাহার সংকার হয়। বৈশাখ মাসের ত্তর-বিতীয়াতে বিতীষণ শ্রীহর-কর্ত্তক লভ্যরাজ্যে অতিবিত্ত হন। উক্ত কৌণ্য মাসের-ত্তর-

চতুর্দশীতে শ্রীহরের অমোঘাতিবৃষে বাক্সা, পর দিবস পূর্ণ চতুর্দশীতে ত্তর্য্য পক্ষমীতে ত্তর্য্যবাক্সা উপস্থিত। বক্ষীতে বক্ষিগ্রামে ত্তরতের সহিত শ্রীহরের সাক্ষাৎ ও লক্ষ্যীতে অমোঘ্যায় অতিবিত্ত। মৈমিলী রাম-বিহুত হইয়া। রাবণ ঘূষে একাধন মাস ও চতুর্দশ দিবস বাস করিয়াছিলেন। এইরূপে শ্রীহরচন্দ্র বন্য রাজ্যে ত্তর্য্য প্রেধ করেন, ত্তরন ত্তাহার বহুকাল বি-চত্বারিংশৎ বৎসর। তৎকালে সীতার বহুকাল ত্তর্য্যবাস বৎসর।

রামারণের উত্তর, কণ্ড, ৪২ শ্লোকে লিখিত আছে অত্যাধিক্রমতঃ কালঃ পৈশিহো ভোগস্য নহা। “বন বর্ষলক্ষ্মণাশি পতানি সুদহাতমোঃ।” এতদ্বাচ্যে ত্তর্য্যকারণ ব্যাখ্যা করেন, নহা বর্ষলক্ষ্যে বিনপতঃ; অর্থাৎ বর্ষক দিন বলিয়া লগ্য করিতে হইবে। এই প্রণালী অল্পমাত্রেরেই যোগ্যতীর একদ্য অত্যাধিক্রমতঃ হইয়াছে, “বহাধা রাম ও সীতা এইরূপে বিবিধ ভোগ্যকর উপভোগ ও বিহার করত “সপ্তবংশিত বৎসর অতিবাহিত করিবেন। ঐ সময়ে এক দিবস রাম সীতাকে কহিলেন, “লক্ষ্মণীক বহাধাঃ সীতাঃ সুবহুভোগ্যম্। অপর্য্য-লাভের বৈধেবি বক্তব্য লক্ষ্যস্থিতঃ। কিমিচ্ছসি বহাধাঃ কামঃ কিং ক্রিয় ত্যং তব। সিতং কৃত্য তু বৈধেহী রামঃ ব্যাক্যকথ্যবীৎ। বৈধেহী। ভোগ্যের গর্ত্তলক্ষণ স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, অতঃপ-বহাধাঃ। ভোগ্যের কোন বন্যাবশ পূর্ণ করিব? আর কোন বিজ্ঞহই বা ভোগ্যের ইচ্ছা হয়? সীতাও কহিয়াছেন,

“ন বক্তব্যঃ নোমিচ্ছো কীদন্তঃ আকৌষলে।

অ্যেচ্ছন্তঃ রাজবন্দেত তত্ত্বং পরিহাস্যতে।” ৮।

মিচ্ছা,—তত্ত্বভাগ্যবৈধেভুদ্য, রাজবন্দ ইতি।

রাগ সন্তানঃ পরিহাস্যতে বিজ্ঞিততে ইত্যর্থঃ।

আমার গর্ত্তে সন্তান রহিয়াছে, এ সময় প্রাপ্ত ভাগ্য করিলে আমার বাহীর বংশলোপ হইবে; তাহা না হইলে মতই লাক্ষীকালে প্রাপ্তভাগ্য করিলাম।” (উত্তর কণ্ড, ৪২ শ্লোকে)। ইহাও বিশেষ প্রদীপনযোগ্য যে, সীতায় বৎসর রাজ্য করিবার পর লোকান্তরায় ভগবৎ রাবচন্দ্র প্রধারজনমার্থ সীতাকে লিখ্যভাগ্য করিতে বীকৃত হইয়াছিলেন। বাক্যকালে সীতা ভুবনবিজয়ী কুল ত্তলব এই-বহুকাল-মাসকথকে বাক্ষীকির পণ ত্তরীয়ে প্রেধ করেন।

কিছু কি আশ্চর্য! রামচন্দ্র সুপ-লবের চন্দ্রবিশর
খুঁজিবেও আশ্রিতেন না। উত্তর কাণ্ডের ১০৬ সর্গের
বর্ণনামুযায়ী বাস্তবিক সুপ-লবকে কহিলেন, “যদি পুঙ্খ-
স কাহুংহো বুঝাং কল্যাণি হারকো। বাস্তবিকের স শিল্পে
যো ভ্রতমেবররাবিশপ।” ১২। যদি রামচন্দ্র তোষাবিশপকে
‘তোষরা কাহার পুত্র’? এইরূপ জিজ্ঞাসা করেন, তাহা
হইলে তোষরা এইমাত্র বলিবে যে, ‘আমরা
বাস্তবিকের পিত্র।’

ঊপরিউক্ত বিষয়বস্তুই অভিনিবেশ সহ কারে
পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হইয়া উঠিতেছে
যে, সুপ ও লবের বন্দন ভিন্ন হয়, তখন নীতার ব্যাক্রম
একান্ত বৎসর, পক্ষান্তরে উনবার্ষিক বৎসর, এবং রামের
ব্যাক্রম আটটি বৎসর অথবা চরমণী বৎসর।

চরক-সংহিতার চিকিৎসাশাস্ত্র, পক্ষ অধ্যায়ে নির্দিষ্ট
আছে,—

“বাক্ষাশ্বৎসরাস্তুর্ভবা পক্ষাশ্বৎসরাঃ ত্রিঃ।

মাসি মাসি তদবধা। প্রকট্যোবাবর্তনং প্রত্যেকং।”

শ্রীলোকের দ্বাষ্পদ বৎসর ব্যাক্রমের পর হইতে পক্ষণ
বৎসর ব্যাক্রম পর্যন্ত তত্তাবধই প্রতিমাসে তিন দিন
করিয়া আর্ভব (বহঃ) বোমিষু থাকা প্রকট হয়।

“দিনে ব্যতীতে বিরতঃ সঙ্কটিতাত্মকং বধা।

ক্লেভা ব্যতীতে নার্যাভ্য বোমিঃ সংশ্লিষ্টে তথা।”

“যেমন বিধাবসান হইলে পশু সঙ্কটিত হয় তদ্রূপ
কুকুলাল (বোদ্ধগনিপাত্তক কাল) অতিক্রান্ত হইলে
নারীসপের বোমিঃ (অর্য্যে হার) সঙ্কটিত
হইয়া থাকে।”

উত্তরকাণ্ডের ১০৭ সর্গে বর্ণিত আছে,

“উচুঃ প্রঃশপ্যাক্ষং সর্পং এব সমাবহিতঃ।

উচৌ রামস্য নবুপৌ বিশ্বাসিহিবোহুতৌ। ১৩।

অট্টলৌ যদি ন সন্ততাং ন বক্ষলবতৌ যদি।

বিনেদং নাথিপজ্জাম গায়তো বাবৎসর চ। ১৪।

“এই বালক দুইটি বেন রামচন্দ্রেই প্রতিনিধি হইতে
নির্মিত; নতুবা রামের সহিত ইহাদের-এক মৌল্যবৃত্ত
কিন্তুই হইল। যদি এই গায়ক-বৃন্দ (সুপ-লব)
অত্যবদগম্য্যো না হইতেন, তাহা হইলে রামচন্দ্রেই সহিত
ইহাদের কোনই পার্থক্য থাকিত না।” এই প্রসঙ্গে

চরক-সংহিতা হইতে আশ্ববিশের উদ্ধৃত হইল,
“বর্তলপভৌতু মনঃ ত্রিরাংহং, জহং ত্রঃজতংসপুণং প্রমত্তে।
পর্ত্যাপতিকালে ত্রাকের মন বাদুপ প্রাপির প্রতি বাবিত
হয়, তাদুপ সন্তান অস্তে।” ২৪। শারীরস্থান, ২৪
অধ্যায়।

সুভকর্ণের সহপক্ষেই রাবণ জন্ম হইয়াছেন বৃত্তিতে
পারিষা, তাঁহার বিশর অশ্রুচর মহাপার্ষ রাবণের মনস্তত্ত্ব
জন্মে বহিরাছেন,

“বলাং সুহৃষ্টগুণেন প্রবর্ত্তক মহাবল।

আক্রম্যাক্রম্যসীতাং বৈ তাংকুচ চ রমম চ।

গীতা,—অনন্তকুলো কথং ভোগজজ্ঞান, বলাদ্বিতি।
সুহৃষ্টগুণেন। সুহৃদীনাং কামিসুহৃটসংযোগে কোষো
ভাতি বর্ন ইতি বাৎসর্য্যমঃ। অগাপি সংক্লেহঃ সুহৃদীর-
কুল্য সুহৃদা বদা সুবিনত্বং বদমপি তবৈতর্ধ্যঃ। তথৈব
বর্ণমতি। আক্রম্যতি।

হে মহাবল! যদি রমনকালে গীতা আপনাত
অনন্তকুল না হয়, তাহা হইলেও আপনি বলপূর্বক বারংবার
আক্রমণ করত তাহাকে উপভোগ ও রমণ করুন।”

লঙ্কাকাণ্ড, ১০ সর্গ।

গীতা কহিয়াছেন,—

‘নৈবাতি নুনং মন বোমদত্ত বধ্যারমগ্যাগ্রিহকর্ণনয়।

জাযং ন চাপ্যাহমহুপ্রোভুতমঃ শিখো মন্ত্রমিবাধিত্য। ৪

“যদি ইহাকে আশ্ব-সম্পন্ন করিবে আদর ওকা হয়
বটে, কিন্তু বিধগণ বেদন শূন্যকে মন্ত্র জানে সমর্থ হই না,
সেইরূপ আমিও অহুতুল হইয়া ইহাকে মর্য্য অস্তর প্রদান
করিতে অসমর্থ।”

(সুন্দরকাণ্ড, ২৮ সর্গ।)

মহাতারতের বনপর্ব, ২৮ অধ্যায়ে গীতার প্রতি
রাবণের মনোভাব এই প্রকার বর্ণিত আছে,—

“প্রত্যাখ্যাতোহপি দুর্ধেগঃ পুনঃবোব্রাবীষঃ।

কামমদ্যাসি মে গীতে হুনোতু
সবারলমঃ। ন স্বামকামাঃ স্ত্রোমোঃ সখেভে
চাক্ষাসিনীম্। কিং হ
লক্যং সত্য কণ্টং বদমতাপি মাহুংহ।

আধারকৃতরসাকঃ।

রামমেবাহুকথাসে। ইত্থাক্য তামনিম্ম্যাতীঃ স

চাক্ষলমহেষ্টাঃ।”

“রাগণ সীতাকে কহিলেন, যে জনকনন্দিনী !
মহাশয় (মন) আমাকে যাঁপেরনাই বাধিত করিতেছে,
কিন্তু তুমি পুণ্যবতী না হইলে তখনও আশ্বিন্দু-
চরিতার্থ হইবে না, তুমি যখন অতাপি আমাধের আহার
বস্ত্রণ মন্থত বাঘচন্দ্রের অস্ত্রোণ করিতেছ, তখন আর
আমি তোমার কি করিতে পারি ?”

বাবণ, সীতার দেহের অতিরিক্ত মনকেও অধ করিবার
কন্ত যে সমধিক অভিলষী ছিলেন, এই উক্তিটি তাহারই
ইচ্ছিত বলিয়া মনে হয় না কি ? বলা বাতুল্য বাঘণ, এই
ঐশ্বর্যের বশবতী হইয়া বহির্বিধ কৌশল অবলম্বন করিয়া-
ছিলেন, কিন্তু সীতার অতিজ্ঞানীয় ও অকৃতপূর্ব চিত্ত
সংবনেষ্টক শেখ পর্থাস্ত সকলকার হৃদয়ে গারেন নাই।

অতঃপরকার দুহৃতপূর্ব সীতা কামচন্দ্রের সম্বন্ধে
কহিয়াছেন,—

“বহুহং সাত্ত্বসম্পর্শং গতানি বিবশা প্রভো ।
কামকারণং ন মে তত্র বৈবস্ত্রতাপহাযাতি ॥ ৮
মবদীমহ তু বস্ত্রং জগতঃ বসি বর্জতে ।
পর্যাবীনেমু পাত্রেব কিং করিতামানীযয়া ॥ ৯

• • • • •
বসি তু নৃপশর্ঙ্গং যোগমেবাত্তবর্ত্ততা ।
লভুঃসেব মদুঃশ্রম স্ত্রীতমেব পুংস্কৃতম্ ॥ ১০

• • • • •
মন বৃত্তক বৃত্তক বহু তে ন পুংস্কৃতম্ ॥ ১১

টীকা.—নন্দিনী তে পরীক্ষা বকোইকপুটায়জিত্রাহ,
বহুহমিতি । বিবশাঃ পরীক্ষা নভী সাত্ত্বসম্পর্শং গতানি
প্রাপ্তানি । তত্র যে কাষকাগো ন ইকাপূর্বগতাম । তত্র
বলাৎ সম্পর্শং বৈবস্ত্রতাপহাযাতি অপর্যায় করিতবন্ত ।
বৈবস্ত্রতাপ কারণং ন বৈবস্ত্রতাপ ইতি ভাবঃ । বস্ত্রতা
হাবল্লনকং কর্ত্ত তু মে নাতীতাহ, ববদীমিতি ।
বৈবস্ত্রতাপবশতামিত্যর্থঃ । পর্যাবীনেমু পট্টপ্রদীপ্তম্
কৃত্যম্ বৈবাবীনেমু চ । বদ্যাদ্ব্যয়ানি তদ্বীনানি
দ্রাব্যানি । প্রবৈবস্ত্রতাপেবানি নির্ধারিতঃ । জগতঃ স্ত্রী-
বাক্যপ্রাণীতি ভাবঃ । স্ত্রীতমেব প্রাকৃতসাধারণ-
প্রাণিতেরেব পুংস্কৃতং চিহ্নিতা । তদা যে বদমানাহং
প্রকটিতক তে তদা ন পুংস্কৃতং অপরিচয়গে যেতুয়েন
নির্ধারিতম্ ।

হে প্রভো ! আমি আশ্বিন্দু না থাকায়, তাৎপে
সহিত আমার যে গাত্র সম্পর্শ ঘটাইছি, তাহা আমা
ইচ্ছাকৃত নহে ; বৈবই সে বিধের অপকারী । নাহ
যাহা আমার অমৌল, সেই জগতকে তু কেহ সম্পর্শ করি
পারে নাই, জগত সমভাবে আপনাই অধবর্তী রহিয়াছে
পরম গাত্র সকল আমার বশীভূত নহে, সুতরাং তক্ষণ
না থাকায় রাগণ সেই সকল সম্পর্শ করিয়াছে তাহাযে
আমার অপরাধ কি ?...হে রাজ-শর্ঙ্গ ! আপনি
বোমপবশন হইয়া, প্রকৃত মন্থের জ্ঞান, আমার কেব
দ্রাভুই বিবেচনা করিলেন...আমার চরিত্র সংক্ষেপে সমুচিত
সম্মাননা করিলেন না...আপনার প্রতি আমার ভক্তি
এবং আমার বতাব ত্রিগুণ তাহাও বিবেচনা করিলেন না”
(লঙ্কাকাণ্ড, ১১৮ সর্গ) ।

অভিযুক্ত নয় ও নারীর স্বতাব-সিদ্ধ মনতত্ত্বগতবশ
হইয়াই সীতা বচীর বোমকালনের নিমিত্ত দেবতা ও
ব্রাহ্মণগণকে পুনরাশি বলিয়াছেন ।

“কর্ম্মনা মনসা বাচা বধা নাত্তিরোমাহং ।

দ্ব্যবসং সর্গবর্ধজঃ তথা মাং পাশু পাতকম্ ।

অভিধানমতে কর্ম্ম শব্দের ব্যাখ্যা.— কামেন মনসা
বৃত্ততী কেটেলিভিভিগৈরশি যোগিনঃ বর্ধ বৃদ্ধিতি ।)

আনি, কার, মন ও বাক্যে কখনও বর্ধক তদুদঘাতকে
অতিক্রম করি নাই, অতএব বিতাবস্থ আমাকে বন্ধা
কর্ত্তন।” (লঙ্কাকাণ্ড, ১১৮ সর্গ) ।

সীতাব পক্ষ সমর্থনকারী সকল লোকের পাণ-পুণ্যের
সাক্ষী গুণধান-পাণকত আমীর নির্ণায়িতা প্রমাণ
করিবার মানসে প্রায়ঃপ্রত্যেক কহিয়াছেন ।

শবৈব বাচা ন মনসা বৈব প্রাণা ন চক্ষুবা ।

সুহৃতা বৃত্তবর্ত্তীতঃ প্রাণতঃচক্ষুতঃ ।

হে চরিত্রগণিনি ! এই গুণলক্ষণা সঙ্কটিতা সীতা,—
বাক্য, মন, বুদ্ধি অথবা চক্ষু ব্যাভাত কখনও তোমাকে
অতিক্রম করেন নাই” (লঙ্কাকাণ্ড, ১১৮ সর্গ) । এই
বচনটিতে ‘কার’ শব্দের প্রয়োগ নাই ইহা লক্ষণীয় ।

অতীত প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা অধুবারা,—“অকামা
অনভিলাষিনী দুর্বলা নারী বলধান পুংস্ববর্ত্তক পুতীতা
হইলে পতিতা বহিত না, সে স্ত্রী স্ত্রীর সংসর্গে বৃত্তিতা
হইত না” (অষ্টবৈবর্ত্ত সুদাণ, প্রকৃতি বও, ৪৮ অধ্যায়) ।

অজিগাহিতার লিখিত আছে,—

“বয়ঃ বিশ্রুতিগ্না বা বহি বা বিশ্রুতাবিতা।

বলগ্রাহী প্রকৃতা বা চৌরকৃতা তথাপি বা॥ ১২৬

ন তাত্যা হুবিতা নারী ন কায়েইদ্যা বিবিরতঃ।

অহুকাল উপাসাও গুণ কালেন ত্যগতি ৮ ১৩৪

অর্থ,—স্ত্রী-ব সন্দর্ভ অবতরণে, বহি কোষ বক্তব্য, বল বা চৌর্যপূর্বক উপপত্তি চর্য তাত্যা হইলে এই অমুদ্রা গ্রীকে পরিভোগ্য করা বিধেয় নহে। যেহেতু এই কার্যে স্ত্রীর ইচ্ছা ছিল না; পরে অহুকাল উপস্থিত হইলে এই স্ত্রীর সহিত সন্দর্ভ করিতে পারিবে (তাহার পূর্বে করিবে না); কেন না অহুকাল উপস্থিত হইলে স্ত্রীলোক তথ্য হয়।

ব্রাহ্মণ্যে বর্ণিত বনক কৃষ্ণ ও লবের জন্মনির্ণয়গ্রন্থে যে সকল অঙ্গবর্তি নষ্ট হইতেছে, তাহা হইতে, কি করিয়া কৃষ্ণ ও লবের অক্ষ সীতার লজা হইতে আঘাত্যের প্রত্যাবর্তনের পর হইতে পারে, এই সম্বন্ধটি উপস্থিত হইতেছে না কি?

অব্যবহিত পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে অতি পুরাকালে অকামা নারী বহিতা হইলে পতিতা হইত না; অর্থাৎ তাহার সামাজিক প্রতিষ্ঠাও বর্হাথা অক্ষুর থাকিত। এই অবস্থাপ্রাপ্তী নারীর বিবাহিত পতির দ্বারা সন্দর্ভে প্রত্যাবর্তনের সন্দর্ভ সামাজিক অধিকার ছিল, এবং পতির পক্ষে দ্বিগুণ হইয়া পুনঃপ্রবর্তন সামাজিক অহুগমন ছিল এই প্রসঙ্গে কোন প্রশ্নই উদ্ভূত না। দীর্ঘকাল লজার অবস্থানকালে সীতার চিত্তভঙ্গি ছিল কি না, এই সম্বন্ধে হরীকরণার্থে অননুসন্ধানের সমুদে তাহার অধিকৃত ব্যাঘ্র হয়, এবং পোকসাকী পাবক সাক্ষাৎকারের সীতার চিত্তের একপ্রভা সঙ্গ্রামিত করেন, যেহেতু-সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেন নাই। রামচন্দ্রের এই সাময়িক লোকপন্যাসের তৎকালীন পতিবর্তনোদ্ভূত সুখবর্ধের প্রভাব বলিয়া মনে হয় না কি? (Coming events cast their shadows before.) সাত্ত্বিক বৎসর পরে বনন পরিচরিত সমাজ ব্যবস্থা সাময়িক প্রচলিত হয় তখনই এই প্রশ্ন পুনঃপ্রাণিত হয়, এবং প্রবল জন্মশব্দের অহুবর্তী হইয়া রাম, বিশেষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও, সীতাকে পরিভোগ্য করিতে বীজিত হয়।

ঐশ্বর্যচন্দ্রের ভিত্তোক্তাবে কৃষ্ণ ও লব উভয়ে সীতার বাছ্যের কুল্যাগণের অধিকারী হইয়াছিলেন। তৎকালীন সমাজবিধি অনুযায়ী শাস্ত্রে স্বাক্ষরবিধি পুত্রের বিবাহ উল্লিখিত আছে; তদ্ব্যতীত পৌত্রবর্তন পুত্র অন্ততম এবং ক্রমপর্যায়ের চতুর্থ স্থান অধিকার করে। দিকুংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ে লিখিত আছে, “পৌত্রবর্তনচতুর্থঃ। ৭। অক্ষতা কুহঃ সংকৃতা পুনঃকৃ। ৮। কুহঃ সংকৃতাপি পরপুত্রী ৯। এতৎবাং পূর্ব জ্ঞেয়ান্ ১০। স এব দায়দায়ঃ” ১২০। অর্থ-চতুর্থ পৌত্রবর্তন পুত্র। পুনঃসংকৃতা (অর্থাৎ পরোক্তের সহিত পরিণীতা) অক্ষতা (অর্থাৎ অহুগকৃতা- বাগবত)।—পুনঃকৃ এবং পরোক্তকৃতা, পুনঃসংকৃতা না হইলেও (অর্থ একজন্মের সহিত বাগবান ও অগণের সহিত বিবাহ এরূপ না হইলেও কেবল পুত্রসংকৃতির সংসর্গস্থিত হইলেই) পুনঃ হইবে। ইহাবিধের মধ্যে (পরোক্তকৃতি অপেক্ষা) পূর্বপুত্র লিখিত পুত্র প্রধান; সেই পুত্রই পিতার বন্যধিকারী হইবে। পৌত্রবর্তনবিধির অষ্টাদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

“আবৃত্ত ক্ষেত্রে পরস্বাং তদং হর্যাকী। তদং-চতুর্ভুৎসেব অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে বহি-অপরে সন্তান উৎপাদন করে, তাহা হইলে এই সন্তান বাহ্যক ক্ষেত্রে তাহারই হয়, অথবা ক্ষেত্রবাহী ও উৎপাদকিতা এই উভয়েইই সন্তান বন্দিঃ গণ্য হইবে; এবং যে এই সন্তানকে প্রতিপালন করিবে, তাহারই সন্তান হইবে। এই প্রসঙ্গে সোভিল রাক্ষস বর্ত্তক বর্ণণেতে কংসের বহুতম্ব্র ও রাজ্যপ্রাপ্তি এবং চন্দ্রের উৎপত্তি বহুশক্তিগতী তারার গর্ভে পুত্র সন্তান হইবে ও এই বিবাহ দুইটিই কাহিনী শ্রবণীয়। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব, ৪৯ অধ্যায়ে লিখিত আছে, “যেহে ইহা নিশ্চিত আছে যে, যে ব্যক্তি পানিগ্রহণ করে, তাহার ক্ষেত্রে যে সন্তান হইবে, সেই সন্তান তাহারই হয়। যদি কেহ পরস্ত্রীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করে, তাহা হইলে সেই পুত্র উৎপাদকেরই হইবে; কিন্তু যদি উৎপাদক এই পুত্রকে পরিভোগ্য করে, তাহা হইলে এই পুত্র বাহ্যক গর্ভে জন্মিবে, তাহার পানিগ্রহণের হইবে।”

এসকলমে, বাহ্যবর্ধের অর্য্যাকৃত, ২-৪ ধর্ম বিখ্যাত হইলেই কাহিনী সম্পর্কে যে বর্ণনা প্রদত্ত আছে তাহার

অক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইল ।

একথা হওকারণে বিবরণ করিতে করিতে রাম, লক্ষণ ও সীতা এক বিকট লক্ষ্যকারী পর্বতশৃঙ্গলত্ন হাঙ্গলকে দর্শন করিলেন। সেই ঘোর দর্শন বিকটকার হাঙ্গলের চক্ষু নিত্যন্ত পঙ্কিত, বদন অতিরুদ্ধ, উগ্র মতিবিশাল ও অঙ্গসংগঠন অতিবিবর ছিল। সেই হৃদয়াকার বীভৎস তাকল বলাঙ্গ ও কথিতাক ব্যাঘ্রচর্চ পরিধান করিয়াছিল। সুব্যালাসকারী বহকে হেবিলে যন্ত্রণ তার হইয়া থাকে, সেইরূপ তাহাকে দেখিলেও কল প্রাণীর মনে ভীত স্ফার হইত। পরে সেই হাঙ্গল, রাম, লক্ষণ ও সীতাকে দেখিতে পাইয়া অতীব হুঙ্ হইয়া তাঁহাঙ্গিলের প্রতি ঘাবিত হইল। সে মতিভায়নক পক্ষ সঙ্কারে সীতাকে কোড়ে গ্রহণ করিয়া ক্রিচ্ছ্র ধূবে হাইয়া কহিল। “তোরা লটাবারী ও চীরপরিহারী; অচট হুঙ্ বহু, বাণ ও জলি ধারণ করিয়াছিল; সে বাহা হটক, বদন তোরা তাঁহাঙ্গিলিত হওকারণে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন তোদের মার জীবনের আশা নাই। তোরা কে? আমি তাকল, আমার নাম বিরাধ। এই পরমাত্মদী নারী আমার গর্ভা হইবে। তোরা পাপাগারী, আমি হুঙ্ তোদের জপাম করিব।” সেই হুঙ্কার বিরাঘের উক্ত প্রকার পর্ব পহিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সীতা বেদী তরে শ্যাকুলচিতা হইয়া, বটিকা সময়ে কদলী-বৃক্ষের ভাষ লিপিতে লাগিলেন। রাম সেই সাক্ষী সীতা বেদীকে বিরাঘের কোড়কা দেখিয়া শুকধ্বন ও শোকাক্রান্ত হইয়া লক্ষণকে কহিলেন, “হে হুমিজনানন্দ! তাকলহরণ, পিতৃনিদান ও বৈবেরা সীতা বেদীর অঙ্গ পরশুভবল্লর্প, ইহা অপেক্ষা আমার সমধিক ধূবে আর কিছুই নাই।” রাম এতল কহিল, লক্ষণ তাঁহাঙ্কে উৎসাহিত করিয়া অমাত্যের ভাষ, পরিভাগ করিতে নিবেশ করিলেন। অনন্তর রাম ও লক্ষণ বিরাধ তাকলের সহিত হুঙ্ প্রহুঙ্ হইলেন। সেই হুই নরশ্রেষ্ঠ কর্তৃক পীড়নাম হইয়া, সেই ভয়ানক তাকল সীতাকে পরিভাগ করিল এবং উগ্র হুঙ্কারে তাঁহাঙ্গিলের উত্তরকে গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিতে ইচ্ছা করিল। পরে সেই অতিবদলান্ উত্তর তাকল খীর বল দ্বারা রাম ও লক্ষণকে, বালককে

ভাষ, উত্তোলনপূর্বক অত্মরোপে আরোপণ করিয়া ভয়ানক বনের অভিমুখে প্রীতকার করত পদন করিতে লাগিল।

তাকল রাম ও লক্ষণকে হরণ করিয়া লইয়া হাইতেছে দেখিয়া সীতা বেদী খীর দ্বন্দ্বের বাহুধর উত্তোলন করত উচ্চৈঃস্বরে এরূপ বিলাপ করিলেন।

“এহ বাণবী রাম: সত্যবান্ শীলবান্ ভূতি।

তক্ষা মৌর্যরোপে বিরতে সহস্রমণ।

মাং ত্বকা তক্ষরিত্তি শাঙ্গলীশিন্তবদ।

মাংধেরোং স্বকাংকুংহৌদমতেরাকলোত্তম:।”

টীকা—কোশলপ্রকারবাঃ। এহ ইতি। শাঙ্গল-খীশিন: সখিঃ বিদুব্যাভাঃ মাং হর তে নম ইচ্ছাক্তিঃ তাকলমণরোঃ প্রোভাতিমহাং।

“ঐ ভয়ঙ্করকার তাকল শ্যাকুল হুঙ্কারে সত্যনিরত সুপবিত্র হরণের তনয় রামকে লক্ষণের সহিত হরণ করিয়া লইয়া হাইতেছে। হাঃ। ত্বক, মাং প্রমুখিত্তি লক্ষণের আমাকে তক্ষণ করিবে। ওহে তাকলশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে মনস্কার করিতেছি। তুমি ঐ হুই কাকুংহুকে পরিভাগ করিয়া আমাকে হরণ কর।” হুঙ্কারে বলিতে হয় যে, সীতা বেদী হুঙ্কারে খীর প্রাণবল্লর্পে, বিকল্পে হরিতগিলের জীবনল্লর্পে, যে কাহাংই হটক, যেজ্ঞার বিরাধ তাকলের গর্ভা হইবার জন্য আত্মদান করিতে স্বীকৃতা হইয়াছিলেন। বাহোয়া হুঙ্কারে প্রভাব অতিক্রম করিতে অশক, তাঁহাঙ্গিলের অত নিরসিণিত শাঙ্গলকা উক্ত হইল।

“সহস্রং কীর্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং শুভব্যবন।

সত্ত্বোৎসবলান্যত কির্যাদিশক্তিঃপ্রব চ।

এতন্নৈশ্বর্যমষ্টকং প্রবর্ততি নদীবিগ:।”

(বকন:হিতা, সপ্তম অধ্যায়)

অর্ব—বরণ, কীর্তন, কেলি, দর্শন, গোপনে কথোপকথন, সত্ত্ব, অব্যবসায় ও কার্য নবাতি;—পণ্ডিতগণ বলেন, মৈথুন, এই অষ্টক।

অনন্তর বিরাধ তাকল, রাম ও লক্ষণের সৌহার্দ্যেরে সাংঘাতিকরূপে আঘত হইয়া প্রাণত্যাগের অনতিপূর্বে রামকে বলিয়াছিল, “আমি পূর্বে গর্ভ হিলাষ; আমার নাম ভূহুঙ্, আমি হুঙ্কারে কর্তৃক এতল অভিশপ্ত হইয়াছি। অভিশাপ সময়ে আমি সেই বহাঙ্গল হুঙ্কারে এস

করিলে, তিনি আমাকে ইহা বলিয়াছিলেন যে, 'বন্দিত্ব তখন রাম যখন তোমাকে হৃদয়স্থলে বস করিবেন, তখন তুমি গর্ভবৎ লাভ করিয়া স্বর্গপ্রাপ্ত হইবে। যে পত্নস্বামী। অতীত আদি আপনায় প্রসাদে সেই সুখরূপ অভিলাষ হইতে মুক্ত হইলাম। বীর ভবনে গমন করিব। আপনাদিগের মঙ্গল হউক।' এই উক্তিটিকে উপলক্ষ্য করিয়া অনেক হৃদয়, বলিবেন যে, যাপনকৃত হইবার উদ্দেশ্যে, বিরাগ স্বাক্ষর সম্মানে এই হৃদয়ের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, রাম-হৃদয়ে নিঃস্বাভাৱ্য; প্রকৃতপক্ষে তাহার কোন দুঃখভাব ছিল না। কিন্তু বিরাগ নিকটেই বলিয়াছিল।

"নর। হু পূর্বকং বোধ্যে জাতঃ পূর্ববর্ত।

কৌন্দল্য। মুগ্ধতা জাতঃ রামস্য বিচিত্রো ময়।

বৈদেহী চ মহাতাপা লক্ষণং মহাবল্যঃ"।

"যে পূর্ববর্ত্ত! পূর্বে আমি অভ্যন্তরীণ আপনাকে জানিতে পারি নাই; অতীত জানিলাম যে, আপনি রাম, কৌন্দল্য। যেহী আপনার স্বাভাবিক উৎকৃষ্ট পুত্রবতী হইয়াছেন। আপনি আদি মহাতাপাবতী বিবেচনাকৃত হিতা নীতা এবং মহাবল্য লক্ষণভেদে জানিতে পারিয়াছি।"

বিরাগ স্বাক্ষরের প্রসঙ্গে স্বাভাবিক বর্ণিত সমগ্র বিবরণটি মনোনিবেশ লক্ষ্যে পাঠ করিলে প্রতীক্সমান হইবে যে, 'বর্ধন' শব্দের প্রয়োগ কোথাও নাই, এবং বিপর্য্যতা প্রকৃতির আত্মবিশ্বক বর্ণনায়ও একান্ত অভাব, স্বাভাবিক উল্লেখ কেবলিতে পাওয়া যায় স্বাক্ষর কর্তৃক নীতা বর্ণনাকালে।

লক্ষ্য বিবরণের অধ্যবসিত পরে রাম নীতাকে করিয়াছিলেন।

"স্বাক্ষরপরিচিতিঃ। বৃত্তিঃ দুইট চক্ষুঃ।

কথং বা পুনরাবৃত্ত্যঃ ক্লেশঃ বাপুনিগ্ধবৎ"।

স্বাক্ষর হৃদয়স্থিতে তোমাকে দেখিয়াছে, ক্রোধে করিয়াছে, অতএব আমি তোমাকে পুনর্বার গ্রহণ করিয়া বীর পুত্রবৎ ক্লেশ কলঙ্কিত করিতে পারি না।"

লক্ষ্যাকার, ১১৭ সর্গ।

স্বাক্ষর নিবন হইলে, মনোবলী কখন বিশেষ করিতে করিতে করিয়াছিলেন।

"তদ্বৎ বর বর জ্ঞঃ বর্ধনঃতুহমব্যাহাং।

নৈবা বিজ্ঞাতি তে পূর্বে স্বেচ্ছায়া লাবিহুয়োপমাঃ।

তুমি যে সেই স্বাক্ষর। স্বাক্ষরকে বর্ণন করিতে করিতেই বর হও নাই তাহার কারণ ইচ্ছাধি বৈবরণ তোমার ভর করিয়া চলেন।"

লক্ষ্যাকার, ১১০ সর্গ।

নীতার অধিপতীকার সময়ে রাম করিয়াছিলেন,

"ন চ পত্নঃ স বৃত্তান্তা নন্যাপি চ নৈবিন্দীম্।

এবং বিন্দুঃপ্রপ্যাঃ বীণামি নিবামি।

আমার বোধ হয় (wishful thinking) সেই বৃত্তান্ত। প্রতীক্স অধিপতীকার মায়, এই অনন্তলভ্য নীতাকে মনে মনেও বর্ণন করিতে পারেন নাই।

লক্ষ্যাকার, ১২০ সর্গ।

উল্লিখিত বচনগুলি বিচার করিলে ইহাই প্রতীক্সমান হইয়া উঠিতেছে না কি যে, শেখোক্ত স্বাক্ষর উক্তিভেদে যে 'প্রবর্ত্তিত্ব' শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা দ্বারা প্রচলিত ব্যাখ্যার অতিরিক্ত অর্থ প্রবর্ত্তিত্ব হইয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, মনোবলীর উক্তিভেদে 'বর্ধন' শব্দ কোন অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা পাঠকগণের বিবেচনায়ী।

ব্রহ্মবর্ধনপুরাণের ঐকান্ত-অনুশ্রব, ৩২ অধ্যায়ে লিখিত আছে.—"কামদেব দ্বতীর শাপে শিবমহাবলিতে ভবীকৃত এবং মঙ্গলপুরাণে অতিশুল্পাতে বলিগ্রাহ্য স্বাক্ষর হইয়াছেন; অতঃপরে, যেমন মিত্রকেশব শাপে বৃহস্পতির তর্ক। অশ্রুতবাহু, সেইরূপ আমায় (নারায়ণ স্বাক্ষর) শাপে স্বাক্ষর তর্ক। অশ্রুতবাহু হই।" বৃহস্পতিপত্নী তাহা ও রাম তর্ক। নীতা, উভয়ের চরিত্র সমতুল্য। এই কথাটি পরিষ্কৃত করাই কি নয় শেখোক্ত বচনটির অর্থনির্ধারিত উদ্দেশ্য?

অধ্যাত্মস্বাক্ষর প্রবর্ত্ত কোন কোন বর্ধনঃ 'মায়' নীতা বা 'হায়' নীতার কল্পনা, নীতার শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষরভাবে প্রকৃতিভিত্তি করিবার মানসে বিভীষণের

সহিত মনোভীর দ্বিতীয় বাত বিশ্বাসের বন্ধন।, যাচায়েত উল্লেখ মূল রচনায়ে নাই, সীতাকে লজ্জার আনিয়া রাবণের মাতার ভাষ বক্ষণাবেক্ষণ এবং অনসাধারণকে বিশবগানী করিবার উদ্দেশ্য 'পক্ষত্যা' রোক্তস্থিত তারা লজ্জিত শত্রু সম্বন্ধ বৃহস্পতিপত্নী তারার পতিবর্তে যানত বন্ধ বালীর ভাষা তারা বলিয়া দিয়া প্রত্যক, প্রভৃতি অসুস্থ বচনগুলি পরিবর্তিতালের পাত্রকার গণের মূল খর্ষ প্রত্যাহায়েজ্ঞ মানসিক দুর্বলতার পরিচয় দেয় না কি ?

“মূগে মূগে চ বে খর্ষঃ মূগে মূগে চ বে দ্বিজাঃ।

তেহাং নিকা ন কর্তব্যো মূগতপা দ্বি তে স্ততাঃ”।

অর্থ—প্রত্যেক মূগের বে খর্ষ এবং প্রত্যেক মূগের বে দ্বিজ, তাহাবিদের নিকা করা উচিত নহে, কারণ তাহারা

মূগতপাঃ। খর্ষঃ, কেহুপে বিবেকক গুণপ্রবণ করিয়াছেন, তাহাবিদের কর্তব্যঃ নিবেদন-আচরণ যারা সেই মূগোচিত খর্ষ কর্তব্যঃ।

অন্য-অধিনী সীতা প্রায় বৎসর কাল লজ্জিত অরজ্জবস্থা রাবণরাজে লবিলেব মিস্ত্রীত্যাগে লাজিতা হইয়াছিলেন, কিন্তু অযোনি তাকার মন ভইতে যোমীর প্রতি প্রগাঢ় অহুহাণ ও ভক্তি-কণিকের সমস্তও অলসারিত হয় নাই, বাহা সচরাচর স্মরণিত। এই বহু-কালের অনোই বৈসেবী পতিগতপ্রাণা সতী নিবোধুদিবিলেব স্মৃততমা-এবং সর্বকালের ও লবলোকেব পরমাবাধ্যা। এই কারণেই কথিত হইয়া থাকে, “পুণ্যলোকে নলরাজ্য পুণ্যলোকে পুণ্ডিতঃ। পুণ্যলোকে চ বৈসেবী পুণ্যলোকে অনাধিনঃ”।



আহারের পর
দিনে দু'বার..

এবং খুব
খাস্য লাভের
শ্রেষ্ঠ উপায়

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান



মহাভ্রামারিষ্ট
(কি হাঙ্গামা সেরে)

মৃতসঞ্জীবনী

সাধনা ও স্বধালয় • চাকনা

কলিকাতা কেন্দ্র ভা: নবম চত্বর
মোহ, এম-বি, বি-এস, আর্ক-বৈ-
আচাধ্য, ৩৬, সো হা ল পা ডা
রোড, কলিকাতা-৩৭



অধ্যাক ভা: যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ,
আইআইবিএস, এক.সি.এস. (পণ্ডিত),
এম.সি.এস. (আমেরিকা), ডাঃগঙ্গপুত্র
কলকাতার ইলাহা ন্যায়ের তৃত্বপূর্ণ অধ্যাপক।

এই চাকনা মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মরিচ
আধারিষ্ট (কলকাতার পুরাতন) সেবনে আপনার
স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মরিচ
আধারিষ্ট মৃতসঞ্জীবনী শক্তিশালী এবং সর্দি, কালি,
স্বাস-প্রবৃত্তি রোগ-নিবারণ করতে অত্যন্ত
ফলপ্রসূ। মৃতসঞ্জীবনী সূক্ষ্ম ও হৃদয়মণ্ডল বর্ধক ও
বলকারক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে
আপনার ঘোষের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলক
স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।

ঐক্যবোধ থেকে বাস
ছাড়া ঠিক সকাল পাড়টার
নরেশ্বরনগরের পথে ।

হাতী বোঝাই বাস এখন
চলতে লাগল ধুলে ধুলে ।
বৃন্দাবন পাহাড়ের ওপরে
উঠতে আরম্ভ করছি
আরসা । তারপর দেখি জান
দিকে উঠে পাহাড়ের গা,
বাঁ দিকে বাস-সে বাস দতই
ওপরে উঠি ততই নীচে
নেমে দাও । জানদিকে পাহাড়ের কর্ণ পা

ছাড়া আর কিছু দেখবার নেই । জিনাবাইট ও
গহিড়ির কতচিহ্ন । বা দেখছি সে ওই বাঁ দিকের
জানলা দিগে । দেখছি দার দার পাহাড় । একটী
পাহাড়ের গা দিগেই আর একটি । আবার সেই
পাহাড় শেষ না হতেই আর একটি । পাহাড়ের গায়ে
বন । ভোরবেলার সোনালী আলোর সে-বন ভারী
দুন্দুভ দেখাচ্ছে । থেকে থেকে চলতি বাসের জান্দার
কাছে সংলগ্ন করছে দেবদারু কচি কচি পাতাগুলো ।

এভাবে অনেকখানি গা এসে ফেলা—সেই উঠতি
পড়তি গা, আর ফলে ফলে বাক । বড়ই উপরে
উঠি, গাড়ীর সোলায় সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনের গর্জন বেড়ে
ওঠে । সেই সঙ্গে আবারও এ ওর গায়ে দুর্ভিক্ষ ধরে
পড়ি । না, নিভাল বেই কারু । কন্দুর গিগের গা
বাকি বাকি করছে । বাসট্যাঙে মোটা কয়েক কাগজ লেবু,
কিনে কাঁচের কোলাটার কেসে দিগেজিলাস, তার একটা
দোর করে সেই গুর হাতে ।

দার দার পেছনেই ছিলেন । বলছেন, কেন লাগবে ?
বাকি, কেনই আর লাগবে । সেই যে সাড়েরিকি ভাষা,
অনেকটা তাই ।

হাতবশায়ের কথা বলিনি । গাড়ীতে উঠেই ওঁর সঙ্গে
আলাপ হল ।

গাড়ীতে আমরা, দুবাপেরা ও উনি এক অন্য

স্বল্পমোত্তরী ও গাঙ্গোত্তরী

গণেশ লালগুয়ানী

[বাঙলা দেশ থেকে বড় মান্দু কলারবঙ্গীর দিকে
বাস গঙ্গোত্তরী স্বল্পমোত্তরীর দিকে তত দান না ।
বোম্বের পথের দুইদুইতাই এর কারণ । তবে পথ কি
সত্যি দুইদুই ? সকলেই এ বিষয়ে একমত নন । তাছাড়া
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আকর্ষণ এপথেরই বেশী বিশেষ
করে স্বল্পমোত্তরীর পথের । বীরা উৎসাহী, পথের
সৈন্যে বীরা গমনে না, তাঁরা এ পথে পা বাড়ালে
লাভবান হবেন, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস ।—লেখক]

দূরে নয়, ঐক্যবোধ হতে দার দার হাইল । হাতি পথে
আয়ো কম । গতি । এখানে গাড়ীর ওই শীর্ষ ।
কখনো কখনো কচি আবার শূন্য হুঁতে বাক ।

বাকি দুইদুই সময় বা তেমন তেমন জায়গায় তা না
হবে আর উপায় কি ?

কিন্তু বাঙালীরা আছে এই সব ভ্রমীভারের । কোথায়
কোন বাকি, কোথা হতে গাড়ী বোঝাতে হবে, এসব
এদের একবারে দুঃখ । না হবেও উপায় নেই ।

তবু যে নাকে নাকে দুর্ভিক্ষটা ঘটে, কাগজে যে ঘোঁষ
চোখ কি কুঁড়ি জন দারী নিয়ে বাস ভলিয়ে সেল তার
কারণ মনে হয় অন্য । হরত হঠাৎই কোথাও বস মেনে
পথ ভেঙে গেছে নতুন জলে গিরলে গেছে গাড়ীর ঢাকা ।
একবারত লোকভাঙি গাড়ীকেই ভাগিয়ে নিয়ে ফেল
অলকন্দার হঠাৎ কেসে ওঠা হল ।

ছোট একটখানি দূর এই নরেশ্বরনগর । পাহাড়ী দূর
যেমন বোঝা হয়, তেমন নয় । বেশ ছিছান দার
পরিপাটি । অস্তিত্ব প্রথম দেখার আবারও তাই মনে হল ।
ওঁর মধ্যে এক কীকি দুই জোড় বাজার । ধূব দূরে
নয় । করাও সেল কিছু কেনাকাটি । মানে কিছু ফল
কিনে নিলাম । ওই যেহেই থাকতে হবে আজ । রাস্তা করবার
সময় পাওয়া দাবে না । অথবা, প্রতি বাস স্টেশনেই পাওয়া
দার তেলেভাজা পকৌড়ী আর আলু কাবলী ।

বাঙালীরা থেকে এসেছি । আর
সব অন্য প্রদেশের তবে
মনে হয় বাঙালীতাবার
শোকেই মনে বেশী । মাথার
কুদুম্বী রঙের সব পাগড়ী
আর লাল নীল ওড়না ।
ব্যাবস্তিক কি বনী নয়, ভাট
কি কিবাস ।

কটাবাসেনের হতেই
এসে সেলার নরেশ্বরনগর ।

নরেশ্বরনগরত দুই বেশী

নরেশ্বরবর্গের গড়ে গুলি পেলে, মিলিয়ে দেল দিগন্ত-
বোঝার তার আকাশচূড়নি বান্ধাশাল। ছাড়িয়ে এলাম
আগরখাল, কাছাকাছি ও চন্দ্রা। প্রথম দিকে কেবলি উল্লসিত
আমরা, তারপর কাছাকাছির পর হতেই বোধ হয় নাকছি।
নাথতে নামতে নেল ছাড়িয়ে বন্য চিহ্নি এলাম তখন প্রায়
নেমে এলাম একেবারে সমতল মাটিতে।

উঠবার দূরে কেবলি দেখে এসেছি পাহাড় আর
পাহাড়। সে পাহাড়ের যেন শেষ নেই। ভেবে পাইনে
কখন কিভাবে এসেব দৃষ্টি হল। ততক্ষণের কি
কলবেন জানিনে কিন্তু আমার মনে হল পৃথিবীর বুকের
আদমক বেনবাই বেন উৎসারিত হয়েছে এই সব কঠিন নির্দিষ্ট
শিরানিভের মতো পাহাড়ের ভূগুণে।

ভোরে বন্য গাড়ী ছেড়েছিল তখন বেশ একটা হিলেল
হাওয়া ছিল। তারপর সেই হাওয়াই তাঁড়িয়ে উঠল বতাই
বেলা ব্যক্তে লাগল। গাড়ীতে বসে এখন সব গাড়ী-
টাই যেন কেমন ভাপিয়ে উঠছে। কিম্বা কিম্বা করছে যেন
একটু মাথাটা।

চিহ্নিতে গাড়ী গাড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। উলটো-
দুটী বাস না এসে এদিকের বাস ছাড়বে না।
এদিকের পথ এতই সঙ্কীর্ণ যে দুটো বাস পাশাপাশি
চালাব উপায় নেই। তাই এদিকের গাড়ী আর এদিকের
পথ পরিষ্কার না পেলে যেতে পারবে না। একমাই যে
গাড়ী সব পেলে আসে তার
দুপে একটা সবুজ নিশান
থাকে। সে গাড়ী এসেই বোকা
থাবে ও দিকের পথ এখন
পরিষ্কার। এখন এদিকের
গাড়ীছাড়া যেতে পারে। এদের
মাতটার এগরটার তিনটের যে
সব গোটের বাসার তার বানাই
ওই। গোট ছাড়লে তবে গাড়ী
পাস হবে।

গাড়ী ছাড়বার দেরী নেমে
মাটিতে নেমে দাঁড়াই। কিন্তু
সেখানেও কি দাঁড়াবার উপায়
আছে। যা যাবে। কাছাকাছি

কোনো গাড়ী নেই। না ছাড়া। নীচে তবু যেন বাতাসটা
একটু ঠাণ্ডা।

চিহ্নি হতে গাড়ী ছাড়ল একটা দশে। মনে মনে
হিসেব করি এক্ষণে তাহলে সবুজ কতখানি পথ এলাম।
নরেশ্বরবর্গ যদি ৭৫ মাইল হয়ত এদিকে আরো চলি।
যেট পলাশ মাইল। ধরাসু, এখন হতে পটিশ মাইল।
ডিউলশাও হয়ত আরো একশ। তাহলে পটতালি
ছোটল মাইল হতো পথ এখনো বাকী। জাবি শৌছে
হয়ত যেতে পারি সেখানে শস্য আর দিগে। শস্য হয়ে
সেলেও পাহাড়ী অকলে গিলেব আসো ঘাই ঘাই করেও
বন্য আরো অনেকক্ষণ আটকে থাকে।

ইঞ্জিনত ঠাট নিলে। কিন্তু আনালের প্রায়
যেকন ওষ্ঠাপত ইঞ্জিনটিরও তাই। আমরা তবু দূর
দূরে ছাছি কিন্তু সে দূর বৃদ্ধি থাকবে কেন।
তাই অধরই শুনছি তার হৃদয় আর আশ্বাসন।
কিশোরলাল (আমাদের বাস ড্রাইভার) এক ভাল
কাবা এনে পানদ্বার করে চাপিয়ে দিবেই ইঞ্জিনের
ওপর যেন বিকারের হৃদয় রাখার সেওয়া হল
আইনদ্বার। তারপর হারে মাঝে কাবা দ্যাগে দিচ্ছে।
আর তার 'কমবাইও হ্যাণ্ডি' গ্যালন গ্যালন ভল এনে
চালছে তার দূরে। তবু বহি তার পিপাসা হয়ে। ধরাসু
হেঁচকেই গাড়ী গাড়িয়ে পড়বে—ভল চালাবে। না লেখলেও



কীভাবে। তখন গোছোলের খালিটিয়ে যে খাল এনে তবু
রেখেছে সেই হল চালে।

কীর্ণা সেবেল আনরাও আবার নেমে গাড়াই। চোখে
হৃদে-জল-সেই আর বাড়ের পেছনটা ভিঁষিয়ে তুলি।
কিনোমাসিন তখন ভাড়া লোটার। ওঠো ওঠো এনি
কলকল করলে কি বেঁটে পাংখে দড়োর খালে।

কটপট করে তখন সাতারিত উঠে বসি।

১. ঈশ্বরের সাক্ষি হোন এবং পৃথিবীে এবার ভাবিক হয়ে।
 সাইকিয়া ভক্তিদ্বারা হাড়িয়ে এসেছি অনেকজন। চন্দা না
 কি একটা টপেজও যেন পেতিকে জ্ঞায। শ্রুতান্দ
 বললেন, শাসনই এবার হুয়াস।

সঙ্গার ওপর ছোট্ট নগর ব্রহ্মাণ্ড ।

১. বঙ্গদেশে গণস্বাক্ষর সভাগুলি আয়োজিত হইতে একটা
 ২. গণস্বাক্ষর সভা আয়োজিত হইতে একটা
 ৩. গণস্বাক্ষর সভা আয়োজিত হইতে একটা
 ৪. গণস্বাক্ষর সভা আয়োজিত হইতে একটা
 ৫. গণস্বাক্ষর সভা আয়োজিত হইতে একটা
 ৬. গণস্বাক্ষর সভা আয়োজিত হইতে একটা
 ৭. গণস্বাক্ষর সভা আয়োজিত হইতে একটা
 ৮. গণস্বাক্ষর সভা আয়োজিত হইতে একটা
 ৯. গণস্বাক্ষর সভা আয়োজিত হইতে একটা
 ১০. গণস্বাক্ষর সভা আয়োজিত হইতে একটা

‘জাই বনু-বোজুরী দাও কি বংশোদ্ভবী ধরান্দ, সবাইকে
বাসন্তীই হয়।’

একই আবার একিকার বাস টাৰ্ণিং। অতঃ
 কাৰি-টাই। হিন্দ। এখন অবশ্য পথ গেছে এগেগে, পাতী
 গাছে জাভলগাও অবশি, কিছু তবুও বাস টাৰ্ণিং
 ই হয়স। তিভিলগায়ে টাৰ্ণিং বাস শু নরুর একটা
 ট্যাঙই নেই। দাভীসের তাই পাহাড়ের গাছেই নামিয়ে
 দিই বাস ফিরে আসে।

বদরীর দিকে যেমন শিশলকোট, এ দিকে এই
মন্দির। রাতে আর ইককে ঝট পাকিয়ে আছে। আর
অগ্নি স্থান বোধো।

জিওলগারের টিকেট ছিল তাই খানদুহে আর
না। পাড়িতেই বলে কাঁধে।

হঠাৎ কিশোরীলাস বন্ধ, আঁখি জড়িতলাগারে না
হয়ে অঁখি বন্ধবালাে অঁখি—ভারপর আঁখায়ে, দিকে চরে
স্বপ্নিক বলেন আপনরা ।

ବିଶ୍ୱକାମ ଦେବାନ, ହସ୍ତେ ନିଜେ ଲେଖି । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱା

‘আর বলতে পারি ‘আসিনি’ ও ‘একটু’ এই আগে কখনো
তাই এ ওর হইবে চাই। লুৎফা-র আগে এসেও ‘তব
বয়স’ থেকেই ‘কোটেশন’, তাই এই ‘পথ’ নতুন। ওর
‘মিছেজের’ নবো ‘পরামর্শ’ করে লুৎফা-র বলেন, ‘হাঁ’ লুৎফা-র
আগে ‘ডিওলস’-এ ‘গাওয়াই’ ‘দায়’ ‘ভবে’ ‘সেন’ ‘আর
‘বানায়-বকে’ ‘পড়ে’ ‘বাকা’—‘তা’ ‘শে’ ‘বয়ম’ (‘ব্রহ্ম’) ‘বানাই’
‘হোক’।

কিন্তু কখনো বোধহয় মনঃপুত হই না। কিশোরীলালের
ও কিছ্ না বলিলেও ভাবে বৃদ্ধশ্রম গাড়ী ছাড় আর
যাবে না বরম্বালের দীর্ঘা ছাড়িলে ।

কেন জানিনি, সেহেনে গাড়ীকে ধোঁয়া এগিরে যেতে
 মিল কিশোরীলাল। কিন্তু সেই হল কাল। হঠাৎ
 হাড়িরে মাইল আটকেও আসে নি, ধোঁয়া সেই গাড়ীটা
 পাইড়েরে পড়ল সামনে। ইঞ্জিনের কি একটা কল বিকল
 হয়েয়ে। কলে আমাদের গাড়ীকেও পাইডাতে হল।

বুই গাড়ীর বুই ব্রাইভার ও দুজন 'কম্বাইও হ্যাণ্ড'
 বিশেষ শাসন সেই গাড়ীর ইঞ্জিন সারান্তে। কিছু ইঞ্জিন
 যে সবজেরী সারবে তা মনে হল না। তাই গাড়ী রেড়ে
 পলাই নেবে পড়বার আশা। আর কিছু না হোক পাঁ
 ঢেঁটা একটু খেলিয়ে নেওয়া যাবে।

হোম' পড়ে গেছে অনেককাল, সেই দপে গরমের
দুস্বেচ্ছাটা। সরকারী রিক্রাড' কলেজের পাশ দিয়ে বন্ধ-
পথে আসছিলাম তখন দুস্বেচ্ছের সেই কিংকিরে ডাব
কেটে গিয়ে ভালোও লাগছিল আবার। আসতে
আসতেই দেখি সেখানে 'মহাভাষী হুসিয়া' বলে পথ
সেবারতির কাজ করছিল সেখানে কে একজন হাঁড়িতে একটা
ছোট্ট হলি শিশু কোলে নিয়ে। কিনোয়ীদারের দুলে
ভরে কি কথা হল যেন তারপর কিনোয়ীদার ডাকে
মহাভাষীতে চলে গেল।

পরের মধ্যে এমন লিফট দিতে মেম্বারিং কমিশনার দালিকে
লানো। বরেন্দ্রনগরের পর দু'জন শিশু ঢালতি সাহসকে
হাসে দিচ্ছেন, তারপর ডিম্বীর আসে কোথার ঘের
খবর দিলে।

কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর আগেই পড়লার আদর্শ সকলেরই।
কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর আগেই পড়লার আদর্শ সকলেরই।
কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর আগেই পড়লার আদর্শ সকলেরই।

সুখের ছায়ায়, সুখের দিনে প্রভাতের L সেই যে 'কলক, বঙ্গী
হুগলি নন্দী—'

কিন্তু, কি করে এলো, এখানে হরিণ শিশু, কোথা
থেকে এল? কে ধরল ওকে? 'রিজাউ' করেচের জীব
জানোয়ারত কারু বরবাত্র কি মানুষের ক্ষমা নয়।

ছোট্টটির বুকেই হরিণের ইতিবৃত্ত পড়ি। বলে,
হুগলিই হয়েছিল ওকে। হরত বন থেকেই হয়েছিল নরত
হুগলি। এনে গড়ে থাকতে পারে, গবেষক ওপর। জ্বালি ও
ওয়ে, হরত পুড়িয়েই খেত, নরত দিত বিক্রী করে
কাউকে। তাই কিনে নিলার। বনের পশুকে বনে মেড়ে
সেব, ওয়েতে হুগলিতে ওয়েই আবার এনে নেবে, তাই
গলে নিয়ে যাবি।

কিন্তু জ্বলেই উষ্ম হয়ে উঠতে আরম্ভ করেই
আমরাসকলেই... উষ্ম হবার কথাও। হুগলিহানের
ওপরেই হল হুগলি ক্রিয়, হুগলি সেরে ওঠবার কোনো
লক্ষ্য নেই। ওদের 'সবুজ' জেটাই, 'ব্যর্থ' হয়ে
যাচ্ছে। শেলে বরাদ্দ না... টেনে নিয়ে যেতে হয়।
ওয়েকে সন্ধ্যার ও আর বেরী নেই। আর তার ওপর
পাশেই বন। হরিণ এখন রয়েছে তখন চিত্তে থাকেও কিন্তু,
আচ্ছা নয়। বনে বনে জাবি ভিঙলগলিওত হুগলি বরদ-
বালি আক আর পৌঁছাতে পারব না। সবত হাতই হরত
আত কাটাতে হবে গাড়ীর মধ্যে একদারসার বলে।

হাটবর নদীর দিকে ঘাড়িয়ে ছিলেন। নীচের দিকেই
নদী—কম করেও হাইল ছেড় দূইত হবেই। ওই নদীরই
দার দিয়ে পথ বেরকে বেরে এসেছে ওপরে। কি নাম
যেন—বোম্ব হুগলিহান।

জল শিশুরা শেতেছিল নীলকান্তের। কিন্তু এখানে
কোথায় জল। রাতে বহি গাড়ীতেই থাকতে, হুগলি হাটবার
তো হুগলি তকার এক কেচি জল ও পাওয়া যাবে না।
এখন যে বরাদ্দ কিসে দার তারো উপার নেই, না এগিয়ে
দাবার।

সন্ধ্যার হুগলিহানি গাড়ী ঠিক হল তাই বন
বরদখালে এসে পৌঁছালার এখন সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ
নিবিড় হয়ে এসেছে। নীচের অবিভক্ত হুগলি পাছাড়ের
দুগুগলি পনত ঢকে গেছে হুগলি এক অন্ধকারে। আকাশেও



হুগলিহানের দল

তাই অন্ধকার। অন্ধকারে বেশি নামদীন এক পছায়ে
হুগলিহান জলজলে করে জলরে পুত্রা তুতীয়ার
পশুসেবা নিমিল-ভার-বর ওপদান চরতুগলি হলই
চাউ চরতবতগলি হতে।

কোথায় ভেবেছিলার বরদখালে এসে মাথা পুঁজ
একটুখানি ঠাই পাব কিন্তু, তার কিছুই দেখছি
এখানে। একটি হাত সোফান আর কয়েকটি চারি
খোলা চালাবর। ওপরের দিকে একটা ঘরের ত্রু
দেখছি বটে তবে তার বহু খবর নিয়ে এসেছে সেখা
কোন আশা নেই। কিন্তু আশা কি আছে আর
এখানেও? চালাসুগো চালা ভর্তি। হোকার
দামনে ও পথের উপর, পাছাড়ের গারে লোক কেই
পরে বলে কেউ বা গাঁড়িয়ে।

কিন্তু গাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। ওই বহু বন
যেখা নিতে হবে। হুগলিহান বেতুগলি পাতলেন ব
পথের ওপরেই। আহা হোকার দার বরদার লাম
আচ্ছা হুগলিহান এইভাবেই কাটাতে হবে।

ভাটগলি ওপরের করণ হতে জল নিয়ে এসেছে বি
বাসনসহ কিছুই পাচ্ছে না। তাই উঠে সোফানে-বা
হোকার দার বলে কি কর বরদা, বাসনসহ বা।
দুই, হাইরে। বাগি হয়ে আনুগলি তখন সে।

বাসন পাওয়া প্রত্যেক চুটিতেই, তিনিই কিনলে। রাগা কত খাওয়া বলে বেছে যবে আবার কোথ গাও। তার জন্য কিছু দিতে হয় না। না তার ঘরে দু' একদেলা যে থাকি তার জন্যে। ওরে ভাল ভাল আটা বিপের যে হান নের তাইতেই পুখিরে বের সব।

তাই বাসন পত্র বড় কেউ একটা দশে আনে না, যা চাল ভাল আটা। আদরাও অনিনি। তবে হঠাৎ প্রয়োজনের জন্যে রেখেছি দু' বালা বালা ও একটি সরা। সেই সরাই বের করে সেই তাগাদতকে। বলি এতেই কিছুটা তুলে পাও, তাহলে অন্য বাসন আর লাগবে না, হবেও তাড়াতাড়ি।

তবু রাগা হতে হতে হল হাত হুন্টা। খেতে শূতে শূতে বাঘোটা। আদরা শূতে চাচ্চাকের আলোও নিতে গেল। দোকানী ঝপ ঠেবে দিল দোকানের। দুঃখানুয়া সবাই ঘুনিরে পড়লেন কুম্বল মূর্তি দিয়ে। বৈদ্যনাথত বোম্বের ব্যক্তি ক্যাপটাও পরে নিষেছিল। বললেন, যা ঠাণ্ডা। কাল আবার উঠতে হবেত। তা হবে! কিন্তু, মূশে

কাপড় দিয়ে ঘুমতে পারি না আমি কিছুতেই। হাজার শীত হোক, তবু না। মনে হয় কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। মিঃম্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে যেন। তাই খোলা আকাশের নীচে শূলেও গায়ে শুবু, কুম্বলখানাই সিনে দিই গলা অবধি।

এখন আর কোথাও আলো নেই, না আগুনের দালিমা। একটু আগে যে মশালের আলো দেখছিলেন শাহাড়ের মাথার হড়ে চড়ে বেড়াতে, সে আলোও আর দেখা যাচ্ছে না। রক্ত ঠাণ্ডি আছে হুহু ওদিকে, নইলে মশালের আলো নিয়ে কে আর ওখানে ঘুরে বেড়াবে। তাই সবখানে এখন এক অশুও সীমাহীন অন্ধকার। এ অন্ধকারকে প্রকাশ করি এখন ভাল নেই।

ঘুরে চোখ দুটো বড়িয়ে এল বাবার। আর একটু পরেই স্নাত ঘুরিয়ে পড়ল। কিন্তু, হিমালয়! দেখলেন হিমালয়ের চোখে ঘুর নেই—সে কি আমরা আর তার অভিধি তাই। দেখি সতর্ক দৃষ্টি মেলে হিমালয় চেপে ধইল আবারের শিরে অতন্ত প্রবীর মতো।

(ক্রমশঃ)



এম সি দলের

ভারত দল

ভারতীয় ক্রিকেট

কম্বোয়াল বোর্ডের কম-

স্টাব প্রি চি রা শ্বা নী

১৯৬১৬২ সালে-এম সি.

সি. দলের ভারত দল

দুটি প্রকাশ করে ন।

এম. সি. সি. দল দলের পাঁচটি টেস্টের মোট পনেরোটি
ম্যাচ খেলবে।

এম. সি. সি. দল প্রথমে পাকিস্তান দল করবে
এবং আর্থিক দলের পর বিমানযোগে পূর্নাব
পৌঁছাবে। সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় সহিত তিনদিনব্যাপী
ফোর যোগদান করিয়া দল উদ্বোধন করবে।

কেন্দ্র ভবনে রাজস্থান একাদশের সহিত এম.
সি. সি. দল ম্যাচিং উইকেটে খেলবে। অন্যত্র ঘাসের
উইকেটে খেলা হইবে। এম. সি. সি. দল এখানে
পাঁচটি টেস্ট, পাঁচটি আঞ্চলিক, একটি সভাপতির একাদশের
বিরুদ্ধে, একটি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জাতীয় ক্রিকেটে
বিজয়ী, অর্থাৎ রাষ্ট্র ট্রফি বিজয়ী বোম্বাই দলের
বিরুদ্ধে একটি সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় দলের বিরুদ্ধে
একটি এবং রাজস্থানের বিরুদ্ধে একটি ম্যাচ খেলিবে।

এই সর্বপ্রথম কটকের রাহবাটি স্টেডিয়ামে পূর্বাঞ্চল
দ্বন্দ্ব এম. সি. সি'র খেলাটি অন্তর্ভুক্ত হইবে।

রাহবাবাবাদে সফরকারী দলের বিরুদ্ধে ১৮ই নভেম্বর
ক্রি-কম্বোয়াল সভাপতির একাদশে খেলবার জন্য আদান-
প্রদানের ভিত্তিতে পাকিস্তানের তিনজন ভূম
খেলোয়াড়কে আদান করা প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই
প্রস্তাব কার্যকারী হইলে ভারতের তিনজন ভূম
সিউলোয়াড়ও পাক-ক্রি-কম্বোয়াল সভাপতির একাদশের
প্রতি খেলিবেন।

এম. সি. সি. দলের ভারতে পৌঁছানোর পর
সিউলোয়াড় এবং অন্যদল আলী বেগকে ভারতীয়
দলের সহিত মিলিত হইতে পারিবার হইবে। তাছাড়াও

খেলাধুলা

ক্রীড়া জগতের খবরাখবর

অজয় বসু

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের

দল গঠন

প্রিচাম্বাবাদী আরও

জানান যে, ইংলণ্ডের

বিরুদ্ধে ৩০শে ডিসেম্বর

হইতে চতুর্থ টেস্ট খেলা

চলিবার দর ওয়েস্ট

ইন্ডিজ দলের জমা

ভারতীয় দল নির্বাচন হইবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকারী

ভারতীয় দল ১৯৬২ সালের জানুয়ারী মাসের শেষ

সপ্তাহে খাড়া করিয়া ফ্রেডারী-মাসের প্রথম সপ্তাহে

সোমবারে দলের খেলা পূর্ব, করিবে এবং এপ্রিল মাসের

পেরাম্বিক এই দল দল করিয়া ম্বারেশে করিয়া

খেলিবে।

বিস্তৃত ক্রীড়াসূচী

২৯শে, ৩০শে ও ৩১শে নভেম্বর—পূর্নাব সম্মিলিত
বিশ্ববিদ্যালয় একাদশের বিরুদ্ধে।

৩০, ৩১ ও ১ই নভেম্বর—হাফরাবাদে পাকিস্তানের
বিরুদ্ধে।

১ই ২ই ও ৩ই নভেম্বর বোম্বাইয়ে রাষ্ট্র ট্রফি
বিজয়ী দলের বিরুদ্ধে।

অলিম্পিকের চূড়ান্ত তারিখ ঘোষিত

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি ঘোষণা করেন ১৯৬৪
সালে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক ক্রীড়া ১১ই অক্টোবর
হইতে ২৫শে অক্টোবর অবধি টোকিওতে অনুষ্ঠিত
হইবে। পূর্বে কমিটি ১ই অক্টোবর হইতে যিন স্থির
করিয়াছিলেন কিন্তু আগামী উদ্যোক্তা নির্ধারিত সমাপন
বলেন, ভুল বোঝাবুঝির কলে তারিখের সোলমাল
হইয়াছে।

১৯৬৪ সালে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক ক্রীড়াসূচী
অষ্ট্রিয়ার ইন্সব্রুকে ২৯শে জানুয়ারী হইতে ২ই
ফ্রেব্রুয়ারী পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া ঘোষণা
করা হয়।

আই ও সি সর্বসম্মতিক্রমে স্থির করেন যে,
সম্প্রদায়িক দল দল করিয়া অন্য দল বিজয়ের

পইনালেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে “কটো কমিশন” সাহায্য লওয়া হইবে, বাহাতে রোম অলিম্পিকে সভ্যদের পত্ন খিটোর বিভ্রান্তির অবস্ফূটন বতর্ক না উদ্ভিষ্টে পারে ।

জাপানী প্রতিনিধি জামান বে, ১৯৬৪ সালে অলিম্পিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় হাভা এবং ৭৪-বাড়ী পর্যায়ের জন্য জাপ সরকার এবং টোকিও মিউনিসিপ্যালিটি হাট ৫০ কোটি ডলার ব্যয় করিয়াছে ।

নিম্নলিখিত ক্রীড়াসূচী দ্বারা টোকিও অলিম্পিক প্রকাশিত হইবে :—

মুষ্টি বৃদ্ধ, বাস্কেট বল, এসোসিয়েশন ফুটবল, হাইকেল চালনা, হকি, অথলেটিক্স, ক্যানোইং, আধুনিক পতাকাখন, জুডো, রোয়িং, ফুটি, ভারোত্তোলন, সুটিং, সি চালনা, সস্ত্র ও আইসিৎ, ওয়টারপোলো, হায়ি, অব চালনা, জিমন্যাস্টিক ও তলিবল ।

রোম অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচীতে আঠারোটি বিভাগ হল, টোকিওতে এই সঙ্গে তলিবল ও জুডো যুক্ত হইল । এই দুইটি ক্রীড়া এইবারই প্রথম অন্তর্ভুক্ত হইবে । গত বৎসরে জুডো অলিম্পিক ক্রীড়াসূচীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল । উপরিত ৪০জন সস্ত্রের মধ্যে মাত্র দুইজন ‘জুডোর’ বিরোধিতা প্রদান ।

আই ও সি সিদ্ধান্ত করে যে, ১৯৬০ সালে আইসোবিতে পরবর্তী অলিম্পিক কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে ।

জি জি সন্নি অলিম্পিক কার্যকারী পরিষিদ্ধে নির্বাচিত

এখানে ২১শে জুন ভারতের প্রতিনিধি শ্রী জি বীথ স্বাভাবিক অলিম্পিক কমিটির কার্যকারী কমিটিতে বিদ্যায় সন্তান-ম্যার, আর্থার পুরিটের সঙ্গে সাক্ষাৎ নির্বাচিত হইয়াছে ।

শ্রীদি পূর্ন বৎসরের জন্য সমস্তপক্ষে থাকিলেন ।

অস্ট্রেলিয়ার ভারত সরকারের সভাপতি

নির্ভরযোগ্য সুত্রে জানা গিয়াছে যে, অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি ম্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যানের

দ্বারা একটি প্রথম শ্রেণীর অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট দলকে ভারত দলের আশ্রয় করিতে সম্মত হইয়াছে ।

স্বাভাবিক হাতি অনুসারে অস্ট্রেলিয়ারই ভারতকে আশ্রয় জানাইবার কথা । কারণ ইতিমধ্যে ১৯৫৬ সালে এবং ১৯৫২-৬০ সালে অস্ট্রেলিয়া দল ভারত দল করিয়াছে ; ভারতীয়দল কেবল ১৯৪৭-৪৮ অস্ট্রেলিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল ।

শ্রীচাম্বারসের সহিত এই সম্পর্কে পরামর্শে ম্যার ব্র্যাডম্যান এবং ভারতের অস্ট্রেলিয়া দলের দৃষ্টি স্থা করার জন্যে কিছু এই দলকে আর্থিক সাহায্যে সম্মত প্রকাশ করিয়াই তিনি ভারতীয় সভাপতিকে পুনরায় ভারতের অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের দলের আয়োজনের পরামর্শ দিয়াছেন ।

ভারত এই পরামর্শ গ্রহণ করিতে চাহি আছে—কিন্তু এই দলের সভাপতি পূর্ন পূর্ববারের অনুসরণ হওয়া বাস্তবীয় নয় যদিও জানানো হইয়াছে ।

ইন্সটিটিউট ক্রিকেট কনফারেন্সে যোগদানকারী ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীচাম্বারস এবং বরোদার মহারাজা এ বিষয়ে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন ।

অস্ট্রেলিয়া ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব জীবিত্যে ভারত দলের আশ্রয় ব্যবস্থা করার জন্যেও ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি শ্রীচাম্বারসের উপর ভার দেওয়া হইয়াছে ।

পৃথিবীর প্রাচীনতম ঐতিহ্য

স্বাধীন প্রযুক্তিকর্মণ দুই দ্বারা সভ্যত বৎসরের পুরাতন অংশ পৃথিবীর প্রাচীনতম যে টেভিয়ারটি (অলিম্পিয়া, গ্রিক্স-গ্রীস) হাতি বৃদ্ধিমা বাসির করিয়াছিলেন তাহা আজ আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রীসকে অর্পণ করা হইয়াছে । প্রথম বৃদ্ধিপাতের কলে খিউসের বাসিরে অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় নাই ।

৫৮তম কংগ্রেসে যোগদানকারী প্রায় ১০টি দেশের প্রতিনিধি এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন । ১৯৫৭ সালে প্রথম জার্মানির উদ্যোগে এই ‘বনবাস’ আশ্রয় হয় । বৃহত্তর পর পুনরায় ১৯৫৭ সালে কাল চালান হয় ।

এই প্রাচীনতম টেভিয়ারে অংশগ্রহণের জন্য আধুনিক-কালের অলিম্পিক গ্রামের দ্বারা পূর্ন এবং প্রসিদ্ধ

হোঁহতে পাওয়া যায়। সৌভাগ্যবশত স্থল এবং সৌভাগ্য
টাক এবং ১০ জন প্রতিযোগী গীড়াইবার জন্য পাথরের
নির্মিত 'স্ট্যান্ড'ও আছে।

৩৯৪ অব্দে এখানে শেষ অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত
হয়। তারপর পর যোন দত্তাট বিয়োজেনিদাসের আমলে
অলিম্পিক অনুষ্ঠান বন্ধ হয়।

শত শত বছর ধরিয়া এই স্টেডিয়ামটি ধূলোমাটিতে
প্রোথিত হইয়া সোকরকুর অন্তরালে চলিয়া যায়।

এই স্টেডিয়ামটি খুঁড়িয়া বাহির করিতে ভার্মান
অলিম্পিক কমিটি আড়াই শত লসার সাহায্য করে।

মার্কোপোলো পথে মশালবাহক

ক্রীড়ামহলের (তাইপে) নিকট হইতে আসা গিরায়ে
বে, আসান আসা করিতেছে বে. কম্যানিষ্ট সরকার চীনের
ভিতর দিয়া ১৯৬৪ সালের অলিম্পিক মশালবাহকের
টোকেও বাইতে অনুষ্ঠিত দিবেন। এই অনুষ্ঠিত পাইলে
মার্কোপোলো অনুষ্ঠিত পথ ধরিয়া মশালবাহীরা ১০৬৪
সালে টোকেও অলিম্পিকে দেখিহিতে পারিবে। এ পথে
কয়েক শত বছর পূর্বে মার্কোপোলো পৃথিবীর পবিত্র
স্থল হইতে পূর্ব দেশে আসিয়াছিলেন।

চীনের মূল ভূখণ্ডের ভিতর দিয়া পথ বানহাতে
অনুষ্ঠিত পরিবর্তে জাপানে নাবিক কম্যানিষ্ট তৈরি
আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটিতে দক্ষ্য পদ লা
সকলে তৈরি করিবে। এই সংবাদে এখানে জাপান
কিরূপে উদ্ভা প্রকাশ করা হইয়াছে।

কলিকাতা টাউন ক্লাবের সিং ভাঃ শীর্ষ মহল ক্রিকেট ট্রফি লাভ

কলিকাতার টাউন ক্লাব (২১শে জুন) শ্রেণী
শোর্টস স্টেডিয়ামে এলাহাবাদ জিমখানা বদকে শোভন
ভাবে ৭শ উইকেটে পরাজিত করিয়া নিখিল ভারত শ
মহল ক্রিকেট ট্রফি লাভ করিয়াছে।

সংক্ষিপ্ত ভোয়

এলাহাবাদ জিমখানা—১৮ ও ১০৭ ও ৩২, ডি ৪
১৪, হেবা ৬৮, প্রবিশিষ্ট ১২, বাবু দুখারী ৫৫ হাতে
শি বন্দু ২২ হাতে ২৩, কিল্লর লী ১৭ হাতে ৪)।

টাউন ক্লাব কলিকাতা—১৫৫ ও কের আউট না ৪
৫৫ (৫৫ হাতে ১৮, এল দিহ ৩৪ হাতে আউট।



চিত্রনাট্য ও পটচিত্রনা—

মঞ্চ চক্রবর্তী। সৌভ
পটচিত্রনা—সুদীপ দাসগুপ্ত।
কাহিনী—রাসবিহারী দাল।
চিত্র গ্রহণ অক্ষয় দিত্ত। পট
গ্রহণ—শিশির চট্টোপাধ্যায়।
শিল্প-নিৰ্দেশনা—সুশীল

সরকার। সম্পাদনা—বিশ্বনাথ দাস, দেবীলাস
গোপাধ্যায়। অংশ গ্রহণে—কালী বানার্জী, বাঃ পল্লব,
বিকাশ রায়, কাহ্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, তরুণ দিত্ত,
সন্ধ্যা রায়, হারা দেবী, সবিভাবত, বাঃ নীপক আরও
অনেকে।

বিশ্বভারতী চিত্রমন্দিরের নতুন চিত্র উপহার
'পটচিত্রক' দর্শক সমক্ষে বিভিন্ন রসের ভাবাত নিয়ে
উপস্থিত হয়েছে। এই ছবিতে বহু চরিত্র এবং বহু ঘটনার
সমাবেশ। "লালু চুন্" এবং "মানিক" ছবি দুটির সঙ্গে
এর তুলনা করা যেতে পারে।

সেবকের এ কাহিনীর শুরুতে একটি অন্ধ বালককে নিয়ে-
বালকটির নাম নীল। সুদীপরঞ্জন তাঁর ছেলে নীলকে
নিয়ে আসছিলেন কলকাতায়। কিন্তু নীল এক দুর্ভাগ্য-
হলের কবলে পড়ল হাওড়া রেলনে এসে। দুর্ভাগ্য বালক
নীলকে তুলল নিজেদের আশ্রয় নিয়ে। নীল খুব ভাল
পান করতে পারত। নীলকে বিয়ে পান গাইয়ে পরগা
গোছপার করবে ঠিক করল ওরা। কিন্তু নীল পান গাইতে
সাক্ষী হয় না এবং খেতেও চায় না। যখন কিছুতেই কাজ
হয় না—তখন রেলের সার্কারের একজন সাক্ষর নীলকে
উপর তীব্র ক্রোশে ওঠে। ঐ অন্ধ বালকটির মত সিতারার
হুজি একই মামা হয়। সিতারা হুজিকে খুব ভালবাসে
এবং ভারি সাহায্যে চাষি চুরে করে সে নীল, হারা আরও
হুজি ছেলেকে এই পালক হতে হুজি করে দেয়।

সুদীপরঞ্জন ছেলেকে হারিয়ে শিকশতার কাজ গ্রহণ
করেছেন। তার সঙ্গে এক বড় লোকে ওখুৎ ব্যবসায়ীর
ছেলেকে তাঁর আশ্রয়ে থেকে। সুদীপরঞ্জন কর্তব্যপারায়ণ ও
উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। ফুলের পুরানো কোষাগার-
সত্যাবাহুর একমাত্র সন্তান দুর্ভটনার পড়ে শয্যাশায়ী হয়।

রত্ন জগৎ

পটচিত্রক

শিল্পক

অপারেশন করতে হবে
ডাক্তার বলেছেন—এবং সেখান
এছুর অর্থে প্রয়োজন। অত
অর্থ তিনি কোথায় পাবেন?
সত্যাবাহু যখন টাকা টাকা করে
পালল! সেই সময় সুদীপরঞ্জন
কতৃক অসতর্ক অবস্থার বাধ্য

শিল্পকের চাষিটি সত্যাবাহুর হাতে আসে এবং এছুর টাকা
ফুলের তহবিল হতে নিয়ে আসেন। অবশ্য সন্তত কবাই
সুদীপরঞ্জনকে সঙ্গে দেখা হবার পর ফুল বলেন। পরদিন
ছেলেটিকে বড়ো ঘেমে সুদীপরঞ্জন ডাক্তারের হাতে
চিকিৎসাধারক গাড়ি তিন হাজার টাকা দিয়ে আসেন।
টাকা নেওয়ার কথা ফুল কমিটির নিকট নীকার করেম।
এর বেশী কিছু বলতে চান না। বিচারে সুদীপরঞ্জনকে তিন
বাসের জেল হয়। অবশ্য শেষ পর্বত প্রত্যেকেই, মানিতে
পারে সুদীপরঞ্জন নির্দোষ। তিন মাস যেখানে থেমে
কেটে যায়। জেল থেকে যখন সুদীপরঞ্জন মুক্তি পায়, তখন
ডাঃ ব্যানার্জীর তরী নীলা এসে জানায় তার প্রিয় ছাত্র
অসুস্থ।

কিন্তু এর মধ্যে নীলার মনের গোপন খবর সুদীপরঞ্জন
পেরেছে। সেজন্য নীলার ভীকে সাফা না দিয়ে পারে না।
ছুটে গেল অসুস্থ ছাত্রের পাশে। কিন্তু বাঁচানো সম্ভব
হলো না ছেলেটিকে। ডাঃ ব্যানার্জীর নিজের
ল্যাবরেটোরিতে তৈরী মলে ইনজেকসেন ব্যবহার করা
হলে ছেলেটির উপর। তাতে কোন কাজই হল না। নিঃ
ব্যানার্জী নিজের পাপ কাজের ফলে ফুল অসুস্থের
চিত্ততরে শয্যা নিলেন।

ডাঃ ব্যানার্জী মাতা বাবার পূর্বে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি
ফুল ছেলে-মেয়ের দেবার মত হাসপাতাল তৈরী করতে
দায় করলেন সুদীপরঞ্জন ও নীলাকে করে গেলেন সেই
হাসপাতালের টাঙ্ক।

এই ছবিতে বাৎসর্য বন পাণাহুতান, অসাহু বৈজ্ঞানিক
ও ব্যবসায়ী মানবতা ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ
ইত্যাদির সঙ্গে মনস্ত, কর্তব্যনিষ্ঠা, উদারতা ইত্যাদি উচ্চ
ধরনের মানব হানও আছে। তা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্ত্যই

স্পষ্ট ও ছবিরগ্রাহী হয়ে ওঠে নাই। এ-ছাড়াও ছবিটিতে বহুবির ফ্রন্টের অল্প বর্ষকদের মন আকর্ষণে পেরেছে বলে আশাধের মনে হয় না।

অল্প বালক নীচের ভূমিকাও নবাগত পল্লব। এই বিশেষ প্রিন্টটি বর্ষকদের মনে রেখাপাত করেছে। মিঃ ব্যানার্জীর ছোট্ট হেল্পেটও বর্ষক-মনে এক অপূর্ব মায়াবী সৃষ্টি করে। কিন্তু অসঙ্গত চরিত্রাভিনয় খুব প্রশংসনীয় নয়।

ঘোট্ট ছয় বানি গান এই ছবিতে আছে। পেরেছেন—হেমন্তকুমার, মাদা সে, লতা সুশেপকর, কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। আবহসঙ্গীত কোন কোন কারাগার বিতর্কিত হয়ে উঠেছে।

অল্প মিমের আলোকচিত্র গ্রহণের সুবাদ স্মরণ হয় নাই। শেষ গ্রহণের কাল প্রশংসনীয় মলা চলে।

টুকরো খবর—

আরোহা চিত্র প্রতিষ্ঠান তাঁদের তপিনী নিবেদিত। চিত্রের অল্প লোকজন সব বর্তমানে ইংলেণ্ডে রয়েছেন। পরিচালকদের বিষয় বহু ও অল্প বহু জীবন কালে ব্যত আছে। স্মরণীয় সরকার বিখ্যাত ('ভেনডাম ট্রিভিও'র সঙ্গে দুক) আরোহাকে এ বিষয়ে বগেট সহযোগিতা করেছেন। ব্রিটিশ ক্যামেরাখান রবার্ট টেলর 'অরোহা'র হয়ে কাজ করেছেন। লণ্ডনের বন্দর অফিস, নিবেদিতার জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্থানের চিত্রগ্রহণ করেছেন। লণ্ডন রানস্ফোর্ড মিশন থেকে স্বামীজী ও নিবেদিতা সম্পর্কীয় কিছু হুস্মান চিত্রগ্রহণ পেতে পারে ও এগুলি চিত্রে স্থান পাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

দেশের বোর্ডের তড়াকর্ষি অকস্মাৎ হুঁচি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্র নির্মাতারা বিশেষ চিন্তাচিন্তিত হয়ে পড়েছেন। ভারতীয় কিন্ন ফেডারেশনের সভাপতি ও বিভিন্ন প্রযোজকরা যেতারমন্ত্রী ডা. পেনকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

হক্কাি ভারতীয় কিন্ন চেম্বার অব কমার্স' এর প্রযোজকগণ নিম্নেরাই ছবি দেশের কবরার সফল করেছেন। ১২ জন সভ্যকে নিয়ে একটি দেশক



'সন্ধ্যার রঙের' একটি দৃশ্য। মুহুর্তে অপর্ণা চক্রবর্তী ও অমলী তট্টাচার্য

সেলসনিশ কমিটি গঠনের উদ্যোগী হয়েছেন। এর কার্যকর হলে গত দু'মাসের ছবিগুলিকে দেশেরের হারালো। অন্তর্-দিয়ে এমন নির্ভরতাবে কাটা হয়েছে যে চিত্র-নির্মাণাধারের জীবন অর্থ ক্ষতি হয়েছে। সেলস নিম্নেরাই আগে থেকে দেশের করে অবধা কিন্তু নষ্ট হওয়ার হাত থেকে প্রযোজকদের রেখেই দিতে চান।

"বেঙ্গল মোশান পিকচার্স" অ্যাসোসিয়েশন" তার নাম পালাটিয়ে "আনান পিকচার্স" অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারপ্রেটিং" M.P.A.E.I এই নাম রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এইরূপ সিদ্ধান্তের কারণ হল—অ্যাসোসিয়েশনের কার্যসীমা আরও বাড়ানো। পণ্ডিতবর্গ আশাম, বিহার, উড়িষ্যা ও পূর্ব পাকিস্তানকে এর অন্তর্ভুক্ত করা।

এস হুবার্জী কিন্ন প্রতিবেদক বর্তমানে ইষ্টম্যান রঙের একটি তত্ত্বিন ছবি নির্মাণে ব্যস্ত আছেন। প্রোডাশে আছে বিনোদনময় ও বৈজ্ঞানিক। রাম হুস্মানপাধ্যায় পরিচালনা ও সঙ্গীতে মৌসে।

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক বিজুভিভূষণ হুস্মানপাধ্যায়ের "আজান" এর কয়েকটি বহিঃস্থ সঙ্গী, ছবি, ও ছবিগুলি নবীরা তাঁর গ্রহণ করে পরিচালক অধিক হুস্মানপাধ্যায় দিয়ে এসেছেন। বিখ্যাত ও সঙ্গী বার কথাকথমে নায়ক

নাথিকার জুড়িয়ার অবতীর্ণ হবেন। শ্রীপদ্ম মল্লিক
সকীত পরিচালনার।

বিখ্যাত ছাত্রচিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী পদ্মিনী সন্তোষ
ডাক্তার রামচন্দ্র-এর সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ
হয়েছেন। উক্ত শিকার জন্য ডাক্তার রামচন্দ্র স্ত্রী-সহ
দীর্ঘই লণ্ডানভিমুখে যাত্রা করছেন।

মিষ্টার এও মিলেদ চৌধুরী পূর 'মূলতা শিকচাল'
এর পংখ্যে 'দ্বি-চৌধুরী বাড়ি।'

অত্যাশঙ্কিত একটি স্ত্রী কয়েকটি পত্র 'অপর্ণাকে' অবলম্বন
করে পরিচালক কবিতা চট্টোপাধ্যায় একটি চিত্র তুলছেন।

"চিত্র প্রযোজক" নামের একটি নবগঠিত সংস্থা
উত্তরকুমার ও সুচিত্রা সেনকে নিয়ে তাত্ক্ষণিক
বলোপাধ্যায়ের একটি পত্র অবলম্বনে 'বিশাখা' নামে
একটি চিত্র নির্মাণ করছেন।

দুই ভাই হবির কাছে ক্রম এগিয়ে চলছে।
অভিনয়শিল্পী উত্তরকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বকিং,
জলপিত চৌধুরী প্রভৃতি। নাতী পরিচালনার সুবীর
জুবোপাধ্যায় ও সাকীতে বেদন্ত জুবোপাধ্যায়।

ভারতে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের যে পরিকল্পনা
গ্রহণ করা হয়েছে, তা আগামী ২৭শে অক্টোবর হতে ২৮
নভেম্বর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ, ১৭৭ হতে ১৮৮ কলিকাতা, ৬ই
হতে ১১ই নভেম্বর পর্যন্ত বারাণসী, এবং ১১ই হতে ১৪ই
নভেম্বর পর্যন্ত বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত হবে। এইরকম এ
কিছু পণ্ডিত হয়েছে। গত ১০ই জুন তথা ও বেন্ডার
মহী ভাঃ কেশব কবিতাকে জানিয়েছেন যে, ভারতের
আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবটি চলচ্চিত্র প্রযোজক
সমিতির অনুরোধে গিয়েছে। ভাঃ কেশবের আরও
জ্ঞান অষ্ট্রেলিয়া, মূলগেরিয়া, ফ্রান্স, পূর্ব জার্মানি,
পশ্চিম জার্মানি, দানা, মাসল, মনোপিয়া, নিউ জিল্যান্ড,
নেদারল্যান্ড, ক্যানারিয়া, সুইজারল্যান্ড, বেলজিয়াম

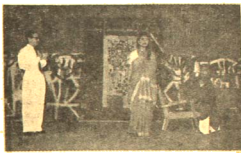
ভিয়েটনাম পপুয়া গিনি, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোনেশিয়া
হুয়েনগুয়া। এই উৎসবে বোম্বাইয়ের সমস্ত জ্ঞানিয়েছেন।

এখানে উল্লেখ্য, এই চলচ্চিত্র উৎসব প্রতিযোগিতা
মূলক নয় এবং এতে ধর্ম্ম অংশ নেবেন তাঁদের আরও
উপহার দেওয়া হবে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র বাই হোক না কেন সাংস্কৃতিক
ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে মিলন আর
আকাশ সূক্ষ্ম কল্পনা নয়। সম্ভ্রান্তি হুক্ত বঙ্গের এ
মিলিত বৈশিষ্ট্যে স্থির হয় যে অল্প তবিলতে দুই তরফে
প্রযোজকের মিলিত পরিচালনার চলচ্চিত্র প্রকাশিত
হবে। পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র শিল্পের সহ-সভাপতি
মিঃ এ, মজিব ও ঢাকার এক সাপ্তাহিকীর সম্পাদক এ
বিষয়ে যোগাযোগের জন্য সম্ভ্রান্তি কলিকাতা এসেছিলেন
বেঙ্গল মোশান শিকচালস এসোসিয়েশনের তরফ থেকে
এ বিষয়ে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সম্ভ্রান্তি
ও অপর একজন (পূর্ব পাকিস্তানের) প্রযোজকের মূল
পরিচালনার "পদ্মিনীর রাস্তা"র চিত্রগ্রহণ হতে বাঞ্ছা।
সম্ভ্রান্তি দ্বারা এ কাজের দায়িত্ব অবিলম্বে ঢাকা যাচ্ছে।
কলিকাতার আলোহারা প্রোডাকশন ও পূর্ব পাকিস্তানের
ইআত করপোরেশনের সিঃ আর একটি ছবি চিত্র-
গ্রহণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আশা করা যাচ্ছে
উত্তর সরকারের কাছ থেকে এ বিষয়ে সহযোগিতার
অভাব হবে না। আদর্শ আশা কবি এ ধরনের সহ-
যোগিতা উত্তর দেশকে অনেক বিষয়ে আরও একটু কাছে
আনবে।

১৯৬২ সালে রাশিয়ার প্রথম সত্য আন্তর্জাতিক
চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর আগামী ৬ই
থেকে ২০শে জুলাই পর্যন্ত এ উৎসব হবে। প্রথম ও পর্যন্ত
সমস্ত মহাশয় থেকে বিশিষ্ট বেশ অংশ গ্রহণ করবে বলে
জানা গেছে। বহুলক্ষ শ্রাবীণতা প্রাপ্ত আফ্রিকা
কয়েকটি দেশও এ বছরই অংশ গ্রহণ করছে।
সোভিয়েত সাংস্কৃতিক দলের পরিচালনার এ উৎসব

ভারত থেকে পরিচালক মেহেবুব খান অন্যতম জুরি রূপে মনোনীত হয়েছেন। এ এসকে উল্লেখযোগ্য যে আগামী ২২শে জুন থেকে বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবের অন্য সত্যিকারের জুরী রূপে মনোনীত হয়েছেন। অবশ্য এ বিষয়ে জিয়ার এখনও তাঁর মতামত জানানি নি।



সিরিগুপ্তের 'রক্তকরীর পথে'র একটি দৃশ্যে অল্প ভট্টাচার্য, লীলিকা হাস ও তামল খোঁস

একাদশ বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসব আসন্ন। এ পর্বত জানা গেছে যে পরভ্রমণটি বেশ উৎসবে অঙ্গ গ্রহণ করছে। জানা গেছে যে একুশটি বেশ কাহিনী মূলক ছবি পাঠিয়েছে। দুইটি বৃহৎ মূল্যবান মকে এ উৎসবটি অন্তর্ভুক্ত হবে।

Academy of Motion Picture Arts & Science এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৬০ সালের Todd-Ao-Production এর "The Alamo" সর্বশ্রেষ্ঠ শব্দ গ্রহণের জন্য Oscar পুরস্কার লাভ করে। এ সাক্ষ্যের অস্ত Fred Hynes এর বৃত্তি সর্বাধিক।

ভারত ইতিহাসে সুউন্নতিবিধ চাপক্যের কৃষিকা অপমান। ঐতিহ্যগত ইতিহাসকে কেন্দ্র করে এই পৌরহানবের কাহিনী আজও ভারত ইতিকথায় সমান উজ্জলতার সঞ্চার করে আছে। এই দুঃখের হৃদয়ীতিবিশ্ব এর চিত্রশাসনের যে গোন ইতিহাস পাঠকের কাছে হোঁচকল ও আনন্দের বিষয়। শুধু বস্তু এই ঐতিহাসিক কাহিনীটি পরিচালনাও তার গ্রহণ করেছেন। বস্তুই জানা গেছে গুরু বস্তু নয় নাথ ভূমিকার অবতীর্ণ হচ্ছেন। এই কাহিনীটিকে বস্তুই সত্ত্ব প্রাচীন ঐতিহাসিক পরিবেশেই প্রণীত হবে বলে সংবাদে প্রকাশ।

সাম্প্রতিক কালে মটরস গোনীক কথক নৃত্যক গ্রন্থ গ্রহণে ও বিশেষে প্রসিদ্ধ। সন্ততি বারানসীর এক অল্পটানে তিনি স্থানীয় বিবর্তন বর্ণক বস্তুগোকে দৃঢ় করেন।

সংবাদে প্রকাশে যে আগামী আগষ্ট মাসে তিনি সোভিয়েত রাশিয়া যাচ্ছেন। আমরা এই সাংস্কৃতিক সন্ধরের সাক্ষ্য কামনা করি।

উৎকর্ষতার দিক থেকে "মোগল-ই-আজাদ" বস্তু সকল হয়েছে তা সমালোচকের সেধনীর অপেক্ষা রাখে তবে ব্যবসায়িক সাক্ষ্যে এ চিত্র সবার উপরে। আ পর্বত জানা গেছে যে এ ছবির কল্যাণে ১৭,০০,০০০ টাকা প্রণীত হয়েছে। ছবিটি তাহিল ভাবান্তেও প্রকাশিত হয়েছে।

*

ব্রীজ শতাব্দী সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচার সবে প্রাণিত হয়েছে এবং হচ্ছে। কোন অল্পটানে অস্ত সাধারণ পরিবেশে কবি প্রাণম জানান হয়েছে। আন কোমল বা হঠাৎ আলোয় সলকানি, ভীত ভাবে থে দিয়েছে। কলকাতা এবং তার সমরতলীতে সন্ততি অল্পটান হয়ে গেছে। গত ১৬ই মে জানকুমিত্তে উপলক্ষ্যে এক মনোজ অল্পটান হয়। বৈষ্ণবের বা এবং বীতিনাট। অত্যন্ত সাক্ষ্যের সন্ধে অন্তর্ভুক্ত এখানে। স্থানীয় মেলে মেহেরাই এ অল্পটান পরিচাল করে। অল্পটান শুধু এবং মূল্যে সাক্ষ্যের পরিচালন বীতিনাটটি সবার মনোমগ্ন করে।

আমেরিকার পি সি সরকারের নতুন সম্মান লাভ

বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি বাদ্‌বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান আমেরিকার ইন্সটিটিউট অফ স্টাডিজ অফ ইন্টারন্যাশনাল ল্যাংগুয়েজ এন্ড কালচারাল স্টাডিজ নামে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। মন্ট্রালের উপর পি, সি, সরকারের চবি ডাশাইবা প্রতিষ্ঠার পূর্ণ সুক্তি পূর্ণাঙ্গাণী একটি বিশেষ অধ্যায়ে তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছাশক্তির বিবরণ আলোচনা করিয়াছে। প্রতিষ্ঠার সম্পাদক নিম্নলিখিতেন প্রায় পঁচিশ পূর্ব পি, সি, সরকার বাহু ভগতে এক উজ্জল জ্যোতিষের মত আবিষ্কৃত হইয়াছেন। বিশেষ বাহুবিজ্ঞানের ইতিহাসে একমাত্র জড়িনি ডাড়া অল্প কয়েক বাহুবিজ্ঞান এত ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন নাই।

ম্যাট্রাভিসম

'গদ্য' নতুন ম্যাট্রা প্রতিষ্ঠান হলেন বিদ্বিত। এ'রা এখার একটি দ্বন্দ্ব মাসখাপী একাংক উৎসব করছেন। গত মাসে এ'রা মিনার্ডের অভিন্ন করলেন অধ্যাপক চিত্তবল্লভ ঘোষের 'বেংগলেশিয়ান' এবং সুকলম বিজ্ঞানের 'নেপথ্য-কর্ম'। অভিন্নের বিশেষ উল্লেখের দ্বারা তাহা পিহিৎকর, তামল ঘোষ, মনোজ মিত্র প্রকৃতি। মার্ক হুইট 'বিশ্ব মতাব্দী'তে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে।

'অনর্ঘ-প্যাত সুশীল সুখোপাধ্যায়ের নতুন মার্ক 'বিশ্ব' অভিন্নের করলেন জড়িত চার্চ কলেজ কর্তার ইউজিস অ্যালোনিবেশন।' সু-অভিন্নের করেন পূর্ববর্তী বস্তু, সুসুখিতা বাগচী, হুনকা মজুমদার, সুশীল সুখোপাধ্যায়, বিনার্শি সেন, রমণিৎ ব্যানার্জী প্রকৃতি।

বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক
বিমল কল্লের উপদেশনাথ
'কথামালা' পত্রিকাটি এখন থেকে
নবরূপ গ্রহণ করবে।

আমার সংখ্যায় সম্পূর্ণ উপভাষা লিখেছেন।

প্রবোধবন্ধু অধিকারী
“অতসী”

এ ছাড়া গল্প লিখেছেন :

ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র
সত্যেন্দ্র আচার্য
বরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
রতন ডাটাচার্য এবং আরও অনেক

আমার সংখ্যা আমার মাসের তৃতীয়
সপ্তাহ প্রকাশিত হবে।

প্রতি সংখ্যায় মূল্য এক টাকা
বার্ষিক প্রাইস চাঁদা বার টাকা।

‘কথামালা’ ২০, গ্রেট স্ট্রিট,
কলিকাতা-৭

বিংশ শতাব্দী

‘সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই’

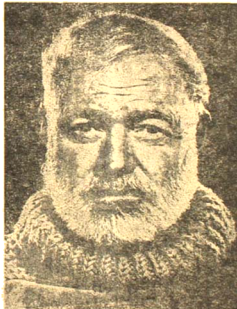
আনন্দি হেমিঙওয়ে

হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ইত্যা না দৃষ্টিনা না আয়ত্ত্যা—চিরদিন এই লংগ দোলায় মগেই মূলতঃ থাকবে ঘর্নোন্মিত হেমিঙওয়ের মৃত্যু। বাণালী পাঠকের কাছে এ মৃত্যু বেলনার, কারণ তাদের কাছে হেমিঙওয়ে ছিলেন একজন সুপরিচিত ঘরান শিল্পী। ১৯২৯ সালে ‘এ ক্যোরওয়েল টু আর্নিস’ প্রকাশিত হবার পর হেমিঙওয়ের জনপ্রিয়তা শূন্য স্বদেশে নয়, পৃথিবীর ইংরেজী ভাষাভাষী অঞ্চলের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বিংশ শতাব্দীর প্রায় পঞ্চাশ হাজার হেমিঙওয়ে অবশ্য বাংলা দেশের সাধারণতঃ এগে পৌঁছান আরো কিছুকাল পরে—তার প্রেক্ষিত বর্ণিত ‘দ্য লস সি বেল টোলস’ বইখানির চিত্ররূপের মাধ্যমে।

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে ২১শে জুলাই হেমিঙওয়ের জন্ম হয় পিকাপো শহরের ইলিনয়ের ওক শাফে। বাবা ছিলেন ডাক্তার। বাবার ইচ্ছা ছিল ছেলে ডাক্তার পড়ুক, না চাইলেও ছেলে শেপার্ড হোক। বাবা মার

ইচ্ছা ছেলের জীবনে পূর্ণ হয় নি। মাত্র বোল বছর বয়স থেকেই গ্রাম ঘরগের সংক্রাম দূর করতে হয় হেমিঙওকে। দিনবছর হিসাবে, কৃষকের সহকারী রূপে চাকরির মোকা মে কা প হোওয়ার লোক হিসাবে দিন ঘাপন করতেন তিনি। প্রথম মহাব্যবহার একজন সৈনিক ছিলেন হেমিঙওয়ে। যুদ্ধে আহতও হয়েছিলেন। তারপর ১৯১৭ সালে দ্য বাসিক ও সাহিত্যিকের জীবন মে যে নিযেছিলেন



আনন্দি হেমিঙওয়ে

হেমিঙওয়ে। ক্যানডাস শিটি ‘স্টার’ পত্রিকার সংবাদ্যাতা রূপে তার এই মৃত্যু জীবনের শেষভাগ।

পিকাপো শহরের অন্য নাম হল মধ্য-বিশ্বের রাজধানী। বাল্যে ও কৈশোরে অনেক দিন এই পরিবেশে অতিবাহত হয়েছিল তার। কিন্তু তার রচনার মধ্যবিশ্বের জীবন সংঘাত, পারিবারিক লড়াই, কৈশিকতার ব্যুৎপত্তি আবির্ভূত হয় নি। শিনক্রোয়ার লাইনের মত নাগরিক বৈদ্যোতন

উত্তরাধিকারী তিনি ছিলেন না। তিনি ছিলেন হুজ গ্রাণ ধর্মপাত্রী চলমান জীবনের রূপকার। অনেকটা ডি. এইচ. লরেন্সের সমোত্তীর্ণ ভাবে বলা চলে। তাঁর রচনা এসেছে নানান জীবিকার মানস। নানা কর্মক্ষেত্র। বিবিধ কর্মক্ষেত্রে তাঁদের ফিরন।

এ্যান্ড্রুসেন ইটালির সন্ধ্যা হিসাবে ফেব্রুৱারী ক্রান্তি এসেছিল। তারপরে ইটালির সৈন্যবলে বহলী জন। এবং আহত হয়ে প্যারীতে ফিরে আসেন। ফেব্রুৱারী প্রথম সাহিত্য সাধনা হুজ গ্রাণ প্যারী সহরে। প্রথম মহাদুঃ ইটালিয়ান শেখ হয়ে গেছে। বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে ইউরোপ ও আমেরিকার দুর্বলিক যেটুকু তরঙ্গ সোষণ করেছিল হুজ বাতল তাকে তখন টুকরো টুকরো করে দিয়েছে।

তখনও ও জীবন বিবেচনা দুর্বলতার ভীতি প্যারী তখন উদ্ভাবন। ফেব্রুৱারী তারের দলে ভীত বাড়ানেন। ফেব্রুৱারীর প্রথম রচনা 'এটিল সিন্টি—প্যারিস'—এই দলেরই কাহিনী।

প্যারীতে এডগার পাউণ্ড এবং গেরউড টাইনের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। ফেব্রুৱারীর সৃষ্টির আদিপরে 'সাঁসের প্রভাবও হয়ে গেছে। ১৯২৫ সালে তাঁর প্রথম পম্পের বই 'ইন আওয়ার টাইম' প্রকাশিত হয়। কিন্তু সাক্ষ্য আসে ১৯২৬ এ 'দি লান অলসো রাইজেন' প্রকাশিত হবার পর। আরো তিন বছর পরে 'ফোরওয়েল টু দি আর্ম' তার সেই ব্যাভিক আয়ো বিতৃত করে দেয়। 'রাই ওল্ড ম্যান' বইখানিতেও পঙ্কির পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রথম বিকল্প বইখানিতে একটির বেশ কয়েক এক হলী জীবন-অধোণী ও তীক্ষ্ণ কথোপকথান পরিচয় পাওয়া যায় অব্যাহিক তেমন জীবন সম্পর্কে 'অভ্যাক্স' উচ্ছলতা ও উদ্ভাবন এই বইখানিকে বিপিন্ধিত করে দিয়েছে। এই গ্রাণ প্রাচ্য', এই জীবন-উচ্ছলতা মার্কিনী তরঙ্গ তরঙ্গের অব্যাহিক প্রভাবিত করেছে, একথা বলা বাহুল্য।

প্রথম মহাদুঃের সময়ে সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে ফেব্রুৱারী 'ফোরওয়েল টু দি আর্ম' পুস্তক রচনা করেন। সর্বনাশা হুজের প্রতিক্রিয়ায় আচর্য নিপুণ জাবে এই গ্রাণে মুদ্রাণিত করেছেন তিনি। আশাহত

জীবনাদর্শ, বৈদ্যাবিক অনুভূতির সে কাহিনীর মধ্যে হুজের বিতৃত যে বাণী শ্রাব্যিত করেছেন এ দুঃসং-মার্কিনী সাহিত্যে তার তুলনা নেই। সমোচ্ছলতা ও নকল বীজের বহিরা জীবনের এ যেন এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ।

১৯২৯ এর এক দশকেরও বেশী পরে ১৯৩০ এ ফেব্রুৱারীর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'কন হুজ দি বেল টোলস' প্রকাশিত হয় এবং তারও এক দশকের বেশী পরে ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয় 'ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দি সী' যা ফেব্রুৱারীকে নোবেল পুরস্কার লাভের হুজের সম্মান লাভের অধিকারী করেছে। নোবেল পুরস্কার কমিটি ফেব্রুৱারীকে যে প্রশংসা ভূষিত করেছেন তার মধ্যে প্রথম কথা এই: ফেব্রুৱারী এ দুঃসংের শ্রেষ্ঠ কাহিন্যকৃত। 'দি ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দি সী' পুস্তকের ফেব্রুৱারীর এই শিল্প বৈশিষ্ট্যের অঙ্গুর্য বিকাশ। এই উপন্যাসে তিনি তাঁর সর্ব জীবনের শিল্প সাধনার পরিপূর্ণ রূপায়ন করেছেন। উপরন্তু বহু শিকারীর জীবনের কথা দিয়ে এমন এক শোচনীয় প্রথম চরিত্র তিনি তুলে ধরেছেন—যে চরিত্রে মানবিক সংবেদনশীলতা চরম হুজের' এসেও শেষ হয় না। ফেব্রুৱারীর আগের রচনাগুলি হুজের দ্বারা এবং হতাশার শানিতে ভাঙাচুর। কিন্তু এই বইটি সম্পূর্ণ নতুন হুজের বাঁধা। যতদূর এবং সমানুভূতিতে সম্পটি যিহ। পম্পের হুজেরই ব্যাবোলিন-এর বৃত্ত জেলের প্রতি আকর্ষণ পাঠকের নমকে কোমল করে। স্যান্টিমাসের সামগ্রিক পাখী এবং বক্তাণীকৃত মাহটির প্রতি কল্পনা ফেব্রুৱারীর সাহিত্যে নতুন রূপ সৃষ্টি করেছে। উচ্ছল আশাবাস হল বইটির সমস্তে বড় কথা। জীবনের হতাশার অব্যাহিক আশারী ফিরে উচ্ছল সম্ভাবনার মধ্যে কাহিনীর সমাপ্ত। 'সংগ্রাম। প্রাণের আশা নয়, লাভের সোভ নয়। ক্ষত্রাই হল জীবন।' এই মহামুখই হল 'ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দি সী'—নোবেল পুরস্কার কমিটি এই ভাবেই বইটিকে সম্মানিত করেছে।

কোন কোন সমালোচক অবশ্য এ কথা মনে ন।। তাদের মতে 'ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দি সী' প্রতীকী উপন্যাস। বৃত্ত জেলের সঙ্গে বক্তাণীকৃত মাহটির সম্পর্ক

যথোপযুক্ত হইতে উঠিয়াছে আনেকের আশ্রয় আশ্রয়ালী
 -রিত ইতিহাস এবং আধুনিক ব্যক্তিগত সম্পর্ক।
 নিত্যকাল নির্মিত সোভেট তাকনা একদিন ওয়া এসেছিল
 ভরস্বয় নব্বু অতিবাহিত করে। বোনা পদ্ম লোম আর
 চামড়ার সোভে, তেল আর চর্বি'র সোভে, নব্বু মানবিক
 দলোবোমকে অগ্রাহ্য করে অগ্রাহ্য অগ্রাহ্য 'রিত
 ইতিহাসের' ওয়া উৎসর্গ করে দিল। তবু অলম্ব্য বান
 বান হয়ে গেল কঠিন কঠোরে। আনেকের আশ্রয়ালী
 ও মানসের পরিষ্কার প্রকল্পটি হিঁড়ে হিঁড়ে সেই রক্তাক্ত
 মানবতার পারের পক্ষ পাওয়া যায়। হৃদয় সত্যতার
 বংশোদ্ভূত হিঁড়ে ফেলি সাহিত্যেও প্রতিফলিত হয় তার
 রূপ। Hermann Melville-as Moby Dick—ভবি
 শিকারের পক্ষ উদ্বেগনার মধ্যে অপরিসীম রক্তভাবের মধ্যে
 সেখানে শ্বেত সত্যতার লক্ষ্যহীন হৃদয়টি প্রত্যক্ষ
 হয়েছে। হেরিংগের দরজা হনোলাক ত এই অশ্রু
 সংস্পর্শের পক্ষে হৃদয়, রক্ত গড়ে ঘন। সত্যতম উদ্বেগে
 থাকে অংশ করিয়ে। যে আবার কোন স্মৃতি করেনি, যে
 ছিল দুঃখের, যে আবার পড় নর, নির নর, যে পড়ে
 আনাই সোভেট কারণে আবার শিকার, থাকে ঘৃণা করা
 অসম্ভব, ভালোবাসা আরো অসম্ভব, তার আর আবার
 মধ্যে প্রত্যক্ষ সন্দেহের গভীরে ভাসা বোনা ইতিহাস বোনা,
 প্রকৃতি বোনা, নব্বু জীবন ব্যবহার বিধিত নির্দেশে এক
 জাল বোনা হয়ে গেছে!

কেন সে আবার শিকার? কেন 'রিত ইতিহাস'
 সত্যতার অংশ ভ্রমের ওপর গড়ে উঠল ব্যক্তিগত সত্যতার
 'ভাই ন্যায়'। হেরিংগেরও সেই জিজ্ঞাসা।
 অজানা দলুপ্তত থেকে বৃদ্ধ অংশে যে প্রবল দায়িত্ব
 ভিল ভিল করে হত্যা করে জালার তুলছিল, থাকে বৃন
 করতে করতে তপ্তত হয়ে। স্নেহ নর, ঘৃণা নর, কোনো
 প্রকৃতি লৌকিক বনোভাবের বাঁধা কঠোরের পড়ে না
 এখনি এক বনোভাব, পৃথু উত্তরের অতিবৃত্ত ও সংগ্রামের
 সমতলে পাওয়া এক আশ্রয়' সাধুদ্বাবোব গড়ে উঠেছিল
 উত্তরের মধ্যে। যে সাধুদ্বা ও মানসিকতার বীজ রয়েছে
 আনেকের ইতিহাসের পাতায় পাতায়। সেই অজানা
 বীজ সমুদ্র তো তত অজানা নয়—সে তো ঐ বিতীর্ণ
 মহাশেপ, প্রসাদ আর গ্র্যাটলান্টিকের হৃদয়দ্বার

বানুবন্দী তার আচরন, আর সেখানে আগন্তুক বৃন
 অংশেও তো আনায়ের অপরিসীম নয়, সে ঐ দুঃখান
 দায়া মানব আর তার শিকারকেও তো দায়া চিনি
 মহাশেপের গভীরে সেই বৃদ্ধ বীজের মৃত্যুভাবের দৃষ্টি
 আকর্ষণের রিত ইতিহাসের চোখ থেকে এখনো বৃন
 যায় নি।

আশ্রয় ইতিহাস সম্পর্কে এই প্রস্ত, আনেকের
 মানস থেকে অংশই বৃদ্ধে ঘাবে না। তাকে অশ্রু
 তুলছে অংশ। 'কী সেলায় সব শেবে' এ প্রস্ত সে বিবর্ত
 ব্যক্তিব্যক্ত। থাকে বরা সেল না, থাকে হত্যা কলসায়
 তার অপরিসীম কলসায় হাতা তো কিছুই আবার হল না।

আধুনিক সত্যতার অশ্রয়ভূমিতে গাঁড়িয়ে হেরিংগের
 দায়িত্ব পড়েছে, প্রাপ্ত নয়, সংগ্রাহী বৃত্ত কথা। যে
 দায়িত্ব বাণী পূর্ণিয়েছিলেন পীতা-উপাতা, মহাত্ম্যে
 মহাঅশ্রয় কুহুক্ষেত্রে গাঁড়িয়ে : কর্মনিবাহিকারত, ১
 কলসে কলসায়।

প্রত্যক্ষ উপন্যাস ছোক বা না ছোক, নোবেল পুরস্কা
 কথিত চাক পেটানো গড়েও 'ওড় বান এত দি ন'
 হেরিংগের প্রেক্ষ উপন্যাস কিনা সে বিষয়ে হতভ
 আছে। সম্ভবত সে স্বর্গালা দাবী করতে পারে 'হ
 হৃদ বি বেল টোলন।' কিন্তু সাহিত্যের দরবারে এ
 উপন্যাস কোন দিন স্থান হবার নয়। হেরিংগের
 অপরতা হান করেছে এই গ্রন্থাবলি। বিরাট পটভূমিকা
 বিভিন্ন চরিত্রের চলাফেরা, পুরুষেরিকার পূর্ণাঙ্গের, লম্ব
 আয়ত্যাগে, ইন্দ্রিয়দামাশ্রয় বিজ্ঞেয় মহান কর্ম
 উদ্যোগে যে আশ্রয়ের বাণী কালের গারে উৎকর্ষ হয়ে
 তার তুলনা হয় না।

"...Any man's death diminishes me, because
 I am involved in mankind, and therefore
 never send to know for whom the bell tolls
 it tolls for thee, জন ডানের এই কথ্যাদর্শ উচ্চ
 করে পুরুষের আশ্রয়ে কলসে ওঠা ব্যক্তি প্রায়
 মানবের হতে পিছলি স্নেহের পৌরবশীল: মানব
 কাছিনী বৃদ্ধ করেছে হেরিংগের। কথ্যাদর্শের গুরু
 বৃদ্ধ এইটুই নয়। কথ্যাদর্শ হেরিংগেরও। সে
 সলে সে কোন বহু সাহিত্যিকেরও।

আঙ্গনের আঁচ থেকে নিরাপদ দূরত্বে বসে বেহালা বাজানর মত পিন্ধী কোনকালেই ছিলেন না হেইংওয়ে। তাঁর পরবর্তী জীবন ও রচনাবন্দী সম্পর্কে তবু কেউ কেউ সে অভিযোগ করেন। তারা বলেন, বিচিত্র জীবনের বহিঃলগ্ন রোমন্থের আকর্ষণে হেইংওয়ে প্রলুপ্ত হয়েছিলেন, পঞ্চশ্রুতি হয়েছিলেন অনেক পরিমাণে। কিন্তু হেইংওয়ে পিন্ধীন সমাজবাদের প্রেরণাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল অস্বস্ত একখানি বই-এ। এক আত্মক প্রেরণা প্রবাহে তার লেখনী পতিলাসিত হয়েছিল ‘কর হুন বি বেল টোলস’-এ—এ কথা আত্ম তর্কাতীত।

গৃহযুদ্ধের অনিবার্য হতাশার মূখোমুখি পড়িবার এক দায়ী যেন বুদ্ধ Anselmo কে বলে—*you are an old man who will not live long.*

“I am an old man who will live until I die”

Anselmo said, “And I am not afraid of foxes.”

হেইংওয়েরও এই একই জবাব। আত্মজ্ঞা আঁচি বোঁচ বাকব। কাম্যবৃত্তের মত আঁচি প্রতি পরিক্ষেপে মরব না। জীবনের স্ফুটন মস্তোত্তর মখোমুখি হতে হেইংওয়ে পিছ পা হননি কখনো। জীবনের অন্তরঙ্গ পিন্ধী হিসাবেই মৃত্যুর বান ও পক্ষি মূখ প্রাঞ্চল করেছেন। বিপদ, বর্বরতা, ঐশ্যাতিকতার পরিবেশে তেম ও জীবিকার কাহিনী তিনি তুলে ধরেছেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বলতে যা বোঝায় তা তাঁর গথ্যেই ছিল। সাহিত্যিক বলতে সচরাচর কল্পনার যে ছবি মনে জাগে তিনি ছিলেন তার ব্যতিক্রম। মৃষ্টি মৃত, গম্ভীর মলের মন্য শিকার, গহন অরণ্যের পশু শিকার এবং বুদ্ধকেয়ের সাংবাদিকতা এগুলিতে ছিল তাঁর আত্ম। যে জীবন তিনি অনুভব করেন নি তাকে সাহিত্যভাঙ করতে

— বিশিষ্ট সাহিত্য স্রষ্টি —

প্রতিভা বন্দুর নবোজ উপন্যাস

○ বনে বসি ফুললো কুহন ৪০০

বিতর্কিত গৃহের স্বপ্নগ্রাহী উপন্যাস

○ লাল সন্ধ্যা ৬০০

মনস্তাত্ত্বিক বৈরাগ্যের প্রেরণ উপন্যাস

○ এক মুঠো আকাশ ৫০০

॥ নতুন বই ॥

প্রতিভাবান লেখক মণি গঙ্গোপাধ্যায় রচিত

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

কিশোরের উপযোগী অশ্লব জীবনী-গ্রন্থ।

পত্রের মাধ্যমে অভিনব প্রকাশ-ভঙ্গীতে
অসাধারণ। মূল্য : ২/৭৫

॥ নতুন বই ॥

মেঘনাধিবন কাব্যের

পুস্তকক পুস্তিকিত গ্রন্থের অর্থ

বাণী হার প্রসীত

মধু-জীবনের নূতন ব্যাখ্যা

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ গবেষণার
আলোকে মাইকেল-জীবনের নূতন বিশ্লেষণ।

মূল্য : ৭/০০

— সাহিত্যের সমাঙ্গন —

প্রভাতকুমার মখোপাধ্যায়

○ ভারতে জাতীয় আন্দোলন ১০/৭৫

পরিমল দোষাবাদী

○ স্মৃতিচিহ্ন

বিশ্বদেব বিশ্বাস

○ কাঞ্চনজঙ্ঘার গর্বে

মায়া বন্দু

○ ডেনা-অডেনা

৩/০০

কল্পলোক পত্রিকা ও পুস্তক ভাণ্ডার মনুবা বর্গার জন্য লিখিত :

গ্রন্থম্, ২২/১, কার্নাওয়ালিস ট্রাট, কলিকাতা-৬

চেতা না করার মত না তিনি ছিলেন। জীবনের অগভীরতা নিয়ে জীবনের ভাব্যকার তিনি, 'স্নেহ অথবা কিশোরীমায়ের কাহিনী' সংগ্রহ করতে গিয়ে লুইসিয়ার আহত হয়ে থাকা দৃষ্টান্ত ছিলেন অব্যাহত। যে বলিষ্ঠতা তাঁর সাহিত্যে ছড়িয়ে রয়েছে সে বলিষ্ঠতা তাঁর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত।

অভিজ্ঞতা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, নিহিত অভিজ্ঞতাই সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে পর্যাপ্ত মূল্যবান নয়। অভিজ্ঞতার অঙ্গার বোকা হয়ে পড়তে পারে বসন্তে গারে যদি না সত্যের শিখা স্পর্শে তা আগুন হয়ে জ্বলে ওঠে। সৌভাগ্যের কথা হেইংওয়ের অভিজ্ঞতা বোকা হয়ে ওঠে নি। 'উঁ হাত অ্যাণ্ড হ্যান্ড নট'—তাঁর আর এক প্রমাণ। সত্যের সত্যসত্তা সাহিত্যিক যখনই মানুষের চোখ দিয়ে পৃথিবীকে চিত্রিত করেছেন এই প্রকারে। এ অসামান্য বৈশিষ্ট্যের জ্বলনা বেলে না। 'মানুষের বিচার কোন মানুষের নেই'—এই চরম অভিজ্ঞতার কথাই বলেছেন হেইংওয়ে নামক চ্যার্লী ব্রস্কারের মূখ দিয়ে।

গল্পভঙ্গের জন্য সংগ্রাম, ক্যান্সারের বিশৃঙ্খল সংগ্রামে সৈনিক হিসেবে হেইংওয়ে। বৈচিত্র্যের প্রতি তাঁর যে আকর্ষণ বলিষ্ঠতার প্রতি তাঁর যে আশ্রয়—পঞ্চাশত, স্পেনের গৃহযুদ্ধের আবহাওয়া তাঁর পরিপূর্ণতা বড়োছিল। 'দি ক্লিফ হোল' নাটকের মর্কবার্ট হল আদর্শ একা বই, সমগ্র বিশ্ব বই। এ বিশ্বকে বাসযোগ্য করে দাবি আদর্শ—এই আদর্শ অঙ্গার।

জীবনের বাস্তব রূপকে পলকভাষা না লাগিয়ে চিত্রে নেবার দক্ষতা, সূতীক জীবনবোধ ও বহু-ব্যাপ্ত অভিজ্ঞতা হেইংওয়ের বিশেষত্ব। তাঁর প্রকাশভঙ্গী স্বাভাবিক। শিখার মত সত্যভাষ্যের উপর দৃষ্টি তাঁর ভাষা ও আঙ্গিকের। এই আঙ্গিকের জন্য তিনি একই সঙ্গে দুঃখ ও দুঃখের অধিকারী।

'স্নেহ' পত্রিকার রিপোর্টার হিসাবে এই আঙ্গিকে হেইংওয়ে হাতেখড়ি। 'স্নেহ' রিপোর্টারের প্রতি

অবশ্যপালনীয় নির্দেশ ছিল—Use short sentences ...Be positive, not negative. বাস্তব জীবন ছিল তাঁর সাংবাদিক জীবন। কিন্তু তাঁর রচনারীতিতে আদর্শের প্রভাব দেখে গেছে এই সাংবাদিকতাবাদি। কোন রচনাতেই হেইংওয়ে নেতিবাচক নয়। অথবা ব্যাক-আপ নেই কোথাও।

আর ঠিক এই কারণেই এক প্রেমীর পর্যালোচনা অভিযোগ করেন, তিনি লুইসিয়ার পশ্চিম দিক। পর্যালোচকের এ অভিযোগ সত্য। অথবা এটা যদি আদর্শ কোন অভিযোগ হত! জাতীয় রচনারীতিতে ভেঙে ছড়ান করে দিয়েছেন হেইংওয়ে। দত্ত ভাবাবেগ ও বহু-মুখ পদ-চলিত পার-পরিভ্রমণ করে রূপকথা উপকথা সংক্রান্তের বেরাটোপে জীবনবোধে বস্তু হাতে চান নি তিনি। সত্যতার যখন অঙ্গসি হয়েছে, মানুষের যোগ যখন আসের চোরে জাগ্রত তখন কি কথাশিপার কাছে 'কাহিনী' রাখা করা হবে হেইংওয়ে এবং স্পেন-বিশ্বের হেইংওয়ের উচ্চ দিয়েছেন 'না'।

উপন্যাসের ক্ষেত্রেই শূন্য নয়, ছোট গল্প রচনাতে সন্ধান কল্পনা তিনি। তাঁর Men without Women এ গল্পসৃষ্টি মানব জীবনের এক দৃশ্যপট পরিচয় বহু করেছে। অথচ 'দি কালিড' গল্পটি বিশ্বসাহিত্যে সর্বোৎকৃষ্ট রূপে বিবেচিত হতে পারে। জীবনের অর্থ কলি সত্যের বিবেচনা নিশ্চয় করে হেইংওয়ে বলেছেন, "...This is how human beings behave. It is cruel. It is ugly. But it is true.

হেইংওয়ের গল্পরীতি সত্যই অত্যন্ত স্বচ্ছ, সরাসরি। শুধু যখন অ্যাণ্ড দি দীর্ঘ বহু ছোট প্রত্যক্ষিত স্বপ্নভাষ্যিক এর আদর্শ নিশ্চয়।

হত্যা, লুইসিয়ার না আদর্শ—চিত্রিত এই গল্প হোলার দৃশ্যে থাকবে আদর্শ হেইংওয়ের দৃষ্টি। কিন্তু হত্যা বিবরণে ছিলেন হেইংওয়ে—কোন গল্প বাস্তব হতে পারে না সেখানে।

রাজবন্দীর জবানবন্দী প্রসঙ্গে

পাঁচ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮ সংখ্যা বিশেষ পত্রাঙ্কেতে 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' নামে কাজী নজরুল ইসলামের যে বিবৃতিটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, তার সম্পাদকীয় হস্তক্ষেপে একটি মাত্রাতিরিক্ত তুল রয়েছে। এই বক্তব্য সেখানে বলা হয়েছে, ১৩২১ বর্ষাব্দে ভারতীয় সংখ্যার "মানবমণ্ডলীর আগমনে" নামক গ্রন্থ প্রকাশের হস্ত কাজী নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার মাফল্য আনে। সেই মাফল্যের বিচারক ছিলেন এল ওয়ালেস আলি বিনি নিম্নে সাহিত্যিক।"

এই তথ্যটি তুল। নজরুলের বিচারক এল ওয়ালেস আলি ছিলেন না। তার বিচার করেছিলেন ডব্লিউসি চীক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট হুইন হো।

এই তুলের বিবেচনা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন প্রবন্ধের জননেতা ও কাজী নজরুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হুইন ও নজরুলী সমবেদন মুদ্রকর আহম্মদ। মীচের তার চিঠিটি প্রকাশিত হল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, কাজী নজরুল প্রসঙ্গে (মুদ্রিকতা) গ্রন্থেও কয়েক মুদ্রকর আহম্মদ এই বিচারের বর্ণনা দিয়েছেন: "নজরুলের নামে বিরুদ্ধে তার পরওয়ানা বেত হওয়ার পর হতে পুলিশ তাকে খুঁজছিল। শেষ পর্যন্ত তাকে কুইল্লা হতে গিরেক্তার করে কলকাতার নিয়ে আসা হল। বিচারাবধীন বন্দী হিসাবে সে কলকাতার প্রেসিডেন্সী গেলে ছিল। তার বিচার হয়েছিল কলকাতার চীক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিটার হুইন হোব আদালতে।"

৩১, কড়িয়া রোড

কলকাতা-১১

১৫ই জুলাই, ১৯৬৯,

ক'দিন থেকে আপনাকে পত্র লিখব আশঙ্কি, কিন্তু কিছুতেই হয়ে উঠেনি। জ্যৈষ্ঠ মাসের 'বিশেষ পত্রাঙ্ক'তে আপনি নজরুল ইসলামের "রাজবন্দীর জবানবন্দী"র পুনর্মুদ্রণ করেছেন। তার সঙ্গে যে আপনি সম্পাদকীয় বক্তব্য লিখেছেন তাতে এতটা বড় তুল আছে। নজরুলের বিরুদ্ধে এল ওয়ালেস আলি সাধেব করেন নি, করেছেন চীক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট। সেই সময় চীক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মিটার হুইন হো। এই

হুইন হো নাকি কবিতা লিখতেন। ওয়ালেস আলি সাধেব তখন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, চীক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন না। পেনাল কোডের ১২৪-এ ব্যাংক মোকদ্দমাগুলি তখনকার হিসেবে শুধু চীক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটই বিচার করতেন। এখনও হয়তো সেই নিয়মই চালু আছে। এ ছুটটা সংশোধন করা আবশ্যিক। আশা করি যে আশ্রয় লুপ্তা বেকবাব আপে কেউ এ বিবেচনা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নি।

আপনার
মুদ্রকর আহম্মদ

আবার করেও।
চলতে চলতে হঠাৎ
যদি পায়ে তলার কিছু
না থাকে, তা হলে
সেটাকে বর্তমানের
বেইমানি বলে মনকে
প্রবোধ দিতে হয়।
প্রবোধ দেবার আগে
ধার্মিকতা নাকানি-
চোবানি খাওয়া আর
ধার্মিকতা সীততে পার
হওয়া আছেই। তারপর
আবার মন কিছ
ঠেঙ্গল পায়ে তলার

তখন ঠিক ছাড়বার অবকাশ পেলে চুটিকে প্রবেশ মন
কর মনকে। বৃত্তিবে বল যে ভাসাটা আর নাকানি-
চোবানি খাওয়াটাই আদল ব্যাপার নয়, ওটা হোল
পায়ের ওপর ভর দিয়ে নিজেকে নিজে বেরে বেরিয়ে
হাত থেকে সাময়িক মুক্তি লাভ। হোতাতে
বোঝাতে বর্তমানের কত না ফলে ধার্মিক এগিয়ে
কি আবার ফলা, একমম অষ্টে হল। প্রথমে তলির
দণ্ডে আত্মপূর ভেলে ওঠ, তারপর আবার ধার্মিক
সীতার দ্বিধে এগিয়ে যাও। আচরণে আবার না
দৃষ্টান্ত ঠিকবে কিছুই নক। ব্যাল আবার এগিয়ে
চল হাঁপাতে হাঁপাতে হৃদয় কীবে নিয়ে। সাবধান,
যুব সাবধান, পড়িট বেন হাত কলকে না পালার।

অতীত যে বীণা আছে হৃদয় নক। অতীতকে
টেনে নিয়ে দিয়ে তবিতের রববারে হাঝির করতে
পারলেই বর্তমানটুকুকে বিচক্ষণতা সহ ব্যবহার করা
হোল। এইই নাম গুণ টানা, বর্তমান হোল ঐ ভব
ওট যদি না কলকার বুটো থেকে তা হলে অতি
অবিত্তই অজানা ভবিষ্যতের গর্তে হাতিয়ে থাকে না।

হাতিয়ে হাতিয়ে কো কোবার। প্রতিটা হৃদয় প্রাণ



প্রকৃতির স্রষ্টার পরমেশ্বর
ঐশ্বর্যপূর্ণ স্রষ্টার

হৃদয়ে তল কর।
হৃদয় করে মানুষ প্রতিটি
হৃদয় প্রাণে আটকে
বসেছে। একজন যদি
হাতার, হাতার মাঝে
তলিয়ে বার বা হাণি
পড়ে, অতকন তলে
সাহাবা করবে।
ওকে ও একে সামনে
নিয়ে চলতে। নৌকা
মাঝলের তলা থেকে
ক'গড়া হৃদয় নে
এসেছে, তার প্রত্যেকটি
মুখে হৃদয় যত্নে

আছে। এক হৃদয় মানুষের অপর হৃদয় মানুষকে
দেখতে পাচ্ছে না দেখা সম্ভব নয়। মিসমি
অজ্ঞান, মিসমি বুক লগন বলে নাক লগা
তঁহু টেউ উঠছে, তার তেতর কে কানে দেবে
পাবে। কিছু চলেছি সবাই একমুখো, কিছুপারে কি
টিক করে এগুচ্ছি তেবে পেলাম না। আমার লে
বিনি ছিলেন তার বেশ বংশ হোয়েছে, তাঁর
ভিজালা করলাম ব্যাপারটা। টানতে টানতে নি
সিয়ে নৌকানামকে অদ্য কোথাও পৌঁছে পোব
ত আমরা!

অবাব পেলাম—“কাজেন সাহেব বলে বলে আছে
নৌকার মূখ এক চুল এখার ওখার হবে না বতক
কাজেন সাহেব জেগে থাকবে।”

ব্যাপারটা মনকে সেগুলো না। তাইনে বী
মুখে যদি বী আমরা তাহলে কি হবে! আনাকে
টানের চোটে নৌকা তাইনে বীরে লবে আসবে না।

যেহেজোটা লকীট বেলে বললেন—“তা কি হ
কখনও। নৌকার মূখ যে হিকে থাকবে সেহিকে
এগিয়ে যাবে। আমরাই তাইনে বীরে গিয়ে লক
আর ঐ হৃদয়লোতে আর টান থাকবে না। হৃদয়ে

টান না। হলেই বুঝতে হবে মাথায় তব্বেনে বাঁধে গবে
সেছি। যতক্ষণ হুঁড়ি টান টান হোয়ে আছে, ততক্ষণ
ট্রিক পথে এগুচ্ছি পুকেতে হলে। কাপ্তেন সাহেব ত আর
তুল সবতে পারে না।

কল্প উপলক্ষ্যেও বুকে বুক সমান জলে মাড়িয়ে
মৌকো-মাকার কুঠীর রাতে একটা ভারী দাবী কথা
ভেমে নিলাম। কথাটা হোল, হাল খাঁর হাতে আছে,
ভাঁব কখনও তুল হতে পারে না। আমাদের কাক
জাল হুড়িতে টান বাধা আর সেই টান টান হুড়ি
কাঁধে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। কখনও দাঁতের কখনও
হেঁটে বিশ্ববাক্যনিচোপানি খেয়ে এগিয়ে যাওয়াটাই
আমাদের কাক।

হুড়িটা টান রাখতে পারলেই হোল, হুড়িতে হুড়ি
টান থাকে তা হলে ট্রিক সম্বন্ধ পার হওয়া যাবেই
অস্বকার। কারণ পেছনে যিনি হাল ধরে বসে আছেন
তিনি কিছুতেই মৌকার লুপ এক চুল এখার ওখার
হোতে দেখেন না।

আগে আগে পার হোতে লাগলাম অস্বকার।
আগে আগে আসার মধ্যে এগিয়ে যেতে লাগলাম।
যত একটা তুল ভেঙে গেল। উপর-অস্ত্র দিয়ে পড়া
হিন রাত, দিনের পরে রাত রাতের পরে হিন দিয়ে
শিকল পীষা জীবন, এই খাংগাটা ঠঠাং বলে গেল
যনের পা থেকে। ট্রিক বুঝতে পারলাম, জীবন যানে
কতকগুলো হিন আর কতকগুলো রাতের সমষ্টি নয়।
জীবন হোল পড়ি, অস্বকার থেকে আসলো আর
আলো থেকে অস্বকারে জরায়র এগিয়ে যাওয়ার নাম
জীবন। পুর লুপা একটা পথ, তার বামিকটা আঁধার
আঁধার বামিকটা আলো। পল্টা পার হোতে হোলে
একবার আঁধারের মধ্যে চুকেতে হবে আঁধার আলোর
ভেতরে দিয়ে যেতে হবে। দিন রাত-উপর-অস্ত্র এ
সমস্ত তুল ধারণা, আলল ব্যাপার হচ্ছে যাওয়া আর
যাওয়া। এগিয়ে যাওয়ার নাম হোল জীবন এবং এগিয়ে
যাওয়ার ওপর ছেঁব পড়ার নাম হোল মৃত্যু।

অবিচ্ছেদ্য এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ বামিকটা
উঠে পড়তে হোল। জলের ভেতর লব্ধি আরগা সমান

নয়। কোথাও জল হুঁড়ি হুড়িয়ে উঠছে না, কোথাও
বা কোমর পথ উঠছে, কোথাও বলা তুলিয়ে যেতে
চায়। মাকে মাঝে আঁধার দাঁতবোতে হচ্ছে। বামিকটা
দাঁতবো ভেঙে পার হোয়ে উঠলাম এমন আরগার
যেখানে জল কোমরের ওপর উঠল না। তখন নয়
মেঝার জন্যে হুড়িয়ে পেছন ফিরে তাকালাম। পেছনে
অস্বকার, অস্বকারের মধ্যে বিটকেল কালো বিটকেটে
একটা আনোয়ার উঁচু হোয়ে ভেসে উঠছে। বীরে সুবে
গেটা এগিয়ে আসছে আমাদের পানে, যানে আমাদের
তাকায় করেছে। সর্বমান হতে। আর এক হুড়ুই বেবি
করলাম না, ঠগপাড়ে হাঁপাতে হুড়ি কাঁধে নিয়ে লামনে
হুঁকে পড়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

দেখিন সেই আলো-আঁধারের আলগোড়ে লরে
উপর অস্ত্র জীবন মৃত্যুর আলল অর্ধটা বড়ই ভয়ানক
ভাবে হুকের মধ্যে বরা পড়ে গেল। হিপক জোড়া
মহামুগতার মাথখানে পড়ে পেছন ফিরে তাকালে অতি
পরিচিত অতি অস্ত্রহী একমাত্র আশ্রয় জীবন তরুণী-
বানিকে কেমন দেখাবে তা হাড়ে হাড়ে টের গেলাম।
জ্যাক বিকৌরিকা, হিংস্র হাতের, তাকায় করে বরতে পারল
হাঙ্ক হাংক তিনিয়ে বাবে।

অনেক দিন আগে, জীবনের পোয়াখানেক পথও
তখন পার হোতে পারি নি, একজনের পাশে চুপটি
করে বসেছিলাম তার বিহার মেঝার বিবর্ণ মূর্তিটিকে।
মৃত্যুর পরেই বোঝা গিয়েছিল যে রাতটা আর পার
করতে পারবে না সে, রাত থাকতে থাকতেই চুপি চুপি
সরে পড়বে। সুই নয় ট্রিক, কতকটা বোম্ব অস্বকার
পড়েছিল, জালা খরগা বাধা বেদনা কিছুই বেন ছিল
না তার তখন, বরং বেশ লাভিয়েই ছিল বলা চল।
সুই নিশ্চিত হোয়ে অপেক্ষা করছিল বেন মৃত্যু একটা
কিছু ঘটবার আশায়। তার পাশে তার বিদ্যমত ওপর
তার পা বেঁধে নিশ্চিত হোয়ে বসেছিলাম আমিও।
চলে যখন বাবেই, কিছুতেই যখন রাখা যাবে না, তখন
আর হাঁকুপাঁকু করতে কি লাভ হবে।

রাতটা। একটু একটু করে এগিয়ে গাঙ্গিল। পা টিপে
টিপে নিস্যাড়ে চলে যাচ্ছে রাতটা, আমি শুধু তাকিয়ে

হিলাম। অল্প হোলে বসে হাতের পানিরে বাঁধা দেবছি। বাবা বেবার মজি নেই, লাক দিয়ে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ে পলাটা উপে ধরব হাতের, সে উপায় ছিল না। কেনন যেন একটা কনুপুর অবস্থা, টনটনে হাঁপ করছে, কি হচ্ছে না হচ্ছে সব বুঝতে পারছি। কিছু করতে চকতে পারছি না। চরম অবস্থার অবস্থা থাকে বলে। সেই বিষম অবস্থায় পড়ে স্নেহ তাকিয়ে ছিলাম সেই হাতটার পানে। তখনক নিঃশব্দে খুব আসানোছে পা কেলে কেলে ধীরে ধীরে হাতটা সরে পড়ছিল। ভূক হুৎকে তাকিয়েছিলাম আমি সেই পলাহমানা তাকির পানে, এতটুকু নড়া চড়া করাও সামর্থ ছিল না।

হঠাৎ একটা বাঁধা লাগল শুভ্রতার বুকে, লাগল একটা চকোহুড়ি পড়ে গেল। নিবাক্ষন বকম চমকে উঠে ভাড়াভাঙি তাকে চ'বাস্তে চোপে ধরলাম। মাখাটা বাসিনের ওপর ঠেকে রয়েছে, বাড়টা উঁচু কোয়ে উঠেছে, পিঠখানাও বিছানার সাথে ঠেকে নেই। ছুঁচোষ মেলে গেছে ভয়কর একটা বিভীষিকা দেখছে বেন চোপ মেলে। চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, কি বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম টিক বলতে পারব না। চেঁচিয়ে শুঁটার সঙ্গে সঙ্গে একটা কি ছুটো বিভা ভুলে দ্বির হোয়ে গেল সে। তারপর খুব আত্ম আত্ম মেতিয়ে পড়ল। বাড় পিঠ আবার বিছনার ওপর ঠেকল। হুম বন্ধ করে অপেক্ষা করত লাগলাম তার বুকের ভেতর আটকানো খানটুকু পড়বার আশায়। সেটা আর পড়ল না, বুকেও ভেতরে আটকানো খানটা বুকের ভেতরেই রয়ে গেল।

আমার জীবনে সর্বপ্রথম সেই সত্যিকারের বিভীষিকা দেখা। তার চোপ ছুটো দিয়ে আত্ম বিভীষিকা পেয়ে ছিলাম আমি। বিভীষিকা যেবে সে হয় কেলতে পারত না, হঠাৎকে পর্বত হজম করে দিবার কোয়ে রইল। আমি হুম কেলতে গেয়েছিলাম। তাই দিবার হোয়ে বাই নি আত্ম পর্বত দিবিয়া খুবে বেড়াছি। কিছু বিভীষিকাটার অর্থ তখন টিক খুবে উঠতে পারি নি।

বয় বিন পরে খুতে খুতে করাটী থেকে কচ্ছে পৌছবার পথে হঠাৎ সেই বিভীষিকার অর্থটা মনেও নথো পড়িবার হোয়ে গেল। পর্বতকার বৃত্ততে পানলাম কি যেবে অমন ভয় পেয়েছিল আবার সেই একান্ত চেন-

মনা বহুট। আলোর মাঝে পৌছে দিয়েছিল সে, পৌছে পেছন দিবে তাকিয়েছিল। তাকিয়ে দেখতে পেয়েছিল উলটু জীবনটাকে। অন্ধকারের ভেতর তাকিয়ে বেবেছিল, বাংলা হিংস্র জীবনটা ই। করে তেড়ে বাজে তাকে বহতে। চেঁচাই অঁতকে উঠে দিয়েছিল হাতের ওপটাকে ছেড়ে। বাস, জীবন আর তাকে ভাঙা করে ধরে ফেলতে পারে নি।

শুভ্রতা কে আমরা কিছুতে ছেড়ে দিলাম না। তাই বেশ পর্বত বহা পড়তে হোল। সামনে কলের ভেতর থেকে এক লাফে আকাশে উঠে গেল প্রকাণ্ড এক রেলা টললে লাগল পেছন থেকে বহু নির্ঘোষে কি কতকগুলো হুহু পোনানো হোল। আমরা হাসলাম। পাশের সখীটা বললেন—মৌকা আর বাবে না, জল খুব কয়ে গেছে। আবার যখন কোয়ার লাগবে তখন এগনো বাবে।

অন্তঃর তখন পিছোত, অবস্থা সেইখানে ঠাঁড়িয়ে সড়ি শুটোতে থাক। মৌকাই ঐ কাচে এসিয়ে আসছে।

তাই করলাম, ঠাঁড়িয়েই রইলাম সেইখানে। এক পা এগতে পেছতে মন চাইল না। চাইবে কেন মন, মন তখন তাক্সর বনে বসেছে। সামনে পেছনে ডাইনে ধীরে বহুটুকু দেখা যাচ্ছে সেই কোমর সন্ধান কলে ঠাঁড়িয়ে, তা বেবার কলে মন একেবারে প্রস্তুত ছিল না। কি কাত বে বাপু! কলের ভেতর থেকে একটু একটু করে ওগুলো কি সব মাঝা আগাচ্ছে!

কিছুতকিমাঝার আকৃতি সহ, কোনটা লম্বাটে, কোনটা উপুর করা হাঁড়ীর মত, কোনটা বাটিক হুঁদিয়ের ঠোঁট। একটা হুঁদির বেন আকাশের দিকে খুব উঁচিয়ে দ্বির ঘোয়ে রয়েছে। একটু একটু করে জল কুমতে লাগল, একটু একটু করে আত্মপ্রকাশ করলে তার। কলের ভেতর থেকে। সবায়ের ওপর পুত বরে কাথার জ্বলেন পড়েছে। কার কি আসল পরিচয় কোয়ার উপায় নেই।

পরিচয় গ্রহণ করার খুবসভও আর মিলল না। এলে পড়ল মৌকা, এলে ঠাঁড়াল একেবারে বুক চেঁবে। ঐ ঐ ঐ ঐ ব্যাপার, মৌকা-তত্ব দ্বাধ্ব কোমর পর্বত

ক'রিয়ে দেখছে। "ঐ ঐ, ঐ ঐ হচ্ছে, ঐ বে দেখা
যাচ্ছে, উঃ কি ভীষণ লোক !" বাব বা খুশি বলে গ্রাম
পলে ঢেঁচাচ্ছে। একটি নতুন আবিষ্কার, যে লোকটা কি'রা
বাঞ্চিল খুশিছিল আর সেই হ'লেও কাছে বলে বসে প'র
বসে বলে বসে লোকটার সঙ্গে গল্প গল্প হুল হুল কর
ছিল, সে লোকটা যে কি সাংঘাতিক ভাষা জানা ঘোরে
বেছে সকলের। নতুন ভাবে আবিষ্কার করা গেল
লোকটা। ইন্দু স্নান একটা তরকারী'র সঙ্গে চলছে,
এটা আসে বোকা বাই নিত !

পাঁট বাধা বাধা অনেকগুলো গড়ি খুলছিল নৌকার
দুশাশ বেতে। সেই পাঁটে পাঁটে পা আটকে টপাটপ
পথই উঠে পড়ল। নৌকার। লাকনা গরুর আর
বাকী বইল না কিছু। তৈরী হোয়েই উঠেছিল। নৌকার,
বোকা বোকা দু'র করে নিঃশব্দে সমস্ত সবে পেলান।
সইতেই চলে, ভালবাসা আত্মীয়তার আর বিভাজনা
এই ভিতর দিয়ে গিয়ে পাবে না, তার পক্ষে বনে
ধাস করাই সের।

বনের মধ্যে মন ব্যাথাপ করে বলে থাকার প্রয়োজন
হোল না। দেখতে দেখতে চকু'রিক বন গভিরে উঠতে
লাগল। উত্তট উত্তট চেহারার যে সমস্ত কল্প
প্রানোয়র আশু-প্রকাশ কল জলের ভেতরে থেকে,
ভাসের পা থেকে প্রবিরে করে গেল কাগা হাট, চাওরার
সঙ্গে মাথা বোলাতে লাগল সবাই। আসল পরিচর
পাওয়া গেল সকলের প্রকাণ্ড এক ভঙ্গ। সমস্ত প্রাণ
হালসা আর বোঝানিধ, তার সঙ্গে মন। ভাতের সিক।
নিষার বস ভাতের সিক গাছ আছে, সমস্ত সেই বাবলা
দার বোঝানিমের অঙ্গল অবিরাম করছে।

কোথাও একটু চাষা নেই, নৌকার তলা থেকে গেছে
গাছ। দুপুত্রের আগেই অল কাচা টপকিয়ে কেটোর
উৎসব হোল। বিতিকিচি গন্ধে গ্রাম খা'র আর কি !
পুঁজি'র ঘরে পান্থক ভগলি কীকড়া পড়ে। জোয়ার
'টার টানে বাপি বাপি এসে পড়ে সমুদ্র থেকে, গাছ
'লার ভেতরে আটকে যায়। অল নেনে গেল ওরাও
দেবার বাবলা করে। ওদের যেমন চলন, বিভক্ত
চলন চলে চলে থাকে। চলা গল্প হবার পরে

আবার আসে জোয়ার, তার সঙ্গে আসে ভারত
বাঝাতিরা। এসে তারা খাড়ের ওপর চলে বসে।
জোয়ারের পরে ভাঁটা এবং ভাঁটার পরে জোয়ার এই
টানা-পড়নের ক'কে কোথাও কোনও তিক পালানটা
ওদের ভাষে। ঘটে ওঠে না। অবিস্রাজ্ঞ বহাতির
আগমনে বহাতির চাপে বহাতি ধ্বংস হয়। কি করবে,
তা বলে নিজের ধাঁচের চলনটা'র আর বহলাতে
পারে না।

পরমানন্দী বললেন—"এই ভাষেই বহিঃজীবা তৈরী
হোয়েছে। অল'র জীব-কল্পের বেহু'রমতে কমেতে গড়ে
উঠেছে এত বড় বহিঃজীবা। প্রবালদীপ কথাটা
ওনেছেন ত। প্রবালদীপ কি করে তৈরী হয়, আশঙ্ক
করে নি।"

বলল—"তৈরী হোতে একটি পরমা বহু'র হয় না,
তা বেশ বৃত্তে পায়ছি। সুতরাং আমাদের বহিঃজীবা'র
যে কানাকড়ি মূল্য নেই, এটাও প্রমাণ হচ্ছে। কিন্তু
এই দুর্ভাগ্যটা। অতবড় বহিঃজীবা। তৈরী হোতে কি
তরকারী দুর্ভাগ্য হুটেছিল, সেটা আশঙ্ক করতে পিঠেই যে
প্রাণ খাঁচাচাড়া হোতে চাচ্ছে।"

পরমানন্দীর চেয়ে ছোট ছোট হোতে হোতে প্রাণ
বুকে এস, হুচোপের মতখানে সালা সালা ছুটি রেখা মাত্র
হেঁবা যাচ্ছে। সেই রেখা ছুটি থেকে এমন অদ্ভুত জাতের
আলো ঠিকরে বেরচ্ছে যে সে দিকে তাকিয়ে থাকে তার।
অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেই অবস্থার স্থির হোয়ে বলে ওঠলেন
তিনি, অনেক কিছু যেন ভাল করে দেখে বুকে মিসিয়ে
নিলেন নিজের ভেতরে। তারপর আভে আভে বলতে
লাগলেন—"ষ্টিক বলেছেন, সর্বপ্রাণে গন্ধ উৎপন্ন হোয়ে
ছিল। পৃথিবীতে হোল গন্ধ, এই অন্তে মানস পুষ্কার সমর
আমরা মনে মনে ভাবি যে কিত্তি অশু'র তেজ মন্ত্র
যোম এই পকতরের প্রথম তত্ত্ব যে কিত্তি সেই কিত্তির
ওপ হোল গন্ধ। আমার চেহের ঐ কিত্তিতত্ত্ব বা গন্ধ
ঐটি মানস পুষ্কার প্রথম উৎসর্গ করতে হয় চন্দ্র
হিদেবে। তারপর আমার চেহের আকাশতত্ত্বটি হয়
পুশ, ব'র তত্ত্বটি হয় স্প, তেজতত্ত্বটি হয় লীপ। তারপর
বা পকে থাকে, অশ বা অল সেই অশু'রক অশু'র বসন
করনা করে বৈবেদ্য নিবেদন করি। ষ্টিকই বলেছেন,

এই বত্রিশো স্ত্রীর মূল কথা হোল গদ্ধবতী। গদ্ধতত্ত্ব হোল পুণ্ডিঃখ, চন্দ্রকর মিলে যাচ্ছে। আপনাতঃ কথ্যটা খুব ভাল ভাবে মিলে গেল।”

মিলে যে গেল তা ঘর্ষে ঘর্ষে বুঝলাম। কিছু শুধু মিললেই ত হোল না, সেটা আবার সঙ্গ হওয়াও চাই। বললাম—“কিছু আর যে সঙ্গ হচ্ছে না পরমানন্দী, এখন এই মিলের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় বাতলাও। যখন জোয়ার আসবে তখন নৌকা ছাড়বে, আর শুভক্ষণ আশাযের যদি এই সঙ্কটভূমি সঙ্গ করতে হয়, তা হলে গঙ্গাঙ্গ হোয়ে যাবে। বাপস্, এই চর্যকো মাহুঘটকতে পারে।”

পরমানন্দীও উৎসাহ চরমে দিয়ে পৌঁছল, ঢাকা হোয়ে উঠে তিনি তখন গদ্ধতত্ত্ব বোঝাতে শুরু করলেন। বললেন—“খুব গোখা, গদ্ধটা সইতে পারছেন না, আপনাতঃ বেচেই মধ্যে গদ্ধ বোধ করার যে ক্ষমতা সেটিকে অকোজো করে কেন্দ্রন। তখন ঐ গদ্ধ আপনাতঃ কিছুই করতে পারবে না।”

“কি সর্বাংশ!” চক্ৰ কপালে তুলে বললেন—“তার মানে হুম বদ্ধ করে থাকতে বলেছেন। মারা পড়বে যে।”

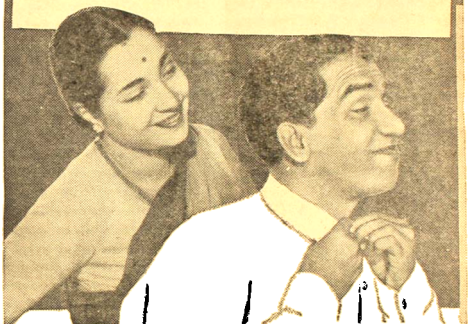
“হুম বদ্ধ করে থাকতে কেন, খাস প্রাণসংহমন চলছে তেমনি চলবে তবু গদ্ধ বোধ আর থাকবে না, এইটে করলেই হোল।” নেহাতঃ ভালমাহুঘের নত উপদেশটি প্রাণন করে সেই নিম্ন গতের চাটমির হাসিটি হানতে লাগলেন পরমানন্দী। তেবে সর্ব শরীর জলে গুঁঠার বণিল হোল। হোসে যবে তি, যেসে না কেলে থাকতে পারলাম না। পরমানন্দী যখন ওর চাটমি দিয়ে ছাপতে থাকেন, তখন তার সাধা সেই আলোয় হাসিকে পরোয়া না করে চটচটি করবে। শুধুও বতস্ব সন্তব চক্ৰ পড়ে করে বললাম—“গুঁঠা করবার সময় পেলেন না আর। ঐ যে একটা কথা আছে না, মাঝি মরছি যেমার আলোয় হস্তব গোশ কোলাপ যেতে, তেহনি ঝাড়াচ্ছে। উঃ, এই দুর্গত সরে মাহুঘ ঝাড়াতে পারে!”

টপ করে লুক মিলেন যেন আশার কথ্যটা পরমানন্দী। বলে উঠলেন—“কি। কি। কি কেন বেশ বললেন। টাকা চাইতে দিয়ে কোলাপ বাওরার

পরামর্শ গেল। বাঃ বাঃ ভোকা—টিক ঐ কথ্যটাই ত বলতে চাচ্ছি। কেনো জালায় যে মংছে তাক বাইরে হাও কড়া কোলাপ। যেমার জালাটা আর থাকবে না, কোলাপের ক্রিয়া শুরু হোলো টাকা কড়ির চিন্তা বেশ ছেড়ে পালাবে। টিক সেই ব্যাপারই করতে হবে। যেনে করম, আপনাতঃ ঐ নদীওটা একটা অদ্ভুত জাতের যেতারহর, ওটা দিয়ে আপনি ইচ্ছে হত যে কোনও টেপন ধরে গান শুনেতে পারেন, বক্তৃতা শুনেতে পারেন, কোথাও কোনও ভাল বেলা হচ্ছে সেটা শুনেতে পারেন। বরকার হোল, চাষি বুরিয়ে খুঁদিয়ে যে টেশন করতে চান সেই টেশনের সঙ্গে আপনাতঃ বহুটাকে মিসিয়ে নেওয়া। এখন আপনাতঃ ঐ যেতার হর গদ্ধ শুকছে। চাষি বোঝাতে বাস্তব, বতক্ষণ না গান সোনা শুক হর খুঁদিয়ে যান চাষি, টিক বাবুয়ার কাটাটা সরে গেলেই গান শুনেতে পারেন, গদ্ধ শোঁকা বদ্ধ হোয়ে যাবে। আপনাতঃ তেতহের পুরীহর এখন খুব বেগে উঠেছে, আকাশ শুকুটকে আগান বা বাহুঃশুকুটকে বা তেলঃশুকুটকে। যেটকে যখন কাগাংন, সেটি তখন কাক করবে। এর মধ্যে আর শক্ত ব্যাপার কোথার।”

কোথাও নেই, সমস্তটাই তুলতুলে নরম কাণ্ড-কারখানা। পরমানন্দীর গলায় আওয়ার, ওর খুব আলতো ভাবে উচ্চারণের চক্ৰ, আর ওর আশা-মুগ্ধ হাস্য-সংকুল চাটমি এই তিনটি অতি তরকের অস্তর সামনে বলে বিশ্বের বিলকুল সমস্তকে সত্যমাহুঘের গিরিব তুল্য মনে হয়। চক্ৰ মুখে ঢাল আর গেল, কোথাও আটকায় না। আটকালোও না চূপ করে বলে মিলতে লাগলাম। পরমানন্দী সিরি ঢালতে লাগলেন—“ঐ গদ্ধ, ঐ উৎকট গদ্ধ খুব মুখ অবস্থার আপনাতঃ ভেতর রয়েছে। বাইরের গদ্ধটা আপনাতঃ তেতহের সেই মুখ গদ্ধটাকে ভরানক রকম জাগিয়ে দিয়েছে। খুব ভাল সুখ বাইরে কোথাও হোল, সেটা দিয়ে আশাতঃ যানল আপনাতঃ তেতহের মুখ শুকুটকে যেটা খুঁদিয়ে ছিল। সবে সবে বেগে উঠল আপনাতঃ তেতহের সুখ আপনি বাইরের গান শুনে মোহিত হোয়ে গেলেন। বিশ্বাসমানে যেখানে বত প্রকাণ্ডের গান গদ্ধ আছে তা অতি মুখ ভাবে খুঁদিয়ে আছে আপনাতঃ মধ্যে বাইরের

‘যদি ভাবেন ওঁকে খুশি করা সহজ...’



‘...ভাষে রিচরই আপনি ভুল করতে’—বোম্বের শ্রমজী আর. আর. প্রভু বলেন। ‘কাপড় কামার বেলাতেও কি উনি কম খুঁতখুঁতে...!’
 ‘এবর অবশ্য আদি ওঁর কামা কাপড় সবই সানলাইটে কাচি—
 প্রচুর কেনা হয় বলে এতে কালো সহজ আর কাপড়ও ধুয়ে
 করা হয়।... উনিও বুঝে!’
 ‘কাপড় কামা যা-ই কাচি সবই ধুয়ে আর ব’লেমতে করা—
 সানলাইট হাড়া অন্য কোর সাধারই আমার চাই না’

সুনির্দিষ্ট স্বাক্ষরিত হাট, পোশাক
 সানলাইট হাট কাপড়ের ৩০
 কালো কাচা বোম্বের সাধারই নিঃ
 পাবে না। আপনিও তাই করুন।

সানলাইট

কাপড় জামার সঠিক যত্ন নেয়!

বিদ্যুৎ দিভারের তৈরী

9-30-X51 BQ





সবিরহ নিবেদন,

রবীন্দ্রসংখ্যা: বিংশ শতাব্দী
পড়লাম। খুব চমক হইছে।
রচনাগুলি সবই সুনির্বাচিত ও
সুগঠিত। প্রতিটি লেখাই
ব্যকৃতিস্বতন্ত্র। ১৯০৮-
১৯১০ সালের প্রবন্ধেই পাকী
অঙ্গুর আছে। তেমনি অবস্থা
বাগদত্তের কোম রচনাই ভুল
বা দুর্বোধ্য হয়ে ওঠেনি।
এটা খুব ভাল লাগল। অল্পবাক-
গুলিও সুন্দর ও সাবলীল। রবীন্দ্রসংখ্যার পাঠকদের
কাছে পত্রিকাটি যথেষ্ট অপ্রতীক্য হবে বলেই
আশা রাধি। ইতি—

চাঠকের চোখে বিংশ শতাব্দী

['বিংশ শতাব্দী'র সমালোচনা করে পাঠকেরা হয়
চিঠি পাঠিয়েছেন। কিন্তু লম্বা চিঠি স্থানের অভাবে
ভাঙ্গা সত্তর হোল না। কয়েকখানি চিঠির অংশ-
বিশেষ ভাণ্ডা হোল। পরবর্তী সংখ্যার আরো
কয়েকটি চিঠি ভাণ্ডা হবে।
সম্পাদক 'বিংশ শতাব্দী']

পবেল ভট্টাচার্য
আলাইপুর, নবীরা

হস্তবন্দী মহাপণ্ডিত বনাবার। আমার কিছু বক্তব্য
পেশ করেছিলাম কিন্তু সে অধিক পাইনি বাইহোক পরে
সে কথা বলব। “বাক্য” ও “মা ও নিবিস্তান” দুটোই
পতাবর্ণের রচনার বেশ সুন্দর ও বিবেচনাবল্ল লেখা
বা সত্যই আমার ভাল লাগেছে।

পাণ্ডে সংখ্যাত কবিতা কমালে ভাল হয়।

পুস্তক পরিচয়টা উষ্ট্রের বিধে পাঠকদের দ্বা একটা
চিঠি অধিক বিধে ভাল হয়।

শির কবিতা একই আধারের মত সাধারণ মানুষের
বিধে—কোম্পানীর ব্লক ছবি সহ রচনা আশাকরি কোন
ইজিন্সারের লেখা বা অনুবাদ আশাকরি।

আমার প্রেরণ বলে সত্যি-কথা বলতে কী, যে
কবিতা মাদিক পত্রিকা রাধি তার মধ্যে “বিংশ শতাব্দী”
একখানি ভাল লাগেছে যে এখানকার একেকের থেকে
নেওয়া বক্ত করে আশ এক বছর হল আমি সত্য হয়েছি
কেননা একেকটা বক্ত কেরী করে বই বিতে।

তবে সবচেয়ে ছাখ যে এই কবিতা সংকলন মোটেই
ভাল নয়। অবশ্য বিশেষ সংখ্যাকলো ছাড়া। এক

অল্পবয়সে আর এই আধার-
মতের আধারের এর থেকে ভাল
কাগজ আশা করা অসম্ভব।

ইতি বিদ্যোত—

শ্রীশংকরানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
ভিলাই
সত্যসংখ্যা ১০৩৭

সবিরহ নিবেদন,

আমি প্রগতিশীল লেখা
পছন্দ করি।

চারের পোড়ার কথা, সেতি

চাটপাঠের লেখক প্রভৃতি লেখা শুধো খুব মনোযোগ বিধে
পড়েছি আমার ভালো লাগেছে।

রবীন্দ্র সংখ্যা বিংশ শতাব্দী সম্পর্কে কোন
সমালোচনাই করা হয়না—শুধু একটি মাত্র কথা বলা যায়
বা হলো সংখ্যাটির সংগ্রহ অধিকার হয়েছিল। এমন সুন্দর
একটি সংগ্রহ লেখক কোথাও আশা করা যায় না।

নতুন বছরের সুচী টিকই আছে। তবে বাস্তবিক
উপন্যাস গ্রীক হুটো মিন। প্রতি সংখ্যার একটি সম্পূর্ণ
উপন্যাস চাই-ই। এর মত যদি অন্তকোন সুচী (সদীত,
সংক্ষেপীকরণ) বাহ বিতে হয় সেটাও বিধে।

‘সিনেমা ও ব্লক ওপনের আরো কয়েক খানা টীল
কুটোকে ভালো ব্লক করে ছাপানো বাক্য। ডি-
সমালোচনা আর ডিকের সংবাদ আরো একটু বেশী বিস্তৃত
হলে ভাল হয়। পত্রিকা খানা ছাপানো হয় ‘নিউজ
প্রেস’ এ। এরচেয়ে আরো একটু উন্নত বরনের কাগজ
হলে আরো খুশী হতাম। প্রবন্ধ অবশ্য এক থাকলে
কোন ক্ষতি নেই যে বেহু বাইনডিং এর সময় কভার
খার খার। বিজ্ঞাপনগুলো সুচীপত্রের আগে হ-
হা বাক্য। বিজ্ঞাপন ছাড়া কোন পত্রিকা ছাপানো অসম্ভব
আমি। তবুও পত্রিকার কোন বিধ আরম্ভ হলে তারপর
আর বিজ্ঞাপন বেতের বেতের পত্রিকার অধিকারি বলে
মনে হয়। (সাধনা ওৎপালর প্রাইমবক্স, সানলাইট এর
বিজ্ঞাপন অধিকার)। আবার বক্তব্যত খানাপান।

পত্রিকা বা মাছাংগের পক্ষে। তবে পক্ষে একই বৈধি মানিত হইলে ভালো। হুং, পত্রিকার আমি যখন বাইনিত্র করবে-অন্য অক্ষর হাট্টে পক্ষত্যা থাকেন।

ইতি—বিশ্বকল—১১২৫ ২৫

২-বীণ রীকর পাঠ্যপুস্তক
৮. বসুপানিতলা নবদীপ

প্রকাশের প্রথম বৈধি আমি 'বিশ্ব নতাবী'ও একমিষ্ট পাঠক। পত্রিকার প্রতিটি পর্বের ক্রমোত্তরিত রূপ আমি লক্ষ্য করে এসেছি। যদিও আজ 'বিশ্ব নতাবী' সাঙ্কল্যের সীমার এসে পৌঁছেছে, যদিও অন্যান্য পাঠ্যপুস্তকের অকৃত সর্বস্বত্বের ভাণ্ডারে ঘটেছে, তবুও 'বিশ্ব নতাবী'ও এমন কিছু অজ্ঞান বরফে বা পাঠক মনে পূর্ণতা এনে দেয় নি। 'বিশ্ব নতাবী'র উপভাস ভাল লাগে। কিন্তু তার গল্পগুলি পাত্তপত্তিক। পড়ে তুলি পাই নি। কবিতাগুলিও যে খুব উচ্চ পর্যায়ের হয় বলে মনে হয় না। পত্রিকার অঙ্গসজ্জার দিক দিয়ে বিশেষতঃ প্রচ্ছদপট আঁক ও সরল ও সরল করে আনলে ভাল হয় না কি? একতরু প্রচ্ছদপটট, আবার মনে হয়, সরলতার দিক দিয়ে উপযুক্ত। ততহাৎ এদিকে কুই ছিল 'বিশ্ব নতাবী' আঁক ও সুন্দর হয়ে উঠবে তাকে দেখে নেই। ইতি—

মজির জায়েক

গ্রাম—গোবলগাতি, বীরভূম

বীরভূম নতাবীদ্বীপে বীর প্রাণ্যের "বীরপ্রাণ্যে সন্মুখ" বিভাগটির কল্প লেখককে প্রকাশ জানাই। এই সাপ্যায় কবিতাগুলি বাতীত অন্য সাপ্যায় কবিতাগুলি ছাড়া। এই সাপ্যায় সত্যই প্রাণসার যোগ্য।

যে সকল লেখা বৈধিযোগ্যকে কেন্দ্র করিয়া লিখিত সেগুলি আমি কোটেই পক্ষ করি না। গল্প ও কবিতা বিভাগ দুইটি বড়ই দুর্বল। এই দুইটি বিভাগের পক্ষের দান যদি উন্নত হবেই বা তাহা হইলে আবার মনে হয় কিছুদিনের মধ্যে পত্রিকা গুপ্তে 'বিশ্ব নতাবী' একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইবে। যথো যথো গল্পগুলির মধ্যে বৈধিযোগ্যকে এত বৈধি প্রকট করা থাকে যাহার কল্প পত্রিকাটি তাই যোগ্যের হাণ্ডে লিখিত হইবে।

বৈধিযোগ্যকে প্রকট করা থাকে সেগুলি আপনি আপনার পক্ষের হাণ্ডেই রাখিবেন।

এবারকার শারদীয়া সাপ্যায় মিত্র আচার আচার উন্নত হবেই, প্রথম ও বিস্তারিত বিভাগে সম্বন্ধিত এবং বিশেষ করিয়া। ব্যাচান ও বিস্তারিত বিভাগে বিশেষ নতাবীকে বাকি হইবে। হুলা হুডি পক্ষপাতি পত্রিকার প্রতিক্রিয়া জানা করি।

প্রিত্যাক্ষের সাধু

গোড় ও গ্রাম—সাঁটগাতি,
বর্ধমান

মতন বছর থেকে আপনার লেখা নিরন্তর বিভাগ কি অঙ্গ-বঙ্গ করলে ভাল হয়। বেদন বঙ্গ বাহা-বাহিন উপভাস ভিত্তি না দিয়ে একটি পরাবাহিন উপভাস এবং একটি সম্পূর্ণ উপভাস আমি আশা করি। অত্যা উপভাসটি বাহা-বাহিন ভাবে লক্ষ্য রাখা হইবে। পা ভিত্তিও লক্ষ্য রাখা হইবে। সর্বোত্তম, সিনেমা ও বঙ্গ অর্থনীতি, আচার হুদিয়া। ইতি—

প্রিন্সেসেসকুমার দাস

গোঃ—ভূবা, গাংগা-গিল্প, আসা

'বিশ্ব নতাবীকে' একান্ত আপনার বলে হয়— তাই পত্রিকার উন্নতির কল্প লেখার হাট্ট, শিকল, কুসল প্রদিক সবাইকে এদিকে আসতে অগ্রহণ জানাই বিশ্ব নতাবী যে কোন দৈনিক পত্রিকার লক্ষ্য প্রতি যোগ্যতার দিক দিয়ে পক্ষে পক্ষে এটা জোড় করে থাকা বা যদিও অন্যত্র পত্রিকার চাইতে এর হয় কম। বীণ নতাবী দ্বারা প্রকাশ করার শিকলে আপনার লেখার পরিচয় জানাবার বহুদিন মনে থাকবে। এই পত্রিকা চাই বহু ও অধিকতর কল্প লেখা নিরন্তর প্রকাশ করলে খুব ভাল হয়। পাঠকের মতামত প্রকাশ করার ক্ষমতা নিরন্তর একটি বিভাগ 'চাণু' করলে পত্রিকার লক্ষ্য অনেক বাড়বে বলে আমার বিশ্বাস। গতবারের শারদীয়া সাপ্যায় পাঠ্যপুস্তক সাপ্যায় মত এলান হুলা-বান হুদিয়া বলেই পরিচিত হবে আশা করি এবার শারদীয়া সাপ্যায় দুইটি ভাল পূর্ণাঙ্গ নাইক প্রকাশ করলে অনেকের কাছে লাগবে। বিশ্ব নতাবীকে সাপ্যায় লেখকের গল্প ও প্রবন্ধ আচারের ভাগ লাগে। যদিও

স্বপ্ন দৃশ্যের কথা মনে মনে প্রকাশ করা উচিত। সেবিষয়েই সেনী করে এই পত্রিকার লেখা প্রকাশ করে। সুযোগ মিলে খুব ভাল হয়। বিশ্ব পত্নীও প্রথম প্রেক্ষণের মাসিক—এটা মিসেসের বলা হয়। তাই পার্থক্য বহুতর করে অত্যাধিক—বাক্যে সমালোচনা না করে বিশ্ব পত্নীও স্বপ্ন দৃশ্যের অসীমতার দৃশ্যের ক্ষমতা স্বাভাবিক সাক্ষর আদর্শন জানাই। পত্রিকার পৃষ্ঠার সংখ্যা বা মূল্য বৃদ্ধির কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। বাংলা ভাষা ও বাঙালীর মানবিক সমস্যা সমাধানে বিশ্ব পত্নী কৃত সৎকল্প যোগ্য। কল্প—ইছাই আবারও একবারে তাহা।

ইতি—দেব আশুতর হোসেন
এম্বের পুত্র, মালদহ

বিশ্ব পত্নীর শাহীরা সংখ্যা আমার খুব যে ভালো লাগে তা নয়, কেননা কবিতাগুলির সাহিত্যিক মূল্য কম, উপন্যাসগুলি উচ্চতর নয় এবং প্রবন্ধগুলির বিষয় নির্বাচন উপযুক্ত হয় না তবে কবিতাগুলি গল্প আমার মিসেসের ভাল লেগেছে।

এ বছরের শাহীরা সংখ্যার মিস্ট আমায়ের প্রকাশনা এই যে উপন্যাসগুলি যেন উচ্চতর এবং মনোহরীনা হয়। কবিতাগুলি যেন চরিত্রের গল্প কবিতা না হয়ে ব্যাক্তায়া গল্প কবিতার দ্বারা কবিতা হয়। গল্পগুলি যেন অঙ্গগতের দাবি করে। প্রবন্ধগুলি যেন বিজ্ঞান, র্পন এবং সাহিত্য নিয়ে লেখা হয়। অর্থাৎ সবকিছুর যেন শাহীরা বিশ্ব পত্নী আকর্ষণীয় হয়। আর মিসেস, কল্পন, অর্ধনীতি, সত্য ইত্যাদির কতকটি যাতে না থাকে সেদিকে বিশ্ব পত্নী তাগতেন।

বিশ্ব পত্নীর স্বামী ও মাটা সংখ্যা উৎকর্ষতার দিক দিয়ে খুবই উল্লেখযোগ্য। তবে স্বামী সংখ্যা আরও তথ্যবহুল হলে এবং মাটা সংখ্যা প্রথম প্রথম প্রতিবোধিতার সেরা নটিকগুলি ছাড়াও ব্যবস্থা করলে আরও ভালো হয়।

এ বছরের মাটা সংখ্যা নটিকগুলি যদিও খুব উচ্চতরের হয় নি তবু উচ্চ সংখ্যার ক্ষমতা আপনাকে বলায়াক না দিয়ে পারছি না।

শ্রীঅম্বেরনাথ সুযোগাধ্যায়
বেণীপুর, পোঃ শালডাড, খেলা—পুল্লিয়া

বহাশিব,

স্বামী সংখ্যার কবিতা সংকলন সত্যিই প্রেমসমীহ, অস্ত্র তারতীয় ভাষার স্বামী আলোচনা-গ্রন্থের একটি তালিকা বিশেষ দোষের আরও বড়ত। তবে প্রথম প্রেক্ষণের সাহিত্য পরবর্তে স্বামী সংখ্যার সঙ্গে পড়াকার হু—এক নম্বর বেশিই পায়ে 'বিশ্ব পত্নী'।

এটা যোগ্যের সকল পার্থক্যের কথা যে 'বিশ্ব পত্নী'র ব্যক্তি কবিতা-সাহিত্যের দৃশ্য, অগ্রহী, পূর্ণাঙ্গা, বিশ্বভারতী, চতুর্দশ, পনিবারের চিত্র, গল্পভারতী প্রবন্ধের ব্যাটিকে ছাপিয়ে থাক (প্রত্যেক পার্থক্যের প্রতি পত্রিকাকে বহুতরভাবে এই বুদ্ধিভিত্তিতে দেখা উচিত) যাতে না পড়া থাকলে অন্তত একবার পড়তে মন হবে তার একবার পড়াই আরও কয়েকবার পড়বার ক্ষমতা আলবারীতে তুলে রাখতে হয়।

সাহিত্যিক গুণাবলি বিচারের মাধ্যমে আমার হয়ত নির্ণয় হল না, কিন্তু এখান থেকে গলাব বলাহি—এই স্থলেতে এমন ক্ষমতার আর একটিও সাহিত্যপত্র ভিতরে পাওয়া যায় না। এই দৃশ্যের আরও 'বিশ্ব পত্নী'র 'আল' থাকুক, এই 'আল' কখনো জানাই।

'বিশ্ব পত্নী'র পৃষ্ঠাভিত্তিতে যিনি আপত্তি তুলবেন, তিনি নিশ্চয়ই তাকে তালগায়েন না। কিন্তু খুব কম সাহিত্যপত্র আছে যারো টাকার কম চলেতে বা কেনা যায়। 'বিশ্ব পত্নী'ও যদি সেই পত্র নয়, তাহলে অতিদারাবহুত কি তাতে হাতাব,—আমরা তা হলে হাতাব কোথায়? তবে ব্যবসার ব্যক্তির পৃষ্ঠাভিত্তি, যদি হোব করেনই তবে ব্যবসার সংগে তা যেনে না নিয়ে 'মানা পত্নী'। নমস্কার। ইতি—কালীদাসের ক্রোড়ী

প্রমাণাতিক, সবুজদেব
বাসুদেবপুত্র, মেদিনীপুর

সুত বৎসরের শাহীরা সংখ্যা মান প্রথম দৃশ্যের অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ। আশা করি আপনাদী শাহীরা সংখ্যার মান উন্নত হবে। স্বামী সংখ্যা ও মাটা সংখ্যা দুটি আবার ভাল লেগেছে।

কোন কিছুই বর্জন করতে চাই না। ভারতের ইতিহাস সত্যীর লেখা আশা করি।

উচ্চতর মান মান থাকলে পত্রিকার মূল্য ও গুণা বৃদ্ধি বিষয়ে আমায়ের আপত্তি নেই।

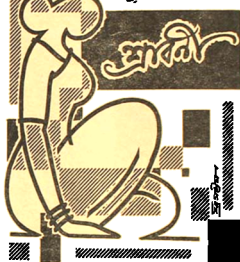
বিক্রিতস্বপ্ন সুযোগাধ্যায়
গ্রাম—সেন্ডা, পোঃ—সেন্ডা-কাগুদা,
জিলা—হুগলিয়ার

—হুড়ি—

সেই-খুব যে রাতের
তারার হাওয়ার ঝড়ানো
যে রাত্রি আদামা একটি
পৃথিবী। অজানা দুনিয়ার
হতোই তার হৃদে আছে
অজস্র রহস্য। তার
আনাচে-কানাচে কতো যে
জর ভাবনা ছোট বড়
দৈত্যের হতো ওং শেতে
বসে থাকে। প্রাণীকে
একা পেয়ে তারা এগার-
ওয়ার থেকে বেরিয়ে এসেছে
—যিরে গরুছে গণ দিক
দিকে। বতকল গ্রীষ্ম
ছিল, হুঁ ছিল ততকল,
প্রাণী মনে মনে ভেঁত
রেখেছিল—ওরা চলে গেলে

আজ সারারাত বসে পড়াপুনা করবে। এই যে কটা
দিন বিজয়রতর দলে আজ্ঞা দিয়ে হাসপাতালে গিয়ে
দমর খপচর হয়েছিল—তার দুসময়েত একটা রাতের
উপলব্ধি করে দেবে। আরও কতোই সাধুসংকল্প
প্রাণীকে মানবের দিনের উল্লেখল সম্ভাবনার দ্বন্দ্ব
যেখিনেই চুপি চুপি তার হিসেব সেই। এমন কি
গ্রীষ্ম দশম চলে গেল তখন প্রাণী জানালায় গাঁড়ির
তার গতিয় অনিচ্ছাম্বর হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে এও
জানতে পেরেছিল যে গ্রীষ্মকে পরাজিত করাটা এমন
কিছু কঠিন কাজ নয়। প্রাণী যদি এই কটা রাত
একটু যেতে বুটে পড়ে তাহলে কেনই বা পারবে না!
আসের হতো গ্রীষ্মকে যেন অসামান্য ধারালো ছাত
বলে মনে হয় না। বরং একটা বিপরীত দাবী নাক
হাকে উঁকি দিয়ে যায়। এবং কতকটা এই কারণেই
প্রাণী তাকে ছোঁর করে ব্যক্তি পাঠিয়ে নিজেই আত।
হরতো তার মধ্যে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতাও ছিল। গতিয়

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য



গীতিমত ভব পেয়েছে
গ্রীষ্মের দিনদিনই বেশ
পড়ার আবহাওয়া হবে
সব খাচ্ছে এবং তার প্রভা
কিছুটা প্রাণীর ওপর
এ সে পড়বে—ইচ্ছার
অনিচ্ছার। প্রাণী অ
বাই করুক ততীয় প্রেপ
এম-এ এই পরিত্যক্তা আ
বদলায় করতে পারে না
ওদের কলেজে একা
অিন্নতাইটার আছে তি
নাকি ততীয় প্রেপ
এম-এ কিছু সে পরিচয়
দল্লম্ব মোশন ক
বি-এম-পি লেখেন। কথ
আজই হঠাৎ মনে পড়ে যে

কেন? সেই তরলোকেয় কুণ্ঠিত চোখাটা প্রাণ
বিছুরতেই হুঁহে ফেলতে পারছে না।

পড়ার ইচ্ছে আর পড়তে বসে অসামান্য ভ্রমে যাও
যে এক বক্তৃতা তা আর মনে মনে টের পাচ্ছে প্রাণী
বিদ্যায় ওপর বই-বাতা হুড়ানো রয়েছে। প্রথম বা
বলে পড়তে চেষ্টা করল, জুং হল না। কেবলই গ্রীষ্ম
কথা এসে পড়ছে বইয়ের অক্ষরগুলো গিরির দিকে-
আচ্ছা, এমন যদি বটে যে প্রাণী কাঠ কাট হাস পেল অ
গ্রীষ্ম বাতর্ হাস পেয়ে কোনো রকম পাস করল
হি, হি, তাহলে প্রাণী পঞ্চাষ নুত লেখাতে পার
না। মিনতির বল গতিয়ে বেজায়ে যে-প্রাণীর জো
পড়ে ছেলোটা বসে গেল। আর ওই বক্তৃতা যে
গিণি গ্রীষ্মের কাছে পড়াপুনার হালি নিয়ে, তার মনে
বান মোটসুগুলো ব্যগিয়ে নিয়ে—(আরও মোশনে ও
বদলে যে ছেলোটার মাথা খেলে) ছেলোটা কে মট ক
আদম মতলব হাসিল করল! হি, হি, হি!

প্রাণী প্রাণীকে প্রাণী বলে উঠে পড়ল। কক-কক

করে পুরো এক মাস চল করে আর এক মাস চল নিয়ে
 যাচ্ছে যুগে মাথায় । বড় ঘাব হচ্ছে । বিপ্লী গরম পড়েছে ।
 আবশ্যী গায়ে ছায়া খুঁজল । কেউ নেই । তবু কেমন
 যেন লক্ষ্য করছে । তা করুক, গায়ে হাওয়া লেগে
 যেন অনেকখানি স্বস্তি পায় আবশ্যী । তবল বা একটা
 শিশু-পিরে শিশল পুত-পুত্বি হচ্ছে বুকের মধ্যে কি
 রকম একটা কাঁপনো লাগে । এ কাঁপনো এর আগেও
 টের পেয়েছে আবশ্যী । এই মধ্যে কেমন যেন সর্বনাশা
 ভয়ঙ্কর বেশা লুকিয়ে থাকে—বা দুনিয়ার সবকিছু
 ভুলিয়ে দেবে । এই অবস্থায় ইচ্ছে করে কিছু একটা
 থাকতে করতে । যা হোক কিছু,—! এই ধরনের মূর্খতাই
 আবশ্যীকে শ্রীমত পিথল বাড়ির করে ফালে ।

ও সব ভাবনা কেড়ে ফেলে দেবে আবশ্যী । দরকার
 হলে শ্রীমত গলে কথা কওয়াও বড় করে দেবে । নতুবা
 এই সর্বনাশের অভ্যন্তর ওরা দুজনেই ভুলিয়ে দাবে যে !

কিরে এসে এয়ার উলুড় হয়ে পুরো ম্যাক্সিক্রিওসের
 বিবরণী মেলে ধরল । কিছুক্ষণ কটিল বেশ নিশ্চিন্ত
 পড়ার মনোনিবেশে । সেই প্রাচীন ভারতবর্ষ—আর
 'ক' দু'কর সে আদলের মানুসগুণি । সবাই ছিল
 গভীকার মানুস । চোর ছিল না । চুরির কথা কেউ
 মাকি ভাবতেই পারত না । অথচ আভ্যন্তর এই সভ্য
 দুপে ল নেই । সভ্যতা যেন একটা বিবল বস্তু । আর
 সেই দুপে যদি আবশ্যী জন্ম নিত । আচ্ছা, এই দেশেই
 গাটিতে সেই সব মানুস জন্মেছিল অথচ আর কেন
 মন্য বকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে ? বিশ্বাস, সভ্যতা, সব কিছুই
 মাঝরা হারিয়ে ফেলারি কেন ? বিজয়না অকলা বলেন,
 কিছুই হারান নি—সব রয়েছে । তবে মানুস পারি-
 গাশ্রুিক অবস্থার পাকে পড়ে যা করেছে—সেটা সম্পূর্ণ
 চার ইচ্ছার বিপরীতেই করেছে । তার শিখের মূর্তির
 যো আর সে নেই—তাকে চলতে হচ্ছে প্রভুও একটা
 মাথের চালে । এই প্রবাহটা কি ? অনেক চেষ্টা করেও
 আবশ্যী ধরতে পারে নি । বিজয়ব্রতর কথার দৃষ্টির
 ভাব নেই,—তবু আবশ্যী যেনে নিতে পারে নি,
 বিশ্বাস প্রবাহকে । এখন আবার সেই কথাটাই ঘুরে
 আসে ওর গায়নে হাঁড়িঘরে ।

শিখের মূর্তির মত বিজয় ব্রত আবশ্যী ।

অন্যদোষাণী এই মেয়েটা । কিছুতেই পড়ার পড়া নিয়ে
 থাকবে না । ঘুরে ফিরে আবেশবাক ভাবনার কাঁকি বুকে
 কাঁকির দিকে চলে পড়বে ! আচ্ছা এমন যদি হয়, ওর
 গায়নে সোপানবিন্দু স্বর্য হাঙ্কির হলেন—তখন ও কি
 করবে ? কোথায় বসতে দেবে !

মুঠু করে শব্দ হল । কিসের শব্দ ?—কে !—আবশ্যী
 গাফা দিল । কই কোনো ছাবা ত এল না । হয়তো
 হাওয়াতে পাখের পাভা বড়েছে, কিম্বা—না পাখের পাভা
 এখানে কোথায় । এ ভো ওর সোপের বাড়ি ন ।
 তবে ? তবে কি কোনো মানুস ? চোর ? হ্যাঁ, তা
 হতে পারে । হয়তো ধর পেয়েছে যে, এ বাড়িতে কেউ
 নেই—আছে পুতু একটা মেয়ে ।—কান খাড়া করে বসে
 আবশ্যী—আর কোনো শব্দ হয় কি না শোনার জন্যে ।

শব্দটা খেমে গিয়েও যেন থাকে নি, থমকে আছে—
 যেন আবশ্যী একটু অন্যমনস্ক হলেই আবার হবে । শব্দের
 শিখরে যে অজানা কারণ রয়েছে সেটা আরো মায়াকর ।

এখন কি করবে আবশ্যী ? পদা চাড়বে হুকুকে
 ভাকবে ? না, সে তারি বিপ্লী মাপার হবে । হুকুকে
 ভাকলে আর সবাই বেগে উঠবে, তখন যদি ওরা লাগে যে
 আবশ্যী অকার্যসেই ভব পেয়েছে ।

বক দিল নিজেতে । থাক দেখাপড়া চোর হয়েছে ।
 এখন আসো নিভিয়ে ঘুনিবে গুঁড়াই ভালো । একবার
 ঘুনিবে গুঁড়লে সব গা ছুঁ-ছানো ঠাণ্ডা ! বরং কাল ভোর-
 বেলা নতুন বন নিয়ে পুতু করা যাবে । চোর যদি আসেই
 তা হলে বিশেষ ঘুনিবে করতে পারবে না । বাপিনী যা
 কিছু লানী তা এই ঘরে রেখে দেয়েন । ও ঘরে তালা
 জেতে বেচারী চোর খুব ঠকবে । আর এ ঘরে বরফা ত
 ভিতর থেকেই বড় করেছে আবশ্যী । অন্তঃস্ব—!

মুঠা সোপামাল শোনা গেল । ভের মস্তর বাড়ির
 সেই সোফটা নিচর তার নৌকে বের ঠাণ্ডাচ্ছে । সোফটা
 ওই রকম—কিচ মেলেটা হাত ধুপুর্মে কানাকাটি কালেই
 সোফটা চটে গিয়ে ন্যাকৈ শাসার—'বাড়ি থেকে বার করে
 দেয়া' । আর নৌটাও জেখান, যুগে যুগে তার জবান
 ভেরাই থাকে । ও মাকি বড়লোকের মেয়ে । নিজেতে
 ওর বাবা এই বাড়িখানা যৌতুক দিয়েছেন । অন্তঃস্ব
 বাড়ি থেকে বার করে দেবার অধিকার যদি কারো থাকে

ত সে ওই দাঁড়ই। এ কথা জানতে পাড়ার কারুর বাকী নেই। বনের বেলাতেও এক এক দিন গোলমাল হয়। তবে রাতের ব্যাপারটা ইহানীও বেড়েছে—কারণ, একটি কোলে থাকতেই আরও একটি কচি মেয়ে হয়েছে। এমনিতে ও বাউটাকে শ্রাবণী অপরহণ করে। কিন্তু আজ রাতে এই গোলমালটুকু হওয়াতে ওদের ওপর কী ঘুণিই না হল ও। ব্যস্তভাবে জানশায় এসে হাঁড়াল। কি কথা বলছে ওরা? একটা কান্নার একটানা গেল বোধহয় বৌটা করছে। কচি মেয়েটাও চিলেছে। আর সেই লোকটা গল্লাহাচ্ছে—“লাথি মেয়ে মূখ ভেঙে সেবো! গলা দাকা দিয়ে বার করে সেবো সব কটাকে।” অপরহণ হয়তো ঘন নিশে মারের দাকা গানসেয়ে বানিকটা, গোদা গেল—“আনি তোমার নামে কান্দে মানসা করব। ভটসোকের মেয়ের গায়ে হাত তোলা ঘুচিয়ে সেবো। হাছতে পাঠিয়ে ছাড়ব—হ্যাঁ-এঁ-এঁ।” এবার প্রচণ্ড চিৎকার করে লোকটা বোধহয় বৌ-এর ওপর কাঁপিয়েই পড়ল—“যদি হাছতে যেতেই চাও তবে ডেকে ভালো করে শিকা দিয়ে তবে ধারো। পায়ের তলার জাত...”

শিউরে উঠল শ্রাবণী, বৌটা বলে যাবে নাকি। এ কি অব্যাহার, অত্যাচার। কেউ ওদের ঠিকোচ্ছে না কেন? ইচ্ছে করছে ছুটে গিয়ে বৌটিকে ছিনিয়ে নিয়ে আসতে। আচ্ছা রে, মেয়েটা নিচর ভয় শেয়েছে—কি রকম কাকরে উঠল। আরও অনেকগুলো কচি কচির কান্না—গোটা রাতঘনাকো বিধিরে দিল। উঃ, কি অমানবিক ব্যাপার! শ্রাবণী জানসা থেকে লড়ে এল—খার শগা যাব না।

নিজের অকরক ভূমিকটো সইতে পারে না শ্রাবণী। কিন্তু কই-বা করার আছে? বড় ছোয় ওই জানালাটাকে বন্ধ করে রেওয়া যায়—ভাতে পরতঃ কচি শিশুগুলির কান্না আর কানে আসবে না। অর্থাৎ শ্রাবণী পাল্লাতে চায়, পালিয়ে বাঁচতে চায়।

আচ্ছা ম্যালিনীরও ত অনেকগুলি ছেলেমেয়ে—ভাঁকেও কি এইভাবে ম্যানীর গল্পনা সইতে হয়েছে? শ্রাবণী এখন কচি ছিল তখন কি মহিমারজনও এইভাবে ওর হাকে উত্থাপন করেছে! মহিমারজনের মেজাজও বদল

হাওয়া বহ। তবে, তবে হ্যাঁ ম্যালিনী ত তেমন প্রথমা নন। বরং সেবিক বিয়ে মালিনীর সঙ্গে এই বৌটির কিছুকিছু মিল রয়েছে। কিন্তু ম্যালিনী বাঁচবেন ত? বোকারী বড় ভালো মানব। ওই ভালোমানবীর ভয়েই হয়তো ভুগে ভুগে কষ্ট পাচ্ছেন। এমনি বিয়ে মালিনীর কপাল ভালো বলতে হবে। শ্রাবণী অদৃশ বিন্দু বড় একটা হতে দেখে নি ও’র। মালিনীর গোটা জীবনটা যেন পাটীগণিতের অক্ষের বতো—এতটুকু ভুলতুক বন্ধায় করতে পারায়। মালিনী তাঁর ম্যানীকে বন্ধন করুচ্ছেন, কবা করতে অক্ষম ছিলেন বসেই বোধহয়। কখনো এমন আচম্ভকা হয় গল্পনা যাত্র শ্রাবণী গুরে শিউরে উঠল—ওরকে এগান-ওগান দেখল, যেন কোনো অপরীণী আত্মা ওর মনের ভাবটা টের পেয়ে এক নিমেষে মালিনীর কাছে ধরুটা শৌঁছে সেবে। নিজের ভরকে পর হুহুতে উপহাস করে শ্রাবণী—ইস্ এত ভব। তবে কি তুমি মালিনীকে কেবলই ভয় করো? তোমার ভালোদাসা, তোমার ভক্তি সবের মূলই কি এই ভয় ছাড়া আর কিছুই নেই! নিজের এই মনোবিকলনকে ভুলুটি করে শ্রাবণী আবার জানসায়ে এসে হাঁড়াল। গোলমালটা যদি আর একটু শোনা যায়। না, না পরের বাড়ির কুশার ওপর মোটেই ওর শোভ নেই—কেবলমাত্র পরিণতিটুকু যেমে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে চায়। পাশাপাশি বাস করলে এটুকু আত্মবিত্তা এসে পড়ে বই কি।

মাড়ানশ নেই। ছেলেমেয়েগুলোও চন্দ। শব্দ কর্তার গদা পাওয়া গেল—হ্যাঁ গো, এক পালো জল সেবে?

অপর পক্ষ নীরব।

আবার কর্তার কণ্ঠস্বর—যেমে শূনে তুমি কেন ব্যক্তি যেটা লাও বলো তো! ছি, ছি, ছি, হাস চুপাল। মায়ের মাথা মানব কী না করতে পারে! সেবি কোথায় লাগল?

—বাউ—

—বাছি, কিন্তু দাঁড়িয়ে যার বাও কেন। কতোদিন হলোহি, আমি যোগলে পাগল—তখন পালিও, মাখন থেকে না।...

ধাক, মিটে গেছে। আত্ম নিশ্বাস কেলে বাঁচল শ্রাবণী।

অশ্বের গরম হাড়ির ছোঁয়া পেলে ও মনে বনভা আসবে।

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সত্যিই এক সময়ে প্রাণী ঘুমিয়ে পড়ল।

...দুশালিনীর ক্যাকাসে ঠেঁটি-বুটো ঠোঁট গাড়া টুঙ্গুটুঙ্গু হয়ে উঠল। পাখসা পাগড়ির হতো ঠেঁটি দুটি কথা বলার সময় ঈষৎ কঁকি হয়, মূচ্ছার বহু কক্ককে ধাঁচে আসতো কিলিক দিয়ে যায়। দুশালিনী অত দুশালিনী নয়! প্রায় দুই দুশ অঙ্গের একটি দুহতী বোঁ। বলছেন দুশালিনী—পাখসী চলছে। দুশ-দুশ, বেহায়ারা হাঁক পাড়ছে আর পথ চলছে। পাখসীতে আনি, আর বড়দুশ। তাকে ছুই খোঁষ নি। বাশের বাড়ি বাড়ি। বাবা তখন বদলীর চাকরীতে মকলবেল থাকেন। সেখানেই মা-টা সবাই থাকেন। পাইক বরকশাষ আছে আর আছে মূচ্ছা হাতা বসলে। তখন মূচ্ছারাই বা বলেন কতো, বেহাং বেলেমানদুশ। তবু মূচ্ছারাই ভরসা। 'কিপকিপ' বুঁকি! প্রায় হাস। টেনন থেকে সাত মাইল পথ পাখসীতে যেতে হবে। দস্তাও বাউড়ে গেল। রাত হল ও মশাল হালিমে চলো। যেতে হবে। ভাবনাও নেই, মূচ্ছার হাতে বন্দুক, আর পাইক বরকশাষ সবাই নামজাদা সেক্টল—ওদের কে না চেনে। তাছাড়া বাবাকে ও চোর-ডাকাতেরা ভক্তি করত, তাদের ধারণা বাবা পিছপুরুশ। বুঁকি। সে সব ভাবনা ও ভেমন কিছু নয়। ক্যাকাসে এল অব্যাহিক থেকে। আমার পেট ব্যাথা বাড়ল। আসের যিন থেকেই খিনুখিনে ব্যাথা ছিল—কাটকে বলি নি। পাছে বাশের বাড়ি বাওয়া বহু হয়ে যায়। এদিকে প্রাণের আকাশ পড়ল ভেঙে। উপুড়-কুপুড় বিড়ি। বিড়ি বহু বাকু পেটের ব্যাথা ভক্ত অমত হয়ে ওঠে। ঠেঁটি কানড়ে ও লমলাতে পারলাম না। পেছল পথে পা হুড়কে বিশর ঘটবার ভয়ে মূচ্ছা এক পাছতলার পাখসী নরনার হুকুন দিয়েছিল। বিড়ির পথ ছাপিয়ে আমার সোজানী তার কানে গেল। সে পাখসীর পান্না কঁকি করে বলল—কিরে এখনই হবে না কি!...কি বলেছিলেন না—বলেছিলেন মনে নেই। বহু বুঁকীর কাছে পথে শুনছি ওই তাপারা দিয়ে। বলল—'নামা শিখুগির হাই ডাকো'। হাই! গা লেগল থেকে সের

কোশ-দু'কোশ দুঃ। গাঁবে লোক ছুটল গিহনের গাঁবে লোক চৌচলো। সেদিন বোধহয় মহাশয়দের গর ছিল। সেই লড়ে যে আমার কোশে সত্যাতী বসে আসছেন তা কি তখন টের পেরেছিলেন হাই! শুনিয়ে যে সে-সেবাগা অতিশাসের বশে বশম মতে' ভদ্র নিতে বাধ্য হল তখন এই রকম একটা মহাকাণ্ড কিছু হয়। তা তুই সেই লড়ে হুজুহালি পান্না!...আচ্ছা মূচ্ছা বহু ভেঙে গেল প্রাণীর।

শব্দ! হ্যাঁ, শব্দই দেখছিল প্রাণী এতক্ষণ। কিন্তু কি বহুর শব্দটা। 'কি আচ্ছা', এমনও কি ঘটে নাকি কখনও! প্রাণী সত্যি সত্যিই দেখতে পেরেছে সেই তরুণী দুশালিনীকে—যে মা ওগার দিগাহুণ বন্দ্যাব হুটুটু করেছে। প্রাণ মাসের কনকম্বু বুঁকির পথকে ছাপিয়ে যে কাতর চাপা কান্না অন্যের কানে পৌঁছয় সে ও সামান্য বন্দনা নয় (তবু দুশালিনী যেসেছেন, দ্যাকাত বেহেকে সেবে তাঁর বুকে-চোখে হালি-বুঁশ উপচে পড়েছে)। দর—এ সবই প্রাণী আর চোখের সামনে ঘটতে দেখল কি করে।

পাড়ীর আঁচল দিয়ে গায়ের ঘাম বেশ ভাল করে মুছে নিয়ে প্রাণী ভাবতে চেষ্টা করে, শ্রমে কি কি দেখেছে। অন্ধকারের গভীরে সেই ছাঁবদুলো ক্রমশঃ তলিয়ে থাকে। প্রাণীর আগ্রহভরা মূচ্ছা চোখে এসে আশ্রয় করেছে সবুজ মন—তবু ভালো করে দেখা যায় না—অশপট ছায়া ছায়া ছবির বাতা। অত একটু আগেও ত দেখেছে ও দুশালিনীকে সেই কচি বাছাটিকে। এখন শব্দ মনে পড়েছে বনানীর বুঁবে শোনা কাহিনীটা—যা একদিন শিলিগুড়ির বাড়িতে বনানী ওর পাশে শ্রমে শুনিয়ে ছিল। মহিমারজন ও সেদিন বলেছেন যে দুশালিনীর বিশ্বাস প্রাণী কোনো গুপ্তজ্ঞতা দেবী। কথাটা সেদিন প্রাণী মনে উড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু এখন বরা পড়ছে ওজাতে পারে নি। মনের মধ্যে শ্রমে রেখে দিয়েছে, বহু বহু করাই রেখেছে। নইলে এ শব্দ আর কেউ ওকে দেখাতে পারত না।...হালি গেল। দূশ হল, নিজের রক্ত দীন দুর্দশা সেবে। আচ্ছা শব্দ-কলহাতে বুঁশ হতে পারার মতো শূন্যতা কেন তাকে গ্রাস করল।

এত সামান্য ব্যক্তি হওয়ার লক্ষ্য থেকে ওকে কে উদ্ধার করবে? মুসলিমের বিশ্বাসকে বাধা করে দেবে কি সেবে প্রাণী? জীবনে ত কিছই নিজে পারল না ও নিজের আপন না কে। যে মা দূরে থেকে নিরন্তর 'ওর ওর' শ্রবণ করে রয়েছেন, নিজেকে সম্পূর্ণ হুঁজে নিয়েছেন ওই কল্যাণের মূৰ চরে—সেই মায়ের অসামান্য ভ্যাগের কিছই কি মন্থন দিয়ে প্রাণী নিজের এই আত্ম-এই বেঁচে থাকাকে সার্থক সম্মান দিতে পারে না?

আর একখানা মূৰ উঁকি দেয় মনের জাদুঘরে। হাসিনা। মালিনীও ত ওকে বড় দেখতে চান। হ্যাঁ, মালিনী নিজেকে বিধাতার আসনে বসাবার জন্য সর্বদাই ব্যস্ত। সেখানে আরবিলোপের বিপদমাত্র সম্ভবত নেই। তিনি যেন সবটুকু জুড়ে প্রাণীর অস্তিত্বকে ঘিরে থাকার জন্যই ওকে বড় করতে চান। সেখানে প্রাণীর নিজেকে হুঁজে পাওয়াই যেন স্বত্ব অপরায়। আর সেই জন্যই অভিযোগ পূর্বত হয়, 'জন্মের সব যে বেয়ে মাটির ঘোঁরা পেল না, তার প্রাণে মারা যাবাকবে কি করে?'—মালিনী ওর মধ্যে হুমতা খানো দেখতে পান না। আর মুসলিম—! কিছই হাত হুঁসুরে এগর কেনই বা ভাবছে?

ভাবছে কেন! শ্রীহর্ষ ওকে স্বীকৃত ভাবিয়ে তুলেছে।—শ্রীহর্ষ তুমি চলে যাও সরে দাঁড়াও। তোমার গুটি পায়ে পড়ি হর্ষ, তুমি আমাকে এমন ভাবে জড়িয়ে ধরো না।—ট্রেট নকরে প্রাণীর। শ্রীহর্ষ ট্রেটের বিদ্যোৎপাদন এখনো ওকে অলপ অভিভূত করে রাখতে চাচ্ছে। 'বাব' গেবে মূর্বতে পেল নিজের অপর বিরক্তিমাত্রা কণ্ঠস্বর। কিছই শ্রীহর্ষ কল্প লোপ হুঁটোর জিকে ডাকিয়ে লক্ষ্যর আবেশে প্রাণীর দৃষ্টি নত হয়ে পড়ল। কী লক্ষ্য! প্রাণীর মনের সঙ্গে হুঁসুরে কথা বলি নেই সেটুকু বুকে কেনেয়ে শ্রীহর্ষ। শ্রীহর্ষ বলছে—'আমার কাছে লুকিয়ে পার পেতে চাও প্রাণী! কেন? কেন এই আত্মঘাতালা! আমাকে হলনা কছ তাতে কিছই বলি নে, কিছই নিজের সঙ্গে চাটুরী কর না প্রাণী, তার ফল বড় ভয়ঙ্কর। একদিন এই জন্যে তোমাকে আকৃশণ করতে হবে।

ভুলে যেয়ো না যে স্বীকৃতি দিচ্ছ বই-এর ছাপা অক্ষরকে আশ্রয় করে বাঁচতে পারে না। কাগজের কল দিয়ে তুমি কতো কাল মনকে উঁকিতে পারবে। একদিন সে এর শোণ দেবে। তখন তোমার সব্বা আমার সেই পিসিমার হতো হবে। সেই নামকরা অধ্যাপিকা যিনি হুঁতো বরেনে কচা বরনের হেসেদের নামা ভাবে হুঁট করে নিজের কাছে গরে রাখতে চান; যিনি নিজের কলেজের ছাত্রীকে গথে খাটে কোনো হেসেদের সঙ্গে (সে তার আপন ভাই হলেও) বলতে চলেতে হেসেলে কৈকিল্য তলব করেন। এই মন পিসিকে নিয়ে নামনে শিমে সবারি হাসি-ঠাট্টা করে। অত ভয়খিলা ইংরেজীতে সুপণ্ডিত, মনুতে তিনি চারটে উপাধি আছে আর বাংলার ত মোটা মূর্খ বিস্তর পবেশনা-এই রচনা করেছে। ভবু মন পিসি মন পিসিই হয়ে গেছেন। চোখে বুখে তাঁর এই পৃথিবী সম্পর্কে চরম বিশেষ সর্বা দেখা থাকে। মন পিসি কখনে একা গরে, কখনে বাইরের লোকের নামনে। তুমি মন পিসি হয়ে যেয়ো না প্রাণী তুমি মানুষের হতো বাঁচবার কথা মনে ঠাই লাও।'

অচিন্তে ঘড়ির ঘান হুঁজে শুরে পড়ল প্রাণী। ওর পাশের শূন্য বিছানাটার বাকী জায়গাটুকু জুড়ে শ্রীহর্ষ যেন শুরে রয়েছে। ঘাবকা! আসলে ওর নিজেরই মনের ভেতরে ভুত রয়েছে। কইলে,—হ্যাঁ,—নইলে, হাছার ঢেঁকা কলেও অন্যের সত্য কি ওকে চেনে মামাতে পারে! প্রাণী নিজেকে বিচারের ঘর, বেশ ত বিবে করে নিজেকে বানকেন বানিয়ে ফ্যালো। তের মন্ডর বাজির হান্দুগদুলোর হতো বিভাধিন লক্ষ্যর মূখ তোমার কপালে অক্ষর হোক, অথবা হুঁসুর বাবা বৌদির হতো—!

নিজের পিঠে এরকম চাবুক প্রাণী প্রায় মারতে উন্মত্ত হয়, মারেও—কিছই আত্ম তেন পিঠের উর্টল। সত্যি যদি—যদি—না না, তা ভাবা যায় না। কিছই সোটা হতে মেয়ে না প্রাণী। ভোর হওয়ার জন্য হুঁয়া অশেষা না করে এখনই পড়তে বসে যাওয়া ভালো। কতো দিন পরে হ্যাঁ, যেন সে অন্য হুঁসুরে হাঁপ আর কার জীবনে বটে গিয়েছে—এদিন রাত মেয়ে পড়তে

বুঝ করতো প্রাণী! মালিনী বকতেন। পরীরা
খাগাশ হয়ে থাকে যে! খাগাশ ঘন বই বসে বসে প্রাণী
তখন নতুন নতুন লাগল নিচ্ছেকে। মালিনী বই।
বকবার হতো কেউ বই আশপাশে—

আজকাল প্রাণীর দৈনিক কাজের একটা ধারাবাহিক
হক তৈরী হয়ে গেছে। সকালে পড়াশুনো করছে বন
হিয়ে। মহিমারঞ্জন নিজে থেকে ওর কান্যে বড় অধ্যাপকের
সঙ্গে বন্দোবস্ত করে কেসেছেন—সন্ধ্যায় তিন দিন তিনি
ওকে পড়ানেন পরীক্ষার দায়ের এই কটা মাস। বড়
পড়ের হাফিজ মহিমারঞ্জনই। কোনো আশঙ্কিই তিনি
গ্রহ্য করেন নি। বসেছেন—শুঁটাকা পরমা বড় কথা নয়
পান্দু বা। আমি একটু তৃপ্ত পেতে চাই, সেটাও কি
তুমি দেবে না? কেউ ভাবতে পারবে না। তোমার বা
(তিনি যেন ‘বা’ উচ্চারণ করার পর স্বীকৃত আর
দাঁতে চাপ অব্যাক্তাবিক ছোর সেন) টের পাবেন কি
করে। তুমি বই হলো যে অধ্যাপক বশাই নিজে থেকেই
পড়াতে চান্নেছেন তারইই সব প্যাঠা চুকে যাবে। আমি
বাসে বাসে জইর খাওয়ারের বাড়ির ঠিকানাটা ঠাকা
পাঠিয়ে দেবো। বাস. হয়ে গেল।”

বনানী ক’দিন এগানেই রয়েছে।

প্রথম দিন প্রাণী নিজেই বাজারে গলে বাত্রে নিয়ে
বেকুঁচিল. ছতুর কাছে বসক শেষেই “আমরা কি হয়ে
সিঁহি পান্দু? দি। নাকি পশা চুঁরি কর বসে তোমার
জ? হি, হি, তোমার হতো কলার কি না বাজার
করবে—” শুভকর ছতুই এখন বাজার করে হোক সকালে।

দেখা আটটা পর্যন্ত পড়াশুনো। ওদিকে হি
আলে, বাসন বেজে, উনুনে আঁচ দিয়ে চলে যায়। রাগা
ত ভাঙ্গি,—বাগের কোল, একটা কিছু জ্বাড়ে। আর
শেষ পাতে বই। তারপর দুই ঘোরে বেরিয়ে পড়ে।
বনানী বুলে যায়। যে দিন হলে যেতে ইচ্ছে না—
করে সে দিন। হালপাতালে। বিকেলে হালপাতালে
হুশাপিনীকে সেবে ওরা মহিমারঞ্জনকে সঙ্গে বাড়ি করে।

ঐহব’র সঙ্গে ক্রমে চোখাচোখি হলে প্রাণী বাখা
নাযায়। কি আমি ওর আজকাল কথা-কইতে ভরসা
হু না? ঐহব’কে একদিন বেশ ভালো ভালো রাসা

করে খাওয়াবার কথাটা প্রায়ই মনে পড়ে—কিন্তু না,
এখন ও সব বাত্রে কাজে দর অচর করা চলেবে না।
পরীক্ষার ফাউন্ট ক্রাস ওকে পেতেই হবে। ঐহব’কে
উপেক্ষা করতে বিশ্বাস্য ইচ্ছে বই,—কিন্তু এ হাতা
অন্য উপায়ই বা কী ছিল।

মহিমারঞ্জনকে প্রাণী কোনও দিনই চা হাতা অন্য
কিন্তু বাজারেতে পারে নি। অনেক বন্দুর অব্যাক্তাবিক
অভিমান দিয়েও তার সংকল্পকে উলানো যায় নি।
তার এক কথা—“পাগলী, তোমার কোনো অনেক ত দর
হয়েছি, আর বসল যে। চৌদুহী সংগের মর্দা একটু
গ্রহ্যতে যে। হুঁ. বাগে হলে মালিনী বকুঁদার যে
ব্যস্ততার করেছে আমার সঙ্গে তারপর ওকে লোক
লাগিয়ে থুন করে তবে জলপর্ণ করতাম। কিন্তু,—”
ঐহব’বাস পড়ে মহিমারঞ্জনকে। তিনি বেশকল
থাকেন না।

মহিমারঞ্জন এবং বনানীকে বেশ এ বাড়ির সকলেই
নানা প্রশ্ন করেছিল এখন দিন। বিশেষ করে ছতুর
বৌদি ত বলেই বসলেন—“তোমার বোন এখানে না
থেকে হটেইসে কেন থাকে? তাতে কতো বেশি খরচ
ত! মেয়েবশাই কোথায় থাকেন?” ইত্যাদি। আর হুঁ
কারণে অকারণে আজকাল ওপরে আসে। পড়া রেখিয়ে
নিজে এসে আর নড়তে চায় না। বকুঁ-বকুঁ করে।
বনুঁর সঙ্গে তার ধুব ভাব. বন্ধনেই নিম্নমার পলপ
পেলে আর সব ভুলে যায়। বাত্রে বাত্রে প্রাণী
এক হয়ে।

ঘোড়ের ওপর নতুন হাখে দিনগুলি বকুঁ কাটছে না।
ভালোই কথা যায়। উনুঁ কাঁকা কাঁকা স্নানুতব করে,
রাতে বিহানায় পুঁবে। বনে হু বা থাকলে আরো
ভালো হুত এই নিটোল আনন্দের কিছুক্সত আশ তাঁকে
না দিয়ে, একা একা জোল করতে হনের নীতি অব্যাক্ত
হু বই কি। তাহাড়া আরও একটা ভর মাছে—
মালিনী কলকাতায় ফিরে বকন পুঁবেবে এইদর পলপ
তখন কি ভাবে এল কখনো তার চিকি কি।

সেদিন সকালে দু-চার ফেটা বৃষ্টি পড়ল। বৃষ্টি
হ’ল না, কিন্তু সেখ করে বৃষ্টি। দেখা প্রেমের
বেদুতার বনটা ছেদন অক্সিপ্লু বকন. কতক সে।

প্রশ্ন সেওটা চলবে না । ভাল থেকে সোজা কমনরুমে গিয়ে নুকে গভেছিল প্রাণী । ভার্সিটি মার্শলী গিয়ে পর্বত একখানা চিঠি দেন নি । অবশ্য প্রাণী নিজেও একখানি চিঠি লিখেছে তাও লম্বা পত্র কাল দিয়েছে । প্রথমে ডেবেরিটস বাবের কাছ থেকে চিঠি এলেই উত্তর দেবে । কিন্তু শত দিনের মধ্যে চিঠি এল না । এরপর সবতো হুট করে তিনি চলে আসবেন এবং মেহের আবেশ-বিবেকনার ওপর এক প্রচণ্ড ক্রোধের জারি করে বসবেন । অতএব চিঠি দিয়ে ফেলছেন প্রাণী । চিঠিতে অবশ্য অনেক কিছুই লেখে নি । কমনরুমে বসে বাবের কথাই ভার্সিটি ও—ঠাং নব হল, বা যেন শ্রীহর ।

মহা এসে বসল—তোমার সোশ্যাল গাইডে হবে ভাই । আর, আমরা একটা ড্রাবা করব, তুমি তাতেও থাকবে ।

প্রাণী অস্বাভাবিক চোখে মন্যকে দেখল । তিশত্ কিছু বলতে পারল না । বলবার আগেই মিনতিদি কোড়ন কাটল—যেভাবে যেইন তোলে না হামালে ও রক্তী হয়ে ছুই ভেবেছিল !

সেই মিনতি দেন, থাকে ঠাং এক অসতর্ক মূর্ত্তের কলকে বড় মন্য, করুণ মনে হয়েছিল তখন একে দেখলে আরো তা মনে হবে না । মিনতি 'ডাল্গার' বলে বলল প্রাণী । ফেসে উভিয়ে দিল মিনতি ।

ঠিক এই রকম একটা বিব্রী অবস্থার শ্রীহর এসে ডাকল প্রাণীকে—সোনো !

অঁ কঠকে প্রাণী বেরিয়ে এল—কি ?

—জেন্সের খাতখারি আর পড়াতে যাবেন না, কাল !

—ও ! এই কথা ?

—হ্যাঁ ।

বলেই শ্রীহর গিছন ফিরল ।

প্রাণী ডাকল—সোনো ।

—কি ?

শ্রীহর বক্তৃতাতে বিরক্ত হয়ে ঘুরে হাঁড়াল ।

অপ্রতিভ প্রাণী বলল : মতো কিছুই বুঝে পেল না । শ্রীহর মিনতি বানেক থ হয়ে লিফিয়ে থেকে অল্পেবে বৈকিৎস চওড়ার ভঙ্গিতে প্রবৃত্ত করে—ডাকলে কেন ?

ফেসে ফেলল প্রাণী । কোনো কিছু নেই । বরং বসে বসে গটেই গিয়েছিল শ্রীহর বিরক্ত দেখে, ভদ্র, শেষ পর্যন্ত ওকে কে বেন মূর্ত্তমুখি দিয়ে হাসিয়ে ফেলল । ও বলল—ডেবেরি, বেশ করোঁ । আমার ইচ্ছে হয়েছে ডেবেরি । তোমার ইচ্ছে হর চলে যেতে পার ।

হুঁ !

—উভুন নাজ বৃষ্টি ।

—তা হাড়া কিই বা করা । আম্মা গিল ।

—মেহো না । একটু চা খাওয়াবে ?

—খাওয়াতে পারি ।

—না থাক । কাল খাবো । তুমি যাও । তারলে খাতখারি কাল আসবেন ?

সে কথাই ভাবার না দিয়ে শ্রীহর গেল ।

ভার ভার বন নিয়ে প্রাণী হালপাতালে ঘাবার পাশে এক পদ্মতা বৃষ্টি নামল । ম্যাসিনারি কেবিনে শৌখিনো ম্যাসিনারিক ভিকি পদ্মপদ্ম করছে । ম্যাসিনারি বললেন—মদ্যবিশুদ্ধ করলে কে দেখবে তোকে ? হালুই বা বলবে কি ! না, না এখনি ওগুলো ছেড়ে ক্যাল । এখানে কানাকান্ড অনেক হয়েছে ।

জামা থাকলেই ত আর সহ্য্যার সন্ধান হয় না । ম্যাসিনারি ট্রাডিক প্রাণীর পাশে হয়ে কি করে । তবু তাই পরতে হল ।

মেহের স্যারামিনের শাশানারি কলে সন্ধ্যার পরই আকাশ ভেঙ্গে পড়ল । ভূমূল বৃষ্টি । বারকয়েক চেষ্টা করেও মহিমারঞ্জন প্রাণীরের বালা থেকে বেরুতে পারলেন না । প্রাণী বলল—বাবা, আর বেশ মিচুড়ি করি । আপনি এখানেই খেয়েসেই পরে পড়ুন ।

মহিমারঞ্জন বাবা নাড়লেন ।

হুঁ এবে বর দিল—গানু তি । আমাদের গলিতে আজ নৌকো চলেবে আর একটু দব্দু করো ।

বনানী বলল—তাহলে আজ আমাদের স্যারামারি উপোসেই কাটবে ।

মহিমারঞ্জন অঁ কঁকন করেন—কেন ?

—গানুদি বলেছে, তুমি না ঘেবে থাকলে, ও বাবে না । আর ও যদি না খার তবে আমি কি করে—

ও কথা শেষ হবার আগেই মহিমারঞ্জন হাত নাড়লেন—হয়েছে । তোরা আর আমার মদ্যবৃত্ত রাখতে দিবি নে । বাবো বা—

দুই ঘোলে স্যারামারি বহা উৎসাহে কাছ করতে লাগল ।

এই ভূমূল বৃষ্টির মধ্যে যে এতবড় একটা বিস্ময়কর পরিমাস লুকিয়ে ছিল তা কেউ জানত না । প্রাণী নয়, বনানীও নাই, এমন কি মহিমারঞ্জন বিকেও টের পান নি যে এই প্রচণ্ড বর্ষার মধ্যেই ম্যাসিনারি এসে হাজির হবেন ।

হঠাৎ ফেন জাহ্নবীহলে ম্যাসিনারি এসে শৌখিনেন । তিনি একাই এসেছেন, বিকেলের স্নেন বয়ে । ট্যান্সিখানা স্যারামারি যেইন তাকে শৌখি দিয়েছে ।

ম্যাসিনারি কে দেখে সকলেই গুত হয়ে গেছে ।

বাইরে বৃষ্টির কব্ কব্ শব্দ হাড়া আর কোনো শব্দই যেন শাখিতো নেই ।

[আগামী গায়ার দস্যাদ]

হাস দাছেব চোবোর
 নিষ্ঠে বেঘটা এলিহে হিরে
 চোক বুকে বসে থাকেন।
 দেবদাস নাভেত্তিক রেখার
 ক্ষতহাতে তা সিন্ধিবৎ
 করে চলছে। জেনারেল
 ম্যানেজার শ্রী এন্স আর
 হাণ্ডের বাসকামতা। দেবদাস
 তাঁর ব্যক্তিগত হেনো।

একথায়ে ছোট একটা
 টেবিলের দামনে ইলা বসে
 আছে। এখানে গর বলাব
 জাঙ্গা নয়। আক বিশেষ
 কিছু কাজ পড়েছে। হাস
 দাছেবই একটা বিপোর্টেড
 অনেকগুলো কপি চাই
 একুদি। তিনি নিজে তবে উঠবেন। তাই অফিসের
 টাইপসেটলন থেকে ইলাকে আনা হয়েছে।

টাইপিট আরো ক'জন আছে। তবু তার মধ্য থেকে
 যে ইলাকে ডাকা হয়েছে এটা দেবদাসের নির্বাচন।
 ইলা একটু মধর থেকে তার কাজ খুব স্বত্বরে
 ভাল-চুক কম থাকে। কিন্তু এটাই হয়তো সব
 সে কথা হাসদাছেব না জাহ্নন, অফিসের অনেকে
 জানে। জানে ইলার সহকর্মিনীরা। তাই দেবদাস
 বলতে এলে সরমা সেন পাশের স্বর্ণার দিকে চোক
 ঠাবুল। স্বর্ণাও টোপা হাসিতে তার জবাব দিলে।

চূপচাপ বসে বসে ইলার হাত পায়ে যেন কিনিবনে
 বরছিল। এমনভাবে আড়ষ্ট হয়ে কি বসে থাকায়
 বোধ বড়কর্তার সামনে। হঠাৎ তার মুখ দিকে একটা
 হাই উঠে গেল। সেই লম্বে হাসদাছেব চোখ মেলে
 তাকালেন। দেবদাস ইলা জু'খনারই মুখে
 শংকর ছায়া।

হাসদাছেব বিরক্ত ছননি। বরং যেন এলাধ
 গড়ির লংকতের মত তিনি সচকিত হয়ে উঠলেন।
 হাতের খড়্গটার দিকে চেয়ে বললেন—কতদূর হল?

পাখির কল্যাণ



দেবদাস পড়ে শোনালে।

—বেশ এই পর্যন্ত আপে
 ওকে দিয়ে পাও। ও কপি
 করতে আরম্ভ করুক।

কাজ শেষ হতে সন্ধ্যা
 উত্তরে গেল। অফিসের
 ছুটি অনেকক্ষণ হয়ে গেছে।
 নেতৃত্ব যে ছুটি তার ক্ষমতার
 দ্বারা প্রকাশিত তা তাই
 আছে।

হাসদাছেব দেবদাসকে
 বললেন—ও এক' থেকে
 পাওবে তো? বাড়ি
 কোথায়?

—হাওড়ায়।

উত্তর দিলে।

—অনেক দূর যে—

—আমিও হাওড়ায় বাড়ি। আমার সঙ্গে যাও
 আর কেউ হলে হয়তো এই কথায় কি ক'বেত
 জানে। কিন্তু হাসদাছেব উচ্চতাপ মাত্র।

তুচ্ছ বিষয় তাঁর চোখে লাগে না। এসবকণ্ঠে বললেন—
 তবে তো ভালই। তুমি ওকে পৌঁছে দিও।

বাইরে এসে ইলা বললে—ওই বন্ধু যেই হল।

—হঁ। দেবদাস উত্তর দিলে। এখন বাড়ি যা'য়েন
 তো?

ইলা বিজ্ঞান্ গোণে তাকিয়ে বললে—কেন,
 যা'য়েন না?

দেবদাস তখন তখন কবে কপালে চোখ জুলে বললেন
 —যাব না! চাকরিটা খোঁজাই আর কি! দাছেব কি
 বহুদূর করলেন!

ইলা হাসল। বাইরে থেকে ওকে একটু কক্ষ, একটু
 নীরস দেখার বটে। কিন্তু তা গ নয়। বাইল বছর
 বয়স। এর মধ্যে তিন বছর চাকরি হয়ে গেল। সকালে
 নিজে বাগা করে মাকে-মুখে গুঁজে মটর বাড়ি থেকে
 বেহোয়। ছুটির পর দোশা বাড়ী কিংবাই আবার হেঁসলে



ঢোকা ওর মাথের বা শরীর অর্ধেকটিন তাকে তুলে থাকতে হয়। বাত হপটার আগে বিশ্রাম নেই ইলার। এত পর কি হল যোগ্যতার দত্ত, হাসি-ভাষায়া করবার মত মেলামা থাকে কারো। সামনের ছোট পাঁচ ছুটি ঘিরে অংগের ওপর একটু চাপ ঘিরে ইলা বললে—আপনার কি ইচ্ছে ?

ইচ্ছে দেবদাসের হার যেকি ? বাড়ি চমকের হাওড়ার হলে হবে কি। একজনের সালকে আর একজনের নিবপূর। উত্তর আর হকিন। তবু বেধা হয়। যেতে আসতে। অকিসের কাছে। দেবদাসের কান ছুটির পর অনেকক্ষণ পড়িত। আর ইলার ছুটি হলেই বাড়ি ঘাবার তড়া। তবু হরতো কোনদিন দেবদাস প্রস্তাব করে—চলুন কোথাও ঘাওয়া থাক।

লোভ ইলাবও হয়। কিন্তু রানী হতে গিয়েও পাবে না। —আজ থাক। মাথের শরীরাটা আজ ভাল নয়।

এগষ্টানমেতে এসে একটা হাওড়ার ট্রাম বেধে দেবদাস হাত তেবিরে এগোতে বাঙ্ছিল। পেছন থেকে ইলা বললে—যেতে বিন। —চলুন কোথাও একটু বসি। বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না এখন।

কথাগুলো বুঝতে দেবদাসের একটু সময় লাগল। তারপর বললে—সত্যি ? কোথায় যেতে চান ?

—কোথাও নয়। একটু ফাঁকা জায়গায় বসব শুধু।

তাকে ধাঁড় করিয়ে রেখে দেবদাস এক রোঙা বাথাম আর আলু ভাজা কিনে নিয়ে এস।

—আপনার খুব ক্ষিরে পেরোছে বৃত্তি ?

—না। ছুটির পর থাকতে হয় বলে আমি বেরীতে টিকিন খাই। এ সময় ক্ষিরে হয় না।

—ওবে ?

—আপনার ভক্ত।

—আমার ভক্ত ! ওর ভক্ত কেউ যে কিছু করতে পারে এ বেন ইলার বিশ্বাস হয় না।

ট্রাম লাইন পার হয়ে পার্কের ভেতর দাসের ওপর বসল দুজনে।

বাড়ি গেলেন না যে ? দেবদাস কথা আত্মক করলে।

—না। যেতে ইচ্ছে করছে না মোটে। ইলা দাসের ওপর কাত হয়ে ওরে পড়ল।

দেবদাস চেয়ে দেখছিল। অবিস্তৃত করেকটা চুল কপালের তপত এসে পড়েছে। বামে মেঝা মুখখানা। ক্রান্তিতে ক্যাকাসে দেখাচ্ছিল। যে সব মেয়েরা বাইরে যেমোর তথের হাতখালে দু'একটা প্রসাধনের সামগ্রী থাকে। পাউডারের কোঁটো, একখানা হাত-আংল। ছোট একটা চিক্নী। পরে বাটে বেবোবার আগে চেয়ারটার একটু গোঁড়াছ করে মের তরা। ইলার ওসব বাংলাই নেই। তার হাতের কোলার থাকে টিকিন বান্স। তাকে দু'খানা পরোটা বা চারখানা ছোট লুচি। একখানা হরতো কামাল। আর বড়ো জোর দু'চাংটে এসুপিহিরেব বড়ি।

দেবদাস বৃত্ত চোখে দেখতে দেখতে বললে—নিম্নেকে বড় অবহেলা করেন আপনি। চাকরী অনেক ঘেরেকেই কংতে হয় আত্মকাল তাই বলে—

এই পরিজ্ঞাত মুহুর্তে এখন একজনের সহায়কৃত্তি বড় মিষ্টি লাগল ইলার। মা মাঝে মাঝে বলে বটে—এটা কিসিন না কেন ? ওটা ধাসনা কেন ? কিন্তু এতে তার মন শান্ত হওয়ার চেয়ে বড় বিরোধী হয়ে ওঠে। তার মনে হয় এটা ওদের চাকুরে ঘেরেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা। জ্বেলা পাইকে গৃহস্থ যেমন বড় করে। সে পাশ কিরে দেবদাসের কাছে সরে এসে বললে—আপনি সহমা, কর্ণাহের সঙ্গে জুলনা করতে চাইছেন। ওদের হল মনের চাকরি। সাক-পোশাকের বরচ উঠলেই হল। কিন্তু আমি চাকরী করি কেন ভাবেন ?

ওর কথা কিছু কিছু আনে দেবদাস। ভ্রনেন্দে। বললে—না। ওদের সঙ্গে জুলনা দিই নি। একটু সাধসোজ অবস্ত বন্দ নয়। মনের ক্ষুতি থাকে তাতে। তবে আমি বলছি শরীরের বস্তের কথা।

ইলা আর একটু বসিষ্ট হল। বললে বাবার আর কত না বললেও বুঝবেন। গভর্মেন্ট অকিসের সাধারণ কেডানী। বাবার ১৮৭৭ আর আবার ১৯০৭। এর ভেতর অক্ব-বিক্ব, ছেলে বাস্তব করা, মেয়ের বিয়ের ভক্ত সফর।

সহমা চমকে উঠে দেবদাস একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করে কেগলে—যেহের ঘিরে ? তাই নাকি ? কবে ?

ওর বকম তেবে দ্বিমিত হুয়ে ইলা বললে—মেয়ের বিয়ে শুনে অমন করলেন যে ?

—না, যামে নেবতহটা না কলকে বাহ এই আর কি । অপ্রতিভ বেবহাস রহত হিয়ে মনোভাব ঢাকতে চাইলে ।

ইলার ঠোঁট দুটতে একটুকরো হাসি ঝিক্‌ঝিক্‌য়ে উঠল । বললে—সেমস্তর পেতে হলে বৈধ বহতে হবে ।

—বৈধ বহতে হবে !

—হবেনা ? আগে টাকা-কড়ি সত্ত্ব হোক । পাঠ যোগাড় হোক—

—ও তাই বলুন । বেবহাস বস্তির মিথাস ফেললে ?

—কেন আপনি কি ভেবেছিলেন ?

বেবহাস বুদ্ধ মূহু হাসতে লাগল । কিছু জবাব দিলে না ?

সে কি মনে পড়ে গেলো । ইলা হঠাৎ উত্তে বসে বললে—এবার চলুন । অনেক রাত হয়েছে । শুধিকে কি হচ্ছে তে জানে ?

বেবহাস গুঁঠাব গোঁটা না করে বললে—আপনার মায়ের শরীর কেমন ?

পিরোপিরি তিন বোনের পর তাই । তার কোলে যোন । আগর মায়ের ছেলেপুলে হবে । একবা কারো কাছে বলা চলে না । বিশেষ কোন পুঙ্খ বজুর কাছে । বললে—মায়ের শরীর আর কবে ভাল ?

পুজোর পর । এখনো অকিস খোসেনি । গদি খুঁজি হলেও লহরের নবর বেওরা বাড়ি । বেশী খুঁজতে হলনা বেবহাসকে । একটি তক্তাবী এসে রহজা গুলল । বেবহাসের সম্মেহ ছিল না বে এই নীলা । ইলার পরের বোন ।

একটু পরেই ইলা এল কাপড়ে হাত মুড়তে মুড়তে । কিছু করছিল মনে হয় । বুঁবে অস্তাবিত খুঁনির হাসি । —কি ভাগ্যিস ! বাঃ বাইরে ধাড়িয়ে কেন ? ভেতরে আন্দুন । তারপর বুঁব খুঁরিয়ে ভেতরের বোনবের উদ্দেশে বললে—একজন বাহুব এলে তোমরা বৃত্তি ভেঙে বগাতে পার না ।

বাইরের ঘর হলেও এটা ট্রিক বসবার ঘর নয় । তক্তাপোলের ওপর লম্বা বিছানা । আলনার শাড়ি ঝাঝা । আবার ওরই মধ্য একপাশে টেবিল চেয়ার

ফেলে পড়ার কাহ্না । নীলা, বোলা ব্যস্ত-শান্ত হয়ে ঘর ভুছোছিল । বেলাঘর বা বহর এং চেহারা তাতে ত্রুক না পরে শাড়ী পরলেই মানায় । কিছু শাড়ির বরচ অনেক । তাই বাড়ীর ভেতরে এখনো পুরোনো আঁট ত্রুকগুলো পরে থাকে । এ অবস্থায় বেবহাসের সামনে পড়ে বেন বাজোর লম্বা এগে তার বুঁবে জড়ো হল । গুণগণ করে ছুটে পালাল সে

চুকে পড়ে বেবহাসও অপ্রস্তুত হয়েছিল । বললে— এসে দেখছি অস্থবিধা ঘটানুহু আপনাকে ।

—অস্থবিধা কিসের আধার ? ইলা বললে ।

—আপনার কাছের । ওঁর পড়ার । আর একজন বে কেন পালুল বৃত্তমুখনা ।

শেব কবাটার ইলাও বেবে উঠল । বেলার বাবার কারণ কে জানে । কিছু চুপ করে থেকে লম্বাটাকে কেবল আরো বাড়িয়ে বেওয়া । বললে—পাদার নি । ওর বাবার অজ কারণ আছে । তারপর একটু বেমে নিছের হলুফরঙা আনুলগুলোর দিকে চেয়ে বললে—জামার কথা ? জামার পক্ষে বরং ভালই হল । তবু একটু ছুটি পেলাম ।

নীলা তখনো বুঁব নিচু করে বইপত্র ভুছোছিল । সে দিকে চেয়ে বেবহাস বললে—আর পড়ার ?

এবারও ইলা জবাব দিলে । বোনকে হেথিয়ে হেলে বললে তা হয়তো হতে পারে । ও বুঁব পড়ে ।

—অ । কিন্তু—বলে বেবহাস মিটিমিটি হেসে বেমে গেল ।

—কিছু কি ? ইলা কোঁচুহনী হয়ে বললে ।

—না থাক ।

—যাঃ রে জমন অর্ধেক কথা বলে বামতে আছে বুঁজি ? না । বলুন । ইলা আনুত্বেপলার মেহ ঘরল ।

বেবহাস নীলাকে ইজিত করে বললে—বহি অন্তর ফেন—

ইলা বললে—আচ্ছা ওর হয়ে আমিই অন্তর ফিলুন ।

—বলছিলেন কি পড়াটা কাক পালাবার অজ্ঞহ্যাত নয়তো ? ছোটখেলার আঁহার এমন অভ্যাস ছিল কিনা । অবস্ত এর ট্রিক উঠোঁ কারণে । পড়ার অয়ে

হোকান বাজার হাং

ছিল।

ইলা ছোট ঘরের মত হেসে ছুটি ছুটি হতে লাগল। এই ঠাকে নীলাচর বর থেকে পালাল।

ইলার বাবার সঙ্গে আদ্যাপ হল। যতীনবাবু নাহুই সেই ঘরের হাঙ্গর দ্বারা খোদ সংসারী অচর সংসারের বিশেষ কিছু বোঝেন না। একটা কিছু ভাল লাগলেই হল। অমনি তাতে যেতে উঠেন।

যতীনবাবু বললেন—আপনি বুঝি যানেকারের পি-এ।

—না, পি-এ-টিক নয়। ঠেনো। কিছু আনাকে আপনি বলবেন না। আমি আপনার ছেলের মত।

যতীনবাবু খুশি। ছেলেটি বেশ। বললেন—তা হলেও বোধ যানেকারের সঙ্গে কাছ। তোমার কিছু কন্যতা আছে বৈকি। দেখনি তুমিই তো খুঁকীকে যানেকারের ঘরে নিয়ে গিয়েছিলে।

যেহেতু প্রতিবাদ করতে চাইছিল। কিন্তু যতীনবাবু সেরিক কান না দিয়ে নিজের কথাই বলে চললেন—
একটু হেনো বাবা দেহেটার দিকে। এইভাবে চুপাচর দিন গেলে এসে একদিন নগরে পড়ে যেতে পারে সাহেবের।

তার আশা যেনে দেহবাস বনে বনে হাসল। শুধু তাঁর এতগনি কল্পনাকে সে আশাত করতে চাইলে না। বললে—শুধু টাইপিটের চেয়ে সটর্চ্যাও জানা থাকলে ভাল হতো।

যতীনবাবু বেন একটা পথ দেখতে গেলেন। উৎসাহের সঙ্গে বললেন—এখনো হয়তো ?

—কেন হবে না ? অনেক স্থল আছে। সন্ধ্যাবেলা বস্ত্রাধারক করে—

বাংলা মিলে ইলা। বললে—সন্ধ্যাবেলা ক্রাণ কবছার মত সময় কোথা আদ্যাপ ?

যতীনবাবুর বেন খোলা হল। সত্যিই তো এটিকে তাহলে দেখবে কে ? একটা কথা বনে হতে তাঁর বন্দীবেশ-পুট কন্যা হুং বীড়্যবনতা গুজলীর মত লাগ হয়ে উঠল। আদ্যাপ আদ্যাপ করে বললেন—বাড়িতে পড়ে হয় না ?

—বাড়িতে ? দেহবাস একটু ডেবে নিয়ে বললে—

হ্যাঁ। তাই হয়। অন্ততঃ কিছুটা এদিকে নিয়ে দেহকালে কোন স্থলে কিছুদিন নাম লিখিয়ে একটা পার্টিকিউর খোঁজ করে নিতে হবে।

যতীনবাবু উৎসাহ হয়ে বললেন—তবে আর কি ? তাই কর খুঁকী।

তারপর দেহবাসকে বললেন—কি কি বই লাগবে তুমি লিখে দিয়ে থাক। সাহসে মাসে মাইনে পেলেই কিনে দেব।

—বই কিমতে হবে না। আদ্যাপ বা বই, বোটা খাতা আছে দেব এখন।

ইলা এতক্ষণ চুপ করে ছিল। বললে—বই খাতা হলেই যদি সব দেখা যেত তাহলে আর ভাবনা ছিল কি ?

—কেন যেহু রয়েছে। যেহু কাছ থেকে দেখিয়ে তুমি লিখি। যেহু কি তাতে না বলবে ? যতীনবাবুর কথাতো ইলাকে শাসন না কি দেহবাসের কাছে আবেদন টিক বোঝা গেল না।

ইলা এবার একটু উচ্চ হয়ে অবাক দিলে—সে সময় থাকলে তো খুলেই যেতে পারতুম।

যতীনবাবু উপায় মেতেকে কিছু সন্ধান করে চলল। তাঁর এত আগ্রহে ঘরের কোন গা নাই মেনে দ্বিধে দিয়ে গিয়ে বললেন তাঁর যদি ইচ্ছে না হয় থাক। তারপর দেহবাসকে সাক্ষী মেনে যেন নিজেকেই শোনাতে লাগলেন—তাঁর ভালর জগতই বলা। নইলে আদ্যাপ কি ? আমি আর কদিন ? সারাশ্রীষন টাইপ টুকে কি হবে ? ঠেনোর মাইনেও যেমন ভাল তেমনি কত উন্নতির সম্ভাবনা। তেমন হলে পি-এ কি সেক্রেটারী পদও হওয়া যায়।

বাপের আকাশচুম্বী আশা যেনে এবার রাগ না করে ইলা হাসল। তাঁর এই ছেলেরাছুরী বস্ত্রাবের অন্য ইলার বড় মাথা হয়। হুবে পেলেও রাগ করতে পারে না। সে হাসির অর্থ বই হোক যতীনবাবু তাতে আদ্যাপ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।—ওকে তুমি একটু বুঝিয়ে বল যেহু। ওর সব ভাল কেবল বড় একজগতের। তোমার কথা মরতো গুনতে পারে।

এবার হাসল দেহবাস। সে ডেবে গেলেন। যতীনবাবুর এ বিশ্বাস কি করে হল। বললে আপনি ভাববেন না। আদ্যাপ বাবা বস্ত্রাচর হুং তেঁরা করণ।

দশীন খাবু খুশিতে বেন গলে সেলেন। বলে বদলেন
তোমার বাড়ি তো হাওড়ার। মাতে মাতে এস না কেন ?
আপবে, তেমন ? শকীরত তাহলে সুখিমা হয়।

কেবলমাত্র সময় ইলা লকে লকে রাত্তা পংক এল এগিয়ে
হিতে।

বেবলাস বেবে হাঁড়াল। বললে এবার আপনি যান।
তুু অতিথিকে বাইরে নিজের পেট ভরে না।

—তবে কি না ভরে আপনি তার কি বোঝেন ?
কিছু তার আপে একটা কথা বলি আপনি তারি বার্ষণর।
বেবলাস কিছু বুঝতে না পেরে বিস্মিতভাবে বললে
বার্ষণর।

—হ্যাঁ। তাই। এই নানিক আসে আপনি বলা
মিহে বাবাকে বুঝ নীতিবাক্য শোনালেন। নিজের
বেলায় সেটা খাটে না বুঝি ?

বেবলাস যেসে বললে ও, বেশ। সেটা তাহলে উত্তর
লক্ষ থেকে হোক।

—তাই অল্প তো আরো বার্ষণর বলি। কিছু না
পেলে হিতে চান না আপনাতা।

বেবলাস লহাতে বললে—তবে বার্ষণরভার আর
একটু পোন। তোমার বাবা বললেন বলে যে আপন
তা চেবনা।

তবে ? ইলা নিখাস বহু করে একটা অপ্রত্যাশিত
কিছু পোনবার অল্প অপেক্ষা করতে লাগল।

—আমি এমনইই আসতুম। তোমার সান্নিধ্যে
লোভে। আর তোমার এই হাতের রাহাব লোভে।
বলে বেবলাস ইলার হাত ছুঁতে গিয়ে একটুখানি চাপ দিলে।
ইলার হৃৎপিণ্ডটা বেন কোম্বায়েব চেটএর বহু তার
কুকের মধ্যে আহাড় বেতে লাগল। কয়েক দৃঢ়ত
দীর্ঘব থেকে গিরন বিরে বাড়ির দিক চেয়ে বেবে সে
সরে এল। ওরা বহুতো খানাদার বাত চেউ বাকতে
পারে। তারপর কি মনে করে বললে—তোমার
বোন আছে ?

—হ্যাঁ আমার তিন বোন।

—কি করে তারা ?

—কি আবার করবে। যা সহাই করে। যা
সমসার করছে। দুজন আমার চেয়ে বড়। ছোট

বোনের এই সেদিন বিয়ে হল। একটা অকুট ঠা
হাস বেহিহে এল ইলার নুস থেকে। চেট করে
সেটা চাপতে পারলে না।

বেবলাস সচকিত হয়ে বললে কি হল ?

—কিছু না। এবার বাই। বলে ইলা অকস্মাৎ গির
কিরে চলতে আরম্ভ করলে।

তিন বোন একসঙ্গে পোর। বেলা যাত্রখানে। ও
ছুপায়ে ইলা নীলা।

নীলাকে উস-খুস করতে বেবে ইলা বললে—দী
জুমানি ?

—খুস আসছে না দিহি। বড় লম্বা, নর ?

—হুঁ। ইলা সংকীর্ণ অধাব দিলে।

হঠাৎ নীলা বললে—জুহি ভজলোককে বিয়ে কর দি
ইলা চমকে চেউে বললে—কে তাকে বললে ?

—কেউ বলেনি। বেশ ভাল উনি।

অন্ধকারে নিঃশব্দে হাসল ইলা। বললে তোর না
হয়েছে ?

—হ্যাঁ। বলেই লম্বায়ে বেন কথাটাও অর্ধ উপ
করে লক্ষিতভাবে বললে—যাক আমি তোমার ব
মদহি।

বড় ভাল লাগল ইলা। তার ছোট বোন অস্ত্রত :
কথা তাহে। তার না বাবা বা তাহে না। লক্ষে :
একটু লজাও হল। বললে—এইলম বুঝি বিখা
আমকাল।

অজনিবের মধ্যেই বেবলাস এ বাড়ির ঘনিট
উঠল। বেন সে তুু ইলার পরিচয়ে আপে
বতীনবানু তেকে পরামর্শ করেন ছেলের পড়ার।
মুখাসিনী খেরবেব বাবে আনতে না পারলে সে
কাছে নাশিল আনাম। নীলা খেলা আর পাণি
লখে থাকে না। তুু এগোয় না খুইলাব লটাই
খেবা। একটু সুখির হয়ে যে বদবে তেমন লম্বা
তার। সে না বলে সংগারে কিছুটা চলেন।

তুু লোর করে বেবলাস থাকে মাথে তেকে বল
সে একটা বাতায় দিচিত লব রেবা এঁকে বাড়ি
ইলা পানে বসে তাই কেবছে। হঠাৎ লম্ব হতে
জুলল লম্বনে।

৮৪তমঃ লামনে সুহাসিনী যেন নীলাকে ঠেলে
বিচ্ছেদন ।

—যা বললে যা দেখুক । লক্ষ্য কি ? নীলা কি
বললে বোকা গেল না ।

—সত্যজ্ঞাঃ যেহেতু । কেউ যদি আমার একটু মূখ
চাইবে । এই কবে সবাই বিলে আমার হাড় মাল
বেলে । সুহাসিনী মূখ হয়ে হাসিয়ে উঠলেন ।

—আবার কি হল ? দেবদাস মিজাসা করলে ।

উত্তর দিলেন সুহাসিনী । ওদের কলমে কি
গল্পটান আছে । একবার না কার্ট এগেছিল । এসেছিল অবশ্য
খুঁকীর জন্য । তা খুঁকী থাকে না তাই শুধুতে চাইছে না ।

—বাও না কেন । দেবদাস নীলাকে বললে । কত
আনোদ আলাপ হবে ।

—তাই বলত বাবা । তবে তুমি খাওনা দেবু ।
একাগ্রেতে ওর ভাল লাগছে না ।

—আমি ! কেন এক ভয়-ভুঁকিত বৃত্তিতে ইলার
বিকে চেয়ে দেখার বললে । এইমাত্র ইলা তাকে
বলেছে তাত সবে বাবার জন্য । দেবদাসকে দিয়ে
পছন্দ করে তার কয়েকটা জিনিষ কিনবে । অনেকদিন
কোন ছবি দেখে নি । অমনি সময় হলে সন্ধ্যার পোতে
কোন শ্রীমতীর বাবে ।

—হ্যাঁ দেবু তুমি খাও । রাত হবে হরভো ।
কেলে নাহু একলাটি আসবে ।

হায়ের কথার যেন বিব হুঁড়িয়ে দিলে ইলার সমগ্র
দেহ-মনে । একটা তীর কই প্রতিবাহের মূর তার
কর্ত্ত পর্যন্ত ঠেলে এগেছিল । কিন্তু মূখ হুঁটল না ।
কুখুখু হুঁড়ে চলে গেল সে ।

অফিস থেকে এসে ইলা বেবেলে নীলা তখনো
কেয়েনি । সন্ধ্যা হয়ে গেছে । বহু একটু রাতই ।
আশ্চর্য ! একটা দুবতী মেয়ে এতক্ষণ বাড়ি ভিঙ্গল না
অবশ্য কারো মধ্যে কোন উদ্দেশ্যের চিহ্ন নেই যেন কিছুই
হয় নি এমনভাবে দরজীবানু বললেন—কোথা আর
যাবে ? কোন বন্ধ বাস্তবের বাড়ি । নরংতা দেবুয়ের
বাড়িতেও যাবার কথা ছিল ।

দুহিন হয়ে দেবদাস অফিসে আসছে না । তাই
বলে নীলার না কেবার সবে তার সম্পর্ক করনা ?

অনন্তর ! বাবা দিয়ে ইলা বললে—না না ওদের বাড়ি
যাবে সে ? কিন্তু তার সন্দেহ হয় কি যেন একটা
ইচ্ছা আছে এর মধ্যে । বাবা কথা এড়িয়ে যেতে চায়
যেবে সে আর কিছু বললে না ।

অনেক রাতের নীলা এল না । শুয়ে শুয়ে সে
আকাশ-পাতাল ভাবছিল । হঠাৎ পাশের ঘর থেকে
যা বাবার অল্পত আলাপ কানে এল । কিছুটা স্তন্যে
গেলে কিছুটা গেলো না । দেবদাসের সঙ্গেই গেছে
নীলা । আশ্চর্যের মতো করে ওদের বিয়ে হয়েছে ।

বাবা বলেছে এখন খুঁকীর কাছে আমি মূখ দেখাই
কি করে ?

.....কিন্তু এতগুলো প্রাণীর মূখ চাইতে গেলে
এ হাড়টা উপায় কি ?

স্তন্যে স্তন্যে ইলার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন অলাভ হয়ে
গেল । একটা চারুখর তার মূখ দিয়ে বেরল না । আশা-
তক্ষেব একটা হোঁখান পড়ল না । যা বাবার উপর
অভিমানের তার চোখের পাতা ভিলে উঠল না ।
প্রতিহিংসার কোন সংকল্প লাল না তার মনে । তার
হেঁচটা যেন রক্তমাংসের নয় । পাথরের । কোন অমূল্যত্ব
নেই তার মধ্যে ।

সকালে রোজ যেমন সবায় আগে ওঠে তেমন
উঠল । উছন বহিয়ে হাটার যোগাড় করে থাকে
জিঞ্জেল করলে—নীলাব লত চাল নেব কি ? গলাটি
বুঝি একটু কাপল গুহু ।

ওর চোখে চোখ পড়তেই সুহাসিনী চোখ নামাল ।
বামনারীম নিষিকার যেন দুটো নকল চোখ । ওকনো
অলের আশ্রয় নিয়ে ঢাকা ।

ইলা আর অপেক্ষা করলে না । বললে—তবে
নেব না ।

রাত্রা হলে বতীবানুকে খেতে দিয়ে সে নিজে বেয়ে
নিলে । কে কি বাবে না বাবে অজবিন তা নীলাকে
বলে যায় । আশ্চর্যের মতো ভেবে সব বুঝিয়ে দিলে ।
তারপর অফিস যাবার লত তৈরী হয়ে এসে মাকে
বললে—আজ কিভাবে আমার বেতী হবে মা । সট-
হ্যাণ্ডটা ভাল করে শিখতে হলে মুলে না গেলে হবে না
তাই কোন মূলে ততি হয়ে আসব ।

ডাক্তার যেমন তাঁর প্রকৃতির ক্রমবিকাশের নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন, মার্কস্ যেমন মানবজীবনের ক্রমবিকাশের নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন। পুণঃ তাই নয়। বনবাদী ও সমাজতান্ত্রী অসাম্প্রদায়িক এতদিন যে অন্ধকারে হাত ডুবিয়ে সরছিলেন উদ্ধৃত মূল্যের আবিষ্কারের কালে হঠাৎ সেই অন্ধকার আলোকিত হয়েছে।—

এলস্. The classic society of Marx is as dull as the heaven of the orthodox Victorian; and it inspires as little credence and as little enthusiasm.

—Hallett,

গত পঞ্চকে মের্কসন মনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছেন উত্তর পুরুষের ওপর। পৃথিবীর ভবিষ্যতের ওপর, সমাজ সংগঠন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার ওপর কার্ণ মার্কস্। অথচ মার্কস্ই সব চেয়ে বেশি বিতর্কিত পুরুষ। এক দিকে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের অবস্থা পেলেছেন তিনি, অন্যদিকে কুড়িফোঁটা রানি রানি কুৎসা। ব্যক্তিটির মতবাদের জন্যে ব্যক্তিও কলহের কালিমাগ ডগ্নিত হয়েছে। মৃত্যুর পরেও তিনি রেগেই পাননি, কারণ তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মৃত্যু ঘর নি তাঁর মতবাদ : বিশেষতঃ জীবিতকালে মার্কস বা ভাব্যতঃ পালেম নি, আচ্ছ তাই খট্টেই তাঁর মৃত্যুর মাত্র আটগুণ বছরের মধ্যে : বিশ্বের একমাত্র কোটি লোক এক ভৃত্যত্বাধীনের বেশি সমগ্র লোক সংখ্যার, তাঁর মতবাদে বীজিত হয়েছে, শিক্ত হয়েছে। মার্কসের অস্বাভাবিকতার অনুষ্ঠান-সময়ে মার্কসের মত, ও সমস্যা যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তাই উদ্ধৃত করার পরে আমরা

যুগান্তকারী লেখা ও লেখক

কাল মার্কস ও দা ক্যাপিটাল

○

At bottom, the passion by which has moved was passion for justice the main spring of life was the desire take from the shoulders of the people burden by which was oppressed.

—H. La

Modern econor has destroyed Ma theo y, but has replaced it by a te: Scientific one.

—Barza

মার্কস্ সম্বন্ধে ম্যালোচন পুণঃ করতে পারি। এখানে সেদিন বলেছিলেন :

“মার্কস্ ছিলেন তাঁর মৃত্যুর দর্শনিক যু ব্যক্তি, কুৎসা ও রচনা করা হয়েছিল সর্বশেষ। তাঁর বিরুদ্ধে। ঈশ্বরোত্তর ও গণতান্ত্রী উভয় তে সরকারগাই তাঁকে মরম্ব এলাকা থেকে বহি করেন; আর রকসনাল ও উত্তর ল্যাণ্ডাম্বিক জেলীর মুর্জোয়াগাই তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা প্রত অজিয়ানে পরশপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কে তিনি মার্কসের মালের মতো এই সব তিনি পাশে গরিবে দিয়েছেন, উপেক্ষা করেছেন, এবং নিত্যতাই প্রয়োজন খট্টেই তখনই কেবল হ দিয়েছেন; মৃত্যুরের শারীরিকতার খনি থেকে আ করে আমেরিকায় কালিফোর্নিয়ার উপকূল পর্যন্ত লক্ষ বিব্রতী ত্রিমের প্রভা ও ভালোবাসার পাত্র তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন—তাঁর নাম

তার কৃতিত্ব নতাসের পর নতাসী মানব মনকে
বাহ্যে ।"

কিন্তু ও সহকর্মী এ্যাংসেলসের কথা অস্বস্তি এনতাসীতে
আত্মক ও আত্মস্বার্থক হ'বেই সভ্য ।

আত্মক মানব ছিলেন মার্ক'স্, আত্মক তাঁর সাধনা ।
নিভাত হোই বল থেকেই তিনি তাঁর সাধনার জন্য সবস্ব
পন করতেন। এমনকি বড়ো বয়সেও যখন হারিডের
কন্যাতে কন্যারিত তখনও বিদ্যুৎমাত্র বিচলিত হন নি তাঁর
অন্তর্ভূত পন থেকে । দুঃখের কালস্রাব মার্ক'সের জীবনে
কোনদিনই মোহাযনি ; তাঁর এই সাধনার ন্যায়তে তাঁর
স্ত্রী সেনী—তিনি মার্ক'সের চোখে বয়েসে চার বছরের বড়ো
ছিলেন—সমান ত্যাগ স্বীকার করেছেন । অথচ সেনী
ছিলেন অভিজাত পরিবারের কন্যা, আর মার্ক'স্ ছিলেন
সাধারণ নব্যবিত্ত বয়সের । এবং এমনও দিন তাঁদের মধ্যে
যেদিন বাংলা সংজ্ঞান করা রীতিমতো কষ্ট লাগে হয়ে
উঠতো । একদা মার্ক'স্ বয়ের জালালাপুরজার কবীট-
দুসো কেটে কালা-কালা করে বয়ের মধ্যে আগুন জ্বলে
দিলেন পাত থেকে রেচাই পাড়ার অন্যে । ভাবেননি
পরের দিন কি হবে । মার্ক'স্ যখন তাঁর প্রদানজন গ্রহ
জন্যে ব্যস্ত তখন মার্ক'সের বা বসন্তেও তুমি পুঁজি-
বাসের ওপর যেতো মোটা মোটা বই বা লিখে কিছ, পুঁজি
করলেই তা পারতো ।

জাত-বিত্রাসী বা জাত-বিসমী বলে কোন কিছ,
আমরা বিশ্বাস করি যদি, তবে বলতে হয় মার্ক'স্ তাই-ই
ছিলেন । কারণ তুম্বের পরীকার রুমার বিশ্ব ছিল,
"তোমার পেশা কী হবে" । এই রুমার এখানেই তিনি
লেনেন, যে দেশীয় ল'য়ে উপস্থিত বলে আমরা আমাদের
মনে করি, আমরা সব সময়ে সেই পেশা অবলম্বন করতে
পারিয়ে । আমাদের দ্বি কবায় হতো অবস্থায় উপস্থিত
হওয়ার আগেই সমাজ আমাদের সুপ'ক কর-বেশি পরিমাণে
গড়ে উঠতে সূচ্য করে ।" বাত হতেতো বয়স বয়সেই এই
ছিল তাঁর চিন্তাধারা । অল্প সম্ভ্রান্ত মার্ক'স্ তেতিসেডেট
কেনেডাৎ বলেছেন, মার্ক'স্ যখন সিউইয়ক'র কাগজে লিখে
জীবিকা নির্বাহ করছেন, তখন যদি এ কাগজ তাঁকে আরও
কিছ, টাকা বেশি দিতো তাহলে মার্ক'স্ আর মার্ক'স'মায়ের
প্রভা হতেন না । সভ্য কথা বলতে কি, সিউইয়ক'

সিউইয়ক—যে পত্রিকা মার্ক'স্ সেবা পাঠাতেন—আরও
বেশি দক্ষিণা দিতে পারতো তাঁকে কারণ, সেও উচিত
ছিল, বেহেজু অনেক সময়ে মার্ক'সের সেবা কেটে—কেটে
সম্পাদকীয় হিসেবে বেরতো ।

কাল' মার্ক'স্ ১৮৮৮ সালে জার্মানীর মাইন অকসের
স্ট্রিগের নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন । তাঁর পিতা ছিলেন
বুর্জোয়াবলম্বী ইহুদী আইন কন্ঠচারী । মার্ক'স্ বিভিন্ন
জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নিত আইন ও দর্শনশাস্ত্রে
অধ্যয়ন করেন । মনে রাখা হওয়া, মার্ক'স্ যখন অধ্যয়ন
করেন সেই বৃষটা ছিল সারা দু'রোপে অধিকতার দু'স,
চারিচক্রে বিদ্রোহ-বিস্রব, আলোড়ন-আত্মোলন । কন্যাসী
বিদ্রোহের স্মৃতি তখন সতেজ, আরও অনেক বিদ্রোহ পরে
পরে আসছে, ১৮৩০শে, ১৮৪৮ শে, ১ ইংলণ্ডে তখন
চারিচক্রে আত্মোলন—তামান দু'রোপ যেন অগ্নিসত্ত্ব হয়ে
বয়েছে । মার্ক'স'বাসের উদ্ভাবনার পক্ষে এর চোখে ভালো
সময় খোদহব আর হতে পারে না ।

অনান্যজন কালে দর্শনিক হেগেলের খ্যাতি দু'বিশ্ব
ছিল । মার্ক'সের জীবনে তাঁর প্রভাব অসংশয় । হেগেলের
হতো মার্ক'স্ও মনে করলেন, ইতিহাস একটা বিশেষ
নীতির অভিব্যক্তি মাত্র । এবং জগতের প্রতিটি বিশিষ্ট
পরিবর্তন একটা দ্বয়ের শেষে আর একটা বিস্রব এসে
জগতকে পরনতী উন্নততর করে চৌনে তোলে । এই মত ও
বিশ্বাসই মার্ক'সকে বিশ্বে বিশ্বাসী, বিশ্ববী করে তোলে ।
১৮৪২ সালে তিনি একখানি কবাস পত্রের সম্পাদন-কারিত্ব
গ্রহণ করেন । তিনি প্রাঙ্গিা সরকারের বিরুদ্ধে সেখানী
চালনা করেন বলে সে-পত্রিকা শত্রুই বহু হয়ে যায় ।
তারপর তিনি প্যারিসে সেনেন, সেখানে কন্যাসী সমাজ-
তত্ত্বাবধানের সঙ্গে পরিচিত হন ; তাঁদের মধ্যে কুঁসিয়ার ও
লেন্ট মাইয়ের নাম উল্লেখযোগ্য । এখানে মার্ক'স সারা
জীবনের সরকারী ও সরকারী এ্যাংসেলসের সঙ্গে দখ্যদুয়ে
আচ্ছে হন । এ্যাংসেল ইংলণ্ডে তুম্বের ব্যবসা করতেন,
এদী ছিলেন তিনি, এবং বিলাতী সমাজতত্ত্ববাসের ভক্ত
ছিলেন ; টমাস হজকিন্স, ডবলু টমসন, গিয়ার্গি
ব্যাভেনবট্টের ও রবার্ট ওয়েনের প্রতি মার্ক'সেরও
প্রশংসা মনোভাব ছিল । প্যারিসে মার্ক'স্ ক্রাম্কা-জার্মান
ইদার দু'ক'স্ নামক সামাজিক পত্রের লেখক হন । কিছ,

১৮০৬ সালে ক্যান্টারি সরকার ও প্রাসিয়া সরকারকে সমালোচনা করার জন্যে হার্ক'স্কে বিতাড়িত করেন। তখনই তিনি লেখিকাজীবনের রাজধানী ব্রাসেলস্-এ তিন বছর ছিলেন। আবার তিনি অংশদ্বয়ের জন্যে জার্মানিতে যান। এবং ১৮০৮ সালের ব্লুমবার্গে সন্মানে তিনি গ্যারিসে গিয়ে আসেন। এই সালেই কবিতাগুলি 'সেইনফেল্ডে'—সাম্যবাদী ইশ্তেহার—প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ হার্ক'স্ বাসের তাত্ত্বিক সমাজবাদী ও সাম্যবাদের কৌশলগত সম্পূর্ণ দার্শনিক প্রকাশনা প্রকাশিত হলো। "ইশ্তেহার" একখানি দৃশ্যকরী হল। এটি আসে পর্বত সমাজতন্ত্রবাদীরা যে সমাজতন্ত্রের কথা বলে আসছিলেন তা ছিল কম্পশন (utopian) "ইশ্তেহার" যেমনতরী মানবের আন্দোলনের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের যোগাযোগ খোঁজা করলো। পাঁচটি প্রধান ভাগে এই ছোট বইখানাকে ভাগ করা যায়—(ক) শ্রেণী সমাজের তত্ত্ব, (খ) দলবাদের সমাজের বিকাশ, (গ) দলবাদের শ্রেণীর বিকাশ, (ঘ) সমাজতন্ত্রবাদ থেকে শ্রেণীবাদী সমাজে পরিণতির কথা, (ঙ) সাম্যবাদী দলের দল। এই পুস্তকে এ্যাংগেলসের সহযোগিতাও ছিল। এই পুস্তকের মূল কথা আজ প্রবাদ বাক্যে পরিণত—দুনিয়াকে মজবুত এক হো।

হার্ক'স্ যখন সেখানে গেছেন সেখানেই তিনি অসম আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন, সাম্যবাদী পত্র পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। ইউরোপে ১৮০৮-১৮০৯ সালের বিদ্রোহ যার ফলস্বরূপ পরে হার্ক'স্ ইংলণ্ডে আসার প্রণয় করেন। তাঁর দুই কাল পর্বত তিনি আত্মজীবনীক সোসিয়েলিস্ট আন্দোলনের সেতু করেছেন। ১৮০৯ সালে ইংলণ্ডে যাত্রার পরে তিনি বছরের পর বছর ধরে সৈনিক সেলো ফটা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পড়ানো করতেন। ১৮১০ সালে এ্যাংগেলস্-এর বই—"ইংলণ্ডে যেমনতরী মানবের আশা"—যখন বেরোয় তখনই প্যারিস ক্যাঁপিয়ালের বীজ উৎপন্ন হয় হার্ক'সের হয়ে। প্যারিস আঠারো বছর ধরে তিনি এই বই লেখেন। এবং এই অল্পবয়সী কালে এ্যাংগেলস্ তাঁর পরিবারের অনেকখানি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ্যাংগেলস্ ভেবেছিলেন এই লেখা আন্দোলনের শেষ হলো না। তাই তিনি বলতেন—যেদিন বই

হাস্তে থাকে সেদিন আমি শ্রম করে মদ পান করবো। অবশেষে ১৮১৬ সালে বই সেলো হার্মস্-এর এক দ্ব্যর্থক দ্ব্যর্থক, এবং পরের বছর ১৮ ৭৩ বেরুলো। তাঁর বইয়ের মধ্যে কিছু দ্ব্যর্থক ক্যাঁপিয়ালের ইংরেজি সংস্করণ পাওয়া যায় নি; অবশ্য ১৮৭২ সালে রুশ ভাষার অনুবাদ হয়। দ্ব্যর্থক ক্যাঁপিয়াল হলো যেমনতরী মানবের কাছে বের বইকে-কোয়ালের মতো। দ্বিতীয় ৭৩ এই বইকে হার্ক'সের জীবনস্মৃতি বেরোর নি। দ্বিতীয় ৭৩ বেরো এ্যাংগেলসের তত্ত্ববাদের ১৮১০ সালে, এবং তৃতীয় ৭৪ ১৮১০ সালে, এ্যাংগেলসের দ্ব্যর্থক পুস্তক বেরে। দ্ব্যর্থক ৭৩ হলো যে বিবরণ নিয়ে সেটি হার্ক'সের পাঠ্যপুস্তক থেকে কাল কাটানোর দৃষ্টান্ত করে বের করেন "উচ্চ মানবের তত্ত্ব" নাম দিয়ে ১৮০৮-১০ সালে জার্মানিতে দ্ব্যর্থক ক্যাঁপিয়াল পড়েছেন, এবং পড়ে সেটিটাই বইকে এবং নিজে বইকে অপরকে বোঝাতে পারেন এমন বৈশিষ্ট্য পাইক ও বোঝা শ্রম করা পাওয়া যায়। দ্ব্যর্থক ক্যাঁপিয়াল দুইভাষায় বই। কারণ, শ্রম ব্যাপক, চিন্তাশ্রম বিস্তারিত বিবরণে আলোচনা এই বিস্তারিত গ্রন্থ পরিপূর্ণ পণ্ডিতদের ক্ষেত্রে উদ্ভব করেছেন—the strange composition of the book, the mixture of general theory, of bitter controversy and satire, and of historical illustrations digressions, তাছাড়াও বইখানা তাঁর মতে, unsymmetrical, badly arranged and out of proportion.

ক্যাঁপিয়ালের উদ্দেশ্য হলো, বর্তমান সমাজে গতির অবশিষ্ট কল্পনা তুলে ধরা। দলবাদের উৎপাদন যখন যখন যে মূলদে উদ্ভব মূলতত্ত্ব এবং ঐতিহাসিক বত্বব্যব ই এতে ব্যাখ্যাত, সমাজিত। হার্ক'সের সমালোচনা করতে গিয়ে অনেক বলেন, যে হার্ক'সে সন্মানে কোন সেলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল না। ১৮৭২ সালে ইংলণ্ডের সমাজবাদী অসমগণ ভোটাধিকার প্যা এবং উচ্চ জার্মানিতে বিলম্বিত শ্রমিকদের ভোটাধিকার প্রবর্তন করেন; তাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হার্ক'সে অজানা ছিল। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে লোকের কী পরিণতি কতোখানি সুবিধা হয়েছে, এ

মার্কসের হত যে কতোটা বাস্তবচিত্তাশ্রুত তা আর বোকা দায়। ক্যাপিটালের প্রথম ধরের অটুটি ভাগ : মূল আদ্যোচা বিধব বনবাণী উৎপাদনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা—অর্থাৎ উচ্চত মূল্যের উৎপাদন ব্যাখ্যা। দ্বিতীয় ধও তিন ভাগে বিভক্ত : মূল আদ্যোচা বিধব মূলধনের প্রয়োগ, অর্থায় ঠাকর কেনন করে পণ্যে পরিণত হয়, এবং তার থেকে কী করে আরো বেশি ঠাকর পরিণত হয়। তৃতীয় ধও কর, মূল, লাভ নিয়ে আদ্যোচনা।

এর বেশি আদ্যোচনা এ প্রবন্ধে আমাদের প্রয়োজন নেই। আসলে বোঝাকবার মার্কসের নীতি প্রধানত তিনটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত—(ক) ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা, (খ) মূলধনের স্ফোরণ, (গ) প্রত্যা-বিয়োগ ও সংগ্রাম। তার হতে সমগ্র আর্থিক অবস্থার উপরেই ধর্ম, শিক্ষাদীক্ষা, আইন কানুন, সমস্তই নির্ভর করে। যে সব জিনিষের সংঘে আর্থিক সম্পর্ক নেই বলে বনে হয়, তাও কিছু অর্থনৈতিক অবস্থা অনুসারে নির্ধারিত হয়। কারণ অর্থনৈতিক অবস্থাই মানুষের চরিত্র ও হত্যারত গঠন করে। তিনি বলেছেন যেতোলিন জমি ও মূলধনের উপর ব্যক্তিগত অধিকারের ব্যবস্থা থাকবে ততোদিন সম্রাজ্ঞে স্বত্যাচার মূলকতার অবসান নেই; তবে নেহেনতী মানুষ চিরকাল এই অবস্থা

যেনে নেবে না, তারা রাষ্ট্রের পক্ষি অধিকার করবে ও সম্পত্তির তথা ধনউৎপাদনের ওপর ব্যক্তির স্বত্বাধিকার উঠিয়ে দেবে। তখনই মানবজাতি প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করবে।

অতি অস্পষ্টকার মার্কস ও তাঁর সহযোগী সম্বন্ধে আদ্যোচনা করা গেল। তিনি যে মূল্যাত্মক সৌখ্য ছিলেন এবং তাঁর রচনাবলী যে কাহিন্যকারী চেষ্টনায় উদ্ভূত করেছে তার স্বীকৃতি—“The great constructive gift of Karl Marx to modern society, Socialistic and Capitalistic alike, is his picture of the inevitability of a society in which poverty and suffering will cease. This ideal has become a challenge to every social system. Even a social system like ours, which rejects his economics, nevertheless accepts that ideal in its own way. Thus, the man who himself lived in misery gave the world the hope for the complete abolition of poverty. This is the accomplishment of Karl Marx. That is the way in which he has changed the mind of the modern world.” (Free hop)



[এক]

পায়ে জামাটা চড়াইয়া
একটা চিকনীর সন্ধানে
ইতস্ততঃ হা ত ডা ইয়া
বেড়াইতেছিলাম—কা নে ব
কাছে গৃহিণীর কাণ্ডাক্ত
বাঁজিয়া উঠিল : সেজেগেজে
কোথার বেরজ্ঞ তুমি ?

টিক এই ভয়টাই
করিতেছিলাম।

মনে মনে বলিলাম, না,
তুমিতে হইবে না। তাহা
ছাড়া সকল কথা সকলকে
শোনানও যায় না। আমার
সকলের সব কথা শোনা
উচিতও নয়।

কিন্তু প্রকাশ করিয়া বলিতে সাহস হইল না। আমতা
আমতা করিয়া যাহা বলিলাম তাহা স্বগত উজির ধার
ধৌষিয়া গেল। বাঁহার কথা তিনি কিছু ঠিকই
তুলিলেন।

: হররোজ ওই আজ্ঞার না গেলেই নয়।

আমারই মতন আরও কয়েকজন হতভাগ্য স্থল-মাটির
একজে মিলিত হইয়া তামখেলার ঝাঁকে যদি বেশের ভূত-
ভবিষ্যৎ বর্তমান সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াই
ধাকি, তাহা আজ্ঞা হয় কেমন করিয়া। সাধে কী বলে
প্রাবুড়ি।

: ভাত বেড়ে মাঝরাত পূর্বস্থ বসে থাকতে পারবো না
বলে দিচ্ছি। **সববদ্বিধাসে** এবং তৎসহ তাঁহার বাক্য
গুলিকেও পাশ কাটাইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম
বলিলেই কথা বাড়ে। **word begets word।**

: না গেলেই যদি এর, নিজের বৈঠকখানায়ই তো
বসতে পারো আজ্ঞাটা। বড় মিষ্টি লাগিল গৃহিণীর
শেষের কথাগুলি।

গল্পগুচ্ছ / ১১



[দুই]

: মারিনে কত পা
তুমি? অত নবাবী কিলের
মেজাজ বি গড়া ই
গেল। একজন গ্র্যান্ডয়ে
শিক্ষকের যা পাওয়া উচিত
: বাকা কথার ধা
ধারিনা। সোজা ক
বলতে পার না?

: বলাবি আব এয়ে
আছেই বা কী। যা পা
মানেশ পরশা তোমার
হাতে ও যায়।
: হ' তেমনি কপা
আমার।

বুদ্ধিলাম গৃহিণী এখানে

আমাকে অবিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন।

বাহিরে সহকর্মীরা বসিয়া আছেন। গৃহিণীর উচ্চকণ্ঠে
মনে মনে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলাম। যিগড়ানে
মেজাজটাকে বধাসম্ভব নরম করিয়া বলিলাম,

: তোমারই কথামতো ওঁদের এখানে—

বক্তব্যটা আমার শেষ হইতে পাইল না।

: আজ্ঞা বসাতে বলে কী মাথাটা বিক্রি করে
বিষেছি।

: বা হবার হয়েছে অন্তত আজকের মতো—

: আজকের মতো করে করেই তো এক হপ্তা হয়ে
গেল। গণ্ডা গণ্ডা লোকের চায়ের চুপ কোথায় পাই
বলত! বোজ বোজ খুসুর ভাগের চুপ থেকে ওঁদের চা
ধাওয়াতে পারবো না বলে দিচ্ছি।

: আচ্ছা আচ্ছা, আজকের মতো হোক ত; কাল
একটা কিছু ব্যবস্থা করা ব্যবস্থা করা থাকবে।

: কী ব্যবস্থা করবে? গৃহিণী আবার কঁদিয়ে
উঠিলেন।

: পাউচের দিক এক কোঁটা এনে দিলেই তো হবে।

চা চিনি লাগবে না?

কোন উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া বহিয়া।

আমার মূখর দিকে চাহিয়া তাঁর কল্পনা উদ্ভিক্ত হইয়া থাকিবে বহুতো। কহিলেন। কী ব্যবহার তাঁর ডেকে আনার। মাইনে তো পাও একশ টাকা—যেজাকটা কবেহো হাজার টাকার।

আমাকে কিছু উপদেশ দিয়া উনি চলিয়া গেলেন চায়ের জোগাড়।

[ভিত]

নিঃস্রবাসের পাঠ্যপুস্তকে যনঃসংযোগ করিয়া বল-কোলাহলময় বাস্তব পৃথিবী হইতে কিঞ্চিৎ উল্লস বিচরণভূমি প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত ছিলাম, অকস্মাৎ গান তল হইল। চমকো; একটা কথা বলবো?

অর্থঃসিয়ার অস্বাভাবিক কোমল কঠোর বৈজ্ঞানিক পদার্থগণিত গল্প পাইয়া মড়িয়া চড়িয়া বসিলাম। তল হইতেছে, নিজেই কঠোরতার উহা না নষ্ট করিয়া কেন। স্রী কঠোর গান অনেকদিন শুনি নাই কিন্তু এমন মধুর স্বরও গোবর্ধন শুনিতে কুসিদ্ধি। বসিলাম : বসো; পোনার কন্যা এ হাসি সর্বদা প্রস্তুত।

উল্লসিত হাতে উনি আমাকে আগ্নায়িত করিলেন।

: বলবো? কিন্তু মনে করবে না ত?

স্বাভাবিক পেশায়। চির বসন্তময়ী এক নতুন দলিকতা অসমের প্রতি। শুনার মূখর দিকে চাহিয়া আছি বাক্যহারা আমি। উনি আরও কয়েক পদ আসাইয়া জাঁপিয়া আমাকে বেসিয়া ঝড়াইলেন। তড়িৎবেগে বেহের মধ্য সিঁচা একটা পুস্তকের নিষ্করণ বেসিয়া গেল। লোমকূপে লোমকূপে তোমাদের তরঙ্গ বহিয়া গেল। অনেক দিন আগে এখন বাহ্য বৃত্ত-সুতি হইয়া ঝড়িয়া আছে, উনি সময়ে অসময়ে হঠাৎ আসিয়া আমাকে জড়াইয়া বসিতেন। তাঁহার বাহুবল দ্বারা তাঁহারই বকে আমি পিষ্ট হইতাম। সত্য বলিতে কী, ভালোও লাগিত। পূর্বের মতো তেমনি করিয়া জড়াইয়া দ্বিবেশ না তো! চাতিটি সন্ধানের সমস্যাও পোষণ এখন কী আর ভালো লাগিবে।

রোমাঙ্কের পরিবর্তে হঠাৎ তল করিতে লাগিল সত্য। সত্য বহি উনি মনে মনে তদ্বিষয় প্রাণত হইয়া পূর্ব প্রতিক্রিয়ায় করিয়া যান, আর বাজালবার কেহ যদি তাহা হঠাৎ বহিয়া কেলে!

তাঁহার মূখের দিকে চাহিয়া তিতরে তিতরে বাসিতে লাগিলেন।

না, বাহা জাতিয়া ভীত হইতেছিলাম, তাহা ঘটিল না। কিন্তু হঠাৎই বেগবন ভালো হইত। কারণ বাহা ঘটিল—আরও তলঃকর।

: কিতোনের একটা চিঠি পেশাম। চাকরি গিয়েছে। বেচারী বড় অভাবে পড়েছে। তবে আসতে লিখে দিলাম। মকুদ চাকরি না ছোটা পর্যন্ত এখানে থাকবে, কী বলো? বলিবার কীই বা আছে। কিতোনের সর্বোত্তম তলঃ বসিতে হইল। ভালোই তো! তলঃ কিতোনের নচে, তাঁহার মাতা-পত্নী ও আরও বহি কেহ থাকিয়া থাকে তো তাহারাও আসিবে।

[চার]

অনেক সমতার বিশেষিত বি'ডিট্যতে শেষ টান দিয়া ভাগিতেছি, কোন বিশেষ কোমল প্রকাশ করিয়া আরও চুই একটা টান না টানিয়া কেনিয়া বেওয়াটা অহুতিত হইবে কী না, এমন সময়ে অসম হইতে তাঁহার ভাবি গলাব আওয়াজে সচকিত হইয়া উঠিলাম। অজ্ঞানুবি হইতেছিলাম। আর হওয়া হইল না। নিশিগ্ধের মতো একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া চুইট নারীর উত্তর উপভোগ করিতে লাগিলাম।

স্রী কঠ : তুমি এ বয়ে কেন বো? সেদিন না বাধন কতলা তোমার?

কিতোনের পত্নীর কঠ : একটা বই দিতে চুকেছি। ঠাকুর আমাকে চাইলাম। তিনি বললেন এখান থেকে নিয়ে নিজে।

কেন, আমাকে চাইলেই তো পারতে। তাঁর কাছে আমার চাইতে সেলে কেন?

: চেরে কোন লোণ কী করেছি?

: না, তা করবে কেন! তবে তোমাদের এখানে আনাটাই আমার অজ্ঞার দ্বারা সেহে। তলঃ এই কথাটা

মনে রেখো তোমাদের এনেছি নিজের সবনাশ করবে
অন্তে নয়। বলিকতার সবছাড়াও নঃ হয় দুট
চাটটা ঠাট্টা আশালাই করিল আমার সঙ্গে।
তাই বলিয়া—!

ব হইয়া বলিয়া বহিলাম। আশীর্ষকে নিমন্ত্রণ
করিয়া ঘরে ডাকিয়া আনিয়া অপমান করার প্রতিবাদে
বিজ্ঞান আমার কণ্ঠ হইতে একটা কথাও বাহির
হইল না।

[পাচ]

: অহ।

: উ।

: ওমহো।

: কী।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের সংক্ষিপ্ততর উত্তর।

নিমন্ত্রণ পতীর বাজি। সুপ্রিন্সা ধবনীর দিকে চাহিয়া
চাহিয়া চাহে বহু হাসি হাসিতেছে। বহু কামান্দর
বল্লভব কঁক দিয়া একটুখানি হাসি কেমন যেন চুঁচি
করিয়া আমার এই বস্ত্রবান্দা চুকিয়া পড়িয়াছে। নিম্নিত
লগ্নবলের শাস-প্রশাসের একটানা লক কানে আসিতেছে।
বাহে যেমনে বহু বিম্রণ বসনা প্রিয়ার বক্ষস্পন্দন আপন-
স্বকে অশ্রুত করিতেছি।

বাক্তির ঘোষ-মতির পরিবেশ নামক-মানবীর প্রসূ-
তরীতে আবিব ক্ষুধার শাস্তালাল রচনা করিয়া
চলিয়াছে।

[ছয়]

: কতকর ?—পৃথিবীর উক্তি।

: কত আর যেমন বা, চপটা পরলা দিন।

: হ'লগা পরলা! ক পতা নাছ হবে বাছা, জুইই বল।

: ক পটা কী গো, একপোশ বসতা আছে যে।

: ওমহো গো, অনতিদূরে উপবিষ্ট আনাকে লক্ষ্য
করিয়া পৃথিবী কহিলেন,—এই কটা নাছ বলে কী না
একপো।

অনভিজ্ঞের মতো বেকাঁদ কথাটা বলিয়া ফেলিলাম:
অবন কবেই কবে দাঁত না।

আমার মুখের উপর সর্বোদয় দুই ছাঁড়িয়া বাঁধিয়া অতি
বাস্তবতার সজিত ভিতরে চলিয়া গেলেন। আমিও লগ্নাধ-
পূর্বেও বহু কালকের একটা ছিন্নঅংশ পারের নিকট
হইতে সূড়াইয়া লইয়া তাহাতে মনোযোগ লিলাম।

: হ' আনা বহ, তোর মেজা লর হয় চাপ আনা।
পরীষ হাতব তেজেক পাঁচ আনাই লিলাম বা। চোখ
জুলিয়া ফেলিলাম অপ্রলয় যুগে হাছগরানী উঠিয়া গেল।

: তোমার যদি একটুই কাণ্ডখান থাকত! কোথায়
কী বলতে হয় তাও জানে না?

ওমহো, সেই থাকিওয়ানী আনিটা চলিয়ে লিলাম।

বলিয়া বলিয়া সবই ভুলিলাম।

প্রলয় পরিবর্তিত হইল।

: ওকথেকে আসতে লিয়ে গিরেছো ত? পুতুর
জুড়িটা এখনো কতান হয় নি। তোমার পরীষটাও দিন
দিন কেমন খাপাল হয়ে যাচ্ছে। তোমার অন্যও এবার
জুড়সেবকে ধিয়ে একটা অষ্টপাতুর মাছলি পড়িয়ে
নিতো হবে।

[সাত]

: একটা পরলা কেবন না, আজ তিন দিন কিছু
বাই নি।

তিস্কক বাসকের ম'তলঘোথনেও পৃথিবী ভিকিলেন
না। : বা বা, পরলা পাছে কলে নাফি। মাতের নিকটে
আশাছরণ সত্যবহার না পাইয়া বাসক দিতাকে বলিল:
একটা পরলা দিন না বাবা, একটা পরলা।

বিশিষ্ট এক কেবস্থানে দেব-সম্বর্ধনে আসিয়াছি।

ভিক্ টেলিয়া আশাখা সাধন করিয়া কোন রকমে
দেব বিগ্রহের প্রাণ নিকটে আসিয়া পড়িলাম।
সম্বর্ধনীর দিকে এক নম্র চাহিয়া ফেলিলাম, আঁচলের
এবি খুলিয়া তিনি পরলা বাহির করিলেন। অকল
প্রান্ত হইতে একটা ঢকঢক সিঁকি দেবসমূহে স্থাপিত
বিশেষ একটা বাস্তবের মধ্যে গিয়া নিরাপদ অস্ত্র লাভ
করিল। অচুস্ত পাখ্য বিগ্রহের কথ বেলাকার বাণের
সংস্থান ভই দিতিটি বিরা করা বাইবে তাহা আমার
জানা নাই। শুধু অকারণে তিস্কক বাসকের অনশন-
জিষ্ট কর সুখশ্রীটা চোখের সামনে জালিয়া উঠিল।

দেবতার উদ্দেশে একটি দিকি নিবেদন করিতে
পারিয়া শ্রীর মূখ তৃপ্ত হইল আনন্দে ভরিয়া গিয়াছে।
চাহিয়া চাহিয়া তাহাও দেখিলাম।

[আত]

শব্দ আর অনেকগুলি উচ্চৈঃস্বরে করিয়া শেষে উঠিয়া
বসিলাম। শ্রীর নিকটে গিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিলাম : রাত
তো অনেক-ঘোল এবার একটু শোবে যাক।

শ্রীর আচরণে উত্তিরার কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না।
বলিলাম : একটু বিশ্রাম না নিলে নিজের শরীর
খারাপ করবে যে। এই সময় সেটা কী খুব ভালো
হবে। তুমি এখন কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নাও ; আমি
বসে কিছুক্ষণ জেপে থাকি।

অল্পক্ষণ সন্তানের শিথরে বসিয়া বিভিন্ন নয়নে দুইটা
রাত কাটায়াছেন। দিনে যেমন করিয়াই হউক
সংসারের করণীর সমস্ত কাছই করিয়াছেন। পিতা
হইয়াছি। অতএব তৃতীয় রাত্রিটা না হয় আদিই
আগিয়া কাটাইলাম। সন্ধান যেহী পিতাবের ব্যক্তিতে
নাই কিন্তু কে শোনে কাহার কথা। স্থির পান্যের
মতো সেই যে কখন আলিয়া বসিয়াছেন, কাহার সাধ্য
এখন সেখান হইতে তাহাকে একটু এখিক গড়িক নড়ায়।

[নয়]

ইহাধের কাহাকেও আমি চিনি না। কীভাবে
প্রতিটি লক্ষণে ইহাধের দ্বিতীয় আমার প্রতিদ্বন্দ্বিত
পরিচয় ঘটতেছে। সেই অতি পরিচয়ের অন্তরালে
অপচয়ের অপরিণীত ব্যবধান। নবত্বের সন্ধানই এ
শাখ্যনার মুহূর্ত্তের বাহ্যকে দেখিয়াছিলাম, অতি আপন
করিয়া বাহ্যকে কাছে টানিয়া লইয়াছিলাম, ভালো
করিয়া না দেখিয়াই বাহ্যকে চিনিয়াছিলাম, সে আজ
কোথায়! এখনি করিয়া সে আজ কোথায় হারাইয়া
গেল। কেমন করিয়া অতি সাবধানে ব্যক্তিগত
তাহাকে হারাইয়া ফেলিলাম। আমার চারিপাশে ক্ষুদ্র
বৃহৎ সকল কালের মতোই তাহাকে দেখিতে পাইতেছি,
তবুও তাহাকে বুঝিয়া পাইতেছি না কেন! দে কী
চিরকালের মতোই হারাইয়া গেল! আর কী তাহাকে
কোনদিন বুঝিয়া পাইব না।

ওগো, আমি যে তোমার বহুদূর চিনি না। যে জগৎ
তোমার প্রথম বরণ করিয়া লইয়াছি, সেই তুমি আজ
কোথায়।

যাকি কীবনটা ঘুরিয়া আমার কী সেই খোঁজার
পালাই চালাইয়া বাইতে হইবে।



ব্রহ্মসামান্য একদা মনসা
করেছিলেন, বাংলা সাহিত্যের
পনোরো আনা আয়োজন
হয়ে। আনন্দা মনে করি
সে কথাটাও ঠিক হতো যদি
তিনি মনসা করতেন, বাংলা
সাহিত্যের পনোরো আনন্দ

কেন চোখের জলে ডিজিয়া দিলেম

কল্পনাপতি যে

★

চোখের জলে ভেঙা। এই যে চোখের জল, এ ধূস-
লাসিয়ার জন্মে যদি বসি, তবে একেবারে সোভাকার
হাফা কবিতার মতোও হৃদয় হর না; হরত সেখানে
কেটা কেটা চোখের জল কবিতার পথিকালোকে
ভিত্তি দেয় নি। হারিদবর্ষার মতোই চোখের জল
টলল করছে, হরতো তা উশটে পড়ার মতোই পানি;
কবি-সাহকের লজ্জা লেখনী হার পথে তাকে বন্ধ করে
দিয়েছে। কিংবা বৈজয় কবিতার কথাই বলা যাক—কারা
সেখানে নরত, হারুতান, আকেশ, অস্তিনান সেখানে নারক
নারিকর মনের কবাইলগা ভিতর দুয়ারে প্রলম্ব হয়ে
উঠেছে। মনসা-মল-চণ্ডী-মল কাহিনীতেও পা হুঁড়িয়ে
কবিতা বসার মতো পরিস্থিতি সর্বত্রই উদ্ভূত হয়েছে। আর
ছোটবেলার সেরাস পড়ে চোখের জলে ভিত্তি দেয় নিম্নে
পাতার পর পাতা। নদীতে ঘরো জল পরফলের নারক-
নারিকার গোপনে প্রকাশ্যে বোম হর তারও বেশি জল
কেন্দ্রেছে।

সাহিত্যে কারার রকমের হয়েছে। কখনও তা
অন্তর্লীলা কল্পনায় মতো, কখনও তা বর্ষার পাগোল
প্রবাহের মতো। এই কারা—ক্রন্দন যদি চরিত্রসূত্রের
বিলম্ব হতো তাহলে হরতো বিতর্কিত পার্শ্ব পরিভূত
হতে পারতাম না। হই-ও নি কখনও কখনও: আর
সেবাসের বেনা সেবাসেরই, পার্শ্বতীর পাশলীনা হর
বেরিবে আলাটাও কোন প্রকারে হারি চলে রাখার ব্যাপার
হয়ে গেছে। কল্পনার মতো যদি লবনাক অঙ্গ সেবাস
হয়ে শুভ তব একদা বলা যায় বেহুলায় চোখে জল ছিল
না বসেই থাক বেহুলায় কোনোই আনন্দের ব্যাধি বুক
ভেতরে হুঁড়িয়ে ওঠ এবং সেই মতো কল্পনার মতো
অঙ্গবোতনে বন একটা আত্মিক তালি, মনসা

করিনে। তা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু কারার স্থান
সাহিত্যে কতোখানি—
বাংলা সাহিত্যে—তার
মুখ্যতম আলাচনার
বসি। রবীন্দ্রনাথের পান
পুনেই মনে হলো, হই-ও-

সাহিত্যে মনসাতে স্তম্ভিত ক্রন্দনের অনেক মূর্তি
সেখোঁ, সর্বত্রই তিনি চোখের জলে ভিত্তি দেয় নি।
তার বর্ষার কর কর ব্যর্থতা মতো সহজে করে
হয়ে গিয়ে নবাবুর ইকুবনে মিনাতে, মিনাতে, ততো
সহজে মনসের বলায় মনের জল নারেনি; নারতে গিয়েও
নারতে পারেনি, কারা তখন হই, মনসা হরনি। তখন
ক্রন্দন নেই, আছে বেনা—মুতীর বেনা অপর।

সব মনসা মূর্তিই কিন্তু একটা ক্রন্দন থেকেই জাত।
ক্রন্দন, ইংরেজিতে যাকে বলি ক্রাই; উইশ, মর বা মর
মর। যখন ক্রন্দনে আর সাহিত্যের ক্রন্দনে একটা তফাৎ
আছে। সাহিত্যের ক্রন্দন হতে পারে নন সোভাকো মন-
সারো হতাশাস, আনন্দের ক্রন্দন হতে পারে ক্রাই অব
এ্যাম্বলমেন্ট বা হতে পারে ক্রাই অব এ্যাম্বলমেন্ট।
আবার চোখের পাননে প্রতিবিম্বিত হারিদবর্ষার মতো
সেখোঁ তার কলে আবার মনে যে প্রতিবিম্বিত হইছে তাই
যেক ওপরে ঐ তিনটি 'ক্রন্দন' মূর্তি হতে পারে। কিন্তু
উক্ত তিনটি ক্রন্দন (ক্রন্দন বল্যো, হরতো আনন্দের
কলে উল্লাস বলা যেতে পারে, কিন্তু বল্যো না,
কারা উল্লাসের মতো কোন একটা মনসা হর ভিত্তি
আছে, হারিদবর্ষার তার, একটা মনসা হর) মনসা
অন্য মনে রাখতে হবে, বিতর্কিতের শেষেও কিন্তু উক্ত
তিনটি ক্রন্দনের মতো প্রারম্ভেতে বা ছিল,
তাই-ই হয়েছে; নারাকের নারি প্রতিভার পরিস্থিতি
হইছে, হইনি উক্ত তিনটির অগ্রগতি, মনসা পরিণাম।
কারা নারাক হরোয়ার নারকে কী বেশি? ইংরেজ
কবি হারিডবর্ষার মতো একটা বেনা মনসা মনসা সেখোঁ,
কিন্তু উপন্যাসের চরিত্রসূত্রের মতো কতো অঙ্গ বেশি।

জ্যার্স্‌গোয়ে' বহি ভেই মানদভার বিশাল সলীত শূনে
 থাকেন তবে একবা বলসে অন্যায় হবে না বোধ হয় যে তাঁর
 অনুভূতাপন্ন জনগণই অভিভাবনা—অধীকৃত প্রাপ্ত কন্যা
 ক্যারোলিন ও তার মা এখানেই ভালো-ব করণ্যে । এই
 আর্থিন্স্ট জনগণাপিত ক্রমবর্ধমানের বেশ তাঁর প্রকৃতিস্বভাবের
 উদাহৃত্যর বহুই যার কারাবাসিকের মন থেকে : কিছু উক্ত
 ত্রিবিধ ক্রম (যদি বলি "আতি" "ক্রমবর্ধমান" পরিবর্তে)
 তারলে সেন্নে হয় ?) যে কোন বহু-নিশ্চয়ের তথা সাহিত্য-
 কর্মের পক্ষে অপরিসংখ্য । মনে হয় তিনের যে কোন
 একটির অনুশাশিত সম্পূর্ণ মস্তোত্তর প্রকাশে ব্যর্থ হবে ।
 আবার এর যে কোন একটির আধিক্য ভাবাবের প্রবণতার,
 চৌলভতার, সলভতার, জীবনরস গ্রন্থিকতার অভাবের মূল্যে
 করে দেবে : ইংরেজি ও ক্যান্সী সাহিত্য পাশাপাশি
 মনের সাহিত্য : মাতৃভাষা সংস্কৃতভাষা জলভাষা দুটো
 স্নেহকে যেন পৃথক করে দিলেহ, তেমনি দুটো মনের
 সাহিত্য মানসে ও মনোভে কানাক । ইংরেজি 'হিউমার'
 আর ক্যান্সী 'উইট'-এর পূর্ণাঙ্গাভাব আর বক্তব্য স্পষ্ট
 হবে । ক্যান্সী বুদ্ধি বিলাসে কোথায় যেন একটা বৃদ্ধার
 ভাব রয়েছে, কোথাও বাসিকটে আত্মন্যতা । তা সে বসো
 ভুলভেদ্য বা কোলোয়ার, কোলাসী বা ভোদ্যেদ্যের ।
 আর ইংরেজি 'হিউমার'-এ প্রথম পানিত বুদ্ধির দীপা
 (ইংরেজী বুদ্ধিবান জাতি, একবা সলাই জানে,
 ভগ্নভেদ্য) অনেক কম, সেখানে বাধ্য-বেদনা ও আনন্দের
 সন্নিবেশ, যেন সকলই বলসেন, সেন্নে চোখের ভলে
 ভিজিয়ে দিলেন না । স্বাধীনভাবে ক্যান্সী বুদ্ধিবিলাস
 স্বাধী বহি, ইংরেজের হিউমারের সঙ্গে তাঁর 'মাতাভাষা'
 অথবা ক্যান্সী সিনিজিভ (এর বাংলা প্রতিবাদ কী
 হবে ?) প্রথম চৌদুরী ছাড়া আর কারো মতো বাঙালী
 মনে আছে বলে বলে করতে পারছি। ইংরেজ স্নায়োচক
 (ভেঁজিত সৌন্দর্য) ইংরেজি ভাষাকে কবিতার উপযোগী
 সিন্ধিত ভাষা বলে মনে করলেও, ক্যান্সী ভাষা ও বাঙালী
 ভাষার মূল-ও মূল বান্দু' যেন ক্যান্সী পরিভবতী বলেও
 ইংরেজি ক্যান্সী মানসে গলেই যেন আশায়ের বেসে বেঁধে ।
 ক্যান্সী ল্যান্সের সেবার সাধন্য ব্যর্থতার বৈ । তাঁর
 ল্যান্সে শব্দগল্লার অভাবসে যে বেগনাই' জল রয়েছে তা
 আশ ও আশায়ের আত্মত করে । বাঙালীর প্রথম চৌদুরীর
 সেবা লঙ্ঘন পরিকল্পনা ও বুদ্ধি বিচার জলতকে নাক্ত দেয় ।
 আশায়ের প্রভাবের ক্যান্সীরাষ্ট্র জীবনে সে-সেবাই তত্ত্ব
 দেয় গার পরিবর্তন লঙ্ঘনভুক্তি অপরিসংখ্য তৈরী, বেদনা
 বিবৃদ্ধতার সোমার মনে যা চিহ্নিত । সেই জন্য
 সেক্সপীয়র আর স্বাধীনভাবে জীবনোন্মাদে আশায়ের পরম

পরিভুক্তি : তাই স্বাধীনভাবে বড়ো ইংরেজ আর
 জার্মান সমালোচক ভুলেই ততো ক্যান্সী সমালোচক
 ভোটে বি । আসলে জীবনোন্মাদে চেয়ে, হান্সসের চেয়ে
 বৈশ্বাভিকতা কার্যপাঠেরও অনেক পরে মনে মনে নানা
 অনুভূতি ও ভ্রমণ তোলে : আর তোলে বলেই তা
 অনেকদিন পর্যন্ত ভালো লাগে । তাইতে বলা হয়
 ট্রান্সিভি ভাষা হলো দার'জনী ভাষা, ক্রমবর্ধমান ভাষা,
 কর্মবর্ধিত তা নেই । তাই এসেদের কর্মবর্ধিত ও এসেদের
 হান্স অপরিসংখ্য, ও এসেদের কর্মবর্ধিত আনন্ড 'খব' বহুই
 পাইয়ে । নিশ্পন্নমুখ মনের বুদ্ধিবিলাসে স্বাধীনভাবে
 মনের বুদ্ধি বিলাসে বিল নেই কোথাও । অথচ ব্যাধার
 পাঠ্যাবারে দলসেই দল 'অপ'—the pal : of the
 Children of Adam is the same pain তাই
 সেক্সপীয়র পরিভুক্ত তাঁর চারটি বিশিষ্ট ট্রান্সিভিভেই ।

সেক্সপীয়রের নাটকে হোক, বাজির নাটকে হোক,
 আসলে নারক ভো সেখানে বান্দু', কোনও দার'ওলা
 বান্দু' নয় । দার'ওলা নির্বাহকের বান্দু', বিশেষ নির্বাহকে
 বিশিষ্ট করা হয়েছে আশিসের সুবিধের জন্য । এই বান্দু'
 হলো কনিদানসে হান্সে বেনা প্রকাশের—আত্মজন্ম-
 ব্যাপী জগৎ বাপ্যায়ের প্রতি ক্রিমার বিদ্যুৎ কবি চিত্তে
 হান্স প্রকাশের বাধ্য । এক পলকে বিশ ব্যাপ্যায়ের
 যেটুকু বৃদ্ধা কবির মনে হয়ে যার তারই আত্মনন্দ ক্রম
 কবিতা, আশেপা বা খটমার ঘনঘটার চুলচেরা বিশেষের
 প্রকাশ যেমন বহু তা, তেমনি স্বাধীনভাবে প্রতি কবি বা
 মাতাকারের স্বাভাবিক ভালোবাসা থেকেই যাত ট্রান্সিভি
 আশায়ের আনন্দ দেয় । আর বা সিন্ধিত, ভাঙে প্রাথমিক
 নেই, নেই—মিলটনের ভাষার Doing বা Suffering
 তা আশায়ের তত্ত্ব দেয় না । বৃত্ত পিতৃ, ক্রমবর্ধমান বা
 আশায়ের কৌতুক জাগ্রত করে, জল প্রকাশের গভীরতর
 মধ্যে কোন অধিকতা জানে না । জীবনের মধ্যে প্রকাশ
 করে বাধ্য 'বিজ্ঞানবর্ধমান' প্রকৃতির চোখে জল আসে,
 তখন কবি নেই অতুলে ভিজিয়ে মেন পাঠকের মন ।
 জীবনের পথে চলতে 'চলতে বাধ্যতা, অতুলিত,
 অধিকতার তেপাতরে এসে পথ হারিয়ে কোঁস তখনই তো
 কাটা পায় । নিশ্পন্ন 'একাধিকের বেদনা তখনই কাটা হয়ে
 করে গড়ে না, আশিপন্ন বুদ্ধির মতো বুদ্ধিতে থাকে ।
 স্বাভাবিকতার, সাহিত্যে, দার'ওলা, দার'ওলা এ হুকো কলে
 না । তাইতো বৈশ্বাভিক মন থেকে সেক্সপীয়র হয়ে
 চেক্ত স্বাধীনভাবে পর্যন্ত এক কথা—যে কবিতা কবিতা সে
 কাব্যর জন্য, সে কবিতার জন্য । তাই সব লেখকেরই
 কথা—কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেন না ।

ঘুম আসছে না গুণী
ডোনের। বিছানায় পড়ে
এ পাশ-ওপাশ করছে। এক

পাঁচ বিঘা ভূমি



সমর বিছানায় উঠে বসে,
ডাকিয়ে থাকে লামনের ঐ
কাঁকা খাটটার দিকে।
ছোয়াশুনা রাত হলে এখানে
থেকেই দেখা যেতো তার
পাঁচ বিঘা জমিটার কোয়ার
সেমর গাছের মাথাটা। ঐ
যার পাঁচবিঘে জমিই আত্ম
তিন পুরুষ হয়ে ওঠের অর
জুঁগরে আসছে। এখনও
সেই ক্ষেতে বঁশ বোনা হয়,
সেই রকমই বান হয়; কিন্তু
এতে গুণী ডোনের আর

যেই কোন অধিকার। এ কথা মনে করলেই গুণীর
হৃকের ভিতরটা টান্টন করে ওঠে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্রুটে পড়ে গুণী। হঠাৎ
একটু শুষ্ক এসেছিল, হঠাৎ খরী মেনকার ডাকে ধতকগিলে
উঠে বসে। হাতের কাছে হ্যারিকেনের পোলডেটা
একটু উলকিয়ে দেয়। খরীর হৃকের কাছে হৃদ্র এনে
জিজ্ঞাসা করে—“কি হল আবার? বমি করবে বুঝি?”
—“না, শো। বড় মাথা কামড়াচ্ছে।” আরে
আতে বলে মেনকা।

—“হাক, বমিটা আর হবে না বলে মনে হয়। পা-
টাও আর ভতটা গল্প নাই।”

—“হা গো, কাল একবার ডাকাতের কাছে যাবে তো?”

—“ডাকারবান্?” একটা শুষ্কদীর্ঘশ্বাস হৃক চিরে
বেরিয়ে আসে গুণীর। তা হাফা আর উপার কি?
ডাকাতের কাছে তো আর যাওয়াই চলে না। পাঁচটাকা
আগে শোধ না দিলে ছোটলোকদের আর বিশ্বাস করে
ওবুর দেবে না বলেছে ডাকাত। ওবুর না হয় ছেড়ে
দিল, কল খরীর হৃকে কি যে বাবার চেয়ে তার যে লম্বান
সেই। আত্ম মিন হৃশেক অদবে করেছে খরীর। এ কদিন

তো সে একরকম উপবাস
আছে। শেষে হঠাৎ ন
মেয়েই বান্না যাবে মেয়েটা
এমন অবস্থা হতো না, যা
তার ঐ পাঁচবিঘে জমিট
থাকতো। আত্মও সেক
নমে করলে হৃক ছে
বার। ঐ পাঁচ বিঘে
কলতো সোনার কল
গুণী প্রতি-হাটবার হৃতি
মোকা, কুলো প্রভৃতি তৈর
করে বেচে আসতো বোল
পূরের হাটে। আর মেনক
বাড়ি বাড়ি বান ভানতো
খসি নিয়ে বাজারে কেতে
বেশ দুখেই তারের কাটতে

মিন। কিন্তু মানুষেই তো বাক লাগলো। মিনে নি
জমিটুকু। হৃদ্র করতে মনে হয় ঐ পূরেন গুঁড়াইকে
গরীবের ঐ জমিটুকু না মিলে হৃতি পেট ভরছিল না
কিসের অভাব আছে ওদের? আত্ম তিনপুরুষ হ
তারা ঐ পাঁচবিঘে জমি বংশ করে আসছে, আর আত্ম হ
কিনা ও জমি ওদের! নতুন ‘সেটেলমেন্ট’ বাড়ি ও
নামে বেরিয়েছে। এ বর শূন্যেও গুণী সেদিন লাগ
নিয়ে গিরেছিল জমিতে। বংশ হাতলে চলবে না।
পাড়ার হাফালাসেব—গুণীর জমির পাশেই জমি—সেদি
বললে, “মল হাফা বি না গুণী। জমি তোর লাফ
বেব। চিরটাকাল সেবে আসছি এ জমি ডোনের।”

জমির কাছে আর যেতে হয় নি, ‘অশ্রমঘাটে’র বটল
যেবে গুণী মেবে গুঁড়াইয়ের হাল হৃদ্র তার পাঁচ
বিঘেতে। মেয়েই গুণীর মাথা পেল হৃরে। হৃ
কেটে কান্না এলো। ধীরে ধীরে লালস নিয়ে ক
এলো বাড়ি। একটু প্রতিবাদ পর্বত করে নি।

মাংসার মিন আর মেরী নেই। গুণী পেল
বোলপূরের পরিচিত উকিলের কাছে পরামর্শ নিতে।
উকিল কালেন, “সাক্ষী জোপাত করতে পারবি। এদের

লোক যদি তোর হয়ে সাক্ষী মের তা'হলে তোর ভবি
কেউ নিতে পারবে না ।”

আনন্দের দ্যাক্ষিণে উঠলো গুপ্তী, “সাক্ষীর অভাব হয়ে
যা হানু । আমার হয়ে সবাই সাক্ষী দেবে । বরষ বসন্তো
একটা জিনিষ আছে, কে বাবে গাঁড়াইয়ের হয়ে নিখা
কথা বলতে ।”

গুপ্তি মনে বাড়ি করে এলো গুপ্তী । গ্রামের ছোট
বড় সকলের কাছে গেল তার হয়ে সাক্ষী দেবার জন্য
লগতে । সবাই বললে,—“তোরা কোন ভয় নেই । আমরা
নিজের চোখে যা দেখছি তাই বলবো, নিখা বলতে
পারব না । বাবার উপর একজন আছে ।”

মামলার দিন আর সাক্ষীদের ডাকতে হলো না নির্দিষ্ট
ময়ে সবাই গিয়ে উপস্থিত হ'ল বোলপুরে সেন্টেলমেন্ট
দফতরে ।

প্রথমে ডাক পড়লো গুপ্তীর সাক্ষীর । এগিয়ে গেল
প্রাকদ্বারের । বাড়ি নেড়ে দৃঢ় কর্তে বলে গেল,—
‘হুজুর, বোলদার কব্ব করে বলছি নিখা কথা বলবো
না, আন্দা আছে বাবার উপর । ঐ পাঁচবিষে ভরির
গাশেই আমার জনি, আমি জান খবরি হেবে আসছি ও
এমি গাঁড়াইগাই ভোগ করছে ।”

ব্রাহ্মণত হল গুপ্তীর বাবার । সমস্ত গুপ্তিবীটা
ক'শে উঠলো ধরবার করে । গায়ের নীচের মাটি গেল
পরে । এবে স্বয়ং !—এ-ও কি সম্ভব !—

একে একে সবাই সাক্ষী দিল গাঁড়াইয়ের হয়ে । ভিত্তি
লো গাঁড়াইয়ের । বাতাসের মত চলতে চলতে বাড়ি
কিনলো গুপ্তী । পথে পথে বিনম্রাত বৃক্ গাশড়ে
বজাতে শাসল ।

গুপ্তীর চোখের সমনে দিয়ে একদিন সবাই ভোজ
খোঁয়ে এলো গাঁড়াইয়ের বাড়িতে । হুস্ এক ভোজ
গাব গাঁড়াইয়ের ন্যাক হাখার বানেক টাকা বন্ধ হয়েছিল
দুয়েয়ে গুপ্তী ।

তারপর থেকে কুড়ি বুনতেও আর ইচ্ছে হয় না ।
স্বনকা আর গান ভানতেও বার না, কারণ আত্মকাল
আর কেউ ট্র'কিতে গান ভানে না, পরে ‘কমে’ চাল
হরে বানে । তাই সেনকাও একরকম বেকার । বসি
ব্রত আর হু'একশানা কুড়ি দুনে কি শংসার চলে ?

শংসার গেল উজ্জরে । বন্দ ছোড়া কলের ঘরে বেড়ে
দিয়েছে আসোই ।

আজ দিন যশেক আবার সেনকা ভুগছে । বাবার
নেই ঘরে । কি করবে গুপ্তী ? কি করে দুটি পেট
চালাবে ? নব্বরি বাড়বারও ভো আর পাকি নেই । তবে
উপার ? উপার একটা আছে । হু'চিন্তা করে একটা
উপার আবিষ্কার করেছে গুপ্তী । একমাত্র বাটার উপার
হচ্ছে চুরি করা । হ্যা, সে চুরি করবে । সে চোর
হবে । চুরি করে তাকে যদি নরকে যেতে হয় সেও
স্বীকার । তবে সে অন্যভাবে স্বীকে সম্মুখে রেখে হুঁকে
হুঁকে তার হু'চিন্তা দেখতে পারবে না । চিন্তা করতে
করতে গুপ্তীর সমস্ত শরীর এক হিংস্র পাখবিক উত্তেজনার
উদ্ভব হয়ে উঠলো !

আসোটা ভুলে গুপ্তী একবার স্বীকে বেঁধে দিল ।
না, হু'দুখে ঠিকই । ঠাতা কন্কনে শীতের হাওয়া
বইছে । ছেঁড়া চানরটা ভাল করে জড়িয়ে দিল মেয়ে ।
আছে আছে পরের কাঁপটা ভুলে উঠানে নেমে এলো
গুপ্তী ।

ঐশ ভোলার পক্ষেই হয়তো সেনকার গু'ভেপে
যায় । জিজ্ঞাসা করে,—“এত হেতে কোথায় বাবে সো ?”
—“চুরি করতে ।” অস্পষ্ট শব্দে বলে গুপ্তী ।
আঁকে উঠলো সেনকা ।

৪২।

গ্রামের ওপাশে বনের পারে গু'গালে ঘাতি দ্বিতীয়
প্রহর ঘোষণা করল ।

আনমনে পথ চলতে চলতে এক সময় গুপ্তী এসে
দাঁড়িয়ে তার হারানো পাঁচবিষে জমিটার বাবার । হঠাৎ
দিয়ের জমিটার উপর সচেতন দৃষ্টি পড়তেই লমকে
উঠলো গুপ্তী । পূর্বের বসি কাড়ের লীক দিয়ে চাঁদ উঠছে
বালায় মত । শিশির অরা সোমানা বানের শিবের উপর
চাঁদের কিন্ন পড়ে তিক্তিক করছে । ছোট বড় কতপত
খাতি । বেশ গান কলেছে আর তার পাঁচবিষেতে । কেন
কোনবে না ? ওয়া বড়শোক । গায় দিয়েছে গালা-পালা ।
হায়, কতদিনের বাবার ঘাম পড়ছে তার এই জমিতে ।
হবে পড়ে বর্ষার সময় প্রতিদিন হু'শু'রে ভাত নিয়ে এসে
সেনকা বদতো এই বেকার গায়ের হারায় । একটু পরে



গুপী লালাল ছেড়ে ঘান বহুতে বহুতে এগে বোশতো মেনকার শাশে। ভাত খেতে খেতে সংসারের কত গল্প হত। মেনকা প্রায়ই বলতো—“আরও বুড়ার বিধে ভালে চাষ করে না যো। বুড় এই পাঁচ বিধেতে কি হয়ে।”

—ভগবানের কিয়াই এই বুড় মেনা। আবার কিসের অভাব আছে। বুড়ি তো শেট।

—“আর একটু বাড়তেই বা কতকাল।” বলে আঁচলে বুড় লুকিয়ে বিল খিল করে হেসে লুকিয়ে পড়তো মেনকা।

আর একদিন গুপীতো ভাত খেতে খেতে বলেই ফেসেছিল,—“তোমার বুড়টা বড় কীকা কীকা লাগে মেনা, এয়ার ঘান উঠলেই তোমার কানের বুড়ি গুল গড়িয়ে দেব; যেমনটি পরেশবাবুর ইন্ডার কানে আছে ত্রিক তেমনিটি।”

মেনকা দ্বার্পিত্ত করেছিল, বলেছিল,—“বলকি বড়লোকের ইন্ডার সঙ্গে আমার তুলনা? না যো বেশ আছি, লোকে আমার বলবে ভোমর্গার নম দেব।”

—“তা বলাকসে, আমারও তো একটা নম আছে। আমরাও তো মানব। গরীব বলেও নিজের বৌকে একটু সাঝাতে গোঝাতে কার না মন যায় যো।”

সেই হল বেচে সেদিন মেনকার ভাকার দেখাদ। সে কথা মনে করতে আঙও বুক কেটে যায়।

ছুটে গিয়ে একটা গানের আঁটি বুকে জড়িয়ে বরলো গুপী। যেন আপন মেয়েকে কোলে নিল শিঙা দীর্ঘ বিরতর পর। গানের শব্দে হাত বোলাতে থাকে আদর করে। বুকের তলায় গুরে ওঠে ব্যথা। হলহলিয়ে ওঠে চোখ। গানের গারে গাল চপে শিশুর মত ভুরু করে কঁমে ওঠে গুপী। অশপট ন্যরে বলে,—“কি অপগার করেছিলাম? বল লখী বা, বল—”

অকন্য বাথার তার একটু লাঠি পড়লো। নাড়ের পাহারাওয়ালারা মেয়েকে পাঠি। চীৎকার করে আহুতে গড়ে গেল গুপী।—

বদন তার জ্ঞান ফেরে যেনে গঁড়াই বাড়িতে সে পড়ে। বুড়ি শূকর হকের বাথি মাথা থেকে গাল পথত পড়ল। পুর্বাংশে নুর্দ তখন উঁক-বুকি মারছে।

এমনে গণ্যমাণ্য সোকজন, ছোট-বড় মেলে মেয়ে ভাঁড় করে আছে তাকে। বুড়ী পাশে লাঠি হাতে বুক কানিয়ে গাড়িয়ে আছে এমের চৌকিয়ারো।

—“কি রে ঘান চুঁরি করছি কৈন?” মিছামা করে গঁড়াই নুর্দ পোঁকের কণা বুড়ি নাচিয়ে।

হাত বুড়ি ছোঁতে করে হলহল বেয়ে গুপী বলে—“আমি গরীব বটে, কিন্তু মিথ্যে কথা বলতে পারব না বাবু, ভগবান আছে বাথার উপর। চুঁরি করতেই আমি যেত্নিয়েছিলাম। কিন্তু—”

বলে কি গুপী! সবাই পরশরের মূখ চাওয়া-চারি করে। লম্ভ করে বলে মিছে সে কিনা চুঁরি করতেই যেত্নিয়েছিল। ওর কি জীবনের একটুও ভর নেই! একবার মিথ্যা বলে দেখবে বাশু বালাস সেব কিনা। এ বোটা লাখ নিখাত মার খেয়ে মরবে।

একটু থেনে গুপী আবার বলে,—“কিন্তু আমার পরানটা কেমন হবে যেন ঐ পাঁচবিধটার মাফান গিরে। ভাবলাম—”

—“ভাবিলাম, কে আমার ধরের দরজা ভাঙ্গছে, ধরের কাছেই ঘান, ভরি কিছু ঘরে; এই তো?” গুপীর বুকের কথা কেড়ে বলে পরেশবাবু।

—“না না বাবু চুঁরি আমি করি নাই।”

—হ্যা-হ্যা-হ্যা:—হাসির কড় বরে মের বড়লোক পরেশ গঁড়াই। পরবহুতে পারের জুতো বলে সঝোরে আঘাত করে গুপীর গালে।—“হায়ামঝালা, ছোটলোক, চোর, বদমাস; চুঁরি করেও বলে কিনা চুঁরি করি নাই। চৌকিয়ার। বেঁচে নিয়ে বা থানার—”

চৌকিয়ার থানার নিরে সেল কোমড়ে গড়ি বেঁচে; গানের একটা আঁটিও সেল মধ্যে প্রমাণ করাবে বলে।

হুঁমাস পরে জেল থেকে কিয়ে এসে গুপী। রোগা দিবালিকে চোরা। বুখে খোঁটা খোঁটা গোল। টলতে টলতে চলছে পথ। ভাবছে, মেনকাকে কি আর দেখতে পাবে। বাথ জন্য সে জেলে সেল সে কি এখনও তার অপেক্ষার সেই ভাল্যা কঁড়িতে বসে আছে? এই হুঁমাস সে কি খেয়ে আছে? বাথার গিরে কি সে খাঁশ বেচতে পেরেছে? না খেয়েই মরতো বাথ সেছে! হাথ, মরবার সময় নুর্দ একলাস হল পেরেছে কি না কে জানে!



—আর চলতে পারে না গুপী। গ্রামের পাশে চির-পরিচিত ‘অশ্বানবাটের’ বটভঙ্গার বনে গড়ে। ক্রান্ত মেঘ-খানাকে এলিয়ে দেয় নরম বাতাসের উপর। আঃ! এমন নরম বাতাস সে কতদিন শোষণি। হঠাৎ হঠাৎ গিকে দৃষ্টি পড়তেই চোখে পড়লো তার পটাবিষের বাথার খেজুর গাছটি। গাড়াইয়ের পটখোড়া কলম হুহুয়ে মেঘতে শেল। অস্বাভিকতাই বৃক্কোটা অল্প পড়লো বাটিতে।

—ক্যা-ক্যা-ক্যা-ক্যা-ক্যা-ক্যা—

হঠাৎ একটা করুণ ডাকে ঢকে ওঠে গুপী। শিখর শিখর চোখে মেঘে কতকগুলি কাক-পত্নী আর কুকুরে কি একটা বিধে চানচানি করছে অশ্বানের পাশে একটা খালে। কী ওটা? পর, হাসল কারও মনেই হয়তো। কিহু...কিহু, না না পর, হাসল তো নয়। হাত রয়েছে যে। হাঁ, ওটা দিচ্ছি হাত। হান্দ্য হাতা ওটা কিহুই নয়। হাত, কে এমন পাশীয়ে, একটু কাঁচ কল্যাও ছেটে নি।

গ্রামের কয়েকটা বাসুদ্বির ঘরে সোবর কুড়িতে কুড়িতে আসছিল এই বিকে। গুপী তাদের লক্ষ্য করে বললে,—“ওঁ গো, বলতে পার ওটা কাদের বহা? ঐ যে গুহ্মনিত্তে ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে!”

তারা গুপীকে চিনতে পারলো না খিকও তারাও একই পীরের বাসিন্দা। কথা-না বলসেই চলে গেল। কেবল শেখাক মেয়েটি একটু লাঁড়িয়ে বললে, ও আর গুহ্মতে হবে না বাহা, বলতে গেলে পরল কেটে যায়।

জুঁহিতো বাহা চিনতে পারবে, ও আশ্বানের পীরে। গুপী জোম বলে একটা শোক ছিল, সে বান চুঁহির করে আশ্ব হাঁসান মেলে আছে। তারই বৌটা কাল বাহা গেল। তার আর কেউ নেই বাহা। তাই কে আর গোড়াকতে বাবে? সেবে ‘শেসিভেমে-ভো’ হুহুয়ে মেঘর এনে নিয়ে যায়। তারা আশোড়া করে গুহ্মির ঐ খালে কেলে দিয়েছে। হার রে অগিক্ত। ভগবান এ ভোমারই খেলা। কলতে বলতে চলে যায় মেয়েটা।

ধর ধর করে কেশে উঠলো বাটিটা। হয়তো এক হুহুভে’ লও ভও হয়ে বাবে দমত গুহ্মিনী।—
সেনকা—সেনকা—পত্নীতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে!
ভগবান, ভগবান, একি করলে জুঁহি! সেবে জুঁহি এই মেখালে!—হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—গুপীরা একটা অটমাসিতে দমত অশ্বানভূমি কেশে উঠলো ধর ধর করে। গুপী যেন গালল হয়ে গেল।—পারহুভে’,—“সেনকা! সেনকা!” বলে হুটে গেল গুপী সেনকার অগদ্য অগদ্যিত্তে মেখটার কাছে। একটা পাখরে পা মেগে পড়ে যায় বাটিতে। উঠে আবার গেল হুটে। কাছে যেতেই কাক পত্নীসকলো হুপায়ে একটু, সরে দাঁড়াল। এখনও হুহুটা বোকা যাচ্ছে স্পষ্ট। কেবল চোখ দৃষ্টি কোঠরে নেই, হয়তো পত্নী খেয়ে কেলেছে। হুটে গিয়ে গুপী সেনকার উপর অস্বাভিকতায় পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেল জ্ঞান। চিবিবনের বত নিতে গেল জীবন-বীণ। হুটি দেহ যিশে গেল একসাথে।



(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বনকুলের পর তাত্ত্ব-
সিংহের পদাবলী। অসংখ্য
বাগদ-কবি রবীন্দ্রনাথের
এক সমরকার কবিতাবলীর
সম-তারিখ নির্ণয় করা
কঠিন; একপ্রকার অসম্ভব।

“রবীন্দ্র-প্রতিভা”—আদ্যপিও

মৌলানা হালদার



ইংলণ্ডের প্রাচীন কবিদের
জ্ঞান ও ছন্দের অতুলন
কবির কবিতাদিগে Rowley
Poems নামে এক পুস্তক
প্রকাশ করেছিলেন। জন-
সাধারণের কাছে তিনি
জানিয়েছিলেন যে Rowley

বললেও চলে। কোন্‌দিন এই বাগদ-কবি যে কোন্‌
কবিতা লিখেছেন তা ঠিক কথা অসম্ভব। কবির
কবীর বলা চলেতে পারে—“ত্রিষ্টিতে আমার তারিখকে
বাঁধা ঐতিহাসিক বলে ধরে নেন তাঁরা প্রায়ই ঠিকেন।”
তা’ছাড়া তাত্ত্ব সিংহের পদাবলীর পঞ্চতালি কবি দীর্ঘ
দিন ধরে লিখেছিলেন বলে মনে হয়। সম্ভবতঃ
চোখ বন্ধের মধ্যে কবি প্রথম বৈকুণ্ঠ কবির অতুলন
করে “তাত্ত্বসিংহ” এই ছদ্মনামে পদ লিখতে আরম্ভ
করেন। কিন্তু ১৮৮০ সালের প্রথম বর্ষের ভারতীয়
আধুনিক সাহিত্যের পূর্বে কোন পদই প্রকাশিত হয়নি।

তাত্ত্বসিংহের পদাবলী লিখবার পিছনে একটু ইতিহাস
আছে। এই সময় অক্ষরচন্দ্র সরকার এবং সারথচরণ
মিত্র “বৈকুণ্ঠ পদাবলী” প্রকাশনার অগ্রসর হয়ে
ছিলেন। বৈকুণ্ঠ পদকর্তাদের বিশেষতঃ চণ্ডীদাস ও
বিদ্যাপতির পঞ্চতালি বাগদ রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে
আকর্ষিত করেছিল। “বিদ্যাপতির রাগা” দীর্ঘকাল প্রবেশ
পর্যন্তকালে রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সাংকে-
যে সমালোচনা করেছেন তাত্ত্ব ভক্তচন্দ্রের তক্তি-
অর্থ ছাড়া আর কিছু নয়। এমন সুখের সমালোচনা
এ পর্যন্ত আর আমাদের চোখে পড়ে নি। উপরিউক্ত
সংগ্রহ-পুস্তকে বিদ্যাপতির “রক্তকলি পদ্য” এর জমি-
মাধুর্য বাগদ-কবিকে যন্ত্রণিত করেছিল। এই জমিই
বাগদ-কবির অন্তরে প্রতিটি হয়ে তাঁকে আত্মল ক’রে
ভুলেছিল। বৈকুণ্ঠী-ভক্তির যে বীজ এই সময়ে কবির
মনোভূমিতে উদ্ভূত হোসে। পরবর্তীকালে এই বীজ
জন্মদিত হয়ে বিরাট বৃক্ষ পলিগত হয়। এর উপর
এই বাগদ-কবি অক্ষরচন্দ্রের কাছে জনসনে আর এক
বাগদ-কবি চ্যাটার্জির পদ্য। চ্যাটার্জির বাগদালে

ভিক্টরের অনেক অধিবাসী ছিলেন এবং পুঁথিতেই
তাঁর কবিতাগুলি প্রাপ্য মিস্ত্র ছিল। তিনি
সেগুলি সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন। এই কবিতা
একবার বইয়ে স্থানান্তরিত হয়। পরে অসংখ্য কবিতা
একটি যে চ্যাটার্জির মিস্ত্রের লিখা নয় সকলেই
তা’ জানতে পারে। দ্বিতীয় চ্যাটার্জির হ’বার ইচ্ছা
থেকেই বাগদ-কবি রবীন্দ্রনাথের মনে “তাত্ত্বসিংহের
পদাবলী” লিখবার প্রেরণা আছে কিন্তু এতটা বাহু।
আদম কথা বৈকুণ্ঠী-ভক্তি এবং বৈকুণ্ঠী-সংগ্রহ রবীন্দ্র-
নাথের বাগদালেই তাঁর উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার
করেছিল। বৈকুণ্ঠ পদকর্তার সাংকে এবং ভক্তি-
দর্শনের চরম কথা তাঁদের পদাবলীর মধ্যে লিখিত আছে।
সেই জন্যই তাঁদের প্রভাব বাগদ-কবিকে এমনভাবে
আকর্ষিত করেছিল যে অতুল্য রবীন্দ্রনাথ এক প্রভাব
থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। বৈকুণ্ঠী-সাংকে বিশিষ্ট
ধারাটি রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কাব্যে যেন দৃষ্ট হ’য়ে
উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী এই সাংকেয় স্বরূপটির
আলোচনা করবার আয়োজন হ’য়েছে। বৈজ্ঞানিক
প্রণালীতে আলোচিত হ’লে কেবল বাবে যে রবীন্দ্রনাথ
কাব্যের ক্ষেত্রে বাস্তবিক ও কালিহাসের সংশয়,
কিন্তু সাংকেয় ক্ষেত্রে বৈকুণ্ঠ সাংকে-কবি চণ্ডীদাস ও
বিদ্যাপতির।

বাগদালেই রচনা হ’লেও এবং তাতে মৌল তাবের
অত্যন্ত থাকলেও তাত্ত্বসিংহের পদাবলীকে অস্বীকার
করবার উপায় নেই। বহু রবীন্দ্রনাথও পারেন নি।
তাত্ত্বসিংহের পদাবলীর আর সব পদ হচ্ছে হিন্দু—

মরণ যে,

পুষ্টি নয় তাঁর মন।

যেদ বরণ তুমি, মেঘ ভটা ছুট,
রক্ত কমল কর, রক্ত অধর পুট,
‘তাপ বিছোঁতে করণ কোর তব,
হুজু অদৃত করে হান ।
তু’র মন প্রাণ সমান ।

কো তু’র বোলবি মোর
হৃদয়-মা’র মনু আগবি অহবন,
অ’ব উপর তু’র রচলছি আমন,
অরুণ নহন তব মরম সন্তে মম
মিথিষ ন অন্তর হোর ।
কো তু’র বোলবি মোর ।

এই পদ দুইটি শাক্ত সাহিত্যের আলনে প্রতিক্রিত থাকবে। যদিও বৈষ্ণব মিশ্রের সঙ্গে জীবনমুখিতে পরমিতিকালে তাহসিংহের পদাবলী প্রদর্শন কথি লিখেছেন,—

“তা’হসিংহ যিনিই হৌন তাঁহার লেখা যদি বর্তমানে জানাও হাতে পড়িত তবে আমি নিশ্চয়ই ঐকিতাম না। একথা আমি ছোর করিয়া বলিতে পারি। তাঁহার তাহা প্রাজ্ঞ পুরুষেরা বলিয়া চাপাইয়া দেওয়া অসম্ভব ছিল না। কারণ এতকা তাহাদের মাক্ততাবা মধ্যে। ইহা একটা কৃত্রিম তাহা; কিয় তির কবির হাতে ইহার কিছু না কিছু তিরতা বটিকাছে। কিন্তু তাহাদের তাহের মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না তাহসিংহের কবিতা একটু বালাইয়া বা কসিয়া, তেবিলেই তাহার যেকি বাধিষ হইয়া পড়ে। তাহাতে আনাদের বিনি নহবতের প্রীণপলানো। চাপা সুব মাই, তাহা আক-কালকার সত্য আশিনের বিলাতী টুং টাং মাত্র।” (জীবনমুখি, পৃ: ১৪০)

রবীন্দ্রনাথের এই কঠোর সমালোচনা ভরবার পরত কিন্তু পাঠকের তাহসিংহের পদাবলীর প্রতি অস্থ্যাপ একটুকু করে নি। সুতরাং এই কঠোর সমালোচনা পাঠকের অস্থ্যক্তিও উত্তর আশী প্রতাব বিতারণ করতে পারে নি। আর তাহসিংহের পদাবলীর তাহের মধ্যে প্রজিমতা বেকত থাকে, আন্তরিকতার অভাব ছিল না; সার ছিল না জনির অভাব। এত কি কর? এই

আন্তরিকতা বা সাহিত্যে থাকে বলে সন্তক-ছবর সত্যকীভাবে এবং ঐ জনি কবিতারেক্রে যে অনেক-খানি স্থান ছুড়ে দাং। তাকে অবহেলা করা যায় কেমন করে।

যেদন্তের তাহে তাবিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ যেমন ‘যেদন্ত’ কবিতা লিখেছিলেন, ঠিক তেমনই বৈষ্ণব পদাবলীর তাহে তাবিত হ’রে এই—তাহসিংহের পদাবলী লিখেছিলেন। এটি “না বিখার” এর বস্ত আকমিক নয়। সময়ের বহু পাশে যেমন পঙ্কের পাণক্তি আছে আছে যেদন্তে থাকে ঠিক তেমনি ক’রে বৈষ্ণব পদাবলীর বহু পদম বালক-কবির ছব-পঙ্কের পাণক্তি য়েলে লিখেছিল। আনাদের এত কথা বহুবার তাহে কি? কারণ এই যে, মিষ্টিক কবি রবীন্দ্রনাথের মিষ্টিকবাদ বা অভ্যগ্রহ-বাহের পথে এই প্রথম পদক্ষেপ। আর এই মিষ্টিক-তাবটি রবীন্দ্র তাহা-প্রবাহের একটি উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট-তাব বা “বাহ”।

বৈষ্ণব পদাবলীর তাহে এমনই তাবিত হয়ে ছিলেন যে বালক-কবি মানন-বৃদ্ধাবনে প্রিমতী ও গোপাণের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। তখন মনেটে লিখে ফেলেন,—

পদম কুন্দন-কুন্দ মাধ
বহুল মধুর বংশি বাজে,
বিসরি আস লোক লাগে,
সজনি, আও আওলো।

• • •
যেব সজনী তাবদায়,
নরনে গ্রেম উদল যায়,
বহু বয়ম অদৃত সযন
চন্দ্রমায় নিখিছে;
আও আও সজনী বৃন্দ,
হেবদ লখি প্রিমোখিক
প্রাম কো পদাবলিষ
তাহসিংহে থাকিছে।

তাহ-সবিলরের এই পদটির মূলনা কোবার?
তার বার জনি। অহমেরে প্রীণতগোবিনদের জনি

১। স্বাক্ষর প্রতিভা—আদিপর্ব

—বৈষ্ণব পদ্যাবলীর ধ্বনি বাহু ছিলেও—বালক-কবি
কতখানি আয়ত্ত করে ছিলেন তাও লক্ষ্যের মত।

বীর সমীরে যদুনাতীরে বসতি যেন বনমালী ॥ ১ ॥
নাম লভেত্তং কৃত সত্তেত্তং বাঁহরতে বৃদ্ধ বেহু ॥

পত্রতি পত্রে বিচলিত পত্রে লভিত ভববৃন্দানন্ ॥
রচয়তি পত্নং সচকিত নরং পত্রতি তব লহানন্ ॥ ৩ ॥
বৃন্দবনবীরং ত্যক্ত বজ্রীর ত্রিপুরিণ কেসিহু লোমন্ ॥
চল সখি বৃন্দং বতিলিরপুঞ্জং নীলগ্ন নীলনিচোলন্ ॥ ৪ ॥
দীপ্তবোধিহ ॥ ৪ম পর্ব ১১ম দীপ্ত ॥

এখানে ভাবাবিরহে স্নিগ্ধকের আত্মলতা প্রকাশিত
হয়েছে। নিম্ন বালক-কবি স্বাধীনভাবে দিয়ে শুঁত
পদটিতে কলকবিরে স্নিগ্ধতার আত্মলতা বদিত হ'য়েছে।
পড়লেই মনে হবে—কবি নিজেই স্নিগ্ধতার ভাবে ভাবিত
হয়েছেন। ভাব-সংলগ্নের এই পদটির অন্তর্নিহিত
ভাবের মধ্যে কবি বেই অতি অল্প বয়সে যেমন দীপ্তার
পরিচয় দিয়েছেন তেমনি তার মধ্যে তুলেছেন স্নিগ্ধ
গোবিন্দের লগ্নি তরং।

সতিমির বহনী, সচকিত সজনী
পূন্য নিমুজ্ঞা অরগ্য।

কলয়িত মলয়ে সুবিজ্ঞন মিলয়ে
বাল্য বিরহ বিহর।

মৌল আকাশে, ভাবক ভাগে
বহুদা বাওত গান,

পাষণ মরমর, নিম্ব কবর
কুহ্মিত পন্নীবিভান।

তুখিত, মজ্জাবে, বন-পথ পানে
নিবংহ ব্যাকুল বাল্য,

বেশ ম পাওয়ে, আঁধ কিবাওয়ে
গাথে বন-কুল মাল্য।

মহলা ভাণে চাহন সচকিত
দূরে পেপন মাল্য।

কল "সজনী ভন, ধানির বাধে
কুঞ্জে আওন কালা।

চকিত পইন নিশি, দূর দূর দিশি
বীজত বাঁশি দুপান।

তর্ক মিলেওল চল চল বহুন্
কল কল কলোল পানে।

ভনে তাহু অব গুন গো কাহু
নিম্বাসিত সোপিনী প্রাণ।

গীহার পীড়িত বিমল অকৃত রস
হরমে করবে প্রাণ।

প্রথম পর্বের চতুর্থ পর্বারে "কবিকাহিনী"। স্বাধীন-
ভাবেই যোগ বৎসর বয়সে লেখা এই বঙ-ভাবাবানি
১২৮৩ সালের প্রথম বর্ষের ভারতী পত্রিকাতে প্রথম
লগ্ন্য হতে প্রথমবারের প্রকাশিত হয়। চাও-
সর্বের এই ভাবাবানি চার মাসে শেষ হয়। কবি
কাহিনীর একটু টুল্পে-লগ্ন্য তুলিকা আছে। প্রথমতঃ
এই ভাবাবানি ১২৮৬ সালে পুস্তকভাবে প্রকাশিত
হয় এবং ইহাই কবির প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। দ্বিতীয়তঃ
এই স্বাধীনবন্দক ভাবের নায়ক যে কবি তাঁর শৈশব
কেটেছিল প্রকৃতির কোলে। নায়িকা মলিনীও প্রকৃতির
—মুখিত। বাল্য প্রকৃতির সৌন্দর্য প্রাথমিক উপভোগ
করতে পারেন নি বলে কবির মনে বিশেষ ভাবশেষ
ছিল। এই আপশেষ বালক-কবি মিটিয়েছেন নায়ক
কবি ও নায়িকা মলিনীকে দুই প্রকৃতির কোলে দাখল
করে। নায়ক কবিকে কেবল মনে হয় বাল্যের অকৃত
আকাঙ্ক্ষাগুলি এমনি ভাবে প্রকাশ করে শিশু-কবি
যেন বানিকটা কৃত্রিমতা করতে চেয়েছেন। তৃতীয়তঃ
বালক-কবির নিদর্শ-প্রীতি "বনকুলের" মধ্যে এর প্রথম
প্রকাশ দেখতে পাওয়া গিয়েছিল; আর কবি কাহিনীর
মধ্যে সেই নিদর্শ-প্রীতি স্ফুটত হয়েছে।

প্রকৃতির কবি Wordsworth-এর Lucy Poems,
The Education of Nature এবং "Ruth or The
Influence of Nature"-এর মূল্যই প্রত্যয় আছে
কবি কাহিনীতে। বনকুলের কল্যাণ ও কান্দিসের
শুক্লতার সঙ্গে মলিনীর সামান্য মিল আছে। অবশ্য
প্রাচীনকালের তপোবনের প্রত্যয় সব সময় স্বাধীনভাবে
উপর পূর্ণদাতার ছিল। প্রাচীন আবহাওয়া সত্যতা এবং
ভাববাহ্যকে কবি শিশুকাল থেকে মনে-প্রাণে প্রথম
করেছিলেন, তার মধ্যে কোথাও একটুই ফাঁক ছিল না।

এই শিল্পে বরষেই কবি প্রাচীন আরব্যাক সভ্যতার বৃশ
কথা ।

“ভাক্সেন কুজীবা” এর মৰ্শ সত্যটি সখ্যক উপলব্ধি করতে
পেরেছিলেন। আর পেরেছিলেন বরষেই—এই আরব্যাক
সভ্যতার দ্বন্দ্বিতা ছাপাটি বয়ে সেজে আবারিকা কাব্য
বনকুল এবং বণকাব্য কবিকাহিনী এর মধ্যে ।

কবিকাহিনীতে নলিনীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গে বালক-কবি
লিখলেন,—

হেন কালে বীরি বীরি শিরবের কাছে আসি’

দাঁড়াইল একজন বনের বালিকা,

চাহিয়া মূখের পানে করিল কখন কখন—

কে তুমি গো পথপ্রাপ্ত বিধব পবিত্র ?

প্রকৃতি চুহিতা এই বালিকার কাছে মায়ক-কবি আসল
মনোভাব ব্যক্ত করলে বালিকা তাকে বলে ছিল,—

হোথায় বিকল বনে বেবেচ ছুটির শুই,

চল ঘাই ওইখানে ঘাই’ কখনায় ।

বন হ’তে কলকল আপনি তুলিয়া দিব,

নিব্ব’ত হইতে তুলি’ আনিব সাদিল ।

Wordsworth এর The lost love কবিতায় বালিকা
Lucy কে বনে একাকিনী রেখেতে পাওয়া যায় ।

She dwelt among the untrod ways

Beside the springs of love ;

A maid whom there were none to praise,

And very few to love.

এই বালিকাটিও যে প্রকৃতি চুহিতা তারও সাক্ষ্য
আছে Wordsworth এর The Education of
Nature কবিতায় ।

Three years she grew in sun and shower

Then nature said, A lovelier flower

On earth was never sown :

This child I to myself will take ;

She shall be mine, and I will make

A lady of my own.

কিছু প্রকৃতি চুহিতা Lucy-র স্তব্ধতায় লড়ে নলিনীর
মৃদুতায় সামঞ্জস্য নেই, সেখানে সাদৃশ্য আছে শুধু বরষের
সঙ্গে । Lucy এখানেই— আর বরষে বাহা যায়, কিছু

নলিনী কবি তর্জুক পরিভ্রমক হ’য়েছিল বরষেই যোগে হয়
যোক লক্ষ্য করতে না পেয়েই বাহা যায় ।

মায়ক কবি প্রকৃতির কোলে পালিত হ’য়েছে,
প্রকৃতি তার সন্ধিনী । বিশ্বাসেই সব সময় কবি প্রকৃতির
রূপে দৃষ্ট । বিন ও রাসির বিভিন্ন সময়ে প্রকৃতির মধ্যে
যে পরিবর্তন আসছে কবি শব্দেই তা’ বেষ্টন করে ।
প্রকৃতির সেই অগলপ রূপের বর্ণনা আছে কবিকাহিনীর
মধ্যে । কবি যে শুধু তাঁর প্রকৃতি-সন্ধিনীর রূপ দৃষ্ট
অশ্লীল বৃত্তি নিয়ে বেগেছেন তা’ নয়, উভয়ের মনের
আশা আকাঙ্ক্ষা, আশা-বেহনায় তারও বিমিশ্র হয় ।

প্রকৃতি আছিল তার সন্ধিনীর যত ।

নিজের মনের কথা বত কিছু ছিল,

কহিত প্রকৃতি—‘সেই তার কানে কানে,

প্রত্যাহার সধীরণ কথা চুপি চুপি

করে কুসুমের কানে মরম-বাণত ।

অতঃপর প্রকৃতি-গ্রেমপুট এই মায়ক কবির সঙ্গে
প্রকৃতি-চুহিতা নলিনীর সাক্ষাৎ হ’লে কিশোর-কবি
রবীন্দ্রনাথের কল্পনাতে এল একটি রোমান্টিক ভাব ।
রবীন্দ্রনাথের এই সময় যে বরষ সে বরষের বধুই হ’ল
রোমান্টিক ভাবগ্রন্থিত । এই রোমান্টিক ভাবেই প্রথম
প্রকাশ পেণা শিল্পেছিল বনকুলে’ কিন্তু তার প্রবাহ বেশিক
সিয়েছিল কবিকাহিনীতে সে হিকে না নিয়ে তার হিক
পরিবর্তিত হয়ে, বেশ এবং এই পরিবর্তনই রবীন্দ্রনাথের
পরবর্তী কাব্যে ও কথা-সাহিত্যে দ্ব্যর্থিত শক্ত করেছে ।
উপর কাব্যের পরিণতি যাচ্ছে টানেভিতে, কিন্তু তার
প্রকৃতি জিজ্ঞাসা । এরও মূলে ঐ রোমান্টিক ভাবপ্রবাহের
পতি পরিবর্তন ।

নির্জন বনে বর প্রকৃতির কোলে মায়ক-কবি ও
নলিনীর আশা-বেলাবেলায় কলে উভয়ের মনে এল
প্রেমের জোয়ার । কিন্তু বেশ পরিচ্ছন্নভাবে কিশোর কবি
রবীন্দ্রনাথ এখানে ছুটিয়ে তুলেছেন । মায়ক-কবির
মনোভাব নলিনীর কাছে প্রকাশ হয় বর হয়না, বেন এক
সঙ্কেতের ক্ষতিমা এলে সেখানে অজ্ঞতার হ’য়ে পড়েছে ।
কিছু নলিনী—

কেবল অগ্রর জলে, কেবল মূখের কানে

পড়িল বালিকা তার মনেই কি কথা ।

কিশোরী নগিনী মারী। নারী-মূলত তার চরিত্র।
তাই এত দিন তার নারীমুখ কোটে কোটে কোটে না।
এবার! এবার! কিন্তু হুটিল। তাই বসে বসে
নাথক-কবির কাছে।

আর—

অরণ্যে দুজনে মিলি ' আছিল এমন সুখে,
অগতে তারাই বেন আছিল দুজন,
বেন তারা সুকোমল হুলের সুরতি শুণু,
বেন তারা অলংকার সুখের সঙ্গীত।

এই বর্ণনার মধ্যে শব্দের আড়ম্বর নেই, অথচ সহজ
সহস্রভাবে অনাবিল প্রেমের ছবি সুটে উঠেছে। একটু
লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যাবে যে 'এই' অল্প সময়ের
মধ্যে কিশোর কবিতা তার ও তারার মধ্যে বেশ বানিকটা
পরিপক্বতা এসেছে। তা' ছাড়া তারের মধ্যে যে বসন্ত
(Sublimity) প্রকাশ পেয়েছে সেটিও অতি উজ্জ্বল।

নগিনী তার অন্তর উজ্জ্বল করে স্নেহ ভালোবাসা
নাথক-কবির দিল। কিন্তু দিলে কি হ'বে। কবি
ছবিরে না লেখা সুবসন্ত।

এখনে কহিছে কবি—আরো যাও ভালোবাসা,
আরো ভালো ভালোবাসা ছবির আশায়।
স্বাধীন বিহব সম কবিরের তরে, বেরী,
পৃথিবীর কায়াপার বোধ্য নহে কভু।
অমন সূত্র সম আছে বাহ্যের মন
ভাষারের তরে বেরী নহে এ পৃথিবী।

এরপর নাথক-কবি নগিনীকে ছেড়ে গেল, কিন্তু
নানাহানে ঘুরেও কবিত্বেরে শান্তি এল না, তাই কবি
আবার কবিরে এল। কবিরে বসন কবি এল তখন নগিনী
পরপারের দারী। নগিনীকে ছেড়ে বাতায়ার সঙ্গে Words-
worth এর Ruth or The Influence of Nature এর
অপূর্ণ সাদৃশ্য আছে। নাথক-কবির কবিত্বের তিষ্ঠেই
সবট মন বলে অস্থির, আর Wordsworth এর উক্ত
কবিতার দু'কটির উপর ছিল গ্রীষ্ম প্রদান হেনের প্রভাব।
সেজন্য ঐ দু'কটিও ছিল অস্থির। এজন্য Ruth তাকে
যে রাখতে পারেনি। দু'কটি Ruth কে ছেড়ে গেল।

Full soon that better mind was gone :
No hope, no wish remain'd, not one,—
They stirr'd him now no more ;
New objects did new pleasure give,
And once again he wished to live
As lawless as before.

এর পর—

The youth
Deserced his poor bride, and ruth
Could never find him more.

নগিনী মরে গেল, আর Ruth হ'ল পাপল। কিন্তু
এর পর কবির জীবনের সঙ্গে Ruth এর জীবনের বেন
বানিকটা সামঞ্জস্য হয়ে গেছে। বিহব-মহিত Ruth
কিছুদিন পরে সুখ বোলে আর আশ্রয় নিল আবার সেই
প্রকৃতির কোলে নিশ্চিন সে জুনিতে। প্রকৃতির কোমল
হৃদয়ের স্পর্শে এল তার প্রাণে বানিকটা শান্তি।
কবি আরও পাওয়ার আশায় নগিনীর ভালোবাসা
উপেক্ষা করে চলে গেছে যেখানেই ছবির শান্তি আসে না।
প্রকৃতির সৌন্দর্যও নগিনীর বিহবেরে অস্তর থেকে সরিয়ে
বিত্তে পারেন না। তবে কবির লাভ হলো কি! কবির
পরিচয় কবি বুঝতে পারলেন নগিনীর কৃতিত্বে কবিরে
এলে। কিন্তু যে কবিতা ছবিরে গেছে তার আর পূরণ
হওয়ার কোন পথ নেই।

শেষ সর্বে প্রিয়ের দুহা শোক। বিহবেরে অবস্থিতি
কালে শোকে শান্তি, শেব অসে পাণির মনোরমতা হিত্য
আর সেই সঙ্গে দার্শনিক তত্ত্বের বিচারণ ও ভাবিকালে
সাম্য ও মৈত্রীর আশা এবং সর্বলোকে কবির বৃত্ত্য বর্ণিত
হয়েছে। কবি কাহিনীর মধ্যে লক্ষণীয় বিষয় হলো
আরণ্য জীবনের শান্তি। দার্শনিক তত্ত্বের বিচারণ ও
ভাবি বর্ণনাসের কল্পনার কিশোর বীজপ্রদানের ধর্মতা।
প্রাচীন ভারতের আরণ্য-সভ্যতার বাল্যকাল থেকেই
বীজপ্রদান হুত হয়েছিল, আর যেখানেই সম্ভব হয়েছে
সেইখানেই আরণ্য-সভ্যতার ভগবান করেছেন। অপ্রান্তের
আশায় প্রাণকে ত্যাগ করেন অপ্রাণীদের আত্মল
দীর্ঘকালে যে আকাশ বাতাস ঘূর্ণিত হয় এই সভা তিনি
তাল করেই দেখিয়েছেন কবি কাহিনীর মধ্যে। পতিবাদের

অনুভবও দেখা গিয়েছে এই কবি-কাহিনীর মধ্যে, যাঁর
পরিণতি লাভ করেছে বলাকাই।

হিম্মতির এই তরু অঁথার গহরে
সময়ের পরকণ গণিতেছি বসি,
তবিত্য ক্রমে হইতেছে বর্তমান,
বর্তমান নিশিতেছে অতীত সমুদ্রে।
অন্ত দাঁইতেছে নিশি, আসিছে দিবস,
দ্বিবস নিশার কোলে পড়িছে ঘুমায়ে।
এই সময়ের চক্রে ঘুরিয়া নীরবে
পৃথিবীর মাল্যের অলঙ্কিত ভাবে
পরিবর্তনের পথে যেতেছে নাচিয়া।—

এই বর্ণনার মধ্যে পতিবাহের অল্পর স্মরণে
বিভ্রম।

প্রাচীন আৰ্যবাহের মত বীণ-নাথও ছিলেন সত্যজি।
আর তাঁর সত্যবর্ণনের ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি
কিশোর বয়সেই। পরিণত বয়সে যে সাম্য ও বিশ্বশ্রদ্ধার
বাহী নিয়ে তিনি বিশ্ব-পরিভ্রমণ করেছিলেন সেই বিশ্ব-
শ্রদ্ধাও বীণ অঙ্কুরিত হয়েছিল তাঁর কিশোর বয়সে। আর
তাঁর পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি কবিকাহিনীতে তুলিয়েছেন,—

অনুত মানবগণ এক কর্তে, কেব,
এক গান গাহিবেক অর্ধ-পূর্ণ করি'।
নাহিক হরিত বন্য অধিপতি প্রভা;
কেহ কারো কুটিলেতে করিলে গমন
মর্যাদার অপমান করিবেনা মনে,
সকলেই সকলের করিতেছে সেবা,
কেহ কারো প্রভু নয়, নহে কাব্যে লাম।

পরিণত বয়সের চিন্তা কিশোর বয়সেই অঙ্কুরিত হয়।
বীণ-নাথও তাঁর কাব্যস্বভিতে লিখেছেন—

“যদি কেহ মনে করেন এ সময়ই কেবল কবিতা,
তাহা হইলে ভুল করিবেন। পৃথিবীর একটা বয়স ছিল
যখন তাহার বন বন ভূমিকম্প ও অগ্নিউল্কাগণের সময়।
এখনকার প্রবীণ পৃথিবীতেও যাকে যাকে সেরূপ চাপাঙ্গার
লক্ষণ দেখা দেয়, তখন লোকে আশ্চর্য হইয়া যায়; কিন্তু
প্রথম বয়সে আবরণ এত কমই ছিল না এবং ভিত্তিকার
বাপ ছিল অনেক বেশী, তখন সর্বদাই অস্তাবস্তীয়
উৎপাতের ভাণ্ডর চলিত। তখন বয়সের আরম্ভে এও
সেইরকম একটা কাণ্ড।”



[পশ্চিম হুনিয়ার দেশে]

দেশে এখনো অসংখ্য
শাখাধর বাহুব আছেন,
বাঁধের সংচিহ্নাও ততবৃদ্ধি
বর্তমান হুনিয়ার সবচেয়ে
বড়ো সমস্যা নিরস্ত্রী-
করাগের প্রাণে ধানবতীর

আমরা বাঁচাবো [প্রচারণা]

জিওমিড লিওনস

অনুবাদ : দাসর সরকার

অনুগ্রহে এখানেও একটি
চরিত্র লিখি করা হয়েছে—
সেটা পরস্তানের ।]

দি: ম্যাককিন্সলের দ্বিবা-
রাজির চিত্রায় একটি
নিরাস্ত্রণ পরিণতির আশংকা

কল্যাণকেই এর বলে মনে করে। সেই সব
দেশের রাজনীতিতে তাঁদের এই কল্যাণভিত্তির প্রত্যক্ষ
প্রকাশ দীর্ঘদিন ধরে নিরাস্ত্রণের জুমিকা গ্রহণ করতে
পারে নি। সেই সব বিনোদিত পৃথিবীর বুকে বনিয়ে
জুলেছিল এক অভিশাপের মেঘ যার প্রসার ঘটলে,
যদি বিশ শতাব্দী পর্যন্ত সত্যাতাচ থাকিতু অবধান,
মাহুদের সঙ্গে সঙ্গে তারো ঘটতো অপসৃত্য। আশো
সেই অভিশাপ মেঘ কেটে গেছে পুরোপুত্রি, একথা ঘোর
করে বলা যায় না, বহিঃ অগণিত মাহুদের সচেতনতা
সেই শেষের দিনটিকে সরিয়ে দিয়েছে যে কথা প্রায়
অস্বীকার্য। আন্তর্জাতিক রাজনীতির এই চরম স্তম্ভ-
পূর্ব প্রাণে, সমাধানবিমুখতার সমোজ্যকে সমস্ত
মাহুদের স্বার্থে, সমাধানের দিকে নিয়ে যাওয়ার
প্রচেষ্টাকে ব্যাপকভাবে করার জরুরি, এই নাটকের
অমতবোধ। এই নাটকের তাই বেশ, বা ভাষার
সীমানার সীমিত কোন চরিত্র নেই, নেই কোন বিশেষ
সংস্কৃতির বা সমাজের চাপ। বাঁচার আশির বিখ-
মানবিক বলেই। বাঁচার রাজনীতিতে বেশ কাল পাড়ের
ব্যবধান হচ্ছে গিড়ে, গড়ে ওঠে সমাজের সামগ্রিক
চেতনতা ও ঐক্যবোধ।

তাই এর স্থান ও পরিবেশ এক চরিত্রগুলির
অস্বীকার্য। দৃষ্টই কাল্পনিক। তারা সবচেয়ে মাহুদ
এবং আশাধরেই দৃষ্টবাসের মাহুদ। নাটকে যেখানে
যেখানে কিছু লক্ষ্য প্রকাশ পেয়েছে আলপ
আলোচনার বা চরিত্র চিত্রায়—সেখানে বা আছে
অন্তে হানির আড়ালে বিবাদের স্রষ্টই প্রধাম। আর
সব শেষের কথাটি হলো, পাশ্চাত্যের নাট্যরীতির

দীর্ঘদিন ধরে বহুদূর ধরে, প্রায় তাকে বিশেষতায়
করে জুড়েছে। আনবিক যোমার মারণ ক্ষমতার
ব্যাপকতা বৃদ্ধির পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যুদ্ধের ভয়াবহ
শক্তি, কামান বহুকের শব্দ, প্রাণভয়ে তীত ত্রুত মাহুদের
আত্মল আর্দ্রনাথ আর থেকে থেকে তাকে ছাপিয়ে ওঠা
সাইরেনের বাঁকী—এসব যেন তার মনের পথের স্পষ্ট
হয়ে ওঠে যখন তখন। যেন সেই সব দিনগুলো: হঠাৎ
কীমত হয়ে ম্যাককিন্সলের সমস্ত অহুতির ওপর স্থায়ী-
ভাবে বাগা বাঁধতে চায়। অচৈতন্য ভয়াবহতার একটি।
সকীং চিত্র যেন তাকে তার বর্তমানের কীমতবোধ থেকে
টেনে নিয়ে যায়, যখন তারা সব ছিল ম্যাককিন্সলের
বিনোদনমূলক অভিজ্ঞতা।

ম্যাককিন্সলে পালাতে চায় এই শক্তির অপর্যাপ্ত থেকে
বা তার সন্ধান যখন পত্ত্ব করে তোলে। কিন্তু বিতীং-
সতার এই নিরাস্ত্রণ শ্রুতিপীড়ন থেকে ম্যাককিন্সলে কি
চায় আশানীকালকে, অমাপগত দিনের মাহুদকে রক্ষা
করতে ?

ম্যাককিন্সলের মনে ভেলে ওঠে কৈশোর শক্তি। দীর্ঘ
দিনের কথা। সব কেমন আবহা হয়ে গেছে। কেবল
একটুই তাব মগেখও বেঁচে আছে চিত্রায়ির দেশের মতো
বিক বিক করে। যখন তার তখন কতোই দূর হয়ে চার
কি পাঁচ। রাজ্য ছিল সে—কোথাও গিয়েছিল বোম্বার
...সঙ্গে ছিলেন তার মা...তারপর হঠাৎ রাজ্য ছাড়
হয়ে দেশ...বলে বলে লোক সার বেঁধে হাঁটছে...সঙ্গে
সঙ্গে তাদের হাত পা ভুলো কেমন যেন ভাল ভাল
পড়েছে...কোথায় যেন একটানা একটা শব্দ হচ্ছে বোম্বার
ভ্রামের শব্দ...তারের পরে সব যেন একই রকমের

পোশাক...তার বেন মনে হয়েছিল একটা বিরাট, লম্বা
ঘর, বেন মেশিনের তৈরী একটা অজানার সাপ এঁকে
বেঁকে টুকরো টুকরো হয়ে, মানুষের ব্যক্তি দিয়ে চলছে
আর চলছে...শেষ নেই নৃতি। সে আর থাকতে পারে
নি, মাঝের কোলে উঠতে চেষ্টা করত। তারপর মাঝের
কোলের নির্ভর আশ্রয়ে চেয়ে চেয়ে বেঁচে গেছে সেই দীনেশের
হাওয়াটা। আর কিছু মনে নেই তার।

তারপরের স্মৃতিটা তার একটা বিশেষ স্রবের
অনুস্মৃতি। ম্যাককিন্সলের এক কাকা, অপূত্রক, থাকতেন
ভাষার থেকে অনেক দূরে, কনুঙ্গো। কেত বাসায়
ছিল তাঁর। দেখান থেকে পাঠাতেন মাঝে মাঝে
ম্যাককিন্সলের জন্যে নানা রকমের হন বেওয়া আঁয়ের
বেশন। একবার বেন অনেকগুলো টিনের পুতুল পাঠিয়ে
ছিলেন। কেনন সব বসতে পোশাক পরা, কাঁধে বসুক
কোমরে তলোয়ার। পুতুলগুলোর কল টিপে হেঁড়ে ছিলে,
তাঁরা পরস্পর মারামারি করত। তারপর একদিন বেন
মনে হলো তার সেই হন বেওয়া টিনের পুতুলগুলো বড়ো
হবে সত্যি লড়াই করতে বেমে পড়লো মাঠে
ময়দানে...

ম্যাককিন্সলের মনে আছে এতও প্রায় বছর তিনেক
পরের একটা ঘটনা...একটা হাসপাতাল...সারি সারি
বাগিচা বিছানো...প্রত্যেকটার কেউ না কেউ তরে আছে
...ব্যাগের আঁতরায়ে লেখানকার বাতালটা কেনন ভর্তী...
তার সঙ্গে বেশনো তাঁর একটা গছ...আরডোকা...
মাঝের সঙ্গে সেও বিছানার পোয়া মানুষগুলোর পাশ
কাঠিরে ছাঁটছিল...তারপর এক ছাত্রপার তারা যেম
গেল...তার দা একজন নাসংকে একটা নাম করে কি
জিজ্ঞেস করলেন...অল্পক পবেই সেবেল ঢাকা লাগানো
চেয়ারে বসা একটা আলগোফা কাপড়ে মোড়া মানুষের
মতো কি পাবে বীরে গড়িয়ে আগুনে—বোম্বার তারেরই
দিকে...ট্রিক তাই...কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না...কেনন
স্রবের আঁতরনের মধ্যে একটা মাত্র চোখ দেখা যাচ্ছে...
সেই চোখটা চক্ চক্ করে উঠে দাঁত ম্যাক বলে
ডাকলো...তারপর বেন তার দিকে হুঁকে পড়তে চাইলো
...সে শুধন তার চাঁৎকার করে তার মাকে জড়িয়ে ধরেছে
...ম্যাক পবে শুনেছিলো ওই কাণ্ডে মোড়া যেহা তার

সেই কানুঙ্গোর বেলনা পাঠানো কাকার...শুধন গ্রন্থম
মহাভূত চলছে...

আরেকটা কথা ম্যাককিন্সলের মনে এখনো বেশ স্পষ্ট
হয়ে আছে। বাবার সঙ্গে সে যুগেই কতো ছাত্রপার,
বেশে বিশেষে। তার বাবা ছিলেন ইকিনিয়ার। যেখানে
যখন কাজ সেখানেই শুধন বেতে হতো তাঁকে, তা বে
কেনেই হোক আর বাইরের হোক। ইউরোপের কতো
ছাত্রপার, কলোনিগুলোতে সে ঘুরেছে তার বাবার সঙ্গে।
এই যোরা-ঘুরিতে বৃদ্ধ সম্পর্কে তার মনে খারাপ হয়েছিল
প্রচুর। তার কতগুলো আবার বেশ মজার। কোথায়
বেন সে বেবেছিল সার বেঁথে লৈজ্ঞা একটা বিরাট গ্রানায়
পাহারা বিচ্ছে। বাঁবা সময়ে এককল পাহারাভার চলে
যায়, আরেক হল আসে। বিরাম নেই, বিরতি নেই।
একবার একজন অফিসারকে সে বেবেছিল। মজার
পোশাক পরে লোকটা কেনন জারিচি চালে ঘুরে
যেড়াছিল। তার অমকালো পোশাকে এখনে শুধানে
নানা রঙের পালক গাঁজা, কাঁধের ওপর অফিসারের
আঁক চিত্র বহন করা নানা জিনিস আঁকানো। কোমরে
মাটি পর্বত খেলানো তলোয়ার। আরেকবার মনে
হচ্ছে এককল বেলে চলে চলা অমকালোই লৈজ্ঞ বেবেছিল
গ্রাণে ফেলের কোন এক শহরে ভাষের রকম সজন দেখে
জারী মজা লেগেছিল তার।

কিন্তু তখু মজাই নয়। অনেক ব্যাখ্যাতর ঘটনাও সে
দেবেছে। বার মধ্যে ব্যাখার চেয়ে ছাত্র-বিদ্যাক
অনুস্মৃতিটাই তার মনে গ্রন্থম হয়ে উঠতো। কোন এক
উপনিবেশের একটা গ্রাম সে বেবেছিল। তাল পাছে
যেরা। বেশ শান্ত, নিভৃত পরিবেশ। কিন্তু একদিন কি
যেন কোথা দিয়ে গেল। সেদিনের ছবিটা তার চোখে
আজো জল জল করে আসে। সারাটা গ্রাম ধোঁয়ার
ঢেকে গেছে, তার মাঝে মাঝে তাঁর লাল আর ঘনু রঙ
ছড়িয়ে এঁকে বৈকে উঠেছে সেলিহান আঁজনের দিঘা।
পাকে পাকে সেই দিঘা গুলো জড়িয়ে বহছে সাবা আঁমেহ
নবুচেহ সমারোহ, বেন একটা দিটোল জলন্ত পিত ছাড়া
আব কিছু চোখে না পড়ে। দিঘী মিথিরোবী মাজ
গুলো পরিমার্জি চাঁৎকার করে ছুটে বেরিয়ে আসতে চায়,
অজ্ঞান বের, মজা। কিন্তু পরিজ্ঞান নেই। আঁজনের

বেড়াগেলের বাইরে কেউ ছিটকে এসে পড়লেও তার
 স্ক্রলি নেই। আগুন ছেড়ে দিলেও, আগুনের ঢেয়ে
 ভয়ঙ্কর মানুষ তাকে ছাড়বে না। তার লক্ষ্য সব দিকে
 কাজ করতে নেমে কাজে ঝাঁক রাখে তার বড়বাব বিজ্ঞ।
 তাই সেই মানুষগুলো যখন আগুনের বাইরে এসে
 ভগবানকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্যে অসীম কৃতজ্ঞতার
 আকাশের দিকে চায়। ভগবান বুঝি তাদের অর্পিত
 দেহের জালা জুড়োবার জন্যে তৎপর হবে, ওঠেন।
 আসে তাঁর অসীম করুণার ধারা—ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি
 বোম্বাক বিমানগুলো বোম্বা কেলে এতক্ষণ শুধু পাক
 গাছছিল। মেলে দেওয়া চিলের মতো।
 শিকার শেষ, তাই কাজ নেই আপাততঃ। কিন্তু এ কি,
 নীচে যেন কি লেগা যায়! করি সব আসছে বেরিয়ে
 নোহুন শিকার, নোহুন সব জানন্দ। চিলের ছোঁ হাতের
 জব্বিতে বোম্বাকগুলো নেমে আসে, জব্বির হুক করে
 হুত্বা স্বর্ণ।

আবার এও বেগেছে ম্যাককিন্লে তার এই অন্তি-
 দীর্ঘ জীবনে। এই সব নিবীহ, অত্যাচারিত মানুষ-
 গুলোর মার বেয়ে বেয়ে আর মরে মরে, মরণজরায়ণ
 তারা তখন মরতে আর মারতে বজ্রপরিকর। এতদিন
 মরতে ভয় পেতো বলে মরতে ভয় করতো। কিন্তু বেতিন

মহার জর ডাঙল সেদিন ডাংরা গানের ন্যালে বা পেয়ে
 তাই নিয়ে হুটু ছিল অত্যাচারের, উৎপীড়নের শো-
 নিতে। খুনের বদলে খুন। দৈনিক তাই
 সেকেলে বর্শা আর অস্ত্র হাতিয়ারগুলো বকুলোপল হ
 ছুটেছিল বিজ্ঞানের ধানের সঙ্গে মোকাবিলা করতে।

একটা স্বপ্নালোকিত ঘর। বেশ পরিপাটি ক
 সাঝানো না হলেও পরিচ্ছন্ন। শ্রীমন্তিত না হলেও শা
 পরিবেশ তার। দুজন মানুষ বসে আছে। থেকে থেকে
 কথা বলছে। এক জনের গলা কর্কশ কিন্তু স্বর অস্বাভাবিক
 অস্বাভাবিক বেশ অস্বাভাবিক অস্বাভাবিক মিটে।
 একজন পুরুষ, প্রায় পঞ্চাশ, অস্বাভাবিক নারী, দুই
 বারিশের কাছাকাছি বয়স। কোথা থেকে গানের এক
 সুর ভেসে আসছে পরিবেশটার ভাবপ্রবণতার আগে
 যেখানে। একটা সাদা বৈঠকেই আবহাওয়া। এ
 যথো পূর্ণগতি হলো মিঃ ম্যাককিন্লে। মহিলাও
 মিলে দিল। স্বতন্ত্র বোধধন লবছিল ম্যাককিন
 আসেগমর গলায় গানটো স্বপ্নে: স্ত্রীর মতো।
 থাকে মাঝে বা কিছু ভেলে ওঠে মনোহর সীমা পার।
 তারই কথা বোধধর ভাবছিল। আর থেকে থেকে মা
 কথাগুলো বুঝে কথা হতে বেরিয়ে আসছিল। এ
 স্বভাবের ছেড়ে, ম্যাককিন্লে কথা শুরু করলো।—

(কমপ)



ম্যানুয়াল ইংরেজি

প্রতিভা বলে নতুন নতুন
কিন্তু আ বি জ্ঞান
করেছে। জলে, হলে
আ বি জ্ঞান
আবিষ্কার। বি জ্ঞান
করেছে। কারণ, প্রকৃতি
এখনই প্রমাণবিক
প্রক্রিয়ায় চিত্রিত, সা,
কৃষিকার্য, নিরোহিত,
বলি উৎসাহন প্রকৃতি

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

প্রাণের ভূমিকা

অনিবার্য প্রক্রিয়া

○

F. Engles তার
Dialectics of Nature
গ্রন্থে প্রাণের সংজ্ঞা
নির্দেশ করতে গিয়ে
বলেছেন "Life is the
mode of existence
of protein bodies,
the essential
element of which
consists in continual
metabolic inter-

সোক্রেটিসের কাকে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছে, তার
অনেক দিনের যত্ন ছিল প্রাণের সৃষ্টি করা। বিজ্ঞানীদের
ঐকান্তিক চেষ্টায় সেই যত্ন বাস্তবে পরিণত হয়েছে।
আজকাল গবেষণাগারে প্রাণের সৃষ্টি অসম্ভব কথা নয়।
হুইল বিজ্ঞানীর চেষ্টায় কলে অবৈধ পদার্থ হতে
ট্রাইক্লোরো প্রাণের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

এখানে শুধু বাক আমাদেব এই পৃথিবীতে প্রাণের
প্রথম বিকাশ সম্বন্ধে বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের মত কি।
প্রাণের প্রথম বিকাশ সম্বন্ধে মানব সভ্যতার বিভিন্ন
মধ্যযুগে বিভিন্ন বর্ননাদ্বারা ও বার্ননিকেরা বিভিন্ন
গাণিত্য দিয়েছেন, অবশ্য এই সকল ব্যাখ্যার সবই ছিল
বৈজ্ঞানিক যুক্তি বঞ্চিত। প্রাণের প্রথম বিকাশ সম্বন্ধে
চার হারল্ড বলেন "Life does not occur because
of some unique accident. It is the result of
infinite process : given the suitable con-
dition, these process will inevitably lead to
the development of life বৈজ্ঞানিকদের মতে
ঐক্য পদার্থ হতেই স্বতন্ত্রভাবে প্রথম প্রাণের
বিকাশ ঘটে। সৃষ্টির কারণবশত প্রাণহীন পদার্থ
এর তাড়াতাড়ি চলছিল। উপকরণ ছিল বাষ্প, জল,
হাওয়া, পানির, আর সমস্ত ছিল অস্বাভাবিক, হাইড্রোজেন
ইটোজেন প্রকৃতি গ্যাস। নানা প্রকার গুলট গ্যাসট
জীবীনতার মধ্যে প্রথম দেখা দেয় প্রাণ।

change, with the natural environment outside
them, and which ceases with the cessation
of this metabolism bringing about the
decomposition of the protein."

প্রাণের প্রকৃত সংজ্ঞা নির্দেশ করা অত্যন্ত কঠিন
হলেও তার বিভিন্ন লক্ষণ দেখে অল্প পদার্থ হতে তার
পার্থক্য বুঝতে পারি। প্রাণের দুইটি প্রধান লক্ষণ হল
বংশবৃদ্ধি ও নিউট্রেশন ক্ষমতা। অবশ্য এখানে বংশ-
বৃদ্ধি বলতে অধঃপন্থী সৃষ্টি অর্থাৎ একটি কোষ হতে বহু
অনেকগুলি কোষ সৃষ্টিই বুঝায়।

আমরা জানি প্রত্যেক জীবের দেহ অগণ্য কোষে
বিত্ত, প্রত্যেক কোষের নিউক্লিয়াসে ক্রোমোসোম
নামক সূত্রাবলি মত এক প্রকার পদার্থ থাকে। এই
সকল ক্রোমোসোমের 'জিন' নামক পদার্থ বংশগত
গুণাবলীর ক্ষেত্রে হারী নবজাতকের কোষসমূহের
ক্রোমোসোম পৈত্রিক কোষসমূহের ক্রোমোসোম হতে
জাত। ক্রোমোসোমের জিন নামক পদার্থই পৈত্রিক
গুণাবলীর প্রতিনিধিত্ব বহন করে, এই অর্থেই নবজাতক
পৈত্রিক গুণাবলীর অধিকারী হয়। কোন কোন পদার্থ
বিশেষ কারণে জিনের রূপান্তর হয়ে থাকে। ফলে
নবজাতক পৈত্রিক গুণাবলী হতে বিভিন্ন গুণাবলীর
অধিকারী হয়। এভাবে নিউট্রেশনের সৃষ্টি হয়।

এই সকল জীব প্রাণের লক্ষণ হিসেবে বংশবৃদ্ধি

প্রাণাত লাভ করেছেন সেখানেই অল্পতন সূত্র ও মিউটেশন তাপ দেখতে পাব। তাইরাস এই হিসেবে আশ্চর্য-স্থানীয়। এ অল্প তাইরাস-বিষয়ক গবেষণা আধুনিক কালে প্রাণাণা লাভ করেছে। তাইরাস সম্পর্কে গবেষক বিজ্ঞানীদের একটি ভুলবশত বিতর্কের বিষয় হল তাইরাসের প্রাণ আছে কিনা? প্রাণী দেহের অনেক লক্ষণ তাইরাসে রয়েছে, আবার কতগুলি তাইরাস রাসায়নিক পর্যায়ে বসে কোম্পক্ষে পরিণত হতে পারে।

জীবাণুদের সঙ্গে এই পার্থক্য অবিকার্য জীবাণু অস্থবীকণে ঘটে হয়। কিন্তু সাধারণ অস্থবীকণ যন্ত্রে তাইরাসের অস্তিত্ব বরা পড়ে না। তাইরাস আকারে এত ছোট যে পরীক্ষণে বৃহৎ তাইরাসের আকৃতি এক বিশিষ্টতাযুক্ত ০০০,০০০০০০ তাপের এক ভাগ। ইলেকট্রন অস্থবীকণ যন্ত্র আবিষ্কারের পরেই এই ক্ষুদ্রাতি সূত্র তাইরাসকে দেখা এমন কি ক্রোটোপ্রাক ভোলাও সত্ত্ব হয়েছে, তাইরাসেরা পরীক্ষণী। এদের আক্রমণ হতে মানুষ, নানা জীব ভয়, গাছ পালা এমন কি ক্ষুদ্র ব্যাক্টেরিয়াসহ পৃথিবীর নেই। বসন্ত, গলাতল, পলিওমাইলাইটিস, পীতজ্বর, এনসেফালাইটিস, হাম, ইনফ্লুয়েন্সা, যক্ষ্ম প্রভৃতি তাইরাস দ্বারািত রোগ, এক এক ধরনের তাইরাস বিশেষ ধরনের কোষতন্ত্র বাহিরা লাইফা আক্রমণ চালায়।

ইলেকট্রন অস্থবীকণ যন্ত্রে পরীক্ষার কালে তাইরাস সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গিয়েছে। ভাবাকের বোকেইক তাইরাস দেখতে অনেকটা হলের মত। ব্যাক্টেরিয়ায় পরজীবী তাইরাস বহুবীকৃতি, তবে এক বিকে হলের মত লেজ আছে, পশিও বোগের তাইরাস বিশুদ্ধ মত, পরীক্ষার আরো দেখা গেছে তাইরাসের মধ্যে দুইটি অংশ আছে। কেন্দ্র ও বহিবেষ্টনী। রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা যায় এই বহিবেষ্টনী প্রোটিন এবং কেন্দ্র নিউক্লিক এসিডে তৈরী, কলকলয় সমন্বিত এক জটিল রাসায়নিক পদার্থ এই নিউক্লিক এসিড এক উহা কোমোমোমের এক বিশিষ্ট উপাধান। অবশ্য বিভিন্ন মূত্র হতে প্রাপ্ত নিউক্লিক এসিডে পার্থক্য ঘটে হয়।

ইলেকট্রন অস্থবীকণ যন্ত্রে পরীক্ষার আরো দেখা গেছে ব্যাক্টেরিয়ায় পরজীবী তাইরাসকে ব্যাক্টেরিয়ায়

সম্পর্কে আনা হলে উহাদের বস্তুত্বিত লেজ ব্যাক্টেরিয়ায় সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তারপর তাইরাসের কেন্দ্র নিউক্লিক এসিড বহিবেষ্টনী হলে ব্যাক্টেরিয়াতে প্রবেশ করে এবং ১-২০ মিনিট পরে ব্যাক্টেরিয়া কেটে তা হতে লভাবি তাইরাস বের হয়। তা হলে এখানে দেখতে পাচ্ছি একবার নিউক্লিক এসিডই প্রতিকৃতি বহনে সক্ষম। তাইরাসের কেন্দ্রে একটি রাসায়নিক পদার্থের অল্পর মধ্যে জীবনের সমস্ত লক্ষণ পরিদৃষ্ট হচ্ছে। এই অল্প অল্প জীবের মত জন্ম লাভ করে খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাক হতে পুষ্ট হয় এবং যখন বিজ্ঞানের ক্ষমতা ব্যর্থ করে। কেবল তাই নহে, এই অল্পগুলি আকারে জিন অপেক্ষা হস্ত সাহায্য বড়ই হবে অল্প উহাদের মধ্যে বংশোদ্ভূতকি ভাবে বীর বস্তুদের ধারা বজায় রাখার ক্ষমতা বিদ্যমান।

তাইরাসের কেন্দ্রীয় পদার্থ 'নিউক্লিক এসিড' নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। ভাবাকের বোকেইক তাইরাসের কেন্দ্রে পরীক্ষার দেখা গেছে উহার নিউক্লিক এসিড দুইটি সমান্তরাল সূক্ষ্মের দীর্ঘ সলিল রেখা যান। Gramow র মতে এই সলিলাকৃতি হতে ওর সঙ্গে যুক্ত প্রোটিন সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। Arley মতে প্রোটিন নিউক্লিক এসিড তৈরী হইত হিসেবে কাম করে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে তাইরাসের যন্ত্র বৃদ্ধি বোটা-নুটি নিয়ন্ত্রণ : তাইরাসের নিউক্লিক এসিড আশ্রয়-ধাতার বিশেষ ধরনের কোষতন্ত্র বাহিরা লাইফা আক্রমণ চালায় এবং আশ্রয়ধাতার কোষ হতে নিজ দেহের অল্পরপ প্রোটিন তৈরী করে। এই প্রোটিন হতেই তাইরাস দেহের অল্পরপ নিউক্লিক এসিড তৈরী হয়। প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিডের মিশ্রনের কালে শৈল্পিক তাইরাসের অল্পরপ তাইরাস সৃষ্টি হয়। এখানে তাইরাসে আমরা দেখি যে প্রাণবীর জন্ম পদার্থে জীবনের সঞ্চার ঘটেছে। কিন্তু জীব দেহের পঠন বৈশিষ্ট্য উহা লাভ করে নি।

ফ্রান্সিসকোবিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের Frankel-cornet এবং Williams এর প্রকাশিত তথ্য হতে জানা যায় ভাবা ভাবাকের বোকেইক তাইরাসকে প্রোটিন ও

নিউক্লিক এসিডে বিভক্ত করতে সমর্থ হয়েছেন এবং এই দুইয়ের সংমিশ্রণে তামাকের মোজেইক ভাইরাসের অন্তঃস্থ পদার্থ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। এবের গবেষণা হতে আরো জানা যায় যুগ্ম ভ্যাক্সিন পাতার পলার এই নবজাত পদার্থ তামাকের মোজেইক রোগ সৃষ্টি করতে পারে, এ সত্য হতে প্রমাণিত হয় উক্ত বৈজ্ঞানিকের তামাকের মোজেইক রোগের ভাইরাস সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছেন, তাহলে ভাইরাস সৃষ্টির উপকরণ প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিড ছিল প্রাণ হীন অল্প পদার্থ। ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের Commoner কর্তৃক প্রায় একই সময়ে একই কল লাভার কথা ঘোষিত হয়।

উপরোক্ত ঘটনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এখানে আশ্চর্যের বিষি প্রাণ হীন অল্পপদার্থে জীবনের সঞ্চার ঘটেছে। নিউক্লিক এসিড ও প্রোটিন এই দুই পদার্থের রাসায়নিক গঠন আমাদের জ্ঞাত, কৃত্রিম উপায়ে এদের

তৈরী করা সম্ভব। তাহার ভাইরাস হতে নিউক্লিক এসিড নিয়ে তা হতে নূতন ধরনের ভাইরাস সৃষ্টিও সম্ভব হবে।

প্রকৃত পক্ষে ভাইরাস প্রাণহীন অল্প ও প্রাণবন্ত জীব-অণুতের মধ্যবর্তী পর্যায় বিশেষ। যখন পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তা আবির্ভাব হয়েছিল। জীবন-সৃষ্টির আদিমতম স্তরের চিত্রই এতে আমরা পাই। তা বাই হউক, প্রাণহীন অল্প পদার্থ প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিড হতে ভাইরাস সৃষ্টি জীব-বিজ্ঞান অণুতের একটা মস্ত বড় সাফল্য। কালে এই সাফল্যই আধুনিক যুগের অণু-পরমাত্র উপর প্রভূত প্রসেকা। অধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করবে, এবং এই সাফল্যকে মূলধন করে মানুষের মস্ত উন্নত ধরনের জীব সৃষ্টি ও সম্ভব হবে। বিংশ শতাব্দীতে...



একটা বিহাট

জিঙ্গাসাঃ কিছু বুঝে বুঝে
বেতালে। কোথা
থাকবে? কোনখানেই
হাস নেই। যেখানে
গিয়ে থাকতে চেষ্টা
করছে, সেখানেই
আলোচনার পূর্ণক্ষেত্র
পড়ে থাকে। কোন-
খানেই তার হাস নেই।
রাস্তা ঘরের হাওয়াতে,
ভিখা ঘরের মধ্যে

চৌকিতে বাড়ির ছাঁচের কন লোক অড়ো হয়ে কিছু
আলোচনা করছে, অতি সতর্কণে, যেন ঐ জিঙ্গাসার চিকিটা
শুনতে না পার, ওর শোনাটা যেন কোন বিহাট অহরল
জেকে আনবে। তার এ আলোচনা শোনার যেন
অধিকার নাই। চিকিটা জিঙ্গাসা করেছিল, কী হচ্ছে রে
বৌ? তোর সৎগারে আমি বিব হুঁছি? বোকা কিন্তু
আমি বুঝবো ব্যবস্থা করতে।

সত্যবতী!

তার বাবা বাপুজি আদর করে নাম রেখেছিলেন।
হিন্দুর বাড়ি রামায়ণ মহাকাব্যত পাঠ নিত্য-নৈমিত্তিক
ব্যাপার। ছেলে মেয়েদের মাঝ হাত তাই রামায়ণ
মহাকাব্যের বীর পুত্র ও নারীকে নামাঙ্কন করে।
মাত্র এক পুত্র আশে পর্বত এই রেওমাজটা-ই চলে
এসেছে; কিন্তু বর্তমানে মহাকাব্যের বীরদের কথাকে
নাক দিটকে ধার, তার আলোচনাটা “জাষ্টি”,
সেকেন্দ্রে; বরং তারের বীরদের চেয়ে ইংরাজদের
বীরত্বের চারে তথাকথিত সভ্যতার ধূসারটা “নাইন”,
“আলস্টা হার্ডন”। তাই সত্যবতীর ভাইপোর নাম-
করণ যখন হোল ভীষণে, সে নামটা কুলের বাতায়
পর কলেক্টর বাতালে আর হাস পার নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে
পিটিশনের গোবে ভীষণেবের পরিবর্তে হয়েছিল বীরেন্দ্র
বা সংক্ষেপে বীরেন। পিটির মুখ দেখলে হয়েছিল,



বাগ-পিতে-মো যে নাম
রে গ্যা ছে, তাকে
বহলাস্‌হিস্‌তীঃ।

ভীষণ হেসে পিটিকে
বলে ছিল, নামটা
বহলেছি পিটি কিন্তু
মানে বহলাস্‌হিস্‌তী, বীরেন্দ্র
অর্থাৎ সেই বীর বীরেন্দ্র,
ভীষণ বীর বীরেন্দ্র,
টিক নয়।

সত্যবতী আ:

হলেন নি।

নামকরণে বাধ্যতাবদ্ধ অহরহরণ করলেও
অন্যান্য ব্যাপারে তার নীতি গ্রহণ করা হোত না,
তাই সত্যবতীর কোর অক্ষর জ্ঞান হয় নি। এং বিয়ে
হয়েছিল কিন্তু নিজে বিয়ে করে নি অর্থাৎ সংস্কার হয় নি।
ঘিরে হয়েছিল বড়ো পরে মাত্র তারার বহুর বংশে, তার
স্বামী তাঁকে সত্যবতী বলে নিজ বংশের কৌশিন্য রক্ষা
করেছিলেন মাত্র। শুনতে পাওয়া যায় সত্যবতীর
শাতড়ীর সংখ্যা ছিল আট, এং সে বুঝে এটা নিত্য-ই
অঙ্গ ছিল। সত্যবতীর স্বামী কিংবা আধুনিক ছিলেন
তাই তাঁর প্রথম দুইজনের বৃদ্ধার পরেই সত্যবতীর
পানিপীড়ন করেছিলেন। সত্যবতীর স্বামী তারপরে
কিছু পরপারে মারা গেয়েছিলেন। নিঃসন্তান বিধবা
সত্যবতী যখন বাপের সংসারে, অর্থাৎ একমাত্র তাই
এই সংসারে কিংবা এল মাত্র কুড়ি বছরে তখন বাপ
লোকান্তরিত। মা বিধবা এং তাই এর বয়স বয় বছর।

তারপর বছর কেটে বেতে লাগল।

তাই এর বিয়ে হোল, সত্যবতীর কি আনন্দ।
অধিক বয়স করে অবশ্য তুলতে পার নি, কারণ তিনি
বিধবা। কিন্তু সব ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছিলেন,
বলতেন বউ, ভূই আসাতে আলো হুঁচ বাড়ি।

শরৎ মেয়ে তো কি, এটাই মন থেকে নাই।

প্রত্যুত্তরে সরমা জবাব দিতেন হেসে, আপনি না

যাকলে ঠাঁকুরকি, আমি কিছুতেই তিষ্ঠিতে পারতাম না এই লগুটানে ।

বন্ধুদের প্রাণল্য যোগে দুর্ভবনীয়, বরংসে বাবধান তো দেখানে বাংলির ধঃ । তাই এই দুই মনঃ-ভাঙ্গে প্রীতির একটা ধরনে বেঁধে পড়েছিল । যানৌরবাচিত হতেম : মনঃ-ভাঙ্গে এত জায, এ বে মনি-মারিকোর চেয়েও গুরুত্ব । মনঃ-ভাঙের মধ্যে পুরস্কার দ্বিত্যকরণের টিটকারী অপেক্ষা হাসি-ঠাট্টা-জামালার পিটকারীটাই প্রাধান্য লাভ করেছিল ।

প্রথম নাকির মুখ দেখে সত্যবতীর মা হোলেন লোকাকর্ষিত, আর সত্যবতী নিজে হাতে তুলে নিলেন সব জায । তাঁর তুহিত দাত্তব্রতের সব তালোবাসাটুকু উজাড় করে চেপে দিলেন তাইপোর ওপরে । তালো-বেসে নাম রাখলেন ভীষ্মবেব ।

মা যেন ভগ্ন কিংই বালাস, ছেলে যেন সত্যবতীর, চোখের আড়াল করবেন না । হেসে সরমা বলতেন ওকে যে ওমনি করে চেপে বরংসে ঠাঁকুরকি, বড় হোলে চোখের আড়াল করতে পারবেন না যে ।

কোন উঠতেন সত্যবতী অদৃষ্টে কথাকলো মুখে আমিস ক্যানে যৌ ? চোখের আড়াল হবে কোন মুখে ?

সরমা বলতেন, পড়াভনা করতে চাকরি করতে পারাবেন না ওকে ? সত্যবতী ভীষ্মে গারে তেল মাখাতে মাখাতে যোবে শুইয়ে দিবে বলতেন মরং আর কি ? চাকরি না করলে যেন বেতে গাবে না ভীষ্ম । বলি বাপ-পিতা-বাঁধা কত কেতাব পড়ে জজ-ম্যাজিস্টার লাট নাহেবের, দুখী হুঁদিলো বল দেখি যৌ ?

সরমা হাসতেন ।

কচি বাজা ভীষ্মও পিসির মুখের বিকে চেয়ে হাসত, আর হাত পা হুঁকুতে ।

সত্যবতী বলতেন, তোর হাসি দেখে গা জলে বাপু । তোর আর ছেলানোর দুই সাহেব করিস নব্বয়ে পড়িয়ে, ভীষ্ম আখার পড়বে না ।

কচি বাজা ভীষ্ম আরও ছোরে হাত পা ছুড়ে ছেলে পিসিরে পড়ত । সত্যবতী তার ব্রতভালু ওপরে একটা কাঁধা পাট করে চাপিয়ে দিতেন ।

-ইতিমধ্যে ভীষ্মে একটি বোন হোল, ভীষ্মে বরস

স্ত্রিন বড়ত উপন । সত্যবতী নাম রাখতে চেয়েছিলেন বেববাণী । সরমা রাখলেন নীলা ।

ভীষ্মবেব বরস পাঁচ বছরের ছোল সত্যবতীর মনটা একটু বদলাল । পড়াভনা এক আংলুই মেবা ভালো বৈকি ? গ্রামের কুলে ভতি হোল । ছাত্রাতি পাণ করল । সত্যবতী আর পড়াবেন না, কুলেই মাষ্টাররা ছাড়বেন না ভালো ছেলে নব্বয়ের কুলে পড়ে বহি ভালো কল করে তবে গ্রামের সুখ । তাছাড়া কুলেই বাওরা পালটান্বে, পড়াভনা করাটা প্রয়োজন ।

সত্যবতী দীর্ঘবাস কেলেন, কিন্তু মনে মনে পবিত হোলেন, ভীষ্মবেব । পেল নব্বয়ের কুলেই প্রতি ব্রত পুণোপলকো ভীষ্মবেবকে অংগে হবে । প্রতিটাতে ভীষ্ম আসতে পারতনা, সত্যবতী কেঁবে আকুল হোতেন । সরমা বুঝতেন, নব্বয়ের পড়া, সব সব্বের কী আসার সময় হয় ? কুলে ব্রতটতে টুটি-ছাটা থাকেনা, সাহেব মাষ্টার সব, তাঁরা ব্রতের মাগা কী বুঝবেন ?

সরমা বিবেচ্য করে সাহেবের কথটা কোথ করে বলতেন, বরংসো তাহলেই সত্যবতী বেশি বুঝবেন, কিন্তু কল গোট বিপরীত, কেঁবে উঠতেন, ঐ কিরিষ্টান মেলেছো ওলা পড়াছে বোকাতে ওরে আখার কী হবে ?

অগ্রভত হয়ে সরমা বলতেন, তাত্তে কি বরংসে ঠাঁকুরকি, আপনাত ভীষ্মের তো ভালই হবে ।

সত্যবতী জবাব দিতেন কাঁড়ের সাথে, কী বলসি যৌ, ঐ কিরিষ্টানওলা বোকার ভালো করবে ? না বাপু, বোকাতে আমি পড়াবো না ।

সরমা হাসতেন মনে মনে । ওপরে হাসলে সত্যবতী তুলস কাও করে দিতে পারেন । তাই গভীর মুখেই বলতেন, নীলা পড়াভনা করবে আর ভীষ্ম দুখ হয়ে থাকবে, কেমন লাগবে ওং বদু ?

সত্যবতী কেটে পড়তেন, বলতেন, তোর নিটিকে দুই বহি নাহলে বাসী করে তিসু তাত্তে আখার কী ? তাই বলি আমার বোকাতে ও আমি ভাঁপিয়ে দিবো ।

ভীষ্ম যেন সরমার কেউ নহ । নীলাই যেন একমাত্র মেয়ে তাঁর । নীলা পড়াশোনা করছে কলকাতাতে তার দ্বায়ার বাড়িতে থেবে ।

কিন্তু এত করেও ভীষ্ম পড়াভনাও বড় হয় নি ।

সত্যবতীর ভূমি ছবিরে তালাবোলায়ও একটুও বাটতি পড়েনি, বরং সাময়িক বিচ্ছেদের পর মাঝে মাঝে মিলনের সময়ে এটা ঝিঙন তাবে থেকে গিরেছে।

ভীষ্মের ফুলের প্রত্যবে ও বহুসের লাভেরও অনেক নবা বনেছিল, পিসির অল্প মন ছুটপট করলেও বহুসের কাছে সেটা প্রকাশ করতে লজ্জা হোত।

ভীষ্মেরের পরচের ফুলনাতে টাকা আদত ভিনওণ এবং এটা পিসির আশ্রয়তিপথে। সুতরাং নহু এতবড় একটা সংস্থান বেখানে, সেখানে মৌনান্ধির অতাব হয় নি। ভীষ্মেরের বহু সংখ্যা ছিল তাই সকলের চেয়ে বেশি। ভীষ্মের বাকি আসা প্রায়ই বড় করে বিয়েছিল, কিন্তু বহন এক মাসের বহু সংখ্য প্রেরিত তিন মাসের সমগ্র টাকা পরনেও বিনেই মিশ্রণ হয়ে যেত, তখন গিরে আতও টাকা গিরে আসতে হোত।

শান্তনুবাং তাগেচন, ভীষ্মেরের বাবার নাম শান্তনু। কিন্তু বিবির অল্প কিছু বলতে পারতেন না। সরমাও কিছু বলতেন না। সত্যবতী আরও টাকা গিরে ভীষ্মেরের পরে পাঠাতেন। পর করে সোকে, নানে তাই-তাঝকেই পোনাতেন, কত বরচ করি বোতাকে পড়াছি, বোকা বহন সাহেবের মূলী হয়ে আসবে তখন দেখি।

সাহেবের মূলী হওয়ার চেয়ে বড় কিছু থাকতে পারত না। সত্যবতীর মতে।

শান্তনুবাং হাঙ্গতেন। তিনি যেসেই বংলাদ। সংসারের কিছু বেখতেন না, অর্থাৎ বাড়ির ভেতরের কিছু বেখতেন না। বা করতেন সরমা আর সত্যবতী। সত্যবতীর কথাত সরমা হেসে বলতেন, আপনায় বোকা সাহেবের মূলী হয়ে কলকাতা চলে গিরে যদি বেন সাহেব বিয়ে করে ?

মাসে হাত হিতেন সত্যবতী, হুবে এক প্রকার লব করতেন। চোখ বড়ো বড়ো করে সরমায় ফিকে চেয়ে বলতেন, এমন অলুপ্তে ছিটুছাড়া কখাটা জুই দুবে আমতে পারলি কো ? এইটুকুন বয়েস হোতে বোকাকে মাস্তাই না হয় করছি, বলি পেটে তো তোরাই চোখেছে, নাকি ? সেই বলে না, বার বে' তার বে' নহ, পাড়া-পড়শি নিহু নাই।

প্রমোদ গণতেন সরমা। তাড়াতোড়ি বলতেন, সে কি ঠাসুবেকি, আপনি পাড়া-পড়শি কেন হবেন, ছেলে তো আপনায়ই।

দুগীতে কলমলিরে উঠত সত্যবতীর দুঃ। সরমায় কাছে এসে বলতেন, জুই বড় ঠাট্টা করিস বৌ, অত ঠাট্টা জাশো নহ, শুকলান অলুপ্তে কথা।

ভীষ্মের মাস্ট্রিক পাশ করেছিল। হুতি গেরেছিল কলেজে পড়বার অল্প কলকাতাতে সেল। তিন কি: দুমোয় মি। সত্যবতীর, পাঠাবার ইচ্ছা ছিল না কি ভীষ্মেরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি না করেন মি।

কলেজ ছুটি হলে স্টু-প্যাট পরে ভীষ্ম বাঁ কিরেছিল। মধ্যে এসেছিল লীলা, মাল খেটে বেওয়া ক্রম ছিল তোলা জুতো। সরমা হেলেকে বুকে জড়িয়ে বয়ে ছিলেন, কলকাতাতে কলেজে পড়া ছেলে এ বংগে প্রথম চোখ কপালে উঠেছিল সত্যবতীর। বলেছিলে হারে বোকা, শুকলান কো ?

ভীষ্ম ছুটে গিরেছিল পিসির কাছে, পিসি কয়েক পিছিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, জুই সাহেব হয়েছিস্ ব সাহেব হয়েছিস্ ?

বুজতে কাকর বাকি থাকে মি। ভীষ্ম প্যাট-কে ছেড়ে হুতি পরে পিসির কাছে এসেছিল। পিসি ক্যা জড়িয়ে হয়েছিলেন, দুগটা জুলে থাকে বা বেখছিলেন, বেন ভুতি হচ্ছে না। পলায় কাছে হ' হুলাচ্ছেন, পিঠে হাত বুলচ্ছেন, তার পরে বলেছিলে ওখানে পেট করে খেতে পাল না, নারে ? তাত বাস, পাঁচকটি বা কাঁচকটি কি ছাই বলে, তাই ?

সকলেই হেসে উঠেছিল। লীলা বলেছিল কেন পি পাঁচকটি খেতে নেই হুতি ?

সত্যবতী বলেছিলেন, ঐ ছাই পাশ বেয়েই ে পরীরে এই ল্পা হয়েছে। আমার আকরে খেতে তে পরীরই বা কী হোয়েছে লীলা।

এর পরেই লীলা বলেছিল কখাটা, হাওঘাতে শতর পেতে এক বাটি বি-হুতি, দুকড়ী, তোয়ার ত্রের না নিজে হাতে খেতে গিরেছিলেন পিসি। ভীষ্মের আপন করেছিল, অত হুগে পড়তে যে জুই এই আমবাটির দু' ব' খেতেন।

আর অপত্তি চলে নি। খেতে বেতে লীলা সত্যবতীকে দিকে চেয়ে বসেছিল, আরো পিসি, হাশার মেসে দিয়েছিলুম সেদিন। হাশা পুরো ক্যালকেনিয়ার বনে বেছে, ভূমি জানতে পারো নি।

সত্যবতী বলেছিলেন-হেসে জুই তো মনে যোচ্ছে কলকাতাতেই গিয়েছিল। আচ্ছা হোল বাপু, তোর মা-ও তো শহরের তা' তোর মতন 'হালুদ' 'সেলুদ' 'মলুদ' 'বেলুদ' করে কথা বুলতে জানে না।

লীলা কলকর্তে হেসে ছিল। বলেছিল, আমি তো কথা বলেই থালাস, কিছু আরো, হাশা নাম পরিবর্তন করবে, বীরেন্দ্র। হীমসেব নামটা বুঝ সেকলে।

একে উঠেছিল সকলেই! কিন্তু সরমা কিছু বলেন নি। শান্তহুবা বুতো বলেনই নি। ভীষ্মের নামটার নামে ষ্টিক রেখেছিল। পিসিকে সেটা সে বুঝেছিল, পিসি, একটা দীর্ঘবাস কেলেছিলেন। তারপর কল বহুসারে চক হয়েছিল।

সত্যবতী চেয়েছিলেন বীরেন্দ্রের বিয়ে কেবল সত্যীক হুটাতার ঘরে হুজুর সখে। বেহন বেগতে জনতে, তেমনি কাজ কর্বে। সরমা চেয়েছিলেন শহরের ঘরের সখে, শিক্তি হে আনতে। সত্যবতী রেগেছিলেন, তাঁর হতে শহরে শিক্তি বেবে কেরিকেলের তৈরী হুগু কাক কত শরমা। বেগতে বেশ, কমে টেকেনা, পালিস উঠে য়ে ছুটিনেই, অর্থাৎ আগল হুপটা ছুটিনেই বেহিবে য়ার। হেসে সরমা বলে ছিলেন, আমি? আমিও তো শহরে।

সত্যবতীও জবাব ছিল, জুই তো বাহা শিক্তি মোস। তাই তো। শিকা মানেই কাঁজ পালিশ।

বীরেন্দ্র কিন্তু অচুত কাজ করেছিল।

এম-এ পড়তে পড়তে এক কারু শরপাট্টিনীকে বিয়ে করেছিল। লীলার বিয়ে আগেই হয়েছিল কলকাতাতে। বীরেন্দ্র তার বিয়ের শহর নিকে জানতে সাহস করে নি, লীলাকে বিয়ে আনিবে ছিল বাড়িতে।

শান্তহুবা চিঠিটা পড়ে বায়ার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে ছিলেন চাকরের হাত দিয়ে, বলে পাঠিয়েছিলেন বীরেন্দ্রকে ঘন লিখে বেগুয়া হয় এ বাড়িতে তার স্থান নাই।

সরমা চিঠিটা পড়ে একটা দীর্ঘবাস কেলেছিলেন।

সত্যবতী তার পরে পরতে টাঙিয়ে দিয়েছিলেন হুত

দিয়ে কথা লড়ে নি। তারপরে, বহুশন পরে কেহেছিলেন তারপর শাপাত করেছিলেন তাইশো বহুকে। কিন্তু বহন জনলেন শান্তহুবা বুত কথা, শুভন নিকে চিঠি লিখে বীরেন্দ্রকে আনিবেছিলেন, মনিকাকে চুপে ঘরে আনার করে ছিলে নিবেছিলেন। বীরেন্দ্র বিস্ময় আশ্চর্যে হুতবাক হয়েছিল, তেমনি আশ্চর্য হয়েছিলেন সরমা। মনিকার একহাত, ত বীরেন্দ্র একহাত বহে শান্তহুবা বুত বহে দিয়ে সত্যবতী বলেছিলেন, কৈ, ভাড়া বেধি বোমাকে এ বাড়ি থেকে কার কতখানি বুকের পাটা।

তারপর আর কিছুই হয় নি। মনিকার হুপ ও যাবহারে সরমা, সত্যবতী উভয়েই বুত হয়েছিলেন। সত্যবতী মনিকার পিঠে হাত দিয়ে বলতেন, জুই বাপু শহরে কিছুতেই মোস, বল দিকিন, তোর বাপ-দিতে মো'র বাড়ি কোথায়?

মনিকা বলত, হুগলী জেলাতে।

একপাল হেসে সত্যবতী সরমার দিকে চেয়ে বলতেন, কেবলি হে? আমি কী বুলাছিলাম?

অর্থাৎ তিনি কিছুই বলেন নি। মনিকার প্রতি ভালোবাসা ও শহরের প্রতি বিবেশ এই দুটোই তিনি সমগ্র শাবন কবতে চেয়েছিলেন। সরমা হাসতেন, ততোধিক হাসত লীলা। বীরেন্দ্র বুতকী হেসে আনিবে যেতো, আর মনিকা হাশা নামেরে লজ্জিত মুখে হাসত। তারপর কালের কটাকে অনেক কিছু ঘটছে। অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

সত্যবতী জৌরুশ পেরিয়ে বাহ'কে) পৌঁছেছেন বহনিন। শহর বহরবে বুতা তিনি। তোষে ছানি পড়েতে, গীত পড়েছে, শহর থেকে নিয়ে একটা বিজ্ঞানসার ডিঙ্কর আকার বাতন করেছেন। সংসারের কোন কাজ করার কথাও তার নাই, তাই তিনি আশ সংসারের বোকা। শান্তহুবা বুতা হয়েছেন বুথোনিদের আক্রমণে। বিববা সরমা সংসারের বোকা নিয়েছেন, আর আগে মনিকা তার বড় হেসে কলকাতা ছলে গড়ে। লীলার ঘরে থাকে সরমার কাছে। বীরেন্দ্র হামাকে চাকরি করে, পুতোতে একবার আসে।

সত্যবতী আশ কর্কমতাহীন বুতা। কোন কাজে জেউ জীব পরামর্শ বের না। বীকা শরীরে হাটাবার

দরজার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কীয়ে বৌ, কী হোলছে? তোদের সংসারে বাস্তবিক আমি বিব হোস্ছি বোকা। কিকক এইবার, আমি বুলবো অমাকে নিয়ে চল।

সরমা কোন কথা বলেন না। সত্যাবতী রাগান্বিত ভাবে ঘরে আসেন, ঘরে চৌকতে মণিকার হাতে একটা চিঠি, তার পাশে লীলার মেয়ে লুদী। কিসের একটা আলোচনা হচ্ছিল। সত্যাবতী চুকতেই খেমে গেল।

সত্যাবতী চোখে ভালো দেখতে পান না। অনেক কষ্টে মণিকার দিকে চেয়ে বলেন, কী হোস্ছে বে বৌমা, কিসের পথ করছিল? চিঠি এস্সাছে বৃদ্ধি বোকার?

বুড়ার চোখটা চিক্ চিক্ করে উঠে, কী লিখাছে রে? কাল তো খল্লি। কাল আসবে? লুদী উত্তর দেয়, হ্যাঁ বিবিমনি।

সত্যাবতী আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। ওরে বো গুজ্যাহিস, বোকা আসবে কালকে।

সত্যাবতী কিন্তু রাহাংরে ঘন না। ঠাকুর ঘরে গিয়ে প্রণাম করেন অনাধিনকে। ঠাকুর ঘরের দরজার বাইরে সরমাকে আবছা অন্ধকারেও চিনতে পারেন তিনি, বলেন, বৌ, গুজ্যাহিস, কাল বোকা আসছে।

সত্যাবতীর চোখের ছানিটার অন্ধ ঘান পরা মণিকাকে তিনি চিনতে পারেন নি। ভেবেছিলেন সরমা। আসার পথে গ্লেন আরিয়েটে বীরেন গতায়। সঙ্কল চোখে সরে যায় ঘান পরিহিতা মণিকা। কিন্তু ঠাকুর ঘর থেকে সত্যাবতীর গলা শুনতে পাওয়া যায় না বৌ, তোর ঘেন কী হোস্ছি। হেলা আসছে তো, এইটুকুন আনন্দ নাই। বোকা কিকক তো আমি বুলবো আনার ব্যবস্থা করতে। আর কহিম? কালকেই তো কিংবে বোকা, আমি তো তোদের বিব হোস্ছি।



দ্বিতীয় কাণ্ডের
রাজবংশের
হাসের সর্বদা অধার।
তদানীন্তন ঐতিহাসি-
কোষের রাজবংশের
বন্দনা গেরেছেন ইতি-
হাসের পাতায়।
পরবর্তীকালেও রাজ-
নৈতিক স্থপতিত্বের
প্রচুর ভূমিকা
করেছেন তিনি। বহুক্ষে-

বিশ্ব সাহিত্য

রূপ সাহিত্যিক পুস্তক

সুদীপ্ত সামান্য



ভবিষ্যৎ এই মহিলা ধূরন্ধর-র জন-ভিত্তিক হিসাবে ব্যাভ।
মহাশূন্য বর্ষভা ও প্রতিনিধি পাক্তা) চিত্রাধার
এক আশ্রয় সংগ্রহ তাঁহার মধ্যে দেখা গিয়েছিল।
মহাশূন্য পিটার্স হার আনলে রূপ ইতিহাসে সর্বাধিক
আলোচিত লড়াই। হার পলকবর্ণের মধ্যে কেবলমাত্র
পিটার্সই উল্লেখনীয় বৃত্তিকালী পতিচরিয়েছিলেন।
এক প্রকাশনকে পাক্তা) শিক্ষার সুশিক্ষিত করে
জুগতে চেরেছিলেন। কিন্তু এ হেন সম্রাটইও মধ্যে
বিশ্রীত ভবের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। একদিকে
তিনি রূপ সাম্রাজ্যকে পাক্তা) শিক্ষার ও ভাবধারার
প্রবোচিত করতে চেরেছিলেন। অপরদিকে তিনিই
আবার পাক্তা) সাহিত্যের প্রবেশ তাঁর রাজ্যে সম্পূর্ণ-
রূপে নিষিদ্ধ করেছিলেন। এই সাধনাই যোগ্য উত্তর-
সাধক ছিলেন ক্যামেরিন। রূপ সম্রাট হলেও তিনি
ছিলেন আধীনবৎসজ্ঞাত। আর সেই কারণেই তাঁর
বৈদেশিক নীতি গভীরভাবে পবে পরিচালিত হয়নি।
একদিকে তিনি স্বাধীন স্বাধীনদের সম্বন্ধে পত্রালাপে
লক্ষ্যে আনন্দ লাভ করতেন। অপরদিকে তিনি আপন
স্বামী রূপপুষ্টিকে হত্যা করে নর ও দ্বিতীয় মনোভাবের
পরিচর দিয়েছিলেন। বিভিন্ন সমাবেশ।

এই বিশ্বাসের মূলে প্রথম দুঃখসাধ্যতা করেন পুস্তক।
"পুস্তকভেদে ইতিহাসে" সাহিত্যিক পুস্তকভেদে এক
সুদীপ্ত সামান্য চিত্রাধার পরিচর পাওয়া যায়।

অবশ্য ইতিহাসে
সাহিত্যিক হিসাবে,
বাক্যভিত্তিক রূপে তিনি
পরিচিত নর। ১৭৭০
সাল। আর পাসন
পূর্ণোক্তে চলেছে।
এমেলিয়ার পুস্তকভেদে
নেতৃত্বে ১৭৭০-৭৫ সালে
এক রূপক বিজ্ঞান হয়।
এ বিষয়ে পুস্তকভেদে
ভাবে অধ্যয়ন করেন ও

পুস্তকভেদে ইতিহাস লেখেন। এই বইয়েই বিশ্বব্রহ্ম
মূলতঃ ১৭৭০ সালের আর পাসন অবলম্বন করে পণ-
অভ্যুদয়। এই বিজ্ঞান রূপকভিত্তিক মধ্যে সীমাবদ্ধ
বাক্যভেদে সংগ্রহ রূপ সাম্রাজ্য ও তৎকালীন আরকে
সম্প্রদেয় প্রকাশিত করে। সেলস্ব ব্যবস্থার কঠোরতাও
অন্ত তিনি বিশেষ এক কাঠামো বেছে নেন। সংগ্রহ
বিষয়ে বিজ্ঞান "ক্যাপ্টেনের মেয়ে"—এই উপজাতিগণই
ব্যাপ্ত। কলে এই উপজাতি পুস্তকভেদে বিজ্ঞানভেদে ইতি-
হাসিক ধরণের পূর্ণ চিত্র দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।
অশেষ বাধাবিগতি সত্ত্বেও উক্ত উপজাতি যেভাবে সংগ্রহ
কাহিনীভেদে উপস্থাপিত করা হয়েছিল তা অসামান্য
চরিত্রের পরিচায়ক। এই উপজাতিগণ চরিত্রগুলি বাঁটি
রূপ চরিত্র; বৈজ্ঞানিক সাধারণ একজন অদ্বৈতীয়, তাঁর
স্বামী, একজন লোকচরিত্র—সাধারণ মানুষের সাধারণ
মহত্ব। রূপ সাহিত্যে এ ধরণের চরিত্রচিত্রণ এই প্রথম।
এই উপজাতিগণ যেখানে তিনি ক্যামেরিন চরিত্রের উপর
তীব্র আলোকপাত করেন। সে আলোকে সাম্রাজ্যের
সমস্ত বোধগম্য স্পষ্ট বিশালোকে তার প্রতিভাভূত হয়।
ক্যামেরিন সম্পর্কে তাঁহার বাক্য এই মহাবাহুর মন। বিশ্ব
পতিভূত হয়েছিল—"মানুষের দুর্বলতা সম্পর্কে জ্ঞান এবং
সেই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ, যদি এইই নাম হয় সাম্রাজ্য
তাহলে তাহীকালে ক্যামেরিন বিশ্বব্রহ্মে পাক্তা) যেন।
কিন্তু এমন দিন আপনবে যখন ইতিহাস বিচার করবে,

১. মূখ্য সাহিত্যিক পুঁকিন

ঊষ্য রাক্ষসকালে মানুষের নীতিবোধ কোথায় গিয়ে ধাক্কায়েছিল; লক্ষ্যতা ও নিকলুতার সুযোগ খুঁজে গিয়ে উল্কাটিক্ত হয়ে এক মিথুয় বাস্তব—তা হচ্ছে ঊষ্য বনোচ্ছগারিতা।

শেখের ইতিহাসে সাহিত্যিকগণ ঊষ্যের সাহিত্য-কৃতিত্ব ভক্ত ধনবী বন। নিজ ক্ষেত্রে আপন প্রতিভাবলে ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক বা কেশবচরণা মায়কগণ অতি-স্বাক্ষর রেখে যান। শিল্পের দিনে সাহিত্যিকগণও ভাববারি হয়েছেন—পুঁকিনের ইতিহাসে এ দুটোও দুর্গত নয়। পুঁকিনের অগ্রদূত রাজনৈতিক রচনা ও মতবাদ এই ধারনাই পরিপোষক। ঊষ্য জীবনে সাহিত্য ও রাজনীতি একাকার হয়ে গেছে। ঊষ্য প্রায় সমস্ত রচনাই এক বিশেষ মতবাদের পরিচয় দেয়; সে মতবাদ হল পূর্ণ স্বাধীনতার মতবাদ। স্বাধীন ও নির্ভীক এই মতবাদের জন্য ঊষ্যকে রাজ্যেপথে পড়তে হয়েছিল, অস্বাভাবিক লাঞ্ছনাও নীরবে সহ করতে হয়েছিল। কিন্তু ঊষ্য বিপক্ষে তিনি নির্ভীক ও নিশ্চল ছিলেন।

নিরাক্ষর লোকবিশ্বের মধ্যে পুঁকিনের সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত হয়। বেনগোলিয়ারের বিরুদ্ধে পরিচালিত “পেট্রিওটিক স্তম্ভ” ঊষ্য জাতীয় চেতনা প্রাণিত করে। ঐ সময়ে ঊষ্য রচনা কলিকাতার প্রায় সমস্ত স্বাধীনচেতা নাগরিকগণের হাতে প্রেরণ হইয়াছিল। ঊষ্য রচনার বিরোধিতার সূত্র অল্পবয়সেই হতে থাকে। ১৮১৭ সালে প্রাক্তন স্বর্গের অব্যবহিত পরেই তিনি ভিসেসরগণীর ভাবী নায়কগণের সঙ্গে গোপন সংযোগ স্থাপন করেন। এ সম্পর্কে কিছু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। কৃষ্যাত জার-নামনে রাজ্যবাসী সমস্ত কেশবাসী জুড়িয়াসে পরিণত হয়। তাদের স্বাভাবিক চিন্তাধারাও বিবেচনা-বুদ্ধিপূর্ণ করবার জন্য সত্য সত্যই সকল প্রকার ধমনীভিত্তি অবলম্বন করেন। চেতনাবোধে হারিয়ে যাপনিকগণ আরও অস্বস্তিক্রমে পরিণত হন—যেমন হয়েছিলেন কলামীপদ যোদ্ধাশুই ও বাহান আন্তোয়ানভের আহলে। নাগপালে তখন প্রায় সকল প্রকারই আতঙ্কতা প্রায় বিলুপ্ত; অতি অল্পসংখ্যক মানুষই আরো এই কৈশোরের বিরুদ্ধে

কেশবের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করেন; কেশবাসীতে নগ্ন নাগপালে থেকে সূত্র কদম্বার জন্ত তিনি ক্রিসংসার করেন। যে আশ্রম এতকাল মার্টিব নীচে জলছিল সমগ্র বিশ্ব-প্রদর্শিত করে ১৮২১ সালের ডিসেম্বর মাসে তা প্রচণ্ড অগ্নিনিবার জলে উঠল। আপাতদৃষ্টিতে যদিও এই অগ্নিনিবার সমস্ত বিদ্যুৎ ভয়ানকভাবে করতে পারে, তবুও পরবর্তী দিনের ইতিহাসে আলোচনা করলে দেখা যায় যে ধমনীভিত্তি তখন থেকেই সূচিত হয়েছিল। ঐ সময়ে প্রকাশিত “কলমার ও লুজবিলার” পুঁকিনের অন্তর্গত চিন্তাধারাই সমর্থক। “Ode to liberty” কলকাতার স্বাধীনতাই রচিত হয়। এই উক্ত কবিতা শেখের সমস্ত সূত্রপ্রাণ মানুষের হাতে আগুন জালিয়ে দেয়। কবিতাটি পাতুলিগণি আকারে সমগ্র শহরে প্রচারিত হয়েছিল। এবং এর কলমও স্বাভাবিক নিয়মে দেখা গেল। ১৮২০ সালের বসন্তকালে এই নবীন সাহিত্যিক হুজিগালিয়ার নির্জন প্রান্তরে নির্বাসিত হলেন। নির্বাসনকালেও তিনি বিরোধী দলের স্তম্ভ সমিতি “Green Lamp”—এর সাহিত্য গোপন সংযোগ স্থাপন করেন।

১৮২০ হইতে ১৮২৭ এই চার বৎসর তিনি কলকাতা ছিলেন। ঐ সময়ে ঊষ্য জীবনধারা নতুন এক ধাপে প্রবর্তিত হয়। নির্বাসনকালে তিনি স্থানীয় ক্রান্ত-জীবনের নিকট সম্পর্কে আসছিলেন। তাৎপর্ষ্য জীবনধারা তিনি অত্যন্ত নিপুণভাবে লক্ষ্য করেন। তাৎপর্ষ্য জীবনধারাই—ঊষ্য কলিকাতার বিষয়বস্তু হয়ে উঠে। পরবর্তী দিনের সাহিত্যে এই সমস্ত মানুষ জীবন হয়ে উঠেছে।

এদিকে তখন বিরোধীদলের গোপন কার্যকলাপ পূর্ণা-ভাবে চলছে। অন্ধকার রাত্রে তারা গ্রাম-গ্রামান্তরে চলে যায়; তাদের কার্যধারা গোপনে সকলকে জ্ঞাত করে। গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ করে, শেখের মানুষকে তারিফে তুলতে থাকে। অতি দীর্ঘ পরাক্ষেপে প্রবর্তিত হলে থাকে। পুঁকিন এই সময়ে মিথাইলস্বর্গে স্থানান্তরিত হইলেন; কিন্তু সেখানেও কলকাতাশহরের মধ্যে পো-পোনে সংবাদ পৌঁছাতে লাগল। আরো ধমনীভিত্তি ওরফে প্রবল হয়ে উঠল। সমগ্র জন সত্যাকার আবহাওয়া দীর্ঘ দীর্ঘ উত্তর হয়ে উঠছিল। সাধারণ মানুষ চত

নিঃশেষ অপেক্ষা করতিল। কিছুদিন পরেই তৎকালীন রূপ সাত্রাকোব রাজধানী সেন্ট-পিটার্সবার্গে বিস্তারের আশ্রয় গ্রহণ করতিল। সিনেট, স্বাক্ষরের এই বিস্তার অনতি-কালের মধ্যে সাত্রাকোব একপ্রান্ত হতে আর এক প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল। রক্ত কাহাংগারে বসে পুশকিন বসাসময়ে লুথ বহর পেলেন। এ বিস্তার হমন কংবাত ভক্ত রূপ সত্রাট অমাত্যবিশ্ব রক্ষণশীলি অবলম্বন করলেন; মাতৃদের কীদন অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে উঠল। বর মাপনিক পল্টর হল। আর থাকী সব চিত্রকালের রক্ত পঙ্খ হয়ে উঠল। এত পাপনিক অস্ত্রাচারেও মিনেও কবি জাহের চিত্রাচার চমক বিধানী ছিলেন। পরাক্রমের পর এ বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইল। কৈবর্ত্যের রাজতন্ত্রের অবসান উভাবিত হয়ে ওল। কবি এই সময়ে তাঁর সর্বশক্তি বিহা অধিনর্ভর কবিতা ও কাহিনী একের পর এক রচনা করতে লাগলেন। তাঁর সেই বিশ্বাসের সাক্ষ্য আজও বহর কংহে To Siberia, Arlon ও October 19 প্রদৃষ্ট কবিতাগুলি। এই কবিতাগুলি বিস্তারীতের প্রাণে অতুল্য আশার সকার করে।

পুশকিনের পুর্বোদ্যম আলেকজান্ডার সারভেভির পুশকিন। ১৭৯৯ সালের ৬ই জুন যতোর এক সন্তান পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। এই সন্তান পরিবারের পৌরুষবিশিষ্টত্ব প্রায় অস্বাভাবিক। ইতিহাসে সেবা বার যে, পুশকিনের পুর্ববংশীয়গণ বোকা ছিলেন। এমন কি তাঁহার প্রপিতামহ মহামতি পিটারের রাজত্বকালে দুঃ-বিজ্ঞান অসামান্য পাতকশক্তি ও বৈপ্লবিক প্রেরণা করেন। এবং পরে তিনি রূপ সত্রাট পিটার কর্তৃক ধ্বংস সম্মানিত হইয়াছিলেন। পুশকিনের বাবা ছিলেন সাহিত্য রসিক মাতুল। সাহিত্যের দরবারে তাঁর পতিবিধি ছিল অবাধ। জ্ঞান পিপাসাও ছিল প্রবল। তাঁর বিশ্বাস এক প্রকার প্রমাণও ছিল। বেশ বিশেষের প্রচুর বই ছিল সেই গ্রন্থাগারে। তাহী কবির শিশুকাল এই পরিবেশে পরিণত লাভ করে। আর তদনন্তর কীদনে এই গ্রন্থাগারের প্রত্যয় অসামান্য। সেই বাড়ীতে প্রতিদিন সাহিত্যের আশ্রয় বসত। সেই সাক্ষাৎসঙ্গে আসক্তন তখনকার দিনের দেয়া দেয়া জানীভী পুশকিন বুদ্ধি বা

তাঁর বাল্যকালের স্মৃতিতে বার কবা সব থেকে বেশী উজ্জল হয়ে আছে সে হল পরম দেহনীর বাড়ী আদ্যিন। সন্তান অপেক্ষে সেই বাড়ী তাঁকে প্রতিদিন প্রাচীন কাহিনী ও পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি খোঁজাতেন। সন্তান আঁখারে সে সবই কাহিনী জীবন্ত হয়ে উঠত। তাঁকে মিরে যেত অজানা, অচেনা কোন এক রূপের দায়ালোকে।

কিনোর পুশকিন ১৮১১ সালে সন্তানপ্রতিষ্ঠিত আর-সকোগলোর সাহিত্যমন্ডলে জতি হলেন। পত্ন্যমুগতিক শ্রিম সাহিত্যিক শিকার সূচনা হল এই শিকারাতনে। এই শিকারাতনে তিনি প্রায় ছয় বৎসর বিভ্রান্তি করেন। এই শিকারাতনের দান অসামান্য। তাহী বয় রূপ মায়কের সমাবেশ ঘটছিল এই পীঠস্থানে। তাহের সাহচর্য তাহের অল্পপ্রেরণা পুশকিনের আগামী কীদন-পথ চিহ্নিত করে।

পুশকিনের সাহিত্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয় এই সাহিত্যমন্ডলে বাল্যকালেই তিনি দক্ষতা ও বৈপ্লবিক পরিচয় দেন সাহিত্যের দরবারে। ঐ সময়ে তাঁর মানসভক্ত ছিলেন মহাদেবী ভলটেয়ার ওনারনে ও পরে রূপ সাহিত্যিক বাৎসকত। সাহিত্য কীদনের সূচনাতে তাঁকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করে সন্তান ও অষ্টাব্দ পত্ন্যখীর কবিতা সাহিত্য। অন্যত্র তাঁর রচনার শেকস্পীরের প্রভাবও মন্য নয়। “বোরিস গ্লুকভ” শেকস্পীরের টায়েভির প্রকার সম্বল। বারবনের ভন ক্র্যানেব প্রভাবও তাঁহার রচনার লক্ষ্য করা যায়। এ প্রদর্শে “ক্যাপটিভ অব ককেশাস” কবিতাটি উল্লেখযোগ্য।

শেকস্পীর, বরীজ্রাব বা বাল্যকাল বেদন সাহিত্যের পবিত্ররূপে পরিগণিত হয়ে থাকেন, পুশকিনও সেইরকম রূপ সাহিত্যের অন্যক বলে বিবেচিত হন। পরবর্তী দিনের সাহিত্য আলোচনা করলে এটা বেশ বোকা যায়। জুর্গেনিভ, টলষ্টর, গগল্যভ প্রমুখ সাহিত্য মহারথীগণ তাঁরই নির্দেশিত পথে গগ-চারণা করেছিলেন। স্ত্রাচাচীন জাতীয় ঐতিহ্যের যোগ্য সাধকরূপে আজও তিনি পুজিত হয়ে থাকেন।

শ্রিতিক কবিতা রচনার পুশকিন স্মরণীয় ছিলেন। তাঁর মনিক শ্রিতিক কবিতাগুলি প্রথম প্রেরণ। এই

১. রূপ সাহিত্যিক পুণকিন

সিদ্ধিক কবিতার প্রাঞ্চাল উপরবর্ণ "রূপলাল ও লুচমিলা" কবিতাটি। ছুটি সর্গে রচিত এই নীতি-কবিতাটি রূপ সাহিত্যের অন্ততম স্রেষ্ঠ অধর রচনা। স্বাভাবিক-বোধ ও রোমান্টিক ভাবধারার পরিপূর্ণ সহস্র সাহিত্য হয় এই কবিতার। রূপস, বর্ণিত, জাতীয় জীবনের অধরান সুপ্রতি হয়েছে এই নীতি কবিতার স্বরূপে প্রত্যেক।

পুণকিন রূপসিয়ার প্রতি প্রান্তর হতে তার সাহিত্যের পাবের সংগ্রহ করেছিলেন। সমগ্র রূপ সমাজের সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। ককেশাস, ক্রিমিয়ার ও সিন্ধুদেশের বিনতপিত্ত তার স্রেষ্ঠ কাহিনীগুলি রচিত হয়। "ক্যান্টিক অব ককেশাস" ককেশাস জ্বলন্তে রচিত হয়। এই জ্বলন্ত সেনাপতি রেড্ডি তাঁর সঙ্গী ছিলেন। এই উপভাসের বিবরণের অত্যন্ত রোমান্টিক; রূপ অফিসের বক্তা ককেশীয় এক তরুণীর প্রণয় কাহিনী এই উপভাসের বিষয়বস্তু। "ক্যান্টিক অব বাতীসিয়া" এর অগ্রভাগ পরেই রচিত হয়। ক্রিমিয়ার বার, দিবিবে এক পোলিশ যুগের বকীলদার কাহিনী এতে বর্ণিত হয়েছে। "দি কৌনসিস" কবিতাটিতে তৎকালীন রূপ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষণিকা বর্ণিত হয়েছে। রূপসার স্বাধীন এই রচনাগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণভাবে উল্লেখ্য। পরবর্তী কালে পৈতৃকগ্রাম বিবাহিত উভিতে অকস্মিক বাক্যবাহিনী তিনি অসংখ্য যুগোত্তর প্রবন্ধ ও উপভাস বানীকর করেন। "বোবিস পল্লভক" এই সময়ে রচিত হয়েছিল। দেবস্বামীীর পদ্ধতিতে রচিত হতে এই বিবোপাত-নাটকটির জন্য সমগ্র লেগেছিল সুদীর্ঘ আট বৎসর। রূপ সাহিত্যের অন্ততম স্রেষ্ঠ এই উল্লেখিত সাহিত্য, পাতাশা ও কনমানবের অতীত বিদ্যেবৎ ছবি বহু বিস্তর হইয়াছে। স্বাভাবিক লোক-নাট্যের সমা-রসি এই নাটকটি। কালের ও দেশের চরম নিয়ন্ত্রণে জনসাধারণ এই নাটকে বর্ণিত হইয়াছে। পুণকিনের বোবিস পল্লভকের বিবোপাত ভাষা অনুসরণে নিকট হইতে বিহিত এক শাসকেরই বর্ণিত বিবৃতি। অসংখ্য উপভাস "দি মিলো অব শিটার হি প্রেট" এর মধ্যে রূপ-ঐতিহাসিক উপভাস সাহিত্যের প্রাচীনতম হয়। লোক-স্বাভাবিকতার দাঁতে লেগা "পোলপাতা" কবিতার ও পরে "দি ব্রোজ হস'গান"-এ পুণকিন আর একবার প্রথম শিটারের ঐতিহাসিক ক্রমিকারে বিবরণের কং শিটারের স্ববিরোধী চরিত্রের মধ্যে আরও গভীর ভাবে অঙ্গপ্রস্থের করেছেন।

১৮১১ সনে পুণকিনের আর একটি প্রাচীনতা রচনা প্রকাশিত হয়। রচনাটি হল "ইউজেনি ওনেগেনি; রূপ-কনকীসের বিবৃতি। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়

দশক এটির রচনাকাল। সুদীর্ঘ আট বৎসরে রচিত এই উপন্যাসটি সম্পূর্ণ প্রত্যেক যুক্ত হয়। "রূপ জ্বলন্তে" ছাড়া কিছুটা যেম এর উপর পড়েছে। সে বাহ্যিক হইক, এই মহৎ স্বাভাবিক রচনার কবি রূপসিয়ার জনজীবনের বিভিন্ন বিক, অস্বাভাবিক অঙ্গসহস্রাণ সাধারণ মানুষের অতিশয় সম্প্রদায়ের উল্লেখ জীবন তীর যের ও বক্তব্যসি সহকারে বানীকর করেন এই জ্বলন্ত উপন্যাস বানিতে। তাহিহান এই উপন্যাসের নারিকা; তার বুদ্ধিভক্তি ও নীতিবোধ স্বতন্ত্র। পরবর্তী যিরে রূপ উপন্যাসিকপণের রচনার এই নারিকা পরোক্ষ প্রত্যেক পরিপাকিত হয়েছে। এই মহৌসনী নারী সমগ্র রূপ নারী সমাজের প্রতীক। এ উপভাসের আর একটি লক্ষণীয় চরিত্র ওনেগেনি। উনবিংশ শতকে রূপ অধর সাহিত্যে বাহা যথেষ্ট ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তা সত্ত্বেও আরের আহলে প্রতিভা সুবর্ণের সুবর্ণে পায়নি—সেই সমগ্র "অস্বাভাবিক অলভ্যবৎ" আর একটি কবিত্ত প্রকাশ এই ওনেগেনি চরিত্র।

সাধারণ মানুষ, তার বৈশিষ্ট্য জীবন, তার ভাল লাগা, মন্দ লাগা, তার ছোট প্রাণের ছোট কথা—এই সমগ্র সর্গ প্রথম প্রকাশিত হয় পুণকিনের সাহিত্য—রেলকি-মসের গল্পে। পরলোকগত ইহান্দু পোহোতিং বেলকিনের গল্প গুলি বেলকিনের প্রায় ১৮০০ সালের সেক্ষেত্র, অতীতের মাসে রচিত হয়। এই বিনতলি কবিত সর্গপেকা করি বহুল সমাজগণ গণ্য হয়ে থাকে। রেলকিনের গল্প ছাড়াও পুণকিন এই সময়ে, ছোট বিবোপাত নাটকগুলি, কালোদার ছোট বাড়ি, রবিব্রিনো প্রায়ের ইতিহাস রচনা করেন। ছোট গল্পের সংজ্ঞা অনুসারে রেলকিনের গল্পগুলি পুণকিনের অন্ততম সেরা ছোট গল্পের পর্যায়বৃত্ত।

কিছু শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবন মোটেই সুখের হয় নি। নাতালিয়া পরকারভের সহিত বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। এই চট্টল, চপল মহিলা সমগ্র বিনোদিত নাচগানের আগে ব্যস্ত থাকতেন; আনন্দ লাভ ও আনন্দ বিভবই তাঁহার একমাত্র জীবিকা বলে মনে হত। এই মহিলা কবির ব্যক্তি জীবনের যথেষ্ট অংশজির কারণ ছিলেন। কবিও অল্প বৈশিষ্ট্যের গল্পের বোধ্যান করবার আগে কিছুকাল নাচ গানে কিছুটা মাতামাতি করেছিলেন।

এই সাহিত্য-রবীর পশিমানান্তি কিছু যেমন করণ তেমনই আশ্চর্য। নোবোলাও হুভাভাসের বর্ণিত জীবনের সহিত সম্বন্ধের ফলে এই মহানারকের জীবনকীর সহস্র নির্বাণিত হয়। তখন তাঁহার বয়স মাত্র পঁচাত্তর।

পদ্মা ও ঘনানা দুই

বোন—আপন মাসভূতো
বোন। ঘনানা গৌরাণী
মহা ও শাশু—পদ্মা
শ্যামাশীচকস বদমাশ্য-
মুখরা। কলেজে যেন
ওগা তুতাই বার্ষিক
হেলোতে পড়ে—তখন
ওদের সঙ্গে আমার
পরিচয় হয়। একঘানা

পদ্মা ও
ঘনানা
বিক্রম সত্যকার



মাসভূতা ঠানক সংসারপথে অধ্যাপনার কব'প্রার্থীর
বিজ্ঞাপন বিবেচিল। ছাত্র কিম্বা ছাত্রী পড়বার
জন্যে। দুই জায়গাতেই আবেদন করলান। তাক
এল দুই জায়গা হতেই। একটি মেয়ে পড়তে চায়
কু'বীতিত আর একটি মেয়ে পড়তে চায় ইতিহাস। দুটি
জায়গাই গ্রহণ করলান—খির করলান এক বাড়িতে পড়াব
দু'কালসেদা আর এক বাড়িতে পড়াব সন্ধ্যার পক্ষে।
বর্ষও একটি মজার কথা এই যে, মেয়ে দুটিকে পড়াবার
জন্যে দুইজনকে অভিভাবকের কাছে যে বৈতন চেষ্টেছিলান
ওদের দু'জনকে অভিভাবকই তাই দিতে প'কৃত হ'লেন।
তখন চন্দনতাম না ঘালের শিক্ষকতা গ্রহণ করলান তারা
এই কলকাতার উত্তর ও পশ্চিম প্রান্তের অধিবাসী হলেও
ওদের দু'জনকার মাসভূতের দিক থেকে সম্পর্ক আছে—
ওগা মাসভূতো বোন। ঘনানা গায় আমার কাছে সকাল-
সেলার দিকে ইতিহাস পড়ে। পদ্মা চৌব'রীকে সন্ধ্যার
পড়াই—অর্থনীতি। ঘনানাকে ইতিহাসের গল্প বলি সে
হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে তাই শোনে—আর
মাঝে মাঝে ঝাঁক কাত করে একাইছ ব'কে লাল লেডিক
কাউন্টেন যেন দিখে বোটা লেখে। সন্ধ্যার পড়াকে অর্থ-
নীতি-তত্ত্ব বোকাতে গেলে সে তর্ক করে বলে কীলসে—
ও তো ক্যান্টোনীজের দালাল—ওর লেখা কেন পড়ব।
আপনি আমাকে মার্কস পড়ান—মার্কসের খিওর ব'কিয়ে
দিন। সশিভত হয়ে বাই ছাত্রীও দু'য় প্রাতিবাসে ও তার
মানসিক তীক্কায়। একটু চুপ করে থেকে বলি
তোমার আজকের পাঠ্যবিষয় মার্কস নয়—কীলসে।

লেশ আমি যেন
তোমার অধ্যাপনার ভার
নি যে ছি—তোমাকে
যেন পরীক্ষার জন্য
প্রস্তুত করে দেব তোমার
জানব'ছির সভাবক হ'ল
তখন নিচুই ব'কিয়ে
দেব—আজকের দিনে
মা ক'লেগ চেয়েও
কী ন'বেত তত্বের

প্রয়োজনীয়তা কেন বেশী। ব'কিয়ে দেব ঘনানা
ইকনমিক্সটলের মধ্যে মার্কসের নৌলিততা কোথায়—।
পদ্মা কিছু বলে না। ওর চোখ দু'টো রোদ-বাঘা হুঁর
কলার মত চক চক করে ওঠে। বিদ্রোহী বোটারে মত সে
ঘাড় বোঁকছে note নিতে থাকে।

এমনি প্রায়ই ঠোকাঠুকি হতে থাকে পড়ার মধ্যে। ঘনানা
নিঃশেষে শ্রীভার করে দেব আমি যা বলি ওদ'চোখ দিয়ে
আমাকে গেলে ও উৎসর্গ হয়ে আমার কথা শোনে, মনে
করে আমি যা বলছি এতে কোন ভুল নেই। আমার
কথা যেন আশ্রয়াকার মত অজ্ঞায়। পড়াতে পড়াতে
কখনও বই বন্ধ করে ওকে ছিজালা করি তোমার কি কোন
প্রশ্ন নেই? ও আমার চোখে চোখ তেখে থাকে কিছুক্ষণ
—ভারপর চোখ নত করে বলে—না। এমনি করে ওদের
দু'জনকে দু'বেলা পড়াতে লাগলান। টেটে ওগা
দু'জন ভালভাবেই উদ্ভীন' হল। শিক্ষক হিসাবে
দু'বাড়িতেই বাড়তি বাড়ল। দু'বাড়িতেই অভিভাবক
আমার পাঠ্যক্রমিক আরও ২৫ টাকা করে বাড়িয়ে দিল।
খঁড়ি কটার মত ওদের বাড়তি বাই আমি। দু'টির দিন
মন্টা যেন কেমন কীকা কীকা লাগে—বলে হয়
বাই ওদের দু'জনকার বাড়িটা একটু ঘুরে
আসি। কিন্তু কোথায় যেন একটা বাবো বাবো
ঠেকে—। যাওয়া আর হয় না। ঘরে বলে বলে
লেখ পড়ার মার্কসানে ওদের দু'জনকার কথা মনে হয়—
হ'ল পড়ে একটি শাশু—আর একটি দু'য় দু'য়।

সে দিন ঘনানাকে পড়াতে গেছি—চাকর এসে পড়ার

আমার যে আয়টিটি হারিয়ে গেছলো সে আয়টিটিও কথা শুনের কাউকে ও আর ভিজ্ঞাসা করি নাই । যে স্পর্শ আমি পেরেছি যে স্পর্শ আমার চিত্তকে সোনা করে দিয়েছে—সে সোনার মূল্য এ হাতের সোনার চেয়ে অনেক বেশী ।

সেদিন হঠাৎ পত্রা বলে বলল—আজ পড় না বাস্তার মশার ভাল লাগছেন। চলুন সিনেমার যাই, গিনেমা । একটু অবাক হবে ওর মূখের দিকে চাই । হ্যাঁ সিনেমা । লাইট হাউসের দু'খানা টিকেট কিনে রেখেছি—মা-বাবার মতও নিজেই আসনার সঙ্গে বাবার । তারপর হেসে বলল—ভেন বা কি দরকার ? আগমি তো আর বাস-ভাঙ্গুক বন—আমাকে খেতে কলসেন । দু'ঘনে পানাপানি গিয়ে হলান সিনেমার দাঁটে । হবি আরম্ভ হল—গলবহীন দৃষ্টিতে তাই দেখছি । গল্প-অভিনয় কোন কিছুই বাবার দ্বারা চোখে যা—মতও স্পর্শ করে না । আমার সেখানের তন্দ্রাপ্রসূতা শব্দ ভীক অনুরণিত হতে থাকে । বিজ্ঞানের দ্বারা আমরা “কোল্ড ক্লিম্পের” লাউজে গিয়ে হলান—ওয়েটার দু'টো বীয়ার দিয়ে সের—আমরা তাইভেই আতে আতে চুমুক দিতে লাগলাম । কেউ কোন কথা বলছে না—চুপচাপ । যাকে যাকে আমি পত্রার মূখের পানে চাই—সেই ওর চোখে কী বেন একটা দু'চুঁমির ছাপ চিক্‌চিক্‌ করছে ।

সেকেন্দ বল পড়ল—আগে-পাশে যাঁরা বাচ্ছিল ভাড়া ভাড়াভাড়া উঠে চলে গেল । কীকি হয়ে গেল লাউজ । পত্রা তখন তার ভেলভেটের ডায়ালিট ব্যাগ থেকে বের করলো আমার সেই ধারানো আয়টি—আয়টিটা টেবিলের ওপর রেখে আতে আতে ক্যামেরার গুলি ঢালার মত এগিয়ে গিয়ে বলল—আপনার আয়টি, চক ভেলসে যায়—চাল্পা হয়ে বসি । কি হবে এ আয়টি দিয়ে । এ আয়টি তো হারিয়ে গেছে । চাঁপার কপির মত একটি আয়তল আমার দিকে এগিয়ে বিয়ে বলে পরিচয় দাত—তোমার আয়টি কত হোক । আতে আতে ওর কোমল হাতটি আমার বিয়ের হাতের মধ্যে ঢেপে ধরে চাঁপার কপির মত আয়তলে আমার আয়টিটি পড়িয়ে কই । আমারই মূখ এত কাছাকাছি এসে গেলো যে ওর দ্ব্যবসার উকতা আমার কান স্পর্শ করছিল । হাস এ

পর্বত । আমার আর সিনেমা হলে কিরে গোলম না । বললাম গিরে চাহুরিমা লেকের একটি বেঞ্চে । আমার কোলের উপর মাথাটা রেখে ও শূন্যে পড়ল—আমি তখন আতে আতে ওর মাথাটা তুলে ধরে ট্রীটে দৃষ্টি চুম্বন এঁকে দিলাম—ও কিন্তু তার প্রভুত্ব দিতে কান্দ'গ্য করল না । বসন ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিলাম তখন হাত ১২টা । ঘরের মূখের দিকে চেয়ে মা-বাবা কেউই কিহু বলল না । আমিও নতমতকে গিরে টারিয়েত বললাম ।

মাগ কয়েক পরে ঘরুনারে জানালার আমার বিয়ের কথা—পান্দু ক' বাবল করল ছাত্রীর মূখ । তারপর জান হেসে বলল ভাতী আনন্দের কথা । অবৈতুকী কয়েক ফোটা চোখের জল মূকোর মত গড়িয়ে পড়ল ঘরুনার দু'পাল বেয়ে । ওর হেঁকে হুটে পালান ।

দু'বাড়িতেই পড়ানো ছেড়ে দিলাম । বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেল, চিঠিও ছাপানো হল । কিন্তু পাড়ী সেদিন হঠাৎ বেঁকে বলল । বলল—মাগর তোমার আমি বিয়া করব না । আমার ঘরের উদ্যমতার তোমার ব্যক্তি-সভা ভেঙ্গে গেছে । তোমাকে আমি বিয়ে করব না—জেনেছি একটি ঘরে তোমার ভালো বাসে ।

হুড়ের মত দ্রুত করি—কে সে ? মদ্য একবারি শোভিতকর্ত' নাইয়ের কটো আমার চোখের মাঝে হুগে ধরে বলল একে চিনতে পার । ছাত্রীর বিবি ঘরুনা—বড় পাগল বেরে । মদ্যও বিবিয়ার আশা কৈশোর জীবন থেকে ওর হৃদয়ে আত্ম করছে । সে তট হুড়ো—সে চার তার প্রেম-ভালোবাসা দিয়ে সেই তটকে প্যামল উঁক' করতে । আর আমি পত্রা—ভালুই আমার পালা । উদ্যমতাই আমার শব্দ । আমার ভালোবাসা শব্দ ভালুনের দোয়ার সেতে থাকে । আমার ভালোবাসা তোমাকে পলি হয়ে থাকবে । বদ্যার জলের মত বর ছেঁকে বেঁচে গেল পত্রা । গিরে হাঁড়িলাল ঘরুনার কাছে—বললাম আমারে প্রেম কর । আমার ভালোবাসাকে বিশ্বাস কর ঘরুনা । কোম কথা বলল না, আমার হাতখানি ঢেপে ধরে বলল—চল মা-বাবার কাছে যাই । ওর চোখ দিয়ে ফোটা ফোটা জল দু'পাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল । বললাম কীকি কেন ? বলল পত্রার জন্য বড় কষ্ট হচ্ছে ।



১৯১১ সালের ২০শে
মে। লন্ডনে ডাইজোসের
মানদায় রায় বার হল।
বিচারপতি বারক্রেভ
উইকলি বনাম উইকলি
এবং লরেন্সের মানদায়
বিবাহ-বিচ্ছেদ মন্তঃর

লেডী চ্যাটার্লির লেখক

হানি পমোশাখ্যার

নবন পথিা মায়ে ।
গাপনাগোর সঙ্গে
তুলনার অনেকই লরেন্সের
এই লেখিকাও জীবনকে
সাহিত্য সৃষ্টির নিক বার
বলেছেন। কিন্তু আমরা
প্রতি-বাতির দৃষ্টিতে

করলেম। লরেন্স আর আমার জীবনের একটা বিশেষ
স্বত্বাধার ঘটনা দেখে নেই। সেদিন মনে হয়েছিল
ভাগ্য বৃষ্টি এবার প্রসন্ন হবার মূহুর্ত। এমন কত
আকাংক্ষাময়ই না আমার রচনা করি, কমলায়
জীবনযাত্রের জীবনকে নিজের মনের মত করে গড়ে নিই।
তাই সেদিন শেষেও ভাববার অবকাশ ছিল না যে
লরেন্সের জীবনে ভাগ্যের নির্ভরতা সেলা পূরুর সেই
দুঃখপাত। অবকাশ ছিল না, মেনন অবসর ছিল না
জানবার ইউরোপের আকাশে ঘনীভূত কালো মেঘের
আঁচর।

অবশ্য ভবিষ্যতকে জানা যায় না বলেই বর্তমানের
আনন্দটুকু মিশ্রণে উপভোগ করা যায়। আমরাও
তাই করেছিলাম। প্রবাস জীবনে ইতি করে ত্বরিতে
সাত্তা বিশার মতন জীবনের ইদারায়। সংসার
সৃষ্টিতে আমার পথে মেয়ে পড়লাম, লন্ডনের পানে
প্রসারিত পথ। সেদিন থেকে লণ্ডন, পথ দীর্ঘ নয়,
কিন্তু সেদিনের সেই পরিকল্পনা ছিল সৃষ্টির ভারে
মহর। যা হলেই অবশ্য বিখ্যিত হবার। আটমাসের
জীবনে দু'কয়েকই সেদিনের সঙ্গে আর্থেটিক্যাল বার
পড়ে গিয়েছিলেন। লরেন্সের সৃষ্টির জোতে কিং
জিটা পড়েছিল ঠিকই, কিন্তু উঠান হয়েছিল সামাজিক
প্রতিষ্ঠার অভাবিত অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে। এক
কবার অমন নির্ভর নির্ভর হবার পক্ষে অভিনব
পরিবেশ বলা যায়। স্পেন্সারের কম্পান স্যার টমাস
ডানলপের সঙ্গে বন্ধু হয়েছিল, প্রীতির সম্পর্ক গাঢ়
হয়েছিল আইভিসো'র সঙ্গে। আইভিস তখনও অবশ্য
বিখ্যাত রায়নীতিবিদ ম্যাক্সিম পিট্‌ভিনভের দ্বারা
হন নি। এ দ্বারা আরও কত অভিজ্ঞতা হইবে আরও

কতকালেই কি কম্পেনের সমাধানে আশা করা যায়?
বীজ বৃক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বি কি নবন মেঘের পথ চেয়ে প্রতীক্ষা
করে না? লরেন্সের জীবনে সেদিনও সেই প্রতীক্ষার
প্রহর পক্ষা; বনসৃষ্টির সমাধানেই লন্ডন হবার পূর্ত-
বৃষ্টিভের সাধনা। আগামী দিনের লেখক পিকারো,
অরেল আর প্রুতের পথিকত। যে শব্দ ভারউইন,
মাক্স, আইনস্টাইন আর ক্রয়েজের মনোমার পান নিলে
হুশাকরের প্রতীকার। ১৯১০ সালের ইংলণ্ডে বসে সেই
আগামী দিনের, আধুনিক সমাজের বাস্তব চিত্র আঁকার
অন্য প্রকৃতির প্রয়োজন ছিল যে কি। লেডিসের পথ
হয়েছিল সেই প্রকৃতি।

সৃষ্টির পাতার স্বত্বাধার সেলা দিনগুলোয় কথা
ভাবছি আর চোখের সামনে হাজারবিধ মত ভেসে
উঠছে ঘটনার পর ঘটনা—২৭শে জুন, ১৯১০ পনিবার
লন্ডনের হলোড প্যাকের পার্টি; হুশার্ট ব্রুকের সঙ্গে
পরিচয় হল। তারপর কেন্‌সিংটনের বিনগলো।
ক্যাম্পবেল আর বিয়েহিগের আতিথেয় ভাববার হো
বিশেষ কিছু ছিল না। প্রকাশক বস হয়েছিল, গার্ডে
আর ডাক্তারগার্ডকে মেয়ে পিকারের মধ্যস্থতায় মেয়েনে
The Rainbow প্রকাশের জন্য প্রকৃত হুজল। হাতে
প্রথম মেয়েদের আগাম মেগা তিন পো পাউণ্ড।
রাজার হাতে মেয়ে, মেয়ে, বাইরে নির্দিষ্ট কাটাঙ্কিল
লরেন্স। প্রত্যহ পতিচিহ্নের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে গিয়েছে।
চলছে ভাঃ ভেতিভ এডার আর বারবারো লো-ন কারে
ক্রেতার মনত্বের পার্ট মেগা।

১৯১০ সালের ১৫ই জুলাই: কেন্‌সিংটনের
রেজিষ্টার অফিসে আমার সঙ্গে লরেন্সের বিয়ে হল।
স্বাক্ষরিত বারি, ক্যাথলিন আর ক্যাম্পবেল। কারে

৫

অভিবে পড়ে কোরি নার্শ' আদতে পারে নি। রেভিস্টার অফিস থেকে বাড়ি ফিরেই লরেন্স মিসেস হপকিন্সকে লিখল "বেশ দুর্ভাগ্যবশত, সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিশেষভাবে যোগাযোগে। হঠাৎ নতুন নান্দনিক পরিণত হয়েছি বলে হয় না, তবে বোধহয় হয়েছি।" আর একটা চিঠির কথাও মনে আছে যাতে লরেন্স লিখেছিল "তুমি কি মনে কর বিয়ে হলোই প্রেম সম্প্রদায়ের পাথ? মোটেই তা নয়। তোমার স্বামীকে অন্তর দিয়ে, সে বিশেষকণে বড়টা জানে তার চেয়ে বেশী করে জানতে হবে আর সে তোমাকে বড়টাকে কেনেছে তা স্বীকার করে নিতে হবে।...এই জীবনে তোমার একমাত্র এবং একান্ত প্রয়োজন হচ্ছে স্বামীকে ভালবাসা? নিঃসন্দেহে বৈ আর তা সম্পূর্ণ স্বর্ণপদমে দার সার্থকতা। এই হলোই অন্তরে গতি আর মনে শক্তি পাবে, তা জীবনের অপর অনেক কথা, বিশেষকণে বড়ই কেন গমলি হোক না। এই পাণ্ডিত্য দার পাক্তির দ্বারা তোমার কন'শক্তি হবে অব্যাহত, দুষ্টির দ্বারা হবে অবিরাম..."

হয়তো দুঃখ কথার কথা লিখেছিল লরেন্স অথবা এই মতো ছিল ওর অন্তরের অনুভূত সত্যের প্রকাশ। রূপা সেদিন ওর দুষ্টির দ্বারা অবিরাম হবার কোনও লিখিত ছিল না। তখনও The Rainbow উপন্যাস লেখা, পরকণে ব্যতিত করা এবং আবার নতুন করে লেখা চলছিল। সংগ্রহ করে রাখলে এই একটা উপন্যাসেরই আটটা সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাওয়া যেত। বিবাহ দ্বার লেখা হয় নি বললেই চলে। মনে পড়েছে, ১৯০৭ সালের এপ্রিল মাসে লেখা হয়েছিল "Sad Landenzio"। তারপর বছর তিনে চল, ১৯১৪ সালে টেম্পল কেনসিংটনে লেখা হল "One Woman to all Women"। সেই One Woman তো আদর্শই, কবিতার ছে ছে তো আবারই কথা :—

If you knew how I swerve in peace,
In the equipose
With the man, if you knew how
my flesh enjoys,
The swinging bliss no shattering bliss
ever destroys,

Beyond compare :

You would weep to be lapsing
on such harmony
As carries me, you would wonder
aloud that he
Who is so strange should correspond
with me

Everywhere,

You see he is different, he is dangerous
Without pity or love,
And yet how his separate being
liberates me
And gives me peace..."

হ্যাঁ, সেদিন সত্যিই অপর গতি চলে ছিল আবার অন্তর জুড়ে জীবনের সেই অশ্রু' অভিজ্ঞতার কথা, অন্যস্বামীত্ব দুঃখে কথা সঞ্চয়কে বলাবল নয়। দুঃখ বা বেদনা, অত্যাচার আর অভিযোগ আমাদের দুঃখকে দিয়ে ছিল না এমন নয়। ব্যক্তির হৃদয় পূর্ণ' বার বার শিথিল হয়েছিল আর বার বার সেই আর শান্তনা নিয়ে পানে বাড়িরেছে লরেন্স। এ্যাটর্নি'র অফিসে ছেলে-মেয়েদের বৃকে নিয়ে কে'য়েছিল। বিবাহ দুঃখে তারা কিয়ার নিয়ে চলে গেছে, আদি চোখের মলে ভাগতে ভাগতে বাড়ি ফিরেছিল লরেন্সের হাত ধরে। সেই দুঃসমনে ছিল অন্তরে গরম শান্তনা—জানি বহু আদি তোমার কাছে যে হাতখানি। থেকে থেকে তামস-সত্যার বেশ আচ্ছন্ন করেছে আমাদের আনন্দের আকাশ। কলহের বিবে অক্ষয়িত হয়ে দুঃসমনে জ্বলোই কত দিন আর রাত, বিশেষকণে দিন, বিশেষকণে রাত। কত উপহাস লরেন্স করেছে আমার বাবার অশ্রুকে বেঁধে করে। ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে হয়ে ইংলণ্ড আসবার পথে বাবাকে অশ্রু' দেখে এসেছিলাম, সেই শেষ দেখা। লরেন্সের নির্ভর আধাতে তবু বাবা পড়ে ন। কলহের আগুন পড়েতে পড়েতে, আঘাতের বা মনে মনে

আমাদের বন্ধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে। আমার মনের কথা চিনে নিয়ে লেগেন পুত্র কবিতাই লেখেন, সার্ব প্রচার আমাকে ও কবিতা নিয়েছিল সম্পদে আপন করে।

১৯১৪ সালের ৩০শে জুলাই: আমি সোয়েডের বাড়িতে কাব্যসাধন, সাহা বধায় কবির লড়াই হল। জিভার্ট অ্যান্ডিটেন আর তার স্ত্রী ভো ছিলই খার ছিল একাধিক ভরণ কবি। বেশ কেটেছিল ক্ষাতি। ইউরোপের বাড়িতে লড়াই-এর সম্ভাবনা তখনও সম্ভাব্য, অতঃ এইসব কবিরের কাছে। পুরাতন গভাম্পাতিক জীবনের জীবিত সত্য কাব্যের পাখার গুণ তিনে সেদিন উড়ে গিয়েছিল ভারতেও আত্ম' লাসে।

১৯১৪ সালের ৩১শে জুলাই:—নবদল জু, কোটেসিয়ামপিকর মণে লেগেন লেক অকলে বেড়াতে গিয়েছে সেল। ক্রিস এই আগুণ। ইতিমধ্যে ইউরোপের দেশে দেশে বুকের ধানবা বেছে উঠেছে। সারা ইংলও জার্মানির বিরুদ্ধে সার সার রব উঠেছে। বিশ্বব্যাপী প্রথম মহাযুদ্ধের সেই পূর্বে।

ইতালী কিত্তে বাওয়ার সম্ভাবনার ধর্ম জেন গডল। ইংলও। জুড় পরিগণিত বর্ণী হল লেগেন। তাকাতাতি ব্যাকহানপায়ের চেনালে একটা খর বেঙা হল। আর্থিক অনটন তখন আমার প্রকট হয়েছে। ২:০০ের বিন আমার ঘনিবে আগার অশেষ। লেগেন বিশেষ বিচলিত হয়েছিল বলে যেন পড়ে না। মোট কথা বুঝতে সেদিন ওর মনে কোনও গাভা তোলে নি। আর সভা ভুললেও বাইরে তার কোনও প্রকাশ ছিল না। ১৯১৪ সালের আগস্ট থেকে ১৯১৪ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত চেনালের জীবন। সিঁথিয়া এ্যাস্কুইথিতে লেগেন গিয়েছিল 'আমার আত্মা এখন কবির লড়াই—বৃত্ত ন্য. শব্দে বহু হিন্দীতল আত্মা একটা বিরাট পাখরের তলায় চাপা পড়ে আছে। এই অবস্থার আমার কাছে কিছুই অতিক্রমই কারন আমি নিয়ে অতিক্রমিয়েছি। কিন্তু আমার বৃত্ত, জীবন—আমার অবস্থার অবশেষিত হয়ে পড়েছিল—কিন্তু সেই অবস্থার প্রতিটি বৃদ্ধিতে অতিক্রম করেছি যে আমার আত্মা লড়াইয়ে উঠল।

সেন্টেম্বর মাসে পিন্ডারকে লিখল 'টমাস হার্ডি' সম্বন্ধে একটা বই লিখব ঠিক করছি। হার্ডি অনেক বই পাঠিয়েছে, হার্ডি'র বই এবং হার্ডি'র বই-এর একাধিক সমালোচনা। এই বুকের সম্বন্ধে মনে যে কোববলি জলছে তারই প্রকট বিশ্লেষণ আমার এই প্রকট। মনের এমন অবস্থাই বোধ হয় আমার দিকট প্রতিবেশী পাখ, ভর এই বৃত্তে নিয়ে কিছু লিখবার অনুভূত।" অক্টোবরে হ্যারিয়েট মনরোকে লিখল "জার্মান বুলেটের মূখে অকারণে, ত্রেক মেনাঙ্কলে বিসর্জন দেবার পক্ষে আমার জীবনটা অনেক বেশী বলাগান।"

এরনি কথার কুলকুতি, লেখার কোমরা নিয়ে বুকের এই প্রথম পর্বে নেতাইল লেগেন। ইতিমধ্যে একবার বেশ অনুভূত হয়ে পড়ল। চেনালের আবহাওয়া ওর সর্বা হাঁজল না, বাড়িটার অস্বাভাবিক পরিবেশে হাকিয়ে উঠেছিল বোকার। কিন্তু তখন মনের বহু পরিবেশ বুকে মরে যাবার রঙ্গ নেই। বিখ্যাত সব ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হচ্ছে কিন্তু পুত্র প্রদর্শন তো শেট ভরে না, পুত্রবংশীর আলোচনায় তো অভাব ঘোড়ো। বরক সেজে চলে: বহুদিন দত্ত মনে, মন থেকে লেগারচিত্রা তত দূরে মরে যায়। বিখ্যাত স্যার ডেমস্ ব্যারী এসেন, আলাপ করলেন তারপর কিছুদিন পরেই পা খাডাল লিলেন। আর্থিক অবস্থার আলোচনা বোধ হয় আউলভোর মনোভূত হয় নি। অ্যানি সোয়েল আর্মেরকা থেকে নিরানিত লেগেনের বোঁক নিত। মনে মনে কিছু আর্থিক সাহায্য পাঠাবার ইচ্ছেও হতো ছিল। লম্বার পারে ট্রি, পুঁববতে' পাঠিয়েছিল একটা স্মৃতির টাইপগাইটার। বুধী কদমল লেগেন উত্তরে লিখল 'টাইপগাইটার পাওয়ার সম্ভাবনার আমার যে কি আনন্দ হয়েছে। এতদিনে একটা মনের বহু ধরন সেলাব।—আমি ওটাকে মহামূল্যে রাখব বহু করে রাখবো। এতদিন বসেছি যে পুঁববতে আমার নিম্নশ একটিনা সম্ভাব্য আছে, একটা দুপোর ঘণ্টা—গাভা কথাই বলেছি। এখন টাইপগাইটার যোগ হয়ে সম্পত্তির সংখ্যা বর্ধিত হল। এখন নিজেকে বর্ধিত করতে পারি।—"

১৯১৪ সালের ৩১শে জুলাই:—নবদল জু

বেঙ্গল! লিখিত মতই নির্বিকার। তা না হলে Royal Literary Fund থেকে পঞ্চাশ পাউণ্ড দান হাত পেতে বড় শারদো না।

অভাব আর অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে দিন কেটে গেল। ডিসেম্বর এসে গেল। বড়দিনের আনন্দকে ছেঁয়ে কালো ছায়া এসে কয়েছিল। তবু প্রকৃতিতে নব উৎসবের রেখা যে ছিলনা তা নয়। বান্দ্যের ভাব অভিজ্ঞতাকে অগ্রাহ্য করে কাল অগ্রসর হয়, হৃদয়ের চান্দাচান্দিকে উপেক্ষা করে আকাশে বাতাসে পড়ে পড়ে আশ্রয় উৎসবের আভাস। ঠিক তেমনি হুন্সিন জীবনের একটি সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে বেঙ্গল তার নিজের গভীর গভীরে হাসি, কথা আর স্নেহ নিয়ে বসেছিল। চিঠি লিখত, এখানে দেখাবে। প্রতিষ্ঠিত অপরিচিতকে। ১৮ই ডিসেম্বর অ্যান্থনি মারেলকে লিখল "পত পতনু তোমার চিঠি পেয়েছি। তুমি ছাড়া দিশান্ত দূর পেয়েছি। এত ভেঙে ভেঙে কাগজ কি?—তোমার কবিতার বই নিয়ে কান্নাঝে কান্নাঝে বিরক্ত মনোযোগের মধ্যে নিশ্চয়? কিন্তু ওতে ভাববার কি আছে? ওই সব কুয়ে মনোযোগের তা এমন করেই থাকে। মনোযোগেরা যে দেখকের লক্ষ্য মনোযোগ করবে নিজেকে তার সমান লোক প্রতিপন্ন করতে চায়। কিন্তু মনোযোগের পক্ষে সম্পর্কের লোক হওয়া তো দুঃস্বপ্ন, তাই লোককে বীড়না করে তাদের চলে না। ওর একমাত্র কাল কোন মনোযোগই নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু অস্তিত্ব স্বীকার করতে নাগর। আর তার কলে আমরা লোকেরা কুয়ে মনোযোগেরা তাকে বড় কিছুতেই হতে পারি না। সুতরাং ও নিয়ে দুঃখ করা না। নিজের নিজের উৎস থেকে উৎসাহিত সৃষ্টি পর্বতের মত হতে প্রতিষ্ঠিত, সৃষ্টিগত আমাদের কোমল সম্পর্কতার অঙ্কুরে অন্যের বিরুদ্ধে মনোযোগেরা বা বিরুদ্ধে কণাঘাত লাগলেই বা কি এসে যায়।

আমার প্রয়োজনে মিসেস কেরানির কাছে বাঙালি জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু জুনি যে লিখে এর কলে তোমার পক্ষে Forum এর লোক সৌহার্দ্যবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা

নষ্ট প্রকৃতির বান্দ্য? আমাকে অবশ্য আর পর্যন্ত আমার পাণ্ডা একটা পল্লীও ছেঁয়ে নি।...ওর কাছে আমার একটা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি রয়েছে, সেটা আদায় করে আনতেই হবে।

উপন্যাসটা অবশ্য আমি নতুন করে লিখছি। নাম হবে—The Rainbow। সেখান থেকে আসা করছি একটা অপূর্ণ গাইডেন্স সৃষ্টি হবে।

আমার ছোট গল্পের বই (The Precious Officer and Other Stories) প্রকাশিত হয়েছে। একমাত্র বই এই গল্পে পাঠ্য। বইটার কিত্ত, ভেদ চাহিয়া হচ্ছে না। মনোযোগেরা সত্যিই আমার প্রতি বিরুদ্ধ। আর তাই হওয়াই বোধ হয় উচিত।

টমাস হার্ডি সম্বন্ধে দেখা বইএর পাণ্ডুলিপি আমি আর ক্রিডা দৃষ্টে টাইপ করছি। বইটা সেখ পর্যন্ত আমার আত্মজীবনী হয়ে না গভীর। পরে সমস্ত আত্মজীবনী বা আনন্দবন্দী হওয়ার বিড়, একটা লিখবার ইচ্ছে আছে। অবশ্য এখন বই প্রকাশিত হলে সবতো মনোযোগের হাতে প্রচার লাভ করতে হবে।

আর এক সম্ভাব্য পরেই বড়দিনের উৎসব।... টমাসের এই কৃতিত্বে আমাদের বড়দিনের উৎসব সম্পন্ন হবে।...জনআগেটকের পাঠি—দুঃখ হয় হবে না। রাজার হালে টাকা পাঁচশ বকে করবো মনে করছি।

ইলোওর বাটিতে এইবার সত্যিকারের শিষণ ছেলেছে, বুকের শিষণ। গতকাল আর আজ দুদিনই ছাত্ররোডে বোমাবর্ষণ হয়েছে। সারা দেশের বান্দ্যদের হয়ে প্রচণ্ড উত্তেজনার ট্রেট, অবশ্যটাকে দরলে কড়া হলের মত উপভোগ করছে।

১৯১৫ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত লরেন্সের জীবনে বেপারোয়া, মোহেরিয়ান সুখ, দার কিছু অভাব ওপরের চিঠিতে রয়েছে। বুকের প্রথম কয়েক এই অভিজ্ঞতা বা আত্মজীবনের গুরুত্ব ও প্রাণের মধ্যেই আনতে চায় নি। অবশ্য আত্মজীবনকে বুকে বুকা করতো বলেই আনন্দ খিতে চাইত না। কিন্তু বুকা করা আর সেই বুকা প্রকাশ করা দুটোয় যে কত তফাত তা যদি ও সেদিন বুঝতো। বুকের হিংস্র মন বড়দিন ওর প্রতি প্রস্তুত হয় নি। ততদিন কত হান্ধা কথা যে বলেছে, ওর-ওর-তারা

কাছে কত ব্যাপোক্তি যে খেলার হলে প্রকাশ করেছে। কে জানতো যে কালের কালো ধসিতে সব দীক্ষিত হয়ে থাকবে, ওকে প্রতিটি উচ্চির ন্যূন দিতে হবে মান, সম্মান সব বিসর্জন দিয়ে।

ইতিবাহ্য একবার স্থানান্তর হয়েছিল। ভাষালা মেনেল তার প্রেমাব্যবস্থার ব্যক্তি হোতে দিয়েছিল আবারও পলিমার জন্য। নতুন জায়গার লরেসের স্থানান্তর অনেক উন্নত হল। তার প্রতিষ্ঠাও তখন প্রসারিত হচ্ছিল ন্যায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। কিছু এই প্রসারিত হওয়ার মধ্যেই বৃষ্টি ছিল ভাস্কর্য নির্মিত চক্ৰ। ও প্রতিভার আকর্ষণে একের পর এক নৈ-বানী মানব এসেছে ওর সংস্পর্শে, আশাশ্রম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আর্থিক সৌহার্দ্যের রূপ নিয়েছে। তারপর তারপর অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি। ওর জীবন-পট্য ঘটনা একদিন সব পরিচয়কে গণিত করেছে কিছু তিরু অভিজ্ঞতার সনাক্তিতে। কাছের অনেক মানবই একে একে দূরে সরে গেছে। শূন্য তাই নয় এদের মধ্যেই, ভবিষ্যতে সৃষ্টি হয়েছে ওর অসংখ্য শত্রু।

গার্মেন্টের সঙ্গে বিচ্ছেদ আসেই হয়েছিল, তবে শেন শিন পর্বত উত্তর পাশেই বিরূপতা বিকৃত রূপ দেখান। মারীর সঙ্গে বন্ধুত্ব তখন শিথিল হবার মতো। লরেসের মেসোবানুগিই এর জন্যে গারী। গারী আর ক্যাথারিনের মাঝে ঘনিষ্ঠতায় গাশ-নিষ্কর ভাবিকা অভিনয় না করলেও ওর চলতো। যেমন চলতো "Rananim" অর্থাৎ "স্বপন সপে স্বপ্নজায়া" পঙ্কজার স্বপ্ন নিয়ে ঘটনা কেন্দ্র না উঠলে। অধ্যাত, অজ্ঞাত এক ধীশে গিয়ে শূন্য "Rananim" এর সূত্রপাত করলেই চলবে না, সেখানে মারী, ক্যাথারিন ইত্যাদি বাছাই করা আট-কণ জ্ঞান ওর মনের মানবকে দেতে হবে। নতুন পরিকল্পনার পথিক্স জোড়াক করতে গিয়ে বন্ধুত্বের পথে অকারণে কটা কল্যাণ এক লরেসের পক্ষেই সম্ভব ছিল। সম্ভব ছিল কারণ ওর কাছে অনুষ্ঠানের প্রাণবীজতার চেয়ে বড় ছিল অজ্ঞানের অদ্বা প্রেক্ষা। ওর কবির গভাব্যতিকতার বহন থেকে মনোবৈকল্যের স্বপ্ন দেখছিল। বন্ধুর অবশিষ্টকতাই হতো এক জন্য গারী।

গারী সেই যোক এই কণিক পরিচয়, ভাষার বন্ধুত্বের বিবরণ কল আবার লরেসকেই ভোগ করতে হয়েছে। অল্প সেবা, একটু জানাঘ বা হর তাই হয়েছে ওকে কিছরের ক্ষেত্রে। সবসেই প্রায় শূন্য হয়ে শূন্য নিষ্কর অভিজ্ঞতাটুকু বসেছে, ফলাও করে প্রতিফলিত করেছে ওর তামসলতার প্রকাশ। সবসেই বক্তব্য কিছু না কিছু হতে গড়িয়েছে, আর সে রকমের সবটুকুই খোর কালা।

এমন কথা বলছি না যে লরেসের বিচ্যুতি বা দূর্বলতা ছিল না। অশ্রু, শাখার মানবের চেয়ে অনেক বেশীই ছিল। আমিই তো মাঝে মাঝে ওর অভিজ্ঞতায় মারীর মাঝার মণি হবার আশ্রয় নেবে বিরক্ত হতাম। লেডি শিথিয়া তো ছিলই; জনপদ তালিকার নতুন নাম যোগ হচ্ছিল। লেডি মটোলাইন বোরেল, ভাষালা মেনেল, এক কথার দারা মেনেল পরিবারই ওর ভক্ত হয়ে উঠেছিল। কিছু এসব, ওর কীবনের সব দূর্বলতা জানার পরও আমার প্রশ্ন হচ্ছে— প্রতিভার গান নিয়ে রাজমার্গিত করতে যদি আশাতি না থাকে তা হলে তার দূর্বলতাদ্বারা শূন্যমনে মেনে নেওয়াতেই বা বাবা কোথায়!

জানুয়ারী মাসে লরেস এক বন্ধুকে লিখেছিল "এখনও The Rainbow অবল-বল শেষ হয়নি, বইটার জন্যে অসম্ভব পরিশ্রম করতে হচ্ছে। ৩০০ পৃষ্ঠার মত সম্পদ" হয়েছে। এই মতো আমাকে ভূমি নতুন রূপে পাবে। The Prussian Officer-এর একটা কপি তোমার পাঠ্যতে পারলে দৃশ্য হতাম। কিছু পাঠাই না; বন্ধুর রূপ নিয়ে অনেক তরুণ এসে আমার নিষ্পন্ন সব কপি চুরি করে নিয়ে গেছে যদিও তাদের মনোকেই কিনে পড়বার অবস্থা যে নেই তা নয়। বৃষ্টির এই ভাষাভালে আমার অবস্থাও বদল গপলি। হাতে কিছু টাকা আসলে তোমার এক কপি পাঠিয়ে দেব।

আমরা যে কি কবিতা তা আমি নিজেই জানি না। কেবলকারী পর্বত এখানে (চন্দ্রাবার) আমি কি না তাও বলতে পারবো না। ইতালিতে রাজ্য শব্দ না হলে

ভাষালা বেনেদের সাসের অকলের ব্যক্তিগত আস্থানা পাড়তে হবে। এতটা বিরাট পরিবারের সঙ্গে দানিয়ে চলা সহজ না, তাই দানি আতিথ্য নেওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগিত হতে পারছি না। তেখা লাক্ কি হয়।

The Prussian Officer-এর বিশেষ চাষিয়া হয়নি পুনর্বি—আবার অন্যান্য বইএর মতই ধীরে ধীরে ফিচ্চী হচ্ছে। দানার বিশ্বাস The Rainbow পেয়ে মেথেনে—এর নতুনতে বিশ্বস্ত হয়ে। পুনঃ নতুন নয়, আবার অন্যান্য বইএর তুলনার বেশ একটু বিগল্টও। বইটা লিখে এক অপদূর্ তৃপ্তি পেয়েছি। মনে হচ্ছে এভাবে আমার সাহিত্যিক-সত্তা সম্পূর্ণ বিকাশের পথ পেয়েছে।

পুনর্বি ছুঁনি ঘুড়ে ঘাঁটে—ব্যাপার কি বলতো? আমি বলছি বাবে না। নতুন জীবনের অভিনয় ঘাসের প্রয়োজন নেই তারাই যুদ্ধের আহ্বানে সাড়া মেবে। আমি যুদ্ধকে ঘৃণা করি। এ এক মারাত্মক ভুল, অসমর্থের বোকাখনি। এখনই এটা শেষ হচ্ছে না কেন? আমরা কেউই তো ঘুড়ে চাই না, তবে? .. ঠাণ্ডা লেগে আবার খুব সচিৎ হয়েছে। মূল কেন লাগছে? ...”

এই যুদ্ধের প্রতি বিরূপ মনোভাবকে কেন্দ্র করেই ওর Bloomsbury-Cambridge সোমার্টার ইন্টেলেকচুয়ালদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। এই সোমার্টার দুজন প্রথানের নাম না করলেই নয়—লর্ড সেনার্ড কীন্স আর বাটল্ড রাসেল। তাঁদের সঙ্গে অল্পবয়স্ক হবার আগ্রহে লরেন্স কৌশল পর্বত পার্ভি ভনিশের। কিন্তু কল কিছু মরতাদো হয়নি। পেশ পর্বত সোমার্টার অধিকাংশের সঙ্গে ওর মতাবের হয়েছে, এমন কি রাসেলের সঙ্গেও। তবুও ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে রাসেলের নত অভিজাত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে লরেন্সের মতাবের এক বছর ছাড়াই হয়েছিল। পুনঃ হ্যাঁইই হয়নি, লরেন্স ওর আশ্চর্যশী শক্তি দিয়ে রাসেলকে মুগ্ধ করে রেখেছিল।

পুনঃ রাসেল কেন অস্বস্তিকর ও মুগ্ধ করেছে কিন্তু মুগ্ধ হয়ে ওর পাশে পড়ল শেষ পর্যন্ত ফেঁকেছে এমন বছর সংখ্যা বিলস। বছর প্রথম জুনে ও ওর কলার আর সেবার একদিকে সন্ধ্যা আর অন্যদিকে সন্ধ্যাের একাধিক মাথাকে বিরক্ত করে তুলেছিল। সন্ধ্যা বিরক্ত হয়েছিল ওর যুদ্ধের প্রতি বিরুদ্ধতার আভাস

পেয়ে। আর ব্যক্তিগত বিরূপ হাজলেন এবং হয়েছেন ওর দুটো-তরিগে, ওর ঐতিক অভিজ্ঞতার আঁচড়ে তীব্র নিষেধের প্রতিজ্ঞা বি লেখে। পাঠক যেখানে রসের আশ্বাস পেয়েছে, বিশেষ ব্যক্তি ওর সেবার আশ্বাস নিষেধকে চিনতে পেতে দেখানে পেয়েছেন আশ্বাস। এই বিরক্ত আর বিরূপতার প্রতিক্রিয়া পুনঃ হতেও দেয়ী হয়নি, কিন্তু সে আরও পরের কথা।

সেরী হলেও নীল আকাশের কোণে কালো মেঘের টুকরোর মত আগাম নিশানার আভাস কিছু কিছু যে তখনই পাওয়া যায়নি তা নয়। জাইভোলের-খরগ বাবর একশো পঞ্চাশ পাউণ্ড লরেন্সের কাছে পাওয়া হয়েছিল। সলিসিটরের ডাঙ্গারান কোর্টার পাগল হবার ছোপাড। টাকটা সেনার ইচ্ছে ওর অব্যয় ছিল না। তবু, হয়তো রাজী করতে পারতাম—কিন্তু টাকা কোথায়? উপন্যাসের দরুণ প্রকাশকের কাছে একশো নম্বর পাউণ্ড পাওয়া ছিল ঠিকই কিন্তু বই প্রকাশের আগে সে টাকা পাওয়ার আশা ছিল না। কল যা হবার তাই হল। সলিসিটর নাগিন করল। এপ্রিল মাসের শেষে নমন পেয়ে ওর সেই বৃত্তবৃত্ত আবার এখনও মনে আছে। ২২শে এপ্রিল ওরাসেলকে লিখল “.....একটা মোটো প্রাপ্ত এইমাত্র একটুকরো খাগল দিয়ে সেল। আইনের আহ্বান—১-ই সে তারিখে গিয়ে কৈকিগত পেশ করতে হবে। সঙ্গে মামলার খরচ জন্যে পঁচিশ পলিং পার্টিয়েছে।..... টাকটা হাতে নিয়ে এই আইনের নীতিমা সম্প্রদে এক নীতিমা’র কোথ অন্বেষ করছি—কোথ অন্বেষ করছি ইংলণ্ডের বর্তমান সর্বিষানের প্রতি। জেলে না হবে ক্রিমিন্যাল হলেও আমি এতদূরে পুঁচী হবার। কিন্তু আমি বলছি, ধীরে বড়, ধীরে। আমি ঘের এই এত ঘরে গড়ে তোলা ইয়ারতের তলার একটা প্রকৃত বিস্ফোরক রাখবার জন্য প্রকৃত ছিছি।”

সেই অন্যতম প্রকৃত বিস্ফোরকের নাম—The Rainbow—লরেন্সের পরবর্তী উপন্যাস। ২২২ বছর সেখা শেষ হয়ে বই তখন প্রকাশকের ঘরে প্রকাশের অপেক্ষার। আশ্চর্য যে শেষ হবার তারিখটা ছিল মৃত্যুর ইয়ারান্তিত—ঠিক পনেরো বছর পরে যে তারিখে মৃত্যু চুপি চুপি এসে ওকে হিঁদিয়ে নিয়ে যাবে।

[ক্রমশঃ

শৃংখলিতা মহাকৌ।

সভা নাটকের বিজয়
বৈজয়ন্ত্রী। আগামী নাটকের
আশা আকাংখার ভীর্ণ-
ক্ষেত্র।

মশানজোড়ের কালো
পিচ রাস্তাটা এসিয়ে গেছে
সদিশ পতিতে। সে পথে
মুখর বেগে আনা সোনা
কতো ঘানেন, কতো ঘনেন।
কত মালুখ বেগে ধার ধানের
চব্বরে চব্বরে করে কী
অশংসার মল্লভের ছাপ।
ওদের কীতিত জ্ঞান উড়িয়ে
আসে বৃষ্টি কিংবা ভ্যান-
সার্ড। এখনও যেনা বার

বিকেলের রান রোজুই বুথপত সোলাইটি-কল্যাণের
বৈকালিক চা-ডকে মশানজোড় মুখর হয়ে আছে।
ওদের ট্রান্সেল সংবদ্ধা বেনী হাতে উড়ে আসে আভুপ বেহ
নির্ধাস। উজ্জল হাসিতে ছিটকে পড়ে কাপ ভিল।
চায়েব দিকার হারী আসন করে বের টেবিল রুখে।
পাওয়ার হাউসের একটানা ঘর আওয়ারজের কান্দি নেই।
আইভীলতার বেড়া দেওয়া লাঞ্ছনো লুনে কতো মরহুমী
মুনের উত্তর যৌবন। আর আকাশমুখী কোয়ারার
অবিরাম ছন্দপতন। শুকনো চাপা রোল এসে পড়ে
ধানের পায়ে, ইলেকট্রিক পোষ্ট। সন্ধ্যার দুসর অন্ধকারের
মাঝেই জলে ওঠে শেড দেওয়া লাল-নীল বাথগুলো
স্বিরসির বাতালে তেলে আসে শাল আর মহয়ার মুহুর
আর্তনাথ।

মহাকৌ কতো জনপথকে করেছে বিধৌত। কতো
অনুভূতির বুক এর অশায়ে ডেই। শত মালুখের ভালে
আকণ্ঠের এই রূপ মশানজোড়ের। বাস্তবিক অঙ্গতের
কীতি। এই বাথেরই নীচে কয়েক কোটা অঙ্গ আল্পনা
রোষানিত হয়ে আছে বিরাট কীৎবাসে। কোছনার মত
বন্ধ, আকাশের মতো উদার একমুঠো আশা চাপা পড়ে

সাহিত্যিক



বেছে মধ্যাকীর দক্ষিত
পলিতে। নিওনেব ব্রিল
আবেশে কতো মালুখের
আসে মল্লভের দ্যুতি
নিরে, আসে কোলকাতার
কিৎবা আরও দুবজের
কোন অষ্টাশনী তবী হনিমুনে,
লাল ক্রাশেনের বস্ত্র মতঃ।
বেগে বার এর প্রান্ত মূল
টরলেট পাউডারেব হৃৎস্পর্প
আমেঘ। কিন্তু কেউ কি
খুঁজে পেয়েছে, এক পাহাড়ী
কল্যাণ উজ্জল হাঁস আর
আশা চাপা পড়ে আছে
অহংকারী পলায়ের অতল
মরবে। আশাও পেট

হাউসের বাড়িগুলো কাশে বেহিনের কথা অঙ্গ করে।

মুখরী এগেছিল দুটো পরদার আশা। আশাপক,
খীখন ছেড়ে নগরবিলাসে। ওদের কীবনে ছিল না
সামাজিকতার রূপ শৃংখল। রূপ আর পাউডারে
ভারাক্রান্ত নর মূখমণ্ডল, শুধু ছিল খোপার জড়ানো
কিশলয় মল্লভী। আমাের কীবনের ব্যাকরণ দিয়ে যদি
এবের ঘাচাই করি তবে যেনবা ওদের কীবনে নেই সন্ধি-
সমাস কটুকিত করবুল। এবের সন্ধান ঘেলে না
কর্ষব্যত মালুখের নামে, উগ্রপঙ্ক আশুপিকার বলর বংকত
টীপটিতে। ওদের কণিকের আনন্দ নিয়ে মিলে বার
আনন্দের আতলাস্তিকে। ওরা শুধু আসে ষাঁচবার
অধিকার নিয়ে। কিন্তু ওরা কি পেলে? সত্য মালুখের
বুজের নীচেই ওদের বঙ্গ সমাধি।

ছড়ান মাথির কীর্ষবরথানা আশাও যেনা উচু করে
দাঁড়িয়ে আছে। ওর মেয়ে মুখরী কল নিয়ে এল।
রোজুই আনে। এলেই মাথা ঝাঙতে বদল। সামনে
একটা আরনী। মুখলদান মাঝে মাঝে এসিয়ে পড়ে
মুখের ওপর। পেতলো পরিবে নিয়ে আসে বিল বিল
করে। একটা কথা ভাবিছে মুখরী। ভালো লাগছে

ক'বতে। শ্যামলু আসবে আজ বধের মেলায়। ওকে চুড়ি কিনে দেবার কথা দিয়েছে শ্যামলু। বশির হাতের দিকে একবার চাইলো সুমতী। পুরোনো হস্তে গেছে এক বছরে। পুকার মেলায় এনে দিয়েছিল শ্যামলু। ঘোঁপার কড়িয়ে মিল বনজুল, কপালে-একটা বড়ো দিম্বুর-বিলু। কতো কথাই না ভাবছে সুমতী। ওখন তার বহন-দি। কৈশোর আর যৌবনের প্রাণসীমার ঝড়িয়ে। ওখন ঘোঁবনের উচ্চত আলোঙ্কাস তনুতটে আছড়ে পড়েনি। শ্যামলু সেদিনও ঠাট্টা করে বলতো, তুই আর একটু বড়ো হ'লে তোকেই বিয়ে করবো। হাসতো সুমতী। বড়ো মাঝির ডাকে চিত্তাশ্রু ছিন্ন হল। এগিয়ে গেল ত্রুত পথে,—তুই আজকে যেলায় বাবি? বাবা নাড়লো সুমতী। আমার কত কিছু কিনে নিয়ে আসবি।—এই নে চারটে পরমা।

চারটে পরমা তুলে ছিল বৃদ্ধ দ্ব্যদম মাঝি। দীর্ঘ ধলীখেদা হুটে উঠলো। বিপত্নিদের স্মৃতিব বোম্বুনে সুমতীই না ওখনও ছিল। এখন বধের মেলায় দিনে মাঝা গেল ওর ম'। ভাবতে ভাবতে গড়িয়ে পড়লো অজবিলু।

ধুবলী এলো ভাকতে সুমতীকে।—তোকে আজ ভারী ভালো মানিয়েছে সুমতী। কানে কানে বললো ধুবলী। সুমতীই মূলে তাঁক বাসি, চোখে রুই চাহনী। বাপের বাপীর মিঠে মূর ভাগতে লাগলো বর্ষার জিকে বাতাসে। নবের নাহুবটিকে সুমতী আজ পাবে খুব কাছে। তাই এ অকলঙ্ক। ত্রুত কণোত্তর হাতো চললো প্রেমের অকশিত বিঘাটী ছেলে।

—তুই এতো ঘেরী করদি সুমতী। ওখালো শ্যামলু। এইনে চাব পতা পরমা চুড়ির জন্তে। ওরা এগিয়ে গেল, ভাঁড় ঢেঁলো। ধুবলীই ওকে কিনে দিল পছন্দ করে। কিওতি গবে আবার বাপীর মূর হাড়িরে কিয়ে আসে পাখাড়ী ছেলেব রাগামাটীর পথ বেয়ে। পুলক জাপে পাখাড়ীকভার। ইজিরের সর হার বুলে যায়। পুনক কাছে পায় প্রততিকো।—খোন সুমতী! একটা কথা বলতে কুলে গোছি। ধাঁটী বোরাতে খোতাতে বললো শ্যামলু। মশানকোড়ে ধাঁধ হচ্ছে, অনেক কুলী বাটবে। ভালো পরমা হবে। বাবি তুই?

—বাবাকে শুধাব। আজ চল ঘেরী হবে।

বাড়ী কিয়ে এল লজ্জার পর। বৃদ্ধ মাঝি বসেই ছিল। কে সুমতী এলি?

—হ্যাঁ। আলোটা খুঁজতে লাগলো সুমতী। আলোটা ছেলে বুড়োমাঝির কাছে বললো। অনেক কথাই বললো। আর শেষে বললো শ্যামলুর কথাটা।

—তুই বাবি সুমতী। তুই যা। এ কঠে আর সহ হচ্ছে না। মমতার পরম মূলিয়ে দিল মাঝি। সে দিনতি ছড়িয়ে গেল পলাশহালা প্রান্তরে।

মশানকোড়ে ধাঁধ ভৈরী হচ্ছে। পাখাড়ের কোল ঘেঁষে। সুমতী অবাক হয়ে দেখতে লাগলো কতো বিচিত্র মাহুয় আর যন্ত্রপাতি—সাদনে তেলে উঠলো মূষ। কল্লার চেটে। আকাশের দিকে চেয়ে দেখতে গেল একমুঠো আখা। মশানকোড়ের পথ খুঁজে গেল নতুন বৃষ্টি, প্রাচীর পেলো স্থিতি। বতীন কণ্টাইর এগিয়ে এসে ও'র নাম লিখে দিল। কুৎসিত ত্রুততি মূষ নিয়ে একবার তাকালো সুমতীর দিকে, চোখে হানী যেআগন ক্রোমের চমকা, মূষে স্বাভাব্য সিগ্রেট, হানী হুটেব ক্রীক উচ্চত।—ভোর নাহ কি?

এগিয়ে গেল শ্যামলু আর বলল, সুমতী।

—বেশ নাহতো, তোকেওও এখন নাম ছর? কোন কঠ হবেনা, ধলোই জানাবি কিশোরীকে। কথাটা ইদিত করলো সুমতীর দিকে চেয়ে। চোখদুটোতে উজ্জল মূর্ততা। কুলী কোগাড় করে কিশোরী। বাড়তি কিছু পায় তার কত। বতীন কণ্টাইরের ভালো লেগেছে সুমতীকে। পরিচ্ছন্ন বেন। জতল কালো চোখে বর্ষার মেঘের সির দ্বারা।

সিটি বাজার সংগে সংগে কাক আরম্ভ হয়। মিস্ত্রার ঘোঁপটা করুণ আর্দ্রনাহ ক'রে গোঙাতে থাকে। বাহোটা। বাজতেই ছুটী হয় টিকিদের।

—চল সুমতী হুড়িকলো ধেরে নিই ঐ নীচের কলাটার। ত্রাতি অকানো পা দুটোকে টেনে নিয়ে যায় হুকনে। 'ক'রত, এ বেড' এর পাশেই বসে আছে কিশোরী। তাকালো কিশোরী। ছোঁকাটা ওর পাশে পাশেই দুহুয়ে। কিশোরী ও'টার হতো চোখ দুটে। নিয়ে তাকান্ধে।

বতীন কট্টারি বিজ্ঞেস কবে—কিছু কবতে পাংলে
কিশোরী?

—না বাবু অপরাধীর মতো মাথা চুলকাব।
পরকপেই বতীন কট্ট ঈর ভাঁজে ছিল একখনাঃ বনটাকার
কাপেদৌ নোট কিশোরীর হাতে। সিক্রেটটা ধাঁড়ে চেপে
থলু। একমুখ খোঁরা ছাড়লো তারপর।

—তোমার বকশিস। বার্ষিকার কারণটা বোধহয়
বুঝতে পেয়েছে জ্বর দিয়ে। পরদিনই কুমরীকে বননী
কভা হোল পাথর বাবে। শামলু রইলো নির্দিষ্ট
জায়গায়। মাথার ওপরে টুকরো টুকরো পাথর বয়ে
আমছে কুমরী। হঠাৎ লক্ষ্য পড়লো কিশোরীর দিকে।
কি যেম একটা বেগাখে ও। ওর সাপের মতো চোখ
ছুটো বেগে শিউরে ওঠে। মাথার কুড়ি লম্বা নীচে
পড়ে যায়। ছুট তের কিশোরী। একটু কিয়িৎ নিল
কুমরী। হাগাচ্ছে ও। কুটটা কাঁপছে ওর। ভালো
লাগছে না এই ক্লেবাক পরিবেশ। পরকপেই চোখে-
মুখে বেগে চট্টলো ভাবন প্রতিক্রিয়া। সে পাহাড়ী কভা।
একখা জানালো না শামলুকে। হোরের সিট বাজতেই
সবাই আগলো। মূক হোল বেঁচে থাকার সংগ্রাম।
রাতের ভিলে ভাত শুলো বেগে নিল কুমরী। শামলু
এগিয়ে পেছে হাজরী দেবার লজ। উৎসাহের কাছে
আবার বেগা হয়ে গেল কিশোরীর সংগে। বুঝবে
একলা বেগতে পেয়েছে কুমরীকে। পাথরের পাশে থলে
ছিদে ফেলছে একটা লম্বাঘড়ীর লতাকে। পারের
কাছে কুঁকড়ে পড়ে আছে পাতা শুলো।

—কুমরী! তোকে বাবু ডেকেছেন। জোর কামে
বুব খুঁী! তোকে বকশিস বেবন। একটা পাঁচ
টাকার নোট ব্রুজের মাথো ভাঁজে দিতে চায়। হিংস্র
হাসিটা ধাত বেব করে বাপছে কুন্তিতে। তীর মাথা
ছুটে উঠলো কুমরীর। মুখে টান মেয়ে হুঁক্কে ফেল দিল
নোটটা।—আবার অমন টাকাতে বরকার নাই।
মিলিয়ে গেল কুমরী পাহাড়ের বাঁকে। বখারীতি আবার
জাক পড়লো কিশোরীর। অসহায়ভাবে বললো
কিশোরী—না। তার এ কাম আমার দ্বারা হবে
না। মজ কউকে.....সিক্রেটটা টেবিলে টুকতে
ঠকতে বতীন কট্টারি বরল—তুমিই পারবে।

শামলু আজ বাড়ী বাবে বলছে। কুমরী একা থাকবে
আজ রাতেই.....। ইয়া প্রোবাক্ষরিত শিশিট: নি-
কিত্ত। বতীনবাবু বুঝতে পেয়েছেন বোধ হয় বার্ষিক
কাপে, অসুস্তব করেছেন জ্বর দিয়ে। কিশোরীর অসহা
বুড়ী জাপসা হয়ে এল মিক্কার বেনিনট:র দিকে চেয়ে
বনে হোল শামলু বহি জানতে পারবে তবে পিখে ফেলা
ওর জীবনদী, কংক্রীটের মতো করে বেবে ঘরটি।

অস্বাস্থ্যবালো রাত্রি। পেট হাউসের মাথার ওপা
জ্বল রাতের অজকার। মধুরাকীর বৈদিক জে
অলপিত নক্সের বীতি। হিংস্র উত্তর বতীন। কাপে
পিচ: হাতাথবে এগিয়ে গেল ওরা। কুলোশেচের হিয়ে

রাতের কুতীর প্রথম। ক্রান্ত চোখে বুন রে
জাগছে কুমরী। সারাফাত ডেবেছে ও। নতুন ব
নিরে এসে ছিল এখানে। কিত্ত এখানকার লজ পাথ
নেই প্রাণের স্পন্দন। কতো রাত হয়েছে কে জানে
তখনও পাওয়ার হাউসের একটা:না লজ তীর কৃত রচ
করে চলেছে। প্রতীক্ষা করে পরিচিত পরজনি:
শামলু জোরের আগেই কিংবে বলছে। সহসা
সমস্ত শরীর কিসের স্পর্শে কঠিন হয়ে এল। অনুশ্রাব
বেগতে গেলো অজকারে। তাতে জ্বর-কৌশল্য সে
ছিল না পাহাড়ী কভার। ওর পারের চাপে পুথিবী
কোঁপে উঠলো। কিত্ত সে সুহৃৎের অন্য। পরক
কিনের উত্তর পড়ে সমস্ত শরীর নিখিল হয়ে এল। রাত
নিশ্চয় তমিয়ার নেমে এল পুত পুত বুব। এগিয়ে প
ওর বেগবান। লুজ রজনী সজার ভাঁটার মতো।
হাউসের জাকরাণী পূর্ণা নড়ে উঠলো। জানা
অজ্ঞাতের দিকতে মৌণ অভিযোগ। নির্ভীক মূল ব
পড়লো অল হয়ে। লম্বাঘড়ীর লতা কুঁকড়ে
লম্বা। ছিঃ রাত্রি। তোমার চোখে বুন নেই এখন ব

তোমার অনেক আগেই কিরে এসো শামলু। এ
ডাকলো-কুমরী। কুমরী! বেগলো বহট:র কেউ নে
সে ডাক প্রতিজ্ঞিত আবার হোল ছুটে গেল বী।
দিকে। এদিক তদিক ডাকাল। শিরার উপনি:
তীর বিদ্যাত বইতে লাগলো। ও কে। কার কে
ছুটে যায় লাল পাথর বিছানো পথের দ্বারে। বেব
পড়ে আছে কুমরীর উলম বেববরী।



মাঝে ওপরে তখনও সীমাহীন নক্ষত্রের ঘনিঘেল।
যশ করছে। কালো মেঘ জমছে। আকাশও বুঝি
নদীন সত্যের তাহার চুম্বকী ঢালা আঁচল লুকিয়ে নিল।
যাই বুঝিতে পড়েছে।

কুহু হুহু নেই থিবথ্রা কুমদীর স্বপ্নতবা অলককঙ্কর।
যে নেই হুহুহু হইলেকটুক আলোচ্য। শুড়িয়ে নিল কুমদীর
নকট্য বুকের মধ্যে। বেন পিবে ফেলবে ওকে। অক্ৰ-
পাঙ্কিত হুহুটীর তাকিয়ে জমন্ত প্রায় শামসুহ—কি দিল
তা? যে জীবন ঘোঁষন এই লখটুক বক্ত মিঙড়ে বচনা
নলো এই পাখানপ্রাচীরের। হুহুহু মিঙাসাৎকে মরে।

হাতের স্বপ্নের মৌতাত শেষ হ'ল। হাটের বুক সত্য
ধিবীর মত উত্তরতা। হাঙ্গুরের উল্লস চিত্র চোখের
গমনে ভেসে উঠলো। বিংশে পতালীর সংস্কৃত পর্ব
হাবার উঠবে ঐ পাখাড়ের চূড়োতে, কি সেবে সে?
করে সেবে শাল মন্থা বনের ঘাঘাঘিহী কুমদীকে।
চাখের হাতের কুটে গুঠে চরম প্রতিধ্বংস। খেন আরেব-

দিল্লিত আতঙ্ক জেটায় হাতে বেরিয়ে আসতে চায় উত্তর
লাভ। এ হুহুর যন্ত্রের বসুধ কপণতা, এ হুহুর
হাঙ্গুরের বিলাসিতা: ফিরেছে এক নতুন দৃষ্টি—দে বুঝি গিয়ে
মিশে গেছে বাঘের প্রত্যেক পাখের। কুমদীর হুহুর
ওপর ভোরের আলো। ঠোটে এফ টুকরো নিশান
হাসি।

আজও সবাই সে গায়ে হাতে বসন্ত উৎসবে।
আজও হাল হাখে, পলালের লাশ রঙে আজও সে প্রায়
রান্নাচিত হয়ে ওঠে।

পতালীর হুহুর পাখের গুলো চরম শাখা স্বপ্ন করছে
দেখিনে ঘটনাপুঞ্জের। যদি পতালীর দিল্লিবে কান পাতে,
জনতে পাবে এই পাখান প্রাচীরে এক প্রাণের ছন্দ পতনের
হুহু। পলাল আর মন্থা-বনের সীমান্ত ছাড়িয়ে সে শ্যবা
ছড়িয়ে পড়ে অনেক ঘরে। ছড়িয়ে পড়ে ইবারের
পরতে পরতে।



ছোট রুবি—রবীন
সুখাপাখ্যি; প্রকাশক, বঙ্গ
প্রকাশনী ১১১ বিবেকানন্দ
বোড, কলিকাতা। মূল্য
এক টাকা।

‘ছোট রুবি’ রবীন্দ্রনাথের
পৈলব জীবনকে কেন্দ্র করে

লিখিত একখানি ছোট নাটিকা। রবীন্দ্রনাথের
অল্পবয়সিক উপন্যাসে রবীন্দ্র জীবন ও প্রতিভা
সম্বন্ধে একাধিক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু
“জীবনমুখিতর” রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে এমন ধরনের
স্রষ্টৃমিথ্যাবোধিত অভিনয়-উপযোগী নাটক একখানিও
প্রকাশিত হয়েছে বলে আমরা জানি না। যে রবীন্দ্রনাথ
“স্বভাবাত্মকভঙ্গের” আওতাধীন ছিলেন, যে রবীন্দ্রনাথ
আত্মবিশ্বাসে কবিপ্রতিভার প্রথম পরিচয় দিয়েছিলেন
সেই রবীন্দ্রনাথের নাটকে বিশ্বাস হওয়া উচিত।
কবির জীবনের প্রথম পর্ব যে সাতমহলা বাড়ীর সামনে
এসে শেষ হয়েছে সেই পর্যন্তই এই নাটকের বিস্তার।
যদিও কবির এই প্রারম্ভিক জীবনে নাট্যকীর্ত্তার ভাষণ
কম? ছিল, তবুও বর্তমান নাট্যকার আমাদের তথ্য
নাট্যকীর্ত্তা সৃষ্টি করতে পেরেছেন। চরিত্রগুলি উজ্জল
সংলাপে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পতিত বটনকে
নাট্যরূপে বেগুনা করিনি; সেই হুতব পতীকায় নাট্যকার
উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন, একথা বলা চলে।

প্রোক্তঃস্বরূপীতা পঞ্চকল্পা—মনোনিয়ত সেন;
প্রকাশক গ্রন্থপথ ৬, বিহারি চট্টোপাধ্যায় ট্রাষ্ট, কলিকাতা।
মূল্য পাঁচ টাকা।

পাশ্চাত্য পঞ্চকল্পার নাম ভারতবাসীর কাছে
প্রাচীন। রোমকল্পিত পঞ্চকল্পার নাম এই—
অবলম্বা, সোপহী, কৃতী, তারা, মনোহরী-তথা। পঞ্চ-
কল্পার অর্থশ্রিত্য মনোপাতক নামক। কিন্তু এমনই
মত। আশ্চর্য এই বিভ্রান্তের মূলে এবং ইতিহাসগঠার মূলে
আমরা নান্দগুলিকেই সর্ব্ব জ্ঞান করে নিশ্চিত হয়ে
ওয়ে আছি। রমত বা আরো অজানা সত্যের খবর

নতুন বই

আছে এই মারভলির আর
পরিচয়-ইতিহাস সম্বন্ধে।
পাঁচজন নারীর কাহিনী;
যে পতির সম্বন্ধে পতি;
পতিতে তর্ক-বিবর্ক-বিশদ
কর মন্ত। অথচ এই পঞ্চকল্প
সঙ্গে আরও অনেক গৌরাণি

চরিত্র ও ঘটনার প্রকৃত তথ্যপূর্ণ বৈধি আর
উদ্ধার করতে পাঠ্যে ভারতবর্ষে প্রচলিত পা
ইতিহাস-কাহিনীর বন সুখাপার অন্তর্গত থেকে, সে
হয়ত আশ্চর্যের পরিণতি অস্পষ্ট যে প্রাচীন ভারতবর্ষে
মুখিতা অনেকখানি পরিমাণে তখন স্পষ্ট ও আ
বেশি আশাযের প্রভাব হয়ে উঠবে। কিন্তু এ যে
হয় কারো একার পক্ষে সম্ভব নয়। শ্রীমেনোন্নিত
একটি এগুণে অগ্রগত হয়েছেন, এবং বণ্ড বণ্ড আলো
নয়, নিশ্চিত মনে প্রাচীন ভারতের সমাজব্যবস্থার
এই পাঁচটি চরিত্রের পূর্ণ-পূর্ণ আলোচনা করেছে
লেখক মহাপ্রভ হলেও বক্তব্য উপস্থাপনে মুখিত প্রের
মুক্তির সংযোগে প্রাচীন সমাজতত্ত্ববিদ-মূলত ভ্রমণ
পরিচয় দিয়েছেন। এই পাঁচটি চরিত্রকে কেন্দ্র
ভিত্তি প্রকাশ করেছেন, “নারী ও নারীর পথচলন
... নারীর বহু সম্বন্ধের সমষ্টি। এই সম্বন্ধগ্রন্থ
যে পতিভ্রমের স্থান আছে সেটি কিন্তু পতিভ্রম
নারীর সর্ব্ব নয়।” একথা আশ্চর্য, পাকত্যা
মুখিত, প্রাচীন সমাজেও যে তাই সত্য ছিল,
সংসার যেন অনেকেরই মূলভিত্তি হবেন।

প্রথমখানি আরও বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা
যা এই স্বল্পপরিমিত সম্ভব নয়। তবে এই
বহুল প্রচার নিশ্চয়ই কাব্য। এই প্রকার গ্রন্থে
যেখানে সংস্কৃত উদ্ধৃতি রয়েছে তাতে মূল্য
যেখানি হলেও মূলি হওয়া যেত, কিন্তু হৃৎস্বের বিষয়
পারিপাট্যের আবেশের সঙ্গে সঙ্গে মূল্য প্রকাশের আ
পুস্তক শেষে অন্তর্ভুক্ত হওয়া বাধ্যতাবদ্ধ পড়ার

হাস্য হাস্যবৃত্তা—বঙ্গদেশের চট্টোপাধ্যায় সম্প্রদায়ের
প্রাথমিক : কীলেন্দ্রনাথ বসোপাধ্যায়, অবসরকাল :
১৯১০, মহাকাব্য : ১০, কবিতা : ১০।
সং : এক টাকার।

রৌজগারী—কনক মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক—প্রতিক্রিয়া,
১৯১০, রচনা : কবিতা : ১০, কবিতা : ১০।
সং : দু টাকার।

'হাস্য হাস্যবৃত্তা'—বঙ্গদেশের কবিতা চিত্রকাল মানবতার
পক্ষে। মানবতার যোগ্যতাই অসম্মান ঘটবে, অসম্মান
যোগ্যতাই তার পোষক ব্যবস্থা বিচার করে, অসম্মান
যোগ্যতাই উচিত আশ্রয় দিতে পারে, যোগ্যতাই কবিতা
যোগ্যতাই রচনা করে, যোগ্যতাই কবিতা রচনা
করে। রচনা করে মানবতার সেই ঐতিহ্য আছে
যদিও চলেছে। যুক্ত কালের অসম্মান আশ্রয়
দানের উপায় যোগ্যতা, মানবতার আশ্রয়
দানের উপায় যুক্ত বাস্তব ও যুক্ত মানব কবিতা, কবিতার
গতিবাহক বৃত্ত হচ্ছে কবিতা। 'হাস্য হাস্যবৃত্তা'
কবিতার উদ্দেশ্যে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় বিভিন্ন
কবির প্রচেষ্টা, যার ফল হচ্ছে রচনা করে
যোগ্যতা 'আত্মিক' কবিতার উদ্ভূতি থেকে। যুক্ত
পাদির যুক্ত থেকে লেখা চিত্রের অসম্মান করেছেন
কবিতা মুখোপাধ্যায় আর যুক্ত থেকে লেখা কবিতার অসম্মান
করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। কবিতা লিখেছেন,
বঙ্গদেশ থেকে, মনীষা বসু, যার বসু, কবিতার প্রভূতি।
কবিতার নিঃসঙ্গ থেকে বাংলা সাহিত্য একটি উল্লেখযোগ্য
যোগ্যতা।

'রৌজগারী'—কনক মুখোপাধ্যায়ের কবিতা বিভিন্ন পত্র-
পত্রিকার পৃষ্ঠেই আত্মসম্মান। কিন্তু কোন একটি বিভিন্ন
সময় কবিতা লেখা যার না, যখন যখন যার তার
ইচ্ছা সংকলনের সমগ্রতার। শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের

বিভিন্ন কবিতা : সংকলন দ্বিতীয় খণ্ড। কবিতাগুলির
রচনা কাল উল্লেখ : হাশিম থেকে বাট সাং।

রৌজগারীর সব কবিতা কবিতার মধ্যে অসম্মান
কবিতা বিভিন্ন কবিতাগুলি ও সংকলন। কবিতার বিভিন্ন
কবিতা বসু থেকে যে তিনি লিখেছেন বিভিন্ন কবিতা, কিন্তু
বিভিন্ন কবিতা লেখা যখন পাঠকের মনে স্পষ্ট করে
করে তখনই তা সার্থকতার স্বীকৃতি পাওয়া এবং রৌজগারী
নিঃসঙ্গ থেকে সে স্বীকৃতি হাশিম করতে পারে।

কবিতার বিভিন্ন কবিতা সংকলন থেকে ব্যক্তি করেছেন।
যদিও আধুনিক কবিতার চিত্রকাল ও মানবতার উদ্দেশ্যে
কিছুটা পরিমাণে চিত্রপট, তবুও তাতে কবিতার উদ্দেশ্য
স্বপ্ন হয়নি। কবিতার স্বপ্নে মিথ্যা ও স্বপ্নাভূতি ভাবনার
গভীরে যোগ্যতা পাওয়া করে। আধুনিক যুগের চিত্র-ভাবনা
ও মানবতার স্বপ্নের কবিতাগুলিতে পদক্ষেপ, কিন্তু
সমগ্র কবিতা যখনই একটি স্বপ্ন অসম্মানিত সে সাধারণ
স্বপ্নের প্রভু ত লগা। ও সাধারণ দিনের সাধারণ
যেমন :

"যেমন যেরে, যেরে, যেরে
এই লগে করে মাও
নূরুল হকের সাথে
দুটি বিভিন্ন।" (কালো বোরকা)

অথবা :

কাকমতলায় পিড়ের
লাল দুই টুকি ছিল
পাথরের নুকে চোরা পথ দেখা যায়
এবার প্রাণের সন্ধ্যা ঘরের ঘুলায়।

(পতাকার শেষ)

পরিচ্ছেদে কবিতা যে কতকগুলো আত্মসম্মান
কবিতা লগে চরনের দুর্বলতা চোখে পড়ল। কবিতার
রচনাভিত্তিকতার অসম্মান এই কবিতা কবিতা দুটি আত্মসম্মান
কবিতা। হাশিম, হাশিম ও প্রাণের স্বপ্নের।

—কামরুজ্জামান

বিপ্লবী বৈশ্বাত্মিক—সংসারত্যাগী অনাসক্ত সন্ন্যাসীর
এ বিপ্লবের প্রতি আকর্ষণ থাকতে পারে, অংশাভ্যুত
তা অনন্তর বলে যান হর। কিন্তু বিপ্লবের সঙ্গে বৈশ্বাত্মিক
চেতনার সম্পর্ক যে বহির্ভূত, তা অস্বস্তি ভিন্ন অন্য প্রতিভাবান
বাস্তবিক লেখক বোঝা যায় : ব্রহ্মবাক্য উপাখ্যান,
স্বামী বিবেকানন্দ আর বেতালি স্তম্ভবস্ত্র। আরো
অনেক কৃষ্টি আছে। এ সবই ত্রিলোকসুন্দার বার
লিখেছেন, “প্রকৃত যিনি বিপ্লবী তিনি মায়াবাহের পূজারী
না হয়ে পাবেন না, মায়াবাহই তাঁর চহিজে পূর্ণতা অর্জন
করে। আধো ঘোরের সঙ্গে বলতে পারি, বিপ্লবী প্রেরণা
আর মায়াবাহের প্রেরণার মধ্যে একটা মূলগত সাদৃশ্য
ও সম্পর্ক আছে। (আবার বহু স্তম্ভাব, পৃ: ১২৬-২৭,
গৌরীশঙ্কর গুপ্তাচার্য-কৃত অন্তর্ভুক্ত।)”

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছেন, “বৈশ্বাত্মিক সন্ন্যাসীর
এক বড় এড়ও পরিবর্তন আমার করবার অধীনে ছিল,”
তা সঙ্গত হবে নি। বৈশ্বাত্মিক প্রেরণা থেকে বিপ্লবের জন্ম
হয় অথবা বিপ্লবের প্রেরণা মাত্রই বৈশ্বাত্মিক হয়ে পড়ে,
লে দৃষ্টান্তের অবতারণা না করেও বেলা বার যে,
বৈশ্বাত্মিক ও বিপ্লবীর মূলমন্ত্র বাংলা দেশে হায়েনাই
পাওয়া গেছে। ১৯০৬ সাল ও পরবর্তী কালের তরুণ
বাস্তবিক বিপ্লবীদের অনেকেই ছিল বৈশ্বাত্মিক। সুতরাং
রবীন্দ্রনাথের কল্পনামণ্ডিত অপরূপতা বিশ্বচরিত্র বলতে
হবে। তার চেয়েও দুঃখবাক্য, ব্রহ্মবাক্যকে “বিজীহিসা-
পতী” বলে ইঙ্গিত করা এবং তার অধ্যায় উপস্থানে তাঁর
অঙ্গশক্তি হের করে যেখানে।

বিশ্ব শতাব্দীর বাস্তবিক পার্থক্যের অনেকের ভাষাতে
অগ্ররূপে পড়ে, বিখ্যাত রোমান ক্যাথলিক বৈশ্বাত্মিক
মহাত্মী যিনি একথা বিবেকানন্দ-বিধায়ী ছিলেন তিনি
কি করে রবীন্দ্রনাথেরও কল্পনাতীত উপায় বিবেকানন্দকে
তক্ত উত্তর সাধক, শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীসেবক ও মনস্ত পুংরাণা
বিপ্লবীতে পরিণত হলেন। তাঁদের আদ্রই এই অন্তে
আরো উজ্জীবিত হবে যে, ১৮৯০ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি
তারিখে জাক এই মহান অধিনায়ককেও অস্ত্র লত্যাধিকী
এখন উদ্ঘাণিত হচ্ছে। তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ মুক্ত
কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন : “তৎকালী, নিতীক, জ্ঞানী,
বহুজ্ঞ ও অসামান্য প্রদাহপালী।” সেই তাঁকে জানতে
হলে, তাঁর চহিজে পরিবর্তনের ঐতিহাসিক স্তর-
পরম্পরা উপলব্ধি করতে হলে বিখ্যাত ঐতিহাসিক,
সম্প্রতি হরিলাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়
বিরচিত “উপাখ্যান ব্রহ্মবাক্য ও তারতীয় জাতীয়তাবাদ”
গ্রন্থটি পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য।

হরিলাসনাথ ও উমা বেবী উপস্থানের চেয়ে চিত্তাকর্ষক

ভবিতে এ গ্রন্থে বেশিরক্কে, কি ভাবে তহানীতবর্ণ
মুখোপাধ্যায় (১৮৬১-১৯০৭) নানা বোমানকর
আলোড়নের বাস্তবপ্রত্যয়ের মারকতে বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম-
বাক্যের পরিণতি লাভ করেছেন। আজকের তক্ত প্রকৃতির
জামলিক বাস্তবিক গুরুত্বের মনে তাঁদের লেখনী বৈজ্ঞানিক
কণাধাতের কাক করবে। তাঁরা লিখেছেন : “বাস্তবিক
আবার নতুন করে কঠোর আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্লেষণ
করতে হবে।” এই আত্মবিচারপর ব্রত উদ্ঘাণনে এই
স্বকৃত্তি সুনির্দিষ্ট উপাখ্যের অধ্যবস্ত্র গ্রহণনি পার্থক্য
মাত্রকেই অপরিহার্য সমাধতা করবে।

বাস্তবিক বিচার করে লাভ নেই; পাঠকের বর্তমান
মূলমন্ত্রের উপাখ্যানকে বিশ্লেষণ করা, যিনি পত্রিকা
কার্যালয়ে ঢুকে বলেছিলেন : “ওহে, লিখে কিছু হবে না,
চলো, ঘরে আসি।”

—প্রানলসুন্দার চট্টোপাধ্যায়

দর্শনে অনেক মুখ—পত্রিক মুখোপাধ্যায়। প্রকঃশক
—কবিগুরু প্রকাশ তখন। কলিকাতা-২৬। লম্বা ছুঁতাকা।

বরলে তরুণ, ঘর্ষে অধুনিক ও রচনার আকর্ষণ নিপুণ
এক কবিত্তে বর্তমান সাম্যোচ্চ বিপ্লবের সঙ্গে আধিকার
করলেন। তিনি পত্রিক মুখোপাধ্যায় বার রচনা ইত্যন্ত
বিশিষ্ট সাহিত্যপত্রে পার্থক্যে কৃষ্টিগোচর হয়েছেন, হরতো
বা রচনাগুলি বিশ্বের কাণেও স্রষ্ট্র করতে দ্বিধা করে নি।
বিশ্ব শতাব্দীর বাংলা দেশের প্রকৃতি গ্রন্থে স্রষ্ট্র বা
অন্তর্জালা তেমন কই এক হুবক কবিত্তে মুখ, বিশিষ্ট,
অভিভূত করে ফর্শনে অনেক মুখের কবিত্তাগুলিতে সেই
প্রশস্ত্রীক বিপ্লব, হুংরে বিচিত্র উদ্ভাস পাঠকে নতুন
এক পৃথিবীর সম্মান দেয়। কবিত্তাগুলি পড়তে পড়তে
ঘনে হয় আশঙ্কের চিরচেনা এই পৃথিবীর পরিমণ্ডলের
অন্তঃ আর এক পৃথিবী বেমানানীল অন্ধকারে বস্ত্রাভ
সাম্রাজ্য পড়ে স্তম্ভেছে। পৃথিবীর অস্ত্র এ পরিমণ্ডলে
চিরচেনা মুখগুলিও বেন মূলমন্ত্রের আদ্র।

পত্রিক মুখোপাধ্যায়ের প্রধানগুণ তাঁর চিত্তবহীতা
এ বইয়ের কবিত্তাগুলি পড়তে পড়তে পার্থক্য মুখ নরেন
নতুন এক ভূতের অস্ত্রবস্ত্র, পরিচিত পৃথিবীর বস্ত্রের
অস্ত্রবলে অপরিচিতের বিশ্বের বেমানানীল এককালি
আকাশের সম্মান পাবেন। আগামী কাব্যগ্রন্থে এই ভীম-
বহী করার মানসকলদের বিভিন্ন বস্ত্র আদ্রের মুখ
করবে আশা করা যায়। শিল্পী পূর্ণেশু পত্রীও এতক্ত
চিত্রণ মুখর।

—জামায়েত সহকার

বিবাহিত ভীষনে আপনি
কি দেখে!

জানি এ প্রশ্ন করা হলে
বিক্রমবোধ করবেন, হঠাৎ
এড়িয়ে যেতেও চাইবেন
আবার। কিন্তু কৈ শোভ
থেকে স্বপ্ন দেখা সেই সোনালী

খিনটি আপনার কাছে কি ব্যর্থ বহন করেছে, গানধন-
রত্নিন 'আত্ম' সব স্বপ্নের রত্ন স্মৃতি না নেহাৎই
কল্পস্রোতের বাস্তব?

বিবাহিত ভীষনে আপনি দেখে কিনা তার উত্তর
পেতে পারেন নীচের প্রশ্নগুলিঃ জ্ঞানবীরের সাথে রয়েছে :

১। আপনি কি সত্যিই আপনার স্বামী-স্ত্রীকে
সমালোচনা করতে পারেন?

২। স্বামী-স্ত্রী দুজনে আন্তরিক হলে আপনারা
কখনো অসুখী হন না?

৩। প্রয়োজনের সময় একে অন্যকে বিশ্বাস করেন না
আপনারা?

৪। মনের গভীর থেকে দুজনে কি আন্তরিক হয়ে
গল্প করতে পারেন?

৫। সুখী হবার জন্য আপনারা কি স্বামী-স্ত্রীতে
উদার হতে পারেন?

৬। একে অপরের কাছে বা সমালোচনা ঈর্ষান্বিত
হন কি?

৭। আপনি কি সত্যিই আপনার স্বামী-স্ত্রীর নিজস্ব
বিবাহ বা সব্য্য মেটাতে আগ্রহী?

৮। অন্যের সঙ্গে কথা বলার চেয়ে আপনি কি
আপনার স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে বেশি বিরক্ত-
আনন্দ বোধ করেন?

৯। সংসারে কত অর্থ ব্যয় হওয়া উচিত এ বিষয়ে
আপনারা দুজনে কি একমত?

১০। দুজনে মিলে কোন কাজ করার আপনি কি
স্বপ্ন আনন্দ পান?

বিচিত্রা

লেখক

*

১১। একে অপরের
আদর্শকে কি প্রভাব চাখে
দেখেন?

১২। অপরের সাহায্যের
জন্য এগিয়ে যেতে আপনি কি
স্বপ্ন কুষ্ঠাবোধ করেন?

১৩। আপনি কি সত্যিই

বলতে পারেন যে আপনি যা করেন তার পিছনে 'কথা'
কোন দৃষ্টি আছে?

১৪। একে অপরের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ হওয়া
সত্যিই কি প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

১৫। অপরের বিবাহে আপনি আন্তরিকভাবে
ঈর্ষাবোধ করেন না?

১৬। প্রেমে আপনার আস্থা কতখানি?

১৭। স্বামী-স্ত্রীর প্রতি আপনার ভালবাসা কত
খানি?

১৮। স্বপ্নের মিলে কোথায় যাওয়া হবে এ কথা
কি মৌখিকভাবে আপনারা ঠিক করেন?

১৯। আন্তরিকতা আপনি কি স্বপ্ন দেখে?

২০। গৃহ-পরিবেশ আপনার স্বপ্ন তৃপ্তির
কারণ তো?

২১। আন্তরিকভাবে এ কথা কি বলতে পারেন যে
বিবাহ-বন্ধনে আপনারা দুজনে কোনদিনই প্রয়োজ্য
হবে না?

২২। গেভিও বা ছবির অনুষ্ঠান আপনারা কি
মৌখিকভাবে উপভোগ করেন?

২৩। ব্যক্তিগত বিবাহকে একান্তভাবে নিজস্ব
ভাবের স্বপ্ন কি আসে নি আপনার মনে?

২৪। সংসার-পরিচালনার আপনারা দুজনে কি
একমত হিলেন?

২৫। পরস্পরকে সুখী করার জন্য আপনারা কি
সত্যিই আগ্রহী?

। ছবি ।

হর্ষবতার ও জুরীমহোদয়গণ,
আমি পূর্বেই এই কাঠগড়ের
সামনে দাঁড়ানোই না পূর্বে
স্বাভাবিক কণ্ঠ ও স্বতঃস্ফূর্ত
বাক্য শুদ্ধ হয়। আমি পূর্বেই
ঈশ্বরের নামে সভ্যতার পশখ
নেওয়ার অর্থ এক বিশেষ স্বরে
বিশেষ ভাষার বিশেষ ভাষাতে
কথা বলা। আমি পূর্বেই কিছু-
কিছু বাক্য প্রয়োগ এখানে
অবগাহনীয় এবং কোনো কোনো
পক্ষ ব্যবহারের কল আদালত
অবধাননা। হর্ষবতার, ব্যক্তিগত-
ভাবে আপনাকে বা মানুষের
বিচার ব্যবহার মহান, অদর্শকে দাহিত করার কোনো
ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু অন্যতরতা, অসত্যক আবেগ
ও সভ্যতার পশখিত তাক্কার যদি প্রতিবিরুদ্ধ কিছু
বলে বলি, তাহলে মার্জনা করবেন।

আমি নিজের পক্ষে কোনো উকিল নিয়োগ করি নি।
জুরীমহোদয়গণ, আপনারা ভালোই জানেন এই বিচার
ব্যবস্থা কি জটিল আর ব্যাপক আর সুখ। আমার
অন্যদিকে কি সরল, একমুখী ও প্রত্যক্ষ। জুরীমহোদয়গণ,
আপনারা জানেন জীবিকাজানের কোনো অমোঘ নিয়মে
একটা প্রাণের উত্তর হয়েছিল আর অন্তরের কি অনিবার্য
তাক্কার ধাপে ধাপে মানুষ তার বর্তমান আকার ও
প্রকৃতি লাভ করল। এই অমৃত-নিমৃত বস্তুর ধরে
মানুষ নানা ভাবে তার এক এবং একমাত্র প্রকৃতির অকুণ্ঠ
পঙ্কির ঘিরেছে। জুরীমহোদয়গণ, পৃথিবীতে ব্যক্তি
বলে কোনো দিন কিছু ছিল না, আজও নেই। ব্যক্তি—
দরদার যে কোনো ইউনিট নাম নব; একক একা, অত
দারভৌম। মানুষের কলনারও তাই স্বসংগঠিত হয়
হয় পৃথকত্বকে। এমন কি তার কলনাসক্তিও ব্যক্তি
স্বতন্ত্র্যকে সহ্য করতে পারে নি। যদি বাক্য অমুদ্যে
এক শব্দ ঈশ্বর। কিন্তু আপনারা উত্তম রূপে জানেন



স্বাভাবিক নামে স্বাভাবিক

সত্য জজের সিঁড়ি

কোনো ধর্মই ঈশ্বর শেষ পর্যন্ত একা নন। হর্ষবতার
ও জুরীমহোদয়গণ—কি জীবনে, কি কলনার এইভাবেই
মানুষ দর্শন বহু থাকতে চেষ্টা করে। আর একেই বলেছি
তার সহজাত প্রবৃত্তি, তার জন্মগত প্রকৃতি। এবং এই
তাক্কার একে একে পরিহার। গোষ্ঠী দর্শন ও রাষ্ট্রের
উত্তর, থাকে বলা দার সভ্যতা আর সভ্যতার অর্থই হল
সংগঠন। এই সংগঠনের চরিত্র ও প্রকৃতি কি বিশাল, কি
ব্যাপক, কি স্বাভাবিক নামে বহুদর্শন—তাও আপনারা
জানেন। মানব সভ্যতার এমন কোনো স্তর ছিল না—
যখন সংগঠন ছিল না। মানব জীবন ও কলনার এমন
কোনো ব্যাপার নেই—যার পেছনে সংগঠন নেই। স্বয়ং-
সত্ত্বের স্বভাবই অমৃত-নিমৃত বস্তু ইতিহাস যে বহু
বিচিত্র সংগঠন গড়েছে, নিজের জীবন ও ব্যক্তি দিয়ে
মানুষই তার বিনিয়োগ দৃঢ়, দৃঢ়, দৃঢ়ভাবে চেঁচিয়েছে।
একেই বলি সভ্যতা।

হর্ষবতার ও জুরীমহোদয়গণ, নিঃসন্দেহে মানব
সভ্যতার স্রেষ্ঠ অবলম্বন হল বিচার ব্যবস্থা—যা এই তার
সংগঠনের উর্বে অর্থাৎ এক দারভৌম সংগঠন, জটিল
দৃঢ় অত দর্শনীয়। যা চোখ প্রায় নির্যাত। আমি
অভিযুক্ত হয়ে তার সামনে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু আপনারা

জানেন, নিজের পক্ষে কোনো উকিল নিয়োগ করি নি ।
কারণ সভ্যতার মধ্যে ব্যক্তি বিচারে আনি বিচার ক্রম-
বিক্রমকারী কোনো সংগঠন বা তার একচেটির সহায়তা
চাই না । এক্ষেত্রে আনি আনি ইচ্ছা—একা, আত্মপক্ষ
সমর্থন করব ।

আপনার নাম ?

নিশানাথ ।

বয়স ?

ঠিক জানি না ।

শিতার নাম ?

অব্যক্ত প্রাণ, কারণ আপনারা তা জানেন ।

ইহার অন্যর, আসামীকে প্রতিটি প্রাণের উত্তর দিতে
নির্দেশ দেওয়া হোক । নইলে এই আদ্যাত্ত কল্লের
পরিব্রতা কল্প হবে । আপনাদের পক্ষেও এই ভুলি ও
অসম্মত পাশের গুরু উন্মোচন করি হবে মনে করি ।

বর্মান্তর, কৌশলী মহোদয়ের কাঁসে আমার
সম্পর্কে জ্ঞাতব্য দ্রব্য তথ্যই লিপিবদ্ধ আছে । তার মধ্যে
কোনো আমার ক্ষেত্রে তিনি নিত্যস্থায়ী গঠিত বলে জানেন,
সেগল সম্পর্কও প্রসূ করে করে আপনাদের অন্তর্য্যাম
হরণ করা বা অন্যর প্রাণ বিবণ করা—আদ্যাত্ত এই
কৌশল সম্পর্কে আনি প্রথমেই আমার আপাত্ত উপাশন
করিছি । কারণ জানি ভবিষ্যতে বারবার এই পদ্ধতির
পুনরাবৃত্তি হবে ।

নিশানাথবাবু, আনি পুনর্বিবেচনা সম্বন্ধে আপনি
এক মত বিশেষজ্ঞ । আপনি বিশ্বাস করেন, সময় হল
স্থির, তা কোনোদিন এবং কখনোই প্রবাহিত হয় না ।
তথ্যটি আত্মসময় হরণের এই বান্দুগী অভিযোগ কেন ?

ব্যতীত, সময় কেউ হরণ করতে পারে না । সময়
এক স্থির অকল্প ব্যাপার । পৃথিবীতে এমন কোনো
বস্তু নেই বা মানুষের এমন কোনো কল্পনা যার সঙ্গে
সময়ের তুলনা গেল । আপনাদের শূন্যতা, হৃৎপী, চিহ্ন-
বৈশিষ্ট্যবর্তী উর্বরতা কথা শুনেন, শূন্যতাভাস যে
আপনি শূন্যের নিম্নে অনন্তকাল বস্তুত রেখেছে ।
আপনাদের ইমার্জিনেশন ও ইম্পেক্টিবল চ্যুত প্রসব
হল এই বর্মান্তরসম্পর্ক উত্তীর্ণ, কালাতীত, অথবা বর্তমান
কল্পনা । বর্মান্তর ও জুর্মান্থোদয়, আমার

বিবেচনার এই বিশ্লেষণের এই এ্যাডমিনিস্ট্রেশন হারফ
অভার মানুসী এক ইমার্জিনেশনকে আরো বেশি এটো
করে দেওয়া হয়েছে । একবার সময়ের কথা ভাবুন—সে
কি ভয়, না তার প্রাণ আছে ? সে কি শূন্য বা বর্তমান ?
সে কি শূন্য বা স্থিতি ? শূন্য মত বস্তু কোথায় তার
প্রকৃত অবস্থান ? তার সেই, হৃৎ নেই, গুল নেই,
মানুষের কোনো সম্পর্কবোধ বা অভিজ্ঞতার আওতার
পড়ে না । অথ সে আছে । আর জানি না কবে তার
শূন্য, কি ভাবে তার শূন্য । অথ সে আছে । আর
জানি না কি বা কেন, অথ সে আছে । আগিতেই যে
সময় ও শূন্য, চিরকাল যে অতীত আর বর্তমান আর
ভবিষ্যতের সহায়তা, স্থির অনন্ত অপরিবর্তনীয় সেই সময়কে
আমরা তুলনা করেছি তুল্য প্রবাহের মধ্যে—প্রকৃতির কারণে
যার অস্তিত্ব । সেই সময়কে আমরা খণ্ডায় মিনিটে
সেকেন্ডে বেঁচেছি—আর মেশে মেশে তার ভিন্ন হৃৎ ।
বর্মান্তর ও জুর্মান্থোদয়—এই এখন, ঠিক এই
বৃহত্তে বস্তু পৃথিবীতে একটাই সময়—অথ ব্যালোথার
আর ভীতিতে মেশে মেশে কতই না ভিত্তি । এই এখন
সময় স্থির হয়ে পড়ছে—অথ কি তুল্যভাবে তার পরিমাপ
করি । আর পর্য্যাপ্তি লিখি পিতৃ উচ্চাসে । ব্যতীত,
কৌশলী মহোদয় ঠিকই বলেছেন—সময়কে কেউ হরণ
করতে পারে না, সময়ই সব কিছু হরণ করে । না, তাও
না । সময় সবকিছুকে জড়িয়েও তাৎক্ষণিক ব্যাপার থেকে
হালকা—অর্থাত্ত সময়েরই বর্মান্তর ল্যাক্স বসেছে, তাই সে
শূন্য সেবে, কিছুই করে না । হ্যাঁ, সময়ই বর্মান্তর ব্যক্তি ।

আসামী, তোমার কথার মধ্যে এই ল্যাক্সবার প্রবল
ঠিক বুঝতে পারছেন না । একটা কটনোই নাও ।

বর্মান্তর, আপনি বর্মান্তরই গঠিত । শূন্যতা এ গুল
আপনাকে বলায় শূন্য আছে । একবার সময়কে মেনে
কেন্দ্র সেনকে দেখতে—বহর না দিচ্ছে সেমেন ।
কেন্দ্রস্থ তখন সীমিত শূন্যের চান করছিলেন । সময়কে
হরণ থেকে তাকে সেবে নিজের সঙ্গীর বসলেন—এই
যে, এই লোক বসেছে । কথাটা কেন্দ্রস্থের শিব্যের
কানে গেল আর তত্না উঠলেন ছেপে । কেন্দ্র সেন তাকের
পাত করে সময়কে বসলেন, হৃৎপাত, আপনি এমত
বসলেন কেন জানতে বড়ই কৌতূহল যোগ করি ।

রামকৃষ্ণ একগাল হোসে বললেন, 'তাও বুঝলে না? এমি ব্যাডাটি দেখেছ? ' 'হ্যাঁজে হ্যাঁ'। 'ব্যাডাটির ২২' কি জান? ' সে হলে থাকলে জ্বলেই থাকে, আর দুগা হলে জালায়। যখন তার শ্যাক হয়ে, সে যাত্র চর, ইচ্ছে করলে জলে-জালায় বেখানে বুধি থাকতে পারে। তুমি বাশু' সেই বকব দস্যর বা সন্তান নুইসেই তুমি থাকবে বিচল কব' ইত্যাদি। 'বর্নাবতার, রামকৃষ্ণ এই 'আন্তব' উপমাটি বড়ই অস্বাভে অশ্রুণ করেছিলেন। 'বাজবিক, এক সর হাফা' কায়ের শ্যাক বসেছে বলে জানি না। ঘরিকও চারদুইয়ের খিসোরী অব্যাহতকর।

ইসোর অবার, অন্য কোনো আসারী অর্থাৎ কোনো সাধারণ অপরাদী হলে, কনটেক্টে' অব কোটের পকে এই মাত্রাতিরিক্ত বকব যথেষ্ট হত। কিন্তু প্রাধ'না করি বিচল আসারীর প্রসঙ্গত 'অনিকটেক্ষ' করে আপনি তাঁকে আশাতত এই অগ্রমোগ থেকে অব্যাহতি দেবেন। অপরাদীর পূর্ব' অপরাদ এত গু'রুপূর্ব', এত মৌলিক যে আমিও তাঁকে এই বিচার ব্যবস্থার সপে ভড়িত সর্বাসোকা গু'রুতর অপরাদ থেকে প্রতিবিন্দু করার জন্যই মলে প্রসঙ্গে কিরতে চাই।

কনটিনিউ।

নিশানাথ বাবু, আপনার জীবিকা কি?

অত্যন্ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন, উত্তর দিতে বাধ্য নই।

আশনার বামদার' সপে জড়িত সব প্রশ্নের উত্তরই আমায় দানি করে।

বর্নাবতার, আমার বিরুদ্ধে বখাখ' অভিযোগ কি তা জানি না। নু'তরাং এই মাসলার সপে কোন প্রশ্নের স্পর্শ' আছে তা নিশ' করা কর্তন। শুধু সাধারণ বুদ্ধিতে যে প্রশংসী অপ্রাসঙ্গিক হবে হয় সেগুলির উত্তর আমি দিতে বাধ্য নই।

সাধারণ বুদ্ধি? নিশানাথবাবু, আপনি আমাকে বিখিত ফিলিস্তি বিখিত করলেন। ভেবে দেখুন—সাধারণ এবং বুদ্ধি এর দ্বারা হবের কোন ভাব প্রকাশ করতে চাইছেন?

বাজবিক, কৌশলী মহোদয়—আপনি ঠিকই বলেছেন। পথ-বায়েই আশেপাশিক। সাধারণ এবং বুদ্ধি—এই দুটি

ক্ষেত্রে এক না-ও হতে পারে। কিন্তু আমার যেহেতু আইনের দান সেহেতু—

ও, ভাব্য সঙ্গকে' আপনি নিজের সেই বিবোরা ব্যক্ত করতে চাইছেন? বাহা এ সঙ্গকে' বর্নাবতারকে এ কু'মহোদয়গণকে আমি এই চিঠিটি প্রদর্শনের দিচ্ছি। ইসোর অবার—এক্স'হিবিট নাম্বার ওমান। লেখক, আসারী নিশানাথ চক্রবর্তী, প্রকক—গু'নাবনী বন্দু চিঠির তারিখ ২৭শে জুন ১৯৬২, একটি পোস্টকিনে মিল—১লা জুলাই ১৯৬২, দ্বিতীয় পোস্টকিনের দ্বারা ২২ জুলাই ১৯৬২। দ্বিতীয় পোস্টকিনের নাম দেখারি চালিগঞ্জ—গু'নাবনী বেরী চালিগঞ্জে থাকেন, তাই ন নিশানাথবাবু?

অব্যক্ত ও ব্যক্তিগত প্রশ্ন। উত্তর দিতে বাধ্য নই।

কিন্তু আমি তো আপনাদের সঙ্গক' কি, আসারী কি ভাবে বা সে দাক—ইত্যাদি ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি নি। আমি গু'রু জানতে চাইছি—

চিঠিটি যখন শেষেছেন, তখন ঠিকানাও তাতেই লেখ আছে দেখে থাকবেন।

নিশানাথবাবু, আইনের কাজে সবই প্রমাণ সাপেক্ষ অব্যাহতী বন্দু, দণ্ডগাল—জোরা বন্দু, দাক্য বন্দু—সবই এ কারলে।

বর্নাবতার—কৌশলী মহোদয় আর একটি বিচল উক্তি করলেন। একবার এক বাড়িওয়া ভরি ভাড়াটেয়ে নিখে বামদার উচ্ছেদ করতে চাইলেন। ভাড়াটে আবা বন্ধু, আমি সেখানে নিযুক্তি যেতাম—সমস্ত ঊনাতাঁ' দ্বারা জানা ছিল। বিচারে বাড়িওয়া হয়ে সেসেন—সভ্যেরই হয় হল। অত্যন্ত সাধারণ কেস। আমি দাক্য হিন্দু। সত্যের পক্ষে সত্য জেনেও আমাকে নিখ্য দাক্য দিতে হল। নইলে দাক্য নিশানাথবাবু আমার বন্ধু হেরে বেডেন, তাঁকে বাড়ি হেতে দিতে হত। আমায়তে অভিজ্ঞতা দেই প্রথর। কিন্তু বুদ্ধির বিচার বাধ্য কি অদ্বার আর জড়ি—নাহিসে...

কিন্তু নিশানাথবাবু, আমায়তের অভিজ্ঞতা সেই প্রশ্ন কেন বললেন? পরেও কি এ অভিজ্ঞতা হয়েছিল?

হ্যাঁ। কাঠগাসে তারপরেও নু'বার আমাকে গাঁভাতে

আসানীচুপে ! আপনার অশ্রাব ?

অপগ্রহের প্রভ হেঁচে দিন । অভিবোধ ছিল—বে-
আইনী অবোধে, গুণানি, পুণিলের কতরো বারাদৃষ্টি,
নরহত্যার চেটী ইত্যাদি ইত্যাদি ।

তারপর ?

সাত-আট মাস আটকে রাখল—কেস ফর' করার জন্য
তারপর শেষে রাস্তার গুণাবির চাক্ষে' খিটার হল । সে
কেস ঠিকল না । তখন নতুন করে মানদা সাজানো হল
—ইবন হরকাতকে উচ্ছেদের বড়বন্দ ।

ও, আপনি বামশহী রাজনৈতিক ?

অব্যক্ত প্রভ ।

আর চ'য়া, সকা' দিবেছিলেন কিসে ?

বলব না ।

টমার অন্যত, এই প্রবের উত্তর বত'মান নামদার পক্ষে
অভ্যাব্যাক বলে মনে করি ।

আপনার ।

আবার এক বন্ধু সুইসাইড করেন । সেই নামদার
সরকার পক্ষ আনাকে সাক্ষী হোনেছিল ।

আপনার বন্ধুর নাম ?

প্রিয়সোপাল দে ।

কতদিনের বন্ধু ?

চার বছরের ।

কি দূরে আলাপ ?

কাছকরের ।

জীবিকা-বিষয়ক ?

না ।

তবে ?

কি তবে ?

কি ধরনের কাছকর' ?

আপনার-প্রভ বৃত্তে পার্যছি না ।

আচ্ছা, ঠিক আছে । কবে তাঁর সঙ্গে আলাপ ?

মনে সেই ।

দাঁড় বলছেন তো ?

মানদু ভাবে অথবা সোভে অথবা তত্ত্বতার খিণে
বলে । আমি তাঁহু সোভী ভর কিছই নই ।

তারবানে আপনি মাদনী নিশ্চৈত এবং অভ্র—এই

কি বলতে চাইছেন ?

কৌশলী ধরোদর—আপনারে বিচারপালার
অভিবানে শূন্য দৃষ্টি শব্দ আছে—হ্যাঁ অথবা না
ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক । আর আমার অভিবান
যেহে আমি ওই পৃষ্ঠাগুলি একেবারেই ছিঁড়ে ফেলেছি ।
নীতিবাচকও নয়, নেতিবাচকও নয়—অবচ্ছাদিত—এ
জিনিষটা বোঝেন ?

বৃত্তি প্রিয়সোপালের ব্যয়হত্যার ব্যাপারে । ভালো
কথা—সে হঠাৎ এমন একটা সিদ্ধান্ত নিল কেন ?

বর্ষাবতার, তুল শব্দপ্রয়োগ আমি একেবারে সইতে
পারি নে । একজন তুললোক সম্পর্কে—

অত্যন্ত দুর্ভাব, পরলোকগত প্রিয়সোপালবাবু
পরলোকে প্রিয়সোপাল বিবাসী ছিলেন না ।

ঠিক আছে । বৃত্ত প্রিয়সোপালবাবু ব্যয়হত্যার
সিদ্ধান্ত নিলেন কেন ?

জীবন তাকে শূন্য করেছিল ।

কেন ?

সে অনেক কথা ।

ব্যবসায় প্রিয়সোপালের এই ভারেরিখান্য যদি আপনি
সনাক করেন—তাহেই সমস্ত কারণ গণিবদ্ধ আছে—
তাহলে আদালতের ক্ষুর পরে বেঁচে যায় ।

এ ভারেরী আপনি কোথায় শেলেন ?

বৃত্ত প্রিয়সোপালবাবুর বিষয়া—

আহ, এ ভারেরী আপনি কোথায় শেলেন ?

বৃত্ত প্রিয়সোপালবাবুর বিষয়া শ্রীমতী ঈশ্বরমতী
সেবীর হান্স থেকে ।

বর্ষাবতার ও জুর্দীমহোদয়গণ আমি সনাক করছি ।
কিন্তু ভারেরির সমস্ত বক্তব্য সঠিক নয় । বর্ষাবতার, এ
সত্য নয় যে আমারই অন্য প্রিয়সোপাল—বর্ষাবতার জীবন
তাকে শূন্য করেছিল । আকাংক্ষা এবং অভিজ্ঞতাকে
সে বেলাতে পারে নি—তাই

নিশানাশবাবু, আপনার ব্যবহার নাম কি ?

দীননাথ রায় ।

আপনার বাবা কি করেন ?

ওকালতি ।

আপনারা ক তাই ?

চার ভাই।

ক কোন ?

তিন কোন।

ভাইয়ের কি বিয়ে হয়েছে ?

হয়েছে—বড় আর ছোট ভাইটি।

সে কি ?

কেন ?

না, কি আছে। আপনি কোন্ ভাই ?

সেই।

আপনার দাদা কি করেন ?

ডাক্তার।

আপনি কি করেন।

ব্যক্তিগত প্রশ্ন।

আপনার পরের ভাই—বিনি বিবাহ করেন নি—তার কি পেশা ?

পূজারী করা।

ছোট ভাইয়ের ?

স্বাধীনতা।

বোনের বিয়ে হয়েছে ?

বড় বোনের বিয়ে হয়েছিল, মেসারেশন হয়েছে।

পরের দুটি বোনের ?

না।

কেন ?

ভাড়া করেন নি বলে।

স্বাধীন করেন, প্রভৃতি করে কেনেই ভেদেছিলেন আপনি বলবেন—ব্যক্তিগত প্রশ্ন। আপনার বোনেরা কি চাকরি না পড়াশুনা—

হ্যাঁ, দুইই করেন।

দুজনেই ?

দম্ভবত।

যানে ?

অর্থিক আর্থিক সব বর রাখে না।

ও, আপনারা দুই আলাদা থাকেন ?

হ্যাঁ। না, যানে একই বাড়িতে থাকে—তথাকথিত

জয়েন্ট ফ্যামিলি সিস্টেম ব্যবহারে। তবে আলাদাই আপনাদের কলতে পারেন। অর্থিক পরামর্শ করে কি পা

করেছে কি চাকরি নিচ্ছে বা ছাড়ছে—দব খত বলে রাখতে পারি না। আমাকে বলেও না আত্মকাল।

ও, আপনি তো আমার একা থাকতে ভালোবাসেন।

হ্যাঁ।

আপনার ভাবের মেলেপুলে কটি ?

হাস্যের একটি।

তার শেষ বলে আছে ?

যোরাট ছুঁ ইউ মিন ?

স্বাস্থ্যে আপনিও ইংরিজী বলেন দেখছি। কোন বর রাখেন না বলেন—ভাই—

বাব, আমি যে তাকে ভালোবাসি ?

সেম্বারল অব দি জুরী, 'ভালোবাসি' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করুন।

সে কি নিশানাখবাব, আপনি তো স্রেফ ভালোবাসা ইত্যাকার মানবিক ব্যক্তিসূচকে বিন্যাসই করেন না।

জিই বলেনে। ওকে আমার ভালো লাগে। আমি ভালোবাসার অবিন্যাসী নই।

ইয়ের অন্য অর্থের নিজের স্বীকৃতি আপনি ও জুরীয়েমেরগণ নিতাই উপেক্ষা করেন না। নিশানাখবাব, ভালো না বেলেও ভালোলাগার বিন্যাস—এ আপনার সাম্প্রতিক রাস্তা। একদিন যখন আপনি প্রেম ইত্যাদি মহৎ বস্তু বিন্যাসী ছিলেন—

একদিন শৈশবের পেরিয়ে মানব ব্যক্তি হয়।

নিশানাখবাব, সভ্যতার মহৎ বস্তুসমূহিক অবিন্যাস করাই কি ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত ?

না। সভ্যতা যে সভ্যতাই মহৎ হতে পারে নি, সম্পর্কের বিন্যাসবস্তু যে নিত্যকালীক কথা, ব্যক্তিগত তা কোথায়। ব্যক্তিগত মানবকে বিবেক দেয়। অর্থ বিবেকবানের বৃদ্ধি নেই। সে জানে কোনো কিছু আর্থিক বা কার্যকারণ-সম্পর্ক বিহীন নয় তাই প্রত্যক্ষ পরোক্ষ পানের বোকা কানে নিয়ে সে এইভাবে কঠি পরাজে এসে পড়ায়।

সাহু সাহু, নিশানাখবাব, আপনার বক্তৃতা হাত বড় চকচকায়।

আবার ভুল শব্দের প্রয়োগ ? বক্তৃতা হাত নয়, এ কেনে হবে বাস্তবকথা।

‘নশানাথবাবু, আপনার মা সম্পর্কে’ হাওয়া কি ?

মানে ?

মাকে আপনার কি রকম লাগে ?

অব্যক্ত প্রেত ।

মার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি রকম ?

মোটামুটি ।

মার সম্পর্কে আপনার হাওয়া কি ?

বাক্যগত প্রেত ।

ইয়ারে অন্যর এই প্রশ্নের উত্তর স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে
গেল অত্যন্ত ভয়ঙ্করী ।

আমার ।

বলুন ?

না একটা ভিখারী ।

কেন ?

না চিরজীবন শূন্য ভাবে জীবনের কাছে হাত পেতে

গেল তার শৈশবকালে যখন প্রতিটি সান এল, তখন তা
মিলিত পাতল না । খাবার কাগজে সেইসব লাহু ভিখারী
বা পরিচিত লাহার কথা কখনো কখনো বেরোয় যারা হঠাৎ
অপ্রত্যাশিত বন কুড়িয়ে মালিকের কাছ বা খানার জমা
বেব—আমার মা তেমনই এ লাহু ভিখারী । অবশ্য এ বদর
কাগজের নয় । শূন্য আমিই জানি আর মা জানে আর—
আর কে ?

বলব না ।

আজ্ঞা, আপনার মা-ই সে কথা লেগেন । তিনিই
আমার এক নম্বর উইটনেস । শব্দবস্তুর লাকী
মুশালিনী সেরীকে ভাকা হত ।

‘নশানাথ’ থাকিরে লেখল যবে আপো জলে উঠেছে ।
আর লেখলে জানলার পরাণের ছায়াটা মিলিয়ে গেল ।
সেখানে না এশে পড়ালেন ।

[ক্রন্দন :



ঐ ঘটনার দু'দিন পরের কথা।

সকালে, ববরের কাগজ খুলতেই এলহামির মন্ডর পড়ল প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হেতুপাইয়ে ববর বেরিয়েছে—
—‘জীষণ ঝড়।’

এলহামি ববরের কাগজ

সাধারণত: পড়ে না, তার কারণ সে মনে অবশ, কাগজে যে সব ববর খেতাব, তা নিয়ে তার কোন দিন কোন কাজ হবে না। শুধু আশা যে সে কোন কাগজ-পানার খুলে হেড লাইনগুলোর চোখ হুলস্থিল, তা সে নিজেই জানেনা।

ঝড়ের ববরটা পড়ে দেখতেই, এলহামি বেগলে, কাগজে ববর বেরিয়েছে, ইলেক্ট্রিক আর্থ ডেভেলপমেন্টের ট্রান্সমিউশন, পত দু-দিন দিন থেকে জীষণ ঝড়। আর দুটি তার মাঝে মাঝে হচ্ছে, আর আশঙ্ক সে ঝড় লাগে হয়নি। এর কসে, ঐ সব জায়গার অবিসানোরা, ববরের নিয়ে খুবই বিব্রত হয়ে উঠেছে। অনেকের চোখা ঝড়ে উড়েছে, আবার কারো কারো সব ববরটাই কাৎ হয়ে ভেঙে পড়ে গেছে। কিন্তু কতটা পরিমাণ ঐ অবস্থি তার চেয়ে বড় দুর্ঘটনা যে কোন কিছু ঘটবে, সংবোধনের সংযোগতা? সে বকম কোন কথায় বলেনি।

কিছুক্ষণ অন্য টেবিলে বলে একটা চিঠি লিখছিল। কাগজের ববরের মধ্যে আর কোন কিছু এলহামির মনোযোগ আকর্ষণ না করার, সে পেনের পাতার মতুন প্রকাশিত বইগুলোর সমালোচনা পড়তে লাগল। হঠাৎ একটা বইয়ের সমালোচনা পড়ে সে কিছুক্ষণ ভেবে বললে,—‘শোন, শোন, কিংবা বইখানার কি লুন্ডর সমালোচনা দেখিয়েছে।—সমালোচক লিখেছে—
‘এ এমন একখানি বই, যা দুজনে বলে বইখানি পড়ে দেখতে হবে।’—কিন্তু এত অতিহাসিক কথার আর সবাই-ই একথা ভাল করেই জানে, যে কোন বই দুজনে বলে সেটাকে ভাল করে পড়ে দেখতে হবে একে বইয়ের

সোল অব লিলিথ

মেরী করেলী

অনুবাদক—হরপ্রসাদ অধ্যাপাধ্যায়

সমালোচনাটা হল কোথায়—না পড়ে, কেউ কি কো: দিন কোন বইয়ের উল্লেখ করতে পারে নাকি?—অতি অদূর, আর নতুন একমের সমালোচনা ন কি এটা?

তবে কিংবা যে

উঠল। তারপর হঠাৎ তার একটা কথা মনে পড়তে গে পড়ার হয়ে বলে উঠল,—‘সে দিন ম্যানমসে ইরীনের একটা বইয়ের সমালোচনা কাগজে পড়লুম পড়ে আবার ইচ্ছে হচ্ছিল, একটা ভাল কাঁটাওয়া হাটার দিয়ে, সেই বুদ্ধ: সমালোচককে বেশ করে অংগ পাড়তলা চাষকিয়ে দিবে আসি। বা সে লিখেছি সেটাকে কোন বই এর সমালোচনা না বলে, অবশ্য কিংবা আর রুটতারই নিল’ক প্রবন্ধ বলা চলে।’

‘তার কারণ আছে কিংবা? আশঙ্কের মূল এমন পড়েছে যে নাকি লেখক বা লেখিকার লেখার ভেতর ব বত বেশী কল্পিত হোক ত্রুটি দেখাতে পারবে, ততই ব বড় সমালোচক সাহসী নিষ্ঠুর সমালোচক বলে পাঠ সমালোচক কাছে প্রতিষ্ঠা পাবে। এটা এই বতাকীর একা নতুন চাল বা কারক্য বলতে পারে। এতেই সমালোচকের নাম, ডাক, প্রতিপত্তি বেড়ে যায়।’

‘তা হলে দুজনে হবে, আগের দিনের সোয়ে মানসিক ভাবের এমন অনেক পরিবর্তন হয়েছে,—কো তাই নয় কি?’

‘টিক তাই।—কারণ এখন পরিবর্তন আরও অনেক কিছুবই হয়েছে কিনা! ...এই বত, মেমোরি কথ আগের দিনে প্রচুর পকে তারা পুস্তকের ক্রীতদাসী ছিল। আর আজ তারা সকল বিষয়েই পুস্তকের স পর্যায়ের উঠেছে,—সব কামেই তারা পুস্তকের সাপে প্রতি প্রতিষ্ঠা করছে। কাজেই পুস্তকোত্ত, এখনো সেটা টি বরফাক করে উঠতে পারছে না। টিক টিক বরফাক করে আর সময় নেবে।—তা ছাড়া, প্রকৃতির বিগানে পুস্তক

চিত্রকাল অভ্যাচারী ছিল, আর থাকবেও, আর নাটী হবে তার বর্ণের সামগ্রী, কাজেই এই সংঘর্ষ অনিবার্য। —হ্যাঁ, একথা সত্যি যে পুতুষরা আর ঠিক ভাষের ভেতন নেই। —আর চোঁটা করলে বা তাতা হতে পারত তাও হয় নি।”

“তা ঠিক। মানুষ ইচ্ছে করলে বেব-চরিত্র হতে পারত। কিন্তু, তার বদলে ফোঁটা বাজে শরতান ধবার স্বাক্ষর অধিকাংশ লোকের।”

“ঠিক তাই কিংবা। কিন্তু এরও একটা কারণ আছে জানো আর সে কারণটা হচ্ছে, ফেবতা হওয়ার চেয়ে হাড়ান হওয়ারটা অনেক বেশী সোজা কিনা। আর মজাও চ্যাপে মেলে বেশী।”

কিন্তু এবার, আবার তার চিঠি লেখার মন ছিল। লিখতে লিখতে তার মনে পড়ল ইদীপকে আর গুপরের বেত নিমিত্তি। উত্তরীকে। সেই লগ্নে একথাও তার মনে হল, যে ইদানীং বেদ এলরামির মধ্যেও অনেক নিবর্তন ঘটে গেছে। তার স্বাভাবিক তীব্র চোখে ঠি এখন বেদ, আগেকার চেয়ে অনেকটা কোমল হয়েছে। সুখের ভাবেও বেদ আগেকার চেয়ে কতকটা ক্ষমীয়াতা ফুটে উঠেছে। দেহের সৌন্দর্যেও বেদ একটা মানুষ ফোঁটা দিয়েছে। কলে, চোপের তার আগেকার, আগেকার মতন তীব্র হলক, এখন আর বড় বেশী কথা যায় না। কিন্তু তার এত সব পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও, সাজা কিন সে যে বকম অস্বাভাবিক পরিপ্রভা কবে, কতকগুলো তরুণ, তার কলে হরত সীপিরই তার শরীর তাকে পড়বে!

এই সময় হঠাৎই এলরামি তাকে প্রশ্ন করলে,— ‘সাজা, উপাসনা করাটা তোমার কি বকম মনে হয়?— অর্থাৎ এই কঁবাই আমি জানতে চাইছি, যে এই যে গল্পের উপস্থানের এত উপাসনা করে, ও উপাসনা, কোন দীন কারো চরিত্রপ্রভা পৌঁছায় কি?’

হাতের কমদটা রেখে দিয়ে, দু’ দু’লে কিংবা লালে,—“জুদিই ত একদিন বলেছিলে, যে বাহুত্তর প্রভৃতির এক বিরাট কনোগ্রাফ বর দার মধ্যে সব লক্ষ্যনা বার আর বরে রাখা বার।—কিন্তু উপাসনার হল। আরও একটা কথা তবে যে বরবার আছে,—অর্থাৎ

কেমন তাহে উপাসনা করত জুদি? এ একটা গিবেলনা করার মতন বিশেষ কথা।—আমার মনে হয়, মন প্রাণ দিয়ে ঐকান্তিকভাবে উপাসনা না করলে, সে উপাসনা কোথাও পৌঁছায় না। বাহুত্তরে বিনীত হয়ে যায় শুধু।—তবে এ কথা খুব সত্যি যে উপাসনার উপাসকের চিত্তবৃত্তি করে। আর প্রার্থনার সবচেয়ে ঠিক ঐ কথা-গুলোই বলা চলে। তবে আমার এ মত সবাই হরত না মানতেও পারে।—এ সবচেয়ে, আমি নিজে যা বুকেছি আর তা বুকে, আমার যে ধারণা অগ্রেই সেই কথাই বললুম আমি তোমার।”

“বেদ তারপর?”

“তারপর প্রার্থনা সবচেয়ে আরও আমার বলবার আছে। নিজে আমি প্রার্থনা বড় একটা করি না। শুধু সকালে ঘুম থেকে উঠে আর রাতে শোবার আগে, আমি উত্তীর্ণকর বাছা বাছা কথা দিয়ে উপস্থানের স্তম্ভগান করি। তিনি হয় করে যা বতটুক পেমিন আমার হিরেছেদন, গুণে খেঁচে থেকে শান্তি পাবার পক্ষে তাই আমি যথেষ্ট মনে করি। তার চেয়ে বেশী আর কি প্রার্থনা করব, অর্থাৎ পাবার জন্যে চাইব তাঁর কাছ থেকে? তিনি নিজে যেটা উপযুক্ত মনে করে আমার হিরেছেদন বা যেবেদ তার চেয়ে বেশী আর কিছু আমার প্রাণা থাকে কি?—অবশ্য একটা কিনিব আমি তাঁর কাছ থেকে পাবার জন্যে রোজই নিরমিত তাহে প্রার্থনা করে থাকি।”

“কি সেটা?”

“শাখা।—আমি মন প্রাণ দিয়ে রোজই প্রার্থনা করি,—‘যে বিধিভা, অপরাধ করে আমি বেদ কোনদিন তোমার কাছে কথা প্রার্থনা না করি আর কখনও ফেন সে অপরাধের শাস্তি নিতে আমি স্তুতিত না হই,—এই বরাই আমি তোমার কাছে চাই প্রার্থনা।’—পরলোকে গিয়ে গাপের সাক্ষাতোগ করার চেয়ে আমার মনে হয় এইখানেই সে সাক্ষা ভোগ করে কর্কলের তার কনিরে পরলোকে যাওয়া অনেক শ্রেয়। তা না হলে এই কর্ক-কল দক্ষিত হতে হতে যখন সুগন্ধ প্রাক্তন কর্ককল হয়ে গাড়াবে তখন কোন এক ক্ষণে, অস্বপ্নমুগ্ধ থেকেই সে কর্ককলের সাক্ষা ভোগ করতে হবে অথচ সে ক্ষণে জ্ঞান হবায় আসে আমি কোন অপরাধই করিনি। ওর জাতি

নর নাহু সে ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই মনে করলে, তগবান যেন তার গুণের অবিচার করেছেন!...প্রাক্তন কর্মকলের কথা নাহুয়ের মনে থাকে নাও।"

কিরাজের কথার এলহামির সুবান! যেন বেশ একটু রান হয়ে গেল। ঠোঁট দুটো ঠেং ঠেং উঠল তার। ভিত দিয়ে শুকনো ঠোঁট দুটো সরগ করে নিয়ে সে কিবাজকে বললে,—“তুমি আজ আমার একটা অমৃত কথা,—বিচিত্র হুজি খোনাতে কিবাজ! অগৎ শুভ সোক দিন রাত তগবানের কাছে প্রার্থনা করছে,—‘আমি পাশা আমার কথা কর হুজ!—আর তার বললে তুমি প্রার্থনা করে চাইছ, ঠোর কাছ থেকে—‘সাজা’!...আর তোমার বলার রকম থেকে আমার মনে হয় এই সাজাটাকেই যেন তুমি সবার বড় আশীর্বাদ বলে মনে কর।’

“সত্যিই বাবা, সাজাকেই আমি সবার বড় আশীর্বাদ বলে মনে করে থাকি। আমার ধারণা এই সাজাই নাহুকে গোড়বাওরা পাকা সোনার মতন খাটী—নির্ভর করে দেয়। ঐতিগবানের নিরমতক করার পর সাজা ছাড়া আর কিই বা আমাদের প্রাণ্য হতে পারে? প্রকৃতির নিরমতক করলে প্রকৃতি লগে লগে তাকে অমৃত করে সাজা যেন। তেহমি মনে আমাদের যখন পাণ্ডিত্যের উপর হয়, সামলিক অশান্তি দিয়ে গুগবান আমাদের সে পাণ্ডিত্যের সাজা দিয়ে থাকেন।—এই-ই ও হুজা উল্লি!...আমার মনে হয় আমাদের কর্মকল সবই হোক বা দুঃখই হোক বাই আমাদের প্রাণ্য হোক না কেন এই পৃথিবীতেই তা আমাদের ভোগ করে কর্মকলের স্বর করে যেতে হয়।”

“তগবানের কাছ থেকে আর কিছুই কি তুমি চাও না কিবাজ।”

“না বাবা!...তার কারণ আমার ধারণা,—না বুড় বিশ্বাস এই যে—বা আমার পক্ষে মজলকর—বা আমার পাওরা উচ্চ, ঐতিগবান তা নিয়ে থেকেই জানার বেধেন—বিচ্ছেন, তার মধ্যে প্রার্থনা করার স্বকায়ই নেই কিছু। আর বা আমার প্রাণ্য নর, তা নিশ্চয়ই আমার পক্ষে ‘হু’। নত প্রার্থনাক্ষেত্রে তা তিনি আমার বেধেন না!...তাই যদি হয় তবে এরকম প্রার্থনার স্বকায়টা কি?”

কিরাজের কথা শুনে এলহামি কিছুকণ অবধি চুপচাপ বলে রইল চেয়ারে। তারপর চিন্তিত মুখে চেয়ার থেকে উঠে যত্নের মধ্যে সে পাচচারি করতে লাগল। তার করক পাচচারি করে সে এগে কিবাজের পাশে ঝড়িয়ে বললে,—“হারমিক ভাইটা আমার! তোমার কথা তোমার হুজিগুলো আমার বড় ভাল লেগেছে। আজ থেকে আমিও পাবার জন্যে প্রার্থনা করা বন্ধ করে দেব।...আমার জীবনে একটা বিশেষ লক্ষ্য আছে,—একটা বিশেষ রকম আনন্দ আমার পেতেই হবে!—কিন্তু আজ থেকে তা পাবার জন্যে আর প্রার্থনা করব না নিজের উদ্যমে পুরুষকারের বলেই তা আমি পেতে চেষ্টা করব।”

এলহামির কথা শুনে, কিরাজের মনের মধ্যে কেমন যেন একটা তরুর ভাব বেগে উঠলো। দুখে ভাইকে শুধু এই কথাই দে বললে,—“সচা যদি তোমার পক্ষে ‘হু’ হয়, তবেই তোমার উদম সকল হবে কেনো—কিন্তু তা ‘হু’ বলে, কিছুতেই তুমি সকলকাম হবে না!...এ সব বিষয়ে গুগবানের বিচারই চরম বিচার,—তার গুণের আর আশীল নেই!”

এইবার কিরাজের হুজি শুনে এলহামি বিব্রত হয়ে যেন বৈবহার্যর মতই বলে উঠল,—“তোমার কেবল ভগবান,—তগবান, আর গুগবান! আমি গুগবানের কোন বাগা না যেনে নিজের পুরুষকারের বলেই, আমার সে উদ্বেগ সকল করব বেধে নিয়ে তুমি।”

এই সবর কোন সোক যেন ধেয়ে ধেয়ে বাইরের ঘোরের কড়াটা বার বার নাড়তে লাগল। এলহামির কথার কোন উত্তর না দিয়ে, উঠে গিয়ে, সঘরের দোর খুলে কিবাজকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে সে একটি অলমতরা চোখ কেঁপে কেঁপে মুখ চোখ ফুলে গেছে, গলা দিয়ে কোন স্বর বেরুচ্ছ না—এমনি একটি আশঙ্ক! তার দুখের বিকে চেয়ে মহাবিশ্বতরের এলহামি বলে উঠল,—“আরে ?—কাল? যে ?...এখানে তুমি কেন এসেছ কাল?”...হঠাৎ কি তোমার ?—সব কথা আমার খুলে বল বেশি ভনি তোমার ব্যাপার কি?”

উত্তরে কাল! কিছু বলতে গেল, কিন্তু চেষ্টা করা নাহুও বেচারীর গলা দিয়ে কোন স্বর বেরুল না কেবল দুচোখ থেকে অশ্রুপ্রাণ্ড দারার অক্ষ বহতে লাগল তার। তার

অবস্থা হেবে এলরাহি একটা মাসে এক গেলান মর তেলে, তার হাতে বিয়ে বললে,—“কাল” তোমার শরীর ভাল নেই !...এই এই চেয়ারে বসে মটটু হু খেয়ে তেলত আগে !”—বলে তাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলে ।

উপবেশ মত মটটু হু খেয়ে কাল” কতকটা সামলে নিলে । তার পর বেঘে বেঘে বলতে লাগল,—“আপনি ...আপনি কি আমায় কিছুই শোনেন নি স্যার ?”...

“না কাল”, আমি তো কিছুই জানি নি । তোমার অবস্থা হেবে কিছু আমি বেশ বুঝতে পারছি, কি তুমি বলতে চাইছ !...তোমার মনিব...ডাক্তার ক্রেমলিন দ্বারা পেছেন ?—তাই না ?”

এলরাহির কথা শুনে কাল” আবার নীরবে কাঁপতে লাগল ।

কিরাঙ্ক আর চুপ করে থাকতে পাংলেন না । এগিয়ে এসে কাল”র কাছে একটা হাত রেখে বসন্তত্যা কণ্ঠে সে তাকে বললে,—“চুপ কর কাল” !—মন শক্ত কর । ভেবে দেখ পৃথিবীতে তোমার মনিবের ত কোন সুখই ছিল না, কেবল দুঃখই ভোগ করে গেছেন আদ্যে । কিন্তু তিনি এখার বেঘাবেনে খেছেন, সেখানে আছে শুধুই সুখ ;—দুঃখ বলে কোন কিছুই নেই সেখানে ।”

কাঁপতে কাঁপতে কাল” বললে,—“এ-কথার মন মানছে কই তার ?...তগবান, বিচার করে থাকে সাক্ষা দিয়েছেন, তাঁর তাল্যে মন কোথা থেকে আসবে ?”

এইবার এলরাহি কিরাঙ্ককে বলেছিল—তগবানের কোন বাণাই মানব না আমি’, আর এখন ‘কাল’ কেঁবে কেঁবে বলছে,—তগবান বিচার করে থাকে সাক্ষা দিয়েছেন । এই দুটো কথা মনে বসন্তত্যা এলরাহি ঘের একটু বিচলিত হয়ে উঠল—“তোমার ও কথার মানে কি তা আমি জানি না কাল” । তবে এ-কথা আমি জানখুই যে একটা বৈবহুত্বনা না বলে তোমার মনিবের সত্যের কোন সন্দেহনাই ছিল না । তবে তুমি তগবানের বিচার তগবানের বেত্তা সাক্ষা এসব কথা বলছে কেন ?”

“না হুত্ব সে বক সাধারণ বুদ্ধিটা নয় ।” বলে কাল” কাঁপতে কাঁপতে বেঘে বেঘে ক্রেমলিন কি তাহে জানা গেলেন তা সন্নিহারে বলে গেল । অন্তরে অন্তরে

এলরাহির মত বৃচ মনবলে বলীমান লোকেরও তরে শরীর রোমাঙ্কিত হয়ে উঠতে লাগল ।—বুকের মধ্যে বেন ছর ছর করতে লাগল এলরাহি । সে সময় একা কিরাঙ্কই শুধু সে ঘরের মধ্যে অবিলম্বিত অবস্থায় ছিল ।

কাল”ের বর্ণনা শেষ হলে কিরাঙ্ক তাকে বললে—“তিনি ত বেশ ভালই পেছেন কাল” ? বাজ লড়ার সঙ্গে সঙ্গেই, তাঁর আত্মা বৈবহুত্ব হয়ে গেছে কাঁকেই কোন ভাবনাই ভোগ করতে হয় নি তাঁকে !...এর চেয়ে সুখের নয় বাস্তবের আর কি হতে পারে ?”

অস্থির মত কাল” তার আগের কথাই জের টেনে বললে—“সেই ক্ষেত্রে ত বলাই যে তগবান বিচার করে তাকে সাক্ষা দিয়েছেন । মনিব আমার রাত দিন লেখপড়া করতেন—আর যা জানবার নয় তাই জানতে চাইতেন । তাই যোগদেয় তগবান তাঁর তগর বিস্তর হয়ে উঠেছিলেন ।”

বিস্মিতভাবে এলরাহি বললে—“হান বাপু ! যা বোঝ না, তা নিয়ে মিছে মাথা ঘামিও না ।...তুমি বিশ্বাসী, আর খাট্টের চাকর তোমার কাজ তুমি ভালই কর । কিন্তু তোমার মনিব কি করতে না করতে, তার সন্ধে তোমার মতব্য করবার বরকার কি বাপু ?—ছেড়ে দাও ও সব বাজে কথা ।”

এলরাহিকে অসন্তুষ্ট হতে হেবে কাল” বললে—“আমি বিশেষ করে আপনার কাছে এসেছি এই কথাটাই বলতে যে বহা করে আপনি আমার মনিবের সেই অতিথক চাকাটা এখানে আনিয়ে নিল । যাবত্বাটা আপনারকেই করতে হবে কারণ আমি বাস্তববানের আর কোন লোকই সে তুত্বকে চাকাখানা হুঁতে অধি রাছী নই !...আর, ষা আমার মনিবের দ্বারা এই চিঠিখানা ছিল ।”—বলে সে নীলমোহর করা একটা বানের চিঠি এলরাহিকে দিলে ।

হাম ছি’কে এলরাহি দেখলে, চিঠিতে লেখা আছে,—‘প্রিয় এলরাহি,

‘আমার সত্যের পর আমার বা কিছু সম্পত্তি সবই তুমি নিজে । কেবল একটা অহরোণ বেঘো,—আমার সত্যের পর চাকাখানা মই করে কেলো যাতে আমার মতনের সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনল্যার শেষ হয়ে যায় ।

চিঠি পড়ার পর কতক্ষণ অবধি বসটা নিভক রইল,—
কেউই কোন কথা বললে না। তারপর এলগামি উঠে
গিয়ে আলমারি খেঁচ লাগ রঙ-এর মতের মত কোন
কিছু ভরা একটা বড় বোতলে এনে কাপ'কে দিয়ে বললে,
—“এই বোতলে সে শুষ্ক। আছে চাকার ওপর তা তেলে
দিলেই যেখাবে কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্ত চাকাটা পুড়ে ছাই
হয়ে যাবে। কাজেই বুঝতে পারছ যে চাকাটার কুহুতে
কোন কিছুই নেই, একটা নতুন বকশের ক্ষটক—কাচের
তৈরী চাকাটা।...চাকাটা পুড়িয়ে আবার বন্ধুর বেশ
কাননপজ, আর অন্য জিনিষ আছে, সব এখানে
নিয়ে এসো।”

তারপর জেমসিনের শেখত্যা সব্বন্ধে কাপ'কে
উপবেশ দিয়ে বিস্ময় করলে তাকে,—“তারপর তুমি
কি করবে মনে করছ কাপ'?”

“আব কোথাও চাকরী খুঁজে নিতে হবে হুজুর!
তবে মনে করছি এবার কোন ঘরের মনিষের কাছে চাকরী
নেব। পুস্তকসেব কাছ বড় একঘেরে হয়, কিন্তু মেরেসের
কাছে নিভা নতুন হুজুর গ'ওয়া যায় শুনি।”

এলগামি বললে,—“বেশ ঘরে মনিষই তোমার
খোঁজাক করে নেব।”

খুবী হয়ে কাপ' হোতলটা নিয়ে চলে যেতে যেতে
বললে,—“সে আলনার বধা হুজুর।”

[৩২]

কার্ল এর কাছে, জেমসিনের হুজুর বিবরণ শুনে,
এলগামির দূর্বীর সাহেব আর অসীম মনোবলের যেন
ভিত্তি অবধি কেঁপে উঠল। বাইরে তার কোন লক্ষণ
প্রকাশ না পেলেও মনের মধ্যে তার একটা ঢাকলা ভেঙ্গে
উঠে তেতরে তেতরে যেন তাকে অশান্ত করে ফুলেছিল।
তার কপে বসটার পর বসটা ঘরে আসে যেমন সে পতীর
মনবোধে পুঁথি অধ্যয়ন করতে পারতো এখন সে তা আর
একটানা কিছুক্ষণ অবধিও করতে পারছিল না।
কাজেই বিরক্ত হয়েই সে দিলিখের ঘরে যেত। তার
কারণ সে লজা করেছিল কোর করে বলে অধ্যয়ন
করলেও খানিক পরেই সে বুঝতে পারত, একক্ষণ সে যা
পড়ছে তা বোটেই তার মনের ওপর কোনো প্রভাব পড়ে
না।

পারে নি! তাই সে অল্প কিছু কবিতার গুজুই অধ্যয়ন
করে দিলিখের ঘরে যেত কিন্তু সেখানেও আর যেন সে
আপেক্ষার মত ব্যাবাহিক ভাবে পতীকর কাছ
চালাতে পারত না। অনেক সময়ই বসটার পর বসটা
সে শুধু দিলিখের সুন্দর সুখামির বিকে পলকহীন
দৃষ্টিতে চেয়ে বসেই থাকত। আপেক্ষার মত দিলিখের
আলোকে ঢেকে প্রভেদে পর প্রর করে মজুন মজুন তথ্য-
সংগ্ৰহে চেষ্টা মাত্রও করত না। অনেকক্ষণ এইভাবে
চুপ চাপ বসে থেকে শেষে সেখান থেকেও ব্যর্থ কাহ
হতে বেগিরে আসত। সে বুঝে উঠতে পারছিল না
এভাবে সে দিলিখের কাছে সিরে কোন প্রর না করে
চুপ করে বসেছিলই বা কেন?—আর বসে বসে একক্ষণ
ভাবছিলই বা কি?

দিলিখের ঘরের শেষ প্রান্তে একটা নিভিত্তি কোণে
আরোবা তার লেপ বেগমার কাম নিরর বসে থাকত
আর মাত্রে মাত্রে চোরা চাউনীতে এলগামির চিত্তা-
রান হুখের বিকে চেয়ে নিরর মনে মনে ভাবত,—
“এলগামির প্রাণে প্রেমের আভন লেগেছে...জগবানের
রাখো এ আভন থেকে কারোই যে নিভিত্তি নেই! কিন্তু
আর কতদিন এলগামি এই দুর্ভব প্রেমের সঙ্গে যেন।
মনে মীরবে লড়াই করে য়া। সময়ের অপচায় করবে?...
তার চেয়ে বেচারী দিলিখকে এই বস-হুজুর থেকে
খানিরে হুজুর বা কেন?...প্রেমের আভনেই লজ লড়াই
করে আল অবধি কেউ কিংতে পেরেছে কি?...
পেরেছে কি মনকে আপের মতন অক্ষত অবস্থার খরে
রাখতে?...তবে এখন করে বসে বসে, য়া সময় নষ্ট
করা কেন মিছি মিছি?...”

আরোবা যেন যেন প্রতিদিন এই, সব কথাই
আলোচনা করলেও যুখ হুটে আর কোন কথা বলতে
তার সাহসে হুলাহ মি।...কি জানি বনিব চটে উঠে
আবার যদি আপেক্ষা মতন তার বাক রোহ করে গের!
...কথা না করে থাক বাহ মাকি?...

ফিন কতক এমনি ভাবে কাটবার পর এলগামি
নিষের মনেই প্রর আগল,—কেন সে দিলিখের কাছে
এসে এখন করে তার বিকে চেয়ে চুপ করে বসে থাকে?
এসে এখন করে তার বিকে চেয়ে চুপ করে বসে থাকে?
এসে এখন করে তার বিকে চেয়ে চুপ করে বসে থাকে?

কোন সহজতর খুঁজে পেলে না।

অপেক্ষা...সে দৃষ্ট বহুলা ক্রমতে চার—কানতে চার
বান সে ও কি? কিন্তু আজ তার হৃদয়ে সন্দের কাপল
মিলেতে কানে কি? আত্মশক্তির, নিজের দৃঢ় মন-
দর গায়ে তার কোন দিন অস্ত ছিল না। আজ
তার মনে হতে লাগল, ঐ যে স্বপ্ন-সুখার আঙ্কর
। লিলিথের যেহটা পড়ে আছে, সশ্রুতি তাতে যেন
একটা অস্ত্র শক্তির বিকাশ হয়েছে, আর তাইই কলে
। যামিত নিজের মনের মধ্যে কেনন যেন একটা গোল-
দেব সৃষ্টি হয়েছে। এই মনের মধ্যে গোলগোল সৃষ্টি
। ওঠাতেই, সে লিলিথের আঁখিকে ডেকে আসেকার
। তার প্রস্তের সমাধানে করিয়ে নিতে পারছে না।...
সে অস্ত্র শক্তি যা তাকে এমন করে বিস্তার করে
পড়ে?

মনে হল যথেষ্ট এসে লিলিথকে চেপে ধাবার পর
তেই যেন লিলিথের দুর্ভাগ্যের বেগে এই মনু শক্তির
কাপ হতে আরম্ভ হয়েছে।

যথার্থ্যকে ক্ষমতা যে কত অসীম তা সে ভাল
ইই জানতো। তাছাড়া তিনি বলে ছিলেন, লিলিথের
স্রোতে তিনি ব-সকে গেছেন,—বেশছেন। অচ-
ল্যামি, আজ অবধি তা যেহতেই পার নি কদিকের
মোঃ।...তবে—তবে কি তিনিই তরুণীর বেগে এই
সুত্র শক্তির স্ফূর্তি করে গেছেন, বার প্রত্যয়ে
লরামির আক এই বিস্তারিত পেটে?...কে জানে? এও
। এক দুঃখো লম্বা।...তারপর কিরাগ।...তারি
। ছুঁতি,—তার প্রেম-দিক্স আভান তনে দুর্ভাগ্যের
লিলিথের ক্রমে শূন্য হাঙ্গি কুটে উঠেছিল। তা থেকে
। কথা স্ট্রি বোধ্য যায যে কিরাগের ডাকে লিলিথের
নের মধ্যে যেন একটা আনন্দের তুলির অস্থায়িত্ব
অগে ছিল।

পেগের কথাগুলো যেন হতেই প্রাণের মধ্যে এলরামির
কমন যেন একটা অলোচ্যত্ব তার বেগে উঠল।
। যেন হল তার তবে ক লিলিথ তার,—একমাত্র তার
একটাই শুধু নয়।...যাযারই তার কথা। যে লিলিথ
রু তার এতাইই নিজের সম্পত্তি থাকবে। কাকেই
হাঙ্ক এ দিবসে সন্দের জাগ্রতের মনে তার এতটাই

দংকর বেগে উঠল,—লিলিথ একা আমারই থাকবে।
তপনাম,—যরতান কেউই তাকে আমার কাছ থেকে
ছিনিয়ে নিতে পারবে না...না, না...কিন্তুতেই না।
কেহটা তার একা যাবেই সম্পত্তি আমার যেহাল শূন্য
মত, যতদিন ইচ্ছে তাকে আমি এমনি তাই বাঁচিয়ে
রাখব, আর...যদি আমার মজি হয়,—তখন ইচ্ছেই
যদি আমার মনে লাগে, তবে হস্ত তাকে বাঁচিয়ে
আগিয়ে তুলব।...আর কেলে বা দুমিহে যেমন তাইই
থাক না কেন লিলিথ—আমরা তার আমার কথামতই
কাজ করবে চিরদিন!...এহের পাশে উপগ্রহের মত,—
কারার পাশে ছায়ার মতনই সবদিন সে শুধু আমারই
কাছে পাশে থাকবে। আমাকে রেখে তার কোন হস্ত
সতাই থাকতে পারে না।..."

এই সময় হঠাৎ সে অস্থিত্ব করলে, যেন তার
হাস্যের হয়ে বাজে।—এক মলক তাকাতা হাতাসের
অন্তে প্রাণ তার আঁকু-পাঁকু করে উঠল। উঠে যেটা
মহামলে পরমাণা সঠিরে বহু-বোনের কপাট দুটো
মুলে তাকাতা হাতাসের সে হাস নিতে লাগল। তখন
পেলে সে এই সময় নীচে অর্গান বাজিরে কিরাগ তখন
গান করছে। তার গানের কথাকলে স্ট্রি এলরামির
কানে এসে। কিরাগ গাইছিল—

আকাশের যে পাতালের দানা
নাযি না আমি কাহারও দানা
তার প্রেম তরা ছুঁব আমার
চিরদিন হবে আছে মোর আনা—
তাই ত মরণে করিয়া তুচ্ছ
নিশি রাপি তার চিত্তার পাশে।...

কিরাগের এই প্রেমের গান তখনতে শুনে এলরামি
যেন মনের মধ্যে হালু বৌঁলা অস্থিত্ব করতে লাগল।
ক'পতে বাকা হাতে সে তাকাতাচ্চি মোটাই বহু করে
তার তপর যব মনের মোটাই পরাটা পুরো দাকার টেনে
দিলে, হাতে কিরাগের গান আর তার কানে এসে না
পৌছয়। তখনও তার মনের মধ্যে সেই গানের কথাগুলো
কমন যেন একটা চাকলোর ডাক কুটরে তুলতে চাই-
ছিল। হঠাৎ কেউ যেন কথা কইছে বলে সে যোয
মসক।

১. সোম অব লিলিথ

দুঃ কিভাবে বেধতেই দেবতে পেলো জ্যোবা।
ইতিমধ্যে কখন মিশেছে নিজের কোণটি ছেঁকে উঠে
লিলিথের ঘাটের পাশে গিয়ে ঝাঁড়িয়ে অতুল ধরে
বলছে,—“আমার জোবের যদি! কতদিন ধরে তোমার ঐ
অপচল স্বপ্ন,—তোমার ঐ সোনার দেহখানা। আমি কেবল
আমি বেধছি—আমি দেখছি! তপস্বান কি সত্যিই এত
নিষ্ঠ? যে তোকে আর আধিয়ে তুলবেন না?”

জ্যোবার কথাগুলো অতুল ধরে হাসে এলরামি তা
সবই স্পষ্ট শুনেছে পেলো। একটা সখিত দুঃ হাসি
কথাগুলো শুনে তার মুখে কুটে উঠল। মনে মনে সে
বললে,—“তপস্বান ত লিলিথকে দুঃ বছর আগেই মেরে
কেলেছেন—এ প্রাণের স্পন্দ ত আবার সৃষ্টি!...তাহলে
মাহুসের শক্তিই বা মনসা কিলে?...আমার মতম দুঃ
মনঃশক্তি থাকলে যে কোন মাহুস বুক জুলিয়ে অনায়াসে
বলতে পারে,—‘আমার ইচ্ছেই ত তপস্বানের ইচ্ছে’!...

কিন্তু আমি?...আমার মনঃশক্তি কি সত্যিই দুঃ?...
শেষ অবধি তপস্বান সত্যিই কি আমার হাত থেকে
লিলিথকে ছিনিয়ে নেবেন?...কে জানে? আজ আর
আমি কথাটা যেন ঠিক করে বেবে হির করতে পারছি
না...জ্যোবা মধ্যে কেমন যেন একটা গোঁফাকড় ভাজনে
হারছে বলে মনে হচ্ছে!...আজ যেন মনে হচ্ছে আমার
আলেকার সে অসীম মনোবল আর নেই,...সেই দুঃ
ইচ্ছা শক্তি আমার কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়েছে!...
কিন্তু সত্যিই কি তাই?...সত্যিই কি!...

একটা বল্‌বসানি জ্যোবার শুনে সচেতন হয়ে
এলরামি কেবলে সামনের হোটা। হেলফেটের পংখা
গরিতে জ্যোবা। নিজের নিষ্টি কোণে ফিরে গেল।
এইবার একা এলরামিই লিলিথের কাছে দাঁড়িয়ে
বইল শুধু।

[ক্রমশঃ]



চীনের

উত্তরে, কিংগ্‌ জেন।

পাছাড়ে-পর্বতে বেগা হ্রদ

হতো জায়গা। চ্যাংপাই

পাছাড়ের সৌন্দর্য চীনে

বহুবিদিত। সেই চ্যাংপাই

পাছাড় দিগে আছে সবটাই

জায়গা।

একদিন সকালে বেগিবে পড়লাম।

পাড়ীতে করেই।

সুন্দর তখন হবে উঠেছে।

অনাকুলকাল সুন্দর

আলোয় চারিদিক সজল

করছে। একে বোঁকে পাছাড়

গা বেগে, এ গ্রাম সে-আলোর কোল

দিয়ে চলতে লাগলাম।

ঘড়ী চারেক চলার পর এসে

শেখালাম টুয়েন দৌর ঘাটে

এক ছোট্ট গায়ে। এখানে তোলা

কিউনিং-এর সোনার

চীনের একটি কমিউন

হো সে

★

সরকার প্রতিষ্ঠার পরে দিন

গেল বদলে, বদলে গেল

জীবন ধারা। প্রথমেই

জমি-সংস্কার ব্যবস্থা করা

হলো। কৃষিসংস্কার আর

গণকমিউন। কলে বছরে

বছরে কলসের উৎপাদন

বেড়ে গেল, আর সেই সংঘে জীবনযাত্রানির্ধারণের

পদ্ধতিটাই।

কিন্তু তাই বলে রাজ্যপাতি লগ হয় নি।

কাগজ কাগজটা ছিল একেবারেই পিছিয়ে-পড়া।

প্রত্যেকটি সোকে শ্রোদন্তর বেতে পরতে পারবে ওমানকারই

কলসের উৎপাদন থেকে, একদম একদিনে হয় নি।

১৯৫৭ সালেও চাষার চাকার টন

ক্যালেন্দার বাইরে থেকে আমদানী

করতে হয়েছে। আর এখানে কমিউন

হো ১৯৫৮ সালে; আর চ্যান ও কোরীয়

জাতি-গোষ্ঠীর প্রায় আট

চাকার মানস বিকৃত হয়, পতিত

জমি চাষের কাছে লাগাতে

সুদূর করে তখনই। আরও বেশ

বেশি জমি, আবাস করে যেতে

থাকে, চাষের সুবিধের জন্যে

বাদ কাটতে থাকে, ফুরো

বুড়তে থাকে, এবং সর্বোপর

ওখানে তারা বিপ্লবীভাবিত

পাশ্চিম বেশি হয়। আসে এখন

কল ছিল না তখন হতো এককক

কল, আর এখন বহুর হতো

ব্যাপক ভিত্তিতে হামচাষের

ব্যবস্থা করেছে তারা। আজ

এখন, এই গণকমিউন

ব্যাপন্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ। আর্দ্র

হই নি এখন সুন্দর, সুন্দর

সংস্কৃতি নয়, আজ এই

গণকমিউন রাষ্ট্র সরকারের

কাছে পশা বিক্রি করে।

শুধু কল উৎপাদন করেই

পেব নয়; এই কমিউনে

শিল্প সংস্থাও গড়ে

উঠেছে। বাড়ীঘর তৈরী

মানবপশা এখানে তৈরী

হয়, আবাসবস্ত্র তৈরী

করার কারখানাও আছে;

অন্যক উৎপাদনের জন্যে

সামগ্রিক বস্ত্র-কারখানা,

যন্ত্রাংশের গার প্রস্তুত

হয়, পোকানাকড় মারার

জন্যে ওষুধের তৈরী

করার কারখানা আছে, আবাস

কমিউনের কাছে লাগে

যেদর বস্ত্রপাতি সেদর

সেদরত করার কারখানাও

আছে। সেই চালায়

জনসাধারণের দরবেশপঞ্জির কমিউন।

দশর ছিল না যাতে বেশি কিছু দেখবার। এখানে-সেখানে একটু-আটটু ঘুরে দেখলাম। নানারকম বাড়ির দ্বারা ভেঁরা হচ্ছে দেখলাম। সেটা বস্ত্রশাণ্ডি তৈরীর কারখানা। এখানে তিন রকম জিনিস তৈরী হয়—কার্টের নানা জিনিস, বাড়ির জিনিস-পত্র, আর রয়েছে একটা কাউণ্টী। কিছু লেন্সেসিন-আরে, ঢোলাই করার জন্যে বিজলীচালিত বস্ত্র গা তি, ইলেকট্রিক হামারও। ঘুর-একটা



জটিলবক নেই কোথাও। বিচ্ছেদের অর্থায়ন সমস্ত কমিউনের প্রাত্যহিক প্রয়োজন মেটানোর আয়োজনটাই পাকা করা হয়েছে। আগে তিরিশ মাইল যেতে হতো তবে হতে যাচ্ছে-কোদাল-কুড়াল পাওয়া যেতো, কিংবা বিকল হলে বেগামত করা যেতো—তিরিশ মাইল দূরের গম্বু। কারখানা তৈরী হওয়াতে সে অসুবিধে আর নেই। এখন যারা উৎপাদন করবে তাদের দানত্রিক প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থাটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এমন কি, বিরাট একটা ভাণ্ডারে কমিউন মাছের চাষ করছে, এবং মাছের চাষ সংক্রান্ত আলোচনা-চক্রও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

চাষ আবার বস্ত্রশাণ্ডি তৈরীর সংস্কে মতো এমন নিয়মিত মাছের চাষ হচ্ছে তেরশি আবার হাঁস-মুরগীর চাষ হচ্ছে। পুষ্কালিত জন্তুস্বের জন্তুবার বাড়ানোর জন্যে বোঁগাড় খোলা হয়েছে। এই সব কারণে এই কমিউনেরই অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রাম—টিয়সিটো—দারিদ্র্যের অভাব থেকে সফলতার সবতলে উঠে আসতে পেরেছে। এককালে কী গরিবই না ছিল এই গ্রাম, কী দুঃসহ জীবন না ছিল এখানের?

তাই ভাবলাম দেখে আসি এই গাঁ। কিশ বছর আগে উত্তরাপায়া দিশি এই গাঁ ছিল দুঃস্থের প্রান্তস্থিত একটা বরা জরি ঘাট, অসাব্যধী পতিত জরি বিপদকতা এখানের মানুষের দেহে ও মনে হুড়তা ও ককর্পতা এনে দিগেছিল। হানুইই বা ছিল কোথার তখন। ভাণ্ডার বেশ উত্তর চীন বদল করেছিল তখন জাপানী শাসকরা ছোর করে তিন শ

বিকৃত শস্যক্ষেত্রে টাইটের অভ্যন্তর

লোকের পক্ষাশতা পরিবারকে ছোর করে গাঠিয়ে দিগেছিল এখানে তারা সবাই কোঠার লোক। কোঠার। তারা এসে এখানে বসতি স্থাপন করলো। আর জাপানী শুলিশের বক্তৃকর নামে কীপতে কীপতে জিন চাষ করতে শুরু করলো, বন কেটে জমি আবার করতে লাগলো। দিন রাত পরিশ্রম করতে লাগলো তারা; তাতেও তাদের রেহাই ছিল না; কোন রকম গাঠিকর্পিত-বিয়ান-বিজ্ঞান করতে দেখলেই তাদের ওপর বেত চালানো হতো। নিশ্চেষ্টনের নিয়ম ছিলো কঠোর। এতো প্রবীক পরিশ্রমেও তাদের পেটে আর জোটেনি, কারণ তাদের দিনান্ত অস্ত্রের পরিশ্রমের ফল ও ফল জাপানী দেশের বেয়ে দিগে। তারা নিয়ম নিয়ন্ত্রণের হয়ে হুত্ব্যর-বিকে হুটে চলেছিল, কারণ চীনে বিদ্রোহ হওয়ার আগে এই কোঠার মানুষের লগ্ঘা কয়ে সেল-হুই-তুতীয়াং, ব্যাকিা হলো হাজিঙ্গার।

কিন্তু আজ দুনিয়া কলে সেছে, নয়া অনানাবহাল। আজ আর ঘরে প্রাচুর্য, ঘরে গাঠি হব' জীবনোন্মাদ। একদা যেখানে রাতে আসার জন্মে সেলারহুতীর পায়ের ভাঙ্গু জ্বলিয়ে রাখতে হতো, আজ সেখানে কলবল করছে বিজলী-বাতি।

এই কমিউনের প্রধান আর বনদম্পদ থেকে। কাঠ-কল্যা ও টারপিন তেলের ক্যাটরী আজ গড়ে উঠেছে। ডাকগরী ওগু পথের জন্যে নানা জাতীয় গাছগাছড়াও লাগানো হয়েছে। এই ভাবে একটা হোট গাঁ এখন জটিল-বিকে চলেছে। দুঃস্থ আরও দুঃস্থ হচ্ছে।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দুই ডেকে গেল দুই
সকালেই। সেখান হাঁড়িতে
চারটে।

না, শব্দ আর নেই।

সেই যে—

“হাতা করো, বাহা

করো, বাহাদিল,”

উঠেছে আলো

“বন্দরের কাল হল শেষ।”

বন্দরের কাল শেষ হলো আমাদেরও। ভাইত কালকে
বেখানে দারানো একটু ভাঙ্গার জন্য হুটোপুটি
করাছিলাম, সেখানের সবটুকু কাগপাকেই এঁটো পাতার
মতো ফেলে দিয়ে চলেছি—বন্দর নেই না পিছু টান। না
বারবার কিরে কিরে দেখা।

আমাদের পাড়ীটাই ছাড়ল সকলের আগে। তারপর
হেভসাইটের আলোর লীল করে অন্যরা এগিয়ে চলে।
বাইরে শিশির ডেতা ছিলে বাতাস দিয়েছে। সেই বাতাসই
হুঁ হুঁ করে আসছে গাড়ীর ভেতর শব্দের কাঁচের কাঁক
দিয়ে। তাড়াতাড়িতে পরম কাগপ কিস্তি বাইরে রাখা
হয়নি। ভাই মূখখানা একটু হুঁগিলে বসি।

তারপর ভোর হল। তারপর বাক কোথায় ভেলে
সেলে সেই আলোর স্রোতে। আগরপের শাড়া পড়ল বনে
বনে। পাখীরা ডাক দিল। তারপর সুর্ষের আলো
কুঁটেতে-না কুঁটেতেই এসে দেবার আঘাতা ডিঙিল গাঁয়ে।

বনের কুপ্পনার দলে জোঁপ বাতবের কোনো বিল
নেই। ডিঙিল গাঁয়ের কথা শোনা অবধি ভাবছিলাম হয়ত
গাঁটী খাঁয়ে সেখানে, পাখাডী সোকেস বগতি, কিস্তি এখানে
কিছুইত দেখলাম না তার। এসেই যে গেছি শেষ
পর্বত তাও ভালো বুঝতে পারিনি। কিশোরীলাল
পাড়ীখানা হুঁগিলে গিয়েছে। বললে, নামুন এবারে।

হুঁকুমুড় করতে নামলাম। বালও নামানো হল।
এতকম লাঠিগুলো ছিল পায়ের কাছে পড়ে, এবার হাতে
উঠল। কিস্তি কোথায় পথ? বাস হুটোটা সেইখানেই এসে

মমুনোত্তরী ও পাকোত্তরী

গণেশ লাল গুহাশী

○

শেষ হয়ে গেছে। নামনে
আর পথ নেই। নীচের
দিকে চেয়ে দেখি। জোঁপ
চালু, পা হাড়ে পা।
নিকটই ওদিক দিয়ে নামা
বারে না।

কিশোরীলাল

দিকের পাহাড়ের পায়ের একটা ভাড়া ভাড়া অংশ
সেবার। বলে, ওখান দিয়ে নামতে হবে।

সেই ভাড়া ভাঙ্গপাটার গিরে নীচের দিকে চেয়ে
দেখি। কিস্তি ওদিকের চেয়ে যে কিস্তি ভালো মনে
হল তা নয়। তবে পারে পারে একটা পায়ের মতো
হয়েছে বেন বটে। কিস্তি ভাবছি, ওই পথ দিয়ে ক্রি আর
নামতে পারব, না যে পথে আমাদের হাটতে হবে ওই ডরে
নবুনা।

তারপর শানিকটা নেমে গেছে। বলছে, নেনে এসো
আবার পেছন পেছন।

তারপর ডের পেছন পেছনই নামতে আরম্ভ করি।

তারপর হাতখানা এগিয়ে নেয়। বলে ধর কি?

বলি, না থাক। কিস্তি, পা হুটো বেন ঠিক মতো
পড়ে না। এক এক ব্যক্ত মনে হয় হুঁগাড়ি থেয়ে গিয়ে
নীচে পড়ল কিস্তি দেখি পরমুহূর্তেই কেমন করে বেন
নিজেকে সামলে নিরোঁহি। প্রায় মাইল দুই পথ
ওইভাবে নেমে এলাম। এতকমে পথ বেধতে পাই।
তখন শুন যে পথে নেমে এলাম ওটা পথ নয়, পাকগুণী।
বাসগুণী হতে আগের হাটা পথে নেমে আসতে গেলে
ঐ পাকগুণীটুকু বরাইকেই পেতে হবে।

তখন ভাবি ভাগ্যিলা কাল রাতে কিশোরীলাল
আমাদের এখানে এসে ফেলেনি।

সুর্ষ বোম্ব হুঁ উঠেছে এতকমে। সুর্ষ পাহাড়ের
চুড়ায় চুড়ায় সোনালী রঙের ছোঁয়া সেগেছে। একটা
হেশবের মতো কোমল আলো বেন হাঁড়িয়ে পড়েছে
চারদিকে। কিস্তি সে আলো তখনো নামনি দেখানে
আমরা গাঁড়িয়ে আছি। হয়ত নামবে একটু পরেই। সেই
আলো আমাদেরও অভিভুক্ত করবে, অভিগমিত।

চলতে চলতে প্রথম সোকান হেঁচ। হুঁট পাথরের
গাখনি নর, লতাশাভাষ ছাওয়া। দু'খ আর চা নিয়ে বলে
আছে সোকাণী। বলে চা খেয়ে মাও, দু'খ।

আমরাই বোধ হয় তার প্রথম বন্দন। তাই সম্ভব
করে বাঁশের চাটাই এগিয়ে দেব। সেই চাটাইতে বসতে
বসতে ক্রমশঃ বলি, চা খেয়ে নেওয়া থাক, কি বল।

চা খেয়ে উঠতে দাব। সেখি দু'খান্দুরা এসে
সেলেন।

কেশব বলে, ক্রম-না হু'ব যে হটিয়েন।

হটিহি আর কোথার। শোহিয়ে পড়তেই হবে।
তাই একটু এগিয়ে আছি।

কেশব বলে, বলে বিন্দু এখন যা হু'শী।

দু'খান্দু জ্ঞান ও শেট বার করেন। হাত হু'খ
বোনেও এখানেই। তারপর বেরুবেন।

আমাদের ও সব হয়ে গেছে। এমন কি চা খাওয়াও।
তাই আবার বেরিয়ে পড়ি।

পথ আর খায়াপ নর, বিশেষ শিমির পর। এত চীৎ
গাহ এখানে যে তার সন্মুখ পাতা আর কাঠিতে দমত
পথটাই আচ্ছন্ন। পাথরের ওপর হটিছি তাই তা আর মনেই
হয় না। যেন হয় হটিছি যেন ভানলোপিসলের পদুম নয়
সদীর ওপর। একটু ডাড়াডাড়াই হটিছি আবার। ভোর
বেলার ভিজে শির শির বাতাসে বনের সমুদ্রের গন্ধ
ভাসছে। সেই গন্ধ কেনস যেন একটা মেনা লাগিয়ে
দিয়েছে। তাই পা হু'টো আর কিছুতেই থামতে
চাইছে না।

আরো বানিকটা এগিয়ে যেতেই কানে আসে বন্দনার
কলবর্ধন। হু'কতে পারি বন্দনার কাছাকাছি এসে গেছি
আমরা। গমনেই গঙ্গোত্তরী।

চীৎ বনের কাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসতেই চোখে পড়ে
গঙ্গোত্তরী চটি ও ধব'পালা। ঠিক একেবারে নদীর পা
দিয়ে। নদীর ধারে ট্রুটুই ওই চড়া। এখান থেকে
ভারী ভালো লাগছে। ইচ্ছে করছে ওইখানে থেকে বেতে
পদুম, একবেলাই নয়, চিরকাল।

ঈশকে জিগ্যাস করি, আর এগুবোনা এইখানেই থাকবে
এই বেলার বতো।

পদুম বানিকটাই আরো দূরে গেল।

এইখানে থাকবেন কি? রোগ এখনো এসে শোঁদায়
নি আবারের পারে। এখন থামলে চলবে কেন? কব-
করে ও ভিন চার খটা হটিতে হয়।

ক্রম বলে, কটা বাবল আসে দেখ।

খাঁড়ি দিকে চেয়ে দেখি। বা আটটাও থাকে নি।
মোটো সাড়টা চল্লিশ।

ক্রম বলে, তবে চল খাওয়া থাক। এমন ত কিছু
কষ্ট হচ্ছে না।

তা হচ্ছে না। তাই এগিয়ে যাই।

নদীর ধারে ধারে সেই পথ। তাই বলের ক-ক-ক পথ
পদুতে পদুতেই চলছি আমরা। ধারে মানে নদীর
কিনার দিয়ে বর—বরী অনেক নীচে—আর পাথরের
ওপর দিয়ে পথ। তা হোক তবুও নদীকে দেখতে
দেখতেই চলছি। তবে কখনো চাঁড়বন তাকে
আড়াল করে, কখনো পথ বার একটু হু'রে, কিছু একটা
বাঁক পেছতেই বা পেছতেই আবার শিল শিল করে হেনে
ওঠে নদী। যেন বলতে চায়, হারাইনিও আছি, এই যে
আছি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে।

চলতে চলতে সেই হাসি মূর্খিন, সেই পথ। কখনো বা
একটুখানি আঁচি বলের রঙ লেগতে। কি মজা জল এই
মুন্নার। মজা বলেই দেখছি কখনো নীল, কখনো দহু'ক,
বলের তলার নুঁকি পাথরে দে রঙ সেই রঙ। খ্যাওয়াও
হয়ত করেছে।

কিছু একটু বেতে না যেতেই সেখি দর রঙ হু'রে
হু'রে গেছে। পাথরে পাথরে নদীর গতি অবরুদ্ধ। কিছু
নদীকে কে ধরে রাখবে। তাই সেই সব পাথরের খাড়া
যেতে তারের ওপর দিয়ে লাগিয়ে পড়ছে জল—বাতাসে
বলের কেনা উড়ছে—আর বলের রঙ সে কি মাঝা—মাঝ
হাসের পালকও যোগ হয় ওত মাদা হয় না।

গঙ্গোত্তরী পদুম মোকমল শোঁখনি। একবারও মনেও
হবেছিল, ঠিক পথে থাকি কি না। তারানতের ভুল হয়
নি ত। কিছু এখন দেখছি দু'এক জনাকে। বন্দনোত্তরী
হবে এসেছেন। পাণ দিয়ে যেতে যেতে বলে থাকেন, জয়
বন্দনোত্তরী কি।

শাবনেই থরপা। পদুম হতেই বলের পথ পাওয়া

দিয়েছে।

হুড় হুড় করে অনেক গুলি হতে জল নামছে—পথ ভাঙছে সেই জলে। সেই জল বহুদূর গিয়ে পড়ছে আবার পাহাড়ের গা বেয়ে।

জলের ধারে পানচকী দেখলাম।—বাঁটার ভাঙা কাঠের ঢাকা বসান। জলের জোড়ে ঢাকা খোঁচ, সেই দলে খাড়া। তাতেই গর ভেঙে আটা শেখা হয়ে যায়। শরীরের খাটুনি নেই।

পানচকীর ঘরে চুকি। চাকীর হালিক—সব দেখতে দেয়।

রাহনপার-কিন্দু-ভাল কিন্দু দেখলেন না। এগিয়ে গেলেন।

এক বলে, বাহাদুরী আছে কিন্দু, রাহনপারের, এই বলে যে ভাবে হটিছেন।

স্বাকীর না করে উপায় নেই। সেও আবার সিরের বোকা বিজে নিয়ে চলেছেন।—কম্পূর ফেন দাঁড় দিয়ে বোঁধে শিটে নিয়ে কপালে আটকে বিলে অনেকটা দেই রকম। আনালের কাঁচের কোলাটাই ভাঙে—লাগছে, বলে হচ্ছে ফেনে দিতে পারলেই বোঁধে বাই যেন। কিন্দু, বৃত্তে পারছি না রাহনপার হটিছেন না—হুটছেন। সেই যে শূন্যের মার পেট হতে পড়ে ছুটে ছিলেন, অনেকটা দেই রকম। কোনো দিকেই কিন্দু দেখলেন না।

কে জানে রাহনপারের এত কীসের ভাড়া?

সাননে হতে চিঠির বলি নিয়ে ডাকহরকরা আসে। ডাকহরকরা দেখে পথের মধ্যেই বলে দাই। এক বলে বার কর শোন্ট কাড়—এক একখানা-চিঠি লিখি বাড়ীতে। হরিহারে এসে চিঠি দিবারে তারপর চিঠি লেখা হয় নি তাই চিঠি লিখি আনিও।

বলি দেখে ডাকহরকরাও বলে পড়ে আবারের পানেশ। তার বিতোনো হয়, আবারের চিঠি লেখা।

বুঝেই লিখি। ভালো আছে। এর পর চিঠি পেতে দেই হলে—জিজ্ঞাসা করে না। এছাড়া কী-ই না আর লিখি। লিখে তার হাতে দেই।

সব চাকী বনের মধ্যে গিয়ে সেজে এবার পথ। সেই পথ একটা পাহাড়ের গা দিয়ে বৃত্তে গেল যেন। সেই পাহাড়ের শেষ শীষার এলে গুপের দিকে চেয়ে দেখি। দেখি দুই আলোর বহুদূর সেই পথ কী—সব পাহাড়

পাঁড়িয়ে আছে—সবুজ। পাহাড়ের চূড়ো হতে সেই অগ্ন্য দেখে এগিয়ে অবিভাকার শেষ শীষা অবধি।

জানিনে, সূর্য-হলপারী এই অগ্ন্যের কবে প্রথম উদ্ভাস হয়েছিল। তারপর বছরে বছরে বহু চক্রে আবর্তনে সেই অন্ধুর কিতাবে আকর্ষণ এই অগ্ন্যের হুণ লাভ করেছে। কিন্দু—এদের বহুদূর দেখছি যে পান্ডার, যে আভিকাত্য সহজেই তা সবটুকু আকর্ষণ করে নিদ্রা আবার বনের। আমি বৃত্ত হয়ে গেলাম।

মাইস চারেক পথ যেটে চলেই আসি খরার।

সোকাশীর সোকাশের সামনে পাথরের গুপ্ত কাঠের তক্তা পাতা। তারি গুপ্ত কোন্স কুলি মানিয়ে রাধি, পাথরের গারে ঠেঁগ দিয়ে রাধি হাড়ের লাঠিখানা। এককে বলি—কি করবে, আর এগিয়ে যাবে না এখানেই থাকবে।

খরার তেমন চিঠি না, তাই বাক্য হয় না। একও দেখে শুনবে বলে তাই। বলে চলো, ঘনো চিঠি, এমন কি আর ভ্রাতৃ হরিহর যে এখানেই থেকে যেতে হবে।

সব চাপিদো স্টেশি, দুই।

সে আর বলতে। নাড়ীতে টান ধরেছে পেটের। সকালে চা খেলেছি, তাই দুই কণাই বলতে হাঙ্কলাম।

এক বলে গই আছে, গই?

গইত—তেমন পাওয়া যায় না এখানে। শীতের জন্য ভালো-কই বলে না তাই। তবু যদি কেউ কখনো এরা হতে নিয়ে আসে।

এক কপালক্রমেই বোঝা হয় গই পাওয়া যায়। গই এগিয়ে যায় সে। দেখে বলি, একটু জল আর চিনি দিয়ে একেবারে লগাই করে লাও।

চার পলসকা চাপিদো বান্ধী। চিরে জোঁষি হুঁক—চুল মলিন কোট গারে এক আঁধ বৃত্তো।—পারে—বৃত্তো—নেই। অতীর গরিবত—কেল-বল্লা ন্যাকড়া—অদ্যো। একটা পাত আবার কেমন—কোন্স কোন্স। এক বলে, বস, বাঙালি চা।

চার পলসকা—চা যানে আঁধ সেলাস চাপ। যারা চার স্তারা পুরো সেলাস কখনো চার না। আর—সেলাসেই গহুড়ি।

বাঙালি হল ল্যাঁচ, বাঙালো হল চা। তারদণ্ড তো বসেই রেখেছে মাঝে চড়াই—দেখতেও পাচ্ছি তফাৎ। তবে

ভরসা দিচ্ছে ও—তবেই চড়াই নব।

তা হরত নব। কিন্তু হলেই বা আর কি কথা বেত।
উঠতেই হত আমায়ের। তবে তেমন না হলেও, উঠতে
উঠতে গা ভেসে গেল যায়।

চড়াই শেষ হতে গেছে অনেকক্ষণ। হটিছি আমার
আমরা। সেই উঠতি পড়তি পথ। সেই লোকটিও
আবার হটিয়ে পাশে পাশে থাকে চা বাগানো হল। নাম
বললে, রামচন্দ্র। বললে, বাবুজী, তীরথ করতে
বেরিয়েছি সে আচ্ছ তিনবাস। পাখে হেঁটেইত আসছি
নব। হয়ে গেছে বন্দ্যোত্তরী, গল্পাঙ্গরী। তার পর বাব
কোয়ার ও বন্দীনাথ।

গলি, ভিকে করেই ত চলছে।

হাঁ, তাহাড়া আর কি? চালিয়ে দিচ্ছেন রামচন্দ্র।
আপনাদের দখা হয়ে যায়।

হ্যাঁ না হয়ে আর উপায় কি? ক্রম বলে, আচ্ছ ওরা চার
হলেই ত ঘিরে আনন্দ। নইলে আর বিভ্রম কাকে।

অবশ্য বন্দ্যোত্তরী ও কথার দ্বারা ভিক্ষের ওপর বড়লক্ষ্য।
ভায়া বলে, আমরা দিচ্ছে দিচ্ছে না ওদের দাবার চড়িয়েছি।
তাই ত ওরা কান্না করে না, বলে বলে যায়।

কিন্তু সবাই কি আর বলে বলে যায়, যেমন এই
লোকটি। কত দুঃখ করে কত কষ্ট করে চলছে—এদের
বসি আমরা না সেই।

অন্ধর আবার নকলের সব কথা না শোনা পূর্ণত যেন
শব্দই সেই। তাই পর চলতে চলতে কখনকোন কানে
ডাকে শুনিয়ে নিচ্ছে তারা যত্নে কথা। ওর বুকেই শুনি,
গয়র দিকে কোথায় যেন বাচ্চী ওর। ক্ষেত্র জোয়ার ছেলে
থাকে আর বউ, ছবি করাও আছে কিছু।...মানে বেশ
শুদ্ধ অবস্থা, ভিকে করবার হতো নব।

জানিয়ে কার মনে কি আছে। আর জেবেই বা কি
লাভ। বিচার করতে গেলে গাঁ উন্মোক্ত, তার চাইতে
দিয়ে আনন্দ করো। অন্ধর কথাই ঠিক, দিচ্ছে আনন্দ পাঠ,
তাই সেই।

সেই ঘন চড়ি বন আর নেই—পথও অনেকটা সমতল।
হলে হয় যেন মার্গের যতো দিচ্ছেই হেঁটে চলছি। বন্দ্যোত্তরী
জোঁপ জোঁপ চলছে। কোথাও রাস্তা নব, কোথাও পাড়লা।

যার কত ক্রমের গাছ। বিচিত্র কিছু দেখলে ভায়াবন্ধকে
মিগোল করি, বলত কি গাছ।

ভায়াবন্ধ বিজ্ঞের হতো মাথা নেড়ে বলে, জলপী ছায়া।
জলপী কলতে ত ভায়াবন্ধের নরকার করে না। কিন্তু
এই এক কথা শুনলে শুনলে বুঝতে পারি আমরা বাহ্যিক
কাশ্মা দেখি, ও কিছুই দেখে না। কিন্তু ওর আর কি
দেখ—গাছের মানে আমাদের যে আশ্রয়, ওর সে আশ্রয়
থাকবার কথা নব। অন্ধর এখন কোনো বড়লক্ষ্য
দেখলেই বলছে, বন্দ্যোত্তরী, বন্দ্যোত্তরী ওর কল ভায়াবন্ধে যায়।

কিন্তু তবু, রজোভেদনকে চিনে নিতে-ভুল হল না
আর আবারো গাছ। 'উক্ত বড় শাখার শিখরে রজো-
ভেদন শব্দ'। কিন্তু লাল রজোভেদনের চাইতেও
আমরা ভায়াবন্ধে লালকে কষ্ট শোলাল। মাঝা মাঝা-কল।
এক পর। গভ্র সেই মোটে। কিন্তু তা হলে কি হয়।
পথের দু'ধারে কুটে রয়েছে অন্ধর। 'পূর্বতলা' যে
পড়েছিলার বন জোঁপআর কথা, যেন হল এই যেম সেই
বন জোঁপআর।

হটিতে হটিতে অনেকখানি পথ এগিয়ে এসেছি। রোদ
উঠেছে, আবার আবার ওপর। না, বেশ কড়া রোদ দেখি
এদিককার। কবলে শির শিরে হিমেল ছাওয়া দেখে কি
আর ভাবতে পেরেছিলার এখন রোদ উঠবে। ছাড়া তাই
নলে রাখি। আর রাখলেই বা কি হত? এক হাতে
ছাড়া অন্য হাতে লাঠি নিয়ে ত আর পথ চলা যেত না।
এদিককার বন্দ্যোত্তরী যে পিঠে বোকা নিয়ে কপালে
আটকায় তার কারণও ওই। হাত দুটো খালি রাখে
এক টুপি আনলে ঠিক। কিন্তু সেক্ষেত্রে কেউ হতে
সেইনি। তাই সোমোটার বানা বুলেই বাবা জড়াই
গায়ে এখন সোমোটার বানা না থাকলেও চলবে। এখানে
দেখি ছেঁদে শীত; ভেঁদে রোদ, ভেঁদে বৃষ্টি
ভায়াবন্ধ ত নব কিছুতেই বলছে, হিমালয় ছাড়া তো। ত
হিমালয়ই ফোক—কিন্তু কখন কখন যে এমন বড়লক্ষ্য পরিবর্তন
হতে থাকি আসে তেঁকে আমরা ভাবতে পেরেছিলার?

কিন্তু হটিছি ত হটিছি—পথ আর কুসোর না
কোথায় সেই বন্দ্যোত্তরী—চলছি আমরা বার উন্মোক্তো
পথে হাইল শোভিত সেই যে যেতে বড়লক্ষ্য কতখানি জলা
দু'বাইল লার হাইল দরই একটা কথা কথা।

দকাসে পড়াই যেন পোর্টরে এসেছিলার একটা তাকাতাড়ি । এমন দেখি সেই পড়াইই হোছে বিলম্বিত । নাইল ফালগুণে হিসের হয় ত আছে একটা নিভাই, কিন্তু দাসল হিসের মেসাজের ওপর । তাই এগণে এক নাইলও লস মাইল হয় । লস মাইলও এক নাইল ।

হানদাই বেঁকে গেছেন অনেক আসেই । তারদত্তকেও এমন ছেড়ে দিলার ঘাটে আসে ভাগে গিয়ে একটা ঘরের ব্যবস্থা দেখতে পারে আর রাসা-বাসার । কিন্তু যোগ যেমন কাঁ কাঁ করছে, পা দুটো যেমন ভেঙে আসছে ক্রান্তিতে তাতে এক পাও আর তুলতে ইচ্ছে করছে না । তারপর হঠাৎ ক্রম কে খুঁড়িয়ে হঠিতে দেখে ভব শেষে বাই ।

ক্লম বলে, এমন কিছু নয় । পারের এখানটার কেমন যেন লাগা চলেছে । বা পা-টা তাই আর তুলতেই পারছি না ।

তারপর একটা খেয়ে বলে, অন্যায় করেছি প্রথম দিন গাড়ী হতে ফেরে নেবেই এতটা হেঁটে । জািন্মা তাও নয়, তবু সেই ত হাটলাম ।

কি-ই বা বলব ? করবারও নেই কিছু । তাই ধীরে ধীরে হেঁটে চলি । বেলা যে বৃষ্ বেনী হয়েছে তাও নয় । মাত্র পাতে লগটা তবু বনে হচ্ছে বেলা যেন ঠিক দুপুর । তার ওপর কোথাও কোনো সাড়া নেই, শব্দ নেই, সব নিব্বন ।

দূর হ'তে একটা কল্লার শব্দ শুনেন ভেবেছিলাম, রহত এনে সেলাম—একটা ঘরের মতোও দেখলাম যেন পাথর বাঁকে । কিন্তু ও আমায়ের ভুল । চাঁট নয়, দোকান । কিন্তু কল্যাণি ভারী মনোরম । দেখছি ক'জন বাড়ী বসে সেই কল্লার বায়েই দুপুরের খাওয়া সেয়ে নিচ্ছে ।

খাওয়া আর কি । পান্নার বাঁধা দু'কনো দু'টি । সেই দু'কনো দু'টিই চিঁকিয়ে যাচ্ছে আর আঁকলান করে করবার জল ।

ক্লম বলে তারদত্তকে আসে থেকে পাঠিয়ে না গিলে এখানেই এবেলা থেকে বেতাম ।

তা মঙ্গ হোত না একেবারে । দূর থেকেই না হয় বাঁধা যেত একবেলা । কিন্তু এখন তারো উপায় নেই । তারদত্ত রহত এতকনে রাসাই তুলে দিচ্ছে বদনা

ঠাটিতে । তাই দেখানো আর পড়াই না । কিন্তু আকাশ হতে পড়ি বদনা চটি আরো দু'মাইল শূন্যে ।

ভবে কি এতকনে এলাম আমরা মাত্র দু'মাইল ।

তাই হবে রহত ।

অনেকখানি পথ এসে বাঁ ধারে সোঁপ এক বসতির মতো । ঘরের চালে কে যেন কাঁচ করছিল আর একটা ছোট্ট মেয়ে বাঁড়িয়ে ছিল নীচে সেই দিকে চলে । দূর থেকে আমাদের দেখতে গেয়ে এক ছুটে সে ওপরে উঠে এলো তারপর নাচের ভঙ্গীতে দুলে দুলে বলতে লাগল, এ-সেঁঠা, এ মাইকা, পাই পতলা ।

এদিকে এরা চার এই পাই পরলা আর দুই বাগা (তাপা) । পাই পরলার বেশী ত কাউকে চাইতে শুনিনি । আর শূঁচ দুতো সেটা ওদের প্রয়োজন । দামান্যই চিনিব কিন্তু পাওয়া যায় না এদিকে । তবে চিকণ সন্ন শূঁচ লাও, নেবে না । ওরা মোটা শূঁচ চার । শিভাইত ওরা ত আর আমাদের মতো কিনকিনে আরবির পান্জাবী পরে না, না সাটিনের ট্রাউজ । কম্বলের জামা কাপড় পরে তাই মোটা শূঁচ চাই । মোটা মোটা কোঁড় দিতে হয় ।

ঠাটিতে হঠিতেই দেখছি ওদের কাপড়ের বরষ বারষ । দু'দু'সের কম্বলের পান্জাবী আর আত্ম রান্ধা—পত জালিবারা । মেয়েদের দু'গো হাতের জামা । কেনর পর্বতই নয় । নেনে সেয়ে পারের হিটু হাফিয়ে গোড়ালি অবধি । শৌঁচিরে শৌঁচিরে পেটের কাছে কাপড় জড়ানো । সে ওদের মেয়ে পুন্সের সকলেরি । বোব হয় ওতে পেটে ঝাঙা কম লাগে আর পাহাড়ী পথে উঠতে নামতেও আরাম । মেয়েদের আবার দু'কের ওখানে হাতের দু'দিক দিবে কম্বল কোলানো দু'কের কাছে বা আবার ওরা আটকে রাখে কতি দিবে । যারা গরী তায়ের ওই কতি কটিই কি কম্বলেরে বাঁধি, কিন্তু বাস্তব সঙ্গতি আছে তায়ের হুপোর । কটির মলে হুপোর সে । কালো কম্বলের ওপর কম্ব লাগে না দেখতে ।

গরী ওপার দিবে একটা পথ সোঁপ পাহাড়ের গায়ে । বোব হয় কোনো বসতির । তবে পড়াই যেমন দেখছি তাতে ওদিকে বন বসতি হয়েছে বলেই ত মনে হচ্ছে ।

অনেকখানি পথ এগিয়ে এসেছি । বেলাও প্রায়

বারটা। না আর ভুল নয়—গায়ে এক কাক গিয়ে দেখা যাচ্ছে এবার ঘুম্না চাঁটের সোকান ও ধর্ম্মপালা।

চারের সোকানের পাশ দিয়ে গিয়ে দাঁড়াই ধর্ম্মপালার সামনে। রায়মশায় ওপরেই ছিলেন সামনে যে এক কালি ব্যাখ্যা সেই ব্যাখ্যার। আমাকে দেখে জাক দিলেন। উঠে আসুন একবারে ওপরে।

ওপরেই উঠে বাই সেই ছাঁটু উঠু দাঁড়ান বাপ ভেলে। তিনটি কি চারটি দাঁড়ান বাপ ভাপতে ইতোতালার। কিন্তু ঘরে পা ফেলতে গিয়ে সোঁপ কোথাও পা ফেলবার জায়গা নেই। তারায়তকে দেখতে পাইনে আবার কোথাও। তারপর ব্যাখ্যার গিয়ে দাঁড়াই। বিগেলস করি রায়মশায়কে, কোথায় গেলে তারায়ত।

অল নিয়ে সেল রায়ার ঘরে। বোধ হয় রায়ার কোণাক দেখে।

কিন্তু এসে এসেই শূরে পড়ল। বলল রায়-মশায়কে কিছু মনে করবেন না। পা ধুটো একবারে জ্বর। এতক্ষণ বা পায়ে ব্যাখ্যাটা ছিল, এখন মনে হচ্ছে যেন ডান পায়েও।

প্রথম দিকে কপপূরে আগলিল আমাকে দগে দগেই। তারপর পেছিয়ে পড়ল। পেছিয়েই আরে সে। তবে তার জন্যে কিছু ভাবনা নেই। তা সে পেছিয়েই থাক কি এগিয়েই থাক—ওরা আসন ইচ্ছা হতোই থানে, আসন ইচ্ছা হতোই হাঁটে—তবে একটা কিনিবে ওনের কখনো ভুল হয় না, যেখানে যে চটিতেই বা ও ওরা ধুঁজে পেতে চলে আসবে ঠিক সেই চটিতেই।

কপপূরে অলেকাতেই বয়েছিল। ও এসে কাপড় চোপড় নিয়ে বাই ধুম্মার। ভাবছি ধরিতে ভালো করে মান করে এসে শেটশূরে বেতে গেলে এ ছাঁটুটা আর থাকবে না। তখন হঠাৎ অনেকটা দুখ বোধ করলে জ্বল।

চাল চাল আটা ধীরে সোকানের পাশ দিয়ে গেল। বার সোকান সেই এখানকার ধর্ম্মপালার চৌকিয়ার। শূরু, তাই নয়, এখানের পোন্ট অকিসের পোন্ট মন্টারও। তার সোকানে বাস পোন্টকর্ত্তও পাওয়া যায়। সোকানের গায়েই দেখছি চাঁটের ব্যাক।

কিন্তু সোকান পেঁয়রে এসে থরকে দাঁড়াই। ডানামতে

হবে কালও দুই। আর শূরু নামাই নয়, উঠেও আসা হবে আবার ওই পা টুছু।

গতি মিলি করতে শেল পদপত্ত নাখিই। না বে বা কি করি। জ্বলও মারে শেলন শেলন। রায়মশা এসেছেন। তিনিও মান করবেন ধর্ম্মপার।

কিন্তু সেই রায়মশা মিলুর ধর্ম্মপূরে পাছাকতক ধরিতে কাপড় কাঁচতে বসে সোঁপ মন্টা কেমন বেং উ হতে সেল। মনে হল আমার কোথাও যেন কোনো নেই। কোনো কালেই ছিল না। এমনি কেঁটে এতে পারে পারে জীবনের সেই প্রথম দিন হতে। পয়েই বা পয়েই বাই। পয়েই আবার রায়ের শব্দ। চো ওপর শূরু ওঠে, অত বার।—আলে তারায় ভগ্না র জ্যোৎস্নার পরিদ্রাবন। রাতও শেষ হয় কাল শূরু আবর্তবে। দিক প্রান্তে ধপ ধপ করে শূরুভার।

তাই ওদের মান হয়ে গেলেও, আমার কা কাঁটাই আর বেশ হয় না। ওরা চলে বেতে ভাড়াত মাথার অল চলে ওপরে উঠে।

ঘেয়ে ঘেয়ে ওরু যেন একটু শূরু হওয়া সেল নি কোথাও একটু গড়িয়ে নেয়ার জায়গা নেই। তাই : হয়েই বসে আছি রায়মশায়ের শতরজে। তেতরে : লক্ষ্যপীঠের অটলা, নীচে বাড়গ্যাতী গাভীয়ে। চাকর হাটুনা নিয়ে ওরা এক বিরাট দল।

সামনের পাছাকের দিকে চেয়ে বসেছিল পাছাকের গা দিয়ে ধুঁরো উঠছিল। ধুঁরো সে আবার আগুনের অন্তরান করতে হয়। তাহলে আ সেসেছে চাঁড় বনে। কি করে লাগল ? কেউ লাগি না সেসেছে আশনা হতেই ? ওই যে দাবাড়ির কথা বইতে, তাই মরত ?

সে আশনা হতেই লাগুক আর কেউ লাগা পাছাকের আগুন কে বেরাবে-বতকল না আশনা ? নিজে-বার।

আড়াইটাও বাতেনি। সেখি ওরি ময়ো বাতী বেরুবার সাদা পড়ে গেছে। লাক্সল্যাক্সা বের আরম্ভ করেছেন একে একে। কেউ ধর্ম্মোত্তরা এসেছেন, কেউ ধর্ম্মোত্তরা যাচ্ছেন। শূরু মলের ধুঁরু পথ—সামনে ও শেলনে। দেখছি হাডোয়াকী সেই দল।

বেরিয়েছে। নামহীন তাঁরা হেঁশালার পেছন দিয়ে
ঘনুনার দিকে । তা হলে ঘনুনারই বাঞ্ছন ওঁরা ।

প্রায়শঃ উঠি উঠি করছেন । বলাহীন, আপনাতঃ কি
বেরুবেন এ বেলা ।

পীরের এমন অবস্থা নয় যে বেরুই । প্রকৃত নয় ।
তবু দর্যাকে স্নেহেতে দেখে মন উদ্‌বুদ্ধ করে উঠল ।
আমি প্রথম হুঁচটাই শুদ্ধ আমার হুঁচ । শেষে কই বলে,
লল, ধীরে ধীরে ঘাই । তবে হারমনারে বতো হনুমান
চিঠি নয়, নামনে যে-ন্যাম চিঠি না কি চিঠি আছে,
সেই চিঠি ।

ভারময় কাগজ চাপড় বলের ভরে । কপূরে গজিকা
ঘিরে বাঁধে পিঠে বালির দেবার জন্য । জু লাঠি নিয়ে
উঠে দাঁড়ায় । ভারময় ধীরে ধীরে নীচে নামে ।

ঘনুনা পেরিয়ে পাহাড়ের গা দিয়ে উঠছে সব হারীরা ।
একটা খেবড়া পাখর । ভাঙা ভাঙা হাওয়া । হেঁচিট
ষেয়ে জগিরে চলি নদী পার হয়ে কোনো বতে । সামনের
পাহাড়ের গা দিয়ে এবার আবার উঠতে হবে ।

দোকা বাড়া পথ । পা রাখতে পা পিছলে আসে ।
পথ যে এত ব্যয়াল তাত বর্গনি ভারালত । তহালে
হাত বেরুতাই না আছ এবেলা ।

পাহাড়ের গা ধরি, পথের মাটি । হাড়োয়ারী দলের
কতাই হবেন বোধ হয়—উঠছেন গ্রাম হামাসুদ্ধি দিয়ে ।
ভাঙা আছে লগে । কিন্তু এই ব্যয়ালটিতে ভাঙি কাঁড়,
দরই ফল । নিজেই উঠতে হবে যেন করে পার ।

উঠেই চলছে আমরা—ওপরে আরো ওপরে, অনেক
ওপরে । মাটি অথবা আর বরতে চলে না কিন্তু যে নদী
পেরিয়ে জলার জীবন সেই নদী ভঙ্গিয়ে সেল অনেক
নীচে । এখন তাকে দেখতে হলে কঁকু দেখতে হয় ।

..... হঠাৎ দাঁর্বনে হৈ হৈ শব্দে চমকে উঠি । গাই বাহুর
জাকিরে আনছে এক জোকার পাহাড়ের ওই সন্ধ্যা
ভাঙা ভাঙা পথ দিয়ে । বতো পাখি পাহাড়ের গা বেঁধে
দাঁকাই—এমন দিকে ঘুরে দিকে দাঁকাতে নেই । একটু
দাকা লাগল কি তখন অতলে । এ দিকে বড়জোর সামান্য
আঘাত লাগবে কি গা হুড়ে যাবে ? যাব ওই পথই ।

কিন্তু না বতটা শুয় পেরিয়েছিল—তা নয় । পাপ
..... কাড়িয়ে চলে সেল জা আবারেই কিছ, না- বলে এ- ওয়া

পেরিয়ে গেছে সামনের দিকে আবার পা বাড়াই ।

সাতার লিমে চলেছে বাতীরা । হাড়োবাড়ী লগতির
কথা আগেই বলেছি । ওদের মেবেয়ের অবস্থা বাখরা
নেই । কিন্তু বাখরা হুঁচিরে চলেছে গাছপুতানী
মেঝে । শেঁচিলা দুইদিক-বে ভারে মাথার নিয়ে চলেছে
তাতে বনে হয় হুঁচি কই দাঁকা । ওদের পুতুনের
মাথার টিনের প্যাটরা । আবার ওদের-লগে দগেই
দেখছি হুঁচিয়ে একজন কাছা দিয়ে কাপড় পড়া হারাকী
কি রাগাঠী, স্বামী স্ত্রীভেই চলেছেন বোধ হয় তাঁরা
পরিচরায় ।

হুঁচুরে যে আগুন ঘেঁষেছিলাম চিঠিতে বলে পাহাড়ের
গায়ে, মেঘদার আবার সেই আগুন । কৌণ পুড়ছে,
কাত পুড়ছে । পুড়ছে বড় বড় চীড় । কারু গা কলসে
গেছে, কেউ বা আংশোড়া হয়ে পড়ে আছে হাটীতে ।
আগুন জলেছে পথের দার অবধি । পথের ওপরাই এসে
পড়েছে একটা প্রকাণ্ড চীড় । চিড় বিড় করে শব্দ হচ্ছে
আর কল কল করছে আগুন । সাবধানে পেরিয়ে দাই
পাহাটকে ।

ওঁড়বার হুঁচ পথটাকে যেন ব্যয়াল পেরিয়েছিলাম এখন
অবস্থা তা নয় । একটু প্রশস্ত হয়েই আর ঘুরে ঘুরে
গোছে এক পাহাড় হয়ে আর এক পাহাড়ের গা দিয়ে । দূর
হতে তাই দেখা দাদ প্রায় সকলকেই । হামশায়কেও
দেখতে পাছি । দেখছি তিনি হুঁচিয়ে প্রায়-সকলের
আস-দিয়ে ।

পায়ের গতি একটু হুঁত করি । আছ যেতেই হবে
বানিবটা আসে । কাল রাতে খোলা আকপের নীচে
পথের ওপর কাড়িয়েছি কিন্তু আছ আর তা চলবে না ।
বাতালে শীতের পল্লি পাই যেন, জুবারে-শীতলতা ।
ভারময়কেও আবার বলে দেই এগিরে থাকতে ।

যেদিক দিয়ে হুঁচি, সেই দিকেই বা একটু-সন্ধ্যা,
তবে সকলের-বতো সন্ধ্যা নয় কিন্তু ভান দিকে নদীর
অধিতাকা-হাড়িরে কেবলি হুঁচ কর্প পাহাড় । কোথাও
একটু বড়-বড়ের চিহ্ন নেই । কেবল ভারী ভারী কালো
কালো পাক-অনেকটা হুঁচি ভারতের বক কাট
টেম্পলের প্যাটার্ণের ।

..... পুড়ি-একটু-উঠল যেন । কিন্তু-নামনে কোথায়

কিন্তু কলকাতার কেবল নিম্না শূন্যেইত আসাধি আমরা
তাই কলিকাতার প্রশংসা শূন্যে বনটা একটু ভাঙে উঠল ।
কিন্তু এখন বলে, লজ্জার এক ডাক্তার সেছেন ওপরে তিনি
একটা ওপরে দিবে সেছেন আমাকে—

ঐক বলে, আমরাও ত ওপরে থাকি পথে দিকমই দেখা
হতে পারে ।

বলি, তা পারে, কিন্তু তাকে চিনব কি করে ? তিনি ত
আর হাতে ছেটিগটিকোপ নিয়ে হটিবেন না, না আমরাও
মনে মনে ছিগোপ করতে পারব কে লজ্জার ডাক্তার ।

কিন্তু বাঙালীর ওই কথার একটা কান হল ।
ওপরে কথা হওয়া অবধি থেকে যাও থেকে যাও
দৈতে শূন্যে উচ্চ বনটা কেমন বেন বলি বলি করছিল
কিন্তু এখন দেখি তার উল্টো । সকালে উঠে লাঠিবান
পাতে তলে নিয়ে বলে, আর এক গটি এগিয়ে চল ।

বলি, কেন থাকবে না এখানে, দশাই যে বসছেন ।

না না । শেষে কি পা নিয়ে পড়ে থাকব এখানে
বাঙালীর হতো আত্মকাল ।

শেষেরা আবার খেরিয়ে সেছেন খুব সকালেই ।
কাল সকালেই ওঠেন ওঁরা, সকাল সকালেই বেগেন ।
বাব হুখে দেখা হতেছে আবার সপে । পথে কাল
ছায় আলাপ হতেছে । সেই আবারো বলে সেলেন,
আর যেন আমরা না বেরোই । তাঁরা নানা ভাবে
গমায়ের সাহায্য করবার চেষ্টা করছেন ।

কিন্তু বেশ পর্যন্ত বেরুবারই আশা । তবে এবেলা
নয়ান চটি । হাইল চারেক পথ । হায়বদার হতো
হতো হুড়ে হোজাম নব । তিনিও একেলা থাকবই
ল চটি । আর সন্ধ্যার দিকে যদি পারেন ত বন্দোবস্ত ।

তা বান, কিন্তু ভাবছি স্খামশূন্যের কথা । কাদও
দৈর সম্মুখে বন্দাবলি করছি । কি হল ওঁদের ?
মনো কেন খলন না ওঁরা ।

ঐক বলে, সত্যি আত্মক । ওঁরা যে আমাকেও হার
দিয়ে সেলেন ।

বাঙালি যা দিচ্ছে পথ । এখন হতেই চড়াই । চড়াই
যে ধীরে ধীরে ওপরে উঠি ।

কাল বিকেলের হতো ওজন গাছপালা বিরল পথ নব ।
দিকেই পলক কল, নভাবের সবারোহ । হতোভেদন

গাছের তদাত কথা কলে হেরে আছে বেন লাল অটল
শেতেছেন বনদশী । আর সেই কাঠ গোলাপ । পুস্কে
যেন তারার মালা তাঁর কালো চুলে । আর এক কক্ষের
কুল দেখছি, কুজুড়ার হতোই গাছ । কিন্তু কুল পুসো
হোই হোই মস্তুরী হতো, আর উজ্জ্বলী । ওপরে হতে
নীচের দিকে এখন চেয়ে দেখি এখন সেই মস্তুরী হাড়া আর
কিন্তুই দেখা যায় না । বনে হর কে বেন দেখানে জ্ঞানদিয়ে
দিয়েছে অস্তুরী পীপিকা হা হোনের নীরব প্রশতিতে ।

আমরা বানিকটা এগিয়ে যেতেই শেঠমীর বলে দেখা
হব । হাছার ঠিক ওপরেই পকারেভী কুল । হোই
হোই হেলেনেবেরা বেলো দেখাচ্ছে । শেঠমীরা তাই বলে
বলে দেখছেন ।

যেনা দেখতে আমরাও দাঁড়াই একটুখানি ।

শেঠমী বলেন, তোমরা চলে এসে, থাকলে না ?

বলি না, কেমন ভালো লাগল না, তাই চলে এলাম ।

তবে যাব না বেরুদুর । ওই হনুমান চটি ।

শূন্যে হাসলেন তিনি । বললেন, আমরাও থাকব ওই
হনুমান চটি ।

হনুমান পঙ্গুর নামেই ওই চটির নাম । হনুমান
পঙ্গুর শূল গেরিবে পাছাড়ের গায়ে হোকান ও বনশালা ।

পথে আসতে আত্ম প্রথম ত্বার মৌলী পাখাড়
দেখলাম আমরা অতঃ ও বাতায়ত প্রথমই । হুই
পাছাড়ের কীকে দেখা সেল তাকে আকাশের গায়ে কক কক
কহতে । দেখে আনন্দে কলরব করে উঠি ।

আর একবার আনন্দে কলরব করি হনুমান পঙ্গুর পাড়ে
এসে । পাছাড়ের দ্য দিবে যেন পঙ্গুর কহতে কহতে
নাহবে কল । বাতানে যেন উচ্চের জলের কথা তাতে
কলরব না করেই যা কি করি ।

ভারামত বলে, ঐ যে হনুমান পঙ্গুর ভান দিকে
পাছাড় দেখছেন ওও ওপরে দিবে সেল বাজ্য বায় পলোভারী
তবে পথ বলে কিন্নু দেই । রাত কাটাতেও গাছের তলা
নরত পাছাড়ের কাটল । ভিন চার দিবের কলও নিতে
হবে সেল ।

ঐক বলে, তবে আর কি আনন্দে যাওয়া—তবে হ্যাঁ,
লে ওই আনন্দেই ।

‘মহাশয়’ আ ন মি ই

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অ্যাথলিট,—
মুইজেন চ্যাক স্ত্রাক এই
ঐতিহাসিক নমুনা
করেছিলেন ১৯১২ সালে
স্টকহোমে, চতুর্থ অলিম্পিক
ক্রীড়াক্ষেত্রে ।

তারপর বহুবর্ষ অভিজ্ঞতা

চরেছে। যেন যেন বহু প্রতিভাবার ক্রীড়াবিশ্বের ঘটেছে
অনির্বচ্য। বৈজ্ঞানিক পথেরদ্বারায় হুয়ে খেলাধুলার মান
উঠেছে হুয়ে। পরিসংখ্যানের পরিচয়ের উজ্জ্বলস্বরূপ।
এসিবে নিবন্ধন পূর্ণস্বরূপের পিছনে কলে। হুগ থেকে
বৃদ্ধান্ত। তবুও সেই ঐতিহাসিক অভিমতের বাবাবা।
সম্পর্কে সন্দেহের দ্বিটোকোটা বেধা বেওয়ার কারণ
ঘটেনি এখনও ।

এখনও একালের নিরিখে ‘মহাশয়’ জিমবর্ণ সর্বকালের
সর্বোত্তম জৌকব ক্রীড়াবিশ্ব, প্রতিভা বীর সহজাত।
অ্যাথলেটিক তাঁর রেকর্ড বহি বা রান হয়ে গিয়ে থাকে,
এক হাতে অ্যাথলেটিকের আরও
হরেক বুকখ খেলাধুলার কৌশল
থরে রাখার তাঁর কৃতিত্বের জ্বলনা
কোথায় ? রা গ বী, বেসবল,
ব্যাডমিন্টন তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর
এখনও স্বর্ণজ্যোত উজ্জ্বলিত।
তাকে বাব হিসেবে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ
হাগবী ও বেসবল বল নির্বাচন
করার চেষ্টা বাতুলতা মনে ।

জিমবর্ণের আরও পরিচয়
আছে। ল্যাক্স, বিলবার্ড, সঁতার
সবোভেই সেই পরিচয়ের অঙ্গান
নকায়। হাত বিয়েছেন বাস্তবেই
তাতেই তিনি অমল সাধারণ।
আর অ্যাথলেটিক ? সবচেয়ে
বিচায়ে সেখানে তাঁর স্বড়ি

খেলাধুলা

‘ব্রোঞ্জ পড়া মানুষ’

অমল বহু

বেলাই তার। প্রত্যেক নকায়
স্টকহোম অলিম্পিক
আসল ইতিহাস। অ্যাথলিট
মতে বীরুত বিজয়ী
‘আলিকার উল’ যে ইতি
হাসের মর্যাদা ।

আহুঠানিক বিজয়ী

আলিকার জিমবর্ণের না

অমল। কিন্তু স্টকহোম অলিম্পিকের আসল ইতিহাসে
লিপিবদ্ধ আছে জিমবর্ণের শক্তিশাল অবিচ্যত কাহিনী
স্টকহোমে বর্ণ একাই পেটাবলন এবং ডেকাবলন
শীর্ষস্থান পেয়ে দুইটি স্বর্ণপদক এবং সেই স
রাখা স্ত্রাকও রূপভারের দেওয়া ঐতি উল্লেখ্য
অঙ্গান করে ঘরে ফিরেছিলেন। ঘরে তখন
তাকে ঘিরে ঘরা দোহাগোল। জনসাধারণ এবং জ
মারিন প্রেসিডেন্ট শব্দ বর্ণের জয়জয়িন্দে
দোচ্ছাৎ। কিন্তু বছর দুয়েত না দুয়েতই উৎসাহ।
উদ্বোধনানুষ্ঠান মারিন হুয়েক চোয়ারার অংশ পবিত্র

ঘটে গেলো। কে ঘেন কা
জ্বল, স্টকহোম অলিম্পি
আগে জিমবর্ণ অপেশাবারী ক্রী
নীতি তব্ব করেছেন। সঙ্গে
তদন্তের প্রথমনষ্ট্রুর আ
পর্ষত না নিয়ে বিচারের বৃশক
বলি বেওয়া হলো তাঁকে। ব
পবক-পুংকার কেড়ে নে
হলো, অলিম্পিকবিজয়ী তাঁসি
থেকে মুছে কোলা হলো জিমবা
নাম। আজ তাই আনু নি
অলিম্পিকের লুকলপ্রতিহোদী।
তাঁকে তাঁর অভিত নেই।

পাঁচটি বিভাগীয় প্রতিযোগে
তার মোট কলাকলের তিন
পেটাবলন এবং বনটি দিগা



অসুষ্ঠানবৎ হয়ে ডেকাঘলন প্রতিযোগিতার অসুষ্ঠান একালে হয় না। কিন্তু ঠিকভাবে এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। এবং সেই ব্যবস্থার সুবাদে জিমবর্ণ চারটি করে বিভাগে পৌঁছান পেরে অক্লান্ত পরেটেই হিসেবে সমস্ত প্রতিযোগীকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। পেটাবলন ও ডেকাঘলন, দুটি অসুষ্ঠানই বলতে গেলে, অ্যাবলেনটের প্রায় সর্ব বিভাগেই তাঁর প্রকর্ষের নকীত ছিল প্রত্যক্ষ। এমন কৃতিত্ব আগে অথবা তাঁর পরে আর কখনো নজরে পড়েনি। সুতরাং সর্বকালের সর্বোত্তম চৌকল অ্যাবলিটের পরাভিবিজিত হওয়ার অধিকার তাঁর চেয়ে বেশী আর কারই বা আছে?

বিস্তৃতভাবে বলা যায় যে জিমবর্ণ পেটাবলনের ব্রডজাম্প ২০ ফুট ২.৭ ইঞ্চি অতিক্রম করেছিলেন, ডিসকাস ও বর্শা ছুড়েছিলেন যথাক্রমে ১১৬ ফুট ৮.৪ ইঞ্চি ও ১৪.০ ফুট ২.৭ ইঞ্চি, ২.০ মিটার দৌড়েছিলেন ২২.২ সেকেন্ডে ও ১৪.০ মিটার ৪ মিনিট ৪.৮ সেকেন্ডে; এবং ডেকাঘলনের পোলক ছুড়েছিলেন ৪২ ফুট ৪.৪৪ ইঞ্চি, ডিসকাস ১২১ ফুট ৩.২ ইঞ্চি, হাইজাম্পে উঠেছিলেন ৩ ফুট ১.৬ ইঞ্চি উপরে, পোল ভল্টে ১.০ ফুট ৭.২৪ ইঞ্চি, ব্রডজাম্পে ডিয়েয়েছিলেন ২২ ফুট ২.০ ইঞ্চি পর্যন্ত, এবং দৌড়েছিলেন ৭৩ মিটার ১১.২ সেকেন্ড, ১১০ মিটার হার্ডল : ২.৬ সেকেন্ডে, চারশো মিটার ৪২.২ সেকেন্ডে : ১৪.০০ মিটার ৪.১ সেকেন্ডে।

এক কৃতিত্বের এইসব নকীয়েই জ্যাক-অ্যাবলিট জিমবর্ণের জৌলিত্ব বাচাই হয়ে গিয়েছে। অলিম্পিক বিজয়ী ভ্যালিকার অঙ্কু করে রেবেক কেউ জিমবর্ণকে আতঙ্কিত করতে পারেনি। ইতিহাসাহুর্ন সত্য-মিথ্যে মাঝখানের বৃত্তিতে জিমবর্ণ ছোটো হয়ে বাসনি। এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ করে দেখলে কখনোবানোয়া একধিন বেশ বড়োয় পড়ে গুলেছিলেন, উত্তরকালে সেই বড়োয়ই বুঝেই গিয়েছে শিথিল হয়ে।

সোনা বাঁধ হাজাখীনে কারলিসলে ক্রুকের গ্রীষ্ম-বকালে পূর্ব ক্যারোলিনা বেসবল লীগে বেলার সমগ্র জিমবর্ণ অবশ্য প্রয়োজনীয় বয়স বাৎসরিক সামান্য কিছু অর্ধ হাতে নিয়েছিলেন। অলিম্পিক কমিটির নিয়মে শেকালে এবং একালেও অবশ্য প্রয়োজনীয়

যায়তন যেটোতে অ্যাবলিটের সামান্য অর্ধ গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু অর্ধ সামান্য অর্ধই গ্রহণ করেছিলেন আরও পাঁচজনকে আসেই। তবুও সামান্য অর্ধের অজকে কুন্সিগে কাঁপিয়ে বড় করে গুলে ধরে জিমবর্ণকে এত অসামান্য হয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

জিমবর্ণের সঙ্গে গিরে দেবিন আর বার্না সামান্য অর্ধ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা কিন্তু উত্তরকালে সমগ্রাণে অপেশাবার এঁড়ানিহি হিসাবেই স্বীকৃত হয়েছিলেন। তবুও বরা পড়লেন বর্ণ এবং বহুপক্ষে উত্তর অ্যাবলিট এক কোণে তাঁর অপেশাবার সংজ্ঞা ভিন্নবিনের মতো কোতল হয়ে গেলে।

কুন্সিগের কোল জিমবর্ণের উপর পড়েছিল একমাত্র এই কারণে যে তিনি মার্কিন ক্রীড়া তথা আন্তর্জাতিক ক্রীড়ার কর্ণধারকদের মতো বর্ণিত-সমগ্রাণকৃত ছিলেন না। তিনি ছিলেন মার্কিন যুগের আহিবাদী, ধর্মীতে বার্না বর্ণিত ইতিহাসে পোদিত প্রাথমিত। অলিম্পিক, ম্যেচোর সাহসিকতা দুটির মোহও ছিল না। উপাধিত অতিযোগের সত্যাসত্য বিশ্বাসেই যখন বর্ণিতেরা কোনো চোঁড়াই করেন নি। বর্ণ নিজেও তখন নিশ্চিত ছিলেন। বর্ণ পর্যন্ত দুটি ক্রিয়ের বেধেছাত পর এই বিতর্কক, সাহসিকতা তবুও বলে উঠেছিলেন 'সব থাক'। কিন্তু তাঁরা তো জুইডেনাংক শুভাকের অভিমতটি কেড়ে নিতে পারবেন না!

অনেক বছর পর বাস মার্কিন যুগকই জিমবর্ণ সম্পর্কে নতুন করে তথ্য করে আগ দিয়েছিল যে যৌবনে তিনি বড় পাবার মতো কোন অপরাধ করেন নি। সুস্থানা অসুস্থতা বর্ণিতেরাও সেদিন সুবিচারের প্রত্যাশার বর্ণগ্রন্থে বিবেচনার দাবীও জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাত্ত্বিক সুবিচার মেলে নি। কেঁচো বর্ণে সাপ বাব করার আন্তর্জাতিক কমিটি কোন আক্রমণ ছিল না। বর্ণ আশঙ্কা ছিল বেলামাল হয়ে যাযার।

আলল কথা, জিমবর্ণ সম্পর্কে সত্য স্বীকৃত হয়নি আন্তর্জাতিকভাবে। তবুও মিথ্যার আড়ালে সত্য ঢালা পড়ে যায়নি। আন্তর্জাতিক কমিটি স্বীকার করুন বা নাই করুন দিরপেক দুনিয়া যেনে নিয়েছে জিমবর্ণের

আধুনিক পরিবারে অভিনব সাঁর্ফ



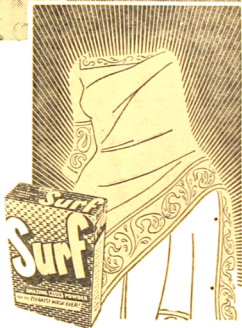
‘আমাদের আজকের জীবনে...’

বোধের দৃষ্টিতে প্রেম। সুন্দরী বালেন

‘আমাদের আধুনিক এই জীবন যাত্রার মনে হয় কোন্‌ই
মূল্য ছিবিবটাই, আর আমাদের মনে আরও ভালো জিনিস
হাি—যেখান থেকে আমাদের বোধের জীবনটা বেঁচে। জি.
বুদ্ধির জীবনটা। জিনিষ হলো, ‘আজ এ যুগের মন
আধুনিক, উন্নত জিনিষ বাছতে পারছে। এই
বলব লাগে, ব্যবহার করে সঠিকই আসল জিনিস। কারণ
সার্ফ কাপড় কাচার গুণ অসুখীয়া।’

‘সার্ফ’র মতো কোনো বস্তু কাপড় ধুঁকতে কখনো
কখনো লাগে কাপড়ের মতো কোনও বস্তুই কখনো
হলেই!’
তাই বুদ্ধির মতো কাপড় কাপড়ের গুণ—সঠিক, পার্ফেক্ট,
পারী, তোলালেগার, ওয়াশিং মেশিনে কাপড়
ধুঁকি সাফ করে।

আপনি সার্ফ ব্যবহার করেছেন? সার্ফ আপনার কাপড়
কাচার জীবনটা জটিল করে দেবে—অন্য সার্ফ
কাপড় কাচার মতো অনেক ভালো, অনেক বেশী
কমলা হবে। তাইতো ঘরে ঘরে সার্ফ সার্ফের কথা।
আপনিও এবার সার্ফ কাচার গুণ কখন!



সার্ফ কাপড়জামা সবচেয়ে ফরসা করে কাচে

বিজ্ঞান পিয়ারের ভেটী

BJL 18-7531 801

অনন্ত-পাথর জোড়া প্রতিভা। বিশেষতঃ মহল আদ্য তাই একবারো পোড়ার : এমন সহজত প্রতিভার সন্ধান আর বেশে ন; আশেও নয়; বর্ণের পরবর্তী কালেও নয়।

সহজাত প্রতিভাই ছিল জিব্বর্ণের পদম পাবের। নির্মিত চাষির ঘরে ১৮৮৬ সালে জন্মেছিলেন তিনি। সহায় ছিল না। ছিলনা সখল। কিছু বা ছিল ছিল না আং কাকরই। ছিল অটুট স্বাস্থ্য-দম্পন। মাঝার হু'কুটের উপর লগা, চওড়া হাতের কাঠাঘোর উপর সুবিস্তৃত পেশী, তাহাটে হাতের আঙুরন হুটে হুল্লুত হাওয়া-প্রী তি'কি তিতো। মনে ছিল অহুত কু'তি। সহজাত প্রভুত্ব টানে লজ পাঠ্যত্বকৃষ্ণে লাক্ষিয়ে হা'নিরে নির্ভেজাল ইন্দ্রাজে পরিণত হয়েছিলেন তিনি।

হাশ্যে জিব্বর্ণকে হাতেকলবে বেলা সেবান নি কট। পরে আদিবাসী হুল কারলিল'লে ইনট্রিউটের পড়ুয়া ধবন তখন তাঁর ওপর নবর পড়ে রেড ইন্ডিয়ান কাচ পপ্ ওয়ার্থারের। পপ্ ওয়ার্থার ছিলেন ষাটি হরতী। আত্মক'তিক কৌতুমহলে এই একটি অহুত পহার বিয়েই তিনিই অক্ষরকৌতি'য়েবে বিয়েছেন।

জিব্বর্ণ' মারায়ান ১৯৪০ সালে। বিজি কবা যে রিলোকপদনের পর বর্ণের মধর দেহটিকে আঁকড়ে

ধরার জন্তে ওকলাহানা, পেনসিলভানিয়া শহরে যেন রীতিমতো কাঁকাবাড়ি পড়ে যায়। পৌর সংস্থা, নিজ সংস্থার কর্তব্যারেরা সেদিন বর্ণের সমা'যতে পগমচুদী স্থতিসৌধ বানাতো চেয়েছিলেন, কচি আর ল'স্থতির কুরো অভিমান বিসজ'ন হয়ে। কে জানে, বর্ণবৈত্তের আবেগের উজ্জ্বল কোলে সেদিন লোকান্তরিত পু'ত্ন অলকো যেয়েছিলেন কি না।

জিব্বর্ণের জীবিতাবস্থায় তাঁরই জীবনী অধলবনে একটি ছায়াচিত্র নির্মাণ করে মার্কিনমূলক ভূলের প্রাধান্তিত করতে চেয়েছিল। চিত্রটির নাম 'ম্যান অব ব্রো'। সার্বক নামকরণ। তবুও যেন মনে হয় যে 'ব্রো' পড়া মাহু' সেই বিরাট পু'ত্নের অতি সংকিশ্ল পরিচয়। তাই ব্রুটি বিবাত্ত মার্কিন সমালোচক মি: গ্রাউ'লাও হাইল বলতে বাধ্য হয়েছেন:—

"তখনও আমাদের দোষখলন হয় নি। আরও কিছু করার আছে। আমার প্রত্যাখ, নিউইয়র্কে মিউজিয়াম অব' স্ট্রাচারাল হিস্ট্রি তবনের প্রবেশদ'রে জিব্বর্ণের তামাটে পূর্বাধরব প্রতিব্রুতি স্থাপিত হোক'। যেন প্রথম হু'বোনে এক পক্ষকে চিত্রে নিতে কট না হয় আমেরিকার, না ছুনিহান সর্বকালের সর্বপ্রোচ চৌকল আখলিটতে। সত্যিই এমন সহজাত কৌড়া প্রতিভার তুলনানেই!"





ডাঃ
১৮৮
বর্ষ ব
৩য় সংখ

বিংশ শতাব্দী

‘সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই’

১২৬৮ সাল বাঙ্গালীর ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য বছর। এই বছরে শুধু যে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ভাষ্যকাশকে রঞ্জিত করেছিলেন তাই নয়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এক স্বামী বিবেকানন্দের জন্মও এই বছরে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের শতবার্ষিকীতে দেশে উৎসবের ধুম পড়ে যায় নি, এক হিসাবে তা ভালই হয়েছে। এই নীরবকর্মী দেশবাসীর নিঃশব্দ শ্রবতার অধিকারী হয়েছেন। আচার্য রায় ছিলেন স্বার্থ শেখপ্রেমিক। তিনি জানতেন, যে দেশের অস্তিত্ব নেই, সে দেশের ভবিষ্যত রচনাও কষ্টসাধ্য। একটি আত্মবিশ্বস্ত জাতিকে জাগানোর চেষ্টায় সারা জীবন অতিবাহিত করেছেন তিনি। হিন্দু রসায়নের ইতিহাস রচনা তাঁর জীবনের অগুস্তন স্রোত কীর্তি।

শিক্ষক হিসাবে, কর্মী হিসাবে, রাসায়নিক হিসাবে আচার্য রায় অতুল-কীর্তির অধিকারী। নিরহঙ্কার এবং স্ববিশ্বস্ত সারল্যের অধিকারী ছিলেন তিনি। তাঁর মত সন্তানের জন্ম যেকোন দেশমাতৃকা গর্ববোধ করতে পারেন।

বাংলার অগ্রযুগের অগ্রতম নায়ক ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। স্বাধীনবাদের প্রতি কোন সমর্থন না রেখেও তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া ছাড়া সম্ভব নয়। ভ্যাগ, দূচিহীনতা আদর্শনিষ্ঠা প্রভৃতি বহুগুণের সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে।

স্বামী বিবেকানন্দ জন্ম মুহূর্তের হিসাবে রবীন্দ্রনাথ প্রফুল্লচন্দ্র ব্রহ্মবান্ধবের চেয়ে মাত্র কয়েক মাসের কনিষ্ঠ। ‘বিংশ শতাব্দী’কে যুগ হিসাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর চেয়ে বড় বলে স্বীকার না করার উপায় নেই। কিন্তু আজ থেকে শতবর্ষ আগে মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে বাংলাদেশে পর পর যে দিকপালদের আবির্ভাব ঘটেছিল তাতে বাংলা দেশের ক্ষেত্রেও এটা সত্য বিনা সে সম্পর্কে গভীর সন্দেহের অবকাশ আছে।

আমরা ১২৬৮ সালকে প্রণাম করি।

প্রবন্ধ পত্রিকা

॥ জীবন সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে ॥

সূচী

। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বসু ।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বসু : দুটি অপ্রকাশিত পত্র
: চিন্ময় বসুরাধনের ইতিহাস
রবীন্দ্রনাথ : ইংলিশি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অভিমত
মহেশ্বর মহীপুত্র : পূণ্য স্মৃতি
কৃষ্ণচন্দ্রনাথ বোস : আচার্য স্মৃতি
। বিজ্ঞান ।

হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : চিন্ময় বসুর
চর্চন ।

রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : মাকড়সিঙে প্রজ্ঞা ও প্রত্যাশ
শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : মনোবিজ্ঞানী ইত্য

। সাহিত্য ।

স্বদেশিক বসু : প্রোফান প্রোবের সাম্প্রতিক উপস্থাপ
। গ্রন্থ-প্রসঙ্গ ।

মুদ্রণ ভিত্ত : রবীন্দ্রনাথ
জগদীশ চন্দ্র : সাম্প্রতিক বিজ্ঞান-গ্রন্থ
চন্দ্র : প্রতিসংখ্যা এক টাকা
বার্ষিক গ্রাহক টানা : বারো টাকা

কার্যালয় : ২০, গ্রেট ইট, কলিকাতা-৪
ফোন : ৪৫-৪৪২৫



সংস্করণ ইংরেজি ভাষায় ও ইংরেজি
বই এবং লেখার সাহায্যের
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান



রামকৃষ্ণ বুক বাইন্ডিং ওয়ার্কস

২০, মোকাম্বার ইট,
কলিকাতা-৪ ।

মামুল এগুচ্ছে । সত্যতা এগুচ্ছে ।
সত্যতার সঙ্গে তাল বেধে চলতে বলে
বেতারের সঙ্গে যোগাযোগ চাই-ই



তার অন্য বোঝা বহন

রেডিও টেকনিকস্

এইচ-এম-ডি ও কলোম্বিয়া
অনুমোদিত প্রতিনিধি

৬৪৪, শতাব্দীমোহন এডিনিট, কলি-৪
ফোন : ৪৫-৪৮৩১

—আট—

ক্যা সা ব বলে
ক্যাসা, কোড়া কোড়া
চোখ নিয়ে জলজ্যাস্ত
ক্যাসাদেবী সশরীরে
আবির্ভূত হোল হাঁটু
সমান ভটভটে পচা
পাঁকে র ভেতর।
নৌকাখানাকে ঘিরে
ধাড়িয়ে ক্যালফ্যাল
করে তাকিয়ে রইল
তু তারা। কিছু চাইলও
না, নিলও না, চাওছা
পাওছার হিসেব তারা
তুলে নেবে হিয়েছে!

অবস্থিত



প্রকৃতির্মি হিমালয়ের পর্বতী অক্ষর

ঐশা পূর্ণার স্মার

পাঞ্জাবি পবে আছে
সবাই, বেবেতা পবেছে
বেদী বকর বঙচঙে
হুড়িবার পি তার।
যেহে পুণ্য প্রত্যেকে
মাঝর জড়িয়েছে নানা
হস্তের জমা। উড়ট
কর্নি পাথরের মালা
মুদিয়েছে সবাই গলায়,
প্রত্যেকের আত্মলে
পাথর বসানো আংটি।
তাও কি এক আংটা,
জুঁহাওয়ে মশটা আত্মল
কম-কম-কম পনে র

ভাষের চাউনিতে কখনো নেই, লোভ তাকের ত্রিসীমানা
পৌঁছতে পারে না। তাদের চাউনি বলতে চাচ্ছে তু
যে তারা আর পারছে না। বেঁচে থাকতে থাকতে
তারা হররান হোয়ে পড়েছে। তু তু বেঁচে থাকটা
যে কি ভরষর ক্যাপারে পড়ে যাওয়া, তা হবি জানতে
চাও তাহলে চলে যাও সেই আধা-ভুবর আধ-ভাসন্ত
চড়াগুলো। বরাটা বেকে কছে আসার জলপথে
পড়বে সেই ধীপগুলো। সেখানেও কিছু মাহুত বাস
করে, মাহুতবের সঙ্গে কিছু মেয়েমাহুতও আছে
সেখানে। মাহুত মেয়েমাহুত আছে বলে তাদের কাজ
বাজাও হয়। সবাই তারা বেঁচে আছে। দেহা
ধান গম্মার, দীছড়ে মাছ ধরে। পেট ভরে খেতে
যেতে আর বেঁচে থাকতে থাকতে তারা বড় ক্যাসাদে
পড়ে গেছে। নিবেট নিচ্ছির জগদল পাথরের মত
আত আত জীবন বুকে চেপে বগে আছে তাদের।
সেই জীবন বোঝাটা সবল করে তারা আর বেঁচে
থাকতে পারছে না।

তারা কেউ অসত্য নয়। কোল ভিল সঁওতালদের
মত সাধ গোশাকের পরোয়া করে না তারা, এ
ধাবণী করলে মস্ত ভুল করা হবে। দস্তবমত পাঞ্জাবী

বিশটা করে হবেই। সব আংটি পেতলেদ বা চাটির
ঠেদরী, সমস্ত আংটিতে লাল সবুজ হলহে কালো নানা
ঝাতের পাথর বসানো রয়েছে। মেয়েদের মাতে কানে
পাথর বসানো গয়না, গয়নার ভারে নাক কান ছিঁড়ে
যেতে চায়। কাজা বাজাংর পলাতেও পোছা গোড়া
চাটির ছাব, কাজা বাজাংর উলক নয়। সব হুতু
মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, তারা কেউ হাড়হাংবতে
উনপাঁছুরে হস্তজাড়া হস্তজাড়া নয়। তু বেন তাদের
কিন্তু নেই, তারা বেন সর্বস্বাত হোয়ে বেঁচে রয়েছে।
জীবনবাধন করতে গেলে যেতে পরতে হয় এবং
যেতে পরতে গেলেই বেঁচে থাকা যায়। খেঁয়ে পরে
বেঁচে থাকাটা যে কি নিছুর ভাবে বেঁচে থাকা, তা
বেন উলক হোয়ে হুটে আছে তাদের স্নেহ জ্বলাতে।
উলক সবুজের চাউনির সঙ্গে তাদের চাউনি সম্পর্ক
হিসে যায়।

তারা সবাই সওয়া নিতে এল। বড়া বড়া চাল
হুড়ি হুড়ি খেছুর আর শুটকী যাচ্ছে পাঁট তুলে
ঘিরে সেল নৌকার, ঘিরে সেল তার বহলে কয়েক
পাঁট জামা পাখানা, হুনের বড়া কয়েকটা আর
কয়েক টিন কেরোসিন। একটা কাঠের বাজ বোকাই

শৌখিন জিনিষ-পত্র একধন যিনা পয়সার সওয়াত
বিলেন আমায়ের কান্তেন সাহেব। ওটা নাকি হিতেই
হয়। না দিলে কোন্ডি থাকে না। আখটি পাখরের
মালা নাক কানের গহনা আর অংকনা চিকনি, এগুলো
কে কিনতে যায়। না পেলে কিছু নৌকার ওপর
উঠে আসতে পারে সহাই। এলে মিকেরা নৌকা
হাতড়ে বা বুনি নিয়ে যেতে পারে।

সহজে তা আর কোনও নৌকা ওদের ওখানে
ভেঙে না। কোয়ারের হল বেমে না গেলে আমদাই
কি আসতাম, লিখে ওদের বীণটা পেরিয়ে ওখানের
ধড়িয়ার পৌঁছে এককণে পাশ তুলে দিয়ে উঠাও
হোরে যেতাম।

দিনের পর দিন ওরা তাই দেখে। নৌকা আসে,
নৌকা চলে যায়, ওরা সবাই ছেলে বুড়ো ঘেরে পুঁক
পেট কোলা পালের হিকে তাকিয়ে থাকে আর মনে মনে
হাত কাশড়ায়। মাহু ওরা দেখতে পায না, মাহুয়ের
পানে তাই ওরা ক্যালকাল করে চেয়ে থাকে। অপরাধ
যান শুধু বেঁচে থাকতে থাকতে ঝেঁচু থাকা কাছটার
ওপরেই ওদের বিড়কা হবে গেছে। সেই বিড়কার
ক্যালকালে হোরে উঠেছে ওদের ডোবের চাউনি বোলা
চোখে কোনও রঙের ছোপ পড়ে না।

বেনন সমুদ্রের বোলা ফলে আকাশের রক্ত বতী পড়ে
না। বোলাটে সমুদ্রের বুকে ছুঁত বেলো ছুটে চলেছে
নৌকা, চড়া পার হোরে আমরা পালিয়ে এসেছি।
কখন বাড়ল হল কখন নৌকা ছাড়ল, কিছুই টের পাই
নি। নৌকার বোলের মধ্যে বাতির গাফার ওরে বুঝিয়ে
পড়েছিল। সুখ ভাঙতে ওপরে উঠে গিয়ে বেখলাম,
সব কথানা 'পাল বুক চিড়িয়ে পেট হুলিয়ে দিলন্ত
পানে তাকিয়ে রয়েছে। সব কখন মাহু নৌকার
পাড়ের ওপর হড়ি-হড়া হাতে নিয়ে দির হোরে বলে
আছে। নৌকাখানা বেন আসমান দিয়ে উড়ে চলেছে,
বোলাটে হল নৌকার তলার ঠেকছে কি ঠেকছে না।

ভাতাভাড়ি চারিহিকে নজর কেলে বেখলাম। না,
চালা নেই, সব কাখা বাখা পাছ পালা ঝোপ জল
হুপ্রায়ের সেই ডাখাটুকি একবন পোপাট। শুধু হল,

কাখা গোলা ফলেও ওপর পালে পাল জরহুস বে'হা'হে'সি
গাড়িয়ে হাই তুলছে। কেউ একটু নড়ে চড়ে না, ঐ
হাই তোলাব হলক যাকে নায়ে বা একটু কুলে
ফেঁপে ওঠে।

নৌকার কিনারার বুক পর্বত হুলিয়ে গিয়ে চুপচাপ
চেয়ে বইল। কেলে বালের এলাম, তাহের চোখগুলো
বুঝেই ম্পষ্ট ভাবে দেখতে লাগলাম ফলে মখে। দেখতে
দেখতে বুঝি অন্তরমন হোরে পড়লাম। তাহের চিনি
না, তাহের আনি না, তাহের তাবা পর্বত মুক্তে পারিনি।
তবু তাহের লড়ে বুকের চেহেরে কোবার বেন একটা
কোড়া আউরে উঠল। আচমিতে একটা আছত্তবী
বেহাল উবর হোল মগধের মখে। কেমন হয়! ওহের
সঙ্গে সেই নাম-না-আনি বীণে আবুত্বা বীণাত্তর হও ভোল
করলে কেমন নিঃশব্দ নিশ্চিন্ত হয়ে জীবন কাটানো যায়!
ছুটি মিলে যায় একেবারে, লখা চওড়া ধরনীখানার বুক
ছুটোছুটি করে মগার হাত বেকে কয়ের শোব নিছার
পাওয়া যায়।

ওরাত কি এখনও তাকিয়ে আছে হু বিনত পানে!
আমায়ের হাডলের ভগায় ভগজল লাল চোটি পতাকাখানি
এখনও হরত দেখতে পান্দে তারা! তারা হরত
আশা করছে, কোনও একটা অমটন কাও বটে
হাযার হল আমরা হরত নৌকার মুখ হুগিরে কিরে
যেতে বাখা হু ওদের কাছে। তারপর বেশ কিছু দিন
ওদের সঙ্গে থাকতে হবে আমায়ের। ওদের মনের
মালা ছড়বে। মাহু হরে মাহুবকে যে ভাবে আমরা
হেনেতা করে ফেলে এলাম, তার উপদ্রুত হল ওরা মুরে
ভাসলে উতুল দিয়ে দেবে। আর আশায়ন অনাখিল
আখীরতা দিয়ে এখন তাবে জুড়িয়ে দেবে আমায়ের মন
যে আবার এখন নৌকা ভাসাযার সময় হবে তখন আমরা
কীবে কুল পাব না। বুকের মধ্যে প্রত্যেকটি ভদ্রী
বিশ্বেষকায় ভদরে ভদরে উঠবে।

তাই নাকি রয়েছে।

সন্ধ্যার পরে বুক পার্শী মশাভিট্টর সামনে বসে এক
আজব কাহিনী শুনলাম। ওর মাথট ঠিক মনে করে
উঠতে পারছি না। বেশ লখা নাম, বেশ হলক মিল হু
আছে ওর নামে। কি বেন আববনী পযম তাই ইত্যাদি

ইত্যাদি ব্যাপার। অন্তর্ভুক্ত নামটাকে আমরা সংক্ষিপ্ত করে আবহাওয়া বা আবহন সাহেবে ঝুঁকি করিয়ে কেলসায়। নৌকার ওপর ভিন্ন ভিন্নটে হাত কাটবার পরে চতুর্থ বাতের তক্ততে তাঁদের সঙ্গে সবারের আশাপ পরিচয় হোল। সবাই ঠাণ্ডের বেলহিলাম, তাঁরা হলেন শুভবাহ-পাকী ওঁচা। নৌকা হুদ মাহুদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না রেখে নিজেদের আতিকাত্য ঝাঁড়িয়ে কাহান্নানে গিয়ে পৌঁছলেন। হঠাৎ কি থেকে কি ঝাঁড়িয়ে গেল, বলতে পারব না। যেহা গেল, মহিলাটি ভৈরবীর কবলের কিনারায় বসে গালে হাত বিরে তুলকালায় হিন্দী বাত হলব করার চেষ্টা করছেন। বিবস বকম উত্তেজিত হয়ে দু'হাত আর মুখ বাঁধা নেকে ভৈরবী তাঁকে বোকাবার চেষ্টা করছেন বক্ষবক্ষ ব্যাপারটা। মানে বক্ষবক্ষে পতিনিব্বা সোনার দলনই বেহত্যাগ করেছিলেন কিনা। সত্য, সুতরাং বেহত্যাগটা না বোকাতে পারলে কি করে তিনি বোকাব যে সত্যিবে বেহ কেন বসে বসে ছিল। এবং বসে বসে বসে বসে না হুঁকে সত্যিবে বেহ ততক্ষণ হিংল্যে তাঁরটির উৎপত্তি আসে কেমন করে। সেই বক্ষবক্ষের মীয়াংসা করার দস্তন পরমানন্দীকে গিয়ে যোগদান করতে হোল। ভৈরবীর হিন্দী বাতকে চেলে সেজে তিনি পার্শ্বী মহিলাটিকে বোকাতে লাগলেন। কৈকটীমদন মিশ্র মহারাজ আবার দুর্ভাগ্য বকদের হা কালী তক্ত। বহুত বকরা তিনি চড়িয়েছেন কলকাতাওয়াসী কালীর কাছে। বহু স্ মহারাজ আর দুর্ভাগ্য যদি যে বাপ বেটা, এও তাঁর অজান্ত নয়। সুতরাং তিনিও আসন নিলেম সেখানে। যেহেতে যেহেতে দস্তবস্ত একটি সত্য জন্মে উঠল। আবহাওয়া পরমানন্দীও পেয়ে না এসে পারলেন না। তারপর ভান্নার বোকা পড়ল। মিশ্রবন্দী মহারাজ স্বয়ং এসে নৌকার ধার থেকে চৈনে নিয়ে গেলেন আবহা। বস করে একখানা হাত করে সত্যিই হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন। মানে—আবহাওয়া নাকি তার হোবে গিয়েছিল। সত্যি হোবে সেই বক্ষবক্ষের মাহাধানেই তিনি পড়াটা প্রকাশ করে কেলছিলেন। লোকটা আশু আবহাওয়া ত'। নৌকার ধারে ঐ চানে ঝাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আবার কি বোলা উঠবে মনে কে বলতে পারে। হস্ত পড়বে

আবার লাড়িয়ে বহিরাব। বরকার কি ওর ওখানে একলাটি ঝাঁড়িয়ে থাকার। বরে নিয়ে এস, সবাই আবহাওয়া এখানে বসে থাকা-নয় করছি, ও কেন একলাটি আলাসা হয়ে থাকবে।

সুতরাং আশাপকে বক্ষবক্ষে যোগদান করতে হোল। বক্ষবক্ষটা কিন্তু বেশীকম চলল না। বক্ষবক্ষটি হোল অরি উপাসকদের বর্ষ, তারতবর্ষে অরি উপাসক ছিলেন পার্শ্বীরা, পার্শ্বীরাই আসল আর্ষ। পারত থেকে সেই আহিম কালে তাঁরা ভারতে এসেছিলেন। অরি উপাসনা থেকেই সনাতন হিন্দু বর্ষে বর্ষে। অর্থাৎ হিন্দু বর্ষটা আসলে পার্শ্বীদের অর্থপূর্ণ প্রেরিত বর্ষ ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক সব আসল কথা উঠে পড়ল। একটি মাত্র পরমানন্দীর সব কথা ভুলতে গিয়েই মাঝার হিন্দু পলে বল হোবে মাঝার উপাসক করেছিল, এবার তার সঙ্গে সংযুক্ত হোল পরম বিজ্ঞ আবহাওয়া পরমানন্দীর ঐকিক ইতিহাস। ইতিহাসের পূর্বতন পরবর্তী পুস্তকেও ঐহেব মালাপ পার নি, তাঁরা কবে কি মতলবে—পারত বেশ থেকে পাঠ্য পর্বত ডিট্রিয়ে তারতবর্ষে এসে উপস্থিত হোয়েছিলেন তা ভুলে হস্তবক্ষ হোয়ে পড়লাম। আশুন জালাবার কাহাট্টু হস্ত করতে পারার বক্ষ এমনি কেউকেটা ঠাণ্ডেছিলেন নিজেদের যে সেই পারত থেকে হাটতে হাটতে চলে এসেছিলেন ভারতে। মতলব! মতলব অতি দোষী, আশুন জালিয়ে আবহাওয়া তক্তে যেনে।

আশু আবহাওয়া ঐ বর্ষটি একটি মাত্র কাটির সাহায্যে সম্ভব করতে পারি। এবং পকাশ বাটটা কাটি হুদ একটি বেলসাহেব মূল্য মাত্র এক আনা।

ওনে আসল আর্ষের ওপর—অনুগ্রহ অনুকম্পা হোল একটু। বস করে একটা কথা জিজ্ঞাসা করে বললাম।

“আজ আবহাওয়া, ঐ যে বাহের ইরানী বলি আবহাওয়া, তারা তা'ইরাণ দেশের মানুষ। মানে, তারাও পার্শ্বী। তারাও কি অরি-উপাসক নাকি। কলকাতা বোকাই হিন্দী, তারতবর্ষের পর্বত ঐ ইরানীকে বোকাবার। মেরে পুস্তক কাক বাচ্চা বর সংসার যাতে করে জীবন ভোব হুবে বেড়াচ্ছে। মাঠে বাটে লেগানে কাপড় কবলের তাঁবু বাণিয়ে বাসা বাচ্ছে বাচ্ছে, আমোদ-আজাহ কহছে। বাচ্চা বিতে হয় না, চাব আবার করতে হয় না, একলা

এক বলে নির্ভরতা রাখারের হল। ওরাও কি আশাওর আসল পূর্বসূর্যের আত ? অরুণ কে ছিলেন, কেন বর্ষ প্রচার করেছিলেন, জানি না। কিন্তু ওদের কেবল ত' ধারণা হয় যে ওরা কার্ট স্কটো হুড়িয়ে এনে ই'ট পাবর অর্থা করে তার হাতখানে আঙন আলিয়ে তাত ৪টি বানানো ছাড়া অন্য কোনও আন্তের অগ্নি উপাসনার দার বাবে না ।”

আরমজী পতীর তাবে করেফার মাথা হুলিয়ে বললেন—“ই, ওরাই আসল আর্থ। আসল পার্শি হোল ওরাই। অরুণ নামটাও হস্ত শোনে নি ওরা, কিন্তু তাঁর প্রবর্তিত বর্ষে বুল অহুশালনি আশও মেনে চলছে। বর ঠেবে এক আরগার থেকে না, এক আরগার বর ঠেবে থাকলেই একটু তুল আরগার মধ্যে বাবে। ভাবতে শুরু করবে, এই যদি আমার। আমি কিছ কাহত নয়, করেফটা দিনের অজ্ঞে—এই পৃথিবীতে এসে পৃথিবীর এক টুকরো মাতিকে নিছের বলে মনে করাটা পাপ। অধাপাপ—”

পরমানন্দজী তাঁর সুবের কথাটা কেড়ে নিয়ে ভেঙে বলে উঠলেন—“আপনারের অরুণ কেন, আবারের গীতাভেও বলা যাবে—অনিকত। অনিকত যানে নিকতন দার নেই, অর্থাৎ নিরত বাস স্মা অর্থাৎ—”

“ই, আপনাদের গীতাভেও তা বলেছে।” আরমজী আবার মাথা নাড়া শুরু করলেন। ওটা বোঝার তাঁর বুজাবোঝ। এমন কিছু বুঝা উনি যন নি যে কথা বলতে গেলে মাথাটা কাঁপবে। তবু কাঁপে, কাঁপন আরমজী খুব বুড়ে সুখে কথা বলেন। যে কথাটি যোয়ার তাঁর দ্ব্য থেকে, তা যেমন সংক্ষিপ্ত ভেদনি সসীতান। সসীতান কথাগুলি তিনি পয়সর সহকারে বলতে লাগলেন—“কিন্তু পৃথিবীতে অনিকত হোতে বলা হয় নি গীতায়। বৃহস্পের পৃথ থাকবে, পৃথ ছাড়া পৃথক কেনন ব্যাপার। বর সংসার থাকে করে সূর বেকানো কি চাট্টিমানি কথা। ঐ যে দেখলেন মাড়ের বলা, হরিয়ার মতো বীণে পড়ে আছে। ওদেরও বাঘনা দিতে হয় না, কোনও বন্ধন নেই। চাষ করতে হয় না, বল কাটার ভেতর বান চাট্টি হুড়িয়ে দেয়। বল বত বাড়়ে, রান পান্ডে তত উঁচ হয়। কিন্তু বিন পবে বানের

ছড়াগুলো ছিঁড়ে নেবে। হোরে সেল ওদের বেঁচে থাকার জন্যে পাটাখাটুনি কথা। ওরা হোল দিত্ত ইয়ানী। আসল আর্থ। অরুণ আবারের নামও কখনও শোনে নি। বেধুন কি বলা।”

পরমানন্দজী আবার চোখের পানে তাকালেন, কি যে বোঝাতে চাইলেন বহুতে পারলাম না। আমার সুখ থেকে আর তা বেরলো না। ওরা হোল ইয়ানী। কি কাহত বোঝ। সূরতে সূরতে হস্তাধা হস্তানীরা কোথায় এসে ছুটেছে। কেন, অন্তঃস্থ যেশটার পহর গায়ের দারে কাছে বিখ্যাত পড়ে আছে ওদের আত বেরাফরা। মেয়ে পুরুষে মনে। আন্তের ছোবানুটি কিরি করছে, শোক ঠেকছে, হাতের কাছে পেলে ছিঁটকে ছুড়িত যে না করে তা নয়। কিন্তু সেখানে ত ওরা হতে বেঁচে নেই। বাহুরের সজ ত্যাগ করে মনুষ্য অঙ্গ ভোগ করা কি নর্যাস্তিক কর্তব্যোগ। চমক ওয়া ঐ বীণের সুখে কাঁটা মেয়ে। আমরা পৃথবীরা অঙ্গ অঙ্গ ওদের অত্যাচার সহিব। তবু ওদের ওভাবে পড়ে থাকতে হেত্তরা দার না।

আরমজী পরমতাই আমার মনের কথাটা যেন টের পেয়ে গেলেন। বললেন—“ওদের আদ্যতা ওখানে কেলে বেবে এলাম। আমাদের মন ব্যাধাপ হচ্ছে। ওরা কিন্তু বেশ আছে ওরা নিছেরা জানে না ওদের কি ছাঃ। ঐ বীণে মেয়ে অনেকটা ওপরে উঠলে ফেলেতে পেড়েন ওদের বর বাড়়ি। বড় বড় খুঁটি পুঁতে অনেক উঁচুতে বাজা ঠেবে থাকবার বর বানিয়েছে ওয়া। সে সব বরে হাঃখোনিয়াঃ ফেলেতে পাবেন, গ্রামোঞ্জন ফেলেতে পাবেন। পান ওদের মজাপত মেধা। বান চাল থেকে সব বানিয়ে মেধা করে, পান পাঃ, আর মেয়ে বাঃবের অজ্ঞে এ ওর খুন নেয়। ওদের মগবে অন্য কোনও বতপন সম্ভার না। বিন বিন ওরা বাড়়ে, বেশ বিশেষ থেকে ছেলে মেয়ে চুড়ি করে আনছে। ষোয়ান ছোয়ানীদের হুললে আনছে। একবার যে পড়বে ওয়ে পালাঃ, তার আর নিভার নেই। সে সব তুলে যাবে বর বাড়়ি আতীর বজঃ, শিকা সত্যতা বলে পতিজা কিছু তার বেরালে থাকবে না। বকে বাবে ওফা সকে, বাঃব হোরে বেঁচে থেকে বাঃবের বর্ষ বাঃবের

সমাজ মাহুকের তৈরী আইন কাছন মানতে হবে না, এর চেয়ে বন্ধা আর কি আছে।”

রাত এগিরে চলেছে। নৌকা আর রাতে পাঠা বিরে ছুটেছে অনন্ত পানে। সাক্ষী রয়েছে অনেক ঊঁচুতে আকাশের নক্ষত্ররা। বক্ষবন্ধের সত্তা অনেকখণ তেজে গেছে। যে বার ওরে পড়েছে ঝটটল ঘেয়ে। আঘাত দুজনে বেগে আছি। কেন যে বেগে আছি, তাও ঠিক বুঝতে পারছি না।

আলোটা কমিরে মাথার কাছে বসিরে রেখেছেন তৈরবী, মাথা কিছু তাঁর বখানানে নেই। মানে, ঘাড়ের ওপর মাথা নেই এ কথা বলছি না। মাথাটি বালিশ-রূপী কাপড়ের পোটলাটির ওপর পড়ে নেই। সোকা হোরে বেগে আছেন তিনি পমরো বিল মিনিট অল্পর কইকই করে সুগুরি কাটছেন আর ঘুমে কেপছেন। অনেকখণ ঢোপ বুকে পড়ে রইল। আশা করতে লাগলাম, এইবার—পান বুধে দিয়েই তৈরবী শুয়ে পড়বেন। কোথায় কি। বারিক লবে আবার কটাকাটা-কট, আওয়াজ উঠল।

বিরক্ত হোরে উঠে বললাম। বতবুও সন্তব দশা খাটো করে কণে উঠলেন—“বলি, বাঘবে এবার। দ্য-ভুলো সুপুরি নিঃশব্দ না হওয়া পর্যন্ত কি আক রেবাই হবে না।”

তৈরবী বললেন—“এই পোড়ার-মুখো নৌকোখানা থেকে আমরা নামব কখন বলতে পারেন? কি স্বকমারি করে মরেছি নৌকোর চেপে, সন্মানেসে অহুহুহুতা কি আর কুরোবে না।”

হকচকিরে পেলাম। নৌকোর বেশের মাহু, বহলাল নৌকা চড়ে দূরতে পারেন নি বলে ভর মনে আবেশের অস্ত ছিল না। কবাতী থেকে কোটেবর—হুঁদিন হুঁদাত নৌকার কটাতে পারবেন অলি আচ্ছায়ে আটখানা হোরে পড়েছিলেন। নিবিঘ্নে কাটলও তিনটে দিন নৌকার, শুক কলা জুবে মরার ভয়, কিছুই গুকে কাবু করতে পারল না। হঠাৎ আবার হোল ছি।

বেগালুম থোকা বনে পেলাম। ঢোপ কপালে জুপে জিজ্ঞাসা করলাম—“হোল কি আবার। বেশ শু আছে নৌকার। ভাঙা বর খোয়াংদার আলো, যে কদিন ধার সে করিন ভাল। নৌকা থেকে নামলেই কানে ঝোলা চড়বে। ঝোলায় পাল কাঁধ থেকে নেমেছে কটা বিন। এত সুখ সহিতে পারছ না বুঝি।”

বল কিছুক্ষণ চুপ করে নেবে একটা মিঃখাস কেলে তৈরবী জ্বাষ ফিলেন—“আজ্ঞে দি এমন সুখের মুখে।

না বাপু, সুখে আমার কাক নেই। লক্ষ লক্ষ কোলা কাঁধে খুঁবে মরব মাহুত ভনের সংসারে। সংসার ছাড়ি হুটী ছাড়া সুখে আমার কাক নেই।”

বলবার আর কিছু বইল না। বহু খুঁবে মরার ফেলে বেথলান, লুহুরের অধিম বখা লম্বুগনিত হোরেছে বেন। মরখাপর পাচুর একই আশোং আতা লুহুরের মুখে ছুটে উঠেছে। ওটুহু নিতে গেলেই হাঃখা হুকে থাকে। চেনা জানা নিগুতি রাত কই! গুম ঘেবে বসে হইলাম কোনও একটা মিঃখাসে পাখির নুক কাপানো ডাক শোনার আশায়। পোকা মাকড়ের ডাক শুনতে অভ্যস্ত কান হা হা করতে লাগল। কি হোল! সব কিছু বড় হোতে গেল নাকি! খেঁচ বে আছি তার কোনও প্রমাণ পাছি না ত! হুটী ছাড়া অখানা অচেনা ছকতার গড়ে তলিরে ঘেতে লাগলাম।

তত্না ছুটে গেল আবার। তৈরবী আগন মনে বিভ্রিভি করে বকছেন। কি বলছেন, ঠিক বুঝতে পারলাম না। খুব গোরে নিশের মাথার একটা কাঁকুরি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কি বলছ। মাথা খাংপ হোরে গেল নাকি! নিশের মনে বকে মরছ কেন।”

এতটুকু উজ্জ্বলিত না হোয়ে আড়ো আড়ো ছাড়ো ছাড়ো তাগে লবায় ফিলেন তৈরবী—এ ওদের কথা বলছি এ যে বুড়ো বুড়ো চলছে আমায়ের সঙ্গে, ওদের উদ্দেশ্য কি জানেন? ওরা ওদের একমাত্র ছেলেকে গুঁবে বেকাচ্ছে। কতদিন ধরে বুঁগছে জানেন। যোল বছর, যোল বছর ধরে ওরা হুঁগছে বুরছে। যোল বছর আগে ওদের ছেলে ছুঁি গেছে। ওদের গারখা, ইরানীরা তাকে ছুঁি করেছে। ইরানীদের আজ্ঞা আক্ষার বুরছে ওরা। এই বীপটা, ওটাতেও ওরা তিন চার বার এসেছে বেকাচ্ছে। কোথায় যায়নি ছেলের বোকে। সেই চুঁগ্রামের ওগারত গেছে। আবা বে, গেলে বুঁগতে বুঁগতে ওরা বুঁকো হোয়ে গেল! তা গেল। অস্তমন্ড হোরে পড়লাম আবখ। পার্শী বুঁকো বুঁকায় ছেলে হাঃখোয়ার থোকে নয়, অস্তমন্ড হোরে পড়লাম আর একটা কড়া চিন্তা করে। ওরা বুঁকো হুঁগছে, বুঁগতে বুঁগতে, আনুতা কি বুঁকে কিয়ছি! কি যে বুঁগছি, তা আমরা নিজেগাত জানি না। হাঃখানো ছেলেকে বুঁকে গেলে ওদের বোরোঘুরির শেখ হবে। আমায়ের যে কিছুতেই এই বাউগুলেশনার শেখ হবে না, খুঁবে আমরা মরবই চিরকাল, কাতব আমাঃফের কিছু বুঁকে মরবার পরকইহুও নেই। হাঃ-বে-হাঃ, আমায়ের চেয়ে বিভ্রি ইগাণী আর কোথায় কে আছে!

[ক্রমশঃ]

হ্মন : মিঃ ম্যাককিন্সলের
যাকিতে একটা ঘোড়া
চারের অঙ্গর। সময়
সম্মেলন। নিমন্ত্রিত
তু মিঃ বিটল। একটা
কোটো অ্যালবাম নিয়ে
বিল বিটল নাড়াচাড়া
করছে।

ম্যাক : এই যে আমার কাকার কোটো। দুটিটার
আগে তাঁর চেহারাটা এইরকমই ছিল। আর
এটা হলেন গুরুজন সব.... আজ্ঞা আমার দেখতে
অনেকটা বাবার মতো না?

বিটল : বঃ ঠিক উঠে। যাবের সঙ্গেই আপনার
চেহারা মিল বেশি।

ম্যাক : আচ্ছা যদি তাই সত্যি হতো। জানেন বাবার
দুটো হয়েছে খুব শোচনীয়ভাবে। আমায়ঃভাবের
বোনা বর্ণের সময়। আমি তখন সেনাবাহিনীতে।
...এই যে সামরিক পোষাকে তোলা আমার ছবি
—আমরা চলছি রোমেলের সঙ্গে লড়ায়ে আফ্রিকায়।
আজ্ঞা সামরিক পোষাকে আমার কেমন দেখাচ্ছে,
ঠিক বলুন তো?

বিটল : (একটু ইতস্তত করে) দুটো আপনার বাতে
ঠিক নয় না যেনই আমার ধারণা, মিঃ ম্যাককিন্সলে।

[বিল বিটল বীরে বীরে পাতা গুলিতে লাগল।
ছবির পর ছবি নানা লোকের ধী, পুরুষ, কিন্তু
প্রায় সবগুলোই—খুব পুরানো নয়। মোটামুটি
মুন্ডের সময় থেকে এর ছবিগুলো তোলা
’তক হয়েছে।] বিল বিটলের দুটো শোভন আবুলগলো
কেমন ষোবলভাবে অ্যালবামের পাতার উপর পড়ে
আছে। তাই দেখতে দেখতে ম্যাকের চোখেও
একটা কোমল স্নেহের ছায়া জেলে ওঠে। তার
মনে হয়.....মনে হয় এই আবুলগলো একটা
সুন্দর আঙঠে থাকলে বেশ হতো। কিন্তু পরক্ষণেই
ছবিটা কিংক হয়ে যায় মনের চোখেও। ম্যাক
আবার বলতে শুরু করে:]

আমরা বাঁচাবো [শোভিত চিত্রনাট্য]

লিওলিড লিওলিড

অনুবাদ : বাসব সরকার

ম্যাক : এই যে ছবিটা
দেখছেন, আমি তখন
হাসপাতালে ভরষাবাহারের
কি রকম একটা বিসফ্রিয়া
হয়েছিল। এটা হলো
ট্যাংকারদীতে ভাঙাবরের
ছবি, চারদিকে আগুন

ধরে গেছে। আর খোঁষার হুতলীগুলো মনকে
মনকে আকালে উঠছে, তেলে বাজে, উড়ন্ত হাঁসের
বলেন মতো। এরা.....এরা হলো আমার সখীরা
...আজ্ঞা এই হলো আমিই একটু শান্ত পতীর
ধরনের নয়?

[বিল বিটলের সখ আবুলগলো ছবির পর ছবি উঠে
যায়। কতো কাহিনী, কতো প্রাণ মুন্ডের মতো
হারাণো অতীত থেকে জোখের সামনে তেলে ওঠে,
আবার হারিয়ে যায়। ... একটা বোমার আঘাতে
উঠে পাওয়া লতী আগুন ধরে গেছে, একজন শাহী
চুটি ধারার মধ্যেও বাঁধা বাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে, ওটা
কি? একমল লোক বন্ধুকে তাকু করছে.....সামনে
তারের চোখ বাঁধা একটা লোক হাঁড়িয়ে.....
কাহারিং কোয়ার্ড.....গুপ্তচর.....কোর্ট মার্শাল
হচ্ছে... ..হবেও যা।]

বিটল : জীহনে আপনার অভিজ্ঞতা অনেক মিঃ
ম্যাককিন্সলে।

ম্যাক : তা ঠিক। কিন্তু অভিজ্ঞতা আমার বুদ্ধিরে
জুগেছে। প্রত্যহের আলো আর আগের মতো
সখী, প্রাণবান ম্যাককিন্সলের মূদ ভাঙার না।

বিটল : আমারও সময় সময় ঠিক তইরকমই লাগে,
আবহাওয়া পাঠে পেল। আচ্ছা খুব পরম, তাই
না? আজ্ঞা জীহনে আপনার মূন্ডের স্মৃতিও তো
কিছু আছে?

ম্যাক : সুখ-স্মৃতি?

বিটল : হ্যাঁ কোন বতীন মুন্ডে? কোন আকর্ষণ?
লোকে তো বলে আপনি বহুবল্লভ। আপনি
তো আপনার সেই রকমই নাথ। এ করে কি

তাদের স্বতির রেশটুকু যিবে নেই ?

ম্যাক : কেন নয় ? শুধি তো! হাতের মংগল থাকারই কথা।

বিটল : সত্যি, তাঁরা সংখ্যার কতো ?

ম্যাক : স্বতির দু'একটা মণিগোষ্ঠী তাই তো মূল, তাতেও যিগে ?

[কথাগুলো শোনে যায়। কণিকের বিরতি। একদ্বারা চেয়ারর মিস বিটল তখনও পাতা উন্টে যায় আলবামের। সেহে তাও খ্রী পড়ত রোলের মতো বাই বাই করেও হুড়ে যায় নি। বন বহর আগে নিশ্চয়ই সে বহরমতা ছিল, ছিল অনেক বন ভাঙা বুক ভাঙা একাক নাটকের নাটক।

আমি ম্যাককিন্সলের ব্যক্তিগত চেয়ারর বিবাদের একটা আলম্বা ছাপ আছে। শিখর পাখীদের মতো অনেকটা। কথাত সে হেসে কথা বলে। বাড়ি একটা আখাত পাওয়ার হুগল মাথাটা ঝুং সামনে কুঁকে পড়ে। কিছু শারীরিক ত্রুটি তার চেয়ারকে বেমানান করে নি মোটে। বহর এতে মুটে গটে একটা আগ্রহের ভাব যেন সবসময় লম্ব কথা শুনে সে সব সময়ে রাঙা।]

বিটল : যবের ভিতরে একটু গরম লাগছে না ?

ম্যাক : আচ্ছা আমি ঠাণ্ডা কিছু পানীয় নিয়ে আগছি।

[ম্যাক উঠে যায় পাশের ঘরে। সেখানে অনেক আলো, পানের রেশ সেখানেই উঠছে। বিটল উঠে দাঁড়ায়। বহর/মহো একটু পাখচারি করে। চাতিমিকে এই বহর, একলা লোকটার অবিস্মিত জীবনের অলংকার ছাপ স্পষ্ট। ম্যাটেলপীলের উপর এক ... দুই ... শর হুটা কটো সাঝানো আছে। হুটাই মেরয়ের ছবি, নানা বরনের। ছবির বহরগুলো যেন ধীরে ধীরে একটু একটু করে বেড়ে গেছে। সব ছবিগুলোই একই বকম স্ক্রেনে আঁটা। ... প্রত্যেকটার একটা করে হুগ বোঝা আছে। কিন্তু কি আশ্চর্য ছবিগুলো সব উন্টানো—যা যা বীচে করা। আচ্ছা শেষ ছবিটা কার! আমার মতো! আরে কি আশ্চর্য, আমায়ই ছবি এটা। পাশেই রয়েছে একটা ছোট কোঁটো। কি আছে

তার মধ্যে! আংটি.....ওয়েডিং রিং.....বিয়ের আংটি। তাহলে এই সেই আংটি যা একে একে তার আশের পাচকন পেরেও যায় নি। হঠাৎকি! মিস বিটলের চোখ পড়ে আমনার গারে লেগে থাকা চেয়ারটার দিকে। ট্রোলের উপরে একটা হুদু হাসির ডেই খেলো যায় তার। মম্ব, হ্যাঁ মম্ব বহরতো তার এখনও বাকী আছে। সে লবে আসতে চায় আমলায় থাকে। প্রায় পৌঁছে দিরেছে এমন মম্ব কিছুটা সন্তুষ্টভাবে ঘরে ঢোকে একজন বহর বহিলা। মি: ম্যাককিন্সলে বাড়িওয়ালী। আমার আগে একবার লেগে মের চাতিমিকে তার আড়তে ম্যাককিন্সলে গারে কাঃ কোথাও আছে কি না।]

বাড়িওয়ালী : এই গরমর লোকটা নিশ্চয়ই তোমার কাছে এখনো কোন প্রস্তাব করে নি। নাকি বলেছে কিছু ?

বিটল : না মিসেস স্ক্রিন এখনো না। প্রস্তাব সে এখনো করে নি হুবের কথার। আশ্চর্য লাগছে আখাত, কিন্তু কেন ?

বাড়িওয়ালী : লোকটা বহর চোখ বহর হরে আমাবের লকে আছে। গর হাড় হুদু সব আমরা চিনি। আশ্চর্য এই চোখে আমর আমরাই তোমাদের হুগনের কতটুকু করেছি।

বিটল : আপনায় বহর আর শেষ নেই, মিসেস স্ক্রিন।

বাড়িওয়ালী : হতাল মম্বো না! তার কোন কাহণ নেই। আরে অবিস্মিত লোকটা হুগর তো বটে। অস্ত যে-কোন লোকের মতোই তাহেও বিয়ে করা যায়।

[মিস বিটলের চোখ পড়ে রাজিমাখা বাঙাটার উপর। আমরা দেখা যায় বাঙাটা জাদুলা বেক। হুবের আলোগুলো কেমন কাপা কাপা মনে হয়। সেই আলোর পার্কেট রেলিংগুলো অশ্লষ্ট দেখা হচ্ছে। মাঠের গুলানে কোন এক কোম্পানীর মম্ববড়ো এক কলমলে সাইন বোর্ড।

মি: ম্যাককিন্সলে ট্রিক এই লংগে কিরে আসে,

দু'ধাতে দুটো হাস নিচে। "এটা আ'নার বলে একটা এগিরে কেব' বিটুলের বিকে। তাৎপর্য হারা; চাকনে ধীরে ধীরে বলে হাসে চুপু'কিত্তে থাকে। লাং ধরে একটা শুদ্ধতা, বেন কিসের একটা মুক কীকৃতির আচান। হিন্ বিটুল ক'বা বলতে শুরু করে।

বিটুল : মি: ম্যাককিন্লে, এমন কিছু আছে কি...

আচ্ছা পৃথিবীতে আপনি সবচেয়ে কি ভালোবাসেন ?

ম্যাক : ইং, ছোট ছেলেরা যেহেতু !

বিটুল : ঠিক তাই। আপনারাও সব ছোটোরাই

আপনাকে হারান ভালোবাসে, প্রচা করে। আচ্ছা

আপনি কেন এতদূর এতে? পছন্দ করেন ?

ম্যাক : (পাশে কিছু দ্রুতত স্পষ্টভাবে) কারণ তারা চকল, এলোমেলোর হল, যেখানে বার সেখানেই শোরগোল বাধার। এতদূর না বলে আমাদের একত্রে নিশ্চিন্ত জীবনটাই সুবিধার হতো।

[মিস বিটুলের মুখে তখনই কোন কথা ভোগা না ধীরে ধীরে ম্যাকের গাভটিকে টেনে নেত নিষ্কর হাতের মধ্যে। খানিকটা বিস্তৃত তার, কিন্তু রক্তজ্ঞাত সেখানে উপলব্ধ পড়ছে। চুপ করে বলে থাকে তারা। হঠাৎ হাইরে চকিত একটা মুহুর্তে গঠে, সন্ধানী চোখ। হাতে গাত ধরা ম্যাককিন্লে আর মিস বিটুলকে ঘেঁষে অস্ত্র হয়ে যায়, তেমনই সকলের অসংখ্য। আনন্দ দিয়ে হাইরের কাপা কাপা নিগুন আলো এসে পড়তে থাকে এতদূর চোখে মুখে। একটা নাচের সুর তেলে আসে হাওয়ার।

ম্যাক : আশ্রয় না, একটু নাচি ?]

বিটুল : কেন না, নিশ্চয়ই। (তার নাচ শুরু করে।

কিন্তু ম্যাকের অঙ্গগতির দরে তাদের নৃত্যরূপ বাবা পেতে থাকে গলে গলে।) একটা কথা জিজ্ঞেস করবো? আপনি বিয়ে করেন নি কেন?

ম্যাক : আমি! একটা নিঃসঙ্গ বেকরের হতো আমার জীবনটা। তা ছাড়া আরো কিছু বলার আছে আমার। আপনাকে সে-জগো বলতে চাই, বলবো? মুহুর্ত সময় একবার একটা ভয়ানক অনুভব পড়ল একবার, হাতের ঠোঁটের মধ্যে এক

কোমর ভলে সাটা হাত হাঁড়িরে থেকেছি আমরা— আমার হাতটা, আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন একটু থাকা।

বিটুল : কিন্তু আপনার বরষে, এটা তো কোন পুঁতই নয়। বরষে বলবো, যে-কোন বিচ্ছিন্ন হীর কাছে এটাতো একটা সম্ভব। (একটু থেমে, পতীর আন্তরিকতার সুরে বলে) এতদিনে আপনারা নিশ্চয়ই অনেক ছেলেমেয়ে থাকতো। অবিশ্রাস্ত সে সময় এখনও যায় নি। কিন্তু কেন বিয়ে করলেন না আপনি?

ম্যাক : ভয়!

বিটুল : ভয়! কিসের ভয়। স্বাধীনতা হারানোর ?

ম্যাক : না তা নয়! বুঝে আমি অনেক হতাশা ছেলেমেয়ে দেখেছি। আমের মুহুর্ত ক্ষয়ক্ষতির ভয়াবহ তালিকার সেই নামহারা অজ্ঞানার হল হারিয়ে গেছে। কোন রিপোর্টে, কোন সরকারী কাগজে, বলিলে তাদের কোন নাম মাত্র নেই। কিন্তু আমার চোখে, আমার ঘনে তাদের কবাই তেলে ওঠে লবার আগে। আচ্ছা বেন দেখতে পাই—তারার দু'ধারে চকানো আছে তাদের গুড-বিকৃত সহগুণো—নিশাপ, নির্বাক মুখ—পৃথিবীর। হাহুয়ের, কঠি, কাঁচা, বিচারকের হল শুদ্ধ দৃশ্যতার। আমি আর তাই ভাবতে 'পারি না, আমারও ছেলে-মেয়ে হবে! ওই সব মুহুর্তে পানস পাখাকে নিভল করে দেয়। এইতো আজই বেলশাম কোবার আবার হাইডোজেন বোমা কাটানো হয়েছে, পরীক্ষা-মূলক নাকি এসব। কিন্তু এমনই পরীক্ষা, আর, এমনই তার সময়, যখন হাহু সব ভাবতে শুরু করছিল, বোম্বার মুহুর্তে এবার আদমতা সত্যিই পিছিয়ে দিলাম।

বিটুল : (অভিভূতভাবে) তুমি, তুমি এতো ভালো! কিন্তু মুহুর্ত, সে তো অতীতের কথা, হুঃখর! তা আর কিরে আসতে পারে না। সে তো নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই ঘেরছে! এই ধরন, অমায়ই এক প্রতিবেশিত কথা। তার জীবনটাও এখন ছত্রছাড়া হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে তো ভয়ই নিয়েছে। সেদিন

তার মুখে শুন্লাম পরম লড়াই। এখন লড়াইয়ের মর্যাদা
যেহে উঠে এসেছে নেতাদের কবার তোড়ে।
এটা মিডরই একটা ভালো লক্ষণ, তুমি খীকার
করবে? না, না, হুঁ কিহিয়ে নিও না। একটু
ডেরে থাকো আমার বিকে, আমার মুখের উপর ঠিক
চোখের সামনে। [মিল বিটুলের আবেগতপ্ত স্বরেঃ
ম্যাক : যোগ্য উদ্ধৃত হিতে পারে না। যেম
থায়। সূর্যের বোলারিত তার মন।]

ম্যাক : (একটা গুঁড়ু দীর্ঘশ্বাস নেমে আসে) আচ্ছা,
আসছে লনিয়ার এখানেই কি আমরা আবার
মিলতে পারি না? ততোদিনে আপনাকে কিছু
বলায় দ্ব্যতো কথা আমার মনে যেতে পারে। কে

জানে হয়তো আপনি ততো পুঁদি তবেন :
বিটুল : এই কবাই এর আগেও যেম কোবার
গনেছি তাই না?

ম্যাক : সেদিন সারা পথরটাতেই নামা পড়গোল
ছিল। সারা সকাল ধরে দেখিন কতো কি যে
ঘটে গেল।

বিটুল : সারা সকাল ধরে? কিন্তু আমাধের বেখা
হওয়ার কথা পড়গোলায় ছিল না, মিঃ ম্যাককিনলে?
একটা অস্বস্তিকর নীরবতা। নেমে আসে তামের হুজনের
মাকখানে, সারা ধরে। মিল বিটুল একটু গেমে
আবার বলে, "প্রিয় বন্ধু, তোমার অবিভি ঠাট্টা করার
সময় এখনো কিছু আছে। তুমি পার, তুমি তা পার।"

[ক্রন্দন]



। সত্য ।

খাবি না?

না।

খেরে এসছিলাম?

হ্যাঁ।

মিশানাথ অকারণে মিথ্যা বলল। অবশ্য এক মুহূর্ত্ত আগেও অমনমনাবে তাকে ভাবি থাকে না।
হা যদি বলতেম, 'গেতে চল'—
তাহলে হয়তো আমি, হা নেতি-
বাচক উত্তরের সুযোগ দিয়ে প্রশ্ন
করলেম বলেই কি আমাকে বাধ্য
হয়ে আসলে, আশ্চর্য ঘেঁষেছে;
গোধর কত, কতদিন বাদে আশ
মার সঙ্গে কথা বলছি। মার
সঙ্গে দেখে কথা তবে কি প্রসঙ্গে হয়েছিল মনেই
পড়ছে না।

কোথায় খেলি?

হা হাসলেন। হা অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করছেন।
একটা না এইসব প্রশ্ন করতেম, আমি বৃথাতম কৈকিরং
গাইছেন। মার সঙ্গেই আমার বিরক্তি, এমন কি শূণ্য
হত। আজ কতকাল প্রশ্ন করেন না। করতে সাহস
পান না। যে দিন থেকে সত্যিই কৈকিরং বেওয়ারি
প্রয়োজন ছিল, ভ্রমোণ ছিল—সে দিন থেকেই হা নীরব।
আসলে হা কি সব বোঝেন? থাকে ভাবি ভয়? থাকে
বনে কবি' ভগ্নসীত—বাস্তবিক সেজন্য কি মার সৌভাগ্য,
হ্যাঁ, হতাশা? মিশানাথ অজান্তে দুচক হাসল।

হা বললেন, কিরে?

হা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস কেললেন। প্রব্রুত উত্তর দিলাম
হা বলে কি? হা কি অপমানিত বোধ করছেন? হা
জুনি কি জুনি কি হা বাস্তবিক বলতো হা তোমারও কি
হপমান বোধ; তাহলে আমায়ের মতো সন্তি, আমার
তো এইম একট রঙ্গ প্রদর্শ করে, হা বলতো এত বড়
একটা মিথ্যা ক'াকি ব্যর্থ জীবন কাটিয়ে আসতে যে
ক'াপ বছর বয়েম ক'ালে সিঁদুর, হাতে শ'াপা, অন্ধ



মিশানাথ
নামে বর্ণিত

গজন ঠাকুরের সিঁড়ি

হা হা নিয়ে একটু আগে যেতে যসে পুত্র এবং
পুত্রবধূ সঙ্গে গল্প করছিলে, এখন এনেছ তোমার প্রবাসী
পুত্রটিকে কিছু একটা বলতে—না, বলতো জুনি কি—

ছোট্টু আর কৌমা কাল আসছে।

ও।

কাল তোম কাছ আছে নাকি?

মিশানাথ হেসে কেললে। হা জুরোবা দৃষ্টিতে তাঁর
ছেলেটিকে হাসতে হেখছেন। হা জুনি যে কি পৌরাণিক
ভাষায় কথা বলো—আমি বুঝতে পারি না। মিশানাথ
অনেক ভেবেও কিছুতেই মনে করতে পারল না কি কাছ
তার থাকতে পারে। তবু, বলল, হ্যাঁ।

কাল যে বাড়িতে মানে তার কি বুঝ অজরী—

হ্যাঁ।

কখন বেরোবি?

বেশি।

হা আবার দীর্ঘশ্বাস কেললেন। কিন্তু জুনি বুঝাই কষ্ট
পাচ্ছ। উপযুক্ত মনোযোগ তিরে তোমার প্রশ্ন শোনা
এবং যোগ্য বর্ণনা তার দ্বারা উত্তর দেওয়া আমার
পক্ষে সম্ভব নহ। আমি ভাল করছি না। হা জুনি
যদি বলতে কাল বাড়িতে এই ব্যাপার, তোকে থাকতে

হবে—তারলেগ আমি বলতাম দেখি মা তুমি বোঝ না কেন—আমি তোমার অপরিচিত তোমাকে আমার লজ্জা করে। তুমি এই এসেছ—তোমার চোখ দুটো বেগে আমার লজ্জা। মা তুমি আবেশ করতে পার না—কিন্তু তোমার ভীক বিবর কর্ত, তোমার ভীক বিবর চোখ, তোমার অবস্থি আমার ক্রন্দনপত অভিযোগ করে। মা তুমি বাও—বহি বৃত্তে তোমার সম্পর্কে আমার অভিযোগ কত ভীত; বহি বৃত্তে মা বহি—

গোম।

কি?

কাল বড় বোমার সাধ।

কি সাধ।

মা হেসে কেলেন।

আর মার হাদিতে নিশানাথ যেম এক বিলালিগির পাঠ আবিভার করল। বনই বিবিত্ত হল, বিবিত্ত হল। বলল, ও।

সেইকন্তেই তো বাড়িতে কাল,

ছোট্টুবাও—

ও।

তুমি কি ভাবিস এত?

নিশানাথ চোখ জুলে ডাকাল।

‘মায়ের ঘেব করে বললেন, সব সময় অন্তরমন—কোনো কথা ভালো করে শুনিস না, উত্তরও দিস না! কি ভাবিস রে?’

মা আমি জানি, তোমার প্রেই সব সময় উত্তর থাকে। এই মাঝরাতে আমি, তুমিও জুলে আমাকে অভিযোগ করতে। নিশানাথ বিরক্ত আর অসহায় দৃষ্টিতে তার গুনীর দিকে তাকিয়ে রইল।

ঠাকুরপো, বাবে না?

নিশানাথ গুরছিল, চকিতে উঠে বলল।

চৌকাঠের ওপাশে ঝাঁড়িয়ে বর্ষ এক হাতে মাথার ঘোমটা জুলে অস্ত্র হাতে বহুবার পাঞ্জার করই টেকিয়ে বলল, কোনো তোমার দাধা বলছিলেন কালকের মাঝরাটা বহি তুমি কর। মানে কেট তো তোমাই, আর কাল আবার—এরকি কাল জোর হাতে গুকে বেহোতে হবে সেখানারুকেও তো—

নিশানাথ ছুঁতোয়া বিস্ময়ে শব্দের শব্দের দিকে তাকিয়ে রইল। ‘বোঝো কান্ত। কালকের মাঝরা চাকরে কবো মান থাকে না। আর এ বাড়ির দেহ দেলের ওপর কারো বিশ্বাস নেই। তোমার বোঁঠান নিশানাথ, তোমা এককালীন বনিষ্ট বাছনী। সে বলছে কাল বাধা করতে হবে। কারণ উনি তোমার হাতে বেহোতেন কারণ কাল আমার সাধ। তোমার দাধা, মানে উনি বুঝলে ঠাকুরপো—আমাকে আর একটি লজ্জান দিচ্ছেন অন্তঃকরণে। বুঝলে ঠাকুরপো, কাল বাড়িতে উৎসব হবে তাই তুমি বাধা করে দেয়ো।

নিশানাথের অজীব, অজীব হৃদয় হল। আর এক অজীব স্বপ্নের কতার ইচ্ছার তার মাথা নংল। বোঁঠান পান চিরুয়ে। চিরুকে ভোল। বোঁঠান অজ নিম্নে গেলিল। যেতে বলে মামী আর বাস্তবতার দিকে গর হাছিল। অঝো! জীবন! নিশানাথ, তুমি ভাবন ভাবনার ভাবনার কোন বর্ষে—কোন নরকে পৌঁছো চাও। এই বেগ—সম্পূর্ণ একটি রমণী। শিকি-মুহুরা, গৃহকর্মে নিপুণ, লক্ষ্যবাহা—তোমার সাদ ঝাঁড়িয়ে আছে, কত সুখী, কত নিশিত। আর নিশান—তুমি বুঝ তাবৎ সত্যতার বোঝা থাকে বা নিশানাথ—হার হার হার, নিশানাথ—

কি অমনি দুখ পড়ীর হয়ে গেল? একদিন না একই কাল করলেই বাবা।

সাবধান নিশানাথ, এও একজন শাকী।

তোমার বিকতে তর্জনী উঁচিয়ে অভিযোগ করেছে। কিছু কর না। তুমি উত্তর। নিশানাথ, এই প্রতিবার প্রতি কোনো কর্তব্যই তুমি পালন কর নি। তোমার বাবা, তোমার মা, তোমার দাধা—বৌদি, তোমার বোনেরা—ওহ, কাল ছোট্টু আর-মাধনা আসে নিশানাথ, তোমার ছোট্টো আই তোমাকে দখা করে তুমি বোঝ না? তোমার আইয়ের বোঁ তোমাকে ক করে—তুমি বোঝা না? আর অন্ত তাই বোনেরেব। তোমার তো বাস্তবিক কোনো সম্পর্কই নেই। নিশানাথ, প্রতিবারের দাবি ছিল—বোঁঠান সেই ক মনে কঠিয়ে ছিলেন। সমাজের দাবি ছিল—ছোট্টো সেই কবাই কাল বলবে। নিশানাথ তুমি উত্তর, ও

তোমাকে ঘিরে চতুর্দিকে শুধু অন্ধিমোহ।

তাই! পূর্ণ বিচিত্র হোসে বলল।

নিশানাথ যেন খুম তেজে জেগে উঠে বলল, এঁা!

সেক্ষবাবু।

ও।

বানান্দার আবার বাস্তবের আলো পড়েছে।

নিশানাথ আর বিধানাথের ভাত ঢাকা থাকে। বাড়িতে এই দুজনের ক্ষেত্রের ঠিক নেই। নিশানাথ অনেক দিন না ঘরেই গুপ্ত পড়ে। মাঝে মাঝে দুজনে একতলেও যেতে বসে। ঢাকনা জুড়ে খালার চারপাশে বাটি গুলিয়ে বাধ। নীচের খাদ। কতদিন নিশানাথ শুভ হাতিতে নিঃশব্দে খেতে খেতে হঠাৎ দুজনের ভাত টিপোনোর শব্দ চমকে উঠেছে। আর মনে পড়েছে—স একা নয়। পাশে বসে থাকে তারই সহোদর ভাই। আর এইকথা ভেবে সে ব্যর্থের নাই বিশ্ববোধ করেছে।
শোনো!

নিশানাথ অবাক হয়ে তাকাল। কি চান এই ভক্ত-হিলা, তার বোঁঠান। এতদূরান্তে তার ঘরে এসে কি সব লুপ-লুপেই কথা বলছেন, কত সহজ ভ্রুতে কি নিবিড় নিমিষ্টতা? যেন প্রত্যহ বাড়ি ফিরে নিশানাথ বাওরার মাগে বা পরে এমন ভাবেই তার বাড়ির লোকজনের সঙ্গে বানিক গল্প করে। কিংবা বেন প্রবাস থেকে ফিরেছে।

কটু আশ্রয় গীতছিল।

কেন? নিশানাথ ভীত চোখে তাকাল।

জুনি নাকি কি হেবে বলেছিলেন, তাই জেলে হাসে থাকবে। আমি জোর করে খুন পাড়িয়েছি। কাল কিংবা সন্ধ্যাবে—

বোঁঠান। "জুনি হাসছে। চোখ হাসছে। জুনি জানে আমি, আমি নি। জুনি জানতে আমি জানব না। তাই নটুক খোর করে খুন পাড়িতে তোমার দাখে নি। সুবরী, সুবর, জানত আমি বাব না। তাই, যাতে আজ বাড়ি ফিরে চিঠি পাই তার ভক্ত হিলেব করে আপনাই চিঠি পোঠ করেছেন। কিন্তু তোমার হঠে কোনো অভিযোগ নেই। এমন কি কোলুকও না। কি সরলভাবে বোঁঠান, জুনি, ঘটনাটা বিবৃত

করলে, সস্তা বোঁঠান, ছোট বড় সমস্ত ব্যাপারে তোমার এই জুজু পূর্ত্যামে বেধেতে বেধেতে আমি জ্ঞাত। জুনি একটা মাহুদী মেহেচামুহু। বোঁঠান, জুনি যদি এখন বাও আমি বাস্তবিক বলছি, অত্যন্ত খুশী হব। আর এই যে জুনি, ভক্তবিলা, আমায় গর্বগামিনী মাতঃ পাত্রে-নীতিকথার-দিল্লী সাহিত্যে তোমারই জয়জয়কার; এবং সেই জুনি, মা, কেনন সবলীলার এখানে বসে আর পাশের ঘরে তোমার পুত্র একাকী—চাকনা জুলে ভাত খাচ্ছে। জুনি জান তোমার এই পুত্রটি বেতে ভালবাসে, তার আত্মচর্চার ব্যাপার আছে—ব্যক্তব্যয়ের পরিমাণে জুল বলে, হাজার গুণে ভাল হল, প্রোটিন আর ভিটামিন ডি কব পড়লে সে ব্যর্থপরনাই বিচলিত হয়। তবু জুনি তার ভাত সাচ্চিবে ফিরেই সম্বল। কারণ ও হোক দেয়ি করে কেবে, ও ভক্তা, ও বংশের মূলে কালী ফিরেছে—ওর সম্পর্কে তোমাদের আবেগ কব কিন্তু আমি জানি যদি নিঃশব্দে ঢাকা এনে দিত, সমস্ত বেধনা ও অপমানবোধ সহ্য করত জুনি এবং তোমার সার্বিকী সমান বধুনাভ্য বত রাতই হোক—ওর বাওরার পাশটিতে গিরে বসতে। আর মা, জুনি জান না, তোমরা জান না—তোমাদের অতঃস, তোমাদের অল্পভব—ঐক নীতিশাস্ত্র যেনে চলে না। ঐক নীতিশাস্ত্র যেনে গড়ে ওঠেনি। বাস্তবিক, এ বড়ই পূর্বনো কথা যে মাহুদের সঙ্গে মাহুদের বাবতীর সম্পর্কবোধের ভিত্তিই হল উৎপাদন বাবদ্য।

বহুগণ, বহুগণ, আগনাহা বিলকণ অবগত আছেন, মানবসভ্যতার ইতিহাসে রেনেশ্যাস একট ঘটনা। মধ্যযুগের জুনিবাবদ্য, উৎপাদন ব্যবস্থা আবুল মাদ্য। আর পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র—তাবৎ সংগঠনের চেহারা গেল বললে। চার্চ এবং ধর্মীয় কুসংস্কারের অমাহুদিক বন্ধন দশা থেকে মুক্তি গেল ব্যক্তিকের বোধ। আর বিজ্ঞ, সাহিত্য, বিজ্ঞান, কালবিজ্ঞা, দর্শন নমন-ভব, ইতিহাস চর্চা ও অর্থনীতিশাস্ত্র—যা কিছু বলুন, মানব সভ্যতা ও বহন্যর বাবতীর স্রেষ্ঠ উপাচার সেই থেকে হুজ হল। মাহুদ তার বহান অতীত ভলে গেলিল। যেলেনীর সংজ্ঞিতর পুনরাবিজ্ঞারের

মাধ্যমে পৃথিবী একটিকে তার অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্ক
আবিষ্কার করল অস্ত্রবিক্রেতার জগৎ-জয়ের চরিত্রের
বিকে তার নৌকা ভাঙল। এই দুটাই আবিষ্কার
আর অস্ত্রবিক্রেতার দুট। দুটি আর পৃষ্ঠের দুট।
বস্তুত, রেনেসাঁস সেই দ্বীপে যে প্রাচীন পৃথিবীর
পর্দা থেকে নবীন জগৎকে কুন্ঠিত করল।

কিন্তু, কোন সে জগৎ? এ বড়ই জানা কথা
আর পূর্বেও বলেছি—সে জগতে হল ব্যক্তিবোধের
উদ্বেগ ক্রীতবোধ নাকি স্বাভাবিকতার গভীরতা ছিল অসামান্য।
কিন্তু তাকে আমি গ্রীক ব্যক্তিবোধ বলব না। মানুষ
যে যেন আর নিরতিব্রত ক্রীতবোধ নয়, প্রকৃতি চার্চ আর
স্বাধীন ক্রীতবোধ নয়, কোনো ব্যবস্থা বা অবস্থাই
যে মানবকীর্তনে অপরিসরিত নয়—মাছুষ তা কুসল।
আর সেই থেকে শুরু হল তার অপরিসরিত উচ্চাকাংক্ষা।
আমি ভাব করব, বর্ণ-বর্ণ-বর্ণের আদি অসীমের হব
—সে ভাবল।

আর বহুগুণ, উচ্চাকাংক্ষা ও প্রতিযোগিতা ও সনাতন
রেনেসাঁস পৃথিবীকে ঘিরে গেল এই দুই জগৎ উল্লেখ
আমি যেনে করি এরাই হল সেই আদম ও ইভ—
রেনেসাঁসের কল থেকে দ্বারা মহাশূন্যের আদম অব্য-
ভাব আর তিরিত বর্ণ থেকে স্রষ্ট হয়ে নিজেদের
নয়তায় নিউতে উঠেছিল। আর আদম জন্মল।

বহুগুণ, আমি কবে কোথায় যেন বলেছি পৃথিবীতে
কোথাও ব্যক্তি ছিল না, ব্যক্তি নেই। অব্য
এখন বলেছি রেনেসাঁসের অবস্থানই হল জগতে ব্যক্তি-
বোধের আবির্ভাব। একি পরস্পর বিরোধী কথা?
না; মেটেই না।

প্রথমাবধি এই ব্যক্তিবোধ ছিল বিকৃত, বণ্ডিত।
স্বাধীন ও স্বাধীন সংসদ, তথা পৃথিবীর সঙ্গে ব্যক্তির
সম্পর্ক কোনদিনই ইতিহাস সম্বন্ধ, উদ্বার ও বর্ষা
হয় নি। তার কারণই এই উচ্চাকাংক্ষা, প্রতিযোগিতা।
কলত এই অসম বিকাশ থেকেই একটিকে হল
স্বাভাবিক জগৎ, অস্ত্রবিক্রেতার জগৎ। আর
এইভাবে নতুন এক প্রেরণার আবির্ভাব ঘটল। মানবো-
তিহাসের কি ট্রাজেডী। বহুগুণ—রেনেসাঁস প্রেত
সাহিত্যিক সেক্সপীয়ারের জগৎ, ইতিহাসের জগৎ, এই
দুই পৃথিবী। জগৎটা হৃদিত রেবেছি' কি লাভ?

ট্রাজেডী? এই বিকাশ আর বিনাশের ট্রাজেডী?
তাই কি মেকিগ্লেভের প্রিন্স একাধারে অস্ত্রবিক্রেতার
আর অসামান্য? তাই কি করানীবিদ্যে প্রোভাই
মেনোলিগন?

বহুগুণ, এই উচ্চাকাংক্ষা, এই প্রেরণিত সম্পর্কে আমার
প্রচুর বক্তব্য আছে। কিন্তু সে পরের কথা। জগৎ
বিদ্যাকে সাম্প্রতিক ইতিহাসের এক আলোকবর্ত্ত
হিসেবে বহুতে অপ্রতি করার কোনো কারণ দেখি
না। এই বিশ্ববের প্রথম ভূমিকাই ছিল বৃত্তান্তময়ী
নৃত্তি সাধন, তার এই প্রেরণের ভূমিকাকে মার্কস-
সাহেব অস্বীকার করেন নাকি জানি। কিন্তু তারপর?
স্বাধীনতা, সাদা, স্বৈরাচারের সেই পতাকাপতের ওপর
সেদিন বেবেছি কোচ্ মেনোলিগন—যার কিছু—মানবিক
ভূমিকা ছিল আর অস্বীকারই হল দ্বারা। অস্ব
শেখি হ গেল বিকাশ মাক। আর রেনেসাঁস পশ্চিম
ইয়োতোপে মানুষকে দিল নৃত্তি—এনিয়া এবং আফ্রিকার
গড়ল উপনিবেশ। ব্যক্তিত্ব—আমি যদি রেনেসাঁসের
ভিমাণ্ড এ্যান্ড সাদাইয়ের একটি কার্ড করি তাহলে
যেথা বাবে একটিকে হইল সঙ্গে তা, অস্ত্রবিক্রেতার
মেকিগ্লেভের প্রিন্স, মেনোলিগন, হিটলার? বহুগুণ,
আমরা বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে গেছি।

এই এক আশ্চর্য শতাব্দী! পৃথিবীর ইতিহাসে,
এখন আশ্চর্য সময় আর আসে নি।

এখন, এই এখন, গ্রীক এই দুই পৃথিবীর সমস্ত
সোলোথো' মানুষ প্রেরণারত। বহুগুণ, পৃথিবীর সমস্ত
আকাশে সন্ধানী চোখ পাছারা হিচ্—নৃত্তিপঙ্কে
হকেট কখন, কোথা থেকে এসে আঘাত করবে, কেউ
জানেন না। আর এখন, এই এখনই কাঁচের সরাসরে
বন্দী আইনগন হওয়ারমাম। আফ্রিকা পালল হয়ে
গেছে, প্রোটা ভাতের ইনসপ্লুয়া, হাইলক টেনসন।
ইয়োতোপে সমস্ত—বাংলাও রাসেল উর আলমারি
যেকাই সত্তা পোয়েন্ডা কাহিনী দেখিয়ে বলেছেন
আমি যখন পৃথিবীর আশ্চর্য ভবিষ্যতের কথা ভাবি
তখন আশ্চর্য, উচ্চাকাংক্ষা হয় বহু হয়ে আসে।
তাই নিজেদের কলিরে রাখার জন্য এই সব হালকা
আমরা হৃদিত রেবেছি' কি লাভ?

পশ্চিমে আর্মীতে চল্লিশ লাঠি পার ছোকা কাটিয়া পুনরায় দুই হুঁসিগে ঘুরে বেড়াইছে আর পুনরপি অর্ধাশ রক্তের শ্রেষ্ঠ বোঝা বহছে। আর জাপান আশ্রমী করে পুরুষ তার বীর্যে হিরোশিমার পুত্রি বহন করবে।

বহুপণ, ব্যস্তবকে এই নিরবচ্ছিন্ন উৎকর্ষা আর অনিন্দ্যতার সাননে এনে দাঁড় করিচ্ছে হেনেস'স। তাই ও বেগে পিটী-সাহিত্যকে অনেকই আঁজ মনে করেছেন যে—আজ্ঞা, তার আগে আমাদের দেশের কথাটা দেখে নি। সর্বেশ্বর, স্বষ্টির একটা বড় ভূষণ—যাকে বলা হয়। বিজ্ঞানমান শিবির—সে এসব তো টাইলই।

এমন সময় তার মনে হল কে কে যেন ঘুরে চাঁৎকার করে বেঁধে উঠেছে। নিশানাথ চমকে উঠে পীড়াল আর পরশবেই বুঝল সেই ভিগহিনাটা হোজকার মতোই 'মাপো, দৃষ্টি ত্যাত হবে' বলে ডাকতে ডাকতে আসছে। নিশানাথ এ পলা চেনে। এ ডাকের রনিতরক কোথায় বিলম্বিত হয়, কোথায় ব্রহ্ম এবং কিভাবে ঘুর থেকে কাছে এসে আবার ঘুরে চলে যায়—নিশানাথ তা জানে। অনেকদিনই এত ব্যস্তে তিনি পিত্ত-হহিলায় এই অকারণ ডাকের অর্থহীনতার কথা ভেবে মনে মনে সে বিম্বিত হয়েছেন। তাই পলায় তার রনিতরক একদিন সে প্রত্যাশাশীল আবেহন করছেন, যেন উল্লাসীরা অথচ অজ্ঞাত ডাক। আশ হঠাৎ নিশানাথ এই ছোট কথাটার নামে বুকে, তাৎপর্য ঘুরে পাথর হয়ে পেল। ভগ্নহহিলায় কিংবে পেয়েছে, ঘুর ছিঁধে পেয়েছে, কিন্তু ব্যত নেই।

কি যেন ভাবছিলাম? হেনেস'স, উজ্জ্বলজ্ঞা, প্রতিবেশিতা, ব্যস্তের মৌলিক পাল, পৃথিবীর বিনাশ—আহ, আহ! এই কলকাতা শহরে পঁচিশ হাজার লোক ছুটপাতে শোত, এই ঘেসে প্রতি মিনিটে বহুসার একজন মরে যায় (বহুপণ, মরে যায়,) এই ঘেসে শিকড়হুতার হার যেন বস্ত? আর আমাদের গড়পড়তা আর? সেনাসেনে রিপোর্ট? অগ্রহাণী আমি বোধহয় বুত।

নিশানাথ বহুদক করে উঠে পীড়াল।

কি রে, হাত ঘুর ঘুরি না?

নিশানাথ তাকিয়ে দেখল, না! অত্যন্ত বিম্বিত হল। না, ঘুমি—ও, মনে পড়েছে, কিন্তু বোটার—ও, চলে গেছে। ও, কাল তোমার সাথ বোটার, অতএব আমাকে বাঁধারে যেতে হবে। আর এই ভগ্নহহিলা হাজার প্রত্যন্ত প্রত্যাশাশীল উল্লাসীরা অথচ অজ্ঞাত কর্তে আর আমি যব বাড়ি কেন আর আবার ভিনপুতবে এসে, অথচ মহাকাগত তো কাছেরই রয়েছে।

শোন।

যা অত্যন্ত সজ্জিত, অত্যন্ত সুস্বীত ওষিতে বললেন, আমি একটা ঘুর ব্যাধন মনে দেখছি।

এটা?

হ্যাঁ রে। ফেশলান তোর এবার মায়ের কথা হয়েছে।

তোর মারা শরীরে-চোখে—যা বলতে বলতে শিউরে উঠলেন। আর ব্যস্তল ভাবে নিশানাথের হাতটা জড়িয়ে ধরে বললেন, কাল সকালে তোকে আমার সঙ্গে মন্দিরে যেতে হবে, না করতে পারবি না কিছু।

আর নিশানাথ তার সম্মুখে যেন এক প্রাচীন অপরিচিত শিল্পমূর্তি দেখল। সেইজন্য, আবার সেই মন্ত্র ঘুমি—না, ঘুমিয়ে তোমার ভয়, ভয়বানকে তোমার ভয়, স্তবকে তোমার ভয়—না, ভিগহিনার মতো। এই যে ঘুমি বললে তোকে আমার সঙ্গে মন্দিরে যেতে হবে—তোমার কর্তে, উজ্জ্বল যে কি অনিন্দ্যতা আর সংশয়—তোমার ভয় আমি বাব না তাই সেই স্বপ্ন থেকে বসে আছে, কথাটা বলার জন্য পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছ—হায় না, আমি যে ঘেসে ঘেসে ঘুমিয়ে ঘেঁষি, যা আমি যে ঘেসেঘূষ সমস্ত পৃথিবীটার পারে ক্ষত, চোখে, গীতে, নবে, বাধার চূলে,—যা, আমি কোন্ মন্দিরে বাব—কাকে নিয়ে বাব। না, হায় না—

কাল সকালে আমি তোকে ডেকে দেব।

নিশানাথ অজমমত ভাবে উত্তর দিল, দেখি।

না আবার তার হাত দুটো ধরে বললেন, না, একটু কথা শোন।

নিশানাথ অতীব, অতীব বিরক্ত হল। তার হঠাৎ সমস্ত ব্যাপারটা অস্পষ্ট মনে হল। অথচ তার মস্ত মনে অপরিণীম কল্যাণে বসে করল। আর বিরক্ত কর্তে উত্তর দিল, কিন্তু কাল সকালে যে আমার বাঁধারে যেতে হবে।

তার চোখে-ঘূষে নিশানাথ ঘূষ দেখালে। সে স্পষ্ট বুঝল, না এমন উজ্জ্বল প্রত্যাশা করেন নি। বললেন, বাবু তার আগেই আমার মন্দির থেকে ঘুরে আসব। দেখি। নিশানাথ তাত ভাবে ভয়ে গড়ল আর স্থানিলী বয়ের আলো মিডিয়ে নতমুখে বেরিয়ে গেলেন।

ইয়োহ অনার, তাটস্ অল।

নিশানাথ সেই অশৌকিক কর্তৃপক্ষের বিকে বিস্মিত বৃত্তিতে তাকিয়ে বসিল।

(ক্রমণঃ)

না দু ৩ ৫

ধাড়াগো। বিকি-
টার শেষ স্তম্ভটান
কিরে ছুঁকে ফেলে
বিল সে। সাধনের
সোনার হেলিক-
গুলোর মধ্য দিয়ে
গলাকে একবার
বেঁধল। তাঁটা
পড়েছে সেই
সকালে। এখন
বিকেলের ছায়া
ঘনিয়ে এসেছে।



জোয়ারের স্রাব
চিন্ময় পুখুরীকুরতা

আর কিছুকণ পরেই সন্ধ্যা হবে। তখন এখানটার
ভাঁড় হবে। রোজই হয়। আজ রবিবার। আরো
বেশী হবে।

হাতে এখন কাছ নেই কিছু নাহয়। হুঁরে গলার
কুকে তাঁ গাছল একবার। ঈদার বাজে একটা।
কোথায় যে যায় শুভলো নাহু বুকতেই পাবেনা।
ঈদার বেথলেই হারানোর কথা মনে পড়ে। 'অনেক
অনেক ফল বেখেছে হারাপ। সাগরেও পেছে কতবার।
জাহাজে চাকরী করত। মেনিন-ঘরে কাজ করত।
একবার এঞ্জিনীয়ার না যেট কার সঙ্গে মারামারি করে
চাকরী হুঁয়েছিল সে। হারানোর কাছে সাগরেও
অনেক গল্প শুনেছে নাহু। বিলেতে গরীব নেই নাকি।
লবাই বড়লোক। পাড়ি-বাড়ি আছে। হারাপ শুধামেই
থেকে যেত ঠিক। নেহাত বাড়িয়ে বোয়ের কথা
ভেবে। ওবেশের মেয়েসাত খুব সুন্দর। নাহুও সেই
থেকে ভেবে বেখেছে সাগরে যাবে সে। হারানোর মত
খালসীর চাকরী নেবে। চলেও যেত ঠিক এদিনে
তু বাসিনীর সঙ্গে গারছেন। বাসিনী তাকে কোথাও
যেতে দেবেন। অনেকদিন ধরে তাবড়ে নাহু আর ওর
ছলকপলার কুলবেন। সে। বাসিনী তার কে যে আটকে
রাখবে থাকে।

বাসিনী তার কে নাহুই তা ভাল জানেন। বেশ

ভাল হবার পরে
সাতচরিল সাগে
বুড়ো নাকে নিয়ে
কলকাতায় চলে
এসেছিল নাহু।
তারপর ছ'বছর
পরে বুদ্ধি মরল।
বাসিনীর সঙ্গে
এ ক ই বজিতে
পাশাপাশি হবে
থাকত নাহুই।
বাসিনী থাকত
একা। তিন কুল

কেউ ছিলনা তার। তবু কি করে যে তার চলত
নাহু বুকতেই পাবত না। বাসিনীকে কোনদিন
রোজগার করতে দেখেনি ন'হু। কিন্তু খরচ করতে
দেখেছে হ'হাতে। কত আজে-বাজে জিনিস কেনার
গথ ছিল বাসিনীর। সো-পাউডার চুলের ফিতে।
ওর জালার কেরিওলাবের ও রংস্তার যাওয়ার উপার
ছিলনা। কিছুক না কিছুক চাকবেই। চানচুর থেকে
সো-পাউডার আলতা ঘাই হোক।

ছোটবেলা থেকেই বাসিনী ভাল নাহুর।
প্রবমেই নাতক বেবে বাসিনীর চোখে জালো
পেলেছিল। বখন-ভখন এটা সেটা কিনতে গিত
নাহুকে। কোথায় টেকিটি বাজারে গলার
চুড়ি পাওয়া যায়—কোথায় কখনো টোলার
জালো যশোর চিত্রনীর কাহবানা আছে—বাসিনীর
কাছে শুনে শুনে গথ প্রায় মুখস্থ হয়ে গিরেছিল
নাহুর। বাসিনীর এটা সেটা কখনাস খটতে ব্যাপার
লাগত না তার।

মাথা নীচু করে ভাবছিল নাহু। কয়েকটা গলার
মথ। কটা বাজা ছেলেমেয়ে। গলার ঘাবে বেড়াতে
এসেছে। লেগুপ-দুটিতে তাকাল নাহু। না, একটায়ও
গলার কি হাতে সোনারপোর চিহ্ন নেই। ছোট
ছেলেটা নৌকার দিকে আহুদ বাড়িয়ে কি দেখাচ্ছে।

সব ভটা নাক্ত একসঙ্গে হেগে উঠল নতানী।
ভালো লাগল ওহে চাঁদ। বাক্যে বহুটাই ভালো
একবারে ফেঁটী চোপেটা বাহুর বহু চোবোবো বোমী
নয়। কি শুকনো ঠোঁকভানো চুল। ওহে একটা
ভেলের বাপ বহু চোবো সে।

দুধ কেবল নাহ। কেটী আছে এখনো। এখন
জীত হবে উঠবে পাতে আছে। গলাব বুকে টানারটাকে
লোহা হাফেটা আর। দুবে কয়েকটা নৌকো। উঠবে
গাওরাব সবে থাকিবে গানের একটা টুকরো ভেসে
এল এতিকে। নতানী শুনল। ভালো লাগল তার।
ভেসে থাকতে থাকিবে কত গান শুনেছে সে। নদীর
ওপারে একটা ভিমনি গিবে পলপল করে ঘোরা
যেহেজ্ঞে। ওটা কিসের কাবখান। জামেন। নতানী।
গলাব ওপারে আরো অনেকগুলো কাবখান। রয়েছে।
হিনসাত কালো কালো বোঁয়া ওপহাচ্ছে। কত করলা
বহত হয় ওতে। নতানী হাবল। তাহার মন। না কি
আরো বেশি হবে। একমন করলা টুটাকা। তাহলে
হুঁহাঝার টাকা। শুধু জালিয়েই নই করছে হুঁহাঝার
টাকা।

আজ, নতানী বহি নতানী থাকত। নতানী তাহলে
সামর দেখতে যেত। বিলতে যেত। আর বাসিনীকে
কিনে দিত কত কি।

বাসিনীর কথা মনে পড়তে দুহুড়ে পড়ল নতানী।
কয়েকদিন ধরে দুগছে বাসিনী। কি বোপ ভালো
বোকেনা সে। যেয়েলি-বোপ। বাসিনীও কিছু বলেনা
তাকে। চটকলের ডাকার বাবুকেও দেখিয়েছিল নতানী।
তার কথা কিছু বোঝেইনি সে। শুধু এইটুকু বুঝছে
বাসিনীকে গাঢ়িয়ে তুলতে হলে টাকা বহত করতে
হবে। সে দু'এক টাকার কাছ নয়। অনেক টাকা।
বহত নেই। ক্যাফানে হয়ে থাকে বাসিনী। এনিমিয়া
না কি বলছে বেন ডাকার। ভালো যেতে বিতে
হবে। বাটাখাটিনি বহু করতে হবে।

তো! বাসিল একসঙ্গে কয়েকটা। একটা বড় জীবর
আগছে। মল কাটছে বেন বড় একটা হাস। দুদিকে
বড় বড় ডেট আঠছে। পাহাড়ের চূড়ো বেন। পাহাড়
কোনদিন যেয়েনি নতানী। তবে শুনেছে অনেক কাহ্নে।

দুধ উঁচু পাহাড়ের চাই সেগুলো। নতানী ভালো পাহাড়ে
চড়েছে হবে একবার। না। এ পাহাড় জীবনে কিছুই
পোশাম না আটাল বহুর ধরে শুধু আশা বোশাম।
আমিহীটোলাব এই বহু থেকে যেতেও হবে।
পোশাম না দেখেনি নতানী। তাই। নইলে এতদিনে
বিলতে যেত ট্রিক। তবে বিলতে ও দাবে একদিন
না একদিন। নেহাৎ বাসিনীর আছে।

হটান হটান শব শুনে সরে দাঁড়াল নতানী। ট্রেন
আসছে। মাল গাড়িগুলোকে টানছে একটা পুথো
ইঞ্জিন। টানেতে পায়েছেনা। বর্ণায়েশনের মাল-টানা
গাড়ি যেহেজ্ঞে নতানী। সেগুলো টানে কতগুলো বুড়ো
মোব। তেমনি এই ইঞ্জিনটাও বেন একটা বুড়ো
মোব। হাঁপাচ্ছে বেন। দুধ বিরে কেনা পাঁজিরে
উঠেছে। যেমন ওঠে মোবগুলোয়।

হটান চমকে উঠল নতানী। একটা সাইকেল।
পায়ের ওপর পড়ছিল হড়বুড়িয়ে। রেগে উঠল নতানী।
মশাই চোবহুটো কি পকেটে নিয়ে চলছেন নাকি।
কি! সাইকেল থেকে নামল লোকটা। বেশ জোরান।
নতানী দেখল। কি জানি মারামারি করবে নাকি!
এয়াই। কি বললে তুমি? নতানী দেখল লোকটা তার
চেনা। তবে তাকে চিনবেনা। কোন ব্যায়াম পরিষ্কার
বাঁহাট। সর্বনাশ!

নতানী একপা পেছিয়ে এল। কই কিছু বলিনি
তো। ইয়াকি পেয়েছ? কিছু বলনি! তোবার পায়ের
সেগেছে সাইকেল?

না। নতানী হুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

তবে? দারব এক চড়। নতানী সরে থেল। কি
জানি যে চেহারা লোকটার। দারবে নাকি। নতানী
বুকে আঁঠার হয়েছ তার। অমন করে বলে বলা
ট্রিক হানি লোকটাকে।

এর মধ্যে হুঁএকমন লোক আছে হয়ে দাঁড়িয়ে
নিগেছে ওহের চারপাশে। মশা যেহেজ্ঞে! যেতে বিন
হালা। জীড়ের মশা থেকে কে বেন বলে উঠল।
হ্যাঁ। হ্যাঁ। ছেড়ে বিন মশাই। নতানী দেখল গোমুল
বলেছে কথাটা। ওহের বহুতেই থাকে গোমুল।
চটকলে কাছ করে।

নাহর হঠাৎ বড় আপন মনে বল পোহুলকে ।
দব লোকগুলোই তার আপন । তার মতই বেটে
বাড়ার বস্তির হাড় । চারিদিকে চেয়ে দেখল নাহ ।
একজনও তদরলোক নয় এরা ।

কেন ওদের সাথে গাঙ্গি ! পোহুল বলল । ওরা
তদরলোক ! তদরলোক কথাটাকে টেনে টেনে
উচ্চারণ করল । তারপর থুত করে একধলা থুত
কেনল । নাহ তাবল সবাই ওরা একরকম ।
তদরলোকদের দেখা করে নাহ । শালা ।

আগে আগে তিড়ি পাওয়া হবে গেল । নাহ
আবার একটা । বেশিভের দিকে এগিয়ে গেল সে ।

ওব হনটা জরি ব্যাথা লাগছে ।

হলের দল ভদতে গেল নাহ । আগের থেকে আঁরে
বেচেছে । হুতহুত করে করে হলের দোত ভেঙে পড়ছে
বাঁধানো ঘাটের ওপর । মাথা নীচু করে ফেলল নাহ ।
শানবাঁগানে ঘাটটার একটা দিক আছে গেছে । একটা
পর্ড হয়ে গেছে । গলটা হুত হুত আসছে যাচ্ছে ।
একটা ছোট দুর্নী হয়েছে সেখানে ।

সকো ঘনিরে আসছে । অন্ধকার টুকরো টুকরো
হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে । ওদের বড়িতেও লভ্যের
আঁধার মেঘেছে এখন । বহৎ আবে আসে । আলো
বাতাসের দুখ দেখা যায় না সেখানে । ওদের বহমান
আঁধার একটেরে । বাসিনী কি করছে এখন । চুল
করে বলে আছে । নাকি শুয়ে আছে । হুত বেতা
ঘাটটার দিকে চেয়ে দেখল নাহ । এত দুব থেকেও
নাহ পড়তে পারল কার্ণের বাসিনীর ওপর আলকাতরা
বিয়ে সেবা 'শ্রীলোকের বস্ত' কথাটা । ওখানে মেয়েরা
চান করে । অস্ত ঘাটগুলোর থেকে অনেক আলো ।
অনেক হিন বাইরে থেকে বেবেছে নাহ । ভেতরে
থায়নি । আচ্ছা, বাসিনী কি পা হুতেরে আ ।
নাহ তাবল । বোরহর থোরনি । আচ্ছা কাল রোক গা
বোরনা । এমনকি চুলও থাখেনা রোচ্ছ । কেনন
থেন হয়ে গেছে আচ্ছা কাল বাসিনী । মেয়েমানুষ ।
এখনই হয় । হঠাৎ হুড়ি হয়ে যায় । ওর হাতের কথা
মনে পড়ে । একই রকম । কি যে অস্থব কেউ
আবেনা । যেবেলি রোপই বোরহর । তারপর হঠাৎ

চুল থেকে হাত পড়ে হুড়ি । ওর হাতের তনু পয়স
ছিল । বাবলার কাটা পয়সা । ভাতার খেঁচিয়েছিল
ওহুৎ-পণি বাইরেছিল । কিছ নাহ কি করছে
বাসিনীর ভেত্রে কি করতে পেরেছে সে ?

শালা । ঢেলে ঢেলে বলল নাহ । আমোদের মত
নাহরের বৈতে বাকাই হেনজা । হুতার জীবন ।

হঠাৎ যেবেলি হাদির শবে দুখ কোরল নাহ
একটু হুত ঘাটটার পৈঠার ওপর বলে আছে হুতন
একটা । লোক আর তার বউ । বউ কিনাঠার কত
বেশল নাহ । হ্যাঁ । সিঁদুর আছে কপালে । না
বলল মনে মনে । মাথার কাপড়টা বলে গেছে
গ্যাসপোয়ের আলোর তাই ওর মাথার সিঁদুরে
রেখাটাও চোখ এড়াল না নাহর । কে জানে ব
কিনা ! না হতেও পারে ! সিঁদুর ফিলেই বউ হ
এর কোন মানে নেই । এ ঘাটে কত কেদ
বেগেছে সে ।

বউটার হুতটা বেশ স্টাই দেখা যাচ্ছে । না
দেখল । দেখতে ঘোটাছুটি ভালো । কানো র
কপালে দল সিঁদুর অলঙ্কার করছে । থুনিতে এক
আচ্ছা চুঁকিয়ে বলে আছে সে । কত বলল হয়ে
আঠারো ? না হুড়ি ! কি জানি ।

নাহ বাসিনীর কথা তাবল । তিরিশ বছরে
মেয়েছেলে । অথচ যেন সস্তর বছরের হুড়ি । শাল
কপাল থাকা চাই । নইলে বা পাখে তাই হুটো
নাহ বলল । কথাটা অবস্ত ওর নিখের নয় । সে
হাবাপ বালাশীত । কথাই বলে সে বলতো একঘাট
জিরেপাখির মাথার মত ছোট থুনিটা আঁধার চে
চেয়ে দেখল নাহ ।

লোকটা কি বের বলল । হাসল হুতনে । অনেক
বরে হাসল । কি যে বলল লোকটা নাহ শোনে
একটু এগিয়ে গেল সে ।

তারপর অনেকক্ষণ হয়ে অনেকবার ওদের হাস
দেখল নাহ । কেন হাসে শুতা । কি নিয়ে এত দু
ওদের । নাহ বোরেনা । হুততে চায়ও না ।

বউটার কানে সোনার একটা হুৎকা । চিকি
করছে । সোনা তো । না হুটো । নাহ অনেক

কছে। আজকাল তব্বলোকের তাহের ঘেতে বউকে । পরমা পরায় তার বারো আনাই বুটো। পালা। কব্বলোকভলোর কীবনই বুটো। আবার সেই বাগটা । বুটো ঘিরে উঠল নাহুর ।

তার পরমা থাকলে সব তব্বলোককে একবার ঘে মিত। পালাতা! পকেটে ছুঁড়োর হবিসংকীর্জন ঘে বাজে আর বাতকটাই কত! তব্বলোকভলোর বেতলোও থাকে। কতবার কত ঘেয়েকে বেতলে সে। এই বাটেই বেড়াতে আসত ক-একটা ছোকরা বাবু মাঝে নিজে। তারপর বুটো নেবার মতো মিষ্টি মিষ্টি বাবু! পালপল! তারপর টি-বাওরা খুঁড়িত মত একটা পোতা। তারপর ওরা। সেই ঘেয়েকেই পরে আবার বেতলে নাহ। সে আর একজন। আবার সেই অন্ধকার বাটটার সে.....

পালা। আবারের ছোটলোকরাই তালা। হংকার ই অমন তব্বলোকে।

কিছু এ বউটাকে ঘেবে অমন মনে হচ্ছে না নাহুর। ও বোধ হয় ভরকম নয়। বউটাকে ভালো লেগে ছে তার। ওর হাসির শব্দটা কি সুন্দর। বেনরের কালে চামচ নাড়বার শব্দ। এক কাপ চা পেলে ল হস্ত! চায়ের কথা মনে পড়তে ভাবল নাহ।

কিছু এরকম করে ঝড়িরে থাকলে চলেনা। দিনী একা বাড়িতে। চাকারবাংর কাছেও যেতে যে একবার। বাটার বড় পল্লার ঝাঁকতি।

অলের শব্দটা আরো ছোরে। খেউব লগে বাবা গাধার শব্দলগলো নড়ছে অলের গাধার। শব্দ হচ্ছে। গৌকোভলো নোওর কলে আছে। টিম টিম করে জিঁ অলছে। ঝাঁক বিচ্ছে ঘাঝিরা।

—চলো এবার উঠি। রাত হল অনেক। বউটা লল।

বড়ি বেলল লোকটা। আটটা বাজে। চলো। পল্লার অল আর তীরের মাছ লবাইকে ঝাঁপিয়ে আরের ভেঁ। বাছল একটা। একটানা অনেকক্ষণ রে বাছল।

এক মজার উল্টো। অলের শব্দটা বাচ্চে ক্রমশ।

এবার কোয়ার আসবে ওরা এসে পড়ছে। বউটা মাঝার বোমটা জুলে হল। ওর কানের লতিটা হুলছে ঘেন। অলমল করছে সুমকোটা। কতটা লোনা হবে। ডিন আনা? নাকি চার আনা? বাসিনীর একখানা পছন্দও নেই। সব বেচে দিতে হয়েছে। বেতেই পারনা। আবার পরমা!

একবারে কাছে। নাহু লোনা হয়ে ঝালা। —এাই কি চাও! লোকটা তাকেই বলল ঘেন। হাঁ। তাকেই বলছে।—অনেকক্ষণ ধরে আমাংহে পেছনে খুঁড় হুদি!

আর নয়। চারমিকে চেয়ে বেবল নাহ। লোকজন নেই।

কানের লতিটা হুলছে। সুমকোর ভাবে। না হাওগার। হঠাৎ মাঝনের দিকে লৌফ মারল নাহ ছোরে। একটা চীংকার করে হল পড়ল বউটা। হুহাতে কান চেপে ধরল। লোকটা টেতিয়ে উঠল চোর চোর বলে। হুঁ একটা লোককে ওর দিকে এসিয়ে আগতে বেবল নাহ। ডানমিকে রেললাইনে কতগুলো ঝালি ওয়াগন। একটা গাড়ির ডলা ঘিরে ছুটে ওনারে চলে গেল নাহ। ছুটতে ছুটতে সে ওনতে গেল পেছনে চীংকারটা ক্রমশ বাচ্চে।

অন্ধকার গলির মধ্যে এসে পড়ল নাহ। আর ছুটবে না। হাতের মুঠোর সুমকোটা অলুত্তর করল নাহ। পালপোঠের আলোর বেবল সে একবার সেটাকে বেশ ততী! সোনাই বোধ হয়। ইসু। রক্ত লেগে গেছে হাতে! কানের লতিটা ওক হিঁচে এসেছে। বউটার দুবটা মনে পড়ল নাহুর। অনেক লেগেছে ওর কানে।

যে হুকে নাহ বেবল ওয়ে আছে বাসিনী! টেমি অলছে একটা এককোণে। অন্ধকার আরো বেতলে জাভে।

পরীর কেমন আছে? আছে আছে বিজেল কল নাহ। তোর অস্তে একটা কিনিগ এনেছি রে বাসি। কি? নড়ে চড়ে বলল বাসিনী। এই হ্যাং। সুমকোটা বেখালো নাহ। সোনার। খাঁটি সোনার! রটো নয়! —সোনা! বিশ্বাস করতে পারছে না

বিশুদ্ধ, কোমল
লাক্স এবার
৪টি রামধনু-
রঙে

আর আপনার প্রিয় সাদাটিও রয়েছে!



‘বউগুলো এতই সুন্দর,
মনে হয়
সবই আমার চমক’
একজন গীতালো বলেন-

দেখুন! লাক্স এবার রম্যতার লভ্য লব্ধি আর মনোহরই
বোতলে—সবটির রয়েছে। অতিশীঘ্র আপনার দিগন্ত সাদা—লীলা
এবং যে লাক্স চিরদিনই আপনাকে প্রভেদিত।



চিত্রতারকার
বিশুদ্ধ, কোমল
সৌন্দর্য-সাহায্য

হিন্দুস্তান লিভারের তৈরি

হাত বাড়াল সে। হাত! কাছে মির এলো টেবিলে।

টেবিল টিনটানে আলোর নাক্ষত্রবাসিনী হাসিল। অনেকদিন বাসিনীর হাসি দেখেনি নাক্ষত্র। আবার দেখল সেই বউটার মতই সুন্দর হাসতে পারে বাসিনী। ও এখনো সুকো হয়ে যায়নি তাহলে। নাক্ষত্র বলল: এটা ভেঙে তোকে দুটো মাকড়ি গড়িয়ে দেব। ভালো হয়ে ওঠ, তারপরে।

এমা! একি! রক্ত! টেমির আলোতেও শইত দেখল বাসিনী। নিউবে উঠল। রক্ত! এ তোবার পেলে তুমি? নাক্ষত্র খুন করেছে। তুমি?

না। না। খুন করবো কেন? দিতে চায়নি তাই। অপরাধীর হত অড়িয়ে অড়িয়ে বলল নাক্ষত্র। আমি ছিনিয়ে নিরেছি।

পাথরের মূর্তির মতো বলে আছে বাসিনা। তার হাতের মূর্তির গোনার কৃষকোটা ঠিকঠিক করছে।

সোনা নয়। কুটো। নাক্ষত্র বলল। রূপ হল তার। নিজের ওপর। ওই বউটার ওপর। বাসিনীর ওপর। রক্তের হাসি দেখল নাক্ষত্র নিজের হাতে। কৃষকোটার তারে শুধনো লেগে আছে কানের এক টুকরো মাংস। নয়ন! পাথরের শরীরের মতো নয়ন বাস।

ঘেয়েমাস্থ আতটাই ব্যাঘ্র। রেগে উঠল নাক্ষত্র।

মাদিরা বাগি চকু আনে। রক্ত! রক্ত তো তোরা কি! যা পেরেছিল তোরা বাপের জাঙ্গি। মাদির হত চকু। কান থেকে ছিঁড়ে আনা ছিনিলে রক্ত থাকবে না তো কি থাকবে?

যর থেকে বেহিরে এলো নাক্ষত্র। হাওয়ার এসে বলল। মনটা ভারি ব্যাঘ্র হয়ে গেছে তার। ওই একটু করে মাংস সব নষ্ট করে দিল।

অন্ধকার হাওয়ার ক্ষুধার মতো বলে রইল নাক্ষত্র। ঘরের মধ্যে থেকে বাসিনীর কোঁপানো কাছার লব্ধ তখনও পেল সে। বাসিনী কাঁচছে। কেন কাঁচছে? সে চোর বলে! নাকি রক্ত দেখে।

অন্ধকার। ওই রক্তের হত চাপ বেঁধে আছে। বাসিনীর চোখের ভল এই অন্ধকারে বেগা বার না। শুধু তার কাছার লব্ধ পাচ্ছে নাক্ষত্র।

ঘুরে ভেঁ। বাজল পক্ষীর কুক। টীবার আলছে! জোয়ারের লব্ধ তখনও নাক্ষত্র। মনের মধ্যেই।

ভেঁত আলছে। নোড়ের শেকলগুলো গায়ে ঠেকছে। লব্ধ উঠছে মনে। খুঁটির হত ঘুরছে অল। জোয়ার আলছে।

অন্ধকারে বলে থাকতে থাকতে অসুস্থত করল নাক্ষত্র। জোয়ারের অলটা বড় নোনা।





দিন গেলো, বাস
গেলো, ঘুবে আবার
নতুন বছর এলো— একটা
রেডিও কেনা হোল না।
দ্বিধের বছর থেকে প্রতি
নতুন বছর পড়তে না
পড়তে এই এক তাগিদ।
ঘিরে আসছে অসীমা :
একটা রেডিও কেনো।



: আর—কিনতো না
বলেছি ? তবে লোকাল-
সেট কিনে কি লাভ ?
আজ এবার কাল
ওখানে। ইন্ডস্ট্রির
চাকরিতে লোকাল-সেট
কিনে কি হবে ?
মোহিত আশ্বর্যকার
চেষ্টা হবে।

পাশের বাড়ির রেডিওর ব্যানব্যাননী ভালো লাগে না।
নবাব জালাল বলেও কলেজে কতবার অসীমা।
কিন্তু চাপা বিতে হয়েছে সে কথা শুনি। জানে মোহিত
সুখোপ পেলেই বলবে :
তবেই বোঝ রেডিও কেনার কত কামেলা।
আসলে চিরকাল এমনি করে বাসা ঘিরে এড়িয়ে
গেলো মোহিত।
অসীমার দিনতে বাকী নেই।

আর গো কোনো। লোকাল-সেট কিনতে তোমাকে
কে বলেছে ?
অসীমা ফেলে উঠলো যেন।
: কিন্তু অল-ওয়েট দে-তো অনেক দাম ! এক যা
মাইনেই সেব !
নিরীহ পলার বলল মোহিত।
: ও কথা তো অনেকবার বলেছে। কত টাকা
কত দিক ঘিরে বেড়িয়ে গাছে—আব তোমার একটা
রেডিও কেনা হয় না।

অবশ্য বরখানা তার সে নেহাত বারাপ তা নয়।
সুন্দর সাফারো-সোছারো। ভবল বাট, সেলিং টেবিল,
বড় কাঁচ বানানো সেটপরি কার্ভে গালিগ-করা আলবারী,
চমৎকার স্বকৃত্যক বুক-কস আর বেজিনে মোড়া টেবিলের
পাশে নতুন টেবিল ল্যান্স বিলিয়ে যে স্বপ্নপূরী রচনা
করেছে সে—তাতে নেই কি ?
বেওয়ারে তাকালেও সেই এক ইন্দ্রজাল। নানা
রংয়ের প্লাম-সুন্দর ক্যালেন্ডারের পক্ষে চমৎকার ঘাট
করা হুজুপা কাঁটার সমারোহ সমস্ত বরটাকে দিয়েছে
এক অদৃষ্ট সুখময় পাতীর্ঘ। এতলো মোহিতের নিঃস্ব
চালের পুত্রীপুত্র খোয়াল।

বহা পলার অধ্ববোণ করলো অসীমা।
মেমো নেরে তিন বছরের কুঁহ কোথেকে চৌফে
এসে আত্মকা বয়ে চুকে চোঁড়িয়ে উঠলো : আনাকেও
একটা রেডিও দেবে বাবা ?
: কেন তোমার তো একটা আছে !
মাসিকের ছোট রেডিওটা দেখিয়ে মোহিত
গাড়ীর্ঘ জানে।
: ছাই রেডিও ! ওতে কি গান গায় না কথা বলে ?
ছোট টোট কুলিরে একটা মোস্তাফেরে বেড়িয়ে
গেলো কুঁহ।

এক কথার সব আছে—নেই কেবল রেডিও।
মোহিত বলে : রেডিও কেন চাইছে। লীমা—বর
শাখাতে না ভনতে ?
: তোমার ঐ এক পাঁচের কথা। আসলে রেডিও
কিনবে কিনা বলো।
বদিনুটী চির-বিচির গ্রীণ বেড-কতারটা টেনে টিক
করে বিস্তে বিস্তে মুস্ট গ্রন্থ কুলো অসীমা।

এতক্ষণে না বেগে পায়ে না অসীমা।
: কবলে তো—কুঁহটা পর্বত তোমাকে ঠকিয়ে
গেলো !
: ঠকাবে বলেই তো একটার পর একটা ইনসিওয়েল
করে দাখি। হুঁবেরেও ভবিজ্ঞ তাবতে হবে না।
মাইনের আছেক টাকা তো বর তাড়া আর
ইনসিওয়েলেই গেলো। রেডিও আসে কোথেকে ?

বৈধি আর দ্বিষ্ট হালকানীর বুথোল খুলে পড়ল মোহিতের।

কি কথাই কি কথা এলো বেথো।

আর বাটানো ভালো বেথার না। পেছিয়ে এলো অসীমা।

কিছু বুথোল তো তাইও আছে। এ পন্থ পেরটা পড়তে আপত্তি কি!

ঃ জানি কি সে কথা বলেছি? যখন তুমি পারবে তখন কিনে দিও। না পারলে দিও না।

দ্বিষ্ট করে হেসে কেমন আবার সামনে এগিয়ে গেলো অসীমা।

এই ছাফিল বছর বয়সে দু'মেয়ের মা হয়েও এখনও মাঝে মাঝে দ্বিষ্ট হাসলে না চেয়ে পাবে না বোহিত।

এ সময় তার হাসিটাকে আর বুথোল বলে মনে হয় না।

একবারে কুমারী সরলতার নিষ্কর বলে মনে হয়।

না; নিষ্করই বেথো। এ হয়ে সত্যি বেতিও না হলে মানায় না।

ছ'মাসের মধ্যে নিষ্করই বেথো।

টাকা না হয় বেতিওর জুড়ই রেখে বেথো।

শান্তিপূর্ব সম্বোধনের সুযোগ ছাড়লে না মোহিত। ছ'মাসের সময় নিয়ে ঠিকলো এ ব্যক্তি। যেন পাওনাধারের জড়োর সামনে কিস্তিখন্ডীর পারতারা। সম্প্রত্য-সম্বোধনের কিস্তিবন্দী।

•

•

লোকে বলে পাণের বাড়ির বেতিও আছে—পরল্য নেই। ঠাট আছে ঐমক নেই। তবে বেতিও চলে কেন? অসীমা বলে : ওটা একটা নেশা।

মোহিত বলে : তোমার কি ভবে?

ঃ শুনার বেতিও-ও নেই পরল্য-ও নেই। তবে সাধ কার না থাকে? আবার কোন সাঙটাই বা তুমি যেটালে? নেশা তো পবের কথা।

হঠাৎ বৈকরী হয়ে উঠলো অসীমা।

ঃ কিছু তোমার ঘরের বিকে চেয়ে কে বলবে তোমার টাকা নেই? বর সাঝাংতো তো তুমি অনেক জাহ্ন বড়লোককে ও হার মানিয়েছো।

বাইরে তো আমারই কাংলো—বড়রা বলে বেথ আছে।

কথাটাকে বোঝাবার জন্ত প্রসঙ্গার হালকা প্রোত বহালো মোহিত।

নিষ্কের প্রসঙ্গার কে না হুত হয়?

বিহীন-স্তম্ভ বাখটা শুকে এলো অসীমার।

ঃ ঘেরেরা বর সাঝাবে না কি তোমরা বর সাঝাবে?

সব মেয়েই নিষ্কের বর সাধাঘত সাঝার। এটাও তাহের শিল্পকর্ম।

নীচু গলার আঙে আঙে বলল অসীমা।

ঃ চারশো টাকার ক্ষুবে অধিনারের দ্বিষ্টর পক্ষে এটা একটু টুহুরের বাড়াবাড়ি ছোল না কি! তাহা কি এ কথা বলে?

ঃ না বলে তো না বলে। তোমার সব তাতেই খুঁত থরা। থাক সে। শোনো।

টুহুর ছুলে বজ্রিণ টাকা দিতে হবে। জাহ্নহারীর প্রবমেই সব পাওনা মিটিয়ে দিতে বলেছে। কি করবে বলে।

করের বেলে কথাঝরে গেলো অসীমা।

টুহুর অর্থাৎ অসীমার বড় মেয়ে। দ্বিষ্টর জ্বাসের ছাজী। তার হাপট কে বেথো? পাড়ার না চেমে কে? কোন কাংলেনে না আছে?

মোহিত চিন্তার পড়লো।

এ মাগে বেতিওর জমানো পকাশ টাকার হাত পড়লো।

টুহুর ছুলের বকেয়াটা এতদিন বেতিওর হুরলদিত্তে ভসিয়ে ছিলো।

হেড দ্বিধমণি নোটিশ বিয়ে সেটা মনে করিয়ে দিয়েছেন।

বেতিও নয়—টুহুর বকেয়া মাইনে।

অসীমাত যেন হঠাৎ বেতিও ছেড়ে বোর-লংগারী হয়ে পড়েছে।

হেড দ্বিধমণি এই পাড়াই থাকেন। তার কাছে লখান খোয়াতে বাকী নয় অসীমা।

এতএব টুহুর মাইনে আগে—বেতিওর জন্ত টাকা না হয় এক বাস নাই জমলো।

টুঙ্গর টাকা মিটেয়ে হিলো ঘোষিত।

কিছু পাণের বাড়ির বেড়িওটা এখনও বাঘেরে না কেন?

বিকলে আবার পাটা কি বকম গুলিয়ে উঠলো
অসীমার। সম্বন্ধ হয়। আরেক কামেল।

স্নাতে অকিস কেবল এককাপ চা নিয়ে পেপারটা
খুঁজলো ঘোষিত। বিনে পড়ার সময় হয় না—স্নাতে
পড়তে হয়।

বাড়িটা কেন যেন নির্জন হয়ে গিয়েছে।

স্নাতকের লাইটটা আজকাল বড় জ্বলে না।

ইন্দেকটুক বিল কথ্যতে হয়। কিছু অন্ধকার সব সময়
ভালো লাগে না। বাড়িটা নির্জন হলে আরো না।
যেহেতু নিয়ে অসীম কোথায় বেড়িয়েছে।

কি চা করে ছিল।

এ সময়টা শুধু পেপার পড়ে ভালো লাগে না।

একটা বেড়িও থাকলে মনে হয় লোকজন আছে।
কথ্যবর্তা হয়। অথচ এ কথাটা কখনও মনে হয় নি
মোহিতের। একটা অসম্ভব বিলাসিতা আর অসংলত
যান্ত্রিক বলে বেড়িও কেনাটা এতকাল উড়িয়ে দিয়ে
এগেছে ঘোষিত।

আজ বড় নির্জন লাগে।

চাল-চিনি-তেল আর নিত্যকার হাজার জিনিষের মত
বেড়িওটাকে-ও তার যেন দরকারী মনে হয়।

কিছু একথা বাক্যের করতে যেন চায় না। কিহে
কিহে অর্থ চিন্তা যা রাখে। সে বাক দে—এ সব
কালজু মনোবীণা বাজিয়ে লাভ নেই। তার চেয়ে এক
শেখাটা চাই ভালো। সংগে যদি তেল-বাখা বুদ্ধি বা
চিন্তা-ভাষা থাকে তো আরো ভালো। চামচ দিয়ে
মজ-মজ করে খেতে যে জানে সে যোগে হাত লাগায় না।

কিছু করতে কে?

ট্রিক ভিকে দিয়ে ট্রিক এসব হয় না।

তাই চা খেয়ে আবার বেড়িওব কথা ভাবতে হয়।

এ মাসটা ছুটিসেব শেষ মাস।

অসীম নিশ্চয়ই ভালো। কিহে অস্থির করে তুলবে।

কিছু পত মাসের কামানো টাকা তো অজানা—
অপাত্রেই গেল।

অসীমার যে এক অসীমার নিমিত্তে একটি ইচ্ছা

মিলে সবটাকা জলে কেলে এলো।

স্বপ্নের টাকা খোটে না—কিছু সামাজিকতা না
করলে গুনছে কে?

অসীমাকে বলে লাভ নেই—সংগে সংগে কয়ে উঠবে।
বহুরে কথার এ সব কথের? নাহুরে যথো থাকতে
গেলে ছুটিগেটে এমন বংচা হয়-ই। কে না করে?

কিছু অল্প সকলেই মাহুথ—সে কি মাহুথ নয়?
তার নিম্নের বলতে কি কোন বংচা থাকতে নেই?

একথা কে বলতে পারে?

তার চেয়ে চুপ করে পেপার পড়া ভালো। অসীম
আজুক। দেখা যাবে তখন। এ যাত্রা একটা বড়রকমের
হুগেই তাঁওতার সম্মানে চিত্রিত হয়ে পড়লে ঘোষিত।
না হলে তৈরানো যাবে না অসীমাকে। টাকা নেই—
দেখা ভনবে না।

কতজন ছিলো জানে না কোথেকে হঠাৎ গটগট
করে শাকীর বোলুল আর শিকরীর কলকানিতে বয়ে
চুকলো অসীম।

বুক টিপ টিপ করলো মোহিতের। চকিতে চোখ
তুলে পেপারটা দিয়ে আড়াল করলো হুথ।

আজকাল সামনেই শাকী ছাড়ে অসীম। মাহুথ আরে
মনে করে না।

কি কতকণ এসেছে?

শান্তিনিকেতনী লাল বর্ডার বেওচ্য কচি কলাপাতা
হংয়ের ট্রাউজটা বুলতে বুলতে মাহুদী কতটা ক'হল
অসীম।

অথচ একটা বড় আসল কথার ভনিতা মনে হোল
মোহিতের। তাহ'লেও ব্রেগিয়ার-বাখা উল্লাহ ধন্যবে
মহন পিঠে এখনও বাগাণ দেখায় না অসীমাকে।

চোখ আটকে যায়।

কোথায় গিয়েছিলো? নিরীহ গলায় জানতে চাইলো
ঘোষিত।

ভাকার চক্রবর্তীর কাছে। তুমি যাপু এক কাক
করো। কাল শিবমহলে গিয়ে কাড় করিয়ে আনো।
সামনের মাসে একবার ভক্তি হয়ে দেখানো ভালো। না
হয় গার দিন বাধবো। এবার আমার কেন যেন তার
সময়।

জীবন বেগ বলে গেলো অসীম ।
 রক্ত ভাঙা ভাঙি এলুমি এতটুকু
 মোহিত তুমকে নিয়ে প্রাণ করে ।
 : না-না : যে ভাবেই হোক যোগাড় কনো । আমার
 অবস্থা আদিত্যিক জানি । ব্যস্ত হয়ে উঠলো অসীম ।
 : কিন্তু হেডিও ? সাহসের মানে যে তোমার হেডিও
 কেনার কথা !
 মোহিত সুখোপ ছাড়লো না
 : চুপে থাক হেডিও ! ও আর তুমি কিনে বিয়েছো :
 এখন এদিক তো আগে সাবলান্ড ।
 কথার স্বাদে মন বিচলিত ছুটে উঠলো অসীমার সুখে
 চোখে : হ্যাঁ করে চেয়ে বইলো মোহিত । নিতান্তই

মটকীষ । অসীমাকে চিনতে পারা গেলো না আজও ।
 এতো মহল সৃষ্টির কথা কে ভেবেছিলো ?
 ব্যক্তি সম্বন্ধের বহুটা ও হঠাৎ বেন একেবারে
 মাদুলী মূল্যহীন মনে হোল তার কাছে ।
 অবশ্য এর ক্ষত কত চিন্তা—কত কথা—কত বিভিন্ন
 বস্তুগত ওঠা-নামা ।
 বিজয়লেন্স টাকা বিয়ে আগতে হবে সাহসের মানে ।
 এ বহুটা সমস্তা এলেও স্বস্তি আছে ।
 হেডিওর সুখের চেয়ে এ স্বস্তি বহু ভালো ।
 হেডিও পাবে কিনলে-ও চলবে ।
 অসীমার কথাই শ্রীক :
 পানের বাড়ির হেডিওটা বড় ব্যাম-ব্যাম হবে ।



বিশ্বের যাদু...



জার্মানি থেকে জুন ১৯৬১ যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকাকে ভারতীয়
বাটা প্রতিষ্ঠান ৫১০০০০ জোড়া জুতো সরবরাহ করেছেন

Bata

লিপিধের ঘরে, একটি
সুন্দর কুলদানে এক টি
অপরূপ সুন্দর ছোট
টেবিলের ওপর, কটা টাটকা
গোলাপ কুল রাখা ছিল।
বাঁড়িরে থাকতে থাকতে
এলরামি পায়ে পায়ে এসিবে
গিয়ে, সেই ছোট টেবিলে

রাখা কুলদানীটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অকস্মিক ভাবে,
কুলদানী থেকে একটা গোলাপ কুল টেনে নিয়ে, একটা
একটা করে তার সুন্দর পালকীগুলি চিত্তে লাগল।
টিক তার কাছেই, বেওয়ারে টাঙান ছবিখানার ওপর,
এই সময় এলরামি ঘেন নতুন করে নজর পড়ল। বীবে
বীবে সে চবিতার কাছে এসিবে গিয়ে তার ওপর থেকে
চাকনাটা সরিয়ে দিতেই দেখা গেল প্রচু বিত, তার
চোখের সঙ্গে মিলে সমুদ্রের ধারে বাঁড়িরে আছেন, আর
তলার লেখা আছে,—

তোমাদের মতে আমি কে ?

চিরকর ছবিখানি এমন স্তম্ভর করে একেছিলেন,
যে দিকের দর্শার সৃষ্টি করা সুন্দরামির হিকে চাইলেই,
দর্শকের মনে হতে থাকে, ঐ যে দিক, উক্তের কিলেপ
করছেন,—“তোমাদের মতে আমি কে ?”

আধিরে মতন এলরামি কিছুক্ষণ সেদিকে চেয়ে
থেকে ঘেন দিকের কবাব উত্তবেই মাথা নেড়ে, অক্ষুট করে
কলে উঠল,—“আমিভা খাবগাই করতে পারি না।”

তার পর বীবে বীবে চবিতার কাছে থেকে কিত, অসুখে
রাখা একটা চোখের ওপর, ঘেন কতকটা স্নানি করে, হলে
পড়ে নে ভাবতে লাগল। তার আর হুঁড়ে মুনক লিপিধ
করে রয়েছে। পায়ে সেদিকে সুখ কেরালে সেই অপরূপ
সুন্দর সুখ বাসি নজরে পড়ে, এই ভরেই ঘেন, সে দুহাতে
যে ঢেকে বলে হইল। ঘন তার ওপর হয়ে উঠেছিল।...
কিছু কেন ?—কি করে ?...সেইটাই তা' সে বুধে উঠতে
পারছিল না।

অপরূপ পরে সে সুখ থেকে হাত বাখা নাখাল। বেসতে

সোল অর লিলিথ মেরী করেলী

জহাংবর—হরপ্রসাদ অক্সোপাখ্যার

পেলে কুলদানীর কুলগুলো
ঘেন বীবে বীবে মাথা
নাড়ছে, অপর ঘরের খোর
আনলা সবই বহু ! এলরামি
মিলেও তখন ছির হয়েই
বলে বহু ছে...ত বে
গোলাপ গুলো অমন করে
মাথা নাড়ছে কি করে ?—

এ হাওয়া আলছে কোথা থেকে ?...সুখ তুলতেই দিকের
ছবি খানার ওপর আবার তার নজর পড়ল। এগরি
এলরামি ঘেন হতে লাগল, ঘেন ছাসি সুখ তাইই হিকে
চেয়ে প্রচু বিত ঐ তা'কেই ঘেন জিখেল করছেন,—
“তোমাদের মতে আমি কে ?

বাত হয়ে এলরামি চোখের ঢেকে উঠে দাঁড়াল। তা'বতে
লাগল,—“হঠাৎ এমন ভয় ভরালে হয়ে গেলুম কি করে ?
আমি দেখছি, সাধারণ চরিত্র-চেতা বাহুরে চেয়েও আমি
চরিত্র হয়ে পড়েছি !”

এইবার সুখ কিতরে সে মুনক লিপিধের হিকে চাইল।
তার মনে হতে লাগল, ঘেন, কি-একটা-কিলে, তাকে
লিপিধের বাটের হিকে আকর্ষণ করছে। পায়ে পায়ে সে
এসিবে গিয়ে লিপিধের বাটের কাছে বাঁড়িরে তার হেবের
ওপর ঝুঁকে পড়ে, সেই অনিন্দ্যসুন্দর সুখ বাসির হিকে
দলকহাওয়া হু হুতে চেয়ে বাঁড়িরে হইল এলরামি।

লিপিধের সোনার রঙেরে হুদের একটা। অজ্ঞ তার
হাতের কাছেই পড়েছিল, হঠাৎ ঘেন প্রবল অস্বাভাব করে,
এলরামি সেই হুদের গোড়া হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে তাকে
একটা হুদ বলে। পরক্ষণেই, তার মনে হতে লাগল, সে
ঘেন, এক অজ্ঞ সুখ-বিক্ষেপ, এই স্নানি চুখন করেচে,
এমনি তখন তার ঠোঁট ছুটা জ্বালা করতে লেগেছিল।

তারপর ঘেন হল তার, “এতো শুধু লিপিধের হুদ নয়,
এ একটা ভাল ! আমার হুটা এই আলো ছড়িয়ে, বহা
পড়ে, হতে বলে ঘেন !...হা ওপরবান ! আমার প্রাণের
এ আকুতি, যদি সত্যিই লিপিধের প্রাতি আমার প্রেমের
হতে হয়, তবে বহা কব, এইটুই তবু বহা কব আমার, বে

লিপি যেন কোনদিন একথা জানতে না পারে! ...ও জানতে পারলেই মুক্ত হবে আমার কবল থেকে! ... হে তপস্বিন, কোথায় তোমার, আমার এ ক্ষণিকের দুর্বলতার কথা লিপি যেন কোনদিন না জানতে পারে! ... মুক্তি পেলে, লিপি আর আমার কথা শুনবে না—আমার কাছেও থাকবে না। তাহলে আমারও সারা জীবনের সাধনা পণ্ড হয়ে যাবে! ... না, না,—এখন আর আমি লিপির আশ্রকে তাকব না! ... এটা ত' তার মরা দেহ,—মড়া একটা! ... হ্যাঁ! সত্যিই তাই। আশ্রা না থাকলেই বোধ হয়! ... এই ভাল, আশ্রাধীন বোধ ত, আমার কথা শুনতে পার নি! ... আর আমার মনের এ দুর্বলতার কথাও জানতে পারে নি নিশ্চয়!”

তবতে তবতে, লিপির একথানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে, কি করছে ভাল করে বোঝবার আগেই, হাতটের ওপদে দে একটা চুই খেলো, তারপর সে হাত ধানি একবার নিজের গালের ওপদে চেপে ধরলে, পংকণেই সেটি আপনায় ঢুক চেপে, যেন একটা অদীন তুষ্টিভরে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলে। সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত শরীর যেন ছড়িয়ে গেল,—যেন একটা মিষ্টি ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শ পেলে সে! ... সমস্ত যন তার উৎসাহে হয়ে দিলে যেন ভাঙা হয়ে উঠল। এইবার এলহামি বীরে বীরে হাঁটু পেড়ে, বাটের পাশে বসে পড়ে, লিপির দুমুখ দুখের বিকে দুই দুটিতে চেয়ে বসল। সেখতে সেখতে তার মনে হল, যেন সেই দুমুখ দুখে একটা তুষ্টিত বৃহৎ হাসি কুটে উঠেছে, আর সেই হাসিমাখা দুখে এক নিরীহ, পরমানন্দময়ী স্নানময়ী শুভময়ী, যেন নিশ্চিন্ত মনে ঘুঁিয়ে রয়েছে।

হঠাৎ এলহামি মনে পড়ল, কেন সে মরা লিপিরে যেহটা আরবের মস্ত থেকে ধরে তুলে এনেছিল। কি তার প্রতিপত্তে?—কি সে প্রাণ কবতে চেয়েছিল, তার সেই মরা যেহটার দ্বারা? এই প্রেমের আনন্দে আত্মসমর্পণ করবার আগে, তাকে এই মহাসত্যের প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে, যে এই রক্ত-মাংস-মেহের শরীরটাকে, যে প্রাণ শক্তি সজীব করে রাখে, সেই চেতনাময় মরা-প্রাণটির স্বরূপ কি?—কেনন সেখতে?—কি তার সত্য? লিপির এই রক্ত-মাংসের শরীরটা সে তার গোখর

ওপদে রেখেই দেখে, কিন্তু কই সেই মহাপ্রাণ?—সেই আত্মকে ত' সে আর অনুধি দেখতে পার নি? এই আত্মকে দেখতে হবে, তার অস্তিত্বের সত্যিকারের প্রমাণ পেতে হবে,—এই তার প্রথম আর প্রধান প্রতিপত্ত।

এই ভাবে যখন সে নিজের ভাবনার মধ্যে ভুবে ছিল তখন হঠাৎ তার খেয়াল হল, যেহটা যেন এক অতি সুনিষ্ট সূত্রের কংকণে ভরে গেছে। আবিষ্কার মতন, কানপেতে সে সেই সূত্রের স্বংকার শুনতে লাগল। যেন এতে তার কোনরকম ভয়ের সন্ধান হল না। ইহানীত সে একমাত্র তার নিজের ‘অহং’কে ছাড়া আর কাউকেই ভয় করত না। সে স্পষ্ট অসুভব কবল তার মগ্ধের মধ্যে, যেন কোথায়, একটা ক্ষুণ্ণ ভিলে হয়ে গেছে, যার কবল সে এই অদীন যত্নের মধ্যেও এমন সূত্রের স্বংকার শুনতে পাচ্ছে! নিম্নক জাতি ছাড়া, এটা আর কিছুই নয়, কাজেই এতে আত্মবিস্ময় বা তরলাবাব কিছুই নেই!

তারপরই কিছু এলহামি অবাক না হয়ে পারলে না। তার কারণ সূত্রের কংকণ শুনতে হঠাৎ সে লিপির কথা শুনতে গেলে—“আমি এখনে এসেছি।”

কথাত্তনে এলহামি বুকের মধ্যে ঢুক-ঢুক করে উঠল। কাপা দলার সে বলে উঠল,—“কই, আমি ত' তোমার ডাকিনি লিপি?”

লিপির দুখধানি এবার হাসিতে ভরে গেল। বুদী ভরা হয়ে সে বললে,—“না, তুমি ডাকনি—আজ আমি নিজে থেকেই এসেছি।

“কিন্তু কেন এলে?—এতদিনের মধ্যে, এতকম করে আননি ত' কোন দিন নিজে থেকে?”

“আজ এসেছি, আমার নিজের, আর তোমার আনন্দের অজ্ঞেই! ... জান না? ... প্রেম, ভালবাসা,—স্বর্গের চেয়েও বহু। সেই ভালবাসা এখন এখানের বাতালে রয়েছে যে!”

যত্নে যেন লিপির বুদী উপহু পড়ছিল। শুনতে শুনতে এলহামি সেহের শিরা-অস্থিরার তেজত বিরে যেন বরফ-অলের স্রোত বইতে লাগল। মঠাখাফের কথা শুলো আবার এখন মনু করে তার মনে পড়ল,—‘লিপির প্রেমই তার আত্মকে মুক্ত করে যাবে।’

কথাটা মনে হতেই, সত্যাসে সে মনে মনে ককিরে

উঠল,—“না, না, না—তা হতে পারে না—তা হতে হবে না আমি। লিপিখ আমায়! —এক! আমারই সে! ... জগদ্বাসী হতে রয়েছে তার নিহতি! ... ভগবানের যদি কিছু মাজে বিচার-জ্ঞান থাকে, তবে তিনি ঋণেই বুঝতে পারবেন, লিপিখের বেধে... লিপিখের আত্মার ওপর, আমার চেয়ে বেশী দাবী,—বড় দাবী জার করো নেই—হাসতে পারে না!”

এই সময় গানের সুরের কংকারটা হটাৎ থেমে গেল। লিপিখের হেঁচটাও অল্প নড়ে উঠল। তবুও এলারামি আত্ম তাকে ডাকলে না বা কোন কিছুই উত্তরও চাইলে না। তার কারব আত্ম লিপিখকে ডাকতে তার মনে কোনও তরঙ্গও ছিল। ভেবে বুঝলে, চূপ করে থাকাই এখন শ্রেয় তার পক্ষে।

কিন্তু এলারামি লিপিখকে না ডাকলে কি হবে? আগুন থেকে লিপিখের চৌঁট ছুটো নড়ে উঠল, পরক্ষণেই সে বললে—“ভগবানের বিচিত্র বিধান! দেখি কি সম্ভব হবে?... এক ভাগ্যবানী বুঝো... পৃথিবীর লোকে তাকে চিরদিন পাগল বলেই ঘেঁষা করে এসেছে... কিন্তু সম্ভব আত্ম তার বিশাশ—ভগবানের প্রেমে মগ্ন। ... যেহেতু সেলু একটা অসঙ্গ আত্মার শিখার মতনই আত্ম তার বর্ণের দিকে ছুটে চলেছে... ভগবানের প্রতি প্রেমই তাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে... বলে সে একটু চূপ থেকে আবার বললে—“গ্রহ-তারাও সবই জনতে বড় কথ নেই অনেক ভাষের স্বপ্নের সন্তিতও নিতুল ভাবে পরমর্শেণ করতে গেলে... কিন্তু বিশ্বাস তবু প্রেম দুলভ।”

লিপিখের কথা শুনেও ভনতে এলারামির ক্রমলিনকে মনে পড়ল—কারণ লিপিখের কথার বহন থেকে তাই মনে পড়া স্বাভাবিক। আশ্রয়তরে এলারামি প্রশ্ন করলে—“কথা কথা বলছ লিপিখ?... সম্ভ্রুতি মারা গেছে আবার জানা সোনা কোন সোকের কথা নাকি?”

“হ্যাঁ ছুঁমি তাকে জান। কিন্তু সে মরে গেছে বলছ কেন... কেউ আছে সে। মরা বলে কোন কিছু নেই। আগন্তুক তোমার সে কথা বলেছি?... আর...”

লিপিখের কথা শুনে গেল। তার বেহের ওপর চক্ষু পড়ে পলকহীন চক্ষুতে চেয়ে এলারামি অপেক্ষা

করতে লাগল তার বাকী কথা শোনবার জন্যে!—যেহেতু যেহেতু যেহেতু তার শ্রুতর চোখের পাতা দুটা কাপছে—মনে হতে লাগল এখনি বুঝি ফুলবাগে পাতা দুটা চোখের। তা কি হইল না প্রকৃত পক্ষে, অল্প পরেই পাতা দুটা আবার ছিন্ন হয়ে গেল। ... যেহেতু যেহেতু তার তার এলারামির মনে হচ্ছিল কি শ্রুতর সে মৃগধানী! ... না, না! শুধু শ্রুতর বললে তার এই সৌকর্যের কিছুই হল। হয় না—অপরূপ শ্রুতর এ মৃগী!

এই কতকণ আগে এলারামির মনের মধ্যে লিপিখকে হারাবার যে ভয় ঘেঁষেছিল মোর কবে তা সে মনে থেকে মুছে কেলে গিলে। বহু এবার তার আত্মল আত্মিত মনে কেঁপে কেঁপে উঠল। অক্ষুণ্ণ হয়ে সে ডাকলে—“লিপিখ” তার ডাকতনে লিপিখের হেঁচটা সামান্য নড়ে উঠল। মাঝার চূপাশে বালিশের ওপর তার হাত দুটা একতরফে অ-মুদ্র অবস্থায় পড়েছিল। এইবার সে সেই হাত দুটা মুক্ত করে মাঝার ওপর ফুলে মনে গভীর মিনতির তরীতে বললে—“ভালবাস! আমার... প্রিয়তম আমার! আমার ছুঁমি ভালবাসো!”

কর্তব্যর তখন তার অতিমিত্র গানের সুরের মতই বরাবার মনে একটা শ্রুতর সুরের মেল সৃষ্টি করলে। আবেশে—বিস্ময়তার এলারামির সারা দেহ মনে মনে তরে গেল! ... বরকেও মতন পাশাপাশি ছুঁমি দিয়ে তৈরী একাত্ম নিবিচার মনে না হলে লিপিখের সে মিনতি না মেনে থাকতে পারে কখনও?... তার স্বাভাবিক চেতনা আগবার আপসেই সে লিপিখের মুক্ত কর ছুঁমি নিষেধ হাতের মধ্যে নিয়ে তাঁর বেননা আর মোহমাগান ঘবে বললে—“আমি কি তোমার ভালবাসি না লিপিখ?”

উত্তরে লিপিখের বহু মনে কারার ককিরে উঠলো—“না না। ছুঁমি আমার প্রকৃত আদিকেও ভালবাস না! সেই অন্তরেও বলছি প্রিয়তম আমার কারা যেটা প্রকৃত ‘আমি’র হাওয়াই শুধু তাকে না ভালবেসে আমার ‘আমি’কে ভালবাসতে খেপো।”

তার কথা শুনে এলারামির সারা হতভম্ব হয়েই তার হাত দুটা ছেঁড়ে গিলে। লিপিখের অহনয়নাগা স্বর মনে তার সঙ্ঘট মনের অন্তরল অবধি নাড়া দিয়েছিল;—তাই সমস্তের জগৎ মনে মনে তার জগতনামী আকাশ জগত

যেন নিলে।...তার পরক্ষণেই কিছু মাথা নাড়া দিবে মনে তার বলে উঠল—‘কিছু তার প্রমাণ কই?’ আর এর পরেই তার অবচেতন মনের স্বাভাবিক অবস্থা মাথা তুলে উঠল। এই ভয়েই সে লিপিখের শেষ অনুসন্ধানের কোন উত্তর দিতে পারলে না।

লিপি কিছু আহার বলে উঠল,—‘হাতবকে বার দিবে বাছ বড়টাকে ভালবাসা মাড়া মাতি করা তাকে নিয়েই তোমাদের পৃথিবীর মানুষের একটা ধারণা-বসত্য। এটা শুই বাছ তেতা!—বর্ষ থেকে মর্জক তক্ষত করে হাশবার আবহক পর্যবস।—ফেটটা ছায়া, কাটা হল তার আত্মা। আমার এই আত্মা অর্থাৎ প্রকৃত ‘আমি’ অর্থাৎ বিনেব ভক্ত পৃথিবীর ওপর আমার যে প্রতিবিম্ব ফেলছিল ‘বেহাটা’ দিবে সেটা আমার প্রতিবিম্বই শুধু কেনো। প্রকৃত ‘আমি’ তার অনেক ওপরে।’

এলগামি এই সময়ে মাথা তার স্বাভাবিক মনের বল অবস্থানের প্রস্তুতি দিতে দিতে কিংবা পাচ্ছিল। লিপিখের কথাগুলো শুনে তার মনে হতে লাগল এই ত তার সাফল্যের পূর্বদক্ষণ ফুটে উঠেছে।—এই ত সাফল্য লাভের মহেন্দ্রক্ষণ।...কথাটা মনে হতেই সে তার মনে পূর্ণশক্তি বেন করে পেলে। তার মনে হল, আজ যদি সে অস্বাভাবিক আত্মার অভিযেব প্রমাণ না পায়, তবে বৃদ্ধি জীবনে আর কোনদিন তা পাবে না।

মনস্থির করে সে আবেগভরা মিষ্টি হয়ে লিপিখকে বললে,—‘তবে তুমিই আমার হেথির হাত,—লিপিখের হাত লিপিখ, কেনন করে আমি সত্যিকারের ‘তোমাকে’ দেখতে পাব?—ভালবাসতে পারব? তুমি এববার আমার চোখের সামনে ফুটে ওঠো,—যেখি আমি তোমার সে চিত্ররূপ কেনন?—কত সুখের তা?—হয় ত তোমার সে আত্মার ধীপ্তি আমার মেবে ফেলবে,—কিবা মরণ বলে কিছু নেই-ই যখন, তোমার মতে তখন হয় ত আমিও তোমার মতই ধীপ্ত হয়ে উঠব। আর তখন তোমার সে সৌন্দর্য উপভোগও করতে পারব—হয় ত চর্চচক্ষেও দেখতে পাব।—আটের ওপর তোমার অবস্থা আমার মধ্যে যে অজ্ঞানের আবরণ রয়েছে সেটা ত ফুটে যাবে! তোমার আমার দুয়োহুই হয়ে দাঁড়াবার

সুযোগ হবে ত?—তোমার এত সুখের দেখটা যদি সত্যিকারের ‘তুমি’ না হয়, তবে যেখান আমার তোমার সত্যিকারের ‘তুমি’র অতুল তপস্কোক্তি।...এস আমার চোখের সামনে লক্ষীটি।’

কথগুলো বলে সে আগ্রহের লিপিখের দেখটার দিকে চেয়ে রইল। প্রতি মুহূর্তেই সে আশা করছিল—হঠাৎ হয় ত দেখটার একটা অতি আশ্চর্য রকম পরিবর্তন হয়ে যাবে! হয় ত বা তাকে এমন একটা ধীপ্তি ফুটে উঠবে, যা অলৌকিক। আর তা যেখতে গিয়ে হঠাত তার চোখের দৃষ্টান্ত দ্বারিবে যাবে,—টিক সেদিন মুহূর্তের জন্য বেহাটকে বেগে যেমন হয়েছিল তার।

বেচারা এলগামির আশা কিছু অপূর্ণই হয়ে গেল,—লিপিখের দেখের কোন পরিবর্তনই হল শুধু মনে হল তার শাস-প্রশাস স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশী ক্ষত হয়েছে, এইমাত্র আর কিছুই নয়। আর, লিপিখের হাত ফুটোও যেন এবার একটু নড়ে উঠল কিছু পরক্ষণেই যেমন ছিল তেমনি হইল নিশ্চল হয়ে।

দুহুধরে লিপিখ বললে,—‘হ্যাঁ, আমি আসব।...কিছু তার আগে, তুমি...তুমি তার উপস্থিত হও।’ তপস্বানের উপাসনা কর...প্রাণ জরে তাঁকে ডাক... তাঁর আশীর্বাদ পেলেই সব মিছ হবে কেনো।’

একটা ধাক্কা বিরক্তিতে বেন এলগামির মনটা জবে উঠল। লিপিখের শেষের কথাটা শুনে। মনে হল তার,—‘তপস্বান?—এর সকে তাঁর লক্ষ্য কি?...আমাদের পরস্পর পরস্পরকে দেখতে চাইলে কেনই বা তাঁকে তার মাঝে বাধতে হবে?’

বেন তার এই মানসিক চিন্তার অব্যবহিত লিপিখ বলে উঠল, ‘তিনি যে ইচ্ছাময়, লক্ষ্য জ্ঞাতা!’

লিপিখের কথাটা বেন আরও অনুরোধে একাত্মানে বলে উঠল বলেই এলগামির মনে হল,—বেন একা লিপিখের স্বর নয় সেটা!

ইতিমধ্যে এলগামি লিপিখের হাত ছুঁবার নিষেধ হাতের মধ্যে বরে রেখেছিল এই কথাগুলো বলার পর সে বেন সেই ধরে রাখা হাত ছুঁবার ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল। কিন্তু এলগামি তার সে চেষ্টা ব্যর্থ করে হাত ছুঁবার ধরেই রাখল। আগ্রহ-ব্যাকুল হয়ে এলগামি

তাকে প্রেরণ করল,—“কবে তুমি আসবে লিলিথ!... আজই এগ নঃ? আমার অন্তঃকর্মেব কষ্ট বেরী করবার করবার কি? ...বল, বল লিলিথ! আমার কেবল এক; আমার লিলিথ!”

বৃহত্তমের বাবা দিগে লিলিথ বললে,—“না, না—উপবাসের—এক উপবাসের লিলিথ!”

কথাটা শুনে এলগামির বড় রাগ হল, লিলিথের হয়ে রাখা হাত দুটো তার মাথার বালিশের ওপর এমন ঝেঁক দেইভাবে রেখে দিলে। তারপর নিজের দুবার ইচ্ছাকৃত পূর্ণ প্রয়োজন করলে সে, পলকবীন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লিলিথের দিকে চেয়ে থাকে কতক্ষণ। লিলিথের বুকে রাখা বড় চুনিটার ওপর টমৎ চাপ দিগে আগের মত আগেরের পরে বললে সে,—“লিলিথ! আমার কথার উত্তর দাও!...কবে তুমি আমার সামনে আত্মপ্রকাশ করবে বল?”

তার ইচ্ছাকৃত প্রয়োজনের পরই লিলিথের সাধা বহু বর বর কবে কাঁপছিল। এবার এলগামির প্রেরণ শুনে দীর্ঘ কাল কঠে উত্তর দিলে,—“তুমি আমার বেশবার মতন হয়ে উঠলেই আমি আসব।”

“এখনই ত আমি তার উপযোগী হয়েছি,—তৈরী হয়েছি বেশতে। আমার কি করে তোমার বেশবার মত হব?”

“না, না। এখনই নয়!...এখনও তৈরী নয় তুমি। তোমার প্রেম এখনও প্রবল, দুবার হয়ে গঠেনি!... ঝাঁট দাও নি তুমি, নির্বল নয় প্রেম এখনও তোমার!...

বৈধব্রত...অপেক্ষা কঃ? আর সেই সময়টার উপবাসের উপাসনা করে কাটাও! তা করবার পর সত্যি বখন উপভুক্ত হবে, সত্যি বখন আমার তোমার দেখা দেখার সময় হবে, তখন তুমি তার সংকেত পাবে!... প্রিয়তম, আমার কাধকে ছেড়ে, বাস্তব আমিকে ভালবাসতে শেখো, তবেই আমার দেখতে পাবে।”—বলতে বলতে স্বয়ং তার বেগে গেল। সেই সঙ্গে তার দেহের সৌন্দর্যবোধিত বেন নিতে গিয়ে তাতে একটা স্নানিমা হুটে উঠল।

হঠাৎ লিলিথের দেখটা এমন রান হয়ে বাবার মানে কি, এলগামি তা বুঝে উঠতে পারলে না। ব্যাকুল হয়ে সে তাকে উঠল,—“লিলিথ! লিলিথ! যদি সত্যি আমার তুমি ভালবেসে থাক, তবে এমন করে এতুনি আমার কাছে থেকে সরে যেয়ো না। আরও,—আরও কতক্ষণ থাক তুমি আমার কাছে!”

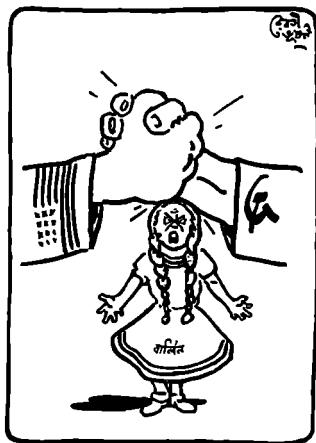
বে আত্মা লিলিথের বেহেব মধ্যমে কথ’ কইত, সেহিন লাগা বাতের মধ্যে আর তার লাড়া পাওয়া গেল না।

দীর্ঘ দীর্ঘ প্রত্যাহারের আলো পুনঃ হয়ে উঠছিল। সেই আলোতে দেখা গেল, এলগামি বিত্তর ছবির সামনে হাট্ট পেড়ে বসে আছে। এ তাব বসে এলগামি কিছু তখন বিত্তর উপাসনা করছিল না। সে সেই ছবির দীর্ঘের দেখা—‘তোমাদের মতে আমি কে?’—এই প্রশ্নের উত্তরই বনে মনে খুঁজে বার করতে চাইছিল।

[ক্রমশঃ



জেনে রাখা ভাল



পাছের পয়সার

ঐতিহাসিক

যেই তার ঐতিহাসিক
হাসিন্দা: জানেন যে
সকল বইই বই
যাও পঠিত যাবের ভাগ
করা যায় না। এই বই
কিন্তুকের বলা হয়
পত্রাণু। ইংরেজ
বিজ্ঞানী ডাঃ টম
সাহেবেরও মত ছিল যে
পত্রাণুকে ভাগ করা
যায় না। কিন্তু পরে

যেহা সেল যে পত্রাণুকে ভাগ করা যায়। পত্রাণু
কতগুলি অতি ক্ষুদ্র কণিকা দ্বারা গঠিত। এবার
তাদের কথা আলোচনা করা যাক।

পত্রাণুর মধ্যে দুইরকম অতি ক্ষুদ্র বৈদ্যুতন কণা থাকে।
এক জাতের বৈদ্যুতন কণা পজিটিভ বা হ'ল-ধর্মী, আর
এক জাতের বৈদ্যুতন কণা নেগেটিভ বা না-ধর্মী।
পত্রাণুর আকারে ট্রিক সৌরমণ্ডলের মত। সৌরমণ্ডলের
কেন্দ্রে সূর্য রয়েছে এবং গ্রহরা তার চারদিকে ঘুরছে।
সেইরূপ পত্রাণুর কেন্দ্রে হ'ল-ধর্মী বৈদ্যুতন কণা: অবস্থান
করে এবং এই কেন্দ্রস্থলের চারদিকে ঘুরছে না-ধর্মী
বৈদ্যুতন কণা:। পত্রাণুর কেন্দ্রস্থলের নাম নিউক্লিয়াস।
এই হ'ল-ধর্মী বৈদ্যুতন কণাদের বলে প্রোটন আর না-ধর্মী
বৈদ্যুতন কণাদের বলে ইলেকট্রন। প্রোটনের ওজন ধরে
নেওয়া হয়েছে ১ আর ইলেকট্রনের ওজনটা পণ্যের
মতোই নয়। কিন্তু প্রোটনে বসেই বৈদ্যুতন রয়েছে ট্রিক
সেই পরিমাণ বিপরীতধর্মী বৈদ্যুতন রয়েছে ইলেকট্রনে।
বৈদ্যুতনের ধর্ম অনুসারে প্রোটন ও ইলেকট্রনের মধ্যে
আকর্ষণ হয় কিন্তু প্রোটনের প্রতি প্রোটনের এবং
ইলেকট্রনের প্রতি ইলেকট্রনের মতাবগত বিকর্ষণ আছে।

পত্রাণুর কেন্দ্রস্থলে আরও একপ্রকার কণা দেখা যায়
যাও হ'ল-ধর্মীও নয় না-ধর্মীও নয়, তারা সামান্যই।
এই বিদ্যুত-ধর্ম-বলিত কণাদের বলা হয় নিউট্রন।
এরা ওজনে প্রায় প্রোটনের সমান। প্রোটন যেমন

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

পরমাণুর কথা

ডঃ সাল বন্ডোপাধ্যায়

০

ইলেকট্রনকে টানে এ
ভেদে টানে: পারে না
অর্থাৎ বৈদ্যুতিক শক্তির
প্রভাবে টানতে পারে না
আবার প্রোটনকে টেলে
কেন্দ্রে দেখার প্রয়াসও
এই মেই।

পত্রাণুর কেন্দ্রস্থলে
বসন্তলি প্রোটন আছে
ততগুলি ইলেকট্রন তার
চারদিকে ঘুরপাক
খাচ্ছে। অজিহেন ম্যাসের

পত্রাণুর কেন্দ্রস্থলে আছে আটটি প্রোটন ও আটটি
নিউট্রন আর তার চারদিকে ঘুরছে আটটি ইলেকট্রন।
পৃথিবীর সবচেয়ে ছালা গ্যাস হাইড্রোজেন। তার
পত্রাণুতে আছে একটি প্রোটন আর ঘুরছে একটি
ইলেকট্রন।

বিভিন্ন পর্যায়ের পত্রাণুরা ভিন্ন ভিন্ন তাদের
প্রোটনরা ভিন্ন মত, তারা এক:। কেন্দ্রস্থলে প্রোটনের
সংখ্যার উপর নির্ভর করে এটি কোন পর্যায়ের পত্রাণু।
সেইরূপ বিভিন্ন পত্রাণুর ইলেকট্রনরাও এক।

ইলেকট্রন না-ধর্মীই হয়। কিন্তু এমন এক জাতের
কণা বরা পড়েছে যারা হ'ল-ধর্মী কিন্তু ওজনে ইলেকট্রনেরই
সমান এবং বলা হয় পজিট্রন।

পত্রাণুতে হ'ল-ধর্মী ও না-ধর্মী বৈদ্যুতন কণার সন্নিবিষ্ট
করে আছে। যদি কতগুলি ইলেকট্রনকে সরিয়ে আনা
যায় তাহলে হ'ল-ধর্মী বৈদ্যুতনের চার্জ হয়ে পড়বে।
তখন ঘিরে কাঁচের গায়ে যদি দবা হয় তাহলে কাঁচের
থেকে কিছু ইলেকট্রন যেনেবে চলে আসবে। তখন
কাঁচে ইলেকট্রন কমে যোগার হ'ল-ধর্মী বৈদ্যুতনের
প্রাধান্য হবে। কাঁচ ও তখনে হবে আকর্ষণ।

ছোট প্রোটনের পরমাণুর প্রতি বিপরীত বিপর্যয়।
তাহলে পত্রাণুর কেন্দ্রে একাধিক প্রোটন কি করে
থাকতে পারে? হাইড্রোজেনের পত্রাণু কেন্দ্রে একটি
প্রোটন অবস্থিত। অতএব পত্রাণুর কেন্দ্রস্থলে যদি



‘এমন ছেলেকে
সানলাইটে হলে...’

‘এমন ছেলেকে সানলাইটে হলে আপনার কাঁধের দারি অস্ত্র
বেই...! বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের যদি ফিউকটি রাখতে
চান, তা’হলে কাপড় কাচাটাতো লেগেই আছে।’
‘সানলাইটে কাচি, তাই বন্ধে! শুধু গেরে উঠছি সানলাইটের
যেদার ফেনাফ কাচাটা খুবই সহজ বলে। কেবল এমন বাঁটি
সাবানাই এত ভাল কাপড় কাচা যায় আর তাও কোন
কষ্ট না করে।’

৪০ গ্রাম ট্রাফে, চমৎকারি বার্বেট, বহু
কিনীর জিনিসী ওয়াশজানি করেন,
‘কাপড় কাচায় সানলাইটের ছাড়া এত
ভাল সাবান আর হয় না।’

সানলাইট

কপড় জামার সঠিক যত্ন নেয়!



একাধিক প্রোটিন না থাকতে পারত তাহলে হাইড্রোজেন ছাড়া আর কোন পদার্থ পৃথিবীতে থাকতে পারত না। কিন্তু পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে একাধিক প্রোটিন থাকতে পারে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে দুটি প্রোটিন খুব কাঁচে গিয়ে পৌঁছলে তাদের টেনসারেলি আর থাকে না। তখন তাদের টেনে রাখবে শক্তিই বেশী ক্রিয়া করে। এই শক্তিই প্রোটিন, নিউট্রন ওডককেই টেনে রেখেছে পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে।

পরমাণুর কেন্দ্রস্থল ইলেকট্রনের আকর্ষণ করে। তাহলে ইলেকট্রনরা কেন কেন্দ্রস্থলে গিয়ে এঁটে যায় না? ঠিক যে কারণে পৃথিবী সূর্যের কাছে গিয়ে এঁটে যায় না এখানেও তাই হয়। সূর্য্যে সৌর্যের বেগ তাদের তাকতে রাখে। পৃথিবীর সৌর্যের বেগ বেশি হলে টানের বান হিঁড়ে পুড়ে যেত। বেগ হ্রাস হলে সূর্যের কাছে গিয়ে পড়ত। পরমাণুর বেলায়ও ইলেকট্রন যখন কেন্দ্রস্থলের কাছে আসে তখন তার গতিবেগ বেড়ে যায়। আর হ্রাস যখন চলে যায় তখন গতিবেগ কমে যায়।

অনেক বিজ্ঞানীদের ধারণা এট যে ইলেকট্রন যদি একই পথে চলিত তাহলে তার শক্তি ক্রমে ক্রমে কম হত এবং সে গিয়ে পড়ত কেন্দ্র-বস্তুর উপর। এটা হয় না তার কারণ ইলেকট্রনের চলবার পথ একাধিক।

পরমাণুতে যতগুলি প্রোটিন আছে সেই সংখ্যাটাই পরমাণুর আণবিক সংখ্যা। প্রোটিন এবং নিউট্রনের সংখ্যা যোগফল বা তাই হচ্ছে পরমাণুর ওজন।

কতগুলি পদার্থ আছে যাঁরা নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। এই সব পরমাণুর বলা হয় তেজস্ক্রিয় পদার্থ। এদের পরমাণুর ওজন বেশ ভারি। পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে প্রোটিন ও নিউট্রনের সংখ্যা খুব বেশি। আপন তত্বশিল সাধারণতঃ না পারাত একেই কেন্দ্রস্থল থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি বহির্গত করে দিয়ে যায়। এইরূপে পরমাণু হালকা হতে থাকে এবং ক্ষয় পরমাণুর পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়। এইরূপে পরমাণুর রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব। যেমন ইউরেনিয়াম দ্রাব্য বৈদ্যুতিক শক্তি বিকিরিত করে হালকা হয়ে রেডিয়ামে রূপান্তরিত হয়, আরো হালকা হয়ে পোলোনিয়াম, অবশেষে দীর্ঘকাল পর্যন্ত হয়। এই

তেজস্ক্রিয় ধাতাই নানা রকম মারণাস্ত্র তৈরী হচ্ছে আরো মানবজাতির মঙ্গলজনক কার্যও হচ্ছে।

তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নানা রকম তেজস্ক্রিয় রশ্মি বেরোয় যেমন, আলফা রশ্মি, গীটা রশ্মি ও গামা রশ্মি। যে সব পদার্থ তেজস্ক্রিয় নয় তাদের মধ্যেও কৃত্রিম উপায়ে তেজস্ক্রিয়তা আনা যায়। এই সব পরমাণুর কেন্দ্রস্থলকে যদি আলফা রশ্মি ধারা আঘাত করান যায় তখনই তারা তেজস্ক্রিয় বর্ণা হয়ে উঠে। এইরূপে প্রায় সকল পদার্থকেই তেজস্ক্রিয় বর্ণা করা সম্ভব হয়েছে এবং পৃথিবীতে পাওয়া যায় না এমন অনেক পদার্থও সৃষ্টি করা হয়েছে পরমাণুগারে।

কোন পরমাণুর কেন্দ্রস্থলকে আলফা রশ্মি ধারা আঘাত করে সেই পরমাণুর আইসোটোপ ও সৃষ্টি করা যায়। আইসোটোপ কি? কোন পরমাণুর পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে নিউট্রন কম বেশি হলেই সেই পরমাণুর আইসোটোপ সৃষ্টি হয়। কোন পরমাণুর সঙ্গে তার আইসোটোপের পার্থক্য কেবল পরমাণুর ওজনে এবং এজনের উপর নির্ভরশীল মর্মে। কোন পরমাণুর রাসায়নিক ধর্ম তার আইসোটোপের রাসায়নিক ধর্ম। পরমাণুগারে সকল পরমাণুরই আইসোটোপ সৃষ্টি করা হয়েছে।

১৯০৯ সালে জার্মানীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অটো হান ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রস্থলকে নিউট্রন ধারা আঘাত করে দেখলেন যে কেন্দ্রস্থল প্রায় সমান ছুঁতালে ভাঙ হয়ে গেল। একে বলা হয় "ফিশন"। "ফিশন" যখন হয় তখন প্রচুর শক্তির উৎস হয়। এইরূপে বস্তু থেকে শক্তিতে রূপান্তর সম্ভব হল। অটো হানের এই আবিষ্কারের ফলে পরমাণুর শক্তিকে কাজে লাগানোর পথ খুলে গেল। পারমাণবিক বোমার এইভাবে পরমাণুর কেন্দ্রস্থলকে ভেঙে খুব অল্প সময়ে প্রচুর শক্তির সৃষ্টি করা হয়।

যদি থেকে শক্তিতে রূপান্তরের একটা সম্ভব আছে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন দেখিয়েছে যে

শক্তি = বস্তু × দ্রুতগতির বস্তু থেকে বস্তু শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। এইরূপই সূর্যের মধ্যে প্রচুর শক্তির উৎস হচ্ছে।

বাস্তবতার পূর্বকেন্দ্রে
 সুললিতাির মধ্যে বাগা
 করবার চেষ্টা করছিল দুটো
 মানুষই পানী। বিজ্ঞান কাগি-
 সূত্রি যোগাড় করে ফেললে।
 মেয়ে পাখীটি বাসা সাজাচ্ছে
 পুত্রবটি ক্রমাগত হাসিমুখা
 যোগাণে ঘিরে আছে। কি
 অমলস অমলস সাহা!
 সাঝাতে গিয়ে প্রোহই একটি
 ছুটি কাগি, হাসপাতা পড়ে
 আছে, পুত্রব পাখীটি তখনই
 নেওদা উঠিয়ে দিলে।
 একবার তোসন্ত তৈরী পুরো
 বাসাটাই পড়ে গেল! পাখী-
 দুটি এবার একটু বিচলিত



হয়ে পড়ল যেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেদের ভাবার কিছু
 মিচ ইত্যাদি আশার বাণী বলাবলি করে নব উত্তবে নতুন
 করে বাসা তৈরী করতে সেগে গেল। এখন কি মেয়ে
 পাখীটির অবিস্মৃতিভাবিতোই বে বাসাটি অমন বেয়কা
 পড়ে গেল তাতে পুত্রব পাখীটি একটুও বিরক্ত হয়েছে
 এখনকমও যেন হল না। অনাগত সন্তানবের জন্যে এই
 ছুটি ভাবী অনন-অননীর কি অস্বস্তি ব্যস্ততা।

বাস্তবতার একপাশে একটা তারী আরাধকেরাচার বলে
 কেমন একটা প্রেমমিশ্রিত ঔষাক্ত ভাবা দুটি নিয়ে জেবে
 কার্ণকলাপ লক্ষ্য করছিলেন মিসেস ইন্দুমতী মৈত্র এন-এ.
 বিক্টি—বাণী হীরাবতী পার্লস কলেজের অবলম্বিত
 অধ্যাপক। অবসর অগত্বে মেবার বয়স এখনও তাঁর ঘর নি,
 কিন্তু নিতে হয়েছে ডাক্তারের নির্দেশে। হাই স্ট্রাট
 প্রেসারে ভুগছেন তিনি। কালের পরে কিছু কিলসফি
 বিষয়ক একটা বই বেলা পড়ে আছে। বইটা না পড়ে
 ওদের কাণ্ডকারখানা দেখছেন তিনি। নিয়মের ব্যতিক্রম
 হয়ে থাকে। এখন এসব স্ত্রীছাড়া কাণ্ডকারখানা স্পেসবার
 কথা নয়। লক্ষ্যাল বেলা চুটা থেকে চুটাং মধ্যে কিছু
 কিলসফি একটা চাপটীর খেব করবার কথা। তারপর

পতিতঘণ্টাই আসবেন
 তাঁর সঙ্গে ষষ্ঠাধানে
 সংযুক্ত কাবা আলোচন
 চলবে। তারপরেও গ্লি
 করা আছে কি করবেন
 কীমতটকে একটা ছকে বেঁ
 কলেছেন ইন্দুমতী। যদি
 কাটাং সঙ্গে মিলিয়ে কাজে
 তটিন চলে তাঁর। পা
 মিনিটটও বেগংহর এটি
 ওদিক চর না। নিম্নাং
 বহিততা ইন্দুমতীর কীবা
 একটা প্যামান হা
 ই! কি রেছে নিচমে
 এতটুকু ব্যতিক্রম ত্রি
 সইতে পারেন না।

কিন্তু দিনকতক থেকে যে কি হয়েছে সব কিছুতে
 একটা নিমিলিতা আসব আসব করছে। এ কথাটা নিয়ে
 কাছে কীকার না করে পায়েন না ইন্দুমতী! কিন্তু, আ
 আসবই করছে। আসতে তিনি কিছুতেই খেবেন ন
 এ সব প্রকৃতিকে কঠোর হয়ে শমন করবেন ইন্দুমতী।

এই যে আজ যেমন পড়তে পড়তে চুটুই পাখী বেশ
 পরত যেমন তাইটো লিখতে গিয়ে উলাং হয়ে তবে
 থাক। অবস্ত্র অলস ভাবনা-চিন্তারও প্রবোজন আ
 কীবনে। এতে মনের ব্যস্তা বন্ধা হয়। সেইকেনো তাঁ
 বৈমল্লিক কাঞ্চন্যে এর কনোও একটা; পঁয় নির্
 রেখেছেন। লভ্যাংবেলা চুটা থেকে বটা পর্যন্ত বই
 বাগানে শুণু চুপচাপ বলে থাক। তখন আর কোন ক
 নয় বা কারও সঙ্গে কথা নয়।

কুতা হরিয়া তাঁটা হাতে ব্যস্তাংকার এসে পাখী
 হেলবটা এক নকরেই বৃষ্টি নিয়েছে। আর একটুকু
 কেবী না করে আঁকসী নিয়ে হাফিট হয়েচে। এ ব্যা
 বিল বছরের ইতিহাসে এরকম বেয়াংলি বরগত ক
 নকীর নেই। বরং কতী যে এখনও হাঁক পাড়েন নি এ
 চুপ করে বলে ওদের কাঞ্চল্যাপ সেবে বাছিলেন, তা

আশ্চর্য হল হরিয়া। তবে সেই মাঝাত্তা আমলে ইন্দুমতীও তাই কি পিসির কাছে ছুটি কাটাতে এসে একবার একটা বেয়াল ছানা খুঁবেছিল, তাই কোনরকমে নাক টিপে সব কবেছিলেন ইন্দুমতী। তাই কি চলে বাবার পরদিনই জকে বিচার করে ফেন।

হরিয়া আঁকসিটা ভাল করে বাগিয়ে বাসাটা ভাঙতে বাজিল, ইন্দুমতী বাধা দিলেন।

শ্যাক না হরিয়া। দেখেই না কি করে শেষ পর্বত গয়া। হয়তো এমনিতেই বাসাটা কেঁকে বাবে। আর, হতধিনই বা থাকে ওয়া, ব্যাডা হলেই উড়ে চলে বাবে।"

করুণহটা। কেমন রাস্তা বিধায়ন।

এবার পড়িই আঁথকে ওঠে হরিয়া। বাড়িতে বসেই বসে বসে। গুলোবাগি, কোন রকম হিন্দুখলা সব ফেরে না ইন্দুমতী। একনো মাঝে মাঝে হরিয়াকে কম খেয়েছিল হতে হয় না। কিছু কিছুদিন থেকেই সে একটা হরিবর্তন লক্ষ্য করতে ইন্দুমতীর মধ্যে। অনেক বেন মলে গেছেন তিনি। ঐ ভাড়াটে বাবুর চলে বাবার পর থেকেই এটা হয়েচে বেশ বুঝতে পারত হরিয়া। অথচ চারাতো কেউ আপনজন ছিলেন না। আর ইন্দুমতীও ব বিশেষ আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন তাও নয়। সে হতাবই নয় ইন্দুমতীও। বহু বেন বিরক্তই হতেন মাঝে মাঝে তাদের ওপর, এটা বেশ বুঝতে পারত হরিয়া।

হমানাথ মৈত্রেয় হুতুর পর বাড়িটা বেন বড় বাগি গুলি লাগতে লাগল। লজানাবি হয় নি। বাড়িতে স্নাক বলতে তিনি আর চাকর হরিয়া। অবস্ত চাইলে জ্ঞানেন্দ্র লোকের অতাব হত না ইন্দুমতীর। স্বামীমূলে কিছুমূলে স্বামী-বন্ধনের অতাব নেই। তিনি বললে :কত না কেউ এসে থেকেই বেতে পারে কিছুদিন করে। স্বাকার আশীর্বাদ ছ' একজন আছেন। কিন্তু কায়ত কাছে হুঁপতা একাধি করা অতাব নয় ইন্দুমতীর। মনে হল, একবড় বাড়িটাতে। বাগিই পকে আছে, একটা দিক গার্ডিয়ন্স করে ভাড়া দিলে বস হয় না। একটা নির্দিষ্ট মাসও হয়। অবস্ত চাকার যে তাঁর বিশেষ প্রয়োজন তা নয়। বা আছে তাতে ভালই চলে যায়। তবু তখন াকার কথাটাও বিশেষ করে মনে হয়েছিল। ব্যবস্থা হয়ে দল। সুবিধে মত ভাড়াটেও খোঁসাড় হয়ে গেল। ছোট

পরিবার। স্বামী-স্ত্রী আর ছোট একটি ছেলে। চিরকালই কামেলা ভালোবাসেন না ইন্দুমতী। বাড়ি ভাড়া বিচ্ছেদ বলে বে নতুন করে কামেলা টোকাবেন বাড়িতে, তা নয়।

ওদেরও বাড়িটা বেশ পছন্দ হয়ে গেল। সব কিছুই আছে ছোটর মধ্যে। তারপরে বহিরীণী একজন মহিলায় স্মারিতা পাওয়া বাবে সেটাও কম কথা নয়। বসেই মেহাতাই হলে মাহুয়। এই বাইব তেইল হয়ে বড়ঝোত। স্বামীর টুয়ের চাকরী, মাসের মধ্যে ৬৭ দিন টুয় থাকেই। তখন একেবারে একলা বাড়িতে বসে বসে করে। ওয়া এই তকমই একটা বাড়ি চাইছিল, যাতে নিছক একলা না থাকতে হয়। ভাড়াটাও তেমন কিছু পায়ে লাগার মত নয়।

মাসের প্রথমেরই এসে গেল ওয়া। চার পাঁচটি টেলো করে ওদের ভিনিয়গজ এসে। দুটি মাহুয়ের পকে মাল কিছু কম নয়। এই তো সবে ও বড় সংসারে ঢুকছে ওয়া, এইই মধ্যে ভিনিয়গজ কিছু কম সংগ্রহ করে নি। দুটো কুলি নিয়ে সারাদিন বৈ-টে করে বাড়ি পোছাতে লাগল ওয়া।

ইন্দুমতীর কেমন মনে হল, বেন তাঁর বাড়ির প্রতিটা কিছুটা নই হয়ে গেল। একজন বৈ-টে করে কাজ কর এ বাড়িতে কেউ কখনও করে নি। বাড়িতে অনস্বাধ্যম হয়েচে—কিন্তু সে অন্য ভাবে। ইন্দুমতীর সহকর্মিনীরা প্রায়ই আসেন, আসেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা। স্বর্ণপত স্বামীর বন্ধুত্ব আসেন মাঝে মাঝে। তাঁদের সঙ্গে উচ্চাঙ্গের আলাপ আলোচনা হয়ে থাকে। কখনও কখনও তাঁদের চা-পানে, নৈশ-আহারে আগ্রহিত করেন ইন্দুমতী। কিন্তু তাঁর বাড়িতে সব কিছুই নিতরো অনুশ্রমে হয়ে থাকে। অবস্ত মনের এ ভাবকে প্রেরণ না দিয়ে প্রচুর হবারই চেষ্টা করলেন তিনি। তা, কখনো বৈকি, প্রথম দিন বাড়িটা প্রিকটাক করতে একটু ব্যস্ততা আসবেই।

'কৈ গো কোবারা বাম্বাটা বরা' ইন্দুমতীর সকালটা আনন্দাল এই রকম করে শুরু হয়। তিনি এখন পুজোয় বসে থাকেন তখন ওদের বাজার আসে। ইন্দুমতীর পুজো অবস্ত ঠাকুর সালিয়ে বাসা ঘুলিয়ে দুপ চমকের বটা-পটার নয়। সংবত মাস পুজো তাঁর।

। আশুভিক

ইন্দুভতী একে ঈশ্বরের আরাধনা বলে থাকেন।

কোন স্মৃতি নেই, কেবল কয়েকটি সহঃপুরুষ ছবি টাঙানো আছে। একটা ছোট কাঠের পাশে পালি করা চৌকিতে ধবধবে সাফা টেবলরূপ পাভা। তার ওপর মোরারাবাদী পিতলের রেকাবীতে টাইকা কুল বাধা থাকে। ইন্দুভতীর নিজের বাগানের ফুল। মাগী রোষ সকাশে রেখে দায়।

ভরসাক বাহারটা এনে হাওরার এক পাশে বেগে বিলেই পারেন, তা নয় রোজ সকাশ বেলা এই টেজানেচি। ব্রী বতকন না এসে বাহারের পলিটা হাত থেকে নেবেন ওতকন ঠার বাড়িয়ে থাকবেন। এত আবিখোতাও মাহুনের আসে! ইন্দুভতী এটাকে আবিখোতাই বলে থাকেন যেন মনে।

‘আজ কালি ক্রাপ একদানা মুড়ো এনেছি। বাসা করে ছ্যাচকা। বাঁধো বেগি? বগনি ছ্যাচকা বাওয়া হর নি তাই মুড়ো বেগে আর সোত সালসাতে পাইলান না!’
—এক পাল হাসলেন বামী। ‘তা ছ্যাচকা তো বাবে, এবিকে হলো শাক-ফুন্ডে-বেগুন এদব তো কিছুই আনো নি?’

‘ওহ, ছ্যাচকা করতে এ্যাতো কিছু লাগে? তাতো আবার আনা ছিল না। এগুনি এনে বিছি.....’

‘না না এগুনি আবার বাহারে বেতে হবে না, চা-টা বেগে তবে বেও...’

পুছো করতে করতাই (প্রথমে দীতা থেকে কিছু পাঠ করেন তারপর বাহা বাহা উপনিষদের কয়েকটি দ্রষ্ট আয়ত্তি করেন। দিহক কাঁকা আয়ত্তি নয়, বীতিমত অগ্ন্যায়ন করে তার অর্ধ ফরফর করে পাঠ করা। ইন্দুভতীর সংস্কৃত উচ্চারণও চমৎকার।) ট্রাট আর নাকের একটা বিহিন্ন ওদা করেন ইন্দুভতী। পাং সকাশটা এরা গুহু শাকচকড়ির গর করেই কাটায়ে দেবছি। বেবা দাক আরও কতকন চলে! দূর্ণত মাহু-অর এরা শুধু বাহা বাওয়া আর বাওরার গর করেই খেণ কাটিয়ে দিল।

ইন্দুভতীর মতে, বেহেতু বাওরাটা একটা নিত্যতাই বৈবিক প্রচোখন, এর মধ্যে বতটা কম সবর দেওয়া বেতে পারে ততটাই বেওয়া উচিত। বামী রমানাথ বৈর

ইন্দুভতীর এ অমুশাসন (অগ্রান্ত অমুশাসনের মতই) নেনে নিষেছিলেন। মুতরাং তাঁর জীবিতকালে এ বাড়িতে হাজার পদপলি নিত্যতাই সাধা দিখা ছিল।

শিঙ্গাছা বাওরে দিকেই ইন্দুভতীর ষ্টোক ছিল বেনী। বেটুই মশলা ব্যবহার করা হত সেটুই না বিলেই নয়। ইন্দুভতীর ডাইবেকপনে কৃত্য হরিয়া এইসব হাজার একেবারে এগুণটি হতে গিয়েছিল। তবে শেষের দিকে বাওবর রমানাথবাবুর মুখোচক বাওরে দিকে একটু ষ্টোক হয়েছিল। তাই বহু-বাওবর বাড়িতে গিয়ে মাঝে মাঝে মূষ বলে আসতেন। তবে দীর্ঘদিনের অনভ্যাসের ফল তেল-দিন-মশলা একেবারেই সঞ্চ হত না; তার ফলে ইন্দুভতীর কাছে বহুনি ওনতে হত। শেষে ইন্দুভতী গ্রিক করলেন বাড়িতেই একটু মূষ বলের ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু সেটা একটা বিফলতা হয়ে ঠাকাল। দীর্ঘদিনের অনভ্যাসে চাকর হরিয়া এবং তিনি দু’মনেই তেল-মশলার প্রয়োগ প্রায় কুলে গিয়েছিলেন ফলে বাহা বা ঠাকাত তা বিয়ে মূষ বলান দুইর দাক, গল-বাকরণ করা হার হত। কাচকলার চপ খোঁকার ভালনা ইত্যাদি করবার চেষ্টা করেছিলেন ইন্দুভতী—কিন্তু যেতে বলে তাহের বিকে এমন জাবে চেয়ে বেখতেন রমানাথবাবু যেন তার পাচ্ছেন। এ সব ইন্দুভতীর বৃত্তি এড়াই নি। শেষে বিফল হয়ে তিনি এ চেষ্টা ছেড়ে দেন।

তবে মশলাযুক্ত কয়েকটি বিশেষ বিশেষ পদ হরিয়ার বেশ রপ্ত করা ছিল যা বিয়ে ইন্দুভতী অতিথি আগায়ন করতেন।

ইন্দুভতী এবং রমানাথবাবুর একটি বিশিষ্ট বহুযতনী ছিল বাওর তঁরা মাঝে মাঝে চা-পানে এবং নৈমিত্তিকভাবে আগায়িত করতেন। অন্যত বাওরাটা গুহুই উপলক্ষ্য, আগল উদ্বেত ছিল একটু মিহিবিগি পরিভ্রমণে উচ্চাধের আলাপ-আলোচনা করা। কিন্তু বিষয়-মুখে দানানোমে, উচ্চাধের আলাপ-আলোচনা তঁাদের কাছে খুবই সোতমীর ফলেও ইন্দুভতী পরিচালিত উচ্চাধের বাওরা হাওরাটা তঁরা গ্রিক বসায় করতে পারেন নি। কারণেই ইন্দুভতীর নিমন্ত্রণ পেলে বহুযতনী বাড়িতে দ্বিতীয় বকা আহারের ব্যবস্থা থাকতেন।

ওহে হাজার বেতে ভিন্ন আকার পদ ভেসে এলো।

অবশ্যি তিহ তাক্য সিরে চা বাওরা হবে। জোরে জোরে নীড়ার গোক পাঠ করতে লাগলেন ইন্দুভতী। কি জানি আরও কি শুনে ফেলেন শেষে। সত্যি এতর ভক্তে ইন্দুভতীর পুজার ব্যাঘাত হতে শুরু করেছে। এদের দাবী-দ্রোহে হাশপতা আশাপ-আলোচনাটা সপ্তমে বাধা থাকে সব সময়ে; কাজেই না শুনে উপায় নেই ইন্দুভতীর। উর্দো-বের মধ্যে হয়ে একটা প্যাঁচিলের আড়ালে আর কতটা ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারে!

‘হ্যাঁ পা, তুমি কিছু বলে না? কেন্দ আমাকেই বলে!’ দাবীর গলার দরটা বেশ গর গর।

ইন্দুভতী পড়ছেন—বসন্তা ধর্পাহতি……‘আঃ, কি হচ্ছে বলতে?। হানিহা ওখিকে শুনেতে পাবেন যে?’

আঃ হানিহার কি আর শুনেতে থাকি আছে কিছু? দাবী জোর করে নিজের স্টেট থেকে দ্রোহে বাওরাচ্ছেন আর দ্রো বাধ না বাধ না করে কপট আপত্তি তুলছেন, নেটা এদান থেকেই বেশ টের পাচ্ছেন ইন্দুভতী। কাবল আপত্তিটা কপট হলেও প্রকাশটা বেশ প্রকট!

‘বেশ একজোড়া কলো-কলোতা পুবেছি বটে!’ নিজের অজান্তেই দাবীটা বেরিয়ে আসে ইন্দুভতীর মূখ থেকে!

ভক্তকণে সুকো হয়ে গেছে তাঁর, বিরক্ত মূখে বেরিয়ে আসেন বর থেকে।

নীড়ের কোণ জানলা দিয়ে লুটিয়ে পড়ছে বরে। হুপু বেলো খোবার হয়ে একটু বিলম্ব করছিলেন ইন্দুভতী। দিনে পুনোয়ার বর অভ্যাগ তাঁর কোন কালেই নেই। তবে ইদানীং ডাক্তারের নিষেণে বিদ্যাহার কিছুকণ গড়িয়ে নেন।

ঘরের থেকে টুকটুকে লাগ। হরিয়া বোজ পুঁছে পুঁছে তার খবর চক্কে গোহারা করে দিয়েছে যে হাছি বললে পিছুলে যায়। রতনার কাছে অতি ক্ষুদ্র একটি ছায়া পড়ল।

‘গীঃ—’

নেন হাতের মুঠিই মধ্যে বরা বার একখানি লিভ মূখ—হুঁমিতে উচ্ছল। হাতে একটি ছোট্ট শাট।

তার আড়াই বছরের ভীষনের বেনীর তাগ কেটেছে ঠাকুরার দেহদ্বারার। তাই এখানে এসে ঠাকুরাকে

চুপতে পারে না। বাড়িত আসে-পাশে তার ঠাকুরার বড়ই এককমকে বেগেছে খোয়া-কোয়া করতে। দুহত মাকে টাকি বিয়ে আক তাই পালিয়ে এসেছে ইন্দুভতীকেট করতে।

ভক্তমহিলা টিক ঠাকুরা নন বিদ্ধ ঐ বরণের জো বটে? ‘গীঃ, দুগা দুগা বেলেবে না?’ বাবার কালো কৌকড়া চুল কঁাকিরে গ্রন্থ করে থোক। হাতের শাট্টা নাড়িয়ে অর্ধটা প্রাঙ্গল করে শেষ।

এবার সত্যিই চমকে ওঠেন ইন্দুভতী। ভীষনে অনেক অবতার লম্বুখীন হয়েছেন ইন্দুভতী কিন্তু এরকম অবস্থায় পড়ছেন কি কখনও?

দাবী ভীষনে তিনি কখনও কোন লিভকে জেকে আবার করেছেন কি না মনে পড়ে না, কোন লিভও তাঁর কাছে হাত বাড়িয়ে আসে নি। একসঙ্গে মনে কোন কোভ পোষণ করেন না ইন্দুভতী। তাঁর নিজের সত্যানানি বর নি। ছোট ছেলেমেয়ে সবছে কোন বোম্বও তাঁর ছিল না। বরাবরই তাহের থেকে দুবে থেকেছেন এবং দুবে থেকেছেন। গৌবনে পাড়া-প্রতিবেদী এবং বন্ধ-মাত্রবের ছেলেমেয়েরা বাড়িতে এসেই তাঁর কাশফা হত এই বুঝি বরাবরই নষ্ট করে। তাহা বতকণ থাকত ততকণ সন্তত থাকতেন। আদিকাল আর এ বরনের অতিথি লগাগন হয় না বাড়িতে।

ইন্দুভতীর আত্মীয়স্বজনের ছেলেমেয়েরা কেউ এ বাড়িতে চুবার আসে নি। ইন্দুভতীর বড় ভাস্মরি বৃহ একবার তার বাবার সঙ্গে এখানে বেড়াতে এসেছিল। এ সেই তিন বিন না বেতে হারের জন্তে এমন কার্যকটি আরম্ভ করে ছিল যে তার বাবা কিবে বেতে গর পান না। কিবে গিরে সে নাকি তার মাকে বলেছিল, জানি না, বাড়িটা কি ঠাণ্ডা—টিক বেন চাঁদের মত।

এক ব্যতিক্রম ছিল তাঁর ছোট্ট আইজি বৃহ। তাঁর বরনধারণ একটু আলাদা মত ছিল। ইন্দুভতীর বিলিষ্টতা, কদাসক্তিকে সে লোকের মধ্যেই আনে নি। প্রথমবার এখানে গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে এসেই সে একটা বেফাল ছানা পুবে কেলেছিল। পিসিমার কোন গুজর আপত্তি যোনে নি। ছানাটা বোজ ইন্দুভতীর বাবার সময় তাঁর পাশ বেঁধে বলবার চেষ্টা করত এবং বন বন মিটিমিট করে

দ্রুততর
বিলির

প্রধান
উপায়

পোষ্ট অফিসগুলি থেকে প্রতি বছর প্রায় দেড় কোটি চিঠিপত্র, ফেরত চিঠির অফিসে পড়িয়ে দেওয়া হয়। সব রকম ভাবে চেষ্টা করেও এগুলি বিলি করা যায় না এবং এর একমাত্র কারণ হ'ল অসম্পূর্ণ ঠিকানা। ফেরত চিঠির অফিস অবশ্য লভকর। প্রায় ৯০ ভাগ চিঠি প্রেরক বা প্রাপকের কাছে পড়িয়ে দেয়। কিন্তু এর ক্ষমত বৃদ্ধি পেরিভ্রম করতে হয় এবং এতে অনেক সেরীও হয়।

অসম্পূর্ণ অথবা অস্পষ্ট ঠিকানা থাকলে আপনার চিঠিপত্র পৌঁছতে সেরী হয়

সম্পূর্ণ ও পরিষ্কার ঠিকানা
থাকলে চিঠিপত্র
তাড়াতাড়ি
পৌঁছায়



আপনাদের
আরও সেবা করতে
আমাদের সাহায্য করুন

ডাক ও তার বিভাগ

মনের ইচ্ছেটা জানাত; ইন্দুমতী প্রায় কাঠ হয়ে বসে কোন বসনে খাওয়া সাজ করতেন। খেতে বসে কুহু প্রায়ই এ বাধ না সে খাব না করে জ্ঞানাতন করত এবং রসপোষা তৈরী করে দেবার কাজে ইন্দুমতীকে ঐতাদীড়ি করত। ইন্দুমতী অবশ্যই তৈরী করে যেন নি কিছু হরিয়া একে তাকে প্রের করে প্রণালীটা নিয়ে রসপোষা তৈরী করেছিল এবং হিহিমসিকে বাইরে বিলম্ব আনন্দ পেতেছিল। প্রথম দুটো কাটাখার পর পরের দুটিতেও বন কুহু এখানে আসতে চাইল তখন ইন্দুমতী অবশ্য খারজ করতে পারেন নি কিছু উৎপাতের আশঙ্কা করে শঙ্কিত হয়েছিলেন।

সে কুহুও এখন আর আসে না। বড় হয়ে কি একটা কুস্তি নিয়ে বিলম্বতে চলে গিয়েছে পড়তে। সেখানে থেকে মাঝে মাঝে চিঠি লেখে ইন্দুমতীকে। লেখে, পিসিমা তোমার আর হরিয়ার মধ্যে ভীষণ মন কেন্দ্র করে মাঝে মাঝে—(এ কথা লিখতে বাধবর কেবল কুহুই পারে।) ...সেবে, এখানকার সব ভাল কেবল হুগাটা টিক তোষায়েব বাড়ির মত যেন। পড়ে অবশ্য ইন্দুমতী চমৎকৃত হন একেবারে।

কিন্তু ব্যাপারটা বেশী দূর গড়ার আগেই নিতে গেল।

খোকার না পলাতক ছেলের সন্ধানে এলে হাজির। এই ক'নাগেই সে ইন্দুমতীর পতাবীটা খানিকটা বুঝে নিয়েছে। তাই এসেই কিছু কিছু হয়ে বলল, কিছু মনে করবেন না হাসিয়া, আপনাদের বিব্রানের ব্যাখ্যা হল। যা ছুই ছেল, যেই একটু গোষ বুকেছি অন্তি পালিয়ে এসেছে।—

খোকাকে নিয়ে ওর যা চলে গেল। খোকা অশ্য যেতে চাইছিল না। তবে আলাপটা হঠাতে বাড়িল—বিশুট লজ্জার সত্যবদ্যপূর্ণ প্রথম আলাপ (অনেক প্রথম আলাপের অভিজ্ঞতা দিয়ে সে একথা কেনেবে) এখন সময় আর আবির্ভাবটা সে আপনগেই পছন্দ করে নি।

দূর থেকে খোকার কান্না শোনা বাড়িল—তার না তাকে খোর করে খুদ পাড়াবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ বড় ক্রান্ত বোধ করলেন ইন্দুমতী।

এখনও তা দিয়ে থাকে না কেন হরিয়া? এখনও কি ভিন্নটে বাধে নি?

এরপর কিছু খোকার বা সাবধান হয়ে গিয়েছিল যেন খোকা নিয়ে ইন্দুমতীকে অবধা বিরক্ত না করে। ইন্দুমতী যে একটু মন প্রকৃতির মাঝে সে কথা খোকার বা আপনগেই একটু একটু করে বুঝে গিয়েছিল। তার সন্তান-গর্বে একটু পেগেছিল বৈকি। ইন্দুমতী নিজের থেকে কোন দিন খোকাকে কাছে তাকে নি সেটা খোকার দায় নকর এড়ার নি।

অন্য বৈকি বিনের মধ্যে এ সাবধানতা মন কারণ আর মাস দুই পরেই ওরা বধনী হয়ে চলে গেল। কি কারণে যেন খোকার বাবাতে আবার হেট অফিসেই কিরে যেতে হল। ওরা বাদী-স্বীতে বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগল, মাত্র পাঁচ মাসের আগে। এরকম বধনীও কোন বাদে হয় না। ইন্দুমতী অশ্য খুসীই হলেন যেন। থাক বাঁচা গেল, যা গোলমাল হৈ-হৈ যিন রাত হত। বন্ধু-বান্ধব তো পেগেই আছে, তাছাড়া আশ পুনিক কাল নেমকর। আর বাড়ি ভাড়া বেবন না ইন্দুমতী। ওরা চলে গেলে বাড়িটা ভাল করে পরিচর্য করতে হবে। কি জানি কি অবস্থা করে রেখেছে। মেহাত হরকার না পড়লে ওবেব বিকটা যেতেন না ইন্দুমতী। আর এবার বাগানটাও বাঁচবে। কি নিতি নিতি কুল তোলা বউটির। শামাক ব্যাপারে কিছু বলাও চলে না।

খাবার দিনে ওরা ইন্দুমতীর ঘরে এসে বেধা করে গেল। বউটি পারের কাছে মত হয়ে প্রণাম করল তাঁকে।

আজ তার চক্ষু লজ্জা হচ্ছে বার বার। তার বিবাহিত জীবনে প্রথম এই বাড়িতে নিজের হাতে সংসার পাতা। কলকাতার তো শব্দবাক্তি, যেখানে কিরে থাকে। সেখানে শব্দ আছেন শাক্তী আছেন। সে মন জীবন। এবনে সে দিল পুদিনী; বহিও অনভিজ্ঞা কিছু সে অনভিজ্ঞতাত্তেও কি আনন্দ। বললে, হাসিয়া আপনাদের এ বাড়িতে আপনাদের কাছে কিছুদিন থু থু আনন্দে কাটল। বসেই গোষে জল এসে গেল যেন, আর কিছুই বলতে পারল না। ইন্দুমতী কিছুই বললেন না কোন বসম হিলো কথা বলা গীর পতাব নর।

কেবল খোকার ছোট হাতটি নিজের দুটির মধ্যে একবার বরতে ইচ্ছে হয়েছিল। কিছু হেপলেন খোকার দু'হাতে দু'টি লজ্জা। তাই আর বললেন না।

গীর্জা বাহু বিয়ে বন্ধনী
পঙ্কজ কল বর্ণনা করে কিছু
লিখতে গেলে পেটা যেমন
একটা আপজিকার ব্যাপার
হবে, আবার আলোচ্য
গ্রন্থের শিরোনামটিও ঠিক
অল্পকণ কীরকমই আপত্তির
কাছ হতে উঠতে পারে। তবু একথাও সত্যি যে
বন্ধনীপঙ্কজ নাম করলেই তার পছন্দও তার সহযোগী
হয়। পদ্ম ছাড়া যেমন বন্ধনীপঙ্কজ অকল্পনীয়, বিজ্ঞান
দুবিনতা ছাড়া অপরীক্ষণীয়ও সেকম অভিজ্ঞানীয়।
কাজেই, সে পবিত্র অক্ষর বেবে তাঁকে অস্তিত্ব
দৃষ্টিকোণ থেকে লোপার স্পর্শটুকু আশা করছি আমি
হয়ে উঠবে।

অপরীক্ষণীয় বস্তুর শৈশবজন্ম। কেটেছে কতিপয়।
এখানে দুটি বিভাগের ছিল। একটি সরকার পরিচালিত
ইংরাজী বিভাগের এবং অপরটি বাংলা বিভাগের।
শিক্ষাকালে এই বাংলা বিভাগেরটিতে পড়বার সুযোগ পেয়ে
যমের পঞ্জীর বর্ণমালায় এবং সহজাত কবি-প্রকৃতি
তার বেড়ে উঠবার অবসর পেয়েছিল। পরবর্তী জীবনেই
তাঁকে বিজ্ঞান জীবনে ঢেলে দিয়েছিল। কিন্তু তারও
মূল ছিল অপরীক্ষণীয় দার্শনিকতা এবং সাহিত্যিক-
শ্রুত মনোভাব। বলছি সে কথা ক্রমশঃ।

বাল্যকালে অপরীক্ষণীয় বিশেষ সংসী সানী পান নি।
তার সংসী ছিল তখন দুইজন—কৃত্তিবাস আর কানীয়াস
হাস। এই রামায়ণ ও মহাভারতই পড়ে তুলেছে
তার মনোজগতের ভিত্তি। এই দুই মহাকাব্যের বহু
চরিত্র তার মনে রেখাপাত করেছে এবং মনটিকে
স্পর্শকাতর করে তুলেছে। বহু প্রেরণা মনে এসে তীক্ষ্ণ
করেছে। আজ যদি বলি, এই সব বাচ্চাগুলো প্রায়ই
তার বিজ্ঞান জীবনের প্রথম বাপ, যদি বলি এই
স্পর্শকাতরতাই তাঁকে ঠেলে দিয়েছে উত্তরের চেতনা-
নিরুপনের ক্ষেত্রে—তবে কথটা অবিস্মৃত মনে হলেও
অব্যক্ত কিছুতেই হবে না। কারণ, একই মানুষের
প্রকৃতি কবিশ্রুত এবং কর্মধারা বিজ্ঞানীয় মত হওয়া

দার্শনিক-কবি অপরীক্ষণীয়

হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

★

বুঝে সত্য। আপাত-দৃষ্টিতে
কথা ও বিজ্ঞান পরস্পর
বিরোধী মনে হলেও
কার্যতঃ তা নয়। অপরীক্ষণীয়
বস্তু নিজেই লিখেছেন,—
শৈবজ্ঞানিকের পরা সত্য
হইতে পারে, কিন্তু কবির

সাধনার সত্য উহার সাধনার অন্য আদে। দুটি
আলোক বেধানে দেখে হইয়া যায় সেখানেও তিনি
আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন। তত্বের সত্য
সেখানে সূত্রে দেখে সীমার পৌঁছে, সেখানে হইতে
তিনি সম্প্রদায় ব্যক্তি আহরণ করিয়া আনেন
প্রকাশের অতীত যে বস্তু প্রকাশের আড়ালে বসিয়া
নিব-ভ্রান্তি কাছ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাৎপকে
প্রায় করিয়া দূরীকৃত উত্তর বাহির করিতেছেন এবং
সেই উত্তরকেই মানস তাহার বসাব্য করিয়া ব্যব
করিতে নিশ্চল আছেন।

উদ্ধৃতি যে তবু কবিশ্রুতি ও বৈজ্ঞানিক মনোভূতি
সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্র—একমতঃ তাহা চলবে না
এই উদ্ধৃতিটুকুর সাহিত্যিক বর্ণনাও প্রচার করা আশা
উদ্ভব। উপরের অংশটুকু আর দেখনী প্রস্তুত তি
বে সুসাহিত্যিক দেখকটা কি অনবীক্ষণীয় নয়?

অপরীক্ষণীয়ের ক্ষেত্র বহু ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ
হীরেন্দ্রনাথের কবি চেতনাও তার ওপর প্রত্যক্ষ বিস্তার
করেছিল। যমের বিস্তার দার্শনিক বিজ্ঞান। তিনি
হীরেন্দ্রনাথের সংশ্লিষ্ট আলোচনা করতেন। হীরেন্দ্রনাথ বহু
নোবেল প্রাইজ পান তখন তিনি উজ্জ্বলিত হা
লিখেছিলেন,—

“পৃথিবীতে তোমাকে এতদিন অসমাপ্তে তুলি
না যেছিল। যেমন অসুস্থত করিছিল। আজ সে
হুঃস্থ হুঃস্থ হইল। যেভাবে এই কর্মের ক্ষেত্র
করিয়া আবার কৃতজ্ঞতা জানাইব? চিরকাল
শক্তিশালী হও, চিরকাল অসুস্থ হও।
তোমার চিরসময় হউন।”

অপরীক্ষণীয় সময় সময় যে দুঃস্থ হস্তিকতা পরিবেশ

হইতেম তাহাতেও তাঁর পারিতোষিক বৃত্তি প্রকট হয়ে ওঠে ।
উল্লেখের চেতনার চিত্র প্রদর্শনে লিখিতে গিয়েত বিজ্ঞানী-
মূলক মনোভাব পরিত্যক্ত করে তিনি লিখেছিলেন,—

“সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, পাছেহ লেখা কতকটা
বেশমানসী হইত—অস্বিকৃত কিংবা অস্বিকৃতির
পক্ষে একান্ত প্রবোধ্য ।”

এই সুস্থ রূপবোধ কি বিজ্ঞান-মুহুরিত্যের পরিচয় দেয় ?
কখন কবির বৈশিষ্ট্য কি ? সে বা বলতে চায় তার
হস্ত তাকে পরিবেশ সৃষ্টি করে নিজে হয় । কিন্তু সেটাই
যে বস্তু নয় । পরিস্ফুট করতে গিয়ে একজন কবি
প্রকৃত প্রয়োগ করেন ; যাকে ইংরাজিতে বলে
/usual image/. একজন বিজ্ঞানী কিন্তু তা করেন না ।
কিন্তু যথোপযুক্ত পার্থক্য এইটুকুই । সেজন্য নিচে অগসীপচন্দ্র
দ্বারা একটি রচনাংশ হুতোম হইল । পড়ে আপনারা
ইচ্ছা করবেন অগসীপচন্দ্রের চরিত্র কবিত্বমূলক না
বিজ্ঞানমূলক । সে অংশটি হল “বুদ্ধকাবে”র কিছুটা,—

“একটি শিশু কিবা একটি নারীর উল্লেখিত
বাহ্যতে সমস্ত বৃত্ত পরিবর্তিত হইয়া যায় । আলো
ও ছায়া, সুখ ও অপরিহার্য দুঃখ তখন বদলি
স্থানে সমাবিষ্ট হয় । তখন সেই দুইখানি উন্মোচিত
বুদ্ধময় হইতে কিরণবেগা অন্ধকার তেজ কঠিয়া
সমস্ত বৃত্ত কোমলিষ্ঠ করিবে ।”

যাহে তাঁর একটি প্রচ্ছন্নভাব আছে । এবং প্রত্যক্ষভাবে
কঠিনতা কথা বলার আছে । আর সেটা হল, ‘সমস্ত
বৃত্ত পরিবর্তিত হইয়া যায় ।’ এই কথাটুকু তিনি একজন
বুদ্ধ বৈজ্ঞানিকের মত সিলিবেজ করেই কাত মন নি—
যেহা এক পুস্তক বা চিত্রকর প্রয়োগ করেছেন ।
ইহানে অগসীপচন্দ্রের কবি মানসের চরমতম পরিচয় ।
তার ‘অব্যক্ত’ প্রাণের পাতার পাতায় এই কবি-মানসের
চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে ।

কিন্তু সেখানে শুধু কবি-মানসেরই আভাস নেই,
পল্লিকতার পরম প্রয়োগ ও উত্তরিত হয়েছে ‘অব্যক্ত’
হের পাতার পাতায় । ‘ভাগীরথীর উৎস সন্ধান’
গ্রন্থে প্রবর্তে তিনি প্রয়োগ করেন যাহা ইচ্ছার পর
সাধারণ ব্যক্তি ? ইন্দ্রে এর চেয়ে বড় প্রয়োগ আর আছে কি ?
বিশ্বের ভৌগোলিক হস্তান্তে তিনি বিচার করেছেন
সাপেক্ষ এবং পরিস্ফুট করেছেন নারীর গতিপথের সংশ্লিষ্ট
বিষয়ের এই চরম প্রাণের সাধুত্ব ।

আরও একটা কথা বলবার আছে । বিজ্ঞান

অনিশ্চয়তাকে স্থান দেয় না । বা নিশ্চয় করে বলা
যায়—সেই নির্দিষ্ট এবং প্রত্যক্ষ বস্তুই বিজ্ঞানের উপলব্ধি ।
কিন্তু স্বাভাবিকভাবে লিখিত তাঁর পত্রাবলী থেকে বলা
যায়, অধিকাংশ সময়েই তাঁর একটা অশিশিষ্ট মনুষ্য
এবং সাময়িক হতাশা । চিত্রিত হয়েছে আরে শুধু প্রত্যাশা—
কোন মন্দির মত ভাঙতে কই আছে । যেহেতু—

“জুনি তো এতদিন বিজ্ঞান সাধনা করিয়াছ,
বলিতে পার কি, কি করিলে সুখ-দুঃখের অতীত
হওয়া যায় ? একদিন ভারতে সুধিন আনিবেই,
কিন্তু একথা সূর্য্য মনে থাকিবে না । . . . একটা
আশা না থাকিলে আমার মতি চলিয়া যায় ।”

প্রকৃত বিজ্ঞানীর কাছে বিশ্ববস্তুর বস্তু, ভাব্য নয় । কিন্তু
যে বিজ্ঞানীর অন্তরে কবি-চেতনা আছে তাঁর কাছে
ভাব্যতাও একটা সমস্যা । অগসীপচন্দ্র লিখছেন,—

“আমি অনেক সময় মনে করিয়াছি, যে বাংলা
কোন দার্শনিক পক্ষে আমার এই নূতন কার্য সম্বন্ধে
কয়েকটি প্রশ্ন লিখবে । কিন্তু কথা খুঁজিয়া পাই না
যদিহা সে ইচ্ছা মনেই করিয়াছে ।”

অগসীপচন্দ্র বহুতর পত্র থেকে আরও জানতে পারি
একটা নৈরাশ্য তাঁকে কবিতায় রেখেছিল । সাধারণ মানুষ
এক কবির কাছে এটা মজুন না হলেও অগসীপচন্দ্রের
কাছে একটু বিষমকর বৈকি ।

বিজ্ঞানের অন্তর্ভাগে, অবসারের সমুদ্রে, অগসীপচন্দ্র
কখনও কবি, কখনও বা দার্শনিক । এই দুই চেতনার
অপূর্ব একটা সংমিশ্রণ উদ্ভূত করে প্রবল শ্রেণি করার
চেষ্টা করবে,—

“অধিকাংশ সময়েই তো অবসার । সুতরাং
তোমার সাধিত্য লাভ করতে ইচ্ছা হয় । সেদিন
তোমার কতকগুলি কবিতা পড়িতেছিলাম, সেই
নিমাইবহের প্রাচুর্য ও নবী, সেই আকাশ ও বায়ুর
চর আশার চক্রে সন্নিবেশিত আশিতেছে । বলিতে পার
কি এই জ্বরের আকর্ষণের অর্থ কি ? তোমার কি
মনে হয় যে, এই পৃথিবীর ছায়ায় অন্ধরালে আত্মা
আশার সহিত অস্তির হইয়া যায় ।”

উপরের উদ্ধৃতিটিই অগসীপচন্দ্রের কবি ও দার্শনিক
প্রকৃতির চরম উদাহরণ বলে মনে করছি । অগসীপচন্দ্র
বিজ্ঞানী, সম্ভবে সেই । কিন্তু তাঁর কীব্যে দার্শনিকতা
ও কবিত্বেরও একটি অধ্যায় আছে ; এবং আশ মনোঃসে
বোধবা করতে পারি সে অধ্যায় প্রতিভার দ্বারকে উন্মুক্ত ।

একানাইতে যাননি।

ছোট ঘরে। পড়ে ঘাবি।
রাখার হাতে নিয়ে
করল না।

কনি চলছিল। ঝাড়া।
বলে পড়ল। টোট ফুটো
ফুলোফুলো। অভিমানে
বল এল চোখে।
না না না। ওরা কেউ
আমার বেগতে পারে না।
কেউ না। ছোট ছোট
ছোট। দিনরাত শুধু ছোট
বলে। কনি ভাবল।

কেন? আমি কি চিরকাল ছোটই থাকব। ক'কড়:
চুলগুলো হুল। কনি না: কাকাল। হুলহুলে হাত।
মোমের মত। নরম। সেই নরম হাতে চুলগুলো খসল।
টানল। ক্রকের একটা কোন পাকাল। হুবে পুহল।
একমনে জিন্তে থাকল।

ওরা আমার কেউ বেগতে পারে না। তাই ছোট
বলে হুবে রাখে। এটা করতে নেই। ওটা কোর না।
ছোট ঘরে। কিছ কেন? বড়ির বিয়ের সময় হাম:
হিতাম। তখন ছোট বলত। এখন তো বড়ির বেহেটা
তিঁ তিঁ করে। ওতো ছোট। আমি তো এখন নিজে
হাট। শুধু আমি ছোট? না। ওরা আমার বেগতে
পারে না। কাকাটা বহুখাল। হালি কান করে। বাবাটা
হুই। হালি কোলে বেবে। কেন? আমি তো এখন
বড় হয়েছি। বড়তা কি কোলে অর্থে? কাকাকে কেন
অবে কোলে বের না বাবা। কনির হাসি পেল কবাটা
জেবে। হুবে মত লাগা ধতে কিলিক বিল। সঙ্গে
একটা টোল পড়ল।

ওরা একচোখো। আমার বেগতে পারে না। বড়ির
বিয়ে হল। মেঝে কলেজে পেল। ছোটবি ইচ্ছলে পেল।
কাক। পলায় নল ক'নিতে কনী খেবে। বাবা অকিস
যায়। আর আমি কি করি? কনি ভাবল। আমি
নাকি ছোট। আমি শুধু দুখ বাব। ওবে ওবে দুখাব।



কনির মন

এবার শাড়ী পড়ব। লাল গিছের শাড়ী। অ
লাল রাউন্ড। আর হিলতোলা বড় জুতো। এ ছে
জুতোটা তখন কেলে খেব। এটা চাই নে। ক
টোট শুটোল। এগুলো বাজে। আমি চাই
ওটা। মেঝের মত আনাহত কত বড় হবে
অনেকগুলো বড়। বাড়ীতে ভাবব তামের। তাহের
করে বেবে বা। কোকান হতে বাবার আনবে। তার
আমরা লুকা বেলব।—না। লুকা নর। বড়তা লু
বেলে না। মেঝের মত গরের বই পড়ব। সিনেম
যাব। বাতায় ইটিব। ওই বড় রাস্তায়। রাস্তা
কোনটিকে কতদূর গেছে, হুঁকব। হুঁকে বার করা
ভেটী পেলে হল বাব মোড়ের লোকনে। তা বাব
তেলভাঝা বাব। বতখুণী বাব। মা বকতে পারবে ন
বেগতে পারে না। কি মমা। কনি আনবে প্রাণ হা
তালি বিল। হুখটা হাসি হাসি হয়ে উঠল। পে
হুখ থানায় সোশানী আটা আগল। ক'কড়া চুলকে
হাতরায় উড়ল। কপালে এসে পড়ল। হাত বিয়ে ক
মেতলি সরিয়ে বিল।

এই দুখবাব। পাকের হবে? চল। পেড়াফুলো
ঠেলতে ঠেলতে জায়া এলে ঝাড়া। আমার বরল হয়ে
শোকা হয়ে ঝাড়াতে পারে না বেশীকন। ঘাবে হেল
বিয়ে ঝাড়া। কনি তার দিকে ফিরে চাইল না। কো

—না না না। ককি
উঠল কনি। আ
ছোট নেই। আমি ব
হয়ে গেছি। অনেক বড়
অনেক অনেক বড়। ও
আকাশের মত। ও
বাড়ীটার মত। আম
কবা ওরা ভাবে না
বেবে না। আমি।
বড় হয়েছি, ওরা জা
না। মেঝে ছোটবি
লাড়ী পড়ে। আ
কেন কক পড়ব। আমি

হিস, ডেমরি হইল। বিকেলের ছায়া পড়িরে অন্ধকার
নাহবে। একটা তবল অন্ধকার দীরে দীরে ছড়িয়ে
পড়ছে। বাঘের ছায়াটা অনেক দূর হবে গেছে। সিংসিরে
একটা হাওয়া বইছে। জনির দীত লাগছে। অল্প অল্প।
অনুভূত লাগছে। চুলচাপ বসে থাকতে।

এই পুতু বাবা, চল। আরা তাক্সা দিল। জনি
বিরক্ত হল। তার রাস হল। টানা টানা চোখটো
ছোট হল। নতর মুঠোটা শক্ত হল। পলাটা ভারী করে
হল, বাব না।

তাড়াতাড়ি এস। নইলে মা বন্ধবে। আরা আবার
তাক্সা দিল। জনির বিলি লাগল। তোড়ি কাটল, মা
কেবে! তুই নব জমিস। বা বা রাগুণী। আমি বাব
মা। বেশ করব। নিজেই চুলগুলো আবার এলামেলো
করে দিল। ক্রকের কোণাটা মূব হতে নামাল। ভিজে
দেখিল। একটা আনুল মুখে পুহল। চুয়েত থাকল।
মাঝা চলে গেল। বুদ্ধি, বুদ্ধি। জনির ঘেরা হল।
মাঝাটা বুদ্ধি। গুব দীত পড়ে গেছে। ওর চুল লেকে
গেছে। শনের হুড়ির বত। জনি হাসল। আরাটা
হাসুণী। আবার পাকে' নিরে গিরে নিজে গল্প করে
জ্ঞত আরাবের সংগে। ওটা লরতান। ভাস-ভাস
চোব হুটি আবার ইঁচকে এল বাগে। জ'হুলটা কামড়ে
হল জনি।

জনি উঠে দাঁড়াল। আসতো পা কলে হাঁটতে
থাকল। তোয়ালেটা হাত থেকে ছুঁড়ে দিল। অনেকটা
চলে গিয়ে আবার ফিলে। তোয়ালেটা ফুড়িয়ে নিল।
আনুলটা মূব হতে বের করল। তোয়ালেতে মুহল।
তোয়ালেটা কলে দিল। আবার হাঁটতে থাকল। হে'টে
হে'টে বের হুকল। আনালায় কাছে এল। গোহার
দরারে নরম পালটা সঁপে গিয়ে দাঁড়াল। বাইরে ওর বত
কণি ছেলেদেরে বেলাতে। জনি একঝুটে মেদিকে তাকিয়ে
বইল। ওরা ছেলে রাহব। তাই কানামাছি বেলে।
আমি ওদের বত ছোট নই। আমি কানামাছি বেশল না।
আমি কাকার মত ব্যাতবিক্রম বেশল। যেখনি, ছোটখি
বত টেমিল বেশল। ওরা ছোট। আমি অনেক বড় হয়ে

গেছি। জনির মনে হল। অনেক বড়। বড়দি, বেজদি,
ছোড়দির মত। মা আবার বন্ধবে না। কাকা কাম
মলবে না। আবার বা বৃণী, তাই করব।

এই কনি, আরাবের সংগে বেশলি আরা! ছেলেবা
তাকল। আনালা হতে মুখটা সবিরে নিল জনি। মা না।
তোদের সংগে বেশল না। তোরা ছেলেমাহুব। তোরা
বিচ্ছিরি। পুব ভাল লাগল কবাটা জনির। -তিবিরে
তিবিরে উজারণ করল, তোরা বিচ্ছিরি। বিচ্ছিরি!!
একধলা পুতু ছিটিয়ে দিল ওদের দিকে। তোরা ছোট।
তোদের সংগে বেশল না। তোরা কানামাছি বেশল।
তোরা বেশুন কিনিস। তোরা পুতুল বেশল। তোরা
ছোট। তোদের বা তোদের বকে। আবার মা আবার
বন্ধবে না! আমি বড় হয়ে গেছি। আমি ইচ্ছলে বাব।
আমি কলেবে বাব। তোদের সংগে বেশল না।

সরে আসতে চাইল জনি। আনালায় দরার ছেড়ে
দিল ওরা ছোট। ওদের কাছে থাকবে না। জনি সরে
আসছিল। কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়ল। ওরা সবাই ছুটে গেল
কেন তাকিকে? একসঙ্গে সবাই? জনি দাঁড়িয়ে গেল।
ওর কৌতুহল হল। চোখের পাতা কু'চু'ক এল। ওরা
ক্রোমেনি করছে। একটা, বেশুনওরালাকে দিরে সবাই
চোঁচাচ্ছে। বেশুন কিনছে। তীড় করছে। ওরা ছোট।
তাই তইবকম করছে। কিন্তু আমি করব না। যেখনি
ছোড়দি, কাকু কেট ওরকম ছুটে যায় না। বেশুন কেনে
না। আমিও যাব না। বড়রা বেশুন বের না। বেশুনগুলো
কিছ বেশ বড়। লাল। নীল। হলদে। অনেক
বড়ের। লবা। খেঁটে। গোল। কিন্তু আমি তো
কিনবো না। আমি শুধু বেশছি। বহু কিনলো। লালু
কিনছে। ওরা সবাই কিনছে। কিছক। ওরা তো
ছোট। ইন। কি নিরাট বেশুন। একি টুলু যে ওটা
নিরে নিচ্ছে। কিনলেই তো কাটাবে। ওতো কিনেই
কাটার। কিন্তু আমি যে বড়! ইন। টুলু যে ওটা
হাতে নিয়েছে। কিন্তু বড়রা কি বেশুন কেনে? একি
টুলু যে ওটা নিয়েই যাচ্ছে।—এই বেশুনওলা! দাঁড়াও
আমি কিনব ওটা। দাঁড়াও।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বাওয়া বাওয়ার পাট

আজ চুকে গেল একটু
সকাল সকালই। বর্ষাশাল্যেও
ভেমন ভীড় নেই তাই
অনেকটা গিরিখিল। কিন্তু
দুপুরে দু'খালে না

আমার চোখে তাই পুরে পুরে হুন্সান গঙ্গার গর্জন
শুনি আর চোখে দেখি আকাশ দিয়ে ভেসে বাওয়া বেধ
—সাদা, হলুদ, কালো।

সকালের দিকে বেশ রোদ ছিল, দুপুরে ত কাঠকাতা।
কিন্তু একটু বেলা গভাতেই বেধি সে রোদ গেল মরে।
তারপর বেধে বেধে ছেয়ে কেদেতে লালস আকাশ। বোধহয়
তাই মেঘেই ঘাতীয়াও যেন বেধিয়ে পড়তে লাগল
একটু ভাঙাভাঙি ঘর যেনেকৈ ঘাবার। শুনলাম গঙ্গার
দিক দিয়ে এদিকে গ্রাহেই দৃষ্টি আর কড় হয়।

কপপুরে ও তাই গভার্ভ দিয়ে মাল বাঁধতে শুরু করে
আর ত্রু পাতে ছড়াতে আরম্ভ করে পঠি। পাতে
পঠি জড়িয়ে নিলে পা দুটো নাকি আরামে থাকে
আর পারের 'মাপসে' ব্যথা হয় না। কপপুরের
পেছন পেছনই বেয়ে এসে ছিলাম। ত্রু বেনে
এসেই হঠিতে শুরু করব। কিন্তু ওপারে চোখ পড়তেই
জোঁধ, হুন্সান গঙ্গার গুল পেরিয়ে সুবাসুন্সার ওপরে উঠে
পাগছেন।

কাঁছে আসতেই কলরব করে উঠি। ত্রুও ততকণে
এসে সেজে নীচ নেয়ে। সুবাসুন্সার বলেন, কেমন, পেছনে
কেলে এসেছিলেন, এসে গরো নিলাম ত।

ত্রুর দু'খালে আবার হাসি কুটেছে। পারের ওই ব্যথা
হবার পর ওর দু'খে এমন হাসি জেঁধনি।

ত্রুর পারের ব্যথা শূন্যে, থকবা বলেন, আপনাবা যে
ভাবেন মেনে নেমেই হেঁটে এসেন। অত হাটা ঠিক হয়
নি। ওবেলা গংগানীতেই ছিলার আছবা। আছ
সকালে এসেছি শ্যাকটিতে। কুল গটি ঘাব বসেই
একটু ভাঙাভাঙি বেধিয়ে পড়ছিলাম।

ত্রু বসে, সে আর বলতে। তারপর আমার

সম্মুতোত্তরী ও গঙ্গোত্তরী

গমেশ লালজ্ঞানী

০

দিকে-চোখে বসে, কিন্তু সব
সোপ তোমার রাস বশাবের।
উনি ঘর ওবেলা বসুনা গতি
না আসতেন তবে কি আর
আমরা আসি।

সুবাসুন্সার বলেন, কই, রাস
বশাবে ভো দেখাচ্ছেন?

বলি, তাঁকে আর এখানে দেখবেন কোথায়। তিনি
এখন সম্মুতোত্তরীতে উঠি উঠি করছেন।

ওঁরাও কুল গটি যাচ্ছেন। ভালোই হল। তাই
এক মল্লেরই হঠিতে আরম্ভ করি আমরা। পথ কিছু
খারাপ নয়। সেই নদীর ঘারে ঘারে পথ। আর সেই
গভোত্রেন, কাঠগোলাপ ও উর্ধ্বদৃষ্টি রঙ্গরী। ঘন বনও
হয়েছে মাঝে মাঝে। এমনতেই চারদিক সবুজ তার
ওপর আকাশ ঘিরে বেধ করে আসার সবখানে একটা
শিথতার ছোঁয়া লেগেছে।

‘মেইবেই’র দু'খালয় বনভূমি প্যানভলারট্রেন।
তমাসহুদ্র নয় তবে তাই বসে বনভূমি প্যান কিছু কম
দেখাচ্ছে না। পারের তলার দু'র দু'র করে শুকনো
কণা পাতা। একটা সাপকে বেধে এলাই গটি থেকে
বেধিয়েই পাছাড়ের এক গহরের মধ্যে পড়ে থাকতে—ওর
পাশ দিয়েই গ্রাঘ হেঁটে এসেছি আমরা। এখন দেখলাম
আর একটা সাপকে সেই শুকনো পাতার ওপর দিয়ে সর
সর করে নীচের দিকে মেয়ে যেতে।

তাই আর একটু এগিয়ে যেতেই বনন মাথার ওপর
ঠোঁপ ভালটা নড়ে উঠল, তখন বকে শিহিচ্ছে আসি।
নীচের জঙ্গলের দিকেও আবার ঘর ঘর পথ হচ্ছে। তবু
ভালো। যা ভেবেছিলাম তা নয়। পোতা দুই তিন
ঘর। কিন্তু দু'বার সাপ জেবে পথের দু'দিক ভালো
করে বেধে আসছি। আকাশপাট কেমন যেন ঘোর
হয়ে এসেছে। বোধহয় দৃষ্টি নামবে।

মাঝলও বড় বড় কোঠায় দৃষ্টি। বর্ষাতি বার
করে রেখেছি গটি হতেই। তাই সেই বর্ষাতিই পারে সেই।

কমকম ত্রু দৃষ্টি আর প্রল মেকসর্জন। মেঘের
দু'দু'দু'দু' পথি পাহাড় পাহাড় কেবলি প্রতি-

খনিজ হয়ে চলেছে। সে পক্ষ যেন কিছুতেই শেষ হতে চাইছে না।

আমার কিছু ভারী ভালো লাগছে, ভালো লাগছে বলিও শব্দে যেন আসছে হি হি করা ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া। মনে হচ্ছে সেই হাওয়া যেন মৃত্যুর স্বাক্ষর হতে এইমাত্র উঠে এল।

সুখান্দু ও কেশব এরই মধ্যে এগিয়ে গেছেন। কী লম্বা লম্বা পা কেলেই না ছাঁটেন ওঠা। আর বিন্দা নীলকান্ত ও বৈদ্যনাথ আমের বোম্বের সেই লোকান্বে যে লোকান্বেকে জেটু আসেই শেখন কেলে এলাম। তাই আমরা দুজন ছাড়া আর কাউকেই দেখছি না পথে—না কাছাকাছি কোনো আশ্রয়। তাই সেই বাতাসে বৃষ্টিতে নামনের দিকেই কেবল হাঁটিতে থাকি।

হলে না ভিজলেও ঘামে কিছু মনে উঠবার। ম্যাগস্টিকের বর্ণাভিত। তাই ভেতরে এক কেঁটা বাতাস দাবার উপায় নেই। কিছু সেই কারণেই অশ্রুটি লাগছে আরো। ইচ্ছে করছে হুলে কেলে সেই—বোম্বের হলে ভেজাও ওর চাইতে অনেক ভালো।

কুলচটির কাছাকাছি আসতে জলটা যেন একটু বরল। কিছু জল বরলে কি হবে? বইল সেই হাওয়া যা হুঁচের নতো চোখে-নুখে এসে বিধিল। আমরা যে বন্দুকের কাছাকাছি এসে পড়েছি—আর মাইল হরেকও নেই তা ওই হাওয়াতেই জ্বালিয়ে দিচ্ছে।

একটুখানি চড়াই। তারপরই কুলচটি জ্বালিয়ে কেন ওই নাম। কিছু সেই চড়াই উঠতে লেগলার যেমন কচি কচি ঘাসের তিন প্যানলিমা—চোখ দুটো তাতে জ্বড়িয়ে গেল।

সুখান্দু যা যে বন বন করেছেন, সেই ঘরে এসেই আশ্রয় নিচ্ছে। বেশ প্রশস্ত বন, বেকের গরুর পাতা। আমরাই থাকব, আর কেউ আগবে না। তবে কুলচের হস্ত রাতে জ্বালা দিতে হবে। বাইরে যা শীত।

ভারাদেবের সৌন্দর্য হুঁই বাঁটার জন্যই বেতে গিরোহিলার নীচে তা নইলে নীতি বলতে কি কুলচের মধ্যে হতে হাট পা বের করার ইচ্ছা ছিল না জল একটুও। নীলকান্ত ত কি একটা ব্রহ্মে বাইরে বেতে নিয়ে গড়ান করে গরের দরজা বন্ধ করে গিলেন। বসলেন,

যা শীত। বরজা হুলতেই বুকটা কেবল যেন গর গর করে উঠল।

পুনে কুলচের মধ্যে হতে হুল বার করে জ্বল বসে, বাহাদুর হলে! আমই এই, কাল না জ্বালি ভাংলে কী হবে?

বিশ, কী আর হবে। ওর ত কৈলাস রানস ঘুরে আসা আছে। তাতে জ্বল গিরোহিলেন আবার গৌরীকুণ্ডে। বিন্দা আমার দিকে চেয়ে বসেন, পুনে জ্বল। জ্বলি কীমিটি ছিলে নীলকান্ত...নীলকান্তের জ্বাল দেয়া শেষ হলে বিন্দা বসেন, জ্বলত নয়, গদা বরক। হলে নামবার লগে লগেই বরক জ্বাট বেঁচে যায়। আসল জ্বলে নামতে হয় তারপর ওপরে উঠে এসেই মোটা পুনে কুলচ দিয়ে যা বঁচি।

জ্বার বড়ের গল পুনি নীলকান্তের হুলে। হুল-কথার পরিবেশ। বরজাও ভেদনি অন্ধকারে বন বন করছে, আলোটা কবিরে দেওয়া হয়েছে তাই। হঠাৎ নীলকান্ত বলে ওঠেন, যাবেন এখন কৈলাস রানস তখন বিজ্ঞানস্বাক্ষকে লগে নেবেন গাইড হিসেবে। আর যাবেন জ্বালিই। এগথে যে একবার জ্বলে সে আর একবার না এসে পারবে না।

পুনে বিন্দা হাফেন। বসেন এবার নিয়ে কথার হল সুখান্দু। তা বার লগে ত হবে।

কোথার সেই কৈলাস, কোথার সেই রানস। গৌরী-কুণ্ডের জল যা বরকের মতো ঠাণ্ডা। লম্বাশ্রু হতে ১৫০০ ফুট ওপরে। বেশি আমার বন কালাপানি গৌরীয়ে হুটে চলেছে শীশু বাঁটার দিকে। তারপর গৌরীয়ে এলাম যেন তলকাটো, ভিজুকের প্রথম বাবার। বরচিন হতে পরিজ্ঞা আরম্ভ করছি কৈলাস পর্বতের। ওদের মতো গিরোহিলার হয়ে গিরোহি কিনা বেধিকে পারবিয়া হল ভারতের শেষ সীমানা।

ব্রহ্মেও বৃষ্টি হল আবার। ঘরে চলে পুনরায় তার বড় বড় পক্ষ। অন্ধকার তারনী রাতি। ভারদেবার বরের বাইরে সেই আশ্রয় আর হু ত কেউ। কিছু দেখলাম আমার যে বনের হালুদ তাই উদ্দেশ্য নেই। কে জানে সে তখন কোথার ঘুরে বেড়াচ্ছিল, কোন দরজা তাঁরে, কোন বনের ধারে, দুর্বোধ্য সেই ঘনাকারে।

কিন্তু কালরাজে অত যে বৃষ্টি হয়ে গেল তার কোন

চিহ্নই হইল না আর সকলের আকাশে। হাঙ্গরে যেন আকাশ। কুট কুট করছে আলো। বৃষ্টির জলে নোবা হয়ে গেছে বলে নির্মল মনে হচ্ছে সব কিছু।

জানকীবাই চিঠি পবিত্র ভাষে এলায় শব্দেই। এক হাইল পথ। এলায় আবার একটা পঞ্চাশ-র মধ্যে দিয়ে। গায়পালার নির্বাক একটুখানি আরগা, ক'ধর বস্তা। বেশি একটা গাছ কাটা হয়েছে কিন্তু পুঁড়িটা রয়েছে ঠিক ভেমনি। সেই পুঁড়ির ভেতর কুরে কুরে বানানো হয়েছে কাঠের একটা টপ। ওরি মধ্যে খোঁজা হল বরা রয়েছে। তারামত বলে ওর মধ্যে কনালের কাপড় কাঁচে। এসবিত্তে যা ভারী হয়, তাতে হাতে ত আর কড়া বার না। ওরি মধ্যে কেসে দিয়ে পা দিয়ে ভলে।

তারিক না করে উপায় নেই মানুসের বুদ্ধির। প্রয়োজনে সব কিছুকে সে কিভাবে কাজে লাগায়।

জানকীবাই চিঠির সামনে পথের ওপর বাড়িরে হুঁরে চরে বেশি বরগালি গ্রাম। বেশ বড় বসতি হয়ে হচ্ছে আর খেপতে পাছি একটা বন্ধরের হতো। অনেকটা নেপালের পদুপতি নাথের বন্ধরের প্যাটার্নের। এটিকের নইই গ্রাম ওই। মেঘাধি, হিমাচলে হিম্-ভারভের চাইতেও দৌড় ভিৎতের হাসটাই বেশী, সে কি হাসতা শিল্পে কি মানুসের মৈনাম্বন জীবনে। না হয়েও উপায় নেই। এই বরগালিতেই পুন্দার, ভুয়াপাত হয়ে ওপরের পথ ঘন বড় হয়ে বার তখন বন্দুয়ার হুঁতি নিয়ে আসা হয়। তখন এইখানেই হয় তাঁর ভোগদাপ। বলতে কি গঙ্গোত্রীর পথে যেমন বরগালি বন্দুকধারীর পথে ভেমনি এই বরগালি পাণ্ডাফেরই গ্রাম।

রবিয়া বলেন, আপেকার পথ ছিল ওই বরগালি হয়েই। এই পথটা নতুন।

তাঁহি হয়ে হুত। বরগালি চিঠির কথাই ত জানা ছিল, যেমন বন্দু চিঠির পর কুঁসলা। কিন্তু আবার সেখানে পেলান গ্যান। কিন্তু মায়েই বা কি, পথটা একটু এখিক ওখিক ঘুরে গেলেই বা কি যেমন হুঁর ভেমনি হুঁর। কিন্তু পুনঃহিলায় বরগালির পর কিব-নাছির উপদ্রব, কিন্তু তা আর পেলান না। ওমাছি গারে বসলে রক্ত শূন্যে নেয়। সেখানে যে যা হয়ে বার, সে যা নাকি আর সারতে চায় না।

তবে কিবরাহি পেয়ে ছিলান আবার গ্যান চিঠি হতে বন্দুয়ান চিঠি আসতে। ত্রুধর বোধহয় হাতে কানড়ে ছিল। পুনঃ তাড়াতাড়ি হাতের আখিন নারিয়ে দেই। চিঠিতে এসে ত্রুধর বেশ করে ভেঁল দিয়ে নিলে।

কিবরাহি আবারকেও কেটে ছিল একবার। কোথায় ঠিক মনে নেই। কেটেছিল হাতের আঙ্গুসে। নাছির হতোই মাছি কিন্তু মনে হল কেন হুঁত কুঁটিয়ে নিলে। শিমের ভদায় বটটুকুন রক্ত ওঠে ততটুকুন রক্ত। যা হয় নি ভেঁল দেবার জন্য কিন্তু সেই লাপ দিল্পতে লাপল অনেক দিন।

রবিয়া বলেন, নামনে এবার আবারের পক্ষ চড়াই।

সেই কথাইত পুনঃ আশিহি গ্রাম সমস্ত পথ ধরে। চড়াইর হতো চড়াই। বুক কেটে বার। প্যাটার্নালীরা পক্ষ বলে না বলে বিকট। বিকট চড়াই এই বন্দুকধারীর গ্রাম হাইল চারেক পথ। জানকীবাই চিঠি হতেই সেই চড়াই।

জয় বন্দুকধারীক বলে উঠতে আরম্ভ করলান আবার সকলে—আরও অনেক উঠছে—সেই হাটার পেঁচকীর লসটিও। কে নেই? পাছাদী আছে, বাগালী, বাগালী আছে পুন্ডরীটী, রাক্ষসী আর বেশওরালী।

কিন্তু খানিকটা উঠতেই বেশি হাঁপ ধরে গেল—বুকের কাছে যেন একটা বাখার হতো। আর নিশ্বাসও পড়ছে কোরে কোরে। হুঁধ দিয়ে নিশ্বাস নিতে বারন করে হিলায় ত্রুধকে, সেই হুঁধ দিয়ে নিশ্বাস নিছি আশিহি।



আর বলতে হচ্ছে। দাঁড়াচ্ছি আমার পুঁপা বেতে না যেতেই। এই শীতেও গা দিয়ে ঘাম বহছে আর গলা পুঁকিয়ে কাঠ।

ওঠার-বঠলে হল হয়ে অনেকখানি। কিন্তু তার অনেকটাই কেসে দিয়ে ছিলাম উঠবার মুখে, তার কিছু পাখি কববার জন্য। তোলা কুলিও আজ আর কিছু রাখিনি। শুধর ক্যামেরার ব্যাগও উঠেছে তারামতের পিঠে। বতটা পারি হাল্কা হয়ে নিরেছি। কিন্তু এখন ভাবি হল কেসে দিয়ে ভালো করিনি। যেটুকু হল ছিল সে যে প্রার নিঃশেষ হয়ে এস।

উপর হতে দাবছিল এক পাহাড়ী। পাহাড়ের গা দিয়ে নুড়ি পাথর গন্ধিয়ে দিলে পাথরে পাথরে বাজা ঘেয়ে যেন ঠকাস ঠকাস করে নামে, অনেকটা ঐকম। সেবে হেসে ফেলেছিলাম। বলে, হাল্কা কি? এখন নামবে তখন দেখবে এখনি মেল পাড়ী।

মেল গাড়ীই বটে। কিন্তু উঠতে উঠতে দেখছি ওপরের দাবীলের কেউ পড়ছেন পুঁবে কেউ বা বুক ঢেপে হয়ে বসেছেন হঠাৎ দুটো বুক নিয়ে। অগত্যা সেই গম্বা। সেলাসে হল গালতে ঘাচ্ছি, কে একজন এগিয়ে এস করুন চোখ মেলে। বতটুকুন হল ছিল ওর হাতে ঢেপে দিলাম। পাতার মতো দিয়ে বাতাস বইসে যেনন বর বর পথ হু তেমন পুঁবি তার নিঃশ্বাসের পথ।

কিন্তু মৃদাংগুরা প্রায় লাক দিয়েই এসে সেলেন দামানের সামনে দিয়ে। মনে হয় ওঁদের যেন স্রাতি নেই, ওঁরা যেন ভাত পাহাড়ী।

পরের বটকে একটা নিশান বতো দেখতে পেলাম যেন। তবে কি এসে সেলাম বন্দোস্তরী? কিন্তু তা কী করে হবে? এখানে দেখাছিনেও নদী, না পুঁবিছ জলের পথ। বন্দোস্তরীর বিবাহ-ই বা কোথায়?

রায়মার ওপর হতে মনে আঙ্গিহলেন। বদলেন, এ চীরাঙ্গা ভৈরব।

দু' ডিন যিনিটাই কথা হয় ওঁর সঙ্গে। কাল ছায়া বেলার পৌঁছে ছিলেন তিনি বন্দোস্তরী। এখন প্রায় একবারে বন্দোস্তরী গিয়েই থামলেন।

আবারো ভাবি, রায়মারের এতো কিসের ভাড়া। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে ঘাই তার মনের জোর দেখে, তার অশাব্যবশ কষ্ট দহা করবার ক্ষমতায়।

পাহাড়ের গায়ে চীরাঙ্গা ভৈরবের ছোট একটুখানি মন্দির। সমতটাই পাথরের। বাইরে বাপ বাপ সিঁচি, ভেতরে শীলামুড়ি। সমত পথটাই এখানে বাপ বাপ। মন্দিরের সামনে পথের ওপরই বয়ে গড়ি পাথরের এক বাসে।

সামনেই প্রকাণ্ড গাছ দার পাখা প্রাণাঘা বিস্তৃত হয়ে আছে পথ ও মন্দিরের মাঝার ওপর। তারী মনোরম পরিবেশ। গাছের ডালে দেখছি অল্পটর কোলানো।

পুঁবি, বন্দোস্তরী দাবার পথে দার যা ইচ্ছে মনে করে এখানে চীর কুলিয়ে দার। তারপর বহর ঘোরে না—ওঁর মতো মনের সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

চীর ত মলো করে আনি নি। না দেখছি এখানে কাউকে। চীর পেলে চীর কিসে কুলিয়ে দিতাম।

ওখানে মনে মনেই দেখি, ওপরে উঠতে উঠতে পাড়ীর গাছ ছিঁড়ে তাই ওখানে কুলিয়ে দিল সেগওয়ালী একটি ঘরে। না কাপক ছিঁড়ে চীর কোলোবার পথ নেই আমার—মনে ইচ্ছেই নেই কোনো বা পূর্ণ হয়ে। দুটোখ মেল দেখছি এই অগত্যা সেই ত পরম বিশ্বাস। এর ওপর আর কি চাইব?

পরমের দিনে কলকাতায় যেন একটা কুরকুরে লাওয়া সের মধ্যে বেলার প্রাণি হাওয়া দিয়েছে—কিন্তু কার মলো কার তুলনা? এ বাতাসে একটু ও কালি কুলি নেই। না মলো বালি। তাই বুক ভরে নিঃশ্বাস নেওয়া দার। অনেককাল বসেছিলাম ওখানে। তারপর দাবার উঠতে আরাগম্ব করি।

উঠছি ত উঠছি। মনে মনে ভাবছি এখনি কি জাঙ্গ উঠতে হবে শারায়নি। তারপর অনেকখানি উঠে এসেছি না, বন্দোস্তরী আর মূরে নেই। মোদহর আর এক কালুও নর। বটে হতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বন্দোস্তরীর মন্দির—দূরের ওই পাহাড়ের গায়ে যেন ছোট একটুখানি পাথরী বাসা। মন্দিরকে আমার মন্দির বলে মনেই হয়না। এর চাইতে অনেক বড় পেছনে কেসে আনা বরলাগির ওই মন্দিরটা। কিন্তু

যে অল্পতরুণার গাছের কথা ভেবে এসেছিলাম তার তো এখানে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম।

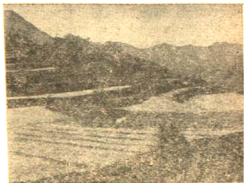
তুমার অব্যাহত রয়েছে যেদিকে বন্দনার হিমবাহ সেই দিকে, পাহাড়ের মাঝে, পাহাড়ের গায়ে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে হুশোপাল জলের বন্যা। সে বন্যা নেমে যেন শুষ্ক হয়ে আছে। আর তারি পা দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে জল, জলের বন্যা। বর্ষাশালার আপশাপ দিয়েও জলের বন্যা নেমেছে। "নার বন্দনার খেটী মূল বারা সেই বারা আসছে সামনের পাহাড়ের পা দিয়ে অধিকা-বিকা স্রোতে—নরু, নৃতোর মতো দেখতে পাচ্ছি তাকে পড়ে থাকতে কালিন্দ পাহাড়ের কানো গায়ে। কালিন্দ হতে নেমেছে বসে বন্দনার আর এক নাম কালিন্দী।

যা দেখছি সমুদ্রই অপর্যবী। অভাবনীয়। তবু যেন হন ভরে উঠল না আবার। বসি, বন্দনোত্তরীর হিমবাহে কি যাওয়া যাবনা যেখানে বরক হতে চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে জল, ফোঁটা ফোঁটা। এতো নদী।

গ্রীষ্মা বসেন, কেন যাবেনা। কিন্তু এভাবে ন। বরক কটা হুড়োদ আনতে হবে আর সুরেরি করে আসতে হবে তেমনজিরে বহর ছায়া।

আর একবার ওই পাহাড়ের দিকে চোখ মুলিতে নেই। পাহাড়কে এখন আর পাহাড় বলে বনে হচ্ছেনা আবার। যবে হচ্ছে যেন বরকের চার মূড়ি দিতে বসে আছেন নগরিরাজ হিমালয়। আর ওই যে হুশোপাল জলের বন্যা—সে যেন তারি কণ্ঠহার ঈষৎ আঘোষিত হচ্ছে আকাশের মতো বিপাল গিরিরাজের বকায়োনে শাস প্রবাদের উত্থানে পড়নে।

কিন্তু বন্দনোত্তরী জায়গাটা এমনিতেই বড় সম্ভবী। না হয়েও উপায় নেই। সামনে পেছনে জাইনে নিয়ে সবদিকেই পাহাড়। পাহাড়ের মাঝখানে ওই একটুখানি জায়গা যেখানে পাহাড়ের পা দিয়ে প্রথম সেমে এসে বয়াল গড়িত চলেযেন শূন্যকন্যা বন-সহস্রোতা বন্দনা। নদীর এগারে বর্ষাশালা ও হোকান-পাট ওপারে স্থিতির। সবুজ পাহাড়ের গায়ে। ঐ স্থিতির একটু, নীচ দিগে ডান দিকে সরে এসে তপ জলের কুণ্ড, বনে হতেই বৃষ্টি দেখা যায়। গ্রীষ্মা-



পাহাড় কেটে গানের বন্দনা

একটা পল্লও আছে। ওপরটা বর্ষাশালার একটু ওপর দিগে যেখানে এক সাবুর আত্মনা। কিন্তু এখানে দিগে ত কাউকেই যেতে দেখলাম না। সবাই দাচ্ছে নীচ দিগে নদী শেরিগে খালি পারে। সেইভাবে আনবার পেলান আবার ওপারে, পাশের ওপর পা রেখে, নদী চলে পা চুইয়ে।

বরক-গলা জল, তাই দতখানি ঠাণ্ডা হতে হয় তাই দপ হাজার কিট ওপরে এই বন্দনোত্তরী অথচ কি যাকব এই ঠাণ্ডা জলের ঠিক পাশেই উপবস করে গরন জা কুটছে। হাত দিলে হাতে কোকা পড়ে যাবে। কাশতে বেঁচে চাল কেলে লাও চাল সেক হয়ে যাবে।

চাল সেক ও করছে আবার সকলে। এখানেই এ মহাভ্রমণ। এই প্রসঙ্গই এখানে শেষে হয়। আর সপে করে নিয়ে যেতে হয় সবাইকে ছেবার জন্য। গ্রীষ্মা-কোরা গামছা এনেছেন সঙ্গে করে। তাইতে চাল বেঁচলে কেলে ছিলেন আর এক প্রান্ত পাখর চালা দিগে, যাত সেক হয়ে সেমে টেনে তুলতে পারেন হাত না পুঁড়িয়ে।

বন্দনোত্তরীতে বন্দনার জলে কেউ বড় একটা জা করে না ঠাণ্ডা বলে ভতটা নয়, বতটা উল্লসের কু আছে বলে। কিন্তু ও হুতে ত আর নামা যাবে ন না রান তাই আর একটা কুণ্ড করা হয়েছে বন্দনার ঠাণ্ড ও তপহুতের উষ্ণ জল মিশিয়ে। ওই কুণ্ডেই জা করছে সকলে। আয়রাও তাই বন্দনার কল মাথা হাইই সেই কুণ্ডে এসে নামি। না, ঠাণ্ডা জল মেপালে কি হ

—বেশ উষ্ণ । তাই হঠাৎই নানা গেল না একটু একটু করে শব্দে শব্দে নামতে হল ।

অপরিচয় স্তম্ভ । সেই স্তম্ভের ভালে একসঙ্গে ঘান করে মেয়ে দুইদুই দললেই । না করেই বা উপায় কি—তাহাজ্ঞা ওলর কথা কারইবা এখানে বনে হর—আমরা সবাই এখানে তাঁরইবা । ওই একবার আমাদের পড়িল ।

এই নিরাশ্রয় ঠাণ্ডার রাজ্যে সেই হল ছেড়ে উঠে আসতে কি আর হিঁসে করে । তাই উঠবার কারু নার নেই । গল্প জমে সকলের পা হয়ে উঠেছে লাল, গাঙ্গা একটু কল্পনা তাদের ত 'সিঁদুরবন' । কিন্তু সেখান শরীরে আর একটুও ব্যথা নেই । না ক্রান্তি প্রাপ্তি । সেই হল থেকে একেবারে করকরে শরীর নিয়ে ওপরে উঠে এলাব ।

বেলা তখন আর কত ? বোধহয় বাগোটা । তারপর পুরুষেরই সঙ্গে সঙ্গে হাশ্বরে গেলার । সেই ছোট হাশ্বরে । ভয়েমুখ । আশঙ্কা হর কোনোদিন হরত একেবারেই ভেঙ্গে পড়বে । আশঙ্কাও নর । কাল সামনে যে বাতীপালা ছিল তার আশ্রয় এক ভিত ছাড়া আর কিছু অবশেষ নেই । দুইদুই হর অতঃ—

হাশ্বরটা ছোট বসেই ভেতরটাও সম্পূর্ণ পরিচয় । সেখানেই বসেই হাশ্বর সঙ্গের দেখি ঠান্ডাটিস আরো কয়েকটা দৃষ্টি গাঙ্গানো ।

তারপর পুরুষে শেষ হলে এগারে আসি ।

রাত্রা আর হর না । একে তাঁর স্থান, তার ওপর তারারস্ত রাত্রা করবার জায়গাই পাচ্ছে না কোথাও । লোকালে তাই পুরি করতেই বলে নিলেন দুইদুই । এক সপ্তেই তাই ভট্টা করে বসে সেলাম বাহার যেতে ।

আজ বিকেলে আর গঠিতে হবে না, সেই আদর্শেই আছি । তাঁরইক্ষেত্রে জিনিসটি না হোক এক রাত্রিত থাকতেই হর । কিন্তু অনেকই তাও থাকেন না । 'কড়া' গঠিত ভাবে বসে ঘান শীত জানকীরাই গঠিতে । তাহাজ্ঞা এখানে 'বাকবনেই বা আর কোথায় ? জাল্লা ত নেই তেমন । হাশ্বালা বলতে ত আবার এই একটা—বার প্রথম হরের আর্থে'কর আছি আমরা, বাকী আর্থে'কর গঠিত শেঠকীরা । এই বরের ভেতর যিকটায় দুটো কুঠরী বসেই আছে সেখানে আদর্শ শেঠকীদের বেকো । বাদ, আর আর বাতী বার তাই আদর্শ এখানে ওখানে । কেউ বা সোকারীণী গালা ঘরে, কেউ বা পাণ্ডাঘর কাঠের হাশ্বরিতে । কিন্তু সেও তেমন বর বেশী নেই । রায়ে ত এখানে আর খোলা জালার থাকা গলে না ।

বাইরে শুধন জাণ্ডারা শেষ হয়েছে । জাণ্ডারা মানে সাধু সন্ন্যাসী সবাইকে ভেঙে যাওয়াযো । যাওয়াযো গঠিত সেই শেঠকী । কিন্তু তখন কি আদর্শ সেই জাণ্ডারা শেঠকী একা সেননি । ওর মধ্যে জাপ বাতীঘারা ছিল । এ বইলে আর ব্যবসায়ী বৃষ্টি । কিন্তু ভাবি, শেষে স্বর্গে গিয়ে পুণ্যের ভাগ্যভাগি হয়ে যাবে মাস্তো ।

সন্ধ্যার দিকে আকাশটা ঘোর হয়ে এলেও বোধহয় আমাদের বর তেরে বৃষ্টি আর নামেনো না । বৃষ্টি নামলে যে কষ্ট হত অপারিসমি তাতে আর ভুল নেই । কুল গঠিতেই কাল তার নমনা শেঠেই । তবুও সন্ধ্যার পর বরনার আরতি যেখানে ওপরে যাবার জন্য বাড়িকেই তুলতে পালোব না । বরের জালালা বরনা বর হয়েছে অনেক আগেই—এখন সকলে কন্ডলের অভয় গঠে । এমন কি বাওঘা দাওরা পূর্বের মাথার উল্ল এবেলা । বিকেলে পাঁচজি কিছু ভাঙ্গিয়ে আদা হয়েছিল আর জা । পাঁচজি সংযোগে জা বাওঘা হয়েছে ।

এক কন্ডল হতে দুই বার করে বসে, আমাদের সকলের হয়ে তুলিই বাও, তা হলেই হবে । আর মনে করে শিথিতে করে বরনার জল ভরে এবে । বাড়ী নিয়ে যেতে হবে ।

কন্ডলখানা বেশ করে গারে জড়িয়ে নিচ্ছেই বেরোই । তারপর সন্ধ্যার আলো আরগীতে নদী শেঠেই আসি ওপারে । শেঠ শেঠকীরা এসেছেন লুপরিবারে । ওঁদের কল্যাণেই আর যেন আরগীতে একটু বেশী রকম যটা ।

শেঠকী কিন্তু আমাকে সেখাই তাঁর কাছে ডেকে নিলেন । তাই তাঁদের সঙ্গেই একসঙ্গে আরগীতে গমন করে অন্ধকারে লুপরিবারে আসেই নদী শেঠে ওপারে ফির ।

হরজার কাছেই গাঁড়িহাটল কপসর । বসে, কোথায় শোব ? জালালা ত পাঙ্গিলে কোথাও । বাল, কোথায় আর শোবে এবে আবার সঙ্গে । তারপর হাশ্বকটা জালালা তাকে ছেড়ে থিই একটুখানি সরে গিয়ে ।

পুণ্যে পুণ্যে তাঁর, জৈর্জমাঙ্গের অসম্মত পরবে কলিফাতার ঘন সবাই হটকট করছেন তখন জালালা বর বানা করে সোমের গারে থিই বরদুটো কন্ডলের হায়েও শীতের ভল পাঙ্গিলে । শোবার আসে এক চোঁক জল খেয়েছিল । এ হল গাঁতে স্পর্শ করবার উপায় নেই, কিন্তু গলা থিই বা নাল পেও থিইবার ঐ পলানো বরক জালা আর কিছু নর ।

[অবশ্য :

আমি বলে বলে ওকে
বেঁধছি। বেঁধছি চুঁচি
করে। সোনা বুড়িতে
আঁকতে জর হচ্ছিল।
যদি কিছু বলে করে।
তাই এমন ভাবে বলেছি,
যেখান হতে ওকে আমি
বেঁধতে পার। কিন্তু ও
আমাকে বেঁধে নে।



অজিত
রবীন্দ্র

পাতলা ঠোঁটে সেই
হাসির কথা, বাবু! তাত
বুকে সেপটে।

—ও দেখ, কি সুন্দর
পাল তোলা নৌকা।
পাকল হুঁহাতে বাবু! হার
মাথা ঘুরিয়ে ছিল।

আ মি ও বুড়ি
কেঁরলামি।

পক্ষর হার বেঁধে পান বাধানো চেয়ারে বসেছি।
চেয়ারের পেছনেই একটা বুড়ো কুকচুকা পাছ। সেই
পাছের ভাঁড়ির পাশ দিয়ে আড় চোখে বেঁধছি। চোখের
মনি হুঁটো ঝা তিকে নিয়ে তাকছি। অনেকক্ষণ ধরে
বেঁধছি। যখন চোখে বেশ বাধা ধরে তখন শুধু দিয়ে
তাকাই পক্ষর ছোট ছোট তরবে।

পাকল সুন্দর দেখেছে। সোনা বড়ের বাড়ি আর
আশুন মাথা টাউন ওকে আরও অপছন্দ করেছে। কাল
চুলের পক্ষ যোগার মাঝে আটকে দিয়েছে একটা সাধা
গোলাপ। প্রথমে কেঁবেছিলাম কাগজের ভবন।
প্রাসঙ্গিকের। কিন্তু না। ছোট ছেলেটার লগে সৌন্দর্য
পিরে তার চুল হতে একটা পাপড়ি করে পরল বলে।
বুয়লাম ওটা গোলাপ। পাছ তার অনেক মাথা-মহতা
বেধ আর সৌরভ দিয়ে ছুটিয়েছে।

—বাবু! ছুঁমি বড় গুঁ। হাসির বিছান বগলে উঠলো
পাকলের বুকে। সে বলে পরল ঘুসে।

—আমি না তুমি। বাবু! ছুটে এসে কীপিরে পরল
পাকলের কোলে।

পাকল হুঁহাতে তাকে বুকে অরিয়ে ধরল। পুর সেনে
বুকে আটকে বেঁধে কচি মুখ চুঁবেল।

আমি বেঁধছি। আমায় চাষদিতে শুধু ওরা হুঁহান।
হঠাৎ চমকে উঠলাম। আমায় বেঁধেই সমস্ত রক্ত মুখে
অধা হলো। শরীর ভীষণ পরহ হয়ে গেল। বুকে আগল
কীপুনি। চোখের বুড়িতে বেন আস্তর।

পাকল আমাকে বেঁধেছে। সুন্দর সহজ বন্ধ সে বুড়ি।

পক্ষর বুকে পাল তুলে একটা নৌকা তেল চলেছে।
অলের বুকে আগেছে আলোড়ন। তেলসেছে তার প্রতি-
জ্বি। পক্ষর আলোতে পেরুয়া বড়ের পাল বড় অপসরপ।

বীরে বীরে আমায় বুকের বং বলালো। রক্ত আবার
নিঃসরণতো চলতে শুরু করলো। নিশাদের কড় কমে
এল। চোখের বুড়িও আবার সহজ হয়ে এল। পাকল
আমাকে বেঁধেনি। আমায় নব্বুর তার নব্বুর মেলেনি।

এবার বুকের মধ্যে কেন বেন পুড়ে উঠল। অংলা
বললো। অলহুদীর মনে হলো নিজে। আমাকে
বেঁধলো না কেন পাকল? প্রথমে তব গেলো সে ভরে
ছিল কিছু শান্তি, কিছু শাশ্বত। এখন বেন মনে হচ্ছে
আমায় এই চেয়ে থাকা হয়েছে বার্ষ। আমাকে যদি সে
একবার বেঁধতো। সে দেখার বতো বুগা থাক, অবহেলা
থাক তবু বেন শান্তি পেতাম।

আমি আবার বেঁধলাম।

পাকল চলে গেল। বাবু! তার পাশে হুঁটো ছোট
ছোট পা কেলে। পুণি লাইনের সামনের পীচ ঢালা
হাতা ধরে বীরে বীরে এগিয়ে গেল। তাহলর এক সন্থ
বাক বুঝে চোখের আড়াল হলো।

এবার আমায় হুলস্থল হুপসে বীর্ঘবাস বড়িয়ে পড়ল।
ভীষণ ভাবিতে চোখ হুঁটো হলো অন্ধকার।
বিরের আলো হারিয়ে গেল জাতির স্পর্শে।

পাকল চলে গেছে অনেকক্ষণ।

আমি বলে আছি। অকারেই অনেকবার তাকিয়েছি

সেইখানে। যেখানে এসেছিল পাকল। যেখানে সে বসেছে। গেঁড়েছে। হেসেছে। আমি জানি সে নেই। চলে গেছে অনেকক্ষণ। তবু ব্যর্থতার তাকিয়েছি। আমার বুকের ভেতর দখল পড়েছে পাকলের আঁচড়া দেহ। বহিঃ স্তব্ধ আমি আমার বনের কল্পনা ধরাপড়েছে চোখের ছায়াতে। তবু ব্যর্থতার তাকিয়েছি।

পাকলের নাক পরিচয় হয় গ্রীন্-কমে। নাটকের পাত্র-পাত্রীর সম্ভা গৃহে।

আমি নারক নই। পরিচালক।

স্বর্গ এসে বলল—মুহুরতা আমার ভ্রষ্টা টেনে দিল না।

আমি তখন ঠোঁট। কাট সিন্ডলে টিক আছে কিনা দেখছি। প্রতিটি রিকুইজিট পছন্দ মতো নাগিয়ে নিচ্ছি। বই শুরু হতে মাত্র আর বিশ মিনিট বেরী আছে। হাতে আর সময় নেই। স্বর্গের কথাকে বেশ রাগতচোখেই চাইলাম। ও ডর পেয়ে গেল।

—আমার ভ্রষ্টা—। যেমন গেল স্বর্গ।

বেশলায়। কি বিস্ত্রি বেকআপ নিয়েছে। হাকডা হাকডা গং। চোখের নীচের কাঞ্চল এতো ঘোটা ধরেছে যেম ভিন বাসের শিশু কাঞ্চল পড়েছে। বিরক্তে জলে উঠলাম—একি করেছে?

—পারছি কতে রিলেন। তার পেয়ে যায় স্বর্গ।

—হিমাংক কি করছে?

—পুল্পের গন্ধে—

ছুটে এলাম গ্রীন্-সমে।

পাকল একটা চেয়ারে বসে পুস্তকের বেক-আপ দেখছে। বেশছিল। আমাকে মেখে ঘেসে ফেলল। সে হাসিতে ছুঁলি।

—এটা কি হয়েছে? স্বর্গকে বেধিয়ে বেশ বেপেই বললাম।

—কেব। বেসতো হয়েছে। তেমনি হুঁই হাসি তার ঠোঁটে।

—বেশ হয়েছে?

—নরতো কি। এককোটা মেখে সে কিনা নাচিকা।

ঠোট উলটে বলল পাকল।

চীৎকার করে উঠতে পারলাম। আড়িয়ে দিতে

পারলাম গ্রীন্-কম হতে। কিন্তু কিছুই করলাম না। সেই মুহুর্তে কি যেন হলো আমার। মনে হলো তার শব্দত অপরাধ আমি যেন অপরাধ বলে করতে পারছি না। সব অপরাধই অপরাধ নয়। তুল। তবু তুল।

আমি হাসলাম। সে হাসল।

আমার চোখে বিদ্যুৎ কলক রিল। তার চাহনিতের নরম প্রেরণ বড়ল।

উইন্ডের পাশে ঝড়িয়ে আছি। সে এল। পাড়াল আমার পেছনে। একটু ধোঁবে এলো। তার নিবাস আমার হাতে পড়ল। হাতের চুলগুলো কাঁপলো। আমিও কাঁপলাম। বুকের মধ্যে অসুস্থ হুঁ হুঁ দখ। মুখে যেন আভ্যন্তর হলকা।

আভ্যন্তর আরো বাড়ল।

আমি পুড়লাম। পাকল পুড়লো। হুঁকনের বুক ফুড়ে বহুই হলো বর্গীর আনন্দ। বহুই গায়ে ঝুঁড়ি হলো। তুল হুটলো। সৌরভ ছড়াল। আমরা মৃত হলাম। পালল হলাম। হাবিয়ে গেলাম নিজেদের মধ্যে।

গল্প উপস্থাপন নয়। দিনেবার জগালী পর্বার ছবি নয়। আমরা বিতোব হলাম। হাবিয়ে গেলাম। তলিয়ে গেলাম এক বাসনার সমুদ্রে। সে মহাসাগরে বড় নেই। বিদ্বৎ গুরু নেই। ভাঁটা নেই। আছে শুধু জোয়ার।

—কি করবে মুহুর্ত। আমার চোখে চোখ রাখল পাকল।

—বল। বহুবিকোর বৃষ্টি তুলে ধরলাম।

—মা জানতে চেরেছেন—। পাকল কথা শেব করল না। মাথা নীচু করে কাগড়ে আঁতুল অন্ধারে থাকলো।

পাকলের মাত্র মুখটা ভেসে উঠলো। বিবহার সুন্দর হাসি মাথা হুঁ। কী মিষ্টি। একটু চুপ করে বেক করলাম—দাকে বলো।

—বলব। আমার আলো কলক মারলো পাকলের বুকেরে।

আমি হাসলাম। সে হাসিতে কি ছিল আমি না। (আমার বুতো আমি মেখেতে পাই না।) পাকল আমার আগো কাছে সরে এল। অনেক ঘন হলো। এক সময় আমার হুঁক হুঁ রাখল। তার অধিকতর তুল

হৃদয়ে পড়ল আঘাত বোলে। আমি দুটো করে হালান সে চুল। কী নহন। কী মন্দ।

যৌবন বয়সের সময় বেলে মাটিতে। প্রাণে লবটুকু আবেশে ভিঁষিয়ে ফিলায় সে যৌবন। যৌবন কাটল। ছোট লম্বা চায়া মাথা তুলল। একটু একটু বড় হলো। একদিন শিশির দিক কুয়াশাচ্ছন্ন ভাবে বেলায় সে চায়া হুইয়ে গেছে। বৃকের মধ্যে কে'ল উঠলো। তবে মলিন হলো মূখ। সজল হলো বৃষ্টি। বেলায় বৃষ্টি মেলে বেলায়। চায়া গাছের পাঁজরে বহেছে পচন। প্রাণের লবটুকু আবেশের পরিণাম। একটুকু প্রাণে একবেলী জালবাগা সহ্যে কেন। দীর্ঘকাল পড়ল বুক ঠেলে। এ ছাড়া কীইবা আমার আছে।

নীতের কুশা মাথা তোর।

প্রতি দিনের নিয়ম মেনে এলাম ওকে বাড়ী। ছোট তাই নিতাই ওখন পড়ছিল কালনার বাবে বসে। আমাকে রেখে বই থেকে মূখ তুলে তাকাল।

সলজ চোখে তাকাল। জানতাম। পাকলের লেখা আমার যে সম্পর্ক পড়ে উঠেছে তা কারো অজান। নেই।

—বিদ্যে ভাবের বাগেই চলে গেছে। হালতে হাসতে বলে নিতাই।

চমকে উঠলাম! ও উঠকে গেল অজান। চিন্তায়। গলায় ভেতরটা বেন ওকিয়ে গেল। রান কর্তে বললাম— কোথায় গেছে।

—কেন। আপনি জানেন না।

—নাভো। আরও অবাক হল।

—কাল রাতে কাকার টেলিগ্রাম এসেছিল। বিদ্যে চাকরি হারছে। আমাকেই বড়না হতে লিখেছেন। আপনাকে এ কথা বিদ্যে বলে।

প্রথম অবাক হলেও এবার নিরাশার বৃকের মধ্যে হাছাকার উঠলো। পাকল আমাকে কেন এ কথা জানালো না? এত বড় জানকের সংবাদ কেন গোপন করল। তবে কি সে ভেবেছিল। আমি মাথা বেব।

—কে, মূল এনেছো। ভেতরের বকের পর্দা ঠেলে পাকলের যা এলেন। আমাকে এই সকালে তাকে

আরো সপ্রতিভ মনে হচ্ছে। এতদিনের মলিন মূখ আমায় অসুস্থ উজ্জল রক্ত ভরা। মনে হচ্ছে দীর্ঘ রোগ তেপের পর যেন অ'বোগ্য হয়েছেন, অবস্থা অজ্ঞান পরিবর্তন থেকে আত্মকে লটারীতে পেয়েছেন প্রচুর অর্থ। তাই চাহনিতে আমায় বেন ঐশ্বর্যের বড় মেশান। অর্থ পতকাল রাতেও তিনি ছিলেন সুস্থিত। চলনে বলনে ছিল পরিবর্তন।

দীর্ঘবে শুভ্র চাইলাম তাঁর দিকে।

—পাকল তে'মকে খুঁজেছিল। তোমার বাসাতে গিয়েছিল। কিন্তু তোমাকে পায় নি। বাবার লম্বা আমাকে অনেক করে বলে গেছে। তুমি যেন ওর উপায় করো না। বেশ মিষ্টি করে বলেন তিনি।

চুল করে ঝিঁকিয়ে বইলাম। আমাকে আমাকে কেই বলতে বলল না। (বললে হঠাৎ বলতাম না।) আমি কোন কথা, সে মতই অপ্রয়োজনীয় হোক কারো মূখ হয়ে পোনা গেল না। নিতাই জানতে চাইল না কোম ল'কে অর্থ বা কোম কঠিন ক্যালকুলেশনের অর্থ। পাকলের ম'কোম অল্পবয়সের করলেন না ল'কাতার সাহায্যের অর্থ অথবা অল্প কতক বিয়ের ল'ক'ও কথা।

মাত্র একজনের অসুস্থতা আমায় এত বড় আঘাত জানালো আমার মনে। ওকে টুকরো টুকরো হতে পেল। মনে হলো আমি হঠাৎ এ পৃথিবীতে নেই কোম অসুস্থলোককে বিচরণ করছি। আমার লম্বা অসুস্থতা যৌবন যৌবন বেন মই হয়ে গেল।

এবার কি ভাবে পাকলের বাড়ী হতে বেড়িয়ে এসেছিলাম মনে নেই। শুধু মনে পড়ে একটি মূখ বেবেছিলাম অস্বাভাবিক হাসি। অজানার উদ্ভাপায়ে ল'ক'কিছু উলটপালট হয়ে গিয়েছিল।

কেন তাই বিন কেটেছে বলতে পারব না। ত'ক'দিন পর পাকলের একটি চিঠি পেয়েছিলাম। সে লিখেছিল—“হাস করো না ল'ক'কি। আমি আমার ভেতরা কান্ডে কি'র আসবো।

এই একটি লাইন। এই ক'টি ল'ক' বেন আমায় আমার আমার পৃথিবীতে কি'রিয়ে দিয়ে এল। আমি কে অসুস্থতার পক্ষ হতে অনেক ক'টে হাতকিয়ে আসোনে আসবার পথ পেল। আমার মন স্তব্ধ পেয়ে বলল

এ পৃথিবীতে এখনো আলো আছে। বৎ আছে। এখনো
এক বনশ হচ্ছে। গ্রাণে আছে কাকী। আমি অধিকার
জলুনি হতে মুক্ত হলাম।

সব পাছেই কুল কোটে না। কুড়ি এসেও যাবে না।
আমার হৃৎক আনে। আমার গুহ হলো জীবনের গতি।
হাতিয়ে পেশাম বিবিক্ত আঁধারে।

আমার চোখে সবুজ রিয়ে একদিন পাফলবের বাড়ীর
সবাই চলে, গেল। চলে গেল পাকল বেখানে
চাকরি করে।

চিট্রি বিলাম। গ্রাণের সবটুকু অসুস্থি চলে
সাক্ষ্যলাব সবকটি অক্ষর। প্রত্যুত্তরের আঁপাধ দিন
পড়িয়ে নতুন দিন এল। পাকলের আর সাক্ষ্যলাব
না। আচরকা সে বিহার বিল।

দিন কেটে গেছে প্রাকৃতিক নিয়মে। রাত কেটেছে
বিস্তার অমিস্তার। একদিন সব গিয়ে গেল। কুলে গেলো
পাকল নামে কোন যেরের কথা। আর তার পরিচর।
আমি শুধু আছি। আমার বর্তমান আছে। তবিত্তে
হুতো আছে। শুধু অতীত হারিয়েছে। অতীত
আজ অতীত।

আট বছরের পুরনো কথা বেন সেদিনের। সেবেলার
সে কলের। বেবলাম আর অমাক হলো। এত স্পষ্ট।
এত বন্ধ। এত বরাহেবার কেওরে তাতো আনতাম না।

আজ পাকলকে বেবলাম। বেবলাম জীবনের রূপ
সাক্ষ্য। বেবলাম আর অমাক হলো। বেবলাম
আর অতীত কিয়ে পেলো। আনলাম। আমার সকে
একদিন পরিচর ছিল। একদিন অত্যন্ত কাছের মজু
ছিল সে। আজ আর কিছু নেই। আজ শুধু একটা বর।
আজ আর আমার ছায়া নেই তার বারে করে। আমার
ছায়া নেই তার বেহে। আমার রূপ নেই তার চোখে।
আমার সুনাথ-দুর্দাম তার বুক আশা ধরায় না। পুনীতে
উজল করে না। আমি আজ কিছু নেই। পাকল
পাকল। আমি আছি। ছুই এক বর। এক
আর এক।

ঠাণ্ডা লাগছে। পাকার কলো ব্যাকাস ব্যাপটা ধারয়ে
সবাকো। একটু শীত শীত করছে। একবার কেঁপেও
উঠলাম। চারিদিকে গোখে হুপিয়ে বেবলাম। সাক্ষ্য

পড়িয়ে গেছে। আলোর পোটলোতে আলো জলছে।
বাকার জলে পড়েছে সে আলোর ছায়া। ও পারের
সামকক মিথমে শুক হয়েছ সাক্ষ্য প্রাণনা। সে শুক।
সে শুক, সে কলো ব্যাকাস পোটলে আসছে।

ইচ্ছালাম। বাড়ী কিরতে হবে। নইলে সবাই
আববে। কুহতে পাবি না বাড়ীর সবাত ডাবার কি
বাকতে পারে। আমি তো অসুস্থ নই। আমিতো শক্ত
নই যে পথ হারাব। শুধু সবাই ভাবে। ভাবে আমি
পাশল। আমি শক্ত। হতে পারে এ পথের আমি
নতুন এসেছি। এ রকম আরো কত নতুন পথের আমি
গেছি। পথে পথে গুরে সে পথের একদিন আমার পরিচিত
হয়েছে। আমি পথ হারাই নি। পথ আমাকে নতুন
পথের সন্ধান দিতে পারে নি। এ পথেরও আমি মাত্র
পাঁচ দিন পূর্বে আসতে পারি। শুধু মাত্র একটা দিনেই
এ পথেরও প্রতিটি বাড়ী প্রতিটি গ্রাম। আমার অত্যন্ত
পরিচিত। আমি যে একদিন শুধু খুঁজছি পাকলকে।

বালের মাঠ পেরিয়ে পুশিল শাইনের সাহনের চীত
রাস্তা দিয়ে এছছি। আরও একটু গেলেই ঐ বাক
পার হলই সেই বাড়ী। ছোট বুক সন্ধান প্রাচীরে থেবা
বাংলো। সবুজ মশপ বানের লন আর কেয়ারিতে
কেয়ারিতে মনস্তমী কুলের বংবাণার।

আমি এসেছি এ বাংলোর সামনে। এই মাত্র এলাম।
এখানে এসেই আমার পা প্রচণ্ড ভাবি হয়ে ওঠে। বনে
হয় বেন হাটতে পারছি না। বেহটা বেন বোকা। মনটা
বেন কেন আকুলি বিহুনি করে। চোখের কুট্রি কেন বেন
ঘন ঘন পথ বলায়।

—মা ঐ যে বাবা।

চমকে ওঠে বেবলাম। পোটকোতে বসে পাকল।
তার কোলে বাবু। সামনের ছোট টেবিলে একটা বই।
তাদের মাথার উপর উজল আলো। পাকল চোখ মেলে
বহল পোটলের দিকে। কি, স্মরণ চাষনি। কুট্রিতে
শুনী আর আনক হকান।

—মুঠু ফেল। পত হলছি। কুজিম বহক করে পকল
পাকলের।

আমি বেহছি। চোখ মেলে বেহছি। আমার হাটায়
গতি কখন গুহ হয়ে গেছে আমি না।

আধুনিক পরিবারে জীবন সার্থ্য



‘আমাদের আজকের জীবনে...’

বোম্বে গৃহিণী প্রেমা স্ববরতী বলেন

‘আমাদের আধুনিক এই জীবন ব্যস্তার অনেক রকম বেকসই জটিল জিনিসপত্র, আর ব্যস্ততার মধ্যে আরও জটিল জিনিস চাই—যেখের ওয়ানেকশন বোম্বে গৃহিণী প্রেমা, বি. স্ববরতীর অভিমত। তিনি বলেন, ‘আমি এ ধরনের সব আধুনিক, উন্নত জিনিস আমার পরিবারে ব্যবহার করি। এই ধরনের সাজ, যত্নের করে সজ্জিত আবশ্য হয়। আমার সাজের সঙ্গে সঙ্গে আমার গুন অনুভবীয়।’

‘সার্ফ’ সবার সবার বহুলাৎ কাল্পনিক জিনিস বলে দিন, যেখানে সবার কাপড়সাজা কেন্দ্র বহুলাৎ করা হয়েছে।’ তাঁর স্ববরতীর বাড়ীর কাপড়সাজা—সাঁট, গাউন, ট্রাউজ, শাটী, বোম্বেগার, ওয়াশ কাপড়সবই বাড়ীর সুখী সাজে কাটান।

আপনি সার্ফ ব্যবহার করলেই সার্ফ আপনার কাপড় কাটার কামোলা আঁটক করিয়ে দেবে—অল্প সার্ফে কাটা কাপড় আপনার গ্রেড অনেক ভালো, অনেক বেশী কমলা হবে। তাইতো ঘরে ঘরে আমি সার্ফই ব্যবহার। আপনিক এখার সার্ফে কাটতে শুরু করুন।



সার্ফে কাপড়সাজা সবচেয়ে ফরসা করে কাচে

দ্রুত পিছিয়ে নেওয়া

ST. 16-753 HQ

গেট পেরিয়ে এক ভাঙ্গেলোক এসিয়ে বাঁধেন।
মুঠা দেখি নি। পেছনটা দেখছি। বুকে পাংছি।
হামার চেহেও সুন্দর। আমার চেহেও বসিষ্ঠ। আমার
চহেও অনেক অনেক বেশী সুপুরুষ।

—বাবা! বাবুয়া পাকলের কোল হতে নেমে ছুটে
এল। কাঁপিয়ে পড়ল ভাঙ্গেলোকের হাটুর কাছে।

হাত বাড়িয়ে তাকে জুলে নিলেন ভাঙ্গেলোক। চুই
বলেন তার নয়ন গালে।

পাকল নেমে এল। ঠাণ্ডাল ভাঙ্গেলোকের সামনে।
হামি দেখলাম। স্মি দেখলাম। পাকলের গোঁষে মুখে
দীর কোঁচ-র। সব কে অন্দের তরঙ্গ। ভাঙ্গেলোকের
হে দেখতে পাচ্ছি তবু বুঝলাম। সে খুশী।
খলাম সে খুশী।

—বাবা! কে ভাকছে।

ভাঙ্গেলোক কিতে চাইলেন আমাব কিকে।

আমি চমকে উঠলাম। নিস্তর হরে গেলাম। লম্বাক
আমার কেঁপে উঠল। চুরি করে ধরা পড়েছি।

ভাঙ্গেলোক এলেন। গেটের কাছে ঠাঁড়িয়ে বললেন
কি চাইছেন?

আমার জখনো মুখে হাসি কইল। কান্ড ঘন হতে
খুশী উপচে জুলে বললাম—আপনার বাগান দেখছি।

ভাঙ্গেলোক দুটি কিত্রিয়ে দেখলেন মূল পাছের
কেয়ারিগুলো। বললেন—ভেতরে আসুন।

—না, থাক। আমি হাটতে শুরু করবাই পূর্বে
চাইলাম পাকলের মুখে। বিপুল বিশ্বাস চাহ নি তার।
তবে সে চাহনিত হয়েছে অচেনার ছন্দ।



সাহিত্য সমালোচনা

এক দুঃস্থ কবি। বিশেষ তাৎপর্য আবার তুলনামূলক বিশ্লেষণ হয়। সেটা তো আদ্যো হুতব। এর ক্ষেত্রে প্রয়োজন বন্ধ মন এবং তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী ক্ষমতা। কিন্তু

সমালোচকের মন যদি উদ্বেগে ঘেঁষাযুগ থাকে, বিবেক যদি অর্ধের বিনিময়ে তাত্ত্বনৈতিক বার্ধক্যে কাছে বন্ধক দেওয়া থাকে, তাহলে সমালোচনার নামে বা স্তম্ভ হয় তাৎপর্যের ওপরকার আবর্তের চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। তাতে প্রভুকে ভুট্ট করা বাহ্যিক পণ্যবস্তু কৈকিষ্ণু শাবী করেন। সেখানে সকলের সমান বিচার। ব্যাতিমানব, অর্থাবানের, কাতোরই ক্ষমা সেই সেখানে।

সাহিত্য জগতে প্রবেশ করলে সমালোচনার সন্দ্বীপ হতেই হবে। রবীন্দ্রনাথকেও হতে হয়েছিল। কিন্তু তখন তিনি ছিলেন জীবিত। প্রয়োজনমত উত্তর দিয়েছেন, তর্কযুক্তে নেমেছেন বরবার বহুপ্রসঙ্গে, কিন্তু আজ বিশব্দুর তিনি আমাদের ক্ষেত্রে চলে গেছেন। তাই আজ আমাদের প্রয়োজন সংশয়ের। তাই বলে রবীন্দ্রনাথিত্যের সত্যিকার আলোচনা বা সমালোচনা বন্ধ করে দিতে হবে এমন কথা নয়। কিন্তু আজ এই রবীন্দ্রশত-বাহিনীকী বর্ষে বলে আমরা কি দেখছি? নিষেকে রবীন্দ্র ভক্ত বলে আবেগধন প্রচারকাণ্ডী অধ্যাপক সাহিত্যিক শ্রীহৃদেব বস্তুর লেখনী হতে বের হয়েছে এক অপূর্ব অদ্ভুত প্রবন্ধ। বা সাহিত্যে সমালোচনার ইতিহাসে চিরকাল এক কলঙ্ক হয়ে থাকবে। সাহিত্যিক সত্যতার প্রতি এক চরম আত্মঘাতী আঘাত এই প্রবন্ধ। রচনার ভাষায় বাহুবুঁ মিশিরে অত্যন্ত গঠতা ও বৃত্ততার সঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথকে গালিগালাজ করে গেছেন অগাধোচ্চ।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে রাজনীতি, পশ্চিম বহুবার করেছে, কবির নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির মূল থেকে তাঁর জীবনের গ্রন্থ শেষ পর্যন্ত। নাইট উপাধী জ্ঞাপনের পর গ্রন্থ সমস্ত ইংরেজ জাণ্ডাইতো চটে গেল তাঁর ওপর। দল্লু সঙ্গে সেই অন্যায়ের রাজনীতি অভ্যাসিক পেরিয়ে আবেদিককেও

শতবারিকী রবীন্দ্র-কৃত্য।

ভক্তবাস বহু

○

পরবর্তিকালে আনাহের যোগেও একপ্রণীর সাংস্কৃতিক হুজিবেচার বল সই হয়েছেন খাটা বেশ বিশেষ তারতের হুমি তো সুর করছেনই, এমন কি তাঁদের আপন বিচ্ছতাকে বিশ্বাধনীতির আড়কাঠিগুণে নিঃশ্রুতিত করে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে রাজনীতি সুর করেছেন। অব্যাক বিশ্বের এঁদের গত করেও বহুবার কার্যকলাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এঁরা প্রথমে অবনীন্দ্র মল্লালকে নিয়ে পড়েছিলেন। এঁদের মতে আধুনিক ভারত শিল্পে বেলমূল বিনিময়ী একটা ভূমি ব্যাপার। ওটা প্রাচীন ভারতের শিল্পকলার অমৃতত নাহ। প্রতিবার উঠলো এঁদের যত্নের বিলম্ব। এঁরা কিছুদিন চুপ করে থাকলেন। এখন আবার তৈরব আগে উঠেছেন। এবার তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ শুরু করেছেন। সম্রাতি প্যারিসে প্রকাশিত "Two Cities" পত্রিকার এক প্রবন্ধ লিখেছেন বুদ্ধসেব বাবু। প্রবন্ধটির নাম "Western influence on Rabindranath Tagore" শ্রীমন্ত কলিকাতা বৈতার মারকৎ একটা বক্তৃতাও প্রচার করেছেন। মে মাসের প্রবন্ধার্থের "বৈতার জগতে" সেই বক্তৃতা বুনোকায়ে প্রকাশিত হয়েছে। নাম "রবীন্দ্র বচনার পাশ্চাত্য প্রভাব"। অত্যন্ত সুন্দর নাটক। চমকপ্রদ বিষয়বস্তুও বটে। বিবর্ত সাহিত্য সমালোচকের আদর্শ বিষয়। সত্যিকার সন্দ্বীপ মন ও বিবেকবী নক্তি দিয়ে, বিচার করে যদি সত্যই কোন তথ্য কেউ উপস্থিত করতে পারেন, তিনি প্রত্যেক সাহিত্য পাঠকের প্রচুর উপকার করবেন। কিন্তু বুদ্ধসেব বাবু সে পথ ছাড়াননি। তিনি নেমেছেন কবির সূঁসা প্রচারে। স্বভাবতই তাঁর বৃষ্টি গেছে খোলাটে হয়ে। ইতিহাসকে ও তথ্যকে করেছেন বদুদ। বিবর্ত। নিজের মনের বিকার এবং পাক তিনি আত্মগোপন করেছেন

শ্রম করলে। পরবর্তিকালে মুলোমিনীও তাঁকে নিয়ে এক চোট রাজনীতি করেছিলেন। রাশিরা থেকে কেববার পর আনৈতিকতা তাঁর কোন বক্তব্য সুনতে চারনি। কিন্তু স্বাধীনতার

বিশ্বকবিও গুপ্ত। তুলনামূলক সাহিত্যালোচনায় বসতে বলে এ পর্বত কোনও সমালোচককে এমন তালাতাল্য মুক্তি দিতে দেখা যায় না। সবচেয়ে বিশ্বাসের কথা এই যে, তিনি তাঁর প্রবন্ধের সিদ্ধান্ত টেনেছেন কোনরূপ তথ্যভিত্তিক আলোচনা না করেই। এবং সেই কঠিনা করার মুক্তি বা পেয়েছিলেন তা একজন মূল ছাত্রও দেখতে লজ্জা পেল। তাঁর বিবেক বোধের তাকে একটু বাধা দিয়েছে এখানে। তাই তাঁর প্রবন্ধের যেটা গ্রন্থ-সেই “প্রত্যয়” কথাটি তাকেই তিনি ব্যাখ্যা করেছেন অত্যন্ত খোঁষাতে ভাবে। কারণ তিনি এ বিষয়ে নিঃসংশয় ছিলেন যে তাঁর পক্ষে তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ সম্ভব হবেনা। তাই তিনি লজ্জা করেছেন একলাশ অবাঞ্ছিত কিছু বাড়া বাছা নশ্ব। সবচেয়ে তাকে সান্ত্বিত্যেছেন হুতাশে। পশ্চিমের পাঠকদের ভুলে চরনা করেছেন সেই সাবেকী আমলের পশ্চিমী তৎসংগে বন নিয়ে পশ্চিমী থানা। কারণ তিনি জানেন বিশেষভাবে প্যারিস এমন একটি ভারতীয় থোবানে বর্তমানে রবীন্দ্র-লোচনা একরকম নেই বললেই হয়। তাছাড়া সেখানকার পাঠকমূলের রবীন্দ্র রচনার সাথে তাঁর বক্তব্য বাচাই কতে দেখার সুযোগও খুব কম। কিন্তু তিনি একথাটুকু খুব ভালোভাবে জানেন সে চরনার কথাগুলোই বাঙালীর পাতে বেগুলা চলবেনা। তাই তিনি সংক্ষিপ্ত-করণের নামে ছাঁট-কাট করেছেন তাঁর ইংরেজি লেখাকে। বাক দিয়েছেন বর আপত্তিকর বক্তব্য মূল রচনার সুরকে করেছেন অত্যন্ত মোসঃসেহ। ইচ্ছা করেই তিনি এক ইংরেজী শব্দের পরিবর্তে অল্প-ইংরেজী শব্দের বাংলা বলিয়েছেন।

আমাদের দেশের একশ্রেণীর কবি, কবিতা লিখতে বলেন সামনে পশ্চিমী কবিরের কাব্য স্থল রেখে। দুইহাশ চরন ঝড়ন, দুইহাশত দাক্য চরণ করেন এবং তারপর তাকে পংক্তির পর পংক্তি সাজিয়ে সাজিয়ে সৃষ্টি করেন তাঁদের কবিতা। বলে সত্যিকার সৃষ্টি কি জিনিষ, তা তাঁরা জানেন না। তাঁরা নিজেদের গায়ের পঙ্ক সকলের গায়ে ধুঁকে বেঁকাতে মান।

বীজের অমুরোদগম কখনো মানুষের হৃদয়বাসিক হয়নি

মুক্ত করবে ডাব মধুগুণ, তার ভূমিরাপা প্রেমীর সাধে।
তারেই সেই হৃদনের হৃদনে খুব হয়ে ওঠাতে সাধায়া
করবেন প্রভৃতি, দিকন করবেন বাহি। বাহায়া হাওড়া
লেনে তখন পাগল উঠবে নেচে। সেই মাচনের মাধে
স্বর্গেই সেবেন উত্থাপ। সেই উত্থাপ লেনে আতো হাতন
জাগবে বহুভাষার প্রাণে। তার হৃদয় মিঃকে নিয়ে বেহিয়ে
আগবে অন্ধুর। সৃষ্টি তার ভ্রম পায়ে বিশাল মহীভূতের
সজ্জাবনা নিয়ে। এইই তো সৃষ্টি। মহান প্রতিভার
লেননীহতে যে সৃষ্টি হয় তাও তাঁর ভ্রমে নিঃসৃত রক্ত।
কবি নিঃসেই বলে গেছেন “কবিতা এক এক সময়ে বটিন
আলিফনে হৃদয়টি মিঃকে রক্ত করে নেন।” বুদ্ধবোধব
প্রথম সজীর বেহিয়েছেন ‘বর্ধন’ কবিতার সাধে শেলী
ওট টুনি ওয়েটার উইও কবিতার সাধুভাষা কথা বলে।
সৃষ্টিই খুব পুরাতন। রবীন্দ্রনাথ এসবকে আলোচনা করে
গেছেন কিন্তু কোথাও বীজের করেন নি ওই অসুস্থতির
কথা। তিনি বর্ধন কবিতার সৃষ্টির বে পটভূমিকা
বিবৃত করে গেছেন তাকেই প্রাথমিক বলে গ্রহণ করা
উচিত ছিল। কবি বলেছেন—“১০০০ সালের বর্ধনের
ও বিন্দুনের সুরেও একটি প্রকাণ্ড তড়ৎ বেহেছি। এই
তড়ৎ আমার কাছে ভরতে আসেনা এসেছিল। বাকি
পুরাতন ও জীর্ণতার আসক্তি ত্যাগ করতে হবে তড়ৎ
তড়ৎনা পাত্যটকিরে সেই ডাক দিয়ে গেল। এমনভাবে
জির নবীন বিনি তিনি প্রলয়কে পাঠিয়ে ছিলেন মোহ
আশরন উড়িয়ে যেবার ভুলে। তিনি জীর্ণতার আড়াল
সরিখে দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করলেন। তড়ৎ বামলো
বললুন অত্যন্ত কর্ন নিয়ে এই বে কাটাখুঁ এতে তো চিত্ত
প্রসন্ন হ’ল না? যে আশ্রয় জীর্ণহয়েবার তাকেও নিষেধ
হাতে তাড়তে বমতার বাধা দেয়। তড়ৎ এসে আশ্রয়
হনের ভিতরে তার ভিতকে নড়িয়ে দিয়ে গেল। আমি
বুদ্ধুর বেহিয়ে আসতে হবে।” এই পটভূমিকার
লিখলেন সেই বিনিই সেই দুইহেই তাঁর বর্ধন কবিতা।
কিন্তু বুদ্ধবোধ বাসুর মতে তিনি এই শেলীর অসুস্থতির ধন
বীজের করে বাননি। তাঁর কথায়—“রবীন্দ্রনাথের বর্ধন”
এই বীজের মূল অর্থ্য কোন্ কোন্ রচনা থেকে তিনি
ভাববারা গ্রহণ করেছিলেন আমরা আশ্চর্য তা জানতে
কিন্তু এ কবি লেখক পশ্চিমী সান্ত্বিত্যে তার তাঁর

"Debt" বীকার করে দাননি।

এখানে দুটি কথা উঠেছে—(১) প্রথমতঃ ঐকমুখী বীকার করেন না। যে সত্যাকার সৃষ্টি অঙ্গসংগেয় মাধ্যমে আসে না। রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত পটভূমিকার ব্যাখ্যান তিনি যোগ্য কবি বীকার করেন না। তাই তিনি কবিকে কদা বলেছেন ব্যর্থব্যর্থ। directly borrows (চুরি) কথাটাও একস্থানে ব্যবহার করেছেন।

(২) দ্বিতীয়তঃ এটি সত্যে আলোচনার যখন কবি শ্রীতিভাই তাঁর ধর্ম বীকার করেন নি তখন এই প্রদর্শন উপাধান করে তাঁকে পশ্চিমের চোখে দেখে কথা হয়েছে। কারণ ঐ প্রবন্ধে তাঁর সত্যে বহু অবমাননাকর উক্তি করা হয়েছে।

ইংরেজী প্রবন্ধের প্রথম ও শেষ প্যারায় দুটি বাংলাতে বার বেওয়া হয়েছে যেমন বার বেওয়া হয়েছে মধ্যে মধ্যে অনেক কট্টমন্তব্য। ইংরেজী প্রবন্ধের প্রবন্ধেই কোন এক তরুণ কবির মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলেছেন যে "রবীন্দ্রনাথের কাব্য আসলে বাংলা ভাষায় লেখা ইউরোপীয় কাব্য।" তিনিও এই মত সমর্থন করেন কারণ তিনি নিজে বলেছেন—

"This remark, is of course an exaggeration but it is exaggeration of this sort that reveal the truth in a flash." তিনি আরো বলেছেন "Any perceptive reader of Bengali poetry must acknowledge that he (Tagore) was very much of a European." কারণ "Rabindranath's works are European literature written in Bengali language. And they are the first of their kind." তার পরেই বলেছেন যে তিনি জানতেন যে তাঁর উক্তিই দ্বারা "Orthodox Tagorites may be offended." হয়েছে। তাগিল রবীন্দ্রনাথ আর দ্বীষিত নেই। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ভারতীয়ের এতটুকু নেই, বোলিক্স তো নেইই একথা শুনে Tagorities বা offended তু নর রবীন্দ্রনাথ বহুত হতচকিত ও বিজ্ঞপ হয়ে পড়তেন। তু তাই নর প্রাজ্ঞমন দ্বারা আদ্যও দ্বীষিত তাঁরা ভাবতে চিত্র করেছেন যে, এতদিন রবীন্দ্রনাথ পড়ে বা বুঝেছি, বা নিয়ে

অসংখ্য বই লিখেছি, অগণিত ছাত্রছাত্রীদের বা বুঝিয়েছি তা কি সব তাহলে তুল ? আদ্য তবে কলকাতার হকিমপ্রাসাদের এক নব বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে, এই গুরুকেশ শিবিল শেনী নিয়ে এই চিরনবীম ? অধ্যাপকের বিশ্বাস প্রধন করতে হবে নাকি ? কিন্তু তাঁর এই প্রাথমিক মন্তব্যগুলি বাংলা প্রবন্ধে প্রবোধেই নেই। কি কারণে ?

এই সূচকুর অধ্যাপকটি পশ্চিমের মূল্যপানে চেয়ে আর একটি কথা বলেছেন ইংরেজী প্রবন্ধে, যেটা বাংলা প্রবন্ধে নেই। তিনি বলেছেন—

"We have no right to assume that the poets he never mentions or the schools he disapproves had no share in his making. We can never be sure that he did not know those poets of France who in his youth were recreating European poetry. Scantily perhaps, scampily perhaps, perhaps through quotations or reviews in magazine—but a single spark is enough to ignite the mind of a genius." অর্থাৎ যেন-তেন-প্রকারের প্রমাণ করতেই হবে তিনি পশ্চিমের কবি, বিশেষ করে কদাশী কবি দ্বারা গ্যাবো, বোহলেশের ত্যাগেলী, দিলকে প্রবুধ কবিতার দ্বারা নিশ্চয়ই প্রভাবিত হয়েছিলেন। যদি তাঁদের কবিতা না ভালো লেগে থাকে, বা তাঁদের কাকতই যদি কবিতার থেকে বহল দিয়ে থাকেন বা তাঁদের কবিতা সামান্যই পড়ে থাকেন বা ভাবভাবভাষা পড়ে থাকেন বা কোনও পত্রিকার সমালোচনার মাধ্যমে দুটো একটা লাইনের উদ্ধৃতি পড়ে থাকেন ত তাই যথেষ্ট। তা নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ করেছেন। আর যেহেতু তিনি একজন ক্রিমিয়াল সেয়েতু তিনি তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এবং তাকে আদ্যই করে নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর দেই ধর্মের কোনও কীকৃতিই তিনি বেবে দাননি তাঁর কোন রচনা। দ্বিতি, দ্বিতি, কি হুক্তি ! সাহিত্য সমালোচনার শুদ্ধ কোটেশান পড়ে এত প্রভাব পড়ে, বলে আদ্য পর্যন্ত কেউ বলেছেন বলে মনে পড়ে না। বাংলা প্রবন্ধে এসব কথা নেই। সেখানে তিনি বলেছেন অন্য কবিতার দ্বারা প্রভাবিত হতে হলে তাঁদের মূল রচনা পড়তে হবে এমন কোন কথা নেই।

অর্থাৎ অসুখের পড়েও প্রভাবিত হওয়া যায়। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ এই সব কবিতার অসুখের পড়ে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু “He has kept the story of his development hidden from curious eyes.” বাংলায় বললে—“পশ্চিমের আধুনিক লেখকদের মত তিনি নিজের মানসিক ক্রম-পরিবর্তির কাহিনী কোঁচুহনী দুষ্টির সাহায্যে ঘেঁষে বড়েন নি।” সেই এক কথা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বপ্ন স্বীকার করেন নি। তাছাড়া আবার এক কারণ তিনি মুক্তি পেয়েছেন যে, “কবিতার অসুখের প্রতি তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) একটা মনস্তত্ত্ব বিড়কা ছিল।” হায়রে একই প্রবন্ধে চরায় চরকম কথা!

“তিনি বলেছেন—Heine is the only non British European poet whose direct influence is palpable in him, the best pieces of “Kshanika” (The poems of Transience) are no doubt the outcome of a happy encounter between the Hindu Sage and the Frenchified German Jew.” বাংলায়—“আর ব্রিটিশ নয় এমন ইউরোপীয় কবিদের মধ্যে একমাত্র হাইনের প্রত্যক্ষ প্রভাবই তাঁর রচনার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। “কণিকা” উৎকৃষ্ট কবিতাগুলি যে এই হিন্দু তপস ও সেই ক্যানী বর্মী জার্মান-ইয়দীর স্তম্ভ পরিচয়ের কল এবিধে কোন সন্দেহ নেই।”

উক্তমত। সঙ্গ্রামিত করা বৈত উদ্ধৃতি দিয়ে যা উক্ত কবির কবিতার মূল হরের মূল্যবান ব্যাখ্যা দিয়ে। কিন্তু শ্রীমন্ত চকুর লোক। তিনি ও পথে বারনি। কারণ তিনি জানতেন যে সে কাক তিনি পারবেন না। তাই একটা পাণ্ডিত্যপূর্ণ উক্তি করেই কাত থেকেছেন। কিন্তু তিনি বন্দন এই প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন তখন যৌবন করি জুড়ে যেত। অলক্ষ্যে বলে হাসছিলেন। কারণ এই প্রবন্ধে বুদ্ধের বাবু একটা মারামারি উক্তি করেছেন। তিনি প্রবন্ধে অল্প এক স্থানে বলছেন যে—“শান্তি-নিকেতনের অধিবাসিনী জৈনকা জার্মান মহিলাত সন্ধ্যাতায় তিনি হাইনের কিছু কিছু রচনা পাঠ করেন। কিন্তু তারপর কবির বৈরাগ্যটি ঘটে।” কিন্তু কিছু

পড়েই হাইনের প্রত্যক্ষ প্রভাব রবীন্দ্রনাথের ওপর পড়েছিল! শুধু তাই নয় “কণিকা”র প্রেত কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথ হাইনে পড়েই লিখেছিলেন! কিন্তু আমরা জানি ‘কণিকা’র কবিতাগুলি রচনার কথা বলতে গিয়ে কবি কোথাও হাইনের কথা উল্লেখ করেন নি। তবে কি তিনি কণিকা-র অনিচ্ছাকৃত? কিন্তু এ ব্যাপারে কবির কোন প্রবন্ধই আছে না। কারণ শ্রীমন্ত তাঁর এই “প্রভাব” কথা রচনাকালে কোনও বিশেষ কিছু বার্য্য নিয়েই যে প্রভাবিত ছিলেন, তা তাঁর রচনাটা একটু ভালোভাবে পড়লেই বোঝা যায়। যেমন—কবি ‘কণিকা’ রচনা করেছেন ১৯০০ সালের প্রথমার্ধে। বুদ্ধের বাবুর কাছে প্রায় এই—১৯০০ সালে শান্তিনিকেতন কোষায় ছিল? সে সময়ে কোন জার্মান মহিলা শান্তি নিকেতনের অধিবাসিনী ছিলেন। তাঁর কাছে কবি হাইনে পড়েছেন আর তাঁর দ্বারা directly influenced হয়ে কবিতা রচনা করেছেন? সুতরাং প্রচার করতে বললে এইরকম বিব্রাতিই আসে। বুদ্ধের বাবু হাইনের সাথে মিলিয়ে তো যেবেনই নি, এমনকি প্রবন্ধ রচনা করতে বলে দেন তাঁরিতত্ত্বলোভ মিলিয়ে যেবেন নি। অথচ তিনি পশ্চিমদেশকে শুনিয়া এলেন যে—কবি হাইনের মকল কলেজে দেখা স্বীকার করে যাননি। অথচ আমরা জানি কবির এক গৌরবময় উক্তি আছে তাঁর “গাহিত্যের স্বরূপ” প্রবন্ধে :—

(১) “ইংরেজের প্রাজ্ঞতা সাহিত্যকে তো আনন্দের সঙ্গে মেনে নিয়েছি; তার থেকে কেবল যে বস পেয়েছি তা নয়, কৌশলের ব্যালাপে আসো পেয়েছি। তার প্রভাব আশঙ্কিতো মন থেকে দূর হয়নি।”

(২) “গাহিত্যে কণ প্রথম কবিতার ক্ষমতাকে গৌরবের সঙ্গে স্বীকার করা যেতে পারে। বার্য্য প্রথম করতে এবং স্বীকার করতে পারেন নি আসন্নকাল পর্যন্ত তাঁদের আমি অশ্রদ্ধা করে এসেছি।”

এরপর বুদ্ধের বাবু একটা সাহিত্যিক ঘটকাহিনী করেছেন রবীন্দ্রনাথের একটি লেখা থেকে উদ্ধৃতির নামে পূর্ণ দুই প্রপঞ্চের দুইটি পাতা-একেক দুইটি পাইন নিয়ে, কবির সমগ্র বক্তব্যের একটা কবর্ষ করেছেন। তিনি উদ্ধৃতি চিহ্ন দিয়ে কবির লেখার

অসুখের বলে যা চালিয়েছেন তা এই—“What impressed us was the demented fury of a Lear, or the flaming jealousy of an Othello. It is the mire of human nature that comes to the surface in these works.” বাংলাভেত উৎসাহিত হয়ে তিনি বলেছেন—“আমরা যা পড়ে অভিভূত হতাম—সে হল লীরবের প্রচণ্ড ক্রোধ, নতুবা ওথেলোর উগ্র ঈর্ষা এই রচনার তেতব যা মুটে উঠতো তা মানব-প্রকৃতির আবল-নাযাও” অর্থাৎ এই বিকৃত উক্তি তিনি উপস্থিত করেছেন এই কথা প্রমাণ করতে যে শেক্সপীয়ারের রচনার সাথে তাঁর পরিচয় ছিল। কিন্তু শেক্সপীয়ার পুরোপুরি তাঁকে সঙ্গী করতে পারেনি।” তাঁর এই স্বীকারিতার প্রতিবাদ জানাই এমন কথা আমাদের নেই। এমন গুণিত কাব্য তিনি করতে পারেন একথা ভেবেই হতবুদ্ধি হতে হয়।

আসল উক্তিটি রবীন্দ্রনাথ করেছেন জীবনমুখতির ভরস্বরে অল্পক্ষেপে। (জীবনমুখি পৃ: ১০০—১০১, রবীন্দ্র রচনাবলী ১৭ম খণ্ড পৃ: ৩৭৪)—সেখানে কবি ভরস্বর কাব্য প্রসঙ্গে আপনাতঃ “মনের অপরিস্রবিত কথা” বলতে গিয়ে ভাবনাকার শিখার কথা বলেছেন। “ভাবনাকার” দিয়ে আমাদের সাহিত্য কেবল্য ছিলেন শেক্সপীয়ার মিস্টার ও ব্যায়ন। আমাদের বাংলা ভাষার সাহিত্যে বীজ্যাতা অক্ষর চৌহুরী মহাশয় যখন বিতোব হইয়া ইংরাজী কাব্য আওড়াইতেন তখন সেই আয়তনের মধ্যে একটা জীৱ নেশার ভাব ছিল। রোমিও জুলিয়েটের প্রেমোদ্গাহ, লীরবের অক্ষর পরিভাষার বিক্ষোভ, ওথেলোর ঈর্ষানলের প্রলয় বাবুয়া, এই সবজটাই মধ্যে যে একটা প্রবল অতিশয়তা আছে তাহাই আমাদের মনের মধ্যে উত্তেজনার সত্য কহিত।”

এর পরে ইংরেজী সাহিত্যের প্রত্যাব সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য শেষ করে পরের প্যারাগ্রাফে এসে কবি বলেছেন সাহিত্য-কলার দৌলত আমানিকে যে সুখ দেয় ইহা সে সুখ নহে, ইহা অত্যন্ত বিরহের মধ্যে থুব একটা আন্দোলন আনিবারই সুখ। তাহাতে যদি তলার সমস্ত পাক উঠিয়া পড়ে সেও স্বীকার। “কবির সন্দর্ভ দুই প্রদর্শে উল্লিখিত দুইটি উক্তিকে (ভাত শেষের

লাইনটিকে বিবৃত করে) এক কণ্ঠে প্রচার করবার স্পর্শ গ্রীবন্ত পেলেন কোথায়? এর পেছনে সুস্বাদের শোভা দৃষ্টিতে আছে?

পাঠকদের অবগতির জন্য এখানে শেক্সপীয়ার সহস্র কবির এক সুন্দর উক্তি উদ্ধৃত করা গেল—“সাহিত্যের মধ্যে মানুষের মূর্তি দেখানো উদ্দেশ্য রেখার মুটে গুটে, দেখানো জোলের পথ থাকে না। এই প্রতিশীল ভগ্নতে যা কিছু চলছে কিছেরে তাই মধ্যে বড়ো রাজপন দিয়ে সে চলাকেরা করে। শেক্সপীয়ারের মূর্তিই এত: ভিন্দু এ্যাণ্ড এ্যাটোমিস এর কাণ্ডের বাই আবারের মুখে আজ কচিকর না হতে পারে। কিন্তু সেটা ব্যাকসেব অববা কি: সৌর অববা এ্যাটমিস ও ক্রিস্টোপেরী এদের সবচে: এমনকথা যদি কেউ বলে তাহলে বলব তাঁর রসপায় অস্বাভাবিক বিকৃতি ঘটেছে। শেক্সপীয়ার মানব-চরিত্রের চিত্রণালার যাত্রাকোঠান করে দিয়েছেন, সেখানে যুগে যুগে লোকের ভিত্তি করা হবে।” (সাহিত্যের স্বরূপ; কবির এই অমর উক্তিগুলি কি শ্রীমুখ পড়েন নি? পড়েছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু তিনি তা নেমেছেন সাহিত্যিক বসিত্য-গুণিত্তে। সুতরাং মনটির সাথে সাথে লেবনীটিকেও যদিও না হতে দিলে তাঁর হস্তের মানুষ হইয়া যা পারে কোথায়? আর নগরবিহারী বা কহবে তেন?

শ্রীমুখ রবীন্দ্রনাথের “মিল্কমেন হাউস”র সাথে বোম্ব-লেয়ারের শব্দ ভরষক, এর আভর্ষ্য দাবুত “strange resemblance” দেখেছেন। কিন্তু বোম্বলেয়ারের ও রবীন্দ্রনাথের রচনার মূখ কি এক? বোম্বলেয়ারের কবিতাটির শেষ ভবকে আছে:—

Pour us your poison to
revive our soul
It cheers the burning quest
that we pursue
Careless if Hell or Heaven
be our goal
Beyond the known world
to seek out the New!

এই কথাই কি রবীন্দ্রনাথ মিল্কমেন হাউস বলেছেন? কোথায় সেই strange resemblance! তাহাড়া তাঁর মূর্তি

"Let us note that the mysterious woman in it is a foreigner and the golden boat is journeying westward. Is not that a veiled confession of Tagore's debt to the West?"

আহা, কি কথা শুনিব। এ-ধেম সেই গৌরাঙ্গের-
নীল-নর' হেরি কক ভাবি নুহুতে স'শি দিল প্রাণ'।
'আগুন ছায়ায় আঁধারে দেখিয়া ককুদলি ভ্রম হয়'।
বুদ্ধের বাবুও হয়েছে সেই অবস্থা। কবিতাটির মধ্যে
পশ্চিম কথাটি বেখেই তিনি উল্লসিত। পশ্চিমের প্রেমে
সব দহ হয়ে তিনি বলে উঠলেন—'মা কৈ, ঐ তো
পশ্চিম হয়েছে! তবে আর কি? রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমের
কাছে যুগা, আর তার প্রেমের স্বীকৃতি তিনি বেখে গেছেন
তার ঐ কবিতায়'। রবীন্দ্রনাথ তার বচ কবিতার স্বভাব
পশ্চিম কথাটি ব্যবহার করে গেছেন। স্মৃত্যং তিনি
এ নীকার বহুবারই করে গেছেন। তাহলে কেন এই
প্রকার নামে প্রাচ্য করা?

বোম্বের প্রমুখ কবিরা অশান্ত হামস নিয়ে নীরব
দৃষ্টিতে যে বিকোত যে অন্তর্দ্বন্দ্ব যে যুগা যে কামার্ত আত্ম
প্রকাশ করে গেছেন তা কি 'নিরুদ্ধে ব্যাধি'র প্রবল?
কবি সমগ্র 'সোনার তরী' কাব্যে যে সূক্ষ্ম নিসর্গ-বিজ্ঞ
একে গেছেন তারই একটা চরম পরিণতিই কি আমরা
এই শেষ কবিতাটিতে পাইনা? পশ্চিম ভিগনে যে যেনের
দুর্ভাগ্য অন্ত বেনের সেবার হতেই পূর্ববিশিষ্ট দুর্ভোগ।
এই ব্যাধির শেষ নেই, তাই কোণার ভিত্তিবে তোমার
সোনার তরী, এই প্রেরণও উভয় বেই। "কহিবে না
কথা বেথিতে পানবা নীরব হাসি।"

বুদ্ধের বাবুর মতে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটা in-
sidious wor অর্থাৎ কর্তৃদুষ্ক চলেছিল আত্মীয়।
'রবীন্দ্রনাথ অন্তর্দ্বন্দ্বের ভারতে বিদ্যুত তার রবটা ছিল
আসলে বাঁটি modern European। তার চেতনাকার
এই দৈত ভাবের অবস্থিতি তার মধ্যে কেনেই এই কর্তৃ
দুষ্ক। বাংলায় থাকে বলেছেন একই বোলায়ের দ্বারা
(insidious war অর্থে)—হাসনিক কব না কি তার
সমস্ত সত্যকেই করেছে বিবর্তিত। একটা তার খাইয়ের
রূপ, একটা তার ভিতরকার রূপ।

খাইয়েরটাকি কবন?

"করুণাশ্রম কবির প্রতিমূর্তি।"

আর তিতরেটাই বা কি কবন?

"dark, turbulent and passionate (অন্ধকারময়,
দুর্ভাগ্য ও কামার্ত)—in short of a modern
European."। বাংলায় বোলায়ের দ্বারা লিখেছেন—
উনকিন শতকের ঐতিহ্যবাহী এক বোম্বের রূপ—যে
রূপ গুট, অশান্ত ও আবেগময়। সংক্ষেপে বলা চলেলে
রূপ হচ্ছে এক আধুনিক ইউরোপবাসীর রূপ।" বোধ
করি তার নিছক রূপটাও সেই রকম। কবির মধ্যে এই
রূপ তিনি নাকি পেয়েছেন "তার কবিতা কবিতায়।
যেহেতু "আপাত দৃষ্টিতে আমায়ের কাছে মরল বলিয়া
ভ্রম হয়।" কবি তাহলে সেই রূপটিকে সূচিয়ে রাখতে
পারেন নি। বহুটা কবিতা ছিল কেলোতে। নীতাজলির
কবিতাগুলিও নাকি এই রকম অশান্ত বোম্বের মত-
যেননা ব্যক্ত হয়েছে, সেই কামার্ত কবিতা কবিতার কাব্যের
মত। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সবচেয়ে এই বিতীর্ণ রূপটি গোপন
রাখার চেষ্টা করে গেছেন। এবং নিজেকে এক শান্তিবাধী
হিস্তু কবি বলে প্রচার করে গেছেন এবং পরতে প্রচার
কিয়েছেন সেই রকম প্রচার করতে। এখানে একটি
বক্তব্য রাখতে হয়—নীতাজলি সম্বন্ধে পশ্চিমদেশেও প্রচুর
সমালোচনা হয়েছে। নিম্না প্রণয়না দুইই হয়েছে কিন্তু
এর মাঝে dark, turbulent and passionate
romantic মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে একথা কেউ
বলেছেন বলে জানা যায় নি। বরক "বিচ্ছুরী ঔপত্যিক
বে সিনক্লেয়ার হ্যান্ডবুক হীবে বোম্বেরাইনের বাড়িতে
রেইস্বে যে সত্যার রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ করেন সেদিন
উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখিত ছিলেন—বোম্বেরাইনের
বৈতক্যনাটি সেদিন সন্ধির পরিপত হয়েছিল।
সুইনবার্ণের কবিতার সহিত তুলনা করিয়া লেখিকা
হলিগেন, রবীন্দ্রনাথের কাব্য সুইনবার্ণ হইতেও অধিক
নিষ্ঠ, সৌন্দর্য Intensity ও subjectivity এবং
বার্ণিকময় হইতে ইহা গভীর। তার মতে কোনো
পাচাত্য কবিতা রবীন্দ্রনাথের সহিত তুলনা করা যায় না,
মিলটন মাথুরের ধর্মের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; এমনকি
ডার্স্টসুওয়ার্থও নহ। কারণ তিনিও অটল ও
ponderous। লেখিকা উল্লেখিত আবেগে বোম্বের

কলিলেন যে, টংলোর কোনে। মনসিরা কবির সহিত রবীন্দ্রনাথের তুলনা হয় না।*

(রবীন্দ্র-কীবনী—প্রভাতকুমার ২য় ৭০ পৃঃ ৩২১)
“আমেরিকায় বাসকালে কবি গীতাঞ্জলি সম্বন্ধে বহু পত্র পান। বিলাত চঠিতে বোয়েনটাইন এক পত্রে কবিকে লিখিতেছেন,—“People have felt more than ever I dared to hope and more than you yourself will readily believe. A friend send the book as a gift to Mrs. Walts, the wife of G. F. Walts the painter and she wrote that your book has brought her closer to her great husband (dead now some dozen years than ever since she lost him)”।

(রবীন্দ্র-কীবনী—প্রভাতকুমার ২য় ৭০ পৃঃ ৩২১)

এই পরেও একজন বাঙালী (?)—বাঙালী বলেই শ্রীমন্ত বাগ অবহেল না হো?—ভক্তস্রোতের (?) কাছে ভ্রমতে হ'বে যে রবীন্দ্রনাথ নাকি মনে-প্রাণে-লেশবার অন্তরীণ ছিলেন। এবং তাঁর কবিতার মধ্যে পদ্মাতোর কার্যে কীবন বহন প্রকাশ পেরেছে প্রজ্ঞাতাবে। এবং সেই প্রজ্ঞাতা তাঁর ইচ্ছাকৃত। ইচ্ছাকৃত হুজুবেশে অনুকরণের মাধ্যমে মধ্য শির সঙ্গি হয়? এ কথা তিনি তাঁর ছাত্রেরও পেছানেন নাকি? তবেতো বাংলার চারুকলেবর খুব ভালোই শিকা হচ্ছে। কিন্তু কবিরা এই গোপনতা কেন? কারণ কবি যেহেতু খুব বুদ্ধিমান ছিলেন সেহেতু তিনি জানতেন যে পশ্চিমী কবিরের খুব একটো প্রথমাঃ যদি তিনি করে বসেন তবে পরাধীন ভাবভাবঃী তাঁর ওপর চটে বাবে। হয়ত বা তাঁর মই কিনবে না, হয়তো বা তাঁর মূলে ছেলে পাঠাবে না। এমনও হতে পারে তাঁর কবির বাহির কতেও ভিত্তে লাগে। তাই বুধ্বেশে বাবু বলেছেন—“We suspect his admiration for the West was warmer than felt it to be compatible with the political status of his nation; and that was why he strove hard (আগ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন?) to conceal or disguise it in his writings.”

রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমের ভ্রমের বা পশ্চিমের কাছে তাঁর গুণ বহু আনন্দায় স্বীকার করে গেছেন। কিন্তু কবি ভোলহাঃ নয়। ইংরেজীতে যেখানে শ্রীমন্ত Conceal বা disguise লিখেছেন বাংলায় বলেছেন উচ্চ বা প্রজ্ঞাত। এইভাবে হুজুবেশ বচন। ছাত্রগণ প্রচার করার মত আশাযুক্ত লক্ষ্যবীর। এই বৈপরীত্য কেন? তাছাড়া

এই অঙ্গুর প্রবন্ধের সম্বন্ধে সে ব্যক্তি এগিয়ে আসেন মিথ্যা বুদ্ধি নিয়ে, তাঁর সম্পর্কেও প্রায় এই—তিনিই বা কোন কারণে এই অঙ্গুরেই লোমের মতে চান? রবীন্দ্রনাথ কীবিত্তকালে পশ্চিমের ভ্রমের প্রশংসা যেমন বহুবার করে গেছেন গ্রীক তেমনই যোযেব ভ্রম তৎসংগত করে যেতেও বিধা করেন নি। এর জন্যে বহুশেষ কেউ কোনো বিন তাঁকে হেয়জান অস্বীকার করে থাকলেও তিনি কোনও ভ্রমক্ষেপ করেন নি। আপন বিবেক অনুসারে কাম করে গেছেন সর্বদা। অসংখ্য চিঠিপত্র প্রবন্ধ ও তার বিশাল বিচিত্র কর্তব্যবন্দেই তার প্রমাণ হয়ে গেছে। সবচেয়ে বহু প্রমাণ তাঁর “হানিয়ার চিঠি”। পশ্চিমের গুণগনার কাছে তাঁর অনেক আশা ছিল “কীবনের প্রারম্ভে”; সেই আশা ব্যর্থ করতে, সেই অঙ্গুণার প্রশংসা করতে কোথাও বিধা করেন নি। আবার কীবনের শেষ প্রান্তে এসে আর আশা তৎসংগত কথা ব্যর্থ করতেও তিনি বিধা করেন নি (“হইলিলা হয়ে পেল”) তাঁর “সত্যতার সঙ্কট” প্রবন্ধে। কেন? সং-বিল্লীর পক্ষেই কীবন বহু নিজেব মনোভাবকে লুকিয়ে বেঁধে “হুজুবেশ” ধারণ করে (conceal or disguise এর বাংলা উচ্চ বা প্রজ্ঞাত নয়। এরকম বাংলা অনুবাদ অধ্যাপক যারা কেন করেছেন? ছাত্রঃ পরীক্ষার ষাতার এই অনুবাদ লিখলে কি তিনি মত্ত হয়েছেন?) হিমাশের প্রমাণ বচন। সঙ্গি করে যেতে পারেন না তাছাড়া শ্রীমন্ত প্রথম বিকে আর একটি প্রজ্ঞাত উক্তি করেছেন যা হচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথ নাকি দ্বিত্ববাহী নয়। ভট্টাচ তাঁর হুজুবেশ। তাঁকে যে পদ্মাতোর সংঘর্ষ প্রবণতা বিচারী বলে মনে হয় তাও তাঁর হুজুবেশ কারণ “he was very much of a European”, রবীন্দ্র-প্রবন্ধ এই অধ্যাপকটি বেশ পক্ষা-পোক্ত ভাবেই করেছে। মিথ্যা উক্তি, বিস্তৃত ভ্রম, অশালীন মন্তব্য, ষোলাটে বুদ্ধি, ইতিহাসের বিস্তৃত প্রকৃতি বহু বকম অস্বাভূত। সম্ভব তার আশ্রয়ে এই বদা-বহু ব্যক্তিই গ্রহণ করেছেন, রবীন্দ্রনাথকে ইংরেজীপীর বানাত্তে গিয়ে। এমন কি নিজেই ইংরেজী প্রবন্ধকে ভুল বাংলা প্রতিপক্ষ দিয়েও মূলের পরিবর্তন এনে যে বাংলা অনুবাদ তিনি করেছেন তাতেই অত্র এক সহযোগী অধ্যাপককে দিয়ে প্রানাত অনুবাদ বলে চা্লিয়েছেন। চক্ৰাক্ত বেশ পক্ষাশালি এবং ষোলাটে ভাবেই পড়ে উঠেছে তাহলে। এঁদের হুজুনের কাছে বিনোী অনুবাদ যে ষেধের কাছে বিবেক, মনুষ্যত্ব ও মনটিকে বহুত ্রবেশছেন হ্যা করে যেহেতুও সেই হুজুে ধ্যানগতিত কজন। নতুবা বাংলার ছাত্র সত্যজ্ঞের সন্মু কতি হবে।

নববার্ষিক সন্ধ্যা

ভি. এইচ. লরেন্স

এখন শুধুই আমরা চাঁদ, আর
কূরে আনা গাভতম নিশা
এই আগুনের আভা।

এই আগুনের আভা, এই যে কোরক
আমরা ছুটি পরিণত বীজ
অঙ্কুরিত হব বলে আছি।

আমাদের এ আগুন
গান গেয়ে প্রদক্ষিণ করে অঙ্ককার ; শোন।
ফেলে নাও সব আবরণ।

তোমার খ্যাংলানো ঠোঁট, কাঁধ
বুক, তোমার নগ্নতা !
আগুনের আচ্ছাদন নাও !

পদমূল থেকে ঠোঁটে, তোমার সর্বস্ব
আগুনের আঁচ বেই কাঁপ দিয়ে সহসা লাক্য
জাখো জাখো ডুব দিয়ে মুখ তোলে কম্পিত আঁধার।

অনুবাদ : রাম বসু

ম্যারিশ কবিতা

রোসালিয়া কাস্ত্রো

আমি তো জানি না এই অহরহ কী বুঁকেছি মুক্তিক।
আকাশে হাওয়ার। আমি তো জানি না এই
কী যে খুঁজি, কী যে ! অথচ সে যেন, যাকে
কখন জানি না হারিয়েছি।

খুঁজেও পাই না যেই স্বপ্নে দেখি নৃশংসতার সীমা
ছাড়িয়ে, আমার সেই স্পষ্ট-হোঁতা-সকল-কিছুর
পিছু ঘোরে।

হে আনন্দ, তোমাকে পাবো না।
না মাটিতে, আকাশে হাওয়ার।
হমিও তোমার স্থিতি জানি ;
এক এখনো তুমি শূন্য বর্গ নও।

অনুবাদ : কলিহাস চট্টোপাধ্যায়

পাকিস্তান

আফ্রিকা, কিং এসো

ফরেনজ আব্দ মদ ফরেনজ

[একটি রঙ্গলগীত]

তুনেছি তোমার মন ডমকু ধনি
আমার তপ্ত রক্তে লেগেছে দোলা,
ভিনি ভিনি হবে স্পন্দিত তার তালে—
এসো আফ্রিকা, এসো !

এসো তুমি, দেখো ধূলা থেকে মাখা তুলি
হৃৎথকে মুছি মুখমণ্ডল থেকে
যন্ত্রণা কেটে মুক্ত করেছি বাহু,
হতাশার জাল ছিন্ন করেছি আমি।
এসো, আফ্রিকা, এসো !

হাতের চূর্ণ কড়াকে করেছি মূল
ভাঙা শৃংখলে বানাই আমার চাল,
বর্ষা আমার অরণ্য বেরা পথে
জলে উজ্জল যেন সে হরিণ-চোখ।
শত্রু শোণিত রাজির ছায়া লাল,
এসো, আফ্রিকা, এসো !

পৃথিবী-শব্দর স্পন্দিত মোর বৃকে
জ্বলম্পন্দনে শ্রোতবিনোদী নাচে,
সময়কে গোনে গহন অরণ্যানী
আমি আফ্রিকা, তোমার মুখোশ পরি
আমি আজ তুমি, আমার পরম্প
তোমার সিংহ চারণার পদপাত
আফ্রিকা এসো,
তোমার সিংহ চারণায় এসো তুমি,
এসো আফ্রিকা, এসো।

অনুবাদ : রুক খর

প্রাচীন জাপানী গীতি-কবিতা

(১)

আজ রাতে

আমি তোমার কাছে আসব তোমার স্বপ্নে,
কেউ আমার দেখতে পাবে না, কিছু শুধাবে না—
কিন্তু তুমি তোমার ঘরের দরজা খুলে রাখতে
ভুলো না বেন।

(অনাবা কবি রচিত)

(২)

সারসেরা কাশবনে ঢাকা নদীতীরে
উড়ে উড়ে ডাকছে,
বিছানার গুয়ে নিভেছে আমার মনে হয়
কত এক।

(বিহঙ্গা কবি ওতাতোবা কতর্ক অষ্টম শতাব্দীতে রচিত)

প্রাচীন চীনে গীতি-কবিতা

(শো চু বাই : অষ্টম শতক)

আমার ভাবনা যেন সেই ছোট নৌকো
যে ঘোপের আড়ালে আড়ালে
সকালের সূর্যাস্তর নাক দিয়ে
‘আকাশী’র তীর খেঁবে চলেছে।

একটি আফ্রিকান লোক-কবিতা

দেহে জরা নামে কিন্তু তন্দর থাকে সবুজ,
খাবার বইতে বইতে জোঁপ হয়ে আসে খালা,
পুরনো হলে কোন গাছই
আঁকড়ে রাখে না তার বাকল,
প্রতিদ্বন্দ্বীর চোখে মল দেখলে প্রেমিক হয় না সুখী।

ইতালী

পৃথিবীর ক্রময়ের কাছে
একরশ্মি সূর্যকিরণে এখিত হয়ে
সবাই বেঁচে থাকে নিঃশব্দ—একা,
তারপর কখন জানতেই পারে না
লজ্জা নেমে আসে।

(নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত গির্গিলিস কবি
নালভাতোর কোয়ারশিমো রচিত)

আধুনিক আইসল্যান্ডীয় কবিতা

তেজস্ক্রিয় চক্ষু | বোনাস. ই. সাতাকার

বহুমেঘভর চোখ
বর্ণন করে সৈনিকের রক্তাশ্রু,
বেশিমগানের খটাখট,
টাইপ করে মানুষের ইতিহাস,
দানব এবং বীজাণুর দল
সূচিত করে নৃতন দিনের আবির্ভাব।
চিন্তার মেঘ থেকে
করে পড়ে হাইড্রোজেন বোমা,
উল্কে—বাহুবল্লব
রচিত হয় মৃত্যুর আগের-সেতু।

ফ্রান্স

“তুমি আমার চুল আঁচড়ানো শেষ করলে
আমিও তোমাকে আর ঘুপা করব না।”
শিশুটি দরজার সিঁড়িতে বসে চুল আঁচড়াতে চাইছে।
“আমার চুল ধরে এমন টেননা। কেউ না ধরলে
এখনই আমি পড়ে যাব।
তুমি আমার চুল আঁচড়ে দিলে ; হতরাত্ত আমি তোমাকে
ঘুপা করব।”
ইতিমধ্যে দিবসের প্রজ্ঞা একটি স্থল্লর বৃক্ষের
কাণ্ডে প্রবেশ করেছে এবং বৃক্ষটি : লতে হলতে
এক ঝাঁক পানি উড়িয়ে দিয়ে আকাশের ঘোপে
এমন একটি সবুজ রচনা করল, একমাত্র
জলজ পতঙ্গরাই যার থেকে আরও
বোঝা সবুজ। “আমার চুল ধরে এত টেননা.....

(নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি পাঁ কন্ পাস’ রচিত)

অনুবাদ : অশোক মুখোপাধ্যায়

সূর্যাস্ত

অসিতকুমার ভট্টাচার্য

সূর্য বাতায় অগ্নি-আতুলে আকাশ বীণা,
একি অলস প্রাণের নিকরণ !
কালো অরণ্য লাল হয়ে ওঠে । পাহাড়ে প্রতিধ্বনি
একি ছরস্ব পৃথিবীর যৌবন ।

দেবতা ! তোমার বাহুতে জড়িও আমার বাহ
আত্মতে ভরাও আমার অস্থি,
শিরায় শিরায় অগ্নি-সাপেরা উঠুক বেগে ।
আশ্রয় লেগে
রক্তে আলোয় বর্ণ-শিখর অপারূর্ত,
মত্ত মিশুন আকাশ পাতাল মর্মে মেখে ।
Hælderlin-এর Sonnenuntergang (সূর্য ডার্মান)
অনুবাদে ।

মায়গট হাইনম্যানের প্রতি জন কর্ককোর্ড

ক্লদয়হীন পৃথিবীর ক্লদয়,
হে ক্লদয়, তোমার অন্তর্ভুক্তি
আমার কাছে এক যুগ্ম
আমার দৃষ্টিসীমা আচ্ছন্ন করে ।

বিকেলের আকাশে উদ্ভিত বাতাস,
মনে করিয়ে দিলে, শরৎ সমাগত :
তোমাকে হারাবার ভয়ে আমি ভীত,
আমার শংকায় আমি ভীত ।

হাউসার শেষ মাইল আগে,
আমাদের গর্বের শেষ প্রান্তে ;
কল্পনার সংগে মনে রেখো প্রিয়, যে আমি
তোমাকে আমার পাশে অনুভব করেছি ।

এক মন্দভাগ্য যদি আমার শক্তিকে ছুঁয়ে দেয়
প্রচ্ছন্ন কবরের মধ্যে,
যত সৌভাগ্য দিয়ে পারো, মনে রেখো ;
আমার ভালবাসা তুলে বেগ না ।

শৈশবের পৃথক্বে কবি ধ্বংসে নিহত ছন । কবিতাটি
গুরুদেবই রচিত ।

অনুবাদ : আশিস সাত্তাল

যাত্রী

কমলাদী সেনাপতি

ওরে যাত্রী—

যাত্রা তোর বিত্তীর্ণ অকুবান
কালরাত্রি হবে নাকো ভোর,
পূর্ণ সমারোহে—
উঠিবে না সূর্য লীপু সূর্য,
যাত্রাপথে মিলিবে না সাথী ;

তবু, শোন

মহাশূন্ত যাত্রার আত্মন ।

যদিও

অসীম নিগন্তে ঘন অন্ধকার,

নাই সেখায়

প্রলুক উজ্জল আলো ।

কালরাত্রির নিবিড় অন্ধকারে

যদিও দেখা দেয়

অসীক প্রলয়,

তবু,

যাত্রী ওরে—

এ পৃথিবীর

অকাংশ জাতিমা রেখা ছুঁয়ে

যাত্রা তোর হোক হ্রনিবার ।

ধূমকেতু উজ্জ্বল লক্ষ শত

পারিবে না কথিতে তোর পথ

দূর্য্য,

দূর্য্য,

সুদূরে যাত্রি, মহাকাল ।

মূল শুদ্ধি থেকে অনুবাদ : অসিত সরকার

“তোমাদের যে ডে

আবার অনেক দূরে চলে
যাচ্ছি মোত” অনেককাল
অশেষা করে হঠাৎ এক
সময়ে বলে ওঠে বিজয়কৃষ্ণ
তার কয়েক-কী বনের
ঘনিষ্ঠতন বহু জেদীলালকে।
কি সেই এক অস্বাভাবিক
ধেনার আচ্ছন্ন হইবিন
শেষে, বহুপ্রতীক্ষিত এই
কাগজমুক্তি দিনেও ওর
মন যেন কেঁদে কেঁদে ওঠে।
কত-কত বসে ওঠে আবার
বলে ওঠে বিজয়কৃষ্ণ—
“তোমার, তোমাদের কোন
দিন জন্মতে পারব না
বহু—আচ্ছন্ন এই অবশেষে দিনেও কেন যে কাগজ
পাঠে—” আর বলতে পারেন না সে।

বিজয়কৃষ্ণের আচ্ছন্ন হুটি হয়ে সেলে কাল সে চলে
যাবে, যেতে যাবে ২০০৭ কয়েক জেদীলালকে, যেতে
যেতে হবে ঐ বহু, আসন্ন আলি আর অস্বাভাবিক বলকে,
যেতে যাবে ঘনিষ্ঠ বলদ কামারশালার হাতুড়ী আর
হাস্যকে। বিপত পাঁচ বছরের দলী কয়েকটি সব শ্রুতি-
চিহ্নকে ভবু এই বিশেষ দিনের জন্যই তো ওরা প্রতীক্ষা
করে থাকে, এই দিনটার জন্যে তো কয়েকটি কীরনের
অবসর বহুতে ওরা নানা ধর্ম কল্পনার মনকে
প্রবোধ দেয়, ওরা কিরে যেতে চায় পুরানো কেসে আলি
হাতুড়ীর সমাবে, কিরে যেতে চায় এককোষে, পরিচিত
কীরনের পাতিকে আশ্রয়বিভাগ্যে ত্রেনে দুঃখে ভরা
হাতুড়ীর মনকে, তবে কেন কাল আচ্ছন্ন বিজয়কৃষ্ণ।
জেদীলাল যদি ওকে ভালোই বাসে, যদি ওর মনগলই
চায় তবে আচ্ছন্নের এই শ্রুতিমানে কেন ওকে ছাড়তে
চায় না। দুঃখনেই ভাবে কেন। পাশাপাশি ন্যায় ন্যূত
নিজাধীন চোখে ভাবছে ওরা কেন।

লালিপিং সেন্দ্রীল জেলে, বিজয়কৃষ্ণ এসেছে এখানে



কবিতা



পাঠ বহু। এবার ওর দিনে
দায়ক দিন এসেছে। তাই
হোলদর মনে পড়ে বিজয়-
কৃষ্ণের, এখানে আবার
সেই প্রথম
বিজয়ের পর তাকে চোমায়
করা হয়েছিল সেই কতদিন
আগে, আসে গাফা
যেতে যখন তাকে জেলের
ফটকের সামনে না হান
হালো তখন পত্রিকার
সময় শুরুর আশ্রয়নের
হাবিশ্বতো জেলের ওই
উঁচু প্রতীক্যে গায়ে
শিনেয়ার মত পশু ফটে
উঠেছিল সেন্দ্রীল ওর চোখের

সামনে। এক অস্বাভাবিক আচ্ছন্ন ওর হৃদয়টাকে কয়েকদিন
বরফের মত কঠিন। শীতল কল্পনার সেরে আচ্ছন্ন ভিতরের
উজ্জ্বলিত হয়েছিল কটি কপা ছেঁড়ে লাগে, ছেঁড়ে পাও,
তোমাদের পায়ে পাঁজি এগায়ে মত আনন্দের হেঁতে
নাও, পাশ্চাত্য তাকে অহেলসে হেঁকে বিজয়কৃষ্ণ বৈকি—
হাস্তে বঁধা শিকলটা টানতে টানতে লন পর্বেতে
পটখানা সেল এগিয়ে একটা লম্বা ওয়াতের মধ্যে প্রেলে
বিরেছিল আর সব কয়েকদিনের মধ্যে, যে-কথা আচ্ছন্ন
পশু মনে পড়ে। যেন হয় এই তো সেন্দ্রীল। “অঁচ
দাত সেঁকি মাল আসে কামারশালার হাতুড়ী পিটতে
পিটতে কপাল থেকে ঘার মূহুর্তে মূহুর্তে নিকের
অজান্তেই কখন বলেছিল—ওঃ পটীটা বহু কুরে যে
শেষ হবে একটি করে বিন এগিয়ে গেছে আর তোকই
ও মনে হবে হিসেব করে লেখোছে আর কতদিন বাকী।
আচ্ছন্ন সব শেষের দিনে সবই পশু মনে পড়ে।
নব এই তো সেন্দ্রীল।

কয়েক-কীরনে প্রত্যেকেই হুততো সেখানে লাগ
বেটে দিন গোমানে বিজয়কৃষ্ণ এটা শিখেছিল—তার
ব্যাক্ষ লুট করা বহু, কল্পনালোর, কাছ থেকে।



হুশলাস—। হ্যা এইদা লম্বা শরীর, ইহা চম্পন ইকি
রুকের ছাতি কালো সোমে ঢাকা সারা লেহটা যেন
কালোপাথর দিয়ে গড়া আঙ্গ মনে পড়ে সেই প্রথম
পরিচয়ের দিনটা।

ওষাডের মতো আবুল হয়ে কাঁদছিল সেদিন বিজয়-
কৃত্ত। অতীতের কত কথাই না সেদিন মনে পড়ছিল
তার। এক এক বার কান্না ধারিয়ে ডাবছিল থাক না
জীবনটা এভাবে নিশেবে মিলিয়ে একবারে তলিয়ে
থাক গভীর অন্ধকারের মধ্যে। আশা আকাঙ্ক্ষার
সোলায়মান জীবনের ছত্রিশ নাড়ি ধরন কেটে বেরিয়ে
আসুক সেই আদর্শ অমানুষ—চন্দ্রমার করে দিক তার
অলীক স্বপ্নকে, মিলিয়ে থাক হুশলাস অতীত, তুলে
থাক তাকে—। হায় তবু কি ভুলতে পারে বিজয়কৃত্ত।
আবার আবার মূখ-চোখের সামনে ভেসে ওঠে, স্পষ্ট
হয়ে ওঠে মায়ের পাকের চারিধারের দাল পাড়তুঙ্গ,
আরো স্পষ্ট হয় ভাই বোনের কুবার কান্না। আবার
কান্না তার শূন্য হৃৎ। তার এই কান্না শূনে ওষাডের
অন্যান্য বান্দবগুলোর বোম্বর হয় তাদের কয়েক-জীবনের
প্রথম দিনটাই ডাবছিল। কিন্তু হুশলাসের এটা বোটেই
ভালো লাগে নি, ভালো না অতীত। ধীরে ধীরে বাজে।
শূন্য বর্তমান, বর্তমানকেই সে অধিক শ্রদ্ধা করে।
সে এখন যা ভাই এখন সে ভালোবাসে। আসে যা
ছিল তাকে তখন মনে করতেন সেটাই সব থেকে
ভালো। হুশলাস ভালোবাসে সেই ডোরে ওঠে মাটি
কাঠতে, ভালোবাসে শেট ভরে লাগনি বেতে, ভালো
বাসে সারায়ত অকাতরে মোহের মত হুসোতে।
হুশলাস তখন হুসোচ্ছিল। কান্নার কোঁসকোঁসানি
বোম্বর হয় তার ভালো লাগে নি। অন্ধকারের মধ্যেই
হঠাৎ এক দমবে লাফিয়ে উঠে বসেছিল। এই শাসে—
চোপ—যাব এক—। তার কিছুক্ষণ পরে আবার
বসেছিল মাটির রক্তন কঁচা কঁচা করিল কেন।
শূন্যব্যক্তি যেতে সোবাই কোঁস কোঁস করে, লোকিন
হেঁটে যেতে পরে বন সোরে না—সে সে শূন্য পড়।
বড় ভয় হয়েছিল সেদিন বিজয়কৃত্তের। নভাই দোকটা
ভয়ঙ্কর, কিন্তু হুশলাসের চরিত্রের আর একটা দিকও
ছিল।

মেঘাচ্ছন্ন সেদিনটা। সকালেই কয়েক পশলা বৃষ্টি
হয়ে গেছে। কেন যেন সেদিন অজান্তেই বিজয়কৃত্তের
মনটা গম্বুজে গম্বুজে উঠছিল। মাঠে এসেছে তারা—
পাখুরে মাটি কুণিরে ঢাবের জমি তৈরী করতে। এলো
হুশলাস, হক্কু, আসদক, ঘনপান, বৈজনাথ আরো
অনেকে। এদিক-ওদিক ছড়িয়ে কাজ করে চলছে তারা।
বাফলা হাওয়া বইছে, আকাশে বেন করেছে। কখন
বিজয়কৃত্তের কোমল খেবে যায়। চোরে থাকে ঐ
কালো বেঘের দিকে। ঐ কোড়ো হাওয়া আর ঐ
কালো বেঘ ওয়া কি তার ব্যক্তি ছোট ছোটের ওপর
দিয়ে ভেসে আসছে না? হয়তো ঐ বাতাসেই সেসে
রয়েছে মায়ের স্নেহের পরশ। না—। মেঘলা দিনটা
নভাই তার নভা আঙ্গ বড় ভারী করে তুলেছে। মনে
পড়ে দার বর্ষার জলে ভরা মাঠ। আউস ঘানের চায়া-
গুণিতে ভরে যাওয়া সেই মাঠ। মনে পড়ে মেলে
বেলায় এমন দিনে খেলে বেড়ান মাথারের। হুশ
পালিয়ে আশ্রয়পতির কাছে শোন সেই মাঝপন্থের গল্প
আঙ্গও মনে আছে। চোখের সামনে যেন ভেসে উঠেছে
বগুড়া জেলার পরিচিত সেই বড়ের হাওয়া ঘনপান,
চালটা দার ভরে উঠেছে কুনডো থাকে পাতার। ঘরের
মধ্যে—ওকি? কে—। —পুড়ার চিত্তার সেদিন হঠাৎ
হাতের কোমলখানা খেবে গিয়েছিল বিজয়কৃত্তের, সে
যেন স্বপ্ন দেখছিল তাদের সেই ঘরের মধ্যে বিছানার শূনে
বাবা যেন কাউকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে শূন্যছেন। মাঝার
কাছে বসে আছেন ‘মা’, নির্বাক নিম্পদ, চোখে তাঁর
জল ঐকি শূন্যই স্বপ্ন? না, না বিজয়কৃত্তের মনে হলো
সিঁড়িই যেন মাঝার চিরব্যক্তি মূখ সামনের কান্নি
জমির ওপর পড়ে স্থির দৃষ্টিতে চোরে রয়েছে—আর
বিজয় নিজে কাঁঠন হাতে শক্ত কোমলের আঘাত করছে
মারে মারে—। তবে কি—। বিজয়কৃত্ত আর গাঁড়িয়ে
থাকতে পারে নি ‘বা-বা’ বলে চিৎকার করেই সে জাম
হারিয়েছিল।

তারপর কতক্ষণ কেটে গেছে অন্ধকারের রাতে।
পরে সে ঘেঁষেছিল ঐ হুশলাসই তাকে তুলে নিয়ে এসে
শূন্যছিল এই জায়গায়। সারাদিন পরিচর্যার পর সেই
তার জাম কিয়রে এনেছিল। তোমাকে বন্যবাদ

হৃৎশাল। আশ সেদিনের হৃৎশালকে চিত্রা করতে কত ভালোই না লাগছে। হৃৎশাল তাকে ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছিল, বলেছিল, শব্দ কি আর সত্য নয় কিবা। কিন্তু হার শব্দই তো তার জীবনে অমর্য্য গভীরত্বে দেখা গিল। হ্যাঁ—সেইদিন—গভীর বুড়োবুড়ী মনে খবর এসেছিল যে গভীরত্বে তার বাবা আত্মহত্যা করেছেন—। হৃৎশাল—হৃৎশাল, শব্দই তো উঃ...ওগবান, বলা সঙ্গত' হয় নি বিষয়কক্ষেত্র, কারণ ভেঙ্গে পড়েছিল সে। হার কেই বা কার ঘোঁষ নেত্র, বিষয়ই বা হৃৎশালকে কতটুকু বুঝেছিল। তাকে সে চিনেছিল একটা হাঁকিত লম্বা বনমানুষ হিসাবে, একটা বিষ্ঠুর অমানুষ হিসাবে তার বেশী তো নয়, কিন্তু সেদিনের কথা ভাবলে হৃৎশালকে কেনন খেন মনে হয়। অত বড় একটা পাখরের দেহ হতে কোন দিন যে কান্নার কোঁদকোঁদানি শোনা যাবে একথা কি কোন দিন ভেবেছিল বিষয়কক্ষ। মাঝার তার হাত হৃৎশলে বিচ্ছিন্ন হৃৎশাল, বলছিল কাঁদিয়ে, কাঁদিয়ে কিবা; এতো আমায়ের সন্ত করতাই হবে, সেদিনই সে বলেছিল তার গভীরত্বের ইতিহাস তার অভিজ্ঞতা বলেছিল। ঠিক এখনি ভাবে সেও একদিন তার বাবার মৃত্যু সংবাদ এই বেলে বসেই শুনিয়েছিল, সেদিন তাকে কেউ সন্মানভূমিত জানায় নি। তাতে কিন্তু আসে যায় না তার মৃত্যু শব্দে বাবার সঙ্গে শেষ মেথটাও সে করতে পারলো না। গল্পের সেনে কারণ শুরুর সে বলেছিল 'বাবা আমাকে বড় ভালো বাসতো' কিবা, বাবাকে আর বড় বেশী মনে পড়ছে। বাবা আর কাঁদিয়ে—আর বেসেই বা কি হবে; শব্দ শুরুরে তাই বহুইছিল হৃৎশাল।

সেদিন রাতে হৃৎশুরে দেখা শব্দটা আবার বাবা চাঞ্চা ঘিরে উঠলো। মনে পড়লো আবার নতুন করে সেই পাঁচটা বছর আগের তার নিজের সংলাপকে, বাবা বুড়ো হয়ে পড়েছেন, কিছদিন আগে জাকারবাবু পুণ্ডই বলে দিয়েছেন হাকে ল্যানিটোরিয়ার বা কোন ভালো হাসপাতালে না পাঠালে তাঁর আশা করা দ্বিগুণে, হাড় বের করা শিলেশার ডাই-সোবগুসোর ওষুধ না পখ কোনটা আগে ষোণাফ করবে সেখিন জেবে পাচ্ছিল না। পিতার স্মৃতিশ্রুত বিষয়। আর মনে পড়ে সেই

সঙ্গোদরী অকিন থেকে রেস্তোরার পরমা পর্যন্ত চাকরীর উষ্মারীতে হুরে পোকান গিনগুসো, হ্যাঁ—হ্যাঁ—সে এক অন্ধকার রাত হুঁটি পড়ছে। ঐ তো মানবের বঁধ বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। বাবে নাকি বিষয় ও ভেতরে। কেন—কুরি? হ্যাঁ—হ্যাঁ বই বা কেন?—খন আশায়ে চাকা সোতলার একখানা ঘর—সবাই ঘুরিয়েছে—পাশের পিচ্চাং রাত্রি গুটো বাজলো—আয়গ চোটো ভালো জালার নক হলো—কে? কে ওখানে? একমথ বলছি যেতে পাও। মাঝার রক পরর হয়ে ওঠে বিষয়কক্ষেত্র। হাতের হুঁটি একবার বক্তক কবে উঠলো, মাঝে নাকি লোকটাকে? ওকি শব্দ করবে। হ্যাঁ—হ্যাঁ—বেরেছে—বেরে কেছে—কে আছ বর—তো ...জাকাত...শ্রুত। হুহুতে' চাঞ্চিক গগগন হা উঠলো। না, বিষয় সেদিন পালাতে পারে নি—বরা পড়েছিলো। আর মনে পড়ে থানার নিখাতনের কথ মনে পড়ে আদালতের শুরানো সেই ছবিগুসো, বিচা তার জেল হলো, বেলে যেতে তার মৃত্যু ছিল না কিন্তু হার অন্য বেলে পাওনা সে সন্ধ্যার তো সন্ধ্যা হলো না। তাইতো তার কামা পাচ্ছিল সেদিন—বে এলো এখানে—এখানে এসে কিই বা তার ভালো হয়ে

নার্জিলিং সোংদাল জেলের এক লম্বা ওরাতের স বয়ান বেরীতে, বিদান বড়ের উপর জেলীলানের পা শুরে এই কথাই ভাবছিল বিষয়কক্ষ। মেদীলায়ে ময়োও আর চিত্রার কড় নেমেছে। মেদীলাল তাকে তার বহু কাল সকাল হলেই চলে যাবে। আল হরতো আর এক নতুন মানব। আবার সেও চ যাবে। সেও কি এখনি বাহিরের জাকে নাফা দি যাবে না? নীল আকাশের নীচে বাড়িরে সেও উপভোগ করতে পারে না পৃথিবীর সব হসটু হরতো সে পারতো, কিন্তু কেন যাবে, কিসের জা কর তাকে? তার সব বিষয় এখনও কি শেষ হয়? একথা তার আর বুঝতে বাকী নেই যে বিবাতা ও কপালে পাতি, ভালোবাসা, স্থায়ী গুহ এর কোনা সেমেন নি। উদ্ভাতের মত এহ থেকে অহাতের হুর হুরতে হঠাৎ এক অশ্রুত লয়ে হঠাৎ একদিন এ ব্যাকর হয়েছে পৃথিবীর বুকে। তারপর উল্কার

হুটেতে হুটেতে বন্ধনহীন হুগোভার দ্বিধ কটা কাটিয়ে
ঠানই এতদিন নিশিবে ঘাবে সে, সেই ভালো। আর
সে নিজে বন্ধী কিন্তু কীবনের বন্ধন নেই কিছুতে। কিন্তু
—কিন্তু—সেও তো মানব। তার মধ্যেও তো ছিল
শ্রম, ভালোবাসা, মায়া, মনোতা মানবের বাথাকে, আর
বিনে ভালো তো সেও বেগেছে অধিনাকে—।
হামিনা? চমকে ওঠে হেদীলাল, বন্ধ আরও তার
দেখ করে ফুটে ওঠে। মাথার চুলগুলো ঠানতে
ঠানতে বার বার বলতে থাকে—অধিনাশী—নেমকহায়ার
—বেইমান—।

হেদীলাল আর অধিনাকে মনে করতে চায় না।
গর দলে দল দলপক শেষ হয়ে গেছে। তবু হঠাৎ
কন মাকে মাকে তাকে মনে পড়ে যায়। তবে কি
চমকে সে অধিনাকে মনে মনে ভালোবাসে? হেদীলালের
চামের সামনে পুরানো শ্রুতিগুলো আবার ভেসে
ঠে। হবির মত ছোট সেই গ্রাম। আম, জাম,
আবতেলে খেয়া। সেই গ্রামে ছিল অধিনা আর
হেদীলাল পালাপাশি বাঁধিতে। মনে পড়ছে প্রথম
রিকটের দিনটা। পঁথির পাড়ে, পাঠশালার কিন্দা
দাম কঠালের বাগানে কেলে আসা দিনগুলো। মনে
পড়ে সেই কংকী গাছটা ওদের সে-দিনর একটা শ্রাবক,
নে পড়ে বিবাহবাসর। হুগা—তারপরই তো গ্রামে
লগেছিল বন্ধ, মহামারী। যে যেসিকে পারছিল
গালাতে চাইছিল। ওরাও চলে এসেছিল কলকাতার,
তবে কেন যে এসেছিল। তারপরই কথামূলো আর
সমতে ইচ্ছে হয় না তবু মনে পড়ে যায়। কে বলবে
কন হুগুই মত প্রবেশ করেছিল অভাব ওদের মধ্যে।
হুগুইর করে দিবেছিল ওদের সাধের স্বপ্ন? আসলো
ধিনেশ্বার। বোতলে ভর্তি পলকাতের রস শ্রুতিভারে
ধিকার করল হেদীলালের মন আর প্রলোভন
হামিনাকে।—সেদিন এক হুগুইগর রাতি। চটকলের
শ্রী হেদীলাল আজ হতা পেয়েছে। রাতের মাঝে
মাঝে মেনাও হলেছে অকস্মাৎ গাঢ়। টলতে টলতে নরজার
মনে বাঁড়িয়ে আঘাত করে হেদীলাল—‘বন্ধা মোসো’
—একবার হুগার তিনবার—। বন্ধা শ্রুত না।
তারপর কিন্তু হাতালের কয়েকটা পলকাতের ভেসে

গিয়েছিল কীপ বন্ধা। তিতরে চুকে চমকে উঠেছিল
হেদীলাল—‘ধিনেশ্বার! আবার তুণি এখানে? ও
বুর্জো!’ তারপর কি যে হোল হেদীলালের, বন্ধভের
মধ্যে তুলে নিয়েছিল কাটুয়াই করা কুঠারখানা,
উৎকট একটা গালাগালির সঙ্গে সঙ্গে কুঠার খানা বেরে
এসেছিল অধিনার কান ঘেঁসে কাঁধ ভের করে। এক
নিদারূণ চিন্তারে অতিক্রমে উঠেছিল অন্ধকার বড়তা।
তারপর—

তারপর আর কি—লোকজন—ই ঠে...পুনিশ...খানা
—কিয়ার...হেল হলো হেদীলালের। সেজন্য তার হুগু
নেই, সে আর হুগু চায় না। বন্ধে মাঝ তার বিটে
গেছে। কিন্তু অধিনা তো এখনও বেঁচে আছে।
হেদীলাল ভাবে আর একবার যদি সে ছাড়া পায় তবে
তাকে দলপক শেষ করে দিবে আবার কিরে আদরে
এই এখানে। তবু বতই হোক সে মানব, এখানে এসেও
সে ভালোবেসে কলেছে। ভালোবেসেই বিজয়কৃত্তকে।
বলেছে তাকে জীবনের ইতিহাস। বলেছে কোথায় ঘাব
সোজ, কার কাছেই বা ঘাব। কেন ঘাব? বলতো
আমাদের কেই বা চায়, তার চেয়ে এখানেই ভালো—
এই আদরক আদি, বন্যায় সমাজের কাছে বতই হুগু
বতই হুগু হোক ওরা আবার সোজ আমর মনের মানব।
নিপক্ষে কথামূলো শ্রুতিছিল বিজয়কৃত্ত। হবে
হবেই ঠিক এই কথাই যেন একদিন হুদলাল ধাবার
সময়ে বলে গিয়েছিল। বলেছিল—আদি চোলে ঘাবে
তাই কানহিস কিনা—আদি ভোলের হোকে কি খাডে
পারবো—খোডি—সেখার হো গেছে না। আবার লটকে
ঘাব মেখে বিশ। এখানের বেশ হুগু হোক হবে—হা
—হা—।’ শ্রুতি—হুদলাল আজ কোথায়।

কিন্তু বিজয়কৃত্ত কিরে ঘাবে আবার কিরে আদর
হুদ দিয়ে ঘাব। কিরে ঘাবে সে চিকিৎসার জন্যে তার
বিজয়ের বাঁধিতে মনের কাছে। গিয়ে সে হুগু মনের
পা হুগুখানা হুগুতে জড়িয়ে আকুল হয়ে কেঁপে বলে
আমাকে কমা করো। হুগুতো বা গভীর আবেসে তাই
বোনগুলোকে হুগু জড়িয়ে বলে উঠবে উদ্—আদি—
আদি কিরে এসেছি আবার আর কোথায় আদি তোদের
হেঁকে ঘাব না—কোথায় না—আজ হুগু একবার



আপনার বার্ধক্যের দিনগুলি কেমন হবে?

বার্ধক্যে আপনি সকলের তত্বা পেতে পাবেন, কিন্তু সে সময় যদি আপনার আর্থিক বাতস্তা থাকে, প্রাচ্যে তা' অনুভবিতভাবেই পাবেন। যদি আপনি একটি 'এন্ডোউমেন্ট' পন্থি নেন তাহলে আপনি বৃত্তদিন উপার্জন করবেন এবং তার পথেও যখন আপনি যখন যখন যখন করবেন যখন যখন যখন আপনার আর্থিক বাতস্তা অনুভব হাবে। যাহা যাহা যাহা কিছু টাকা বাতস্তে পারেন একটা মিথিষ্ট সম্বন্ধে গর আপনি একটা মোটা টাকা পাবার প্যারান্টি পাবেন—সে টাকা নিয়মিত ভিত্তিতে আর হিসেবে বা এক সঙ্গে এক বোকে, যে ভাবে আপনার ইচ্ছা আপনি পেতে পারবেন।

একটি উদাহরণ দিন: ২৫ বছর বয়সে একজন যুবক প্রতিমাসে ২০ টাকা করে একটি 'এন্ডোউমেন্ট উইথ প্রফিট' পন্থি দিয়ে শুরু করেছেন। যখন তাঁর বয়স হবে ৫৫ বছর, তিনি পাবেন প্রায় ১৫,০০০ টাকা। আর যদি তার আশেই তাঁর দুই ভাই ভাই তাঁর পরিবারকে পাবেন কমপক্ষে ১০,০০০ টাকা।

প্রিয়দায়ক কত দিতে হবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে আপনার এবং আপনার প্রয়োজন্যের উপর। যখন যখন একজন এক্ষেত্রে বাছে বোঝা নিয়ে জাহান একটি 'এন্ডোউমেন্ট' পন্থি কিনতে বার্ধক্যে বিপ্রান ও আল-পস্থানকে অনুভবিত হবে।



জীবন বীমান্ন কোম বিকল্প নেই



আগের মত দাসা বলে মানাকে কড়িয়ে ধর—। বাবে—নিমিত্ত বিজ্ঞর কিংবা বাবে তার পুরানো মানুষের সমাজে জাই বোনদের মানুষ করে তুলবে, আবার বহু-বাড়ির আসবে। কঠিন পরিভাষে উপার্জন করে আনবে প্রচুর অর্থ, সম্মান প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করবে। লাভ করবে মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসা। বিন্যাস—সমাজের উচ্চ বকে—না—না এ সব কি ভাবছে। বিজ্ঞরকৃষ্ণ, বিজ্ঞরকৃষ্ণ কি পাগল হয়ে থাকে? সব ভুল? সবই বয়? হুতোম দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে বিজ্ঞরকৃষ্ণের। হুঁপিয়ে কেঁসে ওঠে ভুল সবই ভুল।

বিজ্ঞরকৃষ্ণ কহিলে। বলে ওঠে ছেঁদীলাল তার পায়ের তেত রেখে তোতা কাছে বিজ্ঞরকৃষ্ণ তোতা কিউ? 'ভুল করছি ভাই ভীষণ ভুল'

ছেঁদীলাল বোঝেব অলংকারে একটু বেলে নেই লে হুঁপ আর কি ভুল করেছে বিজ্ঞরকৃষ্ণ আবার বত তো দর। হুঁপি আবার ত্রেবেও অধিক দুঃখ পেছে? স্কাপেও তাকে বৃত্তেতে চেষ্টা করে বেগতো যা যোগ হয়ে গেছে। পূর্ব দেখা কিংবা গিরে বেন তুল করে আর ভুল করো না।

হাতি প্রায় শেষ হলো। শুভ নিম্ন পৃথিবী। প্রত্য পনের পীতল বাতাল কয়েক বৃহত্তর জন্যে মাঝে মাঝে বিহ্বল করে দিয়েছে পাতা পৃথিবীটাকে। শোনা যায় উজ্জ্বল বাতালের কামর দুই। বাইরে আকাশের পায়ের জলে জোলের শুকতারা—ভিতরে সামনে প্রাচীরে ঘেরা পাচ অন্ধকার; পাখান প্রাচীর—কত যে মানুষ... দেখেছে, কঠিন কয়েক শুভ হয়ে কত যে বেননার কন্যাস কাছিনী পুনেছে তবু বলে না কিছুই। বেননার, হতাপার সাফা বহন করে করে বৃগ বৃগ হয়ে কঠিন হতে কঠিনতর হয়েছিল আশনার হাতে ধীরে। পনের নন্দর জাভের কঠোরের দানের তালিকা বকে হয়ে শির হয়ে গাঁড়িয়ে আছে কতকাল। এগেছে হাম্বির

প্রদান লিখেছে দায়—চলে গেছে। এগেছে হুঁপলাল লিখেছে দায় চলেও গেছে। এগেছে বিজ্ঞরকৃষ্ণ—কঠোরী ১৭৪—১৯—লিখেছে দায় চলে বাবে। একদিন ঐ চিহ্নটুকু ছাড়া পৃথিবী হতে ওদের সব কিছু মিলিয়ে থাকে। তারপর কালপ্রোতে ঐ প্রাচীরও হবে হরতো নিশ্চয়। প্রাচীর অন্ধরালে নির্বাক মনের অকথিত ব্যথার গান, বেননার ইতিহাস, যা বলাই থেকে থাকে। সেদিন কেইবা জানবে কেইবা মনে রাখবে এদের?

ভোর হয়ে গেল। জেলের প্রভাতী বটা বেছে উঠলো। ছেঁদীলালের দলকে আবার কাছে যোগ দিতে হবে। ওয়ার্ডার এসে হাঁক দেয়—উনআশি—বন্দর উনআশি বিজ্ঞরকৃষ্ণ...। জানিয়ে দেয় তার হুঁটির ববর।

পাঁচটা বছর পরে পুরানো জামা কাপড় আবার পরেছে বিজ্ঞরকৃষ্ণ। জেলের বাহিরে এসে প্রথম দিনের বত আর একবার ভালো করে দেখে নেয় জেলের উচ্চ কটকটা। কিছু আশ আর কোন ব্যতংক নেই মনে।—ওয়ার থেকে ভেলে আসছে টুং টাং বট—কোদানের আগ্রাঙ্ক ছেঁদীলালের দল কাছ করছে। বিজ্ঞরকৃষ্ণ যেন স্পষ্ট দেখতে পায় ওদের চোখের আর ঘানের জলে পাখুরে রাতি ভিজে উঠেছে আর তারি পরে কোদানের যা পড়ছে টুং টাং বট। পড়ছে—পড়ছে—দারো কতকাল পড়বে। একটি করে দিন বাবে আর প্রতিদিনই পুনে দেখবে ওরা আর কতদিন।

হাতার পাতের গাঁড়িয়ে ছিল বিজ্ঞরকৃষ্ণ—ঐ দায় আসছে... আসছে। বিজ্ঞরকৃষ্ণ কিংবা হুঁটিতে গাঁড়িয়ে থাকে ঐ কটকের দিকে চোরে ঐ উচ্চতে লেখটার দিকে। হাতিখালি পেন্সিল জেল। অকারকই চোখ দিয়ে টুং টাং করে জল গড়িয়ে পড়ে—দুঃখতে বৃষ ঢেকে কেঁসে ফেলে বিজ্ঞরকৃষ্ণ—তপবাদ...। দায় তখন এগিয়ে গেছে অনেকটা।

মাননীয় সম্পাদক মহোদয়—

পত্রিকার উন্নতির অঙ্গ রচনা নির্বাচন ব্যাপারে নির্বাচন-কর্তাকে পক্ষপাতিত্ব বর্জন করতে হবে। হবে প্রকাশককে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পত্রিকাকে প্রকাশ করতে হবে। এর ক্ষেত্রে আগে থেকে বহুতর প্রাপ্ত হতে কামনা, যখন আপনাতা পত্রিকা দেবী করে প্রকাশিত হওয়ার অস্থায়িত্ব হেতু, “কামক পাওয়া যাচ্ছে না” বলে।

বলুন, ধারা অর্থ বেন, তাঁদের ক'জনই বা মেনে নেন বার্ষিকের ওজনকে, প্রাকৃতিক চর্য্যগণকে ! প্রতিপক্ষেই যেখানে করার বেলান ক'জন সেখানে না হয়ে থাকতে পারে ? আচ্ছা, এতে কী পত্রিকাটি সহজে অনুশ্রিত্য অর্জনে সক্ষম হবে ? গ্রাহক সংখ্যাটি কি এতে বৃদ্ধি পাওয়ার সুদূর সম্ভাবনা আছে ? আপনাদের ব্যবসায়ী বুদ্ধি কী বলে জানেন কী ?.....

“বিশ্ব শতাব্দী” বীজ সংখ্যাটি, আমার মনে হয়, অল্প যে কোন বিশেষ সংখ্যার চাইতে স্তম্ভর। এ সংখ্যাটিতে কবির যে কথানি ছবি ব্রুজিত হয়েছে, সব কটি পছন্দসই, রচনাগুলিও উৎকৃষ্ট। এইক্ষেত্রে “বীজ সংখ্যাটি” অল্প যে কোন সংখ্যার চেয়ে অনেকখানি বেশী পৌরব অর্জনেই অধিকারী।

কিন্তু “নাট্য সংখ্যাটি” খুব ভাল সংখ্যা বলে মনে হয় না। এর কারণ—(১) নাটকের সংখ্যা মাত্র দুটি, একাধিকতা, এবং, নাটক বিষয়ক প্রবন্ধ তিনটি খোঁট ছাড়া রচনা নিয়ে কোন বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা যা বলে পাঠক সাধারণকে আপা দিয়েছেন সেটা বলায় যাবেন নি।

পাঠকের চোখে বিশ্ব শতাব্দী

[‘বিশ্ব শতাব্দী’র সমালোচনা করে পাঠকেরা বহু চিঠি পাঠিয়েছেন। কিন্তু সব চিঠি মানের অভাবে জানা সম্ভব হোল না। কয়েকখানি চিঠির অংশ বিশেষ হালা হোল।

—সম্পাদক ‘বিশ্ব শতাব্দী’]

পীড়িত, আর নিজেদের মনের কামনা সেই চাইছেন পাঠকের মনে স্ফুটিত করতে। আপনাতা যোগ্য করেছেন “.....পৃথিবীকে নতুন কথা শোনার ক্ষমতা ও সাহস বাস্তব আছে.....এ পত্রিকার লেখক তাঁরাই। এই কি “পৃথিবীকে নতুন কথা শোনানো?” আপনাতা হস্ত বলবেন প্রকাশিত সব গল্পই কি শুধু রকম ? না, সব গল্পই শুধু রকম নয়। এমন অনেক গল্প আমরা ‘বিশ্ব শতাব্দী’র পৃষ্ঠাতে পেয়েছি, যা অশ্রুত রূপে ভাল। আর অশ্রুত রূপে ভাল গল্প পাই বলেই নোংরা গল্প পড়ে মন কেঁপে উঠে।

‘বিশ্ব শতাব্দী’র পৃষ্ঠার রচনা বা রচনাকার বড় অভাব। একমাত্র পূর্ণাঙ্গ সাংবাদিক সাধারণ সংখ্যার পৃষ্ঠার তা প্রথম মৌলি বললেই চলে। প্রকৃত রচনা বা রচনাকার পাঠের যে আনন্দ তা আর্থো পাওয়া যায় না।

‘বিশ্ব শতাব্দী’কে আমি ভালবাসি। আর ভালবাসি বলেই মনের কোষ—অভিযোগ সব জানালাম।

প্রদ্যোত

ত্রিবিধ রায়

পি ৬ মিশন রোড, এলস্টোনশন কলিকাতা-১

উদীয়মান লেখক-সমিতির রচনা পত্রিকার প্রকাশ হতে আমার আগ্রহ নাই। তবে যখন হতে হবে তখন লেখার কোন যোগ্যতা আছে কিনা, পত্রিকার মান অর্থাৎ ট্যাগেড অস্থায়ী ওষের লেখা

ত্রিবিধ রায়

২০০৩১০বি, হরি বোম্ব ট্রাট, কলিও

অভ্যাসে

‘বিশ্ব শতাব্দী’র প্রতি আমাদের আপা অনেক। কিন্তু ‘বিশ্ব শতাব্দী’র বিরুদ্ধে আমার প্রথম অভিযোগ

হয়েছে কিনা। সংস্কৃত ও বাসানের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে পত্রিকার মূল্য বাড়ানো সমীচীন হবে না। পৃষ্ঠাবৃদ্ধি নাই থাকবে।

শ্রীকৃষ্ণ কাকি দাসগুপ্ত

লড়াই রোড, পোঃ কলিমগঞ্জ, জিলা কাছাড় আসাম
সবির নিবেদন—

পত্র দিন বছর বিশেষ পতাকারী পার্ট হিসাবে আমার কিছু বক্তব্য সাধারণ ভাবে চলতে চাই। প্রথমেই কয়েকটি কারণে বিশেষ পতাকাকে বঙ্গোপসংস্পর্শে আনা। কারণ, বিশেষ পতাকারী এমন একটি সাহিত্য পত্রিকা যার প্রায় প্রতি সংখ্যার সাহিত্যে নবোদয় তপস-চক্রটী লেখক লেখিকাদ্বয় অন্তর্নিহিত হয়েছেন তাক্রমেই বক্তৃত্বের কারণে জানাতে বিশেষ পতাকারী—অসম্পূর্ণ পত্রিকার মত অস্বীকার ও বরীকরণের রচনাই শুধু ছাপা হোক এটা সে চারদিন—উদাহর। এবং দেখছি নানা সামাজিক দৃষ্টান্তের দৃষ্টান্তে কোন ‘ইকোমের’ প্রকাশ দিতে পারে সে তার আসল উদ্দেশ্য, সাহিত্যসংস্পর্শ ও নিজের আশ্রয় চ্যুত হয়নি। বানেশ্বর বক্তৃত্বের কারণে বিশেষ পতাকারী আপন তত্ত্ব মিলিয়েছে।

এ একটি ক্ষুদ্র কথা এবার বলতে চাই। বঙ্গ, ছাপার তুল মাকে মাকে খুঁই লেগে যায়। বাধাই খুঁই হালকা। প্রকাশ কাল ক্ষুদ্র হলেই ভাল হয়। গল্পের ‘ইলাস্ট্রেশন’ প্রায় আকর্ষণীয়।

নিবেদন—

নীলাদ্রি চক্রবর্তী
দিউড়ীঃ বীরভূম

সেই ধরনের সেবা পছন্দ করি, যা জীবন সম্পর্কে মানুষকে বিখ্যাত রাখা দেয় না।

চিত্তব্রজ বোম্ব, সমবেদন বঙ্গ, অকৃত, সুবোধ বোম্ব ও সমবেদন বোম্ব।

শ্রীকৃষ্ণ কাকি দাসগুপ্তের কারণে আশ্রয় বোম্ব ও প্রেরণ হোক—কামনা করি।

বীরভূম সংখ্যা পেরে খুঁই হয়েছি। ন্যাটো সংখ্যা ভাল লাগে।

সামাজিক উপভাস ভিত্তি, অস্বাভাব উপভাস একটি, গল্প ভিত্তি। বিজ্ঞান, নিরাম ও বঙ্গবঙ্গ, দেখেবিশেষ, বেলানুলা, সংস্কৃতকরণ, বিশ্বসাহিত্য, কথিত্য, বঙ্গ-ভাষা, জীবনী, পুস্তকপরিচয়, বিভিন্ন আশ্রয় ছবি। কাটুন, প্রবন্ধ।

আমার চিত্ত করা বিশ্বভূমি সঞ্জিবনিত হওয়া মনে করি।

বৃদ্ধির বিবাহী আমি। পত্রিকার কলমেই বৃদ্ধি বা মূল্য বৃদ্ধি কোন রকমে বাস্তবীকরণ নহ।

মাজির আমের
প্রায়ঃ কোমল বাটি, জেলাঃ বীরভূম

অমল কাছিনী, উপভাস, গল্প বেল ভালই লাগে ভাড়াটা বেলানুলা, বঙ্গবঙ্গ, বিভিন্ন, বঙ্গভাষা সবই ভাল লাগে।

উপভাসের মধ্যে সামাজিক বঙ্গোপসংস্পর্শ, সুবোধ বোম্ব, চিত্তব্রজ বোম্ব, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য প্রকৃতির সেবা উপভাস ভাল লাগে। সামাজিক ভাবে সবই লেখাই ভাল সেগেছে বলা যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কাকি দাসগুপ্তের কারণে বিশেষ পতাকারী সমস্ত সংখ্যাই আমার ভাল লাগে।

নৃতন বিশ্বের কিছুই সংস্কৃতন করতে চাই কি না জানি। তবে আধুনিক সমস্ত নিয়ে প্রবন্ধের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চাই।

বানিশ্য সমস্তের একটি বিভাগ বা বানিশ্য সংস্কৃত প্রবন্ধ, অসম্পূর্ণ বিশেষ পতাকারীতে থাকলে অনেক গুণ্য জানা যায়। পত্রিকার মূল্য বৃদ্ধি বা পৃষ্ঠাবৃদ্ধি কোনটাই পক্ষপাত নহ।

শ্রীকৃষ্ণ কাকি দাসগুপ্ত

প্রায়ঃ গিমলা, পোঃ অসম্পূর্ণ, জেলাঃ বঙ্গবঙ্গ।

নোট ছোট গল্প ও পত্রী চিত্তামূলক প্রবন্ধ (সাহিত্য বিষয়ক)।

সুবোধ বোম্ব সংস্কৃত পক্ষোপসংস্পর্শ, হিন্দুসংস্কৃত চিত্তোপসংস্পর্শ।

সুবোধ বোম্বের “চিত্তব্রজ” ও সমবেদন বঙ্গ “কোরাই” (সংস্কৃত)। চিত্তব্রজ বোম্বের ন্যাটিকা “বোম্বোম্ব বঙ্গ” (কোরাই)।

হোটাট্ট চলনসই। নোট বনি সাহিত্যের পিরোনি হয় তাতে আগামী শ্রীকৃষ্ণ কাকি দাসগুপ্তের বিশেষ পতাকারীতে ভালো নোটের প্রকাশ্য করি।

‘বীরভূম সংখ্যা’ বীরভূম বঙ্গোপসংস্পর্শের “সার্বভৌম বীরভূম” প্রবন্ধটি ভালো সেগেছে। নিরমিত প্রবন্ধ হয়েও “ন্যাটো সংখ্যা” বঙ্গবঙ্গ হয়নি।

সামাজিক উপভাস বঙ্গবঙ্গ করলে খুঁই বঙ্গ উপভাস লেখকের সেবা ছাপাব্য অস্ত্র অস্ত্রো জানা। অস্ত্র ও ভাষার সেবার বিশ্ব বৈচিত্র্য বঙ্গবঙ্গ ও আশ্রয়ের বিক থেকে বঙ্গ নৃতন বঙ্গ।

শ্রীমাদিকলাস হাস

প্রায়ঃ ইলাদবাজার, পোঃ চক্রবর্তী জিলাঃ বীরভূম।

আধুনিক বিশ্বরাজনীতি
ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক:

লেখক—সত্যনারায়ণ বন্দ্যো-
পাধ্যায়; প্রকাশক—ইতিহাস
এ্যাসোসিয়েটেড, পাবলিশিং
কোং প্রাইভেট লিমিটেড,
৮টি ইমানাথ বন্ডনবার স্ট্রিট, কলি-২।

মূল্য—সাড়ে তিন টাকা মাত্র।

যাণীনতা লাভের পর ভারতের সাধারণ মানুষ আর
পৃথিবীর অন্তর্গত দেশের স্বরাশ্ববর নায়েবে পারে না।
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের স্থান করে নিতে হলে
তুই হুঁচাব জন নেতার আবির্ভাব-অভিভূই বশেষ গণ্য হতে
পারে না। নেতাদের সংগে সংগে ভারতের সাধারণ
মানুষ বিশেষত যুবজনেরা আন্তর্জাতিক ছুনিয়ায় হালচাল
স্বরাশ্ববর বাগতে বাধ্য। আমেরা ষাঁকে সাত্রাআবাধী
কবি বলি, সেই কতিভ্যর্জ কিপলিং একধা অতি শ্রুহর
করে বলেছিলেন—He Knows not England, who
only England Knows. সত্যই পৃথিবীকে জানলেই
ভারতবর্ষকে সত্য করে জানা যায়। আর, এক যেনেব
ইতিহাস জানলে জান ষাঁকে অসম্পূর্ণ; একাধিক যেনেব
ইতিহাস জানলেই তবই জানা সার্থক হয়, ক্রোচের এ
কথারও আশয়ের সমর্থন আছে। স্মৃতহাং আরকে
আমাদের আন্তর্জাতিক ছুনিয়ার অবস্থা জানতে হয়।
পর্যায়ীন ছিলাম যতাতনিন ততাতনিন কেহানীদিগিবি
অন্যে লেখাপড়া করেছি, বিবেচীর দেখানো বিস্তের পণ্ডিত
হয়েছি। তখন ভারতের মঙ্গল ছিল ইংরেজের মঙ্গল।
সেহিন নেই আজ, তাই মূল্যে কলেজে বিশ্বরাজনীতি ও
আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস পাঠন-পঠনের ব্যবস্থা
হয়েছে। এর প্রয়োজনীয়তা অনবীকার্য। উপরন্তু
যেহেতু আজ কোন দেশই একক ভাবে চলতে পারে না,
কোন এক দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ঘটনা অন্য
দেশকে প্রভাবান্বিত না করে পারে না। সেই হেতু বিশ্বঃক
নীতির ব্যাখ্যাধিটারের গুঠানোনা লক্ষ্য করতে হয়।
তাহাছা, সংবাদপত্রের বেড গাইনের অভ্যুত্থানে যে আরও

নতুন বই

অনেক স্ববর থাকে তা জানার
অন্যে অন্যান্য পুস্তক পাঠেবও
প্রয়োজনীয়তা আছে, কারণ
যটে যা তা সব সত্য নয়, সেই
সত্যই সত্য যা বাস্তব অবস্থার
প রি প্রে কি তে অর্থনৈতিক
অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ও বৃহত্তর
অনসাধারণের কলেক করে বিচার-বিশ্লেষণে প্রাপ্তব্য। তাই
আধুনিক বিশ্বরাজনীতির ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। বিশেষ
ধরন সেই ইতিহাস মূল্য-কলেজে পড়ানো হবে।

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক পরিশ্রম সহকারে
বইখানি লিখেছেন যটে, কিন্তু দুঃখের সংগে উল্লেখ করতে
বাধ্য হচ্ছি, স্মৃতিস্মরণমতি তরুণ তরুণীদের মাঝার তিনি
যে সব কথা অপ্রগ্রহিৎ করতে চেয়েছিলেন সেগুলি যথোচিত
হয় নি। যেমন এটিদি চেয়েছিলেন ইংলণ্ডকে “সাময়-
তান্ত্রিক দেশে (১) পরিণত করতে” (পৃ: ১০৪); কিংবা
“পূর্ব ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রই আজ কমুনিষ্ট রাশিয়ার
প্রভাবাধীন। নতুন এক ধরণের সাম্যতাবাদের দৃষ্টি
করেছে রাশিয়া। প্রচুর, বল প্রয়োগ, অর্থনৈতিক সাহায্য
প্রভৃতির সাহায্যে রাশির পোশাও চেংকারাতানিরা
বাংলাদেশী, কমানিয়া, মূলগেহিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রকে প্রকৃত
পক্ষে জনপ্রভাবাধীন উপর্যাপ্টে (satellite) পরিণত
করেছে।” (পৃ: ২০১); কিংবা, “১৯৫৫ পূঃ রাশিয়া
টিটোর চুক্তি অগ্রহণ্যী তাকে স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রনির্বাচনের
অধিকার দিয়ে নিজ হলমুক্ত করে নিল” (পৃ: ১০৬);
কিংবা “দেশের অভ্যন্তরে বৈষ্যভাটী মাপন চালালেও
বহির্বিষে তবাব (রাশিয়ারা) নিজেদের পরিচয় বিস্তার
নির্ধাতিত জনগণের বাণীর দারক ও বাহক বলে।”
(পৃ: ১০০); কিংবা, ১৯০ পৃষ্ঠার উল্লিখিত গ্রীসেব
বিস্তোষে রাশিয়ার অগ্র বিস্তে সাহায্য করার কথা, কিংবা,
“পূর্ব-আধাধিনিতে রাশিয়া পরিপূর্ণ নিরস্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন
করে পশ্চিম আধাধিনির সংগে তার বিচ্ছেদ প্রার সম্পূর্ণ
করে তুলতে লাগলো” (পৃ: ১০৫৪); আবার,
“কমুনিষ্ট তার দৃষ্টির পথ এনিমিত্তই খুঁজে পেয়েছে

মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটতে আড়ম্বর বিড়ম্বার হলেও, বক্তব্য অতি সাধারণ এবং সহজসূত্র; আর বিংশ শৃংখার সাত্ত্বালের প্রবর্তনিক উপেক্ষণ করা চলে। হীরেনবাবুর লেখা সম্বন্ধে শনিবারের চিঠির সম্পাদক অবিকারী ভেবেও কথা কুলে যে অন্যবস্তক কৃপা করাব চেষ্টা করেছেন (শনিবারের চিঠি, আখ্যায় ১৩৬৮) তার উত্তরে বলা চলে, পত্রিকাখানার ব্যয়স হয়েছে, সম্পাদকের উচিত এমন একটি পাত্তী আনা। হীরেনবাবুর প্রবন্ধ থেকে যে উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে, তাতে সত্যতার অত্যন্ত ঘটেছে। মুখোপাধ্যায় সরকার সম্বন্ধে শনিবারের চিঠি নতুন্য বাংলাটে হেঁচকার মতো। একথা কী কুলে বাওয়া উচিত হবে ভারতীয় রেনেসাঁস সম্বন্ধে পঠিতে পঠিতে তর্ক আছে? একথা কী কুলে বাওয়া উচিত হবে, শনিবারের চিঠির “ক্যাটিনারাম” রবীন্দ্রনাথ একেবারে আড়ম্বর খোলাই ঘরেছিলেন? একথা কী কুলে বাওয়া উচিত হবে কলিকাতার রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনার ভক্তি থেকেই রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনার নৃতন বিশ্ব উন্মোচিত? রবীন্দ্রনাথ “ভাগবতী ভদ্র” হতে হতে বেঁচে গিয়েছেন? তাই এমন কোন কোন পত্রিকার রবীন্দ্রসংখ্যা রবীন্দ্র-সম্মান দাস সংখ্যা হতে পারছে? মুখোপাধ্যায়ের প্রভাভাবন ব্যক্তি, এবং স্বতন্ত্র মানি তার কোন কোন বিষয়ে জান কিংবাধা; মুখোপাধ্যায় চাপলা বুড়ে বিজ্ঞা নয়, এটা ঠিক পত্রিকার সম্পাদকের কুলে বাওয়া উচিত নয়। আমি লেখাটি আর একবার পড়তে বলি চন্দা-খোলা চোখে, যে-চন্দা দিয়ে ভারতবর্ষের কোটিকোটি মানুষের “বহুভাষার বহুভাষা” অধ্যাপিত অবস্থা দেখা যায় না, যে চন্দা দিয়ে দেশে মানবভাবা, মানবভাবালী রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ চেনা যায় না, ইত্যাদি। কিন্তু আশ্চর্যের আলোচনা শনিবারের চিঠির সংখ্যা-সাহিত্য নয়। আসলে সংকলনিক আনন্দবাজার সংবাদ সংকলন বলে বিবেচিত করেছেন, আনন্দও তাই কবি। তবে গোপাল হালদার মহাপুত্রের প্রবন্ধটিকে একটি বড় রতনের তেঁত বলে মনে হয়। অপেক্ষাকৃত দুঃখ ওরূপ দেখেও লেখা এই সংকলনে স্থান পাওয়াই আশা আনন্দিত; আশাও বক্তব্য, এই বক্তব্য বিচার একটি সংকলনে ওরূপ বুদ্ধিবী-বের লেখা সমগ্রীত করলে সেটা কালোপমোদী হতো।

“রবীন্দ্রনাথ—কীর্ত্ত ও সাহিত্য” সম্মানিকা হালের “পুরাতনের পুরাতন এবং নৃতনের নৃতন রবীন্দ্রনাথকে লিখা পড়ার মল। এবং সম্মানিকা যে উত্তম সমালোচক বা স্বাধীন বোদ্ধার বলে উপযুক্ত সংগ্রাহক তা এই নাস্তির্ঘর প্রবন্ধানিতে পরিষ্কৃত। যে কোন পার্থক্যও পক্ষে এই প্রবন্ধ অপরিহার্য। সম্মানিকা না বলে হিলে আশ্রয় আনুভেই পারতাম না, কবি রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনা কবিতা নয়, গদ্য, এবং তাও আশ্রয় বিজ্ঞান সম্মানিকা আলোচনা। এবনে উল্লেখযোগ্য বাঙলা হেলের দুই প্রেই সাহিত্যরবী বিজ্ঞান-চর্চায় সমাদিক আশ্রয়ী ছিলেন, এবং বহিষের বিজ্ঞান-প্রবন্ধের ভূমিকা আর রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপরিচয়ের ভূমিকার মধ্যে আশ্রয় সত্ত্বত রয়েছে। সব প্রেইতাই বিজ্ঞানভিত্তিক শুধু আশ্রয় সাংলার মে ১৮৭৭-৮০, চলন-বহিত; সেকসপীরার ও পেটোর বেলায় একথা সত্য, কালিদাসও ব্যতিক্রম নয়। সম্মানিকা তারও আনিয়েছেন, “বিশ্বমেলার উপভাষায়” আগে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কবিতা, “অভিলাষ”। এইপ্রণ নানা গুণা ছাড়া কিছু লুপ্তান হালি, চিঠিপত্র, প্রকৃতি প্রেইত বহিষা বাড়িয়েছে। তবে ছিত্রাঘের কাণ্ড এতদর হতে পারে না। আশ্রয়ও বলি তবে, রবীন্দ্রনাথের গল্পের সংখ্যা একপত্র? না তার বেশি? বিচারত, সম্মানিকা:র বইতে আলোপাত্ত উপরোক্ত পক্ষে সমাধেশ কেন? তিনি নহুন্নয় জান বিবরণ করেন, নিজেও খোলা করা উচিত ছিল বলে মনে কবি।

ভূতীয় আলোচ্য প্রবন্ধ ওষেধাবার ব্যাতির উপযুক্ত। সাত্ত্বালের পরে যেমন সেক্সপীরার-সমালোচনা বাবা স্বরূই পরিবর্তিত হয়েছে, তেমনই ভক্তি চর্চায় প্রবর্তিত রবীন্দ্র-সমালোচনা বাবাই এতাবিন বহমান ছিল। তা ওষেধার “রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনা” বাবা দিয়ে বাঙলা সমালোচনা সাহিত্যের আলোকে প্রবেশ করেছেন; পরপরই তার এ প্রবন্ধ সত্যই রবীন্দ্রপ্রতিভার নবস্তর লুপ্তানে বিশিষ্টতার বাবা করতে পারে। একবারে নৃতন বুদ্ধিবোধ থেকে যিনি রবীন্দ্রপ্রতিভার বিশ্লেষণ করেছেন। এবং বক্তব্যও সমালোচক রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভক্ত ও সাহিত্য-সমালোচনার মধ্যেই দীক্ষিত। সেই কারণে বক্তব্যই তার পুঙ্কে ওষেধার বিশূল সমাধেশ

নেই, তত্ত্বের নিম্ন প্রয়োগ রয়েছে। লেখক ইংলিশ-ভাষা ও সাহিত্যের হাজি; ইংলিশ সাহিত্যের মূল্যবান তত্ত্বগুলিতে সুনিপুণভাবে এই গ্রন্থে প্রয়োগ করেছেন। এর আগে দশ্য লোকান্তরিত প্রবাস জীবন চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের প্রাথমিক আলোচনা করেছিলেন; কিন্তু উচ্চ-কল্পিত সে আলোচনার সাধারণ ও অসাধারণ কোন জাতীয় পার্থক্যই বুলি হতে পারেনি; দৈহিক থেকে শু: ওহেবোয় কৃত্রিমের দাবী করতে পারেন। তাঁর গ্রন্থে প্রচুর পঙ্ক্তানা-সমিত বিবৃদ্ধতার ছাপ আছে, কিন্তু তার প্রর্থন নেই। তাই পার্থক্যকে আকর্ষণ করে, বিকর্ষণ করে না। এই গ্রন্থের সাহিত্যতত্ত্ব পর্যায়টিতে আর একটি বিষয়ে আলোচনা থাকলে ভালো হতো:—রবীন্দ্রনাথের গদ্য ও গদ্য তথা গদ্যশৈলী ও কাব্যশৈলী (Prose, Verse and Poetry) সম্বন্ধে আলোচনা সংযুক্ত হলে ভালো হতো, কারণ, নামা স্থানে তিনি গদ্য ও পদ্যের সম্পর্ক নিয়ে বহুবিধ উক্তি করেছেন। এই অংশের কল্পনা মামক পবিত্রেরটি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, ইংলিশবিশ্ব ও ক্যালি কল্পনা কাল্পনিক: সম্পর্ক আলোচনা আবশ্যিক হতো বহি লেখক এই প্রসঙ্গে প্রাথমিক হাউ স্ট-কেন্দ্র-এর মতামত ব্যহার করতে পারতেন। ডেনিস Styll বা রচনাশৈলী (রবীন্দ্রনাথ থাকে ৩৬) বলে বর্ণনা করেছেন) সম্পর্কে থাকলে সমালোচক রবীন্দ্রনাথ পূর্ণতর পরিচয় পাওয়া যেতো। মোটের উপর “গদ্যলোচক রবীন্দ্রনাথ” সামাজিক কালের সমালোচনা-গ্রন্থের জাতারে উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

চতুর্থ একটি সম্পর্ক ‘সম্মানবীর মন্তব্য’—‘অবদীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আধুনিককাল পর্যন্ত কিশোর মনে রবীন্দ্রনাথকে জাঁকবার যে প্রকার চলে আসছে ‘প্রথম মাতা’ যে তারই সামান্য পরিচয় দেবার চেষ্টা হয়েছে।’ সংকলনে প্রায় উনচল্লিশ জনের লেখা সংগৃহীত হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি কবিতা আছে। সবই যে কিশোর উপযোগী একথা মনে করার কারণ নেই কিশোরদের অভিতাবকতাও এই সংকলন হাতে পেলে বুলি হতে পারবেন। অবশ্য লক্ষ্যেই কিশোর মনের

কারণ তাঁর লেখাটি অনেক আগে লিখিত রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন মামক পুস্তক থেকে গ্রহীত। আর প্রেমের মিথ্রের তেতো লাইনের ছোট কবিতাটি মতো সুন্দর, ততো বিকর্ষক লক্ষ্যবাক্যের দশ পৃষ্ঠার কবিতাটি। তথাপি সংকলনটি সুন্দর, মনোমত হয়েছে, এক কথা: দশ্যে এই সংকলনের সমগ্র বস্তুমান সমালোচক কামনা করেন

অতি দ্রুত পড়িসেং চাইটি গ্রন্থের আলোচনা করতে হলো, তাই সব কথা বলা গেল না, তথাপি এই চাবখানি গ্রন্থের সমগ্র হবে, এটা আশা করতে পারি।

—কমলাপতি দে

চতুর্থদশ ও বিভাগটি—পত্নীপ্রদান বহু, প্রকাশক—
মুকল্যাত আইডেট লিমিটেড।

বৈকুণ্ঠ বহাঙ্গনবের দুই প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সম্বন্ধে বিত্মারিত আলোচনা করে অধ্যাপক পত্নীপ্রদান বহু আদ্যের কাছে বক্তব্যার্থ হয়েছেন। সাধারণতঃ বৈকুণ্ঠ-সাহিত্য আলোচনার একটি তত্ত্ব-নির্ভিত রসবৃত্তি থাকে, তার ফলে অনেক সময় সমালোচক নিরপেক্ষ সাহিত্যে বৃত্তির পরিচয় দিতে পারেন না। পুণ্ডিতের সব মেনেই প্রথম কাব্য রচিত হয়েছে বর্ধভাবকে কেন্দ্র করে। কিন্তু কাব্য দ্বিগুণে সাহিত্যের রামধারে শেব পর্যন্ত সেইগুলিই বীকৃতি পেয়েছে দার মধ্যে বর্ধভাউত সাহিত্যগুণ রয়েছে। বৈকুণ্ঠ-সাহিত্য বিচারেও সেই মাপকাঠি গ্রহীত হওয়া উচিত। অধ্যাপক বহু চতুর্থদশ ও বিভাগটির কাব্য-আলোচনার সেই মানদণ্ড গ্রহণ করেছেন, বলেই তার বিচার উৎকর্ষতা অর্জন করতে পেরেছে।

বৈকুণ্ঠ-সাহিত্যের দুই মহাকবি সম্বন্ধে অধ্যাপক বহুর একটা বক্তব্য আছে। তার বক্তব্য একেবারে সৌন্দর্য না হলেও অজিনব। তার কথ্যতেই বলা থাকে, “চতুর্থদশ সম্বন্ধে আমার মূল বক্তব্য—‘তিনি সর্বাধীনভাবে ‘আধ্যাত্মিক কবি।’ আর বিভাগটি হইলেন, সৌন্দর্য প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি।’” আর একটু বিশ্লেষণ করে বলা দায়, বিভাগটি বৈকুণ্ঠ প্রেম বা সৌন্দর্য নরনারীর প্রেমকে অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেছেন, যা দ্বারা মনে মনে একটা আধ্যাত্মিক

আকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু সেইটাই বিভাগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়। তিনি রূপ-রচনা করি, সৌন্দর্য-বিলাসী, অলঙ্কার-সচেতন ও এবং কাব্য-কলায় বিশেষজ্ঞ। আর চণ্ডীহাসের কাব্য, “মিকমিত হেম, কামধনু নাহি তায়।” তিনি সহজ সুরে আধ্যাত্মিক প্রেম সাধনাকে পানে মূর্ত করেছেন। সেহ সেখানে বিশ্বত, ক্লম-বিরহ দ্বন্দ্বকে মমিত করে ভক্তকে বৈকুণ্ঠের ঘিকে নিয়ে চলেছে।

অনেক অধ্যাপক বহুত বক্তব্যের সঙ্গে একমত নাও হতে পারেন, কারণ প্রথমতঃ চণ্ডীপাসকে তিনি একজন বিশেষ যুগের মানুষ কল্পনা করে তাকে একটি ব্যক্তিত্বপূর্ণ হিতে চেয়েছেন। কিন্তু চণ্ডীহাসকে কেন্দ্র করে যে রহস্য রয়েছে তা থেকেই স্পষ্ট যোগ্য বার পরাবলীর চণ্ডীহাসকে বিশেষ কোন যুগে নিবদ্ধ করা যায় না। তাঁর কাব্যে বৈকুণ্ঠভক্তির সরল সহজ রূপায়ণ সেবে মনে হয়, বৈকুণ্ঠ বিমূর্ত ভাবকে রূপ বেধার চেষ্টা রয়েছে এই সমস্ত পরাবলীতে। এখনও মনে হয়, চণ্ডীপাস নামের অস্থগালে আরও অনেক বৈকুণ্ঠ কবি আত্মগোপন করে আছেন। সুতরাং বা বৈকুণ্ঠী ভক্তির পরাবলী-প্রকাশ, তার মধ্যে আধ্যাত্মিকতায় চরম প্রকাশ মিলবে, তাতে আর সন্দেহ কি। বিতীর্ণতঃ বিভাগতির জীবন আলোচনাও যেবা যায়, প্রথমতঃ শৈব হলেনও এক সময় তিনি শ্রীমদ্ ভাগবৎ গ্রন্থ অমুখার করেন। এই বৈকুণ্ঠ মহাপ্রভুর প্রভাব কবির উপর পড়া স্বাভাবিক এবং যা হরত মৌলিক প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই তাকে শৈব পর্যন্ত নিয়ে গেছে এক আধ্যাত্মিকসোকে। বৈকুণ্ঠ কবিও মূলতঃ পান, এবং যা হরত কাব্য পর্তে আঘাতের কাছে বেহাশ্রিত বলে মনে হয়, সুরের মাধুর্যে তা ‘আমাদের মিকট বেহাশ্রিত ব্যক্তনা আনে। যেট কণা, এরকম একটা ভাগ যে বিভাগতি আধ্যাত্মিক উপলব্ধি-সম্পন্ন কবি ছিলেন না, আর চণ্ডীহাস ছিলেন মূলতঃ অধ্যাত্ম-সর্বস্ব, আমার কাছে কৃত্রিম বলে মনে হয়।

অধ্যাপক বহুর মূল বক্তব্যের সঙ্গে একেবারে কনত না হলেও, তাঁর বিরাট পাণ্ডিত্য আমাকে

মুগ্ধ করেছে। তিনি যে ভাবে বিভাগতির জীবনের সমস্ত ঘটনা, তার সঙ্গে সংযুক্ত ও প্রাকৃত কবিসংগত নির্মিত সৃষ্টি, বিভাগতির কাব্যে অলঙ্কার ইত্যাদির বর্ণনা দিয়েছেন, তা সত্যই তাঁর বিগ্ৰহের ক্ষমতা ও বুদ্ধিপ্রাণী মনের পরিচর দেখে। বৈকুণ্ঠ-সাহিত্যে সৃষ্টিতে ধারা অমূল্যবিশ্ব এবং গবেষণা-উৎসাহী, এ গ্রন্থ তাৎক্ষণিক আছে এক অমূল্য সম্পদ হবে বলে আমার বিশ্বাস।

—কৃষ্ণাশক্তি ভট্ট

কালীঘাটের পট—শান্তি লাহিড়ী। প্রকাশক—ইতিহাস পাবলিশিংসন, ৬, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট, কলকাতা-১। দাম—দুটাকা।

কবি শান্তি লাহিড়ীর একটি চিত্রল কাব্যগ্রন্থ হাতে পেলাম। কালীঘাটের পট। একগুচ্ছ তাণ্ডা কুপের মত এই গ্রন্থের কবিতাগুলি প্রেম ও নিঃসর্গের অপরূপ সন্দীভতার কাব্যগঠনকে মুগ্ধ করে। কবিতাগুলি পড়তে পড়তে মনে হয় কবি যেন এক বিহব পুণিবীর বিভিন্ন নিঃসর্গের কবিতার আঘাতের সন্মুখে মূলে ছিলেন এবং আমরা মুগ্ধ বিষয়ে হৃদয় নাহকের মত বিশ-পতকীর এই তত্ত্ব কবির অন্তর রূপে অপরিচিত অনেকগুলি চিত্রের সন্ধান পেলাম। ‘বিলতের উপত্যকার’, তাই বার বার মনে পড়ে :

যেহ, তীত্র আলো জলে—সমুজ্জল যৌবনের দিবি,
বজ্রাত চন্দনে স্রবৎ স্বরে পাইনে, পাখরে।
বিপুল শিল্পের মত কাচবৎ। নিবিড় সুখেত
স্পর্শে জলে যেহ ওই হিরণ্ময়ী পর্বতের চূড়া।

—বিলতের উপত্যকার : কল্যাণীয়া সীতাকে
বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করি—

বীরব একটি দিন, নিটোল পাখির কণাকলি,
একটি নিম্বত প্রাণ—যেন একটি হিড় পরাবলী
আলস বিচ্ছেদে আদি—কুপ্ত এক প্রবর্তীত প্রাণ।
কেবলি পিছনে টানে একটি হৃৎ—
উজ্জল স্মৃতির আলো—

কণালে শিহর পথে ভূমি মুগ্ধ অমৃত্যুপুত্র।

—অমৃত্যুপুত্রের হৃৎ

চুড়োবে সবুজ খেত, পাঁকা পাঁকা কসলেব ঢেউ;
নির্বেশ সজ্জার চাঁদা, বুকে লম্বাটিল, আকাশের বুকে
কোল পেয়ে শীতের দাখীনা হাত সমুদ্রে ভাঙা
করা। হঠাৎ মেঘের চায়া জাপসা হং সবুজ বন্ধুৎ,
তলশী নিয়ে কল আনতে কেউ বুঝি পেছে সমুদ্রের।
'পৃথিবীর কল্প' করিব এই সবুজ স্বপ্ন পাঠকের চোখেও
সজ্জিত হবে, আশা করা যায়। প্রোফ ডিউ মনোরম।

—ভ্রাম্যপ্রসাদ সরকার

বাংলা গভের ক্রমবিকাশ—অধ্যাপক প্রামাণ্যনার
চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। পৃষ্ঠাখী গ্রন্থ তখন, ১০, মহাশা
গাউ। প্রাচ্য, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত। মূল্য—
৫০ টাকা।

“একদা প্রভের নীলেন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যের
তথ্য ইতিহাসের যে রস-সমালোচনার পূরণপাত
করেছিলেন, পরবর্তী বৃষে সেই আদর্শ বন্ধা করা
সম্ভব হয়নি। প্রাণেশ্বর তথ্যকে প্রাণের প্রবর্তনায়
উজ্জীৱিত করা প্রতিভার কাজ। রবীন্দ্রনাথ সীমান্ত
ভাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের আলোচনা করেছেন
পূর্বাতন ও পরিচিত তথ্যের ভিত্তিতে। তবুও তিনি
আমাদের মনে আশির তুলতে পেরেছেন মনুর কাহিন্য
আবেশ। নীলেন্দ্র সেনের পর বাংলা মঙ্গলকাব্য লিখে
কত তথ্যই হো। সংগৃহীত হল। নীলেন্দ্র সেনের
সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথ মঙ্গলকাব্যের
অন্তঃসংগতী যে কীর্ত্তিহাসের পরিচয় পাঠকে
কাজে হুসে ধরেছেন তার পরিচয় এ হুসে প্রায় দুপ’ত।

তথ্যের প্রয়োজন সত্যজ্ঞানস্বাক্ষরিত কল্প। বর্তমান
বৃষের আলোচনার যেনতে পাই সত্যকে জাপিয়ে উঠেছে
তথ্য। রূপহীন রসহীন ঘটনাপঞ্জীতেই এখন নাম
যেওয়া হয়েছে সাহিত্যের ইতিহাস। তাই নীলেন্দ্র
পরবর্তী বৃষের প্রভেদ পণ্ডিতবর্গের লেখা সাহিত্যের
ইতিহাস’ পাঠে আশা করা যায়। তথ্যের সঙ্গে পরিচিত
হয়েছি। কিন্তু তাত্ত্বিক আদর্শের রূপগীষণা উদীপ্ত
কর না, হুস তখন পড়বার আগ্রহ কমে না, স্বয়ং
ইতিহাস পাঠে আসে সত্য ও অবসন্নতা। প্রাণেশ্বর
পূর্ব-প্রমাণ, তথ্যের বিশ্বব্যাপী স্বকথিত্যের মধ্যে
হঠাৎ বেধতে পেলাম সবুজ প্রাণের নতুন অঙ্গুর—
‘ভ্রাম্য প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা গভের ক্রমবিকাশ’।

‘বাংলা গভের ক্রমবিকাশ’ হোই বহুরূপ বই—
এতে আদি হুস হতে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলা গভের
বিকাশ ও বিবর্তন ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। এতে
তথ্য আছে প্রচুর, কিন্তু সংগৃহীত তথ্য এর

প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়। তথ্যের স্বাক্ষরে তিনি সত্যের
প্রাণের আবেশ ও উত্তাপ আশির তুলতে পেরেছেন।
ইতিপূর্বে একাধিক গ্রন্থে বিভিন্ন পর্বে বাংলা গভের
স্বপ্নাত্তর আলোচিত হয়েছে। কিন্তু স্বপ্নাত্তরের কারণ
কি? এবং কেনন করে আগে পরিবর্তনের জ্ঞান
প্রাণের—পরিবর্তনের স্বপ্ন ও সত্যি কি, তার আলোচনা
কোথায় প্রাণাত্মক করেছি। যিহোবী সংস্কৃতের বলে
কেন এবং কি ভাবে আসে তাহার মঙ্গল ও স্বপ্নাত্তর,
তার সুনিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন প্রামাণ্যনাথ। এখানেই
পূর্বসূরীর সহিত প্রামাণ্যনাথের মৌলিক প্রভেদ।”

—কালিদাস মুখোপাধ্যায়

শেষ-বিশেষে রবীন্দ্রনাথ (সংকলন) : সম্পাদক
কমলাপতি হে ও বাসব সরকার; প্রকাশক, বহু
প্রকাশনী, ১১২ বিবেকানন্দ রোড, কলি—৮। সাড়ে
তিন টাকা।

রবীন্দ্রনাথের অন্তঃসত্ত্বা ঠিকাপনের কালে আদি একবার
প্রকাশিত হলো, রবীন্দ্রনাথ বেশ ও কান্তির সীমা অতিক্রম
করে বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধি। ১৯১০ সালে রবীন্দ্রনাথকে
কেন্দ্র করে প্রাচ্যসংঘ প্রভৃতি মনো ধরণের চিন্তা-
ভাবনার প্রকাশ ঘটে ছিল। কবি তাঁর জীবিতকালে
বিভিন্ন দেশপটন ও বক্তৃতার দ্বারা প্রভৃতি ভাবতত্ত্ব
ও ভাবের প্রেত কবি লিখে আগ্রহ আগ্রহ করে
রেখেছিলেন। নানা ধরণের আলোচনা তাঁর লিখে
হয়েছে, নানা রচনাও প্রকাশিত হয়েছে।
রবীন্দ্রনাথের লেখা বহুনা সংস্কৃত চিন্তা ভাবনা সংগ্রহ
ও সংস্করণের প্রয়োজনীয়তা আছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে
কী ভাবে রবীন্দ্রনাথ ও বর্ণন-চর্চা হয়েছে তা জানার
আগ্রহ আত্মবিক। এ বছর বাংলা যথো একাঙ্গণে সে
কালকে বিবেচন করি কিন্তু আলোচনা যথো পেছে, কিন্তু
সেদব সংস্করণযোগ্য নয়। ‘শেষ-বিশেষে রবীন্দ্রনাথ’
নামক সংকলন পণ্ডের বৈশিষ্ট্য সেখানেই উজ্জল। পৃথিবীর
করেকটি দেশের মনীষীর লেখা ও বক্তৃতা এখানে সংগৃহীত
হয়েছে। বর্তমান সংকলনপঞ্জীতে রাশিয়া, আমেরিকা,
ইংলন্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, পোলাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, লাতিন
আমেরিকা প্রভৃতি দেশের পাকিস্তানের লেখকদের
লেখা সংগৃহীত হয়েছে। প্রতিটি বচনই কৌতুক
আগ্রস্ত করে। আশা করা যায় যিহোবী সংস্করণ আদর
আরো অনেক তথ্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে।
সংকলন পত্রটি সুস্বপ্নাশিষ্টাটো, প্রবাহার ও সম্পাদনার
সংকলনের ক্ষেত্রে নৃতনাত্বের নিদর্শন বহন করে।

—বীরেন সরকার

আহারের পর
দিনে দু'বার..

শ্রম প্রাণতুণ্ডে খাদ্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়

স্বদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান



মহাদানারিষ্ট
(এক আঙ্গুরের জল)

মুতসজীবনী

সাধনা ও স্বধামন্য • ঢাকা

কলিকাতা কেম ডাঃ নরেশ চন্দ্র
মোহ, এম-বি, বি-এস, অ্যাক্সেস-
অ্যাকাডেমি, ৩৬, সোয়া ন পা ডা
রোড, কলিকাতা-৩৭



অধ্যাপক ডাঃ মোহন চন্দ্র মোহ, এম-এ,
অ্যাক্সেস-অ্যাকাডেমি, এম,সি,এস, (নগর),
এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাঙ্গলপুর
কলেজের হস্টাল শাখার চূড়পূর্ণ অধ্যাপক।

দু' চামচ মুতসজীবনী সঙ্গে চার চামচ মহা-
জ্বাক্ষরিত (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার
খাদ্যের ক্ষতি উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-
জ্বাক্ষরিত ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সন্ধি, কাসি,
শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ করতে অত্যধিক
ফলপ্রসূ। মুতসজীবনী দুধ ও হজমশক্তি বর্ধক ও
বলকারক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে
আপনার ঘেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলক
স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।

১৯১৫ থেকে ১৯১৮

সাল। ইউরোপের আকাশ
বুকের বনদটার আচ্ছন্ন।
লরেন্সের ভাগ্যের আকাশও
রাহুলসেনের বক্তৃতা জ্বলছে,
বাফিন্ড বিম্বনের বিষয়।
হেনরেক পুস্তীকৃত। ১৯১৫

লেডী চ্যাটার্লির লেখক

মণি গঙ্গোপাধ্যায়



সালের গোড়ার দিকে লরেন্স এ সবচেয়ে বিশেষ অবস্থিত
ছিল বলে মনে হয় না। প্রথম কাণ্ডে অবশ্য হৈরিক
অনুভূত। থেকে থেকে ওর বুকের অনুভব বেধা দিচ্ছিল।
কিছু নয়, সামান্য সন্ধি-কাসি—এইধর বলে উড়িয়ে
ফেয়ার চেটা করলে কি হবে। ব্যাবি তার কাজ
করে চলেছিল, ধীরে ধীরে বেহায়ে রাখছিল কয়েক
খণ্ড। বিটেরত সারা ১৯১৫ সালটাই ওর অন্তর
জুড়ে ‘তামস সত্তার’ অধিষ্ঠান বলা যায়। আত্মলভ
ডাক বেটলে বলে বেহালা করছিল। সেই সঙ্গে
ওর মনে প্রত্যয়ে প্রতি প্রভা, মাল্লবের পরে বিখ্যাত
বুড়ি সাময়িক ভাবে বেটলে হয়ে গেল।

তবু সাহিত্যের পরিবেশে মিথাস নিতে গেলে
ও সব ভুলে যেত। তাই মারী যখন ‘Signature’
বলে পত্রিকা বাদ করল, ও তার অসম্ভব জ্বল
না নিয়ে পারল না। পর পর তিন সংখ্যার ‘The
Crown’ গ্রন্থ প্রকাশিত হলো। এই গ্রন্থাবলীতে
হার্শনিক লরেন্সের কিছু পরিচয় আছে। এর আগেই
রাহুলসেনকে লেখা টিপ্পিতে কিছু হার্ষনিক তত্ত্ব পরি-
বেশনের চেষ্টা লরেন্স করেছিল। অথবা হারেন্সের
প্রভাবে লরেন্সের হার্ষনিক সত্তা বেগে উঠেছিল।
সে যাই হোক, এই গ্রন্থাবলীর প্রধান মূল্য ‘The
Rainbow’ উপন্যাসের টীকা হিসাবে। লরেন্স নিজের
বলেছে—‘আমার হার্ষনিক লেখাগুলো কল্পনাশ্রী সৃষ্টি
থেকে উৎসাহিত হয়। উপন্যাস বা কবিতা আমি
সচকিত হবার আগেই কলনের দূরে কাগজের বুক
আঁকা হয়ে যায়। আর তারপরই আসে মানসিক
সেই অবস্থার শান্ত, সুস্থ চিত্তে আত্মবিশ্লেষণ করা যায়,
বিচার করা যায় নিম্ন প্যারিপাখিককে। ব্যক্তিগত

তার যমনশীলতা দিয়ে,
লেখকশক্তা তার অভিজ্ঞতার
আলো কলে উত্তীর্ণ হতে
তার কোন একটা বিশেষ
হার্ষনিক সিদ্ধান্তে। ‘আমি
অবশ্য হার্ষনিক তত্ত্ব বৃত্তি
না। তবে ‘The Crown’

পড়ে ওর ‘তামস-সত্তার’ স্বরূপ চিনতে পেরেছি।
বুঝেছি যে কামনা-বাদনার স্রিত, বিক্ষিপ্ত এক অন্তর
চাইছে বিজ্ঞ আলোকে স্পর্শ। সে আলো চকিতে
মনের আকাশে বেধা দেয় বৈ কি। সৃষ্টির ধারা
হয়ে ঝরে পড়ে পুণীকৃত কালো মেঘ, অমনি আকাশ
আলো করে আত্মসিদ্ধ হয় সাতপট্টা রামবহু। তামস
সত্তা আর আলোক-আকাশের ঘন পার হয়ে, বেহনার
বিধ পান কতে, আনন্দের অনুরক্ত দিক্ত মাহুবেই তার
মনের আকাশে সৃষ্টি করে রামবহু—‘The Rainbow’।

লরেন্সের ভাগ্যের আকাশে কিন্তু দামবহু উঠল না।
‘The Rainbow’ কে তেজ্র করে নেমে এল কালো
যেবের বনদটা।

৩-শে সেপ্টেম্বর ‘The Rainbow’ প্রকাশিত হল।
এর বাসবানেক আগে আমরা দু’জনে বোলা মাঠে
গাড়িয়ে ইংলণ্ডের আকাশে জেপেলিনের আবির্ভাব
বেবেছিলাম। অক্রমের সঙ্কেতে বিলঙ্গী কামানের
পর্জন, আকাশের বুক সার্চলাইটের তীক্ষ্ণ আলোর
স্করণ, দুই পাখাড়ের আড়ালে আগুনের শেলিহান
শিখা, কোমল গ্রাম যোগে ঘর জলছে—মাঠের বুক
নীর্থ বটা আমরা চুটি প্রাণী। এই দিনের অভিজ্ঞতা
‘Kangaroo’ উপন্যাসের পাতার অক্ষর হ’য়ে আছে।
সোমার্গ আর তার আধীন গ্রীষ্ম গোবের লামনে দিয়ে
উড়ে চলেছে জেপেলিন। ধীরে ধীরে দুই পাখাড়ের
আড়ালে মিলিয়ে যাচ্ছে, তলার নাটতে রেখে যাচ্ছে
আগুনের শেলিহান শিখা, কংসের শীলা। গ্রী সোমার্গের
হাত ধরে বলেছে— হযতো আমার বাগেদ সলীয়েব
যথো কেউ কেউ ওই জেপেলিনের মধ্যে বসে আছে।
সোমার্গ আকাশের বুক তিলীহমান সেই উজ্জল, চাঁদের

মত উজ্জল বিমুটার দিকে চেয়ে তাবছে—সত্যই কি
ওর মধ্যে মাহুদ আছে? মাহুদ, যার পা দুটো হুবল,
দুটো ঠোঁট উক।”

হ্যাঁ, মাহুদ থাকে আর সেই মাহুদই হাত বিয়ে
অন্ত মাহুদের মাথা হানে বস্ত্রের আঁখাত।

এই অষ্টাব্দ “The Daily News” পত্রিকার
“The Rainbow”র সমালোচনা বার হ’ল। বাক্য আর
রোবোক্তিতে ভরা সেই সমালোচনা। সমালোচক লিখলেন
—এ বেন ট্রিওবার্থের পক্ষে মিস ডিক্টোরিয়া ক্রেশের
ঠাইলে একটা উপজ্ঞান লেখার পত্তম্ব্য।.....বইটার
বস্ত্র অঙ্গীল প্রত্যেকের ছড়ানুড়ি, ট্রিক বেনন শিত্তির
দৃষ্টি নিয়ে কোনও ছুনের ছেলে লেখবার চেষ্টা করলে
হয়। সাধারণ পাঠকের পক্ষে এ বই না পড়াই
ভাল বিশেষতঃ সেইসব অংশ যা বিবেচ্যের বর্জন মনে
পড়িয়ে দেয়। সমালোচনার বিরোধান্য লেখা হ’ল
“The Downfall” আর তলার নাম সেই করলেন
ববার্ট লিন্ড।

রক্তের সন্ধান উৎসুক হয়েছিল শক্তর হল। এই
সমালোচনাতেই সন্ধান পাওয়া গেল সেই রক্তের।
সরম্ব হয়ে উঠল নীতিবাস্তবতার আসর। ববার্ট লিন্ডের
সঙ্গে হাত মেলালেন জেমস, জগলাস আর ক্রেমেন্ট
নটর। তাবতেও আশ্চর্য লাগে যে সেহিন সেই
হুগের সবচেয়ে বিশিষ্ট ইংরাজ লেখককে অপবস্থ করার
ভাব নিয়েছিলেন একজন আইরিশম্যান, একজন ভদ্রম্যান
আর একজন ইহুদী। তাগোর বক্ত কি বিভিন্ন
ভাবে কি অদ্বৈত সপ মাহুদের হাত বিয়েই না
নিকশিত হয়!

ওরা নভেম্বর ইন্সপেক্টর স্ট্রোয়ার প্রকাশকের বাড়িতে
হানা দিয়ে প্রায় হাজার কপি উপজ্ঞান বাখেরাণ
করল। বোকা গেল কড় উঠেছে, এবার তরু হবে
তার ভাবব। অবিলম্বে মাথলা রক্ত হল। বৌ ইই
কোর্টে স্তন্যনীর দিন ধার হল ১৩ই নভেম্বর। এ
নবের পেছনে না কি ছিল National Purity League
আর ছিলেন নীতিবাস্তব ববার্ট করম্যান হটন ও
তার দাম-পাশরা।

বকম্বের আয়োজন প্রজ্ঞত, লেখক লয়েককে রংস

করাব ব্যবহার বিমুদার বিচুতি ছিল না। মাঝে
কটা মিন শুধু পটোতলনের অপেক্ষা। নাটকের
নাথক কিন্তু প্রথম দিকে বিশেষ বিচলিত হয়েছিল
হলে মনে পড়ে না। কেন কে জামে ও গুণমণ্ড
হুয়ে, নির্মানে ক্যাণ্ডা গড়ার হুয়ে বিচ্যেত। সেতি
দিখিয়ার আহুসুলো আমেরিকা দাবার পাশপোটে
কোণাক্তের আয়োজন আবে বেকেই চলছিল। মামলা:
আলের সপ্তাহে পাশপোটে এসে গেল। উৎসাহে উদীর্ণ
লয়েল সেতি দিখিয়াকে লিখল—লিভারপুল থেয়ে
আগামী ২৩শে তাতিবে আমাথের কাহাত ছাড়বে
আনা করছি কিছু পরে জুনিও আমেরিকার চয়ে
আসবে। ইংলণ্ডের এই কচিচ্ জীবনযাত্রা থেয়ে
ছেলে বেরেবের হুয়ে নিয়ে বাওরা প্রয়োজন। তোমা
হামীর আগেই ব্যবহা করা উচিত ছিল কিন্তু বোধ হ
সম্ভব হবে না। ইংলণ্ডের মোহে বড়িয়ে পড়লে হয়
না। মনে বেথো যে তোমার হাতেই তোমার নিজে
তোমার ছেলেমেয়েদের এক হুয়তো। তোমার হামীর
পছন্দমত জীবন বেছে নেবার অধিকার কখনও ত্যা
কোহনা!

চিট্রিটার দিখিয়ার প্রক্তি ওর মনের হুবলতা আমা
চোষ এক্কারনি। হুয়তো এই হুবলতার প্রকৃত বস্ত্র
ওর নিম্বের কালেই সেহিন স্পষ্ট ছিল না। তা:
হলে চিট্রিটা আমাকে থেখাবেই বা কেন। শুধু চিট্রি
মহা মাহুদের মনের এই জটিল সমস্তকে কেন্দ্র ক
লেগা, এই সময়েই লেখা, ছোট গল্প “The Thimble”
জামাকে পড়ে তনিয়েছিল। “The Thimble”
বে সমস্তার ওক তাহই পতিবতি আছে কয়েক বর
পরে লেখা ছোট গল্প “The Ladybird”-এ।

তবু চিট্রি পড়ার পর, গল্প শোনার পর আম
মনে যে নাকড়া লাগেতি এমন কথা বলতে পারিন
বললে মিয়া বলা হবে। তখন বার বার হা
হত—নতুন বাক্যবোধের নিয়ে লয়েল বচি হুয়ে থা
থাকুক। হুয়তো নতুন প্রেরণার স্পর্শে ওর হস্তির উৎ
আবার উৎসাহ হবে। আমি তো কিছুই করতে পারল
না, বিশেষিনী আমি ওর জীবনে হটাৎ এসেছিল
এবন আবার, নিম্বেবে হুছে গেলেই বা কতি কি

"The Rainbow"-র বিরুদ্ধে মামলা শুরু হল—
জল্লালখান অভিযোগে মামলা। মামলা করেছিল পুলিশ
এবং মামলায় লড়াই ছিল প্রকাশক। সুতরাং মামলার
সঙ্গে লেখকের প্রত্যক্ষ কোন যোগ ছিল না। তবুও
মামলার চর্চা নিয়ে লেখকের বিরুদ্ধে প্রকাশক
পিতৃহত্যার সঙ্গে পরামর্শ করতে কল্পন করতেন। কল
কিছুই হল না। হ্যাংগেট ম্যাগেটের সাক্ষ্যই জল্লালতার
অভিযোগে প্রমাণিত হয়ে গেল। কে এই ম্যাগেট?
একজন সলিসিটর। মামলার অবতীর্ণ হয়েছিলেন
সাহিত্য সমালোচকের কৃষিকার। নাটকীয় ভঙ্গিতে
না কি "The Rainbow" বই থেকে বাড়াবাড়ি অংশ
আলাপলগত পড়ে তুলিয়াছিলেন ম্যাগেট এবং শেষে
উদারকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—বইটার ছুঁতে
জল্লালতার ছড়াছড়ি। নাটকেই নারক অস্থপস্থিত—
মামলার লরেন্সের উপস্থিত থাকার প্রয়োজনও যোগ
হয় ছিল। দেখেই জানল না কি বা প্রায় তত, বিচার
হয়ে গেল। ম্যাগিস্ট্রেট তার জন ডিকিন্সন সাক্ষ্য
দিয়ে মনে "The Rainbow"র লেখক কপি ধ্বংস
করার অভিযোগ বিলেন। রহস্যকে ঘনিষ্ঠকাতা হল।

লরেন্সের সাহিত্যিক জীবনেও বৃষ্টি সাময়িকভাবে
নেমে এসে ঘনিষ্ঠকাতা।

"জল্লালতার অভিযোগ, 'এই কথাটা জনসেই
কেমন খেয়াল হালি পায়। বিশেষতঃ যখনই মনে
পড়ে "The Rainbow" লেখার পেছনে লরেন্সের
অসাময়িক পরিপ্রেক্ষিত। তিন বছর জল্লালতার পরিপ্রেক্ষিত
লরেন্সের মত প্রতিভা একটা। পর্যাট্রাক্সির বই বস্তু
করেছে, এর চেয়ে হাল্কা করে আর কি হতে পারে।
মামলার মূল্যবোধ কত বিকৃত হলে তবে এমন একটা
নিজান্তে আসা সম্ভব! হুজুর জল্লালতার মামলার মূল্য-
বোধ বিকৃত হয়েছিল ঠিকই তবে অতটা নয়।
এই বিচারের পেছনে সাহিত্যিক বিচারের চেয়ে বড়
হয়ে থাকিয়েছিল রাজনৈতিক বিষয়। হুজুর বিরুদ্ধে
কথা বলে লরেন্স তৎকালীন শাসকবর্গের হোম আফিস
করেছিল। হুজুর বিরুদ্ধে কথা অস্ত্র হাঙ্গে হোম
বা কার্জনোতে হাইনরিখ ম্যান বসতে কল্পন করেননি,
নিগ্রহও যে ভোগ করেননি তা নয়। কিন্তু লরেন্সের

পক্ষে সমগ্রটা ছিল একান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। স্যালিপিনিতে
হয়েছে, মাথার উড়ছে শত্রুর জেপলিন, লরেন্সের দৃষ্টি।
তথ্যের আনুষ্ঠানিক ক্যাভিনেট ভেঙে গেল। সংবাদপত্রে
পাশাপাশি বার হল চার্চিলের পরতাপ আর "The
Rainbow"র মামলার সংবাদ। সরকারী মুদ্রাপত্র
সম্মুখে ঘোষণা করলেন—হুজুর চলার সময়ে কবিতার
প্রকাশকে প্রচার দেওয়া হবে না। হবে না, তার
কারণ তরুণের হুজুর ঘোষণার প্রয়োজনীয় উৎসাহের
অভাব। প্রচার বিভাগ তারফে চীৎকার করেছে—
হুজুর চল, হুজুর চল। এই বিশেষ প্রসঙ্গে "The
Rainbow"র আবির্ভাব। সরকারপক্ষ প্রমাণ গণলেন।
এমন বই হাতে গেলে যে তরুণের মন বিকল্প হবে
সাহিত্যের সঙ্গে মিলে যখন পৌছবেনা প্রচার
বিভাগের আঙ্গান।

অন্ততঃ সাময়িক লরেন্সের প্রয়োজনে সাময়িকভাবে
ধর্ম হল এক অপরূপ সাহিত্য সৃষ্টি।

শেষ আঘাত মামলার সাহিত্যের তৎকালীন দুই
মারফের—হেনরী জেমস আর জন গোল্ডসওয়ার্থ।
লরেন্সের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বিদ্বেষের চরম পরিণতি।
ভীষণ সমালোচনার আঘাতে লরেন্সের সাহিত্য-কীর্তিকে
নষ্ট করে দিলেন দুই পুণ্ডর।

আইন মাত্র লরেন্সকে হেটরিয়া ঘোষণা করেছিল,
সেই আইনই জল্লালতার অভিযোগে বৈতলে করে দিল
সাহিত্যিক লরেন্সকে। উপরি পাওনা জাতিজোড়ার
কলর আর প্রতি পরক্ষণের লড়াই আমাকে নির-
আমার পিতৃ-পরিচয়, আমি লড়াই কার্জনোর ঘরে।

আইনের বিচার মাই হোক, কালের বিচারে কিছু
ভুল নেই। সব প্রতিভারই পরিমাণ হয় কালের
জুলায়তে। আদ্য সাহিত্যের ইতিহাসের পাতায় সামান্য
কত সামান্য স্থানটুকুই না দখল করে আছে হেনরী
জেমস আর জন গোল্ডসওয়ার্থের নাম। মামলার মনোর
পাতায় কিছু আদ্য লরেন্সের নাম ঘনিষ্ঠকাতা জল্লাল।

লরেন্সের প্রতি অস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে বহুনি তা
নয়। আর্নল্ড বেনেট এবং হিউ ওয়ালপোলের নাম
মনে পড়েছে। হুজুরই এবং সে নিরস্ত্রায়ণও নয়।

মুহু প্রতিবাণের মুহু তুলেছিলেন। তাৎকালিক কালও-
য়েলের Glasgow Herald এ প্রকাশিত পূর্ব সমালোচনাও
মনে রাখবার মত। পোপের সমবেদনা জানিয়েছিলেন
অনু ভিকটরিয়া, তার আলিঙ্গনের লক্ষ্য আরও অনেক।
এমন কি কিলিং-মোরেল পালস'মেন্টে এ সম্বন্ধে প্রায়
করতের কল্পনা করেননি। কিন্তু কিছুতেই 'এন কুল'ের
চলন নড়চড় হ'ল না। শেষ আশা ছিল Author's
Society's আশা—আইনের হস্তক্ষেপে আইনের সাহায্যেই
ভীরা বানচাল করে দেবেন। সত্যি কথা বলতে কি
এই আশারের ওপর নির্ভর করে অপেক্ষা করতে গিয়ে
আমেরিকার পার্লামেন্টটাই ব্যক্তিগত হয়ে গেল। শেষ
পর্বত Author's Society-ও কিছু দূরে ঝাঁকাল।

লরেন্সের আশা ছিল শেষ পর্বত এই অস্ত্রাঘাত
অবসান হবে। কিন্তু তা হল না। হওয়া সম্ভবও
ছিল না। যে উপগ্রাহের নারিকা তার মনের মাল্যকে
বুকে পড়াবে এবং প্রায় কংগ্রেসের মত ব্যাপক হয়ে, যেসে
জুটিয়ে পড়ে বলছে "আমি সৈন্তবীর তুণ্য কতি, ওরা
কেমন বেন প্রাণবীর পাথরের মত"—সেই উপগ্রাহের
প্রকাশিত হবার উপযুক্ত সময় ১৯১৫ সাল নয়।
১৯১৫ সালের লগুন নয়। লরেন্সের কথা—১৯১৫
সালেই পুরাতন পৃথিবীর শেষ হল, পুরাতন লগুনের
প্রাণসত্তার হল মৃত্যু। লগুন কৃপাক্ষিত হল অলপ
তার ছবিরে কামনা-বাগনা, আশা-নিবাশা আর তত্ব
কোষ নবোৎপাদ।" সেই নরকে "The Rainbow"র
হান না হওয়াই স্বাভাবিক।

লগুন থেকে তাই আমরা ছ'মানে দু'সবে সেলাম
অনেক দু'বে কর্তব্যের সময়কালে। তার আগে
পালিঙে কিছুদিন ছিলাম। দু'বে কষ্টে দিন কাটিছিল
আদিক কষ্টে। আমেরিকা বাবার মতে টাঙ্গা ভোগা
হয়েছিল। টাঙ্গা অর্থাৎ কল্যাণ হান। সেলি মোরেল
জিগ পাউও বিয়েছিলেন, মার্শ কুড়ি একা পিটার
লকাশ পাউওর মত। তবে সবচেয়ে মনে রাখবার
মত বার্ষিক ল'র বেওয়া পাউ পাউও। এই টাঙ্গার
টাঙ্গা ভেঙে ভেঙে চলছিল আর যত বেওয়া হচ্ছিল
বর্ষাকালের, সুস্থ ক্রিয়াকার!

—সেইসময় আমরার মিত প্রভাব-প্রভাভে আছে।

তাঁই পালিঙে মজুন অতিবাহিত অতাব ছিল না।
এবের মধ্যে লরেন্সের কীমানে ছ'মানে কিছু কৃমিকা
ছিল—কিলিং-মোরেল টা-ইন আর আলফ্রস হ'লিগ।
যাকী সকলে কো'হল নিজে এলোতে আর স্টেট ক'ম
তবে স্টেট মনে ক'রে পেছে। প্রোজের প্রতি একট
অন্তত আকর্ষণ ছিল লরেন্সের। সেই বাবেই বো
হয় এই সময়ের অতিবাহিত তারতীয় সুবাবির কথা
অনেকদিন মনে রেখেছিল।

১৯১৫ সালটা ক'রের কাছাকাছি। ১৯১৬ সালে
তার কিছু বেশ ছিল। প্রথম বিকটা তরু আত্মীয়
পরিচয় অনেক অন্তরালে বহু ও বাহ্যিক দু'বে সে
পাথর প্রতিতে কটকট। এই অত্যাচার তরু হয়েছিল
বড়বিরের সময়। অত্যাচার শরীর নিয়ে বেচারি তা
আর বোনের কাছে গেল বড়বিরের উল্লেবে এক
আনন্দ করবে বলে। তাই বা বোন কেউই ভে
সম্বন্ধভাবে প্রায় করতে পারল না। বুদ্ধতয়া ব্যাং
নিয়ে কর্তব্যের পথে চলতে চলতে শু বার বা
বলছিল—আর নয়, চলো ইংলও ছেড়ে, মাছুয়ে
লম্বা থেকে দু'বে লক্ষণ সমুদ্রের কোনও নির্জন বী
চলে বাই আমরা ছ'মানে। বাতরা হরদি কিছু অনেকে
ওব কীমানে থেকে দু'বে মেরে বাচ্ছিল। হ্যাংলটাইনে
সবে বিচ্ছেদ হল, বিচ্ছেদ হল বাতীয় কালসের সঙ্গে
কেন জানিনা সেলি মোরেলও হঠাৎ বিচ্ছেদ হল
অবশিষ্ট ছিল মারী? তার সঙ্গে বিচ্ছেদ অন্যত
না কিন্তু অন্তরঙ্গতার অবসান হল। কারণটা অত
হাতকর। অন্তরঙ্গতাকে আত্মীয়তার পর্যায়ে তুল
চেয়েছিল লরেন্স, ঐতিকে প্রোজের সাহায্যে নি
চেয়েছিল সার্বক-প্রতিষ্ঠা। মারী থেকে বয়েছিল ক
বিচ্ছেদ হল অনিবার্য। এই কাংকটাকে কেন্দ্র ক
লরেন্স আর বাতীয় সম্বন্ধের আলোচনাঃ "Mor
Sexuality" কথাটা বাই বার বাবদন্ত হয়ে
অনেকেই অনেক সময়ে প্রকাশ করেছেন। আ
জানি এ কতবড় মিথ্যা। মনে মনে বলি—প্রতিষ্ঠা
নত্যা করার প্রয়োজনে কত মিথ্যাই না হ'ল হয়!

কর্তব্যের লরেন্সের ত্যাগের পক্ষে উপযোজী হয়

কিছু মনে উৎসাহের অভাব ছিল না। মনুশ মনুশ আইডিয়া নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তো চলছিলই; যোগসূত্র তেঁহ না থাকলে হয়তো অনেক কিছুই সম্ভব হত। এই অংশেই *Twilight in Italy* নামে বললে *Italian Sketches* নাম নিয়ে প্রকাশিত হবার জোড়াজোড় চলছিল। পাশাপাশি চলছিল *Amores* নাম দিয়ে কবিতা-সংকলন প্রকাশকের ব্যবস্থা। তাকে পরের সংস্পর্শে তির অশ্রুতের মাছুষ হয়ে দিয়েছিল-প্রভু সেখা আর কবিতা বাছাই করার কাজ। কিছু এইটাই সব নয়। অন্তরালে চলছিল ভর প্রেত সাহিত্য-কীর্তি রচনার কাজ। *The Rainbow* কে কেন্দ্র করে যে আঘাতে তাতে যে কোনও সাধারণ সাহিত্যিকের ভেঙ্গে পড়ার কথা। শুধু *Rainbow* কেন প্রথম রচনা থেকেই তো তাগের নিষ্ঠুর আঘাতে ও কতবিকৃত। সাহিত্যিক লংগে কিছু হাব মানেনি। দুঃখ-বেশনার উৎসে উৎসাহিত, প্রতিটি আঘাতের ক্ষত-নিঃসারিত রক্তের রেখার উদ্দেশ্য ওর পরবর্তী উপজ্ঞান—*Women in Love*। পরবর্তী বলছি কারণ এই সময়ে দেখা হলো ও উপজ্ঞান প্রকাশিত হয়েছিল চার বছর পরে। হয়তো এই বিলম্ব লংগের ইচ্ছাকৃত। অথবা পূর্ব-অভিজ্ঞতা ওকে সাবধান করে দিয়ে থাকবে। সে অভিজ্ঞতার কাহিনীটা বড় কল্প। ১৯১৫ সালের অক্টোবরে *English Review* এ “*England, My England*” নাম দিয়ে ও একটা ছোট গল্প লিখেছিল। সেই গল্পের অন্ততম চরিত্রে ছিল পাশি লুকাসের প্রতিরুতি। লুকাসের থেকে সেই লুকাসের বৃত্তা সংখ্যে এলো জ্বলাই মাসে। মধ্যাহ্নিক সে বৃত্তার কাহিনী। সংখ্যার পেরে লংগের প্রথম কথা—ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হবার আগে গল্পটা সমুদ্রের অতলে তলিয়ে গেল নাকেন।

Women in Love ও তো ছিল ওর অন্যতম পরিচিতির প্রতিরুতিতে ভরা। সুতরাং ইংলও প্রবাসের সময় ও বই প্রকাশিত না হয়ে ভালই হয়েছে।

কর্ণওয়ালে সমুদ্রের পানি চেয়ে বলে বলে এইলম্ব কথা ভাবতাম। সমুদ্রের অঙ্গে থেকে থেকে রঙ বদল হত, আকাশে চলতো বেব-বোয়ের খেলা। আশা করতাম, লংগের জীবনেও হুবি রঙ বদলের

পালো এলো। গার্নানোর মত কর্নওয়ালের জীবনেও হয়তো সাহিত্যের কোথার বইবে।

মাত্রের আইন তো মনের আশা মেনে চলে না। ১৯১৩ সালে দৈন্যবাহিনীতে যোগদানের মনুশ আইন পাশ হল। কিছুদিন পরেই তলব এলো লংগের কাছে। তখন তেঁহ টেনে বিক্রুটিং অফিসে যাওয়ার কি দুর্ভোগ। আমি আমি ওর মনে একটু তরুণ ছিল। হুখে যাওয়ার তরুণ নয়। বেশকিছু ও কন জালবাসতো বা সাহস তরুণ ছিল তা নয়। প্রথমতঃ ও খরে নিয়েছিল যে এই তলব ওকে অলম্ব কংবার এক মনুশ চাল। আর সবচেয়ে বিচলিত হয়েছিল ওর লুকিয়ে রাখা যোগ প্রকাশিত হয়ে পড়বার আশঙ্কা। সেবারের মত রেহাই গেল কিছু আবার তলবের প্রতীক্ষা উত্তম প্রবর্তীর মত ঠাড়িয়ে হইল ওর বিন-তাদের শাঙ্কিকে আড়াল করে। অলম্বার তার বুক নিয়ে আবার পার হল একটা বছর।

১৯১৭ সালে মনুশ কোনও আশা, আশাভীত কোনও আনন্দের সম্ভার নিয়ে এলো না। কর্নওয়ালের সেই নিঃশব্দ জীবন, শৈথল অসুস্থতার তড়ানার মাঝে মাঝে যা দুর্বল মনে হত। আনন্দের দুজনেরই শরীর তেতে পড়ছিল, হয়তো মনও। আর্থিক কষ্টটা আপনাত-অন হয়ে উঠেছিল। লংগের লেখার সব পণ্ডতন বন্ধ বললেই চলে। নিঃশব্দ নামে উপজ্ঞান প্রকাশ করতে চাইলে প্রকাশক পাবার সম্ভাবনা ছিল না। দু’একটা ছোট গল্প লিখে আর কি হু! তখন তেঁহ-মন নিয়ে কবিতা সেখা দুঃখের মাত্র—প্রতিভার গলেক। লংগে তাই মনুশ পণ খুঁজছিল। ইতি-বগেই আমেরিকান সাহিত্য বেশ কিছু পড়ে গেলোছিল।

গুরু হয়েছিল *Studies in Classic American Literature* লেখার প্ররতিপর্ব। ইতিমধ্যে মনুশ মাসে আবার বিক্রুটিং অফিসের তলব এলো। আবার সেই কের-পকীকার সমুদ্রীয় হওয়া। ভাবার “অলম্ব” পার্টিকিউল নিয়ে দিয়ে আশা। ভাগ্য যেন ওকে আঘাতের পর আঘাত দিয়ে নিঃশব্দ করে দেবার কাজে কোনও বেঁচে গেলোছিল।

ইতিমধ্যে মনুশ মাসে আবার বিক্রুটিং অফিসের তলব এলো। আবার সেই কের-পকীকার সমুদ্রীয় হওয়া। ভাবার “অলম্ব” পার্টিকিউল নিয়ে দিয়ে আশা। ভাগ্য যেন ওকে আঘাতের পর আঘাত দিয়ে নিঃশব্দ করে দেবার কাজে কোনও বেঁচে গেলোছিল।

। দেখি চাটাবি'র লেখক

আমি কির আনি যে ও হার মানেনি কিছু সেই মুহুর্তে হতান গরে পড়েছিল। ইংলণ্ড ছেতে যাবার আগে ওর সে কি বাস্তবতা। ওর নিজের প্রতিজ্ঞা, Kangaroo উপভাষার নারক বলছে—প্রত্যেক মানুষের জীবনেই তীব্রতম অস্থিরতার মুহুর্ত আসে। শীতের সকালে গ্রামের ডাকঘরে আমেরিকা যাবার আবেহন পাঠিয়ে বাড়ি কোরার পথে সোমার্সের জীবনেও সেই মহামুহুর্ত এলো—সেই মহামুহুর্তের বিঘনীতল মুহুর্ত। তার মনে হল সে যেন অথানো দুহুয় হাওয়া ঘেঁটে চলছে—সাতা গেছে তার ভরের অস্থি পিছনে। নিজেকে কিস্যো করল—আমি কি অস্তার করছি? আমার পক্ষে বেশ ছেঁড়ে আমেরিকার বাওয়া অস্তার।

অস্তার বা তার বাই হোক, অস্থিতি মিলল না। ও মিলে কাল'ওয়েলকে লিখল—সরকার আমাকে আমেরিকার যাবার পাসপোর্ট দেবে না। তুমি যদি একটু চেষ্টা করো—ওহো! জাতীয় কার্ণের বাবা জুগেছে—সরকারের বলিতে এমন কত কথাই না আছে—আমার পক্ষে ইংলণ্ডে আর এক মুহুর্ত থাকি সম্ভব নয়। বিসের খোঁজার নিঃশ্বাস বদ্ধ হয়ে মরে যাযো। সারা দেশের আবহাওয়া বিসের খোঁজার আচ্ছন্ন, অস্তিত্ব আমার কাছে। আমার দুহুয় মনে হচ্ছে অস্বাভাবিক। কিছু করতে আমি চাইনা, এর বাইরে আমার যেতেই হবে।”

কোনও আশাতে, কোনও অশমানেই লরেন্সের মত প্রতিভার দুহুয় হয় না। ওরা মরতে মরতে বাহুকে খোনার অক্ষতের বার্তা। তাই এই বিধের খোঁজার আচ্ছন্ন আবহাওয়ায় বনে ও ওর নজর কবিতা সংকলনের নাম ছিল—Look! We Have Come Through!—সব নৈরাশ্য উত্তীর্ণ হয়ে এই সময়ে লেখা ওর "Manifesto" কবিতাতে সন্নিবিষ্ট হল এক আশ্চর্য আশার বার্তা:

Every human being will then be like a
flower, untrammelled—
We shall love, we shall hate,
But it will be like music, sheer utterance,
Issuing straight out of the unknown,

এর পংখর ঘটনাগুলো যেমন অজাবিত তেমনি আশ্চর্য। কিছুদিন ধরেই আমেরিকার প্রতিবেশীকে মগ্নে কেমন একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছিলাম। অধিকাংশের কথার বার্তা, হার তাহে কেমন একটা সক্ষেপের ভাব, বিশেষতঃ লেখক সক্ষেপে। ওর লাল বাড়ি যেন ওরা লক্ষ করতে পারছিল না। অবশ্য সাধারণ মানুষের সব গোর দিয়ে লাভ নেই। লরেন্সের অনেক কথা ও লেখার মধ্যে সক্ষেপের অবকাশ ছিৎ বৈ কি। বিধের করে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লরেন্স অক্ষ সক্ষেপে ওর কষ্ট মতবার প্রতিজ্ঞা যে কোনও একটা কর্তার ব্যবস্থা হবে এইটুকু ও না জানলেও আমি অস্বাভাবিক করেছিলাম। এমন কথার ও তখনই যে আমেরিকার হৃৎকনে সক্ষেপ করার পিছনে ছিল আগের দিনের বন্ধ হয়েকায়ে রিপোর্ট।

একদিন হঠাৎ মার্কটর তাহে বটে গেল ঘটনাটা লরেন্স সঙ্কল্পের ভীরে বসেছিল। আমি স্ট্রীটর খেবে যেহিঁরে সে তিকেই বাজিলাম, ক'ণে ছিল একটা স্কোলা হঠাৎ বেন বাড়ি ওতলা থেকে সামনে উঠে দাঁড়াল ছাী উপস্থলরক্ষী। তাহপর প্রেরের পর প্রের:

—বাসে কি আছে?

—যাবার, মাত্র একটুকুরো স্ত্রি।

—স্ত্রি না ক্যামেয়া।

—ক্যামেয়া! আমার তবন আকাশ থেকে পড়বার মত অবস্থা। কিছু কে শুনেবে আমার কথা। রক্ষী হৃৎকন খোর করে স্কোলাটা বেড়ে মিয়ে খেড়ে দুঁরে ছুঁয়ে কেলে ছিল স্ত্রির হৃৎকোটা—লরেন্স সেই বেলার যাবার স্ত্রর বাহুহটাকে খোর মত আর এক কথা যাবারও বনে ছিল না সে দিন। চোখে হল এসে পড়ল। কানে তেলে এল একজন রক্ষীর বসিকতা—আততাইহেত অগ্রে বরফ যে আর বরফে না ফেঁবি।

হৃৎকবিনের মধ্যেই অবস্থাটা বিনের আলোর বস

পরিহার হয়ে গেল; সত্ত্বা অর্থাৎ জাৰ্মানির চর এই সম্বন্ধে জানাশেষ হ'লমতে নতুনকণী তথা হ'য়েছে। সত্ত্বা যে আদর্শ না কি স্ক্রিবে জাৰ্মানীর ভূবাক্য হাতে তসল কোপাট। একটা সামান্য বিছুট যোগে সেই চরম লগটে পরম সম্প্রদায় মত সত্ত্বা করে রাখে, তাইই তো লগ্না জুগোকাহাৎ তসল কোপাট ?

লগ্নাকে বলতে ও বলল—এই বুড়ে প্রথম নিহতের নাম কি বলতো? উত্তর বুঝিছিল। ও হাতে হাতে বোম্ব করল—সত্য। এ বুড়ে 'লগ্না'ই প্রথম নিহত হয়েছে।

নূবে হালশও মনে মনে লগ্নাও ভব পেয়েছিল। একদিন সন্ধ্যাতীরে বেড়াচ্ছি, পেছনে লগ্না। কখন জানি না আমার স'ল ওকনাটা চাওয়ার উত্তরে আরম্ভ করেছে। পেছন থেকে লগ্না চেঁচিয়ে উঠলো—ওকনাটা লগ্নাও নাও, এখনই! আমি বোকার মত কিয়ে হাঁড়তে হ'য়েক উঠল—ওকনাটা যে উত্তরে; এখনই রকীরা' হালশে আঘাত ক্রি পড়বে শিশুস্তান পাঠান্দি। বেনিহিন অ'র জাখতে হল না। হ'নার স্ত্রী আঘাতনে ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসই নাটকের শেষ মজ পৌছে গেল। নাটকের অন্ততম শার্শ-চরিত্রের নাম লুস্কার মেন্সিগ্রে, নাক ব'হে লগ্নাও। নাটকের ঘটনাবলি কর্ণওয়ালের গ্রের আবাস। হাতেও নিয়ন্ত্রণ রাখতে হ'তেন গ্রের ওখানে গিয়েছিল। ঘটনা ঘরের মধ্যে রকীরা' আধিত্যর বোম্বাং: কানশা চিরে আলোর লগ্নেত প'র'কে হ'য়েমো।

আলোর সত্ত্বা? তাই তো, একটা প'র' হতে একটু নড়ে গিয়েছে বটে। কিন্তু তে শুনবে তৈকিং:। জুগো কাহাৎকো আলোর সত্ত্বা পাঠানো হচ্ছে—এই অতিযোগ লিখে নিয়ে চলে গেল রকী। বাকার বিশ্বত অন্তর।

অতিযোগ প্রমাণের প্রয়োজন ছিল না। গ্রের মোটরকর ক্রিম্যান হলো আর ১২ই তারিখে আমাংগের বাড়ি বানাতল্লাদ হবার পর আবেশ এলো—কিম্যানের মধ্যে কর্ণওয়াল ছেড়ে যেতে হবে। কোনও নিষিদ্ধ এলাকার বাক চলেবে না এবং ক্যোনেই ব'হি প্রথম পুলিসের কাছে রিপোর্ট দিতে হবে।

১৫ই অক্টোবর কর্ণওয়াল ছেড়ে হ'লেন প'বে নাথলা। Kangaroo উপভোগ লগ্নেলের বর্ণনা মনে পড়বে—টেন লগ্নেবে পালে হুটে চলেছে।...রী কর্ণওয়াল ছেড়ে বাওয়ার খুব খুশী। বারী চূপ করে বসে আছে, তার সর্বদেয় দৃষ্টির স্পর্শ—কত কিছুই নেই। শুধু দিবাং ছিল—সমাজ, প্রেম, বন্ধু এমনি আরও কত কি। সেই

দৃষ্টিতে লব দিবাং দৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত বিনীত হলো।

এর প'বে ঘটনাভোগের নাটক নেই, আছে কিছু পুত্র তত্ত্বাকং: বিবাহ কিছু বুঝে ব'হে বুঝে পোকার বহলের প্রকৃতি। লগ্না আর তার আবেশপাশে তেটেছিল আবার পুংহা একটা বন্ধু আর কয়েকটা হাস। নতুন পরিচিতদের যোগে রিচার্ড এ্যালভিংটনের নাম জোলবার মত। প্রয়োজনীয় দৃষ্টিতে ওর আধিত্য না গেলে অনুবিদায় লগ্নেত হতো। আদিক লগ্নেতের বিশেষ স্মরণীয় হয় নি। আবার লগ্নেতকে Royal Literary Fund এ সাহায্যের ভগ্নে আবেশন পাঠাতে হয়েছিল।

আদিক যে এত লগ্নেত-ও লগ্নেলের লেখা-ছোতে হ'টা পড়ে নি। ১৯১৯ সালে ওর কবিতা সংকলন New Poems প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯১৯ সালেও প্রকাশিত হল কবিতা সংকলন—Bay। কিছু ছোট গল্পও লেখা হয়েছিল—তার মধ্যে ছিল ওব অন্ততম শ্রেষ্ঠ গল্প, 'he Fox'। ১৯১৯ সালের রুচনা লগ্নারকে বিচিত্রত বলা যায়। উপভোগ Acron's Rod তো লেখা চলছিলই, এংই মধ্যে লেখ হয়ে গেল নাটক Touch and Go। শুধু কি তাই। অন্তর্ভুক্ত প্রেমের হয়ে Movements in European History লেখার ভগ্নে চুক্তিবদ্ধ হল লগ্না। বইটার প্রথম সংস্করণ অবশ্য দ্রুতমানে প্রকাশ করতে হয়েছিল।

ইতিমধ্যে বুড় লেখ হল, সঙ্গে সঙ্গে লেখ হয়ে এলো আঘাতের ইংলও প্রবাসের বরণ।

অসম্পূর্ণ ১৯১৯ সালটার আদিক অনটন বিশেষ ছিল না। শিখ'রের পকাশ পাউন্ড আর কবি রূপাট' কংকর উইলিয়াম লগ্না পাওয়া কুড়ি পাউন্ড না প'লে যাত্রার আয়োজনে অসুবিধে হত। অসুবিধে বলাই কারণ ইতিমধ্যে পাংপোটি' এসে গিয়েছিল। ১৫ই নভেম্বর আবার ইংলও ছেড়ে আবার লগ্নেত পাড়ি ক্যালিফ। অবেশ আর বন্ধন ছেড়ে বাওয়ার যাবা কিছু ছিল বৈকি। Kangaroo-র নায়ক সোমার্সের কথাই বলতে হয়। যাত্রার আয়োজনে সত্যিই সে খুশী হয়েছিল। খুশী হয়েছিল ইংলও ছেড়ে বাওয়ার, যে ইংলওকে একদিন কত ভালবাসতো আর বিবাহ-সুহৃৎ ব'হ ভগ্নে অনন্য অন্তরে সমাজ অনুসৃতির স্পর্শ হ'ত ও অবশিষ্ট ছিল না। বুঝে পাড়ারের মাঝে সালা জুগোয়ার আবরণ। বোঁ এগিয়ে চলেতে, বুঝে লগ্নেত ইংলও, খুব একটু ক্রিম্যানের মত মিলিয়ে যাচ্ছে লগ্নেতের অন্তরে।...

[ক্রমশঃ]

—একুশ—

প্রাণের বর্ষ যেন অনেক দূরের সত্যিকার মনোহাসিনী বঙ্গা প্রাণের বেগে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। প্রাণের অথাক চোখের সামনে হাসিনী বঙ্গা গলার জাঁচল ভক্তির, হৃদয়কে পড় হয়ে প্রণয় করলে নতুন প্রাণের ছোখ ছাপিয়ে আবেগের সোনা জল উল্লেছে উঠতে চাইল। সমুদ্রের অলের বাহুত লোনাই হয়। বহিঃ প্রাণী কখনো সন্তুষ্ট হেবে নি। (সিনেমা হা অস্তিত্ব দেখে) শুধু গর সন্ধ্যা হ'ল নুই বা কোন্ সমুদ্রের বায়ে শুধু মোটা অভিজ্ঞতাই হেবে চলে যাবে। চোক পিলে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করতে করতে স্বপ্ন। চোখে দেখল প্রাণী সবই। শুধু, হাসিনী কাপা গলার মল্লুহ— চৌধুরীমশাই পরীর আপনার ভালো তো?

মহিমারজন বোধকরি এখনও স্বাভাবিক অবস্থা কিরে পান নি, তিনি বললেন—আহা, বীর্বা হও।

—আর ওই আশীর্বাট করেবেন না। এখন যেতে পারলেই হয়।

হাসিনী বেন গভাই জীবনান্ত।

মহিমারজন হাসিনীর হাত ববে পাশে বসিয়ে বললেন—ছিঃ, ওসব কি কথা মালা! তোমাদের বেবে এখন আহারেরই ত বাবার মালা ভাই।

মহিমারজনের কণ্ঠে গভীর স্নেহ উঠল। ‘মালা’ নামটা কানে যেতেই—হাসিনী চমকে উঠলেন। বনানী আর প্রাণী পরস্পর বুঝি বিবির করল। হাসিনীর মোর চোখে হঠাৎ মিলল অনেক অনেক চোখের চোখের চোখের

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য



অন্ধকারে ডুবে গেল।

মহিমারজন বললেন—
ভিক্তে ভাষা-কাপড় আ
ছাড়ো, তারপর অন্য কথা।

—হ্যাঁ, এই ঘাই
বীড়ান, দুটো কথা কই
ছোটটি কেমন আছে
তা না জেনে ত নড়
পারছি না।

—তোমার ছোটটি
সে এ কথের আমাকে বো
আছে যেতে পারবে ন
তুমি নিশ্চিত থাক
পাও।

—অপারেশন কা
হবে?

—ও সব চুকে-বু

গেছে, এখন ছুটি পেন্সেই বাড়ি চলে যাব। বোঝ
ডাক্তারকে আলিয়ে মারছে ছুটির কণ্ঠে।

—ও মা, তাই নাকি! আহা নারের বুকে কণ্ঠে ছি
ছোটটিকে বেঁচে যাবার।

মহিমারজন হাসলেন, কমান্ডার রূপে তিনি বলল
—কিন্তু উপায় ছিল না ত। ভগবান ইচ্ছে না করলে
বুঝলে মালা, মানুষের ইচ্ছে হিরে কিছু হয় না।—ই
যদি চান ত মেয়ে ভাগ্যে মাকে ফোটাটবে হই কি
এই ভাষা না, আচ্ছ আমি তোমাকে দেখলাম।

—জাহা! আপনার সেই মন জুগিয়ে কথা বলা
পুরনো অভ্যাসটা এখনো বরছে!

হো-হো হাসিতে মহিমারজনের পক্ষ চোখের হা
উঠল-মালা করেকবার, তিনি বললেন—সব কিছু
ঠিক-ঠাক রয়েছে ঠাকুর, শুধু তুমিই বেগলে না!

—তা আবার বলতে হয় না চৌধুরীমশাই। আপনা
সে বয়সে জল বা ছিল এরা না কান্নুক আমার ত চো
জালেন।

—আহা! তার ভুলে হুং কর না ভাই, রূপ পেলেও সৌন্দর্য হার মি—বিখাল না হর পরব করতে পারে।

মালিনীর সুখখানা গভীর হয়ে উঠল, তিনি দ্রুত বিতার এঁকে বললেন—সুখটা ত আগে আপনার এত ব্যাপন ছিল না!

—ও সব হয়েছে নেই! তোমাকে কতোকাল পরে কাছে গেয়েছি। ঘনটা চুলবুল করবেই ভাই। আর যেহেতু পক্ষি বখন চলে যায়, কর্ণকোষ বখন বহিত হয় তখন সব কামনা হাসমাই ঠোঁটের ডগার মুখে কথার ঠেঁটে থাকে ভাই!

চোখের ইশারার বনানীকে ডেকে নিয়ে প্রাণী দর থেকে বেরিয়ে গেল। বাতালে কথার বেশ ভেসে এল—আঃ, আপনার পারে পড়ি জামাইবাবু, ছেলে মেয়ের সামনে শুভকম বলবেন না। ওরা কি মনে করবে জামুভো!

অবাক প্রাণী। বিস্ময় প্রাণী। প্রাণীর সন্কেহ হচ্ছে ওর মাথাটা ষাফের ওপর শেষ পর্যন্ত থাকবে ত! এই যে একটা এত বড় কাণ্ড ঘটে গেল, এটা চোখে কেবল যে বিখাল হতে চায় না। কাণ্ড! না, বিস্ময়। বিস্ময় বই কি। মালিনীর কর্তৃত্বের এরকম মিনতি করে একথা যে আরো অবিখাল। তাহলে এখনো মহিমারঞ্জনকে মালিনী ভালোবাসেন? মইলে তাঁর সুদের ওপর যে সব কথা উচ্ছ্বাসিত হল তারপর এই হুদুল বৃষ্টির মধ্যেই হচ্ছে মহিমারঞ্জনকে বার করে দিচ্ছেন।

এখন আশ্চর্য বাতে প্রাণী কি বুঝতে পারে! ওরা ছুই বোনে পাশাপাশি ভরে অনেক গল্প করল। 'বনানী বলল—আর ভাবনা নেই বিবি, ছুই এবার মাঝি মটবর নগরে। সেখানে আশ্রয় সবাই একসঙ্গে থাকবে, কী মজাই হবে।

প্রাণী উদ্ভুদ্ধিত হয়ে ওঠে—তার আগে কিন্তু মাসিমা আর বোশোমশাই আশ্রয়ের বাড়িতে গিয়ে থাকবেন।

কিন্তুখন পরে এই নিয়ে হুংবনে আপোনে হুদুল চলল।

কিন্তু হল। আজও সব পারে, আজও মনে দুজির হাওয়া চুটেছে।

প্রাণীর হবে মহিমারঞ্জনকে শোবার ব্যবস্থা হয়েছে। বাওয়া-বাওয়ার পর তিনি জ্বিয়ে বললেন মালিনীর সঙ্গে গল্প করতে। এককালে এই গল্পের কালটা ছিল বড় যত্ন। গল্প খেন তখন বুঝেতেই চাইত না। কিন্তু আজ কেন কথা কোটে না? মহিমারঞ্জন থেকে থেকে চুপ করে যান, তখন মালিনী বললেন—আপনার সুখ পেয়েছে জামাইবাবু, আমি বই।

—আরে না, না, খুব নয়। তুমি কিছু বলো, তোমাকে কথা কতোকাল শুনি নে।

—মাঝার আবার কথা কি। পরগাড়া চলেই জীবনটা হার ফুরিয়ে যায় তার আর কি কথা থাকতে পারে, বলুন।

মৌলিখাল কেলে মহিমারঞ্জন আসে আসে বললেন—হস্তভাণ্ডা নিকটে দেহ পর্যন্ত স্থানী হতে পারল না, তোমার জীবনটাও জালিয়ে পুড়িয়ে থাক, কয়েক দিন। তোমার জন্মেই হুং হর নানা! তোমার মতো জন্মে মেয়ে বাংলাদেশে বেঁধাই যায় না। ভই যে কথার বলে, অতি বড় তপনী ন' পার বর আর অতি বরতী না পার বর! তোমার হস্তেই সেই কথা।

—না জামাইবাবু, বয়ের হুং আপনায় আনীর্ষ্যে আমার নেই। আপনার মেয়ে পাই আমার সে হুং চুড়িয়েছে।

—আহা, আমার করে বলে কেন লজ্জা হাত ভাই। 'তোমার—ও মেয়ে তোমারই।' কথাটা এইখানে এসে কিছুখন থমকে ছিল। বড় অজান্তি বোধ করেন মহিমারঞ্জন। মালিনী হস্তে ফুডজ্জতা দেখানোর অস্ত্র দু-একটা কথা বলবেন, এই আশায় তিনি যেমে গিয়েছিলেন। কিন্তু, কই তা ত হল না। তবে কি মালিনী বিখাল করেন যে প্রাণী মহিমারঞ্জনকে মেয়ে নয়, তার উপর ঠাওই একমাত্র অধিকার। মনে মনে মহিমারঞ্জন ঙ্ক কোঁচকালেন। কিন্তু এখন তিনি টের পেরেছেন যে, কোঁচ করে মালিনীর কাছে কোনো লাভ নেই। মালিনীর এই ক্ষমতার হাওয়া পেলেই বই কি মহিমারঞ্জন। আশ্চর্য।

তিনি ত নেহেরকে কেঁড়ে নিয়ে যাচ্ছেন না। তবে? তবে, তাঁর হাতি অতি সামান্য বুধে অন্ততঃ হালিমী বীকার করুক যে শ্রাবণী শুণু তাঁর একার সম্পত্তি নয়। বাসু! কিছু ভাঙ করবে না!

মহিমারজনের পুত্রনো অমিহাটী হত প্রকাশ পেল অন্তভাবে। তিনি বললেন—আনো দালা সেই হত-ভাগ্য কি হাল হয়েছে?

হালিমী তাকালেন, চোখে কোনো জিজ্ঞাসা নেই, বুধে বললেন—না!

—আরে একেই বলে বোকার দায়, বুধলে। সেই মেঘ দাগী ত বিলেতে গালিয়ে গেছে। কেন? না, এখানে তার আত্ম খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

—সে ত হন বন্ধর আপেকার কথা।

—হ্যাঁ। তা হবে বই কি। ওরিকে অমিহাটী পড়ে গেল পাকিস্তানে। হতভাগ্যর সাধা চামড়ার দাম দিতেই ত হাফাযনের বাকী মধুটুকু খতম। এখন এর হাতে তার ঘোরে ভিক্ষে ছাড়া পত্তি নেই।

—সে ত শুণু ভালো। আমি ত জনেছি যে লোক ঠিকিয়ে আলিয়াতী করে তাঁর নবাবী এখনো পুরোমনে চলছে। নতুন নতুন কোশানী গড়েন, সেহাও বেড়ে টাকা ভোলেন আর তাই বিয়ে মন-ঘেরমাড়ন সবই পান!

এবার মহিমারজন পুরোমস্তর চৌদুরীমূলত শুকীত পিঠের গুণর হাত রেখে প্যারচরী শুক করলেন—৫! ছুনি তাহলে কোনো বনাই রাখে না দেখছি। কোশানী করার চাল অচল হয়ে এসেছে।

—কে বলল! এবার ত শুনে এলাহ হাখিলিং-এর কাছে টিয়ার মার্চেন্ট হয়ে বসছেন।

—যাচ্ছে বঁবর। আমার ঘোঁটলে পবন্ত বিনও দয়া দিয়েছিল। তাপে গা বী-বী করে উঠছিল, দলা দাকা দেখো কি না ভাবছিলাম, এমন সময় তোমার সুধবান। বনে পড়ে গেল। তিলাম পাঁচটা টাকা।

—কেন বলেন?

—এমনি। মানে, বুধ অহুতাপ করল। কতে! কাহল, বলল কি আনো—

আমি না, জানতে ইচ্ছে নেই।

—আহা রাগ করো কেন। সবটা শোনো। আমার ত মনে হয় তাকে দেখলে তার কথা শুনেলে তোমারও হতা হতো।

—না, হত না। আমার হয় অতোবেলো নয়।

—ভাষো দালা, মাহুবেব একটা জীবনেই কতো কি খট। হরতো এমনও হতে পারে, যে তাকে ঘেঁষে মতিই তোমার মরা হবে। হাফায হোক সে তোমার—

—সে আমার কেউ নয় আমাইবাবু। আপনি তার কথা আমার সামনে আর বলবেন না।

—আচ্ছা বেশ, বলব না।

রাগ করলেন? আমি কিছু বিরক্ত হয়ে বলি নি কোনো কথা। আমাইবাবু, জীবনের সবচেয়ে শুল্লর হিনগুসো অলে-পুড়ে এখন শান্তি অল ঢেলে কি লাভ হল? হরতো আপনাতঃ সব কথাই ঠিক, হরতো তাকে দেখলে নিজেতে দক রাগতে পারব না। কিছু দেহের সামনে কোন বুধে গাড়োয়া তাবপর, সেটা তেবে দেখুন একবার।

—না, আমি তা বলি নি। তবে—

—তবে, হরতো, মহি—এ সবই ত আপনাতঃ মনে করনা আমাইবাবু! শুণু নিয়ে নষ্ট করবার মতো থাকে সময় আমায়ের কাস্তরই নেই।

হালিমীর দিকে এখন তাকালেন শুণু তাঁর চোখের দিকে নকথ বিলে টেব পাওয়া যেত যে, মহিমারজন তর পেয়েছেন। কিছু হবে মনে তিনি হালিমীকে চেয়ে। এইটুকু বেশ ভালো করেই তিনি জানেন যে আজ হালিমীর মন বড়টা উলার থাকবে এমনটী আর কোনো গির নয়। আজ হালিমী তাঁর সঙ্গে অনোভন আচরণ করবেন না। তাই মহিমারজন বলেই কেললেন—তা, এক কাক ত করতে পারো! মেহের বিয়েটা দিয়ে, কাফা হাত-পা হয়ে কর্তা-সিরা তীর্থে বেবিয়ে পড়তে পারো, আমরা-তোমরা—

হালিমী হাসলেন—দক্ষ শোনোছে না। তবে, এ জীবনটা এই তাবেই কাটুক আমাইবাবু! আমি কোনো গাপ করি নি, পুণ্যেও আমার হরকার নেই। বেশি, হাত আপবেন না, এই বয়সে হজমের সোপদাল হবে।

—আহা হলো আর একটু। বা-ই হলো দালা

ভাষাও হিকে এখনো। তাকিরে থাকতে তা
 াঃ, তোমাকে আমি ভালোই বাসি।

—তা বই কি! সেই অন্ত্রে এত বন্ধুর বিলম্বন
 হয়ে নিশ্চিত ছিলেন।

—বাঃ, আমি এলাম তোমার বাড়ি বয়ে!

—তা বটে! আচ্ছ আমি নেই কেনেই এখানে
 ১ দিয়েছিলেন, মেয়ের টানে, থাক থাক!

—না, থাকবার কিছু নেই এতে মালা। সম্পর্কে
 আমি বড়, নইলে দেবার বোঝাবের হুঁটেলেই তোমার
 গেরে খুলো মিথ্যে।

—আমি বই সম্পর্কে বড় হতান তাহলে কি
 রতান জানেন?

—কি?

—আপনার কানটি বয়ে বসন্তা, নেং পেরাম
 হু। জানিস্ না আমার কতো কষ্ট হয়।

হো-হো হাসির দশকে মহিমারঞ্জন রাতের নিশুড়িকে
 দকে ছিলেন।

কিছু মালিনী পে হাসির অশ্রুধার ত হলেনই
 ।, বঃ বিচিত্র বিষয় সুরে হাসিকে শব্দকে ছিলেন
 -এ সংসারে কেউ আমাকে ভালবাসলো না, বঃ
 ঠউ তর কল, কেউ বা মর্খাধা ছিল। সেদিন আপনি
 রকে কথা বলবেন বড় সাধ ছিল আমার।
 কশার ওঠবার পরও হয়ে হয়েছিল। পিছন থেকে
 লা নাশা বলে ডাক দেবেন। কিন্তু, নাঃ!
 হয়ে সামনে এভাবে অপমান আর কেউ আমাকে
 রে নি, জানেন!

—টুক টুক! তুমি আমাকে বুঝ সম্মান সেদিন
 দিয়েছিলেন। বাক পে তাই, মনের বোকা বয়ে
 গিয়ে কি হবে। এখন বলে কি প্রায়শ্চিত্ত করলে
 মি হুই হবে।

—আমি শেতলা নই, মনসাত নই জামাইবাবু।
 হাতাই বাংলা দেশের মেয়ে, আমাকে খুশি করা না
 ত্রা ত আপনায় খুশি-খেগালের ব্যাপার।

—তবু! একটা কিছু বলো।

—আপনি এখন সুমনে। পরে দেখা হবে।

মালিনী এখন এ ঘরে এসেন তখনো বনানী আর

আবনী পরে বসন্ত। তাঁর দশকে ওরা চ'ল'নেই
 হুপ করে গেল।

পরদিন সকালে মহিমারঞ্জন বনানীকে সঙ্গে নিয়ে
 বেরিয়ে গেলেন। মালিনী অবস্ত্র অহরোধ করেছিলেন,
 এখন থেকে একেবারে বাঙরা-বাঙরা সেহে বেস্তবার
 অন্ত। কিছু মহিমারঞ্জন ওকেরে দেখালেন—ভাতারের
 সঙ্গে সকালেই দেখা করা বরকার। বোজকে হুটেলে
 শৌছে দিয়ে, হাসপাতাল সেহে হোট্টেলে চলে যাবো।

তাতে মালিনী মাথা নাড়লেন—উই! হোট্টেলে
 গিয়ে বিদ্যানাপত্তর নিয়ে এখানে এসে বাঙরা-বাঙরা
 করবেন, নইলে আমার মাথার বিথি রইল।

—আচ্ছা! বেশ এবেলা এখানেই বাঙরা যাবে।
 আর বিকেলে তোমাকে নিয়ে যাবো হাসপাতালে।
 অগ্রসর সুখেই মালিনী বললেন—বেশ, তাই
 হবে।

ওঁরা চলে যাবার পর আবনী বইপত্তর নিয়ে বসল।
 আচ্ছ বাঙরাগের বাড়িতে যাবার দিন। অবস্ত্র কথা
 ছিল যে তিনি এসে পড়িয়ে যাবেন, কিন্তু এখনো তা
 মালিনীকে জানানোই হয় নি। বাঙরাগকে কোন কতে
 বলে দেখে যে তাঁর আশার বরকার নেই। বই খুলে
 পড়া একটুও এগোয় না। কাল রাতে যেমন মনে হয়ে
 ছিল,—যে আনন্দ, যে শান্ত-নিবিড় নিশ্চিন্ততার স্বাবে
 মনটা ভরপুর হয়ে গিয়েছিল আচ্ছ কই তেমনটি হচ্ছে
 না কেন? তবে কি, এই সেতু বহনটা নিছক সাময়িক?
 কে জানে! আচ্ছা, মহিমারঞ্জন নিজেও ত টিউটরের
 কথটা মালিনীকে বলতে পারতেন! পাশের সেই
 বাড়িতে যেতিওটা তারঘরে চিংকার করছে—“বাংলায়
 বঃ বঃ বলছি! আচ্ছকের বিশেষ বঃ এই যে, পাকিস্তানের
 স্বতর্পর এ, কে বঃবঃ হক মুহাম্মদীর পরামর্শ অহুসারে
 পূর্বপাকিস্তান বিহারলতার অবিবেচন অনিদিষ্টকালের
 অন্ত হুশিত বাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।।.....” আবনী
 বিরক্ত হয়ে উঠে গিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দিল।
 তারপর একবার রাজাঘরের দিকে গেল, মালিনীর
 মেজাজটা আচ্ছা করবার অন্ত।

ওকে দেখেই মালিনীর চোখের কোণে হাসির হুটা

অলকে উঠল—কি ? রাজনন্দিনীর বুদ্ধি আর গঠনবানান।
তালো লাগছে না ?

—না, বিশেষ পায়ে কোন বল তো ?

—তালোবেলে কোনের পাতে সব উলোড় করে
হাও আবেগেই পেট ভরেবে ! কিছু বাবি ?

—নাঃ, ত আর একটু বাবেই ভাত খাও।
একটা কথা বলছিলাম না—

—বলে কালো—

—মাঝ আবার কিংতে বেঠী হবে। বাসীসঙ্গে—
কথাটা শেব করতে দিলেন না মালিনী, বললেন—
তুই হাসপাতালে বাবি রে ?

—নাঃ ! প্রেক্ষাগৃহের কাছে পড়তে যেতে হবেবে !

—তা, তালো, আমি ত ব্যক্তিই।

প্রাণী হাসপাতালে বাবে না শুনে মালিনী খুসীই
হয়েছেন।

সিঁড়িতে হুঁতোর শব্দ শুনে শুনে মালিনী ঘুম
করলেন। এমন অসময়ে হুতু হুতু গুপের ত কার
ওঠবার কথা নয়, আর হুতুর পায়েব আওয়াজ অজ বকম।

—ক ?

মালিনীর ক্রুদ্ধটির সামনে একটি স্বর্ণবর্ণ মুখক। তাঁর
কণ্ঠের দে হতচকিত। একটু তোড়তানো আড়ষ্টতার
দে অব্যব বিল—আ-আমি প্রাণীকে খুঁজছিলাম।

—আ !

গভীর কণ্ঠের মালিনীর, তার চেয়ে কঠিন তাঁর
মুখের জাব।

বাটনার শিল ছেড়ে উঠে গেলেন তিনি, মেয়ের
ঘরে—এই যে, কোনো নাহ, তোমাকে কে বেন খুঁজছেন।
বাক্যভাবে প্রাণী উঠে এস। শ্রীহর্ষকে সামনে বেবে
সহজ হবার চেষ্টা করে ও বলল—আরে, শ্রীহর্ষবাবু !
আমুন, কি ব্যাপার ? হঠাৎ সকালবেলা যে—

শ্রীহর্ষ হাসবার চেষ্টা করে—এই এবার ফিরে
গাচ্ছিলাম, এসে পড়লাম।

মালিনী ব্যক্তিবে হয়েছেন বেবে প্রাণী বলল—শ্রীহর্ষ,
আমার মাকে ত আপনি স্নাতেন নি !

একবার হাত তুলে নমস্কার করতে গিয়ে কি ভেবে
শ্রীহর্ষ হেঁট হয়ে গায়ের বুদো দিল। মালিনী প্রায় অস্বস্ত

হয়ে উভারণ করলেন—বৈঠে থাকো, বিধান বও বাবা !

প্রাণীর বুক বহিচ হিম হয়ে এসেছে আগভাব, তবু
শ্রীহর্ষ সামনে অলস হতেও তাকী নয়, বলল—হবাব
আমাকে যাচে একাই কণ্ট্রাস পাবেন, কোনো না !
ওহা সব তাই খুব বিশিষ্ট প্রত্যেকেই ইশান জলার !

—আহা, ওমলেও আমক হয়। তা কলেজে বাবেন
না শ্রীহর্ষ বাবু !

—আমাকে বাবু বলবেন না মা ! বাবো বই কি।
আচ্ছা এখন চলি—

শ্রীহর্ষ বাবার অজ পা বাড়ালো। মালিনী বললেন—
তা বলি নি বাবা ! বস, তা খাও, তারপর বাবে।

—না, না। খেয়েছি। বাক, এখন বাই—

—আবার এসো বাবা, তবে বৈকালের বিশে,
কেনন—।

সত্যিই শ্রীহর্ষকে বিশেষ মুখে বিহার নিতে হ'ল।

শ্রীহর্ষ হরতো তখনো গলি গেহোর নি, মালিনী
নেয়েক বললেন—এই বুদ্ধি সেই—

—সেই !

—হ্যাঁ ! সে কথা আমাকে হুতু বলেছে।

—কি কথা মা ?

প্রাণীর কণ্ঠের একটা তীক্ষ্ণ উচ্চত প্রতিবাহের হার
হয়েছে। ওই মনে হয় বেন মালিনী ওই গুপের অস্ত্রাতাবে
কালা লেগে দিতে চাচ্ছেন।

মালিনী বললেন—এখন যদি সাবধান না হও তবে
আগেরে কেউ ঝাঁচতে পারবে না মা। আমাকে
গুকোলেও নিছের মনের কাছে ত ছুঁবি চলবে না।
কথাটা কি সেটা আমার ত অব্যব হোবার হার নেই।
তুইই কোনো।

কোথা থেকে যে একটা তাওবের মেশা প্রাণীকে
পেয়ে বসেছে, ও হঠাৎ সব কিছু জুলে গিয়ে সেই
উন্নততার বশে বলে উঠল—বেশ, আমারই জানবার,
আমিই জানবো ! ছুঁবি-তাকান্তির কথা ওঠবার ত
দরকার নেই !

মালিনীর সামনে যদি বজ্রপাত হয়ে পুঁবিবীটা ছাই
হয়ে যেত তাহলেও তিনি এতবানি গুহিত হতেন
না। প্রাণী তাঁর মুখের গুপের 'চোপা' করেছে !

তিনি আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না।
প্রাণী নিঃশব্দ হৃৎ-ধ্বংস! তার চতুর্দিক মিশ্র হয়ে
পড়ল। এ কী করল ও! মালিনীকে যেম উঁচু পাখাদের
চুড়ো থেকে হাফা যেরে কেলে দিল অভল গরুরে।
এমন কি উপায় হবে?

যে এসে মাথার হাত বেগে প্রাণী অনেকখণ
যে ভাবতে চেষ্টা করে, কিন্তু মাথার মধ্যে সব এলোমেলো
হয়ে গেছে—কোনো এক মুহূর্তের অস্তিত্ব ভিতর বহুতা
কিরে আসছে না। দূরে দীর্ঘার বহুতে পট-বাঝার
বকী কানে হতে ও হান করতে উঠল। মাথার অল
পড়তে তারি আশ্রয় লাগল। ইচ্ছে করছে সাধা কীমন
এই অল খাবার নীচে মাথা পেতে রাখতে পারলে বেশ
হ'ত। অস্তিত্ব একটা ব্যাপারে নিশ্চিত বাক্য বেত
—মালিনীর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে হ'ত না। কপাল
এমনই মন্দ যে, আশ্রয় এই চরম বিশেষে হিহিভাই
কলকাতার নেই। এতকাল মা আর হিহিমার কথা
কথাতরে প্রাণীই মধ্যস্থতী ভূমিকার কান্ন করছে।
কিন্তু আত?

তবু বেতো। রাত্রিতে গিয়ে মাঝের কাছে ভাত
চাইতে হবে। তিনিও মুখ বুজে গেতে হবে। অস্তিত্ব
বিনের চেয়ে দূর বেশিই করলেন। কিন্তু মুখে কোনো
কথা বলবেন না। দু-ঘণ্টা বড়া কথা বললে
সেটা ভাতের সঙ্গে মেখে বিবি গেরে নেওয়া যেত।
কিন্তু—

প্রাণী রাত্রা ঘরে ঢুকই বেশল ঠাই হয়ে গেছে।
আর, বলাব-মার মাঝে মাঝে বাপাখানো বলেন মালিনী।
ভাত হাত দিয়েই প্রাণী বড়-বড় করে কেঁবে কেল।
সে কাঠার ওর চোখের সামনে মাঝা হুঁমিটা: অস্তিত্ব
হয়ে গেল। তবু কানে ভেসে আসছে মালিনীর
কণ্ঠস্বর।

মালিনী বললেন—ক'টা দিন ভিগাম না, তাতেই
এক বাড় বেড়ে গেছে! আপনার বাপকে, বোনকে
দিয়ে বিবি আনকে ছিলে বাছা তা ত জানতাম না।
আমি, আমার বেদন বৃদ্ধি, ভেবে সাধা হই, বেচারী একা
পড়ে রয়েছে! দিনে ভাত রোচে না, রাত্রে ঘুম হয়
না। এক লগপার টাকা বরচ করে হকচ-পুড়তে

এলাম মরতে। ছেগেও মুটেছে! এমন কানলে কোন
হতভাগী আসতো।

মুখ ভাঁকে প্রাণী বেতে লাগল। পাওয়া ত নয়
বেলা এটা করতেই হবে নইলে পরিণাম বড় মারাত্মক
হাডাবে।

মালিনীর মুখও কানাই নেই, তিনি বলই চলেছেন—
তা বেশ ত, এবার বাও তোমার আপনার অনেকের
কাছে গিয়ে থাকো! আমারও শান্তি!

চু-চু করে হানটা বালি করে নাহিয়ে চাপল প্রাণী।

—বলি এটা আমার কি চেষ্টা হচ্ছে তুমি!
বিষয় সেগে ধন আটকে মরার বে। তানা পছিয়েছে
এবার উঠলেই হয়। কি করতে কি অস্বাভ? লেখা-
পড়া শিখছেন। বিতরণী— এবার কোনদিন শুনব
বে রেখেই করে দিয়েও দেবে কেলোছে। তাহলেই
বোলকলার সম্পূর্ণ হয়।

—আমাকে বা পুণী বলা মা, অস্তিত্ব এর মধ্যে
অস্তিত্ব না। আর—

—আর কী! আমার ত কিছু জানার হককার
নেই মা—বা পুণি তাই করে গিরে।

—কিন্তু ছতুর মুখের কথাটা তোমার কাছে বড়
হল! আমাকে জিগোস করতে পারতে ত!

—তোমাকে? হঁ! তুমি কি আর সেই তুমি
আছো মা—

হী হাত দিয়ে চোখ মুছে প্রাণী মাঝের দিকে
তাকালো—আমি ঠিকই রয়েছি মা। কিন্তু
তুমি কি করে তাহলে পারলে যে, তোমাকে লুকিয়ে
আমি কিছু করতে পারি? তাহলে, তোমার
এক বেহেদ্য বে মিলে হয়ে বাহ মা!

মালিনী কীধনিবাস কেলেন—কি জানি মা, আমার
দুখ্য মাহু।

—আমার অনায়াস হয়েছে মা, তোমার পায় পড়ি
এবারের মত কথা কহো।

—হয়েছে-হয়েছে, এখন তর্জী বুড়ী, কলোমের খেদী
হয়ে থাকে।

—উঠছি। কিন্তু তুমি রাগ করে না-যেয়ে থাকবে
না কথা হাত।

—জামি ও পাগল হইনি যে অমূল্য বাটখাটার কথা গায়ে মাথবে। আর বাগা বাগ করি, কড়া কড়া বলি—কিন্তু কেন যে বলি তা এখন বুঝি নে, তবে পরে টের পাবি যে এই বুঝবা মাছটা বা বলে গেছে তোর ভালোর জন্তেই বলেছে।

অনেকদিন পরে ট্রানে বসে শ্রাবণীর খুব ভালো লাগছে। ভালো লাগছে তাবতে যে, মালিনীর মুখের ওপর কঠিন কথা বলতে পেরেছে! আচ্ছ! কেন যিহে মিছি কাঁপল ও! ও ও কোন অজ্ঞান কিছু বলে নি। সত্যি মালিনীর এই যে সব ব্যাপারে আগলে আগলে চলা, এর কোন প্রয়োজন ও নেই। শ্রীহর্ষকে শ্রাবণী সত্যই যদি আমল দিত তাহলে মালিনী কিছুতেই কখনো পারতেন না। অথচ তার কল হল উঠে। তা হোক, আজ শ্রাবণী টের পেরেছে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা ওর আছে। এবং মাথাটা গোটা কাঁপতে চলে এট পথেই চলতে হবে। মালিনী কতো অসহায়, কতো দুর্বলতা আজ ও কেনে ফেলছে। কান্না? হ্যা, কেহেছে নইলে বড় বেমানান হতো। ঘোট কথা শ্রাবণী আজকের এই কথা-কথাত্বের মধ্য দিয়ে অস্থব করল—বেশ করেছি! আমি কতি বুকে নই! বটেই ত, আজ বাবে কাল ও হয়তো কোনে কলেগে অধ্যাপনার কাজ করবে—সুখর ওর বহনী কতো যেহের ওপরে কতীত্ব, নেতীর এসে পড়বে! শ্রীহর্ষ বুঝানো মনে পড়ে গেল। বেগারী ওকনো মুখে চল বেল—কতো আশা নিয়ে এসেছিল। কিসের আশা? ছোটো কথা-বলো বই ও নয়। অথচ, মালিনী তাকে আমলই কিসের না। কেন? শ্রাবণীর বন্ধু ভাকাটা কি এমন অপরূপ! মালিনী যদিও চলাব গ্রন্থ শ্রাবণীর বেশভেতই থাকবে কেন! বিকৃত্তির ফিকেই এত ভৌক বাকা ও টিক নয়। বেশ করেছো শ্রাবণী, পাগলী হওয়া যায়, আর তাতেই আন্তঃপ্রতিষ্ঠা জগার।

সারাটা দিন ওর আজ খুশি গালে হাওয়া সেগে কেটে গেল। একটা ভ্রাগ কানাই করে শ্রীহর্ষর সঙ্গে অনেকদিন পরে পর করল শ্রাবণী—যেব মালিনীর ব্যবহারের কতিপূরণের জন্তে এটা কিসের কর্তব্য ওয়।

অনুপস্থিত মালিনীকে অগ্রাহ্য করাত ও একটা আনন্দ আছে, তা কে জানতো!

মালীগণ্ডে বাবার জন্ত সতী বোঁজার হুকুম ছিল না। হাতের কাছেই ছিল শ্রীহর্ষ কিন্তু—হৃৎকনে এক সঙ্গে বেললে হয়তো অল্প কোথাও পৌঁছাবে। কাজ নেই বিশেষত: আজ একটা 'মর্যাদা' হারিব আছে বিজ্ঞত থাকবার। আগে চল শ্রাবণী নিজের এমন যিনে শ্রীহর্ষর সঙ্গে কোর করে খুঁত কিংত মিছের বিজ্ঞততার অগ্রিমরীকার কর। কিন্তু আজ সেই তরলাটুকুর অভাবে মিছের কাছে লজা পেল। বাসের জন্ত বিজ্ঞত হা ভরে থেকে আর ভগ্না হল না, যদি শ্রীহর্ষ এসে পড়ে! তাই তাকাতাড়ি একখানা ট্রানে উঠে পড়ল, পরে বদলী করে নেওয়া যাবে!

এলগ্নানেভে চকর করে নেমে শ্রাবণী রীতিমত হিমসিম খেতে গেল, কোন ট্রান কোথায় যাবে! একবার এখার একবার ওখার করে মামিক খুঁতে মতল। টিক এই অবস্থার ওয় মূল ধান! যেমন ব্যাঙ হয়ে উঠেছে, সেবে কি পথের লোকের কাছে মিছের অজ্ঞতা ফাঁদ হয়ে পড়বে, এই সব তাবছে বদন, তখন কোথা থেকে বিজ্ঞতত এসে উদ্ধার করলেন।

পিছন থেকে কড়া হুজুটের খেঁরার গছ নাকে এসে লাগতেই শ্রাবণী বড় কেরালো।

চোখে চেঁগে পড়তেই বিজ্ঞতত হাসলেন—ওং, কোথায় চলছ?

—আপনি?

—আমি আপাতত: একটা ওজমারিখের বোকা বইছি। নিরেছিলাম ওখানে—

—ওখানে মানে কোথায়?

—কেন, বাসকবনে।

—নেমস্তর ছিল খুঁত?

—নেমস্তর! তা বলতে পারো। কেন কুহি শোনাও নি কিছু! হরেন মুখুজো মারা গেছেন যে—

সত্যি!

একটা তীক আতিমর লক বেরিয়ে এল শ্রাবণীর কণ থেকে।

—সত্যি, বিজ্ঞত!

—হ্যাঁ! রাজ্যপাল হচ্ছেই তত্বেক পেশ মিশ্রণ
ত্যাগ করলেন। তিনি যে পণ্ডিত ছিলেন একথা আর
কেই বা মনে রাখতে থাকে বলা! রাজ্যপালের দৃষ্টান্তে
আমাদের ত সংস্কারীভাবে খোঁজ করতে হবে। অথচ
মস্তিষ্ক মশাই নিজে কখনো গুরুত্বের মতো থাকেন নি।
বা খোঁজবার করেছেন তা সবই হারি করেছেন। এই
ক'দিন আগেই ত তাঁর সঙ্গে কেবা এক বিয়ে বাড়িতে।
কি বলছেন সেদিন কোনা—‘আগে ত শুধু বড়লোকেরা
লাটসাহেব ডাকলে পুনি হতো, আসত, চাইলে পরে
টাকাও দিত; কিন্তু আরকাল ডাকলেই তারা অস্বস্তি হয়ে
পড়ে। ভিক্টর কুশিতে আগের মতো টাকা পড়ে না
হে! এখন বাবা সেইজনে রেষ্ট! বেঁচে গিয়েছি, বিয়ে
বলো, অন্নপ্রাশন বলো, লাটসাহেবকে নেমন্ত্রণ করলে
নিশেন ‘পাচল’ টাকা হকিবা হিতে হবে। এমনি
করেই বা পাবি পরীষৎ দেশের কিছু কাজ করে বাই।’
তা বিয়ে গেছেন লাখ-লাখ টাকা, কিন্তু শিকার জন্তে
কিছু বা টি-বি বেগীনের সেবার জন্তে। কিন্তু হু-একটা
মাছের ত আর গোটা কেশের মলা কেহাতে পারে না!

আপন-মনে বিজয়ন্ত তদ্ব্যক্ত আছে কথাকলো বলে
লগছেন।

শ্রাবণী অভিভূত। শ্রাবণীর মনে হচ্ছে বিজয়ন্তর
মন অত্যন্ত তাৎক্ষণিক।

হঠাৎ উজ্জ্বল হেসে উঠলেন বিজয়ন্ত—কি যে
আবোল-ভাবোল বকছি। বাহ বাও। তা এখানে চকিত
হরিনীর মতো কার পথ চেয়ে রয়েছ—?

সুদূর কঠ শ্রাবণী বলল—আজ্ঞা বিজুল, আপনি
আজও আমাকে হেলেদাড়াই করে ছুঁতে গরিয়ে রাখতে
চান, কেন বলুন তো?

—কই, না তো!

—তবে কেন হঠাৎ মনেও ভাবটা চাপা দিয়ে
আলুপা গুরে হালকা কথা শুক করলেন? হরেন ব্রহ্মা
মশাইকে আমিত্ত্ব হু-চার বার বেগনির, তবে কাছে থেকে
বোঝার ভাঙ্গা হয় নি। তা হুও থেকে যা দেখেছি তাতে
মনে হয়েছিল বৃহৎ মরোচা মানুষ, লাটসাহেব আদৌ তাতে
পারি নি—

—আর লাটসাহেবী তাঁর বাতে সরি নি, একদিনের

জন্তে লাটসাহেবী করেন নি উত্তি। শ্রাবণী হলভেন যে
আমাদের এই পরীষৎ দেশের পক্ষে এত বড় তাৎক্ষণিক
কিছু হতে পারে না, আমি বাপু বলি কি লাটসাহেবীর
মতো অনেকো পক্ষ এখন থেকে তুলে দেওয়া উচিত
যাক সে ও সব কথা, এখন বলো তোমাকে কি পাওয়াবে
পারি!

—বাঁচার কোনো হেঁচকাও বেগনি নি!

—আমার ত বেঁচে মনে হচ্ছে তোমাকে পাওয়াবে
উচিত। তোমার চোখ মূখের মধ্যে—না, না, তা নয়,
আজ আমার কন্ঠমি কি না!

শ্রাবণী হেঁটে হয়ে বিজয়ন্তর পায়ে তুলে নিয়ে
কেলস। ব্যাপারটা এমনই অতর্কিতে ঘটল যে, বিজয়-
ন্তর বাণ্য হেবার কুৎসং পর্যন্ত গেলেন না। শ্রাবণী
উঠে ঝাঁড়ান-বারে বিজয়ন্তর চতুর্দিকে নিরন্ত বৃষ্টি
ছড়িয়ে বললেন—আজ্ঞা এ সব কি করছ? এই
এসুয়ানেতের মোড়ে আমায় আমায় শোকের চোখের
সামনে।

—তাতে কি হয়েছে, আপনার কন্ঠমিই প্রশ্ন
করব না?

—না করলেও কতি ছিল না, নিশেন করবেই যদি
ত মনে মনে—

—মনে মনে বা করা বার মনজনের সামনে তা করতে
আপনি কি!

—সম্মা করল না?

—না, এতে সম্মার কি আছে?

অবাক হয়ে বলল শ্রাবণী। বিজয়ন্তর ওর সেই
দরল চোখের দিকে অকপট প্রিষ্ট বৃষ্টি মেলে বললেন—
আমার কিছু কি রকম লাগছিল। বাবা দেখল তারা
কি ভাবল বলো তো?

—চলুন, একবার নিউমার্কেটে বাই—তাপর
বাগুয়া—

তবে বাবা, প্রশ্নেই আমি শুট! এর পর আর
উপরীকনের চাক্সা মুড়ে দিহো না। আমাকে এখন
অনেক রাত পর্যন্ত টো-টো করতে হবে! ভুলসই একটা
ট্রিপোর্ট লিখে আমায় ডেস্পাচ্ করতে হবে।

যাতভাবে বিজয়ন্ত হাঁটতে শুরু করলেন।

শ্রাবণী তার কিতে বাধা শুদ্ধতার হাটুনির সঙ্গে
পায়া দিবে চলতে পারছিল না। একটু পরে লিখন
থেকে দিহি সুরে বলল—আমাকে কেনেই বাবেন না কি,
ও বিছা!

বিকেলের চৌকী। প্যাড্ডিতে, হাতুবে বৈশৈ কহে।

বিজয়ন্ত বন্ধু পাড়ালেন—এলা, এলা!

—কিছু কোথায় থাকি? আমার বালিসঙ্গে পড়তে
যাবার কথা—

—অ। তা ধাত—

নিশিগন্তভাবে কথাটা বললেন বিজয়ন্ত। কিছু এই
অল্পদিনেই ঠাণ্ডে শ্রাবণী পেটু ছিনেছে তাতে এটা
বুঝেছে যে, কঠোর আর মনের কথা এক নয়। তা ছাড়া
হঠেন মুখোয়ার নকুতে বিজয়ন্তের মন তার যেনেই শু
বির করে চেলেছিল, আচ্ছ পড়তে যাবে না। তবু
সুখে ও কথা বলে ভনতে ছেঁয়ছিল বিজয়ন্ত ওকে একটু
স্যাধাসাধি করতেন। কিছু, শ্রীধর সঙ্গে বিজয়ন্তের এই
পার্থক্য একজন লেটে থাকতে চায়, আর একজন পাশা-
পাশি চলতে পছন্দ করেন।

বিজয়ন্ত বললেন—তোমার এই প্রণামটা যদি
আমার প্রাণ্য ছিল না, তবু খুব মিষ্টি লাগল শ্রাবণী!
এ আমার জীবনের সখী হয়ে রয়েল।

—আরে সত্যি-সত্যিই আপনি বরচের গুণে না
বাঁধিয়ে পালাবেন না কি?

—বরচ?

চট করে পকেট থেকে মানিচ্যাপ বার করে বিজয়ন্ত
বললেন—হুঁ মনের চা আর টারে বরচ কত হতে পারে?
পাঁচ টাকা—? বেশ এই বরো পাঁচটি টাকা, বেয়ে নিয়ে
তোমার বন্ধু শ্রীধর সঙ্গে।

লক্ষ্য, রাগে শ্রাবণীর মুখে এক কলক বজাতা
উড়লে উঠল—বাক? টাকা রাখুন। আমার বন্ধু শ্রীধর
সঙ্গে থাকার জন্যে আপনার কাছে কেন টাকা
নিয়ে যাবো!

—আরে না, না, আমিই শু বাওরতে চেয়েছি তাই।
তুমি যদি পড়ার ওপর সেখাও, আমার টুটে বরচের
খোঁটা হাত তাহলে বুঝতে হবে যে, আমার সব তুমি
পছন্দ করছ না অথচ থাকার সোতও ছাড়তে পারছ না।

তখন সাময়িক বন্ধা রাখতে চলে অন্য কি পথ আছে
যলো?

—হাঃ হয়েচে, আপনাব সঙ্গে আমি এঁটে উঠতে
পারব না।

—বেশ, এবার শ্রাবণী যেনে হয়ে চলে।

হার্দের গুণর বিধে চলতে চলতে বিজয়ন্ত বললেন
—আচ্ছ তাহো অকুঠের কি পরিচাল, অর্থাৎ অকুঠ
আমি জানি নে তবু—। মাষ্টারশাই হারা গেলেন।
ববীজনাথও এই তারিখেই মাঝা পেছেন আর আমার
অগ্রদিন হল এই তারিখই। আতো মক্য ফেণ, লাটো
দিন হয়ে কতোবার মনে হয়েচে আচ্ছ আমার অগ্রদিন,
তবু নাটকে বলি মি, আর তোমাকেই বলে ফেললাম,
তাও আমার কখন? না মনটা বখন খুব খারাপ হয়ে
হয়েচে তখনই—অথচ তুমি শু আমার কেউ নও।

পেয়ের কথাটার গুণর একটু জোর দিয়ে, ফেললেন
বিজয়ন্ত। শ্রাবণীও কানে খাড়া লাগল। সত্যি
কথা, শ্রাবণী কেউ নয় বিজয়ন্তের—অথচ এটা যেনে
মিতে মন সরে না। বহা গলাও বলল—সত্যি বিছা
আমি আপনার কেউ নই। তাই হরতো এত আপন মনে
হয় আপনাকে।

—আপন?

—হ্যাঁ। আমি অনেক তেবেছি আপনার মতো
আপন আর কাউকে ননই হয় না।

—সত্যি?

—এই আপনাকে ছুঁয়ে বলছি।

বিজয়ন্তের বী হাতখানা চেপে ধরে ছেড়ে দিল
শ্রাবণী—তা আপনার কাজির হাড় কি চওড়া? বুঠোর
বহা বার না।

—মজর দিলে শু রোগা হয়ে যাবো।

—নাঃ। পরের মজর লাগে না, আস্ত্রীয়মনের মজর
হলে—

—আচ্ছ। তুমি মাঝা পেয়েছো।

—কেন?

—মনে হচ্ছে, কেউ নও বলে কষ্ট হয়েছে। আপনে
নিঃশেষেই বিশ্বাস করতে চেষ্টা করছিলাম। নইলে—

—নইলে কি বিছা?

—না, থাক ।

—যাকবে কেন, বলুন !

—জাবো ক্যানো ! এখন যদি না বলি তাহলে তুমি জাববে যে আপনজন বলে বলতাম, আর যদি বলি তাহলে আমার লম্বকে তোমার ধারপাই পাণ্টে যাবে ।

—অনন্তর, আবার ধারপা পড়েও লম্ব লাগে, আর চট করে জু-চারটে কবার ভায়ে ভেঙেও পড়ে না ।

হাত পেঁচিয়ে এনিমিষ্টিক সোসাইটির সেই পুরনো বাড়ির সামনে দিয়ে ওরা চলেছে । গাড়ি থেকে নামলেন ডক্টর রায়, শ্রাবণীকে ধরে একটি হাসলেন, ও হাত নব্বার করল, ঈড়ল না ।

পাইপিং এর সামনে ঈড়িয়ে ও বলল—চলুন আজ নতুন বাসা পরচ করি !

—চীনেদের খাবার বুড়ি তুমি ভালোবাসো ?

—যার হাত জানি না তা আসে থেকেই পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্নই ওঠে না ।

কেবিনের পথ সড়িরে শ্রাবণীকে ইশারা দেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বিজয়ব্রত ছোট্ট মন্তব্য করলেন—
না-জানার খাব নিতে সাব ?

হাসিতে বুলি বেগ্ন মাথিয়ে শ্রাবণী বলল—আপনার অগ্নিহীন নতুন কিছু করতে ইচ্ছে চল ।

বিজয়ব্রত মেহে কার্তধানা ওর লাননে ধরে বললেন—
কি খাবে বলো !

—আমার কাছে লংই লমান ।

—ওহু বলো ।

শ্রাবণী বলল—এক কাজ করা দাক । চোখ বুজে যেখানে আড়ল বেবো সেটাই আজ আমাদের খাবা হোক, কেমন !

—আজ্ঞা বোয়াল ।

—যেখানে আবার আদব-অজব কি ! তা ছাড়া, জিল-চালা ধবার মতো কিছু কিছু ঠাই না থাকলে যে ঈপিয়ে মরে' বাবে বিজ্ঞা !

—তুমি চোখ বুজেই অর্টার হিতে পারো, পড়লেও বরতে পারবে না কোনটুকি কি বস !

শ্রাবণীকে মানতেই হল—চাও-চাও, চো-দিন,

ছড়ল ! কিন্তু এই যে Tea ! আর এটা কি ? গো-বে ! গো-বে টা ওষেব মডো, বাম্বা আমেছ আছে ওটা বাবো !

বিজয়ব্রত মাথা নাকালেন—ওটা খুব কড়া মন, ও তুমি দখ করতে পারবে না !

—মহ মন ? এখানে কি মহ বেতে আসে লোভ ?

—তা আগে বই কি !

নিমেষকাল শ্রাবণীর মাথাটা চক্কর খেল ! মা, মাসিমা, বাবা, বোভা, শ্রীহর, নিজরি—সবাই খেল হল বেবে বেবেছন শ্রাবণী মনে লোকানে ঢুক পড়েছে । কিন্তু পরম্পরে বিজয়ব্রতের হিকে চোখ লড়তেই একটু হাসল, বলল—মহ ও থাকি না ! তাহলে আপনিই করমান কমন, বেটান চমুস দিয়ে কেলব !

—তাতে ঠান দাগবার ভর নেই, আমি ও রইলাম ।

—চাও-চাও-ই হোক, আতো !

—বেশ !

কিন্তু ও চুটোর কোনটাই শ্রাবণী মন করতে পারল না । কিন্তু তাতে একটুও বদল না । বিজয়ব্রত হিকে ডাকিয়ে আকে-বাকে বকতে শুরু করল । অবশেষে এক সময় ও বলল—আপনি হাত বেবতে পারেন বিজ্ঞা !

—পারি ! দেখি তোমার হাতে কি লেবা আছে বাও—

শ্রাবণী সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল—আজ্ঞা আমার লেবাগড়া হবে কিনা সেটা বলুন দেখি !

কিছুক্ষণ মূর্ত্তে ভেতরে হাতবান্য ঘরে, চোখ বুজে রইলেন বিজয়ব্রত । তারপর তাকালেন । ওর সঙ্গে শ্রাবণীর বুড়ি হিলি হতেই উনি বললেন—তুমি মানকেত হবে না, তুমি একটি সুন্দর সুল বাগান হবে ।

—অজ্ঞার্থ !

—তোমার হাতবান্য গোলাপের পানড়ির মতো ভেসেতে ।

—আহা, কতুড়ী হচ্ছে ! হাত বেবতে জানেন না কহু জানেন ।

—লভা জানিনে হাত বেবতে, বাড়িয়ে দিলে বরতে জানি ।

—হ্যাঁহুন।

ছাড়তে ত হবেই, তা ছাড়া অন্য উপায় নেই আমি।
তবু বরং রাখতে পারি বতকশ ততকশই—বিষয়বস্তুর
কঠে ভাবনার হাসকা চাল নেই। চোখের কৃষ্ণিতে
পড়ার একটা বিষয় বেবনা মুঠ। দীর্ঘশ্বাস কেলে মুঠো
চিলে করে বিয়ে বললেন—আমার একটা কথা রাখবে?

—কী?

তবে তবু প্রের করল প্রাণবী।

—চটপট প্রেমে পড়ে' বিয়ে করে নিজেই ভবিষ্যৎটা
বেচে থিরা না। যদিও তোমার বিয়ের ঘটকাকুর
দেলেছি, তবু আশ মনে হচ্ছে তুমি সেই মেয়ে বে
ধব করতে পারে কিন্তু তার চেয়ে বড় কাজ সে আরো
ভালো পারে!

—বেশ আপনাকে কথা হিজি—

বিষয়বস্তুর যে যোমাস্টিক উপস্থানের ব্যয়কর মত প্রেম
নিবেদন করে বলেন নি এতেই প্রাণবী বক্ত, শূলিও বটেই।
নইলে হয়ত— না, না, তা হতেই পারে না' বিষয়-
বস্তকে অতো খেলো কল্পনা কথাও বেন অপরাধ!
প্রাণবী নিজেই শাসালো।

—আমাকে দেবার অন্তে কথার হককার নেই,
আমার কথাটা রাখো তাহলেই আমি কৃতার্থ হবো।

প্রায় কালার সুরে প্রাণবী বলল—আপনি এত
ভালো! আপনার কল্পবিনে যদি আমাকে আশীর্বাদ
করেন তাহলে কি আপনার মতো বানিকটা অন্তঃ?
হতে পারব না বিজ্ঞা?

—আমি। আমার মতো হওয়া? এমন অভিশাপ
বেন কেউ না দেয় তোমার।

—কেন? এমন কথা কেন বলছেন!

—প্রথমত: আমি ভালো নই।

বলেই বিষয়বস্তুর হাসলেন। তারপর প্রাণবীর মৌর-
মুভৌল হাতখানার দিকে তাকিয়ে বললেন—তুমি
না সবিয়ে নিলে হাতখানা পড়ে বাবে টেবিলে তাই
ওকে ধরে রেখেছি!

—খুব তার লাগছে হুজি! তাহলে বজুন সবিয়ে
নিই।

প্রাণবীকেও কথা বলার দৌচ্চা বোনার পেয়েছে।

তা ছাড়া মল লাগছে না বিষয়বস্তুর দল্ল মুঠোর
খেমেওটা আঙুলগুলো। যদিও হাতখানা টেনে নিতে
পারলে আরো ভালো হত তবু তব মনের ক্ষেতরের
ছেলেমানুষটা বলল 'থাক না পড়ে হাত ওখানো!
শেব পর্বত বিজ্ঞা কি করেন ওটা নিয়ে, দেখাই
থাক না।'

—না, তোমার আগন্তি না-থাকলে এ হাত আমি
ধরেই থাকতে পারি। কিন্তু যে কথা বলছিলেন।
আজ আমার কল্পবিন, তোমার কিছু সংসার দিই।
তারপর ট্রিক করো এরপর আমাকে আর পাশ দেবে
কি না।

—বলুন।

—আমাকে অনেক মেয়ে ভালো বেলেছে, আমিও
যে তাহের স্বাধাপ বেলেছি তা নর। তবে আরো
আমার মাথো ভালোখানা বলে কিছু আছে কি না
সেটা আমি নে। হয়তো নেই। আমার কাছে সব
কিছুই নিউজ হয়ে থাকিয়েছে, ভানো। নিজের জীবনের
কোন কিছুই আমাকে লাড়ো দেয় না। সেবার আমার
ছেলেটার খুব বাড়বাড়ি অসুখ করল, দিল্লী
থেকে ঠাঁককসু পেতে চলে গেলাম। 'দু'হাটা পথ বই
পড়লাম, পথ করলাম, একবারও ত ছেলেদে অসুখের
কথা মনে পড়ল না। সেখানে পৌঁচে তাক্যার গুহু সব
ব্যবস্থাই করি, কিন্তু করতে হবে তাই কথা। তার বেশি
অসুখ করি নে। টালনাটাল গেল কটা দিন, অক্লিঙ্কেন
দিল্লীতার হাঞ্জির করলাম—তাও ভাবনা হল না, যদি
ছেলেটা মরে যার তখন ছুং পায়ে কি না সেটাও
ভাবলাম না। বাড়িতে কাল্যাকাটি চলে গেছি, আর ভাবি
আমি কি পাশত না কি! না তাও নই, তেঁাভা—বেন
অন্তের জীবনের ঘটনা আমি দেখছি!

চুফটা ধরাতে ধরাতে বিষয়বস্তুর বললেন—বিরক্ত
হচ্ছে? তা হলে থাক।

—না। কিন্তু এসব আমার কেন বলছেন?

—কারণটা অতি সহজবোধ্য! বিকেলে আজ
তোমার বেবেই এই বুড়ো বয়সে হঠাৎ মনে হল তোমার
সঙ্গে আমার বেন বড় প্রয়োজন। মনে মনে তোমাকেই
বেন বুঝছিলাম তা আসে জানতাম না। বাস, অননি

জগদ্বিনের পাঁচ করে দিলাম। তুমি অমনি আমার কথা বিশ্বাস করলে। আসলে আমার জগদ্বিন করে তা জানা নেই। ভেবে নিলাম, তোমার কি আত্মবিশ্বাস আমার জগদ্বিন হয়! তাতে তোমাকে জগদ্বিন; কিছুকণ বরো রাখতে পারব।

শ্রাবণী এ কথায় হাসল, বলল—যাও বেশ মজা! আপনায় হাতেই আপনায় জগদ্বিনের জগদ্বিন হয়!

বিজয়রত্ন গভীর ভাবে মাথা নাকলেন—আমাকে বলতে লাগে। নইলে, এরপর মনটা হঠাৎ হুঁপিয়ে হর হয়ে যাবে, তখন সবতাম আমাকে বুঝে হাত চাপা দেবে। তোমাকে কেন চাই তাও জেনে কেলেছি। আমার সঙ্গে যতো নৈরদের অন্তরঙ্গ হয়েছে তাহের বেশ আছে, মন নেই। যে মন আছে তাতে কোনো নিউজ হয় না—কমন্ডে হাইওকে আমি মন বলব না। কিন্তু তুমি কেন অজানা একটা বীণ, ট্রোকার আইল্যাণ্ড! সেখানে মনে তুমি মাত্র তুলনা তোমায়! তারপরে না, সোত থাকলেও তোমার বেহের দিকে হাত রাখতে চান। এখানে চেহেটা দমন ক্যাঁট। ওটার চেয়ে হারী তোমার মন। তোমার মনের বিশেষ গুণ চুষকর যতো আমার হতো সোহাৎকো টানে—যদি কোনো সাময়িক নজিতে আমার মনকে চুষক করে নিতে পারি তা তা হতে লাগে, এই ভিক্ষা শ্রাবণী! সেই আমার নতুন জগদ্বিন হবে। সে গান তোমায় হবে।

আবারো সববেশার শ্রাবণী বেন বর-বর কাঁপছে। ও বলল—এ সবই আপনায় মনের প্রতিফলন বিজ্ঞান, আমি উপলক্ষ্য মাত্র।

হাসলেন বিজয়রত্ন—জানতাম, একথা তুমি বলবে। একই আগে তুমি আমাকে তোমায় জীবনের লক্ষ্য হিসেবে ধাক্কা করতে চেয়েছিলে, তারই জবাবে আমার আসল বিজ্ঞান, নৃত্য সভাটা বুকে মেলে বসলাম। তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না শ্রাবণী, এটাই আমার সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি। তোমায় কাছে আমার সব কথা বলবার বড় ইচ্ছে ছিল, কিন্তু থাক, মিথেমি তোমাকে তারাকান্দ করে কি লাভ। তুমি এইটুকু জেনে রাখো—আমি বড় নই, আমি ভালো নই, আমি বড়ি অপ্রসবের একটা

বহর আমার মনে গিয়েছে—তার কোনো হান নেই। আর, তুমি—তুমি পক্ষে তোমার চেহেটা করে নিজে।

দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল শ্রাবণীর মুখ মুড়কে। বুঝে ওর কোনো কথা নেই। ওর কেবলই মনে হচ্ছে ওর সামনে যে মানুষটা এসে রয়েছে সে বড় খাট মানুষ—এ রকম হাউস হুঁপে!

বিজয়রত্ন বললেন—চলো এবার তোমার বাড়ি পৌঁছে দিই।

এতক্ষণ শ্রাবণীর সমস্ত বড়িট বেন বড় ছিল। তুমি সমস্তই নয় হুঁপিয়ে আর কিছুই বুঝে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা কথা ফেনলাই কাটি গিয়েছে সবকিছুই একসঙ্গে ফেনিয়ে বিশাল বিজয়রত্ন। লাঞ্চে লাভটা বেছে গেছে।

উঠে পড়ল ওরা। শ্রাবণী বলল—আপনাকে তুল বিতে ইচ্ছে করছে, বড়!

—তুল!

বিজয়রত্নের হুঁপানে পথের আলোর অনেকখানি নরম হেঁচকে। হানির বেহাটা অসুমনে বরতে ওর এমনই আলোর আভাষ। বিজয়রত্ন 'তুল' বলে একটু থেমে কি বেন ভাবলেন, তারপর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। দীর্ঘনিশ্বাসটা লক্ষের বৈধ বিবে সব সমস্ত মাথা বার না; অপ্রতর্নের আভাষ হেঁচকে হয়। তিনি বললেন—তুলের বিন আমার হুঁপিয়েছে। আমার নাম করে তুমি নিয়ে বরো লাঞ্চে রেখো, তুললে! আর একটা কথা—

—কি?

—যখন তুললে হেঁচকে তখনই বেন মনে পড়ে ওলো। তুমি আমার বিজয়। জাণো শ্রাবণী হেঁচকার ইচ্ছে একটা হুঁপিয়ে রয়েছে বিবে ফেনলাই তোমার হানি হুঁপে গেল। কিন্তু থাকে বিবে তার বোকা হাউল। নিয়ে বাও তুললানী যদি বরো থাকে ভালো, না থাকে সৎপাতের লক্ষ্যন করো, যতদিন তুলেও সন্ধ্যা থাকবে ততদিন জল পাটাও আর লক্ষ্য রাখো কেউ এসে কল ছিঁড়ে নিল কি না। তারপর কলগুলো চোখের সামনে আওকনো জাণো, ওকনো জাও জাণো। ফেলি ফেলি করে হাটার বরো হুঁ—একটা বিন বরো গেল ওকনো কলগুলো। তারপর—

—এই লক্ষ্য আমার জগদ্বিন হয়ে!

—রাগ কর না। তুল ফিতে ভালো লাগে, পেতেও ভালো লাগে—কিন্তু পেয়েই মনে হয় কোনো প্রিয়জনকে আমি এগুলো বিহি। তাই তোমাকে বিহি, তোমার সেওয়া কলের রাশি।

একথা না ট্যান্সি হেবে বিজয়ন্ত বামালেন।

রাগে বিদ্বান্নাথ উপকৃত হয়ে শ্রাবণী অনেক কাহ্না কাঁপল। মায়ের অস্ত্র সবচেয়ে বেশি হুৎ হুৎ মনে। মা ওকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, ভাতে বিরক্ত হয়ে উত্তরভাবে অধাব ঘিরে খুঁশি হয়েছিল। কিন্তু শ্রীহর্ষের ক্ষেত্রে যে স্বতর্কতার ইঙ্গিত প্রয়োজন হয় নি বিজয়ন্তর বোলায় তা সম্পূর্ণ বার্থ হয়েছিল। ট্যান্সি করে ওঠা হুঁজনে অনেক হয়েছে। অন্ধকার বোধহয় সব সজোচ, শোভনতা এমন কি বিবেকের আলোটিহু পর্বত হুছে যায়। দিয়েছিল তাই। বিজয়ন্তর উদ্ভ্রততা করেছে। আর শ্রাবণী? শ্রাবণী বাধা শেষ নি। একটি কথাও বলে নি। সাহ দিয়েছে? না। তার চেতনও বেশি—জানক্স শেষেছে। একথা স্বীকার করতেও এতটুই হুঁটা বোধ হচ্ছে না। এতখানি নির্লজ্জ যে ও নিজে হতে পারে—এ বে ভাবাই ব'র না। কার, কার! কান্না দিয়ে কি এই নির্লজ্জতার মালিন্য ঘুমে ফেলা যায়। বিজয়ন্তর কথা মানতে গেলে যায়। তিনি বলেছেন—চুষক, চুষন, এ সবই শু আপেক্ষিক ঘটনা। ওগুলো মনের মধ্যে পুষে রেখো না শ্রাবণী! আতর্ষ, এমন ইচ্ছে করছে, হাতের কাছে গেলে বিজয়ন্তর পালে চড় কবিরে বিড়ে। কী পক্ষণ। বলে কি না—তুমি আমাকে হুড়ে কেনো, তোমার সমুদ্র তরঙ্গের একটি বুদবুদ হতে দিয়েছ আমাকে—এতেই আমি খুশি। আললে আমরা সবাই ক্ষণজীবী সত্তার হাস্য করি। তোমার সত্যিও তাই। অস্তিত্বকে বিকৃত করে যে সত্যিও আকর্ষের মূলে অচল।

বালিশে মুখ ভাঁজে শ্রাবণী নিজের ঠোঁট কামড়াল। না, না, না। বিজয়ন্তর তুমি ভালো নও, তুমি খারাপ। মা। মা গো—আমাকে ঝাঁপতে হাও—ঝাঁপাও। তোমার ওই স্বরধার কথাই ভালোহার দিয়ে রক্তা কতো আমার প্রবল যৌবনের দুর্বল মেথাকে।

ইচ্ছে করছে মায়ের কাছে এখনই ছুটে গিয়ে পা

জড়িয়ে ধরে। সব কথা মূলে বলে ক্ষমা চাইতে-চাইতে শক্তি। যে শ্রাবণী বড় হবে, সে কি এই মেয়ে? যে মেয়ে প্রেক্ষাগৃহের মাড়ি ঘাবার পথে বেরিয়ে বিপথে যৌবন-উর্জা করে তাগে দিয়ে বড় হওয়া হুঁতাপার প্রহসন ছাড়া আর কী? এই জলন্ত ময়িমারজন টাকা পরচ করছেন! এই লেখাপড়ার কনে মালিনী বেশখর ছেড়ে এবার মেয়ে নিয়ে পাছে চলেছেন। ফি-ফি টী-টী বাজের হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।

কারা হুছে শ্রাবণী উঠল। হরকার বিল খুলল। মালিনীর কাছে যাবে।

কিন্তু বড় হওয়ার সাধনে গিয়ে থমকে ঝাঁড়াল।
মালিনীকে ঝাঁড়িয়ে ও নিজের মনের সঙ্গে কথা কইল।

—কি বলবে তুমি?

—বিজয়ন্তর কথা।

—আর তোমার কথা বলবে না?

—আমার? আমার কথা।

—হ্যাঁ, তুমি নিজেই প্রথমে বিজয়ন্তর হাত ধরে বলেছিলেন, 'আপনি বড় নিঃসঙ্গ না বিভূষা!'

—তা বটে। কিন্তু—

শ্রাবণী 'কিন্তু'র ঠোকাঠে ঠোকা বেল। তারপর ওখ আত্মমর্ধ্যাধোণ মাথা নেড়ে বলল—আমি এখন কচি খুকী নই! হোঁচট বেয়ে কেঁপে মায়ের কাছে দৌড়ে যাবো কেন। নিজেই বোঝাচ্ছ কার মতো শক্তি আমার নিশ্চয়ই হয়েছে। আমাকেই শক্ত হতে হবে। যা করার আমি নিজেই করব।

মায়ের ঘরের বড় হরকা ঘোলবার মতো ছেলে বাহুবীর হাত থেকে নিজেই বাঁচিয়ে নিয়ে বিদ্বান্নাথ শুয়ে সারারাত জেপে জেপে সংকরের দুর্গ খুলল শ্রাবণী।

পরদিন মালিনী হরকার বাকা দিয়ে শ্রাবণীর দূর ডাকলেন। ভয় পেল শ্রাবণী। হরতো এখনই খোঁচা মেয়ে মালিনী বলবেন—রাজনন্দিনীর সকাল দিন দিন বেলার হচ্ছে!

কিন্তু না। মালিনী বাসিখুনি মুখে ডাকলেন—
আজ জোব অস্বস্থি, আমাকে প্রণাম করবিনে!

লজ্জার ঘেন এইটুকু হয়ে বেশ প্রাণী। এগণ্য করবার সমর্থ আর নিজেও সংযত রাখতে পারল না।
কম্পের মালিনীর গায়ের পাতা তিকিয়ে দিল।

—ওঠবার নামটি নেই!

ওঠ, ব'লে তিনি ঘরের ছাত্ত ধরে টেনে তুললেন—
ও কী, আকস্মিক বিনে কি ঠায়েতে আছে! কিশোর
হুগে মা!

—হুগে কিছু নয় মা। ও কিছু নয়।

—শোন, ছুটকে সঙ্গে করে একবার বাজার বেতে
হবে! জামাইবাবুকে বলে দিয়েছি যে, পিত্র, ছোটটি
দবাই আনবে। এখানে তোমার অগ্রহিনে নেমন্ত্রণ পথারই।

মা আসবেন! পুলকে প্রাণীরা মন মধুর হয়ে
গেল ঘেন।

মা আসবেন! কিন্তু তুমি যে হলো না, যেহেতু
অগ্রহিনে কবতে নেই, তবে কেন আজ এতকাল পথে—

—আরে পাগলী তুমি কি আমার শুধু ঘেরে।—
তুমি ছেলের বাড়ি। যে এখন ছুট কাটতে হবে না।
হাত চালিয়ে সকালের সকালের পাট চুকিয়ে ক্যাল,
ওরা এসে পড়বে যে! আমি সেই জোর থাকতে
উঠছি। কতোবার কাকের ঠাকে মজব রেখেছি,
যোর খুলবি। ডাকি নি, কি জানি দাত বেগে পড়াওনো
করে একটু খুঃখাঙ্গিল বলে।

হরষে হবে বেশ প্রাণী।

বাক্যের পথে চলতে বাতবার মিছের মনে লজ্জ
হবার সংকল্পটা ঝালিয়ে মিছিল। হঠাৎ একবার
টারি, থেকে 'বিবি বলে কে ডাকল? ওকে।
দিল।

পাড়িখানা ধামিয়ে ম'হিমারজন বললে— কোথায় যাক?
—যাকারে।

ম'হিমারজন প'ড়ি থেকে নেমে পড়লেন—চলো
আমিও যাবো।

তারপর বললেন তার দবকার নেই, এই ছোটটিকে
মিমে আমি বাজার করে আসি তোমরা তাইবোনে
যাচ্ছি দাত।

কোন আপত্তিই গ্রাহ্য করলেন না তিনি।

ওরা তিন তাইবোনে ওপরে উঠতেই মালিনী বললেন
—বেশ হয়েছে। বাজার থেকে কিনে আনলি দুটি!

সাব্যহিনের উৎসবের ঠাকে ঠাকে প্রাণী নিজের
কাছে বসবার ছোট হয়ে বেতে চেয়েছে তত্তবারই
মুদালিনা, মালিনী, ম'হিমারজন, বনানী আর পিত্র
মুখলো সামনে ঠাড়িয়ে ওকে মজুত করে গড়ে তোলা
জনা পক্তি জুপিয়েছে। প্রাণীর বড় না হয়ে উপায়
নেই। একার জন্তে ত ওর নিজের অস্তিত্ব নয়—এহে
সবারই সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে যে প্রাণী। বিজয়-
ব্রতর মুখও মনে পড়েছে, যে বিজয়ব্রত অঙ্ককারের
সহী সে নয়—যে বিজয়ব্রত সর্বশী, যার কাছে প্রাণী
চুষক সেই বিজয়ব্রত। না, বিজয়ব্রতকে প্রাণী বর্জন
করতে পারবে না। তবে? তবে অঙ্ককারের পক্ষ
থেকে আলোতে টেনে আনবে। পারবে না? খুব
পারবে। অগ্রহিন। আজ ওর পুনর্জন্ম? না, না,
পুণ্যনাকে বাব বিবে মজুত হবার মতো আকাশ কল্পনার
ওর আছা নেই! তবে এই অগ্রহিন থেকেই মুগ্ধতার
মুচনা হোক।

ট্রেনটা কো রেই

চলছিল। এক নিমেষে সে
বাগান দিবে দেখা একটা
লাল পাখরের বাড়ী পেরিয়ে
দেল। অব্যাহত স্রোত।
‘আমি ওকে গ্যালারীতে
থেকে কিনেছি, ট্রেনের এক

ক্যানারীর গান

আলো’ষ্ট হেসিওয়ে

অনুবাদ—গীতন কুতু

রেখে দেওয়া হয়েছিল, ট্রেনটা
এত কোরে চলছিল যে
ভয়ে ভবনহীনার শারীরাত
হু হুতনি।

সকাল বেলায় ট্রেন
প্যারিসের কাছাকাছি এসে
পড়ল। হাতবন্দু দিয়ে বেরিয়ে

আমেরিকান মহিলা বাড়ী বলে উঠলেন, ‘ওর জন্য
খরচ পড়েছে বেড়ে উল্লস, তবে সত্যি শৃঙ্খর গায় ও’
ট্রেনের মধ্যে অত্যন্ত গরম। ঘোলা কানাল দিবে
কোন ঠাণ্ডা হাওয়াই ভেতরে ঢুকছিল না, মহিলাটি
কানালার পর’। নানিয়ে বিলেন। সমুদ্রটাকে দেখার
আর উপায় হইল না। এমন কি দু একবারের জন্যও
নব।

ট্রেনের গতি করে এসে ও বাসেই টেনেবে থামল,
গাড়ীটা এখানে পঁচিল মিনিট ধারবে। আমেরিকান
মহিলাটি একঘণা ‘ভোল মেল’ আর আর বোতল জল
কিনলেন। বেবে স্ট্রিকের ওপর দিবে একটা পায়চারি
করলেন, তবে তিনি তাঁর বগীর শিঁড়ির কাছেই ছিলেন
কেননা কান্দু এ এখন গাড়ী বারো মিনিটের জন্য
যেবেছিল তখন কোন সিমাল না দিবেই গাড়ীটা
ছেড়ে দিবেছিল। তিনি কোন প্রকারে গাড়ীতে উঠে-
ছিলেন। মহিলাটি কানে কম শোনে, তাঁর মনে হচ্ছিল
যে গাড়ী ছাড়ার সংকেত হারত সেওয়া হয়েছিল কিন্তু
তা তিনি শুনতে পান নি।

ট্রেন মাসেই টেনে হাড়ল অঙ্কর হয়ে আসছে।
সন্ধ্যার পর ট্রেন আভিগমন’এ পৌঁছল। বাড়ীরা
ওঠানো করল।

এরপর সেলুনের কেপটীর গাড়ীর সেওয়ারে বসে
থেকে তিনটে বিছানা টেনে বের করে বিছানা করে
দিল। রাতে আমেরিকান মহিলাটির ঘুম এসে না,
ট্রেনটা রাতিতে ঘুম কোরে চলছিল আর তিনি ঐ
পতিভেই রাতিতে হারুন ভব পাচ্ছিলেন। কানালার
পাশেই তাঁর বিছানা করে দেওয়া হয়েছিল, ক্যানারীর
বাটার চারপাশে কাপড় জড়ানো, ওঁতাকে হাড়ার উপর

আবার পর আমেরিকান মহিলাটিকে ভালোই যেবাচ্ছিল,
শারীরাত জাগরণের পরও তাঁকে আমেরিকান বলে
চিনতে কষ্ট হচ্ছিল না, তিনি পাখীটার বাটার ওপরে
কাপড়টা তুলে নিয়ে ওকে রোশ্বুরে দিবে স্নাতকরণের
জন্য ট্রেনের রেস্তোরাঁর গেলেন, তিনি কিত্রে এলেন।

‘পাখীটা আলো ভালোবাসে, ও এখনই গাইতে
শুরু করবে,’ আমেরিকান মহিলাটি বললেন, ক্যানা-
রীটা একবার ডানাতুলো নাড়ল। আমি চিরকালই
পাখী ভালোবাসি, আমার মেয়ের জন্য এটাকে নিয়ে
দাচ্ছি, আচ্ছা, ওবে গাইতে শুরু করল,’ মহিলাটি
চৌঁচরে উঠলেন।

ক্যানারীটা কিচর-মিচর করতে লাগল ও চৌঁচর
নানিয়ে পালকগুলো ট্রাকেরাতে লাগল, ট্রেনটা প্যারিস
পহরের বাইরের দিকে এসে পড়ল, গাড়ীটা একবার
একটা বদী আর একটা দলদ্বারিত বাগানের মধ্যে
দিবে এগিয়ে চলল, মনে হচ্ছিল এখনও প্রাতঃরাশের
সময় হইনি, কয়েক মিনিট হল আমি আর আমেরিকান
মহিলাটির কথার কান নিই নি, উনি আমার স্মার
গলে কথা কইছিলেন,

‘তোমার স্বামীও কি আমেরিকান?’ প্রশ্ন করল
আমেরিকান মহিলাটি আমার স্মারকে,

‘হ্যাঁ, আমরা দুজনেই আমেরিকান,’ আমার স্মার
জবাব দিল,

‘আমি ডেবেলিয়ার তোমরা ইংরেজ,’

‘ও, না,’

‘সম্ভবতঃ আমার ক্রৈয়বদার করার জন্যই আপনি
ওরকম ভেবেছিলেন,’ আমি বললাম,

আমেরিকান ভবনহীলা কিন্তু কিছুই শুনতে পান-

নি। উনি ট্রাটের ভাষা দেখে কথা বোঝেন, আসলে উনি পুরোপুরিই বধির, আর আমিও কথা বলার সময় ও'র দিকে তাকাই নি আমার মূখ ছিল জানালার দিকে, তাই উনি আমার স্ত্রীর সঙ্গেই কথা বলছিলেন।

"তোমরা দু'জনই আমেরিকান বলে আমি গভাই বুঝেছি, আমেরিকান পুরুষেরাই সব চেয়ে ভাল স্বামী হয়," আমেরিকান মহিলাটি বলেন, জানো এই আমার কন্টিনেন্ট হোটেলি। আমার মেয়ে ভিত্তিতে একজনকে প্রেমে পড়েছিল," একটু খেমেই আমার বললেন, আমি অবশ্য তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছি,"

'সে কি আখ্যাতটা কাচিয়ে উঠেছে?' আমার স্ত্রী প্রশ্ন করল।

'আমার মনে হয় না, সে কোনকিছু খাব না, ভালো করে খুঁয়োও না। আমি অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু সে কোন কিছুতেই মন দেয় না। তাই বলে ত' আর তাকে আমি একজন বিশেষীর সঙ্গে নিয়ে দিতে পারি-না।' একটু খেমেই আমার পুরুষ করলেন, আমার একজন বিশেষ বন্ধু একবার বলেছিল কোন আমেরিকান সন্দের পক্ষে কোন বিদেশী পুরুষই ভালো স্বামী হয় না,"

'না, তা আমার মনে হয় না,' আমার স্ত্রী উত্তর দিল।

ট্রেন গ্যারিদ পথের ভেতরে এসে পড়ল, আমেরিকান পুরুষেরাই সব চেয়ে ভালো 'স্বামী হয়' আমার লসেন, এই মহিলাটি, তারাই একমাত্র পৃথিবীতে বিয়ে করতে পারে,' আমি ব্যাপকসুলো নানাবিধালাম, আপনি সত্যিই হল ভেঁত হেঁতেনে?' আমার স্ত্রী এই মহিলাটিকে জিজ্ঞাসা করল।

'দু'বছর আগে, আর আমার বরের কণ্টের জন্যই

এই পাখীটাকে কিনে নিয়ে থাকি,"

'যে হেলেটির সঙ্গে আপনায় মেয়ের ভালোবাসা ছিল সে কি কাতে সুইস।

'হা! ডেভীর সম্ভ্রান্ত পরিবারেই তার জন্ম, সে এখন এজিনীয়ার হতে চলেছে, এই ডেভীতেই ওদের দু'জনের আলাপ হয়। ওরা একসঙ্গে বেড়াতেও অনেক দূর পর্যন্ত,"

'আমি ডেভী তিনি, আমার বিয়ের পর দু'বছরখানি কাটানোর জন্য ওখানে গিয়েছিলাম,'

'ভার্সে সত্যি তোমরা ওখানে ছিলে? তা বুঝে ভালো, আমি ভাবতেই পারিনি যে আমার মেয়ে এই হেলেটির ঘরে পড়বে,

'জানখাটা গভাই বুঝে ভালো'

'আজ্ঞা তোমরা ওখানে ছিলে কোথায়?'

'আমরা 'ইইজ করোনেল, হোটেল উঠেছিলাম,

'ওটা গভাই একটা ভালো এবং পুরোনো হোটেল' আমরা ওখানে একটা ভালো খরও পেয়েছিলাম,'

আমেরিকান মহিলাটি শেষ গাড়ীটার দিকে একবার তাকালেন, উনি গত রাত্রেই হারুন জব পেয়েছিলেন। মাকে মাকে অস্থিত সব ভাবনাও ভেবেছিলেন, উনি আর এই রকম হ্রুতগতি সম্পন্ন গাড়ীতে চড়বেন না।

ট্রেনটা গ্যার দি লায়নস্বে এসে থামল। কুলিগুলো জানালার উঁকি দিতে লাগলো। আমরা মেয়ে পড়লাম, আমেরিকান মহিলাটিও নানাবিধ আয়োজন করলেন।

কুলি আমাদের বিদ্রোহের একটা ট্রাকে ভর্তি করে গেটের দিকে নিয়ে চলল, গেটে একজন আমাদের টিকেট দুটো নিয়ে দিল।

গ্যারিদে আমি ও আমার স্ত্রী কিংকিলাম পৃথকভাবে বসবাস করার জন্যে।



যে কোনো ভারতীয় ভাষায়

আপনি টেলিগ্রাম পাঠাতে পারেন



অবে সেননাগরী লিপিতে তা লিখতে
হবে

ইংরাজী টেলিগ্রামে যে সব স্বযোগ হবিষে পাওয়া যায়, হিন্দি ভাষার অভিন্নতম বার্তা, ভি, লুম্ব টেলিগ্রাম, সংবাদপত্রের টেলিগ্রাম, মাস্তুরের বিশদমূলক সঙ্গ্রাহিকার টেলিগ্রাম, কোনোগ্রাম, টেলিগ্রামের স্তম্ভ লক্ষিত্ত ঠিকান: বেজেটী করা ইত্যাদি নানা রকম বিধে সেননাগরী লিপিতে লেখা টেলিগ্রামেও বর্তমানে সেই সব স্বযোগ হবিষে দেওয়া হচ্ছে। প্রায় ১,৫০০ টেলিগ্রাম অকসেস এই স্ববিধে পাওয়া যায়।

ভারতীয় ভাষায় টেলিগ্রাম পাঠানোর
সুবিধেগুলি কাজে লাগান



আপনাদের আরও সেবা করতে
আমাদের সাহায্য করুন

জা ক ও জা র বিভাগ

DA-60/301

দুঃসাহসী বাখানবোরা।

মাঝ আবার নতুন করে
হল মা মা হ নী ক্যাটেন
যাযুজ ওয়েবের নাম স্বরপ
হিয়ে বিয়েছেন।

বাখানবোরা নিজেও ভয়।
হল কুড়ি। ১৯৬১ সালের
এই জুলাই নারদ্রা হল-

প্রপাতের মুখে কঁপিয়ে পড়ে অক্ষত বেহেই তিনি
ধাবার ফুল উঠে এসেছেন। আর মাযুজ ওয়েব
মণ্ডিতর বছর আগে অধিকল এমনি এক বেলায়
ঘটেছিলেন। কিন্তু নারদ্রার বাঘের যুগ থেকে তিনি
দার ভিরতে পারেন নি।

একখনের বেলা বেলাই থেকে গেল। অগবননের
অন্যে তা হোলো। স্বরপ-বেলা। একজন বাণীনাৎ
হরলেন। অন্তরন হেরে গিরে বিকল হলেন। কিন্তু
সুও যেন বার্ষিকার নবীতটই বড়। কারণ এমন
বীর নববে গড়ে না। সে বুটায় চরম হুঃসাহসিকতার
হবিমিল প্রতীক। এমনি বুটায় রাগতে পারেন
কমাত্র তাঁরাই। বুকুকে হাং মানোতে জীবন বিত্তেও
িহের হুঁটা নেই। যাযুজ ওয়েব নরপকে বরণ করে
ছোকে ভিঝিয়ে বিয়েছেন। তাই যাযুজ ওয়েবে আর
বাখানবোরাতে তাকা আছে।

লভাখীর বাখানবোরা হলেন। তকাল চিত্তায় ও কার্বে।
ওয়েব উন্মিল লভাখীর মাহুব। বালি পারে, কোমরে
পাতারের গোথাক এটে লভাখিক বর্ণককে লভা
হনে অনিচ্ছিত হরিয়ার পা ভাসিয়েছিলেন। আছে
টার সত্তর বহুতা, দুর্ভর মায়স আর আকাণ ছোয়া
মাখপ্রত্যয়। কিন্তু তাতেও হালে গানি মেলে নি।

বিগনে কি করে? বেগতোহা নারদ্রার পাশলাহির
কি আবি অত ছিল? লাকালাকি, বাণবাণিতে
জায়ায় ছিল, তাঁটা ছিল না। ১৯২ ফুট নীচে বাঘে
হাছড়িয়ে পড়ে বিপুল অলরাশি কেবলই ফুটলি আর
সেছিল। আর গবের বাঘা উপবত্ততপিকে কেল

খেলাধুলা

মরণ-ঠাপ

অক্ষয় বসু

হুকাছিল কিবিকিকে।

নারদ্রার সর্বমা লা
যেমাঝ! সেই যেমাঝে
আতন বহিয়েছিল ওয়েব।
পলকের অহিসংযোগ।
সকে লকে বোঝানলে তন্দী-
দুত হলো সব। শিলাঘাতে
আছড়িয়ে, তাঁড়িয়ে অবোণ

ওয়েবকে অব্যাহ নারদ্রা বিশে চরম বত্ত। বিনকরেক
পর তুহাতে বখন নরবের উদ্ধার পেল তখন আর
ওয়েবক ভিনে নেবার মতো চিত্র লব্বত অবশিষ্ট নেই।
কথা ছিল, নারদ্রাকে জয় করতে পাবলে ওয়েব পায়েন
লক্ষ ডলার পুতকার। কিন্তু তাঁর কথা থাকে নি।
তলহীন বাঘে তলিয়ে বাঙরা সেই কথার স্মৃ উদ্ধারেও
তাই ওয়েবের উত্তরাধিকারীরা ভগনা পান নি।

সেদিন ওয়েবকে সাহায্য করতে বিজ্ঞান এসিয়ে
আসে নি। আজ বাখানবোরা প্রয়োজনে
বিজ্ঞান তার কল্যাণ হস্ত প্রদর্শিত করেছে।
বাখানবোরা তাই নিজের হাতে এক হুতকৎ বেচুন
হানিয়ে কেপেন। ইন্দ্রাতেও লক্ষ কাঠামোর ওপর পুক
ববাবের আতরণ। তার ওপর আবার ইন্দ্রাত, ববাব
ও বাতর চার। নিশ্চিত বর্ণকৌপল। সে কৌপলে
উত্তর নারদ্রার সর্বমালা যেমাঝও বাগ, মান্দো।

বহু বেচুন প্রপাতের অলরাশির সঙ্গে বাঘে গড়িয়ে
পড়ে কিছুক্ষণ লাকালাকির পর খাতহু হলে সময় বুঝে
বোতায় টিপে বেচুন উদ্ধৃক করে বাখানবোরা স্মৃ
চিত্তে, অক্ষত বেহেই হাইরে বেরিয়ে আসেন। হুখে
টার তখন বিলম্বীর হালি।

যাযুজ ওয়েবের বিজ্ঞানের আশীর্বাদে কোপানো,
কঁপানো 'হুকাবত্ত' ছিল না সেই ১৯৮০ সালের ২৪শে
জুলাইয়ের অন্তত লরে। তাই নারদ্রার উন্নয় আনবর্তে
জীবন আহতি দিয়ে তিনি তাঁর বেয়ালের খের
খিটরেছিলেন।

কে এই যাযুজ ওয়েব? এক আত্মঘাতী বেয়ালে

হিনি যেতে উঠেছিলেন? নিবোধ? বিকৃত মজিৎ? হরতো তাই। তবুও তাঁর নিরুদ্ভিত্যর দ্বারা আছে। এমন 'পাগলোরাই পারেন হুঃসাহ্যকে লক্ষ্য সাধ্য করিতে।' অনন্তব্যক লক্ষ্য করে তোলায় তাক সাগানো নকীর রাখতে।

সমকালীন হুমিয়া আরও একদিন গুয়েবেক পাগল বলে ঘেসেছিল। যে দিন (১৮৭৫ সালের ১০ই আগষ্ট) সাত বক্টা টানাপোড়েনের পর অপরাহ্নের ইংলিশ চ্যানেলকে সেশাম বাধিতে গুয়েব উঠে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন বেহরকীলের নৌদ্বার। কিয়তাবপর? মাত্র এগারো দিনের ব্যবধানে এই 'পাগলই' কি কাওই না বাধিয়ে ফুলেছিলেন।

এসাবেদিন পর, ১৮৭৫ সালের ২৪শে আগষ্ট বেলা ১২-০৫ মিনিটের সময় ভোতার থেকে গুয়ের আবার কাঁপ ফিলেন অশান্ত ইংলিশ চ্যানেলের নুকে। ততক্ষণে বুক-সাঁতারেরে কৌশলই ছিল তাঁর পরম পাবেয়। সেই হাতিয়ারে জল কেটে, আশ্রয়ত্যায়ে চ্যানেলকে হার মানিয়ে পরের দিন ক্রান্সের উপকূলে আবার ঘনন পারের নীচে তিনি মার্চা হুঁতে পারলেন তখন বড়ির কাটার বেলা বক্টা বেছে একচলিশ মিনিটের হালি।

পূর্বে এতদূর বক্টা ছেচলিশ মিনিটে গুয়ের প্রা'চ চলিৎ মাইল অলপব উত্তরণ করেছেন। যাকপবে প্রত্যাঘাতী আর সেহরসীয়া হলে কাতি হিতে মিনতি করেছিলেন। কিন্তু গুয়েব হাল হাঙেন নি। মরিয়া হয়ে ছুটেছেন লক্ষ্যপথে। তারপর মরণপার অলপার তীরে উঠে ঝাড়িয়ে দু'হাত বাড়িয়ে হুমিয়াকে উপহার দিয়েছেন এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস।

ভোতারের পাড়ে য়াখুদ গুয়েবের আশ্রয় উন্নত দির। ব্রোজে গড়া হুঁদাম প্রতিমূর্তি। তার প্রতিমূর্তির পায়থেনে জলন্ত আধারের অ'চরু—'চ্যানেল উত্তরণে পবিত্র—'ক্যান্টেন য়াখুদ গুয়েব'। সেই মূর্তির সামনে যাবা হুইয়ে একালের চ্যানেল সাঁতারুয়া আশীর্বাণ মাগে। পুতি-তর্পন ক'রে তাহার পুণিবী এখনও যানে অদম সাহসিকতার এই অন্নান প্রতীকটিকে।

বেলাপলাত ইতিহাসে হুগে হুগে বহু চাকল্যকর ঘটনা ঘটেছে। তবু অনেকে বলেন যে চ্যানেল উত্তরণে য়াখুদ গুয়েবের সাকলোর নকীরই সে ইতিহাসের চকলতম অধ্যায়। আর সে চাকলোর সাকল নিজেই ছিলেন নিজের প্রেরণার উৎস।

ইংলন্ডের শর্পপাতার এক মথবিত্তের ঘরে তাঁর জন্ম ১৮৪৮ সালে। বাপ-মা, সাততাই ও চার বোনের পরিবারে একমাত্র স্বামল ফেলে য়াখুদ। ভরভর ছিল না। যাঁহে চকুতে, যাঁহাড়ে উঠতে, অচকার হারে বাতাবিকৃত সেতর্প নকীরে সাঁতলাতে কোনো সতোচ ছিল না। কেউ দেখায় নি, তবু সাঁতারে তার হাত পেকেছিল এমন যে এবদিন ভুতর এক তাইকে হার হরিয়া থেকে বালক য়াখুদই উদ্ধার করে নিয়ে আসে।

যয় বাড়তে বাপ-মা কে না জানিয়েই নৌবাহিনীতে যোগদেন গুয়েব। সেখানে 'বাহিন্যা' ভাষায়ে থাকতে আবার এক পতীক্ষার আছান। বড়ের কাপটীর সন্মতের সেদিন কৃত্ত অগত্য মূর্তি। জলে পড়ে গিয়েছিল এক হতভাগ্য। সঙ্গে সঙ্গে য়াখুদকও কাঁপ ফিলেন। তারপর বক্টাকরেক ধরে সাঁতাক আর সন্মত, ধনে আব মানুয়ে টানাতারি। সে হতভাগ্য তো আপনই তগিয়েছিল। এখিকে গুয়েবও বার বার প্রায়ে। বড়ের হুগে নাবিকমেৎ জলে নামার ভয়সা ছিল না, নৌকা ভাগাবার পথ পর্বত কৃত্ত। শেষ পর্বত হড়ি কেসে গুয়েবকে উঠিয়ে আনা হয়।

সাধারণভাবে নাবিকবা তাপ্যামানে। কিন্তু গুয়েব নিজের ভাগ্য নিজেরই পড়েছিলেন। আর সেই পূর্বেই সাধারণ নাবিক থেকে একেবারে গিয়ে বলেন 'এম'বেক' কাহাজের কাপ্টেনের আগমনে।

কিন্তু তাকেই কি লম্বই থাকে হার? চাকলোর বোরাক জোগাতেই বেন তাঁর পুণিবীতে আবির্ভাব ঘটেছিল। চাকলোর হুগে তাঁর চ্যানেল সাঁতারকে ঘিরে যাকপবে অবিদ্যার সাঁতার তাত সবশেষে তারপ্রা'র কাঁপ বেগুয়া।

তাঁর আগে মরণ-কাঁপে হাত হিতে, যন হিতে আর কেউ সাহস পান নি। গুয়েবের সে হুঃসাহস ছিল কিন্তু সাধারণ ছিল না। সে সাধারণ কাকর কোন দিনই ছিল না। আকও নেই। আর সেই বলেই গুয়েবের জীবন বিস্মিতি হলো অপরিণত যবনে।

তা বাক। জীবনরীপ নিজে বেলেও য়াখুদ গুয়েবের অভিজ্ঞ এখনও বিদ্যমান হয়ে যায় নি। যাবেও না কোন দিন। যেহে সেই বটে কিন্তু তাঁর অপরাহ্নের প্রাণের উক ছোঁয়া প্রাণময় এই পুণিবী এখনও অলুতব কহতে পারে বৈকি। ভিবহিনই শারবে।

কাহিনী : বিবৃত্তি বৃন্দ

রঙ্গ জগৎ

কাকত মূল্য

ঐক্য

উদার করলেন তিনি তাঁর
ব্যক্তিগত। অন্যি ঠাকুর
কিছু এই জোটা বিখ্যাত
উপকারেও অর্থ দ্বলেন না।
সরল ভাষণ ভাবল ত্রুষ্ঠাকরণ
টাকে বিবাহ করতে চায়।
এই আশঙ্কায় তিনি লুকিয়ে

মুখোপাধ্যায়, প বি চা ল না :
নির্ধন দ্বিত, সলীত : নির্ধন
চৌধুরী, চিত্রনাট্য : নৃপেন্দ্রক
ও নির্ধন দ্বিত, চিত্র প্রচল :
বাহানন্দ সেনগুপ্ত, পৃষ্ঠ প্রচল :
বৃণাল গুহঠাকুরতা, সত্যেন
চট্টোপাধ্যায়, অঙ্কিত সরকার। অভিনয়যোগে বালকদ্বী
দেবী, ছবি বিশ্বাস, বিকাশ বাবু, তাহু বন্দ্যোপাধ্যায়,
বাসবীন্দ্রা, গীতা দে, দাটাব পৌতন প্রভৃতি।

জনপ্রিয় কৌতুক শিল্পী তাহু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবেশিত
এই ছবিটি চরিত্রবোধের মনোবল্লব করতে পেরেছে বলে মনে
হয়। মানসিক আনন্দবাহনের লক্ষ্যই লোকে ছবি দেখে
থাকে। "কাকত মূল্য"র বিচিত্র, নানা রসের মধ্যে এর
পর্দা হাত্তরল চরিত্রবোধ আনন্দ চিত্তেই প্রচল করেছে।

কাহিনীর শুক উনবিংশ শতকের বাংলা দেশের একটি
গ্রাম। তখন বিধবা-বিবাহ আইন পাল হয়েছে।
বিশ্বাসগরের সমাজ-সংস্কার-আন্দোলন আন্দোলিত হয়ে
একদল যুবক চাইছে সেই আন্দোলন বাস্তবে রূপ
দান করতে।

আর অগ্রদিকে আছেন কমিটার পরিচালিত সমাজের
রক্ষণশীল ব্যক্তিগণের দ্বারা এই সংস্কার প্রচেষ্টাকে বিচার
করছেন ইংরাজী শিক্ষার সুকল হিসাবে। এবং তার
বিরোধিতাও করছেন। এই কমিটার পুছেই সংঘর্ষ আনন্দ
হয়। কমিটারের শিক্তি জাতুল্য দ্বন্দ্ববাহারণ তার
দ্বন্দ্বের লক্ষ্য দৃষ্টিতে অংশ সহজেই ত্যাগ করল।

এই ঘটনার কাহিনী মোটামুটি কেন্দ্রীভূত হয়েছে
গ্রামের এক ত্রিষ্টাচারী উদারচিত্ত বহিঃ ভাষণ অন্যি
জ্ঞানের পরিবারে। তাঁরই গোঁরোহিত্যে গ্রামের প্রথম
বিধবা-বিবাহ অর্জিত হয়। এই ঘটনার পরে বিরোধী
ল-পরিচালিত দ্বন্দ্বতা বন্দ অন্যি ঠাকুরের দ্বারা
রাজন সাসাতে আসে তখন ঘটনাস্থলে দ্বন্দ্বিত হলেন
দ্বন্দ্বি ঠাকুরের বড় তালিকা।

বিধবা ত্রুষ্ঠাকরণ। বিপত্তী পুর্বোদিতক ও তার

লুকিয়ে বেড়াতে লাগলেন। ভাষণের সংস্কারে দ্বন্দ্ব
মিনি ধবে আছেন তিনি হলেন সেই ভাষণ-বিদ্বিত।
ত্রুষ্ঠাকরণ। ঐ সংস্কারই শুধু নয়। এই কাহিনীকেও
নির্ধিত করেছেন তিনি। কি করে ত্রুষ্ঠাকরণ দ্বন্দ্বতায়
লক্ষিত অন্যি ঠাকুরকে বিচারে একটি লক্ষ্য থেকে উদার
করে তার মধ্যে সঙ্গে দ্বন্দ্ববাহারণের বিবাহ ছিলেন।
এই-ই মধ্যে এ কাহিনীর নাটকীয় পরিণতি।

বাংলা দেশের অতীত কালের সমাজ সংস্কারের
একটি প্রচেষ্টা কাহিনীর পটভূমি। সেই প্রচেষ্টা কেন্দ্র
করে ধীরে ধীরে দ্বন্দ্বতার পর্ববিত্ত হয়, আদ্য সে
পুর্বোদিত ইতিহাস হলেন তার পটভূমি একটি মূল্য
আছে। কব-সাহিত্যের ভেতর দিয়েই সেই প্রচেষ্টার
মূল্যবান নিত্যর সত্য; ছবির ভিতর দিয়েও। বন্দবিত্ত
থিকে এর সার্থকতা অনর্থক। পটভূমিকে এত বড়
করবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তার কলে কাহিনীর
ভাবগাথা সুরক্ষিত হয় নি।

অনেক ক্ষেত্রে ঘটনা ও সংলাপের ক্রটি পরিলক্ষিত
হয়েছে। বালক ত্রুষ্ঠাকরণী নবায়ন কিশোর শিল্পী শ্রীমান
পৌতন (তাহু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র) দ্বন্দ্বর অভিনয়
করেছে। উপযুক্ত শিক্ষা পেলে শ্রীমান্দ পৌতন তবিত্তে
একজন দ্বন্দ্বী শিল্পী হয়ে উঠবে।

ত্রুষ্ঠাকরণের কৃদিকায় বালকদ্বী দেবীর অর্থ
অভিনয় চরিত্রের মন লক্ষ করেছে। ছবির একটি প্রধান
অংশ তিনি একাধিক অর্থে ভরে বেগেছেন। বালকদ্বী
দেবীর (ত্রুষ্ঠাকরণপ্রণে) এই অভিনয়টি চরিত্রা লক্ষ্যে
ভুলতে পারবেন না বলেই মনে হয়।

বিকাশ বাবু রুচকী দ্বন্দ্বন তালী-বোথালের চরিত্রটিতে



কত গ্রামে এক সের হয়?

মেট্রিক ওজন এখন চালু হয়েছে। মেট্রিক ওজন অনুযায়ী দাম বলা হয়। কিন্তু ভবু সেনগুপ্তের সময় এখন পর্যন্ত বিরক্তিকর হিসেব করতে হচ্ছে।

কেন?

কারণ মেট্রিক ওজনের মূল স্কেলেটা কাজে লাগানে হয় না। পুরাণে ওজনে অথবা পুরাণে মাপের ভিত্তিতে মেট্রিক ওজনে জিনিষপত্র চাওয়া হয়।

১ সেরের ওজন ৯৬০ গ্রাম

১ পাউণ্ডের ওজন ৪৫৪ গ্রাম

জিনিষপত্র চাওয়ার সঠিক পদ্ধতি হল:

১ কিলোগ্রাম (১,০০০ গ্রাম)

৫০০ গ্রাম

এই রকমভাবে জিনিষ চাইলে সেনগুপ্ত যেমন সহজ হয় তেমন হিসেবেও কোন গোলমাল হয় না।

আপনার জিনিষপত্র নিন

পূর্ণ সংখ্যা

অর্থাত্

দশের গুণিতক

মেট্রিক একক

এতে আপনার ও ব্যবসায়ীর
উভয়েরই সুবিধে

ভারত সরকার কর্তৃক প্রচাৰিত

প্রাকৃতিকের অকর্মণ্য ও বৈশাখের পুষ্করী ভাষা
হযোগাধ্যায় মাঝে মাঝে রূপকল্পের ভাসবার
সংস্রাব জুগিয়েছেন। এবং তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন
অতুলকুমার প্রকৃতি শিল্পী। মিষ্টাচারী কিন্তু দৃঢ় চিত্ত
মনাফিঃকরের কৃষিকার ছবি বিশ্বাসের অভিনয় ভালই
য়েছে। কন্যার চরিত্রে বাসবী মন্দীর অভিনয় সুন্দর
য়েছে। বিভিন্ন মুহূর্তে নারিকার মনোভাব তিনি সুন্দর
রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। অমিলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
অভিনয় চলনশই।

মহল দ্বিত, অপরূপ দেবী, তুলসী চক্রবর্তী নীতা বে
প্রকৃতি সু-অভিনয়ই করেছেন। নির্মল চেতুর্দীর আবহ-
বায়ী সত্যিই অপরূপ।

সঙ্গীতগণ ভালই হয়েছে তবে বাউল গানের অত
হিস্যাতর কোন প্রয়োজন ছিল না। গান গেরেছেন
—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, নির্মল চেতুর্দী, ও মিষ্ট-
গানভণ্ড। চিত্রনাট্য পরিচালক হিলাবে শ্রীচৌধুরী
হস্তিনকম পাখার যোগ্য।

সামান্য সেনগুপ্ত আলোকচিত্র গ্রহণের কাজে সুনাম
সম্পন্ন বৈশিষ্ট্য। সুনীল সংকারের শিল্প নির্মাণ ভালই।

টুকরো খবর—

মহাশব্দ: চলচ্চিত্রের জগতের 'ন্যাংগ' ও
টপন্যাস জগতের একটি চিত্র নির্মাণ করেছেন।
পরিচালনা করছেন মহল চক্রবর্তী। প্রধান কয়েকটি
চরিত্রে অভিনয় করেছেন—উত্তমকুমার, অরুণভা
মুখোপাধ্যায় বাগ্যোহন চট্টাচার্য, অমর সাংসী প্রকৃতি।

বিষয় বোধ প্রোডাকসন এর প্রথম ছবি 'বু'র
কাজ শুরু হয়েছে বাগ্য কিম্বা টুকরোতে। চিত্রনাট্য
সেবন্যায়গ পুত্র। চিত্রনাট্যে ছবি বিশ্বাস, বসন্ত চৌধুরী,
বিবলিং, বিকাশ রায়, সান্বিতী চট্টোপাধ্যায়, অমৃত্যু পুত্র
প্রকৃতি। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব মুখোপাধ্যায়।

'মনসা শিকড়' তাঁদের 'বদলিনি'র পর 'বাসর'
নামে একটি চিত্র নির্মাণের আয়োজন করেছেন।
পরিচালনার কাজিক চট্টোপাধ্যায়।

চলচ্চিত্রের মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সেনগুপ্তসিপের
কৃষিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত সভ্য কচিনীল
শেষ এ ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোর হতে করা হয়ে
থাকে। কারণ এ ব্যবস্থার জটিলিত্যটি আত্মীয়
চরিত্র পঠনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বাস্তবিক আকার ধারণ
করতে পারে। তাবতে সেনগুপ্তসিপের ব্যবস্থা দীর্ঘকাল
বাণীব্যতির পর আজও সম্পূর্ণ নব। বিগত মাসের
শেষ সপ্তাহে এ সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা
হয় ছই অধিকার মধ্যে। প্রয়োজনবশত এ সম্পর্কে অধিক
বিস্তারিত সঙ্গ সঙ্গকারের মিকট অভিযোগ করেন। সমস্ত
চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে "উৎকৃষ্ট সময়ের" এক বিশেষ
কৃষিকা আছে। সেনগুপ্তসিপের সঙ্গসপ্তের অধিক
বিস্তারিত কলে অনেক সময় সমস্ত চলচ্চিত্র শিল্প বিশেষ
ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ক্ষতি বত নীচ হুত হয় ততই
মহল। আর এক সংসারে প্রকাশ যে, সঙ্গসপ্ত: দক্ষিণ
ভারতের কোন এক অবলম্বিত বিচারপতি বা
গাণ্যপাল চলচ্চিত্র পুংকার প্রধান সংসার সভাপতি
সেনগুপ্তসিপের সভাপতি হবেন।

এতকাল প্রের্ষকতাই সিনেমার টিকিট ছেপে
আসছিলেন। এবং সঙ্গসপ্তের প্রাপ্য প্রের্ষিকার
দেই বত তাঁরা নেটোতেন। এ ব্যবস্থার নীচই বোধ
হয় পরিবর্তন হবে। জুগলের এক সংসারে প্রকাশ
সেইবানকার প্রের্ষক মহল ও প্রের্ষ সঙ্গসপ্তের মধ্যে
এ সম্পর্কে কথাবার্তা চলছে। তাঁরা আশা করছেন যে এই
মজুন নিয়মবিধির কলে প্রয়োজনীয় টিকি বৈতরা
বহু হবে।

সত মাসের শেষ সপ্তাহে সঙ্গসপ্ত চিত্রের পরিচালনার
"বদলিয়াল ভাণ্ড" এর সঙ্গ সঙ্গসপ্ত হয়। বৈশাখিক
কাহিনীটির প্রধান কৃষিকার মনোভাব বসন্ত দ্বিত ও
দেবী চট্টোপাধ্যায় অতীর্ষ হচ্ছেন।

ভারতের চলচ্চিত্রজগতের তিন রাষ্ট্র—সত্যজিত
রায় অক্ষিত বহু ও সর্বোচ্চ সেনগুপ্ত পত মাসের শেষ
—সত্যজিত রায়ের জগতের সঙ্গসপ্ত হয়। তাঁরা

প্রত্যেকেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পারিহাসিক নিয়ে বিশেষে গেছেন।
আমরা এঁদের সকলের জন্য বিশেষ পৌরস্বয় বোধ করছি।

বেদেরকারী এক দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে পশ্চিমবঙ্গে সিনেমা
টিকিটের হার নীচই হুঁত পায়ে। বেদের বুদ্ধদেব বার্ষিক
কথা বিশেষভাবে করে পশ্চিম বাংলায় লোক জনের কিছুই
নয় আদর্শে এটাও হয়ত সইবে। তবে এখন প্রায় এ নতুন
ব্যবস্থার কলে সিনেমা নিয়ে নিয়োজিত কর্মীদের অবস্থার
হেরফের হবে কি? সাধারণতঃ ব্যক্তি বিশেষ কিছু হবে
না। কারণ এর পলক বা কর্মীদের অবস্থার উন্নয়নের প্রায়
টিকিট সিনেমা টিকিটের দ্বারা কমা বা বাড়ার মধ্যে অর্জিত
নয়। সর্বপ্রথম প্রয়োজন কিছুকাল আগে প্রকাশিত নতুন
মহিমার প্রবর্তন করা। বহি তে সম্ভব না হয় তবে
লাভের গুরুত্ব সম্ভবতঃ পিঁপড়েটাই হবে।

এবারের বস্তার তত্ত্বদীক্ষার দক্ষিণ ও পশ্চিম
ভারতের বিশেষ কতি হয়েছে। এই ক্ষেত্রেও শুধু
বস্তার দৃষ্টান্ত নয় বরং সূত্রাধীন জীবন নষ্ট হয়েছে।
সংসারপথে এ নিয়ে যথেষ্ট বস্তারবস্তার প্রকাশিত হয়েছে।
সরকারকে নানান দিক থেকে সম্মান করার চেষ্টা করা
হয়েছে যাতে করে তত্ত্বদেব এ বস্তা কোথেকে মানুষের
তরফ থেকে যেন কোন প্রকারের অবহেলা না থাকে।
তবে একটা পলক হয়তো অনেকেরই চোখে পড়েনি
যে এই বস্তার কলে পূণ্য কল্যাণের কিছু প্রভাভে এর
কল্যাণকাজ আসিটি কিছু-এর প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে।
আর তার দ্বারা এককো পলক হাজার টাকা। যেন হয়
এ কতিপূর্ণ হতে বেশ কিছুকাল সময় লাগবে। এ ছাড়া
পূণ্য পলকের পাঁচটি সিনেমা ব্যক্তি বস্তার—অলঙ্কার,
ডেকান, হিন্দুবিহার, তাহা বিলাস ও বিহার এই কতিপূর্ণ
নিমজ্জিত হওয়ার কলে বেশ কিছু টাকার কতি হয়েছে।
এ কতিপূর্ণের সরকার এবং গ্রহণ করবেন কিনা সে
বিষয়ে আমরা এখনও স্থিরনিশ্চয় নই।

পাঞ্জাবী সুবা গঠন ও তার গুরুত্ব আদর্শ গমন
আমিয়ার সংসারপথের এক পলক দ্বারা। ক'বছর
আগে পূর্বোক্ত দ্বিতীয় দ্বিতীয় পলক দ্বারা একে এ

আমোদনের সূচনা হয়। আর আদর্শ বহুকে আবেশন
নিবেশনে, ব্যক্তি তার সিং এর আদর্শ গমনে পূর্ণ
পাঞ্জাবী সুবা গঠনদ্বারা পশ্চিমবঙ্গের এক রাষ্ট্রনৈতিক
আমোদনের রূপ গ্রহণ করেছে। তবে এ নিয়ে যে
হাসির ছবি হতে পারে একথা বোধহয় গুরুত্বপূর্ণের
ছবি প্রকাশিত হবার আগে কেউ ভাবেন নি। হাত
রসিক গুরুত্বপূর্ণ বর্তমান পাঞ্জাবী সুবা আমোদন
নিয়ে এক হাসির ছবি তুলছেন। কতিপূর্ণটি হোটেলটি
এই রকম। তিন তাই—একজন হিন্দু, অপর দুজন
ব্রাহ্মণে মূলসময় ও লিখ। দ্বিতীয় পলকের ব্যাপার
লিখ তাই—দ্বিতীয় পলকের অবস্থি সে গমনে না যে
গীতা পরম্পর তাই। গুরুত্বপূর্ণ নিয়ে মূলসময় তাই
এর কৃমিকা গ্রহণ করেছেন। পোনা থাকে বরং পাঞ্জাবী
সম্পদ এতে স্থান পেয়েছে। দেখা যাক রাষ্ট্রনৈতিক
সমস্যার Film Solution যেমন হয়।

বোম্বাই এর এক সংসারে প্রকাশ যে দ্বিতীয়
পাতিস্থান সরকারের যে চলচ্চিত্র উৎসব অর্জিত হতে
যাচ্ছে তাতে ভারতের তরফ থেকে ১৯৫৯ সালের
Certificate of Merit প্রাপ্ত “পাঞ্জাবী” অংশ গ্রহণ
করবে। দেখা যাক এ ব্যাপারে আমোদকার বস্তার
পুনরাবৃত্তি না হয়।

মাত্রাধিক সংসারে প্রকাশ যে তামিল-হেলেন্ড ও
কানাকা ভাষার অভিনেত্রী যমুনা, তেলুগু ছবি
‘Darya-Barch alu’র (পানী-স্ত্রী) দ্বিতীয় সংসারে
গুরুত্বপূর্ণের এর সঙ্গে অভিনয় করবেন। যমুনা আরও
তিনটি দ্বিতীয় ছবিতে অভিনয় করবেন বলে চুক্তি
বদ্ধ হয়েছেন।

কালিগুণ্ডার দ্বিতীয় রূপারপের কাল সমাপ্তপ্রায়।
বলরাজ সাহানী ও পাঁচ বছরের এক গিন্জী মেয়ে
মূল চরিত্রে অভিনয় করেছে। এ ছাড়া উষা-কিরণ
সম্মান, অসিত সেন, তরুণ বোস অস্ত্রান্ত পার্শ্ব চরিত্রে
রূপ বিশ্লেষণ। সলিল চৌধুরীর গানগুলি আশা করা
যাচ্ছে ভালই হবে।

সম্প্রতি যেহেতু আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রাধান্য হারিয়ে
মূলক ছবি যে প্রদর্শনী হয় তাতে পাকিস্তানের দ্বিধা
"Focus on Sport" সম্বন্ধিত হয়। ছবিটি পাকিস্তান
সরকারের কিং ও পাবলিকেশন বিভাগ প্রকাশিত।

সাম্প্রতিককালে সমস্ত দিক থেকেই চলচ্চিত্র
পরিচালকদের কাছে গঠনমূলক চিত্র গ্রহণের জন্য
আবেদন জানান হচ্ছে। স্বাধীনতা লাভের পর আক
প্রাণ পনের বছর অতিবাহিত হতে চললো। এখনও
যত কিছু ক্রীড়া বিজ্ঞানি আবিষ্কারে প্রতিবছরই সৃষ্টি
করছে। বিনোদ্যাকী পরিচালকদের কাছে এক
আবেদনে বলেছেন যে তাঁরা যেন সব সময় গঠনমূলক
দৃষ্টিকোণ নিয়ে কাজ নাযেন। জীবনে যেহেতু হালি
তামাসা রোমাঞ্চের এক নিখিঁট ছুঁঁকি আছে। তাই
বলে এতে নোংরাবি বা বৌমচেন্দ্রনাভেভিত করার
কোন অবকাশ নেই। কিন্তু অত্যন্ত নির্ভর হলেও
একথা সত্যি যে ভারতীয় চিত্র আক বেশ খানিকটা
আদর্শচ্যুত। সত্তা হালির বোঝাক কোণাতেই ব্যত।
তাই যেন হয় যে বিনোদ্যাকী কথা মনে রাখলে
চিত্র পরিচালকরা নিজেদেরই উপকার করবেন সবচেয়ে
বেশী।

হুইমহল—

পর ১৯ই আগস্ট, বুধবার, বিখবীর প্রবেশনায়

ও প্রিন্সিপাল রায়ে পরিচালনার কোনও হুইমহলে
হুইমহল নাটকটি 'হুইমহল' বসন্তকে অভিনীত হয়।
নাট্য পরিচালনার প্রিন্সিপাল রায়ে অসুখ বসন্তের পরিচয়
হেন। প্রিন্সিপাল রায়ে একজন হুইমহল পরিচালক।
তখনই, অতীতকাল, মহা, ওসমানী ও হোমেরায়ের
ভূমিকায় বসন্তকে সবুজী নীলরতন বোম, পণেশ রায়ে,
অশোক চট্টোপাধ্যায়, পাণ্ডী চক্রবর্তী ও অমর্ত্যপ্রসাদ
অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় হেন। একটি শান্ত ও সৌম্য
পরিবেশে হিন্দীমহলুর ভূমিকায় প্রিন্সিপাল চট্টোপাধ্যায়,
পরাবর্তের ভূমিকায় প্রিন্সিপাল বোমের অভিনয় বর্ণনায়
আকর্ষণ করে। স্বাধীন রায়ে হুইমহল সত্যিকার ও সুনামের
ভূমিকায় সবুজী সৈকত, পটী চক্রবর্তী ও প্রব
হুইমহল রায়ে অভিনয়ের প্রশংসা করা গেল না।
তবে কয়েকটি দৃষ্ট প্রিন্সিপাল চক্রবর্তীর অভিনয় উপভোগ্য
হয়। অমর্ত্য চরিত্রগুলিতে অভিনেতার রাটোমুটি
অভিনয় করেন। বহুদূরপৌঁছে ও আলোকপাতের
কুশলীর প্রশংসা করা গেল না। নাটকটি বাস্তববাহী,
অভিনয়ক বাস্তববাহী হয়।

নাট্যকাহিনীটি মনোমুগ্ধকর কিন্তু সাধারণ আভিলাষ
যেবে দৃষ্ট। শুভ ও বর্তমান সমাজের পরিচোষিত
নাটকটির উপযোগীতা আছে বলিয়া মনে হয়। তবে
সবুজী নাটকটির প্রবেশনায় কেহো পরিচালক প্রিন্সিপাল
নাম সর্বপ্রাণে উল্লেখযোগ্য।



বিংশ শতাব্দী প্রকাশনীর নতুন উপস্থাপনা

সান্তোষকুমার ঘোষের

(সেই আমি

২৫০

চিত্তরঞ্জন ঘোষের

পিপাসা

৩৫০

শ্রীঅমলকব্রত গঙ্গোপাধ্যায়ের

অরণ্য ডাকে এ

মহাভারত

অনেক কাব্যের দিন

(১৯১৩-১৯২১)

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের

আপনার মুখ আপনি দেখ

মৈত্রালী রায়চৌধুরী

স্বপ্ন ও সত্য

(গোবিন্দের আত্মজীবনী)

—বিংশ শতাব্দী প্রকাশনীর অন্তর্ভুক্ত বই—

—উপস্থাপনা—

সমরেশ বসু

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

যশোদাচৌধুরী ভট্টাচার্য

শ্রীমন্ত চক্রবর্তী

ভরতী বসু

অ. বিনোদ সাহা

ভবেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের

রাণীর বাজার

চোরাবালা

সঙ্কীর্ণ

মহামরণ

অবতামসী

নবজন্ম

পাতাল মঞ্জরী

—গল্প—

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

বরনারী

—নাটক—

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

কন্যাকা

—প্রবন্ধ—

মুক্তকর অ. ব. মুখ

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

কাজী নজরুল প্রসঙ্গে

বিভূতিভূষণ

৪০০

৫০০

বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী : ২১, গ্রেন্ড স্ট্রিট, কলিকাতা-৫ :: ফোন : ৫৫৪৬২৭

কার্টিভিতে
ছনিয়ার
সেরা
সাইকেল



র্যালো



রবিনহুড

কী দিন কী রাতে ঘিনিটে ছটিকও
বেশী র্যালো-র সাইকেল পৃথিবীর
কোথাও না কোথাও বিক্রি হয়। তার
মধ্যে আবার সব চেয়ে কদর পায়
র্যালো আর রবিন হুড—কেননা
দেখতেও সুন্দর, চড়তেও আরাম আর
চালু রাখতেও খরচ কম।

SAC. 68 5891

TREAT YOUR HAIR DAILY

with

Chitra

Cantharidine

HAIR OIL

An Excellent
Hair Grower



LAKSHMATH CHEMICAL, CALCUTTA-2B.

প্রবন্ধ পত্রিকা

স্বাধীনতা একবার অভিব্যক্ত করেছিলেন যে বাংলা সাহিত্যের পনের
আনা আয়োজন রসের, মনের অংশ এক আনা । এ সৈন্যদল
যোচাবার দুঃসাহসিক অ্যাল এই প্রবন্ধ পত্রিকা । নতুন চিন্তার
প্রকাশ ও প্রসারকে সংগঠিত করেছে এই পত্রিকা । নবীন
ও প্রবীণ প্রাবন্ধিকদের সম্মিলিত সম্পাদনার প্রতি দাসে
নিয়মিত এটি প্রকাশিত হচ্ছে—সাহিত্য, দর্শন,
অর্থনীতি, বিজ্ঞান, সমাজনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি
বিষয় পত্রিকাটির উপভোগ্য । দলনত-নির্বিন্দ-
শেষে চিত্রাশীল লেখক ও পাঠকদের স্বাগত
জানাচ্ছে প্রবন্ধ পত্রিকা । প্রতি সংখ্যা
এক টাকা ।

২০. গ্রে স্ট্রিট, কলিকাতা-৫

কোন ৪৪-৪৪২৫

কথা মালা

কথামালা পাঠ্যপুস্তকটি মাসিক পত্রিকা নয়। কেবল গল্প ও উপন্যাস
এই পত্রিকার উপভোগ্য। একটি করে উপন্যাস এবং একালের
জটিল বহুমুখিতাকে প্রকাশকর বহু গল্প প্রতিসংখ্যায়
প্রকাশিত হয়।

প্রবীণ ও নবীন শিল্পীদের প্রকাশ প্রদানের বিস্তৃত
পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যপন্থাটি কথামালা।

নতুন লেখকদের এই পত্রিকার রচনা পঠাতে সঙ্গের আমন্ত্রণ জানান
হচ্ছে। নতুন লেখক অর্থে কীটা লেখক নয়, বরং যাই হোক,
পৃথিবীকে নতুন কথা শোনাবার শক্তি ও সাহস দিয়ে
আছে, বাংলা কথা সাহিত্যের অতীত ঐতিহ্য ঘিরা
সফলভাবে বহন করতে সক্ষম এবং বর্তমান
কালে বাংলা কথা-সাহিত্যের দরবারে
সৌরভের স্থান অধিকার করে আছেন
যারা—এ পত্রিকার লেখক
তাঁরাই।

বার্ষিক গ্রাহক টীকা—বার টীকা :: প্রতি সংখ্যার কাম—এক টীকা

: কার্যালয় :

১০, প্রে শ্রীট, কলিকাতা-৬।

কোন—৬৬-৪৪২৬

**আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান
ও ২৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা...**



কৃত্রিম জন্মিত নিম্নলিখিতঃ এতদ্বা-
কস্মেই "সিকলো" শিথিল পদার্থ
অপেক্ষা কম মর্দনশীল পীড়ন,
উদ্ভাব ও দুঃখ দায়ে।

কৃত্রিম জন্মিত পিতৃ বা মাতার
কানি অসুখের ক্ষয় হ্রাস দেয়
হা, তা' দেয়।

সূপ্রা কালি
(স্পেশাল)

নিবৃত্ত মর্দনশীল মানবদ্রব্য

দুগা ইয়াস্ট এক বৈজ্ঞানিক পো: ক্রীকট সি:
কলিকাতা।

**ধনাত্মক
উৎসাহ**



সিগ্ন ও অভিজাত স্বর্ণজিন্সী

স্নাতকো জুয়েলার্স প্রাইভেট লি:

১০৬ জিএস-১০৬, আমার টিএম রোড • কলিকাতা-৬
ব্রাঞ্চ-১৬৮, বহুবাজার ফ্লাট • কলিকাতা-১১
ফোন-১০৬৪ • ১০৬৪ • ১০৬৪

প্রবন্ধ পত্রিকায় নিয়মাবলী

○ পত্রিকার বার্ষিক প্রদ্বক চাঁচা হারো টাকা (দভাক), বাশ্বাবিক হু
টাকা (দভাক), প্রতি দংখা এক টাকা ।

○ বছরের দে কোন দহব প্রদ্বক হওয়া চলে । বহুদা দংখা শেতে
হলে M. O. বা পোষ্টাল অর্ডারে এক টাকা পাঠাতে হবে ।

○ পত্রিকা আওয়ার দ্যাটিকিবেট অব শোশিটিং যোগে পাঠান হবে ।
ডাক বিভাগের গোলদাসে পত্রিকা হারালে কতৃপক্ষ হারি থাকবেন না,
তবে বখাযোগা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।

○ রেজোশিট বা ভি, পি, পি যোগে পত্রিকা নিতে হলে অতিরিক্ত ডাক
বহুদা প্রদ্বককে বহন করতে হবে ।

○ এক্সেস্টের শতকরা ২৫ ভাগ কবিশন দেওয়া হবে এবং পত্রিকা
পাঠানোর দাবতীয় ডাক-বায় কতৃপক্ষ বহন করবেন ।

○ পাঠাবার কয় পত্রিকার অন্য এক্সেস্ট দেওয়া হয় না ।

○ শতকরা দশখানি পদ্য অবিক্রিত সংখ্যা কেহত নেওয়া হয় ।

○ হার এক টাকা পাঠাবে এক্সেস্ট প্রেশীভুক্ত হওয়া চলে ।

বিত্তত বিবরণের অন্য লিখন ।

প্রদ্রা় সচিব, প্রবন্ধ পত্রিকা

২০ প্রে শ্টীট, কলিকাতা

ফোন : ৫৫-৪৪২৫



পৃথিবীতে মানুষ যখন প্রথম আসে, তখন হইতেই সে তাহার চারিপাশের
দৃশ্যাবলী অন্বেষণ করিয়া বাসিতে লেগে যায়। প্রাথমিক দৃশ্য
কার্যকলাপের উপর মানুষ কর্তৃক, যোজিত ছবি ও লেখার বহু মনুনা
প্রত্যক্ষবিদ্যুৎ আবিষ্কার করিয়াছেন।

প্রথমদিকে এই অসংখ্যত সহস্রাত শিল্পীত মূল্যেট এবং বস্তুতাতিক হইয়া
উঠে, বাহা হইতে ইহা ধারণা করা হাইতে পারে যে, মানুষ যোনাই-
শিল্পকার্যে সেই সময়েই কতকটা বাবহারিক জ্ঞানলাভ করিয়াছিল।

সেই দৃশ্যে মানুষ তাহার পারিপাশ্বিক আবেষ্টন সম্বন্ধে কিছু শিখিতে
আবশ্য করিয়াছিল কিনা তাহা বুঝা যায় না, এবং আজ পর্যন্ত তাহার
কোন প্রমাণও পাওয়া যায় নাই।

আধুনিক দৃশ্যে বৃত্ত-শিল্প যেমন উন্নতি লাভ করিয়াছে তেমনই ইহা
তীক্ষ্ণ প্রতিবেদিতারও সম্ভব হইয়াছে। এখন কাজ কেবল শিল্পের ও
পরিণামী হইলে চলিবে না, অধিকতর কাজ বহা সম্ভব ক্রম সম্পন্ন
করাও চাই।

● শিল্পের মূল্য

● শিল্পের উন্নতি

● শিল্পের সমস্যা

লিওনার্ড কার্ড-বোর্ড বক্স ফ্যাক্টরী প্রাইভেট লিঃ
প্রিন্টার্স ও কার্ড-বোর্ড বক্স মেসার্স

১/১, গ্যালিক ষ্ট্রিট, কলিকাতা-৩ ফোন ৫৫-১৮৬১

कथासालार नियमावली

- কথাসংগ্রহের পত্রিকা-নিরীক্ষা এই পত্রিকা-র উদ্দেশ্য।
 - সহ ও উপস্থাপিত হইতে পারে বহু প্রকারিতা হইবে না।
 - প্রতি সংখ্যার একটি সম্পূর্ণ উপস্থাপনা ও কয়েকটি ছোট পত্র প্রকাশিত হইবে।
 - কোন বাৎসরিক সেবা 'কল্যাণ' প্রকাশিত হইবে না। প্রতিটি সংখ্যার বহুসংখ্যক হইবে।
 - ব্যক্তিগত ও উপস্থাপিত সেবার সেবা সমান আকারের সহ সৃষ্টি হইবে।
 - সেবা পাঠ্যের জন্য নিয়ম নাই। যে কেউ সেবা পাঠ্যে পারেন। অনন্যায়িত রচনা কেবল বেওয়া হয় না। রচনা অনন্যায়িত হলে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ বহুসংখ্যক সেবাকে জানাইবে। সেবা সম্পর্কে কোন অসুস্থতাই হইবে বেওয়া হইবে না। সেবা পাঠ্যের ছবি আসে মধ্যে কোন বহু না গেলে সেবা অনন্যায়িত হইবে বলে ধরে নিতে হবে।
 - পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা এক বা দুই হইবে না। বহু উপস্থাপিত প্রকাশের ক্ষমতা প্রয়োজন হলে পৃষ্ঠা সংখ্যা বাড়ানো হইবে।
 - পত্রিকার বহির্ভাগে প্রকাশ টাকা বাটো টাকা (সত্য), বাৎসরিক ছবি টাকা (সত্য), প্রতি সংখ্যা এক টাকা।
 - বহুসংখ্যক কোন বহু প্রকাশ হইবে। নতুন সংখ্যা পেরতে হলে M O, বা পোষ্টাল অর্ডারে এক টাকা পাঠ্যে হইবে।
 - পত্রিকা আওতায় সাইটিকিট অব পোষ্টমেন্স পাঠ্যে হইবে। সত্য বিস্তারিত পোলমায়ে পত্রিকা ছাড়াই কর্তৃপক্ষ হইবে না, তবে বহুসংখ্যক ব্যবস্থা গ্রহণ করি। হইবে।
 - বহুসংখ্যক বা তি, পি, বোপে পত্রিকা নিতে হইবে অতিরিখিত করি করি। গ্রাহকে বহু করিতে হইবে।
 - একটিকে পত্রিকার ২৪ ভাগ করিবে বেওয়া হইবে এবং পত্রিকা পাঠ্যের ব্যবহার ডাক-ব্যয় কর্তৃপক্ষ বহু করিবে।
- (১) পাঠ্যের কন পত্রিকার ক্ষমতা-একটি বেওয়া হয় না।
- পত্রিকার সম্পাদনা পত্রিকার অতিরিক্ত সংখ্যা গ্রহণ হইবে।
 - যাত্রা এক টাকা পাঠ্যে একটি প্রেক্ষিত হইবে।
 - প্রতি বাংলা আসে পত্রিকা তাহলে পত্রিকা প্রকাশিত হইবে।
 - বিস্তারিত বিবরণ করি।

ଅଢ଼ାଏ ମିଟିର, 'ବନ୍ଧାସାଳା'

২. প্রে ইটি, কলিকাতা-৫

କୋଚ : ୫୫-୧୫୨୫

বিংশ শতাব্দীৰ নিয়মাবলী

- 'বিশ্ব শতাব্দী'র বার্ষিক গ্রন্থক টাল (মডার) নয় টাল।
- অঞ্চল মাসে পত্রিকার বর্ষসম্বন্ধ কিন্তু বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রন্থক হওয়া চলে। সাড়ে চার টাকা পাঠের ছয় মাসের গ্রন্থক হওয়া চলে কিন্তু সস্তিক্রিয় মূল্য ছাড়া তাদের শারদীয় সংখ্যা পাঠান হয় না। শারদীয় সংখ্যা প্রকাশের পূর্বেই ছাত্র পর পর দুবার বাধ্যনৈতিক টাল পাঠিয়ে বার্ষিক গ্রন্থক চলেছেন তাঁরা। সস্তিক্রিয় মূল্য ছাড়াই শারদীয় সংখ্যা পাবেন।
- গ্রন্থকরা ইংল্যান্ডে ৮ সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোস্ট অফিসে খেঁজ নিয়ে চিঠি মিলে যথাপন্থক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- গ্রন্থকদের শতকরা ২৫% কমিশন দেওয়া হয়। অবিহিত সংখ্যা ফেরৎ নেওয়া হয় এবং পত্রিকা পাঠাবার ভাক যার কর্তৃপক্ষ বসন করেন।
- লেখা পাঠাবার কোন নিয়ম নেই। যে-কউ লেখা পাঠাতে পারেন। মাননীয় হল কানোনা হয়। অবমাননীয় রচনা ফেরৎ পেতে হলে ঠিকানা লেখা ট্যাম্পন্থক বাম রচনাগত দলকে দেওয়া অস্বাভাবিক অস্বাভাবিক অস্বাভাবিক রচনা নষ্ট করে ফেলা হয়। লেখা ফেরৎ হলে ৫০২২ বেওয়া বা লেখা দুপূর্ক সিদ্ধান্তাবাদের লুপাব বেওয়া



ଆବାହନୀ

ପାଦିକାବେଶ ବାହୋଦୁରୀ

বিংশ শতাব্দী

‘সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই’

বাংলার কৃষ্টি, বাংলার সংস্কৃতিতে নবকাল এক বিশেষ স্থানের অধিকারী। বীর তিমির অগ্নিস্ফুল্গু সরাইয়া নক্ষ্র ভাষার অরুণ আলোর অঙ্গুলি যেদিন আকাশে বাতাসে বিস্তার করিয়া লেব, সেই দিনই বাঙালী মন উৎসবের প্রজ্যোতাময় উদ্গূহ হয়ে উঠে—পারদোষসরে। ইহা তাহার প্রাণের উৎসব। কিন্তু এই পারদোষসর বাঙালীর কাছে শূন্য সেবার্চনা, শূন্য গ্রাম-জন্যার চকল হইয়া জাতিয়া বেতান বহ, ইহা তাহার নিকট সাহিত্যের পারদোষসরও বটে। সাহিত্যের এই পারদোষসরে বাংলাদেশের সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী ও পাঠকগণ যে ভাবে যোগদান করেন ভারতের অপর্যাপ্ত প্রদেশে তাহার তুলনা নাই। বাঙালী মানসিকতার ইহা এক বিশেষ দিক।

‘সহিত’ কথাটি হইতেই ‘সাহিত্য’ কথাটির উৎপত্তি। জীবনের সহিত সাহিত্যের সংযোগও অসংশয়কার্য। ‘আত্ম’ কর আর্চন সেক’ বা ‘সাহিত্যের জন্যই সাহিত্য’ এই ধরণের কথাগুলিও তাই স্বভাৱে অসংশয়ী। জীবনের প্রয়োজনেই সাহিত্যের সৃষ্টি। মানব জীবনকে উন্নত, বিজ্ঞত করিয়া তাহাকে যত রূপে রাহাইয়া তুলিবার আশ্রয় সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে যুগে যুগে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। শূন্য ব্যক্তি মানবের জীবনে নব স্রষ্টা জাতি এমন কি নবজ মানব সমাজের চরম দুঃসময়ের ও সংকটের মধ্যেও সাহিত্য মানবের উত্তরঙ্গ ভবিষ্যতের জয়গান করিয়াছে।

সাহিত্য অপরিমেয় শক্তির অধিকারী। ইহা দুঃসময় মানবজাতির সংগীত। এই সংগীতকে গৃহ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। করায়ী বিপ্লব, রূপ বিপ্লব, জাতিগত অধিকৃত প্রাণের কবি সাহিত্যিকদের দ্বিতে ডাকাইলে এ দত্ত অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না। অবস্থা যত সংগীত, যত জটিল চইয়াছে, বিশদ ও হৃদয়ের ঐক্য জাতিকে যত বেশি গ্রাস করিয়াছে ততই ইহারা অনাগত ভবিষ্যতের আহ্বান করিয়াছেন। রূপো-ভঙ্গটোকার, গোষ্ঠিক, ভেদকরণ, বক্ষিকচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ অবশ্য লেখনী লইয়া জাতির পাশে লড়াইয়াছেন।

‘বিংশ শতাব্দী’, সাহিত্যের এই অপরিমেয় শক্তিতে বিশ্বাস করে। ‘বিংশ শতাব্দী’ প্রত্যক্ষ করিয়াছে মানচিত্রের বদী পরিবর্তনে বাংলাদেশে বিভক্ত হইয়াছে কিন্তু বাঙালী জাতিকে বিভক্ত করা যায় নাই। বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ—নবজন্মের চিরকল সৃষ্টি মানচিত্রের বদী পরিবর্তন অশেষা অনেক বেশি দ্রুত তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

যত এক যুগে বাঙালী জীবনের ঘটনা স্রোত বোঝে হব নভবর্ষের ঘটনাসমূহ। যুদ্ধ, দ্রুতি, বহুমাত্রী প্রাতঃভাষা, লেব বণ্ডন, আসান ও পূর্ববঙ্গ হইতে নিরবচ্ছিন্ন উষ্মত, স্রোত, পূর্ববঙ্গ মনোবর্ষ—তবু বাঙালী জাতির মেঘদূত ভাষিয়া যায় নাই। জলন্ত অগ্নিস্ফুটনের মধ্যে লড়াইয়াও সে আসন্ন উৎসবকে অভ্যর্থনা জানাইতেছে—সাহিত্যের পারদোষসরে।

‘বিংশ শতাব্দী’ বিশ্বাস করে আত্মিকার দুঃসংগের রাতগুলি যখন অতিজ্ঞাত হইয়া বাইরে তখনও সাহিত্যের ‘দুই’ রূপগুলি অগ্নান ব্যাকবে। তাই সাহিত্যক্ষেত্রে কনিষ্ঠ হইয়াও নত ত্রুটি বিদ্রুতি, নত অক্ষমতা সত্ত্বেও সাহিত্যের এই পারদোষসরে ‘বিংশ শতাব্দী’ অংশগীর হইতে চায়। অক্ষমতার অন্ধ্রাঘাতে এই উৎসব হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে সে নাগর। বাঙালীর এই জাতীয় উৎসবে ‘বিংশ শতাব্দী’ও তাই তাহার



কয়ক আটা কড়া

১১/১১/১১

তাবাস্কুর

বন্দ্যোপাধ্যায়

চন্দ্রশেখরবাবু বিকেলে যেন মোহ চারটে
সর ওঠেন—তখন উঠেন। হান পুছো বাওয়া
শেব করে ওঠেন হুটো থেকে আড়াইটার মধ্যে—কোন
কোন দিন তিনটেও হয়ে যায়। তারপর একবার গড়ান।
বাড়ির পিছনে একটা ক্যাষ্টার আছে—দিনখানি চলে
সেটা, তিনটে পিফটে, আটটা থেকে চারটে, চারটে
থেকে বায়োটা, বায়োটা থেকে আবার পরদিন সকাল
আটটা। পনের মিনিট আগে—অর্থাৎ তিনটে
পঁয়তাল্লিশে পিফটে বলের একটা ‘সাবান-বণ্টা’ পড়ে—
চন্দ্রশেখরবাবু গেলেন—সে হুটোই হোক
আর আড়াই কি তিনটেই হোক ঠিক ওই বণ্টাটি
হাজসেই তাঁর ঘর তাতে। আরও কয়েক মিনিট
পড়ে থেকে উঠে—বাথরুমে গান—বুথ হাত ধুয়ে বোরিয়ে
আসতে আসতে ৫ঃ ৫ঃ করে চারটে বাজে—ক্যাষ্টার
পেটা ঝড়তে। চাকরো ঘুমোয়। কাপ ওয়া গায়—
তাঁর পরে, তাদের ভাবতে ওঁর বারন আছে। তারা
‘ছটার সর উঠবে। তার বড় পুত্রবৎ ওঠেন—তিনি
মিটে নামেন—চা করেন; ইতিমধ্যে কুন্দ থেকে
এসে যায় তাঁর নাতি রনটু, সে চারের কাপটি এনে
মাথিয়ে দেয়—হাঙ্গু চা।

সে দিনটা রবিবার। রবিবার আবার এ পরিবারের
সকল আইন অব্যাহত দিন। বাড়িতে চাকুরে এবং
পত্নীরা নিয়ে তের চৌকসন। দুভরাং আড্ডা
জবে বয়া কড়িয়ারে উপর ডেওরো পিশপের বড।—
ডেওরো পিশপেরা—বুনে পিশপের বড কেটে কুটে
গড়ে’ বয়ে নিয়ে যায় না—ওরা বোঝেন ব্যাক পায়—
সেইখানেই জবে যায়, পটখনের জায়গার কখনও
লক্কাই করে না, বায় দেব হ’লে চলে যায়। এরাও তাই
চৌকসনে তিন ভাগ—দুয়ের মিটে চার পটখন। তাঁর
উপরে কি পবঁচ চার বন, বিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ চট্রি
পবঁচ হ’ল; এদের সঙ্গে আবার—চন্দ্রশেখরবাবুর
মেয়েদের ভরকের নাতি-নাতনী—জামাই এসে জমলে—
আরও হ’ল জন বাড়ি। ক্যারন থেকে সুন্দ করে পার্হতা
পিন্দা হাঙ্গুদিত্তির বয়া কড়িয়ারে মেহগুদি নিয়ে বসে

যায়। তার সঙ্গে চলে হুড়ি হুঙ্গনি শেঁচাক-হুঁচি
এবং চা। হেঁচাকহুঁচি করে দস্তাটাকে খতম করে ওঠে বা,
বাড়ির মেয়েদের ত্যাগা মেয়ে ওঠে একটা-দেড়টার
সর। তারপর হান বাওয়া দেবে সবাই ঘুম দেয়। তখন
বাড়িটা ঠিক শুভ থাকে না, নাকতাকার পবঁচ ওঠে—
কিন্তু সে অনেকটা আধুনিক কলম্বকের পত্নীপট
সম্প্রদায়ের ভেতের বড—তার উপরেই বাড়িটা শুভতার না
হোক নিশ্চিততার অ্যাকলো বরষ করে। মেয়েদেরও
ঐমিন উঠতে দেয়া হয়। চন্দ্রশেখরবাবুকে বাথরু
থেকে কিয়ে চুপ করে বসে থাকতে হয়।

কুতী সোক, ব্যাতি প্রতিষ্ঠা—বাচ্চাদের শিখরে
উঠেন—চন্দ্রশেখরবাবু, অবশ্য শিখর বলতে এভারেট
কেন—বন্যাদৃষ্টিও নয়—হাজারিহাসের—কাছাকাছি
গরেনবাব পাছাড়ের শিখর—কিন্তু, শিখর তো বটে।
সাহিত্যিক। হানবঁচি একা।

তিনি বাথরুবে চুকেছেন, বুথ হাত মোবেন—হগতি
চৌবাচ্চার ডুবিয়েছেন—হঠাৎ একটা সুর এসে তাঁর
কানে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে তার মেহে বয়ে একটা
যেন প্রবাহ বেলে সেল। চমকে দিয়ে দেহে বয়ে সেল
নাথা থেকে পা পবঁচ। রক্তপ্রোত চকল হয়ে উঠল।

অপর্নানের সুর। মিটে থল এবং মিথার উচ্চহাসে
মিশানে সুর। কি বাতছে? বন্যানো গুল্পে জন্ম—।

হুড়তে’ চন্দ্রশেখর যেন মোহগ্রস্ত হয়ে গেলেন।
তাঁর বাস্যকালের—দৌবনালের—দিনগুলি—সদ্য
হুহতায়া বনকে জাহত শব্দের বড আছর করে কললে।
কতকনের জন্য কে বলবে, তিনিও বলতে পারেন না—তাঁর
এই বাড়ি—বাথরু—এই উনিশ শো একষষ্ঠি মাল সব হুছে
সেল, মিথ্যা হয়ে সেল। পকাশ বহর আসের দিন কিয়ে জল।

একখানি সন্মত গ্রাম। বাপির রাজ্য। এখানে মাঘ
বাবুর বড পাকা ঠাকুরবাড়ি—এ পাশে বড়ের
চাল—বাংলো ঘর—সোকে বলত—কন্ঠোশার আপিল
—মাঘরনের হুয়ে সেটা দাঁড়িয়েছিল কন্ঠাল আপিল।
তার দক্ষিণে হেরেদাবাবুর নতুন কললে হলুর রঙের
ডেভলো বাড়ি। কন্ঠাল আপিলে এই অপর্নানের

দূর বেয়েছিল—এই গান—এই গান—এব বাঘো
 মূপ্তভরা । গুর থেকে এই দূর শূনে তিনি ছুটে
 গিয়েছিলেন—এই কণ্ঠাল আপিলে । কি সুন্দর দূর ।
 এমন দূর জীবনে তখনও তেঁনি পোনে নি !
 হৃদয় সুন্দর । পা থেকে মাথা পর্যন্ত রক্তচোত চকল
 রে বেয়ে গিয়েছিল । কোন বিশেষ দৃষ্টের দূর বা দূরের
 মূপ্তা এক একটি মানবের হৃদয় শিয়ার কোন বিশেষ
 সম্পর্ক আছে কি সেই—সে কথা ঠিক তিনি বলতে পারেন
 না, তবে তাঁর যে হৃদয় শিয়ারে এই অঙ্গানের দূর একটি
 প্রবাহের সৃষ্টি করে এ সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ ।
 অনেক দূর অনেক জলসার তিনি জানানার পরাসেতে
 হাত দিয়ে অনুভব করেছেন—এব নিঃসন্দেহে বহুভাবেই
 অনুভব করেছেন যে বস্তুর দূরত্বই ওই পরাসের মধ্যে
 নিঃসঙ্গ একটা কিছুর দূর সৃষ্টি করেছে । সোহাগ
 পরাসে যেন দীর্ঘ কক্ষার তোলে । ঠিক তেঁরনি ।
 অঙ্গানের দূরে ঠিক তেঁরনি ভাবে কিছুর একটা দূর
 করে ওঁর হৃদয়শিয়ারে ।

শৌখিনও ছিল আঘাত হানের চারটে, শৌখিনে চারটে ।
 গ্রামটা তখনও ঠিক দিবানিহার জড়তা কাটিয়ে বাতর জগতে
 জাগেনি ; তাঁর তখন যেনে বদন—তিনি ঠিক কি করতে বা
 কোন মতলবে ব্যাধ থেকে বেরিয়ে বৈঠকখানা ব্যাধি
 আগ্রহিলেন সে ভুলে গেছেন ; ভুলে সেই দিন তখনই
 গিয়েছিলেন স্বপ্ন গলিগল থেকে বেরিয়ে—হৃদয়ভুলে
 বেয়েছেন আর ওই দূর উঠেছে । যুদ্ধভেত নব ভুলে
 আতঙ্কভূতই হয়ে যান নি—ওই দূর—ওই দলপীতম
 শব্দধ্বনি—তাকে যেন আকর্ষণ করে নিয়ে গিয়েছিল ।
 হৃদয়গার আকর্ষণ । বানের বাঁশীর দূরে হাবার
 আকর্ষণের কথা তাঁর কাছে অসীক নহ । এবং ওই
 গাবিটি—এব বাঘো পূম্প ভরা ।

শৌখিন আরো বিয়েটারে তারিগে এবং বিয়ের শব্দে
 বিয়েটারে প্রতিষ্ঠাতা পাকবাবু বত একটা টেবিল
 হারমোনিয়ম কিনে এনেছিলেন কলকাতা থেকে । ওই
 কণ্ঠাল আপনাই ছিল বিয়েটারে কেন্দ্র—এই আঘাট
 জড়াসের হল বাড়ী । সেই বোব হব প্রথম গুর উঠেছিল
 অঙ্গানের মধ্যপ্রায়ে । গাইছিলেন—সোপালবাবু । আতঙ্ক
 সুন্দর কণ্ঠস্বর ছিল তাঁর । হৃদয় কণ্ঠ । এবং সে

কণ্ঠস্বর এত বহুর এবং এত ছোয়াসো ছিল—যে বক্স
 হারমোনিয়মের দূর হারিয়ে যেত ।

তারপর থেকে—বখনই শূন্যতে শেভেন অঙ্গানের দূর—
 তার হৃদয়শিয়ারে এখন ভাবে উদ্যমানের চকল গতি
 শিয়ারে শিউরে উঠত । পড়া বহু হয়ে যেত ; শিখতে
 শিখতে থেকে যেতেন—ছুটে ওঁরখানে থেকে ইচ্ছা হত ।

পরবর্তী কালে—তাঁর প্রথম যৌবনে—তখন
 বদন আঠারো—ব্যাঙ্গিক পাশ করেছেন—বিরোধ
 হয়েছিল—বহুর বদন বদন ; কলেজে সেকেন্ড ইয়ার
 থেকে—শুশিণ হয়ে নিয়ে—ভারত বঙ্গ আইনে
 অন্তরীণ করেছেন স্বগৃহে—তিনি গান শিখবার
 জন্যে—বহুদিনের আকাঙ্ক্ষার সাধ্যশ্রী এই একটি
 অঙ্গান কিনেছিলেন । অঙ্গানটা আজও আছে । তেঁতে
 আছে—বাকানো হার না তবে আছে বদন । বহর চারেক
 আসেও তাঁর ছোট্ট ঘরে বাপী—এই অঙ্গান ব্যাঙ্গিয়ে গান
 করেছে । কয়েক বৎসর আগে পর্যন্ত তিনিও কোন একদিন
 —ওঁতাকে বুলে—ভাঙ্গা বেলোটার প্যাডেল করে—
 দূর তুলতে চেষ্টা করেছেন । বনে পড়েছে—যৌবনের দিন
 হারিয়ে বিশেষ বিশেষ কলপুলি । কত জ্যোৎস্না রায়ে
 কত গাঢ় অন্ধকার বর্ষণবহুর বর্ষণরায়ে—তিনি দূর
 তুলেছেন অঙ্গানে—দূর ভরে উঠে বাইরের বাতুরে হাড়িয়ে
 গিয়ে ওই পবিত্র বাতুরেই দালানের গারে প্রতিধ্বনি
 তুলেছে—তাঁর পাশেই তাঁদের মিছেদের ঠাকুরবাড়ির
 হাঙ্গিরের গারে গারে বুরেছে পাক ঘিরে ; হর তো কত
 জনের নিহার মধ্যে স্বপ্ন সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে ।
 পাশে হাঙিরে বাকত উমা, তাঁর বদন । বিরের ভিন বহর
 পর । তখন সে কিশোরী । তার মনে কুটে উঠত
 প্রপংসা, চোখের হৃদয়িত অদুরাপত্তা বিশ্বর ।
 পাতলা পানের রসে লাল হৃদয়নি ঠেঁটে হারির রেখা ।
 তিনিও হাসভেন—বীরবে । রেবার আঁকা হাসি । হঃ ।

অভিনব করতেন—ভাল অভিনব করতেন তিনি ।
 তিনি সুন্দর বদন আরো—আজ কাল তো মিছেকে
 ঐচ্ছিকই শূন্য বদনে বা—বদনে—অদূর—। ব্যাঙ্গিক
 শব্দ সেহ । ১৪ কালো হয়ে গেছে । যেন—পুড়ে
 গেছেন । মিছে বদনে—প্রতিষ্ঠা কাবনার আগুনে
 পুড়ে গেছেন । বদনে—চর বাশুল আশি বিয়েহি ।

ব্যাধি গ্রহিয়েছি—ঐ হারিয়েছি। বোধকরি—ভাস্যে আমার প্রাণ্য ছিল না। কিন্তু অধিকৃত হলে তদাঙ্গার প্রশ্ন উপেক্ষা করতে পারেন নি বিধাতা—, ওই দৃষ্টি—স্বাধ্য শূন্যতা আর ঐ এই দৃষ্টির বরলে তোমাকে প্রতিষ্ঠা দিলাম। কিন্তু প্রথম যৌবনে তাঁর ঐ এবং স্বাধ্য দুইই ছিল। যেহেতু তাঁর দীর্ঘ নয়—বা বাসেল নয় কোনকালেই—তিনি নারী ভূমিকার অভিনয় করতেন। নায়িকার ভূমিকা ছিল তাঁর। সহস্র পাণ্ডগল্যের দাবীতে শক্তির জোরে শেতেন। গান থাকলে বাম দিকেও দেওয়া হত তাঁকে। তার জন্যই তিনি দলী সেরে গান শিখতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। কিছুটা শেয়েছিলেন। যেরে গান সেরে স্বাক্ষর অবস্থানে গৃহীত করতে পারতেন, বৈঠকস্থানায়—বহুসের মধ্যেও গাইতেন—কিন্তু গগনকে গান নি। হু তিনবার ঘিয়েটারে সকলে বলেছেন—গাইবে তুমি। ব্যাঙ্গ্য হবে না। গাইবে। কিন্তু তেঁকে নামবার আসে—গান বাম দিকে প্রমুখিৎ কপি কেটে প্রবর্তার—হাতে দিবে তেঁকে নেয়েছেন। সহ অভিনেতাকে কোন শূন্যবেশে চুপচুপি বসে দিচ্ছেন—গান বাম গেয়ে। হবে না। পর থেকে হু! এ সব কৃতিত্ব যোগ্যতা তাঁর ছিল। নিজে নাটক লিখতেন।

অঙ্গানের দূরে এবং ওই গানের পতে—অঙ্গ কয়েক শূন্যভেদে বসে এত কথা এত ছবি তাঁর চারিদিকে কুটে উঠল। স্বান কাল—হারিয়ে গেল। ১৯৬১ নয় যেন উল্লিখ শো বাইশ তেইশ। কলকাতার বাড়ির বাসস্থান নয়—ভারি গ্রাম—নবগ্রাম।

বাইরে থেকে ধরবার কে বাজা ধারসে—কে রয়েছে বাসস্থানে? হু! না—বাক্য? চন্দ্রশেখরবাবুর পুনঃবদলনে, তাঁর ষাট বছর ও সাত বছর বয়সী দুই ছেলেকে—তোমাদের না—বাসস্থানে চুকে ধরমা বহু করতে বাধ্য করেছি!

—আমি—না। কণ্ট্র বাক্য নয়।

চন্দ্রশেখরবাবুর দিবা শব্দ ভেঙে গেল। ও তিনি ১৯৬১ সালে—৬২ বছর বয়সে তাঁর কলকাতার বাড়ির বাসস্থানে রয়েছেন। দিনের শব্দ থেকে উঠেছেন—বেলা

এখন চারটে। ওঃ! কিন্তু অঙ্গান এখনও বাক্যে। কে? কোথায় বাক্যে। পুস্তক শূন্যের শব্দ—এতো পুনরো ভাষা অঙ্গানের নয়। এখনও রক্তপ্রোত—বা একটি শিহরিত গতি চকলতার শ্বাধুশিরা চকল হয়ে রয়েছে। শূন্য হাতে বল দিবে বেগিয়ে এসে—প্রথম প্রথম করলেন—অঙ্গান কে বাক্যে বা? আবাসের বাড়িতে? —হলে হচ্ছে। বাঁচের তলার যেন। ঠিক জানিনা কে বাক্যে।

গামছার শূন্য শূন্যতে শূন্যতে আবাস পায়ের তিনে নেবে এসেন। এ শব্দ এ শব্দ ঠিক সেই আকর্ষণে তাঁকে টানছে।

বাইরের কলার ঘরে। বাক্যে—গম্ভীর শব্দ শব্দে শূন্য—বন বাসো পুস্তক ভরা। শাখাহান নাটক, নবগ্রামের—ভেঙে;—স্বাধীনায়—কালোবাবু মহামায়া—অনিবার শিরায়া শ্বাধুশিরা শ্বাধুশিরা। চারশী চারশ দুই ছিল—সোপানবাবুর নেতৃত্বে এই গান হয়েছিল। তার পর তিনি স্বাধীনায়—বৈশাখ মহামায়া—শিরায়া কলকাতার প্রথম। চারশ চারশ শৈবের আচ্যে—শ্বাধুশিরা শ্বাধুশিরা। এখনও শূন্যতে পাচ্ছেন গাও চারশাঙ্গ—গাও—

“বন বাসো পুস্তক ভরা আবাসের এই বসুধা।”

নিজেই গুন গুন করতে করতে বাইরের ঘরে চুকেছেন তিনি। তার ছোট ছেলে শূন্যতা বাক্যে। অঙ্গান নয়, অঙ্গান টিউন বহু হারমোনিয়ম। বহু হারমোনিয়ম, বেলোটা একজন হাত দিবে টেনে—আর শূন্যতা হু হাতে বাক্যে—বন বাসো পুস্তকভরা। —একটু ঘরে বসে আছে বড় ছেলে শূন্যতা।

উনি চুকেভেই তারা খেবে গেল। শূন্যতা উঠে গাঁড়িয়ে বললে—এ শূন্য তেলে গেল আপনায়।

শূন্যতা বললে—বললাম তোকে আতে বাঁধিয়ে দেব।

চন্দ্রশেখরবাবু ও কলার উজ্জ্বল—না—বিষে—শূন্যতার পাশের চেয়ারটার বসে হারমোনিয়মটা টেনে নিয়ে বাঁধিয়ে গেলেন। প্রথম এক হাতে নিজে বেলো করে, পরে যে সোফাটি বেলো করছিল—তাকে বেলোটা দিবে বললেন—টেনে তো।

সে বেসোটা হয়ে টেসেতে টেসেতে বলসে—আবাকে
স্নান বলসেন কেন ?

সে কথার স্রবণ না দিয়েই নু হাতে তিনি বাঁজিয়ে
গলেন—এন বানো পুশে তরা—

এখনও বেশ বাছাতে পাবে চন্দ্রশেখরবাবু। পানটা
জ্বিয়ে শেষ করে বললেন—বেশ শ্বর। নতুন ?

—হ্যাঁ মস্তুর জন্মে কিনলার।

শ্বর—হ্যাঁ মাদ্যাকী দুবহার কন্যা। শ্বর বছরের মেয়ে।
তার জন্য কিনেছে দুবহা। বটে বটে—মস্তুরকে বাড়ির
মহলের পাকটার ওপাশের একটা গানের ইচ্ছা সে ভর্তি
রে দিতেই বটে। একটু হাসলেন। এমশে আশও
যেও জীবনের সব প্রতীতি কনে মেঘার আসরের জন্মে।
শ্বর বাড়ির মত বাড়িতেও। সেখানকা গান বাজনা—
সে—তাও সব এই একটা দিনের জন্য।

—গান জান তুমি ?

বাড়িটি নড়ল হ্যাঁ এম ভাঙ্গিতে।

—কি গান ?

—বৌশ্র লগ্নাতি।

—জ্যানিসকাল ?

—জল্প জ্বানি।

—আবদ্বিক ?

না এম ভাঙ্গিতে বাড়ি নড়ল। মেয়ের বাপ বললে
—ও আনি শ্রিকটালি বাগ করি দিয়েছি। কেউ
রয়েকে গান গাইবে বলে—শেখার না। তার
চাপ্য ভাল—নদা ভাল—সে রেভিসোতে বার
হানোকোমে তারপর শিনেমার মেয়াকে—গান গাইবার
দুবোগ পায়—এব চাকার জন্মেই—বাপ শ্বরুত মাদ্যী
গাইতে হুকুম সেন। রেভিসোতে সেয়ে নাম বলে—ওই
দুবাবাদুলি মিলবে এবং কেউ হয়তো যেতে এসে বিয়েও
করবে—এ প্রত্যাপাটাই প্রক।

একটু হেসে—কথাটাকে যত্নে যত্নে টেসে দিবে
বদকে ঘুরিয়ে দিবে—বললেন—কত পক্ষ ? গায়ে
বলে যে বেসো করছিল—সে বললে—আচ্ছাইগো।

হেসে চন্দ্রশেখরবাবু বললেন—আমাদের সঙ্গে—

শ্রীমতী শ্রীমতী শ্রীমতী শ্রীমতী শ্রীমতী শ্রীমতী শ্রীমতী শ্রীমতী শ্রীমতী শ্রীমতী শ্রীমতী

ভাল বন্ধ বন্ধ। আমি অবদ্বানটা কিনেছিলাম—একশো
পাঁচ টাকায়। মিলার কোম্পানীর।

লোকটি বললে—ওর দাম এখন অনেক। ও হীভ
পাওয়া যায় না। আমি মেখেছি জার্মান হীভ।

চন্দ্রশেখরবাবু বললেন—আমাদের যৌবনে—তিনটি
জীবন মা-বলে সে কালের হানার হওয়া যেত না।
এব অভিভাবতও বটে। শাইকেন—হারমোনিয়ম—
গ্রামোকোন। এখন শ্রুটার—জানিসকাল সেট বাড়িতে
গ্রামোকোডে। এরপর টেলিভিশন আসছে।

লোকটি বললে—আপনার অবদ্বানটা বেয়ামত করান
না কেন স্যার ? শ্বর জীবন।

—ভাবি এক এক সময় একটা নতুন অবদ্বান কিনব।
ওর দূরে আমার নেদা লাসে। দাপুড়ের ডুবড়ী বাঁশী
সম্পকে—যেব দাপের হয় বলে প্রচার আছে। তা করুন না—
কিন্তু হবে ? কারণ পানটারাপদো বন্ধ ভেঙ্গে গেছে।

—সেলব ঠিক হয়ে যাবে। শ্বর বীভদুলির জন্ম
বলছি। জার্মান হীভ আর তা মেলে না। অতত এর
গানবো ডো/হবে।

—হ্যাঁ ওর দূরে আমার আশও শোভ আছে। যত্নে
যত্নে ভালো পলার—গাইতে তো পারব

তোমার শেষ বিচারের আশায়—বলে আছি।

রাজ কাছারীর সেউড়িতে যে—বলে আছি।

পানটা ওইই গান। গান চন্দ্রশেখরবাবু যত্নে
যত্নে লেখেন। তার যে সব বই ছবি হয়—তার জন্য
লেখেন। এবং এক একটা সময় আসে যখন নিজের মনেই
লেখেন। নিজের প্রাণের আবেগন। আকৃতি।

বললেন—আবার নতুনের মত হওয়া চাই। নইলে
আমি নতুন কিনব।

লোকটি বললে—আমি নতুনই ক'রে দেব। লেখবেন।
আমি ঠিক ব্যবসায়ার নই। আমি এর আসে অনেকবার
এগেছি। মেখেছেন বলে বই। যা বলে আপনাদের
অবদ্বানের দরদ জানব কি করে ? আমি দুবদ্যাবাবু
সহকর্মী—ইঞ্জিনিয়ার—গানব্যবসায় শপ আছে। আমার
একটি জাহা ভাল চাকান আছে। বন্ধুর চাকান।
লেখান থেকেই করিয়ে দিলাম এটা—ওর মেয়ের জন্মে।

শ্রীমতী শ্রীমতী শ্রীমতী শ্রীমতী শ্রীমতী শ্রীমতী শ্রীমতী শ্রীমতী শ্রীমতী শ্রীমতী

চন্দ্রশেখরবাবু, ব্যাভিকের হান্ধ। সঙ্গে সঙ্গে চাকরদের হাঁকসেন—ওরে বাবা—অপ্যান্টা আন তো ওপরে বাণীর ঘরে আছে।

হাঁতযথো ব্যাভ—হুতন হুটু, এসে হাঁড়িত্রহিল—কথা শুনছিল,—হুতন বললে—আমি আনছি হান্ধ।

হুটু বললে—ওটা তো বাণীমার ঘরে নেই। হান্ধের সিঁড়িতে আছে। একেবারে ভেঙে গেছে। একটা পায়—

ভয়লোক বললেন—ও সব পাণ্ডে গেছে। শূন্য, হাঁডলো ওইগুলো থাকসেই—হল।

হুতন নিয়ে এল কাঁখে করে। হাঁপাচ্ছে। কিয়, শক—বলপালী হেলেন,—নাশন্যাল ক্যাডেট কোরে নেড়িতে টেনিং নিচ্ছে। উৎসাহের আভিকটাও বেশী।

বিতরু হতে চন্দ্রশেখরবাবু বললেন—তোকে কে আনতে বললে—এঁকারে ?

—চাকররা সব ঘুমচ্ছে।

—বুঝলান। কিয়, একদা এইভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে কে আনতে বললে।

হুতন খোঁজা অপ্যান্টাকে ধরেই থাকল। চন্দ্রশেখর-বাবু ভালোটা খুললেন। হাঁডের উপরের কাঠ ও পাতলা সাদা আবরণীপুঁপি একটিও নেই। হুতনীন এক অপ্যান্টপার বুকের মধ্যে গহ্বরে মত শূন্য খাঁ-খাঁই করে নি—বীভৎস ধর্ষণ হয়ে গাঁড়িয়েছে।

—এমন কে করলে ? চমকে উঠলেন চন্দ্রশেখরবাবু।

—ও কি হয়ে থাকে। বলে ভয়লোক কাঁঠখানা তুলে কেললেন। নিচে হাঁড বদানো কাঁঠখানা।

—এ কি ? হাঁড কোথায় গেল।

একখানাও হাঁড নেই সব টেনে কেঁট বের করে নিয়েছে। ভস্মিত হয়ে গেলেন চন্দ্রশেখরবাবু।—কি হল, কোথায় গেল ? কোথায় গেল হাঁড ?

মোট ছেলে দু'খ্যা—কড়া সেকাডের লোক—বড়বাবী হান্ধ। সে কিয় হতে উঠল—কি সবনাশ।

কে—কে করলে এ কাজ ? হুতন হুটু—? কে—? কে ?

এ জিনিষ পাওয়া যায় না। বেশী কিনতে গেলে চাকরপাটশো দায়—

হুতন গভুর বললে—বাচ্চু—হুটু—হুটু—

—বাচ্চু হুটু হুটু ? তারা খুলে কি করে ?

—এটা বাণীমার ঘরে ছিল। ঘর হুং করবার সময় ভাঙার ঘরে রাখা হয়েছিল। তারপর এটাকে হান্ধের সিঁড়িতে রাখা হয়েছিল। পড়েছিল সেখানে—ওহা কখন কখন—হ্যাঁকিয়ে হ্যাঁকিয়ে নিয়েছে। হান্ধের ওপর খেলা বর গড়ে ভাঙে রেগিয়া করেছিল।

নির্বাঁক হয়ে সেলেন চন্দ্রশেখরবাবু। তিনি ভাবলেন। হনের মধ্যে হুটুতে হুটুতে অনেক ভাবনা—বর্ষার বেঘের মত এসে পুঞ্জীভূত হয়ে কখনো—পাক খাচ্ছে।

—কি আভব ? ও—!

হুৎখা বললে—ভাক ওয়ের। বল নিয়ে আনুক সেগুলো।

উঠে গেল সে জুড় হয়ে। হুৎখা শুধু হয়ে বলে হুইল। শস্মিত হয়ে উঠেছে সে। তিনজন অপরাধীর মধ্যে হুৎখার বাপ সে ! এবং সত্যান বাফলা একটু গাড। চিত্তও কোমল। ছেলেরের মধ্যে হুতনকেই সে একটু পানন করে—প্রহারও করে। কিয়, অন্যের কাছে—নিভাধ অপহাররূপে কোমল।

বাপকেও ডর করে। কৃতী ব্যাভিমান বাপ—তার গুণমুছ এবং ভক্ত সে। বাপের উচ্চাপ তাকে সহিতে হয়। ওই নির্বাঁক শুভতাই তার একমাত্র গণ্ডারের চামড়ার ঢাল।

চন্দ্রশেখর বাবু বললেন—ও ! তারপরই বললেন—আমার জীবনের প্রথম কালের দু'ব কন্ঠের দুঃসহতার সময় এটাই ছিল একটা আনন্দের আভর।

ওঁহকে শূন্য ব্যাভীতা তোলপাড় করছে। কোনটা কদিয়ে। আভ্য করলেন না চন্দ্রশেখরবাবু। তিনি ভাবছিলেন—ও—তা হলো তো—জীবনে যা কিছু পড়ে ছুসেছেন—সব—সব—এইভাবে একধিন—

বইগুলোর পাতা ছিঁড়বে—ব্যাভিকের ছেলেরা। হবি কাটবে। তিনি মধ্যে মধ্যে শূন্য তৈরী করেন। শূন্যল গঞ্জে করেন। ও গুলো সরিয়ে নিয়ে কেলতে গিয়ে ভাঙবে। বইগুলোকে কেলো দিয়ে—সেফ আলবারীপুঁপি—নিজেরা নেবে ! ও !

ওঁহা কোথা থেকে কোথায় এলেন—জিজ্ঞাসা করে

বলেন—ওটি ছিল—রাশীর ঘরে। সেখান থেকে হাঙ্গের—
রতন বললে—না তাঁড়ার ঘরে—সেখান থেকে হাঙ্গের
সিঁড়িতে।

—হ্যাঁ তাই হল—। কিন্তু কে ছিলে এই নির্বাক ?
—কেই ছিলে।

রতন বললে—তাঁড়ার ঘরে—জায়গা হচ্ছিল না।
তাই না বললে—ভালো হারমোনিয়টাকে—ওখানে
গা।

—ঠিক—ঠিক—ঠিক।

একটু ভাব থেকে বললেন—আমার ঘোঁরনের স্মৃতি
জড়ানো ওটি। ওই হারমোনিয়—আমি হারানো তপ্পের
পান লিখে—ওতেই সেট করেছিলাম। "সকাল সাতের
মিলন বেলায় কোন সুরে গাই পান ; পূর্বী না প্রভাতী
এ কোন রাগিনীর তান।" ওঃ! জিভেন বাড়িলে—
বতীন্দ্রমোহন এসেছিলেন—মিটিংয়ের পানের জন্য—
হারমোনিয় পাইনি, মিটিং করার আবদা পাইনি।
হুসলবানদের কর্তৃত্বময় মিটিং করেছিলেন, ওই হারমো-
নিয়—ওপনিং না হয়েছিল—শেষ—শেষ বন্ধিত করি—
বন্ধিত ভব ভেরী! ওঃ—

চণ্ড করলেন—আবার বললেন—ওই অর্দান আমার
আমার স্মৃতি সঙ্গের কত রাসি আসার নাকী। আমি
বাহ্যতঃ—গাইতাম—সে নৃত্য।—ওঃ!...তা হল
তো—তা হল তো আমি জঁপী হল—আমাকেও—

—এদর কি বলছেন বাবা ? বললে নৃত্য।

—কি বলছি। বলছি নৃত্য সত্য।

সুখ্যা করেকটা, সোটা হয়েক রীতি নিয়ে কিংবে এসে—
বললে—আর নেই। এদুগোৱ মাঝখানের সাউণ্ড পাত
সুশো হাড়িয়েছে। চাবকাত হর। এয়ে—

চম্পেনব্রবাহু, হা—হা করে নির্ভর হাসি হাদলেন।—
ঠিক করেছে, ঠিক করেছে। বৃত্তো হলো আদ্যকে—বর
থেকে হাঙ্গের সিঁড়িতে ট্রেনে। বরলে—জীবনসুখো
ভাপবে ভাগ করবে—বাড়ি পূর্বো হলো—বাড়ি
ভেবে। ভাপবে। ঠিক করবে। নিভর করবে—আমি
বরলে কি আমার সেটা বর থাকতে পারবে।
পারবে না!

হঠাৎ উঠলেন তিনি। বাথটী বহর বসে হুঁই ওই

মানুষটি—ওই—অগ্ন্যাকটার অংশগুলির বতগুলি এর
দলে পাললেন—জুসে নিয়ে বাড়ি থেকে বোড়িয়ে—
হাঙ্গের উপরেই ভাউবিনটার ভিতরে ফেলে দিলেন
কিৎবে এসেন। অবার জুসলেন। জুসে হঠাৎ বললেন—
কই ? বৃন্দুর বড় হবিখানা—সেখানো তো আবার বড়
টাঙানো ছিল—সেখানোতো—নেই।—

হুঁড়ে কেলে দিলেন নাকী অংশগুলি বারান্দা থেকে
য়েলিং পার করে। তারপর থকা দস্তব হুঁড় উঠে গেলে
ওপরে।—কই—কই সে হবি ?

কই সে হবি। উপরে হবিখানা বর। সব বৃন্দলেন,
কোথায় ?

স্মৃতি বেরিয়ে এসেন। তিনি ভাপবত পড়ছিলেন
কি হল কোথায় ? এভাবে কেলে উঠলে কেন ?

—বৃন্দুর হবি ? কোথায় ?

—সে এখানে কোথায় পাবে ? সে নবগ্রামো
বাড়ীতে আছে।

—নবগ্রামের বাড়ীতে ? ওঃ বৃন্দ বা জুনি। সে
হবি আমি নিজে এনেছি এখানে ক'বর আসে।

—এনেছ ? না।

—এনেছি। এনেছি। এই এই সেওরালে টাঙানো
ছিল। বৃন্দুর হবি।

চোখ তাঁর জলে ভরে এল। পলা বর এল।

• • •

তাঁর বৃত্তা কন্যা বৃন্দ। পাঁচ বছর বরলে সে বার
বার। বড় প্রিয় ছিল সে। বড় প্রিয় বড় বনভাসী।
বৃন্দ তাঁর সকল বৃত্তাস্য নিয়ে অকালে চলে গিয়েছে।
সেই ব'রে তাঁর প্রতিষ্ঠার পথ বৃত্ত করে দিয়ে গেছে এই
তাঁর বিদ্যাপ।

তিনি কালো বান্ধ—সে কালো ছিল। কেউ ভাবে
কালো মেরে বললে—সে তাঁর কালো এসে বৃন্দ
বলভ—বাবা তুমি কালো আমি কালো। আদরা বৃন্দ
বরে বাই চলে।

সে তাঁকে নিয়ে বেলা করত। তাকে হেসে দাখাতো
তিনি নাখডেন। সে বা হত। তাকে মেঝের উপর খোঁ
অঙ্গুলি ভাবে—বাতাস তুলে নাখা চাপত—বৃন্দ
বৃন্দ—বৃন্দ। অল ঢলে গান কবতো।

১ কয়েক কোঁটা রত্ন

মোহান্ত। যাওয়াতো। তারপর বলত—পোও তুমি।
বুঝুও। আর রে—আর রে—আর রে!

তার ছাঁবনের ইতিহাসের দৃষ্টকণে সে এসেছিল।
তিনি ছেলে সেলেন তার জন্মের পর। তিনি বেয়রে
এলেন—তাকে কোলে নিয়েই তার স্ত্রী গিয়েছিলেন—
তাকে জেল পেতে লক্ষ্য রাখতে।

অনর্পণ করা বলত। সে তার কথা নয়, শব্দ—
মহু—তাকে বলে 'বান্দা'। শব্দ বাক্য। সব তো পিতৃ-
জনের আভিষেক কিছ, আছে কিছ, সে মানান্য—
কল্যাণ।

জেল থেকে আসবার এক বছর পর সে অকস্মাৎ
মারা গেল। কেউ বুঝতে পারলে না। তার মনে
অপরাধের একটি বস্তুক—চিরদিনের জন্য বিঁশে আছে।
আজ এই মহুতে 'নিরাপন্ন বংশা' অনুত্তর করছেন
তিনি। তার লব্ধ হল—তার দশে তার মায়েরও মর
হল; তখন তিনি থিয়েটারে নেতৃত্বেন। সে বহুতা—
প্রভু মনুতা। সব কিছ,র দিকে গিমন করে মাতলেন।
টোলের তার তাঁর, তার দশে অভিনয়, কখনও প্রবচিৎ।
চারদিন-কেন খবর রাখেন নি। বেয়ের মর। গ্রাফ
করেন নি। ম্যালেরিয়া। থিয়েটার শেষ হল। পরের
দিন প্রীতিভোজন—কীট। কীট সেয়ে মায়ের বাড়ি
এলেন—বরফা খোলা ছিল ঘরে চুকে পোবেব, মর অর্থাৎ
বলু ডাকলে—বাবা।

—বা।

—জল-বার।

গ্যা-আলান বিহানায় শব্দ। স্ত্রী জন্ম-করত।
চন্দ্রশেখরবাবু বললেন—এই যে আমার কাছে জল।
উঠতে পারবে।

সে-বন্দারী বুকে গেরিয়ে এল। জল খাওয়ালেন
তিনি। শ্রমলেন মর অর্থাৎ কটা। বলু, জল খেয়ে
সেছিল—বাবা আমি তোমার কাছে পোব।

চন্দ্রশেখরবাবু পড়লেন একা পোয়ার অনেক দিন
থেকে। এখন মনুতার পর থেকেই প্রায়। কেউ কাছে
পড়লে—বুনের ব্যাখ্যাত হয়, তিনি বলেছিলেন—না—বা
মায়ের কাছে পোব। মায়ের মর হয়েছে।

সে আর কিছ, বলে নি। চুপ করে গিয়ে পুরেছিল।

তারপর দিন থেকে সে প্রায় বজ্রান। ভাস্কর এল।
প্রথম দিনই চাকত হয়ে—ইনসেকশন দিলে। চন্দ্রশেখর
বাবু শিরে বসলেন। প্রতিদিন পর করে ছাড়ল। ভাস্কর
বেশে বসলেন—বাস। মর ছেড়ে গেছে। ভাল আছে।

সে দিন চন্দ্রশেখরবাবু একটি শিকা শেয়েছিলেন।
আচ্চ' বহু—সকল শিকা। তার শিকারী কীট ফেলনা
থিয়েছিলেন-বলুকে। বলু সে কটিকে একবার নেড়েই
মারত হয়ে পুরেছিল—আর মৌষ নি। ভাস্করের কথা
পূনে তিনি বলেছিলেন—ভাল আছে বলু ভাস্কর?

—হ্যাঁ, মর ছেড়ে গেছে। কাল কোল দেব। পরশু
ভাত দেব।

—হ্যাঁ বাবা। আমার তো ভাল লাগছে না।

—কেন? হেসেছিলেন ভাস্কর।

দ্বিতীয় বলেছিলেন—হ্যাঁ বাবা, মেলে যদি ভাল
আছে তবে সেলনার নত জিনিষ—সে তার দিকে একবার
হাত বাড়াল—তারপর আর না। এ কেন ভাল বাক্য?

—কাজ হয়েছে। ও কিছ, নয়।

ভাস্কর উঠে কি নিয়ে বোড়িয়ে যাবার মন বলেছিলেন
—ও কিছ, নয়। ওঁদের সব গুণ্ট আইডিয়া। কাল
কোল দেব।

বু বলেই আসছিলেন ভাস্কর। এরপর মের টেনে
বললেন—ও বেলা থাক আর আস না। কেন আপনার
দুটো টাকা কিনা প্রয়োজন দেব। মাছা চলি।

বলুয়ে থেকে তিনি ছিয়েছিলেন সেদিন। বুয়ে
উঠে বাইরের বাড়িতে এসেছিলেন কাছে। পরে ভাস্কর
থাকলেন। তাইই মলে কিছ, বুয়ে হেঁটে গিয়েছেন গল্প
করে। তখনও ভাস্কর বলেছিলেন—কাল কোল দেব।
আজ আর দেখবার দরকার নেই।

চন্দ্রশেখরবাবু বাড়ি করে—ভেবেছিলেন—যেতে ভাল
আছে—আজ একবার থিয়েটারে গিয়ে থাকেন। মরার
উপরে থিয়ে গিয়ে কাপড় ছেড়ে জামাকাঁচি নিয়ে নিচে
এলে মেয়ের কাছে বলেছিলেন একবার গিয়ে হাত
নিয়ে দেখে বাবেন। পাশে মর পরে আছে স্ত্রী।
তার মর ছাড়লেন। সেই প্রথম দিন—ভাস্কর সেদিন
আসে—সেইদিন তারা দে সকালে নিচে নেমেছিল আর
ওপরে যারিন। ভাস্করের মনা ছিল। চন্দ্রশেখরবাবু

বেগের কপালে হাত দিয়েই ঢেকে উঠেছিলেন—
এত ঠাণ্ডা ? হাতে হাত রেখে আবার চমকেছিলেন—
এ—। পরক্ষণেই হাতখানা তুলে নিয়ে নাড়ী
বহেছিলেন। নাড়ী কেটে-কেটে যাচ্ছে। হাতের
আঙ্গুলগুলি বরফের মত হিব। তিনি কোন কথা
কাটকে না বলে—হুটে বেড়িয়ে গিয়েছিলেন—ডাকারের
কাছে।—আসুন ডাকারবাবু। বন্দুর নাড়ী কাটছে।

—সে কি ! বিশ্বাস করতে চাননি ডাকার। তবু
চন্দ্রশেখরের মত লোকের কথা অবিশ্বাস করতে
পারেন নি। এলে দেখে তিনিও চমকে—ভাড়াভাড়ি
ইনজেকশন দিয়েছিলেন। এবং কিছুকাল বসে থেকে
প্রতিক্রিয়া দেখে কিরে গিয়েছিলেন। নাড়ী উঠেছিল।
কিছু আধকণ্টার মধ্যে কঠ বহি করে—আবার নাড়ী
কেটেছিল। আবার ডাকার এসেছিল। আবার
ইনজেকশন। আবার কঠ বহি। আবার নাড়ী কাটল।
আবার ডাকার তাকতে চলেছিলেন—চন্দ্রশেখর। কিছু
হাতে ঢাকা ছিল না। এক পরমাত্রীর মধ্যে ডাকার হলো
পাঠিয়েছিলেন। ঢাকা পাওনাও ছিল। পাঁচটা ঢাকা।
কিছু তিনি সেমনি। বলে পাঠিয়েছিলেন—হিসেব
না করে দিতে পারব না। ডাকারও আসতে চান নি।
ডাকার জন্য বহ। আর হাত সেই বলে।

রাত্রি মটীর পর বন্দু বার্য গিয়েছিল। বাকী
রাতিটো—। সে কি রাত্রি ! সে এক অতর্কিত বহা
অবস্থান। রাত্রে নব্বই ঘরতো ছিল—কিছু
অতর্কিত বহু চোখেই হুটাত—সে নব্বইয়ের
দাঁড়ি তিনি দেখতে পাননি। ছিল একটি শিশুর
শব—আর ও পাশে দুর্ভাগ্যবান করে শয্যাশায়িনী
শোকাচুয়া একটি মারা—আর এ পাশে তিনি। পোক
আরও অনেক ছিল—কিছু তাদের কথা তিনি শুনতে
পাননি—তাদের অস্তিত্ব অনুভব করেন নি। সে এক নির্ভর
বহির অতর্কিত। বহে হলে আরও শিউরে ওঠেন
চন্দ্রশেখর। সেদিনকার কথা বহে হলে বহে খেলে ওঠে
একটি বিচিত্র দৃশ্য। যা তিনি বাতবে সেকেননি। অত
ওই রাত্রির কথা বহে হলেই ওই বিচিত্র দৃশ্যটি খেলে
ওঠে ; তিনি শব্দ দেখতে পান একটা বিরাট বটের গাছের
অতর্কিত বাঘা নির্ভর কালো ছয় পল্লব—অনন্ত আকাশকে

ঢেকে নিকব কৃষ্ণ হাথার মত ক্রম প্রসারিতই হচ্ছে না—
নিচের দিকে নেনে আসছে। মূরে পড়ছে—ডাকি এবং নব
কিছুকে চাপা দেবার জন্য। পতীর আতঙ্ক অনুভব
করেন। সেই অতর্কিত বট—বন্দুকে গ্রাস করে ফার
হয়েছিল সে রাত্রে।

বন্দুর ছবি ছিল না। প্রায়েই একটি ঘেসে কটোত্রাকী
এবং ঋণ্ড গায়ত্রীর কাছ করত। তাকে বলেছিলেন—
সেই তুলে দিয়েছিল সেই শবের ছবি। বন্দুরই একখানি
নাড়ী ছিল—সেইটেই তার শবের ওপর ঢেকে দেওয়া
হয়েছিল। সেই ঢাকা ফেঁড়া শবের ছবি। পরে
কলকাতার এনালার্জ করার সময়—সুকৌশলী আর্টিস্ট
তার সেহতাকে বাটের ওপর শূইয়ে দিয়েছিল ছবিখানি এর
পর থেকে টাল্পানো থাকত তাঁর শিবিরে। নিভা—সকালে
সন্ধ্যা—বন্দুরে—ছবিখানির কাছে দাঁড়িয়ে থাকতেন।
কথা বলতেন।

এই মৃত্যুর প্রতিজ্ঞার পিতৃমরণের বেধনা তিনি
কুটিরে ছুঁয়েছিলেন একটি গল্পে। সন্ধ্যানি বহ
দিয়েছিল। সন্ধ্যার কোটে যে কল তার নাম সন্ধ্যানি।
আর বন্দুর ভাল নাম ছিল সন্ধ্যানি। সাহিত্যক্ষেত্রে
এই গল্প থেকে তার ব্যাধি বিজ্ঞ ব্যাধি। তার শূই
কয়েকটি গল্প তিনি লিখেছেন কিছু, সে গল্পে তার
প্রবণতা হলেও প্রতিষ্ঠার মূদ্রপাত করে নি। বন্দুর
শূই নিয়ে সন্ধ্যানিতে ব্যাধি মূদ্রপাত—তাতে যের
এখনও পড়ে নি।—প্রতিষ্ঠার অতর্কিত কব্ধে প্রসারিত
হয়েই চলেছে। চলেছে। তাকে ডেকে নিয়ে চলেছে
কব্ধে। হুটিয়ে নিয়ে চলেছে। সমস্ত কিছু অকস্মে
কব্ধের স্পন্দকে—বনকে—বন্দ্য নিয়ে—হুটিয়ে দিবে
চলেছে। সেই বন্দুর শূই—তার ছবিও শিবনে
কেলিয়েছিল সে। তিনি কলকাতার ওয়েলিংটন মন্ড্রান
হেডে। বাগা করেছিলেন। ছবিখানি—সবগ্রাম—তার
শোবার ঘরে সেই শিবনে—টাল্পানো ছিল। তুলিয়েছিল,
শিবনে যেরে হুটিয়েছিল। কিছু, তিনি তা হতে যেন
নি। তার ছপনার আদ ছির করেছিলেন। একবার নবগ্রাম
গিয়ে ছবিখানা এনে—তার নিজের মতন ব্যক্তি
শোবার ঘরে—বাটের শিবনে টাল্পিয়েছিলেন।

সে ছবি কে সরালে? করে সরালে? কোথায় সরালে? তাকে আত্মকাল—ছুটেতে হয় নানান স্থানে। দিল্লী যেতে হয় নিরবিত। তার উপর আত্ম চলি—কাল মতো পশু, তাসক্ষেপ, বসে মাঝামাঝি এলাকায়। ব্যক্তিগতও তিনি কিছুদিন নিজে গুঞ্জে। এর মধ্যে সে ছবি কে সরালে? কোথায় সরালে? জরী হল—কায়ের নিয়ম। মানব কবির তপস্যা তাঁর এমনি করে ব্যর্থ হল। উপস্থাপিত হল। ব্যক্তিগত লোকেরা কলসে।

কে সরালে ছবি? কোথায়?

ডাইভার হঠক এসে গাভাস—সে ছবি আছে গ্যার। আমি বেবেছি। ব্যক্তিগতের সময়—

—বড়ের সময় খোলা হয়েছিল। তারপর? টাঙানো হলো না কেন? কোথায় বেবেছি?

—টাঙানো হয় নি। সেটা—বড়ি বললেন—অন্য ছবির সঙ্গে ওই—ছোট কুঠরীতে বেবে দেওয়া হয়েছে।

একটা চোর কুঠরী আছে। সেখানে রাখা হয় মনোহীন ছবি। ফ্রেমে রাখাও অনেক অভিনন্দন পর পাঠ্য করে রাখা আছে সেখানে। তারই সঙ্গে উঠেছে মনোহীন বন্দুর ছবি। আত্ম কোন মনোহীন বন্দুর, কেউ নয় সে কারও। কোন স্থান নেই—তার কোন স্থান নেই। হার যে মনোহীন হারের নির্ভর কালের নিয়ম। হার বর্তমানের দ্বারা। অতীত মত—বুঝে যাও অতীতকে বুঝে যাও। বর্তমানের স্থান চাই। ইনকিয়ার জিহ্বা। এই তো। এইতো যানে। ও। বুঝো বাপ—ভার হয়। বরে সেসে তার বর হোসে বরল করে, ছবিখানাও তার করে। ও, কিছু তিনি বেঁচে থাকতে বন্দুর ছবি-সবো?

—তা হলে আমার ছবিগুলো খোঁজ। ক্লে যাও—ওই ভাঙতিবনে। হারনোনিয়মটার সঙ্গে। ঘরি মনোহীন—তবে—তেল—ওইখানে—ওই বন্দুর ছবির সঙ্গে ক্লে যাও। কঠিন তার কারার ভাবে যেন তেলের পড়ল।—হার রে হার। হার রে হার। এই তাঁর জীবন দান্য। মৃত্যুকবিত্ত প্রিয়জনকেই অমৃতের শঙ্খবিত্ত করতে পারলেন না; বন্দুরকে যেহে কেসে নির্ভর ক্রোধক—তার পরিকল্পনা-বয়ে তিনি বর্তমানে। এর

থেকে উপহাস—এর থেকে পূজার আর কি হতে পারে। অমৃত নেই—অমৃত নিখো। মানব জানোয়ার। মানব জানোয়ার। মানব জানোয়ার!

অবদূর হয়ে গেল তাঁর কণ্ঠ। রাখা বরে তিনি বসে হইলেন। বনের মধ্যে চিত্রা যেন ট্রেনের গতিতে ছুটে চলেছে।

—বিশ কিনে—। না। রাতে উঠে সকলের অভ্যাসে—নিরুদ্দেশ পথে বের হলে—এটা যেন একটা বড় টেনশন—। অনেক লাইনের ছোড় পার হয়ে—অনেক ইয়ারত পাশে ঘেঁষে ছুটেছে ট্রেন।

—হ্যাঁ এইটাই নয়।

এখানেই ট্রেনের চেন টেনে ধাঁড় করাবেন ট্রেনখানাকে? পার হচ্ছে টেনশন।

ধাঁড় করিয়ে কি করবে। তোমার এই মূখ মেঘ, জুঁষি পুঁজল—তোমার গতি আছে—নিরুদ্দেশ পথে বের হবার? পড়ক অভ্যাস তোমার—সিপরেট,—বখারী গাড়ী।—না—না—গাড়ী অভ্যাস নয়—নয়—নয়। বেশ তাই হল। নয়—। কিছু সকালে উঠেই যে মাঝার নির্ভর বখারী অমৃতের কল—ওম্বেরে প্রিয়জন হয়; তার কি করবে?—না—ওম্ব নয়। তিনো না চেন। ট্রেন পার হয়ে গেল। চলল, আবার চলল।

—আল্লহত্যা।—হি—হি—হি। কী ভাব? কেন? লিখে যাবে—বাজার কাঁচতরান হয়ে অমরকলাভের প্রহাস হাস্যকর বলে—বা এম সেই মৃত্যুই নয় নিষি। পৃথিবী নিজে কথার বন্দুর একটা।

ছোট অতি ছোট টেনশন যেন টেনশনে ঢাকার মূখে ও বের হবার মূখে লাইনের ঝোড়ের উপর পুঁজার কাঁচি খেয়েই পার হয়ে যায়—তেননি ভাবে পার হয়ে গেল।

তবে—কি? তবে কি?

—স্বভাব বাসা করে একা বাস কর।

সিনক্যাল আপ বা কখন থাকলে যেন মূখ থেকে ট্রেনের গতি বন্ধীভূত হয়—তেননি ভাবে প্রত্যন্ত বেলে বাবমান চিত্রার ট্রেনখানা বহর হল।

—হ্যাঁ। বন্দ নয়। সেই ভাল। সেখানে জুঁষি আপন তপস্যা বহর থাকতে পারবে। তোমার পুঁজার

উপকরণ থেকে কেউ ভাগ নিয়ে নিষেধ পড়া করতে পারবে না ।

চন্দ্রশেখর বান্দ পড়া করেন । কলসার তিনি নিষেধ হাতে লাগিয়েছেন । অবশ্য কল কোটে । কল অল্প তুলতে বসেন । তাঁর শানের কল পায়ে থাকলে বীজ হয়ে তার অমৃতলাভের মতো—শ্রেষ্ঠ পড়া হবে তাঁর । কিন্তু শ্রী পুরে এতের ভাগিয়ে সব কল তোলা হয় । শ্রী—বড় হলে পড়া করেন । অন্যেরা কল-দানিতে দাখিরে গৃহশোভা বর্ধন করে । ছোট হলে গুলি—বারা অর্পণকারী হঠাৎ বুললে ভেঙে—ভায়া অকারণে কল হেঁড়ে—তুলে হিঁড়ে—কেনে দিয়ে ভাগ নেয় । তাঁর জীবনের অমৃত তপস্যার উপকরণের অপচয় করে । এ সেই এ দুসের ইনকিয়ার জিপাবার ; ভাগ—, মিতে হবে—মিতে হবে । —ছিনিয়ে, নেব । —জ্বর, —নেব ।

—হ্যাঁ এই ভাগ । এই ভাগ । এই ঠিক ।

চিয়ার বেলট্রেণ বেয়ে আসছিল ।

হঠাৎ—মনে হল—নিশা হবে । ধারূণ উপহাসে উপহাসিত হবেন । সোকে বলবে—। —বিচিত্র নয়—হটনা হবে—তিনি কোন প্রণয় লীলার লিপ্ত হয়ে এ কাজ করেছেন । অথবা অন্য কিছু । ক'রবার আগে তিনি গুতার হাতে পড়েছিলেন । তাঁর টাকা এবং গায়ের শালখানা কেড়ে নিয়েছিল—গঙ্গার গারে । তাঁর এক অমূল্য—গ্রন্থ্য করে সেটিকে গুরুসে রক্ষিত করে গুটিয়েছিল—তাকে ভায়া—উলঙ্গ করে ছেড়ে দিয়েছিল ।

—না—না—না । হুঁতুত' প্রায়—বেশেখানো চিয়ার ট্রেনের গতিবেগ বাড়ল । বাফা সিগন্যালটা—নূরে পড়েছে । ট্রেনের গতিবেগ বাড়তে লাগল । ওই চৌকর—পিছনে রেখে ছুটেতে লাগল ট্রেন উর্দ্বাশে । চল—চল—চল । পালাও । হ্যাঁ, পালাও ।

কিন্তু কোথায় ?

—হ্যাঁ । সাবরের চৌকরটা যেন বড় । হ্যাঁ । ধারবার হস্ত চৌকর ।—এখান থেকে বাসিন্দা হুঁরে, বাসিন্দা—কঠা সেডেক আয়না লীল নাও । সুঁড়ি বহর । তার বেশী নয় । অথবা—তোমার স্বীকৃত বতখিন ভতখিনের জন্য । ভুবি হয়ে গেলে—কিয়ে বাবে জাি । ছেলের

বেতের কাবুর গারী থাকবে না । কেউ পাবে না । সেখানে হুঁখানি নয় । একজন পক্তারক । এই দিয়ে সকলের মধ্যে সন্তোষবাহীন হয়ে বাস কর । আজ পর্যন্ত যা লভ্য করছে, যা কবে—সব পিছনে থাক । ওই জা়া নিক । ভুবি হয়ে চল ।

—হ্যাঁ । হ্যাঁ । এটাই ধারবার জায়গা ।

—অপবাহ হটবে । সেটা হুঁখানা বাফী করার অপবাহ । একখানা থেকে হুঁখানা বাফী করেছে—চন্দ্রশেখর । কম্পিট্যান্ট । কয়েকী শ্বাৰ্বে প্রমত । তা—কহুক । ওর হায়া—আর কম্পান্যগুলি—ঢাকা পড়বে ।

—স্যার । এই যে—। পাঞ্জা গেছে ।

ভ্রাইভার মরিক—হুবিখানা নিয়ে সামনে বসলে ।

—হ্যাঁ সেই হুঁদুর হুবিখানিই বটে ।

হুঁদুর করে বাগিয়েছিলেন তিনি । সেই ক্রৈব । কাচও রয়েছে । কেটে গেছে । হুঁদো, মরিক কেড়ে হুঁড়েই এনেছে । কিন্তু—। ওঃ । ক্যাকাশে হয়ে গেছে হুবিখানা । ময়ো ময়ো কঠো পেপাক্সে চটা ছেড়ে দাদা দাস হয়ে গেছে । হুঁকে পারে—হাতে রাখার দিকে—দাদা দাদা দাদা ।

হুঁদু । হ্যাঁ হুঁদু । মিলিয়ে তিনি পাচ্ছেন । অদৃশের সব চুলগুলি ছোট করে কেটে সেওয়া হয়েছিল । বেশ নিটোল হাঁসের ডিমের বড় হুঁকের গড়ন ছিল হুঁদুর । সেই হুঁ । হুঁদুর চোখ টায়া ছিল । এ হুবিতে চোখ বড় হুঁদুর । নবের হুবি যে । —কোন চোখটা টায়া ছিল হুঁদুর ।—ঠিক রঁবে পড়বে না । আঃ মিন্ট ভায়াই ছিল হুঁদুর । বেশ কিছুকল করে দেখছেন—চন্দ্রশেখরবান্দ ।

শ্রী এসেব ।

—হুবিটার আর কি আরে—। চলা-ধাওয়া

—না থাক ।

—বাই বাসি দার ভবে জটা টাতিয়ে রেখে কি হয়ে—

—হবে । জটাই আবার সেবার কারখানায় আবার দাকনের মেঞ্জালে—ঠিক হাফখানে—টাছোনে থাকবে । মেঞ্জালে—মেহেহুজীর কাছ থেকে প্রাইজ মেঞ্জার হুবিটা

আছে। ওইখানে। অপোক।

অপোক—ভাঁই ভাইপো। বৃন্দ্র সববেদী; বৃন্দ্র বছর থাকেবের বড় ছিল। এক সংসে খেলা করত। মনে আছে চন্দ্রশেখরের—বৃত্তার দিন সকালে খবর তাঁর পিসীমা বৃন্দ্রকে পুতুল দিয়েছিলেন—পুতুলগুঁড়ি নিতে গিয়েও গিয়ে রাখতে পারে নি বৃন্দ্র—পড়ে গিয়েছিল হাত থেকে মিনিট দুয়েক বা তিনেক পর, তখন লেগুঁড়িকে তার চোখের সামনে—চোপনবার পাশে—খাচ্ছিলে যেনে দিয়েছিল। সে মরণস্পর্শনিক অমায় ক্রান্তিতে নিখর হয়ে পড়ে পুতুলের দিকে তরে ছিল। তখন এই অপোক—সে তখন চার বছরের—সে এসে পুতুলগুঁড়ি নড়েছিল—মোয়ার চোঁটা করেছিল। বৃন্দ্র বলেছিল আতঁভাবে—ওরে বৃন্দ্র—মিল না রে! আমার পুতুল!

সেই তার শেষ কথা মোর হয়।

অপোকের কিছ্র হলে নেই বৃন্দ্রকে। তার জন্যে একবিন্দু হৃদয়র একটি সুখ কোল হুল নেই সারা জন্মের। ওই বোব গরি হাতের জীবনে—প্রথম জীব—যে বৃন্দ্র তঁকি পরবর্তী জন—যে—তার স্থানের অধিকারী হতে চেষ্টেছিল। হু তো হয়েছিল। বৃন্দ্র ভাগের খায়া—বৃন্দ্র ভাগের পুতুল—কিছ্রটা সে গেরেছিল। এখানেই হানুয়ের বনের কাছে জন্তুজীবনের জীব বনের দার। বৃন্দ্র আতঁ আমার নৈতে আছে। ওই সিক টাছিয়ে হাবিখানা।

মাল থাকে পর।

জানববের একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক এসেছিলেন। তিনি বললেন—এটা কি ছবি চন্দ্রশেখরবাবু?—একজন বোকা যায় না? পুতুলো কিছ্র বা—আব্দুলকাদের নতুন কিছ্র করার চোঁটা? কুর খা কটোত্রাকির ফালা?

কথাটা হাসিকতা করেই বলেছিলেন তিনি। মোবও তাঁর সেই। হাবিখানা এমনই বিবর্ণ পাওর হয়েছিল—যে বৃন্দ্র হৃদয়ের উপর—হৃদয়ের উপর যেনে আদ্য পাওরভার চেয়েও নিষ্ঠুর। সে বিবর্ণতার জীবনের পানখাই পুন্দ্র গিরেছিল, অরব তখনও ছিল। এ তো সেই অরবনে প্রতিষ্ঠিত; শিশুর ছুটির নিশ্চিনতার

বাট এঁকে চারিপাশে করে দেওয়ালের চেখা রং টেনে—বৃন্দ্রকে বৃন্দ্র বৃন্দ্র—করে তুলতে চেষ্টেছিল—শেখেরও ছিল। হাবিখানা তোলা হয়েছিল খ্যানে। খ্যানে পার্শ্বের চন্দ্রশেখরবাবুর খেয়াল হয়েছিল—বৃন্দ্র হাবি সেই। তখন হুটিয়ে লোক পাঠিয়েছিলেন—কটোত্রাকির দ্বারা অপেকা কর। নিজে গিরেছিলেন—সেই কটোত্রাকিরের কাছে। সে খ্যানে—কিছ্র ভালপালা ভেজে খ্যাসস্তর কুস্তবনের একটি পটভূমি সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল। হয় নি।

আজ-তিনি হাবিখানার হয়ে বৃন্দ্রকে দেখতে পান—নিখের সৃষ্টির আতঁশী কাচের ন্যা গিরে। অমায়র কাছে একখানা হৃদয়—কিছ্র হাবি, পুন্দ্র কাপড়ের পাড়ের আঁকাবাকা চেখা দেখা যায়। বৃন্দ্র হৃদয়ের আতঁজ। তাও বলে না দিলে বৃন্দ্রের উপার সেই যে—এটি ছোট একটি বয়ে শেখ বৃন্দ্র হুটিয়ে পাড়ের।

চন্দ্রশেখর বললেন—ওটি আমার—

যেবে যেবে আতঁস্বরণ করে বললেন। জ্বলোক অভিজ্ঞত হলেন। লক্ষিতও হলেন। একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস কেলে বললেন—এমন এমন উত্তর কটোত্রাকির কাল; এমন ছুটি একে এমন করে রেখেই কেন? নতুন করে নাও।

—বেব। মনে হয়েছ। কিছ্র নানান কাজের হয়েছ নি।

—ওই হয় ভাই। নুনিয়ার কান্দন—।

—না। ও কান্দন হান্দ্র মিখো কান্দন করে গিরেছে।

—না ভাই। হুত সৃষ্টিস্তস্ত—বিশ্ব—এ দর সেই নামটাই থাকে। আঁকা যে সে থাকে না। থাকে—এইভাবে—যেমন তোমার কাছে এ আছে। তা ছুটি এটি নতুন করে নাও।

চন্দ্রশেখর বৃন্দ্র কন লক্ষিত হন নি।

তার পুত্র বৃন্দ্র—হাবিখানিকে এনি বিবর্ণ হতে দেখেই একে তুলে রেখেছিল—। তার স্ত্রী হাবিখানার হয়ে কন্যাকে বৃন্দ্র পান নি বলেই তার দিক থেকে হৃদ্র কীরেছিলেন। কিছ্র—তিনি? হি—হি—হি। অরব পান নি।

তিরস্কার করলেন তিনি নিজেকে। ব্যর্থবার। হি—
হি—হি। আত্মপ্রতিষ্ঠার আবেগে তুমি নিজেকে
জ্ঞানিতে দিয়েছ। তেঁসে পেছ একথা লভ্য নয়। নয়।
নয়। তুমি সবার ক'রে হৃদয়ানিকে নতুন ক'রে তুলবার
কথা ভাব নি। ভাববার অবকাশ পাওনি—এ কথা বললে
তুমি বিখ্যাত। তোমার এই রেহ এই মনতা সব
ক'রির তাই প্রমাণ তুমি কলহে তোমার আচরণে।

তার অল্প অপর্যায়ের মত আত্মনার করে উঠল—
না—না।—না। আর বলো না। বলো না। বলো না।
তিনি তখনই উঠলেন। হৃদয়ানিকে নিতে বের হলেন।
জ্যেষ্ঠ লোকানন্দলিতে একের পর এক ঘুরে এলেন।
ঠিক নতুনটি করে দিতে হবে। নতুন। তার গল্পজনও
তিনি ছিলেন। কতককারাগার তাঁকে গল্পের দিতে ছা
নি, তারা চিনেছিল।

দকসেই এক কথা বললে। নিদ্রা ঘরে গেছে।
এ থেকে ঠিক তেমনটি—। জ্ঞান হুই বললেন—
কেন্দ্র অন্য লোক হ'লে নিভার। এবং একটি মেয়ের
হৃদয় এঁকে দিতার। দত্তটা পারতাম উদ্ধার করতাম।
অন্যায় বড়টার আর কিছু নেই। সামান্য। এ হয় না!
বেলা তিনটোর সময় তিনি ফিরলেন। তখনও
অস্বস্ত অতৃপ্ত। কিছু তাঁর মূখ্যে মেখে ফেটে কিছু
বলতে সাহস করলে না। শ্রী পশ্চিম না।

স্নান করে পুঙ্খাব বসে ক'লিলেন। বললেন—অস্বস্ত
নেই। কোন কলহই মৃত্যুকে অর্জিত করা যায় না!
হে দেবতা! হে ভগবান!

যায়।

চমকে উঠলেন তিনি। তার নিজের কনই কলহ
উঠল বৈবাল্যের মত। —যায়।

—কি করে যায়। কেনন করে।

পদ্মমুখেরি তিনি পুঙ্খাব আসনে বসেই ডাকলেন
বড় বড়।

—একে ডাকেন বড় বড় বলে। তিনি ব্যতীর
বড় মেলে। তার শ্রী—বড় বড়।

শ্রী এসে গাড়ালেন।

—দেশ তো, বৃন্দার হৃদয়ানি নিতে রেখে এলো
দায়েরি বয়ে। আন তো নিয়ে এস তো। আর ছোট

চৌকীখানা দেয়ার উপর আনার দোয়াত কল থাকে। আন।
আমন্ত্রণ হয়েছেন তিনি। পথ শেষেছেন। এইখানে
যেথ য়েবতার সঙ্গে পুঙ্খাব করবেন। পুঙ্খাব
বলতে যা বোকে লোকে তা নয়। কুন্দের মালা
দিয়ে সাধাবেন নিত্য। —এই তো অস্বস্ত। পুঙ্খাব
বয়েই ভগবানের অস্বস্তার অস্তিত্ব। যেখানে তার পুঙ্খাব
নেই সেখানে তার অস্তিত্ব মৃত্যুতে।

হ নাস পর।

কুন্দের মালা দিতে গিয়ে নজরে পড়ল—ভিতরের
বিবর্ণ হৃদয়ানি যেন কুন্দের উঠেছে। কোঁশে উঠেছে।

শ্রী চন্দন দিয়ে থাকেন যোজ। ঠিক কপালে
একটি করে টিপ পরিবে যেন। তার হাত মোটা।
আর এ দিকে বৈব'ও কম। চন্দনের চোঁচটিটা মোটা
হয়ে যায়। চন্দনের পুঙ্খাব বয়ে—ভিতরে আত্ম দিতে
কাত মোহেন—তারপর—কুন্দের বেঁচি দিয়ে নব্বো বিবর্ণ
বিবর্ণ তিলক থাকেন। অনেকে দিল করে কল যেন।

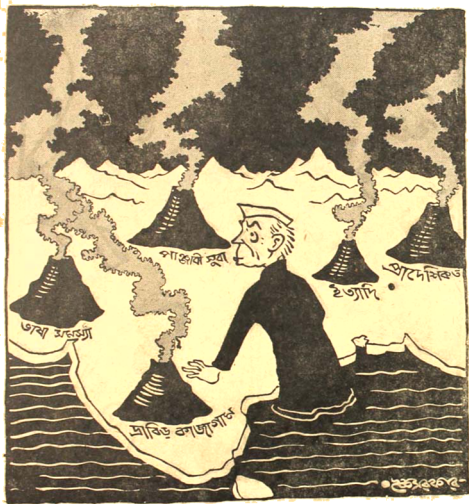
কুন্দের সন্দেহ জলে জলে—ভিতরে কোঁশে উঠেছে
হৃদয়ানি। ভিতরের বোঁচটি। —তিনি এটা ভাবেন নি।
তিনি বিহ্বলের মত হৃদয়ানি টেনে কোন্দের উপর তুলে
দিলেন। যেন তুলেছেন—জেন থানা থানে গেলেন।
জলে সেথানাও—গড়েছিল। হৃদয়ানি দিয়ে কাচখানা
পড়ে গেল বাচিতে। কনকন পশ্চ উঠল। জ্যেষ্ঠ বেল
কাচখানা। তিনি আঁকতে বরতে গেলেন। পারলেন
না। কেটে গেল হাত—এবং—বুকের কাঁচটা। তবু
তিনি টেনে তুললেন হৃদয়ানি।

পুঙ্খাব বলে জলে পুঙ্খাব বোঁচখানা বসে বসে করে
গলে—হুই তিন-চাপ বয়ে পড়ে গেল। আবার কুন্দের
পড়লেন তিনি। না—বিছাই দেই। কিছুই দেই।
—চন্দন চন্দন করে কোঁচা কোঁচা বড় করে গল্প
তার উপর।

—চন্দন চন্দন করে কোঁচা কোঁচা বড় করে গল্প

—তারপর আত্ম এক গ্রান বাসি কুন্দের উঠল তার
হুয়ে। ডাক্তার সঙ্গে—একটি গভীর হৃদয়ানি বাস।
চোরে হইলেন বড় কোঁচা কটির দিকে।

ডাকপরে কলেন—টিকার বাইজনের পিপিটা আন তো।



ভারতে ভারতীয় এক পুরুষ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিলাতে
 গিয়ে। সেখানে সেখানে অবস্থিত হয়েছে।

শিল্পী : কেশবকর



কালের খাবার

রশেল অরবিন্দ

বায়ু প্রেমেন্দ্র মিশ্র



চিঠি। কাগজেট থেকে দেখা। ইংরেজিতে।
বাংলা অনুবাদ করলে মোটামুটি এই গভীর—
বিশিষ্ট,

আনাকে নিজের ভুলে দান নি। আমার সঙ্গে
একবার পড়িয়ে হলে কেউ আর ভোলে না। এটাও
আমার একটা অসম্ভাব্য। আপনার সঙ্গে ত একবার
নব দুবার দেখা হয়েছে। দুবার-ই অবশ্যই হৈনে।

টেনে দুটো রাজ্যে যেতে যেতে একটা অদ্ভুত
ঘনিষ্ঠতা অনেক দূরে দু এক জনের সঙ্গে হয়।
চল্লিশ বছরের পরিচয়ে মনের যে সব দরজা বন্ধ-ই থাকে
চল্লিশ বৎসর আসলে তা কেমন করে খুলে যায়।

আপনার সঙ্গে সে রকম ঘনিষ্ঠতা না হোক কোথায় যেন
একটা মিল হয়েছিল। বিশপীতের মিল। আপনি ও আমি
ভেতরে ও বাইরে নানাবিধ দিকে ভিন্ন জাতের।
তাই বোধ হয় পরস্পরকে আকর্ষণ করেছিলেন।
আকর্ষণটা প্রাতিবন্ধ তা বলছি না। কিন্তু সেটা
ঐশ্বর্য্যের চক্রে ভালো।

আমার দম্ভে বিরূপ হাওয়াই আপনার হয়ে বলে
যে নিচ্ছি। কিন্তু তাতে আত্মা হ'ল না। বিরূপ
না হলেই বরং অত্যন্ত হালকা কথা। কারণ প্রথম
আলাপে আপনাকে একটু ক'কানি লেগে গুটাই
করেছি। সেটা আমার শ্রদ্ধা। আমার শ্রদ্ধাবোধ
আরো দু একটা বিশেষত্বের পরিচয় নিজের পেয়েছেন
এবং মনের খাতায় সেগুলো টুকেও রেখেছেন যোগ্যের
দুবিধামত কাছে লাগাবার জন্যে।

কিন্তু সে দুবিধা বেওয়ার্ষ দম্ভবতঃ
দরকার হবে না।

যাতে না হয় সেই জন্যেই এই পত্রাঘাত।

আপনি বাংলা ভাষার একজন লেখক, বিত্তীয়ভাবে
টেনে যাত্রাতেই তা ভেবেছিলেন। আনাকে নিয়ে
মানবো গল্প লেখবার কষ্ট করবার কিন্তু প্রয়োজন
নেই। আমার পত্রাকার কাগজ-ই আপনাকে পাঠ্যদান।
যালাভাষার সাহিত্যে নিয়ে যোগাতে পাবেন।

কট হাট একটু করতে ইচ্ছে হয় করবেন, কিন্তু কত

ছড়ানোর চেষ্টা করবেন না, কারণ এমনিতেই আমার বিশ্বের হতে গম্পের হং বেশ ছড়া ।

দম্ভ আমার বতই থাক তার জন্যে এ কাহিনী যে আপনার কাছে পাঠ্যিচ্ছি না, একথা বিশ্বাস করতে পারেন । আমি যে হাজো থাকি সেখানে আপনারা 'বাংলা সাহিত্যের কোন খবরের কোন ধান-ই নেই । দুতয়াং খাতি বা মিশেল হুসে আমার এ কাহিনী পড়ে বাংলা ভাষার পাঠক পাঠিকা কি ভাবে তাতে আমার কিছু আসে যায় না । আমি শূদ্র নিজেই খোঁজবার খোঁজের মাধ্যম এ কাহিনী কিছুদিন আগে লিখে ফেলি ।

লিখে ছি'তেই ফেলছিলাম, হঠাৎ আপনার কথা মনে হল । ভাগ্য করে ডায়েরীর পাতার আপনার টিকানাটাও শেষে সেলাম । তাই আপনাকে পাঠ্যিচ্ছি ।

আপনারা বানিয়ে বানিয়ে অনেক গল্প লেখেন । বানিয়ে লেখেন বলে-ই সে গল্প মিথ্যে এমন কথা বলছি না । কল্পনার ধান না মেগালে সোনার বত নত্যকেও রূপ দেওয়া যায় না বলে আমি মনে করি । কিন্তু জীবনের সত্য যেখান থেকে আপনারা গুলিয়ে তোলেন তার বাইরে কত এলাকার এমনও জরিপই হয় নি একথা নিজের মনেব । আমার জীবনের কথার তেরমি অপরিচিত কোন এলাকার সন্ধান পান কি না জানবার কৌতূহলে এ লেখা আপনাকে পাঠিয়ে দিলাম ।

বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সাদান্য একটু পড়ির দ্বারা আছে ইংরাজী ও পু'জ্যাতী ভাবার ভেতর য়ে । সে পড়িরের ছোরে আপনারা সাহিত্য লখে কোন রায় দয়াসরি দেওয়া যায় না । কিন্তু পু'জিবীর সব সেনের সাহিত্যে আজ যে ভট্টার চান লছে বাংলা ভাষা তা থেকে মুক্ত বলে মনে হয় না । আমার নিজেই ধারণা এই যে একনকার সাহিত্যিকেরা নিজেদের দম্ভ হারিয়েই নিজেদের কাছেই কেন্দ্র খেলো হয়ে সেয়ে । কলিত বিজ্ঞানের চোখ বাঁধানো ঐশ্বর্য সাহিত্যিকের নিজেই দু'কিতেই তার সজ্ঞাকে বিস্তৃত সত্তা করে দিয়েছে । স্পষ্ট স্বীকার করুন বা না করুন নিজেদের আপনারা বানিকটা অবতার কালছু মনে করেন । তাই হয় প্রায়শই আদরসে জাতিসে নর ভবিষ্যতে ভারী

করে আপনারা সাহিত্যের বাহ্যারে খবিসার ভোলাবার চেষ্টার মত ।

ধান ভানতে শিবের গীত গাই'ছি মনে করছেন ? তা কিছু নয় । বৈজ্ঞানিক দার্শনিক শিল্পী রাজনীতিক যে বাই করুক জীবনকে বোকার বোলবার কঠিনতম সাধনা যে একমাত্র সাহিত্যের এ দম্ভ আপনারা আব্বা কিরে পাওয়া দরকার ।

আবার এ কাহিনীতে সাহিত্যের সে দম্ভ অবশ্য নেই । আসেই ত বলেছি আমি শূদ্র নিজেই বোকার আশ্রয় এ কাহিনীটা লিখে ফেলেছি । লিখে আরো কাঁপের পড়েছি । মনের মধ্যে ঘার ইঁপাত ছিল ভাষা দিতে গিয়ে দেখছি তা আরো খোলাটে হয় সেয়ে । আপনার কাছে তাই পাঠ্যিচ্ছি । দেখবেন ত একে ওলট গালট করে শাফালে মানেটা কোথাও উটীক দেয় কিনা ।

গল্প আমার বড় নয় । শূদ্র একটি ঘটনা । সে ঘটনার সৌন্দর্য্যের জন্যে শূদ্র একটু ভূমিকা দিচ্ছি । সে ভূমিকা আপনি নিজেই বুদ্ধিতে কল্পনার বাড়িয়ে নেবেন ।

মানুষটা আমি সঙ্গারের বশজনের বিচারে ভালো নয় । সোকে থাকে গলর বলে তা আমার বখেটে । দু'নি ওঁটির মত জীবন কাটাই নি, নত বড় কোন কাজ করি নি, মান ধ্যান ত্যাগ ট্যাগও নয় ।

তবু এই আমিই একদিন নিজে জীবনটা শেষ করে দিতে চেয়েছিলাম । চেয়েছিলাম এককম অর্থিকভাবেই ভাবতে পারেন । ভাস্যের সঙ্গে এমন পাশা খেলতে চেয়েছিলাম যাতে হারলেও জিৎ ।

আপনি ত নিরীহ পছুরে মান'ব । শিকার টিকার কখনো করেছেন বলে মনে হয় না । কলসেও বড় ছোর পাশি টাশি বেয়েছেন ।

আবার সঙ্গে সাদান্য পড়িয়েই নিজের জেবেলে যে শিকারের ব্যাপারে ভারতবর্ষের দেয়া শিকারীদের আমি টকর দিতে পারি । আবার এ দম্ভ বিশ্বাস করুন বা করুন এ গম্পের কিছু আসে যায় না ।

এই শিকারের একটি ঘটনাই আপনাকে বলছি । মনে করুন মধ্য প্রদেশের এক অরণ্যর বন । মনে করুন মান'ব খেচো এক কেঁটার বাগটে সেই মনের আপন পাশের সমস্ত গাণের ধরবার কল্প অবস্থা ।

মোহ হাঙ্গল ও বটেই বাচ্চা বড়ো মেয়ে পুতুং মিলে
গোটা বায়ে মান্দু তার পেটে গেছে। তার বধো
একজন সাতের শিকারী। গাঁয়ের লোক দিনের বেশার
পর্বত বাড়ি ছেড়ে বেরুতে চায় না। চাপ আবাদ
দব বন্ধ হয়ে গেছে।

এমন একটি গাঁয়ে দূর দূর একটা মান্দু বারার
ঘর শেষে আমরা গিরে জুটোহিলাম। আমি আর
আমার বন্ধু বন্দুপ্রসাদ।

শিকারের গল্প আপনি বিস্তর পড়েছেন অনেক।
তবু, ছুটিশাটি কিছু বোঝার জানেন না, যেমন বুন
চল্লিশ পরশেট আর বুন পঁচাত্তর পরশেট হাইকেনের
তকাল, বাঘ আর চিতার জানোয়ার বা মান্দু মারবার
পদ্ধতি কি, কিংবা অংশে জানোয়ারদের ডাক থেকে
কিন্তুরে শ্বাপদদের চলা-ফেরা বুঝতে হয়।

শিকারের সাম্প্রতিক বুলি বদামাধ্য বাদ দিওঁই
কাহিনীটা তাই বলব।

আমার বন্ধু বন্দুপ্রসাদ শিকার সম্বন্ধে এমন কিছু
অভিজ্ঞ নয়। বিপ্লবজনক শিকার সে জীবনে খুব কমই
করেছে। বাচ্চা মহারাষ্ট্রদের সঙ্গে বুন-একবার হাতীতে
চড়ে অংশ ভাঙানো বাঘ দ্বারতে হাওয়া শিকারে গেছে
মাত্র। মাতান বেঁচে সে কখনও ঘরি পাহারা দিবে
বলে নি।

সেই বন্দুপ্রসাদই কিছু এবার জেল হয়ে আমার
সঙ্গে এই মান্দুবধোকা বাঘ শিকারে এল।

তার আসাটা একেবারে অপ্রত্যাশিত।

যে অংশে বাঘের উপর চলাছিল সেখানকার একটি
ফরেস্ট বাংলোতে সপ্তাহখানেক আগে আমি একাই
এসে উঠেছিলাম। কাছাকাছি বাঘের সম্ভাব্য চলাফেরার
পথে বুন কারখানা দুটি বাচ্চা বধি বধিবার ব্যবস্থাও
করা হয়েছিল। কিছু বাঘ সেদল ছোঁই নি। একবার
বরষাসের শ্বাদ গেলে বাঘের দাবারপতঃ অন্য বাঘে
বিশেষ ছুটি থাকে না।

আমি ফরেস্ট বাংলোতে পৌঁছোবার দিন ডিবেক
আসে বনের এক কাঠুরে বাঘের হাতে প্রাণ দিচ্ছে।
সুতরাং এ অংশ ছেড়ে না গিয়ে থাকলে বাঘটা বেশী
দিন আর উপবাসে কাটানো বলে মনে করছিলাম।



আজবতায় অন্য সব রাতও তো আছে প্রসাদ।

হান্দু বা পেলে হ'ত শেটোৱা জনাৰ মোৰেৰ বাক্সা
গুসোৱা ওপৰ নকৰা হৈছে পাৰে এই ছিল আশা। কিন্তু
সে আশা বুঝা।

পাকিমে ও পাকিমে বন বন বেখানে ক্রমশঃ পাতলা
হয়ে পাখোড়ী উপত্যকাৰ এসে বিশেষে সেখানে শ্রাব কুটি
কোমৰ মথো হুতানো কৰে কটা আশা জংলী জাম।
কোন জাৰেই বিশ বিশ থৰে বেনী হান্দু নেই।
হান্দুৰ পাখুৱে জৰিতে হান্দু একটু চাৰ-আবাদ কৰে
আৰ নুচাৰটে মোৰ পূবে কোন কৰে তাৰে চলে।
এই কটা জংলী জামই গত হুতান হৰে শ্রাব হুতান হুতান
উপক্ৰম হৈছে। জংগল থেকে বেৰিয়ে কোন গাঁয়ে
বাহ বে কখন বাবা গেবে তাৰ কোন ঠিক নেই। গাঁ
থেকে বেৰিয়ে কোথাও বাওঁৱা নুৱে থাক গাঁয়ে ভেতৰেই
নিব হুপুৱে দল বেঁৰে হুতা গাঁয়ে লোকোৱা কিন্তু
কৰতে সাহস কৰে না। চাৰ-আবাদ দল নষ্ট হতে
চলিছে। গাৱেৰে মোৰগুলাও উপবাসী। তাৰে
জংগল চমতে নিৰে বাওঁৱা বা তাৰে জংগল বনৰ
বাল কেটে আনাবাৰ কাৰুৰ আৰ সাহস নেই। বেপাৰোৱা
হয়ে নু একজন বাৰা সোছে তাৰা সাধাৰণতঃ আৰ
কেৱল। গাঁয়েৰে মথো সন্তো না হতেই তাই এখন
বিভা বিশ গড়ে বৰে বৰে। সে বিশ বুলে বেন বেলো
না হুতা পৰ্বত কেউ বাৰ হতে সাহস কৰে না।

গাঁয়েৰে লোকোৱা এই আত্মশ্রিত সতৰ্কতাৰ গত সাভ
বিশ হৰে বাৰে কবলে কোন হান্দু গড়ে নি। কিন্তু
তা সন্তো নবৰ ভাগতা নুটি হৰিব শাবক অক্ষত
অবস্থাতেই আছে।

প্রতিদিন হুপুৱেৰে আশে গাঁয়েৰে নু একজন অশোক-
কৃত সাহসী লোককে সংসে নিৰে হৰিব শাবক নুটি
বৰ নিতে ও জীবিত থাকলে তাৰে জংগল কিন্তু
আহাৰে ব্যবস্থা কৰে নিৰে আসছিলাম এই কৰদিন।
গাঁয়েৰে লোকোৱা সেহাৰ আৰাৰ বন্ধুৰে ভৰনাতেই
অবশ্য এ কাৰে আৰাৰ সাহায্য কৰতে যক্ষী হুতান।

সেদিন মোৰেৰ বাক্সা নুটোকে বহাৰানে বহাল
ভবিৰতে থাকতে সেবে হুতান হৰে হান্দুৰ অকোটাৰে
প্রশ্ন কৰবাৰ আৰ কি উপাৰ আছে ভাবতে ভাবতে
কৰেই বাংলাদেশ কিছিলাম।

বাংলাৰ কাছাকাছি এসেই অবাক হৰে বৰে
পাঁড়াল।

বাংলাটো একটা নীচু পাখোড়ী টিলাৰ ওপৰ।
জংগল থেকে আসতে নুৰ থেকেই দৰটা দেখা যায়।
বা সেবে আৰি অবাক হৰে বৰে পাঁড়াল। তা আৰু
কোন ব্যাপাৰ নৰ। একটা হুতান শাভি হাত। বাংলাৰ
বাইৰে টাটানো দড়িতে হাওঁৱা উঠে। কিন্তু এই
শাভি ওড়াটা আৰাৰ কাৰে ভৰন আৰুগুৰি ব্যাপাৰে
চৰেও চাক্ষাৰ।

বাংলাৰ সৌৰে বা আশাৰা কৰেছিলাম তাই
কেলান। বহুনাশ্রাদ সন্তোৰ আৰ সকাৰেই আৰি
বৰ হৰিব শাবকৰে বৰ নিতে বেৰিয়েই ভৰন একটা
জীপ নিৰে এসে কৰেই বাংলাদেশ উঠে। ইতিমধ্যে
তাৰে হানটান যে সাভা হৰেই বাংলাৰ উঠানে
হাওঁৱা ওড়া শাভি তাৰেই প্রমাণ।

আৰি বৰন বাংলাৰ গিৰে চুল্লীৰ ভৰন হুতনেই
বাৰাৰাৰ পাভা নুটি বেৰেও চোৱে বৰে আছে।

সুভাৰা আৰাৰ সেবে শব্দ হুতটা কিৰিয়ে বিলে।
বহুনাশ্রাদ একটা শৌকিকতাৰ সন্তোৰ হানালৈ হাত।
কিন্তু সোটা বিভাৰ দাম্বিক। কোন উত্থাপ ও ভাভে
নেই-ই। ভৰতাৰ কলে একটু হুততাৰেই আভাৰ।
এখানে এখন কৰে হুতাৰ উৰ হুতাৰ কোন কৈছিল
সেও যেন বিলে না—আৰিও চাইলাম না।

আহাৰেৰ বাৰহাৰ সেবে যে কেউ বৰে কৰতে পাৰত
যে তাৰে এখানে আসাটা বিভাৰ সাধাৰণ দাম্বিক
ব্যাপাৰ।

বিকেল পৰ্বত এই ভাবেই কাটল। সুভাৰা এ
পৰ্বত আমাকে এখিৰে থাকবাৰেই চেষ্টা কৰে সাৰাৰ।
এক নলে কাছাকাছি বৰেও চোৰে চোৰ পড়তে সেৱি
একাৰও। বহুনাশ্রাদ একটু আৰিও আসাৰ বা কৰে,
তাও কুছ ব্যাপাৰ নিৰে।

বিকলে চা থেতে বাৰাৰাৰ বৰেই আৰি এই
অশ্রিতৰ আৰহাওৰা শেৰ কৰে দিলাৰ।

কঠিন শ্বৰে জিভাৰা কলান,—হুৰি বন্ধু নিৰে
এসেই সেৰাই প্রমাণ। সে কি এখানে শিকার কৰবাৰ
আশাৰ।

তাহাজা কি হলো?—প্রণব বিরহের স্বরে বলসে,—
শিকারে? কোনো বন্দুক লাগে বলসেই শু আমি।

হ্যাঁ বন্দুক নিন্তা লাগে, কিন্তু সন্দ্বী স্ত্রীরও কি
দরকার হব? সন্দ্বীকে নিয়ে এসেছি কেন?

আমি নিয়ে এসেছি। —বন্দুপ্রদান হঠাৎ অব্যক্ত-
বিক উচ্চস্বরে হেসে উঠে বলসে,—সন্দ্বী যে আমার
দল ছাড়তে চায় না। ও নিকে ছোর করে এসেছে
কি না ওকেই জিজ্ঞাসা করো।

সন্দ্বী চকিতে আমার দিকে চেয়ে হুঁচটা আমার
দূরের অবসের দিকে ঘুরিয়ে নিলে।

সেই এক হুঁচটে তার চোখে যা দেখলাম তা অস্বস্তির
আভাস না কিন্তু বহির জগত যোকা সেল না।

পর্যন্ত দুজন শিকারীকেও সে শেব করেছে। তার নবো
একজন কান্দু সাহেব শিকারী।

ভাষে শু এ বাঘের খোয়াক হবার দোভ সন্দ্বী
হায় না। —বলে বন্দুপ্রদান সন্দ্বীর দিকে কেরে
হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করসে—তুমি কি হলো ভদ্রা?

সন্দ্বী নীরবে পাণ্ডুর মুখে উঠে চলে সেল উত্তর
না দিবে।

পাগলামি কোরো না প্রদান! আমি এবার খন্দু
করে বললাম—এখান থেকে টেপন পাঁচপ মাইল। রাত্তা
খাশাপ হওয়া দত্তেও দত্তোর আসেই তোমার পাভিতে
দেখালে শেীখে যেতে পারবে। আর এক হুঁচট দেবী
না করে তৈরী হয়ে নাও। সন্দ্বীকে নিয়ে তোমার



করেই বাংলাদেশের সংগে আমাদের জীবনের হতাকর্তা? কি তুমি নাকি?
যন্দুপ্রদানকেই বুড়ভাবে জিজ্ঞাসা কলাম,—কিন্তু
মেতেই হবে এখনি।

তুমি নিজেই কি বলে এখানে এসেছি? এখানে শিকার
করতে আসার মানে কি, তা তুমি জানো?

যন্দুপ্রদান আমার দিকে চেয়ে হেসে বলসে,—তুমি
বছর সতদিন বয়ে এসে নিষ্কর্ষ হয়ে বলে আহ, তখন
এখানে শিকারের মানেটা কি? কেতাই হই কি।

আমি ভদ্রাধরে বললাম—এ রাণি তাহাণর ব্যাণার
দয় প্রদায়। মানুষকে বাঘের মধ্যেও তফাৎ থাকে।

হিংস্র শরতানীতে এই বাঘটার তুলনা মেলা ভার। এ

করেই বাংলাদেশের সংগে আমাদের জীবনের হতাকর্তা?
কি তুমি নাকি?

এ আখাতটাও গায়ে না মেখে আমার সন্দ্বীবিবর্ত
কাতরতার সংগে বললাম,—বাই তুমি আমার বসো, আর
একবেলাও তোমার এখানে থাকা চলেবে না। নিজের
কথা না ভাবো, সন্দ্বীর কথাটা ভেবে দেখো!

এক দৃষ্টে আমার দিকে বান্ধকল চেয়ে একটু ভিক
হাণির সংগে যন্দুপ্রদান বলসে—তার কথাই ভাবছি।

ত্যাগত আমার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে
কান্দাখা থেকে নেমে বাইরের দিকে চলে গেল ।

বন্দুপ্রশাসকে বোকাতে না গেলে একবার মনে হল
দুঃস্বপ্নকেই গিয়ে এ উদ্ভত মেথালে বাবা দিতে বলি ।
কিন্তু তাতে কোন ফলই হবে না মনে বন্দুপ্রশাস
একবার দেখে নেবার জন্যে নিজের ঘরের দিকে গেলার ।
আমার সঙ্গে ৪০০ পরশুই ভাড়াই ডবল ব্যালন হাইকল
ছাড়া ৪০০ পরশুই হাইকল একটা আছে । বন্দুপ্রশাস
যে হাইকল সংগে এনেছে সেটা ইতিমধ্যে দেখেছি । সেটা
পাখী বা চিত্তল কাকার মারবার ২৪০ হাইকল মাত্র । বন্দুপ্র-
শাস যখন কিছুতেই জেদ ছাড়বে না তখন তাকেই আমার
৪০০ হাইকলটা দিয়ে নিজে ৪০০টা বেস তিক করেছি ।

নিজের ঘরে বাবার গথে বোলা দরজা দিয়ে পাশের
ঘরে দুঃস্বপ্নকে দেখতে গেলার । দরজার দিকে পিছন
কিরে জানালার ধারে পাখরের মূর্তির মত নিস্তব্ধ হয়ে
গাঁড়িয়ে সে দরজার পাহাড় জংগলের দিকে চেয়ে আছে ।

এক দুঃস্বপ্ন দরজার কাছে গাঁড়িয়ে তাকে ডাকল কি না
যিহা করে নিজের ঘরে চলে গেলার ।

তার পরদিন সকালেই আশাভীত খবরটা পাওয়া গেল ।
বাবা গাঁড়াই আর উপর্যাপী থাকতে না গেলে আমাদের
কান্দাখাছি বঁধা একটি মোবের বাজাকে ঘেরে বানিকটা
ঘেরে গেছে ।

মোবের বাজা মূর্তি দেখানে বঁধা দেখানে দুর্বিষে-
দোষের উচ্চ গায়ে চমকসই মচানের ব্যবস্থা আগে
থাকতেই কটা ছিল ।

দুঃস্বপ্নেরে হুয়েই মরা মোবের বাজার কাছের বাচানটা
কম্বলুত করে বঁধা হয়ে গেল ।

বন্দুপ্রশাসকে তার ওপর দাবা তিক করে নিজের
জন্মেও কান্দাখাছি একটা বদবার কাছগা দুঁকে নিদার ।
মরিটা দেখানে রাখা তার পাশ দিয়ে একটা কোলঝাড়ে
ঢাকা নাল্য সেজে সেই নালার ওপারে কিছু দূরে একটা
মাজারী বসন উচ্চ পাথরের চিঁড়ি । তার একদিকটা
একবারে নাখা পর্বত প্রায় সোজা বাড়াই । মরিচ বুনো-
বুঁধি বিকটাও বানিক দুই বাড়ি উঠে একটা পাথরের
খাঁজের মত আশপাশ বেধে হয়েছে । পাথরের একটা
টুকরো তাকের মত সেই আশপাশ পাশের এক দিকের কিছুটা
চালু এভাবে খোদো, যা ঘেরে ওঁটা বার এবং একটা
আকাখাচি ভাবে হলো মরিচ দিকে নজর রাখা যায় ।
একাত্ত নিরাপন না হলেও কিছু কটা কৌশল দিয়ে
ঘিরে ঘিরে সেইখানেই আনি বসব তিক করলাম ।

দুঃস্বপ্ন অত বাবার আশেই যে বায় জায়গায় গিয়ে বসতে
হবে নাগরাত জেসে বাবের অর্ধভক্ত মরি যেতে আসার
প্রতীকী করতে ।

কিন্তু এ ব্যবস্থাতেও বন্দুপ্রশাস গেলো বাহাল ।

প্রথমতঃ আমার ৪০০ হাইকল সে কিছুতেই নেবে না ।
তার নিজের ২৪০ এর সঙ্গে আমার ৪০০ হাইকলটা
ব্যবহার করতে যদি বা তাকে রাজী করানো গাছের
ওপরকার নাচানে বসতে সে অসম্ভবভাবে আশঙ্কিত জানালে ।

তার বিরোধী একদুই মিনিটে হাঙ্গ আর মারদাতে না
গেলে জলে উঠে বসলাম,—আম্বলভ্যার অন্য সহজ
রাষ্ট্রাও ত আছে প্রমাণ ।

সে কোন রহস্যময় ভাবে যেসে বদলে—আনি । কিন্তু
আম্বলভ্যা আনি করতে চাই কে তোমার বদলে ।
তোমার ওই মানুসখেকো বাবকে আনি এক রাষ্ট্রের
জন্যে নিরন্তর গলে বসাতে চাই ।

দুঃস্বপ্ন কঠিন স্বপ্নে এবার বদলার,—না তোমার এদর
পালালমিকে প্রমাণ দিতে আনি পারব না । হয় তুমি
নাচানে বসবে, নয় শিকারে যেতে তুমি পারবে না ।

বন্দুপ্রশাস একটু হাসল । তারপর প্রায় সহজ পাথ
দলার বদলে—বাধা তুমি আমার দিতে পার না । তবু
ওই চিঁড়ির ওপর যদি আনি নাই বসি তাহলে আনি
বাংলোতেই থাকব, আর গভীর রাতে হেঁটেই ও জংগলে
হাবো জেনো ।

সহজ খবর আর বেশী নেই । নিরুশ্রান্ত হয়ে তাই
বন্দুপ্রশাসের জেদই রাখতে হল ।

ফক্টে বাংলো থেকে বন্দুপ্রশাস চিঁড়ি জলের জ্যাক কম্বল
প্রস্তুতি পাশ সহজার নিয়ে বেঙ্গুরার মর দেখানো দুঃস্বপ্ন
বীরবে এসে বরাপার ঘারে দাঁড়িয়েছে । তার বেশভূষাটা
ওই অবস্থায় সত্যি মনে দেবার মত । উজল অলস
হস্তের শাড়িটা তার দুইদিক দাঁধ দেখতেকে বেসে আসন্নদের
শিখার মত বেটন করে উঠেছে । কিকে সবুজ হস্তের
চোলিটা ঘেন সেই আগুনোরই রূপ্য ছায়ায় ইংলিতবর ।
চুড়ো করে বঁধা মাথার বোঁশায় বনকুলের বেত—
বাংলোর আশপাশের গাছ থেকেই তোলা ।

সবিস্ময়ে তার দিকে তাকাতো একবার দুঃস্বপ্নের চোখের
দুটো নিমিত্ত হল কিন্তু মনে হল তার দুটোর শোভনে
কোন চেতনা ঘেন নেই । সেহের ওই শিখার আগুন
তার ঘন ঘন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ।

মরি পাছগা দিয়ে মানুসখেকো বাবকে জন্মে অপেক্ষা
করা কি মের ও আম্বলভ্যের পরীক্ষা তা আশপাশে
বোকাবার চেষ্টা করব না । প্রত্যক অভিজ্ঞতা ছাড়া
অনুভূতির আশাস পাওয়া অসম্ভব মনে হল ।

মত মর সম্ভব স্থির নিশান হয়ে বাচানের ওপর বসে
আছি । দুঃস্বপ্ন অত দিয়ে অভ্যাস ঘেনে এল সহজ অবস্থায়
পাহাড়ের ওপর কান্দো অবস্থার মত । পাশুটো জল
মোরগগুলো শেরবায়ে মত ডেকে উঠে তাদের বাসার
গেল ।

তারপর তীকির কন্যারসঙ্গে থেকে থেকে রাতজা

পাখীদের ডাকের চমক। অন্ধকার ঘন অট্টাল মত গাড় হয়ে উঠেছে। মাথাটা জালা আছে তাই, নইলে মজান থেকে অন্ধত্বের বোনের হাওয়া। পাখীটা দেখাই দাচ্ছে না ভালো করে।

হাত বৃত্তে তবু দেখলাম হাত প্রায় নটা। বহুদূরে 'আইও' 'আইও' গোছের একটা ছ' উঠে গেছে সেল। এক পাশ চিত্তল হরিশ কোন কারণে ছর পেয়েছে। বাঘের গন্ধ কি গাড়ী গেছে হতে পারে। অন্য কারণেও হওয়া সম্ভব।

হাত ঘন কটা বেছে গেছে তখন হাইল খানেক দূরে একটা কথা সম্বন্ধে ডাকে চমকে টান হয়ে বসলাম। অনেকটা কটাঘরনির মত সম্বন্ধ ডাক। ডাকটা অমণ: দূরে মিলিয়ে যেতে বৃদ্ধদের সম্বন্ধটা ভর পেয়েই পালাচ্ছে। এবার বাঘ না হয়ে বাঘ না।

বাঘটা হঠাৎ দিকেই আসছে মনে হল।

কিন্তু কই? আধকটা চক্কর মিনিট ফেটে সেল। এতক্ষণে বাঘ এসে পৌঁছে দাবার কথা।

বাঘটা কি তাহলে কাছে এসে কোথাও থাপটি ঘেরে আছে। গায়ে বাঁধা মজানটান যে মানস আছে তা কি সে বুঝতে পেরেছে।

কিনো বহুনাগ্রাসেই সে কি সন্ধান পেয়েছে। নিশ্চয় বাছে ডাকে আক্রমণ করতে।

বৃদ্ধটা এক বহুদূরে কি হকন কোঁপে উঠল। পাখীটা বাকীটা দকেট নিরাপন্ন নর আনি জাতি। বাঘও সেরকম পেরোয়া হয়ে লাক দিলে বাকি গিয়ে উঠতে না পারুক বাঘার খায়ে সেখানে যে আছে তাকে অন্যরাসে পেড়ে ফেলতে পারে।

বাঘ কি সেই বহুদূরেই গেলিকে গেছে।

এবার আনি বা করলাম, তা অভিব্যক্তি নির্বোধ বা উন্মত্ত হাড়া কেটে করে না। মজান থেকে চ' লাগান বন্ধুত্ব নিয়ে আনি নিজে নালায়।

কেন এক কাছ করলাম তা আপনাকে বোকাতে পারব কি না জাতি না। আনি নির্বোধ বা উন্মত্ত কিছ' নই মিথ্যে। পাশ পূন্য লাব্যজিক অপরায় সম্বন্ধে আবার বাগদা লাব্যরশের থেকে এমন খালামা যে গভীর অমুশোচন্যর কোনরকম প্রার্থিত্ত করতে আনি বরিয়া হয়ে উঠিনি। শূন্য এক বহুদূরে আবার বনের ঘোে কি ঘন একটা ওলট পালট হয়ে সেহল। মনে হয়েছিল বৃত্তর সঙ্গে জুয়া আনিও বেলাতে পারি জটীল দৃশ্বেছা আবারের গরুরে লম্ফার এহি মোচনের দৃশ্যোগ নির্ভিত্তকে হিতে।

মজান থেকে নেমে বাকখানের জুলা নালাটা পার হয়ে কি ভাবে বহুনা প্রসারের পাশুর্বে জিবিটার কাছে পৌঁছলাম সে বর্ণনা দেবার প্রয়োজন নেই। বলা বাহুল্য অতি লাব্যবে সঙ্গর্পণে সে দিকে আনি

অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু সেখানে পৌঁছে অন্ধকারে বহুদূ সম্ভব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নেমে টেটুকু দেখতে সেলা তাতে আনি তন্মিত। বহুদূরপ্রসার সে পাশুর্বে বাঁকের ওপরই নেই। আনির হয়ে এবার উচটা কেতে দেখলাম। না, সেখানে তারি মনের স্রাভ আর কন্দলট শূন্য পড়ে আছে।

কোথায় সেল বহুনাগ্রাসদায়?

বাঘ কি অতর্কিতে তাকে আক্রমণ করে এত নিশ্চয়ে নিয়ে চলে গেছে যে এতটুকু আভাসও আনি পাইনি!

ব্যাকুল হয়ে আনি 'চ' ফেলে চিবিব চারিবারট দেখলাম। না কোথাও এতটুকু হকের বাস নেই।

বিনম্র হয়ে কি করব ভাবছি এখন সবচে আবার মাটা বাঁধা গাড়ীর নিচে একটা উচের আসো পলকের জনে জলে নিতে সেল।

বহুনাগ্রাসে তাহলে তার আক্রমণে ছেড়ে আবার মজানে দিকেই গেছে!

কিন্তু কেন?

ভর পেয়ে এ ভাবে তার পক্ষে বাঙা অবস্থাস্য।

তাহলে এতখানি বিপরীত্ব করে আবার মজানে দিকেই বাঙা তার উদ্দেশ্য কি?

এবার বৃত্তি শক্তি আবার ঘন গুলিয়ে সেল প্রসার। প্রসার। বসে চিৎকার করতে করতে সব লাব্যবাক্য জলাজলি নিয়ে আনি তার দিকে কোণ কা ছেতে ছুটে সেলাম।

কিন্তু বেশী দূর বেতে হল না।

বেশ কিছু দূরে আবারের ফরেক্ট বাংলোর দি থেকেই জাতির নিভরতা কপানো একটা জুজার পোন সেল। সেই সঙ্গে অশুট একটা আত'বাহ।

আর বিশেষ কিছু দেখবার নেই মিথ্যে।

নিরাতির দলে জুয়ার হুতুর বসি হলান আবার না সূজাই।

বাংলো থেকে কিছু দূরে তার রক্তের বাগ আ রূপালের কটার আটকানো তার আপন রঙা শাড়ির ছি অংশ পাওয়া সেল। আবারের কাছেই আসছিল একল ভই গায়ে।

কেন?

কেন বহুনা প্রসার তার আক্রমণে ছেড়ে আবার মজানে দিকে গিয়ে ওপরে উচের আসো কেসেছিল?

বহুনা প্রসারকে সে কথা আনি জিজ্ঞাসা করছে পারভান। করনি।

সূজহার বনের কথা জানবার কোন উপায় আর নেই।

সাক্ষ্য নিরতিশ্রব্ধশ পেরাঘ আনি তারপর ঘেরেছিলান মিথ্যে।

ଓରଫିଏସ୍

ମାସିକ ନିଆରାଣ୍ଡା



NITISH/MUNGERJEEII

কাল সকালে এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।

এই বাড়ি—যেখানে আমি পৃথিবীর প্রথম আলো দেখেছিলাম। যেখানে জীবনের এই চূড়ারটা বছর কেটেছে। ইংরেজেরা বলে হুপার চামচে, সোনার চামচে মূখে নিয়েই জন্মেছিলাম আমি। অথবা সোনার কিন্দুক। তারপর আমার চোখের সামনে এই চূড়ার বছর ঘরে কীভাবেই যে সব শেষ হয়ে গেল! হাজার হাজার আততয়াহি জলিল, মূর্ত্তা মূর্ত্তা করে আলোর অধমিকা হৃদয়ে দিলে আকাশের তারার দিকে—তারপর তার হাসের অমাবস্যার বেখে ঢাকা হাতের হতো নিখর কালো অন্ধকারে চারিদিক ভুবে গেল।

হাসনের আদালা দিয়ে সাত পুত্রদের ভিটেটা দেখতে পাচ্ছি। সবটা দেখা যায় না—এতটুকু এই আদালা দিয়ে দুর্গের হতো বাড়িটার কতটুকুই বা মজরে আসে? তবু, কতটুকু দেখতে পাচ্ছি—তাও কি বিরাট—কি ভয়ঙ্কর। জ্বালি একটা হাসব পুত্রীতে এই চূড়ার বছর ঘরে বাস করছি, এই লতাটাকে যেন আমি আমি প্রথম আধিক্য করলাম। যেমন সমুদ্রের বাহ ডাকার তুলে আমলে সে সাগরের বিরাটত্বকে অনুভব করতে পারে।

হানাদার বাইরে দৃষ্ট্য নেবেছে। পুরোনো ঘর বাড়ির এখানে ওখানে তরুণ তরুণ, পট্টা চিত্রকার তুলেয়ে—ওতানতপে—পায়রার পাখা ঝুঁটানির আঙাখ পাচ্ছি। ঠাকুরবার মূখে পুনেছিলাম, বাড়ির লক্ষী ছেড়ে গেলে পায়রায়ও আর থাকে না—অন্য কোনো মূখের ঘরের লক্ষ্মী বিহার নিয়ে যায়। কিন্তু ওরা কেন এখানে বাস নি? কিসের আশার আছো এই বাড়ির আনাচ কানচ আঁকতে পড়ে আছে?

ওরা থাকুক, ওদের জন্যে আমার ভাবনা নেই। আর আমায়ই বা ভাববার কী আছে? কাল সকালের ট্রেনেই তো ঘেরিবে পড়ব। প্রথমে ঘাব হরিয়ার। সেখান থেকে অনুভব। তারপর—

তারপরই বছর আমি আর জানি না। এই বসন্তাভরা লিভারটা বেশ দিন যে পুত্রীরে বোকা নামায় বইতে দেবে না কেনল তাই আমি। কোনো হোটেল—কোনো ওয়েটিং রুমে—কোনো লগাইনায়—একদিন পৃথিবীর সব বাড়ী হিসেবটুকু চুঁকিয়ে দেব। 'হান-ল্যাবেটেক্স আন-গার' কে আমার জন্যে বিলাস করবে? এমন কোন যন্ত্র কীতিতী জীবনে করছি—যার জন্যে আমার মৃত্যুকে আশ্রয় করে কোনো কবি পান বাঁচতে যাবে।

হাঁ—কিন্তু করছি বই কি। কীতি' না বাক, অকীতি'র খাতার নক্ষ্য কিছু রেখেছি নিভর। এই যে হাজার হাজার আততয়াহি জলিল সাত পুত্রদের - অথবা তারো বেশি—বা কিছু জন্মেছিল, বাহুরের কলার হতো পুত্রে নিঃশেষ হয়ে গেল, তাতে আমারও অনেকখানি কুতিয় ছিল। সেই সৌরবের ইতিহাস কেউ লিখবে না। জানি না নরক আছে কিনা; যদি থাকে, তা হলে সেইখানে বসেই শতজন মজার মূর্খের প্রাণ ছেলল একটা কালো বাতায় রক্তের অক্ষর দিয়ে তা লিখবে। সেই আবার হাতে পাকা হিসেবের হাকলজি গরবে দিয়ে কোনো হৌরন-কুতীপাকের রহস্য বলে দেবে।

এই বিশাল শূন্যবাড়িটার নামা বহলদুলো অন্ধকারে আমার চোখের সামনে গাঁড়িয়ে। যেন সারি সারি শোভা আসতবাজার বোলল। কলকাতার পাক' শ্রীটের সেই কালো কালো পুরনো কবরদুলোকে যেন কেউ পাচ-পশপদ বাড়িয়ে এখানে এনে রাখিয়ে দিয়েছে। হাকরাতে ওদের তলার আমার শিতপুত্রদুলের হাকদুলো বড় বড় করে নড়ে উঠে—বাতাদের পথে গদা মিলিয়ে তারা আমাকে আঁতদম্পাত দেবে। আর চূড়ার বছর থকেই দ্ব্যতো দিচ্ছে। কিন্তু তাতে আমার কিছু আসে যায় না।

আমি অনুভব ?

না—বিশ্বাস্য নয়। কেন অনুভব করব ? আমিও এই সংসার—এই জীবনের ব্যক্তিই হলে। কি করে এত বড় সম্পত্তি প্রথম আনালের হাতে এসেছিল, সে জাহ্নবী কি আমিও শুনিনি ?

আমরা ভ্রমণ। যখন-যখন-অবস্থাপনা আমাদের পেপা। জীবনের হওয়া আমাদের দ্বারা নয়, জীবনের আমরা ছিলুমও না। যেন আলাদাভাবে প্রবৃত্তির দ্বারা একসঙ্গে আমাদের হাতে এই বিশাল সম্পত্তি চলে এসেছিল। সে এক অশুভ ইতিহাস। অশুভ বিবাহ-যাত্রার ইতিহাস।

সাত পুরুষ—এক পুরুষ—তিন পুরুষ ? জানি না। অত হিসেব আমার আসে না। সেই বড় পুরুষ যাতেই হোক—আমাদের কীর্তিমান সেই বড়পুত্রটি ছিলেন পেপার পুরু। অনেক বড়ো বড়ো শিখা ছিল তাঁর। তিনি নাকি গিন্নি পুরুষ ছিলেন—বয়স বলে দৃষ্টান্তী তাকিনী উত্তরে এনে ভয়সাধনার বসতেন।

কাজেই হনাত পাথর ছিল তাঁর।

তখন এই গ্রামের যিনি জাহ্নবীর ছিলেন, তিনি ততপুত্র কত্রি। যোগল আনলে বাগো ভূইয়া লন পরে তাঁর কে যেন এখানে জরি জাহ্নবীর বকশিস হয়েছিলেন। গুরু ভ্রমণে ছিল তাঁর অচল ভক্তি আর হটুট বিবাহ। আমাদের সেই পুরু পুরুষটির চরণ-হাতে ধীকা নিয়ে বন্য হয়েছিলেন তিনি।

তাঁরা শ্রাবী-শ্রী ছিলেন নিলজান। তাঁদের দুইজনের বন্যবলে ডাকিনী-যোগিনী আহনে করতে গিয়েও একটি লজান কিছু দিতে পারেননি। বাই যাক বড়ো বয়সে তাঁরা তীর্থ ভ্রমে বেরুয়েন ঠিক হলেন। কাশী পুরা থেকে পুরু করে বেলারের শূণ্যতিনাথ আর হারকার হারকানস পরন্তু গর্জন হয়ে আসলেন।

কিন্তু এত বড় জাহ্নবীর কাছে দিয়ে দানেন ? কে হা দেখানো করলে ?

তখন পুরুষকে শ্রবণ করলেন। গুরু পিতা, বড় ভ্রম, পুরু বন। লগারে গুরু চাইতে বড়ো হা কে পারে ?

—প্রভু, আমরা দর্শন তীর্থ ভ্রমে থাকব, ততদিন আমাদের এই জাহ্নবীর ভার আমাদের নিতে হবে।

গুরুদের আশীর্বাদ করলেন। জানালেন, তিনি লজানী (বহিঃ পুরু-লজানী এবং পুরু কন্যার দ্বিগুণে গুণিত পাতক লজান তাঁর ছিল) ; এ সব বিষয়-বইবার দ্বিগুণ তিনি নিতে পারেন না।

কিন্তু শিখা হাফেন না। অগত্যা পুরু হললেন, আচ্ছা, নিতান্তই বন্য হাফেন না—তখন তোমার অনুভব আমার হাফেনেই হবে। তারা ভ্রমণী—লগই তোমার হাফেন।

শিখা-শিখাণী বেরিয়ে পড়লেন তীর্থ ভ্রমে। একে-বারে নিশ্চিন্ত হয়ে।

চার বছর পরে যখন ফিরলেন, তখন মেউড়ীর বাগোয়ান-আর তাঁদের ভেতরে চুকেই দিলেন।

গুরু কাছই হল শিখার পাশ হরণ করা, আমাদের সেই পুরু পুরুষও নিজের কতখানি ভোলেননি। শিখার বিষয়-বান্দার পাশ তিনি মোচন করে দিয়েছিলেন। কখন নিজে দ্বিগুণ হয়েছিলেন শূণ্যতিনাথের নবাব সরকারে, কী করে ভুলিয়েছিলেন হেগ্যানকে—সে যোগ-শক্তি কথা তিনিই জানেন। কিন্তু পুরোনা জাহ্নবীর—বড় অলমার মান্দুটি, তীর্থ থেকে ফিরে এসে দেখলেন এই জাহ্নবীর তিনি আর কেউ নয়। গুরুদের সব দ্বিগুণের নামে পড়নি করে নিয়েলেন।

নবাব সরকারে হুটেহুটি করে নিজের সম্পত্তি ফিরে পাওয়া জাহ্নবীর পক্ষে সম্ভব ছিল কিনা জানিনা, কিন্তু প্রবৃত্তি ছিল না। রামপুত্রে হুই চোখে আসন্ন করলে উঠল, কিন্তু একবারের জন্যেই। তাঁরপর পুরু-সেবতার দ্বিগুণে লাকালে প্রদীপাত করে যে নৌকোর এসেছিলেন সেই নৌকোতেই আমার ভেসে চলে গেলেন। হাতো গুরু হয়ে সব নিবেকন করে কতখানি হয়েই চলে গেলেন। কিন্তু কোথায় গেলেন—কেউ তার বর রাখেনা।

তাঁরপর থেকেই আমরা জাহ্নবীর। ডাকিনী যোগিনী বয়স বলে আনতে পারি আর না-ই পারি, বাইজী আনিয়ে। কারণ বাঁচির পাড় না ছোটে, যকের বোতলের অভাব ঘটেনি। আমরাও স্রেষ্ঠদ্বিগুণ লাভ করে

ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই শ্রেষ্ঠ আদর্শকেই বাস্তব
মটকে রক্ত পুষে ফেলেছে—প্রভব বলতে এই।

অমায় কবেই? বিহু বাড়ও নয়। শাপ নিয়ে ব্যাধ
পড়নি হয়েছিল, শাপের বা দিগ্ধই তার শেকড় পুঁজি উপড়ে
দিয়েছি। আদর্শ সেই কৃত্তী বংশের—যে পুঁজুপুঁজুর
কৃত্তবতার চরম প্রায়শ্চিত্ত করে গেল।

আমি জানি—রাত বাড়লে কাঁদে। তখন এই শূন্য
বাড়িটার দাতপুঁজু, মন পুঁজু, চৌক পুঁজুর
শ্রেষ্ঠাভাষা এসে হানা দেয় বলে বলে। ভাষা ইট-কাঠের
ছপের ওপর দিয়ে চলে বেড়ায় তারা, তাদের ককাল
খাঁয়ের ছাড়াগুলো নিঃশব্দ কোয়ে বহন করে আওয়াজ
তোলে, তাদের শব্দা কণ্ঠাটির চক্ৰখান থেকেই থেকে
আগুনের আলোর মতো অতিশয় ঠিকরে পড়ে আমার
দিকে—তারের দাঁতে দাঁতে কড়কড় করে আওয়াজ ওঠে।
তখন এই বাড়িতে বাতাসের খিঁচিয়াস পড়ে না, বাতাস
পাণ্ডাগুলো ধীরে কোঠারে এসে বৃষ্টি পুঁজু, আতঙ্কে
থেকে দাঁত ভকৎসে ডাক। আর আমার ঘরের দিকে
আত্মস বাড়িয়ে জ্বালাত যেন অতিশয় দিতে থাকে
নিশাত বাও—নিশাত বাও—নিশাত বাও—

ক্রমশঃ। কতদিন রাতে যেন ঘুমের ঘোরে সেই
অতিশয় পুনতে পুনতে আমি ঘুমের উঠছি। নিশাত-
বাতাস দিয়ে যে বংশের ইতিহাস আরম্ভ—তারের
শাপ কলনা। নিম্নের শোণা ছেড়ে দিয়ে যে ভ্রম
জীবিত করে, তার অতিশয় নিম্নে হয়ে যায়। আমি
তা চাই না।

তবু ভাষা পাওয়াতে চেষ্টা করেছে আদর্শকে। আমি
জানি—আমি নিশাত করি না। তবু সেখান থেকে নিম্নের
চোখেই।

শেখর অনেক রাত পর্যন্ত মন খেঁচিয়েছিল। তারপর
ট্রেবলটার ওপর মাথা রেখে যখন কঁচিয়ে পড়েছি খোলা
নৈ। এক সময় মূর্খে মাথার জলের খাপটা লাগতে আমি
ঝেঁপে উঠলুম। সেখান থেকেই বাওয়া দিচ্ছে—বহু বাওয়া
কৃষ্টি নেমেছে বাইরে। আর কড়ের বাতাসে জানলা দিয়ে
কৃষ্টির ছাট এসে সর্বাঙ্গ ভিঙিয়ে দিচ্ছে আমার।

টলতে টলতে উঠে পড়লুম। বহু করতে সেলুম
জানালটা।

আর ঠিক সেই সময় সেখানে সেলুম।

মানবের উত্তরাধিকার কে ধারণ করে। হয়তো আদর্শের
সেই প্রথম পুঁজু—সেই পুঁজুকেই ধরেব পুঁজু। একটা
প্রথম বিলুপ্তির চক্রে সেখানে সেলুম, মাথার মানবের
চাইতে অতঃপর সেলুম সে উঠে, মাথার পুঁজু দিয়ে
কৃষ্টি জলের সোহা শাপের মতো বিলবিল করে, শাপা
দাঁকি সোহাগুলো পুঁজুর মতো জ্বলছে, কপালে কঠিন
জ্বলছে ঐক্যে কৃষ্টিতে চেয়ে আছে আমার দিকেই।
চোখ নয়—উঠতে লাগে কড়ের পুঁজু ভাঙা হয়ে তার
মোটা মোটা কড়ের দাঁতে।

এক কৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, তবু এক কৃষ্টি
অল পুঁজু—তার গায়ের। নিম্নের চারিদিকে কড়ের
বিচ্ছিন্নতা নিয়ে সে পুঁজুই থেকে আদর্শ হয়ে আছে।
তবু পুঁজুইর দিলে স্পষ্টতার টানটা এখনো কাটাতে
পারিনি—আদর্শ।

মা—আমি ভাব পায়ে। তৎকালে বহু ভেঙে উঠল,
তার স্পষ্ট গলা মিলিয়ে আমি উঠছিলাম হালদে। তারপর
সেখান—সে নৈ। সেই শিতপুঁজুর আমার হাসির
আদর্শ দাঁতে পারিনি, তার ক্রীড় কোণ নিয়ে কড়ের
হাওয়ার হাওয়ার করতে করতে নিম্নের পুঁজুসঙ্গে
কিরে চলে গেল।

চোখের জ্বল? নেবার ঘোরে সেখান? হয়তো
তাই হবে, হয়তো। তা নয়—এই বাড়িতে একা রাত
কাটিয়ে অনেক রক্ত অতিষ্ঠ হয়ে ভো হয়েছি আমার।
কতদিন যেন হয়েছি পুঁজুর বাইরে কাটা যেন কিসকস
করে কথা কইয়ে। কে এসে বহুকে চাইতেও তাঁতা একজানা
হাত আমার কপালে রেখেছে, বহুবার বাইরে একজানা
সোহানির আওয়াজ জ্বলে কাটা যেন শায়িত হয়ে
কেঁদেছে। ঠিক জানালার পাশে বিকট গলায় বেজারের
কজা পুঁজু, কিন্তু জানালা ঘুমে—ট—ট—ট—
—বাইরে বেজার দূরে থাক, একটা মেটি ইন্দুরও
চিৎ নৈ।

আমি বহু ভিনেই হয়েছি এই উৎসাহগুলো বেজারে।

ভৌতিক ব্যাপার। শিতপুঁজুরের জানান সেওয়া।
অথবা সেখানো পুঁজু বহু হয়ে দত্ত অশ্রুতে অশ্রু
ঘটেছে এই বাড়িতে এ সব তারই স্মৃতিবহু।

ডাকারকে ডিঙেস করেছিলুম। সে বলে, ও-সব কিছু নয়। সিগোনিশের আড়ুতা পড়তেই মানস এসব নানা রকম ইলিউশন ঘেঁষে। মন ছাড়ুন, এসবও আপনাকে ছেড়ে যাবে। হঠাৎ করেই বছর বেশিও বাঁচতে পারবেন।

কে চাষ বাঁচতে? ডাকারকে বলেছিলুম, তুমি একটা ইঁদুরট।

হঠাৎ রোসের ঘোরেই এ সব দেখতে পাই। অসুস্থতার মধ্যে দেশার ঘোর চোখের সামনে এগুলোকে দৃষ্টি করে—যা কিছু পুনতে পাই, সবই অস্বাভাবিক। কিংবা সব দৃষ্ট। এ আমার তৃতীয় দর্শন, তৃতীয় স্রুতি। আমি যদি বৃহৎই সমুদ্র আর স্বাভাবিক মানব হৃদয়—তা হলে সবাই যা দেখে তার বেশি কিছু পুনতে পেতেন না। কলমে পড়বার সময় কবি কোলরিঞ্জের কথা মনেছিলুম। তাঁর আঁকির বেনা যেমন করে তাঁকে প্রত্যক্ষের সীমার বাইরে নিয়ে যেত, তেমনি করেই আমার ব্যাধি—আমার বেনা তেনা পৃথিবী থেকে আমার দৃষ্টি দেখ—আমার চোখের সামনে থেকে ইলোক-পরলোকের স্নাত বাগা সরে যায়।

কিন্তু চুলোর দাক পূর্ব-পূর্বের কথা। জানি, দাক হাতেও তারা আসবে। শেখবারের মত অভিশাপ দিতে আসবে আমাকে। আসুক, আমি প্রাণও কখনো কান দকালে এই ব্যাধি ছেড়ে আমি চলে যাব। আদি-পূর্বের পাপের বৃত্ত কখনোই, সব একেবারে মিটিয়ে দিয়ে দিবার দেখ।

কিন্তু পাপ? আমি কি সত্যিই পাপ করেছি? আমি কি একেবারে বার্থ—এবার মিথ্যা? আজ এই দুঃস্থের নিম্নেই বর্তমান দিবার দিচ্ছি, তার সবটাই কি আমার প্রাপ্য?

শিশু-দুঃস্থের কথা জানিনা, কিন্তু একটা কথা আমাকে বৃকতে পারছি। প্রত্যেকটি মানুষই এই দুঃস্থের অভিশাপ নিয়ে জন্মায়। হিসের অভিশাপ? বা সে হতে চায় না—তাই তাকে হতে হয়; বা সে হতে চায়—তা কোনোদিন হতে পারে না। দাখ চাই তাহা তুল হয়ে চাই—এখন কী একটা কথিতা আছে রবি চাহুরে।

দাইনগুলো আজ আর আমার মনে পড়ছেন, কিন্তু বহুবার ভেবেছি, হঠাৎ আমার কথাই ওই কবিতার অমন ভাবে লেখা হয়েছিল।

আমার কথা? কিংবা সকলের কথা—সব মানুষের কথা।

কর একটা ইংরেজী গল্প যেন পড়েছিলুম অনেকদিন আগে। অনেকদিন পরে মেল থেকে বেরিয়ে এসে একটা হাঙ্গী চোর ভেবেছিল এইবারে সে ভালো হবে—চুরি চাষার আর করবে না, একেবারে খাঁটি ভরলোকের মতো দিন কাটাবে। কিন্তু কিছুতেই সে ভালো হতে পারল না। বেশ-পথে সে যেতে চায়নি, সেই চুরির পথই আবার তাকে টেনে নিয়ে গেল।

পূর্ব সেই চোরটাই নয়। আমরা সবাই যা হতে চাই তা হতে পারি না। যা হতে চাই না—তাই হতে হয়। তখন নিজের ভেতরে যে বিরোধটা দৃষ্টি হয়—তাতেই আমরা যিমের পর দিন কর্তব্যবদ্ধ হই, অস্বস্ত্যের পথ বন্ধ। পৃথিবীতে যদি কোনো পাপ থাকে, তা হলে তা এই। একমাত্র এই।

আবার উগারানীকে মনে পড়বে।

সেদিন এনিরুনে কি কান্নাই কেঁপেছিল সে। কি অসহ্য দুঃখটো তার কান্না।

—জানেন, কুলে যখন ভর্তি হয়েছিলুম, তখন সব পরীক্ষার আমি কাস্ট হতুম। কিন্তু চৌপ বছরের পা দিতে না দিতে আমার মা—উগারানী তারপর কেল বসেছিল, ভাইনি—ভাইনি।

কিন্তু উগারানী এখন নয়। তার কথা পরে আমার ভাবতে হবে—অনেকবার ভাবতে হবে।

২

আজ দিন সাতেক হল, সব ছেড়ে দিয়েছি। আমি অনেক সেরা হয়ে গেছে—এমন ছাড়া না ছাড়া দুই-ই সমান। তবু ভেবেছি, ব্যাঙের পানে এই ব্যক্তি থেকে দাখা চোখ নিজেই বেরিয়ে যাবে। এখবার তলিতে যেনে নিয়ে যাব—কি করছি, কি করতে পারিনি। লোকে বলে, নিজের চোখ দিয়ে নিজেকে দেখা যায় না। কিন্তু আমি জানি, ওটা মিথ্যে। একমাত্র নিজের

বনের কাছেই দূর পড়ে, আমি কতখানি বাতি, কতটাই বা কাকি, জীবনে আমার কতখানি সত্য আর কতখানিই না অভিনয়।

অভিনয়।

এই কথাটা আমার আসল চিন্তার মধ্যে আমাকে ভিরিয়ে দানল। এতকাল ধরে এই ধানটাতেই আসক্ত চেষ্টা করছিলাম। আমার হওয়া না হওয়া পাড়া-পারার চাবি কাকিটি লুকিয়ে আছে এই ভেতরে।

আমার জানদা দিগে মোমবাতির একটা আলোর রেখা অন্ধকার উঠোনেতে গিয়ে পড়েছে। একটা নাটকের প্রথম দৃশ্য বনে আসছে, মাকরাতে ঘরের ভেতর ঢুকেছে বুনী, হাতে বাগালো ছোরা দিগে এগিয়ে চলছে তার শিকারের দিকে। একটা আলোর রেখা তাকে অনুসরণ করছে। সেই বুনীর ভূমিকার আমি অভিনয় করছিলাম। তারপর আলোর রেখাটা গিয়ে পড়ল ঘুমন্ত বেয়েটির নখে—কি যেন হৃৎকের মধ্যে এক টুকরো হাসির রেখা কন্দের পাগড়ির মতো ঠোঁটে কুটে আছে তার। চমকে বুনীর হাত থেকে ছোরাটা বনে পড়ল, ভবে বিছানার ওপর উঠে বসল বেয়েটি। তারপর চাপা গলায় চিৎকার করে উঠল : তুহি।

পাটীটা করল উল্লাসপাণী। আর চরিত্রটার নাম কি ছিল? সুনিত্রা-না সুনিতা! সুনিত্রাই হবে খুব সম্ভব।

কিন্তু জীবনের প্রথম দৃশ্যটা যখন আরম্ভ হয়েছিল তখন খুব কোথাও ছিল না।

বাড়িতে বাত্মা হচ্ছিল। এখনো বনে আছে : লক্ষ্য বর্ষণ।

আমার তখন বয়েস কত আর? এগারো? বায়ো? সানবের পারিতে বসে-বাত্মা পুঁজিছিলাম। কখন খুঁজিয়ে পড়েছি জানিবা, যখন খোয়াল হল, তখন কাড় লপ্টন বিন্দু বিন্দু ভোনের আলো কুটছে। আর রাম লক্ষ্যকে বুকো লাড়িয়ে বয়ে বাহ্যকার করছে :

প্রিয়তম, অন্ধ আমার

বাও চল দেবদাস পথে—

তোমারে ছাড়িয়া

আমিও বহিতে নারি সেহ আপনায়

খিটাইব সব জালা সরদর দৃশ্যভঙ্গ জলে—

আর সেরাঙ্গিন বহর পরেও এই লাইনগুলো আমি ভুলিনি। সেই হারপ শোক, হাবের সেই হাভাকার আলো আমার বুকের মাকরানে বিঁধে আছে। অনেক অভিনয় সেরেছি, সাগা জীবন অভিনয়ের মধ্যে যিহেই তো কেটে গেল, কিন্তু সেই দৃশ্যটা বনের মধ্যে সবাইতে কি আর স্থায়ী হয়ে রয়েছে। সেই রঙের খুব ভাড়া চোখ সেই ভোনের আলো আর বিন্দু বিন্দু কাড় লপ্টনের আকর্ষণে রাখাটা সেই অভিনয়—সব মিলে আমার জীবনে তা সব চেয়ে অপরূপ অভিজ্ঞতা।

সেই আমাকে অভিনয়ের দোয়ার বরল।

বাড়ি তখন জরুজমট। তিন শরিকের কেউ তখন পর্যন্ত দেখছাড়া হইনি। ছোটভূতো বড়ভূতো ভাইয়েরা বিসর্জন করছে চারদিকে। ভোনের জুটিয়ে নিয়ে আমিও বাড়িতে বাত্মার দল খুলে ফেললাম।

দুপুর বেলা বাত্মা হত বাড়ির চতুর্দিকে। আমগাই অভিনেতা জানাই দর্শক। আর আমি অবিকারী। হাবের পাটীটা আমিই নিয়েছিলাম।

বাড়ির অন্য মেয়েরা আমাকে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু আপত্তি করত বড়ভূতো ভাই বিজ্ঞ। বর্ণিতো : পাটী নিয়েছিলাম তাকে। বিশেষ কিছু তাকে করতে হত না, কেবল বলতে হত, 'সুখে থাকে বৎসপণ, মন'পথে থাক রতি, হটক কল্যাণ।'

তা-ও ভালো করে বলতে পারত না—আমাদের মধ্যে সেই ছিল সব চাইতে ব্যাপ্য অভিনেতা।

তবু বিজ্ঞাই প্রতিবাদ করত সব চেয়ে বেশি।

—না রে তুহি একাই কেন হাবের পাটী করবে? আমিও রাম হবো।

বলতুম, দা-না। বেশি বকবক করি তো তোকে কুন্ডবর্ণের পাটীটা দিয়ে দেব। কিংবা তাককা গাকুদীর।

লক্ষ্য বর্জনে কুন্ডবর্ণ কিংবা তাককা কোথাও ছিল না, কিন্তু বিজ্ঞকে অপমান করবার পক্ষে ওই ছিল যথেষ্ট। কান দাল হয়ে উঠত ওর, বেয়ে শোঁ হয়ে থাকত কিঙ্কর, তারপর বলত, ছাইয়ের বাত্মা ভোনের—পটা বাত্মা। ভোনের বাত্মার আমি আর পাটী করব না।

কিছু খাবার আসত পরের দিন। সোভ সামলানো পারতনা।

অবশ্য ভীষ্মের শেষ অভিনয়ে বিজুই জিতে দিয়েছে। তখন দিন এল, তখন সেয়েছিল—ওই হল সত্যিকারের অভিনেতা। আমার দাব্য কি—শেরে উঠে ওর সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত ভ্রম্যণ তো বিজুই দিলে। আর আমি মৃত সৈনিকের ভূমিকার কোয়ার তালিরে গেলুম।

কিছু আগেও কথাতেই ফিরে আসি।

শেখন সোদ হয় মূখ বলাবার জন্যে 'লক বালি' হায়া লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর হায়া দুইখের ভূমিকার বেয়ে আমি খুব লক্ষ্য কল্প করছিলাম আর কিছু একটা বুঝে বসে যাযা নাফেছিল সমানে, ভাবটা : হচ্ছে না—কিছুই হচ্ছে না তোরা।

কাকা তখন বাইরের কাছারীতে বেরিয়েছেন। যোজাই ঘান, আমায়ের ছেলেরামদুই ব্যায়ার দিকে জরি চোখও পড়ে না। কী মনে করে শেখন গাড়িরে পড়লেন। বললেন, বাঃ—বেশ হচ্ছে তো! এর পরে লেখারি হায়াগ অবিকারীকে আর জাকতে হবে না, তোরাই মারিতবে কিবি।

আমরা লম্বা গেলুম। আর শুধুনি অভিনয় খেয়ে সেল।

কাকা আমাকে ডাকলেন।

—নিম্ন এখিকে আর।

একটা চক্ক উক খান কিনা বুঝতে পারলুম না, তোমার মতো এগিয়ে গেলুম কাকার কাছে।

কাকা আমাকে কাছে টেনে নিলেন। পিঠে আবেসোটা হুই বাগড়া দিয়ে বললেন, তোরা তো খিচোটারে বেশ ব্যাক্স আছে দেখছি। এবার তোকে কাজে লাগাতে হবে।

আমার ভাগ্যের আকাশে—খদিও ভাগা বলে কিছু আমি মাঝি না—পনিত্র সেবা দিল সেই প্রথম।

এইখানে বলে রাখি পুছোর দর যাযা হাডাও ব্যাক্তিতে খিচোটারও হত কখনো কখনো। বিশেষ করে লম্বা-পুছোর হাতে বড়ো অভিনয় করতেন, আমলা কর্মচারী হাডা জামের কেউ কেউ ভাতের পাট করতেন। কাকাই ছিলেন তার পাটা।

সে অভিনয় আমরা দেখতুম, কিছু কখনো খুব ভাল লাগত না। হায়া তো একবার হাডার ভূমিকার চন্দা পরেই চলে এসেছিলেন। নাগের হায়াইয়ের দাড়ি তেঁকেই বলে পড়ে গিয়েছিল। হাঃ—হাঃ—হাঃ—সামকেন বলতে বলতে কাকা নিজেই চুইয়ে করে হাটুয় ওপরে একটা মণা ঘেরে দিয়েছিলেন। সে সব অভিনয়ে অভিনয়টা বড় কথা ছিল না—যেমন করে মোক বাড়ির লোককে খানিকটা আনন্দ দিতে পারলেই হল। সে আনন্দ সবাই-ই পেতেন—তা নাগের হায়াইয়ের দাড়ি বলে বাওয়াতেই হোক কিংবা কাকার মণা মায়াতেই হোক।

পারিনি তার বিজ্ঞাতি টীকা-ভাষা চলত অন্যর মতলে।

—আহা ঠাকুরগো, কী ভূবন মোহিনী সামকন্যাই দাড়িয়েছিলে! মালো, ভাটা ভাটা চোয়াল—কাকের মতো গলার আওয়াগ ওইরূপে নাকি মিতুবন পাগল।

—বলি হুগুগো ঠাকুরগকে কাপড়টা পরিয়ে দিয়েছিল কে গো। যোচাখীর কী খোয়াক্ত—এক পা হটিতে পারে না কৈলেন থেকে ভক্তকে বর দিতে এনে গেছে হুগুগু করে একটি আছাক গেলে।

ছেলেবেলাতেই আমরা বুকে নিগেছিলুম ও খিচোটার আর কিছু নয়, পুছু এমন পুছু লোককে ভেকে হালে পোলাও বাওয়ানোর ব্যবস্থা। কিছু হায়াগ অবিকারীর ব্যাড়া ও-বকম ছিল না। তার তলোয়ারের কোলা মেখে বুকের বক চমকে উঠত, তার হায়াগ পলা হবে হত দিখে গজবের মতো। তাই ওই খিচোটারে দলল আনরা কখনো করিনি, বামাই বেয়ে নিগেছিলুম।

কিছু কাকা আমার বাড়ি হাত রাখতেন।

বললেন, হুঁ, তোরা ময়ো বড় আছে সেখারি। এবার তোকে কাজে লাগাব। 'হায়া হাংকস্ত' মেটা খাখাখি, মোহিতামের পাটটাই সেব তোকে।

বিজু বললেন, বাবা আমাকেও পাট দিয়ো একটা।

কাকা বললেন, তোরা মাখার গোবর—তোকে দিখে কোন কিছু হবে না। নিম্নই হল জাত ব্যাটীর—এবার জুকেই গান্দু দিতে হবে।

বিজু হুঁ চোখ চক চক করে উঠল একবার। আম জাখি, সেই ও প্রথম চ্যালেঞ্জ করতল আমাকে।

তারপর সব মতো এ ওর নিজের হিসেব করতে নিয়েছে—
একটি কড়িও বাকী রাখেন।

...বাইরের হাওয়ার মোমবাতির আলোটা কাঁপছে।
আমার ঘরটার ভেতরে কতগুলো ছায়া নেচে বেড়াচ্ছে
যেন। যা—সেই পিতৃ-পুত্রুত্বের নয়—আমার ঘরে পা
দেবে এমন সাহস তাদের নেই। এই বহুত্বের তার
হয়তো পুঁদা বহুসংখ্যার এখানে ওখানে বিস্তারিত জোরে
পাকড়ার করে বেড়াচ্ছে হাতের অঙ্ককারে, কাউকে
কাউকে তরুণ হয়ে হারাকার করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু
আমার ঘরে তাদের প্রবেশ নিষেধ—এখানে তারা কেউ
চুকতে সাহস পাবে না।

কিন্তু মোমবাতির আলোটা কাঁপছে। কতগুলো
ছায়া কাঁপছে ঘরের ভেতরে।

কিদের ছায়া? আমার জানা কাপড়ের, বাস বিছানার,
আমার শরীরের?

না না তারোও কিছু বেশি। বহুত্বের পরাধীন আমার
ঘরেও কাগা যেন এসেছে। আমি হব বাইনি, আমার
ব্যতিক্রম নিজস্ব থেকে ওরা আমার বহুত্বকে প্রতিফলিত
হয়ে পড়েনি। অনেক এসেছে। কণ্ঠ পাল? ঘর
পল্লার বাড়ি যেওনা শরীরটা কোড়ো হাওয়ার নাঠের
মাঝখানে সেই আদমহস্তার খড়ির হোলকের মতো ধুলিহীন
আর ধুলিহীন। চন্দনা? বিবে দার কণ্ঠা সাধা বুঝানো
একোয়ারে নীল হয়ে গির্জাঘর? কোণার বাড়িতে ওকে
কান্নে চাপা পড়ল। উষারানী? উষারানীই তো!
আর ও কে এমন করে এঁগবে বাচ্ছে চোখের
মতো? বিন্দু?

কী পাসলাবো।

কেউ নেই—কোথাও নেই। আমার ঘরে পেন গ্রামি
দ্যাসন করছি আমি। হার-বহুত্বের পর থেকে, বাইরের মতো
যে খট্টা আমি বেছে নিবেছিলাম—সেই ঘরে আজ রায়েও
আমি একেশ্বর। কাউকে চুকতে দেব না—কাউকে
নয়। আজ এইখানে বসে আমি আমার নিজের কথার
ব্যত্যাশানা একা বসে বসে উঠে দাঁড়, সে পাভুলিগির
একটি পাতাও বেখতে দেব না কাউকে।

কত দিন আগে কিরে গিরেছিলুম? এক চল্লিশ বছর?
ষোড়শ বছর? তাই হবে।

বনে আছে প্রথম ঠেঁকে নামলেন কথা। এ সেই মটি-
মন্দিরে বাড়ির ছেলেরের ভূঁড়িবে কণ্ঠের তলোয়ার খুঁটিয়ে
ঘামা করা নয়। শক্তিকারের পিঠেটার। বাইরে বসে
এতদিন হয়ে অন্যকে নিয়ে বস্তু দেখেছি, আজ আমাকে
নিজে অন্যের বস্তু দেখবার পালা। আমার বুক
কাঁপতে লাগল।

বাবা বিদ্যাকির সেজেছেন। বাবার প্রকাণ্ড জটা—
কিটি লাড়ি। বুধ থেকে বকের গরু আসছে, চোখ দুটো
যেন জ্বাং পাগড়ি।

আমার বুকে তখন ৩৪ আর পাউডার মাখিয়ে দিচ্ছিল।
সামনে একটা বস্তু আনো, আমি চুপ করে বসেছিলাম,
নানা কণ্ঠ করে আমার বুধ-পাল ভুলু ঠিক করে
দিচ্ছিল। এই সময় বাবা ঠিক আমার পেছনে এসে
দাঁড়ালেন। ঘর দুটো কারবাইড ল্যাম্প জ্বলছিল,
মোড়া গ্যাস তেল-বুজ আর পাউডারের গন্ধে আমার নানা
কিম্বদন্তি করছিল; অকেন্দ্রীয়া বাহুতে লুট হয়েছিল,
একটু পরেই অভিন্ন আরম্ভ হয়ে—আমার বুকের ভেতর
সেই বস্তুটার তালে তখনই উঠেছে—আর ঠিক সেই
সময় মত জটা, প্রকাণ্ড লাড়ি আর বকের গরু নিয়ে বাবা
আমার পেছনে এসে দাঁড়ালেন।

আমার ভেতরে তাঁর একটা অস্ত্র আর ঘবাক্ত
প্রতিফলন সেগলুম আমি। পাউডারের পুঁড়ো সেগে
এখানে ওখানে কাপসা হয়ে যাওয়া কীতের গুণের হঠের
ছিটে বসে আত্মার—কারবাইডের আলোতে এত স্নো
হানু'র এত ঘুরে চলে যায় সে কথা কে জানত!

[পরে আমি বেবেছি কীমনকে ওইরকম একটা অস্ত্র
আমার বস্তু দিতে যেবাই অভিন্ন। আর সেই আত্মার
কণ্ঠ একটা ভানু'রওর বেশ। ওর বাবার যে ভুলেছে
তার আর মুক্তি নেই। যা আছে, অথচ নেই—যা শক্তা
ভবুও শক্তা নয়; যে হাসি, যে কান্না এত কাছে অথচ
এত দূরে—হাত বাড়ালেই বা পাওয়া যায় বলে যেন হয়,
অথচ হাত বাড়ালেই একটা কঠিন শীতল আবরণে সনত
কামনা যেখানে প্রতিহত হয়, তাই অভিন্নের কণ্ঠ।
যা শব্দই নাসা, তার হাত থেকে কোমলিও হানু'র
হয়তো পরিচয় আছে; কিন্তু বা শক্তি এবং নাসা
—যা হাতের একোয়ারে কাছে রয়েছে অথচ হাত বাড়িয়ে

দিলে কোন হতেই পাওয়া যায় না—সেই খোজ আকৃষ্ট আর শব্দে উপভাষকে কে মৃকি দেবে ? কে ?

আমি জানতুম না, গ্যাসের নীচে আলোর পাউডারের কণার গোঁঘাতে আর রক্তের ছিটেতে বিভিন্ন আঘাতাচার সর্পিদ আবার ভবিষ্যতের পথ আঁকা হয়ে গিয়েছিল ।]

বাবা বললেন, কিংবদন্তি, ঠিক আছিল তো ?

ভগাট গম্ভীর গলা । একটু যেন ভড়ানো । আরনার মধ্যে একটা অগাধ প্রতিনিধি ।

আমি বাবা নেড়ে আনালুম ঠিক আছি ।

বাবা, বললেন, সেখান, বাবাড়ি গিয়ে সব গোলমাল করে ফেলিসনি । তা হলে কিব্দু বাবা ভেগে ফেলব ।

বেক-আপ ন্যান বহুদিনের পুরোনো সোফা । হেলেন বললে, কিব্দু ভাবলেন না বেজবাবু, তৈরী হলে আপনায় । যেন চালাক, তেমনি চটপটে । বেগবেন বেশ নামজাদা অষ্টার হবে ভবিষ্যতে ।

—নামজাদা অষ্টার হয়ে আর লকাবে নেই । আজকের রাতটা নানে নানে ভরিয়ে দিক তা হলেই যথেষ্ট ।

আরনার বাগার পাশে আর একটি ছাত্র পড়ল ।

এই ছাত্র অন্যাক্ষ । বাবার হুকুমে যেন মণিহুঁকা তলদল করছে । পরগে রাজবেশ । কাকা এসেছেন । আজ তিনি রাজা হরিকণ্ঠ ।

[কাকাকে হরিকণ্ঠই বলা যায় । কি ভাবে সবত অবিনষ্টা নিয়ে জুয়ো খেললেন । পাণ্ডার দানে বাবে বাবে ঘেঁরে খেলেন—অন্ত যেনের দিক থেকে কোনদিন হার মানলেন না ।]

কাকা আমার কাঁধে হাত রাখলেন । হাসলেন একটুখানি । রাজার সঙ্গে আত্মবন্দু স্বপ্নের সোখাছিল তাঁকে ।

—নিজের ডালির যিহেই দেখনা । বন্দু পাটান্দু আছে ওর । সেখো, জীবনে দেবে ।

বাইরে আকেশীর বাজনার ঢ়ে উঠছিল । বেক-আপ নিতে বসে ভ্রুপ সীনটা এখন দেখতে পাখিনা, কিব্দু ওর ওপরকার ছবিটা চিরদিন আমার মনে একটা অপূর্ণ মোলা দাগাত । নীল শব্দে ওর বিয়ে কেনা কেটে জাহাজ চলছে—এইটাই আঁকা ছিল ওখানে । কণ্ঠস্বর মধ্যে

বেগবো রহস্যময় আকেশীয়া গানোনিয়র সেতার-বেলালা-তবলায় প্রতর্গতি শব্দ উঠত আর বাতাসে দুলত ভ্রুপসীনটা, তখন মনে হত এই সমুদ্রের ডেউগুলো যেন সীতাই খঁখত হয়ে উঠেছে, চলার তালে তালে ধ্বংস করে কাঁপছে জাহাজটা—এই বাহনা যেন এই সমুদ্রেরই গম্ভীর । আজও আমার মনের গামনে সমুদ্র দুলতে লাগল, ডেউয়ের প্রাক শব্দে শেলদুব—অনুভব কলদুব—ওই জাহাজটার চড়ে আমিও যেন কোনো অনিশ্চয়ের পথে পাড়ি জমিয়েছি ।

বাবা বললেন, আর সেরি কত ? সোকে অধৈর্য হার উঠেছে যে ।

কাকা বললেন, হ্যাঁ, এইবারে ভ্রুপ ভুলব ।

জীবনে অনেক রাত এসেছে গেছে—কিব্দু সে রাত্রি আমি কখনো জুঁবো না । বেগায়ে গরুর জালে অগ্ন পালের পরীরটা হাওগার হাওগার বড়ির ফোলকের মতো দুলছিল—তার ভরকের শব্দিতও কি কখনও হচ্ছে যাবার । কিব্দু আমার সেই প্রথম অভিনয়ের মতো রাত আমার আর কখনো আর্দ্রান ।

সোকে বিয়ের রাতের কথা বলে—গ্যাট, বেমোরেবল দাইট । বিয়ে আমি করিনি, সে অভিজ্ঞতা আমার নেই ; আমার অধিকাংশ বহুই তো একরাতির মণিদী, কাকুন হলো কেনা । কলপবার অন্যে দুই দুই গ্রামে আমার অপেক্ষা করতে ধরনি, বোনা ভরা চোখে সব পথ্যাই আমার কাছে সমান বলে মনে হয়েছিল । সেই প্রথম অভিনয়ের রাতই আমার বিয়ের রাত সেই আমার দাদর পথ্য । বাবা বিবাহই বলতে পারা যায় সারা জীবনে তার বঁধন আর কাটল না । পরলোক যাবি না, কিব্দু হুকুর পরে আমার অন্যে কোন অগ্ন বধি থাকে—সেখানেও একটা বিরাট টেজ বটায়ো আছে মনে ধর—ঐকতানও তার দৃষ্টি হয়ে গেছে, শব্দ আমার কোনোই এখানে তার ভ্রুপ ওঠেনি ।

কিব্দু তার অন্য এখন ভাবব না । সেই রাতিটারেই দেখতে পাছি চোখে ।

অভিনয় শব্দ হতে গেল । প্রথম বৃক্কের কাঁপনি খানিকখন চলছিল তাও যিহে নয় । তারপরেই সব যেন

দারনে দারি দারি কারাবাইত জলেহে তার আলো
যেন আমার রক্তের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল; আশপাশ থেকে
হালকা মনের গন্ধ—উইংসের পৃথক থেকে চুটু শিগায়েটের
গন্ধ—পাউডার আর রঙের গন্ধ—সবই আমার বেশা
ঘরিয়ে দিল। চতুর্বিমুখ অন্ধকার করে দেওয়া হয়েছে,
সেখানে দারি দারি মানুষের হৃদয় অথচ কাউকে চিনতে
পারছি না, সব মিলিয়ে নিজের অস্তিত্ব আমি ভুলে
সেলুম।

হৃদয়ের কীকে কীকে কারা যেন আমার পিঠে চাপড়ে
যিচ্ছিল।

—বেশ হচ্ছে, বেশকার হচ্ছে।

কিছু আমি সেই স্বপ্নের মধ্যেই ভুলিয়ে সেলুম,
আন্ধার হয়ে ছিলুম সেই নেশার ঘোরেই। কাউকে যেন
সেখতে পারছি না। অভিজ্ঞানের সেই দারি দারি অবাস্তব
হৃদয়ের ভেতরে সব একাকার হয়ে রয়েছে।

তারপর সেই দৃশ্য। সেই দৃশ্য দৃশ্য।

—বান্দা-বন্দো।

—কী হয়েছে বাপ রোহিত। কী হল তোরা। তুই
অসব-করছিল কেন।

—পূর্ণ শাখা থেকে কী যেন আমার ধ্বংস করেছে
না। আমার সবশ্যপ জলে থাকে, তুচ্ছ আর আমার বুক
পড়ে থাকে আমি যে আর পইতে পারছি না।
বা-বা-বন্দো

তারপর আমি লুটিয়ে পড়েছিলাম। আর আমারে
দেয়েজার মানিকসা সেই সৈব্যা সেরেছিলেন, বুককাটা
গদার ভুকরে ভুকরে কেঁপে উঠেছিল: রোহিত-
রোহিতরে। ওরে দৃষ্টিপীর বুকের বন, ওরে আমার
সর্বশ্ব—তুই আমার কীকি দিয়ে চলে যাসনে বাপ। চোখ
যেলে চা রোহিত—একবার আমার বা বলে ডাক—

বুবে কেঁপেছিল মানিকসা। কিছু সেও শুধু
মানিকসা ছিল না—সেই অপূর্ণ আরনার জগতে চলে
গিয়েছিল। আর নিচল হয়ে গড়ে থেকে আমি
ভাবছিলাম, সত্যই যেন আমি ধূর্য্যাক রোহিতাম, কাল-
দাশের দ্বারলে হৃদয়কে হৃদয়ে পড়েছি, আর বুক
দাখা রেখে হাফাকার করছে আমার দা।

আর শুনতে পাচ্ছিলাম কণ্ঠসুরে কান্নার আওয়াজ।

যে মেঝেরা খিচোটর সেখতে এসেছিলেন, তথ্যও কইয়েল।
গীম পড়লে কাকা আমার ভুলে নিয়ে নাচতে
লাগলেন।

—অবৃত্ত—অবৃত্ত। তুই লভাই হুমিরে যিরেছিল।
আমি তখনই বুকেছিলাম, হেলোটা একটা জিনিস।

তারপরে এল অপানের দৃশ্য। সেই যিন্দা, সেই
সেবতারের আশীর্বাদ, রোহিতামের পুনর্জীবন, হাফা
হৃদয়কে নতুন করে সব কিয়ে পাওয়া। যখন শেষ হল,
হাততালিতে কেঁপে গেল চারিদিক।

আমাদের গ্রান-দুবায়ের জ্যাঠানদাই পণ্ডিত মাংবত
শ্রুতিগর উঠে উঠে এসে। পণ্ডি গরিয়ে দেওয়া হল।
মাংব জ্যাঠা কাঁপা গদার হললে, আতকের অভিনয় অতি
হস্যময় হয়েছে, সেখতে সেখতে আমি অভিতত হয়ে
গেছি। আর সব চাইতে বর্নশপণী অভিনয় করেছে
রোহিতামের ভূমিকার আমারে পদ্য কল্যাণী শ্রীমান
নির্মলকান্তি। আমি তাকে দর্শকরূপে আশীর্বাদ
করিছি এবং তাকে একটি দৌল্য পদক উপহারের
প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

কাকা বুক দৃশ্যতে আমাকে ওপরে তুলে ধরলেন।
করতালিতে যেন কানে তালি ধরে সেল আমার।

হৃদয়ের হৃৎ পরিষ্কার করে যখন পুড়ে এসে, তখন
হাত কিকে হয়ে এসেছে বিরক্তির করে বইয়ে ভোয়ের
হাওয়া। বা আমাকে বিদ্যমান শূন্যে দিয়ে আস্তে আস্তে
বাবডাতে লাসুলেন ছোট হেলোটর হতো।

উঃ, কী কান্নাই আমার কহিলে হস্তভাগাটা।
ভাবলে বুক এখনো কাঁপে। আমার কোনদিন তোকে
ওই সমত হাইভস খিচোটর করতে দেব না। কখনো না।
হৃদয় ভাবনো লুটিতে আমি যেন সেলুম গ্রান চোখ
জলে ভরে উঠেছে। ভারী একটা ভূমিতে আমার সমত
জাতি জড়িয়ে সেল। তারপর কখন যে গভীর বৃন্দে
তলিয়ে সেলুম তা নিজেও জানি না।

ভবে এইটুকু যেন আছে। একটা শব্দ সেরেছিলাম।
সেই আমবাটার শব্দ।

না এলিদ্ ধু দি লুৎকিং মাল বইটা তখনো আমি
পড়িনি। কিছু সেই স্বপ্নে আমি সেরেছিলাম, আরনার
কাতনে ভেতর দিয়ে একটা আকাবাকা শিঁড়ি কোথার কত

দূরে যেন উঠে । আর সেই দিকি বেধে আমি
চলেছি কোন আশার পেরিয়ে কত তারা ছাড়িয়ে
তবু দি'তাই আর কিছতেই শেষ হে না ।

একটা দমকা হাওয়া মোমবাতিটা নিয়ে গেল । আঃ
ফেনলাইটা আবার কোথায় বেগেছি । আর আর কোনো
মজ্জার আনার সইবে না মোমবাতির শেষ টুকরোটা
পর্যন্ত জ্বালিয়ে নিয়ে আমি নিজেকে মৃত দেখে দেব ।

এর মধ্যে হাত মটা বায়ল ? আশ্চর্য ।

নিজের ভাবনার ভেতরে তলিয়ে আছি, কখন যে
কানাইয়ের না টেবিলের ওপর দাবার বেধে সেজে উঠে
পাইনি । কাল সকালে যখন চলে যাব, তখন ওর কথা
ভেবেই আমার কণ্ঠ হবে ধানিকটা । এই বাঁড়িতে এই
আমার শেষ বন্ধন । বন্ধনটা কাঠিন নর—তবু হিঁড়ু
য়েতে নারা লাগবে ।

কিন্তু এখন আর যেতে ইচ্ছে করছে না । পরে
চেষ্টা যাবে ।

সেই বেডেলটার কথা ভাবছি । দাবার কাকা একটা
হুপোও বেডেল দিখেছিলেন । কাকা চেষ্টায়ে বেরিয়েছিলেন
দবাইকে । আর বিষ্ণু কেবল বসেছিল, ইন্স-ভারী
বেডেল ! যখন হয়ে গিয়ে আনিও বেডেল পেতে পারি ।

—ওঁর তো ভারী হিংসে—বেজায় হোট বন ।—

কাকা একটা চড দিখেছিল বিষ্ণুকে ।

বিষ্ণু ভাগেনি—দু'চোখে আগুন বৃদ্ধি করে চলে
গিয়েছিল ।

সেই যে দুঃ, হল—তারপর থেকে দাবার পথ আর
হইল না । সেই আমদার জবতে আতর্ক-হাতছানি আনি
আর কিছতেই ভুলতে পারলুম না । বা সত্য, তা
প্রতিদিনের ; তাকে চিনি আমি—ক্রমেই তা পুরোনো
হয়ে যায়, রক্তকে বাঢ়ায় না—বনকে ভোলায় না ; তাই
পরমাশুদ্রী নদী সপ্নে থাকতেও কখন হানুয়ের চোখ চলে
যায় একটি দাবার পাম্বা সেমের দিকে—যার একটি
দিনুনা আর এক টুকরো পাড়ির অচল সামনের পথের
বাকি মিলিয়ে দেল—বুধদানাও আর দেখতে পাওয়া দেল
না । সে সত্য হতেও সত্য নর—যতটা তাকে দেখা দেল—
তারো অনেক বেশি না দেখা বিষয় সে হয়ে নিয়ে ফেল
নিজের চারদিকে । শুধু একটি বিকেল, ধানিকটা মেঘ

ভাঙা আলো, কোনো স্রাওয়ার মূল থেকে একটুপা'ন
পথের উজ্জ্বল সেই মেঘেটির সঙ্গে ভড়িয়ে গেল ।

আলো খিয়েটারেও এনি করে জীবনকে পেয়েছি—
অথচ পাইনি ; সে জীবন সাধারণ বৈচিত্র্যহীন একটানা
পুনরাবৃত্তি নর ; তার আবেগ, তার বিশ্বাস, তার
অশ্বাভাবিকতা, তার বিচিরতা সে হয়ে আসে । বিধে
হয়েও সে কী বিরাট লতা । জীবন যদি আত্মর হয়—
অভিনয় তার শূন্য, তার তীক্ষ্ণ হিংস্র নির্দাশ ; তার বেশাকে
আরো ভগ্নবর করে তোলে সেই রঙের গধ—সেই আলো,
মুক্ততের স্পর্শ তোলা উজ্জ্বল । তার শব্দ যে একবার
শেয়েছে, সে কি আর কিরতে পারে ?

যনে পড়ে কলকাতার সেই মৃদু মল্লিককে ।

এককালে নামকান্দা ছিলেন—বিশেষ করে কংসের
পার্চে' এক দমর ব্যাতি একবারে কেটে পড়েছিল তার ।
তারপর বয়েল ব্যঙ্গল, দাঁত পড়ল, নরীর ভাঙ্গল । যখন
বিরাট শক্তির চেহারা একটা নুয়ে-পড়া কঙ্কালে পরিণত
হল । দেহপট সনে লুকলি হারালো—খিয়েটারে
নবমৌবনের ষাভার মৃদু মল্লিক অতীতের একটা নাম হয়ে
হইল কেবল ।

তবু আসতেন । তবু ধনী হিতেন খিয়েটারে
—হাওনা ভাই, একটা কিছতে আমার লাগবে ।

—আর কেন দাদা ! ডের তো হল । এনি
বিকীর যিন ।

—বিত্রান আসে না ! নতুন খিয়েটার পোষ্টার বখ
পড়ে, তখন দুকের ভেতর যেন আগুন ধরে যায় । হাওনা
একটা মোট বাটো কিছতে যাক্সা করে । পরমা চা
না—একটা বোভলের বক্স দিহো—যাদ ।

—কেন দাদা আর পাগদারি করো । এককালে যনে
পার্চ' করত, এখন হোটবাটো ভূমিকার নামে
তোমার কি মান থাকে ? আর সে অব্যার কি আন
হতে দিতে পারি ?

মৃদু মল্লিক এয়ার উচ্ছ্বিত হলেন । বস বস কর
কালি-পড়া চোখ ।

—বুধতে পারছি, আমার একাডে চাও । তোমাকে
য়েগের ঘোড়ার ওপরেও দেখছি বরা আছে । সে অচল হা
পড়লে তোমরা পড়ি করে যাবে । কিছ; তোমাকে

যত নিষ্ঠুরতা মানুষের বোধ্য। নতুন নতুন শ্রেণী হবে—
সোকে ভিড় করে আগবে। আসো বলবে, আকর্ষণী
বাহ্যে—আর আমি চুপ করে বসে থাকব, একা একা
কউ পাৰ বাতের যতখান ? বসতে পারো এ আমি কেন
করে সহ্য ?

এনি এই বোবা। এনি এই আকর্ষণ। পাৰ-
ক্রীমের আসোয় ভাবে যে পতঙ্গ একবার ভুলেছে, পড়ে
সে মরবেই, তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টা বিভ্রম। আমিও
পড়েছিলাম।

নিষেধ কথাতোই কিংবা আমি।

পরের বার আবার খিঁচোয়। তারপর আবার—
আবার ! যে বছর ব্যাটিক পরীক্ষা দিই, সে বারে ‘শীতা’
নাটকে আবার অভিনয়ের ব্যাটিক আশে-পাশের সমস্ত গ্রামে
ছড়িয়ে পড়েছিল।

অভিনয়ে মন দতই পড়ে থাকুক, সেব্যপঙ্কজ কোনদিন
বাগ্য হিন্দু না। গ্রামের ছল থেকে চারটে সেটায়
নিরে পাশ করেছিল। অঙ্গের জন্যে ভিল্লিক্ট,
কলারশিপটা পাইনি। হেডমাষ্টার হুঁম করে বলেছিলেন,
পরীক্ষার পনেরো দিন আগেও যদি তুমি পাশের গ্রামে
খিঁচোয় করতে না যেত তা হলে এটা হত না। থাক—
কলকাতার গিয়ে একটু মন দিয়ে পড়াশুনো করো—
খিঁচোয় নিয়ে বেতে থেকে না। সারাটা জীবন তো
মানবে পড়েই আছে—যত বেশি খিঁচোয় পরে করতে
পারবে। তার আগে পরীক্ষার ফোপটা ভালো
করে যাও।

কলারশিপ না পেয়ে আমিও লক্ষ্যহীন হয়েছিলাম।
খিঁচোয়ের পাশদানিই যে তার একটা বড়ো কারণ, সে
কথাও আমি ভুলিনি। প্রতিজ্ঞা করলাম—আই-এ-তে
আমি স্ক্যাড করবই।

প্রতিজ্ঞা। এখন ভাবভেদও হালি পার।

বাইরে রাত ঘন হচ্ছে আরো। উঠানে গাঙ্গীচকে
উড়ছে পাক ধেরে ধেরে। একটা ছায়া পরে থাকে না ?
তার একটা অশ্বাভাবিক ধীর্ঘ ছায়া ? কার ও ছোটো
চোখ ওখানে জলজল করছে ? নাকি—কোনাকি।

না—ভয় আমি আর পাই না। সব ভয়ের শীঘ্র পার
হবে এসেছি।

এইবারের ছবিটা কলকাতার।

নামজাদা কলেজ, নামকরা হোস্টেল। সোতলায়
যে আরো হুজুরের সঙ্গে দাঁটি শেলুয়। তাগাও ফাণ্ট-
ইয়ারের ছায়া।

বকসবলের হোস্টেল কলকাতার হোস্টেলের সঙ্গে সবচেয়ে
মিশতে পারে না, কিন্তু নিষেধের কাছে তারা অশেষ
আশ্রয় হয়ে ওঠে। একজন প্রথম, সে এসেছে পাজাগিয়ার
এক ছল মাস্টারের ঘর থেকে, কলারশিপ নিয়ে।
আর একজন তড়িৎ। তার দাবা চাকরি করেন
পতিবে—সেখান থেকে পাশ করে সে এসেছে কলকাতার
পড়তে।

তিনজনেই আবার ঘনিষ্ঠ বন্ধ হয়ে উঠলাম। একসঙ্গে
ক্রাসে বসে—একসঙ্গে বেড়ানো। আমি আর তড়িৎ যদি
বা দু' একবার কলকাতায় এসেছি, প্রথম একবারে
আনুকোয়। তাই তিনজনেই যেন নতুন করে যোগ
আবিষ্কার করত—‘রিচিটর’পেশী কলকাতাকে। তার
বিশাল গড়ের বাঠি—যত দূরে ঘাই, ঘন সন্ধ্যার নিঃশব্দতা
আর ক্রোধ না। চৌঃপাণ্ডে চৌঃ শালি সাহেব আর
সাহেব—কৌশ, ভিক্টোরিয়া বেনোয়িয়ারের সাহেব গির্জা
উপবস করে তারা ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। কৌশ
আলিপুরের চিকিৎসাব্যবস্থা, শিটমায়ে করে পার হয়েছি
গম্ভা—ছুটির দিন কেটেছে সাহেব ছায়া—কিলের ধারে।
হাওজার পুল খোলা হয়ে সেসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি,
কি ভাবে বড়ো বড়ো জাহাজ থাকে। বেলেঘাটার
নির্জন বাসের বার দিয়ে কতদূরে চলে গেছি। সাকুরিয়ার
নতুন সেকের ধারে দাঁড়িয়ে দেখেছি, জলা আর সপ্পানের
ভেতর দিয়ে শেরাল ছুটে থাকে, পাছপালার মাথার
নিকেসের রঙ পড়েছে, চারদিক থেকে উঠেছে কিঁকির
ডাক। আর অন্ধকারে শাপ বেরবার ভয়ে ডাড়াডাড়া পা
ঢালিয়ে চলে এসেছি বাদ ধরতে।

খিঁচোয়ের কথা তখন কিছুদিনের জন্যে মন থেকে
হুঁজে গেছে। ক্রাস ভালো লাগে—নতুন ধরনের
পড়ানোতে নতুন শ্বাস পাই। প্রথম প্রথম থেকেই পড়া
পত্র করেছিল, তার সপাঙ্গুণে আনন্দ ও নিঃশব্দ
পড়াশোনা করে বাই।

তড়িৎই একদিন বললে, ফে, ফাণ্ট-ইয়ারে যত

পড়তে নেই। তেউ-ই পড়ে না। চল, বায়োবোস তেমে আসি।

প্রশ্ন আপত্তি করল। বললে, লজিকের পড়টা অনেকখানি এগিয়ে গেছে ভাই। একটু দেখে রাখি।

—আরে প্রকৃতির স্মরণ আছে, লজিকও থাকবে। আচ্ছ রবিবারে রক্ত পড়লে দরমসতী চটে যাবেন। চল—ম্যাটিনিতে ব্যাভান খিরেটারে বাই। খুব ভালো হ্যাণ্ড-বিল দিচ্ছে। একটা লোক সিংহের সঙ্গে লড়াই করে আফ্রিকার জঙ্গলে।

নুনো সোভ হল প্রশ্নবোধক। তবু গহিগুই করে।

ফাকার লগে কলকাতার এসে আমি বায়োবোস দেখে সেছি, আমার ব্যাপারটা অজানা নব। তড়িৎও দেখেছে কবেকবার।

প্রশ্ন একেবারে আনন্দোন্মত্ত। পর্বীর ওপর জীবন্ত মানবেরা চল বেড়ান, হাসে কহে—এই পরম বিশ্বরটা ওকে না দেখালেই নয়। জোর করেই টেনে নিয়ে গেলুম।

হাঁপ আফ্রিকার জঙ্গলেই বটে, কিন্তু আগে কিছ্র ছিল। বেশরোমা পিকারীর পাল্পনী জুটেছিল একটি মেয়ে। সিংহ পিকারের সঙ্গে লগে রেখেছি বিবদনা হয়ে প্রান করতে চল কপাঁধ জলে, সর্ব-অসবরে তাকে আদর্শগনে আবদ্ধ করে পূর্ব-ট চন্দ্রনে চন্দ্রনে গুত্রে দিতে লাগল তার মন।

তড়িৎ কী ভাবছিল জানি না—আমার বুদ্ধের ভেতরে শিরাশির করতে লাগল। ঠিক এ জীবন এত আসে কখনো সোঁধনি। আর প্রশ্ন যে কখন থেকে দুহাতে বৃষ্ টকে বসেছিল, সে আমি লক্ষ্যও করিনি।

পথে বেরিয়ে তড়িৎ বললে, চল—একটা রেটুরেন্টে চুকে চা আর চল বাই।

প্রশ্ন বললে, না—জানি দাব না।

—কেনহে, সোঁধনও তো ঘেঁটেছিল।

—জানি একুশি কিংবদন্তি বার ঘোড়ারো।

ওর গলায় শব্দে চব্বকে আমরা দুজনেই ওর দিকে তেয়ে দেখলুম। দুজনে ওর কেনন রূপে সেয়ে, চোখ দুটো অশ্রু-বিকল লাল। কেনন হঠাৎ বড়ো নিঃশব্দে ফেললে।

—কিরে কালিহালি নাকি?

এবার গভীর ওপরেই কেঁপে ফেলল প্রশ্ন : কেন এসব অসত্য জীবন দেখাতে আনলে? জাতি আর কোনদিন তোমাদের সঙ্গে আদর না—কখনো না।

আমরা দুজনেই লক্ষ্য পেলাম। পূর্বনো হাসি হেসে তড়িৎ বললে, জুই একেবারে পাড়ালে'য়ে। আরে বায়োবোসে তো ওদর থাকেই। আর সান্দে-মেয়েটা ওতে কিছ্র মনে করে না।

—আমরা তো আর সান্দে নই। না ভাই, এ তোমাদের অন্যায়, ভারী অন্যায়।

অনেক কন্টে সাধনা দিয়ে ওকে সোঁধন ঘোড়ারো জানা গেল। সোঁধন ভালো করে খেলো না—টের পেলাম, লাগাটা রক্ত ও গিহানার সঙ্গে হটকট করছে।...

—বাবু, বাবারটা খেলেন না এখনো? সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে।

চব্বকে কিরে এলুম আটকিত বহর পরে। আমাদের এই পুরোনো পূর্ব্য নাড়িটার—সারি সারি কবরের মতো বহলপুলোর নিঃশব্দতা, নিজের শেখরাজি বাগানের বগিচিতে। আমার শব্দে নাড়িয়ে কানাইয়ের হা। এই বাড়ির সঙ্গে তারও পক্ষাণ বহরের হোগ। আমার লগে সঙ্গেই যে হোগ ছিন্ন হয়ে বাদে চিরকালের মতো।

—বিন, যেহে বিন বাবু। বাসনপুলো পূর্বে রাখব আমি।

লুচি এনেছে, দুটো ভরকারী, একটু কপাঁধ, মিষ্টিও তার লগে। 'বাবার আসে একটু ভালো করে খাইয়ে দিতে চায়। লাগলিত রাতে দুখানা দুটি আর একবারি দুইই আমার বজাল।

—এত কে পারে কানাইয়ের হা?

—আপনিই যাবেন বাবু।

—কিন্তু আর তো এ-দর যেতে পারি না। দিল্লার যে সম্পদ বিক্রয় করে বলে আছে।

—অত কথা জাখিনা বাবু। খেতেই হবে। এবাড়ির আরে পাট তো চিরদিনের মতোই তুলে দিলেন। তবু বাওয়ার আসে—কানাইয়ের হা চোখে আঁচল দিলে।

আকর্ষণ লাগে। আচ্ছ আমার অমো কেউ কলি—

আমাদের আরে পূর্ব্য জাখিনা বাবু।

অথচ আমি তো কারো কাছে কোনো দাবি রাখিনি।
নিজের পায়ে চলি যেখানে পড়িয়ে, নিজের হাত ধরেই
তা বুঝে নিয়েছি। পুণ্ড্রী আত্ম—আরো আত্ম
মানুষের মতো। কোথা থেকে সেই মতো যে বলস্বয়
দুই নের—তা সেই-ই হবে।

পুণ্ড্রী-ভরকারী—সবত বিশ্বাস বনে ধর। তবু যেহে,
চলেছি। হাবনে কাউকে কিছু দিতে পারিনি—চলে
বাওয়ার আগে মানুষকে আর আঘাত দিতে চাই
হয় না।

বাদিক পরে বললুম, আর পারছি না।

—বাবু, এই মিউটা—

—না-না।—আমি মাসের জলে হাতটা ধুয়ে
নিলাম।

কানাইয়ের বা বাসনগুলো গুলিয়ে নিলে। অচিরে
চোখ দুটো আবার বুজে ফেলে বললে, আর রাত
করবেন না বাবু, ভাড়াভাড়ি বুজে পড়ুন। কাল তো
আবার ভোরেই নৌকো আসবে।

—আম্মা—আম্মা।

বাইয়ের উঠানে দিবে কানাইয়ের বা চলে থাকে।
আমি দেখতে পেলুম। একটু পরেই কেন্দ্র দিকে
খিলিয়ে গেল। এ বাড়ির রাজিকে আবার বতো ও—ও
জর পার না। হয়তো যে সব পুণ্ড্রী-বুকের প্রেক্ষাপট
এখানে অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়, তারাও ওকে চিনে
নিয়ত।

আমার এসে বললুম নিজের কাঁপ ডেক চেয়ারটাতে।
মোমবাতির শিখা কাঁপছে বাওয়ায়। ঘরের মধ্যে কিসের
ছায়া পড়ছে? মানুষের? ব?—একখানা পোষ্টারের।
পোষ্টার।

‘বিশ্বের কুমারী’ অর্থা লম্বা গাত বক্তিকার। আবদ—
দুর্ভিক্ষনাথ ঘোষ (দানীয়াবু)।

হ্যাঁ—ভাঙি আর প্রবের কথা ভাবছিলাম। তারপর
অনেকদিন বায়োস্কোপে বাওয়া হয় মি। প্রবের
অন্যেই আমার দিকের সারসে নিয়েছিলুম।

ভাঙি অবশ্য মধ্যে মধ্যে ছটকটি কত। বলত,
দূর—একঘেয়ে বেড়ানো আর ভালো লাগে না।
এই পুণ্ড্রী-বক্তার পরে চুড়চাপ পড়ে থাকুক—চল, জুই

আর আমি বায়োস্কোপ দেবে আমি।

আমি বললুম না—না, ওটা বড়ত ওপর বিদ্যায়
ভাঙকতা হবে।

ভাঙি রাগ করত : নিজেই বনেই পাশ আছে ওর।
নইলে ওতেই এমন পাগলামো করে?

আমি চুপ করে বেরুই। পাশ কি আমার নিজেরও
নেই? ওই ছবিটা কি আমারও মনের ভেতর অনেক
দিন ধরে আনাগোনা করেছিল, এওটা চাপা উদ্বেগনা
মাঝার কোষগুলোর ভেতরে কিন কিন করে বাসতে
থাকেনি? কিছু ভাঙিকে সে কথাটা বল্য গেলনা।

যেদিন ঠাণ্ডা লেগে একটু করে জ্বর হয়েছিল। কী
একটা খেলা ছিল গড়ের মাঠে—প্রবই ভাঙিকে টেনে
নিরে গেল। এইখানেই প্রবের নিজের বাদিকটা
উৎসাহ ছিল, সে ভালো ছুটল খেলোয়াড়।

ফেলার ব্যাপারে আমার কোনোদিনই কৌতূহল নেই
—তার ওপর শরীর ব্যাপার—আমি বোঝি-যেই ছিলুম।
দূরে থাকতেও ইচ্ছে করছিল না—উঠে দাঁড়িয়েছিলুম
আনন্দের ধারে। সেই দম্ব সারনের সেকলার গাছটার
একটা শোস্তার আমি দেখতে পেলুম। নিজের দিক
থেকে আঁঠা ধুলে গিয়ে একটা পতাকার মতো দুলছিল
সেটা।

প্রথমটা ভালো করে লক্ষ্য করিনি, তারপরে চোখ
পড়ল। বড়ো বড়ো লাল-নীল হজকে ছাপা। উপরে
খিটোখিটো মাথ, তার নীচে :

পরিবার ও রাক্ষসের দ্বারা মাত বক্তিকার

মি ন র জু মা রী

আবনের ভুক্তিকার অবতীর্ণ এইবনে :

দুর্ভিক্ষনাথ ঘোষ (দানীয়াবু)।

আমার মাঝার মধ্যে হঠাৎ যেন বিদ্যায় চমকালো।
দাঁড়করের প্রভাবে অশান্ত চকল ছাড়তে একটা চকিত
উদ্বেগনা ছাপল : যেন অনেকদিন পরে জন্মগত
পুণ্ড্রীতে পেলুম জলদে তবলা চলেয়ে, রক্তের মধ্যে পুণ্ড্রী
তুললে অকোঁটা। সেখান, মেকআপ বুকের সেই
মাঝার-বক্তার দামনে এসে আমি দাঁড়িয়েছি, সেই রক্ত—
সেই পিপিট—সেই পাইভারের মত আমার খিরে বয়েছে।

একটা, পাঁচই ত্রুণ উঠে, তৎপাতিতে আমি পাটের
এঁদের চোখ বুলিয়ে চলেছি।

সুঁকনের দাল-দাল করকসো বিকেলের আলো
কিছুক্ষণে হুশ বসল, যেন জীবন্ত হয়ে উঠল তারা, আর
এই গোপালীরা ক্রমশঃ হাতছানি দিয়ে আনাকে হেঁকে
চলল।

এই চ'হাস করে—‘খিচোরের ইচ্ছা, হী এই কলকা তার
সে—খিচোরকে আমি ভুলেছিলাম কী করে।
মজ এই খিচোরের কত বর্ণনায়ই পুঁসেছি কাকার নুঁসে।
তার দুশাপট, তার অভিনয়—তার উদ্যমণ। সামনে
দুয়ার সম্মুখ রয়েছে—আর এক বৃক পিঙ্গলো নিয়ে আমি
অনিভাবে পড়ে আমি।

সারা একটা দিচ্চাই আছে।

যোড়িংয়ের কটা নিম্নে ছাত্রদের সত্তা পাড়ে
পাতটার মধ্যে কিংবে আসতেই হবে। আর সে নিম্ন
আন্তে সেসে খিচোর বেঁধা কোনো নড়েই সম্ভব নয়।
চাউনি শোনেত বাসোয়োগ স্নেহেই আপ রেটোতে হবে।
বাতোতোপ।

পক্ষীর ওপরে কতগুলো হাঁস চলে বেড়াচ্ছে কেবল।
কম, তারা পুঁদুই হাঁস, পুঁদুই আসোয় বেলা।
পানের ছোঁয়া নেই, গুচ্ছাংয়ের উত্থাপ নেই কোনো-
পানে। কী হবে ওই সব হাঁস সেবে? কী অব'হর
সকলের?

পনিবার সন্তা সাত বঁটিকার! খাচ্ছই তো পনিবার।
যার একটু আসেই তো কোথার একটা পেটা বঁকিতে
চিটা বাহুল।

আমি আর থাকতে পারলুম না। সামনের দেওয়ান্দ
পাছটা থেকে শোন্টার হাতছানি যেন বুকের সমস্ত
পাউপুলোকে ধরে নির্ভর ভাবে আকর্ষণ করতে লাগল।
মজের হুকে অকোঁটার হাঁস পুঁসতে পুঁসতে কখন
হাসি কাপড়-ছাদা পরে বিলুপ, পরজার তালা বহু
হলুদ, তারপর যেনে এলুস হাতার।

সেখিন খিচোরের সামনে এসে কতকল বে চুপ করে
চলুন আমি না।

সামনে শোন্টারের পর শোন্টার—যাদের পর নাম।
ই সব দাকনুলোকে কতদিন হুশকবার বত পুঁসেছি,

কতদিন ধরে ওরা শব্দের মধ্যে ভাঁড়িয়ে রয়েছে। আর
তারো আমার কাছ থেকে আর হাত-কন্দের দূরে। হাতটা
পায় হবেই আমি শেঁদে যেতে পারি, একখানা ডিকেট
কিনতে পারি, ভেতরে গিয়ে বসতে পারি। তারপরই
আমার চোখে সামনে মাথাপুঁদুর দরজা খুলে যাবে,
বলবল করে উঠবে অশ্রু'র সমস্ত দুশাপট, অশ্রু'র
দরজার সেবা সেবে আমার বংশলোকের সেই সব
স্বা-পুঁদু—যাদের নামে সারা বাংলা বেশ পানল
হয়ে যায়।

আমার সামনে দিয়ে একে একে লোক চুপুতে লাগল
খিচোরের। টুকটো টুকটো কথা পুঁসতে পাচ্ছি।

—আমি ঝিকাকোও এসেছিলাম রে। সত্যি বলছি,
কাটিয়ে দিচ্ছে।

—কী চমৎকার বুলো এসেছে দেখেছি।

—নতুন মেয়ে। বাসা চোয়রা ভাই। পাশ'ী
খিচোরের চটকবার মেয়েলুলোকেও টোকা দিয়ে যায়।

খুঁর নাম করবে—তোকে বলে দিচ্ছি।

আমি যেন খুঁসের ঘোরে পুঁসতে লাগলাম। একটার
পর একটা ল্যাভো কিউম—চাকা প্যাঁচ এসে বাসতে
লাগল খিচোরের সামনে। হাতে মালা মাড়িয়ে দাবল
সৌখিন পুঁদুসের বল, সামনে ভারী ভারী পথবা পরে দাবল
ঘোড়া-পরা সব মেয়েমা, সঙ্গে কি চলল পানের বাটা আর
হাত পাখা নিয়ে। আতর আর বেশকুলের সঙ্গে ভরে
উঠল চারিদিক।

—এই বঁকি বারক এসেছে রে।

—সঙ্গে ওটা কে রে। নতুন কাকে আমার জুটিয়ে
সেখাই।

—ওতো হাববাসানের পক্ষ। আগে এই খিচোরেরই
সখী হয়ে মজত। এখন বড়ো ক্যাটেন বাগিচেরে, বসে
বসে খিচোরের সেবে আমকাল।

আমি সেই শব্দজগতের শীঘ্রায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে,
নিম্নের অশ্রু হারিয়ে আয়ো কিছুক্ষণ কন্দের তাওব
পুঁসলাম। তারপর হাতের এপার থেকেও কানে এল
অকোঁটার চাপা গম্ভীর এখনি খিচোরের আরম্ভ হবে।

আর—আর—এখনি হাঁসে না উঠে বসলে আমি পাড়ে
পাতটার মধ্যে ছোট্টেলে কিনতে পারবো না।

চুড়ায় পিরে মূণে জীবনের সব চাইতে সুখ্য
কেনে আশার অসঙ্গততা নিয়ে যখন আমি যোড়হা
কিরে এসে, তখন ঠিক নাচে লাগে। পেট বড় কঠোর
কন্যা তৈরী হচ্ছে গায়োবান। এক দুঃখের কন্যা ইচ্ছে
হল গায়োবানটার গালে প্রতাপ চকু বসিয়ে দিই একটা।

নিশ্চয়ই সিঁড়ি বেয়ে সোতলাব উঠে যেন।

প্রশ্ন আর তড়িৎ মশেকা করছিল বাইরে। আমাকে
সেখে চটে উঠল।

এই, কোথায় গিয়েছিল। একখটা গবে আমার
হাঁকিয়ে আছি।

একটু বেয়েছিলুম।

—কেন বেয়েছি? বলিনি—তোমার করে।

—একা একা বসে থাকতে ভালো লাগছিল না।

প্রশ্ন বললে, খেলার মাঠে সেলেই পারতিল - পরী
ঠিক হয়ে যেত। নে—চাঁবি গেল—

বরজা বলে ভেতরে ঢুকে আমি সোজা বিছানার
পরে পড়লুম।

—কী হল রে তোমার?

—বাংলা মাথা গরুরে ভাই—চোখ বুজেই জবাব
দিলাম।

পাড়াগারের মেলে প্রশ্ন বড় হয়ে উঠল : মাথাটা
টিপে দেব?

—না, বরজা সেই। একটু চুপ করে পরে থাকলেই
ঠিক হয়ে যাবে।

ওরা দু'জন কিংকর্ণ খেলার মাঠে গম্ব করল।
ক্যালকাটা টীমের ব্যাকটার পা দুটো দেখেছিল ভাই।
যেন থাকের মতো। আর ওই বুট! কী করে এসোবে
বাগদারী খেলোয়াড়রা বলতো। তবু কিংকর্ণের টুলির
বিজিরে সাহস খুব। একটা সোল তো চুকিয়ে দিলে।
কিংকর্ণের টুলির সোলকীপারটাই কোনো কালের
নয়—শেষের দুটো সোল ওর সোলেই তো হল।

ওদের কথাগুলো আমার কানে বাজিল, কিংকর্ণ গরের
ভেতরে একটার পর একটা নিশ্চয়কৃত্যরী দৃশ্য অভিনয়
হবে চলছে। বাটকটা আমি জানি—পড়েছি। আমি
আবনে অঁকন দেখেছিলুম—দু'নতে পাখিলায়
মাঝেমাঝে নির্ভর কর্তব্য—সেই দু'নতী বেয়েছি—যে

পাখি খিচোয়ের রঙিন মেয়েদের হার বানায়—তুটিপান
আবার দু'কান ভরে বাজছিল। আমার চারিদিকে তখন
বড়ো বড়ো জড়ি কটিল, স্যাকো এসে বাজছিল—
আতরের আর বেদকলের বালায় সব যেন বিন্দু
উঠছিল।

যেহ হর মাঝে গবে পড়েছিলুম—একটু একটু
ভালবে গিয়েছিলুম স্বপনের ভেতর। দেখি, আমাকে
আজ্ঞে বাজা দিলে তড়িৎ।

—এই উঠিয়ে? বাজার বেল পড়বে।

—আবার কন্যা একবাড়ি দু' পার্শ্বে বিতে বসিল।
আর বিজ্ঞা দাব না।

—তোমার করে বেড়িয়ে নাকি? দু'দারিতেওঁকে
বলব?—পাড়াগারের মেলে প্রশ্ন আমার ওকল হয়ে উঠল।

—যেতে বাজিল—যা না? কেন বিরক্ত করছিল
আমাকে? বড় পদার আমি জবাব দিলাম।

তড়িৎ বললে, আছা—থাক থাক—ওকে চুপ করে
পরে থাকতে দে। চল—আমরা বাই—

বাগোতোপ দেখে এসে যেন বিনিময় হাত কেটেছিল
প্রবের, তেমনই ভাবে সে রাতেও আমি দু'নতে পারলুম
না। সারারাত সেই কল আর আতরের গড় আমাকে
প্রলম্ব করল, সেই আতরের দেখা পথটা একটা পোটার
হবে আমাকে ক্রমসত্ত হাতছানি দিয়ে চলল—আর চোখের
সামনে মিশরকুমারীর একটার পর একটা দৃশ্য অভিনয়
হতে লাগল।

হাবার সকালে যখন বিছানার উঠে বসলুম, তখন
গরের জরোটা হেড়ে গেছে। আর সেই বনও ছিন্ন হয়ে
গেছে আমার। আর মিশর কুমারী আমি দেখেই। তারপর
যা হাজার হোক।

তড়িৎকে ছেকে চুপি চুপি বললুম কথাটা।

শুনে, তড়িৎ চমকে উঠল।

—যদি কী করে? গাড়ে গাড়টার তো পেট, বড়
হয়ে যায়।

—আগেই বেয়েছে দাব।

—তারপর।

—আমাদের জানালার পাশেই তো হাবের নলটা রয়েছে।
তড়িৎয়ের চোখ কপালে উঠে গেল সে কথা শুনে।

—হাসিল কিরে। এ যে দীতিমতো সোপেন্দ্র গল্প।
সে ট্রেসে উঠে আসনি।

—আমরা পাতাগুলির ডানপিটে হলে।—আমি
দ্বাদশদশের হাট হাঙ্গলম : নারকেল সুপারি গায়ে
ঠোঁট খড়সে করেছিলাম। কলের দল তো তার কাছে
ঠিকমতো দাঁড়।

—সেখানেতে উঠে আদর্শ দল বেধে।

—সেইদল, ঠিক চলে আসব।

এইবার তড়িৎ বিদ্যুৎস্রাব আর মূর্খের দিকে তাকিয়ে
হইল কী করে। তারপর খানিকটা বোকার মতো হেসে
দিলে, যাঃ, তুই ঠাট্টা করছি কিছর।

—ঠাট্টা করছি কিনা আজ রাতেই দেখতে পাবি
নিম্নের চোখে।

—কিছর ভাই, কেউ যদি তের পার।—তড়িৎতের
মুখে চোখে আভ্যন্তরীণ হাঙ্গা পড়ল : তা হলে তো
দর্শনাশ হয়ে যাবে।

—কে তের পাবে? আমাদের এই বড়টা একবারে
কোণাব। এগারের ওই জানালা দিয়ে সোকা বেয়ে ঘাস
দাঁড় মতো—দিলের বোলাভেঙে ও পাশে লোক চলে না।
কে দেখতে আসছে শের রাতে?

—হিসি হাতার পুঁদিশে দেখতে পার?

—পুঁদিশকে আমি ভব করি না।

তড়িৎ প্রকার আমার মূর্খের দিকে চেয়ে হইল
কিছুক্ষণ। তার পর আত্মে আত্মে বললে, এ-সব মতলব
ছাড় দে ভাই। তুই তো মায়া পড়বিই, আমাদেরও
তাকিয়ে বেবে মোর্জিৎ থেকে।

বলেছি তো কোনো ভাবনা নেই। তুই-ও চন্দ্রা।—
আমি হাসলাম।

—ওরে বাবা।—তড়িৎ ভয়ে পুঁকিয়ে গেল : আমার
অত সাহস নেই। তাছাড়া ওই পাইপ বেয়ে নামতে গেলে
আমি হাত পা ভেঙে পড়ব। এ সব মতলব বহির্বি নি
নির্বদ। কেন বামোবা—

আমার রাস হয়ে গেল। বললাম, তবে বা.
সুপারিটোপেন্টের কাছে দাঁড়ি করে আর। বললে
না যে নির্বদ চৌকুরী আজ খিটোর দেখতে যাচ্ছে, শের
রাতে পাইপ বেয়ে ফিরে আসবে।



তড়িৎতের মূখ এইবার কানে? হয়ে গেল।

—তুই কি আমাদের ট্রেটার ডাবিস? একথা বলদি
কী করে?

—তা হলে চুপ করে থাক। মাথা—আমি কী করি।

তড়িৎ আরো কিছুক্ষণ চুপ করে হইল। তারপর
বললে, কিছর, দলব? আমি না হব এককম বৃত্ততে
পাঠাই, কিছর, তোর এই মতলব শুনলে ওঃ মায়া ব্যাপার
হয়ে যাবে।

ওকে কিছু বলতে হবে না।

বা-রে। সন্ধ্যের পর তোকে পীটে না দেখলে।

বলদি, আমার হামার অদৃশ্যের ধর শেরে কালাঁঘাটে
চলে গেছি।

আর শের রাতে ফিরে আসবার দলব। তখন যদি
দেখতে পার।

মতলব মতো ঘুমোয়।

আর ভোরে উঠে যদি অজ্ঞান করে, কালাঁঘাটে থেকে
রাতে কিজলি কী করে?

বলব, সুপারিটোপেন্টের স্পেন্যাল পারমিশন ছিল,
মারোয়ান পেট খুলে দিয়েছে।

তড়িৎ হুটো বিহল চোখ বেলে আমার দিকে তাকিয়ে
হইল।

—নাভা বলছি ভাই, তুই যে এমন ভোলাপাশ হলে,
তা আমি জানতুম না।

—এখন বৃষ্টি ভর করছে জানাকে দেখে? আমার
দলে আর মিশতে চাননে?

—না ভাই—তড়িৎ হচ্ছে তোর গুণ। পারবে
খুলো রে।

এতদিন পরে প্রবোধের কথা বদে পড়ে হাসি পাচ্ছে
আমার। সে বিন ও কতটুকু আমাকে চিনেছিল? আমার
ভেতরে যে উদ্ভাবন বন্যতা পায়খানীপের আলোর বার বার
সমস্ত বস্তু দ্বিগুণ বেগে বেগে গেছে, তার হিঁচকে হুঁটাকে
কতখানি কল্যাণ করতে পেরেছিল ও? ও কি ভুলেও
ভাবতে পেরেছিল আমার রক্তের মধ্যে কী আদর্শ যে
জলছে, তার কতটুকু উদ্ভাবন অনুভব করেছিল?

আমার জানদার বাইরে উদ্ভাবনের গুণ ঘন কালো
হয়ে অন্ধকার নেমেছে। সোকাবাতির আলোর আমার

একটা চায়া যে ওখানে গিয়ে পড়েছে, তা আমি এই প্রথম লক্ষ্য করতে পারলুম। সেদিন এমুনি করে আমার হায়াটাই যেন আমার টেনে নিয়ে গিয়েছিল। নিজের উগ্র আন্দাকার এমুনি একটি আলোর ভেতর দিয়ে আমি অঙ্গুর হয়ে গিয়েছিলুম—আমার চারপাশ অন্ধকারের ভেতরে আর কিছু আমি দেখতে পাইনি।

নিষেধ ভাঙার সমস্ত উত্তেজনা নিয়ে আমি থিয়েটারে গিয়ে বসলুম। আমার চাতিবিকে অজেনা—অজ্ঞাত সমস্ত বান্দবের ভিড়। টুকরো টুকরো কথা—হাসি গল্প, আতর আর পাউডারের গন্ধ, পান অর্ধ সিগারেট, হাত-পাখার হাওয়া। সামনে বিরাট ড্রপস্টোন—তার আয়তল থেকে কী শব্দল করা ঐক্যতানের শব্দ। আনাদের বাড়ির থিয়েটার, তার শরিবেশ, সবই এই এখন আমার কাছে নিহক হোসেলের মতো মনে হল।

আর অভিনয়।

মর তখনো আমি ঘাইনি, তার দ্বন্দ্ব—তার প্রভাব আমার কাছে তখনো অজানা। কিন্তু থিয়েটার শেষ হওয়ার পরেও কিছুক্ষণ আমন্ত্রণের মতো বসে রইলুম নিজের ভাবগার। অভিনয়। অভিনেতা হিসেবে পাড়াগাঁয়ে কিছু শুন্য আমার হয়েছিল—একটু অম্বকার যে ছিল না—নিজের কাছে এত বড় বিদ্যা কথা বলবার ইচ্ছেও আমার নেই। কিন্তু এই মৃত্যুতে একটা কথা আমার মনে হল। কলকাতার এই সেরা দর্শকদের সামনে যদি এমনি করে কোনোদিন অভিনয় করতে পারি—এমুনি করে সকলের মনের ভেতর দেশার যোলা জাগিয়ে দিতে পারি—তবেই আমি অভিনেতা।

প্রায় এক ঘাইল নিব্বন পথ বেয়ে আমি এখন কিয়ে এসেছি, তখন গ্যালের আলোর আমার সেই হায়াট ছাড়া আর কোনো সঙ্গী কেবাও ছিল না। কয়েকবার কুঁচর ডাকল, দেখলুম প্যাগশপেট, তড়িয়ে হয়ে মাড়াল টসছে আর বিড়বড় করছে। কিন্তু, আমার চাইতে বড় মাড়াল সে রাতে কোথাও কলকাতায় ছিল না।

তাৎপর্য জলের পাইপ। আমার শূণ্য গায়ে জ্বালা অভিজ্ঞতার হোসেলের মতো মনে হল। এখন ঘরে পা গিললুম, তখন আলোর কাছে তড়িৎ যেন পাখর হয়ে গাঁড়িয়ে।

—এলি। কিস কিস করে জানত চাইল। ভরে ওর সারা গা কপিছিল।

—দেখতেই পাচ্ছিল।—আমি হাসলুম। বিখ্যাত মোতদার শিঁকি বেয়ে উঠে এলুম।

—এই আভে আভে। প্রব ভেঙ্গে উঠবে।

—কাগবেনা ওর নাক ডাকছে।—নিজের শিঁকি এলে জানা মূলতে মূলতে আমি বললুম, তুইও সারাতাক মেরেছিলি নাকি রে?

—কি করব। যা ডাকনা গরিতে ঘিরেছিল, মূর আসে?

—যা শিকিতে মূর পড় এখন—মূরো।

এইবার আমার মূর চোখ ভরে মূর নামল। অনেকখানি মূরই উত্তেজনার পরে তড়িৎ অলসের মূর। প্রব আর মূরতে পারল কিনা সে আমি জানি না—জানাবার মূরো কোন মৌতহল আমার ছিল না।

সেই মূর—কিন্তু সারা মর। যে দেশার কঁরে পা ঘিরেছি, তা থেকে আর পরিত্রাণ কোবার আমার।

পরের শনিবার। তার পরের রবিবার। তড়িৎ দেশ পরন্ত হাল ছেড়ে দিলে। কাদীঘাটে নানার অশুভে গল্পও প্রবকে আর ভোলাতে পারল না।

তারপর প্রব একদিন হেলেনামূরের মতো বহিল, অনেকক্ষণ।

—তাই নিব'ল, তুই যে এমন অসংপাতে ঘাবিতা কোনদিন জার্বিন।

আমি ককশ গলার বললুম, তোমাকে উপদেশ দিতে হবে না। তুমি আমার ক্যাল গায়ে মনও।

তড়িৎ বাবা দিতে চেষ্টা করল : ও তে তোর ভালর জন্যেই বলছে। বজ্র বাজাবাচ্ছি করছিল একদিন গোঁহিল সে অদায়া কথা, তাই বলে প্রত্যেক লগায়ে—

—আমার বা শূণ্যকর, তোমার কী,

প্রব সেইমই ঘর বলালো। তেতালার একটা খালি, গাট ছিল—এলে গেল সেখানে। আর আতর্ভায়ে নীরব হয়ে গেল তড়িৎ। মধ্যে মধ্যে এখন ভাবে আমার দিকে ডাকাতো যে মনে হত ভাত দেখে।

আমি গ্রাঘ্য করিনা—কাতকে না। মূরতে পেয়েছি, থিয়েটার না দেখলে আমি মর না। শনিবার বিকেলে

সুন্দর আলো লাগ হুই উঠলই আমার গকে তেই ওঠে—
—টেবিলের আলোগুলো আমার প্রত্যেকটা নাড়ীকে করে
নিখুঁত হাতে আকর্ষণ করে। আমি কিভাবে পারি না—
কোরণের গুণ নেই।

তারপর—

একদিন শেষ রাতে পাঁচপ বরে ঘানিকটা উঠেছি,
এমন কে দর ঘেন বহুদূরতে আমার পা চেনে বলল।

—শালা চোর!

তারিবে সেখন্দর পুঁদিশ।

কন্টেবল আমাকে চেনে নাযালো। মাথা ঘেন
ঘুরে পেল আমার তারপর গদা চুকিয়ে কন্টেবল হাঁক
হাতল : এ সুপারিটন বাবু—এ সুপারিটন সাহাব!
হোটেলে যে চোর থুসতা যা—পকড় লিহা।

হোটেলেসের জানলার গারি গারি নুখ দেখা দিল।

দুখানা নুখ আমি চিনতে পারন্দর। একখানা
তড়িতের—নড়ার হতো বিবর্ণ। আর একখানা
সুপারিটেণ্ডেণ্টের। অনেকখানি কড়কে পড়ে তিনি
জানতে চাইলেন : কাঁধা চোর কেইগা চোর?

এক গ্রাস জল খাওয়া যাক। বুদ্ধের ভেতরটা নুকিয়েউঠছে।

হাত কটা হল? এগারোটার কাছাকাছি। পুরে
পড়া? না—আজ আর আমার হুম আসবে না এখনো
আমার অনেক কাজ বাকী। এই রাতেই—আজকের এই
শেষ রাতটিতেই—এই বাড়ির সব হিসেব—নিকেশ আমার
চুকিয়ে নিতে হবে। আর আমার সময় খেই।

সেই দিনটার কথা ভাবছি। কলকাতা জীবনের পালার
বেমিন দরন্দতী। কাছ থেকে বিদায় নিলুম। তারপর
থেকে উৎসাহ বন্দনার পালা। হাতের পাত্রে ঘর সুখা,
চোখের দৃষ্টিতে ঘর বিধাক নাবকতা।

ফিচার হল প্রিন্সিপ্যালের ঘরে। ভাইল-প্রিন্সিপ্যাল
ছিলেন, সুপারিটেণ্ডেণ্ট ছিলেন, কলকাতা কমিটির একজন

কেউ ছিলেন বলে মনে পড়ে।

এখনেই তড়িতের পালা।

—তুমি এর সঙ্গে খিচুটোরে যেতে।

তড়িতের ঠেটি কাশল একবার।

—না স্যার, কোনো শিন আমি ঘাইনি।

ও—যে আমি করে বেরিয়ে যার, তা নিয়ে কেন
খিচুটি করোনি তুমি?

তড়িৎ মাথা নিচু করে রইল।

পাঁচপ টাকা কাইন হল তোমার। এই ওয়ানিং।

জীবিত্যতে আর কিছু খটলে তোমাকে তড়িতে দেওয়া
হবে কলেক্টর আর বোর্ডিং থেকে। যাও—

তড়িৎ বেরিয়ে গেল।

এইবার বরশুড় লোভের অধঃপাতি পড়ল আমার
দিকে। ঘেন দৃষ্টি বিধেই নুকিয়ে মারতে চাইছে।

প্রিন্সিপ্যাল হাতে হাতে চাপলেন : কিছু কৈকিক
আছে তোমার।

না স্যার।

তুমি লিখিত।

না স্যার।

সবত থরটা ঘেন বাবুদখানার হতো তখন হয়ে রইল।

আর আমি দাঁড়িয়ে রইলুম বিস্ফোরণের চুড়োয়।

প্রিন্সিপ্যাল কিছুক্ষণ নিখর ভাবে বলে রইলেন।
তারপর বললেন, আমার সাগাছীবনে এমন বেহাযোগ
বহুদূরত্রে ছেলে আমি ঘোঁর্ণনি। তোমাকে কলেক্টর থেকে
রাষ্ট্রকেট করা—হল। আর আজই বিকেলে তুমি
বোর্ডিং ছেড়ে যাবে।

আমি বেরিয়ে এলুম। কলেক্টরভিত্তি ছেলে ঘেন
দুঃস্বপ্ন দেখছে আমি করে তারিবে রইল আমার দিকে।
আর হোটেলে কিয়ে টেলিগ্রাম পেলুম একটা।

মহালে বেরিয়ে দৌকাডুবিতে এক সপ্তই বাধা
সেজেব হুজব। বাবা আর কাকা।

মোমবাতির কিতোর নিখা

১ ১ ১

মোমবাতিটা পুড়ে এসেছে অনেকখানি। রাত ব্যাটারি বতো হবে হবে হয়। আবার চোরাটা থেকে একটু নুয়ে পড়ে হাত বাড়ালেই খড়্কাটা আঁধার পেতে পারি। কিন্তু কোনো উৎসাহ বোধ করছি না। আলকের এই শেষ রাক্ষসীর সবসের কোনো হিসেব আমি করতে চাই না। সব হিসেবের পাট আমার বিটিয়ে গিয়েছে।

যার সময় আছে, সেই হিসেব করে। আমার সময় কুঁড়িয়ে গেছে অনেকদিন আসেই। এখন আমি একটা পুন্যভার ভেতরে বাস করছি। কাল সকালেই এ ব্যক্তি ছেড়ে চলে যাব। কোন পথের ধারে—কোন সন্ধ্যাখানার—কোন হাসপাতালের একায়ে এই জীর্ণ শরীরটা চিরদিনের বতো হুটি পাবে সে আমি জানি না। সব ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু এখন হাফা-না-হাফা দুইই সমান। এই বুদ্ধিতেই একটা তীব্র ব্যর্থতার উৎকণ্ঠ টের পাচ্ছি লিভারের ভেতর। হয়তো আর রাত্রিই—এই রাত্রিই—এই টেলিফোনের ওপরেই আমার বুকু হতে পারে।

কিন্তু রবর না—এ ব্যক্তিতে কোন রতেই আমি রবর না। আমার পিতৃস্মৃতির সঙ্গে অভিস্যপকে কোনো রতেই ছিড়তে দেব না আমি। চিরদিন তাদের উপেক্ষা করে এসেছি—বাওয়ার আগেও করে যাব।

আমারও কৈফিয়ত আছে। আমারও অধিকার আছে প্রর করার।

আনন্দা দিয়ে মোমবাতির আলোর আবার যে ছায়াটা বাইরে ছড়িয়ে আছে, আর একটা চকিত ছায়া হুলে সেল তার ওপর দিয়ে। কী ও? বাবুড়? আমিবা। কিন্তু আমি কাকার কথা ভাবছি। এই বুদ্ধিতে কাকা যদি আমার সামনে এসে দাঁড়ান, আমি বলব, হুঁই—হুঁই। হুঁই তো আমাকে সেই বাবা-বুদ্ধির পথ দেখিয়েছিলে, সর্বশেষের বেশা নাচিয়ে গিয়েছিলে রক্তের ভেতর। তোমরা দু'কল বাঁচিয়ে চলেছো, আমি পারি নি। কিন্তু তার জন্যে সব দোষই আমার। তোমাদের সকলের বিব কি জেদমা আমার মধ্যেই চলে বাও নি—তোমাদের সকলের পাপ চাপিয়ে দাওনি আমার ওপর।

আমি একটা ব্যক্তি মানুস নই—আমি পরিণাম। তোমাদের সকলের পরিণাম। বিশ্বাসঘাতকতা দিয়ে জীবিত্যায় পত্তন করেছিলে, তারপর বংশধারার বাশে বাশে যে নির্ভুল অশক্তি পাচ্ছিলে সেই, আমি তার যোগফল। কেন আমার ওপরে আর তোমাদের বত ফোঁস—বত ফালা? তোমাদের সকলের পাওয়া পাতি আমার ওপরেই চাপিয়ে দাও কেন?

কিন্তু ছায়ায় সঙ্গে তর্ক করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। বুদ্ধ—বুদ্ধ—ওগা অন্ধকারেই বুদ্ধপাক ঘেঁষে চলুক একটানা। বাবুড় আর চারটিকে হয়ে এই সাত-মহলা ব্যক্তিকে প্রাণিষ করতে থাকুক, ঝালায়ে ঝালায়ে ছায়া কেলে ক্রী বংশধার নাখা বুদ্ধ, সেওয়ারের কাটল থেকে তলকের বিকট গলায় গ্রহের গ্রহের ব্যত-নাম তুলুক। আমি ওদের ব্রাহ্মণ করি না।

নিজের চিন্তাতেই ঘিরে আমি আবার।

মোমবাতিটা জ্বলছে। তাকে ঘিরে ঘিরে পোকা এসেছে অনেকগুলো। ওদেরও কি আমি চিনি? বাহা ওর শিবার পুড়ে রহবার জন্যে হুটে এসেছে কে কে আছে তাদের মধ্যে? বহু মল্লিক? উষারানী?—আমি।

আবার কথাই ভাবছি।

যেটোলে পা ঘিরে বন্ধন টেলিগ্রাম পেশদু, তখন সবত পৃথিবীটা গায়ের তলার লোশা ঘেঁষে উঠল। কলেজে বা বচেয়ে তার জন্যে আমার মন সম্পূর্ণ তৈরী ছিল, আমি জানতুম এ হাফা বিবুই আর হতে পারে না। দু'পাশে ছাওয়ার বল বন্ধন অরাক কিংবদন্তি তাকিয়ে তাকিয়ে আমার ঘেঁষছিল, তখন নিজের মধ্যে যেন অন্ডর করছিলুম স্ত্রীটির মহিমা—ওদের ঘেঁষছিলুম অনুভব করছি। কিন্তু এ কী হল। বাবা আর কাকা এইভাবে এক সঙ্গে—

এ কি হল। এ কি হতে পারে।

বাঁচিতে চলে পড়ে থাকিলুম, কে যেন দু'হাতে আমার জড়িয়ে ধরল। তড়িৎ? এখন? আমি জানি না।

ভবু সেপে করে এলু। আমি আর বিবু পাশ-
পাশ বসলুম তাক করতে।

—যো জীবা অনলম্বা—

ভাবশর আস্তে আস্তে পোকের ঢুকান শুরু হয়ে গেল।
আমারও আর কোলকাতার ফেরা হল না। কলমে
কী ঘটছে, সেখানে আমি কী করেছিলুম, সে বর
জানাবার কেউ ছিল না। কাউকে দিতে হল না
কৈফিয়ত।

বিবুর তখন কুলের পাতা শেষ হয়েছিল। বড়তুতো
ভাইবোনেরা সবাই এখানে ছেলেমানুষ। শুবু
আমারই বরষ সতেরো বছর। জীবনের অভিজ্ঞতা বহি
কিন্তু থাকে, আমায়ই আছে।

শুবুগোনা কল্যাণীয়া এসে বসলেন, বিবু—এখন
তুমিই বুঝে নাও সব। তোমার ওপরে আর ভো কেউ
নেই।

সেয়েসায় গিরে বসতে আরম্ভ করলুম।

সেই বাঘনা, ঢেক দাঁড়ানো, ভাবনা, মালিশ, লাটের
কিচি, উদ্বেগ, গাউনিকেক্ট—এক বিরাট আর বীভৎস
চ্যাপার। মাথা ধরে উঠত। সকালে যে দু'দিন খণ্ডা
সেয়েসায় গিরে বসতুম, সে সমস্তা যেন নরক গন্ধপার
হতো মনে হত আমার কাছে। কখন বু'জাবে আমার
স্বপ্ন বরষ। সেখতে সেতুম বড়ো ভুঁড়ি গাউ এসে
হামছে খিচোরায় সামনে আভর কুলের মালার গন্ধে
চরে বাচ্ছে চারমিক, কিংবা খিচোরার শেষ হয়ে গেলে
সয়েসায় মাকদামে এসে খিচোরায় কি ভাক দিচ্ছে :
সবুতপার বিজিৎ ব্যক্তি'র সব কই শো? তোমাদের
গাউ এসেছে।

হঠাৎ হাতো চক তেজে বেত মাথের বণাইয়ের ভাকে।

—বিবু, এগুলোতে একটু লই করে পাও বাবা। আর
পদাশ্রয় থেকে এই প্রকার সব এসেছে তোমার কাছে
ওয়ে ওখানে একটা নতুন হাটের পতন নিয়ে কী দরবার
করতে চায়।

উঃ—কী বন্দ্যাসেই পড়া সেল।

হাস হচ্ছে পরে যা একদিন বসলেন, বাবা আর একটা
কাজ আছে যে।

আমি হান বুকের দিকে তাকালুম।

কথাটা বলতে গিয়ে হান চোখ জলে ভরে গেল।
অচিলে চোখ বুঁজে বসলেন, ও'রা অনথ্যেতে গেলেন, গমর
স্নেহমিলার শিঙি না দিলে ভো ও'র গতি হবে না।
তোমাই কাছটা করে আসতে হয় যে।

দু'দিন হয়েই রাঙা হয়ে গেলুম। প্রত্যেক দিন সকালে
সেয়েসায় নিয়ে বসা আমার কাছে আতঙ্ক হয়ে উঠেছিল।
কোনোভাবে এখন এ ছেলখানা থেকে বেহুতে পারলেই
হুঁকি পাই।

তিন চারদিন বামেই বণ্ডা হয়ে পড়লুম গরাস্তে।

যা বসলেন, কাউকে সঙ্গে নিয়ে যা বাবা একা
অন্ত হয়ে যাবি!

বসলুম, আমি এখন বড়ো হয়ে গেছি বা, বিবু
ভেবে যা।

ট্রেনে উঠে যেন হুঁটির শূণ্যবীটার শব্দ পাওয়া
গেল। দৌঁদলুম গরাস্তে। কোনো বেস পেতে হল
না। আমার ব্যক্তির পাওয়ার কথা আমি ভেবেই
গিরেছিলুম, তাকে বুঁজতে হল না আমার। একটা
বিরাট খাতা বের করে সেই আমাকে ট্রেনে নিলে।
সেখলুম, আমার বাবা কাঁচা থেকে আরম্ভ করে সাত-
শু'বুকের কে কবে গরার এসেছিলেন, তার বিস্তৃত বিবরণ
তার খাতার পাটার মাঝানো আছে।

আকাগম্ব গিরালন্দ: বায়ুতুতে নিগাস্ত:—

দিন তিনেক গরার কাটিয়ে মনে হল, এত তাড়াতাড়ি
ব্যক্তি কিংবা না এগন-ওগন বেরিয়ে যাই কিছূ'দিন।
কিরে সেলেই, আমার সেয়েসায় সেই কুস্তীপাক—সেই
আদায়-অপলি, বামলা সোব'রা, লাটের বাঘনার হিসেব
নিয়েল! আর এখটু হুঁকির আনন্দ উপভোগ করা থাক।

চলে এগার কাশীতে।

বিশ্বনাথের বাঁশবে বাই আরতি সেখতে, কখনো
বা টান্দা নিয়ে সারবাঘের নিশ'ন পথ হয়ে এগিয়ে গেল।
যে বর'পালার উঠেছিলুম সেখানকার বসোবস্তও বু'ব
ভালো। একটা দীর্ঘ অবসার আর অশিক্ষতার পরে
যেন বাঁয়ে বাঁয়ে আমি শূ'ক আর শ্যাতাণিক হয়ে
উঠেছিলুম। এখন সময়—

শেখিন সন্ধ্যার সময় হুঁকিতে হুঁকিতে চলি'র ব্যক্তি দিতে
একটা জগ'ন সেওয়া খিলি পান খেয়েছি, কেমন কিং কিং

করছিল বাবার ভেতরে। কখন লেগেতে লেগেতে জান বিকের
একটা গাভা ধরেছি ছানি না।

আবার চটকা ভান্ডল। ফুলের গন্ধ, আভরের গন্ধ।
এইটুকু রাত্তার সৌখিন সাজগোছাকা পরা মানুষের ভিত্তি,
প্রাণ সবলের চোখ ওপরে দিকে। তারপর কানে এল
বাহুর আওয়াহ-গানের গন্ধ।

ওই গন্ধ—বাহুর আওয়াহ—গানের সুন্দর।
তারপরে মানুষসোপার চোখে—চোখ—কবার ভঙ্গিতে
দেবার রঙ। আরি ছানুই না এ কাণীর বিখ্যাত
রাত্তা, বিশ্বনাথের গলির পরেই এর ব্যাতি। রাত্তার
সাইনবোডে এনার নামটা দেখতে সেলুই : 'ভাল-
কি-বতি।'

দু-পাশে গারি রেওয়া মোতদার কুল বায়ান। তাকে
চুপ করে বসে আছে মেয়ে। উৎসাহ সাজ—আরো
উৎসাহ কটাক। প্রাণ বাঙি থেকেই রাত্তা পর্বত সিঁড়ি
নেমে এসেছে, দু-একজন মানুষ হাতে হালা জড়িয়ে উঠে
যাচ্ছে। বাবের আওয়াহ আসছে—তবলাচলেছে চুপ লয়ে।

প্রথমে ভেবেছিলাম, কলকাতার সেই মেয়ে—বাগা
এনিভাবে বহায়ে পরা গারিমে বসে থাকে। রাত্তা
কে। বেরিয়ে আসারি, কানের কথা আমার কানে এল।

—ভামান হিন্দুমানকো সবসে অম্বী বাই সোপ
হতী হিংগাপর। আপতো বহুং সবকার আদর্শি—
চলি না—সেবিয়ে না কেইসা গান। আপদিকে
দুনাউ'!

তা বলে এরা সেই কাণীর বাইজীর হল। বাবের
গানের ব্যাতি এত দুনিহি।

আমি গাঁড়িয়ে পড়লাম। রক্তের ভেতরে সেই
দুনিয়া আবার পাক ধরে উঠল। সেই গন্ধ—সেই
বাক্যতা—সেই পরিবেশ। আবার বনের ভেতর যেন
খিটোটারে থাকে শ্রী বাহতে গাঙ্গল। কী কহি ভালো
করে বোকবার আসেই গরমে যে সিঁড়িটা সেলুই, তাই
বয়ে উঠে সেলুই ওপরে।

একটি কাঠের চৌপাই নিয়ে বসেছিল কুড়ি ওহুপ
বয়ের মেয়েটি। আমাকে দেখে উঠে গড়ালো।
সকাগুণী লতার বতো হুপিড গীর্ষ বহা। সুন্দরী
কিনা বলতে পারি না—দুন্দুনা। পরবে লাল শেখোয়ায়,

গারে কচিঙ্গির ওপর নীল রেশমের ওড়না। শাপের মতো
একটি বিশাল বহা কানার ছাড়িয়ে নীচে বসে
এসেছে।

মেয়েটি বহুই হাসি মেলে বললে, আইয়ে শেঠী—
আইয়ে।

বাগাখার পরেই একটি ছোট হলুদ। মেয়েতে
করাসি বিহানো। রেওয়ালে আদ্যো—নান্য রক্তের গঠন
হবি। ক্যানের ওপরে পড়ে আছে কয়েকটি বায় বহু—
ইতস্তত হুডানো পুটিকমেক তাকিয়া।

পাকা চুল, পাখা কাপড় পরা এক বড়ী বসে পান
সাজছিল। মেলে বললে, বৈঠিয়ে।—বুকের আলম থেকে
বসে হল, মেয়েটির না।

পকেট থেকে দু'দানা বহু টাকার বোট বড়ীর বিকে
এগিয়ে দিতে বললুম, পান শুনব।

বাবের হাতে মেয়েটি বললে, বাবতো আপকো দেবা কি
শিরে।—একটা তাকিয়া আবার দিকে এগিয়ে দিতে
বললে, আগম কিভাবে।

না একটা পানের বাটা এবং আবার দামনে রাখল।
তারপর বললে, সগতী লোমোকো বোলা না।

আমি একটা তাকিয়ায় ঠোঁপ নিয়ে অভিজ্ঞতের
বতো বসে বইলুম। যেন এখনো কিছু বক্তে পারছি
না—যেন এখনো ডালিয়ে আবি শব্দের মধ্যে। তারপর
কখন সগতীয়া এল, সারেন্দীর সুইটল, তবলা বাজল—
আমি কিছু যেন ভালো করে টেরই পেলুম না।
সুনির্ভিত ভীত বহুই পদ্য বহাযা ভরে উঠে ধীরে
ধীরে—মেঘলুম আওর্ধ আবেশে দুটি দুনিয়া কালো
চোখ আদ্যর হয়ে গেছে, পানল দুহুবার একটি দলটের
ওপর সোনার টিকিগিটি জলজল করছে গাছটাকার
বতো।

একটি পান শেষ হল। আর একটি। আরো একটি
তার পরে।

—আপকো পদম দুয়া শেঠী?

আবার ঘোর ভেঙে গেল। বললুম, হুই বহু
ভালো লাগল।

—বহুলক আদর্শি বহুং সবকার মোতা। মেয়েটির
বহু ভরে উঠে প্রগড়ার হাসিতে।

আমি উঠে পড়লুম এবার । বললুম, আর চাঁদ ।

নমস্কার জানিয়ে বেগেটি বললে, মেহেরবানি করছে কির আনা । পরসত্যীকো ভুলিয়ে হুং ।

তা হলে পরসত্যী—পরসত্যী মেহেরটির নাম । একেবারে বোমানান নয় । তানপুত্রা নিশ্চয় বহু দৃষ্টিতে ওর পান পাওয়ার মধ্যে মেহেরি একটা ছবি যেন কটে উঠেছিল কোথাও ।

আমি পূর্ন বললুম, আচ্ছা—আমর ।

হঠাৎ ভেতর একটা উত্তেজনা নিয়ে—স্বপ্নপথে অদৃষ্ট হুত আর প্রবল পশ্চিম পূর্নতে পূর্নতে আমি কিয়ে এলুম । দায়গাত হাতা-হাতা হুত আনা-বাণী করতে লাগল, আর তার কীক কীক দেখতে পেলুম, পরসত্যী পান গাইয়ে—তার কপালে সেই সোনার চিকুণিটা বিক-রিক করছে হাতাটীকার মতো ।

পরেই বিন আবার সেলুম ।

সন্ধ্যার ছায়া নামতে-না-নামতেই আমি পা ফিলুম ভাল-কি-বাণীতে । ছানডুব—গাইয়ের অভাব নেই এখানে, আমার জন্যে কোনো হানাত্তাব কখনো ঘটবে না । কিন্তু পূর্ন পানের জন্যে না—আমি যে বিশেষভাবে কখন সন্ধ্যার কথাই ভাবতে পূর্ন কতেছিলুম—সে আমি জানি না । বনের ভেতর এই আনন্দসাই বোধ হয় ঘুরছিল, আমি আসবায় আসেই আর কেউ পায়ে পরসত্যীর ঘর আঁকায় করে বসে ।

তখনো ভাল-কি-বাণী করে ওঠে নি—তখনও তার হাতকতার পাশা পূর্ন ছবি । রাগোপায় পরসত্যীকে আমি দেখতে পেলুম না ।

পরসত্যীর বা আমাকে মেহের পর আমরে অভ্যর্থনা করল ।

—আইয়ে—আইয়ে—

কিন্তু হাঁসি আর আমার ভালো লাগে না । হাঁসিতে প্রত্যেকটা কথাও মনে করতে পাচ্ছি না । আমার শব্দের ভেতরে যে-ভাবে তারা বাঁধা পড়েছে—সেই ভাবেই নিজের কাছে নিজের কথাগুলো বলে দাম ।

পরসত্যীর বা বলেছিল, মেহের আমার স্বাম করছে । ভৈরী হয়ে আসবে একটু পরেই : ততক্ষণ যোসো, গল্প করো । তা আনাই ।

—বরকার নেই । তা এখনি মেহের আসবি ।

—তা হলে পান ।

—তারও বরকার নেই । পান আমি বেশি খাই না । আর কাশীর বদলা দেওয়া পান খেলে আমার মাথা ঘোরে ।

তারপর দুটী আমার পাঠের নিতে লাগল । ভারী মেসেবানুম দেখছি । বাণী কোথায় ? কে কোথায় ? শাধী কোথায় ? না—তাও তো বটে, এত কব মেসে বহালীর শাধী হয় না । তুমি জমিয়ারে মেসে ? ভারী মেইনু আনবি ? তা তো হবেই । সে আমি মেইনু বুকেছিলুম । জমিয়ারে মেসে না হলে এমন চেহারা হয়—এমন আধাটা নেমাক হতে পারে ?

তখন ঘরে এল পরসত্যী ।

ঘরে আলো জ্বলছিল—সে আলো যেন আরও উজ্জল হয়ে উঠল মনে মনে । আক পরমে সোলাপী গল্পের শাড়ি, কপালে কাচের তিল । সন্ধ্যোস্তান আর এসাঘনের গল্পে মনে হল, এক দুটো কুল যেন পরীর নিয়ে আমার মাঝে এসে ধাঁড়ালো ।

হাসিতে তার উঠল পরসত্যীর মূখ ।

—কী ভাব্য আমার । আচ্ছা আমার পায়ে দুসো গুলল ।

বা বললে, ভালো করে ব্যাতির কর বেটী । বহু জমিয়ারে মেসে—তা জানিস ? বড়া মেইনু আনবি ।

পরসত্যীর দুটো চোখ এসে যেন আমার বুকে বিধল । বললে, আমি ছানডুব । হাতের হীক্রে আঙুলটা মেইনু বুকেতে পেরেছিলুম । তারপর আমার পাশে বসে পকে বুড়ুনিতে ছোট একটা টোকা দিয়ে আমার করে বললে, হাআবান্দ !

মেসেদের হাতের ও-বকর পশা আমার জীবনে সেই প্রথম । পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন বিধল দুটে লেল । আমি সরে বললুম ।

পরসত্যী একটু হাসল । তারপর বললে, না—সলসত্যীর ভাতো ।

পান কী পূর্নপূর্ন—আমাকে আমার কাছে তা আরো যেন অশ্লীল হয়ে গেল । আমি সেই পশাটুকুর আঁকবক নিয়ে কিয়ে এলুম বরশালায় । তারপর মেহে

চিঠি লিখলুম, কাশীতে আমি আরো কিছুদিন থাকব, আমাকে চারপো টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

পরের দিন। তার পরের দিন। তারও পরের দিন। হাওয়ার উত্তে যেতে লাগল সময়—তার সঙ্গে টাকা। কিন্তু কোন ছোজ, কোন হানি আর তখন ছিল না। বিঘ্ননাথ সেল, গঙ্গার বেড়ানো সেল, সারান্যেই সেই দাল হুলোর ভয়া নিৰ্জন পথটার কোনো আকর্ষণই আমার আর রইল না। আমি পুর্ন্ব অপেক্ষা করতুম, কখন দল্ল্যা আসবে—কখন আমি আমার ভাল-কি-বঁাওতে গিয়ে পৌঁছব।

সেদিন আকাশ মেঘ ঢাকা। অল্প অল্প বৃষ্টিও পড়ছিল। তবু তার মধ্যেই আমি বেঁকে পড়লুম।

সরসতী আম যেন অন্য দিনের চাইতে বেশী স্রাবান করেছিল। কী রঙের ওড়না আর পাড়ি পরেছিল আমি না—সাগর গায়ে যেন ওর আগুন জ্বলেছিল।

বললে, হা হা হা হা, আর বাতলায় তুমি কিছুতেই আসবে না। আমি বললুম, নিশ্চয় আসবে। ওর সঙ্গে যে ‘প্যার’ হয়ে গেছে আবার।—বলেই যেলে উঠল কিলকিল করে।

‘আগনি’ থেকে দল্ল্যাঘটা ‘তুমি-বত’ বেরে’ল ক’দিন আগে, কিন্তু শেষ কথাটির জন্যে দন তখনো তৈরী ছিল না। জ্বলন্তের ভেতরে আমি যেন বেয়ের ডাক শুনলুম—নাথর রক্ত কাঁপা করে উঠল। আর সরসতী—সরসতী আমার পুত্ৰবিন্দে চোকা দিয়ে দূর বলল : ‘ক্যাসে আগুনে পিষা হো মের সেরিয়া’—

—কী বজ্রাণি করছিল!—সরসতী হা ধবক দিলে একটা।

কিছুই নয়—হঠাতা সামান্য একটু দুর্ভাগি—একটুখানি অকস্মাতের সময়। কিন্তু আমার সারা শরীরে দন দন বিদ্যুৎ খেঁচে লাগল। আমি বাধা নীচু করে ক্যাসের ওপর বসে পড়লুম।

পানের পর গান চলল—বুড়ট হাজার—কিছুকি হাজার—বট হাজার। আর বাইরে দুর্ভাগি আরো দন হয়ে উঠতে লাগল। ভাল-কি-বঁাওর আলো জ্বলল পথটা কখন দল করে ভবে গেল অন্ধকারে—সরসতীর ঘরের আলোটাও হুতুতে হুতুতে ভেতরে লুকিয়ে পড়ল। একটা চিংকার উঠল কোথাও : বিদলী কি তার টুট, পিয়া—

বাইরে বড় গজ্ঞে বেড়াচ্ছে—বৃষ্টির আর বিয়ার নেই। কোথেকে কয়েকটা মোমবাতি জ্বলে আল দল্ল্যতীর হা। কিন্তু গান আর বেশীল জ্বল না ভাল-কি-বঁাওর দর কোলাল বেবে গেছে—বড় আর বৃষ্টির গজ্ঞানি হাড়া কোথাও আর বিদ্যুৎ নেই। দল্ল্যতীরা একটু পরেই বাধনা রেখে দর থেকে চলে গেল—এই বড়-বায়লের মাঝখানে তারা কোথায় গেল জানি না।

উঠে দাঁড়িয়ে আমি বললুম, চল।

সরসতী পথ আগলে বললে, কোথায় বাবে এই তুকানের ভেতর? বিদলী তার দিঁতে গেছে।

—তা হোক, তা হোক আমি যেতে পারব।

—না, যেতে পারে না। বিদলী হেঁচা তার সালে লাগলে দান বতন হয়ে বাবে। ‘সেতু’ ভেঙে পড়তে পারে নাথার ওপরে। তারপর গুতা আছে—দরদাস আছে। ইয়ে কালী হ্যার—বহুং বায়ান কাগসা। তুমি এইখানেই থাকো আজ।

—এখানে?

—হ্যাঁ এখানে। কোনো ভয় নেই তোনার।

আমি তো আমি।—সরসতীর চোখ থেকে বিদ্যুৎ এসে বিদল আমার বুকে। সালে পুতী এসে, হিচাই এসে, হাবড়ী এসে। কিছু বেলুম—আর দল্ল্যতী পড়ে রইল। তারপর সেই ক্যাসের ওপরেই কোথা থেকে দরদাস তোদক আর বাগিন এনে দিলে সরসতী, বললে, দান আগ্রামে নিধি করে।

কিন্তু হুম আসছে না বড়ো হাওয়া—বৃষ্টির পথ—অজানা বিদ্যাবা—অস্বাভাবিক পরিবেশ। আমি হট্ট কট্ট করলুম।

হঠাৎ কে যেন আমার পাশে এসে বলল। নিয়ে এসে উঠে বানিকটা দৌরভের উল্লাস—আর—আর তার সঙ্গে—আমি জানি, আমার কাকার হুম থেকে অনেকবার সেবেছি—যবের পথ।

জ্ঞানো সলার কে যেন বললে হুম আসছে না—না! আম্মা, আমি হুম পাড়িয়ে দিছি।

কিন্তু রেণম—কিন্তু চল—আর একটা দরদাস। হুতুতে আমাকে নিতিল করে নিল, তালিয়ে দিল কোনো তুকানের নদীতে। আর বাইরে বড়-বৃষ্টির সঙ্গে

তাল মেলায়ো অত্যাশ্চর্য্য ভালোবাসার বন্যার সঙ্গে
পুনতে পানিল,ম যানের কাছে চাপা শব্দ : যেহী হাঙ্গা—
যেহী হাঙ্গা—যেহী হাঙ্গা—

হোহরদো বখন তাঁই বসলু, তখনও সন্তুস্তী
একখানা হাত আমার গদার ওরে এলানো ।

মানিতে—লক্ষ্যায়—কোন্ডে আমি তৎকণ্য তাঁই
দাঁড়িল ম । আমার পুঁকট ছেকে একটা একগো টাকার
মোট বের করে রেখে দিলু, সন্তুস্তীরা হাসিলের নীচে ।
কুঁঠি তখনো পড়য়ে—তখনো বাইরে আবহাওয়া অন্ধকার—
তখনো ভাস্ক-কি-বস্তীর ঘুম ভাঙেনি ।

দাঁড়ি গিরে লেনে এলু, আমি । পানিলে চললু
কুঁঠিতে ভিততে ভিততে । পাগবোয়ে, লক্ষ্যায়—
নিজের দর্পণতায় কুঁচোব গিরে আমার কর কর করে
জল পড়'ল ।

সেইদিনই আমি সেখৈ ফেরবার জন্যে ট্রেন বসলু ।

। ২ ।

নোবাব'তটার দিকে চোখ পড়ছে । দেখছি, এর মধ্যে
বখন অনেকগুলো শোনা এসে পড়ে রয়েছে । ওয়া অমনি
কহেই বসে । আমি নিজেই ভা জানি না ?

আমার কোনো আত্মা আছে কিনা জানি না । যদি
থাকে—ওই শোকাপুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবছি—যদি
থাকে, তা হলে সেটা কখন আমার ভেতর থেকে বেরিয়ে
এসে ওই শোকাপুঃ যশেই পড়ে রয়েছে । কিন্তু ওদের
মধ্যে কোনটা যে আমি, সেইটেই কেবল বুঝতে
পারছি না এখনো ।

বাইরে শেগল ডাকল । আসে বুঝে থেকে ডাকল—
কত কাছে এগিয়ে এসেছে এখন । আর কীজন পরে ওই
বাঁধে ভেতরেই ওয়া জায়গা করে নেবে । আমার পূর্ব-
পুরুষেরা কী করবে তখন ? হাত ছেলে শেগল তাকাবে ?
কম্পনাটা নিজের কায়েই এখন অন্তত বোঝ হচ্ছে যে হাসি
পাচ্ছে আমার ।

কিন্তু সন্তুস্তী । আমার জীবনে সেই প্রথম নারী ।
আমার চিত্তকুয়ারজীবনে সেই প্রথম বাসরাজি ।

আমি হঠাৎ বহর পরে বখন নিজেকে বাঁড়য়ে দেখতে
বর্ণেছি, এখন বনে হচ্ছে—অত হাস করবার, অত অনুতপ্ত
প্রস্তার প্রয়োজন ছিল না সেদিন । বসত সেই স্বজের

হাতের হাতলায় সবটাই কাঁকি ছিল না—পুরুন্দো
দেখাই তাকে সে হাতে অমন করে আমার কাছে টেনে
আনে নি । 'যেহী হাঙ্গা—যেহী হাঙ্গা ।' সেই অসদ্য
তীর আবেগ কি কেবল খানিকটা বন্যার গল হাড়া আর
কিছুই ছিল না ? হয়তো সঁতাই ও ভালোবেসেছি
আমাকে । হয়তো নানা মানুষের ভিত্তে আমিই প্রথম
পুরুষ হয়ে এসেছিলাম ওর জীবনে । তাই সেই
ভালোবাসার ধারিতেরেই সে হাতে ও অমন করে আনবে
ছিনিয়ে নিবেছিল ।

বরা দ্যাক, আমি ওকে নিয়ে যদি পর বিবাহু ? তা
হলে ও আমার স্ত্রী হয়ে সেখা দিত, য়েই দিত, সমতা
দিত কুঁঝে কুঁঝে-স্নাতিতে দেবা দিয়ে আমার
বদ্য করত । হয়তো নিজেকে নিয়ে এই ভাবে আমি জুঃ
শেলতুঃ না—হয়তো চুঃগ্র বহর বদনে এ কথা বনে হয়
না যে আত্ম এখানকার সব প্রয়োজন আমার কুঁঝিয়ে
সেছে ।

হুঁবহর পরে আমার বখন কাশীতে ঘাই,তখন অদ্য
ভৌতুঃসে একবার চলে গিয়েছিলুম ভাস্ক-কি-ব'ন্তিতে ।
সে দিন আমার বনে সে প্রতীকা ছিল না—সে দেশের
ছিল না । তবু সেই চেনা গলি—সোতালার বাগান
সম্পীত-বসিক শেঁটছাঁসের জন্যে প্রতীকায় বলে থাক
সেই মেঝো—সেই পান ভরা কুলের গছ সেই তরলা
সাবেগী আর কোথাও বা পুরুষের আঙাঘর—মধ্যে মধ্যে
ঠিকরে আসা তীর বহুর গলায় এক আঙটা গানের সু
কয়েক মৃৎস্তের জন্যে বিচল করে গিয়েছিল আমাকে ।
আমার বনে পড়ে গিয়েছিল আঁঠো। বহর বয়েসের প্রথম
বৌবনে সেই প্রথম স্বপ্নার সেওয়া সুধের স্বাদ ।

সন্তুস্তীরা বাগানঘর আর একটা মেয়ে । মল্লবায়ণ
হীথোক্তল্লা একটি শৌর্যপাণী । আর সেই তত্ত সম্প্রদায়
আইয়ে শেঁটছাঁ—পা ধারিয়ে—

—সন্তুস্তী বাই ?—না—তার কোনো ধর সে জাতে
না । সে আত্ম থেকে বাক হুঁবহর আসে এসেছে ।

কেবল এক পানওয়ালা একটুখানি ধৈর্য দিয়ে
শেয়েছিল ।

—উতো লৌ গরী ।

—চলে গেছে ।

—হাঁ, গাছিত্যাহাঃ। সে আচ্ছ প্রায় 'চাই বঁধব' বলে। এক পেরী'রী এসেছিল, সেই ওকে নিয়ে গেছে রামবার ভবনে—ওর বা-ও গেছে লগে।—আমার মনের দিকে একটুখানি সহানুভূতির দৃষ্টি কেন্দ্রিত হতো, কী ভেবেছিল সে ই জানে, যেন গাছিত্য লেবার ভবনই বসেছিল : বাই সোপোর্সকী কানুন এঁই ছায়া বাব্দ্যাহেব। উভো চিঠিগা-কি-ছাত। সোনেকা পি'রগানে যে পু'তে পারে—চিঠিয়া তারই।

ভেবেছিলুম, পরসুতী চিরকালের মতো গাছিত্যে গেছে ; বনে যেয়েছিল—সেই গাছিত্যের পটভূমিতেই সে চিঠিহনের জন্যেই স্থির হয়ে রয়ে উঠল। এই ভাগ্যভরতের ত্রিগুণোটি মানবের ভরণে একটি ছোট বৃক্ষকে আমি আর কখনো বুঁদে পানো না। কিছু—

নিম্নের হাতের দিকে তারিখে বের্ছ। কড় আচ্ছলে একটি আ'ট—হীরের আ'টি। ভাবনে অনেক মূল-বর্জিনেও এটিকে আমি বেছেতে পারি নি। সেই হাতে কখন পরসুতী আমারটি নিয়ে তার বসলে এটি পরিচয় দিয়েছিল।

আমি তখন কিছুই টের পাইনি। মাথার ভেতর আঙ্গুরের ঢাকা ঘুরছিল, নিম্নেই কী অশুচি—কী অপূ'ন্য বনে হয়েছিল ! কিংগে গিয়ে আমা কাপড় পু'ই আমি বজ্রহার মাথা শীতল গঙ্গায় ছান বয়েছিলাম, ল'টিয়ে প্রণাম করেছিলাম বিশ্বনাথের মন্দিরে—তারপর বর্ষাশায় শেঁথে সারাটা দিন বৃ'ষ গুঁড়ে পড়ে থেকে ছিলুম। তারপর টেবে না ও'য়া পর্বত—নিম্নের দিকে যেন আমি তারিখেও বেঁচেতে পারিনি। সেই ব্যাঘ্রোশ মেখে প্রব অদ্ব করে কে'রোছিল কেন—তা যেন তখন আমি বু'তে পাল্লুম, ওখনি অনেক কিছুই অর্ধ আমার কাছে লুপ্ত হয়ে গেল।

আখটটার ওপর নব্বয় পড়ল বোপলসম্মাহিতে এসে। বনে বয়েছিল, হ'ঠে কলে দিই। পারিগি। তারপর থেকে ও আমার হৃদয় বহরের দলী। বিনের পর বিন ওঁয়ার ওপর আমার মাথা পড়ে গেছে—মাঝ আমার পরীরে অং হয়ে গেছে ওঁয়া।

এঁয়ার আ'ম ওঁয়াকে বেঁচে বিতে পারি। বসতে সেলে, ওঁইটেই আমার শেষ ভরসা !

পু'নো'র হীরের দাম এখন অনেক। হাতের হামার'র' বাবেক তাঁকা দাম হতে পারে এগম। এখন থেকে কলকাতার গিয়েই আমি ওঁয়াকে বিক্রী করব। তারপর হাতী জীবনটুকুর জন্যে ওঁই আনাগ পায়ে।

কিন্তু পরসুতীকে আমি চানাই নি। আতো কয়েকবার দেখা হয়েছে। তখন সে কাছে এসেও অনেক দূরে। তখন আতো বনজন ক'গকের অভ্যর্থিত হতে'ই একটুখানি পরিত্রের সৌখ্য। আমিও তো কোনো দাঁব তুলিনি—সেই হাতের কথা একটিনাংরে জন্মেও বনে ক'গে দিইনি তাকে। তখন কত আগে—হত দার। এমন কি এ কথাও আমার মনে হয় নি যে আচ্ছলে তারই সেওয়া সেই আখটটি রয়েছে—সে-ও সে আখটটিকে চিনতে পারিনি।

পরসুতীর কথা এখন থাক।

দেখে যখন কিংগে এলাম—তখন লক্ষ্যায় মা'র মনের দিকে ক'গনি আমি জালো করে তারিখে যেহতে পারিনি পর্বত। পরার পু'গাভূ'মিতে শিতকৃত্য করতে গিয়ে—কাশীতে বিশ্বনাথ বর্ষন করতে গিয়ে—একি মানির বেকা মাথার করে কিংগে এলুম আমি ! এতদন্ত অপরায়ের প্রায়শ্চিত্ত আমি কেমন করে করব।

প্রাপপরে কাশীর বিনগলুসাকে আমি বু'তে দিতে চাইলুম। কাগা তাক্য—তার আগে ঠাকু'গে যেনন করে সেয়েতার বসতেন। বিশ্ব লক্ষ্যিত লেভেভ, আ'মও তের'ন ভাবে নিম্নের দৃষ্টি পালন করার ভায় নিলুম। ঠিক কদাল সাতটার গিয়ে সেয়েতার নাকখনটিতে গিয়ে বসতুম, কিংকুম বোলা এগারোটার। প্রভায়া আসত—লোকজন ব্যাভায়াত করত—বজ্র নিয়ে বেত। সন্ধ্যাবেলায় যেওয়ান এসে আমার ঘরে কাগলপ'র গিয়ে যেতেভ—অনেক রাত পর্বত চিরেপ'র দেখা পোনো করতুম।

ক'মজা'গা বলত : হাঁটা নিব'বাবু'ই প'ত্যাকারের জীবনাংগের ছেলে। এ'ব'নি না হলে কি আর বিশ্ব লক্ষ্যিত মাথা দার।

মহালে বেতুর কখনো কখনো। নতুন অতিজ্ঞতা হত। এত পাপ এত অভ্যাচার লগেও কী ভ্রম প্রজা'র—কী তাদের ভালোবাসা ! বিনের পর বিন থাকের ডিটে মাটি উচ্ছে করে বৃ'দ ওঁয়—তারে ভক্তি'র সৌকি উচ্ছাস। অংবা তাঁক ভালোবাসা ও'ব'ব

কিছুই নয়—শুধু আতঙ্ক—শুধু হস্তার—কেবল—অভ্যাস। যে অভ্যাসে মানব সভ্যতারূপের পুঙ্খোপপুঙ্খ করে, যে অভ্যাসে পথে ঘাটে ঠাকুর দেবতার থাম দেবদেবী মানবের মাথা নীচু হয়ে আসে—এ সব তা ছাড়া আর কিছু নয়।

কিছু সেই বসে এত তত্ত্বাবধা রাখার আস্ত না। নতুন জিনিসের হস্তার মোহে—একটি নিত্য কল্যাণ ইহারে হাম থেকে হাতারিয়াৎ সিংহাসনে বসার উচ্চৈশ্বর্য আরি তখনকার বড়ো আতঙ্ক আতঙ্কিত ছিল। বনে হেরেছিলো এমন করে দিবসগুলো যদি কেটে যায় তো—থাক; ভবিষ্যৎ করে, প্রজা পালন করে, হোল দৃশ্যোৎসব ভেতর দিয়ে শিত-শুষ্কবের পথ ধরেই আমি নিশ্চিত বনে এগিরে চলি।

কখনো কখনো যে চকলতা একেবারে আস্ত না—তা নয়।

আমাদের পলাপড়াশার কাছাকাছি গেলে আমার ভালো লাগত। অল্পত দুধের ছায়াগাটি। একটি উঁচু টিলার ওপর কাছাকাছি বাড়ি, তার সামনে নবাবী আমলের পুরোনো দীঘির অবশেষ—এখন কেবল অতল পল্লব। সেই দীঘির ওপারে বাঁধে গুঁড়ু করছে—বতসুর চোখ ধার ধুটো চায়তে তাল আর বাবলা গাছ সেই পূন্য মাঠটাকে যেন আত্মা শ্রীহীন রিক করে রেখেছে। দিকনির্দেশ দুধের বেলার আমার দুখন শোভা গুন গুন করে তুলসী দাসের রানাল পড়ত, কাঁকা মাঠের ওপর দিগে শুকনো হাওয়া এসে কাঁপিয়ে পড়ত যেন পট্টাবিধিতে রান করত—তারপর সেই দলোয়ানের গছ নিয়ে যেন আমার দুধের ওপর কোনো রেখা শাখি কিংবা শুভ্রার ছোঁয়া দুধেরে যেত। আর আমার মনে পড়ত, ভাল-কি-মন্ডীর সেই বিস্তারিত গাছটিকে—গবে রান করে—সারা শরীরে গোলাপী শাড়ির মোহে জড়িয়ে ধরে এসে প্যা দিয়েছিল নরসতী।

আমি তখন কড়ে আত্মসের হীরের আংটিটার দিকে তাকিয়ে যেতুম। নবদর্শনের বড়ো কিছু একটা বৃত্তে চাইতুম, বৃত্তে চাইতুম ওর ভেতরে। কিছু আমার জিজ্ঞাসার কোন জবাব মিলত না।

তবু দিন কাটছিল। থিয়েটারও কথা আর আমি

ভাবি না। প্রায়ে বা আশেপাশে কোথাও থিয়েটার হচ্ছে শুনলেই যেন কেমন একটা শীতল আতঙ্ক উঠে আমার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে জড়িয়ে পড়ত। বনে হাত, ওই থিয়েটারের জন্যেই সব। ওইই সবদাশা দেখার অবন করে কলেজ থেকে আমাকে বিদায় নিতে হল, ওইই জন্যেই বৃষ্টি অবন আকর্ষিত স্নানঘাটে বাবা আর কাকাকে আমি হারালুম, আর তারপর কাশীতে গিরে—

আরমানির আর আরম্ভশেষের কথা দিয়ে আমার ধুটো বহর পার হল দেখতে দেখতে। কিছু আমি তা জানতুম না।—এনিহুমে সেই বাবা দুধেরে ভেতর দিয়ে ভাগ্য কখন আমার জন্যে পথ তৈরি করে রেখেছে প্রতিদিনের ব্যবহারে এত বেশী চেনা জানা এই জীবনের মধ্যে আমার শান্তি কোথায়—আমার দুক্তি কই? যে সত্য অথচ সত্য নয়—বা জীবন না হয়ে জীবনের দুখানুসে মানবকে বাতাল করে—তার হাত এড়িয়ে বাব—এমন শক্তি কোথায় আছে আমার?

বিষ্ম তখন ব্যাধিক পাখ করে কলকাতার কলেজে পড়ছিল। আমি জানি, কলেজে আমি কি করেছিলাম—কিভাবে ওরা আমাকে ডাঙিয়ে দিয়েছিল, সে সব ববর বিষ্ম একেবারেই অগোচর ছিলনা। কিছু একটি দিনের জন্যেও ও কখনো তার আভাস দেয়নি। আর বৃত্তে পারি, সব ও লক করে রাখছিল। সেদিন যাত্রার অভিব্যয়ে একে রান্না দুধের পাট দিইনি, যেদিন সোহিতাশের পাট করে আমি হেডেল পেয়েছিলাম—সেদিন থেকেই ও অপেক্ষা করে আছে। সময় এসে দুখে আসলে মিটিয়ে নেবে।

বাই হোক, কলকাতা থেকে ববর এসে, বিষ্ম হঠাৎ অদৃশ হয়ে পড়েছে। বা আর কাকার কানাকাটিতে এখন একটা অবস্থার সৃষ্টি হল যে সেই দিনই বেগিরে পড়তে হল আমাকে।

কলকাতার কথাতেই বনের মধ্যে ডেউ উঠতে শুন্য করেছিল। চোখের সামনে দেখা দিছিল বিকলের পড়ত আসো, সেবারে গাছটা থেকে লাল নীল বড়ো বড়ো হরকে আশবান্য দুখে ওগো সেই শোটারটার হাতছানি, তাঁক—এখন—সেই ল্যাডো গাড়ী—সেই অক—স্ট্রা—

না—এরপর থেকে আমি চোখ বুজে চলব কলকাতার

পথ দিয়ে। রক্তাক্ত হলে কালীঘাটে যাব, বেলুড় বট গিরে হাখির হবো, কিংবা সাধারণ ত্রাণ-সম্বোধে বকুতা শুনতে যাব। যে ভুল একবার আনি করেছি—আর পা দেব না তার ভেতরে।

ভুল।

এখন তাবছি কোন ভুল করিনি। থিরেটারকে আমি ভালবেসেছিলাম—আমি পিশী হতে চেয়েছিলাম। তার হয়ে পাশ ছিল না—অপরায়ণও ছিল না। কেবল তার ছিল সেই পরিবেশের—বা প্রতি বৃহত্তে' নামের ডালা থেকে মাটি গরিয়ে নিতে চেষ্টা করে—বা আসো আর আসোয়ার মধ্যে কিম্বদন্তি দেয়।

হঠাৎ সেই কথাতেই আসছি।

কলকাতার এসে সেখান, বিজ্ঞ, অনেকটা ভালো। বৃন্দ দস্তব ম্যালেরিয়াতেই তার হাই টেম্পারেচার উঠেছিল, ভুল বকেছিল। আমি বেদিন সেলুন সেদিন তার করে অনেকখানি নেবে গেছে, পরের দিন একবারেই ছেড়ে গেল।

বিজ্ঞ, আলোচনা করনের ছেলে। হোটেলে বোর্ডিংয়ে সে ওঠেন। পনের টাকা দিয়ে একবারে কলকাতা স্ট্রীটের ওপর একটা মেসের তেতালার সিঙ্গল স্ট্রিটের ঘর ভাড়া নিয়েছে কোন গণ্ডগোল নেই, কারুর সঙ্গে তার গারে গারে লাসে না—বিদ্যা-চর্চার অল্প পরিবেশ পড়ে নিয়েছে সে। বিএ পাশ করে সে ওকালতী পড়বে—এই তার একমাত্র স্বপ্ন।

ছাত্র হিসাবে ওর চাইতে চার ভালো ছিলাম আমি। ও একটা বায় ফ্লোটের পেরেছে—আমি সেয়েছিলাম চারটে। ওর ঘরের সেলকে সারি সারি বই দেবে আমার বীথ-বাল পড়ল।

বিজ্ঞ, আবেগোচা ভাবে কল্যাণে বকু, থাকিল। হঠাৎ বললে, তুমিও কলকাতার চলে এসো না নিম্নো। এক সঙ্গে পড়াশোনা করি দু'জনে।

আমার বুদ্ধির ভেতর বকু করে উঠল। শুনুনো হাসি হলে বললুম, না—সে আর হয় না।

—কেন হয় না? এমন ত্রিপিণ্ডি ছাত্র তুমি! তুমি পড়া ছেড়ে সেবে চাবাই যায় না।

—আমি পড়তে আসব—সেয়েই নিজের কৃপাতি দেখবে কে? —চিরকাল তারা সেবে আসছে। ওই যে ওয়ানসী—

ওই নামের নশাই। তুমি কি ভাবো—বাবা আর ছোটো-নশাইও কিছু দেখতেন? গিরে সেয়েতার বসতেন কেবল। তখনও বা হত, এখনো তাই হয়। তারা চুরি করত, তারা এখনো করে। তুমি রাত বেগে বতাই হিসেব মেসো আর বতাই মহালে বাও—সব সেই এক রকম।

বাঁকিতেও তো কারুর বাক্য বরকার।—তারপর শুনুনো হাসি হলে হবাব মিলল। বাচ্চা, তুমি আসো 'শ'টা পাশ করে নে, তখন না হয় আমি নতুন ভাবে আকর্ষণ করব।

বললুম বটে, কিন্তু যেন কোন একটা ভার হয়ে রইল। বুদ্ধির বিজ্ঞের কাছ ছাড়িনি—আমি একটুখানি বেড়াবার জন্যে বেড়িয়ে পড়লুম। তারলুন চলে যাই গঙ্গার ধারে—আউটারান ঘাট ছাড়িয়ে, কেলার পাশে কোনো নির্জন আরগার বানিতটা ঘাসের ওপরে গিরে চুপ করে বসে থাকি।

সেই সংকল্প নিয়েই হঠিতে হঠিতে চলে এলুম কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে। এখান থেকেই টান ধরল।

কিন্তু ভয়ঙ্কর আবার চোখ পড়ল মাননের বাড়িগুন্সোর সেওগারের নিকে।

কে ভেবেছিল আম পনিবার? আমি কলকাতার মানব নই—সম্রাটের প্রতিটি দিনের হিসেব আমাকে করতে হয় না—পনিবারের হুঁটির জন্যে ব্যালুন প্রতীক্ষা আমার মনের কোথাও নেই। কিন্তু সেই লালে নীল রক্ত সেই শোণ্ডার এক বৃহত্তে' আমাকে জাগিয়ে নিলে।

‘অ্যা দম্মা মাডে দাত বক্তিকার—কর্নাধুন। প্রোভাণে—’

বৃহত্তে' আমি বেন পাথর হয়ে সেলুম।

আমার সামনে দ্বিগে হাইকোর্টের নিকে কাক্য ট্রাণগুন্সো চলে যেতে লাগল। একখানা-দু'খানা-তিন-খানা। সরে শিয়ারেট খেতে নির্বোধ, তার নুটো টেনে নিলুম পর পর, প্রতি আর গলা কানসা করতে লাগল। তবু আমি নড়তে পাগলুম না ওখান থেকে। ওই শোণ্ডার-গুন্সো আমাকে কেন বন্দন কর রেবেছে।

একবার ভাবলুম—গাশাই, বিজ্ঞের সেই তেতালার হুঁটিতে গিরে হুঁচ শুনিয়ে বসে থাকি। কিন্তু তারপর

একটা প্রবল ইচ্ছা একটা ভীত উগ্র আকাঙ্ক্ষার আবেগ ধীরে ধীরে শেষে বলতে লাগল আমাকে । বিষের সন্তানশাব্যের ভাবা ঠাণ্ডে দিয়ে উঠে আসতে লাগল । হুঁকি ।

আমি আর কিসের ভয় ? কুড়ি বছরের শাবলম্বক আমি বিষের অধিনাশী হামিলক । এখন টানে যেতে যেতে সুপারিশেন্টেণ্টের হৃৎকের ওপর আমি শব্দশব্দে সিগারেটের বোঁরা ছড়িয়ে দিতে পারি, প্রিন্সিপালের সন্তান পথে দেখা হলে ওরি কাঁধের ওপর হাত রেখে অস্তরঙ্গতার সূত্রে বলতে, পারি, চলুন না স্যার আমার সঙ্গে, আমি আপনাকে বস্ত্রে বসিয়ে থিওটার দেখাব এখন । অনেক টাকা আছে আমার পকেটে আপনার এক হাসের হাইনে আমি এক ঘিনেই খরচ করতে পারি ।

অন্যায় ?

কিসের অন্যায় ? মানুষের দেখবে বলেই তো থিওটার, ট্রাকে আকৃষ্ট করবার জন্যেই তো এত শোশটার আর হ্যাণ্ডবিলের ছড়াছড়ি । তার সারাটা সন্তানের রক্ত আর একঘেয়েমি হৃৎ করে দেবে বলেই তো নাটকের এত মহলা, এত আলো, এত বাজনা এমন প্রাণহাড়া অভিনয় । কেন ঘানিকটা কাম্পানিক অপরাধে সংকুচিত করে সেই আদমের জগৎ থেকে আমি নির্বাসিত করে রাখছি ।

বাবার পকেট খুঁড়িটা বা আমার কিয়েছিলে—স্মৃতি হিসেবে । তারিফে সেখলুন, লাভে হুঁটা ।

আবার একটা হাইকোটের টাই বেগেরে গেল সাহসে দিয়ে । কিন্তু পঙ্গুর বাবের একটা পাখ হায়ার বাবের ওপর চুপ করে বসে থাকার ভৌত ভাবনা তখন নিঃশেষে হুঁচে দেখে আমার । আমাকে ভাক দিয়েছে সেই কলহাতা—চিম্পুর রোজের হু-বাবে সন্ধ্যার পরে হাঁড়িতে থাকা মেঘপারিশদীর হতো, ভাগ্য-কি-বাণীর গলিতে হায়াপ্যার বলে থাকা বাইরাইনের হতো—বেলা ভূরে গেল আর সারি দিয়ে গায়-ইলেকট্রিক অঙ্গে উঠলো চোখের পলকে যে মোহিনী মৌনবন্দী হয়ে ওঠে ।

মন স্থির হয়ে গেল আমার । আমি রাজ্য পেয়িছে আবার কিয়ে ওলুন বিজ্ঞর যেনে ।

বিজ্ঞর কলসে, এত ভাড়াভাড়ি কিয়েছে যে নিঃশ্বাস ?

আমি বললুম, থিওটারে থাকি । কিন্তুতে সেরা হবে । আমার জন্যে ভাবিসনি ।

বিজ্ঞর চোখ দুটো যেন ভালে উঠল একবার—কা একটা বলতে চাইল যেন হয়ে হল । কিন্তু আমি আর সময় বিতে পারি না । কখন—কোন হৃৎকতে—আবার হৃৎক হতে পড়ব কে জানে ।

আমি ভাড়াভাড়ি বললুম, তুই তো আমি ভালেই আছিলি । একটু শাববাবে থাকিস । আচ্ছা—আমি চললুম ।

বেগেরেই আমি থললুম শ্যামবাজারের টাই ।

তারপর :

তারপর সেই আলো ভলল, বাজনা বাধল, হ্রস্ব উঠল । মায়া হৃৎকরের ভেতর দিয়ে যে আকর্ষ পৃথিবীর লগান পাওয়া যায়, হৃৎক গেল সেই হায়াপ্যারীর দরজা । আর সেই কড়ের হাতে সন্তানতীর আলিঙ্গনের হতো আমার চারুগিক খিরে খিরে নামতে লাগল ইন্দ্রজাল আমি তার বহো তলিবে সেলুম ।

এবার শিডিই বাঁব ভাঙল ।

৩৩

না—এক গ্লাস জল খাওয়া থাক । কখন যে তুমি পদাটা শূন্যে কাঠ হয়ে আছে টেই পাইনি ।

আমলার বাইরে দিয়ে কে গেল ? কিসের পথ হচ্ছে বাইরে ? কাগা এসেছে আমার ঘরের ভেতর ?

কেউ নয়—কিছুই নয় । বাবুর চারুগিক উড়ে বেড়াচ্ছে—হাওয়ার আমার কাপড়-মায়া নড়ছে হয়তো—এই লক্ষ্যভাড়া বাড়িতেও তারা এখনো হুৎ কড়ো হুড়িয়ে পায়—সেই ইন্ডোরেরাই হুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে হতো । কেউ নেই—বিজ্ঞই নেই । বা কিছু দেখি, বা কিছু শুনি—তা আমার ব্যাপি অজ্ঞানিত শিতার থেকে উর্ধ্বকর বাণিক পুনঃস্থ হাঃ ।

এই বাড়িতে আমি আছি একা । এই বাড়ির শেষ আলোকটিকে নিবিষে দিয়ে হাওয়ার জন্যেই অপেক্ষা করে আছি ।

মোহবাতির নীচে হুৎ শোশটার তুলন অমেছে । ঘানিকটা পলান মোহ বয়ে চলছে টেবিল বেয়ে । একটা খন্দা উপমা যেন আসছে আমার । এই পরিহারে শেষ শিবার হতো মোহবাতির আলোটা তো আমিই । সেই

প্রথম বিশ্রামব্যতীত তা থেকে শব্দ করে বড় অসুস্থ
আমাদের জনৈিক, দ্বি ওই পোকামূলের মধ্যে পুড়িয়ে
আমি নিঃশব্দ করে নিশ্বাস।

আমার চোখাটোতে এসে বসেছি। কানাদা দ্বি
অন্ধকার উঠানে আমার দ্বারা পড়ছে; কিন্তু উঠানটা
এখন আর দৃশ্যশূন্য এককালে নেই। এই বাড়ির দ্বারা
গুপ্ত বোধ হয় এককালে এককালে ভাঙা চাঁদ উঠেছে,
যানিকটা ধীরে ধীরে বসে। এই দ্বিগিরে গেছে
চিরকাল।

হবে পড়বে—‘কল’‘কল’ শব্দে করে আমার কথা।

বাই বসে ভাঙল—তখন এককালেই ভাঙল। হু-হু
করে বন্ডার উল্লসিত হুটে এসে তারপর।

পরদিন রবিবার। আমার আমি খিচুটো
বেলুন।

বিজ্ঞান আর বিজ্ঞান বসে। একটু হেসেছিল
বেলুন।

—যাক যাক এভাবে রাত ছাপেতে কষ্ট হয় না।

বিজ্ঞান?

বেলুন, খিচুটোর কণ্ঠে বসতে আমার রাত
আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।

বিজ্ঞান বসেছিল, হু-হু তো বসেছিল খিচুটোর
পাশে।

আমি আর কোনো কোন্ ছিল না—একটুই লক্ষ্যও
কোথাও বসে—বেটুই বাবা ছিল, বিজ্ঞানই যেন তা সহজ
আর দিকভ্রষ্ট করে।

পরের সন্ধ্যায় আমি বাড়ি ফিরে এসে।

কিন্তু বনের ভেতর। তখন অন্য সুর বাজতে শুরু
হয়েছে। আর বিজ্ঞানই নিঃশব্দে কোন্ পার্শ্ব না
সেইবার বাতাস, হিসেব নিঃশব্দে, পাটের কিত্তে।
এমন কি পলাশভাঙার কাছাকাছি গিয়ে বাতাস ভেতর
থেকে বসে আসা পনের গন্ধ বাবা সে বাতাস আমার অক্ষয়
বোধ হয়।

এককালে না যেতেই আমার অক্ষয় হয়ে উঠল। যখন
হল, এভাবে আরো কিছু দিন গড়ে থাকলে আমি হয়ে
যাব—আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে।

না-কে এসে বসলুম, যা আমি কলকাতা দাব।

যা লব্ধে উঠে বসলেন, কেন্দ্রে—বিজ্ঞান আমার অক্ষয়
কলকাতা।

—না—না, সে-সব কিছু নয়। সে ভালোই আছে।

—তবে যে-ই চাইছিল কেন?

—ভাঙা এককালে লাগছে। অবিচারিত বচনচিত্তে
বিরক্ত হয়ে গেছি। বেগে আসে বিন করকের জন্যে।

যা একটু চুপ করে বসে—যেন অকারণে কলকাতা
বাওয়ার প্রভাবটা তার বসে ভালো লাগল না। তারপর
আগে আগে বসলেন, তবে যা। কিন্তু এখানকার
তো সবই জানিস—বেগে বসেই করিস না।

সেই কর না প্রতিশ্রুতি নিয়েই এসে। কিন্তু সে
আমি আর সেলুন না ওয়ার। সোচ্চার এসে শোলাবার
একটা বড়ো হোটেলেই আসতামা নিলেন।

বিকলে বিজ্ঞান এসে বসল, এখানে কেন নিশ্বাস
আমার যেতে চলে।

—না—না—কিন্তু নরকার নেই। আমি হু-হু করে
জন্মে এসেছি, ইজারতো ঘোরা ফেরা করে চলে যাব।
তোর ওখানে গিয়ে উঠল নিশ্বাস নিশ্বাস পড়ানোর কতি
করা হয়।

বিজ্ঞান একটা হু-হু নিলে। এখন হবে বস—ও
আমাকে ঠিকই চিনে নিয়েছিল। দৃষ্টিভঙ্গি অনেকা
করাই কেবল।

—আজ্ঞা, কাল তবে আমার বসে নেব—বসে বিজ্ঞান
চলে সে।

শোলাবার হোটেলে উঠেছিলুম বিজ্ঞান পড়ার কতি
বাতাসে যা। আমার ইজারতো চলাফেরা একটুই
বাবা রাখতে চাই না। হোটেলে থাকলে নিঃশব্দ।

খিচুটোর বোধে করে এসে বসে। কিন্তু সন্ধ্যা
বনটাকে ফেলে এসে।

কিন্তু বিন পরে আমার তারপরে আমার। সেবে আর
কোথাও কোন অভ্যাস রইল না। খিচুটোর না চলে
আমি থাকতে পারি না। শব্দ বোধই নয়—তার শব্দ
কলকাতা, আমিও অভিনয়ে সেবে পড়েছি। সবচেয়ে
দারী আসবে বসে অভিনয় সেবেতে সেবেতে কলকাতা
অভিনেতাভায়ে সেবে এবং হয়ে যাবে; যখন বসে পরীক্ষা
দর্শকের মধ্যে পড় থাকলেও আমার আমা আমাকে

হাতিতে অভিনেতাদের মধ্যে চলে গেছে আমি ওদেরই একজন ।

মুচতার শালা কাঠিরে এখন সমালোচনা ছাণে কখনো কখনো । অনুভব করি, যেমনটি আশা করেছিলুম, তা যেন হচ্ছে না । আমি যদি ওখানে গুই চরিত্রে নামতে পারতুম—তা হলে চরিত্র বেশি ভালো করতে পারতুম ।

কিন্তু, বাড়িতে তখন একটা সমস্যার চেষ্টা উঠেছে । আমার কলকাতা যাওয়ার হাতপাখি একটা অন্য অর্থ নিয়ে চালা গুল্লন হাতিয়েছে বাড়ির । আমার থিয়েটারে আনন্দোন্মাদার স্বরও যোগান দেই । খুব সম্ভব, কিছুও কিছু লিখে পাঠিয়েছিল, কিন্তু সে-কথাটা তখন আমার মনে হয়নি ।

সেবে না-ই আমাকে ডাকলেন একদিন ।

—তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরী কথা আছে কিছু ।

ভেবেছিলুম ভবিষ্যতী সংক্রান্ত কিছু হবে । বললুম, সো ।

কথা শুধু করবার আসে মাস ট্রেটি দুটো বার করেছিল—যেন নিজের মধ্যে তৈরী হয়ে নিলেন । তারপর গল্প শুধু গলায় বললেন, আচ্ছা দু'আড়াই বছর হয়ে গেল করি, কিন্তু কথাটা বলেও বসিনি । তোমার হাতে সেই পৈতের আংটিটা কোথায় গেল ?

একবারের জন্যে আমার চোখ দু'খাঁজ করে উঠল, চকিতে পাললুম আমার গাল কপালের হাওকেবারে কলে গছে । ভাল-বিক-বস্তীর সেই হাতটা আমার চোখের মাঝে দিয়ে দু'খাঁজ হতো বুঝে গেল ।

আমি বললুম, সেটা ছোট হত, তুলে রেখেছি ।

—তাই ওই কভে আল্লের ওই ছোট আংটিটা কবে বুঝি ?—আমো শান্ত শোনালো মাস গলা ।

—ব্যাং, তাই কিনেছি ।

—ও । তা কভে আল্লের আংটিটা কিনলে কেন ? গা হাড়া ওরকম আংটিটা তো সেয়েসই পরে ।

আজব চোখ । পরে আমি ভাবতুম বাবার মৃত্যুর রে পুঙ্খো-বাঙ্গা আর গীতা পাঠ দিয়েই দু'খাঁজ মাস হা কাটে, এমন দু'খাঁজ জিনিষ তাঁর কন্ডারে আসে না ।

আমি বিবল হয়ে বললুম, পছন্দ হয়েছিল তাই কিনেছি । অন্ত ভেবে দেখিনি ।

মাস কপালে কয়েকটা রেখা দেখা দিলে কয়েক দু'খুঁতের জন্যে—ঠাটি দুটো চোখে বলল একবার । যা আংটির প্রসঙ্গটা আর তুললে না । তাঁর মনে বললেন, আমায় ইচ্ছা তোমার বিয়ে দিই ।

—বিয়ে ! এতদিন কেন ?

একুশ বছর তোমার বয়স—এমন কিছু ছেলে মানুষ নও । তোমার বাবা-ঠাকুরদার অনেক কম বয়সে বিয়ে হয়েছিল ।

আমি জবাব দিলুম, সেদিন এখন আর নেই । বিয়ে আমি করব না ।

ইদ্র মাস মাস তাঁর হয়ে উঠল । চকিতে ভেলে টুকরো টুকরো হয়ে গেল এতকাল হয়ে বহু কন্ডে হয়ে থাকে বৈদ্যের দু'খোঁটা—চোখ শুক শুক করে উঠল । হাতে হালা ছিল কপের, ঠক করে সেটাকে পাখরের আংটিটার মধ্যে নাখিরে রাখলেন ।

মা বললেন, তবে কি-করবে ? মাসে মাসে কলিকাতার বাবে আর থিয়েটারের মজার মেয়েদের নিয়ে বখানো করবে ?

আমি তাঁরের হতো উঠে দাঁড়ালুম । বললুম, না ।

মা ভেবেনি কতদিন শাপিন্দ গঙ্গার বললেন, চোখ হাঙ্গা কাকে । তোমার বাবাকেও কোন দিন ভয় পাইনি—তখন বাড়ির মেয়ে ছুঁনি আমার পাওনি ।

—চোখ আমি তোমার হাঙ্গারিনি । কে হাতিয়েছে এই এখন কথা তাই জানতে চাই ।

মা বললেন, কে আমার ছোঁবে ? তোমার নিজের দু'খাঁজ বিয়ে সেয়ে—তাই বলে দু'খাঁজ পুঙ্খ সোলের চোখও শুক হয়ে সেয়ে ? কেন তোমাকে কলে খেলে তাকিয়ে দিয়েছে ? খেব মতে হোটেলে গলে পাইন বেয়ে ছুঁনি কেন উঠেছিলে ? কলকাতার গিরে কেন ছুঁনি বিজ্ঞান কাহে জুঁতা না—হোটেলে গিরে থাকো ? শাপিন্দ-বিবাদের ছুঁনি কোথায় বাও—কী করো ?

সব কন্ডাই জবাব সেয়া যেত । বলতে পারতুম—কিন্তু না না, কিন্ত না । ও কেল থিয়েটারের বেয়া । বলতে পারতুম—পছন্দতাকে মেখে আমার চোখে শু

ঘরেছিল বটে, কিন্তু ওই আংটিটার জন্যে কোন অপরাধ ছিল না। কিন্তু বাবার তখন হুকু ছুটছিল। বললেন, যা করো, বেশ করো। নিজের ভালোমনা আমি বুঝি।

—সে তো সেখতই পাশে নখের দ্বারা ছুঁই হয়েছিল। ভেবেছিলেন, এতদিন পরে ছুঁই হয়েছে মাননীয় হয়ে—কিন্তু বুঝিতে নিজে বড়ো হবে সংসারকে বড়ো করে তুলবে। কিন্তু, দ্বাই চলেই একই প্রত্যাহ। তোমার বাপ-ঠাকুরার তবু চকুলম্বা ছিল—না কিন্তু, নতুনো করত হায়ে গিয়ে। তোমার হতো তাঁরা এমন করে কলকাতার পিরে নাহ বাসাত না।

আমার সারা শরীর কাঁপছিল। বললেন, আর কিছু বলবে?

—বুড়, শেখবার অভিজ্ঞ কর একটা কথা। তুমি বিয়ে করবে কি না?

—করবে না।

—তা হলে সরে যাও আমার সাবসে থেকে। আর কখনো এসো না।

না-বর থেকে বেগিয়ে এসে আমি কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম ব্যাভাষার হেলিং ঘরে। মনের ভেতরটা বখন আতে আতে শাও হয়ে এল, তখন কোথা যেন একটা মুক্তি আনন্দ অনুভব করলুম—বোধ হল, সর্বাপেক্ষ থেকে কতগুলো শেকল আমার ভেঙ্গে গিয়ে পড়ল। এতদিন ভেবেছি, এই সংসারের আমি বড়ো ছেলে—আমার কত'খা আছে সবসের ওপর, আমার মাখার অনেক দায়িত্ব। এখন সেখতে পেলুম, চারিদিকের দ্বাই সে দায়িত্ব ধীরে ধীরে সরিয়ে নিয়েছে, কখন আমাকে ভিড়িয়ে দিয়েছে ব্যাভিলের হলে। আর আমার কোনো সকেচ নেই, কোথাও এটাই বুঝা নেই। আমি ছুটি গিয়ে গেছি।

ধীরে ধীরে নেমে এলুম সেরেতার।

সেওয়ানজী বললেন, ভালই হল কিন্তু তুমি এসেছ।

এই কলকাতার কালজঙ্গলো একটা দই করে দাও।

আমি বললাম, পাব না।

—পারবে না! তে কি কথা!

আমি ভাব দিলুম: আবাদের এওয়ালী দলখি বিজ্ঞ পদম্, আসলে এখানে গরমের ছুটিতে—তাকে নিয়েই যা কিছু দরকারী নই করিয়ে নেবেন। তার

আঠারো বছর হয়ে গেছে। আমি আর এ সেরে হায়ে নেই।

সেওয়ান জী করে তারিয়ে রইলেন কেবল।

আমি বললুম, তা হাড়া তিনশো টাকা আমার দেবেন। আমি আরকেই কলকাতা দাব।

—বাব চারদিন আগেই তো কলকাতা থেকে কিলসে।

এদনি আমার—

বাবার চাইতেও বড়ো সেওয়ানজীকে এই প্রথম হুকু ভাবার আমি সন্তোষ করলুম।

—আমার কাছের কৈকিয়, আমি আপনাকে দেবো না। তিনশো টাকা আমার চাই।

সেওয়ানজীর মূখ কালো হয়ে গেল।

—কিন্তু পদম্, যে কিলের টাকা পাঠাতে হবে।

আমি হাঁতে দাঁত ধরে বললুম, চুলোর থাক কিলি।

আমি কলকাতার চলে এলুম। প্রত্যেকবার আসবার সময় না-কে প্রশ্ন করে আসি। এবার সে প্রয়োজনও আর ছিল না। এই বাড়ির সঙ্গে সব সম্পর্ক আমি মেটাতে চলেছি—কোনো বন্ধনই আর রাখব না।

বনে আছে—সেহিনও পনিবার।

আজ ভাবছি, যেদিন দরিকন্ত অভিনয়ে যোহিতাবের ভূমিকার মেয়েছিলুম, সে দিনটাও পনিবার ছিল কিনা। পুরোনো পাঞ্জীর পাতা খুলি হাতের তার হালি মিলত। কিন্তু মনের সেই বিশ্বাসটাকে তেতে দিতে চাইনি বলেই সে খেঁজ আমি কোনদিন করিনি। আমি জানি,—সেও নিজের পনিবার ছিল, নইলে আমার ওপরে এমন ভারে পনিগ্রহ এসে ভিড়ান কী করে?

আমি থিরেটারে সেলুম—কিন্তু অভিনয় সেখবার জন্যে নয়। সোম্বা নিয়ে কাউন্টারের একজন কর্মচারীকে বললুম, বাসিকের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—কী দরকার?

—তাকেই বলতে চাই।

—তিনি আর আসেন নি।

—তবে বাড়ির ঠিকানা দিন। আজই আমি দাব করার কাছে।

কর্মচারিটি হাসলেন, বেশ অর্থ'ভরা হাসি। বললেন, এমন তাঁকে বাড়িতেও পাবেন না। যেখানে তিনি

আছেন—একটু সামলে নিয়ে বললেন, বরং কান বাড়িয়েই দেখা কংবোনে সকাল দশটা নাগাল।—বাগদারের ঠাট্টার একটা কণার সিরে বললেন : এই তারি তিনটা ।

সমস্ত হাত হোটেলে আঁধি জোপে কাটলুম। বার বার নিব্বের উত্তর উত্তেজিত হৃদয়কে শাসন করে বলতে লাগলুম—না, আর আমি গিছিয়ে পড়ব না ? আমার লক্ষ্য আমি ঠিক করছি—বেছে নিব্বছি আমার পথ । মিথ্যে ইচ্ছার করে এতদিন ঠেকিয়ে রেখেছিলাম নিজেদের—চুকানোর সামনে গড়তে চেয়েছিলাম অর্থহীন একটা বাসির ঘাঁধি। আমি যা ভাই আমার হতে হবে—নিজেকে হাড়িগে বা ওয়ার সারা আমার কোনোরহতেই নেই ।

পরের দিন বধ্যস্থানে পৌঁছে গেলাম ঠিক সন্ধ্যায় । বঁটা বাজতে না বাজতেই ।

দিনে বেশি অর্ধবিঘে হল না । বন্দী আদলের পুরোনো বাঁক—এক সবে ঘুর ভ্রম-ভ্রমট হিল মনে হত । কিন্তু এমন পড়ত অবস্থা—মনে হত । লক্ষ্য বেগিয়ে ঘাবার কন্যা পা বাড়িয়ে রয়েছেন । অনেক দিন রঙের পোচ্ পড়তেন—সে ওয়ালে কাটল বেরে, একটা ছোট অণবের চাগা নানা নাড়তে ভেতলাগ হাজার ওপার ।

দীভর বসবার ঘরেই ছিলেন সুরগতি বান্দু । হরমার সামনে হাঁজতে জিজ্ঞেস করলেন, কী চাই ?

—একটু কথা ছিল আপনার সঙ্গে ।

—আসুন ভেতরে ।

সেই ঘরটাকে এখনো আমি হাবির হতো দেখতে পাই—তার কোনো ছাঁটনিটি জিনিষ পথের আমি জুড়ানি । প্রত্যেকটি বহুদা আদালার হাবার ওপরে অর্থহীনতার কারখানাটি লাল নীল কাল দিয়ে সাজানো—সকালের সোপে থলে ভেতরে একটা অশ্রু রহিন হারা ছড়িয়েছে ভায়া । খেন সাগা বরটাই কোন খিয়েটারের স্টেজের বহু হাবার আছুর হয়ে রয়েছে । সে ওয়ালে নানা রঙের ছবি—গিলী বহুবার, কয়েটি শ্মশানরণী বিদেশী সৈন্যের হাংল উপস্থাপনা ভা হাভা কয়েকটি বড়ো শাইজের কটোত্রাফ—বিভিন্ন নাটকের অভিনয় থেকে তোলা । একটা খড় টক টক করে লগছে । যেহেতু ক্রাস পাভা—তাহতে কয়েকটি বাকিরা ছড়ানো—একটিতে ঠোঁটান বিধে সুরগতি বান্দু বলে ।

বৃহত্তর অথো মনে হল খেন আমি কানীর সেই বহুদাথাকে দেখতে পাচ্ছি—খেন সুরগতির সেই বহুদাথ । কিন্তু তৎকাল্য আমি নিজেদের সামলে নিলুম—বহুদার করে বলে পড়লুম সুরগতির সামনে ।

বোটা পস্তার গদার সুরগতি বললেন, কী চাই ?

বহুদার করে বললুম, নিশেব একটু কথা ছিল ।

—বলুন।—একটা ছোট আর অলস প্রতি-বহুদার এল ।

—আমার নাম বিশ্বকাসি হারটোব্রী ।

—বেশ—বলুন ।

লক্ষ্য করলুম, ভয়লোকের বয়েস পঞ্চাশ পার হয়েছে । সোলগাল চোখের মান্দুম, হাখার কটি-পাকা খোলাসো পাতলা চুল । হং এক সবে উত্তমল সৌর ছিল, এখন একটা সলিনতার হারা । চোখ লাল—সব একটু আড়ন্ত, একটু কিম্বদা । বৃহত্তে শারলুম পদ্যহারের হাতটা ভালোই কেটেছে কোথাও—এখনো ওঁর খোয়াড়ি ভায়েনি ।

—আমি অভিনয় করতে চাই । সুযোগ দিতে হবে ।

শিবরা চোখ বৃটো একটু বুলে গেল এবার । নড়ে বললেন এখানে । ঠাট্টার কোনার খেন অবজার একটা বাক কুটিল মনে হল । অর্থহীন সেই পুরোনো আবদার । কেন যে এরা কামোতে আসে ।

বললেন, কখনো করেছেন অভিনয় ?

কর্গছি । পাড়াসারে । নিজের বাড়িতেই স্টেজ আছে আবাদের ।

পাড়াসারে অভিনয় সকলেই করে থাকে, কিন্তু কলকাতার সঙ্গে তার আকাশ-পাতাল তফাৎ । ঠাট্টার কোনার সেই বাকটা হাসি হয়ে উঠতে ব্যাঙ্গল, হঠাৎ থমকে সেল : বাড়িতেই স্টেজ আছে বলছিলেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ ।

তার নামে অবস্থা বেশ ভালোই আপদারের।—সুরগতি আবদার নড়ে উঠলেন ।

—ভালো কিনা আমি না—তবে সোকে অভিনয় বলে বটে ।

—অ—অ—এইবার চোখ বৃটো সম্পূর্ণ মেলে ধরলেন—বেশ নিরীক করে দেখলেন । এতল হিলালের

মন্দির নিয়ে বর্ষেহালান, জাবহিহালান, যে কোনো সরেই
বলে বলতে পারেন—আচ্ছা, আসুন বশাই। কিন্তু
হিমালয় যেন বাড়ার কোনো ঝুটো-খানি।

—কী বললে পাঠে' করেছেন ?

ক, এন্টার নিবন্ধন বিলম্ব। শুনে যেন একটা
ভয়ঙ্কর হলেন।

—কী, চোখেরা আশবার ভালো। বয়েস কত ?

— ଶତ୍ରୁ ।

—বাক্য !—হাসলেন, কিংবা লক্ষ্য প্রকাশ শেল :
 তা হলেও বসেই চেগরা ।—যেন হাটে মোর, বাড়াই
 করছেন এমন ভঙ্গিতে বলে চললেন, টল কিসার, মোটা
 হাড়—চোখ ভালো, দাঁড় কিসার । হুঁ ।

কথাগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যে এ অবিরত আঁধার করতে চাই না। কিন্তু, সেদিন—সেই তখনও এই সামান্য দৃষ্টান্তই বৃত্তে আমার দৃষ্টি থাকেনি যে জমিদারীর ওই পটভূমিই না থাকলে আমার চেহারাও যে এত ভালো ভালো জিনিষ আছে, তা তার নতুন আসন কিনা সম্ভব।

কিন্তু আমি তখন আমার ঘরে উঠেছি একটু
 একটু। দোষ হচ্ছে পান মাক' পাখি পড়ীকার।

—সুযোগ দেবেন আমাকে ?

—হাঁ!—আবার পছন্দের চোখ পড়ল আমার ওপর—
এবার বোধ হয় জাভা-দাঁপড়টাও বেঁধে নিলেন। তারপর
ভাকলেন, হব্ব! ওরে ও হউছাড়া বব্ব।

একটি বোমা লম্বা চোরাবার চাকর দেখা দিল।

—ଜା କରନ୍ତେ ବନ୍ଧୁ । ଆଉ ଖୁବ୍ ଦୈର୍ଘ୍ୟ 'ଜନା' ନାଟକଟା
ମିଳିବ ।

যদু তুলে গেলেন বললেন, আপনার চেহারা যেহে পঙ্খ
হচ্ছে আমার। গলার দ্বয়ও বেশ ভরাট-গম্ভীর।—
একবার থাকলেন : পুণ্যোদা নাটকটা তুলে দেব ভারি—
এবার নৃত্য করে 'ছন্দা' হবে।—একটু খেয়ে বললেন,
করছেন আপনারা !

—মা । একবার শব্দ করা হবেছিল, করা হয়নি
 শেষ পর্যন্ত ।

—হঁ, খুব শক্ত নাইক। যেমন ছাদা, তেমনি
ইকোপেন——তার সঙ্গে আবার ফিলসফি। বেশ

ছাট্ৰাঙ্গাৰ জিনিষ যশাই। আমৰাই সব দৰৰ বস্তুতে
হিন্দুসকলৰে থায়ে। আৰু লাড়ুগাঁৱৰ অস্তিত্বতো
বিতৰ্কিত পাবৰে না।

বন্দা খাটক এনে ঘেঁষে গেল দমেনে । বই বুলে একটা
 জারপা বের করে বললেন, পড়ুন তো । মানে—পদ্য পড়া
 নয়—খ্যাতি—এর যত্নে করে—বাক্যের ?

—बुद्धोहि ।—आदि भद्रात्तु बुद्धं कथयतः ।

“কথা মজুতা হ’তে কিবা আছে বা কল্যাণ ?

କେ ହୋଦାର କଞ୍ଚିତ-ବନ୍ଧୀ

স্বাভাবিক অকালে জাতি বাড়ে !

कृष्णान्तरात् नृपुत्रं कालं कालमा कालमा ?

କଞ୍ଚିତ-ବିଧିନୀ କାର ଡାକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ।

ମିଆଦାର ନିରାକରଣ ଯଦି,

या कश्चिद्वत्तु, किञ्चिद्वत्तु इति ।

विषय: जमात-ए-अहमदिया-क्या है—

ਸਾਹਿਬ ਜੀਵਿਤ ਸਾਹ.

महानाथसिंहनामस्मृतौ ।

କାଳେ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷେ ନିବାରଣ ସାଧନା.

उपनिषद् सूत्र—

डिप्लोमा फॉर ग्राहक सेवा

—ব্যাস—ব্যাস!—সুদৃশ্যি বাধা দিলেন : আর
পরকার নেই। হবে—আপনার হবে। কলকাতাতেই
থাকুন।

—এলিফি বাগাভড । একটা কোটেল ইটলি ।

চা এস। আমার দিকে যেন ক্রমশ আকৃষ্ট হইলেন
দুর্ভাগি। বললেন, শৃংখা চা খাবেন ? একটু খাবার
চাবার—

—ଏକାବାସ । ଯୋଗେଁ ଯୋଗିବେଶି ଆସି ।

তা যেতে যেতে সূর্যপাত নানা বকর গল্প করতে লাগলেন।

—গিরি চোখের সামনে ভাসছেন বনাই—যুক্তির
আগুতি কি জুড়েতে পারি—তা ছোঁয়া বর
তিনকড়িই। সেদিন এখন সেয়ে। দোহের সে মেজাজই
আর হৈই এখন। আর এই যে বামোঁকোপ দেখছেন—
এই গিরিচোখের সামনে !

—কিন্তু শিরেটাতেই আছে কি আর বাতাসোহাওয়া

পাশে ।—বললুম, ওতো শুনই দ্যাখ । ওতে তো কোনো গ্রামই নেই ।

—গ্রামের কথা বলছেন ?—সুদূরগতি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন : গ্রাম এখন কোথায় আছে বলুন ? ছেলেবেলা থেকে এই আদমি তো খিচুটোর অল্প গ্রাম—কত টাকা ফ্রলিখি, নিষেধ লুণালা বাড়িই বেচে ফেললুম । কিন্তু কে ডাকার আদার বিকে ? লম্বাই শ্বাৰ্ফ বোঝে—দমাই টাকা চায় । বললে বিশ্বাস করবেন ? ওই যে আপনাদের উনি—একজন বিদ্যাত অভিনেতার দাব করে বললেন : ওঁকে প্রত্যেক দিনের টাকা আপন হাতে তুলে না দিলে বোভেই নাযবেন না । একদিন একটু টানাটানি ছিল, অর্ধেক দিয়ে বললুম—এখন তাঁরই দিন ব্যাকটা পরে দিচ্ছি । করলে কি আসেন ? বেশ পড়ছে, তখনো এক দিকে আবখানা বাড়ি, আর এক পাশে পা-আদা পরে বসে রয়েছে । বললে, অর্ধেক টাকার অর্ধেকের বেশি মেক-আপ হয় না । আর এই ফ্রেসে আবখানা অভিনয় করাই বাড়ি চলে যাব !

আমি বললুম, টাকার জন্যে আমি আসিনি ? অভিনয়ই আমার লক্ষ্য ।

ইয়া ।—সুদূরগতি হুসি হয়ে উঠলেন : এই তো চাই । আপনাদের চোখা দেখেই তা বুঝতে পেরেছিলাম । বড়ো আদম পেলুম লম্বাই কথাটা শুনো । কাল বিকেলে একবার আসুন বোভে ! বিয়ার্সেল হচ্ছে । আঙ্ক্যাকে দিয়েই প্রায়টা ঠাই করানো ।

বসড়ায় করে বোয়রে এসে । আদার চোখের সামনে বৌরুজলা কলকাতার রূপ তখন অপরূপ হয়ে গেছে । চলত চাঁদে যেতে যেতে বসে হল—আদার হুঁকারে কোনো বাজব পৃথিবীর অস্তিত্ব নেই—একটা বিরাট স্টেজের ওপর দিয়ে যেন সরে সরে যাচ্ছে একটির পর একটি হুঁশ পট ।

তারপর—

তারপর নতুন পাশা শুনুন হল আদার ।

মোমবাতিটার দিকে চেয়ে দেখছি । তার একটা ভরল শুন খারাপ টেবিল বেয়ে নেমে আসছে । একটা কৌটা হাতে পড়ল । আর একটা । আরো একটা । টপ—টপ—টপ—

যাইরে ছোয়াছার কার ছায়া ধুলে যাচ্ছে ? কে সেল ? শেখার ? কার পায়ে নখ উঠছে ? হেওয়ানী ? হেওয়ানীই বটে । তাঁরই তো আদার দম রয়েছে এখন ।

প্রাণ দিয়েই শুনুন । মোহিতামের চাইতেও অনেক বেশি বুক কেঁপেছিল, অনেক বেশি ভয়ে হাত পা যেন হিম হয়ে যেতে চেষ্টাছিল । কিন্তু তারও চেয়ে বেশি বাবকতা ছিল রক্তে । আর সেই বাবকতাকে আরো উদ্ভাদ করে তুলেছিল সেই রাতেই আর এক নতুন দাকী ।

তার দাম উত্তরাশ্রী ।

আদার বেশ বনে আছে, একজন পুরোনো বড়ো শিক্‌টার একবার একপাশে ভেঙে নিয়ে গিয়েছিল আদার ।

—একটা কথা বলব নির্বাপন ?

—বলুন ।

—আদার চর বহন হয়েছে লম্বাই, তিনটে খিচুটোর চিরিয়ে এসেছি এর আসে । অনেক দেখেছি । একটু দাবদানে থাকবেন ।

আমি হাসলাম ।

—হাসির কথা নয় । এ বড় পাখী আত্যা লম্বাই ।

নরকের ধরাত্ম । শেখন থেকে একটি গাফা বেয়ে কখন চুকিয়ে ঘরে ঢেঁক পাবেন না ।

আমি আদার হাসলাম ।

আগনি তো উপদেশ দিচ্ছেন, অল্প হুঁশ থেকে যত্নে গল্প বেরচ্ছে আপনাদের ।

হুঁকারের ধব ।—জহলোক হুঁকুটি করলেন : হুঁ—এক দ্রাব কারুর পেটে পড়লেই তার ইহকাল-পরকাল করবার হয়ে সেল, এ সব হেঁচো কথা আমি বিশ্বাস করিনে । রাজ্য রেখে গেলে কিছু হয় না । আদার বলল কত আসেন । পরবাসি । কিন্তু এখনো একটা আড্ডা গঠি আর তিন সের বসগোড়া পার করে দিতে পারি । আমি সে কথা বর্জিদি ।

—সেয়েসের ব্যাপার ?

—ঠিক তাই । একে জমিদারের ছেলে, তার অমন চোখা । দবার ওপর এত কচি বহন । শুনুন ব্যালে গাল্‌দা নয় লম্বাই—বড়ো বড়ো আকট্রোয়া পরবাসি হিঁচু

যেতে চাইবে আসনাকে। হুঁশিয়ার-বুদ্বুশিয়ার।
মরে আর কী হবে মশাই-ওইভেই তো মনুষ্য মরে।

নব আশি বাই না-বাওয়ার প্রদীপ্তিও নেই।
আর কাশীর সে রাতটাকেও ভো আশি ভুলিনি।
আজ নরসতী আমার কাছে কেবল বানিকটা
মানি নর-বানিক লক্ষ্যের ইতিহাসও নয়। সেই
রাত্রির ছোট পটভূমিতে ধীরে ধীরে একটি অপরাধ
ছবির বড়ো কুটে আছে সে। আমার কড়-
আঙ্গুলের ধীরে আঙুলটার দিকে তাকালেই তা
দেখতে পাই।

আমি যেসে চলে এসেছিলাম। কিন্তু এ কথাও
সম্পূর্ণ ভুলতে পারিনি যে উদ্যোগীর সঙ্গে স্টেশনে
নাগসেই জখপণ্ডে আমার সারা জীবন। তবু, অনেক
দিন পর্যন্ত বাঁচি ভালো হেসেই ছিলুম আমি। সুরপতি
বলতেন-‘দ্যাব’-‘শিবে’ নে। বড়ো অর্টিপ্টি হতে হলে
এখনি হওয়াই চাই-বুড়োছিন্?।

দশন বলতেন, তখন হরতো নিজেই টলয়েন।

সেপের বাড়িতে আর ফিরলুম না-চিরদিনের মতোই
ভার বহুতা বহ করে এসেছি। মা’কে কোন চিঠি আমি
দিলুম না। সোম্বা দেওয়ানজীকে লিখলুম, আমি
খিচোরের সোণ দিগেছি-দ্বারীভায়ে কলকাতার থাকব।
জিলারীতে আমার যে অংশ আছে তা থেকে আমার
বাসে বাসে ভিনপো করে টাকা পাঠাবেন।

যেওয়ানজী চিঠি এলো অনেক অবদান-বিনয় করে।

-হিঃ বাবা, এদর পাগলামো করতে আছে? আর
মা-র ওপরেই বা কি কেউ এমন ভাবে রাগ করে? তুমি
বৎসের বড়ো হোসে-এতবড় পরিবারের মান-ইচ্ছা, সব
তোমারই ওপর। কিসে এসো ভাল হও। কলকাতার
পাবলিক খিচোরের মানুষের সর্বশাসনের রাজ্য, ওখানে যে
দায় ভারই ভরাডুবিছে, অতঃপর-

উভয়ে লিখলুম, আপনায় কাছে আমি উপদেশ
চাইনি, পাওনা টাকা চেয়েছি। অতএব আপনিকও টাকাই
পঠাবেন, উপদেশ নয়।

টাকাই আসতে লাগল তার পর থেকে।

বেশ নাম করে কেসদাম হ’ শ্যাম বাস পরেই।
শেখারদার হোটেল থেকে দিগে বাস দিলুম শ্যামবাজারে

চল্লিশ টাকার ছোট একটা মোতাদা বাড়ি। সুরপতিবাবু
থেকে আরম্ভ করে খিচোরের অভিমত, কর্মচারী-
এদের সকলের আভ্যাতনা হয়ে উঠল বাড়িটা। দিনগুলো
যেন যোজের মতো কেটে যেতে লাগলো।

খিচোর থেকে কিসে সেদিন বেদা লপটা পর্যন্ত
বুঝেছি, চাকর এসে ছাঙ্গালো।

-বাবু আপনায় ভাই দেখা করতে এসেছেন।

বিজ্ঞ! বুকের ভেতরে একটা বাজা লাগল আমার।
শেখারদার হোটেলের থাকার সময় দিন দুটুক এসেছিল,
ভারপর তার বাসের মধ্যে তার আর দেখা নেই। হঠাৎ
কেন এল-ঠিকানা বা খোঁজা কোথায়? বাড়ির হিসাব
থেকে আমি তো খারিজ হয়ে গেছি অনেক আগেই।

বিজ্ঞ এল। প্রথমটা কেনন কুঠাযোগ হল, ভাল করে
চাইতে পারলুম না ওর দিকে। কিন্তু বিজ্ঞ দখল
করে দিলে।

-ববর নিতে এলুম নিম্না।-ভালো আছো?

-ভালোই আছি। ভোর পরাশুনা?

-চলছে একরকম।-বিজ্ঞ হাসল: তোমার নাম
তো চারিধিক কেটে পড়ছে নিম্না। এখন শোভায়ে
তোমার নাম দেখি-পথে-বাটে তোমার খিচোর নিয়ে
আলোচনা করে সোকে, তখন ভারী আদম্বর হয় আমার।
ভাবি আমারই তো দাদা, যে সে সোক পেয়েছিল নাকি?

আত্মব’ হয়ে ওর দিকে তাকালুম। ঠিক একথা
আমি আপা করিনি।

-কিন্তু বাড়িপুঙ্খু সবাই তো আমার কুলান্দার বলছে।

-কী আসে দার? -বিজ্ঞ উত্তেজিত হয়ে উঠল:
ছেড়ে দাও ভবের কথা-ওরা গৌরো, কন্বারভেতিভু।
তুমি যে কত বড়ো কণীত-গড়তে বাচ্ছ-সে ওরা কেনন
করে বুঝে?

মা-র ওপরে রাগ করে এসে যেদিন খিচোরের
ভিত্তিহীন, সেদিন বসে দত ফেলছি থাক, একটা অশান্তির
কটিক কোন হতে ভুলতে পারিনি। চিত্তার ভেতরে
কোথায় লুকিয়ে থাকত কেনন একটা অপরাধের স্রোতা,
থেকে থেকে আমার চাকর ভারতে চাইত। কিন্তু, আজ
বিজ্ঞ এসে সেই অপরাধটাকে অনেকখানি মাঝিয়ে দিলে।
নতুন করে খেন ছোর পেঙ্গুর।

—তা হলে তুমি বলছিল ভালোই করেছি।

—দুবার বিদ্বৎ কণোনি। তুমি শিল্পী—নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছো। পাড়ারগায়ের বশবসে শিমল হাত্য হয়ে তুমি জনিয়ারী করতে বাবে কোন হুমুসে? —বিদ্বত্তর চোখ উত্তেজনার জ্বলে উঠল: আমি পুরো সানোটে কঠরি তোমাকে

আমি খুঁশি হয়ে বিদ্বত্তর জন্যে চা আর বাবার আনন্দন। ভিজ্জেল করলুম, আমার স্নে তুমি দেখেছিল?

বিদ্বৎ অভিমান করে বললে বা-রে, পরমা বদ্ধ করে দেব না কি? তুমি তো আমার পাণ-ও দিলে না। যাকি কলসের অতঃ পরটা পর্বৎ হাতধনি—গাছে গিয়ে পাণ-টান চাই। শেষে থিয়েটারে গিয়ে খবর নিই। তাও কি ঠিকানা দহছে দিতে চায়? অদেক করে বোঝালুম আমি তোমার ভাই, ভাবপরে—

সংস্কৃত হয়ে বললুম, অপরায় হয়ে সেয়ে, তোকে আমি বুঝতে পারিনি। আচ্ছা—শনিবারে আসিল থিয়েটারে, পাণ লাগবে না।

ভারপর থেকে বিরহিত বাঙালী-আসার করতে লাগল বিদ্বৎ। আমি সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলুম। কিছুদিনের ভেতরে সুবর্ণিতর সঙ্গে ও হারলুম বাতির হয়ে উঠল তার।

সুপারিত বলতেন, চমৎকার হলে আপনায় ভাই এই বিজয়। ওকেও নামিয়ে দিই।

আমি ফেনে বললুম, এ হাতা ওর জন্যে বর। ও অ্যাক্‌ভোকেট হয়ে।

এখন আমি, বিদ্বৎ অ্যাক্‌ভোকেট হয়েছে বটে, কিন্তু অভিনেতা হিসাবে ও আমার চাইতে ঢের বড়ো। হোসেনোয়ার সেই গুলাটা একদিনের জন্যে ও ভুলতে পারেন। আর কি নিশ্চয় অভিনয়ের ভেতর দিয়েই দা পল চাইতে ভালো জ্যাগুটা দেখার জন্যে ও ভৈরা হুঁসিল।

মোহাবাভটা লু করে উঠল। চোখের সাবনে আর একটা হাবি বেগা দিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। এখনি করেই সেদিন তিনটে খয়ের আসো কিছু লু লু করে হঠাৎ একগাণ অন্ধকারের ভেতর ভলিয়ে গিয়েছিল। সেদিন আমি প্রথম বল দেখেছিলুম।

তার আগে চমৎকার কথা।

আচ্ছা কল্যাণ হুঁসিল মেমোর—কালো চুল বাধ দিলে ঠিক আংলো-ইণ্ডিয়ানের ঢেহারা। নিঃশব্দেই ইউরোপিয়ানের বক ছিল গারে। থিয়েটারে নাচের দলে থাকত—কথাবাভা বেশি বলতে না হলে নৌর্যাপক নাটকে কৈলাসে মহাশয়ের পাশে পার্বতী সাজিয়ে বসিয়ে দেওয়া হত থাকে। দীর্ঘ ললল পরীর—নাচের দলে নিখুঁত সঠিক হয়ে উঠেছিল।

চমৎকার ওপর একটা শব্দ লোলুপ হুঁসি অনেকেরই ছিল, ভাংকে বাঘের হতো পাহারা দিত অগ্ন্য পাল। কুমারটিলির অবস্থাপন ঘরের ছেলে সে। জনৈক ককা লোহার হতো পরীর—হলের পিণে শেষ করে দিয়েও তার পা এতটুকুও টলত না। থিয়েটারে সেনাপতি ভাবি কিংবা গুণ্ডার পাট ছিল তার বাঁবা। আরো একটা গুন ছিল অগ্ন্য পালের—চমৎকার বাঁগ বাজাতে পারত সে। তার হুক কক'ন ঢেহারার আড়ালে ওইটুকুই যেন কোমলতার কঙ্গুর হতো বয়ে যেত।

সেই রেখেছিল চমৎকারে। আর যেহেঁটি যে তার সম্পর্কে একরাই সম্পত্তি—ওর ওপর কারো দখল পড়লে যে তার অধটে হুঁস আরো—এই সত্যি কথাটা অগ্ন্য পাল কখনো গোপন করত না।

কিন্তু থিয়েটারে হুঁসটাও কোন অসতক হুঁসডে' যে আপনা হয়ে যায়—একথা অগ্ন্য পালের জন্য ছিল না।

সেই বড়ো থিয়েটারের উপরেন আমি ভুলে গিয়েছিলুম। আপ-পানের হুঁসটা চাঠতে চককে চোখের আহান, চুকুরো চুকুরো অর্থভ্য ককা—সদয় সুযোগ পেলে কাগো কাগো একটু বেশি হাজার কাছে বেশে বগা, কখনো কখনো শেহন থেকে কিয়ে ওপর হুঁসটা একটা তন্ত ন্যাস আমার কাছে যে কোন অর্থই বয়ে আনেন তা নয়। কিন্তু নিজের চাঞ্চল্যকে তখনো আমি শক একটা বর ভৈরা করে রেখেছিলুম। আমি শিল্পী হতে এসেছি—থিয়েটারে এসেই যে কথাবোঝ বলে ভিত্তে যেতে হবে, আরহত্যা করতে হবে ভিলে ভিলে, এই চলতি হাংগাটাকে বিখ্যো প্রকাশ করব এই আমার প্রতিজ্ঞা। ওয়াও হয়েতো সে কথা জানত।

সেদিন বিতরি অশেষ পর পর তিনটে হুঁসো আমার

কোনো পাট ছিল না। দিনটাও অসম্ভব দুঃস্বপ্ন—
বাঘাটা ঘরেই ছিল ঘানিকটা। আমি একটু ক্রিয়ার
অন্যে স্টেজের একেবারে শেষে বিকটার সোপে এলুম।
সেখানে কতকগুলো কাটা গাণ, এলোমেলো স্টেজ
প্রাণটি আর দুই-তিনটে কোট ছড়িয়ে ছিল ইতস্তত।
তারই একটাতে চোখ বুজে আমি শূন্যে পড়লুম—
অন্তত আধকটা বিব্রাহ করতে পারব।

হঠাৎ আমার বুকে কার নিখাল পড়ল, ঘানিকটা
ঝুঁকো চলে ছোঁয়া বুলিয়ে সেল গালে কপালে, কার হুটো
পাতলা ট্রাট চলে বদল আমার ট্রাটের ওপর।

সারা শরীর পিঠেরে উঠল, চবকে ডাকিয়ে দেখলুম।
চন্দা।

বললুম, হি-হি—এ কী করছ ?

বিল বিল করে হেসে উঠল চন্দা : ভাবী হাস হল—
না ? উবা হলে বুঝি বুদে খুঁসি হতে ?

আমি কি বলতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই চন্দা ছুটে
পালিয়ে গেল।

আমি পাখর হয়ে বসে রইলুম।—না অগণ, পাল নয়।
জার অন্যে আমার ভাবনাই—সহানুভূতিও না। কিছু
উষারানীধি কথাটাই আমার রক্তে সোপা জাগিয়ে দিয়ে
গেল। তার সঙ্গে অভিনয় করতে যাবলে আমার বেশা
একটু লাসে, সে আমি জানি। কখনো কখনো আচমকা
বেমানে যবে হয় তার দুখের ওপর সহনশীল একটা ছায়া
কুটে উঠছে। কিছু আমার সেই সোপন বনের এতটুকু
দুর্গন্ধভার বনও কি এদের অজানা নেই ? ওয়া ঠিক
টের পেয়েছে, আমি উগাকে—

ঠিক তখন শ্রীপৎ এল। খিরেটারের কবিক আকুটার।

—কেবে কেলোই দাদা। ভুবে ভুবে জল খাওয়া
—জা।

আমি প্রায় চিন্তার করে উঠলুম : শ্রীপৎবাবু।

কোনো ভয় নেই দাদা—কোনো ভয় নেই। ও রকম
লুকিয়ে চুপিয়ে এক-আইটে না হলে কি রস ভবে ?
হোঁতা অগণ, পালটা কত বড়ো গাধা, তাই ভাবছি কেন।
তা আমি কাউকে বলতে যাচ্ছি না—কিছু নিভিত
যাকো। দ্যা করে একটা সিগারেট বদল হাও—তা
হলেই পাকাপাকি আমার বুদে বহ।

শ্রীপৎ কবার কলোপ করেন, বুদে সে বহই তেরেছিল।
কিছু চন্দা তার এটুকু নটাইয়া মতো লিখে আমার
ভেতরে উষারানীধি জাগিয়ে দিয়ে গেল। যা আমার
চন্দন-অবচেতনার গীতেরে হুঁসছিল, তাকে নিয়ে এল
একেবারে স্যামে। আমি আবিস্কার করলুম, উবাকে
পাওয়ার জন্যে একটা তাঁর তাঁক আকান্ধা আমার ভেতর
বীরে বীরে কুঁসে উঠছে।

হাল হয়েক বাসে এগরিন স্যামেবেলার নিছের বরে
চুপচাপ বসেছিলুম। কল ও বখন স্টেজের একেবারে
এক কঁকে চুপ চুপ এসে চন্দা কিগর্কিসের আমার
বলেছে, আমি কি উষার চাইতে বেশতে বাগাপ। তার
পরেই আমার পিঠে একটা চিহ্নটি কেটে ছুটে পালিয়েছে।
আর সারাটা দিন কেনম একটা ভার আমার জবে রক্তে
যাবার ভেতরে। বুঝতে পারছি, উষার আকর্ষণ থেকে
নিছেকে কোন মতেই যেন কোনো বাজে না—যে পিছল
পথে কোনোদিন আমি যেতে চাইনি, তাই আমার
চানছে। এ উচিত নয়—কোনো মতেই উচিত নয়।

হার কথাবনে পড়ছিল। নিষ্ঠুর ভাবে দুঃখ দিয়ে
এসেছি তাঁকে। কিরে বাব এবার গিয়ে বলব, বা তুমিই
ঠিক হয়েছিল। আমি নরকের দিকেই পা বাড়িয়েছিলাম—
কিছু নিছের জল বুঝতে পেয়েছি। তাই কিরে এসেছি
তোমার কাছে—করা করা আমারে।

বেলনার খন্দুডালে আমার চোখে জল এসেছিল।
আর তখনই বরঝার ভাণী পায়ের পদ।

—কি হে ঝাশপুত, চুপচাপ বসে যে ?

হুঁপতিবাবু। ওই নামেই গ্রিন আমার ডাকেন।

—এমনিই বসে আছি। আদুন।

—এক একা সন্ধ্যাবেলার ভুতের হতো বসে থাকে
নাকি ? চলো আমার সঙ্গে।—তারপর হাসলেন : ভয়
নেই হে ভয় নেই। তোমার চরিত্রের বাগাপ করে দেব
না। তুমি যে খুঁজ-র—সে আমি জানি। চলো।

বেরিয়ে পড়লুম। ভাবলুম, বেমানে হোক ঘানিকটা
যুগে এসে বাঘা কিছটা ঠাণ্ডা হবে হয়তো। বেখন্দন,
হুঁপতিবাবু, গাড়িও নিয়ে এসেছেন।

—গাড়ি কেন আমার ?

—একটু বুঝে দাব। কালীঘাটে। ওঠো-ওঠো।

—কালী পদ্য কহতে ?—উঠে বসে বিজ্ঞান করল
আমি ।

পাকোয়ানকে হাঁকতে বলে সুপাতি হুঁব বীকালেন :
আরে—আনারের হতো মহাপাণী পক্ষে আমারে বশিয়ে
তো প্রবেশ নিয়ে । দাব উবারাণী ওখানে ।

—উবারাণী ।

আমার রক্ত যেন জলে সেল হুঁদেতে ।

—সেখানে কেন ?

সুপাতি হুঁকে হাসলেন : তোমাকে চাষের মেজাজ
করেছে । কোয়ারী ভারী সাথ—নিজের হাতে একদিন
তোমাকে এক-আমটু খাবার-খাবার করে খাওয়ার । নিজে
থেকে তো বলতে পারে না—ভূমি বা পিউরিটান । ভাই
আমাকেই পাঠিয়েছে হুঁত করে—তোমার হয়ে নিয়ে
যেতে ।

আবার হুঁকে হাটুরি পড়তে লাগল । মনে হতে
লাগল, পাড়ির হুঁটো হুঁটু খোঁজার দাব-দাব পায়ে
খাওয়া ছাপিয়ে আমার হুঁপঙের আগ্রহ উঠে
লাগছে ।

—আমি দাব না । কোচমানকে পাড়ি হুঁতে
লব ।

—পাগল হলে—সুপাতি আমার হাত চেপে
রলেন : বেমেটা দাব করে সারাদিন হয়ে তোমার জন্যে
দাবার করেছে । ভূমি না সেলে কত কষ্ট পারে
লো দিক ? আম তার ওখানে একটু চা জল খাবার
হলেই কি তোমার চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে ?

আমি চিৎকার করে উঠে চাইলুম—পাগল না ।
হাটু চলতে লাগল—আমার মিশিত পলিবারের দিকেই
টানে নিয়ে চলল আমাকে । আর আমার হুঁপঙের
হাওয়া খোঁজার পায়ে দাব ছাপিয়ে যেন দাব
জলকাতার দিকে পড়তে লাগল ।

তারপর—

তারপর প্রদোষের দিনগুলোকে আর এক একটা
হয়ে বসে রাখতে পারছিলাম । উবারাণীর নিজের হাতে
হলে বেড়া প্রবন বসে রাস । একের পর আর এক ।
দেব আসোগুলো হুঁতে হুঁতে হুঁত হুঁত করে নিজে
পল । তার মধ্যে সুপাতির একটা চাপা হাসির

আগ্রহও কি শুনতে পেয়েছিলুম ? জানি না ।

কেবল চন্দনা হাতে হাতে যেন বলেছিল, ভাইমি । ওই
তোমার কেতে নিলে ।

আমি তখন নিলম্ব হয়ে গেছি । আবরণ ভেঙে
খাওয়ার পরে সংকোচের কোনো বালাই-ই মনের কোনো
কোণায় নেই ।

যেনে বলেছিলুম, তোমার এত যিৎসে কেন ? জল
পালতো তোমার হয়েইছে ।

—একটা পুতা—একটা সোঁয়ার ।—চন্দনার চোখে
আসুন ঠিকরে বেরিয়েছিল : ও যেন বহুদূরের হতো
আসলে আছে আমার । ভারী একমুঠো টাকা দিয়ে যেন
আমার মাথা কিনে রেখেছে । ওকে একদিন আমি বিব
বাইরে যেরে কেলব—এই তোমার বলে বি.এ. আর—
আর পারি তো তোমার ওই মাথের উবারাণীকেও ।

কিছু চন্দনা তখন মানত না, সে বিব তার নিজের
অন্যেই ভৈরী হচ্ছে ।

আর—আর সব চেয়ে ভালো অভিনয় করে সেল
বিজ্ঞ । ঠিক এসে এল কালীঘাটে উবার বাড়িতে ।
সেখানেই তখন ভেরা বেঁধেছি আমি । দূনা দূনা ভরে
দমত স্তম্ভগুলো পার হয়ে গেছি ।

বিজ্ঞকে যেনে আমি অঁথকে উঠেছিলুম, একবারে
অন্যে পড়িয়ে দিয়েছিল উবারাণীর হুঁব ।

বিজ্ঞ হেসেছিল । সহজভাবে—নিঃসংকোচে ।

দূনা কী নিবুদা ? ভূমি আটকি—তোমার বোম্ব
গিল্পাই তো ভূমি বেরে মেবে । এই যে বৌদি—
পাল্যেজেন কেন আমাকে মেবে ? আরে—আরে আপনি
তো আমার পুঁদুদন । দাঁড়ান—প্রশ্ন কর একটা ।

সত্যলেনই প্রশ্নটা করেছিল ।

হাত একটা ।

এই সাতবহলা শূণ্য বাড়িটার এমন অদ্ভুত তত্ত্বতা :

তব্বত ভাকরে না—পাঁচা ভাকরে না—আমাদের
সাতপুঁদুদের নিঃসংকোচে নিয়ে বাতাস আসছে না । হঠাৎ
যেন অধিবত-হুঁত হুঁই হলের শূণ্যবীতে আমি নিঃসংক
হয়ে হাঁড়িয়ে আমি । বাবা বেঁচে আছে, তারা এ বাড়িতে

কেউ নেই, দাড়া হয়ে গেছে, ভাঙাও কিছুক্ষণের জন্যে
স্নাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি জীবিত নই, মৃতও
নই—তাই একা এখানে প্রায় জাগ্রত।

হয়ে পড়েছে, উদারপাণীকে নিয়ে বারোটা জ্বর
কি ভাবে আমার কেটে গিয়েছিল।

মেশে এসেছিলুম দ্বার।

একবার মার মূর্খের পরে। দু'খাধির সুবাস মেলে
নি—কিছু খায়ে আমাকে বসতে হয়েছিল। শেষবারের
জন্মে অশিশুও তুলে দিতে দিতে ভেবেছিলুম—এই
প্রহসনের কোনো দরকার ছিল না—আমার হাতের দেওয়া
অশিশু আর না কখনো গ্রহণ করবেন না। দ্বিতীয়বার
এসেছিলুম আমার সম্পত্তির একটা অংশ বিক্রয়কে ক্রীড়া
করে বসে হাজার টাকা নিয়ে যেতে। তারপর আমার কিশ
হাজার টাকার দরকার হল। এবার আর আমার কষ্ট
করে আসতে হয় নি। বিক্রয় তখন ওতালতী পুত্র
করেছে, তার ছোট ভাই চিন্তার ভালো নাম দিয়েছে—
সে কলকাতার চায়ের ব্যবসায় বন দিয়েছে। বিক্রয়ই
সিন্ধুর হাত দিয়ে আমার টাকা কাস্তুরপত পাঠিয়ে
দিয়েছিল, আমি সব করেই নিশ্চিন্ত হয়েছি।

সত্যটা আবিষ্কার করেছিলুম আরো কিছুদিন পরে।
ত্রিশহাজার টাকার বিবরণে আমার প্রায় সত্তর হাজার
টাকার সম্পত্তি তখন বিক্রয় গ্রাস করে দিয়েছে। ঠৈতক
বাঁধতে একটুখানি যথ্য সৌভাগ্যের জায়গা হাফা আমার
এতটুকু দাবি হাওয়া কোথাও নেই।

আর—আর ত্রিশহাজার টাকাই আমি তুলে দিয়েছি
সুদৃশ্যিতাব্যবসায়।

এখন আমি, আমাকে এত ভালবাসে থিয়েটারে
জেকে দেবার ক্ষেত্রে কী স্বার্থ ছিল সুদৃশ্যিতার। কেন
এইভাবে তিনি উবার হাত দিয়ে আমার হয়ে বনের পাখ
তুলে দিয়েছিলেন, তার আশ্রয় গ্রহণও আমার কাছে
গোপন নেই আর। সুদৃশ্যিতা এখন মারা গেছেন, তবু
আমিও আমিই থিয়েটারের মালিক হয়ে পড়ি।
কিন্তু কেনো শুভ-কু-বু-বু। সেই অসমাপ্ত মালিকানার
সমস্যাটাই যে কী ভয়ঙ্কর, সেটা মৃত্যুতে বেশিদিন আমার
সম্মুখ নাগে নি।

আর বিক্রয়?

সুদৃশ্যিতার কথা আমি বুঝতে পারি। আমাকে
মোহন করে টাকা আদায় করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বটে,
কিন্তু নিজের স্বার্থের জন্যে না। থিয়েটারকে দখলই
ভালোবাসাভেদে গুহলোক—নিজে জুবেয়েন তার পেছনে,
আমাকেও ভোবাতে চেয়েছেন মগে মগে। তাই
উদারপাণীকে সেদিন সোজোদনী হিসেবে ব্যবহার করেছেন।
কিন্তু বিক্রয় ইচ্ছে করেই আমার স্নাতনের পথ পরিষ্কার
করে দিয়েছিল। চিরদিন সে আমার উপদেষ্টা দিয়েছে
আর বলেছে, ঠিক আছে নিব্বা। আর্টের দাব্য করা
হুঁম, কত বড়ো জিনিস পড়ে তুলতে বাধ্য। টাকা চাই?
আমি সেন। তুমি পুত্র-শ্রোণ বৃদ্ধ এই কাস্তুরপতলো
সই করে যাও আর কিছু দেখতে হবে না।

আমার বিক্রয় দেখবার দরকারও হয়নি।

কিন্তু না—সুদৃশ্যিতা, বিক্রয় কারো ওপরে আমার
এক বিপদ অভিমোগ নেই। স্নাতনের কথা বলছিলেন।
নিখো স্নাতলে তো আমি বাইনি। না আমি করেছি
তাই আমার কন্ঠ্যের ছিল। আমার পথে আমি
চলোঁহিন্দু—ওরা পুত্র-শ্রোণ তাতে আমাকে সাহায্য
করেছিল যাহ।

হ্যাঁ আমি কৃতজ্ঞ। সুদৃশ্যিতার কাছে—বিক্রয় কাছে।
কারো ওপরে কোনো শাপিন নেই আমার।

বাইরে কে চিৎকার করে উঠল। কেউ না—পাঁচা।
তবু আমি চমকায় চিৎকারটা যেন শুনতে লেগেই রইল।
চমক।

কী চোখ দিয়ে সে আমাকে দেখেছিল! আমি বড়
ডাকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা, তত সে ছুটে এসেছে
আমার কাছে। ঠিক যেনন করে এই মোহবাতিটার
শিখার দিকে পোকাদুন্দো পাগল হয়ে ছুটে আসছে।

—আজকের রাত—পুত্র-শ্রোণ এই রাতটির জন্যে তুমি
চলো আমার হয়ে। একদিনের জন্যে ভোবাকে পেতে
যাও আমার।

—কী হচ্ছে চমক। জগৎ বরি দেখতে পার—

—কে গ্রাস করে ওকে? তুমি চলো আমার সঙ্গে—
একদিন নয়—দুদিন নয়, তিন দিনও নয়। দ্বিদের
পর দিন।

শেষ পর্যন্ত বসন্তবিশুব, তুমি আমার এখানে এসো না।
উষা পরম করে না।

—উষা শয়ন করে না কী আসে দার? ওটি তোমার
হাতপাকের স্রষ্টা? তোমার ওপর ওর বা দাবী আছে,
দামারও তাই। ও কেন তোমার একলা আসলে
শয়রে?

—না চন্দনা দা, এ আমার ভালো লাগে না।

—তুমি আমারকে ভালোবাসো দা?

—না।

—এতটুকুও নয়?

—এতটুকুও নয়।

—আচ্ছা দেখে নেব। দেখব—ওই উষা কতদিন
তোমার ঘরে থাকবে। একদিন ওর হাত থেকে তোমার
হাতি তিনবার নেব—

আমি নেবই।

চন্দনা দ্বন্দ্বোদে আসছেন করিয়ে চলে গিয়েছিল।
সবই শেষ দার।

কিন্তু কথা রাখতে পারে নি। তার আগেই ভগ্ন
লাল চন্দনাকে পরিচয় দিলে। পরিচয় দিলে এখন
মতগার—যখানে কেউ তার কোনদিন তাকে হুঁতেও
পারবে না।

ব্যাপারটা ঠিক কী যে হয়েছিল কেই জানে না। প্রকৃত
জিহ্মান লক্ষণপাল—দুগ্ধা আর ভীষের ভূমিকা ছিল দার
কতটুকু তার আকর্ষণীয় হয়ে হয়ে যে আকর্ষণ
দ্বন্দ্বের বাণী বাসন্ত—তার হলের ভেতরে কখন
স্বত্বকান উঠেছিল আমরা কেউ ভা টেকও পাইনি। সে
টুকু বয়েছিল, চন্দনা আর তার দর—চন্দনা তাকে আর
হিতে পারে না। কিন্তু অমন ভোজান হাবুদটা অত
দ্রুতই নিখোঁদ হাতি হস্তে হিতে চায়নি।

শেষ পর্যন্ত হলের প্রাসে বিন মিশিয়ে বাঙালো
ন্দনাকে। তার পর কড়কাঠের দপে গতি বেঁচে অত
ভো শরীরটাকে অবলীলাক্রমে হুলিয়ে দিলে। অমন
লেকা গতিটা তার বিশাল দেহের ভারটা কী করে দাঁদ—
গা ভাবতে আতঙ্ক আতঙ্ক লাগে আমার। ধর শেরে
হস্তে গিয়েছিলুম।

বেকের ওপর বিবে দাঁস হয়ে এগিয়ে আছে চন্দনার

শরীর—আগলো ইতিমধ্যেই হস্তো তার আকর্ষণ পাগে
হস্ত কী বস্তুত বিবর্ণ হয়ে গেছে। বসন্তগার বিকৃত
হুঁ। আর তার হস্ত শরীরটার ওপর ভাষা ফেলে
করাকার ফেট্টা দৃশ্যে লগ্ন পাগে—যেন হুঁচার পড়েও
ওকে পাহারা দিচ্ছে। তার হাতি দেন কিছুতেই
হাটবে না।

আর একদান চিঠি বেধে গেছে লগ্ন পাগে।

“আমি হলের দপে বিন বাঙালো চন্দনাকে হুঁ
করিয়াছি। আমার কানি হুঁত। কিন্তু পূর্ণলপকে
আর সে কট আমি হিতে চাই না। তাই নিজেই
কানি দিলাম। চন্দনা এবং আমার হুঁচার লুনা একদা
আমিই হারী।”

না, চন্দনার ভন্যে আমার কোনো অনুভূতি নেই।
ওর দপকে আমার হলে কখনো এতটুকুও দৃষ্টতা
জাগে নি। আর চন্দনাও কি আমারকে ভালোবেসেছিল?
ভাতে আমার দপেই আছে। আসলে লগ্ন পাগের
যে নিষ্ঠুর হাটুর স্রো ওকে ঘিরে রেখেছিল—তাই ওর
নিঃশ্বাস বন্ধ করে এসেছিল, যে কোনো এটা উপায়কে
আদর করে তার হাটের বেরিয়ে আসতে চেষ্টেছিল চন্দনা।
আমি না হয়ে সে যে কেউ হতে পারত—আমি একটা
উপলব্ধ হাত।

অভিনয়ের ভীষনে হুঁচা আমি অনেক ঘেঁষেছি। ঘেঁষেছি,
নিয়োগিন্ অক শিভারে লক্ষ্যিত হয়ে বসতে—ঘেঁষেছি
একদা শব্দাধন্য অভিনেতাকে অন্যায়ের বসতে, যে
অভিনেত্রীর পারের ওদার কলকাতার অনেক হস্তো
হস্তো ধবীর-দাবা একদিন লুটিয়ে পড়ত—বর্তন ঘরে
কি ভাষে এক হুঁচক হুঁলে সে শেষ নিঃশ্বাস ফেলত,
সে হুঁচক আমার অধোনা দর। আসলে অভিনয় করতে
করতে জীবন-হুঁচক হুঁচক-দৃশ্য সব এক হয়ে দার—তখন
সব কিছুই পাইভারের কদা হুঁচকো পেইন্টের দার
দর আদনার হস্তো বিচিত্র হয়ে ওঠে—বা লতা লগ্ন
লতা দর। আতঙ্কের অভিনয়ের সাক্ষা কালকে যেমন
অবলীলাক্রমে কবিরের পাটে—দার, টিক ভেতনি করেই
একদিনের সৌভাগ্য বন্দ হুঁচকোয় হুঁচক বর, তখনো
তার হস্তো কোনো কোন্ড থাকে না। সেওতো পাট
কলানো দার। আর হুঁচা? হিনের, পর বিন

খিচোরের ঠোঁটের নৃত্যের মতো দিতে দিতে দেখকালে সত্যিকারের নৃত্য যখন আসে, তখনো জীবনের সব চাইতে বড়ো ক্র্যাপটা ছাড়া আর কিছুই চাইবার থাকে না।

অপ্য পাল আর চন্দনা মনে ছিল কোনো ভালো প্লেন-এর পের নেশার মতো, বর ভালো অভিনয় করতেন। আর মনে মনে ক্র্যাপ দিয়ে বলেছিলেন, বাঃ—এই তো বাসা। এর বেশি আর কী চাই ?

সিনিকের মতো শোনানোই ? না—না। এই ধর—এনিই হওয়া উচিত। শোক-বঃ-শূন-আনন্দ—এদের প্রত্যেকটি আবেগকে যখন দিনের পর দিন অভিনয়ের মধ্য দিয়ে কুটির তুলি, তখন তারা পুরো সভ্যও থাকে না—পুরো বিধেও নয়। সেই সভ্য বিখ্যার সঙ্কল্পে গাঁড়িরে—শেষ পর্যন্ত নৃত্যেরই দীঘারোহা হারিয়ে যায়। তখন আমরাই সত্যিকারের দার্শনিক হয়ে উঠি। এত বেশি তেঁদেরি যে আর কারা আসে না ; এত বেশি আবেগ জাগিয়েছি যার যার যে আসেগের সমস্ত উৎসই শুকিয়ে যায়।

আম্র সেই দৃষ্টি নিয়েই দেখছি জীবনকে। নৃত্য নেই, নৃত্য নেই, প্রতিবার নেই, প্রত্যাশাও নেই। এই ষ্টপতক ব্যক্তি ছেড়ে যেতে তাই আমার এতটুকুও নৃত্য নেই, বা কিছ, করছি তার জন্যে কোনো প্রতিজ্ঞা মনের কোথাও আসে না।

মনে আছে, তখন খিচোর আনিই চান্সি। চারদিকের দেনা আর কড়-ক্যাপটার বয়্য দিয়ে এগিয়ে চলছি পথ কেটে। সেই সময় একটা বলদার বেম্বর এল। গাড়ীর দিকে এক বাগাবাফিতে।

উষাকে নিয়ে আমি সেলুয়। স্টো-অন্দের ভাঁড়ের মধ্যে দেখি বিস্কুকে।

—হ্যাঁ যে তুই এখানে।

অ্যাডভোকেট বিস্কু এসে পরম ভক্তি ভরে আমাকে আর তার 'বৌ'কে প্রণাম করলে। যেসে বললে, হুকুমাবাদ, আমারও ক্র্যাপ্টে কিনা। তাই ছাড়লেন না—আগভেই হল।

কিন্তু বিশ্বাস সেখানে নয়। যে বাইজীটি আম্রের পানের 'আফসর্প', সে হঠাৎ সকলের মাক্যান থেকে

এগিয়ে এল। তারপর ছাত্রা বায়লার বললে, দমস্তার চিনতে পারেন ?

হুকুমতের জন্যে ক্র্যাপের শরমে কতগুলো এলোমেলো রেবার ভাঙের লেল। তারপর আমি বললুম, সন্তুসতী ?

—জী হ্যাঁ। ঠিক চিনেছেন।—পালে সত্যতো ঠোঁটে হাসির কিছু যেবা ছিল, কালো স্মৃতিচানা চোখে চক চক করে উঠল : তবে এখন মার বসেছি। মোতি।

—মোতি।

—জী। ওই নামেই সবাই এখন আমার চেনে।

আমার হকের মধ্যে সেই কড়ের ক্র্যাপটা ভেঙ্গে উঠতে চাইছিল, কিন্তু অনেক অভিনয়ের পর, অনেক আবেগ নিয়ে হিন্দিবিন কববার পরে আঠারো বছরের সেই দিনগুলোকে আমি হারিয়ে এসেছি। দমস্ত হবার চেষ্টা করে বললুম, তুঁধি বলকাতার এসে কী করে ?

—আমাদের আর ঠিক-ঠিকানা কী, সারা হিন্দুস্তানই তো আমাদের ঘর। এক বছর আমি এখানে। আশনার খিচোরও আমি দেখেছি। তখনই জানতুম—বাবু দশী লোক।

হুকুমাবাদ—আম্রের গুম্ফারী এগিয়ে এসে।

—আলাপ আছে নাকি ?

—যোদ্ধা জানু গুচ্চান ছিল বছর কয়েক আগে—সন্তুসতী হাসল, তারপর বললে, আম্রা—দমস্তে পরে দেখা হবে হয়তো।

বিস্কু হাসল, আর্টের লাইনে মারা থাকে, তারা নিম্নস্নাকে সবাই জানে।

অ্যাডভোকেট বিস্কু সে হাসির একটা অন্য অর্থ ছিল। আম্র সে অর্থ বুঝতে আমার থাকী নেই।

আমার পাশে চুপ করে গাঁড়িরেহেল উবারাণী। তার দিকে একটা নীকা দৃষ্টি ফেলে মন্থ মেসে চলে সেল সন্তুসতী। বিস্কু এতটুকু ছাত্রা শব্দ না উবার মূখে—এক বিস্কু বৌতুলও নয়। এই গণ্ডা ওর বয়সের বেগেছি। অনেক দিন ওর দলে কাটিয়েছি, মনে হয় ভালোও বেগেছিলেন। ওর সঙ্গকে কোনো একনিষ্ঠতার প্রতিশ্রুতি আমি কোনোদিন দিইনি—

ও—ও কখনো দাঁবি করেনি। চন্দ্রনাকে আমি গহন করিনি, গুণ্ডা জগৎ পালের পাগলামির বরও জানতুম—তাই চন্দ্রনাকে কোনো রকম প্রত্ন দিতেই আমার বাধত—বনে হত, জগতের দলে আমি বিশ্বাসাতকতা করছি। তাই বলে, উবাই যে আমার একতরা ছিল, এত বড়ো মিথ্যে বলতে পারব না। বনের বাথার কত জাবগার উখায় রাত কাটিয়েছি—এক রাত হুংগারের কত শিশ্ননী এসেছে সেয়ে—তারের সকলের কথাও আমার মনে নেই। উবা কোনদিন তার জন্যে এওটুই আপত্তি তোমোনি, কখনো বলেনি, এ তোমার আবার হচ্ছে। আসলে থিয়েটারের সেই নির্বোধ তাকেও স্পর্শ করেছিল।

যখন বেশার বোর কেটেছে, দাদা চোখে ভেবেছি নিম্নের কথা, তখন বনের ভেতরে হুটি মেয়েকেই আমি দেখেছি—বহুবল্লভের সেই অসংখ্য নৈশ-নারিকায়ের এওটুই হ্যাগাও আর চোখে পড়েনি। একজন আমার প্রথম দৌরনের প্রথম শাকী, আর একজন অনেক হুংগারের প্রায় দীর্ঘ সজ্জারপী—সেই সঙ্গতী আর কাউকেই কোথাও আমি দেখতে পাচ্ছি না।

কিন্তু ততকথা থাক। সেই রাত্রির জলসার আর একটা জিনিস ভুলতে পারিনি আমি।

তানপুত্রা নিয়ে প্রথম যে গানটা হয়েছিল মোতি—তাতে আমি চমকে উঠেছিলাম। এ সেই গান—বা ডান্স-কি-মণ্ডার সেই বেলাহগানো প্রথম সজ্জাটিতে প্রথমে শুনিয়েছিল সঙ্গতী। বা আমি শুনেনেও শুনিনি—বা আমার চতবার মধ্যে ছেঁড়া শব্দের মতো করে বোঁড়িয়েছিল।

ইচ্ছ করে আমাকে শোনাবার জন্যেই গানটা আরম্ভ করেছিল মোতি? কিংবা নিত্যন্তই যোগাযোগ?

আর সেই সঙ্গে দেখেছিলাম, ঘরের ছোরাগুলো আসোয় তানপুত্রার বেখানে জর আসলসুলো দানবদ্বন্দ্ব বেলা করছে, সেবার থেকে ঠিকরে ঠিকরে উঠছে একটা উল্লসে বারালো হুঁত। একটা হীরের আংটি। কিন্তু ওই আংটিটাকে কি আমি চিনি।

১৯-২০ টি না আমার চিরজীবনে? আমার কত

আঙুলে যে আংটিটা এখনো রয়েছে, সেই কড়ো রাত্রিতে ওই আংটিটার সঙ্গেই কি সেটা বন্ধ হয়ে দারিনি?

বিশুদ্ধ আমার চোখের পলক পড়ল না।

কিন্তু যে জগত সভ্য নয়—অথচ মিথ্যাও নয়—আমি সেই জগতের মানুষ। আমার কাছে সব সমান।

এতদিন—এত ঘটনা—এত অভিনয়, প্রতির ভেতর সবসুলোকে এখন আর গুঁহিরে ভুলতে পারছি না। কতগুলো ছাড়া ছাড়া ছবি আসছে এখন। আমি তাদের বাছিনি, সাজাইনি—আমার চিত্রার ভেতর থেকে আপনাই যেন সেগুলো নির্বাচিত হয়ে আসছে আমার মনের আড়ালে কোথাও একটা মন রয়েছে—সেই তারের গামনে এগিয়ে নিচ্ছে। আমার কিছু করার নেই

ঠক—ক’—ক’—ক’—ক’—

বিশ্বী কর্প আওগায়ে তখন ডাকল—আমি চমকে উঠলাম। আমার ঘরের মনেই ডাকছে। এতদিন তো ছিল না। আমি চলে যাওয়ার আগেই ঘরের দরজা নিতে চাইছে নাকি? নিক—তাই নিক। আমার আর কোনো রাস নেই কারো ওপর—আমি আর কোথাও কোনো দাঁবি রাখিনা নিম্নের জন্যে।

কাল সকালেই এ ঘর থেকে চলে যাব।

আবার ছবি আসছে।

থিয়েটারটা হাড়ছাড়া হয়ে গেল। বেকার। বিশ হাজার টাকা অন্তলে তালিয়ে গেছে। আরো যে কত সেয়ে, তার হিসেব করবারও আমার শক্তি নেই। একটা রাত পুত্রা মন নিয়ে বোর্ডেছিলাম—হঠাৎ উবার সঙ্গে বানিকটা বিশ্বী বসড়া হয়ে গেল।

বলেছিলাম, ছবি আমাকে অতিক্রম পড়ে আরো কেন। নিম্নের পথ বুঝে নাও।

—কোথায় যাব?

—তোমার জাননা কী? হুংগারী থিয়েটার তো ডাকছেই। সেসেই পারো।

—ওই মাইনেতে যাব? আমার একটা সম্মান আছে না? আমার চাইতে বহুনায়ে ওয়া বোর্শ মাইনে দেবে—কোন সম্মান কার্য করব সেখানে? আমি পারব না।

আমার বাথার ভেতরে ছালা করে উঠল।

—কেন তোমাকে মাইনে দেবে বন্দুর চাটতে বেশি ?
ওর এখন উঠতি বয়েস—কত জ্ঞানার। তুমি পরিত্রাণ
শেখিয়ে গেছ—হিরোয়ানের পাটে পার্বলিক আর দিতে
চার না। ওরা যা দিচ্ছে, তাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট
এখন।

উষা বরার চুপ করে থেকেছে, পার্থকে কোনোমিনি
তক' পর্যন্ত করেনি আমার সঙ্গে। আজ হঠাৎ বিদ্রোহীভাবে
চিৎকার করে উঠল সে। ওর চোখ মূর্খের চেহারা যেন
বলে সেল।

—আজ তো এ কথা বলবেই তুমি। আমার বর্ননা
করে এখন তুমি সাধু শাস্ত্র !

—উষা।

—বলবেই তো স্পষ্ট কথাই বলব। পাঁচ বছর আগেও
আমাকে অন্য খিরেটারে সাহায্য করতেন চেয়েছে, কত
টাকা দিতে চেয়েছে, সেদিন তুমি আমার যেতে দাওনি।
বলেছ, 'যে খিরেটারে আমি নেই, সেখানে উষা নামতে
পারবে না।' আর আজ আমার যেরূপ হয়েছে, বাজার নষ্ট
হয়ে গেছে, এখন তুমি আমার সোজা রাজ্য দেখিয়ে দিচ্ছ।
অসম্মত বিরক্তিতে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

—চুপ করো, সকাল বেলাতেই চৌকিরো পাগলের
হতো। আমার মন-বোঝা ভালো নেই।

—তোমার মন-বোঝা ভালো নেই তো আমি কী
করব ? কী ভুলই করছি গার্য জীবন। সেবার যখন
উজ্জ্বল সেই রাজকুমার আমার নিয়ে যেতে চাইল, তখন
তাকে আমি দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলাম। কী
জানুই তুমি করেছিলে আমাকে। এখন ভাবছি, কী ভুলই
করেছি—আজ আমি রাণীর হাঙ্গে থাকতে পারতুম।

আমি তীর কটু গলায় কী বাসিকটা সূক্ষ্মত গাল
দিয়েছিলাম—হঠাৎ থমকে যেতে হল। মেঘলুদ, উষা
ছুটে গিয়ে বিজ্ঞানার গড়কে, বিজ্ঞানার মূখ শূন্যের কোঁসে
চলেছে পাগলের হতো। আর সেই মূর্খের অদ্ভুতালের
একটা উচ্ছ্বাস ভেসে উঠল বুকের ভেতরে। উষার
কথা তো সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। আমারই জন্যে—আমারই
হতো ও আজ কেউলে হয়ে দাচ্ছে। কোন শনিগ্রহের
দূর্বোণ খেলেও এ এখন করে জড়িয়ে সেল আমার
জীবনে। আমি তো জুর্বাঁই সেই সঙ্গে ও—ও ভুলছে।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ওর মূর্খের দিকে তাকিয়ে থেকে
বেরিয়ে পড়লাম।

কোথার বাব ? একবার হবে হল, বিজ্ঞান কাছ
দাই। ও এখন কলকাতার জাদী অ্যাডভোকেট—
বালীগঞ্জে বাড়ি করেছে। চিন্তাও এখানেই বাবলা করে।
কাকীনা কলকাতার বিজ্ঞান কাছ চলে এসেছেন—বোন-
গুণের বিয়ে হয়ে গেছে, সবচেয়ে ছোট ভাই মৃদু—
মৃদু প্রেসিডেন্সী। কপেকের ছাত্র। সেলের বিবর-
সম্পত্তির কর্মচারীদেরই হাতে, তাগাই যা ইচ্ছে দেখানো
করে, ওরা পুছোর ছুঁতে কখনো কখনো সেপে যায়।

বাব বিজ্ঞান কাছ ? গিয়ে বলন, আবার বাজার
বিশেক আমার সে ? সম্পত্তির কিছু অংশ কি আমার
এখনো নেই ? যদি না থাকে, তবে বারই সে, আমি
ধীরে ধীরে শোধ করে দেব।

কিন্তু আমি, টাকা সে আর সেবে না। দু বছর
আসেই বলেছিল, তোমার যখন সবটাই কিছু বেতে দিলে
নিম্না—কিন্তু আর বইল না। অ্যাডভোকেট হিসাবে
যে বিজ্ঞান ওর মূর্খই এখনভাবে পণ্য করিয়েছে, তার হাত
থেকে আর একটি পণ্য বেরিয়ে আসবে—এখন এ মৃদু
ছাড়া আর কিছুই নয়।

আর বার ? খিরেটারের জন্যে টাকা দিতে কেন
পাওয়ার আশা না—অন্য কাঁচা সোজা বিজ্ঞান নয়।

চাঁদ ডিপোর ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি কী করব,
এখন মনে কে এসে আমার প্রশ্ন করল।

আমি চমকে মরে গিয়ে বললাম, আশান—

শেখি, মরলভী। মোড়ি বার নাহ। পড়িয়ার
বাগানবাড়িতে আজ তিন বছর হয়ে থাকে ভরস-শোষণ
করছেন মৃদুস্বাব্দ।

মরলভী হেসে বললে, কালীমারের মন্দিরে গিয়েছিলুম
বর্নন করতে। বেকিরে আসছি—শেখি তুমি দাঁড়িয়ে।
মনে হল, তোমাকেও প্রশ্ন করি একটা।

এই তিন বছরে মরলভী মৃদুস্বাব্দুর সঙ্গে খিরেটারে
গেছে কয়েকবার, আমি ওদের বক্কে বলে থাকতে
সেখছি। আরো দু দিন গিয়েছিলুম পড়িয়ার বাগান-
বাড়িতে গানের জলদায়। মরলভীর সঙ্গে বহুবার
বিদিক হয়েছিল, কথা হয়েছে টুকো টুকো।

মহাশয়, ভালো আছেন? থিয়েটার ভালো চলছে?
উষা: হ্যাঁ, ভালো আছেন তো? কিন্তু কাশী সেই
দিনগুলোর পরে সে তো কখনো আমাকে খুঁবি বলেনি।

আমি আতঙ্ক হয়ে কিছুক্ষণ চেষ্টা করছিলাম ওর মনের
দিকে। না—কোন ভুল নেই। সরস্বতীও বলেন
হচ্ছে। মন সোজা হয়েছে, সেই নাটকের মধ্যে বাঁচা
গিটার আর নেই, চিৎর হয়েছে। আতঙ্ক—সব কলার।

একটা চন্দ্র করে থেকে বসলুম, হঠাৎ প্রাণ
কমলে কেন?

সরস্বতী হাসল: হেইলু, আমবা—তাই।—তারপর
কিছু কিছু বললে, আর কী বার বলা তো?

—নিবারণ।

—কী তারিখ? আরেকটা তারিখটা বসো।

মোহনাবিন্দু শেখ নিখা

। ১ ।

এক সপ্ত-চার পাঁচটা পেয়াল ভেঙে উঠল ঠিক
মানসার। বাইরে। আমি চক্রে ভেঙে উঠলুম।

ভেঙেছিলুম কিছুতেই বুঝাব না—অত ঠিক ঘুরিয়ে
পড়েছে! কখন চোরের মতো ঘুরে নেবে এসে বলের
মজার পাছাটাকে হটিয়ে দিয়েছে। নিজের ওপরই হাস
ল। এ সেই পিতৃহৃৎসবের চক্রান্ত। আর কিছু
পাছুক আর নাই পাছুক—অন্তত আতঙ্কের হাতটিতেও
আবার বলের ওপর বানিকটা কুহক হুড়িয়ে দিতে চায়।

কুহক থেকে গড়িয়ে আর এক স্নান জল সেলুম—
পেটের মধ্যে কেন একটা বাজা লাগল। অনেক পরে
এখন আমার লিভারের বন্দ্যটা চের পাচ্ছি। কিন্তু
আজ রাতে আমি কাউকে গ্রাস করব না। আজ নিজের
ওপর সম্পূর্ণ অধিকার বজায় রাখব আমি।

হাত ক'টা এখন? বোধ হয় তিনটির ক'টা পেঁয়ালে
সেজে। উদ্ভাসের ওপর যে বহা ছোয়াছটা ভাসছিল,
সেটা বেন কখন মিটিয়ে গেছে—ভরল অন্ধকার আতঙ্ক
হুড়িয়ে তার। মানসার ভেতর দিয়ে লেগা থাকে
মানসার পূর্বা বহলগুলো গারি গারি কবরের হতো
গিঁড়ে—কিন্তু গারি গারি শোভা প্রবলী বোলা।

বসলুম, সবচেয়েই আগন্ত। কিন্তু তারিখ জানতে
চাও কেন?

—এবন।—সরস্বতী আমার হাসল: ওই যে আমার
হালিক আসছে—আমি বাই।

হেখলুম, একটা দোকান থেকে কী কতগুলো কিনে
শামনের মোটরটার দিকে এগোচ্ছেন মনুষ্যবান্দু।

সরস্বতী চলে গেল। পেঁয়ালে আমার মনের ওপর
রেখে গেল স্যোমান আর চন্দ্রনের গন্ধ। একবারের অন্য
মনের ভেতর একটা আসোক্তন কুটে উঠল আমার।
এমনি একটা গন্ধ আমি আগেও পেয়েছিলাম। কিন্তু
সে করে?

সেই সময় একটা হ্রাস এসে মানসার দিয়ে—বাঁড়িয়ে
পড়ল। সরস্বতী হারিয়ে গেল চোখ থেকে।

আমিই জ্বালিয়েই শেখ আসো। আমার হাতেই
এর বিনাম।

তা যদি না হত, যদি আমি পেঁয়ালও গ্রহণার্থী
হোতামূল্যে কতক, তা হলে এখন ভাবে সব কুড়িয়ে যেত
না। কিন্তু নিজের সব পুষ্টি দিয়ে কলকাতার কায়দা
হয়ে বসত না, চিন্দু আর মনুষ্য নিজেরের মধ্যে হালকা করে
কড়র হয়ে যেত না। চিন্দুর বান্দা সোজে—

এখন সে কোন্ বাহোয়াকী কার্মে ঢাকরি করে।
মনুষ্য মানসার মনুষ্য টাকা হাইনের ঢাকরি নিয়ে কিভাবে
কোন্ এক নব্বয়ে পড়ে আছে।

সব বৈধী হয়ে গেছে, এই শৈশুক বাঁড়িটাও। শেখ
পাঁচটা বহর আমি মনুষ্য মনুষ্যের পড়েছিলাম—মানসার
হাস থেকে করা বেন এই বাঁড়ি বহল বেনে। আর কাল
আমি চলে যাব।

চিন্দু আর মনুষ্য পাঁচটা করে টাকা পাঠাত, তাদের
অন্যত্রয়ের দান নিয়ে কোনো মতে আমার দিন কাটছিল।
তারের লিখে দিয়েছি, আর টাকা পাঠানোর পরকার নেই।
আমি চলে যাচ্ছি।

অন্ত আমি যদি ব্যাকরে আসব না পিতৃ, এরম জ্ঞান

সব যেত না। এইভাবে সব গিরে পড়ত বা বিহীন
ধর্মের ভেতর। কিন্তু সে আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল।
সেদিন খাতার সব তাকে ধরা সুরের পাঠে বিনে,
সেই দিনই সে চ্যালেঞ্জ করেছিল আমাকে। আজ পুরো
ক্র্যাপটা সেই নিম্নে, আর আমি পড়ে আছি কঠিন
সৈনিকের ভূমিকা।

মোমবাতির আলোটা জলে জলে একেবারে নীচের
দিকে চলে এসেছে। অত বড়ো বাড়িটা কী ভাবেই যে
পড়ে গেল! নত শাবা অঘাট বাঁধা ঘোনের ভেতরে
অসংখ্য পোকের সবুজ। ওই আলোটার বড়ো আদম
জলস্রব—সুন্দর, পূর্ণিমে বাসল।

অঘাট? পাণ? না—কিন্তু নাও নর। জলস্রব
জলাস্রবও একটা অধিকার বাধা চাই—সকলের তা
থাকে না। পূর্ণিমে অধিকাংশ মানুষই আনন্দটা ভিত্তি
কপড়ের মতো, নিম্নের ছোট বাড়িটা সুন্দর-সুন্দর নিয়ে
দিনে দিনে পড়ে, গলে যায়—বাঁধিত যায়। সুন্দর
সুন্দর-সুন্দর আসে এই মোমবাতির মতোই—নিম্নে জলে,
অন্ধকে জলাস্রব, অধিকাংশ ওটা। আর—আর—আজ্ঞার
আলো অতঃপর কিছুকালের জন্যে উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে
দিয়ে যায়।

আমি সেই ব্যক্তিরই একজন। কেন লক্ষ্য পাব?
কেন বোঝ করব অনুভূতি?

আমার শব্দ অঘাটের কথা ভাবছি।

উঠেছিলুম বত পড়ে, তার চাইতেও দূরে যে
গেলুম। নতুন করে খিচোর তৈরি করার সময় নিয়ে
সরকারি ধরকার ঘুরেছি, কেউ আর আমার তখন
বিশ্বাস করে না। ব্যাটারে গুড়, উইল আমার নষ্ট হয়ে
গেছে। তারও পরে এসে গেছে সিবেরা নতুন ঘাস।
হবি কথা বলতে পুরু করেছি। খিচোর ভাঙছে—
হাত বলাচ্ছে—আবার ভাঙছে, আবার কোড়া-জড়া
দিয়ে চলছে কিছুদিন। মানুষ পাগল হয়ে উঠেছে
সিবেরা সেপার।

চতুর্দশ কবির পান আজ বাংলা সপ্তকে বাড়িয়ে
দিয়েছে:

‘হুঁসোনা হুঁসোনা বঁদু ওই বাবে থাকো
বুঁদু লইয়া চুঁচু হুঁসোনি মেঘো—’

সে ছবি আমিও দেখেছিলুম। বাতাল করবারই
মতো। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও বুকেছিলুম, আবার দিন
কুরিরে আসছে। পুরু আমি? গিরি ভাদুগীর মতো
সুন্দর তখন বেবের হাজার জুনে থাকেন। নিম্নে
লাহিড়ী বই পাচ্ছেন না—আমি নিম্নেলাহিড়ী
আছি কোথায়? মান-অভিমান সব বিসর্জন দিয়েছি
পরে। যে-কোনো খিচোর যে-কোনো চাকার পাঠে
বসে বসে। কিন্তু কোথাও তিঁতে পারি না। অসংখ্য
বাতাল হয়ে গেছে। আমাকে বিয়ে আর কাজ চলে না
বনে পড়ে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেছিলেন, সন্দেহ ছাড়া
শিল্পী বড়ো হয় না। এই গোড়া কথাটাই বনে রাখা
পার না বলে তোমরা কোটবার আসেই করতে
পুরু করে।

করবার পালা এখন আরম্ভ হয়েই গেছে, তখন ও-ধর্ম
কথা ভেবে আর কী হবে। বড়ো পাঠ করি এ-দিকে
ও-দিকে। সব রাতে ঘরেও কিঁরি না—বাতাল হয়ে
ও-বাড়িতে পড়ে থাকি। কাশীঘাটের বাসা কবে মেটে
দিয়েছি, এখন দুখান তিনের বর নিয়েছি ঠাণ্ডা
দিকে। বলতে গেলে উবাই এখন শংলার চালায়। সে-ও
আমার মতো ছোট-বাড়ি পাঠ করে, কখনো কখনো
অ্যাংকোরবের অভিনয়ে চল্লিশ-পঞ্চাশ পার। আজ আমি
তার গল-এব।

কিছুদিন হাতে কোনো কাজ ছিল না। সন্দেহ
বোকার। উবা একটা দলের সঙ্গে কোথায় গেছে
খিচোর করতে। আমাকে সঙ্গে নেবার জন্যেও তবির
করেছিল, কিন্তু খিচোরের কর্তারা বলে দিয়েছেন,
তারা অভিনেতা চান, বাতাল চান না।

উবা যেতে চায় বি আমাকে ছেড়ে। পুরু কে’বেছিল।
—তোমাকে নিয়েই বত ভাবনা আমার। আমি
চলে গেলে কী করে বলবে কে জানে।

বলেছিলুম, কিন্তু ভেবে না, আমি ঠিক থাকব।

উবা বলেছিল, কিংবদন্তি হয়েতো আমার বেড় বাস-দুদাস
যেহী হবে। দোহাখাল, চিটাগাং, কুঁচিয়া, ঢাকা,
বিশ্বনাথ হয়ে তারপর কিংবদন্তি। কিন্তু টাকা রেখে থাকি,
বন যেমন পারি পাঠাব। দোহাই তোমার, হাইপার
বোঁশ মেঘো না। আর বা বাও বাড়িতে বসেই মেঘো।

ভোতার পাবে পীড়, এদিক-ওদিক বেঘো না।

—না-না, আমি ঠিক আছি।

—আমার যা হইবে শব্দ করে তুমি ভালো থাকবে ?

—থাকবে।

ঐশ্বর্য বিদ্যমান করিনি। কিন্তু না করেও তার উপায় ছিল না। অনেক টাকা পাবে। আরামের সুদিন চলে গেলার পর এত টাকার মূল্য সে একদম্পে আর দেখেনি।

কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা রাখতে পারিনি।

‘তিন চারদিন সংঘত হবে থাকতে চেয়েছিলুম, তারপর ক. দ্বায়ার কোনো হান্সই আর আমার মনকে বাঁধতে পারল না। দূরতে দূরতে ছাড়িয়ে হলুম এক বিশালাকায়ের সোফাতে।

এখনটাই হচ্ছে ছিল একটু গলা ভিজিয়েই চলে যাব। মনে একবার বসে যেই পবিত্র ভাঙ্গল, তখন তাকে কে রে টেকার ? ভিজিয়ে রাখায়েই নিছকের বাইরে চলে গেলুম।

তখন সেই আলাপটা আমার কানে এল।

—আমি আচ্ছা বিয়েটারে ?

আর একজন বললে, দুঃখ—কী আছে বিয়েটারে ? সেবার বাই।

আমার বেশা ধরা বসলে হঠাৎ যেন আগুন কুটে গেল। হঠাৎ মনে হল, আচ্ছা আমার যত দুঃখ—যা হুঁ বিড়ম্বনা, তার জন্যে এই লোকটাই দায়ী—এরাই আমারে বাঁচবার পথ বন্ধ করে দিচ্ছে।

লোকটার বিকে আরও-বসি ফেসে বললুম, কী বলেন আপনি বিয়েটার সম্বন্ধে ?

সেও ভবন বাতাস। অসুস্থি করে বললে, বললুম যেটার অতি মজার। কোন ভুললোক দেখে না।

আমি বাঁধিয়ে গেলুম, কটা জ্বললোক দেখেছিল হুঁ ? বিয়েটারের ছুই কি জানিন।

সেও উঠে গাড়ীসো তৎক্ষণাৎ। ঠাস করে আমার সে একটা চক্কর বসিয়ে বললে, দুঃখ কর, শালা বাতাস।

এক বক বক করছি তো এই বোতলের ঘরে বাবা

বোতলটা সে ভুলতে ছাড়ল, আমিই আমারটা ভুলে নিলুম তার আগে। তারপর—

বোতল ভাঙ্গল বোমার মতো আগুয়াক করে। বিকৃত চিৎকার ভুলে মাটিতে পড়ল লোকটা। আমিও কটা হস্-কানো নদ আর ভাঙ্গা কাচের সোটা করে কটকটো ছিটকে এলে আমার মূর্খে লাগল।

চারিদিকে চিৎকার উঠল : বুন—বুন। —আমিও যেন একবার ভাঙ্গা গলায় বললুম, বুন। আমার বাঁ-কানের ঠিক ওপরটার কে যেন একটা সোলাস দিয়ে বা মারল। আমি মূল্য বুঝতে গেলুম—দুঃখের লুপ্ত হল।

হাসান পরে বেগলুম জেল থেকে। চরম হয়ে গেছে শুধন।

আমি নিঃশব্দে চৌকুরী। ত্রাঙ্কনের মতান। বিশ্বাসঘাতকতা দিয়ে গড়া এক জীবনের ধ্রুপদ আমার জন্যে হয়েছিল। আচ্ছা লক্ষ্য-মানির শেখারীয়ার সৌন্দর্যে দুঃখ-দুঃখের পাশের শেষ প্রান্তিক হয়েছি।

আমি বিয়েটারকে ভালো বেগেছিলুম। শিশুটি হতে চেয়েছিলুম। কিন্তু এই কথাটা ভাবিনি শিশুটিও সাধনা। জানতুম না, বীরত্বের তত্ত্ব সব প্রয়োজনের উপকরণই আছে, কিন্তু তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পারাই শিখি। যখন বুঝেছি, তখন সাধনার আসন ছেড়ে আমি বেড়িয়ে এসেছি গভীর বাইরে। এখন আমাকে ঘিরে ঘিরে জাকিনীর উৎসব—কবিত্বের মৃত্যু।

অনুভূতি ? না—অনুভূতি আমার নেই। পাপ আমি করিনি, মৃত্যু আমারও ছিল। দুঃখ—হ্যাঁ, দুঃখ আছে। আমি প্রমাণ করতে পারলুম না কতবড়ো নীতি দিয়ে এসেছিলুম ; সেখানে পারলুম না—একদিন মিথের ছোঁয়ে শিশুহত্যারের কাছাকাছি আরণ্য করে সেবার যোগ্যতা আমার ছিল।

কিন্তু সে কথা আর নয়। বা হতে পেয়েছি তাই আমার পরিচর। বা হতে পারেনি—সে হয়তো আরো বড়ো মত, কিন্তু আমি হাচ্চা সে-কথা আর কেউ জানবে না।

আমি, লিভারটা আমার মস্তিষ্ক মোচর দিচ্ছে, মারা পরীর কিসকিস করে উঠছে। তবু এই মস্তিষ্কে আমি ভাবব। এই বাড়িতে শেষ হৃদয়ভাটি কাটানো পরে

কোনো পুঁথিগতকে এতটুকুও আমি প্রমত্ত দেখ না।
কাল যখন পুঁথিবীর পথে বেড়িয়ে পড়ল, তখন আর
কোনো ভাবনা রাখি না। যা হওয়ার তাই হোক।

মেল থেকে বেড়িয়ে আমি আর উবার কাছে গাইনি।
আমি বুঝতে পারিছিলুম—অনেক দেরী হয়ে গেছে,
তবু এবার ওকে আমার হুঁকি দেওয়া উচিত। নিজে
আর আমি বিশ্বাস করিনা। এর পরে হয়তো এক
দিন ওকে বুন করে—ওর নামান্য যা গমনা আছে তাই
নিরে আমি পালাতে চেষ্টা করব। একবার যখন 'বয়ের
কৌকে' নামের বাবা ভালপড়ে পরেছি, তখন আমি সব
পারব। আর কিছুই এর পরে আমার ব্যবসেনা।

টালিপক্ষে আমি সেলুম না। তার বসলে চলে এলুম
রাবাবাসনে।

দরজা বসে গিয়ে বেয়েছি অথাক বিশ্বরে চরে হইল
আবার দিকে। বললে, নির্মলতা!

আমি বললুম, অলি, তোর ঘরে আমার কাঁধ
থাকতে দিবি? আমার কেউ নেই। দু'বেলা
দু'কুঠো খেতে দিবি, আর সোজা একটা করে বারো
আবার বোভল। পারবিনা তাই?

অলি—অসকার চোখ দিয়ে জল পড়ল। এই
মেথডিকে আমিই একদিন আবিষ্কার করেছিলুম, উবার
করেছিলুম নখদলের উপেক্ষার দীনতা থেকে। আর
তার অনেক নাম হয়েছে, একটা বড় ঘিরেটারের
নামিকা সে।

অলি বললে, এমো হাদা, আমার ঘরে। আমার যদি
দু'কুঠো ছোটো, তোমারও ছোটো।

একটা বছর কাটিয়েছি আমি অলির আলয়ে। আমার
নিজের বোন ছিল না—বোনের স্নেহ কোনোদিন আমি
পাইনি। আর অলির মধ্যে যেন তা নতুন করে
কিরে সেলুম।

বললুম, কেন আমি এ ভাবে তোর গলগ্রহ হয়ে থকি
দিখি? আমি চলে যাই।

—কোথায় যাবে?

—জানি না। পুঁথিবীর বেগানে হোক।

—তুমি যেতে চাইলেই আমি যেতে দেব?—অলির
চোখ আমার বলে ভরে উঠল: আমার আর বা কিছু

নাই তোমার জন্যে। এই পরীক্ষা নিয়ে তুমি বঁচি ব্যক্তি
বাইরে পা হাও, মাথা ঝুঁড়ে আমি রক্তপালা করব।

প্রায় এক বছরের মধ্যেও সে কোনদিন আমাকে
উবার কথা ভিত্তাস করেনি। কেন করিনি আমি জানি।
হয়তো ভেবেছে, উবা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে—একটা
ব্যাপকত্ব নাভালকে যে সধ্য করবে?

আর আমি প্রাপণে ভুলে থাকতে চেষ্টাছি উবাকে।
আজ আর এ সত্য আমার নিজের কাছে গোপন নেই যে
আমিই উবারাণীর সমস্ত সম্ভবনাকে ব্যর্থ করে দিয়েছি।
আমাকে ভালোবাসতে গিয়ে সে খেউলে হয়ে গেছে।
আমি তার সব নিয়েছি, বিনিময়ে এতটুকুও কিরিয়ে
দিতে পারিনি। আজ যদি অনেক দেরী হয়ে
থাকে, তবুও সে হুঁকি পাক, তবুও সে নতুন করে
অনন্তজীবনের শেষ কটা দিন সুযোগ নিক।

কিন্তু উবাও বাঁচল না।

সেদিন খিরেটার থেকে কিরে অলি কিছুকাল বিবধ
ভাবে আমার বিজ্ঞানার পাশে বসে হইল। আমি তখনো
জেসেই ছিলুম, একটা সিনেমা পত্রিকা পড়ার চেষ্টা
করছিলাম। আমারের দিন আর নেই—এখন শেষ পদবী
খিরেটার চলে না, ব্যাটোটার মধ্যেই অলি কিরে আসে।

আমি বললুম, কিছু বলবি অলি?

অলি তরুণি ভাবাব দিলে না। একটা ইভত্ততঃ
করে বললে, উবারির কোন খবর জানো কিম'লতা?

আমি চবকে উল্লসুম, কেন কি হয়েছে?

—উবারি আর বাঁচবে না।

মাঝার মধ্যে কিছুক্ষণ চমকে পেল। উঠে বলে আমি
অলির হাত চেপে ধরলুম।

—অলি, কী হয়েছে উবার? কোথায় সে?

খিরেটারে যা শুনবে এসেছে, তাই আমাকে জানালো
অলি। আজ গরমাল ঘরে চি-ব-তে ভুসছে উবা।
হাতে একটা পলসা নেই তার। দশা হাসপাতালে
পিরেছিল, ক্রী-বেডে কোনো জায়গা পারনি। আর
বলে দিয়েছে, এখন কিছুই করার নেই—ডাক্তারী শাস্ত্রের
বাইরে চলে গেছে সে।

—কোথায় আছে সে?

—কোথায় আর থাকবে? সোনাসাঙ্ঘিতে তার বাসী

এনে কাছে রেখেছে । ওদূর নেই, খেতে পাব না—
তিলে তিলে মরে যাচ্ছে ! অথচ কী দিনই ছিল উষ্মার
এত রূপ, এত নান, এত ভালো অভিনয়, আর স্বাস্থ্য—
অলির গলা ভরে উঠল নমতার আর বেদনার ।

আমি তখন নেমে পড়েছি বিছানা থেকে । পা
বাড়িয়েছি দরজার দিকে ।

অসি থেকে বললে, কোথায় চলছে ।

—উষ্মার কাছে ।

আমি বাওয়ার পরে সাত দিনের বেশি বাঁচিনি উষ্মা ।
শুধু, রববার আগে যখন ওর মাথাটা কোলে তুলে
নিয়েছিলাম, বেশ রক্তের বলকটা বৃষ্টি দিয়েছিলাম
কোঁচের কাপড় দিয়ে, তখন উষ্মা ভারী তৃপ্তির হাসি
হেসেছিল ।

—ভেবেছিলাম, রববার আগে তোমার সঙ্গে বৃষ্টি
আর দেখা হবেনা । কিন্তু কোনো দায় আমার অপমান
হইলনা ।

আমার নাইকের শেষ রূপা যখনকা পড়ল ।
এইটুকুই অবশিষ্ট ছিল বৃষ্টি । ঠিক এমন একটা বল বা
বটলে রূপকের হাততালি পড়ে না, তাদের চোখে জল
আসে না । কিন্তু আমার নাইকে আমার চোখে জল
এলনা—তালি দেবার জন্যেও তুলতে পারলাম না হাত
বৃত্তোকে । শুধু মনে হতে লাগল, জীবনের চক্কিটটা বন্ধ
হবে কী ব্যর্থতার মধ্যেই উষ্মাকে আমি তুলিয়ে দিলাম ।

ওকে পুড়িয়ে স্বপ্নান থেকে আমি আর কিরতে
পারলাম অলির কাছে ।

রক্তমাখা ঘাটের ধারে পল্লার পাশে এসে বসলাম
চুপচাপ । সাধনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে পল্লার খোলা স্রোত ।
সেই স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনের ইতিহাসটাও
যেন দেখতে পাচ্ছিলাম আমি । শেষ অভিনয়ের পরে
এখন আমি আর কী করব—কী আর আমার করবার
আছে ।

এবন সব কে আমার কাঁধে হাত রাখল । তাকিয়ে
দেখলাম, চিনু ।

বিছিন্ন ভাই হয়েও ওরা বিছিন্নে চিনে নিয়েছে । হঠ
তো আমার জন্যে একটা কপল মজাও হয়েছে যেসঙ্গে
আমার সম্পর্কে ।

চিনু বললে, বড়লা !

আমি খোলাটে চোখে চেয়ে রইলাম । কথা বলতে
পারলাম না ।

—কেন পাগলের মতো এমন করে পথে পথে ঘুরে
বড়লা ? দেশে গিয়ে থাকোনা কিছুননি । বাড়িটা তো
খালিই পড়ে আছে । আরগা বা পানি মাসে মাসে তোমার
পাঠাব ।

আমি উঠে দাঁড়ালাম । সেইদেই ঘাব । প্রথম অভিনয়ের
যখনকা যেখানে উঠেছিলাম, শেষ যখনকাও সেইখানেই
পড়লাম । আমার পক্ষে সব জায়গাই এখন সমান । বেশ,
কলকাতা, বাংলা দেশ, সারা ভারতবর্ষ—সব আমার
কাছে এখন একাকার !

শুধু করে মোমবাতিটা নিবে গেল । গোড়া মোমের
গন্ধে ভরে উঠল ঘর ।

বাইরে অন্ধকার শাখা হয়ে এসেছে । ভোরের ঠাণ্ডা
বাতাস টের পাচ্ছি । আমার বাজার সময় হয়ে এল ।

ছোয়ার থেকে অসাড় আড়ন্ত শরীটটা টেনে তুলে আমি
বাইরে এসে দাঁড়ালাম । গোড়া তুবড়ীর খোলাগুনসোকে
শেষবারের মতো দেখে বাই একবার ।

। ২ ।

কী আর নেব ? কী আর নেবো আছে ?

ওই ছোট স্ট্রেক্‌স্টা । দু'একটা টুকিটাকি জিনিস ।
আমি জানি, আমার সময় শেষ হবে গেছে । অনুরোধের
বোকা টেবে আর দেবের দিনগুলোকে ভারী করতে চাই
না । এখন যতখানি পানি নিক'ছাট হয়ে পথ চলা ।
চলতে চলতে কুরিয়ে যাওয়া ।

কানাইয়ের বা এল । দাবার আসে ওই গৃহিণী দেবে
জিনিসপত্র । ওই কাছ থেকে শেষ মততার পায়েটুকু
কুড়িয়ে নিয়ে যাব ।

কানাইয়ের বা বললে, বাবু, এই চি'ট্টা কাল নিক-
হেলার ভার্যাপদ দিয়ে গিয়েছিল । আনতে তুলে
দিয়েছিলাম ।

সকালের প্রথম আলো পড়ছে । সেই আলোর
দেখলাম কানাইনা । চিনু কিংবা বৃন্দার বাড়ির দেখা
না । সম্পূর্ণ অজানা ।

(১৪৪ পৃষ্ঠার শেষ)



অচিন্ত্য কুমার মেনন

শুক্লবার এল।

এ রকম করে আর কোনোদিন বসেনি। আরার এল, এ অনেক দিন শূন্যে। বিশেষ বার ও তারিখ, সময় ও জায়গা, আগে আগে বছরবার নির্দিষ্ট হয়েছে। কিন্তু এমন ছোট করে কোনোদিন বলেনি।

এমন সম্ভবতঃশুধু করে।

'কোন শুক্রবার?' শব্দ ব্যর্থ হলোই ততো চলেনা দপট হওয়া দরকার। সোমনাথ কুটপাতের দিক এক পা এগিয়ে এল।

'আসছে শুক্রবার।' মিত্রা অথ। কোনদিকে তাকিয়ে উদাসীনের হত বললে।

'কোথায়?' এবার বুধি সোমনাথেরই চোখের দৃষ্টিটা পাড় হয়ে এল। কোনো গ্যাংবাস্ত্রাঙ্গার নিচে, কোনো বাসস্টপের কাছে না কোনো সিনেবার দামনে

এবনি একটা রুমত জাংগাই ঠিক হবে ভেবেছিল। কিন্তু মিত্রা একটা পরমাত্রা কথা বললে। বললে, 'বাড়িতে।'।

'কর বাড়ি?' বুকের বুক চনন করে উঠল সোমনাথের।

বুকেল এ প্রশ্ন অব্যাহত। কেননা বরাবর মিত্রার দুবিনেতেই জায়গা ঠিক হয়েছে। তবু উত্তরটা জানা থাকলেও ভ্রিগপেন করতে অপরূপ লাগল।

অশকুটে হাসল মিত্রা। বললে, 'আমাদের বাড়ি।'। রহস্যের পরিবেশ আরো নিবিড় হয়ে উঠল যখন মিত্রা আরো ছোট করে বললে, 'আমার ঘরে।'।

এমন করে বলেনি কেউ কোনদিন। এমন করে শোনেওনি কেউ কান পেতে।

'কর?' কখন বলতে গিয়ে আবার কবে ভ্রিগপেন করে বলল সোমনাথ।

‘কলসায় যে। এই—এই শূন্যতার।’

‘তোমার ঘরে?’ যেন স্বাক্ষর হাঁড়িয়ে থেকে বিশ্বাস
করা যাচ্ছে না। কুঁচপাতের উপর উঠে এসে সোমনাথ :

‘গতি? নৃবিষে হবে?’

বিজ্ঞানও বুদ্ধ বরষর ককছে। কলসে, ‘হুতো হবে।’

‘কখন?’ আত্মব। সবটাই এতকাল বিস্ময়ে
করা হয়নি।

‘গত্রে লাভটা নাসা।’

‘গত্রে লাভটা?’ উজ্জ্বলিত হল সোমনাথ। দিনে-
রাত্রে এককাল আর হতে নেই। ছেলে-মানুষের বত
হাসল সোমনাথ : ‘আর সোমদ্বিপদ।’

‘সোমো। বিজ্ঞাই কাছিরে এল : ‘একতলার, নিজেই
আবার ঘর।’

‘সবটা ভেজানো থাকবে। আত্মে টেলে চুকে পোড়ো।
কড়া নেভোনো যেন।’

‘মানে, জুনি কাছাকাছিই থাকবে।’

‘হ্যাঁ, আবিই তো দ্বয়ের খিল খুঁলে রাখব।’

‘জুনি থাকবে কোথায়?’

‘আমার নিজের ঘরে। জুনি দর টেলে চুকেই
আমাকে দেখতে পাবে। বাঁ-হাতি আমার ঘর।’

‘চুকেই তোমার ঘরের মধ্যে ঢলে যাব?’ ব্যস্ত-
দ্বয়ের হত কলসে সোমনাথ।

বিজ্ঞা শব্দ করে যেসে উঠল। কলসে, ‘অত
দিশেছারা হলে কি ঢলে? দর খোলা রেখে যাবে?
খিল দেবে না?’

‘খিল দিলে পালানো কি করে? পালানোর পথও



‘তোমার কাছে আমার একটা পাওনা ছিল, তাই নিতে এসেছি।’

‘তা কি আমি জানি? আমি কি কেমনেদিন
তোমাদের বাড়ি গেছি?’ আবার নির্দল হুখে

হাসল সোমনাথ : ‘তোমরা কি আমাকে চুকে
‘দিয়ে?’

‘হ্যাঁ, সোমো।’ দক্ষাণ্ডীর বত পলা কলসি বিজ্ঞা :

তো প্রশ্ন রাখা বরকার। বাহ্যার ভাব কলস সোমনাথ :
‘চোর যখন ঘরে ঢোকে পরজা-উরজা হাট করে রাখে।

কখন পালানো হয় ঠিক কী।’

‘হি, চোর হতে যাবে কেন?’ তাতে বুদ্ধি
নিজের দক্ষাণ্ডীরে যাসে বিজ্ঞার।

‘তবে আমি কী!’

‘তুমি গৃহস্থ। আমার গৃহস্থ।’ মিত্রা দু’তে সেধে নিল এদিক-ওদিক। বললে, বেশ, তুমি চুকে শোকে, আমিই বন্ধ করব।

‘শুধু সদর?’

মিত্রা শুধু চোখে চোখ রাখল, কথা কইলনা। বহু কথা দিয়ে তৈরি যে নীরবতা, দুই চোখের ডালার করে তাই বৃষ্টি উপহার দিল।

‘তোমার অভিভাবকেরা থাকবেন কোথায়?’ আরো যেন একটু নিশ্চিত হতে চাইল সোমনাথ।

‘ভাঁরা দূরে কোথায় কীর্তন শুনতে যাবেন।’ বললে মিত্রা, ‘কীর্তন সাতটার সময় শুরুর, তাই অন্তত ওঁদের যাতে জটায় বেরতে হবে।’ হাসল মিত্রা: ‘যাই বলো, কীর্তনকে বন্যবাদ। কীর্তনের জন্যে ওঁদেরকে বসলে অনুপস্থিত পার।’

‘দাদা তো চুরে, কলকাতার নাইরে।’

‘বাড়িতে তা হলে তুমি একা থাকবে?’ সোমনাথের কাছে এটাও বৃষ্টি কঠিন হবে হল।

‘না, আমার ছোট ভাই দুলস থাকবে।’

‘ছোট হলে কী হবে, এ ক্ষেত্রে সে মস্ত বড় কড়া অনেক তার হাঁক ডাক।’

‘না, তাকে আমি মাস্টারের বাড়ি পাঠাব।’

‘বিকিকে সে একা কেলে বাবে হলে হবে মন না। সম্ভো সে তোমাকে আঁকড়ে ধরে তোমার ঘরেই বসে থাকবে।’

‘না, তার ভল নেই।’ মিত্রা হাসল: ‘তাকে আমি তার ঘরে, সোডালার, টাক দিয়ে আটকে রাখবো।’

‘মাসকাল গুরুত্বের চাইতে লব্ধবন্ধে বেঁচন। সব একেকটি সিদ্ধ।’ মিত্রার হাসিতেও সোমনাথের আভ্যক্ষ হুহুে সেলনা! ‘সম্ভো টাক



‘নাইট শো’তে না হয় ম্যাটিনিতে হবে। তার জন্যে এত তাড়া কিসের?’

‘আর ঘাঁরা আছেন?’ ভল যেন তবু কাঁটতে পেল করে তোমার ঘরে নিচে চলে আসবে।’

‘দাদা-বৌদি! বার্ষিক প্রমাণ করতে বৌদিও আমার ঘর বন্ধ, তখন আমাকে আর ও ডিস্টার্ব করবে না তাববে যুঝুছি ওর নিজের ঘরে ফিরে যাবে।’

‘আর দাদা?’

‘সত্যি?’

‘হাঁ, তোমার কোনো ভয় নেই, ভূমি এম ।’
সবের ব্যাঘাত, চলে ব্যাঘাত উদ্যোগ করল মিরা । আবার
ছুরে ধাঁড়িয়ে বললে, বরা পড়লেই বা ভব কিবের ?
একটা না হয় বোকাপড়া হবে থাকে ।’

এবার মোহনর সোমনাথকেই ধরে বেতে ধর । সাতার
ল্যাম্পপোস্টের নিচে ধাঁড়িয়ে কতকণ এমন কথা বলা
যায় ? দু’ পা ঘাব-ঘাব করে আবার ফিরল সোমনাথ ।
বললে, ‘কীত’নি কতকণে ভাঙবে ? কতকণে ও’রা
ফিরবেন নবন হয় ?’

‘তা কে জানে ? ও’হিসেবে কী ধরকার ? দড়ো
দাড়টার পর কিছুক্ষণ আনন্দ পাব, নিজ’নে নিগালার,
এই যথেষ্ট ।’

এই বলল ‘আদব’ ।’ সোমনাথ আঁধার হয়ে উঠল :
‘আদব কী ব্যা ? বেশী ?’

‘আদব সোমনাথ ।’

‘উঃ, এখনো কত ঘেরি । কেমন বঙ্গদেবর হতে
পারে না ?’

হাণির টানটি বেবনা মিশিরে দৃষ্টি করল মিরা ।
সাতনার দূরে বললে, ‘সেখতে-সেখতে কেটে যাবে ।’
তারপর ফিরে বেতে-বেতে আরেকবার বললে,
‘এদিকতু ।’

‘যেকো কিছু ।’ হাটতে-হাটতে সোমনাথও পালটা
বললে ।

‘কি রে, আদব পড়াতে গেলি ।’ ‘আঁকল থেকে
ফিরে এসে তখনপোনে একটু টান হয়ে-দূরেই সোমনাথ,
দূরত্বা বালিশ করে উঠল ।

‘টিউনানি ছেড়ে দিওছি, না ।’

‘সে কী !’

‘আর বাটনি গোষার না । সন্ত দিন বেটে এসে
দড়ের গিরে আবার গাথা শেটাও ।’

‘সত্তাহে তো মোটে ভিন মিন ।’

‘আর বাকি চার দিনের জন্যে আরেকটা জুটলে

ভূমি হরতো তাও খাটতে বলতে ।’

দূরত্বা বানিককল চুপ করে রইল । তবু অভাবী
সংসার কথা না করে পারল না । বললে, ‘তবু মানে ত্রিশটা

টাকা ! সোমনাথের আরো একটু ভালো চিকিৎসা হত.
পথ্য হত—’

‘বাকি চারদিন টিউনানি করে আরো ত্রিশ টাকা
আনতে পারলে, বাড়তি আর মোটোটা টাকা হলে,
তা দিয়ে ওকে চেয়ে পাঠানো যেত, স্যানিটোরিয়ামে
গাথা যেত—’ সোমনাথের ক্রান্ত শব্দ থেকে বালা করে
পড়ল ।

‘তা তুই-ই বল, হত না দু’দিনে ?’

‘আর আরো বাড়লে ভূমিও যেতে পারতে ও’র সঙ্গে—’

‘তোমের রাসার জন্যে বাড়িতে একটা ঠাকুর রেখে
দিতাম—’

‘উঃ, দত আর তত অভাব ! একটা মেটে তো
আরেকটা এসে ছোটো ।’ উঠে পড়ল সোমনাথ : এর
কি শেষ নেই কোনোখানে ।’

‘তারই জন্যেই তো—’

‘তারই জন্যে আমাকেও আন্টেশুটে বাঁধতে চাও ?
সোমনাথের সঙ্গে একই পথের পোষাতে চাও ?’

‘হি, ও কথা বলছিল কেন ?’ দূরত্বা ছেলের পায়ে
হাত রাখল । বললে, ‘তুই দরদের বড় । সব চেয়ে
দক্ষ, দম্ব’, উপযুক্ত । তুই না করবি তো কে করবে ?’
পায়ের হাত রাখা ছলে আনল দূরত্বা : ‘ত্রিশ টাকা,
দিনে এক টাকা, এ কি তুচ্ছ করবার বস ?’ কিছু দুঃ,
একটা আগল, দুটো ডিম—’

যাবের হাত ছেড়ে কেসে দিবে সাতার বেরিয়ে পড়ল
সোমনাথ ।

ছুটল আবার ছত্র বরতে ।

না, টাকাই মোদামতি, টাকাই বৃদ্ধ হাওয়া ।

কিন্তু, ‘আর, সন্ধ্যোটা যদি একটু বেশী হুত ।’

সন্ধ্যোটা বেশী করবার কোনো কিছুই কি উপায়
নেই ? জর, দুঃ, দক্ষ উপায় ।’

আছে । বঙ্গদেবর আঁকলে গিরেই টের পেল
সোমনাথ ।

আঁকল প্রকাণ্ড একটা অভাব শেয়েছে । সাত দিনের
মধ্যে তা সম্পাদন করে দিতে হবে । আর, তা করে
দিতে হলে ক’টারীসের ওজারটাইন না মেটে উপায় নেই ।

ব্যানোয়ার পালতৌবুদী কয়েকজনকে বাছাই করলেন। আর তাদের বাছাই করলেন তাদের মধ্যে সোমনাথ একজন।

‘আমাকে আবার কেন?’ প্রকট ভাবভাষা দিয়ে সেল সোমনাথ।

‘যেহেতু তুমি দক্ষ, সমর্থ, উপযুক্ত।’ হাসলেন পালতৌবুদী : ‘তোমাকে দিয়ে আমার অনেক কিংবা।’

‘কতক্ষ থাকতে হবে?’ হটকট করে উঠল সোমনাথ।

‘হ্যাঁ হ্যাঁ আটটা পর্যন্ত—দাড়ে আট।’

‘আমি পারবনা, স্যার। সৌদির বস্তন বলে বলল সোমনাথ।

নির্ব্যচিহ্ন-অনির্ব্যচিহ্ন সকলেই বিকার দিয়ে উঠল। এমন হাঁও কি কেউ ছাড়ে? হাতের পাখি উড়িয়ে দেবে?

অন্যদিকের দলের কেউ-কেউ এগিয়ে এসে, বললে, সোমনাথ যদি না করে আত্মা করব।

হ্যাঁবেকার পক্ষের মধ্যে বললেন, ‘না, সোমনাথই করবে।’

ভালোলে সোমনাথকে।

‘কেন করতে চাইছ না?’

‘একটা টিউপনি আছে, স্যার।’ বাড় চুলকোল সোমনাথ।

‘টিউপনি?’ হাসলেন যা কবিবর ঠিক করতে পারলেন না ব্যানোয়ার : ‘পাও কত?’

‘ত্রিশ টাকা।’

‘ত্রিশ টাকা!’ পালতৌবুদী উচ্চারণে মেলে উঠলেন : ‘তার মানে গড়ে দৈনিক এক টাকা। আর এ ওভারটাইমে তুমি দৈনিক কত পাবে জানো?’

আনন্দেও লোকে ভয় পায় কৃষি। পাশ্চাত্য মধ্যে নিঃশব্দে বসে থাকল সোমনাথ।

‘তোমার যা মাস-মাইনে তার দৈনিক যেটুকু এক টাকার চেয়ে ঢের ঢের বেশি।’ পালতৌবুদী উচ্চারণে হলেন : ‘এ ওভারটাইমে দৈনিক তুমি সে যেটুকু জমক পাবে।’

ভদ্র, যেন সোমনাথ উজাল হয়ে উঠতে পারে না। হলের গরমে আর কিছুই হিসেব করে।

‘আর আমি ব্যবসা করেছি—’

কী আশা করে সোমনাথ স্বর্ণিক উজ্জল হল।

‘ব্যবসা করেছি ওভারটাইমের টাকাটা মাসকান্না মাইনের মধ্যে সেওয়া হবেনা, মগল সেওয়া হবে।’ অর্ধ অন্ধ ওভারটাইম খািলে ভাল সকালেই সেবে যা টাকাটা।

কাজ কী করে আকর্ষণীয় করতে হবে, কী বেশ চোড়ার প্রম আদায় করা যায়, সে কৌশল জ্ঞা পালতৌবুদী।

সকলে প্রায় জয়যনি করে উঠল কিন্তু সোমনাথ কে নিজেই ভেদনি নিজেই।

‘তোমার টাকার দরকার নেই?’ চোখের দৃষ্টি বন্ধ করলেন পালতৌবুদী।

‘উঃ, ভীষণ ভীষণ দরকার।’ মূখ্য থেকে বেরি সেল সোমনাথের।

চকিতে লোকনাথের শীর্ষ মূখ্য হয়ে পড়ল, ন পড়ল তার লক্ষ্যের মনের কথা, বরষোক্ত নিদর্শন্যের কথা।

‘ভবে?’ জ্ঞান দৃষ্টির আরেকটা বল হৃদয়ে পালতৌবুদী।

‘ভবে—স্বপ্নের সন্ধ্যাগুলি বাড়ি হবে।’

হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ করে পালতৌবুদী বসে মেলে উঠতে পালতৌবুদী। ‘কোরানির আবার সন্ধ্যা! ঐ যে : না বলে কথাটা। যেটো হৃদয়ের তামাক খাব, গড়গড়া কই?’ পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে বললেন, ‘নাও, সেগে যাও সোমনাথ সেগে সেল।’

সেরি করে করতে মূখ্যতা ব্যাখ্যল হয়ে কা এগেলিল, সোমনাথ বললে, ‘দুই স্বপ্নের, যা।’ স্বপ্ন দুয়ের কথা, স্বপ্নবরের বরও তো কোনো দিন পার মূখ্যতা।

‘কেন, কী হল?’

‘আকস্মে ওভারটাইমের ব্যবসা হল। রোজক রোজ হাতে-হাতে রোজগার।’ চোখে-মুখে দুই উৎসাহ নিয়ে বলতে লাগল সোমনাথ : ‘এরনি গড়গড়তা দৈনিক যা আর তার প্রায় দ্বিগুণ। কোম্পা দুই লাভ করছে, যা। নতুন নতুন সব জরুরি অর্জ পাচ্ছে। ওভারটাইমটা বোধকর স্বাধী জাহেই জা হল। অর্জার বৃত্তে যেটুকু হের-কের কিছ: হতে পার

কিন্তু, না, খাটতে পারলে আরের অন্ধ মোটা করতে
তবে ।' শব্দ আরো চড়া কলে সোমনাথ : 'লোকনাথকে
ঠান দ্যানিটোরিয়ায় । তোমার জন্যে ঠাকুর রেখে
যে, উন্মত্তের গরবে তোমাকে আর পুড়তে দেব না—'

সুখভা বলানো মুখে হাসল । বললে, 'আর তোরা
যে দেব । তোরাগার কন বলে তো পিঁড়ির ব্যক্তিদি,
যার তবু বসি আর ব্যভে—'

মনে মনে সেই পুরোনো কথাটা আবৃত্তি করল
সোমনাথ : 'যেমন আর তেমনি অভাব । একটা মেটে
গা আরেকটা কোটে । এক টেউ মিলিয়ে যেতে না
তেই আরেক টেউ ঝাঁপিয়ে পড়ে । টেউয়ের পর টেউ ।

কিন্তু ঘাই বলি, আর বাড়ার কথা মনে হিরা
ক্ষয়ই হুসি চলে । ব্যক্তি পবিত্র, চাইবে চরিত্র
ঠে আসতে ।

তখন আর হিরাধর পর নয় সোমনাথের পর ।

আজ বেনে, কাল পোদ্দার ।'

আজ যাগা গুজর কাল তারা পাহারা ওখাল ।

সম্মার শোনা গলে গলে গুপার চাকতিতে শাদা
হতে লাগল ।

কিন্তু, আজ, আজ পুজুর কী হবে ? আজকের
লজ্জা ও কি অভাবের পুঁজার হিসেবের কালিতে কালো
করে দেব ?

'আজ আমাকে ছুটি দিন ।' হেডনার পরমেশের কাছে
গিয়ে দাঁড়াল সোমনাথ ।

'ছুটি আবার কী !' পরমেশ অবাক মানল ।

'ভীষণ একটা জ্বরুরি কান পড়ে গেছে ।'

'কি, কোনো মজুর সংবাদ ?'

'না, তা নয়—'

তা মইলে আর কিসে মানুসে ছুটি নেয় ? তাও
মানুসে বলে, মরছে তো, দুঃখও জরি করতে বলে,
ওতারটাইমটা সেয়ে আসি । একমাত্র নিজের মৃত্যু
ফটলেই দাকি বাধ্য হয়ে ছুটি নেয় মানুসে ।

'তা নয় তো আর কী ?' সন্দেহ চোখে তাকাল
পরমেশ ।



আধুনিকতম সৌন্দর্য প্রসাধনী

প্যাঙ্কি

সুগন্ধপান ও লাগনা ব্রকার



MR.: PANZY COSMETIC CO. DLR.: B. Sarkar & Co., Calcutta-7

‘হে যেন কী সীমাহীন সুখ, বলতে
পাচ্ছেনা সোমনাথ।’

‘পুরো হুটী নয়, খসুনে এই এক ঘণ্টার
হ্যানসেল, লাভটা থেকে আটটা।’

‘তা হ্যানসেলের কান থেকে নিসেনা
কেন অনর্থক?’

‘বলতে শব্দ চলনা। আপন হা
দয়া করেন—’

‘কিন্তু, কেন, ব্যাপারটা কী?’

উঠল পরমেশ।

‘তখন সোমনাথ বললে। বললে গোপন
হয়ে। ‘একটি ঘোরের মধ্যে বিট করার।’

‘বিট করবে!’ হাসিতে তরল না হয়ে
তিক্ততায় পলল হল পরমেশ। ‘বিট করবে
তো পরে কোরো। বিট করবে তো
আরেক দিন। এখন এত হেনো হবার কী
হবে! লাভটা আটটা
কম আটটা থেকে হবে। পুতুবার

না কম পরিবার হবে। নাটক শেষে না হয়
ন্যাতিবিলে হবে। তার মধ্যে এত তাড়া কিসের?
তার জন্যে কে গরম গরম চাকতি ছেড়ে দেবে। যেহে
বলতে পারে টাকা বলতে পারেনা।’ বলতে বলতে
ক্রোধ হল পরমেশ। পরে বলার পর একটু, মোদায়ে
করে বললে, ‘তা তুমি যেতে চাচ্ছ তো বাও, কিন্তু
অর্থের কান্দ সায়া হবে না, আমি ব্যাপারটা হ্যানসেলের
কানে তুলব। তখন ওভারটাইম হেতে আসল টাইমটা
চলে যায় কিনা তার ঠিক কী।

‘এই মোদয়ে থাকনি।’ সচক্ষু আর ধারা আটছিল,
স্বরণ করল।



এন.সি.

একট্রা স্ট্রং

নম্র

**মনে ও দেহে
প্রচুর উৎসাহ
যোগায়**

ইহা মদ্রাস স্যাপের সর্বজনসন্মতিক্রম ও উৎসাহময়।

ইহা শুধু কোন ব্যক্তিবিশেষের আভিষেক নয়—

সারা বিশ্বে সর্বস্তরের লোকই এন. সি. স্যাপ
ব্যবহারের প্রবীণ এবং জনসম্মত। কখনো কখনো পড়বে।

**প্রস্তুতকারক: এন.সি. আর্মি স্ট্রাক ফ্যাক্টরী
মাদ্রাস-১**

কলিকাতা কেন্দ্র: ৯২ এ, চিত্তরঞ্জন এডিটিং, কলিকাতা-১২

নিজেকে একটা বড় বড় স্নান-ঘা শুভ হতে বা
বনে হল সোমনাথের। একটা নিচল জলপাত করল।

কিন্তু, না, দিনে আট-দশটাকাই বা কম কিলে
লোকনাথকে যে ঠিকানাটা দিয়ে গেল ভাঙ্কার তা
নাম কত।

‘কিন্তুই ক্রোধে ঘাচ্ছে না, শব্দ থাকলেই হয়ে যায়
খান দিলেই হার বাড়ছে।’

যেহে আবার বড়ে চড়ে উঠল। আওয়াচ তুলল।।
আওয়াচ সোনার তারের আওয়াচ নয়, রপোর চাকতি
আওয়াচ।

আটটার সময় পরমেশের কী বনে হল কে জা

— **ভক্ত বিবাহ ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জা** —

মজার ডেকরেটরস

৬৩ এ. ডব্লু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা-৬ ফোন-৫৫ ২৫৪৯

তাকাল ঘড়ির দিকে । সেখানেথেকে ছুটি মিল ।

অনেক ঘর-ঘর করেছে বিদ্যা, সেখানে অনেক দল-
ঝড়িত, অনেকবার আসে জেলেরে আর নিবিড়েরে ।
তবু সোমনারের মেধা নেই ।

তারপর আটটা ঘন বেজে গেল তখন রাত্রি হাজার
হেতু গলি শেষেরে দাঁড়াল ক্রমে রাত্তার, ইলেকট্রিক
সোপোর্টের নিচে ।

আরো অনেক পরে সেখতে গেল দূর থেকে প্রায় ছুটে
দাসেরে সোমনাথ ।

‘বিদ্য’ মূর্তি নয় উদ্ভূত মূর্তি ।

‘আনো আবার ওভারটাইম হয়েছে ।’ আনন্দে উৎসে
উঠেছে সোমনাথ ।

‘সত্যি ?’ প্রতিধ্বনি করল বিদ্যা ।

‘তাই ঠিক দমবে আসতে পারিনি ।’ এটা বেন
কোনো সোফলান নয় অন্য প্রান্তি, অন্য হৃদ্যকার তুলনায়
—সোমনাথ তেরনি পরিপূর্ণ কণ্ঠে বললে, ‘আনো,
রাত্রিবার অনেক বেড়ে গাবে । কোম্পানি এখন ঘর
উন্নতির মধ্যে, ওভারটাইমটা বোঝায় পার্মানেন্ট ফিচার
দূর দাঁড়াবে । পার্মানেন্টসই বেড়ে গাবে ইনকাম ।
তোমার ঐ হস্তাক্ষরটি টিউপনির থেকে ভালো ।’

‘অনেক, অনেক, ভালো ।’ আর প্রায় বিশদ হয়ে গাবে
কী বলো ? হৃদয়েতে চোখ নাড়াতে দাসল বিদ্যা ।

‘প্রায় তাই ।’

‘কী হুঁ ! কী কুঁত’ ।’ বিদ্যা তরল তুলল ।

‘তোমার বাবা-মা’র কিংকরেন ব্যাড়া থেকে ?’ সোমনাথ
হাঁসতে এগিয়ে এল এক পা ।

‘এখনো কেনেনি । তবে কেনার দম্ব হয়েছে ।

‘আজ তা হলে আর হয় না ।’

‘কী করে হু ! দম্ব কোমার ?’

‘বেটু, দম্ব আছে—এখনো দম্ব আছে—রাত্তার
প্রকাণ্ড ক্যাম—কিরতে আরো অনেক ঘেরি হবে । চন্দো
না, একই দম্ব, বড়টুই বয়—’ হৃদয়েতে বসত হুঁ করল
সোমনাথ ।

‘ব্যস্ত কী । আরেক দিন হবে ।’

‘আরেক দিন ।’

‘ক’ল, ক’লরে থাকেবা কিছুই । বেশ তো, তোমার

পাওনা রইল, আরেক দিন এস ।’ বিশদ্বিবেশান দাসল
বিদ্যা ।

ওভারটাইম । আর সন্তোষলি থাকবেনা । আর
দিনেবার ঘাওরা যাবেনা । বেফানো যাবেনা এখানে-ওখানে ।
আর বসা যাবেনা পার্কে । ড্রাকো যাবেনা রেস্তোরাঁ ।
একটি নিঃশব্দতা হুঁকে নিয়ে ভাঙ্গা যাবেনা অবসর,রে ।

আর সেই সব শব্দ, হুঁ, ভাই, কথাসুনি বলা
যাবেনা । কলকালের অসিদ্ধে ক’ল যাবেনা সেই সব
রক্তাক্ত প্রত্যয় ।

আর আশা নেই বস নেই, জিজ্ঞাসাও নেই ।

কত দিন বিদ্যার দেখা নেই সোমনাথের সঙ্গে ।

এখন সন্তোষে হুঁ, এক বিধবার । টিউপনির দম্ব
করেকলি তবু কাঁচা ছিল । ইচ্ছে করলে কাঁকি দিতে
পারত অনায়াসে । কথা রাখত বিদ্যার ।

এখন এই ওভারটাইমে হুঁ, এক নিশ্চয় বিধিতা ।
সেই হুঁর আকাশের পরিবর্তে একটানা অন্ধকারের আতরণ ।
অন্ধকারের বদলে হুঁ, দলারের দলদান ।

ঘর ওভারটাইমে নেই, ঘর সন্তোষলি শব্দান, এমন এক
সুপতার অন্ধ নগালো শব্দানির ঘর করতে গেল বিদ্যা ।
সম্মারপভাবে সবই তার আছে, কিন্তু এক দম্বদে পে
অনায়াস । তার সন্তোষলি আছে ।

এক প্রকাণ্ড হুঁ, হুঁ, নিঃশব্দতা সোমনাথ চলে
এসেছে বিদ্যার নতুন ব্যাক্তিতে ! নতুন ব্যাক্তিতে যাবে
তার শব্দানির ব্যাক্তিতে ।

‘এ কি, হুঁ ?’ কল্যা হুঁলে দিলে ঘরকে দাঁড়াল বিদ্যা ।

‘এই চলে এলাম তোমার কাছে ।’

‘কিন্তু কী হবে করে ?’

হুঁ, চোখে তার দিকে তাকাল সোমনাথ ।

বললে, ‘তোমার কাছে আমার একটা প্যাকো ছিল,
তাই নিতে এসেছি ।’

হাসির আরেক অর্থ বে বিশদ্বিবেশান তাই দেখাল
বিদ্যা । বললে, ‘কিন্তু সন্তোষ তো আশি নতুন-ওভার
নিবেছি । এ ওভারতে ব্যাক্তিতা আর নেই ।’

এসুতে চাইল সোমনাথ । বললে, ‘কী, সোম জেনেনা ?’

দলদা হুঁতে দাঁড়াল বিদ্যা । বললে, ‘কী করে দিই
বলো ।’ আশি ওভারটাইম পাটি না ?



প্রবোধি কুমার মাল্লিক

সজাতি অঙ্গাঙ্গের বিপরীত পক্ষেই নাম 'উৎকর্ষনী' ছিল কিনা আমার শঠিক চান্না নেই। যিনি তব করে ফেলেছেন বা স্বাক্ষর—তিনিই 'বোম' করে 'উৎকর্ষনী'। 'উৎকর্ষনী' নামটির উৎপত্তি সম্ভবত 'উষা'। বাগ্‌দাদে রাজা যত্নে সজাতি আনি এসে পড়েছিল অবশীতশেষে।

এরা এককালের রূপকথার রাজ্য। ছোট ছোট সংখ্যাতীত গাছ—বারা প্রাচীন যুগে ছিল সম্পূর্ণ শাহীন—তার গাছ অগ্নি-অগ্নি এলাকা দখল করে। এদের নিয়ে ছিল রূপক, উপকথা, কথকতা, প্রবাদ এবং নানাবিধ লোকসংগীত, জুটি ও জুটি। পৃথিবীর নানাদেশে ভ্রমণকে বলা হয়, রূপকথার রাজ্য, "land of the fairy tales, land of the winged angels, flying horses and peacock-princes." তামিলনাড়ু, মণীপুর, হাজরাবাহ, এমন কি দে-রাজ্যে উজ্জ্বলতার স্মৃতি বসেছে এখনও উল্লেখযোগ্য বস্তু কিছু পাওয়া যায়—শেঠী শাহাবুজ্জ, যাতে এই সব উপকথার রূপকথা। পৃথিবীর চোখে ভারত হল নতুন এক বিশ্বব্দ। বৈজ্ঞানিক-আজ্ঞাক্রমেও বিশ্বব্দ আছে—কিন্তু সেই বিশ্বব্দকে ধরে

গেজেট শিখরে মৃত শ্রী নরসিংদেব দত্তের জনক, অক্ষয়
দত্ত নামক নরক বংশের অধিবাসী, মৃত্যু বা বিধবা ভীম
প্রকৃতির জবান ফুল। এদের বিধ, পদ্ধ, ভাবগেহ
আছে, তবে এখানে নরসিংদেবের লগ্নে লভ্য হইতে পারে,
এবং ছাড়াও ভাবগেহ বা আছে, পাইবীর

বা পাওয়া (বিশেষ) পাণ্ডিত্যের কারণে
 সব দেশে লেখের নাম জারজের নুই-কণ্ঠের মতো
 (এই একটি অমায়িক অংশবিশ্বের মতো
 বোম্বাট—নুইয়ের প্রকারের নানা প্রকারের
 দেশে বহুমান মনে পড়ে। পুঁজির বিধি আর প্রকারের
 বহুভাষার অঙ্কন, এ নুইয়ের মধ্যে পাণ্ডিত্যের এম এম এম
 দেশে লুপ্তমান দেশের জাতি নীতিবিশেষ
 (মজার বলাও, বিশেষ পাণ্ডিত্যের চক্ষু, দেশ
 অংশে

কিছু একদলের তাল-কাল
 প্রকাশ ছিল। তফাৎ অঞ্চল বেহুলা প্রকাশ
 মহাকোশলের সপ্ন অস্তিত্বের আশ্রয় প্রকাশ
 প্রকাশের প্রকাশ প্রকাশ প্রকাশ প্রকাশ

উজ্জয়িনীতে অথবা লাউ-নাওর দূর বনগণের আশে পাশে বিস্তৃত নিভ'ন নদীতীরবর্তী প্রাচীন কীর্তিকলাপের মধ্যে রত্নপুত্রের কাহিনী নামা চেহারা লাগিয়ে আছে । পৃথিবীর কোনও ভূভাগে এমন লক্ষ লক্ষ রত্নপুত্র রত্নপুত্রের হৃদে-হৃদে ঘোরে না, কল্পনার এমন আত্মক' অভিব্যক্তি আর কোথাও নেই, এমন দৃশ্যের রোমাঞ্চ আর কোথাও বাস্তবের স্পর্শলাভ করেনি,—যেমনটি খটেছে ভারতবর্ষে ! একে সাধনা করেছে একদিকে ইতিহাস, অন্য দিকে ভৌগোলিক প্রকৃতি । এখানে দর্শনোন্মাদ বিবরণ দর্শ' রত্নপুত্রের হাতে পোদ বাবে, নদী তীরবর্তী ভগ্নোবনের পুর কূটীয়ে মহাজানী মনসীর বেলা মেলে, প্রবল চিংগার বিরুদ্ধে দর্শ'ভ্যঙ্গী প্রেম এখানে গাঁড়িয়ে ওঠে, রাজমুকুট কেলে দিয়ে রাজপুত্র এখানে সন্ধ্যা গ্রহণ করে, অর্জুণ বারাদেশের প্রার্থনা পূরণে একেশের দর্শ'পুত্রেরা দাতাকর্ষ' আপন পিঙ্গপুত্রের নওদান করে ! বিচিত্র এই ভারত !

অবস্থানবশত প্রাচীন রাজধানী ছিল বোম্ব কীর উজ্জয়িনী । অনেক বলে, কাশী-কাশী-কোশলের বড়ো উজ্জয়িনীও ভারতের প্রাচীনতম নগরীর একটি । অবস্থার সূত্রাচিন নাম ছিল অবস্থিকাপুরী । উজ্জয়িনীর পাশ দিয়ে যে আঁকাবাঁকা নদীটি বয়ে চলেছে, পুরাকালে তার নাম ছিল সম্ভবত 'শিপ্রা',—এখন হয়েছে 'শিত্রা' । শিপ্রার পবনগত অর্থ বোধ ঠিক নেই ! অবস্থিকাপুরীর এবং উজ্জয়িনীর পাদনকর্তা ছিলেন মদ্রাট অশোক । এমন উজ্জয়িনীর একটি বড় রাজ্যর একটি সিন্ধো হাউসের নাম দেওয়া হয়েছে 'অশোক' । অশোক আরও প্রতি রত্নপুত্রের কণ্ঠে কণ্ঠে ঘোরে ।

কবিতা আছে পৌরাণিক যুগে একলা হস্তেশ্বর শিব ত্রিপুর নামক এক রাজসঙ্গে এই উজ্জয়িনীতে বিন্যাস করেছিলেন । এ সকলে অদ্বৈতগতি প্রবল ছিল বসেই যোগ করি দেবাসুরের পঙ্কজের কাহিনী এখানেও পোনা যায় । দানব ও দেবতাদের সেই পঙ্কজের কালে যখন একটি অমৃত পরিপূর্ণ 'স্বর্ণকলস' সমুদ্রের তল থেকে বৃক্ষে পাওয়া যায়, তখন সেটি নিয়ে দেবতা এবং অদ্বৈত-গণের মধ্যে কাড়াকাড়ি চলে । সেই পঙ্কজের মধ্যে উক্ত অমৃতকলসের থেকে কয়েক বিস্ম' অমৃত এখানে

এখানে যে চারটি ভানে ছিটকে পড়ে, সেই হলপুত্রের নাম হল, উল্জয়িনী, নাসিক, হরিদ্বার এবং প্রয়াগ । অতঃপরে অঙ্গরাসুলপতি কঙ্কনের এই কলসটি নিয়ে 'সর্বলোককে পাশিয়ে ঘাম এবং সেখানে দেবতারা কলসভরা দূহাপান করে' অমৃতভ' লাভ করেন ! ঐতিহাসিকরা বলেন, পঞ্চম পতাবীর মহাভাগে মদ্রাট দর্শ'বর্ষ'ন পূর্বোক্ত চারটি স্থলে ঐতিহ' ভিন বহর অতঃ-অতঃ একটি করে কুন্তবেলার প্রবর্তন করেন । এই নিয়মটি আরও অর্থ'ন বিস্তৃত বারো গুণ বনগণ হয়ে চলে আসছে । এই কুন্তবেলার আপ্যাতরূপ হল দর্শ'ন, কিন্তু এটি ভারত রাজনীতির একটি অঙ্গ ! মদ্রাট দর্শ'বর্ষ'ন জনজীবনের সঙ্গে যে ভাবে নিজেই জড়িয়ে ছিলেন, ভারত ইতিহাসে তার বিস্তার উদাহরণ নেই । তিনি ভগ্নানীকন ভারতের সকল মহত্বম-সম্পন্ন রত্নপুত্রের মধ্যে ঐক্য এবং সংজ্ঞিতবোধ আদায় জন্য এই বৃহৎ বেদার প্রবর্তন করেছিলেন । এই বেদার মিলেছিল শেহিনকার আর্থ'বর্ষ' আর দক্ষিণাত্য, মিলেছিল গুজ আর হুন, মিলেছিল দ্ব্যতননী ত্রাঙ্কন সভ্যতার সঙ্গে নৌক সং'গতি । দর্শ'বর্ষ'নের কালেই এগেছিলেন হুয়েন সাং । ভারতের ইতিহাস তিনিই প্রথম লেখেন । তাঁর স্মৃতিকথাই ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ।

মদ্রাট অশোকের পর মৌর্য সাম্রাজ্যে জাল্পন হয়েছিল । পরে এল শুলবংশ—ভার্য ও গাঁড়িতে বাকতে পারেনি । অতঃপর ইতিহাসের অন্ধকার বৃক্ষের আচ্ছন্নত । এই অন্ধকারে হাতাঙ্কিয়ে ইতিহাসের অনেক কাহিনীকেই হুঁত পাওয়া যায়নি । অতঃপর বৃষ্টীয় চতুর্ষ', পঞ্চ ও ষষ্ঠ পতাবীরাষ্ট্রীয় পুত্রসাম্রাজ্যের কাল হল ইতিহাসের স্ম'বর্ষ'ন সেই বৃক্ষে দগ্ধোবনে দাঁড়িয়েছিল এই উল্জয়িনী আর অবস্থিকাপুরী । এখান থেকে ওঠে শিশু নাহিত্য কাব্য ভাব'ন' দ্ব্যতননী । এখান থেকে আরম্ভ হয় আবার একটা মহত্বম সভ্যতা । এই সভ্যতাই উত্তরপাশক হলেন মদ্রাট দর্শ'বর্ষ'ন ! হুয়েন সাং মদ্রাটের দানপীলতার যথিয়া বর্ণনা করেছিলেন ।

ষষ্ঠীয় চতুর্ষ' ও আপন নাম নিয়েছিলেন বিজ্ঞানগিতা । উজ্জয়িনী ছিল তাঁর রাজধানী, বিশাল ছিল তাঁর সাম্রাজ্য নগর ও লালিতকলার অসামান্য তার জদুগুণ ; লগতি

ও কাব্যকলায় তিনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে ঘুরে বাধ করলেন। মহাকাব্য কালিদাস, বরহমিহ, শঙ্ক, বেতাল-চট্ট, বরাহমিহির প্রমুখ নরক নরক স্বরূপ তাঁর রাজসভা বন্দনকৃত করেছিলেন। সংকৃত নাট্যে ও কাব্যে উজ্জয়িনীর আকাশ-বাতাস ঘূর্ণিত হয়ে উঠল। বিক্রমাদিত্য বিক্রমশতকের প্রবর্তন করেছিলেন :

আধুনিক উজ্জয়িনীর 'গ্র্যাণ্ড হোটেলে' উঠেছিলেন। হোটেলেটি বৃহৎ। নীচের দিকে কুলবাসান। সামনেই 'টাওয়ার ক্লক,' অর্থাৎ ঘণ্টাঘর। হোটেলেই বাসদামারী পরিচয় ইংরাজীতে কথা কয়। বুরুতে পাঠ্য গেল বিদেশী ট্যুরিস্টরা এখানে ওঠে। দৈনিক তিন টাকার পূর্ববৃত্ত ও পূর্ণাঙ্গিত একটি ঘর পাওয়া গেল। অল্পে একটি রেলওয়ে পুল! সেই পুল পার হয়ে গেলে পথেরে মধ্যকোষে শৌখিনো ঘর। বলাবাহুল্য স্থান ভাল অনুসারে আদম একটু ইংরেজি মেজাজেই ছিলেন।

ইতিমধ্যে এ বরগতি আভ্যন্তরে পাড়া ঘর, আড়াই গজার বহুরেও আগে থেকে এই উজ্জয়িনী, তদানীন্তন অবস্থা,—একটি রাজনীতিক ও বাণিজ্যিক ঐতিহ্য বহন করছে। বোধ করি আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। পথ ছোট নয়, এবং বাজার বেশ বৃহৎ। এগর বাজারের মহাজন দাঁড়া' তাঁরা প্রধানতই বাজোরারী। তবে এদের মধ্যে বিভক্তি আছে কিছু। কৃষ্ণভক্ত জৈনী, শাক্ত,—এবং শেতম্বরী ও দিপম্বরী। কিন্তু এ দ্বিধে আমি বেশি দূর এসোতে চাইনে, কেননা অতটা আবার জানা নেই। পাঞ্জাবেরও একটা অংশ আছে ছোট রাজপুতীয়। তারা হাছ-হাছ, বাছ, শিব এবং কালীপূজো করে। তাদের নিয়ে আমি ঘর করেছি অনেকবার। বিচার পরিচয় পথে পাঞ্জা পুত্রের বিন্যাস জৈনধর্মেরে ঘাসের মেখেছি, তাদের সঙ্গে রাজসভার নাথ্যহারের বনছোড়ার জৈনের বেলেদা। বাজোরারী এখন পূর্বব্দ একটা সাধারণ সংজ্ঞা। অঙ্গের অভাবে এরা বিজ্ঞেরে সেম গাকতে পারল না,—অর্থাৎ এরা দম্বত ভারতে অঙ্গরত বাসিন্দে পলক মুদ্রাক্ষে চলপাদ করিয়ে বেড়াল! এমন অব্যবসায়ী

দহিক, অজ্ঞাতপত্র, বনবাণী, বাজারী-বহুবংশ এবং গানশীল মানবশ্রেণী পৃথিবীর যে কোনও দেশেই কম। উজ্জয়িনীর এ-বাছারে ও-বাছারে প্রতিদিন ঘুরেছি। অসংখ্য বাজোরারী জনকটদার ভিতর দিগে আনা-সোনা করছি, কিন্তু এক ব্যক্তিকেও ক্রুদ্ধকণ্ঠে কথা বলতে দেখিনি। কলকাতার বড়বাছারে বাজোরারী মহলে কখনও পারস্পরিক ঘণ ও অশান্তি দেখা দিয়েছে এমন বহর আজও কায়ে ওঠিনি। এদের ঐক্যবোধ অবন্যসাধারণ।

প্রাচীন দিনের ভারতের একটি টুকরো এসে পড়িয়েছে যেন শিল্পাতত্ত্ববতী হাছবাটের প্রান্তে। এটি যেমো সোদারবতী তাঁরবতী নাসিকের ঘাটটির কথা মনে পড়ছিল। আমার মন তখন ছৌক ছৌক করছে অবস্থাধেরের গুরু দ্বন্দ্বেরে জন। কিন্তু সেই গুপতি কোথায়? মন খারাপ হচ্ছে আধুনিককালের বাজার গাতি দেখে। বাজার মানেই 'ড' কলকাতা রোমন্বাই বাজার আর সিল্পী। একটি পথর অন্যটির অদ্বন্দ্বরদ। সেই বিজ্ঞ অববগতি, ভিতরে ভিতরে সেই নোংরা বতী। রোমন্বাই সিনেমার ছাঁব দেখবার জনা পথে-পথে সেই বাজানবাসদ্যহ প্রচারপত্র বিলি! সেই লাউড স্পীকারের কলম' চিংকার।

আদ্যাবের কাছাকাছি মন্দিরের ভিতরে সেই দৃশ্যেরে মনো দেখেছিলেন সত্যিযেবীর শীল্হান। এখানে মহাকালেশ্বর মন্দিরে ঢুকে ঠিক সেই দৃশ্যটি মনে পড়ছিল। এই মন্দিরে গান জ্যোতির্লিপির অন্যতর লিপটি প্রতিষ্ঠিত। এখানেও সেই পথরের মনো প্রবেশ করতে হয়। একটি দৌল্যপট্টের উপরে জ্যোতির্লিপটি লাভ করাযো। ভিতরটি নকটিক-বিচ্ছুরিত আলোর কিছু নব্বছ,—অতটা অন্ধকার হবে হয় না। এর পিছন দিগে রয়েছে শেতম্বর' নির্মিত একটি ক্ষুদ্র পার্বতীমূর্তি'। এমনটি দেখেছিলেন বৈদ্যনাথ হায়ে! এই ঘাটে পিতৃস্মৃতিরে ভ্রাত ও তর্পণ করা হয়।

যেবটি কাণীতে দেখা যায়। যেবেরে হাতে ও গলায় বেশ মোটা মোটা গহনা। পরশে দাল এবং হলুদ রঙের বাসরা বহা ওড়না। হাতে ও

পায়ে ঘেঁষা পাতার গংগের ঘোষ । চুইকি বসানো
পরিষ্কার তারা হঠাৎ নিয়ে গান গেয়ে বাহ গ্রামঘাটের
দিকে,—সেমনটি দেখা যায় কাশী কিংবা কাঁপিতে ।
ঘাটে গিয়ে যেয়েতা ক্রাসার হুপ, এবং স্রোত জেলে
শিখার উপরে ভাসিয়ে দেয় । অনেক রাস্তাবন্দের
উকরোয় কুল বেলপাতা এবং নারিকেল বেঁচে ভাসিয়ে
দেয় । এই নারিকেল তারা আবার হুত সেন থেকে ।
শিখার ঘাটের কাছে কঙ্কণের হু বেঁচে এসিয়ে আসে ।
মজার টোল পার্কে তাড়ের খাওয়াবোটা পুস্যকর ।

হাকাল হিন্দুটি দেখলে হঠাৎ অতি প্রাচীন বলে
হবে চর না ! অত ইতিহাসে দেখছি বহু পত্নী
এর উপর দিয়ে চলে গেছে । প্রায় সাতশ' বছর
আগে এই হিন্দুটিকে একবার প্রায় খুঁজ করাই
হয়েছিল । অতঃপর বিসৃত অস্ত্রাশ্রয় পত্নীতে এটিকে
পূর্বনির্মাণ করা হয় ।

একটি শ্বেত পাথরের চ্যাপটিয়ের মধ্যে সৌণ-
নির্মিত কঙ্কণটি দেখে তাকিয়েছিলেন । এটি
গোপাল হিন্দু । এটিও প্রায় একশ' তিরিশ বছর
আগে নির্মাণ করা হয়েছিল । হিন্দুসুলি দেখে-
লেবে বেড়াছিলেন ।

অস্ত্রাশ্রয় পত্নীর প্রথমেই অস্ত্রের বহুরাজ্য অর্থাৎ
যে পাঁচটি হান্দুশির পাঁচটি গগের নির্মাণ করেছিলেন
উল্লিখিত তারই একটিতে বহন করছে । অতি নির্মিত
আশ্রয় পত্নীর দ্বারা যে-সমস্ত এবং সেগুলিসুলি
তিনি নির্মাণ করেছিলেন, আরও উল্লিখিতালের মধ্যে
দুইয়ের সেই দ্বারা এই হান্দুশিরের নির্মিত সমস্ত
ও গতিটিকে নির্দেশ করে । দুই-তের গতি
সম্পূর্ণ, চন্দ্র এবং বায়ানের সঠিক হিসাব ও পন্থা,
নন্দ যিনি এই বসাবাস্য থেকে হান্দুশিরকে একটি
গতিকার আকর্ষণীয় বহু করে রেখেছে ।

যায়েকটি ছোট কার্যের জন্য উল্লিখিত বিদেশ
প্রসিদ্ধ । এককালে ভারতীয় ভৌগোলিকরা দুই-তের
পথে পৃথিবীর যে-অব্যাহতালীন পৃথিবীর ব্যাবহারিক
অর্থনৈতিক উল্লিখিত পথ হিসাব করেছিলেন, সেই
ব্যবহারিক বিদেশের উপর দিয়ে এসে চলে গিয়েছে
এই হান্দুশির হিন্দুটির জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর দিয়ে ।

সম্পূর্ণ বহু পত্নী পূর্বে এই পন্থা এবং হিসাব করেই
শিবের তৎকালীন উপাসকরা চিত্র এইখানেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের
স্থাপনা করেন । হাকালের কাকাকাকি যেটি
হান্দুশিরের নির্মিত দ্বারা—তারই কাছে রয়েছে
হাকালের পত্নী,—তিনিই চিত্র দ্বারা দেখা অবস্থিত !

শিখার অপরদিকে সেদিন দেখেছিলেন যে বিরাট
গুপ্তাশ্রয় আশ্রয়, সেটির নাম "পত্নী" । এখানে
সংসারবিরাগী ব্রহ্মচারীদের বসবাসের স্থান । চীনের
সম্প্রদায় দ্বারা প্রদত্ত তোলে, দ্বারা বলে ব্রহ্মসত্য চন্দ্র
বিদ্যা, দ্বারা উল্লিখিত সংসার নিয়ে যত জেঁদে বৈরাগ্য
পড়ে, এই "পত্নী" তাদের জন্য । শাস্ত্রসম্মত,
দ্বারা, বৈরাগ্য, পান্থ্য, বৈরাগ্য, দর্শনিক,—
ইত্যাদি দ্বারা অবৈতন্য, তারা এখানে "পত্নী"ই
বসবাস করেন ।

দ্বারাতে দ্বারা হিন্দু । কিন্তু হিন্দু ওখানেই
শেল হয় । প্রাচীন হিন্দু, হিন্দু, হিন্দু ওখানেই
স্বদেশের প্রকৃতি সেবারদ্বারা প্রদত্ত । অদ্বারা হিন্দুও
আছে, কিন্তু তারা চলে আসলে ।

আবার বিদ্যার নেবার দিন এগিয়ে এগিয়ে ।
সেই কোকালের অবসরদের চাকরা বোধ চর বইল
না আসার মনে । যে-বস্তুর আশ্রয় এই উল্লিখিত
পথে ও পথের প্রান্তে পেতে এগিয়েছেন তা শেল
কিংবা শেলের না, অতটা তালিয়ে দেখিছি ।

কিন্তু যেটি শেলের সেটি অদ্বারা হলেও সেটিতে বহন
করুন না । সেই অদ্বারা অদ্বারাদের আশ্রয়ের কল্যাণ
দ্বারা বেঁচে থাকে । সেটি এখানে সেই, সেটি আছে
কোথাও তাও জানলুম না । বাইরে যেটি দেখে
শেলের সেটি একালের একটি দমর । সেই দমরের
সম্প্রদায় বইছে এখানে ওখানে । পুরাতন কাল তার
সমস্ত দ্বারাট একে একে চলে নিয়ে গা ঢাকা
হিচ্ছে । আরি একদিন কাল বিলুপ্ত ।—

তদ্বালের পাতাপত্নী পেরিয়ে দ্বিতীয় অধিকার
আবার এসে পলা বাড়িয়ে দেখে থাকলুম উল্লিখিত
উপরে সঠিকভাবে । সেই একই দ্বারা । অদ্বারা এবং
একই চার বছর পরে । দেবার আশ্রয়, তাই বইতে

একটি ছোট ঘটনার কথা শকৌতুক লিখে রেখেছিলেন, সেটি বলি। সেটি ৮ই জানুয়ারী, ১৯৪৪ খৃস্টাব্দ। ভারতের রাষ্ট্রপতি ভট্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ লালিতে উপস্থিত হয়েছেন। ট্রান্সজিয়ার ত্রিক বিচ্ছেদ সমস্ত প্রান্তের কলেক্টরের বাংলার তিনি উল্লেখ করেন। সেদিনকার সেই বিরাট রাজকীয় সমারোহ এবং রাষ্ট্রপতির সেই বিশাল প্রান্তব্যাপী শোভাযাত্রা না দেখলে স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের প্রকৃত স্বরূপকে সোজা যেতনা! খণ্টা দুই আমি অস্বাভাবিক হয়ে ছিলাম। এক সময় ইচ্ছা হল, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে কেমন হয়? সেই অবসর অনুসন্ধান এবং আনুষ্ঠানিকপর্বের ভিতর দিয়ে বহু প্রচেষ্টার রাজপুত্রস্বপ্নকে এড়িয়ে আমি এক সময় গিয়ে পৌঁছলাম মেজর জেনারেল হুনার গিয়ারে কাছে। সেদিন লালিতে আমি একমাত্র বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলাম, সুতরাং মেজর জেনারেল আমার কল-প্রার্থনা বহুত করলেন। অতঃপর বেলা চারটার পর যখন রাষ্ট্রপতি ভিতর থেকে নুবে চোখে চল গিয়ে হুনারে বসে নুবেতে বসতে বাইরে এসে গাড়িতে উঠবেন, সেই অবকাশ-ইচ্ছায় হয়ে আমি তাঁর সামনে গিয়ে দরবার করে দাঁড়ালাম। তাঁর পোশাক অতি শাফাফ। একটি পুরনো লম্বা বস্ত্রের লংকোট, পরনে শূণ্য, এবং বাথার টুপি। পিছনদিকে কোনও পারিপাট্য বৈশিষ্ট্যে ভাল লাগল। বৃহত্তে পায়ে স্নেল বাকি এবং রাষ্ট্রপতি এ দুইজন এক বয়। রাষ্ট্রপতির এই বিরাট সমারোহের মধ্যে ভারত রাষ্ট্রের আত্মাভিমান থাকতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিগত দল বিরক্তিবাদ। এইকৈ আমার বক্তব্য ছিল। পরে যখন তাঁকে মাথায় একপালা জিন্স গাড়িতে বসতে দেখলাম, আমার আরও ভাল দেখেছিল।

পরিকার বাংলার আমার কথাবার্তা আশ্চর্য্য করতেই ভট্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ একটু ক্লান্ত হয়েছেন। আমার আলাপ-ইচ্ছা আগেই কিং করে রেখেছিলেন। সেটি এই। প্রায় আড়াই বছর আগে দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবনে আমার “হজা প্রত্যয়ের পথে” তথা “যাজিক” নামক লিখনটি জমাটি হৈলে রাষ্ট্রপতি বিশেষ তাত্ত্বিক করে নিউ থিওরটর কন্ট্রোলিং কাছে একটি পত্র দেন। আমার আলাপ করার কালে সেই তথ্যটি তাঁকে অবগত

করিয়ে আমার পাঁচকটুকু দিলুম। তিনি বেশ সহজ বাংলায় জানালেন, ছবিটি অত্যন্ত বনোজ হয়েছে এবং তিনি এটি বিশেষভাবে প্রসঙ্গে রেখেছেন। কোর-বরী ধর্ম্মে বাংলার তাঁর বিশেষ বাসনা। এ বইখানি যে পণ্ডিত বহর আগে বাংলা ভাষার প্রকাশিত হয়েছিল এটি শুনলে তিনি আনন্দিতই হলেন। পাশে বাঁকিয়ে মেজর জেনারেল আমাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন। ছবিটি তিনিও দেখেছিলেন। আমি দুই বসেছিলেন, জীবিত কোলও মেজরের জীবনের একটি ইচ্ছা নিয়ে ছবি ভারতে এই প্রথম। অতঃপর ১৯৪০ খৃস্টাব্দে রাষ্ট্রপতি কলিকাতা তীর্থস্থানে যান।

আপাশে কিছু কিছু লোক যোগ করি দিক। উপস্থাপন করে উঠে থাকবে। সুতরাং আমি পুনরায় রাষ্ট্রপতিকে দরবার জানিয়ে আমার ভিত্তির মধ্যে এসে তলিয়ে দেলাম। চোখ তলি করে একটি লোক একটু প্রসন্ন হয়ে আমার হাত ধরে টেনে এনে বসে সাহায্যকার তলার বসিয়ে চোখের পেছালা ও বসন্তের দ্রুত এগিয়ে দিল।

আজ লালি ভবন। রাষ্ট্রের সারের শূন্য একটি চোটে। দেখানে এক আশ্চর্য্য পণ্ডিত বসি ছিটকে আসে তবে সেই চোটেলের পরিচালক নামের বান আচার ও বাসস্থান ধূপের তালের পরিচালনা করে। চার বছর পরে আমার শৈবন এক দাক ঘুরে এলুম লালি-ভবনের ওপর। ওখানে নতুন বসন্তের চক্রেতে সেলে এখন অতি আদ্য দৃশ্য। প্রচানবতী মেজর, ১৯৪২ খৃস্টাব্দে যে যোগবুদ্ধেন চারটি পুঁতেছিলেন, সেটি এখন আরেকটু বড় হয়েছে! এখন প্রতি বছর একবার হাত পাশিত্ত আর হারামো-পলানার অধিকন্তু দেখানো করে থাকে! বসন্তের বেতের বীতের দিকে ভূমন্ডের মধ্যে ইমানী সেই অধি লোককর অবস্থানে রাখা হয়। আর একবার লালিভবনের সেই বিরাট ও কালকরী বসন্তের আলাপাশে করে খণ্টা যোগাকেরা করে অপরাহ্নের দিকে এসে টেনে উঠলুম।

খাঁসি আদরার উপাচয় ছিলনা। কিন্তু, আসতেই হল। বিশ বছর আসেকার মে-খাঁসি, হাত সেই খাঁসি সেই। এগুলিকে সিজিম লস-লাই দেখানে দরকারী,

কাছারী ইকুপ এসেচ, ওনেইটী আর ডালপাতাল,—
অদ্বিতিক সাধককালের সেই পুরনো, মোংগা, খিচিক
খাঁসি। কালি সেখানে মরুভূমির মতো বুক ছিল।
ভিত্তিরা পথে পথে কল খিচি করে ডেড। পরকারী
হরের কদে হান করে যেত ফে-ফেমন পারত। সেদিনকার
সেই পরিত্যক্ত উপেক্ষিত অবস্থাত কালি! কালির হাদীর
পীতাক সেই ইয়ারতের লাবনে পড়িয়ে চারিদিকের মোংগা
গলিখুঁজির নিকে তাকালে সর্বব্যাপী অমলর চোখে
পড়ত। বুক মার্তি হু হু করছে সব দিকে, দরিত্র চাউতলা,
—পুষ্টিবীর সব মোংগা জবেছে নালা আর মনবার।
গভীর মধ্যে মানুশ কিলবিল করত! তাদের ভবিষ্যৎ
ছিল অন্ধকার। ইংরেজের প্রতি নিম্মল আক্রোশে সেই
কালি ঘনে ঘনে পড়ত।

আজকের কালি অন্য। আজও পুরনো পুরনো পুরনো
পুরনো অন্ধকার, কিবু, চকরা, ভিত্তিপ্রকার। আজ
জনতার ভরে সেজে খাঁসি। পুরনো টাল্পা আছে, কিবু,
হাইকেল কিসা এসেছে। মোটরকার হুটীয়ে অমল্য,
এবং দুর্গপ্রাকারের দীর্ঘ মোটরবাসগুলো হাঁস-কাঁস করছে
দর্শক। মোটর, বাজার, কারিকবানা, কাছকারসার
সিকিভনি—চারিদিক সেব ঝে ঝে করছে। কালি আজও
উপর প্রদেশের ঘোড়ী হয়ে গেছে এবং উক্ত প্রদেশের
কিন প্রান্তে কালি ঘনে কুলে রয়েছে।

সেই কালি। দু'রে দু'রে অজানা পরিচেনার মেন্টম,
গলব মনত্বনি, এবং তার ভিতরে ভিতরে সিকিভনি,—
এরা পুরনু রহস্যভরা সব, সম্পটস্কেলও বটে। এসেছে
ভিতরে ভিতরে আত্মশোষণ করে থাকে তারাই, বাবেরকে
দল্ল ভাবার কলা সব রাষ্ট্রত্বাদী। তাদেরই বৃদ্ধ একটা
খণ্ড আজও সম্পর্কভাবে রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থাকে স্বীকার
করেনি, সমাজকর্মিন মারেনি, মোগলরনের কোনও কর্মে
মিথেষ্টেয়েকে মথেক করেনি। বৃদ্ধের কালি আজও
তোমনি 'ডাকাতের দেশই' হয়ে গেল। কিবু সেই
ডাকাতরা যে কোনদিন বিশেষ বিজ্ঞাতাদের কাছে ল্যাতা
'স্বীকার করেছিল, এমন সবও পাওয়া যায় না। তারা
আলম 'রাষ্ট্রশাসনাবার' মধ্যে কোনও হাইয়ের সোককে
চুকতে ঘেরনি। চারটি দলী—বেডোয়া, সিদ্ধ, চন্দল ও
পাখতী—এই চারটি মেন্টমীর মধ্যে তারা আজও 'মারনি'

কীরম যাপন করে চলেছে। এদের বীরত্ব ও দুঃসাহসের
জাতিমী মধ্যভারতে বা মধ্যপ্রদেশে বিশেষ পৌরবের
সঙ্গে অধ্যাবাসি কথিত হয়ে থাকে। তথাকথিত সমাজগণ
বা সমাজ সমাজে এরা আজও এসে প্রবেশ করেনি।

কালির দু'দু'রে ভিতরকার 'চামাখটি' এককালে আবার
ভাল সেজেছিল। উনিশ বছর পরে আর একবার সেটি
সেজে যেতে পার হল। জর্জের রাজা বীরসিং দেও
সম্পদ পতাবীর প্রথম দিকে এই দুর্গটি নির্মাণ করেন।
দুর্গটি আকবরের পুত্র সেলিম যখন কাভালীর উপাধি
মিথে সিংহাসন লাভ করলেন তখন বীরসিং দেও গির
সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর প্রিয়শত্রু হন। মাহাদীপীরে
দুর্ভার পর তিনি মোঘল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ
করেন। কিবু দুর্গটি আওরঙ্গজেবের সেনাদলের নিকট
তিনি পরাজ হন। তাঁর আত্মকাল কিবু ছিল আবার
জানা মেই। কিবু একখাটি ভেবে বিশ্বাস পাগে যে,
তিনি প্রথম পুরনু আকবরের প্রিয়মন্ত্রী আব্দুল
কজলকে হত্যা করেন। দ্বিতীয় পুরনু মাহাদীপীরের
সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব। তৃতীয় পুরনু দুর্গটি শাহজাহানের
কালেও তিনি দুর্গকার ব্যক্তি। চতুর্থ পুরনু
আওরঙ্গজেবের নিকট তিনি পরাজিত। আকবর থেকে
আওরঙ্গজেব,—সম্পূর্ণকাল মদেহ মেই। সেই কারণে
এ সম্বন্ধে ভারত গভর্নমেন্টের এম্বুটি প্রচার পুস্তিকা
থেকে কয়েক হু হু কুলে বিজ্ঞ :

"He murdered Abul Fazi, the favourite
minister of the great Moghul Emperor Akbar...
He rose to high favour when Salim ascended
the throne as Emperor Janangir...He was
defeated by an army led by Aurangzeb, the last
of the Great Moghuls."

এককালে কয়েকটি ইংরেজ সৈন্য কালি দুর্গঘারে
পাহারায় থাকত। তাদেরই অমৃত্যুর উপর দর্শকদের
প্রবেশ নিষেধ করত। তাদেরই একজন আবার একটি
কাবেরা ভেঙ্গে দিয়েছিল, সেটি কারণে কালি দুর্গে
আর কোনওদিন আসনা স্থির করেছিলুম। কিবু
চাকটা আজ হঠাৎ ঘুরে গেছে। আজ ট্যুরিস্ট দলের
মধ্যে ইংরেজের সংখ্যা বৃদ্ধি কম,—কয়েকজন আত্মজী

স্বাধীনতা' লেখতে গেলে ইরানীঃ এক এক সময় ভারতীয় প্রবর্তার কাছে অনুভূতিগতের আবেশের ভাবাবেগে হয়। ইংরেজ-বনোবদ্ধি আর সেটিকে অসম্মানজনক বলে করে।

কীর্ষি হুসোর বাইরের চেহারাটি এককালে অস্বস্তিক ছিল, সেটি বিবর্ণ হয়ে এসেছে। ভিতরের প্রবল অশ্রুতার জ্বলে জ্বলন্ত,—চেহারা এসে গেছে কীর্ণতা। তার চেয়ে বড় কথা, ভিতরের পরিবর্তন ঘটেছে অনেক। ছিল প্রাচীন, হয়েছে আধুনিক। পুরনো ইমারতের কোথাও কোথাও অঙ্গালের নিউটন বসেছে। হঠাৎ চোখে পড়ে সিরেটের পলভারা। ভিতরে যে দুর্ভাগ্যি বর-সোর নির্ধন করা হয়েছে, সেগুলি হাল-খাচরের আশ্রয় বাড়ি,—নতুন আর পুরাতনের সঙ্গিত বন্ধা ঘনি। এখন এখানে ভারতীয় পল্টনের শিকারী কাঁচা বাটে থাকে। রাহমানের প্রশস্ত গ্রামপথে তারা কুচকাওয়াজ করতে বেধে। এটি এখন একটি রাস্তার অভ্যন্তরে কেন্দ্র। ভিতর মহলে তাদের বস আধাসিক বাবুবা।

কই, সেই 'গামাতি' লেখতে পাচ্ছিনে—যার ভিতর-কার স্কটিক বিচ্ছুরিত আলোকে পলাতক রাওয়ের স্ত্রী রাণী লক্ষ্মীমাই গোলাপের দুগন্ধী নির্ধন মিশ্রিত ক্ষুধাশিল্পে অসম্মান জান করতেন। সেই গির্জা পীতলজঙ্ঘারের স্বপ্নালোকিত 'গামাতি' আর হুঁড়ে পাচ্ছিনে। না, তার গির্জা কোথাও নেই! হিজ্রাসা করতল এখানে ওখানে। কই, খবর জানেনা কেউ। 'ভবানীপঙ্কজ' নামক বৃদ্ধ কাহিনীটি পড়ে রয়েছে যেন বস এক হুঁড়ে দৌছতে! নীচের দিকে রয়েছে সেই প্রখ্যাত শিবকাম্বর,—যেখানে 'তরুণী লক্ষ্মীমাই' মাথার কঁচি আরতেন পুরাতন উপহার। আজও রয়েছে সেই 'সপ্নের তোরণ'—যেখান দিয়ে ছুটে বেঁচেছে যেত তরবারিহস্তে রসোবদ্বন্দ্ব অশ্রুপূর্ণ অসম্মানজনক অশ্রুতোহী। পুরোহিত্যনি এখানও হুঁড়ে ঘাটনি। উপর দিকে রয়েছে সেই দুর্গপ্রাকার প্রান্তের বিশেষ স্বাভিভূমিটি—যেখান থেকে রাণী লক্ষ্মীমাই তাঁর পালিত পুত্রটিকে বন্ধের সঙ্গে বেঁচে যোকার পিঠে হুঁড়ে শেরোয়া উদ্ভাসিনীর হতো অগার নীচের দিকে দ্বিগুণকাজপনা হয়ে কাঁচা গিরিহিলেদে পলাতনের কালে। যোড়টি বাঁচনি। সেই যোড়ার মর্ম হুঁড়িটি চারিদিকের পুণ্য প্রান্তরের মাঝখানে আঁকও রয়েছে দাঁড়িয়ে। এটি অবিদ্যমান কাহিনী পুন্যে একাশেও কন পিউরে ওঠে। হুঁড়ের নীচে দিকে রয়েছে কনকটি ঐতিহাসিক প্রকটা বস্তু। একটি হল পলাতক রাওর আবেশের কাঁচা বস, অন্যটি দুর্ভাগ্যের ভিতর দিয়ে গোলাবদ্বন্দ্ব হুঁড়ি দিয়ে শৌর্য্যের অন্ধকার পথ।

হঠাৎ পল্টনের দলে একটি ঘুরকের সঙ্গে আলাপ হল। ঘুরকটি বালাশী, বাড়ি বাকুজার। তার কাছেই পুন্যপ্রবণ এখানকার পল্টনে করেকজন বালাশী সৈন্য আছে। তারা এখানে আশ্রয়-আশ্রয় যোগাভা ও নিরানুভূতিতার জন্য বিশেষ গির হয়ে উঠেছে। হাইকেন প্রাকৃতিকে তাদের 'দক্ষ' বেশ নিভুল। আবেশের কথা এটি, আহার দুটি অভ্যাস বদলায় এবং স্বাধীনতারের ব্যাপারে বালাশীর দলটি দর্ভাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এটি সূর্যের কথা। কেননা সামান্য দুর্ভিক্ষ বলে, অগ্নে তারা, আশ্রয় দর্ভাগ্যে ভারতীয়, পরে বালাশী!

নতুন কীর্ষি আধুনিক। পুরাতনের পাশ কাটিয়ে নতুন কীর্ষি এবার মাথা তুলে পাঁড়িয়েছে। নগর সম্প্রদায়ের কাজ চলছে হুঁড়গতিতে। কেউ বলে নেই। বুদ্ধ চাপড়ানোকে। কবার কবার কোমল ও ল মিলি বার করে দুর্ভাগ্যের কাহিনীতে চাইলে না। কাজ বড় হচ্ছে, কচকি চলছেন কোথাও। বিশ বছর আগেকার সেই হুঁড়ি অশ্রুজিত এবং আলিঙ্গনীয় স্বাধীন-রাষ্ট্রটি আর চোখে পড়ছে না। এখন এরা বলে গেছে নতুন স্বাধীন নির্মাণের কাজে। এদের নতুন উৎসাহ এবং নতুন পরিচালনার দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে। পুরনো কীর্ষি হুঁড়ি চাইলে যাবে এবার—লেখতে পাচ্ছি। আশ্রয় হান্নে বসুজের ঘন এখানে ওখানে!

বস্তুর ভিতর দিগে উপাশ্রয়স্থান: চালিয়ে এসে শৌর্য্যের সেই 'রাণী ভালাও' পরে। সেই বিশাল ক্ষুধাশিল্পে যোবদ্বন্দ্বের ছোট ছোট উদ্ভাসনা আঁকও বাসুদ্বন্দ্বনে ঐশ্বর্য্য করে। পাশেই সেই কালীমন্দিরের চত্বর,—সেই কামরুজী দুর্ভিক্ষের পরোক্ষের মাঝখানে ঘাট। দরোবরের চতুর্দিকে প্রবৃত্ত-গম্ভীর হতো এক একটি হায়ান। এদিকে শিবকাম্বর। চারিদিকের দলল কোমল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের হয়ে ভারত হুঁড়িহাসের সেই অবিদ্যমান রাণী লক্ষ্মীমাইয়ের হুঁড়ি যেন উদ্ভাসিত হচ্ছে।

বুদ্ধপ্রবণ হায়ার নীচে বসতল কতক। হাওরা উঠেছে কুঁচকিয়ে। লেখতে পাচ্ছি পল্টনের পুণ্য-পুরাতন। বস্তুদের ভিতর পুণ্যপ্রবণ দুর্ভাগ্যজনক এখান থেকে পুন্যে পাচ্ছিনে। আবার ডাড়া ছিলনা। লেখতে বেঁচেছিলুম অবশী রেপ। এসে শৌর্য্যের দুর্ভাগ্যবস্তুর পল্টনপ্রান্তে বেতবতীমণ্ডিতীয় কাঁচির এলাকার। হুঁড়ি: এই হাওয়া নিগ্রিহাল গানের তলায় হুঁড়ি হুঁড়ি তলাজর হয়ে থাকা ভাসিট লাগছিল।

তুমি নারী

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়



ব্রূপ দায়ী কত বড় সম্পদ তা বোঝবার বয়স এখনও মেয়েটার হয়নি।

ও কালো, কিন্তু সুশীতল নয়।

তা সুশীতল না হিলেও, সৌন্দর্য' যেটুকু ছিল তা এই কালোতেই সবটুকু ঢাকা পড়ে গেছে।

অবশ্য হৃদয়ের কলরবে কতটা তা শুধনও পুঁটি বুঝতে পারেননি। সে শুধু জানে সে কালো। তা হাতা আর শরই তার আছে।

যাবা তার বোনী জন্মিয়ার।

ক্রমাগত অট্টালিকা, গ্রন্থাগারের অতিরিক্ত হাসানাদী। অভাব করছে বলে তা যে ছেলেবেলা থেকেই জানে না। মেয়েটারি মায়ের কোলেই সে মানুষ হ'চ্ছিল।

ভবিষ্যৎ-গিন্নী অপর্ণা সেবার একমাত্র আশ্রয়ণী মেয়ে পুঁটুয়ারাণী—জাকামার পুঁটি।

পাড়ার মেয়েরা জন্মিয়ার বাড়িতে বেড়াতে আসে। বেড়াতে এসে খোদাখুঁদি করে পুঁটির প্রশংসা করে। বলে, তা হোক না বা তোমার মেয়ে কালো, এমন গড়ন আর কচনের আছে বল দেখি।

কিন্তু এই সব চাটুখান্যে অপর্ণা সেবার মন কিছুতেই ভরে না। মেয়ে যে তাঁর দুঃস্বপ্নের তা তিনি জানেন। একটু হেসে বলেন—না বা মেয়ে আমার দুঃস্বপ্নের নয় তা আমি জানি।

বলেই একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুঁটির মাথার চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বলেন—কি জানি না ওকে আমি কেনন করে পাগল করব, সেই কথাই ভাবছি দিনরাত।

দুঃসৌন্দর্য বলে—তুমি হাসালে দিদি। তোমার মেয়ের বিষয়ে তুমি এত টাকা ব্যয় করবে। তোমার মেয়ের আবার বিষয়ে ভাবনা। মেয়ে যে শুধু কাঁচিওঁকর মত নয় আসবে।

অপর্ণা বলে—তা ত আসবে ভাই, সংই বুকছি। টাকাত ব্যয় করব। কিন্তু সেই কাঁচিওঁকর মত নয় আমার পুঁটিকে পছন্দ করে, ভালবাসে তবেই ত।

—শুধু ভালবাসবে। পরে পছন্দ করবে।

—কিন্তু

—কোনও কিন্তু নেই দিদি এর মধ্যে। মেয়েদের বাইরের রূপ নিয়ে কি হবে? হৃদয়ে বৃত্তে থাকবে? আসল হচ্ছে ভেতরের রূপ, মানে গুণ।

অপর্ণা আবার হাসলেন। বললেন, কেন তুমি ত জানিনা ভাই সৌন্দর্য, তোর ঠাকুরকির কি হলো? হৃদয় থাকলে কি তার এই ধূঁধুয়া হাতা কলতে চান?

দুঃসৌন্দর্য বললেন—না দিদি তুমি জানো না। ঠাকুরকিও ত কম বস্কায়ত নয়। হৃদয়ও নেই, গুণও নেই।

অপর্ণা বললেন—কি জানি ভাই আমার অলুপ্টে যা আছে তাই হবে। আর ভাবতে পারি নে।

বলেই তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

অপর্ণা হৃদয়ে এ কথা বলেন বটে, কিন্তু ভাবনা থেকে নিরস্ত হতে তিনি পারেন না।

পুঁটিকে কাছে ডেকে আদর করে তিনি বলেন—দেখিও না, ঠাকুরকি দিয়ে বড়টা হয়, আমি তোমার জন্যে সংই করব পুঁটি, কিন্তু শ্বাশুরী ভালবাসা পেয়ে শুধুই শ্বশুরকে বস্কায়ত করতে বলে নিজের গুণ থাকে চাই বাছা, ঠাকুরকিতে কিছু হয় না।

সে সব বোকবার মত বয়স শুধনও পুঁটির হয়নি।

সে শব্দ তার মার মূখের দিকে তাকিয়ে থাকে ।
কখনও বা ছুটে পাগলিবে ঘাে ।

সন্ধ্যায় তুলসীমঞ্চ প্রাণ বিতে গিয়ে অপর্ণা দেবী
তার গলায় কাপড় জড়িয়ে ছুটি পেড়ে হেঁট হয়ে প্রণাম
করবার সময় দেবতার কাছে শব্দ ওই একটি মাত্র প্রার্থনা
জানান—আগন্তে-বিশপে তুমিই আমার পুঁটিকে রক্ষা
কর চাকুর, তোমারই চরণ প্রান্তে তাকে আমি সর্পণ
করলাম ।

স্বামী তারানাথবাবু ত শব্দে শব্দে হাস্যময় হয়ে
গোেন । কিন্তু বলতে গেলে কখনও বা হো হো করে
হেসে ওঠে । আমার কখনও বা রসে চমকায় করে
বলেন—ওসো খামো ছুঁব, খামো । শব্দ পুঁটি আর
পুঁটি । ও আমি অনেক শুনছি ।

অপর্ণা দেবীর মূখের বেয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে
পড়ে । ভরে তার মূখ দিয়ে কথা বের হয় না । ঠ্রুটি
দুটি বর খর করে কাপতে থাকে ।

তারানাথবাবু তার মূখের দিকে তাকিয়ে বলেন—
কদিমো কেন গো ? কদিগার কি হয়েছে ?

এতক্ষণ পরে নিরাম্বল অভিনয়ে অপর্ণার বুকের
ভেতরটা হুলে হুলে ওঠে । চোখের জলে তার দৃক
ভাসতে থাকে । অভিনয়-কৃত বিকৃত কণ্ঠে বলে—না,
কিছু হয় নি ।

তারানাথবাবু বললেন—যার যার কত আর শুনব
বল ! সেই জন্যই তোমাকে বকেহিলাম । চল্লিশ
ঘণ্টা পুঁটি পুঁটি করে তুমি যে পাগল হয়ে গেলে !

অপর্ণা তার চোখের জল মূখে বলেন—মেয়েটা যদি
শব্দগণী হতো তাহলে বলতাম না । তাহাড়া অদ্ভুতের
কথা ত বলবার উপায় নেই । ওর বিয়ের আগেই যদি
আমি মরে থাকি সেই জন্যই তোমার এত করে
বলাই ।

তারানাথবাবু বললেন—বরবে কেন ? হি, খামো
জি কি রকম কথা ।

অপর্ণা তার স্বামীর মূখের দিকে তার সেই দুটি
জলসিক্ত আরত চোখ একাধা নিবদ্ধ করে চোঁটের
কৃকি প্রান একটু হেসে বলেন—সব না ?

দিয়ে সরলকণ্ঠে বলেন—কেন মরবে ? হি, এ কথা
বলতে নেই ।

স্বামী-সোহাগিনী অপর্ণার সব 'হেঁহে' তখন আনন্দের
আবেগে তখন যেন একবার শিউরে ওঠে । চোখদুটি
তার তখন তেমনি উজ্জ্বল তুলে বাঁধন গ্রীবা হেলিয়ে
হেসে বলেন—যদি মরে থাকি ত এই আমি আপন
যেহেই তোমার বলে রাখলাম, পুঁটির বিয়ে যেন
তুমি ভাল ঘর ভাল বর বেছে দিও । কৃপণতা
কোরে না । তারপর ওর অদ্ভুত বা খায়ে তাই হবে ।

তারানাথবাবু হেসে বলেন—পুঁটি কি একা
তোমারই মরে ? আমার কেউ নয় ।

অপর্ণাও হাসেন ।

হেসে বলেন—তুমি যদি না হতে তাহলে কিছু
বলতাম না । বলবার দরকারও হতো না ।

—কেন ? বাপসালো কি নাম্ব নম ? বাপের
হেঁহে কৃকি রে মর ?

অপর্ণা বলেন—কি জানি বাপু, সোহাগিনীর সব
মেশেনে কেন যেন আর বিশ্বাস করতে পারি না ।

—কোথায় ? কি বেগলে ?

অপর্ণা বললেন—সোহাগিনী—তোমাদের ওই গার-
সাহেবের । আরও কত লোকের দেখলাম ।

অপর্ণা মিথ্যে বলেন নি ।

তারানাথবাবুর দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় প্রচুর
ধন-সম্পত্তির মালিক হয়ে তার সাফের খেতাব পেয়ে-
ছিলেন ।ভরলোকের একটি মাত্র ছোলে আর একটি মাত্র
মেয়ে । মেয়েটির ধন বিয়ে বিয়েছিলেন, তখন তার
অবস্থা ভদ্র ভাল ছিল না, কাছের বড়লোকের বাড়ি
বিয়ে দিতে পারেন নি । অতি কষ্টে মেয়েটির
বিন চলছিল । ভোগেছিল, বাপ তার বড়লোক হয়েয়ে
মরবার সময় নিকাছি তাকে কিছু দিয়ে থাকে । কিন্তু
সাহসাহেবের হত্যার পর দেখা দেল, মেয়েকে তিনি
একটি হানাতাও দিয়ে দাননি ।

তার লক লক টাকার বিষয় সম্পত্তি মেয়েকে মেয়ে
হেসে খেলে ওড়াতে লাগল । আর ভগ্নদুর্গবনী কন্যা
হল তার পথের ভিখারিণী । ভাইএর প্রবাত হঠাৎ-
দিনার দিকে তাহার আর ধর্মস্থান মেলে । এ-

ওর বাড়ি কাছকর্ম করে অভিক্রান্তে দিন চালায়।

অপর্ণা বললেন—এই ত বিচার! তাই ভয় হয়।

ভারান্যথাবাদ্ হাসতে লাগলেন। বললেন—ছেলে ত তোমার এখন হয় নি সো, এখনও ত তোমার পুটিই নহ।

সে কথা সত্য।

অপর্ণা বললেন—কি জানি বাপু, তবু আমার কেমন বেন হয়ে ছয়।

ভারান্যথাবাদ্ হেসে বললেন, তুমি একটি আত্ম পাগল।

১০ ছুই।

সে বছর প্রচুর বর্ষার পরে গ্রাবের ঘরে ঘরে জল-জমা হতে লাগল।

সে বকম জল এ-অকলে প্রায়ই হয় না, সেবার বেশ বহু হতো, তে জানে। একবার থাকে হলে তাকে আর সহজে হাঙতে চার না।

হু-একজন করে লোক হরতে লাগল।

অপর্ণা ত ভয়েই আঁখা।

পুটিকে বিনয়ত চোখে চোখে রাখেন। পুটিয়ে দান করতে দেন না, যোগে বের হতে নিষেধ করেন। দিনের মধ্যে অল্পতঃ লগবার করে পায়ে-বাখার হাত দিয়ে দেখেন, তার শিধু হয়েছে কি না।

কিহু বান্ধু বা ভাবে অনেক দূর তার বিপরীত ঘটনাই ঘটে।

পুটির কিছুই হলো না, উলটো জল পড়লেন অপর্ণা নিজে। রাতে বাওয়া লাওয়া পর তিনি শূন্যে ছিলেন, দিনের বেলা থেকেই পরীক্ষা তাঁর কেমন বেন ব্যাধ ব্যাধ করছিল। পরদিন সকালে দেখা গেল, বিছানা থেকে তাঁর আর ওঁসার পাকি নেই, হুঁচ চোখ হয়েছে শিধুর মত লাগ, জলের ঘোরে ডিম্বিত চোখে বিছানার ওপর তিনি হটকট করলেন।

পুটি তাঁর পায়ে বাখার হাত দিয়ে দেখল—পা বেন আশুব। শুধুনি সে তার বাখাকে ভেঙে আনলে।

ভারান্যথাবাদ্ বললেন,—হাঁহ, পরীক্ষের ওপর বা অত্যন্ত ভূঁহ কম। বেশ হয়েছে, ভালই হয়েছে। এখন থাকো দিন কতক বিছানার গড়ে।

এই বলে তিনি অনিল ভাকারকে একবার ভেঙে পাঠালেন।

কিহু দিন আগে এ অকলে কলার কুঠিগলো ঘর খুব জোরে চলছিল, অনিল সেই সময় একটা কুঠি একজন ভাকারের কাছে কপাউত্তরী করত আত্মকা সেই অনিলই নাকি রোগী দেখে দেখে পাকা হা ভাল একজন ভাকার হয়েই!

ভাল হোক আর মন্দই হোক, অনিল হাড়া আও উপ নেই। পাপ করা বড় ভাকার এ-অকলে আছেই বা কে। অনিল এসে অপর্ণাকে দেখে ওখুঁচ নিয়ে গেল বললে—ও কিহু নহ, মানাভ ভয়, ওই একপাশ ওল খেলোই গেরে যাবে।

পুটি জানমুখে কাছেই বাঁকিয়ে ছিল। বললে—তু গতি বলাই ভাকার কাকা?

অনিল হেসে বললে—হ্যাঁয়ে হ্যাঁ, গতি বলাই। পুটি তার মার কাছে গিয়ে কাকের একটা পেলা ওখুঁচ তলে হাতের কাছে জল নিয়ে বললে—বাও চুক করে এইটুকু খেয়ে ত্যাগো ত। ভাকার কা বললে—ওতেই গেরে যাবে।

অপর্ণা বাড় নেড়ে বললে—গাছ ওইখানে, এম পরে বাছি।

পুটি বললে—না' বা ওখুঁচ আমি ওই বেল তলেছি, তুমি বাও।

অপর্ণা হাত বাড়িয়ে পেলাপটি হাতে নিয়ে গিৎ খেলেন। খেয়ে বললেন—পুটি, তোর বাখাকে এক ভাক ত বা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি।

ভারান্যথাবাদ্ কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন কি কথা?

অপর্ণা বললেন—যগো বলাই।

তখনই তিনি পুটির হুঁচের পায়ে তাকালে চাউনির অর্থ পুটি বুঝলে। তখনই ঘরে ঘরে সে থেকে বেরিয়ে গেল।

ভারান্যথাবাদ্ অপর্ণার শিরের কাছে বসে আ জিজ্ঞাসা করলেন—কি বলছিলে?

—বলি। বলে অপর্ণা হাত বাড়িয়ে বিছানার

জি হের চানজায়েস লাগলেন।

—কি হুঁকর ?

অশর্পা নুবে কিহুই বললে না, হীরে হীরে শ্বামীর হাতখানি নিজের হাতের হুঁকর মতো ত্রুণে ধরে বললেন—
আমি আর বাঁচব না।

কথাটা ভায়াবাবাবুর ভাল লাগল না। বললেন—
এই জন্যে ভাকলে, তবে আমি এই উঠলাম।

অশর্পা তার ঠোঁটের কাঁকে হুঁকর হাসলেন। বললেন
একটা কথা বিজ্ঞাস্য করব ? অবাব ঘেবে ?

—কেন সেবো না ?

—না বাপু, রাগ কোরো না, ভাল লাগে না। ভাল
করে অবাব দাও।

কি কথা বলই না আসে শুনি !

অশর্পা তার হাত খানি আরও—কাছে টেনে আনতে
গিয়ে হঠাৎ ছেড়ে দিলেন। বললেন হাতটা আমার
বন্ধ গরম না ?

ওই বলে ভায়াবাবাবুর হৃদয়ের দিকে চোখবুড়ি তুলে
মিতান্ত করুণ শব্দে বিজ্ঞাস্য করলেন—আমি মরে গেলে
শুনি আমার বিবেক করে ত ?

রাগে হৃদয়ে বান্দুর অনেক সময় হেসে কেলে।
ভায়াবাবাবুও হাসলেন। বললেন তোমার মরেও
কান্ন নেই, আমার আর বিবেক করেও কান্ন নেই।

অশর্পা দেবী কিছু সত্যই জানতে চান।

বললে—তোমার ও-সব হেঁয়ালী রাখো। আমি
মরে থাকি তাতে তুমি একটা সত্য কথা বলবে না ?

ভায়াবাবাবু ব্যক্তি নেড়ে বললেন—না, বিবেক আমি
আমি করব না। কিছু ছি ছি, তোমাকে বিবেক আর—

অশর্পা আমার জান একটুখানি হাসলেন।

বললেন—মিছে কথা। কি যে তুমি করবে তা
আমি জানি। কোরো। আমি বলছি, তুমি কোরো।

ভায়াবাবাবু বললেন—বেশ, তারপর ? বল—তার-
পর কি বলতে চাও ?

অশর্পা বললেন—কি বলতে চাই হুঁকরে এখনও
পারছি ?

ভায়াবাবাবু বললেন—সেয়েছি। পুঁচিকে ভাল-
বেসো। এই ত ?

হুঁকর দিয়ে একটুও কথাও বের হলো না।

নিচেকার ঠোঁটটি খর খর করে কাঁপতে লাগল। তার
সেই কল তন্ত হাতখানি আবার একবার বাড়িয়ে ভায়া-
বাবাবুর হাতখানি ত্রুণে ধরলেন। তারপর বামদিকের
ওপরই মাথাটি একটু কাঁপ করে শ্বামীর হাতখানি
নিজের হৃদয়ের কাছে টেনে আনতেই চোখ দিয়ে তার
টপ্ টপ্ করে হুঁকরটা জল গড়িয়ে পড়লো।

ভায়াবাবাবু বললেন—পুঁচির জন্যে ভেবনা অশর্পা,
ভেবে ভেবে তুমি সত্যিই মরে যাবে দেখছি।

অশর্পা ব্যক্তি নেড়ে বললেন—হ্যাঁ, মরব। সেই
কথার আছে না, অর্থাৎ বড় ঘরতী না পার বর—আমারও
ঠিক তাই হবে।

পাঁচ হ দিন বয়ে ক্রমাগত তার ছেড়ে ছেড়ে করে
আসতে লাগল। সকালের দিকে জরুরি একটুখানি কম
থাকে। রোগশরীকে সেগে তখন একটুখানি স্তব্ধ হয়।
মনে হয় হুঁকরটির মতোই তিনি শূন্য হয়ে উঠবেন।

কিন্তু হুঁকরটির সঙ্গে সঙ্গে সেই যে জরুরি মাথা
তার একটু একটু করে বাড়তে শুরু হয়, সন্ধ্যার পর
আর তার ঠেঁতলা থাকে না। পা যেন আগুনের মত
গরম। শরীর নুবে কে যেন নির্দ্বন্দ্ব দাঁড়িয়ে রয়েছে।
ঠোঁট হুঁকর লাগ—বামদিকের ওপর মাথাটা এগাশ ওগাশ
করে ছুঁ, কুঁ, ধরেন আর ভাল বকতে থাকেন।

আর পুঁচি তার মাথার পিরয়ের কাছটিতে স্থানহীন
হয়ে থাকে। মনে মনে তারের প্রাণের সব ঠাকুর-দেবতাদের
জায়ে আর তারের কাছে কিছু না কিছু মানত করে
আর ব্যাকুল প্রার্থনা জানায়—বাক্য আমার ভাল করে
দাও ঠাকুর। মাথার বললে আমার মরে যোক।

কিন্তু তার যে ব্যাকুল প্রার্থনা কোন দেবতাই শুনল
না। ব্যাপার সেবে অশ্লিষ্ট ভাষার হাল ছেড়ে দিয়ে
ভায়াবাবাবুকে আড়ালে ঢেকে দিয়ে গিয়ে চুপি চুপি
বললে—মহা-একবার লোক পাঠান।

—কেন ?

—সৌরীনবাবু এম বি পাশ, বড় ডাক্তার।

অশ্লিষ্ট ভাষার শপথই হলেন—হঠাৎ আমার কেমন
যেন ভাল বলে মনে হচ্ছে না। এশাঙ্কর হুঁকরবাবুর
ঠিক এমনি হয়েছিল।

সেদিনই সন্ধ্যা ঘোড়ার গাড়ি চড়ে সৌরীন ডাক্তার এসেন নগর থেকে। অপরূপ অথবা তখন অত্যন্ত ব্যাপ। দিনের বেলা আর তাঁর কন থাকে, কিন্তু আগের দিন যিনরাত সমানে আর চলছিল।

সৌরীন ডাক্তার রোগী দেখে ওরূপ লিখে দিয়ে টাকা নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। তারানাথবাবু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—কেন দেখলেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু কেমন যেন অন্যান্যদের মত জবাব দিলেন—দেখলাম—হুঁ...ও হুঁ...ও হুঁ...ও হুঁ...। তারপর কেন্নন থাকে কাল একবার খবর দেখেন।

তারানাথবাবু আবার জিজ্ঞাসা করলেন—বটমেন ত? বলে তিনি উত্তেজিত গলায় ডাক্তারের মূর্খের দিকে তাকালেন।

ডাক্তারবাবু বলে উঠলেন। বললেন, হ্যাঁ বট। ভগবানের হাত, আমরা হেতু মাত্র। বুঝলেন তারানাথবাবু? আমি এমন রোগী দেখছি, দেখে যেন হয়েছে একদিন পেরোবেনা—সে রোগীও শেষ পর্যন্ত দেখলাম বৈতে গেল। আবার এমন রোগী, দেখলাম, নব্বাং কোন চিকিৎসা নেই, অথচ সেই রোগী—গেল হয়ে।

এই বলে ডাক্তারবাবু পাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

পাড়ি ছেড়ে দিল।

ডাক্তারের পিছু পিছু পুঁটি তারের ব্যক্তি নরম পর্বত এগিয়ে এসেছিল, মান মূর্খ সে পুঁট পাড়ির দরজার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

পাড়িখানি কন, কন, বড় বড় করে হাজার বাকি অদৃশ্য হয়ে গেল। পুঁটিকে তখন সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ব্যক্তির সরকার বশাই বললেন—ওখানে এমন করে দাঁড়িয়ে কেন যা, যাও ব্যক্তির ভেতর লও।

পুঁটি তখন ধীরে ধীরে সেখান থেকে চলে গেল।

সেই পুঁট, চিকিৎসা, কোন, কিছুইই অটুটি হলো না—জবু তার পরদিন সন্ধ্যা থেকে অপরূপ কেন্নন মেন করতে লাগলেন। লক্ষন যিনের ভাল বলে হয়ে হল না।

অনিল ডাক্তারকে ডেকে আনা হলো।

গোগিনীর অথবা সেবে তাঁর মূর্খবান পুঁটিকে গেল। কাউকে কিছু না বলে সে ধীরে ধীরে সরে গেল।

পুঁটি তার মাথের পিছনের কাছে চুপ করে বসেই ছিল, তারকনাথবাবুও এগে বসলেন। অপরূপ এখন বাকচোর হয়ে গেছে। গোগিনীর টানের মত মূর্খ নিয়ে ক্রমাগত ঘন ঘন নিশ্বাস টানছেন তিনি।

সে-কুর্খোপের গার্ড আর শেষ পর্যন্ত নির্বিশেষে প্রত্যন্ত হলো না।

দুঃস্বপ্নের পরেই সব শেষ হয়ে গেল। অপরূপ দেবী শেখবারের মত একবার চোখ তুলে তাঁর স্বামী ও কন্যাকে শেষ দেখা দেখে মিলেন। তারপর নীরবে আবার চোখ বুজলেন। পুঁটি চোখের কোণ থেকে ধর ধর করে পানি গড়িয়ে পড়ল।

তারপর বার কতক বাপুটি বেয়ে প্রথমে বুকের পক্ষ থেকে গেল। তারপর মূর্খ থেকে মূর্খের নিশ্বাস প্রস্থান ও ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল।

অপরূপ দেবী যা বলেছিলেন শেষ পর্যন্ত তাই হলো অতি বড় বরষার মত কংকার ইচ্ছা, আশা আকাঙ্ক্ষা—সব কিছু তার মনের মহোই চাপা ছিল।

জিজ্ঞাসার পুঁটী।

সন্ধ্যার কোল মাথা রেখে বসলেন। এমন সৌভাগ্য কখন নারীর ভাগ্যে ঘটে? সকলে অপরূপ সৌভাগ্যে কণা পছন্দে বলে বেড়াতে লাগল।

পরে লাল টকটকে আলতা পরিবে, কপালে বুঝানকটা সিঁদুর মাখিয়ে রানী বেনাওনী পাড়ি চান দিয়ে পাড়ার ছেলেরা সব হজা করতে করতে 'বল হরি-হরিবোল' বলে মূর্ত্তেরে অস্থানে নিয়ে গেল।

তারানাথবাবু চোখের আল মূর্খ হলে হলে চললেন গভীর মূর্খে মনটা ভেঙে পড়তে চাইলেও মূর্খ কিছুই বলতে পারলেন না। তিনিই যদি ভেঙে পড়েন ত সমস্যা চলে কি করে?

পুঁটিগাশীই তাঁদের একমাত্র সন্তান। মূর্খাধি করা বলে তাকেও অস্থানে বেড়ে হয়।

তারানাথবাবু বললেন—নিজে এগো।

পুঁটি কেঁদেবেটে অস্থির—সে অস্থানে পারে না অস্থানে অস্থির করে মূর্খকে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো। আরের বাইরে মূর্খাধি শেষ করে পুঁটিকে আবার ব্যক্তি পাড়িয়ে দেওয়া হলো।

বাড়ি ফিরে পুঁটি কুলে কুলে কাঁপতে লাগল।

। ভিন্ন ।

চন্দ্রনাথের কাছে ভাগ্যনাথবাবু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—যেদিন তিনি করবেন না।

প্রতিজ্ঞা কথা যে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন তা নয়।

ভাগ্যনাথবাবু বললেন না থাক, টাকা আছে।

হোৎখই সেই টাকার লোভেই তার হাতে বেয়ে সন্ধান করার মধ্যে বলে বলে পোক আগতে লাগল।

ভাগ্যনাথবাবু প্রত্যেককেই বললেন—আজ্ঞে না বিয়ে আমি করব না : আবার মেয়ে রয়েছে বিয়ে দেবো।

জানাই আনখো ছেলেগুলো হবে—বাল্য তাহলেই হলো।

* আমি আর কিছু চাইনা, আপনায় ঘান।

এই বলে কত লোককে যে তিনি কেঁদালেন তার আর দর নেই।

একদিন করে কেঁদাতে কেঁদাতে হাস পাঁচ হা পয়ে হঠাৎ এতদিন এক অবসান ঘটে গেল।

ভাগ্যনাথবাবু বিয়ে করবেন না ভেবে লোকজন আলা তখন বন্ধ হয়েছিল।

গত কয়েক বছর ধরে দূরের একটা মহালে ভাল আলায় হিঁদল না।

ভাগ্যনাথবাবুর মন ভাল না থাকার কিছুদিন তিনি বিষয়-কর্মের দিকে বেশি নজর দিতে পারেননি। কিন্তু যারোবের অন্যরোহের সেবার তাঁকে সেই মহালা দেখতে যেতে হলো।

কিন্তু সেই মহাল পরিদর্শন করতে গিয়েই বস্তো গণ্ডগোল। ভাগ্যনাথবাবু জীবনে বা কল্পনা করেননি তেমন ঘটনার সম্মুখীন হতে হলো তাঁকে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা।

ভাগ্যনাথবাবু কাছারি বাড়িতে একা বসে আছেন, এমন সময় সন্ধ্যার আঁধারে পা-গাফা বিয়ে বণীসী একজন মহিলা তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালেন।

ভাগ্যনাথবাবু দুঃস্থ ভুলে দেখলেন। তিনি একা ঘন, সন্ধ্যা আর একটি মেয়ে। সম্ভবতঃ তাইই কন্যা।

লাইটের আলোয় একবার হাত তার দুঃখানি দেখা গেল। ভাগ্যনাথবাবু আর দুঃস্থ কোমতে পারলেন না।

মহিলাটি বললেন—মায়ের বাড়ির বৌ বাবা, আবার মেয়ে।

ভাগ্যনাথবাবু একটুখানি অপ্রস্তুত হয়ে সেদিক থেকে ভাঙাভাঙি মূহু কিয়রে নিরে বললেন—হ্যাঁ, মায়ের বাড়ি ? বিপিন গায়—আশুবার—

মহিলাটি বললেন—বিপিন আমার ভাদ্রের পো হয়।

ভাগ্যনাথবাবু আর একবার তাকালেন। কিন্তু ছোট মেয়েটি তখন মেওয়ারের গা ঘেঁষে গলে দাঁড়িয়েছে।

মায়ের বৌ বললেন—এইই অন্যে আমি এসেছি এখানে।

ভাগ্যনাথবাবু বললেন—কেন ?

—মেয়েটির খসে হয়েছে, বিয়ে দিতে হবে বাবা।

অবচ আবার দেওর-পো, ভাদ্র-পোদের নিয়ে কোন কাজ হয় না। হাতে একটা পরগা নেই, ভাবছি জমিদারি কিছু বিক্রি করব। কিন্তু ওই ঘর নাম করলেন, বিপিন ছোটোটা এত বড়মাত্র, বলছে, আমি আমি বিক্রি করতে দেবো না বিহুতেই। এ অবস্থায় আমি কি করি বলুন ?

ভাগ্যনাথবাবু বিভ্রান্তা করলেন—জমিদারি কত আছে ? আপনার ভাগে কি শেয়েছেন আপনি ?

—তা আছে অনেক। কিন্তু আমার ছেলেটি নিভাত

ছোট বাবালক কিনা, তাই এটা তাকে কাঁকি দিতে পারলে বাঁচি !

—আপনার কি এই একটি মেয়ে একটি ছেলে ?

—হ্যাঁ বাবা, এই মেয়েটিই বড়।

ভাগ্যনাথবাবু আর একবার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বিভ্রান্তা করলেন—মেয়ের বিয়ে বাবু কোথাও করেছেন আপনি ?

মায়ের বৌ বললেন—পায় মেয়েটি বড় ভিনটে.

কিন্তু নবের হত লোক কোথায় ?

দুঃখেরই চূর্ণ করে ছিলেন।

মায়ের বৌ বললেন—বিপিনকে ভেঙে একবার ভাল করে দুঃখের বলে দিন।

—হ্যাঁ।

বলে ভাগ্যনাথবাবু, মাথা হেঁট করে কি যেন ভাবতে লাগলেন।

একটু পরে গায়েদের বৌ মূখ বললেন ।

সেইলেন, তারানাথবাবু তখন বিদায়ের ।

বললেন—আমার মেয়ে দেখে কান্ডে অপছন্দ হয় না ।

বুললেন । মেয়ে আমার সুন্দরী । শূন্য পাত্র একটি
খুঁজে সেবার সোজের অভাব । তা না হলে বিয়ে আমি
হয়ত ওর খুব ভাল জামাতাভেই দিতে পারতাম ।

এই বলে গায়েদের ইশারা দিই তিনি তাঁর মেয়েটিকে
কাছে ডাকলেন । বললেন—এই খাশে আর উমা,
শোন ।

মেয়েটি ধীরে ধীরে তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল ।

তারানাথবাবু এতক্ষণ ধরে বোধ হয় শূন্য একই
জনো অপেক্ষা করছিলেন ।

মেয়েটির মূখপানে ভাল করে তাকালেন তিনি ।

আর তাকাবে যেন আর চোখ ফেরাতে পারলেন না ।

এখানে এই নিত্য নগণা পরীক্ষার এক সুন্দরী মেয়ে
যে থাকতে পারে, সে হাবপাত্র কোন দিনই ছিল না ।

হা তার বিদ্যা বললেন ।

দিত্য, অতিশিখার মত চুপট বটে ! যেন চলতে
চোখ, ডেহরি লাহা রাত্রি দৃষ্টি টেঁটে । কোথাও যেন
কোন বৃত্ত বেঁটে—সুন্দর সুন্দরী !

এই বিয়ের জন্যে তার হা চিহ্নিত হয়ে পড়েছে ।

তারানাথবাবু বেশীক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকতে
পারলেন না ।

বললেন—পাত্র একটি আছে আমার হাতে তখন
বলে দিলেই একটু বড় হবে । হোক বোঝে পায়ে
বিধে কি দেবেন ?

গায়েদের শৌ একটু হাসলেন ।

বললেন—যে-কিটি পাত্রেই কথা আপনাকে বল-
ছিলেন—বুট্টিই কোথায় । একটির আমার বৌ বেঁটে
আছে । তবে বৌটি চোখে ভাল দেখতে পার না ।

তারানাথবাবু চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগলেন ।

গায়েদের বৌ বললেন—চুপ করে হইলেন যে ?

তারানাথবাবুর যেন চমকু ভাব । এদিক ওদিক
একবার তাকিয়ে দেখলেন, কাছে কেউ আছে কিনা ।
তাকান বললেন—আম্মা বরুণ, আমিই বঁধি বিয়ে করতে
চাই আপনার মেয়েকে—যেমন আগনি ?

কথাটা বিশ্বাসযোগ্য মোটে নয় । এক বড় নৌজাদা
কি তার হবে ?

হয়ত কথাটা তিনি উপহাস করে বললেন ভেবে
গায়েদের বৌবিশ্বাসের হানি ঘেঁষে চুপ করে হইলেন ।

তারানাথবাবু বললেন—বিশ্বাস হলো না ?

গায়েদের বৌ বললেন—না ।

তারানাথবাবু আবার একবার এদিক ওদিকে তাড়িয়ে
অপেক্ষাকৃত নিচু গম্ভীর বললেন—স্ত্রী আমার আর
সেইলেন, তা আপনি শুনছেন কি ?

—হঁ, তা জামি ।

—আমার এতটি মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই ।

—ভাও শুনছি ।

তারানাথবাবু বললেন—তবে আর অবিশ্বাস করছে
কেন বলুন ?

গায়েদের বৌ বললেন—সে ভাগি কি আর—

কথাটা তিনি আর শেষ করতে পারলেন না ।

তারানাথবাবু বলে উঠলেন—এমন মেয়ে দিত্য
আমার চোখে পড়েনি । আপনি মত বিন । বিয়ে আঁ
করব ।

—কিন্তু আমরা গরীব না হলেও বিধব-দুর্গা
গোলমাল—

তারানাথবাবু হেসে বললেন—সে আমি বুঝব ।

—কি ব্রহ্ম ?

—আমরা দুগ্ধে আপনাদের মেয়ের বিয়ে হলে কেউ আ-
শাশন করে কটিক হিতে পারবে না । তা ছাড়া বিন
বড়ো বকাটেই হোক, আমাকে সে অগ্রাহ্য করতে পার-
বে না ।

—এ অবশ্য ঠিক । কিন্তু আমরা এখন কোন পাওন
ভেদন কিছু—

তারানাথবাবু হেসে বললেন আমার অভাব বিশেষ
একটিমাত্র মেয়ে—তার বিয়ে হয়ে গেলে দরই ত আপনা
মেয়েই পারে ।

—তা ত ঠিকই বাবা, তা ত ঠিকই !

তারানাথবাবু আর কোন কথা বললেন । তিনি
তখন মেয়েটির হৃদয়ানুগে দিকে আর একবার দৃষ্টি
নিক্ষেপ করলেন ।

৪ চার ।

তারপর সেই দণ্ডারের মধ্যেই একটি ভাল দিন দেখে
তাগানাথবাবু উমায়্যাদীকে নিয়ে সরলেন ।

গ্রামের সকলেই বলতে লাগল—এ মেয়ের ভাগ্য ভাল ।
সে যে একদিন রাজকন্যা হবে সে কথা তার চেহারা দেখে
সকলেই নাকি বলেছিল ।

তবে নিশা যে কেউ করলে না, তা নয় । চাষের
মাড়ালে অনেকই আবার এই নববিবাহিত দম্পতির
বংশের পার্থক্য নিয়ে তীব্র আলোচনা করলে । বললে—
বড়শাকের বাড়ি বিয়েই হলো রাত, মেয়েটা মূখে
থাকবে বলে ত আশার মনে হয় না ।

বাই যেক, এই দল নিম্নকরের মূখ বড় করতে ত্যাগ-
নাথবাবু জানেন । একে ত তিনিই গ্রামের আমির,
সকলেই তাঁর প্রভা—তার ওপর অনেক টাকা ব্যয় করে
গ্রামের আবালবৃদ্ধবর্গিতাকে নিমন্ত্রণ করে এমন বাড়ী
তিনি বাইরে দিলেন যে, যত বড় নিম্নকরাও সেই দিন
যেকে উল্টো কথা বলতে লাগল ।

তারপর উমাকে নিয়ে তিনি কিছুদিন পরানদে
সেখানেই বাস করলেন ।

তারপর একদিন পালকি চড়ে তিনি রওনা হলেন
নিজের গ্রামের দিকে ।

তাগানাথবাবু যে রীতাব এমন কাণ্ড করে বসবেন,
কেউই তা বিশ্বাস করেনি । গ্রামপুত্র লোক অস্বাভাবিক হয়ে
এ এর মূখ চাওয়া-কাওঁর করতে লাগল ।

পুঁটিগামী মূখ ভাঙি করে বেরুছিল, তাগানাথবাবু
সেদিন সন্ধ্যায় তাকে কাছে ডাকলেন । বললেন—আর
যা পোব ।

বাধা ছেঁট করে মেয়েটা তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল ।

উমা দাঁড়িয়েছিল আশাভরা চোখে ।

তাগানাথবাবু সেদিকে তাকিয়ে বললেন—তুমিও
এসো সো, পোবো ।

ডাক শুনলে উমা মূখ ফেরাল ।

পুঁটি তাকে আসেই দেখেছে, কিন্তু তবু ভাল করে
দেখবার সুযোগ তার হয়নি । মূখ তুলে দেখলে,
অসামান্য সুন্দরী তার এই নতুন মানসি । মূখের রঙ

ওর আসো করে তারই মূখের দিকে তাকিয়ে মূখ
হাসছে ।

সে যে তার কে, সে কথা বোঝবার বয়স পুঁটির
হয়েছে । দাঁটিটা তার ভাল লাগে না । পুঁটি সেদিক থেকে
মূখ কিসের নিলে ।

তাগানাথবাবু বললেন—এসো, তোমাদের পরিচয়
করিয়ে দিই । এইটি তোমার মেয়ে, বৃন্দে ! একে
আমর বয় কোরো ।

—সে কথা তোমার শেখাতে হবে না, আমি জানি ।
বলে উমা বেরন জানলার বাইরে আসর অন্ধকারে অস্পষ্ট
পাহশাদার দিকে তাকিয়ে ছিল আবার ভেতনি মূখ
কিসের সেই দিকেই তাকিয়ে রইল ।

তাগানাথবাবু ভাবলেন—হাজার হোক, সন্তান-বিবা-
হিতা বড়লাগি মেয়ে, লজ্জার বোঝ হয় সে তার কাছে
আসছে না । না—আসুক, সবই সে জানে । পুঁটিকে
ভালবাসার কথা, আমর-বয় করবার কথা তাকে আর
শেখাবার প্রয়োজন নেই ।

তবে পুঁটি ছেলেমানুষ, তাকে বৃন্দে দেওয়া
ভালো । পুঁটির মাথার চাত দিলে তাগানাথবাবু
বললেন—এ তোমার বা হত, একে না বলে ডেকো ।

পুঁটি বীরবে মূখ, একবার মাথাটি তার কাঁধ করল ।

কিন্তু বা বদল বলসেই বা বলা হয় না । ভালবাসন
কলসেই ভালবাসা যায় না ।

পাড়ার মেয়ের আড়ালে একটুখানি একা পেলসেই
পুঁটিকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করে—হ্যাঁলো পুঁটি,
বাগী ডোকে ভাল-চাল বাসে, না মূখের মেমাসেই বয়ে ।

এ সব কথা পুঁটির ভাল লাগে না ।

কি জানি কেন, চোখদুটো তার অস্বাভাবিকই হল হল
করে আসে । পলার আঙাঝটা ঘেঁষে আসলো থেকেই বড়
হয়ে যায় । তাই তাদের প্রস্রের উত্তরে কখন বা
ছেঁট মূখ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, আবার কখনো বা
সুযোগ পেলসেই ছুটে পালায় ।

এদিকে আবার উমাকেও জিজ্ঞাসা করতে হাড়ে না ।
মূখ জানিচ্ছিল তার মূখের প্রশংসা করে চুপি চুপি বলে—
বলি মেয়েটা তোমার কিছু বলে না ত ? যেখো না, একটু

সাবধানে খেতে। যে ওর ট্যাংকটেকে কথা হতভাগীর
মুখ নেই গুলও নেই।

উষা কিন্তু সেদিক দিয়ে অভ্যস্ত ঢালাক ধরে।

এ সব কথাই উত্তরে সে একটি বাক্যও মূখ দিয়ে
উচ্চারণ করে না।

এমনি করেই দিন কাটে।

উষা সেই যে তার মার কাছ থেকে সন্ধ্যার ঘর করতে
এসেছে, তারপর আর একটা দিনের অন্যেও মার কাছে
যাফি খাবার প্রয়োজনও হয়নি।

উষার ছেলে ধনে পুনে বা তার মাথাইয়ের কাছে
চিঠি শিখেছিলেন।

শিখেছিলেন :

মা বা তারামাখ,

উষাকে অনেকদিন ঘোঁষনি। মারের মন, বড়ই
সেখত ইচ্ছে করে। এই সময় তাকে একবার
যদি এ বাড়ী পাঠিয়ে দাও ত বড় ভাল হয়।
প্রথম শোয়াতি। ছেলে হবার সময় লোকজন
কাছে বাক্য বাক্য। ডোমার বাড়িতে
সেখবার বস্ত লোকজনের অভাব। সেইজন্যে
শিখি, ডাক্তারিও এর একটা ব্যবস্থা কোরো
ডোমার আমার আশীর্বাদ জানবে। ইতি

ডোমারের পুত্রবধী বা

চিঠি পেয়ে উষা খেতে চাইল।

তারামাখবাবু বেতে দিলেন না। বললেন—
দাঁড়াও ভেবে দেখি।

ভেবে যদি বলে তারপরের দিনই তাঁর এক কিন্তুত
কমচারিকে শাসুড়ী-কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বললেন—
তাকে এখানে দিয়ে এসো।

উষা হেসে বললে—ভালই হলো, আমিও তাই
চাইছিলাম।

তারামাখবাবু ভাবলেন—বাক্য, বাক্য-বাক্যে অনেক
কমল।

শাসুড়ী-ঠাকরুন বড় ভাল মানুষ। যেমন কাছের
লোক তিনি তেমনই বুদ্ধিমত্তা।

তারামাখবাবু আফশোস করতে লাগলেন। হি হি,
আরও আগেই আপনাকে আমার এখানে আনা উচিত
ছিল। অনেক অপব্যয় তাহলে আমার বেঁচে যেতো।

শাসুড়ী ঠাকরুন হেসে বললেন—আমরা পুত্রবধীর
মেয়ে বাবা, বাকে বন্ধ করতে কোনদিনই শিখিনি।

প্রথম প্রথম এসেই তিনি তাঁর মেয়েকে তিরস্কার
করতে লাগলেন।

বললেন—কি রকম করে সংসার যে চুই করছিল মা,
কে জানে। রোজ এই এতগুলো ঘুঁটে বস্ত হা
উন্নয়ন করতে।

—হবে না বা ?

—মা, এই মাস্য আমি কেনন করে সংসার
বড়লোকের পরমা বলে কি এমনি করেই লোকসান
করতে হয়। যদি হ্যাঁগা বি !

কি কাছই বাড়িঘোঁষল।

মনিবের শাসুড়ী, ইচ্ছা থাকলেও কিছু বলবা
কো নেই। বাড়ির গিঠাই এখন কিছু বলছেন।
কাছেই চুপ করে নিবিঁবাসে নিছের অপমান নিচ্ছে
বছম করে বেশ।

পুঁটি সেখিন তার কাপড়টা হিঁড়ে এসেছিল
হেঁফা কাপড়টা উঠানোর তারে নুকুতে দেওয়া হয়েছি
শাসুড়ী ঠাকরুনের সেখিকে নজর পড়লো।

বলে উঠলেন, এ কার কাপড় গা ?

কি বললেন—পুঁটির।

—কোমার সে, কই, ডাক ঘোঁষ একবার মেয়েটাকে
পুঁটি এসে দাঁড়াল। বললে—কি বলছ ?

শাসুড়ী-ঠাকরুন আত্মল বাড়ির কাপড়টা তাই
ঘোঁষে দিয়ে বললেন—কাপড়টা কি এমনি করে হিঁফ
আছে যিনি ?

পুঁটি বলল—হিঁড়ে গেল ত কি করব ?

কেন হিঁড়লো ? কই, মাঝারের তো হেঁড়েনা !

তা হিঁড়ুকলে। বলে পুঁটি পালাচ্ছিল।

ঠাকরুন তাকে যেতে দিলেন না। হাত ও
টেনে এনে বললেন—বড়লোকের মেয়ের মতন কণ
বটে কিছু এখন ছিল, এখন ছিল, এখন ত আর ও
একলা বও মা, এই ত একটা এসো বলে। দেখ

দেখতে আবার কত হাসবে তার ঠিক নেই। এখন আর ও রকম করে কাশড় ছিঁড়ো না। ছিঁড়লে এই হেড়টা কাশড়টা পড়তে হবে। বুঝলে ?

—হ্যাঁ, বরং সেজে আবার ছেঁড়া কাশড় পরতে।

বলে পুঁচি তার হাতটা ছাড়িয়ে ঘিরেই সেখানে থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।

সেদিনই রাজিবেলা।

তারানাথবাবুকে তিনি জানালেন বেরেটিকে হোয়ার একটু পানন কোরো বাবা। আর শেষে গায়ে একবারে নষ্ট হয়ে গেছে।

তারানাথবাবু বললেন—না না, আর ত ওকে আমি দিই না।

—গাও না ? একটু যেন বিস্মিত হলেন তিনি।

—না, বানে, যে রকম আর ওর পাওয়া উচিত ছিল, সে রকম ত ও কিছুই পার না।

গেলে চলবেই বা কেন বাবা ?

বলে তিনি হাসলেন।

তারানাথবাবু সম্ভ্রম দৃষ্টিতে চাইলেন তাঁর বুকের দিকে।

ঠাকরুণ বললেন—মাকে বিয়ে দিতে হবে, পরের বাড়ি চলে যাবে। সেখানে তারা কোন কিছুই সন্ধ্যা করবে না।

—হ্যাঁ, বিয়ে ত দিতেই হবে।

—সে চেষ্টা করছে বাবা ?

—না, এখন ভেদন—

—চেষ্টা করতে হবে ত। আসে থাকতে করাই ভাল নয় কি ?

—সেই ত মাঝে মাঝে ভাবি। নেমেটরি চেহারা ভাল নয়, কি যে হবে।

—ঠাকরুণ বললেন—সেজন্যে চিন্তার কি আছে বাবা টাকা ত চলবে—

—তা ত দিতেই হবে।

—এখন থেকেই তাই চেষ্টা করো তারানাথ।

সন্ধ্যা ত হবে না সন্ধ্যা লাগবে।

—হ্যাঁ তা করতেই ত হবে।

—হবে না, ঘটকী লাগাও, নইলে শেষে ভারী বিপদে পড়বে।

। পাঁচ ।

উমার একটি শূন্যস্থান হয়েছে। চমৎকার চেহারা।

যে দেখে সেই বলে—হবে না ? ওর বা কেমন ?

ওই আনন্দে তারানাথবাবু যেন বিশেষায়া, আশ্চর্য্য হয়ে পড়লেন।

পর্য্যচিত অপর্য্যচিত যে কেউ দেখা করতে আসে তাকেই তিনি বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে ঢেলে দেখিয়ে আনেন।

বাড়িতে লোকজন ষাওয়ানো ত লেগেই আছে।

খিচোরের দল করবে বলে গ্রামের ছেলে ছোকরাদের তিনি একটি হাঙ্গরোনিরান কিনে দিয়েছেন, ছেলের অগ্রশ্রাবনের সময় যদি তারা সকলকে খিচোর শুনিয়ে দিতে পারে ত খিচোরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার স্বাধীন-পত্র তিনি নিজে কিনে দেবেন।

শাশুড়ঠাকরুণ একবার ঘাব ঘাব করছিলেন বটে, কিন্তু যাওয়া তাঁর এখনো হটে ওঠেনি।

উমা বলে—আর বেশদিন তোমার এখানে থাকা ভাল নয় না, এবার তুমি যাও, বরং আবার আসবে।

—যেতেই ত চাই না, কিন্তু তারানাথ যেতে দিচ্ছে না।

সে কথা গতি।

তারানাথই তাঁকে যেতে যেননি।

পুঁচির বিয়ের জন্যে তিনজন ঘটক নিযুক্ত করা হয়েছে। তারাই একটা কিছু ব্যবস্থা না করে উমার বা যেতে পাচ্ছেন না—ওটাই আসল কথা।

ঘটকরা টাকার সোতে লোকজন ধরে ধরে আনছে বটে, কিন্তু পুঁচির চেহারা সেখান থেকে বৌ করতে কেউই রাশী হচ্ছে না।

শাশুড়ঠাকরুণ সেদিন একজন ঘটককে ডেকে পাঠালেন। অশ্রু-বহুলে ডেকে তাকে নিজের ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে নিতান্ত সন্তপণে বললেন—বাপারটো কি হচ্ছে বল দেখি ?

ঘটকঠাকুর বড়ো মানুষ। বললে—কি করব না, কেউ যে গ্রামি হচ্ছে না।

—কেন হচ্ছে না বল দেখি ?

কথাটার জবাব দিতে বোধ হয় সে একটুখানি ইতস্তত করছিল। শশুড়ি ঠাকরুন তা বুঝলেন। বললেন—
চেহারা ভালো না বল কারও পছন্দ হচ্ছে না, কেন ?

খাড়া নেড়ে বটক বললেন—ঠিক বলেই না। ঘাসের
ডেকে আনিছি, তারা ত ঘরে ভারতে আসছে।

—তা ত আসবেই বাবা। যা যেহে 'চেহারা, দেখলে
পারে ছত্র আসে।

এই বলে তাকে বসতে বলে নিজেও তিনি বেশ ভাল
করে চোখে বললেন।

বলে চুপি চুপি বললেন—খ্যাখ্যা ছুঁনি বিয়ের ঘটক,
তোমার কাছে গোপন করে লাভ নেই। নিজেদের মেয়ে
বলে যে তার প্রশংসা করবে, সে রকম মেয়ে আমি দই,
ঠাকুর, আমি সাদাগিমে মানব।

ঘটক হেসে বললে—হ্যাঁ তা ত দেখতেই পাচ্ছি।

—আনি বলি কি, ছুঁনি এক কাজ কর।

বলে শশুড়ী ঠাকরুন কিছুক্ষণ ঘেমে বোধ হয় একটু
দূর নিয়ে কিস্কিন্দ করে বললেন—মেয়ে যেমন আমাদের
দেখতে ভাল নয়, হেসেও ত আমার ভেতর আসে,
না সেই বলতে চাও ?

ঘটক বললে—হ্যাঁ তা আছে বই কি না। তা আপনি
খরি ভরসা যেন তাহসেই পারি।

—তাই তোমাকে বলছি।

—এই কাজ আমরা চার পুরুষ ঘরে করছি না, কত
কাণ্ডখোঁড়া পার করে দিয়েছি, ত ও পুরুষ কালো।
তবে কিনা জামিনার বাড়ি, তার ওপর বাবু নিজে আমাদের
বলেছিলেন—

শশুড়ী ঠাকরুন বললেন—কি বলেছিল তারানাথ ?

—বাবু বলেছিলেন, ভাল একটি ছেলে দেখলে
তার জন্যে বড় টাকা লাগে আমি বরু করতে
রাখি আমি।

শশুড়ী ঠাকরুন ইংগ দ্বাঙ্গলেন। বললেন—কেনেই ছুঁনি
সাতেল ? ও সব বাজে কথা। তোমার আমি যা বলছি
তাই কর। এই মেয়ের জন্যে ভাল ছেলে ছুঁনি পাবে না।

সাতেল বললে—ঠিক বলেই না, ও পুরুষ দ্বাঙ্গরানি
হচ্ছে আমাদের।

—কথাটা বনে থাকবে ত ?

সাতেল হেসে বললে—তা আমার থাকবেনা ?

বলে সে উঠে দাঁড়াল। বলল—দেখুন না এই
আমি ঠিক লাগিয়ে দিচ্ছি।

শশুড়ি ঠাকরুন উঠেছিলেন। ফিরে ঘাঁড়ি
বললেন—আর হ্যাঁ, ও কথা তাই বলে তারানাথ
বলো না যেন।

সাতেল তার গরহীন মূখের ভেতর থেকে অনেকখানি
ছিন্ন বের করে বললে—সাতপুঃ, তাই আমার বটে
বুড়ো হয়ে গেলাম, ওকম আমাদের অনেক করতে
মাঠাকরুন। ওই করে করেছে আমার চুল শেকে দেল।

শশুড়ি ঠাকরুনের কাছে ভরসা পেয়ে সেই
ঘটক ঠাকুর এক সম্বন্ধ আনল। বললে—জামাইটি নি
একবার কমে দেখতে চায় বাবু।

তারানাথবাবু বললেন—কেন, নিয়ে এসো।

—জামাই নিজে আসবে, আর তারপক্ষে আ
দৃশ্য বহু। দেখাশুড়া জানা সব কোলকা
ছোকরা কি না।

শুনে শশুড়ী ঠাকরুন সাতেলকে তত্বনি তে
পারালেন। বললেন—দেখাশুড়া জানা কোলকা
ছোকরা কি রকম সাতেল ?

সাতেল বললে—না না, এই আম্বকালকার
দেখাশুড়া সামান্য একটু জানে, এই আর কি।

কথাগুলো চিবিবিরে চিবিবিরে ঢোক গিলে গিলে ব
দেখান থেকে সে পলায়ন করল।

অরুণে তারানাথবাবু এসে দাঁড়ালেন।

শশুড়ী ঠাকরুনও তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন
তাই বদ সাতেল। আম্বকালকার ছোকরা শুন
যে ভয় হয়।

কিন্তু তার সে ভয়ের কোন কারণ নেই।

পরদিন সকালে ভাড়াটে একখান মোটরদ
তারানাথবাবুর বৈঠকখানার দরজায় এসে দাঁড়াল।

মেয়ে দেখতে বাবা আসবে বলেছিল, তারা এসে
সঙ্গে সাতেল বসাই।

পুঁটি গির্জের পাতার কানের বাঁকি বেড়াতে ।
তাকে তখনই বন্ধে আনা হলো ।

কেন তাকে ছেড়ে আনা হলো, তা সে জানে ।
জ্ঞান কাহ্নে গিয়ে বললে—চললুমো আমার বেঁচে থাকা
যোকাকে সে তখন দৃষ্টি খাওয়াছিল । বলল—
আমার ত এখন অবসর নেই না ।

পুঁটি তখন নিচ্ছে তার চুল বেঁচে পরা পরে
পাকি পড়ে নিচ্ছে কেন পারল নাচপোষ করে বলে
হইল ।

শান্তল বসাই তারানাথবাবুর কাছে এসে বললে—
আমি ডায়েল, আপনি একবার নিচ্ছে নিয়ে চলুন
হইল ।

পুঁটিকে সঙ্গে নিয়ে তারানাথবাবু বৈঠকখানায়
গিয়ে দেখলেন কম বয়েসী তিনজন ছোকরা বসে আছে ।
পুঁটিকে তাদের সামনে বসতে বলে তারানাথবাবু
বললেন—এই আমার ঘরে । কি জিজ্ঞাসা করবে কর ।

ছোকরা তিনজন চোখ টোপাটোপ করতে লাগল ।
অর্থাৎ এ বলে, ভুই কর । ও বলে ভুই জিজ্ঞাসা কর ।

কালো কিশকর্তার একটা ছোকরা তখন বিড়ি
চানাল । বিড়িটা সেরায়েলের গারে চপ করে চিপে
নিবিয়ে দিয়ে পুঁটির দিকে সে দৃষ্টি করিয়ে বলল ।

ছোকরাটার বাথার বড় বড় চুল । চোখদুটো কেন
জ্বলে চুকে গেছে । বিড়ি বড় বড় দাঁত—তার ওপর
গারের গাটা একবার বান্ধা করা জুতোয় বতাই কালো ।

ছোকরাটা পুঁটির দিকে অনেকক্ষণ থেকেই দিটু-দিটু
করে ডাকাছিল । এয়ারে জিজ্ঞাসা করলে—কি
বই পড় তুমি ?

পুঁটি মুখ নামিয়ে বসেছিল । বললে—আমি
দুর্ভাগ্য, এখন আর পড়ি না ।

—চিঠি দিখতে পার ?

—পারি ।

—গান পাইতে জানো ?

—না ।

—দর রকম রান্না জানো ?

—কিছু কিছু জানি ।

তারানাথবাবু বললেন—গেরত ঘরের মধ্যে,

গান-গান আর শেখাইনি বাবা, তবে রান্না ভালই জানে ।

ছোকরাটি তার অন্য বন্ধুদের মতের দিকে তাকালে ।
বললে—আমরকালকার মেয়েদের গান জানা উচিত ।
আমরা উঠে একবার গাড়াও দেখি ।

—বাথার চললুমো বেঁচে এসে কেন ?
বলতে হবে ।

পুঁটি তার চুল বলতে লাগল । দাঁত, দর করবার
হত চুল তার আছে ।

বাথার চুল দেখে, ঘরের মধ্যে হাটিয়ে, হাতের লেখা
পরীক্ষা করে, কান-পা ইত্যাদি দেখে, শব্দের পর শব্দ করে
কোরা পুঁটিকে তার বাবার মতমতই ছোকরাটা
একেবারে নাড়ানাবু করে তুললে ।

পরীক্ষা যেন তার কিছুতেই শেষ হয় না ।
তারানাথবাবু বিরক্ত হয়ে উঠলেন ।

ঘটক বসাইকে চুপি চুপি ভেবে তিনি জিজ্ঞাসা
করলেন—জানাই কোনটি এর মধ্যে ?

আজল বাঁধিয়ে হাত উঠে চুল-জালো সেই কালো
হেলোটিকে দেখিয়ে দিয়ে ঘটক বললে—এইটি ।

তারানাথবাবুর বাথার ঘরে গেল । তিনি উঠে
গাঁড়ালেন । বললেন—পুঁটি আর ! শান্তল, গোন ।

শান্তল বসাই বসেছিল ।

এখন দর হঠাৎ তাকে উঠে পড়তে দেখে যেন তার
কেন যেন একটু সন্দেহ হলো । ভয়ে ভয়ে তাঁর পিছু
পিছু চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করলেন—কিছু বললেন ?

—বাপি এমো ।

বলে ভাড়াভাড়ি বাঁধির ভেতর চুকে পুঁটিকে আসে
পাঠিয়ে তারানাথবাবু ধুকো গাঁড়ালেন ।

বললেন—শান্তল বুড়ো বসে জুঁবি আমার গলে
রহয় করতে চাপ দাঁকি বল দেখি ?

শান্তল ভয়ে তখন অস্থির হয়ে গেল—হাত মোড়
করে কাঁপতে কাঁপতে বললে—আজ্ঞে না । আমি ত—
আমি ত—তখনই জানি—

—জান ! হাই জানো !

—না জানে

—গোন শান্তল, আমার ঘরে কালো বলে কি তুমি
ঐ ছোটটার সঙ্গে বিয়ে দিতে বসো ? কেন, আমি কি

টাকা ব্যয় করতে পারব না ? তুমি কি ভেবেছ কী ?

আপল কথাটা আর চেপে রাখতে পারলে না ।

আর কেউ যাতে শুনতে না পারা এখনি ভাবে চুপচুপিসি বললে—আপনার শাস্তি ঠাকুরদেব আবার কে বলেছিলেন বাবু, তা বইসে আমি ও রকম পারা আনতাম না কখনও ।

ভারানামাবাবু বললেন—আবার যেহেঁতু আমি যেন, না আমার শাস্তি মেবে ? কারো কথা তুমি শুনো না যাওগে, ভালো একটি ছেলে নিয়ে এসো—সেখতে যেন ভাল হয় । পরদিন সোক হলে খতি সেই । যেহেঁতু পরবার আমি বুদ্ধি দেখো, আর জামাইকে বাবার পরবার জাবনা ভাবতে হবে না, জামাই আমার বাড়িতে থাকবে ।

যাওগেল বুদ্ধি বড়করানি একতরুণে কিছুটা করে এসেছে ।

বললেন—যে আছে বাবু ওহের আমি বিয়ের করে দিচ্ছি ।

ভারানামাবাবু আবার যেহেঁতু উঠলেন । বললেন—ভুলোকের ছেলেরা আমার বাড়িতে এসে না যেহেঁতু চলে যাবে ।

—আছে না ।

—তবে আমার ব্যবস্থা কর যাওগে ।

—যেহেঁতু অবশ্য এটা এসেছে আমি জ্ঞান ।

—বেশ, বা শুনিস কখনে গাও । আমি আর কিছু জাণিয়ে ।

এই বলে তিনি হুন্ হুন্ করে চলে গেলেন ।

আর যাওগে দীর্ঘশ্বাস কেসে ভাবতে লাগল, আচ্ছ তার একটা বড় বড় কাঁচা কাটল বটে ।

। ছয় ।

উমা বললে—টাকা ব্যয় করে বিয়ে ত' মেবে, কিছু জমাই শুকে নেবে বলে ত আমার মনে হয় না ।

ভারানামাবাবু বেজার ভাল ছিল না । বললেন—তোমার হস্ত রূপ যদি কারও না থাকে ত তার বিয়ে হবে না ।

উমা বললে—টাকা ব্যয় করলে কানো খোঁজারও বিয়ে হয় । হবে না কেন ?

উমার বা বাইরে কোথাও বোম্বের অনেক

করেছিলেন । ঠিক এই সময়টাতেই গলার আঙাছ কও ভারানাম, বলে থরে ঢুকলেন ।

উমা একটু সরে দাঁড়াল ।

ভারানামাবাবু বললেন—কি বলছেন ?

শাস্তি ঠাকুরদেব কিজাণা করলেন, আচ্ছ কি হবে বাবা ? শুনলাম ছেলেরা সেখতে ডেবন ভাল নয় ।

—হুন্ বড় বিজ্ঞী সেখতে ।

—না বাবা শুন যাগাপ হরতো কাজ নেই । জব দিয়ে যাওগে । এই বলে একটু খেমে তিনি বললে—তোমার ঐ ঠক ঠাকুর এসেছিল আমার কাজে বুদ্ধোবশুন পা দুটো আমার স্বাধীনে থরতে এলো বলে কিনা পাওয়ার আমার হাতে আছে অনেকগুলি বড়লোকও আছে ভাল চেহারাও আছে, কিছু বেও কথা শুনবে সবাই শিখিয়ে যাচ্ছ ঠাকুরদেব । আপনি ব আপনায় জামাইকে একবার বলে যেন ত সবানে সব একবার চেষ্টা করে দেখ ।

ভারানামাবাবু তাঁর কথানুগো শুনলেন । বললে সবানে সবানে কিরকর ?

শাস্তি ঠাকুরদেব—বললেন—কি জাণি বাবা তোমার ঐ ঠক ঠাকুর জানে । আমার মনে হয় চেহার দিক দিয়ে একটু যাগাপ হবে এই আর কি ।

দস্তারভায়ে কি যেন ভাবতে ভাবতে ভারানামাবা বললেন—হুন্ ।

আরও কিছু হবত বলবার ইচ্ছা তাঁর ছিল, কিন্তু ভায়োনামাবাবু বুদ্ধির চেহারা দেখে বলবার সাধ তাহ আর হল না ।

তা না হোক শূঁটির কপাল বোম্ব হয় ভালো অনেক বুদ্ধি অনেক কষ্টে যাওগে ঠাকুর এবার যে পাখি আন তার চেহারা সবাই চমকায় যে শূঁটাই বরং পাশে দাঁড়ায় বোম্ব নয় ।

ছেলেটির নাম—জমলেন ।

এক একজন মানুষের জীবনের কিছুটা অতী ইতিহাস থাকে । অহরহের জীবনের তেমনি কিছু ইতিহাস ছিল । সে কথাটা আপনাদের জানা দরকার । ছেলেরা থেকে অহরহ তাঁর মাঝার বাড়িতে বা

করত। বাস করবার হেতু ঘরবা একটা ছিল।

বয়স বখন তাঁর তিন বৎসর, তখন একদিন অকস্মাৎ তার মা মারা গেল। মাতামহ বড়লোক। তাঁকে তিনি আর তাঁর বাবার কাছে যেতে দিলেন না। বললেন—আমার একটি মাত্র মেয়ের গুই একটি মাত্র ছেলে। বিবর-সম্পত্তি ওকে আমি সবই দেবো। থাক ও আমার বাড়িতেই।

অমরেশের বাবা তাঁকে নিতে এসেছিলেন। স্বপ্নেরে কথা শুনে দেশে ফিরে গিয়ে আবার তিনি বিবাহ করে নতুন সংসার পাতলেন। অমরেশ আমার বাড়িতেই মানুস হতে লাগল।

অমরেশের বাবা অমরেশ দম্ভে নিশ্চিত হতেছিলেন। বড়লোক মানার বাড়িতে যে মানুস হচ্ছে। বিবর সম্পত্তি সেইখানেই পাবে। তাঁরই তাঁর বিয়ে দিয়ে বর সন্মান পেতে যাবে। সন্তান তাঁর দম্ভে কাকেও আর ভাবতে হবে না।

কিন্তু কিাতার এমন বিভ্রম্বনা অমরেশের বয়স বখন মোলো পড়েয়ো তখন একদিন তাঁর মাতামহ অকস্মাৎ বাড়ী ফের করে মারা গেলেন। বিবর-সম্পত্তি কিছুই তাঁকে দিতে যেতে পারলেন না। মাতামহী আসেই দাবে গিয়েছিলেন।

মাতামহ না দিন, অমরেশের ভরসা ছিল—মারা যাবে।

কিন্তু যেসের ছেলের আইনতঃ কিছুই পাবার অধিকার নেই। মারা তাঁর ঘরে কিছুই বললেন না। মামী পক্ষই একদিন জবাব দিলেন। বললেন—ব্যাঘো বাবা অমরেশ, তোমার বয়স হয়েছে, শোন তোমাকে বুকিয়ে বলি। স্বপ্ন তোমাকে যদি কিছু দিতে যেতেন ত আমায়ের কিছুই বলবার ছিল না। তাঁর নিজের বিবর বিভ্রম তাঁর বেড়ে ছেলেকে। কিন্তু আমার বাবা বিয়াট সংসার আর চারটি মেয়েকে যে কেমন করে পার করব সেই কথা ভেবে ভেবে রাতে আমার ঘুম হয় না। ছেলে তিনটি ত লেখাপড়া শিখলে না। কি করে যে পাবে কে জানে। এমন তোমাকে বাবা কিছুই আমর্য দিতে পারব না। আমার বাবা পক্ষ কথা। আমারের আপায় ভূমি যেন বসে থেকো না। ভূমি আপনায় চেষ্টা ব্যাঘো।

একথা যে মামী তাকে বলবেন, ত সে আগেই বুঝতে পেরেছিল।

ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করতে তখন তার এক বছর বাকি। অমরেশ ভেবেছিল, চোখ বুজে কোনরকমে একটা বছর সে এখানেই কাটিয়ে দেবে।

কিন্তু মামীমার ব্যবহার দিন দিন এমন হয়ে উঠল যে, একটি দিন সেখানে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হলো না।

অমরেশ বহা সমস্যার পড়ল। তখন সে যার কোণার বাবাকে সে তার ভীয়ে মাত্র কয়েকবার দেখেছে, তার ওপর তিনি তখন আমার বিয়ে করে নতুন সংসার পেতেছেন। সেখানে তার বিবাতার ছেলোমেয়ে। কেমন ভাবে যে তাঁরা তাকে গ্রহণ করবে কিছুই জানে না।

কিন্তু উপায় নেই।

অমরেশকে শেষ পর্যন্ত তার বড়লোক মামার আপা পরিভাষ করে বাবার কাছেই যেতে হলো।

অমরেশের বাবা বিপুলের অবস্থা তখন খুব পোচলয়।

নিজের ছেলে কি আর করবেন! বললেন—ভালই হলো, আর।

অমরেশের তখন আর একটি বছর পড়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করবার বড়ো লাগ।

কিন্তু বাবা তার নিতান্ত পরীষ। স্কুলের বাইনে দিয়ে এক বছর তাকে পড়বার সামর্থ্য তার নেই। পানের গ্রানের বাই স্কুলে গিয়ে হেডমাষ্টারের ছাতে পায়ে বসে ছেলেকে ত্রি করে দিলেন।

অমরেশ ম্যাট্রিকুলেশন বেশ ভাল ভাবেই পাশ করল।

পাশ করে সে তখন বাম্বারুপুয়েই বসেছিল। বিপুলের আর সামর্থ্য নেই। কাজেই পড়া-শোনা তার গুঁথানোই শেষ।

সামর্থ্য অবশ্য তাঁর কোনদিনই ছিল না।

অধিষ্ঠা যা আছে, তা দিয়ে অল্পাংশে নতুন চাবের নবায়ের সমর থেকে ঠিক শেষ পর্যন্ত অতিক্রম্ত কোন একবে চলে, তারপর বছরের প্রথম শূদ্র দরবর থেকেই জল।

কিন্তু অমরেশ আসার পর থেকে কিছু আশা তাঁর হয়েছিল। আশা হয়েছে এই যে, তাঁরা কুলীন ব্রাহ্মণ—অমরেশের বিয়ে দিয়ে হাত কিছু টাকা হাতে পেতে পারেন। তার পরে হেসে ম্যাস্ট্রিক পাশ করলে চাকরি বা হোক একটি মিলবেই। তাই তিনি হেসেকেও আশ্বাস দিচ্ছিলেন তোষাফ করিয়ে চলেন। গত বৈশাখ থেকে অন্ন্যাস পর্যন্ত বিপুল ছিলেন না।

অমরেশের বিয়ের জন্যে গ্রাম গ্রামে নিয়ে পাত্রী খুঁজে বেড়িয়েছেন।

পাত্রীর সন্ধান যে গোটাচকত না মিলেছে তা নয়। কিন্তু অতীত তাঁর এত বেশি যে পাত্রীর সন্ধান পাওয়ায় নিয়ে উপযাচক হয়ে ভাণ্ডী বৈবাহিকের বাড়ি আতিথা গ্রহণ করেছেন। কথার কথার কৌশল করে বলে বলছেন—তা বেশ, হেলের বিয়ে আমি এখানেই ঘেঁষো। কিন্তু একটি কাজ আপনাকে করতে হবে।

মেয়ের বাবা বললেন, কি কাজ বলুন।

বিপুল বললেন—পক্ষাণটি টাকা কিন্তু এখন আপনাকে দিতে হবে। তারপর বিয়ের সোনা-পাওনা তো আছেই; তখন না হয় কেটে নেন। সোকারে ছিদ্দিন কিনতে সেসে ত কিছু বাম্বা দিতে হবে।

এই বলে আল্প লাভের অনেকে তিনি হেসে উঠলেন।

কিন্তু এই কৌশল করতে গিয়ে সব জাটগাতেই সোলমাল হয়ে পেল।

মেয়ের বাবা ভাবলেন—এত বার অতীত, মেয়ে সেখানে না সেঁকাই ভালো।

এনি করে এ গ্রাম, সে-গ্রাম করতে করতে কোন বকবে আবার অন্ন্যাস এসে পড়ল। পাকা রান তখন ঘরে এসে উঠেছে।

অন্ন্যাস কাটলেই পৌষ।

পৌষে নাকি থাকি বের হতে হয় না।

যাচে ত হুঁত পীঠ।

কাপ্পুনটা ঘাই ঘাই করেই কাটে।

ঠেলে বিয়ে হয় না।

আবার আসে সেই হুঁতপ্যা বাগ বৈশাখ।

টাকার অভাবে বিপুল প্রতিজ্ঞা করে বলল—অমরেশের বিয়ে এ বছর নিজেই হবে। তাহলে তাঁর এত টাকা অতীত থাকবে না।

তাই বলে তিনি ঘাই ঘাই করলেন, এমন সব তারানাথবাবু খটক এসে ছাঁড়িল।

বিপুল যেন হাতে শর্শাল করলেন।

। সাত ।

দান্যালের হুঁত সোনা পাওনার কথা শুনে বিপুলে চোখ দিয়ে জল এসে পড়ল।

খটক ঠাকুরকে বললেন—চন্দ্র তাহলে পাকাপাট করে আসি।

—কবে ?

—চন্দ্র আছই !

—তা ভাল। বলে খটক হাসল।

—জানেন না, কথার বলে, ‘পুণ্ডর্য পীঠং ?’

—এটা পীঠং নয় পীঠং...

—ওই একই কথা, চন্দ্র বশাই...

পাকাপাট করতে গিয়ে দেখেন, তারানাথবাবু প্রকাণ্ড সোতলা হালান।

মেয়ের চেহারা ভাল নয়, কিন্তু সোবার গহন পুঁড়িহানী বলবদ্ব করছে।

তারানাথবাবু বললেন—এ গহনাসুন্দো ওর যাবে দেও হারা সেহে অশ্লিষ্ট আসে।

—হুঁ, বলে বিপুল চোখ জুড়ে তাকালেন। বললেন—এবার সোনা পাওনার কথাটা তাহলে—

তারানাথবাবু বিপুলকে তাঁর নিছকের ঘরে নি গিয়ে বললেন।

চাকরে গান দিয়ে গেল। ডানাক মিল। হুঁশে বেকমীতে গান, পড়গড়ার বল সোনা দিয়ে বাঁধানো।

সোনা-পাওনার কথা উঠল।

তারানাথবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার হেসে। ওই একটি ?

—আজ্ঞে না। অমরেশ আবার গ্রহণ পক্ষের স্ত্র ওই একমাত্র ছেলে—ওর না নেই।

আর কি যেন তিনি বলতে ব্যক্তিগত, তারানাথবাবু হেসে উঠলেন উঠল।

বললেন—তাঁহলে আপনাতঃ তাই । আমার মেথোঁ
প্রথম পক্ষে ওট এটাঁ মাত্র নেয়ে ।

বিশ্বদুঃখ বললেন—হেসে আমার হাঁরের টুকরো
মশাই । ওই ত আপনার বটক মশাই সেবে এসেছেন ।
মাসিক বেশ ভালভাবে পাশ করেছে । কিছু পাশ
করেই অসুখ হলো কিনা, তাই আর কলেক্টে গতি
হতে পারলে না ।

বটক বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, হেসেটি বৎকার ।

কিছু সে সব কথা তারানামধন্যদুঃখকে চান না ।

তিনি বললেন—হেসেকে কিছু বিয়ের পর থেকে
আমি এইখানেই রাখব । তাতে আপনার আগ্রহ নেই ত ?

বিশ্বদুঃখ হেসে হাত বেড়ে বললেন—কিছু না, কিছু
না । আগ্রহই তার অভিজ্ঞতাবক হবেন । কালকর
একটা সেশেশনে লেবেন—

তারানামধন্যদুঃখ বললেন—বেশ, এইবার কাজের কথা ।
মেয়ের যে সব গহনা দেখলেন, এ-সব গুই । তাহাড়া
নাম টাকা আনি ন গীতকের বেশি দিতে পারব না ।

গভদভার মলটা তুলে নিয়ে টেনে টেনে বিশ্বদুঃখ
বের করতে লাগলেন ।

দুঃখের দিনে স্ত্রীর গহনাদুলো বন্ধ পড়েছে ।
সেগুলো হাভাতে দুশো টাকা লাগবে । পঞ্চাশ টাকার
চাল কিনে আর রাখতে হবে । বৌভাতে কোন না
পঞ্চাশ টাকা খরচ হবে । তারপর বাকি দুশ টাকা
দুখিনীর হাতে তুলে দেন—বা করতে হয় সেই করবে ।
বড়লোক বৈবাহিক । এমনি কতটাকা তিনি তাঁর
কাছে আদায় করলেন । একম বৌ গঠিতে সেলে বধি
আবার সম্বন্ধটা ভেঙে যায় । তার চেয়ে আর কিছু না
চাওয়াই ভালো ।

বিশ্বদুঃখ বললেন—সে আপনার বা দুশী করেন ।
পঞ্জিকটা দেখুন তাহলে । ভাল দিন এই বৈশাখ ।
চৈত্রিতে ত দিতে নেই—কাল অমলে আমার ছোট
ছেলে । বা লক্ষীকে আমি তাহলে আশীর্বাদ করেই বাই ।

বৈশাখেই দিন স্থির হলো ।

হানদুর্ভাগ্য দিয়ে বিশ্বদুঃখ পুঁটিয়াপীকে আশীর্বাদ
করলেন ।

তারপর ভাবতে লাগলেন—আজি কিছু টাকা তিনি
বৈবাহিকের কাছে চাইবেন কেমন করে ? এমনি চাইতে
গিয়েই ত অন্য সম্বন্ধগুলো সব ভেঙে সেছে ।

ওদিকে তারানামধন্যদুঃখ ভাবলেন, পাকাপাকি একটা
কিছু করে কল্যাণ করুক । তাই তিনি উমাকে বা উমার
হাকে না জানিয়ে পণ্টাটাকার লক্ষ্মণানি মোট তাঁর ভাবী
বৈবাহিকের হাতে পুঁঠে দিলেন ।

বললেন—এতশো টাকা এখন দিন, বাকি টাকা বিয়ের
সময়ে দেবো ।

একশ টাকার কথা বিশ্বদুঃখ ভাবতেই পারেন নি ।

কাল্যান কাল্যান করে মোটপুঁটির দিকে কিছুক্ষণ তিনি
ভাবিয়ে গেলেন । পড় পড় করে গড়গড়ার মলটা বার
কতক খুব ছোরে চানলেন—তারপর একসঙ্গে মোটা দুই
পান হুবে দিয়ে, আনন্দে একবারে আত্মহারা হয়ে গিয়ে
কিবে করলেন কিছুই বুঝতে না পেয়ে বলে বলে
ঘামতে লাগলেন ।

তারানামধন্যদুঃখ ইশারা করতেই চাকর এসে তার হাতে
একটা পাখা দিয়ে সেল ।

এই ত সেল বিয়ের ইতিহাস ।

বিয়ের সময় পুঁটিয়াপীর নাম নিয়ে একটু সেলবাল
হলো ।

দুঃখোহিত বললেন—পুঁটির আদায়ের ভাল মাথটি
হলো গিয়ে—

কল্যাণ সম্বন্ধান করতে করতে তারানামধন্যদুঃখ বললেন—
পুঁটিয়াপী ।

তারপর স্বাক্ষরকে চিঠি লিপিতে বলে ভাল নামের
প্রদোষন । তা এ হাতে নামের ধরকার হতে পাঠ্য ।

কিছু বিয়ের পর থেকে শ্রাবী ত বাড়িতেই রয়ে
সেল—কাজেই পুঁটির চিঠি লিপিব্যয় প্রদোষন ত
হলো না ।

কাজেই আদায়ের পুঁটি শেষ পর্যন্ত আগ্রহবর্তিত
ভাবে পুঁটিয়াপীই হয়ে গেল ।

তা বাই মোক, নামের জন্যে কিছুই যায় আসে না ।

তবে অমরেশ্বর মত জানাই দেবে তারানামধন্যদুঃখ

শাপুড়ী ঠাকরুন যেন বস্তাক। তাঁর মৃৎখানি শূন্যের সোল।

উমাকে ডেকে তিনি চুপি চুপি বললেন—আমি কিংবু এই বলে রাখছি উমা, তুই সেবে মিন্, এ জামাই পুঁটিকে নেবে না কিংবুতেই।

উমা বললেন—কেন ?

—সেবে বুড়ি না ?

—সেবে না ত এ বাবে কোথায় ?

উমার মা বললেন—বাকবে এইখানেই। সেব পৰ্বত ডোকেই জ্বালাবে বিনরাত।

উমা বললে—জ্বালালেই হলো আর কি!

—জবে কি করবি ?

—আমিও কম বেবে নই মা, সেব পৰ্বত কে কাকে জ্বালায় দেখবো।

বিয়ের পর কাপড়-জামা পায়ে নিয়ে এক পা গরনা পরে পুঁটিয়াশী শ্বশুর বাড়ি গেল।

জামের সোক বউ সেবে শ্বশুর।

যেবেয়া আড়ালে গিয়ে হি হি করতে লাগল।

জামা বললে—ও না, তাই ত বলি। সেবা সেবে তেমা সেবে, বাড়ি সেবে, ঘোড়া সেবে, বড় সোক শ্বশুর বাড়ি—গরনা টাকার শোভে মিন্লে করেছে কি পা ?

বাবাকে তার আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে অমনে বললে—টাকাই আগনার বেশি হলো।

কথাটা শুনতে গেলে ক্রিমাতা সৌদামিনী কাছে এসে বাঁড়ালো।

বললে—কেন বাবা অমরেশ, বৌ আমার শ্বশুর কি হয়েছে ? সেজ্ঞ অরেন বৌ, এমন ও জেনেমান্দুব—বড় হলে ওই মেখার আবার অরেন লক্ষী হবে।

অমরেশ বললে—হাই হবে।

সৌদামিনী খানিকটা ছিট বের করে বললে—হি বাবা হি বলতে নেই অমন কথা। অত অত গরনা নিয়ে বৌ আমার হয়ে চুকেছে, তুই বলিগ কিরে অমরেশ, কই কেউ বার করুক সোঁশ পাঁচ লাভখানা পা বঁকে কার বৌ-এর এত গরনা ! কই ঘোঁষ—একটি চোখ চ্যাগা, এ খুব গরমত। একে বলে লক্ষী চ্যাগা। তুই কিংবু জাবিন্দি

বাবা—ওই বৌ থেকে কত দুঃখু মেখার যুতে ব আনাদের।

বৌ নিয়ে সৌদামিনী ব্রহ্মসার পক্ষমূখ হয়ে উঠল। বৌ সেখতে যে এসো, তাকেই বসিয়ে একটি এং বৌজের গরনা-কাপড় সেখাতে লাগল। বললে—বড়লোকের মেয়ে মা, আনাদের বাড়ি যে আসবে তা আর আমি ভেবেছিলাম কখনও। আমার ছেলে বৌ দৌলতে এবার আমার দুঃখ যুতলো।

সৌদামিনীর এত বলা সহ্যও বৌ-এর দুখা ভেউই করলে না। গোপনে সবাই হলাবলি কা লাগল—প্যাঁচার বত বৌ নিয়ে হাসী করছে গ্যাংবো।

কিন্তু যে বা করল, সবই নাম তিনটি মিনের জন্যে তিন মিন পরেই তারানাথ বাবুর বাড়ি থেকে সোক এসো, শালুক এসো। সেই শালুক চড়ে গরনা-কা নিয়ে বৌ আমার বাসের বাড়ি চলে গেল।

অবশেষকেও তার সঙ্গে যেতে হলো শ্বশুর বাড়ি

। আট ।

অমরেশ সেই থেকে শ্বশুর বাড়িতেই আছে। পুঁটিয়াশী বলে—হ্যাঁ মা, কখন পুঁশি বসছিল, বাড়ি আমার সেবে না ? আনার এইখানে ফেললে কোন দিকে চলে যাবে সতিতা ?

অমনে জবাব দেয় না।

পুঁটিয়াশী তাকে নাড়া দিয়ে বলে কই, কথা : না হে ?

অমরেশ তাখিলাভরে জিজ্ঞেস করে—কে বললে ?

—কর গিশি।

যাক বেড়ে অমরেশ বলে—না।

পুঁটিয়াশীর চোখদুটো তখন হল, হল করে আসে ক্রিমাতার গাঙ্গারে ছেলেবেলা থেকেই বড় হে ফেলার মান্দুব। বিয়ের পর এই এক অমরেশকে। এমন জাবে আগনার করে সে আর কাউকে পাগনি, কা সে বলতে গিয়ে লক্ষ্য আর বলতে পারে না। করে একলুটে কিংবু তাকিরে থাকে। চোখের চোখেই শূন্য হয়ে যায়।

পুষ্টিগানীর সঙ্গে কথা বলে অরুণের মূৰ হব না ।
তাই সে পাশ জিরে চোখ বঁকে ঘূনোবার চেষ্টা করে ।

কিন্তু পুষ্টিগানীর সেদিন কি যে হয় কে জানে ।

অরুণের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে ।

অরুণ বেসিকের মূৰ কিরিরে শূন্য থাকে, পুষ্টি ধীরে
ধীরে বেসিকে উঠে গিয়ে তার মাথাও কাছটিতে চুষ করে
বলে । এইই মধ্যে আচ্ছ ঘূনোচ্ছ যে ? ঘূন শেষেছে
তোমার ?

কণ্ঠস্বর শুনলে দহতা হয় ।

কিন্তু চোখ ঘূলে সে তার মূখের দিকে তাকাতে
পারে না ।

চোখ বুজেই বলে না, ঘূমোইনি । কি বলছ বল ।

ভরে ভরে পুষ্টি বলে—কিন্তু বালিন ।

এই বলে কিছুক্ষণ খেমে আবার জিজ্ঞাসা করে,
মাথার হাত বুদিয়ে দেবো ? ভাল লাগবে ।

অরুণ বলে, হাও ।

মাথার চুলে হাত বুলাতে বুলাতে পুষ্টি বলে,
আমাদের বেশ মিলেছে কিন্তু । তোমারও গম্বা,
আমারও গম্বা ।

অরুণ বলে—হুঁ ।

এইবার সাহস পেয়ে পুষ্টিগানীর মূৰ ঘূলে যায় ।

বলে—কিন্তু গ্যাথো, তোমার গম্বা বেশ ভাল
মানব । আমার সঙ্গে ত সেই বিয়ের সব মূসিনের
সেবা । তাইতে এত ভাল সেপেছিল, সত্যি বলছি,
তোমাদের বাড়ি থেকে আমার আগতে ইচ্ছে করছিল না ।
আমার বাশু নই উল্টো ।

বউলোকের মেয়ে পুষ্টি যে এককম কথা বলবে অরুণ
তা ভাবেনি মোটেই । বললে—সে কি পুষ্টি ? আমার
পরিচয় । আমারে ভাড়া বাড়ির ঘর । আর তোমরা
বউলোক । এমন দুঃস্বপ্ন বাড়ি তোমাদের—

পুষ্টি বললে—হ্যাঁ, শিঙ । জানো না ভ, আমার
ওই গম্বা বাপটির কথা ত শোনো নি । তুমি আমারই
মানব । তাই তোমার মূখের সামনে কিন্তু বলে না ।
সেদিন আমার কাছে কি বলছিল শুনবে ?

কথাটা বলেই সে বুকল, বলা তার ভাল হয় নি ।
শুনবেই যদি সে হাস করে পালায় ।

কথাটা শুধুনি চাশা সোবার জন্যে তাই সে একবার
টুক গিলে নিয়ে এদিক ওদিক চরে অপ্রত্যাশিত একদেখ
হয়ে গিয়ে বলল—বিয়ের আগে ও আমার এমন মার
মারতো । আমকাল বড় হয়েছি, বিয়ে হয়ে গেছে, তার
ওপর তুমি রয়েছ । তাই মারে না । দেখবে কেন
মারতো ?

বলে সে তার বাঁ হাতের জামাটা তুলে কাঁয়ের কাছে
বডের একটা হাস দেখিয়ে বললে—এই গ্যাথো । ওর এই
ছেলোটাকে একদিন কোলে নিই নি বলে কি করেছিল
গ্যাথো !

—এত বড় লাগ ।

—হ্যাঁ, উনোনে লোহার ভাঙা নরন করে—

বলতে গিয়ে চোখদুটো তার ঝলে ভরে এল । দিচ্চে
ঠেঁটিটা ঘর ঘর করে কাঁপতে লাগল । কথাটা আর
শেষ হলো না ।

কিন্তু যে কথাটা সে চাশা দিয়ে গেল, অরুণ তাই
জানতে চাইল । বললে—বল না, কি বলেছিল ?

পুষ্টিগানী বললে—ও কিন্তু না । ও ভাবি বন্ধাত,
আমার দেখতে পারে না কিনা, তাই এমন বলে ।

কিন্তু অরুণের কৌতূহল ভাতে নিবৃত্ত হলো না ।
কাছেই শেখ পর্যন্ত তাকে বলতেই হলো ।

বললে—আগে আমার গা ছুঁবে বল, তুমি হাস
করবে না ।

অরুণ তাই করলে ।

পুষ্টি বললে—বলছিল, হ্যাঁলো, ভোর ঘরের কি
বাবার কোথাও জারসা-টারসা নেই না কি ? এখন থেকে
যে আর নড়ছে না দেখছি ।

অরুণ জিজ্ঞাসা করলে—কে বলছিল ? তোমার বা,
না তোমার মার বা ?

পুষ্টি বললে—বাপের, ও বাপটির কথা আর বোলো
না । বাবার ওই শাপদুই মাসী ভারী দুশ্ট ।

অরুণ চোখ বঁকে চুষ করে হইল ।

পুষ্টি তার মূখের পানে তাকিয়ে বললে—আমার তখন
ইচ্ছে করছিল, মিই আম্মা করে শুনিয়ে । কিন্তু ভয়ে
কিন্তু বলতে পারলাম না । বললাম—তা আঁরি
কি আঁরি ।

অবশেষ তখনও চোখ বুজে চুপ করে আছে সেখ
পুঁতি শুভ হলো। বললে—হাস করলে? তুমি হাস
করলে ওদের ভারী বারই পারে। কাল রাতে সবে আসে
যে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম, তা জাগিয়ে আবার আর খেতে
বললে না। ঘুম ভাঙতেই ঘোঁষ—সব অন্ধকার। কিছু
না যেমতই উপরে উঠে এলাম।

অবশেষ বললে—সেকি?

হ্যাঁ সো।

সারারাত উপোষ দিয়ে রইলে।

জান যেলে পুঁতি বললে—ও আমার অভ্যাস হয়ে
গেয়ে। দেখলে না—ওপরে এসে ঢক্ ঢক্ করে কতটা
জল খেলায়। ওল ঘেয়ে আমি ঘুমিন থাকতে পারি।
মাইরি বলছি। তিন দিনের ঘিন কট হয়।

ভারান্যথাবার স্বেণ্ডা টাকা কবে কুঁরিয়ে গেয়ে।

এই যথো বৈবাহিকের কাছে বিপুল ধ্বংস
এসেছিলেন।

প্রথমবার এসে সাংসারিক অভাব-অনটনের কথা বলে
সোটা করে টাকা নিয়ে সেয়েন। দ্বিতীয়বার টাকাকড়ি
কিন্তু পান নি, বাসানের কিন্নু তরিতরকারি নিয়ে সেবার
তাকে বিদায় নিতে হয়েছ।

দিন চার পাঁচ হলো তিনি আবার এসেয়েন। শ্রীমান
অবশেষে এবং শ্রীমতী বদ্ব্যতাকে সৌহারিনী একখানি
চিঠি লিখেছে। চিঠিখানি সোশনী।

লিখেছে:

তোমাদের অনেকদিন ঘোঁষনি। একবার বড় দেখতে
ইচ্ছা করে। তোমরা দু'জনেই যদি একবার আসতে পার
ত বড় ভাল হয়। বৈবাহিক মহাপরকে বলো যে ঘর-
জামাই গ্রামবার ব্যবস্থা বলেই যে আর যা বাবাকে সেখবার
উপার নাই তা নয়।

আমাদের কন্ডের কথা আর কি বলব বাবা, বড় কন্ডে
ঘিন কটছে। তুমি উপযুক্ত পত্ন। তোমার দু'খ
চেয়েই আমরা বলে আছি।

তোমার মন্থন এখনও তোমার একটি চাকরি কেন
করে দিলেন না বন্ধুতে পারছি না। মন্থকে বলে
যেমন করে পার চাকরি একটি জোগাড় করবে।

চাকরি যদি তিনি না করে যেন, তাহলে বন্ধুতে
ভরি মতলব খায়া। তুমি যদি বৌমাকে নিয়ে এখানে
চলে আসতে পার, তা হলে তিনি জন্ম হবেন। তা না
হলে যেমন বলে আছি তেমনি হয়ে বলে থাকতে হবে।

দু' দিন বন্ধ হ'লো, রাজার বাজনা সেওয়া ঘটনি
এবারে বোধহয় জন্মিলো নীলান হয়ে যাবে। তা হতে
আমরা পথে ধাঁড়াবে।

তোমার ভাই দু'টি বাড়িতে রয়ে আছে। ইচ্ছা
বেতন সেওয়া হয় নি বলে অপনাম করে ইচ্ছা থেকে না
কেটে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছে।

তোমরা আমার অপর্ণির্বাদ জানবে। ইতি—

তোমাদের দু'খিনী বা

পুনন্ত লিখি—বৌমাকে নিয়ে এখানে চলে আসা
চেষ্টা করবে। আসার সময় বৌবার গম্বাগুলি কে
কলে এসো না। অনেক দারী গম্বা। তোমার
ছেলে-মানুষ, সোণালি স্টলে না রাখলে নষ্ট হবে যেনে
পারে।

চিঠি শেষে অবশেষ অভ্যস্ত চিহ্নিত হয়ে পড়ল।

পুঁতি জিজ্ঞাসা করলে—অন করে ভাবই যে? এ
চিঠি লিখেছে? বা?

—হ্যাঁ। বলে চিঠিখানি পুঁতির হাতে গি
অবশেষ বললে—পড়ে যাতো।

চিঠি পড়ে পুঁতি বললে—ওস, আমরা চলে যাই
এখনকার চেয়ে আমরা ভাল থাকব।

অবশেষ একটু হালস। বললে—কঁড়াও একটা কাচ
কর' জোগাড় আগে করি। তারপর যাব। এনি সেও
তোমার কন্ড হয়ে।

—না, কন্ড হয়ে না।

—তুমি শু জান না, আমাদের প্রকৃত অবস্থা। হ
দিয়ের অন্যে দেখিয়ে...

—কেন, করো ব্যবস্থা।

বলে পুঁতি দু'খ ভাব করে বলে রইলো।

—কি হলো? হাস করেছে?

—না আমি বলছি—

কি যে সে বলতে পারে তা অবশেষ জানে।

বললে—কোন চিন্তা নেই পুঁটি, যতো ভাড়াভাড়ি পারি আমি চলে যাবার ব্যবস্থাই করছি ।

পুঁটি আর কোন উত্তর দিলে না ।

জল

ভারানাবাবু বৈবাহিককে সেবার এককক্ষ প্রকারান্তরে পস্টে জবাব দিলেন ।

বললেন—রাগ করবেন না, বেই-কথাই, বাশনাকে একটি কথা আমি ভিজ্ঞানো করি । আচ্ছা বলুন ত—কতদিন আপনি পরের ঘর চলে বসে আছেন ? এর শূন্যে বিশূল একতৃণ্যনি করু হলেন । কোনও জবাব দিতে পারলেন না ।

ভারানাবাবু আর বললেন—নিজেকে বিছা রোজগার করার চেষ্টা করুন না হলে আর কিছুদিন পরে আপনীর দুর্দান্তির সীমা থাকবে না ;

বিশূল বললেন—এত সব কথার কাজ কি বোঝাই, আপনি বলেন না তাই বলুন ।

বৈবাহিক ছেলের বাবা । চটাতোও ভয় হয় । ভারানাবাবু দশটি টাকা জরি হাতে দিয়ে বললেন—আনি ত আর ভিককাল দিতে পারবেনা বেই, তাহাড়া এতে আপনীর দুঃখও হুতবে না সেই জন্যেই বললাম । কিন্তু মনে করবেন না ।

ছেলেকে চাকরি করার উপদেশ দিয়ে দশটি টাকা নিয়ে বিশূল চলে গেলেন ।

সেদিন রাতে বাজা দাওজার পর অমরেশ উপরে উঠাছিল, শিঁড়ির পান্দেই ভারানাবাবু বাবুর শোবার ঘর । শূন্য সেই ঘরের মধ্যে পাশুড়ী ও শব্দে ভুল্ল কসড়া শব্দ হয়েছিল । ঘরের দরজা বন্ধ ! অমরেশ চুপি চুপি সেই বন্ধ দরজার পান্দে গিয়ে কান লাগে লাগান ।

ভারানাবাবু বললেন—আঃ চুপ কর, জানাই হরত শূন্যতে পারে ।

পাশুড়ী বললে—শূন্যক না । কাল থেকে ত আমি শূন্যে শূন্যে বসব । তখনই বলিলাম—না, যে—হা—ভাতে, পঞ্চীরের ঘরে যেনে ছুঁই দিয়োনা । বিন্দুসে আত্ম খেতে কাল নেই । হাউ চাঁড়িয়ে তোমার কাছে ছেলে গিয়ে পড়ে থাকল । হাও এইবার কত দিতে পার ।

এই এক মেঘের শেয়েনেই যদি কতুর হবে ত আমার ছেলেকেই গতি কি করবে শূন্য ।

শব্দর বললেন—তোমার ছেলেকেই হলে শূন্য সো । তোমার জানাইকে ত আর ঘরে শূন্য রাখতে হবে না ।

পাশুড়ী বললেন—আ বরি—বরি ! আমার মেয়ে বড়ি শব্দরবাড়ী গিয়ে ভাত গ্রাধবে ! মেয়ে যেতে । কখনো না । আমারও মেয়ে জানাই আমি ঘরে রাখব, মেয়ে তোমার কত টাকা হচ্ছে কত ছুঁই দিতে পার । এখনও বলছি জানাইকে ছুঁই বিধার কর, না হলে জানাই—এই বাপ তোমার আর আত্ম রাখবে না ।

শব্দর চুপ করে উঠলেন ।

অমরেশের কানদুটো গরম হয়ে উঠল । হাত—পা ঘর ঘর করে কাঁপতে লাগল ।

বীয়ে বীয়ে সেখান থেকে ঘরে গিয়ে সে তার ঘরে ঢুকে বিছানার শূন্যে পড়ল ।

পুঁটি এলে বললে—তোমার কাপড় গরম তোমার কাছেই আছে না ?

পুঁটি বললে—হ্যাঁ, কেন বলত ?

—চল আমরা এখান থেকে চলে যাব ।

পুঁটি তখনই আনন্দে অধীর হয়ে উঠল । বললে—চল আজ রাতিয়েই চলে যাই । দ্বিবি চাঁদের আলো, কাছেই ত হাউপান গরমাদুলো একটা শূন্যটিতে বেঁচে আমি হাতে করে নিয়ে যেতে পারব । কিন্তু কাপড় জানা তাহলে ত বেশী নেওয়া হবে না ।

অমরেশ বললে—না আজ রাতে নয়, শূন্যেরে ত নয়, জানিয়েই যাব ।

পুঁটির শূন্যখানি জরে শূন্যেরে পেল । জড় বেড়ে বললে— তাহলে বাবা হরত বেতে মেনে না ।

অমরেশ বললে—নিশ্চয়ই মেনে ।

এই বলে সে অনেকক্ষণ ঘরে শূন্যে শূন্যে এখান থেকে কেমন করে যাবে সেই কথাই ভাবতে লাগল ।

উমাই আজকাল বাড়ির গির্জা ।

উমাই বা অনেক কষ্টে, অনেক হাসানো করে বাড়ি গেছে । উমাই হাতেই শূন্যেরে সব কিছু ।

পত্রদিন বেলা গেল সেই কোন সকালে চাকর অমরেশের হাতের কাছে এক সেতলা চা দিয়ে গেছে তারপর বেলা প্রায় বারোটা বাজতে চলল তখনও শব্দে তার জলখাবারের কোন ব্যবস্থাই কেউ করল না।

এর আগেও যে হুঁ একদিন এমন না হয়েছে তাও নয়। কিন্তু সে দিনকার এই ইচ্ছাকৃত অবহেলার যেহেতু তা যে কোথায় সে কথা বুঝতে তার বিশেষ কষ্ট হলো না। বেলা তখন প্রায় বিগ্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে তারানামখাবান্ন হান করে যেতে বসেছেন এমন সময় অমরেশ পুনর্বার নীচে থেকে শাপশুভী বললেন :

জামাই কি বাজ পড়ে পড়ে বুঝেছে—নাকি বাবু বাবার চেয়ে কিনা ওইখান থেকে হেঁকে একবার বলত বাবা।

অন্যদিন চাকর এসে হান করবার জল তেল পামছা—নব্বই রেখে যায় আর সে তাও গ্রাসেনি। নীচে গিয়ে তেল পামছা চেয়ে নিয়ে পুতুরে তাকে হান করে আসতে গবে। অবশ্য পুতুরে হান করাই তার চিরকালের অভ্যাস কিন্তু এখানে এসে অব্যর্থ কোনদিনই তার সে ব্যবস্থা হয়নি বলে সেদিন তার কেমন বেন লজ্জা করতে লাগল। নীতকাল। হান তার আর না করলেও চলবে।

অমরেশ ব্যাপড় ছেড়ে হাত-বুখ বুঝে নীচে গিয়ে যেতে বলল। ভাত বেন তার পলা দিয়ে আর পার হতে চায় না। কোন রকমে খাওয়া শেষ করে আবার সে উপরে উঠে গেল। পানের ঘর থেকে গাণা নারীকণ্ঠে কে বেন বললে—হ্যাঁ জিসে তা হিতে আবার বসোসে খাও।

কথাটা তার শাপশুভীই কলস কিনা তাই বা কে জানে।

রাত্রে যেতে গিয়ে ঢেবে অব্যাহিন বালার পাশে ব্যাতি নাকিয়ে ভল্লগাবে তাকে যেমন করে যেতে দেখল ছা সেদিন সে ব্যবস্থাও উঠে গেছে।

জীবনীয় বাঘনী ব্যাতির মধ্যে বঁদু বঁদু করে এর এর সোম ঘিরে শেবে বাহার ওপরেই বা কিছু ঢেলে দিতে গেল।

দুয়ের ব্যাতিতে চুন্দু দিয়ে জেবল, দুয়ের কলে খানিকটা দাখা জল চিনি পুসে গুল করে তাকে যেতে দেখা হয়েছে।

একবার ভাবলে পুঁটিকে সে সেখানে ফেলে রেখে নিজেই চলে যায়। কিন্তু পরক্ষণেই আবার জাববে না, না, আবার কোথা পুঁটি জীবনে অনেক কষ্টই লা করছে। আর না।

পুঁটি বললে—সেদিন ঘাব বললে বলে আবার ঐ ভুলে গেলে নাকি? নতুন বা এতদিন পরে আ আবার বেয়েছে।

অমরেশ বললে—বেয়েছে?

—হ্যাঁ, সেখাবে? সে তার হাতখানা হয়ে নিয়ে মাঝার গিয়ে বললে—হাত ঘিরে দেখো।

অমরেশ দেখল, চুলের নিচে অনেকখানি কুলে উঠে পুঁটি বললে—যেতে বসে বামুনিকে বসেছিল এক গ্লাস জল দে। উনি নিজেই তখন জল গড়ি এনে গ্লাসপুতু কাবার মাঝার ঠুকে দিয়ে বললেন—নি গড়িয়ে নিতে পার না নবাবের বয়ে।

—হুঁ। বলে একটা ধীরে ধীরে ফেলে অন্যে চুপ করে হইল।

তারানামখাবান্ন সেদিন ব্যাতি ছিলেন না।

কি একটা জরুরী কাকে কবেক দিবেন জানো বাই যেতে হয়েছিল। বুঝিন পরেই তার জেববার কথা।

খটাই উপদ্রুত সুযোগ ভেবে অমরেশ বললে ব্যাটাই দাল।

পুঁটি প্রমত্ত হয়েই ছিল। বললে—বেশ।

অমরেশ এসে উমাকে বললে কমাটা।

উমা বললে, কবে যাবে?

অমরেশ বললে—ব্যাটাই।

—ব্যাটাই?

—হ্যাঁ, আর একটা ঘিনও মন ডিকছে না, বা অব এদিকে—

উমা অবাক হয়ে বললে—কোথায়?

অমরেশ মিথ্যা কথা বলতে বাধ্য হলো। কলসে দবার তখনক অবদন, চিঠি সেলাম, বেড়েই হবে।

—হুঁ একা যাবে?

—না, দুজনেই।

—কিন্তু তোমার শপথ কে ব্যাতি নেই।

তারপর একটু ভাবলে—বাচ্চ যাক্ না, আটকে
কি লাভ ।

বললে—নানে ঘাবে ঘাও, গিয়ে স্বর-খাতা দিও ।
তোমার মশুর না হলে চিত্তিত হবেন ।

—হ্যাঁ সো ত দেবোই ।

অমরেশ নিজেই সেল গরুর গাড়ি ভাকতে । একটু
পরেই গাড়ি নিয়ে ফিরে এলো ।

শাপুড়ী ভাবলে, একবার বলে যে পুঁটির পরনাসুলো
বেন সে না নিয়ে যাব ।

তারপর আবার কি ভেবে চুপ করেই রইল সে ।
যাক্ সে, আপন বিসার হলোই বাঁচে সে ।

পুঁটি আর অমরেশ গরুর গাড়ি চড়ে টেপনে
গিয়ে ট্রেন ধরলে ।

কল

হিলে বৌকে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে বাড়ি আসতে
জেনে বিপুল আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন ।

বললেন—বেশ হয়েছে, আমার ঘরের লক্ষী
ঘরে এসেছে ।

আনন্দে সৌম্যমিনীর মুখ দিয়ে আর কথা বের
হলো না চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়াতে লাগল ।

তারের আসার হেতুটা জানবার জন্যে বিপুল
অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন :

ছিজাঙ্গা করলেন—তারপর এলি কেনন করে পুঁনি ?
মশুর তোকে কিছ্ বললে না ?

অমরেশ বললে—এলার—সেখানে আমার আর ভাল
লাগল না বলে । এখানেই আমার থাকব ।
আর থাকব ।

বিপুল বললেন, বেশ, বেশ, এবার ভাল মেয়েছকটি
চাকরী যোগাড় করে এইখানেই থাকো বাবা । 'তারানাথ
বাবু' লোকটা বাপু তেমন মূর্খবের নয়—সে আমি
এইবারই টের পেয়ে গেছি । -বক্ত ঈশ্বর ।

ক্রম মূহুর্তে সৌম্যমিনী তারের কাছে এসে চুপি চুপি
ছিজাঙ্গা করলে—বৌমার পরনাসুলি সব মেয়েশুনে
এনেছ ত বাবা ? তোমরা দুজনেই মেলেমানুষ-সেই
জন্যেই আমার বেশি ভালবা ।

অমরেশ ঘাড় নেড়ে বললো—হ্যাঁ এনেছি ।

কিছ্ গরীবের সংসার । চারদিকে দিনরাত শব্দ
নাই আর নাই ।

বিপুল উঠানের একপাশে ঘোড়ের দিকে পিঠ দিয়ে
চুপ করে বসে ভাবেন আর কাঠি দিয়ে মাটিতে আঁড়
কাটেন ।

লোকানী টাকা পাবে, টাকার ভাগাদা করতে আসে ।
বিপুল বললেন—বোন তামাক খাও ।

লোকানী বলে—না দাদা বলে বলে আমার তামাক
খাবার সময় নেই । টাকা কটা এবার না দিলে আমার
চলছে না ।

—বিপুল বললেন—বাঁড়াও ভাই আর কয়েকটা দিন
সবুর কর । অমরেশ তার মশুরের কাছ থেকে—

লোকানী বলে—সে ত আজ ছ' সাত মাস ধরে
শুনছি দাদা কখনও বল—অমরেশের কাছ থেকে কখনও
বল—তমরেশের কাছ থেকে ও সব পরের আপা-ভরসা ছেড়ে
দাও দাদা নিজে কোথাও যেতে কোণা-বস্তর করে
টাকা কটা কেলে দাও । আমি আরও একমাস সময়
দিয়ে দেবার ।

লোকানী আরের লোক । চকুলুঙ্গার খাতিরে বেশি
কড়া কথা সে শুনতে পারে না ।

কিন্তু জমিদারের শেয়ারা বিপুলদ্বানী । জমিদারের
খাতির তারার রাখতে আসে না । ইহা লম্বা একটা প্যাঠি
ঘাতে নিয়ে মাথার পাগড়ি বেধে বজ্রতের মত দরজার
এসে ধাঁড়াল ।

প্রায় মাসখানেক ধরে জমিদারের নামের বিপুলকে
ডেকে পাঠিয়েছেন । কাছারী বাড়ি বেশি ঘুরে নয় । কিন্তু
কোন দিনই তিনি সেখানে দাবার সময় করে উঠতে
পারেন না ।

ভক্ত সিং তার প্যাঠিটা মাটিতে চুকে বলল :

—আঁড়ি হাই নেহি ছোড়েন্গা । আপনাকে
খাতির হোসে ।

বিপুল বললেন—যেহে কি করব বাবা, বলছি
একবারে টাকা নিয়েই যাব তবু বার বার কেন যে আসছ
কে জানে । ওরে ও অমরেশ-বলত বাবা, ভক্ত সিংকে
ভাল করে মূর্খকে একবার বলে দেত বাবা !

অবশেষ বললে—তা অর্ধনি একবার নায়েবের সঙ্গে দেখা করে না হয় বলেই আসুন।

বিপুল বললে—বলে আসার মানে ত দু'কিস না বাবা। তোর বিয়ের অনেক টাকা শেখোঁছ ভেবে নায়েব ভেঙে পাঠালে। ভেঙে পাঠিয়ে এমন অগমান করলে যে আর বলবার কথা নয়। ভেঙে পাঠাচ্ছে শূন্য অগমান করবার জন্যে।

কথাটা শুনলে অবশেষ নিজেই ভক্ত সিংএর কাছে এগিয়ে গেল।

বললে—তুমি আমাদের নায়েবকে গিয়ে বলবে, বাবুয় ছেলে আর বিকেলে আসবে বলেছে।

ভক্ত সিং হাত নেড়ে চলে গেল।

অবশেষ বললে—আমাদের কত টাকা খাজনা ব্যাকি আছে?

বিপুল ভেতরিন হেঁটমুখে ম্যাটিতে ঝড় কাটতে কাটতে বললেন—চার বছরের ব্যাকি। তা প্রায় দু'শে—আদলে একশ টাকা।

অবশেষ বললে—বিয়ের সম্ব পচিশ টাকা ত পেয়েছ, তাই থেকে এটা আপনার বিয়ে সেওয়া উচিত ছিল।

—উচিত ছিল, কিন্তু দিতে পারলান কোথায়?

—কেন?

—তোর মার গম্বাগুলো বন্ধ পড়েছিল, সেগুলো হাড়াতে হলো। দু'য়েন হালদারের ঘেনাটা শোব করলাম—কাড়ও একখানা পক্ষীর কাপড় ছিল না—হাবন অভাবে ঘরে জল পড়ছিল। মোকামের ঘেনা—কত আর ব্যস।

অবশেষ চুপ করে হাঁড়িয়ে রইল।

বিপুল কিছুক্ষণ ঘরে কি খেব জেবে ঘুঁষ তুলে ভাসালেন।

বললেন—তুমি যে নায়েবের কাছে ঘাবি বসানি, গিয়ে কি বলাবি শুনবি?

অবশেষ একটা হাঁটখাল কেসে বললে—কোঁষি আরও কিছু দিন সময় নিয়ে কাল একবার কামের সন্ধ্যাবে বেহুঁই। শশুরের ভরসাঘর বসে না থেকে এতদিন বেয়োন আমায় উচিত ছিল।

বিপুল বললেন—হুঁ, মোকটাকে আখিও এতদিন

চিনতে পারিনি। ওর ভরসা করা মিছে। ও আর কিছু ঘেবে না।

এই বলে কিছুক্ষণ কি খেব তেবে তিনি অবসার বললেন—তাই ধ্যান বাবা, তুমি আমার উপদ্রুত হৈলে। এইবার কোঁষি যদি তুমি কিছু করতে পারিস।

হারে পুঁটি জিজ্ঞাসা করলে—হ্যাঁ পা নায়েব কি বললে?

অবশেষ বললে—আরও কিছুদিন সময় নিয়ে এলার।

—সময় দিলে?

—হ্যাঁ, তবে বেশি দিন নয়—এক মাস।

—তুমি কি সত্যি সত্যিই কাল কোথাও কলকো চেষ্টার রেহুনে মাকি।

অবশেষ বললে—তাই ভাবছি—এমর তুমি কোথায় পুনসে।

পুঁটি বললে বা বলছিলেন।

—আর কিছু বললেন।

—হ্যাঁ সো, মা আর ঘুঁব কাঁইছিলেন আমার কাছে বলছিলেন, তোর অপসূরতি কোন কামের নয় বা। কোনদি একটা পরমা মোকামার কোন চেষ্টা পর্যন্ত করলে না—খালি পরের মুখ চেয়ে বসে রইলেন।

অবশেষ বললে—হুঁ।

পুঁটি বললে—বা বললেন, আমার ছেলে বৌ দু'দি কোথায় দু'খে বাদ করবে, তা না ছেলেকে আমার কাছে সন্ধ্যাবে হুঁটেতে হচ্ছে।—ব্যাঘো, এমন কথা সত্যি করে হয় না, তা তুমি ঘাই বল।

অবশেষ চুপ করে রইল।

—চুপ করে রইলে যে? সত্যি নয়?

—কি জানি।

—আমার কিছু বাশু ভাঁষি ভাল লাগে। আর মা নেই, সত্যি আমি এতদিন পরে মা পেতেছি।

অবশেষ বললে—ভালো।

পুঁটি বললেন—হ্যাঁ সো, তোমার পরীকার সময় গাখিল করতে মাকি অনেক টাকা পেয়েছিল।

—অনেক আর কি। মোটা পচিশ-ত্রিশ হবে।

—সে টাকা মাই ত নিরেছিলেন শুনলান গমনা বন্ধ দিয়ে ।

—হ্যাঁ নিরেছিলেন ।

—তারপর আবার কি বলছিলেন জানো ? বলছিলেন—

বলেই পুঁটি কিক্ করে একটুখানি হাসলে ।

—কি বলছিলেন ।

—বলছিলেন, তোমাদের এই সব আশঙ্ক্য করবার দর না—তোমরা দুটিতে এখন কিছুদিন এক সঙ্গে থাকো । ছেলেকে এখন আমি বাড়ি থেকে বেতে দেবো না কিছুতেই ।

অমরেশ বললে—তা হয় না ।

—কেন হবে না ।

—তাহলে ওগিকের ব্যবস্থা কি হবে ।

—তাই ত বলছি গো । বলে পুঁটি তার আরও কাছে সরে এসে বললে—না বলছিলেন । উনি তাঁর হাতের চুড়ি ক'গান্না বন্ধ দিয়ে থাকার খাঙ্কনা শেষ করে নেবেন । বলছিলেন, ওই চুড়ি নাকি আচ্ছ তিন বছর বন্ধক পড়েছিল—তারপর আবার বিয়ের সব ছাড়িয়েছেন ।

অমরেশ চুপ করে রইল ।

পুঁটি বললে—কি সো চুপ করে রইলে যে ।

—না ভাবছি ।

পুঁটি তার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললে—তার চেয়ে এক কাজ কর না—হ্যাঁ গো, আমার ত অনেক গল্প—আবারই একটা গল্প না হয় বিক্রি করে খাঙ্কনা শেষ করে দাও না ।

—তা হয় না পুঁটি ।

—কেন ?

—তোমার বাবা কোনদিন এ কথা জানলে আবার ক্ষমা এতটুকু থাকবে না । ভাববেন দুটি এই জন্যেই চলে এসেছি আমরা ।

পুঁটি বললে—পাগল হয়েছো ?

—কেন ?

—যাবাকে আমি না বললে তিনি জানকেন কেন করে । এতসুদী গল্পের মধ্যে একটা পেলে তিনি থরথরে পায়কেন না ।

অমরেশ কিছুক্ষণ কি ভাবলে ।

তারপর বললে—বেশ তাই দিও । সেই গল্পটা নিয়ে কাল আমি একবার বেতের বাড়ি থেকে ।

পুঁটি বললে—না তাহলে আবার বেতবে কেন ?

এই যে না বললেন, ওকে আমি যেতে কিছুতেই দোব না ।

অমরেশ একটু হাসলে ।

—হাসলে যে ।

—কেন ?

অমরেশ বললে—এখন যদি আমি তোমাদের চেন্টা না করি পুঁটিমানী, তাহলে ওই দার মত তুঁনিও চিরকাল কষ্ট পাবে । তাই তোমার আমি দুধে রাখবার অনোই—বুকেছ ।

পুঁটির মুখ দেখে মনে হলো, যেন সে বুকেছে । অমরেশের মূখের দিকে কিছুক্ষণ সে একান্ত্রাঙ্গিতে তাকিয়ে রইল । তারপর বললে—কিছু আবার হবে আসবে ? বলেই একটা ঢাকি গিলে লম্বা আরেবারে যেন সংকুচিত ভ্রমরান হয়ে গিয়ে বললে তোমার ছেড়ে আমি কিছু বেশি দিন—

প্রথমে ।

পূর্ণিমা বুধসপ্তমবার ।

সৌদামিনী বললে—না, আজ এই বিধুৎবারে তোকে আমি কিছুতেই যেতে দেবো না । অমরেশ, একাত্তই যদি যেতে হয় ত বরং কাল দাও ।

অমরেশ চাকির করতে বাবে, বিশূল ভাবতে বললেন, যেতন, যদি তার পূর্ণিমা-বাটী টাকাও হয় ত আগামী মাস থেকে ত্রিণ-চল্লি টাকা সে বাড়ি পাঠাতে পারবে ।

খাঙ্কনা খাঙ্কনা ত অমরেশ কোন কল্প হোক দেবে বলছে—সুভর্য তার আর চিন্তা করবার কিছুখনেই । মনের তাগামার পাণ্ডাবারো টাকা চাইতে এসে এবার অমরেশের নাম করে দিলেই তারা অজ্ঞাতঃ কিছুদিনের জন্যে চুপ করে থাকবে ।

এই ভেবে তিনি আনন্দে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে উঠলেন ।

পুঁটিকে ডেকে বললেন—আচ্ছা বলত বৌমা, তোমার কি যেতে ইচ্ছে করে ?

পুঁটিমানী নীরবে নতমুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ের

নব দিবে মাটি আঁচড়াতে লাগল। খানিক পরে ঈশ্বর
হেসে বলিলে—‘কিছু না !

সৌদামিনী কাছে এগে বললে—‘আমো, আর বাহা-
বুড়ীতে কাজ নেই। নৌবার যা খেতে ইচ্ছে করে তাই
তুর্নি খাওয়াতে পারবে ?

বিশ্বাস বললেন—‘সেখি না চেক্টা করে।

‘সৌদামিনী-বললে—আমি বলছি শোনো। নৌবা
মাংস খেতে চায়।

শীতকাল। অমরেন বাড়ি থেকে চলে যাবে—আনো
না মাংস। কোথেকে আনবে ! সেখি কেনন বাহাদুর !

বিশ্বাসের বাড়ি একেবারে গ্রামের বাইরে। কাঁক।
মাঠের মাঝখানে।

অন্য চিরদিনই তার বাড়ি গ্রামের বাইরে ছিল না।
বাঁ দিকে হরিদর মৃৎকোর বাড়ি। বহুদিন হলো সে
এ গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে চলে গেছে। এখন সেখানে হাত
তারের ভিটে বাড়ি আর কিছুই নেই। বাড়ির
খানিকটা উঁচু চিহ্ন ওপর অবধি বর্ধিত একটা কুলের
পাত খাড়া দাঁড়িয়ে আছে।

সেই কুলপাতার নিচে দু'চরটে হাগল ঘোজই চরতে
‘আলে। ছোট বড় নানারকমের বাড়া।

সেখিন হুঁসুর বেলা।

হুঁসুরটে হাগল কুলপাতার নিচে ঘুরে ঘুরে চিহ্নে
চিহ্নে মাছিল।

একে পল্লীগ্রাম তার আবার হুঁসুরবেলা। লোকজন
কেউ কোথাও নেই।

বিশ্বাস ধীরে ধীরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চুপি চুপি
সেই কুলপাতার নিচে গিয়ে দেখেন দিক থেকে টপ করে
একটা হাগলের পা পুঁচি চলে ঘুরে ফেরলেন।

অন্য হাগলগুলো গুহ শেষে চীৎকার করতে করতে
হুটে পালাল।

ভারপর হাগলটিকে তিনি কোলে তুলে নিয়ে অভয়
নকশনে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলেন। ঘরে ঢুকেই বরজার
কিল বন্ধ করে দিলেন।

সৌদামিনী দেখতে পেরেছিল। বললে—ও তুর্নি
কোথেকে আনলে সে ?

বিশ্বাস বললে—চুপ !

ভারপর অন্ধকার ঘরের মধ্যে গিল বন্ধ করে, বাঁ-
দিয়ে পিঠিটার মূখ তুলে ঘরে নিম্নের পা ঘিণ্ডার
তুলে ব্যাল একটা দাঁ নিয়ে যে কি নিষ্ঠুরভাবে তা
তিনি হত্যা করলেন তার আর কেউ শাকী হইল।
চামড়া আর নাড়ি ভুঁড়িপুলো হুঁসুরে একটা পুঁকু
ঘরে তিনি পুঁতে ‘ঘরে এসেন।

সৌদামিনী রাত্রা চড়ালো।

হুঁসুরে আহার্যার পর অবশেষ আর পুঁচি হুঁসা
কথা বলতে বলতে তারের কোঠাঘরের ওপরে ঘুঁ-
পড়েছিল, এ ঘরের কিছুই তারা জানতে পারেনি।

রাত্রি হাল রাত্রা হয়েই দেখে পুঁচি বললে—এ
কখন করলে না ? বাবা তারহলে আমাকে গি
খাওয়ালেন ?

অবশেষ বললে—‘হাত একটা পিঠাই কেন। হা
বুড়ি ? হাত নিচুই এখনও রেওয়া ধানি ! কত লাগে
সৌদামিনী হেসে বললে, হাত লাগবে না।

বিশ্বাস উদ্যোগে কাছে বসে তারাক খাঙ্ক
বললেন—‘হা হুঁসুরের পাটাটা ওই কুলতলার চরা
বাটাকে কোল দিনই বাসে পেতাম না, আত ঠিক সে
পেলার তাই পুঁচিরে ঘরে’ এনে দিলাম কেটে।’

অমরেন বললে—‘ছিঃ, এ আমাদের উচিত হল।
বিশ্বাস বললেন—উচিত হলো না কি রে। আমা
হাঁস ছিল আর চৌকটা। ওই হেগো-চাটার পুঁ-
চরতে যেতো। একটা একটা করে ‘না হবে ত’।
আটটা হাঁস ও আবার কেটে ঘরে ফিলে।

বিশ্বাসের এ পক্ষের ছোট ছেলে নকু ঘুঁসুরে পা
বলে উদ্যোগে কাছে একটা বাটি নিয়ে মাংস সে
বসেছিল। কোলটা সে পরন পরিভ্রমের গর্ভিত চাই
চাটতে বললে—আর আবারে সেই বহুর কণ্ঠী পাত
বাবা,হা হুঁসুরের বেড়াটা ধরে খেয়েছে।’

পুঁচিরাণী অবাক হয়ে তারের নকলেরই নুঁসুরে ঠি
একবার করে তাকাতে লাগল।

কলিকাতা থেকে অবশেষ পুঁচিরাণীকে একখা
আর তার বাবাকে একখানা চিঠি লিখে। লিখে

সেখানে তার লগাঠী বন্ধ একজন চাকরি করে, অর্থাৎ তারই বাসার গিরে উঠেছে। চাকরি একটি করে দেবে বলে বন্ধ তাকে আশা দিয়েছে। সেই জন্যেই এখনও তাকে কিছুদিন কোলকাতায় থাকতে হবে।

সৌদামিনী বলে—তা বেশত! বৌমা আমার কাছে বেশ ভালই আছে।

তা পুঁটিয়ানী যে তার কাছে ভালই আছে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। বা-বাবা নিয়ে যা পেয়েছে। দিনরাত নিজের পেটের ছোট মেয়ের হাত ‘মা’ ‘মা’ বলে তার পিছু পিছু সে ঘুরে বেড়ায়, পাড়া পড়পারি বাড়ি বেড়াতে যায়, গল্প করে।

সেজো বলে, ‘তা গতি্য বলতে কি মা, এমন গু-শামুড়ী আমার কাণ্ড সেখানি।’ জেন আর হয় না।

সৌদামিনী বলে ‘অনেক তপস্যা করে বৌ পেয়েছি মা, ওকে আমার ঠিক নিজের পেটের মেয়ে বলে মনে হয়।’

হাতির অঙ্ককারে গ্রামের বাইরে তাদের নিরাপাণা বাড়ির ঘরখানি লক্ষ্যার পরই বিকৃত হয়ে ওঠে। বাড়ির সামনে বড় দুর্দর্শনবৃত্ত গানের মার্চে কখন ঘান কাটা শেষ হয়ে গেছে। কোথাও কোন দলের একটা পুরুষের পাড়ে কিয়ো সেই কাটা গানের মার্চের মাঝখানে যখন শেগাল ঝাকতে থাকে, পুঁটিয়ানী তখন ভয়ে কাঁচ হয়ে গিয়ে সৌদামিনীর মলা জড়িয়ে হয়ে বলে মা, একটি গল্প বল না শুন।

সৌদামিনী হেসে বলে, গল্প কি আর আমি জানি মা হাই! সেবার আমি ওই ভাঙ্গা ঘরে একা ছিলাম, তোমার মশর বাড়ি ছিল না, তার ওপর ওই গায়নের পাঁচিলটাও পড়ে গিয়েছিল, সেবার আমি কি রকম ভয় পেয়েছিলাম শোন। গ্রামে সে বছর পুরুষের জল দুর্ভিক্ষে গিয়েছিল, চারদিকে কলোরা-বদন্ত সেসে গেছে, দিনে রাতে মানুষের মর্যা দেখা হ়িলা না। একদিন হাতির বেলা হলো কি—

পুঁটি তার আরও কোদের কাছে বেসে এসে বলে-না মা, ও গল্প বলো না। আমার ভাবি ভয় করছে।

তখন সে হেসে অন্য গল্প আয়ত্ত করে। এবং শেষ পর্যন্ত গল্প শুনতে শুনতে পুঁটি ঘুমিয়ে পড়ে। এরনি করে ভয়ে ভাবনার দিনের পর দিন কাটতে থাকে।

সৌদামিনী বলে ভয় করো না মা, ভয়ের কিছু নেই। মাসের এই অঙ্ককার গনেরটা দিনই যা একটু ভয় ভয় করবে, তারপর আকাশে চাঁদ উঠলে আর ভয় কিসের।

পুঁটি নিশ্চিন্তা করে চাঁদ করে উঠেছে মা।

মা বলে তার এখনও মেয়ী আছে বাছা। আমার ত আর কোন কিছুই ভয় কোন দিন ছিল না মা, তুমি এসেই এতদুর্দিন গরমা-গাঁটি বয়েছে, তাই শব্দ যা চোর ডাকাডের ভয়।

পুঁটি খানিক ভেবে বলে গরমা এবার আমার আনিব বললেই হলো। তুমি যে আমার জন্যে অনেক ভেবে ভেবে দেখাতে গেলে মা।

সৌদামিনী বলে কেন সেখানাম আনো বউমা। আমার লোকে গণীব বলে ধোরা করে তাই ভেবে ভেবে সেখানাম। যদি এই হ্যাণো, লক্ষীঠাকরুন আমার বউমা হয়ে ঘরে এসেছে, আমার আর গণীব নই।

কিন্তু চোর ডাকাডের কথা শুন পুঁটির মূর্খখানি শূন্যকরে এতটুকু হয়ে গেল। এত-এত সোনার গরমা। কাঁকা মার্চের মাঝখানে বাড়ি। চোর ডাকাডে অন্যাসে কোদুলো তাদের কাছ থেকে মেয়ে কোড়ে নিয়ে যেতে পারে। সে কথা এতদিন সে ভেবে দেখেনি। পুঁটির চিন্তা হবারই কথা।

খানিকক্ষণ পরে বললে—আচ্ছা মা গরমাগুদোর কোনও ব্যবস্থা করা যার না।

—ব্যবস্থা।... বলে সৌদামিনী গান্না করতে করতে বউমাকে তার কাছে ভেঁকে বললেন এদিকে সরে এসো মা যদি।

বলোই দুর্ভিক্ষে তারা পরাকর্ষ করতে বসল।

পরামর্শে শেষ পর্যন্ত এই স্থির হলো যে, সোনার গরমা যখন আভরণ, পেট-ভরল দুই-ই, তখন সেদুর্দিন এখন করে বাছের বহো পুরে রেখে কোনও লাভ নেই। তার চেয়ে সেদুর্দিন বিক্রি করে সেই টাকা তার যদি পুঁটির নামে রাখের আমি কিনে ফেলা যার তাহলে বছর বছর সেই খনির উৎপন্ন কদল বিক্রি করে অনেক টাকা জমবে, অভাব ত তাদের করও থাকবেই না, চাই কি দুর্ভিক্ষ বছরের বহো তারা বড়লোক হয়ে যেতেও পারে। পুঁটির জ্ঞান অরকার তা হলে ত হবেই অচ্চ টাকাতে টাকাও হয়ে

ঘাবে কনিষ্ঠনা কেউ চুঁরি করে নিয়ে যেতে পারবে না।

আনন্দে পুঁটি লাফিয়ে উঠল। —চুঁক বলেছে না।
উনি না এলে কিছ:, হবে না, উনি আসুন, উনি
এলে সেই বানছাই হবে।

সৌম্যবিনয়ী চোখে জল এলে পড়ল। বললে
তোমার ওই নিশ্চয়্য নশ্বরের হাতে পড়ে কীভাবে অনেক
কষ্টই সহ্য করেছে বা. এবার বোধহয় তোমার কৌশলে
কষ্ট আমাদের হুঁতলো।

বেলা অনেক হতেছিল। স্থান করবার জন্য পুঁটি
উঠে গেল।

দশক থেকে বিশূল সেই যে প্রাচীরের কোলের
কাছটিতে বসে তারাক খেতে ছিলেন তখনও তেমনি
জড়পড় হয়ে বসে আছেন সেখান সৌম্যবিনয়ী তাকে হাতের
ইঙ্গারায় কাছে ডেকে বললে—গোম।

বিশূল উঠে আসতেই তাদের দু'জনের মধ্যে আবার
কিন্, কিন্ করে বোধহয় ওই গরমাপুলির চোর
ভাকাতের হাত থেকে নিরাপদে রাখবার পরামর্শ
চলেতে থাকল।

বাক্সো

হাতে সোদিন ছোটছোটটাকে আর বেছেটাকে ঘাইয়ে
খুব পাড়ির শাপড়ী বৌ এ খুঁবে খুঁবে গল্প করছে।
বিশূল কোথায় গিয়েছিলেন, অত্কারে শাপের ভয়ে
হাতভালি দিতে দিতে ঘরে ঢুকে বললেন—ওপো
খুঁবেছো?

সৌম্যবিনয়ী বড়কড় করে উঠে বলল। বললে কিস্যো?
কি খুঁবেছো?

বিশূল বললেন,—রাখামাখবশ্বরে কাল ভাকাতি হয়ে
গেছে।

—ভাকাতি।

পুঁটিও উঠে বলল। তার বুকেন ভেঙেটা তখন
চিপ চিপ করছে।

বিশূল বললেন—একটা বেরকে একেবারে খুন করে
দিয়ে গেছে আর অনেক টাকার জিনিষপত্র সব লুটে করে
নিয়োগে। তাই না খুঁবে আমি চট্ করে চলে এলাম।

জাবলান—তোমরা এক। আচ্ছো, আর যে দিনকাল পড়েছে
সোকে যে খেতে পাচ্ছেনা।

সৌম্যবিনয়ী বললে—দরনাশ! বল কি সো, খুন কে
দিয়ে গেছে।

বিশূল বাড় বেড়ে বললেন—হ্যাঁ। একেবারে খুন
ও ব্যাটারের পরীয়ে কি আর বাবা বামা আছে।

পুঁটি তার শাপড়ীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে
চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে হ্যাঁ বা তাহলে আমাদের
কি হবে?

সৌম্যবিনয়ী বললে—তাই ত ভাবছি বা ভয়ে আমা
বুক বুক ধর ধর করছে।

পুঁটি বললে—না বা খুন টুন করে দেব ত কা
বেই বা আমার গরমার, আমি বলে গেলাম—ওই বা
বাক্সের ভেতরে ছোট হাতবান্দে আছে—তোমরা নি
বাও বাবা, নিয়ে আমাদের ছেড়ে দাও।

বিশূল হো হো করে হেসে উঠলেন। ভাল্লা সে
নিগড় নিগড়কর অত্কার খেতে মধ্যে সে অট্টহাসি অত্
শোনাগ। বললেন—আরে কেসেই বৌমা? আ
বোঁটে থাকতে কে তোমার গরমা নিতে পারে। তা
এক কাজ কর। পথে আসতে আসতে আমি এ
বুদ্ধি ঠাণ্ডালায়।

সৌম্যবিনয়ী বললে—কি বুদ্ধি গো? তাই ব
চট করে—হাইলে যে গেলাম।

বিশূল বললেন গরমার বাস্তটা বের কর বৌমা
তারপর চল আমার সঙ্গে ওদিকে—

সৌম্যবিনয়ী বললে—কোথায়?

বিশূল বললে, আমাদের ওই রাস্তাঘরের পা
কুলগাছের তলার খুব খাবিকটা গড় খুঁড়ে সেই গতে
হয়ে বাস্তটা ভাল করে খেয়ে দিইগে। চোর আস
ভাকাত আসুক—কেউ কোন সহান পাবে না। বা
যেহা কোথায় পাবে বাবা, সে সব তার বাত
বাফিতে আছে।

পুঁটি বললে—আমার এই গায়ের গুলোও তাহা
এই সঙ্গে দিই?

বলে সে তার গায়ের গরমালুলো খুলতে গেল।

বিশূল বললে—হ্যাঁ, বাও।

কিছু সৌদামিনী নিবেশ করলে। বললে—না, ওগুলো তোমার গায়েই থাক, তা না হলে সোকে দশের করতে পারে।

যে পদার্থ তার গায়ে গয়নাগুলো গায়েই রইল। পুরুদেহী হাবী গয়নাগুলো যে ব্যস্ত ছিল সেই ছোট হাত বাঁধটা। তারা ভিনভাবে অঙ্কুর উঠানের একপাশে লুপ্তন জেল অতি সতর্কশে কলসারের তলার গর্ত খুঁড়ে পুঁতে রাখল।

সৌদামিনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে ব্যাক বাবা, এতকণে বাঁচা পেলে।

পুঁতি বললে—না বা, সেই তোমার বুড়িই ভাল।

বিশ্বাস লল—কি বুড়ি বৌবা?

পুঁতি বললে—না বলছিলেন, উনি বাড়ি এসে গয়নাগুলো বিক্রি করে দিয়ে আমি আমি কিনব।

বিশ্বাস কোন ভাব দিল না।

সৌদামিনী বললে—সেই ভালো বৌবা, অমরেশ বর্তমান না আসে এখানে থাক—ও এলেই সেই ব্যবস্থা করা যাবে।

কিছু দৃঢ়তায় এমনি যে, অমরেশের আসা পদার্থ গয়নাগুলি আর দেখাবে রইল না।

একজন সকালে উঠে দেখা গেল, কলসারের সেই সোপানীর ভাগগাটা খুঁড়ে এখিক এখিক মাটিগুলো ছড়িয়ে ফেলা হয়েছে—আর যে বস্তুর জন্য এত চিন্তা, এত পরামর্শ সেই গহনার বাস্তব দেখাবে নেই।

বয়সগাটা পর্ব প্রথমে নজরে পড়ল সৌদামিনীর।

সেই প্রথমে গভীরা দেখে হাত হাত করে ছুটে এসে বুক চাপড়ে, বাবা চাপড়ে ডাকলে বৌবা, ও বৌবা। ঘেমে যাও ত বাবা।

বৌবা দেখল। তারপরে দেখলেন বিশ্বাস।

অবাক কাণ্ড!

সৌদামিনী সেই থানই নুতে গড়ে গভীরাড়ি দিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে করতে শুরু করলেন।

পুঁতিগামীও কান্ডে লাসল

গহনার শোক যে কিছুটা তার হয় নি তা নয় কিন্তু নিহেদের অবস্থার কথা ভেবেই সে বেশি দুঃখ পেল।

বিশ্বাস অবাক হয়ে চোখ দুটো বন্ধ করে কোমরে হাত দিতে দেখেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। যাবিক পরে বললেন—অঙ্কুর রাত, চোর-চণ্ডাল আঁচাভে-পাঁচাড়ে দুয়ে বেড়ায়—সোদামিনী আলো হাতে পুঁতে আদাই আমায়ে বেতুর্বা রইছিল। বেশ হলো, এখন কি করা যায় হলো দেখি?

কি যেন ভেবে তিনি আবার বললেন—যাবার যাব যেনো?

কাঁতে কাঁতে সৌদামিনী উঠে বলল।

বললে—না যো না, যাবার যাব যিহো না যো? পুঁতিবা পুঁতি একবারে জানাখান হয়ে বাবে ভায়েল। আমায়ে আর কোন গহনা থাকবে না।

চোখের জল বুড়ে পুঁতি বললে—হ্যাঁ বা, আবার বাবা যেন না শোনে।

বিশ্বাস বললেন—তাই কি হয় নাকি? এত এত চাকার জিনিস গেল আর আমায়ে চুপ করে থাকতে হবে?

সৌদামিনীর কাগ্না তখনো বারোনি।

বললে—ভাড়াটা আর উপার কি বল! সোকে জানা-জানি হলে কি আর কিছু ব্যক্তি থাকবে? এই, তুমিই বল না বৌবা।

বলে বৌবাকে তার কোলের কাছে টেনে আনল।

পুঁতি নিরুত্তর।

সৌদামিনী বললে—সোকে ত আর চুড়ি কথা বিশ্বাস করবে না—বলবে শশু-শশু-শশু অভাবী বান্দব, ওয়াই নিযেছে।

এই বলে সে কাঁতে কাঁতে তিক যেন উদামিনীর হত পুঁতিকে জ্বিকরে বয়ে তার হৃদয়ের গানে ক্যাল ক্যাল করে চেয়ে রইল।

পুঁতিও শোকে হুঁহাবান। সে একটি কথাও বলতে পারলে না।

সৌদামিনী বললে—কি হবে বা? অমরেশকে আমি কি করে হুঁ দেখাব? সকলে কি বলবে? না এ দুর্ভাগ্য আমি নইতে পারব না বা, তার চেয়ে আমার ছেড়ে যাও, আমি জলে ভুবে যিগে যাই।

এই বলে সত্যিই সৌদামিনী উঠে দাঁড়াল।

সে ফলে ডুবে রঙেতে থাকে ভেবে পুঁতি তাকে
সমসে জড়িয়ে ধরল।

বললে—না মা, থাক্ সে আমার গন্যনা, কপালে থাকলে
অমন কত আবার হবে। এ আর কাউকে জানিয়ে কাজ
নেই। তুমি অত কৈসো না মা, তুমি চুপ কর।

সৌম্যবিনী চুপ করেও চুপ করল না। মাকে মাকে
এক একবার গভীর হৃদয়ে কুঁপিয়ে কুঁপিয়ে উঠতে লাগল।

—কীদ্বি কি আর মাসে মা? অত অত গন্যনা যে
আমি কখনও চোখেও দেখিনি। তুমি যে কি করে চুপ
করে আছ মা, কে জানে!

পুঁতি বললে—বাক্লে মা। আমার বনে হচ্ছে, আমার
বাবা ওগুলো আমার ভাল বনে দেখনি, তাই সেল।

বিশ্বাস তখন অন্ধের বসে হেঁট হুঁশে তামাক সাঙ-
ছিলেন।

এবারে পুঁতির কথা শুনে হুঁশ তুলে একটু হেসে
বললেন—ঠিক বলছে বৌমা, ঠিক বলছে—আমরাও ঠিক
এই কথাই বনে হয়েছি।

কোলকাতার অরণ্যের ঢাকার হয়েছ—গাট ঢাকা
হাইনে।

চিঠি লিখেছে:

ডোমার গন্যনাটি বিকি করেছে। গ্রাম হুঁশ ঢাকা
পাওয়া গেছে। কিছু ঢাকা নিয়ে আমার এখানকার বড়
ঢালাচ্ছি। আগামী দশহায়ে আমার চারদিনের ছুটি
আছে। ভাবছি সেই ছুটির সময় বাড়ি গিয়ে অবিবাহিত
বাছানাটা বিড়ির ডোমার হাতে কিছু ঢাকা দিয়ে
আদম। সেই ঢাকা থেকে দশগার খরচের অর্ধো বাকে
কিছু হবে। ভদ্রবাসের আশীর্বাদে আশা করছি, এবার
আর আমারে কোনও কষ্ট হবে না।

কিছু চিঠিবাদা দেখার পরেই পুঁতির গন্যনা চুরির
দংঘর শেষে অরণ্যেতে ভাঙাভাঙি বাড়ি আসতে হলো।
অবশেষে কে মেয়ে সৌম্যবিনী এত কাহা কবিত্তে লাগল
যে, তাকে চুপ করানো যায় হয়ে উঠল।

অবশেষে বললে—কি আর করব মা, অর্ধটুকু
খাওয়া হবে তখন এমনিই হবে বাকি। চুপ কর।

বিশ্বাস বললেন—কী বাবা, ঠিক বলাইছে, অর্ধটুকু

আমাদের বড় বন্দ। পোন্ তবু কেনন করে কি হলো
বলি পোন্।

এই বলে ভাল করে এক কাগজান চেষ্টা বসে গন্যনাচুরির
গল্গটা তিন বসতে পারছিলেন। সৌম্যবিনী কাঁকা/কুঁকি
হিয়ে উঠে বসল।

বললে—খাবো, তুমি খাবো। ডোমার বড় একটা
ময় বাটাচ্ছেলে বাড়িতে বাড়িতে আমার দর্শন চোরে
নিবে সেল—তুমি আর সাহায্য কয়ো না—একটু
খৈবৎ ধর।

বিশ্বাসের হুঁশের কথা হুঁশেই আটকে রইল।

সৌম্যবিনী বলতে শুরু করলেন—মিনকালি খাওয়াপ—
চারিগিকে চুরি ডাকাতি করছিল, আমি ত বাবা
ভয়েই বরি।

সৌম্যবিনীর কথা শুনেও সেল হয় নি। বিশ্বাস বলে

উঠল—আর গাফান্যবশুণের সেই ডাকাতিটা—
যেয়ে শুন...

য়েলে হুঁশ ভাঙ করে সৌম্যবিনী বললে—মাও তবে
তুমিই বল।

বিশ্বাস আমার চুপ করল।

সৌম্যবিনী বললে—তুমিই বরি তখন হবে, তবে
আমার আর এত কষ্ট হবে কেন?

এমনি করে কতক দললে সৌম্যবিনী, কতক
বললেন বিশ্বাস।

অবশেষে একটা বীর্ষবিশ্বাস কেসে চুপ করে রইলেন।

। জেজো ।

সেই দিনই বিকেলে অবিবাহিত বাছানা দেখার জন্য
বিশ্বাস হুঁশে গ্রামের ভিতর গিয়ে অবশেষে কাহাঞ্চি
বাড়ির দিকে যাচ্ছিল।

কোলকাতার তার ঢাকার হয়েছে সে কথা এমই বগো
গ্রামের লোকের আর কারও জানতে বাকি নেই।

যায়ই দলে যেবা হয় সেই বলে এই যে অবশেষে কবে
এলে? শুনলাম কোলকাতার ডোমার বেশ মোটা
হাইনের ঢাকার হয়েছে। তা বেশ বেশ শুনো ভাণি
আদম হলো।

হুঁশ জটাজেয় বৈঠখানায় পশুপতি বোধহয় তার
মোকাদের ঢাকার ডাগমার এসে তামাক টানছিল।



কম্বাটা শোনা বাক্য হঠকো হাতে বিলে পশুপতি
কাশতে কাশতে বের হয়ে এলো ।

বললে—হাঁ অমরেশ আনাদের হোকরা ধ্বংস
হবে । তা ভালোই হলো তাহলে আবার সোকাবের
চাকটা এবার—

অমরেশ বললে—হ্যাঁ আমিই সেবো ।

পশুপতি বললে—বেশ বেশ বাপের কম্বাটা এবার
ঘুড়ির দাও বাবা ! সব্বের ছেলে—মানুষ এট
জানোই চায় ।

দাঁন ভট্টাচার্য ও বের হয়ে এলেন । হঠকোটা দেবার
জন্য পশুপতির দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন—তা কম
বলেন ও ছেলেরি হারছিল তাই রকে ! বিপুলের কম্বাটা
তবু খুঁজ এত দিন পরে ।

এই বলে তিনি হঠকোটা টানতে টানতে সাতার ওপর
অমরেশের কাছে এগিয়ে এলেন ।

চাকরিটি তোমার নশ্বর ফাই করে দিগেন কি বল ?

অমরেশ বললে—আজ্ঞে না. আমি নিজেই জোপাড়
করলাম ।

দাঁন ভট্টাচার্য একটুখানি অবাক হয়ে গিয়ে বললেন—
নিজেই জোপাড় করলে ? বাঃ ! তাহলে তোমার
বাহাদুরী আছে বাবা !

বলেই তিনি তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপি
চুপি বললে—একটা সন্ধান টেঁধান রেখো সেখি বাবা ।
আনাদের বড় এই মূখ্য মানুষের পক্ষে—এই বর চাকুর
সেবার কাক-টাক, তা হাড়া রপুই এর কাকও আমি বেশ
ভালই করতে পারি । বুঝলে ? যবে থাকবে ত ?

অমরেশ বাড় নেড়ে চলে যাচ্ছিল ভট্টাচার্য আবার তার
একখানি হাত চেপে ধরে বললেন—এই তোয় হাতে ধরে
কলিঙ্গ বাবা অমরেশ বড় কটে পড়েছি ।

বলতে বলতে চোখ দিয়ে তার জল এসে পড়ল ।

তাইই কথা ভাবতে ভাবতে অমরেশ পথ চাচ্ছিল ।

পথের পাশেই বিনোয় স্যাকরার বাড়ি ।

সে তার সাতার বাগের ছোট ঘরখানিতে বসেঠুক
ঠুক করে সোনারপোষ গরবার কাক করে । লোকটির
বলেন হয়েছে । বোঝ হয় বিপুলের চেয়েও বড় ।

গেছেন থেকে তারই ডাক শ্রবণ অমরেশ থকে দাঁড়াল ।

বিনোয় তার দিকেলের চপচাপি কপাসে তুলে বাঁশের
একটা নলের মধ্যে আঙুলে কুঁ দিতে দিতে বললে—এসো
বাবাছি তোমাকেই ডাকছিলাম ।

অমরেশ তার থরে ঢুকে বললে—কি বলছ ?

বিনোয় ডাকল তার দিকে ।

বললে—বোসো ওই চাটাই-এর ওপর ভাল করে চেপে ।
তারপর শোনো । কাল আমি শহরে গিয়েছিলাম বাবাছি,
সোনার বাজার আর মেহেনাদেশের ঘোঁরা—ও দুই-ই
স্নান বাবা উঠতেও বতস্পন আবার পড়তেও ততস্পন ।

কম্বাটার অর্থ অমরেশ ভাল করে বুঝতে না গেলে ও
বুঝে গিয়ে তারিফে বসল ।

বিনোয় বললে—তোমার বাবা আমার বলেছিলেন
বটে যে, আমার অমরেশকে বলো না বিনোয়, এ দবে তার
বড় লক্ষ্য । কিন্তু এতে আর লক্ষ্যের কি আছে বাবাছি ।
মেয়েছেলের গরবা কে বিক্রি না করে শ্রমি ? বিপদে
পড়লে কত বড় বড় বিক্রায়ে ওই কাক করতে হয় । তবে
তোমার বোঁঠাকরুণ বড়লোকের ঘরে—ও গল্পনা কি
আর বলতে আছে বাবা—তাই খাটি বনুই শহরে গিয়ে
এটির ব্যবস্থা করে দিয়ে আদি ।

অমরেশ কি যেন ভাবল ।

বললে—আমি কিছু বুঝতে পারছি না বিনোয় ।
ভাল করে শুলে বল ।

বিনোয় বুঢ়াকি বুঢ়াকি হাসতে লাগল ।

বললে—বুঝতে চিকিই শেয়ে বাবাছি, তবে কি না
লক্ষ্য—তা লক্ষ্য একটুখানি সরায়ই হয় । কিন্তু পাশেই
ত আমি বলে দিলাম বাবাছি, লক্ষ্য আমার করে না ।

অমরেশ তবু চুপ করে বসল ।

বিনোয় বললে—তবে শোনো আর একবার বুঝেই
বলি । আনাদের বাবঠাকুর—তোমার বাবা সো—সেখিন
চুপি চুপি আমার কাছে এসে দাঁড়াল । বললাম—পেরায়
বাঘঠাকুর, আসতে আজ্ঞা হোক ।

উনি বললেন—আমার একটি কাক তোমার করে দিতে
হবে বিনোয় । কাউকে বলতে পারো না কিছু । এমন
কি আমার ছেলে অমরেশকে পর্যন্ত না । অমরেশের বড়
লক্ষ্য তা ত জুঁমি জানো । তাই যে-ই আমার কাছে এখানে
পাঠালে ।

এই বশে একটি শোনার গমনা তিনি আমার হাতে দিলেন। দ্বিবে বশলেন—ওজন করে ধ্যানো আগে ক' ভরি হয়। বজ্জো টাকার ধরকার, এটি তোমার বিনতে হবে।

গমনা দেখে বুকশার, এ আর কারও নয়, তেমন গমনা তোমার বৌ হাড়া এ গণি আর কার আছে বল। ওজন নাড়ে পাঁচ ভরি হলো।

বলশার—এত টাকা ত আমার কাছে হবে না ধ্যানঠাকুর, এটি আপনাকে বিন্যাস করে আমার হাতে ছেড়ে দিতে হবে। পর থেকে বাচাই করে ধানে যদি শোনার ত পরেই বিকি করে আসব।

ধ্যানঠাকুর হেসে বশলেন,—শোনো বিনোয়ের কথা। তোমার আমার করে অবিন্যাস করছি বিনোয়।

তাই সে জীবনটা আরি কাল পরে বাচাই করে এসেছি বাবাঝি। নিজে এক পরমা প্যন্ত না রেখে এই আরি বিন্যাসের চাতুর্ভূত হুঁসে বলছি বাবাঝি, অনেক মোকাম বোরাকেন্দো করলাম, কিন্তু, হুড়ি টাকার বেশি ধর আর কোথাও শোনা না।

তাই তোমার হিজ্ঞানা করছি বাবাঝি—যদি বল ত এই পরেই বিকি করে আসি। আর না যদি বল ত পরমাটি নিয়ে যাও। ধানী জিনিদ, নিজে কাছে রাখতে বড় ভর হয় বাবা। বল, এই ত কথা, এখন কি বলছ, তাই বল।

অবশেষে আমার ভেতরটা বেন কেমন করছিল।

বলল—কই দেখি—দেখি গমনাটা।

অত ধানী গমনা বাবুঝি, একটু সতর্পণে রেখেছি।

বশে বিনোয় তার কোমর থেকে একটা মোটা ঢাবি বের করে উঠে ভেতরে ঢলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে কানজে মোটা গমনাটি এনে অবশেষে হাতে দিবে বললে—এই ধ্যানো।

অবশেষে দেখলে—পুঁটির মাথার টায়রা। দেখামাত্রই তার নিম্নের মাথাটাও বেন খুঁসে গেল।

তারপর বিনোয়ের হাতে কানজ-পনেত গমনাটি কিরিয়ে দিবে বললে—সামো।

একটু ধামল অবশেষ। কি বেন চিন্তা করল।

অবশেষে বললে—একটা কথা তোমার বলছি, শোনো বিনোয়।

—কি কথা বাবুঝি ?

—এ গমনা সম্পদে কোন কথা তুমি দে আমার বলছ। যা এ গমনা আমার দেখিয়েছ—বাবাকে কি অন্য কাউকে এ কথা বলতে পারে না বিনোয়।

বিনোয় বললে—তা বেশ। বাবল এখন করছ বাবুঝি, তখন আর কাউকে বলব না।

অবশেষ বললে—বাবা যা বলেন, তুমি তাই করো। বুঝলে ?

বলে অবশেষ আর দেখানে অপেক্ষা না করে পথে এসে দাঁড়াল।

অধিমারের কাছারীতে যাওয়া আর হয়ে উঠল না। সে পথে এসেছিল আমার সেই পথ ধরেই বাড়ি ফিরে চলল। বাড়ি !

অবশেষের ঠোঁটে জান একটুখানি হাশির রেখ কুটে উঠল।

পশ্চিম আকাশে তখন সূর্য ডুবছে।

বিচিত্রবর্ষে রঞ্জিত সেই নভমণ্ডলের অলীক বিস্তারিত দিকে মূহু হৃদিত্তে একবার তাকিয়ে অবশেষ ভাবলে নিম্নের না দার নেই, তার আর এ জগতে বাড়ি কোথায়

পুঁটিকে অবশেষে হিজ্ঞানা করলে আচ্ছা, তোমার তে বাস্তব মধ্যে কি কি গমনা ছিল।

পুঁটি বললে, কেন ?

—বলোই না।

—যা আমার পারে আর তুমি যেটি নিয়ে গেছিতে তা হাড়া দবই ছিল। মাথার টায়রা, শাতনগী, ব গিনির হালাটা, ব্রেসলেট, রক্তচুড়, তামা, তারি কতো কি—

অবশেষ শিউরে উঠল।

বললে—বাবু, আর শুনতে চাই না।

টায়রাটিও ছিল ?

...হ্যাঁ ছিল। তাই যদি তখন বুঝি করে গারে প বাকভাম, ত চোরে এমন করে—

বলতে গিয়ে পুঁটির চোখদুটো জলে ভরে এসো।

অবশেষ বললে—হি, পত পুঁঃঃ করে লাভ কি ? বাবার তা ত গেছেই, অবশেষ —

বলতে গিয়ে তার গলাতে যেন কথা আটকে গেল।
 পুঁটি বললে—কি ভাবছ ?
 অরুণ বললে—এল, আমরা এখান থেকে চলে যাই।
 পুঁটি ভিত্তাস করলে—কোথায় যাবে ? বাপের বাড়ি
 আমি আর দাব না কিছুতেই। পরমা গিরেছে, যদি
 মেয়েও দিবে দাব চোরে, তবু না—
 অরুণ ঈষৎ হাসল।
 বড় ব্রাহ্ম, দৃষ্টিশীল হাসি।
 বললে—না গো না, তোমার বাবার কাছে নয়। বাবা-
 না আমাদের নেই। কেই বা আছে আমাদের !
 —তবে কোথায় ?
 —এল আমরা কোলকাতায় চলে যাই।
 —কলকাতায়।
 —কেন যাবে না ?
 কথাটা পুঁটি যেন বিস্ময় করতেই পারছিল না
 প্রথমটা।
 অরুণের মুখের পানে একদৃষ্টে যে চেয়ে গিয়েছে
 বেশ কিছুক্ষণ হয়ে।
 তারপর হঠাৎ ধূমকাত বাড়িয়ে তার পলাটা জড়িয়ে
 ধরে বললে—বাসা করে থাকবে ত ? তুমি আর আমি—
 এই সামান্য কথাটা বলতে গিয়ে এমন অতর্কিতে
 চোখ দুটো তার কলে ভরে এলো যে, আঁচল দিয়ে
 চোখ না মুছে কথাটা সে আর শেব করতেই পারলে না।
 চোখ দুটো দোটা একবার পরিষ্কার করে বললে—
 গাতি কলহ ?
 —হ্যাঁ হ্যাঁ গাতি—গাতি বলছি। অরুণ বললে
 —এল আমরা দুজনে একটু কষ্ট করছি না হয় পলা
 টাকা পাই—কোন রকমে, না কি বল ?
 পুঁটি বললে—এক কি সো ? না না কষ্ট কিছুই
 হবে না। তারম্মে আমি গণিতে পারবো, না ?
 অরুণ পূর্বে হস্তু হাসল।
 পুঁটি বললে—গাতি বলছি গো, সেখো ছুঁনি, এমন
 হারা মেয়ে সেখো। লোকজন কাউকে রাখতে হবে না।
 আমি নিজেই সব করব ছুঁনি মেয়ে নিও।
 অরুণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—সেই ভালো।
 পুঁটি হেঁটমুখে কি যেন ভাবতে ভাবতে হেসে

বললে—কষ্ট ! কি যে বল ! তোমার সঙ্গে আমি
 পাছতলার গিরে থাকতে পারি—ভিক্ষে করে খেতে পারি।
 তৌছ
 শেব পথও তাই হলো।
 রাতে খেতে বসে অরুণ বললে—তোমার মৌমাকে
 কাল আমি কোলকাতার নিরে দাব না !
 সর্বনাশ !
 কথাটা সৌদামিনীর হৃকের ভেতর গিরে বন্ধ
 করে রাখল।
 বললে—সে কিরে ? এরই মধ্যে ? চাকুরি
 পেতে না পেতেই ?
 অরুণ বললে—হ্যাঁ না, হোটেলের খেতে স্তার
 কষ্ট হচ্ছে।
 সৌদামিনীর গলার আঙাঙটা যেন হয়ে এলো।
 তবু সে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিরে জোর
 করে বললে—বাসা করে চালাতে পারবি ত বাবা ?
 কোলকাতা শহর, খরচ অনেক—
 —তা হোক না, কষ্ট করবে চালাব।
 ওর ওপরে আর কথা চলে না। অরুণের ও কথা
 বলতে কষ্ট হচ্ছিল। সৌদামিনীও নিশেব করলে না।
 বললে—তা বেশ বাবা, যাতে বা ভাল হয় তাই কর।
 তোমার ওপরেই আমার একমাত্র ভরসা।
 কথাটা বিশূলও শুনলেন।
 শোনা মাত্র কি এক অজ্ঞাত কারণে তাঁর হৃৎস্রাব্য
 কেনন যেন অন্যরকম হয়ে গেল।
 বললেন—বেখ, নিজে কথা।
 সৌদামিনী বললেন—নিজে কথা কি গো ! কাল
 যাবে বন্ধন তখন সেখো :
 বিশূল ধতি দিবে নিচেকার ট্রেটিটাকে ঢেলে ধরে
 হেঁটমুখে কি যেন চিন্তা করতে লাগলেন।
 দ্বাদিক পরে বললেন—কোথায় যাবে শ্বশুরবাড়ি ?
 সৌদামিনী ব্যস্ত নেড়ে বললে—না।
 —তবে ?
 —শ্বশুরবাড়ি ওরা যাবে না কিছুতেই। মৌমা
 তার বাপের কাছে আর হৃৎ সেখো না বলছে।
 —কোলকাতায় ?

—তাইত পুন্যাম ।

—সে যে অনেক বয়স ?

—অমরেশ বললে—চাপিয়ে নেবে ।

—হঁ, বসে বিশূল কি যেন চিন্তা করলেন ।

তারপর একটু রান হেসে বললেন—গরনাকাতার
ব্যাপারে ওদের সম্বন্ধ হচ্ছে মনে হয় ।

—হতে পারে ।

—আচ্ছা, ইচ্ছে এখন হয়েছে, তখন থাক্ কলকাতায় ।

মিনকতক থেকে আনুকসে ।

সৌদামিনী এ কথা আর কোনও জবাব দিলেন না ।

বিশূলের সঙ্গেও সৌমিন অমরেশের কথা হলো ।

বিশূল বললেন—কোলকাতার বৌমাকে নিয়ে
বাচ্ছিন পুন্যাম !

অমরেশ বললে—হঁ ।

—তা এত ভাড়া-ডো কি ছিল ?

অমরেশ বললে—না, মানে আমার হোটেল থেকে
পরীর টিকছে না, তাই বললাম—

বিশূল বললেন—তা, বৌমা যদি যেতে চায়—

অমরেশ বললে—হ্যাঁ, এর মত আছে ।

বিশূল কি যেন ভাবলেন ।

তারপর বললেন—তা, কিছুদিন ঘুরে আদ্য ভাল ।
পরীর ভাল থাকবে অতঃ । তা না হলে বজ্র মন খারাপ
হয়ে সেজে যেতে পারি । এতে পরীর খারাপ হয় ।

অমরেশ গম্ভীর ভাবে বললে—হ্যাঁ, কোলকাতার
মানা জিনিস সেজে গরমার শোকটা অতঃ জুড়ে থাকতে
পারবে !

বিশূল কোনও কথা বলতে পারলেন না ।

একটু পরে বিশূল বললেন—বাসা ঠিক করেছিল ?

—না ।

—ভাঙ্কে ।

—সে গিয়ে ঠিক করে নেওয়া যাবে ।

বিশূল ঐকটু চিন্তার সঙ্গে বললেন—কোলকাতার
আবার সব বাসা ভাঙা না । একটু হেঁপে পুনে নিতে হবে ।

অমরেশ বললে—আমার বড় বাড়ির বসে নিলেই
ক' নাগরিকের হাটো জমি বাস পেয়ে যাবে ।

—ভাল, ঠিকানা দিলে চিঠি লিখব ।

—হঁ ।

—আমার বৌমার শ্বাশুরের দিকে যাবার রাগিন ।

এবারে অমরেশ সব কথাই কি, ও, হঁ হাড়া আর
কিছু বললে না ।

একতরফা আর কি কথা বলা যায় ? অসত্য বিশূল
একটু চিন্তা করে চুপ করলেন ।

একটু পরে অমরেশ বললে—হাই, টিকিটটা আন
থাকতেই কেটে আনি—তা না হলে শেষ সবই
ভিত্ত হয়—

বিশূল বললে—হা ।

অমরেশ বেড়িয়ে গেল ।

পরদিনই সন্ধ্যার ট্রেনে তাদের কোলকাতা
বাওয়ার কথা ।

স্টেশনে বাওয়ার জন্যে বিশূল পরের গাড়ি চি
করেছিলেন ।

পুষ্টির বাস-প্যাটরা সব গাড়িতে তোলা হলো
সৌদামিনী হাউ হাউ করে কানিতে লাগল ।

সৌদামিনীকে লিভাই পুষ্টি ভালবাসত ।

তাকে ওভাবে কানিতে লেখে পুষ্টির চোখেও
এসে পড়ল ।

সৌদামিনী বললে—আমাদের যেন জু
যেকো না না ।

পুষ্টি মাড় নেড়ে বললে—না ।

—হাতে হাতে চিঠি দিও ।

—আচ্ছা না ।

পুষ্টি তারপর গাড়ির ওপর উঠে বসল ।

বলদ গাড়িতে জুড়ে গাড়ি ছেড়ে দিল । গা
এগির চলল । পেছনে পেছনে চলল সৌদামিনী ।

চলতে চলতেই সে পুষ্টির সঙ্গে কথা বলতে লাগল

গাড়ীটাকে গ্রাম পার করতে না নিয়ে সৌদামিনী
কিছুতেই বাড়ি ফিরতে পারল না ।

কি জানি, গ্রামে কতকালের দৃষ্ট-লোক হয়ে

কে যে কখন কই, কই তাহা বিস্ময়ে কি কথা বলে বলে, তার কোন ঠিক নেই ।

গাড়ির পেছনে পেছনে দাঁড়িল সৌদামিনী আর তার মেয়ে তরঙ্গা ।

গ্রামের একটোরে বিশূলের বাড়ি । গ্রাম শেষ হতে কতটুকুই বা আর পথ !

চাষাভের বাড়িগুলো পার হয়ে, বুড়ো শিবের মন্দিরের পাশ দিয়ে, গাড়িটা তখন দবে নতুন পুকুরের সেই প্রকাণ্ড বটগাছটার তলায় গিয়ে পৌঁছেছে ।

ওই জামপটী পার হলেই গরুর গাড়ি একেবারে কান্ধা মাঠে গিয়ে পড়বে ।

বটগাছের গুঁড়িগুলো গাড়ির হইতে লেগে দর দর করে একটা শব্দ উঠছিল ।

গাড়ির ভেতর থেকে পুঁটিই আসে কথা বলে উঠল—
জুনি গাড়ি বাও না, আর কতদূর আসবে ?

—হ্যাঁ না, যাই ।

বলে কাপড়ের ঝুঁটে তার শব্দল চোখ দুটি একবার বুড়ে নিয়ে সৌদামিনী দেখানোই থমকে দাঁড়াল ।

হুটু হুটু করে শব্দ করতে করতে গাড়িটা গিয়ে শব্দল নাটে । সৌদামিনী সেখান থেকেই চোঁচিয়ে বললে—
গিয়েই চিঠিপত্র দিও না !

পুঁটি নীরবে শব্দ একবার নাখাটা তার কাণ কলল ।

গাড়িটা বতরুল দেখা গেল, দু'জনেই দু'জনের মূখের দিকে তাকিয়ে রইল ।

তারপর দূরে আমগাছটা পার হয়ে গিয়ে গাড়ি এখন অশান খাটার গিরে নামল, সৌদামিনী তখন তরঙ্গার হাত ধরে শিখল কিরে বললে—চল বাড়ি বাই বা ।

দু'রে গাড়ি খিলিয়ে যাচ্ছে ।

সৌদামিনী বাড়ি নাড়লে ।

অন্যেণ দেখতে পেলো না । পুঁটি সেজন্য দিকে ছিল, সেই দেখতে পেল ।

পুঁটি বাড়ি নাড়ল ।

ভালো ছোট মেয়ে—অত দূর ভেতরের ব্যাপার বোঝে না ?

সে হাত তুলল । হাত তুলে হাত নাড়তে লাগল

দীর্ঘে দীর্ঘে—খতরুল না গাড়ি চোখের সামনে থেকে খিলিয়ে গেল ।

তারপর সে হঠাৎ কেঁচে কেলসে ।

সৌদামিনী বললে—কবিছিল কেন রে ? ছি, কবিতো নেই—বাড়ি চল ।

কিন্তু তার নিজের মনটার মধ্যে যেন কেমন একটু মোড়ক দিয়ে উঠল ।

। পল্লেরো ।

সৌদামিনী বাড়ি কিংবেই দেখতে পেল, বিশূল দরজার কাছে বসে বসে তামাক খাচ্ছেন ।

সৌদামিনীকে দেখে বললে—কোথায় গেছিলে ?

সৌদামিনী বললে—আম্মা কুঁড়ে বান্দু পুঁটি বান্দু ।

গাড়ির দলো গেলো না, ওয়া কি মনে করবে বল ত ?

বিশূল তাঁর মূখ থেকে একমুখ বোঁরা ছেড়ে মেলে বললে—নামে বা করবার তা ত করেছেই । তবে—

এই বলে কথা শেষ না করেই হুঁকো হাতে নিয়ে দীর্ঘে দীর্ঘে তিনি উঠে দাঁড়ালেন ।

কথাটার জবাব সৌদামিনীকে দিতে চলো না । জবাব দিলে তরঙ্গা ।

বললে—আমমা নতুন পুকুরের হটতলা পর্যন্ত গাড়িও দলো গেছিলার বাবা । আর যাই নি ।

বিশূল বললে—কিছু বললে ওয়া ?

—না বাবা ।

—হুই কিছু বললি ?

ভালো বাড়ি নেড়ে বললে—হ্যাঁ, আমি হাত নাড়লুম ।

বৌদির মন খুব ব্যাপাল হয়েছিল বাবা ।

বিশূল বললেন—জুনি একখানা চিঠি লিখো বৌমার বাবে ।

সৌদামিনী বললে—আম্মা ।

তারপর একটু ভেবে বললেন—কিন্তু, ঠিকানা ত জানি না । কোথায় বাবা ঠিক করবে—

বিশূল বললেন—সে ওয়া চিঠি যেনে যোগ দর ।

বিশূল এগিয়ে সরে যথো চুকলেন কিনা ভাবলেন, এমন দর হঠাৎ দেখে ঢেকে কে ডাকলে—বান্দু !

কে ?

দেখেন ছাকিয়ারে চাপরাণি শুকত সিং ।

—তুই কেন ?

বিশূল বিশিত হলেন ।

—চলিবে বাবুজি, চলিবে ।

বিশূল বললেন—তার বাবে ? অমরেন কাল গিয়ে
দিয়ে আসেনি ? বাজনা দেবার জন্যই ত গেল—বাঁশ
হ্যাঁ না, ওয়া পুনঃ—

থরেক ভেতর থেকে সৌদামিনী গাড়া দিল—কি বলছ ?

—এদিকে এস ।

সৌদামিনী বাইরে এল ।

বললে—আবার কিছু বলছ বাবুজি ?

বিশূল বললে—হতভাগা বাজনাটা তাহলে কাল
সেদিন ! ভক্ত সিং আবার আমাকে সাক্ষাতে এসেছে যে ।

সৌদামিনী বললে—তা আমি কি জানি ! বাজনা
না দিয়েছে ত দিয়ে যাওগে যাও !

ভক্ত সিং হেসে বললে—বাণটি ফেরন আছে,
সেড়কাটিও তেরনি আছে । জায়া কাঁকিবার ! চলিবে,
বাবুজি চলিবে ।

সৌদামিনী এইবার থরেক ভেতর থেকে বাইরে এসে
হাঁকাল । ভক্ত সিং-এর কথাগুলো শোষ হয় সে পুনতে
সেয়েছিল ।

বললে—বাও না গো—বৈদ্য ম্যাকবার কাছে যাও
একবার আসে । বাজনাটা বিড়িরে লাগে—তারপর
আমাদের কপালে যা আছে, তাই হবে । ওর এত কথা
শোনেবার কি দরকার ?

—ঠিক বলছ ।

বলেই বিশূল তার বাজের হুকোটা নামিয়ে রেখে
ভক্ত সিং-এর কাছে এসে বললেন—চল ।

জমিদারের বাজনা চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে ।

বিশূলের আর কল বলতে কোথাও কিছু নেই । দিকে
দিকে প্রত্যেক লোকের প্রাণ যেনা সে দিয়ে এসেছে ।

যে বিশূল কনের পক্ষে আকর্ষণ চুরেছিলেন, যে
সৌদামিনী উনোনের ওপর জাতের গাঁড়ি গাণিয়ে এর ওর
বাড়ি চাল বার করবার জন্যে হুকোচুটি করে বেড়াতে,
আজ তাহের অধিকাংশে তাদের সোক ত অবাক ।

প্রতি বৎসর বর্ষার দেখা যেতো, বিশূলের গরের

চালে বড় নেই, চারদিকে টপ টপ করে জল পড়ছে, বাড়ির
প্রাচীরে ছায়ে নানাফানে ধূসর পড়তে লুপ্ত চরেছে ।

কিন্তু সে বৎসর বর্ষা নামবার ঠিক আগেরই একছোড়া
গরুর গাড়ি করে বিশূল গরুর থেকে কয়েক বাড়ি
চিন কিনে জানলেন । গরুর পাখির পাশে পাশে বিশূল
পায়ে হেঁটে বাড়ি চুকলেন । পাড়িতে বহু চিনের
বাড়ি দিবে উনোনের ভট্টাচার বিভাগ্য করলেন—
চিনের গরু কি রকম বাচ্ছে বিশূল ? আমিও ভাবছি—

—কিনবে নাকি ভট্টাচার ?

—ইচ্ছে ত আছে—কিন্তু উপায় কি আর হবে ? তা
দাম কি একম চলেছে আজকাল বলত ?

বিশূল বললে—গরের কথা আর বলো না ভট্টাচার ।
আনলাম গরু-গরুর করে কোন রকমে । নগদ টাকা আর
কোথার পাব বল ?

অগরেন পাশ্চাত্য গাড়িতে ছিলেন একটু দূরে ।
জানের মধ্যে স্পষ্টবাদী বলে ব্যাতি আছে । লোকে
তাকে যেমন ভয় করে, তেমন মান্যও করে । তিনি
বললেন—আর বলো না ভট্টাচার, লম্বের ছেসে ত মান্য
ওই জন্মের চার ! ল্যাংগো, স্কেন টাকার হুকি, তার বাসে
দুঃখ ঘুটিয়ে দিলে ।

ভট্টাচার পশ্চিমাস কেসে বললে—না, আমাদের
ভাস্যে আর এত টাকা দিয়ে চিন কেনা এখন
সম্ভব নয় ।

বিশূল তার থরে চিন চড়ালেন । চারদিকের বাড়ি
প্রাচীরের ওপর ভাল করে বড়ের আচ্ছাদন দিয়ে সেগুলো
পাকা করে ফেললেন ।

কোন দিক দিয়েই বর্ষার জল পড়বার ভয় ছিল না ।

এদিক করে একে একে দাবিক দামলে নিয়ে বিশূল
একটুখানি নিশ্চিত হয়ে বললেন । এমন সময় সৌদামিনী
জেন হয়ে বলল—অমন করে হাত পা হাড়িয়ে বসতে
ত চলবে না, এইবার গরুর জন্যে ভাল একটি ছেসে
বোঁঝ কর ।

বিশূল মেসে উঠলেন ।

বললেন—বাবা, এইই ন্যোই ছেসের বোঁঝ কে
পো ? ওর বসে কত ?

সৌদামিনী বললে—তোমার হাঁস সেখানে আছে

দর্শনা জ্ঞানো করে। কুলীনের মেয়ে, তেরো পেরুলো।
আর কি চাও ?

—তেরো পেরুলো, শে কি তো ?

হিসেব ত আর গানো না ।

বিশ্ব বললে—এই যে বয়ো এইটুকু পড়কে মেয়ে
তেরো পেরিয়ে গেল ?

সৌম্যিনী বললে কি আর বলব বল ! ভোমার
কথা শুনে হালিও পাথ আবার বুকুও হয় ।

—কেন ?

—তলপীর হল গড়াতে গড়াতে কতকাল আর থাকবে
বল ?

—না বাবে ভাবছি—

—কোনও ভাবনা ভাবতে হবে না । এই সময় হাতে
কিছু থাকতে থাকতে বিয়েটি ওর গেরে খ্যালো—নইলে
পেনে এমন বিশেষ পড়বে—এই আমি বলে রাখলাম দেখে ।

বিশ্ব বললেন—শুধিন যে একটু জিরিয়ে নেব
নিশ্চিত হবে তারও জো নেই ।

সৌম্যিনী এমার হাসল ।

বললে—হ্যাঁ, জিরিয়ে বই কি ! চিরঞ্জীবনে যেতে,
রোজগার করে চারবান হবে গেলে, জিরোবার অবসর
আর পেনে কই ?

বিশ্বও হাসলেন কথাটা শুনে ।

বললেন—ঠাট্টা করছ ? কর । কিছুর এই যে এখন
শুনে রয়েছে, এইটুকুও ত আমার বুদ্ধি না হলে হতোনা,
তা দেন মনে থাকে ।

সৌম্যিনী বললে—না বাপু, আমার কি আমি ভাল
লাগছিল নাও সব ব্যাপার ।

—কেন ?

—আমার হবে হাঙ্গল এ সব টাকার কখনও দূর হয়
না । ভূমিত আর তা মানতে লাইলে না । তার চেয়ে আমি
কিনলে—

—তা অণ্য থাকত না ।

—কিছু সেঁধ, এ টাকাটা সব ত ভোমারই হইল ।
কত দূরে থাকবে ।

সৌম্যিনী বললে—নিজের রোজগার করে দূরে
গাথতে পারতে যদি ত জানতান ভূমি বাহাদুর ।

কথাটা বলতে গিয়ে চট্টাৎ আর একটা কথা তার
মনে পড়ে গেল ।

বললে—হ্যাঁগা, বয়সরই ত বলতে—বিক্র টাকা হাতে
পেনে বেজগার কাকে বলে একবার দেখিয়ে দিয়ার ।
টাকা ত এই সময় রয়েছে হাতে, রোজগার কিছু কর দেখি ।

বিশ্ব বললেন—তা মশ্ব না ।

—কত টাকা লাগে ?

—বেশ ত দাও না একশ টাকা ।

—কি করবে ।

—ছোট একটা কাপড়ের দোকান করা যাবে ঐ
টাকার ।

—কাপড়ের দোকান ? তাতে লাভ হবে ? পারবে
লাভ করতে ?

বিশ্ব বললেন—চট্ট করে বড়লোক হতে হলে ও
ছাড়া আর উপায় নেই । সব চেয়ে বেশি টাকা কাপড়ের
বল দেখি ।

—কি করে জানব বাপু, অত সব জানিনে ।

—বাড়োরারীয়ে ।

—ওরা এত টাকা কেনব করে পার ?

—সেই ত মজা : ওরা টাকা পায় এমনি কাপড়ের
বাসা করে ।

—শুধু কাপড় বেচে ?

—হ্যাঁ ।

—তবে ত ভালই ।

বিশ্ব বললেন—ভূমি দাও আমাকে একশ টাকা,
আমি একবার দেখিয়ে দিই । কারবার ছাড়া কখনো
বড়লোক হওয়া যায় না, বুঝলে ?

—

হরিন কেটে গেল ।

কাপড়ের কারবার করে বাড়োরারীয়ে বত বড়লোক
হবার আশায় সৌম্যিনী একশ টাকা প্যারীর হাতে দিয়ে
বললে—হ্যাঁ গা, হবে ত ঠিক ?

—কেন হবে না ? এতদিন হরিন শূন্য হাত পা
বাঁধা ছিলো বলে । শূন্য হাতে কিছু হয় না, বুঝলে ?

সৌম্যিনী বললে—আমার বুকের ভেতরটা দূর হর
করে । দিন রাতির জর হয় আমার । শূন্য ভাবি,

যদি এই দরদ হঠাৎ একদিন ওয়া এসে পড়ে! আমারের
এই দর দেখে বুঝে কি ভাববে বল ত?

বিশ্বদূর বললেন - কিছুই ভাববে না।

- কেন?

- ভাববে না যাতে, সেই ব্যবস্থাই ত করছি!

- তার মানে?

- আরে এটা বুঝলে না? এবারে ত মোকান
হলো, বলব নিজে মোকান করে করছি। কি আর
করি, অনেক কষ্টে কাপড়ের মোকানটা করে ফেললাম।
তারপর এই মোকান থেকেই এইস হলো। কি হলো?

- স্ট্রা, সেটা বন্ধ নয়।

- তা হলে সেখো আমার বৃত্তির সৌন্দর্য কত।

সৌন্দর্যিনী হেসে বললে - শুন; এই বৃত্তিটাই ত
আছে, এ ছাড়া আর কিছুই নেই -

- আর কিছু কি গো?

সৌন্দর্যিনী বললে - নানে জুনি খাটতে সীদ
ভর পাও।

বিশ্বদূর বললেন, - তা ঠিক বলেছ সৌন্দর্যিনী।
আমি বেশি খাটতে কোনওদিনই পারিনি। তবে এবার
ব্যবস্থা শুন, কলসে আর কলসে খাটতে হবে। না
খাটলে বসন্তা চলে না।

সৌন্দর্যিনী আর কোনও উত্তর দিলে না।

বোলো

সেই দিনই শরৎ থেকে একশ টাকার কাপড় কিনে এসে
বিশ্বদূর তার বাইরের ঘরে কাপড়ের একটি মোকান বুনে
বসলেন।

গ্রামের কত লোকের কত কথা বলতে লাগল।

কেউ বললে—আর ভাবনা নেই, লোকটা এবারে
বড়লোক হবেই। আমার কেউ বলল—কেসেই? সেনার
ঘরে মাথা বিকিয়ে আছে, একে আর বড়লোক হতে
হবে না।

উত্তরে আগের লোকটি বলে—সেনা যা ছিল তা গ্রাম
পৌছ করে বিয়েয়ে—এমন বিশেষ কিছু সেনা আর নেই।

—ভূমিক যখন। যা সেনা ছিল গ্রাম তার অনেক
দিয়েছে—গাফিটা না ফেরা বড়লব।

—তা হোক, হেলের মোকানও ত কম নয়! পুনোই
নয় বড় লোকের।

—অমন কত খাতি খোড়া গেল তল!

বেশে-বহলেও এ কথা ওঠে।

পথে-ঘাটে যেখানে সৌন্দর্যিনীর শরৎ হেলের-বৌ-এর
দুঃখান করতে আরম্ভ করলে।

আবার কেউ কেউ বললে—খামো না খামো, দুঃখ
নবুত কর। এক গানের ছাপ কখনও আর এক গানে
পাশে না!

—তা ঠিক না। তবে এমন ত বড় সৌন্দর্য না।

—এ দর দুঃখিনের। কাখোই না—

সে যাই হোক, যে যাই বলুক, বিশ্বদূর আর সৌন্দর্যিনী
কারও কোনও কথা থাকে না।

সৌন্দর্যিনী নিঃশব্দনে ঘর-বাগানের তাক করে।
লোকানের বিঘরে মাথা সে ঘামায না।

বিশ্বদূর লম্বা একটা কাঠের ওপর আলকাতরা দিয়ে
নিজে হাতে বড় বড় অক্ষরে লিখেছিলেন 'সৌন্দর্যিনী'
শব্দালাব।

সেটা ঠিককথানার সংস্কার ওপর টাঙিয়ে দিয়ে তু
করে বসে ঘরে তিনি তামাক টানেন আর ভাবেন বড়লোক
ঘরন হবেন তখন কি কি কাছ তাকে করতে হবে।

কাপড় কেনবার খবর শুঁচারজন আসে। বড় টা
ছোড়া যে বিক্রি হয় না, তাও নয়—তবে যে এক
আশাতীত লাভ হবে ভেবেছিলেন, তা হয় না।

না হোক—লোকগান করে কোনও কাপড় ত্রি
বিক্রি করেননি, দুঃখাং লাভ হবেই।

একটা কথা তিনি বনে বনে স্থির করে রেখেছিলেন
একদিনে বড়লোক কেউ হয় না, ধীরে ধীরেই হয়।

এবনি কয়েক দিন কাটে।

বৃত্তিঘন ঘর, সৌন্দর্যিনী দেখে তার দরজের দর
কবে কিছু কিছু কবে আসছে, কিছু উপাভবন বু
পাচ্ছে না।

সৌন্দর্যিনী একদিন বললে—বিশ্বদূর, মোকান বে
ত একটা টাকারও সংসারে বিদ্ধ না, এদিকে টাকা খ
হচ্ছে, আর কবে যাবে। আমি ত কিছুই বুঝ
পাচ্ছি না বাপু!

বিশূল বললেন—টাকাটা যদি লগ্ন্যরে ঢালি তাহলে
বাড়বে কি করে—আর বড়লোকই বা হবে কি করে ?

সৌদামিনী বললে—কিছু আমি ত বাস্ কিছুই
বেশতে পাচ্ছি না ।

বিশূল কোনও উত্তর দিলেন না আর ।

একটু পরে সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করলেন—ইয়া গো,
এরা চিঠিপত্র ত কিছুই লিখলে না—বুঝতে বোধহয়
সবই পেয়েছে ।

বিশূল উত্তর দিলেন না ।

সৌদামিনী আবার বললেন—তুমি কি বল ?

—কি আর বলব ? বুদ্ধিতে হরত পেয়েছে— পারসেই
বা আর কি করা যাবে বল ?

—তা ঠিক, তবে বৌমা বলেছিল,

—কি বলেছিল বৌমা ?

সৌদামিনী বললে—বৌমা বলেছিল, কোল্‌কাতার
শেঠীয়েই চিঠি দেবে, তা ত দিল না ।

—স্নান ছাড়া কানত না কিছ্ ; অবশেষেই
হয়তো লগ্ন্যরের কথা তাকে বলেছে ।

—তা অশুভ হতে পারে ।

সৌদামিনী একটা নিশ্বাস ফেললে । তারপর আপন
মনেই বিভ্রিষ্ট করতে করতে কি যেন সব বলে
অন্যায় চলে গেল ।

সৌদামিনী কিছ্ কিছ্‌তেই কথাটা ভুলতে
পারে না ।

গ্রামে পিওন এলেই সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করে—
ও পিওন আমাদের চিঠিপত্র, টাকাকড়ি কিছ্ আছে ?

পিওন ঘাড় নেড়ে চলে যায়—সৌদামিনীর বুকের
ভেতরটা বক্ করে ওঠে ।

এরনি করে যাসের পর বাস পায় হতে হতে গীরে গীরে
কর ছুঁয়ে আসে ।

সৌদামিনীর ব্যাঙলের অর্ধেক কাপড় এখনও বিক্রি
হয়নি ।

সৌদামিনী রেগে বলে—বুঝ হয়েছে । কাপড়ের
সোকান তুমি ভুলে যাও ।

বিশূলের ডখন সোকানের সখ মিটে গেছে ।

নতুন বনে ভাবছিলেন এসব ওই হাডোয়ারীয়েই যাবে ।

আর তা ছাড়া এই রকম ছোট পাড়ারিয়ে সোকান
করলে কিছুই হয় না—সোকান যদি করতেই হয় ত
পথের কড়াই উঠিত ।

সৌদামিনী বললেন—কি যেন বুঝে বেড়াচ্ছিলেন,
সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করলে—কি বুঝে যা ?

বিশূল বললেন—বুঝেছি সেই বাতাতা ।

—কিসের বাতাতা ?

বিশূল বললেন—যে বাতাত কাপড় চোপড়ের আসল
নাম লেখা ছিল সেই বাতাতানা ।

—গ্যাথো, কোথায় রেখেছ হরত মনের ভুলে ।

বিশূ বিশূল ত মনের ভুলে কোথাও রেখেছেন বলে
মনে হয় না ।

একঝোড়া কাপড় বিক্রি করতে হলেও সেই বাতাতা
ছাড়া তাঁর উপায় নেই ।

গাভারিন বুঝে বুঝে হস্তান হয়ে গিয়ে সন্ধ্যার সেটি
পাওয়া গেল । রেওয়ালের গায়ে ইঁদুরে একটা পতের
নুখ থেকে সোঁটা তিনি টেনে বার করলেন ।

যে অবস্থায় বাতাতা পাওয়া গেল, বিশূল দেখলেন,
সেটি পাওয়া না গেলে কোন অর্জি ছিল না ।

ইঁদুরে কেটে তার প্রত্যেকটি পাতা একেবারে খও
খও করে কেলেছে—কাপড়ের নম্বর আর দায়ের কোনো
চিহ্ন পর্যন্ত ডাতে নেই ।

সর্বনাশ !

ইঁদুরে যখন বাতাতিকে এরকমভাবে কাটতে
পেয়েছে, কাপড়গুলোই বা আর রেখেছে কিনা, তাই বা
কে জানে !

বিশূল কাপড়ের ভূশ নাযিয়ে উশ্টে পাশ্বে বেগতে
লাগল । সেখানে সৌদামিনী দিয়েও তাঁর সর্বনাশ কর হয় নি ।
মহুত কাপড়ের প্রায় সবই ইঁদুরে কেটে কেলেছে ।

বিশূলে মাথার হাত দিবে বলে মনে ভাবতে লাগলেন ।

সৌদামিনী বললে—তা বেশ হয়েছে—হবে তা আমি
জানি । এখন তুমি এক কাজ কর দেখি ! তরলার বিয়ের
ব্যবস্থা গ্যাথো । রেগেও বাড়ি থেকে ।

বিশূল কি যেন ভাবতে লাগলেন ।

—কি ভাবছ !

বিশূলের চিন্তার কারণ সেই সোকান । যে সোকানের

জানো তিনি এত কষ্ট করেছেন, সেই লোকান তাঁকে ছেড়ে যেতে হবে।

বিশ্বাস বললে—আমি যেলে লোকানের কি হবে ?

সৌম্যমিনী হাসল।

বললে—ও থাক, তোমার ও লোকান আমিই চালাতে পারব।

—হুঁহি।

—ব্যাখ্যাই না।

অদভ্যাত বিশ্বাস তরলার বিবরণ জানো বেরোতে রাজী হলো।

লোকানের হিসেব ঝাঁপিয়ে দেখা গেল, পাণ্যপানি গ্রামের ভিত্তিটি টাকা অনাদায়ী পড়ে আছে।

নগদ বণ বাগো টাকা লোকান থেকে নিয়ে টুকিটাকি বন্ধ করা হয়েছে। ভাল ভাল পাড়ি দেখে বেছে নিয়ে সৌম্যমিনী ঘোড়া দুই পরে ফেলছে। আর বাকি যা ছিল তা হিসেবের বাইরে।

অধিকাংশ পাড়িই ঈশ্বরে কেটে ব্যবসারের অব্যোপ্য করে ফেলছে।

দুতরাং লোকান নিয়ে অনর্থক বাবা: বামিয়ে যে কোন লাভ হবে না তা ভাল ভাবেই বোঝা গেল।

বিশ্বাস বললে—ভাবো যে একশ টাকা ভূমি কম পেলে—তা ছাড়া আর কি। একবার চেষ্টা করা ত হলো।

এই বলে মনকে বার বার শক্তানা দিয়ে তিনি বের হলেন তরলার জন্যে পাকের সড়ানে।

দু' তিনটি পাত্র এলো তরলাকে দেখতে। কেউ প্রশ্ন করলে না—বাগা করলে তারাত এত টাকা চেয়ে বদল যে দশছ কেঁটে গেল।

অবশেষে অনেক কষ্টে বিবরণ স্থির হলো।

হেসেটি বন্দ নয়—সবের চাকরি করে। চেহারা ভাল। ব্যাকারও বেশ অস্বাস্থ্যিক।

তরলার বিরুদ্ধে প্রায় চারশো টাকা বন্ধ হবে।

১. সৌম্যমিনী বললে—এত টাকা লাগবে।

বিশ্বাস বললে—এর কমে আর ভাল পাত্র খোঁজার পাব ?

অদভ্যাত সৌম্যমিনী রাজী হলো।

কিছু বললে—অবশেষের বিরুদ্ধে আসতেও

বদলে না ?

বিশ্বাস বললেন—কি করে বলব ?

—কোলকাতার দল নাও।

বিশ্বাস হাসলেন।

সৌম্যমিনী বললে—কান্নাও যে ?

—না ভাবছি তোমার কথাটা।

—কেন লোকে কি খোঁজ নেয় না ?

বিশ্বাস বললেন—কোলকাতা শহরটা কি এতটুকু নাকি, যে ঝুঁকলেই মানুষকে পাওয়া যায়। ঠিকানা ন জানলে সারা জীবন ঝুঁকলে সেখানে মানুষকে পাওয়া যায় না।

—তারলে উপায়।

—উপায় আর কি। তোমার হেলে আর বৌ ইয়ে করেই কোন সম্ভব রাখতে চাব না।

সৌম্যমিনী আর কোন উত্তর দিলেন না।

এরিকে তরলার বিবরণ জানা যাচ্ছে গেল।

বেশ দুঃখান্বিত করেই বিয়ে হলো।

বিবরণের পর গুস্ত পট্টিটি বহরের মতো আবার কারও আ কোন সংবাদ নিতে পারিনি।

১ সন্তোষ

এরিকে বাপের সংবাদ ছেলে রাখেনি। ছেলের সংবাদ বাপ জানতেন না।

সে বছর বাবা বাসের এক দুঃখ পীড়িত সকালে দেশ গেল, বাসার দল্লর ঝুঁকতে ঝুঁকতে বিশ্বাস এগিয়ে চলেছে গম্ব হয়ে।

অবশেষে অমরেশের বাড়ির দরজায় এসে তিনি দাঁড়ালেন।

বহুদিন পরে পিতা-পুত্র আবার দেখা !

অমরেশ তার বাবাকে দেখে তাঁর হৃৎকের পানে তাকিয়ে ধীর কণ্ঠে বললে, আসন।

বিশ্বাস-হেসেলে যেহেই কর কর করে কেঁদে ফেললেন পুট্টি তার রক্তার কাগজ বসে চা তৈরি করছিল—দুঃখ তুলে শব্দকে দেখানায় মাথার কাপড়টা টেনে দিও

উঠে পীড়াল, তাঁঃ

প্রশ্ন করলে ।

চোখ মুছে কেঁপে ওঠাটা একটু পরিষ্কার করে নিতে বিপুল বললেন—এরনি করেই কি তুলে থাকতে হয় না । ভাল আছ ত ।

নাঁহবে শুবু একবার ঘাড় নেড়ে পুঁটি আবার তার নিচেঃ কাঁচ গিয়ে বলল ।

বিপুল তাঁর হুঁশের কাহিনী বলতে লাগলেন—এই আট বছর তোরা দেখলি না বাবা, এর মধ্যে কত কি ঘটে গেল । কত বড় কড়-কাপটা যে পেরোল মাথার ওপর দিয়ে তার আর ইয়ত্ন নেই ।

এই বলে তিনি একটু হাসলেন ।

পুঁটির দিকে তাকিয়ে বললেন—চা কি তোমাদের হবে গেল নাকি না ? কুসোর ত আনাও এক শেরালা দিও, আর না ঘর কুশার ত থাক না হয়—

এসাতটা চা আর একটু ছালুয়া করলে পুঁটি । নিচে এসে তাঁর সান্নায়ে নানিয়ে দিতে গেল ।

চাখের বাতিতে চুর্ক দিয়ে আবার বললেন—তারপর কত কষ্ট করে তরলার বিয়ে দিলার ।

—তরলার বিয়ে হয়েছে ? পুঁটি বললে ।

অনুরোধ তাকাল বিপুলের দিকে ।

—হ্যাঁ না হয়েছিল । তখন কত করে তোমাদের খোঁজ করলুম । ঠিকানা জানতুম না তাই তোমাদেরও দেখা পেলাম না ।

পুঁটি হিজাঙ্গা করলে—তরলা কেনন আছে ?

কথাটা শুনবেই বিপুল যেন নিরুপে অন্য হামুদ্ব হয়ে পেলেন ।

থর থর করে তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল—চোখ দিয়ে ধর ধর করে জল গড়িয়ে পড়ল ।

অনেক কষ্টে বললে—তরলা আর নেই না ।

—তরলা নেই ?

অনুরোধ কথাটা শুনে শুক হয়ে যায় ।

মনে পড়ে নেই মিসটার কথা । বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে তারা এখন গা ছেড়ে আশঙ্কিত গরুর পাকড়িতে চড়ে, তরলা তাদের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে বেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়েছিল ।

সে যেন এই সেদিনের কথা ।

পুঁটি আর অনুরোধের চোখদুটো যেন গভীর হুঁশে হল ছিল বহু উঠল ।

বিপুল বললে—বিসের একটি বছর পেয়েতো না পেয়েই গলার দড়ি দিয়ে মেখেটা মারা গেল । তাই নিয়ে কত ছাপামা যে হলো তা আর বলবার নয় । সবতে সবতে বেঁচে গেলাম । কিন্তু ওই শুবু বেঁচেই গইলান না, যা বাচিলে যোম হয় ভাল হতো ।

অনুরোধের দিকে তাকিয়ে বললেন, মেখেটার দায়ে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি বাবা, জরিজরা আর কিছু নেই । আমি এখন পথের ভিখারী ।

তরলা সেমটিকে পুঁটি অত্যন্ত ছোট থাকতে সেই ঘেমে এসেছিল । তার বিয়ে হয়েছে এবং এরই মধ্যে সে হয়ে গেছে শুবু সে শক্তি শুবু দুঃখিত হলো ।

শুবু তুলে ব্যাভাব্য কর্তে সে হিজাঙ্গা করলে—গলার দড়ি দিয়ে হলো কেন ?

বিপুল বললেন—কেন হলো সে আর বিহু বলে গেছে না ? শুবুদাম গমনা নিয়ে তার মার লগে কণ্ডা হয়েছিল, পরের দিন সকালে উঠে দেখে—কুলতলার কাছে হান্নাঘরের ঢালার মেখেটা গলার কঁপ লাগিয়ে কুলছে ।

কথাটা বলতে গিয়ে তিনি যেন একবার শিউরে উঠে চুপ করলেন । আবার তাঁর চোখ দিয়ে আনিকটা জল গড়িয়ে পড়ল ।

পুঁটি সেদিকে বড় একটা প্রক্বেশ করলে না । তার কানের কাছে শুবু একটা কথা যেন বারে বারে কক্ষর তুলতে লাগল—‘গরনা নিয়ে কয়কা’, আর সেই ‘কুলতলার কাছে’ ।

পুঁটির চোখদুটো কেন যেন আকারবেই হল হল করতে লাগল । ব্যার-অন্যায়ের বিচার হুঁশিয়ার কি তবে ঠিক এরনি করেই হয় ।

—সুদবায়ের জমি স্বাক্টার বা, একটা মেয়ে ত আমায় সর্বস্বান্ত করে দিতে চলে গেল, তার জায়গায় আবার দুটো পাঠিয়ে দিলেন । এই ছোট মেয়ে দুটোকে তোমরা দেখে আসোনি ।

তারপর সবশেষে চুপ ।

কাণও হুঁশে আর কোনও কথা নেই ।

হাশার কি বোধের কাজকর্ম শেন করে দিবে চলে
বালিস, পুঁচি তাকে ডাকলে—

হানসা বয় কে গুঁড়ানো। বললে—কি হা ?

—তোমার গায়ের কাপড়টা নিয়ে বাও।

এই বলে সে ডাকাত্যাঙ্ক সেখান থেকে উঠে এলে
এ ঘরের আলমারী হুলে গুঁড়ি একখানি গায়ের কাপড়
বের করে কি হাতে দিবে বললে—শীত পীত করছিলে,
হয়েছে ত এবার ?

কি বুগি হবে গায়ের কাপড়খানির তাঁত হুলে
তখন গিয়ে দিবে হানসে হানসে বড় হবে পুঁচিকে
একটি প্রশ্ন করে বললে—হ্যাঁ না, হয়েছে।

বিশূল এতক্ষণ কোনও কথা বলেননি। চুপচাপ
সেই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন।

হানসা চলে গেলে অমরেশ্বর বিকেল ঘুমে কিরিরে
বললেন—এখনি একটা যদি আমাকেও কিনে দিতু, শীতে
বড় কষ্ট পাচ্ছি।

অমরেশ্বর খান্ড নেড়ে কি যে বললে কিছুই বোকা
গেল না।

এতক্ষণ পরে শাহন সেবে বিশূল বললেন—আর অমনি
যদি সেটা পাঁচ গুণ টাকা তোর হার নায়ে মনিঅর্জার
করে পাঠিয়ে দিতিল বাবা, হেলেনেরেগলো একবেলা
শেঠিরে বেতে পায়না আককাল।

এবারেও অমরেশ্বর ঘুমে কিছু না বলে বোধ হয় তার
সম্মতি জানাল।

পুঁচি কিছু একটা কথাও বললে না।

পুঁচি সেদিন রাতে অমরেশ্বকে একা সেবে বললে—
ভালবান নেই নেই করেছিল, কিছু শুনলে ত—

অমরেশ্বর খান্ড গুঁকে বগেছিল। বললে—হুঁ।

—যেহা, অত অত নিয়েও আবার সেই বংশ ? কিছু
হ্যাঁ না উনি তোমার ঠিকানা কেমন করে সেলেন ? তুমি
কি চিঠিপত্র বিহু—

অমরেশ্বর বললে—না।

—তবে ?

—তাই ত বুঝতে পারছি না।

কিন্তু তার ঘুমে বেবে হলে বোঝা, আসল কথাটা সে
সম্ভবত সোপান করলে।

—মাইঃহাক, তুমি কেন আর কিছু ওঁকে দিয়ে না।

কেমন ? অমরেশ্বর সেও হয়ে—

অমরেশ্বর বললে—না। যেহে না।

তিন চার দিন পর।

সেদিন রাতে সেখা সেল চেষ্টার একটি পর

আলোয়ান গারে দিবে বিশূল বেতে বললেন।

পুঁচি বার বার সেই আলোয়ানটির দিকে দিবে দিবে
তাকতে লাগল, কিন্তু তাঁর সাক্ষাতে অমরেশ্বকে কোন
কথা সে জিজ্ঞাসা করতে পারলে না।

হায়ে পক্ষের বাওয়া বাওয়া চুকে গেছে। পাশপাশি
হুঁহানা বার। বাইরের ঘরে বিশূল শুলেহান, আর
ভিতরের ঘরে ওয়া হুঁই শ্বাবী শ্রী। হাঙরানে হাঙ
একটি বড় বরকার বরবান।

পুঁচি বেশ জোরে জোরে জিজ্ঞাসা করলে—হ্যাঁনা
ওই আলোয়ান তুমি কিনে দিয়েছো ?

—হ্যাঁ। বশে হাতের ইসারা করে অমরেশ্বর বললে—

চুপ, এত জোরে জোরে চোঁচিয়ে চোঁচিয়ে বলো না।
হি, শুনতে পারে।

—শুনুক, না। শুনিয়েই ত বলছি।

পুঁচি চীৎকার করতে লাগল।

—কেন ? সেদিনের কথা ভুলে গেলে ? যে দিন
ওঁরা আমার সর্ব্ব্ব চুরি করে' নিয়ে আমাদের পথে
বিসেহিলেন। আর আবার সেই হেলেন-বৌয়ের কাছে
আসাই-না কেন শুরি ?

হ্যাঁ হ্যাঁ করে অমরেশ্বর তার ঘুমে হাত দিবে চুপ
করাবার চেষ্টা করতে সেল। বললে—অভাবে পড়লে
মানুষের ওপর...খাঃ। বাহো চুপ কর।

—ক্যান্ডজান থাকে না তা আমি জানি। সং-না.
বা-শুগি তাই করুক, তাতে আমার আপাত নেই; কিন্তু
বাবা ত' আর সং দর।

এই বলে ঠিক উদ্ভাবনার হত পুঁচি তার শ্বাবীর
গলে তুলল কলকা শুল করে দিলে।

—বরজার বলছি—ওকে তুমি একটা পরমা দিতে
পাবে না। বখেট দিবেহি, আমার সর্ব্ব্ব দিবেহি, আমার
হান, শাহন, বাবা আমার হরে' সেল তবু তাকে আমি
একবার শেখ-সেখা সেখতে শুল পদ্য না। সেলার
না কেন—তা তুমি জানো না ? কিসের জন্যে সেলাম না
শুল শহরার জতোই ত'।

বলতে বলতে গলাটা কে যেন তার চেষ্টা বরল
চোখ দিবে জল গড়াতে লাগল।

তবু সে বাসলে না।

যে সব কথা সে অবশল বলে চল পুঁচির হুঁ
দিবে তা যে কোনদিন বের হতে পারে অমরেশ্বর তা
বিশ্বাস করেনি।

কোন প্রকারে তাকে চুপ করাতে না সেবে অমরেশ্বর
শুল হাঙরান নির্বাক হয়ে নিশী'য়ের হত পড়ে গেল।

পরদিন সকালে শহরার আর অমরেশ্বর তার বাহায়ে
হুঁ সেখানে পারছিল না। তবু সে জোরে করে পা

তিশে তিশে একবার বাইরের ঘরে এসে উঠিক ঘরে দেখলে।

ভাবলে বাবা যদি কোন কথা তাকে ভিজাসা করেন ত সে বলবে—সবনা চারি বাওয়ার পর থেকে পুঁটির মাথাটা মাঝে মাঝে এখনি গোলমাল হয়ে যায়। ভেবে চিন্তে কোনও কথাই আর সে তখন বলতে পারেনা। শূন্য কণ্ঠে আর অনঙ্গল বা হৃষে আসে তাই বলতে থাকে। এ তার কঠিন একটা স্বাভাবিক হয়ে গাঁড়িয়েছে।

কিন্তু বিশৃঙ্খল তাকে কোনও কথা ভিজাসা করলেন না।

সেখানে ট্রেস দিয়ে হুই হুইর মধ্যে হুধ গাঁকে তিনি বসেছিলেন।

অন্যেণ কি যেন বলতে ব্যাঙ্কল, কিন্তু বলা তার হলো না। কিছুই বলতে পারলে না সে।

বিশৃঙ্খল উঠে দাঁড়ালেন। একটা ঢাক গিলে এবার জ্বর তাকিয়ে বললেন—আজ আনতে যেতে হবে অপরেশ, এখনি যেতে হবে।

—আজকেই যেতে হবে ?

—হ্যাঁ, বিশেষ একটা জরুরী কাজ আছে। আমি জুলে গিবেহিসার বাবা, এই সকালেই ট্রেস—আমি উঠি। অপরেশ হস্তভঙ্গের মত গাঁড়িয়ে রইল। চুপচাপ। হুধ দিয়ে তার একটি কথাও বের হল না।

তারপর এখন দেখল, তাকানো থেকে নেমে তিনি তার হেঁচা জুতো দুটি পরলেন, তখন সে বললে—আজ ত আমার কাছে টাকাকড়ি কিছুই নেই আমার ফিনটা আগনি—

—বাক সে হবে এর পর। তুই কিছু ভাখিস নে বাবা, কিছু না, কিছু না, কিছু বনে করিয়ে দে।

বলতে বলতে তিনি ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। চলে যাবার আগে রাজা থেকে হুধ ফিরিয়ে অত্যন্ত সঙ্কল্প গ্রাস হুঁটিতে অপরেশের হুধখানি বোঝে হয় আর একবার ভাল করে সেবে নিলেন।

অপরেশের আর কি হলো, কে জানে। সে না পারলো হুঁপা এগিয়ে গিয়ে দরজার কাছে হুধ বাড়িয়ে দেখতে, না পারলো কোন কথা বলতে। কি করবে। কিছু ভাবতে না পেরে বিস্ময়ের মত সেওয়ারের একটা ছবির দিকে তাকিয়ে চুপ করে গাঁড়িয়ে রইল।

কিন্তু কল কেটে গেল। বিশৃঙ্খল তখন পলির রাজা

পেরিয়ে বড় ভাভার গিরে পড়েছেন।

হঠাৎ অপরেশ সামনে তাকিয়ে দেখতে পেলো তারই কিনে দেওয়া আলোয়ানখানি ভালি করে তিনি তাকানোয়ের ওপর ফেলো দেখেন। ওখিকে তিশের একটা চেয়ারের ওপর ছোট একটা ব্যাকডার পুঁটিলিতে কি যেন বসে রয়েছে।

পুঁটিলিটি অমনে হুলে দেখলে।

এক টুকরো বরের কাগজে মোকা কামেকখানা বিস্মুট মোটা হুই তিন হুধনো সন্ধান আর হুঁটি ব্যাককোসের মত।

মোক তার জলখাবার থেকে কেটে সেদুলি বোল হয় তিনি ব্যক্তি নিয়ে দাবার জ্বনোই লকর করছিলেন।

আবার তেজনি করে পুঁটিলিটা বাঁধতে গিয়ে অপরেশের চোখের দৃষ্টি ভাঙ্গা হয়ে এলো।

এদিকে পুঁটি তখন দরজার কাছে থেকে বাইরের ঘরে একবার পুঁটি মেরে দেখলে, অপরেশ একা বসে আছে।

বললে, একা বসে বসে কি করছ ? উনি কোথায় ? অপরেশ জবাব দিলে না।

তুনি অমন করে বসে রয়েছে যে। কথা বলছ না কেন ? কি হয়েছে কি ?

অপরেশ নিরুচ্চর।

—কথার জবাব দাও না কেন ? করছ কি ?

বলে পুঁটি ধীরে ধীরে তার পানীর কাছে এগিয়ে এসে তার হুধের কাছে হুধ নিয়ে গিয়ে দেখলে, কিছুই সে করে নি। শূন্য সে এককৃষ্টিতে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে আর সেই ভালি করা নতুন আলোয়ানটির ওপর টস্ টস্ করে তার চোখের জল-গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

হস্তবাক পুঁটিলিটা বুকলো দরই। বুকলো জ্বন করে চোখের চোখের পত্ন রায়ে কথামূলো বলা তার উচিত হয়নি। হস্ত বা তারই কথার বিবে অজ্ঞারিত হয়ে শূন্যের এ-বাড়ি থেকে চলে গেলেন।

তার সেই চলে যাওয়ার হুধে বিলাপিত হয়ে তারই, চোখের হুধে বসে যে হানুটি অজ্ঞ বিস্ময় করছে তাকে শালনা দেবার মত কোনও ভাষাই সে শূন্যে পেল না। নির্বাক বিশৃঙ্খল হস্তবাক হয়ে দস্তানহীন এই দারী, উজাল উয়েল এক দরদর শূন্যের সম্মুখে গাঁড়িয়ে আছে যেন প্রথম অনুভব করলে—দস্তানহীনতার বেদনা।



ବାସ.ଗ୍ରାମ

ନିର୍ମାତା : ବଳାୟାମ ବନ୍ଦୁ



ମଞ୍ଜିର ମଘେ

ନିର୍ମାତା : ବଳାୟାମ ବନ୍ଦୁ

স্বপ্ন বসতে আমরা চোখ ৯ পাশে তুলে

শ্রমিকদের দুঃখ দেখেছেন

জা. শিখরতালা সুযোগাযোগ

ছিলেন। তিনি

বলে ন-এ বা র

আকাশে লড়ে

আকাশকে বুঝাই। এই দুনিয়ার সব পথভিকের সেয়া
পথটিক সম্ভ্রান্তি মত শীঘ্রা ভেঙ্গে মহাকাশের ঈষাদের দেশে
বিনা ভিঙ্গার পথটিক শেষ করে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির
সৃষ্টি করেছেন। স্বপ্নারীয়ে স্বপ্নে গিয়ে এমন স্বপ্নারীয়েই
আবার মতের আগে কেউ করে আসেনি। মরে গেলে
কেবল স্বপ্নে যার—স্বপ্নে গেলে আর কেউ করে আসে
না—এই কথাই ভো আত্মবিন শূনে আসছি। কিন্তু

এই রূপ ভরলোক কি অসম্ভবকে
সম্ভব করলেন? সপ্তম হুই তাকে
মহাকাশে গুণ্য করানোর আগে নিশ্চয়ই
“মরিতে চাই বা আমি মৃত্যুর ভয়নে”
এই কথাগুলির তাৎপর্ষ্য রাখিয়ানে
হৃদয়ঙ্গম করান হুই বহু পতরাশি কা
পালনের জন্য। যার ফলে তিনি
স্বপ্নারীয়ে স্বপ্নে গিয়েও স্বপ্নের বাহ্য
কাঠিরে থরের ছেলে হয়ে আবার
থরে করে এসেছেন।

কিন্তু কিসের মাথা খেতে এই
সর্বস্বপ্নে দুঃখের অভিযানে
গ্যাগারিনকে যেতে হয়েছিল? সে
ধর আপনারা রাখেন না। সে ধর
দক্ষিণ একান্ত গোপনীয় তবু
আপনাকেই শূন্য বসছি। আপনি আর এ নিজে
পাট কান করবেন না। তা বলে সব জানাখানি হয়ে আর
একটা কাণ্ড হবে।

আসকার দিনে ভগবানরা যেমন মারম প্রভূত দুনি-
খণিক স্বপ্ন থেকে পৃথিবীতে অ্যামব্যাসাজ করে
পাঠাতেন এও তেখানি মতের অ্যামব্যাসাজ আবার এই
গ্যাগারিন। এও তেখানি উল্টা করে পাঠা বাত্যা।
গ্যাগারিন অগত্যা তার শ্রী কন্যা রেখে স্বপ্নারীয়ে স্বপ্নে
যেতে রাষ্ট্র হন। ক্রুশেই গ্যাগারিনকে পাঠিয়ে

বাণ। হুকেটে চড়ে স্বপ্নে বাণ। সেখানে গিয়ে দেখে এস
স্বপ্নে ভূতটুত বলে কিছু আছে না কি। গ্যাগারিন
হুকেটে চড়ে বায়ুমণ্ডলের পতীর শব্দ শেরিয়ে উঠু উঠু
আরও উঠুতে উঠুতে থাকেন। ভারহীনতার অবস্থা
কাঠিরে অতলের তিনি হুয়েতে লাগলেন জনহীন
কক্ষপথে।

গ্যাগারিনের হুস্কিল হুই স্বপ্ন বসতে যে ঠিক কোন
আচগাটা বুঝ্য তা অবশ্য তিনি
জানতেন না। তার ব্যাখ্যা ছিল
“আউটার স্পেস” বলতে বুঝ্য
যেখানে পৃথিবীর বায়ুতর জমে কীপ
হতে কীপতর হয়েছে। পৃথিবীর
ধন মাইল উপরে বায়ুর চাপ সমুদ্রের
কাছে যত তার ধন ডাপের এক
ভাগ্য। আবার বিশ মাইল উপরে
বায়ুতর নেই বলসেই হয়। শুধুও
এই কারণকে স্পেস বলা চলে না।
সেড়গো মাইল উপরে বাওয়া নেই—
তাই সেখানে কোন পথ ভালে না।
আর পৃথিবীর মাগাল থেকে বাইরে
চলে যেতে ধরকার হুই অভিকর্ষের
টান থেকে হুড়ু হওয়া। কোন

জিনিষ বক্টার ২৪,০০০ মাইল বেগে ছুটলে এই
আকর্ষণের বিপরীত দিকে চলে যেতে পারে।
আর তার করে অর্ধাং ১৬,০০০ মাইল বেগে প্রতি
বক্টার চলে এই অভিকর্ষের টানের বাইরে না গিয়ে
পৃথিবীর কক্ষপথে কেবল হুয়েতে থাকবে। তিনিও এই
রকম মহাশূন্যে উঠে প্রভু বেগে চরকি যেতে লাগলেন।
জনহীন কক্ষপথে হুয়েতে হুয়েতেও তিনি জনহীনতা
অনুভব করেন নি। নিজের কোথানে বলে থেকেই তিনি
স্বপ্নে ভগবানের গলো রূপ ভাষার কথা বলতে চেয়েছেন।



তার শর টেপ রেকর্ডে উঠেছে। ভগবান গ্যাঙ্গারিন জানেন না—অন্তঃর তিনি বিরক্ত। গ্যাঙ্গারিন কাগজের উপর বসে বসে করে কলর চালিয়ে শব্দে বাতাকালীন দিগের অনুভূতির কথা লিপিবদ্ধ করলেন। ভগবান নিজেই বিরক্ত—লেখার উচ্চারণ করতে পারেন নি।

বা আশা করা যায় নি তাই বুটেছে। গ্যাঙ্গারিন শব্দে গিয়ে গাভী ভূত দেখতে পেয়েছেন। শব্দ গ্যাঙ্গারিন আকাশে নয়—আবহিকার আকাশে, সারা পৃথিবী ভূতে এই ভূতের দীপা চলছে। আকাশের দীপে ভূতের বিদ্যমানতা। বুদ্ধের বিপর্যয় এ ভূত কবিতাভিত্তিক নয়, ক্যান্টোনিজমও নয়—এ অন্য রকমের নিউটন ভূত। ভূত একটা নয়। এরা গুরুভূত।

আকাশে থাকতে থাকতে তিনি ভূতের মেলা দেখেছেন। তিনি ভূত দেখেও ভা পাননি এবং তার পেয়েও ভূত দেখেন নি। তিনি ভূত দেখতে দেখতে দেখেছেন এবং যেতে যেতে ভূত দেখেছেন। দিন-রাত্তরে ভূতের মৃত্যু দেখতে দেখতে তিনি প্রথম স্তরকে দেখেছেন যখনদো আকাশের এই পৃথিবীটা প্রায় কমলা লেবুর মত। চমক দিয়ে এমন জিনিষ আগে কেউ দেখেন নি।

আকাশের এই শব্দ পৃথিবীটার একদিক ফঙ্গা অব্যবহিকতা কাসো। শব্দ আকাশে ভাল ভাল করে—পৃথিবীর যে বিকটা শব্দের দিকে কোরান ভা উন্মাদিত। ভা ক্রমে সরে যায়। রীশ নেভা পৃথিবীকে শব্দে পাওয়া সেন বলে মনে হয়। সেখানে প্রকার মাঝে, না ভূতের ছায়া পড়ে? জিনিষ আসমান সব কিছুকে ভূতে পেয়েছে, সর্বত্র যে হুটোমুটি হুড়োমুটি করছে তার অন্য দিকই ঐ শব্দ। সেখানেই বস ভূতের বাসা, গা হুহুহু করা ছায়ে ভূতের চোখে সকাল কোলার প্রকাশ্য ভূতেরা বা আরও নিজেই। এরা দ্বিগু ভূত।

গ্যাঙ্গারিনের এই ভৌতিক শব্দের পিছনে রয়েছে একটি চিরকাল লভ্য। এ ভূত সোচ্চারিত নয়। এরা গুরুভূত। এরা হচ্ছেন ক্ষিত, অস, তেজ, মরু, বোম্ব

—শব্দভূত জিনিষ—সব কার্যকারণের ধাতু। এ গুরুভূতের মূল রসেই রান শব্দে শব্দে আটকানো আটকানের চৌকোই চলছে এ পৃথিবীর ব্যবহারী ভৌতিক কাণ্ড-কারখানা। এই আটকানের মধ্যে শক্তি শব্দশি অবস্থার বন্দী রসেই আলানীনের বৈভবের মত। রান, আটন ভেলে শে বৈভবকে শব্দে বন্ধ করে বিশ্ব শক্তি উৎপন্ন শব্দে নিজে—তাকে নানা বাজে লাগিয়ে নান্দ্র যে শক্তির উৎপন্ন সংগ্রহিত নিজে শব্দে—আর জুড়ে অমর কাল ধরে এই শক্তিই আকাশে বিতরণ করে আকাশে শব্দের মধ্যে এমন ছাটার ছাটার কোটি কোটি সৈধ্য শব্দসোচ্চ বিতরণের নামে শব্দ ভৌতিক শব্দে মেতেছে তার কলে বিশ্ববিশ্ব ডোলপাড়। শব্দ আকা



তেন এবে উপস্থিৎ যখনদোতার এ কি আকাশের নিজস্বের শরীৎ নব্যেও রয়েছে ছাটার ছাটার আটন নানান ভৌতিক কোরানিত। দেহ রয়েছে ভূত বেলানোর ভূত শব্দ। কত কি উঠে তার টেপ পাঞ্জি না। আমরা সবাই এককবে ছায়া ভূত। মরা ভূতের দাঁড় পৃথিবী বোশে চলছে ভূত চা ভূত এক রকমের ছব্ব কি ছায়া না তবে নান্দ্র এক রকম ভূত ভা নির্ভিত। গ্যাঙ্গারিন মরে ভূত হন নি বা ভা হয়েও রয়েছেন।

যেকো ফিরে এসে গ্যাঙ্গারিন জুড়েভকে প্রকার এক রকম বললেন আর কালে কালে বা বললেন ভা আ ভাসক ব্যাপার। যেমন কোন কানে কানের কথাই সো থাকে না—এ কথাও রইল না। সবাই ক্রমে ক্রমে জে কেদল জুড়েভকে নিভূতে গ্যাঙ্গারিন কি বলেছিলে তিনি তার উক্তি করেন—

প্রথম উক্তি : ভগবানকে ভূতে পেয়েছি।

(এ কথা শব্দে জুড়েভ বলারোচ্চা শব্দী হন)

দ্বিতীয় উক্তি : আসমানর মধ্যে ভূতের মত কিছু

(এ কথা শোনা মাত্র তার শব্দ গভীর হয়ে ও

ও বলে মনে ভাবেন গ্যাঙ্গারিনের শব্দন এমনি...)

তৃতীয় ভীক : ভেনেডিক্ত বসোও তাই...

(এ উল্লিখিত বসোও হতে আশ্চর্য, এমন নয়...)

চতুর্থ ভীক : জ্ঞানবাপা এই ভূতের বোলায় আরও
নব্বই এক একটি ভূতমাখ দায়।

(নব সোলমাল হয়ে গেল। কিছুরই অর্থ শব্দ
হয়ে উঠল না, কলসের জ্বলা লাগল।)

এই সব কথা ক্রমে ক্রমে হয়ে যাওয়ার

এ সোভিয়েত রাষ্ট্রনৈতিক মহল আঁতকে

ঠেল। লোকটা বলে কি—গ্যাগারিনের

নভবই বাধা ব্যাপন হয়েছে। কিছুর

শব্দের বৈজ্ঞানিক মহল তার এই

বস্তুবাদিতা শুনলে উঠলেন কোলাহল

লাগাল। তারা নব্বই কি রাশিয়ান কি

আমেরিকান একদলে কোম্বাসে কলসেন—

কন নভতয়ে কত প্রহর কল আউটব্রা কেন

য়ে এই ভূততত্ত্ব কামের করেছে। এইসব

ভূতের পিছনে কোন সে আদি ন্যাতন

দুটি সব ভৌতিক ব্যাপারের কারণ হয়ে রয়েছে,

তাকে ন্যাত করা চাই-ই। ভূতকে ভয় করা চলবে

।—ভূতকা জ্ঞাতে গুরুভূত উচ্চাটন করতে হবে।

ভূত সাধারণ এই পৃথিবীর দূরত্ব প্রশংসকে আরও

জ্বলবে। আকাশ ভরা তারা শূন্য—চন্দ্রলোক, আলো

জ্বলবে, কন বনাজর ছেলে সে ভূত, পরিবাপন তাকে

ভূত খোঁজা করতে হবে।

প্রদলের এইভাবেই শেষ হয়। এই ঘটনার পর

গ্যাগারিন নিজেই একটি উপগ্রহ হিসাবে মানবের বিশেষ
করে যেহেতু মানবের মনের আকাশে নব্বই ভূতের থাকেন।

জ্যোৎস্না হাতে চাঁদে দাবার হত গ্যাগারিনের কাছে প্রকাশ
দেখানোকে একাধিক বহিরা দাবার শব্দ শেতে শূন্য

করেছেন। ইংলেতে সেদিন বসন ইউকি আলোজ্ঞিত
গ্যাগারিনের সন্ধান দাবার বাবদ্য হচ্ছে—সোভিয়েত



নৃত্যবাসে নব্বই অগণিত জনতা তার

নব্বইবে'লাড়িয়ে। ভৌতিকে চেষ্টা মহাকাশ-

জ্ঞানী জ্ঞানলোক গ্যাগারিন বেই রাজ্য দাবার

হলেন ওহনি ভীতির দাবার থেকে একজন

ত্রিটিশ ভূতশীঘ্র দাবার অগণিত্য তিনি

রকেটের বেগে অলভকে এসে তাঁকে

চন্দ্রনের জর ভিলক একে ঘিরে সে চম্পট।

এই গ্রহ হাড়িয়ে শূন্যের মধ্যে শূন্য এনে

মানব আরও সৌর-বসন-বস্তুর অবিকারী

হয়—এক কদার সে আরও আত্মবিশ্বাস হয়ে

ওঠে। অগণিত্যর হতে এ পৃথিবীর

যথো 'সব চাইতে চন্দ্রনবোশা শূন্য' প্রিয়াগারিন।

রাষ্ট্রনৈতিক মহল বসন এই অতিক্রমে চন্দ্রনবোশা

নৈতিক অতিক্রম উদ্ভাটন করতে ব্যত ভবন একজন রশিক

সোভিয়েত বৈজ্ঞানিক বলে কেলসেন—বেরেরের ভূতের

শেলে তারা ভবন এই রকম কাণ্ডই করে বসে। রাশিয়ার

হাইরে ও ভিতরে নব পৃথিবীর মধ্যে ইতিবসো প্রত্য

জ্ঞানদা বসনদা চলছে তারা কি করে অন্য গ্রহে একদার

শূন্যে আসবে।





কাষের সময়

শিল্পী : নিরায়ণ দাস



কলবে কল

শিল্পী : নিরায়ণ দাস



শিল্পী : অরুণ দেবদত্ত



পরিচালক

শিল্পী : বাঘল পাল

অ

ননের
পাঠি বাবার একটি কাঠের
আদিগত মূর্তি থাকে,
কলো লা সেও নেও।
আনা সেও ও ছিল।
বাবাকে ভীষণ ভয়
শেষায়।

না, জেহা তার অনুভূত মত
ছিল না। সে ছিল বহুবৃত্ত, গতি-
সোপ্তা ধরনের। হাতে বৃক্ক পুত্র
লোম ছিল। আমার যখনকার কথা
ননে পড়ছে তখন তার ভাবভূতও
একটি লোম সোকেছিল। একটা



অমৃতস্য

অনন্তাষ কুমার যোষ

বড় কতল ছিল দুই ভূগের ঠিক
হাকখানো, নার অর কপালের
সহিষ্ণানে, জোষের জোপও একটু
লাদেছিল।

সেই জুনোও তাকে রায়ী বাগী
দেখাত। বোধ হয় ভাত খেতে-বলার
সবর পালের তদলে, কিন্তু, গলার



NIHSH (MUKHERJEE)

উপরে, বাড়তি একটা ভাঙ শক্ত, সেই বনোও। খুব নাক ভাকত বলেও হতে পারে।

জয় অবশ্য স্নেহ বনোই পেতাম না। বাবার গলাও খুব ভারী ছিল। গোফেরা সব ছিল ভোরে ভোরে, এখন তখন গলা ঝাঁকি, দিত, হাচি কাশি মাথামতে পারত না।

এই সব মিলে তার ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়েছিল।

এই ব্যক্তিকে মাও ভর পেত। সেই ভরেই অজস্র ভাগ পেয়েছিলাম। আকারে বিশেষ প্রকাণ্ড না হলেও, বাবা যত্নে এসে এখন হাঁড়াত, তখন বাচ্চ ভোরঃ শিকানা ব্যাচিয়ার ঠাসা আমায়ের যেটি স্নেহ মাস মাস পনেরো টাকা ভাড়ার ঘরটার বাকীটাও ভরে যেত। তার পরীয়ে, তার হারায়।

তার দাপটেও। আমরা খুব হাস্যহাসি করছি, বাবার পারের আওতাধ পেলেই চুপ করে যেতাম। মার এমনিতেই রোগা পরী হুঁকড়ে আরও যেন এতটুকু হয়ে যেত। হাঁড়িতে শূকরোতে দেওয়া কাপড়গুলো কুঁচিয়ে কুঁচিয়ে তুলত। দিদি অল্প কবতে বসত, আঁধি যেন পড়াতেই তরর ছিলুম, এমন ভাব দেখাতাম।

মা বলত, চা খাবে ?

বাবা 'না' বলত না। যেত। পৌড়াপাক্রমে বেশির ভাগ দিন খেয়েই আবার বেরুত। তখন বাবা কাছ করত একটা ছাপাখানায়। ওতারটাইম বিত। নইলে হাইনের কুলোত না। পরে বাবা একটা তোরতোর হোকানে কাছ নিয়েছিল, তারও পরে একটা সোভার কারখানায়। সর্বশেষে একটা সুদৃশ্যিত ভেলের কোম্পানীতে অ্যান্টিস্ট্যান্ট যানোজারও নাকি হয়েছিল। সেই কাছ করতে করতেই বড় অল্পবে পড়ে।

বাক, বাবার ছোর ছিল ওখানেই। তার অকুচিতে নম, বুকোর সোমে নম, বেখম্ব পলার শ্বরেও না। সে যে আমাদের বাওগাত।

মা হারা করত বটে, কিন্তু যোগ্যতার বাবার। যোগ্যতার ব্যর, ছোরও তার। আমরা জানতাম। স্নেহে কেসেছিলাম। মার অজস্রসো হাবভাবে, ইঁদুরের মত কুতকুতে চোখের চাউনি থেকে। জানতাম, বাবা যোগ্যতার না করলে মা হারা করতও পারবে না।

দার যোগ্যতার, সেই তো ইঁদুর। আমাদের যেটি পরিবারটি তার ত্রিভুবন।

গগচটা হানুশ, তার ভালবাসা আর রেগে যাওয়া দুইই হঠাৎ। কোমলিন হুঁচি করে এসে বলল, চল দিনেবার চল। মা অবনই: দুড়দুড় করে তার পিছে পিছে যেত। লাল কতাপাড় শাড়ি, কশালে ছোর শিঁদুর। অভ্যাচারও বন ছিল না।

কিছুত অনেক রাখে। নিয়ম ছিল, আমরা ততকল ছেসে থাকব। পড়ব।

আমরা কিন্তু পড়তে পড়তে চুপতাম। ঘুমিয়েও পড়তাম। বাবা কিয়ে এসে পঁচিয়ে শোটা দিয়ে বলত "দুছেবেলাই খুব।"

চোখ গগড়াতে গগড়াতে আমরা উঠে বসতাম। জয় বললে বললে রাগ হয়ে যেত। হাঁতে হাঁত দ্বতাম, পল না করে।

যতকল চোখ দেওয়া ভাত তার সোআনে সেলা সারা না হলে, ততকল বলে থাকতে হত। মাঝে মাঝে হৈকে উঠত সে,—"পড়ছিল।" মাঝে মাঝে ভাকত। যেদিন শালশাভার ঢাকা ঘুরিতে করে রাহাণি আনত, সেদিন।

—বাঁধি নাকি একটু আর।

সোঁধ হয়ে বলে থাকতাম, ভরে ভরে উঠেও যেতাম কোন কোন দিন। বুড়ো আতুল হয়ে চুঁবিয়ে সে আমাদের জিতে ঠেকাত। আমরা রেগে যেতাম। মূখ বুতে যেই উঠে যেত সে, অবধি যাকে বলতাম, কুহুর যাকি আমরা ? তবে উঁহু করে কেন ডাকে ? ডাকে কেন, ম্যা ?

মা বলত চুপ চুপ। বলত, তোরা দুকিল না। অভাবের জন্যে ওর যিমের বেশি লেখাপড়া হয়নি; তাই তো তোদের বেশি বেশি পড়তে বলে।

তবু আমি যে দিতাম সুবোধ বালক হব না সেটা ওই বলে আমি নিজেই আশ্বাস করেছিলাম। হলপ করে বলব না যে, কুলে বাচ্চ বলে বোরিয়ে যোগ্য কুলেই পিছে। সখা ভাড়াভাড়ি হাল থেকে বোরিয়ে দিনেবার ঘ্যাচিনি শোও লাইন দিইনি।

এই সময়েই এক দিন, দস্যুর মূষে বাড়ি কিংবদন্তেই
সেঁপে বাবা। খাতি আসলে বসে আছে। এ-সময়টা
কোন দিন বাগার থাকে না। আত্ম তার প্রকাণ্ড বাঘাটার
হায়া বনের সেরাল অনেকটা ঢেকে ফেলেছে।

আবার হায়া দেখতে গেরেই তার হায়াটা উঠে এসে।

—এ দিকে আর সেঁপে।

আবার মূষের গুপ্ত কঁকে গড়ে বাবা কী-বনে শূঁকল।
ওর ছোড়া চোখ কলহিল। তারপরেই এলোশাখাখি
চক, হুবি। চুলের মূঠি বরে খিঁচড়ে এসে আমাকে
সেরালে চলে ফেলোহিল।

কী মার মারল! তিন দিন গারে বাঘা ছিল। যা
বলল, তোকে দিগারেট বেতে গেরেছে যে। কোথায়
নাকি গুঁকরে টানছিল? খোকা, তুই দিগারেট বসি?
খাই না, একটা গুঁচোই তখন পর্বত গেরেছি। এলাটে
আর গেরেতে গুঁচক, শোখন করে নিভার। সেদিন
করেছিলান কিনা বনে নেই।

—বেশ করি, বাই! গুঁপিলের দারোগার শেখানো
সাকী মাকে সেদিন এত খোয়া হচ্ছিল! —বিড়ি তো
খাই না! ও-বে বাগিল বাগিল বিড়ি কোঁতে আর
ককক কারে।

—চলুদুশ! যা কিংকিন করে বলল আর আখিও
হিলাল করে জবাব দিলান, এর শোখ আখিও নেব। ওকে
মারক! মেয়েই কেলব।

ভয়ে ভয়ে মা আবার মূষে হাডগায়া দিল।

আর ভবনই মার কবজির কাছে টানাটানা কয়েকটা
কালো দাগ আখি দেখতে পেলাম। বাবা মূঠি মাকেও
মেয়েছিল। মার মোখ, মা আমাকে নাকি মণ্ডিকা দিতে
পারেদি।

কর্ণোদাস—প্রসারিত হুই গারে
বাড়া উত্তম মতি'। পিডলের নর,
আবার আত্মর তেতনার সে তামাটে
হাতুতে গড়া কোন পরাবে' পরিপত
হয়েছিল। তার মূঠের ঠিক হাতি-
খানটা ভাক করে আবার গুলতি
থেকে পর পর তিনটে গুলি
হুকলাই। সে মূঠিরে গুলল,

কতকটা সেবার পাতের তলায়
খসুঁরে মত মেখেতে হল।

ওটা আমার ইছাপুতাই বাত, কিন্তু অমৃতকে পরে
দুইতে মূঠে মূঠিরে বেতে গতিই গেরেছি।

গোড়ার কারখানার কার ছোড়ে বাবা গুলানিত তেলের
কোম্পানিতে ভিড়েছিল। এক রকম গড়ে তুলছিল বলা
বার। দিনরাত বাউত।

তখন আমায় অনেকটা বড় গেরেছি।

বাবা একদিন বাড়ি ফিরে এসে শুনলো মূষে।
মাকে কী সব বলল, ঠিক মূঠে পারলুম না। মানে
নিজেছিলুম পরে।

কোম্পানি একটু দাঁড়িয়েছে কিনা, ওরা ওরনি মতুন
পাঁচ কয়েকে। আত্ম বাবা গিরে সেখে, গহিতে মতুন
লোক। শুনল, সেই সব সই করছে। আত্ম থেকে সেই
মানেজার।

—ও! বলা বলল, আনি তবে কী?

—হুনি সেলু, অগনিইভেলটা দেখতে পার।
মালিক অগনি বসনে বলল।

আসলে বাবা মাকে বসোহিল, আসলে মূঠলুম, ওরা
আমাকে ক্যানভাসার করে দিতে চায়। মতুন মানেজার
মানে হল মনিবের ভারত্যা ভাই। জ্ঞান না? ও চাকরি,
আর করব না।

বাবা সেখ পর্বত কিন্তু এই কালেই ফিরে সেল।
তার কল হয়েছিল, মতুন কার ছোটান এ বসনে
কঠিন। তবে তার মন চেতাইছিল, ক্যানভাসারের কাছে
বিভর বোয়াঘুটি, শরীরও ভাতল।

রাজ্যভেই এক দিন অজান হরে গড়ে বার। সকলে
বয়সরি করে গিরে এসে, হুবিটা বনে আছে। আনি তার
একটু আসেই কলের থেকে ফিরেছি। মা কানিতে থাকল,
আনি ভাকারখানার হুইলুম, ভাকার এসে নাড়াচাড়া
করে বলল, ভর নেই। রাজদ্রোণার, তবে এই কার্ড
খ্যাটাক। ঠিকমত চিকিৎসা, বাওয়া বাওয়া গুপ্ত নজর
মানে কন্ট্রোল আর ফেট। তা হলেই উনি ফের চাল্যা
হয়ে উঠবেন।

চোখ আবরোজা, কেতি কেতি হতে তখনও বিহানদ

গার তিহায়ে। সেইম সন্ধ্যাবেলা আমার দবাই ডা পেয়েছিলুম। এক পাশে সরানো লম্বাঘের আলো কালো হায়া ফেলছিল, কিহু তেমন প্রকাণ্ড যেন না।

পরদিন সকালে গিরে বাবার অফিসের নতুন ম্যান-জারের হাতে ছুটি দরখাস্ত আর ডাকারের সার্টিফিকেট জমা করে দিলাম। ভর ছিল, লোকটা পছন্দ করবে, কিহু সে রকম কিহুই হল না, ভারীভারী কী রকম জড়ানো পলার বদল, যেন।

আমাকে বলতে হল না বটে, কিহু সঙ্গে সঙ্গে দরখাস্ত রদ্ব্ব করে দিল। কী অসুখ, এখন বাবা কেমন আছেন, এ সব এক বর্ণও জানতে চাইল না। আসলে সে হস্ত একটু বুশাই হয়েছিল। বাবা তার প্রতিদ্বন্দ্বীই তো ছিল। সে দিনকতক জিনানার কাত হয়ে পড়ে থাকবে, পরে থাকবে জেনে, লোকটা স্বস্তি পেয়েছিল।

খব্ব্ব করে গই করে দিল, অস্ত মিজাসাবাব করল না, এতে স্বস্তি পেয়েছিলেন আবিও।

বাড়ি ফেরার পথে সের্দিন ডিসপেনসারিতে শিশি জমা দিবে এক আফগার একটা মিঠে পান ফোয়ার। চোকানের আমদার দেখতে সেলাম আমার মূখ। সরু সরু কটা লোমের ভরে গিয়েছিল। চানলাম, লাগল। চোমকুস উঠু হয়ে উঠল। উপরের ঠেটি নীচে।

তখন একই সঙ্গে আশ্বত এবং উত্তেজিত হয়ে সেদ পরমার একটা দিগারেটে দাঁড়িতে ধরলাম।

হা একে বহু-পরের হিসাব বক্তত না, তার ছিলে, সব টাকা আমার হাতেই খুসে দিয়েছিল।

হস্ততার মোখ, নতুন ঘরিত্ত আমাকে অভিজ্ঞত করেছিল। অন্য সবাইকে আমার এই নতুন অনুভূতি জানাব কী করে, বাড়ি ফিরে কটল করে ম্যাডালটা ছুড়ে দিলাম, সেটা পলার গিরে এক কোপে।

নতুন চোখ দিয়ে বারাকের দেখলাম।

চাপা ধরনি, তবে উঠে বসে। পিঠের নীচে বাসিন জড়ো করা। চোখ আঘবোঁধা বসেই লাড়ক্ট ছিটে দেখা দেল না। আমার আর ভরও ছিল না। আমার পাতের শবে চোখ সেলে বাবা ডাকল। তখনও ক্রান্ত, মূখ দিয়ে শ্বাস চানছে। কী কলতে চাইল, পাগল না। বাবার হুখে কথা কট্টছিল না,

কট্টছিল চোখে। চোখের পাতা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে আমাকে ডাকছিল, বলছিল পাশে বসতে।

কী কহুন, ক্যাকাশে। একদিনের কষ্টে একেকবার ভেঙ্গে পড়েছে। গাল তোবড়ানো, বাবার মাথার এতগুলো চুল মাথা, মাশে চোখে পড়নি তো। তব্ব্বর পাকা চুদটা আর আলোয়া করে চোখে পড়ছিল না।

পাশে গিরে বসলাম। শুব্বের শিশি মাড়াচাড়া করে বাবা ঠেটি গুলটাল। তারপর আমার পিঠে, মাথার হাত বুসিরে দিতে থাকল।

আবি কঠ হয়ে ব্যাঙ্কলাম। গারে কে জানে, তখনও হস্ত দিগারেটের গহ। বাবা টের পেল কি পেল না সেটা বুঝতেও দিল না।

দিন দুই পরে সন্ধ্যাবেলায় বাব হাতের ছুদি-কোড়া বেতে ঘিরে আসি। হাতে টাকা ছিল না। বাবার অফিস থেকে কিহু মোনি। ছুটি সঙ্গে সঙ্গে রদ্ব্ব্ব করেছিল লোকটা, আগাফের আয়ি' করল না। প্যাকিং বাব আর কড়া সিরাপের গড়ে কিম্বিধ করা আড়তে বসে দরখাস্ত আমার হাতে ফিরিয়ে দিল।

—অনেক বিশের টাকা ব্যাকী। আদার বেই, পলার বেই।

বাস, এই পর্যন্ত। টাকা গারে কি গারে না, লপট করে হল না। আবি চলে এলাক। সিরাপের গড়ে কিম্বা জানি না, মন হু-হু করছিল। একটা বাবা কাদা ভোলা পলার এসে ঠেকে গিয়েছিল। আমার ফই তখন পলার উঠে এসেছিল কিম্বা জানি না।

মন কোষার থাকে জানি না। শূনে শূনে গলগা হয়েছিল, কলিগা, কলকুস, কিম্বা এই ক্ষেজই কলকগাই কোথাও থাকে।

কিহু লোক নারি নারি সন্ধ্যানো যোতলে খুব কিলেক, কটা কলকোনো কলকোর ভেলে ভরছিল আর ছিপি এটে এটে বকু ছড়িয়ে প্যাকিং বাবে পুঁহছিল। তলপেট থেকে একটা গা বহিবনি ভাব উঠে আসছিল। কে জানে, মন হস্ত তলপেটেও থাকে।

বারও বেশি ক্ষেলে অবশ্য, মনের পরবর্তিত কোষার আনতে ব্যাকী ছিল না। জেনেছিলাম মন আসলে,

হল মৃণালিনী, তবে পরীটাই তার শীমা, তারই মধ্যে নড়ে-কড়ে বেড়ায়। যখন খিদে মূৰ চাপে তখন পাকস্থলীকে খালি সোরে মন গিয়ে মূড়ে বসে সেইখানে। গীত কনকন করলে, মাড়ির পোড়ায়। মাথা যখন হিঁড়ে পড়ে তখন কপালের মৃণালের রগে।

অথচ যখন পেটভর্তি, গীতবাখা, মাথাব্যথা কিছু নেই, একমাত্র তখনই মন স্থান পায় বৃকে।

মা বলেছিল পাড়ার সন্নিকটবর্তী লোকানে যেতে। সেখানে যাইনি। গেলাম বেপাডায়। হিংস্রতা, মনুষ্যের একটা দোলাই ছিল, সেটা গায়ে ঝড়ের তারই ভেতর মূলিছোড়া লুকিয়ে গেলেন্দু মনে আছে। তবু পা সরহিল না। আমায়েরই জিনিষ, তবু কী লজ্জা, কী ভয়, আর দাবের জিনিস হাতছাড়া করার কী ঘোর সংশয়, সব সেই শীতের সন্ধ্যার ট্রে পেতেছিলাম।

চুকেতে বাই। লোকজন আসে, সরে গড়্কাই। পিছনে গায়ের শব্দ শেলে ঢেকে উঠে। শীতে মাথার চামর মূড়ি দিয়ে মাথারিগারি লোক পিঁপড়ের বড় নিঃশব্দে হেঁটে গেলে, তারা কেউ লড়াছোনা, সকলেই এত শব্দব্যত, তবু ওই কী খিদে আমার হাতের লুকানো মূলিছোড়া যেন সেবে নিচ্ছে! ওম সকলে জানে আমি কে, আমার হাতে কী, কেন ওখানে এসেছি।

অভাবের ছদ্মস্বরূপে অশপক্ষপ পরিচয় ছিল। অভাবের লক্ষণের সঙ্গে মতোমতো হওয়া সেই প্রথম।

কল্যাণ একটা পাথরে লোকটা মূলিছোড়া বলে পরব করছিল। তার মূৰও পাথর, কতকাল থেকে হাড়িয়ে সেবে আমিও পাথর হয়ে গেছি! যদি লোকটা মাথা ফুলে হঠাৎ বলে, তোরাই মাল? যদি—যদি বলে, না সন্ধ্যা নয়, ওর কিছু নয় নেই!

পরব করা সন্ধ্যা হলে হোকানের লোকটা মূলিছোড়া সরিয়ে রাখল। আমার দিকে তাকাল না। ওর পাশে ভুতের বড় তাম্বিত আরও ভিন্ধন লোক চুপচাপ বসে ছিল। তাদের একজনের দিকে মন করে একটা টাকা হুড়ে দিয়ে বলে উঠল, কমা মাংস আনবে কিম্বা। রাত্তি আর দিনার টুকরো যেন থাকে। মূৰ



—ওই বস্তুতে থাক মূৰি?

কাল হবে আর গল্প থাকবে। আর শীত, তাতে আমার মেঘ করেছে। বাতলা হাওয়া দিচ্ছে। তাকাতাড়ি কাঁপ বন্ধ করব।

সে কেমন শুভ্রসে গলা, তার কপা দেবার ল্যাক আমার নেই। ঐটুকু বলতে পারি, তেমন গলা আসে কখনও মূৰিনি।

হাই ফুলে, চাদের ঝড়ের তিনটে লোক উঠে গেল, হোকানী তখনই যেন আমাকে দেখতে গেল। অনেককাল ধরে আমাকে দেখল। আমার মূৰের শিকনো রূপ, লোকের মেখা, মূর্তির হাসল মাড়ি। ও কী বলবে আমি ভাবছিলাম। যদি বলে, মূলিছোড়া তোমার কই আমার। তখন তখন কী চোঁচ? কে আপরে। এ পাড়ার কাউকে চিনি না, শীতে নিশ্চিন্ত রাত্তিটা স্নেহমূর্তির পদ হয়ে গিয়েছে। স্নেহমূর্তিতে সবই সম্ভব।

—ওই বস্তুতে থাক মূৰি।

ভেবেছে অলসোক নেই। চোঁচের বলতে গেলেন্দু,

না আমি ভুলোক, 'স্টুডেন্ট, বাক' ইয়ার, আট'সের
কৃত্যের মত মন আছে। কিন্তু বললে ও কি
বিশ্বাস করবে।

—সেখন্দ, বিত্তর খাল আছে।

সোনার না ভত্তর? কুলি দারা বঁধা দেব, বেচে
খাও, ভাতের ভত্তর খাব থাকে। লোকটা আমাকে
ভাবিয়ে দিল। কথার মর, ক'শার। চোখের
ভাবার।

—কিঞ্চি টাকা পর্বত দিতে পারি। আমকের
মত বাকতির দিকে। এই দ্যাখ না, কাসকে
দিয়েছে...

আবার তর সইছিল না, কুলকুলান বান দিচ্ছিল,
চোখের পাতা লম্বা লম্বা করে। কাসকে কী দিবেছে
জানতে না চোখেই আমি হাত পেতে দিলাম। কড়কড়ে
কিঞ্চি টাকা।

স্বাস্থ্য পা দিয়ে দেখি, আলোয়ালো ঘরারীতি
কিরে এসে গ্যাসের ঝুটির চৌপরের তলার কোঁকোঁস
করে ভদসে। বাড়িগুলো সব চেবা চেবাটা নিয়ে কের
দাঁড়িয়ে। চাঁব বাসের আগুয়াকও কানে কিরে এল।

হাতে টাকা থাকলে আর কিছু ছব্বনে থাকে না,
সব ঠিকঠিক ঠেকে, ভরটর লম্বা ইত্যাদি সব
উবে যায়।

সব ঠিকঠাক আবারের বেলায় অবশ্য হল না।
বোল দিন পরেই ওই ফোকানে আবার কিরে এলাম।
এবার আংটি নিয়ে। হাট দিয়ে। আর চার দিন
পরে—এবার হাতে হুপোর একটা পানের ভিবে।
আবারের আর কিছু ছিল না।

কেন না, বাবার আরও দু'দিন নাক আর গলা
দিয়ে বড় উঠল। সে উঠে বসতে তারপরও পালল
বটে, কিন্তু মোজা হয়ে আর বাঁচাল না।

আমরা দু'কোঁকোঁয়া, এ ভাবে আর চলবে না। দিচ্ছিলে
হা চালান করে দিল লম্বাক' আবারের হায়া হা একম
একমবের বাসার। সবলকে হা বলত দ্বিবি বেড়াতে
গেছে, আমরা কিন্তু জানতার গেছে বাইগির করতে।
হাফ হামবী নুর্নেহিলস আবার বাচ্চা হয়ে। ওই
দব্বহার সব দিক সে সামলাতে পারছিল না।

বেবে বেবে বেলা বাড়ছিল। অর্থাৎ আমি বড় হয়ে
উঠছিলাম। বাড়িতেও আর হাকশ্যাস্ত পরভার না।
বাবার শেভিগ নেটটা কেড়ে পুঁছে নিয়ে দু'দিন আড়ালে
বাড়ি কাবিয়ে ফেলেরিলাম।

হা বলল, এবার তুই কোথাও একটা কাজ খেব'।

খেলাম। সেই দেখার বিবরণ বাহলা বলে বাস
সেব। সেবে বেবে চোখ বখন প্রায় বানা, তখন একটা
চাকির পেলার।

মাকে বললাম, মাস মাস বাট টাকা করে বেবে। কী
কাজ, কোথায় কাজ, হা কিছু জানতে চাইল না। বাট
টাকা পুঁনেই মার মুখ দাঁষ্ট হয়ে উঠেছিল। বলল, তোর
মাকে প্রমাণ কর।

করলাম। আম'সির মত পুঁনো মুখ, কাঁচাশাকা
দাড়ি। বাবা কী বলল ভাল বুঝলাম না। সেই
ভরাভরা গলাব ম্বর বাবার আর ছিলনা, চোরা বাপের
মত হয়ে গিয়েছিল। বিবতম্মাল বুক থেকে থেকে
উঠত আর নামত।

আর সেই প্রকাত বড় হাচাটা কোথাও ছিল না।
এক পাশে সরে সরে মিশিয়ে গিয়েছিল। বাবার বিহানোও
পাতা চত খরের এক পাশে।

বাবার কথা হা বুঝল। বলল, যোকা তোর বাবা
তোকে আশীর্বাদ করছে। বলছে, মাইনে শেরে এক
বরম আচার কিয়ে আনিস।

মোলা বেড়েছিল। স্বাস দু'ন, সমস্ত বাঙরা বাবার
ছিল বাসল। বিড়ি বাঙরাও বহু। ভব' কামত। ককে-
গয়েরে বিহানা মাঝামাঝি হয়ে থাকত। হা দাক করত
সব। আবার হাত বুঁদে আসন পেতে আমাকে পরিপাটি
করে যেতে দিত।

সেই অসুর বুকো হেঁটে হেঁটে
খরম পুঁদে বেড়াত। নাড়ুসোপাল
হয়ে থাবা তুলে বরত কখনও কখনও।
বলত, যেতে হাও।

আমি একটু একটু বাড়ছিলাম। চুলদুলো
কাঁপালাম, উলটে দিলাম একদিন। আবেশ'ট কাচিয়ে
এবে এনে বব্বরে পাট' পরভার। মাইনে বেড়ে বখন মরত।

টাকা হল, তখন আমার মাথা দেবার জন্য আসার তেল
না-ই আনিবে ছিল। আমার পকেটে সিগারেটের ভাঙা
প্যাকেট থাকত। পিটটা এক লম্ফে কিনতাম।

আর বাবা? তার আর অশ্রু বারোইন বটে, তবে
একটু একটু করে কবে যাক্সিল। বিব্রীভাবে বেরিয়ে
পড়েছিল বুকের সব কটা রূপ। একে একে সব কটা
দাঁতই গিয়েছিল।

মা বাবাকে লুকিয়ে লুকিয়ে কাল রাত্রি একটু একটু
দিত। চিবোতে পারত না তো, বাবা শব্দ চাটত।
চাটত বাতির গা, বাবার চোঁহ-জটি। আর আমি মাকে
বা বিভ্রম, যা তা থেকে বুঁটার আনা দিত বাবাকে।
বাবা তোবকের ডলার রাখত। মাকে মাকে বের করে
গুনত। শেষ পর্যন্ত গোনাটাই একটা বেলা হয়ে
দাঁড়িয়েছিল।

আরও জ্বানি, আমার ফিরতে যেবি বলে বাবা
হুটফুট করত। ঘন ঘন বসন্ত গিয়ে বাইরের হাওয়া।
আমাকে দেখতে গেলে অসুস্থ কৃত্যব', নিশ্চিত হাসিতে
তার মুখ ভরে যেত। আমি বসন্তান নাকে। উঠতে
হাও কেন? ঘর একটা কাণ্ড ঘটে, ঠাণ্ডা লাগে,
শুধে বায়?

মা বলত, বন্ধক বন্ধক। ক'দিন আর। বসন্ত হলো
ভাবনা এখন বাড়ছে। তুমি বুঝবি না।

সেই ছায়াটা আর কোথাও ছিল না। নতবড় মূর্তিটা
ভিরোহিত হয়েছিল। ভারাই যার না, এই বাবাই
দিন তার ব্যক্তি দিয়ে সব ঢেকে রেখেছিল। সিগারেটের
গন্ধ শূঁকে আমাকে মেয়েছিল।

আর, বাবাও একদিন নিজেও সিগারেট খেল
আমার পকেটে থেকে তুলে নিয়ে। অথবা না-ই তুলে
দিয়ে থাকবে। মোড়ের মাথার গিয়ে ঘুরতে গিয়ে যখন
হিসাব বিলল না, তখন ফিরে এলাম। রাগে চোখ
ঘুরছে, মাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বুর-বনকালান
মা শ্রীকার করল।

—বিড়ি সিগারেট খাওয়া না বাগল। অশ্রুের
একটা বাড়বাড়ি না থরিরে তুমি দেখছি হাড়বে না।
বাবাকে তুমিই নারসে।

মা সেই পুরনো যুক্তি দেখাল। কচিব্যাচ, দুখ,



লম্ফার লেপ পিড়াই ছিল না। কলতলার কোণে
বসে...বুকে হাত দিয়ে বসে পড়ে নন শানদা'ছিল।

কথার অল্প ভোতলানির আভাস। না বেলেও বি
আর বেশদিন বাঁচবে বলে মনে করিল। দেখছিল না
শরীরের হাল। শব্দ ক'খানা তো হাড়।

বিব্রী পলার বললান, তা বলে বিড়ি খেত, তাই
বাক' না। আবার সিগারেট কেন?

—আহা বাক না। একটা শব্দ বিড়িরে নিক। কো
দিন শু থাকনি। অবস্থার কুলোয়নি। ভোর বেলা
হলে তুমি-ই কি পারবি।

—তাই বলে হেলের প্যাকেট থেকে? লম্ফা
লেপ সেই।

শব্দ ক'খানা হাড় তখন কাশছিল। লম্ফার লে
পিড়াই ছিল না: কলতলার কোণে বসে এক একট
দুখটান দিয়ে বুকে হাত দিয়ে বসে পড়ে ন
শানদা'ছিল।

সেই অবস্থার বাবাকে দেখলান। চোখে তা
পড়তে বাবা বোকা'র নত হাসল। চোখ নামাল

কলঙ্ক-কাণ্ড-ব্যাখ্যা

বাবা আমাকে একদিন মেরেছিল।
 আর মারতে
 অপর ছাত উঠে না।
 অথচ একদিন কলোশাথকে তাক
 করে গুলতি হুঁড়েছিল। অন্যরা
 সবাই কি তবে এই গুলতিই হুঁড়ি।
 সমর এসে খেনে চাই, পেরি এটি
 ফলো যে, মারব থাকে, সে আগে
 পেরেই মরে থাকে। মৃত,

আত্তে আত্তে লরে এলাম।
 পেয়েছিল। মূখ্য করেছিল। বাবাকে ?
 তার এই কলঙ্কে ? কলঙ্কলার স্মৃতিস্মেতে
 মেয়ালে আর একটা ছায়া পড়েছিল। কাত, আনি
 চিনলাম। বাবাকে সরাতে সরাতে আর একটা ছায়া
 বাবার মতই হয়ে গেছে। লাগতে, রাগে, হোজগারের
 কোরে আর বড়াইয়ে এ পরিবারে আক যে বহু, এ ছায়া
 ছাত থেকে তার রেখাই নেই, এ বাড়ির আনাত-কানাডে
 এ ছায়া টেনে টেনে সেই বেজারে। বাবা মরেছে, অথবা
 কে জানে, বাবার চরিত্র মূখ্য নেই !





সাহিত্যে প্রকাশ বড়ো
যে কটা বর্ণনাও
বর্ণনাও। যাঁরা ভেঁট
কবি তাঁরা পাকাতিলি দিয়ে

বাংলা সাহিত্যে বীন্দ্রনাথের প্রভাব ডাঃ ত্রিভুবান বসুস্বামী

জনা হুসনা করলে
উভয়ের ভারবিন্যাস
পাখীরা সহজেই অবতৃত
হবে, এবং এই পাখীরা

কল গ্রহণ করেন না। বরি কোন পদ্যপ্রভাব বাতাসে
ভেসে তাঁদের কাছে আসে, সেটা তাঁদের অন্তর্নিহিত
পক্ষির সঙ্গে এক হয়ে মিশে যায়। সেক্সপিয়ার
তাঁর পদ্যগারীর কাছে কতটা কলি ছিলেন তাঁর হিগাব-
নিকাশ কে করবে? সমস্তে বাস্তবিকভাবে তাঁর অপর
প্রতিভা-সমস্তে তাঁরা কোথায় ভুলিয়ে গেছে। যেখানে
বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে কল-গ্রহণ স্বীকৃত হয়েছে
যেখানেও ঐশ্বর্যময়িকের বাদ্য-সঙ্গমে গৃহীত
উপাসনের একটি আনন্দ রূপান্তর সাধিত হয়েছে—
ইতি কবি চন্দ্র শূন্যক সেক্সপিয়ারের বায়ানোয়ের
রূপসৌন্দর্য-নির্মিত হয়ে তাঁদের বহুগুণ্য হারিয়েছে।

এর বিপরীত প্রসংগে মহাকবি তাঁর যুগের উপর
কিছু প্রভাব বিস্তার করেন। বীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর
সমসাময়িক বা ঐক্য-পদ্যবীন্দ্র সাহিত্যিকগণের কবির
প্রকৃতি ও পরিমাণ কিছু। এক হিসাবে বীন্দ্র প্রভাব
সুদূরদেশের ন্যায় দূরবাস ও বিশেষজ্ঞাভীত।
তিনি তাঁর কবিতায় ছায়াবস্ত্র আনন্দের জ্বরের মা-
খানে ধ্রুই নিয়ে হস্ত আনন্দের নমন-সরকে প্রতিভাত হন
না। তিনি আনন্দের সাহিত্য-স্রোতের মর্মসুখে
অধিষ্ঠিত থেকে আনন্দের কল্পনা-বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশ-
ভঙ্গী নিয়ে প্রত্যেক প্রভাবের রূপে গ্রহণ করেন। তাঁর
পরবর্তী কবিতা তাঁর চোখ দিয়েই জল ও জীবনকে
সেধে বসেই তাঁর ভাষা স্রোতনভাবে অনুপ্রাণ করেন।
কি না তা অসংখ্য প্রসংগে ঘটিয়া। তাঁরা যে বড়
ভারবিন্যাসের সাহিত্য প্রকৃতির সৌন্দর্য ও জীবনের
সমোচ্ছলতা উপভোগ করেন তা বীন্দ্রনাথেরই দান।
বড় ও বীন্দ্র কবিকল্পনাসাধিত রূপান্তর যে বিশেষ
বৈশিষ্ট্য তিনি প্রদর্শন করেছেন তাইই মোক্ষম
কবিতা সব কবিই আঁশিতে রাখেন। কাজেই এই
প্রভাব গভীরপাণী, অনতিক্রমা ও হৃদয়-নিরপেক্ষ।
বীন্দ্র-দ্বৈত যুগের কবির সাহিত্য বীন্দ্রনাথের-যুগের কবির

যদি একটি কারণ নির্দেশ করা যায়, তবে নিশ্চয়ই
কলা চলে যে ইয়া বীন্দ্র-প্রভাব-স্রোত।

বীন্দ্রনাথের চোখে ঐক্য বৈশিষ্ট্য কবিকল্পন কবির
আপেক্ষা করলেই এই প্রভাবটি আরও পরিষ্কৃত ও
সবোচ্ছলিত হবে। সত্যোত্তমায় বস্তু, বীন্দ্রনাথের
বাগ্‌চি, কল্পনাবিশেষ বস্তুোপাধায়, বীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত,
মোহিতলাল বসুস্বামী, নরেন্দ্রনাথ বসু, কল্পনা-
মল্লিক—এঁরা সকলেই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সহজেও বীন্দ্র-
নাথের উত্তরাধিকারী। কবিরূপনার প্রসঙ্গটি, কবি-
বস্তু রূপান্তর ও রূপ-পরিণতি, ভাব্যপরিণতি ও বৈশিষ্ট্য-
কল্পনাসুতির কারণে আন, কাব্যের দানপ্রকৃত আনন্দের
ছায়া—অন্যকারের নিগূঢ় প্রভাব—ইত্যাদি কাব্যমর্ম-
কোলে বস্তু-স্বভাব-বস্তুয়ের মধ্যে এঁরা বীন্দ্রনাথের কাছেই
হীলা নিয়েছেন। অন্য এঁরা যে পদ্য-মর্ম-সিদ্ধি
লাভ করেছেন তা বলা যায় না। সত্যোত্তমায় বীন্দ্রনাথের
ভাব্যপরিণতি ছিলেন এবং তাঁর কল্পনামল্লিক উদাত্ত সুর
মাঝে মাঝে অনুপ্রাণিত করেছেন। কিন্তু তিনি ছিলেন
সবু ও চটুল; তিনি ছবি ও রং নিয়ে খেলা করতে
ভাদবাসভেন ও ছবির দিকে তাঁর অতিরিক্ত তৌকি
ছিল। সত্যোত্তমায় বীন্দ্র-প্রতিভার সাধপ্রকৃতির একটু
কল্পনা-মর্ম-মাত্রই তাঁর কবিতার প্রতিফলিত হয়েছে।
মোহিতলাল ও বীন্দ্রনাথের মোক্ষম বীন্দ্র-বৈশিষ্ট্য
আছে। কিন্তু তাঁদের কাব্যের কল্পনা-সম্প্রতি ও
প্রকাশভঙ্গী মতো বীন্দ্র-প্রভাব দুগুণ। এঁরা
বীন্দ্রনাথের জীবনাম, অধ্যায়প্রভাব ও সৌন্দর্য-
বোধের বিরুদ্ধে বিরোধ ঘোষণা করেছেন, কিন্তু এই
প্রভাবাধানের মধ্যেও তাঁর কল্পনার রূপবৈচিত্র্য, আনন্দ-
প্রাচুর্য ও প্রকাশ-সম্প্রতির নির্দ্বন্দ্ব প্রভাব আছে।
নরেন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় উন্নত বৈশিষ্ট্য উত্তমতা ও
অপর কোমোদিত আশ্বাসনে সুদূরত কাব্যাকল্পনার কথা
সব সবার ভুলেছেন, কিন্তু তাঁর গান ও গীতি-কবিতার

রবীন্দ্র-প্রভাবিত সৃষ্টি অব্যাহতি ও সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় সহজেই লক্ষ্যীয়। কল্পনাবিধান, কল্পবৃত্তন ও কালিলাস একান্তভাবে রবীন্দ্রনাথের শিল্পকলার অঙ্গগামী বিভূত রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রসন্ন মহাশক্তিপ্রতিভার পরিচয় লেগে যেন অপরূপ-হারায় ঘানিকটো স্নান হয়েছে। তাঁদের পল্লীপ্রীতি, প্রাচীন ঐতিহ্যানুভূতিতা ও শান্ত ভাবুকতা রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে যেন বিচ্ছিন্ন একটু অংশ নিয়ে স্বল্পতর সীমিতে উদ্ভাসিত হয়েছে। সৌরভগতের সমস্ত এই উপগ্রহের ন্যায় রবীন্দ্র পরবর্তী-দৃশ্যের প্রায় সমস্ত কবিতা সোপানী হ'লি ম'ল কে ই প্রদীপ্ত করেছে।

অবশ্য অতি-আধুনিক কবিতা রবীন্দ্রনাথের সর্ব-ব্যাপী প্রভাব থেকে মুক্ত হবার কঠোর সংকল্পে তাঁকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনমণ্ডল ও জনতার কল্যাণের পরিচালনামূলক বিষয়সমূহ তাঁদের বিকট এমন সম্পূর্ণ-মুগ্ধ অগ্রাহ্য যে তাঁরা তাঁর ভাব-পরিচয় ও কাব্যকলা-সাধনার পরিধির সম্পূর্ণ বিহীন। তাঁরা যে বিশৃঙ্খল, নৈরাস্যের অস্বাভাবিক অসুখে, জীবনের ভাবগর্ভীন, প্রসঙ্গমূলক বৈয়াক্যে বাস করেন, গ্রন্থ কবি যেন তাঁদের কাছে একটি নিবেদনোক্তা জ্যোতিষ্কের ন্যায়। তাঁদের কবিতার আশিষ, বসন্তবন, চিত্তাভাষা ও রূপনির্বাণিত সবই যেন এক হারানো হৃদয়ের স্মৃতিতে পর্যাণুল, এক বিন্দু স্মরণীয় ইতিহাস-বিকীরণ দাগবানবে মুক্তিতে ব্যত। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে সৌন্দর্য্যভাবের, আশ্রয়প্রাপ্তি পশ্চিমদৃশ্য উদ্ধার করে তাদের এক বিশৃঙ্খল পরিবেশে জাদন ও তাদের উপর এক ভয় জন-আশ্রয় প্রদান করেছেন।

তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ রবীন্দ্র-অস্বীকারিতার মধ্য দিয়েই এক অদৃশ্য আকর্ষণে তাঁর সন্নিপত্ত হয়েছেন। আশা করা যায় যে আধুনিক কবিতার ধারণার জীবন-জিজ্ঞাসা যখন একটা স্বাভাবিক পরিণতিতে পৌঁছাবে, তখন তাদের প্রকাশপ্রীতি ও জীবনানুভূতির উপর রবীন্দ্র-প্রভাবের প্রতিফলিত আরও ব্যক্তমান্বিত হবে।

(২)

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনা হ'লি বিচিত্রমণী আদর্শের টানে বিধাবিকৃত। তাঁর প্রথম তরুর রচনা সংকলিত গদ্যসংগ্রহবিশেষের আদর্শে দেখা। লক্ষ-প্রমাণে, ঘনি-স্বপ্নায়, কল্পনামণ্ডিত, কাব্য-সুভাসিত ভাব-সৌন্দর্য্যে এ যেন একটি অপরূপ ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ। তাঁর প্রাচীন সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য প্রভৃতি পর্যালোচনা-প্রসূ, কোন কোন কাব্যরচনা প্রসঙ্গে, তাঁর মহাত্ম্যের উপন্যাস ও ছোটগল্পে, তাঁর লিপিকর ন্যায় ভাবোচ্ছ্বাসের, পীড়িত-মুগ্ধতার হৃদয়প্রতিফলিত রচনার মাধ্যমে যে গদ্যপ্রীতি পাই তা তাঁর কাব্যেরই যোগ্য, কবির সূত্রমত্রে অঙ্গপ্রতিভা। তারপর, বিভিন্ন-তরুর তাঁর কাব্যে গদ্য



কবিতার প্রবর্তনের দ্বারা ও তারও অনেক পূর্বে তাঁর গদ্যে বীরবলী-প্রীতির প্রভাব পড়েছে এবং তাঁর সমস্ত পরবর্তী রচনায় এক তাঁর সাক্ষ্যপ্রত্যয়। এক চোখ-বিরানো মননপ্রীতি, এক আবেশহীন বুদ্ধি-বাসের হৃদয়স্বাধীন গতিহীন আবেশের বিশিষ্ট করেছে। কবির ভাবাবেগ ও আত্মবুদ্ধি কল্পনার গির্জা যেন যে এমন স্বাভাবিক বুদ্ধির শাণিত চাকচিক্য, যবনের এমন

অস্বাভাবিকতা-প্রকাশের মত।

অনুমান করতে পারি নি। সময় সময় এটা তাঁর একটা ভাষাতে দাঁড়িয়ে—যেখানে আবহা প্রভ-আবেগ প্রকাশ্য করি সেখানেও এই শূন্য আতঙ্গাঙ্গীর খেলা বর্শীর বহুকে অতিক্রম করে আপনাকে জাতির করেছে। এর একটা ফল হয়েছে এই যে তাঁর পরবর্তী গদ্য লেখকেরা এই আদর্শ-সংগঠিত বিস্তার হয়ে কোন রীতিকেই সংকীর্ণভাবে অনুসরণ করতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথের এত অপার্থীত মানসপটিক এই গদ্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে যে তাঁদের মধ্যে শূন্য ভুলবার অনেক কম, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের অনুবর্তনে সাহসী হন নি। অধিকাংশই বীরকলী কব্যরীতিরই অনুসারী, কিন্তু এখানে তাঁদের আদর্শ বিচিত্র ঐশ্বর্যের রবীন্দ্রনাথ দান, একসঙ্গে কণ্ঠভঙ্গীর অধিকারী, ব্যঙ্গনিপুণ প্রবণ চৌহুরী। কাজেই গদ্যে রবীন্দ্র-অনুবর্তীর সংখ্যা খুবই কম। মৃতদের মধ্যে অজিতকুমার চক্রবর্তী ও জীবিতদের মধ্যে প্রবন্ধাথ বিদ্যাকেই এই অত্যাশংক্য লেখকদের মধ্যে স্থান দেওয়া যায়।

নাটকে রবীন্দ্রনাথ আরও নিঃসঙ্গ। নাট্যকল্পনা দলদলে তাঁর একটা পরীক্ষার্থী গুলত অধির মনোভাষ ছিল, নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তিনি এর ছাঁটটি আবিষ্কার করতে উৎসুক ছিলেন। কখনও পানের তরলভাষ, কখনও সূত্রের গহনে, কখনও কাব্য-খ্যানের পূর্ণিত সন্ততন্ত্রমিতে মানসিক বশের ট্রেট খেলানো উচ্চনীতির অতিক্রম অতিক্রম, কখনও প্রবাহক, পঞ্চাঙ্গপ্রবর্ত নাট্যরীতির অনুসরণে, কখনও বা মূপকের অন্তর্ভুক্ত আলোকে অধ্যায় আত্মতার অতীতির সঙ্গীতের মধ্যে তিনি নাটকের আত্মার সারস্বতীয় হয়ে অনুসন্ধান করেছেন। শেষ পর্যন্ত মৃত্যু ও আবৃত্তির মাধ্যমে তিনি

এর পলাতক সত্তাকে স্বেচ্ছায় করতে চেয়েছেন। এই সন্ত পটীক-প্রক্রিয়ার মধ্যে তিনি নাটকের অঙ্গ-বিন্যাস-কল্যা, এর আত্মার সঙ্গে স্বেচ্ছায় সঙ্গম মিলন-কৌশল আবিষ্কার করতে গিয়ে কখনই সম্পূর্ণ সফল হন নাই। গভীরাট্যবোকে ভেলে, বিশ্ববস্তুর বর্ণনামূল্যে, সংঘাত-কেন্দ্রের স্বাভাবিকরণে, অসামান্যের বক্তৃতা, মৃত্যু মানকরণের মধ্যে মৃত্যু ভাষণের আগে তিনি নাটকের তাঁর বিশিষ্ট জীবনবোধের বাহন করবার সাধনার ত্রুটি ছিলেন। এইখানেই রবীন্দ্রনাটকের অনন্যকণীত্ব রীতি পঞ্চ-সকালদের পর তিনি শেষ পর্যন্ত মূপের নাটকের আকাংক্ষাভেই দ্বারী আত্মর স্বেচ্ছাছিলেন। মাটির মানব ও তার বশ, তার সাংসারিক জীবনে প্রতিজ্ঞার তাকে আকৃষ্ট করেছে ততটা নিজে অন্য নব দত্ততা অধ্যায় আত্মতার প্রতিজ্ঞাশ্রমে আমদা ঘন অর্থনৈতিক বৈধতা ও শ্রেণী সংগ্রামের, বড় জোর মানবিক প্রবৃত্তির অগ্রহণ আত্মপটনের বৈধতাকে নাট্যমূল নিতে চাই, তা রবীন্দ্রনাথ ঘনশ্রান্ত জীবনের অসুস্থতা ও অন্তর্গত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ঐশ্বরী নীতির সঙ্গে তার মনীষা বিশ্লেষ ও তার পুষ্টি লাভের আকৃতিতে অবলম্বন করে নাটক রচনার অভিলক্ষ্যী। তাঁর নাট্যকলা ও জীবনবোধের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে গঠিত। মৃত্যু যে পর্যন্ত আবার জীবনবোধের মূপের না যে পর্যন্ত আবার সংসার-জীবনে অস্বস্তিহীন করবার সাধনা নীতিত না হয়, সে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাট্য অতীতির অনুভূতিবিশিষ্ট নাট্যকলা আবার জীবিত সাহিত্য-চর্চার পটীর প্রভাব বিস্তার করতে পার হলে হলে হয় না।



এটা বইয়ের ভূমিকা নয়, আমার এম্বাহার। বইটার সঙ্গে একটা হত্যাকাণ্ড জড়িত। আর প্রত্যেক হত্যাকাণ্ডই, আমাদের, এমন কি, আমাদের না হয়েও যত্নকে এম্বাহার দিতে হয়। হত্যা ব্যাপারের এই এক সোপ, এবং এই মন্তব্য। এবং এই আমাদের জন্যই, অনেকের মনে হত্যাকাণ্ডের সাধারণতঃ সত্য হয় না। কারণে উঠেও সহসা হাত উঠতে চায় না।

কে হত্যাকারী?—এই বইটির হত্যাকারী যে কে তা খুঁজে বের করতে মনোমগ্ন আপনাদের বেশ পেতে হবে। থাকে এবং থাকে-থাকে হত্যাকারী বলে সন্দেহ করবেন অবশেষে দেখা যাবে যে সে নয়। যে লোকটি মনে হচ্ছে আর যে গোয়েন্দা এই দুইজন হাতা প্রায় দবার প্রতিই আপনাদের সন্দেহ হবে—এবং লেখক হিসেবে সেইখানেই তো আমার বাহাদুরি! এমনকি, এক-এক দূরে গোয়েন্দার প্রতি সন্দেহ জাগাও কিছু বিচিত্র নয়—বাহাদুরি ওপরে সেটা আরো এক-কাঠি। এমন কি, শেষে যদি এমন মনে হয় যে দুইজনও লোকটাই নিজেকে বুন করেছিল (অথচ সেটা তার আত্মহত্যা নয়) তাহলেও আমি কিছুমাত্র আশ্চর্য হব না।

ভিত্তিকভিত্ত বইয়ে আশ্চর্য হবার কিছু নেই—যদিও আশ্চর্যের বিষয় পরে-পরে হয়ে হয়ে বড়ানো থাকে। অবশ্য, শেষ পর্যন্ত কী আপনারা দেখবেন, (একজন হত্যাকারীর দেখা পাওয়াও মোটেই নিশ্চয় নয়), সেটা আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গির ওপরে নির্ভর করে—আমার দিকে তা বলা যায় না। তবে একটা কথা আমি বলতে পারি, এবং বলতে চাই, যে থাকে আপনারা কিছুতেই সন্দেহ করবেন না, করতেই পারবেন না—আমাদের সেই হচ্ছে এই বইয়ের হত্যাকারী। সে হচ্ছে আমি। আমিই এই বইটিকে রচনা করেছি, এবং এই জন্যই আমার এই এম্বাহার।

ভিত্তিকভিত্ত মূল আমি লিখি না। লেখেন আমাদের সমসাময়িক—স্ট্রাউসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্তের মতো।

এক গোয়েন্দা কাহিনীর ভূমিকা "নিবন্ধ" চুক্তি

আমার হচ্ছে যত হাস্যকর প্রাস। তবু কেন যে আমি তার পশ্চাদ্ধাবন করে এই দুঃসাহসিক অশ্রবণে

লিখ হয়েছি তার সৌন্দর্য একটু ইতিহাস আছে! আমার এম্বাহারের মধ্যে সেই কাহিনী লিপিবদ্ধ হল।

ব্যাপ্তির অন্তে হানুস কি না করে? ব্যাপ্তির ব্যাপ্তির একটা আসাদ। এমন কি, লেখকরাও চায় তাদের ব্যাপ্তির চৌহদ্দি বাড়ুক। যিনি কবিতা লেখেন তিনি হঠাৎ উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেন, আর উপন্যাসকার তার চার পোয়া কীতি উপড়ে উঠে কবিতার হাত পাকতে লেগে যান—নিম্নগতক ন্যায় কবিতার। এমনই হয়ে থাকে। অতএব আমি কিছু তার ব্যাপ্তির হতে পারি না।

তবে, আমার যে ব্যাপ্তি আছে, যা কলিত হতে পারে, এ সন্দেহ আমার কখনো ছিল না। কিন্তু সন্দেহিত সে ব্যাপ্তি আমার টলেছে। একজনকে পড়াবাতেই আমার সেই ব্যাপ্তি টলিয়ে দিয়েছে।

যে দুইজন ডাকঘর ছিল না, ডাকঘর একবার, লেখকদের কী কলিতাই না গেছে। নিজেরের ব্যাপ্তির বহর টের পাবার কোন উপায়ই তখন ছিল না। দুই দুইজনকে পাঠক-পাঠিকার বাহ থেকে চিঠিপত্রের মদ্যার নিজেরা লিখবার না এলে লেখকরা কি সাধ হয়? লেখার আশায়ই সেল যায়। আপনায়ই বসুন। অথচ ভবভূতির কথাই বসুন, বিশ্বা কালিদাসেরই বসে থাক। তাঁদের দুইজনের কথা ভাবলে আমাদের দুই হবে। চিঠি পেতে না, কিছু না, তবু কোন্ দুইবে যে তাঁরা লিখতেন লিখে লিখে মরতেন, তাঁরাই জানেন।

ব্যাপ্তিক, তাঁদের কোন বইটা পাঠকসমাজ ঠিক কী ভাবে নিল জানবার তখন কোন উপায়ই ছিল না। বেশ না, তখন ডাকঘর ছিল না, তাই পাঠকসমাজ জানাবার কোন উপায় ছিল না। সত্যি বলতে, কোন লেখক তাঁর পাঠকদের বাহ থেকে কতদূর করে চিঠি পেতে থাকেন তাই তো তাঁর সাক্ষ্যের নিদর্শন। কেবল সম্মান হওয়াই না, একবার বাদলও তাই।

অবশ্য, ডগডুটির বাল্যকালের চতুর্পাঠীর প্রাক্কন সত্যিকার করেই ছিল। পরবার বেতে গেলে তাঁর দেবার বাহবা বিতে কাপাল্য কবিতা না, পাগল পিঠেকের বিনাময়ে চিঠিবিনয়ী তারা তাঁকে উৎসাহ দিয়ে এসেছে। এবং হরত কাপাল্যের ভাষ্যও একেবারেই বড়ভূমি ছিল না। বহায়ায় বিজ্ঞানবিভাগের উৎসাহিনী প্রতীক, এনামিক বহুৎ বগলপালও হরত, কোন-না-কোনমিন তাঁর পিঠি চাপড়ে বলে থাকেন, 'লগে থাকে ছোকরা, চর্চা ছেড়ে না। ভাল হোক বহু হোক, দেবার অভ্যাস রেখে যাও। কালেতে একদিন তুমিও নানমালা হবে। কিছু আদর্শ নয়।'

এমন উৎসাহ লাভ তো আনালের বয়সেও ঘটে থাকে। আনালের এলাকার বাগেগা, অন্তর্ভুক্ত না হোক, একজন জার্মান বৈদ্য আবার একমাত্র বইয়ের উৎসাহিত প্রণয়না করে গেলে। বড়বর বিবর বইখানি আনার দেখা নয়। কার দেখা তাও জানিনে। এবং চপ-কাটলেট খাওয়াগে আনালের বড়ভাই বা কোন আনালের দেখাকে বহু বলবে? তা মনে মনে দতই শত হোক—কিছুই সে কথা তো নয়। কাহালাহির প্রাণশানায়েই স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়া অবস্থান। একেবারেই অবস্থান হরত নয়, বহু বৈশ্বকায়কর, তবে কিনা, তার কোন মানে হয় না। অজানার, অজানার এবং বড়বরের সার্ভিককেটেরই বা কিছু নয়। বহুশ্রমাব কি মাঝে বসেছিলেন, 'আমি বড়বরের পিঠা'।

এই দু'বরা সেকালের কালিরাগ-ভবভূমির ছিল না, আনালের আরও ভাবের-কপতবর প্রাণে নব-নব পমোদনের এই দু'বরা। এই চিঠি-পাওয়া-পাওনি নিয়ে দেখকের মধ্যে কি কম হোয়াবে। কোন সার্ভিক্য কৈরেক বড়বর দেখকের মধ্যে প্রথম আলস্য হরত এইভাবেই হয়ে থাকে।

'ও, কী চিঠিই আসছে আশ্চর্য। পাঠক পাঠিকালের প্রদোষ অজানার তো সোদান ভাই। কখন যে অন্ত-অন্ত চিঠির জবাব সে ভাবে পাইনে, আমার নাবার বাহা সবারই নেই। কী কীর বস তো? আমার হয়ে পুঁজিরে জবাবগুলো দিয়ে দিতে পারে এমন একজন কালের সোক বিতে পার অনার? এই—সেক্রেটারি গোয়েন্দা।'

'দু'বরের কথা আর বোশো না জায়া!' বিতর জন জবাব দিয়েছেন, 'দু'জন সেক্রেটারি ছিল আনার—কেন্দ এই কর্মের অনায়ে। কিন্তু বহা বহা চিঠি এনে তাদের অবস্থা কেন্দ হ, বারেক ভেবে রাখা। তাদের আর কী মোব বেব? আনার কপালের মোব। আজ সকালে তারা দু'জনেই ভেঙ্গে পড়েছে—'

'ভেঙ্গে পড়েছে? কী বললে? চিঠির ভরে পালিয়ে গেছে থাকি?'

'না না, পালানো কোয়ার? চিঠির ভরে নয়—চিঠির ভরে কোলপন করেছে। সেই কথাই তো বলছি! দু'জনেই তারা এখন হাসপাতালে আইনগ্যাপ হাংগ নিয়ে শয্যাগারী। চিঠি তো আকগারই পাই, কিন্তু এও বেশ চিঠি কখনো এর আসে পাইনি। কেন এমন পাচ্ছি বলতে পার?'

প্রথম জন প্রথমটা একটু ভুরুকে গেলেও সমলে নিয়েছেন। এবং বেশ উচ্চ হয়েই এবার তিনি বলেছেন 'কি? গত সপ্তাহে তুমি কতগুলি চিঠি পেতেছিলেন দুনি একবার?'

'তুমি কতগুলি?'

'আমি আসে রিভ্রেন করেছি।' প্রাথমিক দেখক বলেছেন—'আসে তার জবাব লাগে।'

এবং জাগর, আর কোন জবাব নয়, পম্পরকে তারা জবাব দিয়েছেন—'হরত জবাবের বত। বহা দেখকের উৎসাহিত করার অভিজ্ঞারে চিঠি যেন তারা সম্ভবত আনেন না যে ঐ চিঠি নিয়ে আঙ্কাখ্যাক করতে গিয়ে কত দু'বরের চিঠিবনের অন্য ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়! ভগবান তুমি এই চিঠিপাতালের মাফকা কোরো, তারা কী করে—চিঠি দিয়ে অজাতসারে কোন সর্বনাশ তারা করে তারা মানে না।

তবে আদ্য কি করে চিঠি পাইনে? পাই বই কি। কখনো যে পাইনি, তা বলা যায় না। অম্প-বিবর দেখে থাকি—আমিও। সত্যি বললে বলতে হয়, অপেক্ষ দিকটা একেবারে অভ্যাস নয়, মানে—দু'জন নয় একেবারে, আর বিতরের দিকেও ভেদনি দু'জন বেশ বিতর নেই। প্রাঃ মাফকা। আমার বই বাগা পড়ে তারা নিত্যই পাঠক—লেখার তারা কোন বার পারে না, এইদুপ আবার

বালা। হু তারা চিঠিগত লিখতে ভালবাসে না, অধিক লেখা বাধ্য বোধ করে, কিন্তু লিখলে, পত-লেখক না হয়ে একবারেই পত্রিকার লেখক হতে চায়। নয় তো লেখার তেমন কোন সুযোগ নেই তাদের। প্রথমত, নব যাত্রা হলে লোকে আবার বই নিয়ে পড়ে, এইরকম শুনেনি। তখন কি চিঠি লিখতে নব চায়? তারপর, ব্রহ্মবান্যার কয়েকটা আবার বই পড়তে ভালবাসে, কিন্তু তাদের চিঠিগত লেখবার সুযোগ কম। পকেট-মাকড়াও নাকি আবার বই পড়ে বলে শুনেনি বাকি। আবার লেখা পড়ে পড়ে তারা নাকি চৌকস হয়। 'নিত্যকরে' বেরুনোর আগে কীটির সঙ্গে শিত্রাম চকরবর্তির বই একখানা নিয়ে তারা বেড়ায়। যেদিন এর অবস্থা করে সেদিন হয় তারা কাগজে পকেট ধরতে গারে না, নয় শুল্লিপের হাতে ধরা পড়ে। আবার এও গোনা সেহে, পান করার ছেলেরা আবার বই পড়ার জন্যে কল করে কেসেহে। তারপরে কল করার ধ্বংস ভুলতে আবার তাদের আবার বই পড়তে হয়েহে। একই তারপরে তার কলে আবার—পুনঃপুনঃ—বাকি ইংরেজিতে পাশচক্র না পাশচক্র কী বলে বাকি সেই রকম পৌনঃপুনিক। কিন্তু এ কথা আবার বিশ্বাস হয় না—একাবারে পত্রিকার এক বিশদ্যকরণী—এতদূর ক্ষমতা আবার বইয়ের আছে আমি বিশ্বাস করিনে। এমন কি, যেসব ছেল-মেয়েরা আমার বই পড়ে, আবার বই ছাড়া কিছুই পড়ে না, তারা কিছু না পড়েই পাস করতে পারে, এই অবজ্ঞাও একান্ত অলীক এবং অবিশ্বাস্য।

হ্যাঁ, চিঠি পাবার যে কথা বলছিলাম। আরও চিঠি পেতে বাকি—নিত্যকর কম নয়। একের পিঠে অনেকগুলি শব্দ্য বোস করলেই তার ইচ্ছা হবে। শব্দ্যগুলি এখানে শব্দ্যই হয়ে গেছে এই বা ধ্বংস, শাপাতত আমি একখানাই পেয়েছি। এতদিনে সেই একখানাও যে আবার কোন শব্দ্যক পাঠিকার সে কথা রাখার হালক করে বলা যায়।

চিঠিখানি 'শিবরাম চক্রবর্তী'—কলকাতা' এইরূপ বরাট চিকানা বহন করে এসেছিল। তবু যে এসে পৌঁছেছিল, এর মূলে আমার খ্যাতি কি ডাকঘরের

কোয়ালি কী আছে তা জানিনে। আমার মনে হয় এই কৃতিত্ব আমার অনুগ্রহী বন্ধু সেই ডাকঘরের—তারই কৃতিত্ব।

যাই হোক, শাপা পাঠাও থেকে আসা সেই চিঠিখানি এইরূপ :

যাই ডিয়ার চক্রবর্তীবাবু,

শিবপুত্রের ইচ্ছা পড়তে পড়তে একটি বাগলাদী মেয়ের সঙ্গে আমার ভাব হয়েছিল। তার মধ্যে শ্যামনার কথা শুনিয়েছিলাম। আপনার ভাবার নাকি তারি অলংকার সে বলত। আমার শাপা সেহেই মাথাগত আমাদের জাতীয় গান গারে পরি—কিন্তু তা পরতে আমার ইচ্ছা হয় না। সেগুলো পরা তারি কষ্টকারক। আমার বাবা, তিনি এখানকার মাগানের ক্ষার, বলেছেন আমার সেই বাগলাদী বন্ধুর বত অলংকার আমাকে কিনে সেবেন। অতএব আপনি অনুগ্রহ করে বত শিব গানের শ্যামনার সমস্ত অলংকারের একখানা ভালিকা পাঠিয়ে শুনী করবেন। অলংকারগুলির দামও জানাবেন দয়া করে। ক্যাটালগটা ভিংশ করে পাঠালে ভাল হয়। ইতি—

একান্তভাবে আপনার

কুমাখী শিব ক্যাচাচ

ঐ চিঠি পাবার পর অনেকদিন আমার ঘুম হয়নি। ওর কী ভাব হতে পারে, কী ভাব দেখ, আমি ভেবে পাইনি। এখন অবধি আমাকে, যাহা হয়েই, নিরন্তর থাকতে হয়েহে।

ভাবাগত আমার ব্যবহারী অলংকার, (যদি গাভাই কিছু থাকে) ভালিকাভ করে পাঠাতে হলে আমার পুরো এক সেট বই পাঠাতে হয়। বই থেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে আঠা দিবে সেইটা তাদের গারে শাপানো বাবে না যে তা নয়, কিন্তু তেমন অলংকার মাগানের মূহুর্তকেও যেমন অলংগি হবে আমার জানা নেই। দুনিয়ার হালগাম, সেই সঙ্গে ক্যাটালগ আমাকাল এখন অ্যাটম বোমার বেগে বদলাচ্ছে যে ভাল রাখা মুশকিল।

তারপর এই সেটবের কথা বলি। আমি যে কতদূর বিশ্বাস লেখক এর থেকে তার পরিচয় সেলায়।

। এক সোমেরা কাছিনার ভূমিকা

১৩৬

আপনারাও স্টো পান—সেইভাবেই আমার বলা।

ককি হাউসে গেলিন একলা এক টেবিলে বসে
আপন-বনে ককি পান করছি, এমন সময়ে একটি
অচেনা মেয়ে আমার সামনের কৌত্র এসে বসল।
সহ্য-কলেবে-ঐরা কোন মেয়ে? আমার অচেনা হলেও
আমি তার বেশ চেনা, তার হাবভাব থেকে এইরকম
বোধ হল।

‘কী ভাগ্যি আমার! আপনার এখানে বসন পাব
এ রকম আশা করিনি,’ বলল সে।

এর উত্তরে ‘আমারো কী ভাগ্যি!’ এই জাতীর
কোন কথা বশাই বোঝার উচিত ছিল, কিন্তু বলব
কি, সহসা ঐ ভাবে আক্রান্ত হয়ে অপ্রত্যাশিত দাঙ্কার
বিহ্বলকণ আমার মূর্খ দিগে কোন কথাই বেরুল না।

‘তা বটে।’ বললান আমি অবশেষে।

‘আজ আমার ভীষনের কী শূভ লগ্ন! আমার যে
কী আনন্দ হচ্ছে তা বলতে পারি না। এক মূর্খে তা
বলা যায় না। আপনার প্রত্যাবর্তি দেখা আমি বন
দিগে পড়ে থাকি।—তা জানেন?’

‘জেনে খুব খুশি হলো। তবে একটা কথা
ভিজ্ঞেস করি যদি কিছু না মনে কর। তুমি কি
পরাীকার কেল করতেছ না?’

‘কসনো না! আমি কেন, আমাদের বাড়ির কেউ
কখনো কোন পরাীকার খেল ছন। আমি না,
আমার দিদি নহ, আমার দাদাও না—তাইবাও

নহ। আমার দিদি আপনার বই পড়তে কী ভালই
যে বাসেন।’

‘খুব মনকষ্ট বৃষ্টি তোমার দিদির? সব সময়ই
মন খারাপ হয়ে থাকে—তাই বৃষ্টি?’

‘তা কেন? খুব কৃষ্টি’বাহ্য মেয়েই তো। আমার
দাদাও আপনার লেশের জারি ভক্ত। তিনি আদিশপুত্রে
থাকেন।’

‘ও! জেলদানার? বৃষ্টির।’

‘না, মেলে কেন? সেখানকার এক সরকারি আপসে
তিনি কান্ন করেন কিনা!’

‘বটে? জারি আচ্ছ’ তো।’ আমার দিগেই
আচ্ছ’ লাসে এগারে।

‘আপনার বই পড়তে বসলে আমাদের আহার নিদ্রা
বৃদ্ধে যায়, নিশ্বাস শূভ হয়ে আসে। আর এমন হোমাক
হতে থাকে যে কী বলব! আপনার মত দিগেই
বই আর কেউ লিখতে পারে না—’

‘কিন্তু আমি তো দিগেই লিখিনে—
নাহা দিগে বলতে গেলান। কিন্তু কে শোনে? আমার
নাহা অগ্রাহ্য করে মেয়েটি বলেই চলে—‘উঃ, আজ কী
মজাই না হবে, বাড়ি কিয়ে নাকে দিগেই আর আমার
তাইদের বলব যে ককি হাউসে কার দশে আজ এক
টেবিলে বসে খেয়েছি জামিন? শুনলে তাদের চোখ
হানাবড়া হয়ে উঠবে! বলব যে, আর কেউ না, বোধ
আমাদের খ্রীয়েশখুন্সার রায়।’



ବିଭୀଷ

କାହାଣୀ ଏହି



কলকাতার এসে প্রথম যে-বন্ধুর সঙ্গে বিভাসের সৈধ্য হয়েছিল, সে তাকে চিনতে পারে নি। তারপরে হাফিংসনের শেষ ভাউন লোকাল ট্রেনে সে করেছিল। তখন তার জানা হেঁচা। অরু কাহে কোলা তাতো চোখ ঢকে গিরেছিল। নীল বাগ পড়েছিল। ঠোঁটের কবে রক্ত অর্থেছিল। তার পুঁটি ছিল উৎপ্রাভ। বন্ধুর বাড়ি ছিল শিরাসদেহের কাহে। তাই রাত্রি লাগে এগারোটার মধ্যেই শেঁদেতে শেরেছিল বিভাস। পরজা নুনে তার বন্ধু অর্থাৎ হয়েছিল। প্রায় প্রতিদিনের সৈধ্য শোনা। তবু অর্জেনে করছিল, কে।

—আমি।

—আমি কে ?

পরজার কাহে আসো অর্থাৎ তেই বোঝায় আরো অসুবিধ্য হয়েছিল। বিভাসের বিবৃত বন্ধুটা সৈধ্য সে চিনতে পারে নি। বিভাস বলেছিল, আমি বিভাস।

—ও! আরে, এম। এত রাত্রে যে ?

বিভাস প্রথমে কোনো অর্থাৎ দিতে পারে নি। বন্ধুর বাগ-বা-তাই-বোনের বাড়ি। তবু চিলেকোঠাটা তার একলার এক্তিয়ারে ছিল। সেটাই রুখে। বিভাসকে নিয়ে বন্ধু সোজাসুজি নিজেই বরু নিয়ে গিরেছিল। বিভাস লক্ষ্য করেছিল, বন্ধু তার দিকে কেনে একটা সন্দেহজনক বিরক্তিতে তাকিয়ে আছে। এবং আরো লক্ষ্য করেছিল, বন্ধু তার নিঃশ্বাসের গন্ধ নেবার চেষ্টা করছে। কেন ? তা হলে সেও সন্দেহ করেছিল, বিভাস নব-উদেগে এসেছে ? আর হাতাল হয়ে বারবার খেয়ে এসেছে ?

কিন্তু বিভাস ছেলেনানুদের হতো কেঁদে উঠেছিল। কবিতাে কবিতাই বন্ধুকে তার পুঁশ্যার কথা বলেছিল। তখন তার বন্ধু তাকে লাগনা দিরেছিল। আশ্রয় দিরেছিল।

কিন্তু তিন দিনের মধ্যেই টের শেরেছিল। বন্ধু তাকে নিয়ে বিবৃতবোয় করছে। এবং বিবৃত। যদিও আসে সে বলেছিল, একটা চাকরিবাকরি না পাওয়া পর্যন্ত বিভাসকে সে থাকতে দেবে। তিন দিনের মধ্যেই টের পাওয়া গিরেছিল, সেটা একটা অর্থাৎ কথা।

তখন বিভাস গিরে উঠেছিল এক হাতাবাসে, যেখানে তার অনেক বন্ধু ছিল। বিভাসের বন্ধুদের কথা নুনে, তারা সকলেই একটা বন্ধুর প্রায়সকার সংকল্পে উৎপ্রাভ হয়ে উঠেছিল। এবং তারা বিভাসকে একটা চাকরি যোগাড় করে দেবে, অর্থাৎ চেষ্টা করবে, বলেছিল।

তখন বিভাস ভেবেছিল, সংসারে প্রীতি এবং ভালবাসা এখনো আছে। হতাশা হবার বিহীন বৈ।

কিন্তু পর দিন যেতেই একদিন সে নুনেতে শেরেছিল, তারা পরস্পরকে সোবারোয় করছে বিভাসের পাওয়া থাকার ব্যাপার নিয়ে। তারা পরামর্শ করছে, কেনে করে ওকে তাতানো যায়।

বিভাস কেন বিশ্বাস করতে পারে নি। সত্যি না তার স্বপ্ন ভেঙেছিল, যেন নিজেও টের পার নি। তার ক্ষিত পুঁকিরে গিরেছিল। কণিছিল ভয়ে।

সে মনে করেছিল, ছুটে গিরে বন্ধুদের পায়ে পড়বে। কিন্তু তাও সে পারে নি। অর্থাৎ জীবনকে কিভাবে গ্রহণ করতে হবে সে বন্ধুতে পারছিল না।

পরদিনই একটা নিলক্ষ সঙ্গ বন্ধন পুঁদু হয়েছিল। বাবার ঘরের ঠাকুরও যোগ দিরেছিল তাতে।

তার পরদিন মক্কালের একটা কারখানার বিভাসের ইন্টারভিউ ছিল কোরাণীর কাহে। আর সেখানে থেকে সে ফেরে নি। কলকাতার আর তার সংসার কেউ জানে না।

বিভাসের মনে হয়, এইবার সে মারা যাবে। দলিও চোখ চেয়ে আছে সে, কানে শুনতে পাচ্ছে পুরোপুরি। শব্দ তাই নয়, সে শব্দে বোঁই, বসেই আছে। আর বসে আছে একটি পাছতলায়। বহুবল শব্দের এক অন্যরকম বক্তব্য।

অন্যদিন বসে পাছতলায় বসবার উপায় ছিল না। কার্টের যে ছোট বাচাটি বঁধা আছে গাছের সোড়ার ওখানে প্রতিদিন কলের যোکان বসে। কলগুলোর রোগ হোক কিংবা আর কিছু, কতক দিন সে আসে না। সবসময় বিভাস না বসে থাকলে বাচাটি আর কেউ দখল করত। কোন ভিখিরি বাউঙুলে, নয় তো বারোমাসে রাত্তার পাগল কিংবা কুকুর।

বেশা ভবন প্রায় লুপ্ত। অগ্রদূতের আকাশ ভরে যোয়ের কিকিমিকি। পাছে পাছে পুরনো পাতার ইঁতরনোই শব্দ শব্দ ভাব সোঁসেছে। বসতেও আরম্ভ করেছে কিছু কিছু। ভালে পাতার ঢাকা কাকের বাদ্য এর যোঁই চোখে পড়তে আরম্ভ করেছে। রাত্তার দেখা দিয়েছে হলো।

পথে অনেক লোকের আনাগোনা। সামনেই ব্যাক্স, তার পরে রেল স্টেশন। জ্বল স্টেশন। লোকের বাগা-আলার কানাই নেই। বিভাস বসে আছে গাছে স্লোন দিয়ে। সে বুকতে পারে, ইচ্ছে করলেই সে হুটতে পারবে না। বরফাব হলেও নাড়তে পারবে না হাত। চোখের পাতা দুটি কেন খোলা রয়েছে, কেন রয়েছে, সে জানে না। আর তার কেবল মনে হয়, এইবার সে মরে। বিভাসে মরে? প্রশ্ন করে পড়ে যাবে নাকি? কিছুই ঠিক আশা করতে পারে না।

গাছের পাখি বিস্তা ত্যাস করেছে তার গায়ে। জায়া ও মাখার পড়েছে। সরে বসতে সে পারে নি। ভাড়া দিতেও পারে নি পাখিগুলোকে। কেউ কেউ তার দিকে তাকিয়ে গেছে, কোনো কথা বলে নি। কেননা কেউ তাকে চেনে না। সে-এখানকার লোক নয়। এরকম অনেক লোক এই শহরের বুকে, স্নরে ও খিড়ির রাত্তার বসে থাকে। আসে, চলে যায়, মরেও বিচর। সেটা বিভাস জানে। সেখানেও অনেক। তার অন্য কারুর কিছু আসে-যায় না।

সে মরে। আস্তে আস্তে, মরবে, এই একটি কথা তার অনুভূতির মধ্যে পাক খাচ্ছে বাবে বাবে। কখনো মনে হচ্ছে পরীতা হাস্য করাচ্ছে, কখনো ভাব। ভীষণ ভাব, বোকার মতো। চান বেবে পড়ে যেতে পারে। আর সবচেয়ে বড় কথা, সব বোধ এমন দুর্বোধ্য জড় মনে হচ্ছে, মরার কথা ছাড়া বাকি অনুভূতি পর্যন্ত মরে গেছে।

এভাবে বসে থাকলে পড়ে যেতে পারে ভেবে, শব্দে পড়ল বিভাস। কি করে শব্দ নিয়েই জানে না। কতক শব্দে ছিল, সে খেগলও নেই, হঠাৎ হুঁমকিয়ে উঠে বসল। বল কি করে, সে কথা ভাববার অবসার নেই। কিছু চোখেমেখে একটি নিদারুণ ভাব উঠেছে কুটে। একটা ভীষণ লম্বার শিউরে উঠেছে ও।

মনে পড়ছে একটি পুরনো ছবি। একটি লোক মরে থাকল রাত্তার বাবে। অনেকের সঙ্গে বিভাসও গাঁড়িয়ে দেখছিল। লোকটা নাকি না খেতে শেষে মরছিল। আহা উহু করছিল সবাই। কিছু বিভাস দেখছিল, সবসময় ভীষণ আতঙ্কে ও ভাবে গুরুম করছিল সবসময় ছিল করে। আর লোকটা নিশ্পদ, চোখদুটি মাহের মতো নিশ্পদক। কিছু বুকের কাছে, চানড়ার তলার মেন একটা বেণী ইঁহুর পাকালানি করছিল। ঠিক বিভাসের নিজের মেন রকম করেছে।

বিভাস মরবে। কিছু নিদারুণ লম্বার সে শিউরে উঠেছে। এত লোকের মাঝখানে সে মরবে কেনন করে। বঁচনা অব্য প্রায় একই রকম। সে-ও বার নি প্রায় দিন-তিনেক এবং পড়ে আছে রাত্তার বাবেই। কিছু দুটি ব্যাপারে যে কত তলাত, বিভাস বোকার মেন কেন করে। এখনি হুতো লোক জড়ো হতে আরম্ভ করবে। আহা-উহু করবে, বলবে, 'কে?'... 'চিনি নে।'... 'এখানকার নয়।' তারপর...

ভাবা মাহ বিভাস উঠে গাঁড়াল। লোকের শাবনে মরবার লম্বার একটা নিশ্বকর শক্তি কিরে পেল সে। অবলীলাক্রমে হেঁট চলে এল স্টেশনে।

মনে হয়েছিল, সামান্য স্নর সে কার্টে বাচাট শব্দে ছিল। কিন্তু সে সামান্যটাই ম্যাককের মতো কখন বেশা লুপ্তার বুকে এনেছে বিকল ভেবে। ফেমের উপর নীল থাকলে লেগেছে রক্তাভা। পথে লোকের ভিত্ত আছে

বেড়েছে। হুটি হয়েছে কলকারখানাদুলিতে, ঘরে-ফেরা মানুসেরা গভ্যাবেলার কাকের মতো কা-কা করছে যেন।

আরও উত্তরে যাবে বিভাস। উত্তরের নির্জন কোনো গ্রামে, নিরাসার গিরে মরবে সে। অন্তত হতুল তার বুকে ওই ইঁদুরটা লাকাবে আর যাহের মতো অলসক চোখ ঘিরে নব্বই দেখতে পাবে। তারপরে ধবন মরে যাবে, তখন সে কিছই দেখতে পাবে না, জানতে পারবে না।

লোকালয়ে মরার লক্ষ্যার সে ঠিক বসল এসে খাপ প্রাটিকরের বেকে। কিছ ভাবনাদুলি তার চোখে জল আনছে। এ-ই বা কেনব। লোকে মৃতের জন্মই কাঁবে। নিষের মরার কথা ভেবে কে কবে কৈসেছে। আর এত লোকে আপোপাশে ঘোরাক্ষেয়া করছে। চোখে জল দেখেই ভিত্ত করবে। জ্ঞানভেই তার চেহারা দেখে অনেক দশেহজনকভাবে তাকান্ছে তার দিকে।

গাভি এসে গেল। চপে বসল বিভাস। কটাখানেক চলার পর, গাভিটা এসে দাঁড়াল একটি টেপনে। আলোর কোনো বানাই নেই। দূরে একটা কেরোসিন তেলের ল্যাম্পপোষ্ট। সেটাও চিম্ভি করছে। দূ-একজর বাতী উঠল কি নামল টেরও পাওয়া যায় না। কাছেই, দশমন্ত প্র্যাটিকরেরই আর একশাশ থেকে, শেখাল ভেঁকে উঠল একশাল।

বিভাস মেখে গড়ল। গাভিটা চলে যাওয়ার পর তার লক্ষ্য গড়ল, অস্পষ্ট চাঁদের আলো দেখা যায়। আকাশের তারাদুলি কাপলা। একটু বেন শীত শীত লাগে। আপোপাশে অস্পষ্ট গাহালাসার হায়া। স্টেন-মরটা আরো দূরে। সেখানে কোনো দাড়া নথ নেই। না থাকবারই কথা। লোকজন নেই, দিসন্যাল জাউর আর আশ করা। একবার সবুজ, আর একবার লালের ইঁপিত।

এখন কেউ বিভাসকে এই চারদিক কাঁকা প্র্যাটিকরের উপর দেখলে জর পেত। উলকো-শুকাে হুল, বোটা হুঁতটা প্রার হাতিতে লুটোচ্ছে। লক্ষ্যার শাড়ে পাঁচ কুটের কর নয়। চোখলুটি তার বড়-ই। কিছ এক লাল দেখাচ্ছে। হল্যা শাটের রঙ বোকবার উপার নেই।

দমনেই একটি বোঁক শোে শূয়ে গড়ল বিভাস। মশে মশে তার হাত-পা আবার দিচ্ছে হাে এল।

শুধু রাখার লোকের চোখের উপরে, রাখার মরার

দুশার এতখানি চলে এসেছে সে। বিন ঘেে আনন্দত্যা করা যায়, গলা দেওয়া ঘর টেনের লাইসে। কিছ সেটা বড় বীভল মনে হয়।

আর-একভাবে মরা যায়। দে-জায়ে সবাই মরে। অদৃশ হয়, আত্ম-বজেরো উৎকীর্ণত, আত্মকৃত হর, জকার আসে, কায়র মোল গড়ে। কিছ তেলন হল বিভাসের কপালে নেই। মরতে মনে থাকে, এ-ভাবেই। কিছ তার অশ্রমটা চোখে দেখতে হারিছ নয় সে।

মুঁরি এই জন্মেই মরার মতো এতবড় একটা বিদান-গম্ভীর বিবরকে ব্যতলী বলে, মরার ব্যাড়া গাল দেই।

কোখার একটি সোহরু পাভির জাকার ককাঁব আসে জেনে। পাড়োয়ানের কল-ভাড়াযো ককেটি অস্পষ্ট নথ।

শীত লাগে বিভাসের। আর মশে মশেই মরত চেষ্টা তলিয়ে যেতে থাকে কোন্ অন্তলে। 'কি' 'কি' শোকাটার অদৃশ্যে বৈঁচে থাকার পাঁচালিটাই ব্যভতে থাকে তার কাণে। শিশির গড়ে, আকাশের তারাদুলি দূরে চলে যায় আরো।

মেঘবারের জ্যো বোঝার বিভাসের চোখের মাঝে তার বাবার মূর্তিটা জেনে ওঠে একবার। তিন বাপ আসে ভীষণ বড়-জলের মতো, বিভাসের বাবা মাঠে বঁরা সোহু হুঁটিকে বুলে আনতে গিরোঁদেন। ব্যাক থেকে বেঁড়িয়ে পাঁচ মিনিটের রাত্তাও নয়। বাছ শড়ে মারা বাপ সেখানেই। সোহু হুঁটিও হয়ে যায়।

সমুটা ছিল বেদা তিনটের মতো। ব্যাক্তিতে ছিল বিভাসের তিন বাবার তিন বউ। বিভাস আটকে পড়েছিল গ্রামের স্টেনে, কলকাতা থেকে কিরাঁত গথে। তিন হাদা হাকুরীবাঁ, ছিল বিদ্য হাকুরি আমলাভেই। বউদিরা চিরকালই ও সমুটা বুঝে। যিনি জেনে থাকতে পারতেন কিংবা সোহু হুঁটিকে বুলেও আনতে যেতেন নিশ্চই, তিনি না। বাবা সেত্রে অনেক আসে। কিংবা বা থাকলে বউদিরা বুঝেও না, তারাই সোহু, বুলে নিয়ে আসত।

হাইল বহরের বিভাস আই, এ, পাশ করে তখন চার বহরের বোকার। কলকাতার গিরে সে চাকরির চেষ্টা করে, এটা তিন হাদার কেউ-ই বিশ্বাস করত না। বাবা

বিশ্বাস করতেন কিনা বোঝা যেত না গেলো। খালি বলতেন, তোরা কপালে দেখিছ অনেক দুঃখ আছে।

দাদায়া কথা বলত না। বড় আর বেঞ্চ বউদির এড ছেসেবেরে, কথা বলার অবসরই ছিল না তাদের। ছোট বউদির পাঁচ বছর বিয়ে হুগ্গা সঘেও ছেসেপদুলে হয়নি। সে খালি পান বেত করত। বিভাসের সঙ্গে কথাও বলত, কিন্তু ছোট বউদির সবত করার একটি-ই বিষয় ছিল। যেহে আর পুতুদু। সেদর কথা একটা বিশেষ বিষয়ে কেন্দ্রীভূত ছিল। বিভাস হাসতে গিয়ে উল্লুরের মতো তাকিয়ে থাকত ছোট বউদির মূখের দিকে। তখন ছোট বউদি তাকে একটি পান সেজে খেতে গিয়ে বলত, এইটি চিবুতে চিবুতে হাও, বা বশেছি তার একটু কুলকিনারা পায়ে হয়তো।

অদ্য সেওয়া পানের শিক কেলতে কেলতে, কোনদিনই সেদর করার কুলকিনারা পার নি বিভাস।

তারের বাড়িটা ছিল, সেকলে বড়-বাড়ির মতো। সলের কিছু ছায়া। ঠাকুরলার আরলে নাকি আরো অনেক কিছু ছিল। সেকালে অনেক কিছু ছিল, একালে থাকে না। এনিহে ভাববার কিছু নেই।

যাযা যেদিন মারা গেলেন, টেনশনে বাড়িঘরে সেই ভীষণ বাজ-পড়াতা দেখেছিল বিভাস। টেনশনের সকলের সঙ্গে সেও চবকে উঠেছিল। কে একজন বলে উঠেছিল, বুঝ কাত্তেই পড়ছে।

বাক অনেক পড়ছে, হান্দু বয়র সবাবও পোনা গেছে। কিন্তু যাযার মাযার বাজ পড়তে পারে, এটা কোনদিন বিভাস ভাবতেই পারে নি।

তার তিন দাদা এবং দুই বউদি শুবু বয়ের ভরস্করতা, সংকারের আগে অপাভ-বুজার মানান হিন্দু জিন্নাকলাপ ইত্যাদিতেই ব্যস্ত ছিল।

বিভাস ভীষণ কর্মহীন, সেটা কেউ চেয়েই দেখে নি। সেখাবার অনেক সে কাঁদে নি। কিন্তু বিভাস হাড় ভল সেখা সেল না কারুর চোখে। শুবু এক সরে তার ছোট বউদি এসে বসেছিল, শিগারি স্থপানবাড়ির সঙ্গে কাঁচ হাও সে। তবু গাঁরের লোকের মনে থাকবে, অবুকের একজন ছোটছেলে আছে।

আজ্ঞের আসেই সেখা যেত, চিনিবাল, অর্থান অধিবাল,

প্রভাস, বিকাশ, তিন দাদা সকালে বিকালে বসে বসে গুরুগম্ভীর আলোচনার ব্যস্ত।

ছোট বউদির তখন ভীষণ হাই উঠত। একটি কথাও শুনো বলতে পারত না, হাই উঠে যেত। হাবিযা চলছিল। পান করত একদর বহ।

হাই তুলতে তুলতে এসে বসেছিল, দাদাদের কথাগুলো একবার শুনতে চেষ্টা করো।

কেন ?

শুনলে ভালো করতে। ওঁরা যে তুলতে বসেছেন, ওঁরা চার ভাই।

বানে ?

ছোট বউদি হাসতে গিয়ে হাই তুলে বসেছিল, কিন্তু না। ভববান করুন, তোবার বউ বেন আমার মতো একটি বেরে হু।

এখন দুঃখের দিনেও যে ছোট বউদি এসব কথা বলতে পারে, ব্যাঘা ছিল না বিভাসের। তবে ছোট বউদি বলেই বনে করার কিছু ছিল না।

এগারো দিনের দিন স্নান হয়ে সেল। তার পরদিন তিন দাদা ভীষণ স্বগড়া করল। বজ্রাকে মারতে সেল মেজনা আর ছোড়া।

ছোট বউদি এসে ভাড়াভাড়ি বলল, তুমি যে-কোনো এক পক্ষ নিয়ে গিয়ে ধাড়াও শিগারি।

বিভাস বলল, কেন ? ছোড়লার ধর্ষন অংগটা তো বজ্রাই পাওনা।

আর তোমার ?

বা যে-সরটার ব্যাঘা সেল।

ছোট বউদি একবুটে খামিককল তাকিয়ে থেকে বলল, পান খাবে একটা।

বিভাস বলল, হাও।

বজ্রা বেন বহু দিহে মেজনা আর ছোড়াকে শাস্ত করে দিলে।

দিন মনের পরে বিভাসের কলকাতা থেকে কিরতে একটু ঘোর হল। এসে সেখা দবাই বুঝিয়ে অতেন। কোনো ধরমে দরজা-ই খোলা নেই। অনেক ভাড়াভাড়ি পর, ছোট বউদি দরজা বুজে ছিল। গিয়ে কল,

। বিভাস

শুনে পড়ো সে।

খাবি না ?

বড়িদি আরকে তোমার চাল নিতে ভুলে গেছে।
খাবার কিছু নেই।

ও! বলে করুণ চোখে ছোট বউদির দিকে তাকিয়ে
হইল। আশ্বিনের আকাশে পরিষ্কার ছোয়াংরা। ছোট
বউদির গালে তখনো পান, ঠোঁটদুটি অলসভাবে দাল।
চোখদুটি নতুন আয়শোলার পান্থার মতো চকচকে।

খাবার করার পরই ছোট বউদি বলল, তোমার চার
ভারের মধ্যে তুমিই দেখছি সবচেয়ে সুন্দর। মৌবনে
নিজের পশুর মনাই তোমার মতোই দেখতে ছিলেন।

কিন্তু বিভাস তখন বড় কুস্মিত। তার চোখে-
মুখে কষ্ট ও রাগ দেখা দিল। রাগ সে বড় একটা
করে না। সে বোকা নয়, কিন্তু অবিশ্বাস করা কিংবা
সন্দেহ করাটাও তার চরিত্র নয়। ছোট বউদির কথা
গানে না বেঁধে সে বলল, আচ্ছ! বড় বউদি আমার
চাল নিতে ভুলে গেল ?

ছোট বউদি বলল, না, চাল নিতে কেন ভুল হবে।
আমলে তোমাকেই ভুলে গেছে। তোমাকে হলে থাকলে
চাল ভোতা নিভাই।

তবু সংসারে রোষ রাস্তা হয়, তার একটা
মাপানাপি আছে...

মাপানাপির মাতা মাদুনের চিরকাল স্নান থাকে না।

ছোট বউদির গলায় শব্দে অবাক হয়ে তাকাল
বিভাস। কথাটা কিতাবে বলল ছোট বউদি, আশ্বিন
করতে পারল না। খালি ফেলল, ছোট বউদি নিশ্চলক
চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

বিভাস ক্রোধ দামিয়ে বলল, ঠিক আছে। তাহলে
শুনে পড়ি গে।

ছোট বউদি বলল, আমার বাপের বাড়ি থেকে আমদার
পাঠিয়েছে, খাবে ?

হাও।

ঘরে গেল বিভাস। ছোট বউদি আমদার এনে দিল।
বিভাস চিবিয়ে চিবিয়ে খেল।

ছোট বউদি বলল, যেন কালো মাদুনের চামড়া
ছাড়িয়ে থাকে।

ছোট বউদি কালো নয়, কনসাও নয়। বিভাসে
বিংশিত লাগল না। বা-বোকা কিন্তু যেতে গেলে ত
ভালো লাগছিল। বলল, তুমি শোওগে ছোট বউদি।

ছোট বউদি একটি পান বের করে বলল, বল বা-
পানটা দিবে বাই।

পানটা হাতে বেওয়ার সময় ছোট বউদি বল
ঝেঝেঝেঝে হাতে করে ব্যাটাগুলোকে পান দিবে
নেই।

কারণটা জানে বিভাস। ক্যা-কটা মৃদুখানি জ
দিকে ফিরিয়ে বলল, বেঁধে নাও না তরুণশোণের ওপরে।

ছোট বউদি খোঁচাতে ভালোবাসে। বলল, কি
কেন দিতে নেই, জানো তো ?

বিভাস বাড়ি কাত করে বলল, জানি।

তবে ? এতদিন এখন মিথোষ, আশ্ব আর তরুণশো
য়েছে কি হবে।

তবে কি করবে বিভাস ভেবে পার না। প্রবাহ আ
শ্বিনী ভিন্ন কাউকে হাতে পান দিতে নেই। সেটা।
হাতে হাত ঠেকে বাওয়ার আশঙ্কায়, তা নয়। তা
চেনেও ভীষণ ঘরাগ। ছোট বউদি বলেই এ রকম কা
বলতে পারে হাতদুপুরে এসে।

বিভাস অকৃতভাবে অন্য প্রদল এনে, করুণভাবে
বলল, জানো ছোট বউদি, একটা চাকরিবাকির ব্যাক
করতে না পারলে, আমার কি বকব তব হচ্ছে। আ
কিন্তুই ভালো লাগছে না।

ছোট বউদি শানিকল্প অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে
ঠোং একটি নিশ্বাস ফেলে বলল, হ্যাঁ, এতকণে একট
কথা বলছি বটে। এবার আমাকে শুনে নেভেই হয়।

পানটি রেখে বাওয়ার আসে বলে গেল, সেটা হ
একদিনের মধ্যে চোঁটা করো, নইলে বিপদ আছে। পা
সেখে না হয় আর না-ই দেব।

এ ঘটনার দিন যারা পরে, রাত্রি প্রায় আটটা
সময় বিভাস বাড়ি ফিরল কলকাতা থেকে। একট
পরেই শুনতে গেল, চিববার অর্থাৎ বড়ো চিবকা
করছে, কার ঘর সে ? কার বাড়িতে শুতে আসে।

বড় বউদির গলা শোনা গেল, সেটা তাকে গি
জিজ্ঞেস করো।

কল্যাণ সেল মেম্বর কাছে। প্রভাস এসব আর
কতদিন চলবে ?

চিনিবাস আর প্রভাস সেল বিকাশের কাছে—বিকাশ
তুই যদি ওটার ভার নিশ তো নে, না হয় যা করার
তুই কর।

সেই বৃত্তে হোট বউদির চাপা গলা শোনা
সেল, পেছনের জানলা দিয়ে। ঠাকুরপো, কেটে
পড়ো শিগগির।

কেটে পড়বে ? কেন ? ভাবতে না ভাবতেই তিন
দাদা এসে হাভাল বিভাসের ঘরে। বেন তিনজন
পুলিশ অফিসার, লাচ' করতে এসেছে। এদিক দেখে
ওদিক লেগে তারপর মেঝে বদল, আর এভাবে
কখন চালাবি ভেবেছিল।

চাকরি তো চেষ্টা করছি

বিকাশ বলে উঠল, আই, এ বি, এ, পাশ করি
নি, কিন্তু চাকরি কি পাই নি ? ওসব কেনেবাসী
চেষ্টে যা, আসল কথা বল।

বাসে ?

কাসের সঙ্গে কথা বলছে বিভাস ভেবেই সেল না।

চিনিবাস চিংকার করে বলল, ওসব আমরা জানি।
চাকরি-দাকরি চেষ্টা আসলে বাজার সময় হয়ে যায।
বাগটি মেরে আছিল, কখন জবি আর ব্যক্তি ভাঙ্গা-
ভাগি হয়। হলেই নিজের অংশটি বেচে দিয়ে কেটে
পড়ার ভাদ, না ? আর থামরা তোকে বন্ধির
বাগ্যান, অ্যা ?

প্রভাস একটি বাগান কল্যাণ বিভাসের গালে,
উল্লেখ হতো তাকিয়ে আছিল কি, অ্যা ? অথবা
নে না।

বিভাস এসব ভেবে ওঁটার আসেই, ভাবি রাগে তার
হৃদয়ে অস এসে পড়ল। বলল, এসবের বাসে কি।

হুই পদুম আসের শ্রীযায়াল ভক'শাস্ত্রীর বলসর
বিকাশ গর্জে উঠে বলল, ত্যাপ বানচোত, বেরিয়ে যা
এখনি। বলে বিভাসকে ধাক্কা দিল। বিভাস হুইকি
ধেবে পড়ল গিয়ে লজ্জার কাছে। সে চিংকার করে
বলল, বজ্রার বলছি, একম ক্যো না।

তখন শব্দ চিনিবাস বিভাসের চুলের হুই করে

মারতে মারতে বলল, শোরটাকে দেবলে আমার পা
জলেতে থাকে। বেরো, বেরো, ব্যক্তি থেকে।

বিভাস বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে বলতে লাগল, আমি
জানতুম তোমরা বীচ, কিন্তু এতখানি—

বিকাশের বুদ্ধির ভেদে যোবসর বিকাশ হয় নি। সে
বলল, যে আমার আছিল, তোর সে আমার হাই পড়ে
গেছে, বনে রাখিল। তোর বাপ তোর জন্যে কিছই
দিয়ে রেখে যাওয়ার সময় পায় নি। ওসব লেখাপড়া যা
করার তা হয়ে গেছে, বুকেই চায়। এবার কাটো। ওসব
বাগটি মেরে বসে আর পশ্চোশ রাখতে হবে না।

এখন সময় এক কাণ্ড ঘটল। বড় বউ আর বেল বউ
ব্যাপারটা দেখছিল। রান্নাঘরে কেউ নেই, হোট বউ
ছাড়া। বাশা করে অলোহি উল্লস। পোদার ভাতের
হাঁকি চাপানো ছিল তার উপরে। ভাল-ভরকারি আসেই
হয়ে ছিল।

বড় বউ হঠাৎ মেঘল, ভাতের হাঁকিটা উলটে কেলে
দিল হোট বউ, একবারটি জল ত্রলে দিলে উল্লসে।
ব্যক্তি পোড়ানার হতো নশ্ব করে দারা ধর ভরে সেল
ছাইয়ে ও মৌরার।

বড় বউ বসন চিংকার উঠল, ও হোট বউ, ও কি
করছিল। ওগো তোমরা শিগগির এস সো, হোট বউ-
এই বাধা ধরাপ হয়ে গেছে।

হোট বউ তখন ভাল-ভরকারিদুলি সন্ধ্যার হুবে
ত্রলে দিয়ে শ্বাভাবিক শাব্দ দলার বলল, তা কি করব
বামু। এই উল্লেখটাকে আমারও মারতে ইচ্ছে করছে।
কাজেই যেতে গ্যল্লদুস বা, ওগুসোকে দিয়েই সামলে
নিদ্রা।

ব্যাপার দেখে ভক'শাস্ত্রীর কল্যাণেরা ঘেমে গেছে।
বিভাস বেরিয়ে গেছে কাপড় ঠিক করতে করতে।

চিনিবাস তখন হোট বউয়ের চিংকার স্পর্শে 'আলো-
কুখা পদুম করল চিংকার' করে। বিকাশ বলল,
বজ্রার ধায়া।

প্রভাস বলল, কেন বজ্রার ? হাজারবার বোসে যা।
ওসব সময় হয়েই ছিল। তার গতিবিধিটা আমায়
করা যায় নি। কেননা সেটা দেখা যায় না। আবার
একটা সূত্রকে পদুম বল।

ছোট বউ বলে উঠল উঠানের একপাশ থেকে, কার ঘোষে এমন হচ্ছে নূনি। বেক ঠাকুর সেদিন বড়গিরি সম্পর্কে ঘেন্সে ব্যাধাশ ব্যাধাশ কথা বলছিল.....

চিনিবাস বিকানকে ছেড়ে প্রত্যেকে ঘিরে পড়ল।

মারামারি থাকল। সেই রাতটা সোটা পরিবার উপোষ। পরদিন তিন ভাইয়ের তিন হাঁড়িতে রান্না চালল।

তিনদিন আসে সে বেগিরে এসেছে কলকাতা থেকে।

তারপর তারপর এই। বহুজের কাছ থেকে বিভাগিত হয়ে বাড়ি যাওয়ার কথা তার বলে হয়েছিল। তার চেষ্টাও হয়নি। লক্ষ্য হয়ে হয়েছিল তার কাছে। হাতে থাকে নাকি হানুনের এমন বুদ্ধি-জ্ঞান ঘটে। কেবল বলে হয়েছিল, তার জীবনটা এত সবেবে শেষ হচ্ছে। অঞ্চল হানুনের জীবনে নাকি কতই ঘটে। ছোট বউটির আশঙ্ক্য যাওয়ার কথাটা বলে পড়ল একবার।

তারপর কখন একসময় তার লক্ষ্য হয়ে পড়াপড়িও সম্পন্ন হতে হতে, এক সুদৃশ্য কালো পুষ্পের মধ্যে সেল হারিয়ে। বোধহয়, বউটির লাল ছিল, তাই আবার অল আশঙ্ক্য চোখে। এল কিনা, টের পাওয়ার আগেই শেষ হয়ে সেল চেননা। মারা সেল বিভাগ। বোধহয় মরার প্রথমে শেখাল থেকে সেল আর একবার।

কিন্তু বিভাগ বেঁচে উঠল আবার। সেখান কয়েকজন গ্রাম্য লোক এদিকে ওদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে আশন বলে। কিন্তু লক্ষ্য-স্বাক্ষরকারী কীকা-কৃষ্ণি আশেপাশে।

কি বলল হল? বিভাগ হয়ে নি, উপকল্প খিটেটা তার জীবন পেয়েছে। কীটা তরকারিগুলিই যেন সে যেতে পারে, এমনিভাবে তাকাল সোদিকে। মরার পরে আর-এক লক্ষ্য অল হল তার। সোদকের কাছে চলে বেঁচেই আছে কলছে এখন। যা ছিল ভিত্তি চাইতে কোন বাবা নেই তার একজনে।

উঠতে পারবে কি? হ্যাঁ পারছে। বনজনের নামনে মরার লক্ষ্যায় যেমন পজি পেয়েছিল, তেমন পজি সেল যেমন করে হোক কি, যেতে পারার তাক্কার।

সেল পাইনের পুষ্পে, আমদাইল খানেক ঘুরে গ্রাম প্রবেশে যায়। পজিতে স্টেশন থেকে নেমেই একটা চণ্ডা

রাজা গিরে মিশেছে অনেকগুলি চালাখণ্ডের কটদার না ছোটখাটো বৃ-একটা পাকা বরও দেখা যায়।

বিভাগ বেনে সেল স্টেশন থেকে। ধীরে হেঁটে সেল চালাখণ্ডগুলার দিকে। রোদ উঠে বিভাগের হারাটা পড়েছে একটা লম্বা খোঁটা তে বাঁশের মতো। অগ্রহায়ণের এই রোদটা অ দিচ্ছে বেশ।

লাননেই কয়েকটা সোদর গাড়ী দাড় পুষ্পে আ বললগুলি আছে হরতো অন্যত্র কোথাও। বৃদ্ধ গজ লাগছে থাকে। আর অগ্রহায়ণের মার্চের পা একটা আদর্শ কৃষার আভাস।

চালাখণ্ডগুলো এক একে বুলছে। সামনে এ পাকা বর। সোদিকেও বিভাগ তাকাল একবার। বড় বর। বেঁচেতে কয়েকজন মেয়েপুত্রের বলে অ দেখলেই বোকা যায়, তাদের কারুর খুবো তে সকলেই অসুস্থ। আলমারিগুলি দেখে বৃদ্ধ লিঃ ঘরটা একটা ভাকারখানা। দাদা অকলে বো একটাই সাইনবোর্ড আছে। সেটি এই ভাকারখা নাম "জটিন কাসের্স"। জাঃ তারকেশ্বর গর, এ.এ.এক.। গ্রাম—অটিনা, পোঃ—অটিনা, সেল ইত্যাদি

বিভাগ বৃদ্ধির গছটা আর-একবার পুষ্প। তে দিক থেকে আসছে আশ্বাচ্চ নেবার জলো। তা পজিতে পা বাতাল।

একজন ডাকল সেল থেকে, অই গো অবাবু, এটি পোনেন। বিভাগ কিংল। একটা চাশী মানবু দাঁপি আছে পাকা ঘরের ব্যাখ্যায়। বলল আমাকে বলহু? আছে।

কি বলহু?

ভাকারখান, ভাকতেছেন।

ভাকার বোধহয় বিভাগকে অসুস্থ ভেবেছে। বিঃ সেল পারে পারে। ঘরের বৃগীরা সবাই তার দি ফিরে তাকাল।

চোমারে বসেছিলেন তারকেশ্বর। যাবের সা চোমারের অনেকখানি ছিল আছে। ফরসা হও, সোদা পদম। ব্যাখার বিভাগের চেরে বৃ-এক ঠিক লম্বা

হবেন। কালো স্ট্রাইপ সেওয়া বুক-খোলা শার্টের সঙ্গে, গোকুলভাভার কোথায় যেন অবশ্য মিল রয়েছে চোখুটি ছোট, শিশুদের আভাস। চুল ছোট করে ছাঁটা, কিন্তু সেখানেই বোকা বার, গোড়া হাঁটমতশক্ত। বয়স পঞ্চাশের মধ্যে, কিন্তু চুল কালো।

একটা সেকেন্সে গোনো বখানো মোটা কাউন্টেন-সেন দিয়ে কি যেন লিখছিলেন। বিভাসকে দেখে বললেন, কোথেকে আসা হচ্ছে? এ অফিসে কখনো ঘেঁষেছি বলে মনে হচ্ছে না তো।

বোকা গেল ভাস্কারের সঙ্গেই হয়েছে এককবের। বিভাস বলল, না এমিকে থাকি নে। এসেছি অনেক দূর থেকেই।

ভাস্কারের চোখে চোখ রাখা করি। বললেন, কোনো কাজে নাকি?

বিভাস শব্দ রাখা নাড়ল।

তারে?

এতক্ষণ বিভাস মাননের বোভাটা পড়ে দেখে বুঝতে পারল, সে আঁচনা ইউনিয়ন বোভার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলছে। দেখা আছে ডাঃ ভাস্কারের দায়। প্রেসিডেন্ট, আঁচনা ইউনিয়ন বোভা।

কিন্তু কি করা বার? যেতে পাওয়া দরকার। বা যথাকিছু যেতে না পারলে চলবে না। বুঝটাকে কাঁসো কাঁসো করে বা-ভা কিছু বললে কেমন হয়। আজ্ঞে, বাবু, ইত্যাদি।

সে বলল, আজ্ঞে নানান কারণে নিরুপার হয়ে...

ভাস্কারের তার পিলল ছোট চোখে তাকিয়েছিলেন অপসক। বললেন, শহর থেকে এসে সেবার? অবিপা স্টোও আমকাল অনেক ভাবছে।

ভাস্কারের পক বলিষ্ঠ হাতে কেমন একটা নির্ভরতা বেন কুঠেই আছে। কেন এরকম মনে হল বিভাসের কে জানে। ভাস্কারের বললেন, কোথায় যাওয়া হবে। 'তুমি' করে না বলার বদলে কোনো কারণ নেই, তবুও ভাস্কারের সম্মোহন তুমির চোরে ভালো নয়।

বিভাস বলল, বুঝতে পারছি নে। দেখি...

সেখবার মধ্যে আছে এই আঁচনা গ্রাম। শুব-আঁচনা আর পাকিন আঁচনা। এই হচ্ছে হাট। মেসো, শরৎশুভ, ছোট কেউশুভ, আমরা গা আছে এর আশে পাশে। এই রকমই গ্রাম সব। কেউটে-বিশপুয়ে...

ভাস্কারের ধাবলেন। চোখদুটো কঁচকে উঠল এবার বিভাসের দিকে তাকিয়ে। বললেন, দেখা-পড়া কখন? আই, এ, পাশ করেছি চার বছর আগে।

ভাস্কারের পিলল চোখে বিনয়ের বিলিক দেখা গেল। বিভাস করলেন, নার?

শ্রীবিভাসরঞ্জন শাস্ত্রী।

শাস্ত্রী? আই বংশ—?

মুখোপাধ্যায়।

ভাস্কারের চোখে একটা ভীত মনেই বিলিক দিয়ে উঠল হঠাৎ। বললেন, কখন গ্যাপানো ট্যাপানোর জন্যে, শহর থেকে কোন দল পাঠায় নি তো?

কখন গ্যাপানো? ও, রাজনীতির কথা বলছেন ভাস্কারের। কিন্তু গ্যাপা এবং গ্যাপানো, কোনটাই বিভাসের পক্ষে সম্ভব নয়। বলল, আজ্ঞে, ওসব কিছুই কখনো করি নি।

ভাস্কারের ভু জোড়া সহম হল। বোকা গেল তিনি বিশ্বাস করেছেন বিভাসকে। তার অভিজ্ঞ চোখ অনেক গভীরে দেখতে পার।

হুঁ। দেখে মনে হচ্ছে যাওয়া হারান কয়েকদিন!

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভাস্কারের বললেন, কিন্তু বাবে?

বিভাস নীরবে রাখা নাড়ল। ভাস্কারের ভাবলেন, রাস্তা।

আজ্ঞে!

ভিতরে আর একটি ঘর ছিল। একটি লোক বেরিয়ে এল সেখান থেকে। মোটা মোটা চুল। কালো লম্বা বাবু। হলো চোখ, চোখ একটু বেশি পিটপিট করে।

রাস্তা, গদাইয়ের মোকান এতক্ষণ বুঝলে। কিছু খিট খিট আর হুঁকি-হুঁকি চাটুি এনে সে। বোসো, বোসো এইখানে। এই বেকিটার।

কাজের বেকিটা দেখিয়ে দিলেন ভাস্কারের। তারপর

একজনের দিকে ফিরে বললেন, পরাম্পর বেতে হবে বলছিলেন না ?

আজ্ঞে ডাক্তারবাবু তিন কোশ পথ, কাল রাত থেকে এইসে বইসে আছি।

বোসো।

প্রেসক্রিপশন লিখলেন তারকেশ্বর। একটি বড় টেবিলের উপরে কল করে থান পঞ্চাশ বোতল, একছোড়া কল, মলম তৈরি করার একটা দায়া পাখর আর রুটি-কাটা ছুরি—সবই আছে। সেই টেবিলে সেলেন তারকেশ্বর ওষুধ তৈরি করতে।

হাস্ৎ এল খাবার নিয়ে। তারকেশ্বর ওষুধ তৈরি করতেই করতেই বললেন, বাও। হাস্ৎ জল দে হাতমুখ ধোবার। খাবার জল দে। হবু, তোম কি হাতে রে ?

আজ্ঞে ডাক্তারবাবু শেটে একটা বাখা...

পিছারটা পটিয়েছিল, তার ওপর তাকি গিলসে খাবার যোগ কি ?

হবু বাখা দত করল।

বিভাদ বেতে বেতে লক্ষ্য করল তারকেশ্বর সেখান থেকে তাকে মাকে মাকে। বোম্ব হু ভিকরি ভাবলেন তাকে। ভাবতে পারেন। কিছু খাবারটা কোনো রকমেই হাত-হাড়া করতে পারেন না আর বিভাদ। দশজনের সামনে হরার লক্ষ্যার চরে এটা বড় মনে হচ্ছে এখন। কেননা হরার পরে, আর একবার ঘটবার জন্য ঠিক হরার মতোই অচেতন মনে হচ্ছে এখন নিজেকে। আরো তাকাতাকি চটেগুটে বেতে ইচ্ছে করছে তার। কিছু হুঙ্গার, গিলও তাকিয়ে আছে।

বাড়ার পর বলে গইল বিভাদ। ঘরের চারদিকে তাকাল। ওষুধের বোতলের ক্যালেন্ডার থান চারেক। ডি, বি, বি, এল, আর এল, বি, বি, এল—খাবারকমের বন্দুকের ছবি আর মানান ধরনের মান। ডাক্তারখানার এত বন্দুকের ছবি কেন, ভেবে গেল না বিভাদ। কিছু এবার তার কি করা উচিত। তারকেশ্বরবাবুকে একটা থদ্যাব কিংবা আর কিছু, কি করা যায় ?

তারকেশ্বর একে একে অনেককে বিদায় করলেন। হবুকে ওষুধ দিবে বললেন, বিদুল অনেক জনে আছে, হাটে আনতে হবে।

কালকেই দিবে আইসকো।

গড় করে চলে গেল হবু। তারকেশ্বর একটা কাগজ বাড়িয়ে দিলেন বিভাদের হাতে। বললেন পড়তে পার ?

বিভাদ পড়ল, হ্যাঙ্গালক, সিউইড সুইনাইন...

খাক। বুকেছি। তোমার বাড়ী কোথায় বলছিলেন তারকেশ্বরের চোখের ভাঁজে দৃষ্টিটা আরো ভীত দেখার। বিভাদ জবাব দিল।

কে কে আছে বাড়িতে ? একতবে আসার কারণট কি বলো তো পুনি।

বিভাদ বলল, খড়টা বলা যায়।

আই, এ, পাশ করো, কলকাতার দাতারাত করে শহরের চান তোমার বহানরই থাকবে। দইসে একা কাছ তোমাকে আমি বিভাদ।

কাজ ? শেখটার এখানে ? ও, বুকেছে বিভাদ কম্পাউন্টারের কাজ দিতে চান তারকেশ্বর। তারকেশ্বর তাকিয়েছিলেন তার দিকে। বিভাদ বলল, বৈচিত্র্যে থাকতে পারলে...

ঘটার চরে কিছু বেশীই পারে। আমার বাড়ি থেকে বাখা পাখে, কিছু সামান্য হাতখরচা, এই হাটোটা কুড়ি টাকা। নেহাতই পান-বিড়ি রন্যো—পান-বিড়ি বাই দে।

আ। তামা খাও, না খাও। কুড়ি টাকা আ তোমাকে দেব। অবিশ্যি জামা-কাপড়টাও পান তোমায়ের শহরে এর চরে বেশী দেব কি ?

কম্পাউন্টারের মাইনের খোঁজ কোনোদিন গাখে বিভাদ। ভাবে নি এমন চাকরির কথাও। আ তার গায়ের বিন্দু কম্পাউন্টারের কথা মনে পড়ে। আরো অনেক ডেনা-অন্যে চোখে-দেখা কম্পাউন্টারে হুখ ভানসে চোখের দামনে। প্রেসক্রিপশন কো তারা ওষুধ তৈরি করে, মোড়ক মোড়ে, অব্যাক্ততা তাকার হুঙ্গার দিকে। সেই অব্যাক্ততা থেকে হুঙ্গার অব্যাক্ত হর, ওষুধের কল কী হবে, একছোড়া সে জানে। কিছু তারা কেমন মাইনে পায়, সে জানার অবশ্যক কোন কালেই হর নি। বিভাদ হল ঠিক জানি যে শহরে কত করে দেব।

তারকেশ্বর ভাবলেন, আরো খোঁজ চার মেলেটা

বলসেন, আমি এই দিতে পারি, কাছ করা না-করা তোমার ইচ্ছে ।

বিভাগ যখন দিন ঘুরেছে, অনেক চাকরির দরখাস্ত করেছে, কিন্তু কোথাও কোন দরকা খোঁসা পার নি। তার চোখের সামনে ঘুরা চাকরি শেষেছে, তাদের দেখে বিশ্বরে তার চোখের পলক পড়ত না। কেনি মনে হত, এরা বিশেষ কিছু একটা জানে, যেটা বিভাগের অন্যতম। তবে, রাজ্য-পরা সহ কুড়ি টাকা বেতন সেখানে জুটত কিনা, ভেবে দেখে নি। বৈষ্ণব বর্তে থাকাতা এতে অবশ্য কঠিন নয়। তাছাড়া পূর্বকন্ডের জীবনটাকে নিয়ে লক্ষ্য ও দৃষ্টির শেষ নেই বিভাগের। শহর, শহরের বহু, নিজের দামায়া দবাই যেন বরষের দিকেই ঠেলে দিচ্ছে, বরষার পরে আবার তাদের কাছে কিরে দিয়ে বাবে বাবে বরষার চেয়ে এই অপরিচিত জামদায় ও বান্ধবের মধ্যে থেকে আশ্রয় বিভাগের ভালো। এখানে আর বাই হোক জামদায়ের মত কেউ নেই, ঘরা মিন-মাত্রি ভাববে, বিভাগ তাদের সম্পত্তির ভাগ বসাতে চায়। রাজ্যের অধিকার নেই বলে তার ভাত কুটোতে কেউ ভুলে যাবে না, দুরবাসার ভিত্তে কেউ তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ভাববে না আর।

হোট বটটির আশলয় আর কারুর বাবার সোভ ছিল না, সুতরাং সেখান থেকে বিভাগ কাউকে ঠকরানি। সেই জন্যে হোট বটটির কথা মনে রাখলে কেউ তাকে মারতে পারবে না। আর হোট বটটির আবেল-আবেল করার মধ্যে কি যেন বিনেব কিছু ছিল, মরার পরে সেটা অনুভব করেছে সে।

তারকেশ্বর যেন উদ্ভে-এসে-পড়া একটা জানা-জান্দা পাখিকে বিদ্রিকল করছিলেন। কলসেন, তামলে ছুঁচি রাখি হও ।

বিভাগ তাকাতাড়ি হাত কাত করে বলল, আজ্ঞে আমি রাখি আমি। আমি আর কোথাও যেতে চাই নে।

তারকেশ্বর বললেন, বেশ, এই কথাটা মনে রেখো। ছুঁচি চলে সেলে হাত-পা বেঁধে রাখার উপায় নেই আমার। কিন্তু কাছ ফেলে দিয়ে-হট করে একদিন

আমাকে অনুব্রবের ফেলে চলে যেও না যেন। তোমরা শহর-পতি তো, নন কলকল করবে।

বিভাগ বলে বইল। তারপর একে একে অনেক লোক এল ডাক্তারখানায়। কেউ এল ডাক্তারের কাছে, কেউ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের কাছে। কিন্তু লোক এল শব্দ-বশত কথা বলতে। গাঁয়ের ও ঘরের হাল্ফাল। হাটবারাঙের দর, কলকাতার দর, বন্দীনের কার্য-কলাপ ইত্যাদি থেকে শব্দ করে সব নানান কাহিনী। আর একটি ছিনিস অনুমান করছিল বিভাগ, হান্দ নামে লোকটি পানের ঘরে কি একটা বিশেষ কাজে ব্যস্ত আছে। বাইরের দরকা দিয়ে সেখানে লোক ঘাভারাত ও কথামাত্রার শব্দ শোনা যায়। টাকা-পয়সা যাচ্ছে কলকল করে। আর থেকে থেকে, হান্দ লোকের দিকে তাকিয়ে কি যেন বিকিবিড় করে বলে ঘর তারকেশ্বরকে। তারকেশ্বরের শব্দ কখনো হাসে, কখনো ঘুশিতে লাল দেখা যায়। কিন্তু সেটা ডাক্তারখানার ব্যাপার নয়, কেননা ওবু-পক্ষে হাম তারকেশ্বরেরই দ্বিবে বাচ্ছিল সবাই এবং হাম দিতে না পারায় ভিনজনকে ওবুও যেন নি তিনি।

তারপর তারকেশ্বরবাবু বেরুবার সময়ে বলেন বিভাগকে, তুমি বসো, ঘুরে এসে একসঙ্গে বাড়ি যাব। বলে তারকেশ্বর টুপি রাখার 'সেন, গিল্‌কের একটি পলাবক-কোট পরেন। বাকিও সাইকেল রয়েছে, ভবু যেখানে যাবেন, সেখানকার হাতা খরাপ বলে হুপার বাড়ি থেকে একটি মোটো নিয়ে এসেছে একজন। হাকারি মোটো। বড় বড় কেশর, হলদে মোটোটিকে মেখেই মোটা ঘর ঘুর নিরীহ। রেকাব নেই, তাই দামাখার কাছে মোটোটাকে এনে চাপতে হয় তারকেশ্বরকে। ডাক্তারের ব্যাগ নিয়ে, পলার দাঁড়ি হয়ে মোটোটাকে ঘরে নিয়ে চলে হুপার লোক। মনে হল, হুপার হুপার।

তারকেশ্বর কিরে না আশা পশ্চিম বাইরে ঘরে বলে থাকে বিভাগ। আবার খিচে পাচ্ছে। পানের পরটার ততক্ষণে হান্দরও কাছ শেষ হয়েছে। বাইরে এসে সে যেন বিভাগকে দেখছে না, এমন ভাব করে চোখ পিট-পিট করে দেখতে থাকে বিভাগকে। তারপর হঠাৎ কাছে এসে কথা বলে। শ্রান্তাবিক পলার পরটা এতক্ষণে

পোনা সেল হাসত। যেহেতু চোরেও হয় পলা। বল,
আই, এ, পাশ করিয়ে আপনি, না ?

বিভাস বলল, হ্যাঁ।

চিঠি আছে ?

কিসের চিঠি ?

পাশের চিঠি, এই সাতিকপিকেট না কি বলে।

বিভাস মেখে, হাসত বলত চোখ ভীষণ পিঠপিঠ
করছে। বলল, আছে। কেন ?

একটা সোড়ালি দিয়ে আর একটি পাশের পাতা বলে
বলল হাস, না, এখনি ছিজোলা করলাম।

তারপরে হাস কোথায় গলে গেল বান্দা থেকে
নেমে। হাটের দিন না বলেও কিছু ভয়ভয়কারি
এসেছে। সামান্য কিছু চুনোচানা, খান কয়েক চায়া
পোনা ঘাঘ এসেছে অনেকল। কখন বিকোবে, কোন
ঠিক নেই।

বেলা হয়েই যত নয়। রোজে একটু তাত কুটছে।
বিভাসের খিদের কণ্টো হাড়া ভালোই লাগে। রাস্তা
পর বোম্বের হানুকের এখনই ভালো লাগে।

কেনল একটি কথা বড় বড় করতে থাকে। হাস,
যেখানেই যাক, ঠিক তার দিকেই তাকিয়ে আছে বেন।
। ছুই।

পুনো ভাড়া বাড়ির চৌহদ্দির দ্যা দিয়ে, বাপাল
পুকুর পার হয়ে। একটি সেকেন্দ্রে মোড়লা বাড়ির পাশে,
প্রায় একেলে ঘরের নতুন বাড়িতে এসে উঠল বিভাস
ডায়কেন্সের দপে। বেলা তখন প্রায় সেকটা-দুটো।
একেলে বাড়ি, কিছু উঠোমটা বড় বড় এবং বান্দা।
সারা উঠোমটা ভর্তি-প্রায় ঘান পুকোতে খেজা হয়েছে।
হুড়োয়া বাগের যাকখান দিয়ে, সহ হাড়া করে মেখেছে,
ঘর বাবার জন্যে।

ডায়কেন্সের কলোন, এস।

মোহ-পড়া বান্দাগুলি মেখে, ছোট বউদির পদার
সোনার হারটার কথা বলে পড়ে যায়। তখন সন্ধ্যা প্রায়
এক। আর পারা না থাকার বলে ঘর বান্দাগুলি একা-
একা, ঘন-ঘায়াপ ভাবে।

বাইরে বড়টা প্রকাণ্ড, প্রায় সেকেন্দ্রে বাড়ির হল-
ঘরের দতো। ঘরের শালশাখা কলর কলর আপনই প্রভবে

বেটা চোখে পড়ে বিভাসের। সেটা কাতের আলবারাখা
একটি হানুকের কলকাল। পাশে কলসে রয়েছে আর
একটি কলকাল, সেটি একটি বড় বড় শালের। তার
হাখার কাতের আয়ের মধ্যে বড়ি বড় হায়া শাপ। একটি
কালী সোখরো, আর একটি দিকই কেটেটে। ঠিক
তার পিছনের মেঝেতে তিখটি বন্দুক। কভার দপে
বেল্ট দিয়ে ভালোনা। তার দপে কাঠিঘের বেশ
হুতুতুত চিতাবাঘের ছাল রয়েছে একটা সেহাদের এক
পাশে।

একপাশে একটি টেবিল। তিনটি আলবারাখা বড়িয়ে
হই। বাঁধে ঠান্ডাটিস বর, তদু কম নেই। আর-একটি
আলবারাখাতে হানারকম শিশি-সোতল। টেবিলে
ওপরেও বানকরেক বই, কয়েকটি শিশি, কিছু কালভ
পর। একটা পেডলের বেকারি ওপর একটি শকু,
ড্রাইভার, সোটা-করেক হায়া হুসেট, অর্থাৎ হায়া
টোটা। বড়ি ব্যালেন-ক্রিনারও রয়েছে টেবিলের ওপর
চোখের কাছে বানকরেক। এককোশে তকসোপ।

সন্ধ্যটা মেখে এখানে একঘরেই অতিহই ট্রে
পাঞ্জা ঘর। একটি হানুখ, মে-ভির আর কারুর হায়া
পড়ে না এখানে। সে হানুখ তারকেশ্বর, বিভাস যোরে
শুধু যোরে না, অন্দুতব করে, সন্ধ্যা জিনিসগুলির বই
হুদে-কয়েকটি-ভীষ-ভীষ, পিঙ্গল-চোখ তারকেশ্বর কুর্চ
আমেন।

পকু-হুতেই দিঘের হুতিভা চোখে পড়ে তার ক
একটি আলবারাখা। নিজেই চিনতে কণ্ট হয় না। ছোট
বউদি মেঝে আলবার সিঁড়ির দোপা করে এসেছে ভেদে
নিচর একলালতি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিত গারে। কিব
বিভাসের তুলও কি শেতে সেল কয়েকদিনের মধ্যে
যাগটা কি তার বাইশ বছর না, বেড়ে গেল একদিনে

ঠোম অনেকগুলি কুহুরে ডাক পুনতে সেল বিভাস
হুদে কাহেই, ঘরের পিছনে কোথাও। তারকেশ্বর উঠ
দিকের একটি ঘরকা হুসেটেই এক পাল সোশী কুহুর তু-
পড়ল ঘরে। অতোয়া হানুখ হুসেই কুহুর কি রকম হেনং
করে বিভাস আমেন। ভরও আছে। কেননা, কুহুরগুলি
প্রায় সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে একটু-আলবার
পরপরও যে না করছে তা নয়।

তারকেশ্বর হাত বাড়াতোই সরাই তাকে ধরে ধলে ।
 বিভাস গুলে সেদল, এগারটি কানখাড়া বেশী কুহুর ।
 বুধ বড় নর, বুধ ছোটও নর । ৪৩ বোঁশর ভাল কালো,
 গোটা কয়েক দাল । কেউ চিত্ত হয়ে শূন্যে পড়ল
 তারকেশ্বরের পানের কাছে, কেউ বলল সামনের পা বুড়ে,
 আরো কেউ এমন ভাবে কাত হয়ে, মাটিতে শূল যেন
 অনেকগুলি এমন শূরেই আছে ।

তারকেশ্বর বললেন, তোদের যেতে দেব নি বৃত্তি
 এখনো বুনাটা ?

এগারোটি ল্যাক, বাইশটা কান নড়ে উঠল প্রায় এক-
 সপ্তে । তারকেশ্বরকে এই প্রথম হাসতে দেখল বিভাস ।
 দেখলেই বোকা বার, তারকেশ্বরের সব কটি দাঁতই এখনো
 বখোঁড় পড় । বিভাস যেন বিব্রাচোখে দেখতে পার,
 তারকেশ্বর নর বড় একটি মাংসের টুকরো খাচ্ছেন চিবিয়ে
 চিবিয়ে । কেন যে এরকম মনে হয় ।

তারকেশ্বর চাঁককার করে ভাকলেন, বুনা !

একটু পরেই একটি লোক এসে ছুটে । নাম যে
 কালেভদ্রে সার্বক হয় সেটা বুনােকের সঙ্গে বোকা যায় ।
 কালো কুহুরগুলির সংস্পর্শে তার কোথার একটি সাদৃশ্য
 আছে । যদিও বুনার মানবেরই দেখ ।

তারকেশ্বর বললেন, এদের যেতে দিল নি ?

বুনা বলল, আজ্ঞা হাঁ, যেয়েছে, আদর কাড়ছে
 আপনাকে দেখে ।

তারকেশ্বর কুহুরগুলিকে হাত ঘেঁষিয়ে বললেন, যা
 বাইরে যা ।

বেরিয়ে গেল কুহুরগুলো । তারপর বুনােকে বললেন,
 উত্তরাধিকার বাগানের খট্টা এই বান্ধুক ঘেঁষিয়ে দে ।
 বিছানাপত্র কি লাগবে না লাগবে, বাঁধা করে দিল । তেল-
 পাক্ষা নিয়ে যা, বাইরে পুকুর ঘাটটা চিনিয়ে দে । বাজ
 একটা হ্যারিকেন অনালিয়ে ঘিরে আসবি । আর পোম,
 তালসের বৃত্তি পড়তে দে একে একথানা ।

প্রায় সব বাঁধার কথাই বললেন তারকেশ্বর । আদিয়ে
 বিলেন । বুনা যেন সব তত্ত্বভজ্ঞাস করে । বিভাসও যেন
 কোনো কিছু চাইতে না ভুলে যায় । সন্ধ্যাক্রমে কথা
 হলেন নি তারকেশ্বর । ভূলের চরে ওঁইটিই বোঁশ
 হাজার কথা বিভাসের ।

তারকেশ্বরবান্দু চলে গেলেন । বুনা তার খোঁচা
 খোঁচা চুল, কালো মূখ আর শিকারী কুহুরের মতো দুটি
 চোখ নিয়ে কয়েক বছর 'ত' লুকিয়ে নিরীক্স করল
 বিভাসকে । যদিও হাসুর মতো ভক্তটা নুকোতে দেখে
 নি বুনা

বিভাস জিজ্ঞেস করেই কলে, তোমার নাম-ই বুনা ।
 বুনা ল্যাক-নাড়া উচিত কি অব্যবহিত এগনের ব্যাপখ্যা
 দিল । অর্থাৎ ঠিক কোন স্রোতার জীব এসে উঠেছে, সেটা
 বুনার অবমান হয় নি । বলে, আজ্ঞা । জাতেও বুনা
 ছিলার । চলেন, ওই উত্তরের দরজা ঘিরে চলেন ।

কুহুরগুলিও তো ওঁরিকেরই গেল ।

আজ্ঞা । কুকাগুলাব বার ধরে গেছে, ওয়া মানব
 কানড়ার না ।

তাই নাকি ?

আজ্ঞা । বিলে-বারাড়ে কথা এখন শীকার করতে বান,
 তখন কুকাগুলাব যায় । বাঁধিতে চোর চুইকার সময়তে
 যদিও বুনা শোর বইলে না ঠাওর হয়, তবে শালারা
 তাকেও না । বলে বুনা একটা মাগাধক ধরনের হাসি
 ঘেলে ওঠে । বিভাস ভাবে, তবে কুহুরগুলি তাকে
 দেখে অরম পরসর করছিল কেন ?

বুনার সঙ্গে সঙ্গে গেল সে । আর জান নাহকেন গাহ
 রয়েছে অনেকগুলি । প্রায় চল্লিশ বিঘা জমি । সামনে
 ঘিরে একটি গ্রামা চলে গেছে দূর বাটে । বাগানের
 মাঝখানেই একটু কাঁকা আরগার বায়াম্ ওলা পাক্ষা ঘর ।
 চওড়া ভিতরে পুরনো ঘর সেখানে তক্তপোশ আর ভীষণ
 মল্লা ভেলটিটে বিছানা পাক্ষা রয়েছে । পাশে একটি
 ছোট অন্ধকার কুঠির দেখা যায় ।

এতকলে বুনা জিজ্ঞাসা করল, ওম্মে বানাতো
 আসছেন আপনি ?

ওম্মে বানানো ? ও, কল্যাণউত্তারের কথা বলছে
 বুনা । বিভাস বলে, হ্যাঁ, কি করে জানলে ?

আর অ্যাট্টা বুড়াবান্দু ছিলেন কিনা এইখানে, তাই
 জিজ্ঞেস করলাম । চলেই গেছেন ।

কেন ?

শুনছি নাকি সেটা বলে বান নাই । বলে বুনা
 যেন কেমন এককম ঘির চোখে তাকায় একবার ।

কি দেখে এমন করে তাকিয়ে? বিভাস আবার
খিজেস করে, কেন?

বলো বিদ্বানটা ভুলে কেসে বুনো বলে, কেউ
জানে না।

বিভাসের কি রকম অবস্থা হয়। এইটুকুনের মধ্যে
নব্বই কেমন মেন বোঝা না-বোঝার মাকামারি অশুভ
লাগে। সোঁকটা কাঁধ করত। শূনে মনে হচ্ছে বড়ো
মানুষ। কিন্তু কেন চলে গেছে কেউ জানে না। এ কেমন
কথা।

আর কিছু খিজেস করার আগেই বুনো পুত্রবিক্রে
একটা বড় কার পাছ দেখিয়ে বলে, ওইমানটাতেই পুকুর
আছে। তেল-গামছা দিয়ে ঘাষি, চান কইরে আসবেন।
এইটুকু হাততালি দেইরে বাবেন, আর পায়ে অ্যাটটা
ডক আছে, বড় ক্যাঁদক্যাঁদ করে গর্জার। বড়ো
হইরে গেছে। বলে বোঁরিয়ে গেল।

ডক! মানে, বাক্য বলে ল্যাঙ্কফরা ডকক? কি
বিশদ! ওরকম আরগার সোঁকে চান করতে বার কেমন
করে। ছেলেপুঁনে, একটা বিবাক্য সাপের আঙুলার
কাছে কেউ বার কখনো।

হঠাৎ তার চোখে পড়ে, ছোট একটুকরো কাগজ
পড়ে আছে বিদ্বান-তোলা ডকশোপটার ওপরে। বিভাস
নিচে পড়তে আরম্ভ করে। বড় বড় কাঁচা হাতের
লেখা: খ্রীষ্টাব্দে নব্বয়, ছোটকেস্টপুঁর, খ্রীস্টপুঁর বাবা,
পত্তকোটি প্রদান জানাইয়া নিবেদন করিওঁহি, অভিমায়
গিয়া ভোবার কাছে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব না। ছোট
হাশিরা আদিরাছে, আমাকে কোথাও গাইতে বাহন
করে। বলে, ভূই বড় হইছিল, বাপের দলে জ্যাং জ্যাং
করিয়া ছুরিলে হইবে না। পাঁচটা টাকা পাঠাইও, পরায়-
পুঁরের গালাগোবিন্দের বেলায় কয়েকটা বড়ু ভিদিব।
কমালী আমাদের বিচুঁস দেয় না। ইতি সেবিদা,
দুবাদিনী। ইত্যাদি।

বিভাস ভাবে, বোধহয় কম্পাউণ্ডারেরই সেরের চিঠি।
ভালো, কম্পাউণ্ডার তার মেথেকে এখানে আসতে
হলোঁছিল, সে আসে বি। কম্পাউণ্ডার তাই চলে গেছে।
কিন্তু না বলে—

বুনো এল তেল-গামছা কাপড় দিয়ে।

বিভাস ভাড়াভাড়ি বলল, ভূমি যে বললে ওখানে
একটা দাপ আছে, তবে কি করে দাব?

বুনো মেসে বলল, কামদেব না। আপনি ভগাবেন,
তাই আপস-মানে হইলে ঠাকলায়। ব্যাটা বড় আপসী
বড়ো হইয়েছে তো। তা আপন মাদ পড়তে না
পড়তেই পানের ওপর চিত হইরে হোম পায়। হাত
তালি মারবেন, পলায়া বাবে। বলে বুনো চলে
বার। যেতে যেতে বলে, ভাড়াভাড়ি গান।

বিভাস সত্যি সত্যি হাততালি দেবে কিনা বুঝবে
পারে না। কিন্তু জাম পাছটার কাছে আসবার আগে
দলার শ্বর কানে আসে তার। দাপের দর নিচ্ছই, কথা
শ্বর মনে হয়। শূন্য গামছা পরে এসেছে সে। সামান
বাতাসেই সেটা উড়ে যায়। হাত দিয়ে গামছা চে-
ংরে তবু আর-এক হাতে উত্তে চান, চান করে কয়েকটি
চালড় মাল সে। ডকক নজরে পড়ল না, ক্যাঁদক্যাঁ
গর্জনও কানে এল না। কিন্তু পত্তশোল হল অ
জারগার।

বাটের সিঁড়িতে বসে পা দিয়েছে, নিচের সিঁ
থেকে একটি মেয়ে বলে উঠল, এই মূখশোভা, এখি
কোথার আসছিল রে?

বিভাস ভাবল, কথাটা অন্য কারুর উল্লেখ্যে হ
হয়েছে। সে পিছন ফিরে দেখল, কিন্তু কেউ তে
নে হাড়া।

সে ফিরে ডাকাল আবার। একজন দর, বড়ু
একজনের ঘোমটা আছে, আর একজনের নেই। ব
নেই, তার মূখে একটি চেনা দাপ আছে যেন। ঘো
চল একপাঠি হড়ানো, সূঁচান শ্বাক্ষপুঁট পরীয়ে পা
কোথর করে বাঁধা দাল পাড়ির আল। ঘোমটা ব
মাখার, তার কালো চোখটি সত্তর কৌতুকে ভর
বোধহয় সবকলী।

বউটি বলল, কারে কি বলল, কে না কে। সে
নাও আসে।

মেয়েটি বলল, কোথেকে আসছিল?

আজ্ঞা, এ সম্বন্ধে কি বিভাসকে করতে মেয়েটি
ডখনো যেন লম্বেই থাকার বলল, আমাকে কল
আপনি।

বিভাসের কথা শুন দৃষ্টিতেই চোখাচোখি হল।
হাস্যের গদ্যের শব্দ ও কথার ভাষা তার পরিচয়ের একটা
বড় দিক। দৃষ্টিতেই একটু গম্ভীরতা।

মেয়েটি বলল, হ্যাঁ।

বিভাস বলল, আমি তারকেশ্বরবাবুর বাড়ি এসেছি।
আমার নাম বিভাসরঞ্জন মুনোপাধ্যায়।

কুঁচিটা তাকাতাকি একটু ঘোমটা টেনে ফিল্ ফিল্
করে কি যেন বলল। মেয়েটি বোহরর খুব কন্টে হাসি
চলে আসল পুকে দিল হুমে। কোনরকমে বলল, ও,
আমি একটা অন্য ছেলে ভেবেছিলাম।

দৃষ্টিতেই তরতর করে নির্দিষ্ট ভেত্রে চলে গেল।
বিভাস ভাবল মরে যদি বলিলাম, তার ম্যার দুই বা এমন
যেকো এককই হবে। চেয়ারটা কি তার সত্যি বলে
সেই? ভরসাক বলে কনাই ঘর না?

কলে ডুব দিয়ে উঠে বিভাসের মনে হল, আবার
বরার আগের মতো শরীরটা তার কিংকিন্ করছে।
অবশ হয়ে আসছে হাত-পা। আসলে ভীষণ খিয়ে
শেয়েছে তার। কয়েকদিন উপোসের পর কিছু মৃদু
মৃদুকি আর মিষ্টি খেয়ে সে যে এত বেলা স্নান কাটাতে
পেতেছে, তার কারণ আর কিছু নয়। আবার জীবন-
ধারণের আশা।

চান করে এসে, কলসা হুঁত পরে মনটা অনেকখানি
ভালো লাগে বিভাসের। হুঁতর এক অংশ গায়ে জড়িয়ে
বুনোর সঙ্গে বেতে গেল সে।

ভিত্ত-বাড়িটাও মত বড়। পুরোনো বাড়িটাকেই
নতুন করে সেরামত করা হয়েছে বলে মনে হয়। সেখানেও
মত বড় উদ্ভিদটা ভরে ঘান পুকেছে। কয়েকটা ফুল
একপাশে পুকে আছে প্রায় গায়ে গায়ে। সোফাখন ফো
বার না। একপাশের লাল সেতের খায়াবার তারকেশ্বর
আসেই বসেছেন খেতে। পাশেই ঠাঁই হয়েছে বিভাসের।
ভাত বেড়ে দিল যে, তার মনের দিকে তাকিয়ে
বিভাস বিভাস হয়ে পড়ল। মনে হল, এই ঘোমটা-কাটা
মুখটিই বোহরর সে ঘাটে দেখে এসেছিল। ভালরই
তার নকর পড়ে উঠানের অপর প্রান্তে। বায়ান্দার গকে
হেঁটে বাচ্ছে যেন সেই মেয়েটি, যে তাকে কুই-ডোকারি
করেছিল। এতকণে মনে পড়ল তার। মেয়েটির মূখ

কেন একটি চেনা হাস দেখেছিল সে। হাসটা সুশপ্ত
ভারকেশ্বরবাবুর। কেবল চোখে তার যদিও পিপাসের
আভাস, কিন্তু যেন প্রায় আকর্ষণীয়।

তারকেশ্বর বললেন, বা পাগলে, চেয়ে নিও।

চেয়ে নিতে হয় নি। এত বেশি খেল যে, বাগানের
ঘরে ফিরে যেতেও কন্টে হল তার। মারে আর যেতে
পারে নি।

১ ভিত্ত।

এক বরর পার হয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে পূর্ব ও পশ্চিম আঁচনা গ্রামে সকলের কাছে
পরিচিত হয়ে গেছে বিভাস। একটু বেশি করে, বিশেষ-
ভাবেই পরিচিত হয়েছে। এ সকলের সবচেয়ে বড় ভাকার
ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের লোক সে। শব্দ তাই
নয়, বিভাসও অনুভব করে, তাকে বা হলে কোনো
কাছেই তারকেশ্বরের আর চলে না। ইউনিয়ন বোর্ডের
চিঠিপত্র লেখা, জলত ও জীবন সম্পর্কে তাঁর
বক্তৃতা শোনা। বক্তৃতা নয়, তারকেশ্বরের দেগুপি
বিবাস।

তারকেশ্বর একটি বিশ্বয়। তাঁকে ঘিরে আছে এই
বিশ্ববন্ধুর আঁচনা গ্রাম। একে একে তার এক-একটি
বিশ্বয়ের রহস্য আপনা আপনি বুজেছে। একদিন যে
তার মনে হয়েছিল, সবই যেন কেমন একটি অশপ্ত কুহকে
ঢাকা পড়ে আছে, সেটা মিথ্যে নয়। সেই কুহকের কুরাণা
খুব ধীরে ধীরে বিভাসের চোখের সামনে নতুন বিশ্বত
দিয়েছে বলে।

এই চেয়ারা হরতো বাঙালারদের অনেক গ্রামে আছে।
কলকাতা থেকে দক্ষিণে হাইল বিপেকের মধ্যে বিভাসদের
গ্রামেও হরতো আছে। কিন্তু কোন্‌দোখান চলে দেখে
নি। আচ্ছ এই আঁচনার সঙ্গে তার জীবনের যোগাযোগ
অনেক বেশি। বৃষ্টি এত যোগাযোগ নিয়ে ঘরের সঙ্গেও
ছিল না। এতখানি স্নোপোনাই হয়েছে।

তারকেশ্বরের যে বাগানটার বিভাসের বাস, সেখানে
যেকো গাছের কাঁকে পুকে আঁচনার সিন্ড মেধা বার।
একটা মূর্খা'র মাতা, বামিকটা উত্তরে বাক নিয়ে চলে
গেছে দূর পূর্বে।

সেই পথ দিয়ে একদিন বিভাসের প্রথম বন্ধু ইশান

এসেছিল তার একতারাটা হাতে নিয়ে। চলে বাচ্ছিল তারকেশবের বাড়ীর চৌহদ্দী বেঁচে। বিভাসকে সেবে এক নম্বর তাকিয়ে বলেছিল, আপনাকে তো সিন্ডে পাকলায় না।

ঈশান গান গাইতে গাইতে আসছিল, কিছু বেবে সেবে অনেক আগে। বিভাস নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, গানটা গানালেন যে?

বিভাসের গলায় একটু ভক্তির আভাস সেবে ঈশান বাড়িতে হাত বুলিয়ে আর একটু ফেল তার দিকে। তারপর কিছু গলায় বলল, এইখানে গান গাইতে বানা আছে যে।

কার বানা?

ঈশান নিজের বুকের দিকে আঙুল দোঁবিয়ে বলল, এঁয়ার বানা। পাখি পাখালির গান শুনিয়েছেন কোথায় এই বানানে। দিনের কালের ডাক।

তা অবশ্য মনে নেই বিভাসের। নির্জন বাগানটি নিঃশব্দে পড়ে থাকে, এই কথাই মনে হয়েছে সিরিন। পাখি কখনো কখনো করেছিল কিনা, খোঁজা করে নি। বোধহয় নির্জনতার মধ্যেই ওটা পড়ে। বলল, মনে করতে পারছি নে তো।

ঈশান বলল, পারবেন কেমন কইরে। পাখি ওঁয়ার জীব, তার পরানে জর নাই। এইখানে গান গাইতে বানা আছে।

ব্যাপারটি কেনে মহ্যাবৃত্তে লেগেছিল। বিভাস বলল, কেন।

ঈশানের সৌন্দর্য্যের মধ্যে একটি ভুবন বিজয়ী হাসি দেখা গেল। বলল, যে বনে ব্যাধ থাকে, পাখি সেইখানে যায় না। এ বাড়ির কাছে আসলে গলা আপন বুকে আসেন, এও তো আর অন্য জীবন নেই বানা।

তারপরে নিজের পরিচয় দিল ঈশান। বসে সে বাউল, জাতিতেও তাই। এ গ্রাম এককালে বাউলদেরই ছিল। অলিঙ্গুর এর আসল নাম। সেটা ছিল বরসিংহ বাউলের আসলে। তারপরে 'পদ' গেছে, 'অটোনা' বলতে বলতে এখন 'অটোনা'র বাড়িমেছে। কিছু, বাউল আর গ্রাম নেই, হু-তিন ঘর আছে। ভায়া নামেই বাউল। চাখ-আখাখ করে। ঈশানের শব্দ-শব্দে নব্বই আছে। কিছু

দিনে একবার উল না ধিলে বনটা নাকি বীণা-বীণা লাগে। বেরিয়ে পড়ে। হু-একদিন কোরা হয় না। তবে কিনতেই হয়, বাউল এখন সংসারী হয়েছে।

তারপরে ঈশান হু-চোবে বিভাসের দিকে তাকিয়ে বলল, কিছু, জুই এখানে ঠিই গেইলে কেমন কইরে বো বাবা। জুই যে জির বানবু।

কেন?

তোয়ার চ'ক হুইশান কর। মন বলে, আচ্ছ জুই অনেক জলার জইসেছ, শুনতে শুনতে খাটি হইছে। এইখানে তো তোয়ার বান বেশিদিন থাকবে না।

ঈশানার বতো শোনাল ঈশানের কথা। পাগল কিনা, তাই বা কে জানে। পাগলের বতোই ঈশান হয়ে বাড়িরে বিভাসের শ্রুতিন হয়ে বলল, নিজেবে যে ঘর ন জো, তাই এসেছ অচিনশ্রুতে। বানা হইল, আস তোয়ার কাছে।

তারপরে অনেকবার এসেছে ঈশান এক বছরে। একটা বিচিত্র দল্লক'ও মনে করে কখন স্থাপিত হয়ে গেছে তা মনে বিভাসের। ঈশান না এসে তার মন ব্যাথা হয়।

মাঠ বেশি, বানবু কম চোবে পড়ে এই অটোনা গ্রামে বোধহয় সেটা দূর গ্রাম বলেই। তবু শৈশবের আবে হাট আছে। বেশ বড় হাট। প্রতি বুধবার-বিবার হাট বলে। বান, আনাখ-ডরকারি কিছু, কম চালান যায়। বাইরে। গায়ে বলও হাটের দিবে প্রচুর পাওয়া যায় কোলাই আখিবানী ক্ষেতমন্ডুর মেপেদুর্নের ভিত্তর ভালের সংখ্যাই মনে এখানে বেশি ব্যাঙালী চাণীর থেকে হাটের দিবে সাময়িক চালানব বনে হাটের পিছনে। কো থেকে কিছু মেপোপজীবনী বেরোমানব আসে। পরিচয় চলে যায়। গয়ারদুর থেকে নাকি আসে।

হাটের পরে আঁচনা বিসোর। ডাকঘর আছে, হাইক, আছে। বিভাস মেখেছে, কলুটাতে ছেলে গ্রাম নেই হাটেররা অধিকাংশই নাকি বাইরে থেকে যোছ আচে পড়তে। কলুদের মাঠে সোদু চরে লজ্জা বড় ব্যা জালের। মেজবান্টর মশাই গ্রামের লোক। তিনি বলে ছেলে নেই এখানে, কলু চলে না। পড়বার বতো ছেলে গয়ারদুরেই হাইকলুয়ে যায়। জল্লোকোকা শব্দে সে অধিবকার লজ্জাবে। সেখানে বানা করে থাকে ভায়া

এর দৃষ্টি কারণ অনুমান করেছে বিভাস। তারকেশ্বরের ঘরে যে বন্দুক আছে, এবং যেগুলি যেখানে বন্দুকেই আগুন ছিটিয়ে দিতে পারে, এটা জানে বোধহয় কাক-পক্ষীও। বন্দুগনিধি চমকে উঠেছিল বিভাসও, আচমকা বন্দুকের শব্দে। তারকেশ্বর অবশ্য কাক কোকিলের শব্দনে কেন্দ্র নে না। হয়তো দহদা হরিয়াস এসে পড়ে না ভেবে কিংবা অন্য কোনো পাখি। প্রথম দিন যে বিভাস পারদা চোখে নি, তাও বোধহয় এই কারণে। আর এক কারণ হতে পারে আর পাহের সাপটা। তাকে দেখেই বিভাস। কালো সাপটার গায়ে শাখা পদা তারা, হাত ফেলক দখা, চওড়ার চার ইঞ্চির কম নয়। শুনলে, সাপের আঙাটা টের পেলে পাখি দেখানে আসে না। তা সে ভক্ত-বুড়োই হোক আর অয়ারসাই হোক।

কিন্তু গানের অপরাধ? হয়তো মন ব্যাঘাৎ ছিল তারকেশ্বরের। কঠিন হৃদয় জাবনা ছিল বলে, হাতের হৃদয় হয়েছিল হয়তো কেউ। আর ঈশানোরা শব্দ আসন বলে গান গেয়ে যায়। মানুসের হিকে কিয়ে ডাকার না। নইলে আর কি হতে পারে। হান্দু তাকে গানের কথাগুলিও বলেছিল;

ওরে লুকিয়ে তুই ফিরবি তোখা

চাকাতুর্কি দিবি কত?

খিনি আমেন অবরোতে

তিনি যে সব দেখতে হত।

হান্দু এমন করে বলেছিল, বিভাসের মনটা চমকে উঠেছিল কি বকম। যেন হান্দু তাকে কলছে। কিন্তু কি লুকিয়ে ফিরেছিল বিভাস। হান্দু কি মনে করছিল, বিভাস আই. এ. পাশের চিঠি এখন আসে নি, তখন সে নিজের পাশ করে নি? কিংবা ফিরে আসতে দেখলে, তার কথা শুনলে ছোট্টটির কথা মনে পড়ে যায়, পর বাকি চোখে হাসে, অকারণ হাসানের ঘরে এসে উঁকিছুকি মেরে যায়, এমন কথা আসে হান্দু?

কিন্তু সেদন কিছুই নয়। তারকেশ্বরের ব্যক্তিগত দৃষ্ট কয়েক ঘর হান্দু। তাপনের কট বিদ্যুৎ। তারকেশ্বরের মেরে পক্ষর সঙ্গে বিভাসের আরো পরিচয় আছে কিনা, সেটাই হান্দু জানে না।

কিন্তু ঈশানের গান শুনলে কি এখনি করেই

তারকেশ্বরের মনের মধ্যে চমকে উঠেছিল? হান্দু হয়েছিল তাই?

কিন্তু তারকেশ্বর এখন জাকারি করেন, তখনও যেমন তাঁর হৃদয়ের শীতলগুলি কঠিন হয়ে থাকে, পিঁকারে সেদেও ভেদনি। কেন্দ্র পিপল চোখ-বুটি হলো একটু বেশি। তার কারণ, সেদিন তারকেশ্বর নয় বান। মোড়ল এখন কুরিয়ে যায়, তখন বুনো আনোপানে কোথা থেকে কলগিতে করে তাদের গল নিয়ে আসে। তারকেশ্বর তাই বান।

সেবে মনে তো হয় না যে তারকেশ্বর তাঁর কোনো কাক লুকিয়ে করেন কিংবা কোনো কিছুতে ভয় আছে।

এখন যেদিন ডাক পড়ল বিভাসের পিঁকারে হাওয়ায়, সে ঘাবড়ে গিয়েছিল। তারকেশ্বর বললেন, একটা গার নিয়ে দিও, নইলে পীত করবে।

কিন্তু বাবে যায় কি ভান্নুতে যায়, তার ঠিক নেই, গারটা নিয়ে ঘর কেন্দ্র করে বিভাস। শুনুরের হিকে সেদিন আরো কয়েক গল আধিবাসী এসে হুটস। বাইরে ঘরে উঠানে কালো কালো মানুসগুলি তাঁরবন্দুক আর টাঠি নিয়ে ছটসা পাকাতে লাগল। বুনো তাদের সঙ্গে কথা বলল হাত-ভাষায়।

তারকেশ্বরের সঙ্গে হাতি কঠিন। বাগকোটা মেয়ে কাগড় পরে শাট-কোট পরে তারকেশ্বর অনুরের হতে চললেন পৌষের গোলা-হুড়ানো মঠ ভেঙে। প্রায় আটমাইল দূর কেউটে বিল।

আধিবাসীরা হাটের চারপাশে হাঙিরে চলছে। সে এগারোটি কুকুর কখনো পেছিয়ে পড়ছিল, এগিয়ে চলছিল কখনো একসঙ্গে লবাই ভেঙে উঠে পৌষের রিক্ত হাটে বিকলটাকে জুলাইল স্তম্ভিত করে। কুকুরের ডাক বা হলোই শোনা ব্যক্তিগত বিকিত্তি ডাক। বাকিও তখনে মিনের বেলা। বিকিত্তি না ডাকলে মৈলমধ্যকে টের পাওর যায় না। তাই তারা সব দর ডাকে। মানুসকে কোলাহলের অন্য সোকালায়ে মিনের বেলা চাপা পড়ে থাকে তাদের ডাক।

বুনোকে একবার জিজ্ঞেস করল বিভাস, নামট কেউটে বিল কেন?

বুনো বলল, কালিনী কুকুরে ভল, কেউটা মাপে

নতুন। বড় নদীর জল যখন এসে বেশ বর্ষাকালে তখন মনে হয়, জল যেন সাপের নতুন পাক বিধা দিয়া চলেতেছে। শিত শালে দু-চারটে মানুষ কেউটারিসের গোটে ঘর। ভিজেন কথাই বোঝার অব্যয় হয়েই বিভাসের। বুনো একটু ভালোভাবে বলতে পারত না কথাটা। আবার হাত তুলে ভাপি করে বদল, এ-সবও বুঝে আছে।

অর্থাৎ শাপ। বুনো কলস, কেউটে শাপ আছে। চোখে পড়তে পারে।

কিন্তু তারকেশ্বর কোনো কথাই শুনেন না। না এসে উল্লস কি বিভাসের। একজন একটা ব্যাঘ্র তার জীবনে এই প্রথম। আনন্দ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দর বিপরে সব মানুষের আনন্দ হয় না।

বিসের প্রান্তে এসে যখন শৌর্যনো গেল তখন শৌর্যের ফেলা গেছে। আশেপাশে ছোটখাটো দু-একটা গ্রাম থেকে শিখের কীল পক্ষ শোনা গেল। আকাশে সব এককালি গাঁব দেখা দিয়েছে। টাচপাইটে, হ্যাংগকেন, পতঙ্গি, আটার বুটি, মাংস আর জল আনা হয়েছে।

তারকেশ্বরের বাড়িতে ব্যাপারটা যেন এখন কিছু নয়। এ আদার জন্যে কোনো বকর আসাদা হকিডাক চিংকার হয় নি, হুটোহুটি করতে হয় নি, অন্তত টের পায় নি বিভাস। বিকালে ডাকারখানার না গিয়ে কেউটে বিলে আনা, এইটুকুনি যা তফাত।

কিন্তু বিল কোথায়? হু হু করছে বাঠি। দুর্বা ঘাসও হয়েছিল বোঝা যায়। ঘান কেটে নিয়ে সেহে। এখানে সেখানে কঁকড়ার ঘোলস। ভিতরে বাস কেই। পানুকের খোলও দেখা যায়। একটা পোরর ককাল চোখে পড়ল একবারসায়। আর হারার ঘুনি, কবে পাডা হয়েছিল, তোলা হয় নি। বৈকে দুইটে আছে এক-জালসায়। কয়েকটি ঘুনি আর একটা ছোট জলা নানজলির মধ্যে।

বিল কোথায়? বিলের জল আগো দেড় হাইল ধরে। তার কাছাকাছি যেতে হবে। কীভাবেই বাতক মানুসের।

দু-একটা গাছটিল, হিল্লপ গাছ দেখা যায় ধরে ধরে। একা একা ঘাঁড়িয়ে আছে এখানে সেখানে। জানা-

অজানা নানান ছোটছোট গাছে এই সব প্রেত প্রান্তর ছেয়ে আছে। বিলের কাছে গাছ আর একটু বেশি দেখা যায়। নরম বোঝে হয় মাটি। পাখি উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে এক কাকি।

তারকেশ্বর চোখ তুলে দেখলেন। আর মাতে মাতে কুকুরগুলিকে ডাকলেন। কিন্তু ডিক ডাকলেন না। যেন। কুকুরগুলি ডাকার, আর আয়ে আয়ে হাঁড়িয়ে পড়তে থাকে। মনে হয়, আর একমাইল জারসা থিরে হাঁড়িয়ে পড়ছে কুকুরগুলি।

আমিবাগীগুলিও হাঁড়িয়ে পড়ে এথিকে ওথিকে। তারকেশ্বর বললেন বিভাসকে, তুমি আবার কাছে কাছে থাক। হরিয়াসের কাকটা কেমন মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল দেখে।

কবাকের প্রত্যাশা না করে, ইভালিমান হাইডম্যানার ব্যাগো বোরের বন্ধু-কটা তুলে নিলেন। ব্যাগেল-লক তুলে দেখে নিলেন একবার এক চোখ লাগিয়ে। গুলি ভরলেন চোখারে।

হঠাৎ হাত ফুটি ধরেই বড়বড় ঘাস কেঁপে উঠল, কাঁদুনিটা একটি রেখা ঘরে ধরে বিলিয়ে গেল তাঁরের মতো।

বিভাস চমকে উঠেছিল। তারকেশ্বর বললেন, বরা। অর্থাৎ বরসোস। বিভাস ভেবেছিল, এখানে তারকেশ্বর তাপ, কবলেন। কিন্তু হাসলেন একটু। ভিজেন করলেন, থারার মাংস খেয়েই কখনো?

বিভাস অবাক হয়ে বদল, ভরসোকে ধার? তারকেশ্বরের হু কঁকড়ে উঠল। বললেন, মানে? কথাটা বোঝার ঠিক হয় নি বলা। বিভাস বলল, না, মানে, খাওয়া যায়।

তারকেশ্বর বুনোকে ডেকে বললেন, একটা বরা ব্যাঘ্রা ধার কিনা বেশি তো, একে বাজাতে হবে।

একটি গাছলয়ার সব চেয়ে তারকেশ্বর ডাকলেন বিভাসকে, এল আবার মগেন। একটু নম্বর বেবে কান-খাড়া করে এল। অব্যয় এখন ম্লান পড়ে সেহে, বিশেষ ভয় নেই।

বিলের ভয়। সাপের।

পীতভা যেন একটু বেশি লাগে বিভাসের।

হাত মেয়ে এসেছে বিলের প্রান্তরে। অশ্রুতে চাঁদের আলোর স্রোতিনী কৃষ্ণ হাঁকিয়ে পড়েছে সর্বত্র। আকাশে আতরণ পড়েছে কুসুমার।

তারকেশ্বর শিশু বিলেন বদন আছে। তারপরে ছোরে। অদূরেই একটা গাশা ক্রুর পঙ্কজ, পদ্ম শোনা সেল। কের কুকুরটা কি বলছে।

বিভাস বলল, আচ্ছা বাব আছে এখানে।

তারকেশ্বর বললেন, কব। বিলের ওপারে চিতাবাঘ দেখা যায় প্রায়ই।

কোথায় চললেন তারকেশ্বর কে জানে। বিভাসও তার শ্যাওলা হেঁচকে হেঁচকে চলছে। তারকেশ্বরের বিশ্রামে হলের গন্ধ। অশ্রুতে আলোর সুবাসি আরো বড় আর ভালবাসে সেখানে। পক্ষ বৃন্দির নীচে শিল্পা চোখ-মুটি হলুদে যেন বর্ণাকারে। বিভাসকে যদি গলা টিপে ধরে ঘেঁষে ফেলেন, কারুর কিছু বলবার নেই। সোড়ার কম্পাণটার মতো গড়ে থাকবে সে বিলের মাঠে। কিন্তু, যারকেন ফেল, আর এ সব কথা মনেই যা কেন আসে।

কিছু মনে হয়, মানব বদন বদন করে, তখন ঠিক তারকেশ্বরের মতোই বোধহয় দেখার তাকে। ডাকারের হাতের গপিঁল বঙ্গালি মোটা হয়ে কুটে উঠেছে।

হঠাৎ একটা কুকুর কেউ কেউ করে উঠল বাঁকি থেকে। তারকেশ্বর ক্রিয়ে ডাকলেন সেখানেক। কাঁবে কোলান হু-ব্যাটারিট চট্‌লাইটটা ওঁর আঙুলের চালে চকিত আলোর চককে ফিল মার্চের একটা দিলস।

কুকুরটা কেউ কেউ করতে করতে ছুটেছে।

হঠাৎ একটা গলা শোনা সেল কাছ থেকেই, হু-বু...

ডাকটা যেমন সেল কুকুরের। তারকেশ্বর গলা তুলে বললেন, কী।

জবাব এল, বঁরা।

সবাই আছে আপনাপনে, সেখতেও পার হতো, শব্দ; বিভাস কিছুই লেখতে পার না। শব্দ এই নীতাত' বাপটি-বাবা বাস, মাঠ আর তারই নিশিতে পাওয়া তারকেশ্বর তার চোখের সামনে।

আবার চলতে লাগলেন তারকেশ্বর। পা-বুটো কাঁপিয়ে গেছে বিভাসের। হাতবুটি কিছুতেই বাইরে রাখা যাচ্ছে

না। কিন্তু পকেটে পোড়া ও নুস্কর। অপরান বাড়িতে টাল সামলে চলা যায় না।

তারকেশ্বর চাশ। গলায় কুঁসে উঠলেন, ভীতু জানোয়ার।

বিভাস চবকে উঠে বলল, আছে।

বাঁতালের কথা বলছি। ভীতু, জানোয়ার। যত করেছে, চিরদিন পাঁচিবে থাকতে পারবে। গাঁতাল শূন্যের খোঁচা হচ্ছে, বৃত্তে পাবে বিভাস।

কতকাল এরকম ঘুরে বেগাল নেই বিভাসের শিখ'নতার এই বিচিত্র নিশির খোঁচা কখন তাকেও পেয়েছে একটু একটু করে। সেও অনুভব করছে, কারা ন ঘুরে তাদের আপনাপনে, হিসাতে বৃক চোপ চোপে।

আবার একটা কুকুর কেউ কেউ করে উঠল। গলে গলে আর একটা। তারপরে প্রায় সব কুকুরগুলিই এঃ জালা থেকে ছেকে উঠল যেন। কুকুরগুলির কেউ কেউ ভেদ করে, একটা ভয়ঙ্কর কর্ণ তীব্র চিক্কার এল ভেদে তারকেশ্বর চিক্কার করে উঠলেন, হেই, হেই রে।

জবাব এল, হী, হী বাবু।

চট্‌লাইট কলসে উঠল তাঁর হাতে। সেই আলোর বিভা দেখল, কুকুরগুলির ডাক লক্ষ্য করে আবিবাশী মান্দ, শূন্য ছুটেছে। হাতে তাদের উল্লভ তাঁরনুকও টাঙি।

হঠাৎ একটা কুকুর কেউ কেউ করে কেঁদে উঠল তারকেশ্বর শাইত-ব্যাবারটা তুলে পাঁতে পাঁত বলে বললেন ঘেঁষে ফেললে কুকুরটাকে।

যেহে ফেলল। বিভাসের মনে হল, একটা অপরীষ কিছু মেন ঘিরে আসছে চারদিক থেকে। কিন্তু তা গলায় কোনো দর নেই।

কুকুরের ডাক ছাপিয়ে তখনো সেই আকাশ ফাট প্রান্তর-হেঁচা আঁ-আঁ চিক্কারটা ভেঙ্গে আসছে। আ আসছে যেন এ দিকেই। আবিবাশীর ভাবা বোটে না সে। তারাও যেন কী বলছে চিক্কার করে।

তারকেশ্বরের চোখ হলুদে হলুদে অপরার মতো কেবল কিস্কিক্স করে বললেন, হ্যাঁ, ঠিক আছে। ঠি আছে।

পরমহুতেই বিভাসের চোখে পড়ল, কতকগুলি কালো কালো কী ন ঘুটে আসছে বাস-কালল গাণি

মাড়িয়ে । সুকুমারি গেল হাসে ঘিরে আসছে যেউ যেউ করতে করতে । তাদের খেয়াওরের মাঝখানে তারকেশবরের আসো পড়ল । বিভাস দেখল, মহাবড় একটা শুরোর । দাঁতাল শুরোর, একরোখা, সোকা তীরবেগে ছুটেছে চিৎকার করে ।

তারকেশব চিৎকার করে বললেন, পারাবি ?

হ্যাঁ ।

বিভাসের চোখে পড়ল, একটু, দুটোই অন্ধকার থেকে একটি হুঁত' যেন ঘাস ফুঁড়ে উঠিল টাঙি হাতে । শুরোরটা হঠাৎ একটু বাকি নিয়ে লোকটার দিকে অগ্রসর হল । দুটোটা দুখ হাকিয়ে তার বাকি দুটোই হাঁড়টি বর্ণার বতো আগে আগে চলছে যেন ।

দুহুত' কী ঘটে গেল । বিভাসের চোখে পড়ল টাঙিটা আঘাত করল শুরোরটাকে । আবার তীব্র চিৎকার । টাঙির আঘাত ঠিক বতো লাগে নি । নিয়মে তারকেশবের হাতের সাইজ্যাবার গর্বে উঠল ।

বিভাস পরিষ্কার দেখল, সুকুমারি লম্বার একতায়সার কাঁপিয়ে পড়ল । তারকেশব চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন, কাউকে ঘেরছে নাকি ?

জবাব এল, না ।

তারপরেই একটা সমবেত উল্লসিত চিৎকার উঠল শুরোরটার চেয়েও তীব্র গলায় । তারকেশব বললেন, নারা পড়েছে বাটা ।

কিরে আসার পর দুদিন শুরু সেই শুরোরের চিৎকারটাই কানে ভেসেছে বিভাসের । সেই বিভাস কী লুকিয়ে ফিরবে । তার ভয় কিসের কিছ, ঈশানের গান শুনেন কেন কিছ হারিয়েলেন তারকেশব ?

বিশ্বাস কিংবা পথর যে পুত্ চিটাটা যনের কোণায় লুকিয়ে ছিল বিভাসের, তারকেশবের নিশ্চয়ই সে রকম কিছ নেই । তবে । ঈশান মিঠি-মিঠি মেসে গায়—

মন আছে তোর যনের ভিতরে
তাতে একবার দেখ বেড়চেতে ।

চান্ন

ঈশানের চোখে হাসি, বাড়ির ভাজেও যেন একটি চাপা হাসি লুকিয়ে ফেরে । ঈশান গেয়েই বাদাল, 'মন আছে তোর যনের ভিতরে' ।

বিভাস জিজ্ঞেস করে, সেটা আবার কেনন ? মন আবার যনের ভিতরে থাকে কেনন করে ? ঈশান নাউল, কিছ হা-হা করে হাসে না । বিভাসের কথা শুনেন, তার দাঁতির কাকে কাকে টুনটুনির লুকোচুরির বতো হাসি একটু বেশি খেলা করে । বলে, ঠাণ্ড করতে পাইলেন না, না ? কথা হইল, মন কানারে আশ্রয় কইরে আছেন, সেইটে একবার দেখা । এই দেখ, যান্দের এই মেহ কানারে আশ্রয় কইরে আছেন ?

বলে, যেন কতো না আশ্রয় ও সোহাগ ভরে, মাটিতে হাত বলিয়ে বলে, এনাকে । ঘরীতীকে আশ্রয় কইরে আছেন দেখ, দেখকে যার কইরে আছেন উনি । শঙ্ক আছে তোমার সামনে, তোমাকে চইলতে হইবে । তেমনি যনেরও আশ্রয় আছে যে । তারো শঙ্ক আছে সে শঙ্ক হইরে সবাইরে চইলতে হয় । যনের সেই আশ্রয় হইলেন যনের ভিতর । তানারে একবারটি শূঁকে শেতে বেড়ে চেতে দেখতে হইবেন না ?

বিভাস বোকার বতো চোখে থাকে ঈশানের হুয়ের দিকে । যেনন ঈশানের গান, তেমনি তার ব্যাখ্যা । বিভাসের বোকা হুয়ের চিবুকটা বেড়ে দিলে সরেছে যেলে ঈশান চলে যায় ।

নানান হুত'কের লম্বাহনে মান্দুণ কত কী আবোলভাবোল কথা বলে । তাহাড়া রাখার ভিখির হুয়ে ওরকম অনেক কথা বিভাস শুনেনে । সে জ্বায়েতো, ও দব ভিকে চাওয়ারই হ্লাকলা । তার জিরকাল লম্বাই করতে ওল কথা শুনেন । যে-লম্বাহাযোবের জন্য লম্বাহনের সামনে মরতেও তার মরবে সেগেছিল । তারের গাঁবেও একরকম মান্দুণ মেখেছে বিভাস । চতীর সোকায়ে সেই ব্যালাপাংলা বোন্টন লোকটা আসতো । চলতে কিংবতে গারতো বা । বলে বলে এমন এক তরঙ্গ আওড়াতে লাগত যেন জগতের আদি-মুত্ত জালতে তার বাকী সেই । ভিকে তার জুটত সামান্যই, দু এক ছিঁলিষ ভানাক, তাও দুটো বাহ, শুরু কদকে, আর দুচারটি বিড়ি । লো কটা র কথা শুনলেই ভীষণ লম্বা করতো বিভাসের । তাকে পালাতে হত । কীত'ন গান পোনার লাব থাকে সবেও কোনদিন শুনতে পারে নি বিভাস ।



গায়কের বকম-বকম সেবে লক্ষ্যায় যেন হাতিতে
বিশিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, আদরের সব
মানুষ বুঁত তাকেই দেখছে। কোন কোন সময় কাউকে
বুঁত বেশি গাঢ়ারগাঢ় করতে দেখলেও বিভাদে লক্ষ্য
করে। হাঙ্গারের ব্যবহারে তার হাস হয়েছিল, ক্রন্দা
হয়েছিল। কিন্তু তার চেয়ে লক্ষ্য হয়েছিল অশ্রুসীমা।
এই চেয়েও বড় কথা, তার বাবা যে বজ্রাঘাতে
হয়েছিলেন, তাতেও যেন কোথাও একটি লক্ষ্যের স্পর্শ
লগেছিল তার মনে।

ঈশানের প্রথম দিনের ব্যবহারে তার যে লক্ষ্য না
করেছিল তা নয়। কিন্তু তারকেশবের এই বিকুন
বাসনে, অচেনা আলিয়ার কোন যেন পাগল-পাগল ভাব
থাকা সত্ত্বেও ঈশানকে ভাল লগে গিয়েছিল।

কিন্তু ঈশানের এই 'মনের ভিতরে মন' থাকার ভিত্তকে
পাগলামি ভেবে উড়িয়ে দিতে গিয়েও মনের কোথায়
একটি অশ্রুজির ছোট কটা ঈশানের বিচিখিটি হাসির
মতো ফ-ফ করে। ব্যাটা দেখতে গিয়ে চিরকালই
বিভাদের মনে হয়েছে, 'বিরেক' সোঁকটা নির্ভাত
সোয়েশা। নইলে কোন রাজা পাগল করেছে, কোন
মহারাজ পুঁজা করেছে, নে-কথা সে গান গেয়ে বলে যায়
কেনন করে। ঈশানের বিচি-বিচি হাসি-হাসি হানাতো
কমার মধ্যে সোয়েশাপিগির ছুটে ওঠে যেন। ভাবখানা,
ওরে আমি তোমার সব আমি।

বিভাদ হাস করতে চায়। পারে না।

পর আর বিদ্রুতের কথা বলে নাকি ঈশান। এই বুঁত
নয় মেয়েমানুষের সঙ্গে তার কী যেন কী এক
বেদা আছে উঠছে, যার কোনো কৈকিন্ত কেউ
চাইলে কোনোদিন কিছু বলতে পারবে না
বিভাদ। বাড়িতে যখন ছোট বউদি ছিল, সেইরকম।
ছোট বউদি, বউদি ছাড়া আরো কিছু ছিল, সেটা
তার ব্যবহারেই প্রকাশ পেতো। সেটা কী, বিভাদ
বলতে পারবে না। কিন্তু সেটা নয়, এখানে দবাই
তার পর। বাংলা দেশের মতো সে। একটি
যেহে আর একটি বউ—নীরবে হোক সরবে হোক,
কেন হলে তার দিকে চেয়ে, চাঁটারবহন করে কিংবা
বদনুটি করে, এর কোনো কৈকিন্ত নেই, জানে

বিভাদ। জানে পথ কেন বাগানে আসে, জানাশার উঁকি
হারে, হাসে খিলখিল করে, সেটা লোকের না জানাই
ভালো। তা এদন তার নিজের ভালো লাগুক আর
না-ই লাগুক এই 'না-জানা ভালো'র শিদ্ধান্ত থেকেই
ঈশানের মনের ভিতরে মনের ভিত্তে সে বোকা হয়ে যায়।
চোখ শিটশিট করা অভ্যাস থাকলে স্বভাবে হাস্যর মতো
ভাবো চোখের পাতা খির হয়ে যেতো।

তারকেশবের এক বিশ্বর। সেটা আলিয়ার মধ্যে
বিশ্বরের একটি প্রস্থর ভাল যেন হাঁড়িয়ে আছে। তেমনি
বিদ্রুত পঞ্চও বিশ্বর।

সেই প্রথম দিন পুকুরে দেখা হওয়া ও 'মুখপোড়া'
বলা দ্বিহ্নেই খেলাটা বোঝার পুরু হয়েছিল। তারকেশব
দিন পরে, সকাল বেলা পঞ্চ আর বিদ্রুত দুজনেই এসেছিল
বাইরে থেকে একটি হোবা বুঁত তক্তাশোলের উপর হুঁটে
দিয়ে বসেছিল বিদ্রুত, এই কাপড়টা পরবেন আজ
বল্যা পুকুরে বুঝেই দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে যেনে
বিভাদ মনস্থানে হাঁড়িয়ে উঠে বসেছিল, ও, আচ্ছা।

পঞ্চ কঁটন মেখেও বোঝার ঠিক আন্দাজ করে
পারে নি। তাই চোপা গলায় বলে উঠেছিল, ওহা। ব
চ্যাটা ভাই বউদি।

বিভাদ বিব্রত হয়ে নিজের দিকে তাকিয়েছিল
পুনতে পেরেছিল, পুকুরঘাটের দিকে যেতে যেতে বিদ্রু
চোপা গলায় কয়েক উঠেছিল, চুপ কর, পুনতে পারে যে।

তারপর দুজনেই যেন হেসেছিল। সেই হাসিটা অ
যাবে নি।

হাতে হাতে দুপুকুরে তারকেশবের দূর গায়ে চলে য
বুঁতী দেখতে। তখন বিভাদকে একলা পুকুরে এসে ব
করে যেতে বসতে হয়। যেদিন একলা গুঁড়ে যায়, সেটি
সামনে পিছনে একটি আড়তভাটা বোঝ করে। বিদ্রুত ভা
দিয়ে সামনে গাঁড়িয়ে থাকে। পঞ্চ হাঁড়িয়ে থাকে পিছনে
দ্বয়ের হরমার উপরে। পাড়ের ভাত কুঁড়িয়ে গো
বিদ্রুতের দিকে বুঁত তুলে তাকায়। তারকেশব থাক
তাকাতে হয় না। আড়াল থেকে বিদ্রুত নম্র হাস
ঠিক দূরে ভাত দিয়ে যায়। না থাকলে ভাতাতে হয়
বিদ্রুত বলে, ভাত চাই।

চার্কার চুঁকি অনুযায়ী শেট-সুতারিত প্রাপ্য ভা

চাইতে লক্ষ্য হওয়ার কথা নয়। তা ছাড়া, পেট ভরে ভালো করে খেতে ভালোবাসে বিভাস। তবু বিদ্যুতের জিজ্ঞাসার চঙ-এর জন্যই কি না কে জানে, বিভাসের মনে হয়, সে যেন উপরি চাইছে। বসে, হাঁটা।

বিদ্যুতের চোখে বিদ্যুৎ চিক-চিক করে, অভ্যাসমতো চোঁট গুঁটি একটু চিপে রেখে বসে, হৃৎ কটু বসতে পারেন না।

কথার শুরটুকু কেমন ঢোনা-ঢোনা পাশে বসে বিভাস বসে, আশনি মাঝে মাঝে গাঁড়িয়ে হয়েছেন, তাই আর...

তখন শেহেনে হরতো গম্বর চুড়ি পথ বাজে তার গুঁট-হাঙ্গির হতো। ঘর তো হাল্দি শোনা দার অপস্টভাবে। বিদ্যুৎ বসে, আশি বৃষ্টি গাঁড়িয়ে গাঁড়িয়ে আশনার বাজা দেখাই।

তখন ত্রুটি সংশোধনের ভাষাতে বসে বিভাস, ভাত দিন আমাকে।

বিভাসের মনে হয়, বিদ্যুৎ হাঙ্গির চোপে ভাত আনতে চলে যায়। তখন হরতো গম্বর জিজ্ঞেস করে, কটা ইন্ডেকসন করলেন আজ?

ইন্ডেকসন করতে শিখিয়েছেন তাকে তারকেশ্বর। খাদ্য দাস কাটতে কাটতে জ্বাব দেয় বিভাস। হুঁ তেজ্জে কি না, পক্ষর এই কিছুশাখক প্রহরও জ্বাব দিতে হয়, না, ভাতে বি। হাত কাঁপে বি। হুঙ্গির পাশে বি।

বিদ্যুৎ ভাত দিয়ে আসে। জ্বালা বেশি করে ঢেলে দিয়ে, বসক দিয়ে বাগায়। বসন সাতা আর বেতে পারে না, তখন বিভাস বসে, আশার কণ্ট হচ্ছে।

বাজা পাতে ভাত দেবে বিভাসের গা কিঞ্চিৎ করে। মনে হয় কোনো হুঁ পথ করতে বসে, না খেতে গেরে উঠে গেছে। খালা পরিষ্কার করে না খেলে নিজেদের তার বাগায় তুঁত হয় না। কিন্তু খালা চটে শূঁতে খেতেও তার লক্ষ্য করে। সরাই না জানি কীভাবে। জোঁপ ভালো করে বাওয়া সকলের কাছে ভালো নয়।

সে বসন সাতা আর বেতে পারে না, তখন বিদ্যুৎ জ্বোর করে না আর।

তারকেশ্বর থাকলে টের পাওয়া যায় না, বিদ্যুৎ ও পক্ষর সঙ্গে আশপেই বিভাসের কোনো কথাবার্তা হয় কি না।

এই ভাবে, এক বছরের মধ্যে তাদের তিনজনের একটি সম্পর্ক গাঁড়িয়ে গেছে। কী সম্পর্ক, জিজ্ঞাসা করলে কিছু বলা যাবে না। যেন পক্ষ ও বিদ্যুতের একজন বিভাসের প্রয়োজন ছিল। হু-মনে তারা যে-সব কথা বলে, হাসে, বসকায়, বাসানে খালে, এ সব-ই জ্বা হয়ে ছিল। বিভাস আসতেই সে সব বসত হতে আরম্ভ করেছে। কোথাও কোনো অশাভাবিকতা নেই। শূঁ হুতু' কোনো মানুষ এই তিনজনের মধ্যে এসেই জ্বরী এ চক নীরব হয়ে যায়।

বিভাসও তাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। খেলাটি যে-খেলাই হোক, তার তিনজনের আভিনার বরা পড়েছে সে। আর বরা পড়েছে বিভাসের চোখে, বিদ্যুতের বিশ্বকর ব্যক্তিত্ব। সে ব্যক্তিগতগী, কবিশূন্য, বুদ্ধিমত্তী। কিন্তু এ গবের বাড়ীতে কোথায় কেন একটি অসহায় ডব, একটা গাশা বাখা তাকে অসহায় করে রেখেছে।

পক্ষর কথার কোনো ধরন-পাঠন নেই, ইচ্ছে করলে ছেঁড়াতেও পারে। হাত শূঁ তার যে-ভাবে নড়াচড়া করে, মনে হয়, বিভাসের বাড়ি একটা হুঁ দেবার কিংবা চুলের বুদ্ধি করে টেনে দেবার বুদ্ধি বড় সাব। সে হুঁশ। বিভাগকে চোখে হুঁশ। কথা বলে হুঁশ, বিদ্যুৎ করে হুঁশ। এখন বিভাসের উপর তার রাগ করার অধিকার কমেছে, রাগ করেও হুঁশ। যে-দিন কথিয়ার অধিকার জ্বাবে সেদিন হুঁশ কে'তেও হুঁশ হবে। তারো জর আছে। সে ভর বিদ্যুতের জর নয়। সে হুঁশ, হুঁ হুঁশ এবং এত বে-ইশেনী হুঁশ যে সব যে-তাল হয়ে যায়।

এখন যোর হুঁ-মনের নিবুঁ বাসানে যদি পক্ষ একলা এসে উঁকি মারে বাসায়ের ঘরে, বসে, শূঁতে আসেন কেন? তবে বিভাস জ্বাব দেয়, তবে কি করব?

পক্ষ বসে, নাচুন।

বিদ্যুতও কখনো কখনো একলা আসে। ব্যক্তিগত কথা, কিংবা বা হোক কিছু জিজ্ঞেস করে। কিন্তু কথা হুঁয়ের যার হুঁ তাড়াতাড়ি। উভয়পক্ষই যেন হাল্দিগ কর-...কথা, কথা, কথা কেন পাশে না।

হঠাৎ হেসে বসে বিদ্যুৎ, আশি বিয়ত করি, না।

বিশ্মিত বিভাস হিজেন করে, কেন ?

একম আঁসি বলে ?

না-না ।

ভালো লাগে ?

বিরক্ত লাগে না, সে-কথা বলা যায় । ভালো লাগার কথা বলা যায় না ।

বিদ্যুৎ কী ভাবে, কে জানে । কিরে বেতে উন্মত্ত হয় ।

বিভাস তাকাতাড়ি উঠে হাঁড়িরে বলে, না, হানে—

কি বলছেন ?

আপনি হাস করছেন ?

বিদ্যুতের কালো চোখ হুড়িতে হাসি ঢেকে ওঠে । বলে, করলেই বা, আপনি তো আর কথা বলেন না । ওরকম সোঁক হয়ে থাকেন কেন ? আপনার ব্যাডির কথা হিজেন করি, পরিষ্কার করে বলতে পারেন না । আমাকে তো কখনো ব্যাডির কথা হিজেন করেন না ?

হিজেন যে করা যায়, সেটাই বিভাস ভালো জানে না আর বহি বা জানল, তবে হিজেন করতে বাবে এখনো । তাপনের কথা হিজেন করতে ইচ্ছে করে । তাপস এবং তার হাবার ব্যবহার ও গম্পক' যেনে খবাক লাগে কেন ? তারকেশ্বরবাবুর শ্রী ভুবনেশ্বরীকেও যেন কেনন-কেনন লাগে । মোটা ব্যাডিটাই যেন কী রকম এক অশ্রু পাঠিলে ঘেঁষা । কিংবা বিভাস কানা, অব্ভূত ও হুড়িতে হাঁস, কিছুই বুঝতে পারে না ।

তখন হয়তো বিদ্যুৎ বলে, দিন, মাঝার হাত দিবে ভাবতে বলে দান, আঁসি চলি । কিছু এসে হাস করতে পারেন না, বলে রাখছি ।

বলে চলে যায় ।

হাস নয় । পশু কিম্বা বিদ্যুৎ যে-দিন সকালে অথবা দুপুরে না আসে, সে-দিনটা বিভাসের কঁকা-কঁকা লাগে, কাজের হাফেও সে-কথা মনে ধর ।

তিনজনের মেধাশোনা শারদীন সাদানাই হয় । কথা সব হয় হয় না । তবু এই আঁলার গোপাকী নাম আঁলিপুত্রের অশ্রু দুতোর তিনজনে বাঁধা পড়েছে ।

তারের তিনজনের আঁপোপানে যে-বান্ধুটা প্রাইই ঘোয়কোয়া করে, সে বুঝে । বুঝেটাও যেন ঈশানের

হতোই গানে । র্চায় আসে বাসানের ঘরে । এসে পোরা নিধানর চাষরটি মেধে হয়তো ঘেসে বলে, ও, দিবা মেধে বিধানর চাষর ? কউদিদি দিবা মেধে বুঝিন ?

বিভাসের শিমিত সব প্রয়োজনের সবইই বুঝে আসে । কিছু কিম্বা আর পরর হাত দিবে সে-সব প্রয়োজন খিটে ধাক্কা আসেই । বুঝে হেসে কিরে যায় । বুঝের হোট হোট চোখ, চান্দা নাক আর ঠোঁটের গড়নের মধ্যেই হাসিটা যেন দেগে থাকে । হানে না হয়তো, মেধার হাসি-হাসি ।

পাখিপাখালির কখন গুঞ্জন শোনা যায় না বাসানে । পর আর বিদ্যুৎ আসে, তারের গুঞ্জন শোনা যায় ।

মানুষের ঘর-বাড়ির আছে । বিভাসের বাইরে জপত মেঘে, ভিতরে আছে এই বুঝন । এখানে তার মন, সকলের অসোচরে, যোগদর পর বিদ্যুতের অসোচরে, নাবান রকমের বুঝন-মেঘের চিত্রায় শুভা তাই ঈশানের বিটরিটি হাসি ও মন বেতেতে মেধার কথা মন তার ঢেকে ঢেকে ওঠে । কথার যত চোরে মন বেঁচেবার দিকে । এও যেন বিভাসে একরকমের চুঁরি ।

তা বলে ঈশানকে তার মারতে ইচ্ছে করে না কিছু, তারকেশ্বর ? তারকেশ্বরের কী হয়েছিল ?

কিছু নয় বলে উড়িয়ে দিতে গিয়েও মনে কৌতুহলে বন্ধুত্ব করে । তারকেশ্বরকে সবাই যে বড় বেশি ভয় পায় । হাস, ভয় পায়, পর-বিদ্যুত ভয় পায় । বিভাসের মনে হয়, ভুবনেশ্বরীও বো হয় ভয় পান এবং তাপস ভয়ে কায়েই আসে না ।

তারকেশ্বরকে দলসেই ভয় করে । সেই দলকে মধ্যে বিভাসও এখন একজন । দলসে কতখানি ছো ভয় করে, সে জানে না । বিভাস ভয় করে অস্বাভাবিক তারকেশ্বরকে নয় । সেই ভয়ের সঙ্গে আছে অপরিণ কৌতুহল ।

স্বভাবপ্রিয়তা বোঝে হয় মানুষের সহজাত লিপ্যা তারকেশ্বর লিপ্যায় উদ্বেগ । স্বভাবকে ভালবাসা চোরে মনের হতো নেশা করেন উনি । মেধার কো

বার্হাকার থাকে না। একবার হতে গেলে ঘোষণা না কাটা পর্যন্ত তার রেহাই নেই।

একছত্তরে মধ্যে যোগেশ ঘোষালের অচিন্তা ছেড়ে চলে যাওয়ার ব্যাপারটিতে বিভ্রান্ত যে কথা ভাল করে বুঝে।

যোগেশ 'ইউনিয়নবোর্ডের' সভ্য, অচিন্তার বিপিনী হানু। তারকেশ্বরের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। ইউনিয়ন বোর্ডের মিটিং-এ প্রথম যোগেশের সঙ্গে তারকেশ্বরের বতাকর হয়।

বতাকরের কারণটি ছোট নয়। অচিন্তার চাষের প্রয়োজনীয় অনেক জলাশয় আছে। উত্তর-পূর্বে ঘনুনা থেকে দূর্তি বেসবতী খাল অচিন্তার পূর্ব পশ্চিম প্রাণিত করে করে বাগোমাই বয়ে। কিন্তু, নেদো গ্রামটি হল পার না। নেদো গ্রামে মূলমামান বেশি। তারা ব্যাকিষ্টেটকে ধরবার করে জানিয়েছিল, বহু-কাল আগে, অচিন্তার পূর্ব-দিকের দাঁকলসারী আঙেল-পত্ত খালটি নাকি নেদো দিয়ে প্রবাহিত ছিল। এখনো পুকুরো ঘাসভরা ঘনজল্লির মতো পদ্ম একটি রেবা নেদোতে আছে। খালটি বেঘান থেকে অচিন্তার দাঁক নিয়েছে, সেখানে আছো একটি বারি লক্ষ্য করা যায়। সোকে তার নাম দিয়েছে আকোলগড়। অচিন্তার চাটুক্ষেত্রের পূর্ব-পূর্ব, অঞ্চল চাটুক্ষেত্র এই কীর্তীতি করেছিলেন। অঞ্চল থেকে আঙেল হয়েছি কি না, কে জানে। কিন্তু, নেদোর পক্ষে ব্যাপারটি আঙেল পাওয়ার মতোই। ব্যাকিষ্টেট ঘরি বাঁধি ভ্যালেন তবু নেদো বেঁচে যায়।

ব্যাকিষ্টেট ধরবারটি বিবেচনার জন্য পাঠিয়ে ছিলেন ইউনিয়ন বোর্ডের কাছে। ইউনিয়ন বোর্ডের কাকের হানুনেদো সবাই তারকেশ্বরের অন্তরঙ্গ। একাত্তরে একল আছে। তারা সভ্য বোস বের কালেক্টরে। তারকেশ্বরের হুঁস দিয়ে প্রথমেই বেরিয়ে এসেছিল, না, তা হবে না।

বারি দৃষ্টের কীর্তনের মোহাংকির মতো। হুঁস পাবেন বা বলে। যে পূর্বে বলে, যেন কী ও হাঙ্গ, ব্যাকিরা পূর্ব-তার অনুকূল করে। সে অনুকূল বোস হুঁস, অনুভূতিহীন, বরা। পকসেই বলেছিলেন, তা হবে না।

কেবল যোগেশ বলেছিলেন, এটা করতে হবে ভাই তারকেশ্বর। নেদোর সোকদের অনেকদিনের দাবি।

তারকেশ্বরের কপালে কতসুখি সর্পিণি ভর্তি পড়েছিল। তার বোটা নাক থেকে খানিকটা হাঙ্গ বেন কপালে উঠে গিয়েছিল তখন, আর নাকটি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু চুপ করেছিলেন অনেককাল। জানতেন যোগেশের সম্মুখে বাতাকর আছে, ব্যাকিষ্টেটের সঙ্গে কথাবার্তাও হয়। তার মতামতের গুরুত্ব আছে।

তারপর বলেছিলেন, নেদোতে জলের অভাব কি। যে গর্তে খাল নেই, সেখানে কি চাষ আবাদ বহু থাকে ?

যোগেশও কিছু কিছু করেছিলেন। তারকেশ্বরের চট্টাতে চাননি তিনি। কিন্তু, কথার পূর্তে কথা এসে গিয়েছিল, বহু থাকে না, কিন্তু, অন্যদৃষ্টি হলে ভীষণ ভর্তি হয়। জল থাকলে আর কপাল দুগ্ধ বলে থাকতে হয় না।

—নেদো চিরকাল তাই তো ছিল ?

—চিরকাল নয়, অঞ্চল চাটুক্ষেত্র আমল থেকে। প্রায় ঘাট বহু হয়।

যোগেশ ঘোষালের বহু-বহুল শান্ত চাষের দৃষ্টি বেন কেমন করি হয়ে উঠেছিল আতে আছে। তারকেশ্বরের সঙ্গে কখনো বিবাদের কথা চিন্তাও করেন নি। চিরকালই সার দিয়ে এসেছেন তার কথায়। কিন্তু এবারে যোগেশ ঘোষাল গুণ্ডগোল করে কেললেন। তারকেশ্বরের কুন্তু এবড়ো খেলো শারা পাখরের মতো শক্ত হুঁস, দাঁধ স্নেহ, ভিতরে ভিতরে তাকে পোড়ামিল, অপমানিত করেছিল। আপদহীন করে তুলছিল। বহুকের বর্ধা চিরকাল যোগেশেরাই দিয়ে এসেছেন, তারকেশ্বরের কোনোদিনই দেবে না ? তার আরো স্নান হাঙ্গি ইউনিয়ন বোর্ডের নেদোর প্রতিবিধিকও চুপ করে থাকতে দেখে।

তারকেশ্বরের বর্ধা দিয়েছিলেন, ঘাট বহু বহু চলেছে, নেদোর বারি জীবনও চলে যাবে। দৃষ্টার হয়, ঘনুনা থেকে নতুন খাল কাটিয়ে নিয়ে আগার প্রভাব নাও তোলায়।

—পাঙ্গলের মতো কথা বলে না তারক।

—তোমার মনে হচ্ছে বটে আমি পাঙ্গলের মতো কথা

বলি। কিছু আমি প্রেসিডেন্টের হাতেই কথা বলি।

—প্রেসিডেন্ট তেঁা নামখোলাই করতে পারে না।

ইউনিয়ন বোর্ডের কি কথা আছে যে বন্দী থেকে ছাড়া
কাড়িয়ে নেয়াতে নিয়ে আসবে?

—আমি নয়, বিশ বছর বয়ে ক্ষমতা হবে।

তারকেশবের এ নির্বিকার বিরূপে প্রশ্ন করা বলতে
পারেন নি যোগেশ। একটু পরে বলেছিলেন, আলিয়ার
কোনো কতিবই হচ্ছে ব্যাপ্তি তবে ভোমার না বদার
কারণটা কি?

—কে বললে আলিয়ার কতিব হবে না, যেক্টে কতিব
হবে। টাকাই বা কোথায়।

যোগেশ দুর্দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন,
যেখানে বান্ধবের বাঁটা হরার শস্য, সেখানে কোনো
বাক্য বিশেষের নামখোলাই চলতে পারে না। মেসার
দাঁধি দুর্জিঙ্গ। বোর্ডের হাতে টাকা বা আছে, তাতে
এ কাজ আটকাবে না। মেসার উপকারে আরম্ভেরই
এলাকার লাভ, প্রাচুর্য অনেক বাড়বে। অবশ্য মেসার
সোকোরা ইউনিয়ন বোর্ডকে কিছুই জানায় নি, সত্যদার
ব্যাখ্যাস্টেটকে নয় দিয়েছে। অনেক দুঃখে দিয়েছে।
তারি বহুবার আমাদের কাছে ঘোঁষিতভাবে
বলেছে, আমরা নামা চাপা দিয়েছি। এইটাই যদি
তারের অপরাধ হবে থাকে, সেটা বিচারের বিধ
নয় এখন।

যোগেশ বসেছিলেন, তারকেশব তীব্র অশ্লব চোখে
তাকিয়েছিলেন। বাকের দুঃশানের দুঃসত্যের মেসার
তীব্র বিষে। বিভাসের মনে হয়েছিল, পিকারে গিয়ে
বন্দুক নিয়ে বখন টারসেট করেন তারকেশব, তখন
এখনি মেসার।

সভার মিনিটস-এ যোগেশের প্রত্যাব লিখিত হয়েছিল,
একশাসে, বিরুদ্ধ হত হিগারে। বাকি সকলের আর
একশাসে।

মেইদিন হাতে বিভাসকে ভেঁকে নিয়ে তারকেশব
হাটের ঘরে বসেছিলেন।

বিভাস বৃকতে পার্গার, তারকেশব চিহ্নিত হয়ে
পড়েছেন। একবার বলেছিলেন, মেসারো ভিন ঘর মাত
হিন্দু। বাকি সব দুঃসত্য। হিন্দুগ্রাম হলেও

যোগেশকে আমি ভিত্তিতে দেব না। পিকারের দুঃশাসনে
পাকানো ব্যাপটা নিয়ে এম তো।

ব্যাখ্যানি বলে অনেকক্ষণ দেখলেন। মেসার বাল্লের
মেসারো বলেলেন, পিকার কিকে মেসার পূর্ব দিকে
বোর্ডে নে না?

—হ্যাঁ।

—বোর্ডে কোথায় মেসার?

—মেসারের দিকে।

আম্বায়ে আল্প দিকে মেসার, মেসারের ঘিমে নিয়ে
বলেছিলেন, তার নামে সাত মাইল দুঃশা পাকিস্তানে
গিয়ে পড়ে, না?

হ্যাঁ, কালিন্দীর সীমানার।

একটা মরা বুলেট চটকাছিলেন তারকেশব। দার্শক
পিকারের পর যেন তীব্র উচ্চাসে চোখ বলে তার
দুঃশব্দ করে, ভেদনি বলছিল। হঠাৎ উঠে পড়ে
বলেছিলেন, চল যেতে দাও।

পরদিনই সকালবেলা তারকেশব চলে গিয়েছিলেন
সরে। বিভাস একলাই চিনেলে, দাঁধি বলেছে, ওর
দিয়েছে বড়টা শেয়েছে, একলা একলা করে শান করে
খেয়েছে। তার বন্দী বাবদার বলছিল, তারকেশব ভিত্তে
সেছেন, যোগেশ ছেয়েছেন।

কেবল কিছুই বন্ধ দিয়েছিল, কী ভাবছেন যেতে
বলে বলে?

দুঃশ বলেছিল, বোব হু কাউকে তুল ওর দিয়ে
এসেছে।

পাচদিন পরেই ব্যাখ্যাস্টেটের চিহ্ন এসেছিল ইউনিয়ন
বোর্ডের কাছে। ব্যাখ্যাস্টেট লিখেছিলেন, বাল্লের
ব্যাখ্যাস্টা পুরুষদুঃশ, হাটের একটি বিশেষ ব্যাপার এর
দুঃশে জড়িত। দুঃশতা ইউনিয়ন বোর্ড যেন এ বিষয়ে
একদম কোনো প্রত্যাব না দেন, কারণ, বাল্লের দুঃশ কাটা
এখন সম্ভব নয়।

যোগেশ হেসে ফেলেছিলেন তারকেশবের দুঃশের
দিকে তাকিয়ে। বলেছিলেন, আমরাই তুল হয়েছি।
তবু, ভোমার মনে রাখা উচিত, মেসার উগ্রত পূর্ব,
মেসারের ঘর, দাঙ্গা বাংলামেসার। আম না বোকে,
একদিন এ দাল কাটতেই হবে। দুঃশে তারক?

তারকেশ্বর হাতেন নি। এমন কি কথাও বলেন নি।

তারপরেও যোগেশ যোগাল অনেকবার এগেছেন, তারকেশ্বর কথা বলেন নি। দু' একটি বা বলেন, তা বিদ্রূপ এবং শ্লেষ করার মনাই।

বীতশ্রদ্ধ বিরক্ত ভিত্তি যোগেশ আলা বাওয়া বন্ধ করে দেয়েছিলেন। এমন কি, বোর্ডের সভায়ও। চিঠি গিরেছিল যোগেশের কাছে। অবশ্য দিরেছিলেন, বিটিং-এ আসতে অপারগ। পরায় অসুস্থ। তারপর দিরেছিলেন পদত্যাগ-পত্র। পত্রটি স্বাক্ষর করে দিরেছিলেন প্রেসিডেন্ট।

বিভাগ মনে করেছিল, এ পদে বন্ধুত্বের বদলা। মনটা তার যোগেশের প্রতিই ঝুঁকে পড়েছিল। তার কোনো দোষ কিছুই পায় নি সে। ব্যাপ বিভাগও দেখেছিল। নেদার লাল পার্কস্থানে সরাসরি গড়ে না। কালিদাসী বৃকে গিয়ে পড়েছে। নীচের দিকে কালিদাসী দুই মেসেরই মাঝখানে গড়েছে। সেখানে গিয়ে কতো খালি পড়তে পারে। অবশ্য কালিদাসী নয়। ঘরনার বৃক উপরে আসা নেদার লাল ঘোষার দিকে, সরাসরি ঘরনার চলে গিয়েছে। দুখ হলে দিলে, কালিদাসীও বৃক ভরত ঘরনার নাগাল পেলে।

রাষ্ট্রনির্বাচিত অংকুত ভটিসতার নেদার কপালে জল ছোটে নি। কিংবা রাষ্ট্রনির্বাচিত নয়, বিভাগই ছেঁব এবং ক্ষমতার দম্ভ। না-ই বা জুটেছে, যোগেশ যোগালের মান-বার নি তাতে। স্বয়ং তারকেশ্বর ব্যাপারটিকে ছেঁদের পর্বাণে তেনে নিরে গেছেন। হুতো তার ছেঁদের মনোই নেদার লাল পদে, পার্কস্থানেই ঘাটনি, তার দ্বারা আর কোনো উপকারই হয় না।

কিন্তু, অবাক হয়েছিল সে যোগেশের প্রতি তারকেশ্বরের ব্যবহার দেখে। মতভেদের ব্যাপার তলে তলে একজুর গড়াল কেন, বুঝতে পারেনি। তারকেশ্বর এমন অবস্থ কেন, ভেবে পায় নি সে। যোগেশের সঙ্গে তারকেশ্বর কথা বলছেন না, সে অপমান যেন বিভাগের গারে বিধিত।

হাস্যকে বলেছিল বিভাগ, উনি এরকম করেন কেন ?

হাস্য চোখ পিটপিট করে বলেছিল, কার কথা বদলেন ?

—জাকারবাবুর কথা।

—কে জাকারবাবু ?

বিভাগের মনে হয়েছিল সে বিভাগে চোখ পিটপিট করে কি না। পরিষ্কার বৃকতে পেয়েছিল, হাস্য ইচ্ছে করে ন্যাকামি করছে।

সে পদক্ষেপও বলেছিল ব্যাপারটা। পর একেবারেই উড়িয়ে দিরেছিল, বাবার কথা আদি শুনতে চাইনে। আপনাকে এগর ভাবতে বলেছে কে ? একময় ওগর কথা বাকবেন না। ওরকম হাটার মতো ভাষেন কেন ?

বিদ্যায় শূনে চুপ করেছিল অনেকজন। তারপর কেমন এক রকম একটু হেসে বলেছিল, সংসারে কত মানুষ থাকে। আপনি কি ওঁকে বারণ করবেন ?

—কাকে ?

—আমার মশরুমশারকে ?

সেইদিন বুকেছিল বিভাগ, বিদ্যায় তারকেশ্বরকে বাবা বলে না। বিভাগ বলেছিল, ইচ্ছে করে বারণ করতো।

—তাহলে আপনারও যোগেশ যোগালের হাল হবে।

—কেন ?

—কেন আপনি বারণ করবেন ?

—অন্যায়...

বিদ্যায় হেসে উঠে বলেছিল, যেন সংসারে কত ন্যায় হচ্ছে।

কিছুদিনের মধ্যেই অন্তত সব পুরুষ হট্টছিল যোগেশ যোগালের নামে। সে নাকি পার্কস্থানের চর। যোগেশের বড় বৃক আইবুড়ো মেসেরা নাকি প্রাইম কোয়ার বেড়াতে যায়। কোয়ার যায় ? কেন যায় ? কার কাছে যায় ?

বাংলাদেশের গ্রাম, গ্রাম-ই। তার সংসার, সংসার, ছোট শীমারেশ্বর হয়ে জমি-নির্ভর জম্মশোকেরা সারাদিনে একখানি শবরের কাগজ এশাপ ওশাপ করেও চণ্ডীশঙপ কিংবা বৈঠকখানা ছাড়িয়ে বেতে পারে না। যোগেশ যোগালের দম্পকে দরসেই চিহ্নিত হয়ে পড়েছিল। তারপর একদিন তারকেশ্বরের কথানুযায়ী বিভাগকেই একটি চিঠি লিখতে হয়েছিল। যোগেশ স্মরণ্যর হৃদয়ের আমবাগানটার একটি ফালি অংশ

ইউনিয়ন বোর্ডের সাতার মনো প্রত্যক্ষন মনে করা হচ্ছে।

বিভাগ বিভাজন করে কেসেছিল তারকেশ্বরকে, গাতি নাকি ?

—কিসের ?

—দখল করবেন ?

যানিকল্প চূর্ণ করে তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, তোমার লেখা হয়েছে ?

—হ্যাঁ।

—নাও।

চিঠিটা নিয়ে ঘেসে বলেছিলেন, তোমার যদি বুদ্ধি থাকতো, তবে তোমার বানান্না এভাবে তোমাকে ঘেরে বার করে দিতে পারত না। তুমিই সবটা বদল করতে পারতে। এতটা কথা ছেনে তোমো, কাছের গায়ে ঘনি হাত তুলতে হয়, আসে তুলবে। পরে হাত তুললে হারতে হয় শেষ পর্যন্ত, আসে হাত তোলার এইটি সূচিয়ে।

সেই চিঠি কোনো অধার সেন নি যোগেশ। সর্গবিহারে গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন সারনের বহুকুমা পছরে।

বিভাগের মনে হয় এ পুণ্ড পুণ্ড নির্ভর ধারবেশাল নয় তারকেশ্বরের। পরে হাত তুলে হারবার তলে যেন সব দখল হাত তুলেই আছেন। কলে যেখানে ঘোড়াটুকু পাগা যায়, সবটুকু বনভা হাতড়ে বেড়ান।

যোগেশ ঘোষালের জন্য সবটা বিপর্যয় হয়ে থাকে মানে। তারকেশ্বরের দিকে তাকিয়ে গাতি কেনন যেন ভর ভর করে বিভাগের। ভরভর মান্দ্র মনে হয় তারকেশ্বরকে। আক্রমণোদ্ভূত হাত বার উঠে আছে সে কাকে কখন আঘাত করে বদলে, কে জানে। ভয়ের মধ্যে হাস হয়, হাস হয়। কিন্তু তারকেশ্বরের মধ্যে তার কোন বিবাহ নেই। ব্যবহারের দিক থেকেও তারকেশ্বর তার কাছে অস্বাভিক মান্দ্র। বিভাগ তার অনুসৃত। অনুসৃতদের প্রতি তারকেশ্বর দৃষ্টি। মাসে মাসে ঢাকা সেন, ১৮৬ দরবে জায়া কাপড় সেন কিনে, বিখ্যাসও করেন বোঝায়। হাত বণ্ডে অনেক কাছ শিখিয়েছেন। নিজে বলে থাকেন, বিভাগ হুসীকে ইনকেশন সেন। বরফার হলে এখন দূরে দিতে হুসীকে

দেখেও আসে। বিরে এসে নাকির গতিবিধি বলে পুট্টেখিগকোপ দিয়ে হুসীর পরীরের কোনো অং কোন শব্দ শুনেনে, দেখাও বলতে পারে। বিভাগে না হলে শিকারও করে না যেন আত্মকাল। বন্দুক হাত রক্ত হয়ে উঠেছে বিভাগের।

ভদ্রও ভর হয়। তারকেশ্বরের মধ্যে কোথায় একা অমানুষিক লভা হয়ে গেছে যেন। যাকে দেখা যায় কিন্তু নিরতই পাশে পাশে করে।

১ পাঁচ।

বৈশাখ মাস। এ বছরে এখনো বৃষ্টি হয় নি চারিদিক জুড়ে বড়ো বৃসোর ছায়াছাড়া। পাছের পাতা পাতার বৃসোর আভরণ। সবই যেন শ্রীহীন বিবর্ণ পুশুরবেশার বিভাগ হাঁকিল অচিনা থেকে কিরে আসছিল বোনা বৃষ্টি ভবন পোতা দুই। পাছের পাতা-ডোনা বৃসো দরব হয়ে উঠেছে। মার্চের পোশুপুশি নিদ্রা হয়ে ঘুমে রোয়ে। কাক পক্ষীরা কোন কোশ কাছে ছায়ার আভর নিয়েছে। ডাক শোনা যায়। কথা ব না। একটু বৃষ্টি না হলে আর গ্রাম বাড়ে না মান্দ্রেরও না, বাটিরও না। পান্নাপান্নালিঙ্গিও তুলে

মলটা ব্যাগাশ বিভাগের। তারকেশ্বরের একটি হুণ্ড ভর পেয়ে পরাম্পরের ডাকারবান্দুকও ডাকিবেছিল সবজটা গাশতে চেয়েছিল, পায়ে নি। পরাম্পর মনে দর, ওদর আনা কেনন হুগিল, তাভারকে পাগ তার চেয়ে কঠিন। হুসীর অবস্থা ব্যাগাশ। ছাতে পাগ বয়েছিল তারকেশ্বরের, যান নি। বিভাগকে পাঠিয়ে ছিলেন। জানে তারকেশ্বরকে খাবা কঠিন। ভর ওদর সে নিজেই দিয়ে এসেছে। এখন মনে হচ্ছে লোকটা মরবে, কিন্তু বিভাগের হাতের ওদর যে মরবে।

পথ চলতে চলতে খোঁজাল করে নি কখন বেধ উঠে বাহু কোশে। পুণ্ড পুণ্ড পছন শুনেন কিরে তাকিয়ে দেখল, পাছারের চুড়োর হাতা কাসো বেধের ডা। বিদ্রু কদকাছে। উত্তর-পূর্ব অচিনা দর আছে বোষ্টরপাড়ার কাছে আসতে আসতেই বাতাস উঠল বৃসোর অন্ধকার হয়ে সেল দিলল। পান্নপুশি বাতাসাতি

শুরু করল, দাপটাপি আরম্ভ করল কাঁপে ওড়ার বুনে
কাড়। মাঠে গেরুগূলি ছুটোছুটি করতে
লাগল ভবে ।

দরনে একটি পাক্য বাড়ির নাগদার উঠে দাঁড়াল
বিভাস। কিবু বুসোর কড় সেখানেও কাপটা দিখে
কিহে। দরভাটা খোলা থাথ না। দেখে মনে হয়
বৈঠকখানা থর। হাত দিয়ে কড়া দাড়ল সে।

দরভা বুসে দারনে দাঁড়ালেন একজন শ্রৌচ।
জিহাস চোখে এক মুহূর্ত। দেখে বললেন,
ভেড়ের এগ।

বিভাস চুকতে দরভা বহু করে কিয়ে দাঁড়ালেন।
মুখখানি ঠিক বেশ চেনা মনে হল না বিভাসের। লম্বলও
নর। অচিনা অনেক বড়ো-প্রাণ, লোক সংখ্যও কম
নর। কখনকই বা সে চেনে।

হাত কাটা পাশাবী পরা ভরলোক। চুলদুলি
কচাপাকা উলকা বুদকো। চোখের কানি বেশ বড়ো।
দৃষ্টি মনে একটু উদ্ভ্রাণ। নড়বড়ে তরুণসোবে আর
নকলা বিহান। কলক্যাপ শাখা কামল সোয়াত কলর,
ত্রিটিংসপার হুভানো রবেছে তরুণসোবে উপরেই। আর
হুভানো রবেছে কয়েকটা হুচুচু কল। বোবর
ছায়শোকা তাজাবার মন্যে। ছোট একটি উল্লের
ওপর হুচ-হুতো, পেরেক, হাতুড়ি, কাঁচি, টেবিলের
ওপর গ্রাশখানেক পুরোনো বই।

দরভা বহু আরো অধকারে এল চোখে পড়ল
বিভাসের। তরুণসে বাইরে দৃষ্টি মনেছে বড়ো বড়ো
কেটার। আশ্রুনে জল ঢাললে যেন গন্ধ মেরোর, প্রাণ
সেইরকম গন্ধ আসছে। ব্যক্তিটার পুরনো সোয়ালে মাথা
ফুটেছে বাতাস।

শ্রৌচ নির্বিক্ত মনে কলকেতে আগুন দিয়ে কুঁ দিতে
লাগলেন। তারপর পুরনো মনো একটি গড়গড়ার কলকে
বগিরে থাথ কলকে টেনে হুঁ কুলে জিহাসা করলেন,
ভোমার নিবাস।

বিভাস বলল, হারপাডার থাকি।

জরলোক চোখ কুলে এবার। আগুনবহু মেনেন
বিভাসের। গড়গড়ার মল গদা হাতের আগুনকুলি
অগিরভাণে নাকাজাক্য করতে লাগলেন আর এক হাতে

তরুণসোবে মনো চাখর ভড়িরে মরলেন বুঠো করে।
বললেন, হারপাডাথ। তুমি, তুমি ভাববের বাড়িতে থাক।

ভুবন। ভুবন কে। অলাভ হয়ে ডাকাল বিভাস।

বলল, কার কথা বলছেন।

ভরলোক নিজেই মাথা নেড়ে বললেন, বুঠোই
বুঠোই তুমিই সেই, লম্বাতি এলো আচনার।

বিভাস বলল, এক বছর হয়ে গেছে।

—ওই হল। এক বছর আর কটা দিন। —এস, এখানে
এসে বস।

তরুণসোবে ওপর ছাওয়া করে দিলেন। বিভাস
বলল। বাইরে পড়টা প্রবল হয়ে উঠেছে। এ ঘরের
পুরনো দরভা জানালা ভেদ করে জলের গাথা বেকতে
আগুন গড়িয়ে।

জরলোক বার কয়েক মল টেনে বললেন, ভুবনেশ্বরী
কথা বলছিলাম, তুমি যে-বাড়িতে থাক সেই বাড়ির গিন্নী
ভুবন, পরর না।

ভাবকেশবের ম্যার কথা বলছেন। বিভাস বিস্মিত
হয়ে বলল, ও। আগনার নাম।

জরলোক চালালেন। পুষ্টি তিনেক বীত নেই
পায়নে। বললেন, জরদীপ চক্রবর্তি গ্রামি শ্রোণী বশ্যো
বগ তিন পুষ্কোর চক্রবর্তি। তুমি বা ভাবন, তা নয়।
ওমা আমার জাতি-সোষ্ঠীর কেউ নয়। পায়ের হান্দু,
চিরাবিরে চেনা। ভুবন ভালো আছে।

কেন একটু ছিটক্স বলে মনে হচ্ছিল জরদীপকে।
ভাবকেশবের কথা একবার জিহাসা না করে শুন্য
ভুবনেশ্বরীর কথাই জিজ্ঞেস করলেন, ভুবনেশ্বরীর
কথাই বললেন। বিভাস বলল, বোবর ভাসেই
আছেন।

জরদীপ বললেন, ঠিক করে বলা দার না, না। বোকা
বুদ মূখবিল, না। ভই মল, এক অমৃত জাতের
মেরে।

মেরে। ভুবনেশ্বরী এখনো মেরে। জরদীপ বললেন,
কখনো কথাটা বলছে।

—বুদ কম। —ওনে, হর বৈকি।

জরদীপ প্রাণ মেলোমানের হতো জিজ্ঞেস করলেন,
হাসে টাসে একটু।

হর তো হেসেছেন । পক্ষীর ধাবন বলে পেটা মনে পড়ে না ।

কই, ভুবনেশ্বরীকে কোনোদিন হাসতে দেখেছে বলে তো মনে পড়ে না । বিভাস বললে, মনে পড়েছে না । আপনাদের স্বপ্ন তেনাথেনা বুঝি ?

—হোট কাল থেকে । কতদিনের কথা আর । এই হর না, ওটা বাজার ভেরপো.....

বিভাস বলল, সাতার দাল ।

জগদীশ আপনাদের কত গুলে বললেন, সাতার তো ? আচ্ছা, ভেরপো হুইয়ে আমার কন্, ব্যাভো গ্যালে তখন কয়েছিল । তা হলে পিঁড়িটারি হল ভুবনের । এই সেদিনের কথা । আর এই সেদিনের মধ্যেই জগদীশ পকারতে পৌঁচেছেন, চুল লেকেছে, হাঁত পড়ে গিয়েছে ।

জগদীশ তত্ত্বপাথ থেকে নেবে বেরাঙ্গের গায়ে একটি হাঁড়ির মধ্যে কী যেন বেড়ে দেখলেন । বিভাস দেখল, তারকেশ্বর বাহার দাল নীল হলুদ রং গোলা রংয়ে ওখানে । গুঁড়ি করে কতগুলি সাকানো রংয়ে একটি খান ইঁটের ওপর ।

জগদীশ নিজেই বললেন, কাগজের মত তৈরী করেছি । গুঁড়ুল তৈরী করব ।

ভারপর টেবিলের কাছে গিয়ে বললেন, এইখানে বসে ছেসেবোদার সেখাপড়া করতাম, আর এই জানলার তুলন আসত । তখন বজ্জো হুঁটু মেরে ছিল তো । পড়িতে সেরেনা, লিখিতে মেরে না, অহ চুকে দন আপোছালো করে মেরে । কিছু কিছু বলার থো ছিল না । কাছেই তো ওদের বাঁধি, জানালা বুললে দেখা যায় । আর তারকেশ্বর আসত, আমার ছেসেবোদার বহু, ভালো হেসে, সাত চক্রে কথা কোটে না বুঝে । আমাকে আর ভুবনকে দেখত চুপচাপ বসে । তারপর—

বিভাস গল্প শোনার হতো শুধা বিন্ধরে পুনছিল জগদীশের কথা । জগদীশ বামলেন । কড়ের তাকন সমান ভালো চলছে বাইরে । ছায়ের টাঙ্গি চুইয়ে, কড়িকার বেরে, ফোলা পড়িয়ে হল পড়িয়ে গরের মধ্যে । মেঝেটা ভিজে গিয়েছে । টেবিলে তক্তশাপটে হল পড়য়ে ।

জগদীশ মাথা নুঁকে কাগজের মত ছাঁকিতে বললেন ।

যেখ বাবিকল্প চুপচাপ করে কাগজের মত ছাঁকিলেন জগদীশ । উৎকর্ষ হয়েছিল বিভাস । মনে হল, জগদীশ মনে কী মন বসেই চলছেন. স্বভেদ পক্ষে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে । সে বুঝি যোগাযোগ রাখতে পারছে না আসুরে কথার ।

বুজো মানুষের এমন কথা এর আগে কোনোদিন শোনে নি বিভাস । বুনে যেন তারো মনটা খারাপ হয়ে গেল । অকত কৌতুহলও হল । আশন মনে মাথা নেড়ে, নিতে যাওয়া পক্ষপাতের ঠানলেন কয়েকবার । ব্যক্ততার দরকারটা নড়ছে । যেন কেউ ট্রেনয়ে বাইরে থেকে । ধাককা দিচ্ছে বাতাস, ঘাণা কত তার কাঁদ দিচ্ছে আশাত করয়ে, লজ্জিত করতে চাইয়ে ঘরের মধ্যে চুকে ।

জগদীশ উত্থাঙ্গ অনুসন্ধিৎসু চোখে দরজার দিকে তাকিয়ে রইলেন । তারপর আবার বললেন, ভুবন যেখিন তারকেশ্বরের কথা বলতে এল, সেখিনও এই রকম কড় । কাঁহতে কাঁহতে এসেছিল, দরজা দাখাবাঃ কথা এর মনেই ছিল না । খালি শরীর দিয়ে ট্রেনছিল আঁমি ভেবেছিলাম বিভাস । কড় এরকম করছে আঁমি তখন লুঁকিয়ে তামাক খাবার যোগাড়ে ব্যস্ত তখনো আমাকে লুঁকিয়ে তামাক খেতে হত । কিছু দখেই হল, কড় মন. একটা জাণী জ্বিনিস দরজা ঢেলে আছে । বুনে দেখলাম, ভুবন । চোপ বহুতো মেরে, তক্তনকার দিবে কন তো না, দুবতী মেরে সে বলল, তারকেশ্বর ওকে বিয়ে করতে চেয়ে প্রত্যা পাঠিয়েছে । তখন তারকেশ্বর ডাক্তারি পাশ করে এসেছে ভুবনের বাবা মা'র কাছে হাতে টাঙ্গ পাওয়াও বতে ব্যাপার পেটা । আঁমি এক এন্টাস পাশ করা ছেলে অবস্থাও এমন কিছু ভাল নয় । কিছু তারকেশ্বর খ' হয়ে সেলাম একেবারে । তারকেশ্বরের এ মতল তো একদিনের জন্যও আঁমি টের পাইনি । বরং ওঃ বরায়র একটু ভালোমানুষ. যোগেচোরা বলেই হা হয়েছে । আসত, আমাকে ভুবনকে দেখত, কিছু বল না । আমাকেই বলতে হত, 'ভারত আঁমি তখনো বিয়ে করব ।' ছেসেমানুষ হলে কী হবে । আঁমি তখন মের করতে শিখে গেছি । মনে হত, তারকেশ

এসব বোঝে না, হঠাৎ হঠ কালকাল করে ডাকিয়ে থাকত । কেবল ভূবন আমাকে বলত, 'গাং-বাড়ির ডারকটা ওরকম করে ডাকার কেন বল তো ?' আমি বলতাম, 'কেন করে আবার ডাকার ?' 'যেন গিলন্তে চার ।' আমি বলতাম, 'হা, তোর সব ডাতেই ব্যঙবাড়ি ভূবন । তারক ওই রকমই ।' ভূবন বলত, 'মোটেও নয়তো । তারক কথা বলে না কেন ?' আমি তাকিয়ে থাকে হাঁ করে, নিশ্চিন্ত মনে যেন কী দ্যাখে, আমার অন্তর্ভুক্ত হয় ।' ভূবন মেয়ে, এ বিষয়ে ওরই দ্বিধা । কিছু আমি একটুও ভাবতে পারিনি, তারকেশ্বর করে থেকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গেছে । করে থেকে সে যেন যেন তৈরি হয়েছ, এমন কী যেন যেন রেগেছে কলোছে । কিছু দমকের অপেক্ষা ছিল । ভূবন ভীষণ কাঁদতে লাগল । আমি যেন ওখনো বিশ্বাস করতে পারলাম না । ভূবনকে বললাম, 'ভব পারিনি ভূবন । ভূবন তাতে সন্তুষ্ট পেল না । তারককে পারিনি করতে লাগল, পালাপালি দিল । আমাকেও বলল । বলল, সেদিনই যেন, ওর ব্যবহারে গিয়ে আমি বসি । কড় ধামলে, ওকে বাড়ি পাঠিয়ে আমি তারকেশ্বরের কাছে গেলাম । তারকেশ্বরের বুকের দিকে তাকিয়ে আমার বুকের চেতরাটা কী রকম করে উঠল । বারবারই সে কথা কম বলত, তাকিয়ে থাকত । কিছু সেদিনের তারকেশ্বরের বুকে কী যেন ছিল, আমি আর কিছু ভিজেন করতে পারলাম না । তারকেশ্বর নিজেই বলল, 'আমি বিপিনদাকার মেয়েকে দিয়ে করব ।' ভূবনের বারবার নাম বিপিন চাটুয্যে । বললাম, 'পূনোহি । ও-বেলা আগুণ আমারে বাড়িতে ? কয়েকটা কথা ছিল ।' তারকেশ্বর বলল, 'যাব' । যিকোনো তখন ভূবন আমারে বাড়ি ভিতরে না-কাকীমায়ের সঙ্গে কথা বলছে । তারক এল । আমার স্ত্রী করছিল, অসমানবোধ হচ্ছিল কোন কথা কলতে । কিছু বলব-বলব করেও বসেছিলাম চুপচাপ । ভূবন এল বাইরের ঘরে । তারককে দেখেই রাগ হয়ে গেল ওর । পেছন দিয়ে গাড়ির রইল ভূবন । আমরা ঐতিম হয়েই চুপচাপ । বুঝতে পারলাম, আমার আর তারকের বদল হয়েছে, আমাদের কেউ আর জেনেমানুষ

নই । তবু, আমি না বলে পারলাম না, 'তারক, একটা কথা বলতে চাই আমার লক্ষ্য করছে, তবু না বললে নয় ।' তারক একশিট চুপ-ছড়ানে ভূবনের দিকে তাকিয়েছিল ।

আবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী কথা ?' বললাম 'ভূবনকে তুমি ঘিরে করতে চাশনে ।' তারক বলল, 'কেন ?' বললাম, 'কেন তা কি জানিবে নে ? তোকে কতবার বলেছি । সব ছেলে পূনে'—তারক আমার দিল, 'কোনো জানা-পোনার কথা শোনা আমি দরকার বোধ করি নে । আমি যা যেন করেছি, তাই করব ।' চোখ জ্বরে ভূবন এগিয়েছে কাপটা ঘিরে, বুটোনে আগুন নিয়ে ডাকাল তারকের দিকে । বলল, 'ছোর করে নে' করবে তুমি, আমাকে ? তারক বলল 'বের' আমার কোথাও কী আছে ? সবাই যেন ভাবে করে, সেই ভাবেই করব ।' আমার হাত-পা শক্ত হয়ে উঠল । সেই ছায়াগোবা শো-বোয়ারটাতে ও ভাবে কথা বলতে দেখে, মেয়ে হাত ভাঙতে ইচ্ছে করল আমার । বললাম 'সংসারে মেয়ের স্বভাব নেই । তুমি যেখানে খুঁশি নে' করগে—কে তোকে বাধ্য করেছে ? তারক পাঁচ বছর কলকাতার থেকেই বোধ হয় কথা শিখে এসেছিল । বলল, 'যেখানে ইচ্ছে হল সেখানেই তো দেখছি বাধ্য করছি তুমি ।' বললাম, 'হ্যাঁ এখানে বাধ্য । ভূবনকে নয় ।' ভূবন বলে উঠল, ডাক্তারি পাল কছে বলে একবারে ন্যাকা হয়ে স্নেহ, না ? কিছু জান না ? তোমাকে আমি খোঁজা করি । মেঘলায়, তারকের কটা চোখ জ্বলেছে বক-বক করে । কিছু স্টো লুকিয়ে থাকে চিতাবাঘের মত । কোন জবাব না দিয়ে হঠাৎ তারক বেরিয়ে গেল । আমরা দেখলাম সে ভূবনের বাকি দিকেই গেল ।

পরে পুনলায়, এক বছরের মধ্যে সে ঘিরে করবে ছেলেছিল, সে ইচ্ছে আর নেই । দিন দিন বায়েই বিয়ের দিন হয়েছে, সেইদিনই বিয়ে করবে সে ।

অপরাধ চুপ করে ততাপোনের বলা চারটা হাত দিয়ে চটকাতে লাগলেন । একটি বুকেই মজুতের পাঁড়ি ছিঁড়ে ফেললেন কয়েকটা । আবার বললেন, অনেকদিন আগে একটি বদলার লোক শেষে সবই বলে

নেলসন। ঔপেন, ঔপেন পাগল! আমার ভোমর কথা বলে গেছে। ভোমরে তার ভাল লেগেছে। কিহু না কেনে শুনোই, আমার ভাল লাগল বলে এত কথা বললাম।

বিভাদ বলল, তারপর কী হল?

তারপর? বিয়ে হয়ে গেল ভুবনের তারকের সঙ্গে। বরষার শাহন ভুবনের ছিল না। ভদ্রবান বাঁচিয়ে দিয়েছে। শূদ্র, কান্না আর আমাকে বিজার দেওয়া ছাড়া আর কিছু করার ছিল না ওর। ভুবনকে দিয়ে পাঠিয়ে যেতে পারতাম। কিহু সেটা এখন হবে হয়, তখন একবারো হবে আসে নি। বেংকম দিনকালের কথা। বিশপনকাকার একটা মান-সম্মান আছে। তাই চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। কিহু আমি একবারো বিশপনকাকাকে গিয়ে শূদ্র ছুটে বলতে পারি নি, 'বিশপনকাকা, ভুবনকে আমি বিয়ে করব।' কারণ, তারক পাশ-করা ভীতাকর, তিনি রাগি হবেন না। শূদ্র অশান্তি ভোগ করবেন। আমার দরবন্দী এক কাকীয়া ছিলেন। শূদ্র তিনি কিংক্স করেছিলেন, কী হল কহু, পেয়ে কহু, সঙ্গে বে' গিয়ে দিলে ভুবনের?' আর তারককে তো কেউ বলার ছিল না। তার এক দাশা আর নিচে এক ভাই ছিল, তবু তারকই দরবেশদী। কিহু গুণ্ডোলটা হল কোথায় বান?

বিভাদের দিকে তাকালেন জঙ্গলীশ। বড় বড় চোখ দুটিতে দু'টি তেমনি উদ্ভ্রাণ জঙ্গলীশের। কিহু দাঁতহীন কয়েকটি অন্ধকার কাঁকে তার হাসি দেখে বিভাদের বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল। জঙ্গলীশকে এক্সোরে অস্বস্তকর দেখাচ্ছে। খেন কাঁতে গিয়ে হেসে কলোছেন। বললেন, গুণ্ডোলো পড়লাম নিম্নেকে নিচে। সেই থেকে বাসি বসে থাকি, বাসি বসে থাকি, বাসি বসে থাকি। বড়ই ভেবেছি কাককম' করব, আঁচনা রেখে চলে যাব, কোন্টাই পারি নি। ভাবতে ভাবতেই এতদিন চলে গেল। সংসারে জঙ্গলীশ শুভ ভুবনেশ্বরীকে বিয়ে করতে চরেছে, গায় নি, কিহু এখন অকর্মণ্য হয়েছে? তা' নয়, বাদ্য বড়, ছোট আঁচি, তাই আন্টাই দুই হাফিয়ে

হেতে পারলাম না। বিয়ে? তাই কি করতে পারলাম? কিহু বান-জনি আরে, ভাবো হুটি যেতে-পরতে যেম, বাস। ঘোরা চম, লক্ষ্যও চম, কিহু এখন ঘরে থাকার বেশার হয়ে গেছে। ভাইপো-ভাইকিস্‌লোনকে দিয়ে থাকি। ছোটের মন রাখাই কাক এখন। কাগজের পুতুল গড়ি। আমার কলন উঠির করি। তাহি, সৌখিনের চরিত্র কেন, পি'প'ফেরের দ্বারবোর এই সব। আর একটু সেলাই-কোঁড়াই করি। বৌদিয়া তাদের হেলেনেয়েয়ের জামা-প্যান্ট সেলাই করতে চেন। আমার তাদের হেলেনেয়েয়েরটাও আদরে এখন। বুকতে পারছ কোথার গোঙগোল হয়ে গেছে?

আবার হাসলেন জঙ্গলীশ। বিভাদ তাকিয়ে থাকতে পারল না সেই বুকের দিকে। তার বড় বৌদির হেলেনি এখন শূকনো চোখে বুকের দাঁত-পড়া মনে হাঁ করে কাঁদত, তখন এই রুমই দেখাতে যেন। তখন বিভাদের হাসি পেত। আর এখন তার বুকটার মধ্যে কী রকম বিক্সি কষ্ট হতে লাগল। আর বুকটিটা কী প্রবলভাবে কহে। শুভ শেনে গেছে; শূদ্র বুক্টি। দরুন তখনো আছে আকাশের। বুক্টির পথটা যেন তার কষ্টকে হাফিয়ে গিয়ে আরো।

ঘরের ঘরের ঘুরে গেছে একেবারে। শীত করতে লাগল বিভাদের। হার চুইয়ে জল গড়ে তার জামাও জারসার কারসার ভিজে গেছে।

জঙ্গলীশ উঠে গিয়ে তামাক শাভতে বসলেন আবার। বললেন, কিহু তারকটা এতবড় বোকা, শূদ্রলে অস্বস্ত হয়ে যাবে। হেলেনো, ভুবনের হেলেনে জাপনটাকেও শেব করেছে ও। ভুবনকে তো ভাল বালেনি কোদমিন, আর দশেব, অবিদ্বাস দম দর। পোব দিতে গেল হেলেনটার গুপ। ছোট বসে হেলেনটার জরকের কাঁপি হল, কাপতে কাপতে হেলেনো পশ-চোবো হয়ে গেল, আর কানে গেল কাদা হয়ে। চিকিৎসা করলে না। ভূদে ভূদে সেটি একটি কী অক'ব'ব' হয়ে গেল। বুক্টিদ্বির অভাব, জোর করে দুটি কথা বলতে পারে না। এ কেমন দাশা প্রতিশোধ বল দিকনি। ডোরাই হেলেনে তো। শূদোহি, মেরোটাকে নাকি শূব ভালবাসে। হেলেনো খটা করে বিয়ে দিয়েছে। তবু শূনি, ভুবনের

সাতা কেউ পায় না, কারও সঙ্গে দেখাশোনা হয় না।

ঠাঁই একটি চুঁ গিরে চলে করলেন। বিভাসের মনটা কেন্দ্র এক অসংগঠিত বিষয়ে, ভয়ে বোঝা হয়ে গেল। ব্যক্তিগত বস্তুটা কখন যেন পরে এল। যেন ডেকে উঠল গুরুগুর করে। আবার সম্মুখের দিকে চাফে দেখে, বাবার সম্মুখ ভাঙ গিরে ঘর ভেদনি করে। তাগপরে একেবারে নিশাচর, এক ক্রটি ব্যক্তিও ব্যক্তি পড়ছে না বা বাইরে। কেবল কি? কি? চিত্তকার।

বিভাস বলে, চলি।

কলশীল উঠে এসেন। গুচ্ছা বলে কয়েক বস্তু? বিভাসের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, এম। ইচ্ছা হলে আবার এসে কেন?

বিভাস বলল, আচ্ছা।

বারাণসী গিরে যেনে কারার পা দিল বিভাস। পারের পাতা ভোরা পথের মতো হলো, ব্যক্তি পড়ে সরে কাটা হয়ে গেছে। বাটি নরম বলেই হলো বেশ। তাই ব্যক্তি পড়ে হলোর নিচের ভয়ে ব্যক্তিও গেছে ভিজে। গুরু ব্যক্তি চাকা-চাকা পড়শুলিতে জল করে গেছে। সরে ভেজা। বাটি, গাছ, পাতা, আকাশটাও ভেজা। আর সব কিছুই হল রঙ আরো গাঢ় দেখাচ্ছে। কেবল কুক্কড়ার চোখ-বলপানো আগুনের স্মারোহ নিশ্চয় হয়েছিল একটু। বড়জলে বাসা-ভাঙা শোকা-পতনের অন্য কার-শালিকেরা গিরে পড়ছে। যে কার-শালিকের বাসা ভেঙেছে, তারা বাসা বাঁচা গিরে লাগিয়েছে চোঁচায়েচি। প্রথম পরের পর এই ভেজা আরম্ভক্ ভোগ করবার জন্যে সাপ বেরুবে এখন, বৃ-একটা শোকা-আকড়ও ছুঁবে। পাখি-শালিকও ছুঁতে পারে এক-আবটা। পদ্-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ সকলেই কেউ না কেউ, কাউকে না কাউকে ঘর। মানবও কি ঘর? তারকেশবের কান্না পুনে যেন হয়, মানবের জগতেও কোথাও সেই বাজা-বাগরি মানব হুগে হয়ে গেছে। দ্বিত গিরে চটে, দাঁতে চিবিবে মানবের ভাত বাজা নয়। তার মধ্যে কোথায়? যেন একটি সৌন্দর্য আছে। চটকে, যেনে, পরাসে প্রাসে ভাত চিবিবে চিবিবে খিচ-পাওয়া মানবের ভাত বাজা। কখনো বেশি সেরে সেরে ফেঁ, একটু, নর

নর থাকবে। ঘাতে চিবিবে চিবিবে বাজা ঘর, ঘাতে দুখের লালা বেশি হয়, নর ভাতের রসের সঙ্গে যিশে ভাতে পুঁচি বাজা। বাবা বলতেন, আর পর পর সেই ভাতের কথা মনে করে জল খানত বিভাসের হিজে। মানবের বাজা বাজা দেখতে ভাল লাগে বিভাসের।

এ বাপার ঠিক দেইরকম নয়। মানিকটা যেন টিকটিকির মতো। শিবিরামে শোকা-পুলি যখন জেলে বেজাতে থাকে, টিকটিকি তখন গুরু থেকে তাকে দেখে। যেনে, বৃ-চলে চলে নিশাচর এগোয়। সেগলে বৃ-পোদনে পুঁচিরে পুঁচিরে দলে, তারপর আচরকা গিলে ফেলে।

তারকেশবকে কেন এককম যেন হয় বিভাসের? মাকড়সাও টিকটিকির মতো। একদিন বিভাসের কোলের গুর বলে-বাঙা একটা হাফিকে, তারই পা যেনে যেনে আসা একটি মাকড়সাকে যেতে দেখেছিল। এখানে বাবারের সন্ধান মানেই যেন গুরু ঘাতকের হাতের একটা জুর, শোশন হিজতা। সাপও এইরকম। বাবা পায়ে হাটে, তারের মধ্যে এই রকমের ডকাত। বৃকে-হাটিকের শোশন হিজতার কী একটি বিভাদিকারি হলো যেন যিশে থাকে।

কিন্তু তারকেশব সম্পর্কে এককম কথা যেন হয় কেন? জগদীশ নিজে তো একবারও তারকেশবকে ভরকের বলে কিছু বলেন নি। কিন্তু তার কথা পুনে বিভাসের এককম যেন হয় কেন? ভাবনেপত্রীকে নজর করে দেখবার জন্যে কৌতুহল হয় তার। কট হয় কেন যেন। তাগপরে কথা ভেবে মনটা টেনে করে। বাবা তার কেউ নয়।

কিন্তু, এটি কখনো সম্ভব, যার স্মৃতি, যার জেলে, সে কত নির্ভর, যন্ত্র, আর বস্তু কট পার বাইরের মানব বিভাস। জগদীশ তো সাগল হতে পারেন— ব্যবহারটা তো প্রায় সাগলের—। যমকে যার বিভাস। জগদীশের চোখ বৃচি যেন পড়ে। সাগল নর কোনকরবেই। ব্যবহারে? তাও নয়। এক ভাবনেপত্রীর গোবেই লোকটার দল গওগোল হয়ে গেছে!

যেন হয়, যিহো নয়, তারকেশবের যিহো বৃকে-

হিসাবের পিছার দ্বারা একটা সহজাত নিপুণতা যেন কোথায় লুকিয়ে আছে। ইউনিভারসিটির ব্যাপারটা তো দ্বার দেইকরের।

বাড়ির চত্বরে ঢুকে বিভাসের হঠাৎ পাতালপুরীর সেই বাড়িটার কথা মনে পড়ে। হুশকবার রাজপুত্রী। অজপরাটা বেশাণে মাথার ধাঁপ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। হুশে তার হকের দাঁপ, মোটা হুশটাকে সে খেয়েছে। ধার নি হুশ, রাজকন্যাকে। রাজকন্যাটা তবে কে? ভুবনেশ্বরী? কিহু, ভুবনেশ্বরী তো আর কোনদিন রাজপুত্রের বেশে এসে তাকে হুক করে নিয়ে যেতে পারেন না।

বিভাস একটু হাসল ঠোঁটটি টিপে। কী সব অত্মত চিন্তাই না আসে তার মাথায়।

পুরনো বাড়ি ভিগিয়ে, নতুন বাড়ির পাশ দিয়ে বাসানের দিকে যা বাড়তেই চমকে উঠল বিভাস। ফেল পথ হাঁকিয়ে আছে। চোখাচোখি হওনামাত্র পথ যেন বন্ধে উঠল, পালস আঁপনি, না?

পথের কথা এখন আর বিশেষ জবাব দ্বি না বিভাস। কিহু, পালসের কী লক্ষণ সে দেখতে পেল? বলল, কেন?

হাঁদিয়েলেন কেন? একলা একলা?

হেসেছিল বিভাস? কখন, হবে পড়ছে না তো? আর হেসেই যদি থাকে, তাতে পালস বলার কি আছে। কিহু, পুখর দিক থেকে সে চোখ কেঁপাতে পারল না। অজপরাটার কথাগুলি মনে পড়ছে তার। এই বৈজ্ঞানিক তারকেশ্বর সব চেয়ে বেশি ভালবাসেন এ বাড়িতে। নিজের বিভাস তাই খেঁবেছে। কেন?

পথ বলল, কী দেখছেন?

বিভাসের মন হল পথের চেহারা দ্বার অবিকল তারকেশ্বরের মতো দেখতে। তারকেশ্বরের মতোই স্তম্ভ ফরসা, হুশখানি প্রায় সোলা। চিত্রকের অংগটি নহু। চোখ দুটি কটা। চুলে বড় বড় কোঁচ। চেনাশেনা যে কোন দোকান দেখলে বলে দিতে পারে এ ঘরে আঁদার তারকেশ্বর রাবের। সেই জন্মই বোধহয় তারকেশ্বর পথকে দরজায় বেশি ভালবাসেন। ভালপ ভুবনেশ্বরীর মতো দেখতে। পথের পিতৃত্ব

বোধহয় তারকেশ্বর নিঃসংশয়।

পথ প্রথমটা বিভাসের হুশটিকে তার প্রতি বিভাসের দ্বিরা দৃষ্টি দেখে। কিহু, যে হুশটেকে হুশতে পারল বিভাস তার দ্বি থেকে তাকিয়েও ঠিক তাকে দেখছে না তখন তার মন্থন, ফিলস। একটা অদ্যকর নম্বো করে খিচকির বজা দিয়ে হুশ বাড়িয়ে সে বিদ্যুৎময় জলস, বউদি তাকাতাকি এলিক এল।

বিদ্যুৎ বোধহয় আসছিলই। তাক শূন্যে আরে তাকাতাকি এল। পথ রাগ-রাগ ভর-ভর দলার বলল দ্যাখ, এত বেলায় কোথেকে যেন বোকা হু এসেছে। কী হুক করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

এতকণে বিভাসও লাড় ফিরে গেলে বিদ্যুতের দিতে তাকিয়ে লক্ষ্য পেল যেন একটু। বিদ্যুতের হুশ আভব তাক। বিভাসের হুশের ভিতর পর্যন্ত সে দেখতে পাচ্ছে।

বিদ্যুৎ কি লোহার শোবারি যাচাই করছে বিভাসে না আর কিহু? সে কি কারণ হুশিয়ে, কেন বিভাস মনে করে তাকিয়েছিল পথের দিকে?

পাছে বিদ্যুৎ বিশ্বাস করে বলে, তাই যেন তাকাতাকি বলল বিভাস, মা না, মেনা করব কেন? ঘামি নে করি সে তো।

বিদ্যুতের ঠোঁটের কোণে একটু অঙ্গটি হাসির রে দেখা গেল। বলল সে তো হুশতেই পারছি। কি এত বেলায় এসেন কোথেকে?

হুশী দেখতে সজল, পথে হুশির জন্য হাঁদিয়েছিল এক কারবার।

পথ আবার মনে মনে বিভাস হল। বউদির অঙ্গ হাসি, বিভাসের চোখা চোখা লক্ষ্য দেখে, চাউনির অঙ্গ সে হুশিয়ে ফেলল। ঠোঁটে পালে চোখে তার সে দিল রঙের আভাস। বলল, হুশীকে বেরে এসে বোধহয়?

বিভাস হুশ তুলে রাজার দিকে তাকিয়ে। একবার হুশীটিকে দেখে নিল। বলল, এতকণে সে ছয় হয়ে গেল।

জবাব শূন্যে পথ হেসে উঠল বিদ্যুৎময় করে। হু ইহার্কি হচ্ছে, না?

বিভাগ পূর্বব সপ্তে ইরাকি' সেবে না । বলল, সত্যি, মরে গেল বোধ হয় মরতই ।

বলি সে একটি নিখাস ফেলল ।

বিদ্যুৎ কিত্ত্ব অগ্নিসক চোখে ডাকিয়েই ছিল । তারও ভারনা হাসিয়ে গেল যেন । বিভাগকে আর একটু অন্যায়ম লাগছে । চোখে মুখে তার একটা নতুন কৌতূহলের হাস । যে কি হুশিয়ার জন্য না আর কিছ, যেটা ধরতে পারছে না ।

বিভাগ আবার বলল, তবে এখন যারা বজা বইবার হই কাতারে, তারা নিচর বলাগল করছে, কুশেতাবাবুজী বেরে ফেলল দোকতাকে ।—আজ্ঞা, তাপদবাবু বেরিয়ে গেলেন ।

কথাটা সে পূর্ব আর বিদ্যুতের মতানাকি কারবার চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল । আর অবাক হয়ে চোখা-চোখি করল বিদ্যুৎ আর পূর্ব । এক কথা বলতে বলতে হঠাৎ তাপসের খোঁজ কেন ? কোনোধিন দার খোঁজ করে না বিভাগ ।

বিদ্যুৎ জিজ্ঞেস করল, হঠাৎ তার খোঁজ কেন ?

বিভাগ বিবৃত হয়ে উঠল বিদ্যুতের পত্নের শাননে । কলমীশের কথা শুনে নতুন করে তার সবাইকে দেখতে ইচ্ছে করছে । কিত্ত্ব সে কথা বলা তার কেমন করে । এক কথা, কত প্রশ্ন, কত কথা এসে যেতে পারে । সে বলল, না, এমনি জিজ্ঞেস করলুম । দেখাটেকা হয় না তো ।

পূর্ব এগিয়ে গেল বিভাগের দিকে । যেন আরো ভাল করে দেখতে চায় বিভাগকে ! তারপর যেসে বলল, তবু সেময়েন ওই নড়াটার মধ্যে না ?

এবার বিভাগ একটু হাসল । বিদ্যুৎও হেসে বলল, তাই বোঝায় হবে । কিত্ত্ব এদিকে কোথায় থাকেন ? বাগানে । গানটা করে আঁদ ।

পূর্ব বলে, ও না, কী দোকান গো । বেলা চারটে বাজে, আর কখন যাব ?

বিভাগ চমকে উঠে বলল, যে কি, তোমরা যাও নি ? কেন যাব ?

কেন যাবে ? কেন যাবে না পক্ষা ? ও তো বড় হুশিয়ারের কথা । হি হি, তার মধ্যে বসে আছে । বলল,

না না, ওটা বুঝই অন্যায় । তোমরা—

পূর্ব বলল, ব্যাং অন্যায় বুকে আশনার কাছে পিষতে হবে । এখন যেতে আসবেন, না এরকম লাগলাম করবেন ।

বিদ্যুৎ বলল, এই অবসার আর চান করতে হবে না । আসলুম, মল দিচ্ছি, বুঝ হাত বুয়ে যেতে নেবেন । বিভাগ যেন তখনো একটু বিবৃত । পূর্ব ঠেটি বোঁকিয়ে তেঙে, বিদ্যুতের দিকে ডাকিয়ে হাসল । বলল, কেন ধাঁড়িয়ে রইলেন ? চলুন ।

বিভাগ চলতে চলতে বলল, ও তাই তোমাদের হুশিয়ারো শুনুনো দেখাচ্ছিল ।

পূর্ব ঠেটি উল্টে বলল, সত্যি ? দেখতে পাচ্ছিলে ?

বিদ্যুৎ আর পূর্ব দুজনই হেসে উঠল । বিদ্যুৎ চুপি চুপি বলল পূর্বকে, আস্তে । বলে সে ঘোমটা টেনে দিল । ওরা দুজন আশ্রয় আশ্রয় গিয়ে গেল । বিভাগ ধাঁড়িয়ে হঠাৎ খিড়ির দরজার কাছে । তেরদ করে যেন বিভাগ এটা বুকে নিয়েছে, বিদ্যুৎ আর পূর্ব সপ্তে সপ্তে বাওয়া দার না বাড়ি মগো । তিনজনের দরজার মধ্যে এই অস্থানা বাসান্দেবগুলি আশ্রয় আশ্রয় আরত চলে গিয়েছে বিভাগের । বনে চর, এ সব হলনা । যদিও হলনাতে অভ্যাস নর সে কোনোধিন, তবু পূর্ব ও বিদ্যুতের সঙ্গে বেলাবেশার বাগানে কতগুলি বাগার তার মজাভ হয়ে উঠেছে ।

কিত্ত্ব বিভাগের গায়ের মতো কি রকম শিরশির করতে থাকে পূর্ব আর বিদ্যুতের গায়ের দিকে ডাকিয়ে । বুদ করে না পড়ে যাব দুজনে । বা শিরল উঠোন । খিড়ির উঠোন হলেও গেটি মেহাভ ফোঁট নর । আর কটি হানুই বা মারদিয়ে কিংবা মারা হইয়েই লোকেরা করে । তবুও বাড়িতে মাগ তো কয়েকজনের বাস । উঠোনটা গ্যাঙা পড়ে পড়ে কালা হয়ে থাকে বাতোমাল । মার্টের মধ্যে পায়ে-লো-পনের মতো, উঠোনের কালা গ্যাঙার মধ্যে অলপট এতটি শানের রেখা দেখা যায় । বুকে পড়ে গোটা উঠোনটা এখন যেন শাফৎ হুজুর মতো চক্চক্ করছে । কিত্ত্ব তার ওপর দিয়েই কেমন ভর্তুক্ করে গেলে আছে বিদ্যুৎ আর পূর্ব । আসে বিভাগও এরকম কোনোধিকে লক্ষ্য না রেখে লেত ।

কলকাতার কসমে গভার সময়, বর্ষাকালে একদিন স্টেশনে বাচ্ছিল সে ডাক্তারজি। তারের প্রাণের অবিশ্বাস পাপ্পুলীও বাচ্ছিল তার আগে আগে। অক্লিরের কেয়ানি, পাতি বরভেই হয়ে। বুকিতে পথ ভেদা শিল ছিল। হঠাৎ বৃশ করে একটি নখ হল। বিভাস সেন্স অবিশ্বাস পড়ে গিয়েছে। বিভাস ছুটে বেস তাকে ভুলতে। অভ্যাসপেত অবিশ্বাস পান চিরোচ্ছিন্ন।

বিভাস বলল, ইন্, পড়ে সে.লন। খোস্, উঠ্,ন।

বলে সে হাত বাড়িয়ে বিল। অবিশ্বাস জান হাতটা কোনো রকমে বাড়িয়ে বিল। বিভাস হয়ে টান দিতেই অবিশ্বাস চিৎকার করে উঠল আ, আ বাগো, মেয়ে ফেলল গো!

বসেই পড়ে গেল হাটিতে মূর্খ দুঁছে। তারপর কপিতে লাগল বহুৎ করে। ডাক্তারজি লোকজন ভেঙ্গে অবিশ্বাসকে বাড়ি নিয়ে গেল বিভাস। হাত আর খটা বাসে, ডাক্তার আসবার আগেই হাতা গেল অবিশ্বাস। পাচা, কঠিন, পাশর, হাতেও কি সব হাত মাক ভেঙে গিয়েছিল তার। আগে নানারকম গোলমাল হয়ে গিয়ে ছিল শূদ্র, এই এক আছাভেই। বিভাসের মনে এখনো কেমন একটা সংখ্য থেকে গিয়েছে, সে অবিশ্বাসকে হয়ে টান দিচ্ছিল বসেই লোকটা হয়ে গিয়েছিল কিবা। শূদ্র এই সংখ্যের মনা একটা কথা সে কোনোদিন প্রকাশ করেনি যে, অবিশ্বাসের হাত খরা মারই অবিশ্বাস চিৎকার করে উঠেছিল। আর মূর্খ বৃহৎ পড়ে কেঁপেছিল। আর সেই থেকেই পিছলকে তার বড় ভয়।

পথ আর কিছুই, মূর্খদেরই পায়ের সোছা ও গোড়ালি মূর্খাতিত, মূর্খর। পথর সোড়ালিতে বাসি আসতার হাস। বিদ্রোহের আসতা বসে। তার পূর্বে সোড়ালিতে একটুও কাটাকুতির চিহ্ন নেই। পিছল শানে হুত-কলা সেই পা গেল মূর্খ হওয়াই কথা। কিন্তু বিভাস যেন প্রায় দাঁতে দাঁত সেনে হইল। বৃশ করে একটা নখ হলই হল। হাত ভেঙা-লগনো তারকেম্বের পড়ে দম্ভন নাও হতে পারে। স্মরের হাশপাতালে যেতেও সেই গল্প পাতি। পথও একটুখানি নয়। আর সেই কথাকাড়ার চিৎকার। অসহ্য, ভীষণ অসহ্য লাগে বিভাসের। আর

হাতগোড় ভাঙা অবস্থার ব্যাধি আগে একেকটা মূর্খতা যে কি সাংঘাতিক রকম দেখতে হয়।

পথর চাপা শাসানি শোনা গেল, বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছেন কেন, আস্,ন না। বিভাসও তৎক্ষণে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে বিভাগের তারের ব্যাধিবার উত্তে মেখে। হাতবান থেকে একটা ভংগ উত্তেজনা ও নৃশিতার কাটল তার কয়েকটি মূর্খতা। কেন যে তার মাথা এপর এট পাকায়, ভেবে পার না।

পা টিপে টিপে উঠান পার হল সে। যে বরটা গিয়ে নামের উঠানের দিকে, ব্যাধিরের ব্যাধিবার বেতে হয়, সেই বরই সোতমার ওঁঠর শিঁড়ি। হাত হ-খণ উঠে শিঁড়িটা বাকি নিয়েছে। শুঃগরে আরও কতগুলি বাকি নিয়েছে কে জানে। কেমনা, থেকেলে বাড়িতে, সোতমার উঠতেই ভিন চারটে বাকি থাকত। ডাক্তারের হানলা কথার অসুবিধের কথা মনে রেখে এই ধরনের শিঁড়ি তৈরি হত।

আম্র জগদীশের সংশে শেখা হওয়ার পর তার কৌতূহল আরও উন্নত হয়েছে। বিনের ভুবনেশ্বরী কথা মনে করে। এই শিঁড়ির উপরই ভুবনেশ্বরী আহর্ন। তারকম্বের আছেন। হরতো তাপসও আছে। তারসে কেমন লাগে, না? কে কোন্ হয়ে আছে, কি করছে, কিছুই সোতবার উপার নেই। তাপসের সংশে ভুবনেশ্বরী কেমন কথাশর্তা হল, তাও কোনো দিন শোনেনি বিভাস। অথচ এক বরয়ের ওপর সে এসেছে। আর আম্র জগদীশের সংশে এত কথা হয়েছে।

বিভাস ব্যাধিবার এসে দাঁড়াল! পথ দাঁতে করে হল নিয়ে এসে দাঁড়াল কাছে। এই অবস্থার তার আধখোলা বিন্দি লুটোছে করের পাশে। বলল, নিম, হাত-মূর্খ মোন।

ওদিকে হাতাঘরে দেখা দায়, কিছুই ভাত বাড়রে বিভাসের। হাত মূর্খ বৃহৎ, নিজের কাঁধ পেছাই গামছা বিল পথ। মূহুতে মূহুতে বিভাস বলল, তোমাকে তোমার বাবা মূর্খ ভালবাসেন, না?

থেকে থেকে এই ধরনের প্রশ্ন কোনো মাথাযুক্ত পায় না পথ। বলল, ভালবাসবে না তো কি করবে?

তোমাকেই উনি সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন।

ভাতের কি গন্ধে?

কিছু ছব মি, এমনি বলাহিস্যার।

বিশ্বাস দর কবাই পুনতে পাচ্ছিল। ব্যাখ্যার ঠাই করে ভাত বেড়ে দিল সে। বলল, বলাহিস্যেন বেশ করছিলেন, এখন চলুন।

পর বলল, দ্যাখ না। কবীর মাথা বেই বুড়ু নেই, আরোপ-ভারোপ বকছে খালি।

বিভাসের একটু সংশয় হল এরকম জিজ্ঞেস করা উচিত হচ্ছে কিনা। পর কতখানি রৈগৈয়ে সেখবার জন্য সে বুঝ তুলল। পর তার দিকেই তাকিয়ে ছিল। বিভাস বলল, রাগ করলে?

পর বলল, রাগ হয়, হাসিও পায়।

বেয়েরা এইরকম সোচিনার রেখে দেয়। গোজা কথা বলে না। রাগ হয়, হাসিও পায়। তা কেন? একটা হলে বোকা যায়।

পর দিক থেকে বুঝ কেরাতে গিরে বিশ্বাসের সংসে চোখাচোখি হয়ে গেল বিভাসের। বিভাসের হনটা চমকে উঠল। বিশ্বাসের দৃষ্টি তাঁর। কী যেন বুঝছে সে বিভাসের সাধা মূখে। চোখে চোখ পড়তেই দৃষ্টি স্ক্রোল বিশ্বাস।

থেতে থেতে এক সময়ে আবার জিজ্ঞেস করল সে, আচ্ছা, ইয়ে, ওঁকে তো আর সেখতে পাচ্ছি নে?

বিশ্বাস বলল, কে?

আমনার শাসনিককে।

বিশ্বাসের সংসে পরর আবার চোখাচোখি হল। আচ্ছা কে সোকাটা ওসব জিজ্ঞেস করে সরছে কেন? ভুবনেশ্বরী কেন নামেন না, সে কৈকিৎ কাউকেই পেওরা হলো এ বাড়ীতে। তিনি গলেন তাঁর ইচ্ছাসতো। জান করেন, পুজো করেন, একলা একলা থাকেন, খাবার সরব বউয়ের কাছে এসে চেয়ে যেতে যান, এই সেখতেই সবাই অভ্যস্ত। তারকেশ্বরের সংসেও কথা কম বলেন, তাতে কারুরই যেন বিশ্বাস হয় না। বরাবরই এরকম দেখা গিয়েছে। এর ওপারে কি আছে, কারুর কোনো অদৃশ্যিগা থাকলেও জিজ্ঞেস করে না।

পর কি বলতে যাচ্ছিল। বিশ্বাস তার আগেই বলল কতবারই আপনি ব্যক্তিগত মধ্যে আসেন, আর কতজনই বা থাকেন যে ব্যক্তিগত সেখতে পারেন? মার মগ্নে কি রোজ আপনার লেখা হয়?

বিভাস বলল, তা বটে।

পর বলল, বউদি, তুমি পাগলারির অমায় পাও, আমি ততকাল মাথার একটু জল দিয়ে আসি।

বিশ্বাস ভাড়াভাড়ি বলল, না ঠাটুগতি, এই অবসার আর জল ছুঁইবো না মাথার, গর্বি হয়ে যাবে।

যাক, ভালদুতে একটু জল না ছোঁয়ালে আমার মাথা গরম হয়ে যাবে।

বলে সে গলে গেল। বিশ্বাস বোঝের আবার ভাত আনতে গিরেছিল বিভাসের জন্য। বিভাস ভাবছিল, কি করে ভাতপদের বিবর তোলা যায় বিশ্বাসের সামনে। তাদের এত আলাপের মধ্যেও ভাতপদের প্রসঙ্গ কখনো আসে না, বিশ্বাস আসতে দেয় না। এইবার একদিন ভাতপ-বিশ্বাস সম্পর্ক খালেচা না করলেই নয়। নইলে বিশ্বাসকে কিছুতেই বোকা যায় না-এরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। দেখা যায় শব্দ একটি মেয়ের ব্যক্তিকের আড়ালে চাপা একটা অলমার মাথা।

কিন্তু বিশ্বাসের ভাত নিয়ে আসার আগেই চমকে উঠল বিভাস। সিঁড়ি খরের দরজার পাঁড়িয়ে ভুবনেশ্বরী। আচ্ছা কেই বিশেষ করে এমনি ভাবে ভুবনেশ্বরীকে সেখতে পাওয়া আলাদারের কৌশলের মতোই বিশ্বাসকর।

এঁটো হাতেই বিভাস প্রায় পাঁড়িয়েই পড়ছিল। ভুবনেশ্বরীও যেন চমকে উঠে একটু খোঁটা টেনে দিলেন। খোঁটা টানার ভাগিগি বিচিত্র, যেন নতুন নউ। একটু বোধহয় সেসেও উঠলেন। বুঝখানি পুরোপুরি চাকেন মি। উজ্জল শ্যাম বর্ণ, গন্ধ দাক, চোখ দুটি মাঝারি কিছু শাও ও সন্ততির বলে মনে হয় অনেক বড় বড়। সোহারা গঠন, বোধহয় সেটা বরসেই ভায়। কপালে সিঁদুর নেই, খোঁটার প্রান্তে সিঁখি লাল। সামনের সামান্য গলে সেখলে বোকা যায় এখনো যেন পাক হয়েনি।

একটু যেন ব্রত ভাগিগিতেই বিভাসকে বললেন, উঠলে

কেন বাবা, হন। কঁটা, পল কোথায় ?

বিন্দুও তখন এসে পড়েছে এবং ভুবনেশ্বরীকে চোখে পড়বার আগেই বিভাগের দাঁড়িয়ে পড়া অবস্থা দেখে কি বলতে থাকিল। ভুবনেশ্বরীকে দেখে ভাড়া-ভাড়ি ভাতের থালা মাথিয়ে, বাঁ হাতে ঘোরাটা টেনে দিল আরও খানিকটা। বলল, ঠাকুরাণি একটু মাথা ধুতে দেল। কিন্তু বলছেন না ?

ভুবনেশ্বরী বললেন, না, তোমাদের এত সেরি দেখে নেমে এলাম। এত সেরী কেন কঁটা ?

বিন্দু অব্যবহার্য আসে আর একবার বিভাগকে দেখে দিল। বত সে অব্যাক ভক্ত তার হাস হতে লাগল। বিভাগ কি সাধারণ ভক্ততা অভ্যস্ততার কথাও ভুলে গিয়েছে যে, এখন যা করে তার তাকিয়ে আছে ভুবনেশ্বরীর দিকে ? না হয় কইই দেখেছে। হাবা নাকি দোকটা ?

সে বলল ভুবনেশ্বরীকে, ঠাকুরাণি আর আমি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম নীচের ঘরে। কম্পাউণ্ডারবাবুও আজ অনেক সেরি করে এলেন।

ভুবনেশ্বরী তখন বিভাগের দিকে গ্লান কিয়ে রয়েছেন। বললেন, ও, কিন্তু এ অবসার আবার মাথার জল দিতে সেল কেন ?

বাবল করেছিলার না, কিন্তু—(সে একবার বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল, পারল না) কিন্তু ঠাকুরাণি শুনলে না। ঠাকুরাণি নাকি মাথা গরম হয়ে থাকে।

কিন্তু হাসল, ভুবনেশ্বরীও হাসলেন একটু। বললেন, অদ্যুদ্বিগ্ধ মাথাবে একটা। ভাড়াভাড়ি খেয়ে নাও, আর সেরি কতো না।

তারপরে ভুবনেশ্বরীও বেন টের শেলেন বিভাগের তাকিয়ে থাকা। বাবার আসে জিজ্ঞেস করে গেলেন, বাগ্গা-বাগ্গার কোনো অদ্যুদ্বিগ্ধ হে না তো ?

বিভাগ বেন সস্তত। বলল, আজ্ঞে না।

বলে সে তাকিয়েই রইল। ভুবনেশ্বরী চলে গেলেন।

বিন্দুদের দৃষ্টি আরও তীব্র হয়েছে। সে জিজ্ঞেস করল হঠাৎ, কোথায় গেলেন আজকে, বলুন তো ?

বিভাগ বলল, কেন হুগী দেখতে ?

কোথায় হুগী এ হাফির বিষয়ে কোনো কথা হয়েছে ?

না তো।

তবে ?

তবে কি ?

আজকে এরকম আনোলতানোল বকা, হার দিকে এরকম তাকিয়ে থাকা, এমন কেন ? কবেক বৃহত্তর চুপ করে থেকে বিভাগ বলল, উত্তর মাচাটার ভঙ্গবর্তার সঙ্গে আজ আলাপ হল।

বিন্দুও চমকাল না। কেবল গম্ভীর গলায় বলল, বৃকেই ! ঠাকুরাণি আসছে, ওর সামনে ও-কথা বলবেন না বেন, বৃকেই !

হ্যাঁ।

হেসে বলল বিন্দু, হাই বৃকেই !

পল এসে পড়ল। কিন্তু বিভাগ তখন, বিন্দুও বলে, সে হাই বৃকেই !

আঁচনার বর্ণা যেমনে। শূন্যে মাটি কোথাও নেই সোটা গ্রাম জুড়ে সবত পথে পথে পাকি আর কাল।

ভবু নাকি বর্ণা এখনো ঠিক মাথে নি। এখনে মাঠে মাঠে ভালো করে চল দাঁড়ায় নি। মাঠ চষা হও গেছে, বীজধানের চষা উঠেছে লক্ষলক্ষি। যে-পরিমাণে বর্ণা নেমেছে, এরকম আর দু-চারদিন করলেই হোয়ার কান শব্দ, কণা বার।

ভবুও বড় ভয়। আশা ও নিয়মার হন নিয়তা বোলে। বৃষ্টির জল শ্বাধীন। নিজের আইনে চলে কাগুর হন মাথার হার বারে না সে। যদি বেশী কও করে, ভেঙ্গে বাবার ভয়। কম হলে চাপ হবে না। তবে এখন আকাশ ভরে প্রচুর আশা। এখন বত করছে, ভক্ত ভালো। আর করেও যোজাই। বর্ণীতে পাহাড়ের জ এখনো মাথে নি বোকা বার। কারল এখনো আঁচনা বাসেই বলে ফেরা বত বার নি। কিন্তু জল বেড়েছে থবুনা, কেউটের বিল আর ভাল একাকার হয়ে বার নি হবে, সেই লক্ষল বোবা দিয়েছে।

হাটের চেচা-কোয়ার মন্দা দেখা দিয়েছে। লব বাস্তব আরম্ভ করেছে হান চালের। আসছেও কন। আল বলে পরার্থটি চোখেও দেখা বার না। কিরে, কত, পুঁইশাক—এই শব্দেই হাট ভরে থাকে। চাষীদের কান

পড়িছে। এখন তাদের আর হাটের দিকে নজর নেই। তবু আসতে হয়। বা হোক শাকটা পাওটা বিক্রি করেও যদি নগদ দুটি পয়সা পাওয়া যায়। অন্যায়ের প্রায় বৈশাখ থেকেই শুরু হয়। এ সময়টা আগে বাড়াবাড়ি। অফ পেটে দুটি না পড়লে, হাটে কান্না করাই বা যায় কেমন করে।

হাটে থাকা এখন মানুষের সেনসেই বৈশী। হাটের দিন হাটাও, শকালে বাজারের সময়েও কৃষি বহুধা ভিত্তি করে। বিশেষ অবস্থায় তাদের কিছু বোকা যায় না। অধিকাংশই আদিবাসী বৈশ-পুত্র। তার মধ্যে বাড়ালীও কম নেই। তবে বাড়ালী কিসান-বহুরের হাঙ্গামা কেউ বিশেষ নিতে চায় না। তাদের নাকি বড় টাকটেকে কথা। যদি বৈশী, চুড়ির কান্না থেকে হাত বাড়িয়ে একটু তুলে গছটিও গরুরে দেবে না। তবে কান্না ভাল করে, ধোখে, নন বিশেষ একলা একশো। তবে সে নন পাওয়া হুহু।

কিসান বহুরের ভিত্তি হয় এখন হাটে। সেখানেই চেনা যায়। টোকা, পুঁচিল, কাগুর কাগুর হ্যাগিকেন, খেলো হুঁকা নিয়ে এসে এসে সব বলে থাকে। ঘরের বহুরের পরাকার, তারাতা আসে। ধর কবাকি হয়। সব সময় এভাবেই বহুর পাওয়া যায় না। আড়কাঠিরা গিয়ে নানা ভাষণা থেকে নিয়ে আসে চাষের মরশুমে।

ভারকেশ্বরের দুই-বাবার সোবন্তা হানু এ-পথে একটু চকল হয়ে ওঠে। হাটের শিল্পে, কয়েকটা চালাখের পর পর থেকে যে সেহকীবাবীরা আসে, বর্ষার সবটা তাদের বড় একটা লেখা যায় না। বাড়ায়াতের অসুবিধা তো আছেই। চাষী নৃশিন কাজে ব্যস্ত থাকে, হাতেও পরমা থাকে না। নতুন একদিন হাট। হাটের দিন হানুকে নন সময়েই বৃশ-বৃশি দেবার। চোখ পিটিপটি-করা পত্যান হাতাও তার আর একটি সোখ ছিল, নিতের ট্রিটি কপার ট্রিটি ওপরে এনে বাকে বাকে চাপ দেওয়া। হাটের দিন তার ট্রিটি চাপাচাপি নেন বেড়ে যায়। কেনন কুশিত আর অগ্রীল বলে মনে হয় তখন হানুকে।

বিভাগ মেথেরে, ভারকেশ্বর বাড়ি এসে দেশেই, কিংবা হুরে কোথাও হুঁসী সেখতে দেশে, হাটের দিন হানু শিল্পের চালাখের সেহকীবাবীর কাছে এসে যায়।

কম আর বেশি, তাড়ি সে ধান প্রতিদিনই। বগানের ভেলেভান্না বাস যায় না কোনোদিন। হাটের দিনে একটু বাড়াবাড়ি হয়। বাড়াবাড়ি হলেই দেখা যায়, তার চেহারা কলে গেছে। হানুসটাও বলে যায় অনেকখানি। হলে চোখ লাল হয়। চোখ পিটিপটি করে না, বৃশি প্রায় স্থির। ট্রিটির কলে গরীমা ভারী আঁঠার মতো হয়ে থাকে। গলার শ্বর অসম্ভব গম্ভীর শোনা যায়। সেটাই সবচেয়ে আশ্চর্য্য তার গলার শ্বর সব সময়েই চামচিকার মতো টিটি করে, তার গলার শ্বর অমন মৌটা হয় কেমন করে।

তখন, পা টিপে টিপে, চোখ পিটিপটিতে, হানু গলার কথা বলা, ভা-পাওয়া হানুকে চেনা যায় না। বয় হানুকেই বেন কেমন ভয় করে।

হানু তখন মোটা গলার বলে বিভাগকে, হুঁটো হুঁটো পাশ করেছেন কল্যাণটারবানু, ভারকেশ্বর হাটের বাড়িতে আছেন বেশ রঙে-বণে, আপনায় আর ওখানে যেতে ইচ্ছে করে না, না।

ওখানে মানে হাটের মেয়ের কাছে। হাটের মেয়ের কাছে দাবার কথা কোন দিন চিন্তা করান বিভাগ। কিন্তু একটা জিনিষ টের পেয়েছে, তাড়ি খেনে হানু ভারকেশ্বরে ভক্তি করে আর ভাকারবানু বলে না। একটু খেন ভেরা করেই নাম হয়ে বলে ভারকেশ্বর হায়। হানু এ অবস্থায় অবশ্য কোনোদিনই ভারকেশ্বরের শাফা হয় না। হলে কেনন হত, সেটা জানবার বড় বৌতুলে বিভাগের। অনেকদিন মনে মনে চেতবেছে, বিভাগে এসময়ে ভারকেশ্বরের সঙ্গে হানু একটু যোগাযোগ করার সেওয়া যায়। কবীটা ভেবে, বিভাগের মনে একটা ছেসেহানুদী উত্তেজনা লক্ষণগিয়ে ওঠে। খেন যোগা-পটিকার পলটোর আদুন জলাশয়ে মেবে কি মেবে না, একটা বকা অলভ ভয় ভয় উত্তেজনা অনুভব করে সে।

কিন্তু বিভাগ বলে, মনে-বণে মানে।

হানু কিছুক্ষণে ভাকিয়ে বলে, মানে, ঘরের মৌ-খিরে হাতে পাওয়া, ললটা পানটা হাত বাড়িয়ে নেয়া, এই মানে আর কি, বুঝলেন না। হুরে হানুদের মতন।

বলার চেয়ে হানুদাই যদিও বেশী থেকে যায়, আসল কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না বিভাগের। তার চোখের

দায়ে তখন পান আর কিছুতেই মন ভেঙ্গে ওঠে। রাসুদ ওপর রাসুদ তার। বিরক্ত হই যেন নহে। সে তাকিয়ে দেখতে থাকে রাসুদকে। যেন উপভূত বহি তলে বলে রাসুদ, রাসুদ করলেন ?

বিভাস বলে, না।

—করেছেন যেন হয়। তারকেশ্বর রাসুদকে বলে সে যেন ?

—না।

—আমি কি মিছে কথা বলছি রূপাউত্তরবাবু ?

করে যেসের মতন বটে আমেন, সেই কি।

—হ্যাঁ।

—তবে। তবে আগেকার বৃত্তা রূপাউত্তরবাবুও মনে না। তারকেশ্বর রাসুদে বাড়িতে সেও করে লোনের মতন ছিল। বাড়ির বৃত্তে-সাতার মতন। কেরে লোক বাইরে যেমন-স্বাধীন করে থাকে না।

বিভাস না বলে পারে না, কেরে লোককেও ভাঙে যেতে দেখে।

হাত বেড়ে রাসুদ বলে, মিছে কথা। বাড়ি কেসে লাগা করে, চাপিকে চাপিয়ে বেড়া বাড়া করে, মাঝার বড় বিহিয়ে দিলেই কি ঘর হার রূপাউত্তরবাবু। হুটো হুটো পান দিয়েছেন, এটুকু যাকেন না। সেই করে এটা বউ, কেরেটা যেসেনে থাকলেই তাকে ঘর বলে ?

এহি অনেক কথা বলে রাসুদ। শুধু-কথা বলার জন্যে বলে না, নিজেই কথাই বলে সে। যখন সে এহি বকবক করে তখন অনেক কথা বলে। তাতে বিভাস জানতে পেরেছে, এই আঁচনাতেই রাসুদ বাড়ি ছিল। পনেরো গোলা বকর থেকে সে ভালো মাংসা-বাবু-বাবু বকর। জীবনে-নাকি অনেক মাংসা করেছে। তারকেশ্বর রাসুদের সঙ্গে তার সঙ্গারি মাংসা কখনো হয়নি। তবে, তারকেশ্বরের সঙ্গে বাসের মাংসা হয়েছে, একক শুনকেন সে বুদ্ধি আর পরামর্শ দিত। তারকেশ্বরের যে মাংসা আর ভাই এখন বহু-মাংসা করে থাকে, তাদের মাংসা বেরিয়ে রাসুদ, তারকেশ্বরের বিরুদ্ধে। বাড়ি সঙ্গ-পরামর্শ আর সঙ্গী, সেই দিত সে। কিন্তু তারকেশ্বরের সঙ্গে তার সঙ্গারি হয়ে যায়। তার অনেক আগেই নিজের সাতচল্লিশ বিঘা জমি দর দেব করেছে রাসুদ। রাসুদ বউ তখন তারকেশ্বরের মাংসা-বাবু-বাবু বাড়িতে,

যে পুরনো বাড়িতে এখন তারকেশ্বরেরই বাড়ি, সেই বাড়িতে রূপাউত্তরবাবু বাস করত। হ্যাঁ, রাসুদও ব্রাহ্মণ। কখন বলে, কেসে বাস, বউ। পুত্র-বউ হুসুল, এ তখন পুত্রান দান।

রাসুদ বাড়ি থেকে বলে, রূপাউত্তরবাবু, আমি পরতান, না।

বিভাস বলে, বুদ্ধিতে পারি না।

—আমি পরতান।

—তাই হলে। বিভাস বলে, মইলে এসব করতে সেলেন কেন।

রাসুদ বলে, রূপাউত্তরবাবু, আমি কেরেবাবু হতে চোখিলাম। পরামর্শ-কর জমি-কর মতন। তারকেশ্বর রাসুদের মতন। কেরেবাবু না বলে বউ মাংসা হওয়া যায় না। জমি-কর তুলে সে-না নাকি দরবার। অন্যদের এম-এম-এ হয়েছে কে। পরামর্শ-কর বাসটি বহুরে বৃত্তা জমি-কর। তেনে অন্যর মন-কর। কেরেবাবু, এখানে আছে, বলে।

—হ্যাঁ

—অন্যর মন-কর পরামর্শ-কর জমি-কর, এখানে-কর দর মইলা প্রায় ডাকেরই। সে জমি-কর উচ্ছেদ করবে রূপাউত্তরবাবু, বাড়ি কেরেবাবু হওয়া চাটখা'দ কথা না। আমি হতে পারলাম না। আমার সাত-চল্লিশ বিঘেও গেল। মন-কর রাসুদ আমার চেয়ে একটু বড় কেরেবাবু, তাই টিকে আছে প্রায় বিঘে কিছু। তাই-কর সঙ্গে পারল না। পারিলে গেল দর। তার তাই গো-লেন-কর, পারল না তারকেশ্বরের সঙ্গে পারিলে গেল দর। তারের হকের বনও হাত-কর হতে গেল। আমার-কর লোকে কেরেবাবু বলত এম-কর, আমার ভালো পারল। আমাকে ভর পেত মাংসা বনে বনে খুঁজি হত। এখনো কেউ কেউ ভর করে আমার-কর, রূপাউত্তরবাবু।

রাসুদকে চোখা যায় না। কালো মূর্তি, পাল চোখ তার ওপরে, মাংসা মন-কর পাল হুঁতর হতো পাল কেসে ওঠে। মোটা গো-লিন-কর তার মন-কর জমি-কর সেই।

বলে দাড়া আমাকে ভব করে, তারা আমাকে চোখে চোখে রাখে । তারকেশ্বর রায় আমাকে চোখের আড়াল করে না ।

হাস্যের নামের দিকের হলদে হাত কয়েকটা বেঁধে পড়ে । বলে, তারকেশ্বর রায় ভাবে, পাছে আমি আমার কেবাবাজ হয়ে যাই । কিন্তু কম্পাউটারবাবু আমি আর কোনদিন কেবাবাজ হতে পারব না ।

বলে হাঁ করে, কবের গালে আঙুল দিয়ে কাঁক করে সোড়ার হাড়ি দেখার । বলে, যেখন একখান হাতও নেই । একদিন একটাকা এগারো খানা পয়সা সরিয়েছিল তারকেশ্বরের টাকা থেকে । হিসেবে টের পাও নাই, চোখের দিকে তাকিয়ে টের পেরেছিল । আমি হাস্য হাস্যবাহারী গাঃলাী উত্তর আঁচনার এক নামে সবাই চিনত । সেই হাস্যকে নারদ তারকেশ্বর । আমি পায়ে ধরে হাস চলেছিলাম । আমার সাতচাল্লিশ বিধা জরি ছিল । আমি আর পঁচিটা কেবাবাজের মতো তাকে সাতশো বিধা করতে চেষ্টাছিলাম । সাত হাজার বিধা করতে চেষ্টাছিলাম । কম্পাউটারবাবু, তারকেশ্বর তার কুকুরগুলোর সঙ্গে থাকতে বললে আমি ভাই থাকব । আমি কেবাবাজ হতে পারলাম না । তারকেশ্বরো তিন ভাই । বাবা নকুলেশ্বর । আমার সাতচাল্লিশ বিধা হারিয়ে, আমি নকুলেশ্বরের চাকর হইছিলাম । ভানডায়, কেবাবাজী করে, নকুলেশ্বরকে ভূঁয়ি, আমার আমি বাড়া হব । কিন্তু নকুলেশ্বরই পাদাল, কেননা তারকেশ্বর আরও শোয়ানা, সে সহোদর ভাইকে আমার ঊনয় করলেন । হাতখান থেকে আমার বউটাকে নিয়ে নকুলেশ্বর শূত । নকুলেশ্বরের বউ আমার বউটাকে পিঁড়ত । নকুলেশ্বর পাদাল, সোকুলেশ্বরও পাদাল তারকেশ্বরের ভয়ে । কাল সেও তার বড় ধামার পিঁড়নে ছিল । আমার বউটাও কোথায় পালিয়ে গেল । আর আমার নামে এল পরোয়ানা, পূর্ণিমে ধরে নিয়ে বাবে বলে । বাঁচাল কে জানেন ? তারকেশ্বর রায় ।

নিজেকে বিবৃৎ করেও হাসে না হাস্য । শত্রু হু হু বলে করেও হাত কড়মড় করে না । এককম সুখে একঘেয়ে পলার বলতে থাকে, কেন এসব কম্পাউটার-

বাবু ? না, আমি কেবাবাজ হতে চেয়েছিলাম । না হলে বড় মানু্ধ হওয়া দার না । কিন্তু বড় শক কাজ, বড় শক । স্ম্যাতা চাই । তারকেশ্বর আমাকে শোবে, পঁচটা করে টাকা ঘের মাসে । কত জন্ম করি তার হিসেব রাখে ।

কিন্তু কম্পাউটারবাবু, নকুলেশ্বরের চেয়ে তারকেশ্বর ভাল । তারকেশ্বর লাড়িয়ে । একবার টের পেলে হয়, কে ওঁ পাভয়ে কোপ ফেবার জন্মে । তার রক্ষে নাই । ঠিক তারকেশ্বর তাকে কোপ দেবে । তার ভবিষ্যৎ অনেক উচ্চুতে । সেখন নাই, পয়ার-পূরের জরিদার এম-এল-এ খানাহি মুখুন্ডে আসে, কত কথা বলে । ওরা কত বড় কেবাবাজ, আমার ওদের ওপরে কত কেবাবাজ । সরকার জরিদারি ফুলবে, খানাহি মুখুন্ডে সরকারের হয়ে সেল । কত বড় তারা !

কম্পাউটারবাবু, চোখ বুললে তারকেশ্বর সব দেখতে পাও, সোটা আঁচনার পয়ারপূরে, বেদোতে, ছোট কেউপূরে কি হচ্ছে । অন্তর্ভারী ভগবান, ভগবান তারকেশ্বর । কেউ কোনদিন ওর গণে পারবে না ।

হাস্য বাবে না বলতেই থাকে ।

বিভাগ শোনে । শূনে শূনে শূনে, হাস্যের মত ভর-ভর চেতনাটা বাঁতে থাকে তার ।

তারপর শূনে শূনে শূনে, যেমন ছুঁয়ে আঙ্গুর ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে গল্পানিয়ে ওঠে, কিন্তু টের পাওয়া দার না, তেমন বিভাসের বৃক্সে মনো জলে । নিজেরও যোষ হয় অবাক লাগে বিভাসের, নিজের হাস দেবে । দিক-দিকি আঙ্গুরের মতো, কোন্ডের আঁচ লাগে তার সারা গায়ে ।

আবার বিরক্ত লাগে কখনো । কিন্তু হাস্য বলতে থাকে, প্রায় চোখই বলে ।

বৃষ্টি পড়ে টানুর টানুর । আঁচনার নীতে বান আদর আদর করে । জলে জলে, পাখপালা আকাশমাটি সব যেন ভগমগ । ঘনীলালা, পুঁহুর জোবা, সবই যেন কুল হাণিরে ভাসো ভাসো করে ।

হাস্য এখন যোষ মেশা করে । চোখ বলে । সাতাধিন যেখের মতো, বৃষ্টির মতো, কিরি কিরি খিখি, পাঁক পাঁক, কামা কামা, জেঝা জেঝা, শূনে

বাতাসের সোচ্চারিত বহুতা বলতেই থাকে হান্দা।

ইউনিয়নবোর্ড অফিসে যোচ্ছই সাক্ষ্যে ভাষার সংহার আসে। হাতা পলে ঘাড়ার ধর পাওয়া যায়। সরকারী পরগণিত হান চাউলের বিবর নিয়ে প্রতিদিনই অভিযোগ আসে। একে বলে 'বহুত্বকে বহুত্ব'। পরগণিত হাতাও ভয়ের বিবর আছে। কৃষিবিভাগের এস-ডি-ও ইউনিয়নবোর্ডের উপরেই দিত্ত-রপলি। সূত্রাং এদের চান, কৃষি-ভয়ের চাকা, সবই ইউনিয়নবোর্ডের প্রোগ্রামেই হাতত। সেদর কটনে অভ্যস্ত অদান্য। একজন কেন বোশি পার, একজন কেন কম পার, আর একজন কেন কিছুই পার না, এই নিয়ে প্রতিদিনই জিজ্ঞাসাবাদ।

নির্দিষ্ট জ্ঞান মেয়েন, সেই তারকেশ্বর স্বয়ং অনুসন্ধানিত। কোথায় যেন একটা বিশেষ সোলমাল লেসেছে। তারকেশ্বর পাঠ্যভে নেই। মহকুমা শহরে যাক্ষেন প্রারই। এম-এস-এ অব্যাসি হু-স্ব-স্বের-সঙ্গে প্রতিদিনই সরকার লেসে আছে।

প্রোগ্রামেই অনুসন্ধানিত, সোকে বিভাগকেই যেন তার অদান্য প্রতিদিনই বলে গরে যেন। গত জিজ্ঞাসাবাদে তাকেই।

কিন্তু জ্ঞান যেনার অংকার বিভাগের নেই।

সোকেরা এসে বলতে থাকে। বিভাগ পুনতে থাকে। পুনতে পুনতে পুনতে, ধুইয়ে ধুইয়ে গন-গনিরে ওঁতা জলদুনিটা জ্ঞানার উল্কে উঠতে থাকে বৃকের মধ্যে। ইউনিয়নবোর্ডের হিসের পর সব তার দক্ষপানে। কিন্তু তার অদান্য নেই।

কিন্তু বাতায় হিসের থাকে এক রকম। কাক্তে হর আর এক রকম।

বিভাগ নির্বিকার থাকতে চেষ্টেছে। এখনো থাকতে চায়।

তারকেশ্বর বিংশনরে তার সব বহু বহু দিক্ত অদ্যকার কোণসুপিতে হাত বরে হয়ে, নিয়ে গিয়েছেন বিভাগকে। যেন একটা অদ্যকে, একটা বোকাকে, একটা কাদাকে স্পর্শে স্পর্শে অনুভব করিয়েছেন তার অদ্যগি বহুত্বত্ব। যেন নিজেই আদ্যকে বোখিয়েছেন। যেন নিজেই জ্ঞানার সঙ্গে কথা বলেছেন। বুঝিয়েছেন তার দিক্ত স্বয়ংত্ব।

বিভাগ বিপালী থাকতে চায়নি, অবিপালীও হতে চায়নি। বিপাল অবিপালের প্রসে যেনতে চায়নি যেন। যায়ে যায়ে যেনের মধ্যে কে যেন 'কেন কেন' করে উঠেছে। সেটা বিশ্বাসের। বিশ্বাস ভয়ের।

কিন্তু আদ্যার তারকেশ্বর হাতা হান্দা আছে তারকেশ্বর হাথার উপরে যে আকাশ আছে, যে আকাশ হাতাও আকাশ আছে। তারকেশ্বর যে বাতাসে বিশ্বাস যেন, যে বাতাস হাতাও বাতাস আছে সেই হান্দায়ে কথা বলে। বিভাগ শোনে। পূতে পূতে, খোঁতা খেয়ে খেয়ে খাটা-খণী বিজ্ঞানী জীবিত যেন শেদ পর্বত পথে ওঠে, তেখনি তার ভিতরে কে যেন ওঠে পর্বত পূতে।

সেই আকাশটা তার চোখে পড়ে। আদ্যার সোঁ বিপাল আকাশ। যে আকাশটার দিকে তাক্তে তার মন বিপালে ভরে যায়।

সেই বাতাস এসে লাগে- তার গারে। যে বাতা তার হনকে ব্যাকুল করে।

কেবলই কেসে আদ্য জীবনের কথা হানে পড়ে কেসে-আদ্য নয় বিভাগিত জীবন সেটা। যেন জীবনে এতই হকের এদিক আর ওদিক।

যেখানে সোভ, সেখানেই অপমান। বিভাগে নাহকের জেও অনেক বোশি দল্লত, অর্থ ও প্রতি পড়িতে প্রতিষ্ঠিত তারকেশ্বরের গণ্ডার মধ্যে, সোভে একটি পূর্ণা যেন নিরত আর্থিত হছে। সে বৃকে হাটা জীবত বীভৎস ভাটা কী এক দৃষ্টি লালগা যেন চারিদিক থেকে হাতড়ে হাতড়ে সব কিছু ত শীমানার এনে কুলছে।

সোভ সেই পূর্ণা নেই, তবু ওই শীমানার দিক্ত লালগা-জ্বলের হিসাব হাথে সে নির্বিকারভাবে। হাথে চায়। কিন্তু অপমানে মনটা কালো হয়ে ওঠে তার যেন হর হান্দা কত পরায়ণ।

অপমানের লিখন বহি বিভাগের জ্ঞানবল যেনে কপালে সোবা হয়ে গিয়েছে। সেলিখন আর কোনটা যেন খুঁতে না।

বীভৎস হান্দা হিসাবে অনেক শক্তি অ্যা বিভাগের। সে প্রতিদিন খয়ের কাসঅদ্যনিও পড়ে না।

কামজিতি নিয়ে, তারকেশ্বর জিৎপেশদারি ও অফিস ঘরে অনেক বাকপুঁথিতা হয়। ঠাট্টা বিটুপ হয়, মন ক্যাকসি পথগত গভাষ।

জীবনের সব জাবসাব, সব বিরোধ মিটিয়েই তো বসেছিল সে। কিন্তু ভুলে যে সত্যি সর্বের মতোই লুকিয়ে থাকে, এ শুধু তার জানা ছিল না। সে দেখছে, তার নিজের মতোই অনেক বিরোধ। সেখানে নিরত ধ্বংসেই আছে।

মন অপমান বোধ করেই ক্ষান্ত হয় না। সল না করতে চাওয়াতেই তার শেষ নেই। অবসান করতে চায়।

দুঃসারে অনেক দুঃখ পাওয়ার সমাধীনতা আছে সকলের। তাকে দূর করার অনেক বাবা। বাবা, ভব, আঁচনার আকাশের দিকে তাকিয়ে। যে বিবান গ্রাস করে বিভাসকে, তার চাপাচাপি চাপাচাপি টেনে উঠতে ইচ্ছা করে।

নির্বিরোধের কুলার জীবন যেন কুলোতে চায় না আর। এতটুকু মাগে এতটুকু : একবারে একটুখানি জীব, হীন, দুঃখ, ভীত।

হুড়তে চায়, বাড়তে চায় কেন জীবন ? তারকেশ্বরের সীমানা ভিতরে, অনেক দূরে, বহুদূরে ব্যাঘ্র হতে চায় কেন ?

বিশ্রুতের চোখ লুটি তার মনে পড়ে। যে-চোখে ছোটোবউধির নতো অন্তলম্পশী লুকি আছে। যে-চোখ লুটি তার ভিতরের এই নিরত ধ্বংসকে নিরতর দেখছে। দেখছে, আর যেন দুঃখ না কটেও বলছে, ভেবে কান্ন করবেন, কম্পাউটারবাবু, না, 'কম্পাউটারবাবু' নয়। যেন বলছে, 'ভেবে কান্ন করো বিভাস। আঁচনা ছেড়ে, এ বাড়ি ছেড়ে বাবার জানোই যেন শূন্য জীবনকে বাড়াতে চেষ্টা না। 'শূন্য আমার আর ঠাকুরাকি, কেলার লুটি বলে বলহিনে, আমার নিজের অন্তেও ললছি বিভাস, সাবধান। হুড়তে গিয়ে হুঁ, খেতে যেও না।'

তা কেন ? বিভাস ভাবে মনে মনে। ওই নগ্নোচ্চকে টুকুটি চেপে, নির্বিরোধের সীমানার বাইরে না সেলে, বিশ্রুতের কাছেই বা কি হল্য থাকে তার। নিজের সঙ্গেই বা লড়বে কত আর বিভাস।

কত না চেষ্টা করছে বিভাস, কত না বলছে নিজেবে,

থাক, থাক, সব থাক। তারকেশ্বর যা শূন্য তাই করুন। একবার মরে গিয়ে, বাঁচা, সেটা যে কী, তা সবাই বোঝে না। পাখা ভাঙা, চটুটে গুড়ে পড়া বাড়ির মতো সে জীবন।

কিন্তু মানুষের জীবনে সেট চটুটে বল কখন লুকিয়ে যায়। কখন তার পাখা ওঠে সবল হয়ে, টেরও পাওয়া যায় না। তখন আর জীবনকে ধরে রাখা যায় না। সে আপনি আপনি কখন উড়ে যায়।

আঁচনা ছেড়ে চলে গেলে কেমন হয় ?

বাঁধির অপমান আর মার শেষ হল না আজও। শূন্য খোলস বদলানো হয়েছে। লুকি যদি পেতেই হয়, আঁচনা ছেড়ে গেলেই মিটে যায় সব।

কিন্তু ভাতে জীবন বাড়ে কই ? পালানো হয় শূন্য। অলৌকিকের কথা নয়, মনের বাঁধন বলে কিছু নেই ? সে বাঁধন কি একটুকুও বাঁধনি বিভাসকে ?

বেরেছে। বিলাং আর পর শূন্য নয়। মোটা আঁচনার জীবনের সঙ্গে মনের এতটা বাঁধাবাঁধি হয়েছে। তাই পালানো নয়, সীমানা ছাড়ার আর একটা দৃষ্টি ডাক শূন্যতে পার বিভাস।

যোগেশ যোগেশের দুঃখবানি তার মনে পড়ে। উঁচু গ্রাম বেলোর কিনার দিয়ে, লুকিয়ে-বাওয়া শালের দুঃখ-গছানো নরানজুঁলি তার চোখে ভালে।

আর রাসু, রোজ বলতে থাকে।

লুকি পরে টিপ-টিপ, টাপ-টু-শূন্য। আঁচনার নিদ্রাঙ্গুর ষে ষে করে।

রাসু থাকে না। এক-এক সময় রাসুর গলাটা টিপে বিতে ইচ্ছা করে। চুপ, চুপ। হারানখানা, তুই কেবের-বাখ হতে চেয়েছিলি ; জীবনও নয় মরণও নয়, এই ছোটের জীবনই তোমার পাওয়া।

কিন্তু গলা টোপা যায় না। রাসু রোজ বলতে থাকে। 'লোকেমা রোজ এসে বলতে থাকে। বলতে থাকে, বলতে থাকে।

শূন্যতে শূন্যতে শূন্যতে, বিলুপ্তার তৈরি করতে করতে, লুকি লুকি, লুকি লুকি, ভেঙা বোঝা বাড়তে বাড়তে একটা ভাংকর যত্না হতে থাকে। তারপর রাস হতে থাকে।

ইউনানিমবোর্ডের ত্রারা হিসাবের সঙ্গে নিম্নের এই চূড়-চূড় খেলা আর বিহু-ভেই ভালো লাগে না।
বাকেন্দ্রশাফার পুঙ্কুটা কেন এমন উপলব্ধ করে?

গত ঠেতে টেট রিগকের সব বাকেন্দ্রশাফার নিজের জমি ঘোঁষে ছিলেন প্রেসিডেন্ট। বললেন, এইখানে পুঙ্কুর কাটো। এখিনকার চালান্না যাতে পাট পচাতে পারে। যাকে বলে বড় দূরে যেতে হয়। চালান্নের আবেশন ছিল। পাট পচাবার একটা ধাঁই না হলে, পাট চাষ করা হয় না তাহলে। পারিতোষন নাকি চোষ হাভান, পাট সেবে না। পারিতলের এম্পেট-বাহুরা পাটচাষে উৎসাহ দিচ্ছে তাই।

কিন্তু পাট পচাবার জায়গা কই?

সার্কেল অফিসার প্রেসিডেন্ট হাটা লোক চেনেন না। প্রেসিডেন্ট জমি দিয়ে দিলেন বাকেন্দ্রশাফার।

সরকারি টাকার বড় বড় পুঙ্কুর কাটানো হল। প্রেসিডেন্ট সেই পুঙ্কুরে ঘাট ধাবলেন। কটিডাবের বেড়া ঘিরে ঘিরলেন। বাছ হাফলেন সুই নিরপেল কাংলা।

হুকুল হল, পাট পচাবার এটা জায়গা নয়। রিগকের কাটা পুঙ্কুর? সে-কথা তা হলে নিজের লেখা আছে সরকারি খাতায়। হিসেব গিয়ে দেখানো কর। কিন্তু বাকেন্দ্রশাফার পুঙ্কুর আর পুঙ্কুরে বাছ না হলে, কি আসে যায় তারকেন্দ্রের? টেট রিগকের টাকার, রাজার কাকির মাটি ঢেলে, কিন্তু টাকা গরে তুলতে চান কেন তারকেন্দ্র? বিশ্ববাসের কৃষিক্ষেত্র বড় সেজো পাটশো টাকা, হাতে পেতে পেতে জগশো কেন হয়? বিশ্ববাসের সামান্য একশো টাকার কী লাভ হয় প্রেসিডেন্টের? নরায়নের দুশো টাকা কৃষিক্ষেত্র টিপসই পড়ে, পাশ একশো ঘাট টাকা। কেন? নরায়নের চল্লিশটা টাকাও তারকেন্দ্রের হাফিতে না পুড়ে পারেন না।

টাকাপুঁদিল গুনে গুনে দিতে হয় যে বিভাগকে। একরকমের সেওয়া, আর একরকমের দেখাটা যে লিখতে হয় বিভাগকে।

বিভাগের বৃত্তি একটু হাসতে ইচ্ছে করে না, লোকের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু এ সব কাক যে করে, সে হাসে কেমন করে? তার সঙ্গে যেতে কথা

হাটপাফার চল বাঁকুজের বরো-মরো। তার না ভিন হাফার টাকা কৃষিক্ষেত্র বড়। জমি নেই এ কেটা। তারকেন্দ্রের ভাকারে? ওকুর খাফিল তিন বা হয়ে। কু পাওয়ার সাতদিনের মধ্যে ভবলীলা সাল বরবার আসে বোব হয় কেনে যেতে পারল না। দরক্যে খাতক হয়ে রইল সে চিরদিনের জন্য। সেবে সে বরল শোকাব না কাটা পর্যন্ত তার দার পৃথিবী থেকে ল হয়ে না।

বিনা পরবার ওকুর খাইয়েছেন তাকে তারকেন্দ্র? ভিন তিন বছর হাফেই বৃত্তি খাইয়েছেন। তাই তি বছরের তিন হাফার টাকা শোহ।

পরবার সামলা করবে? করতে পারে। সার্কেল অফিসার প্রেসিডেন্টের ওপর দাব আসবে? বলবে যে, তোম সেবে কল হাওনি? শোহটার তো কুটোপদাও ছিল ন বলতে পারে। কিন্তু এত দাব কে রাখে। এ কারকৃপ করে যে তোরা গলিল দেখাবে ঘাটের বড়া চ বাঁকুজের, তা কে জানে!

এমন একটি দৃষ্টি নয়। অনেক, অনেক ব্যাপার। কে

দিন দার। আঁচনার হোবার কাজ পুঙ্কুর হয়েছে।

হোবার কাজে উকিলা মেয়েদের হাত পাকা। সুন আছে। তারকেন্দ্রের হোবার কাকও উকিলা মেয়ে করে। এই বসন্তে, গলে গলে মেয়েরা আসে।

তারকেন্দ্রের চাষের কাজে সুশো আর চৌকিন সুনাই মোড়ল। রাস্তাও গিয়ে ভিক করে। যো বাঁধনী মেয়েদের গিছনে গিছনে যোরে।

সব বরসের মেয়েরাই থাকে। হাফে হাটা, মোরা বে ইল্লভ তাহের কম, তা নয়। তবু বিভাগ অবাক হ ভাবে, হাটের চালান্নসুদিতে ভিক-করা হোবার মেয়ে সঙ্গে কেমন করে রাস্তা ভাব সমার। উকিলা ভাবা বলতে পারে না। কিন্তু দলদে মর্যে পড়ে, লসরকর ব বলে ভাব করে মেয়। তারপর আসল হতলব টের শো দশজনে হাটা মেয়ে সরিয়ে দেয়। একজন দেয় না। একজন দেয় না, তার দলদেই রাস্তা রাত কাটে।

মেয়েদানপুঁদিলকে লেখতে বিভাগের ভালো লাগে
সব সার্কেল এক সমার হা। হাটের হাটের দিগ

তারের দল । এতজ্ঞানগার সবাই কাজ করে না । দল জ্ঞানগার, দলশ্রমের কাজ করে । কত দূর দেশান্তর থেকে আসে । হযতো ঘর আছে, স্বামী-স্ত্রী, ছেলেরাও আছে ঘরে । বরশ্রমের সময়, দল ছেড়েছাড় করেবনের তাঁগিলে ছুটে আসতে হয় ।

তাই যোগ্য, ওদের সাহস হুঁসাহস হয়ে ওঠে । ঘরের নিরনন্দনা যায় ভেঙে । মেয়েমানুষ হলেও বহাঙ্কা মানুষের মতো তারও মন দুর্বলনীয় । 'কেলে হাঁকিরে চলার বেগ তাকে পেয়ে বসে ।

শ্রী নেই, হাঁস নেই । তবু এই দুর্ভাগ্যবতীদের মধ্যে বিভাগের বড় ভাগো লাগে । দলদের দূর চেনা হয়ে যায় । কেউ কেউ রান্দুর প্রয়োজন্য তার সঙ্গে এসে ব্লিকভাও করে । অদৃশবিলুপ্ত হলে ওৎ খেতে চায় । ডাছাঙ্কা, প্রতিদিনের বেতন বেতীতে হয় বিভাগকেই । রোজার মেয়েদের নিরন এই প্রতিদিনের 'রোজ' প্রতিদিন মিটিয়ে দিতে হবে । স্বাধীন থাকতে চায় । কাজ করতেই পথলা লাও । কালকের কাজ কাল দেখা যাবে । অলিখিত হলেও চুক্তি থাকে, কাজ না মিটলে কেউ যেতে পারবে না ।

রোজা যাহিনী চুক্তি লখন কখনো বড় একটা করে না । মালিক চুক্তি না মানলে অথবা অন্য কথা । প্রতিদিনের 'রোজ' ঘন নিতে আসে মেয়েরা । তখন গান পাইতে আসে । গানের ভাষা বোকে না বিভাগ । কিন্তু, সূরের সোলাটা লাগে তার মনে ।

কখনো গলা ছেড়ে যায় না । লু, গদার গার । যেন অনেক দূর থেকে, অনেকদূর বাঁশীর চাশা সূরের মতো । জমিন বাঁশী নয় । সাপ বোলাবার বাঁশীর সূরের মতো ।

আদিবাসী মেয়েরাও জমিন গান করে ।

ভোরবেলা কাজে বেরোবার সময়ও গান পাইতে পাইতে বেরোয় । রাতের ভিজিরে হাথা পাড়া ঘেয়ে, পোটা রোমানদিল সূরে পান সোঁকে । এইটি এসের বিশেষত্ব । রাতিবেলা ভাত ঘেয়ে পান তৈরি করে রাখে । কাজে বেরোবার সময় পুটলি ভরে নিয়ে নেয় । পান না হলে একদণ্ড চলতে পারে না । সাদা দাঁতের বালাই কারুর নেই । দাল ছোপ পড়ে পড়ে, কালো হয়ে গিয়েছে । আদিবাসীদের সাদা হাঁত না হলে কেমন দায়ব না,

রোমানদের দাল হাঁত না হলে জেমিন মানার না মেনে । দাল হাঁত আর পুটুর গছ ।

দল গিরে পড়ে মার্তে । কুস্তির কামাই নেই । জলে ভিজে, সারা গায়ে কাপড় ঘর লেপটে । কাপড় তুলে দেয় হাঁটুর ওপরে । পায়ের পাতা ভুঁয়ে থাকে জলে । জলে তোবা মার্তেই রোমানদের কাজ । যেন ওদের পা নেই । মাটি-খোলা পাক পাক জলের সঙ্গে ওদের পায়ের ঝুঁ মিলে যায় । শরীরের খোলা অংশ বিশেষে বার কালুতে পশুদুটে মেঘের গারে । আদিবাসীদের মতো শাখা পছন্দ নয়, রোমানদের লাগ-নাল-পবুজ আর বকমারি ডোরা পাঙ্কি, মেখ-কল-কলগলে বাখাখাখি করে থাকে ।

হাত জলে জোবে আর ওঠে । জলে বুয়ে বুয়ে কাটা কাটা হাজা শোড়া হাত । কুস্তির পর খটা উলুড় হয়ে থাকে । দূর থেকে হঠাৎ মানুষ বলে চিনতে জুল হয় তখন ।

রান্দু বলে, মাগীপুলার কোমর হয়ে না ? বুক টাটায় না ?

বিভাগ বলে কেন ?

অতক্ষণ উলুড় হয়ে থাকে ।

বিভাগ ভাবে, হযতো কোমর হয়ে, বুক টাটায় ।

কিন্তু, হনের সঙ্গে আর কাজের সঙ্গে বোঝা পড়া থাকলে জমিন কোনো বাখা মানে না । দুঃখটা তাদের জীবন-ধারণের স্বাভাবিক বেশ ধরেই আসে । আর জীবনধারণ তো নিরুত্তাই কাঠিন ।

জলের নিচে কতখানি গভীর করে চায় পুঁততে হবে সে তার মন আর হাতই জানে । মন আর হাতের সঙ্গে কোনো বিবাদ নেই । তাই ক্লীক নেই । প্রতিজ্ঞায়ে বা আসবে, তা বিশেষ কাঠা বেগেই আসবে । জিনেরের চোখে ঘাবড় কাল্প মাখিয়ে এক বিহেয়ে দুই বিশেষ মেখাতে পারবে না তারা । বাপজোক করা সোপালগা মিলেয়ের ক্লীক । ক্লীক তার জীবনের জিসীমানার চোকবার-বাখা হুঁজ পায় না । দূর সেনে এসে দুঃখের ভাত ঘর নিয়ে বার মেয়েরা । বেঁচে থাকার সাহসের দাপে, কোমর ধরা বুক টাটানো, হাতে-পায়ের চামা-সোড়া প্রকৃতির হরদুয়ের নিরনের মতো । কখনো জীবনকে ছাড়াতে পারে না ।

ভবু ওরা হাসে। যে-বাঁঘতে মেঘ-বন-হল গিউরোর।
মানুষের বুকে দমকা ব্যাথা উঠে পড়ে। আর গান করে।
মকরা করে। ঘরের কথাও মনে থাকে, তাই ঘরের কথাও
বলাবলি করে।

আসলে বুড়ীটা বিভাসকেই। মকরা চাফাকার
করে। একটু সহজ হয়ে, প্রাণ বুকে হাসতে কত সাহ
হয়। কিন্তু হাসতে পারে না। তাই অস্বাভাবিক চোখ
মেলে মেঘবান্দুলস্বপ্নকে দেখতে বড় ভালো লাগে।

বুনো আর সন্ধ্যা চৌকিয়ার বাকিও তারস্বরের
চাকের কাক করে, আসলে বনবাঁঘের কবাই তারের আসল
কাক। রোয়া বাহিনীর কাকের হিসেব রাখে তারাই।
তারের কথা অনুযায়ী বিভাস হিসাব মেটায়। তখন
বাদামবাদ হয়। সন্ধ্যা তার বুনোর সঙ্গে কপড় লাগে
মেয়েদের। হাত দিয়ে বেশে নিয়ে আসে ওরা; বক্তব্যনি
জঘিতে রোয়া হয়। কাঠি পড়ে পড়ে প্রতিদিনের
কাকের হিসাব রাখে।

রোয়া বার, বুনো আর সন্ধ্যা চৌকিয়ার ইচ্ছে করেই
হিসেবের গরবিল করে। বুনো বিশেষ নয়, সন্ধ্যাই
শিগ্গে লাগে বেশি।

মেয়েরা সন্ধ্যার ওপরে ঘাব। সে কাঁপল চৌচাকের।
মনে হয় ডাকবন্দরের ডাকারখানার যেন ডাকাত পড়েছে।
সন্ধ্যার চৌচাকের কোণে হাসিটা ওরা দেখতে পায় না।
বিভাসের মনটা যেন বানিকটা হাস লাগা স্কন্ধ ভলের
বড়ো টিলকি করতে থাকে। সে উপভোগ করে এই
কপড়-বিবল। ইচ্ছে করে সেও বানিকটা চৌচাকে দেয়।
যেমন একটা হই-বুজোকেই বাবে পড়ে ছোটো মেয়েরা
বানে না বুকেই হাতভালি দিয়ে চৌচাকে থাকে।

আরো ভালো লাগে যখন বড়ি আসে। সন্ধ্যা
চৌকিয়ারের বউ বড়ি। কালোফুলো বউটি। বড়ি
বলে একবারে বড়ি নয় পাঁচটা। চোখে বুধে বেশ বার।
কিন্তুকি ঝং পাখরের নাকহারি কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে যখন চোখ
পাকিয়ে চায়, তখন ঝাঁপিতমত ভব করে। পরীয়ে
গাছকোষের বেশে যখন আসে, তখন দেখে মনে হয় না,
বড়ি পাঁচটি গল্পানের হা।

সন্ধ্যা একটু বেশি রসিক। বড়ি তাই অনেকবারই
মার্টে ঘাটে বাঘারে আসে সন্ধ্যার গল্প-গলাপ করতে।

রসিকের চলাচল একটু বেশি, তাই বড়ির অস্তি বাক্যও
একটু কড়া।

বিয়ে না, সন্ধ্যার একটু বেশি বাঘামাধি বাইরে
বেয়েদের সঙ্গে। বরষ বেশি নয়। কাকের বুধ হতো
এমন কিছু লম্বা চওড়া নয়। কিন্তু দেখলেই যেন
ঘায়, পরীয়ে বেশ পাকি ধরে। কালো কৃতকৃষ্ণে ঝং বাঘা
বাঘুরি চুল। পলাখানিও কক নয়, মান গাইতে পারে
লাভল বিতে বল, কোহাল চালাতে বল, আর ক্রোশে
পর ক্রোশ এঁটেল কাবা মাঁজিরে বুড়ো বলদের গাতি
চালিতে নিয়ে যেতে বল, সব পারে।

এমন পুরুষের ওপর সব মানসীই মত্ত থাকে, একধ
জানা ও বিশ্বাস দুইই আছে বড়ির। 'না আগুন লাগে
বড়িই ঘাবে। কথায় বলে, 'জন-জগৎ মান, অন্যগত
বার।' বড়ির কপাল বধ। জগুর বললে তাতে
সন্ধ্যাকেই আগুন লিগতে হয়।

তাঁই দিনের মধ্যে অনেকবার ছুটে ছুটে আসে বড়ি
হাতে-নাতে ধরাও পড়ে সন্ধ্যা। রোয়ার কাক গিও
সন্ধ্যা হরতো কোনো কোনো মেয়ের হাত ধরে ধরে
নাও, হাত বেশি আদারে, ভূমি একটু জিরিয়ে নাও।

পারে হাত সেওখটাই আসল উপেক্ষা। মেয়েরা
যেঁকে বুনো কাড়ার হতো সন্ধ্যার হাত পরিচয় নি
হাসে খিলখিল করে। সন্ধ্যা ততক্ষণ দুইতে পু
করে। রোয়াবীরা বিচ্ছেদের ভাষায় কি সব বলাবলি কা
বিচ্ছেদের মধ্যে আর হেসে মরে যায়। সন্ধ্যা অর্থা
অপভ্রমণ করে। নাচ আরম্ভ করে সেখ। পলাও বা
বানে না। হয় তো গান ধরে।

রাখে কিংবদন্তি মেয়ে—

রাহের মান ভেঙে দে সো।

বুনো এগর নিভে করে না। কিন্তু আদম পাথ।।
হাতভালি দেয়। আর ঠিক সেই সময়েই হয় তো ব
বিচ্ছেদের তলায় বড়ি। কোমরে হাত আর চোখে আগুন
একবারে বণ্ড বেশি।

এখনে বুনোই চোখে পড়ে। বলে বিসর্জন
হেই, হেইয়ে চৌকিয়ার, তোয়ার বউ।

বউ? সন্ধ্যা অর্থাৎ ছুটেতে ছুটেতে একবারে ব
বিচ্ছেদের তলায়। বলে, কি করতে এলি? বড়ি চো

পার্কিয়ে, চিবিরে চিবিবে বলে, তোমার নাপ্রপনা দেখতে ।
সক্কা অমন হেসে উঠে বলে, তোমার হাসি এক কথা ।
আমি কি নষ্ট হচ্ছি ?

বুঁচি ভেঙে বলে, নাঃ । একেবারে আঘাতা গুল্লের
নাশিত ভূমি ।

বলে বুঁচি কোমরের কাপড়ে নতুন করে পাক দেবার
আগেই, বুঁচিকে হাত দিয়ে আপটে ধরে বলে সক্কা,
আরে হুঁর পাগল কমনেকার ! ভগবানের দ্বিবি করে
বলছি কিছু হয় নাই, মিথিবিহি গোশ্পাক ।
চঃ বার্ডি চঃ ।

কিছু বুঁচির গোশ্পাক তাতে কবে না । বলে,
কেন, ওদের সঙ্গে অভ মাখানিষ কিসের শুনি ?

মাখানিষ দেখলি কমনে ? ঘরে গিয়ে শূরেছি না
কোলে নানা রেখেছি । ওয়া কি আমার বুঁচি নিকি ?
তোমার মেনন কথা ! আচ্ছা চঃ আর গান পাইব না
ওদের কাছে ।

বুঁচির চোখের আগুন সহজেই নিভে যায় । হাসে
লগ্নাও পায় । ভবু বলে, ও মালীগলানদের আর
কৌটিকে গাঁ হাড়া করব । বাটোহেলের সঙ্গে ওদের চলানি
কিসের ?

বিভাসের সাথে হুজনের সমান ভাব । বুঁচি আর
সক্কাঃ ।

বুঁচিকে সে হিজরা করে, সক্কাকে কি গতি
তোমার খাগাপ বলে মনে হয়, চৌকিয়ার বউ ?

বুঁচি চোখ কপালে তুলে বলে, আপনার মাথা
খাগাপ নিকি গো, কপনভাক্সাবু ? হান্দুটা না নিব্বল
ভালোমান্দু ? ক্রাসোরে খাগাপ করার অন্য-দুসারে
কত কি হয়, তা জানেন ?

বিভাস জানে না ।

বুঁচি বলে, তবে ? ভালোমান্দু বলেই তো তার
আবার বেঁপ, কপনভাক্সাবু । কমন দেখন, কপল
পুড়ে বসে আছে । আপলে না রাখলে, সবই বন্ধ
হয়ে যায় । আমার তো আর পুটো নেই, এ্যাট্টা ।
ভবু ভাবৎ ভাইনীগলানদের মনে থাকবে, বুঁচি চৌকিয়ারণী
এ্যা আছে । এমন পুত্ব আর কই ?

বিভাস হাঁ করে তাকিয়ে থাকে বুঁচির দিকে ।

সক্কার মতো এত বড় ভালবাসার পুত্ব বুঁচি
পুঁচিবেতে নেই ? বুঁচির চোখে এ কিসের শব্দ ?
যেন এত বড় শ্বামীপরিবনী আর নেই কোথাও ।

সক্কা বলে বিভাসকে, এট্টু, কন্ডিলিটি করি,
কন্সাউভার বাবু । না করে পারি না । কিন্তু,
চৌকিয়ারণী আমারে সাতরো বছরের বয়ে নিয়েও হেলের
মত শালন করছে । গতিা গতিা কি আর আমি অপর
মেয়ে মানবের ঘর করতে পার ?

বিভাসের ঢেকে গিলভেও কন্ডি হয় । বলে, হেলের
মতো কি হে ? তোমার বউ না ?

সক্কা এক গাল হেসে বলে, এই দ্যাখেন, বউয়ের
মতো না নাই ? সব পুত্ব তো আর একরকম না ।
ব্যাগ্জা হাওলাদের মতন সোয়াবীও তো আছে সবসারে ।
তখন সোয়াবীটারে ধরেও তো শালন করতে হয় ।
না কি বলেন ? হেসে দুন্দু গেলে, ব্যাঘো বলে
মেরোমান্দু যেমন করে আগগার, সোয়াবীরেও তেমনি
করে । বুঁচির অবিধি এট্টু, ব্যাগ্জা ব্যাগ্জি আছে । তা,
সব মেরোমান্দু তো আর সোমান না । বুঁচি বুঁচির
মতন করে ।

বিভাস বোকার মতো তাকিয়ে থাকে অবাচ হয়ে ।
আর একটা বিমুগ্ধ শব্দ বেরোর তার গলা দিয়ে, অঃ !

সক্কা হেলোমান্দুর মতো হেসে বলে, হ্যাঁ
কন্সাউভার বাবু । বুঁচি বলে, ব্যাঘ চৌকিয়ার ভূমি
বড় দুরত, আমার মন ভালোলাগে না । তা বাবু,
এট্টু, দুরত আপনায়ের চৌকিয়ার । দুরত হাওলাদের
মতন, গিল্লেলার মন বড় আদচান্দ করে । তখন বুঁচির
কাছে বাবার অন্তে গভরটার মতো কমন করে । তারি
কি বলে, বুঁচিরে বুঁকন এ জীবনে আর দেখতে পাবো
না । কেন বলেন তো, কন্সাউভার বাবু, একক
হলে হয় কেন ?

সক্কার অসহায় বিন্মিত প্রেরের সামনে বিভাসকে
একটি আচ্ছন্ন গোবা, কান্দা মান্দুর মতো মনে হয় ।
পুত্ব তার চোখদুটি চিকচিক করে । জলে নয়, কোন
দুন্দুর অন্ধকার থেকে দ্বিটকে আসা আলোর মতো ।
হঠাৎ যেন তার প্রাণটা বড় কাণ্ডাল হয়ে ওঠে, হাফাকার
করে ওঠে, সক্কা চৌকিয়ার আর বুঁচির ভালোবাসার

জন্য। অতন বইসে আর মানে বেণারোপ একটি মনে। তার সার্যাদিন দুরত্বগণি করে কোরা, সার্যাদিনের একটি ভাষা, সার্যবেলায় পথে নিষ্ঠায়ে কিত্তে আসা একটি ভালোবাসার জন্যে যেন বড় বেশ ব্যাকুল হয়ে ওঠে বিভাস।

বিদ্যুত্তের কথা মনে পড়ে। বিদ্যুত্তের দেই নিঃশব্দ, টোপা-টুটি, ছিঁড় অঙ্গলক চোখ। বিদ্যুত্তের সার্যাদিনের ভাষা হয়ে কি কখনো করে বিভাস। কি জানি। কিন্তু বিভাসের তো কখনো সার্যবেলায় মনে হয় না, কি করে গিরে বৃষ্টি দেখতে পার না বিদ্যুত্তকে।

কিন্তু বিদ্যুত্তের কাছে যেতে ইচ্ছে করে।

আর পথ? ও তো একটি মেরে। বৃষ্টি ভরে, চোখ ভরে, পরী ভরে অনেক ছাঁসি নিয়ে যে মেরে একটি করণ ছায়া পড়ে।

পথের নাতালাও গায় মনেতে ইচ্ছে করে বিভাসের।

তবে? ভালোবাসার জন্যে কেন এমন কাহাল হয় সে। হাফাকার কেন করে?

আবার ইউনিবনবোডের কথা কিত্তে আসে। কৃষিকার্মিক, বেনামী, নামী, আর উল্লভ জমির প্রদান। আবার বিদ্যুত্ত হয়ে ওঠে বিভাস।

মন নিয়ে নানান ভাষা হয়েছ বিভাসের। কখনো ব্যাকুল, কখনো বিদ্যুত্ত। মন বড় উল্লভ। তার যেন দিক নেই, দিশা নেই। অস্থির চকল, এক আত্মসার পাক খাব, হয়ে পড়ে স্থগিণী ওঠে। কোন গতি নেই।

মন হাফাকারও করে। গাঙ্গে জলে উঠতে ইচ্ছে করে কখনো, কখনো বড় কাপাল হয়ে করে জেবায় ভাষা হয়ে যায় মন। বৃকের ভিতর জ্বলন্ত পক্ষ্মীটা বিজ্ঞেকেই উপহাস করতে থাকে। এ যে বড় বিচ্ছিন্নতা। জীবনের কি কোনো মানে নেই নাকি ভাগ্যে?

আজিয়ার দিন গাড়িতে যায়। দিনটা যায় বৃষ্টি ধীরে ধীরে। গাড়ি যায় টুপস করে। জল ভাঙলে জর-জর থির, আকাশ শব্দ-শব্দ। সোয়ানীয়া চলে গিয়েছে।

পক্ষ্মীটা অঙ্গরয়ে গিষের জমির কাছে লেগেছে।

মাস-ভাতায়েই লাগতে হয়েছে। মন খাটানার পরশা নেই। ইউনিবনবোডের চৌকিয়ার। মাইনে করা চাকরের চেয়েও জেসিডেণ্টের বড় চাকর সে। তারকেশ্বরের কাছ পেছ না করে নিষের কাছ করে কেমন করে?

এদিকে মাঠে মাঠে চোকা কিত্তে উঠেছে সবুজ গায়া। থাকায়ের মেঘ কেটে নীলিমার বিপত্ত উল্লভিত হচ্ছে। সময় আর নেই। সোয়ানী-বীজির বৃকে বড় বৃক-পক্ষ্মি।

একদিন ঈশানের সঙ্গে দেখা হল বিভাসের। মাঠের কাষের দূর। অনেক দিন আগতে পারেনি। পঞ্চল্য বড় মনেতে হয়েছে।

তারকেশ্বরের সঙ্গে এক যোপার বাড়িতে গিয়েছিল বিভাস। একলা জেবায় পথে বাউলপাড়া। পথের ওপর ঈশানের সঙ্গে বুঝো-বুঝি দেখা। একভাষা আর জুগি নয়, কোদাল কাঁবে, হাতে গারে কাবা। মাঠ থেকে কিত্তে ঈশান। মাথার চুড়ো করা নয় চুল, এলো খোঁপার বড় বাঁবা। বিভাগকে তেঁপে হাড় উজিরে ছাঁসি। ছাঁসি গায় ঈশান বেশ নক-নকাত নিউট কাঁসি। বসলে, আরে বাব্বা! কতকাল পরে দেখা। চলল, ধরে চলল।

আগতি না করে বিভাস সেল ঈশানের সঙ্গে।

প্রাচীন পাড়া অচিনার। কিন্তু বৃষ্টি-বৃষ্টি নয়। শ্রী-বাসিও নেই ভেমন। নিকনো-পিকনো ভততকে কোথায় চারদিক? বাউলপাড়া যেন গতি-জিগিরিমে। পাড়া। কিন্তু জমি, কিন্তু বর, কিন্তু লাগো। এক পল্যা বৃষ্টি হলোই পাড়া তেলে খাবার কথা। তার ওপরে গোটা বরাতা গিয়েছে। এখনো আরে শরতের বিনা মোটিবে যাওয়া-আসা। চালে বড় নেই, লাগো-গুণি শব্দ ভাষা নদী কিনারের মতো।

কোথায় বসতে সেল বিভাসকে, তেঁপে অস্থির। বাউল পাড়া গৃহের মতোই হাঁকাত শেপে বলল, ওসো ও জয়ের মা, হাদাভাইকে বইসতে দিব কখনে গো?

লালন সঙ্গে ভাই জুড়েছে ঈশান।

ঈশানের একপাল মেলে মেয়ে, চারদিক থেকে উপকর্ষকি মারছে। ভনের মা বাউলানীও যোমটা ঢেকে এল।

বিভাস পড়ে-খাওয়া ত্রুটিতটাকে লেগিয়ে বলল,
এখানেই বসি ।

না না, ওটা হলো ।

ঈশান যেসে যেসে গান গেয়ে উঠল :

কোথায় তোমার বসতে হবে ?

ভূঁইয়েতে রয়েছে ধুলো

বুকেতে তুমি কাঁদো

এ ধন যদি কোথায় ধুলো ?

হাউলানীর এত কথা ভাবতে সেলে গেলো না । সে
ততক্ষণে একটা জল-চৌকি এনে বসিয়ে দিয়েছে সবসে
পায়ে হায্য । জলচৌকির ওপরে সেতুমা কাশড পাডা ।
তারপর ঘোমটার আড়ান থেকেই বলল ভবের বা; মাঝার
গায়ে উকুনে বার, ভূঁইয়ে গায়ে পিঁপড়ে বার সেই ধনা ।

ঈশান বিগলিত হয়ে বলল, ব্যাখেন, শোনেন ভবের
না-ব কথা । আমার শোনার ধন গাফলে খাবে সেই
ভর দেখাচ্ছে ।

পরিচয়ের প্রয়োজন হল না । ঈশানের বউ যেন চোনে
বিভাসকে । আরও দু'চার জন এল কৌতূহলের বশে ।
বিভাসকে দেখে, ঈশানের মতো বৃশি না কেউ । কারণ
বিভাস তারকেশ্বরের লোক । তবে, ঈশানের মতো
বিভাস দলভবের মানুষ ।

চাষাণের কথা উঠল । এ অকলের মাটি ভাল নয় ।
হরিষদ ভাল, যান্টে টানটানি চিরকাল । মাটিতে
ছোঁর সেই, গা হাফা-হাফা, বাগি-বাগি । পাটের চাষটা
বহু ধানের চেয়ে ভাল ।

তারপর কথার কথার জানা গেল, যেন তারকেশ্বর
কিছুদিন ব্যস্ত ছিলেন । অন্যদি মৃৎশিল্পের সঙ্গে
সলাপায়ন শেখ হয়েছে । তারকেশ্বর কো-অপারেটিভ
করবেন । কলকরের দু'দিনের কাছারি হবে
কো-অপারেটিভ । কলকের কথা বলা যায় না । বয়ে-
বাইরে কখন কি বিপদআপদ ঘটে । কো-অপারেটিভ
খাললে জানবে, মাঝার ওপর ভগবানের স্বীতি । শেয়ার
তো টাকা দিয়ে কেনার জিনিষ নয় এখানে । জরি
লিখে পড়ে দিয়ে সেন্সার হতে হবে । তোমার জিনিষ,
তুমিই গুণবে । নিজের ছেলে ভাগর করার মতো ।
ছেলেকে ভাগর শোনো করে তুললে, আশের ফেল দে

তোমাগেই কাজ করে, কো-অপারেটিভ তেমনি । কষ্ট করে,
দিয়ে ধুয়ে গড়ো । তারপর নাক ডাকিয়ে ঘুমাও ।
হামলা-নো-কম্বা বল । অভাব-অনটন বল, তোমার জন্য
লক্ষ্যবো-কো-অপারেটিভ । কো-অপারেটিভ নয় 'কপারটিশ' ।
অদৃশ হয়েছে তোমার ? মাঠে কাজে নামতে পাছ না ?
কবের অভাব ? কোথো চিত্তা নেই । কপারটিশের জন
দিয়ে কাজ করবে তোমার জমিতে । সরকারি সাহায্য
তো আছেই । নিজের পায়ে পাঁজাতে চেষ্টা করাই ভাল ।
চাই কি কপারটিশ একদিন 'টাকটোর' নামিয়ে দেবে
মাঠে । হাল চালবার দরকার হবে না, যতদই মাটি কালা
কালা করে দেবে । এক এক দিনে বিশেষ বিশেষ জমিতে
কলের লাঠল কাজ করবে ।

বিভাসের মৃৎ শিল্পের উঠল । এত বড় একটা
ভাল কাজের কথা শুনলে, বৃশি হল না সে । হাতে
কলবে কাজ শুরু করেন নি তারকেশ্বর, তাই বিভাসকে
এমনো প্রয়োজন হয় নি । তাই জানতে পারে নি । কিন্তু
কপালে নাক পড়ল বিভাসের । অর্ধকটকে উঠল । তার
চোখের সামনে বুকে-গাটা স্বীকের বিভাগে শিকার ধার
হাবি ভেসে উঠল । কো-অপারেটিভ উল্ল্যোখ আয়োজনে
লাজ যোগেশ যোগেশের মান শুনলে, এরকম বনে হত না
বিভাসের । সে যেন দেখতে পেল, অচিনা, পায়শ্শুর,
নেদো, ইউনিয়নবোডের গোটা দীমানা পুরো ধরুমা
খিরে একটি অদৃশ ভাল খিরে আগছে । তারকেশ্বরের
শক্ত চোয়াল, মোটা নাক, স্থির অঙ্গলক চোখ দেখতে
পেল সে । দেখতে পেল, অন্যদি মৃৎশিল্পের মৃৎ ও
পলার শিখিল চাষা, স্থিঃ-নিঃশব্দ চোখ-খালার
পলকবলের মতো কাঁপছে ।

ঈশান বলল, দাদা-ভাইয়ের মতানতটা শুন । কিসে
কি হয়, বৃশি না তো ।

বিভাস ফেল, দলসেই তার মৃৎের দিকে ডাকিয়ে
রয়েছে । কিন্তু ভিতর বাহির এক করতে তার সাহস
হত না । হনের কথা মৃৎে আনতে পাটকে বাচ্ছে । বহু
ঈশানের ওপর রাগ হতে লাগল তার । কিসে থেকে
কি হয়, বুকেতে পার না তো চাষবাদ শস্যের রেখে লাভ
কি ? চিরদিনই এরকম ন্যাকা থাকলে হবে ? না, ন্যাকা-
ন্যাকা কথা কলসেই চলবে ?

তবু একটু নীরস গলাতে বল সে, তা কানটা তো ভালই।

ঈশান হেসে বলল ভাল তো অনেক কিছু শুনতে পাই শো হাসভাই। ভাল সবাই কীর্ত্তে চায়, আমাদের কপাল মশ খে। নকসে কর, তুমি ডানায়ের লোক। কিন্তু তোমার হঠানতটা একবার কও, আমরা নুনি। বিভাস উঠে দাঁড়াল। বলল, ওগব আমি আমি নে। তোমাদের বিষয় তোমরাই বোঝ। আমি কোনো কথা বলতে পারব না।

এনি উঠে দাঁড়ানো, এই বিরক্তির যেন পরিষ্কার প্রতিফলনের মতোই। হুঁ কুট্টে বলা যাচ্ছে না। দার্য পতীর বিধে যোক্তানো।

ঈশান বলল, বইস, যাওকমবে? আমার এবছান নাইর-বেল গাছ আছে, তার শাডানো বইছে। অস খেয়ে যাও।

তার আনানো হল, ভাল খেল বিভাস। কিন্তু ঈশানের কালো চোখের কোণে আর বাড়ি ভরে হাসিটা দয়া হচ্ছে না। যেন বিভাসের বুদ্ধের ভিতর পথও দেখতে দেখে সে হাসছে অপর্যায়ীর মতো। হাস হয়, অপর্যায়িত হয়। বুদ্ধে থাকলে বুদ্ধের। এত শু শু কহায় কি আছে। আমার বুদ্ধনো ডাবের বুদ্ধে কোণ বসিবে, গুন্দুন্দু করে পাওয়া উচ্ছে।

শাক্য ভল্লের ভাল দেখা যায়

চেয়ে লেখ আপন আদ্যার।

যাক দেখা। দিখো কথা বলতে পারবে না বিভাস। এখন থেকেই বলের মধ্যে তার ধ্বংস লেগেছে। আমার কতকগুলি হিসেবের ওলটপালট করতে হবে তাকে নিশ্চয়। হিসেবের পরিচাল আর হালিমের কাছাকাছি বলে বলে করতে হবে তাকে চুপচাপ। আর এরা ছোলেমানুষের মতো অধ্বু কথা বলবে চিরদিন।

বিভাসের সঙ্গে সঙ্গে ঈশানও সেল খানিকটা। আকাশের মেটুহু নীল, মেটুহু বড় বর্ণা নীল। রোম-পড়া আননার মতো স্বত্বকে। যেন চোখ রাখা যায় না। যেন দাদা। এ পাড়ার কালো বুদ্ধোদের বাড়ির মতো। বাড়ানে তাঁপ, সঙ্গে পাট পাড়ার গছ।

দিয়ে নয়, পাড়াটা বাউলপাড়াই। সোকগুলি চাষী, কিন্তু কথাবার্তা ওলট-চাউনি অন্যরকম। যেন

পুতুল নকসেই। লোকে অবশ্য অন্যরকম বলে। বৈজ্ঞানী ভেক্-গারিণী করেকজন শৈবগীণী আছে পাড়ার। আশতা আছে বৈজ্ঞবদের। ঈশানের কথা, আমরা বাউল আছি বল করেক। বাকী পাড়াটা আইসে আর বে-মসেরই।

তবু বাউলপাড়ার বেশি বাড়ানাত করলে আচনার বর্ণনা হয়। কখনে গেলি? বাউলপাড়া? হুঁ। বোকা সেল। চোখে গেটে একটু হাসি খেলে যায় লোকের। হাসুর বাউলপাড়ার আশক্তি অনেক আসেই আনে বিভাস। ঈশান বলেছে বিভাসকে, এ কথার মধ্যে কিছু দত্তা আছে। আচনার হাটে, হাট করা খোলা-ঘরের জীবিকা নয়। পাড়ার বিহু বক্যনির্ভর আছে। কলের চেয়ে গাটি বড় হলে যা হয়। হুগোনের মান নেই, বারাকীর ঘরে কাঁড়বানিক বেহোনান। ভাত মুকুতুভোর না যৌন মুকুতুভোর? পোতার কথা বলে চিপুটেন কেটে লাভ নেই। হুয়েরই কথা আছে জীবের। তাই শৈবগীণী আছে।

তার সঙ্গে আর একটি দত্তি কথাও বলেছে ঈশান বলেতে, ঘাঘের অন্তরনরলের পাঁচিল নেই, দরজা নেই, দরজা খোলা, আসুহুয়ের নেই—পাছহুয়ের নেই এক চাটাইয়ে বসে বেরে-পুতুল কথা বলে খোলা উঠানে ছোঁয়াছুর ভেদ-নেই, পান খেতে চুন বদলে ভাত ঘা না। পর-পুতুলের সঙ্গে কথা বলে ঘাঘের ঘর থেকে চাটাই নিয়ে বেরোয় না, দরাজে তারের একটু বর্ণনা হবেই গোব করবে কে।

বাকি নেই, তাই দ্বন্দ্ব। কিন্তু সে কি আসলে মশ? দ্বন্দ্ব তো হুঁ নয় দাদাবাবু।

কুঁখটু, গথ বাহায়ে। বড় বড় আকাশ-বেঁটানে দিখি বর্ণিকাড়। সেই বর্ণিকাড়ে প্রতিফলি হুসে কুঁখটু, কটাখট। বাউল বোউল-আউলোতা ভাবে জাঁতি নয়, কিন্তু কাপড়ও বোনে। সবচেয়ে দম্পত বাউল পরবেশের বাড়িতে তিনটি জাঁতি আছে। জীবিকা তো চাই মানুহের।

কিন্তু ঈশান পিছন ছাড়ে না। বাউলপাড়া শেগ হতে এস। বালের কলে পাট হুচ্ছে চাষীরা। গায়া গাব পছড়ে। প্রোতের জল। নদীর সঙ্গে অলাপা বাল (১২০ পুষ্ঠার:লেখন)



নাটক

এবং অনধর

« কামি তুষ্ট দাম্পত্য »

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[নাট্যের স্তম্ভাল এবং বড়ের ছাউনির প্রকাণ্ড একখানা ঘরের গাভের অংশ দেখা যাইতেছে। দাওয়ার ছোট পুরনো একখানা খাট পাতা, তাহার উপরে একখানা মোটা পাটি বিছানো, আশপাশে ঘান দুই হলচৌকি ধুঁখানা বেতের মোড়া, উঁচু, ছয়প্রাঙ্গণ ঘান তিনেক পিঁড়ি।]

(প্রান্তর প্রস্থান নালতী ও চক্রবর্তীর প্রবেশ)

নালতী। বাবা—সারারাত গোবরু হলে চড়ে এখন গিয়ে এই গাভের দিকে চুকতে হবে নাকি?

চক্রবর্তী। চুকবে দেখ, এমন কিছু ব্যাপার লাগবে না।

নালতী। তার চেয়ে তোমার কাছে আল্প একটু আশি চেরেছিনু, তা দিয়ে নেবে কেনো তো অনেক সময় হ'ত!

চক্রবর্তী। সাতা পথ ধরে কেন বলে ঐ এক ন্যাকাখির কথা বলছ নালতী, আমি তো তোমাকে আগেই বলে এনেছি, আবারের ঘর, বড়ের ছাউনি, আর এখানে আসতে হলে গোবরুর গাড়ি ছাড়া আর ঘানবাহন নেই। আসতে হ'লে এইভাবেই আসতে হবে।

নালতী। বগি আসবারই বা দরকারটা ছিল কি? সারারাত গোবরুর গাড়িতে চলে চলে বসি করতে করতে এসেছি, ব্যথার ব্যথার গানের প্রত্যেকখানি ছাড় কনকন করছে; আশুখা তো ক'রে নিয়েই এসেছে, ব্যক্তিটা এখন এই নাট্যের সুরঙ্গের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেই হবে।

[লালচে লালপরা গাম্ভা কাঁধে ও পাচনবাঁড়ি হাতে গাড়োয়ানের প্রবেশ।]

গাড়োয়ান। হেই যে বাবু, হেথার গাড়িবে আর তেনারা, আমি ভাবলম কুখার সেলে।

চক্রবর্তী। কেন তোকে তো ওখানে একটু গাড়িবে অপেক্ষা করতে বললাম—

গাড়োয়ান। তা তো করছিই বাবু; তা শূন্যোচ্চলম তেনাদের মালপত্র লাগতে তো কিছু দেয়া হবে—।

চক্রবর্তী। (ক্রুদ্ধভাবে) তা তো একটু হবেই—পাঁচ মিনিটেই তোমার ভাড়া সেলে সেল?

গাড়োয়ান। তুমি এত চটেছেন কেন বাবু, ভাড়া দেব কেন? হেই বলছিলম কি, একটা টাকাক দিয়ে ধাও না বাবু—ভালো মুরগি লিখে দাখিল পথ দিতে, একটা রেখে দিতাম।

চক্রবর্তী। (আরও চড়া গিরা) হবে হবে—যা-যা যাটা গাড়ির কাছে যা, আমি আশি তোমার টাকা দিয়ে।

গাড়োয়ান। যাছি যাছি—আপনার সোবাকেও সেপাই বাবা—সেখানেও—

(গাড়োয়ানের প্রস্থান)

চক্রবর্তী। নালতী, আপাতত পোটা দুই টাকা বিতে পার?

নালতী। কেন? গাড়োয়ানের ভাড়া দেবে?

চক্রবর্তী। হ্যাঁ।

নালতী। কেন, তাও পকেটে নেই।

চক্রবর্তী। থাকলে আর তোমার কাছে গাব কেন?

নালতী। পরশু দিনো ত পকেটে বেশ কয়েকটা টাকা রেখেছিলুম, তা বুকুদু'দিনেই দিশারেটে উড়িয়ে?

চক্রবর্তী। য'ব সামলে কথা বলবে নালতী, বাবু য'ব করতে পারবে একটুও ভর পাই নে—কেন এমন কথা কইলে আমি টুটি টিপে নেবে কেলম।

হালতী। ওঃ, কতটা বড় আমার বেয়ন জেনারেল সো! খিলিটারী কান ক'রে লেখবিশেষ জব করে এসেছে, এখন যেতে পরতে যিতে না শেষে টুটি টিপে মেয়ে কেলবার ভয় দেখানো হচ্ছে। কি আমার খিলিটারী সো!

দেখাও। ঘরের দানবে দকাল বেলার এ-সব টুটি টিপে হারবার কথা কে বলবে সো—(বলিতে বলিতে হুঁকো চানিতে চানিতে বৃদ্ধ কৃষক শ্রীনাথ হাতির প্রবেশ।)

শ্রীনাথ। হাড়ির দানবে দকাল বেলার তোহরা এ সব হারবারির কথা কারা বলবে সো?

(জেনারেল খিলিটারী কারবার হুত হাওয়ার উচ্চৈশ্বাশ্রিত শ্রীনাথকে প্রশ্ন করিল।) কে সো—এমন ভাড়া করে কে এলো? (তাকাইয়া) আমায়ের চকোর না কি রে?

জেনারেল। (অন্যদিকে তাকাইয়া) হ্যাঁ।

শ্রীনাথ। তাই বল। এটাভো পেরান করিল? তাবেশ, খারি তো একম ভড়কে গেছিলে। ও হাড়িরে কে, মৌমা নাকি?

জেনারেল। 'বাবাকে প্রশ্ন কর হালতী—(হালতী প্রায় খিলিটারী বোঝায়ে বোঝ করিয়া পৌছ হুঁয়া বড়াইয়া রহিল)।

শ্রীনাথ। বাক্ বাক্, পেরান করতে হবে না, এমনিই খানখান করছি, সুখে থাকো। তা মৌমা, ঘরের বউ বাইরে দাঁড়িয়ে হইলে কেন? (হালতী হিম্মত বেসে বোঝ হুঁয়া বড়াইয়া রহিল।) তা হ্যাঁয়ে চকোর, বলা সেই কতটা সেই—হঠাৎ যে বড় একবারে বউ নিয়ে বার্কি এসে উপস্থিত!

জেনারেল। কেন, তোমায়ের একটু দেখতে পুনতে নেই নাকি?

শ্রীনাথ। (এক গাল হাসিয়া) কথাটা ভুই বলেছিল, চকোর ভারী মিষ্টি—ভারী সুন্দর, কিন্তু গতিয়া কথা বলব? কিম্বাস করি মি মোটেই, তোর অন্য কোনো মডল আছে। তা বেশতো, এসেছিল, আগে মৌমাকে নিয়ে হাড়ির ভিতরে যা—তবে তো সব কথা হবে।

[হাড়ির উপরে মোটা কাপড় পরা অন্ধুন্ন দানবের প্রবেশ]
কে রে দানবের মোনা কি?

অন্ধুন্ন। হ্যাঁ বড়ো। এ কারা এল,—চকোর না?

শ্রীনাথ। হ্যাঁ হ্যাঁ—

অন্ধুন্ন। কি মোমাক করছিল, রে, খারি ভাবলু কোন্ সাহেব-সুদো এল।

শ্রীনাথ। তা অন্ধুন্ন, দকাল বেলার তোর ববর কি বল। কাল কি হ'ল? তোর মেয়ে ভয়ের পছন্দ হল?

অন্ধুন্ন। মেয়ে পছন্দ হ'ল, কিন্তু এক তালফব কথা বড়ো, তাই তো এই দকাল বেলার তোমার কাছে এসে এল।

শ্রীনাথ। ব্যাপার কি বল তো।

অন্ধুন্ন। ব্যাপার বড়ো ওয়া বলে কি না, মেয়ে তোমার পছন্দ হল, কিন্তু 'তিনশ' টাকা আমার নগদ চাই।

শ্রীনাথ। অ্যাঁ, চাখীর ঘরে বিয়ে করতে নগদ টাকা?

অন্ধুন্ন। তাই তো পুনছি বড়ো, এ তো আমার আগে কখনো পুন নি!

শ্রীনাথ। এ সব কি হল রে অন্ধুন্ন?

অন্ধুন্ন। তাই তো ভাবছি। খাবার বড়ো গেছিল পুনলু, ঐ যে আমায়ের অন্য মওসের ইখা কোমান মেসেটা—

শ্রীনাথ। হ্যাঁ হ্যাঁ—(জেনারেল ও হালতীর দিকে তাকাইয়া) তোমরা ঘরে উঠে বোসো না। হ্যাঁ হ্যাঁ—সেই মেসেটা—

অন্ধুন্ন। সে মেসেটা নাকি সেখিম জন্মা মওসের বড়ো উপরে বলে ছিল, রোয়ে বলে বাঠে বাঠে চাখ খাবার আর তার শোখাচ্ছে না, সে পছন্দে ঘাবে টাকা রোখবার করতে।

শ্রীনাথ। পছন্দে ঘাবে? চাখীর মেসে? টাকা রোখবার করতে? তাই বলল? তবে তো অন্ধুন্ন ব্যাপারটা ভাল না—আমায়ের পেছনে তো পরতান সেসেছে।

অন্ধুন্ন। কি ধরে লাগল বোসো তো।

শ্রীনাথ। শোন অন্ধুন্ন—এই বড়োবড়োদের কাছে পুনছি, এই সোভ হচ্ছে সে সব চেয়ে বড় পাণ—সেই পাণ বখদ খিরে ধরে, হালখী ভক্খুনি হানবকে

হেঁদে যান । তখন হুঁড়ে বনের এসে লক্ষীর বোন
অলক্ষী । ঐ অলক্ষীর পুত্র হচ্ছে বড় শহতান, তারা
তখন নান্দবের শেহনে লাগে । তা তুই কাল কি
বলে দিলি ?

অর্জুন । বললুম বুড়ো, আমরা হালুটে গাধী, নগর
টাকার দার দাঁধি নে ।

শ্রীনাথ । বেশ বলেছিল, এখন ঘরে গিয়ে চুপ করে বসে
থাক, যা থাকে বেতের কপালে দেখা যাবে । যা
বাড়ি বা, আমি চকোখরের সঙ্গে কথা বলছি ।

অর্জুন । (শ্রীনাথের পায়ে হুঁসা দিয়ে) তোমার সাহস
শেহনে আমরা ঠিক আছি বুড়ো ।

শ্রীনাথ । ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমার দেখা হলে বলে
দিলুম, নগর টাকা হল সে তোমার অলক্ষী—ও আমরা
নিচের ঘরেও রাখিনি, গরের ঘরেও চালান করিনি ।

(অর্জুনের প্রস্থান)

শ্রীনাথ । (চকোখরের প্রতি) কি রে, তোরা বাইরেই
পাড়িয়ে থাকবি না কি ?

চকোখর । না, তোমার ঘনন আমার উপরে বিশ্বাসই নেই
তখন আর ভিতরে গিয়ে কাজ নেই ; হতলবে এগেছি
—হতলবেই বলে ফেলি ।

শ্রীনাথ । (অর্জুনের কথায় বিরক্ত হয়ে) বেশ তো,
চুপে চুপে করে তাই বলে কেল ।

চকোখর । কিছু টাকাকড়ির দরকার ।

শ্রীনাথ । তুই বিলিটারি হান্দা, বিলিটারি হান্দাদের
টাকাকড়ির দরকার তো থাকবেই । তা তোমার
তো পুনোছি কেন দরকার তেমন তোরা টাকাকড়ি
পাসও হুঁহাতে ।

চকোখর । সম্মতি কিছু অসুবিধার পড়ে গেছি ।

শ্রীনাথ । সেহি ? ভাসো । আমি তার কি করব ?

চকোখর । কাউকে কিছু করতে হবে না, শুন্যে আমার
ভাগ্যটা আবারে দিয়ে দাও ।

শ্রীনাথ । তোমার ভাগ্য ? কিসের ?

চকোখর । ছোট-বহা, ঘর-বাড়ি, হাল-সোয়া, টাকা-কড়ি
সব কিছুই ।

শ্রীনাথ । এতে তোমার ভাগ্য কিসের, তুই এর কিছু
করোছিস ?

চকোখর । কেন কিছু না করলে ব্যক্তি আর ভাগ হয় না ।

শ্রীনাথ । হয় নাকি ? তোমার বিলিটারিতে আমার ভা-ও
হয় নাকি ?

চকোখর । এ সবের তা হ'লে বাণিক কে ?

শ্রীনাথ । বাণিক আসে হিন্দুর আমি, এক দরবে গারে
খেটে কিছু কিছু করেছিলাম ; এখন বাণিক হলব
আর হজাভায়া—দিনরাত গারে খেটে খেটে লক্ষীর
ভাতার বিপরেছে আমার ঘরে ।

চকোখর । ঐ হায়া ছেলেটা আর বোয়া মেয়েটা ?

শ্রীনাথ । হ্যাঁতে হ্যাঁ—ঐ হায়া বোয়ার মিলে যে লক্ষীকে
একবারে ঘরে বেঁধে ফেলেছে । আর তুই আর
জলবর—হুঁহাতে সেখতে কান্ডিক বাড়িতে গণেশ—
তুই বিলিটারিতে হুঁহাতে মাইনে শেরেহান্দ হুঁহাতে
উড়িয়েহান্দ ; তোমার ভাইও হান্দা আমি ছেড়ে বান্দা
করতে বেল, হুঁহাতে বলে পুনোছি—অচিন্তাভায়া পয়সা
কানাই করে—আর ওখানে বলে বান্দাগুলো করে ।
ঐ পুনোছি তো, আমরা চাখীরা ওকে বাল অলক্ষীর
টাকা—পরতানের টাকা—কেল পুঁঠিয়ে মারে ।

(শেরিলা পুঁঠিল হাতে জলবরের প্রবেশ ।)

কিরে জলবর, আজ সকালে হ'ল কিরে ? ক'রবে
তোমার দেখা নেই, তোমার লান্ডাও দেখা নেই দেখা
নেই তো দেখা নেই—একটু দর পত্তরও দেখা নেই ।
আজ সাত সকালে তোমার লান্ডাও এসে শেরেহান্দ
করে উপস্থিত, সঙ্গে সঙ্গে শেরিলা পুঁঠিল হাতে
তুইও উপস্থিত । পটাশাণ্ডি কথা, আমার মনে কেমন
সম জাগছে । বিলিটারি কথায় কাজ নেই বাপু,
হুঁহাতেই কি হতলব এ'টে এগেছিলাম বল দোঁব ।

জলবর । তুই শেরিলা কেন হার হুঁহাতে হয়ে আর । এসে
হাওয়া বসতেও পাই'ন, যা দিতেই তুই হতলবের
কথা জিজ্ঞেস করছ । তা তুই বন্ধ আসতে না আসতেই
পটাশাণ্ডি করে কথা বলছ, তখন আমিও পটাশাণ্ডি
করেই বলছি, কিছু দিন ব্যবসা-বাণিজ্যে বড় বন্দা
লাগে, অনেক সেনা হয়ে পড়েছে, কিছু টাকা চাই ।

শ্রীনাথ । টাকা ? কোথেকে ? কি করে হবে ?

জলবর । আমি সবারের আমার এক ভৃত্যমাণ্ডল ভাগ
চাই ।

প্রিন্স। (হাতের উপরে ধোঁবে হাতের আঘাত করিয়া)
একবারে মিলে গেছে, দু'বন্ধু মিলে গেছে—দুই
ভাইয়ের এক মতপন্থ, বিশ্ব-সম্পত্তির ভাগ চাই।
(উত্তেজিত ভাবে) পণ্ড করে বলে বিদ্ধি, কিছ
পারিনি, ভাগ তোমার কারুর কিছ নেই—ভাগ
দু'বন্ধু হাওয়া হলবহর, আর বোবা মহানার। আর
কুনো কথা আমি শুনবনি; ইচ্ছে হয় থাক, যবে
ওঁ, নাওগা-নাওগা কর—আর না হয়ত বে যেমন
এসেছিল, তিক তেমনক'রে শির পা দে।

জলধর। (উত্তেজিত ভাবে) এই এক কথা ?

প্রিন্স। অত চোখ পরব করিদ্নি বাবা, চোখা ভুনার
কথা ঐ এক কথা—এ আর কুনো কু'কথা হয় না।

জলধর। (নেপথ্যে) হারে রে অবাণী মহানারা, তোর
আর পোহর পোহাগ কুরোবে না রে, উপরে দৃষ্
ঠাকুর যে সৌভ মেতেছেন, কখন আর মাঠে ঘাবি ?

মহানারা। (নেপথ্যে)—এ' এ' এ'—এ' এ'—

জলধর। (নেপথ্যে) আরে কালী গাইয়ের বাজা হয়েছে
বলে আম আর মাঠে ঘাবি নি ? —ও—ও—

(বলিতে বলিতে প্রায় চৌতাইয়া জলধর ও মহানার
প্রবেশ; জলধরের হাতে হাল, ভান হাতে এক বৃদ্ধা
বৃদ্ধি; মহানার হাওয়া বৃদ্ধি, হাতে কাঠে)

জলধর। (আশিয়া এদিক এদিক ডাকাইয়া) আরে এই
বে বেশি হেরেবা এসেছ, এই বেশি বজা—আর ঐ
কে, ও বড় না, আমায়ের বড় নৌঠান দাঁকি ?

জলধর। হ্যাঁ হ্যাঁ—কুশ কর, তোকে আর ক্যান্দানো
করতে হবে না।

জলধর। ও বাবা, ছুনি বেশি বাড়িতে এসেও মিলিটারি
সো। ওরে মহানারা, ফেলেছিল আমায়ের বড় নৌঠান
সো বড় নৌঠান—সল একটা শোভার করি—(মহানারা
হালতীর সাহায্যে আগাইয়া সেল, জলধরও
আগাইতেছিল; মহানারা হালতীকে প্রশ্ন করিতে
সেলে হালতী পা দগাইয়া বেগে উঠা হোড় করিয়া
দাঁকিল; মহানারা খতমত খাইয়া ইঙ্গিতে জলধরের
কাছে ব্যাখ্যার কি জিজ্ঞাসা করিল।) তাইতো,
ব্যাখ্যার কি সেটি তো আমিও বুঝতে পারলাম না।
ও বক্সা, ছুনি তো মিলিটারি—বৌঠানও কি—

জলধর। (ধবক দিয়া) চোপ—হাবা কোথাকার—
হলধর। (হালদান্য হাটিতে নামাইয়া হাটিয়া)
বাবা, ব্যাখ্যার যে বিহাই বুঝতে পারছি না।

প্রিন্স। ব্যাখ্যার অনেকখানি, চট্ট করে বুঝবে কি
করে ? এই মিলিটারিতে আর পবিত্রান ব্যবসায়ী
মিলে ষোটি পারিয়ে এসেছে,—

জলধর। বুড়ো বসে মিথ্যে কথা ব'লো না, তি
বহরে ওর সঙ্গে আমায় দেখাই হয় নি—

প্রিন্স। তাই হ'লো রে—তাই হ'লো—কু'ভারে আ
সকালে আচমকা একই সরে এসে উপস্থিত হয়ে
তোরা দুই ভাইয়ে বোনে বা করিয়ে কান্দা
যোগাড় করেছিল তার ভাল চাই।

জলধর। ভাগ-টাগ ও সব কি বলছ তোরবা ? তোম
দের যদি কিছু বরকার পড়ে থাকে ও তোমরা নি
লাও। কি বলিস মহানারা ? (মহানারা হা
নাড়িয়া আকারে ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল, তাহা
কোনো আগুতি নাই।) ঐত মহানারাও তা
বলছে; বেশ তো তোরবারে অসুবিধে হয়ে থা
না বরকার গিয়ে লাও।

প্রিন্স। (ক্রুদ্ধভাবে) তোরা কু'টো গতি গণি
হাবা—হাবা হাবা। ওরা কিছু কোনো দিন করেছে
তোরা দু'টোতে মোটে জলে বেটে যেটে বা
করেছিল তাতে ওরা উড়ে এসে ভাগ বসাতে কে ?

জলধর। ভাগ বসাবার কথা কেন তুলছ ছুনি ? ও
বাণ বরকার পড়ে থাকে—কি বলিস মহানারা ?
(মহানারা হ্যাঁ-মুঠক হাওয়া দাঁকিল; জলধর
কাছে আগাইয়া গিয়া) শোনো বক্সা—

জলধর। অত কাছে আসনি নে—কু'—পারে বা গল্প—
জলধর। (অপ্রতীত হইয়া কুরে দিয়া) বা, এই বলাইল
কি—তোমার যদি মাগে লাবা—

জলধর। অত কথা করতে হবে না হাবা তোকে; জি
কহতে আসনি তোর কাছে আর ঐ বুঝি কাছে—
আমায়ের প্রাণ ভাগ আবার চাই—

প্রিন্স। (চৌতাইয়া) ভাগ তোমার নেই—এমন বে
ভেগে পড় বলাই—(মহানারা শিতার নিক
গিয়া তাহাকে হাত নাড়িয়া ও হুশ দাঁকিয়া অসে।

বুঝাইল) তোদের ঘণ্টের জিনিষ এদের সব
ওড়োতে দিবি? (মহানাদা আবার বুঝায়) তোরা
আবার সব গঁড়ে তুলিবি? কি করে করিবি? (মহানাদা
সেখাইয়া দিল, হাত তার কাতে দিয়া) বেশ তো—
তোরা বা ভাল বুঝিগু কর ।

হলধর । সে-ই বেশ কথা । ব্যস্ত কি বড়লা মেজা,
তোমরা ঘরে ঘাও—নাও ঘাও—বুঁচায় দিন আমাদের
সঙ্গে থাক—তারপরে তোমাদের ভাণ লিখে তোমরা
চলে যাবে । তোমরা ভেতরে ঘাও—আমরা মাঠে
চলান—চ—চ—মহানাদা—হু রে রে রে রে—
(হলধর ও মহানাদার বেগে প্রস্থান)

ষষ্ঠীয় দৃশ্য

[সাননে আগাছার ভরা একটা জলাভূমি, কাছে
একটা ডোবা, ডোবার পাড়ে একটা পুষ্করে গাছ,
দুইধা-পড়া গুঁড়িগুঁড়ি ছইতে ভটরাটা নিকড় কুলিয়া
কুলিয়া পড়িয়াছে, তাহার নীচে একটা প্রকাণ্ড
ধানকন্ডর পাতা নাথায় বিরা গুঁড়িগুঁড়ি মারিয়া
বিসরা আছে দুইটি খুঁসে পরতান । তাহাদের
ছটলো কুঁটি, পিটুপিটে ঢাষ, গায়ে ঝাড়াঝড়া
লোন ; তাহাদের নান বেলে ও হেলে]

নেলে—(সুঁর করিয়া)

ভেঁলনের বুদ্ধী
মেঝে গুঁড়িগুঁড়ি
পানানাদা পুঁরে আছে
ভালভলেতে—

হেলে— তার পান্য চুপ
আর বুড়ার কুল
এক করে তুলে আনি
কোন, হলেতে ।

নেলে— কুঁড়িগুয়ালা বলা
আর কলমীর ডসা
পনিবারে পল্লার
হাতে পাওয়া চাই—

হেলে— সব এক করে
কলমীর ঘরে

শেষঘাতে চুপি চুপি
রেখে দেব ভাই ।

দুঃস্বপ্নে একত্রে—

হাঃ হাঃ রেখে দেব ভাই ।
নেলে । তখন কি হবে রে হেলে ?
হেলে । তুই বল না ।
নেলে । (সুঁরে) গোহোলে বরবে গোহু
হেলে । হোসেটা হবে সবু
উভয়ে । ঠিক জেন রে শুবনো একটি ষড় ;
নেলে । দুঃপুঁরে ডাকবে শোয়াল,
হেলে । কাঁপবে কালো বেড়াল,
উভয়ে । ভাঙবে ঘানির গাছটা

মড়, বড়, বড়—মড় ;

হোঃ হোঃ বড়, মড়, বড়—মড় ।

আমাদের কি আশ্ব ভাই—

আমরা ভাতেই বৃশী ভাতেই বৃশী—

ভাই রে নাই রে পাই ।

নেলে । এই রে, চুপ, চুপ, চুপ—পারের পক্ষ পুঁদহি
যেন—

হেলে । আর মানপাতটার নীচে একঝোরে লুকিয়ে পড়ি ।
(তৃতীয় দৃশ্য শেষতানের প্রবেশ নাম কলে ।)

নেলে । হোঃ হোঃ হোঃ—এয়ে আমাদের কলে—

হেলে । (সুঁরে) কোন, বেশ জ্ব ক'রে এলে ?

কলে । বেশি খটাস নে বলছি, বন-মেজাছ ভাল
সেই—

নেলে । কেন কেন ?

কলে । শেখাইলুম শিবু খিঁড়ির জ্যাকরা বউটাকে
একলা ঘাটের পথে—

হেলে । বেড়ে বেড়ে—তারপর ?

কলে । সেখিলুম পেঙ্গন থেকে খোদা চন্দ্রপুঁসোর
একসোহা কড় ক'রে কেটে আনতে ।

নেলে । বারে বা, অনেক কালে সেগে যেত যে ।

কলে । তা আর পারলুম কই ?

হেলে । কেন, কি হ'ল ?

কলে । হ'ল সেই ভাইনী পাউড়ী বেটী, গাঁড়িয়েছিল
দুঃকুপাড়ে, কি এক মজোর কেরে দিল যে, গায়া

গায় যেন পোড়াকারের হ্যাঁকা লাগিয়ে ছিল তে,
কি জ্বালা করছে এখনো—বাবা গো বাবা—
নেলে। অঁা, বেটীর এত বড় আশ্পর্শ, আবারের
শেখনে লাগতে আসা ?
নেলে। সেখিরে দেব, সেখিরে দেব—হাতে হাতে সেখিরে
দেব।

তিনজনের গল

আবরা তিন হুঁত—কেলে-নেলে-নেলে।

আবরা ভাল করবার হার হারি না

নব্ব করতে পেসে।

আবরা সোভ সেখিরে টানি

তখন শুনাই মিষ্টি বাসী,

নেলে তাক বুঝে বি আবারারে

একবারে কেসে।

আবরা পাশপাশের হার কভ, না হারি,

সর্বনাশের পথে আবরা সব করতে পারি।

আবরা পরতানেরই চোয়া

বুঝে দস্তারিতেই কেসা,

আবরা বেশ-বিলেপে ঘুরি, ভাসো

পিকার কোথায় নেলে।

[নিজের বাথার চুল ও গোক দাড়ি টানিয়া ছিঁড়িতে

ছিঁড়িতে বুড়ো পরতানের প্রবেশ]

বুড়ো পরতান। বেং বেং বেং—কিছু হল না রে কিছু,
হল না। হ্যা হ্যা হ্যা—সব কসকে পেল। হেয়াং
হাঙ্কির তিন তিনটে ছেসে, এখন চান চলেছিল
বে তিনটেতে চুল হেঁড়াছিঁড়ি করে গলা কাটাকাটি
ক'রে ধরবে। বেং-বেং-বেং—সব কসকে পেল;
(কপালে হার হার আঘাত করিয়া) হার হার হার,
সব নিজেরা যিঠিরে নিয়ে শূন্য-শান্তিতে বাস করছে
হে—আবার তবু কি উপায় হবে রে। ঐ হাবাটা
আর হোবাটাতেই তো সব লগুভগু করে দিল।
একটু তেড়ে বেড়ে উঠল না—এক কবার সব যিরে
যিতে হাঙ্কি। এখন আর কি করি এখন বসে নিজের
চুল দাড়ি ছিঁড়ি—বেং—বেং—বেং—

নেলে। (আদাইয়া আসিয়া) অমন কর কে নে
বুড়ো চাচা ?

বুড়ো। কে ভুই, নেলে ?

নেলে। হ্যাঁ।

বুড়ো। আরও কাছে আর। (নেলে কাছে আসাইতে
বুড়ো পরতান নেলের কান ধরিয়া ছোরে এক চাঁ
হাঙ্কি, নেলে আবার গিছাইয়া পেল।) ওয়া
কে—নেলে ?

নেলে। (দস্তরে) হ্যাঁ।

বুড়ো। কাছে আর। (দুই কান টানিয়া অত্র
হুইতেই বুড়ো পরতান নেলের চুল ধরিয়া টানি
পিঠে এক কিল বসাইয়া দিল।) গাছের আড়ায়
লুকিয়েছিল কে—নেলে ?

নেলে। (কপিকণ্ঠে) হ্যাঁ।

বুড়ো। এগিরে আর তেসে। (নেলে দুই হা
দুই কান ধরিয়া আদাইয়া আসিল।) ঐ ভাবে তিন
ওঠ বস কর (নেলের তথাকথন)। এখন তিনটে
এসে সামনে দাঁড়া (তিন জনের সামনে দাঁড়ান
তোমের এ রকম কেন করল ?

নেলে। আবারও তো তাই ভাবছি—

নেলে। ভাবলুম আশ্বিন ভাঁগন তেপে গেয়েন—

বুড়ো। (হক দিয়া) কেসে তো গোঁইই লতভা
বেজিত ভোগত হুঁচো চামচকে কোথাকার। তে
কেশেছি ভাই বল।

নেলে। তাই জানতেই ত দাঁড়িয়েছি।

বুড়ো। তোরা তিনটেতে তিনটে গাথা শূরের গা
কোনো কন্ডের নাম নেই—বালি কণ্ঠিনশি ব
ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বল সেখি নি, ঐ সত ি
মাসে কে কোন লোকটার কি সর্বনাশ কর
গেয়েছিল। সর্বনাশ তো ঘুরের কথা—কে ব
একটু কতি করতে গেয়েছিল।

নেলে। তেমন জুতসই পিকার বে বিলছে না।

বুড়ো। (নেলের মাথায় এক চাটি হারিয়া) শি
কি হাতে এসে মিলবে ? নালা-ভোবার পাড়ে গ্যা
ভলে বলে গিবহাত আড্ডা কমায়েই কি শি
নেলে ? লোকালয়ে একটু ঘুরে ফিরে চো
তো ? পিকার তো ঐ পশের গাঁয়ে আছে।

নেলে। কোথায় কোথায়—?

বুড়ো। (বিকৃত স্বরে) কোথায় কোথায়—এখন তত
গরম দেখা দিয়েছে। পানের গাণের হেয়ান্ন মাকিকে
চিনিদু।

তিনজন। হুঁ—

বুড়ো। বড় দুখে আছে এই বুড়ো চাবীটা।

কেলে। শূনে বুক ভুলে থাকে; ওর শ্রোত্রে লাগব।

বুড়ো। ওর শ্রোত্রে লেগে কি হবে, ও তো হুঁসিন
পরে থাকা পাবে। ওর তিন হেলে আছে।

নেলে। তিনটের পেছনে তিনজন লাগতে পারি।

বুড়ো। বড়টা হ'ল চকুর—বহুবড় সেপাই।

নেলে। ওসব সেপাই-টপাই কিছু ভয় করি না,
ওটার পেছনে আমিই লাগব।

বুড়ো। নেমোটা জলধর বহুবড় গহিয়ান—অনেক টাকা
কমাই করে—

হেলে। স্কোতো তা হ'লে হাতের মূঠোর এসেই
আছে; ওটার পেছনে লাগব আমি।

বুড়ো। ছোটটা হলধর বোকার হ'ল, একটা বোবা
বোন, নিয়ে দিনরাত মাঠে খাটে।

কেলে। এইটেই তা হ'লে দেখছি একটু বেগুড়া,
ফোঁষ এটার পেছনে না হয় আমিই লেগে ফোঁষ।

বুড়ো। বা ব্যাপার গড়ে ওঠেছিল তাতে তিনটের
মধ্যে খাওয়া-খাউরি মারামারি একমুনি লেগে
যাবার কথা ছিল।

নেলে। কিসে আটকাল?

বুড়ো। মাটি করল ঐ দাবা হলধরটা। সেপাই ভাই
আর গহিয়ান ভাইটা এগেছিল তাদের ভাগ নিতে;
শূনে বুড়ো হেয়ান্ন ব্যারসা কেলে উঠেছিল তাতে
আমার তো সর্বসেই লোমাক হচ্ছিল; ঐ বোবা
বোনটার বুদ্ধি নিয়ে দাবা হলধর হুঁচো পাঁজি
কিটকেন বহুবড়টা কি করল যে—ভাবতে আমার
বুক কেটে কান্না পাচ্ছে—

হেলে। আমার কিছু না নিয়ে আসুন বেরোচ্ছে।

বুড়ো। দাবা হলধর কিনা—আমোবে সন্মুখে দল
ভাগ দিয়ে দেব।

কেলে। আ—হা—হা—হা—নিল তো আমার এক
দল পথে বসিয়ে দিল।

বুড়ো। কেলে-নেলে-হেলে—

তিনজন। আজ্ঞা করুন—

বুড়ো। তোমার আর এই সব ব্যাকানিতে কাজ নেই।

নেলে। এইবারে ওটা ছেড়ে কাজ হবে, ঐ সেপাই
ভার্যার পেছনে আমি কাল থেকে লাগব।

বুড়ো। কি ভাবে লাগবি শূনি।

নেলে। এখন সেপাই ভার্যাকে আরও অনেক সেপাই
দেব, মারামারি করতে হুঁহাতে অশ্রুশ্রদ্ধ দেব,
তারপরে দিনরাত আরও বড় আরও বড় দাবার সোভ
দেখিয়ে একময় মাথাটি ত্যাগিয়ে দেব; তারপরে
দেখিয়ে দেব এক মাকার মূগে—তারপরে মারামারি
কটাকাটিতে একেবারে সর্বস্বান্ত করে পথে
বসিয়ে দেব।

বুড়ো। নেলে, একবার কাছে আর, (মাথার উপরে
আসে গাটি মারিয়া) মাথাটা তবে তোর দেখছি
পড়ে একদল দাবার হয়ে যায় নি—এখনো বড়
কিছু কিছু আছে। কাল থেকে কাছে লেগে থাকি।
নেলে—তাতে কিছু বাধা হবে না।

বুড়ো। হেলে,—তুই কি করি করি বল তো।

হেলে। আমার তো অতি সোচ্চা পথ—বাবসাবে টাকা
দেব—আরও দেব—আরও দেব—কানের কাছে চু
চু করে সোনার বোহর থাকিয়ে থাকিয়ে মাথা
বিগড়ে দেব—তারপরে হুঁ দাবা—তারপরে ইয়ার
ছোটাব—তারপরে মেহের পেছনে ছোটাব—বাস,
তারপরে একটু একটু করে টাকা সব উড়িয়ে
দেব—বরীয়ে মোগ চুকিয়ে দেব—সর্বস্বান্ত করে
পথে বসাব।

বুড়ো। (সোচ্চা হাতে ডালি থিরা) তোফা তোফা
—ঠিক হ'ল—এইদাই হোনা—কাল সকালেই লেগে
থাকি। কেলে,—তুই কি করি?

কেলে। সেটা একটু ভাবতে হবে। ঐ চাবাসুলো
দাবা হ'লে কি হবে, একেবারে সোচ্চা পোষি।
তা চাচা জুঁই ভেবো না কিছু, যেমন ক'রে
হোক ওর কোভকমিতে পর পর কেবল অম্মা
ক'রে ওকে মারতে হবে। তা হবে দাবা চাচা,
জুঁই ভেবো না।

বুড়ো—তিনটেকেই এইভাবে পথে বসিয়ে তারপর
তিনটিতে আবার লাগিয়ে দিবি।

নেলে। তা আর বলতে ?

বুড়ো। এমন লাগানো লাগানি যে বেন এর ঢোল
উপড়ে নেয়।

নেলে। নীলে আর লাগানো হ'ল বলি কাকে ?

বুড়ো। বার-কান্ন আসে শেষ হবে সে এসে বার শেষ
হয়নি তার সঙ্গে যোগ দিবি, থাকে একজনে না
পারবি তার শেষে নেই একজনে লাগবি, থাকে দু'জনে
না পারবি তার শেষে তিনজনে লাগবি।

কেলে। সব আবারের আবার হচ্ছে আছে, এ আর
ব'লে দিতে হবে না। তা চাচা, এত বড় কান্ন
হাতে নিলু, কিছু পেদুদাদী পার না ?

বুড়ো। সে সব তো বুঝেছি, (গাভারদের নীচ হুইতে
হোষ্ট একটা ধলে বাহির করিয়া) এই নে গিছি
—এই চকু—এই চরস—

তিনজনে। (সোলাসে) তোকা তোকা বুড়ো চাচা
—তোকা তোকার পেদুদাদী—।

(দৃশ্য পরিবর্তন)

তৃতীয় দৃশ্য

[একখানি আগছা-স্তরা মাঠ; এক দিকে আগছার
বড় বড় দুইটি কোণ গড়িয়া উঠিয়াছে, আর একদিকে
সোটা তিনেক শালগাছ দেখা গাইতেছে।]

(নেলে হেলে কেলে প্রবেশ)

নেলে। কেলা কতে—একর কতে—সেপাইভায়া
একবারে পা গিলে আসলু'র ঘর।

কেলে। কি করে কলি নেলে ?

নেলে। যেমন কলি এ'টে গেছি ঠিক তেমনি করছি।

সে অনেক কথা, সংক্ষেপে সেই সেপাইভায়া হাত
পা কেটে মাথা কেটে একবস্ত্রে ঘোঁড়তে ঘোঁড়তে
এসে পৌঁছেছেন একবারে আবার সেই হাবা
হলবের ব্যাক্তিতে। তোর খবর কিরে হেলে ?

হেলে। বলতে হবে না, সেও ব্যাক্তি মাং। সেই গদিয়ান
হলবের শ্রী-পুত্র কন্যার হাত ধরে আবার এসে পৌঁছে-
ছেন হলবের গোহায়ে—হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ।

নেলে। তোর কি খবরকে কলে ?

কেলে। বৎপগোনাক্তি বারাপ। হাবা হলবের আ
হাবা ডাকিয়ে ছেড়েছে। প্রথমে একদিন
হাবার জলে বিব খুন্সু কলে হাবালায়, যেহে
কারওয়ানির জালার হয়ে ব্যাটা, তবু হাল হ
না, কোমাল হাফুবে না, কাত্তে হাফুবে না।
চোখাঠি মারা হাত বলে পিটিয়ে পিটিয়ে
করে দিলু, শরের খিন প্রাতে আবার
হেইও ক'রে ঠেলা মেয়ে সব মাঠ চলে যা
মাটির ভিতরে থেকে একটা হাল ভেঙে বি
হারানকারা আর একটা হাল নিয়ে এসে, ব
ভিতরে ঢুকে হাল বরলু'র চোপে, অদূরের চ
হেইও ক'রে ঠেলা মারতে হারাল হালের।
কানের এ পাশটা ক'রে কেটে গোল, লাভা
দিয়ে কোনো রকমে কুলিয়ে রেখেছি। সব
তার চাষ হয়ে গেছে, বাকি আছে শব্দ
কলি। তোমার দু'জনকে এখন আমাকে এ
গ্যাছায়া করতেই হবে।

নেলে। আমি এত বড় সেপাই মেয়ে দিলু—

হেলে। আর আমি এত বড় একটা ভূঁড়িও
গদিয়ান—

কেলে। ও সেপাই মারা আর গদিয়ানের ভূঁড়ি কাঁচ
অনেক সহক, সোঁতার চাষার পান্নার একবার
দেখ ভাই, জান নিয়ে টানটানি।

নেলে। কি করতে হবে এখন, তাই বল।

কেলে। সে কি আর চোঁচিয়ে বলতে আছে ?

আর। (তিনজনে কাছে আসিয়া গলাগলি বাঁ
পর্যর্ন্ত করিতে লাগিল।) —এই এই এই—
বুকি, ঐ যে বগ, বগ, পায়ের শব্দ শুনছি—ল
লুকো—লুকো—

[নেলে হেলে কেলে চট্ট করিয়া লুকাইয়া গিয়া
কোমাল ফুড়ল কাঁবে এবং কটি হাতে হলবের
হাঁড়িতে পাছাভাত, মাটির বাসনে ভাড়া ও দ
খতিতে জল লইয়া হলমায়ার প্রবেশ।]

হলব। (মাঠের চারদিকে তাকাইয়া) দেখ মহান
এই কিছু দিন বহুতরিক হয়েছে কিছুই বুঝতে পা

নি। নাহে যে কাক করে রেখে দাই—আবার এসে
 দেখি দেই দেই। এই নাহে দু'বার তিনবার বাস
 কেটে পরিষ্কার করে দেখি, আবার দু'দিনে
 কি বাস গছিয়েছে—একবারে কোপড়া !
 না, আত্মকের আমি একটা হাণ্ড-ন্যাক করে
 ছাড়বো। (মহানাবা বিশ্রুতভাবে তাকান আর
 মাথা নাড়ে ; সহসা হলধর পেটে চাপ দিয়া আর
 দু'তাকভাবে নুইয়া পড়িয়া) উঁ হুঁ হুঁ—মহানাবা,
 কি পেট কন্‌কানি যে আরম্ভ হল, এত ঘেরে
 কেনে দেখছি। না, আত্মকে আর নন্দা-শোভা
 আর ভাষা দিলে পাতা খাবনিরে, ও সব ভুই বাড়ি
 নিবে যা। (মহানাবা আকারে বুকাইল, এমন
 হাশিয়া দিয়া ঘর পরে ঘাইবে।) নাহে না মহানাবা,
 পেটের নাড়ীভুঁড়ি কেন ছিড়ে থাকে, আত্ম আর
 কিছই বাব নি ; বরঞ্চ ঐ জলঘটি রেখে যা, তেটো
 পেলে একটু জল খাব। বাড়িতে গরম ভাত ক'রে
 রাখব, আমি সহ্যের কিলে গিরে খাব। যা বোন
 ভুই বাড়ি ফিরে যা। (বাঁধি ও বাঁচি লইয়া মহানাবার
 প্রস্থান।) দাঁড়াও খুপে, তোমাকে একবার বেশ
 করে দেখেনি, দেখি কত কন্‌কন ভুঁমি করতে পার
 (কাপড়ের ছুঁই পুঁলিয়া গরু করিয়া পেট-বাঁক।)
 বাস—এইবারে ঠিক হল—। এইবারে এস দেখিনি
 কোদাল ভাষা—আগে কিছ বাস চোঁছে কেনে নি।
 (কোদাল চালাইতে দিয়া কোদাল আট কাইয়া সেল)
 এ আবার কি হলরে বাবা, কোদাল চলছে না কেন—
 এই-ই হেঁইও—(চানচানি), না, ভাওত চলছে
 না। কি রে বাবা, আসে কোরটোর কি একেবারে
 বতম নাকি। একবার আসে কোদাল দিলে আর
 ভুলতেই পারছি নে। নেং পালা—হেঁইও—।
 উঁরে উঁরে উঁরে—সেঁহিরে সেঁহিরে সেঁহিরে—'
 (বলিতে বলিতে আসে ভিতর হইতে মেলে বাহির
 হইয়া আসিল।)

হলধর। কে রে ভুই—কে রে—।

মেলে। হলধর কি আর গড়ি রেখে বাস, টানের
 চোটে—উঁরে উঁরে উঁরে—

হলধর। (পূর্ণ করিয়া মাথার কুঁটি ধরিয়া) ভুই-ই

আমার কোদাল টেনে বয়েছিদি।

মেলে। বটে বাবা—হেঁই বাবা, তবে বাবা—উঁরে
 উঁরে উঁরে—

হলধর। (কুঁটি ধরিয়া টান ধারিয়া) ভুই কে রে ?
 ঐ যে বুড়োবুড়ীদের কাছে শুনতুন বুদে শরতান,
 ভুই কি তাই নাকি ?

মেলে। ঠিক বরেন্দ্র সো ঠিক বরেন্দ্র, এই ব্যক্তিভে ছেড়ে
 দাও—

হলধর। ছেড়ে দেব ? এই কোদালের বাড়িতে তো
 মাথার পিল, বের করে দেব (কোদাল দিয়া
 প্রহাছোদাত।)

মেলে। হেঁই হেঁই দাদা, কর কি ? পোনো পোনো—
 বাবা অনেক শেরেদি দাদা, আর কিও না। ভুঁমি
 যা বল আমি তোমার ভাই করে দেব।

হলধর। ভুই আমার কি করতে পারিছ ?

মেলে। যা বলবে তাই করতে পারি।

হলধর। পেট কন্‌কানির ওষুধ আনিছ ?

মেলে। ঠিক জানি ; একটু কুঁটিটা ছেড়ে দাও—
 দিচ্ছি তোমাকে ওষুধ।

(হলধর মেলেকে ছাড়িয়া দিল, মেলে এককোণের
 ঘানের ভিতরে হইতে চারিটি শিকড় লইয়া আসিয়া
 হলধরের হাতে দিয়া) এই দাও, শুঁদ পেট
 কন্‌কানি নর, আর পরীয়ে যে অদ্‌ব বাস, একদানা
 শিকড় খেবে কেনেলে সব সেরে যাবে।

হলধর। দাঁড়া তবে, পরব করে দেখি (গড়ি জল বুদে
 দিয়া একটুকরা শিকড় পিলিয়া কেলিল। একটু কাল
 চুপ করিয়া থাকিয়া) না, ঠিকই ত, সব শুনা চলে
 যার। যা ভবে ব্যাটা, বিশুব ভোকে ছেড়ে, বাবা
 শিব তোম ভাল করুন।

মেলে। (লাকাইয়া উঠিয়া) ওরে বাবা শিব—
 চৌকাইয়া প্রস্থান।

হলধর। শিকড় বটে আদব শিকড়, আরও ডিলদানা
 আছে রেখে দিই ট্যাকে, সমরে কাছে লাগবে। (কাঁচি
 হাতে করিয়া আর একটি কোণের কাছে গিয়া বাস
 কাটিতে আরম্ভ করিল, বাস কাটিতে কাটিতে কাঁচি
 আবার আটকাইয়া সেল) হেঁই দাদা, আমার কাঁচি

আটকাল কিসে ? প্যাং তিরি তিরি—(কাঁচি দিয়া
হেঁচকা টান দায়িল)

‘বলুন বলুন বলুন’ (বলিতে বলিতে হেসে কোণ
হুইতে বাধির হইয়া আসিল ।)

হলধর । (বশু করিয়া কুঁচি ধরিয়া কোলিয়া) আবার
তুই শালা ! এই না তুই পালিয়ে গেছিল ?

হেসে । হাতের ডানারটা লাগিয়ে দিয়েছি যে, কথা
বলবার কি আর শক্তি রেখেছি ? না পো রে না—
আমি শালা সেই আপেরটা নই, আমি আর একটা ।

হলধর । কটা তোরা এখানে জুটেছিল শালা ? হাটা,
আগে কাঁচি দিয়ে তোরা লম্বা নাকটা কেটে দিয়ে নি ।

হেসে । পার ধরি বাবা, সেটি করো না ।

হলধর । কেন করব নি ? আজ নর, এই কিছু দিন বয়েই
তোরা আমার পেছনে লেপেছি। আমার চলা
বঠি তুই ভিখিরে কাণা করে দিয়েছিল ?

হেসে । একা নয় বাবা, আমরা বেসে-বহলে-কলে এই
ভিন হুঁত’তে বসে ।

হলধর । আমার খড়ের পাদার মধ্যে জল ঢেলে পড়িয়ে
দিয়োছিল ?

হেসে । তাও একা নয়, ঐ ভিনহুঁত’ বসে ।

হলধর । তবে আর তোকে ছাড়ছি নি, তোরা নাক
কটনই ।

হেসে । পার ধরি, মোহাই বাবা ; তোমার সেনা সোলাস
হয়ে থাকব ।

হলধর । তুই কি কাজ করতে পারিস ?

হেসে । অনেক কাজ করতে পারি, একবার কুঁচিটা ছাড়ো,
তবে দেখিয়ে দিচ্ছি । (হলধর কুঁচি ছাড়িয়া দিল ।)

হেসে । এক হুঁত’ো বড় দিতে পার ?

হলধর । কেন, কি হবে বড় দিতে ?

হেসে । দেখাব এক ডালম্বর কাণ্ড । বড় বড় তত
সেপাই । যিখোবাখা সেপাই নয়, তারা কুঁচকাওয়াছ
করতে পারবে, গান করতে পারবে, লড়াই করতে
পারবে—সব পারবে । দেখবে ?

হলধর । কি সব ডালম্বর কথা বলছে বাবা । না না,
কাজ নেই আমার সেপাই দিয়ে । হালুটে চাবা,
কি হয়ে সেপাই দিয়ে ।

হেসে । তবে এসো ডোমাকে সব গিঁথিয়ে দিচ্ছি
যখন সৈন্যের দরকার হবে তখন বড় সৈন্য চাই ও
বড় হাতে নেবে—তারপরে এমনি দুই ক’রে বলবে—

হেসে জুড়ের আজার
খড়গুলো ভাল ধায়,
বড় গিয়ে আর সেপাই—

নইলে হেসের মাথা বাই—ই—ই—ই

তবেই দেখবে হুঁত’ হুঁত’ ক’রে বড় বড় তত সেপ
এসে উপস্থিত আবার । যখন বলবে—‘কিছু গি
পছ হব, হেসে জুড়ের আজা হব, গাছের ডা
বড় হত, সেপাই আবার হ’ল বড় ।’ তখনই দেখ
সব সেপাই আবার বড় হয়ে গেছে । এইবারে ত
ছেড়ে নাও দালা, দূরে চলে বাই । দেখতে চা
তো সব দেখিয়ে দিতে পারি ।

হলধর । না না কাজ নেই ; বা বাটা দিলুন তো
ছেড়ে, বাবা শিব তোরা ভাল করুন ।

হেসে । (চিৎকার দিয়া) ওরে বাবা শিব—(সোঁতাই
পলায়ন ।)

হলধর । না, আজ আর কাজ হচ্ছে না কিছু,
কোথেকে এসে জুটেছে সব আপন, ভৌতিক দেখি
আমার মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে । বাস কাটা আজ
হবে না । মোহাল হয়ে একটা পালের হুঁচি চা
নইলে ঘরটাই প’ড়ে যাবে । দেখি একটা শাল গ
কেটে চলে বাই । (কুঁড়ুল লইয়া একটা পা
গাছের গোড়াব গিয়া কোণ বিন, হলধর টানি
কুঁড়ুল ভুঁদিয়ে পারিল না । হলধর ভীষণ ক্র
হইয়া) এতো ভারী ডালাগার লড়া সেল আজ
দায়িটা বিনে আর কাজই করা যাবে না—না কি
দেখি একবার—হেঁইও—(ঘোরে কুঁড়ুল ধরি
টান দিল ; পিছন হুইতে সেই সেই সেই কহি
আবার চিৎকার উঠিল ।) আবার কোন্ শালা
(হলধর বশু করিয়া আবার কোলের কুঁচি ধরি
টানিয়া আসিল ।)—শালা এই না তুই চলে পো
গিয়ে আবার শাল গাছের আড়ালে লুকোনি ?

হেসে । ছেড়ে নাও দালা, ছেড়ে নাও, আমি সে না
আমি অন্য হুঁত’—আমি কলে ।

হলবর। তোরা নেল-নেল-কেনে—কতগুলো এসে
আজ ভবেছিল বলতো। একটাকে আজ বাড়ি
নিরে দাব, চল, তুই-ই চল, বাড়ি নিরে তোকে
গোলাঘরে ক'লুশ নিরে আটকে রেখে দেব।

কেলে। ছেড়ে পাও দাবা, আঙুল দিয়ে, আর লাসব
না তোনার পেছনে। যেহ না কতে আঙুলটা

একবারে কেটে গেছে—হুৎ হুৎ—উ হু হু—
হলবর। ওতে হোর কিছ, ছয়নি, এই ক'লুশ দিয়ে
হোর ভালু পুঁকো করে দেব গাভা—

কেলে। ছেড়ে পাও দাবা—ছেড়ে পাও—তুনি বা চাও
তাই দেব তোমাকে।

হলবর। তি দিতে পারিস্ তুই আমাকে ?

কেলে। অনেক সোনার মোহর দিতে পারি—হাত
ভরাতি সোনার মোহর। দেব ? দেব ?

হলবর। (ছাড়িয়া দিয়া) সোনার মোহর ? সোনার
মোহর দিতে পারিস্ ? তে মেরিনি। না—না—
সোনার মোহর চাই নে, আমি সোনার মাঠে সোনার
দাব চাই। তুই পালা—পালা—

কেলে। এখন না চাই এখন চাবে তখনই পাবে।
তোমাকে সব শিখিয়ে দিচ্ছি। হাতে কতগুলো
শুকনো পাতা নিয়ে বলবে—

দিব্যা দিয়ে ভাইবীর শূত

ব'লে সেছে কলে ভুত,

পাতার কথা বার না সোনা—

ক'লুশের পড়ুক সোনা।

তা হ'লেই দেখবে ক'লুশের সোনার মোহর পড়তে
থাকবে। আবার যদি বল—

কিছুকিছুকিছু শব্দ হল,

কেলে ভুতের কথা হল,

বাভা কাতার খসবে দাবা,

সোনা না হ'লে শূকনো পাতা।

তা হ'লেই আবার দেখবে সব সোনার মোহর শূকনো
পাতা হয়ে গেছে।

হলবর। তি ভেপ্‌কই তোরা দেখাচ্ছিস্ আজ।

কেলে। ভেপ্‌কি নর গো—সব গাভা, দেখবে ? একই
দেখবে ?

হলবর। না—না—কাজ নেই আমার সোনার মোহর
দিয়ে, গোলাঘরা আমার সোনার দাবই ভাল। বা
বাভা, তোমের নিয়ে আর কবেলা করতে ইচ্ছে
হয় না ; আবার এমিকে আসবি তো ক'লুশ বেলে
দেব করে দেব। বা বাভা দূরে চল, দাবা শিব
তোর ভাল করুন।

কেলে। (চিংকার করিয়া) ওরে বাবা শিব—

(শৌড়াইয়া পলায়ন)

পটপরিবর্তন।

চতুর্থ দৃশ্য

ঐনাথ বাড়ির বাড়ির পাওয়ার বসিমা মহামায়া বেত
দিয়া একটি সোলনা তৈরী করিতেছে।

(হলবরের প্রবেশ।)

হলবর। ওটা আমার কি হচ্ছে রে মহামায়া ?

(মহামায়া ইঙ্গিতে বুঝাইল, একটা সোলনা।)

হলবর। সোলনা ? কার জন্যে রে ? আমার মেজহার
বাড়ার জন্যে ? বেশ করেছিস্, বেশ করেছিস্। আরা
ওটা কত সুখে ছিল, নাচারে পড়ে এসেছে আমার
আবারের কাছে, আবারের সঙ্গে থাকতে ওদের বড়
কষ্ট হয় ; আমি তা বুঝতে পারি। (মহামায়া ইঙ্গিতে
বুঝাইল, দাবা ভাঙ্গ করিয়া লইয়া গিয়াছিল সব
শৌড়াইয়া আসিয়াছে।)

হলবর। সব বুইয়েছে ? তা বা হবার হ'লে, চারটি
খেতে পরতে দিতে ব্যয়্য পারব। কিছু আমার
সব চাইতে রাস হয় কিসে জানিস্। ওই বজ্রা
আর মেজহা, দু'ভাইয়ে দিন রাত বলে বলে কান্দুর
কান্দুর করবে—কাজ করবে না কিছু। কাল একবার
বলে কেলেকিস্, তুইতো জেগিসনি—হাত দুটিয়ে
চোখ পাঁকিয়ে আমাকে তো এই রাতে কি এই রাতে।
মহামায়া। (কপালে হাত দিয়া দুঃখের সঙ্গে কি
বুঝাইল।)

হলবর। ওই বৌঠানদের কথা বলছিস্ ? (মহামায়া
জানার হ'ল্যা—এবং ইঙ্গিতে বুঝার তাহায়া আরও
অবশ্য।) একবারে ? (মহামায়া জানার হ'ল্যা।)
কিছু দেখ মহামায়া, ওদের গাভা বড় কষ্ট হয়।

আর তাকে চুপ চুপ বলছি, ওরা আমাদের ঘেরা করে, বড় ঘেরা করে,—আমি বুঝি, আমি সব বুঝি। একথরে যদি খেতে বসি, যেঠানরা আমার দিকে ডাকার আর ভুরু কঁচকোর আর নাক পিটিকোর—আর বধি বধি করতে থাকে।

(বহামায়া এবারে এ'এ'এ' করিয়া নখ করে এবং বুঝায়, সে সব জানে—সে দেখিয়া লইবে।)

হলধর। তুই চটিননি যোন, ওরা ঘেরা করলে আমাদের কিছ্ করে না। কিছ্ আমি ভাবছি কি জানিন্, আমাদের সঙ্গে ওদের বড় কষ্ট হয়। আমি ওদের পৃথক পৃথক দু'খানা ঘর করে দেব। ওরা ওদের হলে থাকবে।

(বহামায়া বুঝায় তাহাই ভাল।)

হলধর। কাল কন্ড কিছ্ করে ভাল, নইলে আমরা যা খাই গরি তাই খাবে পরে। (বহামায়া খ্যা দৃঢ়ক মাথা নাড়ে) কিছ্ পোন বহামায়া, তুই সেদিনকার রাষ্ট্রের সব ভাষণের কথা ভাল ক'রে কিছ্ পুনরাবৃত্তি নি। আর কাউকে তো বলা যাচ্ছে না—তোকেও না বললে কথাগুলো আমার পেটের মধ্যে যে একেবারে গজ্ গজ্ করছে। শেকড়টা খেয়ে না—এই পেটের অন্ত জনকমানি—

(বহামায়া ইঙ্গিতে বুঝাইল, ও রকম অনেক হয়।)

হলধর। হয় হয়? তা হোক—কিছ্ সেদিন রাষ্ট্রে—কি বলব—একবারে পরভানের বেলা বলে সেল।

(বহামায়া ভুরু কঁচকাইয়া কানে হাত দিয়া রহিল।)

হলধর—পুননি নি? পুননি নি তুই পরভানের কথা—সেই সব বুঝে পরভান?

(বহামায়া চোখ বড় বড় করিয়া বুঝে আগল দিয়া চুপ করিবার আশে দিল।) বলবই নি, এককর বলবই নি? বাখা—কি ভোর শাসন রে বহামায়া! জাগিয় হেসেবেলায় অঙ্গুণে ভোর কথা বহু হয়ে গেছে—হে-হে-হে—নইলে ভোর শাপটে—হে-হে-হে—কিছ্ একটা বহা তুই জানিন্ সে, ভেজিক—এককর ভেজিক—! বড় বড় তত সোপাই—

(বহামায়া কোঁপা ওঠে।)

বিদ্যাল করছিন সে, বিদ্যাল করছিন সে—আমি তোকে

দর একদিন সেখানে দেব—সব সেখানে দেব। (বাণিক উত্তোষিতভাবে) বড় বড় তত সোপাই—বড় পাতা তত মোহর, কক্করকে সোনার মোহর—সব গিঁথে নিজেছি—সেখানে দেব—সেখানে দেব—।

(বহামায়া হাতের বেতের সোলমটা ঝুঁকিয়া কোঁপিয়া দিয়া উঠিয়া গিয়া খাইভেঁছল, হলধর আগাইয়া গিয়া হাত দু'খানি বাঁধা) খাট হয়েছে যোন, খাট হয়েছে; আর থাক—ও সব পরভানের কথা আর ভুলব নি। বাছিয়া আমি বাছি—রাষ্ট্রে বাছি। তবে কি জানিন, রাস করছনি যোন, এই ক'দিন ধরে না—রাতে রাতে কেমন একটু আয়ান করতে ইচ্ছে করে। চোম রোম আর রাষ্ট্রে যেতে ইচ্ছে করে না। (বহামায়া প্রলম্বভাবে মাথা নাড়িয়া জানায় ইহা ঠিক না) ঠিক না? এক দিনও একটু আয়ান করা ঠিক না? বাছিয়া তাই হবে—আমি বাছি—এখনই রাষ্ট্রে বাছি—ওরে বাণিক—

বাণিক। (নেপথ্যে)—খাই দালা—

হলধর। (চটমা গিয়া) কখন আর তুই ঘাবি রে? সেই কখন থেকে তো তুই 'খাই দালা' করছিন। পীড়নির হাল সোদু বের কর। (বহামায়ার প্রতি) আমি বুঝতে পারিই বহামায়া—তুই ভেবেছিল আমি একদিন পরভানের ভোলে পড়ে যাব। ভুল ভুল ভুল—সে দিন যদি থাকতিন্, তবে সেখতে শোভিন্ তাড়ের এক একটার ঝুঁটি ঘরে আমি কি ছানাতা করে ছেঁকেছি। তুই ভাবি আমি পরভানের ভোলে পড়ব? হ্যা হ্যা হ্যা—। বাণিক—

[বাণিকের প্রবেশ]

বাণিক। এই দালা, হাল সোদু সব প্রতুত, ছুঁই ভো চলসেই হয়।

হলধর। সেখ বাণিক, এই ক'দিন ধরে তুই কাছে কন্ড কেমন ছিলে নি ঘিরেছিল—।

বাণিক। সোদো দালার কথা, আমার ছিলে নি কোথায়? ছুঁইই ভো এই ক'দিন কেমন ছিলে নি ঘিরে বসেছ, কাছে ছিলে এখন ভো আসে কোদোছিন ভোয়ার সেখ নি।

হলধর। বাণিক, বড় বুঝে বুঝে কথা কইতে

শিখিছিল, আজ তোকে দিয়ে তিন তিনখানা
মার্চে নই দিইয়ে তবে আমি ছাড়ব। চল দেখি—
[চক্রবর্তী ও জনবরের প্রবেশ। চক্রবর্তীর মলা হেঁড়া
হইলেও লম্বা পেটলম্ব আর হাকসটি; জনবরের
মলা ছেঁড়া কিতাপাড়ের কাশড় আর আঁপির পাঞ্জাবী]
হলবর। এই যে কল্যা, বেজায়া, গোবো, একটা কথা
বলি, মন্দখানা এমন বেজার ক'রে থাকবে নি;
একবার সব গোছে—আবার সব হবে। তোমাদের
জন্য আমি পৃথক পৃথক ঘর ক'রে দেব—নইলে
তোমাদের বড় কষ্ট হয়। আর—আর বেশ বড়
আর একটা জিনিসও পারতাম,—শিখে নিয়োঁ
আমি পারতাম—না-না-না—বলব না, বলব না ওসব
পরতানের ভেটিক—বলব না তোমাদের—।

চক্রবর্তী। কি করতে পারাতিগ তুই?

হলবর। তুমি তো গাধা মিলিটারি! তোমার তো
সেপাই চাই? পারতাম, আমি পারতাম, বত বত
তত সেপাই (বহামায়া চোখ লাল করিয়া কটকট
করিয়া দলবরের দিকে তাকায়; বহামায়ার দিকে
চোখ পড়িতেই)—না-না—সে সব কথা তোমাকে
বলব না—সব পরতানের ভেটিক।

জনবর। কি তুই আবোল-ভাবোল বকিছল হলবর।

হলবর। আবোল-ভাবোল নয়; শিখে নিয়োঁ—ক'শ
শিখে নিয়োঁ—মন্দ শিখে নিয়োঁ। তোমার
তো চাই বেজায়া ঠাক। খুব দিতে পারতাম—
অনেক দিতে পারতাম—বত পাটা তত সোনার
সোহর—কন্দ, কন সোনার সোহর—চককে সোনার
সোহর—মুঠোর মুঠোর দিতে পারতাম।
(বহামায়া দলবরকে পাসাইয়া হাস করিয়া বেগে চলিয়া
গেল)—না-না-না—সব পরতানের ভেটিক—ও
সব না,—বহামায়া—জামায়া—তোমার মুঠো হাতে
ধরি যোন—আর ওসব না।

পটপরিবর্তন।

পক্ষমন্দ্য

[শঙ্খার প্রাঙ্গণ; আবহায়া অন্ধকার। হলবরের
বাড়ির সম্মুখ দিক; উপরে একটি বড় গাছোয়

টানানো, নীচে ছোপলা বান্দুর বিছানো। আসে
পাশে কয়েকটি বড় বড় গাছ দেখা গাইতেছে;
নেলে হেলে কেলের কণ্ঠবর, কাছাকেও দেখা
গাইতেছে না।]

নেলে। হেসে, ঠিক আছিল তা হ'লে?

হেসে। হু-উব ঠিক।

কেলে। ঠিক ঠিক ঠিক।

নেলে। কেমন বৃদ্ধিহীন?

হেসে। ভালো ভালো।

কেলে। বেশ আশা আছে, বেশ একটু বয়েছে।

নেলে। হারে আমি নিয়োঁ ভৌতিক ওসবের সোভ—

হেসে। আরে আমি নিয়োঁ সেপাই—বত বত তত
সেপাই—

কেলে। মোকম নিয়োঁ আমি—কন্দ, কন্য কন্য কেবল
সোনার সোহর—

নেলে। হ্যাঁয়ে—মেধা আমার ছুঁবে না তো—

হেসে। বা সোঁয়ার তা বিশেষ নেই কিছ।

কেলে। তেঁপে বসে থাক—বাড়ির শীমানা ছাড়বি
নে কেউ।

নেলে। এই, চুপ, চুপ—বাতি নিয়ে কে আসছে।

[দুই হাতে চারটি হারিকেন বাতি লইয়া হারিকেন
প্রবেশ। হারিক দুই কোণে দুইটি হারিকেন বাতি
টানাইয়া দিল; আর দুই কোণে আর দুইটিও
টানাইতে গাইতেছে, এমন সময়ে ছিলাম হারিকের
প্রবেশ; ছিলাম হারিকের দৌড় লোক।]

ছিলাম। বাতি দিচ্ছিল, কে রে?

হারিক। আসুন ছিলাম কথা—আমি হারিক—

ছিলাম। কই রে, হলবর কোথায়?

হারিক। আসবেন এক-খুনি—লাজ পোষাক করছেন।

ছিলাম। লাজ পোষাক করছে? হলবর?

হারিক। হ্যাঁ কথা, সবই কেমন নোচুন দেখতে পাছি।

আজ সকালে মোস্তাফিজের হাটে গিয়ে দেখি পা
পা'র কালো কিতাপাড়ের বুড়ি আর লম্বা হাতের
শিরান কিনে নিয়ে এসেন। বললেন, মোস্তাফিজ,
চাষের সময় হাটুর ওপরে কাশড় পরব, পাল পাকবেও
তাই কেনরে? বিশেষ কাশড় আছাকেও লম্বা

কুলের এক ছোড়া কিনে, সেখানে না ভাই শিখোঁছি।
মহাভাষা শিখিকে দিয়েছিলেন লাশটুকটুক গ্রহণ
পাড়ি, যেমন ঠাকুরদের হাতে মেওয়া—ভেঁমনি
এইশা ঘোরে বাবা হলবরের ঠিক নাকের জগায়
হুঁড়ে হারা।

ছিন্ন। কি হল বল বেশি নি যাপিক—

(বউ নইয়া মোহনের প্রবেশ, একটু কতক ছোকা)

মোহন। কিসের কি হল ছিন্না বলছো?

ছিন্ন। বলছিলাম, এই আমায়ের হলবরের কথা। এই
যে আমাকে দ্বারের উদ্ধর লাগিয়ে দিয়েছে, এমন
নবায় তো আমার চোখপুড়িয়ে দেখিনি।

মোহন। কেন, কি হয়েছে?

ছিন্ন। কি আর হবে? পুরুত নেই পাকন নেই,
চালমাথা নেই, কানকনি নেই। বাওয়া নেই গাওয়া
নেই—বাড়ির সামনে চাওয়া চানিরে এ কিসের
দ্বারের উদ্ধর? আমি তো বুঝতে পারলাম না কিছু।
মোহন। কেন, সেই বাবাভার আমায়ের পাকন উদ্ধরই
যে বলে বলে করতে হবে এমন কোনো কথা আছে?

ছিন্ন। হুঁদের উপরে খুব তো চাটাং চাটাং কথা
বলতে শিখোঁছ। বলি টের কেটে বিড়ি কুঁকে
তুই এসে আমার হলবরের সঙ্গে হুঁটলি করে বেকে?

মোহন। আরে বাবা হলবরের ভাটা কটাল আপনায়াই
ভাগ করে থাকিলেন মাইতি মশাই, আমায় ও না হব
একটু দ্বারটু, ভাগ বগাদাম।

ছিন্ন। হুঁব সামলে কথা বলিস ছোকরা, বাপ্পড়ে
বাড় ভেঙে দেব। ধীরে যাপিক, ছোয়াখ কথা
কোয়ারে?

যাপিক। অনেক বুদ্ধি চলেছেন আমায় বাবা হলবর।
দবাই বলত দাবা, দাবার পেটের দ্বিখানায় অনেক
বুদ্ধি গো। তিন দিন হল বাবা বাড়ি পাঠিয়ে
দিয়েছেন নাকে, সঙ্গে সঙ্গে বাপকেও।

ছিন্ন। আর মহাভাষা?

যাপিক। দ্বিগীর্গকুলের কথা আর বলবেন না বুড়ো,
মহাভাষা নন, ঠিক বা বলত। আর দাবাটি দিন
দাবা হলবরের সঙ্গে কি খিটখিটি না করেছেন, দবর
দবর আমার বনে হয়েছে বুড়ো খুঁপ নিয়ে কাটবেন।

সেয়ে শিকের আগে বেশি পরাত দিনে চলে সেলেন
ওয়াড়ার তারিখী নামের বাড়ি।

ছিন্ন। বাপার ভা বলে অনেক গড়িয়েছে যাপিক।
তা পাপিড় এত লোক তোরা নেবের করোঁছ,
কোনো যোগাড়-বজর তো কিছু দেখছি না, তোরা
বাওয়াবিক?

যাপিক। যোগাড়-বজর ভেতরে ভেতরে অনেক আছে।
মোলাপুত্র থেকে কুঁড়িতে কুঁড়িতে কুলুং এসেছে,
হাড়িতে হাড়িতে ঝাশিণ আর বসোয়া এসেছে—
আর এসেছে না সে আর তোমাকে বলব না কথা,
বড় ভর পাই—

ছিন্ন। বল বল, পুঁনি কোয়ার গিরে পৌঁছেছে।

যাপিক। আর এসেছে তিন তিন হাড়ি যেনো নল।

ছিন্ন। দে-বো ম-অ-ব-? ছোয়াখ বাড়ির বাড়িতে
যেনো ম- (বেশে বাড়ির হইয়া বাওয়া)।

মোহন। আমা-বা—করে যেন বিশ্ব চলে দিয়েছে, একে-
বারে পাশিকে বঠলেন। কেন বাটা? দ্বারের চাল
পুড়ো করে মেখে খেতে পাঠিস। আর একটু
পড়িয়ে খেলেই মহাভারত অশুভ হয়। বল বেশি নি
বউ ভাসো করে, আমা বেশি তোকে দিয়ে গান
গাওয়া-নাচাব।

মোহনের বউ। হতভাগা দাম্ভার দ্বিটিকে কোয়ারার,
বাড়ি বলে গা জলাশয়—আবার পরের বাড়ি নিয়ে
এসেছিন যেনো নল শাইরে নাচাতে গাওয়াতে।

মোহন। তোকে বাঁধি আমি বলছি বউ, যেনো মন না
হলে কিছু হবে না। তুই আমা একটু খেয়ে দেখ
—তোর একবার মিল বুঁলে যাবে।

(কয়েক জন পুরুষ ও মেয়ে ছেলে মন হলবরের প্রবেশ)
১ম পুরুষ। তোকে আমা বা দেখা দাছে রে—ঠিক যেন
দাবা হলবর।

হলবর। দাবা হলবর—হা: হা: হা:—দাবা হলবর—
(দেখতে তিন দিক হইতে একদগে বিকট পথ হা: হা: হা:)
করে করে—এমন করে চাটখিকে হাসল কে?

২য় পুরুষ। কেউ না—কেউ না—ও তোমারি হাসি;
এত ছোরে হেসেছ যে ব-বাড়ি গাছ পালার ঠেকে
ঠেকে আমার কিরে এসেছে।

হলবর। ভাই হবে, ভাই হবে। মাণিক—
মাণিক। এই যে দাদা—।

হলবর। এই যে দাদা কি রে, বলবি আজ্ঞে দাদা।

আমার দাদা-বৌঠানদের কাছে পেছিনি।

মাণিক। আজ্ঞে দাদা ছা।

হলবর। কি বলছেন ভাবি।

মাণিক। আজ্ঞে দাদা, ভেলারা আলবেন নি।

হলবর। কোনো দাদা না।

মাণিক। না।

হলবর। কোনো বৌঠান না।

মাণিক। না।

হলবর। তার মানে হলবরকে খেঁচা। হলবরের নদারের
আমোদ-মামলায়ে আসবে না। আমোদ আমি সেবে
নেব। নিজের হাতে কুড়াল দিয়ে সারাদিন পালসায়
কেটেছি। নিজের হাতে মাটি কেটেছি—এই দিয়ে দুই
ভাইকে দুই ভিটাতে বসবসুত থর তুলে দিয়েছি।
ঘরের খেতে বসে বলে চাল বের করে দিছি—ডাল
বের করে দিছি—মহা আত্মানে আহেন সবাই,
আনাকেই আবার খেঁচা। সেবে নেব, আমি সেবে
নেব। মাণিক—

মাণিক। এই যে দাদা—

হলবর। (বসন্ত দিয়া) আবার এই যে দাদা—

মাণিক। এই যে আজ্ঞে দাদা—

হলবর। কয়েকজন তোরা বাড়ির ভেতরে যা—কুন্দুরি
আন, জিলিপি আন, বঙ্গোয়লা আন,—আর।

মাণিক। আর কি বল আজ্ঞে দাদা—

হলবর। আর—আর—(দুইবার ঢোক গিলিয়া)

মোহন। ঢোক গিলিছিনা কি রে রাজা হলবর—বলে
কেল—বলে কেল,—মাটির সেলাস—আর হাঁড়িতে
করে—

হলবর। (অশ্রুভাষিক উত্তেজিতভাবে) বোনো স্ব—
(বুকন লোকসহ মাণিকের প্রস্থান)

বলে। (নেপথ্যে)—হুঁ হুঁ হুঁ—

হলে। (ও) হেঁ হেঁ হেঁ—

কেলে। (ও) হোঁ হোঁ হোঁ—

হলবর। বাইরে এমন শব্দ হচ্ছে কিসের রে।

১৪ পদ্য। ভাই তো; তোবার বাড়িতে অন্ধকার
আজ কেমন যা হুঁ হুঁ করে, বার বার কেমন
বিচ্ছিন্নি আওলাজ হচ্ছে।

১৫ পদ্য। বনে হচ্ছে ভুড়ন পাখী।

হলবর। ভাইতো এমনি ভয় ভয় করছে কেন রে।

মোহন। ভয় কিসের গো। তুমি তো রাজা হলবর—
আমরা তোবার এতগুলো কোটাল-বন্দী।

[দুই জন লোক সহ অনেকের আবার আনিয়া মাণিক
মাণিকের আবার প্রস্থান।]

হলবর। ঠিক বলেছিল—দাদা হলবর নয় রে হালটে ৯
হলবর নয় রে—রাজা হলবর!

১৬ মেমেছেলে। আমার নই কি বলছে গো।

হলবর। (ম'ত্রহে) নই বলছে। কি বলছে।

১৭ মেমেছেলে। বলছে রাজা হলবর নয়—কাণ্ডিক ঠাকুর
হলবর—

১৮। গুর বেকি, আমি বললুম কই—তুই-ই তো
বলসি—

হলবর। হাঃ হাঃ হাঃ—ঠিক বলেছে, পাল-পালনের
দিনে আবার হালটে হলবর! কি একেবারে—
কি বললে।

১৯। কাণ্ডিক ঠাকুর গো—

হলবর। হাঃ হাঃ হাঃ—ঠিক বলেছে, কাণ্ডিক ঠাকুর
গো (হলবর নিজের জামা-কাপড়ের দিকে বার
বার তাকাইতে লাগিল।)

[মাণিক লোকসহ বাড়ির দ্বার ও ভিন হাঁড়ি সহ লইয়া
আসিল।]

বাঘার বা মাণিক আমার, মাঠে যাটে তুমি
আমার বাঁ হাত, আজ পাল-পালনের দিনে তুমি
আমার ডান হাত। নাও—সবাই ভাগ্যভাগি করে
বত পার নাও—আর যাও—।

[দুসে আবার ভাগ্যভাগি করিয়া লইতে লাগিল,
সেয়েগাই ভাগ্যভাগিতে অগ্রবর্তী হইয়া গেল।
স্ব কেহই গিরিতেছে না।]

মোহন। কি ওটা বৃষ্টি কেউ জোবেই না। (দুসে
দুসে লোকসহ বৃষ্টির দিকে চাওয়া-চাউনি করিতে
লাগিল।)

১৭ পুরুষ । ওটা এ-পাড়া চলে না যে মোহন, ওটা চলে হাড়ি-বাগীরের পাড়ায় ।

মোহন । দর পাড়াতোই চলে—চালালেই চলে— ।
(মোহন দিকে একমাস বাইরা হলধরকেও একমাস দিল ।)

হলধর । (স্বাঃ বাইরা) কি দিল যে মোহন—বুকটা যে জ্বলে যাচ্ছে—(নেপথ্যে তিন দিক হইতে হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া হাসির শব্দ)—ও কি—ও কি—অমন করে বিকট হাসি কে হাসছে ?

মোহন । কিহু, না, কিহু, না, ও একটু মেলে অনেক হাসির শব্দ পোনা যায় ।

হলধর । বাও বাও—সকলকে খেতে হবে—পান করতে হবে—নাচতে হবে ।

ভবৈক পুরুষ । কি দর হচ্ছে এখানে রে ? সেন-পাঁয়ে বউ-মেয়ে নিয়ে ঘর করি না ? শেষে এই মোহাৎ থাকির বাড়িতে এসে এই হলধরের পাঞ্জায় পড়ে বড় মেয়ে মেয়ে-পুরুষে বড়-পান করিতে হবে— ?

ভবৈক মেয়েছেলে । উঃঃঃঃঃ—(শুইয়া পড়িল) ।
হলধর । ওকি ওকি ?

পাণের মেয়েছেলে । এই রে, বউয়ের যে বাখা ঘরে ভিরিরি অসুখ—আবার যে ভিরি পড়ল ।

হলধর । এঁটা—বাখার অসুখ ? আচ্ছা দেখিয়ে দিচ্ছি—
(মেয়ে ভিতরে চলিয়া গেল ।)

১৪ পুরুষ । এরে হাবাটা আচ্ছ একেবারে ফেলে গেছে—আতো ফেলে গেছে ।

২২ । হাতে বোম্ব দ্বাঃ কিহু, নগর জমেছে—তাই হলধর পুস্ত পড়াবোনা শেখন ধরছে—বাখা তেতে ডাঙরা হয়ে উঠছে ।

(হাতে একটু জল ও এক টুকরা শিকড় লইয়া হলধরের প্রবেশ)

হলধর । নাও দেখি নি—এই জল দিয়ে এই শিকড়-টুকু খেয়ে ফেল দেখি ।

৩০ পুরুষ । সে যে হলধর—অনেক কালদারি দেখিয়েছিল—
—আর সেখানেও হবে না । হুঃঃঃঃঃ—এখন বিছানার গিড়ে পড়ে থাক ।

হলধর । চোপ হও—হাবা হলধর নয়—বাখা হলধর;

নাও বউ, এ জল আর শিকড় তোমাকে খেতে হবে ।

ঐ মেয়েছেলে । (জল ও শিকড় খাইয়া সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া বসিয়া)—আঃঃঃঃঃ বাপ—বটলার—বাঃঃঃঃঃ সব বাখা চলে গেল; ভুনি হাঝা বাব—ভুনি বম্বজী ।

হলধর । হাঃ হাঃ হাঃ—এইবারে কিহু, কিখাস হচ্ছে না ভাও হচ্ছে না ? এইবারে তা হ'লে সবাই পা দর নাচ । কেউ করবে না ? বেশ, তা হ'লে সেন্দ্ৰি আবার (মেয়ে প্রস্থান) ।

১৫ মেয়েছেলে । সত্যি বউ তোর বাখা করে গেছে ।

১৬ মেয়েছেলে । আবার কাও দিদি—একবারে বাব দেই—সঙ্গে সঙ্গে করে গেল ।

(হাতে একমুঠো বড় লইয়া হলধরের প্রবেশ)

হলধর । নাচ-পান করবে না তো কেউ ? গরু গকিা তব, সবাই গরু গকিাও,—গরু কিহু, সেপাইয়ে চৌা খেতে হবে ।

১৭ পুরুষ । আরে বলে কি হাবাটার, আবার সেপা আসবে কোথেকে ?

হলধর । আসবে কোথেকে ? দেখবে ?

[বড় মূঠো ভুনিয়া খরিয়া বিড়, বিড়, করিয়া কি পড়িল—তাহার পরে বড় মূঠো ভিতরের দিকে ধোরে ছুঁকিয়া বাহিল, তাহার পরে একবার দুইবার তিন বার হাতে ভাই দিতেই ভিতর হইতে কুচকাওয়াজ করিতে করিতে একবল সৈন্য বাহির হইয়া আসিল, হলধর ব্যতীত সকলে ভয়ে ভড়োমড়ো হইয়া এককোলে পিয়া গছিল ।] হাঃ হাঃ হাঃ—পান পাও ।—

(সৈন্যদের গান)

জুতো মনসিরে পাগড়িটা কষিয়ে
তুরোয়াল হাতে নিয়ে আমরা সেপাই ।
মেয়ে বেই গট-গট—ভরমে পড়ে ছটকট
করে বধি কেউ, সেবে হাতে মেই তাই ।
গুটপাট করে দব ঘর বিই জালিয়ে,
যার খেয়ে ছুটে ছুটে লোক ঘর পাগিয়ে,
কড়া দুরা পান করি—কুঠিঁটে পান বরি,
মারি বা নিজেয়া বরি, কোনো হুঁস নাই ।

এক সো—এক সো—এক সো ভাই ।

একেন এত পিথে আসাদের সোল,

কলসেতে বন্ধ ঢালে কান্নার রোল ।

চোখ ক'রে কটু, বাতাসকে নাড়িয়ে :

দাঁত কক্ষাড়িয়ে লোক বাই ডাড়িয়ে,

ভালবন্দের ধাঁধা আবারে নেই ধাবা—

আবার মানব নহি—এই তো বড়াই ।

এক সো—এক সো—এক সো ভাই ।

কি হে পুনসে সবে গান ? হ'ল ? তবে এইবারে
দেখ—(বিড়বিড় করিয়া আবার কি পড়িল,
ঈশানদল ভিতরে চলিয়া গেল ; হলবর হাত পাতিয়া
ছিল, বড় বড়ো আবার আসিয়া তাহার
হাতে পড়িল ।)

হাঃ হাঃ হাঃ—আবার ঘেঁই বড়, সেই বড়—।

১ম পুরুষ । সত্যি বাবা কি কাণ্ড ! পাড়ার লোককে
খবর দি—(সৌভাগ্য প্রদান)

হলবর । আর কিছু চাই—চাকাকড়ি—সোনার মোহর—
সকলে । চাই চাই—সোনার মোহর চাই—

হলবর । চাই ? তবে দাঁড়াও সবে—(হৃত প্রদান)

১ম পুরুষ । কি কাণ্ডটাই করছে আজ হলবর, এঁক
সত্যি না সবই ভেঁজিক ?

১ম মেয়েছেলে । আবার তো হাত-পা ভরে থরথর কাঁপছে ।

২য় । চল দাঁদি, বাচ্চি পালাই—আমারো বড় ভর করছে ।

[হলবরের কয়েকটা পাভা হাতে করিয়া বেগে প্রবেশ,
সেগুলি দুই হাতে খরিয়া বিড়বিড় করিয়া কি বলিয়া
উপরে ছুঁড়িয়া রাহিল—উপর হইতে বন্ধ করিয়া
কতকগুলি সোনার মোহর পড়িল ; অমনি সবাই
সৌভাগ্য আসিয়া সেগুলি ছুড়িয়া লইল ।]

অনেক বেগেছেলে । ওরে বাচ্চির লোক ভেলে আনি সে ।

(বেগে প্রদান)

অপর মেয়েছেলে । আরে আবার শুনি আবার কাঁধে
হ'ল রে (বেগে প্রদান) ।

হলবর । কি দেখেছ । খাটি না বোঁকি । হলবরের মোহর
বাবা, বোঁকি সোনা নহ ।

২য় পুরুষ । আরও কয়েকটা ফেল না উপরে থেকে
হলবর—

হলবর । উহু, উহু—আজ আর নয়, আবার অন্য সময়
দেখ, আজ আর নয় ।

৩য় । আরি তো পেলামই না ।

৪র্থ । (ভৃত্যেরের টেকে চাপ দিয়া বন্ধ করিয়া
তিনটা মোহর বাহির করিয়া দিয়া) এগুলো
কি রে ব্যাটা ?

৫য় । (চকুর্ককে এক ঘনি দিয়া) ভাতে ভোর কি রে
পালা ? তুই কিছু, কম পেয়েছিস ? (উভয়েরই
হাতাহাতি আরম্ভ হইয়া গেল ।)

হলবর । এই—খাবো বলছি, এইসে সব মোহর আবার
পাভা ক'রে দেব ।

হুড়ি হাতে চক্করেরে প্রবেশ ।

চক্কর । কি হচ্ছে রে এগর ভুলোকেস বাচ্চির মতো—
ভাস, সব এখান থেকে—।

হলবর । এই যে আমার দাখাও এসে পৌছে । নিচ্ছই
সোপাইর বর কানে পৌঁছেছে ; নইলে আর হলবরের
মোহরসে আসবে কেন ! বত বড় তত সোপাই—
হলবর সব পারে । দেখবে দাখা, দেখবে ? না,
এসের একবার দেখিবেছি, এসের নামসে আর
সেখাবো না ।

চক্কর । এসের নিজে তো এতকল অনেক হৈঁঠে করেছিস,
এখন সব ভাগিয়ে সোভা ভাই—।

হলবর । ভাই ? তুমি আমাকে ভাই বললে ? হাঃ
হাঃ হাঃ—হাবা নহ সোভা বর, মোহর নহ দাখাল নহ,
একবারে ভাই ? নিচ্ছ তুমি সোপাইর কথা
পুচ্ছে । আচ্ছা, তা হ'লে সেখাচ্ছি একবার
তোমাকে । বা বা—সব মোহর নিজে বাড়ি বা,
না বানি তো একঘুনি সব পাভা ক'রে দেব ।
(সকলের ভরে ভরে সৌভাগ্য প্রদান ।) হাঃ হাঃ
হাঃ—এখন আর হাবা হলবর নহ—সবাই এখন কথা
শোনে—সবাই একটা ঠাঁই করে—জব্ব—সোপাই—
সোনার মোহর—বত ইচ্ছা তত—হাঃ হাঃ হাঃ ।
চাই দাখা, তোমার সোপাই চাই !

চক্কর । চাই কই কি ?

হলবর । কই চাই ?

চক্কর ।

হলধর। বাবা, তত পাই তত চাই! তত এখন দেব না। এখন দুই মল নাও—পরে সরকার হবে আরও দেব। বাঁড়াও দাও—(প্রস্থানোদ্ভাস্ত)

চক্রবর্তী। (হাত ধরিয়া) কোথায় যাচ্ছি? তাই?

হলধর। (হাত ছাড়াইয়া) একটু দূরে—যাও যে বন্ধ গঙ্গা দাওয়া—হাঃ হাঃ হাঃ—পালাব না দাওয়া, এই একদুনি আসছি। (প্রস্থান ও দুই দুটো বড় হাতে লইয়া প্রবেশ; একটি দুটো বড় হাতে লইয়া বিড়, বিড়, কলিল, সেটাকে হুঁকিয়া বাধিরে কেলিয়া দিল, তিনবার হাতে তাই দিল, একমল সৈন্য কুচকাওয়াজ করিতে করিতে বাধির হইয়া আসিল।) দেব দাওয়া, তুমি নিজে সেপাই হান্দুব, পরব ক'রে দেব। আরও চাই? আরও চাই (আর এক দুটো হাতে লইয়া বিড়, বিড়, কলিল, হুঁকিয়া কেলিল, হাতে তাই দিল, আর একমল সৈন্য আসিয়া পূর্ব দলের নামে লড়াইল।) কি দাওয়া হ'ল?

(বেশে হলধরের প্রবেশ)

কি রেজদা, তুমিও এসেছ? বিড়র সোনার মোহরের কব'কব' পথ পুনতে শেবে। দেব দেব তোমাকেও দেব। দাদাকে সেপাই দিবেছি, তোমাকে সোনা দেব। সোঁক ঘর, খাঁটি সোনা। বাও বন্ধা, তুমি তোমার সেপাই দিবে ভাসো, নইলে সব আবার বড় ক'রে দেব। (চক্রবর্তী মিলিটারি ক্যামার গিয়া মিসাদীনের নামে লড়াইল, তাহারা সেলাম করিল, তাহার পরে চক্রবর্তী সব মিসাদীনের লইয়া চলিয়া গেল।) দবাই আজ কথা শোনে, মিলিটারি দলও আজ কথা বলবাবার

শোনে—হাঃ হাঃ হাঃ—। রেজদা, এসো, এবারে তোমার পালা। দাঁড়াও এইখানে, আরি আসছি (বেশে প্রস্থান ও একটু পরে প্রবেশ) উর্কি কুঁকি ঘেরে সেপতে হবে না, পালাব না কোথাও, মোহর তোমাকে দেবই। (কতকগুলি পাতা বিড়, বিড়, করিতে করিতে খলিল, উপরে হুঁকিয়া কেলিল কব'কব' করিয়া নীচে কতকগুলি মোহর পড়িল।) বাও দাওয়া—কুঁকিবে বাও—হাতে ঘরবে না, এই কুঁকুর কুঁকিতে বাও। (হলধর ভাড়াভাঙি মোহরগুলি হুড়াইয়া লইল।) এখন ভাসো দাওয়া—ভাসো—নইলে সব মোহর আবার পাতা ক'রে দেব (হলধরের মোহর লইয়া দূত প্রস্থান।) হাঃ হাঃ হাঃ—কি ভৌতিক সেখান—। উঃ, মাথাটা কিব' কিব' করছে—বুজ্জো,—আলোদুলো নিবেতে দিতে এখানেই একটু দূরে গড়ি (নিজে হারিকেন লণ্ডন-গুলি নিভাইয়া দিল। হারিকেন নিভাইয়া দিতেই এককোণ হইতে নেলে, এককোণ হইতে হেল্পে, অপর কোণ হইতে কেসে অঙ্ককারে বাধির হইয়া আসিল, তাহার পরে তিনঘনে হাত ধরা-ধরি করিয়া উজ্জও নৃত্য আরম্ভ করিল।) কে রে—কে রে তোরা? এঁয়া—সেই পুতানগুলো—তোরা মাঠে ছেড়ে বাড়ি পর্যন্ত বাওয়া করেছিস? আমাকে আয় ছাড়াছি নি—একলয় হুন (তাড়া করিল, বেলে মেলে কেসে তিন দিকে তিনটা লাফ দিয়া মৌড়াইয়া পালাইল।)

পটপরিবর্তন

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।*



মৎস্যকন্যার প্রতি



“তুমি আছো গো কোন্ পাড়া
তোমার পাইনে যে সাড়া”
খাল হাতে ব্যাকারে সেই রান্নাছি খাড়া-
কোন্ সে গোপন বরুণখানায়
কোন্ সে ডেড়ীর নিবিড় পানায়
চুপুর হাতে লোপাট্, হায় বাধালে ঠাঁড়া !
দম্মা করে সামান এস
পোড়া উদর জুড়াও হোস
ব্যাকারমুখো গৃহিণী ওই দিল্লোছ তাড়া !

ইলকশন : গোপী-বিলাপ

প্রেমময় কান্ন, বঙ্গ রাখাল
অতুলা তব জীলা
তোমার দম্মায় গোরু গ্যাছে ওঠে
আকাশেতে ওড়ে শিলা ।
নির্বাচনের আস যে তুফান
তরো টোলোমালা ভয়ে কাঁপ প্রাণ
বড় অসময় এসা রসময়
হাল ধরা এইবার
বামের ঝড়োত ডোবে ব্রজবামা
করো এ যমুনা পার !



ইলেকশন : কৃষ্ণ-বিলাপ

থামা (তোদের ঘ্যানর ঘ্যানর

থামা তোদের প্যান্প্যানানি—

নিজর জ্বালান মরাছি জ্বলে

গোপোপ্রেমের কীই বা জানি !

রেড্ডো মামাই কংস হলে

হালে এখন পাইন পানি—

বক্সানের মুচল আশা

সম্বনা (তোদের ঘ্যানঘ্যানানি—

(ওলা. মর না তোরা. মুই কো জানি !)



অথ কাছাড়

কাছাড়—কাছাড়—কাছাড়

মারব তোকে আছাড়

‘মাতৃভাষা—মাতৃভাষা—’

রক্ত স্খাথা বাছার !

ঝড়ুম-দাড়ুম চলল গুলি

পড়ল লাঠি, উড়ল থলি

চিট্ না করে উপায় বা কী

নেহাৎ আমি নাচাৰ !

পশ্চিম জার্মানী



বামু বাহ পুরোঁয়ে
ওগো মার্কিনী সৈঁয়া
সয়না তো হেন ছালা

আকি আলাপালা হৈয়া-
হিটলারী ছুত জাগো
বাঁচা গৌকে খুব রাগো
ইহুদী ঠ্যাঙাই কাব

যত একদিল্ ডৈয়া :
(দিয়া) নাৎসী গাঁজায় দম
(আর) ব্যাগিয়ে এ্যাটম বম্
নাচি ডৈরব নাচ
তা-তা-ইশ-ইশ-ইশয়া ।

ধিক্কার

পাগারিন ওড়ু, তিতড্, উড়াহ—
বুলিই তোদের সার
চাঁদে গিয়ায় যদি লাল ঘাঁটি গড়ে—
কাঁচকলা পাবি আর !
কী বকিস তনি ? ওরা আশুমান ?
আর-রে সর্বনাশ—
কোটি ডলারের ছুবড়ী ছুটিয়ে
কাটিস মোড়ার ঘাস ?
হয় চাঁদে ওড়ু—না পারিস মোড়ু—
নয় ছুব মর জলে
নইলে চড়াবো বিকলী চেয়ারে—
সে কথাটি দিমু বলে ।



ନରଥାଦକ ବୃତ୍ତା

ବୋଷ୍ଟାଟେ ଓଇଁ (ବୋଷ୍ଟାଟାକ ତାତାଓ
 ନରଥାଦକ ବୃତ୍ତା ଓକେ ମାତାଓ
 ଓ ସଦି ରସ୍ତ ଜେନା ବୁଲେର ଶ୍ୟାମେର
 ପାକାପାକି ରହିଲ ଡୋକ୍ତେର ପାତାଓ !
 ଲୁହୁଷ୍ଟାକେ କାରେଲିଲୁମ କାବାର
 ସେମ-ସାହିଡେ ଦାଗ ହାଲୋ ସେ ସାବାଡ଼ ।
 ବେଲଜିନ୍ନାବୀ କୋଲଜ୍ଜାବୀ କୀ ଏ -
 ଚୁପି ଚୁପି ଏମାଏଜ୍ଜାଲୋ ହାତାଓ ।



ଆରାଦୋଂସବ

ଲାଲ ଶାଲୁ ଓଢ଼ି
 ଟାନ୍ଦାଓଳା ଘୋର
 ଆସେ ଓଇଁ ମହାପୁଞ୍ଜା—
 ମାଥା ଟବ୍ ଟବ୍
 ହାଡ଼ି ଟବ୍ ଟବ୍
 ଶୂନ୍ୟ ଜାଲେର କୁଞ୍ଜା

মাঝ রাতে তুমি ঘুম ভাঙা চোখে
 দেখেছো কি ঘরের আকাশে
 সারি সারি তারার মিছিল,
 রানি রানি অকুহাণ কোটি কোটি পুত পুত তারা,
 নীহারিকা, ছায়াপথে অগণন নিখিলের নীল সাহার। :

মনের আকাশে তেমনি কত শত স্মৃতির মিছিল
 গুচ্ছ গুচ্ছ তারার মতন,
 চৈত্রেয় করা পাতা দিন
 অতীতের স্মৃতি সব হিসাব-বেহিল

স্মৃতির কোরক কত কথা করে ওঠে,
 গান গায়, হৃদয় কাঁপায়
 আবারে রুটি ভরা রিম রিম হারে
 উছল কায়ার ভেঙা রাতের কিনারে ।

মাঝ রাতে তারা ভরা নীলে
 আমি শুধু দেখে যাই স্মৃতির মিছিল,
 হিম হিম ছায়া মেলা গণিত-অতীত কত স্বপ্নের চিল :

আমার অতীত বেন বোবা চোখে
 দুখে যাওয়া অক্ষ আশ্রয়না,
 আমার আমিবে বেন হলে সেছি
 তব কুসুম না !

শান্তি দাও, ক্রান্তি দাও

কীৰ্ত্তন চক্ৰবর্তী

নগর পুথ	চৈত্র মাস	দ্বিপ্রহর ধূ
বেতার ঘন	অধেষণ	অধেষণ শুধু
একটু মল	শুভভার	অকুপণ ছায়া
একটু দাও	তপ্ত হোক	তপ্ত এই কাহা ।

শান্তি দাও	ক্রান্তি দাও	চৈত্র দিনগুলি
সবুজ হাল	হলুদ বন	নতুন ঘন খুলি
আকাশ নীল	বাড়াল লাল	কপোত চোখ নদী
কিশোর ঘন	অধেষণ	পেতাম কেন যদি ।

তিরিশ পায়	স্বক স্বক	তোমার আছে চেনা
চুলের পাক	ধাতের কীক	ঘেনার পরে সেনা
সখের	লিঙ্গা চের	বার্ভার পুঁজি
আলাসে মন	কলা সাধন	অনর্থক খুঁজি

চল্লিশের	চালুসে চোখ	দৃষ্টি পাক কিরে
তিব্জি ওর	দিনগুলোর	রোমন্থন ঘিরে ।

এই বঙ্গোত্তরকারী ঘটনাটির প্রত্যেকটি দিকের এক একটি গভীর প্রাতীক্য রয়েছে। দুনিয়ার প্রথম মহাকাশ অভিযাত্রী সোভিয়েতের নাগরিক। এ হচ্ছে সরাভভভের প্রার্থীর প্রতীক। প্রথম মহাকাশ বিজয়ী বীরের আখ্যায়ের নাম "প্রাচী"। পল বঙ্গোত্তর ভাষায় বলতে গেলে এই নামের মধ্যে সূচিত হচ্ছে জন্মভূমির সেই অকল্যাণের দুঃপ্রাচীর কীর্তি কাছিনী যে অকল্যাণের বর্ষাধরে আশ্রয় সরাভভভের প্রাপ্য। এই প্রাচীর অকল্যাণে গাইতে গিয়ে আনন্দের কবি বলেছেন :—

প্রথম প্রভাত উষ্ম তব গঙ্গায়ে
প্রথম দাশ-কর ভব জগোবনে...
জান বর্ষ কত কব্যা কাছিনী"।

প্রাচী দ্বারা পৃথক করে উষ্ম অঙ্গুষ্ঠাঙ্গে। সেই ১২ই এপ্রিলের উষ্ম নিম্ন মর্ত্য সীমা চূর্ণ করে সোভিয়েত নাগরিক পাগারিন বিশ্ব মানবের জীবনোত্তীর্ণহাসে এক নতুন যুগের আহ্বানকে হন।

এই পরম ঐতিহ্যিক সেই রক্তের একটি দিন যার



দুনিয়ার প্রথম মহাকাশ বৈমানিক পাগারিন

মানুষ মহাভাগ্যে ভবিষ্যৎ

দশকের গাতি পৃথক্যের কবী লেখক ডেকান ব্রুইস বলেছেন :—

"এই রক্তের অপরূপ নাটকীয় ঘটনাবলী ঘটে যার একদিনে, এক ঘটায় এমন কি মাত্র মৃত্যুভয়ের মধ্যে যার ওপর নির্ভর করে গোটা মানব জাতির পৃথক বর্তমান নর, ভবিষ্যৎও বটে।" আর পাগারিনের এই অপরূপ নাটকীয় কীর্তির ফিটিলি কব্যা ভাবতে ভাবতে বিজ্ঞানাত্মক পারিন রক্তাক্ত করছেন :—"আবার সারাটা জীবনে যদি একটি মাত্রও মৃত্যুর স্মৃতি না থাকত আশ্বস্তের পৃথক এই একটি দিনের জন্যেই আনার বেঁচে থাকা দার্থক।"

এই হচ্ছে সারা দুনিয়ার সমস্ত সভ্য মানবের অভিনত ও অদ্বৈতীয় প্রতিচ্ছবি। মানব পৃথি পায়ের জীব বলেই তার জ্ঞানের পরিধি চার পেয়ে জীবজন্তুর হৃদয় ও বোম্বকে এতখানি ছাড়িয়ে বেতে পেরেছে। নরমান্ব থেকে নর হুণাত্তরিত হওয়ার প্রথম ভূমিকার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এপেলস এই ব্যাপারটির ব্যাখ্যা করেছেন। আনন্দের কবি রবীন্দ্রনাথও এই কথাটাই বলতে গিয়ে লিখেছেন :—"সেইর দিক হইতে মানবের প্রার্থিত, সেইখানে—যেখানে সে পৃথি পায়ের উপর ভর করিয়া সোজা হইয়া নীড়াইবার নিক্ত আহ্বান করিল।

...উপরে মাথা তুলে মানব সেখানে কেবল বহুত্বের নর, সেখানে পৃথক্যে অপরূপ বিচিত্র বহুত্ব একত্বকে।

...মানবের কল্প মূর্ত্ত যেহে যাত্রির নিরন্তর টান ছাড়িয়ে যেতেই তার বন এমন এক বিরাট রাস্তার পরিধি পেরে যা অসম্ভবের নর, থাকে বলা যায় বিজ্ঞান ব্রহ্ম, আনন্দ ব্রহ্মের রাস্তা।"

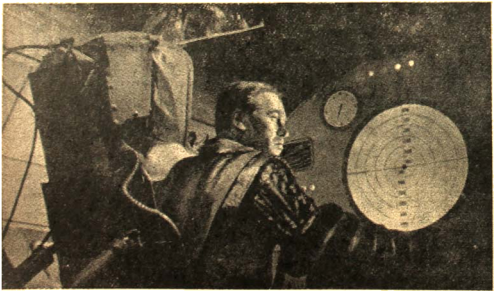
বর্তমান বিজ্ঞানে বিশ্বাসী না হয়েও "নিউটনিক হেরাল্ড ট্রিবিউনের" ভাব্যকার ডেভিড লরেন্স লিখেছেন—

মানুষের মহাকাশ পরিকল্পনা "আরম্ভ হয় আর থেকে ৮ বছর আগে বহন মানুষের প্রাণৈতিহাসিক পূর্ব-দৃষ্টান্তের প্রথম পিরামিডের দূরে গিয়ে ভর করে দাঁড়িয়ে ওঠে।" এতে কোব সম্বন্ধ নেই। কিন্তু তার পরেই এই 'ভলার' নামক "হলদে শরভানের" অনুবৃত্ত দাসান্দ-গান তাঁর চতুর্থ পূর্ব-দৃষ্টান্ত পিথিক্যানথোসের শার করে গিয়ে লিখেছেন :—"এই ব্যাপারটা পৃথিবীর তিহাসের সবচেয়ে বড় ঘটনা, এটা যাচ্ছে কথা।" তাঁর তে এমন কি কান্ডিন প্যাপাসের কেরামিতিও গাফারি-নর বাহাদুরীর চিত্রে বড়। তার গারে হাটিলে চোখ জ্বালা নাতির দিকেই থাকে ওপরের আকাশ দেখা যায়। তবে কিনা, গাফার পকে দুখ না খোলাই ভাল গরপ দুখ বড় রাখতে বৃষ্টির প্রয়োজন হয় না।

পূর্ব-জ্যোতিষ লরেন্স কেন, আরো কিছু কিছু লম্বাও পিথিক্যানথোস আছে। তাঁর ভলার পূর্ব-দৃষ্টান্ত লম্বা পকে মানুষের সবচেয়ে বড়ো আনন্দের দ্বি-লরেন্স বৃষ্টি বিশোতে বসেছেন। যেমন বরণ "নিউ বর্ক" পোস্ট পদিকার উইলিয়াম গ্যানন লিখছেন :—

"গাফারি-নর মহাকাশ পরিকল্পনা কোন জরাজীর্ণ নর, এক বেননারক শোচনীয় ব্যাপার। এতে মানুষ পর্ব বা শান্তনা, কোনটাই পাবে না।" এই গ্যানন বর্ক কতক আগে "ইন্ডানের নামের মোশা" নামে একখানি পুস্তক প্রদান করেন। অনেক গল্প বেরবা সত্য করে তিনি সেই বই এর মধ্যে "পিল্ট-ভাউন মানব" বলে একটি অধ্যায় কেঁসেছিলেন তার মধ্যে কুখ্যাত ক্যান্ডিস্ট ব্যাকারি'র টেলোচান্ডাসের কথা আছে। ব্যাকারি' পূর্বী ব্যাকি-কৃত লোকের মাঝিক লেন্স'দোবে জরলোকের মনেও সেই ব্যাকি'র বীজ লজ্জামিত হয়ে পড়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি 'পিল্ট-ভাউন' অবস্থা থেকেও অথলোতে গিয়ে 'পিথিক্যানথোস' অবস্থা এসে নাকানি টোবানি যাচ্ছেন।

আর এককনের পূর্ব-গানকৃতি বা 'আটান্ডিম্ব' দেখা যাচ্ছে তার দরুনা পূর্ব-আমেরিকা কেন, আমায়ের এই দেশেও রয়েছে। আলেকজান্ডার সেভেরিক' একজন প্রতিবিলম্বী পদাতক রূপ। তিনি আমেরিকার আদ একজন বিমান বিদ্যার "একপার্ট"। তিনি বহুবা



করেছেন যে আগামী বছরের মেম্বারগণ বায়ু "গ্রাণিয়া আমাদেও পৃথিবী থেকে নিষ্কাশ করে ফেলতে পারবে এবং গ্যাসারিদের মহাকাশ যাত্রা সেই শতকের দিকে এক সাময়িক পদক্ষেপ হাত।"

মার্কিন সরকারের মহাকাশ গবেষণা কমিটি গত তাত্ত্বিকাত্মক সম্ভব চাঁদে সৈন্য বাহাবার জন্য সর্বাত্মক প্রয়াসের আহ্বান জাতিয়েছে। একেবারে পাখ পাখ ধব। বেগারা চাঁদ! এতদুর্লভ 'চতুর্থ' তার দিকে চেয়ে গজ'ন করছে! মোকটা তো চাঁদেরই কারণ তথ্যলো ঈর্ষার অন্ধ'রিত হয়ে খেসোক্ত করে বলেছিলেন : ও যোবে তো চাঁদেরই, কেন সে পৃথিবীর এত কাছে আসছে তার কলে হান্ধবগুলো উদ্ধারের হত তাকে ধরবার চেষ্টা করছে!

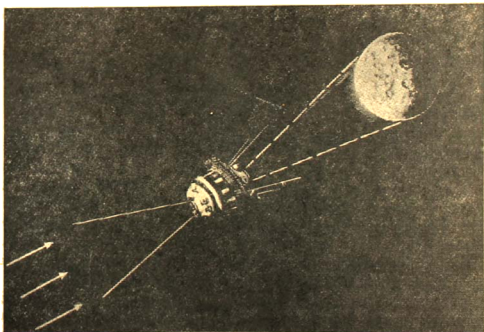
সেভেরিক'র প্রতিবর্তন পোনা গিয়েছে আমাদেও মেগের পক্ষাশাণ্ড থেকে। বোবেল-পুঙ্খার জন্য 'আচার' রমন ৭২ বছর বয়সের পর প্রাণোপাতিক করেছে

যে গ্যাসারিদের কীভি'র মধ্যে বিজ্ঞানের লেশমাত্র নেই, আছে শুধু সাময়িক উদ্বৃত্ততা।

এই দৃষ্টি অভিযোগের জবাব দেওয়া দরকার।

গ্যাসারিদের মহাকাশ পরিভ্রমার মধ্যে বিজ্ঞানের নাম পক্ষ বেই এই অভিযোগটিই আসে বরা থাক। সোভিয়েত পত সাড়ে তিনবছরে বৈজ্ঞানিক সিংস্কৃতির সূচকে বংশকৌশলের দিক থেকে কোথার ভুলে গিয়ে গিয়েছে! সোভিয়েতের পদুয়নিক, রকেট ও মহা যোযবাদের ব্যাব্ধিক উৎকর্ষ সর্বজন সন্ীকৃত। দূতরাং সে দিকটা বান বিলাস। মানবিক দিক থেকে, মানবের ভবিষ্যতের দিক থেকে বিজ্ঞানের বানদণ্ডে গ্যাসারিদের কীভি'র বিচার করাই বাবার উদ্দেশ্য।

একবারে আদিম কালের জীব থেকে পৃথিবীতে বতরকরের জীব আছে তারা প্রায় ২০০ কোটি বছর আগে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে বিবর্তনের পথে আত্মকের বিভিন্ন বিচিত্র রূপে আয়প্রকাশ করেছে।



তৃতীয় পৃথিবী চাঁদের শিরায়ের দিকের হাব ফুসছে

বতহর মনে হয় প্রাণবত্ব অতুল্য হয়েছিল মহাসাগরের উচ্চ জলস্তাির বৃদ্ধি। তারপর পার্থক্য প্রতিবেশের পরিবর্তমান হারার প্রভাবে আদিম প্রাণবত্ব দুগুণে বৃদ্ধি পাইল। বিভিন্ন জটিলতা নিতে বিভিন্ন ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই হারার মধ্যে সেই প্রাণবত্ব পার্থক্য জগতের বিভিন্ন পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাবশালিত্ব নিয়েছে আত্মক করে। প্রাকৃতিক নির্বাচন বহু দুগুণ আগে, বহু আদিম প্রাণীকে ফেলেছে পৃথিবীর বৃদ্ধি থেকে নির্মূল করে।

পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তিকালে আত্মকের মত প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল না। সে সময় আবহবৃত্তলে অক্সিজেন ছিল কিনা সন্দেহ, থাকলেও সে না থাকারই মধ্যে। আত্ম জন্মের ৩০ কিলোমিটার উচ্চতায় ওজোনের তরে যে অতিবেগুনী আলোক রশ্মি শোষিত হয়ে যায় সেই রশ্মির তত্ত্ববকার মিনে পৃথিবীতে আনয়নো ছিল অসম্ভব। কিন্তু, আত্মকের কপাতি হচ্ছে এই যে প্রাণের প্রকৃতির বহু আগে আদিম মহাসাগরে জৈব-পদার্থ গুলিকে সংশ্লেষিত করার প্রথম পদক্ষেপ ছিল এই অতিবেগুনী রশ্মি বা আত্মক কালের প্রাণীদের পক্ষে এখন অসম্ভব।

মহাসাগরের পৃষ্ঠের স্পেসে স্পেসে আবারও এই প্রাকৃতিক যে পরিবর্তন হয়েছে তার মধ্যে জৈব জগতের কার্য-কলাপের অবদানও সামান্য নয়। আত্ম আর আদিম দুগুণের প্রাণীদের পুনরাবিস্তার সম্ভব নয় এবং আবিস্তার হলেও আত্মক প্রাণীরা, যারা আত্মকের দ্বিতীয় জীবন সংক্রান্ত ফেনোমেনা রাখে, তারা ঐশ্বর্য আদিম জীবকে অংশ করে ফেলেবে।

প্রাণের দারভাঙ্গ উপলব্ধি করতে হলে জৈব জগতের বিবর্তনের প্রতিটি পর্যায়কে জানা চাই। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোন জীবাশ্ম নেই ফেনোলির সাহায্যে সেই বিবর্তনের প্রমাণের চিত্র আমরা পুনরাংকন করতে পারি। পুস্তকায় আত্মক কালের জীবনগুলির বিপাক-ক্রিয়ার তুলনামূলক ক্রিয়ার করে তাই থেকে সিদ্ধান্ত চাওয়া হোক। এখনো পর্যন্ত অন্য কোন পদক্ষেপ নেই।

বিজ্ঞান আত্ম পর্যন্ত থকটা জানে তাতে বত্বর পর্বতক আভিযুক্তি হচ্ছে দানব। হানুই জীবনের জটিলতম

পরিপ্রকাশ। আগে আগে অনেক মনে করতেন যে হয়ত অতীতে অন্য গ্রহ থেকে মহাকাশগতিক অভিযাত্রীরা পৃথিবীতে গমন দিতে এসেছে বা উদ্ভিদদের বীজ এবং বিভিন্ন জীবাশ্ম অন্য গ্রহ থেকে পৃথিবীতে প্রাপ্ত হয়ে নিয়ে এসেছে। কিন্তু আত্ম পর্যন্ত এই সব মতের লগ্নকে তো কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না, বরং উত্তেজিত দিকেই প্রমাণ আছে। এ কথা মনে করবার লগ্নত কারণ আছে যে মহাকালের দাপটে পৃথিবী থেকে যে সব জীবন নির্মূল হয়ে গিয়েছে, চাঁদে মললে বা পৃষ্ঠে ফেনোলির কিছু কিছু হয়ত আত্মও বর্তমান। যদি তাই হয় তাহলে ঐ সব গ্রহে গেলে পৃথিবীর যে অতীতের কোন চিত্র আত্ম খুঁজে পাওয়া যায়না সে অতীতের আসল চিত্রা হরত দেখতে পাওয়া যাবে। হরত দেখানে জৈব বিবর্তনের কতকগুলি প্রাথমিক পর্যায় চাকর দেখতে পার। জৈব বিবর্তনের আদি পর্যায়গুলি অনেক দীর্ঘস্থায়ী ছিল। আমাদের বিবর্তনের সেই আদি অতীতের কিছু কিছু উত্তরন আত্মও মহাজগতের অন্য সোকে বেঁচে থাকা খুঁজে সম্ভব। গাঙ্গারিনের পরিষ্কার যে দরজা খুলে দিচ্ছে তাই দিতে হানুই সম্ভবত বিশ্বজগতে জৈব বিবর্তনের আত্মক হারার মনোকার কতকগুলি হারিয়ে যাওয়া ছেড়ে খুঁজে পাবে।

তবুও ব্যাতিরে যদি বার নেওয়া যায় যে অন্য কোন একটি গ্রহে এমন উচ্চ জৈব জগত দেখতে পাওয়া গেল বার স্পেসে আত্মক পার্থক্য জগতের সাধারণ আছে; তাতেও জীবনতত্ত্ব লগ্নকে আমাদের জ্ঞান বাড়বে কারণ স্মা পরিবর্তনশীল প্রতিবেশের সূচক ব্যাতিরে নিয়ে বিবর্তিত হওয়াই এখন জীবনের বর্ষ তখন পৃষ্ঠ বা মললে জীব উচ্চ জৈব জগত হলেও তারের মধ্যে কিছু কিছু অনন্যতা থাকবে কারণ ঐ গ্রহ পৃষ্ঠের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে।

আবার সৌর জগতের অন্য কোন গ্রহে যদি প্রাণের অতি উচ্চ দেখতে পা পাই তাহলেও আমাদের জ্ঞান কম লাভবান হবে না কারণ সে ক্ষেত্রে জৈব পদার্থ লগ্নকে আমাদের এতদধিকার হারবার অনেক কিছু

ঢেলে লাগতে হবে। তখন দেখতে হবে একই অবস্থায় অভ্যাসিত হবেও একসুখি গ্রহের মধ্যে পৃথু পৃথিবীর মধ্যে এমন কি বৈশিষ্ট্য ছিল তার জন্য প্রাণের উদ্ভব হোল পৃথু এইখানে ?

বিজ্ঞানীরা 'ওপারিন' মনে করেন যে মহাকাশে অভিযানে বার হয়ে বহুতর এমন ধরনের চলৎশক্তি সহান মিলতে পারে যা জৈববর্ষ জাত নর অথচ পৃথুই উদ্ভাপের। বহু বিবর্তনের নিম্ন সরঞ্জ মহাধিমে প্রযোজ্য। সেই বিবর্তনের পর্বীর বিশেষে বহুতর সঙ্গতির ভৌতিক ও রাসায়নিক নিয়মগুলি কতকগুলি নবোদ্ভূত ও তটিলতর নিয়মের দ্বারা চাপা পড়ে। তুমণ্ডলে সেই নিয়মগুলির পরিষ্কার জৈববর্ষে। কিন্তু অন্যরকম অবস্থায় বহু অন্য আকারে ও বর্ষে আচ্ছন্নকার্য করতে পারে যা পৃথিবীর জৈব পর্বার্থের মত না হলেও সেগুলির চেয়ে উৎকর্ষের দিক থেকে খাটো নর।

এই থেকে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বিশ্বমানবের ভাবীকালের দিক থেকে মহাকাশগতিক অভিযানের পৃথু অপরিহার্য। জীবনভয়ের উপলব্ধির একমো অর্ন্তক কিছুই থাকি। মহাকাশবের মহাকাশে আবিস্কার জীবনভয়ের দায়বহু লক্ষ্যে আশ্রয়ের ধ্যান ব্যক্তার মধ্যে অনেক কিছু মৌলিক ত্রুটি নপোহন করতে সাহায্য করে জৈব-কগতের বিবর্তনের মানচিত্রের বহু পৃথু স্থান পৃথু করতে সাহায্য করবে। এবং এই বহুকার্যের প্রথম অগ্রণী বোঝা যুগ্মির আলোকন ইয়োজিত গাগারিন।

এইবার অন্য অভিযোগটি বরা যেতে পারে, অর্থায় গাগারিনের বাহাদুরীর লক্ষ্যটা সার্থক এই অভিযোগ। প্রথম কথা, গাগারিনের সাক্ষ্য সম্পর্কে সৌভিক্ষেত কনিউনিট প্যারিস বার্ষিক বলা হয়েছে যে গাগারিনের সাক্ষ্যকে সৌভিক্ষেত অবগন বিশ্বমানবের সাক্ষ্য বলে বলে মনে করে এবং তারা সেই সাক্ষ্যকে পৃথিবীর সর্ব মানবের সেবার, প্রসারিত দ্বার্থে এবং সর্ব মানবের সুখ পাতির দ্বার্থে উৎসর্গ করতে চায়। তারা তাদের কোন সাক্ষ্যকে পৃথু দ্বার্থে ব্যবহার করতে চায় না। সৌভিক্ষেত ইউনিয়ন মহাকাশে প্রথম



মহাপৃথু ব্যক্তার প্রাচ্যালে গাগারিন

পৃথিক পঠাবার পরে মহাকাশে কোন একজন্ম অধিকার দাবি করেন বা চাঁদে হকটে পাঠিরে চন্দ্রলোকে কোন রাজত্ব দাবি করেনি। কেপল্যাশে প্রেণ্ডল্লাভ করেও সে আগাগোড়া পৃথিবীক নিঃশ্রীকরণের জন্য সংগ্রাম করে আসছে, একতরকা পারমাণবিক অস্ত্রপরিচা বহু করেছে, সৈন্যবল হ্রাস করেছে বার বার। হাইড্রোজেন বোমার অধিকারী হয়েও সে কাউকে স্যাক্ষ্যার্থীরে মত পাঠির বোমা মারার ভয় দেখাবনি। তবে হাঁ যে হকটে গাগারিনকে মহাপৃথু পৌঁছে দিতেছিল তা পৃথিবীর যে কোন আশ্রয় হাইড্রোজেন অস্ত্রা পৌঁছে দিতে পারে সে কথা সত্য। কিন্তু ত্রিক সেই জন্মেই শিখর বহুতর, কশো বহুতর, সেবান বহুতর, গিরিমা বহুতর কিন্না আক কিউরা বহুতর, কোথাও হিংসে বিশ্ব পাত্রাঅবাসী যেটি প্রত্যক্ষ আক্রমণ চালাতে দায়ন পাচ্ছে না। এর থেকে এই সত্যই প্রমাণিত হয় যে, সৌভিক্ষেত হকটে পাঠির পৃথু নর বহু।

কিন্তু প্রতীচা ও প্রাচ্যের প্রতিক্রিয়াশীল মহল যাত্রা পৃথিবীর কাছে আসার জন্য চাঁদকে সোম বিয়ে দিচ্ছেদের অপকর্ষের সাক্ষ্যই গান, যাত্রা সৈন্যসামন্ত

নিজ গায়ে সাময়িক ঘাঁটি বানিয়ে পৃথিবীতে তাঁদের পোষপত্রাক কায়েম রাখতে চান তাঁদের আর খুঁসি আশ্বাসনে ছাড়া আর করার কিছুই নেই। তাঁদের নৃশিষ্টের এতকালের প্রতিষ্ঠিত যেনতার বিজয়ের ভিত্তি আজ নড়ে উঠেছে। দুরাকৃত্যবোধ প্রগতিশীল বিজ্ঞান আজ তাঁদের আধ্যাত্মিক বাধ্যতাল ছিন্ন করে মহাদুর্ভোগে বাথ হলেছে স্বর্ণবিজয়ে। এটা স্তম্ভা নইতে পারছেন না। তাই নিষ্কল আকোশে উন্মোচিত করছেন যে গাণ্ডারিদের কীর্তি সার্বিক উল্লভতা! হাতিতে চারপায়ে লানগর্ভি হিয়ে চলবার অন্য ধানের কল্প তারা কোন দিনই আকাশে উড়তে পারবে না।

গাণ্ডারিদের অশ্রু কীর্তির গিহনে যে অসামান্য তন্ত্রল রয়েছে তা কোনদিনই আক্রমণাত্মক উল্লেখে ব্যবহার হবে না। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী বলবশী রাষ্ট্রদোষ্টী এবং প্রদানত তাদের ষোল্ল হার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বা অ্যাক সাগা দুনিয়ার দর্শনে গওগোল পাকাত্বে, যদি তৃতীয় মহাদুর্ভোগ বাথার তাহলে দোভিত্তেভের সেই বস্ত্রল তার আত্মরক্ষার নিকটই ব্যবহার করা হবে। শূন্য আত্মরক্ষার নব, তখন হিংস্র নেকড়কে তাক্সা করে পের পদে তার আত্মদার নিয়ে তাকে ধতর করার জন্মেও তা ব্যবহার হবে। তাই আশোষ আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ দহাবস্থান নির্মিত কবাই একমাত্র পদ। এই সত্য কথাটি আজ বাস হার্কিন হুককেও যে লোকে বুকতে শিখছে তার প্রমাণ রয়েছে জগাশিটনে

অনুষ্ঠিত সাম্রাজ্যিক বিরোধীকল সম্মেলনে। তাতে হার্কিন ট্রেড ইউনিয়ন, জনসংস্থা এবং ধর্মীয় সংগঠনগুলি থেকে ৩৫০ জন প্রতিনিধি যোগ দেন। যে আমেরিকার শান্তি সংগ্রাম অপরূপে বলে গদ্য ছিল সেই আমেরিকার আজ এ হেন ব্যাপার! সম্মেলনে কোয়েকার সোসাইটির রেমণ্ড উইলসন বলেন :—“আমরা বিজিতে চাই বন্দেই বিরোধীকল চাই। দুনিয়ার বৃহৎ বৃহৎ লোক অসংখ্য কিন্তু আমাদের কামান দিয়ে তাদের পেট ভরবে না। আমাদের আমেরিকা আত্মরক্ষাতিক আশোষ ধীবাঙ্গার অন্য লোকগণের হাত ১১ সেন্ট (১ হোভল কোকাকোলার হার) খরচ করে।” নোবেল পুরস্কার বিজয়ী নোবেল বেকার বলেন : “আমি যুদ্ধের দহাবস্থানের প্রত্যাবকে ভয় পাই না।”

হুটনার এই বাথার পতিরোধ করে এমন সাধ্য কারো নেই। সেই সঙ্গে সোভিয়েত বিজ্ঞানের অগ্রগতিও অপ্রতিহত গতিতে চলতে থাকবে। মহাদুর্ভোগে মহান উল্লেবে জ্যোতির্বিদ উল্লেবে মহাবিশ্বের মহদা উজ্জারে জতী হয়ে প্রতিজ্ঞাশীলদের হাতে কীবন বিলম্বন দেন; যেমন ঘিরেছিলেন মেটো, যেমন ঘিরেছিলেন গ্যালিলিও। জ্ঞান ও প্রগতির পদে সব বৃন্দেই ছিল, আছে এবং থাকবে যারা প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রত্যেকটি শাকল্যের বিরোধিতা করবে। কিন্তু উল্লেভ ভাবিত্যভের দিকে হান্দুব এগিয়ে চলবেই সেই সব কটি ললিত করে।



উদ্ধবলোক

নরেন্দ্র নাথ মিত্র



ক্রান্ত দিকসে অন্ধ কবিগৌড়চাঁপ-নামে কীরে এল
নন্দীমাহব, ছেলে গুলি বড় গুলু, অশান্ত। বজ্র বেপি
গোলমাল করে। বিশেষ করে নন্দীকে বেধেলে ওরা
মেনে পেরে বসে। মোটেই ইয়ুক্রান্ত চোরায়া নব নন্দী।
ছোট খাটো মানুষ। হোণাটে ও একটু তোৎলানি
আছে। ছেলেরা সেই পুঁলিতার লুণ্ণে নিতে ছাড়ে
না। বারো পিছনের বেঁকে বসে তারা প্রায়ই বাস্টার
হাটাইর অনুকরণ করে, গ্যা—গ্যা শ্যার—।

নন্দীমাহব কখনো বা রাগ করে দমক দেয়, বেঁকের
গুলি হাঁডাতে বসে, কোনদিন বা মোলারেম শব্দে
উদগৈন দিতে থাকে, 'গুহুভনদের সঙ্গে অফল করতে
বেই। জিয়ারে কথা বরি তোমরা মন দিবে না পোন
পিছবে কী করে। অস্তাবান লভতে জ্ঞানব, তৎপদ
দবেতেস্তিঃ : প্রজ্ঞা না থাকলে—।'

প্রজ্ঞা যে একটা সংস্কার ছেলেরা স্বীকার করে
কিন্তু মনে রাখতে পারে না। গুঁধনিতি যেতে না
যেতে কের গোলমাল শব্দ করে দেয়।

খাণ্ডও অনেক ক্রাসে ওরা বড় গোলমাল করছিল।

পাণের ঘরে ক্রাস মিছিলেদে লককারী চেজাস্টার তলে
বাবু। তিনি বিবক্ত হয়ে ওঠে নন্দীমাহবের পে
দামনে হাঁডালেদে 'আগানার ক্রাস মানেক করু নন্দী।
আপনার ক্রাস দিকস, শারা খুলে মাখায় করে তুলে
আমি এক বর্ণে পড়াতে পারছিলাম।'

তারপর নিজেই ছেলেরে বনডাতে পরে, করু
ভবেদ বাব: 'এই ক্রাস দিকস, কের যদি তাম
গোলমাল করে আমি প্রত্যেককে বেঁজিতে দাম ব
বেব। ফাইন করব একটাকা করে।'

অমনিই সব চুপ। স্ফুটপতনের শব্দ শোনারা:
জঙ্ঘতা। হবেনা কেন। ভবেদ শাব্যালেদে বেশ লা
ওড়া চোরায়া। শব্দবর্ষালয় জাতি। গলাব কের
শব্দ। ছেলেরা তা জানে।

অদমানে শব্দ চুন করে গুলি নন্দী। প্রহায় ত
লাভ হয় কিবু, ভব না থাকলে বোঝ চম প্রজ্ঞা
হয় না।

যাযিক বাবে বণ্টা পড়লে নন্দী জিচাঁপ র
এলে তার হাতলশঙ্কাটা চেয়ারজিতে বসে পড়ল।

চিকিৎসকের সন্মত হইলে আরো চারজন ডিচার এসে জড়ো হইলেন। কেউ বা জানলার বাহরে নিরে বুলেছেন প্যাবরের তৌটো, হেলেরা হাড়া পেতে ঠেঁ ক পুরু করে দিবেছে। বাইরে টেকের কড়া ঘোর ঝাঁঝ করছে। মাঠের পরে মাঠে বহুভূমির বহু কোন ফল নেই।

ননী চোখ কিনিতে নিরে জিজ্ঞাসা করল 'আজকের কলকট্টা এসেছে?'

কারো কানে গেল কিনা বোকা গেল না। ননী বোঝে এর স্বস্বভাবিক করে থাকবে।

বাংলার সীমান্তে এই নকশাবল সমুদ্রে বহুদূরের আসে স্বরের কাগজ পাওয়া যায় না। প্রথম প্রথম ননী বুঝে অনুবিদ্যা বোঝ করত। কলকাতার চারের মধ্যে কাগজ পড়া আবাস্যের অভ্যাস ছিল। এখানে এসে চা আর কুমার আলোচনা হয়ে গেছে। আরো কত অভ্যাসই যে বদলাতে হয়েছে তার ঠিক নেই। প্রথম প্রথম কেই রোঁশে খেত। তাতে হাত পুড়ত, পেটও খেঁচত না। বাস হইকে বাসে বউ আর ব্যাভা হেলোটিকে দিত এসেছে। তাতে আবার অন্যদিকে কানোলা বেড়ে গেছে। বাসা ভাঙা দিতে এর পণ্ডিত টাক। যেকের সময় বহু জেগায়ে হয়। বৃটো টুইন নিবেছে সীমান্ত। কিন্তু তাতেও সব লক্ষ্যমান হয় না। কল্যা ক্যানিলি নিজের কাছে না এনে উপায় ছিল না। কলকাতার দালার দলোরে কতদিনই বা ফেল রাখবে? বহু পরে পাঠিরও অপারির সীমা ছিল না। তজ্জাড়া বউয়ের তো সাধ-স্বাক্ষার আছে। আর মেজোবার দর পতা টাকার ভাগির দিবেছে। 'সবই বাড়ত। কাল কিছু বাজার চলবে না।' দরজা হাতের জন্মে শ্রমকে বহুনি দিবে এসেছে ননীমানব। কিন্তু দিলেই কি আর সমস্যা নিটবে?

'এই যে কাগজ বিন স্যার।'

হুসের বেয়াসা সোবিশ কাগজ আর ডাক নিরে এল। এতকলে। হাট্টার মণাইয়া ওয়ারে গপ করছেন। ননী দরজার কাছে এগিয়ে এসে কাগজ আর চিঠিপত্রগুলি নিল। তার নামে একখানা চিঠিও নেই। আগে বউ দিবত, এখন সে তো কাছেই থাকে।

চিঠিপত্রগুলি টেবিলের ওপর রেখে দিবে ননী কাগজখানাই হুসে ফেলল। বুলেই লাফিয়ে উঠল, 'শ্রীমদা, সেবেছেন? দারুণ কাত।'

শ্রীমদোমানব এ হুসের পুরোন বাস্টার। বহল পকাশ হাফিয়েছে। এই ভর-হুসেরের সন্ম চোয়ারে হোলান দিবে বসে বসেই একটু হুসিবে নিচ্ছিলেন। তিনি থেকে উঠলেন। হুস ভেঙে বাওয়ায় নবীর দিকে তাকিয়ে বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কী হল? আকাশ থেকে পড়লেন যে। কী দিবেছে।'

ননী বলল 'হারুদ বহর ত শ্রীমদা, রাণিমা ফেরে মহাকাশে মানব পাঠিয়েছে। ইওর গ্যান্সারিন পাঠটন ওজনের ক্রকটে করে পৃথিবীর কক্ষপথ হুসে এসেছে।

বিস্মত ননীমানবের মতো কিসের একটু উদ্বেজনা আর চাকলা দেখা দিল এতকলে।

শ্রীমদা বললেন, 'ও তাই বলুন।'

ভারপর কাগজখানা নবীর হাত থেকে নিবে তিনি পড়তে লাগলেন। ইংরেজীর ডিচার শুরেন দত্ত, মৃগী-মোহন ক্রমবর্ধী সবাই এসে হুকে পড়লেন কাগজখানার ওপর।

খানিককল হয়ে হুস আশাপ দ্যোচনা চলল। রাজনৈতিক গবেষণা আরম্ভ হল। রাণিমা এই বিরাট পাকি নিরে কী করবে। ঠাণ্ডা করে দেবে পাকিদের।

আজ হেডমাষ্টার আলোনি। ভবেশ বারুই প্রধান শিক্ষকের আগন জড়ো হইলেন। ছোট কল। মার ক্লাস এইট পর্যন্ত বুলবার অনুষ্ঠিত পাওয়া গেছে। হেডমাষ্টার আর তাঁর সহকারীদের জন্যে একখানাই মার ক্লাসের ঘর।

ভবেশ বারু বললেন, 'সব সহর ভাবলেন না। ওয়াও বসে থাকবে না। আবেলিকাও উঠল বলে।'

ননী বলল, 'আলসে এহ একটা আলোলা সি-সি-সি সিগনিক্যানদ আছে হাট্টার মণাই—'

ভবেশবারু হেসে উঠলেন। নবীর তোফানি না মৃত্যুতা কোনটা বেশি তার হাণির উত্তর কল বোকা গেল না।

তিনি বললেন, 'সিগনিক্যানদ আছে তা আবার

জানি। বিজ্ঞানের জগৎ-যাত্রার কথা বলবেন এই তো ?
আপনার বিজ্ঞান চাইই বা এর উঁচল কিছ? শূন্যে ?
সেখানেও কি উঠতে পারবে, ? এই শূন্য কি একটা ?
অনন্ত আকাশে আরো কত সৌরলোক আছে। তার
সব খোঁজ কি আপনার এই বিজ্ঞান পারে ? কমলা
করাও বাতুলতা। আপনি আই এল সি পর্যন্ত পড়ে
থাকতে সচা জ্ঞান করেন। পুন্ড্রাচার্যী ঠাকুর দেবতা
কিছুই নানেন না শূন্যেই। কিছ? মশাই বসি মতা-
মতা বিজ্ঞানী তাঁরাই জানেন মানুষ কত কল্প তার
জ্ঞান কত দীর্ঘাবধ, এই বিশৃঙ্খল বিশ্বব্রহ্মণ্ডের কাছে
তার নীতি-সাক্ষ্য কত অকিঞ্চিৎকর। মানুষের জ্ঞান
যত বাড়বে তত তার কল্পিতার ধারণাও বাড়বে।

নবী বলল 'ত ত ত তবুতো—'

ভবেন্দ্রাবাদু ফের হেসে উঠলেন।

ততক্ষণে গ্রন্থাবদু আর শূন্যেন্দ্রাবাদু ব্যাপারটার অন্য
দিক নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন।

গ্রন্থাবাদু বললেন তাহাজা ওরা বতই ওপরে উঠুক
হলশেই থাক আর পুন্ড্রাই থাক তাতে আমাদের মত
দায়ারণ মানুষের কী। আমাদের কাছে আনোঁরকা
আর গ্রাণিয়া হলশ আর পুন্ড্রা গ্রহের বতই বহু হয়েছে।
এই তো এককাল হয়ে এরোয়েন আমাদের মাঝার
ওপর দিয়ে বাচ্ছে কিছ? তাতে আনি উঠতে পেরেছি
না আপনি উঠতে পেরেছেন ?

পণ্ডিত মশাই হেসে বললেন 'আমরা আবার-ব্যাপারী।
আমাদের কাছে আহাজও বা উড়োজাহাজও তাই।'

মশাি হাজবার সঙ্গে সঙ্গে মাক্টার মশাইরা সবাই
ক্রমে বাঙার জন্মে উঠে পড়লেন।

নবীমাহবও তাঁদের পিছনে পিছনে বেরোলেন।
ভবেন্দ্রাবাদু ঠিকই বলেছেন। আই এল সি কেল কলার
পর তার আর পড়ানুয়ে হরনি তবু এই তুলে সে
বৈজ্ঞানিক প্রতিদ্বন্দ্বি।

জিয়ারের কাছে পাঠা না পে সে হাজলের কাছে
মানুষের আত্ম একটি বিশেষ সৌরবের পরিচয় সেওয়ার
চেষ্টা করল। ক্রাস পুতে পণ্ডিতবল্লভের ভূগোল পড়তে
এসে বংশান কেলার কথটি মনকুবা আছে তা নিয়ে
আলোচনা করার আগে বলতে শূন্য করল, জানো

মানুষ আত্ম এক অকল কীতিত্ব অধিকারী হয়েছে।
পৃথিবীর শীর্ষা ছাড়িয়ে সে আত্ম—'

কিছ? ছুটির পর তাকে আবার পৃথিবীর শীর্ষায়
যেখানে কিরে আসতে হল। লতা বলেছে কয়েকটি
টাকার দরকার। এ মাসে পুন্ড্রা মাইনে পার নি। বা,
পেন্সিওল ছেঁদের অশুখে আসেই লতা সব খরচ করে
কেনেছে। এখন হাত একেবারে খালি। কলীসদের
কাছে যার চাইতে শাহস হর না। তাঁদেরও তো এই
একই অবস্থা। আরের তুলনার ব্যয় বেশি। মাসের
শূন্যতার যেতে না যেতেই তার সেনা শূন্য হয়।

ভবন শোম্বারের হুটি হেসে মেয়েকে পড়ার নবী-
নাথব। বৈঠকখানা হয়ে তক্তশোশ পাতা। এখনো
হাজ ছাড়ারী এসে বসে নি। শোম্বার-পণ্ডী হরজার
আকাশ থেকে বললেন 'আপনি বলুন মাক্টার মশাই, ওরা
যেবহন এখনো ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। আপনি
ততকাল জা জা যান। আনি ওদের ডেকে আনানিছ?
আপনি আর একটু পরে এসে ভালো হর। মাক্টার
যেহ না হলে কি অতটুকু হেসে মেয়ের পড়ার মন বসে ?'

যানিক বাকো নবীমাহবের হাজ ছাড়ারী হুন্ডন এসে
পড়ল। শিবু আর লীলা। একজন ক্রাস দিকসে পড়ে
আর একজন মাইনে। শূন্যেই বেন শূন্য। পড়তে
পড়তে বিজ্ঞানের মধ্যে মারামারি লাগিয়ে দেয়। নিতা
তিরিপ বিন ওয়ের কপতা মিটাতেই বেশির জ্ঞান সব
কেটে যায় নবীমাহবের।

আজও পড়বার আগে নবীমাহব গল্প করে ওয়েন
তুলবার চেষ্টা করল, 'জানো আত্ম কী ব্যাপার হয়েছে ?'
শিবু বলল, 'কী হয়েছে মাক্টারমশাই ?'

নবী বলল, 'আত্ম মানুষ অনেক অনেক উঁচুতে
উঠেছে। পৃথিবীর বাইরে থেকে তার চারদিকে ঘুরে
আবার ঠিক জায়গায় এসে নেবেছে। এ বরনের কীতিত্ব
মানুষের এই গ্রন্থ তা জানো। তিনি শূন্যে এলেন
তার নাম ইউরি গ্যাগারিন। তিনি জাতিতে মূখ
কিছ? এ সৌরব সন্ত মানুষের। আত্ম মারা পৃথিবী
এক উৎসবের দিন। শিবু বলল তাহলে আত্ম আমাদের
ছুটি দিয়ে দিন মাক্টার মশাই। আমরাও একটু
উৎসব করি।'

লীলা বলল, 'শিখা হুঁটি তোরেন ?'

ননী হেসে বলল, 'তোমাদের কেবল হুঁটি নেওয়ার কপালি না। আর আর হুঁটি ছেঁওয়া বাবে না তোমাদের। চাঁদিন্দাল শরীকা সামনে। সে যেহাল আছে।'

পুত্রো দু'বটা সহ বিবর এদের পড়াল নদীবাঁধ।

ভোরপর একটু ইতস্তত করে শিবকে ডেকে বলল, 'ইয়ে তোমার বাবা হোবহর সোকাব থেকে এখনো ফেরেন নি।'

শিব বলল, 'বাবা তো লোকানে বেই সন্ডে গেছেন। নামলা মোকদ্দমা আছে। কাছ কম' সেরে কাল ফিরবেন।'

নদীবাঁধ আরো কিছুকাল কি চিন্তা করল। তারপর বলল, 'আজ্ঞা তোমার মাকেই একটু তাহলে ডেকে লাও।'

শিব কী কথা আছে। 'ওকেই বলি।'

লীলা বলল, 'ভাকিসনে বাদা। তোর বিরুদ্ধে এবার নালিশ হবে।'

শিব বলল, 'শিখা নাকি মাস্টার মশাই? আজ কল্যাণ নালিশ করবেন নাকি আপনি?'

নদীবাঁধ হেসে বলল 'আরে না না। কোন ভর নেই তোমাদের। তেকে লাও ওকে।'

শিব আর লীলার না এসে কের বরকার পাশে বাড়ালেন। মোটা মোটা হাঁহলা। গায়ে ভারি ভারি গরবা। বলছেন, 'কী বলছেন মাস্টার মশাই?'

'আজ্ঞে একটু কথা ছিল। তারপর হাজি ছাত্রীদের দিকে চেয়ে নদীবাঁধ বলল, 'তোমরা যাও এবার। তোমাদের হুঁটি।'

ওরা বই পয় দিখে ভিতরে গলে গেলে নদী লক্ষিত ভাবে একটু আমতা আমতা করে বলল, 'ইয়ে বাবে মোটা পনের টাকা কি দিতে পারেন? মানে আমার এই মাসের বাইলেটা আপান গেলে বড় সুবিধে হয়। এত বরকার পড়ে গেছে।'

বরকার ওপাশ থেকে বহুত'কাল কোন লাড়া পক্ষ এসে না। তারপর হাজের বা বললেন, 'বড় লজ্জা মিলেন মাস্টার মশাই। টাকা পরমা নর কত'র কাছে থাকে।'

তিনি সন্ডে গেছেন। হামলা মোকদ্দমা নিয়ে এত অপান্তিতে আছি আরহা। আর উকিল মোকদ্দারে পিছনে যা থাকে—।'

নদীবাঁধ বলল 'আমি কিছু জানতাম না। বলে করবেন না কিছু।'

বাড়িতে কিংবদন্তি পথে নদীর বাবে কের অনুপোচনা আর অবলাদ জল। 'হি হি হি কেন মিছি মিছি চাইতে গেল।' চেয়ে হু'ব হারাল। কোঠা বাড়ি। বিবর-লক্ষ্যটি আছে। কপালেন সোকাব আছে বাজারে। ইজ্ঞা করলে কি পনেরটা টাকা পর থেকে বের করতে পারতেন না ও'রা? নদীর আগেই বোকা উচিত ছিল। কেন চাইতে গিয়ে অপমানের বোকা বাঘার ভুলে দিল নদী।

সহরের এক প্রান্তে মোট একটু পুরোনে একতলা বাড়ি। 'হরাকী' অবহা। গায়েব বাড়ি তাঁরা এটাকে ভাড়া দিখে কলকাতার গলে গেছেন। নদী দু'একবার লিখেছে বেরামতের কথা, হোমাইট ওয়াশ করাবার কথা। তাঁরা একখানা চিঠি অববাই যেন নি। আর এক খানার জবাবে লিখেছিলেন, 'বাত হচ্ছেন কেন? সবই হয়ে।'

পায়েই একটা আম বাগান। তার ছায়ায় লারা বাড়ি খাঁচার হয়ে রয়েছে। কিন্তু লামনের ঘরখানার আসো ছেলেসে লতা। শ্বাবীর লাড়া পেয়ে সোয়ের লামনে এসে গাঁড়াল। ভেইশ চাকল বহর হাল হয়েছে। পরনে নীল পেড়ে লারা খোলের পাড়ি। কপালে কুমকুনের চিপ পরেছে।

'এই যে এসে এতকমে।' শ্বাবীর দিকে চেয়ে একটু হাসল লতা।

'কিছু নদীর হু'বে হাসি দেই। ভারি দন্দতীর। ব্যবহর করবে হু'ব।

লতা ভদ্র সাহস করে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল মো? নদী হঠাৎ এবার হায়ে কেটে পড়ল, বিকৃত হু'বে বলল 'কী হল মো? তো তো তো তোমার জন্যে আজ আমি চুড়ান্ত অপমানিত হয়েছি।'

লতা অবাক হয়ে বলল, 'জ্যা, আমি কী করলাম।' নদী বলল, 'দিন ত্রাত কেবল টাকা আর টাকা।'

লতা বলল, 'বা ত্রে টাকার বরকার হলে বলব না। তোমার কাছে চাইব না তো কার কাছে চাইব।'

নদী বলল, 'তোমার কি। তুমি তো চেয়েই খালাস।' লতা শ্বাবীর হু'বে দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'কিছু বাকি আছ ব্যবহা হয় নি। বাক পে

হাত মূখ টুক ধরে নাও। অত ভাগ্যে হবে না তোমাকে। দু'একদিন আমি চাপিয়ে নিতে পারব। তারপর এক গতি হয়েই।

স্বামী কান্ড ছেড়ে লুপ্ত পরল নবী মূখ হাত ধরে নিল। লতা গেল রাসা ধরে। দু'হাজার পিশু তরুণোৎসবের ওপর শূন্য হয়েছিল। কিন্তু ওকে সেবে নবীর মনের অবসাদ কাটল না। জাবল ভালো করে বাওয়া-বার পরাবার ব্যবস্থা না করে ওকে সংসারে আনা তার উচিত হয় নি। সে একেবারে অযোগ্য অশুভপুরুষ। জীবন-সংগ্রামে সে বারবার হেরে যাচ্ছে। সব আত্মপায় মাথা নুইয়ে নুইয়ে লোমায় ঠুকে ঠুকে চলতে হচ্ছে। এই ছোট জীবন সংকীর্ণ পণ্ডার মধ্যে এসে সে ভুল করেছে। এতে করে কলকাতার মাটি কামড়েই তার পড়ে থাকা উচিত ছিল। কিন্তু দেখানো তো কিছু কটিল না। নবীর মনে হল এমন করেই সারা জীবন যা খেতে খেতে তার কাটবে। নিজের অযোগ্যতার সঙ্গে সংগ্রাম, বাইরের প্রতিদ্বন্দ্ব পৃথিবীর সঙ্গে সংগ্রাম। দুই ওপাশে তার এই চারের লড়াই কোনদিন শেষ হবে না। সে চিরজীবন ধরে কেবলই ক্রত বিকৃত হবে, আত্মনার করবে। তা ছাড়া জীবনে কিছুই সে করতে পারবে না।

গরের মধ্যে তারি গরম। ঢাকা বারান্দার অবস্থাও তাই। উঠানটা অপরিস্রব। নবী পা তিপে তিপে ছাদে গিয়ে উঠল। হাতো ওখানে একটু হাওয়া পাওয়া যায়। আর কালকের ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিরীহভাবে বলে ভাববে একটু। গরমের দিনে স্নাতক নিয়ে ছাদে মাঝে মাঝে এসে বসে নবী। কিন্তু বড় বোঁই। লতারও যেমত নষ্ট করে দিয়েছে।

পুণ্ডের সিঁড়িতে পরা বোলা ছাদ। আছে আছে এগিয়ে আদিলার ওপর গিয়ে বসল নবী। বাড়ির

তিনদিকে বেগা কংগল। আগে চমতো বাসান ছিল। এখন অরণ্য। কিন্তু ওপরের দিকে তাকালে আকাশ দেখা যায়। আর আশ্চর্য, সামনের দিকে চেয়ে শূন্য আকাশটাই দেখতে পেল নবীমাদন। নীল উজ্জ্বল সূর্যের আগুন। বিচিত্র বিন্যাসকর। তারায় তারায় গাঢ়, এতক্ষণ ভুলে গিয়েছিল নবীমাদন। ফের মনে পড়ল। পুণ্ডেরদেবার কাগজে যা পড়েছে মানুষের সেই দুঃসাহসিক অভিযানের কথা, তার মহিমাময় জয়জ্ঞার কথা কেউ মনে পড়ে পেল নবীমাদনের। মনে হল এই দুঃসাহসিক তারকাপুঞ্জের উজ্জ্বল সঙ্গে মানুষের ইচ্ছা স্বাধীনতা ও পাল্লা দিয়ে চলছে। তার বিরাম নেই, ক্ষতি নেই। মানব হয়তো কোনদিনই এই আকাশদোলের সব রহস্য ভেদ করতে পারবে না, সমস্ত বিশ্বকে আত্মহারাতে পারবে না, কিন্তু সে দুঃসার পর দুঃসার তেজী করে যাবে। আর এই প্রয়াসের মধ্যেই তার গল্প গৌরব, বিশাল মহত্ত্ব, মিহিত থাকবে।

নবীমাদনের মনে হল আত্মকের এই কৃত্রিম কোথায় মনে তারও একটু অংশ আছে। নীরব ভ্রাতা বিশ্ব আর আনন্দ দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সঙ্গে নবীও যে মানুষের এই রহস্য কৃত্রিমকে 'স্পর্শ' করতে গেলো।

‘ওসো কোথায় তুমি!’

লতার স্বর শোনা গেল। সে তাকে ঝুঁকতে এগেছে

নবী সাজা দিয়ে বলল, ‘এই যে।’

এখন না, এখন ও বড় ব্যস্ত! বাওয়া লাওয়া পেল হল শূন্য নবী স্নাতক সব বিবরণ শোনাবে। আত্মকের এই ঘটনার বিচিত্র সম্ভাবনার কথা গল্পের বস্ত করে বুঝিয়ে বলবে। তার আগে ওকে কিছুতেই ঘুমিয়ে পড়তে দেবে না।



গণতন্ত্র ও সাধারণ মানুষ

* বাসন্তী সরকার *

আধুনিক কাল, স্বকাল, গণতন্ত্রের যুগ। শব্দ ত্রয়, এ কথা আমাদের সনাতনী কথা, উপনিষদের বাণী।

সুতরাং বহু উচ্চারিত বহু প্রচারিত শব্দকে গ্রহণ জানে ত্রয় স্বরূপ হবে করার কোন বাধা নেই। থাকার কথাও নয়। তাই 'গণতন্ত্র' কথাটিকে আমরা অপৌরুষেয় ভগবানের, বিশ্বাস-নির্ভর স্বাধিকার মতোই, নিঃসংশয় চিন্তে গ্রহণ করছি। তার কোন অন্য তাৎপৰ্য বা ব্যুৎপাদ্য রূপ নিয়ে ভাব-বিতর্ক অব্যবহর এবং অর্থহীন হয়ে পড়িয়েছে।

ভগবান স্বর্গবাসী, সুতরাং আমাদের নাগালের বাইরে। আমাদের মূখ্য দৃষ্টির বিরম্ব মিলনের দ্বার তাঁর কাছে সৌচ্য কিনা, কোন মহাকাশ ব্যতী এ ওখটুকু এ দাব্যকাল সরবরাহ করতে পারেন নি। কলে অব্যাহি কাল থেকে অদীর্ঘ আকাশের দিকে যদুচ্ছ আঙ্গুল দেখিয়ে স্বর্গদান ও ভগবানের অধীনে নিছক বিশ্বাসে কোন বাধা ছিল না এবং আছে নেই। কিন্তু বিশেষ নতাত্মক শব্দ-ত্রয় গণতন্ত্র, পরম ত্রয়ের মতো লীলা-পারশন হওয়া সত্ত্বেও, সত্যিই কি নিছক বিশ্বাসের পত্তীতে দীর্ঘত থাকতে পারে ?

ত্রয় চিন্তায় যে নির্ভর ও ঐকান্তিকতা থাকলে তা স্বাধীনতার অঙ্গীভূত হয়ে যায়, কোন সুস্থবুদ্ধি, কপন মানব তার সঙ্গে একমত না হলেও তাকে অস্বীকার বনে করে না। কারণ প্রাকৃতিক বটনার মধ্যে কার্য কারণের সম্পর্কে কোন অদীর্ঘ পক্ষের রূপ কপন মানবের সীমিত অধিকার সহজাতবোধ। এ বাসনা বহুলাংশে চিরকালই সার্বজনীন। স্বাধীনতার দুর্বলতা, অস্বাভাবিক অবস্থা, পরিবেশের প্রতিকূলতা, চিরদিনই বুদ্ধির দৃষ্টির কথ্যাত্মকে ব্যাহত করেছে। এর প্রতিকারে অজ্ঞাত চিন্তার পাকা সত্য থেকে মূর্খের পথে পাকি

দেওয়া, মানবের মূখ্যশক্তি অতিক্রম্যপূর্ণি স্বনয়ন এখনও 'হাটি পা' যুগ অতিক্রম হয় নি। কারণ বুদ্ধির বুদ্ধিতে মানবের প্রবলতম প্রতিপক্ষ হলেন মূখ্য শক্তি বিশ্বাস, অজ্ঞতার নিগারব প্রতিভা স্বয়ং ভগবান। কলে সম্মুখে এই বিশ্বাস ও অজ্ঞতার আশ্রয়ে পৃথি লাভ করেছে বিভিন্ন মত, এক সাধারণ বাবা পথ। জন মূখ্য উচ্ছাসিত হয় এদের দিকে কারণ নির্বাণ লাভের নানা সুযোগ-সুবিধা স্বপ্নতম সময়ে ব্যুৎপন্ন শাকল্যের ইঙ্গিত এসেই করায়ত্ত। অনেকটা ধরনের কালকে পরীক্ষার অংশ সময়ে পাশ হার্ক লাভের জন্যে নানা ধাপের নোত বইয়ের বিজ্ঞাপনের মতো।

১ দূরী

রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থার একালের ত্রয়রূপ হলো গণতন্ত্র। পৃথিবী জুড়ে ঢাক, ঢোল, কবির ঘণ্টা বাজিয়ে তার পূজারিত চলেছে। এর কতোটা ভালো কতোটা মন্দ, এ প্রবন্ধের তা উপলব্ধ নয়। কারণ বহুদূরী ভগবানের মতোই, গণতন্ত্রও রাষ্ট্রিক মতাদর্শে সৃষ্টি করেছে নানা বিশেষণের, যার অনেক চেতনার সঙ্গেই আমাদের পরিচয় ঘটেছে এসেছে অনেকবার। ত্রয় সাধারণ ক্ষেত্রে নানান মতের নানান গাঁড়ের ব্যাঘ্রবধার চরম লক্ষ্য যে ত্রয় ব্যক্তিগত মোক্ষ লাভ বা নির্বাণ, রাজনীতি ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য কিন্তু সেই ত্রয় বিশুদ্ধ ব্যক্তিগতের নয়। সুতরাং বর্জ্যবনে 'বতো মত ততো পথ' বলে সম্মুখের যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় দেখানে চরম লক্ষ্যের কোন ইতর-বিশেষ ঘটে না, রাজনীতিতে গণতন্ত্রের সেই জাতীয় চিন্তার পরিণামক হতে বাধা আছে। তার সব চেয়ে বড়ো প্রমাণ হলো বর্জ্যবোধ রাজনীতি চোরা, অন্য সেনের কথা থাকে আবারের সঙ্গে ডেকে এসেছে চরম বিশৃঙ্খল। স্বাধীনতার পক্ষপাতি অস্বাভাবিকীতেও তার প্রভাব, প্রতিক্রিয়া পুরানো ত্রয়িক অঙ্গনের মতোই এখনো বাড়ির জীবনে লেগে আছে।

এখন প্রশ্ন হলো ব্যক্তিবৈশ্বিক আদর্শ গণতন্ত্রের পক্ষে পরিভাষ্য হলে, তার লক্ষ্য কি ? 'গণতন্ত্র' কথাটির তাৎপৰ্য্যই সে উত্তর দেবে। গণতন্ত্র জনসমূহের শাসন ব্যবস্থা বলেই তার সার্বক লক্ষ্য হলো। সমস্ত মানবের

কল্যাণ বা একটা চরম মানবিকতা। এই মানবিকতার বিকাশ পূর্বে কোন দেশের ভৌগোলিক সীমানার সীমিত নয়, থাকতেও পারে না। দূর জীবন যে রকম অসুস্থ পরিবেশের মধ্যে সম্ভব নয়, চরম মানবিক লক্ষ্যও তেমনি কোন দেশের স্থান কাল পাত্রের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। তাকে অতিক্রম করতে হবে দেশের গতি এবং সেই অর্থেই লক্ষ্যের গম্য। নিরবধি কাল যে রকম ইতিহাসের সমুদ্র তার পরিণতির সার্থকতায় উপলব্ধি চরম মানবিকতাও তেমনি এই পরিণতির সার্থকতায় লক্ষ্যবদ্ধ। পৃথিবীর ইতিহাস হলো সত্যতার ইতিহাস অর্থাৎ মানুষের ইতিহাস। সৃষ্টির আদিমতর যুগ থেকে এই চরম মানবিকতা মানুষের জীবনে একমাত্র কাহ্য, তা সে যে ভাবেই থাক না কেন প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যে। কারণ জীবনচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই তার উৎপত্তি, বিকাশ আর বিস্তার। এই জীবন চেষ্টনা স্বয়ং প্রাথমিক তরে ছিল তখন স্বভাবতই মানবিকতার মূল্য শব্দিকারে কুঠা ছিল ব্যাপক। তাই দেখা যায় রাজনৈতিক সভ্যতাদের অন্যতম হিসেবে আয়িষ্টটেল চিরকাল প্রচলিত থাকলেও, প্রায় আড়াই হাজার বছর পরে একালের মানুষ তাঁর সভ্যতাকে নিঃসীম প্রয়োগ করতে পারে না। যে পনতন্ত্র একালে রাজনৈতিক জীবনের একমাত্র সত্য বলে শব্দিকৃত, আয়িষ্টটেলের চোখে তার দারুণা ছিল যাত্র জনতান্ত্রিক বা অরাজকতার অপর নাম।

১ ডিন।

এ কথা তাই অবশ্যক্য যে সভ্যতার ইতিহাস এই মূল্যবোধ পরিবর্তনের ইতিহাসও বটে। জীবনের সমস্ত সম্ভাবনামূল্যে সভ্যতার কোন বিশেষ তরে একমুখে বিকাশমান হয় নি, হতেও পারে না। নোভু ও পুরাতনায় পারস্পরিক অবস্থিতি, সমাজ জীবনে তথা মানুষের জীবনে যে সম্বন্ধ স্বয়ং সৃষ্টি করে তারই ফলে স্বয়ং সে নোভুতর কোন সত্য বা পূর্বে সেই যুগের সমকালে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয়। এই নোভুতর সত্যের মধ্যে বিদ্যমান সমস্ত যুগের চেষ্টনা, মানবিকতা বিশেষ থাকে নানা ভাবে নানা আকারে। কিন্তু নোভু কোন যুগ সমাজের যেটুকু পূর্ণসত্তা পরিবর্তন সাধনে লক্ষ্য, তার ছাপ যেতোটা পড়ে বাস্তব অবস্থার উপর,

ভেঙেটা। যুগের উপর নয়। যুগের পরিবর্তন ঘটে আছে। ধীরে এবং তার ব্যাধি থাকে অসংখ্য। মূল্যবোধ এ মানবিক পরিবর্তনের ব্যায় উপর নির্ভরশীল।

বিভিন্ন ঘটনার দ্বারা প্রতীতিতে সমাজের বাস্তব অবস্থার যে পরিবর্তন, আপাততঃ সৃষ্টিতে অল্প সময়ের তা পূর্বে ব্যাপক বলে মনে হলেও মানুষের মনে তার ছাড়া ভেঙেটা ব্যাপক হয়ে উঠতে দেরী লাগে অনেক বেশি যুগের পরিবর্তন ঘটে জীবন ব্যায় অত্যন্ত বিকাশে যুগের সমকালের সমস্ত শব্দিকৃত সত্য মানুষের চেষ্টনা অসংখ্য শব্দিকৃত সত্য এ কথা শব্দিকারে বাধ্য আছে সমস্ত সেই ব্যক্তি মানুষের চেষ্টনা চিন্তার নিরিখে সমাজের সোপানো আনা কাক করা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে কিছু তথা চিন্তেবে শব্দিকৃত তারই তত্ত্বগত বিন্যাস অবশ্য শব্দিকার্য এ কথাও প্রচলিত নয়। দূর পূর্বে সমাজের প্রথম শোষণে সমাজ ব্যবস্থা হিসেবে ত উৎকর্ষ প্রকাশে সচেষ্ট হন, তখন এ কথা স্বভাবতই এ যে ইতিহাসের এক বিশেষ তরে পূর্ণতর মানবিক মূল্য যোগের যেটুকু পার্থক্য সৃষ্টি করতে পেরেছে মান যুগের জুগলব্য, সভ্যতার বিকাশে তার পূর্বে পূর্ণ জুগলব্য বিন্যাস পড়ে গেছে দেখাযেই। মানুষ চলমান জীবন ইতিহাসের কোন বিশেষ তরে গ্রে থাকতে পারে না। এবং তার এগিয়ে চলার ঠাণ্ডে সমাজের যে নোভু অবস্থা সৃষ্টি হয় তার সঙ্গে পুরাতন সমাজের বিস্ময়ের তরে পরিণত হয়ে বেশি। সত্যের বিরোধ দেখানে মানবিক্য বহিঃ তা সব সময়ে স্বপ্রকাশ্য নয়। কিন্তু এই বিরোধ মাঝেই লড়াই হয়। মজলসে বিরোধে বাঁচাওয়ার পথ খিঁচাচ্ছে হলেই এ কথা হুবহু মনে করাটা সৃষ্টিমূলক নয়।

মানুষের মূল্যবোধ সমাজ নির্ভর এ কথা আগে বলা হয়েছে। কিন্তু তা পড়ে উঠতে যায় ভূমিকা। চলে বেশি, সেটা সমস্ত। জীবন পরিবেশনামূল্য বলে মানবিক প্রজ্ঞাতি এমন কি প্রতিকূলতাও পরিবর্তিত। সমাজের অগ্রগতিতে। সত্যের কোন নোভু সমাজে মূল্যবোধ সম্পর্কে সমকালের বাস্তবতাই যথেষ্ট নয়। মূল যোগের বিচার বিবেচনে এই আপেক্ষিকতার ব্যাধি ত আশাশীল।

গণতান্ত্রিকতার বিস্তারে এর সভ্যতা যে ভাবে প্রদানিত হয়েছে, তেমন বোধ হয় আর কোথাও নয় : যুগ চেতনা ও মূল্যবোধ রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রাধীন সমাজের পটনের প্রাথমিক তরে যে বরণের ছিল তার সঙ্গে বহু বিংশ শতাব্দীর চিন্তা ভাবনার আনন্দন ভরান কার্যকর। কিন্তু এই ব্যবস্থান যে সব সময়ে সমর্থন যোগ্য সে দাবী বৃত্তিমান। এ কালের চোখে একথাকে সমর্থন ভাঙ্গন হতে হয়, গণতন্ত্রের সমর্থকদের কঠোর পর্যালোচনার সম্মুখীনও হতে হয়, কিন্তু তা হচ্ছে অন্য উপায় নেই।

১. চার :

আধুনিক যুগ গণতন্ত্রের অবিস্মরণীয় জয়যাত্রার বৃন্দ। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে গণতন্ত্রের সংকীর্ণতন ব্যাপক হয়ে উঠছে। যে কোন কিছুর সমর্থন ও বিরোধিতা দুই প্রায় একই, সঙ্গে মূহুর গণতন্ত্রের পোষকতায়। এই পরস্পর বিরোধিতা সম্ভব হয়েছে গণতন্ত্রের দেহাই দিয়ে। গণতন্ত্র আর সংখ্যাভিত্তক ব্যবহারিক জীবনে তাই হয়ে উঠছে সমর্থক। এখানে কোন রাজস্ব, হস্তের কিস্তি, আর তার নিম্নতম পুনের নিরিখে বিচার্য নয়। কারণ সংখ্যার বাহুল্যমাত্র সাধারণ হস্তের সমর্থনকে ভালো মন্দে চূড়ান্ত বিচারে একমাত্র পথ। মৃত্যুর অধিকতার স্বীকৃতির সেবেল অতি থাকলে গণতন্ত্রের হাতে বাজারে যে কোন জীবনের যোগানই, একচেটিয়া কারবারের নিয়মে নিষিদ্ধ। চরম সামরিকতার প্রকাশ তাকে কতোটা স্বাভাবিক হলো ও প্রশ্ন দেখানে বিভক্ত জ্ঞান। আধুনিক যুগ তাই সংখ্যাগরিষ্ঠের বৃন্দ অর্থ সাধারণ মানুষের যুগ।

সামান্য মানুষ নামে সাধারণ কিন্তু পতিতে নয়।

গণতান্ত্রিকতার প্রদানকর তারাই। আর সে কারণ তার শক্তিও একটা অসাধারণের স্বর্ণদা পেয়েছে। রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থার পুরো নিয়ন্ত্রণ হিসেবে এই শক্তি সচেতনতা বেড়েছে কই কর্মনি। কিন্তু শাসকের পুত্র জ্ঞেত হতোই বাড়ুক না কেন—সমর্থন নেই সাধিক সমর্থন শাসন ব্যবস্থার বৃন্দ ভিত্তি—সমাজ জীবনে এই সাধারণের, সংখ্যাগরিষ্ঠতার চাপ, মূল্যবোধের উদ্ভব সাধন করতে পারেনি। এটা কঠোর বাস্তব,

যদিও এর মূহুর সম্পকে সমাজের সমাজ উদাসীন। গণতান্ত্রিকতার সমকালীন সমস্যা এইখানে।

সাধারণ মানুষের চেতনা, আশা আকাঙ্ক্ষা, জীবনে প্রেম ও প্রেমবোধের ব্যাপন বিভক্ত সাধারণ। এটাই তার সাধারণের সীমা। প্রশ্ন হলো সামাজিক উৎকর্ষের বিচারে এই সাধারণের দাবী যদি স্বীকৃত হয় আদর্শের পরাকাষ্ঠা হিসেবে, তাকে সাধিক বলা হবে কোন বিচারে। গণতান্ত্রিকতার আরেমে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পুন্ট কোন ব্যাপন বা হস্তের স্বাক্ষরে কাটতি হয় যে নিয়মে, সভ্যতার শাসকগণের তার মান ঠিক সেই পরিমানেই উচ্চ কিনা একথা তর্কাতীত নয়। বহু ওজনে ভারী জীবন সমর্থনে যে ধারণে চিন্তা হয়ে, একঘাটাই বোধের প্রকৃতিবহুত্ব। এর ব্যতিক্রম বিভক্তই আছে, কিন্তু তা এই গির্জাকেই ধোরবার করে শব্দ।

অত আধুনিক যুগে সমাজের মূলমন্ত্রাল বিকাশের দর্পণেই এই সাধারণের হাপ পড়েছে প্রকৃতিভাবে। সাহিত্য, শিল্পকলা রুচিবোধ, আর দর্শনমুতেই সাধারণের তার পাওনা গতা আবার করছে কড়াকড়ির হিসেবে। কারণ এটা mass culture এর প্রাথমিক দর্পণ। কিন্তু যে কোন দেশে, যে কোন যুগে যেহেতু সমস্ত মানুষের ব্যক্তি চেতনা ও সামাজিক কল স্বহস্ত সমাজ সচেতনতা সমগ্রিয়ানে উন্নত বা অন্নত নয়, কলে সাধারণের অবিস্মরণীয় চাপ, জীবন বিকাশের সেই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে পন্দ করে ছুসেছে। গণতান্ত্রিকতার নামে যেটাই এর প্রশতি গঠিত হোক না কেন, সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রয়োজনে এখানে চিন্তাবিকাশের ব্যতিক্রমিক ব্যাপ্তি হতো বেশি তার গভীরতা অনুপাতে ততো কম।

সমাজের সাংস্কৃতিক সম্পদ প্রয়োজনের তাকদার মূল্যায়নে উৎপাদিত হয় না। কিন্তু চাষিয়ার সীমা দেখানে নিরত বেড়ে চলেছে সেখানে যোগানের মান-নির্দেশের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়া অবশ্যব। কলে সমাজের উপকরণের ভাণ্ডারে শাসক কেবল বিভক্ত-সাধারণ আর সাধারণের হস্তাক্ষিত। অসাধারণ এ যুগে প্রায় অসম্ভব। চিন্তাশক্তির ক্ষরণে তাই নেমে এসেছে

গাঙ্কতান—অন্যমন। সাধারণতঃ ঐতিহাসিক মানবী ভাবে
চলমান করেছে ক্রান্তিকর, পরিবর্তনশীল, অস্থায়ী,
স্থিতির মানসিকতা।

৪ পট

সভ্যতার চরম আদর্শ' নিকটই মানবিকতার এই
স্থানদুয়ে বিশ্লেষণীয় নয়। গণতন্ত্রের জয়যাত্রা এই ভিত্তি-
সৈন্য কাগো অভিলেপিত হতে পারে না। সুতরাং সংখ্যার
আধিক্যকেই অগ্রাঙ্ক বেনে নেওয়া সব সময়ে গৃহ
ভীষণবোধের প্রকাশ হয় না। কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের
ইচ্ছানিষ্ঠ দ্বারা নিরস্ত্রণ করে তাদের কাছে মানব
কল্যাণের চেয়ে অর্থ প্রাপ্তি অনেক বড়ো অনেক
জোরালো আকর্ষণ। চলতি হাওয়ার পথী হতে
অশাণ দায়া, তাদের অগণতান্ত্রিক বলতে এসে
‘শিল্প’ কালও বিলম্ব হয় না। তাই গণতন্ত্রে
গণমানসকে বৈশ্ববৃত্ত্য করতে এসে তৎপরতার আর
শেষ নেই। আদর্শিক গণতন্ত্রী সমাজব্যবস্থার নিদর্শন
সরসার উৎপত্তি এইখানে।

সামাজিক মানব এই ক্রমানবতির প্রতিষ্ঠার সম্ভব
প্রথমতঃ দক্ষবিজ্ঞানের অবদানে বা সাধারণ মানবের
জীবনে গুণগত পরিবর্তন ঘটিত করতে পারে এবং

ষষ্ঠীয়তঃ নিকিত ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে
পরিবর্তন প্রচেষ্টায়। কারণ এসে সাধারণ ব্যক্তির
গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পার্থক্য কল্যাণের পারদর্শী
হতে পারবে না। সংখ্যা-ভিত্তিক যে অ-সাধারণ
বিশেষ স্থান আছে, বিশেষ গুরুত্ব আছে বা দক
কল্যাণেই প্রদৃষ্ট হয়ে, তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে এ
একমাত্র বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ই সেই হস্তের প্রবন্ধ হা
পারে। অন্যথাই বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, মানব
সভ্যতার বর্তমান বিকাশের ত্বরণের চরম দিশারী গণত
তার মানবিকতার লক্ষ্য থেকে সরে যাবে সাধারণ
নিয়মানে। এবং গণতন্ত্র ব্যর্থ হবে তার দুঃসামান্য
বাহুবে প্রদর্শিত করতে। কারণ গণতন্ত্রগতিক চির
গণতন্ত্র যে সমাজ গড়ে তুলবে সেখানে—The Go
can really become the enemy of the Bu
if one insists upon exclusively quantitati
standards—এই হলো তার শব্দীকৃত সমাজনীতি।
এই দুর্দিন সত্যিই চলু থাকে অপরিবর্তনীয় বো
তা হলে আড়াই হাজার বছর আগেকার আর্যশাস্ত্রী
‘জনভাতায়ে’ গাধার থেকে এ যুগে আমরা দ
থাকবো না।



মনসী ঐতিহ্য ঘেরা অরাজীর্ণ প্রকাণ্ড প্রাসাদ
পড়ে আছে একরাতা সূড়ি।
কালের নখর দস্তে বিকৃত বিচিত্র মূর্তি
এক একটি মহলের বিচ্যুত প্রাচীরে,
কড়কড়া ভূমিকম্পে ভূপাতিত
সারি সারি হুটুত গম্বুজ,
পাতাচ্চিত শিলালিপি
ভাব গর্ত শূণ্য চোখে নিম্মত ভাকার।
মহাপুত যুগকাঠ যথারীতি নিরীহ ঝাড়ায়
দব্যস্ত প্রাঙ্গণে,
উভলয়ে এখনও হাইভোলে শীর্ণকার ভবুক পতিত।
নবরত্ন সিংহদ্বার—ফাটলে ফাটলে সমারুত
পুণ্যবান পরগাছা বটাবন।

সহস্র মহল এই সুবিকীর্ণ জীর্ণ প্রাসাদের
দূরপ্রান্ত ধ্বংসে কেল উঠিতেছে নয়া বনিয়াদ :
মুক্তকক্ষ সারি সারি সমকক্ষ বাস—
দীর্ঘবাহু যেন এক পূর্ব থেকে প্রসারিত
সুদূর পশ্চিমে ;
সূর্যের ঘড়ায় গুরু কাকের মহড়া
কাজ ছুটি সন্ধ্যার বাঁশীতে,
বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ থেকে বিচিত্র সড়কে
ধাবমান জীবনের একক প্রবাহ,—
বিভিন্ন বর্ণের সন্মেলন,
বিচিত্র ভাষার কলতান,
সহস্র স্বার্থের সূর্য্যবেগে সাগর সন্ময়।

মধ্য দেশে জোড় মুখে চলে জোড়া তালি—
ভাল পছন্দের পরে আশ্রয়-সাধনা,
সম্মুখে নবীন মূর্তি পশ্চাতে প্রবীণ,
সম্মুখে বাঁধানো পথ পশ্চাতে পড়িল,
বৈদ্যুতিক বাতি তলে আলো তৈল দীপ,
নিদীকৃত লিঙ্গরাজ প্রত্যক্ষ যেনতা।

ক্রিস্টিয়ান এই দেশে খুঁজে দেখে কোথা অধিষ্ঠান ?

ঔপনিবেশিকতা

অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

বৃহৎ ঔপনিবেশিকতা সমস্ত রাজ্য হারিয়ে
নথবস্তুহীন সিংহের মতো
তপু গর্জন করছে নিজের গহ্বরে ;
সে গর্জন তার স্বধাতু সমাধি ছাড়িয়ে
যেতে না পারায়-প্রতিহত
হচ্ছে তার নিজেরই অন্তরে,
তাই সে আজ ভীত সন্ত্রস্ত।
বিগত দস্তুরে ভরতুপ,
সংগ্রেহ শালায় সংরক্ষণের মূর্তি,
কারও নেই নাসিকা, কারও হস্ত,
অথচ অস্ত্র অঙ্গ অপরাধ,
সমস্ত শরীরে শৌর্বের কৃতি।
অর্থিং ওয়া আজ নগণ্য,
ইতিহাসের পাতায় থাকবে
কৃণা জীবনের কাহিনী হয়ে।

জেগেছে আক্রমার অরণ্য,
গোত্রা দায়ন মিউও জাগবে,
কত দিন বাঁচবে এ দুঃসহ অপমান সরে :

আজ তার দিন
শেষ হয়ে এলো ;
পশ্চিম আকাশে রক্তের অক্ষর,
সিঁড়ীতে বঁকাধনি, এবং ককিন
প্রস্রুত, তোমার প্রদীপ আলো
যখন হবে ঔপনিবেশিকতার কবর।

দিশভাষা বাহা।

আধুনিক ক্রাই স্ট্রেশার। বাহিতে পা রেখে মানুষের আকাশ ছোঁয়ার অমর প্রচেষ্টার প্রতীক। সোকে বলে সরকারী দপ্তরখানা, নেতারা বলেন-বৈদেশিক সম্পদ বৃদ্ধির প্রচেষ্টার দায়িত্বের সূচনা। পঞ্চবার্ষিক পরি-কল্পনার না কি দেশের আর বাড়ছে। তাইই বলে পাল্লা দিয়ে ধাপে ধাপে উঠছে এই পাথর আর কীতের নতুন মিনার। আধুনিক স্থাপত্যের সার্থক স্বাক্ষর।

ক্রাই স্ট্রেশার। সহর কলকাতার বৃক্ষের ওপর, দুই প্রধান সড়কের সম্মিলনে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। স্থান করে দিয়েছে আশপাশের প্রাসাদ গুলোকে। প্রাসাদের আভি-রাজ্য সেল এখন ক্রাই স্ট্রেশারের দিন। শূন্যে অভিমানে প্রথম পদক্ষেপ। শেষ পর্যন্ত তো সবই শূন্য, ভবিষ্যৎ ও।

নীচের রাজ্যের জনতা ক্রমশঃ ছোঁয়ারের ভঙ্গির মত কুলে কুলে উঠছে। দশভাষা নীচের মানুষগুলোকে কেন্দ্র খ্যাতি আর বেঁটে বেঁটে দেখাচ্ছে। কালো কালো মাথার সাহ। ভাঁড় গিয়ে সাপের মত ঠিক বেঁকে এগিয়ে আসছে উৎসুক মানুষ। সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে শূন্যে চোখ তুলে তাকাবে। লক্ষ্য, ক্রাই স্ট্রেশারের দশভাষার অর্থস্বত্বাধিকার কার্ণিশটা। পদ আর ধাক্কা দেয়ালের ছোঁড়ের মধ্যে রাজ্যের ওপর ব্যর্থ মুষ বাড়িয়ে আছে ব্যালকনির ঠাঁড়ের কার্ণিশ অথবা কার্ণিশের বিস্তৃত সংকল্প বললেই ঠিক বলা হয়। ছাত্তের কিছু নীচে, পাশের জানলা থেকে হাতকরকে ধরে। কার্ণিশ থেকে দেয়ালের গা বেয়ে উঠেছে হুশোলি রঙের বঁটি, কোনও এক দকালে ডার মাথার গুলুসত্ব করে উঠেছে হঠাৎ পতাকা। এতকাল গতি রাজ্যের মধ্যে অনর্গল বেরিয়ে আসছিল গাড়ির ভোত। বাবা গেছে সে ভোত বহু হয়েছে। জনতার চারপাশে জঁয়ে উঠেছে গাড়ির বৃষ্টি। হর্ন আর গুটার আওয়াজে ঘোলা জায়গাটা খেলার মাঠের মত প্রসঙ্গ।

দশভাষার কার্ণিশে দাঁড়িয়ে উপভোগ করার মত দৃশ্য। দ্রিক উপভোগ নয়। একটু উত্তেজনাও আছে বৈ কি। ব্যাবজ্ঞা মানুষ আর চ্যান্টা গাড়ি মিলে একটা অচেনা, অব্যক্ত হৃদয় মত হয়ে দৃষ্টি। বাহ দশভাষার বাহবায়ে

স্বাই স্ট্রেশার



পরিচিত বস্তু এত রহস্যময় হয় এ ধারনাই ছিল না। বাহি আর আকাশের মাঝে দুলছে একটা অদৃশ্য কুখ্যাস আতঙ্ক।

কালো মাথা আর বেঁটে পা দশভাষার মত নীচে ভাঁড়টাও দুলছে। দুলছে ভয়ে আর আশংকা। কার্ণিশে দাঁড়িয়ে রাজ্যের উর্ধ্বমুখী মানুষগুলোকে চেনা যাচ্ছে না কিন্তু তলা থেকে ভেসে আসা কলকট কোলাহলে খাওয়াহ কানে আসছে। সেই আওয়াজে রয়েছে উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠার আভাস।

উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠা কটুট হয়েছে পাশের অদল জানলার বঁকে পড়া মানুষগুলোর মধ্যে। এখন দ জানাদাগুসোই ভাঁড় গেছে। প্রথম সেই দকাল দশটা আসে কিন্তু জানলা থেকে মুষ বাড়িয়েছিল কাভারারে মত একটা লোক। একবার দেখা দিয়েই হুঁটো অদৃশ্য হয়েছিল। আর একটু পরেই ঠিক যেহেঁচিল উর্ধ্বমুখ প্রহরী। গম্ভীর মধ্যে, গোঁকে চাড়া দিয়ে কৈকির তলব করেছিল। গেটের টুলে বলে বৈদ্যের নেপাং ঢুকে ঢুকে কৈকির তলব করতেই এ অচ্যুত।

কালো কালো ভোমরার মত দুটো পুলিশের গা রাজ্য ভাঁড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। পথ করে দিয়ে দ

দায়ে দোকান্দার, একদল ভদ্রে হুটে পালাচ্ছে । ভিত্তিরে বাতাসে কম্পমান পাতার মত সামান্য হুঁলে উঠেই আবার স্থির হ'য়েই অবতার হুটলা ।

এতক্ষণে আবার অ্যারে দৃষ্টিমত সর হয়েছো নতুন এক মূর্তি । পাণের জানলার দেখা গেল পোষাকে পরিচয় আঁকা দার্শনিকের মূখ । উত্তেজনার ঝিকমে মানুহটা, মূখটা লাল হ'য়ে উঠেছে, কথার কেন্দ্র একটু ভোতলাহিরে ভাব । বুকে ভদ্র হাসির আভাস কুটে আছে । মেলে কত হাসিল করার এই বিস্মোটা ওরা দাকদাল শিখেছে ।

—এ, এ সব কি হচ্ছে ? ব্যাপার কি ? আপনি এখানে অমন করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন ?

—আবার মূখী । বেশরোয়ার মত হ'লে কার্ণিশের প্রত্নমূর্তি সবে দাঁড়িল রোপা, লম্বা মানুহটা ।

—মূখী নামে ? কি করতে চান আপনি ? হবকের দূর বেয়ে উঠল জানলা থেকে কুঁকে পড়া মূখ । ঘোঁচা মনে মনে পড়ল হাসির মূখোশ । উত্তর না পেয়ে আবার গভীর নিঃশাসিত হ'ল—কি করতে চান আপনি ?

—এখান থেকে কাঁপ দিতে চাই, শোনা গেল কার্ণিশের মানুহটার লম্বা উত্তর ।

—অঁগ । নামে । কি, কি নাম আপনার ?

—ভয়েজর ঝিকিত । নাম তো শেলেন, এরপর কেন, কি ব্যস্তত জানতে চাইলে কানে আঙ্গুল দেব কিন্তু ।

—কঁপ দেবেন ?

—হ্যাঁ ।

পাখিমানটা কি জানেন ? ভল্লোলকের কপাল বেয়ে টনটন করে ঘাম করছে, কুঁকে থাকার পরিভ্রমে মূখটা আরও লাল ।

—জানি । এখন আপনি দূর করে জানলা থেকে সরে গেলে মূখী হই ।

কার্ণিশের বিস্তৃত সংকরণ, বেশ প্রশস্ত । দাঁড়া মূখ ঘুম সেওয়া ঘাম । কিন্তু ঘুম দিতে সে আসেনি । তা হাতা পাণের ওই জানলা, মত জলাভ্রম জড়ো হচ্ছে ওখানে । জানলা থেকে দূরে কার্ণিশের দূর বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে যাতে জানলা থেকে হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে পারত । সত্যি জ্ঞানতঃ প্রাচীর ওপর উঠে আসত ।

মাগর গানে জোড়ের নরম স্পন্দ । বাপি পেটটা ঘুলিয়ে উঠছে, কেন্দ্র বহি বহি ভাব । চাঁদ মাথা ঘুরে না ওঠে । মাথা এমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা একান্ত প্রয়োজন ।

কিন্তু ঠাণ্ডা ওরা রাখতে সেনেন । ওরা মাঝে আশ-পাণের জানলার কুঁকে পড়া অসম্মা বিতাকান্ধী মানুহ-মূখো । ওদের বিতাপেরণে অবশ্য কান না দিলেও চলে । কিন্তু সবচেয়ে অসম্মা হয়ে উঠছে এই পাণের জানলার কুঁকে পড়া একটার পর একটা মূখ । ইতিমধ্যে গলার টেবিলকোশ এক ভাক্তার মিনিট করেক তাকে দেখে নিয়ে অঙ্গাঙ্গী হলেন । হরতো তাকে বহু উদ্ভাব বলে হয়ে নিয়েছেন ।

আবার বেশ নরম গলার তার নাম ধরে কে ডাকছে—
মিঃ ঝিকিত, মিঃ ঝিকিত ।

দার্শনিক নামলাতে পারলো না বলে এসেছেন পুন্ড্রদের হোমরা-ক্রোমরা অকস্মিক । মাথা পাণের জানলার গলিরে কুঁকে পড়েছেন । বেঁটে মোটা হাড়টা প্রসারিত, হাড়ের চোঁটোটা ঘামে চট্‌চট্‌ করছে । কপালেও ঘাম, উত্তেজনার না এই উটকো পরিভ্রমে বে মানে ।

—মিঃ ঝিকিত, আবার হাড়টা ধরে চলে আসুন না ।

কার্ণিশের ধারে আরও একটু সরে গিয়ে হাড় নাড়ল জয়েজর ।

—তবে কি একটা বই বাড়িয়ে দেব ?

উত্তরে আবার পুতুলের মত হাড়টা নড়ে উঠল ।

—তবে ? বিশর বিশ্বরে বললেন হোমরা-ক্রোমরা—
আপনার হল কি বলুন তো ? এমন করছেন কেন ?

—কিন্তুই ভো করি নি । তবে করবো...

—করবেন । কি করবেন ?

—আপনারা কেউ বই বেয়ে সেবে আবার বকরা চেষ্টা করলে ত্রেক দাক দেব ।

টুকু করে সরে গেল লাল ঘর্ষক মূখটা—বোবর দাক পুর্বেই মাথার রক্ত লাকিয়ে উঠেছে ।

রক্ত, রক্তের মত লাল চিকু মূখে দিয়ে এ্যান্ড্রোলেক্টা এসে তলার কুঁপাণের দূর বেঁধে দাঁড়িয়েছে । এতক্ষণে তা হলো তার নাম আর উদ্দেশ্য মূখে মূখে দাঁড়িয়ে পড়েছে অনেক ঘর, দালদাচার থেকে দালদাঁধির হস্ত

পৰ্বত। লাল উল্কাপিণ্ডের মত খস্টা ব্যক্তিরে হুটে আসছে দমকলটা। দমকলের মই নিচরই দশ ডলার শৌখিনে বা।

মই বা শৌখিন, মানব অনেক শৌখিনে। পাণের জামদার আবার এক নতুন মূখ। ঘোড়ার মত লম্বা মূখটার সবচেয়ে প্রকট পুঙ্খ ঝেঁটপুটো। হাসছে লোকটা। চোখ দুটো হাসছে বললেই ঠিক বলা হয়। সেই ঘরোয় ছোট ছোট দুটো চোখ বা দিনের আলোর তির্যক হাসি হাসে আর রাতের অন্ধকার তাঁর ঘর জ্বালার মত জ্বলে। শেহেনে চাপরাশির সাদা উর্দি আর লাল টুপি দেখা যাচ্ছে। সেই লাল রঙ। সবাই লাল রঙের ঘন হুড়াহুড়ি। অথবা সেহের সব রক্ত জমা হয়েই অশেষের দুটো চোখের ডায়াল।

—আপনি ব্যক্তিগতভাবে পড়বেন বলে ভাব দেখাচ্ছেন।

—ভাব দেখাচ্ছে না, গতিই লাগিয়ে পড়বো।

—উদ্দেশ্য কি জানতে পারি।

—স্বাভাবিক কিছু করে মানবকে আনন্দ দেওয়া।

ব্যক্তি চোখে একবার চেয়ে সাহেব একটা সিগারেট ধরালেন। পরবর্তী সেহের অর্ধেকটা ব্যক্তিই কুঁক পড়লেন, ব্যক্তিই মিলেন হাতটা। সামনের দুটো আলমুসে ধরা সিগারেটের প্যাকেটটা। ইকি করেকের ব্যবস্থানে মূল্যে পোন্ড ফেকের সোনালী প্যাকেট।

—একটা সিগারেট নিন বা।

কয়েক ইকি পিছিয়ে গিয়ে ব্যক্তি মড়ল অশেষের। কার্পিনের কিশলয়নক প্রান্তে ব্যক্তিই চেয়ে বসল সাহেবের প্রদর্শিত হাতটার দিকে।

সাহেবের সেহটা আবার সোজা হল। মূখের সিগারেটটা হাতের আলমুসে নাচাতে নাচাতে বললেন—এমন প্যাপলারি করছেন কেন। ব্যক্তির লোকেরা হয়তো একতরফে খবর শোনে...

—আমার ব্যক্তিই কেউ নেই। আপনার ব্যক্তিইে ভাষা কথি আছে?

—নিচরই—স্বামী, হেলো, মেরে...

—তা হলে আমাকে রেহাই দিয়ে তাদের সম্বন্ধে কথা বারান।

উঃ, কি ছোরেই বা হাওয়া দিচ্ছে, উক্তিই নিয়ে যান

যেন। চোখ কেনন খুঁজে উক্তিই আসছে। চারটিপের ব্যক্তিগুণে থেকে থেকে মূলে উঠছে। ব্যক্তি, তার নিষের ব্যক্তি। হ্যাঁ, ছিল বৈকি। সে ব্যক্তির লবটা জুড়ে ছিল, মূখ্ণা। স্বামী আর স্বামী মূখনের সংঘাতে সৈন্য হরতো ছিল কিছু মূখ্ণ ছিল না। পিণ্ডীর ভাষে সৈন্যটাই ছিল স্ভাব্যিক। পিণ্ডী অশেষের কিছু সে মার এভাবে শেরেছিল মূখ্ণাকে পাশে শেরে। চাকরী করতো মূখ্ণা, সরকারী পণ্ডেরে চাকরী। টাইগিণ্ডের চাকরীতে আর শাবাবা, তবু ভাতাই মনিমে চলতো মূখ্ণা। স্বাভাবিক স্বামীর পিণ্ডিচরীর মূখোণ করে দিত। শেষ পৰ্বত একটা টিউশনিও নিয়েছিল। অশেষের এতো পিণ্ডেরে বাবা দিয়েছিল। প্রবটা মূখ্ণা তর্কাতর্কির পিঁ একটা রফা হল। এক প্রচার প্রত্যাশানে কাজ মিল অশেষের। ব্যক্তিই অনেক আর মাইনে অশপ হলো মূখ্ণাকে একটু আগ্রহ দেবার আশ্বাসটুকু তো ছিল। মূখ্ণা অথবা একেবারে হাল ছাড়ে নি। ভবিষ্যৎ উক্তিইর আশা টোনাগ্রাকির পাঁচ নিতে মূখ্ণা করেছিল।

আর শেষ পৰ্বত টোনাগ্রাকির হ'রেই টোনে আনলো: স্বাক্ষর পুণিপলো কালো বোনার মত কি কি একটা টোনে আনছে কে জানে। ভীত আরও বেড়েছে। কালো বাঘার মার লবটা স্বাক্ষর জুড়ে প্রদর্শিত হ'বেই। অনেকদিন আগে দেখা একটা মূখ্ণা মনে পড়ে গেল অশেষের। তার ছোট স্ট্রাটের পাশে বড় হাতটা জুড়ে বসেছিল একল কাক। উচ্চমূখ্ণা, কুর্ভাত অসংখ্য কাক। ওপরে বেঁধেও তারে কুলছিল একটা মরা ইঁদুরের দেহাশপ। এখানে এখন কার্পিনে অ্যাক মানব, তলার উক্তিইত মানবের হল। হরতো কুর্ভাতও—মরা আশ্বাসনের মূখ্ণা। পুণিসের ভাক্ণার কার্পিনের ঠিক তলার স্বাক্ষর ব্যক্তিই কাঁকা হয়েছে। কালো বোকাটা খুঁলে কালের মূখ্ণা নিয়েছে। জাল পেতে ওয়া পণ্ডত মানবটাকে হরতে চায়। লবতলা থেকে লাক বিরে সেহ জাল জোঁবার আসেই ওর প্রদর্শনাশী বাঁটা ছেড়ে উড়ে যাবে।

অমনিই বাব। হঠাৎ উড়ে বাব। যেন গিয়েছিল মূখ্ণার। মূখের ওলুখ খেয়ে মূখিইে পড়েছিল মূখ্ণা। কাক সেহে স্বাক্ষর মূখ্ণা নাগার ব্যক্তি কিহে

প্রবর্তা জন্মেছে ভেবেছিল—আহা, সারাদিগের পরিচয়ে
তোরাি স্ত্রাত হয়েছ; একটু বিলম্ব ওর প্রযোজন থৈ
কি। চিরদিনের সম্বন্ধে সত্যিকত হয়েছিল আরও কিছু,
পরে...বাবার জন্যে ভাব দিতে গিয়ে। বুকের ওপর
ব্যেছিল মনুষ্য, সেখবারের মত নিঃশেষে ঘুনিয়ে
পড়েছিল। পাশে পড়েছিল বাসি পিশি আর বাসে
বোকা চিঠি।

ভেবেচিছে কেটেছুটে বদামস্তর সংক্ষেপে মনের
গোপন কথা বলবার চিত্র ছিল চিঠিটার। চিঠির লেখা
মত যেন কানে কানে কথা বলা। হাওয়ার লোঁ লোঁ
ছাপিয়ে এখনও জন্মেছে শব্দেতে পাছে মনুষ্যের মন
কণ্ঠবর। না হয়ে আবার উপায় ছিল না। তুমি
কষ্ট পাবে আমি কিছু এরপর বৈঠে থাকা যে আবার
পক্ষে আরও কষ্টকর হতো। পরোক্ষতর আশায় বোঝায়
হয়ে ছুটেছিলান, সাধেবের টেনেআকাকারের পট্টা বঁধি
শাওয়া যায়। উপযাচক হয়ে বাতায় বোটি নিয়েছি
কর্তনিন, উপযাচিকার মত কত সন্ধ্যা সাধেবকে দিয়েছি
সলা। পরোক্ষতর হারান কিছু পদমল্লন এছানো সোলনা।
বাংলা লিখে গিয়েছিলান তারই প্রতিবাদে সাধেব আমাকে
চাকরা থেকে বার করে দিয়ে নিশ্চিত হয়েছেন।

সাধেব জন্মেছে পরিচিত, যানে মনুষ্যত্ব তেনা
আছে। চৌরঙ্গীর কোন রেজোঁর সাধেব মনুষ্যের
পাশে প্রিয়ানকে চোখে পড়েছিল যেন.....

—দীক্ষার ভীড়টা কি এখনও চোখে পড়েনি।
সেই বোড়ার মত মনুষ্য আবার লেখা দিয়েছে, হুজুনে
সেই উল্লিখিতা চাপরাশি।

শব্দ ভেঙে বেগে উঠল জন্মেছে। গতিই ভীড়টা
আরও বেড়েছে। আল পাতা হয়েছে, বারিদুলো হয়ে
গাঁড়ির আয়ে ছোড়ানের দল। হঠাৎ জন্মেছে মনে হল
যে যেন ওই মানুষের ভীড় থেকে অনেক অনেক দূরে
গাঁড়ির আয়ে, দিল্লি এক বিশ্বের মত কুটে আছে অসীম
শব্দভাষ্য। মনুষ্য তার বিকটভব হচ্ছে বলেই বোঝ
হয় দূরে থাকে মানুষের জন্মতা, পাশের তলা থেকে
সরে যাচ্ছে পৃথিবীর মাটি। সেখটা এখন যদি হাফকা
হয়ে হাওয়ার উড়ে যায়। কিছু উল্লিখিত হয়ে গাঁড়ির
আয়ে জন্মতা, কিছু সেখবে বলে। সেখবে তো

নিশ্চয়ই, না সেখবে সে এক পাও নড়বে না এই
কাগিপণ থেকে। কাল সারা রাত মনুষ্যের মতসেহের
পাশে বসেছিল। একটুও কানেনি। ভীড় অমৃতভিতর
উচ্চাশে মনকে অমৃতভিতর হয়েছিল মতলব। ওরা বাহা
সেখার জন্যে পাগল হয়ে ওঠে উঠুক, সে কিছু
একটুও বিচলিত হবে না।

—কেন এখন করছেন বলুন তো, ভেতরে চলে
আসুন না। কি হয়েছে জানতে পারলে আয়। তো
কিছু করতে পারি।

জন্মেছে সেখল আবার জাদলার ঝুঁকে পড়ে কথা
শুরু করেছেন সেই বোড়ার মত সাধেব। বিরক হয়ে
বলল—ভেতরে বাবার ইচ্ছে থাকলে কি এখানে এসে
গাঁড়াতার।

—বলছি তো ভেতরে দেখুন।

—সেই হয়ে গেছে, আর ভাববার কিছু নেই।
গতি গীত চেপে বলল জন্মেছে।

—এখনও দেয়ী হরনি। একবার শুন্যে লাক দিলে
তখন গতিই সেখাপোনার বাইরে চলে যাবেন।

মুঠটা আবার শ'রে গেল। ওরাও মতলব আঁটছে
নিশ্চয়ই, নানা মতলব। জাল, গতি, বই, ইত্যাদি নিয়ে
একেবারে মতলবের মনুষ্য। বাসি পেলে জন্মেছে।
ওর মতলব জানা নেই বলেই বেচাঝিরা মনুষ্যের করতে
পারছে না। জন্মেছে নিজেই কি জানতো এমন একটা
অভিজ্ঞতার রোমাক। মানুষ্যসুলোর কাছ থেকে গত
দূরে শ'রে থাকে ততই যেন একান্ত হয়ে থাকে আশপাশের
বোঝা ব্যক্তিগুলোর মতল।

—জন্মেছেবাবু এখনও বলছি মনুষ্যের করে ভেতরে
চলে আসুন। সেই বোড়ার মত মনুষ্য থেকে ক'রে পড়ল
করুন আবেদন।

—ওরা কি ভাববে, ওই দীক্ষার মানুষ্যসুলো। বোকার
মত মনুষ্য করে বলল জন্মেছে।

—ওরা আবার ভাববে কি। ওরা তো মজা সেখবার
জন্যে গাঁড়ির আয়ে।

—মজা ?

—নিশ্চয়ই। ওরা তো থরেই নিয়েছে আপনি
সাক্ষীর কোনও আকর্ষণ খেলা সেখাবেন। মনুষ্য থেকে

১ ভাই জেফার

এই হলো দুটো পর্বের পাঁচিমে আছে মশাই, এখন নিয়ম হলে ভাই নিজে একটা আন্দোলন না শুরু করে।

—উপেনাশী নেকড়ে মত দেখাচ্ছে বটে মাদন-গুলোকে।

কথাটা বলতে গিয়ে জেফারের চোখের কোলে কোথাও হয়তো একটু অনিচ্ছা কট্টে থাকবে। যাহায়ে আবুল, আত্মীয়তার গদগদ হয়ে বললেন ভুল্লোক—ওই নেকড়াদের ধুঁকি করতে প্রাণ সেবার কোনও মানে আছে না কি মশাই। চলে আসুন, ভেতরে চলে আসুন।

—যাবো বলছেন!

—নিশ্চয়ই।

জেফারের দেহটা একটু নড়ে উঠলো। ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে পা দুটো কোঁপে উঠেছিল। আচমকা টালটা গুলোশালি ধুঁকি বসে সমলে নিল। পর মুহূর্তেই এক হাতে চোখ তাকে এলিয়ে পড়ল দেয়ালের গায়ে।

—কি হল। কি হল আপানার। আশঙ্কার কোনও পদার্থ কত পড়ে বললেন ভুল্লোক।

—মাথাটা এখন ঘুরছে। আসনি যদি হাতটা একটু বাড়িয়ে নেন। কান্নার করুণ শোনায়ে জেফারের কথা।

পড়োশকারের প্রেরণার এক লাফে জানলার খোলে উঠে বসলেন ভুল্লোক। চোখে পড়ল, সাহনের বাড়ির ছাদে একটা বড় ক্যানেরা ঘাড়া হ'য়ে আছে। যিনেবার হবি তুলবে হয়তো। আরও ট্রান্সমিট বোর করলেন।

—বরুন, হাতটা ধরে আতে আতে গুরে আসুন। হাঁকাতে হাঁকাতে হাত বাড়িয়ে দিবে বললেন ভুল্লোক।

জানলার মাথা বা হাতে থকা, করুণ পড়েছে প্রায় শব্দগাল নেই।

তুমুল চীৎকার তুলেছে নীচের জনতা। টারজানের হবিতের ওয়া এমন খিল পারানি।

জেফার বাড়িয়ে দিল হাতটা। জান হাতে চেপে বরল প্রদারিত সোমল হাতের অর্ধেক কণ্ঠটা।

—আমি জানতাম তুমি আসবেই, বলল জেফার—ভাইতো এই অক্ষির কার্ণিপে পাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে আছি।

—কি পাশলের মত বকছেন। আতে আতে এগিয়ে আসুন না, আমি ভেতরে নেবে পক্ষে তেনে নিই।—শুন্যে থাকেতো অবস্থার গড়ে উঠলেন ভুল্লোক। এমন অধিন পরিচর্য করা তো অভ্যাস নেই।

—সাময় সায়েব, আমার নাম জেফার নব। আমার খ্যার নাম বুলুলা.....

কণ্ঠতে বুলু টান পড়ল। বড়ার মত দালা হয়ে উঠেছে সাহেরের মূখ। পাঁতে পাঁতে চেপে মরীয়া হয়ে হাতটা তেনে নেবার চেষ্টা করলেন। হালেকের পাঁতের বতো কণ্ঠতে চেপে বসেছে পচিটা আলু। আচমকা একটা প্রত্য আকর্ষণে জানলা থেকে ছিটকে পড়ল দেহটা। শুন্যে তুলে চলার কি ভাবন অস্বাভ.....জনতার গরুনে কানের পদাটা হুঁকি কেটে গেল। আর কিহু শোনা বাচ্ছে না, চোখের দায়নে শুন্য একরশ অন্ধকার। হস্তিকের কোষে কোষে শুন্য হয়ে একটা স্বাধীন বখানার যেন—কণ্ঠের চানড়া ভেব করে পচিটা তীক্ষ্ণ বধ শিরা-উপশিয়ার গভীরে পৌঁছে বসে।



কী

কর একটি পংক্তির নামে
একটি বিশেষ সাহিত্য সৃষ্টির
নাম হল, এ রসাত্মক গবেষণার
বিধর হয়ে আছে।



হয়। হেলেবেলা থেকেই তিনি
হাঁস আঁকতে আরম্ভ করেন এবং
সেইটাই পেপার হয়ে দাঁড়াছিল।
একদিন লণ্ডনের চিড়িয়াখানার বলে

বাস্তবিক লিয়ারিক হল আয়ারল্যান্ডের একটি পংক্তির
নাম। কিন্তু সেই নামে এক কাতের ছড়াকে চিহ্নিত
করা হল কেন? এ প্রশ্ন অনেক রসিক ও পণ্ডিতের
মন উত্তেজিত হয়েছে, কিন্তু কেউই কোন প্রমাণলিভ
উদ্ধর দিতে পারেন নি।

এ কাতের ছড়াকে লিয়ারিক বলা হয় তা হল
পাঁচ লাইনের উদ্ভট ছাপিত ছড়া। সনেটের যেমন একটা
মাগোচারণা আকার আছে তার গঠন বৈচিত্র্যের জন্যে
নিম্নকমান্বনের ব্যঙ্গাত্মক আছে, তেমনি লিয়ারিকেরও
আছে একটা বিধি-সম্মত শিল্পরূপ, এমন কি বিষয়-
বস্তুও নির্দেশ।

লিয়ারিকের পাঁচটি চরণে কীভাবে মিল থাকবে
তারও একটা ব্যবস্থা আছে। মিল থাকবে প্রথম,
ষষ্ঠীয় ও পঞ্চম চরণে, আর এক মিল থাকবে তৃতীয়
ও চতুর্থ চরণে। এই মিলগুলি দ্বিত উদ্ভট, অসাধারণ
ধরে ততই হয়ে লিয়ারিকের চটক। অল্পত সৃষ্টি-
ছাড়া মিল রচনা করার জন্যে লিয়ারিক-কবিতাকে
দ্বিত অল্পত সৃষ্টি-ছাড়া পংক্তির অবশ্যন করতে হয়।

লিয়ারিক তার উদ্ভট মিলবদ্ধ পাঁচটি চরণের মধ্যে
একটা চরণাবধি উদ্ভট কার্যনী সৃষ্টি করে। কার্যনীটি
সাধারণত একজনকে উপলক্ষ্য করেই গড়ে ওঠে। এবং
নাহক বা নারিকাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়
কোনো ভৌগোলিক স্থানের অবস্থানে। যেমন—

There was an old Man of Nepaul,
From his horse had a terrible fall :
But, though split in two,
By some very strong glue
They mended that Man of Nepaul.

লিয়ারিককে সাহিত্যে যিনি প্রতিষ্ঠা দেন তিনি
হলেন এডওয়ার্ড লিয়ার। ১৮১২ খৃস্টাব্দে তার জন্ম

তিনি হাঁস আঁকেন, এমন সময় একজন লন্ডনীয় ব্যক্তি
তারি লক্ষ্য করলেন এবং কাছে এসে বললেন, "তোমাকে
আবার বাড়ি নিয়ে যাব। সেখানে আমার নিজস্ব
চিড়িয়াখানার পাখিগুস্তোর হাঁস তোমাকে আঁকতে হবে।"
এই ব্যক্তি ছিলেন আল' অব জারি'। এঁদের বংশই
বিখ্যাত ডার্বি' স্ট্রীপের প্রতিষ্ঠাতা।

আল' অব' জারি'র অনুরোধ বা আত্মার লিয়ারকে
যেতেই হল আল'র বাড়িতে। সেখানে লিয়ার ১৮৩২
থেকে ১৮৩৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বাস করেন। তিনি এ
সময় কেবল হাঁস আঁকেন নি, আল'র হেলেমেয়েদের
পড়িয়েওছেন। তাদের পড়াতে গিয়ে তারি দখল
তাদের সঙ্গে গভীরভাবে মিশতে হল এবং যেহেতু
তিনি হেলেমেয়েদের দশ খুবই ভালোবাসতেন, লিয়ার
ছির করলেন তিনি তাদের জন্যে কিছু হেলেভালোনা
ছড়া লিখবেন। লিখলেনও, আর আল'র হেলেমেয়েরা
তা খুব উপভোগ করল। এই ছড়াগুলি তারি কাছে
লক্ষিত থাকল। আল'র বাসস্থান ছাড়ায় দশ বছর
পরে, ১৮৪৬ সালে লিয়ার তারি দৃষ্টো হাঁসের বই বার
করলেন এবং তারই সঙ্গে বার করলেন তারি সেই
ছড়াগুলি আলাদা একটি বই হিসেবে। কিন্তু চিত্রকর
লিয়ার ভুলে গেলেন ছড়ার কবি লিয়ারের মধ্যে। তারি
ছড়ার বই, যার নাম A Book of Nonsense Verse,
প্রকাশিত হওয়া মাঝে বিখ্যাত হয়ে পড়ল। সোকেস
যুগে যুগে ফিরতে লাগল তারি ছড়া। হেলে বৃদ্ধো
দকলেই সে ছড়ার রসে মেতে উঠল। লিয়ারের ব্যাতির
বহুটা খটল থাকে বলে অপ্রাণিহ।

তবু এই ব্যাতির থেকে লিয়ার অনেকাংশে বঞ্চিত
হন। লিয়ার নিজেই সেটা টেব পান ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা
দিয়ে। অনেক লেখকের মধ্যে তিনিও বইয়ের সোকায়ে
সোকায়ে খুঁজে বেড়াতেই বাতেন অলক্ষ্যে জানিতে পারেন

১। লিঙ্গারিক

তার বই দলবদ্ধ কে কী বলেছে! একবার দেখলেন একজন লোক কয়েকজন ছোট ছেলেরদেহেরদিকে তাঁর হুড়ার বই পড়ে পোনাছেন। কথেকটা হুড়া পড়া শেষ হলে ভরলোক ছেলেরদেহের কানালেন যে এ বইটির আলস লেখক হলেন আল' অক্' ডার্লিং, এডওয়ার্ড' লিয়ার তাঁর ছদ্মনাম। ভরলোক দিগ্নি বুঝিয়ে দিলেন— আল' অক্' ডার্লিং ব্যক্তিগত নাম হলো এডওয়ার্ড' আর Lear এর হয়ে Earl-কে লুকিয়ে রেখেছেন অতি সহজেই—Earl এর 'L' টাকে শেষ পক্ষে প্রথমে নিয়ে এসে।

ভরলোকের এই ব্যাখ্যা শুন্যে লিয়ার আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তিনি জানালেন তাঁর পরিচয়, এবং কি প্রথম পর্বত দাখিল করলেন। কিন্তু সে ভরলোক কিছুমাত্র অপ্রভুত হলেন না। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, আমি যা বলেছি তা থাকালোকের কাছ থেকে ভালো করে শুন্যে তবেই বলেছি।

সে গাই হোক, মোটা উনিশ পত্রক কুড়ে সাহিত্য সভার লিয়ারের ভ্রমভ্রমটি প্রতিষ্ঠা স্বীকার করবার হতো। তাঁর হুড়া অনুকরণ অনুসরণ করে বহুজন হুড়া দিখেছেন। এই বহুজনদের মধ্যে অনেক প্রখ্যাত ব্যক্তিও ছিলেন, যেমন শ্রীমদ্বার্মা, রসেটি, রাষ্ট্রন, উইলিয়াম হারিস ইত্যাদি। সাহিত্যসমালোচকের কাছে লিয়ারের এই হুড়া এতটাই অশ্রুৎ বলে যোগ্য হয় যে রাষ্ট্রন তাঁর একটি লেখ্য একশটি শ্রেষ্ঠ বইয়ের যে-ভালিভা প্রস্তুত করেন তাতে লিয়ারের বইটিকে প্রথম স্থান দেন। জার্মেল সাহিত্য-সমালোচক শেপটনবেরিও লিয়ারের উজ্জ্বলিত প্রশংসা করেছেন এবং জি, কে, সি, অর্থাৎ চেস্টারটন লিয়ারকে বলেছেন আবোল ভাবোল হুড়ার রাজা।

কিন্তু লিঙ্গারিক যে লিয়ারের পূর্বে লেখ্য হারনি তা নয়। এ নিয়ে ঘরী গবেষণা করেছেন তাঁদের হতে আনুমানিক ১৭০০ খৃষ্টাব্দে লিঙ্গারিকের প্রথম নিরূপণ পাওয়া যায়। নার্সারি গাইব বা ঘরপাড়াগি হুড়ার হু' একটা লিঙ্গারিক কাতার হুড়ার লাক্ষ্য মেলে বৈ কি। যেমন,

Diddlety, diddlety, dumpty.

The cat ran upon a plum tree;

Half a crown

To fetch her down,

Diddlety, diddlety, dumpty.

ভার্মাভা, ১৮২২ খৃষ্টাব্দে জন নার্সারি নামে একব্যক্তি একটা হুড়ার বই বার করেন যাতে লিয়ার-বচিত লিঙ্গারিকের স্পষ্ট রূপ পাওয়া যায়। নার্সারির বই থেকে নেওয়া বিস্তারিত হুড়াটিতে লিঙ্গারিকের সব গুণই বর্তমান—

There was a fat man of Bombo,

Who was smoking one very hot day

A bird called a snipe

Flew away with his pipe,

Which vexed the fat man of Bombay.

দুতরায় লিয়ারকে লিঙ্গারিকের আদি প্রভা বলা চলে না। তবে যে পরিমার্দের কলে কোনো বহু প্রতিকর্ষ পায়, লিয়ার লিঙ্গারিককে সেই পরিমাণ দান করেন। অবশ্য পরিমার্দের সঙ্গে ছিল পরিপূর্ণি। নিমল পরিপূর্ণি হারিস রানবন্দ-বাইন এক বাকি লিঙ্গারিক বিচিত্র হুড়ার ও হবিতে ককমকে করে লিয়ার সাহিত্যের দরবারে যে ভাবে সেশ করলেন তাতে সাহিত্য-সমালোচকরাই পুনর্কিত না হয়ে পারলেন না। ভাঃ লিঙ্গারিককে স্বাগত জানিয়ে তাকে হুড়ার একটা বিশিষ্ট স্নাত বলে স্বীকৃতি দিলেন।

লিয়ার কিন্তু নিজে তাঁর হুড়াতে লিঙ্গারিক বলেন নি। তিনি তাকে নন্দেশন ভাঃ'ং আবোল-গ্রাবোল হুড়া বলেই অভিহিত করেন, লিঙ্গারিক কথাটা তাঁর এই হুড়ার সঙ্গে কে করে বৃক করল, সেটা বহস্য হয়েই হইল। ইংরেজ ভাষার প্রাচ্য অভিধানে লিঙ্গারিক কথার প্রথম প্রচলন ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে বরা হয়েছিল। লিয়ার নামে যান ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে, দুতরায় তাঁর কীর্তন্যায় লিঙ্গারিক কথাটির যে উদ্ভব হয় নি এটা নিশ্চিত।

কিন্তু লিঙ্গারিক কেন? লিয়ারের হুড়াকে 'লিঙ্গারিক' বললেও ভো চলে। তাতে অতত অখতি স্পষ্ট হত। সম্ভবত, 'লিঙ্গারিক' কথাটা চালু হয় নি তার কারণ লিয়ার পূর্বে পতি লাইনের অমন হুড়াই লেখেন নি, অন্য ধরনের আরো অনেক হুড়া দিখেছেন; অতএব 'লিঙ্গারিক' কথাটির লিয়ার বচিত সব হুড়াকেই বোঝাত। সেই

অপটুতা দূর করবার জন্যেই নিত্য লিয়ারিক কথাটার উদ্ভব হয়ে থাকবে। এখন প্রশ্ন হল, লিয়ারিক পদ্যের নামে লিয়ায়ে এই বিচিত্র হাজার নামকরণ কী কারণে? পণ্ডিতগণ অবশ্য একটা কারণ জামিয়েছেন, এবং এখনো পর্যন্ত এই কারণটাই শিঙ বসে বসা আছে। তাঁরা বলেন লিয়ারিক কথাটার উদ্ভব হল এই জন্যে যে লিয়ারিক পদ্যের লৈখ্যাবাসে লৈখ্যেরা লৈখ্যভোজের হৈম্যমোড়ে যখন একসঙ্গে জড় হত তখন তারা এক ধরনের হুজা কেটে কেটে গান গাইত যার শেষকণি ছিল এই—Will you come up to Limerick. এই যে হুজার শেষে ভৌগোলিক নামের প্রাধান্য, এই প্রাধান্য লিয়ার রচিত হুজার পাওয়া যায় বলেই তাঁর হুজাকে লিয়ারিক বলে অভিহিত করা হয়েছে। অবশ্য এ দিকটা বিভাজ্ঞ অন্যান্যের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত।

লিয়ারিকের অন্তর্নিহিত এতদূর বৈচিত্র্যে ওঠে যে প্রায় সব কাগজে লিয়ারিক রচনা করার দুর্য লেখা গিল, এবং বহু কাগজে লিয়ারিক নিয়ে প্রতিযোগিতা ব্যবস্থা করার হিড়িক লাগল। এর ফলে লিয়ারিকের গঠন-বৈশিষ্ট্য কিছু বদল হল। লিয়ার যে লিয়ারিক সেখানে তাতে প্রায়ই শেষ চরণ প্রথম চরণের অনুরূপিত্বের প্রকাশ পায়। কিন্তু এখন শেষ চরণকে সর্বতোভাবে আকস্মিক ও বিশিষ্ট করে তুলবার দিকেই তৌক এস। শেষ চরণের চমকেই গোটা লিয়ারিকের চমৎকার-রস আসবে এই যোগে নিয়ে লিয়ারিক রচনার ধর্ম পড়ল। লিয়ারিকের প্রতিযোগিতার প্রথম চার চরণ লিখে দিবে শেষ চরণ জোড়ান দিতে বলা হত। সেই শেষ চরণ রচনার পারদর্শিতাকে পুরুত্ব করা হত। ক্রমে ক্রম-ক্রম পালদের হতো এই প্রতিযোগিতা এক হুমকি দুর্য খেলায় দৃষ্টি করে, যার ফলে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়।

বদা বাহুদ্য, এই সব হুজামে-জা লিয়ারিকের প্রায় সবই আজ বিশ্বদ্রিষ্ট পড়েছে। কিন্তু লিয়ারের লিয়ারিক আজও সর্বজনপ্রিয়, বিশেষ করে মোট ছেলে মেয়েদের মধ্যে হুজে দর্বালাই তা উজ্জারিত হচ্ছে।

প্রসঙ্গত বলতে পারি, লিয়ার দেশবাসে পটু ছিলেন। তিনি শেষ বয়সে, যখন বাট বছর তাঁর বয়স,

একবার ভারতবর্ষে আসেন। তখনই বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক ছিলেন লিয়ারের বহু। নর্থব্রুকের অনুরোধেই লিয়ার ভারতে আসেন। এখানে অবশ্যকালে লিয়ার নিমন্ত্রণ ভাটিতে বহু ছবি আঁকেন। সেই সব ছবি ও তাঁর ভাষিত অর্থের ব্যতীত পাওয়া যায় তাঁর রচিত Indian Journal নামক গ্রন্থে।

(২)

আমাদের বাংলা ভাষায় লিয়ারিক রচিত হয়েছে কি? হয়েছে বৈ কি। এবং যিনি রচনা করেছেন তিনি বিশ্বকবি নহন। বাস্তবিক বাংলা সাহিত্যে অনেক কিছুই হতো লিয়ারিক রচনাতেও পণ্ডিত্য হলেন হাবিশ্বনাথ। পদ্যে তাঁর নহ, বাংলা লিয়ারিক একমাত্র তাঁরই দৃষ্টি। ‘অন্তত উল্লেখযোগ্যভাবে তাঁর পরে আর কেউ লিয়ারিক লিখেছেন বলে জানি না।

কবির ‘বাগদাদ’কে লিয়ারিক-গ্রন্থ বলা যায় অন্যায়সেই। এতে যে সব হুজা আছে তারা লিয়ারিকের সব পদই পালন করেছে, একমাত্র পাঁচ চরণের পদটী সর্বত্রই পালিত হয় নি। কবি বেশির ভাগ হুজার পাঁচ চরণের জায়গায় ছয় চরণ ব্যবহার করেছেন, এবং কয়েক ক্ষেত্রে হরফও বেশি চরণসংখ্যা আছে। পাঁচ চরণের ষাঁটি লিয়ারিকের হুজার হল ‘বাগদাদ’ ৯৬ সংখ্যক হুজা—

তন্দুরা কাঁধে নিয়ে নরী বাগদাদ
ভেবেছিল, তীর্থেই যাবে সে বাগদাদ।
হঠাৎ খেয়াল চাপে গাইয়ের কাজ নিভে—
ব্যবহার চলে গেল ক্ষয়ব গাছনিতে,
পাঠানের ভাব মেখে জাতিগ পানের দর।

এর চরণের একটা লিয়ারিকের উদাহরণ হল—

বাক কে কাহালগার, কলটোলা অকলে
তোজ আসে হুজার এডার গাণি সে।

ঠিক যেই মোড়ে এসে

লাগান গিয়েছে কেসে,

হেঁচি হয়ে গেল ব’লে ভরে হয়ে কাঁপি সে—

যোফাটার লোক ঘরে করে কাপারগাণি সে।

নিজের হুজার আছে এর চরণেরও বেশি; কিন্তু লিয়ারিকের পদ্য তাতে পুরোমাত্রায় রয়েছে—

ইলিপ্পুরেতে বাস করহারি শব্দ,

হঠাৎ যেহাল গেল ঘায়েই সে বর্ষ।

সেখবে শুনবে কে যে তাই নিয়ে ভাবনা,
সমবে বাড়বে, সেবে সোরটাকে ভাবনা—
সহযমিনী নেই, খোঁজে সহ-বর্ষ।

সেল তাই ষণ্ডালা, সেল তাই অগালে,
মহা মেসে গাল বের তেলপাড়ি-চুতালে,
শাখি বৃক্ষে সে কোয়ারী কী গলব-বর্ষ—
বিস্তার ভেবে শেবে সেল সে কোজর্বা।

শিবারিকের হাস্যরস নাহে নাহে তির্যক ও হাস্যাত্মক
হতে পারে। কবি তাঁর একটি শিবারিকের বিষয়বস্তু
করেছেন আধুনিক কবিতা। এর ব্যঙ্গরসটা উপভোগ্য—
মন উড়-উড়, চোখ চল-চল, ঝান বৃষণানি কবিত্বনিক—
আদ্য-আদ্য ভাষা, ভাব এদেরোদো, শুপটা বির-বিরনিক।

পাঠকেরা বলে, 'এ তো নয় সোম্বা,

বৃষ্টি কি বৃষ্টিতে ঘর না সে বোঝা।'

কবি বলে, তার কারণ, আমার কবিতার ছাঁদ আধুনিক।'

আমরাই বলেছি শিবারিকের ছড়ার ছন্দ থাকে
অদ্ভুত বিল। এই মিলের আকর্ষণকতার চক লাগে।
বাগছাড়ার ছড়ার এমন বিল অনেক আছে। তবু
একটা উদাহরণ দেওয়া সেল—

একটা খোঁড়া ঘোড়ার পরে
চড়েছিল চাট্‌খোঁ,

পড়ে গিয়ে কী দশা তার

বয়েছিল হুটিং বো!

এর পরে আর কী বিল হতে পারে? কবির
খোলা কপালকে বেশ শেতে হয় নি। চাট্‌খোঁর গল্পটা
বলন ঘোড়াকে নিয়ে, তখন ঐ ঘোড়া দিহেই শেষ মিলটা
ঠিক করেছেন—খুঁতসই ভাবে বিল দিয়েছেন, 'চাট্‌খোঁ বো'।

শিবারিকের আর এক বিশেষত্ব হল, এর মধ্যে
যাকা চাই অদ্ভুত অদ্ভুত স্মরণের নাম। বাগছাড়ার
ছড়ার ভারও অভাব নেই। যেমন, পোপ-পা
কিন্মা বাব্বাপাড়া। এগুলি মনটিতে বৃষ্টিতে হবত পাওয়া
যাবে না, কিন্তু মনটিতে এদের রূপ বেশ কুটে উঠে।

শিবারিক বেহেতু মূলত আবেদ-ভাবোদ ছড়া,
বুড়রায় আবেদ-ভাবোদ ছড়ার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসুন্দোও

শিবারিকের মধ্যে সম্ভাব্যই থাকে। যেমন, অদ্ভুত অদ্ভুত
নন্দ, তা অপ্রচলিত উদ্ভট নন্দও হতে পারে। আমার
বড়ন শূটিও হতে পারে। বাগছাড়ার ১০ সংখ্যক
ছড়া 'বর্ষা-বর্ষ', 'বর্ষা-বর্ষ', 'বর্ষা-বর্ষ' এবং 'হাস্যরস-বর্ষ'
হল এই ধরনের নন্দ। কিংবা ৭০ সংখ্যক ছড়ার
'শূটি' ও 'চুটি' নন্দ।

বিচিত্র যৌগিক নন্দ-প্রয়োগও আবেদ-ভাবোদ
ছড়ার আর একটা বৈশিষ্ট্য। কবি বৈবাহিকের সঙ্গে
বিল দেবার জন্যে 'দই-বাহিক' ও 'সই-বাহিক' যৌগিক
নন্দ তৈরি করেছেন। নন্দগুলি বড়ার নর কি?

বিচিত্র অনুপ্রাসের মধ্যে দিহেও আবেদ-ভাবোদ
ছড়ার রস অনেক ওঠে। এমন অনুপ্রাসের চক বাগছাড়ার
ছড়ার মধ্যেই পাওয়া যায়। যেমন,

ভাকবাবুটিকে দিল মশে ভালবুড়োর।

অথবা, গাল-মিশামো গিলি তো ভাত।

কিংবা, ভূপদার অবতার ব্রাহ্ম-পালী দে।

বাগছাড়ার ছড়াগুলি পড়তে পড়তে মনে একটা
প্রশ্ন জাগে—ছড়াগুলি শিবারিকের আদর্শে রচনা করে
কবি তাদের দরহিকে পাঁচ পংক্তির বহন দিলেন না
কেন? এর বোধহয় একটাই উত্তর হয়। তা হল এই
যে, শিবারিকের আঙ্গিক পাঁচ পংক্তিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে
কবি তা চান নি। হয় বা ক্ষেত্রবিশেষে ততোধিক চরনের
ও শিবারিক প্রচলিত হোক, কবির এমন ইচ্ছা ছিল।

শিবারিক কৌতুকরসের শূটি করা ছাড়াও আর
একটা বড় কাক করে। সে ভাষাকে বলিষ্ঠ করে।
অদ্ভুত চমকপ্রদ নন্দ ও হাস্যবিলের মধ্যে ভাষার এক
ধরনের শক্তি কুটে ওঠে। শিবারিকের আকার ছোট
বলেই সে শক্তির সংহত রস-কঠিন রসটা সহজেই
বলা পড়ে। কিন্তু 'আদর্শ', বর্ষা-বহনবে পর শিবারিক
জাতীয় ছড়া শিবারিতে আদ্যের কবিতা কোনো ভাষার
পান নি। কবি বলেছেন, শূটি নিয়ে বেলে বটে
কপনা, অন্যদিকে তবু কৌটো কপ না। ঐক
আদ্যের আধুনিক কবির কপনার কৌক অন্যদিকে
দিকে কিছু-রায় তো নেই! ভাষা কি শূট
নিয়ে থাকবে, একটা শিবারিক কিংবা আবেদ-ভাবোদ
ছড়ার দিকেও ঘন দিতে তো পারেন।

আজকের বৃন্দাশ্রু

সার্থ চট্টোপাধ্যায়

অঙ্কুর থেকে বাক্সে ঝাঁপ কুটে ওঠা এক লোক ভাগ্যে মৃত ফিল্মের করতে লাগল বৃন্দাশ্রু। অশ্রুত আলোর রেখাগুলি নিকটবর্তী হল। বহানুভূতির ওপর থেকে দেখা প্রকল্পিত একটি আলোক দেখা ক্রমে ক্রমে একটি জনপদের রূপ নিল। হাতের দীপমালায় উজ্জ্বলিত জনপদ—নাম বৃন্দাশ্রু।

এই কন্যাসে—সেন থেকে ওঠা নানা সম্ভবতর হয়ে এসেছে। এ সেন কিছুই নয়, পানবাচারে বাসে ঢেপে কালিগন্ধে বোড়ে নানা। তবু কর্মীশিটি আছে। আদর হয়ে গেলে সেটি আর পীতাম্বক হয় না, বরং চিত্তাকর্ষক লাগে।

শেই হাতের নিকটস্থ বিমানবন্দর। চট্টাং বাণচাপ পরিবহনের জন্য কানের ভিতর কিম্বিকিম্বা করা। ভিলা চকিং। কাশ্মির। বড়ির লাগ। পোটার। বাস। শিটি টার্মিনাস। অর্চন বেশ। অজানা ভাষা। বতরুল না একটা দস্তা মোটেল বঁটে পাই, ততক্ষণ একটা উষে।

কিছু বৃন্দাশ্রুতে উষের তো কিছু নেই। হাঙ্গেরিতে আমি সরকারী অভিব্যক্তি। সরকারী লোক আগরে বিমান বন্দরে। তার হাতে নিজেকে সঁপে নিয়ে নিঃশব্দ।

কিছু ওয়েজি হয়ে গিয়ে লেখ কাক্সা পরিবেশ। কেউ নেই। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের কাউন্টারে গিয়ে জিজ্ঞাসা তার : বচন শব্দ হল। কিং কর্তব্য।

বর্তমানটি বললেন : গিটি টার্মিনাসে চলে যান। মৃত কাদ পায়েন না। দেখানে ভাগ্য নিভাই আসেন।

অতএব গিটি টার্মিনাস। এখানেও কেউ নেই। নাম ভাবনাম নিঃশব্দইয়ের। পরবর্তী প্রকার বস্তুর বড় আকস্মিক ভাব।

বিমান কর্মচারীটি কোন করলেন তাঁকে। কিছুক্ষণ স্বাভাবিক ভাষায় কি কথাবার্তা হল। কোন নাহলে রেখে কর্মচারীটি বললেন : ওঁরা বলছেন, ওদের লোক গিয়েছে। আপনি মোটেল বেকার চলে যান। আনরা উদ্ভাস ভেঁকে দিচ্ছি।

লেনিন কার্ট হাতের ধারে মোটেল বেকা। যানেকার বললে : আপনার নামে একটি ঘর বুক করা আছে। পাশপোটিয়া রেখে যান আনাদের কাছে। পুঁপিয়ে নাম রেজিস্ট্রী করাতে হবে।

ঘরে এসে একটু বিশ্রাম নিচ্ছি। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

: হ্যাঙ্গো, আনার নাম নিঃ ক্যাগাকাস। আপনিই কি মিঃ চ্যাটার্জী? আমি পরগাউ হস্তরের লোক। একটু দ্যা করে লাঠিজে আসবেন কি?

মিঃ ক্যাগাকাস বললে ততক্ষণ কিছু বললে তুদনার জন্মের গল্পটির। দেখা হতেই বললেন : দেখুন, অত্যন্ত দুর্ভাগ্য, ভারতীয় হত্যারাম আনাদের সংসার দিয়েছেন যে, ভিক্টো থেকে আপনি আসছেন ট্রেনে। আমি রেল ট্রেনে গিয়ে আপনার জন্য বসে আছি।

এবার ভারতীয় হত্যারামের প্রতি আমার বিরূপ হবার পালা। আনার প্রেমের নাম ও সময় তাঁদের কথামত লিখিত ভাবে বিবেচনা করলাম।

মিঃ ক্যাগাকাস বললেন : যা হবার তা হয়ে গেছে। আপনি যে স্রমে লাগল। এখন একটু গোভায়াপ্রভ দ্রাবি পান করুন। তারপর আনার একটু বেড়াতে যাব হবে।

মিঃ ক্যাগাকাস মোটেলটি ভালই ইংরেজী বলেন। তিনি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রশাসি রাজ্য আর কোথাও যাব নি। বর্ধ ও ইলাভে যাবার কপী ইচ্ছা তাঁর আছে।

ক্যাগাকাস জিজ্ঞাসা করলেন : বর্ধ বিহীন যেন না করে, আপনার সাম্প্রতিক বর্তমান কি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

আমি বললাম : স্বচ্ছন্দ! মিঃ ক্যাগাকাস আমি একজন সোশ্যালিস্ট! ক্যাগাকাস বললেন কোন সোশ্যালিস্ট? ইচ্ছাযুক্ত চেতনাত্মক সোশ্যালিস্ট।

লিভারের নামে এক বুদ্ধিগম্য নতুন গন্ধ উদ্ভূত।
আপনি কি সেই প্রচা সোশ্যালিষ্ট পার্টিভুক্ত?

আমি হেসে বললাম : মিঃ ক্যারাকাস আমি
সোশ্যালিষ্ট এই অর্থে যে, আমার সোশ্যালিষ্ট শব্দের
'এস' টি ক্যাপিটাল দেটারের নয় মূল দেটারে।
আমি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য বা সদস্যক নই।
তবে আমি সোশ্যালিজমের জন-আদর্শে বিশ্বাসী।
ক্যারাকাস বললেন : আপনি সার্ববাদিক না হয়ে
ডিমোস্ক্যাট হলেই মান্যত ভাদ। এখন চলুন একটু
গেঁড়িয়ে আসা থাক।

ভিক্টোর ভারতীয় দূতাবাসের মিঃ মিঃ আনাকে
বলেছিলেন পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের সুশ্রবতন নগরীর
নাম বঙ্গদেশ। তার উক্তির মধ্যে খুব বেশী বাহুল্য
ছিল না।

লণ্ডন, প্যারিস ফ্রান্সের তুলনায় বঙ্গদেশ শহরের
কৌলিন। খুব সেন্সিটিভের নয়। মাত্র ১৮৭০ সালে
পুরনো বঙ্গ ও নতুন শহর শেষ নিয়ে তৈরী হয়েছিল
শহর বঙ্গদেশ। তবে বঙ্গদেশের ঐতিহ্য প্রাচীনতম।
জানিয়ার নদীর উত্তর পূর্বদিকে খনন কার্যের ফলে
আবিষ্কৃত হয়েছে হাজার হাজার বছর আগেকার সৌন্দর্য
সভ্যতার প্রমাণসমূহ। তবে তা এখন পুরাতত্ত্ববিদের
গবেষণার বস্তু।

বর্তমান বঙ্গদেশে গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উদ্যম
স্মৃতিকে কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

মাক্সি অবিকৃত বঙ্গদেশের সোভিয়েত অঙ্গার
লিখিত হয়েছে ১৯৪৫ সালে। সোভিয়েত বাহিনী নিয়ে
ফেলেছে চিলম্নে শহরকে। মাক্সি বাহিনী অপসারণ করেছে
শহর বঙ্গের এক প্রান্তে। নিরুপায় হয়ে তারা জানিয়ারের
মাতৃটি সেতু উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তুকি বেন আর না
অগ্রসর হতে পারে। সোভিয়েত বিমান থেকে অবশেষে
বোমা বর্ষণ ও অবিস্তার বোম্ব পানের যদি চলেছে।

বঙ্গদেশে শেহনের সে ক্ষতকে এখনও পারিয়ে
তুলতে পারেনি। এখনও শহরের বিরাট বিরাট অট্টালিকা
বংশ ভূপের হাতে মাথা গুঁজে পড়ে আছে। এখনও
শহরের হাজার হাজার বাড়ির কেওদাল বেনিদগানের



একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে অডায়

ক্ষত বুদ্ধি করে যুদ্ধের বীভৎসতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। যুদ্ধের
বীভৎসতার স্মৃতি এখনও মূর্ছে বারান হাসপাতালের
মন থেকে। তাই তারা আর বুদ্ধি চায় না।

জানিয়ার শেরিবে মোটর এল শেষ পরে। থানস
এক নির্জন কারাগার। নামে এক পুরনো ভয়প্রার
গীর্জা। মোরামতের চেষ্টা হচ্ছে। কার্টের ভাড়া বাঁধা
গীর্জার পাশে। মিঃ ক্যারাকাস বললেন : কিছুদিন
আপো এক হাজার খটনা হয়েছে। এক খাবেরিকান
সার্ববাদিক এসে হাবি ভুলে নিয়ে গেছেন গীর্জাটির।
হাবি ছাপা হয়েছে কোন কাগজে, তুলার ক্যাপসান :
হালোর শরকার গীর্জাগুলির সাহসে এইভাবে অবরোধের
স্মৃতি করেছিল, যাতে সেখানে কেউ না প্রবেশ করতে
পারে।

বললাম : মিঃ ক্যারাকাস ভুলোকেতের কণ্ঠনা পাক্তি
তারিক করার মত। মিঃ ক্যারাকাস হেসে উঠলেন।

বঙ্গদেশে আবার গাইও যে মফিলাটি ছিলেন, তার
আদল নামটা ভুলে গেছি। ওয়া থাক তার নাম

জুলিয়া। পরদিন সকালে লাউয়ে নামতেই সে এগিয়ে এসে করদর্শন করলে।

জুলিয়ার কত বয়স আমি আন্দাজ করতে পারিনি। হালকা শরীরের মেয়ে। যুগে কড়া প্রসাধনের প্রলেপ।

জুলিয়া বলেছিল, আমার কত বয়স আন্দাজ করত ?

আমি বলেছিলাম : বড় বিশপ্পে ফেললে। কত হবে কুড়ি বাইশ।

জুলিয়া বলেছিল : ভুল করলে। প্রায় ত্রিশ বছর হতে চল বয়স। গত মহাদুঃ সের্গেই। তখন শব্দ হোটে, তবু স্পষ্ট মনে আছে।

সেদিন প্রোড্রাম ছিল কুসাপেরের একটি পারলিঙ্ক জুল পরিদর্শনের। আজ আর হোটের নয়। ট্রামে উঠলাম। ইউরোপের সেরা ট্রাম পশ্চিম কার্শানীতে। অব্যাহত ভারতীয় ট্রাবসগুলো পুরাতন দিল্লির কথাই মনে করিয়ে দেয়।

ইচ্ছলে যেতেই প্রধান শিক্ষক অভ্যর্থনা জানালেন। একটি পুরনো ধরনের জুল বাড়ি। এখানে কারিগরি শিক্ষাও দেওয়া হয়। প্রধান শিক্ষক বললেন : পরীক্ষা-দলক ভাবে এই জুলগুলি তৈরি হয়েছে। প্রায় চল্লিশ, চল্লিশ ইউরোপীতে তহবীল করে দিচ্ছে জুলিয়া।

—কী ধরনের শিক্ষা আপনারা দেন ?

—বৈজ্ঞানিক শিক্ষা। বার ভিত্তি মাস্টার্স ও সেনিনবায়ের ওপরে।

—বর্ষীয় শিক্ষার কোন ব্যবস্থা আছে। বা পশ্চিম ইউরোপের সর্বত্র ব্যাব্যাহাদলক।

—না। তবে বর্ষভিত্তিক উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং, ছাত্ররা ব্যক্তিগত ভাবে তা পড়তে পারে।

—ভারতবর্ষ সম্পর্কে কিছু পড়ানো হয় কি ?

—হ্যাঁ, আমরা যে ইতিহাস পড়াই তাতে ভারতবর্ষের উল্লেখ আছে। এই দেখুন না। হাম্পেরির বিশ্ব-ইতিহাসে প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ বৃত্ত হয়েছে। জুলিয়া তহবীল করল : প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যে প্রথা ও শ্রমের ওপর ব্রাহ্মণের অত্যাচার হয়ে গেছে।

ইংরাজী শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ হল। উনি

ইংরাজী শিক্ষার বই দেখালেন। বইয়ের একটি পরিচ্ছেদে অক্টোবর বিপ্লব সম্পর্কে লেখা রয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন কমিউনিস্ট, মহান অক্টোবর বিপ্লব কমিউনিস্ট, সৈন্যেরা ব্যর্থ করতে এগিয়ে যাচ্ছে—তারই একটি বর্ণনা। হাম্পেরিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব সর্বত্র। জুল বলেছিলেন যে, রুশ ভাষা শিক্ষা ব্যাব্যাহাদলক। প্রতিবছর বহু ছাত্র শিক্ষক ইঞ্জিনিয়ার ও শ্রমশীলের উচ্চতর শিক্ষার জন্য বহু পাঠানো হচ্ছে, ওয়ারশ চুক্তি অনুসারে হাম্পেরির নিরাপত্তা ও পশ্চিমী আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য রুশ সৈন্য তো আছেই।

প্রধান শিক্ষক বললেন : এবার আপনাকে একটি ক্লাসে নিয়ে যাই চলুন।

খোঁচি ইতিহাসের ক্লাস। শিক্ষক মহাশয় বললেন : আমি পড়াচ্ছি পিম্পি বিপ্লব। উনি প্রশ্ন করলেন ছাত্রদের, পিম্পি বিপ্লবের কলে কী ঘটল ?

—প্রোগ্রামারের সূত্রপাত হল।

—কোন প্রোগ্রামারের প্রাধান্য লাভ করল ?

—বুর্জুয়া প্রোগ্রামার।

একটির পর একটি প্রশ্ন। ছাত্ররা সূত্রের ভাবে উত্তর দিয়ে গেল। অবশেষে শিক্ষক বললেন : এইবারে একজন আমাদের সমস্ত আলোচনাটা কি দাঁড়াল বলে পাত।

একজন ছাত্র উঠে ক্লাসে এতদল নে আলোচনা হয়েছে, তা বলে দিল।

হাম্পেরিতে শিক্ষাব্যবস্থার পদ্ধতিটি বেশ ভালো লাগল। শিক্ষকের মধ্যে যথেষ্ট আত্মরিকতা আছে। যদিও হাম্পেরির বিদ্যালয়গুলি বৃহৎ ও প্রতি-বিশ্ববের কলে সৈন্যবাহিনী, তবু একদিন এরা সর্বত্র হয়ে উঠবেই।

শিক্ষক বলেন : তোমাদের সামনে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্যাম্পেল কলেজের ইতিহাস। হ মাসের জন্য এসেছেন হাম্পেরিতে। নাম ডাঃ ভট্টাচার্য।

ডাঃ ভট্টাচার্যের সম্বন্ধে বহু গুণ তথ্য রয়েছে আর পাঠকন ভারতীয় অধ্যাপকের মত অহংকার আর অভিমানে নেই। কনবরুল কলকাতা শহর হলে কি হত আমি না, তবে সর্বশেষ থেকে হাজার হাজার বাইল হয়ে পূর্ব

ইউরোপের একটি শহরে আশ্বক কয়েক দিনের জন্য অক্লান্ত বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিলেন।

ডাঃ ভ্যাকার' প্রায়ই অনুযোগ করতেন, ইউরোপীয় জীবনব্যবহার সঙ্গে তিনি নিজেকে কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারছেন না।

সে দিন জুলিয়া আমাকে সিনেমায় নিয়ে গেল। হাস্পেরিতে কলকাতা শহরের সব সুখ্যা সিনেমা হল গুলি'ত। অধিকাংশ সিনেমা হল বন্ধের পূর্বোক্তার তৈরি। বলাবাহুল্য সব সিনেমা গুলিই হাস্পেরিতে জাতীয়করণ করা হয়েছে। জুলিয়া বললে : হাস্পেরি বা ব্রিটেনের কোন ছবি হাস্পেরিতে সন'সাধারণের প্রশংসার জন্য অনুমতি দেওয়া হয় না। এর কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। বন্ধ ও সাম্রাজ্যবাদী প্রভাবমূলক ছবি-গুলি তাহলে অবশ্যে ছাড়াই দেয়া হবে।

যে ছবিটা দেখান সেটি হাস্পেরির গৃহসমস্যার ওপরে রচিত এক কমেডি, হাস্পেরিতে গৃহসমস্যা আবারো সেশের নতই প্রবল। তবে একটি আশার কথা, ওয়েশে ঘর বাড়ি ভাড়া দিয়ে বৃন্দাশ্রম শীকার ও শে.ফলের কোন উপায় নেই। প্রয়োজনের অভাবরিত ব্যক্তিগত বাড়ি ও জমি জাতীয়করণ করা হয়েছে হাস্পেরিতে। তবু গৃহসমস্যা সেখানে প্রবল। আমাকে একজন বন্ধুর শিক্ষক বলছিলেন। পরিবারের পাঁচ-ছ জন নিয়ে তিনি একটা ঘরের স্ট্যাটে বাসেন।

সিনেমা হাড়াও বৃন্দাশ্রমের স্টেট অফিস হাউসে অপেক্ষা শেষবার সৌভাগ্য হল। বৃন্দাশ্রমটি অভিনয়ে হাস্পেরিয়ানদের খ্যাতি অক্ষত-বোঝা। ভারতবর্ষ থেকে এক অভিজ্ঞ এসে উপস্থিত হয়েছেন। তোমাদের মধ্যে কে ইংরেজী জান ?

তখন সম্মুখে একটি শব্দ বহিত হল—জন জন। উঠে দাঁড়াল একটি মেলে।

শিক্ষক বললেন : জনের পরিবার গত প্রতি-বিশ্বের সময় কানাডায় পাঠিয়ে গিয়েছিল, ওয়া আবার ফিরে এসেছে। জন তাই ইংরেজী বলতে পারে।

প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে বিবিধ বক্তৃতা করল জন। স্মৃতিগত যে অভিজ্ঞ। আমাদের ক'র সেশে তোমাকে স্মৃতিগত জানাই। তোমাদের সেশের ছবি আমরা টেলিভিশনে দেখছি।



নব-নির্মিত একটি স্কুল হাউস

কোয় শবে প্রদীপ শিকড়কে বন্দাবন জানিয়ে বিজ্ঞা করলান শিক্ষা কি এখানে অবৈতনিক।

এখান শিক্ষক বললেন : না। তবে স্বপ্ন আ পরিবারের ছেলেরা যখনই সূর্যোদয় সুবিধা পায়।

সকালে ত্রেক কাষ্ট টেবিলে জুলিয়া বললে :। হোটেলের কিছুদিন হল একজন ভারতীয় অধ্যাপক এ উঠেছেন, তুমি জান ?

আমি বললাম : কই না তো।

জুলিয়া বললে : ওই লেখ, উনি ওদিকের টেনি বসে আছেন। আদ্যাপ করবে ? চোখে চশমা, প্রায় : বয়সী এক ভয়লোক।

আমি ইংরেজীতে বললাম : নহতায়।

কথার কথার পরিচয় পাওয়া গেল। সেদিন সেশ এক ইন্টারভিউ স্ক্রিপ্টকাল অফিসে। সূর্য্যোদয় ও মধ্যাহ্নের পূর্বাভাস, এমন কি সিনের বন্ধু জ্যা স্মিথও। তবু প্রাসঙ্গিক অভিনয়ের গুণে অপরিসর

সমস্ত ত্রুটি কোথাও ভেদে গেল। কবক হাতায় হুটু জনতার সাথে আনিও বিল গেলুম।

জাপোটার নাম মনে নেই। শব্দ মনে আছে জেনারেল বেকা থেকে এক মেম্বারের সকালে নেটের আনরা গিয়েছিল। আর হুটা দরং লেগেছিল যেতে।

সেটি হালপেরির একটি বিখ্যাত কো-অপারেটিভ ফর্ম। ইতি-কারের পর থেকে শস্যপানল গ্রানে। গত কদিন হয়ে কৃষ্টি হচ্ছে। গ্রানের দখে জল রয়েছে। এক হুটা কাদা। পাতি বামতেই হুলো-কাদা মাথা চান্দীর কয়েকটি ফলে বেগিয়ে এল।

সো-অপারেটিভ ফার্মটির নাম ড্যা বিটোভি ফর্ম। ড্যা বিটোভি উনিশ শতকের খ্যাতনামা ফার্মের কবি। ফার্মের প্রেসিডেন্ট মিঃ বার্নার্ডাই স্টীভেন আনারের অভ্যর্থনা বনালেন।

ফার্মের অফিসে এসে আনরা বসলার। কী প্রভণ্ড ঠান্ডা পড়েছে আশ। ঘরের ভেতর ভবু একটা চুল্লী জ্বলছে। প্রেসিডেন্ট স্টীভেন বসলেন : ৬৫০ হেক্টর হল ফার্মের আয়তন। ১৬৭ জন চাকী ওর সদস্য। এদের মধ্যে ১০২ জন চাকীর নিজেদের ফার্ম ছিল। ফার্মের মোট উৎপাদনের শতকরা ৩০ ভাগ সংস্থা দরং বাকী ২০ ভাগ শস্যের দ্বারা ইত্যাদির জন্য বেবে দেওয়া হয়। বাকী ৫০ ভাগ শস্য বিক্রি করা হয়। সেই অর্থ ভাগ হয় হুডালে। যে কৃষকের দরং ভাগ জরি সেই কৃষক মোট আয়ের তরং ভাগ পাবেন। এ ছাড়া প্রত্যেক কৃষক দরং ইউনিট কাম করেছে, ইউনিট পিছু একটা বহুদরি পায়।

কৃষকের সাধারণ কিস্যমাগারে গিয়ে সেলেন প্রেসিডেন্ট। সেদিনের জরি নিচে একটা পুরানো ঘরের টোন্ডের চারপাশে কতগুলি কৃষক আপন পোষাছে। আমায়ের মধ্যে ড্যা উইলিও।

ফার্মের আশে-পাশে কৃষকের কুটির। আনরা পেলান এক কৃষকের ঘরে। শব্দক নুটি ছোট সাফায়ে ঘর। ধবধবে বিছানার একপাশে ফেডালে ক্রাইস্ট ও মেরীর ছবি। তার বাকে ক্রুশবিশ্ব শীর্ষক প্রতিমূর্তি।

পাশে একটি কুলদানীতে ক্রিসানথিমাস ফুলের গন্ধ। টেবিলের ওপর রেডিও।

—দীপ্তবাহুঃ হুটু।

—মুক্তবাহী চিত্রাবার্য দরংকে প্রভর সে না। হু-আচরনের ওপর বিবিনিবেহও নেই দেশে। কিন্তু পাতি পদশ করে না, হুর্নের আচার অনুষ্ঠান। জুলায় বস-ছিল এ কথা।

কিন্তু তবু বলাদেশের গীর্জার গীর্জার ভিতর অস্ত নেই। হুবিবারের প্রার্থনা সভায় যেন কিছু বাকুহ। ডাঃ ভট্টাচার্য ও বসেছিলেন ও কথা।

—আমের সোফের দরং থেকে এখনও হুর্নের সংস্থা ব্যব নি। প্রেসিডেন্ট বসলেন। কিন্তু শহরের হানুয়ের দরং থেকেও কি গিয়েছে? এ প্রশ্ন আর কল্যাম না।

জুলায় বসলে : এই যে হাতাখাট দেখে। প্রতি-বিলবের দরং এখানে বৃদ্ধ চলছে। ওই খোয়ারের সামনে স্ট্যালিনের এসে বিরাট মূর্তিটা প্রতিবিম্বীতা ভেঙ্গে কেলেছে।

প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্ব। হালপেরির দরংক সে বিম্ববের দরংখকে আশ ও ভুলতে পারে নি। সেয়েছে কি হালপেরির দরংখও?

ডাঃ ভট্টাচার্য বসলেন : সে দরংখ দরং মূর্তি হয়ে রয়েছে। আত ফরি কোন বৃদ্ধ হালপেরিরদের সঙ্গে জালপ হর আপনার, সে চুপি চুপি পকেট থেকে বার করে দেখাবে, তার মেলে আর দাতির কটো—হর ডায়া দায়া সেয়ে গর বিম্বব, মরতো দেশ ছেড়ে পাগিয়েছে।

ডায়া তুল করেছে। দায়াহক তুল। দায়া অনুভব ডায়া মূর্তি পাছে। অনুভবে দায়ের লক্ষ্য কাহাণায়ের হোয়া ডায়ের দরং বিবের। কপাটা বসলেন পর্যাঈ দরংের বিরাট অফিসার মিঃ মেনকেইল।

সেদিন হাতে পাছাড়ের ওপর এক রেপ্টারেটে এসেছি। সামনে দায়া ও পানীয়। মিঃ মেনকেইল দরংটির ভাবে কথা বলে যাচ্ছেন। জুলায় অনুবাদক। জুলায়র দরং হুপি। মিঃ মেনকেইল হাসছেন না। তার দরং চাপা ফোম। চাপা বিরক্তি।

—কেন ডায়াইট ইট, এন, ও তে হালপেরিকে দরংখ

করল না? কেন? কেন? নিঃশব্দতা ক্রুর হয়ে বলে? কিন্তু ইন্দোনেশিয়া করেছিল। তাতে তুমি লোকপোষিত নিঃশব্দতা ক্রুর হওনি।

—ভারতে সাম্প্রতিক গীনা রান্দার সম্পর্কে আপনাদের বক্তব্য কি? এয়ার আবার উন্নত।

—সমস্ত ঘটনাই অতি-গম্ভীর। ম্যাকনোহন লাইন ইংরেজ আবেল রচিত। শান্তিপূর্ণ ভাবে বোকাপাড়ার দ্বারা এই শরণার্থীর সরাসরি হলে।

৪ মিঃ বেনকেইস সাংবাদিক। কিন্তু প্রতিবন্দ্বীও বলেছিল তিনি রাশিয়ার লোক। তারা তাকে ভাঙ্গি দিতে চেয়েছিল।

—“প্রাচ্যের ভারতের চক্রান্ত ব্যর্থ” হল। ঢাকা বৃত্তে গেল। স্নানান্তর রক্ষা গেল। অধিবাসী সীমান্ত পার হয়ে রেডক্রসের গাড়ি বোকাই অস্ত্র আনছিল। বহু পড়ল। সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের কবল থেকে স্বাধীনতার রক্ষা গেল হাপেরি। দুবারই রক্ষা করল দোস্তোভেস্কের মানস। মিঃ বেনকেইস বললেন : সেসে কিরে সভ্য কথা লিখবেন। পশ্চিমী সাংবাদিকদের মত বিখ্যার কানুলে ওড়ানো না।

মিঃ বেনকেইস চুপ করলেন। জুলিয়া নিমন্ত। নতুন বোম্বার আওরাক ভেসে আসছিল। সেটুকু হাপেরি : এম লোকসংগীতের এক চড়া শব্দ।

আবার বৃষ্টি। শব্দ ইউরোপের শব্দ কী কপণ। জুলিয়া এসেছে বিমান বন্দর পর্যন্ত। আক-ওর ডিউটি



ফলের বাজার

নয়। তবে এসেছে।

বললান : যদি এলে একটা কা হেসে বললে : হল।

—এই টুপিটা ডাঃ ডট্টাচার্যকে ফেলে দিতে হবে।

ওঁ কাহ থেকে নিষেধলান। ফেলে দিতে মনে নেই।

ও নিল। বললে শব্দ এইটুকু। নিয়ে বাজার আদালের সেন থেকে।

—শব্দ : শব্দ। তোমার, আরও অনেকের। জুলিয়া ওদের আবার শব্দেচ্ছা দিও।



প্রান্তরাশ, হুমিয়ার থেকে খুব দূরে
বাহুব, পৌছে গেছে
নমাতের ভয়াবহ, ভয়াবহ রাত ঘত বাড়ি

ইভংস গ্রীষ্মের এক ছায়া
ঘাটকীর মত সুখ
হ্যাণ্ডব্যাগ হাতে নেয়, চশমা পরে

একনিষ্ঠ পৃথিবীর এরা কেউ নয়
এদের স্বাধীন-তত্ত্ব বিভিন্ন আঙুলে, তবে
আছে

সেটের জন্ম-মৃত্যু লোপ, করে
শুয়ে গেছে
সেই প্রত্যক্ষের এরা, এই অমরজীবিতা
হিংস্র শহর খুঁজে পেলে
করে আসে

ডেউলা ভবানীপুর গলি, আশ্রয়ল থেকে উঠে
নিয়ন্ত্রণ আলো বেবে, কিছুক্ষণ
বয়সানের সারাক্ষে বাস-জলে, উপগত,
উপগত হয়ে যেতে চায়

(একনিষ্ঠ পৃথিবীর এরা নয়, কেউ
এদের স্বাধীন-তত্ত্ব বিভিন্ন আঙুলে, তবে
বাছে
দূর চায় সকলের সৌভাগ্যের চেয়ে বেশী গাঢ়
আর-গাঢ় হতে নিয়ে তুল করে, কাছে)

বনোহর-তড়াগের ধারে কাছে দাঁড়ালে,
টংক-নোভংস গ্রীষ্মের থেকে বোলে
রাটকীর মত মথ ।

পড়ন্ত বেলার আলোয় | কামিনীর বৈ

গোধুলির আলো এসে মেহলীতে ভিড় করে
কন্ড দুয়ারের বাইরে শুধু আলো ছায়ায় খেলা
বিনায়ী আলো একে বার হেঁড়া-হেঁড়া ছবি ।
এক তখনো তার মনের বাসনা
এ দুয়ার পার হয়ে সে যাবে
ঘরের কোণে ঘোমটা ঢাকা সুখ
আর একটু পরেই অন্ধকার কাপাবে ।
সন্ধ্যার তারাতলে একে একে নীপ জ্বলে দিলে
হাতের আঙুলে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বলা
কোমল আধারে এই সুখ আলোর সৌরভ
রাত্রির আগমনে যেন স্নান বিধি গান ।

আহা সেই ঘোমটা ঢাকা মুখে
বিচিত্র রূপ রেখা

কত না আশা তার কত না বাসনা
দুইটি ব্রীড়ানত চোখের চাহনিতে
কত না ভালবাসা

আহা, সেই ভালবাসা স্বপ্নে জড়ান
দামাগ ছেলের মতন কন্ড দুয়ার নাড়ে
উনার মাঠের ডাক বাড়ো হাওয়া
আহা সেই ভালবাসা হুমির বৃদ্ধ
ঘরের কোণে বসে অলস দিন গোপো,

গোধুলির আলো এসে ভিড় করে
বিকেলের আকাশে তার মুখে যাবার কাল
বলে তুমি ষার খোলা—সীমানা ঘূচাও
রক্তের রেখায় আঁকা হোক ছবি
সন্ধ্যার স্নানধার এখন নেমে আসে ।

প্রাচীন

সহস্র শৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য



—জামিন, ভারতবর্ষটা এবার কিনে ফেলব ত
ভাবছি!

—হা, হাঃ, পারবি না।

—আলবাহ পারবো, তুই কি ভাবিস আমাকে!

—আমি বলছি তুই পারবি না।

—জামিন আমাকে কেনোজি, জুড়েছ দ্-অনৈই
টাকা দেবে লিখেছে—

—তা হলেও পারবি না, বলে দিলাম—

কথাটা শেষ ক'রেই লালচে চোখ দুটি মেলে বিম্বনাথ
ক'ক দিল 'বো-ই-ইঃ'।

সেদান ঠুকে বড়ো 'বর' এসে বল্ল—স্যা-আ-আ-ব!

আর এক পেগ হুইশ্কার হুকুম করে বিম্বনাথের
বিকে সিগারেট ব্যক্তিগত দিবে আনন্দ বলল—আরে বিশে
তুই কি মনে করিস 'আনন্দ বিজ টাকার' পরোচা করে।
সিমেটে গল্পানাটি মিশোতে পারলেই দ্-চারটে

৩২

কলকাতা পহর কেনা দার। আর এখন আমার মোড়া
বাচ্ছে করবেন! ইতিবা আমাকে কিনতেই হবে।

—বাকী ক্যাল, ছেলে ভুত হয়ে যাবি!

—বেট!

আনন্দ ব্দ' উত্তেজিত হয়ে টেবিলে ঘুঁষ ঠুকলো।

বিম্বনাথ তাকিয়ে তারিগ হাঙ্গি উগরে বিবে বল্ল—
বেট, বেখে কি হবে। তুই আমার ছেসেবেলার বদ্দ—

বলে কানের কাছে ব্দ' এসে ফিস, ফিস করে বিম্বনা
বল্ল—আমি মাইরি ইতিবা বেচবো না—

কথাটা শেষ করে বিম্বনাথ মাসে সোতা মিশোসো
আনন্দ ব্দ'বানো বেজার গন্ডার ক'রে উচ্চ দি
সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

বিম্বনাথ হাসতে হাসতে বল্ল—কিহে কি হলো!

ঠেঁটি ব্যক্তিতে আনন্দ জ্ঞাব দিল—মাতালের সবে
আমি কথা বলি না।

—दातान थारि ना हूँ—।

—যদ্যপ্যং আন্যকে বাতাল বলিবা, তোর মতো
আটলোকে পলায় আর কখনো বহি গলা ডিঙিয়েছি।

—হাঃ, ত্যক্ত করছিলেন কেন !

—‘অথবা গালাগাল দেবে তুমি আর আমি বাগ
দ্বন্দ্বো না ।

• —वपदा !

—ତା ନା ଜୋ କି । ଆଦି ସାଜ୍ଜାଲ ହରେ ନି । ସମାପ
୩୭—

—ବେଳ ନାହିଁ ଅସମ୍ଭବ ।

—আজ্ঞা, আমি শিশু হিতে পড়ো একটি স্বাভাবিক
 লক্ষণ গাইব। শুরুর দিক ঠিক হয় তবে আবার ভালো
 ঠিক হয়েছে এটা প্রমাণ হয়ে থাকবে।

—२४९ वाङ्म ।

দিশনার এক ছোক পানীর গলার ঢোল।

আনন্দ গঙ্গা। ভিক্টোরে ভিক্টোরে বলল—কিন্তু, একটা কথা। তোমাকে বলতে হবে কোন গান গাইলাম।

—आजवा९ ।

১. আদম্বর স্বরাজ্য বিটোল তার প্রভাব পাওয়া গেল।
পাঁচপে টেবিল থেকে স্টাফের একটি ছোট দেয়ালে
নিচল ঠেকে তাল দিতে শুরু করলেন। বিন্দুবাত্তের
দুই হুটকে এল। সে বিয়দ চোখে একবার গ্যোঁকে
মারাল। কিন্তু সূরের গ্রেপ্তারই পাছে নষ্ট হবে যায়
ই আশঙ্কায় বোম্বের তার কাছে অবিকতর চিন্তার বিষয়
গাই সে চোখ বন্ধল।

গান শেষ হল। আনন্দ বজ্র নিকে ডাকিয়ে সেখান-
-চোখ সে তখনো বুঝেই আছে। আনন্দ জড়ানো
লাঃ ডাকল—

ওসো নলিনী খেলো গো আঁখি

কেন এখানে ডাঙি দাখি ?

বিশ্বনাথ ডাকালো, তার মৃত্যুতে অকণ্ট্র আবেশ।
 ন বলল—কেন হয়েছে।

—তা ত হযেছে । এখন বলো কোন্ পানের সত্ত্ব ।

—सुन ! हाँ ! जानि । किछु—किछु, रजत बा ।

—কামো বলবে না ! বটে—তা ল্যাবে না, বলতে হবে—

—इसीप्रकार प्रकटीकृत ।

—সে তো আগেই বলে দিয়েছি আমি। কি বদাই
বদলে—

আনন্দ যেন বন্ধুকে মাটিতে নুঁয়ে দিল ।

বিস্ময়াৎ দাঁতে দাঁত চপে বলল—বেশ গানটা বলে
দিচ্ছি, কিন্তু কার হেক্সট পেটা জানতে চেষ্টা না।

—কেন, কেন ?

—ও মাম বুধে আনতে পারবো না।

দিন দু'নিম্নার মালিক, ভারতবর্ষের তথ্যের গোপন
আধিপত্য করা করে ওই নামটা উচ্চারণ করে আনাকে
উদ্ধার করেন।

আনন্দ হো-হো হাসিতে ফেন এখনি গড়িবে
পড়বে।

বিশ্বনাথের চোখে মূখে প্রচণ্ড আকোশের চিহ্ন, সে
মদের মাসটা অকিঞ্চিৎকর হয়েছে, হাত কাঁপছে তার ।

আনন্দ হেথেনি সুরে বল—বলো না, বলো না,
ভাই । নাহ পথভাশে যার ঐছন করিল গো—

—অনন্দ শ্রীক ওর কথা আবার বলো না, তোমার
পায়ে শিঁড়ি ।

—কেন করব না ! তার গাওয়া গানের মূর্ত্ত আঁধি ভালোবাসি, তার ছবি যেখানে পাই দৃশ্যও চেয়ে দেখতে ভালোবাসি, তার কথা ভাবতেও ভালোবাসি, আর তার নাম করলেই বড় দোষ !

—यज षाहेटे, कुनि सरो, आमि विशाव निळि ।

বিশ্বনাথ বাথার স্বাক্ষর দিয়ে কপালের চুলকানো
 আরো এলোমেলো ক'রে বীরবর্মে তৈয়ারীকে থাককা
 মেরে উঠে গাঁড়াল। আনন্দের ঢাণে বৃষ্টি উপরে
 পড়েছে—হুঁরি বাহা বিশ্বনাথ, আবার মনে হচ্ছে হাফা
 আবার বৃকের ওপর নরম পানের চরম লাখিটি মেরে
 বুকখানা ভেঙে দিয়ে চলে বাহাছে। হো-হো-হো-হোঃ।
 এ-এ-এ-এ, ই-স-স-স-স।

বিশ্বনাথ বন্ধকে হাঁড়াল—সোরাইন, ত্রুট, ভাল্‌সার
আই হেট, ইউ—ভব। তবু আমার হৃদ থেকে হরিণা
চৌবতীর নাম বার করতে পারি না। আমি ম্যান, অব
প্রিন্সিপাল—।

আমন্ত্রণ আশ্রয় কোরে হাসল, বৈজ্ঞানিক—

আনন্দ তাকে ডাকল। কিন্তু বিশ্বনাথ বাধা বেড়ে উল্টতে উল্টতে বেগিরে গেল—না, না, না—

পানের চোকানের শাননে সারি সারি ট্যান্ডি দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্বনাথ ডাকের দিকে হাত বেড়ে বলল—চলে যাও! চলে যাও তোমরা। আর আমি একা—একবারে একলা এই দুনিয়ার পথিক—! কিন্তু—

কিন্তুর জবাব সে নিম্নের কাছেই দিতে পারল না। আঁধার পা দুটো চুপ করে দাঁড়াতে দিচ্ছে না তাকে। চলতে গিরে কেমনই মনে হচ্ছে, কোথায় যাবো? বাড়ি যেতে বন ওঠে না। অন্য কোথাও? তোমার! টানিগল্পের সেই ক্লাট বাড়িটার সোতসার? দেখানে হরিণা—! না, না, হরিণাকে বলায় করতে পারবে না বিশ্বনাথ। দুনিয়ার কোনো চৌকানে যে বাধা দেউ করেন, সেই বিশ্বনাথকে কেঁতা হয়ে হরিণার আশে-পাশে পাক খেতে হবে। আর হরিণা—

পলক কালের মধ্যে দুনিয়ার রঙটা পালটে গেল। দান, বীল, সোনালী—আহা কি আনন্দ! এই সোনালী হাতছানি। ওই, ওই, ওই শু হরিণা! কী চাখনি—কি হাসি—কি সোনা—বলুন হং। ডাকছে তাকে সোনালী—‘এসো, এসো, এসো!’ ডাকবেই জানা কথা। হাসল, শূণির হাসি। দুনিয়া বড় রঙ্গার জগৎ। কিন্তু জ্বর! জ্বর জ্বনি আরো বিচিত্র। আচ্ছা জ্বর ছুঁব ঠিক কোনখানে থাকো? জ্বর জ্বনি কি এইটুকু মেঝের তেতরে বাস করো। না, না, তোমার কণ্ঠিত আকাশ-শাতাল-কমর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, জ্বনি কমর গভীর। তোমাকে আমি শু জিনতে পারদান না। অন্ধ জ্বনি আমার মধ্যেও রয়েছে, জ্বনি হরিণার। মধ্যেও রয়েছে। কিন্তু দুই কক্ষের ছবি শু এক নয়। বাহ!

বিশ্বনাথের শূণিতে হাততালি দিতে ইচ্ছে করছে। আরও শব্দই বাহ! কণ্ঠটা তারি ভালো লাগছে। এখনি হাতের কাছে কাউকে শেলে দুনিয়া দিতে ইচ্ছে করছে। বিশ্বনাথ উদ্ভূত চোখে তাকাল।

হাতা হাতে একজন লোক এই দিকেই আসছে। আকাশে এত তারা, চাঁদের নৃনাথনাও হরিণার মূখের মতো ভরাট। তবু লোকটা হাতা নিয়ে কি জানে

বেগিরেছে? পালল! তা হোক, ওর জনব লোকটা ভালো বাহ। বিশ্বনাথ তাকাতাড়ি চলল—
এক বরতে হবে, বড় প্রত্যক্ষন।

—বশাই! বশাই—এই যে।

—আমাকে ডাকছেন?

লোকটি ঘনতে দাঁড়াল।

হ্যাঁ। আপনাকেই—

—বলুন।

—অত দূরে কেন, কাছে, আরো কাছে—ডাকছেন কি! আপনি বাহ, আপনি আমি শব্দই বাহ। বড় অবাক হচ্ছেন ত!

লোকটি বিশ্বনাথের মূখের কাছে চোখ এনে ভালো করে দেখল, বলল—বাহ! তা বটে। ড্রাক শব্দই কিপ? হ্যাঁ—

—কিন্তু, কিন্তু করে কি বলছেন, ছোরে বলুন।

—হ্যাঁ, ছোরে বলুন? কেন, আপনি একটু ছোরে বলুন না—

—হাং, বাং, বেশ বলেছেন। চলুন, চলুন, আপনার সঙ্গে কথা আছে। আরে বশাই নবের নতো মাননু কি চট্ট করে পাওয়া যায়।

—তা যা বলেছেন, আনন্দ মাননুদের নতো বন আর ক'ম্বেরই বা রয়েছে।

বিশ্বনাথ লোকটির হাত তপে গরল। তার হুঁত দম্বেক হচ্ছে যে, লোকটি পালিয়ে যাবে। হাতাওয়ালা মানু'বুটি বাধা দিল না, একটু হাসল।

হাঁক দিল বিশ্বনাথ—এ্যাঁ ট্যান্ডি! ট্যা-ক-শী-ই—
ট্যান্ডিটা বামল। বিশ্বনাথ হাতাওয়ালা লোকটির হাত ধরে টানল—ওঠে পড়ুন দাদা।

—বাং, তানাপা বন্দ নয়। ট্যান্ডিতে উঠিয়ে কোথার নিয়ে যাবেন বশাই। আচ্ছা পাল্লায় পড়েছি। না, না, এখন আমাকে বাড়ি যেতে হবে। ছেড়ে দিল।

—আহা। অবন করছেন কেন ভাই! চলুন, চলুন, মাঝের কথায় ভেবেছেন বুঁধ আমি' বাতাল। মোটেই তা নয়, ভালো আনন্দকে ওরকম লাগলই জবাব দিতে পারতাম না। কানেন আনন্দ আমার বড়, আমার পদ, ও আমার ভালো অভিশাপ হবে থাকবে, সেও বাহ,

জন্ম না তার জন আছে একটুক্কো, ব্যাড হাট ।
যাকে বলে হাটসৈন্য, অম্বা আপনিই বলুন—নইলে
শ্রমের কারবার নিয়ে কোনো ইমান্‌বার রংঝা
করতে পারে ?

লোকটি ভাবিয়ে আছে বিশ্বনাথের বুকের দিকে ।
সে চিন্তেছে—বিশ্বনাথ বন্ধুস্বাক্ষরকে । চিন্তেছে সে
অনেক আগেই, সম্ভবতঃ সেই কারণেই এতক্ষণ বরদা
করেছে বিশ্বনাথের প্রদাশ । নইলে সাগরিনের প্রভু
মেঘনতের পর, ওভারটাইমের গছের আদুর নির্দাশ
নিংড়ে দেবার পর, কেউ এভাবে শবের ওপর হাতালের
ষোড়শের হাতে আঙ্গুলস্পর্শ করে না ।

বিশ্বনাথ নিষের মনে বকে চলছে, আরও কতক্ষণ
বকুবক করতো তার ঠিক নেই । লোকটি বলল—
শবের ওপর এ ভাবে আর দাঁড়ানো যায় না । হয়
আমাকে জেতে দিন, মৃত উঠুন গাড়িতে ।

—ইবেল, গাড়িতে উঠ ।

ট্যাঙ্কগুলো প্রস্তুত করে—কি বার বাবা ?

—প্রস্তুত ! আবার তুমিও প্রস্তুত করবে । চালাও সিঁচ ।

—গাড়ি মেলে হতো না ?

লোকটি হৃদয়বরে প্রত্যাবর্তা করল ।

—যাবে, যাবে, ব্যাড ত যাওয়া নয়, চিক্কাল ব্যাড
যাবে । একদিন কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে চলো, কথা
শোনো । কি চাও বলো—

বলে বিশ্বনাথ পকেট থেকে টাকা আর ব্যাগটা বার
করল । একতাতা একটা টাকার নোট বার করে
লোকটির হাতে গুঁজে দিল—নাও, ধরো । না, না,
আমি তোমাকে দিতে চাই । ধান নয় বন্ধু উপহার—

—আরে আরে, একর কি কথা ভাই । টাকা
দিয়ে কেন ? না, না, এ খুব ব্যাপার হচ্ছে । চলুন
আপনাকে ব্যাড পেশীয়ে দিই ।

—না, না, তুমি বুদ্ধ না । তোমাকে আমি
ভালোবাসি, ইউ আর মাই ওল্ড ব্রাদার । তুমি এসুলো
হাশো, নইলে আমি বুঝে পাবো ।

লোকটি অসহায় ভাবে কথা বুঝতে লাগল, সে
চৌপ ফেলল—আচ্ছা এখন ত বুদ্ধত রাখুন । বলুন
তো শ্রমের কথা কি বেন বলছিলেন ।

ইবেল—প্রেম—মানে Love ! জানো ভাই প্রেম
বড় শান্তি রোগ । নইলে হরিণা আমাকে এভাবে
অসমান করলো, ওবু তাকে উচিত কন্যার নেওয়া গেল
না । কেন ? না, আমি তাকে ভালোবাসি । সেই
অন্য তার নাম আমি বুঝে আমি না । অফ ক্লার !
ক্লার ত আর বুঝ নয়—ক্লার থেকে তাকে চোখের
আড়াল করি এমন শক্তি আমার নেই । সেই ক্লারের
সমুদ্রে এখন আকাশ-ছোঁয়া চটে ওঠে তখন, একমাত্র
বুঝ হাজার হাজার, লাখ লাখ হয়ে নেচে রঙ্গ করে
আমার সঙ্গে । বুদ্ধে ! সে হচ্ছে বুঝ আর আমি সেই
সমুদ্র । ওবু আমি তাকে হুঁতে পারি না, ধরতে পারি
না । সে ভালো, ভেলে ভেলে চলো—কী গান—ওঃ

বলে বিশ্বনাথ চুপ করল ।

গাড়ির চাকার শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে
না । চৌপপাড়ি উঠে হিনারগালা ব্যাডির খড়িতে
সেবল—নাড়ে এগারোটা বেজেছে । মনে মনে সে ব্যত
হয়ে উঠল । কিছু বুঝে কোনো কথা বলল না ।

বিশ্বনাথ আবার বুদ্ধ বালকের মতো ছোট গদ্য
চেষ্টা করল—ওঃ । কি গানই গাইল সেদিন—পাগল
করে দিল বুদ্ধে ! ত্রেম পাগলা হয়ে গেলান । দরল !
যাকে বলে বুঝের গাড়ীপাড়ি দিয়ে বনকে উপড়ে হাতের
মুঠোর এনে ফেলা তাই করল ও আবার । কিছু গারে
হাত দিয়েছে কি, কি বল ভাই—একোরে সোণারোর
বিব চলে বলল—কি বল জানো ?

—কি ?

—ওঃ, সে ভাবা বার না । তুমি কল্পনা করতে
পারবে না সে-কথা । বললে, পরমা কেললে বাচ্চা
অনেক হাংল কিনতে পাওয়া যায় কিছু বুদ্ধ—আপনার
ও অনেক টাকা বুদ্ধ । একবার ভাবোতো—কি ?
ভাবো না—!

—হ্যাঁ, ভাবছি । তারি বিজ্ঞিহ ।

—বিজ্ঞিহ । অথবা । টাকা-টাকা-টাকা । আমার
টাকা আছে । আমাকে বুদ্ধলো না হরিণা কেন না
আমার টাকা আছে । আচ্ছা তুমি বলো, টাকা দিয়ে
কেনা যায় ভালোবাসা ? হাংলের সঙ্গে আমার ভালো-
বাসাকে বন্ধনাখা করে কেটে ফেলল ।

এতকমে লোকটি হাঁপিয়ে উঠেছে, তার দম বন্ধ হবার বাধিল। সে বলল—প্রীত আমাকে এখানে নাথিয়ে দিন, আমার সেরা হবে যাচ্ছে।

—নাথবে, কেন? তুমি কি রাগ করছো ভাই। যদি রাগ করো তবে থাক আর বলবো না।

লোকটি কাঁকালো পলায় জবাব দিল—আপনার মতো আমার দিল, শরীক নেই। খিয়েতে পেট চুই চুই করছে।

—বেশ তো কোথায় থাকে, কি থাকে বলো। আই হান্ট—

—না মপাই তার মরকার নেই। ছা পোলা নাম্‌দে আনকা, হোটেলসে খেলে মূখ খাওয়া হতে পারে। তখন কি করবো?

—ও-দব চালাকি চলবে না, তোমাকে খেতেই হবে। এই ড্রাইভার চলো, কোই হোটেল পর চলো ফুর্ডেন—

—হী!

—না, না, গোমো।

—না, চলো হোটেলসে—

লোকটি এবার ধমক দিল—কী হচ্ছে বিশ্বনাথ বাবু!

—কই কিহু না তো! তোমাকে বাইরে ছাড়ব—

—সেখেন মপাই, অনেক সত্য বজ্রোহি, আর নয়। এবার যদি আমাকে ছেড়ে না ক্যান তাহলে সোজা থানায় নিয়ে গিয়ে ফুলবো গাড়ি। তখন কি হবে সোজা জেঁবে সেখেন।

—কি তুমি আমাকে ভয় দেখাও! থানা-পুলিশ সব থামার কেনা। বলো তুমি কোন থানায় যেতে চাও। দেখানোই যাবো—

—তবু আপনি ছাড়বেন না আমাকে?

—তাহলে চলুন থানাতে।

—তবু তুমি হোটেলসে যাবে না?

—না, আমি হোটেলসে যাবো না—

—দ্যাখো এখানে ভেবে দ্যাখো।

—সেখা যাবে থানাতে মপাই—

—বল রাইট। ড্রাইভার পার্কে স্ট্রীট থানাসে চলো—



অবশ্য তুমি আমার মতোও হচ্ছে, তুমি হাবিশার মতোও হচ্ছে
কিছু হুই হাবিশার হাবি তো এক নয়

—আচ্ছা হী—

থানাতে চুকে বিশ্বনাথ বলল—বগোমো—

বড়কর্তার ঘরের সাননে যে পুঁসিগতি পাহারা দিচ্ছিল সে সেদান চুকে কাঁকাল—হী—

—বড়া সাবকে বলো একটা কেস আছে।

বড়কর্তা ছিলেন না। সাব-ইন্সপেক্টরের কাছেই

ওয়া গেল। সোড়টি তোলা কথা বলবার আগেই
বিশ্বনাথ গদার হোদ্য দিলে বলল—দেখুন বনাই এই
লোকটি আমার গলা টিপে ধরেছিল। হিয়ার ইচ্ছা
কাল্পিত। অ্যাগেট হিম—

অবাক হয়ে থাকিয়ে আছে লোকটি, তার আপদ-
যত্নে চোড়ার হুতোর চিহ্ন আঁকা।

বিশ্বনাথ বিভিন্ন হুতোর কোয়ারা ছেড়ে দিলে বলল—
মাতাল! আমি! আমি সাতজন্মে মাতাল হতে পারি
এখন তানার কথা কেউ মানবে না। মাতালই বধি
হবে তাহলে চলবন ভোমাকে এখানে হাঙ্গির করতে
পারি। পকেটে বন হাত ঢুকিয়ে টাকা হাতড়াচ্ছিলে,
বন ভোমার ওই কেটে হাতের মতো আমার টুপি
টিপে ধরেছিল—

লোকটি প্রতিবাদে চিৎকার করে উঠল—টাকা!
আপনার পকেটে হাত দেবার ত দরকার ছিল না,
আপনি নিজেই ত মানিব্যাগ বার করে আমাদের
দিতে এসেছিলেন।

—দেখুন, দেখুন হারোগাম্বাই। আমি ওকে
হাতে ভুলে দিতে যাবো টাকা। পাগলের মতো কি
বলছে হে!

সাব-ইন্সপেক্টর বার্য দিলেন—হু! বৃকেছি।
তার পর বন্দু তেঁপে টোঁরিটা—

—টোঁরি না, বিলুং ক্যাট।

—হাউজার, ওই হুস—বন্দু মার।

লোকটি মাথার হাত দিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছিল।
আর বিশ্বনাথ বিষমরূপে তার দিকে চোখ রেখে
অনেকক্ষণ হয়ে যা বলল তার সত্য্য বন্দু মাংগাভিক :
লোকটি পানের লোকানের মানবে শিকারের সন্ধান
দুর্ভাগ। বিশ্বনাথ ট্যান্ডিতে উঠতে বাজ্ঞে এমন সর
লোকটি কাহুতি-কিনাতি করে বলল যে বাস বহু হয়ে
সেছে, পকেটে ট্যান্ডির গদ্য বেই, গাফিতে দ্বা
করে জার্সা দিলে সে উপকৃত হয়। বিশ্বনাথ
লোকটিকে ঘেঁষে সন্দেহ করে নি, নিজের পাশেই
বসতে দিবেছিল। আর তারপর মর্যাদার পাশ দিয়ে
পাফি চলবার সর সে নিষ্পনজার সুযোগ নিয়ে গদ্য
দিলে ধরে আনকা। কিহু, বিশ্বনাথকে মাতাল মনে

করেছিল লোকটি, সেইখানেই ভুল হয়েই তার।
নইলে—

লোকটি বলল—আচ্ছা, তাই যদি হবে, তাহলে
ট্যান্ডিগোলাকে ঢাকা হোক—

সাব-ইন্সপেক্টর বনক দিল—গাম্বু বনাই। যা
জিগোস করি তার জবাব দি। আপনি বিশ্বনাথ
বাবুর গাফিতে উঠেছিলেন?

—হ্যাঁ। কিহু উনি মেগার বোকে হোদ্য করে
আমাকে গাফিতে তোলেন। সাব-ইন্সপেক্টর বললেন—
ওঁর কথাতে আপনি উঠবেন কেন, মেগাডে লোকের
কথার আপনার ওঁরবার কি এত গরজ পড়েছিল?
উনি আপনার পরিচিত?

—হ্যাঁ, আমি ওঁকে চিনি।

—বাজে কথা, শ্রেক ইন্ডেনশন।

হারোগা বললেন—হেত পাতে, না চিনলে বেছে-
বেছে এই গাফিতেই বা উঠতে থাকেন কেন।

—ইয়েস। ইয়েস। এই নইলে পুলিসের হোদ্য।
নাঃ আপনাদের নম্বরকে কীকি রেগা নাইরি
ইন্সপেক্টর।

সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব আত্মপ্রশ্নের হাসি হেসে
বললেন—এ-সব ত সামান্য জ্রাই বনাই! কতো বহু
বহু বড়িবাঝ মহাপুরুষের মাথলাতে হয়! থাক,
এখনকার মতো একে হামতে রাখাই ভালো—

বিশ্বনাথ হুচুকি হেসে বলল—একেবারে হামত।

লোকটির নৃশংসনা শূকরে এইটুকু হয়ে গেছে।
সে হতাশভাবে বলল—হামতে—কাহুটা কি ভালো
করলেন বিশ্বনাথবাবু।

—হ্যাঃ—হ্যাঃ—হ্যাঃ—হ্যাঃ। বিশ্বনাথ বন্দুকারের
দগ্ধে চালাকি করে পার পায়ে এমন এমন শব্দ
জম্বার দি। আগে টের পাওনি, এবার মানতে তো।
—বানছি বনাই। এবারের মতো রেগাই দি,
বন্দু শিকা হয়েছে।

—কর বহু বিভিন্ন তখনই বলেছিলেন।

তারপর হারোগাও দিকে তাকিয়ে সে বন্দু—
আপনাদের কি কষ্ট!

—তা বললে আর কে শুনছে ম্যার—

—আম্মা দাগোগাবশাই। এক কাজ করলে কেনন হ্য।

—কী, বলুন শ্যার।

আম্মা যদি আমার তিনজনে মিলে একন ছোট্টেলে গিরে খাওয়া-পাওয়া করি। কোচী হাফতে থাকলে এমন কি আর খেতে পারে।

—আপনার কথাই ওইরকম শ্যার। ক্রিমিন্যালকে হাফতোগ খাওয়াবেন; তারপর বলবেন ঘূমের ব্যবস্থা কখনই চাই।

—আম্মা ওকে ক্রিমিন্যাল বলবেন কেন, আফটার অল সোকটি শিক্তি! তা হাড়া ইনফ্যাক্ট ও তো আর আমার স্ত্রীত কিছু করতে পারে নি।

—হ্যাঁ! সেইজন্যই আরো ডেকারাল টাইপের সোক বসতে হবে। যদি বোকা হ'ত তবে আপনার সঙ্গে খজানোও করতে, হাল্ফায়া বাধ্যতো! এ একেবারে বান; সোক নশাই।

বিশ্বনাথ হাত উঠে সোকটির দিকে জাকিরে বলল—হোল্পেন! আমি ভাই তোমাকে বঁচাতে চাচ্ছি, কিন্তু তুমি একেবারে বজ্রপের কামত বশিয়েছে। এখন কি করা যায়—

সাব-ইনস্পেক্টর পুলিশী চালে বললেন—বজ্রপের এনে যা হয় ব্যবস্থা করবেন, আপনি নিশ্চিত থাকুন মিস্টার মজুমদার—

ওদের সামনে একটি আংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েকে এনে হাজির করল। সাব-ইনস্পেক্টরটি আড়চোখে গোপনিক জাকিরে বলল—এগেন! তুমি আমাকে জ্ঞানিয়ে দাববে খেচি।

মেয়েটিকে জেয়েছিল বিশ্বনাথ, যেন চোখ দিয়ে যা চাটছে। এমন নর লালসা করে তার নৃশিঙিতে। সে বলল—বাম্বারের মাংস।

বিশ্বনাথের আসানী অনুন্নয় করল—বিশ্বনাথবাবু! বাড়িতে আমার স্ত্রী না বেয়ে বসে থাকবে। সাদারাত বেশে নৃশিঙার ভূগবে। তারপর যদি হাফতের বরষ রটে তাহলে আমি সবাই মূখ লোথতে পারব না। দ্যা ক'রে ও-সব গুলো ভেবে দেখুন। আপনার খেয়ালের সোবে একটি নিরপরাধ মানব খবো নাতি ভোগ করবে।

আপনার গুলু শেখের কাছে আপিল করি।

—হাঁ, হাঁ! মহনা, পড়ে ভালো। গুলু শেখ! ইয়েস, গুলু শেখ। আই উইল গিলিত ইউ। অল রাইট—

সাব-ইনস্পেক্টরকে সে বলল—ছেড়ে বিন নশাই সোকটাকে।

—না শ্যার তা ত পারি না।

—হোয়াট, পারেন না। আমি জারিন দিকিচ্ছি—

নিশ্চিত। গিলিত ইনস্পেক্টর কাঁদে কাঁদে বিয়ে হাত নেড়ে জবাব দিল—কিহু মনে করবেন না শ্যার। আপনার এ অবস্থার আমার জারিন গ্রাহ্য করব না। পরে হবতো আপনিই আমার বিধবু চাচ' আনবেন।

—তার মানে?

—বানোটা নেহাতই শূন্যবন! এখন আপনি বেপা করছেন। অপ্রদত্ত মানবের কথার ওপর ভরসা করা চলে না।

—নাইল! অপ্রদত্ত! ইউ নাইল নাভাল।

খড় কাণ করে অফিসার হাসলেন।

—বাম, বেশ মহা! আমি বাতাল! শোনাও ভালো বাতাল বলেছেন ইঁদ আমাকে। আমার জারিন গ্রাহ নর। নর্যাল ত্রেন আমার নেই—হটে।

অফিসার বললেন—যদি করতেই হয় কিহু ত, এ! বাড়িতে একটা খবর দিয়ে বিন মিস্টার মজুমদার।

—হোয়াই। আমার জারিন আপনাকে বাবতে হবে

—আম্মা বিশেষই পড়েছি। দ্রাষ্ট মিস্টার মজুমদার আপনি এখন কাজ করতে বিন আমাকে। বাড়ি গিরে ঘুরে পড়ুন—

—আপনি ওকে ছেড়ে বিন, ভায়েচী ক্যান্ডেল করুন। যা বলি শুনুন নশাই—

—বোশি বাড়িবাড়ি করলে আপনাকে এখান থেকে যেতে দেওয়া হবে না মিস্টার মজুমদার।

—ওয়েল, ওয়েল! আমাকে খাটকে রাখাই উচিত রাখুন খাটকে, ওই সোকটাকে এবারের মতো ছেড়ে বিন নশাই—

—যতো দর—!

এবার ত শূন্য হয়েই। দ্রাকার গুলুনে একা

হাঙতে দিবিয়া থাকা যাবে। চলো সে প্রদুপেট্টা মাঝার কাশা লাগছে। তখন—তখন তোনাকে পোনাবো। হরিণার গল্প—কী প্রেম—কী প্রেম।

সাব ইন্দুপেট্টে ধিকে একটা সিগারেট বাঁড়িয়ে দিয়ে বিন্দাব বদল—বুব কোর তানাপা হলো ত্রাধার। এবার বুব পাচ্ছে—হরিণা, হরিণা—

—বহুগাছা—

কী হুজুর—

ফেলান ঠেকে দরকা ওল।

—বহুসার সাহেবকে বড়গাছের ঘরে নিয়ে যাও।

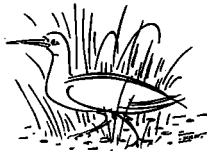
উনি অসুস্থ। আর ব্যাঘো—বেহাল রেখো—

অর্থাৎ বিন্দাবকে বহুবন্দী রাখার হুকুম দিয়ে অফিসারটি বিরক্তভাবে ডায়েরীর পাতাটা ছিঁড়ে ফেললেন—যতো দর হাতালের কাণ্ড!

তারপর লোকটির দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে বললেন—যান নগাই বাড়ি যান।

বিন্দাব শিল্প দিয়ে আনন্দের গাওয়া গানঘানা গলার তুলতে চেষ্টা করে, কিছু পারে না। নাঃ, আনন্দের সংগে রাগরাগি করতে সব মাটি হতে হয়েছিল। সে মাথা নেড়ে বদল—ভূমি বাড়ি যাও ত্রাধার, ডোমার গিঞ্জীর নৃশ-নিদ্রা হোক। আনি থাকবো ঘরের সমুদ্রে ভুবে। ঢেউ—ঢেউ—ঢেউ। একখানি নৃশ অহা—হাঙার হাঙার লাথ লাথ টুকরো ধরে ভাসবে সেই ঢেউতে। কতো ঘবর, কতো সমুদ্র, কী বো—কিছুই তোমরা বুঝলে না। পুণিল সাহেব ভূমি পৃথু হাড় কখনাই চিনলে—! সাব-ইন্দুপেট্টা অ-কৃত্তকে উঠে দাঁড়ালেন—চন্দন বিস্তার বহুগাছা। আপনার বিস্তার বহুগাছা।

—ইয়েদ। চলো। তবে বিস্তার নয়। বিস্তার ত ভীষনর ছাড়িয়ে রয়েছে। অজাব নেই বহুগাছা। টাকা—বিস্তার! রিক্সামিনন আকাশ ছোঁয়া। পৃথু একটুকরো ঘবরের স্পর্শ চাই, তা কি ভূমি দিতে পারো? পারো না—! সেন, ছোঁয়াট!



১৯২০ সালের ১৪ই মার্চ

তা'র পি'নে স-কাউন্সিল
ভারতের গবর্ন'র সেক্রেটার
একটি মোকদ্দমার মন্তব্যে

সই' গিলেন। ভারতীয় হুগ'বিবি আইনের (ইণ্ডিয়ান
সেনাল কোডের) কয়েকটি ধারায় মোকদ্দমা দায়ের
করতে হলে তার আস'ে গবর্ন'মেন্টের নিকট হতে
মন্তব্যী প্রদ'ন করতে হয়। স-কাউন্সিল গবর্ন'র
সেক্রেটারের ১৪ই মার্চ তারিখের মন্তব্যী বসে ১৪ই মার্চ
তারিখে, মিয়ান্টের ডিপা'র্যাটমেন্টের দ্বারা কামরা
ভারতীয় হুগ'বিবি আইনের ১২১-এ ধারা অনুসারে
সোপানে একটি মামলা দায়ের করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই
সোপানে আসাবাদীর বিরুদ্ধে গিরেক'তারা' পরওয়ানাও
বা'র হয়ে যায়। মিয়ান্ট শহরের নাগরিকেরা জানতেই
গেলেন না, কী ঘটতে যাচ্ছে তাঁদের শহরে।

ধারা এঙ্কি সব উলোপ-আলোচন করছিলেন তাঁরা
ছিলেন ভারত গবর্ন'মেন্টের হোম ডিপার্টমেন্টের অধীন
সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর লোক। আসলে তাঁরা
পুলিশ অফিসার, কিন্তু তাঁদের পুলিশ অফিসার বললে
তাঁরা চটে দান এবং তাঁর প্রতিবাদ করে বলেন যে
“আমরা ভারত গবর্ন'মেন্টের হোম ডিপার্টমেন্টের
অফিসার, পুলিশ নয়।”

এই সোনার পাখর বাচিসের ভিতর হতে যিনি
মোকদ্দমার করিমাদী হয়ে ডিপার্টমেন্টের আদালতে দরখাস্ত
দাখিল করলেন তাঁর নাম ছিল ফিচার আর. এ. হুটন।
তিনি আজো ও আবেদ্যা প্রসেনে (এখনকার উত্তর
প্রদেশ) পুলিশের ডেপুটি ইন্স্পেক্টর সেক্রেটার
ছিলেন। সেই দরমে তিনি ভারত গবর্ন'মেন্টের হোম
ডিপার্টমেন্টের অফিসার হয়েছিলেন। সেখানে তার
পদের নাম ছিল সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর
এসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর। কিন্তু দরমাত্তে তিনি নিজের
আল-পরিচয় ঘিরেছিলেন যে তিনি ভারত গবর্ন'মেন্টের
হোম ডিপার্টমেন্টের অধীন সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স
ব্যুরোর বিশেষ কর্তব্যরত অফিসার। মোটের ওপরে,
ভারত গবর্ন'মেন্টের তরফ হতে মোকদ্দমাটি দায়ের করা

মিরাট মামলার যৎকিহিৎ

‘মুক্তমতের প্রাচ্যমদ’

হয়েছিল। এই মোকদ্দম

মিয়ান্ট কনিউনিটি বড়বন

মোকদ্দমা (১৯২০-১৯২০)

দ্বারা বিন্দুভ্যাত হয়েছিল

এর আস'েও দু'টি কনিউনিটি বড়বন মোকদ্দমা হা
গিয়েছিল : (১) শোশোয়ার কনিউনিটি বড়বন মোকদ্দম
(১৯২২-১৯২০) ; এই মোকদ্দমাকে মন্তব্যী বড়বন
মোকদ্দমাও বলা হয়েছে। (২) কানপুর কনিউনি
বড়বন মোকদ্দমা (১৯২৪)। আন্তর্জাতিক কারণে
এই তিনটি মোকদ্দমার পরিচালনাই ভারত গবর্ন'রে
করেছিলেন। স-কাউন্সিল ভারতের গবর্ন'র সেক্রে
টার এই মোকদ্দমাসমূহ চালাবার মন্তব্যী ঘিরেছিল
তখন তাঁর হাতেও ব্রিটিশ বৈদেশিক আফিসের মন্ত
ছিল। মোকদ্দমাসমূহের একটি উদ্দেশ্য ছিল সোনি
দরকারের ওপরে চাপ সৃষ্টি করা।

ব্রিটিশ বৈদেশিক আফিসের নীতির প্রয়োজ
পূর্ব মিয়ান্ট কনিউনিটি বড়বন মোকদ্দমা দায়ের ক
সম্ভব হতো না যদি দেশের ভিতরেও এই মোকদ্দম
অস্বাভ্যাস সৃষ্টি না হতো। অবশ্য, কানপ
কনিউনিটি বড়বন মোকদ্দমা (১৯২৪) ব্রিটিশ ক
আফিসের নীতির প্রয়োজনে দায়ের হয়েছিল। ত
লত'কার'ন বেঁচেছিলেন। তাঁর ছিল সর্বদা গে
গোশো মনোভাব। তিনি ভারতবর্ষে বড়লাটগিরি ও
গিরেছিলেন কিনা। কিন্তু ১৯২৪ সাল আর ১৯
সাল এক কথা ছিল না। -

ইতোমধ্যে দেশের নানা স্থানে গার্ডার্স ও
শেফার্ডস্ পাচিসদ'র পাঠিত হয়েছিল। এই স
পাচিস'তে কনিউনিটিদের নেতৃত্ব স্বেচ্ছাভিত্তি ছিল
১৯২৭ সাল হতে সারা ভারত ফ্রি ইউনিয়ন কং
কনিউনিটিদের একটি বিশেষ শক্তি হিসাবে বোঝা গ
ছিলেন। এই বছরেই প্রিন্স অরু'ত ডাঙ্গো সারা ভা
ফ্রি ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম কনিউনিটি এসিস্ট
সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। অল-ইণ্ডিয়া কং
কনিউটিতেও কনিউনিটিরা ক্রমশ বেশী সংখ্যার প্র
করতে থাকেন। কনিউনিটি আর. এম. বিশ্বেশ্বার বো

প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী হন। পাঞ্জাবে “নওহওয়ান ভারত দল” নামক ধূব-সংগঠন গঠিত হয় এবং তার প্রভাব পাঞ্জাবের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। এই সংগঠনের স্থাপনা ও পদ্ধতিসমূহও কমিউনিষ্টদের হাতে ছিল। সভা বটে শহীদ ভগ্ন সিং “নওহওয়ান ভারত দল”-এ প্রতিষ্ঠাতাদের একজন ছিলেন। কিন্তু তিনি স্বতন্ত্রবাদমূলী হয়ে সভা হতে ক্রমশঃ দূরে সরে যান। পরে তিনি হিন্দুত্ববাদ রিপাবলিকান আদর্শে সঙ্গে যুক্ত হন। এই রিপাবলিকান আদর্শও কমিউনিষ্ট প্রভাবে হিন্দুত্ববাদ সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান আদর্শ হয়ে যায়। বীরাট মাঝামাঝির কসর এই সবই নিচের স্বকৃত্য ছিল, কিন্তু বোম্বার অকৃত্যের কথা এখনও বলা হয় নি। সেটা ছিল ১৯২৭ সাল হতে, বিশেষ করে ১৯২৭ সালের শেষার্ধ্বে হতে ভারতে মক্কাবাসীদের তাঁর সংগ্রাম। পুরো ১৯২৮ সাল এই সংগ্রাম চলতে থাকে। বোম্বে ও বাহালায় মক্কাবাসীর এক একটি ঘরঘিঁচলে মাসের পর মাস। এই সকল সংগ্রামেই কমিউনিষ্ট পার্টি ও ওয়ার্কার্স এন্ড পেট্রোল পার্টি একাত্মভাবে যোগ দেয়। তার কালে ভারতের মক্কাবাসীদের আন্দোলন সংগ্রামশীল রূপ ধারণ করে। তার আগে আন্দোলনের এই রূপ ছিল না। ১৯২৮ সালে বোম্বেতে সূভাষের মক্কাবাসী বহু দায়বদ্ধ করে থাকে। এই ঘরঘিঁচের পরিস্থিতির সাহায্যে কমিউনিষ্টরা একাধারে গিয়েছিলেন। ঘরঘিঁচ শেষ হওয়ার পরে কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে সূভাষ মক্কাবাসীর বিরুদ্ধে “গণনী কামপার ইউনিয়ন (লাল বাঙা)” গড়ে ওঠে।

মক্কাবাসীর এই সংগ্রাম ভারত পর্বনৈতিক নৈতিক বিচারিত করেছিল। তার পক্ষের পাঞ্জা সেন ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় আইনসভার “পাবলিক সেক্টি (অনুশাসন) বিল” নামক একটি আইনের প্রস্তাব উপস্থাপন করা হ’তে। তাতে ছিল যে স্ব-ভারত-বাদী ব্রিটিশ প্রভাব তাঁদের সলো ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রভাবও শাসিত হবেন, ভারতে স্বাধীনবোধী কাজ করলে তাঁদের ভারতবর্ষ হতে বের করে দেওয়া যাবে। আইনের এই প্রস্তাব আদল লক্ষ্য ছিল হইকেন ইংরেজ—বৈদ্য, ব্রাহ্মণ (বৈদ্যিক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ) ও

কিনিস স্ট্রাট। তাঁরা হেট ব্রিটিশের কমিউনিষ্ট পার্টির সভা ছিলেন। ভারতের মক্কাবাসীর সংগ্রামশীল সাহিত্য একাধারে তাঁরা কাজ করছিলেন। তাঁদের কাছে ভারতের ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট বিরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের মেশ হ’তে বের করে দেওয়ার সভা কোনো আইন ছিল না।

কেন্দ্রীয় আইনসভার ভিতরে গণিত প্রতিদান নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস পার্টি ছিল করলেন যে এই আইন পাস করার বাধা দিলেন। তাঁরা বললেন যে কমিউনিষ্টদের সম্বন্ধে তাঁদের কোনো ধর্মসত্য নেই। তবে, কমিউনিষ্টরা যে দেশের পক্ষে বিশেষভাবে হয়ে উঠছেন সেটা গবর্নমেন্ট দেশকে বোকাতে পারেননি। অবশ্য পার্টির লোকেরাও এই ব্যাপারে কংগ্রেস পার্টির সঙ্গে যোগ দিলেন। গণিত প্রতিদানের ইচ্ছা ছিল যে কলকাতা কংগ্রেসের আগে দেশকে বানিকটা গরম করে তুলবেন। হলোও তাই। দেশের নানা স্থানে বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সূচ্য হতে লাগল। এই সকল সভার মোক্ষা কথা ছিল এই যে অকারণে গবর্নমেন্ট দেশকে বসন্তভিত্তিক জ্বর জর দেখাচ্ছেন। দিনের পর দিন এই বিল নিয়ে আইন সভার আলোচনা চলল। অবশেষে একদিন বিলের ওপরে ভোট নেওয়া হলো। গবর্নমেন্ট এক ভোটে হেরে গেলেন। এর পরে আইনসভার হেস্তাকালীন অধিবেশন বন্ধ হয়ে যায়। সংশ্লিষ্ট গণিত বলাই পার্লামেন্ট সেক্টি বিলকে অভিন্যাসপূর্ণ পাস করে দিলেন।

কেন্দ্রীয় আইনসভার পরের অধিবেশন বসন্ত পূর্ণ হলো তখন বীরাট মাঝামাঝি পিটেক্কার হয়ে বীরাটে এসে গেলেন। আন্দোলন পার্লামেন্ট সেক্টি বিলে কিছু কিছু ব্যাধি নতুন যোগ করে গবর্নমেন্ট আবার তা আইনসভার উপস্থাপন করলেন। বিলটির বিল্ট্রুপ-ভাই পাটেল তখন কেন্দ্রীয় আইনসভার সভাপতি ছিলেন। তিনি গবর্নমেন্টকে উপদেশ দিলেন যে গবর্নমেন্ট এখন একটাই কাজ করতে পারেন। তা হচ্ছে, বীরাট কমিউনিষ্ট বহুতম মোক্ষা তুলে নিয়ে এই বিলটি আইনে পরিণত করিয়ে দেওয়া, কিংবা এই বিলটি তুলে নিয়ে বীরাট কমিউনিষ্ট বহুতম মোক্ষা তুলিয়ে যাওয়া। কিন্তু গবর্নমেন্ট আইনসভার সভাপতি

উপরেণে কান দিলেন না। শেষে যখন বিলের ওপরে আলোচনা শুন্য হতে ব্যক্তিগত তখন বিস্তারিত বিবরণ-ভাই পাটেল আইনসভার সভাপতি হিসাবে বসে বসেন যে এই বিলটি বীরাট কমিউনিষ্ট বক্তৃতা-মোকদ্দমার বিষয়ীভূত হয়েছে। কাজেই, আইনসভার এই বিলের ওপরে কোনো আলোচনা আর চলতে পারেনা। এখানেই পার্লামেন্ট সেক্টি বিলের পরিণতি ঘটিত।

এখন আবার মোকদ্দমার কথার আসা থাকুক। মোকদ্দমা দায়ের করার দীর্ঘ কাল আগে হতে ভারত গবর্নমেন্ট মোকদ্দমার ডায়েরীতে শুন্য করেছিলেন। অনেক আগে হতে আইনজীবীরা কাসকস-পত্র পড়ায়ও সেয়ে দিয়েছিলেন। কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার বিস্তারিত ল্যান্সেটের রেকর্ডকে ভারত গবর্নমেন্ট দৈনিক কলকাতা হাইকোর্টের আদালতের বিবরণ লিপিবদ্ধ করতেন। কলকাতা হাইকোর্টের গণিতের দ্বারা মূল্য মতের টাকা। বিস্তারিত ল্যান্সেটের রেকর্ড এই হাইকোর্টেরই বিস্তারিত ঘোষণাকারিত্বকে তার জুনিয়র হিসাবে বেছে নিলেন। তার ফিল্ম দ্বারা হোয়াইট গার্ড গার্ড গার্ড। মোকদ্দমা চলুক, আর না চলুক, আমায় বসে থাক আর বোলা থাক, এই ফিল্ম চলতেই থাকবে। তা হাড়া, তাঁরা সরকার হতে বাড়ি পাবেন এবং আরও অনেক কিছু পাবেন। বিস্তারিত মোকদ্দমা দায়ের হওয়ার দীর্ঘকাল আগে হতে কাসকস-পত্র পড়ছিলেন। তার জন্যে তিনি মোটা টাকা শেয়েছিলেন। বিস্তারিত রেকর্ডও প্রাথমিক সভায়ও ফেওয়ার জন্যে মোটা টাকা দিয়েছিলেন। কী রকম মোটা ব্যক্তি মোকদ্দমাটি শুন্য হয়েছিল তা মোকদ্দমার জন্যে ব্যারিষ্টারদের ফিল্মের কথাটাই শুন্য এখানে উল্লেখ করা হলো।

মোকদ্দমার প্রথমে আসামীর সংখ্যা ছিল ৩১ জন। কয়েকদিন পরে ভারত গবর্নমেন্ট হিট লেন্ডার গার্ডিয়ান ও আর্মী হালফ দায়ের নাম ভাঙতে যোগ করলেন। হিটলার ইংরেজ ছিলেন, কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য ছিলেন না। তেত্রিশ বছরের আসামী আর্মী হালফ দায়ের শুন্য করত গুরুত্বের করতে পারেন। তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য ছিলেন। মোকদ্দমা চলার আগে তিনি ইউরোপে গিয়ে আসামীর

ফিল্মে আসেন। তার পরে তিনি গোপনে বাহ্যিক কমিউনিষ্ট পার্টির সংগঠন গড়ে তুলছিলেন। বাহ্যিকই তিনি শেষে যখন গুরুত্বের দায়ের তখন বীরাট মোকদ্দমা শেষ হয়। সেই সময়ে তাকে বীরাটে এসে আবার মোকদ্দমা শুন্য হতে শুন্য করা সম্ভব ছিল না। তাই বাহ্যিকই অন্য একটি মোকদ্দমার তিনি শুন্য হওয়ার সম্ভব কারণেও বর্ণিত হন। আর্মীর হালফ দায়ের দায়ের দিলে আসামীর দায়ের ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য ছিলেন ১০ জন ও ত্রেট্রিটের কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য ছিলেন ২ জন। এমন অভিব্যক্ত্যও ছিলেন বীরাট পার্টি সভ্য না হতেও কমিউনিষ্ট সভ্যতা সম্বন্ধ করতেন। আবার শুন্যদের কৃপার এক মোকদ্দমাও অভিব্যক্ত হয়েছিলেন বীরাট কমিউনিষ্ট বিরোধী ছিলেন।

১৯২৭ সালে ইউরোপে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন গঠিত হয়েছিল। তার নাম ছিল "সাম্রাজ্যবাদ বিরোধ ও জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনকারী লীগ" (The League Against Imperialism and for National Independence)। এই সংগঠনের ভিতরে প্রচুর সংখ্যক কমিউনিষ্ট ছিলেন, কিন্তু কমিউনিষ্টরাও এর দিকে ওতপ্রোতভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। কমিউনিষ্টদের প্রেরণ হাড়া কোনও আন্তর্জাতিক সংগঠন তখনও গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না, আর এখন তো নয়। ভারত গবর্নমেন্টের তরফ হতে কয়েকজন ব্যক্তি ও কয়েকটি সংগঠন দায়ের এই হিসাবে আমায়তে গণিত করা হয়েছিল। এই সকল ব্যক্তি ও সংগঠন আসামীর সহিত সহ-ব্যক্তি করা। সহ-ব্যক্তি কারী দায়ের এই তালিকায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনকারী লীগে দায়ের ছিল। ইউরোপেও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনকারী লীগের। আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল তা গঠিত অপরদায়ের দায়ের ইউরোপ দায়ের দায়ের তরফ হতে যোগ দিয়েছিলেন এবং তার কাছাকাছি কমিউনিষ্ট সভ্যও তিনি বর্ণিত হয়েছিলেন। তাই প্রত্যয়ে কংগ্রেসের ১৯২৭ সালের দায়ের অধিবেশনে (তিনি তখন দায়ের ইউরোপ হতে ফিল্মে

ইঞ্জিনিয়ার গ্যাপনাল সংগ্রহ উপদেষ্টা দলের সহিত সংযুক্ত (affiliated) হয়। ভারত গবর্নমেন্ট ইচ্ছা করলে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে মন্ত্রী নামদায় আসামীর করতে পারতেন। তাঁর জুলনার অভ্যন্তর নিয়ম চৌবুরী গ্রন্থাবলী দিকে (শ্রীমহাবীর ত্যাগীর জ্যোতির্গ্রন্থ) মন্ত্রী নামদায় আসামী করা হয়েছিল। এই জরুরীকামকালে ও গবর্নমেন্টই শ্রদ্ধা বৃদ্ধিতে। কিন্তু জওহরলাল নেহরু নিজে প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন ও প্রভাবশালী ব্যক্তির পুত্র ছিলেন বলে মন্ত্রী নামদায় অভিযুক্ত হননি। তবুও বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতাদের মনে ভয় যে ছিল না তা নয়। তাই, তাঁরা মনে করলেন যে আসামীদের আত্মপক্ষ সর্বত্রের একটা কিছু দুর্ভাগ্য ব্যবস্থা করা আবশ্যিক। তা ছাড়া, কেন্দ্রীয় আইনসভার বেসংস্কারের সঙ্গে তাঁরা পার্লামেন্ট সেকটি বিলের বিরোধিতা করেছিলেন তাতেও মন্ত্রী মোকদ্দমার জন্যে একটা কিছু না করলে তাঁদের দৃষ্টি রক্তা হতো না। পান্ডীত্বের ব্যবহারে কাগজের বিবৃতি আসামীদের অনুকূলে ছিল না। তা সত্ত্বেও কংগ্রেস নেতারা একটি ডিক্রি কমিটি গঠন করেছিলেন। তাতে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও ডাক্তার বৃন্দার আত্মকাম আনন্দের প্রভাব ছিলেন। আবার যতটা মনে আছে, এতদিন পরে ভুলও হতে পারে, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও ডাক্তার আনন্দের ছাড়া আর কোনও কংগ্রেস নেতা মন্ত্রী ডিক্রি কমিটিতে ঢাকা যেন নি। আসামীদের বিভিন্ন সংগঠন হতে যে সব টাকা উঠেছিল সে সবই ডিক্রি কমিটিতে এসেছিল।

ব্যাকস্টেটের কোর্টে যে দিন মোকদ্দমার ইন্কোয়ারি শুরু হলো সে দিন দেখা গেল যে আসামীদের তরফ হতে উকিল ব্যাকস্টেটের আদালতের দর ভর্তি। দীর্ঘের আদালতে এত লোী আইনজীবীর প্রয়োজনীয়তা আসামীরা বোঝেন নি, কিন্তু তাঁরা প্রতিবাদও করেন নি। ডিক্রি কমিটির কাজে কোনো বাধা সৃষ্টি হোক তা আসামীরা চান নি। এই সকল আইনজীবীর সকলে ব্যাকস্টেটের আদালতেও শেষ পর্যন্ত থাকেন নি। তাঁরা এসেছিলেন তাঁদের ভিতরে বিচারক এম. সি. চান্দলা পর্বতশীর্ষকালে বোম্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি

হয়েছিলেন। উক্ত প্রসঙ্গের বর্তমান দৃষ্টান্তই শ্রীমহাবীর গুপ্ত ও ব্যাকস্টেটের আদালতে দূর অল্প দিনের জন্যে অনুবাহ উকীল হয়ে এসেছিলেন।

আসামীদের সেনে সোপদ হওয়ার সময় যখন এলো তখন ডিক্রি কমিটি উঠে গেলো এবং কোনও উকীল ব্যাকস্টেটের আর থাকলেন না। কংগ্রেস নেতাদের তরফ হতে পণ্ডিত জওহরলালের ব্যাকস্টেট আসামীদের জানানো হলো যে সেনা আদালতে যে দিন মোকদ্দমা উঠবে সেদিন আসামীদের প্রত্যেকে অপর্যাপ্ত বেবে নিলে সঙ্গে সঙ্গেই মোকদ্দমা শেষ হয়ে যাবে এবং যখন অল্প শাস্তা হবে আসামীদের। এই উপদেশ আসামীদের কংগ্রেসের তরফ হতে দেওয়ার অল্পহাত ছিল এই যে কংগ্রেস সংগ্রামে নামতে যাচ্ছে। কমিউনিষ্ট আসামীরা কংগ্রেস নেতাদের এই অশোভন প্রস্তাব তখনই প্রত্যাখ্যান করলেন। কংগ্রেস নেতারা বেসাইনীভাবে যখন বানাতো থাকলেন, আর কমিউনিষ্টদের দ্বারা অপর্যাপ্ত স্বীকার করিয়ে তাঁদের সাগরের নোনা জলে ডুবিয়ে দিতে চাইছিলেন। তাঁরা জানতেন ভারতের গভর্ণমেন্টে রাজনীতিক বন্দীদের অপর্যাপ্ত স্বীকার করার মানে কি? অ-কমিউনিষ্টদের ভিতরে অনেকে ইচ্ছা থাকলেও কংগ্রেসের উপদেশ বেবে নিতে পারলেন না, কারণ কমিউনিষ্টরা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

কমিউনিষ্ট আসামীরা বললেন, তাঁরা নিজেরাই আত্মপক্ষ সর্বত্র করলেন। একথা শুনে দ্বিষ্টার জেহন, ভয় পেয়ে সেলেন, বললেন এই আসামীরাই তাঁকে শেষ করলেন। তাঁর শাস্তা ভালো ছিলনা। তিনি নিজে আসামীদের নিকটে এসে সরকারী পরতে উকীল নিযুক্ত করতে বললেন। আসামীরা বললেন, দ্বিষ্টার জেহনের সরকার কোন ব্যাকস্টেটের কিস ভো গবর্নমেন্ট আসামীদের জন্যে দিবে না, কিন্তু তাঁর চেষ্টা এক বাস দীর্ঘের কোনো ব্যাকস্টেটের কিস কি সরকার দিবে? সে ব্যাকস্টেটেরকো আসামীরাই নির্বাচন করবেন। দ্বিষ্টার জেহন পিছু হটলেন। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী কিছু কলোছিল। সেলেন মোকদ্দমা চলার অপর্যাপ্ত ভিতরেই তিনি মারা যান। যখন অ-কমিউনিষ্ট আসামী সরকারের টাকার উকীল নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁদের

উকীলদরশ বিচারি ডি. পি. সিংহ গবর্নমেন্টের নিকট হতে মাসে ১৫০০ টাকা ফিস পেতেন।

কমিউনিষ্ট আগামীরা রাশিক নামানো ফিস বিয়ে বীরাট কোর্টের একজন জুজির উকীলকে দিব্যুক্ত করে রেখেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল এই যে কোনও কমিউনিষ্ট আগামী অসুস্থ হয়ে কোর্টে হাজির হতে না পারে। এই উকীলের নামে ওকালতদারী দেওয়া হবে যাতে আসামীর অনুপস্থিতির জবো কোর্ট না বন্ধ হয়ে যায়। লেন কোর্টে এইভাবে মোকদ্দমা চলছিল।

৭২ পড়ার পরে কমিউনিষ্ট প্রাসারীরা বীরাট বেলে ঘন একত্র হলেন তখন তাঁরা আদালতে বিবৃতি দিতে গেলেন তা বিবৃতি করে ফেলছিলেন। মোকদ্দমা চলার সময় এখন একটি সময় আসে যখন জুজ ১৮৮৮ সালের জৌরগাঁও কার্যবিধি আইনের ৩৪২ ধারা অনুসারে আগামীকে পাকী কঠিনভাৱে দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। এই সময়ে আসামীরা আদালতে বিবৃতি দিতে পারেন। কমিউনিষ্ট আগামীরা দুর্ভাগ্য বিবৃতি দিলেন ষি করলেন, আর ষি করলেন যে এই বিবৃতির দায়কত তাঁরা সেনের কমিউনিষ্ট ভাবধারা প্রচার করেন। তাতে তাঁদের নামা বেশী হবে, যা ফন হবে সেরিবরে তাঁরা ভাবলেন না। এই রকম বিবৃতিই কমিউনিষ্ট আগামীরা দিয়েছিলেন। সেনের সর্বত্র সংবাদপত্রে তাঁদের বিবৃতি ছানও পেয়েছিল। এখানে যদি এই নকল বিবৃতি হতে অংগ বিপেয় হুসে হিতে পারতাম তা হলে পাঠকেরা আশ্চর্য করতে পারতেন কি ৭২য়ের বিবৃতি বীরাট বন্দীরা দিয়েছিলেন। কিন্তু তত জাগ্রা "বিশ্ব নতাত্মী" নামক সংখ্যার পাওয়া সম্ভব নয়। প্রত্যেক বন্দী পৃথক পৃথক বিবৃতি দিয়েছিলেন। উল্লিখিত বন্দী তাঁদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক বিবৃতি ছাড়া একটি বৃহৎ বিবৃতিও দিয়েছিলেন। এই বৃহৎ বিবৃতির পুরো মূল্যপত্রও এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। বিবৃতি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। সে-পরের পিরোয়ার ও উপ-পিরোয়ারই আমি পড়ে এখানে দিচ্ছি :

প্রথম ভাগের পিরোয়ার হচ্ছে আদর্শবাদের সমাজ তত্ত্ব (Social Theory.)

দ্বিতীয় ভাগের নাম "বন্দ্যবাদ (Capitalism)"

উপ-পিরোয়ার

(১) বৃত্ত্বা বিপ্লব, (২) মার্জের দ্বারা বন্দ্যবাদের নিয়ন্ত্রণ, (৩) বন্দ্যবাদের সোশ্যালিজমের পরিণতিতে সৌহার্দ্যেই হবে, (৪) ইন্টারবেলিকম, (৫) বৃত্ত্ব-পরিবর্তন।

তৃতীয় ভাগ :

সোশ্যালিজম ও সোবিয়ৎ ইউনিয়ন

উপ পিরোয়ার :

(১) সমাজবাদী বিপ্লবত্বের দুই বিপ্লব, (২) দুই সেনে বনিকবাদ, (৩) গণ বিপ্লব, (৪) বিপ্লবের কার্যগত, (৫) পক্ষপাতিত্ব পরিবর্তন, (৬) সোবিয়ৎ ইউনিয়ন একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, (৭) কমিউনিষ্ট ইন্টার-ন্যাশনাল ও সোবিয়ৎ ইউনিয়ন, (৮) সোবিয়ৎ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আসামী দৃষ্টি।

চতুর্থ ভাগ : জাতীয় বিপ্লব

উপ-পিরোয়ার

(১) ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, (২) ভারতীয় বনিক শ্রেণী ও বিপ্লব, (৩) সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বৈপ্লবিক ফ্রন্ট গঠন, (৪) ব্রিটিশ বৃত্ত্ব শ্রেণী ও ভারতীয় বিপ্লব, (৫) সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনকারী লীগ, (৬) সেনের এও সোশ্যালিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল ও উপনিবেশিক বিপ্লব, (৭) কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল ও উপনিবেশিক বিপ্লব।

পঞ্চম ভাগ : কৃষি সমস্যা

উপ-পিরোয়ার

(১) ভারতীয় কৃষকদের দাবি, (২) প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদী ও জাতীয় দিক, (৩) শ্রেণী সাম্রাজ্য হস্তে মোক্ষ কথা, (৪) সমস্যার নিয়ন্ত্রণ, (৫) বনিকবাদের প্রথম অঙ্গ অসেলি ও প্রান্তিকত্ব, (৬) কৃষিকে বনিকবাদের অনুপ্রবেশ, (৭) উল্লিখিত পতাত্মী কৃষকের সমষ্টি ও অবস্থিতি (৮) উল্লিখিত পতাত্মী কৃষক-অভ্যুদয়নত্ব, (৯) কৃষকের পতন বন্ধ করা সাম্রাজ্যবাদী চেষ্টা, (১০) সাম্রাজ্যবাদের কৃষিপতিত্বে আন্তর্জাতিক স্ববিয়োগিতা, (১১) কৃষকদল দ্বারা কৃষকের স্বার্থে কৃষি-সমস্যার সমাধান, (১২) আদর্শ

কৃষক-সনাতনের প্রেরণা, (১০) কৃষক সমস্যার প্রতি জাতীয়তাবাদীরা মনোভাব, (১৪) হালের কৃষক সংগ্রাম হতে শিক্ষা ও তার আলোচনা (১২০০-৩১), (১৫) কৃষক বিপ্লবই একমাত্র সমাধান, (১৬) ওয়ার্কিংস এণ্ড পেট্রোলিয়াম পার্টির কৃষক প্রোগ্রাম, (১৭) কৃষির সমাজবাদী পুনর্গঠন ।

ষষ্ঠ ভাগ : ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন উপ-নিয়োগ

(১) সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের স্থলে বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, (২) সংগঠন, (৩) বন্ধুর প্রেরণ অবস্থা, (৪) ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ।

সপ্তম ভাগ : কৌশল

(১) এই বইয়ের দাবী, (২) "জাতীয়তাবাদী বুদ্ধি" প্রণীত ব্যবহার, (৩) দৃঢ় ক্রান্তি, (৪) গাঙ্গীধর, (৫) ব্যক্তিগত সত্যবাদ, (৬) সংসদগত অগ্রগতি (Constitutional advance), (৭) ধর্মিক প্রেরণ "ইম্প্রিভিক" কৌশল সম্বন্ধে, (৮) বৈষম্যিক পলিটিক্যাল, (৯) বল প্রয়োগ ।

অষ্টম ভাগ :

কমিউনিজম ও বুদ্ধি আ সামাজিক ব্যবস্থাসমূহ

(১) পরিবার, (২) বারী ও স্থান, (৩) ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, (৪) বর্ষ, (৫) বুদ্ধি বা বৈচিত্র্য, (৬) স্বাস্থ্য, (৭) আইন, (৮) বীরাট নামদার আসাদীর প্রতি "সত্যব্যবহার", (৯) সমাজ ।

এই হলো বঙ্গদেশের বুদ্ধি বিপ্লবের প্রতি লক্ষ্য পুঁজী । এই থেকে সকলে বুঝে সবে বুঝে নিতে পারবেন যে বঙ্গীয়া বীরাট আসাদীর কাটাঙ্গী হতে তাঁদের মতাবাদের প্রকার কি ভাবে রয়েছে । তাঁদের কঠোর সজ্জা হতে পারে কিনা দেখেই তাঁরা লক্ষ্যাতও করেন নি । বীরাট কমিউনিষ্ট বুদ্ধিব্য বোকম্বার বঙ্গীয়াই জিতবেইলেন, আর : হার হয়েছিল ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের—ভারতের ও বিদেশের উভয় দেশেরই । বছরের পর বছর বোকম্বা চালিয়ে ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট সারা বিশ্বে বঙ্গীয়ার প্রতি দৃশ্য উল্লেসের পরিবর্তে সমাজসুভাষিত উল্লেখ করেছিলেন । অগতের নানান

হতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর দিকটে অনুগ্রহের এসেছিল যে বীরাট নামদা হুলে নেওয়া য়েক । অধ্যাপক আইনস্টাইনও গ্রামকে মাক্‌ডোনাল্ডকে বোকম্বা হুলে নেওয়ার জন্যে পত্র লিখেছিলেন । তেমন স্বাক্ষর সমাজসুভাষিত উল্লেখ হওয়ার কথা নয় যে সব স্বাক্ষরও জিজ্ঞাসা করেছিলেন । যেমন, একেবারে দ্ব্যংগত লাসিক আবেদিকার যখন প্রেসিডেন্ট রুডোল্‌ফের দ্বারা ভিনারে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন তখন রুডোল্‌ফও লাসিককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে "বীরাট কেন্দ্রি কি এমন ব্যাপার যে তোমরা বছরের বছর তা ভারতবর্ষে চালিয়ে যাচ্ছ ?" বীরাট নামদার আপীলভরের একডোকেট ভট্টর কৈদাসদ্য কাটক্কে লাসিক বলেছিলেন যে "এই কথাটি আপনি সওয়াল-জওয়াবের সময় কোটে" ব্যবহার করতে পারেন ।" মোটের ওপরে, বীরাট কমিউনিষ্ট বুদ্ধিব্য বোকম্বার পঞ্জিালদার দ্বারা ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলন ও ভাবদ্বারা প্রাণিত না হয়ে প্রদারিত হয়েছে । কমিউনিষ্ট পার্টিও ভারতবর্ষে হুতর ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । কমিউনিষ্ট বঙ্গীয়া হলের বাইরে থেকে যে-অবস্থান সম্ভবত বিতে পারতেন না বোকম্বা চলাকালে সেই অবস্থান তাঁরা দেশবাদীকে দিয়েছেন । তাঁদের প্রচারের প্রভাবেই বীরা সমাজবাদী বিপ্লবী আন্দোলনে শিল্প ছিলেন তাঁরা যিকের আন্দোলন সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করতে বাধ্য হয়েছিলেন । আর সমাজবাদী বিপ্লবীয়ে ভিতরে বীরাই স্বাক্ষরীভূত আছেন তারা ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির ভিতরে রয়েছেন ।

অগতের এক দারুণ আর্থিক সমস্যার সময়ে বীরাট কমিউনিষ্ট বুদ্ধিব্য বোকম্বা চলেছিল । সব মিলে এই বোকম্বার ভারত ও ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট কত দরজ করেছিলেন তা কোথাও প্রকাশিত হতে দেখি নি, তবে আমার ধারণা ক্রমশে ৪০ হতে ৫০ লক্ষ টাকা এই বোকম্বার দ্বারা ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট ভারতের রাষ্ট্র হতে কমিউনিষ্টদের বুদ্ধি কেন্দ্রে ঢেলেছিলেন । কিন্তু কার্যত এই বোকম্বার ভিতর দিয়ে বাক্তিঙ্গ স্ফুর্তি কমিউনিষ্ট ভাবদ্বারা দেশের প্রচার । তার কলেই

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দৃঢ়তর ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল।

অন্য সরকারী হলীদ-পত্রে গবর্নমেন্ট কমিউনিস্ট-দের ঠাণ্ডা করেছেন বলে আশঙ্কান করা হয়েছে। বীরাট যোদ্ধা শেখ হওয়ার পরে ১৯৩৫ সালে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স বুরোর ডবলকার ডিরেক্টর সার ভেভিডু পেট্রি সম্পাদনায় “কমিউনিজম ইন্, ইণ্ডিয়া” নাম দিয়ে একখানা গোপন পুস্তক ছাপা হয়েছে। শাসন বিভাগের উচ্চ রাষ্ট্রকর্মচারীদেরই শব্দ এই পুস্তক পড়ার অধিকার। আবারের মতো লোকেরের তার নিকটে যাওয়াও বারণ। কিন্তু পণ্ডিত জগদ্বলাল নেহরুর জীবনী লেখক বিন্টার হাইকেল জোরকে এই পুস্তক পড়তে দেওয়া হয়েছিল। তিনি তা থেকে উদ্ধৃত করেছেন :

“রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্র হতে ৮০ জন কমিউনিস্ট আন্দোলনকারীকে শরতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিল্প জগতে অবস্থার উন্নতি হয়েছিল। এতে কোনো সন্দেহ

নেই যে……গিরেকৃত্যের দ্বারা অবস্থা কতদূরক্ষেণে আবদ্ধে এসেছিল। [ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে নেতৃত্বের একটি শূন্য স্থানের সৃষ্টি হয়েছিল, তার স্থলে অযোগ্য লোকেরা এসে স্থানপূরণ করেছিল।”

এই ভাবেই ইন্টেলিজেন্স বুরো নিভেফের মনে প্রবোধ দিয়েছিল।

এর পরে জেচার যোদ্ধার আশীর্বাদে যে দাঙ্গা করে গিয়েছিল তার কারণ লিখেছেন। এটাও তিনি “কমিউনিজম, ইন্, ইণ্ডিয়া (১৯৩৫)” হতে নিয়েছে। কিনা তা জানিবে, তিনি সাক্ষ্য করে যাওয়ার কাছ দিয়েছেন :—

“ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও অন্যদের চাচে পরে সাহা করে গিয়েছিল।”

২৮ বছর আগে যে ব্যাপারের পরিসমাপ্তি ঘটোঁয়। তা আজ প্রায় পবিত্রতার ঘরে পৌঁছে গেছে। কিংবা তা নিরর্থক পবেষণা নয়।



କାହାଣୀ ଓ କାହାଣୀ



আমাকে যখন কেউ জিজ্ঞাসা করেন, লেখক হোলে সব থেকে বড় লাভ কি হোলেই আনার, আমি সরল ভাষায় জবাব দি—ঐনিক এক বণ্টা বা সওয়া বণ্টার মত সময় উষ্ম উৎকণ্ঠা আর একটা বেগ নেপা-লাগা গোয়ের উত্তেজনা ভোগ। অনেক দূর ভাল লক্ষ উপন্যাসে হেলেনেদার পড়েছিলো, ডাক-পিয়নের পথের পানে ডাকিয়ে কিভাবে নায়ক-নারিকারা ভূগিতোপ করে বলে থাকেন। সেই সময় জীবন্ত হাণ্ডিতোপের বর্ণনা পড়ে তখনকার দিনে মনের মধ্যে বেশ স্ফুর্সক লাগত। ঐ পর্যন্তই, নিজের জীবনে ডাক পিয়নের জন্যে হাণ্ডিতোপ করার সুযোগ কোনও কালেই মেলে নি। তার মানে এ নয় যে, এক আঘাতের একটু-আধটু ত্রেন-ট্রেন করার সুযোগ ছোট্টোনি কপালে। সে রকম সুযোগ তখনকার দিনেও জুটত। জুটলে হবে কি, কপাল গোলে অপর পক্ষের তাঁরা কাগজের ওপর কালির আঁচ কাটতে জানতেন না। জানলেও এখন সাংখ্যাত্তিক রকম জানতেন, যা সম্ভব করে চিঠি লেখ; সম্ভব হোত না। দাক সে সেই অধীর ঘুগের কথা। অধীর ঘুগ পার হোলে আলোর ঘুগে এখন শেঁপেছি, এখন প্রত্যহ ডাক-পিয়নের পথ চেয়ে হাণ্ডিতোপ করে থাকি। আবার জুগল বৃত্তে বসবেন না কেউ, আনার এই তিন কাল পার হোলে এসে চুঁব' কালে শেঁপে হাণ্ডিতোপ কগাটাকে গল উপন্যাসের নায়ক-নারিকালের হাণ্ডিতোপ বলে ধারণা করবেন না। এটা হোল লক্ষণ' অন্য ব্যাপার, এর মধ্যে অরুসিতার গন্ধ বার নেই। এ হোল গলোত্তরীর গলোত্তরীর মত পথিক এবং নিষ্কার এবং বৃত্তের সম্ভব হিতকারী এক বৃত্ত, যা লেখক না হোলে কারও কপালে জুটেবে না কখনও, ছোট্টোবার মোটে সম্ভাবনা নেই। এই পরম পথিক বৃত্তের জন্যে আমি এখন প্রত্যহ ঠিক হুগের বেলা এক বণ্টা বা সওয়া বণ্টা একটা চাপা উত্তেজনা ভোগ করি ঘুগ ভাল ভাবে বলতে গেলে এই ব্যাপারটাকে হোমাক পিয়ন প্লক ইত্যাদি ভাল ভাল নামে ফেঁড়া চলে। বিশেষ কিছু বার আনার হবে না।

এই হোল আনার এই বৃত্ত-বর্ণা'র লেখক জীবনের দূর চেয়ে বড় লাভ, প্রত্যহ কিছু কিছু পদ পাওয়া। যবে বলে ঘড়ি ঘুগে কাগজের ওপর কলম চালান, দূর দিয়ে পিরে প্রকাশক নশাধা নেই হাণ্ডিয়ে কেনে। তারপর চিঠি আদার আরম্ভ হয়। ঘুগ বৃত্তের থেকে চিঠি আসে, এমন সময় জান যেবে আসে দার দার পদ'র কখনও শুনি নি। সে-রকম মানে বাহালা হেরে নান্দ্ব আছে, তাঁকে কালে আনার লেখা বই শেঁপে সেজে, তাঁরা বইখানি পড়ে চিঠি লিখেছেন, এটা যে কত কতবড় উত্তেজনা কাত, তা' দবাই আখ্যাক করতে পারবেন না। সেই দূর চিঠিতে এমন সময় কথাও থাকে বা লক্ষ্য বাবা যেবে কারও কালে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তা' হোক তবু আনার কাছে প্রত্যেকখানি চিঠিই সনান দাবী চিঠি পড়তে পড়তে বলা রকম কলনা করি। যাকে কোনওকালে জানি না চিনি না, তিনি লিখেছে চিঠি। না জানি তাঁকে দেখতে কেন। বয়েস কত তার! কেনে রেজা! তার জীবনের সোপান রহস্য যদি জানা যেত। ইত্যাদি ইত্যাদি' বদু হাতের বেগিনেরী জিয়ার বহুদল মন-রেজা পদ হোলে থাকে। এটেকেই নেপা নেপা ভাব বলতে চেষ্টেছি, আবার লেখক জীবনের ঘুগ কীমোতো পানীর অনেকল বই হোলে থাকি এই পানীর প্রভাবে। প্রত্যহ বেলা বাওটা থেকে সওয়া একটার মধ্যে এ পানীর উপাধিত হয় আবার কাছে। ডাক-পিয়নটি আসে, আসে এসে রহস্য মেতে ডাকডাকি করে চিঠি দিয়ে যেত। এখন সে হাণ্ডিরা নেই, হেঁদা করা একটা বাস কলমে লিখেই দরকার পাশে, সেই হেঁদা মধ্যে চিঠিপত্র গলমে দিয়ে দার। তারপর চুঁপচুঁপি পিরে বাসর ভালা ঘুগে আমি দূর নিয়ে আমি অনেকল আসে দব'ক'খানি পড়তে। লাগুক, দূর বণ্ট হব বলে কোনও আক্ষেপ নেই আনার। পদা হোলে বাবার পরেও অনেকটা দূর জীবি গড়িয়ে দার। পড়ার পরে অনেকল বলে থাকি গলে হাত দিয়ে আর জাতি'...

কি ভাবি !

তা ভাবি, তা সেইসব চিঠিতে লেখা থাকে না । চিঠিতে থাকে, খুব বেশী ভাগ চিঠিতেই থাকে আমার চিত্তকাননা । অর্থাৎ বীভৎস অত্যন্ত কুসংস্কৃত লেখা না লিখে যাতে ভাল লেখা লিখতে পারি, সে জন্যে বহু সঙ্গীতের দান করেন অনেকে । বেশ পড়াশুনা অনেক লেখেন—ভাগ্য করবেন না না দুঃখ হয়বেন না । আপনাব ভাল চাই, আপনি ভাল লিখুন, লিখে সেনের জাতির কল্যাণ করুন, এবং সেই সঙ্গে নিজের নামটাকেও কলঙ্কমুক্ত করুন, এই জন্যে এত কথা লিখলাম । এ জাতের অগ্রাঙ্গা অপাঠ্য বহায়া অসামাজিক অসম্মত প্রদান না লিখে ভাল কথা লিখতে পারেন না ? শুবু, সো-ভায়াড আর চা নগদমা হাজা অন্য বিচ্ছিন্ন পড়ে না আপনার জ্ঞে ? আপনার নজর পড়নের মত কেন ? দুনিয়ার কি হাসি নেই, আনন্দ নেই স্রোম নেই, গান নেই, বিহবব্যা কি দুনিয়া হাজা ফোরে উঠে সজে ? কি হি হি, বরং আপনি কলন ত্যাগ করুন । কলনের অর্থহীন হাচ্ছে আপনাব হাতে । কলর হেড়ে ট্যানিটার ইন্সপেক্টরে চাকরি একটি কুড়িয়ে নিয়ে প্রাসাদসেনের বাহবা করুন নিজের সেন জাতি চ্যা ভবিষ্যৎ বংশধরের বাহবাগুলি আর চিবিরে গাবেন না ।

এই সমস্ত অশকট চিত্তকাননা আর সঙ্গীতশৈলী গায় চিঠিতে থাকে । পড়ে বেরব লাঞ্ছিত হোয়ে পড়ি । নে মনে প্রতিজ্ঞা করি, একটা বেশ ভাল সোজের বিকর ব্যাপার নিয়ে নতুন লেখাটা শুবু করব । লম্বাটার আদর্শ স্রোম থাকবে, উন্নত ধরনের আদর্শত্যাগ থাকবে, একটি সেন বনোরর পার্শ্ব হ'ব । ছেলে মরে শ্রী নিয়ে একজন জগদম্বার মোটামুটি একটি জল্ল অবদার সংস্কারভাড়া বিবাহ করবেন । জোসেয়া ভাল ভাবে লেখা পড়া করবে, যেতেটি লেখাপড়া লিখে শুবু বৈব বরে অপেক্ষা বরছে, বাপ মায়ের মের মত পাত্র পণ্ডা গেলে বিয়ে হবে, অশুবু বাড়ি লে যাবে । শ্রীটি সংসার বরচা চালিয়ে কিছু কিছু খালাস গিরে রেখে সেনের বিয়ের বরচাটা

গ্রাভ জমিয়ে তুলেছেন । কোনও দিকে কোনও সোলমাল নেই । হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ এ রকম সোনার সংসার বরছে । সে সমস্ত ছেড়ে কেন যে মানবের হাচড়াপনা নিয়ে হিচকাবুদী কাদিতে ঘাই, তার জবাব দেবে কে । সত্যিই খোয়া ধরে যায় নিজের ওপর—একশ'বার লিখবেন, পাঠক-পাঠিকালের যদি অনবরত লেখতে লেখা পড়তে হয়, তা'হলে কেন ওপর লিখবেন না ? পরমা বরচা করে বই কিবে পড়বে কি সোকে গ্যা ঘিবাধন করার জন্যে !

অনেক ভেবে চিন্তে প্রতিজ্ঞা করে ফেলছি, পরিচয় কিছু, না শেলে কলন আর বরব না । বিটোল নিখুঁত স্মারচারণলম্ব একটি আখ্যান চাই । পেটিকে মনের মত করে বাছা বাছা কবা দিয়ে লাকাব । লজ্জাটো হোয়ে মনের আনন্দে পড়বেন সবাই, পড়বার পরে প্রত্যেকের মন স্বপ্নীর সুন্দার সমাজের হোয়ে উঠবে । থাকে বলে বনমন কথা, গেই বনমন করবে প্রত্যেকটি পাঠক-পাঠিকার চিত্ত, বৃহত্তর বনমন জীবনের আলাপ্কার সবাই অবীর হোয়ে উঠবেন, তবেই না সন্দারিত্য সৃষ্টি হোল ।

আখ্যান একটি আকর্ষণে বরবার জন্যে এক রকম গুণ পেতে হবে বইলম । অসৃষ্টি বনোত বন নহ, আখ্যানটি শুবু ভাড়াভাড়া বরা দিলে । বরা বিলে ঐ পাঠকের চিঠির ভেতর থেকেই । কিভাবে কি হোল এখন তাই বলছি ।

চিঠিখানি বার তিন চার পড়লাম গালাগালি নেই, নিষে নেই, সন্দারিত্য নেই, আছে একটা অল্প বরনের একটি আদর্শ । লেখক—শ্রীকানকুমার রায়, তিকাদা বাংলাদেশ থেকে বহুদূর একটা প্যাড্ডী বের, পেশা সরকারী চাকরি । শ্রীকানকুমার রায় লিখেছেন, তিনি একটি বার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান । উপেন্দা, আমারে তাঁর জীবনের একটি শুবু বিপ্লব কাহিনী গোনাবেন । তাঁর বিবাস, কাহিনীটি শুনলেই আমি তার কুদান করতে লেগে যাব । এবং একবার আমিই নাকি সে কাহিনী রূপ দেবার যোগ্য ব্যক্তি । সত্য্যং তাঁর পরিবর্তন অনুগ্রহ, আমি যেন তাঁকে বিদ্ব না করি ।

বিন্দু সত্তার বিন্দুরূপে ইচ্ছে যানার ছিল না। তবু একটু সাহায্য হইল। উত্তর দিশান, হাঁ আমি রাজী। শূন্য তাঁর জীবনের নিগূঢ় কাহিনী। কিছু যদি তার স্তরের অগ্নিগতা অগ্নিব্রতা বা এতটুকু সুখটি থাকে, তা'হলে কিছুই করতে পারব না। কারণ প্রতিজ্ঞা করেছি যে প'রম আখ্যান ভিন্ন কিছুতেই কিছু লিখব না। সুতরাং সাবধান—

কির্গিত ভাকে অব্যবসায়িক বিন্দু। আমি শিশুটির হৃদি নিয়ে আপনার কাছে যাচ্ছি। যদি যেকোনো কারণে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করে যেন।

বিন্দু হোলে প্রতীক্ষা করতে লাগল। প্রীতাক্ষ-সুনার একটি বার এসে হল। দু'নিরা-বৃত্ত সবাইকে দেখিয়ে দিতে পারব যে মোংখানি বার দিয়েও আমি লিখতে পারি।

প্রতীক্ষা চলছে। এখানে নিত্য নতুন ভাক আসারও কাহাই নেই। হাবিয়ার বিনীতি শিশুদের হৃদি। সোববার তাই ভাল জোরে চিঠি পাই। সেনিন ছিল সেই ভাল জোরের সোববার, সকাল নটার দরজার বাজা পড়ল। একসঙ্গে চিঠি আছে, সেই ঘিরে নিতে হবে। তিন ঘণ্টা আগে সোববার জন্মে ভের নয়া পদমা বেনী বজ্র করে চিঠি পাঠিয়েছেন যিনি, তাঁর গরজের বহর যোতা পড় নয়। কিন্তু তিনটি কে! সর্বকালের সর্বত্রী কারবারের এলাকা ছাড়িয়ে একান্তে বসে বই নিয়ে যে শেট চালায়, তার সঙ্গে কি এমন স্বাধীন্যাব্যাস কাছ থাকতে পারে তার জন্যে একসঙ্গে মাশুল দিতে হয়।

হৃদয় হোলে বাব হুসে চিঠি পড়লাম। পড়তে আর বিনীতিও লাগল না। বার দু'লাইন—‘সোববার সন্ধ্যার পরে আপনার কাছে যাচ্ছি। আমার কথা না শুনলে কাকনের কথা বিশ্বাস করবেন না।’ ব্যাপ, তারপর সজ্ঞ প্রলাব বিবেচন ও নাম। নামটিও ভারী সুন্দরো—কাঁক। পুতুই ঐ কাঁক, কাঁকনের দেখে পরবী বা দেবী টোথ গোছের কিছুই নেই। তবে কাঁক যে পুতুই নয়, এটা ব'র ভাল করে বোঝা গেল। কারণ অন্তে পরবী না থাকলেও নামের আদিত

বেশ ভারী ঘোরে একটি উপ দেওয়া ছিল। হতভাগিনী কাঁক, হতভাগা নয়। অতঃপর আর কখনই বা কি। ঠিকানা নেই চিঠিতে যে আসতে মান্য করে সোব। সবও নেই, ব'র বণ্টার ভেতর সন্ধ্যা নামবে, সেই সঙ্গে কাঁকও আসবে। আসুক, আসাটা যোথবার কোনও উপায় নেই এখন, তখন আসবেই। কি উপেক্ষা যে আসছেন, এত মানব থাকতে মান্য কাছেই বা আসছেন কেন, ভাবতে বসে সেলাম। বারোটার ভাকের চিঠিসন্দোকে আর ছোঁগই হোল না, কাঁকনের জন্যে কান খাড়া করে বসে থাকলে কি অন্য কিছু মানতে পড়তে ইচ্ছে করে।

চিকতে চিকতে দিনটা পার হোল। সন্ধ্যার আগে ব'র ভাল করে নিম্নেই নিম্নে ঠিক করে কেপলান। সান্দ্রলক্ষা নয়, নিম্নেই নিম্নে ব'র চোখ গাঠিয়ে পাশিয়ে রাখলাম, কিছুতেই ছাড়বে পড়া চলবে না। কোনও কারণেই নিম্নের সান্দ্রা ছেড়ে এক পা নড়া হবে না।

আসুক, কাঁক আসুক কাঁক আসুক, বার বার' হয় আসুক। কান আছে, ত্রেক শুনবে যাব। যদি সত্যিকারের নির্যাস কাহিনী হয়, তা'হলে তার ওপর হঠাৎ চকিয়ে একটি চব্বতার বির্যাব উপন্যাস খাড়া করে কেপল। নত ত্রেক ভালবে যাব, একদিন ঘিরে বা চুকবে ও কান ঘিরে তা বেরিয়ে যাবে। বাক্সে কানেদার নাক গলাবো কিছুতে চলবে না।

এক কাঁক। আবার ঘিরে গড়া ছায়া স্মৃতির মত স্মৃতি সময়ে আবির্ভূত হোল।

বিশেষে হয়ে চুক পাতে হাত ঘিরে প্রশ্ন করলে। সোববার হোলে হাঁড়াবার পর ভাল করে দেখলাম ভাকে। চোখ ধাবাবার মত মানব নয়, নিভাত নিভাট ছাতের আশী। হেটখাটো গড়ন, ওপর দিকের অর্ধেকটার চেয়ে নিচের অর্ধেকটা ভারী। হাত দু'খান নিটোল, নুখটিও শেঁ পান পাতা ধাঁড়ের। চোক নাক ভুতু কপাল সবই এক নজরে দেখে বিশাখ। ভারী অশ্রুত লাগল। বসে চোদ, সেই জ্বলন্তবের কোনও নম্বর থেকে একখানি শাখুরে প্রতিমা হঠাৎ এসে উঠে হোল সাবনে। বেশ একটু খতিয়ে সেলাম।

মিনিটখানেক রাতে কানে গেল খুব চাপা একটু
আগন্ত — “আমি কখন না।”

ভেতরে ভেতরে একটু; চমকে উঠনি বললে মিথ্যা
কথা হবে। চকলেও সেটা প্রকাশ পেল না।
সম্ভার ভাবে বললেন — “এস, তোমার চিঠি শেষেছি।”

কিন্তু তার ভারী শাউরী আঁচলখানা পিঠের ওপর
থেকে ঠেলে এনে দানবে নামালো। মূখ নিচু করে
দিলে — “কাকন আপনায় কাছে আসছে জানতে পেরে
হাসেই আমি চলে এলাম। ওর কথা শোনবার আসে
সময় কথা শুনতে হবে। বরত —”

বরত কি হবে তা' আর বলতে পারলে না কাকিন,
নব্ব্বক আঁচলখানাকে টানটান করতে লাগল। মনে
হাল, নিতেরে আরও ভাল করে ঢেকে ফেলতে পারলে
হল বাঁচে।

ওর হত চাপা গলায় বললেন — “বেশ ভাল।” বোদ
ই চেয়ারে। এখানে এখন কেউ আগবে না, বল কি
লবো — “শুনি।”

পিছনে গিয়ে চেয়ারের কিনারায় আলমোহা ছোঁয়ে
সল। একটু, আঙুলি ভাবে বলতে শুরুর করল —
গন্ধ আপনাকে সব মিথ্যা কথা বলবে। মিথ্যা
নে — ভাল। ওর মাথায় একটা ভাল বাগনা চুকেছে
লগা আপনায় কাছে বলতে আসছে। আপনি মোটে
স্বাস করেন না। আমি — আমি — আপনায় কাছে
নত ব্যাপারটা জানিয়ে যাচ্ছি। আমি যা বলব সব
ভাল। আপনি দয়া করে আমাকে বিশ্বাস করুন।”

আমার একটু, সব চুপচাপ কাটল। দয়া করে
গমাকে কি বিশ্বাস করতে হবে, আপনায় করতে
পারলেন না। কিছু ঐ দয়া করার আবেগটির ভেতর
যেন জ্বলন্ত একটা শুরুর বেগে উঠল, যা একবারে
বাবা করে থেকে দিলে আমাকে। বোবার হত তাকিয়ে
ইলাম ওর দিকে। একটু পরে ও সামলে উঠল।
কখনো হাত বার করে কবজিতে বাঁধা হাঁড়টার
পানে তাকিয়ে বললে — “শেষ সময় নেই আর, তাড়া-
গাড়ি আমার কথা শেষ করে ফেলতে হবে আর কটার
থোঁই আমার নিজে বাবার জন্যে পাড়ি আসবে।”

মকেচে গোলা ছোঁয়ে বসে বসলেন — “বল।

আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে কিছু; হাল আসে না।
তোমার যা বলার অকণ্টে বলতে পার। বিশ্বাস করি
বা না করি, কথা মিচ্ছি, তুমি যা বলে দাবে তা'
আমার কাছ থেকে কেউ কখনও জানতে পারবে না।”

চাপা একটা নিশ্বাস ফেললে কাকিন। কেসে
কাঁপনে কণ্ঠে শুরুর করলে তার কাছিনী।

কাছিনীটা এমন কিছু, পেঁচালো বা বহুসময় নয়,
যা বিশ্বাস করা কঠিন। কাকিন জেছে বাগলা
সেধে, মান্নস চোরেছে বাহুস্থানে। ওর জন্মভাড়া
দিন ভাঙে ও সেধেই কখনও? এমন কি তাঁর পক্ষ
পক্ষ জানে না। পক্ষি হাল এখন ওর বরত তখন হালের
সঙ্গে ওকে হালস্থানে চলে যেতে হয়। তিনি নিয়ে বান,
তাকেই ওখান বলে জানে। নিতের বেগের হত তিনি
পালন করেন কাকিনকে, বহু আটক নিতের আগলেও
থাকেন। তারপর তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পরে দেখা
যায়, প্রচুর টাকা আর কলকাতার কয়েকটা বড় বড়
কোম্পানীর পেয়ার বেগে গেছেন বেগের জন্যে, যে
সাবালিকা ছোঁয়ে ভোগ করবে। তারপর কাকিনের বা
বেগের নিতের বাগলা সেধে চলে আসেন। শুরুর নাম করা
এক বিদ্যাপীঠে নেয়কে ভরতি করে দেন। দেখা পড়া
গান বাজনা শিখে কাকিন আবার বাহলা সেধে যেতে
ছোঁয়ে পড়ে। কিছু বাহলা সেধেটা কেমন যেন ওর
বরত হয় না। বিদ্যাপীঠের পড়া শেষ করে আবার ও
হালস্থানে ফিরে যায়। ওর বা সঙ্গে বান নি, কলকাতা
সহরে মোট একটা বাড়ি কিনে একলা বাস করেন।
হালস্থানে ফিরে গিয়ে কাকিনের বেগাল চাপে ডাকার
হবার। ডাকার অব্যয় হোতে পারে নি, তার সঙ্গে
পূনা থেকে নার্স হোলে এসেছে। কয়েকটা নার্সাবা
হালপা হালে বহু ভিনেব চাকরিও করেছে। এখন সব
হেঁকেছে ঘিরে বসে আছে। বসে আছে সেই কাকিনের
জনো। আচলিতে উদর হেঁকেছে কাকিন ওর জীবনে,
হোলে কিলকুল ওলটপালট হয়ে দিয়েছে।

কবে কোথায় কেমন করে পক্ষির বটল কাকিনের সঙ্গে
জাও বললে কাকিন। কাকিনের কাছ হোল ভরিপ করে
বেড়ানো। হালস্থানের ভেতর এখন সব বান আছে

যেখানে বাবু শহরে যেতে পারে না। নাম কেনবার জন্যে গোয়ায়তুনি করে কাকন জরিপের দল নিয়ে সেই শহরতঃ যখন বাবু জরিপ করতে যায়। ভালর ভালর ব্দ তিনবার কাকন করে ফিরে আসে। তারপর একবার পড়ে ডাকাতের বংশ র। অনেক কাকন করে পাগিয়ে আসে জরিপ করে। তখন একেবারে বরষা ধরা। একটা বাতালীরা হেসে বরষা হাত থেকে শিঙলে পাগিয়ে আসতে পেরেছে, এসে পড়ে আছে হাসপাতালে, হৈ হৈ সেপে যায় শহরে। অনেকে দেখতে যায় কাকনকে হাসপাতালে, কাকনও যায়। তখন ওকে বুঝ ভাল ভাবে মার করা দরকার। হাসপাতালে বলে করে কাকনকে নিজের কাছে নিয়ে যায় কাকন। কিছুদিন পরে মৃত্যু হোলে জরিপ-ওয়ালদের হেডকোয়ার্টারসে ফিরে যায় কাকন। কাকনকেও করে মার দেখানে বেড়াতে যেতে হয়। তারপর সেপেরে এক ক্যাসাল, কাকন এক দামদুদী গল্প আওতাতে মৃত্যু করেছে। সে নাকি জানতে পেরেছে কাকনের বংশ পরিচয়, তবে কোথায় কি ভাবে চুরি করা হয়েছিল কাকনকে আর তার না কে তাও জানতে পেরেছে। কলে একশাল কাকা কাকী, পিসে পিশা আর বড়ভুতো পিসভুতো দাদা বৌদিয়া দাদলা চালাছে কাকনের ওপর। আত্মীয়দের আত্মীয়তার জালনে এখন তার জাল যায়।

এই পর্যন্ত বলে কাকন চুপ করলে। ঠিক বুকে উঠতে পারলাম না, এ কাহিনীর কোনখানটার বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন উঠেছে। কাকন না চুপেছে, সেটা মিথ্যে হোতে যাবে কেন? হোতেও তো পারে, কাকনের ব্যবহার সত্যিকারের পরিচয় কাকন জানতে পেরেছে। নিজের বংশপরিচয় বখন জানে না কাকন তখন কাকনের অবিশ্বাস্যতারকে অবিশ্বাস করার যেতু কি।

হেঁচুটা সম্বন্ধে কিছু আশ্বাস দয়ার চেষ্টা করছিলেন বাইরে মোটা পাড়ির ঘর বৈকে উঠল। চমকে উঠে কাকন বললে—ঐ ওয়া এসে পড়েছে। আজ আমি চললাম আপনি ধরা করে কাউকে কিছু বলবেন না। আমার হাকেও নিয়ে আসব। মার কাছ থেকে সব শুনলেই বুঝবেন যে কি ভয়ানক জাল করেছে কাকন।

দরজার বাইরে উঠে বরষা ইংরেজী টানে কে বলে উঠল—“মাপ করবেন কাকন আছে বোধ হয় এখানে

ভেতরে আসতে পারি?”

উজ্জ্বলিত কণ্ঠে বিশেষী ভাবের বিশেষী কায়দার কাকন জবাব দিলে—“নিকটই নিকটই। চলে এসে মোজা তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।”

বুঝ বোঝা মাঝেমাঝে দরজার সন্ধিগত এক ভ্রমলোক ঘরে ঢুকে ব্দ হাত কোড় করে হাসি হাসি মুখে তারিফে কইলেন আমার নামে। সাতসবের পরিচয় করাতে লাগল কাকন—“ইনি হোসেন সেই উপন্যাসিক, ঘর ভ্রমণ কাহিনী তোমার শুনিয়েছি। বাংলা ভাষা আর শিশুকে না কোনওকিন। হুঁ হুঁ বাংলা শিশুকে আসল বইটা পড়তে পারতে। আর ইনি আমার স্বামী। দাঁও এখন নিজের পরিচয় দিচ্চাম।”

ভ্রমলোক মোটেই হরিদ্রায়াম নয়। বুঝ বিনীত ভাবে বললেন—“আমার নাম দেবদেব, আমার হোসেন শ্যোপাণী। একটু আধটু ডাক্তারী শিখিয়েছি। বুঝে মানসী মানস আনি, যা হোক করে দিন চলে যায়।”

অশরূপ ভূগিরা করে কাকন বলে উঠল—“আমি বিনয়ের অবতার। ওর ভাল মানসী দেখে নিকটই আগনি হাসছেন। বুঝ ভাল করে ভ্রমতা শিশু এসেছে ইউরোপ থেকে। সাংঘাতিক মানস বড় বড় নুটো নারিৎ হোম শুলেছে বোম্বে আর পুনা। বহুরে একটা হাসও মদ্যারের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে না, সেই বোম্বে পুনা আর পুনা বম্বে চলার।”

ডাক্তার সারোপা পকেট থেকে একখানি কার্ড বার করে টেবিলের কোণায় রেখে বললেন—“একধর বিশ্বাস করবেন না আমার স্মৃতি কথা। বেরেবের ওটা ব্যাধি, যে বার স্বামীর সম্বন্ধে ব্যক্তিগত বলবেন। আমার ঠিকানাটা হল ঘর কখনও বোম্বের দিকে যান দূর করে একটু জানাবেন।” তারপর স্মৃতি পানে ফিরে ডাক্তার লাগলেন—“চল চল রেজি হোলে যাবে। অন্ততঃ দণ্ডা দণ্ডা লাগবে কলকাতার শৌহতে। তার মানে ডিনার টাইম পার করে শৌহত্টি আমরা। সবাই বলে থাকবে আবাবের জন্যে। আচ্ছা—আসি তা’হলে আমরা, নমস্কে, নমস্কে।”

কাকন ডাক্তার ডাক্তার আমার পারে হাত চুইয়ে স্বামীর সঙ্গেছেন ছুটল।

বিশ্রী এক কুটুমে কাণ্ড বলে মনে হচ্ছে ।

কোথা থেকে কি আবার ঘাঁটাচ্ছে দেখ । বই দিলে সেটা চালাবেনাও হুব নিয়মের পেশা নয় দেখছি । বই লিখলেই হাসাতে হয়, না হাসাতে দিলে সংসার চলে না । আর হাসাতে দিলেই হাসানো বই দেখানো হুঁসি প্রদান করে । হাসানো বই পড়বার অধিকার প্রত্যেকের আছে । কিনে হোক, চেয়ে চিন্তে নিয়ে হোক বা না বলে বার নিয়ে হোক বই পড়বেই । সবাই পড়ে বার বা হুঁসি চলে লিখবেই । কেউ বলবে ভাল কেউ বলবে হাই পাণ্ডিত্য পড়া আঁতাতুড়ে হুঁসি আবর্জনা । হুঁসিদের হুঁসিদের অভিব্যক্তি অবশ্যলভ্য করে হুঁসি করার ক্ষমতা বার নেই তার পক্ষে এই বই লেখার পেশাটা নেওয়াই উচিত নয় । বই বে-বিন লিখতে পুঙ্খ করি বে-বিনই পিঠে একখানা কুলা বেঁচে হুঁসিকানে ঘানিকটা করে ভুলে গৈলে দিখোই । কামেই পিঠ চাপড়ালে বা গালকন্ড দিলে কিহুই বার আসে না । কিহু এ আবার কি ব্যাপার রে বাপু । কোথাকার কোন পাহাড়ী আচ্ছা থেকে একজন লিখলেন—একটি নিপুত্র কাহিনী শোনাতে আসলেন । আর একজন ভেড়ে এসে এক পাল্য নিষিদ্ধ আখ্যান শুনিয়ে গেলেন । আখ্যানটি কেন নিষিদ্ধ তা বুঝতে কষ্ট হোল না সর্বশেষে ঐ ডাক্তার স্বামীটিঃ আবির্ভাবে । নিপুত্র নিষিদ্ধ নিষিদ্ধ যে রকমই হোক না কেন ওঁদের স্বেচ্ছা, মোক্ষা কথা হচ্ছে, সবই ওঁদের চাক্ষুণ্য ব্যাপার । আমাকে শুনিয়ে লাভ হচ্ছে কি ? শ্রীমান কাকনকুমার জাণিরে রেখেছেন তাঁর নিপুত্র কাহিনী শুনলেই ভৎসনা হুঁসান করতে দেলে যাব । শ্রীমতী কাকন জাণিরে সেলেন কাকনের কথা একজন বিশ্বাস করবেন না । অর্থাৎ হুঁসান কব্জি হুঁসিত হুকু এই হোল শ্রীমতীর বাসনা । হার-রে-হার, যাঁরা হুঁসুল হোয়ে আবার বই পড়েন তাঁরা যদি জানতে পারতেন কোথা থেকে কি উপায়ে আমি গল্প লেখার ভাল বশালা গাঞ্জ করি, তা'হলে সত্য কাহিনী শোনবার জন্যে কিহুতেই আমার কাছে হুঁসে আসতেন না । সত্য কি কখনও দেখা যায় । প্রেস প্রকাশক পুঁসি, পড়ে পড়ে তিন পত্র প্যাট্রিটিয়ে চলে আছে । সত্য যা তার নাম গল্প লেখার মধ্যে হুঁসে শোলে শোষণকারের ব্যক্তি হাযবে না ।

তা'হাতা ডাক্তার সাহেবের পরিবারটি খুঁটুই বলে সেলেন তার মধ্যে গল্প লেখার আছেই বা কি ? একজন হামুলা ব্যাপার । বিবাহিতা মহিলা হোয়ে শ্রীমতীটি একটু—এই—বার নাম অশ্লীলতার আশ্রয় নিয়েছেন । আইনের ভাষায় ব্যাপারটার নাম হবে বোধ হয় অ্যাডালটারি । পাছে কানাকানি হোয়ে পড়ে এই ভয়ে হুঁসে হুঁসি লাগিয়েছেন । কারণ আইন আমার অ্যাডালটারির বলসে ভিত্তোদ'বজুর করে বসে আছে । হুঁসিকল বই কি । সাহেবও যাব তলাও হুঁসে, হুঁসে কি সব সময় সম্ভব হয় ।

হোল—না হোক আমার বয়েই গেল । বোঁটের ওপর ব্যাপারটার মধ্যে গ্লীলতা বলতে কোনও পদার্থ নেই । হুঁসে হুঁসে হুঁসে হুঁসে । প্রতিজ্ঞা বন্ধন করে কলেছি যে পক্ষি ভাবে পক্ষি কাহিনী ছাড়া এক কলর লিখব না তখন এ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি । হুঁসে গৈ ওয়া ওঁদের নজর কাণ্ড-কারখানা নিয়ে । ও থেকে আমার এক বরাণনা লাভ লোকসান হবার সম্ভাবনা নেই ।

মন থেকে সব হুঁসে কলে উঠে গেলোম ভেতরে । ডাক্তার থেয়ে সেয়ে হুঁসে পড়লার ।

সকালে উঠেই আগের দিনের না পড়া চিঠিসুলোকে নিয়ে বসলার । ঐ একই ব্যাপার, কিহু গালাগালি কিহু হিতোপদেশ কিহু পিঠ চাপড়ানো । আর কয়েকটি বিনা পরসার বই পাবার জন্যে আবেদন । প্রায় হুঁসে হোয়ে গেছে, চোখ বুলিয়ে নিতে হয় একবার তাই হাতে করতে হয় । হাতে না করেও বোধ হয় বলে কলেতে পাণ্ডি কোন চিঠিতে কি আছে । টপাটপ চিঠি হুঁসেই আর বাণিয়ে গ্রাফি প্রায় সব চিঠিই এসেছে বশ নয়া পরসার হুঁসে কাগজে, আশুল চুকিয়ে চাপ দিলেই হেঁড়া হোয়ে যায় । হিঁড়তে হিঁড়তে আটকালো এক খালে শৌছে । শক কাগজে তৈরী ভারী হুঁসে বাম একখানি হাতে উঠল । হেঁড়বার আগে পোষ্ট আফিসের হাসটার নজর ফেললার । পোষ্ট কিহুই হোকা গেল না । দাঁতের সাহায্য নিতে হোল, হাতের কাছে হুঁসে নেই । দাঁত দিয়ে ঘাঁবের একটা কোণ কাষে কুটো করলার । তারপর সেই কুটোয় আশুল চুকিয়ে

যান হিঁড়ে চিঠি বার করলাম। চিঠি খুলতে যেতেই
টুপ করে একখানি ছোট কোটো পড়ল আমার কাছে।
এ আবার কি ব্যাপার। চিঠি পড়া স্বাগত রেখে
কোটোখানি ভুলে নিলাম। খাট্ট এক সর্গরজী মোক
দাঁড়ি পাগড়ি শব্দ সর্গরজী ব্যাকিক হাস্যবর্ণিত
জুহুতি করে তাকিয়ে আছেন। অতটুকু হাবিতে নান
তার দাঁড়ির নিচে পর্বত উঠেছে। ঐটুকুই যথেষ্ট,
ঐটুকুতেই সর্গরজীকে সর্গরজী বলে চিনতে ভুল
হোল না। কিন্তু আমার কাছে সর্গরজীর কোটো কেন!
ভাড়াভাড়ি চিঠিখানি খুললাম। কি কাত ঘেঁষ!
কোটো পাঠিয়েছেন সেই কাকনকুমার গায়। বক্তব্য
ছুটি শোভে তাঁর সেরি হবে। এক বন্ধু কলকাতার
বাকেন। নাম—মেঘনাদ কাশ্যপ। কাশ্যপের কোটো
পাঠান হোল, যাতে চিনতে কষ্ট না হয়। কাশ্যপ সেবা
করতে আগের আমার সংশে, সেবা করে যা বললে তা মেন
হয় করে আঁরি পূনে রাখি। শেব কথা হোল, ঐকাকন-
কুমার গায় কিংবদন্ত মনে যে, যেহেতু আঁরি একজন
লেখক এবং যেহেতু আঁরি শব্দ লজ্জাত লোক, সেহেতু
তাঁর বহুটি আমার সংশে স্যাক্ষ্য করার ধরুণ বিশপকে
পড়ল না।

বিশপ!

বিশপকটা কিসের? আঁরি কি বাব না সিঁশি যে
হানবুটা মাঝে এসেই তৎকাল্য তার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে
পড়ল? আর এক সর্গরজী আগমনে। সর্গরজীসের
আবার বিশপের ভর আছে নাকি। উলটে আমাকেই হস্ত
পড়তে হবে হাম্পাবার। যানে—আল সর্গরজী তো,
আবার হস্ত হুসোপদুটির ধাককা করে সর্গরজীর
পক্ষে একটু চোখ পুরই যথেষ্ট। মৈবদর্শিপক্ষে পক্ষে
কখনও যদি ট্যান্ডি করতে হয়, সর্গরজীসের গাড়ি
সাবধানে ঠিকিয়ে বাই। কবিগুরুসে সেই বেশী পাকাইয়া
পিরে—ভুলতে পারি নি কিনা, বেশীর সংশে সেই—
নির্বন নির্ভাকি ব্যাপারটাও খপ করে আমার চোখের
মাঝে ভেবে গুঠি। বলা তো যায় না, কখন ওঁরা—
মোঁথিতে মোঁথিতে জাগিয়া উঠিবেন।

দকাল হেতে না হোতে বেলন হয়ে গেলাম। আচ্ছা
ক্যাসালে পড়া গেল যা হোক। কেন বরতে জবাব দিতে

গিরেহিদান কাকনকুমারকে। বাপস, আর আমার
পবিত্র কাঁচের প্রয়োজন নেই। অল্প অল্প দিনা কাঁচনীতে
গল্প লিখব,—এখন এই সর্গরজীর খস্মর থেকে
আমাকে রক্ষা করে কে।

বিশপের কথাটা মূখ্য কুটে কাউকে বলতেও
পারলাম না। যাবড়ে পোঁছ জানাবারি হোসে হাদা-
হালি পড়ে যাবে। ভবু, মোঁথি নিয়ে রাখলাম শ্রিয়ান
ভবলচন্দ্র ব্যাঙিতে থাকবে কি না। শ্রিয়ান আমার
পরম ভক্ত. এক পাকাতোই থাকে। কপাল আর কাকে
বলে। শ্রিয়ান বললে, ওর নাকি কোথায় ইন্টারভিউ
আছে, বাস্ত বিদ্যানা গৃহিণে রেখেছে, কটাঁর পরেই
শুদ্ধকণে খাড়া করবে। কিরে আগবে দিন পাঁচক পরে।

বেশ, ঐ রকম একটা জবাব দাব জানতাম। ভক্ত
কখনও পরীকার পা দেবে না। দরকারের দরম ভক্তের
টিকি যদি সেবা যায় তা হলে যে ভক্তের ভাকিটুকু উবে
যাবে। বাক সে, একলাই বহড়া নিতে হবে সর্গরজীর,
উপার কি।

ভালর ভালর বেটে সেল সেহিনটা। সর্গরজ কান
দুঁতো স্পর ধরজার বাইরে শেতে বিন কাটানোটা যদি
ভালর ভালর কাটানো হয়, তো তাই হোল। যাত্রেও
স্বাভিতে যুহুতে পারলাম না, দাঁড়ি আর পাগড়ি থাকের
ভগার ভেসে থাকলে কে খুলতে পারে। তোয়ের দিকে
একটু ঘুরিয়ে পড়েহিদান, হাকার চোটে বড়কড়িয়ে
উঠে বললাম। কি ব্যাপার।

কলকাতার ট্যান্ডি একখানা দাঁড়িয়ে আছে ধরজার
মাঝে. আর ট্যান্ডির ড্রাইভার সেবা করতে চাইছে।

মিনিটখানেক লাগল ব্যাপারটা বুঝতে। তারপর
ডডাক করে নেয়ে পড়লাম বিদ্যানা ছেড়ে। চোখে
মুখে দু'খাবলা জল দিয়ে ছুটলাম সর্গরজীর বহড়া
নিতে। নির্ভাত সেই ব্যাকি, সেই কাশ্যপ। কোটাখানা
কোথায় রাখলাম বেন। মনিবখাসের মধ্যে রেখেছি।
মনি ব্যাপারটা আছে কতবার পকেটে। কতখানা বুদে
রাখি যাকার বালিশের পাশে। কিরে যেতে হোল
আবার, কতখানা পরে ব্যাস থেকে কোটো খানা বার
করে এক বার চোখ দুঁলিয়ে গিরে পকেটে ফেললাম।

ঐ বাগাইচু পড়ার পুস্তক সামান্যেও হোলে সেল ।
ছুটে দাবার পরকার কি ! ভাল বকন গান্ধী' প্রকাশ
হওয়া চাই । খুবই ভারি হলে সর্গরক্ষীকে সংবৎনা
করতে হবে । কিন্তু তেই হালকা হওয়া চলবে না ।

পরম্পর ওপর গিরে নীচাতেই সর্গরক্ষী পাড়ি থেকে
নেবে পড়লেন । বীরে হুঁহে তার পাখারার পকেটে
হাত ঢুকিয়ে একখান নামছন্দা সাহিত্যে পত্রিকা বার
করলেন । কয়েক পাতা উলটে একখানি পাতায় খুব
হনোযোগ দিয়ে কি কেন দেখতে লাগলেন । আবার
হুঁহুখানাও ঘেঁষে নিলেন হাতে হাতে । বনে হোল,
পত্রিকার পাতায় যা আছে, তার সঙ্গে আমার কেন
মিলিয়ে দেখছেন । একটু পরে পত্রিকাখানি বাড়িয়ে
বরলেন আমার দিকে । ছিছালা করলেন—“এই ছবি
আপনার ?”

একটিকার তাকিয়েই ব্যাপারটা বুঝলাম । বছর
যাবেক আগে এক পত্রিকাগুলো আমার কিস্টে হুঁহু
তার পত্রিকা, ছাপান । কলে সেবার তার পত্রিকার
বিক্রি বতকরা আশি ভাগ নেবে যায় । সেই পত্রিকা-
খানি যোগাড় করে এনেছেন সর্গরক্ষী, আনি লোকটা
ঠিক আনি কিনা মিলিয়ে নিতে চান । সাবধানের হার
নেই, কিন্তু এতই বা সাবধানতা অবগতন করতে
হচ্ছে কেন ।

সর্গরক্ষী বললেন—“আপনার কাছেও আমার
কোতো পেঁয়ৈ সেজে । আপনিও মিলিয়ে নিব ।
আমার বহু কাকন এই কেতাব আমার পায়িয়েছেন ।
এতে যে কোতো আছে তার সঙ্গে বিলকুল মিলছে
আপনার দুরত । আপনিও আমার মিলিয়ে নিব ।”

বললাম—“ঠিক আছে । তেতরে এসে বসুন ।”

সর্গরক্ষী বললেন—“তার চেয়ে এক কাজ করুন না,
আমার চ্যান্ডিতে আসুন । আপনাকে একটু হাওয়া
বাইরে আনি । পাড়িয়েই সব কথাবাতা হবে ।”

পরীক্ষা । যাকে বলে অধিপতীক । খুব জরিয়ল
একটি বাক্য হয়ে পড়ে সেল—প্রত্যুপপরিবর্তক । যেন
যেন বানানটা গোছাতে গিরে আরও যেন ছট পাখির
সেল হুঁহুতে । কি বলব, কি ভাবে এভাবে দৃষ্টন
পরীক্ষাটা ঠিক করতেই পারলাম না । হাওয়া বাওয়া

বাননা মনের কোনেও উৎক নাগলে না, তার বহলে
হাওয়ায় অভাবে বন বহু গোয়ে এল । সর্গরক্ষীর
মিলিয়ে পাড়ি পায়ে তাকিয়ে চোখেও যেন আঁধার
দেখলাম । তারপর যে কেনন করে কি হোল, বলতে
পারব না । হঠাৎ জেঁপ, সর্গরক্ষীর পায়ে বসে আছি
এবং বা দিকের বর বাড়িগুলো সব হুঁ হুঁ পকে গেছেন
দিকে সৌভ মারয়ে । ভাড়াভাড়ি চোখ বুঁজে ফেললাম
যেন বনে আওড়তে লাগলাম—

এসেছে সে একদিন

লক্ষ পরনে পক্ষা না জানে না রাখে কাহারো বন
জীবন হুঁহু পায়ে ভুঁতা, চিত্ত ভাবনাহীন ।

আওড়ালে যেন কি, বুকের ভেতর গুঁড়গুঁড় করে
দুয়ে উঠতে লাগল ঐ কবিতাটিই পরের হুঁটি
পাইন—

বহন আলিঙ্গনে

কণ্ঠ পাকড়ি বরিল আঁড়ি দুইখানা দুইজনে
বহনকৃত শোনিবিশলা বুকে ভুঁতল যনে ।

একটা বাছপাটির সঙ্গে একটা সাপের লড়াই
চলছে । লড়াইটা গতি চলবে কি ভাবে ! বাছ উত্তে
পারে, সাপ পারে না । বরা যাক, সাপের সঙ্গে লড়াইর
জন্মে বাছ নেবে পড়ল বাটিতে । সঙ্গে সঙ্গে সাপ
তার শেষ বাছের কণ্ঠে পাকিয়ে আঁড়ে বরলে । কিন্তু
বাছ বেচারি কি দিয়ে সাপের কণ্ঠ আঁড়ে ধরে । ঠোঁট
দিয়ে । উঁহু—ব্যাপারটা খুব জুতসই হবে কি । বাছের
ঠোঁটের মধ্যে সাপের কণ্ঠ একটিকার ঘনি যেতে পারে,
সঙ্গে সঙ্গে কৃত করে ফেটে হুঁ আঘাতানা হবে । তার মানে
সেখানেই বোঝাবুড়ির বতন । তারপর সাপের দেহটি
ঠোঁটে করে ধরে উড়ে যাবে বাছ, এবং সুবিধানত
হানে বনে পাতিতে আহার-ক্রিয়াটি দৃশ্যপন্ন করবে ।

হুঁ ভোর—সাপ বাছ হুঁহুকেই নিজের দিকে যেন
যেন যানত করে ফেললাম—যে ঠকুর, যে দুহুয়েব,
ভোমার আল’ অবসারণ করে—কলম চালিয়ে পেট
চালাতে গিরে কি বিশেষ পড়ে সেলাম আজ । যদি এই
বিশেষ থেকে উদ্ধার পাই, সোজা ভোমার অভ্যন্তরে গিরে
বহুলতায় বণ্টা হুঁহুের প্রাণ ছাটলিয়ে দেব—।
তার সঙ্গে খুব ভাল হুঁহুকাটি এক বাউল । ডজন

। কাঁচ ও কাঞ্চন

পাটের রবদীপস্বায় ভাঙিও চড়ান। এইবারটির মত
বকে কর বিশদভাষণ, আমি তোমার দর থেকে অধম
ভক্ত—

ভক্তের আকুল ক্রন্দন বিকল হবার জীবন নয়।
হঠাৎ যেন স্পষ্ট শুনতে পেলাম—

উন্মেষে পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই, গুরে ভয় নাই।

নিঃশব্দে গ্রাম যে করিয়ে দান
কর নাই তার ক্ষয় নাই।

ব্যাঙ্ক অগ্ন একটু নক্ষ কানে গেল, সেই সঙ্গে
সামান্য একটু ব্যাঙ্ক খেলান। চোখ মেলে দেখলাম
গাড়ি খেয়েছে। সামনে ব্যাঙ্কল চার্জ ট্রাকবার
মত বড় কটক।

সর্গারম্মী শব্দ ফিরিয়ে বললেন—“চলুন নানি
আমরা, গঙ্গার পারে বসে দর কথা শুনবেন।”

গঙ্গার কিনারায় বাসের ওপর যা এলিয়ে দিলে
বেথরাজের কাছিনী শুনলাম। বা শুনলাম তা’ কোনও
স্পষ্ট উপন্যাসে ঢালাতে গেলে চিহ্ন পাটকেল অভিনয়
লাভের সম্ভাবনা। অবিখ্যাপ্য ব্যাপারকে বিশ্বাসযোগ্য
করে তোলবার কতকগুলো আইন-কানুন আছে। সেই
আইন-কানুনগুলো প্রয়োগ করার কার্যক্রম শব্দ
সোলেমেলে। যিনি গত বড় লেখক তিনি ততবেশী ঐ
সোলেমেলে কার্যক্রমগুলো রপ্ত করে ছেলেছেন। কিন্তু
আলম কথা হচ্ছে সম্পদারও একটা দীর্ঘা আছে। সম্পদার
হাঁকি অবিখ্যাসের সাগরে নামতে নামতে একবার বই বহি
না পার তা’হলে সম্পদার বহিরাগত আবেশ করা কি
করে সম্ভব হয়। সম্পকে বিশ্বাসযোগ্য করতে হোলে
কাব্যের সঙ্গে কারকের তার সঙ্গে স্থান-কালের দারুণ
ধাক্কা চাই। এটার সঙ্গে ওটার সংগতি না থাকলে
ভিসবাকি বাবেই সম্প, সেই সঙ্গে ভিসবাকি-বাগ্মা
গল্পের লেখককেও কলম পরিভাষণ করে সাত হাত নাকে
খত দিয়ে কাতে হাতে নিতে হবে।

বেথরাজের গল্পের শব্দ কলকাতা সহরে। শব্দটো
বেহাভ অষ্টমীর কাণ্ড নয়। কলকাতা সহরে চুঁরি
ভাক্যটি কবে না হয়, এবং এমন জীবন কি আছে

যা চুঁরি করা সম্ভব নয়। গাড়ি বাড়ি থেকে শব্দ
করে সোকেস নাড়ীতরুঁক পথের বেনামূল হাতিয়ে
নিরে দরে পড়ছে। যেখানে-সেখানে ট্যাক্সীতে প্যাসেঞ্জার
ভুলে তাদের দান গ্রাম নেওয়া ত ছেলে খেলার ভুল
ব্যাপার। বেথরাজের গল্পের নারক-নারিকা ছোট
একটি ব্যাঙ্ক নিজে একটা এক ট্যাক্সীতে বসল।
বেথানে বাবার দানদার ট্যাক্সী চালান, সে ঠিকানাটাও
বলল। কপালের কেরে পড়ে ট্যাক্সী তাদের ঠিক ঠিকানায়
শেঁইছে দিলে না। নারকটি কোথায় উবাও সোলে
কেউ বলতে পারে না। নারিকাটি এবং ব্যাঙ্কটি একবার
পাচার হোরে গেল রাস্তায়। কি উশাবে যে সেটা
সম্ভব হোল তা বলবার পরম বৈ বেথরাজের, রাস্তায়নের
একবার কপরে তাদের টুকিয়ে দিলে বেথরাজ আবার তার
কাছিনী শব্দ বলল।

হাসি পার না। কলকাতা রাস্তায়ন কি এগাড়া
ওগাড়া! শব্দটো ব্যাঙ্ক ভাবকে অটুতা তলাতে
যে শেঁইছন হোল, তার উপরক উপরক, অতঃ
বাতলাতে হবে ত! উকিয়ে দিলে বাগ্মা হোল নারিক
কলম দর কেরে। কেই বা সর্গারম্মীকে জিজ্ঞাসা করে
সে কথা আর কেই বা জবাব দেয়! বেথরাজ তারপর
রাস্তায়নের সেই শব্দ কপরে সর্গারম্মী বন্দা দিতে
লাগল।

সেখানে নারিক মূল পথের মেলে না তাই তারা শব্দের
পিপাসাটা সেখানকার এক ধূমপায় ব্যাঙ্ক। শব্দের
ছিতে কৌটা সেখানে কারও চোখে পড়ে না তাই দবারে
চোখে থিক থিক আগুন ধরলে। সেখানে আকাশেও
কোনও রঙ নেই, তাই বাণির বুক চিরে কিন্তুতকিমাকার
কালচে পাথরের চাঙড়গুলো আকাশকে গাঁত ফির।
সেখানে ব্যাঙ্ক আছে ব্যাঙ্ক বহরে ন’ দান আগুন পোড়ে
আর ভিন দান শীতে কাঁপে। তাই তারা তাদের
দুনিয়াখানাকে অববরত রক্তদান করায়। পরশরের
বনের অধার ঘোড়ার অর্থে কুঁচার ডরবারি কলপানি
একবার উপায় সেখানে, পাওনা সেনার হিসেব শিখতে
হয় বাণির বুকে অর্থাৎ শব্দ দিলে। তবু তারা বেঁচে
থাকে সেখানে বাঁচার মূল ঘোড়ার অর্থে—ঘোড়ার
শিঁঠে আটকে উল্লার মত দৃশ্যবাহুরে হুটে যায়। শব্দ-

বাহুর মত খংস নামে লুপ্তে গ্রামে মনের সাথে ঘরা
সংসার করে তাদের চিক্ পদার্থ থাকে না। পণ্ডিত তাদের
দুর্ভাগ্য সংকল্প তাদের দুর্ভাগ্য। বেঁচে থাকার রঙ্গ
ছিনিয়ে নিয়ে কিরে আসে তারা নিজেদের দুর্ভাগ্য
আজ্ঞানায়, যেখানে পণ্ডিতের পরোক্ষ করতে হয় না
পরিচয়কে পরিচয় করা চলে। যেখানে একমাত্র কৃতান্ত
ছাড়া আর কাউকে চ্যাপ্ত গোদার হাঙ্গামা নেই।

দুর্ভাগ্য। স্মারিকীর বর্ণনার পরে স্থানটিকে সাক্ষ্য
স্বপ্ন ছাড়া অন্য কিছু মনেই হোল না। আদ্য কি
অসুখ স্বাধীনতা। অমন অকলঙ্ক স্বাধীনতা ভোগ
স্বপ্ন ছাড়া আর কোথায় সম্ভব! তা সেই স্বপ্নে শৌণ্ডে
সেই বাচ্চাটির আর তার মাঝের হোল কি।

কাসুদ্র সাহেব শেষে আসল কথা বলেন। বললেন
—“নিবন্ধকারিণি করলে সেই বাচ্চা তার না। যে লোকটি
তাকে প্রাণে বাঁচিয়ে দেখানো নিয়ে গিয়েছিল তার বাচ্চাটা
থলে। কতবড় পরতানী ছিল সে, তাই বলছি।”

পরতানীর সুনিপুণ পঠতা কি সর্বনাশ করলে,
তার পণ্ডিত পেশায়। কলকাতার ঘর চ্যাপ্তিতে
উঠছিল সে স্মারিকীর সঙ্গে, সেই মান্দুটি বিশেষ
রকম ধর্মভীরু ছিল। কোনও কঠি করেনি তার,
এমন কি একদিনের জন্যে তার গায়ে হাত পড়ত
সেই বি। তার গুরুদেব তাকে ছুঁতে বসেছিল, একটি
ভাল থলে বাঙ্গালী মেয়ে পাঠাবার জন্যে। গুরুদেব
ছুঁতে গেলে সেই পরতানীকে বুকিয়ে বসেছিল।
বসেছিল, দেখানো মেলে তার গুরুদেব দুই আঘ
বৎ করতেন। মেয়েকে যাকে দুইজনকেই হাঙ্গার হালে
রাখতেন। অপর পণ্ডিত গুরুদেবের; তার ঘর গুরুদেব
মান্দু ভিরি ঘর—। সেখান থেকে তার ভয়ে
পাণ্ডিতে দুইতে পার না। মরা মান্দুও তার স্বয়
মেয়ে লেকে ওঠে।

অত বড় একটা মান্দুয়ের ঘর গুরুদেব পরতানী
একোয়ে গুলে যায়। তৎকাল্যে বাচ্চা হয় সেই
হয়ানখিন গুরুদেবের কাছে যেতে। কিছু তখনই তো
পাঠান যায় না। গুরুদেবের কাছে সংসার পাঠাতে হবে,
তার পদার্থ বিতে হবে। কোথায় থাকতেন তিনি,
কোথায় থেপ করতেন ভক্তের উপহারটি, সমস্ত আসল মেলে

নেওয়া চাই। তোড়ফোড় করতে হাস্যবানেক দেবি
হোয়ে গেল। সেই দরজা সে কলকাতার আসে-
পায়েই রইল তার মেয়ে নিয়ে। তারী ভয়ভয়ে
রইল। তার স্মারিকীর তার চোখের সামনেই পতন
করা হয়েছিল। সে জন্যে তার মনে এতটুকু ক্ষোভ
বা দুঃখ ছিল না। ও সমস্ত ব্যাপার নিয়ে একমাসের
জন্মেও সোলমাল করার চেষ্টা করল না সে। কবে
তার ওপর সকলেই দুই বিশ্বাস জন্মে গেল। তখন
সেই চ্যাপ্তিগোদার ব্যক্তি যেরেফের সঙ্গেও সে নিপতে
গেলে। মোটের ওপর ঐ একমাসের মধ্যে চ্যাপ্তিগোদার
পণ্ডিতটা যে ভাল করে মেনে নিলে। ব্যক্তি কোথায়
বাঁকিতে কে কে থাকে, মেলে মেয়ে কটি, কউয়ের
নাম কি, চ্যাপ্তি আছে ক'থানা, কোন চ্যাপ্তির কত
নন্দর, কিছু জানতে তার বাচ্চা রইল না। তারপর
নির্দিষ্ট দিনে মেয়ে নিয়ে হাওড়ায় গিয়ে পাণ্ডিতে
উঠল। শৌণ্ডে বিতে সঙ্গে গেল সেই চ্যাপ্তিগোদা
স্বয়ং। বোন চলেছে ভায়ের সঙ্গে, এতে আর
দোষটা কোথায়। তবু আলবার কামরার ভূপতে হোল
ভায়ের, বিশুদ্ধ এক স্মারিকীর সঙ্গে বাঙ্গালীর মেয়েকে
এক কামরার মেয়েলে পাঠে কেউ কিছু সন্দেহ করে,
এই জন্যেই ভায়ের বা মেয়েকে যেমনা কামরার ছুঁলে
দেওয়া হোল। সব বড় বড় স্টেপনে ভাইটি যেমনা
কামরার পাশে গিয়ে বোনের সংসার নিলে। আঘর ঘরে
এতটুকু এটুট হোল না। যেমনা কামরার আরও
কয়েকটি যেমনা ছিল। তাকে সঙ্গে গুল গুল
করতে করতে আরামে শৌণ্ডে গেল আঘার। আঘা
থেকে গাফি বল করে—সঠিক পথে চল।

“হাঁ, সঠিক পথেই চলে নিয়ে গাফিলা ভাইকে
সেই পিণ্ডাণী। একটি ঘায়ের জন্যেও এতটুকু সন্দেহ
হোল না ভায়ের—উঃ—আল কউটে সাগের বাচ্চা।”

জন্মে একটা নিম্নাশ চ্যাপ্ত করে মেঘনাম হঠাৎ
চুপ করল। গুরুদেব চুপই করলে না, গুরুদেব হুঁলে
নিজের দুঃখানা ঢেকে—কোনও রকমে নিজেকে সাহায্যে
লাগল। আঘিও ঘর বড় করে তাকিয়ে রইলার।
আঘ এক স্মারিকী এক হাত তকাতে বসে কুঁলে
উঠলেন আর চুপে গাফিল। ভেতরে মনে থাকা

বিশাক বাগের গ্রামে হঠাৎ কেটে পড়তেও তো পারেন। তারপর সেই কঠি পাকড়ি ধারণ আঁকড়ি—বটে বসতে বাধ্য কি।

না, যেখানক কান্দুরও বনভীম মান্দব। কিংবা এও হোতে পারে বাপলা মেগের জল হাওয়ার পূর্বে সহজেই বেঁচেয়ে পড়ল। পক্ষ নবীর ভীয়ে কটপটি পিরে বেশী পাকিয়ে যা করা সম্ভব বাপলা মেগের পক্ষার ধারে বসে সেটা করা হয়ত ভতটা সহজ নয়। একটু পরে বিশুদ্ধ বঙ্গ সম্রাটের বড় নিষেধকে সামলে নিয়ে কাছিনীর বনামিতকু শুনিয়ে দিলে আবার। পূর্নতে পূর্নতে বসে বসে কঁকড়ে একটুকু হোয়ে গেলার।

সেই একটুকু বাচ্চার না বঙ্গবালা মোরে অভ্যস্ত বেমকসারাকটা করলে কেমন করে! অতটা বুদ্ধি অতর্কিত ঠাণ্ডা নষ্টক, অমন পূর্নীর সাহস কোথা থেকে জুটল সেই ছোট বাচ্চাটির ছোট হাতের ভেতরে। অভিজ্ঞ বাঙ্গালী যে বলেন, মেবে কাউটার কুকে প্রীতিহিংসার প্রবৃত্তিটা একবার জলে উঠলে স্কিমুতে আর নেমে না, স্টোঁ কি তাহলে একদর বিষয়ে নয়। কি জানি কেন কবিরা ওঁদের শক্তিশূণী বলে সম্বোধন করেন।

মেবাবা কারবার বসে পাকির পরিচয় দেবার বন্দোবস্ত করে ফেলে সেই বাচ্চার না। ঐ কান্দুরাভেই বিকানীরে পূর্ন নাম-করা এক শেঠজীর বংশী ছিলেন। শুভসাহিলার ঘনেষ্ট বয়েস হোয়েছিল। তিনি লক্ষ্য করলেন ব্যাপারটা। ছোট্ট একটি বাপলাশী বউ চলেছে এক বাচ্চা নিয়ে। বড় টেনশনে গাড়ি ধামলেই এক সর্গারকী তাদের গম্বাধ নিতে আসছেন। শেঠপন্নীর ঘোঁষ খবর নিতে তার পূর্নও আগ্রহিলেন বাকে থাকে, জানলা দিয়ে পূর্ন বাড়িরে পূর্নের কানে কবাটা কুললেন তিনি। পূর্নটি তখনই অনন্যাবে প্রভোজনদীর পয়ানক নিয়ে গেল। তারপর শেঠপন্নী মেবে আসল কললেন বাপলাশী বউটির গলে এবং প্রথম পূর্নবাগি শেষেই বউটি তার সন্ধ্যাবার করলে। গাড়ি আগ্রার শেঠবাবর আসেই তারে গম্বাধ চলে গেল রাজস্বানের এক মন্দির কাছে, শেঠ পূর্ন পাকা বন্দোবস্ত করে ফেললেন। আত্মা থেকে বসন ছোট গাড়ি হাফল তখন সরকারের পূর্নকাশ, শাসনব্যবস্থার প্রত্যেকটি অঙ্গ

প্রত্যঙ্গ নিম্নে পূর্নতে পূর্ন করছে। শেঠপন্নীর পেন উপশেষটুকু বসে বসে তপতে লাগল বৌটি রাজস্বানের গাড়িতে উঠে। উপদেশটি গোল একদর বাবভারে না, গাড়ি থেকে নামিয়ে মেবানে নিয়ে যেতে চায় বাবে, পূর্নীর আগ্রহ কানে মেলেই মেটেটাকে বৃকের তলার চপে হাতিতে পূর্ন পড়বে।

পূর্নো একটা রাত একটা দিন গাড়িতে কাটিয়ে মেবানে গিরে নামল সেই মেবে অর তার না, মেবানে কয়েকজন মান্দব যোড়া নিয়ে তাদের অন্তর্ভাবনা করার জন্যে তৈরী হোয়েছিল। বাপলাশীর মেবে যোড়ার চক্রেতে পারবে না, অগত্যা হটিমি। রাজার রাজ্যা খিনি সেই পূর্নকের, ওঁর জন্মে যে পূর্না উপহার এল, তাকে হটিতে হবে। অর্ঘ্যের পরিহাস আর কাকে বলে! একজন যোড়া হুটিয়ে চলে গেল, সংসারটা সেই দরশিকমানকে জানাতে। শিবিকা নেই, এখানে বিদ্যবৎ সধ্য হয় না। কাছের সেই দরশিকমান শ্রবৎ অগ্রসর হোলেন। রাতের প্রথম প্রহরে এসের হল শৌছে গেল একটা যোড়া হুটিয়ে ডিলার সামনে। সেই ডিলাকে পাক দিয়ে সারান্য একটু জল পাখর ভিছিরে নিম্নে বসে গাড়িল। সেই জলে অচল ভিছিরে মেবে না, বাধ্য হুছিরে নিলে বউটি, নিজের পূর্নও সেই জল আঁকলা ভরে দিলে। তারপর বলে বলল, আর নয়। আর এক পা সে হটিতে পারবে না সেই রাতে, হটিতে হটিতে পারের গোহ পর্বত কূলে উঠেছে।

মুভরাং মেবানেই ঘনতে হোল দরহাকে। পূর্নিয়ে বড় একটু ঠাই মেবে যোড়া থেকে নেবে পড়ল সবাই। তারপর না মেবের জন্যে কক্ষল বিছিরে দিলে। মেবে নিয়ে না তখনই পূর্ন পড়ল।

রাত পড়াতে লাগল। হুছিরে হইল পূর্ন, সেই বাচ্চা আর বাচ্চার না। যে সর্গা কী তাকে কলকাতা থেকে নিয়ে গেলেন, তিনি মেবে বইলেন। পূর্নমেবের নাম নিবেদিত বড়, পূর্নমেবের পায়পরে অর্পণ না করে চোখের পাতা যোড়া সম্ভব নয়। পূর্নমেবের তরক থেকে দাবা নিতে এসেছে, তাদের বিশ্বাস করতে সেই ডিলার মোড়া হুড়ি পূর্নমেব পারে না। ক'রাত

দেখতে, শিকারের পানে তাকিয়ে লকলকে দ্বিভূত থেকে বল চোবান্ধে । কিন্তু উপায় নেই কাছে এসবার, সর্ব-পাতিমান প্রস্তুত হতে পড়ে যায় । পরবর্ত্তে কাঁকি দিয়ে বাঁচা সম্ভব হোলোও হোতো পারে, পরনের বাবা প্রভৃত্তিকে কাঁকি সেওয়া সম্ভব নয় ।

গভাতে গভাতে রাত সেই বীভৎস স্থানটা প্রায় পার হোয়ে গেল । বউটি ভখনও এক ভাবে শূঁয়ে নিশ্চিতে শুনছে । ওনারে পরামর্শ শুনু হোল, শুন থেকে তাদের উঠিয়ে দাড়া আরম্ভ করা উচিত কি না । পরামর্শটা শেব হবার আগেই শুন কাছাকাছি গাইকেল গছে উঠল । চল সেই উৎকট আওয়াজ বিবিত দলেক ধরে । বউটি উঠিলেও না, শুন ফুলে ভাকালেও না । মেয়েটাকে শূঁকের তলার ফেলে শূঁধাতে নিজের শূঁকান চলে উবড় হোয়ে পড়ে রইল ।

ভাবপর—

ভাবপর কি হোল তা' আবার কানের ভেতর প্রবেশ করতে গেল না । আঁনি সেই মোট বাজার মোট বাজের চিত্তার কেন্দ্র যেন বেহুঁশ হোয়ে রইলার ।

মেথ্যাক কাশুরের গল্প বিন্যাস করে ফেলব, অতটা বোকা নিজাই আঁনি নই । বিশেষ জাতের ডানাক সেবনের পর ও রকম বিকট বিবরণ শুনলে মৌতাত হয়ে ওঠে । বিন্যাস করা বা মৌতাত করার প্রস্তুতি উঠছে না । সন্দেহ ভিন্ন ধরনের একটা ব্যাপার ঘটে গেল । মেথ হাঙের গল্পের বউটিকে হতে হতে বার বার প্রশ্ন করে বলদার—জানি না, তুমি ওই সর্দারজীর ওই গাফিতি বাঁধা শিরের মধ্যে জন্মেছ না সত্যিই তুমি একদিন রক্ত হাংসে গড়া হানবী ছিলে । বাই হোক না কেন, তোমাকে প্রশ্ন জানাচ্ছি । বাঙ্গলা দেশে জন্মে বাঙ্গলী শ্রমীর মধ্যে বা তুমি করলে একলা বাজা বুরু নিয়ে সেই শব্দ দলে চুকে, তার দলে সাবিত্রী উপাখ্যানের ফুলনা করা যায় । শূঁত পতিতে জীবন্ত করে নিয়ে ফিরে এগেছিল সাবিত্রী ধরের বাড়ী থেকে, তুমিও তাই করলে । তোমার স্বামী কোনও দিন হরবে না, তোমার মত স্ত্রী বার ভাগ্যে ঘোটে তার মৃত্যু নেই । স্ত্রীর নামের দলে তার নাম কালের বাতায় অমৃত বক্ষের ঝরকাল বেঁচে থাকে ।

অমৃত ভাতের একটা তপ্তিতে আর গবে' বহুশব্দ বহু হোয়ে এইলার গম্ভীর পানে তাকিয়ে । ভাবপর হঠাৎ এক দম্ব খেপাল হোল, পাশে বলে সর্দারজীর বকেই চলেছে । ওর শেষ কথাটা ধ্বংসে পারলার । কি হেনে একটা বিশ্রী গালাগালি দিয়ে বলে উঠল—“আমাদের সর্দারশ করছে সেই সর্দারশ, বাড়ি ঘর দেল, পাড়ি কথানাও দেল, বাবার আঁত হর ফেল হোল । ফেল থেকে দাদা আর ফিরলেনই না । আমরা তাঁর মৃত্যু ধরটা শুনু পোদার ।”

জ্ঞানক রক্ত থেকে উঠে জিজ্ঞাসা করলার—“দাদা । কে আপনার দাদা ?”

মেথ্যাক শূঁব কিছু করে জবাব দিলে—“যে তার শূঁবকে উপহার দেবে বলে সেই সর্দারশিকে গোপাড করছিল । থাকে সে আপন বহিন বলে ভেবেছিল, বার ইচ্ছাং বর্তাবার জন্যে সে দলে গিয়েছিল । এখন আমি বড় হোয়েছি, তখন শূঁব বাজা ছিলার । এখন বাঁধ একবার হাতে পাই তাকে না তার মেয়েকে তা'হলে নিরকহারানি করার কল শূঁয়ে আসলে কিরিয়ে য়োব ।”

উঠে পড়লার । আসলও বৃষ্টি না তার শূঁব কলতেও জানি না । ও হাঙ্গারের দিলের নিয়ে সর্দারজীর দলে বিচার করার প্রবৃত্তি বা শাসন কোনওটাই ছিল না । গাফিতে বলে মেথ্যাককে শূঁবই বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলার—“কাকনবাবুর দলে আপনার ঘোড় হোল কোথার । তাকে আপনি কত দিন থেকে চেনেন ?”

মেথ্যাক গাফিতির শূঁব একটু শূঁরিয়ে নিলে, একটা শূঁবলো মোথ তার পত্তর নিয়ে বাজা দলে করে হাতা পার হাঁকল । গাফির দৌড় একটু বাড়িয়ে বললে—“বাবুকে আমি এখনও চোখেই চোখিনি । কিন্তু তিনি আমার দোষ, ওয়েশ থেকে তাঁর নামে আমার কাছে শূঁকল এসেছে, তাকে বিন্যাস করতে হবে । ঘি তিনি কোনও দিন কলকাতার আসেন, তাঁর শূঁব-শূঁবিয়ে দেখতে হবে । তিনি বা কলমাস করবেন তা' জোটাতে হবে । হঠাৎ বাবুজী দিখে পাঠালেন আপনার দলে লেখা করণের জন্য আর দলে ঐ বইখানা পাঠালেন যাতে আপনার হানি আছে । বাবুজী চান, আমি সব কথা আপনাকে শূঁতে বলি । আপনি নাকি মর্ষ হোলে আমার বাতলাতে

পায়েন সেই বা আর নেহে কোথায় আছে।”

মুখ বুজে বসে রইলান। পাড়ি এসে ব্যক্তি নামনে পারল। পাড়ি থেকে নামবার সব বেগবাজ আর একবার জিজ্ঞাসা করল “তাদের হুঁজুনের ঠিকানা কি আমার সেনেব না।”

চুপ করে গাঁড়নে রইলান দরজা ধরে। আর একটু হোসেই মুখ কসকে বেহতে বাচ্ছিল। তাদের আনি জানিও না চিনিও না। বুঝে শব্দে নিলার। বদলার “আপনার মোত কাফবাবুই আমার কাছে আসছেন দরজার।” তিনি এসে আপনাকে সেই বা আর বেহের ঠিকানা বদলার হুঁজুনে সেনেব বোঝে হয়। “আমার কাছে হুঁজু ভরমাপ করেছেন, আপনায় কথা সব বন দিয়ে শুনতে হবে। আপনাকে কিছু জানাবার কথা তো দেখেননি। বেগর হুঁজুনে এক পা নড়ার শক্তি নেই আমাদের, একথা আপনিও জানেন।”

বেগবাজ চাত ব্যক্তির আমার চাতটা চিপে ধরে বললে—“কদর বাপ কখন। আপনাই আমার আদার করা উচিত ছিল যে আপনি আমাদের নিষেধ শোক। নমস্তে নমস্তে—”

পাণ্ডিখানা নমস্তের আড়ালে অদৃশ্য হোয়ে গেল।

ওদের আপনজন হোয়ে পড়াটা বুঝে বড় সৌভাগ্য কি না হিসেব করতে গিয়ে বস্ত্র একখানা সরলে খেঁতের মাঝখানে শেঁটে গেলার। যেথিকে ভাকাই শব্দে সরলে কুল, আত সরলে খেঁতখানা হাওয়ার মোশায় হুঁজু। টলতে টলতে বাঁচিতে চুকে চোখ বুজে পড়ে রইলার চোয়ালে। চোখের সামনে গিয়ে ওজন সরলে কুলের বদলে হক্কের নদী বইতে লাগল। ছোটা হুঁজু কুপায় ভরবারি কত কি যে দেখতে লাগলার, তার ঠিক ঠিকানা নেই। ধানিক গরে খোয়াল হোল যে সকাল থেকে হুঁজে একটু চা পর্বত পড়েনি। চোখের কথা বনে পড়তে ধরনের কাপড়কেও দরল হোল। এবার সত্যিই চটে উঠলার নিষেধ ওপর। হজ্জ কি! চা ধরনের কাপড় শ্রান এখন কি হাঁত বাজা কমটিও হাতী আছে তখনও, পাগল হোতে আর গেরি কোথা!। স্বীকরে বিক্কার জন্মে গেল, নিষ্ঠুরি হয়ে গেল দেখার। গুল জায় গপের উপারান হুঁজুতে গিয়ে

বুজনের সঙ্গে নিজে মানুকের গলায় চাকু ঢালাবার হায়ে শেন ভীলনে চরাসহরে পাগল পড়তে চলে থাকি!

ততাক করে থাকিরে উঠলার। তবশর পতি মেছে মুখ ধরে চোখের খোয়াল আর ধরনের কাপড় নিয়ে বদলার। হায়ের নট্টা সত্যিই যদি মানিক নেবে যায়, তা’হলে আত-নাতে গুল লিখে পথনা চোখগানের দার থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়া সম্ভব। বেড়াল-গুলোর জন্যে একপো করে চেনো নাহ কিনতেও বেহক বেআবর, চোতে হচ্ছে। গালে চত বেহে পকেট খালি করে ছাড়ছে বত ব্যাটা কদাই, ব্যাটারে পরীরে কি মারা গয়া বলতে কোনও পদার্থ আছে!

ধরনের কাপড়ে আঁপটে গুটীক পর্বত পাওয়া গেল না। তার কলে চতলোকে শৌরিতে কত বস্ত্র পড়বে, তাই নিয়ে চতলোকা গবেদনা করা চোয়েছে। পড়লেই পায়ের মোখ থেকে হাফার চুল পর্বত রি রি করে ওঠে। ধরনের কাপড় বাঁগ বাগ করেন, তাদের ব্যক্তিও মোত হুঁজু বি মাচ মাংস বেওয়া হোওয়ার চটে ধরে যায়। সেই সমস্ত বস্ত্র উত্তরসায় করার কলে যে সব বস্ত্র শ্রীকৃষ্ণাণ চোয়েছে। সেই সব বস্ত্রখালার চতলোকে বেহে একের পিঠে পক্ষাণ গুটা পথনা বদলে বত হর তত টাকা বজা হোতে পারে। আমাদের হলে না একটা নয়া পরমাণ। পাঁচটি টাকা হাতে করে বাজারে গিয়ে টাকা কটি সোয়াল দিয়ে বা নিয়ে ধরে কিরি, তার হাফা হুঁজুনা পুষ্টির পিঠি গিলে যে কলের বাগল কতে আছি আবগ তা’ তাল্য করে হুঁজুপর্বত এহন করতে একটু কড়ও আপত্তি হবে না। এবং হুঁজুপর্বত একমুখ নিষেজার এহ থেকে এহাথের স্বহস্তে ধরে বেড়ানো ধাবে। প্রত্যহ সকালে বাজারে গিয়ে শাক নাহ তরি-তরকারির জন্যে মহামান্য বিক্রোতা বিক্রোতাদের হুঁজু-নাড়া ধরে মরতে হবে না।

বাজারের হাছ আর আকাশের চাঁদ ছাড়া ধরনের কাপড়ে বা থাকে, তার মধ্যে চুরি ডাকাতের হুঁজু আর একটু চোখ হুঁজুয়ে নিতেই হয়। কত জাতের উপায় উদ্ভাবন করে মানুকে হাফা হাংগের খচির হুঁজুপর্বত-টাকে তিকিরে রাখার জন্যে চেষ্টা করে, তেনে রাখা

গাল। বলা ভো বাব না, হুণ করে করে বান্ধনের চক থেকে গল্প পড়ার সাহ উবে যাবে। তারপরও যদি টকে থাকতে হয়, তা'হলে একটা কোনও পদ্ম ধরতেই বে। দত্তরায় আসে থাকতে একটু আদর; পর প্রাপ্যে ওয়াকিফহাল হোরে থাকা ভাল।

পাতা ওলটতে লাগল। বাবাণিকা সংক্রান্ত ভদ্রটি সংবাদ, বাবাণিকা সংক্রান্ত দ্রুতি, পট্টিতি বাসনা, তিনটি রেল থেকে পিলে পড়া দ্রুতি রেল রাইনে হুটু পাকি সামনে কাঁপ দেওয়া, ব্যাল—দুইয়ে সেল। বিপের ধরবারে আমায়ের ধোঁয়ে ব'হা বাভাবার ধোঁয়ে যে দরত বাণী সেওয়া হোমেয়ে সগুনো পড়ে কোনও লাভ নেই। বিপের ধরবারে হুটুপাই ব'হা। পাবার হুলা দিতে দিতে যেন হুে বান্ধনের হাফ-চারকাঁ প'ব' বিকি হোলে বসে যাচ্ছে, তা' আর জানে না কে! দত্তরায় বাণী টপকে ধক্কারে লেব পাতার শৌখে গেল। শৌখেই চাপ দ্রুতী ছানাবড়া হোয়ে উঠল। স্ব'নাশ! ধরবারে দাগছে ধবি ছেলে দিয়েছে! ডাকলটি তো ঘেঁহি দ্বন্দ্ব বান্ধন নন!

হাঁহ তলার কি লেখা হোমেয়ে জানবার জন্যে দাগছানাকে হুঁদের কাছে তুলে বেরাল। বা লেখে, তা' পড়তে যিনিট হুঁয়েকও লাগল না। ভাা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কানছানো হাত থেকে হসে পড়ল বেকের, নিয়ারুন আত্মকে আকুট হোয়ে ইল। বিদ্ হোয়ে কানছানো ফুলস সে সামর্থ্যও ইল না।

সংবাদটি খুব গরুখ। বিশিষ্ট জরোস বিশেষজ্ঞ ডাক্তার জেরমিং সারোগী সন্ধানিত বন্দে থেকে কলকাতার এসেছিলেন। কলকাতার এক বিখ্যাত গভিনারের কর্তাকে দেখাবার জন্যে তাঁকে আনা হয়েছিল। সোমবার রাতে এক জিনার পার্টিতে কলকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার সারোগীকে আভিনবিত ক'লে। ঐ রাতেই কোনে ডাক্তার সারোগীকে আনানো হয় যে হুণীর অবস্থা ব্যাপ্য হোমেয়ে, তখনই তাঁর আনা প্রয়োজন। কলকাতার এক নামকরা চিকিৎসক ডাক্তার সারোগীকে বন্দে থেকে

আনান, তিনিই কোন করেন। বিহুখণ পরে তিনিই গাফি নিয়ে এসে ডাক্তার সারোগীকে তাঁর হোটেল থেকে তুলে নিয়ে যান। মঙ্গলবার সকালে ডাক্তার সারোগীকে সেক্রেটারী হুণীর বাড়িতে কোন করেন, ডাক্তারের ফিরতে হোঁর হচ্ছে কোন জানতে চান। এবং ছেনে আত্ম' হন যে ডাক্তার সারোগীকে কেউ ডাকে নি, ডাক্তার সারোগীও হুণীর বাড়িতে যান নি। তৎকাল্য পুলিশে সংবাদ সেওয়া হয়। কলকাতার যে বিখ্যাত চিকিৎসকের বান করে ডাক্তার সারোগীকে রাতে কোন করা হয়, যিনি নাকি সারোগীকে হোটেল থেকে তুলে মেন তিনিও ভয়ানক আত্ম' হোয়ে যান।

আত্ম' ব্যাপ্যেরে চরম সংবাদটি হচ্ছে, ডাক্তার সারোগীর যে সেক্রেটারীটি বোম্বে থেকে এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে, যিনি হুণীর বাড়িতে আর পুলিশে কোন করেন, তাঁকেও আর হুঁকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর জিমিনের সব হোটেল পড়ে রয়েছে। বলাভাতার পুলিশ বোম্বে'র পুলিশকে দরাদ পাঠিয়েছে। বা তা ব্যাপ্যর নয় আত্ম'গতিক ব্যাভিসঙ্গর অন্তরক একজন ডাক্তারকে পাঠেব করে কেলোয়ে দায়া, তাহাও নিছকই দ্বন্দ্ব বান্ধন নয়, কিন্তু কি উদ্দেশ্যে এত বড় কাণ্ডটা করা হোল!

যাযা যেয়েছে।

পর পর ঘটনাপুঙ্খো সাঝাতে গিরে মাঝার হাত দিয়ে বসে পড়ল। হলের মত তলল ব্যাপ্যর, পরসু সেয়ে সোমবার। হাঁ, পরসুই ওঁরা এসেছিলেন, ডাক্তার জেরমিং সারোগী এবং তাঁর স্ত্রী কঁকন। নিছক হুঁয়ে কঁকন 'বাসী বসে পরিচয় দিচ্ছেল ডাক্তারের। এবান থেকে তাড়াতাড়ি ওঁরা চলে সেলেন কোথায় জিনার যেতে। জিনারের পরে ডাক্তার সারোগী হোটেল ফিরে হুঁয়ে পড়েন। এবং তারপর ঐ যিথো কল দিয়ে তাঁকে গাফিতে উঠিয়ে দিয়ে 'বিশ'য়ে পাচার করে ফেলা হোমেয়ে। তা' বেশ হোমেয়ে, কাঁচ বাবা যেয়েছে ব্যাভার ভায়া উদ্দেশ্য কবোই। বিদ্ ব্যাধি এখন বাই কোথায়। আত্ম'গতিক ব্যাভিসঙ্গর বান্ধন চুঁর সেয়ে তাঁকে উদ্ধার করার লায়িছ ব্যায়ের দ্বন্দ্ব ব'হা, দ

তাঁরা একত্রে ঠিক বার করে ফেলছে যে ভাকার সাহেবটি জিনের আগে কলকাতা থেকে ত্রিশ মাইল দূরে বেড়াতে গিয়েছিলেন। কোথার গিয়েছিলেন, তা জানতেও তাঁদের ঘেরি হবে না। তারপর তাঁরা ছুটে আসবে আমার কাছে, কেন এসেছিলেন জানবার জন্যে। কলে আমিও অচিরে আত্মজাতিক ব্যাতি অধর্ষন করে ফেলব।

আর ভাবতে পারলাম না। ভাববার আর ছিলও না কিছু। কেনী রকম ভাবনা চিন্তা না করে শুকনায় সরে পড়ার অন্যে প্রস্তুত হোলাম। ছুটলাম মাঝার দু'ঘণ্টা কল তলে এক মুর্তী মূর্ষে সোবার জন্যে। শানটা যাওয়াটা সেরে না গেলে আমার বাড়ির এঁরা আমার পাছোড়াই কিছু দখল করে বসবেন। খেতে বসে বসলাম, বেরুতে হচ্ছে এখনই। সাহিত্য-শক্তা করতে বাচ্ছ সেই টাটানগতে, ফিরতে দু'দিন ঘেরি হবে। টাটা-নগরটাই কম খতে দু'খ দিয়ে বেরিয়ে-গেল। তার কারণ মনে মনে ঠিক করেছিলাম চলে যাব সাক্ষ্যাম। এক সাহিত্যিক বছর হোই একটু কুঁড়ে আছে সাক্ষ্যামে, সেখানেই গিরে আসার মোর। সাক্ষ্যামে বেতে হোসে টাটানগরে যাবার গ্যাডিতেই চড়তে হব। তাই টাটানগরটাই মূর্ষ কলকে বেরিয়ে গেল।

বাঁধা টাটানগর তাঁরা ডিগ্রী গল্প লেখকের গুহে ও হুই-ই মদাম। গল্প লিখলেই সাহিত্য-শক্তা করতে বেতে হবে। কখন বেতে হবে, কোথার বেতে হবে, তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। সাহিত্য-শক্তা করতে বাচ্ছ বলে কখন তখন নির্বিবাহে বাড়ি থেকে চলে যাবার সুবিধে একমাত্র গল্প লেখকরাই ভোগ্য করে। সুতরাং কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজনই মনে করলে না। তাকাতাকি ছুটলাম টেপনে, দশটা পঁয়তাল্লিশের আগে হাওড়ার পৌঁছতে পারলে বক্সপূর প্যাসেঞ্জার থায়া হবে। টেপনে পৌঁছে সেক্সাম সাক্ষ্য মইটার কাটোয়া লোকালটি ছেড়ে চলে গেল। তার মানে দশটা আটের কোনও গাড়ি নেই। দশটা আটের গাড়ি এখন হাওড়ার গিরে পৌঁছবে, তখন বক্সপূরের গাড়ি সাতরগাছা পার হোয়ে যাবে। কে জানে তারপর আমার কখন ও লাইনের গাড়ি আছে।

যখনই থাকুক বেতে হবেই। যাওয়া হাড়া গভাক্স নেই এখন, তখন দাঁড়িয়ে রইলাম প্রাটকরনে। আসুন দশটা আট, হাওড়ার মেসে বা হোক একটা উপার হবেই। বক্সপূর না হব যে কোনও পুর হাওড়া থেকে যে ঘিরে গাড়ি ছাড়বে তখন, তাতেই উঠে বসব। দেখানে নিচে থাক-যাব। খর ব্যক্তি সংসার সর ভেঙ্গে থাক। বে-লেগে সেলে গপ্পের ভুত তাক্স করে গিরে ধরতে পারবে না, সেখানে থাকব দাঁড়িয়ে। পেট। পেট চলবে খেঁক ভাবে চলছিল কিং বহর। মেসে খেতে খিটটা বহর বেঁচে ছিলাম, সেক্ষা ভুলে গেলে কেন। চলতে পুর, কলোই সব ছুটে যাবে, এক জারগার আচ্ছা সেধে বসলেই বাহার আচ্ছা বাচ্ছাকার পড়তে হব। হোমসার করে যাওয়া মাঝার থাকুক, সঙ্গার বরণী পড়ে রয়েছে। অভাব কিসের। মাইবা নিদল অগুণতি চিঠি হোম, চিঠি ঘিরে কি লোব হোয়া! জান প্রাণ বিপর করে ওই বই সেবার শোনা চালাবার আর এতটুকু নথ নেই। বাপস—এতবড় কুক-কুকি শোনা দুনিয়ার কি আর হুটি আছে।

অতঃপর দশটা আটের গাড়ি ঠিক দশটা আটেই এল। এবং সেই গাড়িতে চড়ে চললাম হাওড়া অভিমুখে অর্থাৎ যে ভুলটা করা কিছুতেই উচিৎ ছিল না, তাই করে বসলাম। যে কলকাতা সরে ভাকার সাহেবের মত মানবুও চুরি বার, সেই আকস্মেই সহজেই চললাম। বিপদে পড়লে বার মতিজর হর তাকেই লোকে বেরুয়া বেরাফন বলে।

এগারোটার ঢুকল গাড়ি হাওড়ার। এক গাড়ি লোক প্রাটকর বোকাই হোয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই গাড়িতেই চড়ে বসে। পঁচিশ মিনিট পরে তাঁদের নিচে ছুটে আসার গাড়িখানা বর্মান পায়ে। বারা গিরে পৌঁছল কলকাতার, তাঁদের আর গাড়িতে নাহতে হোল না। বারা বর্মান আসবে বলে তৈরী হোয়ে ছিল, গাড়ি বামবার আসেই তাঁরা হুঙ্কর করে চড়তে লাগল। সে এক ইলাই কাণ্ড, গুতো-গুণ্ডি চুয়েচুবি, গুহুসেবের সেই বিখ্যাত কবিতাটির সেই অতি পরিচিত লাইন দুটি মনে পড়ে গেল—

পাঠ দেল কাজকাচি—আগে কেবা গ্রাণ করিবেক
ন, তারি মাগি তাকাতা'ড ।' গ্রাণ হামের পা'তি
নিমেষে হয়ে গেলে' আসন রেতে উঠলান । তাই
গনি করি, হাওতার পোঁরে চুপচাপ বলে থাকি
রাখিতে । বঁধা নানবার ভায়া নানেন, বঁধা ওঁধবার
গিয়া ওঁধন । উঠে বসবার জায়গার জন্যে বড়কড়
ঠকট করে শেষে বলে পড়ে ঠাণ্ডা হন । বঁধা
স্বার স্থান পান না, ভাঁধা ধাঁড়িরে পড়ে নিশ্চিন্ত
ন । মোটের ওপর পাড়ি খামবার পরে মিনিট
তিনেকের ভেতর নানা ওঁধবার শালা লাগন হয় ।
মন ধীরে সুখে উঠে চুপচাপ নেনে বাই । এ পক্ষ
পক্ষ কোনও পক্ষের সঙ্গেই তাই আমার সংঘ' হয় না ।

একদম লজ্জাতেই, এক পা পাড়িতে এত পা
উকিরে তখন, ঠোল সংঘ' । পূণ কাটাবার চেষ্টা
রেও পান কাটাতে পারলান না । মনে ফোস, ইচ্ছে
হেই ওটা খানো হোল যেন । আর একটু হোলেই
হাজেছিল সংঘান । স্বান—হাওতার পচি মন্ডর প্রাচীর
হয় হোলা এগারটা পাঁচ, শত শত ছোড়া চকুর
মনে পাড়ি থেকে নামতে গিয়ে বহিলাকে হাচ্চা
। ওয়া, তার পাড়ি কি না ছোডে পারত ! কেলেকারি
র হাকী থাকত কি ! আমানান বঁধলাগন্ধ-পনিতির
বৈজ্ঞানিক অন্যায়ারি সভা সেপের প্রত্যেকটি মান্দ' ।
অলস্য শব্দবৃন্দ যথোচিত ব্যবস্থা করবার জন্যে
না মোরে পকুতেন আমাদের চার পানে । তাহপর
হিলাটির ইচ্ছাং বখা করার দিক্কার সকলে বিলে
সন পোরসোল তুলতেন যে স্বপ্নাধারনের ঐকান্তিক
হান্‌ভু'তির কল থেকে বহিলাটিকে আত্মহত্যার
পার খঁকতে চোত । এভাবে অপরাধী হতভাগ্যের
পালে থা জুঁত, তা আর বলে কাজ নেই ।

যাক, দু'পঁটনা কোনও প্রকারে এড়িয়ে দেলান ।
ক হাতে তখনও নয়জার সামনের হাতলটা ধরে
লান বলেই সেটা সম্ভব হোল । যে প্রাণবান
টিকনের ওপর চুইয়েছিলান, সেখানা আবার টেনে
। দান । বহিলাটি পাড়িতে এক পা দিয়েই কিংকিন
রে বললেন—'নানবেন না, উঠে পড়ুন, আপা'র
। ছেই আবি বাজি ।'

কথাটি কানে যেতেই এক পানে সরে হাজিলায় ।
উঠে পড়লেন তিনি ঠিক সামনেই, আর একবার টোঁচি
দু'খানি মড়ে উঠল তার । শব্দে শব্দে দেলান যা
বললেন । বললেন—'আবি কঁকনের না, ভেতরে
চলে যান ।'

বলেই তিনি ভেতরে এগিয়ে গেলেন । কোথাও
বসবার জায়গা নেই, অলত্যা ধাঁড়িরে বইলেন সেওয়াল
ঠেসান দিয়ে । আবিও কিংলান, যে আসনটি ছেড়ে
উঠে গিয়েছিলান সেটি কেলল হোরে গেছে । পায়ে
কারণে সংঘে বহ, সে জন্যে সেই 'আগনের' সামনে
গিয়ে খোকাচি চকুড়ে বিলায় । পিগারেটে কেনবার
জন্যে একটু উঠেই অসনি কেবল হোরে গেল ।
এ কি বলের দু'দু'ক নাকি !

পাড়িতে উঠে পাঁচমনে দেখেছেন যে, আবি
বলে আবি । সুতরাং ভায়া শাকী দিলেন । যে
ভয়লোক বলে পকে'হলেন, তিনি কঁচু'মাত্, বু'ব করে
উঠে গাড়িলেন । জুত করে বসলান, বলে চাংবিনারের
প্যাকেটটি বার করে সংঘাম্রীসের ভয়তার জন্যে বু'ব
খিতে দেলান—'আলুন' । মিন আপনিও একটা মিন ।'

তারপর বোঁধার বোঁধার সেখানটা অঁধার হোরে
উঠল । বোঁধাটে অবস্থার মধ্যে কখন যে পাড়ি ছেড়ে দিল
দু'ক'তও পারলান না ।

কিরে গেলান ।

যে পাড়িতে গিয়ে পৌঁছিলান, সেই পাড়িতেই
কিরি । কিরে থাকি কেন, কৈকিত সেওয়ার সাবা
নেই । আকল বিনেকের লেপ হাত থাকলে ফেরা উচিত
ছিল না । কঁকনের না আবি এই কথাটি কানে যেতেই
বেলাদু'র ভু'লে মেরে বিলায় কেন পালাছিলান বাজি ।
মানভেই হয়ে, এটা ব্যক্তনতে গ্যাকাপনা । শাকার না
করে উপায় নেই যে আমার হত নাককাটা মালায়েক আর
একটি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না ।

মানসায় । পিগ' ভু'লব কেনন করে সেই বাজার
বাড়িকে, বার কাহিনী সে মিন ভোরেই শু'য়েছেন
বেখাং কাপ'র প'গার বারে বলে । চাংবিনার পিগারেটের
দু'দ'ও বোঁধার ওপা ভেতর সরান হোরে গেছে তখন,

চোখ বুজে বসে ভাবছি। না, ভালহিসাব না কিছুই। মেঘগাছ তে। বলে যার নি তে সেই বাজার যা। যে ইউটি তার বাজাকে বুকের ওলার কেনে উপুড় হোয়ে পড়েছিল রাজ্যহানের সেই নোড়ানুড়ি পাখাড়ে পাশে, যার ওপর দিয়ে অবিস্মার পল্লী বিনিময় বহিষ্কল এপকে ওপকে, যার অন্য মেঘগাছের সোনার সংসার ছারখার হোয়ে গেছে এবং রাজ্যহানের সেই সপ'শক্তিমান রাজ্যাবিরাজকে পল্লি বেয়ে বালির বৃকে লুটিয়ে পড়তে হোয়েছে, তার কথাটা বার বার কেন বসে পড়ছিল, 'আমি কীকনের না' এই ছোট কথাটি কানে যেতেই। কেন—।

কৈকিত্তত জেগার ঢেঁটা করলে টিটকারি যেতে হয়েই। কাকন বলেছেন, তার বাকে নিয়ে আসবে। কাকন বলেছিল হাত পাঁচ হাস বখন তার বরেন তখন তার মাথের সপে তাকে রাজ্যহানে চলে যেতে হয়। কেন যেতে হোয়েছিল তা' কিছু বলে নি কাকন। বলেছিল যিনি নিয়ে যান তাকেই কাকন বাবা বলে জানত। তিনিই তাকে খেতে লুপাতি দিলে যান বরবার লম্ব। কিছু তিনিটি যে কে তাও কাকন বলে নি। কাকন অব্যবহার করতে এসেছিল আমি যেন কাকনের গল্প বিশ্বাস না করি। কাকন বা বলবে এসে, তা এককন নিখো! নিখো ঠিক না ওটা কাকনের ভুল ধারণা। ভুল ধারণার জন্যে কাকন যা হটাচ্ছে তার কলে কাকনের ভাণী বিপদ পড়েছে। তাই সে ছুটে গিয়েছিল আমার কাছে আমি যেন কাকনের সেই আছগুদী ব্যাপারটা বিশ্বাস না করি। আগানোড়াই আছগুদী ব্যাপার। কাকনকে বিশ্বাস করতে পারব না কাকনকেই কি পারব। মেঘগাছের গল্পটাও সে যুগের যে যুগে—শ্রীবতীরা এ যেনে কথাত। সেই যে—

বুক ক'শাশে পুররকক তখনি ছুটিয়া আমি
পূরালো, 'কে তুই ওয়ে দুর্গাতি
হরিবার তরে করিল আরাতি ?'
বদুর কণ্ঠে শুনিল, 'শ্রীবতী, আমি বুজের হালী।'
সেদিন শূদ্র পাখ্যকলকে পড়িল গুণালিখা।

চমকে উঠে যার একবার ভাল করে তাকিয়ে সেলাম।
হা—কাকনের বা ঠিক আছেন পাখ্য প্রতিহার হত ধাঁড়িয়ে

আছেন দরজার পাশে, আরও বহু মানুশ দাঁড়িয়েছে যেখানে। নিরম হচ্ছে বতপুলি মানুশ বহুরে ততপুলি মানুশ দাঁড়িয়ে থাকবে। দারা দাঁড়িয়ে যাবে তাদের শূরিয়ের জন্যে মাথার ওপর একসার বাহারি আটো ছুটিয়ে জেগার হোয়েছে। কাকনের না সেই আটো হয়ে কলমে না তিনি দরজার পাশে জেগারলে শিঠি দিয়ে দাঁড়িয়েছেন। আমি যেখানে বসেছি সেখান থেকে আছগুদা যেহ তার বেশ দেখা যাচ্ছে। বুঝখানি নুইয়ে আছেন বুঝ সম্ভব পূরুত্তর কিছু ভাবছেন। কি ভাবছেন।

সেই বাজাটাকে কোলে নিয়ে তার না কি ঠিক ওই ভাবে দাঁড়িয়েছিল যখন সেই বাজার বাপকে তার চোখের সামনে বতম করে কেলো হয়। মেঘগাছ বলে গেল—'একটুকু বিলিতি হযনি সে একটুও কোত পূরু প্রকাশ পারনি তার স্বাবহারে।' অনেকটা যেন সেই শ্রীবতীর হত বুক ক'শাশের সামনে বদুর কণ্ঠে বলছে শ্রীবতী আমি বুজের হালী। তারপর—

সেদিন পাখ্য শব্দ নিশীথে
প্রাশায় কাননে দীর্ঘরে নিভতে

তুপ পরলো নির্বিল চকিতে শেখ আরাতিয় শিখা।
দূর দূর একরম নিখো কথা। শ্রীবতীর হাতের আরাতি হাঁপ নিভে যেতে পারে কখনও! অনিবার্য কলমে, যুগ হোতে যুগান্তরে শ্রীবতীরা হয়ে যানছে সেই আরাতিহাঁপ বুক ক'শাশের যুগ থেকে গাইকেল কামল বোয়ার যুগে এসে পৌঁছে গেছে। পরোয়া নেই, এখনকার এক শ্রীবতী অন্যায়ে বাজাটাকে বুকের ওলার চেনে করে পড়ে থাকতে পারে ওপর দিয়ে যখন পূরুদীর্ঘ কাঁচ ছুটে যায়। রক্তে গাভা হোয়ে ওঠে নোড়ানুড়ি, নোড়ানুড়ি ভিজিয়ে যে কলটুকু নিশাশে হয় তার হেও লালে লাল হোয়ে ওঠে। শ্রীবতী সেই বলে তপ'ণ করে তার স্মারি, যে স্মারীকে একদিন তার চোখের সামনেই বতম করে কেলো হয়েছিল। অজুত, ভারী আকন' ভাবে সব মিলে যাচ্ছে। বিলবে না কেন, শ্রীবতীরা যে সে যুগে এ যুগে একভাবে বেঁচে রয়েছে।

কিছু!

নড়ে ওড়ে বলে আর একটি লজ্জা শিগারেট বরালাম।

দর খেঁক বড় প্রমত্তা বনে পড়ে গেল । প্রমত্ত হুগে—
কিছু ঐ কণিকের বা আদাকে চিনতে পারলেন
কেমন করে ?

গাড়ি ধান্ধে আর হাড়ছে । বাইরে নবর ফেলে বৃত্ততে
পারলান উত্তরপাড়া প্রায় এসে গেল । ভিত্ত নেই আর
কামরার, প্রতি টেপনেই নান্দ্র বসে থাকে । শ্রীমদপুত্র
পর্যন্ত প্রায় গালি হোলে থাকে । জরুরীসকালে ভেঙে
বসতে বসলে কেমন হয় ! কোথার চলেছি আমরা জানতে
হবে । বাড়ি কিরে বাড়ি না নিচ্ছাই । বাড়ি কিসে
কি আর কসে থাকবে ! সোমবার সন্ধ্যার পরে ডাকার
মায়োসী বেনে গিয়েছিলেন আমার কাছে, আমার সঙ্গে
ভাই স্নো জানা হোল কেমন করে, সঙ্গে ভাই কে ছিল,
কৈকির গাও । তারপর কৈকিরতের ক্যাঁকড়া বেরবে
হাজারটা, তারও জবাব দাও । গালি জবাব দাও আর
জবাব দাও । বাড়ি কিসেই জবাবের কদম্ব কুণ্ডে পৌঁছে
হাড়বে । এতকালে তারা প্রতি অবশ্যই এই গীতনীর
কুণ্ডের প্ৰভাগমন করে আদাকে না পেলে হাত
কাঁড়াচ্ছেন ।

কারকান হনের আদাশে বৈষ্ণব বৃন্দ, আদার
চিঁকিটাই আর কণি পাবেন না । লিখে চলে যাব
বর্ষমান, বর্ষমানে গিয়ে নামতে পারলে আর পার কে ।
বিক্রমের দিকে যে কোনও গাড়ি গলে সোজা পড়িন,
এলাহাবাদে শৌছে উত্তর দক্ষিণ কোন দিকে যাব চিঁ
করা থাকে । মাদমানেকের হত বিকিষ্ণ, মাদমানেক
পরে যখন ফিরে আসবে তখন ডাকার সাহেবকে বৃদ্ধি বার
করতে তাঁদের আর বাকী থাকবে না । কোমরটা একবার
চিপে দেখান, চিঁ আছে । বা চিঁক থাকলে মাদমানেক
ছোড়া বার তা' কোমরে বাঁধতে জুঁলি নি । কামা কাপড়
কিছান পর কিছু, সঙ্গে থাকলে ভাল হোত । থাক,
অত ভালতে আর কাছ নেই । যেখানে যেন লাগবে,
হুঁটো একটা কিসে বিলৌই হবে । কিছু—

আর একবার হাজারটার পানে তাকানাম । তাকিয়ে
একবার হাঁ করে তৎক্ষণাৎ হাতে ধাঁত চপে হুঁ-কিঁয়ে
দিলাম । বাইরে তাকিয়ে দেখি হিন্ধার হিন্দুসো
পেন্নে দিকে গলে থাকে । তার মানে কোমরগে যখন
যেখোঁসি গাড়ি, তখন উনি উঠছেন । তার মানে বা

মেবে হুঁ-কনেই আসছেন হাওড়া থেকে । মেবেটি তৎক্ষণ
থেকে থাকে চিনিরে গিয়েছিল ! কাকবের বা আদাকে
চিনতে পারলেন কেমন করে, সে প্রমত্তার বিলম্বি হোলে
গেল ।

যাক, আর একটি বয়ে প্রমত্তের বীমাংগা হোসেই হয় ।
ওঁরা এখন যাচ্ছেন কোথায়, সেটি জানতে হবে । যথেষ্ট
সাবধান হোলেয়েন হুঁ-কনে, এটা বোকাই থাকে । আমার
সঙ্গে যে স্নো-পড়ির আছে, তা কাউকে জানাতে চল
না । ভালই, বৃদ্ধ ভাল । গাড়িতে যায় গলে, তাদের
ভেতর কেউ আদায়ের গুপ্ত নবর রাখছে কি না,
কে বলতে পারে ! ভালর ভালর চুঁটো ব্যাণ্ডেল
পার হওয়া যাক, তারপর যা হয় একটা বৃদ্ধি বার
করা যাবে ।

সেওড়াকুলি এসে গেল । কামরা হুঁক মান্দ্র নামবার
ছয়ে তৈরী হোসেন । থামতে না থামতেই গাড়ি একবার
কাঁকা হোলে গেল । আদিক উল্লাম, পড়িগত গা-
ওয়ালকে ভেঙে এক ভাড়ি গা দিলার । গতি হোল আদার
হুঁহোসো, এ পারে সেওড়াকুলি ওপারে নৈহাটি—লিখে
হাতে যে কোনও সময় ওই টেপন হুঁটিতে গাড়ি থামলেই
এক ভাড়ি গা কিনি । কেন যে কিনি তা' বলা সম্ভব নয় ।
অনেক সময় ভাড়ি টেঁটি পর্যন্ত ছোঁয়াই না । ভাড়ি হাতে
কিছুক্ষণ অব্যবসিক হোলে বসে থেকে গা হুঁক ভাড়িটাকে
জানলা গালির ফেলে দি । গারটে পরমা হুঁক হুঁক
নষ্ট হয় । তা হোক, তবু ঐ হুঁটো টেপনে গাড়ি থামবে
অন্ত আদি গা কিনিব না, এ হোতেই পারে না ।

ভাড়িটি হাতে লিখে চললাম আদার বসতে । গাড়ি
গ্রেপে দিলে । দেখলাম, ওঁরা হুঁ-কনে ভেতরে গিয়ে বসে
পড়েয়েন । যে ব্যারটার বসেয়েন সেবারে একটি মান্দ্র
নেই । সুতরাং এই কাঁকেই সুবিধে । ওঁদের নামনের
আদানে বসে পড়ে জিজ্ঞাসা করলাম—“কোথায় যাচ্ছেন
আদামায় ?”

জবাব দিল মেবে কাক—“আদার কারে থাকে লিখে
গাড়ি ।”

হুঁক ভালতো ভাবে বললাম—“সেখানে কিছু
এতকাল পুঁলি বসে আছে ।”

মেবে একটু থামতে গেল যেন, বন আটকানো হুঁকে

বলে ফেলিল—“পুঁদিল। পুঁদিল কেন?”

যাবের চোখে হুগে এতটুকু চাকলা প্রকাশ পেল না।
অনিবেশ মেয়ে তাকিয়ে রইলেন আবার পানে। বুঝ
আছে আছে উচ্চারণ করলেন—“বুঝেছি। আপনি তা’
হুগে এখন ফিরছেন না। তা’ ভালই, অনেক রকমের প্রশ্ন
করে আপনাকে বিরক্ত করতে পারে, তা ভালই করেছেন।”
বুঝি চিন্তায় পড়ে গেল মেয়ে। কিংকিন করে বলতে
লাগল—“এখন আমরা তা’হলে—”

কথাটা আবিই শেষ করলার বললার—“কোথায় যাবে?
মেয়ে না নিত্যের নিরুদ্বেগে কণ্ঠে সেই উদ্বেগটাই
প্রকাশ করলেন—“আপনার সঙ্গে অনেক কথা ছিল কি না,
তাই—”

যতটা সম্ভব উৎকর্ষ ভাবটা কুটিয়ে ভুলে বললার
—“বেশ তা’ বুঝি ভাল কথা। আমার কাছে থাকলেন,
আমার সঙ্গে দেখা হোয়ে গেছে। এখন আমার দায়—,
আপনারা এখন আমার অভিয। হোলই বা পথে দেখা,
তবু অভিযয়ের জন্যে যা করা উচিত তা আমাকে করতেই
হবে। চলুন চুঁকো পায় হোয়ে ব্যাঙেলে শেঁইই তখন
যা করার করব। কথা আপনার পুনর্বার, নিশ্চিত থাকুন।

চুঁকো পায় হোলার।

তখনও ঠিক করতেই পাগছি না কি কর। বর্মান
পর্বত যাবার কোনও অর্থ না ওঁদের নিয়ে। ব্যাঙেলে
থেকে বর্মান শেঁইতে আরও কটা দুঁয়েক লাগবে।
ভাবলার কি হবে। বর্মান কোথায় বলে ওঁদের কথা
শুনব। ক্যাচায় বাঁড়িয়ে লাভ কি। তার চেয়ে যা ওঁরা
পোনাতে গান, তাকাতাকি তা’ শুনিয়ে বিয়ের হোন না
কেন ওঁদের। যাবার ব্যাঙেলেই, একটা নিগিবিদি জায়গা
মেয়ে সেখানে বলে শুনব যা পোনাবার। সেখান থেকেই
ওঁদের বিয়ের নিয়ে নিজের পথে যা বাড়ায়। সব ঠিক
হকা পারে।

ব্যাঙেলে মেয়ে কোথায় পাওয়া যায়।

এক আছে সেই ব্যাঙেলে চাচ, জোর বেলা সেখানে
বলে মেয়েদের কাহিনী শুনছিলার। না, বাঁড়ির অত
কাছে পাওয়া ঠিক হবে না। চেনা জানা কেউ হয়ত

মেয়েতে আসবে ওখানে, দেখা হোতো পারে।
পিত্তে নিকলই সে রতাবে, দুঁদুকেলা ব্যাঙেলে চাচ,
বন্ধুকে ফেলার দুঁদু বহিলার সঙ্গে তবিয়ে আসল
করছেন। তা হলেই চিহ্নিত। তৎক্ষণাৎ দেবদ্যা দুঁদু
হোয়ে যাবে পাতনের বহিলা দুঁটি লম্বায়ে। না, যতটা
সামান্য দেখানো দর্শনীয় নয়। হাতো এমনও ঘটতে
পারে, ব্যাঙেলে চাচ বলে বন্ধন ওঁদের কাহিনী শুনাই
তখন ওখানে বসে গলে সেল বাড়িতে। বীরা বাড়িতে
অপেক্ষা করছেন প্রর করার জন্যে, তাঁরা কালবিলম্ব না
করে রিশ হাঁকিয়ে দম্পনিত হোলেন। ব্যাঙ্গ, প্রর
এবং প্রেরের জবাব হাতে হাতে নিলে গেল। ওঁদের
দুঁদুকে হাতে পেলে স্বর্গ হাতে পাওয়ার তুল্য দুঁদু
হোয়ে উঠবেন তাঁরা, এ বিসয়ে কোনও সন্দেহ নেই।
কিন্তু সে দুঁদুগেটুকু আবি কেন তাদের দিতে পার।

বিক্রমেই নয়, বিশ্রাস করে আমার সঙ্গে দারা দেখা
করতে এসেছে, তাদের বিশ্বাসের মর্দালা রাখতেই হবে।
গল্প দিখে শেট চালাই বলে কি হানুয়ের চানক্যও
নেই গারে। গল্পের পাঠ-পাঠীরে বন্ধ তখন দেখান
সেখানে বেলালুদ মেয়ে দিতে পারি বলবের কয়েকটা
অঁড়ি, জ্যাচ দুঁটো হানুয়ের সর্বশ্য তা বলে করতে
পারি না। শূভরায় আর কি পরা আছে। ব্যাঙেলে
হামলে এমন স্থান কোথায় পাওয়া যায়, সেখানে বলে
নিশ্চিতই ধানিকরল কাটানো যায়।

হোয়েছে। ব্যাঙেলেই বাহতে হবে। ঠিক ভাবনা
পাওয়া গেছে।

ওঁদের পানে তাকিয়ে দেখলার, দুঁদুকেই পতীর
চিন্তায় বিনয়। পাড়ির পৌঁচ করতে লাগল। উঠে
পাড়িয়ে বললার—“আন্দু। আপনাদের টিকিট দুঁদুখানা
আমাকে দিন। টেটেন থেকে বেরিয়ে একথানা রিভায়
উঠে বসবেন। তাকাতাকি টেটেন থেকে সরতে হবে।
আর একটা রিভায় আবি বাঁড়ি। ঠিক সঙ্গে যাব,
ভাবনা নেই।”

ওঁদের টিকিট চুঁকোর, আমার টিকিট নেই।
হাওড়ার যাবার টিকিট বেটোছিলার, আসবার টিকিট
কাটলার কই। শূভরায় একখানি দুঁটাকার নোট হার
করে ওঁদের টিকিট দুঁদুখানির সঙ্গে ব্যাঙের দুঁদুকে

গ্রাফান। সেটের সামনে গিয়ে ও'দের দু'জনকে আগে
মোর্গে যেতে বললাম। নামসেন ও'রা নির্ভিতে, নশে
নশে হাতের মূর্তি বা ছিল তা' সেট নাহেবের মূর্তির
বর্গে দিয়ে তর তর করে নেবে গেলেন। হাসান
চুকল। যাতেলের রিক্সওয়ালার দিবা রাত হন্যে যোগে
আছে। সামনে দেখানা পড়ল তাতাই উঠে বসলেন
ও'রা। আর একখানার আঁধি উঠল। হুটল রিক্সা
দু'খানা, লাইনের তলা দিবে পার যোগে এসে আবার
রিক্সওয়ালার ভিজানা করল—কোথার যেতে হবে।

বললাম—“ত্রিবেণী চল।”

আবার রিক্সওয়ালার সামনের রিক্সওয়ালাকে গলা হাঁকড়ে
জানিয়ে দিলে—“এবে মিটকা, চল ত্রিবেণী কা ঘাট।”

ত্রিবেণীকা ঘাট থেকে নৌকার ওড়ান বধন, তখন
আংখানা আক্যাপ পার যোগে পুনের দু'র্গ পক্ষি দিকে
পা বাড়াচ্ছেন। ভাটির টানে তরলী ছাড়ল। মাঝিকে
বলে দিলাম, দাঁড় টানতে হবে না, খুটা হিসেবে ভাড়া
যেবে। কলা পানিকল আর শোয়ারা কিনে দিলাম
ত্রিবেণী থেকে, অতিথির সৎকার করতে হবে। সৎকার
কম্বাটা ভাড়া বিক্রী কথা মনে মনে উচ্চারণ করতে গেলেও
ভিল-ফুলসার নাম শ্রবণ হল। গঙ্গার বুকে ও সব
অলঙ্কারে নাম মনে গড়া ভাসি নর, দু'র্গা নাম শ্রবণ
করলাম। বিগড়িয়ে বৃষ্টি পু'র্ন যোগে, বাইরে বদবার
উপার নেই। গুড়ি মেরে ডিন জনকেই চুকতে হোল
নৌকার বস্তাকরে। বস্তাকরে চুকলেই বসতে হবে,
বসলে ছাতখানা বাবার আঁধ হাত ওপোর থাকে। বাড়ী
বহনের ভিপিসুন্সোর আকৃতি নেই হাড়াডার আঁধ
ফেবে ও পু'র্ন একটুও বলার নি। তাই কলকাতা
আর কলকাতার আপপানের হান্বে গঙ্গার বুকে
বেড়ানোটা একেবারে বস্তাক করতে পারে না। অত
বড় একটা নী বসে চলছে নহের বুকো ওপর দিবে,
বেড়ার হান না পেয়ে হান্বে হুটিছাটার দিবে বহর
যোগে বসে বসে থাকে। কি করবে, গঙ্গার বুকে
নৌকার চলে পু'র্নতে হোল সে পদা বস্তা হর আর
সে কল' ভিপিসুন্সে চাপতে হয়, তাতে কারও গঙ্গার
পা করতেই প্রবৃত্তি হয় না।

সেই বাটার মধ্যে আর দেখাখেন করে বদবার
পু'র্নই বোব হয় খনিষ্ঠ ছাটা ঘনিবে উঠতে একটুও সেট
হোল না। আগেই সৎকার ব্যাপারটা মন দিলাম।

বললাম—“হান ওই সব কলটল এখন। যেতে
যেতে বলুন কি বলবেন। নাও ককিন, ভোবার হাকে
পানিকল হাঁকিয়ে হাও।”

ককিনের হা একটা পানিকল তুলে নিয়ে বসলেন—
“হ্যা, যেতে হবেই কিহু এখন। আপনিও হান, আপনারও
বোংহর হাওনা হাওনা হয় নি।”

ককিন বললে—“কোথার হাচ্ছিলে আপনি?
কলকাতার পু'র্ন ভরু'রী কাল ছিল বোব হয়, নরত সকাল
বেলাই হুটেনে কেন। আবার আপনার কতি করে
দিলাম।”

পানিকল একটা হাঁকিয়ে পু'র্ন ফেলে বললাম—
“ভরু'রী হই কি। ভরু'রী কাল হাড়া এক, পা বেরু'ই
না। কিহু যেবে সেবে বেরু'ই, কালটা হত ভরু'রী
হোক হাওটার চেয়ে নর। তাই যেবে সেবে বেরু'ই
ছিলাম। ভোমসের হত না খেয়ে বেরু'ই নি।”

ককিন বললে—“আমরা যেবে বেরু'ই নি, বসলে কে
আপনাকে। আরহাও—”

ওর হা বললেন—“হাক। এসে কালে হাবহানে
কথা বলতে হয়। বড় বড় হই লিখে কেলেনে হায়া,
ভাড়া হা বললেও অনেক কিহু জানতে পারেন। আরহা
যে না খেয়ে বেরু'ই তা' আমদের হু'বে তাখে
বিকরই হুটে উঠেছে। ও কথা নিয়ে কথা বাঁকিয়ে
লাভ নেই। এখন বল, যে হন্যে ওর কাছে আনাকে
নিয়ে এসে।”

সঙ্গে সঙ্গে আঁধি দার দিলাম—“হাঁ, তাই হল।
এই হাও, এই কলটার একটা কালজ দিবে বলতে পু'র্ন
কর। পেটে কিহু পড়লে বলাটা নরহ হবে।”

কলটা দিলে, পু'র্ন নিহু করে শোনা হাড়াতে
হাড়াতে বললে—“কি যে বল বুকতে পারছি না।
পু'র্নই বিপদে পড়ে গেছি আমরা, তাই আপনার কাছে—”

“তা তো বুকতেই পারছি।” তাড়াতাড়ি কালের
কথা পু'র্ন করবার জন্যে আঁধি একটু যোগান দিলাম।
হস্তের সম্ভব আঁধি দেখিয়ে বললাম—“আসা কিহু,

কালকেই উঠিৎ ছিল। সোমবার রাতে ডাক্তার সারোগী উপাধি ছোপেছেন, তারপর পুরো একটা দিন গেছে। আজ বুধবার এতটা সেরী ফেল তেন। কাল সারা দিন বৃষ্টি ডাক্তার সাহেবের কিংবদন্তি অসুস্থতা ছিলে?”

যেহে কিছু বলার আগেই মা বলে উঠলেন—“হ্যাঁ, আমি একটু বৌদ্ধ ধর্মের খোঁজটা করছিলাম। শেবে দেখলাম, আমার বাঁধা ভুল। যা দেখেই করেছিলাম, তা নয়।”

বললাম—“আমারও তাই হবে হয়। সেই বিপ বাইশ বছর আগে একটা বাচ্চা যেকোনো আর তার বাচ্চা নাকে যত সহজে চুঁরি করা গিয়েছিল, এখন কি সেটা সম্ভব! তা ছাড়া ডাক্তার সারোগী যা তা বলছেন। বিরাট ঠেঁকে সেলে গেছে, দু’চার দিনের মধ্যেই ডাক্তার সাহেবকে উদ্ধার করে ফেলা হবে। একটা চার পাঁচ বাসের বাচ্চা আর তার বাপ মা, বাপ মাতের হয়েই বা কত হবে তখন! তা’ ছাড়া সেই তখনকার দিনে আর আত্মকেন্দ্র দ্বিধা পাতাল প্রভেদ। এতক্ষণে বসে কলকাতা ঘিরী সারা দেশটা জুড়ে ভাল পাতা হোলে গেছে, কানে পা মিলে বলে—।”

দু’টি হাত একদম বেয়ে পড়েছিল কাকের মতের, যে পানিকলটা ভিঁনি ছাড়াছিলেন সেটা তাঁর হাত থেকে ধরে পড়ল। চোখের পাতা পবিত্র পড়ছে না, দন বন্ধ করে ডাকিয়ে আছেন আমার দিকে। বুঝে অন্যমনস্ক ভাবে উচ্চারণ করছেন—“কি হোয়েছিল। বিশ বাইশ বছর আগে কারা চুঁরি গিয়েছিল? কানের কথা বলছেন আপনি?”

কথা কণ্ঠি উচ্চারণ করেই চব্বি উঠে মেয়ের পানে তাকালেন। মেয়েও তখন কল্যাণ কান্ড ঘেঁষে নি। আবখানা ছাড়া কোনো কল্যাণ তুলেছিল মনের কাছে, ছাড়াবানা দেখানোই খেঁবে রয়েছে। কপালে কয়েকটি দৃষ্টি রেখা কুটে উঠেছে, তপ্তিত।

নিম্নের নবো দৃষ্টির চোখের ভাষা পড়ে ফেললাম। অদৃশ্যে তিন ঘোঁড়া গোছের খাপার, যদি ঠিক দৃষ্টিতে শেরে থাকি গঠিত অর্থ বা মেয়ের চ্যুতনি থেকে, তা’হলে—

এক থেকে বিন পবিত্র গুণেও দত্তক দান লাগে তার মধ্যে গুঁহিলে বিলাস যা বলতে হবে। হাত বাড়িয়ে একটা কলা তুলে নিয়ে ছাড়াতে ছাড়াতে এলোবেলো ভালে বলতে পুরু করলাম—“যেও ঐ ধরনের কাণ্ডের ঠেঁকে কাণ্ড। ডাক্তার সারোগী জানে আমি যেমন ধরনের কানজগুতো ঠেঁকে বাঁধিয়েছে, সেবারও ঐ রকম হোয়েছিল। অনেক দিনের কথা তো, সব কি মনে আছে। এক ছোড়া স্মারী স্ত্রী তাদের একটা বাচ্চা মেয়ে নিয়ে কলকাতা দূরে টাঙি ছাড়া করেছিল। টাঙিগুয়া স্মারীটিকে খুন করে স্মারীটিকে কোথায় যে পাচার করে ফেলেন, তার আর পাওয়া পাওয়া মেল না।”

কাকের মা দৃষ্টি ভালে নিঃশব্দ নিঃশব্দ পুরু করলেন আমার। পানিকলটা তুলে নিয়ে বাড়িয়ে বুঝে ফেললেন। মেয়েও কান্ড দিল কল্যাণ। আলপের মতোটা কিছু আলটপকা হিঁড়ে গেল মনে। কি করে কোনখান থেকে আমার বেই হরা ঘর।

একটু পরেই বেই ধরিয়ে কাকের মা বললেন—“কত দিন’ আগেকার ঘটনা, চাঁদ খাপনার মনে পড়ে গেল কেন? মনে রাখার ক্ষমতা আপনার বুঝ বেশী বেখি।”

বললাম—“ঐটুকুই যে মূলধন আমার পেশার। ধরনের কাণ্ডে যত সব চুঁরি ছোড়া চুঁরি খুন ছাড়াতির ধর বেগার, সব হবে রাখতে হয়। তারপর সেই সমস্ত জুড়ে জুড়ে উলটে পালটে রত একখানা বই লিখে ফেলি। বই লেখা বার পেয়া, তার ধরি মরুপ-পতি না থাকে, তাহলে কি করে গলে বসে।”

কাক বললেন—“সেইটাই হয়েছে আল বিদ। কোথা থেকে কে এসে রাশিকৃত পাণ্ডগুরী কথা পানিয়ে ধানে আপনাকে আর তাই বিয়ে আপনি এক উপন্যাস লিখে ফেলবেন। এই জানেই আমি ছুটে এলাম।”

“ভাল কাম কর নি।” বুঝে গম্ভীর ভালে বাধা বাড়িয়ে বললাম—“এখন ভাল কাজ করনি। লেখকের কাছে গতি নিয়ে কোনও বাঁধনাই বলতে নেই। তুমি যা বলে গেলো, তার ওপর হুঁ চড়ায়ে যা ছাড়ায়ে তা’পড়ে ছুঁইই হুঁ ভিঁনি ধাবে। সেবার

সেই বাচ্চটাকে আর তার নাকে চুঁবি করার পর ঐ ব্যাঘার নিজে কত গল্প বেরিয়েছিল। একজন লেখক এমন এক গল্প লিখলেন যে বড় বড় সভা করে তাঁকে অভিনন্দন দেওয়া হোল, সাহিত্য-সভারখী উপাধি পর্যন্ত পেতে গেলেন তিনি। উঃ, সে কি গল্প! সে গল্পটা বনে গড়লে এখনও বুক কেঁপে উঠে।”

কাকনের মা একটু বাক্য মূরে বললেন—“তাই নাহি! আচ্ছা, বলুন তো সে গল্পটা। পূর্বে যেখি বুক কাঁপে কি না।”

কাকন বললে—“তাকাতাকি বলুন। তারপর আনাদের কথা হবে। নাকে এবেছি আপনাকে কয়েকটা কথা বলবার জন্যে। মারের কথাগুলো আপনায় পুনে রাখা দরকার।”

বললাম—“পুনব, দর পুনব। অনেক দর আরে। সব পুনে টুনে তোমাদের মাথায় রেবে বৈদ্যটীতে। মাড়িতে উঠে তোমরা কলকাতায় গিয়ে যাবে। বৈদ্যটী শৌধতে কটা হুই লাগবে অল্পতঃ। হুঁকটায় কত শোনারে শোনাও না।”

ও বা বললেন—“আগে আপনায় গল্পটা বলুন। আনাদেরও তাকাতাকি কিছু নেই।”

অতঃপর গল্প শুরু করলাম।

চুড়চাপ বসে মা মেয়ে পুনেতে লাগলেন সেই তখনকার দিনের সাহিত্য স্ফারখীর গল্প। ক্রমে গল্পের ঐ বাকে কলে ক্রাইম্যাক্‌স্—বানে চুড়াক্ত অবস্থায়, সেই চুড়াক্ত অবস্থায় পৌঁছল গেল। নিশুড়িত রাত, দরখী হু-হু করছে, গল্পে অলো অলোয়া হুনের চল। গৌকি মাড়িওলা পার্গাচি পাফানা পরো মোফার চুড়া কোবরে কৃশাল বাঁবা রক্তসোপান নির্ভুর ডাকাত সব থিয়ে থিয়ে চলছে সেই ছোট্টা বা আর ছোট্টা বাচ্চাকে। কোনও পরোয়া নেই। পায়ে পায়ে পর্যন্ত কলে উঠছে মারের, তেঁতার বুক কেটে যাচ্ছে। বাচ্চায় বুধে বুকের দৃষ্টটুকু যাচ্ছে কি যাচ্ছে না, তা' বোকাও যাচ্ছে না। বাচ্চটী ক্রমেই দৌড়িয়ে পড়ছে। হুঁপেপে নেই, পায়ে পায়ে এগিয়ে চলছে দারী, বুক জলছে প্রতিবিধার আগুন। নিভেই হবে প্রতিশোধ, যারা তার শব্দীকে তার চোখে মায়ে পুন করছে, তাদের পুন না দেবা পর্যন্ত সে আসুন নিভবে না।

তারপর এল সেই বোডানুড়িও টিলা, সেই ঝগঝগে পলটুকুর কাছে শৌধে গেল তারা তখন বাচ্চা নিজে বা পুঁথে পড়ল।

প্রভীকা, চরম প্রভীকা। অভিন প্রার্থনা জানাতে লাগল বাচ্চাকে বুক নিজে পুঁথে—রে ভগবান, গতি! যদি থাক জুঁবি কোথাও, তা'হলে শক্তি দাও। শক্তি দাও যেন জেতে না গড়ি। যেন ঐ পলটুকু দালে দাল না দেখা পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারি। সেই দাল জলে শব্দীর তদর্পণ করে তবে যেন আমার শেখ দাসটী বেঁচে যায়।

ভগবান দেখানো শৌধলেন। শৌধলেন একবার রাত শেষ করে। গল্পে উঠল তার হাতের বন্ধ। হুটল গোলাগুমি ওদের ওপর দিয়ে। বরদেখার আত্মদায় করতে লাগল বরদাতক পিঁপাচের চল। মা গড়ে উঠল বাচ্চটাকে বুকের তলায় চেপে ধরে। তখন সেই হতভাগীর হৃদয় ছিল কিনা কে বলবে!

“মা, মাপো” আত্মনিতে আত্মবাপ করে উঠল কাকন, হুঁহাতে আশটে গেল তার মাকে। হুঁপেপে বেঁটল হোলে পড়েছেন, মেয়ে বা হরে ফেললে মূখ পুঁড়ে পড়তেন।

তাকাতাকি হুলাস বার করে কানলা থিয়ে হাত বাড়িয়ে গগায় চুঁবিয়ে নিলাম। সেই হুলাস বাবড়াতে লাগলাম তাঁ চোখে বুধে কপালে। বারকতক ঐ ভাবে জল হুলে বাধায় বুধে বাবড়াতেই চোখ মেললেন। পূর্ব লম্বা একটা শব্দ কলে সোচ্চা হোলে বললেন। মাঝার কাপড় ঝিক করে নিজে অনেককল চোখ বুঁজে রইলেন! একেবারে বোবা হোলে মেয়েটি মাকে হুঁহাতে আশটে ধরে রইল। গল্পের ক্রাইম্যাক্‌স্ পার হোলে গেল।

বৈদ্যটীর বাটে মাথিয়ে ফিলা পুন ওদের তল কোলা প্রায় জুড়ুজুড়। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দই হোল, হোক না—কীময়ের কটা বিন পার্গাচি ভাবে থাটা হোলেছে! হৌকা থেকে বাববার আশে কাকন বললে—“দাক, জটপাকানো কীময়ের অনেক জট হুলে গেল। তানো আপনায় কাছে হুটে এগেছিলাম। এখন আর কাকনকে তার কথি না, কাউকেই তার কথি না আর। থিয়ে

দশমত্রে কিছই জানতাম না আমি, শুধুকারে হাততে মর্যাদায়—ইস!

একটি কথাও আর বললাম না। ষট বদি সত্যিই মুলে গিয়ে থাকে ওর জীবনের, তার চেয়ে ভাল কথা আর কি যোগ্যে পারে। কিছই সত্যিই কি ষট মুল।

কাকলের না মূল মূল্যে রাখা যেটি করে নৌকা থেকে নামলেন, সেই ভাবেই আছে আছে উঠে গেলেন সত্যার ওপর। একটি বার শেখন কিত্তেও তাকালেন না। কি অত ভাবছিলেন উঠি! মূল দশমত্রে নিজের মেয়ের কথাই ভাবছিলেন। মেয়ের জীবনের ষট কি সত্যিই অত ভাবাভাবি মুলে গেল।

তার মানে তা'হলে এই গাঁভার যে, মেয়ের জন্মভাষা মূল্য আর সেই মূল্যের প্রতিশোধ নিতে তিনি কি করেছিলেন ঐ মেয়েটাকে মূল্যে নিয়ে—এই মূল্যে গটনা মেয়ের কাছে গোপন রেখে তিনি অন্যায় কাজ করেছিলেন। করেছিলেন কি!

নৌকার ওপর আমার গুল এখন দশমত্রে হোল তখন নামলে উঠে ঐ কথাটাই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কাকলের বা। কোনও রকমে প্রস্তুত আমি এভাবে গিয়েছিলাম। কোনও না তাঁর দশমত্রে কাছে জীবনের কোনও একটি বিশেষ ঘটনা বৈ আফাল করে রাখতে চান, তা'হলে বলবার কি আছে। সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে দশমত্রে কল্যাণ কামনা করেই অত বড় ব্যাপারটাকে লুকিয়ে রাখতে হয়েছিল তাঁকে। জন্মের পরেই যে সমস্ত ভরসার বাওকারখানা থটে গিয়েছিল মেয়ের জীবনে সেদুলো একে কানালে ও খিঁচড়ে যেত। দেখা পড়া গান বাজনা কিছই হোত না ওর মূল্যভাটাকে মোটে ভাল চোখে দেখতে পারত না। সবেম আর সত্যায় লবল করে যে শিশু বড় হোলে ওঠে তার বড় বড়োটা বিকল্পনা হোলে গাঁভার।

ঐ বিকল্পনার হাত থেকে মেয়েকে বাঁচাবার জন্যে কাকলের না মূল্যে পাগল বেঁচে মূল্যে গিলে ছিলেন। অন্যায় করেছিলেন কোথায়।

অন্যায়টা কোথায় করেছিলেন ভাবতে গিরে অন্য-মনত হোলে পড়লাম। সেই কাকি নৌকার মূল মূল্যে ফেলা লগ্নি গাঁভোর। বা :—

হটকট, বরে উঠে জানলাম কিত্তে মূল্যে মূল্যালান। মোল হর হাততেই থাকিলাম ওর আবার মোল হর—

আর একটু হোলে ভেবেই কোলভার চোঁচিয়ে। হাত কারছাতে ইচ্ছে হোল, কললাম কি। কি যে কলতে এসেছিলেন কাকলের না তা শোনা হোল না।

একধর খিঁচড়ে গেল মেলায়। হাত জিজ্ঞাসা কললে কোথায় যেতে হবে। হাত মুলে ওপারের কোঁকাখিটো চোঁচিয়ে গিরে চোখ মূল্যে বসে গেলাম।

নৌকা ঘাটে লাগল। মেলাকার মানব সেখানেই কিত্তে এসেছি—কোনও চুলোর খাওয়া হল না। আবার একটা কৈকিত্তে বাড়ী করতে হবে, টাটনগরে শাহিত্য-দশা করতে সকাল নটার রঙানা হোলে দশমত্রে আগেই বাড়ি কিললে কৈকিত্তে একটা গিলেই চর। হোক, কৈকিত্তের অভাব হবে না। গুল লিখতে লিখতে নিজে কথা বলটা এখনই লগ্নিও হোলে গেছে যে. হা করলেই মূল্যে করে বেগতে থাকে। লাকিত্তে নামলাম সিঁড়ির ওপর। আর এতখানা পাঁচ টাকার মোট বকপিন পেয়ে মাঝি ভক্তলোক ভক্তকে গিয়েছিল। তাই বিদায় বেলা বেহুড়ক চোঁচিয়ে গেলাম হান করলে। টপাটপ সিঁড়ি উপরে উঠতে লাগলাম।

কয়েকটা বাপ উঠেই পায়ে ছোর করে এল। পা বর মূল্যে, সব মূল্যের কেন বিকল্পিত করতে লাগল। বাড়িটার মানে ভাকিত্তে আশা কর আর চোঁচা করলাম, কালতু মানব কেউ এসে উপস্থিত হোলেই কি না। কিছই মোকা গেল না, পা গিলে গিলে না হোলেও কতকটা ঠিক ঐ রকম ভাবেই শোঁচিয়ে গেলাম দশমত্রে নামলে। তারপর দশমত্রে থাকা দিলার দশমত্রে, যেন সত্যিই কোনও অচেনা লোকের বাড়িতে ঢুকতে বাড়ি।

দশমত্রে মূল্যে।

খোলা দশমত্রে নামলে বাড়িগিরে দশমত্রে হোড় করে তিনি নবতে নবতে হলে উঠলেন, তাঁর মূল্যে পায়ে চেয়ে হা করতেও পারলাম না। হা করে সত্যি মূল্যে গেল মাথাটা, এক হাতে দশমত্রে ক্রোঁচা বরে কোনও রকমে গামলালাম। ভাকিত্তে বেঁচিয়ে মারোপী অভাব জন্মভাষা

লগ্নে অটন করলেন—“আগ্ন—ভেঁটেই আগ্ন ।
আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি ।”

পূরম আপ্যায়িত হোলায় বসা চলে ।

যে ব্যক্তিতে কোনও দিন কেউ আঘাত করে ভেতরে বেবে না, সেই ব্যক্তির সমস্ত দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সাদর অভ্যর্থনা পাওয়া ভাষ্যের কথা । কিন্তু ভাষ্যকেও অনেক দূর ভেংগি কাউতে ইচ্ছে করে রাত শোয়াবার দপে দপে এত বার এত রকম ভাবে ভাষ্যের দরজা খেঁচে যে হোল যে ভাষ্য ব্যাপারটার ওপরই তখন বেগা গছে গেছে । তবু হাসান, অর্থাৎ হাসানর মত বৃদ্ধ করে রাত কখনো প্রলম্ব করানো । ইংরেজী ভাষার সব কথাটিতে বা বোঝার, তার মূল্যমূল্য হোল নীত । দরম্বে উপযুক্ত ব্যক্তির দরম্বে দর প্রলম্ব করবার সামর্থ্য নেই বার, সে সব মূল্যের কলঙ্ক । বরাহি—বরাহি—অর্থাৎ কথ পর্ষৎ সে জানে না । সমাধে ডিকে দাঁড়িয়ে হোলো রাত কাট । চতুর্কে সাধা লুপাটি রাত না থাকলে কি ক্যান্সাসেই না পড়ত জান্দে । রাইনীটি থেকে পর্ষৎ করে বাটপাড়ি প্রীতি পর্ষৎ পর্ষৎ দাঁড়ের প্রয়োজন । দর প্রলম্ব করলে বড় সমাজে বিচ্ছিন্ন দরম্বে ভাবটা সম্প্রদায় করা গা, এমন আর কিছুই নেই সমাজে চর না ।

ভেতরে ঢুকে ভাকার সাফেরে অবগোষ বস্ত
আগ্নে গ্রহণ করল। মোটে তুটি নেই, আদর্শ
দৃষ্টান্তের বস্ত আদর্শ করে বিশ্বের ভিতরে বসতে
অবগোষ করলেন আবার ভাকার, বেন ও'র বাড়িতে
ও'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যে আসি গেছি। ভাকারও
বললেন, বসে বললেন—“প্রায় তিন ঘণ্টা আমি
অপেক্ষা করছি এখানে, আমাকে মেয়ে ব'লে আদর্শ
হোলে সেজন্যে আশ্রয় দিচ্ছাই।”

বলদ্বার—“একটুও নয়। আত্মক’ হোলে যাওয়া
কমটাই আমি একবার শুনে নেবে দিয়েছি। তা থাক,
কিছু একটা আশ্বাসকে চা টা দিয়েছে তো।”

পত্ররত উদ্ধারিত হোলে ডাক্তার বললেন—
 "অনেকবার অনেকবার। শুব, চা নই, আরও অনেক

কি; পেয়ে সেহি। আপনার আগতে অনেক ছেঁচি
হোতে পারে, আর ততক্ষণ না আপনি আগবেন
ততক্ষণ আমি অপেক্ষা করব। পুনে আপনার জন্যে
সাদাবাস্যও হচ্ছে। রাত্রে আমি কি বাই, তা পক্ষ
ফেনে দিয়েছেন। 'আদর্শ' বাড়ি, 'আদর্শ' ব্যবস্থা,
অভিযোগ করার কিছু নেই।"

এবার সত্যিই ছেনে ফেললাম। অত বড় ডাক্তার
অন্তর্ধান বিষয়ে পেটে পুরিয়েছেন, টাকাকড়ি যান দখলের
তো কথাই নেই, কিন্তু একমুখ ছেলেনান্দু। অর্থাৎ
হাবুস টার—একটা হাত তুফাতে প্রবারি বরতি অবস্থান
করছে। কিংবা এও হাতে পারে, বিষয়ের পরম বুদ্ধির
পরম টাকার পরম, সর্বস্বান্তের পরমকে কি উপারে
সম্পূর্ণ উদ্ধারবিহীন করতে হয়, সেই পাটতা উনি
আমল করে ফেলেছেন। ঐটেই হস্ত জ্বালোকের
প্রবারি। প্রবারির যে কত রকম জাত আছে তাই
বা কে বলবে।

বঙ্গলাম—“কিন্তু, আমার কেবলবার কথা তো হিন
স্তিন চার পরে । ততদিন আগনি অপেক্ষা করতেন নাকি ।”

ডাক্তার বললেন “আলপত, চার দিন কি বলছেন, অন্ততকাল এখানে বসে থাকুন। প্রাণের দ্বায়ে মানব কি না করে। বসে শুপলে পাহাড়ে পর্বতে আত্মপোষন করে থাকে, সাপ বাঘ রোগ কিছই পড়োয় করে না; আমি সে তুলনায় কত অমায়ে আমি। গল্পার দ্বায়ে এমন ব্যক্তিতে আত্ম পাহাড়া কত বড় ভাষ্যের কথা। কিছ, আমি এঁয়ের বলেছি যে আপনি আজই ছিরবেন। যিহো কথা বলেছি আপনার সঙ্গে আমার দেখা হোয়ে, আপনি আমাকে এখানে অপেক্ষা করতে বসেছেন, কারণ আপনি আজই ফিরে আসবেন। যিহো কথা বলেছি বলে কথা চাছি। কি করব, প্রাণের দ্বায়ে।”

বললাম—“ডাক্তার, বিধো কথা বললে বহি কথা
 গাইতে-ম, তা’হলে দিন রাত লটপটর আঘাতে ঐ
 কথা বহরটা অণ করতে হবে। দ্যা সর্ব্বা ঐ বিধো
 দশল কত্বে আবি বেঁচে আছি। ওটা হোল আঘাত
 পেয়া। বিধো কথা বলা নাকি পাপ, আঘাতে রাণি
 রাণি বিধো কথা অববরত লিখে করতে দ্য।

দুঃখের বিষয় কথা একটি মাত্র বলে ফেলছেন, এ জন্যে আমার কাছে অস্বস্তি করা চাইবার প্রকার নাই। এখন বলুন, এখানে এসে লুকিয়ে আছেন কেন? ওখানে সরকারের ঘরটা মাইনে বাস তারা যে আপনার জন্যে রাখা হইতে পারে।

“একথা নয়”—ডাক্তার সায়েদী শব্দে দুই প্রায় চুপিচুপি উচ্চারণ করলেন—মোটাই বরং নাই। কলকাতার দুই বড় একজন পুশিপ সাহেব আমার সাহায্য করছেন দয়া করে। পুশিপ জানে, আমাকে কেউ চুরি করেনি, একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে আমাকে এ ভাবে লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে। থাকতেই তোমার মাথা খাবোতে হবে কেন।”

আবার যোগ বিরোধ পূর্ব ভাঙ্গ অথচ কথা আরম্ভ করলেন পূর্ব ঘোরে। না, অথচ কয়েক কিছুর বেরুলো না। দুই টিপে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নাই। কার সাধ্য, এই উৎকট হেঁচালির মধ্যে মাথা গলতে পারে।

ডাক্তার বেশ দীর্ঘ দুই মিনিটে বলতে শুরু করলেন—“কেন্দ্র আপনি গোলেব লেখক মানব, এবং মানবের ওপর আপনার দৃষ্টি আছে। আপনার বই যদিও আমি পড়িনি, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি ভাল ভাল বই পড়েছি তো। সেখানেই, মানবের বন জিনিষটাকে কি রকম ভাবে চিত্রে চিত্রে আপনারা বিশেষ করেন। আমরা পারি শরীরটাকে চিত্রে ছাড়াই বসে দিতে। আপনারা মানবের বনটাকে কাটাছুটি করে বনের রোগ যাত্রাতে পারেন। ডাক্তার আর সাহিত্যিক দু’জনই দু’ভাবেই চিকিৎসক। আমরা শরীরের, আপনারা মনের। তাই আপনার কাছে আমরা হইতে আসি।”

বাক্য দিয়ে বললেন—“এর আগে যোগ হয় কোনও ডাক্তার কোনও সাহিত্যিকের কাছে আপনার বই বনের রোগ দমনে কিছুর বলতে আসেননি। আপনিই যোগ দ্বয় প্রদান এলেন।”

ডাক্তার বললেন—“আমি উচিত। রক্তের রোগ হওয়ার ডাক্তার অথচ অনেক আছেন, পালনের চিকিৎসা করেন তাঁরা। যাতে মানব পালন না হয়, সেই ব্যবস্থা আপনারা করে দেন। কারণ আপনারা দুই সহজেই দুইভাবে পালন, কতখানি অসুখের অসুখ পড়লে মানব পালন হয়। যেমন ধরুন আমার অবস্থা। খাচ্ছি খাচ্ছি দিখি

টাকা বর্তি খোঁজাও করছি। চকু পরীক্ষা করুন, হাট বেরুন, কোথাও কোনও ব্যাধি নাই। তবু আমাকে পালন হোলে যেতেই হবে। আর কিছুর দিন এ ভাবে বেঁচে থাকতে হোলে মানব পালন না হোলে বাস চোখায়।”

অর্থাত্তিক অবস্থা। সম্ভ্রান্ত জরুলোক, ফিল খেয়ে ফিল চুরি করে বেঁচে থাকতে সাধ্য হচ্ছেন। আইনে অবস্থা অ্যাডাল্টটির বসে ডিকোর্সের দৃষ্টি খোলা আছে, কিন্তু দমাই কি অ্যাডেলের মাথা খেয়ে আইনের আশ্রয় নিতে পারে। কালি মাথা মূখ নিয়ে বুক কলিতে বেঁচে থাকার পাক্তি দ্বয়ের সমান নয়। আমার স্থায়ী প্রবৃত্তি, এ কথাটা উচ্চারণ করতেই অনেক দ্রুত পালন হোলে যাবে। ডাক্তারের দুইপানে তাকিয়ে অথচের অসুখ থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এল। আচ্ছা চোখায়—

ডাক্তারও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—“কি উপায়ে যে উদ্ধার পাব এই কোথাও থেকে, বুকতেই পারছি না। একটা ব্যক্তি অসুখের বেঁচে আসার দৃষ্টি আছে। আপনি স্বকর্মে বসলেন, আপনার কাছে আমার পাক্তি বিদ্যে স্থায়ী বলে। অথচ আমারও বিদ্যে হয় নি। হবেও না কোনও দিন যদি আপনি একটু সাহায্য না করেন। আমি জানতে চাই না, আমার সরকার নাই জানবার, কে আমার স্থায়ী আসল বাস। আমার সরকার স্থায়ী মতো, স্থায়ী বাপের মতো আমার কোনও প্রত্যক্ষন নাই। কিছুর উনি তাতে স্বাক্ষর নন। আসে ওর সত্যিকারের বাপের পাক্তি বেরুবে তবে হবে আমাদের বিদ্যে। হঠাৎ নাকি কোথা থেকে কে ওঁর বাক্যে চুরি দিয়েছেন যে ওঁর একজন বাঙ্গালী বাবা ছিলেন। উনি বাঙ্গালী দেশে জন্মেছিলেন, তার পাক্তি বাস এখন ওঁর বনের তখন ওঁর বা ওঁকে নিয়ে গভীরানে চলে যান। সেখানে যিনি ওঁকে পালন করলেন, অত টাকার সম্পত্তি দিয়ে গেলেন, তিনি নাকি ওঁর আসল বাস নন। এ সমস্ত কথা শুনলে রাগে প্রব্রণ হতে পার না? আপনিই বলুন?”

বলতে বসন হবেন, ডাক্তার অপেক্ষা করে তাকিয়ে আছেন আমার দুই পানে, তখন বললেন—“কথাটা

তো সত্যিও হোতে পারে ডাকার । হোতেও তো পারে উনি বাণাল্যই হবে ।”

ডাকার সাহেব গোটা তিনেক কল লাগালেন ডান হাতে দিবে না হাতেও তেলোর ওপর । সেই সঙ্গে হুঙ্কার দিলেন তিনটি—“নয় নয় নয় । আমি বলছি নয় । আমি বিশ্বাস করে সত্যই নিষেধ, উনি স্বাক্ষরান্বেষে রয়েছে । এবং যিনি ওকে ঘেঁষে পরিচয় দিয়ে তাঁর দল সঙ্গীত ওঁকে লিখে দিবে গেছেন, তিনিও ওঁর বাবা । তাঁকে আমি চিনতাম, তাঁর হাং পরিচয় আমি জানি । তাঁর হুঙ্কার পরে এ সমস্ত কথা উঠবে কেন ? উঠুক গে থাক, কে ওঁর বাবা তা কেনে আমার লাভ কি ? আমার বিবেক ঠিক হোতে গেছে, লোকের হাস্যহাসি করছে আর উনি সর্বত্র এখনও আমার পেক্টোটারী বলে নিজের পরিচয় দিবে বেড়াচ্ছেন । বলুন, এ অবস্থায় হান্দুর কাঁচাতক মূখ্য কাকে থাকতে পারে ?”

ধাকা উঠিছে নব । কিন্তু মূখ্য বলেই বা কি করা উচিত ? টাকা কড়ি সম্পত্তি আছে, নিজের খরচ নিজে চালাতে পারেন, সেখা পড়া বসন্তে জানেন এবং বয়েস বাটন দার হোয়েছে নিকটই, এমন একটি ভয়হিন্দী যদি বিবাহ করলে স্বাক্ষর হোতে না চান, তাহলে আইনের আশ্রয় নেওয়া যায় কিনা, ঠিক বুঝতে পারলাম না । যে আইনে ‘ডিক্লোর’ আছে, সে আইনে ঘোর করে বিবেক করার অবদা বিবেক করতে বাধ্য করার কি কোনও উপায় নেই ! নিকটই ধাকা উঠিছে । ডাকার সাহেব অবশ্য আমার কাছে আইনের পরামর্শ নিতে আসেন নি, বেআইনী পরামর্শও কিছু বুঝতে যোগাচ্ছে না । সুতরাং—

“সুতরাং আপনাই এখন ভরদায় ।” ডাকার সাহেব প্রায় বরষার অবস্থার বলতে লাগলেন—“আপনি হাফা উপায় নেই । আপনাকে ও ভয়ানক ভীত করে । আপনার সেই বহুভূমির তাঁঁর বাজাটা সব আমার পক্ষে নুনিয়োরে । আপনি ওকে ডেকে বসে যিনি । ব্যাস এই কলকাতাতেই আপনাকে সাক্ষী রেখে বিয়ে রেজিস্ট্রী করে বসে গেলে যায় । নয়ত এই আপনাকে বলে দিলাম, আমি আর বসেবেত করছি না । চুসোর দাক্ত কাল করা, অন্যথ্য কেন বেতে বসতে যাব ।”

উৎকট ব্যাধি, চিকিৎসাও উৎকট হওয়া প্রয়োজন । জঘন্যদৈর্ঘ্য ত্যাগ করে হুত কথটা নুনিবে দিতে হবে, উপায় নেই ।

বলদায়—“ডাকার, শ্রীলোকের মন আর পরশাতার উপরে জল, এক বস্তু । বরুন যদি কাকনের মন অন্য কোথাও বাবা পড়ে থাকে—”

ডাকার নিজের হৃৎকানে গুঁই আপদে পুঁতে বলতে লাগলেন—“অসম্ভব, ও সব কথা কানে তুলতে চাই না । আপনি জানেন না, কি ভয়ানক বেয়ে ঐ কাকন । আর একটা হান্দুরকে ও ভালবেসেছে । ওরে বাপরে । বরক এ কথা বিশ্বাস করতে স্বাক্ষরী বাহি যে কাকন আমার হাতে বিসের সেলাম তুলে দিচ্ছে, তবু ওটা বিশ্বাস করতে পারব না । আমি ছাড়া, আর একটা হান্দুর ঐ বরক কিছু আভাসে ইঁপিতে জাগ্রাবার চেষ্টা করুক তো ওর কাছে, প্রায় কাণ বেয়ে যাবে । প্রথমে সে মার যাবে ওর হাতে, তারপর তাকে ধরে পুঁলিখে দিবে তবে নিশ্চিত হবে । সাংঘাতিক জীব ও, ও সবদা মন্থেই মনেও আসবেন না ।”

বেশ, আলদায় না বনে । প্রেম থেকে নির্ভা যার সোলেই সোটা অগ্নি ব্যাধার হোয়ে বীড়ার । প্রতিজ্ঞা করেছি যখন যে কিছুতেই অগ্নিতা বরদায় করব না, তখন ও সব মন্থেই চম্বেই বার বেওয়াই ভাল । গল্প দেখকের মন : তা, আসেই একটা বিস্ত্রী ব্যাধার আশ্বাস করে বসে । নিজের মনকে চম্বে ব্যাধিতে বলদায়—আবার । মন কোরা কুঁকড়ে এডটকু হোয়ে সেল । উঠে পড়লাম, হুবে হাতে জল দিয়ে জামা টামা ছাড়া বরকার । তা ছাড়া বরক সেওয়া উচিত ডাকার সাহেবের জন্মে কত গুঁই কি যোগ্য হুছে । বলদায়—বসুন একটু, জামা টামা হুলে আসি । উপায় একটা বার করতে হবেই । এখন সেই কাকনকে একবার বসতে পারলে হু । কিছু সে কি, আর আমার কাছে আসবে ।”

ডাকার সাহেব বললেন—“যাবে কোথায় সে ? অর্থাৎ স্বাক্ষরী বিবেক টেলিকোনের কথা বলে পাগিয়ে রয়েছে কেন জানেন, ওর মতলবটা বুঝতে চাই । গুঁহুতা একটা কাণ কিছু আছে, এই কলকাতাতেই আছে সেই

ব্যাপারটার মূহু। এবারই ও লেখাপড়া নিয়েছে।
 মাঝে মাঝে এখানে চলে আসে। তেন আগে, কার কাছে
 আসে, কিম্বদন্তে বলবে না। তাই আমি হঠাৎ এ হুড়ো
 করে ডুব বারলায়। বা আশা করেছিলাম তাই হোল।
 দলে দলে আমার সেক্রেটারিগি বিরুদ্ধে হোয়ে
 গেল। বাবে কোথায় এয়ার বাহান, হায়ার হস্ত
 পুঁলিশ কয়েক সপ্তে। যেখানে বাবে, বার সপ্তে কথা
 বলবে, সব আমি কাল জানতে পারব। তারপর ব্যক্তি
 করে বের হবে। জাল টেনে নিয়ে আসব আপন্যর কাছে।

১. আগুন একটু ধাক্কা দিলেই চিট, ছোরে যাবে।*

বনে গড়ে সেল, শ্মীরি পেছনে গুল্লির লাগানো কাছটাও
ভাঙা নিম্নের কাছ। ওটা একটা বোম্বোমি, ওটার
কনোও বোম্বের আইনে ভিত্তিওঁ হুঁর হোতে পারে।
কিন্তু, কানি যে এখনও ডাকার শাহবের শ্মীরি হুঁর নি।
বিবাহ কয়ার হুঁরছার ভাঙিখাওঁ শ্মীরি পেছনে গুল্লির
নিম্নোটা বোম্ব কানি, হুঁর বেশী শাসীঅতা-বিরহ
কানি হুঁর।

ভক্ত্যাকে বশভে বলে ভেতরে চলে যেলাম ।

ভেতরেও দায়বদ্ধতার আদর্শ এবং সত্যের অন্বেষণ।
আমার জন্যে মৃত্যুরই বসে আছে। সত্যেরই পথে
রোহাম্পল পরিবর্তন পণ্ডিতোদ্যমবর্গক আশ্রয়, ভাষা
সহযোগে পঠিত চর্চা করছিল রাস্তা করে বসে। ভবিষ্যৎ
কল্পেই অন্বেষণ। তাকে দিলে।

“আন্দন থালা, আন্দন। ঠাটানসরে বজ্জতা দেওয়া
এর ব্যব্যেই হোরে সেল।”

জিজ্ঞাসা করলাম—“তুমি যে হঠাৎ, কি বনে করে ?”
 আর বাই বোক পরিচয় জারায় ঢক্‌ঢল্‌কা আছে,
 এ অপরাধ ওর স্বাভাবিক পরিতোষের দাবী। একটা
 কাঁচা লম্বা ডগাটুকু কাষেড়ে হিঁক্কে নিরে বলল—
 “বব, ডিউটিতে আছি এখন, সরকারি কাজ, টপ্
 সিক্রেট।”

“সকলার তোমার ঐ বাবা লক্ষ্যের কাছ দিতে হুকুম দিয়েছে। কি সর্বনাশ।”

হা হু করে হুধের ঝাল ডাড়াতে ডাড়াতে
পাখিতোষ বলল—“লক্ষ্মা ময়, সৌকো বিব। উঃ,

বায়ের মধ্যে ছোঁখালে বায়ও লেজ জুড়ে পালাবে
বাপস—”

বলদান—“তাহলে পালাও এমন লেখ তুলে,
সরকারি কাজ সরকারই বুঝে নিক।”

প্রভু বাবা নাড়িতে পরিবল কলসে—“ওঁ হুঁ, ত্যা
 হলে আপনিও বিপদে পড়ে যাবেন। যে মাল আপনির
 ঘরে বসে আছেন, ওঁকে পাহারা বিজি। বেহুঁরা কাক,
 বড় মানুষের বনবেলা। ভয়ানক নামজারা এক
 হোটেল থেকে পরশু রাতে নিজেকে নিজে চুরি করে
 সরিয়ে কেলেঙ্কেন উঠি। খোদ বড়কণ্ঠার হুঁম, এক
 হুঁমুঁত দিনে চোখের আড়াল না হন। ওয়ারে খবরের
 কাগজগুলো ঢাক ঢোল পিটিয়ে দিয়েছে যে অত বড়
 একজন ভাকার গভীর নিশীথে খোলাহুঁর গায়েব হোয়ে
 গেল কলকাতার হুঁকের ওপর থেকে। গিলে চমকানো
 সংবার, সংবারপি পাঠি করে মানুষে গিলে চমকবার
 আনন্দ উপভোগ করছে। আর আমি বরহি না থেয়ে
 না হুঁমিবে চাঁব থুঁতে বেড়াছি ওঁর সঙ্গে। শেষ
 পর্যন্ত এসে আপনির এখানে চুকলেন। হাঁক হেঁকে
 বাঁচিয়ে। শ্রৌদি তো বিষয়ে কতে ঘাঁজলেন, আমি
 ত্যাভাঙি বারগ করলাম। তারপর চা মদখাপার
 বাওরবার বাবরা করলাম। সম্মানী মানুষ, হুঁতো
 আপনির সঙ্গে সত্যিই কোনও কাজের কথা আছে।”

এতক্ষণে বৃন্দাবন, আবশ্য'বাড়ির আশ' ব্যবস্থা কেন
করে সম্ভব হোল। চেনা জানা নেই, এমন একজন
লোক তাঁর উপর হোয়ে বলল, যতক্ষণ না গৃহস্থানী
কিরছেন ততক্ষণ অপেক্ষা করতে, চাই। সঙ্গে সঙ্গে
তাঁর আশ-অভাবনা শু' হোয়ে গেল আশ' বাড়িতে
এটা বেন শুই অস্বাভাবিক কাজ বলে মনে হ'ল।
বেশখো শ্রীমান পরিমল বসে কলকটি নাড়ছে, এটা
কে জানত। বাক', তাঁরই হোয়েছে, ভাকার শায়েগীর
নত বান্দ' বাড়িতে এসে কিরে যেতেন, এটা দিকই
ভাল কাজ হোত না।

পরিসর আরও ব্যতিক্রমী পর্যায়ে তীব্র হতে পড়লে।
বোয়ারার কপাল খরাপ, উগরে কেসতে হোল ঘুঘুর
আস। হুততে হুততে এল আমাদের বাড়ির বঁধা
কিন্দাওয়ারা দাবল। উজ্জ্বলতার চোটে বোয়ার

কেবলোই তাম্রাংগের দরবার দেখিতে গেল।

সংবাদ ।

সংবাদ চব্ব্বলের ন্যস্ত অভ্যন্তর বাবাপ। বান্দা
হতে বড়বান্দা, ছোটবান্দা, মেজবান্দা, সেজবান্দা, এমন
কি বোম্বা পুন্ডলি মাচ্চের পর্যন্ত এসে গাঁড়িতে আসেন
রক্তার সান্দনে ।

“কি হবে বাব ?” হাব্দল প্রায় তৌলৈ কেলস ।

পরটা আস্দা ভাঙা হুঁ থেকে বার করে দিলে
নড়া উপকে গল্পার হাতে লাড়িয়ে নামল পরিহল ।
কটারকে “অন ডিউটি” পাকাটা দেখাতে ধরে ।
গপড ভান্না আর কল্যাদার না । বাইরে চা পাঠাতে
এল শব্দ আসে বাইরে শৌনিত্ত সোদার ।

আর ঘণ্টার বস্তা সরকারি গাড়ি বৈক্যাবাটি সেট
শৌনিত্ত সোদ । শোনিবিত্ত সেটটি পড়ে আর, আপ
গাউন শূঁখানা গাড়ি পার না করে কিছতে উঠিলে
না । তাঁরা হুকুর করলে অর্বেক হাতে শূঁখের
পর্বত বাল্পের শূঁখের হোরে আকাশে উঠে পড়েন,
তঁারা সয়েছেন যে গাড়িতে সে গাড়িও নিচল হোরে
থেনে উঠল । বনে বনে একটি চব্বকুত্তি খেলার,
তাঁহলে বাবারও বাবা আছে ।

বৈক্যাবাটিতে যদি ছাড়া সেলার ভালর ভালর,
প্রিয়ামপুরে একদর করে বসতে হোল । সেট যে কতকল
পড়ে আর, কে জানে ! সেট থেকে আববাইল পর্বত গরি
হলে সেহে । তা অর্বেক, কেউ আসে এগতে পারবে
না । সেট উঠিলেই আসে সরকারি গাড়িকে ছাড়তে
হবে । গাড়ির ভেতর যিনি বসে থাকেন, তাঁর হুকুর ।
বুঁ জোরে শূঁখের গোকাপিগতে প্রৈকাঠিক লাগিয়ে
সেটের লিপাধী হুকুর তামিল করতে ছুঁল ।

তারপর নির্বিঘ্নে বাসি শূঁল শৌহান সোল । বাসি
শূঁলের ওপর আবার আর ভাঙার সাহেবের ভার মিলেন
বড় কতাঁদের বড় কতাঁরা । ওঁরা শিড়ার সেহে
কিহে চলেন । আসানের বাবার বড়বান্দা, সজ্বর
বাড়ি । বিবাহের আসে আযাকে বলে সেলেন—
কিছু ভাববেন না, আমি নিজে গিয়ে আপনার গাড়িতে
সবোদ দিলে গিছি ।

বনে পড়ে ফেল দেই বিখ্যাত উকিল বাবুটির
কথা । মকলের কীসির হুকুর হওয়ার পরে মকলের
আত্মীয় ছুঁরা কেঁহে পড়ল — বাবু, আপনি যে বলছিলেন
খাদ্যাস পাবে । উকিল বাবুটি শাখানা দিলে বললেন
হুকুরি বলে শুঁলে পড়তে হাও না । তারপর আপনি
করে খাদ্যাস করব ।

ওঁদের গাড়ি যখন ছাড়ল তখন ডাকার দারোগী বুঁ
বললেন । তাঁর বহুকৈ জিজ্ঞাসা করলেন—“ব্যাপার
কি ? ঘিয়ে আনলে কেন ?”

বহুকৈ ওঁর কথার জবাব না দিলে আবার কিহে
কিহে বললেন—“আপনাকে দাছ হৈনে আনতে হোল ;
কতবড় বিপদ ঘটিলে শূঁলে আপনি জম্বিত্ত হোরে
বাবেন । যে হুকুর মহিলাকে আপনি বৈহাটির ঘাটে
নাথিয়ে দিলেছিলেন সজ্বর আসে, তাঁরা তৈলন পর্যন্ত
শৌনিত্তেই পাবেন নি । একখানা কলকাতার চাকরী
কিহে আসছিল কলকাতার, চাকরীখানা খালি হোরে
কিহিগিল । হঠাৎ তাঁরা সেই চাকরীকে গাড়ি করিয়ে ডাঙে
গড়ে বসেন । তারপর থেকে সেই চাকরীর পাখা পাখা
বাচ্ছে না । এখন আপনার কাছে আমরা জানতে চাই,
তাঁদের সঙ্গে আপনার কি খাদ্যাস হোয়েছিল ।
আপনি যদি সমস্ত খোলাখুলি বলেন তাঁহলে
হয়ত এখনও—”

প্রত্যুত্ত জোরে থককানি দিলে উঠলেন—“চুপ, চুপ
করুন । আসে বা জিজ্ঞাসা করছি, জবাব দিন ।
চাকরী ঘরা চালায় তাদের কোটো আপনাদের
কাছে আছে ?

ভুললোক সম্পত্তি ভাবে মাথা নাড়লেন । অর্থাৎ
আছে ।

পকেট থেকে বিনিব্যাগটা বের করে তাঁর হাতে
দিলে বললেন—“ওর মধ্যে একটা কেছটা আছে ।
যদি পাবেন দার কোটো তাকে ধরুন । সে মোকটা
চাকরী চালায় । ব্যাল—বতকপ না তাঁদের উজার
করে আনছেন ততকপ আবার বুঁ থেকে আর একটি
কথাও বেরবেন না । টুটি হিঁটে কেললেও না ।
দান কিছু বুঁ সাবধান, এই কোটো দার তার যেন
কোনও কতি না হয় । ভুললোকের চুকি, বাস ।”

হাত আড়াইটে।

কাল দিয়ে বেগা ছোট গাড়িখানি একবার এ বোড়ে একবার ও বোড়ে লিভাচ্ছে। হাফকপার থেকে ধবধব বার চার পাঁচ গেল আর এল। গাড়ির ভেতর আমরা নিভক হয়ে বসে আছি। আরি, আরার পাশে ভাকার মারোণী আর আমাদের সামনে বহর পটিন হাকিমের এক রেডিও অফিসার। সে ভুলোকের দু'কান বন্ধ, কানে যে বস্ত্র আটকানো আছে তা' থেকে নির্দেশ পাচ্ছেন তিনি। সেই নির্দেশ অনুযায়ী গাড়ির চালককে এ বোড়ে ও বোড়ে যেতে বলেন। রেডিও অফিসারের সামনে একটি বাস্ত, সেই বাস্তের সামনে কখনও লাল কখনও সবুজ আলো জলে উঠছে। এক দুটো ডাকিয়ে আছি সেই আলোর সামনে, লক্কতে আসছে। দাঁঠক সংকেতটি কখন আসবে।

আমরা অপেক্ষা করছি দাঁঠক সংবাদটির জন্যে আর ওয়া অপেক্ষা করছে দাঁঠক জ্বানে তাক করে হাতের অঙ্গান্দঙ্গুলো চালাবার জন্যে। ওয়া জানে—পটিন দিশাহী, একজন বনেছে ড্রাইভারের পাশে, চারজন বনেছে আরামের সঙ্গে, ওয়া ডাকিয়ে আছে হাইরে, বাঁগানে বয়ে আছে ওদের বস্ত্র। প্রয়োজন হলেই চালাবে।

হাত তিনটে বাস্তল।

ভাকার মারোণী নিজের দু'হাতের আলঙ্গুলুলো মোড়কাতে দু'বু' করলেন। হট হট করে শব্দ হাতে লাগল। রেডিও অফিসার আর একটা দাঁড় বার করলেন বোঁকি তলা থেকে। দু'টো কান আসেই খালি হোরে গেছে, তুতীকী বেরুলো। কতঙ্গুলো ক্রান্ত ভরাতি ককি নিয়ে উনি ডিউটি দিতে বেরিয়েছেন কে জানে।

ক্রান্ত বলে ককি চালা আরম্ভ, কয়েই মিনিট বনে উঠলেন ভুলোক। ভুলোক ছিপি অটিলেন ক্রান্তের দু'পে। সামনের বাস্তের একটা মোড়ার টিপলেন সবুজের বনে লাল আলো জলে উঠল। চোখ দুটো তাঁর অঙ্গান্দিক বকু বোঝাচ্ছে ওখন। এক মিনিট পরেই আবার একটা চাপি টিপলেন, আলোর রঙ বদলালো। গম্ভীর ভাবে আদেশ দিলেন ড্রাইভারকে—'দাঁড় বোড় জলবি—'

দাঁড় বোড় বহর পাল গাড়ি, তখন আর একবার ঘড়ি দিয়ে তাকালাম। এড ক'টিটা অটটার বর ভাড়াচ্ছে। কয়েকটা পরে গাড়ি শাক দবাতি নিয়ে কলকাতার দিকে এগিয়ে গেল। শেহন শেহন খালি দু'খানা মোড়লা হাস পাঁক পাঁক করে হুঁল। কয়েকজন-হানু'র শব্দ, গানে পান্ডা ক'বে করে হাজা পার হোরে পটিন দিকের গাড়ার গিরে চাকল। ওয়া গল্লায়ানে চলছে। তারপর হট, কট, কটাল শব্দ উঠল কোথার, গাড়ার জল পড়ল। কাছাকাছি কোথার মোঙ্গ ভাকতে লাগল। নিভ হয়ে আসা পাশে তারকির দেখলান, একতঙ্গুলো বস্ত্র কিক হোরে বোয়ে।

মিনিট পানারের গাড়িখানা তেঁপে উঠল, বোকে উঠে হোঁশ পূর্ব দিকের গাড়ার তুতী একটা আলো পড়ল। নিমেষের মধ্যে আলোটা ভুলোক হোরে উঠল। সোনা গেল, কান কটিবো মোটর গাড়ির শব্দ। গাড়ির বনে ডাকিয়ে হোঁশ, রেডিও অফিসারটি কি বনে বললেন দিশাহীকে, সঙ্গে সঙ্গে জালের কীতে হাইকলের দু'ব চুশিরে দিবে প্রত্যুত হোরে বদল তারা। শব্দ শব্দ একটা ক'হুনি লাগল। তারপর বস্ত্রসাম আমাদের গাড়িও হুটল।

তারপর বিশ্রী মোড়ের একটা আঙাজ কানে গেল শব্দ। চোখ বুজে দু'কানে আলঙ্গুলি দিয়ে ক'র হোরে রইলাম। কি হচ্ছে না হচ্ছে, চোখ মেলে দেখবারও সামর্থ্য রইল না।

জান—বেলসেহে হানপাতাল। একটি শব্দকে ছিরে আবার সনাই নিভক হোরে দাঁড়িয়ে আছি। দবাই জানে, শাক আট কন। ওখানকার এক ভাকার আছেন, একজন নান' রয়েছেন। পুঁদিলের এক বড় কত'র আর তাঁর দু'জন সহকারী রয়েছেন। আর আছি, আররা ভিন্জন, ককিন, মারোণী ভাকার আর আনি। কাকে বাকি আনতে পারানো হোরেছে তাঁর সামনে বৃত্তাকালীন জবানবখী বোঝা হবে।

জবানবখী যিনি দেখেন, তিনি শব্দে আসেন শব্দে—। তাঁর দাঁ চোখ আর দন্ত মাথাটা ব্যাঙের কজ

গোলায়। চরম প্রতিশোধ নেওয়া থাকে বলে। নিজের জীবন, মেয়ের জীবন, জীবন রক্ষণের কথা একদম ভুলেই গিয়েছিলেন শুভন বহিলাটি। এ রকম মানুষ এ দেশে কটা লক্ষ্য।

অম্মার কি না ভাবুন উনি বলে বলে। আমি সেই রাজস্থানের সেই বৃদ্ধি নোভার পাছাত্তের পাশে পৌঁছে গেলাম। চার পটি মানের একটা বাজাওকে বুদ্ধের তলার চশমে ধরে তার ছোট্ট মনটা উপভুক্ত হোয়ে পড়ে আছে। ওপর দিয়ে এ শব্দে ও শব্দে বুদ্ধের বিনয় রহিত। পরোয়া নেই। মরল তো আর একবার বই বুদ্ধার ঘটে না।

বাড়ি কিসলান।

বুদ্ধার ভোর থেকে বুদ্ধার ভোর বেলা দেড়টা, ঠাণ্ডা হোল। বাক. বাক মণ্টাই হোক, আপনাদের শাস্তি হোয়ে যেল একেবারে। মান করে খেয়ে নিজেই একখানি নিয়া, সেই কাল সকাল পড়ে। আর নর, নাক কান মলে প্রতিজ্ঞা করলাম মনে মনে, আর কখনো জীবনে পাঠকের চিঠি পড়ে গল্পের মত বুদ্ধেরে অতঃপর থাকি না।

কাকনের কথা মনে পড়ে গেল। প্রীতাকনবুদ্ধার রায় তাঁর জীবনের একটি নিগুত কাহিনী আমার পোনাতে আসবেব আকস্মিকের হুঁট পেয়েই। কাহিনীটি শুনলেই আমি তার হৃদয়দান করতে লেগে যাব।

হৃদয়দানের নিহুটি করছে। মরবার দিন পড়ে আর যদি কখনও সত্য কাহিনী অবলম্বন করে গল্প দেখার চেষ্টা করি। বাসগ—গল্পের মত পাবার জন্যে জানটাই আর একটু হোসে যেতে বয়েছিল। একখানা এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম করে দিলাম কাকনকে—এসো না। আসলেও সাফল্য পাবে না। বিশেষ কাছে অব্যক্ত চলে থাকি। টেলিগ্রাম করে হাব করলাম পল্লার। তারপর বাঙালা বাঙালা সেরে শূন্যে পড়লাম। গল্প দেখা এয়ারে হত বাখার থাকুক।

বুদ্ধার সকালে ঘুম ভাঙল।

আমার সেই ভাক, বেলা বাইটাই শিরম এসে এক ভাক চিঠি দিয়ে গেল। চিঠিগুলো নাড়তে লাগলাম,

বুলন না। খোলবার সাহস আর নেই। শব্দ কোথা থেকে এসে লেগে নিছি।

তারপর হাতে পড়ল বুদ্ধার রক্তের একখানি থান। শোণ্ট আকস্মিকের হাপটা পড়ে থান বা বুদ্ধে পারলাম না।

কাকন লিখেছে—

আপনি নিশ্চয়ই আমার বুদ্ধের সঙ্গে আলাপ করে শ্রুতে শেয়েছেন, কাকন কি ভয়ানক বিশেষের মতো বেঁচে আছে। রাজস্থানে দারা আমার চুঁরি কতে, তাদের কাছ থেকে সমস্ত ব্যাপারটা আমি জানতে পারি। আমারে তারা জীবন নিলে কিভাবে দিয়েছিল, কাকন আমি তাদের বুদ্ধিরেইলাম কাকন আর তার মাঁকে আমি চিনি। ওদের দু'জনকে আমি ঠিক বার করে দোব কলকাতার গিয়ে।

ভাষাক্রমে কাকনের সঙ্গে জরপূরেই আমার কথা হল। কথার কথার ও আমাকে বলে ওর বা ওকে নিয়ে রাজস্থানে চলে আসেন বেন ওর চার পটি মাস বসে। বহুস্টা মিলিয়ে আমার সন্দেহ হল। আমি বোধে স্বর নিয়ে সমস্ত জানতে পারি। ওর বাবার নাম তাঁদের বংশপঞ্জীর সব আমি বার করে ওকে জানাই। ওর আত্মীয় স্বজনদেরও সংবাদ দি। তাঁরা ওর কাছে যেঁতে পারলেন না। কোনও কথায় বিশ্বাস করল না কাকন, আমাকে একেবারে হেসে উড়িয়ে দিল।

আমি জানি, কাকন আপনার কাছে যাবে। যাবেই ও আপনার কাছে। আপনার কাছে গিয়ে আমি সব কাহিনী বলব, তাই নিয়ে আপনি একখানা উপন্যাস লিখতে রাজী হোয়েছেন এ কথা ওর কাছে বলবার পরেই ও কলকাতা চলে গেছে।

তাই তাকাতাকি আমার বুদ্ধটিকে আপনার কাছে পাঠলাম। আপনি সবই জানতে শেয়েছেন। কাকনকে বাঁচাবার চেষ্টা করুন হয় করে। সে মেন তার আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে থাকে। কিছুতেই বেন এ যেতে না আসে। তার বা বেঁচে আসেন কি না, কোথায় আছেন, কিছুই আমার জ্ঞান্য নি। কিছু আমার বেন সন্দেহ হল, তিনি বেঁচে আছেন। হয় করে তাঁকেও

লাক 'ন' করে দেবেন আমি দেব' লাং

আছে প্রতিশোধ তার

—দুব সাবধান।

একটা কথা, কতকগুলি একটা মিলে থাকে। হঠাৎ

ও মনে করছে আমি 'ন'র মূল্য জানি। হঠাৎ

আকাশের চাঁদ হঠাৎ পাতাল ভবো হ্যাংলাপনা করছে।

ওই শাবনটা ওর ডেতে দিবে। নানটাই আমার

সাক্ষর, কিছ, আসলে আমি একইকরণে করছি।

বিজ'লা সৌনে পুশটাকা মাইনে পাই। বন বানাত পাতোড

কীকনকে বসবেন

পত্নীর খোঁজা খোজ করত আমার খাত নথ। সে

যেন ভুল না শেখে হ্যাংলাপনার শীরা আছে।

আমি সেই শীরা পরে ছাইনি। প্রথমে মনে।

জুটি পেলান না। শিগগির কেন করে বেরতে

হবে। টিতি—



অধ্যাপক

জ্ঞান।
দেহী

পাঁজতে পড়াতে একবার আড় চোখে সামনের বোর্ডটার দিকে তাকানেন প্রফেসর সুশোভন দত্ত। মনে হলো সামনের দাঁড়ি ছাত্রেরা কি যেন চুপ চুপ বদছে এবং লজ্জা বা বিষমবস্তু ভিত্তিই। মাঝে মাঝে হাসছেও যেন।

অধ্যাপক দত্ত বোর্ডটি থেকে একবার মাথা তুলে চাইলেন তারপর দূর করে ব্যাটাটা বন্ধ করে দেয়ালের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে হুত লগ্নে পড়িয়ে চললেন : আচ্ছ আমরা সাহিত্য স্ট্রাট বস্কিমচন্দ্রের 'বিভাদল' আরম্ভ করবো।

পেছনের বেকের দাঁড়ি থেকে অভ্যর্থনা এলো। : মিউ-টি। অধ্যাপক দত্ত একবার চাইলেন সামনের দিকেই তারপর নিজের মনেই পড়িয়ে চললেন।

দুই এমনিতি আদর্শই নয় ; গ্রামই চিরকুমার প্রফেসর সুশোভন দত্তকে এরা নান্যভাবে বিরক্ত করে আনন্দ দায়। আচ্ছ ভিনমান হলো এই ক্রান্তি একই ভাবে তাঁকে উপাভ করে চলেছে। কখনও বেঙ্গল কুসিমে ক্রাশে ছেড়ে দিয়েছে আর কখনও মিনতি পরেই সেটা একটা বিশ্রী দীর্ঘ শো—ও—ও শব্দ করে এমন ভাবে ভূতলশরী হয়েছিল যে ক্রাশে একটি অবিশ্বাস্য আবহাওয়ার সৃষ্টি করছে। প্রফেসর দত্ত যেন পাথরের মত শুষ্ক হয়ে পেলেন আর তাঁরই চোখের সামনে ছাত্রের দল মূর্খ হওয়ায় গাশা দিয়ে উচ্ছ্বসিত হাস্যবোণ দম্বলন করবার চেষ্টা করেছে আর ছাত্রেরা দৃষ্টান্তিনীতির দিকে আড় চোখে তাকিয়ে কো হো করে হাসছে। ওরা হাসছে ; হাসবেই তো—ওদের হাসিই বরষ এটা কিন্তু এ হাসির উপলব্ধি যদি তিনি না হতেন তাহলেই সমস্ত ব্যাপারটা মনোরম হতো। এ কথাটা বার বার ভাবতে ভাবতে তিনি প্র্যাকটিকল থেকে নেমে ক্রান্ত পায়ের বোরসে পেলেন।



থরের হাতি নিভিয়ে দিলে আত্মসমোচনা করতে হলেন প্রফেসর দত্ত। কেন ওরা এমন করে ? আকাশ-পাতাল চিন্তা করে নিজের মনে মনেই পশপ নিদেন না ; এমনি করে ক্রাশ ছেড়ে না দিয়ে ওদের বোকাতে হবে। হয়তো এটা অপরাধ বৃত্তিতে পারলে ওরা আর দৃষ্টান্তী করবে না। কিন্তু কল বিবেচ্য হয় না।

পরদিন ক্রাশে সাতটি ঘেলে সাতদিক থেকে তিক তিকি বাজনা বাজিয়ে চলে সোহাগ ব্যান্ডের শেট তিপে।

আজ প্রকোপার দণ্ড পতঙ্গী হয়ে রোলকল করে চললেন—
—“নান্দ্যর কোর, কাইড, দিকস্, সিকস্, এ্যান্ডসেট ?
ও এসে! এসে! তবে রোলপ করছো না কেন বলে
তো! এত সোলমালই বা কিসের ? এতে তো
ডোমারেই পদুখা হচ্ছে—খিচোরের বোল দখরই
তো পুনতে পাছ না। জাতে কতি ডোমারেই
হচ্ছে।” প্রকোপার দণ্ড নীতিকথা বলবার চেষ্টা করেন।

কিন্তু লোক-চরিত্র লম্পকে জ্ঞান সেই প্রকোপার
দণ্ডের। যে বান্দব যাতে চটে ছেসেদের সে দণ্ডুখির
পথ বুঝে নিতে বেশকিছু সময় লাগে না। তারা যেন
স্বভাবানুগিত পদুখতি দিয়েই বুঝেছে যে কোথায়
কার দণ্ডপতা এবং প্রকোপার দণ্ডের একটা খতি
কোনদ জাঙ্গা! এই ছাত্রীর গাধি। তাঁর সব
সময়ই যেন হয় যেন ছেসেরা কানে কানে কিস্ কাস্
করে কি যেন বলে নারী জাতিকে অপমান করছে
এবং নারীর প্রতি বিশ্বাস্য কোন অপমান হতে পারে
এমন ব্যাখ্যা তাঁর বুদ্ধিতে আসা হাতই তাঁর বৈধ-
চ্যুতি ঘটে এবং ঘটবেই। এই পদুখতিবুদ্ধির
বশে ছাত্রী ইতিমধ্যেই শকেটু করে ব্যথারাজি দণ্ডুখি
করে চলে।

মারে নাক ওয়া খিচোরের মধ্যে ছেসে বলে : কি
পাঙ্গল বদল তো—কি বিভিন্ন ওঁর কিস্কসড আইডিয়া।

কিস্কসড আইডিয়া। তাই তো। কেন এমন
হলো। চিন্তা করতে চেষ্টা করে দুশোভন দণ্ড।
দামনের বার্ঠে ওপাশ ঘিরে দণ্ড অস্ত বাচ্ছে। সারা
আকাশটা চিত্র বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। বার্ঠে ওপাশ
দণ্ডুখি আরা আরা দণ্ড থেকে হাছার হাছার
দণ্ডুখি আসে জানা করে সন্ধ্যাকে বসে আনবে।

দামনের ছোট নদীর ঘাটে বিছের চিত্রার মধ্যে
জলিলে গিরেছিল দুশোভন দণ্ড।

নশিতা। নশিতা বোম—এগেরে জেনো সেই দায়ী।

টুপ করে জলের ওপর একটা দণ্ডনো জল এসে
দণ্ডনো আর দুশোভন দণ্ড চমকে উঠলেন। চিত্রার
জালদগুনো টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পেল—আর
জড়িয়ে পড়ে বিলিয়ে গেল ওই অতলাত অন্ধকার নদীর
কূপে মধ্যে।

নশিতা বোম তাকে কীক দিয়েছে—। তাকে
জল বুঝিয়েছে, তাকে পাঙ্গল করে দিয়েছে। দুশোভন
দণ্ড হন হন করে পাঙ্গলের মতো মেসের পথে এগিয়ে
চললেন।

ফার্ট পিরিওডেই সেদিন ক্রাশ। তিনি ক্রাশে
চুকেই রোলকল দণ্ড করলেন অন্যমনস্র ভাবেই।
ক্রাশ একেবারে নিতর, যেন মতদণ্ড। যেন যেন
যেন একটু এসর হয়ে উঠেছেন প্রকোপার দণ্ড। তা
হলে কালকের নীতিকথার কাজ হয়েছে। আজ তিনি
খাঞ্চিচ্চোরের “বিভাল” পড়লেন।

রেজিষ্টার খাতটা টেবিলের ওপর নামিয়ে বই যাতে
নিতে গিয়েই চমকে উঠলেন : এ কি ? একটা বাবা
ঘিরে কি যেন চালা দেওয়া আছে টেবিলে। সেটা
খুলে দিতেই ভিন্নতি বিভাল হানা অবিকৃত কণ্ঠে
হাতুভাবার পদনতেরী আত্নান্ন করতে করতে
একেবারে ল্যাবরেটোরীর পাশ ঘিরে দারোমানেরে রাষ্ট্র-
দণ্ডের দিকে ব্যবধান হলো। ক্রাশের এক কোণ থেকে
আওয়াজ এসে : বিভাল বলিল—? আর আপনি
একজন বলে উঠল : ন্যাও। একেবারে মার্জার জাতির
হাতুভাবার অবিকৃত দণ্ড।

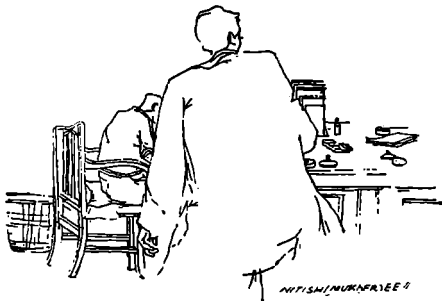
প্রকোপার দণ্ড ক্রাশে দণ্ডিত মত দণ্ডিতে রইলেন
আর হাদির তরঙ্গ ক্রাশে কেটে পড়লো। অধ্যাপক
যেন এবার একটু আভ্যন্তর আশার সোফারের দিকে
জাকালেন। কিন্তু আজ ভাণ্ডও দণ্ডিতে কেটে পড়ল, রু-
সাসের বাগা আর জানয়েনা। আর সেই নশিতার
মত দণ্ড—দণ্ডু তারই মত চোখ দণ্ড, সেই যেন
কেবল পতঙ্গী হতে চেষ্টা করলো। না-দণ্ডও চানছে।
অধ্যাপক দণ্ড এক রিনিট দাঁড়ালেন তারপর শটক
দণ্ডের দিকে বেরিয়ে গেলেন।

সমস্ত পতঙ্গী একটা অদৃশ্য জালার জালেতে জালতে
যেনে কিয়ে গেলেন। কী অপমান !—এ দিকের বিলয়েরই
কাত। সে প্রথম দিন থেকেই যেন ওঁর শেহেন সেহে।
বিলল ভালো ছাত্র—তাই এতদিন তিনি কিছাই
বলেন নি ওকে। বরং একটু আভ্যন্তরই দিয়েছেন।
কিন্তু না আর হাতুতে চেষ্টা বাব না। ওই দণ্ড
বলের পাড়া ওর ঘাটে খিচিপালোর কাছে রিপোর্ট

না করলে আর চলবে না। হর ও কলেশ থেকে বাবে
নর তিনি নিজেই।

মেষের বিহীনায় শূন্যে শূন্যে চোখ কেটে ভাল
আসতে চাইলো। শূন্যতাও হাসছিল? কিন্তু কেন?
ওর বুঝাবানো যে একেবারে নশ্বতার হতো—হৃদয়
কেটে বসানো। হাঁ দিকের গালের তিলটি—সেটিও
তো ঠিক তেহনি আছে? ও কেন হাসছিল! শূন্যোত্তন
দত্ত সব সইতে পারেন, শূন্যতার হাসি সইতে পারেন না
কেন? কেন ও একেবারে নশ্বতার হত হলো?

শূন্যতা কাপসা হয়ে আসে। কতবার বলে করেছেন
এই সেকশনের ক্রান্তি বললে নোবেল একেসার বিশ্বের
মূলে কিছু বলতে পারেন নি, কেমন বাধো-বাধো
ঠেকেছে শূন্যোত্তন হকের। আত্মদম্বাবে আঘাত
লেগেছে। আর নশ্বতার হত সেই বুঝাবানো?—
তারও কি কিছু আকর্ষণ প্রকৃতির হকের ভেতর
ঝেলে আছে শূন্যোত্তন হকের? : কিছু বলবেন
আমাকে? একেসার কিয় বিজ্ঞান্য করলেন। ছোট
হেসে চুঁরি করে বেতে গিয়ে যেন বড়ার কাছে বরা



কেন—কেন?

নশ্বতা ওকে ঠিকিয়েছে। ওকে খেঁচলে করে
দিয়েছে। কিন্তু কেন তিনি নশ্বতাকে এত ভালো-
বেলে ছিলেন সে কথা তিনিও যাকেন নি। হাজার
জীবনে প্রথম প্রেমকে কীকি দিতে চান নি তিনি
কিন্তু কীকি দিয়েছে নশ্বতা। সে হারিয়ে গেছে
চিরকালের হত।

শূন্যোত্তন দত্ত ভাবেন ওরা কি চায় না আমাকে?
তা যদি না চায় তা হলে? একেসার হকের চোখের

পড়েনোহে ঠিক এমনি ভাবে কাঁচামাট্টা হয়ে
শূন্যোত্তন দত্ত : না—কিন্তু দর তেহন! আশানার
পরী ভালো আছে?

একটা আকাশ কাটানো অষ্টমাসিতে বর ভারি দিয়ে
একেসার কিয় বললেন; শূন্যে অবলম্বন ওর কথা।
প্রথম পরিচয়ে এক মূলে ক্রাশ করে এলাহ। 'নেবে'
এসে ভক্ত্যার দোকানে বিকিণাম ফেলায়। এত
পর উনি বিজ্ঞান্য করছেন : ভালো আছেন? ওর
কথা শূন্যে আমার একটা গল্প হয়ে পড়লো। আমার

মামাতো ভাতের বিয়ে—আমরা সবাই গির্জার বয়স্করাই
হয়ে। পুনরায় বেয়ের বাবার মাথার একটু হিট আছে।
বিয়ে তো হয়ে গেল কিছু, তাইই মশাকে কোথাও
পাওয়া গেল না। বাসি বিয়েও হয়ে গেল,—ট্রেনের সময়
হয়ে এসেছে সবাই যেন তখন ভুললোককে কোথা থেকে
টেনে নিয়ে এসেছে ভোর করে। ভুললোক যেন কান্নার
আদামী এসেই ধপ করে হাটের ওপর বসে পড়লেন
সোকোভা সোকটি। সবাই বললেন : এই তোমার
জামাই, আদাম করা, কথা হলো। অনেক জেবে চিহ্নে,
মাথা ঢুলকে আবার মামাতো ভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন :
কবে এসেন আপনি ?

শাক্‌ হুয়ে একটা হাসির রোল বয়ে গেল।
সুশোভন বানিকটা অপ্রতিভের মত ভাকিয়ে রইলেন।
তারপর একবার এদিক ওদিক ভাকিয়ে কি যেন একটা
অবস্থা কথা বনে পড়ার হুঁত পায়ে বেঁধেই গেলেন বর
সেকে। বেশখ্য ববনি হলো : বহু পাগল মশার।

আজ মশহিন হলো বিদ্যাপত্যিকা আসে না। ক্রাপ
একবারে ঠাণ্ডা। সুশোভন দত্ত লক্ষ্য করেছেন বিদ্যাপ
না এসেই ক্রাপ ঠাণ্ডা থাকে। নিচিলে তিনি পড়াচ্ছেন,
ভালোই আছেন, যেন হাঁক ছেড়ে বৈঠকে। বিকেলে
বখন রোদের হুঁ লাগতে হয়ে নিচে আসে—বখন বকের
দারি আদামা একে তার পাখার তলার দিনের আলো-
টুকু হুয়ে দিয়ে বয়ে করে তখন সুশোভন দত্ত হাতে
একটি হাড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে গিয়ে বসেন ওই নীটার
কাছে। ভটি কুলের একটা উঁচু বুনো গছ ভেঙ্গে আসে
মাতাবে—আরো কত নাম না জানা বুনো হাঁসের দল
কলকলিতে বনভূমি গিকত করে উড়ে যায়—ভারি ভালো
লাগে ওই কলকলি। ওদের গলার যেন নিকিতার কণ্ঠ
যিশে বয়ে আসে গেঁধবের চেনা চেনা বিন্দুলোর রঙ্গিম
ছাঁক।

: কে ?—কে জানবে ?—। অব্যাপক দত্ত চুকে
গেলেন।

আমরা মারা—

তোমরা করা—? আবার জিজ্ঞাসা হুঁতে যেন
সুশোভন দত্ত।

আমি বিদ্যাপত্যিকা—

এবার শপট দেয়া গেল বিদ্যাপত্যিকা আর সুশোভন।
সুশোভন দত্ত উঠে দাঁড়ালেন। একবার ওদের ঘুর
ভালো করে দেখলেন ভাকিয়ে তারপর হন হন করে
ঘেঁটে সেই অন্ধকার রাতে যেন কোথার দিগিরে গেলেন।

মজা কেমনে ? সুশোভন বলল।

সেখবার বৈকি ? আমি কি এতই বোকা।

প্রথম থেকে লক্ষ্য করেছি উনি যেন কেমন করে
আবার দিকে ভাকিয়ে থাকেন। আবার ভারি ব্যাধাপ
লাগে।

সেখবার মত জিনিষ হলে সবাই দেখে, এতে এত
চটলে চলবে কেন ?

বাও ইয়ারকি ভালো লাগে না।—

আর হয়ে চুকে মাথার একটা অদৃশ্য বস্ত্রা অদৃশ্য
করেন সুশোভন দত্ত। একটা বই হুয়ে পড়তে চায়,
পারেন না। মাথাটা অদৃশ্যব গরম হয়ে যায়। রাতে
আর কিছু যেতে ইচ্ছে করে না। ক্রান্ত হয়ে পুড়ে থাকেন
যেন বেশা করেছেন। আন্ধারে রাতে অদৃশ্য বস্ত্রা হটকট
করেন সুশোভন দত্ত। বখন ভোরের আলো কুটে ওঠে
পূর্বের আকাশে—বখন পাখীরা ভোরের পূর্ব কোলকলি করে
ওঠে, ঠিক তখন সেই প্রথম আলো-আঁধারীর আলো হাজার
লুকোচুরিতে সুশোভন দত্ত পশ্চিম দেখেন দক্ষিণাঙ্গে।
পরনে লাগ টেলি, কপালে চখন আর হাতে নুতন
গলার দিগির—বুধে হাঁসির রেখা। যেন ও কাছে
আদতে গাইছে—। বখন সুশোভন দত্তের আগ্রহ মাঝে
হাড়িরে তখন সেখেন ওর দুখখানা আর চোখ দুটো
একবারে সুশোভন দত্ত—একটুও তলাত নেই। সেই
চোখ সেই বুধ—সেই হাঁসি। তবে ওর সঙ্গে বিদ্যাপ
কেন ? মাথার একটা ভীত মালার অদৃশ্যভূত
ভেসে ওঠেন সুশোভন দত্ত। সেখেন পূর্বের কোলের
জানালার দিগিরে বর রোদ এসে ভারি মাথার ওপর পড়েছে।
দিয়ের যেন মনেই নিজেই প্রতিপক্ষ ঠাড়ের বলে চললেন
সুশোভন দত্ত : সুশোভন ? সঙ্গে বিদ্যাপত্যিকা আর এ ভাবে
কিপটে দেওয়া চলতে পারে না। আর সুশোভনকে কেউ
খনি অপমান করে তবে তিনি কিছুতেই নইবেন না।
—না—না।

ক্রান্তের জেসেবা কি কিছু বোকে ? কিছু আদাম

করে ? না ! প্রকায় দত্ত নিষেধ মনে মনেই বলেন ।
আর ভাবদই বা । সুমিত্রার চোখ ঠিক নন্দিতার মত
আর ওই গালের তিলটি—আমি চিহ্নাকরে যেমতই
একবারে নন্দিতার—কোন ভুল নেই—তা বলে ?

তাহলে কি একবার কোন জবাব খুঁজে পান না
অধ্যাপক দত্ত । শিষ্য নিষেধ মনের ভেতর কতগুলো
কথাকে খুঁজে ফেরেন । কতগুলো হারান সুরের স্নেহ
কতগুলো জট বাঁধা সুতো ? মনের ভেতর জটিলতার
সুদৃষ্টি করে চলছে তাকেই হুলতে ঢেঁচা করেন । ঢেঁচা
করেন যেন সেগুলোই বুঝে খুঁজে বের করার । তারপর
যেন অর্থহীন কতগুলো কথা, বানিকটা কায়ার স্রোত
কুল হাশিরে বৃকের ওপর ভেঙ্গে পড়ে । ভেঙ্গে
পড়ে দিশবিদিশ সরাছর করে তারপর যেন সব একটা
প্রভও আলোড়নের তলার তলিরে যায় । তাঁর বক্তব্য—
অধ্যাপক বেনা যেন পিঁবে পিঁবে মেরে ফেলতে চায় তাঁকে ।
অধ্যাপক দত্ত আর সত্য করতে পারেন না । তারপর সব
যেন সোলমাল হয়ে যায় । সবই যেন বিদ্যুৎস্পর্শ চিহ্নের ছিদ্র
সুত্র জ্বল ।

তাই সুমিত্রার ওপর—না এ কথা আর ভাবতে
পারেন না । তাই ওর দিকে তাকিয়ে কোন ছেলে কিছু
বললে সুশোভনের আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না ।

মনে হয় ছেলেরা সুশোভনের সুবর্ণতার ধব ধাবে ।
আজ ক্রোধে এসেই ওরা কি যেন বলতে সুরু করলো
সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই ।

বিসদ, তুমি কিছু বলছো ?

কিছু না স্যার—বিসদ একবারে কাঁচুফাচু হতে
শুরু যেন সে কাঁ ডায়াল অপসারণ করে ধরা পড়ে গেছে ।

কি বলছিলেন—?

ও কথা বলা যাবে না স্যার—ভারী লজ্জা পাবো ।
না তোমাকে বলতে হবে ।

না—না স্যার । কিছুতেই বলতে পারবো না ।

হিঃ—হিঃ—তোমাদের এডটরু ময়াল কারেখ
নেই ? আমি কথা দিচ্ছি—তোমাকে কোনো শাস্তি হবে
না—আমাকে বিশ্বাস করতে পারো ।

না স্যার আমার বলতে লজ্জা করবে—আমার
কথা করুন ।

তোমাকে বলতেই হবে—আমি তোমার গুরুদত্ত
অনুরোধ করছি—বলবে না ?

তবে বলবো স্যার ?

বলো—বিশ্বাস করো তোমার বিদ্বৎকে কোন
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না ।

না স্যার বলতে পারবো না—কিছুতেই না ।

সুশোভন দত্তের মাথার চুল চোপে গেল ।

বলতেই হবে—হবে—

বলি—

বলো—সমস্তার গলায় বললে সুশোভন দত্ত ।

ক্রোধে যেন সবাই হুত্বার পল গুণছে—। মেয়েদের
হুত্বগুলো মাথা কাগজের মত বিকল আর ছেলেরা যেন
জ্বলে বরক হয়ে গেছে । সুমিত্রার বুকটার মধ্যে যেন
একটা অসহ্য বক্তব্য কিসের ।

বিসদ দাঁড়াল । আর কতক ইতস্ততঃ করলো । আর
কতক লজ্জায় বলি বলি করেও বলতে পারলো না ।
তারপর যেন সব তেঁকটা কাটিয়ে অতি লম্বা পদার উচ্চ
কণ্ঠে : বললো স্যার বলাচলাম কি, দিশাভার ভো তিন
দিকই বন্ধ আদু ভরে কোন দিক দিয়ে ।

ক্রোধে যেন লাকিং প্যাসের বোনা কাটলো । অধ্যাপক
বিহারী অষ্টকান্টিতে সারা কলেজ কাঁপতে লাগলো আর
অধ্যাপকের মনে হলো তিনি মাটিতে মিশে গেলেন ।

এর পরে অধ্যাপক দত্তের সঙ্গে ক্রাস বহলে নেওয়া
হাড়া আর উপায় রইল না ।

ইন্টারমিডিয়েটের কি জমা নেওয়া হচ্ছে । কাউন্সিলে
ভাষন ভীড় আর এক হাহুস দৃশ্য । কারুর মার হাতের
ড্রোকে যেন চুঁকিপাখি বাঁধা পড়েছে । কারু টাকার
পায়ে সিঁদুর মাখানো ; কারুর শিঁদু রেখকী খুঁজে
খুঁজে টাকা পূরণ করতে হয়েছে ।

যাত্র পলটা টাকার জোমাত করে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল
বিসদ । বা হুত্বাশয্যায়—বোনের পরশে কাপড় খেঁই ।
কিসের টাকার কথা ও বাড়িতে যুঁজে আনতে পারেনি ।
এক অধ্যাপক পলটা টাকা দিয়েছেন আরো তো চাই—

চাইতে প্রবৃত্তি হয় না কারুর কাছে । অশেষ
অধ্যাপক ওকে ভালবাসেন উপযাচক হয়েই দিয়েছেন ।



কিন্তু বিদল কাঠুর কাছে মাথা নোথাতে পারে না । যে বন্ধুত্বের ওপর সে বৈতন্য করেছিল তাদের কাছে ছোট হয়ে গে চাইতে পারে না । হীনতার অপবাদ মাথায় নেওয়ার চাইতে পরীক্ষা না দেওয়াই ভাল । যার টাকা নেই তার আবার এত স্ব স্ব কেন ? কিন্তু হাতে তো ও ভালো । কল্যাণিন পারানি বটে তবে কুটো পেটার পেয়েছে কল কাইনালে । হস্তো আই-ও-গিভে—

সবাই কিছু দিয়ে চলে গেল । বলে বসে বিদল ডাকিয়ে ডাকিয়ে দেখলো সবাই দাক । সবাই দেওয়া হয়ে গেলোই ও যাবে,—শুধু দেবটা ও দেখবে আজ । নিজের হবেনই হাসি পায় বিদলের । এ মাঝার কি পালদামী । না ও এবার উঠবে ।

শাক হুয়ের পাশের একটা বেঁকি পাড়া ছিল । বিদল তারই ওপর এসে বসলো । মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে মিরাকেল হর না ? না হর না—হতে পারে না । পরীক্ষার ছেঁড়া কাঁচার বুকে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখার মতই এসবো ঘটনা ।

কে ? সুশোভন হক বিদলের কাছে পড়তে পড়তে সবলে গেলেন ।

আমি স্যার । লাগলো ?

না ।—কি হচ্ছে ?

না, স্যার । দিতে পরিণি ।

—সাত আপ । টাকা দিয়ে বুঁজি রেজোয়ার খাবে আর সিনেবার যাবে ? মনসেপ ।

না, স্যার । বিদল তার প্রতিদ্বন্দ্বীর সাহসে আঁড় সোজা করে উঠে লাঁড়ালো । শক পলায় বদলে, মা হুজুর পল গুনছেন—বোনের পরণে কাপড় নেই । সিনেবা দেখবার টাকা কোথায় স্যার ?

তবে কী দিচ্ছ না কেন ?

টাকা পনের মাত্র আছে । তাতে তো কিছু হলো । এবার আমি আর পরীক্ষা দিতে পারবো না ।

What ? এবার সুশোভন হক বিদলের দিকে তাকালেন প্রশস্ত কপালে হুক চুলগুলো উঁকছে । যাবের জাবাটা ছেঁড়া—পরশে আবহলো হুঁত । অথচ আকর্ষ্য প্রতিভা-বীণ ললাটে । সুশোভন হক বানিকটা ডাকিয়ে রইলেন হুক হুঁতিতে । তারপর জিজ্ঞাসা করলে—

কত সর্ট ?

বিদল একটু হাসল—শুকনো নিয়ামন্দ হাসি । বললে, অনেক স্যার । আচ্ছা—আসি ।

শটপ—পরাতত অধ্যাপক এবার আর হার মানলেন না । শব্দ করে বিদলের কাঁচটা চুপে ধরলেন । অবাক বিশ্বরে কিয়ে তাকালো, অধ্যাপকের এ চোখ কখনো দেখেনি সে, এই গলাও মোরেনি কোন দিন ।

স্বা মাইনে পাওয়ার টাকাসবুলো পকেট থেকে বের করলেন সুশোভন হক । খান কয়েক মোট বিদলের হাতে গুলে দিলেন জোর করে । বললেন ; এতেই হবে যাবে নিশ্চয় । ব্যালান্সটা কেবল দিয়ে আবার ।

বিদল পাখর হয়ে লাড়িয়ে রইল । মনে হলো যেন স্বপ্ন দেখছে ।

অধ্যাপক গলা চাঁকিয়ে বললেন : তোমাকে বি, এসসিতে ভুলে দিতে পারলে আমিই বাঁচি । নইলে আবার ইন্টারমিডিয়েটে এসে বসবে আর আবার ল্যাগিয়ে যাবে । এত ত্রিসিরাষ্ট ছেলের এমন বদবুদ্ধি থাকে এ আমি কখনও জানতুম না । সো—সো—সো । একটু পরেই কান্ন কাউটার বহু হয়ে যাবে ।

বিদল আর অধ্যাপকের হুকের দিকে তাকাতে পারলো না । মনে হলো পাহাড়ের মতো কী বিরাট একটা হুঁত লাঁড়িয়ে আছে—তার সার্থ্য কি যে হাজার অলমাস দিয়েও তাকে একটু-কুও আঘাত করতে পারে ।

বিদল প্রশ্ন করবার জন্যে মাথা নামালো । কিন্তু পা আর হুঁকে পেল না—চোখের জলে হুঁকি কাপলা হয়ে গেছে ।



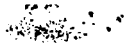
বনপথে

শিল্পী : বাদল ভট্টাচার্য



গ্রাম

শিল্পী : মুচাঁর, বান



কাব্য-জিজ্ঞাসা

হুম্মির মুখোশাখ্যার

সঙ্গীতেই সচেতন, তীক্ষ্ণসত্তি খরলিপি ছায়া
হৃদের পর্দায় স্থির, আচ্ছন্নিত্তে বিচিত্র সকল,
ঐক্যতান অরণ্যের, বধু-নন্দী হরিণের মায়া
দৃষ্টেই হৃঃসহ, দূরে দীর্ঘিকার হাতে ফুলফল।

সে চুল বাতাসে ওড়ে, নিঃশব্দে সমুখে দিনরাত।
হাওয়া দিলে এলোমেলো,

হাওয়া দিলে উধাও কান্নাস।

অক্লিষ্ট নরকেই খাতোক্তত শমনের হাত,
হাওয়া দিলে এলোমেলো, হাওয়া দেয় মাটির মানুষ।

অহনিশি হুম্মিরোতে খরচিত পৃথিবী নিজের।
আলোকের ওই ওঠে বিফারিত প্রথম কবিতা।
সঙ্গীতেই সচেতন খরচিত সে কবিই কেন,
দীর্ঘতর সে উন্মেষ সে-কবিই প্রথম সবিতা।

সঙ্গীতেই অমরতা, আর সব কালদণ্ড কুশ।

হাওয়া দিলে কীদে লোক, হাওয়া দেয় পৃথিবীর হৃৎ।

স্বনস্তনী

কক ধর

কথা বলে স্বনস্তনী, তোমার আয়ত চোখ তুলে
অঙ্ককার চেতনায় আনবে না আলোকিত কথা,
যে কথা অনিন্দ্যাবরে নাড়া দেবে হৃদয়ের মূলে
জীবনকে সংশ্লিষ্ট কিন্নু থেকে দেবে সার্থকতা।

বিচিত্র ধ্বনীর জাহ্ন অনাবাদিত আকুলতা
ছড়ালো বিম্বিত চোখে, প্রাণে লাগে অসহ্য পুলক
তোমাকে সম্পূর্ণ করে কবে দেবে এই বিশালতা
যে প্রেম বর্ণনে দেখে প্রতিবিম্ব নিজের অলক।

আমাকে নতুন করে তোমার আশ্চর্য আবিষ্কার
অবিখ্যাস মনে হয় : নিজেই বিম্বিত হয়ে দেখি
চকল স্রোতের জলে : যন কহে এ কী পুরস্কার
পেলে তুমি উপেক্ষিত, স্তব্ধেনিনী তুমি বলবে কী,
আলিঙ্গনে কেন বাঁধো, ওই চোখে আনো মাদকতা
নিজেই নিহত করে নবজন্ম দেবে সার্থকতা।

প্রাচীন ভারতবর্ষের
লবণ, স্যোডাশিফা ও
পটাস-চর্চা নিয়ে এ পর্যন্ত
অনেক আলোচনা হয়েছে।

এই সমস্ত বিষয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষের অবদানও আর
স্বল্প-অন্যকৃত। প্রাচীন ভারতে রসায়ন বিদ্যার চর্চা
সম্পর্কে গবেষণা, এ পর্যন্ত এ দেশে বা বিদেশে অতি
কমই হয়েছে। আচার্য প্রকৃষ্ণচন্দ্র রায় ১৯০০
খৃষ্টাব্দে A History of Hindu Chemistry-র প্রথম খণ্ড
এবং ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করে এই বিষয়ে
আলোচনার দৃষ্টান্ত করেন।

History of Hindu Chemistry-র প্রথম
খণ্ডে ভারতীয় রসায়নী বিদ্যার উদ্ভবের কাল
নির্দেশ করা হয়েছিল রাসন শতাব্দীতে, দ্বিতীয়খণ্ডে
আচার্য প্রকৃষ্ণচন্দ্র নিজেই সে সময়ে আরো কয়েক শতাব্দী
পিছিয়ে দিয়েছেন। এর কল-ও কিছু ভারতীয় রসায়ন
বিদ্যার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে প্রকৃত গভীর জ্ঞান মেলে নি।
প্রকৃত ব্যাখ্যা হল, ভারতে রসায়ন চর্চার সূত্রপাত—কয়েক
সহস্র বছর আধেকের ঘটনা।

অ্যালকেমি থেকে কেমিস্ট্রি উৎপত্তি হয়েছিল
ইউরোপে কিছু ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্য রকম।
অ্যালকেমি বা স্বেচ্ছবিদ্যার চর্চা এ দেশে ছিল না এমন নয়।
পৃথিবীর কোন কোন বোহ ধর্ম প্রাচীনকালে অ্যালকেমির
প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে পারেনি। সব দেশেই
অ্যালকেমির মূল প্রেরণা হল মৃত্যু। প্রথমটি হল অমরত্ব
লাভ এবং দ্বিতীয়টি হল অমর সম্পদের অধিকারী হওয়া।
মানব-জীবনের এই দুটি পান্থত কামনাই প্রতি দেশের
অ্যালকেমি চর্চার মূলে রয়েছে। ওদেশে যেমন Elixir of
Life-র উদ্ভাবন প্রচলিত দেখা যায়, এদেশে তেমনি দেখা যায়
‘মৃত শরীরবানী’র প্রচেষ্টা। অন্যতম সম্পদের অধিকারী
হওয়ার জন্য কৃত্রিম স্বর্ণ নির্মাণই হল সব চেয়ে প্রথম
পথ। মৃত্যু পান্থত আত্মাঙ্গাকে অবলম্বন করে সব
দেশের অ্যালকেমিষ্টরা ঐ একই কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন।
তা হলেও ইউরোপের সঙ্গে এই মৃত্যু বিষয়ে ভারতের
পার্থক্য আছে। সব চেয়ে বড় পার্থক্য হল, ভারতীয়দের

ভারতীয় রসায়নচর্চার ইতিহাস

হরপ্রসাদ দ্বীপসংগ্রহ

আধ্যাত্মিক চেতনা প্রযুক্তির
অর্থব্যয় অমরত্ব লাভের পক্ষে
অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
যেহে, মৃত্যু, নির্বাণ

প্রভৃতি সমস্ত ধার্মবাদগুণি চিন্তার, হওয়ার বিশপেক যার।
পার্থিব অমরত্ব লাভ অপেক্ষা যেকোনোই সে যুগের
ভারতীয়দের কাছে কাম্য ছিল। তা হাড়া পীড়া
প্রভৃতিতে যেভাবে আল্লার অমরত্ব ঘোষিত হয়েছে
ভারতের জাতি বাসগুন দেখতে চিরস্থায়ী করতেও যু-
বোধী আশ্রয় বোধনয় ক-সেবাগীর ছিল না। কমান্ডরবতে
বিশ্বাসের চেতন দিয়ে তাদের অমরত্বলাভের পান্থত
কামনা অনেক পরিমাণে পরিত্যক্ত হত, সে বিষয়ে
সন্দেহ নেই।

অন্য দেশের অ্যালকেমিষ্টদের সঙ্গে ভারতীয়
অ্যালকেমিষ্টদের দ্বিতীয় পার্থক্য হল : ভারতীয়
অ্যালকেমিষ্টরা দাবী করেছেন তারা রাসায়নিক পদ্ধতিতে
কৃত্রিম স্বর্ণ নির্মাণ করতে পারেন। এবং তাদের পদ্ধতি
অনুসারে যে কেহই এই বিদ্যা আয়ত্ত করতে পারেন
ওদেশের সঙ্গে এ ব্যাপারে এটাই হল মূল পার্থক্য
ওদেশে যারা অ্যালকেমি-বিদ্যার চর্চা করেছেন, তাদের
কেউই বাস্পবাস্তবী অস্ত্রের উদ্দেশ্যে কৃত্রিম স্বর্ণ
নির্মাণ পদ্ধতি জ্ঞাত করান নি। অর্থব্যয় গুণ্ঠিত্বা
বাইরে এটাকে প্রকাশ্য জ্ঞানের মর্যাদা তারা দেন নি।

এক কথায় আদি বলতে চাই, অ্যালকেমি খেত
ভারতে কেমিস্ট্রি উৎপত্তি হয়নি।

ভারতে অ্যালকেমির চর্চা তত না হয়েছে রাসায়নিক
বিদ্যা বা কেমিস্ট্রি চর্চা হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী
এবং এই রসায়ন বিদ্যা গড়ে উঠেছিল পুরোপুরি
বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে। এ দেশের চিকিৎসাশাস্ত্রা ও
রসায়ন একে অপরের সহায়ক হিসাবে গড়ে উঠেছিল
প্রথম থেকেই—এ কথা বললে একটুও অত্যুক্তি
করা হবে না।

অতি প্রাচীন যুগ থেকেই ভারতীয় চিকিৎসা বিদ
প্রধান চাষিগণি বাতে বিভক্ত হয়ে যায় : ১) পারদ
বাছু ২) উত্তম উৎকর্ষ ৩) মন্থতত্ত্ব, কাজ কর

চুক্তাক এবং ৪) পল্য বিদ্যা। এর মধ্যে দ্বিতীয় বিভাগ অর্থাৎ উচ্চতর ঔষধশাস্ত্রের (ডেন্স) মধ্যে আধুনিক যুগের লোকেরা দরাজিক পরিচিত। কিন্তু, তা থেকে এ সিদ্ধান্ত করা চলে না যে, দ্বিতীয় বিভাগটি সর্বাধিক প্রাচীন অথবা সর্বাধিক নবীন।

চরক এবং সুশ্রুতকে আবারের দেশের কোন কোন বন্যী চিকিৎসা বিদ্যার জনক বলে মনে করে থাকেন। এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য তাঁদের জনপ্রিয়তা যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত হয়ে এ যুগে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু, তাদেরকেই প্রাচীনতম চিকিৎসা-বিজ্ঞানী বলে জানলে ভুল করা হবে।

‘হিগ্‌ল রসায়নী বিদ্যা’ গ্রন্থে আচার্য প্রক্লুচর দাস চরককে বৃহৎ পূর্ব-যুগের লোক বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

চরক সংহিতাকার যে সময়েই জন্ম গ্রহণ করে থাকুন না কেন, তাকে কিন্তু কোন ক্রমেই প্রথম চিকিৎসা-শাস্ত্র-প্রণেতা বলা যায় না। চরক প্রক্লুচর একজন সংকলন কর্তা। চরকের পূর্ববর্তী কয়েকজন চিকিৎসা-বিজ্ঞানী অর্থাৎ অগ্নিবিশ, স্বাধিপানি, জাতুকর্ণ, পরাশর, ভেল এবং হারীতের রচনার উল্লেখ চরক করেছেন। একখানি ভেল সংহিতার আবিষ্কার নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে দিয়েছে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দ্বিতীয় শাখার ক্ষেত্রেও চরকই প্রথম ঐতিহাসিক চরিত্র মন।

চরক সংহিতার পাঠ্যমাত্রই অবগত আছেন যে এটির কোন ব্যক্তি-বিশেষের মূল রচনা হওয়ার সম্ভাবনা অপেক্ষা একটি সম্মেলনের বিবরণী হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। আচার্য প্রক্লুচর চরককে বৃহৎ পূর্ববর্তী বলে মনে করেছেন। নির্দিষ্ট ভাবে মন আনিব নির্দেশ না করলেও চরক যে অতীতকে ‘বৃহৎপূর্ব’ গভীর শতকের লোক আচার্য দাস তা ঘোষণা করেছেন। চরক আরো পূর্ববর্তীও হতে পারেন। সে খাই হোক, চরকপূর্ববর্তী হারীত, ভেল, পরাশর, জাতুকর্ণ, স্বাধিপানি ও অগ্নিবিশ প্রমুখ দিকপাল চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের (উচ্চতর স্বাস্থ্যবিদ) অভিজ্ঞ কি এই কথাই ঘোষণা করে না যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই শাখাটির মূল্যপাত বৃষ্টি জন্মাবার দুঃখাবার বহু পূর্বেই হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়।

চরকের পূর্ববর্তী সুশ্রুত। সম্ভবত চরক শতাব্দী পরের। চরক এবং সুশ্রুত উভয়ের কেউই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রথম শাখা (বাহু) বিদ্যা ও পাল্য) সম্পর্কে আলোচনা করেন নি। চরক ও সুশ্রুত উভয়েই ঐবং রায়ান, এবং সুশ্রুত বিশেষভাবে পল্য বিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা করে গেছেন। কিন্তু, তা সত্ত্বেও এ কথা মনে করার কারণ নেই যে ওরা বাতুজ ও বনিবনের ঔষধিক প্রয়োগ সম্পর্কে একবারে অজ্ঞ ছিলেন। ঔষধে বাতু ও আকরের প্রয়োগ সম্পর্কে উভয়েরই যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। চরকে অবশ্য কোথাও পারদের উল্লেখ নেই কিন্তু সুশ্রুতে তাও আছে। তার চেয়ে বড় ঘটনা ভেল সংহিতার (যা কিছুকাল মাত্র আগে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং চরক ও সুশ্রুত উভয়েই তার কাজে কণা) ব্যতন ঔষধের ব্যবহার উল্লিখিত আছে।

মাত্রা কারণে, বিশেষত উচ্চতর ঔষধের প্রক্লুতীকরণে মূল্য হয় এবং মূল্য জন্মের জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে এই শাখাটিই বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু, অন্য শাখাগুলি কোন সময়েই একেবারে লুপ্ত হয়ে বাগিন।

ভেল, চরক, সুশ্রুত এরা কেউই বাতব রায়ান বিজ্ঞানের চিকিৎসক ছিলেন না, তা সত্ত্বেও এরা বাতুর ব্যবহারের উল্লেখ করে গেছেন। তাঁদের স্বস্বাধিককালে বাতব রায়ানের (metallic chemistry) যথেষ্ট চর্চা না থাকলে ঔষধে বাতু ব্যবহারের এ রকম পর্বাপ্ত উল্লেখ (Ready Reference) কখনই সম্ভব নয়।

ভারতীয় রসায়ন বিদ্যার এই ইতিহাস যদি সংগ্রহ করতে হয় তবে পুরাতন এবং আদর্শবোধের সুশ্রুতের পুঁথিপুঁথির পর্যালোচন হওয়া হাজা গতি নেই। রসায়নসমূহ গ্রন্থে রাসায়নিক ও রসায়ন শাস্ত্রকারদের মাঝে এক সুদৃঢ় বায়বাহিক তালিকা রয়েছে। এখানকার বাসডট সাতাশজন রাসায়নিক (সিড) এবং রসায়ন প্রণেতার নাম করেছেন। এই নামগুলি হল :

১। আদির ২। চন্দ্রসেন ৩। লক্ষ্যাবশিট
৪। বাব ৫। লক্ষেশ্বর বাতক রাসচন্দ্র ৬। কপালী ৭।
৮। বাতু ৮। ভাতর ৯। পূর্বসেন ১০। হরকোণ

২৪ ফিট দীর্ঘ, নীচের দিকের ব্যাসের পরিমাণ ১৬'৪ ইঞ্চি জন্মে সড় হয়ে উপরে উঠে গেছে। একেবারে উপরে এটির ব্যাস ১২ ইঞ্চি। শীর্ষদেশে ৩ ফুট ৬ ইঞ্চি অংশে কার্যকর্য কোশিত হয়েছে। তন্তুটির আনুমানিক ওজন হল প্রায় ১৬০ মন। পরীক্ষা করে দেখা গেছে তন্তুটি নির্মাণে কোন প্রকার অ্যালয় (Alloy) ব্যবহৃত হয় নি। বিশুদ্ধ লোহা বনি থেকে সংগ্রহ করা অদম্ভব ব্যাশার। Hadfield পরীক্ষা করে দেখেছেন বিশুদ্ধ লোহার আনৈমিক গুরুত্বের (৭'৮০) প্রায় কাছাকাছি এটির আনৈমিক গুরুত্ব (৭'৮১)। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এর শতকরা ৯৯'৭২ ভাগ লোহা, কার্বন ০'০৮ ভাগ সিলিকন, ০'৮৬ ভাগ, গন্ধক ০'০০৬, কসকরাস ০'১১৪ ভাগ এবং ম্যাঙ্গানিজ নেই। ম্যাঙ্গানিজের অভিরূই নেই, এটা ব্যবহার্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যাশার। তাছাড়া গন্ধকের অভিরূও প্রায় নেই বলসেই চলে। আনুমানিক রাসায়নিকের মতে, এই ঘটনাদ্বারা তখনই সম্ভব যদি কার্ভুরলার অল্প অল্পমুদে (!) এটির নির্মাণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এর পরের প্রশ্ন হল, লোহার পরিপূর্ণ কণ। বনি থেকে এত পৃথক লোহা পাওয়া সম্ভব নয়, তবে কেনন করে এটির নির্মাণ কার্য সম্ভব হল ?

সবচেয়ে বড় কথা স্বরাষ্ট্রাতীত কাল থেকে উদ্ভূত পরিবেশে বাক্য সন্তোঃ এটিতে বিশ্বাস্য মরতে হয়েনি। মরতে-বিহীন পৌরুষ উপাভার মত এটি চির অজ্ঞান। ম্যাঙ্গানিজ, কার্বন এবং গন্ধকের প্রায় অদৃশ্যবিত্ত এবং তুলনায় কসকরাসের অতিদ্রুত উপস্থিতি মরতে না বরায় পক্ষে কিছুটা সমায়তা করেছে সন্তোঃ নেই, কিন্তু এটা কখনই শেষ কথা নয়। এটি একমাত্র তখনই সম্ভব হতে পারে যদি সম্পূর্ণ তন্তুটির উপরে ত্রুটি পাতলা হাসপেটিক অতাইত দ্বারা আঘাত থাকে। তন্তুটি নির্মাণে এই কৌশল অবলম্বিত হয়েছিল। উত্তর লোহাকে বারবার বিভিন্ন লবণ (সল্ট)-কার (alkali) ও উইব-পদার্থ (organic substance) ভবিষ্যে মরতে প্রতিরোধ করার কৌশল ভারতীয় রাসায়নিকরা জানতেন।

বিদ্যেজ্ঞরা বলেছেন, এ তন্তুটি হল ভারতীয় হাতব বিদ্যা ও ভারতীয় স্রমিকের ইঞ্জিনীয়ারিং দক্ষতার অন্তর্লবীয় নিদর্শন। তারা অনুমান করেছেন, অজুত

৩২শি বিস্তৃত অংশ (প্রতিটি অংশের ওজন আনুমানিক আধ মন) ওয়েস্টিংহাউসের সাহায্যে জুড়ে এই তন্তুটি নির্মাণ করা হয়েছে। তন্তুটির মাঝে ওয়েস্টিংহাউস কোন চিহ্ন নেই, তবু ভারতের এরকম অনুবাদের কারণ হল, "সেই আদিমুদ্রের চমুদ্রাৎ একসঙ্গে এত বড় তন্তু নির্মাণ এক অদম্ভব ব্যাপার।"

ভারতের এই মর্যাদাই হল প্রাচীন ভারতের ইঞ্জিনীয়ারিং, হাতব বিদ্যা তথা হলায়ন বিদ্যার উৎকর্ষের সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি।

বাগডট রাসায়নিক হিসেবে এরপর নাম উল্লেখ করেছেন লক্ষ্মেশ্বর রাবণ এবং লক্ষ্মেশ্বর হাতব রামচন্দ্রের। এ দুটি নামের উল্লেখ সাধারণ পাঠকের কাছে কিছুটা বিভ্রান্তিকর বলে যোগ হতে পারে। মনে হতে পারে, বাগডট অবতার রামচন্দ্রকে লবঙ্গুপাখিত রূপে চিত্রিত করার জন্যই সম্ভবত রামচন্দ্রের নাম উল্লেখ করেছেন। এর উত্তরে বলা যেতে পারে, ভারতীয় পুরাণ বা মহাকাব্যে একমাত্র রামচন্দ্রই অবতার রূপে কীর্তিত মন। আরও অনেক অবতার রয়েছে। তাদের কেউই বাগডটের দ্বারা রাসায়নিকরূপে (শিড) বর্ণিত মন এমন কি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও মন।

রামায়ণ ও মহাভারত, উভয়ই কাব্য এবং এর কাহিনী বহুদূরদেশে প্রসারিত হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ সন্তোঃ একথা মানতেই হবে, বত প্রসারিতই হোক না কেন, রামায়ণ এবং মহাভারতের কেন্দ্রীয় দুটি ঘটনা, অর্থাৎ লক্ষ্মণ-বিব্রয় এবং সুগন্ধকের মর্দ, ঐতিহাসিকভাবেও সত্য।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র বসুদ্বার এবং এ, ডি, পুনশকার সম্পাদিত গ্রন্থে আনুমানিক বৎ পূর্ব ১৪০০ অব্দকে ভারত যুদ্ধের কাল বলে নির্দেশ করা হয়েছে এবং ভারতের মতে লক্ষ্মণবিব্রয় ঘটছিল আরো কয়েক বছর আগে, অর্থাৎ অজুতপক্ষে বসুদ্বার ১৪৫০ অব্দের পরে মর। 'পুরাণপ্রবন্ধ' গ্রন্থে শ্রীপরীক্ষিতের বদ্ ১৪:৩ বৎ পূর্বাব্দকে ভারত যুদ্ধের কাল রূপে নির্দিষ্ট করেছেন এবং রামচন্দ্রের অমকাল রূপে বৎ পূর্ব ২১১৪ অব্দ নির্দিষ্ট হয়েছে।

রাবণ বা রামের অম সব সম্পর্কে কিছু বতভেদের

অবকাশ থাকলেও তাদের উদ্ভবেই যে আদ্যাত্মিক রাসায়নিক ছিলেন এ বিষয়ে বিশদভাবে সংকলনের অবকাশ নেই। আত্মবৈশিষ্ট্য এবং সে সব ঐক্য বোধস্বত্ব হতে তার অনেকগুলির উদ্ভাবক রূপ। তা ছাড়া ঐক্যের প্রথম ধাতুর ব্যবহার রূপের অতুল কীর্তি। পারদের প্রয়োগও সবপ্রথম রূপই করেছেন। 'সর্বদাম্পন বোধক' নামে আত্মবৈশিষ্ট্যকে যে উদ্ভেদকটির প্রচলন আনতে হয়েছে রূপই গৈতির উদ্ভাবন কর্তা। গন্ধক, পারদ এবং অম্ল সহযোগে এই ঐক্যটি প্রকৃত রূপ। প্রত্যাপ লক্ষ্যের রূপ লক্ষ্যাবিশেষের রূপ প্রকৃতি বহুভাষ্যত আত্মবৈশিষ্ট্য ঐক্যবন্ধুগির ও আবিষ্কর্তা রূপ। এই ঐক্যবন্ধুগির প্রত্যেকটিতে জ্ঞানীকৃত পারদ, অম্ল, গন্ধক ব্যক্তি হইবে। কোন কোন ঐক্যে হরিতাল ও ক্রান্তিলার ব্যবহারও দেখা যায়। রূপ যে শুধু পারদের ব্যবহার জ্ঞানভেদে তাই নয়, পারদ ভিন্ন কণা পদ্ধতিও অঙ্গীত ছিলেন। এই ঐক্যবন্ধুগির কৃষ্ণগোপ নিরাময়ক। তাদের করাল গ্রাস অতিক্রম করে রূপের একরূপ বই আনতে চেষ্টা করিতে। বইখানির নাম অকপ্রকাশ। অকপ্রকাশে কিরিপ্পি রোসের উল্লেখ দেখে বইখানি অনেকেরই অঙ্গীত বসে সিদ্ধান্ত করেছেন।

আত্মবৈশিষ্ট্য ব্যাপার, এ দুয়ের অনেকেরই মনে করে থাকেন, সিকিপিদ বা কিরিপ্পি গোপটি ইউরোপীয়দের আবিষ্কার। প্রকৃত ব্যাপার হল, 'সিকিপিদ' অর্থাৎ ভারতবর্ষে প্রাপ্ত রোগ নামে পরিচিত ছিল (প্রায় অল্প রোগ)। চরক এবং অন্যায় কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থে সিকিপিসের উল্লেখ নেই কিন্তু গঙ্গোত্রী বা উপত্যকের উল্লেখ আছে।

চরকাই গ্রন্থে সিকিপিস রোগের উল্লেখ বা ব্যাক্য একটি সম্ভাব্য কাল রয়েছে। সে কারণটি হল, চিকিৎসাবিজ্ঞানের যে চারটি বিভাগের উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি, তার মধ্যে বিতী অর্থাৎ ভেষজ চিকিৎসায় ছিলল রোগ এবং উপশয় রোগ উপশয়ে অন্য একই চিকিৎসা বিধি অনুসৃত হত। তাছাড়া সিকিপিস ও গঙ্গোত্রীর মধ্যে ঔষধি ও সংক্রমণ ইত্যাদি ব্যাপার কতগুলি ব্যাপার একই পাকার হুটি নামের ব্যবহার করে লুপ্ত হয়ে আসে এবং উপশয় নামে উভয়-ব্যাপার

পরিচিত হতে থাকে। কিন্তু অন্য নামটি একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি। পূর্বে অকপ্রকাশে বন্য 'আত্মপ্রকাশ', (বা সন্দেহাতীত ভাবে প্রাক-ইউরোপীয় যুগে গঠিত, তাহলেও এই রোগের উল্লেখ আছে।

ডক্টর বাতিরের দ্বি বহুও নেওয়া যায়, সিকিপিস রোগ ইউরোপ থেকে আবিষ্কারী, তা হলে প্রথম থাকে, ঐ রোগের নাম কিরিপ্পি রোগ হবে কেন। ইউরোপীয়দের মধ্যে পূর্বে ফ্রেন্স বা ক্রান্তিলাই প্রথমে এসেছে কিরিপ্পি নামে খ্যাত হয়েছিল। অনেক পরে পশ্চিমা অংশ বিজ্ঞান হতে, তখন ইউরোপীয় মাঝেই কিরিপ্পি বলা হয়। ক্রান্তিলাই প্রথমে ভারতে আসেন। পশ্চিমী ও ইউরোপীয় এসেছে অনেক আগে এবং প্রচুর সংখ্যায় এসেছে এবং তাদের মধ্যে সিকিপিস রোগও বহুশি পরিচিন্তে ছিল কিন্তু তাদের নামে নামকরণ হলো না কেন রোগটির? হতভাগ্য ক্রান্তিলাই কেন অবিদ্বাক হল? এর চেয়ে একথা মনে করা কি অনেক সহজ নয়, প্রিয়ল রোগটি চলতি উচ্চারণে বিশেষ করে ইউরোপীয়দের এসেছে আবার পর (যাদের মধ্যে কিরিপ্পি বা ফ্রেন্সাইও হয়েছে) তাদের মধ্যে ঐ রোগের প্রাচুর্যের দেখে এবং প্রিয়ল ও কিরিপ্পি পদ দুটির ধ্বনি-সাম্যতার জন্য প্রিয়ল কথাটি কিরিপ্পিতে রূপান্তরিত হয়েছে। অশিক্ষিত অনুলেখনে। (Copiest) পূর্বেও এটি ঘটে থাকতে পারে।

যেটি কথা, যথার্থের ভারতে রাখা মোটেই বর্ণিত ছিলেন না এবং নিম্নের নাম সোপন করে রূপের নামে পুস্তক প্রণয়নে সে যুগে সাদানাই লাভের সম্ভাবনা যদি না রাসায়নিক হিসাবে রূপের খ্যাতি থাকে।

ভারতীয় রসায়ন গগনে এক উজ্জলতম জ্যোতিষ্ক হলেন অবোধ্যাপতি বনরথ পুত্র শ্রীরাঘবপুত্র। চোখ বন্ধ স্নেহবাস্যে ইচ্ছাকৃতের হৃদয়ের কাছে তার রসায়ন খাচ্ছে সীকা। তঁরাই এর নামকরণ করেছিলেন দণ্ডকনাথ বা দণ্ডকারণের অর্থশ্বর। এইখানেই ভিঃ রসায়ন ও ক্ষেত্রিকার শিক্ত হন। যাদের কাছে ভিঃ শিক্ষাদাত্ব করেন তাদের মধ্যে প্রধান দুজন হলেন শিঃ কালদাস ও শিঃ লক্ষ্মীনাথ। 'শিঃ' পদটির অর্থ পুত্র, যোগী নয়, রাসায়নিকও হটে। এই রাসায়নিক-রাসায়নিক শব্দেই অর্থবোধ 'রাসায়নিক' প্রযোজ্য।

প্রাচীন হিন্দু রসায়ন বিদ্যার অবিকারনীয় এই গ্রন্থানির অঙ্গন। বৈখানির মৌলিকতা ও স্ফুটতা সম্পর্কে বিস্ময়াভ্যাস সংস্কারের অবকাশ নেই। বাগ্যভূষণের 'রসরসাকর' গ্রন্থে গ্রন্থানির অনেক প্রাচীন। 'রাসরসাকর' গ্রন্থানির রসসংগ্রহে পণ্ডিতভাবে বলা হয়েছে, যিনি কালনাথ ও লক্ষ্মীপতির কাছে রসবিদ্যা শিখা করেছেন সেই স্বর্গবৎ সন্তোষ প্রদায়ক রসের অমোঘ্যাপিত রাসরস এই গ্রন্থের স্ফুটতা। এই গ্রন্থেরই অন্যতম রয়েছে "নিম্নকৃত স্বর্গবৎ রচিত পদ্যোক্তিঃ"।

রাসরসেও এই স্বর্গবৎ শীতা নির্বানের কাহিনী পাওয়া যায়। 'রাসরসাকর' গ্রন্থে স্বর্গবৎ নিম্নকৃত, পরিপূর্ণিকরণ প্রভৃতির বিবরণ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এর আসে কোন কোন গ্রন্থে স্বর্গবৎ উল্লেখ আছে কিন্তু যিনি থেকে নিম্নকৃত স্বর্গ বা হাতু পরিপূর্ণিকরণের আলোচনা নেই। এই রাসরসই আর একখানি বিখ্যাত রাসায়নিক গ্রন্থ 'রসেশ্বচিভাষ্য' প্রণেতা। আচার্য প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থ বৈখানির স্ফুটতায় এক অজ্ঞাত কুলপাল চন্দ্রকম্বাধিকারকে সন্মানিত করেছেন। কিন্তু কে এই চন্দ্রকম্বা? ভারতীয় ইতিহাসে, পুঁরানে, কাব্যে, রসায়নে ইতিহাসে কোথাও কি তার সাক্ষ্য মেলে? কোন পরিচয়, বিস্ময়াভ্যাস নানাবিধ পদ্য কি পাওয়া যায় কোনখানে? রসেশ্বচিভাষ্যের নত গ্রন্থ এক অকল্পনীয় প্রতিভার স্বাক্ষর। তার দ্বারা আলোক সামান্য প্রতিভা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃতির অভাবে তলিয়ে গেলে—এও কি সম্ভব? ভারতবাসী জাতি হিসাবে আত্মবিস্মৃতি কিন্তু তাদেরও ইতিহাসে একজন আর বিত্তীয় একটি বহীষের আছে কি?

কর্তৃকল্পনার প্রায় না নিয়ে একটু বোধবুদ্ধি বন এবং চোখ নিয়ে দেখলে স্বচ্ছন্দেই বোকা যায় সামান্য লিপি প্রণেতা এভাবে বিব্রত হওয়া অযৌক্তিক। লিপিকরের প্রায়বস্ত তার সম্ভবীত প্যুতলিপিতে লুক্কায়িত চন্দ্রকম্বা হয়েছেন। এ রসের ঘটনা প্রায় সমস্ত প্রাচীন পুঁরিতেই ঘটেছে। তাছাড়া চন্দ্রকম্বা বা রাসরস 'রসেশ্বচিভাষ্য'তে নিম্নে কালনাথের শিবা বলে পরিচিত করেছেন। রাসরস এবং লুক্কায়িত

বা চন্দ্রকম্বা একই ব্যক্তি—এতগুলি প্রমাণের পর এ ধারী করা নিম্নই অসম্ভব হবে না।

রসেশ্বচিভাষ্যে নিম্নে বাগ্যভূষণ নিত্যনাথ প্রভৃতি অশেষকৃত আধুনিক রাসায়নিকদের নানাবিধ লেখ বইটির অধীনস্থ সম্পর্কে অনেক বিবরণ দিচ্ছেন। কিন্তু একজন হুত পিত্ত রোগের অকৃত্য। গ্রন্থানির যিকে এটুকু বনোবোশ হিসেবে দেখা যাবে এই গ্রন্থানির প্রকৃতপক্ষে রসের লেখকের রসায়ন স্বাক্ষর বহন করেছে। একজন মূল লেখক, অপরজন ভাষ্যকার। রসের স্ফুটতা যিনি, তিনি আয়োজিত রসে রচনা করে গেছেন। আর ব্যাখ্যাকার সর্বত্র রস ব্যবহার করেছেন। স্লোক গুলির ভাষা অতি প্রাচীন। স্লোকের কোন অংশে বাগ্যভূষণ নিত্যনাথ প্রভৃতির উল্লেখ নেই। ব্যাখ্যাকার যখন বলেছেন তখনই ঐ স্ব নাম পাওয়া যাচ্ছে। আচার্য রাসরস পাণ্ডুলিপিখানি একজন রাস লেখকের বলে ধরে নেওয়াতেই এই বিপত্তির উৎপত্তি ঘটেছে। বাগ্যভূষণ নিত্যনাথ এমন কি চক্রপাণির নানাবিধ লেখক স্বর্গ স্বাক্ষরিক ভাবেই এনে হন বৈখানি চন্দ্রকম্বা নতনের পুঁরী রচিত নয়। কিন্তু স্লোকগুলির ভাষা রচনাগীতি ছাড়াও বহুল বিবরণ বিশ্লেষণ করলে বোকা যায়, রসেশ্বচিভাষ্য নিম্নকৃত পুঁরীপাণ ও এত প্রাচীন আর যিহীন কোন গ্রন্থ এ ব্যাপ পুঁরীপাণী পৌঁছানি। গ্রন্থের মধ্যেও তার প্রমাণ রয়েছে : রসেশ্বচিভাষ্যে নিম্নবর্ণিত লৌহের উল্লেখ আছে। এই নয় প্রকারের লৌহ আর আর পুঁরীপাণী পাওয়া যায় না। পরবর্তী কালের রসায়ন গ্রন্থে তিন ধরনের লৌহের উল্লেখ রয়েছে।

পূর্ণ থেকে সত্তম পুঁরীপাণী বাগ্যভূষণ করেছেন তাদের মধ্যে এক পুঁরীপাণী আর সকলের সম্পর্কেই আবারের জ্ঞান সামান্য।

কপালী ছিলেন রসায়ন-বহাধি গ্রন্থের প্রণেতা। গ্রন্থানি এ পুঁরীপাণী পাওয়া যায় না। নিম্ন নিত্যনাথের 'রসরসাকর' গ্রন্থে ঐ গ্রন্থের উল্লেখ আছে। নিত্যনাথ 'স্বর্গ' বৈখানি কপালীর রসায়নীয় সহায়তা গ্রহণের কথা স্বীকার করেছেন।

নত সম্পর্কে কিন্তুই জানা যায় না।

হাওয়া যে একজন উচ্চতরের রাসায়নিক ছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর অবশ্য কোন রচনাই এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। পুরাণে দূর্গাধরের সভা-বৈদ্য হাওয়ায় নামোল্লেখ আছে। উক্তরেই যদি একই ব্যক্তি হন, তবে মোটামুটিভাবে তার অবস্থানকাল ভারত যুগের (খ্রিঃ পূঃ ১৪১৬ অব্দ) সম্ভাবনিক হয়ে দাঁড়ায়। দূর্গাধরের সভাবৈদ্য হোদ বা না হোদ হাওয়া যে নাগালঙ্কনের পূর্ববর্তী তা নিশ্চিতভাবেই জানা গেছে। নাগালঙ্কন তাঁর রসরসাকর গ্রন্থে হাওয়ায় কয়ে কতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন।

ভাস্কর রসেশ্বভাস্কর গ্রন্থের প্রণেতা। তার সম্পর্কে পূর্ব এইটুকুই জানা যায়। রসেশ্ব ভাস্কর গ্রন্থখানি কোথায় পাওয়া যায়নি।

রত্নকোষ সম্পর্কেও কিছু জানা যায় নি। রসরসাকরে নাগালঙ্কন পিণ্ড রত্নকোষের উল্লেখ আছে, রত্নকোষ ও রত্নকোষ এক ব্যক্তি নন।

ভালিকায় বাগ্‌ভট ঘোষের ধারণ থেকে যোক্তন স্থান দিবেহেন তাদের সম্পর্কেও কিছু জানা যায় না। সত্ত্বশ

অর্থীং ব্যাখ্যা সম্পর্কে এইটুকু হাত জানা যায় যে, যদি হুজা রত্ন প্রভৃতি বিষয়ে তার গবেষণা সীমাবদ্ধ ছিল। এই নামে একজন ঠাকুরপিত্ত ও প্রাচীন ভারতে ছিলেন। তিনি এবং এই রাসায়নিক অন্তর ব্যক্তি কি না বলা কঠিন।

কালানুক্রমিক বিচারে শস্ত্রকে বাগভট একাধিকতর এবং নাগালঙ্কনকে অষ্টাদশতম বলে উল্লেখ করেছেন। তবে এই দুজনের আলোচনা একত্রে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এরা দুজনেই ছিলেন স্কিপাল রাসায়নিক। নাগালঙ্কন কোন ক্রমেই খুঁট পূর্ববর্তীর শতকের পরবর্তী নন এবং শস্ত্র সম্ভবত নাগালঙ্কন অপেক্ষা আটপ বছরের প্রাচীন।

এদের দুজনের গ্রন্থই কালোচ্ছিন্ন হয়ে আবারের মধ্যে পৌঁছেছে। ভারতের রসায়ন চর্চায় দুর্বলত্ব বলি যদি কিছু থেকে থাকে সে হল শস্ত্র এবং নাগালঙ্কনের অব্যবহৃতী হওয়া। প্রাগৈতিহাসিক যুগের চাকচাক প্রণীত রসেশ্বভাস্কর ও রাসায়নিক এই দুখানি বাদ দিলে শস্ত্র বিরচিত 'রসায়ন' এবং নাগালঙ্কন রচিত 'রসরসাকর'ের তুল্য গ্রন্থের ভারতীয় রসায়নে আর নেই।



ଦୃଶ୍ୟ, ଦୃଶ୍ୟାନ୍ତର



ଚିତ୍ରସୂକ୍ତନ ଶୋଷ

দুঃখ। একটা নয়। বহু। অগাধ। পুরো নয় কোনটা। হেঁজা-হেঁজা। কাটা কাটা। বেপানো। কানো। পাকানো। তৃপ্ত। একটা পুরো কোটবার আগেই আর একটা দূর হয়ে যায়। দৈত্যিক আয়ু ধীর নয়। একটার সঙ্গে আর একটার মিল নেই। বহু ক্ষেত্রে বিয়োগ আছে। বর্ষের ছুটি কাগজের লাট খেন। 'দুঃখগুলো, সম্মতি এই বা পার্থক্য। শেষের মন।

আধুনিক মানুষের মন এই। অসন্ত শেষের ভাই বলে করে। এটা মনে করে সে সত্যতা পায়, সে একা নয়। হয়তো ঘটনাক্রমে সে একটু বেশি 'আধুনিক' হয়ে গেছে। কলে নিজের মনের একমাত্র উপমা সে খুঁজে পায় কোন কোন আধুনিক ছবিতে। ক্রান্তির ওপর আঁকা অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন ছবি ভেঙ্গে তার বিবন টুকরোগুলোকে কে যেন এলোপাখাড়ি ভাবে জুড়ে দিয়েছে। শেষের ভাবে, একটু উলটে বলা হোলো কথাটা। ছবির মত নয় নয়। আঙ্গুরে মনের প্রতিরূপ ছবি। কারণ মন থেকেই ছবির জন্ম। শেষের মাঝে মাঝে আকর্ষণ, শব্দ, পিকাসোও এর থেকে নৃত্তি পান নি, বর্ষও তিনি মনের দিক থেকে একটি সংহত মতবাদে বিশ্বাসী।

আজ আরো বিশেষ করে তারগুলো ছুটি পাকিয়ে গেছে মনের গহ্বরে। ভাস-লাগা মন-লাগার তার। ভট-পাকানো তার থেকে গেছে—কী এক লব্ধ ত্রিভুজ গাণো। কত দুঃখ, কত মূর্খ, কত কথা। টোপন, মূর্খ, চন্দ্রনা, কাতি, দুঃখের, পাটের কোঁসো-ওড়া রাত্তা, বহুব্রহ্ম ইউনিয়ন, রমজান আলী, দুঃখের।

দুঃখের আর রমজানকে সে বলে এসেছে যে সে আজ আসতে পারবে না। আজ তার ছুটি। বর্ষও এ কাজ শেষে, প্রাক-স্বাধীনতা দুঃখের ছাত্র আন্দোলনের উত্তরণ মূর্ত্ত্বকে অতিক্রম করার পর থেকে এই পাট কলটির মত ইউনিয়নের স্বাভাবিক সংগঠনকর্মী সে, তবু ছুটি পেতে, এ কাজ থেকে ছুটি পেতেও শেষের ভাল লাগে। সেখান থেকে ছোটবেলার অভ্যাসটা মাঝে মাঝে বলে আছে। হালো শেষের। অথবা তার মনটা এই জীবনের মধ্যে আজও ভাল করে বলে নি। হাসিটা মেলাতে দূর করে।

না, আজ সে গোমড়া মূর্খ ভাবতে বসবে না। কেন ভাল করে ওখানে সে নিজেকে মেলাতে পারে নি—এই চিন্তার ভটিততা থেকে আজ সে নিজেকে মূর্ত্ত্ব রাখবে। আজ ছুটি। আজ সে ভুলে যাবে। ই হুসো, যেটা আর পাটের কোঁসোর ভগ্না ভগ্নটাকে ভুলে থাকবে। আজ সে গলে আসবে, থেকে বাত কোলকাতা গহ্বরে সংহত অঙ্গে। জলের মত জলে। অবশ্য সেই জন্যই শূন্য মূর্খ নয় সে। ছুটি পেলে তার ভাল লাগে। এর পাটকানো কাজের ভীষণে মতো ঠেঁগ এক বলক তাম্বা হাওয়া, একটু আকাশ, একটি অসদৃশ্য, ব্যস্ত এর কম্পার আকাশে জানা মেনে দেওয়া, হয়তো দৈত্যকে একটু, পুঁটির নিচে কলহে ভগ্নার বহুর চোটা, পুরোনো বহুরের সঙ্গে একটু, গাণ-ভীষণ-পল্ল কণা, হাওয়া-বাতা বিকেলে চৌপনে এক বাগটি মেখে আসা, অনেক রাত্তির পর্যন্ত পড়া, নানা কথা ভাবা, চোখের পাতা দুটো আলাদা রাখার মূর্ত্ত্ব চোটার বিয়োগ। আর চন্দ্রনা যদি থাকে কোলকাতায়—!

চন্দ্রনা চিঠি লিখেছে। আসবে। এর আগেও এসেছে—অনেকবার। কিন্তু এবারের চিঠিটাতে ভিন্ন একটা দুঃখ আছে। অনেক অক্ষুট আগেও জন্মে জন্মে কথাসূচী ধান বেরিয়েছে। একটা দুঃখের তরঙ্গ কাগজে কথাসূচী মতো। সে দুঃখ শেষের মধ্যেও বহুসঙ্গে বাজছে। চন্দ্রনা আসছে। আসবে আজ। চিঠিটা এসেছে কয়েক দিন আগে। কিন্তু নানা কাজের ভীষণে ঠেঁগে যেন চিঠিটা এগোতে পারছিল না, শূন্য দুঃখের কম্পনই তাকে ছুঁতে ছিল—সব কাজের মধ্যেও। আজ চিঠির অবার আবির্ভাব। চিঠির ভগ্নভেদ রয়েছে শেষের। চিঠি আর ছুটির বিভাজন ছুটেছে।

অবশ্য পুরো ছুটি নয়। একটা কাজ আছে। সেই জন্যে বেগোতে হবে। যেতে হবে করেক জায়গায় করেকটি বছর কাতে। কঠিন কাজ নয়। বরং সে গায়ের খিরেছে কাছটা। কারি ও সুদর্শন ‘পুনর্নির্মাণ’ উপলক্ষ্যে বছর দুই খাওয়ানী রিববার কারিগর বাড়িতে যায়, চাপান করে। এই আদম্পন জানাবে শেখর ওদের দুজনের হয়ে। শক্ত কাজ নয়। বরং এই কাছটা নিয়ে করেক জন বছর সঙ্গে দেখা করে সে একটু আড্ডা দেবে। হৃৎ-কর্তব্যের থেকে সেটার আদ্র বেশি তার। যত দিন গাছে বছরের সঙ্গে দেখা তত করে থাকে। ছাত্র দ্বীপের বিনমূল্যে বছর-সঙ্গে আকর্ষণ পূর্ণ ছিল। তারপর ক্রমে সবাই ছিটকে যেতে লাগল চাকুরী, ব্যবসা, গাছবাগিচা, বিদেশ-যাত্রা, উচ্চশিক্ষা, কোয়ার্টার, বিবাহ, স্ত্রী, স্পার্সাল, সন্ধান ইত্যাদির দ্বারা। এখন দেখা গাছবাগিচা কন মটে। তার বাড়িতে বিশেষ কেউ আসে না,—কর্মব্যস্ত বলে, শেখরকে পারে না বলে। বরং সে মকলান্য এক এক সময় আবির্ভূত হয় এক এক জনের গাছিতে। গিয়ে দেখে বছর দুই পঙ্গারাক্ষর। ভাল। কিছু পুরোনো দিনের উল্লাস ও উদ্ভাবনতার আদ্র পাওয়া যায় না। বয়স হচ্ছে। শব্দ ও গানেরই হচ্ছে। শেখরের হচ্ছে না। তিরিশ পেরিয়ে গেছে সে। আধুনিক বাংলা ভাষার ‘রীতিমত উত্তরতিরিশ’। ওরা বয়সের চোরে খাসে ছুটে থাকে যেন বার্ষিকের দিকে, আর সে বয়সের সোমসে রায়েরে খানিকটা। তার এই আদ্রাঙ্কিত ভাবমূর্ত্তিকে অনেক ব্যাখ্যা করে, ‘সংসার-বার বই ভাই’ বলে। কিছু এককালে তারও সংসার-বার ছিল, তখন—

শান্ত, সে দিনগুলো কত দূরে চলে গেছে। হাত কয়েক বছর আগেও শেখর কাম্পত্য জীবনের মধ্যে ছিল। কটি করে! মাত। কিন্তু হবে হয় অনেক দিন আগের কথা। প্রায় ভুলেই গেছে সে। মনে পড়েছে এক আদ্রার, কিন্তু মনে রাখবার চেষ্টা করেনি। এমন সম্পর্কিত পদম হয়েছিল, তখন ভাবেনি ভাববে এটা। তখন প্রথম যৌবনের উদ্ভাবনা-পুষ্টি ছিল চোখে, মাঝে মাঝে ক্রমে কাটেনি সেটা। হঠাৎ কেটেছে। বয়সের অংশ পরেই। তারপর সেই বিরজিকর স্মৃতি

একটা পর্ব। তারপর উভয়ের মৃত্যু। বিচ্ছেদ। হুঁশ আর শেখর দুজনেই বেঁচে গেল।

কিন্তু এত সহজে বোধহয় মানান রাখে না। তাই সে মগ্ন আদ্র অবস্থায় শেখরকে আর হুঁশকে দাপট আছে—বিশিষ্টতার পরেও, বিশিষ্ট-বাস দত্তেও।

মহোদাদে গাঁড়িয়ে আছে চৌপন। হুঁশ বিপরীতহুঁশী ব্যায়ার সচিববন্দু। বিশৃঙ্খল আকর্ষণে সে আকৃষ্ট করে কেন্দ্রে গাঁড়িয়ে আছে। দুটো আকাশচাচরী গ্রহ করেক দিবের জন্য পারস্পরিক দারিদ্র্য এসে পড়েছিল, আবার তারা মহাপ্রত্যয়ের হুঁশ প্রাণে বিশ্লিষ্ট হয়ে যেত, একে অপরের সন্ধান পবন রাখত না। কিন্তু একটি বছর জ্যোতিষের চারদিকে বিপরীত অঙ্গপথে জায়া ঘুরে। নিকটতর অঙ্গপথে আছে হুঁশী। হুঁশীর কাছে থাকে চৌপন। শেখরকে যেতে হয় মাঝে মাঝে তখনো চৌপনের চাঁবে। হুঁশীর সংগে সংযোগের কীপ সেহু একটা রয়েই গেছে। সম্পর্কহীন এই বিভ্রাৎ সংযোগ এক বিভ্রম্বনা বিশেষ। হুঁশীও বোঝে সেটা, শেখর দেখা করতে সেসে সে বেরণী ভাগ দর আভাল হবার চেষ্টা করে। কিন্তু একটু বাদে শেখর-চৌপনের কাছে এসে উপস্থিত হয়। হুঁশীর অস্তিত্ব একটা ভয় আছে—এই হুঁশি চৌপন শেখরের উভাসে অভিভূত হয়ে তার কাছ থেকে দূরে সরে গেল। এই আশংকার সে দূরে থাকতে পারে না। মহোদাদে হাছির হয়। শেখর এটা গৃহস্থ করে না। ভাল লাগে না এই মহাবর্তনিকী। সে তারের দুজনের মধ্যে এসে গাঁড়ায়, চৌপনকে শেখর ভাল করে পূর্ণভাবে পার না, হুঁশী বাধ্য হয়ে গাঁড়ায়। হুঁশীর সময়ে এখন চৌপনকে একটু আদ্র কর্তেও তার বাদে, হাপ হতে থাকে তার। হুঁশী মনে মনে হাসে, পরিষ্কারভাটা উপভোগ করে। চৌপনকে শেখর বেবন করে দিবের সঙ্গে বিশিষ্ট দিতে তার ভা হয় না। তবু তাকে যেতে হয়। বার বার। আরো যেতে হবে। ততদিন, বর্তমান না চৌপন বাবার কাছে আদ্রার বয়স অর্জন করে।

হুঁশী বয়স দিয়েছে শেখরকে দেখা করবার জন্য। আদ্রই যেন শেখর দেখা করে। এই চিহ্নটা তার ছুটি, চিঠি আর পুনর্নির্মাণের হুঁশী-হুঁশী সূত্রটাকে ভেঙে

এসোনেলো করে দিচ্ছে।

রি বলবে হুম্মী! হঠাৎ বধর দিল কেন। এমনভাবে বধর সে শেষরকে দেয় না, বেধা করতে চাখনি সে নিচ্ছেদের পর কোনো দিন।

হুম্মী বাইরে—বোম্বের বিল্লীতে একটা চাকরী পেয়েছে, বলেছিল আগে একদিন, ওখানে সে ঘাবে কিনা ভাবছিল। শেষর বারধর করেছে। বধিও সে বারধরে কোন মূল্য নেই তা সে জানে। ভবু করেছিল। হুম্মীর কোন ব্যাপারে সে এখন থাকে না। কিছু এ ব্যাপারে না বলে উপায় ছিল না। টোপনের মনো। হুম্মী সেলে টোপনকে দশে নিয়ে বারে। শেষর তাই বার্য দিতেছে। হুম্মী 'হ্যা' বা 'না' কিছুই বলে নি সেদিন। শব্দে শব্দেছে। সেই ব্যাপারেই কি কিছু বলবে আচ্ছ।

টোপনের কথা জানতে চাব চন্দনাও—প্রার প্রতিটি গিঠিতে। খণ্ড কতটুকু সে দেখেছে টোপনকে। দাবান্য। শব্দ দামান্য। একেবারে ছোটবেলার টোপনকে দেখেছে সে। তারপর বহুদিন টোপন তার চোখের বাইরে। ইরানী টোপনকে নিয়ে বাইরে বেগোতে পারে না শেষর। হুম্মী বের না। বইলে টোপনের সঙ্গে হয়তো দেখা হোতো চন্দনার। কিছু বত দিন আছে, হুম্মী ভতই যেন আগলে রাখতে টোপনকে—যেন তাকে হারানার ভয়ে স্না-উৎকণ্ঠ। আর তার সব ক্ষেত্রে বন্ধ শেষরকে। শেষরই এক পায়ে টোপনকে পর করে দিতে। অধিকার তার কন নর। তার ও টোপনের মাকথানে হুম্মীর এই বেড়া হুসে রেগেয়ার চক্টাকে সে ভাল চোখে দেখে না। এমন কি এক এক দিন টোপনকে দেখতে গিয়ে অতঃপ্তিই দুঃখবোধ নিয়ে ফিরতে হয়। আচ্ছকাল এমন দিনের সংখ্যা কম নয়। বিকল্প কর্মভান বিভাভের পরে যে খানে শেষর বার বার করে এসে একটু, নিম্নেকে শেতে চায়, সে হুজ্জ টোপন। সেই সম্মানভিত্তির দরজটুকু জন্য শেষর তুচ্ছাত' হয়ে থাকে। অথচ সেই হুম্মী'গুলো দিনের পর দিন ব্যর্থ হয়ে যায়। এ জন্যে শেষরের রাগও বের মাঝে মাঝে হুম্মীর ওপর। কিছু দীর্ঘবে সইতে হয়। হুম্মীকে কিছু বলে লাভ নেই। হুম্মী এটা মেনে শুনেন ইচ্ছে করেই করে। শেষরের অতঃপ্তি মদহার কাভর ঘবছাটা সে

উপভোগ করে। শেষরের ভীষণের মদ্যান। দিনর সম্পর্কে হুম্মী উপাসীন। এই একটা ঘাবগার অতি মাদ্রান সন্তেভন। নিম্নেকে সে একটা প্রতিজ্ঞার আদনে বাধ্য করে শব্দে অশেষর মূখে বন্দনা নিম্নেক পর শেষরের দিকে। শেষর হলো। অতঃপ্তিতে, রাগে। কিছু বলে না। জানে, বললে হুম্মী আরো বাধ্যবে। কন দধিক, উপাসিনো দীর্ঘর থাকে জের। আর শব্দ সেবে সেই দিনের, সে-দিন বহল বধি মেহু দর্যাবের ওপর পিতার অধিকার কায়ের হবে। তখন সে টোপনকে নিয়ে আগলে তার কাছে।

এ কথা হুম্মীও জানে। তাই হয়তো টোপনকে সে আকর্ষণে ধরে আগলে আছে। সে জানে, প্রতিটি সম্মানভিত্তি টোপনকে কাছে রাখার হুম্মী'কে সন্তুচিত করে দিচ্ছে। আর প্রতিটি সম্মানভিত্তি তার মনো যেন নতুন প্রতিজ্ঞার বীজ বোনে। প্রতি দিন সে বেড়াটাকে আর একটু বিজুত করার চেষ্টা করে, পাচিলে আর একটা ইস্ট লাগিয়ে সেটাকে চড়কা করে। আর যে ক'বের হুম্মীর পাওনা আছে, তারই মনো সে শেষর-টোপনের ব্যবহানটা ব্যাক্তিবে ব্যাক্তিবে এমন ঘাবগার নিয়ে যেতে চায় যে শেষরের পাওনা-কালেও সে যেন তাকে না পারে। টোপনের মনকে হুম্মী বিবিরে দিচ্ছে, অতঃপ্তি বিবিরে করে দিচ্ছে শেষর সম্পর্কে। এটা তার এক মত অশান্তির কারণ হয়ে আছে। সর্বদল ওটা কোন এক অবস্থা পাত থেকে বিন্দু, বিন্দু করতে থাকে তার মনের ওপর, তার মনের সব কাটলমুদোর তেভর দিবে চুইয়ে চুইয়ে পড়তে থাকে। যে কোন কাজ বা চিন্তাকেই ছোঁটা থাক, সেই অবস্থা পাতের স্ববনের স্পর্শ লাগবে। ইউনি-বনের অকিলে বলে নানা দর্যনা-দর্যলতার মধ্যে এক এক দর্য সেই স্পর্শ এত ভীত হয়ে লাগে যে কাজ কেনে তখন হুটতে হয়-ধকিল কোলকাতার ঐ ঘরটির দিকে, দেখানে টোপন আছে। সে আছে, শব্দ, আছে, এইটুকু শব্দভব করার জন্যই শেষরকে যেতে হয়। যেটুকু শব্দভব করা যায়, টোপনকে দেখা যায়, ছোঁটা যায়, তার পলা পোনা যায়। কিছু তারপর দীর্ঘ দীর্ঘ সেই হারটা এসে দাঁড়ায়, ঘন দার্দ্রান্দি'। দাঁড়ায় টোপন আর তার মাকথানে। তাকে দর্যনো ঘাব না। একদিন, ঘন ছোট টোপন আর একটা, বড় হয়ে, ঘন এ ঘরের

বাঁটা থেকে শেখর তাকে নিয়ে যাবে, তখন—? তখনও কি ছায়াটা হুলেবে অমনি মধ্যাহ্নে? অথবা ছায়াটা আগে পড়াকে আগে ঘন আঁকার বেবে টোপনের মনে? সারা জীবন সে হুটে হুটে আসবে টোপনের মনের দরজায়, আর ব্যস্ত হতে থাকবে? থাকবে তখনও যখন টোপন থাকবে তার কাছে? তারই একাংশ তারই স্মারিণ্ডে থেকে থাকবে অনেক দূরে? কোনো দিন সে টোপনের সেই দরজাটা হুলেতে পারবে না? চানিটা হাতড়ে কি হবে, দরজায় বাজা দেবে? দরজা হুলেবে না, বাকার শেখর মধ্যে অকৃত্য হুমীর অমৃত তিব্বৎ হাসি বাজতে থাকবে। হুমীর সঙ্গে চলবে এই সংগ্রাম চিরিটা কাল ধরে! যখন হুমী তার জগৎ থেকে মুছে যাবে, তখনও ঘন বনিকার আড়াল থেকে সে তার অকৃত্য পর নিষ্পেক করে বিঁহবে শেখরকে, নিজের হয়ে তর্জি বোম করবে। ‘আমি যেমন পাচ্ছি না, তোমাকেও তেমন হবে না’—এই নীতি হুমীর মধ্যে কাজ করে।

থাক, এল ভাবনা থাক। এ ভাবনা তাকে অস্থির করে কেসে। বরং বেগিরে পড়া থাক। টোপনের কাছেই যাওয়া থাক।

চন্দনা যদি কাছে থাকত এখন! কিন্তু চন্দনা থাকে না কোলকাতায়। আসে থাকত। চলে গেছে। দূরে। আসে হাতে হাতে। শেখরের কাছে। কোলকাতায় আক আসবে। চিঠিতে লিখেছে। চিঠিটা আর একবার পড়লে হয়। না থাক? সেরী হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি করে চিঠি পড়া যার না—চন্দনার চিঠি। চিঠিটা থাক পকেটে।

হাতা। ঐ চিঠিটারই সোনালী আভা বোঝে হয় হাতায় ছড়িয়ে পড়েছে। কী হাস এটা। ভাতের পেষ, অথবা আশ্বিন বোঝে হয়। বৃষ্টিঝোয়া আকাশের ওপর আশ্বিনের এই পুন্ডো-পুন্ডো যোহটা দেখতে শেখরের ভাল লাগে। বরষার লাগে—সেই ছোটবেলা থেকে। আছও এ যোহ তাকে ছোটবেলায় দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়। আত্মব’ প্রসন্ন ছিল দিনগুলো। পূর্ববঙ্গের পাড়ার্পা, ভাল আর জল। মঠ আর ক্ষেত। অনেক আকাশ অনেক আগাছা, মাটি আর কাশা। বন্য আর দরল। শ্বাস্থ্যবান শৈশব। যুদ্ধপূর্ব’ বাংলা দেশের শৈশব,

যাকে ঘিরে আছে পুন্ডিত সোনালী আলো—পুন্ডো পুন্ডো আকাশ-আলো-কণা দিন। সোনালী-আলোর খেয়া শৈশব—টোপন। হুমীর হং পেয়েছে টোপন। হুমীর এই প্রভাবটা অবশ্য শেখর অপ্রসন্ন হৃদিতে দেখে না। নিজেকে এই চাঁটটিই করে শেখর মনে মনে বাসে।

বাস। ভীড়। লোন্ডারেল। অন্যদের হুঁতি নয়। হুঁএকটি বাস ছেড়ে দিয়েও সুবিধে হয় না। অন্য একটা হুঁতে বহু দূরে বাঙালা থাক। দর্য বেশি লাগবে। তা কিছু করার নেই।

‘মাজের দান দেখেছেন, মহাই। একবারে আগুন।’ বাসের মধ্যে এক ভরলোক উত্তেজিত কাঁবে কথা বলছেন।

‘মাজ কেন বলছেন পুন্ড’—আর একজন, ‘মাজারে গোলন্দু যে। ইলিশ মাজ তা বলে কিনা শাল্য’—

‘ইলিশ ডো মপাই ইলিশ। পুন্ডি? চিড়ে? আর কোনটা নয়, তরির-ভরকারী? বাসের দরজাও ঘিলে চড়িয়ে। গভন’বেগের যে কী কাজ।’

‘গভন’বেগে তো যে যার কোলে কোল টানতে ব্যস্ত। আমায়ের আর কে দেখছে।’

‘এ বাসের ব্যাপারটা দেখুন না, প্রতি বছর লোকদান যাচ্ছে।’

‘আর ভীড়।’

‘সব মত আসে না। আমার এলো তো তিনটে এক সঙ্গে।’

‘ইয়েরগুলায়টি, হাই বের ইজ স্টেট বাস।’ টিপনি কাটে একটি ভরলোক ছোকা।

যাসে হুঁএকজন।

জন্মে বাসের পূর্ব এবং অবশ্য কথাব্যতীর এ আলোচন্যটা চাপা পড়ে যায়। শেখরের কানে আসে বিচ্ছিন্ন কথার এলোমেলো অংশ। চন্দনার চিঠির হুঁএকটা টুংহো এই সব কথাব্যতীর কীকে কীকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাস চলছে।

চন্দনা

ট্রেন চলছে। বেয়েদের কানরা। এওটা জানলার বাহে আমি বলে আহি। চোখের ওপর দিয়ে হুঁগোর

জ্যোত চলছে। মনের ওপর দিয়েও। চোখেও যেন ঠিক একটা কিছু নির্দিষ্ট হয় নেই, মনেও তাই। তবে মনের ওপরকার জ্যোতের বৃদ্ধ তলান ভূমি হচ্ছে প্রধান হয়ে। যেখানে ভাবি তার আড়ালে আমি তোমার কথাই ভাবছি। বস্তু কিছু, ঐ জ্যোতের ওপারে কুটে উঠে তা তোমাকেই খিঁচ, তোমাগই বৃত্ত।

কী যে ভাবছি তার কিছু ঠিক নেই। আসলে কিছু ভাবছি না। আমার মনের বৃদ্ধ ভেতরে তোমার রেখি, ভেতর-বহনের অন্য সব আলো বিভিন্নে দিচ্ছি একে একে। একটা আলো জ্বলো থাক—বৃদ্ধ তোমার আলো। সেই আলোর গাছতলায় আমি একটু বসি।

আমি ভ্রান্ত! আমি বৃদ্ধ ভ্রান্ত, শেখর। নিজের দশে লগ্নান কর করে আমি ভ্রান্ত, আহত, শীর্ণ। আমি নিজের হাত থেকেও মুক্তি চাই। ঐ আলোর গাছতলায় আমি আমারকে ছেড়ে দিয়ে পূরে পড়তে চাই। চোখ বৃদ্ধে ঘুমিয়ে পড়তে চাই। তরলহীন আবর্তহীন একটা বন। একটা নিশেব সপশন।

যখন ভূমি আমার কাছে থাকে না, তখনও আমি তোমার দশে কথা বলি। ভূমি জানে না। ভূমি পুনতে পাও না। তোমাকে যে আমি আমার ভেতর মহাশে বন্ধ করে রেখেছি। ইচ্ছে করলেও ভূমি চলে যেতে পারো না। আমি ধরে সরে এসেও আমার ভেতর-বহনের বনিকোঠার তোমার আমি চুরি করে নিয়ে আসি। তাই ভূমি আমার কাছ থেকে ধরে নও। আমার কাছে, আমার মধ্যে। তোমার বসন্তেই আমি জানি তার দশে আমার ভাল-লাগার হং বৃদ্ধিরে যোব হয় গড়া এই ভূমি হারা-শেখর। আমি কথা বলি সে উত্তর দেয়। সে হাসে। সে আছে। তাকে ভূমি ছিনিয়ে নিতে পারো না, আমি বাইরে রাখতে পারি না। আমার সব কাছকর্মেই রয়েছে সর্বও সে দাঁড়িয়ে থাকে। আর আমি যখন বিভ্রান্ত তখন আমি তোমার বৃদ্ধোদ্যম। ভূমি জানে না, তোমাকে চুরি করে রেখেছি আমার অজ্ঞাতনামে।

কিন্তু, নিছক হারাতে কি মানুষের চলে? বিশেষত যেসেয়ে? অতত আমি আমার কথাই ভাবছি, আমার চলে না। হারাকে ছাপিয়ে হারায় উৎসকে চাই।

তাই বার বার আমারে ছুটে আগতে হয়। নিজেই সরে গেছি, আমি পূরে, ধরতো আমি ঐ হ্যাগটিকে, নিজেই। কিন্তু আমি পারি না, তা হয় না শীর্ণকাল। নিজেকে বন্ধিত করে, নিজের দশে লড়ে কতকাল চলে।

এক এক সময় মনে হয়, হাস্যকর এই আত্মবন্দনা, এবং হয়তো বড়। কিন্তু—

বৃষ্টি এল। বৃষ্টিপট পুষে জানালা বন্ধ হচ্ছে। জানালায় হাত-পাখা আমার ওপর দশের ছিটি এসে পড়ছে। ঠাণ্ডা। ভাল লাগছে। সেই হেসেবেসার মত। তখন বৃষ্টি নামলে কী এক বৃষ্টি সারা পরীরে শিউরে উঠতো। বাড়ীতে বহুদিন ধরে মেনেও ডিম্বতে পু বয়োভার।

শরতের বৃষ্টি। আকাশ কাঁপিয়ে আসলে, তবে আকাশ কালো করে নয়। পুষ্কোর আর বৃদ্ধ দেবী নেই। মাসটা ভাতের পেল, অবস্থা আশ্বিনের পূর্ণ।

এমন একটা বৃষ্টি-ভেজা-অথ-অন্ধকার-নর দিনে ভূমি আশ্বিনের বাড়ীতে এসেছিলে—ঢাকায়। ভূমি হরত ভূমেই পেছ দিনটা। অথ ভূমি আমার চেয়ে বড়। আমি তখন অত ছোট, তাও মনে রেখেছি আর ভূমি হয়তো দিবা ভূমে বসে আছে। একদিন নিজেস করেছিলাম তোমার, ভূমি দিনটাকে অতিক্রম করে পেরেছিলে, আমাকে বিশেষ নয়। তোমার বেশি মনে আছে খেলায় উঠা। মোটা-গামড়া পুষ্কর মানব ভূমি স্বয় থেকে। আর যোববর চিরটা কাল থাকবেও।

কোলকাতা থেকে ঢাকায় কুটিল ফেলতে এসেছিলে ভূমি—তোমার কলেজের হয়ে। তখন ভূমি ফান্ট ইয়ারে পঞ্চ। কচি ঢেহারা ছিল তোমার। কৈশোর যেতে যেতেও তোমার ছেড়ে যেতে চাইছিল না। আর আমি তখন কৈশোলের বারদশে। ভূমি এলে আমারে বাড়ীতে—বৃদ্ধ বাড়ীতে। আমার দ্বারা ছিল তোমার বৃদ্ধ। আমার পালে তখন বেশ কড়া বাড়ির আবর্তন বটেই। আরো ও একটু ভারিভা চলেচলে—অতত আমারে কাছে। আমারও সেটুকু মাখ্য বসেই মনে করি। যে কোলকাতার থেকে কলেজে পড়ে, যে ছুটিতে বাড়ী আসবার সময় ইকানী একাই

ট্রেন-যাত্রা করে, যে প্রকার হলে, অথবা সরকার না হলেও, দু'দো ইংরেজী কবিতা মূল্য নুনিবে নিতে পারে, তাকে জ্ঞ ও গুণিক বদ্যাসে করা যায়। এহেন দোষ বন্ধ। দাদার গুণ তো সবই তার আছে, বাড়তি সে কুটিল খেলোয়াড়, এবং বাতাধি-সেবু-বোটা খেলোয়াড় নয়, মতুষ্ট একটা কোলকাতার কলেজের এগারো জনের একজন।

জুনি উঠেছিলে তোমার টীকের সঙ্গে অন্য কোথায় যেন। একদিন সন্ধ্যায় এসেছিলে আমাদের বাড়ীতে দেখা করতে, এবং নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে। বাবা বা দাদা ও দিদি তোমার এমন ভাবে ঘিরে গ্রাসল যে আমরা অত্যন্ত হয়ে রইলাম। কসার্ভিং যক্ষিও বা কখনো সন্তত পরিক্ষে অবরোধ ভেপেছি, তোমার নজর পড়েনি, কারণ জুনি দরতো তখন অতি-উচ্চাসে একটা কর্ণার কিকে জুনি কী ভাবে 'হেভ' করেছিলে তার বর্ণনা করছি, অথবা শি, কে, জি, নামক অধ্যাপকের পড়াবার ভুলটির অনুভূতি দেখাচ্ছে। দরতো আমাদের ঘিকে তাকিয়ে, দাদা তাকিল্যভারে আমাদের পরিচয় দিয়েছে, জুনি বিজ্ঞেস করেছে, 'কি নাম, কি পড়?' উজ্জরটা বিভ্রত করে যোবার চেষ্টার বদন আমাদের কথা হারিয়ে যাচ্ছে, তখন অকস্মাৎ বা বা বাবা কী একটা প্রব্লেব হ্যাচকা টানে তোমাকে সরিয়ে নিলেন আমাদের কাছ থেকে। জুনি আবার ওদের হয়ে গেলে, যেন ঠিক একটু আসে ছিল।

সব কথা ভাল করে মনে নেই। মনে আছে সেই ঘটনা। ঐটেই ছিল আমাদের ব্যক্তিগত প্রধান দর। ও দরে আমাদের অনেক কিছু ঘটছে। ও দরেই দাদা আর বাবা—সে থাক। জুনিও ঐ দরেই বলেছিলে, দৃঢ়কল ছিলে।

জুনি তো বেশ ভাল বসে আছে সব। বেশ লোক বাপু।

লোকটির এখন কী করা হচ্ছে? ইউনিয়ন অফিসে মর্সে 'সিপোজার' করা হচ্ছে? দরের ঘরে মনের মোব তাকানোর অভ্যাস তো লোকের একটু বদল হলেই কেটে যায় বলে শুনছি। ও অভ্যাস তো আমারও হয়েছিল। এত রোসের টীকে বেরোল, এর কিছু

বেগোল না, আদর্শ! এ বদল পেরিয়েও দলের এ রোস থাকে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তারা নেতা না নেতাসম-প্রার্থী। আর তারা এ দৃষ্টোর কোনটাই নয়, তাদের এ রোস মরণ-কাহ্ন দিয়েছে। জুনি এই শেবের দলে। তোমার আতো দৃষ্টারজন বন্ধু আছে এমন। এদের মরণ ঠিকানোর সাধ্য কারো নেই। বাজে কথা থাক। কী করছি এখন? শিম্ফ-টিম্বল কিছু আত্মকাল? না কি ওটা শিকের জুলে রেখে দিয়েছ? আর সেই রিসার্চ?

বৃষ্টি আমাকে আলতো করে একটু ভিজিয়ে— যেন আর করে—এই মাত্র চলে গেল। ঐ যাচ্ছে বৃষ্টিটা একটা বড় মার্শের ওপর দিয়ে—সিকলিকে লম্বা পা কেনে কেনে, দল বেঁধে, সনসবের পান গাইতে গাইতে। চলে যাচ্ছে বৃষ্টি বেয়েগুলো ধরে। আমার অতীত অনেকগুলো চন্দ্রবার বত বরণ তাদের ব্যাং-চোখা থেকে আটান-প্রিন। কী উচ্চল হৃত গভিতে ওয়া যাচ্ছে। এরই মধ্যে এত দূরে ওয়া চলে গেছে যে ওদের গান আর শুনতে পাচ্ছি না, তবু আবহ। ভারে ওদের নাচের বত দাবলীল চলা দেখতে পাচ্ছি, আর ওদের আদরের মিষ্টি ছোঁয়া পাচ্ছি আমার গাত্রে।

দশ থেকে ত্রিশ বছরের—চন্দ্রবারা হুটে চলে গেল। দশ থেকে হৃত প্রস্থান। এবার গিরিশের চন্দ্রবারা—ডাম্পা-ডে'ডা-খোঁড়া চন্দ্রবারা—এবার তোমার প্রবেশ। হ্যাঁ, চন্দ্রবার।

মজের মধ্যে যে লোকটার ঘাড়ের পাকবার কথা, তাকে দেখতে পাচ্ছি না যে। সে কোথায়। কী করছে সে এখন।

শেষ

'চৌপন কোথায়?'

'ভেজরে!' বলল হুদী।

'কি করছে?'

'পড়ছে। পড়েন বই। বোধহয়'

হুদুনেই চুপ করে রইল একটু, কল।

'ডাকন।' বিজ্ঞেস করল হুদী।

টটিল শেখর। বলল, 'বা ভাল বোকা।'

'ভাল-বোকাবুকের কিছু নেই। আমার কথাটা

সেতে নেবো আসে ? নাকি তোপনকে ডাকব ?

‘বল । কি বলছ ?’

‘আমি বাইরে চলে ঘাব ভাবছি ।’

‘কেন ?’ পর্য্যন্ত ভাবে প্রশ্ন করল শেষের । ‘কি
অন্যে থাকে ? কি দরকার ?’

‘দরকার ঠিক কিছু নয় । ভাল লাগছে না ।
কোলকাতা আমার ভাল লাগে না । অন্তত এখন
লাগছে না । তাই ভাবছি—’

‘কোথায় যাবে ?’

‘দিল্লী ।’

‘সে তো অনেক দূর ।’

‘দাঁটা, দিল্লী অনেক দূর ।’ একটু যেন ঠাট্টাই
করল রুমী ।

‘দিল্লী চলে যাবে তুমি ! করে থাকে ?’

‘আজ ।’

‘আজ ?’

‘না, না ! আজ চলে যাব । ওখানে ইন্টারভিউ
আছে । সেটা নেবো ।’

‘ইন্টারভিউতে হবেই ভাবছ কেন ?’

‘হোক তুমি এটা গাও না হরভো—অন্য হচ্ছে
তোমার কথা শুনবে ।’

‘না, তা নয় । তোমার বহিঃচাকরির উন্নতি হয়,
আমি বাধা দেবার কে ? কিন্তু ইন্টারভিউ দিলেই
তো চাকরী হয় না ।’

‘তা হয় না, তবে আবার এক বছর আছে ঐ
কলেজেই । সে একটু ভরসা দিয়েছে ।’

‘আমাদের চাকরীও তো তোমার খারাপ ছিল না ।’

‘এখনকার থেকে দিল্লীতে গিয়েই বেশী ।’

‘স্বচ্ছও বেশী । বতবুদ শুনছি ।’

‘সে বড় শুনিয়েও বেশি ।’

‘সে সামান্য । কিন্তু কোলকাতার অন্য শুনিয়েও
আছে ।’

‘কি শুনিয়ে—বা দিল্লীতে পাওয়া যায় না ?’

‘আমি মেটেরিয়াল শুনিয়ের কথা বলছি না ।
এখানে দাম্পত্য-বন্দন, লোকজন—’

‘লোকজনের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই ।’

‘তবু হরভো এখানে কিম্বদন্তি আছে ।’

‘বিপদব্রত নেই । আমি একা এখানেও, ওখানেও ।’
একটু ঘেমে বোম্বের একটু বঁকা হেসে বলল, ‘এ দক্ষ
কথা শুনলে লোক বিবেক করার পরামর্শ দেয়, কিম্বদ
আমার ক্ষেত্রে সেটাও সম্ভব নয় ।’

‘অসম্ভব কী ! তুমি বিবেক তো করতে পার ।
তোমার চোরাগা, বদল—’

‘আছে, আছে । তোপন শুনলে কল্যাণ পাবে ।’
মোহন করল, ‘বিবেক শ্রদ্ধা কি বেটে নি—আমার কথা
বলছি ।’

‘তা কেন ? আরো ভাল লোক, তোমার পক্ষে
শুভচেষ্টা—’

‘বিবেক ব্যাপারটার দূর পরিচয় দেখছি । বিবেক
করছে নাকি শীর্ণগির ? ভাঙচি বেবো না ।’

‘সব শূন্যে পেন্সে করব । মিসোজিনিষ্ট নই ।’

‘কে ? শত্রুটি ? নিছক বেবোনি কোঁতক । ব্যক্তি-
গত কিছু নয় ।’

‘যাক এ সব কথা ।’

‘কে ? চন্দনা নাকি ?’

‘আমি এ সব কথা আশোচন্য করতে চাই না ।’

রুমী হাসল । বেশ জোরেই । ‘তোমাকে চটানো
দূর লক্ষ । ঠিক আগের নতাই ।’

শেষের চটাইল ঠিকই । কিন্তু তোপনের সঙ্গে মেঘা
করবার জন্য ভেতরে ভেতরে তার শরাসী মন উদ্ভূত
হয়ে ছিল । তার ওপর ঐ নিম্নের স্বর । এর অর্থ
তোপনের সঙ্গে এই কীম সম্পর্ক টুকুও আশাভিত্ত থাকবে
না, তোপনকে রুমী বুরে গঠিয়ে নিয়ে বেতে চাইছে ।
তার ওপর অভ্যাসের করে রুমী কি লাভ ? রুমী
শেখরের অন্য যে কোন ব্যাপারে নিশ্চয় । শূন্য এই
বানটার দ্বা দিতে চায় কেন ?

শেষের বলল, ‘তুমি এত একা কেন ? তোপন তো
হচ্ছে ।’

‘তোপনকে তো তুমি একদিন বিবেক দিয়ে ।’

‘কিন্তু এখন তার অন্তরে একা থাকবে কেন ?’

‘একা আদি থাকবেই । তুমিই তো একদিন বলেছিলে
আমার ব্যক্তিক কৌণিকতা অন্তত বেশী । এবং সেটাও

নাকি, তোমার ভাগ্য, যুগপ্রভাব-ভাত । বাধ্য: কী যে শক্ত শক্ত ভাগ্য কথা বলতে তখন তুমি । এখনও বল নাকি ঐকর ? নিছক মেয়েলি কৌতুকে ।'

হুম্মী এত উচ্ছলভাবে শেখরের সঙ্গে কথা বলে যা । কিন্তু আর বোধ হয় সে খুশীতিকে চোখের ওপর তুলে ধরে দেখাতে চায় । অনাগিন সে নিষ্পদ কণ্ঠে হুটো-একটা প্রহ্ন করে ; সেটা আসলে উপস্থিত থেকে পিতা-পুত্রের ওপর পাচাতা দেবার জন্য । শেখরের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ আসোচনাতে হুম্মী কখনও আত্ম দেবার না । আর আসা না ।

হুম্মী আবার আরম্ভ করল, 'পিতা তোমার মেথলে হাতে হাতে আকর্ষ' না হয়ে উপায় নেই । আই/ভ্যা-লিঙ্ক-এর পূর্বা বাতাসে ভেসে ভেসে কম দিন কাটালে না তুমি । বই পড়ে আর বই লিখে চিরকাল বইয়ের কলতে কাটিয়ে গিলে । যে কোন জিনিষকে একটা থিয়োরী বা হীজার পোকার কী অধ্যা আত্ম । নতুন গাঁতের বড় থিয়োরীটা ঘর নতুন গাঁতেরে সে একতর করতে পারে । কিন্তু তুমি কেবল দেখো যে এটা থাকতে আমার বেশ লাগে । একলা না থাকতে সেলেই বরং অনুবিরে বোধ করি ।'

'টোপনকে তো তোমার দরকার নেই তাহলে, তুমি যদি একলা থাকতে ভালবাসো ।'

'আমি টোপনের কথা আসছে কি করে এর মধ্যে ।'

আবার দুজনে চুপচাপ । অস্বস্তি ও বিরক্তি ল্যাগছিল শেখরের এই ভাবে বলে থাকতে । আর টোপনকে কেন গুরু করে রাখা হয়েছে । আজকেই আবার নিজে ব্যাঙ্গা হবে । নিশ্চল কোয়ে সে ভেতরে গুলতে লাগল । টোপনকে স্রেতে থাকতে হবে ভেবে কষ্টও হচ্ছে । কাহের ভীড় ঘন বড় হয়ে বাবার সময় হঠাৎ হুটে বেরিয়ে আসা টোপনের কাছে-এই হুঁকি থেকে সে বিকৃত হয়ে থাকবে ।

তাহাড়া, হুম্মীর হাতে টোপনকে পুরো স্রেতে 'বতে তার বন মার দেয় না । হুম্মীকে সে গারিফজানদীন বলে করে । সন্ধান-পালনের গারিফ পুরো বেবার স্বনভা নেই তার । এখনও টোপন হুম্মীর হাতে অবশ্য । কিন্তু প্রতিনিরত শেখরের জাখ আছে । এই চোখটা সে

সহাতে চায় না । এখনও বহু খুশীতিনিয়তি ব্যাপারে শেখরের মধ্যে হুম্মীর নভাবিরোধ ঘটে—সন্ধানপালনের ক্ষেত্রে উভয়ের বড় আলাদা । শেখর তার নভটা বলে—মিতাখ অদ্য হচ্ছে । কিন্তু ছোব করে না । সে জানে, বড় সে জোর করবে, তত হুম্মী তার উপটোটা করবে, তাকে পরাক্রিত করে তার বিকৃত এক আনন্দ আছে ।

করেক বছর পকে যে হুম্মীর কোনো কতৃৎ থাকবে না টোপনেরও পরে, এখন সে তাই সূচী আসলে উন্মূল করে নিচ্ছে 'যেব । শেখরের তিক্ত লাগে এই ক্ষুর সংকীর্ণব—বিশেষ করে টোপনকে কেবল করে । ওর আশংকা, বাপ-মার এই বশ টোপনের কতি করে ফেলতে পারে ।

টোপনকে দূরে সরিয়ে নিলে তার মনে শেখরের কোন হ্রাস থাকবে না । বতরুত্ব এবং যেমন হ্রাস হুম্মী তার মনে ফেলতে চাইবে, তাই লুপে যাবে শেখর টোপনের কাছে । সে চেষ্টা—শেখর সম্বন্ধে সত্য গোপন ও বিকৃতির উপস্থাপন—চলে ধরতো দুইভাবে । তাকে প্রতি মূহুর্তে গোখবার চেষ্টা করতে পারে শেখর । কিন্তু গিলিতে চলে সেলে—

'তোমার না সেলেই নয় ? হতাপার প্রাণ-করুন মোদাল শেখরের গলা ।

হুম্মী ঐ গলাটা শুনতে বোধ হয় একটু গুজ্ব হয়েছিল । ওরপর বলল, 'আমি ব্যাঙ্ক ইন্টারভিউ দিতে ! বতরুর সম্বন্ধ আমি কিরই আসব । একটু বেড়ানো হবে করেক দিন—এই রাত্রি । কেন এ ঘটনাকে তুমি এত বড় করে দেখ ?'

দুন্দু' বিবাস না করলেও একটু আশ্বত বোলো শেখর । বলল, 'আজই যাবে ।'

'আজ না সেলে ইন্টারভিউ সেওয়া যাবে না ।'

'কখন গাড়ী ? কত সময় প্রাটিক' ?'

হঠাৎ টোপন হুটতে হুটতে এসে ঢুকল । শেখরকে মেখে বলতে লাগল : 'গাবা তুমি !' হুটে এলো শেখরের কোলে । 'তুমি কখন এসে ?'

শেখর শুকে জড়িয়ে নিয়ে বলল, 'অনেকক্ষণ ।'

বাড়ীটা শেখরে সরিয়ে শেখরের চোখে চোখ রেখে বলল, 'আমার ভাষা নি যে !'

‘ভাকহি তো—সেই কখন থেকে। টোপ—ন, টোপ—ন। টোপন পুনতেই পার না, তা আমি কী করব।’

‘কেকেছো আবার?’ চোখ বড় করে করে জিজ্ঞেস করল।

‘অনেকবার।’

‘পুনতে পাই নি।’

‘কি করছিলে তুমি? এত খেয়েছো কেন?’

‘খোঁজার চাপাচ্ছিলাম।’

‘খোঁজা।’

‘হ্যাঁ, তুমিই তো গিয়েছিলে, যাবে। সোলবার অর্থদিনে।’

‘ও তাই তো।’ শেখরের মনে পড়ল রকিম হুসতীর কথা। সঙ্গে সঙ্গে লস্ফণ-এর ‘রকিম হুস’ উইনার’ গল্পটার কথাও মনে পড়ল—তার প্রিয় গল্প। টোপন ও পল হুসতের জন্যে নিশে গেল। একটা কাঠের ঘোড়া খনড কাঠানোর মধ্যে ছুটেছে। সওয়ায় একটি শিশু। পল বা টোপন। পল ও টোপন একাধারে। ছুটেছে ঘোড়াটা, ছুটেছে। ‘মালাবার, মালাবার।’

‘দিল্লী, দিল্লী, আমায় দিল্লী যাব বাবা।’

‘দিল্লী! সে আবার কোথায়?’

‘অনেক দূর। তুমি যাবে বাবা আমায়ের সঙ্গে।’

‘যাব?’ থেকে গেল শেখর। ‘সে যে অনেক দূর বাবা। আমি যাব কেনন করে অত দূর?’

‘কেন? আমায়ের সঙ্গে।’

‘তুমি আমায় তোর সঙ্গে নির্বি।’

‘হ্যাঁ।’ বাড় পুয়েটা কাৎ করে ফেলল টোপন।

‘তুমি যাবে তারলে—কী মজা। দিল্লীতে রেল গাড়ীতে চড়ে যেতে হয়, জানো?’

‘না, আমি না তো।’

‘তুমি কিছ জানো না।’

হুসী দেখেছে ওদের। একদুটে ডাকিয়ে আছে। এই দুটোর সামনে শেখর অবস্থি বোধ করে। আড়ষ্ট হয়ে যায়। এখন হুসী লক্ষণে চলে যেতে পারে। এবার থেকে। কোথাও হাক-আবেশ নেই পাহারায়। তবু থাকে। থাকলই বা! এইতে শেখরের এত অসুখিয়ে

কেন? একটু ভাল করে আদর করলেই তো হয়। হয়, কিন্তু আম অবধি যোল না। ‘প্রাইভেট’ কুর হয়? কথাটা শুনলে হুসী হাসবে।

‘বাবা, তুমি সত্যি যাবে তো?’

‘তুমি নিয়ে সেলেই যাব।’

‘হ্যাঁ, আমি তো নিয়েই যাব। বা বলছিল—তুমি যাবে না।’

থেকে গিয়ে শেখর চোখ তুলল হুসীর বিকে। হুসীর চোখ নানানো উজ্জ্বল ছিল—শেখর মনে করে। কিন্তু সে অশ্লক ডাকিয়ে হইল—শেখরেরই দিকে। লজ্জা বোধ করল না। অশ্লক মনে করছিল না তার কান্নকে। অথবা অশ্লকই বা কী। সে তো সত্যি কথাই বলেছে। হুসী তার বিকে ডাকিয়ে আছে। শেখরের প্রথমে মনে হয়েছিল, হুসী উপভোগ করছে পরিস্থিতিটা। এখন মনে হোলো, হুসী কিছু ভাবছে না, পল দুটোতে ডাকিয়ে আছে বাত। তার চোখ শেখরের বিকে, কিন্তু সে দেখছে না তাকে, বা অন্য কিছুকে।

শেখরের চোখে যে ভয়ানক দুটিটা ঘনিষে উঠেছিল, তা বিফলিত হয়ে গেল।

‘না, আমি যাব না, টোপন।’

‘কেন, যাবে না কেন?’ ব্যক্তি-ভাষায় সুরে আদুরে গলায় বলল টোপন।

‘কাজ হয়েছে, বাবা, আমার।’

‘উ’—তোমার খালি কাজ।’

‘তোমরা আমার সঙ্গে আসবে—হুসী একদিন যাবে।’

‘তার নামে তুমি আমার কাজ যোক তা চাও না।’ হেসে বলল হুসী।

চুপ করে হইল শেখর।

‘কথা বলছ না যে।’ বলল হুসী।

‘ওখানে যোক শু চাই না—তা তুমি জানো।’

‘খালি হুটো বেশি টাকা রোজগার করি, টোপনকে আর একটু ভালভাবে রাখি—তা তুমি চাও না?’

‘ও দুটোকে এখন এক করে জড়িয়ে দিযো না। তুমি টাকা আরো বেশি রোজগার করলে আমার আগন্তিক কী কারণ থাকতে পারে। এখানে থেকে কর না।’

‘এখানে কলেশের অধ্যাপকদের কত লোক তুমি জান না ?’

‘কেন লোক ? কিন্তু তোমার বক্তৃতা তো কম ।’

‘কমবেশটা স্ট্র্যাণ্ড’ অব লিভিং-এর ওপর নির্ভর করে । আমার এতে চলে না ।’

‘টোলনের বক্তৃতা তো আমি বিতে চেয়েছিলাম, তুমি নাও নি ।’

‘না । সে আমি দেখে না ।’

‘তুমি ভুল করছ । এটা তুমি নিছো না । নিছো টোলন ।’

‘ও ব্যক্তি-জানি । আমি নেব না বলেছি তো ।’ বেশ জোরেই বলল রুমী । চীৎকারের মতই শোনাল সেটা ।

টোলন বিস্মিত চাখে শব্দের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল । দূর সে দ্বিত বক্তৃতা উঠতে পারছে না ।

‘টোলন, ভেতরে গিয়ে দিয়াকে বল আমার চা দিতে ।’ বলল শেষ ।

টোলন ধীরে চলে গেল ।

‘টোলনের সামনে চীৎকার করো কেন ?’

‘পাক দিবে নাহি ঢাকা ঘর না বলে ।’

‘না, না । বাপ-মার কড়া হাথে ও কী ভান্দে ! ও বড় হয়ে তো আমাকে কাউকে শ্রদ্ধা করতেও পারবে না ।’

‘সে এতদূরই পারবে না ।’

‘না, না । টোলনের চোখের সামনে স্বপ্ন-’

‘চোখের সামনে না করলেও জানতে পারবে । ভিত্তোপ’ যে কেউ জেববশে করে না এ জান ওরও হয়ে যাবে বড় হলে ।’

‘না, আমি পছন্দ করি না ।’

‘তোমার পছন্দ বক্তৃতা দেখে যখন তোমার কাছে থাকবে ও ।’

‘রুমী-’

যেবে গেল শেষ । চীৎকার করেই উঠেছিল সে । কিন্তু বাক । পরের বাড়ীতে একটা বেলেংকাণী করবে না সে । কারণ চীৎকারের বিনিময়ে চীৎকার বিতে কাপণ্য করবে না রুমী ।

দেখবে মনে পড়ল, একদিন ভায়া কসড়া করেছিল

এই বাড়ীতে—মার অলপ কিছু দিন আগে, টোলনের সামনে । বাড়ীর অন্যান্য লোকেরাও হয় তো শুনবে, কিন্তু বেশীমতাবশত ঘর ঢেকে নি ।

রুমী টোলনকে রাখে ব্যবহৃততা ও বিলাসিতার মধ্যে । এটা শেষের পছন্দ নয় । শেষের চাখ সামান্যই নয়ল অব্যক্তের পরিচরী জীবন । এ দন্দে তার প্রায় একটা থিয়োরি আছে । রুমী সে থিয়োরিকে মনে করে উঠতে । এই নিয়ে বক্তৃতা ।

রুমী হঠাৎ বলেছিল, ‘দাখো, বক্তৃতা-উচ্চারণের যা কিছু একদলেরই মনে, তা নিছের ওপর কর, যেসের ওপর ঐ সব কল্যাণে এসে না । আমার হেলে মজুর নয় ।’

শেষেরও চটে গিয়েছিল, ‘ওপর বাজে কথা দাখো । যেমন ভাবে চিরকাল তাকে থাকতে হবে, সেই ভাবেই তাকে দাখো ।’

‘হেসেকে ভালভাবে খাইয়ে পরিবে দাখা যে কোনো ব্যাপের কতখ্যা । কৃষ্ণভাসাবনের ব্রত আসলে অক্ষমতার আবরণ ।’

অচর্চ । এই রুমীই একদিন মনে করত যে শেষের অ্যাডমিনিস্ট্রিটিভ শাভি’দের পরীক্ষাটা বিশেষ পাবে—বদার যা অনেক ।

‘কৃষ্ণভাসাবন এ দুগুণে নন্দনেকের ধর্ম ।’ রুমী কি স্বকম যেন ফেলে গিয়ে হাবন করছিল ঐ গারদাটোতে ।

‘আমিও জানি সে-কথা । কিন্তু বিলাসিতাকেও আমি দখা করি ।’

‘বিলাসিতা তুমি কাকে বল জানি না । প্রায়শ্চয়ের মধ্যেই শিশুরকে হান্দুর করব আমি । তার যেন নিখ্যাসে কষ্ট না হয়, সে যেন হাত পা ছড়িয়ে হান্দুরের বড় বাড়ে । মোংগার মধ্যে বর্ষ, বর্ষ হাওয়ার মধ্যে নয় ।’

‘এ ভাল কথা । কিন্তু তুমি এর চেয়ে বেশি করছ ।’

‘না, না, না—করছি না ।’ চীৎকার করে উঠল রুমী । মাঝে মাঝে কী স্বকম ইন্সটিটিয়াল হয়ে যায় যেন রুমীকে । তখন শেষেরকে কিছু বলতে হয় না, সে আপনা থেকেই কোমরে ডোলে তার বিবর্তনশীল ।

সেই দুগুণের পুনর্জন্মের করতে চায় না শেষ । ঐ দিন স্বপ্নটা করেই পরে তার লক্ষ্য হয়েছিল । ভিত্তোপের

যেতেও কুণ্ঠিত হইবে গীতিকারের গাশাঘাটা। 'ভিত্তাসে' তবু একটা বৃদ্ধি আছে—বল না। এটা বাইরে দিক থেকে অতন্ত সোটা কত হইবে ব্যাপার। পরিষ্কার, নির্ভর্য। আর ওয়া দৃষ্টে যেন চমকায় করে চৌপনের সামনে বসড়া করে তখন স্নেহটা যেন দৃশ্যমান হয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে। উত্তরমুখের সেই মৃদুভেদে বোকা যায় না। পরে বোকা যায়—সেই স্রোতের স্রোত লেগে থাকে এখানে-ওখানে, অনেক বিবর্তনীয় স্রোতে তবে সে বোঝে। সেই স্রোতস্রোতের স্রোতের দিকে তাকালে চোখ যায় না যে দুই একটা কলসের অধ্যাপিকা আর শেষ একজন—বী। রাষ্ট্রনৈতিক কন্যা। সাহিত্যিক। অধ্যাপক বা আই. এ. এন. হতে হতে স্নেহান্বিত। অধ্যাপক হলেই হয় না যে সে একজন জহালাক। তাকে দৃশ্যপট উল্লস-বহু ইতিহাসের কন্যা বলে মনে, হোবস একটু দূরীকৃত করে। চন্দ্রার তার দশকে অত্যন্ত উচ্চ বাগ্য। এ যেন শেষের ঐ স্রোতস্রোতের দিকে তাকিয়ে বিরক্ত বোধ করতে অনেক দিন—যেন তার ভিতরের কোনো গাশা দৃষ্টিত ব্যক্তি হইয়া কুটুবে গিয়েছে। চন্দ্রাকে অবশ্য বলেছিল সে খটনাটা। চন্দ্রা নীরব-বলতায় শব্দ তার দিকে তাকিয়ে থেকেছে। শেষের দায়িত্ব সে-দৃষ্টি তার প্রাপ্য নয়। আর একটু কর্তন কিছু না বলে স্রোতস্রোতের স্রোতের কি করে।

সেদিন কুণ্ঠিত ভাষা তার বসড়া করে সবাইকে—নিষেধেরও—তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। আর আবার সে বলে দেখাবে না।

সে একটুকু চুপ করে বসে রইল। নিষেধে সাধলে গুড়িয়ে দেয়ার জন্য।

তারপর বলল, 'আমি উঠি।'

'হোসো। চৌপনকে যে চান কথা বললে—'

দৃশ্যনৈ বরজার দিকে তাকাল। সেখানে চৌপন বরজার একটা পালায় আচ্ছাদিত ইন্দ্র ভাষা গোবে গাঁড়িয়ে। সেবেই বোকা থাকে—ওখানে ও গাঁড়িয়ে। আছে অনেককণ। গীতিকারের চান কথা বলেই হাতের ও কিতরে তারপর বরজার কাছেই থেকে গেছে।

শেষে ভাবল, 'চৌপন।'

একটু ভাব ভেবেই যেন চৌপন কাছে এগিয়ে এসে, শেষে একে কাছে চৌপন মিল।

'চৌপন, কিবা কি বলল।'

'বিশ্ব।'

'বিশ্বকে গিয়ে বল, আমার একটু তাক আছে, চান বরজার নৈ।'

'নাটক কোরো না।'

'চৌপন, বিশ্বকে গিয়ে বল একটু তাকাতাড়ি করতে।'

চৌপন চলে গেল।

'দুই, আনি তো বরজার, চৌপনের সামনে চৌপন ঐ ভল্লিতে কথা বলা আমার ভাল লাগে না। নাটক করা আনি পরম করি না। কিন্তু আমার—

'—বিত্তি লাগছে।' শেষেরে ঐক মৃদু কথ্যটি কেড়ে যেন উচ্চারণ পাগল দুই।

শেষেরে একটা চোক গিলতে নিয়ে কথ্যটি বলতে হোসো, 'আমার কাছ আছে।'

'কাছ চা হওয়া অর্থি আপনাকে করতে পারবে।'

শেষের চুপ করে রইল। বিত্তি লাগছে এভাবে দুইই দুইয়ায় বসে থাকতে। কথা বৈ বিহীন—এককণ কথার একটা আচ্ছাদিত ছিল। বিহীন কাছ নৈ কথ্য। বইয়ের পাঠাটা ওলটানো যায়, পড়তে বসে বাওয়া যায় না।

চৌপন এলে ও অবস্থাটা পাঠাট। কিন্তু চৌপন হাতেরে কী যেন শব্দে দূরে সরে গেছে। আসছে না। আসবার সময় হয়ে গিয়েছে অনেককণ। এ বাড়ীর, অপর্যায়ের দায়িত্ব তার অস্বাভাব্য।

না, চৌপন আসবে না। ও হাতেরে এখন সেই রকম দায়িত্বের কাছে গিয়ে গাঁড়িয়ে আছে। গাঁড়িয়ে আছে একটু অস্বাভাব্য হয়ে। এখন হাতেরে ঐ অস্বাভাব্যতাই চৌপন খোঁজাটায়। বসে রইল। তারপর কোন সময় ছুঁ তো দৃশ্যতে অস্বাভাব্য করে—বিশ্বের অস্বাভাব্যতাই। গতি বাড়ে ক্রমে। বিশ্ব অস্বাভাব্যতাই হাতের পদ। হুটুতে চৌপন খোঁজা। লাক্। লাক্। হতে হতে তাকে। লাক্ তার পদ। 'মলাবির মলাবির।' খোঁজাটাই হুটুতে।

‘তুমি চৌপদে সব কিছু থেকে আদাল করে রাখতে চাও, তাই না ?’

‘ক’র স্বাভাবিক সেটা ।’

‘ইচ্ছেটা ক’রই স্বাভাবিক । কাজটা একেবারেই অসম্ভব ।’

‘কেন, অসম্ভব কেন ?’

‘ক’র চার দিনের মধ্যেই ওকে জুলে শুনতে হবে ওর বাপ-মার জেজ্ঞা । ‘আমি-তুমি ‘কেজ্ঞা’ না মনে করতে পারি । এদেশের বেশির ভাগ লোক তাই মনে করবে । এমন কি শিক্ষকের মধ্যেও এ আলোচনা হবে এবং হয় ।’

‘এ হওয়া উচিত নয় ।’

‘ইন্সপেক্টিবল্ ।’ হত্যার মূখ্যদণ্ড করল ক’রী । ‘আইডিয়ালিটিয়ের চরম রূপে উচিত্যের হিসেব তুমি করে দাও, দাড়া বলবার ভাড়া বলে দাও । সত্যতা আমি সব কিছু বলে দিতে চাই । সব আসল্, তারপর ওর যা নেবার নিক ।’

‘না, এত অল্প বয়সে কিছু নিষেধ থাকে বরফার । ওর এখনও বাছবার ক্ষমতা হয় নি ।’

‘সে ক্ষমতা ধার আশেই ওর কাছে সব এসে থাকে, তুমি ঠিকানাতে পারবে না ।’

‘মতটা পারি ।’

হাসল ক’রী । বাকী হাসি : হলল, ‘তুমি বাইরে তো ক’রের কথা, নিজের বাড়ীতে ঠিকাবে পারবে ? বখশ চৌপদ তোমার কাছে গিয়ে পাকান্যাকি থাকবে, তখন সে ক’রে জানবে ও বিশ্বাস করবে যে তার বা ছিল একজন শূর ব্যাঘ্র গরিমার লোক । তুমি ঠিকানাতে পারবে তা ?’

‘আমি তো ঐ সব কথা কোন দিন বলবই না ।’

‘তোমাকে বলতে হবে না । তোমার আশপাশে এ কথা এত কণ্ঠে বহনিত হবে যে তাকে চাপা দেওয়ার নামা তোমার সন্ধিচার নেই ।’

তবে সেখানে কথাটার দত্ততা আছে । এ বিকটা অবস্থা শেষর কোনো দিন ভাবে নি ।

আর সে ভাবতে পারে না । ভাবতে চায় না । এখন একবার চৌপদটা ছুঁতে ছুঁতে যদি আসত, সব ভাবনা-চিন্তা জুঁবিমে দিতে পারত । কিন্তু সে আসছে না ।

‘কি ভাবছ ?’ জানতে চায় ক’রী ।

‘একটা কথা বলব ?’

‘কি ভাগি আমার ? বল ।’

‘ক’র ব্যক্তিগত । তা হলেও বলছি । বস্তুর শূন্যে, অসীম বোস তোমাকে ভালবাসে, ওকে বিয়ে ক’রে—’

‘বিয়ে ক’র কী করে ?’

‘কেন ? অসীম তোমাকে ভালবাসে ।’

‘আমি বাসি না । এবং ভালবাসা বলে কোনো বস্তু পৃথিবীতে আছে কিনা তাতে সন্দেহ পোষণ করি । দৈহিক তৃষ্ণা, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা ইত্যাদি ক’র, কিন্তু ভালবাসা—’ বেতিবারক বাড় মাড়ল ক’রী । ‘সত্যতা বিবেক ক’র মূল্যবান । একদিন যদি ঐ শেষের দাবীর কোনোটা অতিরিক্ত পড়ান করে, তবে ভেবে দেখব । এখনও আমি অতটা ক’রল মই ।’

একটা চা খেতেই ঘেরিয়ে পড়ল শেষর । ওঁরায় হুগে ক’রী বলেছিল, ‘চৌপদের সঙ্গে দেখা করে থাকে না ।’

‘না থাক । ও হরতো খেলছে ।’ একটা প্রতিবাদ হিসেবে বলল শেষর । চৌপদের নামে অনেক অব্যাক্ত ব্যবহার করেছে ক’রী । বিতীর্ণত, শেষর চৌপদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে তার পাওয়াটা অসম্ভব করে দেয় ক’রী । এই ক’রেরই নীরব ও পরোক্ষ প্রতিবাদ করে শেষর বেরিয়ে পড়ল ।

যুডা : ভাল লাগল । কীকায় এসে দাঁড়িয়ে একটু । বিলী হাওয়াটা বয়ে গেছে ঘরে । ক’রীর ঘরে । ওখানে চৌপদ থাকবে । এখনও কয়েক বছর । আসবার দূর চৌপদকে আদর করে আসা হয় নি আজ । সেই ত’ক’র পরিস্রাণটা এখন সে করতে পারল । ক’রীর নামে এ ত’ক’টাও যেন সংহত হয়ে থাকে । এখন সেটা ধীরে ধীরে প্রসারিত হবে তার স্বপ্ন প্রকাশ করছে ।

ক’রীর বাড়ীটা খিলিয়ে গেল মোড়ের বাঁকে । একটা কাছ দাখান ঘিরেই বেগমের সে । কাতি আর ক’রন । ওঁর ‘শূন্য’ ‘শূন্য’ । বিবেক করে কয়েক বছর সূঁখেই—অবশ্য বাইরে থেকে দেখতে সূঁখেই—ছিল ওরা । তারপর বিগড়ে গেল দস্তারটা । তারপরে ছট পাকিয়ে গেল । ক’র বাকতে লাগল বেসুয়ে । সেটা পেয়ে

এমন মাত্রার পীড়ান যে অসাদা বাঁকা ছাড়া কোনো উপায় রইল না। যে বার পথে যেতে চায়। যে বার পথে বেশ ব্যাধিলগ্ন। সুখের আশঙ্ক করল বি. টি. পড়তে। আর কান্ডি চাকরীর বৃহত্তর শিগ্গরার গোলবার লাবনার পরীক্ষার অবতীর্ণ হবার ভোক্তাভোক্ত কর্তে দাসল বৃদ্ধনে। পরীক্ষার বেঁকা ভিগ্গরও সেল। ইতিমধ্যে বহুর তিনেক কেটে গেছে। পোনা ব্যাধিল, আদালতের সাহায্যে বিশেষটা এবার আইনী হবে। লোকে তাদের অন্য নারী এবং পুরুষের সঙ্গে ভাবিয়া বহনের মতনও নাকি দেখতে পাচ্ছিল। অনেক চলক করে একটি নারী ও একটি পুরুষের নাম ঘোষণা করল—বার। তখন বখাটের কান্ডি সুখের নাকি সব চেয়ে বিন্দু। বহুরা এখন বিশেষ-উত্তর এক ভোক্তা বিয়ের কথা ভাবছে, তখন একদিন কে যেন বলল, পাণ্ডি আর সুখের এক আর সময় দেখা করছে। বহুরা প্রথমে কোনো বিশেষ পাড়া সেল না। পরে এখন একই বহুর বিভিন্ন সূত্রে পোনা সেল, তখন কিকিং কান না দিয়ে আর উপায় রইল না। ওয়া দেখা করছিল—গোপনে। লোকের গাননে পড়তে তাদের নিজেদেরই লক্ষ্য করছিল। নতুন করে প্রথ—একই নারীর সঙ্গে। একই নারীকে দ্বার অবিস্কার। এক নারীতে দ্বার রোমান্স। এইটাই নাম দিয়েছে বহুরা—‘পূর্ববিন্দ’।

বেশ আদর্শই লাগে দেখের। এবং একটু বকাও। এমন কি তার বৌভু-উল্লস অংশটা তাকেই প্রদ করে, ‘কি, বুরীর সঙ্গে বিভীয়ার রোমান্স-এর একটা ছেঁটা করে দেখবে নাকি।’

‘হুঁক কর।’ উত্তর ছিল তার অন্য অংশ।

‘চেঁটা করেই দেখ না। এক নারীকে দ্বার অবিস্কার! বেশ ইন্টারেস্টিং নয়?’

‘একবারেই হুঁকটে ইন্টারেস্টিং পেরেছি। ব্যাবার।’

কান্ডি সুখের সম্পর্কটা দেখের মত করে ভালে নি ঘোষণা। শেষর জানে—তার ‘পূর্ববিন্দ’ কী রকম অসম্ভব! যদি যে-সম্ভাবনা থাকত, তাহলে সম্পর্ক ভালাত না। শেষর আশ্রয় চেঁটা করেছিল। সম্পর্কটার যে দিকে বহুরা লক্ষ্যবনার দৃষ্টি আছে বলে তার তার মনে হয়েছিল, দেখানোই সে হাতড়ে

দেখেছিল। কিন্তু তখন কিছু হুঁক পাশ নি দেখে। বহু শেত না, তত তার কৌক চেপে যেত। এটাকে তার একটা পরামর্শ বলে মনে হোত। সম্পর্কটা এখন গড়ে উঠেছিল, তখন চিরদিনের বহুর ভাবা ছিল তার। এখন সেইটা ভালাতে লাগলো, তখন একটা ব্যাবার তখনও তাকে পীড়া দিত। এটা এমন হওয়া উচিত ছিল না, ভালা উচিত নয় সম্পর্কটা, এটাকে অটুট রাখবার ক্ষমতা থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তার আরম্ভাতীত বহু ঘটনা আছে। শেষর বহু আপা করে এনেছিল। শেষর তাকে কোনদিন আশা করতে বলে নি। বহু তার চালাচল দেখে বুরীর আগেই বোকা উচিত ছিল। হুঁকো বুরীরও তখন প্রথম বৌদন—শেষরেরই মত। শেষরও তো ভুল করেছিল। আশাও নিচ্ছিল করেছিল। প্রথম বৌদনের রপন চপনা তখন উল্লয়েরই চোখে। মনে মনে তারা হুঁকনে হুঁকনের দিকে হুঁক সেল—আশ্রয়-আশ্রয়ে চুরনার হবার জন্যেই।

বুরীর রান্যা ছিল, রান্যবীতি ও সাহিত্যের ব্যতিক্রমের অব্যবহিত পরেই মরা চামড়ার মত শেষের জীবন থেকে করে যাবে, আর দেখা দেবে না কিশোরের মত তরুণ মতের এক অবিস্কার—আই, এ, এন্, হওয়াও কিছু আদর্শ নয়। পুরাতন পুঁদিপ-রেকর্ডের কলক হুঁক দেখার মত ক্ষমতা বুরীর পিতৃকুলের নাকি আছে। বিয়ের পর চামড়াটা এখন আশা থেকে বল না, বুরী সোঁটাকে বহুরা মনে করেছিল এখন দেখা সেল তা নয়, তখন বুরী শেষ দেখরকে সংশোধনে নেবে সেল বিভিন্ন অঙ্গ হাতে নিয়ে। বহু সে ব্যাব হোস, তত তার জিহ তেপে সেল, শেষ দিকে কীরকম দ্বিভীজ্ঞাত্ত, একটা-ভাব ব্যাব করেছিল সে। হুঁকাত্ত ব্যাব, অধেষ্টক ঐয়বনত অধেষ্টক দ্বিভীজ্ঞাত্ত। সে আশ্রয়ের পর আশ্রয় করে সেল। তার শেষ নাকি ব্যাব হয়েছিল। বুরী কি শেষ দেখতে জানে? বহুত জানে—তার নিম্নের মনের মত শেষ। একের মনের শেষ অন্যের কাছে নিখা, ব্যাবকর। তখন বুরীর কাছে তার শেষ।

হুদীঃ চিত্রাই শেখর দ্বার বেশ করছে। নাতিকেহা
নাতি সবচেয়ে বেশ উপভোগ্য করে।

‘ঐ তো হুদেনের বাড়ী দেখা দাচ্ছে। হুদীকে
বিদায় দিয়ে হুদেনের দরজার কড়াটা খাড়া দাখ।

‘খুসে গেল দরজা।

‘‘চোটা পাঁচক নয়, দু’লিহালিন, শীপ’ হুদেনেরে
হুদীয়াটা খুসে দলবরে দ্বিভঙ্গ কলল, ‘কাকে চাই?’

‘হুদেন আছে?’

বাগ্মাণিক করতে আরম্ভ করেছে ওয়া শাবনে
ঐশোবার জন্য। বলল, ‘কান্না? আছে।’

‘ভেকে দাও।’

‘‘কান্না, কান্না, কান্না।’ কয়েকজন হুটে গেল
সেল, কয়েকজন পাঁচকে অবাক চোখে তার দিকে
তাঁকিয়ে হইল।

শিপু। চৌপনের হত। না, চৌপনের হত নয়।
পোষাকে নয়, শ্রব্ধশ্যে নয়, শ্রব্ধে নয়। হুদীকে
দ্বিধা। দ্বিধাধিতার চেয়ে স্বভাব করেও ধন্যবাব।

‘তোমার নাম কী?’ দ্বিভঙ্গ কলল শেখ।

ওয়া হুকোতে একটু আড়মোড়া ছিল। বলল,
‘বিলুটু।’

শেখ তার শীপ পাঁচরের দিকে তাকিয়ে বলল
‘হ্যাঁ, বেশ নাম।’

না, চৌপনকে সে এখানে দেখতে চায় না। কোন
বন্ধুরের ঘরে—ঠিক বন্ধুরের হুদেনের হত? বন্ধুর
তলার উত্তর শোনা যায়—না। দ্বিধাও হুদীমনে করে
শেখর হুদেনকে বন্ধুর করতে চায়, শেখর জানে তা
কত বিখ্যা। চৌপনকে সে কী করতে চায়? নিজেই
জানেন না সে। হুদীয়া-বাব না হুদীয়ে হোল।
বন্ধুত্ব হুদী-কলিত শেখরের হত বন্ধ অকিসার হুদীও
সিঁদুর নক, পায় না। আদর্শ আদ্রে বোম্বের
কলিটার। হুদীয়া বা নেই—হুদীয়ে ‘বন্ধুত্ব তাকে
হুকুতে দেওয়াই তো উচিত।

‘‘আরে, শেখর যে?’ হুদেন এসেছে। ‘আর, আর।’

‘ভেতরে গিয়ে আর কি করব। এখান থেকেই
দেখবুটো দেবে যাই।’

‘দেখবুটু!’ ‘বিরে করছি না কি!’

‘সে তো একটা করেই রেখেছি।’

‘না দ্বিধা!’

‘‘তুই একটাই করলি না, আমাকে হুদীয়া বিয়ে
দিচ্ছিন।’

‘ভাগ্যবান তুই।’

‘ভাগ্যবানের বৌ হয়ে, একালের প্রবাহ।’

‘দেখবুটো কিসের?’

‘পুর্নবিন্দনের। কাঁচি আর পুর্নবিন্দন।’

‘আর, আর, এখানে কী করছিন?’ হুদীয়া বন্ধক
দিল হুদেন। হুদেনেরেবুদীয়া একটা হুদীয়াকারে
তারের দ্বিধে দ্বিধিয়ে ছিল। ‘ভাগ্য, উদ্বিগ্নে বা।’

প্রায় হুদীয়া-বোকাগের হত করে ওদের তাকিয়ে দিল
হুদেন। শেখর দ্বিধাকটা আহুতই হোলো। বলল,
‘আঃ ও কী করছিন।’

হুদেন বলল, ‘আর, ভেতরে আর। কাঁচি আর
পুর্নবিন্দন গলপটা পুর্নবিন্দন।’

চৌপনেই ভেতরে গিয়ে গেল হুদেন। হাত ধরে
গিয়ে বাগ্ম্য অবশ্য একটা দল পুর্নবিন্দনে হোল শেখরের।
যেটো খেতে খেতেও গলপ না সে। বাড়ীর ভেতরটা
ভীষণ অন্ধকার। তার সীমাবদ্ধিতে। পুর্নবিন্দনো,
একতলা বাড়ী।

একটা ঘরে এনে হুদীয়া হুদেন শেখরকে। সে ঘরে
হুদীয়া-একটি বাগ্ম্য ও একজন বহিলা। বহিলাটি বলে কি
যেন সেলাই করছিলেন। শেখরকে চুকে ওয়া বেরিয়ে
গেল। বহিলা কাপড়পরা বহিলা হুদেনের বৌদি—
আগে সেখানেই শেখর।

‘বৌদি, আমায়ের একটু চা পাঠিয়ে দিয়ো তো।’
কথাটা হুদীয়ে দিল হুদেন।

‘না, আর চা নয়।’

‘আরে বোম্ব তুই।’

ভিক্রে-ভিক্রে মেঝের ওপর তেলিগটে একটা শীতল-
পাটিতে ওয়া বলল। অন্ধকার-অন্ধকার ঘর। একটা
জালিয়া দ্বিধে দ্বিধায়া বিহীন আলো ঢাকে। অন্য
জালিয়াসুদো পাঠের উদ্ভা-বাগ্ম্য-ওলায়া দ্বিধার পাঠের
ওলায়া অগম্য। একটা চার-বিদ্যার দ্বিধিয়ে পাঠের উপর
না হুদীয়া দ্বিধে বসে হুদেন বলল, ‘হ্যাঁ, বস।’

‘এমন বড় কিছু নয় ব্যাপারটা—’

‘বড় নয় মানে? আসল বড়। ব্যাঘ্র কব্জি বসে পালা একটা বিয়ে করতে পারল না। আর কান্ড ওই মধ্যে পাল। হুঁ হুঁটা বিয়ে করে ফেললে।’

‘আরে হুঁটা গিয়ে নয়। মেয়ে একটাই।’

‘আরে সে তো আবার বড় ব্যাপার। এক নৈরকে হুঁটার বিয়ে করা—এ কি চারটিখানি কথা। হীতিবত প্রতিভা না হলে কেউ পারে না।’

‘হুঁটার বিয়ে করে নি। বিয়ে একটাই।’

‘আঃ, বড় ক্যাচাং করিল তুই। তুই তো একসর হোস নি, হবি ভেবেছিলি, তাইতেই এত নীলস এবং নির্বোধ হালি কি করে। কার্যত আমার কথাটা ঠিক কি না। বিয়ে ওদের প্রাকটিক্যালি ভেঙ্গেই গিয়েছিল—লিঙ্গালি ভাঙ্গে নি। উকিলকেই যা ঘোড়াকত টাকা দেয় নি, তাহাড়া ওদের ভিত্তোসেং যাকীটা ছিল কি।’

‘তা বটে।’

লম্বা করে একটা টান দিল রবেন তার চার-বিদ্যারে। আর লমলম করে ঘোঁরা হাফল। এই রকম চলল বার কয়েক। তারপর বলল, ‘কি রে কথা বলছিল না যে।’

‘সেবছি।’

‘গাধ। এক বল। হুঁটা হুই ইন্ডিরে কাম। হুঁটার কোন বিয়োগ নেই।’

‘কি বলল।’

‘নেতরর কথাটা বল। একদিন গিয়ে বাই-বাই।’

‘কেন, নেতরর ব্যাকাল একর প্যাঙ্কিন না ন্যাক।’

‘হুই রে হুঁটা-একটা। সে সব উপহার-বিয়োগে কপটকত। তাহাড়া বহুসের বিয়ের বত হুমোড় হয় না। বহু-বাহুরের যে কত খিন বিয়ে হয় না।’

‘আর হবে না। কার্য সবাইই হয়ে গেছে। এক তোর হাড়া।’

‘আঃ, ঐ দাগার কথাটা আমার ভালে। হ্যাঁ, পোন, লবার হুমেরে তো একবার, বিত্তার বার হতে তো বাধ্য নেই। এই যেমন কাঙ্ক্ষ-সুন্দর্য হচ্ছে। তোর সে কোণ আবার বেশ।’

‘বামে কথা রাখ। তোর ব্যাপারটা শুন।’

‘আঃ! আবে নেতরর বারটা বল।’

‘নেতরর আর বার কী। ওদের পুনর্বিবাহের ব্যাপারে বহুতা বদলিল—বহুন করে দৌড়াত কর; সেবারে দৌড়াতেটা একটু বহুতভাবে হয়েছিল বোঝ হয়। হুঁতাং ওরা ঠিক করেছে, একদিন যাওয়াবে।’

‘তোকে হুঁত বাবাল কেন।’

‘কাঙ্ক্ষের দরজাভাব। হুঁবর্গার সংকোচ। অতএব হাই কেনতে ভাঙ্গা কুসো।’

‘তা ভাঙ্গা কুসো, যাওয়াবে কেনন? হুঁ হুমোড় হবে তো। আবার যা এসে গেছে। ইহিকে আন।’

একটি অশ্রুত মেয়ে—বহুর পন্থেরা বহন—হুঁকাশ চা নিয়ে চুকছে।

‘রাখ। এখানটার রাখ। আন্তে রাখ, ভাপরি যে। আ গেল বা, তোবে দেখতে পাম না। ফেললি তো চা খানিকটা। নে দেখে। আন্তে, হুঁটা হুঁড়ি-টুড়ি নেই বাড়িতে।’

‘আনি হুঁড়ি দাব না।’ আশক্তি ভাবাল দেখে।

‘না খারি না খারি। হ্যাঁয়ে, নিয়ে আর, তুই আমার হী করে লীড়িরে বইলি কেন, যা না।’

মেয়েটা চলে গেল।

‘ওরকম করে কথা বলিস কেন ওদের সঙ্গে।’

‘তবে কেনন করে বলল? বহু তেলে? হুঁ-বহু না বলে গদা বিয়ে ওটা ঠিক গড়ায় না। একটু ভোয়াবে বাকা বরকার তার জন্য। বইলে—’

‘হুঁতাই। ধার।’ মেয়েটাকে আবার চুকতে দেখে বলল দেখে।

মেয়েটি হুঁড়ি তেলে গেল—হুঁবাতিতে।

‘সে বা, পেঁগা-হুঁড়ি তোকা লাগবে।’

‘ভাবছি।’

‘কি ভাবছিল।’

‘সব। তোর কথাও।’

‘ভাবছিল, রমেনটা অবান্দ, এই তো! আচ্ছা তুই হুঁকে হাত দিয়ে সত্যি কথা বল, তুই ঐ বাচ্চাগুলোকে, হুঁ হুঁকে নিষ্কণি গিটখিটে বড়তে, কপড়তে, ভীল বকরের মোড়া—এদের বহন দেখলি তোর যা তিন খিন করে ওঠে নি। কয়েক, নিখো বলে লাভ নেই। অতএব ওদের মধ্যে থাকলে তুই

পাল হার যেতিল। এমন হুতা বাহ না, ওদের একটা অসুখে না পড়ে। কাঁদে সারা রাত্তির—ঘুমোয় স্নায়বশের সাথি। ওদের দেখলে আমার রাগ হয়।

‘তুই বিয়ে কর মনে।’

‘কেন, বিয়ে করলে ছেলেপুলে ভালবাসে? বিয়ে করলেও ছেলেপুলে খাতে না হয় তার চেষ্টা করব। দার যদি হয়, তাতে নিজের ছেলেকে ভালবাসতেও পারি, কিন্তু অন্য ছেলেকে বাসব এমন কোন কথা নেই।’

‘খাকগে, তুই বিয়ে করছিস না কেন?’

‘এই এদের জন্যে।’

‘উত্তেজনাটা কমিয়ে খাতে খাতে বল।’

‘খাড়া ভারলে চা মুড়ি খেয়ে নি। নে, তুইও যা।’

শেখর চায়ে চুপক দিল।

গমল বড় এস পূরে বিচ্ছিন্ন মূখে।

শেখর জিজ্ঞেস করল, ‘তোরা বোধহয় খিদে পেয়েছিল।’

‘অশ্যাই। তাতে কোন দন্দে নেই।’ আর এক চুম্বন।

বাগা চুপলে শেখর জিজ্ঞেস করল, ‘বিয়ে করছিস না কেন? কত দিন হয়ে তুই এসেছ, তবু তার তো হলো নেই।’

‘মুহুরমত হিসেব আছে। এগারো বছর সাত দান।’

‘তবে? কি করছিস?’

‘বসে আছি কাল গুনে। আমি বিয়ে করলে আমার সারা বৌদি এবং তাঁদের সন্তানরা না খেয়ে বেরে, আর ডিক্কা বিয়ে করলে ওর বাড়ী অবনন-ভিত্তি হয়ে পড়ে। বস্ত্রের আরও দু’তিনটা দিন থাক, সেখা থাক কি রকম ডায়, বেশি আবার আর্থিক দিক থেকে আরো একটু গল করে থাকতে পারি কি না, ইত্যাদি, ইত্যাদি।’

‘বাঘাটা শুন, আর্থিক দিক হয় তবে আর দেখা করা চিন্তা নয়।’

‘আর্থিক ছাড়া আর কী বাঘা হবে?’

‘কত রকম হতে পারে। শুন—’

‘শুন। শুন অবশিষ্টেই পারি না। হলে সন্ধ্যাটারই বীমাংগ করতে পারলে না, তা শুন। হুই নিশ্চয়ই শুন শাইকলটি পড়ি, তাই না?’

‘তা একটু ইন্টারেস্ট আছে।’

‘আমি শাইকলটি পড়ি না।’

‘বুঝ ভাল কথা।’

‘স্মৃতিকার হলো এখন প্রথম কবাবাত’। ঠিক হয়, তখন তার কিশোরী কথা সত্য শেষ হয়েছে, আর এখন সে প্রায় হুতা। এই মোটা কথাটাই চোখের সামনে এখন ভালে যে শুন কথা আর বাগা হয় না। শুনতাও তো একটা বিলাস হে, চারটি ভাল খেতে পরতে না পেলে কি বিলাস করা যায় হে।’

‘বান্ধব হোক, এবার বিয়েটা করে ফেল।’

উৎসাহ করে গেছে। এনসেম্বলটি জ্বাইয়ে রাখতেই এত শক্তি চলে গেছে যে আশ আর বিয়ের কথা মনেই হয় না। সত্যি শেষত, এই বাস্তবায়নের একঘেরে কর্তব্য আর বাট্মিনিতে আমি এখন ভগ্নি স্ত্রীর আর বিয়ত। এই তুই এল বলে দুটো হৈ চৈ করে কথা বললাম নইলে আমি ঐ বাচ্চাদুলোকে পাল দেওয়া ছাড়া বিশেষ কথা বলি না। ওদের পাল দিলে আমার উপকার, বিলাস কর। ওদের পাল দিলে বিরক্ত থাকি। পাল না নিয়ে চুপচাপ বসে থাকলে বেমন বিষয় থাকি। সেটা মনকে বড় বাঁধবে রাখে, ভেতর থেকে কূরে খেয়ে দুর্বল করে ফেলে। তাই রাগ-বাগবোজ করে একটু গা-ছাড়া দিই। অবশ্য ওদের ওপর যে শুন প্রশ্ন ‘আমি তা নয়। তবু আশ্চর্য’ ল্যাং, কীরকম নিশ্চিত কর্তব্য করে যাচ্ছি। স্নেহগার করে সব ঐ অন্তর পছন্দে গলে দিলে আমি ব্যোম তোলামাখ হয়ে বসে থাকি। তোরা খেতে বিয়ে বচি তো বাপ, আমার যা হয় হবে। শুন তোরা কথা করে বেশি ত্রোতাচেরি করি নি। আমার নাত আশকাল বড় অগ্রে অগহিক হয়ে পড়ে। আর একবার-কিশোরী-অশ্বনা-বুতা স্মৃতিকা, সেও কর্তব্য করছে। এইই আবারের এখন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। আমরা এখন আর বিয়ের কথা বিশেষ ভাবিও না। চলছে চলুক। ঠিক আশ সময় তেডেকুঁতে কিছু একটা করতে ইচ্ছে হয়, হাজার হোক মানব তো, কিন্তু উদ্যোগ নেওয়ার আগেই আমোদ কর্তব্য ও বাস্তবতার চোখ-গাঙ্গানি। আমরা অভ্যস্ত দুর্বল, অভ্যস্ত হীন রে শেষত। এ কর্তব্য করাতেই বা সৌখন কর্তব্য—তাও থাকে থাকে এর আসে। কিছু না! অনেক

বড় কর্তব্য তো করছান না। শূন্য এইটাই বা করছি কেন? এটা সহজে দেখে অত্যাশ-বশে হয়ে থাকে। নতুন কিছু করতে ভাল লাগে না আর—আর বোধ হয় বিবেক করতেও নয়। 'পুতুল' নামের ইতিবৃত্তা'র বানিকদ্বন্দ্ব, হুসুনের মূখে বলিয়েছেন, সোহা লাগতে গরম ছিল একদিন ছোটবাবু, তখন বা বলতে তাই করতাম, বা করতে চাইতে তাই পড়তে পারতে, আর সোহাটা বড় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ছোটবাবু। আমারও বোধহয় ঐ মশা। সোহাটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, শেখর। ঠাণ্ডা সোহাও একটা ক'র রে। আমিও একটা ক'র দিয়ে থাকি—অন্য হয়ে পড়ে থেকে। নড়েচড়ে আর কিছু গড়তে পারব না আমি। আমি কেনম যেন হয়ে গেছি যে শেখর। ঐ বেয়াস-বকাবকা ক'র, ওটা শূন্য বিরক্ত-স্রাতি থেকে নয়, ওটা অনেক সময় ইচ্ছে করতেও করি। ঐ সময় একটু মনে হয় যে বেঁচে আছি।'

একটু থামল রমেন। হেসে বলল, 'বাচ্চলে, একটা ছোটখাট বক্তৃতাই দিয়ে কেলদান যে।'

'থাকিস নেই ভোর আর।'

'আছে।'

'যা'বি না?'

'গুলি বেয়ে মোর ভায়েছি। সেই ছাত্র অবস্থায় আমার। যখন টুইপনি করতাম, তখন এক আবেগিন আভ্যার বেগি হয়ে গেলে টুইপনিতে ফিরকম গুলি করে দিতাম মনে আছে।'

'আছে। অকসেসে গুলি মেরে দিচ্ছিল কেন?'

'ভোর অনারে।'

'না, বরকার নেই। টুইপনিতে গুলি করলে টাকা দেয়। অকসেসে গুলি মারলে অস্বস্ত ক্যাঙ্করাল লীড নিহত হবে। তাছাড়া আমার আরো কয়েক বাফার বেনগর করতে যেতে হবে।'

'ভোর ভেতরে, শেখর, বাফার একটা কাঁচখোটা লোক হয়ে গেল। না, তুই একটুও গিভিসাফু' বলি না। বা, সোয়ার বা, আর আমি থাকিসেই বাই এখন—'

চন্দ্রনা

আমি থাকি। তোমার কাছে। কত ছোরে তোমার কাছে থাকি তুমি আনো না। আমি আরো ভাড়াভাড়া

দেতে চাইছি। আমি আমার মনকে ওখা কঠিরে দিবেছি, শৌখে দিবেছি তোমার কাছে। তেরনি ভাবে যদি আমি দেতে পারতুম! তাহলে আমি এখন তোমার ঘরে গিয়ে তোমার মৃণ্মুখি দাঁড়িয়ে। তুমি আকর্ষ হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছ। তুমি দায়বণত কম আকর্ষ হও—খসড়া এখন। কিন্তু আকর্ষ হাওয়ার সেই বিবল মৃদুত'প্লেতে তোমাকে আকর্ষ শূন্য দেখতে লাগে। তোমার চোখে তোমার শৈশবের ছায়া পড়ে, যে-কোন আমি দেখি নি। আমি দেখেছি কৈশবের শৈশব, তখনও তোমার চোখ-মুখে শৈশব লুকিয়ে ছিল।

সেই শৈশবকে তোমার কতগুলো বিশেষ মৃদুত'ই ছাড়া পাওয়া যায়। তার একটা এই বললাম। আরো আছে। সেই মৃদুত'গুলো আমার মৃদুত। তুমি নিজেও জানো না তা।

ট্রেনের এই কাহরার একটি মেয়ে থাকে। কান্ট' ইয়ারে পড়ে। বেশ মৃদুত'—স্বাভাবিক ও শব্দী; তার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তার সঙ্গে কথা বলে ঐ বয়সের দিনগুলিকে বুঝি। বেশ হাসিখ'শী ও বিলখোলা মেয়ে। অনেক গল্প করল। ওর বাবা-মা ছিলেন বান'ল। বুকের সময় চলে এসেছেন। তাঁদের কাছে ও বাবা'র স্ক্রু গল্প শুনবে। আমাকেও তার কিছু মগ্ন শোনাল। আমি চুপটি করে সব শুনতে তারপর বললাম, 'ছোটবেলায় আমিও বাবা'র ছিলাম।'

'ওমা, তাই নাকি।' কী কিম্বদ আ উল্লাস।

'ওখানসেই জন্মেছি। বিদেশের কোলে।'

'মৃদুত আছে তাই?'

'থাকত না, যদি দেশের কোলে ধ'ই হোতো।'

'পাটনা ছেড়ে কোলকাতার চলে যান না।'

'বেদান্তে পারি না।'

'সে কি। বাঙ্গালী হয়ে কোলকাতার বেদান্তে গায়ে না?'

দুসল মেটো। দহক। ত্রিক ওর বয়সের বড়। আমার ঐ বয়স ওর থেকে বেশি-বয়সী ছিল। এক প্রহল' আঘাতে আমি হঠাৎ বড় হয়ে গিয়েছিলাম। কুঁড়ির ভঙ্গর ছোরে চাপ দিলে কেটে কুটে যায় সেটা।

'আশনি বাবা'র ছিলেন তা বলেন নি কেন—আমি

হাস্য'র গল্প বলার দল'।

'পুনঃস্থান ।'

'আমি না দেখেও বলে দিতে পারি আর্পান ছোট
বেলার ধুবুড়ী ছিলেন ।'

হালদা । হুঁহুনেই ।

'তোমার বাবা-মা তো দুজের অল্প পরে নিরাপদে
দলে এসেছিলেন । আরও এনেছিলেন আরো পরে ।
তখন দুই বান্দার ওপরে হুঁহুড়ি খেয়ে গড়েছে ।'

'এলেন কি করে ?'

'হুঁহুড়িতে হুঁহুড়িতে ।'

'সবটা সত্য ?'

'না, বাবিক হুঁহু আশ্বাসের পর গোটাছুত ছাঁক
পড়েছিলেন । তারপরে ট্রেন । সারাদিন হয়ে আমরা
জিভান—হল বেঁচে । বনের সাতা হয়ে । রাত্রে একটা
দুনিখে নত গরগর দেখে ডেরা গিয়া যেতো । রাজ্যেভেই
হাস্যর একটা ছোট ভাই হয়ে যায । বাবা-মার শোক ও
স্বপ্নের ভাবটা এখনও মনে পড়ে ।'

'বাবা-মা বেঁচে আছেন ?' মেয়েটা দলে ।

'মা আছেন ।'

'বাবা ?' আবায় প্রশ্ন করল ।

'বাবা নেই ।'

ওর একাধিকবার প্রশ্নে আমরা ভেতরেও উত্তরটা
ক্যাঁচকি বার বাজতে লাগল । নেই, নেই, নেই ।

আমার মনের চোরাচাটী বোঝার পালটে গিয়েছিল ।
চলু করে দিল । নিশের হুঁহু মেখেতে পাচ্ছিলেন
।। কিন্তু বনটার অনেকগুলো ছবি পর পর হুঁহুত খেলে
গাছল, তার একটা ছায়া হুঁহু পড়া আচ্ছন্ন বর । আমি
সই ছবিগুলোর বিকেই তাকিয়েছিলাম ।

বাবার ছবি । বাবাকে খিরে অব্যাহা ছবি । বান্দার
লা-প্রসন্ন কর্তৃক বাবা । বাংলাদেশের পথে পথচারী,
খিঁচ, লজ্জারদির অন্য হুঁহুত-প্রসন্ন । বাংলাদেশের
টিটিকে মনে করতেন স্বপ্ন—বর্ষাদিগি পরীক্ষণী । এই
টিটিকে পা খিরে হুঁহু আঘাত পেলেন—লোকে আবায়ের
লজ বান্দার আত্মপ্রকাশ, তেজুজি । তখন আবায়ের
চক্ষুকের অবস্থা গাতি, কিছু আদ্যা সেলে খিরে
গেছি তো, আবায় তো বাইরের লোক আদ্যের অন্যে

অন্যে আদ্যি নি । কে গোনে সে কথা । আবায় তেজুজি ।
বাবা বিকৃত, ক্রুদ, সেনান্ত' ।

তবে তেজুজি পতিচরিতা আবায়ের নামের সঙ্গে হুঁহু
বেশি দিন টেকে নি । বাবারও মেজাজটা ক্রমে ভাল
হাচ্ছিল । আর্থিক হুঁহুত-প্রসন্ন চলছিল হুঁহু, সে-খাট বস্ত
হয়েই আভাল করা হোক না একটু-আবুত; আবায় টের
শেতাব । তন্ম বাবা যে বেশে খিরে এসেছেন এই
আদ্যেই হুঁহু ছিলেন ।

ক্রমে বাবা একটু স্থিতি পেলেম চাকার—তার
হাত-ভুড়িতে, তার শিউপাতিভারের বেশে । চাকা দ্বারে
একটা চাকরি নিজে তিনি সংসার পাতলেন । তখন বাবাকে
কোলকাতার পাঠানো হয়েছিল গুডে ।

তারপর বেশ স্বাধীন হোলো, এবং বেশবিভাল
হোলো । রাজনৈতিক নেতার উত্তর বেশে রাজত্ব করতে
লাগলেন । একটা অস্থির অস্থা চলছিল । রাজনৈতিক
জগতে বেঘোবেখিরে । সাম্প্রদায়িক ধুনোখুনি-হলে দলে
লোকের স্বেচ্ছাঙ্গণ । চারিদিকে একটা ধন্য-করা
আশংকা, আর ভয়ংকর হকমের অনিশ্চয়তা ।

এই রকম সময়ে এলো সেই কালো বাড়ি । কাল
নাগিনীর হত । আবায়ের বাড়ী আক্রমণ হোলো ।

সেই ঘর, শেখ, যে ঘরে এসে জুঁহু বসেছিলাম, যে
ঘরে কতদিন খেলেছি বসেছি হুঁহুত, সেই ঘরেই এসে
উপস্থিত হোলো আক্রমণের মেহমানীসৈনিকরা । বাবা হুঁহু
অবস্থায়ও হুঁহু গাঁড়লেন । একটা মাঝারি গোয়ে
ছোরা বদলে উঠে বাবার ঘরের বহো হুঁহুতের অন্য
দুঃখ হয়ে গেল । হুঁহুত পরে এখন ছোরাটা বেরিয়ে
এলো তখন তার উচ্ছলতা বণ্ট হয়ে গেছে । বড়ো
ভোঁতা, লালচে । লাল লাল কিছু করে । বাবা
'ওঃ' বলেই সরেতে পড়ে সেটের ওপরটা ঢেপে গুঁড়ক
করলেন । যেহেঁটা লাল হয়ে গেছে ।

ততকালে নামে এসে গাঁড়িয়েছে হাল । পেলে
যেহে একটা লোহার হুঁহু লজ্জাতে তার বাবার
পড়ল । আর ঐ ছোরাটাও হুঁহুতো তাকে 'শপ'
করাছিল—কিছু সে আর দেখতে পাই নি, আবায়ের
ওপর আক্রমণ হুঁহু হয়ে গেছে ততকালে ।

তবে ওরা টাকাকড়ি ও স্মিথসনের ওপরে লজ্জা

ছিল। সেইগুলোকে নিয়ে ওরা চলে গেল। দাঁড়িয়ে সেল দে আবার আসবে যদি না আমরা বরখাস্ত হইতে চলে যাই। বাদল সরাসরি তাক্সি ছিল ওদের।

আমরা মেয়েও লাঠি হইতাম। চুড়ার আকারে নয়। বগু বিছিন্ন আকারে। লালদার সোন্দর গাওয়া আমাদের গায়ে তার স্বাক্ষর রেখে গেল। জলতে লালদার আমরা। সারা চেহে হয়ে আমরা জলদার। শেষ, কিন্তু ট্রাকতে পারলাম না। 'চাকার মেয়ে' বলে আমাদের একটা সৌন্দর্য আছে। পর্ব করে থাকি আমরা ও কথাটা বলে। সে পর্ব দু'দলের পুঁকির সেল। কেন হারতে পারলাম না। কেন হারতেও পারলাম না—বাহার বড়, বাবার বড়।

মুহুরের মধ্যে কতক বড় ঘটনাটা ঘটে গেল। কেন বেঁচে উঠলাম। বেঁচে থাকবার কী রকম, এ প্রশ্নের এর পরেও কী হলো। হানু'র বে মূল্যবান, তার বর্ষা বা অধিকারের কোন দায় নেই, সে সুস্থ বা পেরাল বা হুজো একটা রাতির চোলা। সেই রকম হানু'র হয়ে বেঁচে থাকাবার সোভ ও কাপড়বুড়ো নিভাই আমরাও যথেষ্ট আছে, এ কথা তেঁর নিষেধে বুঝা করলাম।

যথাকালে, অর্থাৎ তিনা ঘটে বাবার পরে পুঁদিল এল, জানতে চাইল আমরা এখানে থাকতে চাই কি না। ভাবে লক্ষণ বলল যে এখানে থাকটা ভেদন নিগারন নয়। পরের কথা পরে। এখন রাতিগুটা আমরা কোথায় থাকব—তাও বিজ্ঞান করল।

না ওখানে থাকতে রাজী হলেন না। আমাদের একটা কুলে—আরো অনেকের সঙ্গে রাখা হলো রাতিগুটা। না বললেন, 'এই রাতিগুটা আমরা এখানে শেষ।'

শেষ কপর্দক দুইয়ে এয়েগেনে আমরা কোলকাতার পৌঁছলাম। আর একবার আমরা তিখিরি হলার। দেবার তবু বাবা ছিলেন আমাদের বাবার ওপর। এয়ার বা আর আমি, আর কতগুলো ছোট ভাইবোন।

বা শোকে লালদার কয়েক দিনের মধ্যে বড় হয়ে গেলেন, আর অত্যন্ত পশ্চরী। সবসঙ্গে একটা হু'র নিয়ে বা মেয়ে সব সময় কি ভাবছেন।

নব রাতিগু এনে পড়ল আমার ওপর। আমারও

শোকে অত্যন্ত ছিল, লালদার দায় ছিল, কিন্তু সে দিকে তাকাবার দর নেই। না। কলকাতার ছোট্ট আমি তখন এই মেয়েটির মত, যে এখন জাদুঘর হাতের ওপর চিবুক রেখে পুঁর নিসহরবার দিকে তাকিয়ে আছে। দাঁড়া করছি না ওকে। পুঁর ওকে নেমে আমার সেই বিন্দুগুলোর কথা মনে পড়বে।

দিকির আগেই বিয়ে হয়েছিল—কোলকাতার। জামাইবাবু এবং ওঁদের বাড়ির সঙ্গে আমাদের একটা খটাখটি ছিল—দিকির বিয়ের সময় থেকেই। না অনিন্দ্য সজ্জাও কয়েক দিনের মধ্যে ওখানে উঠতে বাধ্য হলেন।

না কথা বলা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এসে দু'র খুলে বললেন, 'চাকার চোটা বর।'

চোটা চলছিলই। আরো কোলকাতার কথা হোলো। জামাশুনো এখানে এত কম যে কোথায় চোটা করি। বাই হোক একটা চৌপাশের 'স্কুল-বাস্তব' দেলাম—নিজের জ্ঞানীয় জ্ঞান। আমার বিশেষও দিক, দরেক। না বললেন, 'এখন থেকে অন্য কোথাও যাব।'

আমি বললাম, 'এই টাকার চলবে কি করে।' 'চালাতে হবে।'

হাওয়ার দিন জামাইবাবু'র কেউ অসুখী হোল না। দিকির পুঁর আঙলে আমার হাত হয়ে কটিল। বলল, 'আমি যদি ছেলে হতাম, তাহলে—।'

আমার চোখেও একটা জল এলো। বাবার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল আমার। একটা বেহমান সৌরবে আমার হু'র ভরে উঠল। বাবার কাছ আমি করছি : বাবা, আমি এখন আছি, তখন আমার ভাইবোনেরা তোমার ছেলেমেয়েরা না যেতে সরবে না, ছুঁনি জেয়ো না। লাবা ও দিকি—ওদের কাজও আমি একাই করছি : গাদা, কোথায় তুই এখন, দু'র পাল না কেন আমাদের কথা ভেবে, আমরা ভাল আছি, বড়ন করে আমার আমরা দু'র করছি।

এসে উঠলাম এক রেক্ট্রীক কলোনীতে। খুঁটি কলোনী, ক্যাক-বিছিন্ন, কু'রাত', নোয়া। কু'রাতা আর বাবা দু'রতি' সেই দু'রোমে এসে বাসা বেঁধেছে। ওরা আবারই। দু' দিনে এক হয়ে গেলার। শোকে আমাদের রেক্ট্রীক বলত—এই বাংলাদেশেই। বাবা,

হুঁসি'র'তে শেহ, নীলে তুমি আমার রেণে উঠতে
—সেই তোমার দল কোথায় !

জানি হুঁসি একটা দল অর্থাৎ টাউনশিপও দল
হল। 'হুঁসি'র'তে আর উঠতে—বলু ক্রমে। কিন্তু
সেই ক্রমের পৌরস্ব আমার শোক ও দায়ে পুরোনো
দায়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গের কাজ করেছিল।

বিপুল সংগ্রাম ছিল অন্য একটি ক্ষেত্রে। প্রতি
দুইতেই হুঁসি ও সমাজ-বিচ্ছিন্নতা এই কলোনীতে
সময়ের মধ্যকার নষ্ট করে, তাকে টেনে নিতে আমার
দীর্ঘ দীর্ঘ সেইটাই দ্ব্যর্থবোধক বলে বোঝ করে।
সেই অস্বাভাবিক 'স্বাভাবিকতা'র বিরুদ্ধে প্রতি হুঁসিতে
সংগ্রাম করছি—ছোট ছোট বোম্বেরে বন্ধা করার জন্য।
সে এক হুঁসির সংগ্রাম। এবং হুঁসিটা পুরোটা জিতি
ন। কেতা দলবদল নয়। ওরা আসেই।

টোপোগ্রাফী চাকরীটা এখন দল চলে গেল।
এ এসে থেকেই নানা হুঁসি তোমার খোঁজ করছিল,
সেখান। হুঁসি দিদি এই এক দল কোন্ এক
দুই বোম্ব দল জামাইবাবু পার্শ্বচলিত মল্লের মাধ্যমে
—তোমার স্থান দিল।

সেদিন একদিন তোমার কাছে। চাকর সে
দলের পর এই প্রথম। তুমি একা তোমার হয়ে বলে
ছিলে। তোমার হুঁসি প্রথম করছিল। কী এক
দুর্ভিতা এবং অস্বাভাবিক তোমাকে ভেতর থেকে পীড়ন
করছিল। তোমার হুঁসি মাকে মাকে কঠিনে কিছু
একটা ভেবে নিচ্ছিলো। আল্পসদৃশ্য এক এক মর
অস্বাভাবিক দেখছিল। তুমি তখন 'অস্বাভাবিক' ছিলে।
কুকেই বুললাম। আমি বাইরের শোক, হুঁসি বাইরের
শোক। তুমি অনেক দূরে অস্বাভাবিক আছো। লক্ষ
বুললাম, তুমি আমার সেবে চিনতে পারলে না।
পক্ষি দিলাম। চিনলে। শেষ দিকে দাওয়ার দলে
তোমার হোপাওয়া ছিল না। তুমি তোমার স্বাধীনতা
দিয়ে প্রমত্ত ছিলে। তাই এদিকের বর কিছু জানতে না।

বললাম বর। হুঁসি। দর্শনশাস্ত্র। অজ্ঞের নাম
কঠিনদ্বারা ভীতস্বস্ত্র আসামীর শাক্যের মত।
তোমার মনের প্রতিভা কি বর হোল তা বুলতে
পারলাম না। অস্বাভাবিক ও দর্শন তোমার সেহে

এহিতে এহিতে দান্য বেরে ছিল। তাহের সরে
আমার কথাগুলো কতটা হান করতে পারল দলেই ছিল।
সেই বললাম, 'চাকরী হুঁসি একটা।'

কী বের ভাবলে! বোঝা দল কিছু উপায় করে
উঠতে পারল না আমার জন্যে।

তাড়াতাড়ি বললাম, 'বলে রাখলাম। বর সেলে—'
'বর সেলে! না, আমাকে কিছু করতে না
পারলে অস্বাভাবিক।'

আমার অস্বাভাবিক ভেবে বটেই। তুমি একটা কাগজের
পাতা মোচড়তে মোচড়তে ভিজিয়ে করলে, 'কী বরনের,
কাজ করতে চাও তুমি?'

'বে কোন কাজ?'

'নাশিৎ?'

পেপাটা দলকে ভাবা ছিল না, পোনা ছিল।
নানা কিছু। ব্যাপারই বেশি। একটু ইচ্ছা করলাম।

'জানি—এ পেপাটার অনেক অস্বাভাবিক আছে।
তাহা দ্বারা বাড়িতে তোমার মরও নত হয়ে কি না জানি
না, অন্য দলকে সেলে না হয় কোরো না। আসাও
আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি আমার এক ভক্তের
বলু কাছে। বাড়িতে মার মত হলে চিঠি নিয়ে
তার সঙ্গে দেখা করলে সে, আসা করছি, তোমার
একটা ব্যবস্থা করতে পারবে। মার মত না থাকলে
এই চিঠিটা দিচ্ছি কলো—দলে রেখো না।'

আমি চিঠিটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম,
'যা করি আমাকে জানাব।'

'আপনি' বললাম। আমার মনে 'আমি তোমাকে
'তুমি' বললাম, কিন্তু তখন উচ্চারণ করতে পারলাম না।
তুমি বললে, 'না। এখন মাস কয়েক আমার সঙ্গে
দেখা কোরো না।'

আমত হয়ে বেরিয়ে এলাম, প্রায় কাহা পান্থিল।
ভরকের কঠিন মনে হচ্ছিল তোমাকে, আর অত্যন্ত
উদাসীন, দূর। মাসও হচ্ছিল : কেন সেলাম।
ভাবলাম, মার না ঐ ভক্তের-বলু কাছে।

কিন্তু সেলাম। মাসিং—এ 'দ্রোণী' হিসেবে কুকেও
পড়লাম এক হাসপাতালে। কয়েক মাস পরে দেখাও
করতে সেলাম একদিন তোমার সঙ্গে—দলকার মাঝে

কোনো দোষ-দুর্ভাগ্যজনিত, অথবা আর কোনো
 চানে কে জানে।

পরে শুনলাম, জুনি কেসে। কার্য-সাময়িক।
 কিছুটা বৃষ্টি। পরটা নয়। তোমার ওপর থেকে
 রাস চলে গেল।

আর আট বটা গাড়ির গাড়ির কাজ করে বসন
 নার্সিং কোর্সটারে এসে পরম জলে পা জুঁবিবে
 কালকের মধ্যে পা বড়টাকে ঠেঁকী করতাম, কিংবা
 সিলিং-সীটে বসে বসন নিজের কাছে নিজেই বসে
 বসতাম, অথবা গভীরে বা-ভাই-বোনদের সঙ্গে
 দেখা করার জন্যে বসন বাসের একটা প্রান্তীয় সীটে
 বসে চলমান হাজার দিকে চোখ মেড়ে দিতাম, তখন
 তোমার ঘণ্টার কথা মনে পড়ত-যে-থরে আমি আর
 একদিনই গিয়েছি, আর হয়তো কোনদিনই যাব না।
 ঘণ্টা ছাড়িয়ে গেছে আমার জীবন থেকে। বালি বনে
 ছা বটা ভাল করে দেখা কর নি। বস্তুর মালিকের
 কর্তব্যে অজ্ঞত বসকে ছাড়িয়ে এখনভাবে কেসে ছিল
 যে অথ কোনো দিকে কিছু দেখা অসম্ভব ছিল।

সামান্য বনে আছে। ছোট একটা বিমানও ভু
 করা এক প্রান্তে। মেঝের ওপরে কতগুলো বই ও কাগজ
 —টোবিল আলমারি উপরে ওখানে ভু হয়েছিল। চেয়ার,
 বসে ছিলে জুনি। একটা পা সামনের দিকে টান করে
 দিয়ে। বাঁকে বাঁকে সে পা-টা কীপাঙ্কলে—অস্বস্তিতে
 অথবা চিন্তায়। আর তোমার পা-র সোজা একটা দূরে
 গাড়ির ছিল সেই লাইট স্ট্যান্ড-টা। দীর্ঘ তথ্য চিত্র
 একটা স্ট্যান্ড। বস লম্বা। ছোট একটা পায়ে বস
 কাজের বস। তার মাঝে একটা আলো। আলোকে
 ঘিরে বস একটা দূরের কাজ তথ্য আলো ঢাকনি—ছোট-
 বাটো একটা ছাটার বস। হালকা একটা আলোর আভাস
 ছড়িয়ে ছিল এই আলোর পাছটার চারদিকে। সেই
 বস্তুর পরিধির মধ্যে পড়োছিল তোমার অনেকখানি
 দেহ। আর আমি গাড়িরে ছিলাম তোমার পাশে,
 একটা পেছনে, বস্তুর বাইরে। সেই আলোর গভীর
 পাছটিকে ঘিরে রেখেছিলাম।

আমাদের চাকার বাড়ির পাশে লম্বা একটা শিউলি
 গাছ ছিল। পরতে-বাঁচি এখন সবচেয়ে ভালের শব্দ

আর ছাড়িয়ে গেল—কুন্দের উৎসব দেখে যেত।
 ফুট, কবুত, লাল। পায়ে: তলায়। গল্প—এ ওপর
 নিচের লাল বস্তুরে পেঁচিয়ে নানা দিকে ঘুরে চলে
 যেত গভীর বীথন শেরোনার উল্লাসে। সেই পাছটা
 জ্যোৎস্না রাতে আলোর গাছ হয়ে যেত।

সে আলোর গাছ ঐ আলো গাড়ির পরে কার আমি
 ভাল করে ভাবতে পারতাম না। জানলেই লালার গায়ে
 লাল-লাল কালো-কালো দাগ হয়ে যেত। সেই গাছ
 আমার শৈশব-বৈশাখের সঙ্গে এক হয়ে ছিল। যৌবনে
 সে দূরে চলে গেল। তাকে আর করতে পারতাম না।

তোমার ঘণ্টা আমার বনে কি এক বাতাস হয়ে
 আছে। সেই গল্প আর শৈশব, শিউলি আর জ্যোৎস্না,
 কুল আর আমি, গাছ আর আলো, হালকা লালার
 গভীর আর আমার নিঃসৃত যৌবন, তোমার অজ্ঞতা
 সত্য দূর আর আমাদের বাড়ির সেই বস, তোমার
 বৈশাখের জুপ আর আমাদের বাড়িতে তোমার প্রথম
 আদা সন্ধ্যা—সব এক হয়ে নিশে যায়। এসো-মেলো।
 ছেতনার আর এক প্রত্যন্ত-ভল। শিউলির গভীর
 যেখানে তোমার প্রানের বস গড়িত।

শেষ

হৃদয়ের কথাগুলোকে শেষের উপটে-পালটে মেড়ে-
 চোখে দেখছিল, বায়োটা বহর। শূন্যের বাসে রতেন,
 লিভিঙা। ওসের বন। অশ্লীলতা। সেই শূন্যতন
 অত চিরন্তন কথা। চটকল-বস্তুরের অর নয় শূন্য,
 বসায়িতের যৌবনকেও বসব করছে নিশ্চয় হাতে।

হাতা দিয়ে হঠাৎছিল শেষ। কোলকাটার হাতা।
 কঠিন, নিশেট। দু'পাশে আকাশ-ছোঁয়া প্রাণায়ের
 গাড়িরের মধ্যে এক একটি গভীর গাছ।

আর্থিক দরদায় কি হুঁদীর এত বেশি যে তাকে
 সেনতায়ী হতে হবে! ও তো বলল যে এটা নিজের
 ইংটারভদ্রা হাত। তবে কেন তার পায়ে শেষের
 প্রদল আর্থিক দরদায়কে একদিন পেঁচিয়েছে চন্দা।
 এহার ওপর একটি পরিবারের দরদায় বসে করেছে।
 শৈশব-বৈশাখের শেষেরও দূর বস দরদায় পেঁচিয়েছে।
 'আরে শেষের ভাই যে!' চটকলের হঠাৎই বস

এবং ইউনিয়নের পরিদর্শন কর্মী সম্মান আদায়।
শ্রুতগৎ শ্রদ্ধা। মৃত্যু কীট-পাতা দাঁড়ি। সামান্য
অক্ষয়মান ছিল আগে। এখন বেশ শ্রুতগৎ-শ্রুতগৎ
পারে। শ্রুত কর্ম-শ্রুতগৎ। মৃত্যুরা নামে শ্রুত।
মৃত্যুরা নামে কর্মী সে একজন।

‘আরে সম্মান বো। এ দিকে?’

‘এসেছিলাম শ্রুতগৎ দাঁড়ি। তবে মৃত্যু নয়, মৃত্যু।’

‘ও মৃত্যু!’—কিছুক্ষণ কলম শ্রুতগৎ।

‘মৃত্যু বিবি জানো তো?’ হাসল সম্মান আদায়।

‘হা নিয়ে তোমার সঙ্গে মৃত্যুর কলম! মনে
আছে তো?’

‘হ্যাঁ। শ্রুত মনে আছে।’ ভারত সরকার এখন
‘এক বিবাহ’ আইন প্রবর্তন করেন, তখন শ্রুতগৎ বলত,
‘এক-বিবাহ আইন শ্রুতগৎ হিন্দু নব, মুসলমানদের ক্ষেত্রেও
প্রযোজ্য হওয়া উচিত ছিল।’ ভারত সরকারের দৃষ্টি
ছিল: ‘বিবাহ বর্ণীয় ব্যাপার। রাষ্ট্র হবে হাত দিতে পারে
না।’ শ্রুতগৎ মত ছিল: ‘বিবাহ সামাজিক ব্যাপার।’
ভারত সরকার অবশ্য শ্রুতগৎ কথার কপ-পাত করে
নি। তখন এই সব নিয়ে আলোচনা হতো। হিন্দু
সমাজে ‘এক-বিবাহ’-এর চিন্তা উদ্ভবিত পতনের
গোড়ায় দেখা দিয়েছিল, মুসলিম সমাজে এখনও বিশেষ
আলোচনা, এবং অন্য সমাজের লোকেরাও এ সম্পর্কে
কথা বলে না, কারণ ওটা বিশেষ ধর্মের ‘বয়োব্রত’
ব্যাপার। ব্যাপারটা যে সামাজিক, এই মত কথাটা
বলতেও বিধা প্রভ। এটাও এক ধর্মের সাম্প্রদায়িকতা,
কাল সম্প্রদায় সংস্কারের কাছে মত বিকৃত হচ্ছে।
শ্রুতগৎ দেখে, মুসলিম সমাজে—এখন কি শ্রুতগৎ
মধ্যেও মৃত্যু বিবাহের বেশ সম্মান আছে। বসে
শ্রুতগৎ মুসলিম মেজাজে সে জানে বরষা ‘মৃত্যু-
বিবাহিত’। তখনও মধ্যে মৃত্যুও এটা কলম,
তার কারণ কিছুটা মন-বৈতিক, কিছুটা অবশ্য
অপ্রশস্ত-চিন্তা। সম্মান আদায় সঙ্গেও তখন এই নিয়ে
কথা হয়েছিল। আসলে শ্রুতগৎ মৃত্যুতে চিন্তা করত
ব্যাপারটা। সম্মান এই সব প্রসঙ্গে কেন বেন একটু
বিত্ত বোধ করত, মত্যু করেছে শ্রুতগৎ। বলত,
‘মেয়েদের আশা না থাকলে মৃত্যু কেন আশা করবে,

শ্রুতগৎ তাই?’ এ কথাটার পালটা শ্রুতগৎ অনেক
দৃষ্টি ছিল। সম্মান ঠিক এটো উঠতে পারত না,
শ্রুতগৎ হেসে বলত, ‘শ্রুতগৎ তাই, মৃত্যু মৃত্যু’ তিনটে
বিরে করতে পারব না বলে হিংসের এত কথা বলব।’

আজ সম্মান বলত, ‘তোমার কথাই ঠিক। বিরে
একটা কথাই ভাল, যা একেবারে না করা মৃত্যু বিবাহকে
তো আগেই তার বাপের দাঁড়ি পারিবে।’ আজ ছোট
বিরে মৃত্যু তার বাপের দাঁড়ি রেখে এলাম।’

মৃত্যুতে আসের সব তত্ত্বসমূহ চিন্তা বিশদ হয়ে
পেল। সম্মানদের মৃত্যু এখন শ্রুতগৎ বড়। পাটকলের
বালিকা কীট পাটের শ্রুতগৎ মৃত্যু হাতে লোক
হুটাই করেছে। সম্মান ইউনিয়নের কর্মী বলে তার
ওপর দাঁড়ি রাপ ছিল। সম্মান হুটাই করে গেছে
অনেক দিন। পাটের শ্রুতগৎ কথা সরকারও শ্রুতগৎ
করে না, কিন্তু তাঁর চান্দ্র হাতে তারা অসার।
সম্মানদের ব্যাপারটা কিছুটা শ্রুতগৎ বলে এটা সেবার
টাইই-মৃত্যুতে পারিবে হয়েছে। কিন্তু সে বাসনা কলম
হতে বিবি মৃত্যু কলম-কলম-কলম নিয়ে অসার হয়ে
যাবে। তাই এই আশা-কালীন ব্যবস্থা। শ্রুতগৎ-
শ্রুতগৎ। সম্মানকে বেশ বিম্বই দেখাচ্ছে। তাকে
কলমের মত কথা এই মৃত্যুতে শ্রুতগৎ কিছু মৃত্যু
পেল না। তার যে-কোনোটা সঙ্গে নিয়ে ভাল করে
ছোড়া লাগে নি, সেই জীবনের একটা অংশ
তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বলে। এতকাল সে
অন্য চিন্তা-ভাবনার মধ্যে ছিল। এখন এ মৃত্যু
এক জন্ম। তাই সে জন্ম, অক্ষ তার মৃত্যু, একে
বরষার জন্ম তত্ত্বসমূহের মতটা প্রভুত, কার্যত
ততটা মৃত্যু। তার এ মৃত্যুবিবাহের কথা সে অনেক
দিন থেকে জানে। এই মৃত্যুতে মৃত্যু-কলম-কলম-কলম
কোন কথাটা আসা উচিত শ্রুতগৎ জন্ম, যা মৃত্যু
কোন কথাটা জন্ম করে কলম উচিত, তা সে মৃত্যু
পেল না। এমনিতেই আশা-কালীন জন্ম তার কলম
আসে, এমনি সঙ্গে ব্যবহারে একেবারেই আসে না
আনতেও চার না সে সেটা। মনে মনে, সেটা এক
বরষার জন্ম। তাছাড়া মৃত্যু-কলম-কলম-কলম
মৃত্যু এ মৃত্যু তার নিয়েও যোতো, তবে মৃত্যু

চলে । ননী চাটুকে। এখন চলে গেল, তখন ইউনিয়নের
অস্থির বিপদ হবে পড়েছিল । আত্মরক্ষাতিক রাজনীতির
আঘাতে মালার কন্যা এখন হতান বৈধিক,
হুজোরাম । ননী চাটুকেরও লেগেছিল সেই দাফা ।
ননী চলে গেল, বলে গেল, ‘একটু ভেবে নিতে হবে,
নইলে কিছু করতে পারছি না,’ শেষে নিজের চোটে বর
কোরে যায় নি । বাই-বাই করেও অভ্যাস বশে বর
আছে । কিছু প্রবন মৌবনের উৎসাহ নেই । ভবিষ্যৎ
দৃষ্টিকে আছে বড়, সংগ । আসের প্রেমা এখন
জিমিত, অব্যবিত । রাজনীতির কথা ভেবে তবুটা
নয়, বড়টা এখানকার মানবসুলোর জন্য সে এখানে
গরে গেল । অত রাজনীতির চিত্তির ওপরে কন-
প্রাস না হাঁড়ালে নিছক শূন্য ইচ্ছা তকে কতদিন
জিকিয়ে রাখবে, এখানে থেকে বিচ্ছিন্ন হবে সেলে সে
হাঁড়াবেই বা কোথায় ! কৈপোর থেকে জীবনের
অবলম্বন বলে যাকে বয়েছিল, তাকে হাড়া মর্জিল ।

‘শেখর ভাই, এখানে ঐ ইউনিয়নের অফিসে তোমাকে
বেশ চিনতে পারি । এখানে এই কোলকাতার ভেতরে
তোমাকে অব্য রকম লাগে ।’

‘তাই নাকি ।’ আত্মব মালো শেখর, জিজ্ঞেস
করল, ‘কি রকম লাগে ।’

‘কন্য রকম, একটু আলাদা, কথা বললে বা হাসলে
ভব, অনেকটা এক । চুপ করে থাকলে একমুখ আলাদা,
মনে হয় জুপি যেন শব্দ ভাব, আর শব্দ পণ্ডিত । কোন
ইচ্ছার মাস্টার—না কোন কলেজের প্রকেশার মনে হয় ।’

‘সে কি । আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে এই
মর ভাবাছিলে নাকি । কি সর্বশূন্য ।’

‘না । সোজা একটু ইরে বয়েছিল । তারপর—’

সে আলাদা । রমজান টিই বসেছে । শেখর
জানে । সে চেষ্টা করেও এক হতে পারে নি । সে
ইউনিয়ন অফিসে গিরে হাট্টা অবধি কামড় তুলে বলে ।
বিড়ি ধায়, এমিতে ঘণ্টা তার ব্রহ্মপানের বেনা নেই ।
বেন উচ্চ কণ্ঠে শ্যাতাবিক ভাষায় ধার সঙ্গে কথা বলে ।
এ সংপর্কে সে সন্তোষ থাকে । আর এইখানে, এই
পাটের-কোঁসো-গুড়া আকাশ থেকে বুরে, লজা নগরে

তখন সন্তোষতার চিহ্নমাত্র মনেতে থাকে না । কলে
সে পাল্টে ঘান, বা শব্দে করে আসে । রমজান
যেন বলল । দুই লজা তার । সে কিছু এক চেয়েছিল ।
দুই সিকে দুই বুর এক চেয়ে—এ বিচ্ছিন্নতা সে চায়
নি । প্রবন মৌবনের দিনগুলোর শেষে বোম্বের অনেকটা
এক হয়েছিল । তবে সে শব্দ, ভাবের উচ্ছ্বাসে,
জীবনের গভীরে হরতো নয় । তবু তা কাছ দেয় ।
আগে দিত । আত্মরক্ষাতিক ও জাতীয় সাক্ষ্যাতির
বৃহত্তর আঘাত তার আত্মা আসের ও প্রেরণাকে বণ্ডিত
করে দিয়েছে । প্রবন দিকে এ সব টুকরো টুকরো হয়ে
হুজিয়ে গিয়েছিল । আর সেই ভয়ভয়ের মধ্যে সে অস্থির
ভাবে কাল কাটিয়ে—একটু জোড়াজোড়ি দিয়ে কিছু,
একটা হাট্ট করাতে চেষ্টা করে । পারে নি । ভালতে
ভালতেই চলেয়ে । দুটো একটা মানব মনে একটু
ভরসা হয়, কিন্তু সে সামান্য এবং সাময়িক । সে
ভালতে । সে জানে । সে ভাবনকে বোম্ব করবার জন্য
এখনও সে আঁকড়ে রয়ে আছে ইউনিয়নের এই মাটি ।
এখানে রাজনীতির বৃহৎ ব্যাপার নাম দিয়েও কিছু
সাধারণ ভাল মানব আছে । তাদের সংস্পর্কে সে
পান করে । তাদের বৃহতে চেষ্টা করে, অব্যব, বৃহত্তে ।

সম্প্রতি-ব্যাপ্ত এক ইংরেজ নাট্যকারের একটি নাটকে
শেখর পড়েছিল যে মধ্যবিত্ত এক নায়ক তার শ্ব-প্রেরণী
ভ্যাস করবার জন্য উদ্বৃণ, কিছু বতবাই সে শ্রমিক
প্রেরণী অতিমূখে বাবার উদ্যোগ মের, ততবাই তাকে
মান্য বাধ্য করে যেতে হয় শ্ব সাজে । এই নায়কটির
কথা শেখরের মাঝে মাঝে মনে পড়ে । সে
অনেক মধ্যবিত্ত সংস্রাবে বৃশা বচে, বণ্ডিত সে এক সবটা
অভিক্রম করতে পারে নি । একবারে বহুতর বৃজ্ঞাত
এখন তার পক্ষে জমি । স্তব্ধতা সে এক মধ্যবিত্ত
প্রাণ—বিচ্ছিন্নত জিহ্ব ।

একবার শেখর এক ভারী মেজাজে তার এই সমস্যার
কথা বলেছিল, লেভা বৃহত্তর বায় চিত্তা না করে
বললেন, ‘সামান্য করো । অব্যবিত্ত কি হয় ।’

যেটাটি বৃহৎ পড়া যেজোর মত বচে বলল ।
অব্যবের কাছে বোম্বের এ বৃহৎটা পড়া হিতে হয় ।
আই জামজাম কর না । শেখরের মন লেগেছিল বৃহৎ

যে নেতাজি নিয়েও সাধনা করেন নি। পরে সম্ভব হয়েছে তিনি এ সমস্যার সমাধানও করেছেন কিনা। আর নিজেদের দল ভেবেছে শেখর। কার কাছে কী সে বুঝতে পেরে? মনে খুব কাঁটা ছিল সে। নইলে মোমার কাছে কাছে আসার ব্যবস্থা নেতাজি করে। পীতাম্বর নিকটতমই বিশ্বাসের কাছে থেকে দূরতম। পীতাম্বর বলা শুনিয়ে ছুটে গিয়েছিল সে—খনি কিছু সমাধান বেলে। সব নেতাজি বলা হয়েছে। বলা হয়েছে নেতাজি না।

‘কি জানছ?’ জিজ্ঞেস করল মোমার।

‘জানছি, মোমার কথা হয়েছে সত্যি।’

‘চল। তুমি তো আর থাক না।’

একজন চলে গেল। ও রাজনৈতিক হয়ে থাকে। এক-নাথ জেলা থাকারো দেহ। বড় ভাই। বাপশান। বাবা। দাদা। চন্দা। চন্দার মনে সাম্প্রদায়িকতার বীজ আছে, এবং সে কথা সে অস্বীকার করে না। বরং বলে যে এ বিবৃতি বেশি দার মতোই আছে। চন্দার মতো যারা বাক্যটা স্বাভাবিক—ব্যক্তিগত কারণে। কিন্তু অন্যরা—যারা অতীত প্রত্যক্ষভাবে আঘাতপ্রাপ্ত নয় সে নিয়ে। চন্দার বা অন্যদের সঙ্গে তবুও সরে সে স্বীকার করতে চায় না তার সাম্প্রদায়িকতার কথা। কিন্তু সে জানে, এটা আছে। তবুও সে কেবল হঠাৎ সে অতিক্রম করেছে, কিন্তু সংস্কারের ক্ষেত্রে পুরো পারে নি। ইচ্ছাশক্তি সে একান্ত আপদই মনে করে, কিন্তু তার মনে যদি ইচ্ছাশক্তি বা অস্বাভাবিক কাউকে বিবেচনা করে, তবে তার মনে পড়েটা অসম্ভব মনে হবে না। সে শুদ্ধা পুষ্টির মত মনে নেবে হঠাৎ, কিন্তু—অসম্ভব সেও বলা হবে না। কি হ্যাগার অসম্ভব!

তার স্বাভাবিকভাবে একবার সে দল-ভারতীয় হ্যাগার সাম্প্রদায়িক গিয়েছিল হ্যাগারকে। সেখানে একজন বড় প্রকল্প মূল্যায়ন নেতা বলেছিলেন, ‘আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়েই সাম্প্রদায়িকতা আছে। প্রতি বুদ্ধিতে আমাদের তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে।’ যে নেতাজি সে অত্যন্ত সন্তুষ্ট করত তার বুকের এই কথা অত্যন্ত ‘পকি’ মনে হয়েছিল। কপালটার অর্থ, তার মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতা আছে। সেখানের তারুণ্যের আবেগে ইচ্ছা হয়েছিল গিয়ে বলে, ‘না দাদা মতো নেই। আমার মতো নেই।’

ভাগ্যবশত বলে নি। তারুণ্যের উচ্ছ্বাসকে পেয়ে এসে তবে তাকে আশঙ্কিত করতে হয়েছিল নিজেকে, অপরকে এবং এই নেতার উদ্ভিদ সভ্যতাকে।

এই উদ্ভিদ ইউনিয়নে কাজ করতে আসার স্বাভাবিক কারণ হ্যাগার তার একটা ব্যক্তিগত আবেগ ছিল। এই উদ্ভিদে প্রচুর লোক মূল্যবান আশ্রয় দান করে। এদের সংগঠনে আসতে চেয়েছিল সে। সাম্প্রদায়িক কালের জাতীয় জীবনের দৃষ্টিতে বড় ঠান্ডাভী বেশ বিতর্কিত হ্যাগারকে তার মনে পড়ার দাস কেলেছিল। এই বিভ্রমের মূল কারণগুলোকে সে দিনের পর দিন অনুসন্ধান করেছে—ইতিহাসে, সাহিত্যে, লোক-ব্যবহারে। সে-কারণগুলোকে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করা সরকার—উৎপাদন করার মতোই। পূর্ব উচ্ছ্বাস-বলে একবার ‘ভাই ভাই’ না বলে লোকজীবনের মূল বুকে দেখা সরকার কোথায় কতটা ঐক্যমূল্য আছে, সেই ভিত্তির ওপর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে শাসনাত্মক জীবনকে নতুনভাবে সংগঠিত করার প্রয়োজন আছে। এইজন্যে সে মূল্যায়ন জনজীবনের বহির্ভূত সংগঠনে আসতে চেয়েছে কিন্তু সে জানে যে সে মোটেই বড় ভেতরে চুকে পড়বে না। বাক্য সে। বাক্য হচ্ছে প্রতিদিন। বাক্যতার পরিণতি বাড়ছে—সাম্প্রদায়িক ক্ষেত্রে থেকে ভাষার ক্ষেত্রেও তা এখন বিস্তৃত। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রায়শ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আসতে বাক্য হয়েছে—অতীত সাম্প্রদায়িকভাবে। আর জাতীয় ক্ষেত্রে? না বাক্য এখন চিন্তা। সকল মানুষের কাছে চরম আশাবাদ করে যে মানুষটা সে বাক্যতার আঘাতে আঘাতে পরাজিত, হত্যাশ্রম। যে সবাইকে সহ্য করার প্রয়োজন পড়বে। সে নিজের ভেতরেরকার আত্মবিরোধে পতন্যাপি। নিজের মতোই এক একটা বিষয়ে নিয়ে সে কলহাকর্ষ। সেই ভাষা-চরম ঠান্ডা সে গুটিয়ে পুষ্টিতে ভুলতে পারছে না। সব কাজই সে করছে অভ্যাস বশে, হঠাৎ কতকগুলো। প্রাণ নেই তাতে। অনুভবনা না থাকলে কাজ একদিন বোকা হয়ে দেখা দেবে। কিন্তু সে যে বোকাকে কেলে দিতেও স্তব্ধ পার—তাহলে মোটা জীবনটার হঠাৎ যে পুন্যতা বা-বা করে উঠবে, তাকে পূর্ণ করতে কী দিয়ে।

অথচ এ রকম ভাবে চলে না। সেখানের অতীত চলে

না হুঁতার কাছ'বিরোধ সম্পর্কে সে অত্যন্ত দ্বিভূত, তাই প্রতি মুহূর্তের সন্দেহের দ্বারা সে আত'। সে অল্পত নিরুত সব ইন্দ্রিয়ের মীমাংসা করে একটা অনুপ্রাণনার মূর্থে তার ভীতিকে শান্তি দেয় তুলতে চায়। প্রেমের ক্ষেত্রেও তাই তার কামা। কিন্তু সে শেষে ওঠে নি। হুঁতার ক্ষেত্রে সে ব্যর্থ। বহুবার সে শিককে বুকিবেছে যে এ ব্যর্থতার দায়িত্ব তার নয়। হুঁতার থাকে মোহটা-গণিমেও সে সম্পূর্ণ তুষ্টি পায় নি। যে কোন ব্যর্থতাই তাকে শান্তিত করে। হানুস সাক্ষ্যের জন্যেই বহুবার প্রাণ'তার কারণ অস্বাভাবিক ক্ষেত্রে সে নিরু—এই জাতীয়, একটা চিন্তা তার মধ্যে আছে। হুঁতার ব্যর্থতা তার মধ্যে প্রাণ অস্বাভাবিক পর্যায়ভুক্ত।

হুঁতার পর যে সব মেয়ে তার নিকট দাঁড়িয়ে এসেছে, প্রত্যেক সে একটা আশঙ্কার দৃষ্টিতে দেখেছে—যেন এরা এক একটি ব্যর্থতার প্রতীক। তাহা হুঁতা যেন তার প্রাণ ধূলি দিয়েছিল—সে অল্প বিশলেই মেয়েদের মানসিক পরিষ্কার নোটার্ণটি পরিচালনা করে ক্রমেতে পারত। কেউ হুঁতা পালক বিস্তার করেই হুঁতা, কেউ শিক 'অস্বাভাবিক আশঙ্কা, কেউ গলবে উদ্ভাসের পলকা পরামিত, কেউ বা শব্দ'চা-পায়সী, কেউ সাদা-মট্টা ভাল মান্দ, হুঁ'একজন হুঁত্বিতী কিন্তু পূর্ব-বসের গাইতে অন্য কোথাও হুঁত্বির ব্যবহার করে না। কারণ হুঁত্বি তার অভিযোগ নেই। এমন কি তারের সঙ্গে তার কিছু সময় বেশ ভালই কেটেছে। কৌতুক আর কৌতুকের দ্বারা সে এয়ে মেয়ে, এবং উপভোগই করেছে। আশঙ্কা, ব্যর্থতা ও গভীর প্রত্যাশা মিলিয়ে সে সার্বিক জীবনাবসেসে সে কলিত, তাকে কেউ হুঁত্বির হুঁত্ব এ সে চেয়েছে। কিন্তু হুঁত্বি পায় নি—হুঁত্বিতা।

তারপর চন্দনার সঙ্গে দেখা। ঠিকত শেষ ওকে সবচেয়ে হানুত্বিতা। শেষের হুঁত্বি বসে একদিন যা হোলো, কুঁত্বিল খেলবার। পাড়ার প্রাক্তনদের সঙ্গে বৈশেষের খেলা। পাড়ার হেলেরা তাকে বরল প্রাক্তনদের ত্রে খেলবার জন্য। শেষের মামল। এবং ডান পায়ে টিটি ডানদল। হানুত্বিতা হুঁত্বি হোলো দিন হুঁত্বি। এখানে চন্দনাও সঙ্গে দেখা। তার শেষেরের স্মার্তে ভিটটি পড়েছিল। হুঁত্বিনেই আত' হয়েছিল।

চন্দনা বলল, 'ক'বের বৈশেষের বেল থেকে ?'

'হুঁত্বি দিন। কয়েক বছর।'

'বৈশেষ বেলার চেষ্টা করেছিলান, পাই নি।'

'আমারও ঠিক তাই। যে ভাকার বহুত্বির কাছে তোমাকে পাঠিয়েছিলান সে বিশেষে। তার ঠিকানা জানি না। তার ঠিকানা যোগাড় করে তাকে চিঠি লিখলাম। বহুত্বি বসে জবাব এল যে সে তোমার বর্তমান কর্মস্থল কোথায়, বলতে পারে না।'

'থাক ও কথা, কেমন আছেন এখন ?'

'অস্বাভাবিক।'

'পারাদিন কৃষ্ণকান্তের দিকে তাকিয়ে কী ভাবেন ?'

'হানুত্বির হুঁত্বির ভগ্নহুঁত্বির কথা ভাবি।'

'হুঁত্বি বসে এ খেলার দাব হোলো কেন ?'

'নিরুতি।'

'নিরুতি লোকটি তো হুঁত্বি হুঁত্বির বসে বসে হচ্ছে না। কথা নেই ব্যর্থতা নেই, হুঁত্বি দিলে ভেঙ্গে।'

'কথাব্যর্থতা বসে ভাগ্যেতে এসে কি আরি ভাগ্যেতে হুঁত্বি ব্যর্থ ?'

এইখানেই শেষ চন্দনারের ব্যর্থ হুঁত্বিগের সব শেষ বিশলভাবে হুঁত্বি। চন্দনা বলল, 'হানুত্বির সব বলুন। বিশেষে কেন ?'

'হুঁতা, ওটা হুঁত্বিরে দেখেছি।'

'হেলেরে ?'

'একটি হেলেরে।'

'আশি ভাল হলে একদিন বার বৌদি আর বাজাকে দেখতে। বৌদি তো একদিনও হানুত্বি নি। অস্বাভাবিক।'

'বোব হুঁত্বি, উপি হানুত্বি না যে আশি অস্বাভাবিক।'

'হানুত্বি ?'

'চন্দনা, আমায়ের ভিত্তি' হয়ে গেছে।'

ওটা হুঁত্বিনেই চুপ করে গেল।

শেষ বলল, 'চন্দনা করে থাকবার ব্যর্থতা নেই।'

'কি ভিত্তি' ত্রেছিল ?'

'হুঁত্বিনেই, বসে নি আমায়ের। তুল লোক বেছে-ছিলান আমায় হুঁত্বিনেই।' তখন দিন হুঁত্বি হুঁত্বি কাছাকাছি ছিল শেষ আর চন্দনা। হুঁত্বিনেই বিশেষের উভাড করে কথা বলেছিল। চন্দনা যে তার প্রাণ

অপরিস্রব—বলতে গেলে এইবারই হবে পারল
হোসো—একথা বনেই চম নি পেছের। আর চন্দ্রনা
যেন অনেক দিন পরে একটা অবলম্বন দেখেছিল। যেন
তারার বুকে ছোটবেলার চেনা—অবলম্বন মধ্যে কয়েক
বছর দেখা হয় নি। চন্দ্রনারের বাড়ির সব বউমা—হোট
থেকে বড়—জেনে কলস শেখর। আলল চন্দ্রনার
বারিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাস। যে বৃত্তের
পটভূমিকার তারা কোলকাতা দামক বিশেষে ঘুরা
করেছিল তার বৃত্তিনাট সব শুনল শেখর। আর বললও।
কতদিন যেন সে কথা বলে না। সত্যি ভাই। এমনিতেই
সে একটু চালা। ঠিক মোকটি না গেলে মৃৎ-বৃত্ততে
না বৃত্ততেই বন্ধ হয়ে যায়। তার জীবনের সত্যি
কবাসুলোও বৃন্দী ভাল করে শোনে নি। আর তার
কুহক বিষয়েও চন্দ্রনার গভীর আগ্রহ। কোন মৃৎ মৃৎ
সে বাঁধা পড়ছিল তা সে জানেও নি। মেয়েদের কাছে
গেলে তাদের মৃৎভাষা ও চরিত্রভাষা 'স্টাডি' কার
ছিল তার একটা পেটাইন্স। এর জন্যে যে বিচ্ছিন্নতা ও
লতকর্তা প্রয়োজন তা জন্মদেই তার বানিনকটা আরম্ভ
ছিল। কিন্তু এখানে এই চন্দ্রনার কাছে সে নিজেকে
ভুলে গেল। এক-মাস সময় যখন বনে হয়েছিল কথাটা
ঐ সঙ্গ-লতকর্তা তিরিয়ে আনতে চায় নি। প্রতি
মৃৎভেদে লতকর্তা মনকে পীড়িত করে, ক্লান্ত করে।
সে ভেতরে ক্লান্ত নিঃশব্দতা ঘিরে মোড়া ছিল।
অন-ভরা এটা ঘোচবার নয়। বৃদ্ধ, হতাশা, বার্ষতা,
উচ্চ আশ্রয়—এই সব ধান্য বিপরীতবৃন্দী পলিন
আঘাতে মন তার ভেতরে টুকরো হয়েছিল। তাকে
লহত করে একটা মৃৎকে বাঁধিয়ে তোলবার স্বেচ্ছা
লাভ করল শেখর। কোন কবের বা আদর্শের বেলীতে
সর্বাত্মক আত্মদান যেন এ বৃন্দের হান্দুব করতে পারে না।
তার একাংশ সামনে চলে, অন্য অংশ পিছনে টানে।
এক কি স্রেফের ক্ষেত্রেও ঘটে সেটা, কিন্তু অকৃত শেখরের
জীবনে যেন এটা না ঘটে। ঐ কৃত্রিম বিন কি আদর্শ
মৃৎ তার জীবনের বাঁধা বেছেছিল। সেবার, মৃৎভাষার
আর কোল এক ব্যতিক্রম সপক্ষেতর আঘাতের
চন্দ্রনা যেন তাকে ঘিরে ছিল। সে নিশাস নিত সেই
চন্দ্রনার আঘাতের। মৃদোত্ত চন্দ্রনার ভগ্নতে, আসত

চন্দ্রনার বিধ চোখ মেলে। আর বৃন্দ ও জন্মদেই
অব্যক্তার ঘাঘাটার চন্দ্রনার অস্তিত্ব যেন হুটনো ছিল।

যখন চন্দ্রনার নাইট ডিউটি পড়ত, এবং যদি ব্যাপার
যোগ্য না থাকত, তাহলে শেখরের বেডের পাশে টুল
বসত সে। বহুদিন অনেক রাত অবধি বসত চলেত।
মাঝে মাঝে উঠে চন্দ্রনা তার 'সজান'দের এক একবার
দেখে আসত। চন্দ্রনা চাকার অন্তীত কারিনি বসতে
ভালবাসিত। চাকার স্মৃতি তার মনে উজ্জ্বল হয়ে
আছে। শেখরও মৃদুতে মৃদুতে কিরে বেত তার
কৈশোরে, পৈশে, পূর্ববন্দের কাহা মাটি-মল আর
অনন্ত আকাশ ও অসীম নসাজাতের মধ্যে, মেঘান
থেকে সে চিরদিনের মত নির্বাসিত হয়ে গেছে। ডিউটি
শেখর বলে শেখরের কাছে এসে হেসে বলত 'চলি।'

পরের দিকে শেখর একটা চাকা-ওয়ালা চেলানো
চোরাহে বসে চলে আসত রাইয়ের বারান্দায়। চন্দ্রনা
ঠেলে আনত চোরাটা। শেখরের বাইরে তাকিয়ে মনে
হোতো, কত দিন বাইরে ঘাই না। চন্দ্রনা বলত, 'বাইরে
বাওয়ার অন্য উত্থা।' 'হব না! কত কাম হয়েছে।'

'অত ঘর কাম সে বৃত্তো বসে বেলেতে ঘর কেন?'

'তখন বৃদ্ধি নি।'

'কয়েক দিন হয়ে গালি ঘাই-ঘাই করছেন।'

'এতদিন মৃদু মৃদু বসে—'

'ভাল হলো তো নিভাই যাবেন। তার জন্য অত
কেন? যেন বলে পড়েছেন।'

'জ্বর বৃত্ততে পারছ না চন্দ্রনা।'

'বৃন্দ পারছি। আপনি বৃন্দ। ঐ অধিক আদর্শ
ভাক পড়েছে।'

'সজান?'

'হ্যাঁ। আমার তো একটি নয়? চন্দ্রনা চলে
গেল। শেখর ঐ রাষ্ট্রে দিকে তাকিয়ে বসে থাকত।
রাষ্ট্রের ওপরে হাঙ্গামাভালের ঘোষণা কাপড় কেটে
বেলে দিয়েছে—গোশ্বর পড়ে আসছে দেখে তুলছে
এখন। হাঙ্গামাভালের কুঁদিলতা অস্বস্তিকর চলেছে বল মনে।
গোশ্বরকে কেউ দেখতে আসছে, কেউ কিরে যাচ্ছে।
নাস্তা ব্যতভাবে বাতায়নত করছে। সবই কাছের
লোভ। শেখর মৃদু একা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে করে সে

হরোরে । কত কাক অপেক্ষা করে আছে তার জন্যে !
 কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে চন্দনা শেষর টের পার নি ।
 'কি ভাবছেন ?'
 'ভাবছি । জীবনের স্রোতের বাইরে আছি ।'
 'যাবেন তো পালগিই । এত অস্থির হচ্ছেন কেন ?'
 'চন্দনা, আমি যখন চলে যাব তখন তোমার একটু
 ঠাণ্ডা লাগবে, তাই না ?'
 'না । আপনি যাবেন আমারই বাড়িতে ।'
 'যাব ।' একটু চুপ করে থেকে শেষর বলল,
 'চন্দনা, সামনের ঘাট পেরিয়ে ঐ যে বড় লাগ বাড়িটা
 —ঐটে তোমাদের কোয়ার্টার, তাই না ?'
 'হ্যাঁ ।'
 'কবে কবে তুমি বাড়ি যাও ?'
 'ছুটি যেদিন থাকে । আর এক-আধদিন, যেদিন
 বকেলে অক' থাকি ।'
 'যেদিন বাড়ি যাও না—?'
 'যেদিন বন্ধুদের সঙ্গে বেরোই । টুকটাকি কিনি ।
 দু'র । সিনেমা দেখি এক-আধটা । কিন্তু আমার
 গাল লাসে না ।'
 'কী ভাল লাগে না ?'
 'মাসি'ং আমার ভাল লাগছে না ।'
 'কেন ?'
 'তা ঠিক জানি না ।'
 'অন্য কিছু কর ।'
 'কী কর ?'
 'কী ইচ্ছে করে ?'
 'পড়তে যাবার ।'
 'তাই কর ।'
 'পালস । বাড়িতে না থেকে মরবে ।'
 'সে একটা ব্যবস্থা করতে হবে ।'
 'কোন ব্যবস্থা সম্ভব নয় । সংসার আমার ওপর ।'
 'তুমি আসে তোমার মন ঠিক কর ।'
 'আমার মন ঠিক আছে ।'

তারপর চাকরী ও পড়া দুটোই চালিয়েছিল চন্দনা
 একসঙ্গে । হা-ব হত ছিল না পড়ার, বাড়িদের অমন
 তিদি দেখতে চান নি । বাড়িদের অমনন করতে হয়

নি । শেষর কিছু সাহায্য করতে চেয়েছিল । চন্দনা
 নেয় নি । দুটোই করেছে সে । পড়ার সঙ্গে গ্রন্থে
 মাসি'ং পরে শিক্ষকতা ।

আগবার আগের দিন রাতে জীবন মন ব্যাথাপ হয়ে গেল
 শেষরের । সেই ছোটবেলার বন্ধুদের বিবাহের অনুষ্ঠানের
 কান্না-কান্না মনটা হঠাৎ ফিরে এসে বন্ধুর মতো চেপে
 মইল । মনে হোলো, কল থেকে তার অন্য জীবন—
 সে জীবনে চন্দনা কোথায় ।

ক্রমী

ওঃ, উনি এসেছেন ছেলের ওপর দরদ দেখাতে । দরদ
 নয়, আশিষোত্তা । যেন উনি না হলে আর ছেলেকে
 দেখবার কেউ নেই । ওপর কি আর আমি বুকি না ।
 অদলে উনি এসেছেন বাবাগিরি কলাতে । ওটা এখন
 করুক বছর দু'লতু'বী রাখলেই তো হয় । তারপর
 কলিযো, কলাবে তা জানি । চোখ দেখলে বুঝতে
 পারি, তোমার পেটে কী আছে । তোমার সঙ্গে এত
 দিন থর করলাম । তোমার হাড়খন জানি । তুমি
 চৌপনের ওপর তোমার অধিকারটা রাখার রাখতে
 চাইছি । চৌপন যে আমার কাছে আছে তা আর সত্য
 হচ্ছে না । হিংসের কেটে মরছে যে ! মর । এই কটা
 বছর অকৃত হলো । তারপর তো আমি কলিযো ।
 সত্য জীবন হয়ে । তবে আমি লম্বে হাড়ন না মনে
 রেখো । কোট' কাছারি কর । কিন্তু তাতেও তো
 মাথা ঘাবে না পু'নেছি । হারব নাকি আমিই । এ কী
 কল্প নিম্ন বুকি না । ছেলের ওপর বাপের বরং কত'ত
 থাকা উচিত নয় । কী তামের দাবী ? কী করে তারা ?
 একটি সত্যের ক্ষেত্রে তাদের দান নগদ্য । অকৃত সেই
 তারই আবে তার সন্তান'র গ্রাস করে । আর না রেখেই
 মরবে ও বাইরে সত্যকে লালন করে—তাইই সেহাৎ
 যিরে । সত্য তারই অল । সত্য তারই, কিন্তু পু'রু'র
 সত্য নিম্ন করেছে উলটো । সেই উলটো নিরমটার
 কানে আমার তুমি ফেলতে চাও জানি । আর তুমি যে
 ছিতে বসে আছে তাও জানি । ছেলের ওপর পু'র দরদ
 দেখানো হয় অকাল—ইহানীং এটা বাড়ছে ক্রমগত ।
 এত বাড়ছে যে আমি ভর পান্দি । তুমি যে আমার

সরিয়ে ত্রেক পঁড়ানে তার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। আমার ভাল লাগে না তা। দস্তগা হয়। সব সময় কষ্টটা চলতে থাকে। দর্বা একটা 'হামাই হামাই' ডাব এই নিত্য আশংকার মধ্যে বাঁচা যায় না। তাই আমি চলে যাচ্ছি চৌপনকে নিয়ে। ইন্টারভিউটা নিরুৎসাহে। কাছ আমার প্রায় ঠিক হয়েই আছে। আর আমি ফিরে না। তোমাকে বেড়াতে বলেছি কখনো। বিশেষ। আমি থাকি বয়সের জন্যে। ওখানে থাকি আমি আর চৌপন। ভূমি নও, তোমার চিহ্ন রক্ত থাকবে না সেখানে।
 ১ ভূমি নিশ্চয় হয়ে যাবে চৌপনের মন থেকে। ঠিক সেই রকম হয়ে যাবে, যখন ও প্রজ্ঞাত ছিল, ছিল আমার মেহের আঘাতে, যখন আমার নিশ্বাসে ও নিশ্বাস বিত, আমার বেদনার ও বেদনা শেত। অথবা হবে যাবে সেই দু'এক বছরের চৌপন, যখন আমি ছাড়া ও ছিল না।

চৌপনটা আত্মকাল বাশের খুব ন্যাওটা হয়েছে, ও যখন তোমার বৃক্কের ওপর কাঁপিয়ে পড়ে তখন আমার বৃক্কটা কড়কড় করতে থাকে। আমি ঐ দৃশ্যের মধ্যে আমার পূন্য ভবিষ্যৎকে দেখতে পাই, তোমরা দুজনই বায়ু বায়ু ভবিষ্যতে, আমি নেই। চৌপন ভুলে যাবে আমাকে। নিদ্রারূপ কষ্টের সেই দিন। তার চেয়েও কষ্টের হবে যখন ও আমার খুব ব্যাথা চরিত্রের সোক বলে গড়ে নেবে, দৃশ্য করবে আমাকে। কিন্তু সে ও করবেই। সে অথবা দুঃসহ। সে সত্য তখন আমার কাছে হৃত। না, হৃদের চেয়েও বেশি। হৃদের তবু কমই হৃদর স্মৃতি থাকে। না, আমি তা হবে যে না। নিজে থাক চৌপনকে তোমার কাছে থেকে। তোমাকে ভুলে যাবে ও আমার কাছের এই বয়সগুলোতে। ভূমি ওর কাছে একেবারে অচেনা হয়ে যাবে। যেদিন ভূমি ওকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, সেদিন ভূমি ওর কাছে অপরিচিত একজন গুল্লোল্য বায়ু, আমি ওর মন। তোমার কাছে যখন ভূমি ওকে রাখবে, তখনও আমার কাছে পড়ে থাকবে ওর মন। যিনি ও আমার ভাববে। রায়ে ও আমার জন্যে কলিয়ে। আর ভূমি ওকে আটকে রেখেই বলে তোমার ওপর যেসে থাকবে। তোমাকে মনে করবে পরামর্শদাতা। ঐ সম্পর্ক থাকবে তোমার সঙ্গে। ওর মন থাকবে আমার মনে।

ওর মন সেই হৃদের বায়ু দাঁটা থাকবে। তারপর একদিন যখন ওর বন্দী বন্দা পড়েবে, ও সাবালক চলে, সেদিন ও চলে আসবে ছুটে আমার কাছে, তোমার দিকে কিস্তেও তাকাতে না, সেই বন্ধ চৌপনকে নিয়ে গিয়ে আমি আমার সমস্যা পাতব।

যাব। আজ। তাই বাকসোটা সাজাতে বসেছি, কি নেব? বাকসো সাজাতে আমার ভাল লাগে। বাকসের মধ্যে অনেক জিনিষ। তারা অনেক দিন আঁকড়ে ধরে আছে। বাকসের মধ্যে অনেক দিন। ভালো খুলেই একে একে খেঁচিয়ে আসে দিকগুলো। গর। ন্যাপখানির। কাপড়ের। কাপড়—কটা নই। কোন্ কোন্টা? নীল পাঠী। নীল হুটা আমি পছন্দ করি। বোনারদী। সূতী। দাদ সিক একটা। গোলাপী জাম্বুটি—এটা বিয়েতে ছোট মায়া দিয়েছিলেন। বিয়ের সময়কার এবং বিবাহিত কালের অনেক পাঠী আছে। এই চাপা হুন্ডর পাঠীটা বিয়ে পরে কেন। বলতে সেলে শেখরের টাকার। এটা ফেলে দেওয়া উচিত, কিন্তু এত ভাল পাঠী কোনো মেয়ে ফেলে দিতে পারে। আমি একজন মেয়ে। চাপা হুটা ফিকে হয়ে গেছে—বিবাহিত দিনের স্মৃতির মতই। হোক দুঃসহ নেই। সম্পর্কটা ভালোবেই এটা কেন যে আমি আসে বৃক্কতে পারি নি। বোকা উচিত ছিল। আমি খুব প্রাকটিক্যাল মেয়ে বলে গর্ব করতাম। সোকেও বলত। তাও এ বিপত্তি ঘটল। সব সেরা নাকি আমার—শেখর তাই মনে করে। কি যোগ আমার। আমি অভ্যস্ত সাধারণ মেয়ে। আর বন্দী মেয়ের মত আমিও বসেই বস, অর্থ, মান, প্রতিপত্তি চাই। শ্বামীর এগুলো থাকা উচিত, যার নেই তার অর্থের চেষ্টা করা উচিত, যে অর্থন করতে পারে না তাকে কি বলব? অল্প বয়সে আশংকার মত বেতে পারো—বয়সকালে যেমন যোগ থাকে কারো কারো। বয়স বলে বিয়ে-থা করলে তা ছেড়ে দিতে হয়। তারপরও যে ওটা নিয়ে পড়ে থাকে সে হয় আত্মদোলেসেট, বোকা অথবা অক্ষম। ও হ্যাঁ, সাময়িকিক নেতারা নাকি আসলে কালার কমপ্লেক্স ভোগে। এতে ভোগে কিনা আমি না, নেতাদের এক্সপেরিমেন্টেশনে ভোগে। একটা সাবালক দাঁড়

মিত্রের এভাবে এক্সপ্লোয়েটেড হতে দেও তবে তাকে বোকা বলা অন্যায় নয়। একটা ভাল চাকরী করলে হান খোঁচো ঘর না হান বাড়ো? শংসার-কর্তব্য, কোন মানস্কতা না করে! স্বাধীনতাকে স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে রাখতে কে না চেষ্টা করে! তুহি তার জন্যে কী উদ্যোগ নিয়েছো? কিছ্ না, তোমার একটা বোকা আচরণের জন্যে তুহি সবাইকে ভোপাতে পারো! লোকের কাছে কি রকম হয়ে হবে থাকতে হয় বন-সম্পদ গাড়ি বাড়ি তো দূরের কথা, ভালচুলো অবধি নেই। আত্মীয়স্বজন ছিঁড়লে করলে উত্তর দিতে পারি না যে আমার স্বাবীর কি ভাবিকা। রাজনীতিতে তুহি চিরদিন ভ্রান্তিষ্টিয়ার হয়ে কাজিয়ে গেলে। তোমার ক্যান্সার কতটা তার প্রমাণ। লিখে বাংলাদেশে ক' শরদা রোজগার হন তা সবাই জানে। সেটা লোকের কাছে বলা যায় না। লিখেও বাংলাদেশে লেখকরা গাড়ি বাড়ি করেছে, কিছ্ তুহি সে-বরের লেখক নও। তা'হলে আত্মীয়স্বজ্ঞা সবাই তোমার নাম এনিভেই জানত। তুহি বোরফব মহাকালের প্রত্যাশায় বসে আছো, থাকো। আমি সামান্য মানুষ এবং বেরোমানুষ। সাহিত্য-চাঞ্চল্য আমি বিশেষ বড়ি না। তবে মহাকালের মধ্যে বসে থাকার বৈধ আমার নেই। মহাকালের পলে বণ্ডকালের গতিবিধা বঁধা হলে তাতে বিচক্ষণতা মনোর—উত্তরেই। তাতে একটাই হাত সুবিধে—'অভ্যাসে' দ্যাঁতে কেউই কনটেক্ট করে না, মিউচুয়ালি বান্ধব হয়ে যায়, কারণ তখন উভয়েই মোহমুক্ত হয়ে পালাই পালাই' করছে।

বাক্সের মধ্যে কতগুলো হাবি। আমার হাবি, জ্যাকটবেশা থেকে—নানা বসনের! টোপনের হাবিও আছে কতগুলো, তোমার লিপ্সল হাবি একটাও রাখি ন, কয়েকটা হাবি ছিল তোমার টোপনের সঙ্গে। সবগুলো হিঁড়ে টোপনকে রেখেছি, তোমাকে কেন্দে দিচ্ছি। একটা হাবিতে তুহি টোপনকে কোলে করে বসে আছো—এটা হিঁড়তে পারি নি কেন্দে পারি নি। হুহি এখনও এসে যখন টোপনকে কোলে টেনে নাও, এই হাবিটা আমার চোখে তেনে ওঠে। হেঁ'ড়া যায় না দু'জনকে। হাবিটা আমার জীবন। হাবিটা দিয়ে জ্ঞান

মিলি। ঐ জীবনটা যেন এখানে কোলে যেতে পারি।

ও, উনি করবেন ছেলের আচরণ! তুহি তো থাকো বাপু! দারামিন হুটে-বতুর নিয়ে। তোমার দরজা কোথায়। সেটা 'বেগলিবেগল' নয়! সেটা ছেলের গল্লে বারান নয়? আর আমি একটু ভাল খেতে পরতে দিলেই হয়ে পেল—কি? না, 'বিলানিতা'। আহা, কি বিচার বুদ্ধি! কোন হান না ইচ্ছ করে ছেলেকে ভাল হুটো জিনিব দিতে! আমার দারমণি থাকলে কেন হবে না?

টোপন কোথায় সেল? অনেককাল টোপনের সাজা পাচ্ছি না।

'টোপন, টোপন। এতকাল কোথায় ছিলিস্নে? বাইরে হাঁড়ির কি করাছিলিস্ন? দু'খানা অন্ন কেন? কি হবেছে? চোখ দুটো হলছল করছে কেন? এদিকে আর তো। বেশি, গা বেশি তোর। ওহা, এবে হিঁকা গা পর। এ ছেলেটা আমার ভাগ্যলো। এই জন্মে নিয়ে তোকে হাঁড়িরে ছিলিস কেন?'

কি ভাবছিল রে টোপন! বাবার কথা। আর। আমার কাছে আঁ। বাবা এত কি ভাল রে? আমাকে তোর ভাল লাগে না? কেন? আমি যে তোর জন্যে এত করি তাও নয়? আমি যে তোকে পাওয়ার জন্যে হয়ে বাড়ি। আর। একেবারে আমার মধ্যে চলে যায়, সেই তোর জন্মের আগের রত—আমার বাইরে তোর আর কিছ্ থাকবে না। টোপন, আর। আরো কাছে আর। টোপন, আমার চোখে জল আসছে! আমার কেউ নেই তুই ছাড়া, টোপন, আমি কঁদছি।

শেষ

চোখ ঢেকে দেছে। গভীর শাসনের অতিকার প্রাসার-গুলো তাদের দ্বারা নিষেধ মধ্যে সন্তুষ্ট করে দিচ্ছে। এখন বাঁধ কেউ ঐ প্রাসাদের ওপর থেকে দিতে থাকার তবে সে হুই পাহাড়ের বাতের গভীরে একটা রোদে দিতে শাখার কালোর বেশা একটা জ্যোত দেখতে পাবে। রোদে জ্বলছে হাফাটা। সন্ধ্যার সোনা রোহ নয়। হুন্দুরের দ্বারালো ইম্পাত রোহ।

শেষ ঐ জ্যোত থেকে একটা পাহাড়ের গহরে ঢুক

পুল। দীপারের বাড়ি। শেখরের বন্ধু ও সহপাঠিনী দীপা। অক্ষর যোগেন নিবে তেন সে এসেছে। আশুও—শেখরের সহান বসেও—সে দীপা। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় তার নাম হটেছিল—‘উর্বশী’। তখনও বিন ইটনিভার্সিটি বা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রী নামের উত্তর হয় নি। হজাভ ২২। মাথার চুলগুলো শ্যামপুর প্রভাবে একটু উড়ু-উড়ু। মাথার অনেক ঘালানী মেলের চোরে উঠে। কিশোর যে কোন মেয়ের ইশার পাঠা। আশুও হজাভে হজাভে সে যেত আশুওভার বিশিষ্ট-এর কঠোর দিবে। অশ্বাধ্যায় প্রশমনের উদার হত ছিল তার। শূন্য কন লোককে সে নিয়ন্ত্রণ করত। কিন্তু ‘আশুও’, গছ এবং প্রশমিত লোকেরের কারুর মলে তার দীর্ঘস্থায়ী সম্পদ’ হয় নি। একের কেউ তার বন্ধু হয়ে থাকে নি। তারা এসেছে, সেহে। কিন্তু তার বন্ধু ছিল। কয়েকজন ছেলে ও মেয়ে। দেখানো সে সহজ ছিল। আত্মরিক ছিল। পোষ্ট-প্রাক্তন-য়েই স্নান ছাড়বার পর ভেলে সেহে সে বন্ধু-বল। বিবাহ, মদ্যার ও জীবিকা গাঁড়িয়ে গেছে পরম্পরের মধ্যে যেগুলোর মত। শূন্য কেমন করে যেন শেখরের মলে বন্ধু তার আশুও টিকে গেছে। একটিকে সম্পদী শূন্য শিখিল—একবারে বেই বললেও কতি হয় না। যখন দীপার বন্ধু একান্ত কথা শূন্য শেখরই জানে। নিরাসিত কোন যোগাযোগ নেই। কিন্তু সেবা বলে উভয়েই নিজেদের অভিজ্ঞতাটো যেন অপরকে বলে একটু ঘাড়াই করে দেয়। বিশেষত দীপার পক্ষে এটা একটা নৈ প্রয়োজন হিসেবে গাঁড়িয়ে কেটে। এবং এ প্রয়োজন দীপার ক্রমশঃই বাড়ছে—অনুভব করতে পারে শেখর। সেই ঠিকশায়ে কখন দেখতে মেরিয়েছিল দীপা। তখন উপভোগই ছিল জীবন। আশু সে ভাবে। শূন্য তার সারা কোলকাভার রাষ্ট্র। দীপা অবশ্য তাতে অশ্রুশ্রবণ করে নি কোন দিনই। দীপার মলে এমন কি শেখরের নামও বন্ধু বলে বন্ধু হয়ে রাষ্ট্র। রাজকীয়নের গোড়ার এ সব কথা তার কণ্ঠে হত, এমন হাসিখিট্টার ব্যাপার হয়ে গাঁড়িয়েছে।

দীপার বাড়ীতে আদতেই সে বলল, ‘কি, কিশর কেটে, এবার এত সেরা যে।’

‘ঐ নামটা বলিস না।’

‘ভবে কি বলব?’

‘শূন্যেরা।’

হাসল দীপা : ‘এত সেরা কেন রে?’ মাথার ভাবেই এ প্রশ্ন করে। কোন অভিযোগ করে না। কোন নির্দিষ্ট দিনের প্রজ্ঞাপনা থাকে না। কিন্তু যে দিনই দেখা যোক আদ্য পায়। ‘কি করছিল? মেশোজার? বেশ সে বটু-ই উড়ু হয়ে সেল। তোর ছেলেরা অন্য একটু রাব। নইলে পরে ওরা কি করবে?’

‘এলান এত দিন বাসে। চাঁদ, কুল, মল্ল, লুচি, মাংস, রসগোল্লা—এই সব বলবি তা নয় হালানীতি।’

‘এই ভাবতে তোমো চাঁদ কুল বা মল্ল আনা একটু কঠিন হবে। বরং শেখরগুলো—’

‘বাস, বাস। ঐতেই হবে। কিশরুলে এই দেখে। ঐতেই আনি কোনো রকমে কণ্ঠে চেপে—’

‘পাশা-অর্থ প্রস্তুত।’

শেখর জানাতি শূন্য হাত হুঁ হুঁ হয়ে বলল। দীপা তোরালে দিবে বলল, ‘এই নে। অন্য কেউ হলে আঁচলটা দিতে পারতাম।’

‘হায়! ক্যানটার শীত একটু বাড়িয়ে দে। হাত-পাখার বীজন না হয় থাক অন্য কারো জন্যে।’

‘দিলার।’

‘এ যে বড়।’

‘বড়ো হাড়ে একটু হাওয়া লাগুক।’

‘বন্ধু আনাকে তারের মধ্যে তরুন হবে করে।’

‘তার বানে ঘাটের নড়ার তোর বন্ধু।’

‘ঐ রকম করে আঘাত করিস না, কাল হুত অবস্থা। এবং আমি আজ হুত।’

‘হায় কিশর কী হাস! সত্যে কেটে শিঙের চাকরী করছে। তা কিশর হুত?’

‘কান্ত ও শূন্যের।’

‘ওদের আবার কী মেলো? এক ছোড়া বিরে নাকি?’

‘না। বিরে একটাই। শূন্য-বাহ।’

‘সত্য। বল শূন্য। ইটাতেই?’

যেতে যেতে বলল ঘটনাটা। আশ্রয় ও জামাল। ‘ষ্টেইন?’

‘কেন, সৌন্দর্য্য কেন?’

‘আমি জানি একবারেই একটা সোকের মধ্যে পড়িয়া
হলোতে পাগলাম না, আর ও দু’দুবার একটা সোকের
পলেই ঘণ্টা মিলাতে দিলে, কেয়ারাত আছে। সুন্দরী
পলে দেখা হলে দরতী শিখে নিতে চলে।’

‘মহর নিখলেই কী তুই প্রয়াস করতে পারবি?’

‘কেন, পারব না কেন?’

‘তুই যে অন্য মনের সাহক, সেই যে তোর সোভনীর
হলে ও সোভনীর মনুতের তক্ত।’

‘তুই আরো অনেক দিন ঠাটা করেছিল এ কথাটা
নবে। কিন্তু আমার ধারণা, একটা সোকের সবটুকু
এবং তাকে সব সময় ভাল লাগা সম্ভব নয়।’

‘হরতো নঃ। তবে এ তত্তের ওপর দাঁড়িয়ে বিবাহ-
দায়িত্ব কিরিয়ে দিতে পারে একমাত্র সুন্দরী মেয়েটাই।’

‘আমি তাহলে সুন্দরী?’ চোখ তিকিতে উঠল দীপার।

‘অন্ত বহু ব্যক্তি।’

হাসল দীপা : ‘অর্থ্যাৎ আমি যে কোন সময় বিয়ে
হাতে পারি, এই তো? এ বললে এ সব কথা শুনলেও
চিন্তা হয়। কিন্তু তোর কথার সমস্যাটা মেনেই নেওয়া
হবে। একজন সম্প্রদায়িতা যেহেতু কাছে এ সমস্যাটা
কিলেও সে এতটা রিস্ক করতে রাজী নয়। বাকী
দ্বীপটা চেষ্টা করতে সে চায় না। বস্তুত্ব পেল
উত্বাহতেই—তত্ত না চোক—স্বাভিক দাকবার চেষ্টা
হবে। আমি জীবন ধারনের সমস্যাটা ভুলি নি। যে
সাক, গর, যেতে পাচ্ছে না। তার কাছে যেহে
চাঁটাইই প্রদান সমস্যা। যেহে বেঁচে আছে যে লোকটা
—আমি মনে করি সব সোকেরই এ মৌলিক অধিকার
হাচ্ছে—তারই সমস্যার কথা বর্ণনা আমি।’

‘এ কালে সব লোক তার পক্ষ-অপক্ষসুলোকে
হাস্যাত শানিয়ে এখন দুঃখ করে তুলেছে যে পাণ্য-
পাণি এমেরি খোঁজা লাগে।’

‘কম্বাটা তোর মনে আছে শুনিয়ে। কিন্তু এ
হাস্যাত যেতে কেয়ার পথ দেখি না।’

‘সবায়ের দলে মিলায়ে নেবার চেষ্টা করতে হবে—
লোতে বলতে যেহে মেল শেখর। তার মনে পড়ল
সুই ভাড়া নেতার ‘সাধনা হয়’ শীর্ষক কবিতা।

আর তারই হত একটা শব্দ বক্তৃতার সূচনা করে
কেনেছে সে। শীর্ষকাল রাজনীতি তার কল বোধ
হয় এটা। তাড়াতাড়ি লব্ধ কবীর অভিজ্ঞারে বলল,
‘অন্ত একটা সোকের ক্ষেত্রে মিলিয়ে নেওয়া দরকার।’

‘মিলায়ে নিতে মন শার খের না। মিলে সেলে
পরে ভাগ্য বলে মানব।’

‘তাহলে তোর আইবুড়ো নাম শুচল না। মানব
পদ’ হয় না।’

‘হরতো হয় না। কিন্তু আমার তক্তা যে এ
আকাশের চাঁদের জন্যই।’

‘আর পদ’ মানব এমেরি যে তোকে পক্ষ
তার কী মনে? সে তো মায়ালগতভাবেই পদ’ মর্যাদা
কামনা করে।’

‘সে ভয় আছে। আমি তো আমি আমি কত
অদলপল।’

‘তাহলে বিয়ে ব্যাপারটা তুলে দিতে হয়।’

‘প্রায় তাই। এক ঘরনের কম্পানিরপাশ থাকবে।
ছাড়া-ছাড়া, আলগা ভাল-লাগার মনুতগুণিকে
নিখে গিয়া।’

‘অর্থ্যাৎ দায়িত্ব নেব না।’

‘আদম্বর দায়িত্ব নেব। শব্দ দায়িত্ব বোকা
বিশেষ-স্তা বইতে পারে একমাত্র তোমার হত পরোপ-
কারী। জেবের ক্ষেত্রে পরোপকারের হত মনুত আ
কিন্তু মেরি।’

শেখর ঠাটা করে বলল, ‘তাহলে তুই একটা বড়
সোকের হাবা ছেনেকে বিয়ে করে অন্যয়ের কম্পানিরদান
হিসেবে গ্রহণ কর।’

‘তাও পারব না। বাইরে থেকে আমার মনুতীতিভ্রত
মনে হলেও আমার একটা শীতি আছে। সেই দাঁড়িতে
বাহবে। হাবা ছেনেটা হরতো অন্য ভাবে মনুতী হতে
পারত। তার মনুত নষ্ট করার অধিকার আমার মেরি।
উকবার অধিকারও মেরি। তাছাড়া ‘বললোক’ শুনলেই
আমার বেরা করে। বাচ্ছে-বাচ্ছে আর কুলছে। আলসে
নয়। এক কথার কুণিসত।’ মনুত টিপে মেনে মোস
কল দীপা, ‘বহু তার চরে রাজনৈতিক কম্পীও ভাল।’

‘তবে তাই একটা হয়ে গিলে ফেল।’

‘অবশ্য তারা অনেকে বেশ দিন ও জীবনে থাকলে
একটু ব্যতিক্রম হয়ে পড়ে।’

‘তবে মুশকিল।’

‘অবশ্য সবাই যে অবশ হয় তা না। যেনন তুই।’

‘সর্বনাশ। আমি তো পূর্ণ নই। তুই আমার
দুটি দুটি ছাতি, সে লক্ষ্যই।’

‘এক নশ ভিঙিন সে এক সেখানে সেলা মুশকিল।
বিষয় খাব যে।’

‘তা বলে তুই একটা কাশ, একটা চোখ আর একটা
ঠ্যাং, বস, সেটা কেন্দ্রি, তখন রাজ্যের বেরোব কি করে।’

‘উঃ, বাব! বাস্তব।’

‘তাহলে তুই বিকাশকে বিবেচ করে ফেল। ও স্বপ্ন
অনুগত হবে। গিরর পর—’

‘একবারে গৃহশাসিত হবে। গরু নত। সকালে
বলে-গাতে বাজার, দুপুরে ভিক্স-গাতে অফিস, সন্ধ্যায়
গল্প-বৃক্ষে বস, রাতের সোড়ায় বাবা, মদ্য শ্রী, অল্প
নিদ্রা, বজ্রবাদ, বাইনের ইনক্রিমেন্ট, মাসে একটা সিনেমা,
সিনাক্রে দুটো চোমা ট্রেজার, বহুজন, যেসব অঙ্গ,
গিরর বাসনা, মেয়ের বিয়ে। হুঁহুহে সর্বাঙ্গ। ভয়ংকর
রাশা। বিগভিকর। জব্দ। মাকোকোটিং।’

‘তবে বিয়ে কর প্রস্তুত, ও স্বপ্ন ঠেগন হবে।’

‘স্মা থিন থিন করে, ঠেগন শুনলে।’

‘বিনতির কথা মনে আছে? ও একটা মজার কথা
বলত। বলত—ঠেগন পুরুষ দুটাকে দেখতে পারি না,
তবে চুপি চুপি যদি আমার স্মারীটি যেন একটা
ঠেগন হয়।’

‘বিনতির কথাটা আংশিক সত্য—সেঁপের ভাগ বেয়েই
এ কথাটা বক্তার মূলভাবে বোকে। জামি না, যিনি
কি ভাবে বকেছে। আমিও ঠেগন শ্রী চাই, কিন্তু
দুর্ভাগ্য পুরুষের যে হৃদয় আংশিক ভিক্ষা করে কমানায়
সেবে ল্যাক নাড়ে, তাকে আমি হৃদয় করি। সবল
পুরুষের প্রবল প্যাগনে নারীকে ছিঁনির বিয়ে তাকে
ভেগন-চুড়ে তার বয়ে লক্ষ্য পূর্ণ আনন্দবিশ্বই আমার
কাব্য ঠেগনতা।’

‘লক্ষ্য পূর্ণ তার হতেই সবল পূর্ণ পুরুষ আনন্দবিশ্বের
কাব্য তার হতেই পূর্ণ পুরুষ হতেই হয়।’

‘এই যেটাটা তুই মাসেও একবার দিচ্ছিল। তবে
শোন, তোকে একটা গোপন কথা বলি। আমার
সংসর্গে’ হত লোক এসেছে তারা কেউ আমার
অপূর্ণতার কথা বলে নি। আমি পুরোটা খিই নি
বলে কোভ থাকতে পারে, কিন্তু পুরোটা কেওয়ার কনভা
নেই একথা কেউ বলে করে নি। বিভিন্ন বয়সের অনন্য
সোকে এই নবোজার আমার একটা গোপন
আনন্দবিশ্বকে বাড়িয়েছে।’

‘কীসের আনন্দবিশ্ব।’

‘হাসিন না যেন। তোকেই বলছি মায়। আর
কাউকে বলিনি। লক্ষ্য নয়, অনেকেই হুঁহুতে পারবে
না। আমি মনে করি আমি পূর্ণ নারী। সেই পূর্ণ
পুরুষের সন্তে আমার লাক্ষ্য হলে সে আমার চিনবে,
সে আমার কেসে যেতে পারবে না।’

‘তোমার কথাটা মানতে চাইলেও আমার উপায় নেই।
কারণ ওর সঙ্গে আমার পূর্ণ পুরুষের কোটা থেকে
বাস বিতে হয়।’

‘তুই পূর্ণ পুরুষ নোস। অন্তিমিক শ্রী-জি
তোমার কতগুলো ব্যক্তিবাক্যে ভোতা করে বিয়ে
দমাঙ্কে ক্যালনা মনে করছি না, কিন্তু দমাঙ্কে
রোদার বানতে চাই না। ব্যাপ, তুই আর আমি, কতদিনের
বন্ধু সম্পর্ক আবার। পাশাপাশি হুঁহুহু বায়ো
ভেবে বহর। থি আর আগুন। কিন্তু কেউ আমরা
গিগেব গলি নি, জালি নি। করে থেকে আমরা বহু
এং আমরা চিরকালই বহু ওকন জামি হুঁহুহুই।
‘আমরা সের বহুও হুঁহুহুই দুটো আলোয়া জিনিব দুর্ভাগ্য।’

‘আমার কথা ছাড়। তোমার কথা বল।’

‘হ্যাঁ নিছক নারী গিগেব আমি পূর্ণ, বলে হয়
আমার। আমি নিছকে নির্লক্ষ্যের মত নিগেবে হুঁহু
পারি—পারব হিতে সেই পুরুষকে। পূর্ণ তাই চায়।
একটা নর ভাষায় বলতে হচ্ছে, মাক করি। নারীকে
জামি নারী মর-বলে উদ্ভটন করে সে আনন্দবিশ্ব
করতে চায়। কিন্তু এ সে পারে না, যদি না নারী তাকে
চলনা করে। এ চাবিকাঠি পুরুষের হাতে নেই, আছে
নারীর হাতে। এবং এই চাবিকাঠি যে-নারীর কাছে কুঁচুটা
পরিমানে আছে সে তত পূর্ণ নারী। সব বেয়েই বহুভাভ

জানব এ গুল কিছুটা পার। কিছু পুরোটা নয়। সংস্কারে লগায় আগারে আচরণে সে গুল চাপা পড়ে যায়। আমার ব্যক্তি। অবিকার্য নারীই স্ত্রীকিঙ্ক। নিরক্ষর সেক্সুয়াল অর্থ বলছি না কথাটা। সে অর্থ তো বটেই, তার থেকেও বড় অর্থ—সামগ্রিক জীবনের ক্ষেত্রে—কথাটা সত্য। পুরুষ কিছু এই নারীকে চায় না। যদি সামগ্রিক প্রথম বর্ণনের মোহ ঘটেও থাকে, তবে একটু দ্রুতগতি হলেই সে প্রতিহত হবে, অর্থাত্ত ব্যর্থ, অপূর্ণ, অতৃপ্ত, সংকুচিত হবে। তার পুরুষতার দাবী বোধিত হবে। সে তখন পুরুষতার স্থান করবে। লোকে 'ব্যাপার' মেয়েদের নিয়েই মূর্খ, আমার 'ব্যাপার' মেয়ের কাছেই সে ঘুরে ঘুরে আসে—সেই আদি কাল থেকে আজ পর্যন্ত। আসলে পুরুষ সমাজ-সংস্কার বিধি-নিষেধ গড়ে একটিকে নারীকে বঁচে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে, আর সে ব্যক্তি হচ্ছে। নারীর কাছ থেকে নারীত্বের পূর্ণ শ্রাব্দ সে পাবে না, পাচ্ছে সম্পত্তি-রক্ষক সম্মানের জবাবদায়ী, এই অভাবই তাকে নিয়ে যাচ্ছে ঐ 'ব্যাপার' মেয়ের কাছে।

'ব্যাক, 'ব্যাপার' মেয়ের কাছে যাওয়ার একটা অল্পমাত্র 'পাওয়া গেল।'

'কামনাশক্তি কিস না। যদি দ্বিগুণ-তিনগুণ করে।'

'না, বল। বেশ লাগছে।'

'ইচ্ছাকী?'

'না, ইচ্ছাকী নয়। হতবিরোধ আছে। সে তো তুইই বলি। কিন্তু বক্তৃতাতে তুমি কহি। ইন্টেলেক্টুয়াল ও কবিতার আপত্তি থাকলে এমন কি বক্তৃতা-প্রোডাকশনও বলতে পারি।'

'তাহলে আর একটু বক্তৃতা প্রোডাকশন কর।'

'কর। তোমার পুরুষতার ব্যাপারটা আর একটু ব্যাখ্যা কর।'

'তি, এইচ, লয়েসের Aaron's Rod পড়েছি।'

'পড়েছি। তবে সব যেন নেই।'

'ওখানে একটি পুরুষ-চরিত্র বলছে যে মেয়ের ক্ষেত্রে নারীই আসলে তার ইচ্ছামত অভ্যন্তরীণে কাজ করে নেয়। পুরুষের ইচ্ছার দুর্ভেদ্য হওয়ায় তার পক্ষের ব্যাপার না সমাজের জাল নেই, অথবা অন্য কিছ:। বন্দীত প-ও

এক ব্যাপার বলেছেন যে মেয়ের ক্ষেত্রে নারীই দুর্ভা পরিচালিকা। এই কথাগুলো খুব শক্ত। নারী না বলে পুরুষ পার না। এবং অবিকার্য নারীই হিতে জানে না। একদিন জানত। আর ভুলে গেছে, ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর সে মেওয়ার ইচ্ছাতেই সংকুচিত হয়, মেয়ের সঙ্গে ইচ্ছা করলেও সে ভুলে গেছে। আরি ভুলি নি। ব্যাপার, ব্যক্তিকে কী স্মারিকা নাকি কবেই পুরুষের। আজ, তুই পুরুষ, তুই ব্যক্তিকে কী বুদ্ধি? আসলে সম্পত্তি-সংরক্ষকের বলে নারীকে বেশি রাখবার ক'শ ওটা। ব্যক্তিক বলে কোন বক্তৃতা নেই তা বলছি না। কিন্তু ব্যক্তিক নারীত্বের অংশ মাত্র। নারীত্বকে ব্যক্তিক দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। স্বামীর সংস্কারটাও কেন্দ্র কাল্পনা করে তুলিয়ে দেওয়া। 'স্বামী' যে সেই পুরুষ। আরি বলি উলটো—যে পুরুষ সে 'স্বামী।'

'তোমার না হতে ইচ্ছা করে না?'

'খুব করে। ভীষণ করে।'

'তবে?'

'একটি পুরুষের কাছ থেকে আমার একটি ছেলে চলে নিলে যেমন হয় ভাবছি। চমকে উঠি না। সত্যি-পাতি করি নি। কোনো কলংক আমার বিশ্বতে পারে না। কিন্তু ছেলেটা যদি এই বকল লইতে না পারে। এই ভয়ে ওটা আর কোলার না। নিজের জীবন নিয়ে এক্সপেরিয়েন্ট করার অবিকার আমার আছে। অন্যেরা নিয়ে নেই।'

'এক্সপেরিয়েন্টের মূল্য একটু বেশি পড়ছে না?'

'পড়ছেই তো। বড় এক্সপেরিয়েন্ট যে তোমার বড় বাপা বাপা এক্সপেরিয়েন্ট তো নয় সোটা জীবনটা ফেঁক করেই এ পটিকা। এবং জীবন হাতে আছে মাত্র একটা। অতএব পরীক্ষার ফলাই মোক, পরীক্ষাটা বামী তা বোধহয় তুইও মানবি 'মরগা করাটাই বামী পরীক্ষার লক্ষ্য বুদ্ধি।'

'মরগা করতে পারে কে? বামী মন। অতত সে কৃতিত্বটা যে।'

'হিসাব। সেক্সট,?'

'তাতা আছে নাকি?'

‘নেমন্তর কর্তে হবে না আত্মা?’

‘গোম্’ ঘাবি’খন। একটা কথা বলি রে, শেখর।
তোর যখন বিয়ে হবে তখন, তোর নৌ যখন আমার
হলে-সেবা করতে চলে না, তখন আমার বেশ কষ্ট
হবে। অনেক কথা বলার মধ্যে জন্মে থাকে তাকে
বলে নিজেই বুঝতে চাই। অনেক অভিজ্ঞতা তোর প’লে
কেনে বিচার করি। তাতে কিচাটা দুটো বিশদীত
ব্রাত থেকে হয়।’

‘তুই একটুও একা বোধ করিস না?’

‘ভগবৎ। সময়-সময় অবশ্য। সৰ্বদা নয়। একা
বোধ না করে আমার উপায় নেই। সেই নিঃসঙ্গতা
কাটাগার মধ্যেও অনেক সময় আমার ঐ কল-শব্দতরঙ্গের
শুশু নিতে হয়। অনেক সময় তাতেও এটা কাটে
না। তখন কোন না কোন ধরনের মলকতার আবেশ
নিতে হয়। সেই উত্তেজনার একটু ভুলে ঘাবি—
খিদ্যা অবশ্যের কাছে ভিড়ে আঁগি তার পরে।
মাত্রে মাত্রে ক্রান্ত হয়ে পড়ি, আমার স্বাধীনপন্থি
যেন করে থাকে। বাইরে থেকে বোকা বার কিনা
কলতে পারি না। তেতরে খটছে। ব্যাপন পক্ষ।
লক্ষ এতদূরে ব্যাপন যে মাত্রে মাত্রে আনি ভাবি—
স্বাধীনতার অর্থ কী, উদ্দেশ্য কী! এবং গতিই কোন
উদ্দেশ্য দ্বারা পাই না, যে উদ্দেশ্যের কথা আসে
বলদান—দুর্গ বাবুদেও খোঁজা—সে চলছে। কোনো
দিন ভা কপালে শুটবে না এটা বুঝেও আনি
ধাঘতে পারব না। হুঁতে আমাকে হবেই। উদ্দেশ্য-
হীন ছোট। না, না, তোর কোনো উপদেশ আনি
শুনব না। তুইও একটা প’ন কিছু অম্য হুঁটিছিল,
এং পান মি, পানি কিনা তাতেও সবেম পোষণ
করিস, অত রাসতে পারবি না। সূতরাং তুই আমার
থেকে কিছু ভান নেই। তাম্বাড়া, তোর ম’ম মেখে
বুঝতে পারছিলাম, তুই একটা স্বাধীনতাক বক্তৃতা
ছাড়াবি। ও আনি শুনব না। যত্নের দু’দু’র কথা
শুনতে চাই না, কেনেইলাইজ্জ’তক অবশ্য উপদেশ
শুনলে আমার মাথায় ব’ন চড়ে যায়। নিজে ক’ল
করে ঘাবি কিছু; বলতে চান তবে বলতে পারিস।
বল, চন্দনার কী বয়স?’

চন্দনা

এ কোন ছায়াপথ হয়ে আনি দাছি! আবহা।
আকাশ। ছোয়াংরা। মাঠ। চলছি। কতকণ হয়ে
হুঁটিছি। কত পথ পেরিয়ে এলাম। কোথায় দাছি ঠিক
জানি না, কিন্তু এক পরম আনন্দের একটা বিহু বেন
অপেক্ষা করে আছে আমার জন্যে। কী সেই ‘কিছু’
হালকা নেই। রাত্তা অবশ্যক্যানি। কষ্ট কম নয়।
কিন্তু কষ্ট আমার আনন্দে পরিণত হয়ে থাকে প্রতি
পন্থকপে। সে কি পা কেনা, না হালকা হাওয়া ভেসে
চল। আনি যেন হাওয়ার ডুই-কর গুণের দুলতে দুলতে
চলেছি। এক একটা ডুই আমার কত হুঁরে এগিয়ে
যিচ্ছে। কী বিশুদ্ধ আনন্দে আনি দাছি। এখানে তুমি
আছো। সর্বত্র, এই আকাশে, ছোয়াংরা, মাঠ। ঐ
ছোয়াংরার হালকা দ্বন্দ্ব হাতে আমাকে ঘিরে আছো
তুমি, যেন তুমিই আমার নিবে চলেছ।

কতদূর এসেছি জানি না। এক ব্যাপার এসে হঠাৎ
যেন আমার ঘুর ভাঙল। এতকণ ঘুর পশ্চি করে বিহু
সেখাছিল না। এইবার সেখান। সেই আলোর গাহ।
শেখর। হালকা আলোর বৃত্ত। চকন কাত। চারা
একটা গাহ। আলো। বই। শেখর, দু’দু’র গাহটা
হুঁতাপ হয়ে গেল। কাণ্ডটা হয়ে গেল একধানা চককে
ছোয়া, আর লতাশাটার মাথটা একটা কালো বগা
বীভৎস ম’ম। ছোয়াটা অদ্ভুত ম’ম হয়ে গেল। লাল।
বিন্দু ক’ছে। সেই ম’মটা কাঁপের পড়ল আমার গুণ।
আতকে মেখে উঠলাম। প্রভু কোদালে।

টোপন এসেছে। আনি ঘুরিয়ে পড়েছিলাম।

আমার আলোর গাহ কোথায়। আনি যে সেই গাহের
তলার আমার মাথটা একটু হাঘতে চাই, শেখর।

কম্বী

এই রাত্তা ভাকার এসে দেখে গেল টোপনকে। না,
তখন পিছু নয়। গুহু বিলেন। ভয়ের বিহু নেই।
দিল্লী মেলেও ঘুর আশঙ্কি নেই। তবে নেওয়ার সময়
রাত্তার ঘুর শারবানে নিতে বললেন। ভয় করছে। যদি
এই আনি’র অম্য হুঁটো বেড়ে যায়। তুমি যেই সকালে
এগেছো, তখনই বুঝেছি একটা অম্যটা খাবে। অবশ্য

আমি আমি আসতে বলেছিলাম। বাক, বত খটনই বটাও, আমি দাব। আনাকে ঠেকাতে পারবে না।

টোপনকে শুনিয়ে রেখেছি। এমনিতে সেখানে ভালই আছে। তবে একটু নিরাশ। আর কী যেন ভাবছে। হঠাৎ বাপের কথা। ও না শেব পর্বত ওর বাপের মত ভাবুক হয়ে ওঠে। ব্যাটাছেলের অত ভাবুক হওয়া ভাল নয়। ও বিলাস ওদের শোবার নয়। ওরা হবে কাশ্মীরের লোক। প্র্যাকটিক্যাল, ডেয়ারিং, জ্যাংিং। প্রথম খবর কোশে মিনামিনে কম্পনা নিয়ে বসে বাক মচিং নয়। ভাবুক হাওয়ার বিলাস মেয়েদের শোবার। মদের কাছ কম, মদর পি। আর নিষেধ মনটাকে টিতে ওরা ভালবাসে—যেমন ভালবাসে ওরা পিপসুকে টিতে-চটকাতে। পিপসু ওদের মনেই একাংশ। মনেই শ্যমান অংশ, স্পর্শযোগ্য একটা মৃদাঙ্গ।

‘হা, দিল্লীতে ঐ ঘোড়াটা নিয়ে দাব।’

‘যেও।’ ঐ রকিম মনটা টোপনের মূর্খ প্রিয়। কত নয় যে ওঁর চড়ে ও যোলে। ওটা তোমার কেওয়া। ঙ্গার ওকে চড়ে মূলতে দেখলে নানা কাটা কাটা-ফেঁড়া-ফেঁড়া হবি আমার মনে আসে। ঐ ঘোড়াটা তোমার তই। টোপনকে কবে নিয়ে ছুটিয়ে। জেলে জুঁবি বাধা। রাসাই সেই শেকল। বেঁচে রেখেছি। নইলে কবে জুঁবি ঙ্গে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যেতে। এখন পারছ না। কিন্তু একদিন পারবে। জেবটা ভেঙে ঘোড়া যায় তার। ওয়ার অবশ্য হয়ে যাবে। ভাঙ্গা জেবটা মূলতঃ কাগজে। দুখ একটা জেব হয়ে। গোটা কত কাঠের টুকরা। রাসের টুকরো কতগুলো—গ্রাণহীন। আমি গড়ে আকবো—দুখ।

শেষ

চন্দ্রনার কথা কী বলবে শেষে। লীলা জিজ্ঞাস হয়েছিল। কিন্তু দলটা শেষের নিম্নেই থাকে না। অবশ্য লীলা ‘সোভনীয় অংশ সোভনীয় মূলতঃ’ দরখা তাদের ঘো নেই। এত কম তাদের দেখা হয় যে মনটুকুই সান্ত্বনীয়। জীবনযতে এ দরখা দেখা মেলে কি না সে লতে পারে না। একটা কথা সে ভেবেছে, নিকট গায়িতো লোক পুরোনো হতে পারে, কিন্তু মজুন

আগিভারও কি একেবারে ঘটে না।

শেষেরে কৌতুক-উৎসাহ অংশটা গিকিয়ে উঠল : ‘নিষেধ মনকে চোখ ঠায় নাভো?’

উত্তর দিল তার আর এক অংশ : ‘কি করে বলব, অভিজ্ঞতা নেই তো।’

‘হাঃ। চন্দ্রনার সঙ্গে অভিজ্ঞতা নেই হাতো। কিন্তু মৃদীর সঙ্গে? তাকে তো ভাল যেসেই বিবে কয়েছিলে। মৃদীর মনে তার মধ্যে কান্য অংশ এক বিশুদ্ধ অবশিষ্ট হইল না।’

‘চন্দ্রনার ক্ষেত্রে তা হবে না।’

‘হবে না আনন্দ কি করে?’

‘না, না, তা হবে না।’

‘চাঁকার কোরো না। কেন হবে না?’

‘ওকে আমার ভাল লাগে।’

‘মৃদীরকেও ভাল লেগেছিল।’

‘সে এ রকম নয়।’

‘একে ব্যাপারও একটু অন্য রকম ভাবে লাগতে পারে।’

‘না, না। জুঁবি মূর্খ হও। আমার মনে সংখ জাগিও না। আমাকে একটা ব্যয়গার একটু মৃদু তে হাও। আমার পায়ে ওলায় মাটি কেটে চৌচির হয়ে গেছে। মোহাই।’

‘আচ্ছা। আপাতত বাচ্ছ।’ তোমাকে এখন বন্ধ করুন দেখাচ্ছে। তাই দাই। তবে আমার আমি আসব। আমার মূর্খ করবে কি করে জুঁবি। আমি যে তোমার মধ্যে আছি। আমি যে জুঁবি। তোমার আর এক সভা।’

‘আমি মদন লাল দেহ-বন-প্রাণ একটা কোনো মূর্খে বাচ্ছিয়ে তোমার চন্দ্রার আমার মাঝার শির হিঁচড়ে কোঁপ, তখন জুঁবি তারগুলোকে তাই পাকিয়ে মূর্খটা মনট করে হাও, তাই না।’

‘হ্যাঁ, সে আদর্শ, ঠিক হয়েছে। কিন্তু আমাকে যে জুঁবি তৈরী করে জুসে।’

‘বিশেষ কথা। আমি জুঁবি দি।’

‘পারিপাশ্য’ গড়েছে তোমাকে। জুঁবি গড়েছে আমাকে। আমাকে জুঁবি ভর পাচ্ছ। তাই না?’

‘পাচ্ছ।’

‘কেন?’

‘আমি তোমাকে টুটি টিপে মাগতে চাই। কিন্তু আমি তোমার চোখে অসহায় বন্দী। আমি শেকল ভাঙ্গবার চেষ্টা করছি, কিন্তু—’

‘পারবে না?’

‘পারব। আমাকে পারভেই হবে। একজন কাউকে আমি পারি চাই। তাহলে পারব।’

‘হুটো অল্প লোক যোগ করলে একটা কুন্ডলান লোক হয় না।’

‘তবু আমার চেষ্টা করতে হবে। আমি হাস ছাড়তে পারব না। তুমি একটু দূরে দূরে যাও। আমি চন্দনকে ডাকি, চন্দনা, চন্দনা আমার কাছে এসো। হুটো’র মত এসো, আমার আলো করে যাও। হুটো’র মত এসো, আমার সঙ্গীত করে তোমো চন্দনা।’

‘কী, এসো?’

‘না। পুরোটা নয়।’

‘তাহলে?’

‘ভাল লাগছে না আমার।’

‘আজ্ঞা আমি একটু গা-ঢাকা দিই। তেজকে ব্যাথো দাবার।’

‘চন্দনা, চন্দনা, চন্দনা—’

চন্দনা

তোমাকে আমি পেয়েছি কব। আমার কথা বার বারি। সেই প্রথম দিনগুলোতেও তুমি ছিলে কালের মোড়কে মোড়া। তোমার বহুবার কত দিন ব্যর্থ আবার করে আহত হয়ে ফিরে এসেছি। তেঁমেছি, বাস করছি, তোমার কাছকে অভিযাপ দিয়েছি। কিন্তু তোমার হেঁকে বাব এ কথা ভাবতে পারি নি। আমার চাক্ষুণ্য বাব দিয়ে ব্যক্তি সমস্ত একটা বিশ্বস্ত পত্রের মত তোমার সামনে পাতা থাকত। কিন্তু কালের বেড়া ছড়ানো ছিল তোমার পথে।

আসলে তুমি তখন ভাগ্যবিশেষ। ভাগ্যতে শূন্য তুমি করে অনেক দিন থেকে। ঐ সময় স্বাধীনতা অগতির বড় ওষুধ চোটে লেগেছিল। তোমার ভয় চোমার দাঁড়। তুমি পেটা সাল্যাবার চোমার বীণ।

যেহা হলে মাঝে মাঝে তুমি এটা-ওটা বলের, কিন্তু তখন চীৎকার অসহন্যে নয় এক ভাষাতত্ত্ব খাণ্ডত যে আমি ওপর যেমন বিপের কিছু শূন্যতা না, বাবে কথার দর নষ্ট হচ্ছে বলে শূন্য চোমার। এর মধ্যে আমি তোমার সাহায্যে বি-এ,—এ-এ, পড়ে কেল্লাব, প্রত্যেক স্বাধীনতার সংস্পর্শে এলাব কিছুদিন, এবং হুটো ব্যাপারেই বাব অবত ছিল, কারণ আমার ভাইবোনের অনন্যে পড়তে হবে এই ছিল ওঁর আশংকা। সেই সংস্পর্শবিশিষ্ট হুটোই শূন্য উচ্চারণ করেছিলেন একটা কথা, ‘না’। আর হুটোই আমি সেই ‘না’ কে অমান্য করেছিলেন। না যেখানে একবার অব্যাহত হয়েছেন, সেখানে আর তিনি সম্পর্ক রাখেন নি। এখানেও তার অব্যাহত হোল না। আমার ভাইবোনকে আমি না বাইরে রাখব না আমি—এ কথাটা বোঝাতে পারলাম না। না এ ব্যাপারে কোনো রিগ্‌ক করতে রাজী ছিলেন না। শীতল ওষুধ প্রচীরের ব্যবস্থা বটে সেল। ঢাকা ছাড়বার পর থেকে আমার ছিলাম বহু। আমারের আমার ছাড়া আর কেউ ছিল না। না ব্যবস্থার বোঝা সেল তৃতীয় এক ব্যক্তি একটি কাটলের মত আমারের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে, এবং সেন্সিটিভ তুমি। আমার দৃষ্টিতে হুটোকে হাফালাম। আমার তুমি ছিলে। না একা হয়ে সেলেন। হুটো না, আমার অন্য ভাইবোনেরা ছিল। বাড়ি আমার কাছে শূন্য বাসস্থান হয়ে সেল। অত তোমাকেও আমি পেতাম না। আমি কেন এক বসন্তের কাঁচা হয়ে রইলাম। মাঝে মাঝে একটা বেলা ওঁর হয়ে দেখা দিত, বনে হোতো আমাকে তোমার প্রত্যক্ষ নেই। এই তুল ভাগতে অনেক দিন পেয়েছি।

যখন এই জ্বলের কেলবার বিপর্যস্ত থাকতাম, তখন মাঝে মাঝে আমার দুঃখের কথা বনে পড়ত। দুঃখের কথা বহু। ঢাকার থাকতে আমার কিলোর বনে সে এক বিশৃঙ্খল উমানবার দৃষ্টি করেছিল। আবেগে-উত্তেজনার সোকাটা—না ছেলোটা—ছিল প্রবল। তার উচ্চারণ ব্যক্তিগত সম্পর্ক থেকে স্বাধীনতাক বিতর্ক পর্বত পর্বত অবতন করা যেত। অত্যন্ত জীবন্ত ছেলে। আমার যখন ঢাকা ছেড়ে আমি, তখন সে

হলে। দুবেলার সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি। যে এখনও পূর্ববঙ্গে আছে—রামশর্মা স্বাভাবিক কথী হিসেবে সরকারের চক্ষুদল হয়েও, নিরাস্রব অত্যাচার হুন্সে ভোগের পরেও। সে কিশোরের চোখে দেখা এক আদর্শ পুরুষ হয়ে আছেও আমার মধ্যে আছে। দিল্লী পাল্লামেন্টে বিতর্কের দর বন্ধকার এমর্শন-বৃদ্ধেরা প্রাণ তুলেছেন—পূর্ববঙ্গের লোকেরা এদিকে আসছে কেন, উদ্বিগ্ন থেকে দাবী-দাওয়া করলেই পারে স্বাধোপদেশে রাখবে। তখন আমার ভাবের কাছে গিয়ে বলতে ইচ্ছে হয়েছে, কেন আমরা এগেছিলাম। আর দুবেলার প্রদল তুলে বলতে ইচ্ছে করতাম—এখনও ওখানে মানব আছে।

দুবেলার কথা তোমার বদেহি। তবু সবটুকু কি বলতে পারছি। আমার অনুভূতির দ্বারা সে ঠিক কি ভাবে হয়ে আছে এ তুমি অনুভব করতে পারো না, পাগটা সন্দেহ নয়। সেই জন্যে এক এক দর বদেহ য়ে তোমার দল্লকে' কিছুটা অব্যয় আমি করছি। আমার মন কোটার প্রথম সূত্রিত বদ ও উদাহরণ আমি তোমার দিই নি। তুমি হরতো লেবে, 'তিনিগটা বহরের কোথায় কোনো একটু অচিক মদবে না, এ কি হয়?' হরতো হয় না। তবু আমার মনে হরতো একটু সংসার, অব্যয় তার থেকে বদ একটা বিহু—কী তা জানি না—আছে।

সেই নিমটার কথা মনে আছে? তোমার ঘরে আর এক দিন। সেই বই, বিদ্যনা, টেবিল, চেয়ার, আর চকল তলী ধীপরিফকা। আর ঘরের মালিক। আল মস্তার নয়। বরং বিপদীত। তোমার কাছ থেকে মল চুকার আছন। যে আদ্যনের জন্য আমি দিবের মর দিন, হাতের পর হাত মেলে দিলাম। তুমি দামার হাত ধরলে। আমি শিউরে উঠলাম। কীনা দামার দামল না। চোখে জল এসে গেল। তোমার হাতের মধ্যে আমি মরে উঠলাম। আমার আর সব চেতলা তে-হবে তোমার শপের দালদটার বেঁচে উঠল। নই বেঁচে থাকার এতটা কম্পন এখান থেকে ছড়িয়ে ছড়তে পাগল—দারা ফেরে, মদে, বিম্বত্বমে। মদে হালো, আলোর পাগের তলার আলো-এলো দামার

বৃত্তের মধ্যে এসে গেছি, বিশেষ গেছি ঐ দামা-দামা আলোর মধ্যে, তোমার মধ্যে।

তবু আমি পাগলাম না। তোমার আদ্যনে দাড়া দেওয়ার সামর্থ্য নেই আমার। আমি যে জানি কী প্রবল হেসে তুমি আসছ, সেই গতির সঙ্গে আমি মেলাব কী করে আমার দ্রব শিবেল দদ্যরণাকে। আমি জানি, তুমি তোমার মধ্যে কী ভাবে ভেগেছো। তোমার নিষের ভাবার তুমি 'এক বদমত্ব'। সেই ত্বকে আমার গড়ে দেবার শক্তি আমার কোথায়, কোথায়। তোমার মন কখনো-কখনো এক বিতর্শী ইতিহাস, তার পরিদর্শন দৃষ্টি-সঙ্গতি এনে দিতে পারব এত আস্থা আমি কোথায় পাব। আমি যে আমাকেও জানি। আমি নিজের ভেগে-কড়ে একশা। হরের বীরাঙ্গার সংগ্রামে আমিও বিপদে, দ্রাভ। আমি কহু। তোমাকে দরগ করতে পারি এমন আবার আমি নই। মৃদুতের আদ্যর পাবার পর মৃদুতে' তুমি দ্রাভ হয়েত দরবে, আশাভঙ্গের আর এতটা ইতিহাস রচনা করতে চাই না তোমার মধ্যে। আমার কহুকে যৌন তুমি আবিষ্কার করবে সে দিনের মূল থেকে তোমাকে আমি বাঁচাবো। এই আমার মনের দাবনা।

তোমার কাছ থেকে কিরে আমি কদিলাম। এক মর্শাভিক অবদার মধ্যে পড়লাম। এ এক নিত্য কব —নিজের সঙ্গে। আমার কহুয়ের দারিহ চাপাদাম ইন্দরের ওপর, তাকে অভিশাপ দিলাম। আমার অকবতা আমাকে লিখিত করল। আমার অপ্রত্নতি আমাকে বিহ করল—বেদনার, আয়ত্তানিতে।

কিন্তু আমি তো মানব। অত্যন্ত সাধারণ মানব। আমার কামদার হাত থেকে তো আমার মুক্তি নেই। আমার সেই লোভের সঙ্গে প্রতি মৃদুতে' সংগ্রাম করে আমি বিকৃত। তাই একদিন পাটদার উন্মোচ্য পাণ্ডি দিলাম। কিন্তু সেখানেও দঃগে। তাই আমার হুটে হুটে আগতে হয় তোমার কাছে—আবার কিরে দামার দঃগে। মদে অদ্বত-বারি দিবে বাই আমি আমার ত্বকার জন্য।

শেষ, আমার কহুয়ের কথা তোমার কোনো দিন মনে হয় নি। গতি করে বল।

শেষর

প্রবাল

চন্দ্রনার চিঠিটা পকেটে ছিল। ট্যাক্সিতে উঠে বেশ একবার চিঠিটা : ‘...আমি আর পারছি না। এই টানা-হেঁচকা করে নিজেদের ধীরে ধীরে করে ফেলছি আমি। তুমি একটা কিছু ভাব করে করো না কেন? হয় আমাকে হিঁকি দিয়ে যাও তোমার কাছে। নরতো হুঁকে হুঁকে ফেলো নাও। এই জীবন-ব্যাপী অনিশ্চয়তার হাত থেকে তুমি আমাকে বাঁচাও। তুমি হুঁকি নাও বিভ্রমনার বন্ধন থেকে। এ বন্ধনে পৃথু বেঁধে আছে, আনন্দ নেই। কল-বীন হালা। ভোর সার। শেষর, জীবনকে নিয়ে একসপেরিয়েন্ট করতে আর পারি না। তিরিশটা বছর জগৎ আমার নিয়ে ভেসে-চড়ে গলে-চলে নেড়ে-কেনে মাড়িরে-পাড়িরে একসপেরিয়েন্ট, করছে। আর আমি সেই পরীক্ষার উপাদান হয়ে থাকতে পারছি না। রান্ধু হতে চাইছি। খাঁটি একটি নারী। শেষর, তুমি পার না জানাও সেই নারীতে পর্যাবসিত করতে? পৃথুবার নারী। আর কিছু নয়। চৈরকমভাবে তুমি আমাকে নাও। আমার শীমানততা যদি একদিন তোমার পিঠে নায়ে—সেই আন্তরকে আমি কিছু করতে পারি না। আমি মনে প্রবল, বাইরে অর্থব’। শেষর, আমি আসছি। আর সব চিন্তা এখন হুঁকে চলে থাক। আমার হন একটি ভোক্তের নত পৃথু তোমার দিকে থাক।...’

‘বাবু,’ ভ্রাইডার ডাকল। শেষর এসে গেছে প্রবাল ঘোলের হোটেলের দরজার। ফেলবে ঠিকমত সময় শেখিতে হলে আর ট্যাক্সি হাট্টা উপায় নেই। ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিল শেষর। পরে আর একটা ঘের। কাগল প্রবাল একটু বকবক করবে নিলসেবে।

প্রবাল বিসেত-কেত বড় বরের ইঞ্জিনীয়া। এতু চাড়া চোখাচার করে। বিয়ে করেছিল, ভিডোপ’ হয়ে গেছে। থাকে একটি বিশ্লিষ্ট হোটেলের একটি কামরা নিয়ে। শেষরের থেকে সাধাধ্য ফলে বড়। ইয়োরোপের সাধিত্য পড়াশুনো আছে ভাল। সেই দূরেই শেষরের দলে বিশেষ করে গেছে। এইলে উভয়ের আঁকলই গ্রাহ্য লেত।

আরে শেষর যে। এসো, এসো। অনেক দিন দেখা হয় না। গ্যা করে এক আধ দিন এ বৃত্তোয়ার ঘরে না-হয় পারের ঘুসো বিলিয়ে। বোসো, বেশ আহার করে বোসো। পা তুলে, কাণ হয়ে, চিং হয়ে—বা ইচ্ছে। ঐ ব্যাপারটার এদেশে সাহেবী বরণ বেওয়া উচিত নয়, মনে করি। ভেবে গ্যাগো তো, তাকিমা-কমাসের নত জিনিষ হয়। তারপর কী বর বল। কাকি-দুবর্ণার ‘পুনর্মিলন’! সে বর তো জানি। কোথায় জানলাম! তোনারের হবনের সঙ্গে একদিন দেখা হয়েছিল সত্যার। ও বলল। তা ওরা ব্যাপাটা বন্দ করে নি। ভাঙ্গা হাড় কোঁড়া লাগিয়ে দিলে! আমি চেষ্টা করব? হা হা, বেশ কথা বলেছে। আরে ও সব হচ্ছে কচি হাড়—চট করে কোঁড়া লাসে। আনারের বৃত্তো করো হাড়। তা তুমি তো আমার চেয়ে কিকিৎ কচি আছো। চেষ্টা করে গ্যাগো না! বলো তো, না হয় হুঁকে হুঁকে হুঁকি দেবার কাছে চলে যাই। পৃথু ব্যাপার সো-পক্টইন’ হবো না যে। না-হয় হাড়ভুঁই হুঁকি, তা বলে হুঁকো-একটা কারো করে কখনও বদতে পারব না? দরকার নেই? না, তুমি একটা হোশদেব। আরে হ্যাঁ, আমার তো এধিকে ‘পুনর্মিলন’ হবার যোগ্য হয়েছিল। না, না, বিশ্লিষ্ট হবার কিছু নেই। কোথায় দলে একদিন দেখা। ওকে দেখলে আনকাল বড় বড় হয়, জানলে শেষর। ওর যদি একটা বিয়ে হয়ে বেত আবার কারো সঙ্গে, ভাল যোতো। ওকে এত পেল’ দেখাছিল যে, বিশ্বাস কর শেষর, আমার একটু কষ্টই হাছিল। না, পুনর্মিলন অবধি গভার নি। ব্যালাদাপেই পরিসমাপ্তি। আমি ওকে বার কয়েক টাকা সাহাধ্য করতে চেয়েছি। না, ঠকতো নয়, বিনয়েই। ও বের নি। কোথায় দলে দেখা হবার পরেই পুনলান কাকি-দুবর্ণার কথা। বেশ আনন্দ যোসো। ওরা যা ফোক একটা গভার চেষ্টা করছে। আমরা তো কেবল ভাস্পতেই আছি। তুমিও। এ ক্ষেত্রে অতত আমরা সখ্য। শেষর, তোনার ভাইভোসের কাপোটা কী, তা বোসো বিন ভেবে দেখো? সব বয় নিকলই হুঁকি ওপর লাগিয়েছো। আমিও

তাই। কিন্তু এখন এক এক সময় অন্য কথা ভাবি। না, নিঃশব্দ ঘোর বন্যহি না। আসলে বিয়ের পর প্রথম বুকেরান যে আমি কত বিশেষ। কথাটা প্রথমে শুনতে উশড়ি। কিন্তু তুমি হঠাৎ বুকের। বিয়ের আগের একাকীত্বের তরঙ্গ সাধনো আছে, আশা করবার ক্ষেত্র আছে, বর্ণনার অন্তত সে একটা সল্লী পায়। বিয়ের পর সেইটা ভাঙ্গে, অসুখ ভেঙ্গেছে আমার ক্ষেত্রে। তখন এক সিলী রকমের বন্দনা। বাটার বাঁধা একাকীত্বের চরে আকাশে ছাড়া একাকীত্ব অনেক ভাল। কী বলছ? ইমোশ্যনের কথা? সে তো তুমিও বই পড়ে জানো। আমি দু'চারবার গিয়েছি অবশ্য, কিন্তু আমায় তো এদের চোঁখ অনেক হাট্টের থেকে। হ্যাঁ, তোমাদের রান্নাও নাকি ভিডোলের সংখ্যা বেড়েছে। এখন কি, এ কথাও বুঝে চলবে যে তুমিই বিয়েই পাকা বিয়ে। নকল তোছো নাকি? তোছো না? কেন? ত্রি চরিত্রের সুযোগ থাকলে ভিডোল' বিজুটা হতেই পারে—হ্যাঁ, তা ঠিক। আসলে আমার শরীরা তা নয়। আমি ভাবি, ওয়া ভিডোল' সত্যেও সম্পর্কটা পড়তে পারছে কি না। পড়িবার এবং আবারের কেউ কেউ বিয়ে করেও সম্পর্ক পড়তে পারি না, এটা থেকে ঘাই। ওয়া সৌক্যে কাটাতে শেখছে কি না, এটা তোমাদের সমাজতন্ত্রের সামনে একটা বড় প্রশ্ন নয়? ক্রাসেস তো নাকি একটা দল বিয়ের চরে শ্বাংনি 'লিভ-টুয়েদার' বেশি পছন্দ করে। বাটার গলেস তো বিয়ের আগে ব্যবস-পুনর্জন্মের বেশ কিছুকালের জন্য দর' অর্থে 'শিক্ষানবীণ' থাকতে বলেন, সেই ট্রায়ালের পরে বিয়ে। থাক সে, এ সব কথা থাক। তোমার দর' বল। ওকটু পানী চন্দ্রক। নয় কেন? ভাড়া আছে? হুং তেরি, ঘোড়ার ছিন পাগে কেন আসো? পরে একদিন এসো—হ্যাঁ, ঘোড়াকে রেখে দিয়ে কিন্তু।

শেষ

চ্যাকসি। চন্দ্রনার চিঠি: '...শেষ, আমার শীমারক্ততা ঘর একদিন তোমার কাছে কাঁদে হয়ে দেখা দেয়, তবু কি তুমি আমাকে কমা করতে পার। আর আমি প্রত্যাপন' হয়ে থাকই বা কেন। যেন নিজ

নিরাপত্তার কান্দাল হয়ে বিয়ে করতে খোঁজা করে, এও তার কাছাকাছি। তুমি হয়তো বিতে পাগো কমা, নিরাপত্তা। কিন্তু তুমিও তো কিছু জানো। বুঝে বড় একটা সম্পর্কে তুমি পেতে চাইছ। দেখানে আমি কতটুকু? শেষ, তুমি জানো না, আমি এক কতু ভয়তরুণ। এক এক সময় তুমিও টুকরোগুলো তোমাকে বেরে দোটা একটা হয়ে ছাড়াতে চায়। তখন আমি হঠাৎ বুঝে বড় হয়ে ঘাই—তোমার বাহিত আবারের মত। টুকরোর থেকে দোটা এক তো বড়ই। কিন্তু এই নাকি আমার সব সময় থাকে না। তুমি পাগো না আমার মধ্যে সব সময় সেই নাকির স্কার করে রাখতে।...

নিম্নত্বের শেষ বাড়ি। পূর্ণ ও বৃন্দ। শান্ত, স্থির। আকাশ' সম্পত্তি—লোক বলে। সম্পত্তির সব বিধি নিয়ম পালিত—অক্রেপে। ওয়া কোনো দিন কল্যা করেছি কিনা কে জানে! কান্তি-সুখের সংবাদে ওরা বুঝী হোলো, আশ্ব' হোলো। শেষের মনে হোলো, বুঝে ভেতরে ওয়া ওদন ভিছুই হয় নি হয়তো, সৌন্দর্য্য হার ওটা। সংঘ ও সৌন্দর্য্য ওদের কী রকম প্রাণবীণভাবে বুঝী করেছে। শেষের বেশ সম্পনা করতে পারে ওরা হাতে বাওয়া-বাওয়ার পরে প্রাত্যহিক পারস্পরিক নিরবিত্ত সংঘের করে—কেন ওয়া বাজার করে, রান্না করে, আঁকলে ঘর, চানে কোলে, ভেমন। যথোপযুক্ত সাড়া ধের পরস্পরে। বাহা সরে ওয়া শূন্যে ঘুরিয়ে পড়ে—কাল অকসি আছে যে। শেষের আর এক দল বলস, 'ওয়া বধি ঐতেই দহু'ট হর, তোমার কী?'

'ওয়া সত্ব'ট নয় বলে আমার বিশ্বাস।'

'তোমার বিশ্বাসই যে নতু তার প্রমাণ কি? বাহা' জীবন দেখে দেখে চোখই ঐরকম হয়ে গেছে।'

'হয় তো তা হতে পারে। ওয়া হয়তো বুঝী আমিই শূন্য ভাবছি। তবে হুং-এর কথা মনে আছে।' হুং বলেছেন, সম্পত্তি-স্বাধীন নাকি একটু টেন্ডেন্স প্রয়োজন।'

আমার চ্যাকসি। হাওড়ার দিকে। চুত। 'আমি আগছি'—চন্দ্রনা। 'আমি এসে যাচ্ছি।'—সোনাল বাওয়া আর আসা—বর্ণ'নের সোনার কাঠি ছুঁশোর কাঠি

কান্ধি আর দূর্বর্ণার ঘটনায় সবাই দ্বন্দ্বী হয়েছে। ওদের কাছে ঘটনাটা ইঁটোরাগিঃ। কিন্তু শেষরের প্রস্তর উত্তরে দূর্বর্ণা বা বদেহিন্স তা খুব আশাব্যক্ত কিনা সম্ভেহ। একটা বান্দী শূত্ৰনো বেবে নিষর্গ'র গলায় বলেছিল, 'আর আমি পারছিলাম না, পেখরো।' ধরে-বাইরে লোকের কাছে এত হীন হয়ে থাকতে হয়, যে ও বন্দ এসে বলল— 'বরং কান্ধির কথাটা ভাল লেগেছিল পেখরের : 'জানিস, পেখর, অনেক দিন ভেবেছি, এক সময়ে হার বানা উচিত নয়। এ হারের পেছনে আমারের দূর্বর্ণতা ইঁয়েছে, ঐকিধ্য রয়েছে। সবগুলো সূন্যোস আমরা পরণ করে ঢোঁপি নি। হুটো একটা ঘেবেছি। তারপরই 'ও হবে না' বলে হাল ছেড়ে দিয়েছি—সোটা ঘেসেরা অংক কলতে সেসে অনেক দূর যেমন করে। আর একটু চেষ্টা করা দরকার, সাবনা দরকার। কোনো কিছুই সম্ভব নয়—প্রেরও নয়। অস্তত এ দুসে নয়।'

কান্ধি পারল। অস্তত পারতে চাইছে। পেখর পারছে না কেন? না, হুঁদীর সঙ্গে নয়। চন্দনা। পাচা উচিৎ।

টেনন। এত তাড়াতাড়ি এসে কোন লাভ হোসো না। গাড়ি লেট। 'পনোরো মিনিটে'র মধ্যে তের দম্বর প্রাটিকর্মে—' তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠে হাইক-বোম্বা। পেখর একটা কাগজ কিনল। অর্ধেকটা পেতে বলে বাকীটা পড়তে লাগল। বাটগাও হাসদের পরবাসু-বিকোরপের প্রতিবাদ—সংবাদ। কিউবা। সার্জের কথা হয়ে পড়ল। 'এখানে সাহিহ্যাকরা কী রকম ভিত্তিত। বাড়ি-গাড়িই বোঝ। ওদের সঙ্গে বিবেক বড়ুটা বোঝ হয় প্রবল।

টেন ইয় করল। চন্দনা নামল। একটি মেয়েকে হাত নেড়ে স্কার জানাল। স্কাভ চন্দনা। পেখরের দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল, 'কতকাল এসেছ।'

'বেশ ঘানিকটা। গাড়ি লেট।'

টেননের কাক-কর্ণারে বসে চন্দনা স্কাভ হোসে বলল, 'চলি লেট করতে করতেই চলেছি।'

'হাক, তবু তো এসে।'

'এদায় কিনা কে জানে। ঠাণ্ড করতে পারছি না।'

'সেই-ভিরজন!' হুঁদী দিয়ে কস করে বোঁগিয়ে গেল পেখরের।

'তোমার কি মেঝাকটা একটু বাহাল?'

'টোপনকে নিয়ে হুঁদী আর চলে যাচ্ছে দিল্লী।' নবটা বলল পেখর। 'সেইখবোই কাক-কর্ণারে বললাম একটু।'

'কত ঘেরী আছে ওদের গাড়ির।'

'খাঁধ কটা।'

'তাহলে যাও।'

'লাভ নেই।' করুণভাবে হাসল পেখর। 'হুঁদী আদরে ঠিক পাঁচ মিনিট আসে। টোপনের সঙ্গে আমার মেঝাটা যাতে কস হয়।' একটু ভেবে বলল, 'তবু, গাই ঘি আসে।'

'আমি ঘাব? টোপনকে একটু হেখব।'

'এসো।'

'না, হাক। হুঁদী আছে। জুনি যাও।'

পেখর প্রাটিকর্মে এসে দেবল, যা ভেবেছে তাই। হুঁদী ওঠনও আসে নি। এসো সে পাঁচ-শাত মিনিট আসে। টোপনের জর রয়েছে। বিদ্য অসুস্থ বাস্তার পল। ওর জন্যেও অস্তত হুঁদীর থেকে গাওয়া উচিৎ। কিন্তু হুঁদীকে সে কথা বলে লাভ নেই। টেনটা তীক্ষ্ণ একটা ঠাঁংকার করে টোপনকে পেখরের কাছ থেকে ছিঁদিয়ে নিয়ে গেল।

ক্রমী

আমার কোলে টোপনের বাঘাটা রেখে বসে আমি বাইরে দিকে চেরে। কোলকাতা থেকে দূরে চলে যাচ্ছি। জামলা দিয়ে সেবাছি, আমার ভলা থেকে বাঁচি গরে যাচ্ছে। তেমন আদম্ব হচ্ছে না, বেমন ভেবেছিলাম। বরং আমার জর করছে। টোপনের হুঁদের দিকে তাকালে, সে ওর বাড়ছে। কোথায় যাচ্ছি আমি। দিল্লী। চাকরা। অনির্দিষ্ট হয়ে হচ্ছে এ যাত্রা। একজনকে কাকিত করছি ঠিকই, কিন্তু আমি কতটা পাব কে জানে। নদই অনির্দিষ্ট। অবিনটাই আকর্ষ অনির্দিষ্ট। এই বাঘাটাও। অঞ্চ আমি একটা দিকিত কোথাও পড়িতে চাইছি। টেনটা হুটু চলেছে অনির্দিষ্টের দিকে। টোপনের জর বাড়ছে। ও ঘুমিয়ে পড়ল। আমার জর বাড়ছে। টেনটা ঠাঁংকার করতে করতে হুটু

সেলে। যেন ওকে একটা ভয়ংকর কিছ্‌ ত্যাগ করে।
হাযার কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে, কিন্তু একটা কোনো
স্বাক্ষর থাকলে তার কাছে কেঁদে মন্দ। শতাব্দীর
যে কীনাও যায় না। কীনা যেন বন্ধ চোখে ধরে।
চোপন, ভূই করে বড় হাযি ?

শেষ

চোপনের গুরু ঐ এখনও দেখা যায়। চোপনকে দিয়ে
সে সেল। চোপন। হুঁই। করে চোপনের সঙ্গে
আবার দেখা হবে। করে সে বিলী যাবে। শেষে থেকে
সে হাতটা বসল যেন কে। ও, চন্দনা।

‘চন্দনা, চোপন চলে সেল।’

‘আমি এসেছি।’

‘ভূমি তো থাকতে আসিনি, চন্দনা।’

চন্দনা

না, না, না। আমি থাকতেই চাই তোমার কাছে।
যে আমার ভূমি বেঁচে যাবে, ছোর করে যাবে।
তে বিলো না আমার। বলতে চেষ্টাছিলো কখনো।
সেই না। সেই আমার চন্দনা, আমার শিখারত্যা,
ই আমার আনন্দ—তারা সবাই আমার গলা টিপে
ল। কখনোই যেন গলা বেঁচে চোপ দিয়ে গড়িয়ে
চল। তোমার কাছে বাই আমার সে পক্ষি নেই,
যে। আমার ভয় করে। সেই অনির্দিষ্ট জাতকের
রবী বিচ্ছেদ-যিন আমার আনন্দের যিনের আনন্দ নষ্ট
রে। এই বতাবনের হৃদয়টিকেও কেন ছোর করে
কিছু ধরতে পারি না। হৃদয়ের পাড়টুকু কেন
নাম কানায় ভরে নিতে পারিনে। নতুন। আনন্দ
জড়ার সুর হয় নি সে-বিধায়। আজ হিঁচক ফেলি
নি-কিন্তু। তোমার রক্তের শেষে। শেষ, আমাকে
ও। একান্ত তোমার করে নাও। তোমার মধ্যে
আবার ভূমিরে হাও। হৃদয়ের মধ্যে হলেও তোমার
গই বিচ্ছিন্ন রক্তল সমুদ্রে আমি অবগাহন করি। হাজার
পটার আঁধার আবলুটিই আমার গুণ দিয়ে ভূমি
দেব হাও। গুণতের সব আলো নিভে থাক। শূন্য
জটা আনন্দ হাজার হাজার আলো আমার সারা

দেহে চন্দন করে থাক—বতাবনা না আমি আলোর গাহের
তলার ভূমিরে পড়ি।

শেষ

কয়েক মাস পরে। চোপন। বিলী গাহে শেষ।
চোপনের কাড়ানাড়ি রক্তের অশ্রুতের সংসার এসেছে।

বিলী। হুঁই বাজি। চোপন শূন্য আছে।
হাযার কাছে মন্দ পুঁজুরে হুঁই কাঁদছিল। তাকে সে
জুঁকরে উঠল সে। কোন এক ভাগ্যের সন্ধান করতে
বেরিয়ে গেছে নতুন এক বিশ্ব অশ্রুত পদ। ‘হালাবার,’
হালাবার। হোড়াতা ছুটছে। হালাবার। তাকে
ছিততেই হবে। ছিততেছিল হালাবার। সন্ধান ছিটকে
সেল। ছিততেছিল হুঁই। ছিটকে গেছে চোপন।
কানায় শূন্যতা তার এখন সেখানে হোড়ার মতই। না,
শেষ তার দিকে তাকাবে না। শোকটাকে হালাবার
ছনোই যেন সে একটা কতিন হুঁককে জাগিয়ে তুলল তার
মধ্যে। হুঁইর দিক থেকে গরবে বিল সে হুঁইটা।

চন্দনা

হুঁইটা গরবে নিও না। আমার আর কেউ নেই।
চোপনকে আমি হাযি নি। আমি শূন্য চাই নি তোমাকে
দিতে। ভূমি আজ আমার কেউ নও। তবু ভূমি তো
একদিন আমার শাশী ছিলে। চোপনকে পেয়েছিলো
তো তোমার কাছ থেকেই। একটু হাড়াও। চোপনের
হাঁহা ‘পদ’ তোমার মধ্যে এখনও বেঁচে আছে। তোমার
পদেই হাড়া হুঁই পড়ে থাকতে হাও আমাকে
একটু। এ হাড়া আজ আমি করতে পারি না আমি।
তবু একটু আমাকে ভিজে হাও।

শেষ

কোলকাতা। বিলীতে চোপনকে জন্মে নিঃশেষ
করে ফিল। এসে সে—চন্দনা। পাটনা থেকে
সেই দিনই এসেছে। উজ্জ্বল, হৃদয়গ্রাহক, হাত-গাঙ্গা
ছোয়া। শেষে বিচ্ছেদ কল, ‘কী হয়েছে?’

‘শেষ, আমি—হালাবার—’ অনেক কণ্ঠে বলল
কথাটা।

‘দুষ্কৃত্যর বিহু নেই। আমি বিবে করব।’ চৌপনের কথা মনে পড়ল শেখরের। ‘আত্মব’। বোকাবাবের প্রত্যাবর্তন।

‘তা হয় না, শেখর।’—আঁখির চন্দনা।

‘কেন ?’

চন্দনা

কেন। নিম্নে আমায় আরো হীন মনে হবে, শেখর। এ যে হঠাৎ ঘরে পড়ে তোমাকে বিয়ে করা হবে। এতদিন যে কারপদুলো বাবা হিসেবে ছিল, তা তো আমায় আছে। নিম্নের বিপদ ঘটলে বলে বাবাগুলো সরে তো যায় নি। তুমি বলতে পারো, ‘দায়িত্ব তো আমারও।’ হ্যাঁ, ওহলেও আমার বাবা-গুলো ঠিক এক থাকতেই থাকবে থাকে, তাই না ? তাহলে বিয়ে না করে একে জগতে এনে লালন করব ? শূন্য ইচ্ছে করে তা, কিন্তু আমি ভীত, সংসারবদ্ধ। আসেই তো বলাই আমি তোমাকে আমার কুছয়ের কথা। ‘চাকার মেয়ে’ গুঁড়ো হয়ে গেছে, শেখর। আরো আসে বলে হয়তো পারতাম। এখন ? এখনও হয়তো পারি। শূন্য চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা করতে বলছ ? তারপর ? আমি হয়তো সত্য করলাম বলবকের কচি। কিন্তু সেই নির্দোষ ছেলেটা—তাকেও তো একদিন জগতে পরিচিত হতে হবে। তখন তার দুঃখকাটা ভাবলে আমাকে দারী মনে হয়। না, তাকে এই বিকৃত্যনা-বংশা-পল্লব হয়ে আমি আনতে পারব না। তবে ? ওর জগতে আসা বন্ধ করব ? সেও তো অমায় ? সেও তো একটা হত্যা। না, আমি পানল হয়ে যাব। শেখর, আমাকে বঁচাও। তুমি বললে, ‘না, হত্যা চলবে না।’

দায়িত্বটার দূর হোলো না—নানা বিহু ভাবনার কাঁপলাব। নানা উপায়ের কথা ভাবলাম—সম্ভব ও

অসম্ভব। কোনোটাতেই মন পড়ো যায় মিল না।

সকালে সেলাম ভাকারের কাছে। ও, কী আনন্দ শেখর, ভাকার আমার দুষ্কৃত্য বিবে বিবেছে। না, ব্যাপারটা আমি ঠিক দুষ্কৃত্য বি। ভূস। দুষ্কৃত্য ও পরিচয়ে সাময়িক একটা অবিরাম দায়। আমি দুষ্কৃত্য, শেখর। আমি উল্লসিত।

দিত্যই কি এ আমার উল্লাস ? আমার অভিক্রম উল্লাসটার তলার কিয়তকি করে একটা বেষণার ব্যাঘ্র বইছে, এক শূন্য বরাটিকা বংশার মধ্যে আমাকে জাপাল, জাপাল আমার তুচ্ছকে। যে-তুচ্ছ ছিল আমার দারী-রক্তে, তার বিক থেকে দুঃখ দুঃখের ছিলাম, সে ছায়ার মধ্যে এসে আমার ওপর প্রতিগোষ নিতে শূন্য করেছে। হ্যাঁ, চাই। দে-তুচ্ছার নিবারণ চাই। না, আমি উল্লসিত নই। আমি শূন্য বই নি। চৌপনের মত কে একজন আমার হাতছানি দিয়ে গেল। আমি মনে মনে পাখলের মত তার শেখনে ছুটছি—তাকে ঘরবার জন্যে। কিন্তু সে তো ছায়া-হাঙ্গল ! তা মেনেও আমার তুচ্ছ ছুটছে। নিশ্চিত ব্যর্থতা নিশ্চিত বংশার মত আমাকে বিবে আছে।

তুমি জিজ্ঞেস করলে, ‘এখন কী করবে ভাবছ ?’

‘পাটনার কিংবা দাব।’

আমার যেতেই হবে। দুঃখ সেমো না শেখর। আমি তোমাকে ভালবাসি শেখর। আমি একটা ভালো মানুষ। তুমিও তাই। দুটো ভালার মিলে একটা গোটা হয় কি ? অনেক দূর হয়তো হয়। আমারের ক্ষেত্রে হবে কি ? তাই ভাবব এখন থেকে। আমার নতুন ভাবনা।

শেখর দুঃখ তুলে ভাল করে তাকাও, আমার কিম্বদন্তি। আমি দাব—তোমার কাছে যাব যাব কিংবা আসনার অনোই—বর্তমান না একেবারে আসতে পারি।

‘রাগ’ শব্দের বাহু ও
 ব্যাকরণগত অর্থ ‘রঞ্জিত করা’
 ($\sqrt{\text{Raj}} + \text{अ} (\text{Raj})$)-ত)।

ভারতীয় সঙ্গীতে ‘রাগ’

স্বামী প্রভুনাথ

দ্ব্যস্তীয়া ভারতে নৃত্য-
 গীত ছিল এবং গীত রূপাঙ্কিত
 হোত স্বরের সমাবেশে।
 আধুনিক যুগের অনুরূপ গানে

অলঙ্কারসম্পন্ন ও সাহিত্য
 প্রভাবিত্তে রাগ অর্থ অনুরাগ, আশক্তি, আকর্ষণ
 অথবা রস ও ভাবের অতিব্যক্তি। সঙ্গীতশাস্ত্রে
 রাগের সার্থকতা নির্ণয় করা হয়েছে এভাবে—‘রঞ্জয়তীতি
 রাগঃ’ ;—অর্থ ‘রঞ্জিত’ করার জন্য রাগ। এখন
 প্রশ্ন এই যে কিসের দ্বারা রক্তানো বা রঞ্জিত করা ?
 উত্তর আনন্দসিক্ত সংস্কারের দ্বারা। সুতরাং
 অনুরাগ, আশক্তি ও আকর্ষণ অথবা প্রীতি, শান্তি ও
 আনন্দের ভাব যে স্বর বা স্বরসমষ্টি সৃষ্টি করে তার
 নাম ‘রাগ’। সুতরাং রাগকে আমরা একটি সত্বল
 উপাদান বা বস্তু বলতে পারি যার দ্বারা জিন্দা
 ও কল একই সঙ্গে থাকে শিব-শক্তির বিদ্যুৎস্রবের
 মতো। স রি গ র প ধ নি এই সাত সৌন্দর্য্য স্বর
 (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, অতিশ্রাব্য ও
 ঋতু এই সাত বৈদিক স্বর) ক্রম-স্বাকর্ষণের পথে সৃষ্টি
 করে ‘রাগ’। ভারতীয় নৃত্য রাগ নয়। সৃষ্টি করে তারা
 গ্রাম, বৃন্দা, বেল, অলংকার ও তাম,—পরিবেশ ও বিকাশে
 ধরা এক প্রকারের বোলো ও নামে ও সার্থকতার বিভিন্ন।
 যখন সাত স্বর ছাড়াও পঁচিটি এবং ছিটি স্বরের সমবেশে
 দুপেও রাগ সৃষ্টি হয়। বসন্তিক্ত কোরে আনন্দানু-
 চ্ছতি সৃষ্টি করাই রাগের তথা রাগসংগঠক স্বরের
 সার্থকতা। এই অনুভূতির কারণ কি?—বা সংস্কার।
 যখন যেকোন রকম চিন্তা আধারা করি-বা-কেন তার
 সংস্কার সৃষ্টি প্রথমে হয় যখন সেই সংস্কার আমার
 সৃষ্টি করে চিন্তা এবং চিন্তার অনুভূতি হয়ও যখন
 তখনই যেকোন রাগ সৃষ্টি হয় আর আসে তার সংস্কার
 সৃষ্টি হয় যখন এবং তখনই ধীরে যখন অনুভব করে
 পাস। সঙ্গীতশাস্ত্রকারেরাও বলেছেন।’

যদি প্রবণভাবে রক্ততে সঙ্গীত প্রকাশ।

সর্বস্বত্বস্বাধীনতায় রাগ ইতি নৃত্যঃ ॥

মোটকথা প্রসঙ্গতঃ পরিবেশ সৃষ্টি করতেই রাগের
 সার্থকতা।

হয়তো দুটি বা তিনটি স্বর স্বর থাকত, কিন্তু
 সেই দুটি বা তিনটি স্বরের মধ্যেই থাকত বহুনাশক্তি
 যা কথা ও হৃদয়ের সহযোগে সৃষ্টি করতো প্রসঙ্গ-পূর্ণ ও
 আনন্দ-এবং তার জন্য অরণ্যচারা বা গৃহাবাসী অসভ্য
 আদিম অধিবাসীরাও করতো গান ও নৃত্য চরমপরিপ্রাতির
 মধ্যেও শান্তি পাবার জন্য। দুই-তিন আধুনিক যুগের পর
 এলো গ্রীক-ইতিহাসিক ও ঐতিহাসিক তথা বৈদিক যুগ।
 বৈদিক যুগের গান বা নবানুগে ‘রাগ’ এই পরিভাষা না
 থাকলেও ছিল বৈদিক প্রথমাদি স্বরের সমাবেশ, সৃষ্টি
 করতো হৃদয়ের তালে তালে আনন্দ-পরিবেশ। ভারতের
 নারদীশিকার ও ভারতের নাট্যশাস্ত্রে তথা খৃষ্টীয়
 পঞ্চমের দুইদশ ১ম-২য় পত্রকে ছিল জ্ঞাত তথা
 জ্ঞাতরাগ ও ব্রাহ্মণ্যের বিকাশ। ভারতও দশসকলের
 সঙ্গে জ্ঞাতস্বের করেছেন সম্পর্কিত। ‘রাগ’-শব্দের
 প্রথমও আছে নাট্যশাস্ত্রে, কিন্তু খৃষ্টীয়
 ৫ম-৬য় পত্রকের সঙ্গীতশাস্ত্রী বলেছেন : ‘যদ্যেকং
 ভারতামিতিঃ’—অর্থ ভারতাদি গুণীয়াও ‘রাগ’
 শব্দটির নির্দিষ্ট কোন অর্থ ও সার্থকতার কথা
 উল্লেখ করেন নি, আর তার জন্য তিনি
 বলেছেন ‘তদ্ব্যাপ্তিঃ নিরূপ্যতে।’ মোটকথা
 শিকারার দ্বারা, ভারত ও এমন কি দিল্লি, কোহল,
 ব্যক্তিক প্রভৃতি লক্ষ্যভিত্তি প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রী ও নাট্য-
 শাস্ত্রীরাও ‘রাগ’ শব্দ বা অতিথানের নির্দিষ্ট কোন
 অর্থও সার্থকতার কথা বলেন নি। যতদূর ‘হৃদয়-সংগীত’
 গ্রন্থে একথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং তার এয়েই
 যখন হয় ‘রাগ’ শব্দের অর্থ বোধাত্মকভাবে নির্দ্বন্দ্বিত
 হয়েছে। যতদূর তিন দশক ভাবে ‘রাগ’ শব্দটির পরিচয়
 দিয়ে বলেছেন।’

(ক) স্বরবর্ণ-বিশেষণ ধর্ম্মভেদে বা পদঃ।

কাজেতে যেন যঃ তদ্বিত্যং স রাগঃ সত্যং সত্যং ॥

। ভারতীয় সঙ্গীতে 'রাগ'

(খ) যোগেন্দ্রো যনিবিশেষেৎ স্রবণবিশিষ্টমিতিঃ ।

রজ্জ্বকো জনচিত্তানাং স চ রাগ উদাহৃতঃ ॥

(গ) ইত্যেবং রাগশব্দস্য বহুবচনপরিভাষিতঃ ।

রজ্জ্বশব্দভাষ্যে রাগো বহুবচনিকঃ সর্বসাধৃতঃ ।

স্রবণবিশিষ্টক প্রতীতিস্বরূপ ধ্বনি বা শব্দ বাদ্যস্বরের চিত্র-
বিনোদন করে এবং সেজন্যই এ ধ্বনিকে 'রাগ' বলে ।
বক্তৃতাশি শব্দ সৌকরিক স্বর অ, আ, ই, ঐ প্রভৃতি
স্রবণের সাহায্যে প্রকাশ পায় । যেমন স+অ=স,
স+আ=সা, স+ই=সি, স+ঐ=সি, গ+অ=গা
প্রভৃতি । অ, আ, ই, ঐ প্রভৃতি স্রবণ বহুবচনকে
শক্তিমূলক মনে করে । শব্দশাস্ত্রে এক্ষণ্য স্রবণকে বলা
হয় শিব বা পুরুষ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ শক্তি বা প্রকৃতি ।
সাংখ্যের ধারণা নিয়েই অবশ্য এই ধরণে স্রবণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ
তথা শিব ও শক্তি ব্যাখ্যা করা হয় । সাংখ্যে প্রকৃতির
নিষ্কেষ কোন শক্তি নাই, অথচ প্রকৃতিই সৃষ্টির মূল
কেন্দ্র । সাংখ্যিক রূপিণী তাই পদ্য ও অন্তর উপমা
দ্বিধে অনড় ও অচল প্রকৃতির সঙ্গে সচেতন পুরুষের
সম্পর্ক পাতিয়েছেন । ব্যঞ্জনবর্ণ স্রবণের সাহায্যে ছাড়া
প্রকাশন ও বিকৃতি সৃষ্টি করতে পারে না । তৎপরে
ধ্বনি অনেকটা তাই,—ধ্বনিও তৎপরে শক্তি বা প্রকৃতি
সাংখ্যের শক্তি বা প্রকৃতির মতো ঋতু মরু, ব্রহ্ম চক্ৰা ও
দুঃখময়ী এবং তারি জন্য শক্তি জ্ঞান—ইচ্ছা—ক্রিয়াবহী ।
মোটকথা সঙ্গীতে সাংখ্যের মতবাদকেই বিশেষভাবে
এখন করা হয়েছে এবং আংশিকভাবে সহায়তা নেওয়া
হয়েছে তত্ত্বশাস্ত্রের, কেননা তৎপরে কালী মৃত্যুচক্ৰা
ও শক্তিকালী,—পরমেশ্বর মহাকালের বুদ্ধেষ্টিফিরে চক্ৰালা ।

এ সঙ্গীত বিদ্বৎ কণ্ঠের কথা, কিন্তু সঙ্গীত-
বিদ্যার এই সঙ্গীতবিদ্যাকে বাহু দিলেও—আবার আদর্শ
ও তত্ত্বের দৃষ্ট হয় বিকৃত, কেননা প্রকাশন
সৃষ্টির সাহায্যই থাকে স্রবণে তথা স্রবণে এবং ব্যঞ্জনবর্ণ
হয় উপার বা আধার । সঙ্গীতশাস্ত্রীরা এক্ষণ্য কল্পনা
করেছেন অলংকার ও বর্ণের । স্বামী, সকারী প্রভৃতি
বর্ণ এবং প্রসঙ্গ, প্রসঙ্গের প্রভৃতি অলংকার স্রবণে ও রাগে
হয় সৃষ্টির জন্যই নির্দিষ্ট এবং সঙ্গীতশাস্ত্রে, বিদ্যায়
ও তত্ত্বে রাগ ও সঙ্গীতবিদ্যার ভাবই সঙ্গীত শব্দক ও
স্রোতার একমাত্র উপাদায়ী ।

মতপোষকের সঙ্গীতশাস্ত্রীরা সাঙ্গীতিভব ধ্বনির
আবার হ্রস্বভেদ স্বীকার করেছেন । বৃহদীয় ২৮-১১
পত্রকের শাস্ত্রী জৈন পান্ডুরের সঙ্গীতশব্দমতে বলেছেন,
স্বাধুর্গপ্ণসম্বন্ধে কণ্ঠে স্যামবৃত্তো ধ্বনিঃ ।

বিদ্বৎকণ্ঠে ধ্বনিভাষ্যেহ্যত্রাঙ্কঃ পরসো ভবেন ॥

শব্দ বা ধ্বনি কণ্ঠে স্বাধুর্গপ্ণ বিশিষ্ট হোলে প্রকাশ
পেলে তা স্বিচ্ছ ও সরস হয় । শাস্ত্রের (বৃহদীয়
১৩ পত্রকের প্রারম্ভে) বলেছেন : "রজ্জ্বা রাগতা",—
অর্থাৎ রজ্জ্ব তথা আনন্দরসিক করে বোলেই রাগ ।
টীকাকার সিংহ ভূগাল (১২০ বৃহদীয়) ও কলিনাথ
(১৪৪-১৪৪ বৃহদীয়) রাসের রজ্জ্বশাস্ত্র ও তার
স্বাধুর্গতা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন । সিংহভূগাল
বলেছেন : "রজ্জ্বশাস্ত্রী রাগা",—চিহ্নে রজ্জ্বশাস্ত্রের
সাহায্য প্রদানসহ সৃষ্টি করে বোলেই 'রাগ' । রামায়ণে
(বৃহদীয় ৪০০ পত্রক) ব্যাধিকারী শাস্ত্রী পদ্য জাতি-
রাসের কথা শ্রবণে উল্লেখ করেন নি, বলেছেন : "তৎপরে
বদ্যঃ সর্বো বাদ্যপদ্যবুদ্ধিঃ", তে প্রীতমানসঃ সর্বো
বদ্যো = ০° এবং "জ্ঞানং সর্বগাভ্যনি বনার্গি জ্ঞানানি
চ" । গায় বা গায়ীর ধ্বনি গায় শব্দে সোমাক্ত হয়
এবং জ্ঞান ও মন আনন্দরসিক হয় তা হোলে বাদ্যবুদ্ধি
'রাগ' এই পরিভাষা ব্যবহার না করলেও রাসের স্বাধুর্গতার
কথা উল্লেখ করতে যে ভুলেন নি, সূত্রের বৃহদীয়
পত্রকের শাস্ত্রী ব্রতপ তার কি উত্তর দেননি । অবশ্য
ব্যাধিকারপদ্য বহুবচনের আদ্য বাদ্যবুদ্ধি নেন নি একথা
ঠিক কিন্তু রাসের আদর্শ ও স্বাধুর্গতা যে
প্রদানসহ সৃষ্টি করা এবং জ্ঞানে প্রসঙ্গ ও আনন্দের
পরিবেশ সৃষ্টি করা একথা বাদ্যবুদ্ধি বৃহদীয় ৪০০ পত্রকে
শাস্ত্রী কোরে স্বীকার করেছেন ।

মতপোষকের সঙ্গীতশাস্ত্রীরা বলেছেন ভবভূতের মতে জাতি
তথা আদিকাজিতস্বাদেই প্রকাশ ও অন্যান্য গান্ধব ও
শেষী রাসসঙ্গীর উৎস : "সর্বগীত সর্বাত্মো জাতিবিভা-
তিবিরতে"। অথবা "জাতিসম্ভূতত্বাৎ প্রাচীনগান্যবিভাতি"
কিন্তু "তৎপরে ধ্বনি গীতে কিংবা তৎপরে জাতিব-
দ্বিভব" । এখানে 'সর্বগীত সর্বাত্মো' বা 'বহু গীতে
কিংবা' শব্দসঙ্গীত থাকার পট বা গান বলতে যে
বৃহদীয় পত্রকের শাস্ত্রীর সম্বন্ধে 'রাগশাস্ত্র' বোঝায়

তা মতঙ্গের বৃহৎবেশী থেকে বোঝা যায়। মতঙ্গ অব্যাহত প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রীর গ্রন্থাবলীর নিদর্শনে ভিত্তি, শব্দ, সাধারণী প্রভৃতি সঙ্গসঙ্গীতির পদ্ধতি দিয়েছেন। অন্যে এই সঙ্গসঙ্গীতগুলিকে তথ্যবাহিনী নামে গানবাহী বীতি বা শৈলীর নিদর্শন বলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সঙ্গসঙ্গীত তথ্য সঙ্গসঙ্গীতসম্পন্ন গীতি-গুলিই ছিল অব্যাহত গীতির আকার বা উৎস।

ভরত নাট্যশাস্ত্রে গ্রহ, অর্থে প্রভৃতি গীতি লক্ষণের পরিচয় দিয়েছেন এবং সঙ্গসঙ্গীতের স্বভাব বা ধর্ম ও রূপ নির্দেশে অন্য এই গীতলক্ষণ ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন—

গ্রহাংশো ভাস্কর্যোঃ ৫ ন্যাসোপন্যাস এব ৫।

অঙ্গস্থঃ ৫ বহুস্থঃ ৫ স্বাক্ষর্যোভ্যবিত্ত তথা ১২০।১০

গ্রহ, অংশ, ভাস, বহু, ন্যাস, অংশন্যাস, অঙ্গস্থ, বহুস্থ, স্বাক্ষর ও ভিত্তি এই গীতি জাতি তথ্য জাতিসঙ্গ বা সঙ্গের লক্ষণ। বর্তমান সঙ্গীতশাস্ত্রীতেও সঙ্গ-নির্দেশে বোঝায় এই গীতি লক্ষণের প্রচলন থাকলেও বর্তমানে সঙ্গসঙ্গীতের ব্যবহার নাই। এই গীতি লক্ষণ স্বাক্ষর্য সঙ্গের শব্দ্য প্রকাশের জন্য বাবী, সংবাহী, অনুবাহী, বর্গ, অঙ্গসংসার, বহুনা ও বসের প্রয়োজন। সঙ্গকে সুশাসিত করার জন্য গদ্য, কান্দ, দ্বার (বুদ্ধিক্যাল স্ত্রেম বা স্বরগঠন) প্রভৃতিরও একান্ত আবশ্যক।

মতঙ্গ, শাস্ত্রসেব শাস্ত্রসেব ও অব্যাহত প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রী সঙ্গসঙ্গীতের কথা বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন সঙ্গের পরিচয় দিয়ে মতঙ্গ বলেছেন জাতিসঙ্গ থেকে গ্রন্থসঙ্গ, গ্রন্থসঙ্গ থেকে ভাব্যসঙ্গ, ভাব্য থেকে বিভাব্য বা বিভাবিকা, বিভাব্য থেকে অস্তরভাব্য সঙ্গ (‘গ্রন্থসঙ্গোভ্য ভাব্য ভাব্যভ্যক্ত বিভাবিকা’, বিভাব্যভাব্য শব্দভাব্যভ্যক্ত অস্তরভাবিকা’) তথ্য বিভিন্ন সঙ্গের বিকাশ। টীকাকার কল্লিমাথ ও ‘চতুর্দশী-প্রকাশিকা’-কার বেন্টিংবী জাতিসঙ্গ থেকে অস্তরভাব্য পর্বত সঙ্গসঙ্গীতকে গান্ধার্যের সঙ্গ বলেছেন (‘‘ * স্বরগঠনসঙ্গ-বিবেকমোক্ষীভ্যাক্ষরভাব্যাক্ষর বহুস্থঃ তদ-গান্ধার্যভিত্ত্যঃ’’—কল্লিমাথ)। গান্ধার্য স্বাক্ষর অস্তরভাব্য সঙ্গীতসঙ্গ সঙ্গসঙ্গ, ভাব্যসঙ্গ, উপাসঙ্গ ও জিন্যসঙ্গ এই চারি সঙ্গের অঙ্গ তথ্য গ্রন্থসঙ্গের বিকাশ হয়।

কল্লিমাথ বলেছেন গান্ধার্য গ্রন্থসঙ্গের অনুবাহ্যে বা দ্বারা অবলম্বনে সঙ্গীত সঙ্গসঙ্গ, ভাব্যসঙ্গের অনুবাহ্যে ভাব্যসঙ্গ ও এভাবে জিন্যসঙ্গ ও উপাসঙ্গ সঙ্গসঙ্গের বিকাশ ও প্রচলন।

সঙ্গীতসঙ্গ বদ্য উৎসেবা এরা শাস্ত্র-নির্দেশের অপেক্ষা না রেখে স্বতন্ত্রভাবে সঙ্গীতের শব্দ অনুবাহ্যী শব্দটি হয় (‘সঙ্গীতের নাম কান্ধার্যগ্রন্থভিত্ত্যঃ’—কল্লিমাথ)। শব্দীত ১৮-১৭ শতকের পূর্বে ও শব্দীত ২৪ শতকের পর থেকে প্রচলিত সঙ্গীত ও জাতিত সঙ্গসঙ্গীতকে সঙ্গসঙ্গের শব্দীকৃত কোরে অস্তরভাব্য সঙ্গীতসঙ্গপ্রতিষ্ঠিত করার কাছ পূর্বে হয় এবং মতঙ্গ ‘বৃহৎবেশী’ (বৃহৎ+সঙ্গী) এয়ে বিবর্তনাবে এই সম্বন্ধে ব্যাখ্যাচনা করেছেন। শাস্ত্রসেব সঙ্গীত-সঙ্গাকারে গ্রন্থসঙ্গ থেকে আরম্ভ কোরে উপাসঙ্গ পর্বত মোট ২৬০টি সঙ্গের নামোল্লেখ করেছেন (‘সংবাহার্য সঙ্গসঙ্গঃ বিলিতানাং পতঙ্গর, চতুর্দশীভিক্স শ্রুতে ০ ০’,—সঙ্গীত-সঙ্গাকার, ২৪ সঙ্গাবিবর্তনাব্যাক্ষর শব্দীত)।

মোটকথা শ্রুতি থেকে শব্দ, শব্দ থেকে গ্রন্থ, গ্রন্থ থেকে বহুনা, বহুনা থেকে জাতিসঙ্গ তথ্য সঙ্গের জন্মবিকাশ। বর্তমানে সঙ্গসঙ্গীতকে আরম্ভ মেল, মেলকতা বা খাটভুক্ত করি, কিন্তু মেল বা খাটের প্রচলন শব্দীত ১৬শ-১৭শ শতকের পূর্বে ছিল না। জন্ম-অঙ্গ বা সঙ্গ-সঙ্গসঙ্গীতের বঙ্গীকরণ করার বীতি প্রচলিত হবার পূর্বে সঙ্গসঙ্গীতের প্রকৃতি ও গতি বহুনা ও দ্বার (বুদ্ধিক্যাল স্ত্রেম বা স্বরগঠন) দিয়ে নির্দেশ করা হোত। পরবর্তী সংকৃত সঙ্গীতগ্রন্থে সঙ্গসঙ্গের শিব, দায়, ভরত, বহুনা, কল্লিমাথ প্রভৃতির মত্রে উল্লেখ দেখা যায় ও এ’অস্তরভাব্যসঙ্গীত কেবল সঙ্গের দায়, গঠন ও সংখ্যা ও সঙ্গের সঙ্গের সঙ্গের জন্ম-অঙ্গ সঙ্গের পরিচয়ের দলে সঙ্গীকৃত। শিব বা শাক ও বৈষ্ণব মত্রে প্রভাবও সঙ্গ-বিভাগের সঙ্গেরও বিভাব্য লাভ করেছে এবং সঙ্গের সঙ্গ শিব-পার্বতী ও কেহ লক্ষী-দায়ারাম থেকে সঙ্গের শব্দীকাধিনী বর্গ্য করেছেন। বর্তমান বিশ্বদ্বানী সঙ্গীতশাস্ত্রীতে সঙ্গের জন্মকাধিনীর মূলে বিধিষ্ট কোম প্রাচীন মত্রে প্রভাব সঙ্গীত কোম মূলে হয় না। সঙ্গ-সঙ্গের সঙ্গ সঙ্গ

দীক্ষিত ও বেন্‌টনবী (১৯৯০ খৃ:) রাগ-বিভাজনের জন্য ৭২ বেলবর্তী বা খাটের প্রবর্তন করেন। বর্তমানে পরিপূর্ণভাবে ঐ নীতি অনুসৃত না হলেও দক্ষিণী পদ্ধতি বেন্‌টনবীর দ্বারা এই অনুসারী।

বর্তমান উচ্চ-ভারতীয় পদ্ধতিতে মোটামুটিভাবে ছয়টি প্রধান ও ছয়টি বা তিনটি অঙ্গরাসের প্রচলন দেখা যায়। সঙ্গীতকর্পদকার পণ্ডিত বাসোবর (১৯২৫ খৃ:) ত্রিরাগ, বদন্ত, পঞ্চব, মেঘ, ভৈরব ও বৃহস্পতি (বা নটনারায়ণ) এই ছ'টি প্রধান রাসের পরিচয় দিয়েছেন। বনুস্বতে ভৈরব, হিঙ্গোল, ত্রিরাগ, মালব-কৌশিক, দীপক ও মেঘ এই ছয়টি প্রধান রাগ। নারসের 'পঞ্চমসংহিতা'র মতে মালব, মল্লার, ত্রি, বদন্ত, হিঙ্গোল ও কণ্ঠি এই ছয়টি মূল রাগ। কল্লিনাথ ত্রি, পঞ্চব, ভৈরব, মেঘ, নটনারায়ণ ও বদন্তকে প্রধান রাগ বলেছেন। তবে পুণ্ডরীক বিটল, হামমতা, সোমনাথ, ভাবভট্ট, লোচন-কবি ও রাগনিরূপকার নারসের মতে রাগগুলির সংখ্যা বহুতর দেখা যায়। রাগদুগ্ধেও কিছু কিছু প্রভেদ আছে। মোটকথা গ্যাতটি, ছয়টি বা পাঁচটি ম্বরের বিচিত্র আয়োজন-অবয়োহস্রমে অসংখ্য রাসের সৃষ্টি হোতে পারে। পরবর্তী শতাব্দীর ১৬-১৭ শতকে গ্যান ও চিত্ররূপ রাগসঙ্গিকে প্রায়শই ও বিদ্বাদিত করেছিল।

। প্রবেশজী ।

(১) 'নাট্যশাস্ত্র' (কাশী, কাব্যমালা ও বরোদা সংস্করণ, ২০শ অধ্যায়), (২) নারদীশিকা (কাশী সংস্করণ), (৩) 'হৃতিসঙ্গ' (কে, সাম্বদিব নাম্মা সংপাদিত, ত্রিবাস্তব সংস্করণ, ১৯৩০), (৪) বৃহৎশেখী (কে, সাম্বদিব নাম্মা সংপাদিত, ত্রিবাস্তব সংস্করণ, ১৯২৮), (৫) 'সঙ্গীতসমরসার' (টি গঙ্গপতি নাম্মা সংপাদিত, ত্রিবাস্তব সংস্করণ, ১৯২৫), (৬) 'সঙ্গীত-রত্নাকর' (কল্লিনাথ ও সিংহভূসাদকৃত টীকাসহিত, পণ্ডিত এম সুব্রাহ্মণ্য নাম্মা সংপাদিত, ২৪ বস্ত, বাভোয়ার সংস্করণ, ১৯৪৪), (৭) কে, বাসুদেব নাম্মা-কৃত The Science of Music (Tanjore, 1954), (৮) এম. এন. হারচন্দ্রন-কৃত The Ragas of Karnatic Music (University of Madras, 1938), (৯) অব্যাদক ও সি. গালন্দুগি কৃত-Ragas and Raginis (Nalanda publication, Bombay, 1938), (১০) ম্বাবী প্রজ্ঞানানন্দ-কৃত 'রাগ ও রূপ' (১ম ও ২য় ভাগ কলিকাতা), (১১) পণ্ডিত ডি. এন. ভাতখণ্ডে-কৃত ত্রিহরক্যসংগীতর' (বোম্বাই, ১৯২৪), (১২) 'রাগবিবোধ' (লোহার সংস্করণ ও বাভোয়ার সংস্করণ), (১৩) 'রাগতরঙ্গিনী' (পণ্ডিত বল্লভের মিত্র সংপাদিত, দ্বারভাঙ্গা) প্রভৃতি গ্রন্থক।





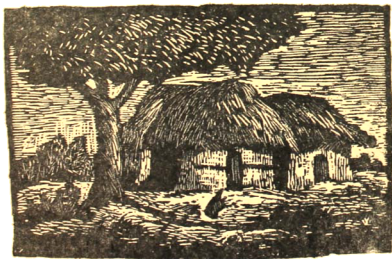
দুশদরের ছায়ায়

শিল্পী : প্রশ্বেষ রাইচি



ভাৱেৰে আলাপন

শিল্পী : উত্তম সেনগুপ্ত



ঘূমিৰে আহে গাঁৱ

শিল্পী : শৈৱা বিশ্বাস



অকস্মিক হুটীর অনেকটা আগেভাগেই সূর্য্য বেগিতে পড়েছিল। আশ নীচের হালে মিটিং-র পোকসভা। এই কোম্পানীর এক বিশেষ নীতিগত বিশেষণে তারা গেছে পরশু, কাল তার এসেছে, আশ কলকাতার অকস্মিক পোকসভা। নীচের হলটা হুপ্পুর থেকেই সভার আয়োজনে নিয়ে নেওয়া হয়েছে, কাকবন্ধ বন্ধ, বোয়ারা চাপরাশির সঙ্গে হুপ্পুর জন বাবু আর ছোট অকস্মিক হুপ্পুরের হাল লাকাতের ব্যস্ত, হুটীর কাপেটি আর চোরা পড়েছে, লম্বা টেবিলের ওপর বসবে দায় চাকর, হুট নাগিকের বহির্ভাগে কটো, একরাস কল। আয়োজনের ব্যস্ততার মধ্যে গুরুত্ব আছে, কলর নেই, কে বুদ্ধি অগুরু হুপ্পুর ছাড়াই দিচ্ছেন যেভাবে যেভাবে, এই ছিন্ন-হীন অভ্যস্ত পরিষ্কার গল্পটির অকস্মিকের ব্যস্ত হুপ্পুরের পক্ষ নিয়ে শোকের আবহাওয়া তুলে করছিল।

সূর্য্যর মাথা আরও বেরে আসছিল। কেন সূর্য্যর মাথা না। আশকাল প্রায়ই হুপ্পুর কি হুপ্পুরের শেষ থেকে তার মাথা বেরে ওঠে। কোনো কোনো দিন এত বাড়তে যে, অকস্মিক থেকে ফেরার সময় হলে হর জর আসে, বা এসেছে। চোখ জ্বালা করে, হুপ্পুরের মধ্যে ভীষণ বিশ্বাস লাগে, হাই তুললে নতুন হর বাতিনকটা হুপ্পুর—প্রাণির উচ্চ ব্যস্ততা পরীক্ষ থেকে বেরিয়ে এস।

আশ হুপ্পুরের আগেই মাথা বেরে গিয়েছিল সূর্য্যর। চন্দ্রসাহেবের কাবরায় তুল করে কিসের একটা শিল্প পাঠিয়ে গিয়েছিল, বিরক্ত হয়ে নীচে কোন করেছিলেন তিনি, হুপ্পুরের কাছে। হুপ্পুরের আবার বন্ধে দিল সূর্য্যকে। অশমানটা সেগেছে সূর্য্যর। সেই বেগে, ভাবতে ভাবতে ক্রমশ মাথা বেরে উঠল।

সভার আয়োজনের জীকে সূর্য্য অশোকবাবু প্রবোধ দত্ত আরও হুপ্পুরের বন্ধে হুপ্পুরের লুকিয়ে পাগিয়ে যেতে দেখল। সূর্য্যরও ইচ্ছে করছিলনা অকস্মিক থাকতে। শোকের বক্তৃতা শোনার উৎসাহ আগ্রহ তার ছিল না। এই সভা, ওই হুট বন্ধ কোনো কিছুই হুপ্পুরের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক আছে বলে সূর্য্যর একবারও বনে হল না। বরং অকস্মিক এক বকম হুটী হয়ে বাবার পর অকস্মিকের অগ্রয়োজনে মাথা বরা নিয়ে বলে থাকতে তার বিরক্তি হচ্ছিল।

সূর্য্যকে একটু আড়ালে ভেঙে সূর্য্যর বলল, ‘আবার হুপ্পুর মাথা বেরেছে, সূর্য্য। আমি বরং চলে বাই।’ সূর্য্যর সঙ্গে সঙ্গে বাড় যেছিলে দায় দিল, ‘আরে চলে বাও, মিটিং-নে তো আড়ার পির দূর্য্য বাত্যা হার।’ সূর্য্যর বাব দায় করছে, সূর্য্যর কয়েক পলক ওর মিকে তাকিয়ে থেকে সতর্ক পলায় সূর্য্যরো, ‘কেন কি বিষয় হব তোমার?’

মাথা নাড়ল সূর্য্য, না। সূর্য্যর সঙ্গেই তাকে বিষয়

হুইল। অকিসের সহকর্মীদের মধ্যে পুণ্ডার দলই তার বিরূপ অস্ত্রশক্তি আছে। নেমেটা ভাল, গুণগাটী ; দুটাকে পছন্দ করে। পুণ্ডার আপনাকে অস্ত্রাঘ্য করা দেখিল। সুদার বন হুঁত হুঁত করতে লাগল। এক সময়ে এহুঁ সরে গিয়ে হুগুয়ারীকে দেখল। হুগুয়ারী তার প্রতিটি পোষ গণন করছে বলে বলে একশাশে। দুটাকে কেউ দেখছে না। সাধারণ সর অপেক্ষা করে দাঁশ থেকে বেঁচেয়ে পড়ল সুদা।

অকিসের দানবের পথটুকু একটু হুত হুঁতে পেরিয়ে এস সুদা। বলা যায় না কে দেখছে, কার সুখোমুখি হুতে যায়। গির্জাঘড়ির মোক হুয়ে আর হুত হুঁতে লে না, এখন অনেকটা নিশ্চিত, কেউ তাকে দেখছে না। গাম্বুর হাটগাটা নাট্যে বহন চওড়া, উত্তর-বক্সে হুদানো গা-কাল্পনের যোগ তাই পুনের বাড়িগুলোয় বুক গরম উঠেছে। হাটার পাশে একটা নন-পল্লবপূর্ণ উঁচু নাচা গায়েব নিকে চোখ পড়ল সুদার অপরাহ্নের ঘোরে উল্ভাস, বাতালে চকল। এই গাছটাকে পীড়ের সর কেনন দেখেছিল, সুদা একবার বনে করবার চেষ্টা করল অকার্যশেই।

হাটা ঘরে মূর পায়ে সুদা হুঁতিল। বাতাস বেশ সরম, এই আগ্রহ বিকলেও রোহ ভগ। কেনন একটা পুতনো উল ভাব চাপপাশে। এবার বোব হু চৈর থেকেই বেশ সরম পড়ে যাবে।

হুঁতে হুঁতে বাধা ধরার ভারটা একটু ভুলে থাকতে চাইছিল সুদা। লক্ষ্য 'ভুলতে পারছিল না। একটু ভুল হয়ে, অকিসে থাকতেই কোয়ারাকে ঘিরে স্যারিডন কিয়ে এনে খেলে ভাল হত। আয়কাল বহু স্যারিডন আছে সুদা। কে বেন বলেছিল অত ওপর যাবেন না, হাট হুঁত হুয়ে যাবে।

কণাটা হানিবাবুই বলেছিলেন। হানিবাবুর দলে আচ্ছ একবারও সেবা হল না অকিসে। আসেন সি হুত। গিয়ে করে ভরসোক আরও বিন্দুকে হুঁতুলে হয়ে উঠেছেন। হানিবাবুর বিশেষত যেতে না পারায় সুদাও এখন অসন্তোষে কেলোছিলেন ভরসোক ; হি হি। কথাটা বনে করতে পড়ল সুদা : 'সেখন, গিয়ে পুতু আদি একলাই কলাবে না, আপনিও করবেন ; তখন

এ অকিসের একটা লোককেও আমি আপনার বিরোধে নেহরর খেতে যেতে বিচ্ছ না। লোকসানটা তখন হুঁতে পারবেন।'

ভীষণ অসন্তোষ হয়ে গড়েছিল সুদা। সেখানে নির্বাবর, গাড়িবে, পাশে পুণ্ডা আর প্রীতি লোহ। নিম্নের অপরাহ্ন কাটাবার জন্যে আসেই অনেক বকর কৈকিত্ত দেবার চেষ্টা করেছিল বলে হানিবাবুর সেব করার পর তার আর কিছু বলবার বা প্রতিবাদ করার ছিল না। চুপ করে বাড়ি হুয়ে গুঁয়ে গাড়িবেছিল সুদা, আর অবস্থা হাসিল।

ঠাটাই করেছিলেন হানিবাবু, কিন্তু এই সরে হাস-তামাশার কথা না তেরে সুদা অন্য কথা ভাবছিল। হানুয়ের সব কথা সবাইকে বলা যায় না। হানিবাবুর বত বিবেক ভাল হানুটাকেও সুদা বলতে পারে নি, আবার বাবার উপায় ছিল না। আপনার বউভাতের নেমন্ত্রে একাধারে কি করে বাই বলুন, একেবারে খালি হাতে কেউ কি যেতে পারে—আমাদের বাড়িতে সেদিন মাত্র এগারো আনা পরশ ছিল, একটা হুপোর গুল করা সিঁদুর কোটো কিনতেও চারটে টাকা লাগে। তা ছাড়া, একাধারে কোথাও যেতে আমার ভাল লাগে না। না একটা ভাল শাড়ি, না বা ট্রাউজ ; হাত খালি, কানে হুটো আঁধাকালের বুল আর গলায় এক ভরির এহটা সুতোর বতন ধার, তাও আমার নয়, অ্যরিত্তর ; আমায় পলায় বেন কাসের বতন সেজে আছে। ...আমি কোথাও যাই না, কোথাও নয়। আম হুঁতর কারও কোনো উৎসর্গে যাই নি।

ঈশ হাটার হুয়ে হুয়ে এসে সুদা একটু দাঁড়াল। আগত কোবে ঈশের শব্দ বেন তার সেব ভাবনার ধামাকে ভ্রমণ ভীত্বতর করে হুঁত চকিত করে তুলল। কুট-পায়েব পা খেঁসে একটা বাস এসে গাড়িমেছে। এত অন্যমনস্ত ছিল সুদা, পথে নামলে বাগটা হুত তার পায়ে এসে পড়ত। ড্রাইভার কি একটা কথা বলল। হুত সুদাকে হুত সুদাকে ধর। সুদা অসন্তোষের বতন কুটপায়েব একপাশে গাড়িবে থাকল।

হু' একজন কে নামল সুদা লক্ষ্য করে গেছে নি। বাগটা চলে গেলে পথে নামবে বলে অপেক্ষা করছিল।

‘এই সূতা—’

সূতা মূৰ্খ কিংবদন্তে তাকাল। অমলাদি।

‘কি তে ভুই?’ বাস খেতে বেনেছে অমলা। এগিয়ে
এল স্থিরিত পায়। ‘জানি তোমার অকিসেই বাচ্ছলাম।’

‘আমি অকিস পালিয়ে ছি।’ সূতা সামান্য হাসল।

‘তোমার আবার অকিস পালানো আছে নাকি?’
অমলা কৌতুকের চোখ করে বলল, ‘সে আশংক্য।
আমাদের পালানোটা এই কাজ, যে বড় পালার তার ভক্ত
বেরড’ ভাল হয়।’ অমলা মন্তব্য মতন হাসল শব্দ
করে।

অমলার মূখের দিকে সরাসরি চোরে থাকল একটু
সূতা। সূতা কেমন একটা লগ্ন রয়েছে বেন অমলাদি।
হৃৎকুমারীর নতন একগালা লিপশিট ঠোঁটে। পাউডারে
একটা খোয়া মেন গালের ওপর সেগে আছে।

‘এতই যদি অকিস পালোও ত আমার অকিসে যাবে-
নিয়ে দেখা করতে আস না কেন?’ সূতা বলল।

‘কেন আসব? ভুই বাস আমার কাছে?’

‘আমার সবাই কই, অমলাদি। আমার অকিস থেকে
পালানো যায় না।’

‘আজ বিটিষ্ঠ বলে পালানিছ।’

সূতা অবাক। অমলার চাশা হাসি এবং ঢকল
চোখের দিকে মূ পদক তাকিয়ে থাকল। ‘তুমি কি করে
আমসে আজ আমার অকিসে বিটিষ্ঠ?’

‘ওই ত, আমি জানি...অনেক কিছু জানি।’...অমলা
হাস্ত্যর পা বাড়াল, ‘চল তোমার সঙ্গেই আনিক সময় কাটিয়ে
আমি।’

সূতাও হাস্ত্যর নামল। অমলাদির কথা থেকে তার
মনে হল, অমলাদি বেন আর কারও সঙ্গে দেখা করতে
বাচ্ছল। ‘তুমি আমার কাছে আস নি?’

‘আসছিলাম। :তোমার কাছে এবং অন্য একজনের
কাজে।’ অমলা ঠেটি ঠিপে বলল।

‘চন্দ্রসাহেবের কাছে?’ সূতা কেমন একটু খাটো
গলায় পূর্ণপে।

‘না।’

‘তবে?’

‘আমি একজন, আরেক সাহেব—’ অমলা তুচ্ছ করার

মতন গলা করল, ‘তা সে সাহেব থাকুক সে, তোমার সঙ্গেই
কাটাই?’

কিছু নয়, তবু সূতা কেন বেন সামান্য ক্রুর হচ্ছিল।
অমলাদি তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে তেবে মূৰ
সম্প্রাপনে যে মূৰী অবৈ উঠেছিল তার কোথায় বেন
একটা ছি আবিষ্কার হয়েছে যেবে বন মূত মূত করে
উঠছে। একটু চুপ করে থেকে সূতা বলল, ‘তোমার
যদি কোনো কাজ থাকে—’

‘কাজ, কার সঙ্গে?’

‘দেই সাহেবের সঙ্গে।’

‘তোমার জরুরি কোনো কাজ নেই। গরম থাকলে সে
নিজেই ছোঁবেশার আমার মূত বের করে বেনে।’

সাত্তা শেরিয়ে ওপাশের কুটপাথে উঠে অমলা হাঁহিল
সূতা পাশে পাশে। অমলা কোথায় বাচ্ছ কোথায় বাবে
কিছু জানা নেই সূতার।

‘কোথায় বাবে অমলাদি?’

‘যেখানে মূর্ণ চল।’

‘আমার কোনো মূর্ণ নেই।’

‘নেই সে ত জানি।’ অমলা হটিতে হটিতে হাত
মূগিয়ে সূতার মূৰ একবার দেখে নিল। বলল, ‘তোমার
মূর্ণী এখনও ওয়ারডেন্টে।’

প্রবর্তায় সূতা মোতে নি, তারপর বৃকতে পারল।
এই কটা তাকে স্বেচ্ছার অনিচ্ছায় মানব কত ব্যর্থ বৈ
বিশ্ববৈ দেয়। ববিসবাব্দ সেদিন ববন বিবের কথা
বলেছিলেন, ‘আশনারও ববন বিবের হবে,’ তখনও বটিটা
বিস্বিছিল। অবশ্য ববিসবাব্দ অনিচ্ছায় অজ্ঞাতে
বিস্বি হয়েছিলেন।

‘চল, আমরা কোনো নিরিবিগি মোকানে ঢুকে চা
বাই।’ অমলা বলল, ‘এসন্নানেভে বাবি?’

‘আবার এসন্নানেভে, অনেকটা হটিতে হবে।’ সূতা
কাজ মূৰ করল।

‘অনেকটা কোথায় যে, ওই ত...’ অমলা ব্যাঘ মনেত
হাতটা একটু এগিয়ে দিয়ে মূতর সেখাল। কয়েক পা
হেঁটে আবার বলল, ‘রিকশার উঠবি?’ বলতে না বলতেই
অমলা রিকশা ভেকে বলল।

সূতা সাহাব্য অন্তিম বোঝ করে বলল, ‘মূতর

বিলে ত্রিকণা, তার চেয়ে ছোট বাসে উঠলেই হত ।’

‘আমি তোকে ট্যাঙ্ক চড়াতেই পারতাম, কিন্তু এটুকু পথ ট্যাঙ্কতে বেবে না ।’ বলে অমলা সুধার মূখের দিকে চেয়ে যেন তার সাথের দৌড়টা রঙ্গ করেই যোঝাতে হাসল । ‘নে, ওঠ ।’ সুধা উঠতে ঠাট্টা করে বলল, ‘তোমার লক্ষ্য করে ত পজা কলে বে বাসু ।’

কাল্পনের গড়ত রোজের উল্লসিতা ক্রমশ ক্রিকে হয়ে এসেছে । ওপাশে লালদীঘি । গায়েল মাথার রোম ঢলে আছে, দিকেরে ছায়া দীর্ঘ হয়ে এদিকের সাজাটা ছুড়ে বসেছে । ছান্দসুলো গোল হয়ে ঘুরপাক ঘেঁরে গেলে বাক্সে, আসছে ; বাসসুলো ডালহাউসির গায়ে গা ধায়ে ঘন ঘন, অকিসপাকায় ছুটির কটা এখনও বাক্সে নি ডব্ব কিকু পলাতক কোরানী, কিহু উকিল হুহুতী কিহু হাদাল-টালালের ভিড়ে জায়গাটা ক্রমশ ভিড় হয়ে উঠছে ।

‘এদিকে বিড়ি বলে বুকি পাণিবে এলি ?’ অমলা সুধেলো ।

‘হ্যাঁ,’ সুধা মাথা নাড়ল, ‘আবার বক্ত মাথা ধরেছে । বাড়ি গেলে বাচ্ছিমায় ।’

‘কলি না কেন আসে । চল তোকে হুটো আলিঙ্গনে বাইরে দি, ওখুন্দন মাথা ছেড়ে ধাবে ।’

ত্রিকপাক্সা একটু বাঁয়ে সরে একটা হাসকে না বেঁধে এগিয়ে যেতে ফিল । বাসটা শেরুতে না শেরুতেই মোটর বাইক ছুটিরে এক ছোড়া এন.পি. ঢলে ঢলে গোল, আর তারপরই ঞ্জরানোভের দিক থেকে একটা মিলিটারী ট্রাক বজের বজন হুটে এসে লালদীঘির রেলিতে বাজা মেরে বর্পল ।

সুধারা পিছু ফিরে তাকায় নি বলে এই বাজা মারাতা দেখতে পেল না । কিহু একটা পথ শুনতে পেল ।

‘এই কলকাতাটা দিন দিন কেন্দ্র হয়ে যাচ্ছে না যে, সুধা ।’ অমলা বলল ।

‘বি.জি. !’ সুধা হোট করে জবাব দিল ।

‘কায়র ওপর সুজি বি.জি. মনে হয় না ; আমি ঘোঁষ অন্য জিনিস ।’

‘কি ?’

‘পছটা মেন ঘোঁষা গাওয়া স্তম্ভস্বের চাক... গড

বহর থেকে এ বহর পব’ত কত লোক বেড়েছে জানিস ?’

‘জ-নেক ।’

‘জ-নেক কি রে, দু’গুণেরও বেশি ; আরও বাড়ছে । সিভিল সার্গলাই করবেটা কি ।...ও জানিস, আমি সিভিল সার্গলাই ছেড়ে দিচ্ছি ।’ অমলা বলল ।

‘ছেড়ে দিচ্ছ ?’ সুধা অমলার মূখের দিকে তাকাল ।

‘বিয়ে করছি ।’ অমলা এমন ভাবে ঠোঁট চেপে চোখ আড় করে বানিকটা হাসি বানিকটা গাম্ভীর্য কুটিরে কথাটা বলল যে সুধা বুঝতে পারল না, অমলাদি ঠাট্টা করছে না কি সত্যিই বিয়ে করছে ।

সুধা একটু সময় চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল অমলার, হেসে বলল, ‘তবে ত সুধার । কবে করছ ?’

‘আগে জিজ্ঞেস কর কাকে করছি ।’ অমলার পলার তরল কৌতুক ।

সুধা নিজেই যেন এই হাঁদার একটা পরাদান করবার চেষ্টা করছে এমন চোখে চেয়ে থাকল । অমলাদি কাকে বিয়ে করতে পারে । মিনন রো-র অকিলে থাকতে একজনের গল্প শুনলেই সুধা, সেই ওকালতি পাশ করা ভুললোক, বোবার ভয়ে যে সেওথরে পাশিয়ে গিরেছিল । সে নয় ; অমলাদি সেই ভুললোকের দান নিয়ে কত রকম ঠাট্টা তামাশা করেছে । তার বুকি বিয়েও হয়ে গিয়েছিল ।

সুধা অমলা অনুবাদের চেষ্টা করল ; বানিকটা সময় কাটাল, কারও নাম তার মনে এল না । ‘কাকে করছ ?’ সুধা জিজ্ঞেস করল ।

‘দান শুনবি । না তার পেপা শুনবি ?’ অমলা রঙ্গ করে বলল ।

কথাটার ‘অ’ ধরতে পাকল না সুধা । অমলাদির রকমই ওই । সব কথাতোই হাসি ঠাট্টা । কাকে বিয়ে করছ জানব পে-খবরটাই আসে চাম, তারপর না ঘর তোমার কি করছে কোথায় থাকে ।

‘দাড়টাই আসে বলো, পেপাকে ত আর বিয়ে করছ না ।’ সুধা হাসকা পলার অল্প হাসির ছোঁয়া ফিরে বলল ।

‘কি বলিস সুই—’ অমলা কাঁধে কাঁধে সুধাকে একটু টেনে ফিল, চোখে দিশ্বরের ভঙ্গি কুটিরে বলল, ‘কায়রো

বিরে ভ' শেখার সঙ্গে, চাম্পি টাকার একটা বেরাবাড়া
কোরানকে তুই বিরে কর না বেঁধি, লক্ষ্যের গলায় দড়ি
গিঁধি।' এক দুঃখুড়' থামল অমলা আবার বলল, 'অন্ত
চারশো টাকা; একটা চাকরিখলা ভা সে গুঁকে মোকলা
টেকে বাই হোক নিজে করলে তোর একেবারে সেরাক
বেঁধি।'

রিকশা পথ ছোট করে নিয়েছিল। বা হাতি
ওঠারলু, শ্রীটি দিয়ে বেস্টিক শ্রীটে পড়ে প্যাগডাইন
গিনেবার সাহায্যকি আসতেই অমলা রিকশা ধারিয়ে দিল।
'এখানেই দাঁড়, আর।'।

ভাড়া মিটিয়ে কুটপাথে একটু গাঁড়িয়ে থাকল অমলা।
বলল, 'তোকে বেশি দূর টেনে নিয়ে যাব না, নমত
লিগুমে শ্রীটে কাকা নিতিবাঁধি বসবার জায়গা ছিল।...
লল, ওই মোকানটার বাঁশ। দূর পা হেঁটেই হঠাৎ কি
ভেবে ডান বিকের একটা টেপনারী মোকানে ঢুকে
পড়ল অমলা। দূরা সোর গোড়ার হাঁড়িয়ে থাকল।

সোরে ৪৫ এখন শ্র' হালকা, সেখলৈই অনুভব করা
বার ভাপ ভাত উৎসাহতা কিছু নেই, বিবেকের হায়া
সেইল অ্যাডভান্স অতিক্রম করে উলটো দিকের বাড়িটার
নাথার ওপর পথত উঠে গেছে। বেস্টিক শ্রীটে ভিড়
বেড়েছে, একটা জল সেওয়া ট্রান গাড়ি এগলানেভের
দুখতির দিকে চলে গেল। এখানে গাড়ি যোড়া মানুস
মোকান-পথার এবং দাবতীর পথের এক মিশ্রিত পুঙ্খনের
হয়ে দূরা অব্যবহৃত হয়ে হাঁড়িয়ে থাকল। কি ভাবতে
চলে কোম কথা ভাবছিল, তাও তার খেয়াল ছিল না।
অমলাখি কাকে বিরে করছে, সত্যি সত্যি কি বিরে
করবে... এই ভাবনা বেন জল সেওয়া ট্রান গাড়িটার
হতন অনুধ্য হয়ে গিয়ে এই মৃত দিনাতে নদর পুঙ্খনের
হয়েও সূচ্যরুকে হয়ে করিয়ে দিচ্ছিল। অস্পষ্ট
বিদ্যুৎ করেকাট স্মৃতি হনের অব' আলোকে স্বপ্নের
হতন দেখা ছিল; বিচ্ছিন্ন হল; আবার বেন অনেকটা
হাতখাশে কেলে বেখে মোকা লাগিয়ে দিল। সূচ্যরু
সঙ্গে এই অকলটার আশে পাশে চায়ের মোকানে এসে
কবে কবে দূরা বসেছিল, দিন বাস কর—সব দেব দূরা
এই দুঃখুড়' হয়ে করতে চাইছিল। কস্তের দেওয়াক
জল হাওয়া সেইল অ্যাডভান্স বুক থেকে একটি



দুটি শ্রুতের পাড়া বড়ুটো জেন বেস্টিক শ্রীটের
দুগো নিয়ে কুটপাতে আনিরের হতন হুতে দিল।
আর দুইই আতনকা দূরার চোখে পড়ল, চিংগুরের ঠায়ে
যেতে থেকেও জাল হানের পালানিতে হাঁড়িয়ে ৪৫
লাগা জায়া গারে দূ, তিন জন বেহারী হানের পিছনে
হাতাশে আবার উড়িয়ে বিচ্ছে। পরশু হোল।

অমলা মোকান থেকে বেরিয়ে এসে গা হুয়ে ডাকল,
'লল।'

অব্যবহৃত তাবেই দূরা পা বাড়াল।
'মোকানের বাহারটা দেখেছিল, দূরা?' অমলা
চলতে চলতে বলল।

দূরা কিছু দেখে নি। অস্তের হতন জায়াব কিল,
'না—; কিসের বাহার?'

'তুই একেবারে দ্যাক গুঁকে পথ হাঁড়িস—' অমলা বিরক্ত
হতার ভাব করে বলল, 'ভগবান যে কেন তোকে
চোখ দিয়েছেন।'

'আমি শুড়ে বোধ কর—' দূরা কি ভেবে ঠাট্টা
করে বলল।

অমলা কথাটা শুনল না, নিজের হনই বলে চলল,
'এই মোকানটা আগেও দেখেছি, তোর হয়ে আছে দূরা, ক
মিশল যো-ব আকিসে চাকরি করার সময় আমরা এই

সোকানটার এশে ভালবুট কিন্তান বাক মাথে । আর-
কাল সেই দোতানের কি বাহার । না আছে এমন
ভিনিস নেই, কি সাব্বনেছে ভেতট্টা : তার ওপর কেনন
সাব্বনে গুঁহুচে বেরে সেলসমান রেখেছে একটা ।

সুদা অমলায় বুঝে দিকে তাকাল । 'নেছে
সেলসমান ?'

'ওনা, জানিস না । বর'তলা জৌগলি পাড়ায়
আজকাল এটাই ত কাণায় রে । অনেক সোকানেই
কোঁবনি, একটু সাঝাতে গোছাতে শেরেছে কি একটা
করে উৎসাহী এনে বসিয়ে দিয়েছে ।'

সুদা ঘাট ঘুরিয়ে পিছু দিকে তাকাল একবার ।

কাছাকাছি ফেটুরেটে ঢুকে পড়ল অমলা । জায়গার
অকুলান, তবু তাইই হলো বড়টা সন্দেহ সাকানো
সোছানো, পিছন দিকে ছোট ছোট দুটো কুঁঠি, পদ'।
মোটানো । অমলায়ের দেখেই পোঁজ গায়ে বোহারাটা
দুটোনো পদ'। আরও তুলে ধরল ।

পাঁচিলের দিকে পিঠ করে এগুলো অমলা । চোয়
নেই, দু'হানুয়ের বডন চৌদান-কাঠ দেওয়া বড়, বেক,
বাকো টোঁবল, অন্য পাশেও একই বকন থেক । টোঁবলের
ওপর হাতের কালো ব্যাপ কেসে দিয়ে অনাড়ম্বর
চিলেভালা ভল্লিতে অমলা বলল : সুদা দু'হানু'খি
দাঁড়িয়ে, অঁচল এবং কাপড়টা ঠিক করে তার কোলানো
ব্যাপ কাঁ থেকে দুলছে ।

'কি বাঁবি ভুই ?' অমলা গুলো ।

'কিছু না ।' সুদা ব্যাপ নাখিরে রেখে বলল ।
চপা দুলে যাবল ।

'তোমাদের সোকানে খিঁচিটিঙিও আছে দেবদার—'
অমলা বোহারাটাকে বলল ।

'দন টাটকা, খিঁচিখিঁ—' বোহারাটা সঙ্গে সঙ্গে বেন
পাশ করার দূরে বলল, 'একটু আসে এলে বাজা কচুরি
পেটেন, পরন, পান্দি আহারের ভাল ভৈরী হু । বাছ
বাংগর কিছু দেব, কাটলেট চপ পরোটা—' বোহারাটা
খিঁচির দিকে যেতে চায় না বলেই যেন দু'ব সতক' ভাবে
চপ কাটলেট চলে এল ।

'খিঁচি কি আছে বল ?' অমলা হাসি বুঝে বলল ।

'একটোপ, চমক হানার জিলিপি, দু'দেয় নাকু—'

'ভুই চমক আর হানার জিলিপি বা, সুদা, আরি
বুঝেচেনাচ্? বাব ।' অমলা সুদার দিকে তাকাল না ।

'না: না, সত্যি বলছি অমলাদি আরি কিছু বাব
না এখন—সুদা তাড়াতাড়ি আপত্তি জ্ঞানাল ।

অমলা কথা কানে তুলল না । খাবারের অর্ডার
দিয়ে বোহারাটাকে বলল, 'বেশ পর লাগছে, তোমাদের
ক্যানটা দুলে দাও । আর পোন, খাবার গুল দিয়ে
গাও ত আগো ।'

বোহারাটা পদ'। ফেলে বেশ করে টেনে দিল ।
বাইরের আলোটাছু ঢাকা পড়ে গেল । দু'হাতের
কুঁঠিটা কাঁপসা এবং নিভৃত হয়ে এল । অমলা
হাতের দুটো থেকে অ্যাপট্রোর প্যাকেটটা বের করে
সুদার দিকে এগিয়ে দিল । 'ভাগ্যিদ সোকানটার
শেরে সেলান নরত আরও হুঁটিতে হত ।'

সুদা বুঝতে পারল না, অমলাদি আপট্রো পাঞ্জার
কথা বলছে, না অন্য কিছু, কোনর কথা বলছে ।
হয়ত অ্যাপট্রোর কথা, হয়ত অমলাদির কিছু, কোনর
হিস সেয়ে সেয়ে । সুদা তখন কোন কৌতুহল বোধ
করল না । অ্যাপট্রোর প্যাকেটটা নিয়ে নাড়াচাড়া
করতে লাগল ।

অমলা বানিক চুপ করে থাকল । হাতের দিকে
চরে চরে কানের ব্রেড দেখছিল । কাঠের ব্রেড
বেশ পুরোনো কালের ক্যান । ছাঁড়টাও বাহারী ।
বোয়ার দুলোয় ভেলে এখন কোনোটাই আর শোভা
নেই, পুরোনো জিনিস দেবার সাধারণ কৌতুহল
হাড়া চোখের অন্য কোনো আগ্রহ নেই । পাখাটা
দু'দে, আর দু'ব চিকণ স্রাড একটা পথ হচ্ছে
খিঁচির মাঝা রেখে ।

সুদা অমলাকে অব্যবহৃত ভাবে দেখেছিল ।
অমলাদিকে বেশ স্রাড উজোহুতো দেখাচ্ছে । দু'খটা
কেমন হয়ে গেছে অমলাদির, আ পাউজারের খোপাটা
যেন বরা চারদুয়ার বডন তুলে নিলে অন্য একটা দু'ব
বোয়িরে পড়বে ।—'আচ্চ', অমলাদি কেমন মোটা-
মোটা হয়ে যাচ্ছে দিন দিন, চোখের কোলে বস
আছে বলেই বেন স্রাড বুঝে কেমন একটা পানস
দিয়ে এই সভ্যটাকে অমলাদি, শেঁথে থথোটে চাইছে ।

‘তোমার বিয়ের কথা বললে না?’ দু’বা কথা শুনু বসল।

‘বিয়ে—’ অমলা দু’বার দিকে তাকাল, তাকিয়ে থাকল কয়েক পলক, বলল, ‘বিয়ে ত করছি।’ বলে অমলা সহজ স্বাভাবিক হাওয়ার চেষ্টা করে তার অভ্যাস বদল হালল।

‘কবে করছ, কাকে করছ তা ত বলছ না।’ দু’বাও শুনু হাসল।

‘বলছি, লিঁকা আসে কিছু বেয়ে নি।’ বেটুকু গম্ভীর হ্রাস নিঃশব্দ ভাব এসেছিল, অমলার তা যেন কাটিয়ে উঠে আবার সে তার শব্দভাব মতন হয়ে উঠেছে।

পরমা নড়ল। জল রেখে গেল বেহারা। অমলা হাত বাড়িয়ে একটা গ্লাস টেনে নিয়ে পিপাসাতের মতন জল খেল। খেয়ে তৃপ্তির শুনু একটা শব্দ করল, নিশ্বাস ফেলল ধীর করে।

‘ওঠ। খেয়ে নে।’ অমলা বলল।

‘কটা বড়ি খাব?’

‘হুটোই বা একসঙ্গে।’

দু’বা দুটো বড়িই খেয়ে নিল। জলের গ্লাস রেখে বলল, ‘মাথা ঘটা আবার একটা পাকাপোকে রোগট হয়ে যদিও, অমলাদি।’

সঙ্গে সঙ্গে কোনো জবাব দিল না অমলা। দু’বার দিকে কেনন অদল চোখে চেয়ে থাকল। শেষে বলল ‘তোমার এই সব বোগের একটা চিকিৎসা করা বি করে?’

‘এর আর কি চিকিৎসা আছে বলে। ...আগে ভাবভাব চোখের জন্মে হয়, চন্দা নির্মোহি কবে, কই বিছাই হল না।’ দু’বা বিরক্ত হতান।

অমলা তার ব্যাখ্যা কাছে চানল, কালো চামড়ার ওপর আঁকল বংল, একটু ডফাতে গঠিয়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে বলল, ‘যেখ দু’বা, তোর যোগ শুনু মাথা ঘরার নয়। না না করেও বিছা একটা গোল তুই পুরে থাকিল। এই তিন হাসে অকস্মে তোর কত কামাই হয়েছে?’

দু’বা শুনু অবাক এবং বিছা বিংলস হয়ে অমলার দিকে তাকিয়ে থাকল।

‘অরু কল্যাণা ক্রুকাইটিস মাথা-বরা গঠি’কাপি—এই করে করে একুশ দিন কামাই করেছিল। করিল বি?’ অমলা দ্বির চোখে চেয়ে থাকল।

‘তুই কি করে জাদলে?’ দু’বা শুনুবো ভীত গলার বলল।

‘মানব কি করে, তুই কি আর জাদিয়েছিল, আমায় জানতে হয়েছে।’

‘চন্দ্রসারের বলেছেন—?’ দু’বার শুনু বিবর্ণ উৎকণ্ঠার গলা কাঠ হয়ে এসেছে।

‘বলেন নি, শুনিয়েছেন—’ অমলা নে’তা শুনু টেটে বলল, ‘কাজুয়েলি আমার কথাটা কবিন আসে তি।’ শুনুরে রাখলেন।’

দু’বা নীরব। অমলা নিজের নিশ্বাসের শব্দ শেল হাতে। পাখাটা কবরীতি বহুয়ে, শব্দ করছে বাইরে বৃষ্টি বদলের ঢুকল শুনু এক জন, বৈদিক ঠাঁটে চাঁদের চাকা ক’প হুড় টেনে শব্দটাকে হুড়াত্তে নিে থাকে। দু’বার বৃষ্টি বহুয়ে কাছিল, উৎকণ্ঠার তা চোখও কেনন কাপসা হয়ে এসেছে।

‘কি শোনালেন চন্দ্রসারের?’ দু’বা অপরাধীর মত গলা করে শুনু শব্দে শুনুলো।

‘ওটা সব এটিয়েটের মানব, হাজার সেক হাজারে অকস্মিকাল, একটি বৃষ্টির বেশী কথা বলেন না অমলা বলতে বলতে থাকল। পর’ পরিষে বেহারা শুনু স্রেটে খাবার এবং চামচ দিয়ে সরে যাচ্ছিল, অমলা চোখে ভাগ্যেরা ঘিরে দিল।

দু’বার কোলের কাছে স্রেটো আরও একটু ছে দিয়ে অমলা নিজের স্রেটে টেনে নিল। ‘নে বা—’

দু’বা হাত ওঠাল না, চুপ করে বসে থাকল।

অমলা চামচে করে শুনুর লাঙ্কু ভেঙে শুনু দিক চিবোতে চিবোতে দু’বার দিকে চেয়ে থাকল।

‘কই বা, বলে হয়েছিল যে...’ অমলা ভাগ্যেরা ি আবার, ঘটায় দু’বার চোখের ওপর চামচে করে হাথ ফেলে বলল, ‘এই যে খিচি খাচ্ছিল না, এই আর বিয়ের খাওয়া। বৃষ্টি। নে, খেয়ে নে।’

চামচ তুলে দু’বা স্রেটের চামচপাশে অনাবনো মতন থাকল। শুনু শীতু, ওর নিশ্বাসের বহুতা ব

পড়ছিল—অমেরকটা খেতে খেতে বুকের কাছটা ওটা নামা করছে ।

‘তোরা অত ভর পাবার কিছ; নেই ।’ অমলা বলল, ‘চতুশাংহের কালকেই তোরা চাকরি খেতে যাবে না ।’

সুধা এক টুকরো হানার ভিলিপি কাটল । ‘কি বললেন উনি ?’

‘বললেন ত, এক দু’ কথাই জানবু ও’র । ওই বলল : তোমার কিছু সেই শিকড়ি দেয়টি, অমলা—প্রাণ আঁকল কামাই করে । তিন বাসে একদু’ দিন ।’ অমলা চতুশাংহের গান্ধীজীর মোটামুটি একটা নকল করে বলল ।

সুধা চমক মূখে তুলল । ঠোঁটের কাছেই ধরে থাকল একটু । কথাটা বিখ্যে নথ, অতেনুত নথ । তবু চতুশাংহের ওপর কেনন কিছু কর না চরে পারল না । মনে হল, অমলার কাছে চতুশাংহের খুব সংক্ষেপে সুধার সম্পর্কে এমন একটা মন্তব্য করেছেন যার প্রত্যয় কম নয় । সুধা আন্তে আন্তে অনমনস ভাবে খেতে লাগল ।

‘তোরা ব্যাণাঃ কি ?’ অমলা অনেকটা পরে বলল, ‘বলে সুধার দ্বিত্ব চরে থাকল ।’

‘কিসের—?’ সুধা মূর্খ গলায় পথ করল ।

‘এই এত কামাই—। অমূল্য বিদ্যুৎ কি হচ্ছে তোরা এত ?’

‘একবার শীতের সময় দু’ বছরে পড়েছিল— সে ত ভূমি ভান, পরে চিঠি দিয়েছিলার তোমার ।’ সুধা বিব্রত কান্ডর গলায় বলল, ছোট্ট ফুটুরির যমো আলো একন অভ্যন্ত যোলাটে—সের্গিসলের দিবের মতন রঙ ধরে আছে, সুধার মূখ এই নিখাদ রক্তের মধ্যে আরও দু’ নির্ভাবি দেখাচ্ছিল । ‘সে-বাকের ভরতই দু’ হস্তার বেশি কামাই হয়ে গেল—’ সুধা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, ‘খাল একটু, আবার বলল, ‘তারপরও দু’ বার দু’ এক দিন করে কামাই হয়েছে ।’

অমলা নব খিয়ে নব কথা শুনছিল । সুধার মূখের দিকে একই ভাবে তাকিয়ে ।

চা এস । চা খেতে পেতে অমলা অভিজ্ঞ করল, ‘কুঁড়ে খুঁড়ে এই যে অসুখে পড়ছিল, ডাকার কি বলছে ?’ সুধা নম্র । প্রাসের ব্যাকি অমটুই খেতে চায়ের

কাশে দু’খ ঠোঁটেরে থাকল । অমলা দু’খ ফেঁদে পড়ছিল না সুধার, মাথার চুল এবং অপরিস্রব সন্মুখি দেখছিল ।

‘ডাকার দেখান যি ?’ অমলা সুধার নীরবতার সন্মুখ করল, ‘বেরোটা দু’খ ডাকার টাকারও দেখাব যি ।’

‘দেখিয়েছি ।’ সুধা অতি মূর্খ গলায় জবাব দিল ।

‘কেনন ডাকার, ভাল ?’

‘জানি না ; এম. বি ।’

‘কি বলছে ?’

সুধা সামান্য চুপ করে থাকল, দু’খ তুলে অমলার চোখে চোখ চরে দৃষ্টি সরিয়ে দিল । ‘অমটু গলায় বলল, ‘একত্রে করতে বলেছিল বুকের ।’

অমলা সেই দ্বিমিত্ত বিব্রত-বভাব সঙ্কারে সুধার দু’খ পশ্চি করে দেখবার আশার দৃষ্টি তীর করে তুলল । অত অমলা অনুভব করতে পারছিল, দেখবার মতন তাকিয়ে থাকা হচ্ছেও সে পশ্চি কিছু দেখতে পাচ্ছে না, সিল রক্তের অন্ধকার যেন তার চোখ থেকে সুধাকে আড়াল করে কেসেছে । ...বাথার ওপর পাখাটা মূর্খছিল, অনেককাল পরে আবার একটু ব্যাণাস এবং শূণ্যেদো দম্ভতার সেই চিল্প স্রাব পথ অমলা অনুভব করতে পারল । বাইরের ঝাঁব বাস জন কোলাহলের অস্তিত্ত সম্পর্কে হঠাৎ যেন বানিকটা গুচ্ছজনতা সক্রিয় হল । রেষ্টুরেটে যে জনাকরক এলে বসেছে, কথা বলছে, অমলা বুকেরে পারল । ...অমলাদের মতন আত্মত ইঁপুয়ের এই ভাসমান অরকা এবং মনের বিহীনতা থাকল । ক্রমশ এই প্রাথমিক চাকলা হ্রাস শেষে এসে নিম্নের উৎসে বিব্রত এবং আশঙ্কা অনুভব করতে পারল ।

‘একত্রে করতে বলেছে ?’ অমলা নিশ্বাসে আশঙ্কার কল ।

সুধা নিম্নত । ছোট্ট কৈবটটা অম্যাতাবিক আনহাওয়ার ধবধবে হয়ে উঠেছে ।

‘একত্রে কেন ?’ অমলা অনমনস অকট উত্তর ।

‘জানি না—’ সুধার গলায় পথ যেন কুঁটিল না, ‘বুকের অসুখ চমুখ ভাবছে হয়ত ।’

অমলা এই প্রথম অনুভব করতে পারল সে ভর শেষেই গলা শূন্যে এবং ঠোঁটের গোড়া কাঠ হয়ে আগছিল ।

‘এক্সের কার্গেইন হ’ তোমো রকমে অমলা পুঁথনো।

‘না।’ মাথা নাড়ল সুধা।

‘কমালি না কেন হ’ অমলা জলের গ্লাসের তলানিটুকু
এক চুমুক খেয়ে কেলল।’

সুধা অঝাব দিল না। টেবিলের ওপর ভ্রম হাত
রেখে আছন্দ এবং ঘোষ ঘেঁষছিল।

অমলাও কিছুক্স নীরব থাকল। তারপর হঠাৎ হার্ড
বাড়িয়ে সুধার ভ্রম হাতের মণিবহু এবং বাহু পথত
নিষ্কেষ হাতের তালুতে বার করে পৰীক্ষা করল। ‘তোম
কি রোগ বিকলের পর জর আসে হ’

‘জানি না।’ সুধা অঝাব দিল, ‘গেথ বিকল থেকে
চোষ জালা করে বড্ড, মাথা ঘরে।’

‘কানিটারি নেই হ’

‘নেই আবার, ওটা ত নিত্য দলগী; বাড়ে কমে।
আজ ক’দিন একটু কম আছে।’ সুধা হাড়ি হাড়ি করে
বলল, হতাপ বিবর গলায়।

‘গায়ে দাম হয় হ’

‘হর বোঝ হয়...’

অলপক্স হু জুনেই নীরব থাকল। সুধা পরীর দিকে
চরে চরে এককায়ের আচ্ছন্নতা ঘেঁষছিল, অমলা সুধার
দিকে তাকিয়ে এই মেটেটার নিস্পৃহতা এবং অজ্ঞানতা
দেখছিল।

‘সুধা।’ অমলা ঘন গাম্ভীৰ্যের স্বর থকা সম্ভব
স্বাভাবিক কন্ঠ্যর চেষ্টা করে ডাকল।

‘বলো।’

‘ভুই...ভুই আর শরীরের অববেলা করিল না।
একটোটা করিয়ে নে।’ অমলার কথাগুলো এত নিবিষ্ট
মহতামর সিদ্ধ এবং আত্মিক যে সুধার মনে হল
তার সমস্ত জীবনে এমন করে বড় একটা কেউ কথা
বলে নি।

আত্মব’ এই আত্মিক কয়েকটা কথা তলায় যে
অপরিণীত উত্তিগতা লুকোনো ছিল, সুধা হঠাৎ সেই
উত্তিগতার পল্ল’ পেয়ে কেমন ভীত ব্যাকুল হয়ে উঠল।

নিঃশেষে কয়েক মুহূর্ত’ কাটল। সুধা অনুভব
করতে পারছিল, বুকের তলায় এক ধরনের আড়ততা

সে নিশ্বাস দিচ্ছে। ভ্রম, উৎকণ্ঠা ও অনিচ্ছরতা
ক’লি লেগে গলা ধরে আর শ্বর ক’টরে না—এম
সূরে ও বলল, ‘আমার কি হয়েছে, অমলা হি হ’

কি হয়েছে অমলা জানে না। বা হতে পারে সে
লগ্নেহটা তখন অমলাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

সময় ছোটামারী কথা অমলার কেন মনে পড়ছিল তে
জানেন! আর সুধার দিকে তাকিয়ে থাকলেও অমল
নিষ্কেষ পূন্য ধূঁশটির ধূঁরতে ছোটামারী মূখ দেখতে
পাচ্ছিল। বরবার সময় অমলা ছোটামারীকে দেখতে যা
নি, শুনছিল হাসপাতালের বিজ্ঞানার বালিসের কো
গড়িয়ে ছোটামারী মাথা মূখ বৃদ্ধে গড়িয়েছিল, পরী
বৈকে পা গুটানো ছিল, আর আত্মব’ সেদিন বিছনা
বুঝে অলপ একটু রক্তের ছিটে ছিল, বিজ্ঞানার মাথা
কাছে কলাইয়ের গামলায় এক বিশদুও রক্তের দাপ কো
য়েছে নি।...রোগটা হবার পর পুরো এক বছর
ছোটামারীকে সময় ঘের নি, বরা পড়ল যখন ওক
পেথটুকু জলছে সলভের।

ছোটামারী মূখ বিশদুত হওয়া এখন সম্ভব হা
না। অমলার মনে হল, অনেককাল সে স্বাভাবিক তাতে
নিশ্বাস নিতে পারে নি। তার বুকে—কুসকুটে
প্রতিবাহেরে অবশিষ্ট বাতাস জমে জমে বুঝে
কেমন ভারী ভারী হয়ে উঠেছে। বুঝে সতক’ হয়ে
এই ভার কিছু হালকা করার আশায় মূখ হা কর
অমলা, নিশ্বাসের দীর্ঘ পথ সে সুখকে শুনতে দিতে
চায় না।

‘কি আর হবে—অমলা বুঝে স্বাভাবিক গলায়
যেন সে ঠিকানিত নয়, কিছু লগ্নেহ করছে না, উৎকণ্ঠা
নেই, এখন সূরে বলবার চেষ্টা করল, ‘হবে আর নি
তোম, কিছু না।’ বলে সুধার দিকে চরে চরে
একটু অববেলার ভাব এনে বলল, ‘তবু ডাকার যখন
বলছে তখন একবার করিয়ে নে এক্সের।’

‘অথবা—হ’ সুধা লগ্নে লগ্নে প্রতিবাহের মতন মন
করে বলল।

গাম্ভীৰ্য ডাবল অমলা। ‘অথবা—না ঠিক অথবা
হা কেন। বলছি না তোম কিছু হয়েছে, তবু যখন

হাড়া, বুড়ালি না, দরকপের দুর্ভিক্ষের চেয়ে, একটা শের বেশ ত্বেনে নেওড়া ভাল, মনের স্বস্তি থাকে, পাঠ্য পাওয়া যায়...

‘মনের স্বস্তির জন্যে টাকা খরচ করব সে-কথা আমাদের কই, অমলাদি—’ দুধা কৃষ্ণ হাসি হাসল, তার চৌচৌর পাশে সেই হতাশ বিষম হাসিটুকু দেখা যেত না ঘর না কেট্টুরেটের ব্যতিত জুপে উঠত সে-দুহর। অমলা হাসিটুকু দেখল, নিবন্ধ প্রসঙ্গের সলভের মতন জলসে। ‘বরং...’ দুধা অন্যমনস্ক, চোখের পাতা ক্লেদ বার কয়েক, অমলায় দিকে তাকাল, ‘বরং এই ভাল, অমলাদি। যোগ হয়েছ জানলেও আমাদের করার কিছু নেই যখন তখন কিছু না জানাই ভাল। জানলে আরও অশান্তি, ভয়...’

অমলা কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। হোটমারী একবার বলেছিল, এ-অদ্ভুতের কথা না জানলে আরও কিছু দিন বাঁচতাম, জানার পর যখন আমার বাবার সোফার এসে ধাঁড়িয়েছে।

‘দুধা—’ অমলা নিঃশব্দে দংঘত করল, ভাল মনের বিবেচনার তার আবেগ যোকার মতন কাছ করুক এ ক্ষেত্রে অবশ্য অমলা ভাতো দায় দিল না। তার মনে হল, দুধার পক্ষে ডাক্তারের কথা গোনা উচিত, কেন না চিরকাল অজানা থাকার মতন ব্যাধি এটা নয়। দুধা জানে না, এই সংসারের বন্ধা এই, সারাক্ষণ গুরুত্ব ব্যাধি শিকার করে বেড়াচ্ছে, আর না হলে কাল, কাল না হয় পরশু, একদিন তোমার তারা ঝুঁক পাবে।

‘দুধা’—অমলায় গলায় স্বর ফল বিবিধ, ‘গোন, একটা কথা বলি। চাকরি করাই তোকে খেতে হবে, সংসার প্রতিপালন করতে হবে। কিছু, সেই চাকরিডেই যদি এত কামাই হয়, দু’ লক্ষ দিন অন্তর অসুখে পড়িল, ...শেষ পর্যন্ত যে চাকরিটাই যাবে।’ অমলা একটু চুপ করে থাকল, তার কথাটা যে কত দরদ এবং কতটা সত্য দুধাকে তা অনুভব করতে দিল, তারপর আবার কলস, ‘তুই যেখানে চাকরি করিল...সেই অফিসের ব্যাপার ত জাণিস, নানান কড়াকড়ি। একদিন যদি চন্দ্রশায়েব অফিস থেকে তারের ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দেয় তোকে, সেটা ভাল হবে।’

দুধার পদক পড়ল না। ষ্ট্রা বিমর্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। দুধ যেনে মনে হচ্ছিল, দুধা যেন চন্দ্রশায়েবের দুধোমুখি লাড়িয়ে এইমাত্র নিবেশটা নন্দল। শূন্য ভাতি বিচলিত সমস্ত পরীর কাঠি করে লাড়িয়ে আছে।

অমলায় মনে হল, শেষ কথাগুলো না বললে হত; দুধা ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু না বলেই বা কি উপায় ছিল অমলায়। চন্দ্রশায়েব ব্যত্যবিকই এ-স্বকম একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন। দুধাকে সরাসরি অমলা তা বলে নি, বলতে চায় নি।

ধানিককণ নীরবে কাটল। পরশপরের দিকে ওয়া কেউ তাকাল না। কেট্টুরেটের বাইরে অমনো অজানা গলার কত টুকরো কথা ভেসে এল, বরংসার শব্দ্য নামছে, এই কোবনের মধ্যে মনেও এ মনে বোকা যাচ্ছে। ‘কি তে, দুধ ভাবনার পড়লি না কি?’ অমলা হাত বাড়িয়ে দুধার হাতের ওপর রাখল।

দুধার গলা দিয়ে অস্পষ্ট একটু নন্দ হল, দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ল।

‘অত ভাববার কিছু নেই।’ অমলা সাহসের চেয়েও বেশি, কিছুটা আশ্বাস দেবার চেষ্টা করল, ‘তোমার চাকরি হুটু করে যাবে না। চন্দ্রশায়েব বাবুটো এখানেতে কিছু ভাদই। তা হাড়া...’ অমলা চুপ করে সেল। আনমনা হয়ে কি ভাবল, দুধ দুধে বলল, ‘আমার ওপর একটু দয়া আছে।’

‘তোমার ওপর দয়া মমতা থাকা আর আমার চাকরি থাকা এক নয়, অমলাদি?’ দুধা বুঝতে পারল না, ঘটায় কেন চন্দ্রশায়েবের ওপর তার বিরক্ত এসে গেছে।

‘বেশ, যদি চাকরি যায় তোমার, আমি সিভিল স্যামাইরে তোমার একটা চাকরি করিয়ে দেব। কথা দিচ্ছি।’

‘এতকাল তুমিই ত বিচ্ছেদ।’ দুধা বলল, কলতে বলতে তার গলা ভার হয়ে কেনন কহু চাপা শোণাল, চোখে জল এসে পড়ল।

অমলা কিছু বলল না। সেই কবে একটা কলে দু’ জনে বাটারী করতে গিয়ে আলাপ, তারপর বিদ্যন রো-র অফিস, এই নতুন অফিস,—যেন হাত ধরে ধরে হিচড়ে এক চক্কাই থেকে আরেক চক্কাইয়ে টেনে এসেছে

অমলা এই মেয়েটাকে। তার শক্তিতে বাস্তবিক কতটা শব্দ সূত্রকে এনেছে অমলা জানে না, তবে নিজের কপালে সূত্রা এসেছে। আরও ত কত বহু ছিল অমলার, অনেক পুরোনো অনেক চেনা জানা, কই কাউকেই অমলা এমন করে টেনে আনে নি কেন? অমলা আজও সঠিক ভাবে জানে না, কেন?

এই মেয়েটাকে কেন সে ভালবাসে। কেন? কখনও কখনও অমলার মনে হয়েছে, সূত্রার কাছে যেন সে কিছু সম্পন্ন পাক্কিত রেখেছে বলে নিজের স্বার্থে সূত্রাকে বলাসাহ্য বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। অথচ কোন সম্পন্ন করে কখন রাখল জিজ্ঞেস করলে অমলা জবাব দিতে পারবে না। যেওয়া মূর্খকিন। একথা অমলাই এখনও স্পষ্ট করে বোঝে না যে, নিজের জীবনে হৃদে রাখিয়া বন্ধনা ভালবাসা হতাশার মধ্যে সত্যি সত্যি কি আসলে রাখবার চেষ্টা করেছিল অমলা, অথচ শেষ পর্যন্ত পারেনি। হৃদয় না মৌলিক পরিবর্তন, নিষ্ঠা না এই প্রতিকূল সংসারে স্বাধীন শক্তি নিয়ে পোষাবি ঘূরে যাওয়া—অমলা কি পারে নি, অথচ পারতে চেয়েছিল, সূত্রা না শেয়েছে, পারছে! হৃদয় সূত্রার কাছে অমলার সেই সূত্রা ও আন্তরিক শব্দগুলি লালিত হয়ে আছে।

এখন, এই ভিত্তি আলোকে এবং একান্ত কক্ষে, সূত্রাবোধি মনে, এই বীরবত্যা বা বুদ্ধিমত্তার মত করে চেতনাকে সর প্রোথ থেকে হঠাৎ পৃথক করে দিয়েছে বলে মনে হচ্ছিল, অমলার অকস্মাৎ মনে হল, সে সূত্রার কাছে এক পলাতক জীবনের মতন বলে আছে। এবং এই বিভূত শাফাতে সূত্রার কাছে বলে অমলা তার

পরিভ্যক্ত মনোবোধের কৃপাল শব্দে, কাগজ সূত্রা তাদের লালিত বাতা।

অমলার আবেগ বনীভূত হয়ে ককর্ণ পাথরের ঘোঁচায় মতন কণ্ঠশালীর কাছে বংশজা দিচ্ছিল। কোনো বকসে নিজেকে সংযত করে, স্বাধীন্য ফেলল; পশ্চাৎ উভয়েরই জানে সেল। সূত্রার হাত থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে অমল তার চামড়ার কাপো ব্যাপটা টেনে নিল। ক্রিপ বৃত্তে টাকা বের করছে, এই কালে ব্যাসের ভেতর হাতড়ানে হাতড়াতে বলল, 'দিয়েছি বখন দিয়েছি, ভোর সময় হতে আমার দিল।' কথাটা যে সব কিছু স্বভাবিক মনে হাসকা করার জন্যে বলা গলার শব্দের তরল চেষ্ঠে থেকেই তা বোকা সেল।

সূত্রা জবাব দিল না, যেন বাতাস দেখছে এমন কা চেয়ে থাকল।

ব্যাপ থেকে টাকা বার করল অমলা। এবং চান পাশে রেখে আবার ব্যাসের মধ্যে বৃত্ত হাত হয়ে নি যেন বৃদ্ধিতে বৃদ্ধিতে বলল, 'তোদের আঁকসের হাঁয়ে সেনপূত্রকে চিনি?'

'সেলসের এলেক্ট্রি?'

'হ্যাঁ, ঠিক তোদের আঁকসের নয়—ওই আঁটাচড় অ কি।...ভুলসোক আমায় নিয়ে করছেন।'

সূত্রার মনে হল, অমলাদি কালো ব্যাপটা ওপর বৃত্ত পড়ে তার বৃত্ত সূত্রা লুকোচ্ছে না, যেন পারলে ওই ব্যায়ে মধ্যে তার সর্বাঙ্গ লুকিয়ে কেলত।

পাথার বৃত্ত বাওয়ায় কপটাকার মনুন নোটটা সরে স অমলার কোলের কাছে গিয়ে পড়ল।



বি শ্ব বি জ হী বল এক
বাঙ্গালী-‘বাবু’? আধুনিক
বতে বিশ্বের চ্যাম্পিয়ন?
কথাটা শোনা বাজই
বলে খট্কা লাগতে পারে।

বেলাপুন্সার কেড়ে বাঙ্গালী, একজন হলও, কোনোমিন
এগিয়ে যেতে শেয়েছিলেন সবায় আগে, মল্লক্রীড়ার ক্ষেত্রে
নাকি পরীক্ষার আসরে হার মানিয়েছিলেন এতো বড়
দুর্নিয়াকে—একথা যেনে নিতে, আর এই আত্মবিশ্বাসের
কালে অনেকেই বল যেন প্রতুত নয়।

কিন্তু ইতিহাসের হৃদয়নায়া যে অলম্ব্যর! ভুলতে
চাইলেও যেহায়ে নেই। বানতে না চাইলেও ইতিহাস
তার প্রাণা আদায় করে দেবেই। সেই প্রাণা মেটাবার
আত্মিক তাগিদে ইতিহাসের সেই বিন্দু প্রায়
অধ্যয়নিকের মনঃকর্ষক।

স্বপ্ন বলি আরও এক কারণে।

আমাদের দেশে ইতি-
হাসের আধরও সবার সবার
কেনন যেন অঙ্গপট্টতার
যৌগার হৃদয় হয়ে যায়।
রেখাসূচিক উচ্চার বরতে
তখন অসোজন বটে তুণী-
কৃত কাঠখড়ের পুঁজি। সবার
যদি উত্তীর্ণ হয়ে যায় তাহলে
সেই পুঁজিতেও টান পড়ে।

সবর এখনও হাতছাড়া
হয়নি। তাই ভবোর পুঁজিকে
আনি তেনে আদরি গঠকদের
নাননে। ভরসা এই যে
যাঁদের জীবনশায়া ইতিহাসের
সেই অবিস্মরণীয় অধ্যায়
রচিত হয়েছে তাঁদেরই কেউ
কেউ এখনও বর্তমান।
তাঁদের প্রত্যক্ষ ধর্শনের

বাবুর বিশ্ববিজয়

এজু স্ক

বিবরণ ইতিহাসের সমর্থনে
বড় প্রমাণ। আরও বড়
কথা, ইতিহাস-প্রতীক সেই
বাঙ্গালী ‘বাবু’ ও আর
আমার অন্যতম পাঠক।

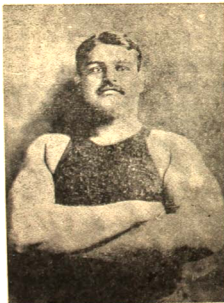
ভবোর ভিত্তিমূল সবে সেলে তিনিই পায়বেন সব পুঁজির
সেওয়াতে।

ভারতভূমিতে এই ধারণা বহুদিন ধরেই জ্বিয়ে রাখা
হয়েছে যে সোল্যামণ্ডের শ্চ্যাবিন্দল সিমান্ডিত জীবিত্যোকে
হারিয়ে বড় গামা পালোয়ান বিশ্বের চ্যাম্পিয়ন আখ্যা
অর্জন করেছিলেন। কিন্তু বারপাতি ভুল। পুঁজির এই
ধারণা স্বরং গামা পালোয়ানের মনেও বাসা বেঁধেছিল।

কিন্তু তবু তা ভুলই। ভুল এই কারণে যে ১৯১০
সালে লণ্ডনে যখন গামা বনাম জীবিত্যোর প্রথম লড়াই হয়
তখন জীবিত্যো নিঃসন্দেহে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় মল্লকের
অন্যতম। কিন্তু ত্তিক বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন নন। আনুমানিক

বি শ্ব চ্যাম্পিয়ন তখন
আমেরিকার জ্যাক গাচ।
বছর কয়েক পর জীবিত্যো
আবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের
আখ্যা পুনরুদ্ধার করে-
ছিলেন সত্যি। কিন্তু
১৯২৮ সালে প্যারিসের
খিতীয়বার গামার মনো-
মুখি হবার আগে আবার
জীবিত্যোকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নে
যেতাব খোঁজাতে হয়েছিল
নাকি বল জো টেঁচায়ে
কাছে যেতে।

সুতরাং লণ্ডন অথবা
প্যারিসের বিজয়ী বড়
গামা পালোয়ান অনুষ্ঠানিক
স্বীকৃতি পাননি। আরও
আগে মহামল্ল পোলাস



বর্তমানের গ.হ. ওরফে ‘গোবর’

প্যারিসে (১৯০০) বেসরকারী ভাবে স্বীকৃত বিশ্বক্ষেত্র
মরবীর ভূগোল কোর্সে তেরোমিক অথবা ১৮৯২ সালে
কলকাতার কঠিন বক্স পেরলেওরানা টন ক্যামকেকও
হারিয়েছিলেন । কিন্তু প্যারিস অথবা কলকাতার কোনো
মণ্ডলেরই সরকারী ভিত্তি ছিল না ।

তবে একটা অবশ্যিকার বৈশিষ্ট্য সোলান, মাথা, করীম
বক্স কেন, এককালে আবারের বেশে এমন অনেক
বিশেষী পালোয়ান ছিলেন । সুযোগ সুবিধে পেলে
ভাষার যে কেউই বিশ্বক্ষেত্রের আনুষ্ঠানিক বর্ণনা
আমার করে নিতে পারতেন । কিন্তু সুযোগের অভাবে
ভাষার প্রতিষ্ঠা অবকাশে ক্ষেত্রেই সম্ভবত থেকে দার
ভারতভূমিতেই । সাংগঠনিক বিধিধে তখন ভারতীয়
মন্ত্রণালয়ের আস্থা ছিল অনগ্রসর । আর ইউরোপ—
আমেরিকার ক্রীড়ামূলক দৃষ্টান্ত । কলে ইউরোপীয়
ও আমেরিকান মন্ত্রণালয় পক্ষে সেকালে আনুষ্ঠানিক
চ্যাম্পিয়ন আস্থা অর্জন করা ছিল অশেষকাত সহজ-
সাধ্য ।

পছিয়ে থাকা সেইকালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে
যোগ দেবার সুযোগ ঘটছিল যার একজন ভারতীয়
মন্ত্রণালয় । ভাগ্যেই কথা, হাত বাড়িয়ে সেই
সুযোগের সম্ভাবনার করে তিনি ভারতীয় ক্রীড়ার
কৌশল্যের পর্ব অক্লান্ত বেধে বহিয়েছিলেন । আমেরিকার
গৌরব, ভারত-গৌরব সেই মরবীর হলেন একজন
বাঙ্গালী । হ্যাঁ, বাঙ্গালীই, 'বাবু' নামে নামের দূর্ব্যম
আজ বড় কম নয় ।

'বাবু'টি ছিলেন এক বিজ্ঞান পরিবারের প্রধান ।
অভিজ্ঞাত কলেই স্বদেশে দরবারী পালোয়ানদের
শেখারী মন্ত্রণালয় বা মণ্ডলে বাস্তবায়িত সুযোগ
পাননি । কিন্তু লোকতত্ত্বের অজ্ঞানসেই ইতিহাসেই আশ্চর্য
'জোরে' তাঁর বোকালি হয়ে গিয়েছে । 'দুর্ভাগ্যবশী
কান্দ' ও গামার ডাং ইংল্যান্ড, আকি সবি, ইনাম
বক্স, গোর পড়াগা, খোলসা চোরে, বঙাং সিং, হরনাম
সিং, অমর সিং, মাঝা, পুতী সিং প্রমুখ পরিবারের
পালোয়ানদের সঙ্গে শিক্ষা, দীক্ষার তিনি ছিলেন
দরকারী ভারতীয় মন্ত্রণালয় অনেক উর্বে । সামাজিক
মন্ত্রণালয় তো বটেই ।

এতো উর্বে যে সামাজিক মন্ত্রণালয় একদিন তাঁর
জন্মের পথে কটি হয়ে গিয়েছিল । বনীর দৃষ্টান্ত
সামাজিক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আশ্চর্য্যের মাত্রি মাথাবে, হাফা
দৃষ্টান্ত সামনে খোলাদৃষ্টান্ত ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে
সেই সব শেখারদের সঙ্গে পরমা হকিমে ঘিরে তিতি
নিজের আশ্চর্য্যেই পুণ্ডিত পারেন । তাও কি কখন
হয় ? লোকলজ্জার চিত্তার পরিবারের বরজনের আশি
জাত্যের অভ্যমান তো ভয়েই মাথা ।

পারিবারিক বর্ণনাবোধের বেড়াগাল ভিঙ্গোয়ে
না গেলে 'বাবু'টি একদিন ব্যক্তি জেতে পালিয়েছিলে
সাপর পারে । এবারেও পালিয়ে চাইলেন, তবে দৃষ্টান্ত
নয়, প্রকাশ্যে অবদানিত আদায় করে । দৃষ্টান্ত তাঁ
অকাটা বৈশেষ আস্থা বসন অবদানিত নয় তখন ভিন্ন
গেলেই কম্পাণ চোকা দাক । সেখানে তো আ
পারিবারিক হুকো বর্ণনা কলে জেলে এতোবার
হয়ে নেই !

একমাত্র দৃষ্টান্তবশী ছিলেন 'বাবু'র মন্ত্রণালয়
সিংহরায় । দৃষ্টান্তে দৃষ্টান্ত জড়লেন তিনি 'চিহ্ন
কথা । মণ্ডলে বা মণ্ডলে বাটি দার মিলবে না
লোকে বশবে গ্রহন কা দ্যাত্তা, পরগার জো
পালোয়ান দার কিলেবে, লোকে নয় ।' জুড়বার এই দুই
আবেগকে বাস মানালো । তাহালা বিদেশেও হাজ
হাজার পাউণ্ড উপার্জনের সম্ভাবনা আছে জেলে বরজের
দূর নয় হলো । এগিরে এসেই জনক রায়চ
গুহ । তাঁর আশীর্বাদ ও গামের সম্ভল করে ১৯
সালের এক দরকালে প্রমুখ মন্ত্রণালয়র অকা
পালোয়ানসেই গহরে এসে হাজির হলেন এ
বাঙ্গালী 'বাবু' ।

বিশাল বক্স সামাজিকক্ষেত্রে তখন বিধি
অনুসারে । কোনো লেপ, কোনো জাতির প্রতিদ্বন্দ্বি
সেখানে অনুদানিত নেই । এশীরদের সঙ্গে চীনাফে
ভিত্তি বেশী । বাটি ভারতীয়ও কয়েক হাজার ছিলে
স্বাধীনতার সফরের পর স্বাধীন অভ্যমানদের উল্লেখ্য
বেড়াই সম্ভারিত পক্ষ থেকে বাস মাকি'ন মন্ত্রণালয়
বোধেই একটি কালী বিশ্বের মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ।
গহরবারও আছে । আছে গহর পাতি'র লোকনো আভা

হলে শুধু দিন কাটে যাদের ডায়া। স্বভাবতঃই বেশেয়োয়া। বেলাৎনার মধ্যে দুর্ভিক্ষ ও মল্লভূত ও ভিক্ষা উপভোগ্য। তাই সান্ধ্যাঙ্গের বাদিগ্যের কাছে দুর্ভিক্ষ ও মল্লভূতের আদর বেশী। আর সেই আদরের সূত্রেই বাঙ্গালী 'বাবু'র আবির্ভাব উপলক্ষে সান্ধ্যাঙ্গের কালিগ্যাবে একদিন বিদ্যানে হলো এক বড় বড় মল্লভূতের আদর।

হুজুরে একবারে বিশ্বের লাইট হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়নশিপ। তাই চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজন অবশ্য একবারে অতিক্রান্ত হইল। বাঙ্গালীরাও বাকি-বাকী গিয়ে কবনের মধ্যেই বোহেমিয়ার 'ক্রেজ' বদী সোসেজ হাল্কা এবং হল্যাণ্ডের প্রেস্ট মল টেমি হাল্কা আসনান হেঁচকে চাকলের মত তুলেই বিশ্ব প্রাচ্যে প্রতিযোগিতার যোগ দেবার অধিকার পান।

বিশ্বের লাইট হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ন তখন অ্যাড্‌ স্যান্টেল। জাতিতে জার্মান কিন্তু ধর্মীয়দিন রহেছেন বাকি-বাকীকে। জড়িয়ে মল হিসেবে তখন অ্যাড্‌-স্যান্টেলের নান্দাক ধর্ম বিস্তৃত। অনেকটা আবার দেশের শ্যাটিয়াল পাসোয়ান সোপার মেমোরিদের মতো। প্রশস্ত ম্যাসাগরীর অকলে তর তর করে বুললেও অ্যাড্‌ স্যান্টেলের যোদ্ধা প্রতিদ্বন্দ্বীর স্থান পাওয়া যেতো না। সুস্থির প্যাঁচের সঙ্গে দুর্ভিক্ষের দাঁও তিনি খনারানে মিশিয়ে দিতে পারতেন। প্যাঁচ প্রয়োজনে এই কোণে অ্যাড্‌ স্যান্টেল এক অপরাজেয় শক্তির অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন যে তাঁকে চিনতেন ঘাঁটা, তরি, মল্লাসে তাঁর মনোবল হতে সাধন পেতেন না। বেশ কয়েক বছর ধরেই তিনি লাইট হেভীওয়েট বিভাগে অবাধ রাজত্ব চালিয়েছিলেন।

অ্যাড্‌ স্যান্টেলের সান্ধ্যাঙ্গের এবার বিনি হানা দিলেন তিনি অপেক্ষাকৃত দুর্ভক্ত। তবু তাঁর সারবে বিশ্বপ্রেক্ষার খেতাব হাফী ধরতে স্যান্টেল হাফী হয়েছিলেন। কারণ তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল অপ্রসিদ্ধ। হুজুরে বা তা হামাতিরিজ।

অ্যাড্‌ স্যান্টেল বনাম বাঙ্গালী 'বাবু'র এই লড়াইয়ের উল্লোভা ছিলেন বাকি-বাকী মল স্মৃতির অনুরোধক্রমে প্রয়োজ্য কক্ষ্যাদ। স্মৃতি নিশ্চিত

প্রাককালীন সতর্ক বলা ছিল যে সুস্থির সর্বাধিক মেয়াদ দুর্ভক্তা তবে প্রয়োজন হলে প্রতিদ্বন্দ্বীতার দু'বার লড়াই হতে হবে।

একটি সুস্থি উপলক্ষে দু'বার লড়াইয়ের সতর্ক ভারতীয় সুস্থির প্রতিদ্বন্দ্বীতার ব্যতিক্রম। তাছাড়া বহুগে হাটীর বলসে গলীর ওপর লড়াই, গীতারের কলিটনের মতো জায়া গায়ে অতি, প্রতিদ্বন্দ্বীর জায়া-জাপিয়া না বরা ইত্যাদি প্রক্রিয়ার ভারতীয় মল্লভূতেরা কোনোদিনই অভ্যস্ত ছিলেন না। তবুও বিশেষ গিয়ে ভিন্‌সেপী বিদ্যানে লড়াই ভারতীয় সুস্থিতারেরা কোনোদিনই অশান্তি ভোগে নি, ঘর ও জাপিয়া বরে অসংখ্য প্যাঁচ কবতে ভারতীয়েরা ছিলেন বরাবরই স্মৃতি।

বিশেপী বিদ্যানের নানান অনুরোধে সতর্ক বাঙ্গালী 'বাবু' সান্ধ্যাঙ্গের কালিগ্যাবে দু'বার প্রতিদ্বন্দ্বী-অ্যাড্‌ স্যান্টেলের মনোবল হাফালেন।

দিনটি শরৎ। ১৯২১ সালের ২৪শে অক্টোবর। রাত নটার আরম্ভ হলো বলা-কালার ঘণ্টা। কালিগ্যাবের ভেতরে তখন হাজার ভিনে ভারতীয় দলে পনোরা হাজার ঘণ্টার ঠান্ডাটি। বাইরের জাপিয়ার আরও কয়েক হাজার উৎসাহীর জায়ে।

দুর্ভক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর তাল ঠেকে পরস্পরকে মরকে নেবার চেষ্টা করলেন। ভারতীয় বাঙ্গালী 'বাবু' লোকান প্যাঁচের বোঁকা দিয়ে শেহনে গিয়ে স্যান্টেলের কোমর জড়িয়ে তাঁকে গলীর উপর টেনে নানাভেই দুর্ভক্ত গালের বৈরত গীতার শব্দে প্রানবন্ত হয়ে উঠলো।

স্যান্টেলও বিশ্বস্ত ছিলেন না। নীচে এসেই 'ক্রি' করে মাঝে মাঝা ও দু'পায়ে তরে পরীক্ষিতকে ঘনুকের মতো বাকিয়ে কবি দুটিকে উঠিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর বন্ধ ছিঁড়ে ফেললেন। লাকো স্যান্টেল কোণটি সেনায়ে ভারতীয়ের জায়া ছিল না। কারণ ভারতে তখন 'ক্রি' করার রেওয়াজ একেবারেই নেই।

উঠে দাঁড়িয়ে স্যান্টেলই এবার বাকিয়ে পড়লেন প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপর। এবার তাঁর পাদা। প্রতিদ্বন্দ্বীরকে তিনি এবার গলীর ওপর নাবালেন, শক্তিতে বরে হইলেন কিছুকাল কিছু কোমর হাফে বাঙ্গালী 'বাবু' স্যান্টেলের বিন কটে বোঁচিয়ে গেলেন। প্রথম আঘাতটা এখনিই

চললো, হুঁতবেই হুঁতবে গলীর ওপর নাবালেন
যারকবেক, কিন্তু বাবু'র প্যাঁচ ছাড়া 'তোড়' জানা থাকার
হুঁতবেই কেউ কাউকে সেই কাকেরি করতে পারলেন না।

অতঃপর বাড়িঘর কুঁড়ি হানে হাঁড়িয়ে হাঁড়িয়ে গড়া।
কিন্তু তখনো কেউ থাকে নাই। সমানে চলছিলেন
দুজন। গম্বা সমান লড়াইয়ের একটানা এই দুশা
ততোক্ষণে ধপ'ধপের বেজায়েও হং ধরবে বিশেষে।
এঁরাও সব তারপরে চাঁৎকার জুড়েছেন। ধপ'ধপেতেরা
অ্যাড্‌ স্যান্টেলের সমর্থনে। আর কুঁড়কার ভারতীর
তাং পাঁতে চান্দা ধপ'ধপে 'বাবু'টির পক্ষে :

'বাবু' নিজেও এই সময় হুঁ হুঁ আওয়াজ জুলালেন
মুহুরাম্ব বশতঃ। যেন ধম কুরিয়ে বাগেরা কম্পন।
দেখে উৎসাহিত হলেন স্যান্টেল সমর্থকেরা। উপদেশ
দিলেন "Take your chance now, he is exhausted!"
কিন্তু কোথায় দুযোগ? যতো হুঁ হুঁকার ততোই যেন
'বাবু'র বাড়তি শক্তি! আসলে ওটা তার
মুহুরাম্বই।

ঘণ্টাব্যবেক ধাপাধাপির পর এক দুযোগে স্যান্টেল
এবার প্রতিদ্বন্দ্বীর পেছনে নিয়ে তার কোবলটি আঁকড়ে
বরলেন। আর হুঁতে চাইলেন না। কেনই বা চাইবেন?
প্রতিদ্বন্দ্বীকে হুঁসই ধরে কোলাই ভো অর্ধেক বাজ'মাথ
করাই গাখিল।

বাপালা 'বাবু' একটু থেমে অবস্থাটা বুকে নিতে
চাইলেন। কিন্তু স্যান্টেলের যেন আর তার সইয়েনা
পাকে পাকে জড়িয়ে ধরতে পেয়েছেন যেনে স্যান্টেল
একবার চাপ দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে নাচে আনার নতুন কায়
পাতলেন। কিন্তু তাতে হোলো হিতে বিপরীত,
স্যান্টেল যেন নিজের কাঁপে নিজেই জড়িয়ে গেলেন।

চাপ পরার দলে সলেই বাপালা 'বাবু' পরিভাড়া
বাড়িয়ে পা দিয়ে স্যান্টেলের পায়ের সোছে আতঙ্ক
ধাক্কা দিয়ে পা'ধিরেই স্যান্টেলের পা'টি সামনের দিকে
টেনে নিলেন। অতর্কিত আক্রমণ, স্যান্টেল তার জন্য
একবারেই হুঁসিয়ার হিলেন না। একটু যেন টলে পড়লেন
আর সেই কাকেরি প্রতিদ্বন্দ্বী চকিত হয়ে গিয়ে নিজের বক
লাগিয়ে তার ক'ধ হুঁটিকে ত্রুপে ধরলেন গলীর ওপর।
সাক্‌ ব'ও, ভারতে পরিচিত এই প্যাঁচের নাম 'টিংখ'।



আমেরিকার পথে 'বাপালা বাবু'

যেমন চকিত প্রয়োগ তার, তেমনই তার পরিত্যগ
অবশ্যাস্তাবা। একবারে সরাসরি চিং।

অ্যাড্‌ স্যান্টেল এবারেও 'ত্রিখ' কবে ব'ীচতে
চেষ্টেছিলেন কিন্তু পারেননি। প'রশক্তি মিনিট ধরে
আনুসারি কুঁড়ির চাপে তিনি এখন রিতিমতো কান্দু।
ধর ও শক্তি দুই তার কুরিয়ে এসেছে। সাকো অতির
চেষ্টা করেই স্যান্টেল আর বাপালা 'বাবু' আবার এখন
সভ' অনুসারি বিতীর বারের জন্যে পক্ষার মিনিট ধরে
দুখলেন তখন কেউ কাউকেই চিং করতে পারেন নি।

পূরো একঘণ্টা পক্ষাঘ্নিচিটের চানাপোড়েনের পর
চাওকের চুড়ার সাহা বোঝিত হবার পর 'বাবু'র
হৃৎকণের উজ্জল আনন্দের বঙ্গা তখন সীতিনভো
গঙ্গা হয়ে গিয়েছে। হাজারো কণের জরথনিতে
অনু কদমিয়ার দরদরম। নকের উপর দাঁড়িয়ে ভনকরক
টি জারতী, তাঁদের কাঁধে বাঙ্গালী 'বাবু'র উত্তরপির
তিত্ব। হাঙ্গা নকের উপর উঠে আসার শুরোপ পাননি
রাগ তখন অবশ্যই মেঝাকে ডলার বৃষ্টি করে চলেছেন
বিবরন বর্ষপের পর যেন 'বাবু'র ন্যানেচার বোম্যান
গঙ্গুলি কুঁড়িয়ে যেন শেষ করে উঠতে পারছেন না।

যে হাতে হান্ড্রাপ্রিসকোতে গুরুদ্বারে দেশবাসীর
পে এক পর্যন্ততে বসে 'আশু' বাঙ্গালী বেঁচে যায়।
ই উক্তি পুনতে পুনতে 'বাবু'টি মনে মনে কেবলই
সেইছিলেন। 'বাঙ্গালী নন্দ'—'নর তো কি? নাহ
নর বতীন্দ্রচরণ গুরু?

যতীন্দ্রচরণ? চিনতে বোধহয় আজ আমাদেরও
নেকের অনুব্রিমে হবে। কিহু যদি বলি, চেনেন কি
সোবর পালোয়ান' কে? তাহলে বোধহয় সব সন্দেহ
রূপ হয়।

সোবাকী নান নর, ভাক নামেই তাঁর আসল পরিচয়।

পিতামহ মল্লগুরু অশ্বু গুরু বাতির শূন্য বিয়ের বাড়র
পরীর দেখে করে যেন হতাশা আর ভাঙ্ছিলের শূরে
বাঙ্গা করে তেকেছিলেন "সোবর ড্যালা"। ব্যাসু সেই
যেকেই সেই নার।

বরল বাড়তে 'সোবর—ড্যালা'র ওপর বতীন্দ্রচরণের
সোবাক চড়লেও চকুচকে সেই সোবাক নিয়ে কেউই
মাতামাতি করেনি। কেন জানি না। শূন্য পুঙ্খটুকু
বিদ্বাঙ্কিত হয়েছিল পরে সোবরের 'নিজের' গুণে।
বরল কালামাটির আলগাভার কোথায গোল হাটির
বিকশেপ এল ইশ্পাতের অননবীর শক্তি তখন আর চিলে
চাল্য 'ড্যালা' নর একেবারে 'শুরোপূর্ন পালোয়ান' আর
এই পালোয়ানী ঐতিহ্য মূল্যবন করেই তিনি গিগেছিলেন
আধেয়িকার।

সেখানে সেই ঐতিহ্যের দন্দল তাকে আদার করে
দিয়েছে আত্মজাতিক শব্দকৃতি—বিশ্বের লাইট
হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ন মল্লবীরের জয়টিকা। এই রাজ-
তিলকের স্বর্ণছটা দিগন্তপ্রসারী। আর এই বর্ণালীই
ভারতীয় কৃষ্ণের স্বর্ণের নিজস্ব পরিচয়, বোধহয়
অন্তর্জাতিক জড়ী মহলে এক বাঙ্গালী 'বাবু'র তথা
এক ভারতীয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠানিক কীর্তি।



কুয়াশায় আত্মসমর্পিত গাছগুলির ভিতরে
এসে পৌছালাম। এখন নিকম-রাত্রি হিহেতম
পিড়পুরুষের ভিটে খুঁজে পাবো বলে সেই করে
যাত্রা করেছিলাম, আজও তা অসম্পূর্ণ হয়ে গেল।

হার অভিশপ্ত, প্রারম্ভে নক্ষত্র ছিল না দিশন্ত
শূণ্যে উজ্জীন আবেশ কিম্বা আদি বাক্যের বিকৃতি
বিখ্যাস করি নি কিছু অবিখ্যাস ততোধিক ক্রুর
নিরাশ্রিত আমরা ইংগিতবহ হতেও অক্ষম।

জটিলতা এখন কপানে। কারখানার পিছনে
ওপড়াণো গাছের শুল, সাপের খোলোশ, ভাঙা টিন
আফ্রোশে পাহাড়গুলি আলাতে প্রস্তুত কেউ কেউ
নিখাদ বাঁচার চেয়ে বাঁচার ভনিতা ভালবাসি।

রাত্রির বিশাল তার ঝঞ্জে নিয়ে সমানে চলেছি
সাক্ষী থেকে পিড়পুরুষ, চাই নি কপট উজ্জীন
আমি দংশিত বিবেকে প্রবীণ সাজাবো ধরে ধরে
কাল পূর্ণ হলে যোহনা ভরিয়ে দেবে প্রসন্নতা।

অমুপ্রাপিত করার মত যদি কিছু নাও থাকে
কতি নেই, আমার নিখাস প্রেমে বিক্ষত চরণে
কংকাল করোট ভাঙা পায় হতে গিয়ে টের পাই
অস্তিত্বে নিহিত আছে জলাশয়, নিরুৎসাহমালা

অপরাজিত

কুবার চট্টোপাধ্যায়

আমি কিছুতেই হার মানবোনা। পশ্চাতের টানে
কখনোই ফুলবোনা আকির্ভাব। সমুদ্রের পথ
আমাকে নিকট থেকে দূরে টানে অস্থির সজ্জানে।

কল্পপথে নির্জনতা প্রতিদিন রহস্য হারালে
সময়ের চিরপটে কোলাহল ঐকে ভবিষ্যৎ।
প্রসন্নত বেঁচে উঠি অসংবদ্ধ হৃদয়ের আড়ালে।

আকাশের পক্ষে আমি। কিছুতেই পাতালে যাব না
আমার ইচ্ছায় নিত্য সৃষ্টি হয় আলোর বৃহৎ।
প্রসারিত শূণ্যতার অন্ধকার কখনো চাবো না।

আমি কিছুতেই হার মানবোনা। ঝড়ের ওপাড়ে
আমার ইচ্ছায় ছায়া কাঠেখোদা যথার্থ আকাশে

(৬০৯ শৃংখার পর)

হলে চান থাকবে বৈ কি । কিন্তু টানের জলে পাট ভাল পড়ে না । সূতো ভাল খোলে না ।

সাঁকোটার দিকে একবার কিয়ে তাকানো বিভাগ । গাশা সাঁকো, যেন জীবন্ত একটা বড় জামোয়ার । হঠি, ভলসে, নৃশ খবরে পড়ে আছে । কোন বর্ষাভেই সাঁকো উঠে থাকে না । বর্ষার ঢল দাবড়ে না দাবড়েই সাঁকো গাড় গুঁড়ে পড়ে । প্রতি বছরই নতুন হয় ।

পর্যাপার করে বাউল পাড়ারই সন্ধান । ছোট বৌকা, ছোট বাল । লগির এক বোটার ওপার ঘার । আর এক ঝাঁটার এপার আদে ।

ঈশান চার কি ? কেহে না কেন ?

পাখিগুলি ডাকছে কোথায় বলে কে জানে ? পৃথিবী ঘনোই চুপ করে না । শোনার কান থাকলে, যিনে গায়ে সব স্নেহই কিছু না কিছু শোনা যায় ।

বিভাগও তো চুপ করেই থাকে । কিন্তু কান গাভলে শোনা যায়, অশ্রুপ্রবাহই তার বুকের মধ্যে কিসের গুপ্ত বাকছে । নানান শব্দ । যেন এখন বাছছে, কো-দশাভিত্তি, জোচ্ছুরি, ঠকানো, বড়বন্দ । আর বুকের মধ্যে একই সঙ্গেশ বাছছে, 'এবার আমি আর কিছুতেই ৯-নব পারব না । নতি স্বকার করব না ।'

হঠাৎ সে বলল ঈশানকে, এবার কিয়ে যাও ।

ঈশানের সেই হাসি । সূক্ষ্মর হাসিটি সেখলে এক এক ময় এমন গা ভুলে যায় । বলল, তা হইলে হতাশভট্টা লসেন না হাম্বাভাই ?

বিভাগ বলল, আমার বলার কি আছে । সাক্ষাৎ জলের তো তল দেখা যায় বললে । নিষেদের কর্তব্য সেখতপাও না ।

ঈশান বলল, জল যে ঘোলা, ঠাণ্ডার পাই না ।

বিভাগ দূরবের বৌকার দিকে চোখ রেখে বলল, ভবু তো অনেক যিনের চেনা । এ ঘোলা জলের বলে তো তোমাদের অনেক যিনের কারবার ।

ঈশান চুপ করে হইল হাসি-ভরাটি হাসি নিয়ে ।

বৌকার উঠে বলল বিভাগ, একটু তলিয়ে সেখতে চট্টা কর এবার ।

বৌকো এক ঠেলায় ওপারে গিয়ে ঠকল । ঈশান তাকিয়ে হইল ভেতনি ।

কোন জরি, কার জরি, অপরের চোখের দান রয়েছে কিনা এখনো সেই বার্তা, সে কথা বলবার দায় নেই । যেন, ওঁই হুঁড়ি ডোর বিয়ে । তারকেশ্বর বেহ করে ঘোড়িগি জারি করলেন বিভাগকে, আছকেই—একুনি বেতে হবে ওকে তারকেশ্বরের সঙ্গে রেখেই থাকিসে । বিভাগের নামে জরি কেনা হবে ।

জীবনে এটা একটা নতুন । বিভাগের জীবনে নতুন শব্দ জন্ম হতে চলছে । যনের মধ্যে এক বিচিত্র অনুভূতি তার । নিষেজ বাটুনির পরসার, নিষেজ অন্ধারের সম্পাতি । নিষেজ, তার নিষেজ । কেমন যেন অশ্রুত, আশ্রব । শূণিতে ভরে উঠেছে মনটা । ভবু একটি সংগরও ছাটার বতো হাটুয়ে রয়েছে চারদিকে । কিন্তু বার্তা বার্তা আমনের কল । কোন জরি কেনা হবে তার নামে ?

কার জরি ?

তারকেশ্বর গম্ভীর গলার প্রায় গহকের সূরে বললেন, জত খোঁকে তোমার দরকার কি ? ছিনিয়ে নিতে যাক না, চুরি করতে যাক না । জত ভাবনা কিসের ?

তা তো বটেই । ফাঁকি তো দিতে যাক না বিভাগ কাউকে । হাতিবতো দেখাপড়া দলিল-পত্বেবেরে ব্যাপার । তারকেশ্বর বললেন, প্রায় সেক বছর হতে চলল এসেছে, কাঁচা পরদা তো একটুও পাওনি । তোমার পাঁচনো টাকা জমেছে আমার কাছে । সাত্তে তিনগো টাকার ভিটে সহ পাঁচ বিয়ে জরি । চল দেখিয়ে যিনে যাব ।

বেলা হতে পারে । তাই বেগে বেতে হবে । বেতে যিনে বিহুয়, আড়াল থেকে একহুটে তাকিয়ে হইল । বিহুভেজ গাউনিতে যেন অবদার । বিভাগের জরি কেনার সখারে তার বুবে শূণির ভাব সেখতে পেল না সে । বরং পর চোখদ্বন্দ্ব কুতকে ভেঙে খিড দেখিয়ে বুঝিয়ে যিনেছে, জানি আমি বশার, আপনার সম্পাতি কেনা হতে চলছে ।

কেন জানি না, বিভাগের মনে হল, ভূদেবেরীও যেন কোনো আড়াল থেকে তার দিকেই তাকিয়ে আছেন স্নেহে ।

তারকেশ্বর বেগে ওপরে সেলেন । পর বলল, বউরি আচাযার জল লাও, পান নিয়ে আসছি ।

। বিভাস

আচাবার জল সে ওগাই ছিল। তলে সেবারও কথা নয়। তবু বিদ্যায় ভাড়াভাড়া খতি তুলে জল তলে দিতে এল। জল ঢালতে ঢালতেই বলল বিদ্যায়, বুঝে বুঝি হয়েছেন, না ?

বিভাস গম্ভীর গলায় বলল, আপনি তো হন নি সেখানি।

বিদ্যায় চুপ। বিভাস বুঝে আ-বোরা যেসেই বলল, কি, কথা বলছেন না যে ?

বিদ্যায় তবু চুপ। জল ঢালছে। বিভাসের হাতের কাঁক দিয়ে জল পড়িয়ে গলে বেতে লাগল।

—কথা বলছেন না যে ?

আর গম্ভীর থাকতে পারল না সে। চিন্তায় হাতা পড়ল বুকে। অথচ হতে তাকাল বিদ্যুতের দিকে। বিদ্যায় তবু চুপচাপ।

বিভাস আচাতে পারল না। কেমন যেন চাপা উত্তেজিত হুঁত গলায় বলল, কথা বলুন।

বিদ্যায় বলল, কি বলব ?

—কিছু বলুন।

—ভয় করে।

—কেন ?

—কারুক সম্পত্তি হতে সেখানেই ভয় করে।

—আমি মঙ্গ হয়ে যাব ?

—সেখানেই নয়। আর কারুর মতি হয়।

বিভাসের মনের কথা। যে সংসরের ছায়াটা তাকে ঘিরেছিল, সেই সংসরেই রয়েছে বিদ্যায়ও। বলল, তা হলে আমি বলেন—

বিদ্যায় অত গুচ গলায় বলল, না, না, তা হলে বুঝে খারাপ হবে। রেখোশি করবেন, কিনবেন। নইলে আমি মাথা কুটে মরব। একটু সোশে শুনুন মেনেবন।

বিভাস চলে গেল বাগানে, তার ঘরে। কাপড়কাষা পরে তৈরি হতেই পর এল। বলল, মৈল, আর তার সইছে না সেখানি। পান না নিজেই চলে আসা হয়েছে। দিন।

বিভাস হাত বাড়াল। পর চৌকি তিগে, হতে পিছিয়ে নিল। ভাবল, এমন নিম্ননে, যে-যেয়ে চার, তার মাঝে একমাত্র বিভাসের হতো পুঙ্খবই বড়িবি এমন নিম্নিকার থাকে।

পন্ন বলল, হা করুন, বুঝে দিয়ে দিছি।

বিভাস হা করল। পানটা বুঝে দিয়ে, বিভাসের বোতাম-পতিতে হাত দিল পন্ন। বলল, বোতাম লাগাবার কথাও মনে নেই বড়িবি ?

বলে চোখের কোন দিকে তাকাল পন্ন। পন্নবুঝতেই চোখ নাচিয়ে নিল। বুঝে তার নিখাল লাগছে বিভাসের।

মত বুঝে বিভাসের। সে বেবল সুগঠিত পন্নকে। গলায় কোটা বিছে হার। হাতের নিচে, সরে বাওরা ক্রাউজের গভীরে, বিভাস দেখল, তার নিজেই রক্ত পাক যেয়ে মরছে। পন্নর চৌকি নিভর ও সর্বনাশের হাসি।

বিভাসের মনে হল, হাতে হাত তলে সে যেন ভয়মানকেই ডাকছে। সে যেন চিৎকার করে কহিছে, আর আবেশপূর্ণে কঠিন বাঁধন ছিঁড়ে পান্নাতে চাইছে। সে চারনি, একি ভয়াবহ অবিশ্বাস্য কথা, সে মন থেকে চারনি, তবু তার গায় শরীরে রক্ত পাক যাচ্ছে। তার করুনা হচ্ছে, মাথা লাগছে। মততার, ছিঁছে, মততার রক্ত লাগাচ্ছে জুরো ভালুকের মতো। মনে হচ্ছে সে যেন কার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। হঠাৎ, মিতর তার মনোও একজন বিশ্বাসঘাতক আছে। তার বুকের গুঁড়ি কটা ভা হলে গুঁড়কন। একটা দিক কালো। কুচকুচে কালো, অন্ধকার, অচেনা।

পন্নর প্রতি করুণার বিসর্গিত হয়ে কথা বলতে গেল সে। কিন্তু গলায় শব্দ শব্দিত বিবর্ত গোলাল। বলল, ভূমি বুঝি হচ্ছে পন্ন ?

পন্নর বোতাম লাগানো যেন শব্দ হয় না। বলল, তবে কি বুঝে হবে ? চিরকালই একজনকে হাতাতে হয়ে থাকতে হবে বড়িবি ! অবিশ্বাস্য বাড়িঘর করতে হবে না ?

কী আশ্চর্য কথা পন্নর। যেন নিজের স্বামীকেই যেন বলছে। তারপর সে আঁচল থেকে কুন্ড শুলে নিল। বলল, চাকুরের কুন্ড। হা দিয়েছে। বলছে, শুলে কলছে থাকছেন, সঙ্গে দিয়ে যান। বলে বিভাসের পকেটে গুঁজে দিল কুন্ড। দিয়েও পর সরল না। বিভাসের মনে হল, নদীর উঁচু পাড়ে চির বেয়েছে। ভেঙে পড়ছে। গুঁহাতে দিয়ে বেটন করল সে পন্নকে। যেন গুঁটু গাঁ মুনী বেয়েটাকে আধর করল।

বুনোর চাঁৎতার ভেদে এল, কম্পাউটারবাবু
আপনার হল ?

বিভাস বেহুতে গিয়ে বলল, পদ্ম বুটোতে তার
হাত। চোখাচোখি হতে পদ্ম ছেঁড়ে দিল।

ভিন্সেপসারি হয়ে যেতে হল। আড়ালে পেয়ে হাস
করার সেই পুরনো পদ্ম গলার বলল, প্যান্ডোডেই
শক গাভ্রেনে তা বলে ?

পদ্ম তারকেশ্বর একবার জিজ্ঞাস করলেন, পরী
আপ নাকি ?

বিভাস বলল, না।

দ্বার পথে, জনক ঘোষের ভিত্তি এনে উঠলেন
গরকেশ্বর। তখনো বিভাস বিদ্যুতের বিদ্যুৎ-মাথা
গ্রীক চোখদুটির দিকেই অসহায় বোবার মতো তাকিয়ে
ছে। ক্র-কর লাগছে তার।

তারকেশ্বর ডাকলেন, জনক কোথায় গেলি ?

জনক বোঁয়ে এল। ঘরে ঘেরেই রয়েছে। তারকেশ্বর
লেন বিভাসকে, এই ভিটে, দেখে নাও। আমি আছে
ল ঘরে।

বিভাস গম্ভীর করে গেল। বলল, কিন্তু জনক
কাথার বাবে ?

জনক শ্বাস্ত্রাবান বলিষ্ঠ পুরুষ। বস বহর পরিত্যাগ
বে। সে নিজেই বলল, পরে বাব বাবু, কলে-কারখানার
চাকর হতলব কইরাই ! তবে, হাসখানেক দ্যা কইরতে
বে কিন্তু।

অবাবে তারকেশ্বর বললেন, সে দ্যা করা বাবে।
দে খেপিস, ভাল দেখা সব দিয়ে পালান্বে যেন ?

বিভাস বলল, বিজি না করলেই কি নয় ?

জনক নির্বিকার গলার বলল, তা খিলে খিলে যেতে
বে। আপনি না নিলে অন্যে নেবে। এ পাশ না সেলে
দ্বার কল করার শাহন হয়ে না। বত ভাড়াভাড়ি দার
চতই ভাল।

তারকেশ্বরের মূখ তার হয়ে উঠল। বিভাসের কথা
শার অধিকারকে দানতে চান না। বা করছেন, ভিন্সি
হচ্ছে। তবু বিভাস বলল, আমার চান হয়েছে
াকি মাঠে ?

—তা হয়েছে।

তারকেশ্বর বললেন, দেদর হিসের নিকশ পরে হবে।
তুই তৈরি হয়ে আর জনক। দেরি করিলেন।

জনক বলল, তৈরি আছি, চলেন।

লোপাড়া হল, ম্পেকবাবুর সেই হল। বিভাস
অনেককণ থেকেই, জনককে আড়ালে খুঁজছিল। জনকের
ভিত্তিমাটির গিহনে তারকেশ্বরের কতখানি হাত আছে
জানেন না। বিভাস। কিন্তু এটুই জানে, জনক
তারকেশ্বরের সুনকরে নেই। হাকিভাকে সাগমারি
মুনোখুনিতে জনকের দুর্বার আছে। সত্য কথা
বলতে গেলে মান্যর মান রাখতে পারে না। বড় গেরিার।

বিভাস একবার যখন তাকে গেল, ঘরে নিজে গেল
দরে। বলল, জনক, বাড়ি তুমি ছাড়তে পারবে না।

—কেন ?

—না। আনার তো থাকবার জায়গার অভাব নেই।
আবার কোন কাছ লাগবে ?

—আপনার না লাগুক ডাক্তারবাবুর লাগবে।

—কিন্তু কিনেছি তো আমি।

—তবু ডাক্তারবাবু গুল নিতে আগ্রহেন।

—না সে দাঁড়ি আহার।

জনক অবাক হয়ে তাকাল বিভাসের দিকে। চোখে
তার স্বেচ্ছ। বলল, তবে কিনলেন কেন ? বিভাস
বলল, নিজেও তা জানিনে। এখন মনে হচ্ছে কিনে
ভালই হল। যদি কখনো আমি ভালি, তোবার লগে
থাকতে দিও।

রেকিষ্টী অফিস থেকে তারকেশ্বর চলে গিয়েছেন
অন্যি মৃদুত্বের কাছে। বিভাস ক্রিয়ে আঁদার।
কিন্তু ভিন্সেপারিতে না গিয়ে, সোচ্চা বাড়ি এল সে।
বাড়ির বাইরে কয়েক মৃদুত্ব গাঁড়িয়ে, খিড়কি বরজা
দিয়ে ঢুকল সে।

কিন্তু দার জানে এল সে নেই। বিদ্যুৎ নেই এদিকে।
পদ্ম নেই। উঠানে শূন্য কি।

বিভাস বাগানে গেল। ঘরে যেতে গিয়ে চোখ
পড়ল, বাটের উপরে বিদ্যুৎ একলা। মৃদু কিরিয়ে,
বেড়া ভাঁপিয়ে তাকিয়ে আছে দূর মাঠের দিকে।
বিভাস গিয়ে দাঁড়াল কাছে। বিদ্যুতের সাজা নেই।

বিভাস পারে শব্দ বলল। বিভাস চমকে কঁপে
বলল, আপনি ?

—হ্যাঁ।

বিভাস বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

বিভাস বলল, চলে যাচ্ছেন ?

বিভাস ঘোষণা টেনে বলল, হ্যাঁ, কেউ দেখতে
পার যদি।

—কিছু সিজেশন করলেন না ?

—বিসের ?

—আমি কেনার ?

—ওই তো আপনার হাতেই দাঁড়াল দেখতে পাচ্ছি।

তারপর হুতনেই চুপচাপ। বিভাস হঠাৎ মেসে বলল,
ঘূর্ণির চোটে নাকি জানার বোতাম লাস্যতেও ভুলে
গিয়েছিলেন ?

না এখন বিভাসের রক্ত হাস্যমুখি করছে না।
মতায় উষল হচ্ছে না। কিন্তু একটা ভরস্কর কণ্ঠ
হচ্ছে। শূড়ে ঘাবার মতো। শূড়ে ছাই হয়ে
বাবার মতো। বলল, কিন্তু বোতাম লাগিয়ে দিয়েছিল
পক্ষ।

বিভাস এক হুতনেই চুপ করে বসে বলল, মার ঘূর্ণ
ইচ্ছে, আপনার সঙ্গে ঠাকুরাণির বিয়ে হয়।

বিভাস অবাক হয়ে বলল, আপনার পাশুড়ির ?

বিভাসের ত্রাঁটির কোশে হাসি। হ্যাঁ। শব্দরমণার
কি বলবেন জানিনে। আনারও ঘূর্ণ ইচ্ছে। তাই যোক।
বাধা তো নেই। পার্শি বঃ—

বিভাস ঘূর্ণি বিভাসের নাম বয়েই জাকতে লাগছিল।
কিন্তু ভক্তটা বাধ্যতান তার সোপ পলনি বোব হয়।
বিভাসকে ভরস্কর নির্ভর বনে ছিল তার। সে বেন
চুচিচাপা গলার বলল, থাক—চুপ করুন।

বিভাস বিস্মিত হল না বিভাসের কথার। বলল,
কেন ? আমায়ের কাছে থাকতে চান না ঘূর্ণি ?

বিভাস বেন অদৃষ্ট বিশ্বের হু পা এগিয়ে এল
কিন্তুদের কাছে। বলল, থাকতে চাই আপনারদের
কাছে। কিন্তু—

বিভাস বলে উঠল, আর তো কোন উপায় নেই।
ঠাকুরাণিকে দিচ্ছে বীরব আশ্রয় আপনাকে।

বলে হাসতে হাসতে চলে গেল। ব হলে বাড়িতে
রইল বিভাস।

মানবানেকের মধ্যেই তারকেশ্বরের সঙ্গে বিভাসের
ভরস্কর বিরোধটা ভিতরে ভিতরে ঘূর্ণি উঠল। কো-
অপারেটিভ, আপানী ইউনিয়ন বোর্ডে ইলেকশন,
জমককে উচ্ছেদ না করা আর ভূবনেশ্বরীর পত্র-বিভাসের
বিয়ের প্রস্তাব, একটু একটু করে আগুন জ্বলিয়ে দিল
বিরাট কুণ্ডে।

বিভাস জানত, তারকেশ্বর সবচেয়ে বেশি ঘূর্ণা করেন
কেউতে শাপ আর ঘূর্ণা পুরোকে। কারণ এরা ভীষণ
তাই নির্ভর।

বিভাস দেখল, কেউটির উদ্যত কথা তার দিকেই।
কারণ, কেউটির জীবনের একমাত্র ভরস্কর হল, কেউ
আঘাত করার আগে তুনি আঘাত কর। শেষ কর।
ভীষণ ঘূর্ণা ও রাগ এমন কয়েই হলে ওঠে। নিজে
হারা দেখলেও চমকে ওঠে সে, হারাতেই হোদলায়।

বিভাস আক্রমণের অপেক্ষা করছে।

বেলা ছোট হয়ে এসেছে। হেরনের আকাশের বেন আর
সবুর নর না। কত ভাড়াভাড়ি সে শব্দ গায় ঘূর্ণি
মেবে, ঢেকে ফেলবে নিজেকে, সেই ভাবনা।

বিভাস ঘেঁষে ঘেঁষে, বিভাস করে অনেকগুল
ভিনদেশসারিতে এসেছে। কিন্তু তারকেশ্বর এখনো
আসেন নি। এদিকে বেলা চলে গেল। ঘূর্ণাটা কয়েকজন
এসে ভীষণ করেছে। ঘাসের ওঘূর্ণ দিগে দেবার
কথা, তাদের বিদায় করেছে বিভাস। দারা ভাকারকে
মেঘাতে এসেছে, তাদের বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

জলে চান ধরেছে। বাড়ি শূর্ণিমে উঠছে। রাজ্য
পক্ষ হচ্ছে আবার। অচিনার বাজারে, সকাল সন্ধ্যার আবার
সোফাকনের আলাপোনা বাড়ছে। শূর্ণোর সহর থেকেই
বাড়ছে। ঘূর্ণা সোফান, বাজারের সোফান দু'একটা
ঘূর্ণে বসছে আবার। এতদিন পাড়ার ছোটখাটো
ঘূর্ণাবাদ্যতেই সোফের চলছিল। এখন আর চলে না।

কাম, প্রকৃতির সঙ্গে সবই বাঁধা : এই শূন্যের দিকে ঘুরে বসে থাকতেও ইচ্ছে করে না। কাছে পিঠের ঝাল-বিলের মাহ, দামান্য ভাঁগ-ভরকারি রোমন্বই বসতে আরম্ভ করেছে দু'বেলা ।

পূত্রের সময় কলো পুঁকের মধ্যেও কলেকিবন শূন্য ভিত্তি গেছে। মাঝে একটু ওড়ি পড়েছিল। আবার শূন্য হয়েছে। আসলে বর্ষার পরে, জীবন যেন নতুন করে আরম্ভ হয়। জীবনের সমস্ত এখানে পূত্রোপুঁকি পশিনের আরাধ্যতা। শূন্যের কোডো বাতাস। থাকে বলে শূন্য। তারপরে বর্ষা। বর্ষার তৌক শব্দ পর্যন্তই চলে। দেবত শীত-বসন্তকালে বস চলা-কোয়া হাঁক-ডাক ব্যতীত।

এ সময়ে যেন হয়, শূন্যটাও বেশ ভাল চলে। শিকক এবং হাওয়া, সকলেই নিঃশব্দ আসে। কটা বাজে, মো পোনা যায় হাওয়ায়। অচিন্ত্যে একটু জ্বরজ্বাট যেন হয় সব দিক দিয়ে। তারকেশবের বাগানে না আসুক, যানে চাষাী আগতে আরম্ভ করেছে বিস্ময় থেকে।

এখন সোলের ঠং সোনার মতো দেখায়। গাছগুলির মন শূন্য যৌবন। মাঠে মাঠে শস্য। সব দেখে শূন্যে বিভাসের মনে হয়, পান ধরি, আমার সোনার বাংলা, আমি তোমার ভালবাসি।

হাস্য ব্যতি অনাঙ্গিরে ছিল। হৃদয়ানে স্রোত্যা হালিয়ে, হৃদ্যে দিতে, বৌরা ওড়ানো। আর হৃদয়ানটা নিয়ে ডাক্তারখানায় ও পাশের মহাশয় ঘরে ঘরে গলে গলে, জর হরি, হরি হরি বল মন, বোল্ হরি !...

একটু অধোকাই লাগে বিভাসের। হাস্যকে সে চিনেছে, জানেই এখন। সে কি সত্যি তারকেশব রাসের মঙ্গলের মনে দস্তাবেলার হৃদিকে ডাকে।

—কই সো কশনভরবান্, ডাক্তারবান্, আসবেন চন্দন।

তাই তো, তারকেশব এখানো এখানে এসেন না কেন। হাছ আবার সময়ে গেলেন নাকি। ইউনিয়ন বোর্ডের—না, ইউনিয়ন বোর্ড নয়, এখন গ্রাম এবং অকল পকারেতে রয়েছে। পকারেৎ নির্বাচন আসার। সময়ে না সেলেও গ্রাম গ্রামে একটু আদট, দু'রতে হচ্ছে তারকেশবকে।

ধরিও তার দেহী আছে এখানো অনেক। কাল্পনের চৈত্রেয় আগে নয়। তবে, গ্রাম পকারেতে কাগা লিঁচাবে, সেন-সব আলোচনা এখনই চলছে। গ্রাম পকারেৎ নির্বাচনের পর, অকল প্রধানের নির্বাচন। আগেকার প্রেসিডেন্টের মতোই থাকে বলা যায়। তাই গ্রাম পকারেতে নিজের বিশ্বাস-ভাষন লোকেরা না নির্বাচিত হতে পারলে, গ্রাম প্রধানেরা সোলমাল করতে পারে। আর গ্রাম প্রধানেরাই অকল প্রধানকে নির্বাচিত করে।

ভা'হাড়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক খোলাঃ কল্যাণেও বিশেষ চেষ্টা চলছে। তবে চারিদিকের সঙ্গেও ওপংয়ের হায়া দেখে, পকারেৎ নির্বাচনের আগে এ বিষয়ে হয় তো লাহস পাচ্ছেন না তারকেশব। আর অন্যটি শূন্যমোই ও'র প্রধান পরামর্শদাতা।

কিন্তু সময়ে অথবা গ্রামের বাইরে গেলে হয় তো বিভাস জানতে পারত। আসে একমাত্র বিভাসকেই বলে যেতেন। সন্ধ্যাটি পেটা বন্ধ হয়েছে। শূন্য সেটাই বন্ধ হয় নি। ফেরকের এই ছোট ঘরে আসা বেলার নভোই, বিভাস তারকেশবের সম্পর্ক নিঃশব্দে ছোট ঘরে আগছিল। তারকেশব ডিপেন্সারি অফিসে গিয়ে কথা বলা প্রায় বন্ধই করে দিয়েছেন। তবল বন্ধ যেমন শক্ত আর কঠিন হয়ে ওঠে, উনি সেই রকম হয়ে উঠছিলেন।

বিভাস এখন রোজ একলাই যেতে যার এবং আদর্শ ভূবনেশ্বরী প্রায় রোজই বাবার মন উপস্থিত থাকেন। বানাদ কথা জিজ্ঞেস করেন। আর বিশ্বাস যে কথাটা বলেছিল, মিথ্যা নয়। উনি চান পক্ষকে বিভাস বিয়ে করুক। বিভাস ভাবে, উনি বোধহয় ভেবে দেখেন না, পক্ষ শূন্য এর মতো নয়। সাধারণিকতার দিক থেকে পক্ষ অনেক বেশী অর্জনার ডাক্তার তারকেশব রাসের মতো। এর সঙ্গে আশ্রিত এবং কর্মচারীর বিয়ে কোনোমুখি দিয়েই পোভন নয়।

কিন্তু পক্ষ একল বছরের মতো। ধর্মিক বিয়েতে তার নভামতের কোনো নাম বাজবে খেই, তবে তার ইচ্ছেটা একটা সমস্যা। অতত ভূবনেশ্বরীর কাছে। আর ভূবনেশ্বরীর জীবনে যে ইচ্ছে এবং সাধ অশূন্য হয়েছে, চূর্ণাধিকার হয়েছে, যেহে জীবনে তিনি তা দেখতে চান না। বরং পক্ষ যাবে, ও'র সমর্থন আছে। বিভাসের

থেকে বিদ্যান বুদ্ধিমান স্বৰ্ণবান দিবে কী দরকার। মেঘের ঘন ঘনি না ভরল।

এ বিঘের বিদ্যুতের দরখানটাই সব থেকে হকচকানো।

বিভাদ বলেছে বিদ্যুৎকে, প্রথমত ভাস্কর্যবান্ এ বিঘে দরখান করতে পারবেন না। ওঁর কাছে আপনায় স্বাধীনতা এ প্রস্তাব তুললে, উনি হাসি করবেন। বিতীর্ণত—
—বিতীর্ণত ?

বিদ্যুৎ মুষ না তুলে, বাগানের ঘরের মেঝের পায়ের আত্মস দশেছে।

—আমি পরকে ঠিক ভালবাসি বলে মনে হয় না।

এই সময়ে বিদ্যুৎ তার আতত চোখ তুলে বিভাসকে দেখেছে।—কেন ?

—তা জানি নে।

—ঠাকুরকি দৃশ্যকী,—জানি বুদ্ধিমতি, অত্যন্ত খাটি মেয়ে।

—জানি।

—সে আপনাকে ভালবাসে। আর সে জানে, আপনিও তাকে ভালবাসেন।

—হ্যাঁ, সে হারটা আমার কিছ্ দ্বীকার করে নিতেই হবে। কিছ্ আমায় কেউ কাউকে আসলে ভালবাসি কিনা, সেটা ভেবে দেখা উচিত।

—আপনার কথা আমি জানিনে। ঠাকুরকি যে আপনাকে ভালবাসে, তাতে কোন দ্বন্দ্ব নেই।

—তা হয় তো নেই। কিছ্—

বিদ্যুৎ আবার চোখ তুলেছে। বিভাদ বলেছে, আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারবো না।

দৃষ্টিমেই অনেকল চুপ করে গেলোছে। তারপর বিদ্যুৎ হলো একটা নিঃশব্দ কেসে বলেছে, আপনাকে তো বলেছি, এ ছাড়া ব্যাবর কোনো সম্পর্ক বাখার আর কোন উপায় নেই।

এর বেশী বিদ্যুৎ বলে নি। এ বিঘের খতবার কথা হচ্ছে, এই তার শেষ কথা। অথ বিভাদ নিজে থেকে নিয়ে উদ্বিগ্ন। পরকে সে 'বোঝার ভালবাসে না' বলছে। তবু পর এখন তার কাছে আছে, তখন তার একটি আশঙ্কা বাকি ভেলে যায়। বিঘের মধ্যে, এই বিচল

অস্পষ্টতাকে সে চিনতে পারে না। ভয় হয়, তার ভিতরেও পাশের একটি ছায়া বেন জিরানীল।

তাপস এল। তাপস অনেকটাই তুবনেশ্বরীর মতো দেখতে, কিন্তু চাইলে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কথা বলে চোঁচিয়ে এবং উচ্চারণ অস্পষ্ট। কেনন বেন কথা ভড়িয়ে যায়। শরীর একটু বুল। বাখার একরাশ চুল। সব কথাতেই প্রায় হাসে।

বাখি জলে বাবার একটু পড়েই তাপস এসে বলল, কম্পাউন্ডারবান্, বাবার শরীর ব্যায়াম আপনাকে ভেকেছেন।

বিভাদ তাড়াতাড়ি উঠল। বলল, জর টর হয়েছে নাকি ? ওয়েশপার কিছ্ বিঘে যেতে বলেছেন ?

তাপস যেসে বলল, সে সব কথা আমাকে বুনো বলে নি। বুনো বললে, বাবা বলেছেন আমাকে একবার কম্পাউন্ডার বাবুকে ভেকে দিতে।

বিভাদ বলল, ও! উনি কি উপর আছেন ?

—না, বাইরের বাড়িতে।

বিভাদের ডু কোড়া কঁচকে উঠল হুঁ দস্তানী চিত্রায়। কে একজন বলে উঠল, হয়েছে। বোধ বনতী আছ কাং হয়েছেন। আমাদের বাবু আর তা হলে হবে না। কম্পাউন্ডারবান্ একটু দেখে যেন না।

বিভাদ বলল, আপনাতা একটু বরং বলুন, আমি দেখা করে এসে দেখব।

উঠলাইট নিয়ে বোঁয়ের বাবার মূখে বলল, আপনি যাবেন না তাপসবান্ ?

তাপস তখন হাসুর সঙ্গে কথার বাস্তব। বলল, না।

বাখির একটি অংশ জুড়ে গিয়ে, সারনের দিকে যেতে হয়। বিভাদ দেখল গোটা বাড়িটা অন্ধকার, স্তব্ধ। জোছাই তাই থাকে। তবু, আছ বসুধে লাগছে বাড়িটা। কোবার কোন দরজার বেন শব্দ হল। বিভাদ একবার খামল। কিন্তু আর কোন শব্দ পাওয়া গেল না। পা বাড়াতোই আবার বসুধে গেল। কি যেন পড়ে গেল কবুন্ করে। বোধ হয় বাড়ির মধ্যে, কারুর হাত থেকে বাসা বাটি পড়ে গেছে।

বাখির শায়নের দিকে এসে, সেট ঠেসে উঠেন

দেখাবার আগেই তেল বিভাস, বাইরের ঘরে আলো
সেই। ঘরটি বিভাসের পরিচিত। বাইরের ঘর না
লে এটাকে তারকেশবের ঘাস ঘর বললেই ভাল হয়।
টা রাখাড়ির সেই পুরনো অংশ।

ঘরে ঢোকবার আগেই নাকে গন্ধ সেল বিভাসের।
তারকেশবের অদৃশ্য বলল তাল। কিন্তু উনি পান
হয়েন কেন? অদৃশ্যের কথাটা তা হলে সত্যি নয়।
দেখতে চান।

একটি মাত্র কেরোসিনের পদ্ম জ্বলছে টেবিলের
পর। টেবিলের সামনেই চেয়ারে বসে আছেন তারকেশব,
মের বোতল এবং সেলাস সামনেই। পাশে টি. রাইকেলটার
গেজিটের খোলা রয়েছে টেবিলের ওপরে। উনি টের
ন নি বিভাস এসেছে। আলোর দিকে তাকিয়ে
দেখছেন। মূখ্য লাল টকটকে আর হস্তবদ্ধ
লক্ষ্যে। এ সেই সিংহ মূর্তি। শক্ত কোঁচিকানো
হাট হ্যাট বসার চুলসূঁচি বেশের কথা হয়ে
জড়িয়ে দেয়।

এ ঘরটি বিশেষ ঘর। নানান বস্তুয়ের গলী গলি
চ্যার টেবিল দিয়ে সাজানো। বড় আয়না দেয়ালে।
গামাগীরি ভিতরে বৈঠকের মধ্যে দাঁপের কংকাল।
পান্থের কন্ডালও আছে একটি। তারকেশবের দ্বারা
গড়িয়ে কন্ডালটাও পারে। ঘরের বেহেতে তেমন আলো
পড়েনি। - কিন্তু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, পুড়ি আটকে
সুপী কুকুর পুরে আছে এখানে ওখানে। এরা
তারকেশবের শিকারের কুকুর। আলো তেমন জোড়ালো
নয়। ঘরের অন্ধকার ঘোড়েনি। বরং একটি অলপট-
মালো-আধারের সূঁচি করেছে। চাকর বুনো নিচর
এখানে আছে কোন এক কোণে বসে। দেখতে পাওয়া
যাচ্ছে না। ডাকা হাত সাড়া দেবে।

কিন্তু তারকেশবকে দেখা হাত "একটা অশ্রু চিত্রা
চোখে বদল বিভাসকে। এ আর এক তারকেশব।
এবং এ তারকেশবকেও কিন্তু চেনা আছে বিভাসের।
এ যোগদর সেই কেউটে, যে আগেই কঁসে গুঁঠে। আলো
হাত তোলা যায় জীবন ধন।

বিভাস রহস্যর কাছ থেকেই বলল, আমাকে ডেকেছেন

তারকেশবের মূখ্য জ্বললেন না। যেন জানেন, বিভাস
এসেছে। বললেন, হ্যাঁ। এম, বল। বুনো।

—দাঙে।

বা-ভাড়া গেলেন, তাই। বুনো উঠে এসে ঘরের এক
পাশ থেকে। তারকেশব বললেন, তুমি এয়ার যা।

বুনো একবার বিভাসের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য দিয়ে
অদৃশ্য হল। তারকেশব চোখ জ্বললেন বিভাসের দিকে
লাল কক থেকে চোখ, দু'বকু অলপারের মতো। কিন্তু
কিছুটা কিংবা ক্রোমের লেপ হাত নেই। একটা চোখের
দেখিয়ে বললেন, ওখানে বস।

বিভাস বলল, তারকেশব সেলাসে চুল্লি দিয়ে, মূখ্য
উঁচু দিকে জ্বললেন। যেন কড়ি বরষা দেখেছে। সেই
ভাবেই বললেন, তেমনোইলাব, তোমাকেই বলব বন্দুক
চুল্লিগুলো পরিষ্কার করতে। কাল একটু কালি-
কেউটার বিলো দাব ভাবি।

সেটা অব্যাহতাবিক নয়। বরং উনি শিকারে
গিয়ে থাকেন। বিভাসও গোছে কয়েকবার লেপে।
বিভাস বলল আমাকে বললেন না কেন, পরিষ্কার করে
রাখতাম।

তারকেশব বললেন, বলতাম। কিন্তু লক্ষ্য
করল যে।

বিভাসের দিকে তাকালেন। বিভাসের অদৃশ্য হল
যেন চোখে চোখ রাখতে। কিন্তু লক্ষ্য? এ কথাটা
প্রথম শুনল সে। তারকেশবের দৃষ্টিতে যেন উঠে বসলেন,
তারকেশবের হাতের নাকি জানাই হতে চলেই গুঁহি।
তাই, কানি কথারোম করতে লক্ষ্য করল।

বিভাস মূখ্য নামিয়ে দিল। তারকেশব বললেন,
তুমি জানতে এ কথা?

বিভাস বলল, জানতাম।

—কে বলেছে?

বিভাস চোখ জ্বলে তাকাল। তারকেশব তাকিয়ে
আছেন। বললেন, তুমি নিভিয়ে বল। বাইরের কেউ?

—না।

—তবে? বাইরের কেউ?

—হ্যাঁ।

—কে?

বিভাগ ভুবনেশ্বরীর কথাটা বলবে কি না বুঝতে পারল না। বহিঃ ও এখন সব বিখ্যাত-বস্তুর মত চলে গেছে তারকেশ্বরের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলাই ভাল। তার আগেই তারকেশ্বর বললেন, পরে না বলছে ?

—হ্যাঁ।

তারকেশ্বর আবার হেসে উঠলেন বললেন, তোমার সঙ্গে যে বাড়ির লোকেরা এক ভাব হয়ে গেছে, আমি যে বরও জানতাম না। আমারও অবশ্য দে-ই বলছে। এ বিষয়ে তোমার কী মত ?

বিভাগ বলল, এটা আমি আপা করতে পারি নে।

—কোন দিক দিয়ে। আমার বেয়ে বলে ?

—না। পরকে খিয়ে করার কথা আমি ঠিক ভাবিনি।

—কিন্তু তুমি জান, বেয়ের না এখন ভাবছে, তখন তার মতো বিশেষ একটা কিছু আছে। সে হয় তো কিছু বুঝেছে।

ইশাভটা পরিষ্কার। বিভাগ বলল, উনি আমাকে খুব মেধ করেন।

—তাই কি জামাই করে রাখতে চান ?

হেসে উঠলেন তারকেশ্বর। —তোমার কিংবা পরে কি কোন ইচ্ছেই নেই ?

বিদ্যুত্তের কথা মনে পড়ল বিভাগের। আর বিদ্যুত্তের মনোমগ্ন ইচ্ছে কথা। তা ছাড়া, তারকেশ্বরকে বডোই ভয় করা যাবে, শুভই সব অঙ্ককারে থেকে যাবে। পরিষ্কার করে বলাই ভালো। সে বলল, আমার ইচ্ছে কোনো দাম আছে বলে মনে করি নে। আপনাদের সকলের ইচ্ছেই সব।

তারকেশ্বর বললেন, আমি তো কিছুই জানতাম না। আরও শুনলাম, জানলাম যে বাড়ির সকলেরই ইচ্ছে আছে। এ বিষয়ে আমার কি ইচ্ছে হতে পারে, তুমি বলতে পার।

বিভাগের আত্মপন্থানে লক্ষ্য এবার। ওর কথাটা বিভাগের মনে থেকেই গেলো। বিভাগকেই সাক্ষাৎ করতে চান বোধহয়। সে বলল, আমি জানিনি।

তারকেশ্বর কিছু রেসে উঠলেন না। চুপ করে সেখানে চুক্ক লিলেন। বললেন, যাবে নাকি একটু ? ঝিনটো বিদেশের।

এই প্রশ্ন আহরন। বিভাগ বলল, কখনো পাইনি।

—প্রতিজ্ঞা আছে নাকি কিছু ?

—না কোন ইচ্ছেই চব না।

—থাক্ তা হলে। আচ্ছা, ভগবানের ওখানে তোমার যাতায়াত আছে ? ভগবান চক্রবর্তী।

বিভাগ তাকাল চোখ তুলে। বলল, মাঝে মাঝে দেখা হয়।

—উ। কিন্তু সবচেয়ে তুমি যে অবিশ্বাস বোম্বলের ওখানে যাও, এটা তো আমি জানতাম না।

তারকেশ্বর যেন ব্যাবের মতো আচমকা তাঁর হুঁড়লেন। এবার বিভাগও যেন কেমন একটু অশান্ত বোধ করল ভিতরে ভিতরে। যোগেশের প্রতি একটা ম্যাক্সিক আকর্ষণ ছিল বিভাগের। এবং সবচেয়ে গিয়ে যে দু'বার যোগেশের বাড়ি গেছে। বলল, হ্যাঁ, দু'দিন গেছি।

—আর বেদেরা শালের ব্যাপারে তার ওপর আমি অবিস্মার করেছি কিংবা অন্যভাবে তাকে জানহাজা করেছি, এ কথা তুমি ভাব ?

বিভাগ চুপ করে রইল। তারকেশ্বর বললেন, সে কথা বলবার সাহস তোমার কেন হয়নি, বুঝলাম না। তবু তোমার মনে থেকেই পরামর্শ জানতে পারতাম। তা'হাজা পক্ষান্তে ইলেক্সনে তলে তলে তুমি যোগেশের দলকে সাহায্য করেছ শুনলাম।

কথাগুলি নিছক মিথ্যে নয়। তাই বিভাগ হঠাৎ মনে হলতে পারল না। লং এবং সত্য কথাও অনেক সময় ঝড়ের যায়। সে মনে-প্রাণে বিদ্রোহ করে, তারকেশ্বরের বিরুদ্ধে দেওয়া উচিত। কারণ তারকেশ্বর কবিতাশিল্পী। লোভী, শৈবরাচারী। যেহেতু ভাল-বসতে তাঁর কিছুই যার আসে না এবং সে সব অনুভূতি আমেরি আছে কি না সন্দেহ।

তারকেশ্বর আবার বললেন, তুমি যে রীতিমত জর্জরিত লোক, এটা আমার জানা ছিল না। প্রায় সব জায়গাতেই তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি ইহাৎনি ! পরামর্শ, বেদো, অভিনা, সব জায়গাতেই শুনছি, 'মেসেজি ভাল।' আমার থেকে বেশি জানল কী করে লোকে, তাইতোই অবাক হচ্ছি। তুমি কি আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আকর্ষণ করে নাকি বিভাগ ?

বেশ একটা ভারতীয় তারকেশ্বরের গদ্য। বিভাস বলল, আন্তার্জাতিক ওয়াক' কী করব বলুন। আমি যা করেছি, আপনি তো সবই জানেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে আমি কোম্বিন কেনো কান্ন করিনি, আপনার বিবরে বলেও বেড়াইনি। আমি নিজে জানিয়ে, কবে থেকে আমি জ্ঞানপ্রিয় হলাম।

—আ রে সেটা তো আরো জেটব্যানের ব্যাপার হে। তুমি জান না, কিছু সোকে তোমাকে নিয়ে লাকাল্যিক করছে। সেটা তো বুঝে ভাল কথা। কিছু কো-অপারেটিভ দলকে লোকজনকে তুমি একটু ভাল বুঝিয়ে।

—আমি।

—হ্যাঁ। তুমি তাদের সেন্সার হাতে বাগ্প করছে।

বিভাস বলল, এটা গভীরা নয়। আমাকে বারো মিডেল করছে, তাদের আমি বিচার বুঝি দিয়ে কান্ন করতে হলো।

তারকেশ্বরও সঙ্গে চোখাচোখি হল বিভাসের। তারকেশ্বর বললেন, যাতে তারা না ঠকে।

বিভাস চুপ করে রইল। তারকেশ্বরও সেলাসে শেব চুপ করে অনেক চুপ করে রইলেন। শব্দ কুহুর-গুদুরি গা-চাটা এবং চুলকানোর অস্পষ্ট শব্দ শোনা যেতে লাগল।

হঠাৎ তারকেশ্বর বললেন, চল তা হলে যেতে যাওয়া থাক।

বিভাস বলল, একবার ভিলেশ্যারিতে যাব ভার্সিটাস করেকটি লোককে বসিয়ে রেখে এসেছি।

তারকেশ্বর বললেন, ও! আচ্ছা, বাও। গাইড, ম্যামোটা তো তুমি ভালই চালাতে পার। কালকে যাবে তো বলে।

—আপনি যদি বলেন।

—নিচর। আমি তো তোমাকে হাড়া আছকাল মোতেই পারি না। আচ্ছা, তুমি ঘুরে এস।

বিভাস বেড়িয়ে এল ঘর থেকে কিছু অস্বাভাবিক শব্দ নয়, তার নিশ্বাস প্রশ্বাস পৃথক অস্বাভাবিক হয়ে উঠল। সারাটা শব্দটা সেইটো অনিবার্য রেখেও তার পরকেন্দ্র অস্বাভাবিকভাবে পড়তে লাগল। কেন? সে কি ভয় পাচ্ছে? মনে হচ্ছে, কিছু ঘনিষ্ঠে আসছে তাকে চারদিক থেকে। একটা অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর বোত। কঠিন কঠিন, নিচর এবং শব্দ লক্ষ্যে, অচিনপদের অস্বাভাবিক থেকে বিভাসের শ্রাবকে কেন্দ্র করে এগিয়ে আসছে ঘনিষ্ঠ। এই অচিনপদেরই সে বহুবার হাত থেকে ঝিটাই জম্বলাভ করেছিল। সেই অস্বাভাবিক শব্দ বহুবার শব্দ হওয়ার শব্দেই একটা অস্বাভাবিক শব্দ ঘনিষ্ঠে আসছে।

একটা ভয়েই একটা শব্দ। তারকেশ্বর যদি কিছু হতেন, কখনে উঠতেন, তা হলে কোন ভাবনা ছিল না। কিছু উনি তা করেননি। একটা কৌতূহলিত হাসির তরলতার জাগ্রতলেন, আর বিভাসকে নিয়ে ঘনিষ্ঠে চলছিলেন। বিভাসের দলকে সব বরই যে উনি যাবেন, সেটাই শব্দ জানিয়েছেন। ওঁর প্রতিজ্ঞার কিছুই থেকে যায়নি। শব্দ বলে যোগ্য করেননি বিভাসকে। অথচ বিভাস নিচর হতে পারছে না।

ভিলেশ্যারিতে এসে দেখল, লোক ক'টি এখনো বলে আছে। বিভাস এখন বোটারুটি মূল্যে দেখতে গিয়েছে, প্রেক্ষাপটও করতে পারে। তারকেশ্বর তার ওপর নিচর করে ছেড়ে দিতেই বলেই দায়িত্ববোধে সে গিয়েছে। যিথো মর, তারকেশ্বর তাকে গিয়েছেন এমন। তারকেশ্বর তাকে নিশ্বাস করতেন। এবং এক নিশ্বাস বোঝার আছকাল আর কাউকে করতেন না। তাই তার

আলফার
বোর্ডিং



যোগ
৪৬
০৬২৬

লক্ষ্মী ব্রাদার্স
জুয়েলার্স

১, হিন্দুস্থান হাট, বামিগঞ্জ
২০৮/৮, রায়বিহারী গ্রিনিউড (গড়িয়াহাট জংগন) কলিকাতা

প্রাণ সব কিছুই বিভাসের ওপর ছেড়ে দিতেছিলেন। তবু বিরোধ হুঁইবে উঠল কেন? অথচ বিভাস নিশ্চয় থাকতে চেয়েছিল। প্রাণপণে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু মানুষের মনের কলকলার এক বিচিত্র জটিলতা। এ মনে বিভাসের নিজের সঙ্গে নিজেই বিরোধ।

এ কি সেই এরীকে নিয়ে বিরোধের মতো? যখন সে ভাবছে পূর তার ঘনিষ্ঠ, পূর তাকে ভালবাসে, ওর ওপর পূর দাবী স্বাভাবিক এবং পূর যৌবনের স্বভাব ও আবেগে যে ভেসে যায়, পূর সবক'ল সম্পর্কের একটি আদর্শ' নকি আছে, আর সে নকির কাছে বিভাসের খিা টেকে না, ঠিক তখনই কিছুভের দিকে তাকিয়ে একটা উদ্টো প্রোত'বহে। মনে মনে তখন সে আর বিশ্বস্ততা বকা করতে পারে না। মনে হয়, সংসারের প্রাত্যাধিকতার উর্কে, কোন' এক দূর গভীরে গিয়ে যেন তারা দু'জনে দু'খোদু'ধি হয়। সেখানে দাবী অনুসারগন্ধ। কথা অর্থহীন। শব্দ দু'জনের চোখের দরদার পারাপার করে, চেতনার এক আদর্শ' জগতে দু'জনে মৌন দ্বির। আনন্দ সেখানে আছে কি না জানা যায় না। ব্যাখা কতখানি, মাপা যায় না। কিন্তু একটা চাপা আবঙ্গ কোথায় যেন ধর'র' করে।

দু'য়ের মারে এ বিচিত্র বিরোধ আছে বলেই, পূর বিরয়ে তারকেন্দ্রকে সোঝানু'ধি কোন কথা বলতে পারেনি। কিন্তু এই-না কিসের বিরোধ। মানুষের নিমের মধ্যে এ কি আদর্শ' মনের ফেলা।

মনোযোগ দিয়ে রুগীরের মেঘতে পারল না বিভাস কোন রকমে প্রাথমিক পাট দেবে, ও'ল' ছিল। ভাপস চলে গেছে। রাস্দ একলাই রয়েছে। বিভাস ও'ল'ের আলমারীতে ভাল' বন্ধ করছে যেখ' রাস্দ বলল, চলে যাবেন নাকি এখন?

বিভাস জানে রাস্দ তাকে অনেকল থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। সে বলল, হ'্যা।

—কর্তার তা হলে সত্যি শব্দ অশব্দ নাকি?

—না।

বলেই আবার ভাড়াভাড়ি বলল বিভাস, হ'্যা, একটু ইয়েই হয়ে আছেন।

রাস্দ মোখা'ল্লা গলায় বললে, তবে শব্দলাল কাল

রাস্দ মোখা'লেই কালিকেউটের নিশে শিকারে যাওয়া হচ্ছে?

বিভাস অবাব দিল না। রাস্দ চুপ করে বিভাসকে কয়েক ম'ব'ত' দিয়ে আবার বলল, শব্দ চিত্তার পড়েছেন মনে হচ্ছে।

বিভাস বুঝতে পারছিল, রাস্দ আদর্শের ব্যাপারটা আশ্বাস করেছে। কিংবা, অনেকদিন আসে থাকতেই আশ্বাস করেছিল।

সে বলে উঠল, তা হতে পারে। আমি তো কেহরবাক হতে চাই নি।

রাস্দ একই রকম গলায় বলল, রাস্দ করছেন কেন। রুগীরের কাছে পাওয়া টাকা পকেটে দিল বিভাস। কোনো অবাব দিল না। বেরিয়ে পড়ার আগে সে আর একবার চার'ধিক দেখে দিল। বহিও রাখে রাস্দই থাকবে এ ধরে। তবু ভিগপেন্দসারির ব্যবস্তা'য় সাংঘাত্যে তুলে রাখবার নিশে'শ আছে।

রাস্দ আবার বলে উঠল, শুনছি কু'রেনা অশব'ধের গন্ধ পায়। আমি যেন কি রকম একটা মারাপ মারাপ গন্ধ পাচ্ছি। মাইরি!

বিভাস বলল, জর দেখাচ্ছেন।

রাস্দ বলল, না। দাঁতায় বলছি।

রাস্দ তার ভাবলেশহীন চোখ দৃতি তুলে বলল বিভাসের ওপর। হ্যারিকেনের আলোয় রাস্দ'র কপাল নাক আর গতে' চোকানো চোখ অত'ত দেখাচ্ছে। তার গলা অবধি বিভাসের গায়ের দ্বারা পড়েছে। সে তার মোটা পম্ভীর গলায় বলল, আপনাকে আমি বিশ্বে বলব না কম্পাউটারবাবু। তবে আপনি পৌঁছো পিপড়ে না লাগ পিপড়ে, আমি বুঝতে পারছি না।

বিভাস রাস্দ'র গায়ের অস্ত্রকার ছেড়ে দরে দাঁড়াল। বলল, বুঝতে পারলাম না।

রাস্দ বলল, মো'লো পিপড়ে যেয়েছেন তো? কালো কালো পিপড়ে। কানড়ার না। আর লাগ পিপড়ে কামড়ায়। কিন্তু লাগ পিপড়েরের ঝাঁকে বহি পৌঁছোয়া'র আগে যায়। তবে লাগদুলোন পালিয়ে যায়।

লোকটাকে সাংঘাতিক পরতান বলে মনে হয়। তবু রাস্দ করতে পারা যায় না। বরং কেমন যেন ভাবনা ধরে

যান। রাস্তার কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝেও বিভ্রান্ত কিছু বলল না। সে বেগেতে ছোঁত গেল।

গান্দু বলে উঠল দেখুন কন্‌গাউন্ডারবাবু, এখানে আপনি একমিনি ভেসে এসেছিলেন, কেনন না? তাই বলছি, যদি ভয় পেয়ে থাকেন, তা'লে আবার ভেসে চলে যান। আজই, এই রাত্রেই। আর মিনিট সাতেক বাতাই গাড়ি আসবে। একমিনি বেঘন এসেছিলেন, তেননি চলে যান।

বিভাগ বাগান্দার ওপরে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, ভয় পাব কেন? আমি কি কোনো অন্যায় করছি?।

গান্দু বলল, আমাকে সে কথা জিজ্ঞেস করবেন না। নিজেকে করুন। আর ন্যায় অন্যায় কী যায় আসে?

—কিছুই যায় আসে না? আর আমি শুবু শুবু কুকুরের মতো পালিয়ে যাব? তা আমি পারব না।

—তা হলে বন্ধন। থাকতে পারলে তো ভালই। লোকে তো তাই চায়। থাকতে পারলে আপনাকে লোকেরা ভাল বলবে। চলে গেলে বাগান্দ বলবে। সেলে বাগান্দ। আমি বলেছিলাম, যদি ভয় পেয়ে থাকেন—

—আমি ভয় পাইনি গান্দাবাবু।

বিভাগ ঘেমে এল। বাগান্দার সজ্জাকালীন অল্প কলরব এখন নীরব হয়ে গেছে। অন্ধকারে দু' একটা গরুর গাড়ি বদলতীন ঘাড় গুঁতে পড়ে আছে এদিকে। এদিকে ধুংসে একটা শব্দ হচ্ছে ট্রেনের। শেষ গাড়িটা আসছে। এ ব্রাক লাইনে, শেন ডাউনটা প্রায় কঁকাই যায়।

বিভাগ এগিয়ে এল। গাড়িটা এসে পড়ল। দাঁড়িয়ে পড়ল বিভাগ। টেনে এসে একটি লোক নেই। গতি চলে গেলে কেউ ডেকেও জিজ্ঞাসা করবে না।

আর কি বা সম্পর্ক এই আঁচনার সঙ্গে। এ সোপের ভাল মধ্যে বিভাগের কি যায় আসে। মাঝখান থেকে নিষেধ ভিতরে বিরোধের ওকে কেনসি এক অনির্দিষ্ট অজ্ঞানিত সংঘর্ষে মতো টেনে নিয়ে চলেছে।
কটা বাকল না। গাড়ি দুইদল গেল।
বিভাগ ভালল, কিস্ত, না, চলে যানার কথা
আজ আর ভাবা যায় না।

গাড়িটা চলে গেল। নিবন্ধতা আগে গভীর হল। সত্যি কি ভয় পাবার কিছু আছে? এত ভয় নিয়ে কি বাঁচা যায়। কিসের ভয়। মানুষের কিসের ভয় সব থেকে প্রবল। মৃত্যু তো। নিষেধ ছায়াবে কেউ এড়িয়ে চলতে পারে নাকি? ওটাই তো নিশ্চিত এবং অবশ্য। একেবারে অপ্রতিযোগ্য। অজ্ঞান যেকে সঙ্গে আছে। কর-হুটির দলল ভবিষ্যৎবাণীর মধ্যে একটি তো বিজয় বলা যায়। মৃত্যু অব্যাহিত। আজ অথবা দুদিন বাসে। রোগে অথবা অশ্রুতে। তাকে কীকি দিয়ে কোথাও পালানো যায় না। তবে কিসের ভয়। আজ আর সেই পথে পথে ঘুরে নিজস্বীরে মতো নরা সম্ভব নয়।

একেবারে বাগান্দার ঘরে সে এল। ঘরের শিকল খোলবার আগেই, খেল তার পিছনে পিছনে আর একটি মর্ডার এগিয়ে এল। অন্ধকারেও চিনতে অসুবিধে হল না বিভাগের। কিছুই এসেই, আর কিছুকে দেখতে গিয়েই, চোখে পড়ল তার বাড়িতে আসো মনেই এখনো। তারকেসর হয়েছেন তা চলে ওখানে।

কিন্দ্য বাগান্দার উঠে, বিভাগের কাছে এসে পড়ল একটি অস্পষ্ট অববব। কিছু একটি প্রত্যক গল্প আছে। চুপি চুপি হুত বলল, শুবুশুবু। আমি গাঁড়ান না, চলে যাব এখনি।

বিভাগ মৃণোমুখি হল বিভাগের। অন্ধকার হলেও, কলমার সে কিছুকে স্পষ্ট দেখতে পেল। বিভাগের চকিত ভ্রম চাউনি। ঘোমটা নেই গারা সেয়ে একটি অশ্বিতা ব্রমকা। কিন্দ্য বলল, অশ্রুতনাই কি শুবু যোগে আসেন।

ডুন্দর ও মজবুত



বাহুর জুতা

* **বাহুর কোং**

৭৬/৭, কালজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ • ফোন ৩৪-২৪১২

বিভাস বলল, বুঝতে পারিনি।

বিদ্যুৎ বলল, আমি শূন্য বলতে এসেছি, কোন রকম অপর্যায় করলে, আর্পনি বনে নেবেন না।

—আমি তাই কি করছি।

—কোনো রকম বিপদ আমার এসে যেন বোকা হয়ে যাবেন না। আপনার ভো আবার, সে গুলে ষাট নেই।

—বোকা হব কেন?

—হন তো যে। হলে জানবেন বুঝ ভুল হবে। উনি বাই করুন আর বাই বলুন, আর্পনি আমার মতো থাকবেন। নক থাকবেন। একটা কিছু মতলব নিচ্চর করছেন উনি হবেন হবেন। বাই করুন, আর্পনি টলবেন না। আমি চললাম।

বিদ্যুৎ যেতে উদ্যত হল। বিভাস ডাকল, শুনুন।

—বলুন। তাড়াতাড়ি বলুন। অন্যকে গিয়ে এখনি আপনারা বাবার বাড়তে হবে। উনি আপনারা জন্মেই বনে আছেন তা'হাড়াটুকুই এসে গড়তে পারে।

বিভাস চুপ করে রইল। বিদ্যুৎও। অন্ধকারেও, হুজবে যেন হুজনার ঢাব সেধতে গেল। বিভাসের হাত হুড়ির ভিতরে গিয়ে যেন কাঁপছে, অথচ অথচ বনে হচ্ছে, বিদ্যুৎ ছোট একটি নিশ্বাস ফেলে বলল, যাচ্ছি।

অন্ধকারে মিলিয়ে গেল সে। বিভাস দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। তারপর ঘরের শিকল আর না বুকে, একবারে বায়বাঁধতে এসে উপস্থিত হল। সেপল, এর মধ্যেই উঠানে হুড়ি গরুর গাড়ি এসে পড়েছে। বলল চারটে এক কোণে বাঁধা। অন্যতলেক আধিবাসী গাড়ির তলার আত্মা দিয়েছে। আগামীকালের বাত্মা আরোজন সবই প্রত্নত।

ঘরে ঢুকল বিভাস। ফেবল, তারকেশ্বর ইতিমধ্যে পয়েন্ট টু রাইকেলটা পাউন্স জুড়ে, বুকের তলর তলে বয়ে ম্যাকডা দিয়ে থকছেন। বিভাসকে ঘেঁষে বললেন, এসে সেহ? চল যেতে বাঙা বাব। তোমার জন্মেই বনে আছি, বুনা, গাবর সে।

ইতিমধ্যে নতুন করে হল ঢালা হয়ে গেছে সেলাসে। কনার ঢালা হয়েছে, কে জানে। কিছু তারকেশ্বর কি। একটা টলছেন না। উঠে দাঁড়ালেন। কুহুপদীস গলে

সঙ্গে উঠল। তারকেশ্বর হেসে বললেন, এখনো সময় হয় নি যে। বুনা বুনা, বুঝিয়ে নে।

বিভাসের কিকে কিকে বললেন, আমরা ভোরবেলাই বেরুব।

বুঝতে পড়েছিল বিভাস। দরজার তোকা পড়ল বুঝতে উৎকর্ষ হল সে। বুনা ডাকছে নিচ্চর ভোর হয়ে এল যোগ হয়। বিভাস তবু চুপ করে রইল কারুর গলার শ্বর শোনা যাচ্ছে না। আবার টক্ টক শব্দ হল। বিভাস উঠে দরজার কাছে এল। দ্বিজ্ঞো করল, কে?

বুঝ একটা ঢালা শব্দ পাওয়া গেল, শুনুন।

বিভাস দরজা খুলল। প্রয়ে কড়ের বেগে পদ চলে দরজা বন্ধ করল আপে। তারপরে একেবারে বিভাসে বুকে এসে আত্মা নিল। চুপকুপি প্রাব উৎকর্ষ কান্নার ভেড়ে পড়ল পদ। বলল, তুমি বাবার সঙ্গে যেতে পারবে না।

বিভাস এক মুহূর্তে তন্মিত্ত হয়ে রইল। বলল কেন পদ।

বুঝ হাতে আরো কঠিন করে আঁকড়ে বয়ে বলল পদ না তুমি যেতে পারবে না। বাবা যেন কেমন হয়ে গেছে আমার মনটা একটুও ভাল লাগছেনো তুমি যেতে পারবে না।

পদ এই প্রথম বিভাসকে তুমি বলছে। কিছু মত হচ্ছে যেন বরাবরই বলে এসেছে। এক দহম শোনাতে আর এই একটা অশ্রুত স্বাভি। নানান গুর ও গুণের যে কণ্টকিত। তবু এই বেহলদ পদ যেন একটি ভীরা পাখীর মতো এসে তার অশ্রুভর্তি উক্ততা আদম্ব করুনাকে জাগিয়ে তুলল। পদর মাখার হাত রেখে বল সে, আমি যে তোমার বাবাকে বলেছি যাব বলে।

বিভাসের বুকের ওপরেই বাহে বাহে মাখাটা বসে লাগল পদ। —না না, তুমি যেতে পারবে না। কা শূন্যে আবার বিয়ের কথা না বলার পর থেকেই বা কী রকম করছে। যা পথত ভয়ে কীরকম শিতিয়ে গ্রহে আঁধি মারা হাত বুনাতে পারিনি এবানে আসব বলে



তুমি যা চোক একটা কিছু বলে যাওয়া বন্ধ রাখ।
কাপিতে উঠে তুমি যেতে পারবে না।

বিভাল পশুরে নিয়ে এসে বল। চিহ্নক তুলে
হবে বল, কেন এ কথা বলছ? উনি কি আমাকে নেবে
কেলবে?

পশু বলল, তাও হয় তো পারে।

বিভালের বুকের ভিতরে চিকুর ধান্য মতো চক্রে
উঠল একবার। তারপরে বলল, এত সহজ নয় পশু। তা
হাড়া, তুমি বুকেতে পারছনা। একবার যদি উনি ভেবে
বসেন, আমি জর পেয়েছি, তাহলে আমার সঙ্গে কুকুরে
মতো ব্যবহার করবেন। সে সুযোগ আমি দিতে চাইনে।
আমি খাব।

—না না, ওসো না। তোমার পারে গড়ি, তুমি
যেও না।

পশুর মতো মাদলীল পক মেয়ে ভয়ে বেন কঁকরে
এতটুকু হয়ে গেল। বলল, তুমি বল পে, মাদলীর
তুমি দেখবে। বাবা একদা থাক।

বিভাল এয়ার মেসে ফেলল। পশুরে গুলে বসিয়ে
দু'হাতে মৃদুখানি ধরে বলল, তোমার বাবাকে দেখছি
তুমি একটুও চেনো না। এখন যদি আমি না যেতে
চাই, তা হলেই ও'র কাছে আমাকে নতি শ্রীকার
করতে হবে। আর এ নতি শ্রীকারে মানে তুমি
বোঝ পয়?

কামার পশুর পশুর শব্দ বুকে সেল। সে বাবা মাড়ল।

পশুরে বুকের কাছে টেনে নিল যাগো বিভাল।
বলল, শোন পশু, এককম দে'লো না। তুমি এরকম কেঁদে
না। একটু চুপ কর।

পশু শব্দ হবার চেষ্টা করল। বিভাল বলল, শোন,
আমি নতি শ্রীকার করলে যদি উনি আমার ওপর
তুষ্টি হভেন, আমি করতাম। কিছু, উনি তা করেন না।
তার পরেও আমাকে এই আঁচনার থাকতে হলে, ও'র পায়ে
তলার পড়ে থাকতে হবে। নইলে যেমন ভালতে ভালতে
এসেছিলাম, তেমন চলে যেতে হবে। তুমি তো জান,
উনি যদি আমাকে শব্দ ভেবে থাকেন, তা হলে আমি
এনিতেও সোঁত, অর্নিতেও সোঁত। তার চেয়ে ও'র
মৃদুশব্দ, খী হাডানোই ভাল।

—তুমি পারবে না।

—পারব।

—কেউ পারে নি। তোমাকে বাবা দেখে হাড়া করে
ছাড়বে। না তো আর কিছু করবে।

—তবেই বল, এ নাম্বের কাছে নত হবে আমার
কী লাভ?

—তুমি আগের মতো হয়ে যাও। বাবা তোমাকে
বে চোখে আগে দেখত, তুমি যে রকম হও আবার।

—সোটা বোঝ হয়ে আর সম্ভব নয়। আর হলে সেটা
ও'র ওপরেই নিষ্ঠ'র করছে।

পশু হঠাৎ অঁচল তুলে চোখ মুছল। ভালভাবে
বলে বলল, বালি তো আমার বিপর নয়। যাগো অনেক
যাণার নাকি বাবার সঙ্গে তোমার গোল
বাল সেমেছে সে সব তুমি কেন করতে
সেহ?

বিভাল বলল, ইচ্ছা করে কিছুই
করিনি। পশু আমি তো মানুষ। এককনের
অব্যাহার বোঝা আর কত দিন আমি
বইব?

—তবে আমার কি হবে?
বলতে বলতে পশু কঁপিয়ে উঠল আবার,
আমি কী করব এখন?

এত অপরূহ কোনো দিন মনে হয় নি
পশুরে। বিভাল তাকে কামার কাছে

আলন্দ-উৎসর্গ...

লিপি... প্রসঙ্গ



এল.পি.ইণ্ডাস্ট্রিজ

১১১, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭

টেনে বলল, এত ভর পেও না পর। তোমরা দত্ত ভর পান্ন, ততখানি কিছূ নয়, আমি বলছি।

পদ্ম কান্না বাধা মানল না। বিভাগের নিজেকেও অসহায় মনে হল। আর পদ্ম কান্না ক্রমেই তার বুকে একটা কড়ের সৃষ্টি করতে লাগল। কারণ, এই পরর মধ্যে কোথাও কীটিক নেই। এ হল সেই বিক্ষলিত মনে, যে এতদিন বিভাগের শ্বাশুর্ এক কথার পর ছেড়ে যেতে পারে। যে কোনো বিপদের কীটিক নিতে পারে। মরতেও পারে। আবার বিভাগের সঙ্গে পাঁচ বছর সংসার করবার পর আবিষ্কার করতে পারে, ও কোনোমুহুরে ভ্রাসবাসিনে বিভাগকে। ও হল এমন এক সাধারণ পত্নীর নির্ভর্য মন। সংসারে যেটা মর্যাদার গটে।

বিভাগ ওকে আরো নিবিড় করে নিল কাছে। আর এ সবেরই বুনো ডাকল, কম্পানভবাবু, অ কম্পানভবাবু। জাপেন নাকি? এংর উঠতে হল, বেরবার সময় হল।

বিভাগ জবাব দিল ভিতর থেকে তুমি যাও, আমি যাছি।

বুনো চলে যেতে যেতে বলল, সব পড়তে কিতুন। আশনি এসেই হল।

ওরা দুজনেই একটু সময় চুপ করে বসে রইল। তারপর বিভাগ যেন স্তম্ভোৎসর্গের মতো ধাঁধা পছন্দে চুপ করে বসে রইল। আর বারে বারে কলতে লাগল, আমি তোমাকে ভালবাসি পর। তুমি বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে ভালবাসি।

পদ্ম তাতে উজ্জ্বলিত হয়ে উঠল না। অসহায় হল না। এবং শান্ত ভাবে বলল, আমি।

কিছু অকস্মিত চিরবিষাদের মতো বলল পদ্ম। বিভাগের সেই বৃহত্তর আবার বিপরীত বলে উঠতে ইচ্ছে করল, না না পর, যিথো কথ্য, ভালবাসিনে।

পর বলল, বাঁচি ভেলে দিই দাঁও।

—বাক আমি ভুলছি।

—না, আমি ভুলছি।

ফেলসাই দিয়ে বাঁচি ভুলল পদ্ম। কী পরবে জাণ-কালপ পরে নাও।

—কেউ এসে পড়বে পর।

—কেউ আসবে না। তুমি বেরিয়ে যাওয়ার পর আমি বেরব।

বিভাগ জানা-কালপ পরে তৈরী হল। উঠে পাইটা হাতে নিল। পর আসো নিশ্চিতে দিল আবার। বিভাগের কাছে দাঁড়াল।

কালিকেউটের বিলের জলল এখানে ভেঙা। কোথাও কোথাও সামান্য জল আছে। কোথাও কোথাও পাক। কালীপুর গ্রামের শেখ প্রান্তে, দোকানদারের বাইরে আত্মনা পাতা হল। মস্তবস্ত কুরি নানা বস্তের তলার বুনো স্ত্রীস্বামীর আশ্রয়ে রইল। আর সবচেয়ে বেশি পড়ল। আদিবাসী তিনজন টাটি নিয়ে। কুতুরগুদিল আছে সঙ্গে। ওরা নিয়েই অল্পা হল জলিলের মধ্যে। বিভাগের হাতে ইটালিয়ান লাইডিয়ায়ার। তা ছাড়া আরো দুটি বন্দুক এনেছেন ডায়কেশ্বর একটি মোনাল্যা, আর একটি পয়েন্ট টু রাইফেল।

আকাশ একবারে নির্বেশ। পাখীদের ভাড়াভাঙিতে চারিদিক নীর। পলিমটির শোকা আর অল্প জলে ছোট ছোট নাহ। বহাভোক্তার আদর। পদ্ম এবং পাখীদের এক অকুণ্ডল শাদাভাঙার এখন কালীপুরের এই বিশাল। একটা শীমা পর্বত ধাব ক্ষেত প্রসারিত। তারপরে ঘেমে গেছে। কালতে সবুজ জলো ঘাস মানুষের কোবর অবধি যেন লকলক করছে। বিলের জল নেনে সেজে অনেক দূর।

কাচারোঁচার উড়ছে। মস্তবস্ত বটে তঁবে জোড়ার জোড়ার দূরভেই ভালবাসে। মস্তবস্ত হয়ে এক সঙ্গে শত শত উড়ছে বাগেফিরা। ছোট ছোট চকায়ের বস্ত শেখতে বলে, অনেক বন-গড়াই বলে। এখানে-ওখানে বিহল গাছ। কয়েকটা বেশ বড় গাছ। আর আছে পিটলী গাছ। দূর থেকে পাছপুলিকে কাড়ালো আর বোঁটে বনে হল। বর্ষাকালে যখন গারিগিকে জল থৈ থৈ করে, তখন শাপেরা প্রান্তর দেয় এইসব গাছে।

এবার নিয়ে বাজারের হল বোঝার বিভাগের বিলে আসা। কিংবা বাগপাটক। এখন বিলের জল বহু দূরে সরে গেছে। নেনে গেছে। ডায়কেশ্বর

একবারেই পুড়িয়ে দাবে। নেতাদের হাতের একটা মূৰ উত্তরিক থেকে এসে বিশেষ পড়েছে। দলি পুৰ্ণাকালে নৃত্তি পেত। তবে নেতাদের হাত দিয়ে বিশেষ বায়োনাট্য জল থাকত। জল থাকলে, বাহু থাকত। কিন্তু, নেতাদের হাত—।

বিভাগ তারকেশ্বরের দিকে তাকিয়ে দেখল। বন্দুকটা কাঁধে ওপর দাঁ হাতে ধরে চলেছেন। বেশ বোকা ঘাস, চোখে ঘরের জড়িয়া। প্রার উদ্দেশ্যহীন ভাবেই চলেছেন এখন। শিকারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নেই। তেমন উদ্দেশ্যনাও নেই। কিন্তু, বন্দুকটি কুলে আছে। চোখ বন্ধ আবেশা, সমস্ত পরীয়ে ও মূলের ভাবলেশহীনতার একটা প্রতীক।

একটা হিমালয় গাছের গোড়ার দাঁড়িয়ে তারকেশ্বর। কালকের বড়ো আত্ম আর তরল নন। হাসছেন না। বিভাগকে তাকিয়ে দেখছেনও না। মূৰে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে। আগুনহীনই বসেছেন, এখন পাখী মাঝে না। খরা বেহেও লাভ নেই। বিহিবিহি শব্দাধিক করে, এখন থেকেই দাবানল করে দিয়ে লাভ নেই।

বিভাগ শুনল। কিন্তু, কিন্তু বলায় নেই।

গাছে হেলান দিয়ে হঠাৎ বসেছেন, জনককে তুনি তোনায় জনি থেকে উচ্ছেদ করতে চাও না?

বিভাগ প্রার চমকেই সেদল। জনকের বাত্ম আর জামাই তার নামে কেনা হয়েছে। বিভাগ বলল সারী ক্রিয়া—.....।

হুঁ.....বান ওকেই দিয়ে মেনে বসেই ?

বিভাগের আবার অব্যক্তি আশ্রয় হল। তারকেশ্বর দূর জঙ্গলের দিকেই তাকিয়ে আছেন আবহবোদ্ধা চোখে। বিভাগ বলল, রক্ত-বজা করে আবার করেছে। এখানটা দিয়ে থাক!

একটু চুপচাপ। বসেছেন, তুনি জান বোধের জনক গুণ্ডা প্রকৃতি লোক। ভরকের হাঙ্গামা বাজ।

বিভাগ জানে, কৃষকের ওপরে ঘরা জল দেবে, জনককে তারা ভয় করে। নির্বিঘ্নে নন কিছু মেনে নেবার পাত্র সে নয়। সত্যকে সে অবিচ্ছিন্ন হুগেই বলে। ঘরা গুণ্ডা করতে পারে না, ঘরের

গায়ে লাগে কিংবা ঘরা অপমান করে, তাদের প্রতি বশতঃ সে হয় না। এবং জনকের ঘরাণা, ঘরের কথার ঠাণ্ডা করা ঘর না, তাদের গায়ে ঠাণ্ডা করতে হয়। অশরিয়ামশী ঘরাণা থেকে নিজেই স্বর্গ সে বেশী করেছে। কিন্তু, বান্দব হিসাবে, একজন কৃষক হিসাবে তাকে মন বলা বাবে না। এবং স্বভাবতই সে তারকেশ্বরের একজন সহযোগী।

বিভাগ বলল, হ্যাঁ, একটু গুণ্ডা লোক।

তারকেশ্বর একইভাবে বসেছেন, তুনি বোধের জান না, সে আনাকে বা ঘুপি তাই বলে। আর আমার লোকের পায়ে হাত তোলে।

জানে বিভাগ। কিন্তু, সে উঠেটা গাইল। বলল, কিন্তু, আপনাকে মান্যও করে। এক কথার বাত্ম, জবির বিক্রী কথায় লিখে দিল।

তারকেশ্বর হাসলেন।—পালক চিনেছে সোশালি ঠাকুর? রাতারাতি ছেলে গাভার ভয় থাকলে, সকলেই ওরকম মান্য করে। নইলে জনক আনাকে কচিকলা দেখিয়ে দিত।

তারকেশ্বরকেও কচিকলা দেখাতে পারে, এটা একটা বস্ত কথ। কিন্তু, রাতারাতি ছেলে পাঠাবার ব্যবস্থা তারকেশ্বরের হসেয়াই করেছিল। জনককে দেশ ছাড় করতে চেয়েছিল তারা। এবং সেটা আশাশী পকারেই নির্বাচনের আসেই। কৃষক, জনকের আরও কতগুলি সোম আছে। এ সকলে যে দাঁ একবার কৃষক জ্বায়েত হয়েছে, সেটাও জনকের জ্বায়ে। মহাজন আর হুগেণী জিনিসদের বিরুদ্ধে কয়েকবার যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে জনকে নেতৃত্বেই। আর একজন উপদেষ্টা নেতা অব্যক্তি আছেন। স্নায়ের সহযোগীও অন্তত নির্বিঘ্ন বান্দব ভবানী চৌধুরী। পরাগপুরের উগ্রজবির গৃহস্থ রক্তাধি চৌধুরী, বিরাট মহাজন, প্রভাবশালী অব্যক্তি ব্যক্তি তারকেশ্বরের বহুমানী। তার ভাষ্য পুত্র বলেই জনকের পরিচয়। শহরে সে হল মাস্টারি করে। যোগেন সোশালের ব্যক্তিভেত তাকে একদিন ঘেঁষেছিল বিভাগ। সেটা সেপের চমকা চোখে রোঙ্গা রোঙ্গা গড়ন কিন্তু, শক্ত বান্দবী। কথা মোহর কই বলে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি

হাত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ভাবানী কখনো সাইরে গিয়ে থাকে নি।

অতএব জনকের অপরাধ অনেক। তারকেশ্বর আবেশোন্মত্ত হতো বলে পড়লেন পাছতলার উঠন পুক মটিতে। বদলেন, আমি জনককে থাকতে দিতে চাইনে এখানে। এ তলাটে।

ঠান কুহুরে ডাক শোনা গেল। একবার ডেকেই খেয়ে গেল। বিভাস বলে উঠল, গ্রাম থেকে ওকে তাকিয়ে দেবার অধিকার কি কারুর আছে?

তারকেশ্বর ফিরে ডাকালেন এবার বিভাসের দিকে। তাঁর স্নেহবন্দু হাসির বিদিক হেনে বদলে তুমি ওকে গিয়ে রাখতে চাইলেও তাড়াবার উপায় আছে।

ঠিক সেই মূহুর্তেই একটা গরুর পশু শোনা গেল। একটা ঘরের রেখা ঘরে জপাল কোঁশে উঠল। তাঁর বেসে উকটা কুহুর এসে উপস্থিত হল তারকেশ্বরের পায়ের কাছে। কুহুরটার মূখে একটি সবুজের পাতা বরগোলা। ঈশ্বর রক্তের হাস সেগোছে। কিন্তু বরগোলাটা মরে নি। তারকেশ্বর কুহুরের মূখ থেকে আতত জীবটিকে নিজের হাতে নিলেন। বরগোলাটা দলে দলে বৃক্ষের জন্মে ছটকটিয়ে উঠল। তারকেশ্বর চলে গিয়ে, কুহুরটার ঘাতে পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। বরগোলাটার কণ্ঠের কাছে চানড়া একটু ছিঁড়ে দেছে। বৃহৎ দাববানে এবেছে কুহুরটা। অল্প এই কুহুরগুলি সারাদিন গড়ে গড়ে ঘুরে থাকতে। তখন দেখে বোঝা যায় না, জানোয়ার-গুলি স্বাভাবিকভাবে শিক্ষিত পিকারী।

তারকেশ্বর ছুঁড়ে কোলেন বরগোলাটাকে। মূহুর্তে কুহুরটা কাঁপিয়ে পড়ল জপালের মধ্যে আর পরমরানির দলে বট,বট, পশু শোনা গেল। বিভাস বৃকল, বরগোলা-টার পাখিরা দাঁত বসল। আদর করে কুহুরটাকে খেতে দিলেন তারকেশ্বর। পুত্রকার।

গ্রাম বন্যায়ান দ্বারা তারকেশ্বরের ঘন জড়ল। মূহুর্তে খেয়ে উঠি, বিভাসী দ্বিহানে গরুর পাড়ির মতো পুত্রোদ্বিলেন। সামনের দিকে ঢোকা দিয়ে, গাড়ি দাঁড় করানো ছিল। বিভাসকেও সেই ভাবেই আর একটা গাড়িতে বিভাস নিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু বিভাস

পুত্র পারেনি। সে ঘরে ঘরে বেড়িয়েছে। বন্দু অবশ্য কাঁপে রেখেছিল। বুনো বলেছিল, 'সেপী। যাবেন না কম্পনভরবান্দ। তেতা গেলে হল সে পাবেন না এ বিল জলসে।'

তখন আর একজন আদিবাসি বলে উঠেছিল, ইহ্যানে জল তিষ্ঠার মান্দ্র মর্যা বাহ, আর উলারা জে গিলে কেখে কেখে জলসে ঘোরে।

আর একজন বলেছিল, 'আর মান্দ্রকে ডেক্যা ডে গিলে বাহ, হুই ঘুরে। মান্দ্র আর ফিরে না।'

জেল নর, পাঁচিল নেই। বৃহৎ ঘন চারদিকে পা ভয়ের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। মান্দ্র নিজেই এগুলি চৈ করছে, বিশ্বাস করছে এবং প্রত্যেক অভিজ্ঞতার মরছে।

বন্দুক হাতে থাকলে একটা পিকারের 'প্রব' আসে। বিভাস উভর পাখী বেয়েছে। একবার এর গর্তবর্তী পুকটাকে পাণ থেকে গুলি করে মেরেছিল আকশোদ্র হয়েছিল বিভাসের। আশুও সারা মূহুর্তে বিকলে বহু পাখী তার চোখের সামনে উড়া ডাকাডাকি করল। কিন্তু সে বন্দুক তুলল ন পুত্র হাতের হাল্লার মতো আদিবাসীরা কপি সে অনেকগুলি বাসোড়ি ধরেছে। কচি ছোট যে পাখীগুলি, আত একটাই এক চুতরো মাংস। কে গরম হল থেকে তুলে, হাল ছাড়িয়ে ভেজে নিলেই হল খেব বিকোলে বুনোর ডাকে তখন বটগর আতানার ফিরল বিভাস, তারকেশ্বর তখন বোতলে ছিঁপি বুলে দলার চালছেন। ওঁর গাল ঘন র ফেটে পড়ছে। আর চোখ দুটি ভীষণ দপস করছে। মূহুর্তানি বড় আর আগুনের মতো কক্ক করছে।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা নামল। ঘুম কুহুরদ্র চকিত হয়ে উঠল। বুনোকে ঘেঁষে বেগিয়ে পদ দবাই। আদিবাসী তিনজন টাতি নিয়ে, কুহুরে দলে অদৃশ্য হল। হাতে উঠলাইট। তারকেশ্বর কায়েও একটা আছে।

জলসে আতত গাড়ি একটা প্রকাণ্ড হিজলে তলায় বিভাসের কাছাকাছি নির্দেশ করলেন তারকেশ্বর। উনি বিকে চলে গেলেন অন্যদিকে। তাগলে স্ন

বিলাসল যেন ঘুমিয়ে পড়ল। 'কি' 'কি'র ডাকের সঙ্গে এখানে দু'একটা অতিপ্রতিক্রিয়ায় তাক শোনা যাচ্ছে এই ছেলে। তারপরে শব্দ প্রতীক। বিভাস বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

একে একে তারা কটল আকাশে। অন্ধকার গাঢ় হল। মারে মারে শিশু শোনা গেল। কুহুরের চাপা গর্জন। রাত প্রায় একটার সময় তারকেশ্বরের ঠা' জ্বলে উঠল। দবাইকে কিরে আদবার নির্দেশ করছেন উনি। আজ আর আশা নেই।

তারপরদিন সারা বেলা ও রাত বৃথা চলে গেল। তারকেশ্বর একেবারে চুপচাপ। কেউ তার সঙ্গে কথা বলতে সাহস করছে না। এমন কি, তারকেশ্বরের ব্যর্থ হতাশ জুড় ভরৎকর হৃৎ স্পন্দে, কুহুরগুণিও যেন ধরে ধরে কিরছে। কিন্তু কিরে আদবার নির্দেশ দিচ্ছেন না। কী জান উনি? চোখের সামনে দ্বিগে দু'টি নবর শব্দের সেজে। মেড়ে মেবার ইঙ্গিত করেছেন উত্তরকেশ্বর। একজন আদিবাসী বিভাসকে বলল, কতটা দাঁতাল চান।

তৃতীয় দিন প্রায় ছোঁয়রাত্রে জঙ্গলের পূর্ব দিকে চললেন তারকেশ্বর। বন্ধন বাহনেন, তখন আকাশ কল্লী হয়ে গেছে। যে দিকটার এসেছে সেদিকে জংলী কোপের ভিড়। আদিবাসীদের নির্দেশ দিলেন। আর ওয়া আজ প্রবেশ থেকেই দাঁড়িয়ে চীৎকার করে কুহুর-গুণিকে নিয়ে ছুটতে লাগল। এখানে কোনো বড় গাছ নেই। বিভাসের কল থেকে হাত পকাশ ধরে তারকেশ্বর দ্বিগে নিভল।

বিভাসের কেবল যেন অস্বাভাবিক হতে লাগল। কোবার ডোবা কোপের মধ্যে যেন কেবল বেঝাক, আর অদ্বার বনে হতে লাগল। গাছের গুঁড়িতে একটা নিরাপত্তা পাওয়া যায়। অস্বাভাবিক দিনের বেলা কোনো ভয় নেই। তবু ভিতরে কেমন একটা অস্বাভাবিক হচ্ছে।

আদিবাসীরা চীৎকার করছে। কিন্তু তাদের সেখতে পাচ্ছে না বিভাস। তারপরে হঠাৎ ফেল, তারকেশ্বরও অস্বাভাবিক। কোবার গেলেন? দু'বটা শাল হয়ে আকাশে বাবা ডুল। যেন ঠাণ্ডা, আদুন সেই দু'ঘণ্টা। হাল্কা আলো দাঁড়িয়ে পড়ল।

হঠাৎ কুহুরগুণি ডেকে উঠল এবং পরমুহুর্তেই একেবারে তক্ত। আর ঠিক তখনই বন্দকের 'গাটার' চানার শব্দ কানে এল বিভাসের। সেও সঙ্গে সঙ্গে গাটার টেনে ছিঁয়ারে আদুন দিল। আবার কুহুরের ডেকে উঠল। আর ডাকটা পশ্চিম থেকে উভরে যেতে লাগল। আদিবাসীদের চীৎকার সমানে চলছে।

—হে-ই দাঁতা—ল!

একজন চীৎকার করে উঠল তীর গলায়। আর সেই সঙ্গেই বান্দন ও কুহুরের চীৎকার। খ্যাপানো হচ্ছে, আর বিভাস করা হচ্ছে আনোয়ারটাকে। কিন্তু কোনদিকে? তারকেশ্বর কোবার গেলেন। সেই পরমুহুর্তেই সেই ভরৎকর আদব বীভৎস শব্দটা শোনা গেল। দাঁতালের অদ্বার জুড় চীৎকার। বোকা গেল, তারকেশ্বর আনোয়ারটাকে তার বর থেকে দাঁড়িয়ে বার করিয়েছেন তার শালপালদের দ্বিগে।

কিন্তু কোনদিকে? শব্দটা উত্তর থেকে গুরে হুটে চলছে। বিভাস সেই শব্দ হঠাৎ একটু একটু ধরে। যেন ওদিকে তাকা দেওয়া হচ্ছে। তারকেশ্বর কোবার? শব্দটা দ্বিগে পূর্ব থেকে দক্ষিণে হুতল।

দু'পিয়ার।

একটা চীৎকার শোনা গেল। পরমুহুর্তেই বিভাস দেখল, অশাল কাঁপিয়ে একটা অদ্বা তীর যেন তার দিকে আসছে। দাঁতাল আসছে। তার দিকেই আসছে। না, ওটা একটা কুহুর। সে দক্ষিণ দিকে কিরল। আর বিভাস দেখল, বিশাল দাঁতালটা তাকে সেখতে কাৎ হয়ে। কোপের ভিড়ে বিশাল দাঁতাল, প্রায় একটা বহিষের বতো। তার শূন্যতর তীর দাঁত সামনের দিকে। সেখতে না সেখতেই নিম্নে কবাবর বিভাসকে লক্ষ্য করে ছুটল।

—যারো হে।

বিভাস কিরে তাকাল। ফেল তারকেশ্বর বিন হাত ধরে দক্ষিণে দাঁড়িয়ে আছেন। হৃৎ একটা জুড় হিংস্রতা, বোহ হর দাঁতালের থেকেও ভরৎকর। বন্দুক বিভাসের দিকে তাক করা। চীৎকার করে চললেন, বন্দুক ডোল, বার, ঘোঁষ তোর কবতা। তুই না পরলে তারপরে আদি।

কিন্তু তুমি বলছেন কেন তারকেশ্বর। বন্দুক তুলস বিভাগ। কিন্তু তার দিকে কেন তারকেশ্বরের বন্দুকের নল। বিভাগি লাগছে। বিভাগ তখন বন্দুকের শীঘ্র থেকেও অনেক এগিয়ে এসেছে। তারকেশ্বর যেনে উঠলেন। বিভাগের দিক থেকে বৃষ্টি ছিঁড়ে বিভাগ তারকেশ্বরকে দেখল। বন্দুক ঠিক তেমনি উঠানো। কেন? একটা বিবর্ততার মধ্যে বিভাগ গুলি করল বিভাগকে লক্ষ্য করে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া মাত্র বিভাগ গর যেতে গেল। সেই বৃহত্তেই তার মনে হল, একটা তীর ছুঁই তার গোড়ালির কাছ থেকে প্রায় কোমর পর্যন্ত বিদ্যুৎ বেগে ছেনে গেল। বিভাগ বুকল, বিভাগ তাকে মারছে। এ পড়ে গেল, আর সংগে সংগে সেই ছুঁইর কলা তার হাতের ডানার ওপর দিয়ে ছিঁকে বেগিয়ে গেল। গুলির নশ্ব হল আর একটা, বিলাসল কাঁপিয়ে। তারপরে আর জান হইল না বিভাগের।

জান যখন হল, তখন গভীর স্নান। বিভাগ জানে না, ইতিমধ্যে চারদিন পার হয়ে গেছে। সে শূন্যের পূর্ণ অজান ছিল না। মাকে মাকে কথা বলেছে। যেন হয় ভুল বকে উঠেছে। —‘আপনি আমাকে মারতে চান? আমাকে মারতে চান?’...

চোখ বেলে তাকাল বিভাগ। অন্ধকার। তার পাখের দিকে গরুর একটা জানালা যেন অগ্নি চোখে পড়ে। কোন কারাগার এটা? পরীরে একটা অশ্লীল অশ্রুতি। অথচ ভারী লাগছে নিজেকে। একটা হাতা কেন এগিয়ে আসছে তার দিকে। সেই বৃহত্তেই বিভাগের কথা মনে পড়ল তার। আর তার ডান দিকের কোমরের কাছে একটা শব্দ লাগল যেন। সে চীৎকার করে মনে করল। পারল না। একটা গোড়ানি বেরুল। ছায়াটা আরো এগিয়ে এল। বিভাগ চোখ বুজল। আর তার কপালে একটা হাত পড়ল। ঠাণ্ডা হাত। কে? বিদ্যুৎ? না পক্ষ? ছোটবটী দাকি? বিভাগ ডান হাত তুলতে গেল। সংগে সংগে বন্দুগার গুলিতে উঠল সে। আবার তার চেতনা লর হয়ে গেল।

প্রায় দুই মাস পরে বিভাগ কর্তৃক দাপত্যভাগে বিভাগ

ওপরে বসেছিল। পৌষ মাসের বিকাল বেলা। শেষ পৌষ। পীত বেশ। দাপত্যভাগের ভাকার বসে আছেন দামবেই। যোগেশ যোগাল বড় বেগে বেলাকে নিয়ে এসেছেন। অন্যক যোগেশবাবুর পিতনে। তার পিছনে ইশান।

ভাকারটি বৃষ্টি। নাম সুখীর যোগ। বৃষ্টি তেন ছিল বিভাগের। এখন আলোশে আরো বর্ষিততা হয়েছে যোগেশবাবু, তাঁর বৃষ্টি বেগে বেলো আর হেনা, অন্যক ইশান এরা প্রায় প্রতিদিনের ভিজিটার। যেনা আরে দুশুভে, দ্বারার দ্বার। অনেকক্ষণ ধরে বিভাগের দলকে আলোচনা করে ভাকারের সংগে। আর আলোচন করতে করতে, সুখীরের চোখে চোখ না রাখতে পেয়ে বৃষ্টি নামিয়ে নেব হেনা। বৃষ্টি একটু বং ইতিয়ে দার ভাল লাগে বিভাগের। একটা দীর্ঘশ্বাস উপরে ও বৃষ্টি থেকে।

তারকেশ্বরও আসেন মাকে মাকে। তাগাল আরে দুর্ভিক্ষে। পর আর বিদ্যুতের কথা বলে দার। ভিজি ভিজি উভারন করে বসে, জানেন কল্যাণভারবা পল্টা খালি কাঁদে। আসতে চান। বাবা ওর বিতে সম্বল বৃষ্টিয়ে দর। পর একদিন, জানেন, দ্বারার সং বৃষ্টিয়ে দাকি কল্যাণ করে। বাবা ওকে দুর্ভিক্ষে করে মারবে বসে ছুটে বন্দুক নিয়ে এসেছিল। কি বাবা গুলি করতে পারে নি। দাকখান থেকে নিয়ে দ্বারার বন্দুগার প্রায় অজান হয়ে গেছে।—দা বা কাঁদে। বসে, বৃষ্টি বিভাগের হাতে পড়ে আপ বেঁচে গেছেন। নইলে বাবা আপনাকে মেয়েই কেলত।

তা জানে বিভাগ। পিকারে গিয়ে একা গুলি তার বৃষ্টির পাঁজর ভেদ করে গেলে, পিকা লক্ষ্যভ্রষ্টার অন্ধ্রহাতে নির্দোষী প্রাণ হ যেতেন তারকেশ্বর। বিভাগ যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হ তারকেশ্বরের বন্দুক তা হত না। কিন্তু বিভাগ বেঁ দ্বার, একথা বোধহয় তারকেশ্বরও জানেন নি। তার সুখীরও তাই বলেছে। বরু না দিয়েও যে এ দুর্ভিক্ষ বাচান গেছে, এটা প্রায় তার নিজের কাছেই অবিশ্বাস পরীরে বরুনার করার প্রাণ মাগে যেন বিভাগ তা বলে এ সব কেল। দাকত, বিভাগ সেইরকমই বেঁচে উঠে

এ হাস্যাত্মক এক বেবায় কোনো ব্যবস্থা নেই।

তবে, বিভাস পদ্ম হারান বটে, তার ডান পা'টি একটু ছোট হয়ে গেছে। সেটাও ডাকাতের পরিভ্রমে। অন্যথায় কেটে বাস বেওয়া হাড়া কোনো উপায় ছিল না। বিভাস দেখেছে, পায়ের গোড়ালির কাছ থেকে গভীর ব্যথের হাস একটা মোটা শাপের মতো পাক দিয়ে উঠেছে প্রায় সূর্য্যকি পর্ব্বত। হাতের কতটা ততোধিক ব্যথারক নয়। কিছু চামড়া এবং মাংস তার বাঁ দিকের পাখা থেকে নিতে হয়েছে কত সেদাই করার সময়ে। অন্যক নাকি দিতে চেষ্টাছিল। সূর্য্যকি বের নি। এবং সেটা ভালই করেছে।

কিন্তু বিভাসকে চিন্তাইনি কোনো কিছুতে ভর দিয়ে চলতে হবে। সূর্য্যকি বলেছে, ডান দিকের হলো একটা ক্রান্ত তৈরী করিয়ে দেবে। বিভাস জানে, পুনরুত্থে 'একটুখানি' অংশে তার ডান পা অনেকখানি ছোট হয়ে গেছে। এখন সে গাঁড়াবে, তখন ডান পা কুলবে। যেদিন সে প্রবর ভানতে পেরেছিল সেদিন সে চোখের ধল রোধ করতে পারে নি। আর প্রমীলা স্টো যেনে কলোছিল। প্রমীলা একবারে নাগ' এই হাস্যাত্মকের। সে আসে সমস্ত পুণ্যকালের গিঁটকী ক্যাপ থেকে। কানো কুনো ঠাণ্ডা মেয়েটি। ওর ভিত্তির অতিরিক্ত নয়, সার্বাচারি ভ্রমণেও বিভাসের সেবা করেছে। তার জন্যে হাস্যাত্মক একে কোনো পরমা দিতে পারে নি। যোবাস বনার দিতে চেষ্টাছিলেন, বের নি। বলেছে, ওনার সেইসা আমি পরমা কিছু না। আমি জানি ওনার হাইলো কলোনার চেষ্টা হইছিল।

প্রমীলা তার হেঁটে খাদ্য খেলায় বাচন ভাঁপ বলাতে পারে নি। কথাসূরি পুনরুত্থে ভালই লাগে। কিন্তু, বিভাসকে যে বেরে কলো চেষ্টা হয়েছিল, ওটা তার দিকের আবিষ্কার। বিভাসের প্রলাপ থেকে নাকি সে ওটা আবিষ্কার করেছে। সূর্য্যকি ওকে বরকে দিয়েছে, কলো সে তার ওপর আবিষ্কার বাইরে সেয়ে বেড়াতে না পারে। কাল এ হাস্যাত্মকের সরকারি কর্মচার কলতে 'কলোই বৃদ্ধা', বিধান সন্তার লক্ষ্য। তারকেশ্বর হাফের সর্বক! পুণ্য সর্বক নয়, প্রাণের অভ্যন্তরে তার সর্বকৈতিক প্রতিকৃতি ও কলতার, একক, প্রচারক, কর্মী

হলেন তারকেশ্বর। অন্যদি বৃদ্ধা'ও একদিন যেনেতে এসেছিলেন বিভাসকে।

প্রমীলা বলেছিল বিভাসকে, কামেন ক্যাপ। আপনে পুণ্য, আপনার ভয় কি? আপানরে পুন করতে তো পারে নাই।

প্রমীলা তার বাথার হাত দিয়েছিল। লক্ষ্য করেছিল বিভাসের। বড় পাকা পাকা বনে হয়েছিল প্রমীলাকে। কিন্তু, বেরটি ওই বকেরে। বিভাসকে তো ওর একটু চোপা কম করে। সকলেই ওর কাছে পাকা পাকা কথার বহুনি শোনে, কিন্তু, সকলেই ওর বশবদ। কারণ, ওর দেবা অকৃত্রিম, নিরলস। বেন ও বাড়ির মেয়ে।

কিন্তু, তাপস সকলের কথা বলে। বিদ্যুতের কথা তার আটকে যায়। তখন বিভাসকেই জিজ্ঞেস করতে হয়, আপনার স্ত্রী কী বললেন?

তাপস বেন লক্ষ্য করছে ওঠে। বেন স্ত্রীর পুণ্ড্রমাঝেই, বানিকল আন্তরোদা হয়ে, সললভাবে বেনে বের। তারপরে জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, 'ও তো আন্তরাল কথাই বলে না। আগে আমাকে বুর বকত। আমি তো গাঁত দিতে নথ কাটি। পায়ের নথও কাটি। আর তেল মাখি না। আর রাসুর সঙ্গে হাতে মথ্যে তাকি বেরে কলি, পরমা চুরি করে ওকে মিই। তাই বুর রাস করত। রাসের বাড়ি চলে যাবে বলত। আমার নথ কেটে দিত। পরমা চুরি করতে ব্যর্থ করত।—কিন্তু, এখন বানি চুর করে থাকে। আপনার কথা জিজ্ঞেস করে। আমি বেরে বলতে আরম্ভ করি, অবনি বরকে ওঠে। বলে, থাক, কেন আমেনে পুণ্য সে কথা জিজ্ঞেস করেছি। কে তাঁকে দেখতে আসছে আর ডাকার কী বলছে, উনি কি থাকেন ওর সাতকাণ্ড রামায়ণ পুনরুত্থে চাইনি তোমার কাছে।'

বলতে বলতে তাপসের বৃদ্ধা বন্য হয়ে ওঠে। বলে, 'কই আমাকাল কেন হয়ে গেছে। আমারও রাস হয়ে ব্যর এক একদিন। আমি খাই না, চান করি না। তখন আমার এসে বুর আদর করে।

তাপস হা করে হাসতে থাকে। বিভাস অবাক হয়ে শোনে তাপসের বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে। বিদ্যুৎ এই শোকটির নথ কেটে দেয়, আদর করে। বিদ্যুতের আদর

সে কি বন্ধু! কিন্তু, তাশপকে হিংসা করবে, ভাবতেও লক্ষ্য হতে পারে।

বিভাস যেন দেখতে পার, পদ ছুঁতে পারে। কান্না দিয়ে।
হাতে হাতে বাগানের ঘরটার ছুঁতে ছুঁতে থাকে। আর
বিদ্যুৎ কি! নির্বাক। এর মধ্যে বিভাসের লক্ষ্য
কতখানি আছে, সে জানে না। কিন্তু, কতজ্ঞতার
ও বাধার ভার হয়ে ওঠে তার বুক। যেন যেন বলে,
'জানি বলতে পারব না, এ জীবনে কিছুই পাই নি। না
চলে যা পেতেছি, তা অনেক। তার তুলনা নেই।
জীবনের যোগ্যতা আমার নেই জেনেও, কেউ আমাকে
কণী দ্বারা করনি।'

তারকেশ্বর আসেন। প্রায় স্নেহ করেই কথা বলেন।
বলেন, 'বাঁকি ফিরেও তোমাকে অনেকদিন পূরে
থাকতে হবে।'

বলতে চান, সম্পূর্ণ আরোগ্যের পর বিভাস আবার
ওঁর ওখান্নেই ফিরে যাবে। বিভাস চুপ করে চেয়ে
থাকে। তারকেশ্বরের চোখের দিকেই সোচ্চারিত থাকে।
কথা তার ঠোঁটের স্রোতে এসে পড়ে। ছোঁ
করে ধামিয়ে রাখে। কিন্তু, তারকেশ্বরের চোখের পতীরে
থিক থিক আঙ্গুন মলে। বোঝে হয়, এ সেই প্রথমেই
আক্রমণ করতেই অভ্যস্ত ফেউটে গার্ডিন।

একদিনই তারকেশ্বর জিজ্ঞেস করে কেসেছিলেন,
'জাকিরে আর যে?'

বিভাস বলেছিল, 'আপনাকে দেখছি।'

তারকেশ্বর একটু থমকে গেছেন। যেসে বলেছিলেন
কেস, তার পাছ?

বিভাস বলেছিল, আগে পেভাস, এখন আর পাই না।

যেন কথা দেহল, তারপর থেকে আর তারকেশ্বর
আসেন না। কিন্তু, এলোছিলেন। কেন না, কেমন
করে যেন গটো তারকেশ্বর তার কম্পাউটারকে গিডালের
মুখে ইচ্ছে করেই কেসে নিয়েছিলেন। কথাটা কীভাবে
হাস্ট হয়েছিল, বিভাস জানে না। কথাটাকে দ্বিগুণ
প্রাণপিত করতে চেয়েছিলেন তারকেশ্বর।

যতো দূর হয়ে উঠে, বিভাসেরও ততো
দূরে উপস্থিত হে। গিডা কি তারকেশ্বর তাকে
জানতে পারছিলেন? সেই দূরের কথা যেন বলে

আর কোনো দূরত্ব টিকতে চায় না। এ বিষ
যোগেশ যোগেশের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা আসে
হয়। যোগেশ তো নিঃসংশয় যে তারকেশ্বর ও
চেয়েছিলেন।

আজ যোগেশ যোগেশ ডাক্তার সুদীরকে জি
করেন, কই হে ডাক্তার, সুদীরকে হিন্দু করে কর
কিছু বলল না তো।

সুদীর বলল, আপনাদের পকারেতের নির্বাচনের
চেয়ে, শুরুর তাকাতারি হলেও হাস্যকর।

—সর্বনাশ। তাহলে তো নির্বাচনে নানাই।
না। আসল লোকই যে পড়ে।

বিভাস অবশিষ্ট বোধ করে। সুদীর বলল, কি।
বলুন, আসল লোককে হেরে তো আর আপনারা
চলতে পারবেন না। তাও আপনারা ওঁকে গ্রায়ে এ
নিয়ে যাবেন শুরুর দাবীতে।

জনক বলে উঠল, সে আছে আপনাকে বলতে হবে
ডাক্তারবাবু। গাড়ির মধ্যে গাড়ি করে নিয়ে যাব। সু
হেসে বলল, তা ঠিক। তবে গরুর গাড়ি তো। আপনা
পব বাটেরও বা অবস্থা।

বিভাস বলল, কিন্তু, যোগেশ বসাই, আরা
একবারে লোকল নেই, আরা কি পারব?

যোগেশ বললেন, কে বললে তোমাকে লোকল নে
স্বয়ং ভবানী চৌধুরী কাকে লেনে গেছে।

দুগ্ধাশীর সংখ্যাও কম নয়। আর তুমি তো জান, ও যে
স্বাভাবিক করার পাত্র নয়। তারকেশ্বরের কণ
শ্বাসের তক্তা ভাঙতে হবে। কোনো দৃশ্যকিত প
এ দূর দূর করা আর সম্ভব নয়।

ঈশান বলে উঠল, আর আকরাই বা আছি কি কর
কামারবাবু। এখন গায়ে সেসেই বস্ত্রতে পারবে, হা
একটু ভিন্ চালে বইছে।

নির্বাচনের প্রতিযোগিতার বিভাসের পূর্ণ দর্শ
নাছে। সেই দর্শনেই আছে প্রচুর দূরত্ব। অ
দৃশ্যকিত তারকেশ্বর হারনের দূর প্রায় পূর্ণতায়। ও
এখন এ অকালের অবিস্মৃতির যেন সংজ্ঞা দিয়ে দর্শ
দেখেন। পরাক্রমের দ্বারা দূর করা অসম্ভব হয়ে উ

বিভাগের পক্ষে । তবুও, এখনও তাই মনে হচ্ছে । অবশ্য, যোগেশ ঘোষালেরা এখার নির্বাচনে দাবতেনই সে কথা আগেই আলোচনা হয়ে গেছে । বিভাগ স্বত্বও জানিয়েছিল । কিন্তু সে নিজে ভোটবন্ধে দাবত, এতটা ভাবে নি । এখন যেনো থাকে, অল্প প্রধান পদের নির্বাচনের জন্যেই তাকে মনোনীত করেছেন ঘোষালেরা । দলপতি সেই জন্যেই আরো বেশী । তাকে কেন লোকে ভোট দেবে । ভোট চাইবার যোগ্যতাই বা তার কতটুকু ।

কিন্তু এ বিষয়ে তাকে যোগেশবাবুদের ওপর ছেড়ে দিতে হয়েছে ।

যোগেশ ঘোষাল বললেন, বেশ, হানুনের মতো খুব অল্প । অবশ্যই হানুনের লোকে চাক বা চাক, ভোট দেবার সময় মনে করে, ওদেরই দিতে হবে । এবার এক প্রার্থী লোকদের 'স্বার্থ' তারা সব সময় দেখে । আর সেই সব লোকেরাই এবার অন্য লোকদের চালায় । এই সব আমি । অভিনায় আমার মতো লোকদের হাতে রাখা সব সময় দরকার ছিল । আমার কাছেই সবাই আসত, জিজ্ঞাসাবাদ করত । আমার যা বল, তাই তারা মানবে । অপীকার কর না, অনেক অন্যায় চোখের ওপর দেখেও চুপ করে থাকে । পাটা বাঁধা করবার কথা ভাবতে পারিনি । কিন্তু নেতার হালের ব্যাপারটা আর দৃঢ় করতে পারলাম না, এ কি রকম কথা । সরকারি বিষয়টাকেও যদি ওরা নিজেদের জব্দকারী চিন্তা করে, তা হলেই ও হুঁকিল । আমার মনে অবশ্য একটা কুসংস্কার ছিল যে, যে সব সরকারি অর্থ ওরা আত্মসাৎ করে এতে কোনো অপরাধ হয় না । নইলে, সব সরকারি কর্মচারীরাই বা নিজেরা আত্মসাৎ করবে কেন, ওদেরই বা সাহায্য করবে কেন । কিন্তু ভেবে দেখলাম, টাকারটা তো দেশেরই, কৃষকেরই । আর এ লোকগুলো সব উই ।' চোর, চরিত্রহীন লোভী । আমি আর চুপ করে থাকতে পারিনি ।

১. যোগেশ ঘোষাল খুব বললে যেহাই নেই । কথামূলক উনি সল্ল বিদ্যানে বলেন । এখন আশঙ্কিত করেন, তখন সহজে খাবতেন না । এ সব কথা বহু ক্ষণ ধরে ওঁর ভিতরে হুঁকিলে । কলতে পারেন নি কিন্তু, বলতে

এখন আশঙ্কিত করলেন, তখন উনি বলল আর পাশ্চাৎ ব্যবস্থা করা, দুটি দাবনে চালিয়ে যাচ্ছেন ।

বেলা অর্ধাতি বেগ করছে । বাককে না যামালে উনি কতক্ষণ চালিয়ে যাবেন, বল পাশ না । বিভাগ জানে, ভাবনী কখন আসবে, বেলা তাই বোধহয় ভাবছিল । হানুনের যে কী বিশ্বাস, ভ্রম, বলবার নয় । সে জানে, ভাবনীর নামে বেলা অন্যরকম হয়ে যায় । যেমন হেনা দু'বারকে দেখলে হয়ে যায় ।

বেলা আর হেনা, দুই মেরে হাফা ঘোষালমণ্ডার আর স্থান নেই । বেহোই তাঁর ছেলে । তাঁর দলী এবং অধিকাংশ সময় আলোচনার অংশদায় ।

বেলা বলল, এ সব আলোচনা আর কেন তুলছ এখন ? তুমি যে আজ বিভাগবাবুকে অন্য কী একটা কথা বলবে বলেছিলে ?

যোগেশবাবু বললেন, হ্যাঁ, সে কথাই তো বলতে যাচ্ছি ।

বেলা দু'বারের হুঁকিলে বিকে তাকিয়ে গেলেন কেল । দু'বারও হুঁকিল । বেলা বলল, তবে এত কথা বলছ কেন ? ঐ কথা তো তুমি সবাইকেই বলেছ ।

ঘোষাল বললেন, হারে যাবে বলতে হবে না । শক্তি কথা অনেক সময় রাজনীতি হয়ে যায় তো । তখন তোমাদের এই বিভাগবাবু আর ভাবনীরা বলবেন, ওতে মশাই আমার নেই । কেন না ওরা যে প্রতিজ্ঞা করেছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই, কিন্তু রাজনীতি করব না । কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইতে সেলোও কালের একটা ব্যাধি আছে । কৌশলও চাই । এমন কৌশল যাতে ঐ লোভী চোরগুণেরা চালাকি না বাটে । আমি কী বলছি, তুমি বুকে বিভাগ ?

বিভাগ ভাড়াভাড়ি হাড নাড়ল, সে বুকে । আসলে সে বুকে, সে যে সামান্য হানু হত্যা গোঁধিয়েছে, তাতে ঘোষাল মশাই হুঁকিল হয়েছেন । কিন্তু বিভাগ হাড নাড়বার আগেই উনি বললেন, আমি বলছি, আসের সেই সব সাহায্যের ঠার কাউকেই তুমি মনে পাবে না । কাল অধিকানই বেশী আমার মালিক । বেলাই হানু কারবার তারের দলকেই আছে, সুতরাং তারপেঙ্গদের পক্ষে না যেক ভালে ওঁর নেই । কিন্তু তামে 'স্বার্থ' যে

প্রানের সোকেসের শব্দ নব, সেই কণাটা আমারের দলতে হবে। তাই বলছি, সোকেস আমারের যথেষ্ট। কারণ প্রানের সোকেসে দবাই চোরের শাবী পড়িকটা নব। অন্যায়কে তারাও অন্যায় বলেই জানে। তাদেরও একটু শয়ল যোগােনে দরকার। আর সেটাই করব আমরা কয়েকজন। বুকেছ।

বুকেছে। বিভাস একবাঙ্গালি নিজেই অনেকবার আপোচনা করেছে। যোগেশ ঘোষাল বললেন, আমি তোমার নামে একটা চ্যাপটিল হ্রাপতে দেব।

আমার নামে ?

—হ্যাঁ, তোমার নামে। চ্যাপটিলে আমরা প্রথম হ্রাপন, নতুন নির্বাকদের পর কী কী আমরা ঘটতে দেব না। প্রথম ক্রম টাকা দিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে বেশী টাকার হুঁচলেকা হবে না। দরকারি ধর্য্যভিত্তি, বীজ, সার, এ সবের তহরুপ আমরা হতে দেব না। যা পাওয়া যাবে তার মোট দ্বিগুন দলল গ্রাম-মুখ্যদের দামনে রাখা হবে। দরকার হলে গ্রাম-পঞ্চায়েতগুলিও উপস্থিত থাকতে পারে। আগের মতো একজন কর্তা সাক্ষি সর্বস্বই হবে না। দললে মিলে নিজে বন্টন করতে হবে। এই লিখিত নিয়ম আমরা মেনে চলব। দরকারি কর্মচারীদের অতিথি হিসাবে বিবেচনা করব। তিনি সাহায্য করতে দায়্য থাকবেন, কিন্তু তিনি কোনরকম অন্যায় সাহায্য কিংবা দুর্ব্বা কিংবা পদমা চাইলে দেব না। গিলিকে কাটানো পাট পকাবার পুরুষকে আমরা একজনের অবর দ্বন্দ্বলে রাখতে দেব না। মৃতব্যক্তির নামে ক্রমের টাকা লুটতে দেব না। আমরা, দর থেকে আঁচনার হাট পর্যন্ত মোটরবাসের রাস্তা কোনধিন হবে না, এ কথা বিশ্বাস করি না এবং রাস্তা ভৈরবীর বাধা আমরা মানব না। বেগের ঝাল না কাটানোর বিশ্বাস গ্রাম্পা আমরা বিশ্বাস করি না। ইত্যাদি ইত্যাদি। ইতি—আপনারের আঁচনার কম্পাউটারবাবু।

বিভাস অবাক হয়ে বলল, আঁচনার কম্পাউটারবাবু ?

যোগেশ ঘোষাল বললেন, হ্যাঁ, তাই হিতে হবে।

দললে চুপচাপ। কিন্তু ঈশানের গৌকবাড়ি কাঁকে কাঁকে খেলছে সঙ্গুৎল হাসি। অনেক দাখা দতছে। একজনকই প্রথম বলল, হ্যাঁ, বাবু তো ঠিকই বলেছেন।

আমরা তো কম্পাউটারবাবু বলেই জানি।

কে জানে ?

ঠিক এ সময়েই প্রমীলা এল। সকলের দিকে এখ তাকাল। তার চাউনির রকম দলল দেখে, দুর্ব্বীর আ ভিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে প্রমীলা ?

প্রমীলাকে বলল বেলাকে, দেখছেন ফেলাদি, কা একবার দেখেন। এই সব কইরা ভাঙ্কারবাবুর চাকী খাইব দেইখেন, এই কইরা গিলাব।

দুর্ব্বীর দ্বন্দ্ব উঠল, আঃ প্রমীলা, এ সব তোমাকে বলতে বলেছে। যাও, নিজের কাজে যাও।

প্রমীলা বেতে উদ্ভাত হয়েও আবার বলল, আপ মনে করছেন, অন্যায় হুঁচলেকা এই সব দর খাইব পাইলে তো সে কইবই, ক্যান, হাদশাতালের মধ্যে : এই সব আপোচনা হয়।

দুর্ব্বীর বলে উঠল, তুমি যাবে কিনা জানতে চাই।

প্রমীলা হুঁ হুঁ করে চলে গেল দেখান থেকে। কবাসুদি এত দুঃখিত, মনসা কেউ প্রতিবাদ উঠতে পারল না। আর প্রমীলাকে সকলের জানা। তার মনোভাব এবং চরিত্র এখন প্রাণ সকলের দন্দপ ধানের দামনে চোপা করে গেল, সকলের দললেই প্রীতির দল্পকে। যোগেশ ঘোষালকে সে বেশো বলে ডাকে। সে দিক থেকে ওকে ভুল বোঝার নেই। বরং ও বা বুকেছে, ঠিকই বুকেছে।

ঘোষালমশাই সবার আগে ঘাড় নেড়ে বলে উঠ ঠিক, ঠিক। প্রমীলা না ঠিক কথা বলেছে। আ স্থান কাল পায় ভুলে গেছি। এই জন্যই বলছি তা তোমার যোগ্যকে একটু ভাঙ্কাভাঙ্কি গিলিজ কর।

কিন্তু দুর্ব্বীরের মূখে তখনো বিরক্তি আর কো হ্রাপ। বলল, হয় তো গতি। কিন্তু কথা বলার দরং। এটা আমি কিছুতেই শোষণাতে পারছি নে।

বেলা বলল, নিখো হ্রাপ করছেন। আমরা যে অতিভদ্রা, তাতে ও ভাবেই একটু, বলার দরকার। প্রাণ যোকেই তো এ সব হয়। আর ওতো একদিন বা ঘোষালমশাই ছেলে মানুষের মতো একবার তুলে এখিক ওখিক দেখে, গাঙ্গা পলার বললেন,

কপাটী এখন ভুলেছি, চুপ চুপ বলে যাই, গাভবিলটা আর দেখা কর না। ও পক্ষ তোড়কোড়ি শব্দ করেছে, বুকে ?

প্রমীলা অথবা এ ওয়ার্ডের মধ্যেই অব্যাহা চুপীতে পরিচর্যা ছিল। কিন্তু সে আর এদিকে কান দিল না। বাকী সকলেই যোগালের জগৎতে হেসে উঠল।

বিভাস বলল, যা ভাল হল করবেন। একবার ভবানীবাবু সঙ্গে আলোচনা করে নেবেন।

জনক বলে উঠল, আমি একটা কথা বলছিলাম। বলছিলাম, কেশবদাসবাবুর গলিল টলিল সব ভাকারবাবু বাড়িতে রয়েছে। সেগুলো আবার পর এল করলে হত। নইলে আবার—

যোগাল বললেন, আরে গলিল নিয়ে কি বুঝে বাবে তারকেশ্বর? ওটা কিরিয়ে না দেহ, বকল নিয়ে আসব মোকিষ্ট অকিস থেকে। বিভাসের নামে বাড়ি ভবি তো আর সে দখল করতে পারবে না।

বিভাস বলল, জনকে ভব কোথায়। জনকে তড়াবার জন্যেই তারকেশ্বর গাত্যগতি বিকাশের নামে সব কিনিরে নিয়েছিলেন। জনক তার দিকেই তাকিয়ে ছিল। বিভাস বলল, সে ভব হুঁম করো না জনক। যোগালমশাই যা করবেন, তাই ঠিক।

একে একে সবাই বিদায় নিল। বিভাস সেল ইশান তাকিয়ে আছে। বিভাস বলল, আবার এস ইশেনদা।

ইশান এইটুকু জবোই অর্পণা করিল। বলল, নিশ্চয়। তুমি ভাতাভাড়া ভাল হয়ে ওঠ দিকিদি। সকলের সঙ্গে ভাকারও বাইরে সেল। আর প্রমীলা একেবারে কাঁপিয়ে এল। বলল, আইন্ডা কন তো বিভাসদা, আমি কিছু ভুল বা বন্ধ কইরি?

বিভাস বলল, মোটেই না।

—তবে ভাকারবাবু বামারে ধবকাইলেন ক্যান!

কলতে কলতেই আবার সুধীরের পায়ে পক্ষ চান্দা সেল ব্যাখ্যায়। প্রমীলা হিটকে গলে সেল। সুধীর বদ গম্ভীর হয়ে ঢকল। বিভাসের দিকে তাকিয়ে লুকিয়ে একটু হাসল। তারপরে সুধীরের সাক্ষাৎকারি পরীক্ষার হত হল সে। এরপরে সুধীর

বেরিয়ে যাবে। এখানে ওখানে বুঝে, যোগালমশাইয়ের বাড়িতেই যাবে? কার্য ওই পাথের পথের জন্যে হেনা কান পেতে আছে।

বিভাস আছে আছে পথে পড়ল।

বিভাস হুঁকি সেল। বাথ বাস সেল। জাট বসলে বাইরে এল বিভাস। আশাতত যোগেশ যোগালের বাড়িতেই আসের নিল সে। কথা আছে, নির্বাচনের পরে, গ্রামে গিরে জনকের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকবে।

হুঁকির পরেই কাছ আরম্ভ হল। প্রবর যেদিন অভিনয় হাতে সে গাঁড়াল, সেদিন গতি বিশ্বকর্ষ ব্যাপার ঘটল। হাট বন্ধ হবার উপক্রম। হাজার গম্ভীর মানুহ তাকে গিরে গাঁড়াল। বিভাস যে এমন একটি হুঁকি হয়ে উঠেছে, সে জানত না। গ্রামে হুঁকিতে হুঁকিতে, ভিত্তি তৈরি একবার কাছ এসে গাঁড়াল। বিভাস অজ্ঞেয় করল, কেন আসেন।

গ্রাম-কোনো জবাব দিতে পারল না। সেয়েই আবার পালিয়ে সেল। বিভাসকে পাশে রেখে ভবানী বক্তৃতা দিল।^{১০} জীবনে এই প্রথম জগদীশ চক্রেতী^{১১} মন্তব্য বাইরে এসেছেন এবং নির্বাচনের কাজে লেগেছেন।

কাল্পনিক বাস্তব মারামারি নির্বাচন সেল হল। জব হল বিভাসেরই। অকল প্রধান হল কপাটভাবাবু, বিভাসজন পাম্রী। সব থেকে আকর্ষণ ভেরোটি গ্রামের হযো, একজন গ্রাম হুঁকি পর্বত হতে পারে নি তারকেশ্বর গ্রামের সোকেরা। কিন্তু আসল সবটো অন্যরই হুঁকি। প্রতি পরে পরে বাবা, অপবান কাঠিরে তাকে অগ্রসর হতে হবে। পুণ্ড এবং প্রকাশ্য বক্তৃৎকের এবং আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। তাই প্রথমেই বিভাস নিজের জগদগোবিন্দে জন্যে উঠে পড়ে লাগল। যে সাধারণ জীব আছে, তাতে জনক তার বই আর যা, এই ভিত্তি প্রাপ্তিই চলে না। পরের হুঁকি জনকে ঘটতেই হয়। এবং বিভাসের সৌভাগ্য নির্বাচনের এক সন্ধ্যার মধ্যেই, ভবানীর চেষ্টায়, একটি প্রাথমিক মূল্যে তার মারামারি হুঁকি সেল।

যোগেশ যোগালের বাড়িটি হোটি পথের একবার

প্রজাপথের ওপরেই। একতলা বড় বাড়ি। পিছন দিকে বড় একটি বাগান আছে। বিভাগ বাগানের দিকে একটি ছোট বর নিয়েই বেছে নিয়েছিল। তুল থেকে এসে সন্ধ্যার বিভাগ তার ঘরেই বসেছিল। সন্ধ্যা হয়ে এল। একটু পরেই ভাবনা আসবে। দু'বীর ভাবার আসবে। সকলে ঘিলে এগরে বাবিকলস আজ্ঞা দেবে। তারপরে বিভাগ ঘাবে অকল প্রবাবের অকিলে, পহরে শেব প্রান্তে পহাইপূর এবে বাবার ভাবার যোকে।

এমন গরমে সে পুনঃ। যোগেশ যোগাল বললেন, কী হয়েছে কী? আমাকে বল।

এবারে জনকের গলা শোনা গেল, বাবু লক্ষ্যবান, হয়ে গেছে গো বাবু।

যোগাল বললেন, বল না আসে। তোমার ঘরে আসুন লাগিয়ে দিয়েছে।

বিভাগ সেবারে কাহ থেকে ক্রাটটা তুলে নিল। কিছু আর উঠতে হল না। শুনল, জনক বলছে, তা হলেও দু'কিন ভাল ছিল বাবু। তারকেশ্বর ভাবারের বেঘের আত বে'র দিন ছিল। বেঘে গলায় বড়ি দিয়ে রয়েছে। আমি নিজের চোখে—।

—চুপ, চুপ কর জনক, বিভাগবাবু পুনতে পাবেন। —বেদা প্রান্ত আত'গলায় চাঁকর করে উঠল।

সন্ধ্যা চুপ হয়ে গেল সেখানে। বিভাগের উত্থান-পতন ঘটিত হয়ে গেল। মনে পড়ল, শেব চেন্টা হিসেবে তারকেশ্বর ছোর করে পহর বিঘে বেঘার চেন্টা করছিলেন। আত তা হলে সেই উনজিগে কান্দুন। এ বছরের বিবাদের শেখদিন। এবং তারকেশ্বর সেই প্রতিজ্ঞাই করেছিলেন। তারকেশ্বরের দল চাকরই আত উল্টো দৃষ্টিতে আরম্ভ করেছে। কিছু এ কি ভাবাব দৃষ্টি তার।

সন্ধ্যা যেন কী হয়ে পড়ে গেল বিভাগের। সে ভাবাতাড়ি ছুরার ঘরে টাল ছিল। হঠাৎ, আছে একটি চিঠি। নিব'চনের সোদরীলের দিনদুপিতে একদিন ইশান দিয়েছিল। পহর চিঠি। তখন ভাবাতাড়ি পড়েছিল। পূর্ব এইটুকু মনে ছিল। 'আমাকে ছুঁবি যেখিন ভাববে, সেইদিনই দল থেকে চলে আসব। কিছু ঘেঁষা করো না। বাবার কোন কান্ডজান নেই।'।

আত তাহার পূর্বে পড়ে গেল। সন্ধ্যাপ্রান্তে বিহী-চিঠি। হাতের লেখার প্রামাণ্য, কিছু পরিষ্কার ভাব। 'আর আমি এ ভাবে থাকতে পারি না। বাবাকে ছুঁবি জান। হোম বটক আসছে বাড়িতে। কিছু, আমি কাউকে বিঘে করার কথা ভাবতে পারছি না। আত ছুঁবি যদি না চাও, তা হলে কী হবে আমি আমি না। আমি ভালবাসতে জানি কি না জানি না কেবল তোমাকে ভালতে পারি না। তোমার প চোখে বসে আমি। আমাকে ছুঁবি সেরিন...'।

হঠাৎ, বিভাগ ভেবেছিল, সে পহরকে ভাববে। কে তা জানত না। সে জানত, কিছুই চিঠিদিন পূর্বে থাকবে। আর পহর সপ্তে তার প্রত্যাহের গলায় আতবাকি হবে। -সংসার পাতবে বিভাগ ভেবেছিল। পান খেয়ে আলতা পরে, বিভাগকে বলকে, হেলে হান্দু ক গৃহিণী হয়ে পহর। কিছু বিভাগ বিন্দ্যসত্যকং করবে না। কারণ বিদ্যুৎ আর বিভাগ, এ দু' হান্দুদের সম্পর্ক গৃহিণীর নিঘরে বাঁধা নথ। সংসার সেটা অসম্ভব। হান্দুদের প্রত্যাহের বিন্দরকর অথবা কোনো একসোকেই তার অবস্থান।

কিছু ভাবার আগেই পহর বিঘের ব্যাবস্থা পা হয়ে নিল। এয়ার?

-যোগেশ যোগাল ঘরে চুকলেন। বললেন, করছ বিভাগ?

বিভাগ বলল, বসে আছি। জনককে এক ডেকে দিন তো।

যোগেশ যোগাল এবার হয়ে পিছন কিরলেন পিছনেই জনক ছিল। সে বলল, কী বলতে দাখাবাবু?

বিভাগ বলল, পহর কোন ঘরে গলায় বড়ি দিয়ে জনক?

জনকের পেছনে বেদা হেনাও এসেছিল। সকলে তন্তিত্ত বিঘরে চুপ করে রইল। জনক বলল, আ দাখাবাবু বাগানের ঘরে। আপনি যে ঘরে—।

জনক কুঁপারে উঠল। বিভাগ টেবিলের ও আলোটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। বাগানের ঘরে রয়েছে। নিব্দ্য বড় করে পীতে দ

চোপে হইল বিভাগ । সেলা ফেনা হুটে পালিয়ে গেল ।
যোশেন খোকার বিবর্ত হয়ে পড়িতে বইলেন ।

বিভাগ বলল, বাতিটা নিভিতে আমি একটু পোর ।

জীবটা সম্পূর্ণ ভিন্ন বাতে বইতে লাগল বিভাগের ।
এক বছরের মধ্যে সে সম্পূর্ণ গ্রাসনীতিতে অংশ গ্রহণ
করে ফেলল । এবং সাধারণ নিরীচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল
অবারিৎস্বাধির সংসে । যখন সে সত্যি জরলাভ করল,
তখন মনে হল, এই সবই অকলে যেন ভাষকের বোমা
পড়ার পরের অবস্থা । মনে হল বহুবিনের একটা বিশাল
পুংনে অন্ধকারের প্রাসার ভেঙে পড়ল ।

বিভাগ আঁচনার জনকের বাড়িতে রয়েছে । বিধান
পড়ার অধিবেশন উপলক্ষে কলকাতার বাতাকালীন একদিন
শিক্ষাকালে তারের সেপের বাড়িতে গিয়েছিল । কিন্তু
বাতিটাই নেই । সেখানে একটা অন্যায়ের বহু বড়
বাতি রয়েছে । বাড়ির মালিক একজন পূর্ববংশীয়
জরলাভ । প্রতিবেশীরা কেউই বিভাগকে চিনতে পারল
না । তার দাদাদের দরও বলতে পারল না । একজন
কেল হোজার কথা বলল, কলকাতার এক ইলেকট্রিক
প্লেনের কারখানায় সে কাজ করে । আর হোজার ববই
সে চাইছিল । কারণ হোটেলটিকে সেবার বড় ইচ্ছে ।

বুকে বঁচে কলকাতার এক বাড়িতে তারের বের
হয়েছিল । পুপুরে হোজা ছিল না । হোটেলটিও
গকে চিনতে পারে নি । হোটেলটির ইতিমধ্যে সন্ধান
তে আরম্ভ করে, ভিনেতে এসে পৌঁছেছে । কল
সঙ্গে লোকটাকে যেনে হোটেলটির দর থেকেই বেহুতে
গইছিল না । বিভাগ বলেছিল, হোটেলটি, আমি বিভাগ ।

অনেক গংগা পার হয়ে হোটেলটির দর কাছে এল,
বিভাগ সেকল, হোটেলটির দ্বারা পূর্ণ ব্যাপ। থায়া
নই, সাধা পর্বত নেই । সেই দাঁড়, বৃদ্ধি কিছুই নেই ।
দার বিভাগের সঙ্গে কথা বলেছিল যেন, কোন মৃত
দায়ার সংসে কথা বলছে ।

পড়ার একটু পরে মনে হল, একটা সোফার পাতি
এসে জনকের বাড়ির কাছে গড়িল । বিভাগ বই পড়ছিল ।
লেখল, জনকের বউয়ের সংসে একজন বোমটা ঢাকা বউ
হয়ে এল । বিভাগ ভাবল, কেউ কোনো বক্তব্য দিয়ে
এসেছে । এককম অমেরক এসে থাকে ।

বউটি খোমটা খুলল । বিভাগ সেকল, মিস্টার ।

—আপনি ।

মিস্টার বিবা কথাকেই মনে পড়ে বলল, হ্যাঁ ।

সোনামুখ থেকে আছি ।

—সোনামুখ ? সে তো জেলার মালিক ।

—হ্যাঁ, আমার বাপের বাড়ি । আমি মাসব্যবেক
হল বাপের বাড়িতেই আছি । এখানে এসেছি কেউ
জানেন না । বাসি থাকে বলে গাড়িবন্দে চলে এসেছি ।
আবার এখনি চলে যাব ।

—সোনামুখ ?

—হ্যাঁ ।

বাদিকল্প চূড়ান্ত । চোখে চোখে হুজনে ডাকিয়ে
হইল একটু । মিস্টার বলল, দু'বোশ সেলে থাকে থাকে
আসব, আপনি নেই তো ?

বিভাগ কথা বলতে পারল না । খাড়া নেড়ে
জাবল না ।

মিস্টার আমার বলল, আর একটা কথা । বাবা, বাবে
আমার সম্প্রদায় আপনাকে সত্যি ভালবাসেন । ঠিক
সেলায়, যখন সেলায়, একদিন কেঁচ ফেলে কলেন,
আমার কবের আসো হয়ে সে এসেছিল । আমি তাকে
চিনতে পারি নি ।

বিভাগের চোখ কেটে জল এসে পড়ল । কিন্তেভেও ।

মিস্টার তারকমরকে 'বাবা' বলল আক ।

ঠাণ্ডা কিন্তু উঠে বলল, এবার যাব ।

বিভাগ বলল, আসিবেন কিন্তু ।

বিভাগ প্রায়শঃকর বিভাগকে ।

স হা ও

* এই উপন্যাসের মধ্যবর্তী একাংশ একটা 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল । পরিমাণিত ও
পুনর্নির্মিত আদিত্য সম্পূর্ণ উপন্যাসটি এই প্রকর প্রকাশিত হল ।

উচ্চ স্বাস্থ্য আপনার উৎসবমুখর দিনগুলিকে

আরও আনন্দময় করে তুলুক.....

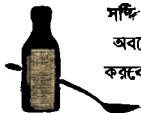
পরং এসেছে। আনন্দময়্যার আবির্ভাবেরও আর দেরি নেই।

আপনি এক বাড়ির সবাই স্বস্থ না থাকলে, উৎসবমুখর পূজোর দিনগুলোর কোনো অর্থই থাকবে না।

আজই বাড়ির ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে, তাঁর পরামর্শ নিন।



ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ, কলিকাতা-২৬



সর্দি কাশি

অবহেলা

করবেন না

শ্রুত আয়ুর্ষ ও প্রমাণিত ঔষধের অস্ত

বি.আই.কফ

সিরাপ ব্যবহার করুন



বেঙ্গল ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল কোং লিঃ

কলিকাতা-১০



মুক্তি পথে

গোবিন্দ বর্মানের

কবিতা



রূপায়ন

তুলসী

অনুপ

হরিধন

স্বামিনাথ

অহর রায়

মবদীপ

বিমান

শেতল

দুখন

মৃগতি

তরু বর্মান

শনি গ্রীষ্মি

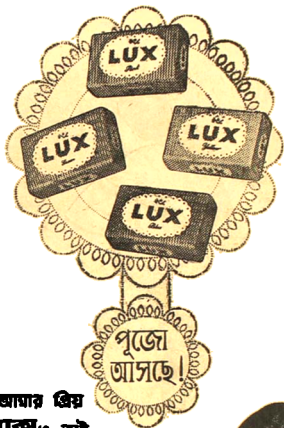
রেনুকা

রাজলক্ষী

অজিত

পদ্মা

প্রথমঃ রতন চট্টোপাধ্যায়, অঙ্কনঃ চিত্তরঞ্জন কাক্যোপাধ্যায়



“আমার প্রিয়
লাক্সও তাই
৪ টি রামধনু
রঙে

-আর সাদাটিও রয়েছে!”



রূপসী সুপ্রিয়া চৌধুরী বলেন

চিত্রভারকার বিশুদ্ধ,
কোমল সৌন্দর্য-সাবান



বিশুদ্ধ দিভ্যের তৈরী

LUX-42920



শ্রী. ক্রি. বিহারী (কল্যাণিত)
সম্পাদক

প্রমোদিনী

স্বদেশ - জননী নাহিন্দী

স্বদেশ - জননী নাহিন্দী

স্বদেশ - জননী নাহিন্দী

স্বদেশ - জননী নাহিন্দী



এসছে আদর্শ বঙ্গের বঙ্গকাল
এবারের সত ইল শেষ ।

(৩০০ শব্দের পর)

কে লিখল? এ ব্যক্তি থেকে বিদ্যার বেদ্যর আসলে এমন ভাবে আমাকে শ্রবণ করল কে? আর একটা মোটা ঘাষ। কী আছে এতে? চিঠিটা খুলে তেলদল্লর এই চিঠি:

সেরী রাজা,

আমি বাংলা আত্মকাল বৃত্ততে পারি, কিন্তু লিখতে পারতে পারি না। তাই আর একজনকে দিয়ে চিঠিটা লেখালুম। আশা করি তুমি হাস করবে না।

আমাকে চিনতে পারছ? আমি পরসত্তী বাকী। এখন আর বোঝি না। আত হুমান হল বুদ্ধবাবু, যারা সেয়েন। নশ্বর এই বাবে তিনি আমার বেশে দিয়েছিলেন, আত ও বাকীর হাত থেকে আমি ছুটি পেয়েছি।

বুদ্ধো আমার দুই ভাগ্যবানত। অনেক টাকা দিয়েছে, কাশীতে বাড়িও রেখে গেছে একথানা। আমি অনেক করেছি—অনেক দেখেছি। কিন্তু বুদ্ধবাবুর কাছে আমি শ্রু শ্রুণে হিন্দু। তোমার সঙ্গে কলকাতা তো করেবাবাই দেখা হয়েছে, তুমি তা নিশ্চয় লক্ষ্য করছ।

কিন্তু বুদ্ধবাবুর কথা লিখবার জন্যে এ চিঠি নয়।

তুমি দেখেছ, তোমাকে ডেকেছি “সেরী রাজা” বলে। বিশ্বাস করবে, আমার ভাবনে ঘরা অনেক এসেছে, ঘরের আমি শ্রবণর জন্যে। ভালোবাসা বিলিয়েছি, কিংবা বুদ্ধবাবুর হস্তে গতিবারের ভালোবেসেছি—তাদের আমি কাউকে ও নামে কখনো ডাকিনি? জানো, শ্রবণ তোমার অন্তরে ও মাছটা তুলে রেখেছিলুম।

তুমি আমার কে? কেউ না। বড় ছোট নশ্বর হস্তের, যেহমান—আমার গানের স্বরধ্বন। তোমাকে আমি ভালোবাসতে চেয়েছিলুম, তুমি সুযোগ দাও নি। তোর বস্তা পালিয়ে গিয়েছিল। আমার কাছে রেখে দিয়েছিলে একশো টাকার নোট। ভেবেছিলে, টাকার জন্যে তোমাকে আমার জগতী বিক্রী করেছি।

অকস্মাতে ভুল করেছিলে। গান আমারের পেলা, কিন্তু শ্রবণ বোটার বাসনা নয়। তুমি কি জানো, যে রাতে তোমার কাছে আমি বসে দিয়েছিলুম, তার আসনের ঘিনটি শব্দ আমি ছিলুম কুমারী? তুমি তো একজন

শাখার বাঙ্গালী ভবিষ্যের ছেলে, কোনো স্বাক্ষরও আমার ‘বদন’ হুঁতে পায় নি।

আমাদের শ্রবণ বস্তা বদল করে দিয়ে কেউ বদ বদিয়ে, এ আশা আমার করা না। যদি, হাত বদল হবে, আমি টাকা দিয়ে বদলোকে। আমাদের কিসে নেবে। কিন্তু তার আসে শ্রাবীকে বদল করে দেব, আমার বা কিছু সব তুলে দেব তাকে; যেমন করে আসে দেবতাকে তেল দিয়ে তারপর প্রণাম বিতরণ করতে হয়।

যে রাতে পেলে আমার বদ থেকে তুমি পালিয়ে গিয়েছিলে, সে রাতে দেবতাকে আমি তোমার দিয়েছিলুম। তুমি জানতে না বা আমার নিষেধ হাতে শাস্তি দেয়েছিল, কসালে পণ্ডিত দিয়েছিল হিন্দুরের কৌটি। তুমি জানতে না, তোমাকে মিল থেকে জামাবার আসে আমি তোমার প্রণাম করেছিলুম। যেন করে শাস্তি দিয়ে ছব—সেভাবে ধরতো সে-রাতে কোনো অন্তর্ধান হয় নি। কিন্তু তুমি একথা জানো, তোমার বুদ্ধের শ্রবণে আমি আশ্রিত-বদল করে নিয়েছিলুম। কেন দিয়েছিলুম, এমন চমত্তো-তুমি তা বুঝতে পারছ।

নবে আছে, একদিন কালীঘাটে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। কি কথা হয়েছিল তুমি জ্ঞানো, কিন্তু আমি একটা কথাও-জ্ঞানতে পারিনি। কিজেন করেছিলুম, কী ব্যর্থ? তুমি বলেছিলে, শ্রবণর। কিজেন করেছিলুম, অজ্ঞেয়ী কোন তাকি। তুমি বলেছিলে, নতোরাই ব্যাক্ত।

তোমার কাছে এই বিন—এই জারিটার কোনো মানে নেই। কিন্তু এ মিনেই—এই রাতেই তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল। সেদিন কোনো অন্তর্ধান কিন্তু, আমার কীভাবে নে-ই ছিল সব গাইতে বড়ো উৎসবের হাত।

তুমি এখন পালিয়ে যাও, তুমি-জারী গ্রাম হয়েছিল। ভেবেছিলুম মানসুতা কি বেদন—আমাকে বুলল না! তোমার থেকে একশো টাকার নোটটা আমারের একটি হয়ে বিক্রিছিল বুদ্ধর ভেতর, আমি বেলকো-করো চুকুরো করে ছিঁড়ে ভাল-ক-বাতির হাতায় হাঁড়িয়ে দিয়েছিলুম।

নবে করেছিলুম, তোমাকে চিরজীবনের বস্তা জ্ঞান

দাব - কখনো আর মনে আনবে না। সত্যি কথা বলি।
ভুলে গিয়েও ছিলুম। কিন্তু দুনিয়াটা তো খুব বেশি
বড়ো নয়। দিল্লী থেকে আমাকে ছোয়াড় করে আনল
হুকুমাবাদ। বেপারোরা মানিব—বরাক ছিল। আর
কলকাতার ওয়ে খিচোরীর গিরে তোমার আমি দেখলুম।
হোক বন বিশ্বের পাঞ্জির—কিন্তু শ্রাবীকে কি কোনো
মেয়ে ভুলতে পারে কখনো? দেখলুম, তুমিও আমার
সম্পর্কে ভোলোনি, তোমার আঙুলে আমার সেওয়া
আংটিটা এখনো রয়েছে।

কিন্তু আজ এসব বলবারও দরকার ছিল না। একটা
কারণেই চিঠিটা লিখছি।

তুমি জানো, তোমার ভাই বিজয়বাবু হুকুমাবাদ
উকিল। তিনি প্রায়ই আসতেন। তাঁর কাছে তোমার
সব খবর আমি শুন্যেছি। কেমন করে খিচোরীর চানে
তোমার সব পেল, কিন্তই আমার অজানা নেই।

আমি পরশু কাশী এসেছি। আসার আগে বিজয়-
বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাঁর মূলে শুনলুম, যেসব
বাড়িতে যেখানে তুমি মরু গুঁজে পড়ে আছো, আগছে

মাল থেকে সে বাড়িতে তুমি আর থাকতে পারবে না।
আমি বলছিলাম, কোথায় যাবেন আপনার দাদা। কিন্তু
বাবু বললেন, রাতারাি।

এইবার শুনে ভয়ে বলি। আমি বুড়ো হয়ে গেছি,
তুমিও বুড়ো আর অসুস্থ। তুমি আমি দুজনেই অনেক
মেয়েছি, অনেক কয়েছি, অনেক লেখা মিটিয়েছি দুনিয়ার।
এইবার আমার কাছে চলে এসো কাশীতে। উপরে যে
ঠিকানা দিয়েছি, তা থেকে হুকুমতে পারছ বাড়িটা
কোনদিকে যাটের কাছেই, তোমার মূলে নিতে কষ্ট
হবে না।

আমতে কি তোমার লক্ষ্য আছে—অপরাধ আছে?
তবে এসো না। আর যদি ভাবো, এক রাতের হলোও
আমি তোমার শ্রী, তবে আমার ওপর তোমার দাবি
আছে। সেই দাবি নিয়েই চলে এসো এখানে। জীবনের
শেষ কটা দিন তবে হুকুম-বুদ্ধিতে বিশেষ বিজয়বাবুর
পুছো করে কাটিয়ে দেব।

প্রণাম নাও

তোমার দয়ালুতা।

চিঠিটা হাতে নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে বইলুম
দুর্ভেদ প্রবণ আসো পড়েছে আমায়ের পুছোতো
পুছো বাড়িটার ওপর। সেই আলোয় বাড়িটাকে
নতুন আর নতুন দেখাচ্ছে। রাত্রির ছায়াছায়া
কোথার পালিয়ে গেছে, অভিশাপের নিশ্চয় শোনা
যাচ্ছে না কোথাও।

কানাইয়ের মা এসে বললে, বাবু, গাভ-বু
দুর্ভে চা খাব কল বাবার ঘরে বিন। সাতটার
বেলগাড়িতেই তো যেতে হবে।

শ্রী, যেতে হবে বৈ কি। অনেক দূরের পথ
আমার সামনে। কিন্তু রাজ্যঘাটে গঙ্গার পুল পার
হবার পরেই নেমে পড়বার প্রয়োজন দমন করতে
পার কিনা, সে আমি এখনো জানি না।

স দা ও

অলঙ্কার
সৌন্দর্য
জিল্পীর
নৈগুণ্য



দিল্লী ও প্রতিষ্ঠান বিশ্বজিন্দী

দস্তাও পাইন ব্রাদার্স

১৯৩৩-৩৪

২৫, কলকাতার স্ট্রীট, এমিলাস-২১ - ঢাকা - ৩৬-৩০৬৪

বিংশ শতাব্দী

সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই

সত্য বেগটন খসে কবিতা বিনষ্ট অতিক্রম পরমানবিক যোনার বিস্ফোরণ গত ৩০শে অক্টোবর সমগ্র বিশ্বে প্রকম্পিত করিয়াছে। এই বিস্ফোরণ ঘটাঁইয়াছে শোভিমেত ইউনিয়ন।

খসে কবিতা এই যোনার নিকট অক্ষপন্ন।। গিগাগীয়া ও ন্যাথারিকতে যে বহুধন পারমানবিক যোনা বিনষ্ট হইয়াছিল এই যোমাটি তাহা অপেক্ষা দূর্ভেদ আঠাল গুলু নিকৃশালী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সব কটি বছরে সমগ্র জাহান্নাতে বিনষ্ট যোমাগুলির খসে কবিতার পরিমাণ ছিল নাই দূর্ভে বেগটন। উপরোক্ত ঘটনাগুলি চাইতে সাম্প্রতিক বিস্ফোরণের চরিত্র বিচ্ছিন্নতা অনুমান করা সম্ভব।

উত্তরোত্তর এলোমেলো জনপদে অকসে এই যোনার বিস্ফোরণে কোন মানুষের নৃত্য হয় নাই সত্য কিন্তু দীর্ঘদিন ধরিয়া মানব সভ্যতাকে এই বিস্ফোরণের জন্য বহু মূল্য দিতে হইবে। বহু শিশু আগামী কয়েক বছরে বিকলাঙ্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে, বহু মানব তেজস্ক্রিয়তার অভিশাপে অভিপন্ন হইবে।

বহুদিন পূর্বেই বিংশ শতাব্দী অশনি বসন্তহস্ত বৃকে লইয়া যোমা করিয়াছিল "পারমানবিক যোনার বিস্ফোরণ ঘটাঁইয়া যাওয়া বাস্তবতাকে দর্শিত করিয়া জুলিতেছে, পৃথিবীকে মনুষ্যবাসের অযোগ্য করিয়া জুলিয়াছে, মহাকাশের ক্রায়ে তাহারের কাহারও ক্ষমা নাই। আজও আমরা নেই বক্তব্যেই দৃঢ় প্রত্যঙ্গী।

তবু সমস্ত ব্যাপারটি ভাল করিয়া তলাইয়া দেখা দরকার। পারমানবিক যোনা অশনি শক্তির হইয়াও শোভিমেত ইউনিয়নই এ যাবৎ কাল পারমানবিক যোনা নিষিদ্ধকরণের জন্য প্রাণপন চেষ্টা করিতেছিল। আর তিন বছর হইল একতরফাভাবে পারমানবিক বিস্ফোরণ তাহায়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ইহার পক্ষে সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে। সাধারণ একল জ্ঞান একে পূর্ণ এক পারমানবিক যোনার বিস্ফোরণ ঘটাঁইয়াছে। তদুপেক্ষা বড় ঘটনা খ্রীষ্টপূর্বকালের তেরদ্বাদশ শতাব্দীর রত্ন কামরু কাটাঁইয়া দিয়া সাম্রাজ্যবাদীরা সমগ্র পৃথিবীতে আবার একটি বিন্দুযুদ্ধের দ্বারপ্রবে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল। জার্মান সম্রাট তথা পক্ষি বালিনকে কেন্দ্র করিয়া উত্তর জাহান্নার গীরাতে দগ্ধ সমাবেশ ঘটাইয়াছিল। বাতুল জন হইয়াছিল কেবল একটি "কমিউনিস্ট প্রয়োজন ছিল।

অস্বীকার করিবার উপায় নাই শোভিমেত ইউনিয়নের বর্তমান পর্যায়ে নির্মিত ভাষাভাষের অভাব রহিয়াছে কখনও তাহায়া মনে করে সাম্রাজ্যবাদীরা ভক্তিমত্তে স্বাভোচ্ছাস, ম্যাকমিলান আইক ল্য গুলের দর্শন মিলে সম্মেলনে বলিমেই বাস্তবিক বিশ্বেসবার সমাধান হইয়া বাইবে: বিশ্ব জাহাী শক্তির মুখ দেখিতে পাইবে সমগ্রভাবে এবং চূড়ান্তরূপে নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব হইবে। আবার পরদিন শীর্ষ সম্মেলন বাতিল করি ইউ-ইউ লইয়া সোভিয়েত তোলে।

জার্মানিস্তরূপ পর্যায়ে নির্মিত এই অশ্বিনতা ব্যতংগার লক্ষ্য করা বাইতেছে। প্রথমে হাঙ্গের অগ্নিমা দীমানা বৃদ্ধ বরিয়া সেওয়া হইল পরে ট্যাংক ও আর্মড গাড়ির সাহায্যে হাঙ্গেরীর প্রাতিদ্বন্দবে

বিংশতি শতাব্দীর পঞ্চম দশকে রুশ নেতৃবৃন্দ সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র বিশ্লেষণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিলেন। সোভিয়েত কল্যাণের দিকে মোহিত হয়ে পড়েছিলেন। সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র তাঁহারা বুঝতে পারছিলেন। কোমরাভ ভিকেনোভে বাহারা বহু পৃষ্ঠে পরিচয়। ক্রমোভকে বাহারা বহু পৃষ্ঠে পরিচয়। বাহারা, সাইমন, টিউনিয়া, মিশর, লাও, কিউবার বাহারা ভবন ভাঙাও চলাইয়াছে তাহারা সাম্রাজ্যিক সাদা বিন্দু গিয়াছে—পাঁচ শতাব্দীর আদির বিবর্তিত খোঁজাইয়া গবেষণার এইরূপ কণ্ঠনাকে প্রদত্ত হইয়াছে।

সোভিয়েত পর্যায়ে নীতিতে যিনি পর দিন এই জাতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কখনও তাহারা আশু পাতিত সম্প্রদায়ের দিক দোষের সৈন্য সংস্থা প্রাপ্ত করিয়াছেন, কখনও একতরফাভাবে পারদর্শনিক বোমার বিক্ষোভ বহু করিয়াছেন কখনও পৌরসভা প্রদেয় বাহোয়রা হইয়া আইক-বৈদেশীকে গুণাই-বাগাই বনে করিয়া পাতিত হুত বিন্দু বর্ণনা করিয়াছেন।

নিজ দেশের সামরিক পক্ষের উপর অত্যধিক আস্থা, পাতি আন্দোলনের উপর অত্যধিক আস্থা হইতে তাহারা পত্রকে ছোট করিয়া দেখিয়াছেন। তাহারা ভুলিয়া গিয়াছেন, বিন্দু আঁকিও বিন্দু নহ। হুতরাহো ক্রমোভ, দক্ষিণ কোমরাভ, দক্ষিণ ভিকেনোভ, বহুপ্রাচ্যে ইত্যাদিতে প্রতিজ্ঞা পাতি গাঢ়িয়াছে। সিয়াটো, সেনটো, ব্যাটো বলকান চুক্তির মত বহু চুক্তিগত আশ্রয় বহাল আছে, সত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন বহু পাতি বাহা পরিবর্তিত, উত্তরে আলজিরিয়া, বহুপ্রাচ্যে কলো, দক্ষিণে দক্ষিণ আফ্রিকা—আফ্রিকার একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্ত পত্র সাম্রাজ্যবাদীরা বহুদূরে দীর্ঘ-বিদূর্গ করিয়া দিতেছে। ক্রমোভ বিন্দু বাহা একপ্রান্ত কিউবা বাহা পত্র সত্র পক্ষের গোলাপ প্রতিক্রিয়ার কতগুলি। সোভিয়েত ইউনিয়ন সামরিক বলে অকম্পনীয় পক্ষপালী হইয়াছে, পাতি আন্দোলন পক্ষপালী হইয়াছে স্পষ্ট নাই, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ সত্র আক্রমণ স্বভাৱে হইয়াছে ইহা আদৌ সত্য নহ। বাহোভা ৩ অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির নবাত পত্র অস্বস্তিকার সঞ্চিত। সত্র পক্ষের ইউরোপ ব্যাটো পক্ষের কলো। পুনঃস্থাপিত জাতি বাহোভা-সম্পদ পক্ষের আশ্রয় পত্র যে বাহা ভুলিয়াছে তাই নহ, সত্র অকল প্রত্যাশের দাঁবি ভুলিয়া পত্র ইউরোপের দেশগুলিকে আত্মশ্রুত করিয়া ভুলিয়াছে।

সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে এই ভবন ও দিগন্তের সত্য প্রাপ্তই বর্তমান রুশ নেতৃবৃন্দ বিন্দু হন। জেগী-সংগ্রাম যে কত কঠোর, কত নিম্ন, সাম্রাজ্যবাদীরা যে কত হিংস্র হইতে পারে তাহারা কোন হিসাবই তখন তাহারা রাখেন না। বিশ্রবকে চোখের গর্ভের মত রক্ষা করিতে হয়, সংরক্ষণ করিতে হয়, পত্র আক্রমণের প্রতিরোধ করিয়া বিশ্রবকে প্রদত্ত হইতে হয়, জাতিগত এই নীতিতে তাহারা বহুদূর করিয়াছেন। তাহাদের এই অসতর্কতা, এই নিবৃত্ততার পত্র সম্ভাব্য সাম্রাজ্যবাদীরা করিয়া থাকে।

অনেক পরে যখন রুশ ভবনের ঠিক নড়ে, তখন আসন্ন শীর্ষ সংশ্লিষ্ট দীর্ঘ হইয়া যায়, সেগাটের পথে বিন্দু প্রকল্পিত হয়। কলোভের বহুপ্রাচ্যে বাহা সম্প্রদায় হইতে পাতিত তাহারা কলো বহু সম্প্রদায়িত হয়—সত্র বাহুতলকে বহুদূর করিয়া, নিরীহ ও নিরপরাধ বাহুতলের তেজস্বীতার বিবে আন্দর করিয়া আসন্ন বিন্দুকে হুতাইয়া দিতে হয়।

রুশ সেগাট বোমার বিক্ষোভের আসন্ন বহুদূর। কিন্তু সেই সঙ্গে শীকার করি বিন্দুত্বের বিকল্প হিসাবে ইহা Lesser evil সেই সঙ্গে Necessary evils বটে।

কবি ও কথাসিদ্ধী
ইতো আশ্রিত জাতকিক
পহরে ১৮৩২ সালের
১০ই অক্টোবর অবগ্রহণ
করেন।

সাহায্যেভোর এই
কাব্য লিখক বংশের
আর্থিক সঙ্কটপূর্ণ ছিল না। আশ্রিতের
পিতাকে তাই সাহিত্য
কাকিন্দীর আর্থিক
এখন করতে হয়েছিল।

আশ্রিত বৈশ্যবৈ পিতৃবীর। কিন্তু মার চারিত্রিক পুণ্ডিত
ও সতর্ক তত্ত্বাবধানে তাঁর লেখাপড়া বাধ্যতামূলক
হলো। ভ্রমগ্রস্ত পহরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আশ্রিত
ভর্তি হলেন। এই মনোমুগ্ধতার পুঙ্খ পহরেই অস্বস্তিক
পরিবেশে তাঁর বৈশ্য ও চৈকেশ্বরের বিনোদিত অভিক্রান্ত
হয়েছিল। ভ্রমগ্রস্ত পহরের বহু ঘটনা ও বহু চরিত্রের
প্রভাব তাঁর গল্প উপন্যাসে সুখে পাওয়া যায়। 'ত্রিভুজ
অনুগ্রহ' নামক উপন্যাসটিরও অবলম্বন এই ভ্রমগ্রস্ত
পহর

সাহায্যেভোর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে গ্র্যাডুয়েট ডিগ্রী
নিম্নে তিনি আশ্রিত, ভিরেনা, জাকাতো বিশ্ববিদ্যালয়ে
কর্মন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অতঃপর গ্রাড
বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মন-শাস্ত্র গবেষণা করে ডক্টরেট পান।

পুণ্ডিত মুগোলাভিয়ার তাগা যখন আশ্রিত-সাহিত্যের
কর্তৃসংগঠনে, সেই প্রথম মহাযুদ্ধের সময় মুগোলাভ-
জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগদান করার কলে তাঁকে
ঝেলে বেঁচে হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে সাগিরা,
ক্রোভ ও ব্রেন্ডেন রাষ্ট্রগুলি একা সংযুক্তি হয়ে মুগোলাভ-
রাষ্ট্রবৃন্দের কাছে নিখুঁত হয়ে তাঁকে রোম, সুডানেস্ট,
বাস্ত্রিক, মেনেভা, বালিন প্রভৃতি অনেক দেশের পহরে
যাকতে হয়।

বিজী মহাযুদ্ধের সময় হিটলারের বালিন থেকে

বিশ্ব সাহিত্য

ইডো আশ্রিতের সাহিত্য-জিজ্ঞাসা

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়



রাষ্ট্রবৃন্দের কুলে নিচে
তিনি যবেবে কি
আলেন। রাষ্ট্র বর্ষ শেষে
অবসর নিয়ে পরী
অকলের বাস ভবনে বচে
নিম্নে সাহিত্যকে
সম্পূর্ণ ভাবে নিম্নে
করেন।

কালিত আক্রমণে
সময় সর্বত্র তিনি
মুগোলাভ অনসারগণে
পানে ষা ডি রে ছেন

আজীর মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে সর্ম্মহা মহাযুদ্ধের
কয়েকদিন। বিস্তার মহাযুদ্ধের শেষে তিনি বসনিয়
হর্ভেগোভিনা থেকে অনসার বারগের প্রতিনিম্নে নিম্নে
হরে সাধারণ পরিবেশে যোগ দেন। সংযুক্ত রাষ্ট্র
পরিবেশেও সত্য হিসেবে তাঁকে নিষিদ্ধ করা হয়।

কারাবাসের সময়ই আশ্রিত অবসর বিনোদনের জন্য
সাহিত্য রচনা করতে করতে নিজের সাহিত্যিক সং
আবিষ্কার করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে সাহিত্য
হিসেবে ব্যক্তি অক্ষম করেন।

'বসনিয়ান ভিলা' 'বি উইও' এবং অন্যান্য বিবি
সাময়িক পত্রে ১৯১১ সাল থেকেই তাঁর লেখা ছোট
নীতি-কবিতা, জাতীয়তাবাদী প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত
হতে শুরু হয়। ওয়াশিংটন হাইটম্যানের অনেক কবিতা
তিনি এই সময় অমুদ্রিত করেন। কিন্তু হাইটম্যানের
স্বদেশী বসিষ্ট কবিতার প্রভাব আশ্রিতের কাব্য
প্রভাবিত করতে পারে নি। আশ্রিতের বিবরণ মানসিক
হয়ত এই সত্যের সত্য: কুর্ভ প্রাণবন্ত কবিতা প্রতি এ
বৈশ্ববীত্যের আকর্ষণ অস্বস্তিক করেছ।

কিন্তু কারাবাসের সময় লিখিত সংকলিত কবিতা
বলী 'একগোলাভো' ১৮১৮ সালে এবং ১৯২০ সা
'মেনিবি' প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি সাহিত্যিক প্রতি
পেলেন।

আশ্রিত প্রবন্ধকার হিসেবেও সুপরিচিত। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস-বিখ্যাত ব্যক্তি, ত্রিভাষী ও সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। বঙ্গ-ভার পত্রিকার, ত্রিভাষী পত্রিকা, মাসিক মণি প্রভৃতি পত্রিকা ও সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ মূল্যায়ন অত্যন্ত মূল্যবান। এ ছাড়াও বহু সাহিত্য ও শিল্প-সমালোচনা বিশিষ্ট সাময়িক পত্রাঙ্কে তিনি লিখেছেন যা বহুতো পরে সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হবে।

১৯২০ সালের পরেই যুক্তরাষ্ট্রের উপত্যাকার দ্বারা পূরণিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে আশ্রিতের উপত্যাকার বিশেষ পরিণতি লাভ করে। রাষ্ট্রপতির কর্তৃক থেকে অবসর নিয়েই তিনি 'বঙ্গবিমান টোবিস', 'আমেরিকান ক্রিস্টিয়ান', 'প্যান্থিওর', 'বেল ইয়ার্ড' ও 'ব্রিগ অফ বি ক্রিস' রচনা করেন।

আশ্রিতের সর্বশেষকাল সুপরিচিত ও বহুপঠিত উপত্যাকারবন্দী নাম—'বঙ্গবিমান টোবিস' 'ব্রিগ অফ বি ক্রিস', 'রাইকা' ও 'আমেরিকান ক্রিস্টিয়ান'। বহু বিশেষা ও বার-এ প্রকাশিত অনুবাদ হয়েছে। অনুরিত অল্পাত ভাসিকার কথা হচ্ছে সেখা 'এক্সপোনেন্ট' ও 'নিমিরি' কাব্য গ্রন্থ এবং 'সিপেকটোর টোবিস' ও 'নিউ টোবিস' ও 'অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেওয়ার কালে প্রথম জীবনে আশ্রিতের বহু বহু অসংখ্য কাব্যকে বিবেচনা করা হলো, সেই নির্বাক নির্বাসনে তাঁর সমস্ত গল্প যেন মূল্যবান হয়ে পেল। চোখের মাঝে শুধু অন্ধকার, ভবিষ্যৎও মূল বেখা যায় না। এক্সপোনেন্টে যেন কোথাও বাস্তব কাব্য, যে বাস্তব অসংখ্য সাধনে পিছনে কিছুই দৃষ্টিগোচর নয়, ক্রমাগত গুপ্তিত পাথর কালো আকাশে পারদেরবন্দীর গুপ্তি খাটবার প্রতিদ্বন্দ্ব হয়ে ফিরে আসে। তিক্ত হতাশায় আকর্ষণ বিনামূলিত কবিতা তবু মনে থাকে। সেই বিবর্তন ধারণার প্রতিক্রিয়া তখনতে পাওয়া যায় তাঁর 'এক্সপোনেন্ট' কাব্যে।

"প্রাচীর অন্ধকারে অসংখ্য অতিথিরা এসে,
নিঃশব্দে, অগোচরে,
বহু বালু ভরে বিল
আমার মূল-পঙ্কজে আর ঢোকে"—

এই বিরাট বিরাট ও হতাশা আশ্রিতের জীবনে সব অসংখ্য গবেষণা নিয়েছিল। বেচনাই তাঁকে বর্তমান ও বর্তমান করবে মূল-পঙ্কজে অগোচর ও সমস্যাধী করে ফুলেছিল আশ্রিতের এই মানসিক বৈরাগ্যে দার্শনিক কার্যপার্যেরও প্রবল প্রভাব ছিল। জেলের মধ্যে একমাত্র ক্রিস্টিয়ানের বইটি তিনি মৃদুবে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। ঐ ছিল তাঁর একমাত্র সঙ্গী।

বলাই বাহুল্য যে কবি গোটা জীবনটাকেই জেলখানা, নিজেদের বন্দী এবং ঐক্যের বহুভাষা হিসেবে বেছে নেওয়া অত্যন্ত তাঁর মনে ক্রিস্টিয়ানের দার্শনিক চিন্তা সঙ্গীর বেখাপাত করবে—এতে বিশ্বাসে কিছু নেই।

সমস্ত 'এক্সপোনেন্ট', কাব্যগ্রন্থে ক্রিস্টিয়ানের প্রভাব বিদ্যমান।

'জন্মকাল আমার বন্ধ, আমার মূল ভাষা হাটেরেছে
সঙ্গীর গায়ে অস্থির পহাচরণ করে,
হিনের পর হিন, বহু ভাষা চোখে,
মূল-পঙ্কজে, ভাষা, ভাষা, মূল-পঙ্কজে, বহু ভাষা
তাঁর নিমিরি কাব্যগ্রন্থে জাতীয় জীবনের অশান্ত
অভীকার আবেগিত। জাতীয় জীবনের প্রবল অস্থিরতা
এই কাব্যের মূল-পঙ্কজে একাধারে ভাষা মূল পেয়েছে।

পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকার ও জাতীয় দৌরবন্দ
অভীকারের সূত্রটিতে প্রেরণা লাভ করে এই হতাশা
যেতে আশ্রিত নিজেদের বীরে বীরে মূল করেছেন। তাঁর
বিখ্যাত উপত্যাকারগুলি সেই দৌরবন্দ অভীকারের পুনরু-
জীবনের স্বপ্নে বিস্তার হয়ে বর্তমানের মূল-পঙ্কজে অস্থিরতা
মূল-পঙ্কজে বর্তমান ভবিষ্যতের আশার আবেগিত। তাঁর
কাব্যগ্রন্থের মধ্যেই সেই প্রেরণার সূত্র পাওয়া যায়—

"পৃথিবীকে আমি চিনি, আমি এই বরষা মাটিতে
বস্ত্রের ভিতরে আমি বুলি,
সঙ্গীর এক মূল-পঙ্কজে গরিচের অন্ধার"—
'ত্রিভাষী পত্রিকা' গ্রন্থে আশ্রিত এক কাব্যগ্রন্থ
লিখেছেন—

"চতুর্দিকে বা বটহেতা ঘেঁষে ঘেঁষে হতমূলি হয়ে আমি
অবশেষে শেষে এই শিঙাটে ও বিধানে উপনীত হয়েছি
যে মাঝরা মিহিমিহি চতুর্দিকের এই অগোচরজনীর মাঝে
বটনার মধ্যে একটা অর্ধ আবিষ্কার করার চেষ্টা করি যে

যটনা সমূহ আপাতদৃষ্টিতে প্রথমে খুশি ভক্তের বলে মনে হয়। কিন্তু অসুখে এর পরিবর্তে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ পৌরষের যে ইতিহাস, সত্যতা ও সত্যত্বের সেই অসীম আনন্দের অধিক্ত অর্থ আবিষ্কারের চেষ্টা করা উচিত।"

'কিছু অর্থ বি জিনা' আঙ্গিতের এই বিদ্যাপ ও দ্বিত্বের পরিপূর্ণ স্বাক্ষর বহন করে। 'জিনা নদীর সেতুতে যেম সেতুটিই মহাত্ম্যের সমস্ত সাক্ষ্য বহন করে নাহক হিসেবে ঠিকিয়ে রয়েছে। যুগ যুগ ধরে এই সেতু তুর্কী আক্রমণের মুখসত্তা থেকেছে। সেখানে তুর্কীদের উঠানো বর্ণার কলার গাথা সার্বভের ছিন্ন শির। কিন্তু সেই তুর্কীদেরও পত্তন হয়েছে। আবার এসেছে অষ্ট্রিয়ানরা, সর্বাঙ্গ হয়েছে, অত্যাচার চালিয়ে গেছে। বিশ্বপত্তকে প্রথম মহাত্ম্যের প্রারম্ভে ঠিকানো বহু বস্তু এই সেতুর কাঁধের উপরে সার্ব সৈন্তরা মাঠ করে এসেছে; এই সেতু আপাত আনিচ্ছে তাদের।

মিষ্টুর বর্ষের অত্যাচারীর হল হান্য হয়েছে। তারা নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে। আবার রণসামান্য ব্যাকিয়ে এসেছে নতুন লুটী। তখন এই সেতু যেন বলেছে—'এদের চিহ্নও দিলিয়ে বাবে।' দিলিয়ে গেছেও। অনেক জনশ্রোত বয়ে গেছে এই ঠিকানো বহু বস্তু কাঁধের উপর দিয়ে। বহু জনশ্রোত বয়ে গেছে এই জিনা নদীর বৃক্কের উপর। কিন্তু মানুষ অপরাজেব। নতুন জনশ্রোত সৃষ্টি করে আবার মাথা তুলে ঠাঁড়িয়েছে। আবার হুজ হয়েছে নতুন বসতি। হুজাক্ত কলঙ্কিত মাটি ঢেকে গেছে সবল বাসের গালিচা, নতুন প্রাণশব্দে। অধিনবর মানুষের এই অপরাজেব কাঁধবদী বর্ণনা করেছেন আঙ্গিত।

মানুষের ভবিষ্যতে তাঁর আস্থা আছে। মানুষকে তিনি তর্কিয়েছেন তাঁর আনন্দস্বামী, তোমার জর হবেই এই আশ্বাস কোনো ঈশ্বর-বিদ্যাসের কল নয়,—মানুষের প্রাণবর্তির উপর মানুষ আস্থার কল।

'বসনিয়ার সৌরিক'-এ বসনিয়ার প্রাচীন ইতিহাস বহু-বিগ্রহ, সাধারণিক পরিচিতি ও তার সতর্ক পরিবেশের মানব সমস্তা ব্যক্ত হয়েছে। বিভিন্ন চরিত্র যুগ দিয়ে উপভোক্ত খাপারে তাদের যান-বারগা আঁটি তুলে পরেছেন। মেনোপিরিয়েনের বিজ্ঞানভিত্তিক সমস্তক বটনাবলী এবং বসনিয়ার অধিবাসীদের উপরে তার যা প্রতিঘাত প্রতিবিম্বিত হয়েছে এই উপন্যাসে।

উপন্যাস রচনার আঙ্গিত উপক্কার আঙ্গিক অনুস করেন। মুগ্ধবে যেন তিনি পর বলে চলেছেন। আ এই আঙ্গিতের অনুবিধা এই যে পর লেখক—'কাতিক পয়েট', 'ইনভাস'ম কিংবা' রেট্রোপেক্সন পদ্ধতি প্র করতে পারেননা কিন্তু তার বলে পার্ককের বিদ্র হওয়ার অস্ত্রবিধার পদ্ধতি হয় না। তিনি সহজ ও সংলগ্নতার সঙ্গে সমস্ত কাঁচেরী নিখুঁতভাবে বর্ণনা ব চলেম, আবেগে বা কিছু সমগ্রই খুঁটবে বলে যান পরে বলেইম বলে কেলে তাইবন না। উপন্যাসের বি ব্যক্তক তিনি উপক্কার সঙ্গে দিলিয়ে যে বনোহর বৌশ পরিবেশন করেন—তার সঙ্গে এই মৌখিক গল্প বচ চাল দিল বেবে বাব।

সাধক কিংবদন্তি আঙ্গিক হিসেবে 'অন্ত্যক' যে অপরাজেব, তেমনই গল্পের সাধকতা তার কল্যাণিক উপর নির্ভরশীল। আঙ্গিতের উপন্যাসের কল্যাণিক নিখুঁত।



সমকালীন | শ্বেতজিৎ জেফবর্তী

যেহাশে অনেক ছাত্র, নানান ছাত্রের মুখ

রুটিয় আড়ালে

মধুর নিমিতি রাখে লম্বু নুয়ে, গল্প বলো গল্প বলো তুমি,
আজকে বলতেই হবে। শোনো—এক আশ্রয় ছিল।

তালে তালে

হলস ছায়া, —এ তো মনগড়া, গুনব না।

করণ নৌহুমি

সবাক তুলিতে আঁকা ছবিটির পুতানো

রঙের মতো করে

গানের পাখির মূর্তি কারুকাঙ্ক,

টাঙানো পূর্বের জানালায়

গাফিলতের শাড়ি বেয়ে। শোনো বলি—

পুরাকালে চম্পকনগরে

এক ছিল রাজ্য। ওরা বাধা দিল—

এ তো রূপকথা! চলে যায়

কল্প পাখি, ভোর হতে কত বাকি,

সবরের হিসেব রাখি নে:

ভোর চোখের মতো ক্রমেই ক্রান্ত আর

কিকে হয়ে আসে

রোয়া প্রদীপখানি। বলছি—সপ্তভিদ্ধা মধুকরী মিনে

এক ছিল সদাগর। ওরা তবু খুশি নয়।

শোনাই উল্কা—

এক যে মানুষ আছে। চমকিত চোখ মেলে

ছায়ায় শুধোল,

হাই হই গল্পকার, যেমোনাক বলে বাও,

তারপর কী হল?

তোমাকে জাগাবো না | মোহিত জেফবর্তী

বতটুকু আশা হরিণনয়নে এঁকে দিলাম

বতটুকু প্রেম তোমার ক্ষণে হলে হান-দোলা দিল

হয়ত দীর্ঘায়িত কোন রাজির তপস্কার

কিবা প্রাণবহির দীপ্ত আভালে

আজও হ্রুপা হয়ে জাগলো না তা তোমার ক্ষণে।

থাক তবে থাক।

মুন্ডির পাণ্ডিতে একটু সতেজ হাওয়া দিয়ে

আঁখির ঈষৎ কলতায় আলোকিত। করে

তোমাকে জানাবো না থাক।

হ্রুপা তুমি না!

তাই ফুলে ফুলে আর কামনার মেঘে মেঘে

তোমাকে জড়াবে না।

তোমাকে জাগাবো না।

এই অশোক তরুণ সাবলীল হয়ে রইলো।

হয়তো তুমি আসবে।

অশোক ফুলকে তুমি ভালোবাসবে

অশোক ফুল তোমাকে দেবে প্রেম।

আর আমি।

আমি ওই অশোক ফুলে অনেক অনেক কাল

জেপে রইবো।

কেন না এ অশোক তরুণ

কোন সে মুন্ডি-দোঁড়া বসন্তের সবুজ সকালে

তোমাকে ভালোবেসেই রোপণ করেছিলাম।

আর কত দূর ।

কখন লাভ করছে ঐ
এক প্রহর, এ ওকে ও
তাকে ছুঁতোয় নতায়
শুধু—আর কত
সেই ?

যে যেমন ভাবে
পারছে, অব্যব দিচ্ছে ।
অব্যবটি দিয়েই খুব
মন মরা হয়েছে ।
বানিক বাদে আর এক
জনকে সামনে পেয়ে
বলছে—খুব দস্তব কাল
সন্ধ্যা নাগাদ আমরা

নাশছি, কি বল ! যে বলবে, সে খুব বিজ্ঞভাবের মাথা
নাড়িয়ে বলছে—মনে তো তাই হচ্ছে, হাওয়াটা যদি
ঠিক এই ভাবে থাকে তা হলে গুরুত্বীয় কৃপায়—

গুরুত্বীয় কৃপায় সবাই সবাইকে সত্যনা দিয়ে নিজে
সত্যনা পাবার চেষ্টা করছে । হাওয়ার মজি' আর
সবুজের মজি', দু' দুলো প্রকাণ্ড মজি'র কাছে অকণ্টে
আত্মসমর্পণ করেছে আমরা কটি জীব । জীবের মধ্যে
শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ আমরা, আমরা কথা বলতে পারি ।
কথার দ্বারা বসন্ত, লুপ্ত লাভ করা সম্ভব আমরা তার চেষ্টা
করাছি । কথা বিয়ে তো আর সম্বন্ধে বা ছাওয়ায়
বশ মানানো থাকে না, নিষেধের বশ মানানো সম্ভব ।
তাই করছি, বৈবাহিক বন্ধনকে মূখের বন্ধনে ভিড়িয়ে
ভিড়িয়ে টেনে বাড়ানোর চেষ্টা করছি, বন্ধনটি যেন
ছিঁড়ে না যায় ।

হেঁতবার উপক্রমই হয়েছে ।

কম্বলী থেকে বন্ধ, ব্যাবধানটুকু পার হোতে অথবা
সব লাগছে । অশ্রু দিয়ে যাচ্ছে জীবনের কয়েকটা
দিন, সময় পাগলিমে যাচ্ছে । সময়কে পরাস্ত করতে হবে,
সময়ের আগে নৌড়ে সময়কে দাঁড় ভেঙাতে হবে ।
কম্বলীর কল থেকে নৌকা বহন ভাল তখন সেখানে যে



একটি প্রিয় হিন্দুস্তানের পরম্পরাগত
ঐশাণ্যের স্মারক

সবটাই ছিল সে
সবটাকে ঠিক সেইভাবে
দাঁড় করিয়ে রেখে
তৎক্ষণাৎ এক নৌ
যদি আমরা সেই
পারতায় কল্প, তা হলে
মনে বাসাই অশ্রু
একশেষ হোত । ও
হলে না, হতভাগ
সব ও অসংকলিত
বলস নৌকার আমা
শুণে, ভাবতে লাগ
লাগতে । ভাবছে স
ভেগে চলেছে ! নি

করছে হাত আঁধারে । হাত কুরছে বিন আসছে
সবটাই যেন ছিলে তৈরি, বিহীন আনন্দের ছাড়াই
একটা যদি কোনও উপায় থাকত ! যদি আমরা নৌ
সুস্থ সবটাকে লাগরের দিকে ফেলে রেখে তখন করে দি
নানতে পারতাম কল্পের কালে তা হলে সেখানে
এগাটা কেমন দাঁড়ায় । উপায় যে নেই তাই সম
সাংসার' লয় করছি । কিন্তু বৈবাহিক সীমা আর
বৈবাহিক বৈবাহিক টানাটানি করে বাড়ানো হচ্ছে, বাড়
বাড়তে শেষ পর্যন্ত না ছিঁড়লে পারি ।

প্রত্যেকের মূখ অন্ধকার সবাই যেন মূখোপ প
ফেলেছে । চোখ বন্ধে নিম্নের মূখ পানে তাকি
ফেছি মূখশানা পেঁচা মূখ হোলে উঠেছে । পেঁচা ম
নিম্নে কারও শরণে আশ্রয় আশ্রয়না করতে প্রব
হচ্ছে না । পেঁচা মূখের ডাঙাটা ধরতো পেঁচার ডা
হোলে দাঁড়াবে । কৈকেয়ী নন্দন নিম্ন মহাসভার গে
সেই আর মনের মধ্যে সর্বত্র ভাগে না । সৌকর্য
আর সৌকর্য নেই, মূখের ঝটি হোলে দাঁড়িয়েছে ও
সেই সৌকর্য দেখে কারও প্রাণেই হাস্যরসের উদ্র হয় নি
নিম্নেরী তাঁর চোখ আর ভুরু পরায়ে সৌকর্য বিহ
মূখের এমন একটা দ্বিধা-স্বাভাবিক আগ্রহে ভরা

হলেন যে তার দাখ দে মূখ পানে চোখ তুলে তাকায় ।
ন আগুনটা ও গেছে নিভে । মিত্রকী কেমন যেন কুঁচো
হায়ে গেছেন । ভয় ভীতি হৃদের কথা ওর পানে
বাকিও থাকিলা কতবার উষ কোল যনে । হঠাৎ
লম্বোত্তর একময় ঘো বোরা যোবে দেখেন ।

অন্যদে লাগে আবার সেই নৌকার লেজ ধরে
সেয়ে । কান্নাকাতি যেতে প্রবৃত্তিই হোল না ।
কাণ্ডকার কে একটা চোটেই বেবে কন্যে নাকে কাণ্ড
দিতে শূঁ করবে, ব্যাপারনাঃ চূড়ান্ত । বেবে যেন
আই নেই মৃন্ময়, সেই একময় কন্যের জন্যে জীবন-
তার নৌকার লেজ আটকে তপন্যা করতে হবে ।
হঠাৎ তার নাম—কাঁচা আর কাকে বলে । মার
পড়—

পরমানন্দজী শূঁহু, হটিছেন । নৌকার আগাপাতলা
পায়ে পায়ে ভরিপ করছেন তিনি । মাথা নুঁচিয়ে অঙ্গ
কটু সামনে কঁকে হাত বুঝা পিঠের ওপর রেখে
নৌকার হায়ে হায়ে হেঁটে বোকাছেন । অন্যমনস্ক গোল্ডেই
বলল, এঁড়ি গড়ায় আটকে লেটতি থাকেন ।

চোঁট খেলোই মূখলি কিতু, হেঁচট আনয়
মনবস্ত থাকি । জ্বর থেকে মৃত্যু—এই দরজা হোচ্ছে
হতকল্লা চোঁটের দর্শন । হেঁচট খেয়ে মূখ কুঁচকে
পড়তে পড়তে সামলে বাওয়া আবার বাকি হেঁটে
কেন একটি হেঁচট বাওয়া কেন সামলে ওঁটা আর এগিয়ে
বাওয়া এর নামই হচ্ছে হেঁচট বাকা ।

বলপাও হোল ঐ হেঁচট । সে মোক্ষ হেঁচটটির
পরে আর সামলাতে পারব না সেইটেই হচ্ছে—সেব ।
ঐ মোক্ষ হেঁচটের নাম হচ্ছে মৃত্যু । তারপর আর
হেঁচট নেই ।

হেঁচট দম্বে আর ভাবা সোল না, অকস্মাৎ
পরমানন্দজী দাঁড়া গভীরে হেঁচট খেলেন । সামলে
উঁসেন নৌকার পাক মূ হাত বয়ে কেসে তারপর হটি
কর করে মূখের দিকে তাকিয়ে সেইখানেই এঁড়িয়ে
বইলেন ।

দম্বে তখন সামলোচ্চ করছেন । সারাটা দিন হাড়
জায়া ঘাটাঘাটনির পর কব না একটু খিটখিট হোচ্ছে

সব হয় । তাই উনি দর্বাঙ্গে সামান্য দালাটে রঙের
পাউডার ছড়াচ্ছেন । তারপর বেগিয়ে পড়লেন । শিল্প
দিতে দিতে দাড়া করবেন ওঁর জন্মেশ্বরীর উদ্দেশে, দাবার
সমর আলোটা নিভিয়ে দিয়ে দাবেন । তারপর আনন্দ
অনুকারে বাকব, বস্তকল না বান্দ, কিরহেন অভিনায়
থেকে ততকল আমাদের আলোর মূখ দেখার উপায় নেই ।

সমুদ্রের জ্বর, সেই জ্বরের জ্বরেম্বরী সেই জ্বরেম্বরীর
উদ্দেশে সমুদ্রের অভিনায় দাড়া । সমস্ত বাপারটা
দাখিয়ে শূঁহুয়ে মেলাতে গিয়ে শূঁহুই অন্যমনস্ক হোয়ে
পড়লাম । অন্যমনস্ক হোয়ে কখন যে উঠে গিয়ে
হাঁড়িরেই, পরমানন্দজীর পাশে হাঁড়িয়ে সমুদ্রের অভিনায়
সম্ভা দেখাই একদম টের পাই নি । টের পেলাম
পরমানন্দজীর ফিসফিসানি কানে বেতে । সমুদ্রের
সঙ্গে উনি কানে কানে আলাপ করছেন । আমি কন
পাতলাম ।

“এই পশ্চন, অবিরাম এই আলোড়ন, বোপার এর
শূঁহু ! এর খেবে বা কোথায় ! কি সেই মহাপাকি বার
প্রভাবে সমুদ্র বেবে বাকতে পায়ে না, সমর পালিয়ে
বার বিনের পর হাত হাতের পর দিন অবিরাম পাক বেবে
দুর্ভতে থাকে ।

তোমার জ্বরে শূঁকিয়ে আছে সেই মহাপাকি,
তোমার আন আছে সেই মহাপাকির রঙ্গা । বধি
জুই একটি বার তোমার কলেরে বহো উঁকি দিয়ে
সেখতে দিতে !”

সমুদ্রের জ্বর রঙ্গ্য আনতে চাইলেন পরমানন্দজী ।
চুঁপ চুঁপ সরে এলাম ওঁর পাশ থেকে । হান্দুটার
দাবার ঠিক নেই । শাপলের প্রলাপ কে কাঁহা তক শূঁহুয়ে ।

আদমবী পদভাটাই তাঁর শব্দার ওপর উঁচু হয়ে বসে
আছেন । তাঁর ভাল লাগল, বৃদ্ধের ওপর ভেতর এক
রকম । হাঁহু পান্নু নেই, হাপিত্যেপ নেই, সর্দকবের
গভন পাতলায় দাপালের বাইরে পৌঁছে পশ্চনটুইও
উনি বন্ধন করেছেন । একদম নয় কুঁচিয়ে বেবে পেয়ে
যেন বম্ভটা, অপেশা করে আছে নয় দেবার লোক এসে
দর দেবে, তখন আবার চলবে । আকাশ-বাতাস শূঁহু
সমর শূঁহুকে ফেল চলবে, ওঁর কোনও সন্দেহ নেই চলান

দৃষ্টির দশে। দৃষ্টিহারা হোলে বেঁচে আছেন, স্পন্দন ওঁর হাতে কাছে পৌঁছতে পারছে না।

আতে আতে গিরে ওঁর সমনে বসে পড়ল। তাতে ওঁর একটুও ভাবান্তর ঘটল না। যেমন ভাবে বসেছিলেন, তেমনিই বসেছেন।

আগির অনাকৃত অশোভন আশাপটটি হৃৎ কণকে বেরিয়ে পড়ল—“আপনি তো বহুবীর এই পথে আসা যাওয়া করেছেন আদমতী, কি রকম বুকছেন? কাল বিকেল নাগায় কি আরগ্যা পৌঁছে যায়?”

বৃদ্ধের চোঁটিন্দুখানি শব্দে নড়তে লাগল। শুনলার—“বরুন, এই যে রাতটা আসছে এটা আর ঠিক সময় শেষ হোল না। রাত গড়িয়েই চলল, গড়িয়েই চলল। তাহলে বরুন, যখন আনরা পৌঁছই না কেন, এই রাতের মধ্যেই পৌঁছব।”

একদম বোকা বনে গেদার জবাবের মত জবাব শেষে। উৎকট বন্দনা, কিছ, চরম সত্যি কথা। সত্যিই যদি ঐ অদ্বৈত ঘটে বসে, রাতটা আর না শোকার, তাহলে এই রাত থাকতেই আনরা পৌঁছই যাই। রাত যে গোরাবার সময় শোবারবেট, এমন অস্বীকার পর কে লিখে দিচ্ছিল!

আদমতী অল্প একটু সময়ের মধ্যে আরও চান্দা গলায় বলতে লাগলেন—“একটানা দিন অবধা একটানা রাত কিংবা দিনও নেই রাতও নেই একটানা একটা সময়, এমনি বরনের একটা কিছ, মেনে নিলেই চালানো চুকে যায়। তারপর সকালে পৌঁছব, না বিকেলে পৌঁছব, না আবার রাত শোয়ালে পৌঁছব, এই সরল বাজে প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামিয়ে করতে হয় না। আরও এক কাণ্ড ঘটতে পারে। বরুন—হাওয়া উলটো দিক থেকে বইতে লাগল, নৌকাখানা উলটো দিকে চলতে শুরু করলে, সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রটাও শেষে দিকে ফিরে চলল। কল হোল এই, যে সর যেখান থেকে আমগা ওগোনা ছোটেছিল, ঠিক সেই সর ঠিক সেই স্থানটিতে আবার আমগা উপাধিত হোল। এই রাত কটা আর দিন কটা প্রেক হচ্ছে সেল এভটুক লোকসান নেই।”

তা নেই। লোকসানটা শেষ পর্যন্ত মন্ত বড় লাভে ঘাঁড়িয়ে যেতে পারে যদি সময়টা আরও বানিক পিছিয়ে যায়। পিছিতে পিছিতে একদম যদি না থাকে সর তাহলে

কি হয়! যে বৃদ্ধত্বটিতে পৃথিবীর বৃকে পরাপন করেছিল, সেই বৃদ্ধত্বটিও পার হওয়া যায়। তারপর অদ্বৈত আসে বা হিদান, যেখানে হিদান, যে ভাবে হিদান, জানা হোলে যায়।

বৃদ্ধই উত্তীর্ণ হোলে উঠল। কিছ, সময়টা কি সত্যিই উলটো দিকে বইতে শুরু করবে!

অসম্ভব নয়, কিছই অসম্ভব নয়। ভরে পর্যন্ত দেখছি, সময় সমুদ্রে জটার টান চলছে। হঠাৎ উজানের টান শুরুর তো হোতে পারে। উজান ভাঁটি, ভাঁটি উজান, উজান ভাঁটি, চমকতার। হে সময়ের দৃষ্টি কর্তা, হোহাই তোমার, একতিবার হয় করে উজানে বইতে আজ্ঞা কর প্রভু তোমার সমুদ্রে। সমুদ্র হঠাটা একটি বার চোখের।

“কি ভাবছেন? ভাবছেন বোধ হয়, সময় কি আবার পিছতে পারে। মনে করছেন, বৃদ্ধতার ভীমগতি রয়েছে।” আদমতীর গলার মত হঠাৎ মেনে চেলে উঠল, প্রতিটি বাক্যের ওপর অথবা জোর দিয়ে তিনি উচ্চারণ করতে লাগলেন—“সময় পিছিয়ে যায়। সময় পিছিয়ে গিয়ে ঠিক এক ভাগ্যস্বরূপ—দাঁড়িয়ে থাকে, তার প্রশ্ন চান? বহুবীর এই ঘটনা আপনাদের মীনেও ঘটছে, বহুবীর ঘটেও। বরুন—”

‘বরুন’ কথাটা হোল আদমতীর মূগা বোব। বরুন বসে একটু ঘানেন উনি, তাপর বা বরতে হবে তা শুরু করেন। আদমতীর কথামূলি শুর সাবধানে একটি একটি করে বেরে কেলতে হয়। কলহাসেই মৃদল, একটি বারের বেশী দৃষ্টিবার এক কথা ওঁর হৃৎ দিয়ে বেগবে না। অতঃপর বরতে লাগল। বরতে বরতে বা ঘাঁড়িল তা কামিনকালে বাগশও করতে পারি নি। সত্যিই তো ও রকম কাণ্ড ঘটছে। অনেকটা সময় পিছিয়ে গিয়ে এক ভাগ্যস্বরূপ আটকে পেরেছে। কোনও একটি বিশেষ ঘটনা, একটা বিশেষ জাতের অনুভূতি, এক জনের সঙ্গে এক ভাগ্যস্বরূপ—মন মেওনা মেওনার একটি শব্দ বাক্যেরা অনুষ্ঠান, একটা সত্যীর বেনা বা একটা শব্দেই আনুভূতি, ঐ রকমের কোনও কিছ, অবদমন করে অনেকবার অনেকটা সময় পিছিয়ে গেছি। আটকে থেকেছি বহুবল সেই অনেক পিছনের সময়কৃত্তে।

তারপর আবার একময় হলো শত্রু হোবাইয়ে সম্বোধন দশো পা কেসে। উজানের স্রোত আবার ভাঁটিতে বইতে শত্রু করেছে। আতর্ক ব্যাশার। দর যে সত্যিই পিছতে পারে, পিছিয়ে গিয়ে এক জায়গায় আটকে থাকতে পারে, ওটা কেন আসে টের পাই নি।

আদমজীর কথামতো ঘরতে গরতে জামি না কখন কেমন করে সরের সঙ্গে উজানের চামে পিছিয়ে যেতে লাগলাম। পিছতে পিছতে আসলাম আদমজীর সঙ্গে, আটকে গেলাম এক জায়গায়। আদমজী এক অল্পত দৃশ্য দেখাতে লাগলেন।

“কি চাও তুমি?”

“সেটা আমি জানার কাজ শেষ করে।”

“না, আগে বল কি দিতে হবে। আগে কথাবাতা ঠিক হওয়া ভাল।”

“না, আমার যা নেবার কাজ শেষ করে নোব।”

“তা দিতে পারব কি না, আমি জানতে চাই। হয়তো তখন তুমি অসম্ভব কিছ্ গাণি করে বসবে। হয়তো এত টাকা চেয়ে বসবে যা দেবার সামর্থ্য নেই আমার। যা দিলে আমাকে পথে বসতে হবে।”

“টাক কড়ি হল সৌগত তোমার কাজ থেকে আমি চাইবও না, নোবও না। তুমি কি বনে কর, টাকার জন্যে আমি ও কাজ করতে বাচ্ছি। টাকার বসলে এ কাজ করা যায়।”

“টাকা দেবে না ভা’লে।”

“ভর পাচ্ছ কেন। আমি তোমার কথা দিচ্ছি, টাকা আমি নোব না। টাকা দিয়ে যা কেনা যায়, এমন জিনিস আমি নোব না। তোমার বাড়ি যাকনা মান ইচ্ছাত সব বজায় থাকবে। তোমার দশমিন পারোজা হবে। আমি আমার পাওনা দিয়ে বিদায় হবে। জীবনে আর কখনও আমার দৃষ্টি দেখতে পাবে না। বিশ্বাস কর আমার কথা। আমরা লোক ঠকাই, ভেলকি দেখিয়ে পেট চালাই। কিন্তু কথা দিয়ে কথার বেদাদ করি না। ইরানী মেয়ের মান নেই, ইচ্ছাত নেই, যা বাড়ি রাখা সৌজবার মান এমন কি বা বাপের পাঁচের পল্লত নেই। কিন্তু একটা জিনিষ আছে। ইরানী মেয়ে কখনও ফাকেও কথা দেবে না।

আর যদি দেখ কখনও কথা, সে কথা সে রাখবেই। বিচ্ছই আমায়ে ঠিক নেই কিনা, তাই জবাবটা ঠিক থাকে। জবাবটা যে বুকের ভেতর আছে, ওটাকৈকি হেলানো যায়।”

“আচ্ছা-বাও। সামর্থ্য যদি কুলার, তুমি বা চাইবে তা যোব। আমার জবাবও ঠিক থাকবে। কাজ শেষ করে এসো।”

যাওয়ার একটা চক্কর লাগিয়ে মাথার বাঁধা কুমাল খানার চেউ ভুলে পিঠে কোলানো বেশিটা দিয়ে এক কাপটা লাগিয়ে ইরানী মেয়ে হাতজার আসে উভে চলে গেল। নামনে লাঁড়িয়েছিল যে বীশ্বদেব শত্রুগাট সে আমার দিকে কিয়ে হাডাল।

ভরানক বরক চমকে উঠলাম। শব্দ আদমজী পছন্দাই বুকে হবার আসে উনি যেমনটি ছিলেন। হাঁ, হু’বু’ মিলে গেল। একই লোক, অনেকটা সর পিছিয়ে গেলে উনি আবার ঠিক ঐ ববই হবে। কিন্তু পিছিয়ে কি উনি যেতে পারবেন!

পরের দৃশ্য।

আদমজী, ও’র মতী, আর ও’দের পাঁচ হ’বরের একটি ছেলে। পছন্দ পাঁচ, চমক তুণ্ডি, পছন্দ আবহাওয়া বইছে। গিরাগিনের শত্রু নিশাত গেছে। লোকটা ছিল ভক্ত জোজর বতপূর সম্ভব হাড়ে হাডামদায়া। অনবরত টাকা নিভড়ে বার করেছে আদমজীর কাছ থেকে। তার দৃষ্টি বহু করার জন্যে গাণি গাণি টাকা তাকে হু’ব দিতে হোয়েছে। বর্তমান বেঁচে থাকত, ঐ ভাবে শত্রু নিত। আপন গেছে, হতভাগা তার লাশটোর কল হাতে চড়ে পেয়েছে। কুণ্ডিত মায়তে গিয়েছিল ইরানী মেয়ের সঙ্গে বুকে ছোঁয়া বে’না পড়ে আছে শত্রুরে বারে। যোশবা সহরে যাবতীয় ইরানী ছিল, সব উবাও। সহরে কোদাখ ইরানীদের একটা ভাব নেই।

শেষ দৃশ্য।

আদমজী অধির হোয়ে উঠেছেন। আসছে না কে সে তার বকপিস নিয়ে যাচ্ছে না! তবে আসবে সে কি আমি কি চলে যববে।

‘কি যোল ! কি বললে তুমি। একটা ইরানী মেয়ের সঙ্গে তোমার ছেলের দূর ভাব হোলে পেছে ! যোগে সে মেয়েটা আসে। তোমার ছেলেকে নিয়ে খেলা দেয়। সেটের বাইরে বসে সেই ইরানী মেয়ের সঙ্গে তোমার ঐ অন্তর্ভুক্ত ছেলে খণ্টার পর খণ্টা বকবক করে। কেন এত দিন বসনি আমাকে ? বাও, নিশাগির ডেকে আম ছেলেকে। আমি জানতে চাই, কখন সে আসে। সেই ইরানী মেয়ের সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে চাই।’

আদমজী গাঁড়িরে ধইলেন। ওঁর স্ত্রী ছেলে আনতে সেলেন।

ভাষণ—

আদমজী গাঁড়িরেই আছেন। পাখরের বত হোলে গেছেন যেন। নড়ছেন না, চোখের পাতা পৰ্বত নড়ছে না। কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না, কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না যেন। ওঁর স্ত্রী ওঁর পায়ের সামনে পড়ে আছাড় পিছাড় খাচ্ছেন।

বাও আন আমার ছেলেকে। আমি ভুল করেছি, বুকতে পারিনি যে সেই সর্বনাশী আমার ছেলেকে চুরি করবে। বুকতে পারিনি বলে তোমার জানাইনি। আমার ভুল, আমার কসুর, আমি তোমার পায়ে রাখা দাঁড়ছি। আমার ছেলে বুকছে এনে দাও।”

অতীতের গভীর থেকে উদ্ধার করে আমার শাসনের বুক বৌকার ওপর নিয়ে এসে আমার আদমজী পুনঃভাই। এনে বসলেন—‘ঐ ছাচপাটার আমি আটকে আছি, আমার সর এগর না শেহ না। আমি কি করে বলব, এই নৌকা কবে কোথায় গিরে ভিড়বে। ভিড়ুক, না ভিড়ুক, আমার কোনও কতিবুছি হবে না। আমার সর পালিয়ে যায় না। দরখের ছাত থেকে পালাবার জন্যে আমিই ভেলে বেড়াছি।’ ছেলের না সশেই রয়েছেন। ওঁর ছেলে ওঁকে দিতেই হবে কিংবদন্তি, কিংবদন্তি যেতেই হবে।”

[ক্রমশঃ]

জালিন হুঁদী ছিলেন।
তিনি অনেক জীবিত
ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলেন
—যি ক্রুৎকেতব ভাষ্য।
ক্রুৎকেত বীর, কান
ত্রিবি হুত জালিনকে হত্যা
করিয়াছেন।

আজব দুর্নিয়

শ্রীজ্ঞানপাপী

আলবেনিয়া এখনও
জালিনকে আঁকড়াইয়া
আছে— যি ক্রুৎকেতব
গোঁদা।

“আবার প্রমাণপণ আবার
তবে তাঁহারে বড় করি
নামে।”

যি: চৌ-এক-লাই জালিন শবাবারে হালাদান
করিয়াছিলেন।

যি: ক্রুৎকেত বলিতে পারেন “এবায়”।

বাঁপ না থাকিলে ভো বাঁপী বাঁচবে না।

হাশিয়া ৯০ হেসাটনের আনবিক বোনা কাটাইয়াছেন।
এবায় ক্রুৎকেত ১০০ হেসাটনের কথার বোনা
কুটাইবেন।

ইংলণ্ডের নোভাতিগনী এলিজাবেথ দানার প্রধান
শ্রেণী ক্রুৎপাশ নক্সার লিহিত পাঠিয়াছেন।

হুদ ভাস কথা। বিপাকে পড়িলে সিংহ ও গরুভের
দোষাত সহ্য করে, সিংহিনীকে না হয় নিজের লিহিত
কটু নাচিতে হইল।

হুদ জিটানিয়া।

ঐ নেহরুই একবার চিরশিশু—জ্ঞানদেব অভিনয়ন।
চিরশিশু কিনা জালি না তবে বিকটাই ইহা তাঁহার
হত্যার শৈল্য।

ঐ নেহরুই বয়স বাহাডর।

বিশ্ব শৌখিন প্রতিযোগিতায় মোদানকারহনী
নিউজিল্যান্ডে শ্রেষ্ঠা সুন্দরীর শাড়ি শূন্য বিভাগ
আটক করিয়াছেন।

শূন্য বিভাগকে বন্যাবাহ। প্রতিযোগিতায় শাড়ি
একটি অপ্রয়োজনীয়। উন্মোক্তাপন পরে বাহ্য করিতেন
শূন্য বিভাগ তাহাই শূন্যকে করিয়াছেন।

ভারত সংকটের বিবানিয়ার সুযোগে চীন নাকি
আবার ভারতীয় এলাকা দখল করিয়াছে।

দত দোষ নব্ব দোষ। ভারতীয় কনিউনিউরাই
অপরোধী। শ্রীঅতুল্য কি বলেন?

হুদ বিবেকের জন্য নাকি'ন বক্তৃতাষ্ট ভারতীয়
সাম্প্রতিক হলের অনুষ্ঠান বহু হইয়াছে। —সংবাদ
দাবাস নাকি'ন গণতন্ত্র।

কলিকাতা ক্রিকেট টেস্টের টিকিট পাওয়া
দাইবে না —সংবাদ।

টাকার কি না মেলে। ক্রিকেট টিকিট তো ছাড়।
দামের শব না হয় শিল্পের মাতা আছে।

কলিকাতার বিশ্ব তাক্কাদের দাবাবেন হইয়াছিল।
ভারতবর্ষকে আর দকেট নির্মাণ করিতে হইবে না।

আবার নির্বাচন আসল।

ভোটদাতারা সতর্ক হউন।

ব্রাহ্মসমাজে বণিত বর্ণদ্বয়

উপাখ্যানটি বহুল প্রচারিত
এবং অতিশয় জনপ্রিয়।

এই উপাখ্যানটির সংক্ষিপ্ত
বিবরণ নিচে প্রদত্ত হইল।

গোবাবরী নদীর তীরে

পঞ্চাশতাব্দে যখন রাম,

লক্ষ্যণ সীতা অবস্থান করিতেছিলেন তখন একদিন
রাবণের ভগিনী সূর্যমুখা বিচরণ করিতে করিতে রাম ও
লক্ষ্যণকে দেখিতে পাইলেন। তিনি তাঁহাদের সৌন্দর্য
দর্শনে বিমোহিতা হইলেন এবং কাশ্য-রথস্বা হইয়া রাম
কিংবা লক্ষ্যণক পতিরূপে সন্দেশ করিবার অভিলাষ
প্রকাশ করিলেন। রামচন্দ্র এই দৃষ্টান্ত প্রত্যবে অতিশয়
ক্লান্ত হইলেন এবং লক্ষ্যণকে সূর্যমুখার নাসিকা ও কর্ণ
দেহন দ্বারা তাঁহাকে বিভ্রান্তরূপা করিবার ক্ষমতা
করিলেন। লক্ষ্যণও কোথ হইতে যত্ন বর্হিত করিয়া
সেই রাক্ষসীর কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করিলেন। এই
অবস্থানমায় প্রতিশোধ লইবার ক্ষমতা সূর্যমুখার অপর
স্রাস্তা ধন এবং তাঁহার সেনাপতি বৃষ উভয়ে যুদ্ধ
করিবার অভিলাষে রাম ও লক্ষ্যণের প্রতি সন্দেশ
অগ্রসর হইলেন, কিন্তু সেই যুদ্ধে উভয়েই প্রাণ বিসর্জন
করিলেন। অনন্তর হিরণ্যকশিপু রাজা সূর্যমুখা তাঁহার
অগ্রজ রাবণের সাহায্য চিন্তা করিলেন। রাবণও তাঁর
ভগিনীর চরিত্রের ব্যর্থ হইয়া তাঁহার প্রত্যবে সম্মত
হইলেন এবং রাবণের ভাৰ্য্যা সীতাকে ধন করিয়া সূর্য-
মুখার প্রতিশোধ লইবেন—এই অভিলাষে তাঁহাৎই
আশ্রিত মায়ারী মারীচ রাক্ষসের পর লইলেন। বিশেষ
অনিচ্ছা সত্ত্বেও, রাবণের ভয়ে ভীত হইয়া মারীচ
রাবণকে সাহায্য করিতে সক্ষম হইল।

অনন্তর রাক্ষস মারীচ, রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া
অত্যন্ত অক্লান্ত বর্ণন বৃত্তরূপ ধারণ করিল। তাহার দৃশ্য
উৎকৃষ্ট বর্ণনাদ্বারা, দৃশ্য বস্তুর ও নীলোৎপল-সম্বর্ণ, বহন-
মণ্ডল ও কৃষ্ণপ্রভাষ, কর্ণ ইন্দ্রনীলমণি-সুলা ও গাজের
বর্ণও নীলোৎপলের সমান, ক্রীড়া ক্রীড়া উত্তর, উত্তর-বর্ণ
ইন্দ্রনীলমণি-সুলা, গাজের বর্ণ পদ্মকণরদ্বারা ও মনোহর

স্বর্ণমুগ

[আলোচনা]

মনোমোহিত সেন

★

চিহ্ন, উত্তর পার্শ্বের বর্ণ
মণ্ডল-সুলা, দৃশ্য বস্তুর
মণি-সুলা, ওজা ক্রীড়া,
সম্মত নিম্ন এবং পূজ
ইন্দ্রমুখের দ্বারা বিচিত্র বর্ণ
ও উজ্জ্বল উজ্জ্বল; সেই
রাক্ষস কণকাল-মধ্যে ও বৃষ

বিবিধ-বৃত্ত-পরিবৃত্ত অতীত মোহিত এক দৃশ্য
হইল এবং বিবিধ দৃশ্যসমূহে চিত্রিত দৃশ্য সেই
মনোমোহিত বৃত্তরূপ ধারণপূর্বক সেই বর্ণ বন ও রামের
আশ্রয় উজ্জ্বল করিয়া বিবেচনাক-দৃষ্টিতা সীতাকে
প্রলোভিত করিবার নিমিত্ত আশ্রয়ের চতুর্দিক ভ্রমণ
করিতে লাগিল। সীতা পুষ্করভ্রমণ করিবার সময় বর্ণ ও
বৃত্তবর্ণ-পার্শ্বের মোহিত সেই অক্লান্ত বৃত্তরূপে বর্ণন
করিয়া অতীত দৃষ্টি হইলেন এবং তাঁহাৎই মারীচের
নিমিত্ত বৃত্তটিকে আনয়ন করিতে বানীকে অক্লান্ত
করিলেন। রামচন্দ্রও তাঁহার সন্তোষবিধানার্থ বৃত্তরূপে
সম্মত হইয়া বর্ণদ্বয়ের পক্ষ-দ্বন্দ্ব করিয়া বহু দূর
উপনীত হইলেন এবং অতীত দৃষ্টি হইয়া বৃত্তরূপে
আশ্রয়পূর্বক অবস্থিত করিলেন। অনন্তর রাম বৃত্তরূপে
মারীচকে পরবারা বিদ্য করিলেন। তাঁহার অক্লান্ত
কালে লক্ষ্যণ সীতার রক্ষা করিতেছিলেন। ইত্যবসরে
মারীচ, বৃত্তরূপে আশ্রয়পূর্বক পূর্বে লক্ষ্যণকে সীতার সন্নিকট
হইতে অপসারিত করিবার উদ্দেশ্যে এক কৌশল
অবলম্বন করিল। মারীচ রামচন্দ্রের কণ্ঠের অক্লান্ত
করিয়া “হা সীতে! হা লক্ষ্যণ!” এরূপ শব্দ করিল।
সীতা, মারীচ শব্দের দ্বারা সেই আশ্রয় শ্রবণ করিয়া
সন্দেশ করিলেন যে, তাঁহার বানী অতিশয় বিশদ হইয়া
চীৎকার করিতেছেন এবং লক্ষ্যণের সাহায্য প্রার্থনা
করিতেছেন। সেই কারণে সীতা লক্ষ্যণকে রামের
অভিমুখে দীর্ঘ বাণিত হইতে আজ্ঞা করিলেন। লক্ষ্যণ
সীতার বক্তব্যবাক্যে নিরুদ্ধ ছিলেন এবং স্রাস্তা
রামের আদেশ শ্রবণ করিয়া গমন করিতে অভিলাষ
করিলেন না। তখন সীতা লক্ষ্যণের দৃষ্টান্ত দ্বিধা সন্দেশ
করিয়া আশ্রয়-দ্বন্দ্ব অতিশয় অশোভন ব্যর্থ

লক্ষণের মধ্যেই চূড়ান্ত করিলেন। অদৃশ্য লক্ষণ সীতাকে আশ্রয় এতদধীন তাইরা তামের সাধারণ্যে পদন করিলেন। এই অশ্রয় তাইরা সীতাকে ছেদ করিলেন। মহাভারতের মনস্ক, ২৭৭ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, তাম ঐ মৃগকে নিশাচর বলিয়া ঘোষ করিয়া (প্রচারিত হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া) অশ্রয় অত্র গ্রন্থপুঙ্খ ঐ দুই নিশাচরের প্রাণ সংহার করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ মৃগ-পঞ্চ-প্রসঙ্গে বাহ্য লিখিত আছে তাহার কিরূপে প্রকাশিত হইল।

মৃগঃ (মৃগরতে অঃ) যস্মিন তুণ্যদিকং মৃগ্যতে বা ইতি।
মৃগ্+ইতৎ+তৎ+কর্তরি চ কা।। পত্নমাত্ম। (যবা, হজ্জাঃ ৫।১০।) অঃ যবপদ্ম। (যবা, সাহিত্য কর্পণে।)
হজ্জাঃ—ইতি মেদিনী।

“কনকদ্বয়ে জ্ঞাত কনকমৃগতৃক্কাভিতায়া হতো
বৈবেক্যেতি প্রতিপত্ত্ব্যন্ত প্রলিপিতম্।
কৃতালক্যতর্ক্যবনপরিণাতিমুটন্য
মহাশ্বঃ রামঃ কুলপনমৃতান বসিষথাঃ”
কনক মৃগত্বং মৃগে অশ্রয়ণে। পক্ষে। কনক মৃগে
দ্রব্যবিশেষ বা তুচ্ছ ইত্যর্থঃ।)

তামের পক্ষে অর্থঃ—অন্যদ্বয় নামক অর্থঃ বর্ণ
সেব অর্থঃ অত্র অর্থঃ বিবৃতি হইয়া। এবং প্রতি-
পক্ষে ‘বৈবেক্য’ মৃগ উভয় করিয়া অল্পপূর্ণোচনে
যদি প্রাণ করিয়াছি। লভ্যাবী বাহ্যের মৃগপুঙ্খ
মৃগ্যার্থে বাণ নিক্ষেপ করিয়াছি। ইহাতে আমার রাম
কর্তৃক হইয়াছে কিম্বা কুলপন-মৃত্যু অর্থঃ সীতাকে
হাসি পাই নাই।

বহিঃপক্ষে পক্ষে অর্থঃ—সর্বের অর্থঃ বিবৃতি
ইয়া এবং ‘বৈবেক্য’ অর্থঃ ‘মৃত্যু’ এই বাধ্য বলিয়া
যদি লোকালয়ে দুইয়া বৈবেক্যইতি এবং পক্ষে পক্ষে
প্রাপ্তোচনে প্রাণ করিয়াছি বনী লোকের মৃগের
যদি আমার কোম্বা বনী বা বিবৃতি করিয়াছি? তাহাতে
যদি প্রত্যগত্বের রামবলাত করিয়াছি। কিম্বা কুলপ-
ন-মৃত্যু অর্থঃ বহুল অর্থঃ প্রাপ্ত হই নাই।

কর্ণপদ পঞ্চটি যে মৃগপুঙ্খ পুঙ্খ সংস্কৃত বচন
হোই প্রমাণিত করিতেছে। এই প্রসঙ্গে অপর একটি
অর্থ বচন উদ্ধৃত হইল। “অনন্তরো রি মেঘমগ্নত তম

তথাপি তাহা পোষ্যে মৃগ্য প্রাণসংস্কারে বিলম্ব-
কালে বিবাহে পুংলা মলিনা ভবতি।” এবং তামেরই
বচন অনন্তর জিনিষের অন্য লোক করিয়াছিলেন, তখন
আর সাধারণ মানুষ যে তাহা করিতে সে আর
বিভিন্ন কি?

লক্ষণও প্রিয়াক করিয়াছিলেন,

“মৃগো ঘোষ্যবিধো রতবিভিজ্ঞো মাতি তাবৎ।

কগত্যো কগতীনাং মাইয়া হিন সংখ্যেঃ।”

“যে ঘৃণনম্ সংখ্যতে। তুহলে উৎপন্ন রতভিত্তি মৃগ
ন ই। হই। নিশাচর মৃগের কাণ্ড, ইহাতে অমৃগ্যত্ব
সংস্কার নাই।” অর্থঃ ৩০ সর্গ।

একপক্ষে বক্তব্যঃ এই প্রসঙ্গ উল্লিখিত পাঠে যে, বনবাস
কালে সর্বের এমন কি প্রাণসংস্কার হইতে পারে বাহ্য
অর্থঃ তাহা সীতাকে লক্ষণের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া
মৃগতনী মারিচের অল্পমদ করেন। সকলেই জানেন,
কেবলমাত্র তামের চতুর্দশ বনবাসের বাহ্য হত,
লক্ষণও সীতা বৈবেক্য তামের সতি বনামৃগমন করেন।
বনমৃগের অনতিপূর্ব তামের বিলম্বিত মৃগ বন
পরিভ্রমণ করিয়া মৃগ-পরিবেশে চৌ (পাছের দ্বার)
প্রাপ্তপূর্ব পরিবাস করিলেন। লক্ষণও অত্যধিক জ্ঞাত-
প্রেম বশতঃ তামের অশ্রুপূর্ণে বিবিরিহিত বীর
পরিহিত মৃগ বনবাস পরিভ্রমণ করিয়া পিতার সমক্ষেই
মৃগ-পরিবেশে চৌ পরিবাস করিলেন, কিম্বা অত্যন্ত
বিষম হইয়া গেলেন। অনন্তর কৌশল-বন পরিভ্রমণ
সীতা যেই বীর পরিবাসার্থে সেই চৌ বন বর্ণন করিয়া
বেদন মৃগী আল দেখিয়া ভীতা হয়, সেইমূহ ভীতা
হইলেন। সীতা যেই চৌ পরিবাসে অনতিজ্ঞাত বনতঃ
লক্ষ্যভিত্তর জ্ঞাত, অত্যন্ত ব্যাধুল-মানস হইলেন। পরে
তিনি বাসপূর্ণ-বন হইয়া স্বামীকে ‘বনবাসী মৃগ সকল
কি প্রকারে চৌ পরিবাস করিয়া থাকেন?’ এই কথা
বিস্তারিত এবং পুনঃপুনঃ সোধ-প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।
সেই বকল-পরিবাসে অনিপুণ সীতা যেই কণ্ঠ যেন
এক খণ্ড চৌ বিভ্রমণ করিয়া অপর এক খণ্ড চৌ যত্নে
পাইয়া লক্ষ্যভার তাহা বক্তব্যমান হইয়া গেলেন। অনন্তর
রাম সত্বর সেই সীতা যেই বনবাসে পাইয়া বহু
জ্ঞান কৌশল-বন পরিভ্রমণেই চৌ পরিভ্রমণ করিয়াছেন।

লাগিলেন। এই মর্মভরী দৃশ্যে সধুপস্থিত মহম্মদী
নিবিশেষে সকলেই অশ্রুধারা অধিকৃত হইলেন। ইহা
সম্পন্ন হইয়া গেল। বহির্ভূত সখিক বিচলিত হইলেন
এবং যে যেহু সীতা যেনী এতল বনবাসে নিযুক্ত। হন
নাই তাঁহার চীর পরিচয় অব্যবহৃত, এই ভাবে
অনুমানিত হইয়া তিনি সীতা যেনীর চীরা-পরিচয়
নিবারণ করিয়া তাঁহাকে উত্তম আচরণ ও বদন লক্ষ
প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিলেন। অনন্তর হনুমান
কোবাথকক বীরা-অভিগতক বাক্য বলিলেন,—

“বাগ্যাসি চ বহাধিবি জুগাশি মহাশি চ।

বর্ষাভোগ্যনি সংখ্যাং বৈবোধ্যঃ কিপ্রমায় ১৫।

নরেন্দ্রেণৈব শূন্যক পদা কোমলং ততঃ।

প্রাচ্যং সর্বভূতা সীতাঃ কিপ্রমেব ১৬।

স। সীতাঃ সীতাঃ সীতাঃ সীতাঃ সীতাঃ সীতাঃ

কুমায়াঃ সীতাঃ সীতাঃ সীতাঃ সীতাঃ সীতাঃ

সীতাঃ সীতাঃ সীতাঃ সীতাঃ সীতাঃ

উপাভোগ্যনি সংখ্যাং বৈবোধ্যঃ কিপ্রমায় ১৮।

তিনি সন্তর বিহীনশ্রী সীতার নিমিত্ত এই
চতুর্দশবর্ষের উপযুক্ত মহাশূন্য বদন ও উৎকৃষ্ট জুগ সমস্ত
আদরন কর। অনন্তর কোবাথক নবোক্ত বনবাসকৃত
সেইজন উক্ত হইয়া তখনই কোবালয়ে বাইরা আদরন
পূর্বক প্রতিমিত্ত হইয়া সীতা যেনীকে তৎসমস্ত প্রদান
করিলেন। সেই বদননমোভাষা শুভলক্ষণ-জাত। বিহে-
চুতি। সীতা যেনীও সেই সমস্ত বিভিন্ন জুগ যাত্রা শুভ-
লক্ষণসম্পন্ন অঙ্গলক্ষণ বিবৃতিত করিলেন এবং সমাক-
বিকৃতিত হইয়া, উত্তরকালে বর্ষে প্রভা বেলল আকাশ
বগুন শোভিত করে। সেইজন সেই গৃহ শোভিত
করিলেন।” (অব্যোধ্যাকাণ্ড, ১২৪র্থ)। তখনই এবং
হতকাল পর্বত বনবাসে ছিলেন, রামের সহধর্মিণী সীতা
যেনী বাজবদন বেলনিবাস পরিহারপূর্বক বাহ-লক্ষণের
জ্ঞান বদন পরিচয় করিয়াছিলেন, এইজন কোবাথক উল্লেখ
নাই। পরন্তু বনবাসের ত্রাণার্থ বর্ষেও সীতা বাজ-
পরিহারের জ্ঞান বেলজুগ বিজুহিতা থাকিতেন, রামায়ণের
একাধিক স্থলে তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত পরিচালিত হয়,
তদ্ব্যপেক্ষ উক্ত হইল। অত্যা কাণ্ডের ৫৪ পর্বে
লিখিত আছে,—

“সিহমায়া তুইবোধী কজ্জিগবদশাতি।

বর্ষা নিবিশ্রুতান পক বাসপুত্রব নু ১।

তেষাং যথা বিশালাক্ষী কৌশেয়ঃ কমপ্রভবঃ।

উত্তরীয়া বরাহোহা শুভম্যাতবগামি চ ২।

কুমাচ বহি বাহাং শাসেন্দ্রিতি জামিনী।

বহুং শূন্য তৎপ্রাচ্য, নিশিগ্ধঃ সততঃ ৩।

“বরাহোহা বিশালমহনা বিহেচরাক-তনয়া সীতা,
হাবণ কর্তৃক স্ত্রিমমায়া হইয়া কোবাথক নামকে দেখিতে না
পাইয়া বাইতে বাইতে পর্বতশৃঙ্গ উপস্থিত প্রধান প্রদান
পাঁচটি বানহকে বর্ষন করিলেন এবং ‘বহি তাহারা রামের
নিকটে কর্ত্তন করে’ এই মনে করিয়া তাহাফিগের নিকটে
তৎপ্রভত উত্তরীয়া কৌশেয় বহু ও কুমোহর অদকার সতল
নিশেগ করিলেন।”

এখানে বিচার করিয়া দেখা যাক, এমন কি বিশেষ
কারণ বলিতে পারে বাহার জন্য রাম এবং সীতা উভয়েই
যাদিচের প্রবেশন-প্রত্যাহ প্রভাতিত হইবার নিমিত্তে
জুগেগ বিদাছিলেন। এই প্রসঙ্গে টেলেরি ‘প্রাচীন
ভারত’ নামক গ্রন্থে তৎপ্রভনার মন্তব্যেরে সম্প্রদায়
মন্তব্য চইতে বিদ্যানে উদ্ধৃত হইল। “Gold,” says Mr.
Coloquhoun, has been for centuries with-
drawn from the beds of the Jirawadi, Sitang,
Salween, Mekong, and Yang-tsi Kiang
rivers. The gold-reefs of Southern India which
have of late attracted so much notice, are,
he points out, but outcrops of the formation
which extends on the surface for thousands
of square miles in the Golden Peninsula.

সিহমায়া বরাহোহা ১২৪ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর
তারিখের ইংরাজি দৈনিক ‘অনুভব বাহার পত্রিকা’
প্রকাশিত হইয়াছে। Gold deposits had been
found in some places in Andhra Pradesh, Mr.
Sarwan Singh, Minister of Steel, Mines and
fuel, told Mr. N. V. Krishna Rao in the Lok
Sabha today, (sept. 7)

রোমান ঐতিহাসিক স্ট্রাবো এক স্থলে লিখিয়াছেন
যে, সীতার বনবাসের সময় তাহাকে সোনার বর্ম ছিল।

। পূর্বে এতৎ হাকার বনদেশেও পূর্বে গোমার কার্বে সম্ভবতঃ
সমস্ত বনোই সমৃদ্ধ ছিল।

মহাভারতের বনপর্ব. ২৭৩ অধ্যায়ে লিখিত আছে
অনন্তর রাবণ কর্তব্যাবধারণ পূর্বক তদনিকে
সুপ্নাবধায়ে) সাক্ষাৎ ও মন্ত্রিগণের নগরের বাক্যভাষা
স্বর্ণণ করিয়া অস্ত্রদিকে উপস্থিত হইলেন। পরে
ঐকুট ও কালপর্বত অতিক্রম করিয়া অতি দীর্ঘ
ভৈমিরবনসকুল দাগর নিরীক্ষণপূর্বক অনাগালে উল্লম্বন
করিয়া ভগবান শূলপাণির প্রিয়তম পোকর্কস্বমে
কাকিণ্যোত্যে অবস্থিত উত্তর কর্ণাটে একটী ভীষণস্থানে
ঔপস্থিত হইলেন। সে স্থানে তরীয়া পূর্বামাত্য মারীচ
গমনকমে নিত্যাক্ত ভীত হইয়া অতি কর্ণের তলে ছুটান
করিতেছিল, রাবণ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহার
গৃহিত সাক্ষ্যে করিলেন। মহাভারতের বনপর্ব ২৮
অধ্যায়ে ইহাও বর্ণিত আছে যে, “গোকর্ক নামে এক
ত্রিলোকবিখ্যাত ঋষি আছে উহা পরমপবিত্র ও মহত-
লভক। * * * তাহার বিবিধ বৃক্ষ ও তৃণাদি-শস্য
কলমূল-বিশিষ্ট পবিত্র হেবদম নামে পর্বত আছে,
উহা অনন্তপাণিগের আশ্রয়। ঐ স্থানে বরকলস-শস্য
মদিসহ বৈশূদ্র নামে পর্বত আছে; তাহা অগ্নির
আশ্রয় বলিয়া বিখ্যাত।”

‘পক-টা’ অগ্ন্যেতার আশ্রয় হইতে মাত্র দুই যোজন
(আট ফুট) দূরে অবস্থিত ছিল। (হামারণ, অধ্যায়
কাত ২০ সর্গ।)

এই বৃক্ষে পূর্বে ‘টলেমি’ এর বইতে অশ-
বিনেব পুনরাব উল্লিখিত হইল।

Vaidurya—This chain has been mentioned
in the Mahabharata (Vana P. L X X X VII,
8343; L X X X IX, 8364—61; C X X I)
which states that the Pandaves in their pil-
grimage went from Vidarbha across these

mountains, to the river Narmada. Thus
the range seems to be the satpura range
(Source of Godavari river) or a portion
of it.

Vaidurya means Lapis lazuli and the range
was so called evidently because the costly
stone was to be obtained there.

পুত্রহাং বলিতে লাগা যায় যে, মারীচ বন্যার বাস
করিত তাহার অথবা তাহার দাঁড়কটবর্তী স্থান সমুদ্র ঘর্ণ,
বৈশূদ্র্য যদি প্রস্তুত হুলাবান সামগ্রীসকল অপেক্ষাকৃত
অদারাসমৃদ্ধ ছিল।

উল্লিখিত বিষয় সমুদ্র হইতে এখন অল্পমান করা
যুব অলম্বত হইবে কি যে, বনবাসকালেও সীতাত মন
হইতে হুলাবান অলম্ব্যাবিহিত প্রতি আসক্তি সম্পূর্ণ
তিরোহিত হইয়াই? মারীচের বিভিন্ন বহুলা বস্ত্র বি-
চিত্র মনোমুগ্ধকর বৈশূদ্র্য অশ্লোকন করিয়া নীতা
কর্ণকং লোভাক্রান্ত হইলেন এবং মারীচ শূলক চপলতা-
বশতঃ তাহাচক্রকে অকল্পন বস্ত্রাধি সংগ্রহ করিবার ভক্ত
লম্বির্ভুত তত্ত্বোচ্য করিলেন। লক্ষণের মাধেব সন্তোষ,
মারীচের প্রত্যোক্ত্যর কাম্যাক্ষ্যাম সীতাব মনো-প্রস-
বস্ত্রাধি অধোপে মরীচিকাত্রয়ে মারীচের অল্পদমন
করিলেন। (বিবাকলের কাহিনী পরগণ)। প্রত্যাহিত
হইয়াছেন বৃক্সে পাতিরা নাম মারীচকে বনম করিয়া
কুটীয়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং নীতাকে দেখিতে না
পাইয়া থেকে হতচৈতন্য হইয়া ভিত্তিকণ বিলাপ
করিলেন। বাম যে অভিশপ্ত কাম্যাক্ষ্যর দিগেন মহাবি-
দ্যাক্ষিক ইহা স্পষ্ট তাহার বলিতে কোন ভ্রুটি করেন
নাই। স্বাভাবিক অপর্যাক্ত ৬২ সর্গে বর্ণিত আছে যে,
পরে রাম কাম্যাক্ষ্যে নীড়িত হইয়া নীতাকে দেখিতে না
পাইয়াও বেন ভীতাকে বর্ণন করিতে কাতকোষে বিলাপ
করিতে লাগিলেন।

৮) দ্বিচ্ছিন্নে বহু বস্তু
বিকৃতি। হ্রিব বিপিন্ততা
বহায যেষে বিকৃতির
আধায়া ব্যাপ্তিহেরে যোড়ায়

প্রাচীন ভারতীয় ব্যঙ্গচিত্র কল্পলৈ সবুকার

সম্পত্তি যেষে ব্যুৎপাদে
কাটুনের এই বহা
ভাব্যায়ার মূত্ৰপাত অষ্টায়
পতকে।

কথা। বিকৃতির সঙ্গে অতিক্রম এবং অস্বাভাবিকত্ব
স্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে বিকৃতিতে 'ব্যাপ্তিহেরে'
সম্বন্ধী' করতে। এই বিকৃতিতে কেন্দ্র করে আধুনিক
কাটুনে গড়ে উঠেছে এবং চিত্রশিল্পে এই বিকৃতির
ব্যবহার ঠিক কোন সময়ে শুরু তা সন্দেহ। বহিঃ
বিপিন্ততার বিক থেকে আধুনিক ব্যাপ্তিহেরে সঙ্গে
একমাত্র আধুনিকতায় সাদৃশ্য ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের
গভীর প্রভেদ বর্তমান তথ্যপি প্রাচীন ঐতিহ্যই আধুনিক
ব্যাপ্তিহেরে প্রতিষ্ঠা একটা অস্বীকার্য্য করবার
উপায় নেই।

ব্যাপ্তিহেরে সব যেনে প্রসিদ্ধ হলেও প্রাচীন ব্যাপ্তি-
চিত্রের ইতিহাস সম্পূর্ণ। হুয়োগে এ বিষয়ে বিকৃত
আলোচনা হলেও ভারতীয় কাটুনের অতীত প্রায়
অজ্ঞাত। বিশেষত হুয়োগীর ব্যবহার এবং কলা
সমালোচকেরা ভারতীয় ব্যাপ্তিহেরে ইতিবৃত্তের প্রতি
অস্বীকার উদাহরণ প্রকাশ করেছেন। এই উদাহরণের
ফলে বিশ্ব ব্যাপ্তিহেরে যে হুয়োগীর ব্যাখ্যা দেয়া যায়
তাতে ভারতীয় ইতিবৃত্ত স্থান পায় নি। কিন্তু প্রাচীন
ভারতীয় চিত্রকলায় ব্যাপ্তি অথবা বিকৃতিহেরে অতীত
হুয়োগীর বর্তমান।

প্রাচীনকালে হুয়োগে বিকৃতিহেরে ব্যবহার হুয়োগ
চিত্রশিল্পের শাসনাবলি স্থান পেয়েছে। আধুনিক
মিশরীয়, গ্রীক এবং রোমান শিল্পকলায় প্রচুর বিকৃতি-
চিত্রের ব্যবহার দেখা যায়। মিশরীয় প্যাগাসী, রোমের
পেগাসাসেখ, ভারতবর্ষীয় এবং পল্লবীতে প্রায়
ভ্রাম্যবহেরে যেনে উৎকর্ষী প্রাচীন অক্ষমশেদীতে বিকৃত
চিত্রের স্থান-সম্পত্তি। এ ছাড়া হুয়োগীর বেনেগার
একাধিক শিল্পী প্রায়তনায় চর্চায় হলে বিকৃত চিত্র
অনুশীলন করেছেন এ হুয়োগীর আছে। হুয়োগীর বিকৃত
চিত্রের এই প্রাচীন ধারা এ হুয়োগে অব্যাহত। তবে
তাকে সত্যভাবেই বিকৃত হুয়োগীর বহায যেষে

ভারতে আধুনিক কাটুনের প্রচলন উদাহরণ পতকের
বস্তু সম্পত্তি। প্রকালীন ভারতীয় ব্যাপ্তিহেরে হুয়োগীর
ব্যাপ্তিহেরে ভাব্যায়ার বর্তমান ফলে এই ধারাই আর
বহুদূর হয়েছিল যে ভারতীয় ব্যাপ্তিহেরে প্রতিষ্ঠা স্থল-
কালেয়। আধুনিক ভারতীয় ব্যাপ্তিহেরে হুয়োগীর
ভাব্যায়ার অনুপ্রেরণিত হলেও প্রাচীন ভারতে বিকৃত
অথবা ব্যাপ্তিহেরে অজ্ঞান নাই। ভারতের প্রাচীন ব্যাপ্তি-
চিত্রের যে অধ্যায় হুয়োগের তুলনায় কোন অংশে বহায
নয় বহায কোন কোন ক্ষেত্রে তা হুয়োগীর বহায যেষে
অতিক্রমের যোগ্যতা যাবে।

ভারতের বিকৃতিহেরে অন্যতর প্রাচীন নিদর্শন
অজ্ঞান বর্তমান। অজ্ঞান পরে উদাহরণে ব্যাপ্তি-
চিত্রের স্থান হুয়োগীর এবং কালো চিত্রকলায় পাওয়া যায়।
ভারতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং চিত্রশিল্পের চর্চায় উৎকর্ষ
হয় অজ্ঞান হুয়োগে। অজ্ঞান অজ্ঞান হুয়োগীর প্রথম চিত্র
একাধিক। হুয়োগে এই চিত্রশিল্পের কোন বিশেষ অর্থ
পাওয়া যায় না তথ্যপি এই প্রাচীন চিত্রশিল্প তৎকালীন
ভারতীয় শিল্পীহেরে বিকৃত চিত্রশিল্পের উৎকর্ষ হুয়োগে।
চিত্রশিল্পের অর্থ সম্পত্তি তা হলেও হুয়োগে হুয়োগের
উৎকর্ষে এগুলি অক্ষিত, ধীরে-কাল পরেও এতদ্বা
নয়হে অনুমান করা যায়।

অজ্ঞান বিকৃতিহেরে হুয়োগে স্থান এবং সম্পত্তিহেরে
কয়েকটি চিত্র বর্তমান। এ ছাড়া অজ্ঞান-কালোয়
বিকৃতিহেরে অজ্ঞান বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি বিকৃতিহেরে
সম্বন্ধী। অজ্ঞান বিকৃত এবং বিশুদ্ধতাকালার চিত্র
প্রদলে ঐতিহাসিক ভাঃ ধীরে-কাল দেন তাঁর 'বহু-বহু'
(১৯৭৮) বসেছেন—'অজ্ঞান ও উৎকর্ষ ভাঃ হুয়োগে
—অজ্ঞান অজ্ঞান। এইহুয়োগে হুয়োগের দেখেও
প্রাচীন চিত্রশিল্পে বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। বহু-ভাঃ হুয়োগে
হুয়োগে অজ্ঞান-হুয়োগের পরিচয় ঠিকতার একাধিক
কৌতুকলোচনীয় হুয়োগে। একাধিক হুয়োগে হুয়োগে

ঠে চাপিয়া বসিয়া ঐ ভয়ুটার চকু দুই হাতে চাপিয়া
রহা তারাসা করিতেছে, যানর ও ঘণ্টাবের ভাবভঙ্গী
হুত । এইরূপ আর একটা ছবিতে একটি ভয়ুত
কটা মানুষকে আলিঙ্গন করিতেছে,—”। এ ছাড়া
দুই এবং কিসরীলের অদ্ভুত ভাবভঙ্গি অজস্র
শিল্পীর কিস্তত্বকিম্বাকার চিত্রশ্রীতির অভিনব
উদাহ । মানুষ ছাড়া ভয়ু-আনোয়ার অর্থাৎ ভায়ুত,
নর, ঘোড়া এবং বহিষ প্রভৃতির উল্লেখযোগ্য ব্যঙ্গচিত্র ।
মহাৎ বিকিস্তভাবে ইতস্ততঃ ছবিতে আছে ।
; ধর্মোচ্চত সেনের উল্লিখিত বহিষ এবং ভায়ুতের
শ্রুতিবের উদাহরণ জন ঐকিষ তাঁর বিখ্যাত *The*
sittings in the Bhudist Cave Temples গ্রন্থে প্রকাশ
য়েছেন । এ ছাড়া ঐকিষের গ্রন্থে কিসরী কিসরী
বও পাওয়া যায় ।

“অজস্র শিল্পীর হাস্যরসবোধ এবং কিস্তত্ব-
কিম্বাকার চিত্র শ্রুতির প্রকাশকে উপলক্ষ্য করে ১৯১১ সালে
লন্ডনে থেকে প্রকাশিত) ভারতীয় শিল্পকলার বিবরণ
চার্যের ভাষ্যে প্রকাশ কর্তৃক প্রকাশিত সচিত্র *The*

Journal of Indian Art and Industry-তে
ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ এবং প্রখ্যাত কলারসিক লেডী
হারিংহাম বলেছেন—*The decorative designs,*
executed with masterly skill, are best exhibited
in the ceiling panels of cave I. (A. D. 600-
650), which display infinite variety, a lively
fancy, and a keen sense of humour. অর্থাৎ
অজস্র ১২২ গুহার প্যানেলের ছবিগুলি প্রাণবন্ত এবং
অসীম বৈচিত্র্যময় । সঙ্গে শিল্পীদের গভীর *Humour*
অর্থাৎ রসভাবের পরিচয় পাওয়া যায় । এ ছাড়া
এ প্রদেশে আরও বলা হয়েছে—*“Plants, animals and*
grotesque little figures are combined in the
most charming manner” Grotesque অর্থাৎ
হাস্যকর অথবা কিস্তত্বকিম্বাকার ছোট ছবিগুলি
আকর্ষণীয় ।

অজস্র ইতিহাস দৃষ্টান্ত ২০০ অব্দ থেকে সপ্তম
শতক পর্যন্ত বিস্তৃত । এই সময়কালের ভারতের
সাহিত্যিক ইতিহাস ঐতিহাসিক তথ্যের দিক থেকে



অনুদর্শিত। বিশেষত বৌদ্ধধর্মের পত্তন থেকে গুপ্তযুগের অন্তিম পর্যন্ত পটিনত বহুরের ইতিহাস অস্পষ্ট। ঐতিহাসিকদের মতে অজ্ঞার শিল্পকৃতি গুপ্তযুগের নিদর্শন। গুপ্তযুগের পরে কয়েক শতাব্দীর বাহ্যানে চালু। বহুরের বাহুরকালে অজ্ঞার শিল্প সংযোজন হয়েছে। দলনত নির্বিশেষে ঐতিহাসিকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অজ্ঞার জন্ম ব্দ: পূর্ব ২০০ অব্দে হলেও অজ্ঞার প্রাচীনতম পূর্বা তিনটি অব্দ: ৭, ১২ এবং ১০ সংখ্যক পূর্বাঙ্গগুলি অঙ্কিত নয়। দলনত এই প্রাচীন তিনটি পূর্বা ব্দ: পূর্ব ২০০ অব্দে নির্বিশেষ। অজ্ঞার শিল্পকলা এবং ভাস্কর্য বৌদ্ধ সংস্কৃতির পরিচায়ক এবং বৌদ্ধ ধর্মের বিশেষ বিকৃতিচয়ের ব্যবহার সৌন্দর্য থেকে ভাস্কর্যপূর্ণ।

অজ্ঞা ছাড়াও ব্যঙ্গাত্মক চিত্রের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত ভারতের প্রাচীন লোকপন্থে পাওয়া যায়। ব্দ: পূর্ব সপ্তম শতাব্দী অব্দ: অজ্ঞার কয়েক পটিনত বহুর পূর্বে 'মহরী' নামে এক দলপ্রদায়ের কথা জানা যায় বাহুর ব্যঙ্গাত্মক চিত্রের সাহায্যে বাহুর পটিনতবহুরের জন্য বিশেষ খ্যাতি ছিল। বাহুরদেশে এই মহরীরা 'পটিলার'

অথবা 'পটীয়া' নামে পরিচিত। একালে বহুরভূত, বহুরীয়া এবং বহুরদেব অজ্ঞে পটিলারদের সন্ধান পাওয়া যায়। মহরীদের বিবৃত্ত বাহুরা প্রদপে ভূত বহুরদেব পূর্বে 'বহুর বহুর' (৭০০ পূর্ব) বহুরদেব — 'আমরা বহুরে সমস্ত বহুরে একজন লোকের সাহায্যে পাই বাহুরের ব্যবহার ছিল বহুর মেখাইয়া লোকের বাহুরে শিক্ষা প্রদায় করা। ইহাধিরের উপাধি ছিল 'মহরী'। বহুরে পটিলে সংযুক্ত চিত্রাঙ্কিত কোন বহুর অথবা 'বহুর-বহুর' অর্থে কবিকল্প 'মহরী' পটিলার ব্যবহার করিয়াছেন, (ভট্টাকারের প্রবন্ধ)। জনসাধারণকে বহুরাইবার জন্য যে সকল চিত্র অঙ্কিত হইত, তাহাতে কখনও কখনও প্রোতবহুরকে আমোদ মেজাজ জন্য প্রভুর ব্যঙ্গরসের ব্যবস্থা থাকিত। দৃষ্টান্ত মহরীয়া যে সকল কথা বলিয়া প্রোতবহুর ও পটিলারকে হাসাইত তাহা তাহাদের নামে পরিচিত হইয়াছিল। এখনও লোকে 'ঠাট্টা মহরী' কথা ব্যবহার করিয়া থাকে। ব্দ: পূর্ব দশম শতাব্দী হইতে আমরা মহরীদের পরিচয় পাই।.....মহরীরা কখনও এইরূপে পটিলে মেখাইয়া সাধারণের নিকট হইতে অর্থগ্রহণের ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে আসে।



বাহুরা শিল্পকলার সাহায্যে ব্যঙ্গচিত্র

অতএব দেখা যায় যে ভারতের চিত্রশিল্পে ব্যঙ্গাত্মক চিত্রের প্রচলন দীর্ঘকালের ভয়ে পূর্ব থেকে প্রচলিত। যুরোপে মত প্রচলিতকালে ভারতেও ব্যঙ্গাত্মক চিত্রের উৎপত্তি বিকৃতচিত্রের বহিরাগত হয়েই এবং লোকশিল্পে তা হুঁতপূর্ব সত্তম পতাকা থেকে প্রবাহিত।

ভারতীয় চিত্রশিল্পে ব্যঙ্গচিত্রের উল্লেখযোগ্য ব্যবহার মূৰ্খণ এবং কাণ্ডা চিত্রে বর্তমান। যদিও দেখালে এ প্রকৃষ্ট ব্যঙ্গক প্রাচ্য লাভ করেন তবাপি সে দলপা নয়!

অমৃত্যুর পর অর্থাৎ সত্তম পতক থেকে মূল মূলে সত্তাট আকবরের সময় পূর্ব ভারতীয় চিত্রকলায় অগ্ন্যায় বংশগতি। মূল সত্তাটের পূর্ণপোষকতার যোগে পতাকাতে পারদী এবং হিন্দু ধর্মীয় সময়ে যে চিত্রকলায় সৃষ্টি তা আর মূল চিত্রকলা হিসেবে নিখাবিখ্যাত। শিল্প হিসেবে মূল চিত্রকলা অবশ্য মূলও ঐতিহাসিক দিক থেকেও মূল চিত্রশিল্পের এক বিশেষ দৃশ্য আছে। অর্থাৎ এ মূলে মূল রাক্ষসের সচিত্র দলিল হিসেবে মূল চিত্রশিল্পের অপর এক মূল্য বর্তমান। মূল চিত্রকলায় ব্যঙ্গক উন্নতি হু আকবর এবং শাহজাহানের রাজত্বকালে। কিন্তু এর মূলে সত্তাট হুমায়ুনের পূর্ণপোষকতা বংশীয়। তাই উল্ল্যেয়ে সময়েময়ের বিখ্যাত বিনিমোচর শিল্পী বেহেছালের হুই দৃশ্যোগা শিলা অমল সাবল এবং দীর্ঘ সাম্রাজ্য আলীকে ভারতে আনা হয় রাজকীয় চিত্রাঙ্কনের উদ্দেশ্যে। দাই হোক, হুমায়ুনের পরে আকবরের পূর্ণপোষকতার মূল চিত্রাঙ্কনের সামগ্রিক উন্নতি এবং সম্ভবত ১৫৭০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৬০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আকবরের উল্ল্যেয়ে পারদীয় পতাকতে হুতপিত প্রায়ই অক্ষরের মূদ্রপাত। আকবরের পূর্ণপোষকতার অবশ্য এই এরা মূল বিনিমোচর শিলা হয়। সত্তাটের নিম্নে একাধিক পারদীয় চিত্রশিল্পী হিন্দু চিত্রশিল্পের পারদীয় ধর্মভেতে চিত্রাঙ্কন শিলা দেওয়া পূর্ব করে। উত্তরকালে এদের মধ্যে রূপ এবং বহন প্রথম প্রথম চিত্রশিল্পী হিসেবে প্রকৃত ব্যাতি অক্ষর করে। আকবরের সমকালীন প্রতিকল্পা হিন্দু শিল্পীদের মধ্যে বেশী, হুই মূল, সেক্ষর,

মহা, মোগেন; মহেশ, রান, হরিবংশ, ভাগা, বনোমাতী এবং কণ্ঠ বিখ্যাত।

চিত্রাঙ্কন ছাড়াও আকবরের নিম্নে মহাতারক, সাম্যে পারদীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়। মহাতারক আকবরের নিম্নোক্ত শিল্পীদের দ্বারা চিত্রিত।

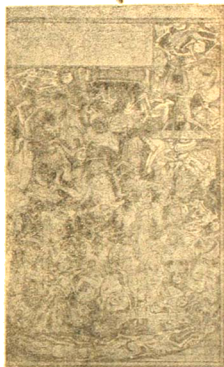
আকবরের নিম্নে মহাতারকের যে শিল্পের পারদী অনুবাদ করা হয় তার নাম 'রাজমহা'। ঐতিহাসিক ভিনসেন্টিনেলের মতে 'রাজমহা' অনুবাদে কাজে প্রায় চল্লিশ হাজার পূর্ব অর্থাৎ প্রায় ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। মহাতারকের এই অনুবাদ সম্ভবত সত্তাটের ব্যক্তিগত প্রয়োজন। বর্তমানে রাজমহার দৃশ্যোগ্য সত্তোগতি করণের মহারাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে করণের প্রকৃত আছে। ভল্লের উক্তন মহারাজা শিলাই কর শিল্পের রাজমহার এই হুতপিত সত্তোগতি মূল সত্তাট মহেশ পার (১৫৯২-৯৬) উপায় মেন। রাজমহা সচিত্র এই এরা আকবরের সমকালীন ব্যাভিনায়া শিল্পীদের দ্বারা অঙ্কিত। এই রাজমহা বিকৃত এবং ক্রিমত্বিকিমাকার চিত্রের মূল পাওগা যায়। রাজমহা অকবরের জন্য যে সব শিল্পী নিম্নোক্ত চিত্র তারের মধ্যে মনত, বন, হুই মূল, মন, কণ্ঠ, মূলশী, মহেশ শিল্প, ভাগা এবং মূল প্রথম শিল্পী। শিল্পীদের মধ্যে হুই মূল রাজমহার এগারোখানি চিত্রাঙ্কন করেন এবং এর মধ্যে কয়েকখানি বিকৃত অথবা ক্রিমত্বিকিমাকার চিত্র। বিশেষত মূল অঙ্কিত 'হুই মূল'ের নরক ল্পন' দৃশ্যটি, ক্রিমত্বিকিমাকার চিত্রের শিল্পী চিত্রায়ন। রাজমহা হুই মূল অঙ্কন থেকে একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে মূল আমলেও শিল্পীরা বিকৃতচিত্রের প্রতিকল্পা ছিলেন।

মূল মূলেও অপর এক উল্লেখযোগ্য ব্যঙ্গচিত্রের মূল্য দেওয়া করেছিলেন বিখ্যাত ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী মনোমূল্য ঠাকুর। এটি সত্তাট আকবরের নবম সত্তা অমৃত্যুর সত্তা সামগ্রিক যোগাযোগে যোগাযোগে একটি ব্যাভিনোচর। পতাকার মূলভাগের জন্য যোগাযোগে পিতা অক্ষরের সত্তাটের প্রিয়পাত্র মন। মনে যোগাযোগে বীমল, ভোভরমল এবং আব্দুল মল

গ্রন্থে সভাসদদের চিত্রগুলিতে পরিণত হতে হয়। কিন্তু, হীরবল গ্রন্থে সভাসদদের আক্রমণ মোল্লা ভায়র তাঁক ব্যক্তিত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন। মোল্লা-মো-পিরায়ার ব্যবহৃত বহু বাগ্যতর মন্তব্য এবং তিওপনী দ্বারাও পাঞ্জাবের অনেক অঞ্চলে প্রচলিত আছে। মোল্লায় নামের সঙ্গে 'মো-পিরায়ার' কথাটি উপাধিগত সভাসদের দৃষ্টি। মোল্লা ভোজন বিলাসী ছিলেন এবং একপ্রকার বিশেষ খাদ্যের প্রতি আকর্ষণই তার খ্যাতিমান নামের মূল কারণ। মোল্লায় মণ্ড্যচিত্রটি কোন পিল্পীর দ্বারা অঙ্কিত জানা যায় না। তবে অনেকের অনুমান মতে সম্রাট আকবরের বিশেষে সামরিক মোল্লাকে হারিস প্রতীক হিসাবে তুলে ধরা হয় এইভাবে আঁকা হয়। মোল্লায় এই কাগজের তার 'জন মুইকসোটে'র কথা মনে করিয়ে দেয়। গগনেশ্বরনাথ সংগৃহীত বাপাচিত্রটি ছাড়াও দাতার নিউজিয়ায় মোল্লা-মো-পিরায়ার আরও কয়েকটি বাপাচিত্র আছে। প্রতিটি চিত্রেই মোল্লাকে সামরিকের প্রতীক হিসেবে আঁকা হয়েছে।

কাংড়া চিত্রশিল্পের জন্মস্থান পাঞ্জাব এবং এই চিত্রকলায় মূল বিষয় খ্রীষ্টের জীবনকথা। মূল চিত্রশিল্পের অন্যতম মাধ্যম কাংড়া পেন্টিং। সমগ্র পত্রকে ঔৎসাহিকের নিম্ন বিবরণিত এবং অষ্টক পত্রকে নারীর দ্বারা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে মূল রাজ দরবারের একাধিক হিন্দু পিল্পী নিপুণতা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে। দ্বিতীয় ভাগ করে পাঞ্জাব এবং সমগ্র রাজপুত রাজ্যের অঙ্গভূত হয়। উত্তরকালে এই মূল পিল্পীদের প্রধান-মন্ত্রীরা হিন্দু ধর্মমূলক বিষয়কে কেন্দ্র করে কাংড়ার দাবীতা অঞ্চলে যে পিল্পদৃষ্টি করে তা আত্ম-কাংড়া পিল্পকলা হিসেবে পরিচিত।

সমগ্র পত্রকে থেকে পূর্ব দলেও কাংড়া চিত্রশিল্পের ব্যবহার দাক্ষিণাত্যের পত্রকে এবং কাংড়া চিত্রশিল্পের পিল্পীরাও বাপাচিত্রের প্রতি আগ্রহ ছিলেন তার কয়েকটি বহুনা দাতার নিউজিয়ায় সংগৃহীত আছে। দাতার নিউজিয়ায় চিত্রগুলির মধ্যে বৈষ্ণব সাধু এবং বৈষ্ণবী-দের বাপাচিত্রগুলি উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণব সাধু শ্রেয়ান্দার দ্বারা বাস এবং তুলসীদাসের বিকৃত প্রতিবর্তিত স্তান



মুহুর অঙ্কিত রাজমহাধের 'মুহুরিত্তের মত মন'। এই বাপাচিত্রগুলিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব সাধুদের সঙ্গে ঐক্য রাজপুত দোড়া অথবা রাজার বাপাচিত্রও বর্তমান। পূর্বভাগীয় সাধু ও শ্রমণীদের কৌশল পরিণত মূল আঁক' আকৃতিগুলিতে বাপাচিত্রের মত বৈশিষ্ট্য বর্তমান। চিত্রের প্রতিটি বহু বাপাচিত্রপিল্পীর পরিপূর্ণ দোস্তা নিয়ে অঙ্কিত। তবে, কবে কোন সময়ে এই চিত্রগুলি অঙ্কিত হয় তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। চিত্রের মধ্যে লিখিত বাসরী অক্ষর থেকে মনে হয় যে হিন্দু পিল্পীদের দ্বারা এগুলি অঙ্কিত।

কাংড়া পিল্পকলার জন্মস্থান হীতিকে কেন্দ্র করে পূর্ব দলেও উত্তরকালে কাংড়ার এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দৃষ্টি হয়। এই বৈশিষ্ট্যের অন্যতম প্রণয়নের অঙ্গন। কাংড়া বিদ্যুর সাহায্যে চিত্রাঙ্কন কাংড়ার বিশেষত্ব। বৈষ্ণব সাধুদের চিত্রগুলিতে কাংড়ার সঙ্গে প্রভুত

শাস্ত্রদ্বাং থাকার মনে হয় যে সম্ভবত কাডো শিল্পীদের দ্বারা এগুলি আঁক্ষিত।

বৈক্য সম্প্রদায়কে উপলক্ষ্য করে আরও কিছু ব্যাঙ্গচিত্রের নমুনা উল্লেখ্য পতকের কালীঘাটের পটে দেখা যায়। যথিও কালীঘাটের পট পুত্রোপদ্রি ব্যাঙ্গচিত্রের পর্কায়ের পড়ে না তথাপি কালীঘাটের শিল্পীদের শেখায়ায় এবং সমালোচনা প্রকাশ মনোভাব ব্যাঙ্গচিত্র শিল্পীদের আদর্শের সমগোত্রীয়। কালীঘাটের পটুদাদের হাস্যরস সৃষ্টির মনোভাবের উচ্চলৈ শ্যাক্ষর অনৈক বৈক্যের পটে বর্তমান। এই পটের কোন বিশেষ অর্থ আছে কি না তা না কেনেও বৈক্যের সৃষ্টিত বর্তকের উপর একটি প্যাবির অবস্থান কল্পনা হাস্যরস সৃষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে অক্ষিত নয় একথা নিষ্ঠুরে বলা যায়। এছাড়া শৈশব শ্রাব্যকে ভেড়া রূপে আঁক্ষিত করা এবং তার গলার দড়ি শ্রীর হাতে থাকার কালীঘাটের পটুদাদের ব্যাঙ্গমনোভাব প্রকাশ পায়। সম্ভবত উচ্চ টেকনিকের জ্ঞান অথবা চিত্রাঙ্কনের ভিত্তি সৃষ্ট না হওয়ার কালীঘাটের এই অশিক্ষিত শিল্পীসম্প্রদায়ের এক পতাকা পূর্বে ব্যাঙ্গচিত্রকে পুত্রোপদ্রি দখলে না আনতে পারলেও ব্যাঙ্গচিত্রের আদর্শকে সহজে কল্পিত করেছিল তার বহু দৃষ্টান্ত কালীঘাটের পটে বর্তমান।

অল্পদূর থেকে কালীঘাটের পট পূর্ক প্রায় দু'হাতার বহুরে ভারতীয় চিত্রশিল্পের ইতিহাসে ব্যাঙ্গচিত্রের ব্যবহার অনস্বীকার্য। ভারতীয় চিত্রশিল্পে দীর্ঘকাল থেকে বিকৃতিচিত্রের মাধ্যমে হাস্যরস সৃষ্টির মনোভাব স্বভাবতই একথা প্রমাণ করে যে আধুনিক ব্যাঙ্গচিত্রের ধারা রূপে থেকে আত্মনানী হলেও ভারতের চিত্রকলার বিকৃতি চিত্রের প্রচলন দীর্ঘকালের। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পীদের বিকৃতি চিত্রের অনুশীলন বিশেষভাবে উদাহারিত রূপোশী কলারসিকের উদাহারিত্যকে উপলক্ষ্য করতে পারে।

ভারতীয় শিল্পকলার বহু অধ্যায় অস্পষ্ট একথা আসেই বসেছি। সম্ভবত সেই কারণে বিকৃতি চিত্রের অন্তীত অসম্পূর্ণ। আশাতসৃষ্টিতে ভারতীয় চিত্রকলার শিল্পীদের বিকৃতি চিত্রাঙ্কন বিশ্বকর হলেও এতে বিশ্বাসের কিছু নেই। বিকৃতি চিত্রাঙ্কন শিল্পীদের সম্ভাব্য প্রবৃত্তি। অল্পন কমতা অর্ধের মধ্যে মধ্যে শিল্পীদের মধ্যে এ মনোবৃত্তি স্ভাব্যবক্তাবে এসে পড়েছে। কলে লেগে বিশেষে সব সম্প্রদায়ের শিল্পীরা এ বিষয়ে অনুশীলন করেছেন বৈচিত্র্যের দ্বায়ে এবং সেই অনুশীলন ক্রমবিকাশিত হয়ে দু'গোপযোগী হয়েয়ে আধুনিক শিল্পীদের চেষ্টায়।



সূর্য কন্যা

● অখীরকুমার বোমারদাস

আলোকিত নব্বু লবটা পেরিয়েই অন্ধকারে
সীমানা—নির্মলতার সীমানা। সেখানে হালতো পায়ে
চুপি চুপি এসে হাঁড়াল হুশালী। তারপর কেবলো
বাড় ফিরিয়ে। নব্বু ঘাসের সঙ্গে ১০ বেলা
বেতের চোখ, টেবিলসুলো গড়ে আছে ইতস্ততঃ, গড়ে
আছে ‘দ্যাদ্যত’ কাপ আর পেট, কটা আর চাকচ,
উজ্জ্বল তের আর প্যাণ্ডির তপ, লিগারেটের কহাবাশিষ্ট
হুঁ চাঙটি উজ্জ্বল, প্রায়গোত কি কিসার বিধানের
হলিত-বহিত একগাণ শাপিত—আর তার সঙ্গে বৈকালিক
পাটির হেঁড়া হেঁড়া স্মৃতির ভগ্নাংগ। নিদার আর
মিসেসের চিহ্ন নেই কোনখানে—খাঁ খাঁ করছে ব্যাও প্যাও,
লন, ব্যালকনি, অদূরে চন্দ্রালোকিত বাগান। তবু
শিব ফিরে চলবার আগে গাশে, ডেসলভেই পরার
অতীকে আরেকবার ভালো করে চোখ বুন্দিয়ে নিল
হুশালী গায়ত্রীদেবী। বুলিয়ে নিয়ে ফেলল স্মৃতির
নিঃশব্দ, না, এয়ার লডাই সে একা একেবারে নিঃশব্দ।
হলবারে আনচাওয়া এমন ভবনময়ী নব্বু উত্তরোল।
লনের বৈকালিক আলর নিঃশব্দেই ভেঙ্গে গেছে তার
চিহ্ন পরিচয়টুকু সর্বত্র। এখন হালকা ভ্যাক আর প্যাক
করা পেরী কি জিনের মোতে গা ভাগাবার সহ্য
আসে। আল্ল সমবেত নাচের লয়। তাই প্রায়শ্চক্য
লনে হতম্বন হুশী এগা বনে থাকতে পারে হুশালী,
তাকে আর বিরক্ত করতে আসবে না কেউ, ভর নেই
আর সেই বিচিত্র নহ-নাগীর অংশো ছাঃগিয়ে বাবার।—
প্রয়োজন হবে না আর হুঃগে অস্তিত্বের তাই রাখ
নব্বু, হুঃগেপাঠী ঘাসের উল্ল বের আরেণ করেই
পা হুঃগালো হুশালী গায়ত্রীদেবী। বাকি হুঃগালো
হবে হবে। অনেকদিন পরে খাটি স্মৃতির নিঃশব্দ।
এখানে ওরা আর নিজস্ব আসনে না, অতঃ কবো

ঐ হলবারে হাল্ল আলর ছেড়ে কণিকের জন্যেও আসবে
না কেউ বনে বনে বার বার এই কথা উচ্চারণ করলো
হুশালী। তাই হুঃগি...হুঃগি..., গভীর নিঃশব্দে
ঘীরে হুঃগে একহুঃগো চাঁতা নির্মল বাতাস টেনে নেবার
হত অবসর এতদিন পরে হুঃগি পেয়েছে সে! স্মৃতি,
পাতি, ভুঃগির শব্দ-ভাল তাই আবার হুঃগে না কি
হুশালী গায়ত্রীদেবী।

তবু বিধা—কিন্তু লব তুলে হঠাৎ যদি কেউ
আসে—বনের কোণে তবু চিন্তার উঁকি-কুঁকি। তখন,
তখন কি করবে হুশালী? নিঃশব্দে কয়েই এবার জবাব
খোঁজে সে। জিন্সেণ করে হুঃগে। তবে কি অভিনয়ের
হুঃগোল সত্যিই বুলতে গাচ্ছে হুশালী? না আবার
অভিনয়? না নিঃশব্দে ছাই করে দেবে উন্মত্তিত বসন্তের
আল্লনকে? নিঃশব্দে হুঃগে হুঃগে বিজ্ঞান করে
তুললে সে। হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস টেল। ওঠে
হুঃগের ভেতর বেতে। অকারণ কারণ কাপল হুঃগে
আসে চারিগিক। অদোষ একটা জবাবই বেন কিউ
কিরে আসছে—না, না, না, কেউ আর আসবে না
আবার সৌভাগ্য হুঃগে ভেঙ্গে চুঃগার হবে বার তাই
হুঃগো সত্যিই এই লনের আগারে আর আসবে না কো
ভর হুঃগে, নিঃশব্দগিক তার নাচের পাউন্ডার হুঃগে
আর যদি আসেও সেকি একবারও কিউ তাকাবে হুঃগাল
গায়ত্রীদেবীর দিকে? পাতা কাটাশির নব্বুয় সেও নি
একবারও কুঃগি করবে তাকে? না, না। কারণ হুঃগি
জানে না সে, তবু নব্বুয়গিকের হত এগালো স
যেন সত্যি হবে হুঃগে তার। এই শব্দকের জ্যান্টিভা
হুঃগে বাকী জীবনকে চিনতে আর বাকী বেনে র পাত
গায়ত্রীদেবী।

এখন তাই যে নিঃশব্দতার হুঃগী হুঃগে উঠে

হৃদ্যালী, এখন তার হাত থেকেই পরিচালিত খোঁজে সে ।
খোঁজে 'নন্দিত' । হঠাৎ বড় নিরাশা হ'ল হৃদ্যালীকে ।
বড় মানুষের মধ্যে থেকেও বৃন্দা একলা । অভিনয়-
জ্ঞাত হৃদ্যালী গায়ত্রীদেবীর চোখ ভাই আবার জলে ভরে
আসে । লজ্জাক্ত হ'লে হয় জীবনকে । কিন্তু অভিনয়ে
সেও ছিল একদিন দূরত । আঁত দূরত । বিপত্ত্যায়
দৌরবনের শ্রুতিভরে পুনর্বার বহুত করে ভেঙ্গে
পড়ে হৃদ্যালী । অতীত দুয়ের স্নেহজন হাতা কি কোন
উপায় নেই তার ?

হ'লে পড়ে তার তৈশোয়ের—দৌরবনের কথা ক'লা
শ্রুতি । পাটনা বিনমরী কুলের ছাতিয় গাছ ওলায়
হ'লে পড়ে একদিন কেমন নাকাল করেছিল দূরব'র
নিরুপসনকে । হ'লে পড়ে কলস জীবনের কথাও ।
মলিহোজ কি আরোপার কিংবা সত্যেন ঘোষের নিরুপস
শ্রুতি আর স্নেহ বিবেকনের স্নান্যক ইতিহাস ।
এলাহাবাদের ক্ষেত্রমোহনের কথাও হ'লে পড়ে । সে
জানতো বায়ালী ঘেরে চিরকাল ভাল, আন-স্মার্ট আর
শাই । হৃদ্যালীকেও একদিন সে কেলিছিল সেই হলে ।
তারপর শেষের বীচে তাকেও একদিন লুটিয়েছিল
হৃদ্যালী গায়ত্রীদেবী । ভাল ইংরেজী আর হাস্যকর
শোকার প্রিয় সেই ক্ষেত্রমোহনকেও । হ'লে পড়ে আর
হাসি পাল ।

কিন্তু আর কত বণ্য হয়ে গেছে হৃদ্যালী ।
কত অসহায় । তার জীবনের কথার মূল্য কি কিছুই
বুঝে বিনল । তার কাছে কি সত্যই কোন কথার আর
পব'ত পেয়েছে হৃদ্যালী ? কীরে কীরে আবার বৃন্দাকে
তার ভদ্র নিষেধে নান্যভাবে প্রবোধ দেয় সে । নানান
পাণ্ডিত্যের জাল । ভাই আবার চোখ কেঁদার হলধরের
কোলাহলে । চোখে দেখে : চোখে থাকে অত্যাঙ্ক
কালি কালি আলোর দিকে । অকারণে চোখ দু'লিখে
যেব সব কিছুই উপরই । বায়ালীর উপর রাগা শান্তি
স্মারি বাহারি অর্কিডের দাছ । সন্ধানীদ্বার দ্বন্দ্ব-বর্ধিত
কাক ; নীল আলোউজ্জ্বল দূরবর্ধিত ব্যালকনির
'একোয়িয়ার কিংবা বায়ালের অধর-বর্ধিত দ্বাধা-বায়ার
কোঁপ । সমস্ত আলোর, সমস্ত হাতা, সমস্ত অন্ধকারের

মূল্যহীন । আর মূল্যহীন হৃদ্যালী গায়ত্রীদেবীর কাছে ।
জাকের স'র ভাগেই বাতাসে । এখনই হাতো দাচ
দু'রু হবে । ওলালচ, টাংশো কি দূরতই কল ইটের
সাবধানী পরবেশ । বোম্বের সেই জনোই বীরে বীরে
সবুজে উঠেছে অক্টোবর মূল্যহীন ; সিনেমাটির কলম্বর ।
বাতাসের জরটাও কি ভাঙা, হোপা ও ট্রাণ, ইভনিং
ইন প্যারিস, বনামি কি নাম ভুলে গাওয়া কিছু
অতি পরিচিত সিনেটিক নিবাদের সঙ্গে বাতাসের
করছে চতুর্ভুজ, ব'ক ভরে নিঃস্বাস টানলে একবার
হৃদ্যালী ।

কান পাড়লে দূরত কলম্বোলে । বিভিন্ন কণ্ঠের
কলম্বোলে ভেলে আসছে—গোলা বাছে মেগা-কলম্বো
কথার টুকরো । নানান প্রলাপোক্তি । ভদ্র হ'লে হয়
ওটা কত সুখী । ওদের এত কাছে থেকেও আর
ভদ্র নিষেধে কেন হ'লে দিখে আসছে হৃদ্যালী—কেন
দিখে বাছে ভিন্ন এক ভগতে ?

লন আর হলধর । একটিকে সিনে কোম্বা হাওয়া
পাতা স'র বাস ; অন্যটির এক আকাশ ভাঙা ; মাথার
উপর কলম্বো দল্লিগ' ; শীতলকরা প্রকৃতির ল্যাগোহ—
আর অন্যটিকে হ্যানান' ; এটিকটের দল্লিগ' পরিদর,
কৃত্রিম অভিনয়ের মূল্যহীন স্নানি, স্নেহের নীলাভ
হাতদান, মিথ্যা তুলিগ' আর মূল্যহীন মর্গটিকা ।
কোনটাকে বেছে নেবে হৃদ্যালী গায়ত্রীদেবী ? অভাবনার
সর হাতে মেগা ক্রিসাধিয়ারে তোড়কাটা ভুল করে
কলে আসা লুগিন কোম্বাও । ভাই সেটাই কুটি কুটি
করে হি'জতে দূরত করলো সে । হ'লে হোল এই
দ্বিবার অভিনয়ের মূল্যহীনতাও ব'কি এমনি ভাবে নষ্ট
ক'লা বেত ভরে একটুও সর নিত না সে, তা হলে
সেদুলোও এমনিভাবে হি'জে, জেলে-লুগ' করে দিত
হৃদ্যালী । অতঃ নিম'র 'অভব'লার হাত থেকে
বচিবার জনাও । কিন্তু আলো অন্ধকারে পরিণত হ'লে
নিষেধে আর ব'ক অসহায়বোং হল তার । হ'লে হল
বচিবার, দূরত হ'লে দরত পল্লোপোটে যেন বিনল
গায়ত্রীদেবীর এলাকা গিরে হি'লেছে । বিনলের আ
তার ভাগের প্রথি তাই অসিদ্ধ । দূরবর্ধিত
এই সময়, হ'লে সত্য ।

দৃশ্যভিত্তিক নীশন—আলোকিত পথের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলো হুশালী রায়চৌধুরী। উৎসবের চিহ্ন তো রয়েছে ঐ পথেও উল্লীপত্রা লাগ্ন্য বরেন ঐ তো কেমন ছোটোছোটো করছে। সেটের বাইরেও গিয়ে দেখে আসবে নাকি একবার? ছাঁচের অশান্ত কেনী, গামী ফোটোর কড়, সত্তা গিলেবার পান, বরমোহা তেগালীর স্রোত বশ হুয়েছে কিনা, না একি পাপসেব মত ভাবছে হুশালী! স্বাভাবিক ভাবেই তো এসেছে পৃথিবীর ঘড়ির কাঁটা, এক তার জীবন ছাড়া আর কোথাও তো ঘনিষ্ট ওলট-পালট। ওই তো কলসরপল্লীর কলসার্টের তালে তালে কলট কলসারো কেনন ছাত মেলাচ্ছে ধীশ্বেন আর ধীশালী, সত্ত্বত আর উমানন্দরী, রক্তমা আর শিনাকীভবন, ওই তো লাউকে। ভীত করছে সবাই ভিল্কের ভবন: ওই তো; ওই তো। মানবচক্রে পলট দব কিছ, যেন জেপেতে পাচ্ছে হুশালী রায়চৌধুরী। এদের ভাবন এখনও কত বহু:র। কত উপভোদ্য।

তবু তার কাছে এই জীবনটাই কি হুশাল:। নরসূরী কলের ঐ তেগারীগুলো, নবুৎ ঘাসে হুৎ লুকানো কি' কি' আর কড়িং-ও। দল—এরাও আর যেন বাস করছে তাকে। এখানে এসেও তাই যেন পারি পাচ্ছে না হুশালী—পারি নেই এই অব্যবিস নিজস্বভাভেও। অশান্ত মনের হাত থেকে কবে পালিয়ে পারবে হুশালী? তাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠে পরল' সে। কিছু ব্যালকনির বালিকোনে চোখ পোড়তেই বিলুপৎপুন্টের মত চমকে উঠলো হুশালী রায়চৌধুরী। ঠিক তার বতই যে একজন; ন্যূনা, অছকার বসায়নার এককোনে বিভক্ত সিদারেটের শিরনে ঠিক তার বতই যে চিকার জাবর কাটছে; কে ও আসবুৎ? অছকারে তালো করে দেখা যায় না তবু, চমকে উঠলো হুশালী। ঠিক প্রাণের মত দেখতে। হে ভগবান, যেন প্রাণ হব। আপা সিরাপার জাগিয়ে বহুজালিতের মত পার পার এসুচ্ছে হুশালী। লন পার হবে গিঁড়।

ভারপর জোৎস্না মোহা ব্যালকনির এক কোনে এসে দাঁড়াল সে। আর একটা সিদারেটে বসলো বহুি আসবুৎ—তাই লাইটারে আসলেন পলট

হবে উঠলো নবের স্রোত আপ।

"ধীশালো ধীশ!" নবুৎ বিব্রভতা যেন বহুতেই ছোচে কেনেয়ে হুশালী। এ যেন চঠাৎ ছাটির স্বাধ! প্রথমে চমকে গিরেছিল প্রাণও, তবু, বিচ্ছেদে সামলে নিতে দেয়ী হল না তার। বললে—আরে, কি আভব' হুশালী জুব... একদম চিনতে পারি নি প্রথমে... So glad to meet you...বাক্, এখানে নর, লে লনেই গিরে বলা থাক। কে যেন অমৃত কর্ণ করছে। হুশালী রায়চৌধুরী তাই আবার যেন নুৎ। স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে কবে কবে। আবার উল্লসল নুৎ—যেন তাই চলো। ধীরে নুৎে বললে হুশালী। প্রথর উৎসবের আলো হাফিয়ে আবার নীলনা জোৎস্নার নিজ'লতা। নবুৎ কার্ণেটের মত ঘাসের উপর বসে এক মনে কাপড়ের একাংশ স্নহতল করতে করতে প্রথন কথা বলে হুশালী—গতিয়ই চঠাৎ এই ভাবে আবার প্রান্যবের যে দেখা হবে তা কোনদিন শ্বযেও জাবনি।

নরসূরী ব্যাক'প্রসের কাডো দিকে চেয়ে সিদারেটে একটা নুৎধী'টান গিরে জবাব দিল প্রাণ। তা প্রাণ নু'বহর পরে কি বল—চাপা ধীর্বা'নিশ্বাস মোনা যাচ্ছে হুশালীর—বতনুৎ মনে পড়ে আন্যের পের দেখা হয়েছিল কোন্দাই।

—আচ্ছা ও দব কথা এখন থাক—হইবে বাওয়া আবহাওয়ার আবার উভেকনা সকার করতে চাইছে হুশালী রায়চৌধুরী। —Let that foolish memory die, জানতো বত'মানে আবি আর মিস রায় নই, এখন মিলেন রায়চৌধুরী।

বা: নুৎবর। But where's your Lucky man? কৈ এই পাতি'ত তো তাকে দেখছি না? কোথায় সে?

হে না বরশী বিবা হও। এ' কোথায় পৌঁছাল হুশালী, আবার সেই বিষর শ্রুতি, পরিভ্রাণ সন্তোটা প্রকাশ করতে হবে নাকি প্রাণের কাছে। অতুত হুঃশে, ব্যথার হলু'হলু' করে উঠলো হুশালী রায়-চৌধুরীর চোখ হুট্টো। নবুৎ এটিবেট ভেব করে হাফাকার করে উঠবে নাকি। না, নর'কন্ত উভরই দেবে

শুধু! গৃহিণী জবাব দিতে তাই শব্দ লাগলো বেশ কিছুকাল ।

আসে নি...আসার পক্ষিও নেই তার...

কোরালিনিস বলে সম্ভেদ কোরছে ভাকার !

সবসের বঁধনে নিজেকে পাকে পাকে বঁধিয়ে হুশালী । না বঁধে আর কি কোন উপায় আছে ?

—Very sad, so sad...।

কিছুক্ষণ গুমোট ভাবতা । কিছুক্ষণ তো হতেই হবে হুশালীকে । অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যে স্বাভাবিক । তাই বলে সেই প্রথমে—But are you still Bohemian ? কিছু কি জবাব দেবে প্রাণী ? যিগা ভরে 'জাদ' করলে শূন্য বার কয়েক, —ন—না, মানে জানই তো নামান কাজে যিগা যিগা কয়াল চাকুরী আবার—Just like a gypsy... তাই ওটা খণ্ডিত রেখেছি এখনও : তারপর স্বসভোক্তির চঃএ বললে সিগারেটের হাই হাততে কাড়তে...তবে...তবে "I am engaged !"।

—তাই নাকি...জ্যা...সৌভাগ্যবতীটি কে ? নারী দুলত কৌতুহল একাধে নিজেই পরে লক্ষ্যত বল হুশালী । কিছু নিছের অভাবে ততকালে ওহু হয়ে উঠে বলে ভাল, উপর হুশ রেখেছে প্রাণী দর । শ্বযাস, মনে হচ্ছে তার চোখের জারা হুটো অন্য বিকে নজর দেবার জন্যে যেন সে চোখের সূঁচি হর নি । মনে হল হুশালীর সে...তুমি চিনবে না । A very sweet girl... সুপ্রিয় চৌধুরী । I mean, রকিম পরগনার S. P.-র মেয়ে—অর্কাদি পান্ডিত্য বয়সে হাওতে শেখের কথাসূতো জুড়ে দে । প্রাণী ।

—বা: Congratulations !—কিছু ঠিক সুপ্রিয়াকে আন নি এই Party তো ?

—এগেছিল কিছু একটা এনসেম্বলেট আছে বলে চলে গেছে । এ সব আসোচনার প্রাণীর তথ্যাদি কেন্দ্র যেন অস্বাভি । অস্বাভি হুশালীরও । তাই বললে—চল, বলে বলে আর ভালো লাগে না, একটু বড়ানো থাক ।

হুজবেই উঠে পড়ে তাই । হারী ন্যাকের হুট, সিগারেটের তীব্র গন্ধ প্রাণীকে ঘিরে থাকলেও কি অক্লান্ত শ্বযাস, আর চল তার চোখ হুটো । মনে হয়

এগুলো বিভ্রান্ত ছেলেনা...নুঃ ঠিক আসেই মত । কিছু প্রাণীর হালির পক্ষে চঠাৎ ওহু ভাঙ্গো হুশালীর ।

চামড়ার সিগারেটের কেনটা হাততে হায়ে প্রাণী । কি জুলো আহি এখনও দেখে কোথায় কেনে রাখবে তা না সবসূতোই ভরেই কোটের পকেটে । কি যেন একটা হালির কথা । কিছু চিরকালই এ রকম শব্দার লোকটার । বুজু জিনিষ নিয়ে হেসে আশ্বিত্ব হবে । সেই পাটনার দেবার মালমোহরের পাটিনতে কিংবা সেকাড' এর মনসুদ বলে ধারোকা হেসে—হালিগে কাড়টাই না করে ছিল প্রাণী । এখনও ভেবে যেন হালি শেল হুশালীর ।

—মাছা, মোটবেলার নামে আমরা পাটনার ধবন ছিলাম তখনকার সব কথা মনে আছে তোমার ? — তাই জিজ্ঞাসা না করে আর থাকতে পারলো না- প্রাণী — আছে বৈকি । অথচ আস্র করলো প্রাণী । মনে আছে হুজবেই : ভোলা কি এত সহজ ? জুলতে পেরেছে কি হুশালীই ? এখনও কঠোর মত মাঝে মাঝে 'খ' 'খ' করে ওঠে সেই পুরানো দিনগুলোর কথা । যে কঠো ভোলা যায় না : যায় না ভোলাও ।

দরচরে বোশী মনে পড়ে সেই প্রথম পাকাতের গিনটার কথা । যে দিন প্রথম দেখা হয়ে ছিল হুশালী তার আর প্রাণী দড়ের । প্রাণীর এক বিকেল । 'শু' বহা' পাটনার প্রাণী । পড়ত রোহে ও বি হর মোটেদের লনে 'চুটি কুটির' দেলাসে সে বিন শব্দ বুমছিল হুশালী তার । অবদে আশার শব্দ । তখন জ্ঞান সান গ্রাসের দার দিয়ে গার্য হুনিয়াটাকেই সুদৃশ-সম্ভার মত মনে হোত তার । যেমন হা ঐ বচনী সব মেয়েদেরই । তব, হুশালীর কথা জালাদা । পাটনার নিস্কর্ণী হুজবে গেলিল আশঙ্কা ; শ্রৌট বিটোরের বিস্ময়, হুজবে কায়ে ভেবাস, বিত্রোহিত কি যোনালিগার তুলনা (engaged) দেব অতুল লভার পাখ আর মেয়ে মললে অনেক ঈর্ষা, অনেক বিকল পরালোচনার যোগ্যক ব্যারিস্টার রায়ের একবার মেয়ে—হুনিয়াটিন'টিং নামকর হাতী—টেনিসের হিম্মত, ভাবদল এ তুলোৎ খোলোয়া তুলোৎ নাচিয়ে হুশালী রায়ের কথা ভাবতে ভাবতে অবাক হয়ে যায় বৈকি হুশালী রায়চৌধুরী । কথাসে শিগাগুলো টন, টন, করে ওঠে—উজ্জ্বলার হোত

হৃদয়ে। হ্যাঁ, দাদা পাক'বানের দুটো, বাবা'র ব্যাক-
ব্রাশ চলে সে দিন দাঁতাই কিছটা বিপণ্ডে দেখাছিল
বৈকি প্রাণকে। আবার হয়ে পড়ে। লম্বা লম্বা পা
কেলে কোন দিকে না চেয়েই প্রাণ সে দিন দটান এসে
বসেছিল হৃদ্যালীর সামনের টেবিলে। অস্তুর বিরহিল
জোয়াসে। মেজাজের আঁধি অফিসার ছিল তখন
প্রাণ। পাজা ঘোষেবিমান।—স্বর গড়ার কেউ নয়
কিন্তু স্বর ভোলাবার একজন। সেই সে দিন গিথিরে
ছিল হৃদ্যালীকে, ভীত, সাবকের মত জাঙ্গা জিনের
মোহে বসার অত্ব কূপে পড়ে থেকে কি হবে—ওজো
আকাশে—চেনা ভগতবে। Know the world, this
wonderful world,—বলেছিল প্রাণ। তখন তার
স্বপ্নাত, চোখ দুটোর সিকে চেয়ে আঁখিতে হয়ে গিয়েছিল
যৌবন-মুখে নম্রা গর্বেমুখতা হৃদ্যালী রায়। কচি-
শোকা যেমন আঁখিতে চল শব্দদুপের চোখ দেখে।
কাট'সীর বাগ বাড়ে নি। একদিনও ফ্রাট' করে নি,
ইনিরে বিবিয়ে প্রেম বিবেচন করে নি সে দিন প্রাণ নয়।

বলেছিল তার সংক্ষিপ্ত অত বিচিত্র জীবনের নানা
কাহিনী তার ভাব্য—The trust fantasy of the
wonderful army life.

নতুন রক্তের শাল পেরে কাঁধের যৌবন পাপল ঠে
চাপ তেরানিই উপভ্রাত হয়ে গিয়েছিল পাটনার হৃদ্যালীর
রায়। তার এক্স বছরের জীবনে এমন একটা কথা ভো
কেউ কোন দিন বলে নি। প্রথম আলোপেই ভো কেউ
সেবার নি এমন গরোবা, নিলি'গ ভরাতা। তাই প্রথমে
থল 'বাট' এর ভূমিকা করেই প্রাণ অবদল নিষের
কবাই বলতে শূন্য অয়েছিল তখনই ভালো লেগেছিল,
শূন্য ভালো লেগেছিল।

যে Love-at-first-sight কে কিংবা যে ফেলেন,
পতুতলা, নিরান্দা, পাক'ভী, কি সেগু'কি বোনাকে তার
এক্স বছরের জীবনে প্রতিদিন বিহু'প করে এসেছে
তারই বলে সেবে পড়েছিল হৃদ্যালী। পততবৎ বহিঃস্থ
বিবিহু উজুক হৃদ্যালী রায়।

কিন্তু ভাবলর...পারানো শ্রুতির বন্যায় যেন আর
চল পাচ্ছে না সে।

—Don't be silly...তোষারও আবেকার স্বভাব

কিন্তু পালটায় নি, you are still so sensitive
emotional...and...and...still so honey। প্রাণের
কথার পক্ষে ঠোঁট চিত্তাসুত হির হল তার। হৃদ্য
ভবর্গনা করছে প্রাণ। তার কথার মধ্যে আশ্চর্যকতার
দূর বুলে চমকে উঠেচো হৃদ্যালী রায়ভৌবর। কিন্তু
নিজেকে শাল সে নিতে দেয়ী হল না তার। ইং' লজ্জার
সমুচিত্ত হয়ে বললে—জানো না পালদার একটা
প্রায় আছে শ্বেভাব ঘর না বলে...আবার কথা হয়েছে
তাই। হাসবার চেষ্টা করেও হাসতে পারছে না যেন
হৃদ্যালী। কিন্তু নিজেকে তুহি একটুও পালটায় নি
একনও।

অভিনব ভবর্গতে হাত দুটো এগিয়ে দিতে কাঁধে
আবার হৃদ্য কাঁধের তুলে হাপছে প্রাণ।—আরে না,
না, না, বড়ো হতে চায়...তোষার কথা কেউ তাই
বিশ্বাস করবে না। দৃক্বে কয়েই কাছাকাছি আসছে।
ঠোঁট হৃদ্যালীই প্রভাব করে বসলো কোথাও বেঁকাতে
যাবার। এই অজ্ঞতার লগে এতগুল বদা মানেই অপবার
কুভানো তাই প্রাণও গ্রাণী হয়ে যেন আনন্দে। কিন্তু
যেখানে বাথের জু সেখানেই শ্রুতা হয়। তাই গেটের
সাহনে বৃক্বেমর্ষি উমানন্দরের লগে কেবা। আককের
পাট'সি হোষ্ট। প্রোট ব্যাচলর। বনী মান'ব। ক্যাপন
কাট'সীর মধ্যে তাই আকর্ষ ভূবে বলতে আসছেন।
পশ্চাৎ পথ আগলে বঁচালেন তিনিই।

—আরে পালদা'ন কোষার, একু'ণি 'ভ্যাপ' শূন্য
হবে যে আপনা'দের জন্য সেরা কন সাট' আনলে—
হৃদ্য ব্যাচ, আর আপনারাই হাত না নিলিয়ে চলে
যাচ্ছেন—আমি বৃক্বেমান'স লব বিক সেমতে পারি
না আর...।

এই সেয়েছে। নাকী মূর্খে এই কাট'সীর মহড়া
ভো লজ্জা পে'ন হবে না উমানন্দরের তাই প্রাণের
থিবা দেখে ল্যাসরি ভবাব দিল হৃদ্যালী।

আমরা অতাত দুর্ভাগ্য উমানন্দর বাবু—But we
have an engagement বন্ধ করু'ব। বাবা হতেই বিবো
বলতে হোল হৃদ্যালীকে। কিন্তু তার উত্তরে চিবিরে
চিবিরে যে কথাসুন্দো বললেন উমানন্দর তা শূনে শুভ
হয়ে গেল সে।

—ভবে—জানি নিরুপার—

যাক! অগ্নিশিখার আর আটকাবো না অগ্নিসিখের হস্ত
শূন্যগাহার, আর বাগা বেবনা। Good night!

আলোকিত দুর্কার পথ হয়ে অস্বাভাবিক হয়ে সেলেন
উদ্যমকর। আর বিকট হয়ে হাঁকিয়ে সেল হৃদয়ালী
গায়ত্রীদুর্গা। সত্যিই কি নিজেদের এত দীর্ঘ নারিয়েছে
আম সে? প্রাণী? কিছু স্বাভাবিক। তার চেয়ে
নেই এ সব বিষয়ে। তাই হৃদয়ালীর বাহুদলে মন
চাপ দিয়ে বললে—একটা স্মার্ট Snob।

যাক! আবার হাঁকালে কেন চল, Let us to go to...।
হৃদয়ালীর দিকে কিয়ে চেয়ে তারপর অজ্ঞান করলে।

—কৈ বল কোথায় যাবে?

হৃদয়ালীর দিকে ভাবলো বৃষ্টি সেই প্রভে। নিজের
দলে বোকাপড়া করে শূন্য হতে বেশ কিছুক্ষণ সময়
লাগলো তার। হাঁতধরা পায়ে পায়ে Car stand এ
এসে দেখেছে সেখানে তারা। প্রাণী এসেছে গিয়ে কল-
ভিত্তি হং এর একটা বৃষ্টির পরবার হাতলে হাত
সেখানে ততক্ষণে। হৃদয়ালী সেখানে চোখ ফিরায়ে।
নতুন মডেল, New model—এর গাড়ীটা কেন শাক
কিছু প্রাণীর উপস্থিতি। প্রাণী না করে তাই আর
পারলো না হৃদয়ালী। বা: সত্যিই পছন্দ আছে তোমার
it's nice and excellent!

বৃন্দ হাসলো শব্দ প্রাণী। কোন জবাব দিলে না।
গাড়ীতে উঠে গৃহস্থের বসার অবসরে দিচ্ছে কেন্দ্র
স্বাভাবিক করে আনতে পারলো হৃদয়ালী গায়ত্রীদুর্গা।
প্রাণী ততক্ষণ Start দিয়েছে। বা হাতে স্টিয়ারিং
চেপে ধরে এবার সে বৃন্দ ফেরালো, কৈ কোথায় যাবে
কল্লে না তো?

—কেন চলো না গংগার ঘায়েই...

বেশ কেন্দ্র নিশ্চয়, গাড়, তা হ্যাঁ ব্যক্তি বর,
হোটেল, পার্টি আর এতদে ভালো লাগে না আমার।
সে দুনিয়ার মধ্যে যে জড়িয়ে আছে একটা বৃন্দ স্বাভাবিক।
একটা স্ট্রিট, গংগার একটা গাওয়ার গংগার।

—কেন এর থেকে ভালো হত তোমাদের ওখানে
সেলে...কেন ভালো করা যেত নি: গং-
গায়ত্রীদুর্গার মধ্যে।

চমকে উঠলো হৃদয়ালী। চমকে উঠবার কথাই
তো। অতি হয়ে যে দূরত্ব একজন দৃষ্টির বেগে
প্রাণীর কাছে এইবার তা প্রকাশ হয় বৃষ্টি। তাই
বৃষ্টির অবস্থা কল্পন চেপে বৃন্দে অন্য প্রাণীর
গায়ে বইয়ে দিলে আলোচনার স্রোত। কণ্ঠ অতিভাবে
নিজেদের আরও অস্বাভাবিক করে আনলে। বন্দে,
—বন্দে তো ব্যক্তি ব্যক্তি আর ব্যক্তি আমার ভালো
লাগে না আর।

জানলার বাইরে বৃন্দ রাখলে হৃদয়ালী। ব্যক্তি
স্বাভাবিক সত্যিই যেন বৃন্দে তার কাছে উদ্যম হৃদয়ালী
গায়ত্রীদুর্গার কাছে। সোপাইটি গার্ল—চ্যাটে অভ্যস্ত,
প্রাণীর অতি পরিচিত বৃন্দ, হৃদয়ালী হৃদয়ালীর কাছে।
অন্ততঃ এই কথাই যেন জানে প্রাণী। এই কথাই যেন
বোঝে।

সত্যি আত্ম। এতটুকুও কি পাগলটার নি প্রাণী?
এখনও কি ঠিক আছে আগের মত অবস্থা witty আর
চিলে চালা? তাই হৃদয়ালীর অভিনয়ে সে প্রভাবিত হল
সব্বেষ্ট। বৃন্দ হেসে বললে—“হ” তা হলে তোমার
বিস্তার দেখাই গৃহস্থ গৃহস্থ হা’ আর তা হ্যাঁ আমার হস্ত
বোঝেবোঝের মধ্যে বাগ ও বাবে না তার—আলাপও
তাই জববে না হ্যাঁতো, কি বল? হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, উচ্ছ্বাসিত
প্রাণ ফোলা হাসি। প্রাণীর কানের সাউটা বার বৃন্দ
হুয়ে সেল, হৃদয়ালীর অভিন। একটু দূরে বসলো
হৃদয়ালী। কিছু বরো বাঁহ তোমাদের ওখানেই দেখুন
তবে কি বলে আলাপ করাতো আমাকে...হং গং-
গায়ত্রীদুর্গার মধ্যে? কৌতুকোচ্ছল প্রভে আরও বৃন্দ
হবার চেষ্টা করছে প্রাণী। কাঁচা পাকা চল, স্টার
সেহ, সৌখিন পরিচ্ছন্ন বন যৌবনের শেষ সীমার লাকানো
ব্যক্তিগর প্রাণী বস্ত।

এবারই বা কি জবাব যেন হৃদয়ালী? এক্ষণিক
মতোব বৃন্দ বিব’ হ্যাঁ বা হৃদয়ালীর সমস্ত বৃন্দ সমস্ত
স্বাভাবিক দিচ্ছে বরো কোরে—আর অন্য দিকে কৃদ্যাত্মক
বিখ্যা—অবাবিল বৃষ্টির স্বাভাবিক হ্যাঁহ্যাঁহ্যাঁ দিচ্ছে চাক
তাকে। কোনটা বেছে নেবে সে? কোনটা স্রো?
যেহেতর হিসেব বিখ্য বিখ্য মানতে লাগলো হৃদয়ালী
গায়ত্রীদুর্গা। বা, অভিনয় করতে হয়ে তাকে; অন্তত

প্রদীপের কাছে ত্রাণ থাকতেও তার স্বীকার কোরে না নে।

প্রকাশ করবে না যত্নের দীনতা।—কি বসে আর আলাপ করাবো বল—হাসিটা প্রশান্তের মত তাই একবার মূল্যে নিল হুশালী—তোমার কত গল্প কোরেছি আমি বিশ্বের কাছে, তোমাকে আমার চিনেবে না—তা ছাড়া ছুটি এখন একটা গাণ্ডা বাণ্ডা সোফা টেরিটোরিয়াল আর্মি'র প্রদীপ হতে আর কে না চিনেবে—You are now famous to every body!

লব্ধ হাসিতে বহুদূর সম্ভব নিঃশেষে স্বেচ্ছা কোরে আনছে হুশালী। আর সম্ভাবনামত কলহাস্যে ফেটে পড়লো প্রদীপ অকারণেই।

—তাই এর ওট্টা নিলে হবে সেহে ঠিক করে পাও তো হনি!

গলাটা এগিয়ে দিলে প্রদীপ। ভাবান্দার বাইরে থেকে মূর্ত্তা সরিয়ে নিতে গিয়ে তাই চক্রে উঠলো হুশালী। আদভো হাতে...শর্পা বাঁচিয়ে সত্যিই বেঁচে গেছে নাকি টাইটা। সেজাই তো উচিত, কিন্তু এক-এক অকারণ—অশোভন আশঙ্কা, এক স্রেসেরান্দ্রীতে শেষে বসলো হুশালীকে।

তাই বহুদূর সম্ভব স্বাভাবিক ভাবেই নাইলনের সাদার সোপানের মত পাতল টাইটা অনাবিকা আর মধ্যমার কাঁকে আঁকড়ে ধরলো সে। বাঁহতে বাঁহতে ভব-পারের মধ্যে ধেমল ঘেন দিগ দিগ করে। উত্তেজনা আসে। এখনি গোক...এখনি তো এককালে প্রত্যাহ হুঁহুড়ো সে। নাইলন, শাক'কীন, কিংবা সেবাঁড়ীন। কন-হোলে নুকে সেজা স্নাক প্রিন অথবা হেলিকসান। মোকন কোর্টের বিবিড ল্পা। পিন্স থেকে কথার কাঁকে কাঁকে সোবাক গিয়ে সেজা—সেই কর্মবান্দ মান্দ্রটিকে। বনে পড়ে কিন্তু তার পরে...

অবল হবে আসে আদুলসলো। কি ঠাণ্ডা পালিশ করা কলারটা। কিন্তু প্রদীপের উচ্চ চিবুকের স্পর্শে চক ভাঙ্গে হুশালী। চকিতে সরিয়ে বের হাতটা, প্রদীপ কিন্তু নির্বিকার। মৃত নেপাটা ভয়েছিল পাঠিতে, তাই আরও Jolly—আরও চলে-চলো হয়ে গেছে সে। নানা কথার টেউএর সোলায় তাই ভাগিয়ে দিতে চায় সব কিছু—তাদের হৃদয়ের ব্যাক্যানে লয়ে

যে অর্পাকরের কৃপাচার বরনিকা টেনেছে হুশালী তাও উত্তরে নিতে চায় এক কদ-এ। উড়িয়ে দেওয়াই যেন তার কত'বা—অধিকার। তার মনিষ্ট কথা বলায় চু—অকারণ হাসি—কল কলো চোখ আর বদশ মূখে তাই কিসের সংকট যেন বারবার ছাড়া ফেলে। অতি সাদরানে তাই চলতে হয় হুশালীকে। পিন্স ঘাটের শেষ শৈঠার এসে বাঁচিয়েছে সে। বহুতের ভয়েও তাই ভুল করা চলবে না। বহুদুই অভিনয়—অভিনয়ের জন্যেই অভিনয় এই কথা বলে মনকে বার বার প্রবোধ দিল হুশালী রায়চৌধুরী।

দব সোলবাল হ'য়ে বার বৈকি। গংগার ঘাটে গাবার প্রত্যাহ লব্ধ লব্ধ কলহাস্যে বহন উড়িয়ে দেয় প্রদীপ তখন হুশালীও পারে কি'দার না দিবে। বি, টি, রোজের উপর ঘিরে আনি'ল'টি গভবোর উদ্দেশ্যে গাড়ী হাতে চলে প্রদীপের। টুকরো কথা লব্ধ আভবিকতা, যৌবনের মনোভাষা স্মৃতি, কলো প্রাশার আশে ভোলায় কঠোর স্রোতাক জীবনের অব্ভুতি—অব্ভুতি। বহুতের ভয়ে ভোলায় স্রোত হুশালীকেও। ধীরে ধীরে নানান কথার মূর ওঠে পকনে। পকনে থেকে লহনে। বাইলের পর নাইল হালতে ঘাঘ শবনের মত। হুশালীর উচ্চকিত হাসি মত। পী'কাল পরে স্রাবার কসোত-কসোতীর গুচ্ছেরে স্বান—আনন্দের, একটা তীর আনন্দের অব্ভুতি ক্রমে ক্রমে যেন অগাধ করে দিলে হুশালী রায়চৌধুরীকে।

কিন্তু লবনের প্রবী রেজির চাষাল বাঁচটা বার লারে হঠাৎ। প্রদীপের মূর্ত্তান বনিনদের উপর বন্ধর পড়তেই বিব্রত-মূর্ত্তের মত চক্রে ওঠে হুশালী

'এগারোটা পাঠিন—

প্রদীপ বহুও তাই অপ্রত্নত।

এবল হঠাৎ সন্তপস।

প্রদীপ ব্রীক গাড়ী ঘোরাও—ব্যাঙ্কল আত'স্বর পোনা ঘাঘ হুশালীর। একি কথছিল সে। বিবেকের সংকলের অব্ভাশনের প্রবী'গুলো, এইবার লম্বাশ, হ'তে উঠেছে। পটীর পূর্বতন কোণে তাই স্রোতের মত বসে থাকা ছাড়া আর কি করতে পারে হুশালী?

বসিও এমন তার কাছে গাড়ীর আনখাওয়াটা বিবৎস, একাত্তই মঃঃঃ— তবু এর হাত থেকে তৎক্ষণাৎ নিজের শবীর কোন উপায় ভেবে পায় না হুশালী রায়চৌধুরী ।

নিশ্চিন্ত হাত । প্রকৃত একটা অজস্রের মত বি, টি, ডোড । জুগাসা লেশা নিশ্চয় আর আকাশ, একটা দুষ্টো বাল গাড়ী বোতাই লগীর কনভর্ত । কীকীর অস্রাও বসি । সী সী করে গাড়ীর বাতাস কাটার শব্দ । অপর্যায় ভ্রমের শব্দের মত হেবত শব্দ রাড়ির ঠাণ্ডা বাতাস । শিশির তেজা কলসডোলা কেতের অলসট নির্মল জল । তারপর আসো বেড়া বড়ীর দারি । ভিখারীর শীতাত' মূখ । কতু গরু, আবর্জনার জুগ । হু হু করে এই সব উৎসবে কলসভার লিকে হুটে চলছে প্রাণের কাক ডিমে রঙ-এর হুইকটা । আর গরু—কড়ের মত হুশালী ডুবে বার চিত্তার অভলে ।

বাড়ি পৌঁছাতে মাড়ে বার ।

গোটের সামনেই গাড়ী পার্ক করতে বসে হুশালী, অনেক নম্বর প্রচার বাপনের পর এ যেন হঠাৎ এক কলক মূর্খি । নিজেই দরজা খুলে এত পরে বেনে গাঁড়ালো । প্রাণের কথা কান দিলে না—বীরগ কেডাম্বল ভাবে একবার শব্দ হাত নাড়লে হুশালী, 'TA-TA' তারপর জাঃ হুটেতে হুটেই এসে বড়ালো গরু বরজার সামনে । বিদায় সন্ডামটা মূখে আটকে গেল প্রাণেরও ।

কিছুক্ষণ অবাক হয়ে হুশালীর অঙ্গদুঃখান মূর্তির দিকে চেয়ে গইলো সে । গতিয়া, অমৃত একদিনের জন্যেও সে মূর্খক ভিবেত পারলো না হুশালী রায়চৌধুরীকে । একটা বাকশোর—একটা ছোত । দুই গাঁতের কাকে দিমারেটাকের কামড়ে গের বক্রের একটা ইংরেজী দপথ আঙুলে তাই প্রাণ দখ । হাসের মাখর অয়েতুক জোরে হুটকে দিলে গিরগটা । জুহু মৌখাসির মত গুন গুন তলে অংশ্য হয়ে গেল প্রাণি দুয়ের হুইক । গজীর শব্দের বিন্যাসে একটু হালকা হচ্ছে হুশালী ।

এক মিনিটও যেন এক মণ্টা ।

চোখ গগড়াতে গগড়াতে তাই কানুহা এসে বধন খিল
 গগড়া—জ্যাক একটু অকারণ বরক দিয়ে উঠলো

হুশালী । চোরা বেকার অস্তিত্ব হতে মাথা নিচু করে সরে হাঁড়ালো এক পাশে । পাফালী কিতু তৎক্ষণাৎ দামলে নিজেই নিজে । বসে এমন বা ।—

তবু বাড়িরে আছে কানুহা । কি যেন বলতে চায় ।

—কোয় কুই—কুই বোলোনা ?

—বাইকী, কুই বোই,—লেকিন ?

—লেকিন—কোয় ?

—বাবুজী জিনার বোই বায়া হায় !

সর্বাপ যেন বশু করে আবার অলস উঠল হুশালী । তা মাঝ কি করবো হাই তুমি জিনার কোরবে তো বাবে কি বাবুজী—বতসর Idiots and fool. হাসের মাখর ইংরেজী বলা হুশালীর বহুর্ভবের অভ্যাস । তাই আবার গম্বাডে গম্বাডে বসে—what I can do ? যা ভাগ সামনে থেকে ।

কানুহাকে আবার বরক গিল সে । হাত নেড়ে ইঙ্গিত করলো সম্ভব থেকে সরে বাবার জন্যে ।

উঃ এক সেকেন্ডের জন্যেও এরা পাতিতে থাকতে সেবে না তাকে । বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যে আশা মাত যেন বর আটকে আনছে হুশালীর ।

উৎসত জোরে যেন পূর্ববার বিসাক হয়ে উঠেছে মনটা । এই প্রাত্যহিকতার রানি থেকে কবে যে মূর্খি পাবে হুশালী ! কবে যে হাড়া পাবে সে ।

তবু লগ্য করা হাড়া আর কি উপায়ই বা আছে ? হরত কাশীবনই মূখ বসে লগ্য করতে হবে হুশালীকে । নিছের কাছে, বিলোর কাছে, বিধির কাছে সব রকমের হার হতেই যে তার । মেয়েদের দুষ কোথায় আনও কি তা বোরেনি বিলভা ?

বিবাতার নিবুর্ভবতার এত দুঃখের মধ্যেও তাই করুণা জালে হুশালী রায়চৌধুরীর মনে ।

কানুহাকেও তাই হুটু দিয়ে দিল সে । তা হাড়া ওকে আটকে রেখেও বা কি লাভ ? বিলোর না মাওয়ার জন্যে প্রকৃত সোশী ভো সে বর—দর বিলও । সব মোল হচ্ছে হুশালীরই । তার ভাগ্যের ।

বার বরে পলু দুগ্ধের বাতিকগ্রস্ত স্বামী, বাইরে বার জন্য প্রদোষন পটু একল মানুং । জ্যাঝিতক হচ্ছে বাবা একটা স্নাক—খাঁজনের দুঃখ রানি তার জীবনে

এ সব কিছুই গা সওয়া, এ সব কিছুই নিজস্ব স্বাভাবিক।

তবু কণিকের পাখি পেল হৃদ্যালী। অতঃত এই
সারির মতো তো নিশ্চিত থাকতে পারবে সে। দাঁড়
ভেঙে মোতামার উঠতে উঠতে তাই সত্যিই বৃন্দী বৃন্দী
মনে হচ্ছে যেন মনটা। হৃদ্যালীর মধ্যে দ্বিগুণ শব্দ।
দুঃখের মধ্যে দ্বিগুণ দুঃখের উচ্চল।

আবার যেন ভাসে। হৃদে গেছে বিবল। সূর্য, সল
প্রকল্প। সেই আসেকার—পাঁচ বছর আগেকার বিবল
স্বয়ংক্রিয়ই যেন দামনে এসে ছড়ান তার। যে সোক
এক পছন্দ একদিন বিশেষ ঘটনোচ্ছল হৃদ্যালীর ভীষনে।
যে বিবল একদিন ভুলিয়েছিল প্রাণিককেও, আরো
হাতারো তরুণের শ্রুতি। ওলমটোরের শব্দভাষায়
সূর্যিঃ ঠাক পড়া কি হিসেবীর বসন্ত ক্রান্তিলের সূচী
চাপানো সখা হাসান একটা মানবের ছবি যেন তাই পাগল
করে দেয় হৃদ্যালীকে। কিন্তু সেই মানবই আজ...

ব্যালকবির রূপকে দাখানো হল। বেলুনী, বতেরী
রঙের বিভিন্ন গন্ধের ঐক্যের বালি শিশুগুলোকে
হেঁবে তাই চোখের কল আর বীর মনে না তার।
বিবলের ভীষন, বৃষের ছাশি তিলে তিলে তো কেড়ে
নিচ্ছে এরাই। এরাই আর হৃদ্যালীর ভীষনে মৃত্তমান
অভিশাপ! ঈজ্ঞা করে মৃত্তমতে ভেঙ্গে পড়িয়ে দেয় ঐ
রাক্ষসী। সারি সারি দাখানো প্রাণহীন। ঐ
শব্দভাষাগুলোকে।

বিবলের বৃষের দ্বিগুণ একবার চোখ ফেরায় হৃদ্যালী।

কিন্তু এক এখনও আপো কলছে। চমকে উঠলো সে।
শব্দোপভ্রমের মতই। সত্যিই, ভারী পর্দার কণিক দিয়ে
এক কালি দীঘল আলো এসে পড়ছে ব্যাপার
রোশনি। তবে কি বিবল এখনও জেগে আছে—যুবের
ঐক্যটুকি তবে সত্যিই বাজে না রাত জেগে আবার বই
পড়ছে বিবল।

দানব আশঙ্কা মৃত্তমতে জাগল হৃদ্যালীর মনে।
কানহার উপরেও বাগ হোল। হরত উচ্চবৃষ্টাই আলো
নেভাতে জ্বলে গেছে। না, এখন দেখা পরকার।
স্বাক্ষরিত্যে তাই বিবলের বৃষের দ্বিগুণ টেনে নিয়ে
চললো হৃদ্যালী স্বয়ংক্রিয়।

ভারী পর্দা সারিয়ে বসে চুকতেই চমকে উঠলো

হৃদ্যালী। আর শোনা অস্বাভাবিক দিলিঃ—এর দিকে চেয়ে
অস্বাভাবিক—কণিকিতে কি যেন বৃষ্টিছে বিবল। হৃদ্যালীর
পদক্ষেপে চমকে উঠলো সেও। ভাঙাতাড়ি উঠে বদবার
চক্টা করলো, বৃষ্টি। শাল হয়ে উঠেছে বিবলের।

বনের শির মৃত্তমা কোলা—হরত আবার টেলোজোর
বেড়েছে—হরত আবার বেড়েছে কোমরের ব্যাটা।

তাই শম্ভিত হৃদ্যালী ভাঙাতাড়ি এগিয়ে এল তার
পথ্যর দিকে। বরের চারিদিকে নানা ঐক্যের ও
দিশারোচের জ্যাপনা গছ। একটা জেন যেন বর
বাটকানো আবহাওয়া। এসেটোও ভর্তি দিশারোচের
ভাঙাবশিষ্ট টুকরোয়। দিকোচিনের নীলাত বৃন্দ তখনও
পাকে পাকে উঠছে নির্বাণিত একটা দিশারোচ থেকে।
জানলাগুলোও বন্ধ। অবশ্য জাকারের নির্দেশ মত
এখনই বন্ধ থাকে রোজ। তবে আজ চঠাং হৃদ্যালীর
বেধন যেন হৃদ্যালী—অসহ্য মনে হল এই আবহাওয়া।
তাই একটানে খুলে দিলে দাঁকনের জানালাটা। সারিয়ে
দিলে জানালী কল জোশা পর্দাটাও এক কল ঠাণ্ডা
বাতাস চুকুক ঘরে—নির্মল হোক এই বিলাফ
আবহাওয়া।

প্রথম কথা বললে বিবলই। উত্তেজিত, গোলা, বদবলে
তার গলা।—‘দাখা—হা, এক কংহো—জোমার নয়
এখন পরীর গরন গরন শেখী কিংবা ভীনে।

কিন্তু, I am not in the Seventh heaven like,
you, Darling—

জরটা এখনও একেবারে পের করতে পারেনি
আমাকে—তা তার ওপর বহি নিউনিয়াও বসাতে চাও,
Then please open the other two—হাকিতে হাকিতে
পাঁচনের জানলা মৃত্তমের দিকে আঙ্গুল দেখালে বিবল।
তারপর বললে—

তা—তা’ বেশ তো রাত কাটিয়েই প্রায় এসেছো
সেখনি, নিশ্চয়ই বৃষ রোজ জমেছিল জানাপিনা, অথব কি
জানতে পারো who was your host? যিবরে যেন
গলে ঘানব ভান করল বিবল সার চৌহুদী।

সেই সপ্নে কৃত্রিম অন্তরণতারও। তবে কি কাল-
বৈশাখীর সকেত। শম্ভিত হচ্ছে হৃদ্যালী। সংস্কৃতও।
চিঁবিয়ে চিঁবিয়ে আবার কথা বলতে সূর্য করছে

रिवन—Darling, क'हाइस नाइन ? May I know who was your partner ? That old fool Mr Gupta or that Menon of Burma Shell ?

কাঁদাহাসিতে বিকৃত হল বিমলের স্বর-তরঙ্গ নুষ্ঠা—
—Darling, আমিও একদিন ছিলার তুতোত পাট'বার—
A Champion dancer. But now I am no better
than a dead piece of log to you and—

বোধ হয় সেই প্রত্যাখিক প্রলাপ হইতেই। সৈন্যসিন
হইবে সেই অন্তর্ভুক্ত। তবে সূত্রটা পাশটাকে।
স্বাভাবিকভাবে সামান্য ব্যর্থ যেন নিজে। স্তোত্রকর তিল
তিল অদ্যতী আকর্ষণে তেঁপে থাকতে পারে। হস্ত তাই
দুশালী। বিদগ্ধ। স্বাভাবিক পুণ্যোৎসাহি অসহ্য বোধ হচ্ছে না।
হস্তঃ বিদগ্ধের এই কথাগুলো শোনার পর।

কিছু দারও বঙ্গবাসী আছে বহি বিবরে। সেই
 হায়েই বুঁচ তাই এই উৎকণ্ঠত অনেক।—How was
 the Concert? রক্‌ এন্‌ গোল না হুন্‌? কে কে
 এসেছিল পাঠিতে? কিছু হুন্‌দারি অমায় হ্রাত
 হুন্‌দারি হুন্‌ পতি বিগলিত করলে তাকে—তাই বললে
 —আরে, you are too tired, I See Honey!
 আর কিছু করো না তোমাকে, গতিই শর্যাবিন পাঠি
 করলে কেই বা tired না হু। তবু ব্যঙ্গের খোঁচাটা
 আর গুচ করা হলে হুন্‌দারি।

‘‘ମିଆଁପୋଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପ କରବାର କରବାର ବାଟ’’ ଫେରା କରେ
 ଆବାର ବନ୍ଧୁ ବୁଲେ ବିସମ—ଆବୃତ୍ତିର ସ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନତୋଳିତ
 ଫେରା ମିଶିବ-ଓ ଶିଳ୍ପ ଫେରା ବଳେ ନେ—କାନରେ ଖସି
 ଆସାଥ ।—‘‘କଢ଼ର ଗାତେ ତୋହାର ଅଭିଳାଷ ବନ୍ଦୁ’’—
 ଫେରା ବିକଳ ମନ୍ଦାର ଆବୃତ୍ତି କରେ ଧାକି ବିସମ ।

কিন্তু সন্ধ্যার শেষ নমিয়ার এসে এবার কেটে পড়লো
হৃদয়ালী। ক্রুদ্ধ পল্ল-গুলিত বাগিনার হাত কোঁস করে
কিছু হাড়ালো। সর্বান্তে কেন আসন দু'টিতে বসে

তার। কি কি বললে—এটুকু লক্ষ্য করলো না
তোমার অসভ্য, গুস্তর, ছোটলোক বিজ্ঞের স্ত্রীর সম্মুখে
এ সব কথা উচ্চারণ করতে এটুকু ধূবে আটকাই না
তোমার—আমি বলে প্রাণ নব নিঃশেষ করেছি, ছি, ছি,
কি লক্ষ্য করলো না।

কর, ধর, বাসছে সে ।

অসমানে, ছোভা, অপর বর্ণন করে হয় নিচ্ছে।
 দর নিচ্ছে স্ফূর্তি কয়েক বছরের গ্লানি বেড়ে
 ফেলে।

কিন্তু ভক্তকে আত্মগতির হৃৎ স্তম্ভ হয়ে গেছে।
যেন একবার উৎসর্গিত করেই নিজে থেকে ফেঁটাতে
আগুন। যে মানুষকে উদ্বেগ করে এই বিস্ফোরণ সে
পড়ে আছে বন্দ পাত্তের ন্ত। ক্যান্সে হৃৎ-ভার্য
চোখ-বুকের ওপর ছড়ানো নিচল হাতের আল্পন-
গুলো। নীলাভ নিওনের আলোর অন্নত পাত্তর আর
অদ্যার দেখাচ্ছে বিকল গ্রাসচৌকীকে।

কিন্তু অসহায় কি হৃদ্যালীও নয়? নিজের কাছের
 নয় কি ভাঙচৌরীর থেকে বৃষ্টি। সমস্ত হেঁচটা পলে
 পলে লব্ধ হোতা হচ্ছে ভাঙ। তার বাস্পাতুল চোখ
 হুটোও ডো কাপুস করে দিচ্ছে সব কিছুর। কাপুস
 হচ্ছে ব্যাঙের কব্জের মত নয় বরং হওয়া খড়্গ। ভিড়ান,
 সোকা, টাঁপের পালশে রোগ-জ্বর অসহায় ভাঙচৌরীর
 বিবর্ণ মুখ। সব কিছুর কাপুসে বেব বড় বড় করে।
 কপিল পায়ের তলসে হ্রদস মোহকের আড়ম্বপটীও।

তাই এতদিন একটা অবলম্বন চাই হুশাঙ্গার।
জাকতে ব্যায়স বত কোন কিছু। বাচতেই হবে তাকে
বাচতেই হবে তাদের। সব ভুল বোকা ব্যক্তি, সব ধর্ম
প্রাণির উপে' বাবা দৌলবার বত এতটুকু চাই যদি বিবে
হবে হুশাঙ্গারকে।

তাই অসহায় মানদণ্ডের জন্য তত্ত্ব বৃদ্ধির উদ্যোগ
উন্নতিসহকারী ভাবে পথে বৃদ্ধি।



জীবন-বহুতর সন্ধানের
সার্বিকতা কি, যদি তা
চিরদিন মুক্তেরই থেকে যায়
মনে কারো এসবম
প্রর আশলে স্বভাবতাই
তার মনে হবে, এলরামির
এ প্রচেষ্টা, এ সাধনা তবুই
বুঝি ক্ষুণ্ণের ব্যাপার! মন-

বাক্যের অতীত যে ব্রহ্ম আত্মা, কে তবে তাঁর অস্তিত্বের
প্রমাণ করতে পেরেছে, বা পাবে? তাই যদি হয়, তবে
এলরামির এ জীবন-ব্যাপী সাধনামেদ?

কথাটা সত্যিই। তবু যেহা যায়, অনেক লোকে
এই অমর আত্মার রূপন জ্ঞানার, অনেক রকম দৃষ্টি
উপলব্ধির করে থাকেন, কবছেন আর কবছেনও। অনেক
পুণ্যাত্মা এই আত্ম-রূপন করে নিজে কৃত-কৃত্যও
হয়েছেন—এমন কথাও শোনা যায়। সুস্থির এই যে,
যদিও অল্প-অল্পাংশেই সাধনার কালে আত্ম-রূপন কয়েছেন,
তীক্ষ্ণ মন-বাক্যের অতীত সেই ব্রহ্ম-আত্মার কোন
বর্ণনাই দিতে পারেন না। শুধু তাই নয়, আত্ম-রূপনের
পর, তাঁর নির্বিকল্প সমাধি হয় মন বন আর অতি শীঘ্রই
ভিত্তি সেই নির্বিকল্প সমাধি থেকে, আর মন-পেয়ে
নেমে আসতেই চান না। তবু কিছু মানুষের এ বিষয়ে
চৌকর অন্ত নেই।

লিগিষের কবিত 'সংকেত' পাবার আশার অপেক্ষা
করে হিন্দুস্তানে জন্মতে, এলরামি অনেক সময়েই এই
কথাগুলো মনে মনে ভাবতো,—আলোচনা করতো।
আশ্চর্য এই, যে লিগিষের বলা এই সংকেতের কথাটা
অবিস্বাসী এলরামির মনেও, কেমন করে মনে বিশ্বাসের
আঁচড় টানতে পেরেছিল—যদিও কালে তার মনে লুপ্ত বিশ্বাস
জন্মেছিল, যে কালপূর্ণ হলোই, সে সেই সংকেত নিশ্চয়ই
পাবে। বিনা প্রমাণে কোন কিছু বিশ্বাস করা বা মেনে
নেওয়া, যোগ হয় এলরামির জীবনে এই সব প্রথম।

এই সত্যই বিনের পরদিন কেটে গেল। যে,
যেকো জ্বন, তারপর জ্বন শেষ হয়ে জ্বলাইও প্রায় এসে

সোল অর লিলিথ মেরী করেলী

অনুবাদক—হরপ্রসাদ কল্যাণাচার্য

পড়ল। সাতা লওন নহর
সুন্দর হাসি, আর নিমেষ
সুর্ধের আলোর কলমলিয়ে
উঠল। তবুও এলরামি,
একা করে বলে বলে, তার
নিদ্রার ভাবার দেখা
পূর্ণিপাঠ করে, আর পতী-
কার কলংকল সন্ধ্যারে

লিগিষে, পাণ্ডুলিপি পর পাণ্ডুলিপি তৈরী করেই দিনের
পর দিন কাটাচ্ছিল। বাইরে কোথাও সে ইতিমধ্যে
যার হয় নি। বাড়িতে বারো দেখা করতে এগেছিল,
তারেরও কারো সঙ্গে সে দেখা করেনি, একা একা মনে
শুধু লিখন-পঠন মিয়েই একা একা সে এই সময়টা
কাটিয়েছে।

এ সময়ে অনেক দিন সে লিগিষের ঘরে সারারাত
বলে বলে শুধু তার হিঁচকে চেয়ে থেকেই, কটার পর কটা
কাটিয়েছে,—যেহাওয়ার সংকেত পাখার আশাতে প্রবৃত্ত
হয়েই। কিন্তু সফল করে লিগিষের আত্মাকে তাকে
কোন প্রর করে নি একদিনও।

ঘুরে কোণে বলে জাবোবা মাঝে মাঝে চোখে
চাউনীতে তাকে লক্ষ্য করতে কল্প করে নি। এলরামিকে
এমন চূপ করে বলে বলে সময় কাটাতে বেগে মাঝে মাঝে
তার মন গুবে উঠেছে এই ভেবে যে চোঁটা করে সে যে
এলরামির প্রাণে হিংসের আঁশ জালিয়ে তুলেছিল,
কই, আত্মত 'ত' তার কোন দু-কলই দেখা যাবে না।
তবে কি এলরামির প্রাণের সে আশ্বিন বার্ষ হয়ে নিজে
গেল? এ যে অসম্ভব কথা!

এলরামির মনের সব উজ্জ্বল আত্মাগুলো যেমন একসঙ্গে
হানা বেঁধে, এখন একটিনায়ে আক:আফর পবিত্র
হয়েছিল—আত্মার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে চর্যকো তাঁর
প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করায়! 'তাই যদি না দেখা যায়
তবে সে রকম আশার অস্তিত্বেরই স্বংকার কি?

লিগিষে লিগিষে কলমটা তুলে ঘরে এলরামি যখন
মনে মনে এই সব কথা ভাবছিল, আর ঘুরে বলে কিংক

তখন সে যিনের সকালের ঘবেরে কাগজ পড়ছিল।
হঠাৎ সে এক সময়ে এলহামির খিকে চেয়ে বলে উঠল—
“তারি একটা মক্কার ঘবর বেরিয়েছে, কাগজখানার
আজ এলহামি!”

“ঘবরের কাগজে মক্কার ঘবর?—সে আবার কি?—
ঘবরের কাগজের মতন নীচস সাহিত্য! আমি মোটে সহ
করতে পারি না।”

“সাহিত্য পড়বার জন্তে দোকান ঘবরের কাগজ পড়ে
না। এলহামি! আমি বা তোমার পোনাতে ঢাকি তা
এক পুখায়া পাঠ্যের ঘবর;—আর তাকে কুহি চেমণ্ড।
আবার বেশ মনে আছে, একদিন সে কোন কাকের
জন্তে তোমার সঙ্গে বেধা করতে এসেছিল। আপাতত
সে একটা বিশিষ্ট ঘটনাপূর্ণ বিবাহ বিচ্ছেদের মামলার
জজির পক্ষে প্রতিবাদী হয়ে আদালতে গেছে। সবটা
এখনও পড়ি নি আমি শুধু এইটুকু জেনেছি, যে তার
বিলম্ব সাহেব তাকে পুত্র-পথ থেকে বরখাস্ত করে
দিয়েছেন।”

“কি নাম আছে পাঠ্যের?—জালিস্ এলস্ট্রুয়ার জি।
সে যদি হয় তবে বচসিন পূর্বের তার পুত্র-পথ থেকে
বরখাস্ত হওয়া উচিত ছিল।”

“ষ্ট্রিক ষ্ট্রিক। ঐ নামই বটে পাঠ্যের। দোকটা
লেন্ডি যেমন পানী তেমন লজতান। নিজেব ছোট বড়
আটটা ছেলে বেরে আর বটকে ফেলে...”

বাবা কিয় এলহামি বলে উঠল,—“বাম-বাম।
ও যে হতেই হবে তা আমি বহু পূর্বের জানতে পেয়ে
ছিলুম। কালেই তার এ পাণের বিবরণ আর বিবরণ
করে আমার বলতে হবে না। সেটিনিই তাকে আমি
তার অনুষ্ঠের পরিবাসের কথা জানিয়েও গিয়েছিলুম,
কিন্তু সে তা বিখ্যাপই করে নি তখন। বাক্। কিন্তু এর
চেয়েও মক্কার কথা এই যে সেখানে একম লোকও
জুমিয়ার বেশ আর্থিক উন্নতি করবে,—অন্যদিনেই সে
নিজের অবস্থা কিরিয়ে দেবে।”

“সে কি?—তা কি করে সম্ভব হবে?”

“কেন হবে না? সে অন্য কোন নতুন মেলে দিয়ে
হর্বের ভাগ মেথিরে বেশ মোটা পরলা হোলপার করবে
তোবা। হর্বের তেক নিজে অনেকই বেশ নিজের আর্থিক

অবস্থায় উন্নতি করে। শুধু ছাষের কশাষ আর আর হয়
তারাই দারা সত্যিই সব! এটী ত জুমিয়ার নিয়ম।
আর এই নিয়মেও প্রবর্তক তোমাদের কল্পনার
তপস্বার!”

“না, না, না এলহামি এমন কথা বললে পাগে হবে।
তপস্বার চির মলমল। অমলল তিনি করেন না,
কখন কারো।”

“প্রমাণ করতে পারি তোমার এ কথা?”

“না তা কি করে করব?—তোমার বুদ্ধি-তর্ক আমি
জাগতিক ভাষায় বণ্ডন করতে পারব না। তত জান
আমার কই? তোমার বুদ্ধির বণ্ডন করতে হলে তেজ
থেকে আমার আত্মকে বাইরে বের করতে হয়। তা যদি
করতে পারতুম তবে তোমার সব বুদ্ধি-তর্কই বণ্ডন
করতে পারতুম।”

যেসে এলহামি বললে—“বেশত তুমি চোঁই করে
কর না? তেজ থেকে আত্মকে তোমার বাইরে বের
ক’বে এনে কিছু উপদেশ দাও না আমার?”

“তা আর আমি করতে পারি কই? বেচমুক্ত
হ’লেই আত্ম আমার তুলোক হেতে আমার তদ তদ’র
সিয়ে গঠেন, আর তখন আমার বৃত্তি থেকে তুলোকের
কথা যেন স্রেক মুচ দায়। এই যে তুমি তখনও
পৃথিবীতেই রহেছ সে কথাটাও আমার মনে পড়ে না
তখন মনে কখনও কখনও তোমার কথা আগলে গোখ
কিরিয়ে কোথাও তোমার বেথতে পাই না। দেখি শুধু
এই কলং আর তার মাঝে হাজার হাজার বাহু-স্তর সে
সব তেজ করে পৃথিবী অবধি দৃষ্টিই চলে না তখন
আর।—আরও এক আশ্চর্য ব্যাপার, তখন তোমার
কাছে আমার কিরে আসতেই ইচ্ছে হয় না। মনে হয়
তুমিই পৃথিবী ছেড়ে এক সময়ে সেখানে গিয়ে আমার
সঙ্গে মিলবে। এই জন্যই আমি ভূত-প্রেতের কথাও
বিখ্যাপ করি না, কারণ বুঝতে পারি যে কোন বৃত্তি আত্ম
একবার ওপরের দ্বারে উঠলে সে আর নীচের নেবে
আসতে চায় না; তখন কেবল ওপরে থেকে আরও
ওপরে যেতেই তার ইচ্ছে হবে। যে আত্ম ওপরে উঠেও
কিরে আসে বুঝতে হ’বে তার চেয়েই সক্ষে তখনও
ঐদম আছে বলসে। বাবা হ’রে তাই এই নিয়মটি

হচ্ছে! সে বীথন ছিঁড়ে গেলে কিছুতে আর নীচের আসবে না।

“কার আবেশে এমন হর বলে মনে কর?”

“স্বপ্নজিত্ব গুপ্ত-গুণা। সে স্বপ্ননিরস্ত্রা আছেন এ বিষয় তাঁরই হবে। তাঁর আবেশ ত্রিভুবনের সবাই-কেই দানতে হয়।”

“আমি কিছু সে আবেশ মানি না, বহু জোর করে আমার আবেশই থাকে মানাই।”

“কি অসম্ভব কথা বলছ তুমি এলহামি? তোমার আবেশ, মাহুদ, পঙ্ক, পঙ্ককে মানতে হলেও যে তোমার তাঁরই কাছ থেকে সে শক্তি সংগ্রহ করতে হবে; আর বসন্ত তাঁর কাছ থেকে নেওয়া শক্তি থাকবে তোমার, মাত্র ততক্ষণই তুমি সৃষ্ট স্বীকৃতি তোমার আবেশ মানতে পারবে তারপর আর পারবে না কেনো!...কিছু গুণবানকে কোন দিনই তুমি, তোমার আবেশ মানতে পারবে না। এমন অসম্ভব শক্তি তোমার আছে বলেও কোন দিন মনে কোর না।”—বলে ব্যাকুল আগ্রহে এলহামির মতামত জানবার জন্যে কিরাক তার বিকে চাইলে।

কিরাকে এই বিজ্ঞতা দেখে এলহামির মুখে বহু হাসি ফুটে উঠলো। সরেছে সে কিরাককে বললে—
“নিছক আমার জন্যে উষ্ম ভোগ কর না কিরাক! আমি ভালই জানি যে আমি জর্বে আমার মধ্যে যে আত্মা আছে সে যদি অবিদ্যমান হয় তবে তোমাদের জগৎবানও তাকে কোনদিন বিদ্যমান করতে পারবেন না। আর আত্মা যদি যথেষ্ট হয়, তবে একদিন আমার মরতেই হবে বহু গুণবানও তা বোধ করতে পারবেন না। কিছু এর কোনটাই আমি গ্রাহ্য করিনা যা তার জন্যে তাবিত না।...আমার সংকল্প হতধিন না আমি প্রমাণ করতে পারি যে সত্যিই গুণবানের আমার গুণর আবেশ দেবার দায়সংগত অবিকার আছে ততধিন আমি তোমার কল্পিত মধ্যাঙ্গির জর ব্যাকুল হয়ে নিবিচারে সব কিছু মনে নেব না।...গুণবানের আবেশও গলান করব না।...যাক অনেক বাগে কথার আলোচনা করে সময় নষ্ট করা হ’য়েছে, আর না অনেক কাক আছে আমার।”

অন্তঃপুর লেগামি নিজের টেবিলে বসে এক মনে লিখতে আরম্ভ করল। কিরাক একদা বই তুলে নিয়ে বহরের কংকণা দূরে সরিয়ে রাখলে। বই-খামার কিছু সে মন বাগতে পারলে না। এলহামির কথাকলো তার মনের মধ্যে কেমন যেন একটা অনাতিংগ জড় তুলেছিল। তার অতি রূপভরা কথাকলো কিরাককে বড়ই জাতিয়ে তুলেছিল। পাগের মধ্যে রূপ যে দেতা পাগ তা সে ভালই জানতো। মনে পড়ল তার কবিগোয়েছেন—

“আমার মাথা নত করে

নাও যে তোমার চরণ ধূলির তলে,

সকল অহংকার যে আমার

জুঝাও চোখের জলে।”—

তার মনে হল শুধু এই ভাবে চোখের জলে দুটে পারলেই প্রকৃত রূপনাশ হয় মাহুদে, তা না বলে একদিন এই রূপই সর্বশেষের কারণ হয়ে ওঠে তার! ইতিহাসের পাতাভাঙে এর খোঁজ নজির আছে। যেই অস্তিন্দারী হয়ে গুণবানকেও তুলে গেছে, সেই শেষ অবধি পতনের প্রবল আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে নির্ভিক হয়ে গেছে।...মনে মনে উৎসুক হয়ে কিরাক তাতে লালল এই অস্তিন্দারী এলহামির কর্মকল তাকে কোন দীমারীন অন্তলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে কেলবে শেষ অবধি।...কোন নবকের আগুন তাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ধাক করে দেবে।...

এইবার লেখা বন্ধ করে এলহামি তার বৃত্ত বন্ধ ক্রেম-লিনের ডায়েরীটা পড়তে আরম্ভ করল। বন্ধ তার ডায়েরী লিখেছিলেন চিত্রিত আকারে তার মৃত্যু প্রণয়িনীর উদ্দেশ্যে। সেগুলো পড়লে শট্টই বোকা বার ক্রেম-লিনের মনে কত চুচু বিশ্বাস ছিল যে আত্মা অমর।...আর পরলোকে তাঁর আত্মা আবার তাঁর প্রণয়িনীর আত্মার সঙ্গে মিলতে পারবে। এই বিশ্বাস মনে রাখা ছিল বলেই দিনের পর দিন তিনি সেই মৃত্যু তত্ত্বটিকে উদ্দেশ্য করে বড় বড় চিঠি লিখতে পেরেছিলেন।

ডায়েরীর কতকটা পড়ে এলহামি সেটা বন্ধ করে রেখে তাবতে লালল—“মরে গিয়ে ক্রেমলিন কি তাঁর মৃত্যু প্রণয়িনীর সঙ্গে মিলতে পেরেছেন?—এখন যদি

তাঁদের এই পৃথিবীর জীবনের কথা মনে আছে কি ?...
কি যে তাঁদের বর্তমান অবস্থা তাই বা কে বলবে ?

। ৩৪

পরের তখন ছুন মাসের শেষ

সুন্দর চাঁদ উঠেছিল পবিত্র তারার ভরা আকাশে ।
আজ কিরাঙ্কর মনটা বেশ হাসি খুলী তরা । তার
কারণ, হঠাৎ বিদ্যায় চমকের মতন লিলিথের বিষ্ট নামটি
এই কতজন আগে হঠাৎই আজ তার মনে পড়ে গেছে ।
একদিন এসবামির ইচ্ছাপ্রকৃত প্রত্যয়েই নামটা তার
নের পদবা বেকে মুছে দেয়ল, এতদিন পরে আজ সেটা
ঠোৎ তার মনে পড়তেই মনটা তার খুলীতে ভরদল
করছিল ।

তার মনে একটা কথা লাগল—“আজ আবার নামটা
তার মনে পড়ে গেল যে ?...কি করে এমনটা সম্ভব
হ'ল ?” —কথাটা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মনে
একটা সত্য কথা উভয়ও এসে ছুটলো । তার মনে হল,
আবহর এসবামি এখন অল্প কাছে বাত বাকার তার
উপরের প্রজাবটা কতকটা শিথিল হয়ে গিয়ে থাকবে ।

তারপর সে ভাবতে লাগল,—“নামটা তার মনে
হোকলে, এসবামির কতিট : কি ?—সে ত লগ্ন করেছে,
সে এসবামির কাছে সে কোনদিন লিলিথের নাম
উচ্চারণও করবে না—আর করবে না তার স্মৃতি কোন
। কয় আলোচনা । তবে...তবে এখন সুন্দর বিষ্ট নামটি
হালি সে মনে করে রাখলে কিই বা ক্ষতি হবে
এসবামির ?...”

ভাবতে ভাবতে মনটা এলিয়ে দিয়েছিল কিরাঙ্ক
চোরাটার ওপর, আর ভাবছিলও সে চোখ মুছেই ।
লক্ষণ পরে তার মনে হল মনটা ছেড়ে আত্মা বেন
তার বাইরে বেড়িয়ে পড়েছে । কোথায় কোন এক
বিলাস পাখাঙ্কর সাহুধেণে সে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে বেশ
বন বীরে সুখেই । তাও চোখের ওপরই সেই পাখাঙ্কটা
মাতে আছে একটা সুন্দর কুলের বাগান হয়ে গেল ।
ওদিক কিরাঙ্ক সেই বাগানের গণে গণে সুব, পাভার
ধীর, কুলের সৌন্দর্য আর বাগানের পাশ দিয়ে প্রধাবিত
...এই মনটা ভাবতে ভাবতে একটা ভাবের দিগ দিগ

লগ্ন উপভোগ করতে করতে, বেড়িয়ে বেড়িয়ে চারদিকে
চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল ।

এতক্ষণে সে বুঝতে পারলে, আত্মা তার লক্ষ্যভূমির
এইটোতেই এসে গেছে । এ সব বুঝই তার পরিচিত,—
চেনা জানা । কিন্তু, তবুও তার নিজেতে স্বেচ্ছা প্রবাসী
বলেই মনে হতে লাগল।...একথা মনে হতেই, মনটা
যেন তার তারকাতে হয়ে উঠল । মন কিন্তু নিজেই
তাকে তখনই সাধনা বিলে,—আর বেশিদিন তাকে
প্রবাসী হয়ে থাকতে হবে না।...আঃ । তবে ?...আঃ
কতদিন পরে সে তার এই ভ্রমণে কিরে আসবে ?

তার আবেশে কত সুখেমখারী তুলন তুলনী,
হাসি ঠাট্টা হাচ্ছিল । একপাশে সরে হাঁড়িয়ে সে তাঁদের
দেখতে লাগল । কিন্তু সে দেখলে, তারা কেউই, তার
দিকে কিতো চাইছে না, তার সঙ্গে কোন কথাও বলছে
না।—যেন সে তাদের কাছে অদৃশ্য বৃত্তি ।

তারাকান্ড মনে বিরোধ বল উঠল,—ও আমার লক্ষ
গ্রহ, তোমার কোলে বাধ'কা-অবস্থা অত্যাচার নেই, অমত
প্রেমের বিনম্র হাসি হাসি খুলী তোমার । কিন্তু আমি কেন
তোমার কাছে পরবাসী ?—কেন আমি তোমার এ আশ্রয়
অংশ পাইনা ?” বলতে বলতে তার একটা দীর্ঘশ্বাস
পড়ল ।

তার লক্ষ গ্রহের চারদিকে তখন যেন একটা পর্বে
আনন্দ হয়ে বাচ্ছিল । কিন্তু কি যে তার কারণ, বা পর্বই
বহি হয়, তবে কি সে পর্ব, কিরাঙ্ক তখনও তা বুঝে
উঠতে পারে নি।...কি করে, কির কাছে জানা যায় ?...
এই অবিবাসীরা যে তার আগমন জন, মনে মনে সে তা
বেশ বুঝতে পেরেছিল তবু কিছু কাটকে কোন কোন
কথা জিজ্ঞেস করতে তার ভয়না হয় নি ।

এইবার সে দেখলে, একটি তুলনী একা তার দিকেই
যেন আসছে । আর চলতে চলতে কীটকে বাধা হুল-
মিয়ে সে বাধা গাঁথছে, সেই সঙ্গে বড় দিগে সুখে গানও
গাইছে । একমাথা এলো হুলভলো তার পেছন দিকে
ছড়িয়ে পড়ে, লম্বা দিগটা তার চোকে দিয়েছিল যেন
দোমার-বরন বেশী আস্তরলে । তার কাছাকাছি এসে
তুলনী বহক হাঁড়িয়ে কিরাঙ্ককে দেখতে লাগল ; যেন সে
চাইছিল, কিরাঙ্ক তার সঙ্গে কথা বলুক—আলাপ করুক ।

তার এই ভাবটা লক্ষ্য করে এককণে কিংবদন্তি যেন ক'বা বলার সাহস হল। বিনীত বৃহৎ বয়ে তরুণীকে সে বিশেষ করলে—“তোমার বাচ্ছ তুমি?... আমি হয় ত' তোমার সঙ্গে যেতে পারব না, কিন্তু একটা কথা বলে পাও আমরা। —তোমাদের এই আনন্দময় প্রবেশ আজ আমার নষ্টন করে আনন্দের চেয়ে উঠেছে কেন বলত ?

তরুণী আহুত হয়ে আকাশের দিকে ঘেঁষে গিলে। তার নিশ্চেষ্ট মত চোখ তুলে আকাশের দিকে চাইতেই কিরাক বেগতে গেল, উপলব্ধির রক্তের মতন রং এর আকাশের হৃদয় বিকট, সোনা আর গোলাপের ফেনান রঙ এর একটা বীণা কুটে উঠেছে। কিন্তু কেন, তা কিরাক বুঝে উঠতে পারলে না।

তরুণী এই বার বললে—“আজ ঐ বান দিয়ে এক ভক্তিত্ব। তরুণীর আত্মা হৃদয় পেয়ে মর্মে গায়ে। ঐ বেশ, ঐ পরিমার নীচের পৃথিবী তার অকথ্যের দূরে চলছে। ঐ পৃথিবী থেকেই আত্মাটি আসছে আজ। সেই আত্মার বর্ষ প্রায় সেখানে ভেঙেই আজ আমরা সবাই উৎসববেশে বেরিয়েছি। এই বকন পুণ্য বৃত্ত বেগলে অনেক শান্তি আর অশ্রুপাণ্ডা বার।... আর চেয়ে দেখে গরিবা আকাশের দিকে কুটে উঠেছে ওটা কোম আলো। মম, ওটা পুণ্যপ্রবেশের বেগের প্রভা।

“প্রভা?... সে আবার কি ?”

আকাশের সেই পরিমা তরা দ্বিধা বীণার দিকে চেয়ে তরুণী বললে,—“এ আত্মাটি আজ মর্মে গায়ে তার আরও উঁচু আরে বহুদা সব তাকে সাধার আত্মার আনন্দের মধ্যে ঐ বান দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। তাঁদের পুণ্য বেশ থেকে সে আত্মার স্মরণ হচ্ছে তাতেই আকাশের ওদিকটা ঐ বকন স্বত্বকে হয়ে উঠেছে। তাইত' বলছিলাম ওটা। আলো না—প্রভা! —বলে তরুণী বার পথে এগিয়ে যেতে লাগল, সেই পরিমা তরা হৃদয় আকাশের দিকে। কিরাক চুপ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, আকাশের দিকে চেয়ে, সেই বিন্দু পরিমা বেগতে লাগল। তার তখন মনে হতে লাগল, সেই উজ্জলতাও যেন কখন কখন রক্তের বল হচ্ছিল, আর সেটা স্থির না থেকে বহু-বার ক'রে কাঁপছিল।

দাঁড়িয়ে বেগতে বেগতে সে তারতে লাগল—

“আত্মাটির বহুদা কতক্ষণ বা কতদিন সেট আত্মার আমার পথের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করে থাকবে?... কখন আত্মাটি এসে ওঁদের কাছে পৌঁছবে ?”

ভাবতে ভাবতে, হঠাৎ তার মনে হল, কেউ যেন কোঁচ করে উঠে, তাকে দেখান থেকে আর কোঁচাও পাঠাতে চাচ্ছে।...সেই সঙ্গে আকাশের অন্ত ঐজ্জলতাও যেন হঠাৎ নিম্নিয়ে গেল, তার সাহা হেঁচটা কাঁপতে লাগলো। বৃত্ততে লাগলে, পৃথিবীতে আবার কিংবে এসে গেছে সে।

এই সময় ঘূর্ণতা তার তেঁত গেল। চোখ খুলতেই সে বেগতে গেল, এলগামি তার কাঁধে একটা হাত বেগে দাঁড়িয়ে হাসছে।

কিরাককে খেপে উঠতে দেখে এলগামি বললে,— “এমন করে জাননা গুলে রেবে গুলোও কেন ? এসে দেখি, তোমার মস্ত বস্তাটা চাৎবে আলোর যেন ব্রহ্ম করছে। সবাই বলে, তাঁদের আলো নাকি স্বত্বকে পালন করে বেশ। আর এমনি ঘূর্ণিত্তে তুমি যে অনেক বার ভাবতে পর, তোমার কাঁধ হয়ে তাঁতানী দিয়ে তবে তোমার কংগাতে পেরেছি। গুলুতে যদি চাও তবে জানাটা বন্ধ করে হাও আগে।”

কিরাক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে, কজিত বরে বললে—“ঘুইনি আমি ঠিক। তবে ঐ পৃথিবীতেও ছিলুম না আমি এতক্ষণ—তখনও তার মানস চোখের সামনে সে দ্বাতি যেন বলমল করছিল।

কতকটা বিমগ্ন তরা হাসি বেগে এলগামি বললে, ওঃ। বৃত্ততে পেরেছি, তুমি এতক্ষণ তোমার কল্পত্বমিতে ছিলে, তাই না ?

এলগামি বিমগ্ন তবে কিরাক বললে,—“হ্যাঁ, তাই। দেখানে আজ তরা, হাজারে হাজারে এক সঙ্গে জড়ো হয়ে, তাদের আকাশের হৃদয় দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারন গুলুম, পৃথিবী থেকে কোন গুলুমতা আজ মর্মে গায়ে, তাই বেশবার ভেঙে তরা জড় করে দাঁড়িয়ে আছে। আর সেই আত্মার বহুদা তাঁকে দ্বাতি জানাবার ভেঙে আকাশের হৃদয় দিকে অপেক্ষা করছেন—তাঁদের বেগের জোড়িতে, আকাশের সেই বিকট যে কি অপূর্ণ আত্মা ভরে উঠেছে কথার বলে তা বোঝান যায় না।

“বোঝা হকমের উত্তম আর অসম্ভব বত স্বত

তোমার কিয়ৎকাল তবে এতে যে তুমি খুব খুশী হও, সেইটাই এর বড় কথা; আর সুখের বিষয়— তুমি এক কাজ করেন কেন? তোমার এই সব বস্ত্র কাচিনীগুলো লিখে, একটা বই ছাপাও না? তা হলেই বুঝতে পারতে অগতে লোক তোমার বস্ত্রকে কি চোখে দেখে। যেহেতু লোকেরা তোমার একটি বস্ত্র বাসল করে আর সমালোচনা করি নিষ্ঠুর ভাবে তোমার স্বর্গের ছবিকে ছিড়ে ছুটে টুকরো টুকরো করে দেবে। তখন তুমি ভিজে গেলে পানি যেমন উড়তে উড়তে মাটিতে পড়ে যায়, তুমিও তেমনি করে তোমার খুশীর বর্ষ থেকে, পাতালের অতল গহ্বরে গড়িয়ে পড়বে।”

নূর হেসে কিয়ৎকাল বললে—“তোমার একথা আমি মানি না। আমি বেশ জানি, অগতঃ কেউই আমার আমার করনা থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। তবে এখন তোমার যা বলুন, এটা আমার করনা; আর কোনো।”

“মাঝা তুমি দুই মিনিটে যেমন বসে বসে খুশী দেখতে থাক কিন্তু তার আগে জানিলাটা বন্ধ করে দাও।—আমি চলি এবার।”

“তোমার যা হবে? খুশি না তুমি?”

“না হঠাৎ আমার মনে একটা কথা জেগে উঠেছে,— সেইটাই আমি হাতে-নাতে করে দেখতে যাচ্ছি। তাইই অর আর আমার দুইবার ছুটতে হবে না। এটা যদি সত্যি বলে প্রমাণ করতে পারি, তবে ভাল সব কথা তোমার খুলে বলব।”

কিয়ৎকাল লেখে এসেছে এওদিন, যে এলগামির রাবের অত্যন্ত সব কথা গোপন করে রাখা। তাই আজ তার এই সব কথা খুলে বলার প্রতিক্রিয়া চলে, কিয়ৎকাল মনে, আনন্দের বসলে, কেমন মনে একটা ভাবই আসল।

বললে সে,—“খুব সাবধান এলগামি। তোমার গাওয়া-পাওয়ার দীবা সেই, কিন্তু কতকগুলো জিনিস হৃদয়ঙ্গর করে রেখে যেতারা বস্ত্রকার, সব কিছুই গাওয়ার আগে কথা, আমার ত মনে হয়, বেশ নিরাপত্তা তাই।”

হেসে এলগামি বললে—“কত-খিলাসী তাইচী

আমার! তা পেতে আমি চেষ্টাই বা করব কেন? আর, উপবানের জন্যে কতকটা ছেড়ে রাখতে বলচ;—আমার ক'ছ থেকে, অর্থাৎ আমার এই দেহটা থেকে উপবানের প্রাণ্য এক চিহ্নটি ছাই!—সেটা নিশ্চয়ই তাঁর জন্যে থাকবে।”

“না, এলগামি, শুধু এক চিহ্নটি ছাই নয়, তোমার মধ্যে যে দেহের আছে, সেটাও উপবানের প্রাণ্য। সেই দেহের তোমার, তোমাকে নির্বল, সম্পূর্ণ অবস্থাতেই উপবানকে কিরিয়ে দিতে হবে,—তাঁর সমস্ত সর্কে মিলিয়ে দিতে হবে। এ নিষ্ঠুর সবাই-ই তাঁর কাছে বাধ্য।”

কথাটা শুনে এলগামি সাহা বেহের মধ্য দিয়ে মনে একটা বিদ্রোহের প্রবাহ বেলে গেল। দুখটাও মনে তার ঝুঁক জ্ঞান হয়ে গেল। আবেগপূর্ণ হয়ে সে বললে,—“সত্যিই যদি আমার মধ্যে কোন দেহের থাকে,—আছে বলে ত’ আমার বিশ্বাস হয় না, তবে সে অস্তিত্ব উপবান, যখন ইচ্ছে আর যেমন ক’রে ইচ্ছে কিরিয়ে দিতে পারেন। আমি ত’ তা দেখনা বলিনি।—আচ্ছা, চলি এবার।”

কিয়ৎকাল আবেগপূর্ণ, দুহাত দিয়ে এলগামির হাত দুটো জড়িয়ে ধরে, তাকে উপবানি জানিয়ে বিদায় নিয়ে আবেগপূর্ণ বললে,—“কত সত্যি এলগামি। উপবান পরম করুণাময়,—তাঁরই বিদায় তোমার আমি ছেড়ে দিচ্ছি।”

এরপর, এলগামি ঘর থেকে চলে গেল।

কিয়ৎকাল একটুই এলগামির হাতের পথে দিকে চেয়ে বসল। মনে তার কেমন মনে একটা অজানা জর বেগে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল তার,—এই বুঝি এলগামির সর্কে দেখে বেখা।—কিন্তু তার কোন মিল সে এলগামিকে দেখতে পাবে না। দুজি-ভাঙের—জবজব করা করে সে তার মনকে এ জড়িময় জর থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারেন না। তাহলে তাহলে, কতকটা হাত হ’লেই, নিজের গোপন হয়ে চলে গেল। সব বস থেকে তার হাতেই সে দেখতে গেল, আরোখা খুলীমনে গিড়ি দিয়ে উপবান থেকে নিচের মেঝে আসছে।

আরোখা কিয়ৎকাল তার ঘরে ঢোকবার ছুব হয়ে

কেন্দ্রলো। তার বুড়োপনার কর্তব্য হয়ে সে কিয়তকৈ
বললে,—“ভ্যাংখা তরা বাউটা। আচ্ছকের বড় চংকার
হেখাচ্ছে, নহ? ...আকাশের গারে আন্ধ হাজার হাজার
তাঁরা ঝিক ঝিক করতে, আর পৃথিবীর বুকে তাঁর
হাজার হাজারে আশা-আনন্দের স্পন্দন জ্যোৎস্নাভরা
চাঁদের আলোর সঙ্গে মিলে-মিলে যেন এক হয়ে যাচ্ছে।
...বলে সে নিজের কাছে চলে গেল।

কথাগুলো কিয়তকৈ কানে পাগলেই প্রলাপের
হাতই পোনাল। কি যে সে বলতে চায় তা কিয়াক
বুকে উঠতে পারলে না কেন আন্ধ সে এক হাসি-
খুসী, আর কি যে তার এ প্রলাপের অর্থ, তা যেন
কিয়তকের কাছে হেঁয়ালী হয়েই রইল।

হঠাৎ তার—“নাতে ধারে বৃত্তি বড় জালান
করে বাপু। ...বরই প্রবোচনার, একদিন আমি এলগামি
অবধা হ'বে, লিদিবের ধরে গিরে তাকে লেবেডিলুম,
আর তার অন্তরূপে বড় হয়ে তালবেগে কেনেডিলুম
তাকে! ...আন্ধ বুঝতে পারছি, সে রকম শুধু আন্ধকে
জালবানার কোন মানে হয় না।—অস্বস্ত: আনন্দের
যতন পৃথিবীর লোকের কাছে তা'নরই। এই জন্যই
বোধহয়, এলগামি নিজের তাকে তালোথাসে না।
সে বুঝেছে, লিদিব কর্তী প্রেমেরই উপদ্রুত—আমাদের
মত মানুষের সাহ-কল্য প্রেমের নহ!”

জানতে পারতে কিয়াক এসে নিজের ধরে চুতলো:
জামা খুলে বাসিবাশ পরে বিছনার দিকে যেতে
গিরে সে বমকে ধাঁড়িয়ে পড়ল। তার মনে হতে
লাগল, একটা পানের অতি মিষ্ট হত, যেন কোথা থেকে
ভেসে আসিচ্ছে। বৃষ্টি-বিষয়ে সে সেই সব কান পেতে
শুনতে লাগল। কি শব্দই গ্রাধ মাতান শুনতে:
...বীবে বীরে মুরটা যেন দূর থেকে দূরে সরে যেতে
যেতে এক সময় ক্রমে যেন মিলিয়ে গেল।

এটা এলগামিরই বোধ হয় বাহুত বেলা।

“বোধ হয় আমি কেবল কেবলই আন্ধ পুরের
ঘর দেখলুম। হরত' এটা আমায় নিজেরই খেয়াল,
কিবা হরত' তারাই ইচ্ছা নজিই এই সুর-বস্তের স্রষ্টা!”

অতঃপর কিয়াক বিছানার কাছে হাঁট, গেড়ে বসে
উপগমনের আরাধনা করতে লাগল। প্রার্থনা শেষ

করে মূহু ববে সে বলে,—“উপগামি লিদিবের আন্ধাকে
রকে করুন।”

৪ ৬ ৪

লিদিব যে দেখিম এলগামিকে বলেছিল,—“সময়
হলে তার সংকেত লাবে,—তার কি হ'ল? আন্ধ
অবধি এলগামি কোন হরত সংকেত পেয়েছে কি?
...না, কোন সংকেতই সে পাব নি। যিনের পদ হিম,
হৈঁধ হয়ে সংকেতের আশার অপেক্ষা করে করে, ক্রমে
সে ঐহৈঁধ হয়ে পড়েছিল! কাজেই আন্ধ সে যেন
স্থির কবলে, আর সংকেতের আশার বুঝ সময় নেই।
না করে, এবার অববহতিই সে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ
করবে।—তল তার ঘাই হোক না কেন? ...আর
বুঝা আশার আশার বলে হিম গোণা নহ, এবার
তার নিজের নজিহেই লিদিবের আন্ধাকে প্রত্যক্ষ
করবে সে। ...অস্বস্ত: একবার এ চেষ্টা করে দেখতেই
হবে তাকে।

লিদিব তাকে বলেছিল,—“হৈঁধ হয়ে অপেক্ষা কর
আর উপগামের মান কর।” কথাটা বলতে বা শুনতে
যেন, কিন্তু নিশ্চয়সিদ্ধির আশা গেলে তাহেই না
হৈঁধ হয়ে অপেক্ষা করা যায়?—তা না হলে
এরকম বুঝা কালক্রমের কোন মানে হয় না,—জাত
শুত হৈঁধও নেই তার।...আর, উপগামের মান
কর?—তার উপাসনা কর?—কি বরতার তা
কবহার? সে নিজের নজিহেই যখন বা খুসী তাই
কবতে পারে, তখন, যে উপগামের অজিহের কোন
প্রমাণই কেউ পাব না, সেই উপগামের উপাসনা
কবার মানে, আন্ধ-নজির ওপর আশা রাখা।...
তা করবার কোন হরকাই সে বোধ করল না।

এইভাবে নিজের মনে আলোচনা করে নিজের
নজিগবে উপবস করতে করতে আন্ধ এলগামি এসে
লিদিবের ধরে চুতলো। আরোহাকে ইজিতে বর হেতে
চলে যেতে বলে, নিজে গিরে লিদিবের পাগলকে পাগে
একটা চেয়ার পেতে বসল স্থির হয়ে। চেঁধ চুটো
তখন তার আশা আনন্দে যেন জল জল করছিল।
যেন যেন স্থির করে এসেছিল সে, আন্ধ লিদিবকে

আগিরে তুলবে তার কল হাই হোক না কেন!

যেন তার কৌতুহল হতে লাগল, চোখ ঘেলে চাইলে লিলিথকে কেমন দেখাবে? তিনোতী লিলিথ ছু বকর আগে তারই হাতে মাথা রেখে মরে গেছে আর আজকের এই তরুণী লিলিথের ফের তারই গুহুর পরিচায়ক।—এটা বিজ্ঞানের অদ্বিত সত্যি ছাড়া আর কিছুই নয়। তবু—ওরূপে তাকে আজ আগিরে তুলবে—আগিরে আজ যুগী তরুণীতে পরিণত করবে। কারণ সে যে আর এ না করে পারছিল না!—লিলিথ কে সে ভালবেসেছে,—যত ভালবেসেছে তাকে! এ অবস্থার তাকে জ্বালা করে নিজেই জ্বালা সজ্জী না করে মন আর তার কোন মতেই লাভ হতে চায় না। প্রেম বৈধ মানে না কোন দিন।

আজ আর এলহামি তার এই প্রেমের কথা অস্বীকার করতে পারে না—চাও না তা করতে! তার ঘরের প্রতি অতুলনাপূর্ণ আজ লিলিথের এই সুন্দর চেহের প্রেম ভরে বুকে জড়িয়ে বহবার জন্য যেন অতি ক্ষুধাক্ত হয়ে উঠেছে।—হি তার সেই আগের দিনের নীরস বৈজ্ঞানিকের মন আজ থাকত, তবে হরত তার মনে হতে পারত যে লিলিথের আশ্রয় বহস্তের চেহেরে বৃষ্টি কেমন করে প্রাণে তার এই প্রেমের কোয়ার বটল সেই বহস্তই ভটিপতর।—আজ কিছ তার মনের অবস্থা আগের দিনের মত আর নেই। কাজেই এরহমোর কথাটা একবার তেবে দেখাও সে আবশ্যক বোধ করল না।

লিলিথের দুমত সুন্দর সুবাসির বিকে চেয়ে চেয়ে সে ভাগতে লাগল—“লিলিথকে আগিরেই একবার দেখি না? কতি কি তাতে? এর প্রাণ আর আত্মাকে যথাসম্মত মিলিয়ে যেত বের নি যে জ্বালাই উত্তম আনাইই প্রচেষ্টা—সে কথা ত নিঃসন্দেহেই প্রমাণ হয়ে গেছে। তবে এখন তাকে আগিরে জ্বালা কবেই বা আমি বতবিন খুদী আমার কাছে,—এই পৃথিবীতে ধরে রাখতে না পারব কেন?—সেইটাই ত হবে বিজ্ঞানের চরম সাফল্য—বিজ্ঞান-বৈজ্ঞানী! আর এ ভয়-লাতে আমার হাবীই যে সব প্রথম তাই না কে অস্বীকার করতে পারে?—তবে একটা কথা ভাববার আছে—

নভাই কি লোকাতীত কোন শক্তি আছে?”

লিলিথের মুখের বিকে চেয়ে চেয়ে এই কথাই ভাবতে লাগল সে। কতক্ষণ পরে আশ্চর্যত ভাবে বলে উঠল,—“না, না, এ হক্ক কোন শক্তির অস্তিত্ব আমি জানি না—বিশ্বাস করি না। আজ অবধি আমি এমন কোন প্রমাণই পাই নি যা থেকে এ কথা যেমন নেওয়া বা বিশ্বাস করা যায়। নভাই বটে, লিলিথের কথাগুলো মাঝে মাঝে আমার ভাবিরে জ্বালে।...তা হোক, আগে তাকে আগিরে বজানে আমি, তার পর না হয় ওরই সঙ্গে আলোচনা করে এ দৃষ্টান্তের নিরসন করা যাবে।...না, জ্বালাত বুড় বিশ্বাস, লোকাতীত শক্তির কোন অস্তিত্বই নেই। তা যদি থাকত তবে লিলিথের বলা ‘সংকেত’ আজও এলো না কেন?—আমি যখন মনের পূর্ব শক্তি প্রয়োগ করে বলব,—তরুণী আমার আ’মল,—তেনে গঠ ছুই!’ তখন এই যুগ্ম লিলিথকে জ্বলে উঠতেই হবে! বৈচে উঠতেই হবে তাকে! তারপর, জ্বালাই আগরেনে এই পৃথিবীতেই বৈচে থাকতেও হবে ওকে।...কিছুতেই আমি তার অন্যথা হতে দেব না...কোন হতেই না।”

হঠাৎ এলহামি তখনে গেল, তার কথাব সনে লক্ষেই কে যেন বলে উঠল,—“দুমত লিলিথকে জ্বলে উঠতেই হবে, বৈচে উঠতেই হবে তাকে।”

“কে?...কে বলে একথা?” চমকে উঠে এলহামি চাবিরিকি চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল, কিন্তু সমস্ত ঘরের মধ্যে সে আরও কাউকেই খুঁজে পেলো না?...লিলিথও বিভ্রান্তির মতই মস্তার মতন গুরে যুগ্মে... তবে? তবে কে কথাগুলো বলল? আমার ঘরে চারদিক ভাল করে খুঁজে দেখতে গিয়ে এলহামি দেখলে স-নিয্য বিস্তর ছবিখানার ওপরের পরগাটা খোল রয়েছে। ত্রোম সেটা নিরখিতভাবে পরগা ঢাকা থাকে, তবে সেটা আজ খুললে কে?...জ্বালাই বা মোহর তুলতেনে খুলে রেখে গেছে। তাহলং, ছবি তলার লেখাটার ওপর এলহামির মজর পড়ল,—

‘জ্বালাই হতে আমি কে?’

লেখাটা দেখতে দেখতে এলহামির মনে হল কে যেন তার কাছ থেকে কথাটার উত্তর তনতে চাইছে,

যে যেন এর উত্তর দিতে বাধ্য করছে।

পেয়ে যাওয়া হয়েছে যেন এলরামি এ প্রস্তর উত্তর দিয়ে, পায়ে পায়ে ছবিটার কাছে এসিয়ে গিয়ে,— 'একজন ভক্ত আত্মা, আর সংপূর্ণ আপনি।' পরীক্ষা, দুইয়ের উপকার করবার অতি আগ্রহ, আর ঘর্ষের পৌঁছানিতে যেতেই পর্যাপ্ত হয়েছিলেন। বানবীর চূষক নক্তি সম্বন্ধে আপনায় গভীর জ্ঞান ছিল বলেই, ব্যক্তিকের মতন লোকের বোপ সত্ত্বাতে পারতেন। শুণু তাই নয়, দৃষ্টকার মত লোকের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করে দিতেও পারতেন। ঘোড়ের ওপর অত বেশী সং আর পরোপকারী ছিলেন বলেই, দেশের শাসকরা আপনাকে নিজে অধির হয়ে পড়েছিল, আর সেই জেই শেষ অবধি আপনাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করবার সাজা দিয়ে, শাসকরা আপনায় হাত থেকে উদ্ধার পায়।—কিছু আপনায় ঐশ্বর্য-শক্তি ?—না, তা ছিল না।—আজ্ঞা আপনি আছেন ?—মাতৃয়ের পাণের সাজা হাজা করবার ক্ষমতা, পানীর হয়ে ভগবানের কাছে আপনি ওকালতী করেন ?—না, না, এগুলো বাজে কথা সর্বৈব !—পুণ্ড্রবের নিছক ভাওতা এগুলো।"

ছবির কাছে থেকে কিং এলরামি লিপিখের পালকর কাছে এসে কৃত্তকে পড়ে, লিপিখের একটি ঠাঙা হাত নিজেই মুঠোর মধ্যে ধরে রাখলে। তার মুঠোর মধ্যে থেকে সেই ঠাঙা হাতটি বীরে বীরে কবোক্ষ হয়ে হয়ে উঠলো। সেই সঙ্গে যেন বল, হাতটি যেন তার মুঠোর মধ্যে ঝাঁপছে। এই অবস্থাতেই লিপিখের দেহের ওপর আরও কৃত্তকে পড়ে যেন জোলের দৃষ্টি দিয়েই সে তার সৌন্দর্য পান করতে লাগল।

কতক্ষণ ঝাঁজিরে থাকবার পর চেয়ারটার ওপর সে বসে পড়ল। তারপর বীরে বীরে কোমল হয়ে বললে,—"লিপি। আমার দ্বন্দ্ব-ভানী! এতক্ষণে

আজ্ঞা তুমি বাঁচিয়ে, অমর-ভীষন লাভের সাধনা করে লাভ কি প্রিয়ে ?—ইচ্ছে করলেই 'ত' আনবা চিন্তকতক ভীষনটাকে উপভোগ করে নিতে পারি! ভয়ানকই মরতে হবে,—আর মরণ বলেই সব কিছুই শেষ হয়ে যাবে।—প্রেম মরণের ভীষনে মাত্র একবারই এসে থাকে।...আগে আমি এই প্রেমকে কতই না ঘেন্না করেছি...যেন প্রেম একটা খেলার ভিড়। আজ্ঞা যখন আমার দেহের প্রতি অনু-পরম্পা প্রেমের কিংবদন্তি হয়ে উঠেছে, তখনও আমি ঠিক বুকে উঠতে পারছি না, এরকমভাবে তোমার প্রেমে পাগল হওয়া, আমার উচিত কিনা ?—হুঃখিনি লিপি একটি মানব-ভক্তপাই 'ত' শুণু তুমি ?—হুঃখিনি পরেই তোমার এ সৌন্দর্য—থোকা, শেষ হয়ে ফুরিয়ে যাবে,—ক্রমে পর্যাপ্ত শেষ হবে। শুইই নারী তুমি—অমর, অবিদ্যার 'ত' মত ?—অমর আত্মা বলে কোনকিছুই নেই—বাক্যে পাবে না !—"

মুঠোর মধ্যে ধরা হাতখানা, দৃষ্টভাবে চাপ দিয়ে আপনাদের বরে এবার এলরামি বললে,—"লিপি !—লিপি !"

কিছুক্ষণ নিশ্চল থাকবার পর হঠাৎ লিপিখের সাত্ত্বাৎহে যেন একটা ক'তুমি খেলো গেল। ঠোট দুটো তার ঝঁঝ মড়ে উঠলো। তারপর সে নিত্যকার মতই মতই লাড়ো বলে,—"এই যে আমি।"

"এতদিন পরে...অর্থাৎ এবার অনেকদিন পরে তুমি এখানে এসে লিপি।...কিছু, আমার এর আপনের ব্যারে কি বলে গেছলে, সে কথা বোধহয় জ্বলেই গেছে ?"

"জ্বলে গেছি ?—তুমি বড় সন্দ্বিষ্টমান লোক। আমি এখন যে অবস্থায় আছি, তাতে কোনদিন কোনরকম কুশল হতে পাবে না।"

[আগামী সংখ্যার সমাপ্ত]



নাটক থাবা হেলধর

॥ কলিভূষণ দামগুপ্ত ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[প্রিন্স হাভিগ হাভির অধীরে একটা বকুল গাছের নীচে হেলধর হাণিককে লইয়া পাট দিয়া সোফার দড়ি পাকাইতেছে। বকুল গাছটার থাকিয়া থাকিয়া একটি বউ কথা কও শাখী ডাকিতেছে। বেশখো একটি হুরের পথে একটি রাখাল বালক সোফা লইয়া মাঠে ঘাইতেছে আর থাকিয়া থাকিয়া গান পাঠিতেছে। হেলধর কান করিতে করিতেই বামিয়া বামিয়া কান পাতিয়া গান শুনিতেছে।]

রাখাল বালক (বেশখো)—হুরুরে—টক্, টক্, টক্—
হেই—আবার ভিন্ পথে চলি কেনিরে—টক্, টক্, টক্—

গান

জেড়ে বেঁ বা নন্দরানী—আজ পোঠেতে থাকই বাব।

কীর নদী সর বেঁবে বে বা—গাছের তলে বসে বাব।

হেলধর। গান কীরে মাঠে যাচ্ছে কে রে হাণিক ?

হাণিক। গলা পূনে চিনতে পারলে না দাদা ? ও বে দীল্, বড়লের ঘোলে বন্দা গো।

হেলধর। বেশ তো পার।

হাণিক। গাবে না ? ও বে বিশে নট্টের বাতায় বলে গিরে গিরে কেউ ঠাকুর দেখে গান করে।

গান

মোন বলে ছাতার থাকি

হুণ্ডি হলে মাথা ঢাকি ;

নইলে মাঠে খুরে বেড়াই—

এমন বন্দা কোণার পার।

—কলিভূষণ দামগুপ্ত—

[আত্রে আত্রে গানের সুর অগন্ত হইয়া গেল। হেলধর গানের দিকে কান দিয়া থানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া আবার কাছে বস বেশ।]

মোহনের প্রবেশ

হেলধর। (থানিকদূর মোহনের দিকে তাকাইয়া) মোহন কাছে আছ, মোহন।

মোহন। (উৎসাহিত হইয়া কাছে গিয়া বসিয়া) কে কে দাদা, মোহনকে তা চলে বেশ মনে লেগেছে। কে কে হে—কি ভানোটাঃই লেগিন তুঁন ক'মিবেছিলে মশ গাঁতের লোকের মূখে শুনু এক কথা—হেলধর সেবাশী হয়েছ।

হেলধর। (হঠক দিয়া) বেশ কথা হলি নি মোহন, চুপ করে মোহন। (মোহন অপ্রতুত হইয়া চুপ করিল।) মোহন মোহন, তোর দলভে একটা কথা আমি ভেবেছি।

মোহন। (আবার উৎসাহিত হইয়া) ভেবে ? হে কে—কি ভেবেছ বলতো দাদা—

হেলধর। তুই তো এবনিতে কোনো কাজকর্ম করি নি, তোকে আমি আমার সোফার সপো হালে জুড়ে দেব।

মোহন। সে কি দাদা, তুনি ও কোনও রসিকতা করছ ?

হেলধর। (বদ্ব করিয়া মোহনের হাত ধরিয়া) রসিকতা নয় রে মোহন, একেবারে ঠিক বলেছি। তুই কে আমি বুঝতে পেরেছি। মাঠের মধ্যে সে দিন আমাকে বস অলক্ষীর পুত পয়তানে ঘিরে ফেলেছিল, তারাই আমাকে ওসুঁ গিণিয়েছে, বড় দিলে সেলাই করতে গিণিয়েছে, পুকুরে পাতা গিরে সোফার মোহর করতে গিণিয়েছে। তুই তারের

এক শব্দভান আবার এসে আমার ঘরের মধ্যে
সেঁধিয়েছিল—তোকে আমি ছাড়ব কি :

মোহন । কি সব বলছ হাদা—

হলধর । ঠিক বলছি, ঠিক,—আজ আর আমি বেঁঠিক
নেই । তুমি আমার নিজের হাতে দিয়ে জাভারের
চাল বের করিয়ে নিয়েছিল, পড়িয়ে দ্য করভে—
তুমি শব্দভান—তুমি শব্দভান ! (কোমরের গানদা হুঁসিয়া
মোহনের গলায় জড়াইয়া) তোকে আর আমি
ছাড়ছি কি, তোকে আমি হালে জ্বলন্ত ভাবে ছাড়ব ।
(গাফিয়া করিয়া ধরিল ।)

মাণিক । কর কি হাদা, কর কি,—এর বন্ধ হয়ে হাদা
যাবে যে ।

হলধর । থাক—থাক—। সে দিন ফুডুল গিচে
শব্দভানের মাথা তেপে ছিল, বের করে বিতে
চেরেছিলেন, বিশেষ ভাল করভে, সেটা চুকে যেত ।

মাণিক । জেড়ে গাও হাদা—জেড়ে গাও— ২

হলধর । (মোহনের প্রতি) তার এখানে নাকে বসে দে—
আর কোনো দিন আমার চোখের গানদা আসবি কি—
মোহন । (সত্যে) তাই কিচ্ছি—তাই কিচ্ছি—
হলধর । (ছোড়িয়া দিয়া) বা লক্ষীছাড়া—বিলুই তোকে
জেড়ে, আবার কোনো দিন মেথলসেই হয়—।

[মোহনের সোঁড়াইয়া পলায়ন । হলধর আবার কাতে
বসিল । কিছুক্ষণ আগে গুরুত্বাপন্ন একটি মেলে
প্রবেশ করিয়াছিল, সে সব দেখিয়া শুনিয়া শুয়ে এক
পাশে জড়োমড়ো হইয়াছিল । তাহার দিকে হলধরের
দৃষ্টি পড়িল ।]

হলধর । (হেলেটির প্রতি) কি রে মাথা, তুমি আমার
কি চাও ?

হেলেটি । (কাছে আগাইয়া কণ কণে) না তোমার
কাছে পাঠিয়ে দিলে ।

হলধর । না কেনে ? (উঠিয়া কাছে আসিয়া) তুমি দুবল
প্রবানের ছেলে ন'স ? (হেলেটি হঠাৎ সঠক মাথা
দাড়ে) তোমার এমন কথা কি করে হল ? দুবল ভা
হলে নেই ?

হেলেটি । না ।

হলধর । না । কি হল তার, কি হল ?

হেলেটি । একদিন আমারে বাড়ি বর সব ঘিরে
ফেলল সেপাই—

হলধর । সেপাই ? কেন কেন ?

হেলেটি । তারা আমাদের সব হান চাল লুণ্ঠ করে দিল ;
মাথা মেই মাথা দিতে সেল, তারা ভরোয়াল দিতে
মাথাকে কেটে দাঁড়াগ করে ফেল । (হেলেটির
ছুককাইয়া ক্রন্দন ।)

হলধর । কেটে ফেলল ? এঁয়া, একেবারে কেটে
ফেলল ? কোন সেপাই ?

হেলেটি । তারা জেবর হাকার সেপাই ।

হলধর । জেবর হাকার সেপাই ? ও হো হো হো—
কি সব্বাশ করেছি বড়তে পেরেছিল, মাণিক ?
আমি নোয়ার ঘোরে হাদাকে গড় থেকে ধলে ধলে
সেপাই করে দিয়েছি—হান্দুব মারা সেপাই (কপালে
আঘাত করিয়া মাথা নীচু করিয়া গিয়া)

হেলেটি । আমার এখন যেতে পাই নে—

হলধর । যেতে তোরা পারি—দুব পারি, হলধর বেঁটে
থাকতে তোদের কোনো জর নেই । তোকে চাল
সেব ভাল দেব—তোকে আমি রাঠের কাজকর্ম
শিখিয়ে দেব—

[চুক চুক, বদলা কাপড় পরা আট দশ বছরের একটি
মেয়েকে লইয়া মহামায়া প্রবেশ । মেয়েটির হাতে
একটি বাঁটা ।]

হলধর । এ কাকে নিয়ে এলি মহামায়া ? আমি সেপের
কি সব্বাশ করেছি মহামায়া জানিন্ ? আমি
নোয়ার ঘোরে হাদাকে গড় থেকে ধৈরা করে দিয়েছি
—তারা এখন হান্দুব কেটে বেড়াচ্ছে—হাদা জেবর
এখন হাদা জেবর হয়েছে—হান্দুব মারা হাদা ।
হাঁয়ে মহামায়া, হাদা ধলে আমার হান্দুব মাঝে কি
করে ? হাদা ভো হান্দুব বাঁটার । (মহামায়া আগাইয়া
আসিয়া লাভনা দেব ।) এ মেয়েটি কেনে মহামায়া ?
(মহামায়া ইঙ্গিতে জানায়, অনেকক্ষণ আসিয়া বসিয়া
গিয়াছে ।) অনেকক্ষণ ধলে আছে ? ও কি গার ?

[মহামায়া ইঙ্গিতে মেয়েটিকে বলিতে বসিল, মেয়েটি
মহামায়া খাচলে দুখ লুকাইয়া গিয়া ; মহামায়া
মেয়েটিকে কাছে টানিয়া আবার গড়িতে লাগিল ।]

হলবর । ও বের, তুমি অবন করছ কেন গো ? তুমি কে বল না ।

সেয়েটি । (দৃষ্ণ লুকাইয়া) আমি নিশি বাহ্যভোর ঘেবে ছিহি ।

হলবর । সেন তো, তুমি হুং বের কর, তাকাও—কথা বল । তুমি হাতে খাট নিরে এসেছ কেন ?

সেয়েটি । না বলোহে, আমারে একটু দৃষ্ণ দেবে ?

হলবর । কেন কেন ?

হিহি । আমার ছোট ভাই একটু দৃষ্ণ খেতে না পেয়ে শূকরে বাছে বৈশি করিয়া মহামায়া আঁচলের খাড়ে বৃষ্ণ ঢাকিল ; মহামায়া সেয়েটির মূখখানি বাহির করিয়া চিবুকে হাত থিরা খাবি করিয়া বৃষ্ণাইল তাহাকে অনেক দৃষ্ণ দেবে ।)

হলবর । দৃষ্ণ দেব না কেন, অনেক দৃষ্ণ দেব । কিন্তু নিশি বাহ্যভোর ভো কত ভাল একটা দৃষ্ণের পাই ছিল, কীরে হত দৃষ্ণ সিত ভাড়ে ভাড়ে ; নিশি বাহ্যভো মোরুটার কত গব' করে বেড়াতে । কি হল মোরুটার ? মরে গেল নাকি ?

সেয়েটি । মরে কেন, সেটা কিনে নিয়েছে । বাবা বৈঠকে না, তবু জোর করে কিনে নিয়েছে ।

হলবর । কে কিনল রে ?

সেয়েটি । কোথেকে এসেছিল এক জলবর মহামন, লোকজন নিয়ে সোনার মোহর দিয়ে মোহুটা কেড়ে নিয়ে গেল । আমরা এখন আর একদিনও একটু দৃষ্ণ খেতে পাই নে, আমিও না, আমার ভাইও না ।

ললবর । দলনাশ করছি মহামায়া, এসেবের দলনাশ করছি । পরভাসের পাল্লায় পড়ে বোণা করেছি, বোণার মোরে আমি বেকদাকে পাতা থেকে কড়ি কড়ি সোনার মোহর করে দিয়েছি । আর ভাই দিয়ে কিনা কাছা-বাড়ার মূখের দুইটুকু গব'ত কেড়ে বেগু ! আচ্ছা আমি মেখে দেব, ওজর রাখার দল দেপাই আমি আবার বড় করে দেব ; জলবর মহামনের দল সোনার মোহর আমি পাতা করে দেব । একদিন পরভাসের ভেঁকি দেখিয়েছি—না হয় আর একদিন আবার দেখাব । সে দল তো হবে বাহ্যভো—কিছু—কি হয়েছে জাখিন্—পাত্রে

আমায় এত কোর ছিল—তা কেন যেন অবন অবন লাগছে । (মহামায়া বৃষ্ণাইল, মাঠে থিরা আবার ঠিকভাবে কাজকর্ম আরম্ভ করিলেই দল আবার ঠিক হইয়া যায়) বলছিন্, তুমি বলছিন্, ? হ্যাঁ— ? হ্যাঁ— ? আবার মাঠে গিরে কাজকর্ম আরম্ভ করলে দল ঠিক হয়ে যাবে ? ঠিক—ঠিক—তুমি যা বলবি তাই ঠিক । তুমি মহামায়া আপনি লক্ষী ঠাকরণ যোন—অলক্ষীর পুত্র পরভাস তুমি থাকতে মরে চুততে যাবে না—চুততে যাবে না ।

শুট পরিবর্তন

বিত্তীয় দৃষ্ণ

[প্রথম মাখি বাড়ির দাওয়ার বসিয়া হুঁকা টানিতেছে পাশে কাশের তেঁতাজি থিরা ডাল। বৃষ্ণিতেছে তাহার শ্রী ।]

প্রমাথ । কদিন বাড়ি ছিলেন না, বাড়ি কিরে দেখছি বাড়িটা কেন হুংহুং করছে ।

প্রমাথের শ্রী । ওটা তেনার বৃষ্ণখুতানি গো । এই বাড়ির ভিত্তিমাতিতে ঠিক বেন বড়ার বড়ার হউ ঢালা হয়েছে । (বাড়ির ভিতর হইতে একটা কুকুরের আতর্নাম শোনা গেল ।) কিন্তু তাও বলছি, এই কুকুরটা আবারও কেন ভয় ভয় করিতে দিয়েছে । কালো কুকুর যিন রাত অবন করে করছে কেন কিছুই বুকতে পারছি নি ।

প্রমাথ । শৃং বাড়ির কালো কুকুরটা নয়, তোমরা ভড়কে যাবে বলে বলি নি খাউকে—এই দৃষ্ণার যিনে আমি কুলকল অনেক দেখছি । এর মাঝে একদিন যিন দৃষ্ণারে শেরালের ডাক শুনোছি, বুটো থিথিবা বলভেন, থিবার থিরা—বক অবলদল ।

প্রমাথের শ্রী । (হাতের কাজ রাখিয়া) সে রকম কথা তো ছেলেবেলায় আবারও অনেক শুনোছি ।

প্রমাথ । তারপরে আবার—'বিশার কাক' । হ্যাঁ—ঠিক তাও শুনোছি, এই পরশু দিনে একদর রাতে কাক—করে একটা কাক প্রায় বাঘার উপর দিয়ে উড়ে গেল । আরও খোলাশ করছে ? কর নি । আচ্ছা দৃষ্ণারে বোলা বাচ্ছুটাকে লাবনে রেখে আবার

কালী গাইটা হান্দা হান্দা করে ডাকতে আরম্ভ করল। একে ধিনা—‘ধিনা ধিনা—নিশার কাক’, তাতে আবার ‘বৎস সবনে গান্ধীর ডাক’ না, লক্ষ্য কিছই ভাল দেখা যাচ্ছে না। (ভিতরে আবার কুহুরে আতঁনাল।)

প্রিন্সের স্ত্রী। তার উপরে আবার দেখ, কালো কুহুরটা কেনন ভেয়ে কান্না কাঁদছে গো। বসে না থেকে কিছু করিক-ওকা ডাকো—। বাড়ির মধ্যে অবন করে কালো কুহুর ডাকলে ওতে যে পেরেত্তের অবশাল জ্ব। কি উপায় করি বুঝতে পারছি নি (ভালো গ্রথিরা ভিতরে প্রবেশ করিল।)

[দূরে ডব্, ডব্, ডব্ চোলের নখ শোনা গেল; সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক যেন কি বলিরা ঘাইতেছে।]

প্রিন্স। ওরে বান্কে—বান্কে।

খাই সো কত’—বলিরা বাণিকের প্রবেশ।

ওরে চোল সহঃ কিসের রে? দেখে আর তো—
বাণিক। ওরে বাবা, পেঁহিলুম দেখতে—ওকা যে রাজার মান্ধ গো—

প্রিন্স। রাজার মান্ধ? কি বলছে?

বাণিক। কি যেন কি অদৃশ করেছে গো—চিকিৎসক চাই—বাঁধ চাই—কত কি।

প্রিন্স। ডেকে নিলে আর তো এগিকে।

বাণিক। ওরে বাবা, আবার বৃক চিন্ চিন্ করছে,
জোড়ে পালিয়ে এসে—

প্রিন্স। কেন, কি হয়েছে?

বাণিক। ও বাবা রাজার মান্ধ গো, মাথার লাল পাগড়ি, পেটে বঁধা চক্চকে ঢাকতি। ওরা আসবে কেনি?

প্রিন্স। হল সো বাকির বর জাণি আমরা, তবেই ঠিক আসবে।

বাণিক। আরি যে হালার গণ্ডো মোড়ুন হাল আনতে
কামার বাড়ি যাব গো, বাধা যে থাকিবে আছে।

[আবার সেই চোলের নখ আর গলার সোফের গলার নখ; এবারে বানিকটা শোনা ঘাইতেছে—‘রাজার মেয়ে অদৃশ করেছে—এ-এ-এ, যে সারিরে দিতে পারবে—এ-এ-এ……হবে-এ-এ।’]

প্রিন্স। এই যে একেবার কাছে এসে পড়েছে—ডাক, ডাক, ডাক—

[বাণিকের দৌড়াইয়া প্রস্থান, বেগে প্রিন্সের স্ত্রীর প্রবেশ।]

প্রিন্সের স্ত্রী। (বিহ্বল ভাবে) দেখ দেখ, এসে কাণ্ডটা দেখ। পাড়ার সোকে ঠিকই বলছে, হালার আঘাত দেবারলী হয়েছে। কামার বাড়ি বাঁধিল মোড়ুন হাল আনতে, কুহুরটার ছটকটানি দেখে যথাকৈ গাঁড়াল, ঘরে ঢুকে হাতে করে কি একটু নিয়ে এল, মলের সঙ্গে কুহুরের বুকে পুরে দিল, সঙ্গে সঙ্গে কুহুরটা ব্যাধ বেড়ে উঠেমনম বুকে বেড়াচ্ছে। হালারকে কিসে ভর করল—দেখবে এল—

(প্রিন্স ও স্ত্রীর প্রস্থান ও একটু পরে পুনঃপ্রবেশ)

প্রিন্স। তাই তো, কেন সব অজ্ঞানি—তাই তো কলিঙ্গদূর—বাড়িটাও কেন হুঁ হুঁ করছে।

[চুপী, রাজপুত্র ও গৃহীজন সেলাই সহ বাণিকের প্রবেশ; রাজপুত্র-বাণিতে বাণিতে চুপিতভয়ে,—
‘রাজার মেয়ের অদৃশ করেছে—এ-এ-এ; যে সারিরে দিতে পারবে, রাজ্য রাজকন্যা দ্বি তার হবে—এ-এ-এ।’ চুপী চোল বাজাইল, ডব্, ডব্, ডব্।]

প্রিন্স। (আগাইরা গম্বা) রাজার মেয়ের অদৃশ? কি অদৃশ গো?

রাজপুত্র। শোনো সব চাষাভূম্যের কথা। রাজার মেয়ের অদৃশ, তার আবার কি অদৃশ তাকি বলা যায়? কি অদৃশ কেউ তা বলতে পারে না, দবাই বলে অদৃশ—অদৃশ—অদৃশ। ভারী অদৃশ—ভাবন অদৃশ। এই দিবা বসে আছে বসে আছে—এই বকে বাধা বকে বাধা—এই চিংকার—এই আবার ভিন্নবি বিধে পড়ে গেল।

প্রিন্স। তা হলে বাধার অদৃশ—বকে বাধা?

রাজপুত্র। বাধার অদৃশ তো বটেই, নইলে আঃ উঃ করে চিংকারই বা করবে কেন, আর ছটকটাই বা করবে কেন?

প্রিন্স। যিনরাত ছটকট, করছে, কেউ সারিতে পারছে না।

রাজপুত্র। রাজার মেয়ের ব্যাধ বলসেই তো এত চট্,

করে সারাধার নয়, সব দেখা গেছে, কত ভাকার
মোক্কার হেঁকিম ধবরেক ওস্তাদ-ওকা—সব তাৎ ।
যেহেঁ সেই অদৃশ সেই অদৃশ । এখন তাই পরগণার
পরগণায় আমেশ জারী হয়েচে, যে ষাক্কার যেথেকে
সারিয়ে দিতে পারবে সে আমেশক নয়—একবারে
পুঁগো হাক্কা পারে—হাক্কন্যাকও পারে ।

শ্রীনাথের নদী । (কিন্, কিন্, করিয়া শ্রীনাথকে) অদৃশে
জিৎকার করছে, হট্, হট্, করছে বলছে সো, আবারের
হলবরেক একবার পাঠালে হয় না ?

শ্রীনাথ । (হাক্কন্যাকের প্রতি) হেঁই সো হাক্কার হান্দু,
এই বলছিলুম কি, সারাতে গিয়ে ঘরি না শাহাতে
পারে ?

হাক্কন্যাক । তবে ঘালি হাতে কিরে খাশের—

শ্রীনাথ । (দলব) তবে—এই একটা কথা বলছিলুম—
হাক্কন্যাক । বল বল, লোক জানা আছে নাকি কেউ ?

শ্রীনাথ । ছিল—ছিল—

হাক্কন্যাক । হই—কোথার—ভাক, চল্, এক্ষুনি
আবার সঙ্গে ।

শ্রীনাথ । নাপিক, তোর হাদাকে ভাক তো এথেকে
(নাপিকের প্রস্থান) ; বেশি ঘরি যেতে চায় ।

হাক্কন্যাক । যদি যেতে চায় কথার মানে কি হে ?
কানের সঙ্গে তুমি কথা বলছ ? যেতে যে তাকে
হতেই হবে, নইলে এই সর সেপাই রবেছে কিসের
কন্যে ?

শ্রীনাথ । তবে—তবে তো বড় ভয়ের কথা হল ! হলব
যদি যেতে না চায় । দেখছি, দেখছি—(হাপিক ও
চলবের প্রবেশ)—এই যে হলব ; শোন বাবা, এই
এবার এগেছেন হাক্কন্যাক, গোত্রায় কর । (হলবর
হাত ভেঙে করিয়া প্রশ্ন করিল) । এই আবারের
খিনি হাক্কা—সেই যে তিনি হাক্কা—তোনার সে
সেহের হতেছেন অদৃশ, বাখার অদৃশ ; তাকে তো
এমনার সেথেনে যেতে হচ্ছে বাবা, তেবারা এসেছেন
তোকে গিরে যেতে ।

দলব । তাই তো, বাখার অদৃশ, হট্, কট্, করছে—কন্ট
পাচ্ছে— ; খুব কন্ট ?

হাক্কন্যাক । খুব মানে কি সো, বাখার দলব, তুবে

আছেন, হাপ্পন্যাক-হাপ্পন্যাক করছেন, যেতে তোমাকে
হচ্ছেই ।

হলব । তাই তো, আমি যে নোতুন হাল গড়তে
কামার বাড়ি বাচ্চিশান, আবার যে নোতুন করে
ঘাঠে যেতে আরম্ভ কর ভেবেছিলাম, এখন আবার
হাক্কার বাড়ি ঘাব—সে যে অনেক দূর ! আবার
নোতুন হালটা তবে—

হাক্কন্যাক । হাল ? হাঃ হাঃ হাঃ—(শ্রীনাথের প্রতি)
তোমার হেসেটি বড় সরল সো । হাল ঘিরে কি হবে ?
হলব । (চিঠিয়া উঠিয়া) হাল কিরে কি হবে ? এ সব
তোমার বলছ কি ?

হাক্কন্যাক । (শ্রীনাথের প্রতি) নং সরল নয়, তোমার
হেসেটি একটু হাবাও দেখতে পাচ্ছি । বলছিলুম
কি, ওগো হাবা হাবা, হাক্কার যেথেকে ঘরি সারিয়ে
দিতে পার, তবে আর হাল চাব নয়—একবারে
হাক্কা ।

হলব । হাল চাব নয়—হাক্কা ? এতো সেই পরভানের
কবাই হল সো । বাও—বাও—নইলে কিছু কুঁটি
ঘরে ফেলার বলছি ।

শ্রীনাথ । (হিন্ কাচিয়া) বলিন্, কি হস্তভাগা, হাক্কার
হান্দু যে ।

হলব । হাক্কার হান্দু নয়—পরভান, তুমি জান না
বাবা, ভীষণভাবে আমার পেছনে লেগেছে । ঘাঠ
ছেড়ে আমি ঘাব না, হাল ছেড়ে আমি থাকব না—
অর্থাৎ আমাকে ঘিরে ফেলবে ।

হাক্কন্যাক । তোমার হেসে এ সব কি বিড়, বিড়,
করছে ? পাগল নয় তো ?

শ্রীনাথ । অপরাধ নিয়ে না হাক্কা, হান্দু—আমি দর
ঠিক করে দিচ্ছি । (হলবের কাছে গিয়া) হাক্কার
সেহের যে বড় কন্ট হচ্ছে—বাখার হট্, হট্, করছে ।

হলব । বাখার হট্, কট্, করছে ? তাই তো, শেকড়
তো এখনো একখানা আছে । ভেবেছিলাম ও
খার ছোব না, আবার তো হুঁতে হচ্ছে । (অন্যদিকে
তাকাইয়া) আবার যদি পেছনে লগে । তা হাক্কা
না হয় না হলব, শেকড়টা ঘিরে বাখাটা সারিয়ে
চলে আসি ।

স্বাক্ষরত্ব। তোনার সেঁখি সাজা হতেই বস ভর।

হলধর। সাজা? হ্যাঁ—তা কখনো তো হই নি।

স্বাক্ষরত্ব। পাঁচবে দিতে পারলে সাজাও হতে পারবে, স্বাক্ষরত্বকেও পারে।

হলধর। (অবাকভাবে) স্বাক্ষরত্ব। স্বাক্ষরত্ব। যে যে—
—তা—তা বস কি? একবার সেঁখি না—না
হয়—না হয়—শেষে সেলের স্বাক্ষরত্ব। কিন্তু
সাজা? হাল ছেড়ে সাজা। সেটি হচ্ছে না।—
তা, হোক না। সেঁখি দিন নয়—এই একদিন দু'দিন
—তিন দিন—সাজা—সাজা—। বস কি? তা যাব।
(স্বাক্ষরত্বের প্রতি) ও সো সাজার মানব, দাঁড়াও
—আঁবি যাব,—আমার শেকড়টা নিয়ে আসি।
(ভিতরে প্রবেশ)।

স্বাক্ষরত্ব। (প্রিন্সের প্রতি) সেব কে পাসল-পাসল
নর তো?

প্রিন্স। না না, কি যে আগনি বসছেন সো—

স্বাক্ষরত্ব। কেনন একা একা বিড় বিড় করে, আমার
কেনন সন্দেহ হয়।

প্রিন্স। ওই ওর একটু আছে, ও কিছু না কিছু না;
ও ওলব, জানে, বসর জানে, সব ঠিক করে দেবে।

(বুক চাপিয়া বাথার ককাইতে ককাইতে উঠে-
বুঝে মাথার নখলা ছোঁড়া কাপড়ে একটি ভিয়ারী
ঘরের প্রবেশ)।

ভিয়ারী ঘরে। ও বাবা, বুক সেল সো, বুক সেল
(বাড়িতে বসিয়া পড়িল)।

প্রিন্স। কি হয়েছে তোমার, কি হয়েছে?

ভিয়ারী ঘরে। বাবা—বড় বাবা—বুকে ব্যথা সো,
শাল কমে পাগলি বো (ক্রন্দন)।

প্রিন্স। (বিরক্ত ভাবে) তা এখানে কোথেকে এসে
জুটিল?

ভিয়ারী ঘরে। আর চলতে পারছিলাম বো বাবা—ও:
বুক সেল—

(হলধরের প্রবেশ)

হলধর। এঁয়া—বুক সেল? কার বুক সেল—কে—কে
—কে তুমি—

প্রিন্স। কেউ নয়, কেউ নয়, তুই চলে যা হলধর—

এঁয়ের সঙ্গে চলে যা: অভাগারী সাতার আর বরবার
খাওয়া জুটিল না।

হলধর। (মেরিটির দিকে আসাইয়া) কি হয়েছে
তোনার—কি হয়েছে?

ভিয়ারী ঘরে। বাবা—বড় বাবা—বুক সেল—

হলধর। এঁয়া বাবা? বুকে ব্যথা? তাইতো, তাইতো
—কি করি? না-না-না—বো বা, কিছুতে বো না;
এই একখানা হাত শেকড়—এ আঁবি—এ আঁবি সাজার
মেথেকে বো—

ভিয়ারী ঘরে। তুমি ওলব জান বাবা? হাও, হাও—
একটু হাও—

হলধর। না-না-না—সাজা হব—স্বাক্ষরত্বা পার—এই
একখানা শেকড়, কিছুতে বো না; আঁবি এই কান
চোপে চোপ বুকে থাকলান—বো না, কিছুতে বো না—
স্বাক্ষরত্ব। (সিপাহীর প্রতি) দেখ কি হাঁড়িতে—

ভাগিবে হাও না মেটেটাকের। [সিপাহী দুইজন
একসঙ্গে বেয়েটিকে তাক্সা করিল—দূর হ দূর হ—]

ভিয়ারী ঘরে। মেটো না, মেটো না বাবা—বাই বাবা
বাই—উঃ—বুক ব্যথ—বুক ব্যথ—

(বুক চাপিতে চাপিতে বেগে প্রস্থান)।

স্বাক্ষরত্ব। আর দেহী নয়—চল, আনাদের সঙ্গে চল।

হলধর। এঁয়া—চলে সেল—চলে সেল কেন? বুক
ব্যথ? বুক ব্যথ? একবার সেঁখি—ও বেবে—ওসো
মেয়ে—শোন শোন—(বালিতে বালিতে মেয়েটি ঘেঁষিকে
গিরাছে শেঁষিকের বেগে প্রস্থান)।

স্বাক্ষরত্ব। দূর হোক হাই—এ আত পাসল। চল
আমরা অন্যদিকে যাই।

প্রিন্স। পাসল নয়—পাসল নয় বাবা—এই কিনা—

সিপাহীর। চোপরাও—

(স্বাক্ষরত্ব, চুলী ও সিপাহীরের প্রস্থান)।

প্রিন্স। (কপাল চাপড়াইয়া) কিছু হল না—গোরুর
শরৎ মাঠে থাকতে থাকতে হতভাগা একেবারে গোর;
হয়ে গেছে।

ঐ শ্রী। ভূতে সেল না তো? ঐ যে তুমি সব শেয়াল-
কানের কথা কি সব বলছিলে! আমার যে হাতপা
সেটের মধ্যে সোঁষিরে থাকে—

শ্রীমতী। যা হোক সে তাই হোক—সবুজ সে চতুভাঙ্গা—
আমি আর ওর মূখ দেখব নি।

(হলধরের পুনঃ প্রবেশ।)

সিঁরে এলি তো ? দিঁরে এলি তো শেকড়খানা ঐ
হাতার মড়াকে ?

ললিত। হেঁব নি ? বুকের কি কটু—

শ্রীমতী। হাঠে গিরে গোবরুর সংগে থান বা হুতভাঙ্গা,
বাড়ির মধ্যে আর আসিবু নি— (প্রস্থান)

শ্রীমতী। আমার হলধরের কি হল গো—

(বুকে অঁচিল দিয়া প্রস্থান। বাণিকেরও প্রস্থান)

[হলধর একা একা কয়েকবার পায়েচাঁর করিল, ভাটার
পরে একটা খুঁটিতে হেলান দিয়া লাগুয়ার হাটির
উপরেই বসিয়া পড়িল। লুটাবো কাপড়ের অঁচিলটা
হাতে ধরিতে ধরিতে ভিখারী বেয়েটির প্রবেশ।]

ভিখারী বেয়ে। একটু খুঁটে খেয়েছি, তাতেই বেঁচে
গেছি। একেবারে সেয়ে গেছি। ঐ সেবা দিঁরে
সেপাইরা চলে যাচ্ছে সেয়ে লাফল করে শেকড় নিয়ে
আবার কিঁরে এলাব; এই রইল তোমার শেকড়।
এ দিঁরে তুঁবি আরো কত লোক ভাল করতে পারবে।

তুঁবি বাবা সাক্ষাৎ চন্দ্রনিম্বের গো, তোমাকে পেলাব—
[যেয়েটি হুলাস পড়িয়া প্রশ্ন করিয়া চলিয়া গেল;
হলধর অন্যমনস্ক হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।]
পটক্ষেপ।

৪ তৃতীয় দৃশ্য।

[রাজসভা। সিঁহাসনে পাশাপাশি রাজা ও রাণী
উপবিষ্টা। বামপাশে আসবে উপবিষ্ট মন্ত্রী, বাকিল
পাশে সেনাপতি। দুই পাশে সপ্তম দুই সিঁদাষী।
সম্মুখে এক দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিতেছে দুইজন
প্রতিদ্বারী।]

ললি। আমার একটা রাজ সন্ধান—ঐ একটা রাজ
বেয়ে—এতদিন বসে তার রোসের কোবো বিদান
হল না ? কি লাভ হল আমার রাজরাণী হয়ে,
পথের ভিখারী হতে চোখ ছিল কি ? চোখের
দামনে যেয়েটা ব্যথার ব্যথার বিনয়্যাত জটুকু; করছে,
জটুকু ব্যথার—বাঁজা যেট। বর বেটে—বাঁজির কাঁচ

হয়ে গেল—আমি না হয়ে এ আর কতদিন নিজের
চোখে দেখব ? (অকস্মে মূখ চাকিয়া ক্রন্দন।)

রাজা। হুঁদ্রি—

মন্ত্রী। মহারাজ—

রাজা। সেনাপতি—

সেনাপতি। আসেপ করুন মহারাজ—

রাজা। রাণীর অভিযোগের যোগ্য উত্তর হাও।

মন্ত্রী। আমি নির্বাক মহারাজ, অন্তরাগ্রেতে লজ্জা হইল।

সেনাপতি। অসামর্থ্যের প্রাণিতে আমি বাণ্য হেঁচি করে
আছি।

মন্ত্রী। নিজের বিচার—বুঁদ্রি, চেঁদ্যো-বর—এতে আমি
কিছুই ত্রুটি করছিলাম মহারাজ।

সেনাপতি। বাহুবলে যদি রাজ্য জব করতে হত
মহারাজ, এক্ষুনি কাঁশিরে পড়তুম—হর বিজয় না
হয় বংশ—যা হোক একটা বরণ করতুম। কিন্তু
রোগবলের কাছে আমার বাহুবল ও লোকবল যে
একেবারে সামর্থ্যহীন মহারাজ।

মন্ত্রী। তবু আমরা চেঁদ্যোর ত্রুটি করি নি। নগরে নগরে
পল্লীতে পল্লীতে—বাঁটে হাঠে—বনে দরভে—দরভে
আমরা লোক পাঠিয়েছি—সামু হোক সন্ত হোক,
হেঁকিম হোক বগা হোক—ওকো হোক দৈবক হোক—
ব্যথার অনুরূপ যে ভাল করতে পারে তাকেই হয়ে
আনতে।

সেনাপতি। তাতে আমাদের উপহবও কম লভ্য করতে
হচ্ছে না মহারাজ। একটু আসেই কোথা থেকে
উপস্থিত হয়েছিল এক অর্থ উদ্বাহ; বাঁহরকবের
অগ্রদূত করে যে গোজা অজ্ঞানদেরই চুকে পড়বার
চেঁদ্যো করেছিল।

রাজা। কি আপদ।

মন্ত্রী। রাজ্যের সোভ আর রাজকন্যার সোভ মহারাজ।
সোভটা নাকি কেবল বসছিল, আমার রাজ্য চাই—
রাজকন্যা চাই—আমি বুঁদ্রতে রাজ্যের মেয়েকে
ভাল করে দেব।

সেনাপতি। তাকে কেমনো খাঙ্কিল না কিছুতেই—
পথ পর্বত বন্দী করে রেখে দিতে হয়েছে।

মন্ত্রী। আজও অনেক লোক আত্ম দগ্ধরীতে রয়েছে

হায়াহা। আদেশ পেলে একে একে প্রবেশ করাই।

হায়া। বেশ-প্রবেশ করাও।

মন্ত্রী। (হাতে কাগজ লইয়া ভালিকা দেখিয়া)

প্রতিহারী—

প্রতিহারী। আদেশ করুন—

মন্ত্রী। প্রথমে ভট্টাচার্য সাহসকে প্রবেশ করাও।

প্রতিহারী। বে আদেশ (বদিয়া প্রস্থান ও ভট্টাচার্য লইয়া প্রবেশ)।

ভট্টাচার্য। (হাতের চিনটাটা চারিধিকে নাড়িয়া আশীর্বাদার্থে ভিত্তিতে) স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি।

মন্ত্রী। (পাঁচাইয়া) ভট্টাচার্য সাহসকে পাওয়া গেছে—

ভট্টাচার্য। পাওয়া গেছে নয় বাবা, বল, এর দর্শন বিশেষ—

মন্ত্রী। হ্যাঁ হ্যাঁ—এর দর্শন বিশেষে নৈমিষ্যরসো। নক্ষত্রটি পর্বতের পক্ষপাণী গুহ্যত। ইনি ত্রিকালজ্ঞ করি।

ভট্টাচার্য। ত্রিকালজ্ঞ নয় বাবা, বল চতুষ্কালজ্ঞ। সত্য যেতা হৃদয় কর্ণ—এই চারিদিকে এক মুকুটাসনে সাধনা করছি ঐ এক গুহ্যত। এক এক হৃদয়ের সাক্ষী এই এক একটি ভট্টা, এইটি জন্মেছে সত্যদূসে, তাই দেখতে পাচ্ছি, এটি সাক্ষী : এটি যেতা হৃদয়ের তাই এটি হৃদয়। এটি হৃদয় হৃদয়ের—এটি তাই পীতাম্ব, আর এইটি কলিহৃদয়ের—এইটি দেখ তাই এখনো কেনন কৃষ্ণ !

হায়া। আপনি আমার কন্য়ার প্রীতি করা করুন—

ভট্টাচার্য। পর্বত শিখর হতে একবার দক্ষ অবতীর্ণ হতেছি বাবা—তখন বন্যসামনা অগ্নি ধাববে না।

হায়া। একে অবতরণে প্রবেশ করাও। (একজন প্রতিহারী ভট্টাচার্যকে ভিতরে লইয়া গেল।)

মন্ত্রী। (অপর প্রতিহারীর প্রতি) প্রতিহারী, এপ্রচ্যাবকে প্রবেশ করাও।

(প্রতিহারীর প্রস্থান ও প্রচ্যাবকে লইয়া প্রবেশ, পূর্ব প্রতিহারীও প্রবেশ।) ইনি এপ্রচ্যাব সন্তোষী ভৈরবেশ্বর।

এপ্রচ্যাব। যিনি দিবাকর তিনি সর্বপাপনাশ, তাই তাঁকে দর্শনে প্রদান করি। মহাশয় বলবেন

কিনা—সর্বপাপনাশক, তাতে আধি-ব্যাবি কি হ'ল! অতি সুচিন্তিত প্রশ্ন, কিন্তু মহাশয়—আধি-ব্যাবি ব্যক্ত কার্য হায়, কারণরূপে অবস্থিত একবারে পাপ। এ জীবনের নয়, অতি সুস্থ বীজাকারে দত্ত অমরমহাত্ম্যের কোনো পাপ,—হয় পরীক্ষিত নয় ব্যতিক্রম বা দানবিক। এই যে সৈন্যদলী মহাশয়—

হায়া। আমার সাহসী! সাহসী তো অনেক পরীক্ষা করা হয়েছে।

এপ্রচ্যাব। (হাস্য সহকারে) প্রতারণিত হয়েছেন মহাশয় সন্তান বিশ্বাসে প্রতারণিত হয়েছেন। তিনদোরে সাহসী প্রচ্যাবের ক্ষমতা আছে একজন কি দু'জন লোকের, তারা দু'বহুলাদিত প্রশংসাজনক আকর্ষণ করে আনতে পারে জগতিক বস্তুর মধ্যে। সন্তবর্ষ পুত্রভরণ-বোলে গুপ্ত গুহ্য নিষিদ্ধ যে আত্মসী কাচ ওষাণাই আকর্ষণ করতে হয় দানব আধিত্যের সেই সর্বপাপন শক্তি।

হায়া। (স্নেহভাবে) বেশ আর একবার সাহসী প্রয়োগ করে দেখা দাক।

মন্ত্রী। প্রতিহারী, এপ্রচ্যাবকে অবতরণে প্রবেশ করাও। অস্ত্রপুত্রককে বলবে, ভট্টাচার্যের প্রক্রিয়ার পরে যেন এই এপ্রচ্যাবকে সাক্ষ্যকার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়।

(এপ্রচ্যাবকে লইয়া প্রতিহারী ভিতরে প্রবেশ)

(অপর প্রতিহারীর প্রতি) প্রতিহারী, গোসেন্দ্রালি ওজাকে প্রবেশ করাও।

[প্রতিহারী লাল-নীল-কালো-হলুদ বিভিন্ন রঙের শোভাক পরা এক মূল্যবান কবিরকে প্রবেশ করাইল; তাহার সাধারণ বাহির, হাতে তিন বঁকা একটা লাঠি। অন্য দিক দিয়া অপর প্রতিহারী প্রবেশ করিল।]

ওজা। (বেগে প্রবেশ করিয়াই হাতের লাঠি দ্বারা যেকের উপরে দাঁতের তিনটি দাঁড় দিয়া অতি বিকট কণ্ঠে তিনবার দৃঢ় করিয়া উঠিল) কহি—কহি—কহি—(হায়া ও হাশী ভীত সন্ততভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল, মন্ত্রী তাহালিকাতে দৃষ্টি করিতে যোড়াইয়া গেল, সেনাপতি গুরবার বাহির করিয়া

আপাইবা আসিল, দলপত্র সিপাহীদিগ বর্ণা উঠাইয়া
আপাইল ।) উঃ হাং করো—বেশজবি ঘাণ করবেন
মহারাজ মহারানী, পাত্র যোম মন্ত্রী সেনাপতি ।
শরভানী নোলা বিবি ভাড়া করে আসছিল শেহন
শেহন, ওকে আছাড় করে মারলুম্বা তিন বা, ঘাতে
না শেহীদ মহারাজের হাতেবে । দবার ঘরে ঘরেই
হা-বোন্ হবয়ে—তাই নিয়ে কথ্যবাতা; হালখীসের
এই সব অঙ্গুৰ সব হল ষণ্ডকবনের দাওব বনের
দুন্দুৰ বনের দিবিরের ভর,—ওলা বিবি, নোলা
বিবি, কালো বিবি, মালো বিবি, ছিকর বিবি,
বিকর বিবি—কোথাও বিবিদের বেক নম্বর, কোথাও
ভর । কিছু ভব সেই মহারাজ রাণীমা, চালপড়া
আর কড়াই পড়া নিয়ে চোষ ঢকে দিবেছি সব
বিবির, এখন এই পাঠি মারব আর তাকিব । (শব্দ
চোষ দুটি শোয়া করিয়া উপরের দিকে তাকাইয়া
দুঃখ বিচাইয়া ব্যবহিতে বার বার নাড়া দিয়া
বিভ্ বিভ্ করিতে লাগিল এবং বিবির ভঙ্গিতে
ফিল বাকা লাঠিটা আকাশের দিকে হুয়াইতে
লাগিল) ।

জা । মন্ত্রী, যন্তঃপূরে প্রবেশ করাও ।

নী । বেবে আমার ভয়েতেই হচ্ছে যাবে না তো ।

জী । তা গিরেও যদি যোগ নিরাম্বর হয়, তাই
আমাদের কাম্য হানী বা ।

(প্রতিহারী ওকালেক লইয়া অভ্যন্তরে প্রস্থান করিল)

অহ বালককে প্রবেশ করাও । এই পরমভক্ত বালককে
একটি গল্পীগ্রামের ভয়বান্ধরের অন্ধকারে আবিস্কার
করা গেছে ।

[প্রতিহারীর দলে অহ বালকের গান পাঠিতে গাহিতে
প্রবেশ ।]

গান

তোমার নাম বাবে না করল ভালো,

তার ভালো আর করবে কেনা ।

তার ভালো কে ধুইবে মেবে

মেবে জলে না ভুবন মেবা ।

চোখের কান্দার দুকল ব্যাঘার —

গভীর কতে ধুইবে কথার—

শীতল হাওয়া তোবার পায়ে

না করলে ওই চরণ দেবা ।

হাজা । তোমার গান বড় ভালো লাগছে; কিন্তু
তুমি ঐ চরণদেবা হাজা ওদুঃখ পর কিছই জান না ?

অহ । বা বাবা, ওদুঃখ পর কিছই লিখি নি, দবে জানি
ঐ হরিনাম । ববে বেঁবে নিয়ে এসেছে আশনার
লোকজন, ওদুঃখের তো কিছই জানি না বাবা ।

দুঃখ-ভারণ শুধুই জানি

অনাথ-নাথের চরণখানি

তোমার সেই চরণের পরণ বিনে

পাতি শূন্যে কেই বাঁচে বা ।

হাজা । তুমি স্বার্থ পরমভক্ত বাবা; তোমার ঐ
হরিনামই একবার শুনিয়ে এস যেন, তাতে যদি
কোনো ফল হয় ।

(প্রতিহারী অহ বালককে লইয়া গেল ।)

মন্ত্রী । দেখছেন তো মহারাজ, চেন্টার আমায়ের জুটি
চছে না কিছই । এই রকমই তো অবিস্রাজ চলে
—আজ একদিন নয় দুদিন নয়—তিন মাস পরে ।

সেনাপতি । বিশ শতক দৈবা শূন্য দেশ বিশেষ দূরছে
হাজকন্যার অঙ্গুৰের কথা প্রচার করতে আর
চিকিৎসকের স্থান করতে । সকলের উপরেই আসে
হবেছে, চিকিৎসক পেসেই হবে নিয়ে আসতে ।

[আলু বালু বেসে হাজকন্যা ময়ূরালার প্রবেশ ।]

ময়ূরাল । এর চেয়ে আমাকে একদিনে পলা চিলে
মেবে কেল বাবা, এ আর আমার গলা চছে না—
(দুঃখে অচল দিয়া ক্রন্দন) ।

রাণী । কি হল ময়ূরাল—কি হল মা— ?

হাজা । বাঘটা আমার বাকল না কি ? তাই তো—
তাই তো—

ময়ূরাল । গিলে রাখে হাওয়ার কত লোক বেঁটিয়ে
নিয়ে আসে বাবা,—দুকের বাঘা যদি কখনো বাবে
এয়া তো কখনো বাবে না । ওদুঃখ-হাঙ্গুলি, কাড়-
কুক, ভুক-ভাক—দিলে রাখে আমার যে এক
হৃদয় একটা পাঠিতে বাকবার উপায় নেই ।
হাত-পা আমার কণিছে, দুঃখ আমার দুকিয়ে গেছে,
বাঘা আমার দুঃখে, আমাকে বাঁচাও বাবা—বাঁচাও

—(বুঁহুঁত হইয়া ভূমিতে পড়িল, রাজা ও রাণী গিয়া লইয়া বসিল। বস্ত্রী সেনাপতি আগাইয়া আসিল।)

রাজা। কি হল বহুমালা—কি হল?

রাণী। (কাঁদিয়া) ওসো, বহুমালার মূখ্যাবান এমন নীল হয়ে গেল কেন? ও বহুমালার, কথা বল না—কথা বল।

রাজা। হার বস্ত্রী, হার সেনাপতি—এ রোগের কি আর ওষুধ নেই—বহুমালাকে জীবন দিতে আমার রাজ্যো আর কেউ নেই?

বস্ত্রী। মহারাজ, সেই নন্দী পাপদণ্ডকে একবার ডাকন? যদি সত্য কিছু করতে পারে?

রাজা। যা হব কর বস্ত্রী—আমার মূখে আর কথা নরেনা।

বস্ত্রী। সোঁড়ে বা প্রতিচাণী, সেই বস্ত্রীকে শত্রু নিয়ে আর।

সেনাপতি। আমি যাচ্ছি—(বেগে প্রস্থান)

বহুমাল। (মূর্খার ভিতরেই) উঃ—বুক দাব—একটু ভল—

বস্ত্রী। ভল ভল—

[অন্ধপূর হইতে পরিচারিকার জল লইয়া প্রবেশ]

রাণী। (জল বা ওয়াইতে গিয়া মূখ্যাবান তুলিয়া গিয়া) মূখ্যাবান আমার বে ক্যাকাসে হয়ে গেল মহারাজ—কাকে আর জল বাওরাব—(ক্রন্দন)।

রাজা। এ কি পাতি বিধাতা—একি পাতি—

[সেনাপতির সহিত হলধরের প্রবেশ]

হলধর। বাম, জল তো এখানেই আছে, আপে ওগুটা বাইরে নি।

রাজা। কে তুমি?

হলধর। নাম হলধর, হালুটে চাষা; সবাই হাবা হলধর বলত, পাগল কেউ বলত না; পাগল নাম পেলে তোমার এখানে রাজা। সে সব পরে বলব, আপে ওগুটা বাইরে নি। দেখি কলটা আমার হাতে লাগ—(জল হাতে লইয়া) দেহের মূখ্যাবান একটু হাঁ করিয়ে লাও রাণী মা।

(রাণী মূখ হাঁ করায়ে দিল, হলধর জল দিল)

আর কিছু দিল।)

বস্ত্রী। কি দিল—কি দিল রে মূখে—বিধাতক কিছু নয় তো রে?

হলধর। বাত হচ্ছেন কেন, কি দিলুম মূখে তো এখনি যেতে পারেন।

সেনাপতি। (ধমক দিয়া) বস্ত্রীর সঙ্গে কথাটা পর্যন্ত বলতে শিখুন নি—

হলধর। কি করে শিখব? ভাষার সোক নই, একেবারে মার্গের হালুটে মুকুন্দ চাষা—(বহুমালতী চোখ মেলিল।)

রাজা। এই যে মা আমার চোখ মেলেছিল!

বহুমাল। বাবা, আমাকে কি ধেতে দিলে?

রাজা। কেন কেন?

বহুমাল। (উজ্জ্বল বসিয়া) আমার সব জালা যে চলে গেল। আমার তো পরীরে আর কোনো অঙ্গুধ নেই।

রাণী। সত্যি বলছিন্? মা—সত্যি বলছিন্?

বহুমাল। আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখ মা, একটু আর তাপ নেই, বুক হাত দিয়ে দেখ—একটু আর বকক করতে না, আমার মনে হচ্ছে—আমার যেন কোনো মিন কোনো অঙ্গুধ ছিল না! কি করে এমন হল? কে আমাকে জল বাইরে দিল?

রাজা। (হলধরকে দেখাইয়া)—এই—এই চাষী—

বহুমাল। (হলধরের দিকে অনেকদূর তাকাইয়া) চাষী নয় বাবা, নিশ্চয় কোনো ছত্রবেশী। (বহুমাল। গুঁড়াইয়া উঠিয়া হলধরকে প্রশ্ন করিতে গেল।)

হলধর। (লাকাইয়া দূরে গিয়া দিয়া) কি কর, কি কর রাজকন্যা,—হাবা হলধর।

রাজা। সত্যি পাতিব লাও তুমি—তুমি হাবা হলধর নও—তুমি কক্সাতা বলরাম হলধর।

হলধর। সত্যি পরিচয় মহারাজ, হালুটে চাষী হাবা হলধর। তোমার রাজপুরুষ সব পেছিলেন আনতে, তখন আসি নি; কিন্তু তারপরে একা একা অনেক পথ মূখে শৌঁছাই তোমার রাজবাড়িতে। চুরি করতে আসি নি, এসেছিল সব তোমার মেরেকে সাহিরে দিতে, দেখুদম হাতে পড়ল হাতকড়া। আমি না এ তোমার কোন বিচার রাজা।

রাজা। (হাত ঘোড় করিয়া) এলে তো এসে, হাবা হলধর।

কেন এলে প্রভু, হায়ার অস্ত্র জীব কি করে আরও
চিনব ?

রাশী : সত্যি হ্যাংগাঙ্ক, চোখ দুটি কেমন দেবতার মত
জলজল করছে ।

হলধর : এ সব কি বলছ রাজা—কি বিপদ—কি বিপদ—
বিশ্বাস কর, হালদুটে চাখা, হাঠে গোব্দ গাধি
আর হাল চাব করি ।

রাজা : শ্রবঃ কৃৎ হাঠে গোব্দ রাখতেন, আর শ্রবঃ
বলহার হাঠে হাল কর্ণ করতেন । হলধার, যে হও
তুমি সে হও, আমার প্রতিজ্ঞা ভুল হবে না ।
আমার কন্যার ছুঁষি প্রাণ দিবো, এ রাজ্য তোমার
—এ রাজ্যকন্যা বহুমালা তোমার । মন্দী,
সেনাপতি —

মন্দী : আসেন করুন—

সেনাপতি : প্রভুত আহি—

রাজা : রাজপোষাক চাই ।

[মন্দী ইঙ্গিতে প্রতিহারী রাজপোষাকের জন্য
ভিতরে প্রবেশ করিল ।]

হলধর : এরা কি বলছে তাও তো বুঝতে পারছি নে, কি
করছে তাও বুঝতে পারছি নে । এতো মোকুদ বিপদ
হল, এ বিপদে এখন কি করি ? আমি রাজা হব না
—রাজা হব না—কিন্তুতে না ।

মন্দী : (করজোকে হলধরের প্রতি) না চিনে বিদূষ
কথা বলো, কথা প্রার্থনা করি ।

সেনাপতি : (বতহান্দু হইয়া উত্তরবারি দু'লিরা হলধরের
পায়ের কাছে রাখিয়া) অপরাধ স্বাক্ষর্য হই প্রভু ।

হলধর : (ভীতিবিবলে ভাবে) হরি মে, এখন বিপদে
তো আছে পাঁচ নি ।

[প্রতিহারী রাজপোষাক আনিয়া, সঙ্গে অস্ত্রসুত্র হইতে
হুইজন পক্ষিয়ারক ও হুইজন পক্ষিয়ারিকা আনিয়া ;
পক্ষিয়ারককে হলধরকে রাজপোষাক পরাইতে লাগিল,
হলধর হস্তভঙ্গের ন্যায় এদিক ওদিক তাকাইতে
লাগিল । পক্ষিয়ারিকাও বহুমালাকে রাশীর শোণাক
পরাইয়া দিল ।]

হলধর : (শোণাক পরানো হইয়া সেলে ভীতকণ্ঠে)

রাজা : এখন ঐ সিংহাসনে আমি আর বসব না,
(হলধরকে বহিরা সিংহাসনে বসাইয়া দিয়া) এই
সিংহাসন এখন তোমার । রাশীও আর তার
সিংহাসনে বসবে না, ও আসন এখন বহুমালায় (রাশী
বহুমালাকে নিজের আসনে বসাইয়া দিল । রাজা
হলধরকে তারার হুইট পরাইয়া দিল, রাশী
বহুমালাকে তারার হুইট পরাইয়া দিল ।)

হলধর : (সহসা যেন কিছ হইয়া উঠিয়া) এটা—
সেবে কপালে এই ছিল ? এই ছিল ? রাজা হলধর—
রাজা ? হিলুম হালদুটে চাখা—হলধর কিনা রাজা !
[সহসা রূপমকের অগ্রভাগে তিন দিক হইতে বেলে
হেরে' কেসে প্রবেশ করিয়া তিন ভিতটা লাফ দিয়া
হাঃ হাঃ হাঃ করিতে করিতে হাতে তাই দিয়া প্রস্থান
করিল ।]

পট পরিবর্তন

চতুর্থ দৃশ্য

[রাম-অস্ত্রপুত্র ; একটি কক্ষে -দু'দিকজত দুইজন
পান্ডাওয়ালা পান্ডার হাতি টানিতেছে ; পান্ডাওয়ালি
রাজার পক্ষ কক্ষে । পান্ডাওয়াল দুইজন পান্ডার
হাতি অল্প অল্প টানিতেছে আর কিমাইয়া কিমাইয়া
চুপিয়া পড়িতেছে । হরি হাতে এক লক্ষ্যের প্রবেশ ;
পান্ডাওয়ালারের কিমাইতে দেখিয়া দু'জনকেই সপাং
সপাং করিয়া দুই বাড়ি হাফিল ।]

লক্ষ্য : বত কুঁকের বাগনা এলে জুটেছে রাজপুত্রীতে
—বলে বলে দাঁড় করে দুই—খালি ঘুর ; আর সেই
মনোই তো মোকুদ রাজার হাতিতে একজন ঘুর ঘুর
না—সারারাত হটকট করে ঘুরে বেড়ান । কেন
খদি আমার কাউকে আমি একটু কিমোতে দেখি
তো বুকে পাবাণ চাপা দিয়ে চিৎ করে কেসে
রামের বক্ষীমালে ।

[লক্ষ্যের প্রস্থান । পান্ডাওয়ালার ঘোরে
ঘোরে পান্ডা টানিতে লাগিল । খানকল
পরে পানের ঘরে কাহারও চুপিয়া কিংবার ও
কিন্তু একটা পড়িয়া বাইবার পক্ষ শোনা গেল ।

"সে রা" — অসিমে দিলে মরি, দিলে মরিবে মরিবে

কন গৃহরক্ষক, পরিচারিকা, সর্দারের সৌভাইদ্য
প্রবেশ। পান্থাওয়ালারাও সন্মতিক্ত হইয়া
উঠিয়া গাঁতাইল।]

১৫ গৃহরক্ষক। (গৃহজনসংঘের) একটা পক্ষ পুনর্দূর
কিসের—

১৬ গৃহরক্ষক। এই পানের ঘরে কারোর পানের পক্ষ
শেষ হইবে—

১৭ পরিচারিকা। হাতে বা পায়ে লেপে একটা কিছু
যেন পড়ে গেল—

১৮ গৃহরক্ষক। হ্যাঁ গো, লোক একটা আমি ঘেঁষেছি,
পট্ করে হাজার পক্ষ ঘরের পানের ঘরে ঢুকে
পড়তে দেখলুম, আমি পিছনে ডাড়া করেছিলাম,
সর্দার। তোরা এরিকটা দানবা,—আমি দশম প্রহরী
তোকে নিশে দর ঘরটা ঘিরে ফেলছি।

[সর্দারের প্রস্থানোদ্যম; যুগ্মে আল্পস দিয়া চুপ করিবার
ইঙ্গারা করিতে করিতে অপর পরিচারিকার প্রবেশ।]

অপর পরিচারিকা। (কিন্, কিন্, শব্দে) এই—চুপ—
চুপ—

সর্দার। (চোপা কণ্ঠে) কেন কি? ব্যাপার কি?

অপর পরিচারিকা। রাজা গো—রাজা—

সর্দার। রাজা?

অপর পরিচারিকা। হ্যাঁ গো, হ্যাঁ—। আমি দেখতে
পেয়েছি, দর আসে। নিজের হাতে নিজের দিবে
একা একা বাড়িতেছিলেন গিরে ঐ শিশুসংঘের
বারাংবার, সেখানে বাড়িতে বাড়িতে একা একা
ধ্বন হাত পা ছুঁতে লাগলেন, তারপর আবার
চুপি চুপি পা ডিপে ডিপে কিয়ে আসছিলেন।

১৯ গৃহরক্ষক। কি সর্বনাশ! আমি যে অতকারে চোর
ভেবে ডাড়া করতে পেছিলাম, জাগ্রদ্, বাড়িতে
থরি নি!

সর্দার। এই, তোরা সব দর দর করে পালা,—সবাই
দুজান থাকবি, হৈ চৈ করবি নি কেউ।

২০ পরিচারিকা। সর্দার, আমাদের মোহন রাজার
এমন কেন হল গো?

সর্দার। চুপ, চুপ—কথা বলবি নে কেউ—চপে বা
—দর চলে বা—

[পান্থাওয়ালা দুইজন বাতীত আর দলের প্রস্থান।
পান্থাওয়ালাঘর অপর পান্থা টানিতে লাগিল।
যানিকল্প পরে।]

২১ পান্থাওয়ালা। এই যে, ভেতর থেকে আলোটা যেন
কে ক্রমিতে দিচ্ছে—

২২ পান্থাওয়ালা। তাই তো, তাই তো রে—প্রায় যে
অন্ধকার হয়ে এসে।

[ঠাং ঝিঙের একটা কঙ্কর দ্বারা খুলিয়া দুজন
রাজার ঘরে ঘরে পা টিপিয়া প্রবেশ। পায়ে রাজার
চিনা শোখাক।]

২৩ পান্থাওয়ালা। কে কে?

রাজা। (আগাইয়া আসিয়া চোপা কণ্ঠে) চুপ চুপ—
আমি রাজা।

উভয় পান্থাওয়ালা। রাজা।

[উভয়েই একদপে এক হাট; বেকোতে হোওয়াইয়া
অপর হাট্, তুলিয়া করকোড়ে নত নতক হইল।]

রাজা। তোমারা পান্থাওয়ালা? সারা রাত এখানে
বসে বসে পান্থা টানো? তোমাদের ঘুম পার না?
(উভয়ে নীরব) বল বল, আমি রাজা অভয় দিচ্ছি—
তোমাদের ঘুম পার না?

২৪ পান্থাওয়ালা। পার মহারাজ, ঘুম পার; আমরা
বসে বসে ঘুমোই মহারাজ; অপর কথা করুন—
আর ঘুমোব না মহারাজ—(উভয়েই পায়ে দিতে
হাত বাড়াইয়া রাখা দাঁচু করিল।)

রাজা। কেন ঘুমোবে না? রাত্রি হল সবাই ঘুমোক
এই তো আমি চাই, আমিও একটু ঘুমোতে চাই।
আমার চোখে ঘুম নেই—এই ভিন হালে আমার
চোখ থেকে ঘুম পালিয়ে গেছে—আমার কন্যা
পালিয়ে গেছে—পায়ের বল পালিয়ে গেছে—আমার
বনের পাতি—(দেহা ধারিয়া) না না, সে সব কথা
এখানে কেন—এদের কাছে কেন—বখুবালা তো
কত দর দর করে দিচ্ছে। হ্যাঁ গো—তোমারা
আমার একটা কথা শুনবে?

উভয়ে। বলুন মহারাজ—

রাজা। আস্তে আস্তে কথা বল—রাণী বা যেন না
আসেন। বাড়িও তোমাদের একটা কথা বলছি—

(এককে ওরকে তের কাছে কি না ভাল করিয়া
ডাকাইয়া দেখিয়া) তোমরা একটু পানের ঘরে দাও ?

১ম পান্থাওয়ালা । কেন দাও না মহাশয় ?

রাজা । পুণ্ডু পুণ্ডুর জন্য ; তারপরে আমি আমার
চুপি চুপি ডাকব—তখন চলে আসবে ।

২য় পান্থাওয়ালা । যে আছে মহাশয়—

রাজা । কিছ্‌ পান্থান, আর কেউ জানবে না পুণ্ডু
আমি আর তোমরা দু'জনে—

উভয়ে । যে আছে মহাশয়—

রাজা । আর গাশীরা যেন না জানেন

উভয়ে । যে আছে মহাশয় ।

রাজা । তবে এসো—আমার দলে এস—এই ঘরে চুপি
চুপি বসে থাকবে ।

[রাজা পান্থাওয়ালার একদিকের একটি ঘর দেখাইয়া
দিল ; তারপর পরে যে ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল
সেই ঘরের ভিতর হইতে বাহিরের ঘরের আসো
একদমের কড়াইয়া দিয়া আসে আসে বাহির হইয়া
আসিল, পরজা আসে আসে টানিয়া দিয়া অন্যথা-
ঘরের পরজাও বস করিয়া দিল, তারপর পরে
পান্থাওয়ালার একটি আসনে বসিয়া ছোরে ছোরে
পান্থা টানিতে আরম্ভ করিল । কয়েকবার টানিয়া
উঠিয়া দাঁড়াইল, পায়ের পেশাকগুলি আসে আসে
খুলিয়া ফেলিল, একটা শোবাককেই বুড়ির মত
জড়াইয়া লইয়া খালি গায়ে বসিয়া ছোরে ছোরে
পান্থা টানিতে লাগিল । যে ঘর হইতে রাজা বাহির
হইয়া আসিয়াছিল সেই ঘর হইতে রাণী মহম্মাদার
প্রবেশ ।]

মহম্মাদা । (চাপা কণ্ঠে) একি একি—তুমি কহে কি ?
দাঁড়া কি তুমি পাপল হয়ে সেলে ?

রাজা । যে ভয় করছিলুম তাই হল ? তুমি উঠে পড়লে
মহম্মাদা ? কিছ্‌—বিজ্ঞ—আমায় একটু করা কর
মহম্মাদা—হয় কর ; আমাকে একটু খানিক গায়ে
বাটতে দাও, পুণ্ডুও অন্ততঃ আমাকে একটু গায়ে
বাটতে দাও । তোমার রাজপুত্রিতে এসে আমারে
দ্বারায়ে আমি সত্যি পাপল হয়ে উঠিছি—আমি
পাপলম আমি পাপলম আমি পাপলম আমি পাপলম— । জামান

বাটাও মহম্মাদা—বাটাও—রাজ বাহির আমার
থেকে যেনন করে হোক আমাকে বাটাও— ।

মহম্মাদা । অমন অধিকার মত করে না ; অন্তঃপুরে
ঘরে ঘরে ভেঙ্গে আসে পুণ্ডুরক, পাক্কাফিকা, অন্তঃপুর,
—তারার সব দেখতে পাবে—পুনতে পাবে—আমি
যে কাল সকালে আর পুণ্ডু দেখবার ঠাই পাব না ।

রাজা । কেউ দেখবে না—কেউ পুনবে না ; আমি
আসো সব নিভিয়ে দিবেছি, পুণ্ডুর সব বন্ধ করে
দিবেছি—রাত্রির অন্ধকারে একা একা বসে একটু
বাটব—পুণ্ডুও একটু গায়ে বাটব—মইলে আমি
পাপল হয়ে যাব । দিনের বেলা ভেঙ্গে উঠবার পর
থেকে পাবে পাতে লোক, পাবে পাবে মন্ত্রী সেনাপতি
সেনাই সামন্তী—দিনের বেলায় আমার বাটবার জো
নেই মহম্মাদা—রাতে আমাকে একটু বাটতে দাও ।
রাজপুত্রিতে পুণ্ডু বসে রাজা—এ আমার আর
শোবাল না মহম্মাদা—শোবাল না—তুমি আমার
করা কর ।

দর্পণ । (বাহির হইতে ঠক্ ঠক্ শব্দ করিয়া) কিরে
ব্যাটারা—একদম পরজা ভেঙিরে ঘুম চলছে ? হেই
রে পাঁজি হুঁচোদলো—

মহম্মাদা । দর্পণ—এই সবাই এসে পড়েছে—চলে
এসো—চলে এসো—

(রাজার হাত ধরিয়া টানিয়া যে পুণ্ডুর দিরা বাহির হইয়া
আসিয়াছিল সেই পুণ্ডুর দিরা ভিতরের প্রবেশ করিল ।)

পট পরিবর্তন

পঞ্চম দৃশ্য

[প্রিন্স বাহির প্রায়া বাহির মত বাহির সেওয়াল
সেওয়া বড়ের হাউদি প্রকাণ্ড একটা মদন ঘরের
সম্মুখের এক অংশ দেখা বাইতেছে । রাজাটো আর
একটু চণ্ডাও কিট্‌কাট্‌ । হাল, কোদাল, নিড়ানি,
কাতে প্রভৃতি হাতে কতিপয় চাষীর প্রবেশ ।]

১ম । ও রাজা, এখনো মাতা-বাক না কি ?

(ভিতর হইতে বলধর—“হয়ে গেছে, বাসছি”—)

২য় । তাই হলো রাজা ; আমরা ভাবলুম, রাজা এখনো
সোমার পালাকে নাক ভেঙে কসেজে মারি ।

হলধর। (কোলাসি কাসে কাস্তে-চাত্তে চাবীর বেশে প্রবেশ করিয়া) সোনার পালঙ্ক কোথায় গো? সে তো ছেড়ে গিয়ে এসেছি; এখানে এসে একেবারে বাঁশের পালঙ্ক, শবের নড়িতে বাঁধা।

৩৭। (হাসিয়া) ওই বুকলর বুকেলর—ওই আমরা গাঁর চাষা বাকে বলি কি না—

৪৭। একেবারে বাড়িয়া।

হলধর। তা বেঁচে গেছিরে বেঁচে গেছি, রাজপুত্রীতে সোনার পালঙ্কে শুয়ে এই তিন তিনটি মাস এক দম আনিয়া।

১৫। বলে কি রে ভাই? রাজাদের আবার আনিয়া!

২৫। আমরা তো জানতুম, তাদের কাক নেই কখন নেই—বিনরাত সোনার পালঙ্ক পড়ে পড়ে থাকে—আর বুঝে—আর বুঝে।

হলধর। বুক-বুকে দল, বিনরাত পড়ে পড়ে থাকলে কি আর কখনো বুঝে হয়? বুঝে তো একেবারে পালিয়ে যায়।

৩৭। ঠিক বলেছি রাজা, বুক-বুকে দল আমরা রাজবাড়ির এ-দর বদর আগে জানব কি করে? এখন দেখছি আমরা গুরের থেকে ব'লে ব'লে যা ভাবস্তাম তার কিছুই নয়।

হলধর। পীঠের কুশনার গাতির মাঠের পাশে কোণের মধ্যে বুড়ী দেখেছ?

৫৫। বুঝে দেখছি—বুঝে দেখছি—

৬৪। বুঝে দেখে মায়া কাপড় মাখা দিয়ে বলে আছে।

১৪। ব'লে আছে কিরে—মায়া নাড়ছে।

২৪। মায়া নাড়ছে কি রে—হাত নাড়িয়ে ডাকছে।

হলধর। কাছে গিয়ে দেখে কখনো?

৩৭। কাছে বাব কি, বুড়ী ছিঁড়ে রক্ত খাবে যে! ভয়েতে তো এসেই নি!

হলধর। ঐ ভাব করেই তো মাটি কটেছ। আমি একদিন এগিয়ে গিয়ে মাঠি দিয়ে খোঁচা বেয়েছি।

৪৭। খোঁচা মেয়ে? বুড়ী গায়?

৫৫। ভাঙে বুড়ী ছিঁড়ে বেছে নি!

হলধর। দেখলুম বুড়ী নয়—

১৫। বুড়ী নয়? তবে?

হলধর। ভাবি হবে হয়েছে একটা পুকুরে কলাপাহ—দকলে। চোঃ চোঃ চোঃ—বুড়ী নয়—পুকুরে কলাপাহ!

২৪। কি বুঝে বুড়ীই আমরা!

৩৭। ভাগিন্দু রাজা রাজবাড়ি ছেড়ে গিয়ে আমাদের কাছে চলে এসে, নইলে এদর আমরা জানতুম কি করে?

হলধর। ঐ রাজবাড়ির মধ্যেও—

৪৭। বলতে হবে না, বলতে হবে না—আমরা এখন সব বুঝতে পেরেছি।

৫৫। বুড়ী নেই—মাছে ভাবি করা পুকুরে কলাপাহ—৬৪। কেবল ভর দেখা, ভর না পেলেই চল!

দকলে। চোঃ চোঃ চোঃ—কি রাম বুক-বুকে দল আমরা!

হলধর। আমার এই মোতুম রাজবাড়ীটা কেমন হল?

১৫। কেমন হ'ল কথার অর্থ? কি?—এটাই তো রাজবাড়ি হ'ল।

২৫। আর ঘর সব রাজবাড়ি, তার কথা তো আমরা কানেই পুনেছি, চোখে দেখে নি।

৩৭। আরে, ভায়র তো বেজার বুড়ি গতিতেই দেখতে পাচ্ছি! এমন ঠিক কথাটা এমন পল্টু ক'রে বলে-বিলে! বলি যে রাজবাড়ি আমরা চোখেই দেখলাম না—

৪৭। আমাদের বাপ-শালা চোন্দ পুত্র চোখে দেখল না—

৫৫। আমাদের ছেলে-নাতি-নাতনী চোন্দপুত্র কখনো চোখে দেখে নি।

৩৭। সে-রাজবাড়ি তো এখন নেই—

৬৪। বাগা ব'লে দিয়েছিল ভায়া, আমরা খেঁচা কোনো দিন দেখলুম না আর দেখে নি—আমরা বলে দেব, সেটা নেই।

১৫। তোমাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তোমার বাড়ি আমরা দেখতে পাচ্ছি; তুমি-ই আমাদের রাজা, তোমার বাড়িই আমাদের রাজবাড়ি।

২৪। (ভুড়ীকে দেখাইয়া) আমাদের রাজা ভাই চন্দ্রকার গান বাঁজে রাজা; আমাদের মোতুম রাজা

আর রাজবাড়ি নিয়ে ইতিমধ্যেই গান বন্ধ হইল।
তাহা হইলেও পথের সেই পান ঘেরে বসে পান
দাতা হইলেও বসে। সেনা রাজ্য পানটা সংক্ষেপে
বুঝিলে।

১৪। আরও দূর দূর—সেনা হয়ে থাকে যে।

১৫। হোক না আর একটা বেল, সংক্ষেপে পানটা
বুঝিলে যে, আর আবারও ভীষণ ভীষণে
শেষে।

১৬। এর ভেত্রে সবাই সঙ্গে—

[তৃতীয় আসে আসে গাছভেত্রে, অন্যান্য
সকলে পিছনে লাগিয়ে।]

১৭। কথা কি আর বলব যে এক রাজ্য এসে এ দেশে
দুই দিক ঘাঁটি চাষীর দেশে

মারের কাছে যায় দেশে।

যেদের সঙ্গে নানা ব্যা

আর যাদের দূরে গান যে গান,

যার যাদের দূরে কট পান

তাঁই চোখে জল যায় দেশে।

যার বল কত ভাষা নাই,

আহে রাজবাড়িতে পোলাস তাঁই,

সদায় পানে ঘেঁটে যায় দাঁই

কথা কর ভালোবাসে।

১৮। যাদের রাজ্য এই বিধান সবাই ঘেঁটে সবকে জান,
যেদিন এক সন্ধ্যা সদায় সঙ্গে সব দেশে।

[প্রথমে রাজ্য পান পাতিয়া আসাটো আসিতেছিল,
সকলে পিছনে পান পাতিয়া আসাটো আসিতেছিল :
আবার সবাই পিছাইয়া বাইতেছিল। তাহার পরে চলল
হাফথানে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সকলে চললকে
মারে রাজ্য বসিয়া বসিয়া পান পাতিতে লাগিল।

বহুবার হুঁতন সিন্দারী দূর হুঁতী ও

সেনাপতির প্রবেশ।]

১৯। (দূর হুঁত) কি সেনাপতি সেনাপতি, কি
সেনাপতি, দূর রাজ্য কি না রাজ্যপ্রদায় হেঁটে
রাজ্যপ্রদায় হেঁটে চাষীর দেশে কয়েক কোলাস ঘিরে
চাষীদের সঙ্গে মাতে মাতে আসতে করে দিচ্ছেন।
এও চক্রে দেখতে হল সেনাপতি ?

সেনাপতি। (সিন্দারীর প্রবেশ) তোরা দূরে বা এখান
থেকে দূরে বা (সিন্দারীর প্রবেশ)।

হুঁতী। (চাষীদের প্রবেশ) এই—তোরা কোথেকে এসে
জুটেছিস ?

হলধর। (হাসিয়া) ওরা জুটেবে কেন, আমি জুটিয়ে
এনেছি।

২০। হুঁতী হুঁতী—রাজ্য একদিকে মারে কাজ করবেন বলে
ভেবেছেন, তাই এসে সব জুটেছি।

হলধর। ইনি এ রাজ্যের হুঁতী—

সকলে। (বিস্ময়ে) হুঁতী—? প্রশ্ন প্রশ্ন—(সকলের
ভীষণে পড়িয়া প্রশ্ন)।

হলধর। আর ইনি সেনাপতি—

সকলে। ওরে বাবা—(ভয়ে সকলে একতানে জড়ো-
সড়া হইয়া রহিল)।

হলধর। ভয় কি, আমি রাজ্য হুঁতী, আমার সামনে
ভয় কি ?

২১। রাজ্যকে আমার ভয় করি না রাজ্য, কিন্তু এ
হুঁতী সেনাপতি—ওদের আমায় বরাবর ভীষণ
ভয় করি।

২২। ওদের নাম পুনর্নাম আমার ভয় করি।

হুঁতী। এমন করে রাজ্যপ্রদায় হেঁটে এলেন কেন
মহারাজ ?

হলধর। আপনাতো সবাই আমাকে রাজ্য-রাজ্য করতেন,
দিনরাত আপনাদের আর সেনাপতি-সেনাপতি দান-দানী
—এই সবই দেখতুম, আমার রাজ্যটাকে ঘেঁটে
দেখতেই পাই নি। রাজ্য আপনাতো কি দেখবার
কোনো রাজ্যবাড়ি থেকে বাইরে চলে এসে।

২৩। কি রাজ্য কহেই রাজ্য বসেছে। রাজ্যটাকে দেখতে
না গেলে আর রাজ্য হল কি করে ?

হলধর। এই ভিনবাস হয়ে আপনাদের রাজ্যবাড়িতে
আমার একঘর ঘিরে রহিল না, ঘর রহিল না।
একঘর ঘিরে নেই, রাজ্যভোগ ঘিরে আমি কি করব ?
একঘর ঘর আসে না, সেনাপতি পালঙ্ক ঘিরে আমি
কি করব ? যেদিন আমার ঘেরে এসে মারে গিয়ে
বাক কহতে আসতে হইল। সেনাপতি ঘেরেই আমার
ঘিরে—সেই দূরে ঘর। আ—সে কি আর।

ভিনবাস আকাশ দেখতে না পেয়ে—শুধু বর্ণিলুকার
কালর ঘেঁষে ঘেঁষে শ্বাস আমার বহু হতে গোলিল—

মন্ত্রী। কেন, রাজপ্রসাদে তো বাতাসবন্ধ অতাব ছিল
না মহারাজ।

হলবর। ওতে হু না, ওতে হু না—বহু বহু যাত্রের
উপরে বহু বহু ধোলা আকাশ চাই; এদের গণের
যাত্রা গিরে আমার তো তাই বেঁচে সেলাম। আমিও
রাজবাড়ি থেকে পাগিয়ে বেঁচেছি, আমার সঙ্গে সঙ্গে
আমার বা-বা-বা-বোন, তাঁরাও এই যাত্রির মোদা
আর বড়ের ছাউনির ব্যক্তিভে এলে বেঁচে সেছেন।
আর নর মন্ত্রী—আর নর—

মন্ত্রী। আমাদের তবে ছেড়ে দিন মহারাজ—

হলবর। পছন্দে পছন্দে।

১ম। সে কি রাজা, মন্ত্রীকে ছেড়ে বিলে চলবে
কি করে?

হলবর। কেন?

২ম। বুদ্ধি যোগাবে কে?

হলবর। আমরা সবাই মিলে সবাইকে বুদ্ধি ভোগাব।

৩ম। এমন কথা তো আমরা শুনিনি কোনো দিন,
কিন্তু লাগছে ভাল।

৪র্থ। এত বুদ্ধি আমরা কোথায় পাব? আমরা যে
গারে খেটে বাই—রামবুদ্ধি হল!

হলবর। আমরা নিঃশব্দ করে যেন, আমাদের রাজ্যে
সকলেরই গারে খেটে খেতে হবে; তখন সবাই
বুদ্ধিমান হয়ে উঠবে; তখন সেই বুদ্ধি-
বুদ্ধিভেই আমাদের রাজত্ব চলবে।

৫ম। (আনিবে হাতে তালি দিয়া পাক খাইয়া) আরে
আমাদের রাজা বেশ বলে রে বেশ বলে! তাই
ভালো, এ আমাদের বুদ্ধিমান রাজ্য, তাতে এই
আমাদের বুদ্ধিমান রাজা, আর আমরা সব বুদ্ধি-
মন্ত্রী।

সেনাপতি। আমাকেও তবে মহারাজ কিংবদন্তি দিন।

১ম। তবে তো বড় ভাবনার কথা হ'ল। সেনাপতি না
থাকলে রাজ্য রক্ষা করবে কে?

হলবর। আমরা সবাই মিলে।

২ম। অত অস্তর-শব্দর আদর কোথায় পাব?

হলবর। অস্তর আদরের ছালা আর কোবাল আর
কাতে আর হাতুড়ি; আর কোনো অস্তর আমরা
বরবই না।

৩ম। কেউ যদি অন্য রাজ্য থেকে ভেঙে আমাদের
ঘরতে আসে?

হলবর। আমরা তাদের জড়িয়ে বসে ফল, আমাদের
যাত্রা চল, খেটে খুটে বাও।

মন্ত্রী। (অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে) যৈব! আর রাজ্যে
পারলুম না; প্রথম যৌদ্ধ রাজমন্ত্রীতে ঢুকে
পাঠান গিরেছিলেন হাবা হলবর বলে, সৌন্দর্য
ভেবেছিলেন সেটা হলবা, আর সৌন্দর্য সেইটাই
কি দত্ত।

সেনাপতি। এই হাবাসের মধ্যে হাবা রাজাই বাদ্যবে
ভাল, ফলা করবেন, আমরা চললুম (মন্ত্রী ও
সেনাপতির প্রস্থান)।

৪র্থ। কি বলে সেল রে, কি বলে সেল রে? আমাদের
রাজাকে হাবা রাজা বলে সেল? বরব নাকি
শিখর থেকে টেনে? বরব নাকি?

হলবর। ঠিকই বলে সেল। আর থেকে আমরা সবাই
প্রচার করে দেব, আমাদের হাবার রাজ্য, হাবা রাজা—
আর সব হাবা মন্ত্রী সেনাপতি।

সকলে। হো: হো:—আমাদের হাবার রাজ্য সো—
আমাদের হাবার রাজ্য।

(রাণী বদ্বালায় প্রবেশ)

সকলে। (বিস্ময়ে) এ কে সো, এ কে সো?

হলবর। এ কি বদ্বালা, তুমি এখানে—?

১ম। ও রাজা, একবার বুদ্ধিবে হল না কে সো?

২ম। আমাদের যে চোখ চললে থাকে—

৩ম। বুদ্ধি কেন বড়কু, করছে!

হলবর। ইনি হচ্ছেন রাণী বদ্বালা।

৪র্থ। রাণী? আমরা হাবার হল তবে কি করি? কি
করতে হয়?

বদ্বালা। কিছু করতে হবে না।

হলবর। তুমি রাণী এখানে কেন?

বদ্বালা। তুমি রাজাটুকি এখানে কেন?

হলবর। (হাসিয়া) তুমি ছালা না বদ্বালা, এ

রাজ্যকে আমরা গায়ে খেটে খাওয়া হাবার রাজ্য করে
 তুলব, আমি গায়ে খেটে খাওয়া হাবা রাজ্য ।
 হুদুমালা । আমিও গায়ে খেটে খাওয়া হাবা রাণী হব ।
 হলধর । তা তুমি পারবে কেন ?
 হুদুমালা । না পারলে রাজবাড়ি ছেড়ে চলে আসতুম
 না । তোমার বোন^১ মহামায়া কোথায় ?
 হলধর । বাড়ির ভিতরে ।
 হুদুমালা । আচ্ছা আমি একটু আগছি । (হুদুমালার
 বাড়ির ভিতরে প্রবেশ)
 ১৪ । রাণী কি বলল একবার বুদ্ধিরে বল দেখি রাজা—
 হলধর । বললেন, হাবা রাজ্যের হাবা রাজা, তার
 সঙ্গে উনি হলেন হাবা রাণী ।
 ১৫ । (হাতে তালি দিয়া) বেশ কথা বলছেন সো, বেশ
 কথা বলছেন !
 ১৬ । কিন্তু ওই গরীবে দাঁবে ?

৪৭^১ । পোতাকে যে চোখ কলসে থাকে ।
 ৫৪ । কিন্তু রাজা, যেন হচ্ছে তুমি কোন জ্ঞানসূন্য করতে
 পার ; এমন রাণী রাজবাড়ি ছেড়ে চলে এল ।
 (হুদুমালার বেশ বদলাইয়া কৃষ্ণাঙ্গীর বেশে প্রবেশ ।)
 নকসে । (একসঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইয়া) আরে এই যে
 আমাদের নৃত্যিকারের রাণীহা—আমাদের নৃত্যিকারের
 রাণীহা । জয় রাজা—জয় রাণী । ওরে চল্ চল্
 চল্—আজ আমরা নাচতে নাচতে পান গাইতে
 গাইতে নাঠে বাব—জয় আমাদের হাবা রাজ্যের হাবা
 রাজা—জয় আমাদের হাবারাণী ।
 [এক কোলে বড়ো শয়তানকে দেখা গেল ।]
 বড়ো শয়তান । ও-ই শেব নর সো ; আহি আহি—
 এথনো আমি আহি, আমি আরও অনেক দেখে
 বেব—অনেক দেখে নেব ।
 দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ ।*

হাত দুখ হুহুতে
হুহুতেই একবার টেলি
ফন্নির ফিকে তাকাল
আইতি। মটা বাজতে
মাত্র বশমিনিট। ঢকল
হয়ে উঠল আইতি। ত্রু
পায়ে আরনার সামনে
এলে বাবার অসংযত
একরাশ চুলে চিকমির
কয়েকটা টান দিয়ে
খোঁপা বাঁধল। মুখে
সামান্য প্রসাধনেরও
প্রলেপ। পরনের শাড়ি-



লাবণ্যে নিজেই অবাক
হয়ে গেল আইতি।
বিবাস করতে চাইল না
প্রথমে বিবাস করতে
মন চাইল না। তবু
এতো সত্যি।

কিছু কি হবে এ
জগৎ-লাবণ্য দিয়ে ?
কোন আঁধার দেবতার অর্ধ
সামান্যে ওর এ লাবণ্য
উপাচারে। লাবণ্য-করা
দুখ তো ওর নতুন নয়।
সকাল বেলায় নিশিত-

বানো পাথের গোড়ালির ফিকে একটু টেনে আবার
সোজা হয়ে আরনার দিকে চোখ নিয়ে গেল।

নিয়ে গেল ট্রিক বলা বয়স। নিষেধ অজান্তেই দুটি
সরে গেল অবিচ্ছিন্ন। আরনার চেতনবে নিষেধ প্রতিবিম্ব-
টিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বেঁচেতে হুল করল না আইতি।
চোখের ডান বুকর উপর ডান হাতের আলতো স্পর্শ দিয়ে
ডান বুকের কাল তিলটার উপর থেকে পাউডারের ছোল
ভরাল দিয়ে মুছে বুটীটাকে বুকের উপর দিয়ে বুসিয়ে এনে
দ্বিধ রাখল চোখে। কী অন্ধর আরত দুটো চোখ অবাক
হয়ে ফেলল। এ বেশ অনেকদিন পর নতুন করে
আনিকার। তবু খুঁজল, ওর ওর করে খুঁজে বেড়াল
চোখের তারার, হৃদয়ের রেখার রেখার।

মনের উপর এক কলক হিমেল হাওয়ার স্পর্শ।
টোটেট কোণার দ্যাক হাসির মিলিক। বাঁধুঁছিল তা
পেয়েছে বইকি আইতি। আশুও আছে। আশুও ওর
দুটো গালে গোলাপী আভার কবতি নেই। বশটা
পাঁচটাব ঢাকার বাঁধা বশ বছরের ঢাকারী-আঁধারও ওর
মুখের প্রজ্জ্বলন থেকে মুছে নিতে পারেনি অতীতের
সে লাবণ্যসীতি। শান্ত সন্ধ্যার হিড কবনীয়াতা হুপুহ
রোহের চোখ বাঁধনো জোঁদুসে রূপান্তরিত হয়েছে। তবু
তো জোঁদুস। উৎসাহ বাটুনি আর রাশি রাশি দুর্ভাবনার
বহোজ এ জোঁদুস কখন মেহের থাকে। নিষেধ রূপ

প্রান্ত একরাশ ছুঁই ফুলের নত ছুঁইফুলে চেঁহারা নিষেই তো
ওর এই ঘটির পুঁথিবাতে এসেছিল। আর সে চেঁহারার
সাধ নাই তো করেছে চিরকাল।

আশুও ওর মনে আছে বহুর পেছনে কলে আসা
অতীতের সে সবদিন, স্মৃতিতে উজ্জল হয়ে আছে
কৈশোরের হাঝারো ঘটনা। কত লোক আসতো ওদের
বাড়ি। বাবার বন্ধু আতীর পরিচয়, পাড়া প্রতিবেশী
ওর সঙ্গে কথা বলত না এমন একজনও আসত কি ?
সবাই কথা বলত। প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনেও কিছুই
বইতো বলার নেই অথচ বলতে হবে বলতেন : খুকি,
তোমার নাম কি ?

আইতি। মিষ্টি হেসে জবাব দিত আইতি।

খুঁটী ছড়িয়ে পড়ত সারাদুখে। কালহুল ভতি
হাচাটা খুঁটতে নাড়তে থাকতো অনেককণ : বাঃ।
বেশ নাম তো। তারি সুন্দর নাম। চেঁহারার বত
সুন্দর।

দুটো শব্দের সাহায্য গ্রহণসা। তার প্রতিও কখন
লোভ ছিল না আইতির। ওই বয়সে নামের গ্রহণসা
ওনতে, জগৎ গ্রহণসা শেতে কেমন আশ্চর্য ভালো
লাগত। কেউ কেউ বলতেন : কোন জগৎ পড় খুকি ?

আইতি দুটুমিতরা কামল-কাল দুটো চোখ জুলে
বলত : জ্ঞান কোর।

ভক্তলোক একটা অব্যাহত উজ্জ্বল করে বেলে হেল
বলভেন : বাঃ! এই বয়েসে স্নান কোর, বড় ভাল
বেরে তো।

তুই বুকের কথাতেই প্রাণসামর্য মাধারও হাত তুলিয়ে
হিতেন, সম্মুখে আঘাত হিতেন পিঠে আঘাত কেউ
কেউ তিরুক ধরতেন আচমকা। গোলাপী গন্ধে আলতো
স্পর্শও হিতেন কেউ কেউ। এতো পুস্তক-পাঠের ধর।
যেবেশেও সোভ কই ছিল না ভকে কাছে টানার।
আঘতে লোহাণে চুমোর চুমোর অভিষ্ট করে তুলত।
আশ্ব মমতা আর প্রসারিত ব্যাঙ্গুল হাতের ছোঁয়ার
আতুলতার কোলে জুগে নিয়ে চোখে-মুখে মাধার পিঠে
আঘর হিতে হিতে থাকে বলভেন : তোমার বেয়েটি
রাখরানী হবে হিচি।

যার বুখে স্বর্গাশ্রয় হং লাগত। বলভেন : কি করে
বুকে তাই?

বুকেই ওর চোখায়েবে। আশ্ব নীল চুটো চোখ
আর গোলাপী আভা হুড়ানো বুখ বেবে। চোখ বুখ
স্রবে বুঁচি ভবিষ্যৎ বলা যার? যাও যথা গেয়ে প্র
করতেন।

বলা যার বিবি, তুই ভবিষ্যৎই নয়—জুত তবন্ত
চুটোই।

বলভে বলতে আইভিক বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে
চোখে বুখে মাধার হাতের আলতো স্পর্শ দিয়ে
বলভেন : বেবেহেন না কেমন পটল চোরা চোখ, কেমন
পাখা-মাখা বুখ? এ বুখ-চোখ তো বাহার বয়েই
মানার।

তোমার বুখে তুল তখন গভীর তাই, আইভি আঘার
রাখরাড়ির যৌ হোক। এই তো সেই রাখতি।
মানবের আটালটি বছর এক এক করে পেছনে বেবে যে
আজ যার যার যৌবনের আত্মনার সন্ধানিত।

হুচি বছর আলোর সেই আত্মার, সেই পরিধন, সেই
প্রতিবেশীরা আজ কোথায়? তাহা কি সব হারিয়ে
গেছেন কালের আঘাতে? না হারিয়ে যায়নি দবাই,
অনেকেই আছেন। সেই গুণী তাঁদের সেই মন, সেই সেই
চোখ সেই বুঁচি, কিং মা?

হে রা নিজের হাতে লাবান বেবে আন করিয়ে হিতেন.

তখনো পানছায়া সা হাত মুছে বনবে সাধা ক্রক পরিয়ে
মুখে পাটভার আর চোখে নীচে কামল বেধা টেনে
দীর্ঘল চোখ চুটিকে আরও দীর্ঘায়ত করে তুলতে এক
হিনের লজ্জা তুল করেন নি সেই মা? এই কি সেই
মা? না তাঁর প্রতিজ্ঞা মাঝ। সেই থাকে তো আশ্ব
মনে পড়ে। ওর মাধার একটান কোঁকড়ানো অব্যাহ
তুল লাল দিতার ঝাঁকনে সংঘত করে হিতে হিতে বলভেন :
রাখরানী হয়ে আঘারের তুলে যাবি না তো মা?

যার কথার মধ্যে যেন কান্নারই স্রোত যৌক পেত
আইভি, ওর বুকের তেতৎটাত যেন কেমন করে উঠত।
কচি কচি ছুঁখানা হাঃ হিরে নার ভান হাতখানা সন্মোরে
চোপে ধরে উষ্ণ চোখে ডাকাত আইভি, আর বলভ :
না মা, আমি তোমাদের কোমলিন তুলব না। তা হলে
কি করবি? রাখরাড়ির ঘন মৌলত, টাকা পরসার
একটা জলে আঘারেরও দিবি?

যার বুখে হাসি বেবে স্বাভাবিক হত আইভি, যার
হাতে ছেঁড়ে হিরে মাখা নীচু করে দাঁড়াত, বলভ : আদার
টাকা পরসার ঘন মৌলত তোমাতেই থেব না।

আট বছরের নিশাপল নিফলয় কিংবোয় মনের সন্ম
নলে অতিব্যাক্ত হুচি বছরে এসে লভ্যে পরিণত হবে
কে জানতো? সে হিনের সে পিতৃ বরকি পেয়েছিল
রাখরানী হুজার স্রোতের ধর? সে কি জানতো যে
অপরের বর পিরে নিজের ইচ্ছে মত হং বিলিয়ে দেওয়া
যায় না? ও জানতো না, তুই বলেছিল—কথা দিয়েছিল।
সে কথাই লভ্যে পরিণত হয়েছে। কিং দিখে হয়ে
বেছে আত্মার-বন্ধন আর যার প্রতিবেশী-নাড়বীনের
ভবিষ্যৎ বানী।

তাই কি? লবটায় কি মাথো হয়ে গেছে? রাখরানী
জানি কট কেহানী তো হয়েছে। যালের সেবে চুটো
টাকাও তো ঊপেকার নয়। কৈশোরই সেই অতীত-বিন-
স্তলোর বুখ থেকে বেরিয়ে যাওয়া কথা যে একদিন পরে
এসে হিনের আলোর মত লভ্যে স্পর্শিত হবে কে
জানতো।

প্রাকার বেরিয়ে এসেছে আইভি, জত পারে এসে
দাঁড়িয়েছে ট্রাম স্টপে। মন্টা যেন আজ তোলপাড়

সঙ্গীত সঙ্গীত সঙ্গীত সঙ্গীত সঙ্গীত সঙ্গীত সঙ্গীত সঙ্গীত সঙ্গীত সঙ্গীত

। একটি স্বপ্নের হুঁচু

ট্রান স্কপের ধারে বেল গছটার পাভা কাঁপিয়ে এক জনক ঠাণ্ডা হাওয়া ছুটে দেল গড়ের মাঠের দিকে । সে হাওয়ায় আমের আইতির খেঁচ মনেও সুস্থ স্পর্শ দিয়ে দেল । শাড়ির আঁচল কাঁপল ! খোঁপাটা ছলল বহু ।

না, আর কোন ঘোষ নেই, তিনি তো চোঁটার কোন ক্রটি করেন নি । বেল বহুর ধরনে ম্যাজিক পান করার পর থেকে তাঁর তাসিহের শুরু । আর সে তাসিহের দলকা হাওয়ার বাহার প্রাণ যায় যায় । একে বলেন, শুকে বলেন । আত্মীয় বহু বাড়ব সকলের কাছে এক অনুবধ । এক প্রত্যাহ । একটা হেলে তেঁপে ফিন ।

মাস অর্থমাস আবার কোন কোন সময় হুঁমাস তিন মাসের ব্যবধানে এক একটি হেলের সন্ধান এসেছে । ধবের মধ্যে সিগারেটের ধোঁয়া কঁপেছে । অর্থমাস পক্ষে তারি হয়েছে বাতাস । আইতিতে পাড়ার বৌদিগা দাভিয়ে দিয়েছে । কাকলের বেখার টানা চোখকে করেছে আরও টানা । কপালের দাক্ষ্যনে কুমলুয়ের কোঁটার দ্বন্দ্বের বুকে দ্বন্দ্ববস্তর করেছে । ছোট ভাইটিকে সঙ্গে নিয়ে ঘরের মধ্যে লাঠিয়েছে । নিশা বিকির হাত বরে আন্তে আঁতে পা কেলছে । হাসি পেত আইতিতে । মনে মনে হাসত । সে কি পলু না চুড়া ? কিছু উপায় কি ? প্রচলিত নিয়ম মানতে হবে । মারি চিরকালই অচলা । নিজে পা থাকতেও অপরের পায়ে ওর করে ধাক্কাই তো এ সমাজের চিরকালীন রীতি । সে রীতিকে উপহাস করতেই মনে মনে হাসত আইতি । জরতো হাটি হাটি পা পা অবস্থা । চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরের ভেতর পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই আগছকবের একবার সেখবার লোভও আগতো ওর মনে । পর মুহুর্তেই মনকে শাসিয়েছে । হাটি হাটি পা পা করে এগিয়ে গেছে । হাত জোড় করে নমস্কার দেবেছে । নিশাখে গিয়ে চুকেছে ঘরে, বসেছে ওদের সামনে । মাথা নীচু করে । অপ-দায়ীর মত । শাড়ির প্রান্তভাগ টেনে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত ঢেকে দিয়ে । তারপর হঠাৎ হুঁ একটা প্রহ । নিছক কথা, হঠাৎ অর্ধপূর্ণ হঠাৎ অর্ধহীন । তবু ঘামের চিহ্ন ছুটেছে কপালে । কয়েকটি মুহুর্তের অব্যতি, কয়েকটি মিনিটের অনবধার ভাব, তারপরই হাকপেয়েছে । পা পা করে চৌকাঠ ভিড়িয়ে বাতাবিক । ঢকলা হরিণীর

নভই দুটে কানলায়, কোঁালের ধারে কান পেতে থাকে মা, কাকিনা আর বৌদিগের ডিডে !

ঘরের ভেতর তখন আলোচনার শুরু । বাবা কানতে-চেরেছেন মেয়ে পছন্দ হয়েছে কিনা, দুব ছুটে সব সময় না বললে চোখের দৃষ্টিতে সে ভাবা ছুটেয়েছেন । সে তাবা বুঝতে পেরে আগছকবের মধ্যে কেউ ওখাব বিস্তাছেন : এ মেয়ে অগছকবের কিছু নেই, বিবকমার সন্ধ্যা মনের সৃষ্টি, আশ্রম অস্ত্র আলোচনা করা থাক ।

অস্ত্র আলোচনা কি তা বাবা কানেন বলেই বাবার দুব ক্যাকাসে হয়ে খেত । তবু চলত, কিছু বার্ষ হত আলোচনা । বার্ষ হত আয়োজন । আর সে বার্ষতর ভেতর থেকে একটা সত্য আইতি উপলব্ধি করতে পেরে-ছিল, একটা দিচ্ছতে উপলব্ধি হতে পেরেছিল : শুধু রূপ থাকলেই হয় না, সঙ্গে বাবার জগোও চায় ।

এ সত্য কি শুধু আইতি হতে পেরেছিল ওর বাবা কি নয় ? বাবাও করতে পেরেছিলেন, পাহারেন না কেন—স্রোতার অভাবেই তো তাঁর বিরামহীন প্রোঁটো বার্ষ হয়েছে বাবের বাবের । প্রায় ডাকন বানেক আয়োজন তখনই হয়ে গেছে । তারপরই মেজবও সোকা করে ধাক্কায়েছিল আইতি । মার সুখোবুধি ধাক্কায়ে বলেছিল : বিধে দেবার চোঁরা থেকে বাবাকে বিদেত কর মা ।

সে বিধে । না যেন আকাশ থেকে পড়েছিলেন : চিরকাল আইবুড়া হয়ে থাকবি মাকি ? লোকে কি বলবে ?

আইবুড়া হয়েই থাকব না : আইতির দলার হয়ে সেদিন বুড়তা ছিল : যে সমাজের লোককলো মাহুকের চেয়ে টাকাকে বড় করে বেঁধে সে সমাজের লোকের ধার্য কান-দিয়ে কিছু হবে না মা, কেন, কি অপরাধ করেছে বাবা । মেয়ের বিয়ের উক্ত রাম ক্রাম বহু সকলের কাছে বাবের ব্যাং মাথা নীচু করে ধাক্কাবেন, অনুবধ বিদ্য করবেন ? কেন, কেন ছোট বড় সকলের কাছে হবেন ?

হাত সমানে সেদিন কঁপেই কেলছিল আইতি, অপমানটা যেন অলঙ্ঘ্য রেখেছিল ওর কাছে । সেই অলঙ্ঘ্য বস্রায় পাহাড়টাই জল হয়ে সরেছিল । ওর চোখের

বিকে তাকিয়ে মুখের চুপ্ত তপন শুনে যা কোন কথা বলতে সাহস পাননি।

আইভিও বলল পেল। সেদিন থেকে যেম কি বন্ধ হয়ে পেল। প্রাইই বাড়ির বাটীর বেতে লাগল, বাগানীর বাড়ি, জানাশোনা লোকদের কাছে বোঝাফেরা শুরু করল, যা বেখেও বাধ্য হিতে পারেন নি, প্রয়োজনও ছিল না। আইভি কোন অস্ত্রায় কিংবা অসামাজিক কাজ করতে পারে না এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। তাই যারন করেন নি।

মাত্র মাস তিনেকের চেষ্টার কাজ জোপাড় কল একটা, ছল মাইকী, প্রাইমারী চুল শিক্কতা, বাগান জবাক হয়ে গিয়েছিলেন। মাত, বাধ্য হিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু গলার খরে কোর ছিল কি?

সে দিনটির কথা মনে পড়ে। আশুও আইভির কাছে সে দিনের স্মৃতি জমলিন। দিন রাত আলোচনা করেছিলেন না আর বাবা। মার চেয়েও বাবার হুজি ছিল কোরালো। বলে থাকার চেয়ে একটা কিছু নিয়ে থাকার ভাল। পরমা থাকলে হো কলকে মিতান। তা মখন পারলাম না বলিয়ে রেখে কি লাভ? শিক্কতা হো: সম্মানের কাজ। ইতিমধ্যে ছেলের সজান বহি লাগুয়া মার তখন দেখা যাবে। চারখাত এক করে হিতে কটকট।

অনেক কানাকানি, অনেক কিল কিল কথাবার্তা অনেক তর্কের খেবে যা হার যেনে ছিলেন। চাকরী করতে গিয়েছিল আইভি, গিয়েছিল একটা কাজের মধ্যে নিজেই বিজ্ঞত বনকে সমাধিত করতে, যা অসম্মতি দিয়েছিলেন।

সে অসম্মতিই শেষ নয়। মাত্র কয়েকটি মাসের ব্যবধানে অস্ত্র অসম্মতিও চেয়েছিল। টাইপ শিখবে।

আমতা আমতা করে বাবা বলেছিলেন: টাইপ শিখবি কেন না?

ভাল চাকরী নিতে হলেই টাইপ জানা বরকার বাধ্য। কিছু —

কিন্তু কি আছে বাবা, কত মেয়েইতো শিখছে।

সঙ্গে সঙ্গে জানা শোনার মধ্যে কয়েক অনের নারও কয়েকি। বাবা আর কোন কথা "মুখে পাননি। কাছেই

টাইপ আর সট'খাত সেবার বলে। মাত্র মাস ছয়েকের মধ্যে প্রয়োজনীয় শিখত তুলস আইভি।

ভারপর শুক হয়েছিল এখানে সেখানে দরখাস্ত পরানো। কাজকের বিজ্ঞাপন বেখে সবচা-ববর নিয়ে চাকরীর চেষ্টা করতে লাগল। বরাতেও কোর ছিল আইভির, ছ'বতবের মধ্যে গোটা পাচ ইন্টারভিউ পেল আইভি। তার মধ্যে একটিতে বহাল হ'ল। এবার বাগাটা একটু শক্তই হয়েছিল। মাতো কিছুতেই সম্মতি দেবেন না। হাজার-গুণা পুস্তকের মধ্যে বলে কাজ করা? না, না তা হয় না।

আইভিও মার মন জানতো। এক বিশেষ তাঁর মনের সংকার কাটানো শুরু সে জানে। আনে বলেই পদম হাতে বেখে আস্তে আস্তে এসিয়ে ছিল। প্রতিবেশী ছ'একটা চাকরী করা মেয়ের চুটাত দেখিয়ে, আপন আশু-মসমেব কথা চুটতার সঙ্গে বোঝা করে মার ভাবনার প্রাচীরে ভাঙ্গন ধরিয়েছিল। কাছে বসে, পা টিপে দিয়ে হাতেও আঙ্গুল টেনে আরও বিয়ে সোহাগ ঢেলে মার মন গলিয়েছিল।

সেই থেকে চাকরী, চাকরীর ক'কে কাকে পাজী বিশেষে যোগ্যতার পরীক্ষা না মিলেও বাবা যে তাঁর চেষ্টা থেকে বিরত হননি সে ববর কানে এসেছে, মার তারিয়ে যে ভাটা পকেমি সে ববর শু, সামাজ্য কানাকানি আর কিস কিস আলোচনার বাগা না মিলে ও বাগা দিয়েছে বখন কোন বিশেষ ছেলেকে কেন্দ্র করে কথাবার্তা এগোতে চেয়েছে, পাকা করতে চেয়েছে ব্যবস্থা। তখনই দুখ গুলেছে আইভি এখন নয় বা।

এখন নয় তবে কখন? তোর বাপাটা কি বলতো আইভি! তেবেছিল যা খুশী তাই করে বাবি।

জর শেষেছে আইভি। নয় হয়েছে হ'র। চলছে ১ কি হয়েছে না? হয়েছে আমার মাথা তোর হুত। শারী জীবন আইবুড়ো হয়ে থেকে হু বাহাছুরি না? আশুত হয়েছে আইভি। কত মেয়েই তো বিয়ে না করে থাকছে বা।

খুব বাহাছুরি তাতে না। হুজি না বাপু আকালকার মর কাও কারখানা...না রাগে পরপর করে খেতে চেয়েছেন। আর কিছুদিন থাক যা...পেছন থেকে মাকে আশুত

করতে চেয়েছে আইতি, সেই কিছুদিনের অবকাশেই বাবা চোখ বুজছেন, আকস্মিক মৃত্যু হল তাঁর, অকিস ভিন্নিতি বাস ছুটিনার আহত হয়ে হাসপাতালে ঢুকে আর বেরলেন না।

সেই বেকে আইতি মাঝার তুলে নিয়েছে সংসারের বোঝাটা। ছোট ভাই, বোন, মার হাতিখ তুলে নিয়েছে যাচ্ছে। তাতে কি! বিশাল শতাব্দীর লেখা পড়া জানা মেরে। চাকরী আছে—ভর কি?

ভর নেই—তবু বুকের ভেতরটা মোড়ক ঘিরে ঘিরে ওঠে কেন? সে কি ওর ছোট্ট একটি বাসনার সার্বিক স্বপ্ন দিতে পারলো না বলে নর? যা বাবা যা চেয়ে-
ছিলেন তাই হল না বলে? তাইতো। না হলে মাঝে মাঝে মার সে কথাটি মনে পড়ে কেন? ঘিরে কর, ঘর সংসার কর মা!

অনেকদিন পর কথাগুলো নতুন করে মনে পড়েছে আইতির, মনে পড়েছে অনেক কিছু, অনেক ঘটনা। বহু লতার সেই নরম তুলতুলে ছেলোটর মতই ছোট্ট একটা ছেলে বাত বাত বুকের মধ্যে জড়িয়ে বসতো, বাত-
বাত ঠেঁটে চুমো দিবে বেত! তাতো হল না ওর আঁবে, কারণে অকারণে কপকা করত, অতিমান স্নানান্তে আসত পরিচিত নদী। তাতে আদর্শ ভাল লাগে। দুটো মনের খুঁশির মিল ঘিরে রাতানো ছোট্ট একটা ঘর। থাকতো ওরা দুজনে সে আর একজন। আর জল জল করত তাহেরে কমনার নিশিত আকাশে একটি শুধু তায়। প্রতিটি নিশিতে। তা হরনি।

সে আক্ষেপকে কতকাল ঘুম পাড়িতে রেখেছে আইতি। মনের তলার ভ্রমাবিভূত সেই বাসনার কুঁড়িতে অল্পরংগের চুমো ঘিরে আসিয়ে বেবার লোকেরও তো কমতি নেই এ সংসারে। প্রথম প্রথম অকিসের পরিচিত এমনি চোরা চলেছে সুখাল সেন, একঘাটা ছেলটি, দুটো চোখের স্বপ্নের ঘোর। প্রতিভার সীমিত জল জল করে নিকব কাল দুটো চোখের তারা। কেমন করে পথ হারিয়ে বেন এ অকিসের সীমান্য ঢুকে পড়েছে। সেই তো এগেছিল নতুন আশার আলোক বতিকা হাতে নিয়ে। কাছ কর্মের সূত্র ধরে আশাপ তো অনেক আদেই হয়েছিল। বাকী ছিল অন্তরঙ্গতা, তাই জন্টেই

এসিয়ে এগেছিল একদিন। টিকিনের সময় অন্ত মেরেরা কেউ ছিলনা সিনে। আইতি একা বসেছিল একটু অন্তমনক হয়ে। সুখাল এসিয়ে এসে টেবিলের দার বেখে হাঁকিয়েছিল। তখনও অন্তমনকতা কাটে নি আইতিতে। দেবকালে বেমিংটন মেসিনে পেলিলের নর, চমকে চোখ তুলে ডাকিয়ে এক বলক হাসির হাওয়ারই উড়িয়ে ঘিরেছিল অপ্রতিভ তাব। কিছু বলবেন? সুখাল সেই বসওয়ার চোখ দুটো তুলে বেরেছিল; একটা অল্পরোষ রাখেবে?

বলুন—

চলুন না দুটীর পথে বামিকটা বেধিবে আসি।

কেমন নিঃসঙ্কেতে কথাটা বলে গেলেছিল সুখাল ভাবতেও আচ্ছা অবাক লাগে আইতির, পুঙ্খ মাংস এমনি করেই বৃষ্টি হরের মেঘেবের টেনে পথে মাসিয়ে নিয়ে যায়। আইতির বুকেও চেতনেরও সে টান অনুভব করেছিল। কিছু একি সম্ভব ওর পক্ষে? দুদিনের পরিচিত এক সহকর্মীর সঙ্গে যুবে কেড়ানোর কথা ভাবতে ওর সারা বেছে কাটা ঘিরে উঠেছিল। অথচ এক কথার প্রত্যক্ষাণও করতে পারেনি আইতি। সুখালের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করতে ওর মনে আঘাত দিতে কেমন বেন তাব বাত ঠেকেছিল। বসেছিল কোথায় যাবেন?

পক্ষার হাং, কিংবা জিট্টোরিয়া মেমোরিয়াল রপেং কোন নিভৃত আশপাশে। বিশ বছরের বিশটি বসন্ত নিরশির করে উঠেছিল আইতির লেহর অজুতে নবমাস্তে মনের আকাশে শুষ্ক হয়েছিল সাত রংএ মেলা, আনন্দে আর উল্লাসে ছলছলিয়ে উঠেছিল ওব দুটো চোখ, হ্যা, আনন্দেই তো, এমন একটা লোভই তো ওর মনের বাজ্যে স্থগ্ন ছিল এতদিন। সেই লোভের কুঁড়িতেই তো কোঁটা কোঁটা আশার মধু স্তবিরে গেল সুখাল।

কিছু অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘিরিয়ে পড়েছিল আইতি, ওর পক্ষেও পব তো সুখমহার্জি নর। এতো আত্মনে ঝাঁপ বেওয়া, একবার ঝাঁপ হিলে আর উপার নেই। আর কিংতে পারবে না, সে কৃত্ততা কোথায় মনের রাজ্যে? চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল স্নাত দীর্ঘ চার চারটে ঘূষ। সিনেমার ভগ্নাণীর পর্দার হিবিব মন্ত একটার পর এবটা চোখের তারায় এসে বেন ভর করেছিল। সে নব কারা?

। তাই বোঝা যায় কি ? সত্য সত্য যে চাওনা মোতী
যে উঠেছিল, সে লোভের হাতটাই মিথস্বাক্ষর করে নিয়ে
ইন্ডিয়ান হুগল কলার হিরেছিল : আমায় তো সময় হবে
। কুলস বাবু ?

আজ মাঃতাক, অজমিন...তখনও আশার ছাতিতে
। মন্ডিল কুলসের চুটো চোখ, তোলমিন হবে না
। বোলবাবু : আমায় অনেক কাজ অনেক ব্যস্তি...
। বোম্বো মন্থন কেন্দ্রেই ফেলছিল আইডি :

এই ই ক'ল-আজমিন হয়ে কুলসের বুকের হানি-
কুলস কোড মিশেছিল। হাওয়া হয়েছিল আইডিভি।
। ম'বাপ হিরেছিল ভব। এই ভীষনে প্রথম একজনকে
। যে ছিল ও, কিন্তু পথ ছিলনা।

সে আর স'জিন ? চু'চাহটে জিন যাক মন্থন।
। যেছিল কুলস। তার পরেই ওর সময় হয়নি
। বোলসের সঙ্গে বেড়াবার সময় হয়েছিল জয়ন্তী, ওরই
। তখন, পাশেই নিচে বসে কাজ করে। কস'প হা,
। মালমাল বুঝ, একটু সাহুক প্রকৃতির।

কবেকমিন পরেই গুলনটা শোনা দিয়েছিল, ভবের
। ক্রমকে নাকি ভুটিন পর এখানে দেখানে দেখা পাওয়া
। ছিল। আইডিও গুলেছিল। তখন মনটা বাবাপত
। যেছিল, ওর গুলে দেখা নিজে কুলস।

কুলসের সঙ্গে আলোপ হওয়ার পর ও ক্রম প্রবাহের
। বিবর যে অসম্পূর্ণ ও হু'কিরে রেখেছিল সেই অজকর
। গু'ভাই ও চুপি চুপি শিখুগা কলে কিরে বেল।
। গু'রী আলো নয়— আইডিভি এই নিঃশব্দ পরিবর্তন
। কারও চোখে পড়বার কথা নয়। পড়ল না সে খোঁজ
। নেবারও হরকার ছিল না ওর। কথা কবিরে ছিল
। আইডিভি। বোঝ একটু করে, হাসি কবিরে নিল
। কোঁটা কোঁটা করে। সত্যই বনে বোঝ একটু একটু
। করে বাড়তি কথাকে কেটে ফেলা, একটু একটু
। করে বাড়তি হাসিকে মুখে বেগুয়া। বুঝ কই। তবু
। করতে হবেই। এরপরেই হু'একজন এসেতে চলেছে।
। কিন্তু পারেনি। আইডিভি বাড়ীবেই পাঁচিল কেউ
। ভাকতে পারেনি। নতুন কোন প্রত্যাব নিয়ে ওর
। সামনে এসে হাঁড়তে পারেনি।

বাইরে। যে মন, যে আলো হু'কিটি বুঝিয়ে আছে
। তাকে বু'কিয়ে কি লাভ ? যে বু'কিয়ে আছে তাকে
। বু'কিয়ে কাকতে কেওয়াই ভাল।

কিন্তু হু'রাং এমন করে মনের বাগানে কড় উঠবে
। কে জানতো। আশনার সামনে তো বোঝই পাঁচুর
। আইডিভি : নিজের বুঝও দেখে। কৈ এমনটিতে আর
। কোতহিন হয়নি। বুকের ভয়মীহতা, কেহলাবোয়
। কথা তো মোহনিন মনেতে পড়েনি।

আজ মনেই পড়ল না মনের রাজ্যে কড়ও কুলস।
। সব গুলট পালট করে হিরে বেল। সাতা পথটা
। মন বাগানের অস্তিত্ব নিয়ে অকস্মিক কুলস। অকস্মিক
। তাল লাগল না কাজে মন হিরে পাবল না।

ভুটী নিয়ে বাড়ি কিরে এল। কুলস হাওয়াবে
। ভাবনার হত কথা কালার মনটা ভিকে বেল বারবার।
। গুলে দেখেই হা এদিকে এসেন। ভুটী চোখে পড়ার
। ছাপ। কালুল পদার জানতে চাইল : কিবে এলি
। কেন হা, নতীরা ক'বাপ ?

সার রেজকরা কঠ, কালুল কালসা আইডিভি
। কলাক মনের উপরেও শান্তির প্রলেপ বু'কিয়ে হিরে
। বেল। কুল বিবর বু'কে ও কোর করে হাসি টানল।
। বকলে : না হা, নতীরা আমার ভালোই আছে, এমনি
। ভুটি নিয়ে চলে এলাম।

যেবিস হা ...একটু সাবধানে চলিস.....
। 'সাবধানেই থাকে আইডিভি। সাবধানেই চলে।
। সাবধানে চলে যলেই মন বাগান নিয়ে অকস্মিক কতেমি
। আইডিভি। বাড়ি চলে এসেছে। কিন্তু বাড়ি এসেও
। মন লাভ হল কোবার। বিজ্ঞানার উদ্ভূত হয়ে বাসিনে
। বুঝ বুঝ পড়ে রইল।

কু'কই পাবীগুলো উড়ে বেড়াচ্ছে এবিক সেহিক।
। একটা টিকটিকি খপ করে পড়ল বেহের উপর।
। পানের বাড়ির ছাদের টবে হকমারা কুলসের
। বাহার। বাসিন থেকে বুঝ কুলে সেহিকে ডাকিয়ে
। থাকল আইডিভি। ডাকিয়েই থাকল ভব। ডাকিয়ে
। থাকার মনের সার নেই। তবু কু'চোখ কুলে থাক।

আবার কি ভেবে উঠে পড়ল। আশনার সামনে
। এল। নিজের প্রতিজ্ঞাবিটা দেখতে লাগল মন বিবর।

১ একটি শব্দের যত্ন

লজালে বা সেপেছে ঠিকই বেবেছে। কোন তেজালে নেই। জগজ্জীর মত ওর পালে হাড় জেপে ওঠেনি, কবে হাতনি কপালের উপকার তুল, বিবর্ষ হাতনি পারেত রং।

কিন্তু কি হবে এসব বেলে, কি হল এই ঐবর্ষ বেতে। কেউ তো এল না, কেউ দিল না সুলা। বুক হালকা করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল আইত্তির। শাঁকর কাপানো।

পাখের ঘরে আর একটা দারী কর্তী। লজাপ হল আইত্তি। আরনাটা বেবে ঘরের বাইরে এল। কসবা বেতে হাসিমা এসেছেন। মাঝে মধ্যে আসে। এ বাড়ির বেঁটা ববরও বেন।

আইত্তিকে দেখেই অবাক হয়ে বললেন : আচ্ছা অফিস যাওনি বুত্তি মা : গিবেছিলাম হাসিমা, গুটি নিয়ে চলে এসেছি।

কেন, শরীফ খাতাপ নাকি ? হাসিমার লগারও উবেল।

না—গ্রাম হাসিত গলে হললে আইত্তি।

তাই হল মা.....আশুত্ব হলেব হাসিমা, একটুকণ পরে মাঝ বিকে দুখ কবে বললেন : আচ্ছা বিত্তি।

মা চোখ ভুললেন।

আইত্তির বিয়ের কথাটা চিরতরে চাপা দিতে দিলে নাকি : আজকাল তো একবার বলতেও শুনিমা।

হাসিমার বুকের একটা সাত্রা প্রায়ে আঠাল বছর বয়সেও আইত্তির সাত্রা দুখ লজার রাত্রা হয়ে উঠল। বাবাটা আনন্ত হল। সরে বাবে না দাঁড়িয়ে থাকবে বুকে উঠতে না পেয়ে দাঁড়িয়েই রইল। পাড়ির

আঁচলে খুঁটতে লাগল।

প্রথমটা অপ্রাশুত, তারপর দুখানা। পক্ষীর করে মা-ই সরে গেলেন। সরে গেলেন এখন তান করে বেন এই সাত্রা একটা দারী জিনিস ঘরের বাইরে কোথাও কেলে এলেছেন তুল করে।

সার এ অভিনয় বুখল আইত্তি। বুকেলা বলসই হরতো বুকের তেতরটা মোচক দিয়ে উঠল। ছুটো চোখ তুলতুলিয়ে উঠল অজান্তে। সেও সরে গেল সরে গেল দ্রুত পারে। চিকচিক করে শুধী চোখ, মুহুর্তের মধ্যে বজ্র হাতিয়ে-বাওরা দুখ লুকোবার অস্ত্রই বুত্তিমা সরে গেল হাসিমার লামনে বেতে। পার পার হেঁটে একেবারে নিজের ঘরে।

নিজের ঘরে এসেও বহি মেই। বুকের তেতরটা বুক বুক করেছে। কিন্তু কেন ? সে কি জানো ওর ছোট্ট সেই বাসনার, ছোট্ট সেই কামনার অনেক আগেই বৃত্তা হয়ে গেছে। জানে বহিকি। তবু বেন এ অবত্তি ? কেন এই জুগুৎ বয়সা বুকের তেতরে। কেন এ বুক-বুকনি ? তাহলে কি ওর বাসনার ছোট্ট সেই কুঁড়িটুকি আশুত্ব কোটার সাবনার উদ্ভব ? ও নিজেও কি আশার কৌণ সেই দীপ নিবাটি আশুত্ব মনের মনিকোঠাঃ আলিয়ে রাখতে চায় ? চায় বলেই কি মা এখন করে কাজের তান করে উঠে গিয়ে ওর বাসনার কুঁড়িটিকে দুতক্ষে দুতক্ষে দ্বিহা দিয়ে গেল। কুঁহিবে নিতিয়ে দিবে গেল মনের আলিখে মিটমিট করে জলতে থাক। কৌণ আলোক নিবাটি ? কিন্তু কেন ? এই কেনর উত্তর খুঁজতেই বুত্তিমা বালিশে দুখ বুকে চোখের জল ফরাতে লাগল আইত্তি।



পশ্চিম ভারতীয় বন্দু
নগরীতে ১৭১০ খৃস্টাব্দে
১২ই ডিসেম্বর পাতাঘোষ
হরহর সংগীত প্রতিষ্ঠা
স্বাভূতিক ভাষা বৈশ্যক্য



তার হয়ে ওঠেন।
বোম্বাই' বলেছিলেন যে
"এ দিকে নতুন দিন।
একদিন ও বিকটই
বিশ্ববিখ্যাত হবে।"

জন্ম গ্রহণ করেন। বোম্বাইতে তখন পূর্বাশ্রমে সবে
উদ্ভূত হয়েছেন। উদ্ভবের মতো আকৃতি ও প্রকৃতিগত
লক্ষণ ছিল। বোম্বাইতে ছিলেন একটা, বেশী বড়
সাক্ষর, বিনয়ী, মন্থ আর বোম্বাইয়ের বিনয়ী মন্থ, উদ্ভব
প্রকৃতি কিন্তু উদ্ভব বিনয়ী জাতিগত।

কয়েক পূর্ববর্তের সংগীতজ্ঞের পরিবারে বোম্বাইয়ের
জন্ম। বোম্বাইতে পিতা বোম্বাইয়ের জীবনে এক বিরাট
অংশ করে ছিলেন কিন্তু বোম্বাইয়ের পিতা তাঁর কাছে
একটা বিভীষিকার মত ছিলেন। বোম্বাইয়ের পিতা পিতৃ
প্রতিভা বোম্বাইয়ের কথা সোনার পর থেকেই নিজেদেরকে
সেভাবে তৈরী করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলেন
কিন্তু সম্ভব একদিকে বোম্বাইয়ের বাপ মান্যতে
পাঠান নি। পৈশবর্ষে তিনি একা থাকতে ভালবাসতেন।
কল্যাণের নানা জাল বুনতেই তাঁর দিন কেটে যেতো।
সাম্প্রতিক পিতার দিক দিয়ে বোম্বাইয়ের ভাষা
সুন্দর ছিল। তিনি কেউন গ্রন্থ পূর্বসূরীদের নিষ্পন্ন
ভক্ত্যনয়নে সংগীত পিতার সুযোগ পেতেছিলেন।
ভাষাতত্ত্ব তিনি কোন একটা বিশেষ সাম্প্রতিক ব্যাপারে
পাঠের কাজে সাম্প্রতিক দৃষ্টিতে গবেষণার মন নি।
তখনকার প্রচলিত গ্রন্থ সব সাম্প্রতিক ব্যাপার সংস্কৃত
তিনি পরিচিত হতে পেরেছিলেন বলেই একটা নতুন
জীবনধারণী দৃষ্টি তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো। পৈশবর্ষে
তিনি একজন সংগীত পিতার কাছে "সাম্প্রতিক" ইত্যাদি
কত শিক্ষা করেন। তাঁর সেই শিক্ষক বিশেষ করে "বাক্য"
এই সংগীত তাঁকে শিক্ষা দেন। এতে তাঁর স্বাভূতিক
উদ্ভব হয়েছিলো। তখনই তিনি কোন বিশেষ ধরনের
জন্যে নানাভাবে পদ্ধতিগত করার (improvise) কাজে
বিশেষ প্রতিভার পটিকা বিদ্যমান ছিল। বোম্বাইতে
শিক্ষা লাভের জন্যে তিনি ভিয়েনা গিয়েছিলেন কিন্তু
কোন কারণে বোম্বাইতেই কাছ থেকে শিক্ষালাভ করা

তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র বোম্বাই। যাদের স্বাভূতিক
অংশ পেয়ে বোম্বাইয়ের দেশে গিয়ে এলেন। ব্যক্তিগত
একটি তাঁকে সমস্ত পারিবারিক ব্যয়িত গ্রন্থ করতে
হলো। একবার লখনুও গেলার পথে বিখ্যাত সুরকার
ফেল্ডেন কিছুদিনের জন্যে এখানে আসেন। ফেল্ডেনের
সম্পর্কিত সভায় বোম্বাইয়ের স্বাভূতিক একটা "ক্যান্টোরা"
নামে ফেল্ডেন একই মত জন যে তিনি বোম্বাইয়ের
ভিয়েনা গিয়ে তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করতে আহ্বান
করেন। ভিয়েনাতে গিয়ে বোম্বাইয়ের স্বাভূতিক
সঙ্গে "কাউন্টার পয়েন্ট" সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করতে
যান। এ বিষয়েই "ইতিপূর্বে" তাঁর যাবতী
সম্ভবতার অভ্যাস ছিল।

ভিয়েনাতে স্বাভূতিক সম্ভবতার মধ্যে তাঁর নাম
গোপনিক হইতে পড়ে। ভিয়েনার সংগীত স্বাভূতিক
সমাজ ও সংগীতের পূর্বসূরীদের স্মৃতিসৌধ
ব্যক্তিগত তাঁকে একটা ভবিষ্যতের প্রভাৱ চোখে দেখতেন।
ফেল্ডেন তাঁর মোটেই ভাল ছিল না তাঁর ওপর মাঝে
একদম। চল তাতে ফেল্ডেনের যোগ বড় একটা
পড়ত না। সব মিলিয়ে পূর্বসূরী ফেল্ডেনের জন্যেই
সম্প্রদায়গো তাঁর একটা পরিচিতি ছিল। এ সম্বন্ধে
তাঁর ফেল্ডেনের এমন এক বিরাট ব্যক্তিগত দাপ ছিল
যাতে অন্যরা খতিভিত হয়ে পড়তো। তাঁর এক
জীবনব্যাপী লিখেছেন—“বোম্বাইয়ের ফেল্ডেন ছিল
ক্রোয়ানিয়ার গায়ক মত, মন্থা ছিল পিতৃ মত
সম্প্রদায়ের এবং তাঁর অগ্র-প্রতিভা এমন এক সংগীত
দৃষ্টি করে গেছে যাতে মানবসম্প্রদায় অনেক দূর
এগিয়ে গেছে এবং তাঁদের বৈশিষ্ট্য জীবন বাস্তব-
বিস্তৃত হয়েছে।” ভিয়েনার বিজ্ঞান সমাজ সম্বন্ধে
নিজের পিতৃগত একবার ব্যয়িত ও ব্যয়িত
হয়ে কয়েক। স্বাভূতিক ও কৌল্যন্যকেই তাঁরা একদম

মহৎ বলে ধরে নিয়ে ছিলেন। চিরবিদ্রোহী বেথোকেন কখনও তাঁর কালে মাথা নত করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তৎকালীন ভিয়েনা বিদ্রোহ বা উৎসাহিত বিদ্রোহ সংগীত পৃষ্ঠপোষকদের বেথোকেন এ কথা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে মহৎ প্রতিভা কখনও মাথা নত করে না। প্রতিভা ব্যর্থ আছে সে তাদের চাইতে অনেক বেশী মহৎ। ১৭২৫ সালে তাঁর Opus 1. প্রকাশিত হয় এবং এরপর থেকেই তাঁর রচনা ছেপে বের করার জন্যে প্রকাশক মহলে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। এতদিন অবধি ভিয়েনাতে অপেরা সংগীতেরই বদর বেশী ছিল এবং বেথোকেনের ঘষেট নাম থাকলেও সত্যিকারের প্রতিষ্ঠা লাভ হয়নি।

এ সময়টা বেথোকেনের জীবনের একটি নতুন অধ্যায় বলা যায়। তাঁর প্রথম এবং বিতীর্ণ সিম্ফোনী রচনা তখন শেষ হয়ে গেছে। তৃতীয়টি রচনার কাজে তখন তিনি হাত দিয়েছেন। তিনি নিজেই একজন সংগীত সমালোচককে বলেছিলেন যে তিনি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সৃষ্টির প্রচেষ্টায় ব্যস্ত। তাঁর জীবনের প্রথম অধ্যায় বলা যায় সেই সময়টাকে যখন তিনি প্রথম দুটো সিম্ফোনী, তিনটি পিয়ানো কন্সার্টো ও নয়টি সোনাতা রচনা শেষ করেছেন। এগুলি সবই প্রায় গতানুগতিক ক্লাসিক ধারাবাহ্যের চিত্র বলা যেতে পারে। বিতীর্ণ অধ্যায় বলা যায় তৃতীয় থেকে অষ্টম সিম্ফোনী, অপেরা ফিডেলিও, একটি বেহালা ও দুটি পিয়ানো কন্সার্টো, চৌদ্দটি সোনাতা, তিনটি কোয়ার্টেট ইত্যাদি রচনার কালটিকে। তৃতীয় অধ্যায় হল নবম সিম্ফোনী ইত্যাদি রচনার কাল যখন তিনি একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সফল ভাবে প্রয়োগ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে মধ্য সমাজজীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তনে বিশ্বাসী বেথোকেন করাসী বিপ্লবের সিংহাট, ইকোলারিটি ও ক্রেস্টারনিটির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিনি নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে প্রথম জীবনে প্রত্যক্ষ করেছিলেন বিপ্লবের দূত রূপে। তাঁর ভুল শিপিংই ভাঙ্গল যখন জেনারেল বোনাপার্ট নিজেকে সম্রাট নেপোলিয়ন

রূপে প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর এরোইকা সিম্ফোনী (৩য়) তিনি জেনারেল বোনাপার্টকে উৎসর্গ করেছিলেন কিন্তু যখন পুনর্দেব যে নেপোলিয়ন নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেছেন তখন তিনি তাঁর উৎসর্গপত্র ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন তারপর এটি নতুন করে উৎসর্গ করেন "একজন বীরের স্মৃতির উদ্দেশ্যে।" কারণ তাঁর মনের সেই কল্পিত মানবাত্মার বীর সৃষ্টি-যোদ্ধা তখন মৃত। লক্ষণীয় যে এই সিম্ফোনীটির বিতীর্ণ পরিচ্ছেদটির নাম "শব্দঃসমন"। সিম্ফোনীটির ৩য় পর্বটির দিকটা তিনি তাঁরই একটি পুরোনো রচনা "প্রিভিইউ" থেকে নিয়েছেন একথা বোঝাতে যে নিপীড়িত জনগণ এতদিন অত্যাচারীর শেকল ভেঙ্গে বেরোবেই। পাশ্চাত্য সিম্ফোনী রচনার ক্ষেত্রে এটি একটি যশস্বকরী সৃষ্টি। বস্তুনিদ্র জ্যোতিষাবাহন এর সময়ক উপলব্ধি করতে পারেন নি কারণ হেলেন ও নোৎসার্টের রচনার সঙ্গে এর কোন মিলই নেই।

১৮০৫ সালে 'এরোইকা সিম্ফোনী' রচনার কিছুদিন পরে তিনি অপেরা রচনার দিকে মনোনিবেশ করেন। এছাড়া খুব একটা সাফল্য লাভ তাঁর হয়ে ওঠেনি। এ বছরটি বেথোকেনের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা প্রায় সারা দিন রাতই তিনি নিত্য-নতুন সৃষ্টির আনন্দে মেতে ছিলেন। এবছরই তিনি তাঁর বিখ্যাত পিয়ানো সোনাতা "ভ্যাগুয়েট্টো" ও "এ্যাপাসিওনাতা" রচনা করেন। এ ছাড়াও কয়েকটি অতি শৃঙ্খল কোয়ার্টেট তিনি এ সময় রচনা করেন। এ সময় তিনি কোন একটি উন্নত সংগীতকে বলেছিলেন "আমার মনে কোন আইডিয়া এসেই আধি কিছুতেই তা মাথা থেকে বেরে ফেলতে পারিনি। ওগুলো যেন আমার মাথার দূরের দূর ধরে নাচতে থাকে। স্বরলিপি লিখে ফেললে তবে নির্দিষ্ট হতে পারি। কবিতা যেমন তাঁর মনের বিশেষ ভাব কবিতা মাধ্যমে ধরে রাখেন ঠিক তেমনি আমি আমার মনের কথা দূরের মধ্যে ধরে রাখতে চেষ্টা করি।"

একই সঙ্গে বেথোকেন তাঁর পঞ্চম এবং ষষ্ঠ সিম্ফোনী রচনা করেন এবং একই দিনে তার প্রথম অনুষ্ঠান হয়।

এই বর্ষে সিরকোনীরাই “প্যাণ্টোয়ান সিরকোনী” নামে পৃথিবী বিখ্যাত। এতে তাঁর জামাকলের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর প্রতি আকর্ষণের সাক্ষ্য রয়েছে। কয়েকটি পরিভ্রমে সিরকোনীটি সম্পূর্ণ। প্রথমটি হল “শরী জীবনের দৃষ্টি”—গ্রামাঞ্চলে আবার দশো মাসে তার সাময়িক প্রতিফলিত। “হোমি নবীর বাসে” তারপর “নাইটিপেল, কোয়েল ও কাক”। প্রতি হল “চাঁদীর আদম”, দ্বিতীয়টি “কক” পঞ্চমটি “হাফাল বালককেব নংগীত”—ককের পর বিখ্যাতকোব হনসার জাপন। এই রচনাটিতে তাঁর রচনা তিনি এত সুন্দর রূপে প্রকাশ করেছেন যে বলার নয়। প্রতিভা সর্বদেবের ভৌগলিক সীমা অতিক্রম করে এ সংগীত সর্বদেশের সর্বকালের স্রোতাকে অভিভূত করে। একে সিরকোনী না বলে “বিশ্বজনীন ভাবার দুরের কবিতা” বললেই যোগ্য হয় কিংবা হয়।

১৮১২ সালে বেথোফেন তাঁর প্রথম ও অন্তিম সিরকোনী রচনার কাজ শেষ করেন। অন্তিম সিরকোনীটির সম্বন্ধে অনেক সংগীত-সমালোচকের অভিমত এই যে এটি বেথোফেনের অন্যান্য রচনার সমপর্যায়ভুক্ত নয়। কিন্তু পরবর্তীকালে ভ্যাগনারের মত সুরকার একে “নৃত্যের দেবতা” বলে অভিহিত করেছেন। তার কারণ এটি অত্যন্ত স্বন্দর।

এ সময় বেথোফেনের নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। সংগীত প্রকাশকরা তাঁর এক একটি রচনার জন্যে প্রচুর অর্থ দিতে থাকেন কাছেরই বলা বাহুল্য যে এগুলি থেকে বেথোফেনের আর্থিক অভাব ছিল না। কিন্তু ছিল এমন আরেকটুকি অভাব যা পূর্ব অর্থ দিয়ে যেমন ভরা যায় না। তিনি অস্বীকার কোন উত্তরপ্রশ্নোত্তর একটি মহিলার পানিগ্রহণক্ষমতা ছিলেন কিন্তু তাঁর চেহারাও জ্বায়েই যোগ্য হয় সেই ভবিষ্যৎ ভীষণ শারীরিক কষ্ট করতে বাধ্য হন নি। তাই তিনি সারা জীবন অকৃতকার ছিলেন।

এ সময় থেকে একটি দুঃখবোঝা ব্যাধি তাকে গ্রাস করতে শুরু করে। এ সময় থেকেই তাঁর প্রাণপণিক্রম ল্পেতে শুরু করে এবং কিছু দিনের মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ বধির হয়ে পড়েন। তা হাড়া মেরুদেশেও একটা অসহ্য ব্যথা হতে শুরু করে। সাধনী যোদ্ধার মতই তিনি এই ব্যাধির ল্পে লড়াই করতে শুরু করেন। এ সময়টা তার জাই কাল* বায়া বাস এবং কালেশ* নাবালক শুরুর ভগ্নপোষণ ও বার্ষিক করার তার তাঁর উপরই পড়ে। একটু বড় হলে পর দ্রোই কাল* এমন অল্পবয়সে তার পিতৃব্যকে জলাশয়ত করতে শুরু করে যে

তিনি আঁধার হয়ে পড়েন। তার কল্যাণে বেথোফেনের কল্যাণে বাবা, পুত্রপিত, আশ্রয়ত লেগেই ছিল। কিন্তু, পার্থক্যিক বৈকল্য, সংসারে ও মনের অসামঞ্জস্য কিংবা তাঁর দৃষ্টির প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে পারেন।

১৮১৮ সাল থেকে ১৮২০ সাল অবধি তাঁর রচনা-গুলোর মধ্যে “মিসা সোলেমনিস” এবং “নবম সিরকোনী” উল্লেখযোগ্য। এর পর তিনি তাঁর মনম সিরকোনী রচনার কাজে হাত দেন। দশমটি রচনা শেষ করা তার আঁধার হয়ে ওঠেই কেননা তার পূর্বেরই তিনি বৃত্তান্তরূপে পণ্ডিত হন। জীবনের শেষের দিকে রচনা সংশ্লিষ্টতার কারণে অনেক লেখন বাধা* এবং “বাস্তবায়ন” কিন্তু শক্তিকারের কারণে হল। বেথোফেনের রচনাশৈলী এখন একটি দুর্বিধায়া পথ হয়ে চলতে। বার জন্য অনেক সময়ের প্রয়োজন হোতে। জীবনের শেষের দিকে ও তার রচনা একটুও পুনরাবৃত্তি দেখাযুট হয়ে ওঠেনি। সব সময়েই তিনি নতুন শৈলী, নতুন শুরুর প্রবর্তন করার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষাতে ব্যস্ত থাকতেন।

কাজ হাড়া তিনি থাকতে পারতেন না। আঁধার নিস্তা ত্যাগ করে তিনি একাধিকবার অস্ত্রেপে পতি হন দিন সংগীত রচনার কাজে ডুবে থাকতেন। এ ধরনের ঘটনা তাঁর লেগেই থাকতো। বৃত্তান্তর সময় তিনি বলে উঠেছিলেন “আনন্দ কর বহুগুণ রপগত ত্যাগ করার সময় হল।” জীবনশ্রীর কোন সংগীতজ্ঞই এত প্রতিভা লাভ করতে পারেন নি। তাঁর বৃত্তান্তর পর শোকযাত্রার বিশ মাসপ্রাণিক মোক যোগ দিতেছিলেন। প্রখ্যাত সংগীত পরিচালকরা তাঁর শবাবার বহন করে নিয়ে দিতেছিলেন। শিকাগোরদরম বহু রাধা হতেছিল কিন্তু, বাহ্যিকভাবে শ্রুতিগর বশোবস্ত করার অভাবে তাঁর নিত্যব্যবহার* অনেক হ্রাস* ও দ্রোইখাট অনেক অসহ্য রচনা তাঁর আত্মবোধে লীলাতে বাকি করে দিতেছিলেন।

তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টি নবম সিরকোনী রচনার সময় তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ বধির। অসহ্য দৈহ, সংগীত রচনিতার সবচেয়ে বড় শত্রু বধিরতা, কিন্তু এই বহু প্রতিভার পথরোধ করতে পারেনি। দৈহ-শত্রুর মধ্যে সেন-বিশেষের অসংগত দৃষ্ট এই জ্বালাময়ীজ্ঞকে শেষতে আশ্রয়তা পূর্ব তাঁর ব্যাতির জ্বায়েই সব কারণ তাঁর রচনার ভাষা ছিল বিখ্যজনক। তার সংগীত দ্বান, কাল, পাত ভৌগলিক সীলারো বিস্তার* ব্যাধিক্রমিত সীমা অতিক্রম করে বিশ্ববাসের অভাবলে তার বাসী বহাধ*ভাবে শোঁয়ে দিত। এ সংগীত অবদানকাল অনন্ত ধানকের।*

*বেথোফেন, বাথ, চ্যাওল, মেডেল, মোংগাট—পশ্চিম সংগীতের এই শীর্ষ পঞ্চকের জীবন ও সাধনার প্রাথমিক পরিচিতিরূপে গ্রীষ্মকাল সিনে রাসের একটি শীর্ষ প্রকাশিতক।

হিঁড়ে দে.হেডে

দে প্রাপেন ! বর
দাবেরে । ওর.
অত কোরে গলা
টিপিলনে !

আজ কদিন
গরে টরি গাত
হলেই চিংকার
করে । কাগো কথা
পোনে না । সে
যেন কিছু নেখে
—তার চোখের
লেপে বগা পড়ে
কার আদার আভাশ ।

প্রোকেশার দশন ব্যানার্জী' ভৌড়ে এসে দেখেন,
বিশেষ ব্যানার্জী' অজান হয়ে গেছেন । বিশেষ
ব্যানার্জী'র হাট্টিবিল খুব বাডাবাডি হয়েছিল দিন-
পনেরো আগে । এখন একটু, দু'খ হিলেন । ডাক্তার
সেন খুব দাবধানে রাখতে বলেছেন ।

হোট্ট হোসে প্রাপেন চোখের পড়ছে । কুকুরের বক
সব, তাই টিরিকে ও নিজে হাতে খাওয়ার, চান ওগার ।
টিরিকে কাগো কাছে দিবে ওর বিশ্বাস নেই । টিরি
ওর খুব অসংগত । আজ কদিন টিরি বিশ্রোচী হয়ে
উঠেছে । বাবের অদৃশ হওয়ার বববরা হয়ে পড়েছিল
প্রাপেন । টিরির চিংকার বাবের বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাতকে
ও কিছুতেই বন্ধ করতে পারছে না । আদর করে,
কুকুরে, কিছুই হচ্ছে না । প্রাপেন রেগে চিংকার বন্ধ
করতে গিয়ে ছোরে গলা টিপে ধরে টিরির । কতটুকুই বা
টিরির প্রাণ ।

বিশেষ হেনা ব্যানার্জী' প্রাপেনের এইদর কাত দেখে
উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন । পরীক্ষা দ্বারা একটু
অজান হয়ে পড়েছিলেন ।

যানিকটা দু'খ বোধ করে চোখ চাইলেন বিশেষ
ব্যানার্জী' । ডাক্তার সেনের আদরার পর হতেছে ;
প্রাপেনকে মৃত টিরিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে বললেন



○ তারাগ্রন্থ অক্ষরচী

দিয়ে । ঘরের সেওখাল, ডানদা, পুজা, পিছানার
বেড কভার পরদার পক্ষে সবুজ রঙের বেশা ধরে
আছে । ঘাটের ওপর বিশেষ ব্যানার্জী' পড়ে । মাথার
দিকের ছোরে প্রোকেশের ব্যানার্জী' বলে আছেন ।
অন্য একটি ছোরা বিশেষ ব্যানার্জী'র শরনে রাখা ।
ছোরাটি অপেক্ষা করছে ডাক্তার সেনের ।

ডাক্তার সেন এসেন । এগুতাবিন করে জিজ্ঞেস
করলেন নার্সকে—পাল্পের এরকম ব্যাব্ধম্যাম অথবা
হল কখন থেকে ?

প্রোকেশের ব্যানার্জী' বলতে লাগলেন—সুশ্লেষা
বরাবরই বন্ধ দেখতে পারে না । মোহিত কুকুরটিকে
যেবে ফেলার সুশ্লেষার উত্তেজনা আসে বন্ধ দেখে ।
কুকুরটার নাকমুখ দিয়ে বন্ধ বেগুজিল ।

ডাক্তার সেন অগ্রাক হয়ে প্রোকেশের ব্যানার্জী'কে
জিজ্ঞেস করেন—সুশ্লেষা, মোহিত কৈ প্রোকেশ ?

প্রোকেশের ব্যানার্জী' ডাক্তার সেনের কথা শুনে
উঠে বলেন—ওঃ ! আর কি বলতে কি বলিছি, ভুল
হয়ে গেছে । সুশ্লেষা বর হেনা, মোহিত বর প্রাপেন ।

ডাক্তার সেন হেনা ব্যানার্জী'কে দেখে প্রোকেশের
ব্যানার্জী'কে তার চেম্বারে রাতি নটীর সময় অতি
অবশ্য দেখা করতে বললেন । বিশেষ উপস্থিত নামলে
গেছেন, তবে তাঁকে এখনও বিপর মৃক বলা যায় না ।

প্রোকেশের ব্যানার্জী'।
মৃত টিরির দেহকে
কোলে তুলে নিতে
গিয়ে প্রাপেনের
চোখের জল বরি
মানল না । বরি
ভেঙে টিরির দেহকে
এপর্যন্তে লাগল ।
সোজলার হকি-
গের ঘরে নিওন-
লাইট জ্বলে উঠল
—অমাবস্যার অন্ধ-
কার জান করে

প্রোকোপের ব্যানার্জী অক্ষিৎ হয়ে পড়লেন। ডাক্তার সেনের হাত ধরে বললেন—ডাক্তার সেন, আপনাকে ধন্যবাদ! সুস্বাদু বোতাল রক্ত বহ, খুন নয়, যা হলো ও বোঁতে উঠবে।

এখন দর প্রাপ্তি করে এসে বাক্স। সে ধাঁধিল। কি এক দুর্ভাগ্য যুক্তই অবতরিতার আশ্রিত থাকে পাশের করে দিগেছিল। তার যুক্তি দ্বারা সে গিলিত হতে পারেনি। টিকিৎসে ঘেরে কেসেছে পাশের হতে গিয়ে, বেগে কেসবার উদ্বেগ নিয়ে নঃ। তার ইন্দ্র কাতো বারের বিশপ ঘনির্বে এস। অসুখোচনার দর্শন্য হতে পড়ছিল। ডাক্তার সেন তাকে বোঝাতে আসলেন।

প্রাপ্তি তার অসুখের কথা চাইল প্রোকোপের ব্যানার্জী বিশপ ব্যানার্জীর কাছে। প্রোকোপের ব্যানার্জী অসুখেরভাবে বলে উঠলেন—সোহিত তুমি ঘোষণা নও। আমি কিছুতেই তোমার সোখী বলতে পারি নে।

ডাক্তার সেন প্রোকোপের এরকম অসুখ অসুখের ভিত্তে তাঁকে ডেকে পাঠের ধরে নিয়ে সেলেন—আমাকে নিনে ব্যানার্জীর কাছে বসতে বলে।

—প্রোকোপ! সোহিত কে? সুস্বাদু কে? ঘরে এক আনাকে কিছু বলবেন? আনা কবি ঘনি ব্যাপারে গোপন করার কোন কারণ না থাকে তা হলো আমাকে বলবেন।

প্রোকোপের ব্যানার্জী বললেন—ডাক্তার সেন। ঠ জানি কেন আমার জীবনে কেসে আসা ঘিনের ঐক্যকে আত্ম পরিষ্কার দেখতে পান্ন—হেলা আর সেনের ভেতরে। আমি নিজেই দ্যাক্সাতে চেন্টা নাই। তারের ভুলতে চেন্টা করা। এত বেশী দুল হয়ে বাজে যে, হেলাকে চেন্টে গিয়ে সুস্বাদুকে হারান, প্রাপ্তিকে চেন্টে গিয়ে বোহিতকে। অসুখের চেন্টার কালে পল্লী আমার চোখের দাবনে ঘন ঘরে ঘনিয়ে। আমার ঘনে হচ্ছে আত্মকের গতি আমার জঘন অসুখ হাই।

ডাক্তার সেন প্রোকোপেরকে অসুখ করে বললেন—সে বোঁ। আর হাতে আমি আসনদের এখানে থাকব। পালি দ্বিৎস হব।

ডাক্তার সেন প্রোকোপের ব্যানার্জীর ঘুরে দিকে চেয়ে উদ্ভ্রাং হয়ে পড়লেন। নিতম্বতার হাতে প্রোকোপের ব্যানার্জীর ডাবার তরঙ্গ ধুলে ধুলে উঠবে। তিনি বলে চললেন—

আমি থেকে আর তরঙ্গ বহর আপে আমার গহনারী জির বহু শব্দন বিহি একদিন দূরালে এগে আমারে হাইকোটে' সেপনে হার্ডার ট্রায়াল দেখবার জন্য পীড়ানীড় করতে লাগল। ঘুরে আসানীট নাকি তার প্রতিবেশী একটি ঘুরক। ঘুরকটির নাম সোহিত চ্যাটার্জী। বহুত নতুন সোহিতদের পাড়ায় এসেছে। সোহিতের দলো ওর ভেমন আসান হয় নি। কেবল ঘুর চেনা হয়েছিল। কিছু দেখলুম বহুত আগ্রহ বেশী কোটে' বাবার।

দূরাল দাড়ে নটার সামরা বাড়ী থেকে বেরুলুম। তখন আমার এই বিভন স্ট্রীটেই আমারে বাবলা বাড়িতে থাকি। বহু থাকে স্ক্রিয়া স্ট্রীটে।

নটার হাইকোটে' পৌঁছলুম। সেপন কোটের ভেতরে গিয়ে বসলুম। বহু আমার ইগারায় সোহিত চ্যাটার্জীকে দেখিয়ে গিলে। সোহিতের দিকে চাইতে দৃষ্টিতে চোখোচোখি চল। তার চোখের আত্মজাতের দ্বাপ বাধন। দেখতে দৃষ্টি। বহু বোহিতের শব্দন, আমার শব্দন চাক্ষুশ কি পীড়ন। ঘুরে আসানী বলে কি জানি কেন, আমার ঘন তাকে কিছুতেই ঘেনে নিতে পারছিল না। আমি হাতে হাতে আমার অজান্তেই তার দিকে চেয়ে ফেলেলুম। সে ঘন কত ঘিনের পাণ্ডিত। তার চোখ যে কিছু বলতে চাইছে, আমার দাবার এই দাক্সা করে করে ঘেনে বল।

দূরালী কৌশলী কেন, ওপনিং করে ঘুরে যাক্সার একটা দ্বিৎস দাবেই আর জুরদের চোখের দাবনে ভুলে ঘরতে লাগলেন।

—বাই দূর! আসানী সোহিত চ্যাটার্জী এককোরার দাবি ব্যাক্সিট্টে, দাবনের কাছে শাকির করেছে—সে ঘুরী। তবুও কি দৃষ্টিগতভাবে আপে থেকে ঘুরে চেন্টা করে আসানী তার দাবা বহু শোভন দ্যাক্সারিক ঘুর করে, সেই ঘটনাই হানদী ঘুরক এক জুরী হওয়ারের কাছে বিবৃত করাই।

[illegible]

শোভনকে ধন করার মূল কারণটি একটি নারীর প্রতি
মোহিতের প্রদল অংকণ। যে নারী মনে মনে শোভনকে
স্বামীরূপে গ্রহণ করেছিল। তাদের মৃত্যুনের বিয়েরও
ঠিক হয়ে গিয়েছিল। নারীটি দুর্বলী, শিকিতা, দুঃখী
—কুমারী অনিলা চোটাভাণী। অনিলার বাড়িতে
দুঃখই আগত প্রাণ যোগ। শোভনের প্রতি অনিলার
আকর্ষণই মোহিতের মনে প্রতিচ্ছিন্ন। আগুন জ্বলে
দেয়। সেই আগুনে শোভনের মৃত্যু হয়। আসামীর
হাত থেকে বাঁচার জন্য অনিদাকে বেছে নিতে হয়
আত্মহত্যার পথ।

মৃত্যু অবিলম্বে ঘটাতাত্তরীক বা সুবিলম্বে ঘটাতাত্তরীক জীবনিয়েছেন—মৃত্যুর দিন ঘোষিত ভাষের মতকার্য বাবর হুটীটে বাজতে এসে গেছেন সেখানে দাঙতিনিহের মধ্যে এসেছিল কি না; খোঁজ করে। পোড়ন গভতান এসেছিল বলাব সে অবিলম্বে হলে দেখা করতে চায়। অবিলম্বে তার সাথে দেখা না করতে চলে যায়। রাত্রি নটার পর কের এসে অবিলম্বে দেখা করবার জন্য বলতে সুবিলম্বেকে অবিলম্বে করতে থাকে। সে সময় ঘোষিতের চেয়ারর একটা ভীল অধিরতা কুটে উঠছিল। সুবিলম্বে অবিলম্বেকে একবার দেখা করতে বলেন। অবিলম্বে অত্যাধী দেখেও মারের ব্যাধিরিতে নীচে গিয়ে ঘোষিতের সঙ্গে দেখা করে।

একটু পরেই দু'দলিনী নীচে থেকে অনিবার্য কান্নার
 আওয়াজে ওপর থেকে নেমে গিয়ে জেথেন, মোহিত
 দেখানো নেই। অনিলা শিশির রেলিং ধরে কাঁদছে।
 দু'দলিনী অনিলাকে ধরে নিয়ে এসে ব্যাপার কি জানতে
 চাইলে অনিলা পোকে ভেঙে পড়ে। পোড়নকে মোহিত
 বুন করেই তাকে ছানায়। অনিলা পোড়নকে দেখতে

যেতে চায়। সুন্দরীরা সাথে যেতে চাইলে অনিলা বাধা দেবে। বলে—ক'দিন ধরে কত হচ্ছে। বাইরে বেরুলে বাচ্চবে। অং যেতে—। সে এতদিন কিংবদন্তি আসবে। কিন্তু সেই বাণীই অনিলায় শেষ বাণী। আর কিংবদন্তি আসেনি। একদিন পর দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার ধারে তার হস্তরেখাটি ভেঙ্গে গঠে।

শোভনের বেশ বর্ণিলাগোটেই সন্মিলনের প্রাণ
বাঁধি : সন্মিলনী অঙ্গ বহলে বিবাহ জন একত্র হয়ে
অঁদলাতে নিবে । ভাণ্ডার ভীক জানান, যোবার হারে
সমস্ত সম্পত্তি নিম্নার হয়ে থাকে । তাঁর আর সেখানে থাকে
চলে না । সন্মিলনীর স্থানী সজ্জা চ্যাটাতীর সঙ্গে
শোভনের বাবা সূর্য পাল্পালীর পুত্র বহুত ছিল । সেই
সূত্র বহু পত্নী সন্মিলনীকে শোভনের বাপে তাঁর দিহলা
ষ্টীটেই বাঁধি কাঁচে মক্তাগায় বাবুর ষ্টীটে একটি বাড়ি
ভাড়া করে রেখে যেন । সূর্য পাল্পালী সন্মিলনীর
সমস্ত ধন গোলাগেন । বাকে বাকে এসে বাড়িতে ফেরা
করতে যেতেন । শোভনও প্রায় সবই তাঁর সাথে থাকত ।

শোভনের আর অনিলা দু'জনে ভালবাসার সন্ধানে বসি-
ছিল। শোভনের সঙ্গে বোহিও অনিলাদের বাড়ি
যেত। বোহিওর সব জ্ঞান করে আশপিত্য বিদ্যার
ইচ্ছা ও অহংকারকে অনিলা বোহিওই পছন্দ করত না।
শোভনের সকলের ওপর প্রীতি ও শিশু-রত মনঃ ভাবের
কাছে অনিলা হৃদ হের যেত।

হৃদয়। এই সমস্ত ঘটনার পরিষ্কার হয়ে থাকে—
অনিলা শোভনকে ভালবেসেছিল। রোহিত শোভনকে
অনিলার হন থেকে সরাস্তে চোখা করে সরাস্তে পারেনি।
সে নিজেই অনিলায় হন থেকে সরে থাকে বৃত্তে সে
ভাষ্য হয়ে ওঠে। শোভনকে হন করার বড়সড়
কনতে থাকে।

শোভন এবং বোহিভের বহু বিকাশ বঙ্গের কাছে
শোভনকে বহু করার চেষ্টা যে আগে থেকে হয়েছিল
এটিরই মতো পাওয়া যায়।

পোকন, যোহিত বহুশূরে বেড়াতে যাবার সময় বিকাশও গুহের সাথে যেতে চায়। যোহিত রাজী হয় না। আরো জানা যায় যে, বহুশূরে দাবার তিরহুনি আগে যিকেসের যিকে বিকাশ, পোকন ও যোহিতদের

বাঁকিতে গিয়ে এতের দেখা না পেয়ে অবিলাসের বাড়িতে
দৌড়তে যায় দেখানে নীচের বৈঠকখানার শোভন
দ্রব্যে বসেছিল। মোহিত হাতের আঙিন পটিয়ে
তার শব্দে এগিয়ে আসলে। বিকাশের কানে আওয়াজ
পেল—আবার হাতেই তোর শেখ এতদিন। বিকাশ ঘরে
চাকাতে মোহিত ভাতাভাতিক পিছকে সংবত করে
নিয়েছিল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে আপন ছোলা পিন্দুর বত
রল প্রাণ শোভন মোহিতের কুটবুড়ির জাদে আটকে
গড়ে। মোহিত তাকে বেড়ার আরম্ভের ভাবের
বসুন্দের বাড়িতে নিয়ে যায়। শোভন তার প্রিয় কুন্দের
অনিতেও পলে নিয়ে গিয়েছিল। বসুন্দের বাড়িতে
প্রায়ই একজন বান্ধি সেখানেও বসবার সোক থাকত।
তার নাম হুতাজ।

হুতাজের কাছ থেকে জানা যায়—মোহিত কলকাতায়
করে আসবার দিন সন্ধ্যা বদল হুতাজ শোভনের
সকাতা থেকে আসা চিঠি শোভনের কাছে দিতে যায়
সেই দেখে যে, বাবাসার কুন্দের তেলি মরে পড়ে আছে
তড়ি ভাঙে অবস্থায়। চোখ ঠেলে রেগিয়ে এসেছে। ছিঁত
রক্ত অবদি কলে পড়েছে। নাক রক্ত দিয়ে রক্ত রেগিয়ে
মকতে পড়ছে। মোহিত শোভনের পদা টিপে
রেখে। হুতাজ শোভন থেকে মোহিতকে টেনে ছাড়াতে
বাঁহিত তার অঙ্গকর্মে ঢাকা দিতে গিয়ে অজ্ঞানের ভান
য়ে হুতাজের বুকের ওপর অবশ হয়ে চলে পড়ে।
হুতাজ নতি ভেবে তাকে ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে ঘাটে
দুইয়ে দেয়। শোভন অজ্ঞান হয়েই ছিল। শোভনকেও
তার ঘাটে পুঁইয়ে দেয়। সে সময় হুতাজ না এসে
কলে দর্শন পতনই ঘটে যেত।

কশিট অজ্ঞান ভেঙে মোহিত উঠে হুতাজকে
জেনে করে—শোভন কোথায়? কেন কিছু হয় নি।
কুন্দের কথা কাটাকাটি ও রহস্য উদ্ভেদনা বিপিয়ে
কটা সার্বিক স্বাভাবিক হাসকা ব্যাপার। হুতাজ
বাঁহিতকে শোভনের ঘরে নিয়ে যায়। মোহিত হুতাজকে
য থেকে চলে যেতে বলে। একটু পরেই হুতাজের
য়ে গিয়ে জানায়, সে এখানে কলকাতায় চলে যাচ্ছে।

তার পরের ঘটনা বাকী

দৃষ্টিতে। আসামী কলকাতায় চলে আসতে বাধ্য হয়
হুতাজের চোখ এড়াবার জন্য।

পরের দিন কলকাতায় শোভনের বাড়িতে হুতাজ
শোভনকে পৌঁছে দিয়ে যায়। মোহিত শোভন
কলকাতায় এসেছে কেনে কেন তাকে বসুন্দের মৃত্যুর
দুঃখতে থাকে। ঘটনার সত্যি ঘটনা মোহিত শোভনের
বাঁকিতে যায়। শোভনের বসুন্দের মৃত্যুর কাছ থেকে
ছিল না। মোহিত শোভনের ওই প্রকার মৃত্যুর সন্দেহ
এক করে।

শোভনের ছোট ভাই পরিষদের কাছ থেকে জানা
যায়—ঘটনার সময় সত্যি ঘটনা সে শীটে বৈঠকখানার
বসে ছিল। সে দিন বতরান ছিল। বাড়ির সকলে
বেড়িয়ে তখনও কিয়ে আসে নি। ওপরের ঘরে কিছু
ভাঙি জিনিষ পড়ার মধ্যে পরিষদ বৌড়ে ওপরে যায়।
অন্য ঘরে কিছু পড়ার চিহ্ন না দেখে উত্তরের ঘরে
শোভন যেখানে থাকত সেই ঘরে ঘরে দেখে—টেবল
কান টেবল উটে পড়ে গেছে। শোভন মেঝেতে
পড়ে আছে। মোহিত তাকে উপড় হয়ে তেলে বসেছে।
সে কাছ থেকে মোহিতকে ওঠায়। মোহিত আবার
বসুন্দের চোখে অজ্ঞানের ভান করে নিয়ে পড়ে।

শোভনের পদা থেকে গিয়ে রক্ত পড়ছিল। বুক,
শেটে, বাবার আঁখাতের চিহ্ন ও নাক রক্ত দিয়ে রক্ত
বেরছে দেখে সে ভয় পায়। কোন করে তারের ক্যারিদি
ভাকারকে ধর দেয়। ভাকার এসে শোভনের আর
জান ক্ষোভে পড়েন নি।

আসামী মোহিত শোভনকে বুক পেটে পদার ও
মাথার মাথারক ভাবে আঁখাত করে। ঘটনার ব্যাপারে
বেশ স্পষ্টই যোজা যায়, শোভন আত্মহত্যার পর থেকে
বেহুবার চেষ্টা করে।

মোহিত তাকে আটকায়। বাজাবাঁকিতে ঘরের
টেবল, টেবল কান উটে পড়ে যায়। আসামী
পিকার হাতের নাইয়ে চলে যায় দেখে, শোভনকে টেলে
কলে দিয়ে তার ওপর নিষেধ সময় দেহের ভারে তেলে
যায়। শোভনকে টেলে টিপে টিপে মাথার ভাঁস
আঁখাতও শোভনের হুতাজ কাশন বলে উল্লেখ আছে।

মোহিতের কলকাতায় বাড়ির চাকর অর্ধমের জায়

থেকে বানা বাথ ঘটনার রাস্তে বটী বাজার কিছ্, দূর আসে মোহিত বাড়ি থেকে বেগিয়ে যায়। পরে যখন ফিরে আসে মশে চোখে এক উদ্ভেকতার ভাব নিয়ে তাকাতাড়ি ওপরে উঠে যায়। তিন তলার ঘরে গিয়ে বরষা বন্ধ করে দেয়। বানিক বাসে আবার বেরিয়ে যায়।

মহেশ্বর থেকে শোভন ফিরে আসবার পর, অনিলায়ের বাড়িতে কখন যায়, মোহিত সন্ধান নিতে থাকে। ঘটনার দিন সকালে অনিলায়ের বাড়ি এসে যখন পোনে শোভন হাস এসেছিল তখন সে অনিলায় সঙ্গে একটা হেভনেত করবার জন্যই অনিলাকে ডাকে। কিছ্, অনিলা মোহিতের প্রতিহিংসার ব্যাখ্যার—মহেশ্বরের ঘটনা শোভনের কাছে সব নিজরই শুনিয়েছিল তাই সে দেখা করতে চাই নি। এতে আসামী ভেবে ছিল প্রতিহিংসী শোভন থাকতে অনিলাকে পাওয়া মুশকল। তাই সেই রাতেই সন্ধ্যাে শূন্যে শোভনকে খুন করে। শোভনকে খুন করার পর ধারণা হয়েছিল, অনিলা তার কাছে ক্যাডা স্বীকার করে তার দলপেই চলে আসবে। এই কারণে শূনের পর অনিলায় কাছে কের যায়।

অনিলা মোহিতকে প্রভাখ্যান করে বোকে, মোহিতের হাত থেকে বাঁচতে সেলে ডাকে হয়ে বাঁচতে হবে। সেই জন্য সে শোভনকে দেখতে থাকি বসে, সেই রাতেই বরষের পথে বেরিয়ে পড়ে।

মোহিত যখন অনিলাকে তার ক্যাডা স্বীকার করতে পারল না তখন নির্যাস হয়েই থানার এসে আত্মসমর্পণ করে।

পর পর এই সব ঘটনার দেখা যায় আসামী মোহিত শোভনকে খুন করার অপ্রাণ চেষ্টা করে। এমন কি যখন সে বুঝেছিল, শোভনের দেহরক্ষী সুকুর জেঁদে বৈঠে থাকতে অসুবিধা আছে তখন তার পথের কুটি জেঁদেকেও দ্বিগুণ থেকে চিত্তরে গরিয়ে দিয়ে নিশ্চলক হতে চায়। তাই মহেশ্বরের বাড়িতে শোভনকে প্রথম বার খুন করার চেষ্টার আগেই সে জেঁদেকে ঘেরে ফেলে।

চারটে বাজল। কোর্ট বন্ধ হল। অবসর মন নিয়ে বাড়ি ফিরলুম।

প্রায় ষাট বটীর ডিমলাইট কেন্দ্রে বিহবার পুরে পুরে কোর্টের ক্যাই ভাবিহ, হঠাৎ বরষার দিকে চলে

দেখি, মোহিত চ্যাটার্জি' নাড়িয়ে। আমি অবাক হয়ে শেলু, শূনের আসামী এখানে কি করে এল। তাড়ি-তাড়ি বেতস্ট্রিট চিলে জোর আলো জ্বাললুম। দেখি, কেউ নেই। বনের ভুল হকতো। লাইট নিভিয়ে শূরে পড়লুম।

সকালে উঠেই বহু শূনের চিন্তা হতে লাগল। কখন বহু এসে কোর্টে নিয়ে যাবে। থাা দরতে বহু এসে নিয়ে সেল।

জজসাহেব মোহিতকে জিজ্ঞেস করলেন—কিছ্, বলবার আছে, সোশী কি নির্দেশ?

মোহিত চ্যাটার্জির মূখ থেকে নিভীক উত্তর বেরিয়ে এল—সোশী।

কোর্ট জাম্ভিত। আমার কলর মূখেই মূচড়ে ভেঙে পড়ল। মোহিত একি করল। তার নিজের মৃত্যুদণ্ড নিজেই বরণ করে নিল।

মোহিতের দিকে চলে দেখি, সে আসেকার দিবের মত আমার দিকে চলে আছে। মূখের ভীতির, অপর্যাপ্ত কোন চিন্তাই কূটে ওঠে নি।

দরকার পক্ষের সাক্ষীর দৃষ্টি নেওয়া হল। সে দিন বাড়ি ফিরলুম আমি নিজেই কানির আসামী হয়ে।

কিছ্, ভাল লাগছিল না। রাতে শূরে শূরে এক বানা প্রাণ কাহিনী পড়বার চেষ্টা করছিলুম। শূও আসছিল না, পড়ারও মন বসছিল না। এই বক্স অবস্থা। কে বেন কাছে এসে হাঁকাল। চলে দেখি—মোহিত! একি! কেন, তুমি এলো? আমাকে কিছ্, কি বলতে চাও? নিরুত্তর মোহিত তার হাত ধ'খানা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। আত্তে আত্তে এগিয়ে আসতে লাগল। আমার গলায় তার হাতের জোঁদ, অনুভব করতে লাগলুম। দম বন্ধ হয়ে এল। ততনা হায়াবায় উপক্রম হন। হঠাৎ কুলদানি ভাতার আগুয়াকে জান ফিরে শেলুম। জ্রোং টেবল থেকে একটা বেডাল পাকিয়ে পড়ল। বেডালটার হাজার কুলদানি পড়ে গিয়েছিল। সারা রাত বড় অবশিততে কাটল।

সকাল হতেই কোর্টের আকর্ষণ বেড়ে উঠল মূ'শূন।

দরকার পক্ষের সাক্ষীর জেরা শেষ হল। জজ

মুহুরে আবার মোহিতকে জিজ্ঞেস করলেন—সোণী কি নিশীথ ? মোহিতের প্রথম উত্তরই বেরিয়ে এল সে ব্যারও—সোণী ।

কোর্টে শাকীরের শাস্ত সবতাই তার বিরুদ্ধে প্রমাণ হয়েছে । তার নিজের স্বীকৃতিও বিপক্ষে অনুকূলে ।

মোহিতকে বাঁচাবার আর কোন উপায় নেই, এই চিন্তা করতে করতে বাড়ি ফিরলুম । নাথেরই হাতে শূণ্যে পড়েছিলাম ।

আমি বৃদ্ধর ব্যবহার বোধ হতে লাগল, কার বরকত্বা ঠাণ্ডা হাত গলার ওপর চাপে বসেছে । মাথার ওপর কার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে । আমার নিশ্বাস কণী হয়ে আসতে লাগল । ভয় রেশান অদ্ভুত অলপট আগ্রহ গলা থেকে বেরিয়ে এল ।

নিশীথার বোকা, বোকা ডাকে ও হাকার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে গেলুম । নিশীথরা আমারের বাড়ির পুরনো লোক । বাগ্গা দেখার তত্ত্বাবধান করত । আমি বাই নি বলে নিশীথরা আমার কাছে এসে বসে ছিল । আমার অনুষ ভেবে মাথার গারে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল ।

আমার দুর্বলতার জন্য দু'ব লক্ষা গেলুম । গলা বুক পুঁকিয়ে গিয়েছিল । নিশীথার কাছে এসে চেয়ে বসলুম । তাকে সব বললুম । সে বললে—নাথের হাতের ঠাণ্ডা হাওয়া আর কোর্টের ব্যাণার বিশেষ একটা ভয়ের ছবি তৈরী করে ছিল । আমি ভাবলুম, আমার স্মারক সৌবশ্য ব্যাধি হয়েছে । ডাক্তারের কাছে যেতে হবে ।

মোহিতের বোধ আমারের দু'বছরকে কোর্টে টেনে নিয়ে গেল । মোহিতের দিকে চেয়ে দেখি, তার হাসি-খুশী ভাব । আমি আতঙ্ক হলাম হাতে না-খুঁষিয়ে খুঁষিয়ে আমার মনোবিকার হতে চলছে আর মোহিত বরণের সাথে আলিঙ্গনের জন্য মনের আনন্দে ডাসছে । সবক'র পক্ষে কৌশলী শেষ আরসুসেন্ট কলম্বেন—মোহিতের ঘটনার নভাবতার স্বীকৃতিতে এবং সারকম্পট্যানশ্যাল এভিলেল থেকেই নিখুঁত ভাবে প্রমাণিত হচ্ছে—মোহিত প্রকৃত সোণী—খুশী ।

অবশেষে জুরীসের ভারীভট আনতে চাইলেন ।

জুরীসের কোয়নাম উঠে জানালেন—গিল্টি । অবশেষে মোহিতের বৃত্তান্তের আদেশ দিলেন ।

আমি প্রিয়জন বিরোধ ব্যাধা বোধ করলুম । মোহিতকে দেখলুম, তার চোখ আমার কাছে ডাকছে । আমি মোহিতের দিকে এগিয়ে বাচ্ছিলুম । মশন স্পেন থেকে টেনে নিয়ে গেল ।

বন্ধুকে পথে বললুম, ছেলেতে অদ্ভুত কণীর আসে যে কোন প্রকারে মোহিতের সঙ্গে আমার একবার দেখা করিয়ে দিতে । বন্ধু হরত আমার মনের অবস্থা কিছুটা বুঝতে পারেনি । আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমন্ত্রণ করল ।

কণীর আসে পথিক আমি যোজ হাতেই একবার করে মোহিতকে আমার কাছে আনতে দেখিছি । ডাক্তার বাবুসের কাছে গেছি । তাঁরা বলেছেন, মন মন ও রকম কম্পনার দু'ব দু'ব তৈরী করে নিয়ে অব্যক্ত ঘটনা দেখতে থাকে । বলেছেন মনের কোণ করতে মোহিতকে ভুলে যেতে । আমি ভুলতে গিয়ে আরো ঝড়িয়ে পড়েছি । নিশীথরা আমার ঘরে যোজ শোষ । তবুও মোহিত এসে ঝড়িয়ে থাকে কিছু বলবার জন্য । বলা হয় না, চলে যায় । আমার আসে, আমার যায় ।

কণীর আসার দিন বিকেলের দিকে মশন এসে আমাকে বললে—অনেক চেষ্টা করে ছেলার সাহেবকে বয়ে ডিচ্টিরি হিসাবে জেল দেখবার ব্যবস্থা করে এসেছি । এখনি যেতে হবে ।

আমি সে অবস্থার ছিলুম, সেই অবস্থারই বেরিয়ে পড়লুম ।

ছেলার সাহেবের সঙ্গে মশন, আমি জেল দেখতে দেখতে মোহিতের ছেলের কাছে এলুম । একটি লেপশ্যাল সেনট্রী দেখানে পাহারা দিচ্ছে । আমার গিয়ে ঝড়িতে মোহিত ছেলের ভেতর থেকে হেলি এর কাছে আমাদের দিকে এগিয়ে এল । হাততে হাঙ্গতে বলল—আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য অস্থির হয়ে আছি । আপনার নাম ঠিকানা জানি না, না হলে খবর দেওয়াচুম থাক, আপনি এসেছেন ভাল হয়েছে । আপনাকে প্রথম দেখে আমার মনে হয়েছিল, আপনি কিছু জানতে চান আমার কাছে । কাল আমার শোভনের

সঙ্গে দেখা হবার দিন। আমি অপেক্ষা করছিলাম—
আপনার জানবার ইচ্ছা পূর্ণ করতে। বহু দূরে এসে
আমাকে বাঁচিয়েছেন।

আমি ভাবছিলাম, কাল ভোরে এর বেঁচে থাকার
কোন লক্ষণই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মোহিত বলতে শাপল—আপনাকে দেখে অরণ
আমার এই কথাটিই বার বার মনে হয়—আপনাতে
আপাতে আত্মিক বোঙ্গদ্বারা বঁচা। আমি আপনার
ভেতর আমাকেই দেখেছিলাম।

কেটে প্রথম দেখবার পর থেকেই রোজ আমার মন
আপনার কাছে চলে যেত। শোভনকে যেটুকু জানাবার
প্রয়োজন ছিল, তাকে জানাতে গিয়ে বলতে গিয়ে পারি
নি, কেবল নিষ্ঠুর ভাবে ঘেরে কেলেছি। জানাবার
কথা কাউকে বলতে চাই নি। বাক্যে জানাবার ভার
কাছে কাল গিয়ে জানাব। দেখানে আশা করছি সে
আছে, দেখানে যদি তাকে না পাই তাই আপনাকে
জানিয়ে মনের ভার হালকা করতে চাই। আমার কাঁদার
পর আমার লাল্য অশিত চ্যুতাকাঁচি কাছে গিয়ে বলবেন,
তিনি তুমি হারের ঘরের তোষকের ভেতরে একটি
ডায়েরী আছে, তিনি যেন সেটি আপনাকে দেন।
তোষকটির হাতখানের দেলাই কেটে ভেতরে একটু হাত
দিলেই ডায়েরীটি পাওয়া যাবে। যা হারা যাবার পর
থেকে আর এক বছর মায়ের ঘরে কেউ থাকত না।
স্মরণে স্মরণে আনিই যেতুম। খুঁটি অন্য সময় বন্ধই
থাকত। বন্ধ শোভনের ছোট ভাই পরিসরকে ডাকার
নাম, বললেন—শোভন হারা গেছে, আমি ছোট্ট
শোভনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে আমি অনিদারের
বাড়ি। দেখান থেকে আবার বাড়িতে এসে একটু
থেকেই থানার ঘরে আত্মসমর্পণ করি।

জেলখানা থেকে পথে বেরিয়ে যেন হল যেন
মোহিতকে অলস চিত্তার নিজ হাতে শূন্যে দিয়ে এলুম।
গতে ছুঁ হন না। সকালে মোহিতের কথা মত তার
দাদা অধস্তের কাছ থেকে ডায়েরী নিয়ে এলুম।

ডায়েরী দেখবার নিয়ম মত মোহিত ডায়েরী দেখে
নি। সে যেন ডায়েরীর পাতার কেবল নিম্নেকেরই
বিশ্লেষণ করে গেছে।

—আমি এমন পরিবেশে মানুষ দেখানে কতটুকু
অভিমানটাই বেশী। দাবান্য দ্বারা পূরণে বাধা হলে
অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য একজন অপেক্ষে বহু করতেও
থিরা করে না। ছোটবেলা থেকে এই পরিবেশের ছাপ
আমার মনের কোণে আমার অজান্তেই এঁকে থাকিল;
মন ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে উঠছিল। আমি কয়েক কতটুকু সত্য
করতে পারতুম না। বার পিট বসডা নিয়েই থাকতুম
অধিকাংশ সময়। কেউ আঘাতে আহত হলে, আমাকে
অব্যয় তৃপ্তি করলেও বহু আনন্দ পেতুম। তাবতুম
এটা আমার ব্যাধিগ্রস্ত। এতে আমার এগোবার পথ
অন্ধকারে ছেয়ে আসতে লাগল। দবার সাথে নিম্নেকে
মেলতে পারতুম না। কেউই আমার তাকের কাছে
পেতে চাইত না। আমার প্রতিহিংসা জাগত। অত্যাচারী
হয়ে পড়তুম। অকারণে অন্যায় ভাবে অন্যের অশুভ
করবার বাসনা জাগত। বিচার, স্নেহ, ধৈর্য, সকলকে
আশ্রয় করে নেবার ক্ষমতা আমার মনোহারা থেকে সরে
গিয়ে ছিল।

শোভন এমন পরিবেশ থেকে এসেছিল দেখানে
নিম্নেকে সকলের সাথে বিলিয়ে দিয়েই তৃপ্ত। অপরের
আনন্দে আনন্দ। অপরের দুঃখে দুঃখ অনুভব। শোভন
আমাকে তাদের পাশ পরিবেশের মধ্যে টেনে নিয়ে
গিয়েছিল। নতুন, শক্তকারী, আত্মত্যাগী পরিবেশের
দৃষ্টি মনের ভেতর গিয়ে আমার আহিত-অশান্ত ভাবগুলো
প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে ছুঁরিয়ে পড়ছিল।

শোভনের বাবা দৃষ্টি গাঙ্গুলীকে আমি কাকারাবু
বলতুম। কাকারাম অনিদার সঙ্গে শোভনের বিয়ের
ঠিক করে কেলেছিলেন। অনিদা আমাকে দাদা বলত।
আমি তাকে ছোট বোনের বত দেখতুম।

অনিলাকে বহুদিন হারিষ্ঠাটীর মধ্যে রাসাতে গিয়ে
বলেছি—শোভনটা একটা জড়পদার্থ, আমি একটা দল
জীবন্ত মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে অনিদা প্রতিবাদ করেছে—
আমার কথা ভিত্তিহীন, আমার প্রত্যয়ে তার অতিশয়
বৃদ্ধা হয়। শোভনের অতিশয়ে তার সকল সত্তা নতুন
করে জীবন পায়—এক প্রাণ শত প্রাণ হয়ে। আমি
তারই এই প্রীতিতে বহু আনন্দ পেতুম।

হাস তিনেক আসে, টাইফয়েড হয়ে শোভন হানাদাপন্ন

হয়ে ছিল। তখন অনিন্দা আমাকে বলেছিল—শোভন হারা গেলে সেও হারা যাবে। সে যাচতে পারে না। ঘর যাচে তা হলে আত্মত্যাগ করবে।

হবে হলে শূন্য কামনা করেছি—এসের বেন তেমন অশূন্যত্বিন কোনদিন না আসে।

চাইকিওঁতে থেকে গেলে ওঁর পর হারানতেনেক হয়ে গেল কিছ্র শোভনের পরীত হ'ব মল হল না। তার পরীতটা হ'ব তেতে গিয়েছিল। পরীত সারাবার জন্য আমাদের বহুশূরের বাড়িতে যেতে বলায় শোভন রাজী হ'ব। অনিন্দা শোভনকে বুঝিয়ে দিলে দাবার জন্য। আমি বলেছিলুম, ঘর ছুই নাই ঘাস তা হলে আমার হাতেই তোর শেষ একদিন। বিকাশ সে সম্ব এসে পড়ার সেদিন আমরা বহুশূর দাগার পর্ব স্থগিত করে গ্রাণি। পরের দিন বুঝিয়ে, অনুন্নয়-অভিমান করে, রাস সেঁধিয়ে তবে তাকে রাজী করি। আমাদের বহুশূরে বাবার কথা শুনলে বিকাশ যেতে চায়। আমি রাজী হইনি কেন না শোভন আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল, আমি ছাড়া অন্য কেউ সেলে সে যাবে না।

শোভন তার প্রিয় অষ্টেলিয়ান কুহুর জেনিকে সঙ্গে নিয়েছিল। জেনি তার কাছে একমাস বসে এসে ভিন জ্বরে পড়েছিল। বহুশূরে আসার পর জেনির পরীতটা ফেল দাগান ব্যাছিল। তাই তাকে বাড়িতে রেখেই রোজ সকালে আমায় বেড়াতে বেরুতুম।

একদিন সকালে বেড়ার সময় চলার পথে আমরা একটা পোকাবহ বটবার সামনে পড়ি। একটি ইঁদুরার আট ন' বছরের মেলে পড়ে গিয়ে রাসা সেয়ে। তাকে ইঁদুরা থেকে তুলে চারখিক ঘিরে তার বাপ-মা, আত্মীয়জনরা বসে আছে।

মেলেটা একটি -ঝাক্সায়ে। কিয়েন্দাল বলে নবাই ডাকে। বৈদ্যরাজ জী তার হারের পেটের সোলমাদের জন্য রাজা সাহেবের কলারের পাশের ইঁদুরার জল এক সোটা করে সারা দিনে খেতে বলেছেন। কিয়েন্দাল রোজ সেই ইঁদুরা থেকে জল নিয়ে আসত। একদিন রাজাসাহেবের রাণী মেলে ওকে 'হ'ব হারে। রাজাসাহেবের কুহুর। ও জল খািক

ইঁদুরাটি তার বাগানের গারে। বিনও ভিনি ইঁদুরা করান নি, কোন মূলে কে যে এই ইঁদুরা করিয়েছিলেন তার নাম আক বিশ্বাস্তির অতল তলে।

বিশেষতঃ কিয়েন আবার জাতে জোন। শ্রীমতী রাণীসাহেবা ঘর পোনেন, জোন ইঁদুরা হুঁয়েছে, তা হলে ও ইঁদুরা হুঁয়েই নেওয়াবেন সঙ্গে সঙ্গে। হালীরও চাকরী যাবে।

কিয়েন্দাল হার খেতে ওখারে আর না খেতে হুঁদিন হয়ে তাদের বাড়ির কাছে, একটা ভাড়া ইঁদুরা আছে সেখান থেকে জল আনে। বৈদ্যরাজ জীর হতে সে ইঁদুরাটির জলও খািক ভাল। এই ইঁদুরারই জল আনতে গিয়ে আক পাড় বগার সঙ্গে কিয়েন্দাল ইঁদুরার তেতর পড়ে যায়।

শোভন কিয়েন্দালের বাবার হুঁখে সব শূনে হুঁ হুঁখে গেল। পকেটে সোটা মসেক টাকা ছিল, কিয়েনের সংকালের জন্য তার বাপকে ধিয়ে দিলে।

হাতার আসতে আসতে আমরা বদতে লাগল—জল, বাতাস, মাটি, আলোর ওপর ব্যক্তি বিনেবের অধিকার থাকে কেমন করে! এসের এ অধিকারকে নষ্ট করতে সেলে রাজা সাহেবের বত পোকের বোকাতে হবে যে অধিকারকে তাঁরা ব্যক্তিগত মনে করেন সেটা সকলেরই সমানভাবে প্রাপ্য! ঘর তাঁরা একথা বোঝেন, তাঁদের স্বাধিক্ত সবার মনোরাজ্যে চিরদিন। মোহিত! অবচল অন্যান্য স্বার্থে' অস্তের হুঁত্ব সেখবার জন্য বশেন্দা করছিলুম। আমি না তা মেখে যেতে পারব কিনা। সাহাব্য বোকার তুলে আক এক সরল পিশু যে, ভবিষ্যতে হুঁযোগ সেলে হুঁতে সেপের রস হুঁতে পারত, -তা'র অকাল অপঘাত হুঁত্ব হল। নির্দ'র মনের কাঁস হুঁতে ইচ্ছে করে। শোভনের সমস্ত পরীতে জলে থাকা কথ্য সাক্ষ্যতে না গেলে বর বর করে কাঁপছিল। আমি তাকে ঘরে না কেলসে, পড়ে যেত। একে হুঁব'ল পরীত। হুঁবে চল শোভনের হুঁখে যেন বক্ত দেই, সারা হয়ে সেয়ে। তাকাতাড়ি বাড়ি নিয়ে এসুম।

সন্ধ্যার সমর বোতলার সারান্দার বলে আমি, বর থেকে বেরবার দরজার গারে জেনি শূরে। শোভন খেরে তেতর থেকে সারান্দার বেরতে গিয়ে জেনির পেটের ওপর পা

দিয়ে বাড়িয়ে কেলে। জেনি ওর পায়ে কানড়ে হয়ে গেলো করতে থাকে। শোভন ছেড়ে দিতে বলে। কিন্তু জেনির কাছে আর যেন শোভন অপরচিত। শোভনের পায়ের দিকে চেয়ে দেখি রক্ত পড়ছে। আমার মাথা কি বকম হয়ে গেল। আমি মৌড়ে গিয়ে জেনির গলা টিপে ধরলুম। কত ছোরে তা মনে নেই। তবে শোভনের বহুনিতে প্রকৃতিস্থ হলুম। প্রকৃতিস্থ হয়ে শোভনের বুকে বা শুনলুম তাতে আমার অকৃতিস্থ হয়ে উঠলুম। শোভন বলছে—মোহিত, হিঃ। তুই কুহুটাকে ঘেঁরে ফেলি। তোর মধ্যে ছুঁতর বুনী শিশুকে আর বুনী যুবকের মূশে দেখলুম। মোহিত তুই বুনী।

আমার ঘুমিয়ে পড়া আত্মাভিমান হঠাৎ জেগে উঠল। আমার ফিচার দুর্ভি ছার হাবল। আমি বললুম—কোর যদি তুই আমার বুনী বলিস তাহলে তোকে এতদিন বুন করব। সে বললে—একবার বলব—তুই বুনী।

ভারপর কি বেহুল জ্ঞানি না। একটু মনে পড়ে আমি শোভনের গলা টিপে ধরে ছিলাম। কিছুটা স্বাভাবিক অবস্থা কিরে এল বুদ্ধিমান আমাকে ধরে টানটানিতে। আমার যেন কেমন একটা দেশার ঘোর চোখে লাগছিল হায়ার মত।

মনের সম্পূর্ণ সামাজিক আদতে শোভনের ঘরে গিয়ে দেখি তখনও সে অজ্ঞান হয়ে আছে। তার কাছে বলে থাকি। জ্ঞান হতে সে আমার দিকে চেয়ে বলে—বেরিয়ে যা আমার কাছ থেকে! আমি আমার কৃতকর্ম লক্ষিত হয়ে পড়েছিলাম।

সেই রাতেই বন্দুর থেকে কলকাতার ট্রেন ধরি। ভেবেছিলাম শোভনকে আর বুঝে দেখান না। কিন্তু পরের দিন সন্ধ্যার দশন শুনলুম, শোভন গলে এসেছে তখন থেকে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য আশ্বিত হয়ে পড়েছিলাম।

একদিন, দুদিন করে হালি কোন প্রকারে উদ্দেশ্য আত্মা অকুরাকে নিয়ে কাটালুম। গাড়িধরের বিন মকাদ থেকে এক অরমনী আকর্ষণ শোভনের বাড়ির দিকে আমাকে ক্রমশঃ টানছিল। লম্বা এসে নারে নারে মাথা দিচ্ছে। আমি ভাবলুম, অনিলাকে সঙ্গে করে নিয়ে হুজনে শোভনের কাছে যাই। একলা বাজার

গল্ফাচ ভেঙে যাবে। অনিলায়ের বাড়ি যাই। অনিলা দেখা করে না। হরত আমার বিন শোভনের বুকে সে দন শুনছে বন্দুরের ঘটনা—জেনিকে সেও বুন ভালবাসত। রাস অভিমান হওয়া স্বাভাবিক। কিরে এলুম। রাত শোনে বটার আমি নিরবেকে কিছুতেই বশে রাখতে পারলুম না। শোভনের বাড়িতে গেলুম।

শোভন ঘাটে বলে কি ভাবছিল। হরত দেখে পুট জেনির নৃশংসভাবে মৃত্যুর কথা। হঠাৎ আমার দিকে নজর পড়ার সে বুন উত্তেজিত হয়ে উঠল। আমাকে বলল, বর থেকে বেরিয়ে যেতে। আমি তবু তাকে বোঝাবার জন্য কাছে এগোতে লাগলুম। সে উঠে থাকিয়ে বলল—বুনী! তুই চলে যা! আমার ভেতর থেকে শূন্যতা বাসিন্দা বেরিয়ে এল। আমার হাত-পুটো তার গলার কাছে এগোচ্ছিল দেখে আতঙ্কিত স্বভাববর্ণ তাকে আমার কাছ থেকে মুক্ত করার জন্য ধুরে ঠেলে দিলে। সে মৌড়ে বর থেকে বেহুত গিয়ে দরজার পাশে পিরামোর ওপর সবসে উপড় হয়ে পড়ে। তাতেই তার বুকে পিঠে বুন আঘাত লাগে মোহ হর। টাল লালসাতে না গেরে পিরামোর পাশে টেবলের ওপর গিয়ে পড়ে। টেবলের ওপর গাত খোলা একটি টেবুল ফ্যান ছিল। টেবুল ফ্যানটির ব্রেডের চাপে শোভনের গলা কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছিল। রক্ত পড়ছে দেখে আমার যেন হৃদয় হল। শোভনকে নেবে থেকে তুলতে গেলুম। হরত আমাকে সে তার বুদ্ধিরূপে ঠিকই দেখেছিল। চিনেছিল। আমি তার কাছে যেতেই, সে তার বৃন্দ পায়ে ওপর ভর করে হাঁড়াল। আমার কাছ থেকে ভাড়াভাড়ি হয়ে যেতে গিয়ে মেঝেতে ভীল ভাবে আড়ড়ে পড়ে গেল। শিবস্টের মেঝেতে তার মাথা খেঁতো হয়ে গেল মনে হল। আমি তাকে জড়িয়ে ধরে তুলতে চেষ্টা করলুম। পরিহল এসে আমাকে সঠিক দিলে। কিছুক্ষণ আমি যেন দরজার রাস্তা ভেবেছিলাম। যখন বেক ভাঙ্গল, শুনতে পেলুম—ভাড়াবাহাঃ বলছেন, শোভন মারা গেছে।

দেখান থেকে বেরিয়েই অনিলায় কাছে দেখা করে কানাই—এখনই আমার আত্মাভিমান যে, সামান্য একটি কথা আমার বর্গভার বুকে নিয়ে গিয়েছিল। আমি

সহ্য করতে পারিনি। বিচার করতে পারিনি। নিজের অন্তর্ভূত ভাবকে ধরে রাখতে পারিনি। শোভনের সম্মান নিতে পারলুম না। তাকে আমিই হুন করে এয়েছি। আমার মৃত্যুও হলে আমি পাতি পাব।

অনিবার সন্ত শরীর যেন কুলে কুলে উঠছিল। সে কেঁপে উঠল। আমি দাঁড়াতে পারলুম না। ব্যক্তি এলুম। ঘটনাই সব লিখলুম। ধাবার আত্মপরিচয় করতে পারি। প্রাণিতত্ত্ব রাখার তুলে নিতে।

মোহিত চ্যাপ্টা

১০ই অগাস্ট '৪২

পুনঃ যে পরিবেশের প্রভাবে এই ঘটনা ঘটল, আমি আত্মকৃত ভাবে তার শেষ কামনা করি। যদি কোনও দিন কোন সনদ সেই পরিবেশ নতুন হয়ে জন্মতে চেষ্টা করে তাহলে যেন চন্দ্র মৃত্যুতেই তার মৃত্যু হয়।

মোহিত

মোহিতের ঘটনা পড়ে আমার মন বিবাকে ভরে গেল। আমার জীবনের পুরনো ঘটনা চোখের সামনে এসে উঠলে বেজাতে লাগল।

—তখন আমার বয়স দশ বছর। আমি সবে ইন্টার মিডিয়েট পাশ করেছি। একদিন এক ম্যাজিসিয়ান আসেন আমাদের বাড়িতে। আমি খেলা দেখবার জন্য দুসেখাকে ডেকে নিয়ে আসি। দুসেখারা আমাদের গানের বাড়িতেই থাকত। আমরা ছোটবেলা থেকে এক সঙ্গেই বেগেছি, বেড়িয়েছি। দুসেখার বাবা মানাব মৃদাঙ্গী আর আমার বাবা প্রিয়বল্লভ ব্যাংকী দুজনের ঘর ভাব ছিল। আমাদের বাড়ি দুসেখাদের বাড়ির পাশে পাশে। আসের দিনে কলকাতার অধিকাংশ বাড়ি ওই রকম ছিল। আমরা ছাদ দিয়ে এখানটি ওড়ি করতুম। দুসেখা আমার কাছে তার মোজার পড়া হয়ে নিত আমাদের বাড়িতে এসে। তার আমাকে বুঝাল লাগত। আমরাও তাকে ঘুরে পছন্দ হত। দুসেখা আমার চোরে ছদ্ম মূর্তির মোট ছিল।

দুসেখা, আমি, আমাদের বাড়ির সকলে, দুসেখাদেরও বাড়ির সকলে ম্যাজিক দেখছি।

—ম্যাজিসিয়ান একটা পুটোয় কাপেটি ঘূরে আসেন তার হাতের তিনটি সাত আট জ্বরের সন্ধ্যা

যেতে পুড়ে আছে। মেয়েদের দুই কাপেটি ঘূরে বাবার ঘরে তালো বন্ধ করে রেখে ছিলেন। গিফিকাঠি বাবার কাছে দিয়ে ম্যাজিসিয়ান বাইরে বেরিয়ে গেলেন। ম্যাজিক পর ম্যাজিসিয়ান ঘুরে এসে, আমাদের সকলের সামনে চাঁবি নিয়ে ঘর ঘূরলেন।

আমরা দেখলুম, কাপেটি খোলা। ঘরের মেঝেতে রক্তমাখি। ঘরে তিনটির মাথা আলাদা ধর আলাদা এই বীভৎস ব্যাপার দেখে আমরা সকলে অস্থির। বাবা ঘুর ভর পেয়ে গেলেন। ম্যাজিসিয়ান আমাদের দুটোকে সেবে বলে বাবাকে ভর দেখাতে লাগলেন। পরে হাসতে হাসতে মেয়েদের ঘর মাথা এক করে দিলেন। মেয়েরা বেঁচে উঠল। ঘরের রক্ত অশ্রু হয়ে গেল।

ম্যাজিসিয়ান ঘরে তিনটিকে আমার আসনের মত কাপেটে জড়িয়ে নিয়ে বললেন—এই আমার ভাবমূর্তির খেলা। বাবা তাকে যা দেখার কথা ছিল তার ডবল দিতে বিদায় করে হাঁক রেখে চলে গেল।

সকলে এত ভয় দেখালুম যে, পাশে দুসেখা অজান হয়ে পড়ে আছে তা' এতক্ষণ কারো লক্ষ্য ছিল না। তারপর দুসেখা দু'মাস বেঁচে ছিল।

সেই দিন থেকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ সে দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল। অনেক চিকিৎসা করা হল। কিছুতেই তার মন থেকে সেই বীভৎস দৃশ্য অশ্রু হলে না। তার মন বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। বাঙালি ঘর প্রায় ত্যাগ করেছিল। যে দুসেখার আমাকে খত ভাল লাগত, আমি তার করে সেসে সে যেন ভিনতেই পারতনা। কি, অতক্ষণ নিয়ে সে মারা গেছে—চোখের সামনে দিনরাত বিভীষিকার ছবি দেখে।

তার মৃত্যুর জন্য প্রবীণত আমি হারী। যদি আমি দুসেখাকে ম্যাজিক দেখাতে না ডেকে নিয়ে আসতুম তাহলে এই পরিণতি হয়ত ঘটত না।

আমি জানতুম দুসেখা ঘুরে অশ্রুভাঙকাতর ছিল। একদিন আমরা বেড়াতে যাচ্ছিলুম রাস্তারের কিউনসিদ্ধি করে। বাবাও সঙ্গে ছিলেন। টাইলারাইনে কিভাবে ঘোড়ার পায়ের ঘুর আটকে যায়। মহিষ টাইলারাইন থেকে পা ছাড়তে বাঙালি, ঘোড়ার পা

দিয়ে খুব রক্ত পড়তে থাকে। সুলেখা সেই মেয়ে আমাকে বলে, তার মাথা স্থির-স্থির করছে অজ্ঞানের মত হতে ঘাঘ।

ম্যাগিসিয়ার এরকম খেলা দেখাবে জানা থাকলে সুলেখার মত এমন নরম মনের মেয়েকে দেখাবে ভেঁকে আমকুম না। আমার মনে এত আশাত লেগেছিল যে, আমার আত্মহত্যা করবার ইচ্ছে হয়েছিল।

যাযা আমার ভাবগতিক দেখে, হয়ত কিছু বুঝেই, বেশ বিনকতক করে আমাকে কাছে কাছে রাখতেন। মোটে নম্র ছাড়া করতেন না।

ওগাল ঘড়িতে ঘণ্টা বাজল। উঠেন কি পড়ার আগ্রহ হ'ল। নাস' হেনার পর থেকে বেরিয়ে ডাক্তার সেনকে ডেকে নিয়ে গেল।

নাস' বললেন, মিসেস ব্যানার্জী! প্রাণেশকে বলছিলেন—হিঃ! তুমি খুবী বলে গেবে! প্রাণেশ রেগে বেরিয়ে গায়। তাতে উনি একটু উত্তোষিত হয়ে পড়েন।

নীচে থেকে হানশাল দরোয়ান হাঁকতে হাঁকতে ওপরে এসে বলল—বাবুজী! সবশ্য খুঁচা, প্রাণেশবাবু, চারডলা হাদসে আঙনালে গির পড়ে।

ডাক্তার সেন, প্রোকেশার নীচে গিয়ে দেখেন, রক্তের বিছানার বিকৃত নিশ্চাপ দেহ শূন্যে মাঝে প্রাণেশের।

প্রোকেশার ব্যানার্জী' অসম্ভব রকম কপিহেম ঘেঁষে ডাক্তার সেন তাঁকে ধরে ফেললেন। প্রোকেশার ব্যানার্জী' জ্ঞান হারালেন।

পড়ুন এবং গ্রাহক হোন

সোভিয়েৎ দেশ

গ্রাহকদের অন্ত নতুন বছরের সুবিধা ও পুরস্কার

(১লা নভেম্বর ১৯৬১ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ৬১র মধ্যে হারা গ্রাহক প্রেরণীভুক্ত হবেন)

ভূবিধাজনক হার	এক বছর	৩ বছর	তিন বছর
বাংলা, ওড়িয়া, অসমিয়া এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষা...	৪.০০টাকা	৭.০০টাকা	১০.০০টাকা
ইংরেজী—	৫.০০টাকা	৯.০০টাকা	১৩.০০টাকা

পুরস্কার : একটি অতিরিক্ত গ্রাহক সমেত বছবর্ষের ছয় পৃষ্ঠা সূক্ষ্ম দেওয়ালপত্র।

সোভিয়েৎ মহাজাগতিক উদ্ভাবন সম্পর্কে একখানি পুস্তিকা

(১৯৬২ সালে এই পুস্তিকা সোভিয়েৎ দেশ অফিস থেকে সরাসরি গ্রাহকদের কাছে পাঠান হবে)

আপনার চোদা সরাসরি আমাদের অফিসে বা আমাদের স্থানীয় এজেন্টদের ঠিকানায় পাঠাবেন।

সোভিয়েৎ দেশ অফিস

১/১, উড স্ট্রিট, কলিকাতা-১৬

বিবাহের আর্তি

আলিস সান্তাল

আমি আর তাকাতে পারছি না।

কারণ চারদিকে

প্রাগৈতিহাসিক অঙ্ককার

বার বার এসে আমার কণ্ঠে কশাঘাত করছে।

কঠিন দরজার মধ্যে ওরা আমাকে বদ্ধ করেছে।

অপরিসীম যন্ত্রণার মধ্যে

ওরা আমাকে বোভাংস করে তুলেছে।

আমাকে টুকরো টুকরো করে

ছড়িয়ে দিচ্ছে অঙ্ককারের মধ্যে।

সেই মুখগুলি

আমার দিকে তাকিয়ে যেন হাসছে।

কিনা কিনা করে বলছে

ভালোবাসাকে তুমি হত্যা করেছ।

ভোমার রক্তে বস্ত্র অভিলাপ।

আমি আর তাকাতে পারছি না।

প্রাগৈতিহাসিক অঙ্ককার

বার বার এসে আমার কণ্ঠে কশাঘাত করছে।

গতি

মাসিক দুখোপাখ্যার

জীবনের নানা পথে যাত্রী চলে নানা

নানা মুখ নানা রূপ নানান ভঙ্গিতে :

কেউবা অচেনা লাগে, কেউ বড় জানা—

সবাই ভ্রমের এক গতির সঙ্গীতে।

ইশ্বর বিলাসী কেউ, কেউ ভক্ত ভারী

কেউ বা নাস্তিক রুঢ়, ভবু ভালো লাগে :

সকলেই জীবনের দিতে চায় পাড়ি

কোন পথে হুক্তি নেবে কে যে কার আগে।

জীবনের হুখা খুঁজে নানা মোমাছি

তোলপাড় করে বুক সারা পৃথিবীর,

আমিও ভ্রমের দলে সে পথ প্রয়াসী

ছ'হাতে কঠিন কল্যাণ কালের গতির !

আমি জানি হুক্তি গেবে আমাদের ঋষ,

মিথ্যের পাকিল পথ হলে অতিক্রম।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বন্দ্যোত্তরী পাঠ দাশ
হল, এবার পদোত্তরী।

সকাল সকালই বের
হলাম। যে পথ দিয়ে
এগেছিলাম সেই পথ দিয়েই
আবার ফিরে চলেছি।

যেতে যেতেও বাহ বাহ ফিরে ফিরে চাইছি। সেবে
নিচ্ছি সব কিছু পেরবারের হতো। এই সকালেও
সেখনি হুঁয়ো উঠছে তব্ব হুও হতে—পাহাড়ের গায়ে
বরকটা যেন আগ্রো একটু ঘন হয়ে পড়েছে। আলো
তখনো ভালো কোটে নি। সব বাসে ব্যাঙ হয়ে আছে
একটা ঘোর ঘোর কুয়াশা।

কাল যা ছিল আমাদের চড়াই আচ্ছ তাই হয়েছে
উৎসাহ। উৎসাহই বলেই সেখনি বৃশ ধাপ করে নামছি
আমরা—নামছি আচ্ছ দাবার কুয়াশা ও কেশনের প্রার
দলে দলপাই, ওঁরা যে ভাবে নামছেন ঠিক সেই ভাবে
প্রার দৌড়তে দৌড়তে। কে যেন গলা বাক্য দিয়ে
ঠেলে দিচ্ছে নীচের দিকে। তাই যেন ও ভাবে ছুটে
চলেছি। হঠির কাছে কেমন যেন কর কর করছে।
কিছু গাঁড়বার উপায় নেই। সেই যে নামতে নামতে
কাল প্রাণ পাহাড়ী হলেছিলেন ফেল পাহাড়ী। মেল
পাহাড়ী বটে, কিন্তু হঠির এখানে যেমন লেগেছে তাতে
বা মনে হচ্ছে সে জাহি জাহি। কাল ব্যাঙ নামছিলেন
ভাঁয়ের জেবে মনে একটু যে হিংসে হিংসে হচ্ছিল
সেখি তার কোনো কারণ নেই। চড়াই পথে ওঁরা
যেমন, উৎসাহ পথে নানা ও ভাবনি—বেশী না যোক
সমান কণ্টকর। উঠতে তব্ব যে দূর ভরে আসে সে
দূর ফিরে পাওয়া যায় দু'মিনিট গাঁড়তেই কিছু নামতে
হঠির যে ব্যাঙ হর সে ব্যাঙ আর ব্যাঙ না সহজেই। দত
হিন পথ চলা ততদিন সঙ্গী হয়ে থাকে। এমন কি
তারপরও।

তব্ব চীংবাসা ভৈরবের কাছে এসে একটু গাঁড়াই।
সেখি কাল যে পথটুকু যেতে লেগে ছিল বেত্ব বণ্টা
সেই পথটুকু এসে সেই দার তিরিশ মিনিটে।

বন্দ্যোত্তরী ও পদোত্তরী

পদোত্তরী

○

চীং চমকে উঠি কার
বিকৃত কণ্ঠস্বর শুন্যে কে
যেন আতঙ্কিতের বিভ্রাণা
করছে বন্দ্যোত্তরী আর
কতদূর।

সেখি এক বেশওয়াদী
শ্রৌচ পাঠি বামা ফেলে

দিয়ে বসে পড়েছে সেই পাখর-কাটা দাঁড়ির সেব
ব্যাপটার দেহবান্য এগিয়ে দিয়ে। তার দরত পঙ্কি যে
নিঃশেষ হয়ে এসেছে তা বুকতে পারি। কিন্তু কি
বলব?

বলব কি এখানে দু' হাইল পূর পড়ে রয়েছে তোমার
দামনে এবং সে পথ ভূমি যে পথ দিয়ে এসে তার
চাইতেও শক্ত, তার চাইতেও কঠিন। না, না। তার
চাইতে যদি এই ত ভূমি এসে শেষ প্রায়, পথ আর বেশী
নেই। আর একটু গেলেই এসে যাবে বন্দ্যোত্তরী।

যোক মিথো। কিন্তু সে কথা না বললে সে
ওই নির্বাক কঠিন পথ বেয়ে উঠতে পারবে কেন? গতি
কথা বলা মানেই ত এখানে তাকে ভয় বাইরে দেওয়া,
নিরুৎসাহিত করা।

চীংবাসা ভৈরব হতে তারপর যে ছুটে বিশাল সে
একেবারে এসে দূর নিলাম আনকীমাই চিত্তে এসে।
দুঃখাংশু এয়ার এগিয়ে গেলেন। আমি সেই বানেই
বসে বইলাম একটা পাখরের ওপর। তব্ব এসে এখানে
যে উক কলের হুও আছে হেঁটে যেতে বাব তাই।

উক কলের হুও ও করণা দুইই দেখা হল তবে উক
না বলে শ্রবদুক বলাই ভাল। শুনলাম এককালে
এখানে দাক্তোর গরি আদর ছিল।

দুঃখাংশু দাবার দূর কুলচিঁতে আদর নিয়ে
ছিলেন যত্নে। এবার এসে সেখি আদর নিতেছেন
বাস্যদার। দূর দাবায়া হর নি। এখানে বসে বসে
বন্দ্যোত্তরীর ভূবাগ-নৌলি পাহাড়ের যে অপর দূর
সেখনি সে কি যত্নে থেকে এমন আর সেবা যেত।

দুঃখ বৃষ্টি ও বাতাস নেইই নয়, দুঃখের আলোও
আম অপর্যাপ্ত। বন্দ্যোত্তরীতেও কাল কিছু কণ্ঠ ছিল

না। সে ঠিক হতে আরম্ভ ভাষাবান। তা নবও কি ? এখন ভাবি আমরা সে দিন না গিয়ে যদি আর দু'দিন পরে যেতাম ? দু'দিন পরে এসে এই বহ্নীসোজরীতেই পারিত্রাঙ্ক সংঘের হলটি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল।

বেলা পড়তেই বেরুলাম আমরা সকলেই। সকালের বড়ো এ বেলাও দু'ঘণ্টা ও কেশবের সঙ্গে ছোট্ট এলাম হুন্সান গিটি। তারপর শুল শেরিয়ে নরীরাবারে গিয়ে বসলাম।

দু'ঘণ্টা অবশ্য এগিয়ে যাবেন। আবার ঠিক নেই। ঐক্য এসে জানতে পারব আচ্ছ আর বাব কিনা। কিছু ঐক্য আসা পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে হল না। রবিবার আসতেই সবক'শেলাম ও আর আচ্ছ এগিয়ে যেতে পারবে না। আবার ঐক্য জানেই অপেক্ষা করতে বসে।

দু'ঘণ্টা তাই চলে গেলেন। বলে গেলেন কাল যদি দশক'ব'ত পল্লানীতে আমরা যেন ঐদের পরে নেই। ঐরা চলে যেতেই শা পা করে হুন্সান গঙ্গার শুল শেরিয়ে আবার চটিতে কিয়ে এলাম। কিছু কেন জানি না দেখলাম বনটা কেন যেন ব্যাপন হয়ে গেল—সেই ঐদের সঙ্গে যেতে পারলাম না তাই।

দিনের তখন অবসান হয়েছে। হাজার হলে সেয়ে পর্যন্তের অধিকতা। বাইরে ভালো কিছু দেখা যায় না। গল্পে ভেতরও অন্ধকার। দশটাকা তারামত নিয়ে গেছে। বনটা ভালো ছিল না বলেই যোমবাতি জ্বালাবার কথা বলে হয় নি। পাশেই ক'ব'ত আছে। সত্যিই ও নরীরা বাচ্ছ ভালো ভালো নেই। তা হাড়া নরীরাই বা লোব কি ? পানের ব্যাঘা নিয়ে ও যে ভালো হটিয়ে তা কন নরীরাই পারবে।

তবু বলে বলে ভাবি ও যদি এ ভাবে অদৃশ্য না হয়ে পড়ত—যদি দু'ঘণ্টার সঙ্গে যেতে পারতাম—হুন্সান গঙ্গার জলের যে অস্ত্রাঙ্ক বান শুলতে পাচ্ছি তার বন্দন জাতি নেই তখন আবার কেন জাতি জাতি। কেন ইচ্ছে কালেই এক হুটে গঙ্গোজরী চলে যেতে পারি না, কেন নরীরা বাচ্ছ হয়ে থাকে।

হঠাৎ অন্ধকার ঘরে কার যেন পায়ে নন্দ হল। চলে

কেউ। বলি, কি চাই ? ভাবান আসে, গরুড় ভগবানের প্রসাদ এনেছি, নিতে নাও।

এই এক গরুড় ভগবান।

এ যিকের যে দিকেই যাও, বনগী বিনাসের যেকন নাম নিতে হয়, তেমনই এই গরুড় ভগবানে। গরুড় নারায়ণের বাহন বলেই হয়ত। কিন্তু আবার কেন যেন বলে হয় ওই সঙ্গে যেন একটা সোপান ইচ্ছা যেন জড়িয়ে থাকে—এই সব পাখাড় পর্যন্ত অতিক্রম করতে আমরাও যেন তারি লঙ্ঘ গতি ও শ্রাঙ্ক্য লাভ করি।

উঠে গিয়ে প্রসাদ নিয়ে এলাম। নিজেও কোলা, ঐক্যও দিলার। মাত কয়েকটি জ্বালা দান।

সেখান আবার ক'ব'ত হয়েছিল কিনা ?

ঐক্য কপালে বুক হাত দিয়ে দেখি, মাড়ি বরি। না ক'ব'ত, তবে ও যখন এখানে এসে শেরীয়েছিল তখন ওর হুন্সানা দে ঐক্য আরুড় দেখেছিলার ভাঙে একটু ভয়েই হয়ে ছিল। বলি, ও কিছু নয়। জাতিরা কনাই তোমার ক'ব'ত ক'ব'ত বলে হচ্ছে। কিছু ক'ব'ত নেই কাল শরালেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

যুব ভেঙে গেছে অনেকজন। আলো ক'ব'তার অপেক্ষা করে আছে। নীটে হতে ব্যাটীর পায়ে খস খস ঝট ঝট শুলতে পাচ্ছি। অন্ধকার থাকতে থাকতেই ওরা বেরোয়। আমাদের বড়ো দেখা করে না। দেখি ঐক্যও উঠে বসল। তারপর বেরুবার জন্য তৈরী হতে লাগল।

বসলাম, পারবে ?

বোম্বের পারবে।

তবে চল।

জানি না কিসে কি হয়, কিন্তু সে দিন শব্দক্ষেই ছোট্ট এলাম গ্যান গিটি। শুল গ্যান গিটিই নয়, ঐ বেলাতেই একবারে বহ্নী গিটি। সোমের সেই বনট'ক'ব'ত পাচ্ছি আচ্ছ কি করে এত দৃষ্টি হয়ে গেল সে এক পরম বিস্ময়। গ্যান গিটি হতে বেরিয়েই নরীরা কাছে সে দিনই প্রথম আসাদ হল সেই পারিত্রাঙ্ক সংঘের ব্যাটীর সঙ্গে। শতী পুরুষ হলে ব'ড়ো—সব মিলিয়ে তাঁরা প্রায় কন্য কতি। তাঁরা বহ্নীসোজরী বাজিলেন।

সেই গাঁটির দলটিও চলছে মনো চটি। আত্ম
পথ চলতে তাঁদের আর একজনকে সঙ্গে আলাপ চল।
বললেন হামনেই শন্যে। ইচ্ছে আছে হেনরার উত্তরকাশী
পৌঁছে যাবার কারণ দেখানোই প্রথম আমরা গল্পা মর্শন
করব। বললেন পাথর কিনা জানি না। কারণ হেনরার
মাঝে মাতৃ মৃদুসিন আছে অথচ শব্দ প্রায় শব্দীকরণ মাইল।
তার ওপর মাক বাসে রয়েছে সিন্ধোটের চড়াই।

কিন্তু বিবেকে দেবুজেন কিনা দর নিতে গিয়ে
শূন্য গুঁরাই বেরুজেন না। ওঁদের একজনকে আর
চলছে। তাছাড়া মৃদুসিনে কিছুতেই পারবেন না উত্তর-
কাশী যেতে তাই ও চুটো আর করবেন না।

ওঁরা বলেন না সেখানই যাব হর ত্রয় বলে, থাক,
আমরাও না হর নাই সেলাম। ওঁদের মতো সেই কাল
মকালেই একেবারে বেরু।

শূন্য বলি, তা কেন! যদি পাথর তবু চল, একটু
কষ্ট হলেও।

আমি মনে মনে ভাবছিলাম মৃদুশূন্যের কথা। আত্ম
এ হলো গুণানী গিয়ে না পৌঁছালে তাঁদের আর হরতেই
পাথর না—ওঁরা একদিনের পথ আমাদের থেকে এগিয়ে
থাকবেন। দ্বিতীয়তঃ হেনরার দিন উত্তরকাশীতে
পৌঁছানো হবে না, না গল্পামান।

ত্রয় আমার কথা শূন্য আর দ্বিগুণি করল না,
লাঠিযানা তুলে নিল।

মনের আমার প্রবল ইচ্ছাটাই সৌম্য আমার চালিয়ে
দিয়ে গিয়েছিল। তাই প্রায় স্নায় করাই বেরুলাম সৌম্য
ত্রয়কে নিয়ে। এমনকি আকাশের সাথে যে কালো
কালো মেঘ জ্বলতে শুরু করেছিল তাকেও গ্রাসে নিলাম
না। কিন্তু বায়ারী পর্বত আগুনি, হঠাৎ মেঘ পর্জন
করে উঠল আর হলে সঙ্গে এলো প্রবল আঁধি।

শূন্য বাতাস থাকলে এক কথা ছিল কিন্তু এবে
হলো। চারি দিকের পাহাড় হতে হুলো উড়ে আসছে,
সেই হুলোর সব কিছু অন্ধকার। চোখ বুলাব তার
উপার নেই, অথচ চোখ না বুলে এ পথে হটিব তাঁর
বা উপার কোথায়? পথ একে সন্দীপ তাছাড়া জান দিকে
দুঃ। ঐ দিকেই নীচে অনেক নীচে মনোর নীল বাঘি।
এখন অবশ্য তার আর কিছুই দেখা যায় না।

ত্রয় বলল, কি হবে?

কি হবে সৌক আবার আমিও জানি। বাতাসের বা
বেগ তাকে যে কোনো মনোতেই তা আনালের উড়িয়ে
নিতে পারে। আর তা যদি নাও বের—ওপর হতে
পাথর পড়িয়ে আসতে বাধ্য নেই। বেজুদের সেই
যে অস্ত্র: শূন্য হরতি পথ: সের্বি অনেকটা মেন
তাই। কিন্তু এখানে কোথাও কোনো আশ্রয় নেই।
তাই মনো মনোর হাত শক্ত করে ধরে সামনের দিকে
শূন্য এগিয়ে যাই। হাতে হাতে দমন আর কিছুই দেখতে
পাইনে তখন পাহাড়ের গা অন্ধরে বঁকে ছাড়াই।

ও ভাবেই অনেকটা পথ এগিয়ে এলাম তারপর শোঁর
এলাম একটা কঠিন বাকি। একটুখানি পাথর শূন্য
পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে আছে আর পথ সেজে তাঁর
ওপর দিয়ে বেরু। দেখলাম বাতাসের বেগটা যেন
সেইখানেই সব চাইতে বেশী।

কিন্তু ওই বাকটা পেছনেই বাতাসের বেগটা মেন
পড়ে গেল। পথটা শুঁকে বাওয়ার আমরা অধিক পথে
রয়ে এলাম।

এতক্ষণে আবার আনালের মনো কথা কুটিলে। বলি,
হিমালয়কে সব রকমে না দেখলে কি হিমালয়কে দেখা হল।
শূন্য—অরুজল নীল আকাশের নীচে হিমালয়ের জুয়ার
শূন্যতাকে দেখলেই কেবল হবে না দেখতে হবে দমন সে
নির্ভর করিন নির্ভর।

এখন আমরা একটু হুড়ই হটিছি। হটিতে হটিতে
শূন্যই পেছন হতে ভেসে আসা বাতাসের হুড় শব্দ আর
পাহাড়ের পাহাড় গর গর করে ওঁরা তার প্রতিধ্বনি।

হরতি হটিয়ে আরো এগিয়ে এবেছি। ভাবছি, ঐ
আঁধিটা হরত এতক্ষণে পৌঁছিয়ে বনো চটিতে। শুধু
হরত উঠেছে দেখানো। কিন্তু সের্বি পাহাড়গুলো
কেন যেন বিবর্ণ হয়ে আছে, আকাশের হংও কেন যেন
শাপন। পাহাড়ের মাথার মাথার আকাশের সাথে সাথে
কে জানে কিদের ওই লাল লাল দাগ। যেন হরত করে
পড়ছে।

মনে মনে ভাবছি আঁধি হরত এতক্ষণে চন্দ্রামণিটি
পৌঁছিয়ে গেছে, হরত বাকি নেমেছে এখন কুঁদ চটিতে
যেন বাকি আমরা পেরেছিলাম।

দেখা হল গঙ্গোত্তরীতে পরিভ্রমক দলের দৃশ্য
বৃদ্ধের সঙ্গে। বললেন, কলচরটিতে দেখিন কি দৃষ্টি।
ভালগর্ভিনী বৎসোত্তরীতে বৃষ্টি আর তুষারপাত। কষ্ট
শেষে সবাই ফিরে গেছেন ঐক্যবিশেষ। কোনো মতে
এসেছি এখানে আনরা। কুলী পদে নেই সঙ্গে।
ওদের ওয়া নিয়ে গেছে। কুলী দিতে পারেন একটা ?

আর জর বৎসোত্তরী নয়, জর গঙ্গোত্তরী। গংগানীর
সেই মনোরম চিহ্নটা আবার দেখতে পাচ্ছি। এখন
নাথক আঁধা, নাথক ঋতু কিছুতেই কোনো জর নেই।

সন্ধ্যার তখনো ঘেরা ছিল। তাই শূন্যস্থানের সঙ্গে
সিঁদেই বসলান গঙ্গানরম কুণ্ডের ধারে। কুণ্ডটী ঘরপালা
হতে হতে নয় তবে একটুখানি নীচে একবারে বন্যার
কাছাকাছি। পাছাড়ের গা দিয়ে তাই একটুখানি নীচে
নেমে যেতে হল। পাছাড়ের গায়ে গায়েই নীচে নামবার
সিঁদে কাটা আছে। তবে বড় এলোমেলো ও
ভাঙা ভাঙা।

কুণ্ডের ধারেই বসিবে। গঙ্গা ও বন্যার। ঘুরে
ঘুরে দেখাছিল। রবিবা বলেন, কানেন এর ইতিহাস ?
বলি, নাটো।

রবিবা বলেন, এক কালে এখানে আগুত দৃষ্টির
আশ্রয় ছিল। আগুত দৃষ্টি যদিও বাস করতেন এই
বন্যার ধারে তবু রোজ পিরে হান করে আসতেন সেই
সঙ্গার। বাতায়তে তা হবে কন করেও প্রাচ চরিত্র
হাইল। কিন্তু বড় বয়সে তা আর পারবেন কেন ?
তাই গঙ্গাঝেই ডাক দিলেন এখানে। তাই সঙ্গার একটা
ঘাটা এখনে প্রাচরিত্র হয়ে গেল।

আঁধা বা কোথা হতে আসছে এই কুণ্ডের হল। কিন্তু
সেখানি কুণ্ড ছাঁপিয়ে কেমন কুল, কুল করে সেই হল ছুটে
গেলেছে বন্যার দিকে তারপর বিলোমে পিরে বন্যার।

রবিবাকে বলি, তাহলে প্রায়সই বলতে হয় একে—
গঙ্গা বন্যার সঙ্গে।

হবে মনে ভাবি যেমন বন্যাকানীর লগন হয়েছেন
অলকন্যার সঙ্গে চরিত্র্যাসে, সেখান্যাসে সেই দিলিত
মহাকানী ও অলকন্যার প্রাচরিত্র সঙ্গে ভাগিরথীর,
তেননি ভাগিরথী ও বন্যার প্রাচরিত্র দিলিত হতে পাড়ত
এই দ্বিলাসেই যদি না থাকতানে রাখান দৃষ্টি করে

দাঁড়িয়ে থাকত দণ্ড পর্বত। তেহান্নেত গঙ্গা ও বন্যার
ধারা এসে গেছে প্রায় দুইই কাছাকাছি।

কিন্তু বনন বা হবার নয়, তা হয় না। তাই যদি হত
তবে কোথায় থাকত মনুয়া, কোথায় বন্যাবন। আর
কোথায় ভীর্বাচ প্রমাণ। প্রমাণের গঙ্গা ও বন্যার
অশ্রু বৈশাখের কথা মনে আছে—সেই সাদা আর নীল
জলে। যেন দিনের আলো এসে আঁলসন করছে হাড়ের
নীল ঐক্যরকে।

নীলকান্ত বলে, এ সব কি আর সত্যি! সত্যিই কি
গঙ্গা এসেছিল ?

বলি, কি জানি। এ অনেক কালের কথা। কিন্তু
এ কালেও তা নাগ বন্যারের দৃষ্টিতে রয়েছে।

রবিবা বলেন, ঠিক তাই। বিশ্বাস যদি না হয় তবে
অবিশ্বাসও যেন না করি।

কিন্তু সত্যি ভালো লাগল সেই জায়গাটা। তাই
বতকন না সন্ধ্যার ঐক্যর নিবিড় হয়ে এলো ভতকন বনে
ইসলাম সেইখানোই।

শূন্যস্থানের ঘুরে সিঁকোলের কথা শুনেন শুনেন ঐক্য
বোম্বের একটু জর পেয়েছে। বগছে পাগের ব্যাধা নিয়ে
পারব কি সেই চড়াই পেছতে। কিন্তু তাকে আর কি
শাসন দেব। নিজেই যগোই লগন নিয়ে হাড়ির ব্যাধা বা
কাল হতেই ক্ষ কন করে তাই সেকিতে। তবু বলি,
পায়ে পায়ে দিক্তর পায়ে। ওঁরা যদি পারেন,
আমরাই বা কেন পারব না।

ঘুরে সকাল সন্ধ্যাই বেড়ান হল। এক দলেই বেরলান
আনরা। কিন্তু ভীকনও গেহিরে আঁগনি তার মধ্যেই
শূন্যস্থানের আঁক একিগে গেলেন। আনরা গেহিরে
পড়ল, ত্রস্ত পায়ে ব্যাধা কন পড়তে, আঁক আঁকিও।
তারপর—

দিলি বন হাড়িরে এলাব তখন হাঁতবস্ত কষ্ট হলে
আমায়ের। হাত এক হাইলত পথ, তবু হল বলছে বলি
বলি, পা বলছে আর নয়। একবার ভিঙল গাঁয়ের পথের
দিকে ফিরে চাই একবার গঙ্গোত্তরীর। ভিঙল গাঁয়ের
পথ হানেইত ঐক্যবিশেষ। তাই তাড়াতাড়ি গঙ্গোত্তরীর
পথেই পা বাড়াই। কিন্তু আরো হাইল অনেক পথ
আসতে না আসতেই ঐক্য হাড়িরে পড়ল। কল, এতাবো

কি সত্য। যেতে পারব। তাছাড়া এখনোত চড়াইর
দুঃখই হয় নি।

তা হয় নি। তবে কেরা মানে যে একেবারেই কেরা,
নিষেধ কাছে যেতে বাওর। তা পারব না। তাই
অবশ্য কথার জবাব না দিয়ে সামনের দিকে এগুতে থাকি।

কিন্তু কত আর পারব। অতিরিক্ত হাট্টার জন্যই এই
জাতি। তাই দুঃখ না বাইত দুঃখও বিজ্ঞান করি।

ব্রহ্মত হাঁকিতে হাঁকিতে আমার পাশে বসে পড়ল।
বলল, চল, কেরো।

একবারও যে মনে হয় নি কেন এই দুঃখের তা
নয়—কিরে গেলেই বা এমন কি জতি হবে। না হয়
দুঃখিন সিংলিতেই বিজ্ঞান নিয়ে এলে হবে—একবারেই
কিরে যেতে হবে—তাতো বা কি অর্থ আছে। কিন্তু
না আর একটা মন কিছুতেই কিছুতে চাইছে না—সেখানি
তার জোর অনেক বেশী।

ব্রহ্ম বলছে এভাবে বসে থেকে লাভ কি—কি করবে
ঠিক করে নাও।

তা ঠিক। বালি, কিরতেও ত হাট্টিতে হবে—ওতগামি
সামনের দিকেই এগিয়ে চল না।

ব্রহ্ম আর কথা বলে না, বিরল মূখে উঠে দাঁড়ায়।
আমার চাইতে তার বস্তু অনেক বেশী। তাছাড়া সামনেই
চড়াই।

আমার মনে হল এ মনে আমাদের একটা পরীক্ষা।
এই চড়াইটা পেরিয়ে গেলে আর কোথাও পথ আমাদের
শক্ত হবে না।

চড়াই পথেই উঠছি। কখনো উঠছি, কখনো বসছি।
কখনো জিজিরে নিম্ন পাছাড়ে। গায়েই হেলান দিয়ে।
এবার বনমর পথ। চারদিকে বনের প্যান্ডালিমা। তাছাড়া
আকাশও কেমন হেতুজর হয়ে আসছে। চড়াই ভাঙার
মতই দিন।

[ক্রমশঃ]

ম্যেজাক ডের ওরে
 হা হ ল অচুর্ন
 হৌলকীকে দাত তরে-
 হলে ন। হা হা হ
 কায় বহর পেরে আনগা
 নুহুপ একটি কাহিনী
 লতে পারি, কাহিনী
 হ-পরমাণু হ হ স্য
 জম করে মানুস আছ
 পে রি বে হ পুঁক্তির
 থিকারী চত্রেহ ।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

পরমাণুর বিকিরণ ও জীবদেহ

অশোককুমার দত্ত

০

দাণে তুলনীয় ।

পরমাণুর বিকিরণ
 কিন্তু পৃথিবীতে নতুন
 নয়। পৃথিবীর নানা
 স্থানে—যথা পার্বত্য
 অঞ্চল, বালুকাময় ভূমি,
 এমন কি দাগরের ভেদে
 পর্যন্ত কিছু পরিমাণ
 তে অক্ষি হ বা তু
 প্রাকৃতিক উপায়ে
 সঞ্চিত আছে। এ ছাড়াও

বিকিরণ হলো এক কথায় পুঁক্তির অধিগমন। আলোক
 ক্রি বিকিরণীর ব্যতিতই আরও থাকে বা, ফলে
 জড়িতেও আনগা সেমতে পাট, তাপ বিকিরণের ফলে
 হর থেকে উন্নয়ন "অতি" পাওয়া যায়। 'বিজ্ঞানের
 জড়িতর ফলে আর বিকিরণ কণাটির অর্থেরও প্রসার
 টেছে। পরমাণুর উপাদান ইলেকট্রন বা নিউট্রনের
 মাধ্যমেও আনগা বিকিরণ বলে থাকি।

বহিঃবিশ্বের কোন অজ্ঞাত উৎস থেকে মহাকাশগতিক
 রশ্মি (বা কসমিক রে) নিবৃত্ত পৃথিবীর উপর
 এসে বর্ষিত হচ্ছে। এ তেজস্বিন রশ্মি বায়ুগুণে
 বাধা পায় নত, কিন্তু কিছু কিছু পরিমাণ (প্রায়
 এক শতাংশ) ভূপৃষ্ঠেও এসে পড়ে। যুগ যুগ
 ধরে মানব প্রকৃতিভ্যাত এই বিকিরণকে গ্রহণ
 করে আসছে।

১৯১৫ সালের ৬ই আগস্ট হিগ্গিন্সের 'এটম বোমা'
 দ্বতনের পর জীবিজ্ঞানের মধ্যে একটি কথার দড় প্রচলন
 হ়, সেই ভয়ানক পরমাণবিক বিস্ফোরণকে ভায়া বলতো
 'শিকার'—'শিকা' মানে প্রহর আলো দায় 'জন'
 প্রজ্ঞত পথ। এটম বোমা বিস্ফোরণে প্রজ্ঞত পথ ও
 প্রহর আলো বিকিরণ চলেছিল নত। কিন্তু জীবদেহের
 পক্ষে তা বাস্তবিক নয়। পথ বা আলো ছাড়াও পরমাণুর
 বিস্ফোরণের ফলে তিন প্রকার তেজস্বিন রশ্মি
 আলফা কণিকা ও গামা এবং পরমাণুর অণু বিশেষ
 নিউট্রন বেসে বিসর্জিত হয়। এ দমত অভিন্নর বিকিরণই
 জীবদেহের পক্ষে অত্যন্ত প্রতিফল। এসেয় মধ্যে
 আবার গামা রশ্মি ও গতিশীল নিউট্রনের প্রভাব
 সর্বাধিক। আলফা রশ্মি বাতাস ভেদ করে বেশী দূর
 যেতে পারে না, সেহেতু ফলেই তার প্রভাব সীমাবদ্ধ।
 বিটা রশ্মির প্রভাব এসেয় মাঝামাঝি এবং এক্ষেত্রে

পরমাণুর বিকিরণের দাত থেকে প্রচা পাওয়ায়
 একটি প্রথম অসুবিধা এই যে আলো বা তাপ অনুভবের
 ব্যায় মানুস এই বিকিরণকে অনুভব করতে পারে না,
 ফলে জীবদেহ সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে এই বিকিরণের
 প্রভাবে এসে কণ্ডিগ্রত হতে পারে। ১৮৯১ সালে
 এক্সরে আবিষ্কারের কয়েক মাসের মধ্যেই পদার্থবিদগণ
 এই রশ্মির প্রতিফল প্রভাব সম্বন্ধে দত্তেদন হন। এক্সরে
 যাবহারের ফলে বিজ্ঞানীদের মধ্যে তখন এক প্রকার কত
 অজ্ঞাত ব্যাপক ছিল। এই রশ্মির এভাবে প্রথমে ফলে
 লাল আভা বাতল করে, ক্রমে তা অসদৃশ এবং কত
 গভীর হয় (এরোথিয়া)। ব্যাভান কুর্চী তার দ্বারীর
 জীবন চরিত্রে লিখে গেছেন—কি করে পিঠের সুগী
 শ্বেজার এই রশ্মি গ্রহণ করে কোষের উপর এক্সরের প্রভাব
 লক্ষ্য করেছিলেন। এক্সরের কত শক্তিতে তার বেশ
 কয়েক দায় পেগেছিল।

বর্তমানে মানব প্রমাণের বিকিরণকে নানা কাজে ব্যবহার করতে শিখেছে। জীব সেহের প্রতিবন্ধক হলেও এক্ষেত্রে পরিণতি ব্যবহার চিকিৎসা ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বর্তমানে রোগে ঘেঁষে অভ্যন্তরে অবস্থা জ্ঞানার জন্য এক্ষেত্রে “কটো” ভোল্টা আর অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। আমাদের ঘড়ির “সূঁচ” যে জিনিষটির সাহায্যে ভুল ভুল করে ভাও নিশ্চয়ই বিকিরণের একটি উৎস। উন্নত যেনে টেলিভিশনের ব্লব চলন, টেলিভিশনের পর্দার ছবি দেখা বিশেষ-মানব বটে কিন্তু এই সংশ্লিষ্ট বিকিরণের প্রভাবও এসে পড়ে। পরিমিত ব্লবই অল্প, কিন্তু সারা জীবন ব্যাপী টেলিভিশন দেখার প্রভাব নিশ্চয়ই মানব হতে বা। বিজ্ঞানের এই চরম উন্নতির সঙ্গে “বহু-রূপী” পরমাণু বা আইসোটোপ আর শিল্প, চিকিৎসা ও গবেষণার কাজে ক্রমশ অধিক হাওয়া ব্যবহৃত হচ্ছে—সাইক্লোট্রন মাইনক্রোট্রন বা যে কোন ধরনের পরমাণু রিয়েক্টর জীব সেহের পক্ষে সম্ভাব্য বিপদের উৎস। অল্প জীবনযাত্রায় পরমাণুগতিক ভাঙা বা বিমান চালনা সাধারণ ভ্রমারাবীর বিকল্পে ব্যবহৃত হবে। বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে জীব সেহে বিকিরণের প্রভাব ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে।

কিন্তু মানুষকে আর সম্পূর্ণ অন্য কারণে অধিক হাওয়া বিকিরণের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তা হলো পরমাণু বিস্ফোরণ। সম্ভাব্য যুদ্ধের প্রস্তুতিতে পৃথিবীর শক্তিশালী দেশ এটন বা হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা করছেন। (কিন্তু বিন আসেও রাশিয়া বা আমেরিকার কার্যক্রমে বিরতি দেখা দেলেও ফ্রান্সের বিস্ফোরণগুলির কথা এখানে স্মরণীয়)। এই সমস্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠান থেকে বহু ধরনের মৃত্যু বা ধীশাকলে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, কিন্তু মৃত্যু বিকিরণের পক্ষে প্রকৃত নিরাপত্তা নহে। ১৯৫৭ সালের ৩১শে মে ভারিষে প্রসারিত মহাসাগরের বৃদ্ধমান দ্বীপে ব্রিটেন যে গাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ করেন তার কলে কয়েক হাজার মাইল দূরত্বের কাশ্মীরে দৃষ্টি হলে আত্যাতিক অবস্থা

প্রায় চল্লিশগুণ অধিক তেজস্বিনতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। পৃথিবীতে অস্থিতির ক্রমিক রে পরিমাণক গবেষণা কেন্দ্রের ডিভাইসের ডায়গনস্টিক এ সম্বন্ধে যোগ্য করেন। বিস্ফোরণের কলে উদ্ভূত স্ট্রনটিয়াম ইত্যাদি তেজস্বিন হাওয়া উৎসাকারে উৎকৃষ্ট হতে এবং পরে তা বৃষ্টিপাতের সঙ্গে বা অন্য উপায়ে ধীরে ধীরে পৃথিবীর গাছপালা ও পশুপক্ষের উপর এসে পড়ে। মানুষ ও পশুপক্ষী আত্যাতিক আঘাতবোর সঙ্গে এই স্ট্রনটিয়ামও জড়িত করে। ধূমেও এই কঠিনকর পদার্থটি থাকতে পারে। ক্যান্সারের ন্যায় তেজস্বিন স্ট্রনটিয়ামও আমাদের আশঙ্কিত করা হয়। ৯০ নম্বর স্ট্রনটিয়াম (STRONTIUM 90) ধীরে ২৬ মাসের তার অর্ধেক বিঘটন হাওয়া। হাড়ে অধিক পরিমাণে এই হাওয়া জমা হলে ক্যান্সার দেখা দিতে পারে। অত্যন্ত বয়স্কদের পক্ষেই এই বিপদ পর্যাপক। বছর চার আগে অধ্যাপক জোলিও কুরী সত্য-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে এ পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত পরমাণু বিস্ফোরণের কলে জীবনযাত্রায় ক্যান্সারের প্রায়-ভার দেখা দেবে। একজন আমেরিকান অধি-বিশেষজ্ঞ (উইলিয়াম ম্যুয়ান) সে বিনও যোগ্য করেন, ইন্ডিয়ানে অন্তর্ভুক্ত বিস্ফোরণের কলে পৃথিবীর বায়ু-বল নিরাপক সীমার প্রায় শেষ হয়ে এসে পৌঁছিয়েছে। কিন্তু মৃত্যুশঙ্কায় এ সব সত্তে, পরমাণু বিস্ফোরণের পরীক্ষা বন্ধ করা নিয়ে কোন কিছিন্ন দ্বিধা টানা হয় নি।

হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে এটন বোমা পতনের পর জীবসেহে বিকিরণের প্রভাব সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য স্থান সম্ভব হয়েছিল। এ হাওয়া ইন্ডিয়ানে অধ্যাপক ইত্যাদি নিরন্তর জীবের উপর পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় তথ্য এক্ষেত্রে প্রাপ্য হতেছে।

রক্ত ও অস্থি মজ্জার উপর বিকিরণের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। হাড়ের মজ্জা আমাদের রক্ত সংগঠক, রক্তের পতকরা প্রায় ৮৫% ভাগ হাড়ের মজ্জায় উৎপন্ন হয়ে থাকে। খেত কণিকাকে আমরা বাইরের জীবসেহে আক্রমণের প্রতিরোধক বলে জানি, আত্যাতিক বিকিরণের প্রভাবে কিন্তু রক্তের অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে খেত কণিকার সংখ্যা হ্রাস (লুকোপেনিয়া) হয়, রক্তের গাঢ়তা

হয়ে লাগে। পিঙ্গ বা ধনী থেকে রোমন হতে পারে। বিকিরণের দ্বারা অপেক্ষাকৃত কম হলেও বিশদ অবস্থা দেখা দেয়, তখন থেকে কণিকার সাংখ্যিকতা প্লাম্বোবিকারী হতে পারে। হু' রোসেই কিন্তু পরিণতি একটি দ্বার তা হলো পোকাবহ-বৃত্ত।

টিউমার দ্বারা কারণেই হয়ে থাকে, তবে কণিকাকার টিউমার বিকিরণের একটি সাধারণ প্রভাব। শ্বাসতাত্ত্বিক বস্তু দ্বারা সেরগর্ভকণারী কোষগুলি অত্যন্ত শক্তির মধ্যে কাজ করে। ডেজেনারেশনের ফলে এই "কণ" পড়ন হয়, আন্তরিক বিকিরণের প্রভাবে হেকোমের সংখ্যা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। হালের সংখ্যার এই আকর্ষ বৃদ্ধি কি উপায়ে সম্ভব হয়? সম্ভবতঃ এখনো বিশেষ জানা যায় নি। সে ব্যতীত, হালের সেই এই পরিণতি সংখ্যক কোষের জন্য উপযুক্ত হতে পারে না, ফলে আক্রান্ত স্থান কূলে ওঠে, ওষুধ দ্বারা এই কূলে ওঠাই হলো টিউমার।

জাপানের অধিবাসীদের মধ্যে নানাবিধ স্রাবের রোগ হ'লো অতি সংখ্যক দেখা থাকে, বিশেষজ্ঞদের হতে এল বংশের আসে অনুষ্ঠিত একটা বোম্বাশুই তার রূপ।

বিকিরণের ফলে মানুষের আয়ুষ্কালও হতে পারে। যেটি এখনো পরীক্ষাভাষে পরীক্ষিত হয় নি সত্য তবে শৈশবকালের মতকৈ গ্রহণ করারও কারণ আছে। এবেল প্লাম্বোবিকারী জা: পাউলিং-এর হতে পরীক্ষামূলক তত্ত্বাবধিক বিকিরণের দ্বারা প্রভাবে মানুষের শারীরিক আয়ুষ্কাল পতি থেকে বহু বংশের পর্যন্ত হ্রাস হতে পারে।

বিকিরণের ফলে কয়েকটি ইঁদুরের ক্ষেত্রে অত্যন্ত তিরিক্ত হ্রাসতা লক্ষ্য করা হয়েছিল, মানুষের ক্ষেত্রে হয় অব্যবস্থাপিত বিশেষ আশঙ্কা নেই।

আন্তরিক বিকিরণের কয়েক মিন বা কয়েক সপ্তাহের দ্বারা অত্যন্ত ব্যক্তিগত বৃত্তা হত। পরিমাণ আরও কম হ'লো বিনামূল্য হতে। জীবদেহে বিকিরণের প্রভাব

তার প্রকৃতি ভীষণতা ও স্থায়িত্বকাল এবং আক্রান্ত ব্যক্তির প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। বহি করা বা বহনোচ্চা, জ্বর, চুল পড়া, শ্বাসকষ্ট এবং কঠিন আশঙ্কার—বিকিরণের কয়েকটি দ্বারা প্রভাব, জাপানে এদের লক্ষ্য করা হয়েছিল। বিকিরণের দ্বারা আহত হলেও অনেক সময় তা গোপন থাকে, সর্বাধিক চিকিৎসা পদ্ধতির দ্বারাও অব্যবস্থাপিত হতে পারে। কয়েক বংশের পরে আবার এই প্রভাব পরিস্ফুটন হয়ে ওঠে। এমন হ'লো বহু দেখা গেছে। জাপানে বোম্বাশুইয়ের বিভিন্ন প্রভাবেই ১৯০০ সালে পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গেছে।

বিকিরণের প্রভাব শূন্য কয়েক বংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বিশেষজ্ঞদের হতে তা কয়েক প্লাম্বু পরেও কার্যকরী। বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী ডা: হুদার বলেন, এই প্রভাব বর্তমান অপেক্ষা ভবিষ্যৎ বংশের উপরই অনেক বেশী। আবারও হেকোমের জিন (Genes) দ্বারা অতি দৃঢ় জিনের অতিদ্রুত আছে, বিজ্ঞানীরা তাকে "জীবন কণিকা" ("Atom of Life") বলে উল্লেখ করেছেন। এই জিন বংশ গতির নিয়মক, মানুষের ভবিষ্যৎ সমাজের মৈত্রিক ও মানসিক গঠন এই জিন-এর উপর নির্ভর করে। জিন-এর উপর বিকিরণের প্রভাব সর্বাধিক। কিন্তু হু'দের বিষয় এ সম্বন্ধে আবারও জান অত্যন্ত পরিমিত। শ্বাসতাত্ত্বিক অবস্থাতেও জিন-এর পরিবর্তন (mutation) হয়ে থাকে, কিন্তু তে অস্বাভাবিক প্রভাবে তা বিচিত্রভাবে বৃদ্ধি পায়।

জিন-এর পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যৎ পিঙ্গ বিকলাঙ্গ হয়ে জন্ম নিতে পারে। ডা: হুদারের হতে, এই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত পরীক্ষা বিকিরণের ফলে আসন্নী তিন বছরে অত্যন্ত এক লক্ষ লোকের জীবন হারি হারি আশঙ্কা আছে। জিন-এর পরিবর্তনই এর কারণ। হু'রা যদি ইত্যাদির জিন তিরিক্ততার পরিবর্তিত হয়ে ভবিষ্যতে ডি. ডি. ডি গ্যামা-জিন ইত্যাদি প্রতিরোধক পতনও জন্ম নিতে পারে। বিকিরণের প্রভাব এগুণে দানাদিক দিয়ে দেখা দেবে।

সংশ্লিষ্ট বিন্যাসীয়া সংখ্যার বিশেষজ্ঞগণ এই মত ব্যক্ত করেছেন যে কৃত্রিম উপায়ে-জাত স্বপ্নপতন বিকিরণও জিন-এর পক্ষে ক্ষতিকর। দ্বিতীয়ে ৩০ 'রোয়েনৎসেন', পরিমাণও বিকিরণ গ্রহণ নিরাপদ বলে ইতিপূর্বে নির্ধারিত ছিল। কিন্তু জিন-এর কারণে যে ব্যাধির পরিবর্তন হলো। 'স্পটজই', 'একস'-এর ব্যবহারে আরো সংঘত হতে হবে। একই কারণে শিশু বা গবেষণাকেন্দ্রে তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহারে আরো সতর্ক হবার প্রয়োজন আছে।

এ বিষয়ে চেষ্টা অব্যাহত বহুদূরবেধি শুরূ হয়েছে। 'স্বাস্থ্য পদার্থবিদ্যা' (HEALTH PHYSICS) নামে বিজ্ঞানের এক অভিনব শাখা পরমাণু বিকিরণকে মানুষের পক্ষে নিরাপদ রাখার কাজে নিযুক্ত আছেন। ফলে পরমাণু গবেষণা কর্মীদের মধ্যে দুর্ভট্টা আত্ম প্রাণ নেই বলসেই চলে। শুরূ তা-ই নয়, তেজস্ক্রিয়তার আকর্ষিত ব্যক্তিকে শূন্য করার কাজেও বর্তমানে বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন, আত্মাও সেহে নতুন রকম ও আকর্ষণীয় চুক্তির কোন ক্ষেত্রে লক্ষণও হয়েছেন।

বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষ আসন্ন বা ইলেকট্রন-শিটির মত পরমাণুর সাথেও ঘুরে ঘুরে বাস করতে শিখছে। পরমাণু-শক্তির নিরাপদ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের এখন আর প্রধান সমস্যা নয়, মানুষের শূন্য বুদ্ধিকে জাগ্রত করাই প্রধান সমস্যা হয়ে থাকিবেছে। সমস্ত জটিলতা অভ্যস্ত করে মানুষ একদিন এ বিষয়ে সজ্ঞান হতে পারে। শূন্যবীর স্বাধীনতাক্ষ অবস্থা আত্মা সেই আশাপ্রদ অবস্থার অনেক দূরে থাকলেও ঘটনাস্রোত বারবার সেই একই দিকে ইংগিত করছে।

পরমাণু ১—পদার্থ—হলো উপাদান। আকারে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হলেও পরমাণু বা জীব অবিভাজ্য নয়। কোম্পল (নিউক্লিয়াস)-এ প্রোটন নিউট্রন ইত্যাদি বস্তুসমূহ এবং প্রদাক্ষণিত ইলেকট্রন নিয়ে পরমাণুর

গঠন। এক কণার পরমাণু হলো সুবিশাল সৌরজগতের অতিক্রম সংগ্রহ।

তেজস্ক্রিয়তা ১—পদার্থ—বিশেষ থেকে জাত গতির বিকিরণ। ইউরেনিয়াম থোরিয়াম রেডিয়াম ইত্যাদি সাধারণে পরিচিত কয়েকটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ। জলিও কুরীর উদ্ভাবনের ফলে কৃত্রিম উপায়েও তেজস্ক্রিয় পদার্থ সৃষ্টি করা যাচ্ছে। তেজস্ক্রিয়তার ফলে আলো বিটা বা গামা রশ্মি নির্গত হয়। আলো কণিকা হলো ইলেকট্রন হীন বিশিষ্ট পরমাণু, বিটা হলো ইলেকট্রনের প্রবাহ এবং গামা রশ্মি একস-এর অন্তর্ভুক্ত।

আইসোটোপ ১—পরমাণুর প্রকারভেদ। সোনা-রূপা বা অন্য যে কোন মৌলিক পদার্থের গঠনে অন্তর্ভুক্ত পরমাণু থাকলেও মাঝে মাঝে তাতে কিছুটা ভিন্ন প্রকারের পরমাণুও দেখা যায়। এরই পদার্থের এই ভিন্ন রূপী পরমাণুকে বলে আইসোটোপ। হাইড্রোজেনের আইসোটোপ রয়েছে বলে সাধারণ ভাবে আমরা "জারী জল" (DEUTERIUM OXIDE)-এর সন্ধান পাই। কোন কোন আইসোটোপ তেজস্ক্রিয়ও হয়ে থাকে।

হাইড্রোজেন, সিমেন্টোজেন ১—কৃত্রিম উপায়ে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ সৃষ্টির বিভিন্ন ব্যয়।

রিফেক্টর ১—এক কণার "সংঘত এটম সোমা"। বিস্ফোরণের নারায়ণ শক্তিকে কাজে লাগানোর উপায় বিশেষ। রিফেক্টর নানাবিধ হয়ে থাকে, যথা—ভিজ্যার রিফেক্টর, সোভিয়াম ড্রাকাইট রিফেক্টর ইত্যাদি। বোম্বের নিকটবর্তী ট্রেন্ডেতে ভারত সরকার সুইমিং-সোল জাতীয় একটি রিফেক্টর স্থাপন করেছে। ১৯৬১ সালের গোড়োতে ভারতে দ্বিতীয় রিফেক্টর প্রতিষ্ঠিত হলো।

রোয়েমথ্রেন ১—বিকিরণের একক যে পরিমাণ গামা বা একস-এর প্রয়োগে এক সি, সি (ফন সার্টিফিকার) আয়রনের শূন্য বাতালে সাধারণ চাপ ও শূন্য ভিত্তি সর্টিফিকেড হাজার তাপে এক (ইলেকট্রোস্ট্যাটিক) ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তা হলো এক রপজেন।

দ্বিতীয় মহাদ্বেষের পরে

সমাজতন্ত্র একটি দেশের শািনা অতিক্রম করে এক বিশ্ব-সমাজব্যবস্থার রূপান্তরিত হওয়ার বিন্দু সাত্ত্রাজ্য-ব্যবস্থার মাত্রাঙ্ক রকমের রূপান্তর হয়ে পড়েছে। সাত্ত্রাজ্য-

ব্যবস্থার সেই রূপান্তর সূচক হিসেবে পরাধীন ও আধা-পরাধীন দেশগুলির নিশ্চীকৃত জনতা প্রত্যক্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামে এসেছে। মহাদ্বেষের পর থেকে আর পর্যন্ত এশিয়া ও আফ্রিকার যে দেশগুলি স্বাধীনতা জয় করেছে দেশগুলিতে সেকেন্দো কোটি লোক বাস করে। এই ১৯৩১ সালেই সাত্ত্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব খাটি আফ্রিকার ১৩টি দেশ স্বাধীন হয়েছে। সাত্ত্রাজ্যবাদকে আর একই সঙ্গে দুটি রূপাঙ্গনে বহুত্ব করতে হচ্ছে। সে বহুত্ব প্রধানত আফ্রিকার বহুত্ব। তার সামনের দিকে হানা দিচ্ছে সমাজতন্ত্র, পিছনের দিক থেকে তাকে আঘাত করছে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম। এই সাত্ত্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পারিত্যক্তার সংগ্রামে হাতে হাতে মিলিয়ে নেবে এসেছে সমাজবাদী দেশগুলির বেহেনতী মানব এবং প্রান্তের নবজাগ্রত জনতা। এই অভ্যুত্থান বিশ্বব্যাপী পারিত্যক্তার সারবহু ব্যাখ্যা করে দাঁড়ানো ভগ্নাংশী লেখক জী পল সালে হেলসিংকিতে বলেন :

“প্রত্যেকটি জাতিকে স্বাধীনতা কিরিয়ে দিতে হবে, এই হচ্ছে শান্তির দাবি। কি প্রত্যেকটি প্রত্যাশিত আশায়ের শান্তির অর্থ একটাই এবং সেটি হচ্ছে সমস্ত জাতি ও মানবের নিজেদের ভাগ্য নিজেদেরই দড়ে তোলবার সূচক। তার বাবে সোচ্চার করার স্বাধীনতা। আমরা চাই শান্তি পড়ে তুলব স্বাধীনতার বাঘানে এবং সমস্ত মানবকে স্বাধীনতা কিরিয়ে দেব শান্তির বাঘানে।”

এই শান্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামক্ষেত্রে আর ছাড়িয়ে পড়েছে যেখানেই সেখানেই আবিস্কৃত হচ্ছে সোভিয়েত দেশে নির্মিত কলকণ্ঠা ও যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিনিয়ার ও বিশেষজ্ঞ। এশিয়া ও আফ্রিকার স্বাধীনতা দেশগুলিতে জনগণের সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তা নিয়ে আকার

সোভিয়েত ও পশ্চিমী সাহায্যের ভূমিকা

ভরপ চট্টোপাধ্যায়

০

পতাতিক নিপ্পায়ত্তন নির্মাণ করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত আফ্রো-এশিয়ার দেশগুলিকে ২০০ কোটি নতুন রুবল (এর বিনিময় রুস্কো পুত্রাতন রুবলের দশগুণ) রুস্কোর দ্বাির্মাধ্যমী কল

দিয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন যন্ত্রপাতি ও কারিগরী সাহায্যের আকারে। এ সম্পর্কে একটি তালিকা দেওয়া যেতে পারে :

অনুন্নত দেশগুলিতে মূলধন কল হিসাবে সোভিয়েত যন্ত্রপাতি রপ্তানীর পরিমাণ

(দশ লক্ষ রুবল হিসাবে)

	১৯৪৬-৪৭	১৯৪৭-৪৮
বুলগারিয়া এশিয়া	৪৮'৪	১০২'৬
নিকট ও মধ্য প্রাচ্য এবং আফ্রিকা	১৪৪'৪	১১৭'৬
ল্যাটিন আমেরিকা	৪'৭	২৪'৪
	১০৮'৬	৩৪৪'৭

১৯৪৬-১৯৪৮ মোট ৫৫৩'২ মিলিয়ন রুবল

ভিলাই এর মত যে সব মোটা নিপ্পায়ত্তন রপ্তানী করা হয়েছে সেগুলি এই তালিকায় থাকা হয় নি।

এই তালিকা থেকে রপ্তানীর হিসাব দেখানো হয়েছে তার পতকরা ৩৪ ভাগ রপ্তানী করা হয়েছে ভারতে, পতকরা ২২ ভাগ সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রে, পতকরা ১৪ ভাগ আফগানিস্তানে এবং পতকরা ১১ ভাগ ইরানে।

আলোচ্য ৪ বছরে পুঁজিবাদী রুনিয়ার মোট সোভিয়েত রপ্তানীর পতকরা ৭৫ ভাগ ঘরে অনুন্নত দেশগুলিতে। ১৯৪৩ সালের তুলনার অনুন্নত দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েতের ব্যবসা বাণিজ্য বাড়ছে ৮ গুণ।

১৯৪৩ এবং ১৯৪৭ সালে সোভিয়েত সরকার ভারতে নিপ্পনির্মাণের জন্য ১৪০ কোটি রুবল কল দিয়েছেন যা নিয়ে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সোভিয়েতের সাহায্যের পরিমাণ বাঁকালো পত কোটি রুবলের বেশি।

১৯৪৩ এবং ১৯৪৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট নাসের এবং প্রধানমন্ত্রী কাসেমের চরম

কমিউনিস্টবিরাণী ঘরোয়া নীতি নিয়ে রাখা না থাকিয়ে আশ্রয় বাণ নিমণের জন্য ১০ কোটি রুপল এবং ইরাককে ৭০ কোটি রুপল সাহায্য দিয়েছেন, ইথোপিয়াকে দিয়েছেন ২৫ কোটি ডলার, ইথিওপিয়াকে ৪০ কোটি রুপল, থানাকে ১০ কোটি এবং গিনিতে ১৪ কোটি রুপল।

মার্কিন সাহায্যের স্বল্পতা

সোভিয়েত ইউনিয়নের এই সাহায্য প্যাকটায় মেনগুশির কার্যে স্বাধীন হয়ে আত্মকেন্দ্র সৃষ্টি করেছে। তাই সেখান থেকে সব উঠেছে এ হচ্ছে “রুসলের অর্থনৈতিক আক্রমণ”, “এপিরা আফ্রিকার আকাশে পালকজ্বর ছাড়া”, “নতুন ছব্বদেশে কমিউনিস্ট-এর বিস্তার” ইত্যাদি। কেউ কেউ আবার বলছেন যে সোভিয়েত সাহায্যের পরিমাণ মার্কিন সাহায্যের তুলনায় “মাত্র কয়েক” সামান্য কারণ আমেরিকা যে ক্ষেত্রে “বছরে ৫০০ কোটি ডলার” এই সব দেশকে পরোক্ষত করে সে ক্ষেত্রে সোভিয়েত দিকে “মোট ৮০ কোটির মত।” গত আমেরিকা বেশি ভাগ দিচ্ছে। কিন্তু সেই সেওয়ার নীতিটা কি রকম?

মার্কিন সাহায্যের ভৌগোলিক বন্টনের দিকে তাকালে দেখা যায় যে ১৯৪৫-৫০ সালের মধ্যে মোট ৫৫০০ কোটি ডলার সাহায্যের পতকরা ৫৭% ভাগ গিয়েছিল পশ্চিম জার্মানী, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালীতে অর্থাৎ সেইসব উন্নত দেশে যেখানে বৃহত্তম শাসক শ্রেণীতে জনগণ ভাবে ভলার-মত যা বলে তাদের বঁচানো যেতো। তাছাড়া এরাই নাটো, সিরোটে ইত্যাদি বৃহত্তমের অংশায়।

এদের পরে এশিয়ার মেনগুশির স্থান। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত তারা পেয়েছে ১৮২০ কোটি ডলার (মোট সাহায্যের পতকরা ২৪% ভাগ)। সেই টাকার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভাগ অর্থাৎ ৪০০ কোটি ডলার বেওয়া হয়েছে চিয়াংকাইশেক-কে, ৩৭০ কোটি দক্ষিণ কোরিয়াকে, ৩২০ কোটি জাপানকে। এই তিনটি দেশের শাসকের রাজনৈতিক জালাবানী চরিত্রের কথা কে না জানে?

তা হলে সেবা যাচ্ছে যে আমেরিকার বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যিক শিবিরবিরাণী পুত্র প্রভৃতির ব্যাপারে যে

মেনগুশির তার লহর এবং খাতি মার্কিন সরকারী সাহায্যের অধিকাংশ টাকা সেই সব দেশের সরকারের হাতে যাচ্ছে প্রধানত সামরিক উদ্দেশ্যে।

এ ছাড়া আমেরিকা থেকে মার্কিন ৩০০০ কোম্পানীর মূলধন বিশেষে বাটছে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে মার্কিন এবং সেই সঙ্গে “কমিউনিস্ট-এর বিরুদ্ধে” “স্বাধীন মার্কিনকে” পশ্চিমালী করা। “ওরাল স্ট্রীট জার্নাল” বলছে যে বিশেষে খাটানো মূলধন থেকে অনেক বেশি লাভ হয় এবং পতকরা ৩০টি ক্ষেত্রে সেই মার্কিনের পরিমাণ বিশৃঙ্খল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ১৯৫৯ সালে “কম্পেন্ড-পারোমিড” কোম্পানীর পতকরা ৫১ ভাগ স্কোবেটা হয় বিশেষে এবং মোট লাভের পতকরা ৬৭ ভাগ আসে বিশেষ থেকে। এই সালে “সোকাবিন ডায়ালিস” টেল কোম্পানী তার বাণ্যগিক মার্কিনের পতকরা ৬২ ভাগ কানার বিশেষ থেকে তার ৪২ ভাগ আবার হয় এশিয়া থেকে। প্রতি বছর মার্কিন বনুয়েগোষ্ঠী অনুন্নত মেনগুশির থেকে মাত্র মাত্র কোটি ডলার পক্ষেট্রাত করে।

যে সব দেশ মার্কিন যুক্ত জোটে যোগ দেব না তাদের ভাগে মার্কিন ডলার বেশি জোটে না। “নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন” পত্রিকার প্রকাশিত এক হিসাবে দেখা যায় যে ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে ইথোপিয়াকে সোভিয়েত চীন সাহায্যের পরিমাণ যে ক্ষেত্রে দাঁড়িয়েছিল ২০ কোটি ১০ লক্ষ ডলার সে ক্ষেত্রে মার্কিন সাহায্য ছিল মোটে ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ। ঐ সময়ে গিয়েল পার সোভিয়েত ও চীনের কাছ থেকে ৫ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার, আমেরিকার কাছ থেকে ৫ কোটি ডলার। ইরাকের ক্ষেত্রে ঐ সংখ্যা দুটি ছিল যথাক্রমে ১০ কোটি ৮০ লক্ষ এবং ১ কোটি ২০ লক্ষ। মার্কিন সাহায্যের আসল নীতি বোঝবার পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। কম্পেন্ড মোম্বের মত মালদায়ের মোম্বের মূল ওরত্রে এই নীতি।

তারপর আমেরিকা যে টাকা দিচ্ছে তা অনুন্নত মেনগুশির পতনী উন্নত কি ভাবে সাহায্য করছে সেটাও দেখা দরকার। প্রখ্যাত ব্রিটিশ সাংবাদিক ও অর্থ-ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক পাব্লিশড “বিশ্ববাজারের বিরুদ্ধে লড়াই” নামে একটি বই লিখেছেন। সেই বইতে তিনি “আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক” সম্পর্কে বলেন যে এই ব্যাঙ্কের

টাকার (১০০ কোটি ডলার) অনুদত্ত দেশগুলির অধিকাংশ বন্দোবস্ত। আসলে অষ্ট্রেলিয়া, (ছাতি-বৈষম্যের উপায়ক) দক্ষিণ আফ্রিকা, ইতালী, জাপান ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত দক্ষল অবস্থার দেশগুলিই সেই টাকার বেশি পায়। এ পর্যন্ত যে ৪০০ কোটি ডলার অনুদত্ত দেশগুলিকে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে মাত্র ১২ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার কৃষির জন্য ব্যয় করা হবে।... কারখানা-শিল্প গড়ে তোলা সম্পর্কে ব্যাঙ্কের হস্তগতি আরো অনেক বেশি কড়া।”

বিঃ পদ্বিন্দিত্, আরো বলেছেন যে মার্কিন চতুঃপক্ষে মতে পৃথু সেই সব দেশকেই ডলার সাহায্য প্রণীত উচিত যারা অর্থনীতির দিক থেকে বেশ বানিবট্টা উন্নত হওয়া সেই টাকা দিয়ে উত্তর-দক্ষিণ দেশের মতই উন্নয়ন করতে পারবে। অর্থাৎ যে সব দেশে শিল্প ও হুঁহি এখনো অনেক পিছনে পড়ে আছে তাদের এই টাকা দিয়ে লাভ নেই। এর মানে ঐ টাকা খাটিয়ে উত্তর-দক্ষিণ দেশগুলি বিশেষ বৃদ্ধি কামাতে পারবে না। বলাই এত মর্শপ। যারা খাজ ও হাঙ্গামার আমলে বয়েছে তারা সবাইই পড়ে না থাকলে সাম্রাজ্যবাদী ছোট প্রতি বছরে গানের রক্ত জল করে ১০০ থেকে ১৫০ কোটি ডলার বৃদ্ধি কামাবে কি করে? এই জন্যে মার্কিন হতে বিঃ প্রাদুর্ভেদে বৈদ্যন কলকাতার বলে গিয়েছেন যে আমরা তন বেশি কণ না চাই কারণ ওতে কল জাল হবে না।

পুন্ড্রস্বাধীন জার্মান সাম্রাজ্যবাদের কুশিক।

পৃথিবীর অনুদত্ত দেশগুলির আর একটি মারাত্মক জু আছে পশ্চিম জার্মান সাম্রাজ্যবাদ বা হচ্ছে কাইসার। হিটলারী সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহ্যবাহী। তবে সাম্রাজ্যিক পরিচিতি আর অন্য রকম বলে জার্মান সাম্রাজ্যবাদকেও ভৌগল পালটাতে হয়েছে। মার্কিন পার পুন্ড্র পুন্ড্রস্বাধীন জার্মান সাম্রাজ্যবাদী পালক-মার্কীর বর্তমান পাণ্ডা অভ্যন্তরীণ ১৯২৭ গালে বন্দন লোনের মেয়র ছিলেন তখন তিনি “ইউরোপাইসো গব্রাণ্ডো” নামে পত্রিকা এক প্রহরে লেখেন :

“জার্মান রাইখকে বিশেষভাবে উপনিবেশ দখলের ষ্ট কতে হবে।” আরকের পশ্চিম জার্মান পররাষ্ট্র-
১৯২৭ স-উপনিবেশ জার্মানী প্রাক্তন নাৎসী এন্ডারক

১৯২০ গালে যে দেশবিশ্ব পরিবর্তন্য করেন তাতে কলারী ও বেলজিয়াম কলো, কলারী বিন্দুগৈবিক আফ্রিকা, উগান্ডা, জাম্বিয়া, নাইজেরিয়া, যামা এবং বেনিগা জার্মানী। দখলে আদবার কথা বলা হয়। সেই পরিবর্তন্য আরও আছে যে জন্য আদর্শগিয়াতে বুদ্ধিগোত্রী পিডেল, হুগলগার ইত্যাদি প্রাক্তন নাৎসী নাটোর বন্দ্যাদবগা তবত দক্ষের বান এবং ডাকটে জার্মান সৈন্য পাঠান। এ হেন জার্মান পালকরা আরকের দেশের রাউরেকের আদ্যদের টাকা দিয়ে এমনই ইন্সপাত কারখানা গড়েছেন যা ভেঙ্গে চূরে একেবারে বানচাল হতে চলেছে। হুগের জার্মান সাম্রাজ্যবাদী শিল্পপতিদের মূখপত্র “ইন্ডাস্ট্রিয়াল” গত ঠা কেরারী শপটই বলে যে “কাল আদ্যদের রাডারগতি অর্থনৈতিক উন্নতির শ্রমসেবা ভাল নয়।” অনুদত্ত দেশগুলিতে বড় দলের শিকা প্রতিষ্ঠাকে ভাঙা যবের মত ভয় পায়।

তবু পুন্ড্র পশ্চিম জার্মানী, আমেরিকা বা ব্রিটেনকেও ভারতের মত খেলে কারিগরী সাহায্য দিতে এগিয়ে আসতে হয়েছে কারণ তাদের ভয় তা না হলে দরই সোভিয়েতের হাতে চলে যাবে। সেই জন্যেই আর বোকামোতে ইন্সপাত কারখানা নির্মাণের জন্য, বিহু মার্কিন ডলার পাওয়ার কথা শোনা হচ্ছে। এর আসে “ব্রায়েরহন” এবং দুই আর গবের জন্য হাফা মার্কিন সাহায্য পাওয়া যেত না। সেই জন্যে সোভি়া থেকে ভারতের সাম্রাজ্য অর্থনীতির উন্নয়নে সাহায্য করতে অস্বীকার করে পুন্ড্র ওয়াশিংটনের “আমরাই ও প্রত্নানী বাৎ” ভারতের সাম্রাজ্য অর্থনীতিক ১৫ কোটি ডলার কণ দিতে রাজী হয়। বিহু সোভিয়েত দরকার যে ক্ষেত্রে মাত্র পতকরা ২% ভাস দুয়ে কণ সেন সে ক্ষেত্রে পাকিস্তান পতিকা দুই নের পতকরা ৫% ভাস। এই কণ, সমস্ত ব্যতপাতি পদমরাহ শেষ হবার পরে ১২ বছরের ক্ষতিতে শোধ করতে হবে এবং যে দেশ সাহায্য নিচ্ছে সেই দেশ যে সব পণ্য প্রত্নানী করে তাই দিচ্ছে সেই কণ শোধ করা চলবে, দক্ষ পালকেনা বা বিশেষী মুল্য লাগবে না।

সোভিয়েত কারিগরী সাহায্যেও মধ্যে দুর্গাপুন্ড্র ইহুনের মত বা রাউরেকের মত কোন ঠিকারারী পদ্যোদ

শোভিত শাহাবা নিয়ে ভারতে একাধিক বৈদ্যুৎ-ইঞ্জিনারিং ও প্রিন্সিপাল ইন্সট্রুমেন্ট কারখানা তৈরি হবে ।

মহাশয়ের ঘাইডেলীতে শোভিত বিশেষজ্ঞরা আমায়ের লিয়ার্ট ইন্ডুস্ট্রিয়াল বেস ডানীর বিজ্ঞানীর নির্দেশে সাহায্য করছেন তা প্রথমে আজাই লক্ষ কিলোওয়াট থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত ১ লক্ষ কিলোওয়াট বৈদ্যুৎ সরবরাহ করবে । সেই হবে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি । এ ছাড়া উত্তর প্রদেশের লিয়ার্ট ও মধ্যপ্রদেশের কল্যাণ আয়ো দুটি মেশ বড় বিজ্ঞানীর নির্মিত হবে । এ ছাড়া রাজস্থানের লৌহখনি ও কল্যাণ মধ্যপ্রদেশের কল্যাণ-পাথরের খনি খন্যজালিত করা হয়েছে । এগুলিই ভিলাইকে হোয়াস কাঁচামাল ।

বিহারের ব্যাংকনিতে শোভিত বিশেষজ্ঞরা একটি লক্ষ টনের তৈল-শোধনাগার তৈরি করছেন । এ পাড়া ক্যান্সে, অক্সফোর্ড ও আমায়ের ব্রহ্মদেশের সাভিত্রে বিশেষজ্ঞরা প্রচুর তৈলের সন্ধান পেয়েছেন এবং তাতে উত্তর প্রদেশের সাহায্যমানপুত্রও তৈলের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে । আন্তর্জাতিক তৈল সাম্রাজ্যবাদ ই ইয়াপারে অধিক উত্তর স্বত ভারতের বাড়ির দিকে লক্ষ বসাইল তৈলবাহী গুলি আছে কেনেও না ১৯৬৬ সালে আমায়ের প্রথম তৈলখনি নির্মাণ হবে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ ভারতে যে ভল-নিবন্ধন করছে তা বিশ্ব তৈল উৎপাদনের মাত্র তেরটা ০.৪ ভাগ । ভারত স্বাধীন হবার পর গত ৭ বছরে ওপরে বিশেষী তৈল কোম্পানীগুলি চড়া করে এবং ভিউটি না দিয়ে মেশে তৈল বিক্রয় করে চলেছে । গোমিন শোভিত থেকে তৈল আমদানী করার যে চুক্তি হল তার পরেই এই কোম্পানীগুলি জানাশো যে তারা শোভিত তৈল পরিবাহন করেন না । ভারত সরকারের শোভনাগারদুটি হয়ে গলে অবশ্য এদের গলে চড়া মারা গিয়ে । ইতিমধ্যে কোম্পানীগুলি শোভিত তৈলের সঙ্গে টেককা হবার জন্যে জানাশো যে তারা অগ্নিশোধিত তৈলের দর নতকরা ৭.৫ ভাগ কমাবে এবং ভিউটি দিতেও

তারের আগুতি নেই । ১০ বছরের এই সব সুযোগ দুখিলা তারা যে এক কথার ছেড়ে দিল তা থেকে বোকা যায় কি ভাবে এতদিন তারা অন্যায়ভাবে আমায়ের নুয়েছে এবং কত টাকা নিচ্ছেদের মেশে নিয়ে গিয়েছে আর শোভিত তৈলের দৌলতে তাদের লাভের বহুর অঙ্ক বড়টা কম হল ঠিক ওতটাই হল আমায়ের লাভ । সাম্রাজ্যবাদীদের আমায়ের জন্য দরদের আর নমুনার বোঝার বরকার হবে না ।

এ ছাড়া শোভিত সাহায্য নিয়ে ভারতে কয়েকটি ঔষধপ্রস্তুতকারক কারখানা তৈরি হবে ।

রাজস্থানের সুবর্ণপুড়ে শোভিতের সহায়তায় একটি সরকারী কৃষি প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হয়েছে ।

বোম্বাইতে এবং ভিলাইতে একটি করে কারিগরী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে শোভিতের সহায়তায় ।

তা হলে দেখা যাচ্ছে যে শোভিত ইটনিয়নের সাহায্যের মূল কথা হচ্ছে মূল শিল্পের পত্তন করে দেশের অর্থনৈতিক পরিবর্তন করা দূর করতে সাহায্য করা । আমরা আধুনিক অর্থনীতি পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বলে কি ভাবে এবং কোন কোন শিল্প গড়ে তোলবার জন্যে পর পর কাকে সাহায্যে হবে সে বিষয়েও শোভিত বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন । এই সাহায্যের সঙ্গে কোন রাজনীতির সম্পর্ক নেই, নেই কোন পক্ষ । ১৯৮২ সালে এঙ্গেলস, দরবারা স্রেণীর জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সহায়তা দেবার আন্তর্জাতিক দাবির সম্পর্কে দেখেন :

“সাহায্য গ্রহীতা দেশে কোন দাব্যবোধ চাপিয়ে দেবার প্রব্রী ওঠে না কারণ বিজয়ী দরবারাস্রেণী কোন বিশেষী জাতির ওপর কোন আশীর্বাদ চাপিয়ে দিতে পারে না ।”

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে স্বাধীন অর্থনৈতিক সর্বস্বত্বের সহযোগিতা আদায়ের বিনে এক ঐতিহাসিক বন্ধনিত্ব ঘটনা বা আন্তর্জাতিক পরিবর্তনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের কাসেরী স্বার্থও মূল্যে কুঠাংগাত্য করছে এবং সেই অনুপাতে বিশ্ব নাতি, মুক্তি ও সমাজতন্ত্রের পাক বণিত করে চলেছে ।

সিরাজ ও কমল

● পৌরসভা কেন্দ্র

সেদিন আমার ডিপেন্দ্রাবারি। সন্ধ্যা আজটা একেবারে ঘাটি হয়ে গেল।

নলিনীবাবু এগে খবর দিলেন, আজ নৃশূর সিরাজ মাথা গেছে।

মনটা ধবে গেল। আজ্ঞার রস-যোগান বেওয়া আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠেছে দেখে।

‘আচ্ছা আজ তাহলে উঠি’ বলে দমাই একে একে পাত্ৰোখান করলেন। বিদায়-সম্ভাষণও কাউকে জানাতে পারলার না।

নলিনীবাবু, পানের চেয়ারটার বসে বার করক নিভে-বাওয়া গুড়গুড়ার নল নিয়ে টেনে ব্যর্থ হয়ে ছেড়ে দিয়ে বললেন, সব নৃশূরই তো আর বাঁচে না। এত চিন্তার কি আছে?

উত্তর দেওয়া শক্ত।

মানুষ যখন আর বাঁচে না, তেবল তখনই সে মরে, এই সামান্য কথাটা লোকবার জন্মে দকলের ডাকার না-হলেও চলে। কিন্তু সিরাজের মৃত্যুর মধ্যেই যে তার বর্তমান হৃদয়পত্রটি লুকান ছিল, সে কথা আমি ছাড়া আর কারো জানা ছিল কিনা সন্দেহ।

নলিনীবাবুর কথার তাই নিশ্চয়ে একটু হাসলাম।

কী ব্যর্থপাই ভুলে গেলো লোকটা।

তিলে তিলে করে করে অন্তরক পান্থরে-মোহান মানুসটা শেষ হয়ে গেল।

আমারই চাক্ষুসার ছিল সিরাজ।

অবশ্য আমাকে সে ডাকেনি। কোন ডাকারকেই ডাকে নি। কোন মানুষকেও ডাকে নি।

মুখ কুটে ‘ও’ বলেছে কি না, ‘স্বকণ্ঠে’ কেউ শোনে নি। আরও শুনিনি।

নিজেই গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম তার ঘরে।

জোর করে যে ওরূপ খেতে বলতাম, সিরাজ খেত। নিজের ধন্যতা লাভের জন্যে মর। আমার মন রক্ষার জন্যে। মান রক্ষার জন্যে।

যে আমার মূল জীবনের সংগঠী ছিল কিম্বদ্বিন। আমার প্রাক যৌগনেও তাকে ঘেঁষেছি।

সৌমিন সিরাজ।

অনেক রাত অবধি তার বেহালা শ্রুনে ধন্য হাফি কিম্বতাম, তখন একবা বার বার স্পীকার না করে পারি নি,—সিরাজ শূণ্য। সিরাজ শব্দক।

নলিনীবাবু বললেন, ওকে, কাল আমার সঙ্গোজের শূন্যিকর বিয়ে।

তিনি।

একটু সকাল সকালই বেও।

যাব।

তোমাকে বার বার বলে গেছে, বললে তা বলেছে।

আচ্ছা, আজ তাহলে উঠি।

নলিনীবাবু বেনে গেলেন।

বহুব্রহ্মের পর সিরাজকে যৌগিন এই শব্দে প্রথম যৌগ, শৌগিনের কথাটা বড় বেশী করে মনে পড়ছে।

শৌগিন রোজের তেলের কলটার সামনে কয়েকটা গোপাঠী মূখ শূন্যে পড়ে আছে। তেল কলের কুলিয়া শ্রুনে শ্রুনে তেলের টিন বোকাই করছে।

একটা বুদ্ধি হঠাৎ সন্ধ্যা পার হতে গিয়ে ছুটক এজার মাথে হাফা খেল। আমার সবাই হাঁ-না করে ছুটে বাবার আগেই যে তোমাকে হু-এর লম্বা চওড়া কুলিটা তেলের টিন ফেলে দিয়ে ছুটে গিয়ে বুদ্ধিকে বুদ্ধে ফুলে নিলে, তার ওপর কিছুটা দীর্ঘা হল আমার।

সিরাঙ্ক ।

সোঁকটা আবার সিকে কিছ'ক্ষণ চেয়ে রইল । তারপর বুকে কোরে গিয়ে টমটমে চড়ে বসল । বললঃ
তুমিও এসো ।

কোথায় ?

হাসপাতালে ।

আবার নিজের ডিপেন্ডেন্সারি রয়েছে । ঐ তো ও
কুটীরে গারে ।

সিরাঙ্ক বললে, না । হাসপাতালেই যাব ।

ততক্ষণ লোকের তিড় বেড়িয়ে গভীর ।

চান্ডার দাঙে খাচো-গাচা চোখে ঘোড়াটা যোব বং
বিশ্ব দেখে হাতে হাতে অর্ধাংকু হয়ে উঠতেই তার পলার
কুন্ডলগুলো কুন্ড কুন্ড কোরে বাজতে লাগল ।

মৃতিকে সোঁকান দেখতে বলে সিরাঙ্কের সাথে টমটমে
চড়ে বসলান ।

জনতা পূর্ণ আগলে দাঁড়ালে ।

চালকের মাথা ভাঙবে ওয়া ।

সিরাঙ্ক ওদের বললে, ততক্ষণে বুঝার শেষ নিশ্বাস
হাওয়ায় বিনে যাবে । হাসপাতাল থেকে কিয়ে আসি,
কোঠামানের ভবিষ্যৎ তোমাদের হাতে তুলে দেব ।

যোর অনিচ্ছা দরবেও জনতা সরে দাঁড়াল । তবে এমন
হাতেপাওয়া পিকারটা কদকে গেল দেখে বনে বনে তার
কুন্ড হোল ।

টমটম ছুটে চললো হাসপাতালের দিকে ।

বুঝার কানের গান দিয়ে বকু গড়িয়ে পড়ছিল । ডান
পাটা খেঁচলে গেছে । সংজ্ঞাহীন ।

নিজের হাথার গানছাটা দিয়ে রক্তাক্তা বৃহৎ কতটা
অতি সন্তপনে চেপে বরে বুঝার বুকের দিকে এক হৃদিত্তে
চরে আছে সিরাঙ্ক ।

জান আছে কি ?

বাড়ী দেখলাম ।

অতি কষ্ট ।

বদলায়, বাব বাব করছে ।

সিরাঙ্ক একাওয়ালাকে জোর তাগিদ দিয়ে বলল,
কল্মি ভাইয়া ।

সিরাঙ্কের কল্মি ভাইয়া

ভাবে চেপে বরতেই থাকে থাকে আঘাত সেলে একটানা
অন্তঃ এক পনের দৃষ্টি হতে লাগল ।

ঘোড়ার চালনও হুততর হল ।

কয়েকদিন পর বর পেলাম, বুঝার বুঝা হয়েছে ।

সিরাঙ্কও সেই সাথে কোথায় উঠাও হয়ে গেল । আর
তার সেবা পেলাম না ।

আন্তর্ এই পৃথিবীতে কী না ঘটে !

আম থেকে পর্যায়পর বহুর আসে সেহিবের ধূনিরাটা
এতো বিলম্বটে আন্তর্ না হলেও, দৃষ্টির প্রথম দিন
থেকেই সে যে খন রচনা বেরা, এ কথা অস্বীকার করা
তো বার না ।

সংসারী সিরাঙ্কের কথা মনে পড়ল ।

তখনকার দিনের কল্ম-ইবনসেপকটারের ছেলে সিরাঙ্ক ।
আজকালকার দিনের 'অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক' বর ।
বুঝার তার চেহারা । মাথার কাচ করা সোঁপালি দানা
টুপি আর পেরওয়ানিতে রক্তাকার হানাত তাকে ।

সেই সিরাঙ্ককে এই শহরে তেলকদের হুলি কে
করে দিলে ?

সৌন্দর্য বুঝাকে নিয়ে সে অতি ব্যস্ত ছিল । এ সব
কথা আসোচনা কথাবার উপেক্ষ অবসর পেটা ছিল না ।
কিন্তু, আবার যে সে হারিয়ে যাবে, এ কথাও ভাবতে পারি
নি তখন । কত কথাই মনে জেলে উঠেছিল ।

কয়েক দিন পরে তেল কলেগিরে খোঁজ নিলাম । কেউ
তার ঠিকানা বলতে পারলে না ।

হালানন্দ একটু তাম্বিলস্যের হারি হেসে বললেন,
কল্মির আবার ঠিকানা ? যিব রক্তের তো পড়ে যাটেই
হজিল ।

মনে পড়ল, দাঁড়াই ওদের হজিল ছিল ।

দল্লা কাচ করা বেরা পাঁচিলের ওপর রক্তাক্ত মাথায়
লতা আর মিষ্টি পল্ল দানা রঙের কল্ম ছেলে থাকত ।

হালানন্দ বললেন, লোকটি কি ভাঙ্কারবাবু চেলা ?

এ নব্বু শহরে তখন শ্বাখার কিকিত ব্যাতি
দল্লাব হয়েছে ।

এ প্রবের উত্তর চটে করে দিতে পারলাম না ।

হালদাবাদ্, আমাকে শিরুস্তর দিবে সাফল লক্ষ্য কোরে
আবার শিক্ষাশা করলেন, ওপরে দানটার বিজ্ঞ ব্যক্তি
কেনে পালায়নি তো? বেটা বড়ো বুদ্ধজ্ঞ।

মিজাদা করলাম, আপনাদের এখানে কত দিন
ছিল সে?

—তা হাল দুরেক। আগে তো হুপোরের কোন
দিগারেই কলে ছিল বলে। কি জানি কশাই, সেতাদের
কি বিশ্বাস আছে? কিছু আমার সঙ্গে তো আর সে
দব চালাকি চলবে না। দব পালার এক দিনের পরমা
হাতে রেখে তারে শেখোঁট করি।

—ওর কিছু পাওনা আছে?

হালদাবাদ্ এবার যেন একটু চিন্তিত হলেন। হু-
কুমিত কোরে কি ভেবে নিয়ে বললেন, বলছে কিছু?
আমি জানতাম। বেটা ভারি চুসলি-খোর।

আমার প্রশ্নের উত্তর তখনো পাইনি, তাই হালদাবাদ্
বুকের দিকে চেয়ে রইলাম উজরের আশার।

হালদাবাদ্ চশমাটা ধুলে টেবিলের ওপর রাখলেন।
তারপর হঠাৎ চোঁচিয়ে উঠলেন, আরে ছেদ্দা, মিশিরজী
কা চিটুটা লাগা?

হুৎ খেতে ততোধিক চিংকারে জবাব এল, হাঁ।
ডেলকলের বেশিন চসার অবিসার পথের মধ্যে যেন ঐ
'হাঁ' কথাটা হাঁ হাঁ করে ফিরতে লাগল।

ছেদ্দা নামের আশা-পাগাড়া ডেলকালিতে ঢোবানো
হুবান-ভিত্তি হালদাবাদ্ সামনে এগিয়ে এসে চিঠিখানা
রাখলে টেবিলের ওপর।

—একদন্ত ভিরুশন।

—হাঁ, একদন্ত ভিরুশন।

একদন্ত ভিত্তির চিন ডেল পিরে মিশিরজীর আড়ন
থেকে লাড়চিঠা বেগরা হয়েছে।

উঠলাম।

এবার হালদাবাদ্ আমার দিকে চেয়ে বললেন, চললেন
ম্যার? ঐক, দিগাজের পাওনাটা নিয়ে ফেলেন না?

হাত পেতে দাঁড়ালাম।

দিন।

বাক্স হয়ে হালদাবাদ্ কাঠের অপরিচ্ছন্ন একটা বাক্স ধুলে
তার ডেভর থেকে ততোধিক মলিন একটা খাতা বার

করে, লাইনে লাইনে চোখ বুলিয়ে, পাতা উল্টে, তারপর
অন্ত ব্যস্ততার সাথে আড়াইটি টাকা আমার হাতে তুলে
দিয়ে বললেন, ত্রেক দু'দিনের ছিল ম্যার। লোকটা আর
এলই না। সেব কাকে?

টাকাটা পকেটে রেখে বলে ফেললাম, লোকটা তাহলে
মিথো চুপলি করেরি, কি বলুন?

আমার চেয়ে হালদাবাদ্ ভাল জানতেন হয়তো যে
সিরাজ অনেকের কাছে চুপলি কয়বার লোক নয়। তার
বলি মনে পড়তো, যদি সুযোগ থাকতো তবে হালদাবাদ্
সাবনে এসে লোকটা চলে গড়াত। নিজের পাওনা চুকিয়ে
নিরে নিঃশেষে আমার পথে নেবে যেত।

হালদাবাদ্ একশত কাগজ ও একটি অভিকুর ছোটো
পেন্সিল আমার সামনে এগিয়ে ধরে বললেন, যদি কিছু
মনে না করেন ম্যার।

তার মানে?

একটা ইশে, মানে একটা রশ্মি ম্যার।

প্রশ্নর কথা কয়টি বলতে হালদাবাদ্ যেন জিহ্বার দাক্ষ
ছিল না। কিছু তারপর হু হু কোরে বোলে যেতে
লাগলেন, আপনাকে তো আর অবিসার কোরতে পারি
না ম্যার। ও পরে কেনা চেনে আপনাকে। কিছু
কি জানেন ম্যার ঐ ওরা বাবে ওরা যোল গিরে-জুলি
মানুষ। মনটাই ধাব। কবে কখন হুস কোরে এসে
বাড়ী হবে, বলবে বকেগা লাগ। সে এক মহা হুশেজাং।
তখন কর ধান্য পুঁলিশ। আপনাকে আমার তখন অবস্থা
বিরক্ত করা, এই আর কি...

হালদাবাদ্ খামবেন না মেখে তারি হাত থেকে কাগজ
খানা টেনে নিয়ে নিজের পকেট থেকে বলন বার কোরে
যেন বড় বড় হরকে লিখে দিলাম, —'দিগাজের এ অস্ত্রের
মজুরী নগর বুকিয়া পাইরা এই রশ্মি লিখিয়া দিলাম।'

নিচে দুইবার নিজের নাম শপথাকরে সই করলাম।
বললাম, টিকিট লাগবে? রেভিনু টিকিট? হালদাবাদ্
হুৎখের ভান কোরে চেয়ে রইলেন। কোন কথা বললেন না।

দিগাজের কথাটা যেন হুস কোরে মনের ওপর
তলাব ভেসে উঠেছিল, তেমনই হীরে হীরে আমার
কোথার ভলিয়ে গেল। ভীষন ব্যাকার পথে এমনি কোরে
কত হানুস বন থেকে করে পড়ে যার, সারা জীবনেও

হঠাৎ আর তাকে কোন কথা মনে অত আসে না।
তখন দু'যোগ দার হয় না। আবার ঘন ভাবেরই
কোন একজন অন্তর্কিতে সামনে এসে উপস্থিত হয় তখন
কলে আসা দিনের সমস্ত ভুলে যাওয়া কথা বলার স্বাভাবিক
রূপে জীবন্ত হয়ে উঠে বর্তমানের সবকিছুকে আচ্ছন্ন
হয়ে যায়। তখন বহু বহু বছরের পেছনে কলে আসা
প্রতিটি কল খেঁচ সামনে এসে থাওয়া যায়। বলে, 'আমি
তো হারাই না।' বহু ব্যাঘ্রা স্বাভাবিক এমনি কোরেই
যখন এক এক সময় আবার ঘন এমনি জীবন্ত হয়ে ওঠে,
তখন এমন এক আকর্ষণ, এমন এক বোধ ছেঁসে ওঠে,
যে বর্তমানের সব কিছুকে অতি ক্ষুদ্র বলে মনে হয়।

কিন্তু আমার কোন উপায় ছিল না। সিরাজকে
হঁকে পাওয়া আমার ভাগ্যে লভ্য ছিল না।

একটা নিম্নোক্ত কেসে আমার বর্তমানের জোতে যা
চারিগে হিলাম। নিরন্তর আমার ভিম্পেন্সারির আচ্ছন্ন
হাতে লাগল।

বহু বাক্যের পরে হঠাৎ একদিন বিরাট সৈন্যের হৃদে
দুন্দাম প্রায়ই নাকি সিরাজকে দেখে সে গম্ভীর হয়ে।
অভিহু হয়ে উঠল।

তার নব্বীর অর্থ আমার মনকে ভাষাকার কোরে
রেখেছিল। কেনই বা সে দিন বাসবাবুর কাছে হাত
পেতে ওর টাকাটা নিলাম।

কয়েক দিনের চেষ্টায় সিরাজের আত্মা বহু
শেলাম।

গম্ভীর হয়ে গভীর হিকে যে সারি সারি পুরোন
পাকব্যাগগুলো তারই সামনের চান্দ গলিটা একে-
নেক গিয়ে একেবারে গভীরের শেষ সীমানার ঘোষনে
মিশেছে সেখানে হানুকের বসতি থাকতে পারে কোনদিন
কল্পনা করি নি।

কী অন্ধকার সে গলি পথ।

জল-কাফ-আবজ'দার গলিটার গলা বহুই আছে।

গম্ভীরে ঘোলায় ছোট ছোট চান্দা বহু। কয়েক বহু
হালকা আছে, সে সংবেদ হাওয়া শেলাম। শব্দে
যেহে হুলাল বার কোরে নাকে চাপা দিতে হল।

আট বহু বছরের একটা উলঙ্গ বাচ্চা আমার
কন্ডুরোয়ে আমাকে সিরাজের প্রকার এনে শোঁতে দিলে।

প্রকার কয়েকবার হুদু আবাতে কোরে ডাক দিলাম
সিরাজ। সিরাজ আহ।

বহুটা হুদু একজন বেরিয়ে এল। প্রায় কল কে।
অন্ধকারে তার দেখে আমার চিনতে অনুবিরে
হয় নি।

আবার প্রশ্ন হল, কে।

হাক, শৌছেচ তা হল।

শেলাইয়ের একটা কাঠি কলতেই সিরাজ চিনলে
আমাকে।

হুদু কি কোরে এসে।

যেমন কোরে হুদু আস। আর সবাই আসে।

সিরাজের সাদর আত্মানে তার সাথে গিয়ে বহু
প্রবেশ করলাম।

অবাক হয়ে দেখলাম একখানা মলিন বিদ্যনা পাতা।
তার পাশে একটা কেরোসিনের কুণী জ্বলছে।

বেলাদা বেগমত করছিলে হুদু।

হুদু। আমার সাংসে হেলাদা। মনে আছে তোমার।
চুপ করে বইলাম।

সিরাজ আমার বলে, আত্মকাল ভাল তার পাওয়া
যায় না।

—হুদু কি কলতাতার বেলে।

—কাম বড় বেশি।

একপাশে ছোট পাকানো পুরাতন অপর্য্য হুদু-হুদু
ভায়ে সেহাঙ্গুলো ও হুদু হুদু হেলাদাটা টেলে গিয়ে
দিয়ে সিরাজ বললে, বোস।

বলে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখিলাম।

যেদার বুকটা শুয়ে উঠল।

এই সিরাজ আমার সাথে প্রথম কয়েক বছর হুদু
পড়েছিল। সৌখিন শোখাকে ঘোড়ার গাড়ি চড়ে হুদু
আসত। হুদু পদে কোশে বড় বড় কাউ গাঙ্গুলোর
তলার ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে গেল আর চাকর হল খালের
ওপর গাড়ির গদি বার করে চারটে পর্বত গম্ভীর
গভীরে হুদুয়ে বিভ্রান্ত করতো। ভাঙের সাথে টিকিল
কোরবারে সিরাজের খাবার থাকত। হাতে হল।
টিকিলের অবকাণে আমাদের মত সে বাম্বারের মেঠাই
কিনে যেত না।

একদিন অন্যকে ডেকে বলেছিল, খাবি ?

কি আছে ?

‘বীকু’, বলে গিরাজ হেসেছিল।

তার সাথে সাতদিন কথা বলি নি।

বেশ বনে আছে, এক পনিবারের সকালে তুলে গেছি। খুঁটা বাজতে কিছু দেরি আছে। বেলায় মাঠে সোফার বেঞ্চর ওপর বইখাতা রেখে একা বসে আছি। সেট দিয়ে গিরাজের ঘোড়ার গাড়ি চুকলো।

গিরাজ বসে সোফা আবার কাছে এসে হাঁড়াল।

মুখ কিরিয়ে নিলাম।

কতকগুলো চাঁপা ফুল আবার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, রাখ করেছিস ?

কখনো না ? বান্ধনের ছেলেকে তুমি ‘বীকু’ যেতে বলিস ?

খানসিঁতো।

নাই বা বেলায়। অন্যদের শোনাও নানা।

সত্যিই তো ‘বীকু’ ছিল না। ছিল পাউরুটি। না লেখেই রাখ করলি ? তোমার এতে নানা নেই ?

দেখবার ধরকার ধর না। কানে শুনলেই পাল। পাউরুটিও আমরা খাই না।

গিরাজ ধূম্রবীত হয়ে বলেছিল, জানতাম না। কখনো না।

গিরাজের বাবা ধূম্রকা বললী হয়ে সেলেন।

গিরাজও চলে সেল তাঁর সাথে।

আবার দেখা প্রাক্ বৌবনে।

ওদের বাড়ি বেতাম। আমরা অনেকই বেতাম। প্রবর প্রবর আমরা তেমন ভাল বলি নি। কিন্তু বৌবনের কোঠায় শৌছে এখন নিজেদের বতাবত সন্দেহে কিছুটা বিখাল জ্ঞান তখন দেখলাম গিরাজ সত্যিই জ্ঞান বেহালা বাজায়। ওর বেহালা শুনতে নিঃশব্দিত যেতাম আমরা ওদের বাড়ি। সেখানে শৌধীন চিত্তিত শোলালার কাশের পর কাশ চা পান করে, ধূম্র বেতাক বোঁড়া ধূম্র পানের খিদি আর কানে ধূম্রবাই আন্তরের তুলো গঁড়ে এখন বাড়ির পথে ফিরতাম, তখন সত্যিই গিরাজকে ভাগ্যবান বলে বনে হও।

ভাগ্যবান এক শূন্যর হাত দিয়েছেন ওকে।

কিন্তু সেই হাতে গিরাজ আর তেলের চিন বোঝাই করে। তাবতে শূন্য কন্ট হল আমার।

কি ভাবছ ?

কিন্তু না।

তার বিকে চেয়ে প্রব করলাম, এতদিন রয়েছ এখানে একটু দর দিলে না সে দিনের পর ?

লাভ কি হল ?

আমাকে বিষয় দেখেই বোঝার আবার বলল গিরাজ তুমি তুমিই আছ, না ‘খাপনি’ হয়ে দেখ সে কথা কয়েক খণ্ডার দেখায় সে দিন কততে পারি নি। স্বীকার করছি।

আজ কততে পারলে ?

হ্যাঁ। ভাল ভেঙেছে।

তারপর গিরাজ একটু চৌঁচরেই হাঁক দিলে, লক্সী। অ লক্সী।

ওপানের ধরমা ঠেসে ভেঁতরে এসে নড়াল লক্সী। আনাকে দেখিয়ে দিয়ে বললে গিরাজ দেখ আবার ছোটবেলার বন্ধু। অচানকা দেখা হয়ে গেল। একটু চা হবে লক্সী ?

বাবা দিয়ে বললাম, থাক থাক চায়ের প্রয়োজন নেই।

সে সব দিনে তার ওখানে চায়ের ঘেরি হলে বার বার ডাকি দিতোছি। আজ বাবা মিছি দেখে গিরাজ বলল, কি খেদা করছে ?

জি, কি যে বল গিরাজ।

গিরাজ বলল থাক। তবে নাই বা খেলে।

গিরাজের লক্সী কন্ট করে বলে উঠল সে কি কথা গো ? আমি এতদিন নিইয়ে আসছি।

লক্সী হুঁত পাতে বেগিয়ে গেল।

বললাম, শূন্য অন্যায় করলে গিরাজ।

কেন ?

বৌকে বাজাতে যেতে বাবা করলে ? এই যায়ে ?

হেসে কহাব দিল গিরাজ—পাশেই দোকান।

হিঃ।

গিরাজ আর কোন কথা না বলে যেতাম।

অনেক দূর গ্রাম বাইলখানকে হবে দাবার পর সিরাজ বলল তুমি এইখানে অপেক্ষা কর। নশ নির্দিষ্ট। আমি আসছি।

জাহাঙ্গীরা দাওলতের জংগলে ভরা। উঠে-বঠে। একবারে নিশ্চয়।

আমার উত্তরে অপেক্ষা না থেকে সিরাজ এগিয়ে গেল।

চারিদিকে অন্ধকার। তবে খুব ঘন নয়। রূপোর পাতের নত শূন্য পল্যা ঘেঁষে চলেছে এক মনে। তার সোবে কোথাও বাবা পড়ে না। এ পাতের চক্কর গায়ে গায়ে বড় বড় পত্রে ভেতর ঢেউয়ের আঘাতে যে জলরাশি এসে প্রবেশ করছে ঢেউ কিংবা দাবার পরে সেগুলো বেগেরে আবার গিরে আসে বেশদার যে চাপা কিস-কিসানি বশ এ নিশ্চয়তার হাতে বাঁজিতে পরিণত হয় তা যেন শোনা যায়।

বানিকটা দূরে হঠাৎ সেপদাই কাঠি জলবার আলো দেখে দরলান সিরাজ খুব বেশি দূরে যায় নি।

কিন্তু আলোটা তো নিভল না। কীপ হলেও অলসে।

বীয়ে বীয়ে আরো বানিকটা এগিয়ে গেলান। এখন থেকে সিরাজকে আবছা দেখা যাচ্ছে। সে যেন নতজানু হয়ে বসে। নিজের কৌতূহল বেটাতে আরো এগিয়ে যেতে হল। সামনে একটা সামান্য মাটির বেদীর নত পরিষ্কার জাহাঙ্গীরা। তার ওপর একটা প্রাণী জলসে।

সিরাজ উঠে দাঁড়াল।

আমার দিকে কিংবা একটু হেসে বলল বড় অপেক্ষা হাশিরে ওঁ ভেজায়া। চল। কোথায়।

না, বেশ লাগছে।

সিরাজ ডাকল তবে এসো। বস এইখানে। বেরিয়ে ওলত নিবু নিবু প্রসিদ্ধতা তখন কীপছে। হঠাৎ বলে উঠল একটা কথা জিজ্ঞাসা কর।

কি কথা? সিরাজ শব্দ কণ্ঠে জবাব দিলে। কিন্তু আমার তো একটা প্রশ্ন ছিল না। তাই কোন কথাই বলতে পারলান না।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সিরাজ বলল সে

দিন এজাগারি তলার যে বৃদ্ধা প্রাণ দিলে, এ তারই কবর।

এক দৃষ্টে সিরাজ কবরের দিকে চেয়ে রইল।

বোধকরি তার চোখ দৃষ্টোত্তর ভাবে উঠল।

কে ছিল তোমার?

আম্বাভান।

অসম্ভব। সিরাজের হাতে আম্বা দেখেছি। সেও বললেও যেন তাহা চাপা কুল।

আমার মনের অবস্থান সিরাজ তের শেরে হাঙ্গলে। বললে, তবু সেও আমার মা ছিল, নির্মল। এই জাহাঙ্গীরা দূরে যেদিন নিঃশব্দ অস্বাভাবিক লক্ষ্যের দৃষ্টে বসে এসে দাঁড়াই, তখন আমারই কিছুর না মনেও বিশ্বাস হয়ে থাকতে জাহাঙ্গীরা দিয়েছিল সে। ঐ তেল-কলটার কাছে ছিল তার হাতু-বুড়ির ছোট্ট একটা দোকান। ছোট্টা ভাল টাঙ্গারে পাখি আর কাকের উপর থেকে বাঁচিয়ে রাখতো বাড়ি তার হাতু-বুড়ির ডালগুলো। তিন কুলে কেউ কোথাও ছিল না।

সিরাজ হঠাৎ চুপ করে যায়।

তারপর আবার বলে, না না হলে এখন কোরে কেউ বুকে তুলে নিতে পারে?

নিঃশব্দে সারাটা পথ অভিক্রম করে কিংবা এলান বুঝবে। সিরাজের ঘরের নজর পৌঁছে তার হাতে আড়াইটা টাকা দিতে বললান, আমার তপালবাহী কবিরটা কিছু পাওনা রইল সিরাজ।

সেই থেকে নির্ভরিত সিরাজ এসে বসত আমার ডিপেন্দ্যুসারি সাতা আভার। বেহালা বাঁজিয়ে শোনাতে। একদিন বললান, তোমার পে আগের হাত যেন আর সেই সিরাজ।

তা হবে, বলে সিরাজ নতুন একটা দূর তুলে দিল। তোমার একদিন একা-একা শোনাব।

জ্ঞানবর্ষ হয়ে বললান, কেন? আগে যে বলতে যে সবকিছুর স্রোতের দল না জ্বলে বাজিয়ে দূর দেই

বেহালাটা বাজিয়ে গেছে আরেকদিন সিরাজ আমার বললে, অন্ধিত কে যেন আছে তোমার? অন্ধিত গাঙ্গুলী? খুব মনে আছে। গ্রাম বাহাদুর প্রসাদ গাঙ্গুলীর

হেসে । 'ত-তো মত সাহেব এখন ।

সিরাঙ্ক নব্বু হেসে আবার তার বেহালাটা তুলে নিয়ে ছুড় টানতে থাকে ।

ডাঃগর একদমর হঠাৎপথে গুর গারিয়ে বলে, ঐ অজিতই আমার প্রথম একদিন নিয়ে যায় গর্যতে লক্ষ্মীর ঘরে । তখন বাঘা মারা গেছেন । দু'নিরাটা কঁকি । আঁরি বড় একা তখন ।

সিরাঙ্কের মস্তপড়া বেহালায় তারে আর খেঁদে গুর ওঠে না । কে'পে-কে'পে হারেরায়ে খেঁদে যায় ।

ক'কি বিন্দাস কোরবে একথা ?

অজিত ?

প্রাণ্য গাঙ্গুলির সোনার টুকরো হেসে অজিত ? লেখাপড়া নব্বাংকারি আদরকারি অজিত সেয়া হেসে । 'হরের গব' ছিল সে ! আদর সে অনেক অনেক গুণে । তার দিকে চাইতে হলে চোখ অনেক গুণে তুলে চাইতে হয় ।

এ আলোচনা বড় ক্যার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করলাম, তোমার দাদারা বেঁচে আছেন ?

হ্যাঁ । সবাই বড় চাকুরে ।

বড়দাদা, কেন সিরাঙ্ক যেতে পারে না তারের কাছে ।

প্রতি দস্যর লকলে বন্দ বিদায় নিয়ে চলে যেতে সেই বন্দরে আঁরি আর সিরাঙ্ক অত্যন্ত খবিস্ত হয়ে বসতাম । কোন কোন দিন তার বেহালা শুনাই কাটাডাম । কখনও যা সে তার জীবন কাঁচনী সোনাতে ।

নিখে বদায়পত্র না হয়েও সিরাঙ্কের বদায়ী ছিল কোল আঁরা ।

পিতার মৃত্যুর পর তার অংশতন সেখে ভাইয়েরা বিদায়-আঁরি ভাগ কোরে নেয় ।

স্বাভাবিক ।

কে চাইবে তার মত জীবন নিয়ে জুরা খেলতে ? তারের মদার আছে । আছে জীবিকা ।

গরার লক্ষ্মী খরে সিরাঙ্ক যেদিন তার উত্তরাধিকার দুইয়ে প্রাপ্ত লক্ষ্মীসেই খেব আশীর্বাদটুকুও উজাড় করে দিয়ে ফেলল, সেদিন চোরে সেখে, তার পাশে না আছে

সে একা । একেবারে নিঃসন্দ্বল ।

অদহার সীরাঙ্ক কাতর কণ্ঠে বলেছিল, জুরি আঁরা, তাকিরে নিওনা লক্ষ্মী ।

কি জুরি, কোম সবতার মদনে আবদ্ধ হয়ে লক্ষ্মী সিরাঙ্কের কথা রেখেছিল । এমন কি নিখের দিক্ত হন লক্ষ্মি পাতান বোনকি আঁরা হাছে পজিত রেখে গবে বেরিয়ে এসেছিল সিরাঙ্কের পাশে ।

প্রথম কয়েকটা বর কোম কটাই হয় নি । ব্যক্তি, হাছের অলক্ষ্যর ইত্যাদি হাছতে পাওয়ার দিন চলে গেল । তারপর মৃৎপেরের সিরাঙ্কেট কলে জাল চাকরিও ছোটাল সিরাঙ্ক ।

এই সময় খেঁদেই বোঝার লক্ষী কিকি চকলা হলেন ।

গর্য থেকে মৃৎপের বেশি হুর নয় ।

সিরাঙ্কের সামাজিক সম্বন্ধ আহত হতে লাগল অনেক কারণে ।

আঁরা তারে স্থান ত্যাগ করতে হল ।

এবার এসে শেঁপিল আঁরাগের নতুন গহরে । এখানেই তাকে 'অঙ্গ বিহু' আঁরা হাছ'র অন্তে নিবন সংগ্রাম করতে হল । শেষে বাঘা হয়ে তেল কলের কাছটা বেছে নিয়েছিল । তবু সে লক্ষ্মীহাছ হতে চায় নি । কিন্তু সিরাঙ্কের ভাগ্যে লক্ষী খচলা হয়ে গিয়েলেন না । হঠাৎ কোন এক ব্যারায়ের সোপন আঁরাগে লক্ষী অস্তরীণ করলেন ।

বিদ্যাবাদ, একদিন বললেন, শুনলেন, সিরাঙ্কের মারগীটা পানিয়েছে ।

সে কথা আঁরাগি জানলেন কি করে ?

বিদ্যাবাদ, একটু হাস করলেন বুদ্ধিতে পারদাম ।

আঁরাগ দিকে বাহককে কড়া মদরে চোরে বলে সেলেন, বড় সব ;

পরদিন সিরাঙ্কের আঁরাগার গিরে সেখি, মরআর তাল্য কুসছে ।

তখনই বুদ্ধি, একটা কোম অস্তরীণ হয়েছ, দইলে আঁরাগের বেহালা বাছাতে আসে না কেন সিরাঙ্ক । কিন্তু সেটা যে এমন কাত, ভাবতেই পারিনি । বন্দই সিরাঙ্ক জুর হারে তখনই তার একটা না একটা কিছুর বটে ।

মৃত কোরতে পারলাম না।

নেহটা ওর সাথে এলই যা কেন, আবার এমন কোরে তাকে কেনেই যা গেল কেন ?

নিজের দেখা অনেক সত্যিগতীর হুইই বনের নাকে ভীড় কোরে এল। অনেক গংগার-নাথক প্রবীণ ভক্ত-লোকের কথাও মনে জাগল।

আর, এয়া তো সত্যার লক্ষী। নিঃসন্দল সিরাজ।

আটটি সত্যারের পিতা আটচল্লিশ বছরের সুবোধ-বাবুকে দেখেই তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর দিন অসহায় বাবকের মত কেঁদে ভাগ্যতে। অমরা এখন মৃতদেহ থেকে একে একে সোনার বহনগুলো বসে রাখারিলাম, অশানে নিয়ে যাবার আসে, তখন হুটে এসে তিনি বসেছেন, বুলনা, বুলনা নির্মল। ওদব দিয়ে আর কি হবে আবার ? ওদব ওর সাথেই যেতে দাও।

কিছু, হুটা মালও গেল না। হতভাগা বাংলা দেশের কোন এক অধ্যাত গ্রামের এক পোড়া কপালীর গারে শেষে উঠছিল সে সব গমন।

নবীন বোনের মৃত্যুতে তাঁর স্ত্রীর শোক।

উঃ, সে কি মাথা কুটে কুটে নৃকচাপড়ে কারা।

নবনিবাবুর জীবন কালে অত্যন্ত সৌখিন বলে একটা সুখার ছিল। মৃত্যুর সময় যে পায়াবীটা তাঁর গারে ছিল সেটা যেমন নতুন, তেমনই ধারী।

তাঁর স্ত্রী কাঁপতে কহিতে আমার জেত বসলেন, ওটা বসে রেখে যেও ঠাকুরশো। তাঁর বড় সখের নতুন পায়ালী। এই শেষ স্মৃতিও, বকে কোরে রাখব ভাই।

তাঁর মৃত্যুর দিকে কিছুক্ষণ চরে বসেছিলাম, একটা পুত্রায় গান্ধা দিতে পারেন বৌদি ?

কেন ? কারা কবে দেল বৌদির আবার।

মৃত-সহচরী একেবারে উপলব্ধ নিয়ে যাওয়াটা যে বিধি-বহির্ভূত। হয়ত তিন শোয়া নয় সেকু শোয়া সোদ পারে। শেষে পাড়ার লকলের সাথে বিপদটা আলনারও হবে যে।

অতএব লক্ষীহাড়া। সিরাজের পথের লক্ষী যে সময় বকে সোশন নাগারের ইলাগার পার দিয়ে অতর্কিত করবেন, তাতে আত্মবের কি থাকতে পারে ? নিজের মনকে এই বোসে প্রমোদ বিবেচনা কোরেই ছিলাম।

প্রায় মাস দুই পরে ঠাণ্ড একদিন সিরাজ ছায়া ভাঙা বেহালাটা নিয়ে আমার ডিপেন্সারিতে এসে উপস্থিত।

আত্মব' হয়ে জিজ্ঞাসা কোরলাম, কোথায় ছিলে, এতদিন ? ভাব' পথটিকে।

তাকে বসতে চোয়ার দিবে দার্পনিকের মত বললাম,—নারীকে বিশ্বাস করা কঠিন, সিরাজ।

সিরাজ চোয়ারে বসতে ব্যস্ত হল।

মনকে উঠল।

—ও কথা বোল না। তোমার না, আমার না সবাই যে নারী ছিলেন।

সিরাজ ক্রিমে যেতে উদ্যত হল।

বললাম, বোস।

আরি বাই, এই বলে সিরাজ বেয়ে গেল। তাকে ফেরাতে পারলাম না। বাসন্তী অবধি এগিয়ে গিয়ে বার বার ডাক দিলাম তাকে। সিরাজ ক্রিমেও চাইলে না আর।

হয়তো সিরাজের কথাটাই ঠিক :

নরতো আমার কমলের কথা মনে পড়বে কেন ?

সিরাজের সাথে কমলের কোন দিন দেখা চব নি।

কমল ও এ কথা না জেনেই হয়তো এতদিন পুণিবদী খেতে চিরবিদার নিয়ে গেছে যে সিরাজেরাও আছে এই দুনিয়ার। অথচ উভয়ে উভয়কে চেনে না। নান পথ'ত হয়তো জানতে পার না কোন দিন। সিরাজেরা কমলের জন্যে মরে। কমলরাও সিরাজের জন্যে শেষ চরে মূছে যায়। অথচ একে অপরের কাছে চির অজ্ঞাতই থেকে যায়।

সাঁওতালপল্লভদার কোন এক শ্বাস্তা নিবাসে গিয়েছিলাম কিছুদিন। এক নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে পিঠেই উঠেছিলাম। আমি যে নিজে ডাক্তার সে কথাটা পাড়ার জানাখানি হয়ে যাওয়াতে নিজের শ্বাস্তা উদ্ধার বাদনার কথাটা গোপনই রাখলাম। বিবেশে এসেও দরি কড়ি, গুহ্মিবে তুলতে পারি, ভর্তি কি ?

নাহে মাকে 'কল' পেভান শরীরে নানা আছে।

একদিন আমার আত্মীয়ই ছিলেন এক নতুন 'কোল' স্থান।

সে পাড়ার ছেলে মৃত্যু সবার হুইই বহন'বের নাম। আয়া, অমন মান'ত হয় না। যেমন দেব'হুইে ভর্তি, তেমনই মান'বের প্রতি ভালবাসা—যেন'কত কালের

পরিণত বয়সে নিকট আত্মীয় তিনি দয়ালু। তিনিও নানিক কয়েক বছর আগে প্রথম এখানে বসত শ্রমজীবী করে পাওয়ার উদ্দেশ্যেই এসেছিলেন। কাজগাটী পছন্দ হয়ে যাওয়ার ছোট্ট একটি বাড়ি কিনেছেন। পাজার হোসে-বেরেবের হাউসে পরিণত হয়েই বেটা। কমলদিগি বন্দন আসেন, একটি কোণের ঘরে থাকেন। কিংবা বাবু'র। এক বেলা ঘান। কোন কাবেলা নেই।

আত্মীয়ের সাথে গিয়ে উপস্থিত হলার কমলদিগির বাড়ি। চমৎকার ফুলের বাগান। পরিষ্কার স্বচ্ছত্বের হাবির মত দাক্তান ছোট্ট বাড়িটি।

ভেতরে গিয়ে দেখলান ঘাটে পুতে আছেন কমলদিগি। হারোহান পু'খানা চোয়ার এনে তাঁর পথ্যার পাশেই বসতে বিশেষ আনন্দের। বড় আলোটাও জ্বলে দিয়ে গেল।

অবাক হয়ে চেয়ে উইলার কমলদিগির পানে। এঁকে যেন কেহো দেখেছি! নিশ্চয়ই দেখেছি। ভবে এ হ'নিবাহ নহ। মনে মনে যেন এই চেহারাতে আঁধি তিনি। চোখে মূর্খে অবাক হেনা কেটে পড়ত। কোথায় যেন কি তাঁর মহা সম্পদ জায়গা সেজে। তিনি ধরোদ হয়ে হতানায় ভেঙে পড়তেন। তাই পথ্য নিয়েছেন। অহাধারে মত চেয়ে চেয়ে দেখছেন দরাইকে। সে চোখ দুটি একদিন যে মতিভাই অতি সুন্দর ছিল, মোহনর ছিল তার দৃষ্টি, সে কথা ব'রতে স্মৃতির হল না আবার।

হোগ ব'রতার আয়োগ্যার মনুলাম।

'হাট' 'জিহাদ' বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু পরীক্ষাতে ভেদন কোন প্রশ্ন পেলান না। তবে হাটটি কিছু ম'ন'ল।

কমলদিগির মূখ্যোপায়ে আভ্যন্তরীণ হাটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। কাজের শব্দে বললেন, সারসে ডাকারদান্দু' আঁধি ভাল হ'ব।

অভর দিয়ে বললান, দিচ্ছই সারসে। তাহাড়া রোগ তো আপনায় কিছু কঠিন নহ। কয়েক দিনেই সেয়ে যাবে।

হাসলেন কমলদিগি। বললেন, অনেক ওষুধ করোছি। কোন ফল হয় নি।

জিজ্ঞাসা করলান, বলুন তো কি কষ্ট হয় আপনায়।

—নিজের এই হাটের দায় হইলেন আবার হ'বের

দিকে। ঠেঁটি হোড়া যেন ঝুঁকু'কে উঠল। চোখে জল ভরে উঠল। হীরে হীরে বললেন, কষ্ট? আমার কষ্ট?

তারপর চোখ ব'কে গান দিয়ে পুতে একটা নিশ্বাস ফেললেন। তাঁর পিঠটা কেঁপে উঠল।

আত্মীয় ওরলোকটিকে ভেঁকে দিয়ে ব্যাঙ্গাত্মক গিয়ে দাঁড়াল। বললান, তোমরা তো এতদিন থেকে দেখছ, বলন্ত কিছ' জান কি না।

সে বললে, রোগের তো ভেদন কিছু' দেখনা। বেশ আছেন। মূর্খে বেড়াচ্ছেন। হোসে-বেরেবের পথ্যার পথ্য বসে গিয়েছেন। পাজার প্রভোক্তার বাড়ি গিয়ে পজারদ্বারা মত খোঁজ খবর নিচ্ছেন। তবে উনি মোটর গাড়ির পথ পুনরলৈ ভেদন অধিকতা বোধ করেন। বলেন, পথ দয়া হয় না। বুকটোর মধ্যে কেমন করে।

বললান, ও কিছু' নহ। কলকাতার দিবাগার গাড়ির ছোটোছোটো মেখে, পড়ার অভ্যাচারে অনেকের অমন হয়।

কিরে এলান ঘরে।

ডাকলান, বহল দিগি।

তিনি উঠে বসলেন। বললেন, আসুন। একটু মূর্খের মত হয়ে গেছিলাম।

তিনি একটু লজ্জিত হলেন।

বললান, বেশ পাত পরিবেশ বাড়ি দিয়েছেন। থাকুন কিছুদিন। সব সেয়ে যাবে।

ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা দিয়ে সেদিন করে এলান, তিনি বেশ ম'ক হয়ে উঠলেন। স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন।

একদিন বললেন, এইখানেই তোমার ডাকারখানা খোল না ভাই। অনেক রোগী তোমার কাছে এসে দেয়ে যাবে।

কেন বলুন তো?

খুঁধি ভাল ডাকার। রোগীর মনে দায় দাত।

হেসে বললান, রোগীর মনে দায় দাত মেজাজেই তো ডাকারের প্রথম ও শেষ দ'ব। ওষুধ তো পরের ব্যবস্থা।

স্বাভাবিক কমলদিগি ভগ্নের একখানা দর' পাড়ের দাঁড়ি পরে বাগানে ক'ল জুলালেন। তাঁকে সেয়ে মনে হল, তিনি বেশ প্র'ক'র।

তোমার বাড়ি কোথায় ডাকার ভাই।

বললাম।

দেখি, যদি পারি, কখনো দু'যোগ হব যাব একবার তোমাদের সঙ্গে।

বললাম, নিশ্চয়ই যাবেন।

ফলে বললেন কমলসিঁদ্বি, শেষে তাক্তির ঘেরে না ত ?

আমেকদিন বললেন কমলসিঁদ্বি, বলতে পার ডাক্তার, হাফায়া হানসের সেওয়া দাঁখ, শূর, লুইই বা তেন বলে, পারিতরীক হস্তশাও অন্যখানে দ্বা করে চলা যায়। কিন্তু, ওরই মধ্যে কোন বিশেষ একছবেরই ফেঁচনা দাঁখ সব কিছু ভেঙেচুরে যায় কেন ?

আগে আস্ত বললাম তেমন বুঝতে পারলাম না আপনাব কল।

কমলসিঁদ্বি ফলে উঠলেন। বললেন ও'কা তুমি এখানেই ফেলেননি। আচ্ছা তাক্তি একবারে পাঠশালা থেকে শূর করি কেন ?

পাঠশালার পড়ে ছো ?

হ্যাঁ।

নার ঘেরে ? বাসীরের বা গুবুখাঘেরে মার ?

জা.—হ্যাঁ, যেখানি বইকি।

আচ্ছা, যেমার সাবীরের মার।

হ্যাঁ, তাও ঘেরেছি।

কমলসিঁদ্বি বললেন, লক্ষ্য পেও না। সবাই ধান। বাবাঝারি ফলে দৃপকই মার খায়। কেউ বেশ। কেউ কম।

তারপর বললেন, সে সব মার দখ হযেয়ে নিশ্চয়ই। মরতো মনে থাকতো।

চপ কোর ঝুলায়।

তিনি বললেন, আচ্ছা এইবার বলত তাই, যে যা এত ভালবাসেন, তিনি যদি তোমার নির্মিত ভাবে প্রচার করেন তখন কি হুঁপরে হুঁপরে কলিতে কলিতে বুঝতে পার না ?

খাঁত পোকা প্রঃ। তাই বুঝি উত্তর দেওয়া পক।

এরপর খাঁত ঘন ঘন আমি কমলসিঁদ্বি বাড়ি যেতাম।

একদিন বললেন, এবার দেখছি পালাতে ছোম।

ভর আদহে।

ব্যক্তি কণ্ঠে বললাম, আমাকে বিত্রে ?

হ্যাঁ, তাইয়ের ব্রে বিত্রে। এবার পালাব।

দিন দুই পরে আমার নিজের পত্রের কিত্রে আদিবার কথা। তাই এক সন্ধ্যায় গিয়ে লাক্টালায় কমলসিঁদ্বির বাগানে। দারোগান মেয়ে এসে জানালে, বাড়ী চলা গিয়া।

—তা জানি। আমার এসে বোল, আমিও চলে দেখি।

দারোগান সেলাম জানিয়ে বুঝিয়ে দিলে, সে আচ্ছা পালন করবে।

মহা কেনন একটা নতুন বোঝার ভাবে ব্যক্তি হয়ে উঠল। কিত্রে চলেছি নিজের মনে।

বড় গাফাতা পার হতেই এক অপরিচিত ভদ্রলোক সামনে এসে নবস্তার কোরে হাঁকলেন।

—পারি উকেছে তো ?

—তার মানে ?

তার মানে আশনিও বোক আমিও বুঝি। সদা'লেই কিকিত বোঝেন।

একটু হাসত ভাবেই বললাম, কী বললেন আপনি ? ভদ্রলোক আমার গগকে তাক্তিলোর মতোই বেন চোকে ফেললেন। বললেন, আগে মশাও, আপনি তো আচ্ছাদের বুঝুন লোম। আমি গিলে, ওর শ্রেষ্ঠের দিন থেকে, বোক নি ? আমিই ওর মাতা দেখায়ে এত বড় বড়তা করলাম। যে তো পারি বাড়িতে বেতে শেত ?

—কমল সিঁদ্বির কোন আত্মীয় হন বুঝি আপনি ?

চোখ বুজিয়ে বললেন, আত্মীয় না, আত্মীয় বাবা হই, বোক ?

চটছেন কেন ?

চটবো না ? কমলভায় এবে নাইনে বদাল, সে কেডা ? এই শম্মা। এখন কলা দেখাও। চটবো না ?

আমাকে সিগারেট ধরতে দেখে লোকটার উৎসাহ বেন শত্রুগুণ বেড়ে গেল। বগল থেকে ছাতাটা নামিয়ে নিয়ে মাটিতে ঠুকে বললে, তারপর কত কেডা আইল গেল। সোনাঘানা উঠল দেখে। আলপাকা ছেইছে বেনাঘনী খল। চোখে কাকল দিল। বুঝে হু দেলদো' সে।

দুশা তরে বলসান রাখিল ।

তাকে এক প্রকার ঠেসে দিবে বাত্মা বললাম ।
লোকটা যেন কোশে উঠল । চোঁচের বলতে লাগল হলে মি
হাটের যাবো ? আমার অভিশাপ কি মাংগনা ?

এবার নিজের গতি আমি কহিবে দিলাম । কেন যেন
জানতে ইচ্ছে হল এ সবের সাথে হাটের অশুখের
সম্পর্কটা কোথায় ।

লোকটা আমার মত গতি সেবে জোরে জোরে পা
চালিয়ে বাবার কাছে এল । বলল বাবামাটা এখন বেশ
কোঁশে উঠল, তখন গড়ল নগরের পাল্লায় । গম্বা
বিহার বললেন আমার সত্যিই নাকী । কত মান্য করলাম,
হাঁসে কোমোলা এমন কক্ষও করিলেন । জগন্নাথ কি
আমি শুই ? যেটেখটে যা এমন কত পাল্লা রাখল, তবু
দরজার এসে বাত্মা ফুটল । তা কে কার কথা মোনে ?
সেইবে তখন কোমোলা আমার ভূব-নাঁতার । সব ছেড়ে
বহুদানি উত্তরলেন । সে বৌটা পাক্সা হুত্বাক্স ।
আসল মোমোনা । বছর তিনেক ইঞ্জিন-উপাঙ্গ, হুত্বারে
উহার পরসান ভোগ মালাশা মাইবে সব টাকা পরসান
নিয়া লে চলল । এখন সত্যিই নাকী মাঝে বেধবার ভোইল
হবে আচর্যকর বন্যলেন । ঐ বৌটা গাড়ি নিয়া নিয়া
আইত । গম্বা । গম্বা হলই কোমোলা সব বন্দর
বহু কক কিভাবে ঐ গাড়ির শব্দ শোনার জন্যে বান
শেটতে থাকে । এত গাড়ির শব্দের মধ্যেও ওয়ারি
গাড়ির শব্দ শুনাই বোঝে । হুটে মানে নীচে । এখন
দোক । এখন গাড়ির শব্দ বুক কপে । হুত্বাতে চাইলে
করলে কি আর ভিতরের দে কপন যাবে ? এখন মর ।
সেখ কেবল লাল ।

এবার বললাম সব বললাম । তা তুমি এখনও ওর
সেহ, সেহ, হুত্ব কেন ?

লোকটা যেন ভলসে উঠল, ঘোরঘো না ? তোমার
বাখান যাইকে বহি কোন হুত্বা গাই পলার তুমি খোঁজ
বা না মশ ?

বটে ?

এবার গালে আমার পরীর কপিতে লাগল । শব্দ
হুত্বার তার বক্তের জামটা চেপে বসে বলসান চল আক
তোমার পুণিমে দেব । পরতান কোথাকার ।

বিস্ময় বেগে এক কটকার মে আমার হাত থেকে
নিথকে বুক কোরে হুটে পাল্লাতে পাল্লাতে বলল,
না— । তুমি আমার পুণিশ দাখাও । না—কথাকার ।
পুণিশ মাণিশ কত দেখা দায় । হুই টাকার ওয়াত
পুণিশ ।

এত দিন পরে আকসর সন্ধ্যার ডিম্পেনসারিতে
একা বলে বসে যেন সেই পলারমান পরতানের কীমান
কঠম্বর পুনতে পাছি ।

যতি ভেবে বলসে বাব, লোক এসেছে ।

বকে উঠলাম ।

কি ?

বাইরে ।

দেখলাম এসেছে । সিরাজের বস্ত্র করেকজন লোক ।
গাতে আলো ।

আমার কাছেই সিরাজ আসল ।

আমিই তার অবাচিত চিকিৎসার জন্যে দায়ী । তাই
তার নম্বর দেহটা আক মাটি চাপা দেওয়ার কতখাও
আমাকেই সম্পন্ন করতে হবে ।

বেশ । চল ।

পতীর গাতে সেই গম্বার হাতে আমার এসে
শৌছিলাম । সিরাজের নতুন আশ্বাসজানের কবলে পাশেই
তাকে আমার চিরদিনের জন্যে শুনিয়ে দিবে মাটি চাপা
দিয়ে ফিরে এলাম ।

গম্বার দিকে চেয়ে দেখলাম কোন পরিতর্কন নেই
সেখানে । ডেউ আর তটের একটানা আখাতের সেই এক
শব্দ—কিরে আর । কিরে আর ।

পরদিন সন্ধ্যা আমারকে বেড়োতে দেবে পুণিশ
বললেন লগে কিছু নিজে ?

পথে কিসে দেব ।

আত্ম হুবে বললেন তা বালি পারে কেন ? জুতো
পারে সেখানে যেতে নেই বলে ।

আর কোন কথা না বাড়িয়ে পথে নেমে এলাম ।

পুণিশ বললেন, আমি দাব না ?

নিশ্চয়ই দাবে । এত কোরে বলে গেছে । নগর টাকা
কিও পট্টা ।

এক মাথে গেলে হোত না ?

না ।

পথের এক মোকান থেকে হুটো হাটের প্রদীপ কিসে
লিলাম । কিছু ভেল ও মোকানীর দহায়তার সলুতে
লাড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে চললাম । পথ যেন আর শেব হর
না । চলছি । শুনু চলছি ।

গম্বার সেই কিরে আর জাক শুনু চমক ভাঙ্গল ।

পকেট থেকে চট্টর আদোটা ব্যাং কোরে ছেলসে
পথ চলে এল হাটালার সিরাজের কবরের দানবে ।

বহু কোরে প্রদীপ হুটো তেল দিলাম । একটি

সিরাজের কবরের ওপর । আর একটা তার আশ্বাসজানের ।
নতজানু হুবে হইলার কিছুকাল ।

বীথে বীথে বলসান সিরাজ কমা কোর ভাই ।

ওরকম সিরাজের শ্মশ্রুতির বিধের মানাই বাড়ছে ।
অতি কপ হলেও কানে আসছে । পুণিশনী নগর গিচ টাকা
নিরে সেখানে একা গিয়ে লক্ষ্য পাশে ভাও জানি ।

তবু সিরাজের পুণিশ বিধেতে আক আমার আর
বাওয়া হল না ।

দীঘার আকাশে
বেশ।

মেঘমেঘ
নির্মল
সন্ধ্যা



কিংবা আরো কোশ
গুরুতর পাতি।

সমুদ্র বাউ এর
অবশ্যে নাবল কড়।
বলকল পরিহিত
সম্রাটীর দীর্ঘ
শাখা প্রণামের
জটিলীনে সোনা
বাতাসের তরঙ্গ
লাগল। হঠাৎ
মাটির অন্ধকারে
অতিথের শিকড়ের
দাদা হাড়ে কম্পন

চাইল, পর্বতাকার বাগিচায় দানব্যাগ দমত সমুদ্রবাউ
অবশ্যে অন্ধর বেগবান চাওয়ার ভাঙনার হু হু
করে উঠল।

এখানে আকাশ ছোট। এখানে সমুদ্রের উদ্ভত
কলকল্পন অনুশ্লিষ্ট, এখানে আকাশে শব্দ পাণ্ডুরণ
মেঘশ্রোতের খরচরণের কুটিল ইলিঙ, বীণ হাড়ে এমন
ধিরা বিম্বহরেও অন্ধকার, নীচু নীচু আর ছোট ছোট
কুটিরগুলিতে বিষাক্ত তত্ত্বাবেণ আর বৈশিষ্ট্য।
এখানে শব্দ জর আর ভাবনা, শব্দ বিগত প্রহরের
অনুদ্যান।

উঠল কড়, প্রাণী আকাশে উঠলো কড়, ধরে সমুদ্র-
ভায়ে অকর্ষিত হুঙ্কারের বাসন্তী বাসির আবার
উড়িয়ে হুটল হুটল, রাসাতলার বন শুল্কভবক বেশভাষে
অলম্বারের বত চতুর্পাশে হুড়িয়ে পড়ল।

এখানে শব্দ চিত্রা আর চিত্রার স্রাব। শব্দ
আতঙ্ক। শব্দ শব্দ আতঙ্কে কেঁপে উঠে কুশল
কুমারের বন, এই তো পানের খেই রয়েছে বিস্মের কমে,
দর থেকে পালিয়ে আসা কুমারী, রাতি দাগরণের
উত্তেজনার স্রাব—কিছু সে রাতিও তো তোম বোল,
আবার কি হবে তার।

কি আবার হবে! যা হয়, হয়ে থাকে। নিশ্চিন্ত
হরা পড়বে সে, নারী হরনের অপরাধে জেল, জরিমানা

উঠল, হাওয়ার উড়ে গেল বত নীড়হুট পত্র সম্পদ।

আকাশে বিদ্যুতের কলকানি।

গভীরায় দেইলর হুঙ্কারগুলো অমন শব্দবিভ
বিরুদ্ধাশ্রমের বত আকর্ষিত। থাকুড়ার সেই তাঁণ ফেলা
কোকন-বনে সে আঘোরে হুমোছিল, রাত কত হবে
তখন! হুটী, এগারটা কিংবা আরও বেশী। হঠাৎ
দরজা কয়দাত, প্রথমে শব্দ আর বিলম্বিত লয়ে,
তারপর উজ্জ্বল আর হুতভালে—

—কে! চব্বকে উঠেছে কুশলকুমার।

—আমরা, দরজা বোল, দরজাটো অনেকগুলো
শব্বের কিসকিমানি, নে, শিগুগির—

চোখে একরান তত্ত্বা, পাশে কেউ নেই যে বিলটা
আলসা করে নেবে।

—কই রে উঠলি, বোল, বোল, আর সেরী করবার
দর নেই—একসঙ্গে অনেক দলার অনেক কথার
এলোমেলো মিছিল।

আরে! একটা গলা গুহ বলুই এর না! থাকুড়ার
ভরণ শব্বের কলপতি হাঝির তা হলে! কী ব্যাপার!
বিহানা ছেড়ে পাতিয়ে উঠল কুশল, এক টানে তখন
নাবল, হুট হুট করে হুটো হুটিকনি আলসা করল,
তারপর দরজা খুলেই হুমুড়ি খেয়ে পড়ল, কী ববর

চাপরা

—তোকে পাল্লাতে হবে, একটা মেয়ে নিয়ে, এই
হাত্রে, এখনই, কর্তন কর্তার চক্ষু পল্লী-এর, কোনো
ভূমিকা নেই, হ্যাং'বোব নেই ।

একটা চোখ মিললে কুলদুনার, কথারী কর্তার এসে
শিল্প, তার নামে ? তা কি করে হয় ?

কিন্তু সে কথা বলা হয় নি, সে প্রশ্ন তুললেই প্রমাণ
হয়ে যেত চক্ৰপ বহুরের অবিবাহিত আশ্রয়বাদী
কুলদুনার বৈবাহিকের বিরোধী প্রতিপক্ষের একটা ব্যঙ্গ
সংকল্প নাম, কথার আর কাছের তার প্রভু পরম্পর,
আকস্মিক বিপদের মুখে জাপিতে পড়ার দুঃসাহসে। সৌভ
তার ঐ স্বাধীনতা বিপদের বক্তৃতা পর্যন্ত, প্রমাণ হয়ে
নেত স্নাতকোত্তর আর সংস্কারের কাছের দ্বারা প্রাপ্ত পর্যন্ত
গান করতে দেখা যায় সেই বসন্তেরই একজন হয়ে আসলে
সে ব্যক্তির তরুণ সম্বন্ধে একটা অঙ্গনের, কলঙ্ক,
একটা বিপদগ্রস্ত কুমারী ভরসীকেও রক্ষা করতে সে
দলদল দল ।

এখানে যেহেতু জনসংখ্যা, হাওয়ার শোঁ শোঁ খনি আর
মেয়ের পুরু পুরু ডাক এখানেও এসে পৌঁছচ্ছে, খোড়ো
চালের ছোট খড়ার বসে কুলদুনার কাঁপে, আতঙ্কে
আর ভাবনার, ঐতো পাশের ঘরের গরমে গরমে হুঁপুপা,
কী করছে সে তারই মত চুপ করে বসে আছে, নাকি
আলস্যের কাঁক দিয়ে দেখছে নতুন জায়গা, দেখছে নতুন
আকাশ, ওকে একটু দেখানো করা বোধহয় তার
কর্তব্য, একটু সাহসও ওই সঙ্গে জড়তে পারলে
ভালো হোত, কিন্তু কী বললে নিজের ভাড়াচাল
পড়বে, কী দিয়ে আশ্রয় করলে সবাবিক রক্ষা পাবে !

খনি গরম আর একটা টোকা লাগানো যায়, ঘর বলা
যায়, খিল হুঁপুপ, স্নাত পা একসঙ্গে হঠাৎ সোকে
এ ভাবনের মত শব্দ হয় আর কাল সারা স্নাত হয়ে
একসঙ্গে হঠাৎ এখনি আসবার সঙ্গে একটা কথাও
হোল না ।

অত্যন্ত পানসে পুরুভূমিকা। পুরুষো কথা ।
আপনিও বিবেচ করে 'আপনি' চায় ।

পুরু ভাই নয়, বাবার ইচ্ছে থাকলেও তার নিক
নেই । এক হাজার মধ্যে এমন করে সে বিশেষ হয়ে
যাবে ভাবতে পারে নি । থেকে থেকে তার মনে বাহুর

দূরত অভিব্যক্তি, বাবার কর্তন জোহর, পরিচয়ের দুঃসহ
নিষেধ হলকা এসে লাগছে, আর সে কলসায়ো পাতার
মত কঁকড়ে যাচ্ছে ।

এই বর তার অপরিচিত নয় । এইখানে বসে একদিন
—না, অনেকদিন অনেক প্রতিজ্ঞার পাঠ নিয়েছে সে ।
কিন্তু আর ! আক'কি হোস তার !

চন্দ্রবার পুরু আত্মতার চারিদিকে তাকান সে ।
সেদিন দ্বারা পাশে ছিল আর তার অদৃশ্য । এমন কি
এই বাড়ির দ্বারা জিন্সের সেই চাবী সোকাটা গেছে
এখন থেকে ন'মাইল দূরের হাটে, কখন কিভাবে তার
ঠিক নেই, আর তার স্ত্রী ? ও না থাকার বহো । আর
অকাশে বেব জ্বলছে, বাতাসে আর 'কোমলতা, এখন
সে শব্দ দেখছে হুঁপুপ আর বেগুন' বিক্রীর পরবার
তার স্বামী ক'গাছা গঠন চুড়ি আনবে ।

তা হলে এই প্রায় ঠাকুরা কুটিয়ে জেলে গেল কে ?
দুঃসাহসে চুড়ি প্রাপী । এই সময়ে হুঁপুপ এসে হুঁপুপ
ভালো হোত, কিন্তু না, ওরা ধানসের বিপদের বহু
নয় ! কাল হাতে হাতে হয়েছিল, এখনও তাই ।

কালকেই পাগিয়ে আসতে হয়েছে, কেননা আর
নকলেই পারে হুঁপুপ, হাফিজে প্রাপ্ত পুত্র আট খটকার
পাতারিয়ার সেই ভাববহু হুঁপুপা—পাশের গায়ে সেই
দুঃসাহসে বহুর অবিবাহিত—সেই নির্বাক মতমুখী
জীবনের অবস্থা আত্মতার অশ্রুতলয়—সব একায়ে
গেছে ।

কাল দুঃসাহসে ছিল । কাঁধি টাউনের ভেতরেই ।
জোনপুটী বাবার হাতের হাতে একটা সোতলা হাড়ির
অন্যে । সেও চন্দ্রবার ব্যবস্থা ।

মেয়েটি নইনে কে'সে, কে'সে স্নাত হয়ে পড়েছে;
চন্দ্রবার কি যেন বোকাছিল, তার কিলে, আরি গরমে
যখন, তার চন্দ্রবার কখনো কখনো হুঁপুপ বিদ্যে অঙ্গল
করেছে ? তবে ? জেলে দ্বারা ? সেকলীপুর কলেজে
পড়েছে, বাপের অর্থ চাল ভালের পাইকির সোকানে
বসছে, আর দেখতে কেমন বল দিকি ? সেকলীপুর
দ্বারা, হুঁপুপা সোতলায় বাবা, এভাবে বহুর হাত
কাঁকড় ।

বাসের সেই কড় কড়, শব্দ—পাশের সঙ্গে সোতলা

কায়—কায়ার সঙ্গে যেখানে অনেক চুকুরো গাভানা—
সব কেমন অব্যাবস্থিতশূন্য লাগছিল কুশলের কাছে।
গাভানাইলের পুতুলের ওপর বাসনানা থেবেছিল একবার।
নীচে কলতোদের চপল কলরব, দুয়ে বেননীপুতুলের হাতির
ঐশ্বর্য সবুজ হয়ে আছে বিগতকালে, শিরের কুশলের
অন্তরী হাতির নক্ষত্র সঙ্গল।

বাস থেকে বেরে চন্দ্র কলুইকে ডেকেছিল সে,
একটা কথা আছে চন্দ্রকলা, একটু আড়ালে চেনো।

পরেপাকারের প্রভও উত্তমনার এতকাল সে কথাটা
ভারে নি, ভাববার অবকাশ পায়েনি, সন্দীপাখীরা নবকাল
ঘিরে বেকেছে আর কথা বলে গেছে, আত্মশাখ্যাত্যাপ
আর পরিতত্ত্বের সেই সব অমোঘ হানী নতের বত
বুঝ বলে গেছে, এখন এতকাল বেই চন্দ্রকলার চুপিসার
কথাটি কানে শেঁপেছিল অবনি প্রাণের একটি সুতীক্ষ্ণ
শারক এসে বিবল ছবিরে নাকখানে, ওপরে কি হবে?

সুপের একপাশে পাখর হয়ে গাঢ়িয়ে রইল সে।

চন্দ্র কলুই বললে, আবার ভাবনা? আবারের নীতি
কি? ভাবনাভের ভাবনা নিবেশ। যা হবার হবে। না,
তাও নয়। আবার যা করব তাই হবে।

—কিন্তু তুমি তো জানো, কথাটা হুত হয়ে গেল
কুশলের কণ্ঠে।

—চ্যা ভাবি, সব জানি, চন্দ্রকলাকে চিত্তিত দেখাল।
তার বুধটা নীচু হয়ে এল, একটি প্রেমের ইতিহাস তার
মেন স্মরণে এল, সুখীয়ার জন্যে তুমি অপেক্ষা করে
আছিল।

—এই কথাটি কেন সে নিজেকেই বললে, এই কথাটি
নুহতে পেয়ে নীল-নীল নক্ষত্রের বুধ কায়াকদূশ হয়ে
উঠল, উদান প্রান্তরের ওপর দিয়ে হা হা করে হাওয়া
বয়ে গেল।

—আচ্ছা ভেবে ব্যাপ, আশিও ভেবে দেখি, ভরহীন
জানানাহীন চন্দ্রকলা নিতে গেল, জীবনে এই প্রথম হেরে
গেল, আর তার পরেই শেখবারের বত কথার অন্তরকন্যা
বুদিয়ে গিলে, কিন্তু না, এখন কোম চিচ্চা নয়, সিদ্ধান্ত
তো নই, এখন তোকে যেতে হবে, শেখ পর্বত যেতে
হবে, চল বাসে ওঠ।

বাসের ঢাকা হুদল, কুশলের চিচ্চাও পাক পেয়ে
গাঢ়িয়ে গেল:

সুখীয়া কি আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে
সেইটেই তো এতদিন পর্বত হুততে পারলার না
কিন্তু না যোক্তার অর্থ চন্দ্রকলার কল্পনাকে প্রভর দেয়া
না, আশি তা চাই না বুধকলাকে আশি যে এর আসে
কখনো দেখি নি, আশি যে তাকে চিনি না, জানি না—

তা হলে সে এতখানি এসোল কেন? বাবুড়ল
থেকে কাঁধি, কাঁধি থেকে ভোরের বাসে দীপা, তা
নিম্নের শব্দন থেকে বিজনে, সমাজ থেকে নির্বাসনে
কেন সে ভবিষ্যত ভাবল না, কেন সে উদজাতির হয়ে
এগিয়ে এল, কেন? কেন?

একটা বেশা, পরিণামহীন উপচিকীর্ষা বেশা। তা
কি! আর কি কিন্তুই ছিল না! সমস্ত কোরে
নাকখানে একটা কৃতিত্বের পরম দুঃখান তো সুখীয়া
কানে গিয়ে উঠবে, কুশলকুমার জীহ্ব নয়, রাজ্যারামি
উদাও হবার বত কবতা তার আছে—কিনো আছে
কিন্তু—একটা হুদ্বর্ষ অভিব্যক্তির বোকা আছে, আ
আবার জন্যেও অপেক্ষাকৃত্য আছে, ভোবার একা
নীর্বত্যার আদার আকাশ ছোট হয়ে আসবে না।

দীঘার আকাশে বেধ। জঘিতে বৃষ্টি নামল
ধেদু ধেদু জলের চিহ্নিক কাটা। গতনে উজ্জ্বল নেই
পঙ্খের সমাগোহ নেই। এই হুদ্বর্ষ কৃতিত্বের হয়ে
আমো বেন ব্যাঘো বিবু বিবু হয়ে এল।

দীঘে দীঘে উঠে দাঁড়াল কুশলকুমার। এবার সো
বাক্য গিলে কেমন হয়। যদি বুঝেও তা হলে অর্থ
তোমো তেমে ভাববে তারও সোরে বাক্য পড়ে, কিন্তু যে
যদি জেনে থাকে বোঝ হয় কেঁসেই কেসবে, দ্যা
সকাল দ্যা হুদ্বর্ষ হয়ে একবারও তো সে বেশা করে নি
একটা চন্দ্র হুদ্বর্ষিনা থেকে বাঁচিয়ে বিহেরে, ব্য
করেছে বুড়ো বনের চক্রান্ত। এতেই কি তা
কতখান শোন!

তা সে ঠিক জানে না। অত্যন্ত ভাঙ্গা ভাঙ্গা ক
হয়েছিল চন্দ্রকলার সঙ্গে, ভোরের বাঁসেই কাঁধি কি
সেছে সে বলে গেছে, এই বাসেই মেয়েটার হিলে কর
সব তার আবার ওপর কিন্তু জাঘার হয়ে।

আরো বসে সোহে, তবে হ্যাঁ, ভাববে বই কি, দরদিক ভালো করে ভেবে দেখবে, আমি কিছু অত ব্যাপসানের ভেতর পাঠী দেখতে ভুল করি নি, গাভাসেও বিবাহ প্রস্তাব, এই গীঘাতেই—এদিকে বিয়ে হবে আর এদিকে ছেলের খার মেয়ের বাপ-মায়ের কাছে থার ঘাবে, তারপর একাধা পায় হয়ে উনত্রিপে প্রাণের ভোরে—

কিছু যদি পায় না মেলে, যদি কেউ গাভী না হয়, যদি অকথা কলঙ্ক হতে যায় হৃদুদার গরিতে—তা হলে—তা হলে—কতটুকু দর গরিতে হাতে, হারিকনে প্রাণের এই সব গুঁড়ো গুঁড়ো হৃদুদ'গুসো বৃষ্টির বত অধিরান তার গুণ পড়ছে, আর নিলে বিশে এতাকার হয়ে বয়ে যাচ্ছে, কখন কিয়রে চন্দ্রনা, আমাই এখন, গভীর রাতে কিংবা কাল ভোরে—কখন কি হবে !

আর ভাবতে পারে না কুশলকুমার। আত্রে আত্রে উঠে দাঁড়াল। এবার ঘাবে সে। সোরে করগাভ করে বলবে, তোমার সেবতে এলাম, দেখতে এলাম কার কতটুকু উপকার আমি করিছি, আর কতখানি উপকারে এ কত্রণার অত নিলে।

কিংবা হয়তো বলে বলবে, তব করছে না তোমার আমার সেবে তব আসছে না মনে, এই হৃদুদ গ্রাম, এই ক্ষেত্রে হৃদুদ, কেউ কোথাও নেই জানো।

না-না ওসব কিছু না, একটি কবাই শব্দ সে বলবে, একটি অন্তরতম প্রাণ, যে প্রাণের বিবরণে তার সমস্ত জ্ঞানর ঠিকানা দুলে দুলে উঠছে।

ধীরে ধীরে নিজের আলম্বনটুকু অভিক্রম করল সে এ বাড়ির গুণী ঘুরিতে পড়ছে, ঘুরিতে পড়া ঘাটুই পেরোয় সে আর একটা জানলার মত ব্যাকান, তারপরেই সে বহু সোয়ের দামে হৃদুদ'কে সে পড়বে, একটা হৃদুদ আভি'র সঙ্গে দরদা হুলে ঘাবে, আর তার সমস্ত প্রাণের ট্রে আছড়ে আছড়ে পড়বে আর এক গুহ জন্মে তটপ্রাণে—কোন বিন্যাসে তুমি থা ছেড়ে পথে পা দিলে? শব্দ কি চন্দ্রবার কপা? দাঁকি ভরদা রেখেছো আনায়ো গুণ? আমার সব না ছেলে কেন ভালো রাখলে? বসো—বসো—হৃদুদ'র মত দ্বাধী হৃদুদ'গুসো সব চলে যাচ্ছে।

কিছু না, পারল না শিকলের কবিন বাছাতে, সোরে আঘাত দেয়া আর হয়ে উঠল না, তার হৃদুদ' হৃদুদ'ের আঘাত দেয়া আর হল না, সেই হৃদুদ'ে একটি নিহিত মতের সহ্যা আবিষ্কারে গুহ হয়ে গেল সে জ্বরের মতো অন্তর দিয়ে উপদ্বি করল, শব্দ একটা দাবাধিক দারিত্ববোধ শব্দ উপকার আনায়ের কোথাও নিলে যায় না তার সঙ্গে যদি না থাকে শ্রেয়, যদি না থাকে জ্বর। হৃদুদ'ার বাপ মাও নিচর যেরের উপকার করতে চেয়েছিল, ওর চেয়ে বেশি উপকারের শক্তি সবাত জোয়ার নি তাদের সেও হয়তো এনি হৃদুদ'র করে তুলবে হৃদুদ'ার মীন—

নিজের কাছে নিজে বরা শতল কুশলকুমার।

তাই সে পালিয়ে এসেছে বহু সোয় কাটের থেকে—গভীর প্রাণের অশ্রু'শ্রু' থেকে, মেঘলিন আকাশ নাথায় নিলে পালিয়ে এসেছে গীঘার খেলাভূমিতে।

যে সব সোপিত অরণ্যের ছায়া মেখে মেখে সে গুণ পার হয়েছো তার গুণ বর্ণন কাত হলে, শেব হৃদুদ'ের আকাশ থেকে শেব প্রাণের বর্ণন দাবিক বিবিত নিলে, উদাসীন দম্বু কাউ-ওর গির থেকে জল করে পড়ছে, নীচের কোষল বনজনি করা গাভার ছেলে সেছে, দৃষ্টির জল বঁকা রেবার গাছের পা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে কি এক অজানা শব্দ উঠছে সমস্ত বনজনি কুড়ে, আভ কোষল ঐকভাবে ভারী হয়ে উঠছে শীতল বাতাস।

উঠু, বাসিরাড়ীর গুণ দাঁকি কুশলকুমার নতুন চোখে তাকিয়ে রয়েছে আকাশ পৃথিবীর দিকে।

এখন থেকে সবুজ দেখা যায়, তার আপন মনের মতো ছোট ছোট ট্রে উঠছে ভাঙছে, যেন কোন কিছুকে পাবার প্রত্যাশার পার হয়ে গেল, এখন হইল শব্দ আপন মনের খেলা—ট্রে উঠা ট্রে পড়া।

আর একদিকে রয়েছে কটি বানের সবুজ উচ্চারণ, গভীর কাউল আর গভীর বাসিরাড়ীর দাবাধাটুই একেবারে প্যামলে কোমলে সরল হয়ে রয়েছে, সেই ক্ষেত্রে প্রাণে উপচে পড়া ভলের প্রবাহে আবিভূত হয়ে এক কিশোরী প্রোভোদা।

পৃথিবীকে দেখা শেব করে আকাশের দিকে হৃদু তুলস কুশলকুমার, মেঘে মেঘে মেঘের আকাশ যেন

আজ আদিত্য বিজ্ঞত স্রোতাসের পান্যনিরুদ্ধতা দিবে
আড়াল করেছে এই পৃথিবীর মিলন প্রাপ্তটুকু, যেন
তার ব্যতিরিক্ত করে রক্তে থেকে কল কল বাধার
পরিসীমিত হচ্ছে সে পদ, এই কিশোরী স্রোতোস্মিনীর
অন্তরে প্রবাহের আলোকটুকু জাগিয়ে দেবার জন্যে যেন
আকাশ আজ ওই স্রোতকে পাঠাতে তার অগ্রমত
সমুদ্রের অভিযাত্রী।

প্রকৃতিকে এই দেখা-নিজের সঙ্গে-নিজের
অভিভাবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা একটি উপলব্ধির মত
কৃপণের চেষ্টারই এসে বাহুল্য। প্রকৃতিকে নিজের সঙ্গে
মিলিয়ে ভাবল, মিলবে কি স্রোত কি সাক্ষ্য পাবে
সমুদ্রের।

কোথা থেকে বরষারপানী মেঘ এল, আড়ালী নীচে
নীচে ল্যাণ্টার্ন ক্যানেরার কটল কল, স্নেহত আকস্মিক
শিকড় জাগল পানত্যা, কোথাগাতাঝোপের গোপন
গভীরে উঠল সুবাস।

মেঘ নত হয়ে পড়েছে উদাসীন সমুদ্রের ওপর,
হাতগায় স্পর্শ লাগছে কৃপণকৃষারের বৃত্তে বাহুতে,
সর্বশাশ নিঃশব্দিত হচ্ছে, থেকে থেকে উভয়গোলে মেঘে
উঠছে তার জ্বর।

যেন হোল যে ভিজাসার সে পীড়িত হচ্ছে, ইচ্ছা
অনিচ্ছার যে মধ্যে সে পৌঁছিত হচ্ছে, তার সন্যাসের
সর্বশাশ তার তার ওপরে নেই, আজ ধীধার মেঘমেঘের
আকাশ পৃথিবী যেন নিঃশব্দিত সেই গুরু এষণাতিকে
তার হৃদীর সামনে স্রোতোস্মিনীর প্রবাহে মেলে ধরেছে।

তার ক্ষুদ্রতবে বাহুল্য গোপনকার আর শক্তিকল্পতার
প্রচণ্ড দল্লত একতরফ থেকে যেন হাঁছিল নিত্যের বদলার
কোনদা দুঃখী, আজ এখন কোন আত্মবাহারী
মস্ত্রে সে সর্বশক্তিমান জীবন নিয়ামক হয়ে উঠেছে, আর
সে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও নিঃশেষ হয়েছে একেবারে।

সমুদ্র উলমল করছে আরআবেগে ব্যস্ত হঠাৎ-এর
বুঁধে দাদা ভল কুঁটে কুঁটে ছুটে আসছে। বত
ঢেউ-ঢেউ-এর শিঁড়ি তীরে এসে আলপনা অঁকছে-
জ্ঞান আলোয় চিক্ চিক্ করছে আর বিপুল বাস্পশাল
তাসের মত হু হু করছে।

কত মেঘে এসেছে, ভাড়া মেঘগুলো একাকার হতে
গেছে আকাশের এ প্রান্তে ও প্রান্তে, নানা ভলমেবা এ
মিশ্রণে একটি রংগা, স্রোত গলেছে, কখনো মেঘবহু
হালিগাড়ীর গা ঘেঁষে, কখনো হু হু বাত, তপ্পের পান
দিবে একে সেক, কখনো হুই আড়ালী মাকসানে মূর্ত
উপভাষা দিবে।

আর-আর ঐ স্রোতের মতই সান, কেনে সে
চলেছে, হুঃলা না? বিবাস হোল না কৃপণের, বিশিষ্ট
হোল সে বার বার দেখল, আর তার-ই সে ছুঁতে
সুখ করল, হালিগাড়ীর লাল কালো আর সাদা বালি
ওপর হুত পায়ের হাস কেনে সে নামতে লাগল
নীচে আরও নীচে পড়ে গেল, কয়েকটা পাক গড়ি
গেল, আবার উঠল আর একটা হুঃলা উঠল, আবার
নামল, একবার ডাক দিল, হুঃলা, হুঃলা-আকস্মিক
শেকড় যেনন করে বালুকণা অঁকড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা
করছে ভেরমি করে পানলের মত সেও কি যেন ধরে
চাইল।

-লাঁড়াও, গাঁড়াও-ডাকতে ডাকতে শোন বে
ছুটে আসছে কৃপণকৃষার, বিরাট বন কাউ-এর মত হা
বাড়ির সে ডাকছে, মেঘটি একবার ভীত হুঁটি
শেছন কি? ডাকল যেন অরণের এক উচ্ছ্বস ক
এগিয়ে আসছে, চকিতে সে আড়ালী ওপর উঠ
পাড়ী। রহীন আচল বেলে বরল, হুত আশ্বাস
করল কয়েকবার, মাকসমুদ্রে দিকহারী তরঙ্গীর আত্ম
প্রার্থনার মত।

ততক্ষণে কৃপণ কাছে এসে গেছে, তার চো
পড়েছে সব, হুঃলা একটা নিচল বাস, লেমান বিক্ষুব্ধ
কয়েকটা নাম্ব, নিপান্য শেয়েছে ওদের একজন হা
নেড়ে কি যেন বোকাছে সবলকে।

হুঃলা, কি হচ্ছে, কি করলে তুমি, এক কৃষার
বাহুতে পদ-হুঃলা শেখ পদল, মেঘে চল পিঙ্গল
দইলে আমাকে ওরা দেখতে পাবে।

হাওয়ার অচল উড়তে লাগল, বোকা গেল না
রয়েছে ওর আড়ালে।

হুঃলা হাত ধরে নীচে নেমে এল কৃপণ, ও

বিংশ শতাব্দী

‘সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই’

অবশেষে ভারতভূমির প্লেবিশ্বও পরাবীনতার পাপ ছিন্ন করিল। গোয়া বন্ধ হইল। ভারতবর্ষ হইতে পর্তুগীজ শাসন বিদূরিত হইল।

ভাতো ডা-গামা সেই সুন্দর অভীতে, সেই ১৪৯৮ সালে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। কালিকটের রাজা জ্যোতিষ তাহাকে গাহরে অভ্যর্থনা জানাইয়াছিলেন, বিনিময়ে পর্তুগীজগণ তাহাকে হত্যা করিয়াছিল।

ভাতো ডা-গামার উত্তরাধিকারী আলবুকার্ক ১৫০২ খৃষ্টাব্দে বিজাপুর সুলতানের নিকট হইতে গোয়া অধিকার করেন। ঐ সালেরই শেষ দিকে তাহাকে বিভাভিত করা হয়, কিন্তু পরবশেষে আবার গোয়া পর্তুগীজদের কবলে আসে। তারপর হইতে গোয়ার ইতিহাস নিরবচ্ছিন্নভাবে পরাবীনতার ইতিহাস। ইহার পর ১৫৪৫ সালে দিল্লী ও ১৫৫২ সালে তাহাঙ্গা সমন অধিকার করে। অন্তিম শতাব্দীতে মারাঠা শক্তি বহন দুর্বল হইয়া পড়ে তখন পর্তুগীজরা নিকেরের সাম্রাজ্য-শক্তিকে আরো বিস্তৃত করিয়া লেহ, ভারতে তাহাদের সাম্রাজ্যের চতুর্দিকমাণ ভাঙ্গরা এই সময়ে আনয়ন করে।

বৃটিশ ও করানী সাম্রাজ্যবাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর্তুগীজরা কখনই ভারতে প্রথম শক্তি হইয়া উঠিতে পারে নাই কিন্তু বংশোদ্ভূত তাহারা প্রথম স্থান দখলই অধিকার করিয়াছিল, ভারতের অনেক অঞ্চলের বহু বর্ষকি বাংলায় বংশোদ্ভূতরা স্বত্বাসের রাজত্ব সৃষ্টি করিয়াছিল।

এ ছেন দুর্ভাগ্যের বিভাভিত করিবার ব্যাপারে ভারত সরকার যে টালবাহানা করিলেন তাহা ইতিহাসে নথী হইয়া থাকিবার যোগ্য। যেখানেই সাম্রাজ্যবাদ সেখানেই ভারত সরকার দুর্বল। ১৯৪৭ সালে ব্রিটেনের ভারত ভাগের পরও ব্রিটেনের লম্বীকৃত শক্তির পরিচয় (ব্যাখ্যা) বিচারে সাম্রাজ্যবাদ অর্থে লম্বীকৃত শক্তিই বোকার) ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। ভাঙ্গাটা, পণ্ডিতেরা পরিচালনা করিয়াছে বটে কিন্তু পণ্ডিতেরা আজও সুপ্রীম কোর্টের এজিটার বহির্ভূত। করানীদের বহু অধিকার সেখানে স্বীকার করা হইয়াছে। ১৯৫৫ সালে বহন গোয়ার স্বাধীনতার জন্য সেলব্যাপী আন্দোলন হইয়াছে, বহন নিত্যদিন সাহায্য শব্দ হইয়াছেন, ভারত সরকার বর্ষকের ভূমিকার অবতারণা হইয়া কালচরণ করিয়াছেন।

ঠিক নির্বাচনের প্রাক্কালে উচ্চাল জনবহুর দাবানে ভারত সরকারকে নতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। বাহা বহু পূর্ববর্তী করণী ছিল অপর্যে তাহাদের তাগাই করিতে হইল। তাহারা গোয়ার সৈন্য প্রেরণ তথা ‘শূলিশ প্রাক্করণ’ করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং প্রায় বিনা দ্বন্দ্বই গোয়া ভারতের অধিকারে আসিয়াছে। ভারত হইতে সবপ্রাচীন বিরোধী অধিকার লুপ্ত হইয়াছে।

গোয়ার বৃত্তিতে ভারতবর্ষের বৃত্তিক সম্পদ হইল। সেলব্যাপী আর একটি শব্দ দল হইল। আঘাতও এই আনন্দে তাহাদের অপর্যায়।

এ বছর ডিসেম্বর মাসে

সেই ভালে কলিকাতার
অনুষ্ঠিত হচ্ছে গুরুগাতি
সাহিত্য পরিষদের এক-
ত্রিংশতম অধিবেশন। এই
অধিবেশনে মূল সভাপতির
আসন অঙ্গসম্পূর্ণ করবেন
অধ্যাপক বি. কৃ. প্র. সা. হ.
কুমারস্বামী ত্রিবেদী।
অধ্যাপক ত্রিবেদী গুরুগাতি
সাহিত্যে একজন প্রখ্যাত-
নামা দার্শনিক, চিন্তাশীল
মনীষী ও সুপ্রসিদ্ধ
শিকারতী।

গুরুগাতি সাহিত্য
পরিষদের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়

১৯০১ সালে, এই পরিষদের প্রতিষ্ঠা করেন কলিকাতার
মেম্বার। প্রজা সোপালি-সি পাঠির অন্যতম নেতা
স্বদেশী নেতার পিতা এই কলিকাতার মেম্বার।
গুরুগাতি সাহিত্য পরিষদের প্রথম বারের মূল সভাপতি
ছিলেন গোবিন্দচন্দ্র ত্রিবেদী। গুরুগাতি সাহিত্যে
গোবিন্দচন্দ্র অসাধারণ ব্যক্তিত্বমান ছিলেন, গোবিন্দচন্দ্রের
বিখ্যাত উপন্যাস 'দরবতীচন্দ্র', আধুনিক গুরুগাতি
সাহিত্যে একটি দৃশ্যকর উপন্যাস। দুর্যোধন চরিত্র
কল্পনাকাল হয়ে গুরুগাতি সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে অধ্যাপক
ত্রিবেদী তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর অঙ্কিত করে
গিয়েছেন। অধ্যাপক ত্রিবেদীর মতো একজন প্রতিভাবান
সাহিত্যসৈন্যকে এ বছরের গুরুগাতি সাহিত্য পরিষদের
সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করে কতৃপক্ষ বশে
কলিকাতার কাজ করেছেন।

গুরুগাতি সভা ভেদার উত্তরখ নামক স্থানে ১৯২২
সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে অধ্যাপক ত্রিবেদী সভাপতি
করেন, পৈণমে তিনি শিকারগ্রন্থ করেন গোরগদ, বাসগা,
কাশ্যবস্ত্র ও বহীয়া প্রভৃতি স্থানে। ১৯২৬ সালে
কলিকাতা পৌরসভা উদ্বোধন হওয়ার পরে বিজ্ঞান

কলিকাতায় গুরুগাতি সাহিত্য অধিবেশন

কলিকাতায় গুরুগাতি সাহিত্য

এ বছরের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে কলিকাতায়
গুরুগাতি সাহিত্য পরিষদের একত্রিংশতম
অধিবেশনের অনুষ্ঠান হচ্ছে। গুরুগাতির বাইরে এই
প্রথম পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। স্বর্গ
আনন্দের কথা এই বারের স্বর্গ-সভাপতি
বহুসংখ্যক কবি, ভাষ্যকার, গুরুগাতির অধিবেশন হবে।
এই উপলক্ষ্যে 'দরবতী' কবিগুরু গুরুগাতি সাহিত্য-
পরিষদের আহবানবাক্য অধিবেশনে ১৯০৬ সালে শব্দ
আহবানবাক্যে উপস্থিত ছিলেন, সেইবারের অধিবেশনে
শৌর্যবাহিনী করেন মহাদেবী পাঠ। গুরুগাতির
জনসাধারণ ও গুরুগাতি সাহিত্যের উপরেও স্বর্গ-
নাথের প্রভাব বহু গুরুগাতি; এবারকার অধিবেশনে
সবচেয়ে গুরুগাতি সাহিত্যকে কবিগুরু উপলক্ষ্যে ও
প্রভাঙ্গি অঙ্গ করবেন। স্বর্গ-সভাপতির বিচিত্র সব
কলা গুরুগাতি সাহিত্যের বহু লেখককে প্রভুত
প্রেরণা দিচ্ছে।

আহবানবাক্যের গুরুগাতি
কলেজে ভর্তি' হন এবং
গুরুগাতি কলেজের ছাত্র
হিঁসাবে বহু অঙ্গ কলেজের
মহোদয় তিনি সকলের প্রিয়
হয়ে উঠেন, তিনি ছিলেন
অত্যন্ত মেধাবী ও পরিচর্য।
সেই সময়ে তিনি কলেজের
অধ্যাপক পণ্ডিত ব্যক্তির
সেবাভার হয়ে উঠেন,
এইসময় মধ্যে উল্লেখযোগ্য
হচ্ছেন অধ্যাপক আনন্দ-
পন্থর প্রব। অধ্যাপক
ত্রিবেদী ছাত্রদেরই
একবার 'দরবতীচন্দ্র'
সম্পর্কে 'অত্যন্ত সারসংগত' ও

মূল্যবান একটি আদ্যোচন। ইংরেজীতে কবিগুরু
এবং ঐ আদ্যোচনার মাধ্যমে তাঁর অসাধারণ সাহিত্য
বিচার-বুদ্ধি প্রকট হয়ে উঠেছিল। এর পর থেকে তিনি
অধ্যাপক প্রব সম্পাদিত 'বসন্ত' নামে একটি সাহিত্য
পত্রিকা প্রস্তুত ও নিরন্তরভাবে বিভিন্ন বয়সের
জন প্রকাশ করতে লাগলেন। এই পত্রিকার মান
এত বেশী উঠেছিল যে সেই সময়কার তখন ছাত্র
সম্প্রদায় পত্রিকাটিকে 'আদ্য' বলে মনে করতো এবং
বিক্রয়প্রদায় ত্রিবেদীর রচনাগুলোরও বিক্রয় পর দিন
আদ্য বাজতে লাগলো। 'বসন্ত' পত্রিকার লেখার
দৃষ্ট দরবে বিক্রয়প্রদায় মনে লেখক হবার তাঁর বাসনা
হলে উঠলো। ১৯২০ সালে সংস্কৃত ও ইংরেজী
সাহিত্যে প্রথম প্রেসীতে তিনি উদ্বোধন হলেন এবং
এরপর গুরুগাতি কলেজে তিনি কল্যাণ নিয়ন্ত্রক হলেন।
পরের বছর সার্বজনিক এডুকেশন সোসাইটি দ্বারা
পরিচালিত স্কুলটির এক টি. বি. কলেজে তিনি ইংরেজী
ও সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। ১৯২০ সালে
তিনি সংস্কৃত ও গুরুগাতিতে বিভিন্ন প্রেসীতে এবং এ.
পাণ করে সার্বজনিক শিক্ষা সাহিত্যেতে সার্বজনীনভাবে

সদস্য হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৩২ সাল থেকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভাষা শিক্ষণের কাজে দায়িত্বভারে অতীত। গুরুত্বপূর্ণ ভাষা ও সাহিত্যে তিনি স্বাতন্ত্র্যের পথেরও পি. এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য গবেষণারত ছাত্রছাত্রীদের নির্দেশক ও উপদেষ্টা রূপে সূচীকাল পরে অতীত হয়ে রয়েছেন। এম. টি. বি. কলেজের উপাধ্যাপক থেকে এবং দার্শনিক শিক্ষা পরিভার সেক্সোনেবী শিক্ষকের পর থেকে মাস দুই বছর পূর্বে অবসর গ্রহণ করা হয়েছে তিনি গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক বিদ্যানুশীলন ও উচ্চতর পাঠ্যক্রম অন্যতম স্রেষ্ঠ কেন্দ্র প্রিন্সিপাল গান্ধী বিদ্যালয়বনের প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে বর্তমানে অতীত হয়ে রয়েছেন।

অধ্যাপক জিবেদী উচ্চতর শিক্ষার উপস্থেয়ে সূচীকাল চলিত বছর পরে পুঁই উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন : যে-কোনো আদর্শ শিক্ষাক্রমের পক্ষে এত দীর্ঘকালের নিবিড় সাধনা পুঁই দৌঁধের নয়, এত বেশীদিন হয়ে একক জীবনের সাধনা প্রকৃতিই অতুলনীয়।

শিক্ষাক্রম : হিসেবে বিদ্যুতাই অসাধারণ প্রতিভাবান, তাঁর প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তা, তাঁর বুদ্ধি ও মেধাশীল স্বভাব তাঁর নিজস্ব কতকগুলো বিশেষত্ব। বহু মেধাবী ছাত্র তাঁর আদর্শে প্রেরণা লাভ করেছে, অনেক উচ্চাভিলাষী তরুণ লেখক ও কবি, পরে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, বিদ্বৎ সমাজে পরিগণিতলাভ করেছেন, তাঁরা সকলেই অধ্যাপক জিবেদীর ভাবগায়ার দ্বারা এক্ষোরে প্রথম থেকেই উদ্ভূত হয়ে উঠেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের দায়িত্ব পুঁই সূচীকাল আর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

অধ্যাপক জিবেদী বহু সংখ্যক সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক সংঘের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। ১৯৪৪ সালে সাহিত্যক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের জন্য তাঁকে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক উপহার দেওয়া হয়। গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিস্টেমে তিনি সদস্য ছিলেন, সাহিত্য

আকাদেমীর উপদেষ্টা পরিষদেরও তিনি অন্যতর সদস্য গুরুত্বপূর্ণ বিখ্যাত সাহিত্য সংস্থা নবদ্বীপ সাহিত্যসভা তিনি সভাপতি ছিলেন, ১৯৪১ সালে গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য পরিষদের ভাষাতত্ত্ব শাখার তিনি চেয়ারম্যান হিসেবে এবং ১৯৪৯ সালে উচ্চ পরিষদের সাহিত্য শাখার চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৫৫ সালে তাঁর বিচিত্র 'পরিচয়'ের জন্য আবার তাঁকে স্বর্ণপদক উপহার দেওয়া হয় এবং ১৯৬০ সালে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তিনি গৌরবস্বরূপ দায়বদ্ধতার ত্রিগুণী বৃত্তি হিসেবে কয়েকটি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হন গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য পরিষদের আহ্বোবোধ অধিবেশনে

১৯৬৬ সালে মহাত্মা গান্ধী চেয়ারম্যান ছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যের আবেশে সকল প্রযোজ্যতা ও কৃত সাহিত্যগুণী গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য পরিষদের বিভিন্ন সময়ে চেয়ারম্যানের পদ অলঙ্কৃত করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন কেশবলাল ব্রহ্ম, নরসিংহো দিবেদী, আনন্দচন্দ্র ব্রহ্ম, কামাধীলাল মুনসী, রাননারায়ণ পাঠক, রবিন্দ্রনাথ মল্লিক এবং কাকাদায়েব কালেকর।

গুরুত্বপূর্ণ চিত্রাশীল মনোভূমিতে মনো অধ্যাপক জিবেদী অন্যতর গুরুত্বপূর্ণ ভাষা ও সাহিত্য, শিক্ষা, ধর্ম, নগর, সংস্কৃতি ও নীতি সম্পর্কে

বিদ্বৎসমাজ জিবেদী

শিক্ষা, ধর্ম, নগর, সংস্কৃতি ও নীতি সম্পর্কে তাঁর বিচিত্র সব বিদ্বৎ পত্তির চিত্রাশীলতা ও উদার এবং ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গির দোষাতক। সকল সময়ে জনাই তিনি জনগণের কল্যাণকারী। জীবন ও সাহিত্যে উচ্চতর মূল্যায়নের জন্য এবং তাদের আরো উন্নত করে তোলার জন্য তিনি নির্ভীক প্রচেষ্টা করেছেন তাঁর অতি সূক্ষ্ম, মহান ও ব্যাপক চিত্রাধারার জন্য সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাঁর প্রতি প্রদানশীল।

আজকের দিনের সাহিত্য সমালোচকের হয়ে অধ্যাপক জিবেদীর স্থান অনন্য ও অতুলনীয়। বিখ্যাত গুরুত্বপূর্ণ পদ্যলেখক, চিত্রাশীল প্রবন্ধকার, গুরুত্বপূর্ণ





কম দামে মনের মতো



জিনিষ কিনতে হ'লে



আমাদের কাছে আসুন

তাঁতের শাড়ি

আপনার ওকম বসন হামে, হস্ত্র অথচ মজবুত পুতি
কাপড়, মনোভালানো টেকসই শিল্প, ঘর সাজানোর
জনা দীর্ঘায়ী পর্দা, ওয়াকারকার, শয্যাচ্ছাদন
একুতি তাঁতে বোনা বহু বিচিত্র রকম জিনিষ সাজা
মেস থেকে বাড়াই ক রে আপনার সুবিধার জন্যে
একই বিশিষ্টে সাজাই ক রে তাপা হয়ে—

হ্যাণ্ডলুম হাউস

২. গিওসে ট্রিট, কলিকাতা—১০। ২২১, ডি. এন্.
গোড, বোম্বাই—১। ২. হস্ত্র বাজার, মাদ্রাস—৩
২ এ. কনট সেস, নয়া দিল্লী—১। ১। অলইতিয়া
হ্যাণ্ডলুম কারিকুর মার্কট কো-অপ. সোসাইটি লি.
কলকাতা ওয়ার. গোট ট্রিট, বোম্বাই—১

CHH-1 A BEN

কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, ছোট গল্প লেখক ও
সমালোচকসহ সম্পদে তিনি সমগ্র দেশের সব আলোচনা
প্রবন্ধকারে প্রকাশ করেছেন। বিখ্যাত সব গুরুত্বপূর্ণ
বইয়ের তিনি অতি উৎকৃষ্ট সমালোচনা লিখেছেন,
ইংরেজীতে রচিত গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যের ইতিহাসের তিনি
প্রণেতা, গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য সম্পদে তাঁর অতিবহুল ও
সমালোচনাই চূড়ান্ত বলে গ্রাহ্য হয়। সৌন্দর্যতত্ত্ব,
সম্পদে তাঁর সমালোচনাপ্রসঙ্গ তাঁর অসাধারণ
পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে। একাধারে তিনি সংস্কৃত
অলঙ্কার শাস্ত্র ও পাণ্ডিত্য সমালোচনা সাহিত্যের
গভীর অনুশীলন করেছেন। তাঁর সমালোচনাপ্রসঙ্গ
তাই অত্যন্ত বুদ্ধিপ্রাণ ও বর্ণনামূলক। চিন্তা ও
অনুভূতির আভাস মিশ্রণে তাঁর প্রতিটি সমালোচনা,
প্রত্যেকটি বিষয় অসাধারণ পুঙ্খভিত্তিক ও গভীর অনুশীলনের
পরিচায়ক। তাঁর সমালোচনার পদ্ধতি অত্যন্ত বুদ্ধিপূর্ণ,
সারগত, স্বচ্ছ ও প্রাণবান। ফিক্সডাই অত্যধিক
প্রশংসনাও নন, আবার দনাতন পদ্ধতির অনুগামীও নন।
তাঁর প্রতিটি সমালোচনা খুবই সুমনস্ক, কাজেই
পূরন উপভোগ্য। তাঁর সমালোচনাপ্রসঙ্গ নিঃসন্দেহে
গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ। এক কথা তিনি
সমালোচনা সাহিত্যে নতুন পথের খোঁজা। 'বিবেচনা'
ও 'পরিশীলন' তাঁর সাহিত্য সমালোচনার উল্লেখযোগ্য
দুইখানি বই। ১৯৪৬ সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের
ঠিক জ্যামোদরী বাবরী বক্তা হিসেবে তিনি লন্ডনের
থেকে আনন্দচন্দ্র (১৮৮৪ থেকে ১৯০০) পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
গুরু সাহিত্যের বিস্তৃত সমালোচনা করেছেন। তাঁর
এই বক্তৃতাপ্রসঙ্গ 'অবর্তন চিন্তামূলক গদ্য' নামে বই
আকারে সম্পাদিত হয়। তাঁর সমস্ত রচনাসমূহের
মধ্যে পরিচয়তা ও উল্লেখতা বিখ্যাত। তিনি
প্রকৃতি সৌন্দর্যের সাক্ষর, পরিচয়তা ও নিষ্ঠা তাঁর
স্বভাববহন। তাঁর অনেক প্রবন্ধই গুরুত্বপূর্ণ রচিত হওয়া
সত্ত্বেও পঠিত কবিতার মতো ভাবপূর্ণ।

জানিতে ইচ্ছে হয়, সেই

মুহুর্তে গাগারিন-এর কি

মনে হয়েছিল? বকেট-

প্রাণ্ডি এর দিকে দৃঢ় গম্বন্ধে

এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ

শেষবারের মত তিনি এই

স্বর্ধকায়োজল পৃথিবীর দিকে

ডাকিয়ে ছিলেন। হঠাৎ বৃদ্ধ পিতামাতা, স্ত্রী এবং দুই

পিতৃ-সন্তান নিয়ে গভীর স্নেহের ছবি তাঁর চোখের

সামনে ভেসে উঠছিল। কিন্তু একবারও কি তাঁর মনে

হয়নি সেই গ্রীষ্ম যুগলো জীবনে তিনি আর নাও দেখতে

পাবেন? দেখানে অমৃত স্মৃতি-নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের স্মৃতিসুপ্ত

আলোকে এক চূর্ণ ব্যতিক্রম সব শেষ করে দিতে পারেন,

দেখানে একটি বাহুরের জীবনের নিশ্চয়তা কতটুকু!

ইউরি গাগারিন সৌভাগ্যবান। বাহুরের ইতিহাসে

তাঁর নাম চিরতরে গ্রন্থিত হয়ে রয়েইল। 'মহাপুত্রের

কল্যাণ' রূপে তিনি চিহ্নিত হয়ে থাকবেন অনন্ত কালের

জন্ত। আশাবী যিনি পৃথিবীতে মহাপুত্র অভিযান

হঠাৎ ট্রেন বা উড্ডোষ্যবাহু ভ্রমণের মত একান্ত সহজ

হয়ে গিয়ে। কিন্তু দৈবিকতার মাহাত্ম্য আলোকে এই প্রথম

মৃত্যু ভ্রমণের নীমাধীন বোম্বারের অসম্ভব পাবেন কি?

নিঃসন্দেহে আশা বাক্তেরই হল। কিন্তু ইউরি

গাগারিন-এর স্থানে নিজেদের বসিয়ে তাঁর বিচিত্র

অভিজ্ঞতার অনীলার হতে যোগ্য কি। চলুন না, মহাপুত্র

বানে বসে আমরাও উঠে যাই মৃত্যুলোকে। মার্জিত

বৈজ্ঞানিকেরা তো রয়েছেনই, বলা সত্যে তাঁরা আবার ঠিক

পৃথিবীতে কিরিয়ে নিয়ে আসবেন।

১২ই এপ্রিল, ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে। এখন তোরের

কৈশোর। বকেটের বাহ্যাবস্থ হতে আর আশঙ্কী বাকী

এবং আপনাই এই অভিযানের নাহক। গত কয়েকঘণ্টা

আপনার গণন কয় খল বাহানি। বাবা বাবা 'স্পেন-

অ্যাট্রিয়েশন মেডিসিন'-এর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ

আপনাকে পঠীকা করেছেন, আপনার শারীরিক এবং

মানসিক সুস্থতা সত্যকথা একপ ভাগ অটুট কিন। বাচাই

করে দেখতে। হুজুক হুকে তাঁদের মুখে দিকে ডাকিয়ে

আকাশ থেকে কেতা

অশোক কুমারদাস

০

ছিলেন আপনি। বহিঃশব্দ

হয়ে যান? একবার অনে

হল, বহি তাই হয়, যে

ঈশ্বর, তাই হোকনা! পর

মুহুর্তেই দিকার দিলেন

নিজেকে, হিহি, আনি এত

ভীত, এত অবিশ্বাসী! তা

নইলে বৈজ্ঞানিকের আমোদ আশ্রমে সম্পূর্ণ নির্ভর
করতে পারতেন কেন? উদ্ভব আগ্রহে আপনি
পরীক্ষকের হার তুলেন, তাঁরা আপনার উপযুক্ততা
সঙ্গে নিঃসন্দেহ হয়েছেন।

জগোলে স্পেন-ভাটে সর্বাঙ্গ আত্মত হয়ে আপনি
গ্যাডের কাছে এগিয়ে গেলেন। বাবার ব্যতন হেলমেটা
সকালের কটি হোদে রক্ষক করছে। কেবল মুখে
যানিকতা অংগ উদ্ভব—ওখানে বহু প্রান্তিকের আবরণ।
তার মধ্য দিয়ে আপনি বেগলেন সামনের দৌহ-কর্তায়
গণন সত্যে বাবা উঠু করে সাপের মত হুঁসেছে একটা
প্রকৃত বাহন। বিপুল তার উজ্জ্বলতা—প' হুয়েক ফুটের
কম নয়। এই আপনার মহাপুত্র পদগের যান—পিঠে
পিঠে চাপানো এক বকেট পোড়ী, সব মিলিয়ে আর ওজন
বেড়ন' টেনেও বেশি।

লোহার কাঠামো বেরে একটা দিকটু নেমে এল
নিঃশব্দে। সর্বোচ্চ বকেটের কাছে সে আপনার কুলে
নিরে এল। এখানেই আপনার স্পেন-কোবিন। তার
নাশকরণ হয়েছে 'ভোটক' অর্থাৎ 'প্রাণী'। এর আকৃতিও
দুই অংগেলাব নয়, বেশ বড়সর একটা বাসের মত; ওজন
প্রায় পাঁচ চার টন।

কোবিনের ছোট্ট বংগাটা কুলে আপনি ভেতরে
হুকলেন। আর আশঙ্কী মাত্র নয়, তারপরই আসবে
আপনার জীবনের সব চাইতে চরম মুহুর্ত। লাউক
স্বীকার নিষিদ্ধার ভাবে ঘোষণা করে চলছে: এক
মিনিট, দু'মিনিট, তিন মিনিট—। কিন্তু আপনি তখন
আর বিমুখ্যে বিভলিত নন, সব উত্তেজনা শেষ হুয়ে
কেনন যেন এক মিলিতের হাওয়া পৌছে গেছেন।
আপনার চারদিকে বা বটতে চলছে, আপনি যেন তার

কেউ নন, একজন নির্ধারক বস্তু' মাত্র; যা ঘটনার ঘটে থাকে—আপনি চূঁরে ইতিহাসে নিশ্চয়ভাবে অনুশোচন করে যাবেন।

তাই নাক্ত হয়ে আপনি ভাবতে পারছেন, কি কি বিপদ আপনার মধ্যে ঘটনাশূন্য শুধু পেতে বলে থাকতে পারে। প্রথমেই আপনার মনে হল তারোপায় বৃত্তির কথা। কিন্তু এ অবস্থায় বহুবার অসুস্থতির স্মৃতি কবে, তার সঙ্গে আপনি অপরিস্রব নন। গবেষণাগারে 'স্ট্রিক্টিফিকেশন' যন্ত্রের অভ্যন্তরে বলে আপনি তা উপলব্ধি করেছেন।

তারপরই মনে হল তারোপায়ের কথা। এর লক্ষ্য দ্বারা মাধ্যাকর্ষণের অঙ্গুণ্যবৃত্তি। তারোপায়ের বসন হবে কেন, তখনই এর হবে মূল। তারোপায়ের বসার পদ্ধতি নির্ণয় করার উপলব্ধি বহিঃরে; কারণ পৃথিবীর মাটিতে বসে এই অসুস্থ-স্বস্তি করা সম্ভব হয়েছে; কিন্তু মাত্র ৩২ থেকে ৬৫ সেকেন্ডকাল সময়ের জন্য। অত্যন্ত সূক্ষ্মগতি বিমানকে 'প্যারাবলিক পিচ'এ অধিবৃত্তাকার (Parabolic) গবেষণা করে তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। 'মিরো-গ্র্যাভিটি ট্রাঙ্কেটরি'তে বিমানের নিরাপত্তা পতনকালে আরোহীনের প্রতিরোধ রয়েছে নানাদিক। কেউ তা সম্ভব করে কাটতে পেরেছেন, কিন্তু অধিকাংশই চরম শারীরিক এবং মানসিক অসুস্থতায় ভোগ করেছেন। এক জনের তো মনে হয়েছিল তার হাত-পাগুলো যেন বেহত্যাগ করে শূণ্য ভেসে যেতে চাইছিল।

জারোপায়ের একটি বড় অসুবিধে, আপনি স্বাভাবিকভাবে কিছু বেতে বা পান করতে পারবেন না। তারোপায় হয়ে বলই বা পেরোপায় থাকবে কেন? 'কন বেক' (Von Beckh) নামক জার্মান অস্ট্রিয় বৈজ্ঞানিক একবার কিন্নরের 'মিরো-গ্র্যাভিটি ট্রাঙ্কেট' উপলক্ষ্যে একটি কক্ষকে সবার হিসেবে নিয়ে গিয়েছিলেন। কক্ষটিকে গ্রাসা হয়েছিল একটি বলগতি পারে। উড়োজাহাজ যে ক্ষেত্রে অধ্যাকর্ষণহীনতা প্রাপ্ত হল, সেখান থেকে বল এবং কক্ষপথ নির্ণয় করে দেখা গেল যে কক্ষপথ নির্ণয় করা হয়েছে। কন বেক বলত। কক্ষটিকে তারের নিচে ছুঁলে বসলেন পলায়িত বস্তুরকে পাল্লায়িত করার লক্ষ্য। তারের সময়ে বল এবং

কক্ষপথে আবাহনীয় অবস্থার বুলতে বেগেলে কন না অসুস্থি বোধ হয়।

এ ছাড়া আরও কত সমস্যা আপনার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে কে জানে। হবারেই মল দিয়ে বিশেষভাবে তৈরী জেলির মত বাগ বা পানীয় আপনি যদি কর্তনালী পথে গেল করে চুকিয়ে ফেলত, আপনার পাকস্থলি তা সহনভাবে গ্রহণ করবে কি? তারোপায় অবস্থার তো স্বপ্ন হওয়াও সন্ত। আর আপনার শরীরের হস্ত চলাচল-বাহ্য্য যদি বাগ প্রাপ্ত হয়?

আপনার অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক কার্যপ্রণালী যেমন আপ-প্রাথমিক (যদি স্পেন্সর তেহিনের আভ্যন্তরে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা হয় থাকে) কিংবা যিবিব ইঞ্জিনের অঙ্গুণ্যবৃত্তি যেমন সূত্র, প্রবণ, পদ, বাহ—ইত্যাদিতে বৈজ্ঞানিক না হওয়াই সম্ভব। কারণ প্রথমটি আপো শুদ্ধ নির্ভর নয়, আর শেষোক্তগুলো চলে তারোপায়ী এবং মানবজীবের musculature ব্যবহার সহায়তার—উভয়ই তারোপায় বাহ্য্য মাত্র।

মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব যে যে বস্তুতে লব্ধ হয়ে পৌঁছে, তা হল ইনার-ইয়ার (Inner Ear) এর ভাবসাম্য রূপ বায়ব্যা (Balancing mechanism)। পরস্পর লব্ধভাবে বিন্যস্ত তিনটি অণুগতাকার এবং আংশিক তুল্য পদার্থপূর্ণ আবার এই বায়ব্যা অঙ্গবৃত্ত। যখন আনবার বা বা কণ করে, উপরোক্ত তরল পদার্থের স্থিতিবাহ্য্য বিন্যস্ত হয় এবং স্নায়ুগতীয় মধ্য দিয়ে তাম্রিত্যে পৌঁছে যায়। 'ইনার-ইয়ার' এর আরও দুটি ক্ষুদ্র অঙ্গ বা মাধ্যাকর্ষণের প্রাসঙ্গিকতা স্পষ্টকারণ। এরা হল ইউট্রিকল (Utricule) এবং স্যাকুল (Saccule) নামে অভিহিত দুটি ক্ষুদ্র পর্ক বা ওটোলিথ (Otolith) যা ইয়ার-টো (Ear-Stone) নামের অঙ্গবৃত্তাকার সূত্র পূর্ণ। এই সূত্রের কাছাকাছিই বসার বায়ব্যা তুল্য এর সঙ্গে তুলনীয়। ওটোলিথ বা ইয়ার-টোন কেবল মাধ্যাকর্ষণের দিকেই নির্ভর করে না, তার তীব্রতায় নির্ভর করে। সূত্রের মাধ্যাকর্ষণের অভ্যন্তরে এবেত কি অবস্থা থাকবে, চিত্তাভীর বিষয়। তবে অনেক পাল্লারিভিকারী এই অভিমত পোষণ করেন যে, ইনার ইয়ার এর ভাব-সাম্যরূপ বায়ব্যা মাধ্যাকর্ষণের অঙ্গুণ্যবৃত্তিতে বিন্যস্ত হবে না বলেই আপনা করা যায়।

বাহ্যাবলী সূর্যালোক এবং তার সী
বেগমী পাতের বর্ণি (Ultraviolet Ray)—
যারা বায়ুমণ্ডল ভেদ করে পৃথিবীতে নেমে
আসতে আসতে নিরীহ হয়ে পড়ে—তার
অবশেষে কৃত্রিম উপগ্রহের ওপর ছাপিয়ে
পড়বে। এরা আপনাদের ঘরের সান্নিধ্যে
আগতে পারলে নিঃসন্দেহে কতিপয় বস্তু, কিছু
শ্পেস-ক্যাপসুল (Space Capsule) এর
আশ্রয়ে শ্পেস স্টাটে আবৃত অবস্থার আপন
বস্তুই নিরাপদ থাকতে পারবেন বলেই
মনে হয়।

আর একটি ভয়ঙ্কর বিপদ ‘মহাকাশগতিক
রশ্মি’ (Cosmic Ray)। অসংখ্য করা
হয়, কুপূর্বে যারা মাইল উর্দ্ধে এর সাক্ষ্যতা
কুপূর্বে কুলম্বার পঞ্চাশ জন বেশি।
অতঃপর তা ক্রমাগত বাক্যে এবং ক্রমা
গতগত মাইল উর্দ্ধে উর্দ্ধে উর্দ্ধে
কোন তাৎপর্য হয় না। কৃত্রিম মাইল
উর্দ্ধে মহাকাশগতিক রশ্মির সাক্ষ্যতা কুপূর্বে
প্রায় পনেরো জন বেশি। মহাকাশগতিক রশ্মি
নিঃসন্দেহে অতিশয় হত্যাকারক। এর প্রভাব
পরিস্পর্শে গোপন করতে চলে চাই অনুমান।

এক ছুট বোধবিশিষ্ট সীমার চারদিক এবং তার
নীচে আত্মনিয়ন্ত্রণ পাতের আবরণ। যখন বাতলা,
তখন পুরু সীমার চারদিক আপনাদের শ্পেস-ক্যাপসুলকে
হুজুতে যেলে তার ওজন বা ঠিকাবে, তাতে
তাকে কয়েক ছাপিত করাই আপাততঃ অসম্ভবের
নাশকার্য হয়ে ঠিকাবে। সুতরাং সে চেষ্টা করা হয়নি।
কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনাদের আত্মকিত হত্যার কারণ নেই।
চার বছর আগে ডেভিড সাইমনস্‌ মাসক মটরক
পর্বেকক কেন্দ্রে চড়ে প্রায় কৃত্রিম মাইল ওপরে উঠে বহির্
বস্তু কাল সেখানে অবস্থান করেন। কৃত্রিম মাইল উর্দ্ধেই
মহাকাশগতিক রশ্মির সাক্ষ্যতা সর্বাধিক। শুধু যখন তাঁর
উল্লেখযোগ্য কোন কতিপয় বস্তু, তখন অসংখ্যকৃত কয়
তীক্ষ্ণতর আপনাদেরই বা কতিপয় হবে কেন। এছাড়া ঐ
মহাভূমি চাই মনঃশক্তি এর সঙ্গে প্রেরিত ‘লাইফ’



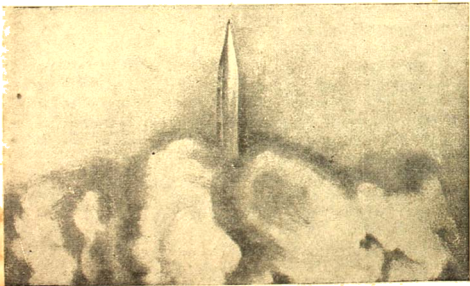
মহাকাশ যাত্রী ইউজিৎ গ্যাগারিন

মাসক কুপূর্বে সাক্ষ্যিত পঞ্চম মহাকাশগতিক রশ্মির
উল্লেখ থেকেও বোঝা গেল। আরও সাক্ষ্যিতকভাবে
‘টেলক’ এবং ‘বেলক’ মাসক কুপূর্বে কুপূর্বে চান। মহাকাশ
ভ্রমণ করে শুধু তেরেই কিত্তি আসতে পেরেছে। অতঃ
আপনাদের বহুকাল পূণ্যত্বহানের মধ্যে মহাকাশগতিক রশ্মি
ভেদন কোন কতিপয়খানে অপারগ হয়ে বলেই আস
করা সম্ভব।

হ্যাঁ, আরও একটি বড় বিপদ ঐক্যকমিকার সঙ্গে
আপনাদের বোমাঘাটের সংঘর্ষের সম্ভাবনা। পৃথিবী
বায়ুমণ্ডলে প্রতি চক্ষুণ বস্তুই বস্তু উল্কা কণিক
(Meteorite) অল্পপ্রবেশ করে, তার মোট সংখ্যা কখনও
কখনও ১০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ অতিক্রম করে
যায়। বাতাসের পাহারা এড়িয়ে এরা কুপূর্বে পৌঁছোলে
পারে না, যদি না বায়ুমণ্ডলের প্রতিবন্ধকতা সঞ্চিত

নিষেধ কিছুটা অতিরিক্ত বয়সে বাধ্য হইত।
সকলই মনে, আপনার যোগ্যতামতে ওপর একে অক্রমণ
চলবে অগ্রতিহত। কিন্তু তবুও এই যে এরা গ্রাফ
সকলেই বলুকনা আপনাকে ক্ষুণ্ণতর। অনেক তো
বীতিহীন আত্মবিশ্বাস। পূর্ববর্তী যোগ্যতামতগুলি এদের
অক্রমণ প্রকৃতপক্ষেই লইতে পেরেছিল। মেহাৎ আপনার
কণাল যদি মন না হয় এবং কালেত্ত্রে বা লৈব আবির্ভাব
যুক্তি তেনে কোন বৃহৎ কলেবর বি'নিত উজ্জ্বলিত হইল।
কিন্তু, তবে এই বিপদ থেকেও আপনি নিষ্কট হই যাক।
প্রেমের ব্যবস্থা। এগবের পরও বরোহে আর একটি বৃহৎ
সমস্যা, বার ভরত অল্পপেক্ষীয়া। সে হল মহাপুণ্য
ব্রহ্মচারীর মনস্তত্ত্বগত পরিবর্তন। নির্জন, অন্ধকার
'সেকি'কিউজ' এ কিছুকণ কাটানোর পর অনেকেরই
মানসিক ভারসাম্য বিপরীত হতে দেখা গেছে, তারা
'ম্যালু'সিনেশন' এ ভুগেছেন। অথচ 'সেকি'কিউজ' এর
ধূলনার শেষ কেবিনের আবহাওয়া হবে আরও
অস্বাভাবিক, আরও অসহনীয়। এর সঙ্গে আবার দৃষ্ট হইবে
সাময়িক টানাপোড়েনের তীব্রতা।

এর মধ্যে আর কৃষ্টি মিনিট উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।
শেষ-কেবিনের মধ্যে মনম ডেলুয়েটে মোড়া প্রান্তিকের
একটা কোণ! আপনি তাতে নিজেই কৃষ্টি হইলেন।
নিষেধ অজান্তেই আপনার হাত সামনের বিভিন্ন 'মন'
এবং 'লিডার' ভলোব হিকে এগিয়ে গেল। এদের
কোনটার কি কাজ, সবই আপনি বিপদ বিনভলোব
একত্র বিক্ষা এবং অপ্রতীক্ষিতের দ্বারকায় তেনেছেন।
অবশ্য আপনার উজ্জ্বলমন, দেখানো অবস্থান এবং
প্রত্যাবর্তন—সব কিছুই ঘটবে নিচ থেকে নিগরনের
মাধ্যমে, অবশ্য হাতের ইঙ্গিত—হাতে আপনার কৃষ্টি
আর বৃহৎ মনকেই মন তবু যদি কোন আকর্ষণ, অতিথ্য-
পূর্ব বিপরীত দেখা দেয়, যদি মাটির সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন
হয়ে যায়, তবে আপনার নিজেই তো জীবনহত্যার
চেষ্টা করতে হবে। তবুও এই সব ক্ষুণ্ণতামত বহাৎ-
গুলির ওপর নিভর করবে আপনার জীবন যৎ এবং
সেই সঙ্গে এই ঐতিহাসিক প্রচেষ্টার সাক্ষ্য বা অসাক্ষ্য।
সুতরাং আপনি শেখাবার মত এদের পরীক্ষা করে
দেখলেন।



বহাৎ-গান

। আকাশ থেকে নেয়া

গ্রেসার পের ?—টিক আছে।

আমার কতিপনার, হেস্তিত, টেলিফোনটি ?—টিক
আছে।

একশপ দিয়ার ?—টিক আছে।

সব টিক আছে, সব নিখুঁত ত্রুটিহীনভাবে কাজ করে
যাচ্ছে। অমৃত তা না হওয়াই তো স্বাভাবিক। বিনেশ
পর বিন নানা জন্মে নানা ভাবে এদের কার্যকরীতা
পরীক্ষা করেছেন, শতকরা একশ ভাগ সুস্থতা সবচেয়ে
নিঃসন্দেহ হয়েছেন, তবেই না এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের
পত্রিকানা ?

আর বাকি পাঁচ মিনিট বাকী। এখন নতুন এক
চিত্রা আপনার মন অধিকার করে বসছে। আপনি
এমন এক ঘটনার অংশ গ্রহণ করতে বসেছেন যা মানুষের
সমগ্র ইতিহাসে এই প্রথম। আপনি এখন এক দোকে
বেতে চলেছেন যেখানে আজ পর্যন্ত কোন মানুষ
পৌঁছায় নি। কি যেখানে আপনি সেখানে ? কি অভিজ্ঞতা
আপনার জন্য আপেক্ষা করে আছে ?

ওদিকে লাউডস্পীকারের গণনা এদিকে চলেছে :

পটিন মিনিট...ছাফিন...সাতাশ...আটাশ...

এসার সাইবেরের কর্তৃক আর্ডনার শোনা গেল,
রকেটের বিস্ফোরণ আরম্ভে সন্দের।

বড়ির কাটার টিকটিক্ শব্দের সঙ্গে বৃষ্টি আপন
হৃৎপিণ্ডের আওরায় গুমেতে পাচ্ছেন।

পাঁচ থেকেও...এক থেকেও...কুড়ি...ত্রিশ...পঞ্চাশ...

পঞ্চাশ...আটাশ...উনবাট...

একটা এচও আওরায়। বিদ্যুতের মত তীব্র
আলোর কলকানি। সারা বেবে একটা অদৃশ্য কান্না।
তারপরই অলুভন করলেন, আপনি ওপরে উঠে যাচ্ছেন।
ঝোরে আঁতও ছোরে। রকেটের পতিবেগ ক্রমেই
বাড়ছে, সেই সঙ্গে আপনি অলুভন করছেন নানা বকম
শারীরিক অস্বস্তি।

আপনার তারবেশ বাড়ছে, সর্ব অকস্মে নিগন্ত
বয়স, আপনার পাকস্থলীতে কে যেন কোরে চাপ দিচ্ছে,
হৃৎপিণ্ডে পান্ডর চাপা অস্বস্তি, চোখের পাতা অদৃশ্য
ভারি হয়ে চোখের ওপর চোখে বসল—আপনি এখন
বৃষ্টিহীন, হাত-পা শুশো যেন লোহা দিতে তৈরী, আপনার



শিরায শিরায বইছে শোণিত খাতা নয়—যেন তরল সৌন্দর্য প্রোত ।

আপনি হ'যাকরণ আশ্রয় করে চলছেন বলেই এই ভারবোধের জন্ম। রকেট-বিজ্ঞানের কল্পনাভাষিওলকভিচ (Tsiolkovsky) বিখ্যাত রুশভাষী 'হাইড্রো শক আবজর্বার' (Hydro Shock Absorber) এর সহায়তায় একে ক'টি হেওয়া সম্ভব। 'হাইড্রো শক আবজর্বার' আসলে একটি আয়ত তরল পদার্থপূর্ণ পাত্র কে-তরল পদার্থের আপেক্ষিক ঘনত্ব জানব হেতের আপেক্ষিক ঘনত্বের ঠিক সমান। আতিমিডিলের পুত্র বলে, কোন বস্তু যদি কোন তরল বা বায়বীয় পদার্থে নিমজ্জিত হয়, তবে তার গুরুত্ব বাহিনীকটা হ্রাস পাবে। এই হ্রাসের পরিমাণ কত? না, বস্তুটি যে আয়তনের তরল বা বায়বীয় পদার্থে অপস্থত করবে, তার গুরুত্বের সমান। সুতরাং যত বিপুল বেগেই যোমবান উড়ে ছুট চলুক, আপনায় ওজন হইবে তুচ্ছ লাগ, অপস্থত তরল পদার্থের ওজনও সমান্তরাল বৃদ্ধি পাবে এবং যেহেতু আপনি পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় রয়েছেন, অস্বস্তি বস্তুর ওজন হবে আপনাকে ওজনের ঠিক সমান। অর্থাৎ আপনি আপনার সম্পূর্ণ ওজনই হারিয়ে বসবেন।

কিন্তু আপনার শৈশব কেবিনে হাইড্রো শক আবজর্বার নেই, সুতরাং ভারবোধের দ্বারা আপনাকে সামলাতে হবেই। এই ভারবোধের জন্ম দ্বারা রকেটের 'দ্বন্দ্ব' (Acceleration)। রকেট বরাবর একই গতিতে উঠতে পারিলে ও ভাবেনা পোহাতে হত না। কিন্তু তা কেমন করে সম্ভব? রকেট প্রথমে দাঁড়ির বুকে স্থির হয়ে ছিল, কিন্তু তাই গতিবেগ ছিল ন্যা; তার জালামির স্পন্দ থাকতে থাকতে মিহি, উচ্চতার আপনাকে পৌঁছে দিয়ে তবে ছুটি। সুতরাং তার ত্যাগারো না করে উপায় কি? এই ত্যাগারো কাজেই গতিবেগ বাড়তে হচ্ছে খুব দ্রুত, যাও অবশ্যাব্যাবী বল ধরনের আধিক্য।

যখন যত বাড়ছে, আপনার ভারবোধও ততই বৃদ্ধিহে। এক সময় আপনি যেন আত্মনৈরও বেশি ভাবি হয়ে পেলেন। কৌতুহে ওপর আপনার শরীর আনুভূমিক (Horizontal) ভাবে পড়ে পইল, কারণ ভারবোধের প্রতিক্রিয়াভাষের এটাই সর্বোত্তম অবস্থান।

তারপর সব মিচের রকেটটি বলে গেল যোমবান থেকে। এ সময় যুগুতের জন্য বিকেতে হাতা ধোব হল আপনায়। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় রকেটে বিক্ষোভ হল; জর্বাৎ আবার সেই বরণ এবং তার আনুভূমিক হল গুরুত্ববৃদ্ধি। এমনি বাহিনীকটা উঠছেন, আর এক একটা রকেট বলে পড়ছে নিচে। শেষতম রকেট বলে পড়া যাত্র সব বহুদায়ের অত্মত্বি যেন বহুদায়ের অত্মত্ব হয়ে গেল। আপনি এখন আপনার বাহুগুরু আধাসহ কক্ষপথে স্থাপিত হয়েছেন। অর্থাৎ এই যুগুত আপনি বকৌর আটার হাতায় বইল বেগে সমন্বত একটি কৃত্রিম উপগ্রহের অধিবাসী।

আপনায় আপে পাশে তাকালেন। কৌতুহে ওপর বলে বা ভাব নয়, আপনি এখন কেবিনের মাক্তবানে জালিয়েন হাইড্রোজেন পোতা-সেলুনের মত। মাথাটা যেন হচ্ছে শোণায় মত হাতা, যেন সব ভাবনা চিন্তা দ্রুত হয়ে আপনি এক নিষ্ঠাবানর হাতা বিচরণ করছেন। যেন হচ্ছে আপনি যেন এক অতল বাসের পটৌর জন্মেই তুলিয়ে থাকেন। হাত-পা কলো শরীর লোপে রয়েচে, কিন্তু তাদের অতিবেগ কোন অত্মত্বি নেই। নেড়ে ঢেড়ে লেঙ্কলেন, সামান্য প্রবাসেই তারা জুগুতগি চিত্রের চরিত্রের মত তুচ্ছক করছে। আর যে সতল বহু জালনা ছিল, যেনম হু'একটা বই, একটা প্রান্তিকের টেবিল—তারা পরবর্তনকে শূণ্যে জালছে। কিংবা শৈশব কেবিনের ফোলের দ্বারে মিহালদ হয়ে ক'লকৌর, আপনি হাত বাড়িয়ে একটাকে ধরতে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে কে যেন আপনাকে শেঙ্কন থেকে টেনে ছিল, স' কত শূণ্যে উঠে গেলেন এবং কেবিনের ফোলে আপনায় হাতা টুকে গেল।

হঠাৎ আপনার কামের পানের বেতায় হাইড্রোকার্বো-তেলে উঠল যন্ত্রকর্ক। সঙ্গে সঙ্গে আপনার যেন হল, এতদূরে এলেও আপনি নিঃসঙ্গ অনস্বায় মন। আপনি এখনও পৃথিবীর দাঁড়ির সঙ্গে অত্মত্ব পুতায় বঁধা। শেখানকার ব্যবস্থাপারের নিম্নে বিভ্রান্তি হল আপনার জীবনের দায়িত্ব নিয়ে বলে আরেণ। টেলিভিশন এবং টেলিফোনের মাধ্যমে উঁচা সাতাক্ষণ আপনার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলেছেন। আর ইয়া, সময় অতিক্রান্ত বলে উঁচা আপনাকে বহুদায়ের বুকে কিতরেক নিয়ে

হাবেন। হাইক্রোকোনে আপনি বেন তারই অভয়বাণী শুনলেন।

ইবার তৎক্ষণে যেয়ে আপনার কণ্ঠ নিচে নেমেপেল, 'হ্যাঁ, আমি ইটরি পান্থাণি শেল প্যাপনাল থেকে কথা বলছি, সব ঠিক আছে, আমি বেন সুস্থ-বেহেই বিরাজ করছি।'

আপনি এখন হৃদয় আবেহিকার ওপর রয়েছেন। আমেরিকার উপকূলবর্তী স্ট্রিকের মত শব্দ। সূত্র, পাহাড় পর্বত, অট্টালিকা-পরিচীর্ণ নগর, অরণ্য, নদী—বেন এক অপরূপ চেলিজের আপনি জ্ঞা।

এখন আপনার শ্লেষ-ক্যাপনাল আক্রিয়াকার ওপর দিয়ে বৃহৎ। আপনি মোটক্কর পাতার আপনায় অভিজ্ঞতার বিবরণ কিছু কিছু শিখিত করে যাচ্ছেন। বহিঃস্থ হাত এখানে তারপাশ, তবু হত্যাকার খোঁজাছুটি অবিরতই রয়েছে।

প্রায় এক ঘণ্টার ওপর আপনি শূন্যলোকবাসী। এখানে নিচ্ছিন্ন মৈত্রী। বেন কত মূল আসে আপনি পৃথিবীতে ছিলেন। পোটরোলের মধ্য দিয়ে আকাশ চোখে পড়ে—গাঢ় মসীমাধা। নিচে বহুমুখী আবছা নীল ছায়ায় মত। 'পৃথিবী পোলাকার'—এই মহাসত্য বহিঃস্থ বস্তুই থেকেই জানা ছিল, তবু রক্তমাংসের চোখে তার বর্তমানকার রূপ আপনিই প্রথম প্রত্যক্ষ করলেন। বিপজ্জ্বালাতন থেকে তাকাতাই বেন বোকা গেল, ভূপট দেখানে চপুখের নেমে গেছে।

এই স্বপ্নকালের মধ্যে আপনার উপগ্রহ পৃথিবীর চারদিকে একপাক ঘনায় করে এসেছে। পৃথিবী এক পোলাকারে এখন বিন, অস্ত্র পোলাকারে রাত্রি। আপনিই একমাত্র সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, তিনি আলোকিত এবং তমসাবৃত—এই উভয় পোলাকারে প্রায় দুইশত বর্ষন করলেন। আলোকিত পোলাকারে প্রাকৃতিক বোমানে নাজোশের তমিস্রার সঙ্গে গিয়ে বিলীন হয়েছে—আজ, সেই সমগ্রবলের সৌন্দর্যের মুখি ছলন। সেই। পৃথিবীর সন্ধিতে ঠাকিয়ে যে তত্ত্ব নক্ষত্রগুলিকে আপনি শিকড়িক করতে বেবেছেন, এখানে তারা অচল এবং লাল। এখানে সূর্যের রূপও পতঙ্গ। পৃথিবীর তুলনায় অনেক বেশি উজ্জ্বল। তার বর্ণও লাল নয়, গাঢ় টকটকে লাল

—অন্ধকার আকাশের সর্বোচ্চ ভাসমান বেন একটা দীপ্ত রক্তপোলাকার।

আলোকিত পোলাকারে বোমানে অন্ধকার আকাশের সঙ্গে মিলেছে, দেখানে সত্ত্ব কিতের মত একটা বলর পৃথিবীকে ঝেঁদন করে আছে। তার রক্ত হাতা নীল। এই হাতা নীলের ক্রমশঃ অন্ধ শারে রূপান্তর ঘূব ঘূব এবং রূপান্তর লাভনয়ন।

আপনার শ্লেষ-ক্যাপনাল এখন অন্ধকার পোলাকার থেকে আলোকিত পোলাকারে দিকে বাজে, তখন দিগন্তবর্তী রূপ অস্ত্র। একটা উজ্জ্বল কমলা রঙের দীপ্তি তাকে ঘিরে আছে। সেই কমলা রঙ ক্রমশঃ কিকে নীল হয়ে গিয়ে মিশিছে অন্ধকার আকাশের সঙ্গে।

হাইক্রোকোনে নীচ থেকে নির্বেণ আসে, 'এবার পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের পালা। তৈরী হয়ে নাও।'

আপনার প্রতিটি ঘটনা বেয়ে রক্তশ্রোত উদ্ভাব হয়ে উঠল। বুকের মধ্যে ছলিতের লগাখাপি, 'আমি কি সত্যি কীমত অবস্থার আমার পৃথিবীতে কিয়ে যেতে পারব—পারব কি আমি?'

আপনার শ্লেষ-শিপের ইঞ্জিন চলতে শুরু করেছে। জর্জ্বিত তার গতির থেকে মুখ করে হকেট-ইঞ্জিনের 'কেট' মিকেল আনত রয়েছে। কলে শ্লেষ-শিপের ওপর বৈ বিপদীতমুখী চাল সূত্র হাঙ্ক, তাকে তার সান্থনেশ হু স পাচ্ছে। আন হুত ত, ক-হে, শ্লেষ-শিপ এই হু-হে-হাচ্ছে নেমে আসছে। আপনি জানেন, এই পাহাড় বর্ত—বিলম্বনক। বহিঃস্থকায় সতিবেশ অচলকি: কনে ঘা, তবে আপনার হাড়গোড় তেজ হুর্ন হয়ে থাকে। কিছু সেটাই প্রথম বিপদ নয়। আসল বিপদ হল, ওঠান পতি ভাল গেলে শ্লেষ-ক্যাপনাল এমন ভাবন উত্তর হয়ে উঠবে, সে মুহূর্তে বর্ণ করে জলে উঠে নিঃশেষে বাষ্পীভূত হবে থাকে—সঙ্গে সঙ্গে আপনিও পুড়ে ছাই হয়ে যাবেন। এমন কি ব্যাপার উপলব্ধি করে ওঠার মত অবকাশও পাবেন না।

তাই পৃথিবীতে বীরে আপনি পৃথিবীর কাছে এসিয়ে আসছেন। এই সময়েও আপনার অস্তিত্ব বহুপাহারক। তারতুষ্টির সর্বোচ্চ মাত্রা এখন ওঠার সময়ের চাইতেও বেশি। বহিঃস্থ পৃথিবীতে বীরে শ্লেষ ক্যাপনাল এর

চক্রবেশ করছে, তবু কিছুটা উত্তাপে স্তম্ভিত এতানো আছে না। কিয়ৎকাল পরে চারদিকে যে আবহবোধ রয়েছে — জলন্ত জলন্ত সেই উত্তাপকে বাইরে ছাড়িয়ে গিয়ে আপনাকে নিরাপদে রাখছে।

অনেকটা অবতরণের পর শেল-ক্যাম্পস্থান বাতাসের হাওয়া গ্রহণ করলে। এখানে বাতাসের ঘনত্ব পর্যাপ্ত। তাই বকেট ইঞ্জিনের সঙ্গে বাতাসের প্রতিযোগিতা নিকটবর্তী পতিত স্থানের কাছে লাগানো হল। আবহবোধ পরিবর্তন পর, ঘনত্ব আপনাকে কুণ্ডলিত করে মাইল চারেক উপরে নিয়েছেন, তখন ক্যাম্পস্থানের দরজা উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং আপনার আগমনের নিচে বসানো 'ইঞ্জিন' আরও জ্বলতে লাগল। আপনাকে প্রস্তুত হতে হবে। এখন কিছুক্ষণ আপনাকে বাতাসের পতনের অস্তিত্ব অনুভব করলেন, তারপর আপনার প্যারাসুট বাতাসে ছুঁলে কেঁপে উঠল। আপনি নিচে ডাকিয়ে বেগলেন, সবুজ পৃথিবীর মনোহর

সৌন্দর্য হাতছানি দিয়ে ডাকছে। পৃথিবীকে বুঝি আর কখনও এমন অপভ্রংশ ঘনো হয়নি। বুক ভরে আপনি মুক্তির নিশ্বাস টানলেন। নিচের ঘোষণার মাধ্যমে কণ্ঠস্বর ভূমির তাককণ্ঠ তখন বীয়ে বীয়ে আপনার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল।

তখন আপনি ভাবছিলেন, মহাপ্রাণের কত না বিপদকে আপনি কীকি হিতে পেরেছেন। যদি তা না পারতেন, যদি তা না পারতেন—তাহলে ?

তাহলে ইউরি গাগারিনকে কে মনে রাখত। কিন্তু তা হয় নি, তাই তাঁর ব্যাতি আশা বিফল। কোটি কোটি যুগে তাঁর নান। এই উত্তেজনা, এই মত্ততা হঠাৎ বীয়ে বীয়ে কমে আসবে; কিন্তু গাগারিনের নাম চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে মানুষের ইতিহাসের পাতায়।

জানতে ইচ্ছে হয়, ইউরি গাগারিন কি সারাজীবনেও চুপচাপ গাংয়েন তাঁর মহাপ্রাণবাসের সেই একশ' আট মিনিটের কথা।

২ • মেজর ইউরি গাগারিন-এর পর গত ১ই আগস্ট আর একজন রুশ 'অ্যাস্ট্রোনট' মেজর বোরিস টিওড 'জোইক-২' নামাঙ্কিত মহাকাশ যানের আরোহী হয়ে কক্ষপথে স্থাপিত হন এবং সতের ঘণ্টা পৃথিবী প্রদক্ষিণের পর পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন। যদিও মার্কিন প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসেবে কম্যান্ডার অ্যালান শেপার্ড এবং কার্টেন ভ্যালি 'গ্রন্থ ইতিহাসে' রকেটের সাহায্যে উল্লেখ্য প্রদক্ষিণ হয়েছিলেন, তথাপি প্রকৃত প্রকারে মেজর টিওডকেই দ্বিতীয়ের সম্মান বিতে হয়, কেন না মার্কিন অভিযাত্রীদের মধ্যে কেউই পৃথিবী-বর্তনকারী কক্ষপথে স্থাপিত হতে পারেন নি।

সময় বাপার বেয়াদ
ক'রিয়ে এল। হোল
শেষ ভেলার ভেসে
থাকা। জঘন্যতম পত্নী
পানে ভাকার যে ভাবে
মানুষে, সেই ভাবে
নৌ কা না না র পানে
ভাকিয়ে আছে দাড়ী
বল। ওর অপরাধ,
ও আমায়ের বন্দী করে
রেখেছে। কটা দিন
কটা রাত আমরা
আমায়ের বন্ধি' ব্যাকিক
দুই ঠ্যাং ঢালিয়ে



প্রকৃতির হিলাতের পরবর্তী অবস্থার
ঐশ্বর্যপূর্ণ ক্ষমার

অপরাধতা ভোগ করিতে
করিতে মন বেজান্ন এমন
ধি'তে উঠল যে একে
নিতে নাথা বাহাবার
কিছু মাত্র প্রয়োজন
বোর কল্যায় না। কেবু
হবেই এক সময়, দেখাই
যাক ওর মৌড় কতদূর।
নির্বাণ এক সময় দেখা
যাবে যে ওর বেহায়াপনা
যু'তে, নাথা যু'তে মরছে
বাতির বহলীর পায়ের
ওপর। সেই লুপ্তি
দেখতে পার এখন তখন

ধর্ম্মীর বৃত্তে দাপাদাপি করতে পারি নি। কি শব্দ!।
করেকখানা বরা কাঠ, করেক ন' লোহার পদাল আর এক
রাশ বড়োভিত্তি শূন্য বান কতক নানা রূপের পাল, সবই
মানুষের হাতে পড়া মানুষের খেলায় বৃশ মত বানানো।
কিন্তু প্রত্যাপ কত। নাতানাবদ্ব করে ছাড়লে মানুষকে।
হাতের পরে দিন, দিনের পরে রাত এল গোল। আমরা
কলজ্যাত কটা মানুষ নেহাত নাচার ছোরে ঐ বরা
কাঠের পড়ে'র মর ছোরে রইলাম। কর্মের ক্ষেত্রে পড়া
আর কাকে বলে।

কর্মের ক্ষেত্রে অথবা মরয়ের ক্ষেত্রে, যার ক্ষেত্রেই পড়ে
থাকি না কেন শেষ পর্বত কিছু বৈষট্টক টিপকে ছিল
সকলের। ছিল ঐ নিরলস সমুদ্রটার অন্যে। বেহায়াপনা
কাকে বলে! একবার জবাব হোল সীমা ছাড়িয়ে
বাওয়ার নাম বেহায়াপনা। গান বল, নাচ বল, বদর ভাল
কোনও সংকথা বল, সবই ঐ বেহায়াপনার দাঁড়িয়ে যায়
ধরি বামবার জামসান্টিতে না বামতে পারে। সমুদ্রের
হোল ঐ পশা, ওর মহিমা ওর বিপুল বিশালত্ব। কিছু
তারও ভেঁা একটা সীমা থাকে উঠে। সেই বলেই ঐ
সমুদ্রটাকে বিয়ে সমুদ্রের মত আবিষ্কৃত্য করা পোষায়
না। ওর দিকে ভাকিয়ে থাকতে থাকতে আর ওর মত

ওর দিকে শেখান ফিরে সোঝা হেঁটে চলি যাব। ওর পূর্ণতা
দেখবার জন্যেও একটি বার শেখান ফিরে তাকাব না।

তাই-ই হোল।

কাড়া পাঁচটা দিন আর ছটা রাত কাটল, দু'বার
উপর আর দু'বার অস্ত গেলেন সূর্য্যিক ঠাকুর। তারপর
আমরা পুনতে পেলাম যে আর একবার অস্ত বাবার
আগেই আমরা ঠিক ঠিকানায় পৌঁছাইছি। পুনলাম এখন
তখন অবশ্য পৌঁছান না পৌঁছান লম্বতে কেমন যেন
একটা নৈর্বাণিক ভাব এসে গেছে চিত্তে। একদিন না
একদিন এক সময় না এক সময় পৌঁছাইবে যে এ ভেঁা জানা
কথা। সুতরাং জানা কথাটা জানতে পেরে কিছু মাত্র
ভাবান্তর ঘটল না। ধীরে যু'তে যে বার মাল-পত্র সোহ-
পাই করতে লাগলাম।

বেহায়া ধরিয়া তখনও ঠিক বোশামু'দি করে মরছে।
যিচ্ছে হোল বোরুল সোলায়। দিক, মনে আর সোলা
লাগছে না। মনের সীমা আছে যে, মন তো আর
সমুদ্রের মত সীমাহীন নয়।

মনের পাকি আছে মৌড়বার। সমুদ্রের সল ভাঙ্গ
করে মন গিয়ে পৌঁছে গেছে তখন ভেঁরন কোটে'র

৩৪৮ প্রান্তে। সেখা হিন্দুদ্বার ভৈরব কোটেশ্বর, কোটেশ্বর পূর্ণ কর্তে পায়েল মহাপাত্রী লক্ষ্মী হোল আনা। সুদাম্পার হবে। আর—এখনও বুটবে।

বনকু হোতাতে হোল লোহা পোড়ার ছেঁকাও খেতে হবে। পরমানন্দী পরমানন্দে হাজলে দিলেন—“ছোট একখানি লোহার ত্রিশূল পুড়িয়ে রক্ত করে চোখে ধরে পড়িয়ে। যেখানে চাও, দাগ দিয়ে দেবে। কনুই বেতে ক্নাঝির ভেতর নিতে পার। অবশ্যে কুঁহাতেও নেব। কেউ কেউ মের বুকের ওপর। ঐ ছাপটিই হোল প্রমাণ, হিংলাক লক্ষ্মী করে কোটেশ্বর লক্ষ্মী কহে, বনকু বুটে সেজে, পূর্ণকু লাক্ত করে, তার প্রমাণ হচ্ছে ঐ ত্রিশূলের ছাপ। ঐ ছাপ দেহের সঙ্গে যাবে, হিংলাক কোটেশ্বরের পুড়ি আত্মা মনে থাকবে।”

পূর্ণে হুঁয়াক করে উঠল মন। বলে কি রে বাবা!

পরমানন্দী বললেন—“হুঁয়, ও ছাপ নিতেই হবে।

ভৈরবদ্বারের আশে না নিলে মহাপাত্রী হয়।”

মহাপাত্রী হয়। তা হলে তো করয়ে লক্ষ্মী।

ভৈরবী গ্রামী হোয়ে সেলেন তৎক্ষণাৎ মহাপাত্রী খেতে, লোহা পড়ার ছেঁকা চর ভাল।

আমি পড়লাম লক্ষ্মী সংকটে। ছেঁকা না নিলে মন মহাপাত্রী হয়, তখন ছেঁকাটি না নিয়ে কি উপায়ে মহাপাত্রীকটিকে লাক্তি দেওয়া সম্ভব, তা জানতেই হবে। উপার একটা না একটা ঠিক আছেই। শাস্ত্র হোল ক্বাণ সহজ-ভদ্রা ব্যাঙ্গ। যে শাস্ত্র পাশ কি তা তুলে দিয়েছে, সেই শাস্ত্রই প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়েছে। প্রায়শ্চিত্তের অনুকরণও ঐ শাস্ত্রেই আছে। লক্ষ্মী পক্ষে বিশেষ বলতে কি কিছু নেই। নেই হোতেই পারে না।

অনুকরণের কথাটা তুলতে সেলাম পরমানন্দী কহে, হিতে বিশ্রীত ঘটল। স্নানক পরমানন্দী ভেলে বেসঙ্গে অলসে উঠলেন—“কেন? লত বড় শ্রীটীর একটু ছেঁকা লাগলে মরে যাবেন নাকি? হিংলাক লক্ষ্মী করতে গিয়ে যে লক্ষ্মীক হোয়ে এসেন, মরে তো যাব নি। ও নর চলবে চলবে না, ছেঁকা নিতেই হবে।”

হিংলাক লক্ষ্মী কহে—“ছেঁকার ভদ্রা ভাবনা

পরমানন্দী, ভাবছি সেই আত্মবুটে দাগটার কথা। এখনও কত দিন বেঁচে থাকব, তা বলা মুশকিল। বতকালই থাকি না কেন এই কুঁহাখার ঐ দাগটা বয়ে বেড়াতে হবে। এইখানেই মন দাব নিজে না। বনকু হোয়ে বাওতা, বনকু হোতাখার ক্বায়ে প্রায়শ্চিত্ত করা, এই ব্যাপারগুলো মনে পড়ে যাবে। ক্বাণ ভোর আশ্রাণ ছেঁকা ঐ প্রায়শ্চিত্ত কর্মটিতে এড়িয়ে চলেছি। দাগ যা করেছি এবং এখনও করতে পারছি সেগুলো নষ্ট করতে চাই না প্রায়শ্চিত্তের আদর্শে। আশা-খাক। পূর্ণা মন একটিও লক্ষ্মী করতে পারলাম না, তখন পাশগুলো অস্তিত্ব থাকুক। ওগুলোকেও যদি ধোয়াই, তা হলে পূর্ণ হাতে ক্বাণনা হোতে হবে যে। পাথের বলতে কিছুই যে সঙ্গে যাবে না।”

“ওটাও একটা মত বড় বাপা”—পরমানন্দী কহে আবার সেই আশে টান কুটে উঠল। চোখ কুড়িতে দেখা দিল সেই কুঁহীর আলো। বাবা বেড়ে লাগ চলে গেছে কুটে কুটে বললেন—“পাশও সঙ্গে যাবে না, পূর্ণাও সঙ্গে যাবে না। পাশ পূর্ণা ভাল বন্ধ কিছুই পাথের হবে না। বেখানকার যা দেখানোই যেতে পারে। তার কারণ, কে কোথায় বাচ্ছে যে পাথের নিয়ে যাবে।”

“যেতে হবে না কোথাও!” আত্মকে উঠলেন—“তার মানে তীব্র লক্ষ্মীর কলে অস্তিত্ব লাগ খুঁটে মল নাকি!”

“কে বলছে যে আপনি অস্তিত্ব নন?” বাপে পেয়ে সেলেন পরমানন্দী। একটু উচ্ছ্বাস কুটে উঠল তাঁর চোখে মূগে। আরও একটু, খানিক্ত হোয়ে বলে গেল একটু, তাঁর কুড়িতে আবার চোখের পানে তাঁকিরে জিজ্ঞাসা করলেন—“আপনি যে করবেন, এ কথা আপনাকে বলছে কে? আপনি কি জন্মেছেন যে মরবেন? আপনাকে জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। কোথাও থেকে আপনি আসলে নি, কোথাও যাবেনও না। আপনি আপনো হিংলাক এখনও আছেন, পরে এমনি থাকবেন। বা থাকবে না তার দাব লক্ষ্মী। লক্ষ্মীটুকু মার বড় হোয়ে যাবে আপনীর ঐ শ্রীটীর। ওটা লক্ষ্মী হোয়ে দিব্যপ্রকাশ্য হোয়। সঙ্গে সঙ্গে আপনি ওটা রেখে দিব্যপ্রকাশ্য হোয়। লক্ষ্মীর সঙ্গে মিলে যাবেন। বইলেন বিশেষ কিছুই নইলেন, ভক্তির আবার একটা উপকৃত বড় মিলে

গেলে তার ভেতর এসে শশিত হোতে থাকবেন। দক্ষ ব্যাপার, এর মধ্যে আশা বাওড়া। তোষার ?”

“ঐ উপাশাটা একঘর দত্তা হয়ে গেছে পরমানন্দজী।”
দত্তার দস্তর বিরক্তিতা ত্রুপে জ্বাব দিলার—“জীর্ণ বাস পরিভ্রমণ করে নতুন বাস দায়ণ—ওটা পুনে পুনে বাসনের কাল পড়ে গেছে। ওটার সঙ্গে আরও বাসিকৃত উপদেশ ও পুনেতে হয় কি না। এটা কের না, ওটা কলো পাশ হয়, সেটা হচ্ছে ভ্রম্যক রকম অন্যায়, এগুলোকেও গিলতে হয় কি না ঐ জীর্ণ বাস নতুন বাসের উপহার সঙ্গে।”

পরমানন্দজী তৎক্ষণাৎ অন্য হান্দুর হোরে সেলেন। দপ করে জলে উঠে বলতে লাগলেন—“ঠিক বলেছেন। হাঁড়িভাঙ্গা ঐ পাশ পুণ্যের ভয় দেখিয়েই সবায়ের হন খিঁচড়ে দিয়েছে। পাশ সেই পুণ্য সেই, প্রাচীনত্ব দ্বারা এ দমত স্নেহ হাঁড়িভাঙ্গার মোকা বাজী। মোকা কথাটা হান্দুরকে বুঝিয়ে বলসেই হয়। একটা একতান দলীত চলছে। পকাশটা বস্তু এক সুরে বাঁধা, পকাশ জলে হিসের মত ঠিক ঠাক বাজাবে। এক জনের বস্তু সেসুরে হেঁকে উঠল, কিংবা এক জন বেহালায় এমন এক বিনম্রুটে চান দিয়ে বলল যে দলীতের ওপর হাঁড়ির কোপ পড়ল। ঐ কাজটি কি করা উচিত। এই পুণ্ডরী, এই পুণ্ডরীর আকাশ, তারপর মহাকাশ, সেই মহাকাশে কোটি কোটি নক্ষত্র, সেই নক্ষত্রগুলোর চন্দ্র সূর্য, এই যে বিরাট ব্রহ্মাণ্ড, এই ব্রহ্মাণ্ডটা চলছে এক সুরে। যে দার নিজের কক পথে ঠিক ঠাক দুরায়ে। ঠিক ঠাক হুপ বসলাচ্ছে সব বজুর, জল বাপ হচ্ছে, বাপ জলে হাঁড়িচ্ছে। ভাপ ভুবার হচ্ছে, ভাপর থেকে ভাপ বেরচ্ছে। কেন হচ্ছে? সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে একটা বিধিষ্ঠ নিয়মে এই শশন চলছে কেন? সে শশনটা কি?”

দ্বয় নিয়ে মিলেন পরমানন্দজী। নিয়ে চক্ৰ বুজে বলতে লাগলেন—“সেই শশন আপনার ভেতরে চলছে, অন্যায় ভেতরে চলছে, বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে ঐ একটি বাহু দত্তা বস্তু—শশন। ঐ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে দ্বন্দ্ব চক্রেতে চক্রেতে তখন হন বুঝিও পেয়েছেন। সেই হন বুঝি দিয়ে ঐ শশনটাকে জানবার চেষ্টা করুন। গত নয় বছর হাইয়ে জীবন নয়। যে বৃহত্তে আপনার

ভেতরের শশনটাকে জানতে পারবেন, গভ্রেতে পারবেন সেই বৃহত্তে সেই বিরাট শশনকে দলো মিলে বেতে পারবেন। তখন পাশ ও করবেন না পুণ্য ও করবেন না একটি বাহু চেষ্টাই তখন করতে থাকবেন—বাতে সেই বিরাট শশনটি নির্ভর জাবে চলতে থাকে।”

শশন বেচানে আছে, সেখানে বসিও আছে। দুই বসিটুকু নিয়ে সাধনা কর। ব্যাস-হাপারা হুঙ্কারত যিঁতে সেল। সেই বসি নিয়ে এখনই যেতে উঠবে যে কোথা যিকে নজর সেবার কুরসত পাবে না। পাশ পুণ্য ভদ্র করছে কে।

বিলকুল সব উত্তম কথা। মোদা ঐ সাধনাটি কর কে? শশন বসি এ সমস্ত যেহন নির্বাণ খাঁটি বস্তু, তেমন খাঁটি বস্তু আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা আমাদের জেহাজেহি আমাদের জীবনটা নিয়ে জুয়া খেলার প্রবৃত্তি দ্বাসটুকু বতকল আছে, তখন শশনত দত্তা আদি আছে। আমি বতকল আছি ততকল আমার হক আ। দুনিয়ার সঙ্গে মোকাপাড়া করার। চুলোর বাক শশন এবং শশন-দস্তত বসি। ও সব বস্তু বস্তু ব্যাপ্তি নিয়ে পিকপাড়া খাওয়ার মত নীর সবায়ের হুচে ফেঁই সুতরাং পাশ কাটাবার চেষ্টা কলার। বললেন—“হা এখন ও সব বস্তু কথা পরমানন্দজী। এবার তো পেশী বাজি। একদিন পুণ্যে পুণ্যে তো কাটল এক রকম এখন বলুন আবার করে দেখা হচ্ছে, কোথায়—আর দেখা পার আপনার?”

“সেই কথাটাই তো বলতে চাইছি।” চোখ ক্রো লামনে কুঁকে পড়লেন পরমানন্দজী। একটা যেন ব উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত করা হচ্ছে, এই ভাবে কিংকি বসলেন—“আবার দেখা হবে আশাশুভকাল হাঁড়ি আপনাতা ঐ পদ দিয়ে কিত্তে যাবেন। কয়েক ি থাকবেন মায়ের স্থানে, সেখান থেকে কি হচ্ছে। শু সাধনা হান্দুরকে কতখানি পাকি দিতে পারে। ি শব্দকে দেখে যাবেন।”

আর একটু হোলেই আবার জড়িয়ে পড়তে বাজি ততজ্ঞানের জালে। পাকি নিয়ে কলশাকটি জোড় জোড় জিহের ঢগা সুদৃষ্টত্রে উঠিল। ঐ পাকি

একটু ভাবিয়ে দিতটাকে মাথোঁকা করে ফেললাম। একটা কিছু বলতেই হবে। ডাড়াডাউড হ'লোত কোড় করে কপালে ট্রিকের হললাম—সবই মাথের কপা। যা আবারের—সবপক্কিপন। আয়া—বার বৈকি। নিভরই ঘর। গিরে মাথের গুরুত্বের চরণগুলো নিয়ে আসব।”

“তা'হলে আর আপনাদের কট করে যেতে হবে না দেখানো।” বিধিরে উঠল আরে আয়ে পরমানন্দজীর সুধ—“ভক্ত ভক্তি ভগবান ভাঁওতা দেখতে হোসে আশ্চর্য্যের সেই বাহলা দেখই সব থেকে ভাল হ'বে। যা যা মম ন্যা করে পান জুড়ে বুক ভাঁপিয়ে কেঁসে হল সবাই, নবীয়ার নিমাইচাঁর ওয়েশে ভক্তি আর স্নেহের ঢেউ বইয়ে দিলে দেখেন। ভাসন গিরে সেই গুরুত্বের গুণের, হারুচুধু শেষে বহুগুণে। কেউ কান করতে হাবে না। ও হোসে জ্বালিয়ে আঁতুর ঘরে মানুষের হানে স্নেহ ভক্তির জোয়ার হয়ে যায়। না মশাই, ও সব চরণগুলো আর গদ্যসঙ্গীত খাওয়া—আমাদের মাথের খানে নেই। মাকে আমরা ভক্তি করি না, মাথের মাকে চোখের জলে বুক ভাঁপাই না। যা আমাদের পর মম যে মাকে খোঁসামুঁদি করে যর। মাকে বা বলতে মর, তাই হলি বিদ্যব্রজাও যিনি এসব করে'হন তিনি যা। বর চৈতন্যে ক্রমাণ্ড চৈতন্যবর, তিনিই চৈতন্যবরী জ্বননী। যা জ্বননী এ সত্ত্ব না বললেও তাঁর কিছু ঘরে না আসবে না। তাঁকে—পালী বা পালীর বেটী পালী বললেই কি আসে যায়। ছিন্ত কঠ'বর ব্যাক্য অক্ষর এই সবজ দিয়ে এমন কিছুই হানানো যায় না, বার হার মাঝে খোকানো যায়। তাই ঐ সবজ ডাকটা চাল, হোলেয়ে—না। যা যখন বা তখন ভক্তি করতে যাব কেন ভক্তিতাও যে ঐ যা। তিনিই শ্রবো বট্টা হুপা, তাঁকে ঐ সব উঠে'হয় নাওঁড়ে খোঁসামুঁদি করতে যাব কোন ধূসে? না কি খোঁসামুঁদি যাব হোসে।

দ্বারা শ্রবো বট্টা হুপা পুন্ডা পদ্য-বালিনীঃ।

অক্ষাঃ বীজ-শ্রবোঃ পালয়িতাঃ বিনাশীনাঃ।

ত্রিধা বাহ্যাব্যক্তিক অলংকারঃ মনোবর্তীঃ।

মহেশ্বরীঃ বাহ্যাব্যক্তিকঃ দর্শনভক্তঃ।

অ উ ম এই যে তিনটি মাত্রা, অ উ ম এই তিন মাত্রার সর্গব্রহ্মণ্ড ও'বীজ। ঐ যে ব্রহ্মাণি ও'বা উচ্চাল করা ধার, আর বা একবারে উচ্চারণ করা সম্ভব নয়, তাও ঐ তিনি। তিনিই ব্রহ্মাণি, তাঁর মায়া থেকে এত কণা এত ব্যাক এত নার সৃষ্টি হোলেয়ে। কাঁকেই তিনি যা, তিনি সব কিছুই যা। তাঁর কাছে হাউ মাউ করে পান পাইলেই যা কি হবে? তাঁর কাছে ভক্তির কাণ্ডা দেখাবেন কি হবে? তার চোখে চোব বড় কাঁকের কাঁধ হবে, তাঁর ঐ মায়াটি লম্বাটে কিছু জানতে চেষ্টা করলে। সেই চেষ্টা যিনি করেন, তিনিই ভাষিক, ভব ভক্তি ভাব

যভাব কিহুই তিনি পাহোকা করেন না।”

মাকে বলে চাটিয়ে বলা, চাটিয়ে বলা বলে পরমানন্দজীওর ফেললেন। তর্কাতর্কি করার প্রবৃত্তি হোল না। তর্কাতর্কি করার বুকেও পেলার না কিছু। যে যেমন যোকে, বুঝকপে। বুকে ফেলতে পারলে হাল্পাধা চুকল। আর কিছু না হোক, এক রকম ভাবে বুকে নিতে পারলে যিবা সংসারের হাত থেকে নিজার হলে। আর যিবা সংসার দেখানো নেই, সেখান থেকে নিষ্ঠা আছেই। উৎকট ভক্তির তাত্ত্বিক নিষ্ঠা আসুধ বা যোকাবুজির কলে নিষ্ঠা আসুধ, নিষ্ঠাটি আসা চাই। নিষ্ঠাই হোল শক্তি, ঐ নিষ্ঠা শক্তি প্রয়োগ করে—যে শক্তি অর্জন করা যায়—তার নার চৈতন্য শক্তি। চৈতন্য হারা বা লাভ করা যায়, তার নয় চৈতন্যমুণিনী বা। তাই যা হোসেনে আত্মার্থিক। বাবা হারাবা জ্ঞান চৈতন্য শক্তি, একটা ছাড়া আর একটা কিছুই নয়। অনেক বার অনেক রকম ভাবে ও সব শুনোঁতে, মাথিরে পুঁহিরে যিরে নিজেও কপটাতে পারি যানিকল। কিছু, তাতে কি পেল এল। যে শক্তির ভাঙ্কার জ্ঞান চৈতন্য বাবা হারাবা আভ্র হোপ পড়ে, পড়বার পরে কোনও দিকে না ভাঙ্কিরে—অভ্রিষ্ট লাভের জন্যে কেপে উঠি, সেই শক্তিরিক আরতে আনা যার কি উপায়ে? এটাকে যদি বাগ মানানো যায়, তা'হলে আর ভাবনা কি? বার জ্ঞানও আনা নেই, অভ্রিষ্ট নেই, হারাকার নেই, সে তো হারাকার হার। অভ্রাব বলতে যার কিছুই রইল না, সে কোন সাধনা করে তর্কালিক উঠাতে যাবে। কিসের সাধনা করবে সে?

করবে। তখনও সে সাধনা করবে। ভক্তিকে দু'পায়ে মাখিয়ে, ভাবের গুণের সব বিধিরে তার গুণের চড়ে বলে পরমানন্দ সাধনা করবে। সব হোল এমন বহু, যার বহু ল্পজন নেই। ল্পজনই হু সেল কোথায়, এটা জানতে হোসে পরবে ওপরেই চকতে হবে। চৈতন্য অচৈতন্যের মাঝে একটি ছোট সীকো আছে, সেটি সেগতে হবে।

পরমানন্দজী পরমানন্দ্যার দু'হাতভঃ যোকাবার অবা তৈরী হোসেন।

যাযা পড়ল। ত্রীকৈকৌলিন্দন বিদ্যে মরগাজের হুকার শোনা পেল—“জর পীয়াগর, ঐ ভাড়া দেখা ঘরন”

পরানন্দ বর, কাষ্ঠাসন হেড়ে তৎকাল্য ব্যাক্য হোয়ে হাঁড়ালার। বহুভব বহুভব আঞ্জার উঠল মাথার গুণের, মাতুলের ভগ্নার বীধা কপুকল হুরে। পালসলো নেয়ে পহুয়ে একে একে। চকল হোয়ে হুটোহুটি করছে মশাই। দক্ষিণ্ডার কোট পাখিরে ঘাড়ে।

হুরে—অনেক হুরে একটা কালো রেখা। হাঁ তাঁর—নির্বাণ এটা মাটির বরজী। মরুটো ঐখানে পৌঁছে বড় হোলেয়ে। [ক্রন্দন]

কয়েক বিনিমি

আসে হু হু করে
পীকার বড়িটার
সাকে হটা বেছে
গেছে। হাট্টা হালের
একটি গায়া।
কিছুক্ষণ আশে
দুব অব গেছে।
আকাশের এক-
কালি চাঁদের হটা
আর হাটার অসংখ্য
লাল গোপেটের
আলোর সোহাগ

এক টুকরো
সময়
ভ্রম



এই আশ্রয়ের হা
সে সে আন
পায়, তার
অন্য না আ
দায় ঐ ক
অসংখ্য, 'মিষ্ট'
জা হু হু হু
তার লক্ষ্য করে
লাল গোপেট
হু হু, আনো
জা হু হু কা
কালো ছায়াপদ
চলতে দেখে নর

আবহা অন্ধকার কিছুটা উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। রাস্তা,
কূটপাথ, পার্ক—চারিদিকেই এই শাব নীরবতার
হাওয়া। কিন্তু এই নীরবতার মধ্যেও হায়ে হায়ে হেথা
থায় হুটি হুটি হবস্ত হয়ে চলছে রাস্তা গিরে।
পার্কের বেকে, সেই আবে আলা, আবে ছায়া
ছোঁতে আবহনের মধ্যেও বসে আছে বেশ কয়েকজন
ভ্রমলোক ও ভ্রমশিলা।

লগ্নের হাইড পার্কের উত্তর-পশ্চিম কোণের একটা
দুর্লভ কলসাহের সারির পাশের বেকে বসে নর
গটসন। এই নরই দেখছিল। তার বড় ভাল লাগছিল
সোহাগের এই কাল সমষ্টি। সে মনে মনে ভাবতে
ছিল—কোন অগতির বিরাট জীবন বৃদ্ধ হাওয়া পরাভিত,
হাওয়া পরাভিত, হাওয়া অসংখ্য, তাদের জন্যই হুটি এই
সেহাগ। সোহাগের পরিভ্রমের হুটি থেকে তাদের
পরাভিত, হুটল-জরকে সোপান গম্বীর এই শুশ্রূষ।

কলসাহের সারির মাঝার উপর ঘিরে হুয়ে দেখা
দাচ্ছে হুটল-জরকে কৈবর্তিক বাতির সারি। আরও
আবার চোখে পড়ে এক অবিরাম, সীমাহীন
সাম্রাজ্যের স্রোত।

সময়ের মনের অবস্থা ভারী হাওয়া। সে যেন
তার জীবনের লক্ষ্য হাট্টায়ে কেসেছে। তার হত
অসংখ্য, বিকৃত হুটি হুটতে কেউ নেই। তাই সোহাগের

যেন মনে মনে ফিরে পায়। চলতে যে সে একেবা
একলা নয়, এ কথা জেনে তার ভারী আনন্দ হয়।

বেকের উপর, নরনের পাশে বসে আছে আরও
বৃদ্ধ ভ্রমলোক। ভ্রমলোকের শোহাগ-পরিভ্রম হুটল
ময়ের না হলেও, এটা বেশ মশকুটে হোকা হায়ে যেতি
কখনও বিলাসিতার হুটল-পরিভ্রম হুটল
ভ্রমলোক এই ভ্রমের সেই অভ্যাসেরই একজন, হা
হুটি ভ্রমের কোন কুতূহলীও শ্রুতিপাত ক
না। বৃদ্ধ হাওয়ার জন্য উঠে পড়ান। নরনে মনে
কল্পনা করে তাঁর হুটের অভ্যাস। হা তাঁর হু
অনেকা করছে। নরনে তার কল্পনার চক্রে দেখা
পায়, হাটার হুটের প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে এক
তাঁর প্রতি ভ্রমের হুট করে। বৃদ্ধের কাল সে
আরও যেন কালতর হয়ে পড়েছে।

কিন্তু নরনের কল্পনার সবচেয়ে এইখানেই গম্বীর হা
কাল, বৃদ্ধ ভ্রমলোকের কালো শোহাগে ঢাকা হুটি
অন্ধকারের ভিতরে মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ
অসংখ্য ভ্রমলোক এসে বসে পড়ে বেকের উপর
হুটের পরে বেশ হাওয়া শোহাগ; কিন্তু তার হাওয়া
অবস্থা হায়ে ঐ আশ্রয় বৃদ্ধের হুটই। হাওয়া অগতির
যে এককোণে তার বিহুটে বহন করে বহে সেটা হে
মশকুটের বোঝাঘার—কোনো বৃদ্ধ বেশ ছোয়া

হু-একটা হত্যাশাসন" হনোভার প্রকাশ করলেন।

দুবকের নিসেহার অবস্থা তার হু-শিগগির করবার এই চেষ্টা শেষে নর্থান ভিজ্ঞাশ করে, "আপনাকে বড় বিরক্ত বলে মনে হচ্ছে?"

দুবকটি ভৎক্ষাণ তার দিকে ফিরে বললে "আজ্ঞে, আমার মত অবস্থায় পড়লে আপনিও বিরক্ত না হয়ে পারতেন না। উঃ! কি বোকারই করোছি।" নর্থান বেশ উৎসাহভাবে উত্তর দেয়, "তাই মাঝি? কেন?"

আর মশাই, আজ বিকালে লণ্ডন টেনশনে মেয়ে সেবান থেকে বার্কসমার হোমার-এ পোর্সি সেবানকার স্টোপম্যান হোটেল গারবো বলে। ওমা! গিরে লেখ, কোথায় হোটেল, কোথায় কি! সেখানে এখন দাঁড়িয়ে রয়েছে এক বিরাট সিনেমা। তখন আর কি করি, ট্যান্ডি ভাইচারের পরামর্শে গিরে উঠলান আর একটা হোটেল। সেখানে গিয়েই আমার ঠিকানাটা দিবে বাড়ীতে একটা চিঠি লিখে দিবে বেরিয়ে পড়লান একটা সাবান কিনতে। সঙ্গে সাবান আনতে সেহলান ভুলে, আর হোটেলের সাবান ব্যবহার করা আমি পছন্দ করি না। তারপর সাবান কিনে, একটু এদিক ওদিক ঘুরে, এক গোলান ঠাণ্ডা দরদর খেয়ে ঘন হোটেল গিয়ে পড়লো, তখন হঠাৎ খেয়াল হলো যে, হোটেলের নামটা ত আমার মনে নেই। এমন কি কোন রাজার সেটা, তাও খেয়াল নেই। নিসেহার, নিরুদন এই লণ্ডনে বসে, কি অবস্থা! অবশ্য বাড়ীতে তার করলে, তারা আমার ঠিকানাটা পাঠাতে পারে। কিন্তু, তারাও কাল দকালের আগে আমার চিঠি পারে না। এদিকে পকেটে একটি হু-পেনি ছাড়া কিছুই নেই। বা বিবে বেরিয়েছিলাম দই সাবান কিনতে আর সন্ধ্যা বেতে থক হয়ে সেয়ে। আর- তা ছাড়া এই রাজিতে ঘাই বা কোথায়?"

দুবকের এই অস্থিত মল শেষ হওয়ার পর কিছুকাল চাটখিবে আর কিছু শোনা গেল না। সে হঠাৎ আবার একটু বিরক্তভাবে বলে উঠলো, "আপনি ভাবছেন আমি বা বললাম তা একেবারেই অসম্ভব।"

"না, না,। বোটেই অসম্ভব না," তাকাতাড়ি বলে উঠে নর্থান। "আমার মনে পড়ে একবার এক বিশেষ

আবারও ঠিক এই অবস্থা হয়েছিল। অবশ্য সেবারে আমার সঙ্গে আমার এক বন্ধুও ছিল। সেথাকাসে, সৌভাগ্যক্রমে আমাদের মনে পড়লো যে আমাদের হোটেলটা ছিল একটা খালের বায়ে। তখন সেই খাল খুঁজে বার করে তবে হোটেল ঘাই।"

দুবক তার হত্যাশাসন মতো যেন এক কীপ আশার আলোক দেখতে পার। সে বেশ উৎসাহিত হয়ে বলতে আরম্ভ করে, "বিশেষী দরদর হলে আমি কিছু ভাবতাম না। কারণ, সেখানে নিজেদের কন্যাদের কাছে সেলেই সাহায্য পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে নিজের মনে এই রকম অবস্থায় পড়লে কেউ সেখবার নেই। এখন যদি কোন দল্লব ভদ্রলোক আমার কথা বিশ্বাস করে, আমাকে কিছু টাকা বার না দেন, তা'হলে আমাকে এই বারের উপরই রাত কাটাতে হবে। আমি দতাই আশঙ্কিত হয়েছি যে, আপনি আমাকে অবিশ্বাস করেন নি।"

শেষের মতবাটা সে এত ভোর গিয়ে, যাতে মনে হয় যে, তার অনুমানে নর্থানের পক্ষে অবশিষ্ট সম্ভবতাত্ত্বিকও অস্তাব হয়ে না।

নর্থান একটু গম্ভীরভাবে বলে, "অবশ্য আপনার কাছিন্দর মধ্যে সবচেয়ে বড় ফাঁকি হচ্ছে যে, আপনি সাবানটি দেখাতে পারছেন না।"

দুবকটি লামনের দিকে ঝুঁকে তার কোটের পকেট হুটো বেশ ভাল করে হাতড়ে দেখলো। তারপরই সে একলাকে উঠে দাঁড়ায়।

"সেটা নিজের কোশও পড়ে গেছে" বেশ বিরক্তির সঙ্গে বলে ওঠে সে।

"একই" লম্বা নিষের হোটেল জবার সাবান হারানো মানে, ইচ্ছাকৃতঃ অবনোযোগিতা," বলে উঠে নর্থান। কিন্তু, দুবকটি ভৎক্ষণে আর তার মতবা পোষবার অন্য সেখানে দাঁড়িয়ে নেই। সে বেশ হুত-পাভতে হাড়া হয়ে বৌকি থেকে এসেছিল, সেইদিকেই চলে গেল।

"হা রে!" ভাবতে থাকে নর্থান, "একটা সাবান্য নিষের অলতক'ভার মধ্যে তাকে শেষ পর্যন্ত হু-পেনি পেতে হলো। ও যদি বুদ্ধি করে একটা সাবান্য কাগজে ঘুড়ে

পকেটে নিয়ে আসতো, তা'হলে ও খাচ্ ওর নিজের বাবদায় একজন প্রতিভাশালী বলে খ্যাতিলাভ করতো। অবশ্য ওর ঐ বিশেষ বাবদায় প্রতিভাশালী হতে হলে অসাধারণ সতর্কতার প্রয়োজন।

এই কথা ভাবতে ভাবতে নর'ন উঠে ধাঁড়ার ঘাঘর জন্মে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তার মূখ দিয়ে বেরিয়ে যাবে একটা বিষয়ের বাণী। বেকের নীচে মাটিতে পড়ে রয়েছে পাতলা কাপড়ে মোড়া একটুকরো সাবান। এটা নিচর ঐ বাকের কোটের পকেট থেকে পড়ে গেছে, যখন সে বেকে এসে বসে।

পরমুহুর্তেই নর'নকে দেখা যায়, হতভম্ব হয়ে সে চলেছে গোবর্ধনের আবহা আঁবারে ঢাকা রাস্তা দিয়ে, একটি হালকা হুং-এর গুডারকোট পরা বাকের সম্মুখে। নর'ন যখন ঘ্রাণ হতভম্ব হয়ে পড়েছে, তখন হঠাৎ সে দেখতে পায় তার অনুসন্ধানের বস্তুটিকে। নাইটসব্রীজের দিকে যাবে, না পাকে' কিরে যাবে, কিছুই ঠিক করতে না পেরে ধাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ধারে। নর'নকে তাকে ভাবতে শুনে বাকটি হঠাৎ স্তম্ভিত হয়ে দূরে ধাঁড়ায়।

হাতের ওপর সাবানের টুকরোটা রেখে নর'ন বলে, "আপনার কাহিনীর মূখা সাক্ষীর সম্মান পাওয়া গেছে। এটা নিচর আপনার পকেট থেকে পড়েগেছলো। আপনি চলে আসার পর আমি এটাকে কেঁতে পাই। আপনি নিচর আনাকে আপনার কথা অবিশ্বাস করার জন্য কমা করবেন। এখন আমি আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। এই সত্যেনটি যদি আপনার কোন কার্ষে পার্শ্ব..."

দুবক তৎক্ষণাৎ সফল সফেচ মূখ করলে, সেটা তাড়াতাড়ি পকেটে পুরে।

এই দিন আবার কার্ড ওতে আবার ঠিকানা আছে। এই পস্তাহের মধ্যে যে কোন সময়ে টাকটা কেবল নিলেই চলবে। আর এই দিন আপনার সাবান। দেখবেন ওটা আবার হারাবেন না। ওটা আপনার একটি মূল্যবান বস্তু।"

"জাগ্রাস এটা আপনি পেয়েছিলেন, নয় ত..... দুবকের গলার কি যেন অটকে মেল। সে কোন রকমে একটা খবাবাদ প্রকাশ করেই নাইটসব্রীজের দিকে হুত পলাতন করল।

"হারে দুবক। একেবারে ভেগে পড়েছিল।" নিজের মনকে বলতে থাকে নর'ন। "আজক' নয়, ওর এই অসহায় অবস্থা থেকে হঠাৎ রেহাই পেয়ে নিচর মূখ আনন্দ হয়েছে। হাক, এই পিন্ডা হ'লো। ভাবিয়াতে আর কখনও বাহিরের চেহারাটা দেখেই কোন বিষয়ে অতি চালাকের মত একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতো না।"

নর'ন পাকে'র ভিতর কিরে সেই বেকের গাননে দিরে কিরে যেতে যেতে দেখতে পায় এক বৃদ্ধ ভরলোক বেকের উপরে নীচে চারিরিকে কি যেন বৃদ্ধছেন। সে তৎক্ষণাৎ চিনতে পারে সেই বৃদ্ধকে যে মর'এবর তার পাশে বেকে বসেছিল। "আপনার কিছু হারিয়েছে না কি?" সে কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে বৃদ্ধকে।

"আজ, হ্যাঁ একটুকরো সাবান।" •

(মোগল যুগে ভারতবর্ষের
ব্যক্তির থেকে অনেক
বিদেশী স্বর্ণ-রত্ন প্রদর্শনকারী
এল এলেন এসে এখানকার
সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক ও
রাজনৈতিক অবস্থার কথা
বিশদ ভাবে বর্ণনা করে

টাকারলীম্বারের ভ্রমণ ও সত্যদাহন বর্ণনা

সমীরকুমার গজোপাধ্যায়

গেছেন। তাঁদের বিবরণগুলি ইউরোপে পড়ার
উৎসাহের সঙ্গে পড়া হয়, এবং তারতন্যবোধের মনোবল
ও নানা কাহিনী আত্মবিক্রিত হয়ে তাদের মনে অকৃতপূর্ব
চোখোপনার সঞ্চার করেছে।

ঊরুগোবেদ সময় এক বসি কহানী বদিক তারতন্যবোধ
এসেছিলেন। তাঁর নাম মী। ব্যাপটিষ্ট টাকারলীম্বারের বীর
ব্রহ্মণ কাহিনী আত্মা বহু জন্মভিত্তে আমনের ও
কৌতূহলের সৃষ্টি করে। তাঁর ছিল অত্যন্ত সুকৃতিপূর্ব
হল ও প্রাণের স্বাভাবিক। সমসাময়িক তারতন্যবোধের ওজন
ও ব্যাপকতা দেখে শুক করে বীরে বীরে নানান বর্ণনায়
বহা, পড়ার বনানী ও কর্তব্যের স্বাভাবিকতা বহা দিয়ে,
তিনি আমনের কৌতূহলী মনকে মোগল রাজসভার
বৈলাস জড়বোধের মধ্যে নিয়ে আসেন। দুই পটভূমিক
জুড়ে পূর্বের তারতন্য বিলাস ঐশ্বর্য ও কাহিনীর সঙ্গে
আমনের পরিচয় হয়। তাঁর লেখনীর মধ্যে ঐতি-
হাসিকের অতুলনিত্য ও সমালোচক মনোভাবের এক
মুগ্ধ বিবরণ বোঝা যায়। তাকাকী একটা দৃশ্য রসবোধ
এবং সর্বোপরি সমসাময়িক কল্পিত মানব মনের বিলাসভা-
সার অসুখ বহনকে ব্রহ্ম-ইতিহাসের সাহিত্যে তির্যকালীন
লক্ষণে পরিণত করেছে। মোগল রাজবংশের উজ্জ্বল ও
চলিত্যের মধ্যে, রাজনীতির কুটিল বক্র পটভূমিতে, কারো
বৈলাসভা, সুখের অস্ত্র বিনাশে, পুলিশপত্নের
ক্লিষ্টতা, অসুখ, ও কতিপয়ের বৈব তন্ত্রিত, এবং
মোগল রাজসভার বিলাস-বর্ণনার তাঁর কল্পনাত-
বর্ণন বীকৃত।

দীর্ঘকাল মোগল ইম্পেরাল স্ট্রীট থেকে তাঁর বর্ণনা
আলো স্বতন্ত্র করে ওঠে। দীর্ঘকাল নিয়ে তিনি

অনেকগুলি অধ্যায় রচনা
করেছেন। 'তাকাকী তাঁর
ব্যবসায়ী মন থেকে সর্বত্র
বাবলা বাবিকোর প্রত্যক্ষণের
এটি একটা পতীর উৎস্রু-
তি নিয়ে আলোচনা করেছে।
চাল, মাখন, মাংস, মুরগী,

মহা, মসী, কুল ইত্যাদির বিস্তারিত অধ্যয়ন প্রাচীন ও
মুসলমান বিশ্বাস করেছেন।

মোগল রাজসভার তিনি একাধিকবার অধ্যয়নিত
করেছিলেন। কিন্তু নিজের বুদ্ধিমত্তার বলে কখনো বৈব
হাবানি নি। স্বয়ং সত্যট নাকি তাঁকে স্বাভাবিকতার চেতনা-
মুখের ব্যবহার পদ্ধতির ক্লিষ্টতা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন।
কিন্তু পৌরসভার ও মোগলবাদের বিস্তারিত তিনি প্রচুর
জ্ঞান আনিতেছেন। স্বয়ং তাঁর লেখনীর মধ্যে প্রচুর
অভিপ্রয়োজিত রয়েছে তবুও কোন কোন লেখক মনে করে
যে, তাঁর মত মতান্তর স্বাভাবিক ও কৌতূহলী লেখনীর
পক্ষে তারতন্য ব্যবহার-বিবির অস্বাভাবিক বিস্তারিত সঙ্ঘ-
নয়। বিশেষ করে সত্যদাহন সম্পর্কে তাঁর রচনাগুলি
অত্যন্ত চিত্তকর্ষণ। পরবর্তী বিদেশী লেখকের কাছ থেকেও
গ্রিক এমনতর-ই বর্ণনা আমরা পেয়েছি। বহুত পক্ষে
সমাজ বিবর্তনের ও সত্যদাহন ইতিহাসে আমরা শুধুও
অনেক পিছিয়ে পড়েছিলাম, বিশেষ করে হিন্দু কুলভা-
স ও অর্থ মনোভাবের পরিচয় তো আমরা এটি পথেই
পেয়েছি।

প্যারীসে ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে টাকারলীম্বারের জন্মগ্রহণ করেন।
তাঁর শিখা প্যারীসে টাকারলীম্বারের ভৌগোলিক জ্ঞান ও
দায়ের চিত্র বিশ্লেষণ ছিলেন। শিখার কাছ থেকে
প্রথমে ব্রহ্মণ বোঝা তিনি পেয়েছিলেন, বাইশ বছর বয়সের
মধ্যেই তিনি ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, কাহিনী, সুইডেনল্যান্ড,
পোল্যান্ড, ও ইটালি ঘুরে এসেছিলেন।

পূর্ব সঙ্কে তিনি ছ'বার পাড়ি ঘিরেছিলেন। প্রথম
বারে, ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে, আলেক্সা, আলেক্সান্দ্রিয়া, মাদ্রাস,
পারস্য এবং কুর্দীর ভিত্তিম পথ তিনি অতিক্রম করেন।

১৬৯৮ সালের দ্বিতীয় স্বাক্ষর মেসেজ, বন্ডোয়া, পিরাঙ্ক হয়ে ইক্সাহানে উপস্থিত হলেন। সেখান থেকে দশ বৎসর ভারতবর্ষে 'ডি'র আকস্মিক ঘর্ষণে তিনি স্পর্শ করলেন। এবারকার সাক্ষর দুবাট, আত্রা, গোয়া, পোলকুতা, ঢাকা ইত্যাদি তার হস্তা ছিল। ১৬৯০ এ তৃতীয় পর্বে আবার বাংলা বেগম যথা পঞ্চম তার ভ্রমণ সমাধা হয়েছিল। সেখান থেকে মালাবারের কুলে তিনি নৌযাত্রা করেছিলেন। পরে তৃতীয় তার নিষ্পত্তি হয়। কিন্তু তিনি সিংহলে উপস্থিত হতে পারেননি। সেখান থেকে দুবাত্তা ও আত্রা হয়ে, উত্তরাংশ-অন্তরীপ ও সেন্ট জেলেনা দিয়ে দ্বারাও যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৭০১ সালের চতুর্থ ভ্রমণে বন্দে আকাস থেকে ভারতবর্ষের পূর্বকূলগামী পোলকুতা থেকে একটি কাছাকাছি হুদে মালি-ল্টটনে এসে উপস্থিত হন। পরে গুজরাট, উরাকাবাদ পোলকুতা ও দুবাটে আসেন। ১৬৯৭ সালের পঞ্চম স্বাক্ষর ইক্সাহান হয়ে মালি-ল্টটনে এসে ভ্রমণে প্রবাহিত হন এবং যথা ভারতের বিভিন্নস্থান ভ্রমণ করেন। বিবাহের পর ১৬৯২ সালে তার শেষ ভ্রমণে ভারতবর্ষে ও পারস্যে পাঁচ বছর তিনি কাটিয়েছিলেন। ১৬৭৫ সালে তার বই Nouvelle Relation du Serrail du Grand Signior প্রকাশিত হয়। পরেও বছর তার বিব্যাগ ভ্রমণকাহিনী Six Voyages ছেলে বেতোর। 'মহুমান করা হয় ১৬৯৬ সালে তাকে বাস্তব কারাগারে আশ্রয় করা হয়। এবং পুনঃ মুক্তকৃত: ১৬৯০ সালে তার মুক্ত্য হয়।

সপ্তদশ শতকের শেষার্ধ্বে 'বে-সন' ইউরোপীয় ভ্রমণ-কাহীর হল ভারতবর্ষে এমেলিলেন তাঁদের মধ্যে টাভার নীর, কীসোরা বাগীর, পে কী বীকেলো, জম ম'বিন, কেরী, ফ্রাঁস, এবং মনোচীর নাম সমগ্র প্রসিদ্ধ। জ্ঞানের একজন ইংরেজ চিকিৎসক এবং নানোচী ভ্রমণিকের চিকিৎসক ছিলেন এবং উরাকাবাদের দ্বিতীয় পুত্র মোরাকোফের বন্ধু ছিলেন। বাকি সকলেই প্রায় সপ্তদশমিক ছিলেন।

টাভারনীরের প্রাপ্তে আগর তাত্বিক নিয়ে মতভেদ আছে। অর্ডে (Orme) র মতে ১৬৭২ এবং ডাক্তার বলের (Dr. Ball) মতে ১৬৭১ সালে তিনি দ্বিপ্রথম দুবাটে আসেন। অধ্যাপক জোরট (Joret) মনে করেন

১৬৭২-এর শেষে ইক্সাহান প্রাপ্ত করে ঢাকাতে ১৬৭৩, এবং আত্রাতে ১৬৭৪-৮১ এ তিনি আগমন করেছিলেন। বার্ষিক ১৬৭৭ সালে দুবাটে আসেন। তিনি চিকিৎসক ছিলেন এবং পাঠ্যক্রমের বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর বই History of the late Revolution of the Dominions of the Great Mogul এ আগর পাঠ্যক্রমের ও উরাকাবাদের আশ্রয় আভ্যন্তরীণ অবস্থা ব্যবসা, বাণিজ্য, উৎপন্ন পল্যাখি, জর্জ, লেনসেন, বাংবাচন ইত্যাদির বিশেষ বর্ণনা পাই। কিন্তু টাভারনীর জৈনিক দৃষ্টিতে মত উৎকর্ষ বেশি হলেও রাজনৈতিক আলোচনার ততটা যথেষ্ট পারেননি। তাঁর রাজনৈতিক তথ্যগুলি প্রায়ই একপেশারী ও অতি প্রচলিত বর্ণনা কখনো বা অশ্রুত নীসে। অনেক সময়ে তাঁর গল্পের ওপর ভিত্তি করার জন্যে বিব্রত ও অসন্তোষও উদ্ভব হয়েছে। যেমন পাঠ্যক্রম ও তাঁর পত্নী জাহানারা-প্রসঙ্গে তিনি যথুবা করেছেন: "But Begum, Saheb, (Jahanara) his (Shajahan's) eldest daughter never forsook him, throwing herself at his feet, and by virtue of that Criminal power which she had over him, as being both his daughter and his wife, kept him from using that extremity, more out of a design to preserve the jewel for herself, than for her brother (Aurenzib), to whom she had always been a mortal enemy." (p. 283)

বাণিজ্যে পাঠ্যক্রমের কাছে অনেক দিন কাটিয়ে ছিলেন, কিন্তু তাঁর বর্ণনার একমাত্র কোন আভাস নেই। বাণিজ্যের রাজনৈতিক ঘটনা বিবরণে যে হস্ততা দেখিয়ে ছিলেন, তা টাভারনীরের মধ্যে পাই না। অনেক মনে করেন যে তিনি বাণিজ্যের কাছে থেকেই রাজনৈতিক ঘটনাবলি শুধু বর্ণনা করেছিলেন:

"Probably he heard the details from Bernier when they were travelling together from Agra towards Bengal in November, 1665" (Jolm Philips: Tavernier's Travels in India: p. x) টাভার বলেন মতভেদ এই যে লগার

সময়গণের দৃঢ় তাঁর সপনীর ভাষার অন্তর হয়ে আছে। শাসন কর্তার অজ্ঞা লাভবা মাত্র সমস্ত মণীষের নীতবান্ধ অসিত হতে থাকে। বড় বড় কঠক কঠোরের লবে কণা বসি হবার উপক্রম হয়। যেন একটা বীতংস বৃত্তের আগে মরকটী উল্লাস। 'সন্তী'র বড় ও আত্মীয়তা তার কাছে এসে তার পারলৌকিক জীবনের ভগ্নে অতি-কন জ্ঞানন বরে যেত। যেন তার সন্তীষের ভগ্নে তার নিভের ভেগীরও একটা হিটাই মধাটা হয়ে, সে কথা তাকে যোগ্যনা হোতো। তাকে নতুন পট্টবাস শোভিত করা হয়, যেন সে তার বিহার সত্যক থাকে। ইতিমধ্যে তাকে কান মারক জলে প্রায় অচেতন করে রাখা হয়েছে। তারপর বহুভার ও অজ্ঞানা স্ত্রীলোকের সীতের কলরবে মিল্কী পদমার মেয়েটিকে তার বৃত্ত দ্বারীর লবে লগে অবতঃ অন্য কোথাও যৌব আন্তরিক হওয়া নিক্ষেপ করা হোত। এমনি কয়েই সেদিনের সমাজের ভগ্নলোভা। যাত্রের হেঁচাই দিয়ে গৈল ভিক উল্লাসে তাকে জিহাং-মনোমুগি মেটোত। এর মধ্যে আবার হামিকটা প্রাণিঃযোগ ও পুত্রপত্নদের যেত। চাঁতাবনীরের মন্থতা সবচেয়ে :

"...all the bracelets as well about their legs as their arms, the pendants in their ears, their rings sometimes of gold, sometimes of silver (for the poor wear only copper and tin) all these belong to the Brahmins, who take for them among the ashes when the party is burned." (p. 408)

সময়গণের তিনটি হিট হিট লভ্যভারও তিন টোপে করেছেন। গজরাট, আড়া ও দিল্লী পর্বত, সমস্তরও ভগ্নে সাধাভগ্ন কোন নলী অবধা পুত্রের পাশে একটা কুঁড়ে বসে বসি করা হত বারো কুঁট অবধি ভাঁচু করে। এই বসটিতে দর্ভা হাঙ্ক হেস লাগান হত। সমস্তরওকে মাঝখানে অবধি লোভা বলা করে একটা কাঠের গুঁড়ির লগে তাকে আটাইপুটে বাঁধা হত। এ কাঙ্ক পুত্ররাই করত। বৃত্ত দ্বারীকে কাঙ্ক ওপর ওইয়ে দিয়ে বরে আন্তন লাগানো হত। মেয়েটি সুপুত্রি চিনাতো, বলা হয়েছে, অজ্ঞা মারকবোত তার সমস্ত

সে-মন-ভবন, অর্থবৃত্ত। এই আন্তরিক ওপর মজুন করে লাভ লম্বা মিক্ষেপ করা হত। তার লবে মেয়েটি পুড়ে গেলে "the Brahmins search the ashes for all her bracelets, pendant and rings, wheather gold, silver, copper or tin, which is all free booty to them selves." (p. 409) বরে বার এ বিহারের উল্লাসে হরতো লেখকের তখনকার সমাজ ব্যাংক্যর প্রতি হুবা-ই প্রকাশ পাচ্ছে। আন্তরিক বিনে কতি সাংবেণ পণ্ডী লোকেবাই যা করতো। শিটরে ভেঁটে তখনকার নিমনি বিলাসিগুণা অমাত্যালেই তা করত পাংগুন।

বাংলা দেশের প্রতি তাঁর দুশাটা যেন বেশি। এখানে নিতান্তই হিট না হলে বৃত্তদ্বারীকে লগার পান করতে পারতো না তখনকার মালীরা। নতুবা প্রায় সকল লবই নাকি সংগার পড়িত্য করা হত। একটা মেয়ে কুঁড়িহিঁদ নায়ে হোটে জলুক অবস্থার সংগার তার দ্বারীর পলিত কুঁড়িহিঁদ লবটী লগিত্যর করবার ভগ্নে এনেছিল। তারপর মিলে পান করে বীর লাভ চিত্তে চিত্তার গিয়ে বসলো যেন মিলের লগাতেই বসে আছে। কণ-পটী-বিহরক চাক চোল বুল পেটানোর মধ্যেই তার আত্মীয়তা কেউ ভকে একটা চিঠি, কেউ কাপড়ের টুকরো, কেউ জপো, কেউ হামা দিয়ে তারের বৃত্ত আত্মীয়গণে লুল পৌছে ফেবাব ভগ্নে অমৃত্যোণ করলো। তখন মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলো আরো কাকর কিছু ফেবাব আছে নাকি। যখন সকলেই নিরুত্তর হোলো, তখন তাকে তার দ্বারীর লবে লগে এক সকে বাঁধা হল, এ কাঙ্ক পুত্র ও আত্মীয়রাই করলো অগণ, তারপর আন্তন গিরে পেঙা চল। অনেক সময় কাঠের অগ্রাচুয়ে ভগ্নে অর্থক কলপ চিত্তকার করা অলর হ মেয়েটিকে লগার কোলে পেঙা হত, যাতে কুঁড়ীতে তাকে খেয়ে ফেলতে পারে। আন্তরিক ভেগীর খেকে ছুটে বেরিয়ে আসা প্রাণভরে উদ্ভাষিনীকে কোর করে আবার আন্তনে ঠেলে ফেলে দেঙা হো। চায়েবাট বটো এই লবার পেছনেই কিছু পায়ে বিনুত লোবাই ছিল।

চাঁতাবনীর এই প্রসঙ্গে বাংলা দেশের আরো একটা অবস্থ বিহারের বর্ণনা দিয়েছেন। যদি শোম লিঙ্ক সাত্তন পান করত না চাইত, তাহলে তাকে বৃত্ত প্রেত পেয়ে

বলে যেন ক'ব' যায়। তবে বাইরে তাঁর সাজের ভালে ভালেই বাহ্যিক সাজের সাজে সাজে, যেন তার গুণ বাস্তবিক বিহীন কিন্তু পণ্ডিত বলাইবা। বলে কাক ভুলেই আসবার শিঙটকে ঝুঁকায় ঝুঁকায় লম্বন করতো। প্রায়ই তার চোখ ছুটি উপড়ে নিতো। সেই ক্ষেত্রেই, তাঁর মতে বাংলা দেশে এত অন্ধ ব্যক্তি খুব দেখা যায়। সত্যের সম্মুখীন হলে একবার হাতুস্তন দেবার চেষ্টা করা হয়। অসম্মত শিক্তি যদি তখনো তা গ্রহণ না করতো তখন আবার তাকে সেই ভাবগত তিন তিন, তিন তিন পথ দ্বারা হয়। 'তবেও যদি শিক্তি না মনে এল তখন না পান করতো'। তখন তাকে 'সর্ব সৎসংকীর্ণ' গংগায় অবতারণা পুঙ্খানুপুঙ্খ মিশ্রিত না করলে উপায় ছিল না। অনেক সময়ে নাকি বাঁহরাত এই সব শিক্তির কাক ভুলেই হাত থেকে বাঁচিয়েছে, শোনা যায়। আর যখন প্রেম বলে পুণ্য করা হয় এমন সব উত্তেজিত হওয়া যে প্রেমই এই সব হস্তসঙ্গ শিক্তির উত্তর করত। অশিক্ষিত ও মুগ্ধতার মাজেই যে কতকাল শিলাচ করে তোলে, এর চেয়ে ভাল প্রতিবেদন আর কি হতে পারে?

করমগুল উপকূলে কুতোর এক ককেন্দ্র সম্বন্ধেই পত্রিকার কথা টাভারনীর বর্ণনা দিয়েছেন। সেখানে নাকি মাটিতে প্রায় চন্দ্রকূট পতীক এবং প্রায় ত্রিশকূট চওড়া গর্ত করে নানা প্রকার হাড় তেল ও অস্ত্রাঙ্গ লগাও দিয়ে তার কাঠ সাজানো হয়। এখন আগুন খুব জ্বলছে তবুও জলে উঠতো তখন মৃত ব্যক্তিকে তার মাঝে ভরে দেওয়া হয়। বিধবা নাকি বুড়া ভক্তিতে সেখানে বীতে বীতে আসতো। বুণে মাঝতে, তার দুপুর। কিন্তু আলো যেন সব হারিয়েছিল। হাতা অচেতন করা দেহটা আত্মীয় বন্ধনো প্রায় স্থগিত হয়ে আসতো। লৈলায়িকভাবে মংসবস্তুর উৎসবের বস চাক চোল থেকে উঠতো। যেহেতু নাকি এই অস্ত্রকূলের চারপাশে জিন্নার প্রকল্পিত করতো, অথবা তাকে করানো হয়। এবং প্রতিবারই সে নাকি আত্মীয়ের হৃদয় করতো। তারপর তার কাবীর পথের গলে তাকে ভাল করে বেঁধে

পুঙ্খানুপুঙ্খ তাকে ধোলে কেলে বিত সেই লেলিহান অগ্নি-শিখার মধ্যে। যেন সত্যী সত্যী পাশাপাশি প্রবেশ করলেন। অসম্মত হস্তগাণী করণ আত্মনা পুঙ্খ করে দেবার আগে চাক চোল আরো বীতলভাবে হাতে হাতে এবং বেগি করে হাড় লগাও সেই অস্ত্রকূলে মিশ্রিত হয়। করমগুলের প্রায় পর্বত কিছু সত্যের জীবন কবর দেবার পদ্ধতি চালু ছিল। টাভারনীর বলেছেন বাংলায় অকলে গর্ত খুঁড়ে জীবন কবর দেবার পর মাটি ভাল করে সমান করে দেওয়া হতো, তারপর আত্মপুণ্যেরিকার, "...jump and dance upon it till they believe the woman to be stifled" (p. 412)

করমগুল আরো একটি কবর ও অস্ত্র ব্যবহার করা তিনি বর্ণনা দিয়েছেন। মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে গংগায় নিয়ে পাওয়া বাংলা দেশে প্রচলিত ছিল, সে কথা অনেকেরই জানেন। করমগুল উপকূলে দুপুর ব্যক্তিকে অনেক সময় মলী বা পুঙ্খের কাছে মা নিয়ে দিয়ে খুব ছোট্ট পাতীর কাছে হাটরা হয়। সেখানে লোকটিকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে পাতীটির লাগ লাগ করে তাকে গুণে ঘরবার চেষ্টা করতেই সে ভরে প্রসার করতো। এবং সেই প্রক্রিয়ায় দুপুর নাকি শুভ হয়। কিন্তু যদি সে মৃত্যুতর্ক না খেত তখন সে হস্তসঙ্গাটিক-জীবন পুঙ্খের দেওয়া ছাড়া আর নাকি কোন উপায় ছিল না, যদিও তাতে তার আত্মীয় বন্ধনো যথেষ্ট দুঃখ পেত।

টাভারনীর বর্ণনা থেকে তারতীয় সমাজচিত্রের মত একটি চিত্র এই প্রথমে আমরা আন্দোলন করেছি। তিনি কিছু নানা বিষয়ের অবতারণা করেছেন। হস্ত ও তাঁর সমস্ত বর্ণনা সত্য নয়, এবং অনেক পরিমাণে অতিরিক্ত তবুও এতজন বিশেষীর চোখে তারতীয়ের সামাজিক রীতনী এবং সুসংস্কারগুলি এত দুপুর ভাবে কুটে উঠছে, যে তা অস্বীকার করা চলে না। আবার সমাজের একটা দুর্গমের চিত্র যে ছিল তা অস্বীকার এবং তা আবারও তৎকালীন পরিণতি বাক্য সমাজ ব্যবহারই পণ্ডিতের ঘে।



খাড়ে হাত রেখে ইশারা
বলল, চলো ।

নিশানাথ আছে আছে বেরিয়ে
এল । টানা ব্যাংকার ভ্যান্ডিতক
ছায়া পড়েছিল । নিশানাথ যেন
দাবার হকের ওপর পা কেলে
কেলে লম্বাখিঁড়ের মতো রাত্তার
নাবল ।

আর ডাকতে ডাকতে ধুর
থেকে কতগুলো কুহুর সৌড়ে
এল । নিশানাথের পায়ের কাছে
হারকর মাটি শুঁকে আবার
চিৎকার করে সৌড়ে চলে গেল ।
নিশুভ রাত্তার ঘুমের বেলাস-

গুলিতে সেই ভাবার চিৎকার এক ঝাঁক তাঁয়ের মতো
প্রতিহত হয়ে নিশানাথের চারদিকে ছিটকে পড়ল ।

তারপর বড় রাত । কতগুলো লোক গাইতি
দিয়ে টান লাইনের বানিকটা শুঁড়ে ফেলিয়ে ।
দাঁতে গিঁত চোপে একজন একটা মলের নুঁখ লাইনের
ওপর রয়েছে আর নীল হলুদ মাংস বিচিত্র বর্ণের আগুন
জ্বালাটাকে ভৌতিক আলোয় উজ্জ্বলিত করে ইশাভের
টান লাইনকে পুড়িয়ে গালিয়ে দিচ্ছে । হাতুড়ি আর
ছোঁর লংঘাতে মাঝে মাঝে একটা অলৌকিক শব্দ, যেন
ঘণ্টা বাজছে । লোকগুলোর একজন নিশানাথকে
দেখিয়ে কি বলল, বাকি কখন যা যা করে ছেলে উঠল ।

কুটপাত ঘরে এসোতে লাগল । পাড়ি-ব্যাপার
তলায়, এমন কি বোলা আকাশের নিচে চাক বেঁধে বেঁধে
মানুষ শূরে আছে । গায়ে বাধার বা শেরেছে জড়িয়ে
শূরে আছে । কে একজন নিশানাথকে দেখে উঠে বসল ।
তারপর উদাসীন অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে
হইল ।

নিশানাথ ডান হাতে বাঁক নিল । সরু রাস্তা, আলো
কম, মানুষ নেই । আবার একরকম কুহুর কোথা থেকে
সৌড়ে এসে নিশানাথকে অনুশরণ করতে লাগল আর
মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ বিলম্বিত শূরে ডেকে উঠে আমল



গিলিঙ্গ নথ্য বালিকারি

গজন ঠাকুরের সিঁড়ি

হাঁরকাঘাতে সেই নৈশ গলিটার জলপাতে ক্ষত দৃষ্টি
করল ।

তারপর বাড়িগুলো আরও কাছে কাছে সরে এল ।
রাস্তাটা আরও সরু হল । দুটো মানুষ পাশাপাশি
হটিতে পারে না । এই পল্টুকু সিনেটের এবং সর্বত্র
মলমা হুড়ানো । যেন একটা ব্যতির উঠোন । বাড়িগুলি
কাঁপ, হুঁলে পড়ে যাবে মনে হয় । আর অন্ধকার ।
যানিক গিয়েই রাস্তাটা বন্ধের মতো বোঁকে গেছে ।

সেই বাকের নুঁখে প্রসন্ন একটা জানাণার ।
এ গলির পক্ষে অজ্ঞাতানিত, বোনান । নিশানাথ
ভেতরে ঢুকল । দৃষ্ণ শব্দাধারের মতো লম্বা চৌরাস্তা ।
জল প্রায় নেই । তার ইচ্ছে হল মেনে চাপ করে শূরে
থাকে । ভাবতেই গায়ে বড়ি বিল, শীত বরল । নিশানাথ
হাস্ত পায়ে বাইরে বেরিয়ে এল । আবার সরু গলি,
লম্বা, ভৌতিক । চোঁৎ একটা বাড়ির ধরজা শূলে
গেল । কয়েকজন একটা মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে পলকে
অস্থিরিত হল । নিশানাথ থেকে দাঁড়িয়ে তারপর বোলা
মরজা দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল । একটা ইঁদুর তার
পা বাড়িয়ে সৌড়ে চলে গেল । নিশানাথ ওপরে
উঠতে লাগল । ভ্যান্ডিতক গিঁড়ি, কোথা থেকে আলো
এসে পড়েছে । নিশানাথ ওপরে উঠতে লাগল । তার

পারে শব্দ নেই। আলো আর বহুকার শব্দ করে। আলোর ছায়ায় নিভেছে মিশিরে গিয়ে নিপানার্থ ওপরে উঠতে লাগল। তারপর দাঁড় দেখানে শেষ হল সেখানে অপ্রসন্ন ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যার ঠিক মাত্রখানে একটি নারীমূর্তি আলোর ছায়ায় নিভেছে মিশিরে ধাঁড়িয়ে আছে। বাঘার ঝেঁষ ঘোমটা। একটি চোখের পরব চোখে পড়ে। নিপানার্থ বমকে ধাঁড়াল। বাঘা নিদ্ করল। কিন্তু নারীমূর্তি স্থির, তার চোখের পাতা কঁপিল না। নিপানার্থ কাছে গিয়ে দেখল মেয়েটি বস্মিনী। নিপানার্থ তার চোখের ডায়া পড়তে চাইল। তারপর সামনে নতজানু হয়ে বসল। আলোর ছায়ায় শরীর মিশিরে গিয়ে বস্মিনী ধাঁড়িয়ে গইল। তারপর নিপানার্থ আস্তে আস্তে যেন তার গলডলে শ্বরে ঘুমিয়ে পড়ল।

এক মিশ্র অবস্থাততে ঘুর ভাঙ্গল। একটি ছোট্ট নরব শীতল হাতের স্পর্শে হঠাৎ চমকে জেগে গেল। সেই স্পর্শের অবস্থানে বৃদ্ধতের বৃদ্ধত পাড়ল জরে হয়েছে। আর বনে হল তার যেন এই গরে থাকার কথা নয়। কাল রাতে না করে সে যেন কোথায়—চোরে চোরে দেখল। হঠাৎ, সেই ঘরটাই। সেই কুখ্যস অত্যন্ত এলোমেলো ঘরটা। আর কে যেন হাট করে জানলা খুলে দিয়েছে। প্রভুর রোন তার পায়ে বিদ্যায় পড়েছে। বেলা হয়েছে।

তারপর বুঝে আতঙ্ক যে নিপানার্থের বনে পড়ল আজ তার বাঘারে বাঙার কথা। মিশিরে বাঙার কথা। বনে পড়ল ছোট্টকুরা বাগবে, বৌঠানের সাধ। প্রত্যেকটি ব্যাপারই ছিল বিরাটকর। কিন্তু দকালে উঠে তার ব্যত্যয় সেবে নিপানার্থের পা প্রহর করতে লাগল। আনি কি পাগল হয়ে যাচ্ছে। আসলে কাল রাতে বা অথবা নৌদি—কায়োর সঙ্গেই কি যোবা হল নি? আজ কি কিছুই হবার কথা ছিল না? আর হঠাৎ সে চোখের দাবনে রেখতে গেল প্রথম দিবালোকে জলজল করছে সেই প্রথম জানাদার। তারপর—তারপর যেন—যেন আবি—আহ, সুদর্শনোকে তত্ত্ব আর উত্তল আর প্রথম সেই জানাদারে হল—ও, বনে পড়েছে, আবি জান করব।

নিপানার্থ বৃদ্ধক করে উঠে বসল।

বটু, বলল, তাই হলো। হটকা মেয়ে পড়েছিলে? নিপানার্থ দেখল বটু। অগহাষের হটকা যেন একটা অবলম্বন পেয়েছে এমনিভাবে সে হুয়াতে বটুকে জড়িয়ে ধরতে গেল। বটু, ছটকে গরে গিরে বলল, উঁহু। আসে বাও?

নিপানার্থ ব্যর্থভাবেই অপ্রসন্ন হয়ে বসল, এই বাহু। আজও তুলে গেছি।

বটু, বলল, মিশ্রক। যোক যোক ঠকাও।

নিপানার্থ জ্বল হয়ে বটুর দিকে তাকিয়ে গইল। বটু, বলল, চাই না বাও।

নিপানার্থ হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠল। আর হাসতে হাসতেই তার বনে পড়ল এ বাড়ির কানে তার হাস্যধ্বনি আর অপরিস্রব হয়ে সেহে। দবাই না ভর পেয়ে যায়। আর একথা বনে পড়তেই সে আবার বিস্ময় জ্বারে হেসে উঠল। বটু, একটু বা বিস্মিত হয়েছিল। কিন্তু হাসির মৌরার তার বিস্ময় অতর্কিত হল। বটুও হাসতে লাগল। হুজনের হাসি শ্বনে সাধনা বহুকার বাইরে থেকে একবার উঁকি মেয়ে হাসিমুখে যেন ঢুকল, তারপর হঠাৎ বনে পড়ার মাঝার ঘোমটাটা টেনে গিরে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে বেকরা?

আর সাধনাকে সেবে নিপানার্থ বুকল তাহলে সে পাগল হল নি, ছোট্টকুরা বনে এসেছে—ভখন নিশ্চয়ই কাল রাতে তার সঙ্গে তার কথা হয়েছে। তাহলে পাগল হই নি? নিপানার্থ অতীত, অতীত পুনর্লিখিত হল এবং আরও জ্বারে হাসতে শ্বু, করল। অপ্রত্যা সাধনাকেও হাসতে গেল। আর কাকীমাকে হাসতে সেবে বটু, আরও বেশি হাসতে শ্বু, করল। নিপানার্থ শপট বুকল এই বটুও জানে হাসার পেছনে একটা কাল বহুকার এবং সে কাল তার কাকার হাসিহতে পারে না, শায়ে সাধনার হাসি। নিপানার্থ বুঝতেও অতর্কিত ধীনন্দ্যতা বোধ করল। এই মেয়েটি, অর্থাৎ কি না তার স্রাত্বে, যে তার দন্দানার্থে হাসতে হাসতেও বাঘার কাল ঠিক রাখছে—সেই ছোট্টকুর বটু যে তার স্রাজে ভাস্ম্যুতি থেকে নিশ্চরযোগ্য বেশি তা: এই বালকও যাকে। নিপানার্থ হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে তার চোখে জল এসে গেল।

ততক্ষণে স্বপ্ন ঘরে ঢুকছে। ^১এলল, কি হয়েছে? সবাই মিলে এত হাসি কেন তোমরা? বলতে বলতে স্বপ্নও প্রায় হাসতে শুরু করে এমন সময় নিশানাথ আচম্বিতে হাসি বাধিয়ে বলে বলল, মশু, আমার বলল আমি যিথোবাদী, আমি বৌকা দি।

শুনেই সাধনার মূর্খের হাসি বন্ধ হল। সে চকিতে একবার স্বপ্নর দিকে তাকিয়ে আছে আছে মশুকে কাছে টেনে নিল। মশু, স্বপ্নে বলল, গুরুজনের এমন বলে।

মশু, বলল, বাবে। আমি তো বৌকা বাও বগিনি, আমি তো বললাম যোজ যোজ ঠকাও।

নিশানাথ চমৎকৃত হল। সে ভেবেছিল মশু বলবে বেশ করেছি। বলবে, যিথোবাদীই তো। যোজ যোজ জানবে বনো আর যোজই ভুলে যাও? মনে মনে সে মশুকে ঘালাভূমিত করল।

সাধনা মশুকে বলল, বাও, পিসিকে কাকুর চা দিয়ে আদতে বলো।

মশু নিশানাথের দিকে একবার তাকিয়ে বাবা ছেলের বডো চলে গেল।

এক মূহুর্তে কেউ কোনো কথা খুঁজে পেল না। নিশানাথ বৃদ্ধ তার কিছু বলা দরকার। দম্পত্যে বৌর্য্য ও ভ্রাতৃবৎ। ভ্রাতৃবৎটি বড় থেকে অনেকদিন পরে আছ এসেছেন। সুতরাং স্বভাবতই কিছু কুপল-প্রত্যাশি করা যেতে পারে। ভ্রাতৃবৎটি, পুনরাপি, শিক্ষিত এবং সমাজসচেতন। সুতরাং রাজনীতি নিয়েও আলোচনা চলে। ভ্রাতৃবৎ ব্যক্তির অরিতে প্রেমজ বিবাহ করেছিলেন। সুতরাং প্রেম ও বিবাহের সম্পর্ক নিয়ে—না না, আমি তো আমার ভাস্কর, গুরুজন। অন্য নিশানাথ, তুমি একজনের ভাস্কর, তুমি একটি বড় গুরুজন। বড় শব্দটির অর্থ যেন আছই সে আবিষ্কার করল। কপালকুণ্ডলার মতো অশকুটে যেন বলল, বিবাহ-। নাত্যবিক, তাহলে যিরে একটা ব্যাপার। আর কি বিয়াটি পে অভিজ্ঞতা। তাহলে এই বাসিকা, সাধনা—সেও কত না অভিজ্ঞতার, আর মূর্খ, সূন্যনী, কত না অভিজ্ঞতার, আর আমি, কত না অভিজ্ঞতার... আচ্ছা, ইন্টারকাস্ট ব্যাঙ্কের যে সাময়িক অপ্রতিভ

শব্দে এক অপ্রতিভার ঘটনা এ নিয়ে যদি সাধনার দলে একটা দম্পত্য দীর্ঘকালের আলোচনা উপস্থাপন করি তাহলে হয়তো সবমিথই বটে। কিন্তু বৌর্য্য নিশুই তাতে অপ্রতি বোধ করে। কারণ এই মহিলাটিরও ছোট্টুর বিরোধে কব আশঙ্কি ছিল না।

স্বপ্ন বলল, ওঠো না ঠাকুরপো।

নিশানাথ বড়বড় করে উঠে বলল। ইতিমধ্যে সে আবার শূন্যে গড়েছিল। বাসি মূর্খ সাধনা দিকে তাকাতে হঠাৎ তার গম্ভীর হচ্ছিল। তার এইবার নিশুই এই ভয়মিলা বাচ্চারে না যাওয়ার বল তাকে অভিযোগ করে। বৌমা মাঝে আছে তাহলে কিছু আমি অত্যন্ত অমানিত বোধ করব ইত্যাদি ভেবে নিশানাথ উত্তেজিত হবার চেষ্টা করল।

স্বপ্ন বলল, মশু, কাল কি বলতে জানো?

ভীত নিশানাথ বলল, কি?

স্বপ্ন বলল, বলছিল বড় হয়ে আমি কাকুর যত্নে হবে। সব সময় শূন্যে থাকব আর বই পড়ব। মশুতে যাব না, অফিসে যাব না। আমি বলছি, আচ্ছা।

স্বপ্ন হাসতে লাগল। কিন্তু সাধনা হাসিয়ে যোগ না দিতে পারলে পাতায় তার মনে উঠে যে মেহালের ক্যালেন্ডারের পা থেকে শূন্যের মতো বাসে পাতা ছিঁড়ে বলল, আশনার চাকরির ব্যাপারটা কি হল?

নিশানাথ বিব্রতভারে বলল, কি আর হবে।

আশনা তা বলে মনে মিলেন?

নিশানাথ যেন ছোয়ার জবাব দিচ্ছে এমন একটা দম্পত্য ভাব চোখে কুটিলে বলল, কেন?

বাবে। পুন্নিপ রিপোর্টে চাকরি বাবে, কেন চাকরি সেল তার কোনো কারণ দেখাবে না—এ সবই যে সংবিধানের কাগজে-টাল রাইটের বিরোধী। আপা এ নিয়ে কেবু করতে পারেন।

নিশানাথ বলল, লাভ কি?

সাধনা একটু খেমে আছে আছে বলল, পাবে দম্পত্যনা অবিধা বহু, তবে—

স্বপ্ন হেসে বলল, তবে কেন করে তুমি তো অত্যন্ত দেখাতে পারতে এটা কত ব্যাপার, এটা মূর্খ পদক্ষেপ

কথা বললেও—যানে তোমার ঘরতে সাধনায়ের খানিক
প্রভাৱ হয়ে যেত। কি বলবে সাধনা?

নিশানাথ অতীত ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, ঠিক সেইজন্যেই
কেলি কঠিন। কিহু না করলে যে সাধার খানিকটে
দুর্ভাগ্যে হয় একথা পরে বুঝতে পেরে না করার জন্য
দুর্ভাগ্যে আপনোয় হচ্ছে।

স্বর্গ বলল, সে কি ঠাকুরপো? তোমার সাধার
দুর্ভাগ্যে আবার কিসে করলে? একটু হলো শুন।
এ একটা ধর বটে।

আহ! বোঁঠান, এই সকলবেলাটা বিচাক করে দিও
না। তোমার নীরব উপস্থিতি, তোমার চাউনি, তোমার
ট্রিটের কোণের হাসি, আহ! বোঁঠান, তুমি যাও, যাজবিক,
তোমার এই দূর্ভাগ্যি দেখলে আমার বমি আসে।

নিশানাথকে নীরব দেখে সাধনা উত্তর দিল, সে তো
ঠিকই। বেতনা কেন করলে বড়ার ইলেকশনে একটু
অসুস্থিবে তো হতেই।

স্বর্গ যেন রেহভরে ছোট বোনকে পালন করছে এমন
ভঙ্গিতে সাধনার পিঠে আলতো চকু ঘেরে বলল, ওরে
দুঃখপুত্রী, সেই জন্যই দুর্ভাগ্য থেকে দৌড়ে এসে
সেজনা। সেজনা বলে ঠাকুরপোকে উদ্ভাবন দিচ্ছে। দাঁড়া,
তোমার বড় ভাস্করকে আঁক বলছি। এনিমিতে তো কটমা
বলতে অভ্যাস।

সাধনা একটুও না বলে হেসে বলল, তোমাকে আর
বলতে হবে না। বড়াকে আমি নিজেই বলব—আমি
এবোধি আপনায় এসেইমুঠে ক্যাম্পেন করতে। আপনি
কেন এদের নথিবেশনে দাঁড়াতে সেলেন। তুমিই হলো
বিধি। বড়ার দিকে কতদিন কত সন্ধ্যাসন্ধ্যা করেছেন।
কত গুন করেছেন। ভাকারী কলোয়ে হাত ভাঁড়তে
হুঁসুটিতে, পড়ানোর অব্যবস্থা, পাল করলে ইনসিকিউরিটি,
বোঁটে থাকবার জন্যে ভাকারদের দুশী হাতে রেখে চিকিন্সা
করতে হয়, ওদুয়ে ভেজাল, প্রয়োজনের তুলনায় হাদপাতাল
সন্ধ্যার মনসা, যা আছে তাও যেন হস', লাস্ট দেখাসে—

স্বর্গ বাবা দিয়ে বলল, বাব বাব বাব। হ্যাঁয়ে,
ফ্রোডাকুরপোয় সঙ্গে হুই কি মিলে কল করিল বলতো?
এই সবই বলিস থাকি।

সাধনা একান্ত লজ্জিত হয়ে সাধার পোমটো তুলে

দিল। সে কথার কথার উত্তেজিত হয়েছিল। বিরতের
নতো হেসে বলল, যাও। ইশায়ায় নিশানাথকে দেখিয়ে
বলল, যা হচ্ছে না?

নিশানাথ বিমূঢ়ের মতো সাধনাকে দেখছিল। তার
উদ্বেগনা, তার লজ্জা দেখছিল। স্বর্গ, যানে বোঁঠান কি
ভাবে ঘেরে গিরেও সাধনাকে খানিকে দিল এবং কি
ভাবে সাধনাকে কানে কলার চেন্টা করে আবার নিজেই
যেন ডাকে উদ্ধার করার বৃদ্ধ; দেখাল ইত্যাদি প্রদলে
ভাবনা করতে করতে করতে করতে নিশানাথ বিমূঢ়ের
মতো এক দৃষ্টিতে সাধনাকে দেখছিল, এমনকিবার ট্রিটে
করে তা দাঁড়িয়ে হৈমন্তী পরে চুকল। পেছন পেছন মন্টু।
মন্টু এসেই সাধনার কোল ঘেঁসে দাঁড়াল।

স্বর্গ বলল, যাও, গড়তে যাও।

মন্টু বলল, না, আজকে—

নিশানাথ উৎসাহী হয়ে শুনতে চাইল কি ভাবে মন্টু
কথাটা শেষ করে। মন্টু কি বলবে আজ তোমার সাহ।
আজ পড়ব না? মন্টু কি বলবে, না, মন্টু কি কলবে,
না, মন্টু কি বলবে, না...

নিশানাথ হঠাৎ উপলব্ধি করল নিশাথে সে থাকে
জাকছে। থাকে জাকছি আমি। রোমাঙ্কিত হল। আর
লজ্জা হল, ভয় হল, কেমন যেন উষ্মে একটা। তার
পদকে হয়ে পড়ল যা বলেছিল হৃদয়ে যাবে। যা
বলেছিল। হৃদয়ে যাবে। যা স্বপ্নে দেখেছে। আবার
দর্বাংসে পুঁচি। আমি কানুর মতো শূন্য থাকব।
পালন হয়ে যাকি। যা কেন এল না? এত হাসি শূন্যে,
আমাদের এত হাসি শূন্যে, আমার এত হাসি শূন্যেও যা
কেন এল না? কাল হাতে কোন কথা কি হয় মি।
ও বাজার। নৌমি তো বলল না। কোনো কথা হয়
মি? তবে সাধনা? সাধনা এখানে কেন? সাধনা কি
এ বাড়িতেই থাকে?

দর্বাংসার ও অর্ধসিহেমেরলন; বহুদল বহুদল;
যালা অজ্ঞকার শিফির তলর দাঁখনী। নতজানু হয়ে
বসেছিলেন। দুর্ভাগ্যে পড়ল। আ, দুঃ।

নিশাথে হয়ে যাবে আগতে পালন—আমি কতকাল
বুসোই মি। কল যালা। আমি এবার শূন্যে।

স ৩ কা গ।

চোখের তল্লাস
মুখ মুখ ভাবটুকু
হাটা চলার হাড়িরে
নিম্নে জীব মাঝাতে
বসে বিত্তি। কল-
কাটা বড় কলো
অপে তি কিয়ে
তুবি-দানা হাড়িরে
কড়াতে এপিঠ
ওপিঠ উটে মাহ
সাতলানোর মত
মা বিয়ে তি ম
তিনটে পাইয়ের

অন্য চোখ



পরিমল সাহা

অবশ করেছো বা-
পা। পারের পাত
তুলে ক হলে
পিঠের আকর
নিরেছিল। তবে
একটু বা টান
থরছে। পাঠিতে
তর বেবে বেহের
চাল সামলে কোমর
সো মা ক র তে
চোকাঠের বাইরে
এ সে বা ডা তে
পারে।

সামনে ঘরে বের। সকাল সকাল বড় দানা পেটে
না পড়লে হাটে ভাল ছুঁব না হবে না। পানান দিয়ে দিয়ে
পান্না বিরক্ত হয়ে উঠবে। তিন তিনটে পাইর আর কম
কথা নয়। তা কিছুকণের মধ্যে ও এসে পড়বে। পান্নার
ছায়া ঘরে ওকে সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে। বাসতি, কৈড়ে,
ভেলের বাটি হাতের কাছে জুগিয়ে দিয়ে ওকে বাছুর
থরতে হবে। বাছুর নাগালের মধ্যে পেয়ে জিত দিয়ে গা
চাউতে না পান্না পাই অশান্ত হয়ে উঠবে। এর উপর
আছে ভাঁশের বিবক্তি। পান্নার ব্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি
পান্নার হাত হুগিয়ে হুকুহুকি না বাতহালে পান্নার
আজুলগোয়ার কি বাট থেকে হু ব টেনে আনা সহজ হবে।

আক-তুবি জড়ান হাত দুটো বুঝে নিয়ে বিত্তি বালতি,
কৈড়ে সব এক টাই করে। পান্না এক মিনিটও ঝাড়বে
না। এসেই বাছুর ছাড়বে। পিরনের চিঠি বিমির মত
পান্নাকে যে এ বাড়ি সে বাড়ি অনেক বাড়ি হাঝিরা
হিতে হয়।

বালতি কৈড়ে এগিয়ে বেওয়ার মত ছোট বাট কাই-
করমাস মাত্র নয়; পাই সোয়ান ছাড়া বাণের প্রায় সব
কাঞ্চলসোই এখন বক্তিক করতে হয়। কাল বিত্তি মনে
হলে হিসেব করেছিল: সাতাশ। আশ আটাশ। পুরে:
চার পণ্ডা ব্রহ্মাশ্রম হয়ে শোয়া। পাইয়ে বাড়িয়ে দিয়ে

ওনে হরজার বুঝ থেকে সুনে। বেফের্ডর লখের
মত জড়ান পান্নার ব্রহ্মাশ্রম পথ তোলে: বিত্তি। অ
বিত্তি। সাধা পাইয়ের বাছুরটা বেফার ডাকতে রে।
ওটারেই আগে দুইয়ে নে।

কাল আট সাগ। আগ আগ পাই। সবইত দুইতে
হবে। মনে মনে বিড় বিড় করতে থেকে বিত্তি বালতি,
ভেলের বাটি সাগ। পাইটার কিকে এগিয়ে বের।

পান্না বাছুর ছেড়ে বাটে পানান দেয়।.....

বিত্তি বাছুর সামলে ডাঁশ ডাড়িয়ে পাইয়ে
বলে রাখে।

সাগ। কাল। ছাই ছাই বং। তিন তিনটে
পাই বোরা হ'ল চার সের দুহ মেনে কৈড়ের ভনে
বিত্তি পান্নার হাতে তুলে বের। চার ডাকার আর
হতবাকুতে বাড়ির বোজের দুহ। ব্রহ্মাশ্রম আ।
মাইলটেকেরও বেশী পাই ঠেড়ির নিরে হু' বাড়ি
দুহ দুইয়ে ফিরে আসত। নতুন অবস্থার পুয়ান
ব্যবস্থার ব্যবস্থার করে নিতে হয়েছিল। মেয়েকে পাঠিয়ে
বাহুর বেলকরে রাখা করিয়েছে। এতদিনের
লেনদেন, অসময়ের সুবিধা অসুবিধা না দেখলে
চলবে কেন? দুহ যখন খাট পাচ্ছে। বাণেব শেখান
কথাগুলো বিত্তি বেশ ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ বলতে শেখছিল।

.....বাই কোয়ানর বহুতির উপর বাড়তি কিছু নেবে সেই থেকে পারে ছ' বাড়ির বোঝের ছ' শৌছে ফের।
 যার কাছের বাড়ির ছ' বাড়ি নিজ পৌছে বের, তা আট ন' বর হবে। হাসভাবারি বন্ধের। হিতির চেনা নব। হুকের বাসতি কৈকে নিয়ে মিলেংকোচে চুকে যায় লম্বোচে। সব বাড়ির মেয়ে-মহলে বরপের মিত্তিতে যেনে নানী, দিনী, বিবি, বৌদি পোছের ভাকের সম্পর্ক পাতিয়ে নিয়েছে। বোঝের ছ' ছাড়াত ঘানী বৌদি-মহলে নগরা পরলার বিক্রিও আছে।

হুখ নিয়ে বেকবার হুখে কানকে তুলিয়ে বিত্তি বলে :
 পোঁদাইয়ের বাড়ির চুইটু কিছু থেকে যাবে। পোঁদাই দিগি লাক বলে গিয়েছে। তোমাদের ঐ হীরালাল, পক্ষ নিয়ে এলে নাকি হুখ দুইয়ে দিয়ে যাবে। আমাদের হুখ নাকি আর হুখে তোলা যায় না! চোখে হুখে অল্প এক তমি করে বিত্তি দেব করে কথাকলো।

ঐ হীরাব পরভানি। শালা কেউটেই বাজা। বিগ চকাকছে। যতকা পেরে আবার বাজার থেকে বসার কিতর করেছে। সেবে ঐটু পাটা। পাটা সেবে উঠলে কি করবে তা বেন ভাবতে থেকে হুপ হয়ে যায় বৃদ্ধাবন। তারপর চোখে-হুখে এমন একটা তার ছুটীয়ে তোলে যে পারলে হীরালালের লকে একটা ঢকা করতে এখনই বেরিয়ে পড়ত। হুখ হুপে বৃদ্ধাবন হুঁদিয়ে ওঠে। সতের মত বাড়িরে না থেকে বাড়িকলো হুয়ে আসবি! আঃ, আবার হবে বাইরে পত্নী.....

ননে বনে অপ্রতিভ বলেও বাপের কথাকলো তেমন পারে না দেবে বিত্তি পথে নাবে। বাবার বরপার কহিলে তেমন বেন বিটবিটে হবে গেছে বাবা। হঠাৎ এভাবে ওকে নিয়ে পড়া যে সাপ না পেরে কেঁচে মারা তা ও বেশ বুঝতে পারে।

: পারিলম্ব পোঁদাই বাড়ির হুইটু বাড়িকে—।
 কানির ধমকে বৃদ্ধাবনের কথার পেটটু কেমে যায়। পুঁদো বেকভটা। হুখ ছুটিয়ে বাঙার কতকলো পকের অঁচকু খেটে বেন হুপ হয়ে যায়। ঢগতে ঢগতে বিত্তি বাবে। কথাকলো পোঁদার মত বাড়ার। কথার পেটটু আশাক করে বিত্তি নিপাত্তে চোখে দেবে আবার

পা ঢালাব। না। বোলা বৌদি হয়নি। হুইটা ভবনো বেকভাক পাছটার পুঁবে হুপছে।

হীরাবের বাড়ি থেকে শুরু। বোঝারিমে মত বাড়ি বাড়ি হুয়ে পোঁদা দিগে বরাহ মত হুখ বেলে বের বিত্তি। ঠিক ওঝনের উপর একটু কাউ।

নন্দীনের বড়বে) দসুপেন এগিয়ে গিয়ে বলে : কদিন থেকে হুখ কেমন লাভলা লাগছে বিত্তি।

পোঁদার পর্তে হুখ ঢগতে থেকে বাট পলায় বিত্তি বলে। তোমাদের হুঁদুনির দিকে একটু চোখ দেব বৌদি। আবারে হুখের বোব নেই।

: কে একজন এসেছিল। কর্তার লকে কথ্য বলে গেছে। পাই নিয়ে এসে হুয়ে গিতে চাইছে। অনেকদিন এক ভায়ায় বেয়ে আসছি। তাই বললাম আর কি!

নিজই সেই পরভানটা! এখানেও এসে ঢোপ ফেলেছে। এই শোকভলোই বা কি! অনেক কথার নাচা কেন বাপু! নিজেরে কি ভালমন্দ বোঝটু নেই! একটা বিবাহের বড়ি গিলে বেন নন্দীবাড়ি থেকে বেরিয়ে এল বিত্তি।

অনেকটা বেরী হয়ে গেল নন্দীবাড়ি। অনেকলো বাড়ি এখনো বাকী। পুঁদো পাড়াটা পাক দিয়ে ও পাড়ার মাঝার লজীরে বাড়ি পদম বেতে হবে। লজীর দিগি মৈল ওর লকে পড়ত। কাইত রূপ পদম এক লকে পড়েছে। হাস কহেক আগে মৈলর বিয়ে হয়েছে। বহুতবানেক আপগাহ। আরেক রূপ পদম পড়ে ও হুপ ছেড়েছে। ওবেব পেহু বয়ের মেয়ের এর বেশী বরকার কি। মোটাহুটি তিষ্ঠি লিখতে পারে। চাল-ভাল-ভেল-হুদের হিসেব রাখা। এটু কানলেই অনেক। লংগোহের কাছ পেহা..... বাবা-মেয়েকে পাক্য লংগোহী করে পরের বয়ে পাঠাবেন। নিজের জনপনা হেঁদিয়ে পরকে আপন করতে হবে বে! আগে পরকে আপন করে গেবে জনপনা বেখামও ত চলে। বিত্তি ননে বনে নয়েবহার হুখের চুবি আঁকে।

বোবে পা ঢালায় বিত্তি। তাড়াতাড়ি না পারলে নয়েবাহের বাড়ি হুঁপা এক করে কিছুক্ষণ বলা যাবে না। হুখ হুপে ছুটা কথ্য বলা হয়ে উঠবে না। মৈলর কাল পদম বাড়ি থেকে আসার কথ্য ছিল। এসে

থাকলে ওদের বাড়িতেও পৌঁচি তবে। শৈল কি সত্যকেই
ওকে ছেড়ে যেবে।

নরেন্দ্রের বাড়ি পাশে রেখে বিস্ত্র পথের ধাঁক নেয়।
লম্ব সেতের তবে এ বাড়ি আসবে।

মিষ্টিবতের বাড়ি সেতের বেতেরে আসতেই বিষ্টি সস্তীক
হীরালালের ফুখাখুশি পড়ে। গাই নিয়ে চলছে ওরা।

: কেমন চলেছে রে বিষ্টি। তোর ত এখন সুখিন।
হ্যাঁ, বলনা। মেয়ে। তা হবেই বা না কেন। হীরালালের
হিকে চোখ ঠেঁরে বউ কবাব ছের টানে : বিষ্টির
দুখ না হলে নাকি বাবুদের বাওয়া হয় না। মিসি
বধা ধাঁতের সার বেব করে নোংরা হাসি হাসে।

বিষ্টির কান দুটো পঠম হয়ে ওঠে। সাতা ঘেঘের
রক্ত দুখে এসে অনেক : বুধে ঝাঁটা। কাল বুধে তোহ
পোকা পতুক। জিত বলে নাদুক। কাক নকুরে থাক।
একধমে কথাগুলো বলে কেলে হনহনিরে চলে আসে
বিষ্টি। ঠাড়িরে থাকলে কথাই কথা বাড়ত। তৈ চৈ
পড়ত। লোক অস্ত হত চারহিক থেকে সব মজা হেবত।
দুখের বাশতিটা ছুঁড়ে নানীর মুখটা ঝাঁপালে হিতে
পারলে তবে বধি ওর জালা ছুঁত। ... রাগটা সামলে
নিতে না পারলে কি নরেন্দ্রকে দুখ সেনান হেত।
কথাটা বাবার কানে উঠলে দুখ নিয়ে বেবোন বন্ধ
হওয়া বিচিত্র কি। না, এর কিছু-মিগণও বাবাকে
জানতে দেয়া নয়। হাতে সুতা লঙ্কানর মত ভাবতে
প্রাণতে বিষ্টি লক্ষীসের বাড়ির উঠানে এসে ঠাড়ান।

: বিবি আসেদি বিষ্টিবি। লক্ষী বেন খবরটা কোর
অমাই ঠাড়িরে ছিল।

: কে? বিষ্টি এসেছিল? লক্ষীর মা ঘরের বাইরে
এসে ঠাড়ায়। হ্যাঁ, শৈল কাল আসবে। আমাইও
ভদ্রছি আসবে। আর হ্যাঁ, (যেন হঠাৎ মনে পড়ে
গেল কথাটা) অমবা পাছে না ফুলে যায় এমনি একটা
ভাব দুটরে। পলার ঘরে তাঁজ কেলে বলে : প্রোভে
দুখ হাড়ও কাল কিছু একদের দুখ বেনী মিসি। মনে
থাকবে ত বে। আর সুখি, (বিষ্টি বেন হোজই জালা
দুখ বের) দুখটু বেন বাঁচি হয়। হাতা হুত অর
আমাইলনকে দেয়া যায় না।

বিষ্টির চোঙতে ইচ্ছে হল। কেবল খুঁতখুঁতগেনা।

পতক না হয় না নিলেই হয়। কত আর মন ভোগান
চলে। বিষ্টি কথাগুলো তাবল শুধু। দুখ দুটে বলতে
পারল না। বলে অস্বস্তিকর কিছু ঘটতে চাইল না।
এমনিতেই যে কামেলার শেষ নেই। ঠেঁটেরে গুণায়
যেখানো গোছের একটা হাসি টেনে যানের দুখে শোভা
কবাটা নরম পলার বলে : ভগবানের জল বেতে আমবা
পরয়া নেই না বাণীবা।.....

এবার কোরার পথ হবে বিষ্টি। আর বাজ একট
বাড়ি। বিষ্টির শেষ বাড়ি। নরেন্দ্রের বাড়ি। বিষ্টির
নরেন্দ্রকে বাড়ি। এই বাড়িটাই এতক্ষণ ওকে
টানছিল। হোজই টানে। যেখানে এসে বিষ্টি হাতে
পারে শুধু জিহা না, মনে মনে ছুঁড়ার ও।

পারবাসের ছেড়ে বাতরা যোণের মত এই দুহুর্থে
কেমন বেন কাঁকা কাঁকা ঠেকছে বাড়িটা। শোবার
ঘরে শেকল ঝাঁটা। রাজা বধের হিকেও কারো অস্তিৎবে
দাড়া নেই। তবু পারে পারে বিষ্টি একবার ঘুরে
এল। ঝাঁপের লাঠি হাড়ির কানে আটকান। কোথাও
হুত গিরে থাকবে নরেন্দ্রের মা। বিষ্টিতে বলতে হল।
বিষ্টি হল। বসে বেকে উঠানের মাঠে সবুজ মোতার
রলমলে বার-বেলে পেয়ারা গাছটার হিকে চোখ তাবল।
নরেন্দ্রা এতক্ষণ একটা ভাঁস। পেয়ারা ছিঁড়ে এনে ওর
হাতে ওখে গিরে পঠ ছুঁড়ে ফিত। ও ভাঁস পেয়ারা
ভালবাসে। নরেন্দ্রা পঠ। হাওরা বাওরার নামে
কোথাও সুখি গলে যেতেছে। ভাকারত সকল বিবেকের
হাওরার কথা বলেছে। কিছু এখনও আর সকল বলে
নেই। কথা গেলে কি হাওরার লময়ের জ্ঞান থাকে।
ছেলেদের পক্ষে বা লম্বব মেয়েদের কি তাই করা চলে।
না শোভা পার। মা বলেন—মেয়েটা হল হুতার বাবা
উদ্ধত ছুঁড়ি। সুতা ছিঁড়লে পাঁচ হাতের কড়াকাড়ি
পড়বে। নরেন্দ্রা কি তা বোঝে। না, বুঝতে চায়।
একদিন যেখা না হলে দুখটি ভায়। কড়ে গিরে
হেলে কথা বললে তবে নরেন্দ্রার দুখে কথা সত্যবে।
হাসি দুটবে। আড়রে পলার বলে—দুখ বুজি কাজ
ছিল? হু পাঁচ মিনিট বসলে যদ্যভারত এমন কি
অন্তত হত। তবে ত চাকরিটা পাকা হল। আর
কটা মাল। হেবব ভদ্রম কত কাজের।

কথা নয়। যেম বেহালায় ছড় টানে নরেনরা।
(নরেনরা কখনো শুনেছে থেকে গেল বছরের বাজা হলের
সেই বেহালা-বাঁককে মনে হয়।) দ্বিত্বকের
গণপার কাছ থেকে ও ঘরটার নাম জেনেছিল। গণপার
কাঁধ সঙ্গে লোকটার ভাব হয়েছিল। গণপা ওর
কাঁধ কাছ থেকে জেনে বশেছিল। লোকটা সেদিন
বেহালায় শুভ তুলেছিল। নরেনরার কথাগুলো যেন
স্বপ্ন হয়ে ওর কানে বাজতে থাকে। যা শুনেছে থেকে
আলম বিনতুলোর এক বসন্ত ছবি যেন ওর চোখের
সামনে জেলে ওঠে। কিছু এখন, এই মুহূর্তে, নরেনরার
দায়িত্বের উত্তাপটুকু ও পেতে চাইছে।.....

ঃ যা কেবেছি। ভিজে কাপড় মুচড়ে জল ছড়াতে
থেকে নরেনরার মা পেছাটা ওলার এসে দাঁড়ায়। উঠে নের
এম্বা এম্বা জুড়ে বাঁধা বড়িতে কাপড়টাকে টানটান
করে মেলে দিয়ে বলে : বেলা হলে বসন্তের কাছ-
কবে পুতুরের জল কি আর জল থাকে। তা অনেকজন
বলে আছিল ন্তি ?

বিজি বাঁধ নাড়ে। কতজন আর।

নরেনরার মা দুই বাঁধার বাঁটটা বিজির দিকে এগিয়ে
যে। এ বাঁধির অঙ্গ বিশেষ করে আনা কাল গায়ের
যম দুইটুকু মেয়ে ফের বিজি। টিক ওজনের উপর
অরুণ হাতের অনেকখানি কাঁট।

ঃ কাল কিম্ব শকাল করে দুই দিবি। নরেন আবার
কাল থেকে অকিস যাবে কিনা।

কাল নরেনরা অকিস যাবে অথচ ওকে এর কিছু-
বিসর্গও জানারনি। বিজি বনে মনে আনত হয়। লোক
বটে একজন। কালও বদলি মাঝার ক্রিমিক্রিমি
জাটটা নাকি এখনো রয়েছে।

ঃ নরেনরার শরীরও এখনো পুরোপুরি সারেনি
দাসীনা। এই শরীরে কি ডাইভারি বাটুনি সইবে।

ঃ মা সইয়ে উপায় কি। টাইনুকের বকল কি
এত সহজে কাটে। ওই অকিসের ভাতাংয়ের দিখে ফেঁদা
ওঁৎগুলো পেয়েছিল বলেই না কিছুটা সামলে উঠতে
পেরেছে।

ওঁৎ, ওঁৎ আর ওঁৎ। ঐ এক কথা। ওঁৎই
যেন সব। ভাল যা কিছু সব যেন ওঁৎ থেকে গেয়েছে।
ওঁৎ ছুঁয়ে আসা খাটি দুই যেন কিছুই না। ও কথা
যেন একবারটিও মুখে আনতে নেই।

মিছের ভাল দাঁতে বসতে থেকে নরেন বিজির
মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়। চোপাচেপি হতেই বিজি
নীচের দিকে চোখ নামিয়ে নিয়ে পায়ের নখে মাটি
খুঁড়তে থাকে। যেন করে আসা আকাশের মত মুখের
জ বহলে যায়।

ঃ হাঁটতে হাঁটতে আজ অনেক দুই গিয়ে পড়েছিলেন।
ছুটে ছুটে এগেছি। এখন মনে হচ্ছে অতটা তাকাতাতি
না করলেও চলত।

ঃ কাল নাকি জুবি অকিস বাজ? বিজি চুপ
করে থাকতে চেষ্টা মনেও ভিতরকার প্রেরণ খোঁজার
ওকে দুই খুলতে হয়।

ঃ সেই রকমই হইছে।

ঃ তোমার শরীরও এখনো সারেনি। আর কটা
দিন—।

ঃ ছুটি নিলে ভাল করতাম। এই ও। অল্প
পড়ে হাত বে এটিকে খোঁজা হয়ে গেছে। তোমাদের
মত জলের পরলা নেই যে ঘরে বলে যায়।

বিজি যেন হঠাৎ যা বেশ। কটিন দুটি মেলে দল
নরেনরার দিকে। নরেনরার মুখে হাতা হাসির কিলিক।
ঐ হাসির আনন্দের বিজি যেন নরেনরার যমের
ভিতরটা খেঁচতে পেল।

জল, জল, আর জল। বিজি যেন জুবে গেল।
অবিসারের জলে জুবে ভলিয়ে গেল। অনেক কথা,
কতগুলো প্রতিভাবের লব্ধ বিভিন্ন দলার এসে আটকে
থাকল। অহিরে কলতে পারল না। চলে এল চোখের
মত, চুপ করে পালিয়ে এল বিজি

পদ চলতে থেকে বিজির আবার মনে পড়ল।
বীদাসের হঠাৎ গায়ে পড়ে অপমান করার কথাটা
থাকাক গিয়ে বলতে হবে।

প্রত্যাখ্যানই বন্ধ

প্রতিভার একমাত্র প্ৰকাশ্য।

চার বছর পর আর সাধা

পৃথিবী পরিক্রমার শেষে

আহাভের ডেকে ঘাঁড়িয়ে

এই কথাটাই বার বার সব

চিন্তাকে হাশিমে বন জুড়ে

বসছিল। ক্রিচার চিত্তাকোণে। চার বছর আগে ইংলণ্ডের

তীরভূমি ছেড়ে অসীম সমুদ্রে আহাভ ভেসেছিল। সেই

আহাভে ঘরাই ছিলো আমি, পাশে ছিল ক্রিডা। কালো

ককিনের মত ইংলণ্ডের উপকূল ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে

ছিল সমুদ্রের গর্ভে। আহাভের বৃকে আছড়ে পড়ছিল

ইংলিশ চ্যানেলের উদ্ভাস ওরফে। শূন্যে চক্ৰাকারে

পাক খেয়ে শিশুশূন্য পাতি জমাচ্ছিল ওদের অভিমুখে

নীচের দৃষ্টান্তে। সে দিন আমার বৃকে কান পাতলেও

শোনা যেত ডেউএর গর্জন, ক্ষোভ আর নৈরাশ্যের

আলোড়ন। আমারও পত্তর সেদিন চরেছিল পাখ। মেলে

উড়তে, এত বড় পৃথিবীতে মানব্য একটু শান্ত, শূন্য

আত্মবোধে আশ্রয়। সে আত্মবোধে ঠিকানা আমার জানা

ছিল না। শূন্যে আনতাম আমি আছি, আছে আমার

বৃক জুড়ে সাহিত্য সৃষ্টির অকুবল হাসনা আর পাশে

আছে ক্রিডা, আমার সেরগার উৎস।

চার বছর পরে আবার কিয়ে ঘাচ্ছি ইংলণ্ডে। আচ্ছ

ক্রিডা পাশে নেই। বেল্লিকো থেকে চলে এসেছিল

ক্রিডা। ক্রিডা ইংলণ্ডে রয়েছে, তাই বন না চাইলেও

আমি আচ্ছ আমার ইংলণ্ডের ঘরাই। ধীরে ধীরে এগিয়ে

চলেছে আহাভ। ডেভোলের গাড়ির পাহাড় সোজা পড়ে

থক্কন করছে। শ্বেতশূন্য বিন্যাসের বত ক্রমশঃ সমুদ্রের

গর্ভ থেকে জেলে উঠছে ইংলণ্ডের মাটি। মাটি আর

মানুষ—এক অদৃশ্য যোগসূত্রে বাঁধা জড় আর জীবন।

কল্পে হচ্ছে গিঁতাই কি ইংলণ্ডে আসতে বন চার নি। ক্রিডা

উপলব্ধ, এতদিন শীর্ণ পরিক্রমায় প্রতিবৃদ্ধিতে, বহাচল

থেকে বহাচলে কিঃপের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে বন

আমার পড়েছিল এই ইংলণ্ডের মাটিতে। বনে বনে

বললাম—ইংলণ্ডের মানুষ আমার চার না, আমি কিন্তু

লেডী চ্যাটার্লির লেখক

মণি গঙ্গোপাধ্যায়



ইংলণ্ডের মাটিকে ভালবাসি,
মায়ের মত ভালবাসি।

ইংলণ্ডের মানুষ আমার

চার না ঠিকই। চার বছর

আগে মানুষের অন্ত্যাত্মারেই

জন্মভূমির মাটি ছেড়ে

আবার বরণ করে নিতে

হয়েছিল ভবঘুরের জীবন। আচ্ছ আমি ভবঘুরে হ্যাঁ

আর কি। শেলীর সেই লাইনটা মনে পড়ছে—*the*

world's rejected guest—পৃথিবীর প্রত্যাখ্যাত অতিথি।

উপমাটা আমার জীবনের সঙ্গে আত্মবৃত্তিতে মিলে গেছে।

গত চার বছরে বেশ থেকে বেশার হয়েছি কিন্তু কোনও

সেপের মানুষই আমার আগন করে বের নি। অথবা

আমিই পারি নি অন্য সেপের মানুষের সঙ্গে নিজেকে

মানিয়ে নিতে। গত চার বছরে অনেকই আমাকে

আমেরিকান লেখক বলে ভুল করেছে। কারণটাও স্পষ্ট

—আমার নামের সঙ্গে লিভ কালিমার কালো ছায়া।

আচ্ছ করে রেখেছিল আমার সাহিত্য সৃষ্টিকে, ইংলণ্ডের

সাহিত্য সমাজে আমার উপন্যাস ইত্যাদি দিনের পর দিন

উপেক্ষিত হচ্ছিল। আর আমার আপত্তিও এই অন্যায়ের

বিরুদ্ধে সেদিন যেমন ছিল আচ্ছ ঠিক তেমনি আছে।

সেদিন সেই ঘুরুর কোলাহলের মধ্যে বহু-বাহুর

—মূল আমার ব্যক্তিগত কোলাহলকেই বড় করে দেখেছিল

লকলে। আমার ব্যক্তিগত আপদানটাই সে দিন অনেকের

মন জুড়ে বসেছিল, আর্থিক অনটন হয়ে গাঁড়িয়েছিল

অধিকাংশের অনুকম্পার বিষয়বস্তু। কলে আমার অস্তরের

সোপান বেঘনাই হুঁকার কাছেই কোনও মূল্য পার নি।

আচ্ছ আমি বলতে পারি, আমার সাধনার পথে ব্যক্তিগত

অপদানকে আমি কোনও দিনই সামান্যতম মূল্যও দিই

নি, কোনও দিন আর্থিক অনটনে ব্যাহত হব নি আমার

স্বয়ং। ওসব কিছুকে আমি দৃষ্টিতেই ভুল করতে

পারতাম। এমন কি আমার শব্দের রূপায়ন, আমার

সাধনার কলঙ্ক—আমার সাহিত্য সৃষ্টি যে আমার

সেপের মানুষের কাছে স্বীকৃতি পেলে না এ বেঘনা

সময়ে সোপান করেছিলেন কিন্তু ইংলণ্ডের সেই সম্মুখ-

সংকুল সিন্ধুদোকে বেশগিন দখ্য করতে পারি নি ।
ক্রোধের আগুন বুকে নিধে আমি ইংলও ছেড়ে ঘাই নি
— অসহ্য দুঃখে দিনেবারা হতে ছিন্ন করেছিলাম বেশের
মাটির মাথা । ইংলওর হানুস আমার অগম্যমান করে নি,
অগম্যমান করেছিল সাহিত্যের শাস্ত্রও আবেদনকে । “The
Rainbow” উপন্যাসকে ব্যক্তিগত বিরোধের বিধে বিশেষণ
করে ঘেঁষা গড়বন্তে ভেঙ্গে পড়েছিল আমার দেশ
বিশ্বাসটুকু ।

আমি জানি আমি সেই বিবাহবিবাহ বিদায় হুজুত
ভেঙ্গে পড়েছিলাম ঠিকই কিন্তু বিশেষণ হয়ে ঘাই নি ।
ইংলওর তাঁর অব্যাহত হবার সঙ্গে-সঙ্গে মৃত্যু নিশ্বাসের
পানে হুঁ করেছিলাম ঠাঁইয়েছিলাম । তলার উত্থান ভরপ-
সংকুল অদ্যাপি, হাবার উপরে উদার শীলিমার বিস্তার
— এই দুই অঙ্গীনের মাঝে ঠাঁইয়ে আমি বুক ভরে
এখন করেছিলাম অনন্তর আশ্বাসন । চৈতন্যের কোণে
কোণে স্ফারিত হয়েছিল নবজন্মের স্পন্দন । ঠিক তখন
হঠাৎ ১৯১৫ সালে ঐক্যবাসে, রোগশয্যার ভীষন আর
হুজুত অঙ্গী শীঘ্রোৎসাহ দুলতে দুলতে । সে দিন
সিঁয়েছিলাম :

“When I am trodden quite out, quite out,
every vestige gone, than I am here
risen, and setting foot on another world
risen, accomplishing a resurrection
risen, not born again, but risen, body the
same as before,
new beyond knowledge of newness, alive
beyond life:...”

সে দিন সেই চার বছর আগে জাহাজের ভেঁকে ঠাঁইয়ে
আমার পুরাতন ঘরের ভাঙাটে ভাঙাটে শিহরিত হয়ে
ছিল মৃত্যু ভীষনের স্পন্দন, অস্তর আভাসিত হয়েছিল
নবায়ুনের আলোয় ।

চার বছরে চার মহাশয় পরিক্রমা শেষ হল । পট
বদলেণ বা সারা পৃথিবী বললেও ভুল হবে না কাল
ইউরোপ থেকে সিংহল ষাঁপদু হুঁয়ে গিয়েছিলাম
অস্ট্রেলিয়ায় । সেখান থেকে আমেরিকা হয়ে যেতিলো ।

এই দীর্ঘ পথটিতে কত অভিজ্ঞতা-সঙ্গ দখত হল,
কত বিভিন্ন মানুষের সঙ্গ হেঁসে গেল জীবনের বিভিন্ন
বিবেক আভাস । আমার সাহিত্য পূর্ণ হয়ে আছে এই
সঙ্গের অসংখ্য কথা, আলোকিত হয়ে আছে এই
আভাসের আশ্বাসনে । কিছই ভুলি নি, কিছই কোঁপি
নি । আমার মনে কাণ কেটেছে এমন কোন কিছই দখই
আমি অত্রাণ করি নি । প্রত্যেক ঠাঁই, আর ব্যক্তিকে
আদর দিয়েছি আমার সাহিত্য দৃষ্টির স্বাক্ষরে যার।
আমার আশ্রিত দিচ্ছে তাইয়েই, তাইয়ে প্রত্যেককে
আমি আদর দিয়েছি আমার চরিত্র-চিন্তাশীল । আমার
চোখ দিয়ে দেখেছি, আমার সম্প্রদায় পরণকটি হুঁয়ে
তাদের পতাকে সজীবিত করেছি মৃত্যু হুঁয়ে, মৃত্যু
হলে । সাহিত্যের প্রয়োজনে আমার অভিজ্ঞতার সঙ্গের
উজাড় করে দিয়েছি । আমার মতই আমার অনেক
উপন্যাসের নামক বিবাসী হয়েছে । সেখ ছেড়ে প
ব্যক্তিরেই বিশেষণের পথে । বিশেষণ হবি আমার লেখা
অনেকাংশ ভুড়ে আছে । এই সবই সত্যি কিন্তু এ
সবের মূলে কোন উদ্দেশ্য ছিল না, সত্যলোচন্য সত্য
বললেও হয় । আমি জানি, পথ চলার হুঁয়ে যারে বা
ভেঙ্গে উঠেছে আমার সাহিত্যকলতা, উপার্জিত হয়ে
আমার দৃষ্টির উৎস । সেই স্রোতের টানে ভেঁবে আ
আমার দায়ক আমারই আনন্দ যেমন অস্বীকার, আমা
দৃষ্ট অন্যান্য চরিত্র আমারই অভিজ্ঞতার আলোয় ভাবের

টেউএর তালে তালে জাহাজ হুঁয়ে । শ্রুতি
উত্থা বাতাসে উলস হয়ে উঠেছে আমার মন । চোখে
দিয়ে ভেঁবে ব্যাঙে হাজারবিধ মিছিল, দীর্ঘ দিগে
পুঞ্জীভূত শ্রুতির লবণ । সারের মূলে স্রোতের টা
যেখা, আমার গভীরভুতে অদৃশ্য কয়টি কত জনপদ
অসংখ্য হানুসজনের শ্রুতির চান্দোড়নে । সম্প্রদায়
শ্রবণে ভাল হুঁয়ে । গভীরনের একান্ত বাঁধ কাটে
কোন অব্যাহত বাসু স্পর্শে আর সম্প্রদায়ের বিবরণ
তা আমার জানা বেই । কিন্তু সেই বাঁধের দায়
মোট বুকটা আমার সামনে খোলা হয়েছে । পাতার
পাতা উলটে চলেছি । ১৯১৯ সালের নভেম্বর, ইং
ছেড়ে ইউরোপের পথে পা ব্যক্তিয়েছিলাম । প্যারি

জন নগে নি। জোয়েশে কয়েক রাজির পর চলে গিয়ে
হিপার গোমে। রাজনীতির অবরণ পরিবে গোমের
রোমান্টিক হৃৎকোষের গৌড়াগ্য হয় নি। তারপর
কাগি—ভূমধ্যসাগরের তীরে বিচিত্র-চরিত্র নবনারীদের
লীলাভূমি। কাগির কোলাহলের মধ্যে আমার অন্তর্ভুক্তি
নিশ্চয়ে পড়েছিল। অনেক ভেবে চিন্তে আদি আর ক্রিয়া
শেষে বাসা বেঁচেছিলাম সিঁগলিতে। তাওরমিবার এই
প্রথম আমার বাস্তব হাবিটা এখনও আমার চোখের সামনে
ভাসছে। এইখানেই আমার আমার সৃষ্টির স্রোত উদ্ভাস
হয়ে উঠেছিল—ঠিক পারস্যানদের মত। সাহিত্য রচনা
সম্প্রদায়িত্বের দ্বারা তৃতীয় পর্ব—স্রোত পর্ব—বললেও ভুল
হবে না।

মোটমুকের এক কোণে দেখা হয়েছে বরিস
ম্যাসনারের নামটা। ইউরোপের মাটিতে পা দিয়ে
পরিচয় হয়েছিল ম্যাসনারের সঙ্গে, নরম ভঙ্গিমা আলাপ
করিয়ে দিয়েছিল। এক আশ্চর্য চরিত্রের মানুষ এই
ম্যাসনা। ইন্দোভারি ডালকানের ম্যাসনারি করেছে,
হুগের সময়ে সফর করেছে পত্রিকা সম্পাদনার অভিজ্ঞতা
আর আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব পরিচয় জন্ম দেখলাম এক আশ-
কৃত্তিক আভ্যন্তরীণতার। নরম, আমার বলেছিল—
ম্যাসনা মানুষটা গতিশীলতার আধুনিক, পাকা
আন্তর্জাতিক্য—ইউরোপের প্রতিটি রাজধানীর মত হ্রাস
বহর ওর মধ্যে গভীর করে। প্রত্যেকে লক্ষ্য করে
ছিলাম মানুষটার পর কিছুই চকচকে, হুগের চকচকে
হুগের আভা থেকে পরিপাতি পোষাকের ওপর রাঙা টাই
পড়ত। গতিয়ই সৌরমি মানুষের গল্পলাল। সুখে
হাকার লোনা জ্বায়ে কিছুই বা জেনও পেয়া নেই। পরে
ওর সঙ্গে আমার পরিচয় আরো গভীর হয়েছিল, আমার
এই ইউরোপ প্রবাসের অনেক আদম আর জেনার
কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল এই ডালকা চিত্রাঙ্গীম ভবন-
রান্নাটো। অনেক কলমেই ও।

ক্রিয়া ওর ওপর বিস্তৃত ছিল বলেই যোগ ওর আমার
জীবনের এক বিশেষ অংশ অবিকার করে ব্যবহৃত ম্যাসনা।
পত্রিকা গভীর থেকে গভীরতর হয়েছিল আর অন্তরঙ্গ
হবার পরম্পরভেদে ও আমার কল্প থেকে পতি পাউণ্ড
হয় রচনা হাবিদুমে দিয়েছিল, সেল ওটাই ওর অবলম্ব

অবিকার। অবিকার যে ভাঙে সম্বন্ধ নেই। বারের
ওপর ভর দিয়েই ত চালিয়ে যেতে বাবুদানির বাহার।
বারের ব্যাপারে ওর বাত বিচার ছিল না। তা না হলে
আমার মত কপর্কহীন লেখক, যে মাত ন'পাউণ্ড পন্দল
করে সেন্ত্যাপ করেছিল তার কাছেও ওর দাবী ছিল
বাগবহন। ক্রিয়াকে লুকিয়েই ওর দাবী পূরণ
করতাম। ভাষ্যও ক্রমশঃ দুঃসহ হয়েছিল। কম্পটিন
ম্যাককিঞ্জ সাহায্যে মার্টিন সেকারের মত প্রকাশক পেয়ে
গিয়েছিলাম। পূর্ববর্তী প্রকাশক শিম্কারের সঙ্গে
বিচ্ছেদ হয়েছিল ঠিকই কিন্তু বিরূপতার সৃষ্টি হয় নি।
অর্থের স্রোতে ভটিয়া তান তখন হৃদয়ভূত হবার মূহে।

ম্যাসনারের মধ্যে আধুনিক বিচিত্রতার মানুষের
অনেক আশ্চর্য পরিচয় দেখেছিলাম। সেখানিলাম সকল
হাত পেতে কয়েক পাউণ্ড দান করে সম্মান হাসিখে ট্রেনের
প্রথম স্রেণীতে বসে আছে ম্যাসনা। উজ্জ্বল
কাছে এই বিলাস কলপনাভীত; স্বভাবতই বিব্রত
চোখ মেলে তাকিয়েছিলাম। একমুখ হেসে ম্যাসনা
বলেছিল—ট্রেনে বসাবতী হয়ে বা ওর আমার পোষার না।
ট্রেনে প্রথম পছন্দই করিনা তবে বাধ্য হলে সেটা
আরামটুকুই বা বাতী থাকে কেন!

আশ্চর্য এক বেপারেরা মানুষ এই বরিস ম্যাসনা
হৃদয়ভূত ইউরোপের বিক্ষিত আদম, বিপর্যয়-মৌল
অন্যে বেকার বুদ্ধিগোচর প্রতিচ্ছবি। একটা সূত্র
সম্বন্ধ মানুষ কিন্তু কিছু, কয়েক না, লিখতে পারে কিন্তু
লিখতে না। কথার ঐ ফোটাতে কিন্তু কালের নাম
পড়লেই হাত পুটিয়ে বলবে। সেবার কথা যে তার
ছিল তাতে সম্বন্ধ নেই। ওর লেখা *Memories of
the Foreign Legion* হইবালা ওর হৃদয় পর প্রকাশিত
হয়। ওর প্রতি একান্ত-সমোপন হইবই আমাকে বইটার
ভূমিকা লিখতে উদ্বৃত্ত করেছিল। কিন্তু তাই নিজে
কড় বড় কম ওঠেনি। নরম ভঙ্গিমা মত মনেই
না কি বলছে যে আদি ম্যাসনারের আত্মহত্যার
জন্য মাত। ঘটনাকে কেন্দ্র করে হৃদয়বাহনা পুত্রিকাও
লেখা হয়েছে যেমন নরম ভঙ্গিমা—D. H.
Lawrence and Maurice Magnus: A plea For
Better Manners। আশ্চর্য আমার মানুষের এত বড়

প্রচারিত হুদুদ্বারের দুবোয়ালে পেরেছে সেই নিমিত্তে। তথাকথিত দ্বতরাই বেশী নিমিত্তে। আর ২১৭ নম্বরের কাহিন্যে সমস্ত ব্যাপারটাই এক মতন আসোব আত্মসিদ্ধ। শান্ত মনে অনুভব করছি—পদ্মা সাহিত্যিক-ব্যক্তির সোভে আমায় অর্থায় আমার কপিত কলঙ্কের কথা রচনার উদ্ভূত হয়েছিল ভগ্নাঙ্গ, এবং আরও অনেকে। পদ্ম ভাই তেমন—আমায় নাম মূল্যবন করে ব্যঙ্গনাগের মত অনেকেই হরতো সাহিত্যের আসরে প্রতিষ্ঠার শ্বব দেখেছে। তবিত্যেও হরতো অনেকে দেখে। চাওরা ও পাওয়ার এই বিচিত্র শীলার অপর নামই তো জীবন। এইসব হানুদের দলই আমার সাহিত্য-দলার সঙ্গীতে নানা সুগের সাফা তুলেছে। ওদের অনেকের শ্ববকে সাহিত্যের শ্ববকে আমি সার্থক করার চেষ্টা করেছি—Aaron's Rod এর Argyle চরিত্রের মধ্যে ভগ্নাঙ্গ নিজেই বৃদ্ধ পাবে না। হয়তো অথবা The Lost Girl এর Mr. May যে ব্যঙ্গনাগেরই প্রতিচ্ছবি এ কথা বলার আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমার অনুভূতিতে ওদের আবির্ভাব বার্ষিক হার্মান—এটাই আমার একমাত্র সত্যতা।

সিগলির পাট জীবনে একটা ধ্বংসের মত আবির্ভূত হয়েছিল ব্যঙ্গনাগ। পদ্ম সিগলি তেমন—ওর থেকে কান্না, বেগলন থেকে সাহিত্যিক—সর্বত্র ছায়ায় মত আমাকে অনুভব করেছে ব্যঙ্গনাগ। কখনও দুনিয়ান ভাব্যর লেখাপত্রের বাহ্যে। সর্বত্র ওর সন্ধ্যা একটাই—বর্ণের সন্ধ্যা। কান্নাতে অভিজাত হোটেলের বান করে যা ঢাকা দিয়েছে, পাওনা বিটিকে ওর হানু-পত্র উদ্ধার করেছে আমি। আমার এই হানুই কখনও সৌকর্যের অন্তরালে গান্ধী-সন্ধ্যারের আভ্যায় আসার জমিয়ে বৈলেছে, পদ্ম করেছে সন্ধ্যার ত্যাগের বহু। নষ্ট কান্নাবোতে ওর সেই হুগ জোড়বার নয়। আমার অনেক দেখার, ওর বইয়ের তবিত্যর আমার অনুভূতিতে এই আত্মক অভিজাততার প্রতিচ্ছবি সিগলি করছি। জোড়বার নয় ওরই আত্মক সাহিত্যিক ভ্রম। আমার Sea and Sardinia প্রবল কাহিনীর এইখানেই সূত্রপাত। ভাই লম্বি, আমার জীবনের এক বিশেষ মূহুর্তে অনেক সিগলি জীবনদর্শনের উপলক্ষ হয়ে উপলব্ধ

হয়েছিল মরিস ব্যঙ্গনাগ—আমেরিকা আর জার্মানীর জীবন ব্যাচার এক অভূতপূর্ণ মিশ্রণ। চকল, হরহাড়া জীবনের বন্ধন হিঙ্গ করার মধ্যেও চকল দিতে কদুর করেছি হানুদ্বা। ১৯২০ সালের নভেম্বর মাসে হাট্টার সম্পূর্ণ বিশেষ হয়ে পড়েছিল ব্যঙ্গনাগ, দরবার বাইরে পুঁপুণ অঙ্গেকা করছিল বানার নিয়ে বাবে বলে। হাট্টার জীবনব্যায়র অভূত হানু কঠোরগারের অঙ্ককারে যেতে হাট্টা হল না। অ্যান্ড যেতে আত্মহত্যা করল। ওর শেষ অনুভব—আমায় কবিত্ব করার স্বাধা যেন প্রথম বেশী হয়।

১৯২২ সালের গার্মানোর মতই সিগলির দিনগুলো সাহিত্যদৃষ্টির সমারোহে সমৃদ্ধ। নোটবই পাতার পর পাতা ওলটাইছি আর চোখে পড়ছে একের পর এক লেখা পেল করার তারিখ। গার্মানোভেই পদ্ম করেছিলেন The Lost Girl উপন্যাস। হুদের জার্মাজেলে ব্যাডেরিয়ার হারিয়ে গিয়েছিল পাণ্ডুলিপি। তখন নাম বিহেছিলার—The Insurrection of Miss Houghton। সিগলির পক্ষে হাতে এসে পড়েছিল সেই হারানো পাণ্ডুলিপি। বিবাতার এক বিচিত্র শীলা। সমস্ত সময়ত সব প্রয়োজনীয় বহু পাশে পৌঁছে দিয়ে যায়। কবেক মাসের মধ্যেই উপন্যাসটা শেষ করে ফেলেছিলেন। বিবর্ন প্রবাসে নিশ্চিত হয়ে লেখার সুযোগ পেয়েছিলেন, তা হাট্টা আর্থিক সন্ধ্যা তখন অনেকটা স্বাধারের পক্ষে। আমেরিকায় "The Rainbow" ইত্যাদি উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছিল, ইংলেও প্রকাশক সেকারও অন্তীত পরিণাম তুচ্ছ করে অবিকালেই পদ্ম-হুগে উদ্যোগী হয়েছিল।

আজ মনে হচ্ছে সিগলিতে লেখা হুটো উপন্যাস—The Lost Girl আর Aaron's Rod—হুটোর মধ্যেই প্রেরণার বিদ্যুৎপাণী ছিল কিন্তু পরিণত অভিজাতর বাঁদন ছিল না। হুটো উপন্যাসই বাগহাড়া, আর্থিক বিচিত্র অংশের চেষ্টাকৃত ছোড়াগুলি। কর্ণওয়াল থেকে বিভাজিত হবার পর হাটা আমার সাহায্য করেছিল তামের অনেককেই স্যাটারারের আন্তরিকিতে তেলেছিলেন। কেন্দ্রে তেলেছিলেন আমি না, হরতো ওর সৃষ্টির পাঠ্য

অনেকখানি দখল করে বসেছিল বলেই সেবার বাতায় স্থানান্তরিত করে ভারতীয় গৃহে চলেছিল। পরে সে মন জড়িয়ে বসেছিল বারী—উপন্যাসের নামক Aaron। Aaron আর Lilley's চন্দ্র-আবার আর বারীর মধ্যে আশ্চর্যগত ঘোষণাভার ইতিহাস। Aaron ইংলও ছাড়ার পর কিছু বেশী ভাগই আমার নিজের কথা আমার গোপন বনের মেডা এবং হাস্যরাস্য সামান্য কিছু প্রতিচ্ছবিও। মনে পড়ছে সেই Aaron আর Lilley's সমাল :

Lilley Aaron-কে বলল—দব বান্দুই বলে তাদের প্রয়োজন একজন মেতার, তাই যদি হয় তারা তাদের আত্মকে কোনও নব্বইর আহার কাছে দর্শন করুক না। তুমি Aaron, তুমিও নিজেকে দর্শন করতে গাও। তোমারও অস্তরের কামনা কোনও নব্বইর, স্মৃতির আহার পায়ে নিজেকে খিসিয়ে রেওয়া। তোমার এ কামনা তোমার অতীত নয়, অতীত নয় যে এই দর্শন ভালবাসার দ্বয়োগ্য নয়। এ যে আহা হৃদয়, তা তুমি ভালভাবেই জানো। কিছু এই কামনার কণ্ঠে তুমি জ্বলবে তবু হার মানবে না। তুমি ব'লে গেলেও হার মানবে না। স্মৃতির হৃদয়ই জেনার একমাত্র পরিপন্থী...।

দুঃখের মাঝে নেবে এল নিশ্চয় দীর্ঘবতা। Aaron একবার Lilley's বৃক্ষের দিকে চেয়ে দেখল। এখন করছে Lilley's হৃদয়, একটা ছায়ার আবরণ পড়ে বনে হচ্ছে হৃদয়ের বত। নবীর বত তাবলেশহীন হৃদয়।

“ফার কাছে আমি আহ্নদর্শন করবো।” Aaron আনতে গাইল। “তোমার চান্নাই তোমার বলে সেবে” ভেবে এল অপরের উদ্ভব।

১৯১২ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯২২ সালের ফ্রেব্রুয়ারী—বহর দু'রেকের মধ্যে দুটো উপন্যাস ছাড়াও অন্তর্ভুক্তো লেখা যে কি করে লিখেছিলেন তা আজ ভেবে ঠিক করতে পারছি না। সিন আর রাত শূন্য যে লিখেছি তাও নয়। সুযোগ পেলেই এখানে ওখানে বেড়িয়ে বেকাডার। হান্দকে যেতে মন জ্বলন প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিল—পাখী, পদ্ম আর নুনের মধ্যে সন্ধান

করছিলাম শূন্যের নুনের, রহস্য। উপন্যাসের মধ্যে অস্তরের পুঞ্জীভূত পুঞ্জ ও বন, মন ও কল্পনাকে প্রকাশ হরতো করতে পারি নি কিছু, দর্শককে উজাড় করে দিয়েছিলাম Sea and Sardinia প্রথম কাহিনীতে। ইতালীর চৌর-কয়েকজন আকাশের হাসি উলসে উঠেছিল এই কাহিনীর হয়ে হয়ে। বইখানা লিখে গতিই শূন্য হয়েছিল। আর শূন্য হয়েছিল “The Fox,” “The Captain's Doll” এর বত ছোট উপন্যাস, একাধিক ছোটগল্প আর কবিতা সংকলন Birds, Beasts and Flowers এর অধিকাংশ কবিতা লিখে। ইতালীর আকাশে বাতাসে ছড়িয়েছিল কবিতার উপকল, অথবা আমার চোখ কবিতার প্রাণবত, আহরণের উপযোগী হয়ে উঠেছিল। উদ্ভব পাখীর ডানার শেরেছিলার কাব্যের ইশারা, গলাল কল আর রঙীন কলসের দল আমার কাছে গোপনে উজাড় করে দিয়েছিল তাদের বর্নকথা। কত চকিত হৃদয়ে যেটি ছোট প্রাণীর মধ্যে শেরেছিলার গভীর জীবনবর্ননের ইঙ্গিত। মনে পড়ছে Zell হৃদয়ে জন্মের গারে বসে বাহ বহর কাহিনী। প্রতীকার হৃদয়ে কাতনা হৃদয় নড়ে উঠেছিল, বঁড়পীর মধ্যে কেঁপে কেঁপে উঠেছিল কোনও জীবিত প্রাণীর বাতনাক্ষিত আঘাত। ছিঁপ তুলে এনে বঁড়পী থেকে হুক করেছিলেন ছোট মাছের দর তুলতুলে শূন্য। হাতের ওপর রেখে দেখেছিলেন ভরাত হৃদয় চিকিৎসকে চোখ বেলে চেয়ে আছে সেই হুক প্রাণ-বিন্দুটুকু। নিবর্তন ধারার বত উৎসারিত হয়েছিল কবিতা :

And my heart accused itself
Thinking, I am not the measure
of Creation

This is beyond me, this fish,
He was born in front of my sun rise,
Before my day.
He outsmarts me.
And I, a many-fingered horror of
day light to him,
Have made him die.
In the begining

Jesus was called the Fish...

And in the end.

এই সময়ে Psychoanalysis and the Unconscious গ্রন্থ শেষ করে পড়ত কর্ণেইলিয়ার এর পরবর্তী বহুমান *Fantasia of the Unconscious*। দুটোই মার্কসের প্রকাশিত হয়েছিল এবং স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে দুটোই লিখেছিলেন অর্বে'র প্ররোচনায়, অর্থাৎ প্রেরণায় নয়। দুজরাং সমালোচকরা কি বলল তা দিয়ে চাখাচাখা ছিল না। বর্তমান বোটবুকের পাতার কোণে চাপ খাটকে সেল। কল লসে কবিতা—*Studies in Classical American Literature*। লিঙ্গলীতে যেন বইটা নতুন করে লিখে ফেলেছিলেন। আশা করে ছিলাম আমেরিকার সমালোচকদের কাছে আমার সমালোচক লজ্জা প্রকৃত স্বীকৃতি পাবে, লেখক বেদগ্ধিতার দায় শো-কে নতুন করে চিনবে আমেরিকার পাঠক। হালের অন্য প্রত্যেক আমার এই আশাকে আমল দেবে কি না, জানি না। আসন্ন দিনের যানবাহন কালে সমালোচক লেখক কতটুকু হওয়া পাবে।

জানি নি তো অনেক কিছুই। *The Lost Girl* শেষ করেই পড়ত কর্ণেইলিয়ার নতুন উপন্যাস—*Mr. Noon*। দ্বিতীয়বার কবি বাল'নের জীবনকে উপন্যাসের গভীর বস্তুর মধ্যে ঢেকেছিলেন। কিন্তু উপন্যাস শেষ হয় নি। এখন কাল হ'র মে-থেকে লেখক বৃক্কের রোগ ঠিক দিয়েছিল। দ্বিতীয় কারণ, একাধিক বিবাহ রীতিনীতির প্রতিকার। সে অবস্থা অনেক পরে, ১৯২১ সালের শেষের দিকের কথা। তার আগেই একটা আকর্ষণীয় ঘটনা ঘটেছিল—বিবাহের বিচিত্র পরিচয় বললেও ভুল হবে না। এডভিনেরা ক্রিমিক্যালার স্বামীর ১০০ পাউন্ডের *James Tate Black Prize* দিয়েছিল, দিয়েছিল আমার

The Lost Girl উপন্যাসের জন্য। আমার অশুদ্ধতা স্মৃতি পুস্তকায় লেখ আর *Women in Love* এল নিকটাত্মক বিবাহিতার বিষয়বস্তু। আমার আত্মকেউ জিজ্ঞাস্য করলে বিবাহীন কণ্ঠে বলতাম—*Women in Love*—এই আমার প্রেরিত সাহিত্য কীর্তি।

কিন্তু সে ছিল বললেও কেউ শুনতো না। আর, আর আমি বললেই তো কণ্ঠে পাথরে বাজাই হয়ে যেত না আমার উপন্যাসের যাম, আমার প্রতিভার প্রকৃত হৃদয়। *Women in Love* প্রকাশিত হবার পর ব্যক্তি লেখককে আক্রমণ করতে তৎপর হয়েছিলেন বহুতা। সেইসব কল্পনা দ্বারা নিজেদের স্বপ্ন দেখতে শেখেছিলেন আমার দুই চরিত্রের আদ্য। হাঃ! আগে থেকেই মারমুখ হয়ে উঠেছিল। ১৯২১ সালের শেষে প্রকাশিত সেকালের চিত্রিত জাফলা হ্যাঙ্কেল টাইম *Halliday* চরিত্রের দ্বারা নিখোর প্রতিচ্ছবি সেবে মারলার ভর ঘোঁষিয়ে—মারমামির মামলা। সেকালের চিত্রিত লক্ষ্যের আভাস ছিল—*Aaron's Rod* এল দাফলা লম্বা হওয়া।

আমি ভাবব দর লক্ষ্যের উল্লেখ। একবার লেখক আমার পিছনে ফিরে টাইবার হৃদ'লজ্জা থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিলেন। তাই ব'পেদের সেই 'লিঙ্গিত হৃদ'তে' ইউরোপ ভ্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হয় নি। আগেই হৃদ'লজ্জার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। জ'ল'লজ্জা, বিবাহিনী, সৌভাগ্যের প্রীতি আকর্ষণ যি: হৃদ'লজ্জাকে বেশ ভালই লাগতো। হৃদ'লজ্জা সে তার লিঙ্গল প্রবন্ধে আশঙ্কিত হয়ে লিখেছে সে লক্ষ্যেও মিই নি ভায়া। এ লক্ষ্যেও ছিল সেকালের লেখক লক্ষ্যেও লক্ষ্যেও লক্ষ্যেও—আকর্ষণীয় আভাস। এই সব বিলম্বের তৎকালে সিদ্ধান্ত করেছিলেন—লিঙ্গল হয়ে সোচ্চা হলে যাম সেকালের—ইউরোপ থেকে আমেরিকা, দ্বিতীয়বার এক প্রাচ থেকে লক্ষ্যে হায়ে।

[ক্রমিক]

বাংলাদেশে বিজ্ঞান-

১৯৭১ সালে দাবীপতাবী-
কাল ধরে। বাঙালীর
বিজ্ঞান মণীষা আত্মকৃতিক
কেনে স্বীকৃতি ও সন্মানিত
লাভ করেছে। বিজ্ঞানের
বিভিন্ন বিভাগে বাঙালীর

সাম্প্রতিক বাঙালী বিজ্ঞান-সাহিত্য

শুভকুমার পাল

★

মৌলিক গবেষণাও সেশনবিশেষের বিজ্ঞানীদের অকুণ্ঠ
প্রণয়নরূপে রয়েছে। এই প্রসঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি
বৎসর বহুসংখ্যক ডিগ্রি, পি. এইচ, ডি প্রভৃতি সৃষ্টি
করে। এতদসঙ্গেও বাঙালী-বিজ্ঞান সাহিত্য এখনও
পৈন্যবদনা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এটা নিঃসংশয়
কোডের কথা।

বাঙালী-বিজ্ঞান সাহিত্যের এই অশ্রুপূর্ণিত্তির জন্য
আমাদের প্রতিভার অপ্রতুলতা বা বাঙালী ভাষার সৈন্য
তত্ত্বা দারী নয়, বরং দারী আমাদের অগেহেলা,
আমাদের উন্নয়োগহীনতা, আমাদের দীর্ঘস্থায়িত্ব।
হাত-ভাষাকে নিয়ে আবেগ কারণে অকারণে প্রায়শই
আবেগ-বিশ্রুততা প্রকাশ করি কিন্তু কার্যক্রে তার
দ্ব্যর্থক সম্প্রদায় গ্রহণে পারি না। এজন্য সেক্ষেত্রে
বহুতর বাঙালী ভাষার উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞান বিষয়ক পুঁথির
সংখ্যা অসুখলিখিত।

তথাপি একদা স্বীকার না করে উপায় নেই যে বাঙালী
বিজ্ঞান-সাহিত্য পৈন্য অতিজ্ঞান না করলেও সে বহুসং
পিত্ত নয়। এই পিত্তির পুঁথির মূলে যে দল মণীষীর
অকাল অস্বীকার তদিয়ে যোগে অকরকুমার, বসিকচন্দ্র,
অঙ্গদীপচন্দ্র, রামেশ্বরচন্দ্র, প্রকৃষ্ণচন্দ্র, অঙ্গদানন্দ রায় এবং
বসীন্দ্রনাথের নাম সর্বপ্রথমে উল্লেখ্য। তবে আমার
আজকের আলোচনা বতর্মান এবং বিগত দ্বু দ্বুকের
বিজ্ঞান-সাহিত্যের মসাই পীষাষক। সাম্প্রতিককালে
বাঙালী ভাষার বিজ্ঞান পরিবেশের যে বহু উদ্ভাষনা
অসেসে, বাস্তবক্রেমে তা কতখানি সূক্ষ্মপ্রদু হয়েছে
তার একটা বর্তমান প্রগেই বতর্মান প্রবর্তের মূল
উল্লেখ্য।

বাঙালী ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের জ্ঞান ও প্রদায়ের

সমক্ষে বড়ো দাবি
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের।
এ বিষয়ে দুর্ভাগ্যবান বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের কাছে বহুবার
গণিতের অনুরোধ জানিয়ে-
ছেন। বাঙালী ভাষার
বিজ্ঞানজ্ঞানের একটা বিস্তৃত

এবং দারী ব্যবস্থা করার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কবিশ্রু,
বাঙালী বিশ্ববিদ্যালয়কে অবহিত করে দিয়েছেন। কিন্তু,
বিশ্ববিদ্যালয় কবিশ্রু, সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের কোনো
সুষ্ঠু ব্যবস্থাই অদ্যাবধি করেনি। সাহিত্য দর্শন
প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কতৃৎপক্ষ দতর্মান তৎপরতা
সেখিয়েছেন, বিজ্ঞান বিষয়ে তার কদামাত্র উৎসাহ দেখালে
আজকের এই পরিভাষার কারণ থাকত না।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত অষ্টমতাত্ত্বিক পুঁথকের মধ্যে
বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। তন্মধ্যে
অধিকাংশই ইংরেজী ভাষার রচিত। বাঙালী বিজ্ঞান
পুঁথকের মধ্যে ডাঃ বুদ্ধেশ্বর পালের পারদীপবিদ্যা, ডাঃ
কে পি বসুর ভারতীয় বনৌর্গি হাড়া উল্লেখ করার বত
আর কোনো বই নেই বহুই চলে। তবে, "বিজ্ঞানিক
পরিভাষা" বইখানি প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয় নিজের
মুখ রাখা করেছেন। অনুদায়ারপের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষা
বিভাগ কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদা করণীয় অনেক
কিছুই ছিল, কিন্তু ডি, এস, সি, পি, এইচ, ডি পুঁথিতেই
বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎসাহ নিঃশব্দিত হয়ে থাকে। আর
সম্প্রতিই সেই সব বসপুঁথকের খুব কম ব্যক্তিই হাত-
ভাষার দখল সন্ধান রেখেছেন। বাঙালী ভাষার বিজ্ঞান-
জ্ঞান সম্ভব নয় এই জ্ঞান বাঙালীর বসবর্তী হয়ে তদ্রি
প্রায় সকলেই বিশেষী ভাষার শব্দাশ্রয় হয়েছেন। কিন্তু,
কিন্তু তেমনে দেখেন নি, যে ভাষার মানব-বনের কার্যযোগি
হিসেপালিত বিভিন্ন ভাবানুভূতিক অস্তর্বা সূক্ষ্ম
বাসীয়ে দিয়েছেন বাঙালীর সাহিত্যকারগণ, দর্শন ও
শিল্পের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পুঁথু জটিল তথা ও তত্ত্ব; যে ভাষার
সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মপে পরিবেশন করা সম্ভব হয়েছে দাবী-
জাবে, সে ভাষার বিজ্ঞানের স্বজ্ঞ, সবল অদ্যাবধি

ভাষ্য কেন পরিবেশন করা যাবে না। বাঙলা ভাষার শব্দটির রহিত এবং সেই সঙ্গে সংস্কৃত শব্দকোষ থেকে প্রাপ্তবা ঐশ্বর্য়ের কথা চিন্তা করলে কিছু বাঙলা বিজ্ঞান সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্প্রদায়ের মততা সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ থাকে না।

বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচারে বিশ্বভারতী প্রকাশনের প্রচেষ্টা সভ্যই প্রদর্শনীয়। বিশ্বভারতী প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যালয়গ্রন্থ এবং লোকশিক্ষাগ্রন্থমালা বাংলায় শিক্ষিত সন্মাজের একটি বহু অসংখ্যত অজ্ঞাতব্য হতে করেছে। "দার্শনিকের সহিত সাধারণ মনের যোগসাপ্রবেশ" জন্য বিশ্বভারতী জ্ঞানবিজ্ঞানের অবাণী জ্ঞাতব্য বাবা বিগতের দর্শনসাহারনের উপদোষী করে পরিবেশনের অভিনবনয়ীর ব্যবস্থা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়গ্রন্থের পত্রাধিক পুস্তিকার মধ্যে "জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার", "ভাষ্যভেদে বস্তুজ", "ভাষ্যভেদে বস্তুজ", "কনজভেদে দোকার কথা", "দুরেক্ষ", "আপ্টোম্যাটিক", "টিউবাইন", "কুইনিন", "বহুদূরের বাতাসতুল্য", প্রভৃতি প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির অবশ্য পঠনীয়। পুস্তিকাসমূহের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলি বিশেষজ্ঞের দ্বারা বিশেষভাবে লিখিত এবং সন্মাজার্থে পাঠক-সাধারণের গ্রন্থ অজ্ঞাতব্য এবং সরলের স্বল্পতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। পাঠকদের ক্রমবর্তী কথ্যও স্পষ্ট রাখা হয়েছে। পরিমিত পরিমিত প্রতিটি বিষয়ে যতটুকু তথ্য পরিবেশিত হয়েছে সাধারণের পক্ষে তার বেশী কিছু জ্ঞানবার প্রয়োজন নেই। রসীপ্তন্য বিজ্ঞান-সাংহত্যের ভাষ্যার্থীত সন্তোষ যে অভিনব সোষণ করতেন সেই আদর্শ সম্পূর্ণে রেখেই এই পুস্তিকাসমূহ রচিত। অনুবাদগ্রন্থের জন্য সেবা তথ্যবিশিষ্ট পুস্তক-সমূহে অবান্তর, অবৈজ্ঞানিক দলপদ্য, কৃত্রিম্যগ্রন্থ হ্রাসক প্রভৃতি বিশেষ তরলীকরণের যে অর্থোক্তিক প্রবর্তা রেখা যায়, বিশ্বভারতীর এইগুলি তার অন্য ব্যতিক্রম এবং সুদৃষ্ট প্রতিবাহ প্রবর্ত।

বিশ্বভারতীয় পরেই বলীয় বিজ্ঞান পরিদপ্তর
ভূমিকা উল্লেখ্য। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান পরিদপ্তর একটি
অভিনবন্যোপায় কাঙ্ক্ষিত করেছেন 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'
নামক বাসিক পত্রিকাটি নিরবিরত প্রকাশ করে। 'জ্ঞান'

ও বিজ্ঞান'ই বর্তমানে বাংলা ভাষার প্রচলিত একমাত্র বিশুদ্ধ বিজ্ঞানপত্রিকা। এবং এই পত্রিকা দীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসর ধরে নিরন্তর প্রকাশিত হয়ে আসছে এটা সত্যই আশার কথা। জনসাধারণের, সম্পাদনামণ্ডল্যে এবং হৃদয়-পরিপাটো 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' উক্ত প্রশংসার দাবি রাখে। তরুণ লেখকদের মধ্যে-বিজ্ঞান সাহিত্য রচনার উৎসাহনা সকার করে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের' সম্পাদক মহোদয় বাংলা ভাষার অপেক্ষ কল্যাণ করেছেন। অক্ষপাত্র, পরার্থবিদ্যা, বহুবিস্ময়, জীবিতবিদ্যা, রসায়ন জীববিদ্যা, পারমাণবিক প্রভৃতি নানা বিষয়ে তথ্যসমৃদ্ধ সুবর্ণাট্র প্রবন্ধ প্রকাশই "জ্ঞান ও বিজ্ঞানের" বৈশিষ্ট্য। এই পত্রিকার প্রকাশিত বাণীভঙ্গী এবং পরিবেশন-রীতি পাঠকদের মনে বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নতুন আশা না জাগিয়ে পারে না। বিজ্ঞান পরিচয় কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য পুস্তকও প্রকাশ করেছেন 'লোকবিজ্ঞান গ্রন্থালা' এবং 'বিজ্ঞান প্রবেশ গ্রন্থালা' নাম দিয়ে। এগুলি মধ্যে চাণ্ডীচরণ ভট্টাচার্যের পরার্থবিদ্যা, ডাঃ হুস্তেন পালের হর্ষোদ, নীলরতন ঘরের আবারের বায়ু, প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অসদৃশচন্দ্রের 'অব্যক্ত' বইটির পুনঃপ্রকাশ বিজ্ঞান পরিচয়ের অন্যতম সর্বশেষ কীর্তি। "বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান" নামক গবেষণা পুস্তকটি প্রকাশের জন্যেও বিজ্ঞান পরিচয় ধন্যবাদী।

অন্যান্য প্রকাশক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে অবগত হওয়া
 বাস্তবিক হওয়া কঠোর পরিশ্রমের ফল। সাহিত্য-
 পত্রিকাগুলিতেই অসংখ্য নতুন লেখক এবং নতুন বই
 এর সাক্ষ্যের বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে! কিন্তু বিজ্ঞান
 বিষয়ক বই এর বিজ্ঞাপন কালেভদ্রে কৃষ্টিগোষ্ঠের
 তার কৃষ্টিত আত্মপ্রকাশের বিধা নিয়ে। সম্ভবত
 বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক প্রকাশের ব্যবসায়িক দৃষ্টান্তের
 অভ্যর্থনাই প্রকাশকের বিজ্ঞান এর প্রকাশে হতাশার
 কারণ।

এবার বাঙালিসত্তা অবলম্বনের কথা বলবো। যে সব প্রবীণ বিজ্ঞানদায়কের দ্বারা বাংলার বিজ্ঞান-সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে তাদের মধ্যে প্রিন্সিপাল ভট্টাচার্য, ডাঃ হরেন্দ্রকুমার পাল, প্রিন্সিপাল ভট্টাচার্য, 'বন'ত

রাজশেখর বসু প্রভৃতির দ্বারা সর্বাঙ্গগত। বীরেশ্বর বসুশ্যামাচ্যার ভাষ্যবিত্তোত্তর বসুশ্যামাচ্যার, ভাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য, ভাঃ বিশ্বনাথ রায় প্রভৃতির নামও নানা কারণে উল্লেখের দাবী আছে।

শিশুদের জন্য বিজ্ঞান-সাহিত্য রচনার চেষ্টাও কিছু কিছু হয়েছে। কিছু অধিকাংশ রচনাই হৃদয় বা হৃদয়-কথার চেষ্টা লিখিত। তথাকথিত গল্পছন্দে লেখা বইগুলি হৃদয়ের কুশলার, আবেশের আভিভাষ্য, এবং আভিকথনের দ্বারা ব্যর্থ হয়ে গেছে। সম্ভবত, শিশুদের জন্য বিজ্ঞান-পরিবেশনের টেকনিক আবহাওয়া এখনও আয়ত্ত করতে পারি নি।

জগদীশ্বর রায়ের রচনারীতি এ বিষয়ে লেখকদের পথনির্দেশ দিতে পারবে বলে আমি মনে করি। আশুতোষ দায়েরী করেক খানি সুন্দর বই প্রকাশ করেছেন। 'শিশুসাবী' 'শুভভাষ্য' 'বৌদ্ধিক' প্রভৃতি শিশুপত্রিকাতে ভালো বৈজ্ঞানিক রচনা মাঝে মাঝে চোখে পড়ে।

বিজ্ঞান প্রচারে বিভিন্ন সাময়িক পত্রের ভূমিকার কথা উল্লেখ না করলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পত্র-পত্রিকা আত্মাধিত বাঙালীদেশে ছব কম পত্রিকাই বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনা প্রকাশে উৎসাহী। এ জন্য পত্রিকা সম্পাদকগণ বড় দায়ী, তার চেয়ে অধিকদায়ী বাঙালী পাঠকের বিজ্ঞান পরাত্মকতা। কারণ, শেখপদ'র পাঠকরাই পত্রিকার দ্বারা পরিচালক এবং বিরামক। তাদের হুঁচকি পত্রিকার মোজা তৈরী করে। সুতরাং বর্তমান বাঙালী পাঠকের বিজ্ঞান হসিক করা সম্ভব না হচ্ছে

ততদিন বাঙালী সাময়িক পত্রে বিজ্ঞান আলোচনার যত্নাচর্য' নিয়ে হেয়োক্তি করে লাভ নেই। কিন্তু কে এই পঠিকরুঁচকে বিজ্ঞান-দ্বন্দ্বী কথার পৌরোহিত্য গ্রহণ করবে তা বলা কঠিন। তবে বাঙালী দেশের জনপ্রিয় এবং ব্যবসায়িক দিকে থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত পত্রিকা-গুলি এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। হাত,ভাষার কল্যাণের জন্য তারা যদি তাঁদের মন'র পত্রিকার অন্তর্ভুক্ত করেকটি পুঁঠাও নিম্নক বিজ্ঞান আলোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট যত্নে তা হলে ছব ভালো একটা কাজ করা হবে। অবিন্নিত বিজ্ঞান পত্রিকা ছব কর পঠিকই শেখার পদ' করবেন। কিন্তু সাহিত্য পত্রিকার গল্প কবিতার সঙ্গে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠক মনে একটু একটু করে আভিত কাটবেই কাটবে। বারিক বদ'মতী, বদ'মতী, বিংশ শতাব্দী, প্রবন্ধ পত্রিকা প্রভৃতি পত্রিকা ইতিমধ্যেই প্রতি সংখ্যাত্তেই কিছু কিছু বিজ্ঞান প্রবন্ধ প্রকাশ করে বদ'বাদ' হয়েছে। এইসব আভিজাত পত্রিকার প্রকাশিত প্রবন্ধ পাঠক মনকে অজ্ঞাত-মাঝে বিজ্ঞানের দিকে আকর্ষিত করতে সক্ষমতা করবে।

বাঙালী বিজ্ঞান সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাধিত হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। সংগ্রহিত বিজ্ঞান সাহিত্য পাঠের চেয়ে রচনার দিকেই উদ্বীপনা অধিকতর হলেও আবহাওয়ার পরিবর্তন সাধারণ পাঠকের মনকেও বিজ্ঞান সাহিত্য পাঠে উৎসাহিত করবে এটা আশা করা অমূলক নয়। এবং শিকড়ের দ্বারা যেখানে ক্রমবর্ধমান মে দেশে যদি বিজ্ঞানের বদ'যোগ্য কথর না হয়, তা হলে তার চেয়ে হোভের বিবর আর কী হতে পারে।



হুলো পারে লয় : কুশল
মিত্র : এই ভগ্ন কলকাতা।
হেঁচ টাকা।

একাত্তর : মানবের
বলোপাধ্যায়। অত্যাচার
প্রকাশ বিশ্বের, কলকাতা।
হুইটাকা।

জীবনের জয়গান :
উদার কা, মানব। হুই টাকা।

হলের আকাশ : সত্য : জয়ভগ্ন, কলকাতা।
হুইটাকা।

হুলো পারে লয় : বিজ্ঞানীতে কবি বলতে
চেষ্টাছেন কবিতা একান্ত আত্মগত। "ভীর লয় নবীর
জলের মতই আনন্দের সৈন্যবিন জীবনের সেই বিরহ
মিলনের আর সুখ দুখের কথা উলঙ্গ করে নবের
কিনারে। তখন প্রেমের বহুবর্ণ হয়ে, কোলাহলে মেঘ,
বাতি আকাশ উজ্জ্বলিত হয় রকে, গুলে। সেই উজ্জ্বলিত
লগ্নে কবিতাই জীবন স্রোতের ঘাট থেকে বহুর মতো
তুঙ্গ আনে কলস ভরা জল।"

'হুলো পারে লয়' কুশল মিত্রের সেই সত্তেরটী
কলস ভরা জলের আরতি। তিনি স্রাভ—ভীষণ স্রাভ,
সংসেধনশীল সংকুচিত তাঁর আত্মা, চন্দার পথে নহু আর
ভর বিহীন চোখে অকল্পিত ভিত্তাশার ঢেউ : মৃত্যু না জীবন
—ভালবাসা না বাহুড়া। কী নিয়ে বেঁচে থাকা যায়
এ পৃথিবীতে—কৃত্রিম, আনন্দ, প্রেম, কাত্য, গাঙ্গি ?
অকল্প চিহ্নের গজালিকা। তিনি কখনো বলছেন :

"ভয়ের আকাশ আর মৃত্যুর পতঙ্গ হয়ে ডাই
অন্ধকার সমুদ্রের ঢেউও ঢেউও আনো সে হুলে।"
(জীবন মৃত্যু)

কখনো বা

"তবু যেন কোবার কবর পৃথিবীতে
হয়েছে যেতর্গিন হাতার গভীরে,...
...বলেছে সে—কিছু কবা আছে এই কবরের বুকে।"
(একদিন শ্রাবণ চোরে)
ইউরোপে ডেকাডেন্স সাহিত্য রোমান্টিসিজমকে

নতুন বই

আক্রমণ করে গড়ে ওঠে নি।
তার পেছনে ছিল পর পর
হুঁটী মহাদুস্তের বীভৎসতম
ইতিহাস। আর যে ইতিহাসের
গড়ে গুলিত কুণ্ড রোপীর
মত জয় নিবেছিল প্রত্যহণ,
অবিশ্বাস, হতানন্দ। বাংলা
সাহিত্যে সেই উজ্জ্বল

আত্মনামী করতে চেষ্টাছিলেন কুশল দেব বলুর মত কবিত্বজন
কবি—বলুর জয়ের পেছনে বঙ্গের মতো কোন সংগত
ইতিহাসের কারণ ছিল না।

কুশল মিত্র 'রোমান্টিসিজমের' নামে সে রকম
কোন অসংমাননিক ব্যাখ্যিতে ভুগছেন না। ভুলছেন
না বলেই তিনি আত্মনামী অভিনন্দন পাণ্ডুর ঘোষা।
গ্রীষ্মের সন্ধ্যা সন্ধ্যা কথা বলতে ভালবাসেন। মিটুতা
তাঁর লক্ষ্যভিত। সন্ধ্যা সন্ধ্যা চোখে মেঘগাথিত আছে।
'ইমেজ' ব্যবহারে মাঝে মাঝে বৌর জাঘাঘা লুকোচুরি
খেলার মত এক একবার জীবনানন্দ নামকে স্মরণ
করিয়ে দেয়। যেমন—

'লেগলী মৃত্যুর হতে এক কালি জ্যোৎস্নার বায়ু।'

কিন্ধা—

'কৃশাণা জল সেতে আনো বাবে কি' 'কি' ডাকা
শোকারের বাসে'

অথবা—

'নবীর আত্মলগ্নি হয়েছ তো পৃথিবীরই অন্ধকার
চুলে।'

গ্রীষ্মের কবিতার 'ইমেজ' রনকে সংসেধনশীল করে।
কিন্তু যেখানে তিনি নিভস্ব সন্ধ্যা ও সন্ধ্যা কথায়
উপস্থিত সেখানে তিনি চিরকল্প বিচ্ছিন্ন, আত্মলগ্নিকারে
বিচ্ছিন্ন, আশন অগ্নিতে অন্তর্গত কিত্ত, অন্য কোন
বাক্য সত্য শেখাতে অক্ষর। যেখানে জীবনানন্দ
স্বার্থক ভাবে উজ্জ্বলিত ও উজ্জ্বলিত। কুশল মিত্রের
নিষ্ঠা আছে। ভালো ও বঙ্গের সন্ধ্যা তিনি উজ্জ্বলিত
হতে প্রয়াসী। তাঁর 'হুলো পারে লয়', 'ভয়ের গিরে',
'জীবন মৃত্যু' কবিতা তিনটি ভাল হয়েছে।

একাত্তর : বানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'একাত্তর' তাঁর লেখার নিদর্শন। তিনি লিখছেন এবং প্রায়ই লিখে থাকেন।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় হৃদয়তঃ চিত্রবর্ষী কবি। মন-শীলতা তাঁর কবিতার ঘরের সমুদ্রে কনকর্ণাশা মেঘেটীর মত অবস্ফূর্তন দিয়ে বসে আছে। এ বসে থাকার পেছনে তাঁর ইচ্ছাকৃত কোন চাতুরী বা হলনা নেই। যেন ঠাণ্ড অভ্যাসের ফল। আধুনিক অনেক কবিই যুক্তিক প্রসূত বুদ্ধি বৃত্তির বৃন্দকান্ঠে বসি যেন পাঠকের উপদ্রবী হন। জ্যামেতিক রেখার সোশক গারার হারিয়ে ফেলেন নিজের অস্তিত্বকেই। সে দিক থেকে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় হৃদয় ও ন্যায়বিক। অন্যথ্যক ভাবে তিনি অনেক সময় ইচ্ছাকৃত পক্ষ যোগ্যের নিষেকের দৃষ্টোদ্য করতে গড়েই হয়েছেন, কিন্তু কিছুকালের পর তার সেই সহজাত সম্পর্কের বৃদ্ধিটীতে আবার ফিরে এসেছেন মনের অবচেতন প্রক্রিয়ায়। এ রকম নম্রীর মেলে তাঁর 'বেলা অনেকা' 'নানা গ্রন্থের গান', 'হৃদয়বর্ষী' 'হাস্যের ঝালা' কবিতাদুগ্ধোতে একাধিকভাবে।

পক্ষ ব্যবহারে তিনি স্ব-সিদ্ধ হস্ত নন; অনেক সময় তখন ও তৎকাল পক্ষের পাশে গ্রাম্য ভাষার অথবা প্রচলিত চমক লাগায়—দৃষ্টান্ত করে কবিতার অঙ্গ। তিনি অনেক বেশী বলেন। অথচ আরো একটু সচেতন হলে অনেক বলাকে 'Symbolic' এর মাধ্যমে সংযত ও সংহত করতে পারতেন। তাঁর কবিতার 'ইমোশন' পরিবর্তন জীবন যৌবন সম্পর্কে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন দৃষ্ট প্রত্যয় অনুভব করা যায় না। চিত্রার ক্ষেত্রে Contradiction বিশেষ নতাস্থার ইতিহাস প্রসূত। মোটামুটি কবিতাদুগ্ধো আধুনিক পর্যায়ভুক্ত।

কবিতার জগৎগামি—কবিতার জগৎগামি উদ্যোগের উদ্দেশ্যে কবিতার সংকলন। কবির উদ্দেশ্য মহৎ, ইচ্ছাও বৃহৎ। কিন্তু যে কলাবিশুদ্ধতা ব্যঙ্গনা প্রকাশ জগৎগামি চৈতন্যবিশ্ব এবং সমস্ত পক্ষ সম্ভাষণের সমস্ত কবিতা উত্তরিত হয় তাই একাত্তর অনুশীলিত কবিতাদুগ্ধোতে।

আমার মনে হয়... আধুনিক কবিতায়... পরিচিত...

অনুশীলন কবিতাকে বসোষ্ঠী'নতার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

হৃদয়ের আকাশ : হৃদয়ের 'হৃদয়ের আকাশ' একই সোরে হুটুই যে কলা নৈশুদ্যের অভ্যাসে উদ্যোগ বা কবিতাদুগ্ধো উত্তীর্ণ হতে পারে নি। পিছল গ্রন্থীদূত কথার আড়ম্বর, অথবা হৃদয় বৃত্তের প্রতি কোকি বা বিশ্বাস, হৃদয় পক্ষ বৃত্তের প্রতি প্রবণতা সম্প্রদায়ের দৃষ্ট একটি কবিতাকেও অস্বস্তি জন্মে দৃষ্ট করেছে। যেন : "আকাশ পানে চেয়ে চেয়ে হুটুই আত্মকর" 'দীর্ঘায়ার শীতলীন পথে মন ভাবনা হারায়'। " (অনুদান)

কিন্তু :

"প্রাণ পক্ষিক হারেক গীতাও ফিরে"
"পথের গারে গারে পদ্য"
"প্রিয় নদীর প্রান্ত হব।"

(পক্ষিক ও প্রান্ত হব)

এ রকম অনেক উদাহরণ টানা যেতে পারে। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চোখ' কবিতাটি ভাল হয়েছে। চোখ থেকে তিনি যেন দ্বারা করেন—বলিষ্ঠ চিত্রা, মনন এবং পক্ষিক ভাষার প্রকাশ।

—কমলেশ দে

জগৎগামি—জগৎগামি সুরোবধূয়ার দম্পতি। প্রকাশক—প্রকাশ 'মিথি', এবং কলকাতা গো, কলিকাতা-৩ হৃদয় : পটি টাকা।

অধ্যাপক শ্রীমদীন্দ্রকুমার দম্পতির দম্পনভক্ত পাত্রী করিয়া আনন্ডিত হইলাম। দম্পনভক্তের দম্পনভক্তের আলোচনা হালা ভাষার অপেক্ষাকৃত দৃষ্ট। বিষয় লইয়া এখন পর্যন্ত বেশী আলোচনা হয় নাই—এ বিষয় লিখিত গ্রন্থের সংখ্যাও নগণ্য। বর্তমান ভাবে দৃষ্ট বিষয়ের অবতারণা ও বিশ্লেষণ আদ্যাদ্য তরে দৃষ্ট বিষয় দম্পনভক্তের একটি বিভাগে আমর প্রতি দৃষ্টব্যমান দম্পনের অধিকারী। সাহিত্যপিপে সৌন্দর্যবিষয়ে আদ্যাদ্যের পূর্বপুরুষসমূহ যে কৃতিত্ব বিদর্শন গামিরা পিতায়েন তাহা বিশ্বব্যব। আদ্যাদ্য

দুর্ভাগ্যবশত নবজাত ভাষার উপনিবেশ এই রক্তভাতার মধ্যস্থ উপলব্ধি সাধনের পক্ষে বঞ্চিত। নন্দনতন্ত্র বাধ্য। প্রসঙ্গে এই আবরণ উন্মোচনের কিছু কিছু চেষ্টা হইতেছে ইহা স্বই আশঙ্ক্যের কথা। এই কার্যে উক্ত নবজাত প্রবন্ধে অভিনন্দনযোগ্য। তিনি তাঁহার গ্রন্থের সূচনার বক্তোক্তি 'ভাষা' বিভূত করিয়াছেন এবং একটি প্রবন্ধে ভারতের নট্যশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন; আধুনিক পাঠকের উপযোগী করিয়া তিনি প্রাচীন মনীষীদের বক্তব্যের সাহস উপস্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা চাড়া তিনি নন্দনতন্ত্রের কতকগুলি মূলদ্বয়ের বিশদগণন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার 'আমের মরুতবা' 'আম'

বাতবতা', 'আম' সার্বিকতা', 'শিল্পে অধিকারবোধে 'শিল্পে প্রয়োজনবোধ' প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। 'হেলেনীর শিল্পধারণা', 'অবনীশ্বনাথের সৌন্দর্য ধারণা' 'গোলায় শিল্পদৃষ্টি', 'রবীন্দ্রনাথের নন্দনতন্ত্র' প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্য দিয়া তিনি নন্দনতন্ত্র, সম্বন্ধে বিশদ কয়েকজন ভাবুক ও শিল্পীর মতবাদ আপোচনা করিয়াছেন। তাঁহার যত্নভর চিত্তাকর্ষক ও সাহিত্যগুরুগাহিত। মান্য পত্র পত্রিকার মধ্যে বিস্তৃত তাঁহার নন্দনতন্ত্র বিষয়ক প্রবন্ধগুলি এই ভাবে একত্র সারিবিষ্ট হওয়ার জিজ্ঞাসু পাঠক বিশেষ উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই।

—প্রীতিভাষণ প্রবন্ধ—

পড়ুন এবং প্রাক্কক হোন

সোভিয়েৎ দেশ

গ্রাহকদের জন্য নতুন বছরের সুবিধা ও পুরস্কার

(১লা নভেম্বর ১৯৬১ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৬১ মধ্যে দাঁরা গ্রাহক প্রেরিত হবেন)

স্ববিধাজনক হার	এক বছর	দু বছর	তিন বছর
বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষা—	৪.০০টাকা	৭.০০টাকা	১০.০০টাকা
ইংরেজী—	৪.০০টাকা	৯.০০টাকা	১৩.০০টাকা

পুরস্কার : একটি অতিরিক্ত প্রচ্ছদ সমেত বছরের ছয় পৃষ্ঠা প্রশ্নের দেওয়াসম্পত্তি।

সোভিয়েৎ মহাজাগতিক উদ্ভাবন সম্পর্কে একখানি পুস্তিকা

(১৯৬২ সালে এই পুস্তিকা সোভিয়েৎ দেশ অফিস থেকে সরাসরি গ্রাহকদের কাছে পাঠান হবে)

আপনার চীনা সরাসরি আমাদের অফিসে বা আমাদের স্থানীয় এজেন্টদের ঠিকানায় পাঠাবেন।

সোভিয়েৎ দেশ অফিস

১/১, উদ্ভ ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১৬

এ কালের এই

ইউলিগীলটির নাম
'ললিতা' (Lolita)।

লেখকের নাম ভ্লাদিমির
নাবোকক। লেখক হকে

রাশিয়ান, জাতীয়তার
আমেরিকান। বাবা

হিসেন অতি জাত
রাশিয়ান ভদ্রবাদী।

কিন্তু জীবনানুগের বিক
থেকে রাজস্রোহী অর্থাৎ

—লিবারেল। শৃংখ
সরকারী চাকরী থেকে ইস্তফাই দর, তারের ধরনারী

কোটটিকে প্রকাশ্যে বিজ্ঞাপন দিয়ে—নিলামে ভোলায় হত
উদ্ধতান্ত ছিল তাঁর হকে। সরকারী আভ্যাতারী হাতে

প্রাপ্ত দিয়ে তার নাম দিয়েছিলেন। তিন শৃংখ বলশেভিক
বিরোধী নবোচ্চাঙ্কের প্রাপ্তও যেতে পারতো বিলম্বে। কিন্তু

ইংরেজ গভর্নমেন্টের কোলে-পঠে মাননীয় নবোচ্চাঙ্ক তার
আগেই পালানেন কয়ালী দেশে। সেখান থেকে

জার্মানী অবশেষে ৪০ নালে আমেরিকা। মার্কিন মন্ত্রকে
নবোচ্চাঙ্ককে অজ্ঞাত রাশিয়ান বাত্মহারা হিসাবে পা

থিতে হর নি। কারণ তখন তিনি আটখানা রাশিয়ান
উপন্যাসের লেখক; তদুপরি অল্পকোডের একখানা

ভিগ্নী তাঁর পকেটে; আত্ম তিনি কণীহিলে ইউরোপীয়ান
সাহিত্যের অধ্যাপক এবং শেখতর পরিচর আমেরিকার

সরকারে অবগ্রহ লেখক।
নবোচ্চাঙ্কের প্রথম ইংরেজি উপন্যাস (Prim) ক'বর

মাগেই বের হর। 'ললিতা' অবশ্য ঠিক তিন
বছরের আগের বই নয়। কেননা বইটি কয়ালী দেশে

প্রকাশিত হয়েছিল ক'বর আগস্টে '৪৫ নালে। আমেরিকার
তিন বছর আগে। ললিতার এই বিশেষে ভূমিষ্ট হওয়ার

কারণ, আমেরিকান প্রকাশকের বইটি প্রকাশে আপত্তি।
এটা এর সাহসীলিগ দেখেন; তারাই এক বাক্যে
দায় দিয়েছেন বইটি শর্শেজাতিক। প্যারীর অলিম্পিয়া

বিশ্ব সাহিত্য

কথাসাহিত্য নবোচ্চাঙ্ক

অবল হালহার

○

গ্রেস সে বকর কিছু পা
নি এতে। তাই তাকে

হাতেই বের হলো এই
বইয়ের প্রথম সংস্করণ।

ট্রান্সলিটের হাতে
শৃংখ চারখানা এসে

আমেরিকায়ও। কিছু
ইংলেতে। গোল বাত্ম

ইংরেজ সরকারকে নিয়ে
শৃংখবাসের হাথ্যে

তার। কয়ালী সরকারে
জানালো যেহেতু বইটি

অত্যন্ত অশ্লীল বলে কিছু সোকার কাহ্নে আশ্চর্যজনন
শৃংখায় তারা এটিকে শ্রবশে সেখতে না গেলে

আনুপিত হবেন। কিন্তু কয়ালী সরকারের সহযোগিত
ভিন্ন তা বসন্তব। কেন না, ইংলেতে এবং কয়ালী

দেশের মধ্যে ব্যবধান মাত্র একখানা খাল। যে কো
বই একলাকে তা ভিগিশবে আসতে পারে। কয়ালী

সরকার শাসনবিজ্ঞানে 'ললিতার' সব কণি রাজেরায়
করলেন।

এদিকে আমেরিকার কোন কোন প্রগতিশীল কাসনে
বের হলো ললিতার আলোচনা। একটি কাগজে

তৎসহ মূল বইয়ের কিছু কিছু অংশও (Ancho
Review)। কিন্তু প্রকাশকরা তৎসহ নিরুৎসাহ। অবশেষে

সহসা একদিন তাদের একজনের মনে বইটির সম্পকে
প্রবল উৎসাহ জাগিলে তুললেন একজন তদুপী পাঠিকা

তার নাম 'হোমবার্ট রিডওয়েল'। প্রকাশক প্রতিষ্ঠা
Putnam-এর প্রেসিডেন্ট ওয়াসটার মিস্টনের কাছে গোট

আমেরিকার হয়ে তিনি আবেদন করলেন 'ললিতাকে —
রিডওয়েলের সুপারিশে মিস্টন পড়লেন। পড়ে অভিভূত

হলেন। আইনগত কোন বাধা নাই। শৃংখায় হাপালেন
সেখতে সেখতে 'ললিতা' আমেরিকার 'বেস্ট সেলার'

পাঠিকা রিডওয়েলও সেই দেশে পাঠকবহলে সহকার
কারণ, এই প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুসারে আবেদনকারী

প্রথম বরের শেষের ইয়াসটির পতঙ্গা পতঙ্গা তার
প্রাণ। পতঙ্গী' দু'বছর পাবে সে প্রকাশকের ভাণ্ডে
পতঙ্গা পতঙ্গা ।

'ললিতা' আত ডাঃ কিভাসের পরই পর্বতিক
আলোচিত। ইউরোপ আয়েরিকার পত-পতঙ্গার একে
কেন্দ্র করে ললিতা অল্লিতার পুরোনো বিভব আত
নতুন করে আবার জীবন পেয়েছে। কারও হতে
বইটি নিত্যই নিকট, কারও হতে সাহসিকতা এমন
দাহিত্য-কীর্তি' আর দ্বিতীয় নেই। ঔপন্যাসিক গ্রাহম
এবের হতে এটি "একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস"।
ভরোথ পার্কারের হতে — "ভাল বই বেশ কথা, উল্লেখ-
যোগ্য বই ভাও ভাল আবার হতে এটি একটি মহৎ
বই।" ১৯৫৭ সালে নিউইয়র্ক টাইমস-এর প্রবাসদরীর
পরে ঔপন্যাসিক এলিজেথ জেনওয়েল বলেছেন :—
Lolita is one of the funniest and one of the
best book that will be published this year.

এটিলাস্টিক পরে গালস্, রোসে — তাকে পুঁথি
দায় পিয়েছেন — One of the funniest of the serious
novels ।

একবারের বতায় এই। অন্যদিকে তার উল্টো।
'নিউইয়র্ক টাইমস' এর বৈদিক পরের দলোচক জানিয়েছে
— 'ললিতা' বৈদিক দুটি ।

"The first is that, it is dull, dull, dull, ...
The second is that it is repulsive," বুদ্ধিমান
দায়ের অনিবার্য একে আলোচনারই যোগ্য মনে করেন
নি। দ্বিবিদ-পর জানিয়েছে তারা ললিতার
আলোচনা করবে না, কারণ 'ললিতা' পর্নোগ্রাফি।
এই দুই দলের মধ্যে নতুন কথা বলেছেন ইংরেজ
দলোচক লিওনেল-হিলিং। তাঁর হতে 'ললিতা'
পর্নোগ্রাফি নয় ললিতা প্রেমের বই। মানব দ্বাধা থেকে
জন্মপদ্যমান প্রেম এ বইয়ের প্রথম এবং শেষ কথা ।

পর্নোগ্রাফি (Pornography) দ্বাটার দলত
হাওয়া কি হওয়া উচিত আদি জানি না। এমন কি
বোম্বার ইংরেজদেরও তা জানা নেই। তা হলে
তি, এইও পরেদকে পর্নোগ্রাফি এবং অবসিমেটির
(obscenity) পার্থক্য নিয়ে দ্বি' প্রবৃত্তি লিখতে হতো

না। কতকগুলি আনা দায় পতঙ্গি' আদি গ্রীস দেশে। তাদের
ভাষার 'Probe' মানে ইংরেজি 'Prostitute' বা আনাদের
কথাব হুগোপতঙ্গীবনী। জেনন জয়েনের 'ইউলিসিস' বা
লয়েসের 'লোভ চ্যাতালিক' লাভার' এই বিশেষ জেপার
নাগীরের জাফি' ছিল না। তবুও এ পতঙ্গের দ্বিতীয়
দশকে জয়েন এবং তৃতীয় দশকে লয়েসের এই বিশ্ব-
বিদ্রুত বই দু'খানার পরিচয় ছিল 'পর্নোগ্রাফি'।
তিরিশের প্রথম বৈদিকতা আত পমেরুতী। পাশ-
পাশ, জালো বদ শীল ও অল্লিতার নতুন দ্বিতীয়
দ্বাধকের মানবের চোখের সামনে জয়েনই হতে থেকে
দুরাঙ্কে বিশ্লিষান। কেননা ইতিমধ্যে আর দুই
দশকে গেতে গেছে। এবং এই দুইটি দশক ব্যাখ্যাত
পুরো দুটো পতঙ্গের সমান। তবুও আত বদন-
অল্লিতার অগাধে কোন বইতে নিবিষ্ট হতে পোনা
নাহ তখন স্বভাবতই বিদ্রুত না হয়ে পারা যায় না।
বিশেষত আনাদের আলোচনা বইটি জাতিতে বাকি'নী
এবং তার প্রকাশকাল — সেপ্টেম্বর — ১৯৫৭ ।

তার আগে কাহিনীটি অবশ্য আনরা পুঁথিতে পারি।
অবশ্যই সম্পদ' নতুন বরণের কাহিনী। বলার কৌশলও
অভিনব। দায়কের জীবনভিত্তে কাগাসুদের অন্তর্গলে
জায়গীর পাতার বলা। অবশ্য পাঠকের কানে শৌর্যনার
আরে জীবন বনজাধিকের হাতে সম্পাদিত এবং তার
দায়গত 'ভূমিকাসর' এটি উপন্যাস ।

দায়কের নাম হাম্বার্ট'। লংকেন্সে — এইচ, এইচ,
(H. H) নামট: প্রোবাক এবং তার দিকেরই দেওয়া।
কেননা দায়কের বিশ্রাস তার চরিত্রের আনব'না-
জুপটাকে তা পুঁথি দেখাবে। সে তাই চায়। দু'হাতে
দলা চপে বরলেও তার স্বত্ব দত্তটাকে সে পুঁথি জানিয়ে
বেতে চায়। হাম্বার্টের পিতা ইউরোপীয়। সে কোন
জাতির ইউরোপীয় না ও তাই। তবে ইংরেজ চোখায়
সে দিতাত কাকার। চরিত্রেও তাই। স্বভাবই তার
সম্মান সেই বহুও সেই। সে তা চায়ও না। তবে
বলে তার কোন কামা সেই তা নয়। আর দ'লতা
মানবের হতো সেও ভালবাসা চায়। যেহেতু বন চায়।
তার এই চাওয়ার বৈদিকতা এই এওটা বিশেষ বরলে
দেখলে সে চায় চর কোন মেয়েকে নয়। বৈদিক তার

নিজের বয়স চারিশোধ' তবুও হাম্বার্টের আকর্ষণ পূর্ণ; ন' থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের কিশোরীরাই। বয়স্ক মেয়েদের সঙ্গ হাম্বার্ট পার না বা পেতে পারে না বহু; ন' থেকে চৌদ্দই তার কবিতা তার আনন্দ, হাম্বার্ট এসের নাম দিয়েছে—N V phit। ন' বছরের মেয়ে চারিশ বছরের পুরুষের সম্পর্কে সামাজিক দরখান আকর্ষণ দিয়ে আমোদের মেশেই নেই; ইউরোপের তো বটেই। হাম্বার্ট তা জানে। জানে খিনা হিসাবে এটা পটভূমির কানে কেন্দ্র রাখবে। কিন্তু সে কারও—দরখান চায় না। এ বয়স সম্পর্কে কথারি ঐতিহাসিক তথ্য, যেমন ভার্জিনিয়া স্ট্রিম নামে চৌদ্দ বছরের একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন! এ্যাডলার এলেন সো, জুগিয়েটেরও ছিল চৌদ্দ এবং দ্বারে এককালে আট বছর বয়স্ক এক বিয়ারিটের মেয়ে পড়েছিলেন ইড্যাঁসি তারা জানা আছে। তদুপরি তার মন তা চায়।

হাম্বার্টের মানসিক পটভূমিতে একটি ঘটনা আছে যা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ঘটনাটি তার নিজের তেরো বছর বয়সে স্কিভেরান একটি মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং প্রেম। মেয়েটির বয়সও তেরো। তার নাম ছিল—'এ্যানিবেল-লি'। ভালবাসার মেয়েটির নাম। যা হোক কিছুদিনের মধ্যেই হাম্বার্টের এ্যানিবেল টাইকাসে মারা গেল। সেই সঙ্গে চিরকালে মতো ভালবাসা আর বয়সের গিসেবটা লিখে যেনে সেলো হাম্বার্টের ভাষাতে।

চারিশোধ'ও হাম্বার্টের তেরো বছরের মেয়েকে বোঝে। ন' থেকে চৌদ্দ তার শাশী। সন্তান্য সম্প্রদায় সকল পূর্বে হাম্বার্ট' তাদের বন্ধুকে বেড়ায়। অবশেষে একদিন সেলো তাকে নিউ ইংল্যান্ডের এক শহরে, দারো বছর বয়সের একটি শুল্কের মেয়ের মধ্যে। মেয়েটির নাম কেলোর হেব ওরকে লিখিত। লিখিত হাম্বার্টের দেওনা নার। বিব্রা মধ্যস্থিত দ্বারের একমাত্র মেয়ে লিখিত। বার বছরের কটকটে কিশোরী মেয়েটিকে পাওয়ার অমর কামনার হাম্বার্ট' বিয়ে করে বসলো তার হাতে। ভারতীয় পাতার এধিকে মনে-মনে প্রতিদিন সে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে মেয়ের দিকে। বা-তা-জানেন না; হাম্বার্টের গোপন ভারতী বৈদ্য তার হাতে

এলো সেদিন তিনি আর বিচ্ছেদে মারলে দ্বাৰতে পারলেন না। এই-বন্ধু'দের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে হুটে বেঁচেয়ে পড়লেন হাম্বার্ট। কিন্তু ন'জি তার নেই হাম্বার্টের হুটেই যেন চন্দ্রান একমাত্র গাড়ী তাকে মিশিয়ে দিয়ে গেল পথে।

শান্তির বিশ্লেষণ কেসলো হাম্বার্ট'। এবার পূর্ব সে আর লিখিত। কিন্তু এই নিরপরাধ অজ মেয়েটা যে তাকে বাবা বলেই জানে, তাকে কুদার পিতার করা যায় কি করে। হাম্বার্ট' অনেক ভাবলো লিখিতা ভাবলো না কিছুই। কিন্তু হাম্বার্ট' ভাবছিল কেসে ভাবতে ভাবতেই লিখিতা একদিন এক ঐশ্বর্যবিশিষ্ট হুজুয়াসে বরা ছিল হাম্বার্টের কাছে। কিন্তু নিরানন্দভাবে। হাম্বার্টের প্রতি তার বিশেষ কো আকর্ষণ বা অনুবোধ নেই। হাম্বার্ট' আর তার সম্পর্ক একটা মতোই স্বীকৃতিমাত্র। সেটা হচ্ছে এই—লিখিত আর অজ নর।

অবশ্য মনে তাই সে এখনও আছে। হাম্বার্ট' এখন তার কাছে তার পিতা। পিতা হিসাবেই তাকে নিউ হাম্বার্ট' বের হল প্রেমের ভ্রমণে। হাম্বার্ট' আর লিখিত দু'য়ে বেড়ালো। আটচল্লিশটি টেটে, হোটেল-হোটেলের ক্রাবে, বেড়োয়ায়। এতটা হোটেলের মাঝে লেখা Children below fourteen free। লিখিতার কো বহু পাগল না এখানে। তার বয়স যে চৌদ্দর কর মনে মনে হাসলো হাম্বার্ট'।

কিন্তু লিখিতা বোরবর হাসবার সব প্রকাশো জানে। মনে হাসে না। কখনও কখনও তার ক্রাি আসে। হাম্বার্ট' তাকে ক্রান্ত হতে বের না। লিখিত তার ভালবাসা। ভালবাসার ক্রান্তি মানায় না। লিখিত অন্য মেয়েদের সম্পর্কে উৎসাহ দেখালে হাম্বার্ট' চিঁচি হয়। কোন কালে অনুগ্রহ প্রকাশ সেলো হাম্বার্ট' ব্যক্তি হর এবং ঐশ্বর্যবিশিষ্টও। লিখিতা যে তার স্বীকৃত লিখিতার কাছে কিন্তু হাম্বার্ট' তা নর। সে এখন হু দাবালিকা। সে ভালবাসে একটি হাকবরশী নাট্যকারকে হাম্বার্টের সঙ্গে তার স্বীকৃতি এখন হলনা মায় হাম্বার্ট' সেটা জানে না। জানলো সে-দিন, যে-দিন লিখিত পালিয়ে সেলো তার ভালবাসার লোকের হাত ধরে।

হাম্বার্ট' নিজের ভাস্কর্যাদির অঙ্ক। এত বড় একটি কঁটার সজাটাও তাই তাকে নিরস্ত করতে পারলো না। সে ললিতাকে হৃৎকতে বের হলো। ললিতাকে সে হারাতে নাগর। কারণ ললিতা এতটা বেহে মায় নয়, তার ভালোলাগা বেহে এবং তার বসেন চৌখ। সে Nymphete।

হৃৎকতে হৃৎকতে যেদিন পাণ্ডা সেল তাকে সেদিন ললিতা আর Nymphete নেই। তার বসেন এখন স্তরের বহর এবং সে জটক সৈনিকের স্ত্রী। হাম্বার্ট কেবলো তার বহরর ললিতার পেটে।

ললিতাকে কিরে আদতে বলে হাম্বার্ট। ললিতা কিরবে না। বহর সে নুনে নড়াই বিশ্বর মে, হাম্বার্ট তাকে ভালবাসে বা কোনকালে বেসেছিল। ললিতা তাকে বাবা বলেই ভাবে। তার ভালোবাসা সেই নাট্যকারের জন্যেই ঘিও আছ সে অন্যমনের কিরাহিতা ন্দ্রী। তবু হিসাবে হাম্বার্টের কাছে জরুরী প্রথমটাই। সে কার ন্দ্রী তা নয়, তার ভালোবাসা তে তাই। ললিতা ভা জানিয়ে দেওয়া যায় হাম্বার্ট ছুটলে সেই নাট্যকারের পেঁকে। নিহঁদভাবে তাকে হত্যার অপরাধেই সে আছ কাপাসারে। রোজনামতা থেকে জানা যাচ্ছে এখনও তার বিচার হয়নি। ভূমিকার সেই বোম্বারজানী সম্প্রদায় মণাই জানিয়েছিল হাম্বার্টের বিচার হয়নি। কারণ তার আশেই গুরুগোষে তার মৃত্যু হয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন ললিতাও মারা গেছে তার সত্যনের স্বরকালে। এই অস্বাভাবিক কাহিনীর অন্তঃপর এখানেই উপসংহার।

একটি প্রশ্ন উঠতে পারে ঘটনাটি নুনে : প্রশ্নবতঃ এটি আত্মকাদকার বাকিনী কোন 'হোরর' (Horror) কিনা? উত্তর না। বরেকের হাম্বার্ট' অস্বাভাবিক চরিত্রের নারক হলেও এমন কি সে মোটেই নারক বোম্বাসাম্পন্ন না হলেও এমন একটি মানব যে, তার হতো বিশ্রীত চরিত্রের মানবের অন্তর্গত হতেও বেশিগল লাগে না। হাম্বার্টকে কহা করার উপার নেই, কারণ সে নিজেকে আদ্যের ভূরে অনেক বেশী দ্বন্দ্বা করে। তাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ এক আত্মক' বিপ্লবের চারুক তার হাতে। নিজেকে বাকিনী টেককে এবং মানবকে ভালোবাসে সে এমন বিপ্লবের বসি হুসেছে কহেঁ যা নুদ্ব পিশাদকত বিবানে নুদ্ব আত্মক'প করে যা ভাবরও। এক কহা ভাবর চমৎকারিত্ব অস্বাভাবিককে স্বাভাবিক করার হতো হুজির সজারতা এবং ঘটনাটি নুদ্বার দাকলো দেবক অভ

স্বচ্ছন্দে 'ললিতাকে' টেনে হুসেছেন একটি অসামান্য বইয়ে হুদ্বাং।

দরীশতা ? বরোকত বলেছেন—রাশি রাশি আয়েরিকান বই—সেখানে পাঠনে তিনি যা লিখাই বদ্রীল। তা হাছা বাকিনী প্রকাশকদের নীতিবোধকেও তিনি যার একটি তথ্য প্রকাশ করে আছ হুসোহ রাশিরে দিয়েছেন। কেউ কেউ নাকি তাকে বলেছিলেন—ললিতাকে বায়ো বহরর বেহে না বলে হেসে করে হিসেই তারা মানবের রাছী বইটি প্রকাশ করতে।

নবকোক তা করেন নি। কে জানে, তাতে পারিতা-সৌরব হাছাও আতকের বাকিনী সমাছ উপকৃত হতে পারে। এতকম বিখ্যাত বাকিনী দশালোচকের হতে বইটি আয়েরিকার দশালোচনা যার। কোন বদ্রীশান ইউরোপীয় বুদ্ধিছীবি এনেছে বলেন, এমেনকে ভালো-বাসােনে কিতু অতর বেরনার মলো ভাঃপর বেহেলে তার ভালোবাসা নিতাতই নাবালিকা ; আয়েরিকা আছও কিশোরী।

কিশোরী মেয়েদের টেনে আনবার জন্যে দারী হুদ্বাংত তার জবাব দিয়েছেন—ইংরেজ দশালোচক ছিলিং। 'কিশোরী জন্য আয়েরিকার বা-বা-বা-বাজা বহর থেকে মেয়েদের চুলের ঠেংহদ্য এবং গছ নিয়ে ভাবিত করে তোলেন। কিশোরী জন্যে তাকে দর্ভক করে তুলসেন ; তার মেয়ের গড়ন সপক' তার চোখের ভাঃ সম্পকে'। ললিতা বাকিনী কিশোরী। ইলিউড মোটসে, নাইট ড্রাব, বিজ্ঞান-পড়া বেহে। এবং তার বা-বা-বাবার হাত এ মেয়ের বনের চরিত্রে অনেকখানি ট্রিলিং শুই বলেছেন : Nabokov aware of which is a good many, the art's of good the boudoir were understood to print to the bed and it they were taught early, they were understood to print to the bed early.

তবে উত্তরযোগ্য এঁই, এই বইখানার বিহুডে এ পূর্বত বত আশিগ যোনা গেছে একটি ক্ষেত্রে হাছা সর্বত্রই তা সব বেরকারী। এবার নীতির তরঙ্গনী হুসেছেন—প্রকাশক, দশালোচক এবং পাঠকেরা, কোন জাতিগ উপাসি নয়, কোন সরকারী বস্তরও নয়। তবে সে যিনের তুলনার আতকের প্রতিপক এত পূর্বণ যে আশ্রীতা পক্ষের নিজের অবদারিত। ইউরোপের বস্তর-পুলোর কলাকল অন্তত, তাই বসে। হুড্ডার ললিতার কাহিনী—স্বাভাবিক কাহিনী।

আপনারা সবাই
জানতে চান্ধেন আমি
হাসছি কেন? দুজুর
দুখোদুখি ঝাঁড়িয়ে
আমার গলা থেকে
কি করে এতখানি
হাসির রোল উঠল
তা হেবে আপনারা
নিশ্চয়ই আঁবা ক
হুচ্ছেন? কি বলুন—
টিক কিনা?

কেন আমি হাসছি
তার কারণ জানবার

অনেক আপনাদের এই অসীত আগ্রহ হেবে আমি অবাক
হচ্ছি। বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের প্রভাব যুগ্মরূপে দুঃখও
হাসি কেটেছে তার কারণ আমি এইমাত্র বুঝতে
পেরেছি আমি কে?

আপনারা বলবেন বেশ জো! তাতে হাসি কি
হোল?

তা হলে মৈত্রী হয়ে শুধু আমার কাঁচনী। এবার
আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন দুজুর দুখে ঝাঁড়িয়ে
আমি এত হাসছি কেন?

পত দু'মাস ধরে প্রতিদিনের প্রতিটি মুহুর্তে আমি
কেবলি ভেবেছি আমি কে? বিদ্যা? মূল্যমান? শিখ?
পুঁজব? জ্ঞানার্ণ? বৈদ্য? ধনী? ধরিত? পূর্ব বাংলা? না
পশ্চিম পাঞ্জাব—কোথা থেকে এলাম? আমি ঢাকা? না
চট্টগ্রাম, লাহোর? না অরুণাচল, রাউলপাণি? না কলকাতা—
কোথা থেকে এলাম? শুধু আমি একাই নই, অনেকে
আমার আসল পরিচয় জানতে চেরেছেন। আমার নাম-
ধান, ঝাতি-মূল্য মানবার চেষ্টারও অন্ত নেই তাঁদের—
কিন্তু কোনদিন সে বহুসংখ্যক সমাধান করতে পারেন নি।
এখন সেগুলো আপনাকে থেকেই মনে পড়ে থাক্বে। অথচ
এবনি ভক্তাঙ্গা যে আমার শেষ পন্থা আসল।

এইজন্য হিলাবে ধরে নিজেকে আর কষ্ট দেবেন না

স্বর্গ হ'তে বিদ্যা
ত্রয়্য যন্ত্রণা



চাকারবাবু! আপ'!
আমাকে হাসাব
চেষ্টায় আছেন আমি
কিছু আপ'না
উৎসাহকে আমি ব
কছি না। আ
আমি সব রকম
চিকিৎসার বাইরে
আপনার বিজ্ঞান
আমি অতুল্য করে
পাতি। আনা
অজ্ঞান: নেই ছো
দাঁটো 'অপারেশ

আপনার সমস্ত ধরে ঝাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমার সম
শরীরে দু'চারটে চুহির হাস এখন বিশ্রী ভাবে বহো
না কেনে আপ'নি টিক করতে পারছেন না আপ'ন
কর্তব্য। তার চেয়ে আমার কাঁচনীই গুচন না?

দু'মাস আগের কথা। অন্তিমতি মাস: বিশ্রুদ্যে
পর জ্ঞান হলে সেদি বিল্লীত সবকারী হাসপাতা
তবে আছি।

'তোমার নাম কি?'—চাকারবাবু জিজ্ঞেস করলেন
আমি ভাবতে লাগলাম। অনেক চেষ্টা করলাম ম
করবার। অনেক সাপনা করলাম। মনের খোঁজা
ভাব দূর করবার। শেষ পর্যন্ত বোধ হযেই বলতে হো

—'মাগ করবেন চাকারবাবু—নামটিক মনে আসছে না
'জুনি বিদ্যা না? মূল্যমান?'—আগের চেয়ে অ'পে

শক্ত প্রশ্ন করলে চাকারবাবু।

এবারও আমি উত্তর বিলাম—'সেটাও টিক বল
পারব না।'

মন থেকে কখন যে মুছে গেছে হেলে আসা দি
বাংবের—এর স্মৃতি তা আমি না। মনে নেই আম'
যদি কি? কোথায় আমার কাঁচনী? কোথায় রয়েছে ক্রী-পু
আমার মনে নেই আমি বিবাহিত না চিরকুমার? বহু
সম্পর্কে কোন ধারণাই করতে পারি না। তবু অসম্পূর্ণতা
আমার মনে হয়েছিল আমি বোধহয় দুবক। আমার

কেশলাম হাড়ি পৌকে আমার ঘুঘ ঢাকা । এর সঙ্গে কোন
পরিচয় ছিল না আগে ।

নতুন বিল্লিও ডাকাতেরা আমার স্মৃতিশক্তি কিবিরে
আমার সব রকম চেষ্টা করেও বার্ষ হলেন বেশ পবস্ত ।
সব চেষ্টা বার্ষ হতে আমি নিজে চেষ্টা করলাম । কারণ
এ রকম বেঁচে থাকার দুস্তারই অন্য হল । গ্রর করে শুধু
হানতে পেরেছিলাম পাঞ্জাবের কিছু উষ্মত সাধে আমি
এখানে এসেছি । তারের অনেক এই হাসপাতালে
ঘাটা গেছে । তারা হিন্দু না মুসলমান না শিখ—সে
গ্ররের উত্তর হানতে চাইলেই উত্তর পেলাম—তিন
দশরাগেই ছিল । অন্ততর আর সাহোবের মাক পথে
হুটো বিল্লিও হিকটলী ট্রেন আক্রান্ত হয়—এদের মধ্যে
একট ট্রেন পশ্চিম পাঞ্জাবের হিন্দু অন্ততর হাড়িল ;
অপরটতে পূর্ব পাঞ্জাব থেকে মুসলমানেরা আসছিল
সাহোবে । অনেকই নিহত হোল, আহতও হোল বেশ
কিছু । মাকীর পিছন হিকের কামদার শেষ পর্যন্ত যারা
অক্ষত ছিল তারাও কোন অন্ত পশ্চিম আঘাতে
প্রাণবন্দী হল । সেই পতীর রাতে আহতেরা পাগলের
মত ছুটে বেড়াল । এক ঘণ্টা পরে অন্যদিক থেকে যে
ট্রেনটা এলা তার তোয়েও ছুটল ঐ একই ইতিপাতের
পুনরাবৃত্তি !

পরদিন সকাল থেকে সীমান্ত এলাকার সাহাবাঘর
নিযুক্ত হোল । তারাও বেশ অসংখ্য আহত আর নিহত
হাঙ্গল বতীর লাইনের ডান দিকে পড়ে আছে ।

বিচ্ছাদিত তাবে সব কিছু আমাকে বলতে হবে
আমি, কিন্তু বলবার মত সময় কই আবার ? সে রকম
কোন মারাত্মক আঘাত আমি পাই নি । তাই সাত
দিনের মধ্যে বেশ বানিকটা সামলে নিলাম । তবু
ডাকাতবানুদের বারণা সাধারণ মধ্যে বেশ আঘাত পেরেছি
যার কলে আমি স্মৃতিহীন ! তারের এই রোগ নির্ভর
কলেই আমি হয়ে পেলাম মাক-না-মাকা কোন খেয়ালী
মাছ !

তারতপর আব পাকিস্তানের প্রায় সব কটি পত্রিকা
আবার হবি বের হোল । তবু আমার আতীর স্বজন,
বন্ধু-মাছ, কেউ আমার সঠিক পরিচয় দিল না । হত
তারের কেউ নয় আমি কিংবা এই পৃথিবীতে আমিই

হত নিঃসঙ্গ ! উত্তিমধ্যে আর একল উষ্মত এসে
পড়তেই ডাকাতবানু কানালেন আমাকে আর তাঁর
হাসপাতালে রাখতে পাতবেন না । তাই নতুন কোন
আশ্রয়ে চেষ্টা আমিও পথে বেরিয়ে পড়লাম ।

সারা সহর ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লাম দুধা
মসজিদের সাধনে । মসজিদের উঠো দিকে একটা
উষ্মত শিখির গড়ে উঠেছিল ।

শিখির পরিচালকের কাছে লোকা দিয়ে বললাম—
‘আমিও একজন হতশালা উষ্মত । আই হাসপাতাল
থেকে ছাড়া পেরেছি, এখানে আমাকে একটু আশ্রয়
হবেম ?’

‘তুমি হিন্দু না মুসলমান ?’

‘মনে করে ঠিক কিছু বলতে পারব না । বিলাস
করুন আমি শিখা বলছি না আপনাকে ।’

‘ঘুঘই হুগিত, এ শিখির মুসলমানের জন্য
সংরক্ষিত ।’

মুসলমান পথে হাটে হাটে এবার এলাম নতুন বিল্লি ।
একটা উষ্মত শিখির চোখে পড়ল । এক খেয়ালেবক
বললাম—‘আমাকে একটু আশ্রয় হবে তাই ?’

পলার ঘর ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছিল, কোন
কথাও যেন বের হতে চাইছিল না । কারণ পূর্বা তিন
দিন পেটে এক ছোট্ট অলপ পড়ে নি ।

‘তুমি হিন্দু না মুসলমান ?’—খেয়ালেবক কিংলপ
করণ ।

‘এবারও বাধ্য হলাম বলতে—ঠিক বলতে পারব না ।’

‘তোমার নাম ?’

‘সেটাও সঠিক বলতে পারব না । কারণ এখন মনে
আগছে না ।’

‘হাণ করো তাই । এখানে তোমাকে আশ্রয় দিতে
পারব না । এ শিখির শুধু হিন্দুদের জন্য সংরক্ষিত ।

ওখান থেকে বেরিয়ে এলে ক্রমাগত ঘুরতে লাগলাম ।
এক শিখির থেকে অন্য শিখিরে । হিন্দুদের অন্য
শিখির আছে, মুসলমানদের অন্যও আছে—কিন্তু কোন
শিখির, কোন আশ্রয় নেই কেবল হাঙ্গলের জন্য !

সারা দিনের খোঁজখুঁজিতে স্নান হয়ে এবং পায়ে
ঘরবার এক সময় বতীর বাহে অজান হয়ে পড়ে গেলাম ।

উলটে দিকে ছিল ভারত সৎকারের উক্ত পক্ষ কোন এক অতিসারেও বাড়ি। তাঁর নাম সর্দার সাহেব। আমার হৃদয়কে বেধে সত্ত্ব হয়ে নিজের বাড়িতে আমাকে আরাণা দিলেন। 'হুঁ করবার জন্যে' এক কাপ দুধও খেতে দিলেন। কাশের ছুব শেষ হতেই তিনি বেশ লাগু সর্দার বিপ্লবঙ্গ করলেন—'এখন কেমন বোধ করছ তাই ?

অনেক দিন ছিলাম সর্দার সাহেবের বাড়িতে। তাঁর স্ত্রী ছেলে মেয়েরা আমাকে খুব ভালোবাসতো। তাঁদের কাছে আমিও লুকাই নি আমার কাহিনী। সত্যিকারের সব পরিচয় দিয়েছিলাম আমার। তবু তাঁদের ব্যবহারে কোন পরিবর্তন হয় নি। কিছুদিন পরে আমার কোন আশীর বাউলপিত্তি থেকে উদ্ধার হয়ে এলো। তাহের মধ্যে সবাই পরে নির্ধাত্ত হয়েচে, কেউ বা বর্ণান্ত্রিত হয়েচে। তারা সবাই নিজের গোখে দেখেছে তিল তাল করে জ্বের সংসার ভেঙ্গে চুরবার হতে।

অত্যাচারের এই দ্বিতীয় সীলা তাহের অনেক করে তুলেছিল হিংস্র আর বাবেষপূর্ণ। এই কাহিনী গুনতে গুনতে আমিও যেন কি বকম উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগলাম। তাহের কাছে আমার বিচারিত বর্ণনা দিয়ে ছিলেন সর্দার সাহেব। হলের বহু লোকের মুখ থেকে বের হোল সৎসাহুতির হুঁচকিতে শুকনো বুলি। তাই দিয়ে আমি চোঁটা কলসাম আঘাত হারান শক্তি কিরিয়ে আনতে। কিন্তু হলের মধ্যে আমার বহলী ব্যাটা ছিল ভারী রীতিমত সন্দেহ করতে লাগল। এক রাতে ওদের পাশে গিয়ে স্পষ্ট গুনলাম কে যেন কিসকিল করে বলল—'ও কিন্তু বিক্যাবলীও হতে পারে। পুতি নক্তি যদি সত্যি হারিয়ে থাকে তবে নিচুই মূলমাম।' রাতের অন্ধকারের মধ্যেও যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম 'জ্বের সংসার ভরা চাউনিওলো।

সকাল থেকে ঐ চিন্তা ব্যাট ব্যাট করে চলল মনকে। আমি হরত মূলমামও হতে পারি। আঘাত আর পুতি নক্তি হারাবার আগে আমিও হরত ঐ কাজই কয়েছি। সেই কৃতকর্মেই কলই যোগ্য এই দ্বিত্ত

তৎপতা। কোন কিছু না তেবে ঐ রাতের সর্দার সাহেবের বাড়ি থেকে পাললাম। আমার সেই খোলা বাজপথ... আমার গোখের সামনে দুটে উঠল অন্ধতাহাঙ্গর তবিত্ত...।

আমাদের শেষ চোঁটাও যখন বার্ষ হোল তখন মৃত্যুর আশায় জ্বা! মগধিরেব সিঁড়ির ওপর গুটিয়ে পড়লাম অচেতন হয়ে। সেখানে কতক্ষণ ছিলাম জানি না জান হলে তেবি একটি আট ঘণ বহুরে কিশোর আমার সামনে বাড়িয়ে বলছে—'জাশো...ওঠো! আমার মা এই মাঝরক্তলো তোবার জন্যে পাঠিয়েছেন।' হেলেটির কবার চেয়ে খাবারের সোতে আমার চেতনা কিরে এলো। আমি উঠে বললাম। কিন্তু বলবার শক্তি কোথায়? আমার টলে পড়ে থাকিলাম কিন্তু হেলেটি বরে কেলল! বেশ রসিরে রসিরে খেলাম চাপাটি আর ডাল। কি দ্বিত্তি যাক। কি অপূর্ণ রাত্রা! তাবপর হেলেটিকে বললাম—'তোমার থাকে আমার অসংখ্য প্রশ্নম জানিও।'

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আশায় হেলেটির হাত ছুটো টেনে নিলাম নিজের মুঠায়। কিন্তু সেই মুঠাতেই ও যেন আর্দমাৎ করে উঠল—'একি! তোমার মা যে পুড়ে যাবে? চল আমার বাবার কাছে তিনি একজন খুব বড় হাকিম নিশ্চয়ই তোমাকে ভালো করে দেখেন।'

চোঁটা বহুটি আমার সব নিয়ে অস্ত্রাঙ্ক করে তার বাড়িতে নিয়ে জ্বলল আমাকে। ওর বাবা একজন সত্যিকারের ধার্মিক মূলমাম। বুড়ো হয়ে গেছেন তবু এখনও যিনে তিন চাংববে নাখাৎ পড়েন। হাকিম সাহেবের চোঁটার কহিনেই আমি ভালো হয়ে পেলাম। তাঁর মত নামকরা হাকিমও পালেন না আমার পুতিশক্তি কিরিয়ে আনতে। তাঁর কাছে লুকালাম না আমার অবস্থা। সব কাহিনী বললাম—'হরত বা আমি হিছু! আপনায় বাড়িতে থাকলে আপনায়ই কতি হবে বেশী।'

তবু তিনি স্বাকী হলেন না আমাকে ছেড়ে দিতে। 'হিন্দু হলেই বা কতি কি? হিছুও তো; আল্লার স্ট্রী জীব!'

এবার আর একান্তে পাবলাম না।

তবু এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল কহিন পর যাতে আমি বাধ্য হলাম বুড়ো বাড়ি হাকুতে। যিরদাহুয়া

তার ছেলে একদিন আমায়ই হত্যা মন সুমুখে আহাব দিতে গিরে আর কিরে এসে না। অনেক রাতে আমি আর বুড়ো হাকিম ভাকৈ খুঁজতে বের হলাম। পথে যা গুলশান তার প্রান্ত ছিলো না কেউই। ছদ্ম মসজিদ থেকে কিংব আমায় পথে তারা যেন গুকে হত্যা করেছে।

বাড়ি বর উঠল কান্নার বোল। হাকিম বুড়োর স্ত্রী হুঁতু হয়ে পড়লেন। আমিও টিকে থাকতে পারলাম না। প্রতি রাতে তার প্রেরণা আমাকে যেন বলতে লাগল—তোমার মরণের সময় আমি তোমাকে আহাব দিয়েছিলাম কিন্তু তোমাদের একালে লোক আমাকে হত্যা করেছে সেটা তুলে বেগে না।

আমি তাকে সত্যি হত্যা করিনি তবু হুঃসহ স্মৃতি থেকে মুক্তি কোবার? হরত আমি হিম্ম! স্মৃতিপত্র হারাবার আগে তার হত অনেক কচি প্রাপ্তকে হত্যা করেছে তাই বাকি কামে! বরণার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলাম না। তাই একদিন চেয়ে সবার অজ্ঞাতে হাকিম সংবেশের বাড়ি থেকেও পাললাম।

সারা ভিট্টা ছুড়ে নেয়েছে তখন তরুর কান্দো দেহ। প্রকাশ্য বিশ্বাসকে হত্যা আর বড় বড় রাজপথে কলি-বর্ষন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। প্রোভের হুঁশে উৎসাহীন লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরতে লাগলাম আমি। পথে কোথাও শুনেছি বোবাই নাকি শান্ত তাই খুঁজতে খুঁজতে এসে লড়ার বিচার ট্রেনে। সীমান্তের পাড়ি ছাড়বার সময় হয়ে গেছে তখন কোন কিছু নাজেবে চেপে বসলাম গাড়িতে। আমার পাশে বসেছে আমায়ই হত হুঃ এক পাঞ্জাবী যুবক। গাড়ি ছাড়তেই সে জিৎসে কবল—‘তুমি কে তাই?’

হিম্ম হতে পারি, মুসলমানও হব হরত। সঠিক আমি না।

‘এ পথ মুসলমানের পক্ষে জরুর বসে শুনেছি। তোমার হুঁশে বাড়ি তাই বসলাম।’

ওর কাছে বীরে নেও তুলে বসলাম আমার কাছিন। কিন্তু আমার সব কথা শুনেও এখনকারে তাকাচ্ছিল যেন কবার সাথে হুঁশের মিল হুঁকছে। একদম বসে বসল ফিফার ভাতি বাড়ির লোকান হুঃ হুঃ, কেমন করে তার

বোম্বা অপভ্রাত হর। এমন সবস্বাধা হয়ে চলেছে বোম্বোতে—কোন কিছু কাজের আশায়।

তরতপুত্রের কাছে গাড়ি খানিকে আর এক লক্ষা অত্যাচার হল আমাদের ওপর।

সে কথা ভাবলে এখন আমার হালি আসে। সমস্ত ব্যাপার যেন এক পৈশাচিক উল্লাসের উল্লাহ। কি আসে যায় তাতে। আপনায় ভাবতে চান যারা এসব মিষ্টুর হত্যা করে তারা কি বকম কৌতুক অহুতব করে? তাহলে শুধু আমার কথা—

সেই হত্যাকাহীরা যখন কলির্বর্ষন আর হত্যা করছিল তখন তাদের হুঁশে লেগেছিল ‘মহাত্মা কী জর’ গুলি। হুঃর এক মুহূর্ত আসে পথত কেউ না হলে থাকতে পারবে না।

আততায়ীরা যখন আমাদের কান্ডার এলো তখন আমি প্রান্ত হলো আসন্ন কুত্বাতে নিজেকে সম্পূর্ণের আশায়। আমার হুঁশ ছিল লাড়ি ভিত্তি। আমি তাই স্থির জানতাম ঐ চিহ্ন আমার বৃত্তাকে কোমরতে রোদ করতে পারবে না। ওরা আমাকে হুঁশে পাবার আগেই আমার পাশের যাত্রীটি তার ডেকে গিলে আধাকে। আমার কথা জিৎসে করতেই গুলশান ও বসল—‘ও কে বিরক্ত কোর না। লাহোরের হাকিম তীব্র আহত হয়েছে।’

উত্তরে সজুই হয়ে ওরা চলে গেল। পরমুহূর্তে কানে এসো গুলি হোঁড়ার শব্দ আর তীব্র আর্দনায়! কী তীব্র আর মর্ষভেদী সেই আর্দনায়! বামিক পথে গাড়ি আমার চোখে মুক্ত কবল।

পথ পর্বত বিধিরে পৌছালো বোম্বোতে। কিন্তু এবারের নিহতির এর আমার শিষ্ট ছাড়ল না। ‘তুমি কি হিম্ম? তুমি কি মুসলমান?’

আমি কেবল ভাবতে থাকি কে হিম্ম? কে মুসলমান? রেসে কান্ডার আমাকে মুসলমান জেবে যে রকম করেছিল সে হিম্ম? যারা হাকিম বুড়োর মিলান নিজেকে হত্যা করেছে তারা কি হিম্ম? তাহলে মুসলমান কে? যারা রাষ্ট্রপতিজিতে অকণ্ঠশ শিব নারী হত্যা তারা মুসলমান? তাহলে শিব কে? সেই বহাগ হাকিম বুড়ো আর তার পরিবার? তাহলে এতগুলো প্রাণ নিয়ে বিদ্রোহে যারা ছিনিমিনি বেগল ভায়া কে?

হিন্দু কে? মুসলমান কে? শিব কাহা?—

হিন্দুত্ব এই গ্রন্থ আমাকে লাগল করে তুলল।

দুনিয় পড়েও নিশ্চিত হতে পারি না। বঙ্গের ঘরে ঘরে হাকিমশেখের হল অধিষ্ঠিত নিয়ে আমার সামনে এসে তোলে—“তুমি কে? হিন্দু? মুসলমান?...? শিব...?”

বঙ্গের মাঝেই আমি আর্ন্তর্য্য করে উঠি—“আমাকে মুক্তি দাও তোমরা। আমি না, সত্যি আমি কে। আমি হিন্দু নই মুসলমানও নই...আমি কেউ নই...আমি শুধু মানুষ!”

বোম্বাইতে উদ্বাস্ত শিবির ছিল। কিন্তু আমি কোথাও আশ্রয় পাই নি। সব আগে আমাকে জানতে হবে আমি কে? তা না হলে নিশ্চিত বৃথা!

কেউ উপদেশ দিলেন ডাক্তার সিমানীর কাছে যাও তিনি তোমার বৃত্তি বন্ধি কিরিয়ে দেবেন।

অপমানের তা: সিমানীর নাম মিশ্রই শুনেছেন। তাঁর বড় বনসদীক্ষাবিদ ডাক্তার ছিল না তারকবর্ষে। তিনি কোন অপরোচন করেন না। কেবল বোগীফের সাথে কথা বলেন—অন্ততঃ বাধা করান তাকে কথা বলতে। কি ভেবে আমিও গিয়ে হাতির হলান তাঁর কাছে।

হাতির ফেওয়ালগুলো লক্ষ্য পাথরে ঠেঙে। ডাক্তার-মাস’ফের পোশাকও লক্ষ্য। প্রত্যেকটি জিনিষ পরিষ্কার স্বকলকে তত্বতকে। সবচেয়ে সুন্দর ডাক্তার সিমানীর গলার বর।

আমাকে ঘেঁষে তিনি একটু বৃদ্ধ হলে বীতে ধরে বললেন—“তোমার মনের ঘরখা তুলে দাও। খোঁজ করে বন্ধ রেখ না। মন থেকে যে সব কথা বেরিয়ে আসছে তা অব্যক্ত বা অপ্রসঙ্গিক বস্তুই হোক না কেন তাকে বাহ্যতে ফিঙ না।”

তিনি কাগজ পেলিল জানলেন আমার কথাগুলো লিখে নেবার অন্তে।

যেমনকোন কেসে আসা অতীত থেকে কোন অনন্তের স্রবীল গগন থেকে এলো আমার মনে। বঙ্গশ্যামল ক্ষেত্র ঘের—

‘বেশ হচ্ছে বলে হাও’—তা: সিমানী আমাকে উৎসাহ দিলেন। আমি বেশ স্পষ্ট ওনলাখ তাঁর দেবার বস বস লক্ষ।

আমার মনের মধ্যে যে সব চিন্তা, যে সব কথা খুঁপুপাক ঘেঁষে লাগল বীতে বীতে একটু একটু করে সব বলে গেলো। মৌল আকাশ...শস্যভরা বেষ্ট...একটা প্রোভ-ভরা নদী—কৃত্র মন বোঁহুদী বাতাসে তার চেউতলো বীতে বীতে হুলছে...একটা বালের খারে কতকগুলো ছেলে মেয়েরা বেলা কইছে...মনের আনন্দে তাদের একজন হয়ে আমিও বেলা কইতে লাগলাম...

‘ঐ ছোট ছেলে-মেরা কাঁরা?—আমার কথার বাধা কিংরে গ্রন্থ করলেন ডাক্তারবাবু তারা হিন্দু না মুসলমান? না শিব?’

‘ওরা কেবল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে’—আমি লবায় দিই।

‘আচ্ছা আবার স্মৃক কর।’

মাঠ থেকে তুলে আনা হয়েছ খানের বোকা। সোনার বং-এব শস্যগুলো স্রবীকৃত—আকাশ স্পর্শ করবার উপক্রম আর নবীন খানের আগমনে গাইছে বৈশাখী উৎসব। চুপ করে শুভন তোলেন লক্ষ। ঐ শুভন কে ঘেন গাইছে...

‘কাঁরা গাইছে?’

‘মেয়েরা।’

‘হিন্দু কনই? না মুসলমান স্রীলোক? না...’

‘মেয়েরা হিন্দু হতে পারে, মুসলমানও হতে পারে, শিবও হবে হস্ত?’

ডাক্তারবাবুর গভীর দীর্ঘবাস স্পষ্ট শুভতে গেলো। একটু ভেবে নিয়ে তিনি বললেন—“আবার স্মৃক কর।”

‘এখন আমি যে আর কিছুই ফেবতে পাচ্ছি না।

শুভতে পাচ্ছি না একটু কথাও। দাবার ভেতবটা অলঙ্ক বহুশায় ঘেন ছিঁড়ে পড়তে চ’চ্ছে। আমার চারপাশে অলঙ্কারের কালো ছায়া বীতে বীতে ভেসে এলো। আমি শুরে আর্ন্তর্য্য করে উঠলাম।

‘উঠা করে ফেব নিশ্রই পারবে। কিছুই কি দেখতে পাচ্ছ না।’

‘হ্যাঁ...হ্যাঁ...আমি ফেবতে পাচ্ছি আঙনের দাল টকটকে জলজ নিখাক্রমেই আকাশের দিকে উঠছে... সমস্ত গ্রামখানায় আঙন ছড়িয়ে পড়েছে...চারদিকের চিৎকার কাতা আর্ন্তর্য্য...হাছাকার ক্রমেই বাড়ছে...

‘এখাই সেই মিটুয়ের হল! এখাই জোখাবের চরম

সর্বদা ক'রেছে...তোমার ঘরে আগুন দিবেছে তোমার ঘরে
জাতির দিবেছে 'বিশ্বীকার' কাণো বিব...একটু চুপ
ক'রে শোন ওঃ' কি বলছে...চোখ খুলে তাকিয়ে যেন ওটা
ধি করছে...

এত চিন্তার আর হৈ চৈ-এর মধ্যে কেবল একটি
বসেই ভনতে পাচ্ছি—'মাঠে...মাঠে...' আমাকে বাঁচান
ভক্তারবা...মাঠের মত বাঁচতে দিন...প্রাণেশ্বর দিয়ে
বাঁচতে দিন।...

এখন ঘরে সুখে ঢাকা এ সব লোক কাণা? বাবা
তোমার ঘর বাড়ি পুড়িয়ে ছাই করে দিল...বাবা তোমার
পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দিল তোমার বিচ্ছেদ তোমাকে
প্রতিহিংসা নিতে হবে। 'হ্যাঁ...প্রতিহিংসা...!'

কথাটা আমার মাথার মধ্যে একটা বিপদের সংকেত
বাণী নিয়ে চুক পড়ল। এইবার ভক্তারবা...আমি
কখন আমি কিছু না। মূলমন্ত্র! শিব না পুতান। এখন...

আমি একজন মূলমন্ত্র, আমি সর্গের সাহেবের
আদ্যের স্বরূপকে হত্যা করেছি। যে পাশ্চাত্যী যুবক আমার
প্রাণ বাঁচিয়েছিল... হ্যাঁ... হ্যাঁ...আমিই তার গোলাম লুট
করেছি! আমি ভক্তার বাবার কিছু বিধ হত্যা করেছি...

আমি কিছু! হার্কিন সাহেবের পুত্র আমারই হাতে
নিহত হয়েছে। বাবার বাবার মূলমন্ত্র নারী নিহত
আমিই হত্যা করেছি...

না—না—হঠাৎ চিন্তার করে উঠলাম আমি—
'ভানতে চাই কে আমি? আমি কিছু হতে চাই,
মূলমন্ত্র হতে চাই...শিবও হবে! আমি শুধু নাহয়
হতে চাই।'

তৎক্ষণাৎ চোখ খুলে তাকালাম। ভক্তারবা...
কোমল হেঁদাখা বন্ধন ছিঁড়ে ফেললাম।

আমি একজন কিছু
আমি একজন মূলমন্ত্র...

আমি একজন—
কে আমি? কি আমি?

কোন কথা না শুনে চুপে লাগলাম। কিন্তু ভাবনা
ধনকে ভবনও বদল করে বসে আছে। কোন পথে যাবি,
কোথায় চলছি তার বেয়াস নেই। হঠাৎ এক হত্যাযাত্রী
চোরাগার লোক আমার পথ আটকে বলল—'কোথায়
যাবি? তুই কে রে?'

ও একজন আতঙ্কিত। এখন বর্ষনেই মূলমন্ত্র ওর
ঈশ্বরগাটা। হাতের মূর্তিও ধরা চকচকে ছোঁচাটা সূর্যের
আলোর স্বকমক করছে। আগের ভাবনার ব্যস্ততার

একই বর ছিলাম যে নিজেই বলে উঠলাম—'আমি কিছু
—আমি মূলমন্ত্র...আমি নাহয়...'

মাত্র কথটা: বোধ চর ও আর শোনে নি। কারণ
শেষ বাক্য আগেই ওর হাতের ছোঁচাটা গিটে চুক
গেল! সেই ক্ষণে তির্যকখনও রয়েছে।

জান হাতাই নি তখনও। কারণ ও বলল ভনলাম—
'কাকেরেব বাজা...' আমার শরীর টলছিল। হৃদয় হাত
থেকে বাঁচবার আশার ক্রমগত হাঁটতে লাগলাম। শিরদে
পড়ে উইল রক্তের লাগ।

কথাটা আপনাতা বিশ্বাস করবেন না আমি। তাই
হৃদয় বুঝাবুঝি দাঁড়িয়ে আমি আপনাতের সত্যের
অভিজ্ঞান দিচ্ছি না—তাও কি বিশ্বাস করবেন না।
কেবল সেই অন্তত প্রায় মনের মধ্যে বার বার মূলমন্ত্র
থেকে লাগল। আমি কি কিছু? আমি কি মূলমন্ত্র?
কিছু কথটা লম্পট উচ্চারিত হবার আগেই আর একটি
ছুরি এসে বিদল আমার হুক।

এবার আপনাতা জানলেন আমার শরীরের দুটো
কন্ডের চির বিশেষ। একটা কিছুই ছোঁচা, অন্যটি
মূলমন্ত্র। সেই কারণে ভক্তারবা...আমাকে বাঁচাতে
পারেন নি, তবে আরও একটা সত্য আমার কাছে স্পষ্ট
হয়ে উঠেছে যে আপনাতাও আমাকে বাঁচাতে পারবেন
না! শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার আগে যদি বলি আমি
কিছু তাহলে আপনাতা প্রতিহিংসার ভয়ে চারকোটি
মূলমন্ত্র হত্যার পরিকল্পনা রেখেন। আবার যদি বলি
আমি মূলমন্ত্র তাহলে মূলমন্ত্রের সমস্ত কিছু জাতির
বিক্ষেপে কোথায় বোদণা করবে।

তাই আজ আমি হাসছি। কারণ আজ অন্তর্যম
করতে পারছি আমি কে। আমি কেলে আস: দিনের
স্বতি হোমনয়ন করছি। আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে আমার
গ্রীর টানটান চোখ দুটো...ফেলে-মেরেবের হাসিনাখা
বুঝলাম। আমি স্পষ্ট দেখছি যেখানি কিতাবে তামের
হত্যা করা হোল। তারপরেই আমি বললাম 'প্রতি প্রাণ।
তবু ক্রমে ক্রমে স্বপ্ন করতে পারছি আমার যদি কথা,
আমার পী, আমার বন্ধু বাহন, আত্মীয়স্বজন, পাড়া প্রতি
বোনী—সববার সমস্ত মাজেরেব সবকিছুই মনে পড়ে।

বস্তুগত! আপনাতা অস্বস্তিক অপেক্ষা করছেন।
আমি কি কিছু ছিলাম? আমি কি মূলমন্ত্র ছিলাম।
এরপরও কি জানতে চাইছেন আমি হাসছি কেন?

হৃদয় বুঝাবুঝি দাঁড়িয়ে এখন কি হৃদয় পথও আমি
এত হাসছি কেন?

(পূর্ব প্রকাশনের পর)

“তবে তোমার কথা
গম্ভীর না কেন ?—সংকেত
কই ? এতদিন ত বৈধ-
গরে বসে রয়েছি। কবে
আমার মনন অতি বৈধ-
শীল লোকেরও বৈধচ্যুতি
ঘটেছে।...আর আমি
পারছি না যে অপেক্ষা
করতে বৈধ হয়ে।”

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস কেলে লিপিখ বললে,—
“আমিও আর পারছি না। সন্দেহের ভালাস দায়া
ভগবতের বৈধচ্যুতি ঘটতে বসেছে।”

লিপিখের কথা শুনলে এলগামি যেন হৃৎকোঁপে ভরিয়ে
লিপিখ হতে পড়ল। পরম্পরই তার মনে হল সন্দেহই ত
মানুষকে ভুল পথের মধ্যে লড়াই করার সেরা ভাল।
—তবে সন্দেহ করার সোদটা কি ?..

এইবার লিপিখ আবার বলে উঠলো,—“তুমি বলছ
যে আর তুমি অপেক্ষা করতে পারছ না কিন্তু, আমরাও
ত আর অপেক্ষা করার পক্ষপাতী নই।—আমরাও যেহে
তবে সন্দেহ হয়ে উঠেছি !...এখন দেখছি বনের অতিগর্ভ
মানুষকে তার স্রষ্টার কাছেও মাথা নীচু করতে দেয়
না।...কাজেই যা বাকান বা মোরাবো যার না তাকে মত
করবার জন্যে ভেঙে ফেলা ছাড়া আর উপায় কি ?...
আলো যার চোখে লগা না হয় মনে না করে, তাকে
অন্ধকারেই ঠেলে দিতে হয়।...তোমার কাছে আসবার
আদেশ শেয়েছি প্রিয়তম।...আসবও আমি নিজের নিজের
স্বত্ব নিয়ে...যেমন আছি এখন যেমন থাকব চিরদিন
ঠিক সেই হৃদিত্তেই তোমার সামনে আসব।...কিন্তু
কি ভাবে আমার তুমি গ্রহণ করবে বলত ?”

আনন্দের উত্তরনা করে এলগামি বলে উঠলো,—
“সোজাভাবে—সঙ্গে তোমার গ্রহণ করব লিপিখ !...তুমি
ত এই উপগ্রহের ভাবধারা পড়তে পার লিপিখ তবে
কেন আমার বনের পাঠ উদ্ধার করতে পার না ? বিহ্বলিত
লিপিখ। তোমার যান, তোমার স্রোত আমার পাখান

সোল অব লিলিথ

মেরী করেলী

অনুবাব—হরপ্রসাদ কল্যাণাচার্য

কল কে ভেঙে আন রক্ত
নাগ দিয়ে নতুন করে
গড়ে তুলেছে !—যে প্রেমকে
আমি চিরকাল বিহীন
করে এয়েছি যত্নে করে
দিয়ে রেখেছি আমার
সারিগা থেকে সেই প্রেমের
অন্তর আমার আত ভরপুর

হয়ে উঠেছে। আমি—আমি তোমার বড় ভালবাসি।
আমি আমি গভীর গভীর ভালবাসতে শিখেছি, তেম
ন্যে পড়তে করতে শিখেছি—“বদ” রক্ত। নিজের জীবন
সব কিছুকে আমি তোমার স্রোতের তুলনায় তুলে মনে
করি।—” বলতে বলতে নিজের হৃদয়ের দ্বারা লিপিখের
সাতখানি সে যার যার চন্দন করতে লাগলো।

লিপিখ তার হয়ে রাখা হাত থান এলগামির হাত
থেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলে। কিন্তু এলগামি
সেটা শক্ত করে ধরে থাকতে লিপিখ হাতখানা ছাড়াতে
পারলে না। তখন ব্যর্থ হয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস কেলে
লিপিখ বললে,—“এখনও দেখছি তুমি আমার হাতকেই
ভালবাস—ক্যাকে নয়।”

লিপিখের কথা শুনলে কিন্তু এলগামির উল্লাস একটুও
কম হল না। আনন্দ মূহুর স্বরে সে বললে,—“এমন
মুহুর তোমার মূহুরানি বাঁধলী কল্লের মনন উকটুকে
লাল তোমার ঠোঁট গুটি সোনার কালের মত এই চুল-
গুটি তোমার—এ সবই কি শূন্য ছায়াই তোমার ?—
কিন্তু নয় একটাও ?—জানি না বুঝি না কেনম সে
অপগম আলো যা এমন অপগম মুহুর হাবার দৃষ্টি
করতে পারে ?—আমার ওপর অধিকার কর না প্রিয়ে।
গভীর যদি তুমি অলৌকিক হও আর এই সেই তোমার
ছায়াই শূন্য হয় তবে লগা করে তোমার সেই অলৌকিক
সেবী হৃদিত্ত অকৃত: হৃৎকোঁপে ভরিয়ে দেয়াও আমার
একবার !—আত তা দেখবার আমি উপযুক্ত হয়েছি—
শব্দ ভগবানের দৃষ্টির সামনেও গভীরার শাসন আছে
আমার !—”বলতে বলতে লিপিখের মূখ্যটা গম্ভীর হয়ে

উঠতে দেখে এলখানি খেয়ে পাল।—লিখিলেন সেই কান্ডিভায়া গম্ভীর মূণ্ড ডার কেন? কোর করেই তাকে খানিরে গিলে!

দীরে দীরে এলখানি আবার বলতে লাগল,—“আমি কি তোমার কাছে বড় বেশী কিছু চেয়েছি লিখিল!—কই আমার তত বনে হয় না?—তুমি যদি আমার সত্য ভালবাস,—হ্যাঁ আমি জানি তুমি আমার ভালবাস,—তবে—তবে কেন তুমি আমার বান্দা পূর্ণ করবে না?”

কতক্ষণ পদ’র লিখিল নীরব হইল। শ্বাস-প্রশ্বাস অতি হৃদয় হইবে; সেল তার আর সেই সঙ্গে সেইটা বনে তার প্রাণস্বামী পালায় প্রতিবার বত দেখতে লাগল। তারপর অতি কণিগ স্বরে বনে বনে—বনে বনে থেকে কথা গুলো ভেলে আসবে এমন স্বরে লিখিল বললে,—“হ্যাঁ, তোমার আমি ভালবাসি। হৃদয় আর বনে বনে বনে-বনান্তর থেকে তোমার আমি এখন ভালবেসে আসছি। সে তুলনার তুমি আমার কোন দিনই ভাল করে ভালবাসনি। তোমার ভালবাসা লাভের চেষ্টাই আমার ভব-কন্যাকরের মান্দা হয়েছে।—আর আমার সেই সাধনা ব্যর্থ” করাই তোমার আঁখনের তত হয়েছে কবে,—তবে!”

“কিন্তু এয়ার ত তোমারই কিং প্রিয়ে! আমি মেছার গানকে হার বনে এয়ার তোমার কাছে বরা দিয়েছি!—কর রাশী আমার। আর আমার কি করতে বল?”

হঠাৎ বনে অতি আত্ম ভরেই লিখিল বনে উঠল,—“উদাসনা কর,—ভগবানের প্রীত্যে আত্মসমর্পণ কর,—তোমার ভব-কন্যাকরের পাশের প্রায়িক্ত কর প্রিয়ে!”

কথাগুলো শুনে গরোমে এলখানি সোকা হয়ে উঠে বসল। তারপর বিরক্ত কণ্ঠে লিখিলকে বললে,—“কি বলই তুমি!—পাশের প্রায়িক্ত কর?—কেন?—কেন তা কর?—কি পাশ করাই আমি যে তার প্রায়িক্ত করতে হবে?—হৃদয়-বনান্তর থেকে বান্দা ‘ভগবান’ ‘ভগবান’ বলে প্রাণ কাটান করা কে’উও যে ভগবানের আত্মও কোন সাফা পার নি যার অভিনয়ে কোন সজ্জাই হুঁজ পাওয়া যায় না সে রকম ভগবান বলে যে কেউ কোথাও নেই তা জানা কি পাশ? না, না, না,—এ পাশ

নব। হাঁখাই লভন বন্যাত হলেও একে আমি পাশ বলে স্বীকার করব না,—অন্য পোচনা—প্রায়িক্ত করা দূরের কথা!—আজ বনে আমার অধিবাসের সীমা নেই। কিন্তু যদি এক হৃদয়ের জন্যেও তোমার ভগবান আমার মাঝে আত্মপ্রকাশ করেন তবে দেখবে ওর চেয়ে সহস্রগুন অসম হয়ে উঠতে আমার বন’ বিশ্বাস। তাঁকে হৃদয়ের জন্যে দেখতে তাঁর অভিনয়ে কোন রকম প্রাণ পেতে আমি অন্য নরকেও যাব করতে রাজী আছি।—কিন্তু তাঁর সে অভিনয় প্রমাণ করার আগে আমি কিছুতেই আত্মসমর্পণ করব না কোন রকম প্রায়িক্তই করব না এই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা!”

দীরে দীরে লিখিল বললে,—“কে মহান তেজস্বী! এ পাতল তোমার উপযুক্ত সাফাই হয়েছে!” বলে লিখিল কতক্ষণ নীরব থেকে আবার বললে,—“ভগবতের হৃদয়ের জন্যে মহান প্রত্যেকে সোল সেওয়া তোমার হৃদয়তাই পরিচয়। সব বিনয়েই একটা বাঁধাধরা নিষেধ, নীতি আছে। সে নীতির এক কথাও ভাঙতে শরৎ ভগবানও পাবে না—হৃদয় তাই নব, সে নীতির অনুবোধও ব্যতিক্রম হলে প্রত্যেক নীতি সবই লর হতে পারে,—বলে বনে কসাতলে চলে যাবে নব! শেখাচারী হানুনের নিষেধ কর’কলে নীতি করা অপাতি দর করতে, প্রত্যেকে তাঁর নীতি বিনয়ন দিতে কলা, তোমার বত অভিনয় আমারই উপযুক্ত কথা! একে পাশের প্রাণ হাফা আর কি বলা যায়? তোমরা তোমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সেই চিরকল নীতি, পদে পদে ভঙ্গ করে, অস্বাভাবিক করে নিষেধের শোক, দুঃস্বপ্ন, অপাতির দাগের নিষ্পত্তি কর প্রতিক্ষণে, তারপর বধন জর্জরিত হাত তাকে, তখন তারপরে চোঁচিয়ে কেঁদে সব মোদের জাগী কর প্রত্যেকে!—কই? অন্যত্রের অধিবাসীরা ত তা করে না?—তারা প্রত্যেক নীতি বনে চলে, বনে-বনে ফিন কাটাতো নবাই!”

খাঁক’ হয়ে এলখানি বললে,—“কিন্তু ভগবানের সেই নীতিটা যে কি তাই ত আমার জানা নেই। তবে সে অজানা নীতির অজানা করার অপরাধে হানুদ্বয়ে অপরাধী করা হন কেন? আগে প্রত্যেক

নীতিতা আবার বৃদ্ধির দাও ডরে 'জু'তা সন্ধান্য করলে আবার সেখানে অপরায়ী করবে।"

"নীতি দ্বাইকেই বৃদ্ধির সেওগা হয়েছে। নিজের নিজের মনের মধ্যে বিবেকের দিকে চলে দেখ, দেখবে সেখানে যে নীতি অতি সরলভাবেই বোঝান রয়েছে। সবাই সে পাঠ পড়তে, নিজের নিজের বিবেকের কেতাবে, তবু কিছু সব স্নেহে-শ্রমেও তোমরা সে নীতি অমান্য কর, তাচ্ছিল্য দেখাও, মানতে চাও না।... ভগবানের নিয়মানুসারে মানব মানবকে ভাই বলে বেনে মেবে। তার আচরণ ভিন্ন ভিন্ন জাতের প্রলম্ব করে মানবকে পরস্পরের কাছ থেকে তফাৎ করে দিয়েছে,—কলে হয়েছে অনিষ্ঠ।—স্বাছোর নীতি,—বেশির ভাগ লোকই তা কোনদিন গালন করে না—তারও কল দাঁড়ায় অনিষ্ঠকর। সফর-সংগ্রহের একটা শীমা নির্দেশ করা আছে কিন্তু মানব তা না বেনে অশীম সফরের জন্যে আশ্রয় চেষ্টা করে চলেছে, কলে অন্য অনেককে পূন্য তহবিল নিয়েই জীবন পাত করতে হচ্ছে।... প্রেম, ভাদবাস্যর একটা নীতি আছে, কিন্তু মানব সে নীতিকে অগ্রাহ্য করে সেই প্রেমকে কানের সর্বনাশা গালস্যর এনে বাঁড় করিয়েছে, কাছের ভাতের মত অনিষ্ঠ হচ্ছে।... অগভের সব পাশ, সব দুঃস্বপ্ন, সব বিপত্তিই মেঘের এইভাবে নীতির অমান্য ক্যাইই পরিণাম, আর তা থেকেই ও সবের উদ্ভব।... এই নীতি আর তার সাধনা, এ যে শ্রীভগবানেরই অংশ।"

"আর মরণ,—যা সব কিছুই বাঁচ করে দেয় সেটাও কি ভগবানের একটা নীতি বলতে চাও লিপি?"

"বল বলে কোন কিছু নেই—একথা তোমার আদি বহুবার বলেছি। তোমরা থাকে বল নাম দিয়েই প্রকৃত পক্ষে ভাই জীবন।"

উত্তেজিত স্বরে এলগামি বললে,—"তার প্রমাণ কি?—বল, বল আমার, কি তার প্রমাণ?... বীর?"

অলক্ষণ অপেক্ষা করে এলগামি আবার বললে,—"স্বই, তোমার স্বরূপ দেখাও আমার? তোমার এই যে প্রেম, যে রূপ আমি আবার চোখের সামনে দেখছি, এ ছাড়া গতিই যদি তোমার অন্য কোন অস্তিত্ব থাকে, তবে তা দেখাও আমাকে লিপি?... তবে ত

আবার সন্দেহ বৃদ্ধির। আর তা যদি করতে পার ত তখন জেগে উঠে, এই সন্দেহ করার জন্যে যে পাণ করছি আমি, চোখের জলে তা ধুয়ে বৃদ্ধি দেব।—কথা পাবার জন্যে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করব।"

"গতিই তোমার অনুশোচনা করতে হবে... গতিই একদিন তোমার শিশুর বচন সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে পরম পিতার চরণতলে প্রার্থনা করতে বলতে হবে।—হ্যাঁ, আমি তোমার চোখের সামনে গতিই একদিন আসব।—পথপ্রান্ত প্রিয়তম আমার। তুমি ভুলে যেয়ো না যে আমার প্রেম, আমার প্রতিশ্রুতি বিষয়ে না এক সত্য! কিছুতেই তা মিথ্যে হবে না,—তুমি পূন্য বৈধ হয়ে প্রতীক্ষা কর সেই পূজকনের। মনে রেখো আজও তুমি আমার দেখবার যোগ্যতা অর্জন করতে পার বি। তাই তোমার আমি সাবধান করে দিচ্ছি,—তোমার ইচ্ছা-পন্থিক তোমার তাঁর কান-ইচ্ছা, তোমার কল্পিত প্রেম, যদি তোমার যোগ্যতা অর্জন করার আগেই ছোর করে আমার আত্মপ্রকাশ করার তবে পরকণ্ঠেই আমার চিরবিবাহ নিতে হবে। এ কথা যেন মনে থাকে।"

"না, না লিপি! চিরবিবাহ নয়—চিরদিন আমার কাছে থাকবে তুমি। লিপি, লিপি, লিপি!—তুমি যে আমার,—আমারই পূন্য। তোমার প্রেম, তোমার স্বাভা একা আবারই।"

এলগামি কথা শেষ হতেই তার মনে হল যের মতো যেন একটা হৃদের তুকান উঠেছে। হঠাৎ সমস্ত মেছটা তার বার বার কঁপে কঁপে উঠলো। একাত্ম হৃদীতে লিপিঘের মেছের দিকে চলে দেখতে দেখতে কেমন যেন একটা অজানা ভরে মন তার ভরে গেল। তাঁর, একাত্ম হৃদীপাতের কলে মগের শিরাসুলো কলে উঠে কপকপ করতে লাগল তার।

মেছতে মেছতে, তার চোখের সামনেই লিপিঘের হৃদয়ের মেছটা ধীরে ধীরে যেন বড়ার মত বিকল হয়ে যাচ্ছে। তবু কিছু এলগামি কোন কথা বলবার বা আর কোন কিছু করার মত যেন উদ্যমই পেলো না। জিজ্ঞাসা যেন তার তালুতে আটকে দাঁড়িল—নিঃশ্বাস নিতেও যেন তার বেশ কষ্ট হতে লাগল।—মনে হতে

লাগল তার প্রাণটা যেন একটা মূর্খ আলোক রশ্মিতে
বাঁধা রয়েছে,—তার সেই বন্ধ অবস্থার সে জীবন আর
বৃত্তা, স্বর্ণ আর মর্তের মধ্যে খড়ির সোলকের মতই
হীরে হীরে মূল্যহীন। —সে পুত্র বৃদ্ধ একটা পরমাণু,
যেন অসীম। বিরাট, মোহাম জগৎপীঠের প্রধান পুত্র মহোদয়
সদাশিব হেমবার ভবো, সেই সোদাম্যমান অবস্থার অবস্থান
করছে।—কিন্তু, নতিাই কি তা সে দেখতে পারে ?

। ৩।

ভেরনি একাধ দৃষ্টিতে লিপিদের দিকে চেয়ে
দৃষ্টিতে থাকতে এলারি দেখলে, হঠাৎ লিপি প্রাণপন
ক্রোড় নিজে থেকে বিদ্যায় ওপর উঠে বসল।—
দৃষ্টি তার তখন যেন একটা অবস্থার কঠিনতার
আঁকট হয়ে গেছে।—খীরে খীরে লিপি এলারির
দিকে মূর্খ চেয়েছিল। বরকের মতন সারা হয়ে গেছে
তখন তার মূর্খের হঠাৎ, আর সমস্ত মূর্খানাও তার
অতি রান দেখাচ্ছিল।

লিপিদের চেয়ারর এই পরিবর্তন ঘেঁষে এলারির
হল হারুন দৃষ্টিবনার ভরে সেল তবুও কিছু মূর্খে
সে কোন কথা বলতে পারলে না—গলা দিয়ে যেন
তার শব্দই বেরল না মোটে।—বলে হল হঠাৎ কেন
করে দৃষ্টি বাক্যোৎসর্গ বা হয়ে গেছে তার। মূর্খ
তার চোখের দৃষ্টিতে তার মূর্খের সেই দৃষ্টিবনা
প্রতিফলিত হল। আর সেই দলে পড়ার উদ্দেশ্যে
তার মেহের প্রতি মূর্খানা যেন হিঁচড়ে পড়তে লাগল।

যেন বড় বড় থেকে, কাঁপা কোন কিছুই হয়ে
দিয়ে আসছে এমন শব্দে, লিপি বলে উঠল,—
“ভগবানের মোহাই।—ভূমি আর আমার এ মেহটার
দিকে, অমন করে পলকবারা চোখে চেয়ে থেকে না
...কতবার সোল মোহা, যে এটা আমার প্রকৃত
আমির ‘মোহা’...এ পৃথিবীর বুলোমাটি দিয়ে গড়া,
মেহটার দিক থেকে মূর্খ কিরিয়ে নাও গো,—পাল্পির
মূর্খ কিরিয়ে নাও।...কেন বৃদ্ধ না, যে এই পলকতে
গড়া মেহটা পৃথিবীরই সম্প্রদায়,—পৃথিবীতেই গড়ে
থাকবে এটা।—মূর্খ কিরিয়ে, আলোর দিকে চাও।
তোমো সে আলো মূর্খ থেকেই প্রতিফলিত হচ্ছে...

‘মণি’র চে’ আলো।...এর মাঝে...প্রতিক আমার,
দেখ ভূমি প্রকৃত ‘মণি’কে দেখতে চাও তবে আর
ভৌতিক কাহাটার দিকে চেয়ে থেকে না। মূর্খ চেয়েও
...মেহটা থেকে কিরিয়ে নাও তোমার চোখের দৃষ্টি!
দেখ...ওরিকে, ঐ যেখানে কুলদানীটা রয়েছে...ঐ
কুলদানীর গিহনে...ঐ সোলাপগুলোর পেছনে দেখ...
ভাল করে দেখ ঐদিকে...ঐখানেই আমার প্রকৃত
‘মণি’কে দেখতে পারে...দেখ ভাল করে। ...ঐখানেই
আমি তোমার দেখা দেব। ...দেখ...দেখ...ভাল করে
চেয়ে দেখো।”

কথা বলা শেষ হতেই মকার মতন মেহটা অমত
অবস্থার বালিশের ওপর চলে পড়ল।

এলারির মূর্খের মধ্যে তখন বিহীনতা আর হত-
বৃষ্টি প্রলম্ব-মতন চলতে থাকলেও লিপিদের কথাসূত্রের
মোটাটুকু যানে সে বুঝতে পেরেছিল। বুঝতে
পেরেছিল, এভারি যে মেহটাকে সে লিপি বলে
ভাবত, বিনাস করত আত্ম আর সেটা লিপি নর।
কুলদানীর সোলাপগুলোর পেছনে এইবার সে প্রকৃত
লিপিদের দেখতে পারে !

যেন কোন অসীম পঙ্কির পঙ্কিমালায় এইবার
এলারি দাঁড় করিয়ে কলের পুতুলের মতই সোমার
কুলদানীতে সারা সোলাপগুলোর দিকে চেয়ে দেখলে।
কিন্তু সেখানে সেই কুলদানী আর কুলদানী গাড়া
আর কোন পঙ্কিই সে দেখতে পেল না।

মূর্খ হাতে ভাল করে চোখ বন্ধ করে মূর্খ মূর্খ বকে
খাবার সে কুলদানীর দিকে চাইল। কতকাল অবধি
চেয়ে থেকে বলে উঠল—“কই ? ...কিছুই ত নেই
তবাবে ? ...নাঃ। কুল হাড়া আর বিহুই—আরে
—আরে—কুলের পেছনে যে একটা আলো।—একটা
উল্লেখ। লীলা যেন কুলদানীর পেছনে চোঁট তুলে
চলানোয় ওপর দিকে উঠছে যে !—কি ?—কি ওটা ?

লিপিদের পর লিপিট এলারি সেই আলোর দিকে
পলকবারা চোখে চেয়ে গেল।—কমক সে বোকাতে
ক্রোড় করলে যে ওটা অস্বাভাবিক কিছুই নয়, বরং
যে আলো কুলদানীর বোঝার তার থেকেই কোনকর
প্রতিফলিত হয়েছে ওটা !—আর তা যদি না হয়

তবে চরত কোনরকমে তাঁদের আলো এগিয়ে পড়বে
ওমানটার! —আর তাও যদি না হয় ওটা, তবে
বৃদ্ধেতে হবে নিচুই আমার হৃদয় বিক্রম বটেই।

তবুও কিন্তু হির হৃদয়েতে এলগারি সেই দিকে
চোরে হইল—যেন তার সব জ্বালাই নষ্ট হইল চোখের
দৃষ্টির মধ্যে এসে সোছে—এবন সে একা একা হৃদয়!

ধীরে ধীরে সেই আলোর দীর্ঘতা উল্লসল থেকে
উল্লসতে হয়ে উঠিল। আর যেন দীর্ঘের চোখে
নাড়া শেরে কলসারির কলসলোও অশ্রু অশ্রু মাঝে
নাড়াইল। সমুদ্রের বৃক থেকে উল্লসমান দুর্বেত রঞ্জন
থেকে বস্তুই দীর্ঘতা করে যেন গ্রাসবত হয়ে উঠিল।
ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সে দীর্ঘতার উল্লসল এত বেড়ে
উঠল যে, হাল অত তাঁর বাতির আলোটা সে দীর্ঘতার
পানে যেন একটা সেনপারের কাঠির আলোর মতই
কাল বিশ্রুত হয়ে গেল। আর আলোটার এই অসম্ভব
দীর্ঘতা দেখতে দেখতে এলগারির নিচল নির্বাক ভয়ে
শ্বাস-প্রশ্বাস হ্রাস বইতে লাগল।

চোখ ঘরের মধ্যে থেকে যেন বড়ো হামবন্ধকের
মধ্যে আলোর দীর্ঘতায়েরা ভেদে উঠে, দেওয়ালে
টাঙান দাল মনবসের পর্যাটাকে ঢেকে দিয়ে তাঁর বর্ণ-
বিন্যাস বিচ্ছিন্নিত করতে লাগল। তবু কিন্তু এলগারি
সৌন্দর্য থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলে না। যেন যেন
সে কলসে—“চোখ আমার কলসে গেলেও দেখব আমি।”

চোখ বড়ো তখন তার হৃদয়েই অলস করছিল।
যেন হচ্ছিল সেই তাঁর আলোর দীর্ঘতা, যেন তার
চোখের দীর্ঘতা পুর হই বিয়ে দিচ্ছিল। একক
যাত্রা সে অসম্ভব কলসেও মোটেই গ্রাহ্যের নবো
তা আদ্যে না। সবার যেন একাক্রান্ত হয়ে সেই
আলোর দীর্ঘতা দেখতে দেখতে তার যেন হল, যেন
সেই হামবন্ধ, মস্তর ডায়া হৃদয় মাঝে একটা অশ্রু
হামবন্ধের হৃদয় কুটে উঠে। যেন হল যেন কোন
অসম্ভব হামব দীর্ঘতা উল্লসমান দুর্বেত তিরসলাল হুসি
জুড়িয়ে ভুবিয় সৌন্দর্যের একটি দৃষ্টিক আঁকছেন
সোমো।—

দেখতে দেখতে সেই হৃদয় শব্দ থেকে শব্দভর
হয়ে উঠিল—অতিনব অশ্রুদীর্ঘ সে কলসার শব্দ হরি।

ধীরে ধীরে হৃদয়ের মাক, বৃদ্ধ, চোখ, অর্থাৎ সবই শব্দ
হয়ে উঠিল—সোনার মস্তর একমাঝে চোখ গেলে যিকে
শব্দে ওপর তার আর একটা যেন আলোর চোখ হুসে
ছিল।

হামবন্ধের চোখা—হামবন্ধের মনই সে দেখে,
কিন্তু তবু হামবন্ধের সঙ্গে কতই না তার পার্থক্য।
দেখতে দেখতে ক্রমে এলগারির যেন শব্দিত শব্দ হয়ে
আসছিল। তবুও সে শব্দিত দেখলে, হৃদয়টি প্রাণবীর
ভঙ্গিতে ক্রম হৃদয় হৃদয় করে ওপর দিকে হুসে যেনে
কি গভীর অনবদ্য, আশা, কাকুতী, আর প্রেমভরা দৃষ্টিক্রম
তাঁর দিকে চোরে আয়ে—

দেখতে দেখতে এলগারির যেন হল, তার শব্দিত
শব্দিত যেন সোপ শেরে বাজে। সপক কলসার মনবন্ধ-
হীন, শব্দ একা তার মস্তর-মাংসের শব্দ, এ অশ্রুদীর্ঘ
দৃশ্য যেন আর মস্তর করতে পারছিল না। চোখ তার
বোব হল সব মস্তর মস্তর মস্তর মস্তর হৃদয় হৃদয়
সঙ্গে সঙ্গে বিবার ভরা একটা অশ্রুভুক্ত ভরে সব
শব্দ তার ধর ধর করে কোঁপে উঠল। আর তারপরেই
কি করছে তেবে না দেখেই সে বাটে শোমান লিপিখের
দেহের দিকে—আর সঙ্গে মাক হই মস্তর তার শব্দিত
চোখ কোমল দেখে যিকে,—

সঙ্গে সঙ্গে একটা বৃক কাটা আত্মদাদ তার
বৃদ্ধ থেকে বেরিয়ে এসে,—“হা মস্তর!”

দেখলে সে, তার লিপিখ, তার গ্রাহ্যের চোখেও শির
লিপিখের দেহটা তার চোখের সামনেই হাম হয়ে যেন
শব্দিত হয়ে বাজে! যে অসুখ সৌন্দর্য ভরা দেহ, এতদিন
সে এত দাবদামে দাম-দাম করে মাক তা করা
পাতার মতই হললে হয়ে গেছে, বিবদ হয়ে শব্দিত
উঠে—তার হৃদয় যে সৌন্দর্য বীভব মস্তর মস্তর
দেখাচ্ছে, তাঁর বৃদ্ধা দল হয়ে গেছে, আর—আর
একটা বিকট বৈচিত্র্যের বহক বৃদ্ধা দল দেহটা
বৈচিত্র্যের বাজে।

দেখে, এলগারি যেন পাগল হয়ে উঠল।—ভুলে
গেল যে দেহটা ভঙ্গুর—মস্তরদল, আদ্যই শব্দ অমর।
—ভুলে গেল যে, তার এতদিনের সাধনা—দাবদামের
শব্দ মস্তর। শব্দ তার এই মস্তরই যেন হল মস্তর

বে, একদিন যে মানবদ্ব্যয়ের বহুদূর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এতদিন ধরে রেখেছিল, আর আবার তা নিষ্ঠুরে বহুদূর ভাঙা টেবের উপরেই গ্রাস করে ফেলবে! কল্যাণী বলে হতেই জানাযায় এলারাম, সেই বড়ার বডম লিলিথের স্নেহটা পাসলের বড দুহাতে জড়িয়ে ধরলে ব্যর্থ ব্যাকস্কতার—

“লিলিথ! লিলিথ! আমার প্রিয়ে!—আমার বডম মনি! আমার গ্রাস!—সেই আমার, সাধনা আমার!—কিরে এসো—আমার কাছে কিরে এসো!—বলতে ভুলতে, দুহাতে জড়িয়ে ধরা লিলিথের বিবর্ণ বড়ার বড দুহে, চোখে চুলে পত পত চুই, বেতে পাসল, পাসলের বডম ব্যর ব্যর।

বেদনাভর শূন্যের চোখে, সেই চুপসে যাওয়া বিবর্ণ দুহের দিকে চেয়ে, এলারাম বলে উঠল,—লিলিথ! লিলিথ! লিলিথ আমি যে তোমার বড ভালবাসি প্রিয়ে,—বড ভালবাসি!—আমার স্নেহের কি এমন শক্তি নেই যে তোমার ধরে রাখতে পারে? প্রেম ভ’ অবর তবে, তবে কেন তা পারছে না?—লিলিথ! লিলিথ! তুমিও আমার ভালবাস, তবে কেন আমার স্নেহে বাধ?—যেহা না প্রিয়ে, যেহা না যেহা না! তুমি যে আমার বন কেবল আমারই?—বহুদূর গ্রাস থেকে তোমার আমি ছিনিয়ে নিয়েছি, ভগবান,—আকাশ, পাতাল, কারো কোন আশঙ্কার নেই তোমার ওপর আছ—কেনল আমার তুমি—কেনল আমারই—ই—একা আমারই আশঙ্কার!—তবে কেন তুমি চলে বাছ?—না, না—তা আমি কিছুতেই হতে দেব না,—আমার কাছে তোমার কিরে আসতেই হবে!—আমি যে তোমার ভালবেসেছি প্রিয়ে!—”

এই ভাবে, বড়ার বডম স্নেহটা বুকে চেপে প্রসাপ বহুতে বহুতে এলারামি বনে হল, সেই বহুদূর বড ঠাণ্ডা লিলিথের স্নেহটা কখন তার অজান্তে কবোজ হয়ে উঠেছে,—তখন আর ভেদম বহুদূর বড ঠাণ্ডা দৌটা তার বনে হল না। এই নত্যটা বনে আগতেই বৃষ্টি, বৃষ্টি, নকে ভরে ভরে সে স্নেহটার দিকে চাইতেই, স্নেহতে গেলে, তার বনে যাওয়া চোখ বুজে আবার স্বাভাবিক ভাব কিরু আসছে।—গায়ে ধালে আবার

কোনল বনে হতে লগল—চুপসুদূর আবার আগের বডম সোনালী স্নেহটা কুটে উঠতে লাগল,—স্নেহতে স্নেহতে সেই বালি হয়ে যাওয়া ঠোঁট দুটি, আবার আগের বডম টুক, টুক লাগল হয়ে উঠছিল বেদ!—এই স্নেহ অবশ, এলিরে পড়া হাত দুটি তার কণ্ঠে কণ্ঠে এলারামি কণ্ঠ বেদন করে ধরলে! তাকে এইভাবে তার কণ্ঠালিঙ্গন করতে স্নেহে, এলারামি বৃষ্ঠাবনা-বিকল গ্রাসে, যেন কতকটা স্নেহত—কিছুটা পাতি কিরে এসো।

এতক্ষণে, কতকটা পাতি হয়ে এলারামি বনে বহুতে পারলে যে বহা স্নেহ!—এতদিন বনে তার পব’ ছিল, যে কোন-কিছুকেই সে ভর করে না। আছ প্রথম বহুতে পারলে কত বড় নিখো তার সে পব’। তা না হলে অবন দিনেহারা হয়ে সে লিলিথের অলৌকিক আশ্রয় দিক থেকে পালিয়ে এসে, এভাবে লিলিথের পার্থিব স্নেহটা নিয়ে এমন হাভার্মাতি করছে কেন?—এই ব্যর সে বৃষ্টি কিরিয়ে কল্যাণীর কল্যাণদূর দিকে একবার ভরে ভরে চেয়ে দেখলে—স্নেহলে সেখানে শূন্য কল্যাণদূরই রয়েছে, আর কোন কিছুই নেই—না হৃদিত, না আসের দীপ্তি। লিলিথের আশ্রয় সে দীপ্তির অলৌকিক হৃদিত কখন স্নেহের হাবির বড নিঃশেষ হয়ে নিলিয়ে গেছে।

এবার তার বনে প্রব উঠল,—তা হলে সে যে অবর স্নেহ আমার আশ্রয় প্রসাপ করতে, তাকে চোখে স্নেহতে এতদিন ধরে যে সাধনা করে এসেছে আছ কি তা বর্ষ’ হয়ে সেল? সেই আশ্রা বডম তার চোখের সামনে কুটে উঠেছিল, তখন তার সব তত্ত্ব বুঝে না নিয়ে ভরে পাসল হয়ে তার সারিধা থেকে পালিয়ে এসে কি সে তার এতদিনের সাধনা-শাকল্যের শূন্যল নষ্ট করে ফেললে? তার অদমি সৌন্দর্যই তবু আশ্রাকে কিরে বেতে দিয়েছে? আর তার ঐকান্তিক বাসনাই এই বহা স্নেহটাকে উল্লীভিত করে ফুলেছে—এই একটা বিকলিত আর একটা শাকল্যের বিশদিত হৃদী বহুতে তখন তার সব পব’ হয়ে উঠল। তখনও এলারাম ঠিক তার স্বভাবিক অবস্থার কিরে আসে নি। এই অন্যই লাভ বা ক্ষতি কোনটা বড় তা সে ভাল করে বুঝে উঠতে পারলে না।

ভক্তকণে যুদ্ধে অস্তিত্বে থাকা লিপির উচ্চ শ্বাস-প্রশ্বাস ধীরে ধীরে তার গানের ওপর পড়বে, তা এলয়ারি শব্দে শব্দে করতে লাগল। লিপিরে কতকগুলো চুল এলয়ারির হাতের ওপর পড়ছিল। যুদ্ধ থামে করে সেই চুলগুলোকে চুপে খেতে সে যুদ্ধ-শব্দে বলতে লাগল,—“স্রেইই বসে।” এতেই আদি যুদ্ধী। এইবার আসো লিপিখ। আমার লিপিখ। তুমি ছেলে ওঠো—চলে যো। আমি সব দেখতা, এমন কি শব্দ ভগবানের কাছ থেকেও তোমার লুকিয়ে রাখব।”

এই যুদ্ধ এলয়ারির আলিঙ্গনে বড় লিপিরে স্নেহটা একবার নড়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কলস আশা,—আগ্রহ ভরে কঁকে পড়ে এলয়ারি তার যুদ্ধের দিকে চলে হইল—দেখতে দেখতে দেখলে, লিপিরে চোখের পাতা দুটো বন্ধ করে কেঁপে কেঁপে উঠছে। তারপর ধীরে, অতি ধীরে—যেন করে উদ্বিগ্ন হওয়ার দিকে চলে চলে একটি একটি করে পত্রের পাগড়ী-গুলো খোলে, ঠিক তেমন করেই পাতাগুলি কপিতে কপিতে একটু একটু করে খুলতে খুলতে গেলে সম্পূর্ণ খুলে গেল। আশ হ বহর পরে লিপিখ চোখ তুলে পাতা জ্বালা হয়ে উঠল। আর চোখের সেই সাগর-নীল তারা দুটিতে একটা বিজয় অশাখিব সৌন্দর্য কটে উঠল। সেবে এলয়ারির মনে হল—আমার চোখের দুটিতে যে স্নেহ, আশা, অনুন্দের আর আত্মতা সে এই কতকাল আগে দেখেছিল, এ দুটি চোখের দুটি থেকেও যেন ঠিক তাই বেরচ্ছে।

একটা কথা কিন্তু এলয়ারির একবারও মনে হল না যে তার পোরে সে যে অন্য আরার দুটির মাঝে থেকে পার্শ্ববে এসেছিল সেই আত্মাই এখন তার পাখির দশ-বৈশ্বের দ্বিগে, হস্ত শেক্সারের মতন তার দিকে চলে বিহার নিচ্ছে! আশব গর্বে আত্মহারা এলয়ারি স্নেহ বিহীন যুদ্ধের মত তাকা-সুর দুটি দ্বিগে সেই অশাখিব দুটি সৌন্দর্য পান করতে লাগল।

কতকাল চলে,—চলে চলে স্নেহ গর গর শব্দে এলয়ারি লিপিখকে বললে,—“ধরন করে কি দেখছ? ভয় করছে? ভয় কি লিপিখ। এই যে আমি।—আমাকেই ত দেখছ

তুমি! এতদিন আমারই স্নেহে মাতা দিবেছ, আমারই নির্দেশ মত যুদ্ধে যুদ্ধে তুমি—তবে এখন আমার চিনতে পারছ না কেন?—এ আমি—আমি—আমি। তোমার প্রেমিক,—তোমার মালিক। একা আমিই তোমার জীবন-বরণের কর্তা! আমারই ইচ্ছার আদর্শ হ বহর পরে তুমি চোখ খুলে যুদ্ধ থেকে ছেলে উঠেছ। আমারই ঐকান্তিক আগ্রহে তুমি আশ শব্দ-বুদ্ধির মোহ থেকে ছেলে আমার জ্ঞাত প্রাপ্ত হয়ে উঠেছ।

এলয়ারির পর্বের প্রদাপ মোহাণ-নাশান শব্দ, লিপিরে কানে বাজিল। কতকাল পূর্বে পূর্বে তার সেই অশাখিব যুদ্ধাধি এক অশব্দ শব্দাধি হাসিতে ভরে উঠল;—মনে হল যেন মেঘের আকাশ থেকে বৃষ্টি গেলে পৃথিবী চন্দ্র কল বল করেই উঠল না। তার সেই পাট নীল চোখের শিশুর মত নিশাপা দুটি এলয়ারির যুদ্ধের ওপর ন্যস্ত হয়ে স্থির হয়ে হইল। আর মনে হচ্ছিল যেন গভীর স্নেহভরেই লিপিখ তার দুই বাহুল্য নিয়ে এলয়ারির কণ্ঠ বেঁটন করে রেখেছিল। এলয়ারি তার এই ভাষারই স্নেহের অভিব্যক্তিতে যেন প্রাণায়ান যুদ্ধের সমস্ত শব্দে পৌঁছে গেলো। মনে মনে সে এই-ই চাই ছিল যে এখন যেন কথা বলে লিপিখ তার এই মীরব স্নেহের অভিব্যক্তি নষ্ট করে না য়ে।

কথার কাক কি? তার চলে এই মীরব অভিব্যক্তিই ত অনেক বেশী শব্দ আর ময়োম। এই সৌন্দর্য-প্রতিমা তার,—একা তারই শব্দ। এই অভিশব্দই ত সে এতদিন যুদ্ধের মধ্যে পূর্বে রেখেছিল,—আশ তা শব্দিক হয়েছ,—সঙ্গ হয়েছ,—পতিত হয়েছ। তার ইচ্ছাশক্তি—দুর্ভাগ্য স্নেহে কঠিন ইচ্ছাশক্তিই আশ করা হয়েছে। এ শব্দ তার স্থির প্রতিজ্ঞার ইচ্ছাশক্তি,—আর কারো নহ। এমন কি ভগবানেরও সাধায্যের,—আশায্যের ভোঝা না রেখেই তার সেই ইচ্ছাশক্তি তাকে আশ শাক্সা মতিত করেছে। তার বহুদিনের কামনা পূরণ করতে গিয়েছে। এই মতটাই কি এ থেকে শব্দে প্রদাপ হচ্ছে না? উঃ! শাক্সোর এ দুর্ভাগ্য,—দুর্ভাগ্য আশব সে স্নেহ করতে পারবে ত? অতি আশবের আবেশে যুদ্ধের শব্দন তার খেয়ে গিয়ে না ত? ও কি? ও কি? আশব যে সেই অতি যুদ্ধের শব্দ

বেশে উঠল ? কেন ? আবার কেন ? এ আবার কি ?
যেন মাঝের পাড়ায় পাড়ায় কড়ের গান শোনা যাচ্ছে
না ? শিল্পীর উপাসনা অর্থে যে বিহারের নৃ-র বাসান ঘর,
এবার যেন তাই বাহুতে আরম্ভ করেছে যে / বিহার
কাকলী এ যে ! সুইটা যেন কে'লে কে'লে উঠছে ?
কেন ? কেন এ বিহার-কাকলী আজ এই বিলাসের কল ?

এই বিহার-কাকলীটা এলহাটির কানে অতি স্পষ্ট
ভাবে শোঁছিল সে সে ছোর করে সে দিক থেকে তার
মনকে সঁহায়ে দিতে চাইল। না, না, না, —কোন
লপাখাঁই বটনাই এখন তার তাকে জন দেখাতে পারবে
না —বিশেষ করে এখন যখন সে তার মাদমার ধনকে —
তার সেরা পুত্রস্বর জীবিত, জাগ্রত লিপিথকে বৃকে
জড়িয়ে ধরে আদর করছে, —সোহাগ জানাচ্ছে। না,
এখন কোন কিছুই তাকে ভা-ওঁকিত করে তুলতে পারবে
না। সুন্দরী লিপিথের চোখ ঘোলা নৃ-র গুহা মেঘতে
মেঘতে পঙ্কজ প্রেমভরে সে তাকে চুম্বা খেতে লাগল
—চুম্বা গুণ চুম্বা—জীর্ণ চুম্বা—আরও দীর্ঘ !
চুম্বা বাগ্গার যেন আর শেষ হয় না তার ।

এবার করে এলহাটি যখন লিপিথকে বার বার চুম্বা
খাচ্ছিল, তখন হঠাৎ যেন তড়াক্রান্ত হয়ে লিপিথের
পরীটা বেঁকে-চুরে বন্ধকের ছিঁকে বাগ্গা হিলার মতই
এলহাটির বাহুবন্ধন ছাড়িয়ে ছিটকে দিয়ে বিদ্যায় গুণ
পড়ল ! বিদ্যায় পড়ে একটা হাত উঠে করে সে যেন
বার্তালকে বুঝে করে ধরতে গেল তারপরই সেই হাতটা
তার গায়ে পাশে ঝাড়কে পড়ে অবত, —বিস্ময় হয়ে
গেল। সেই সঙ্গে তার মস্ত পরী যেন বেঁকে চুরে,
এলহাটির কাছ থেকে দূরে চলে গেল যেন হতে লাগল
সেইটা আকর্ষিত বিবর্ণ ও বিদ্যায় হয়ে বাসিনের গুণ
পড়ে আছে। এলহাটি পলকবীন হুট-হুটিকে ত্রয়ে
ত্রে তাই মেঘতে লাগল। সে-পদে তার মস্তর হতে
লাগল সে 'নব মেঘে ন্যাকি ? —না, হঠাৎ তার হস্তর
হয়ে গেছে ? কি এ ? এক বলাভুর সুন্দরী ? কেন
এমন হল ?

লিপিথ তার শিশুর মত মল্ল হুটী ভরা চোখ হুটী
এভাবে পরে এই মল্ল হুটী ছিল—ও মল্ল হাটির কি
আবার তা ক করে ফিলে ? তবে কি ? তবে কি ?

ভাবতে ভাবতে সে তার চোখের পাতা তুলেই ভবে
বিচল হয়ে মেঘলে বরা বানুয়ের চোখে যেমন একটা
ঘোলা পরলা পড়ে যবে বাবার পর ঠিক তেমনি পরায়
লিপিথের চোখের ভাড়া হুটী হান, —কোণটিহীন হয়ে
গেছে ! হা ভগবান ! ওঃ, ওঃ, ওঃ ! ভগবান এক
করলে ?

না, না, না, এ গতি নর, —এ গতি হতে পারে না !
কাল্পনিক—মিথ্যে এটা ! এ তার নিজের অতি উত্তেজিত
মনের বাহ-মেঘল —এখনি সব ঠিক হয়ে যাবে আবার !
জীবিত লিপিথ তার নৃ-র বাহু দিয়ে আবার প্রেমভরে
তার কণ্ঠ বেঁটন করে ধরবে। আবার তাকে সে তার
বৃকে কিরে পারে এখনি।

বৈরাগ্যের উত্তেজনার পাগল হয়ে, এলহাটি ভেঙে
উঠলো, —“লিপিথ ! —লিপিথ !”

কিন্তু কই তার সে অবসর সুন্দরী লিপিথ ? এই
থাকে সে লিপিথ বলে ডাকছে, —এই কি গতিই তার সেই
লিপিথ ? এই কল্যাসর, চোপসায় অনড়-পড় মেঘ—
এই বীভৎস গুটী ? এই কি তার সেই লিপিথ ?
প্রতি হুটুতেই যেন সেই যেটা আরও কল্ল—আরও
বীভৎস হয়ে উঠছিল। তার মস্তরের মস্ত কোরল
নৃ-বালতার পায়ের রক্তের চামড়ার আতপায় তারপর
নীল দাগ কুটে উঠছিল—কোথায় গেল লিপিথের সে
সৌন্দর্য ?

এলহাটি তাকে আবার ডাকলে, —“লিপিথ !
লিপিথ ! —”

এই সময় সেই বিহারের কাকলী ভরা নৃ-এও ঘোরে
ঝোরে বাজছিল, যে এলহাটির ডাক সে শব্দে যেন ঢালা
পড়ে গেল।

“ব্যাপার কি ? অপরাধের হুঁহু...হাণ ভায়া বৃকি
এনে গেছে এখানে ? কোথায় ই-না ভোয়ার গতি
কই ? কিন্তু এও আগেই ত খানি ভোয়ার হারিয়ে
দিয়েছি ভায়া, তবে আবার আবার সঙ্গে পড়তে
এসে কোন সাহসে ? মেঘা তুঁবি খাবার ভোয়ার
হারিয়ে দেব আখি। লিপিথ আবার...তার ঠিকে
হাত বাড়ায়ে ভাল হয়ে না বলে লিপিথ...” কলতে
কলতে বৃক পড়েই থেকে সে তার নৈর্দ্ভিক তল মাঝে

শিপিটা বার করে দ্রুত হাতে কতকটা গ্রন্থ লিপিধের
শিয়ার মধ্যে ইন্ডেন্ট করে দিলে তারপর সেই ওয়ূসেই
কোটা কতক তার মূন্দের মধ্যে কেল দিলে। এই
অবৃত্ত হাবকের পক্ষিতই একদিন সে বরা লিপিধকে
বাঁচিয়ে তুলতে পেরেছিল তার শ্বাস প্রশ্বাস করিয়ে এনে
তারপর সেই স্বীকৃত বৃত্ত শরীরে শ্বাস্তাবিক বাত্ আনতে
পেরেছিল। তবে আর আবার সে এটা দিয়ে লিপিধকে
বাঁচিয়ে তুলতে না পারবে কেন ?

এলগারি আশা কল্পিত বন্ধে অপেক্ষা করে চেয়ে
হইল,—এক মিনিট... দু' মিনিট। কিছু একি ?
এখনও শ্বাস করে এলো না ত ? তবে কি ? তবে কি
ওয়ূসের পক্ষি ব্যর্থ হবে এবার ? হার, হার ! ব্যা—
ব্যা আর আশা করা—শ্বাস প্রশ্বাসের ত কোন লক্ষণই
দেখা যাচ্ছে না এখনো ? দেখটা বেঁচে উঠার মতন কোন
আশাশ্রয় লক্ষণও দেখা যায় না ! বৃত্তকে বাঁচিয়ে তুলতে
কয়েক সেকেন্ড মাত্র ওষধিটার দম্ব লাগত কিছু আর
কয়েক মিনিট কেটে গেছে এখনও অবধি কোন সুসুখ্যই
দেখা যাচ্ছে না ! বহঃ,—তার বদলে ওষধিটার একটা
নতুন সর্বশাসা লক্ষণ এলগারি এবার দেখতে পেলো !
দেখলে লিপিধের শিরা অনুশিয়ার মধ্যে দিয়ে ওষধিটা
যেমন প্রবাহিত হয়ে ব্যাঙিল অমনি গলে গলে সেই সব
জারসার চামড়া কোষার আকারে কুলে কুলে উঠে কেটে
কেটে যাচ্ছে, আর সেই কোষার তলার মাংস যেন আগুনে
পুড় কাশো হয়ে যাচ্ছে। হলে হলে লিপিধের শরীরের
ভেতর দিয়ে তরল আকারের আগুনের স্রোত প্রবাহিত
হচ্ছে। বিহ্বল ব্যাধা ভরা চোখে তার লিপিধকে বাঁচিয়ে
তোলার প্রচেষ্টার এই ভগ্নাব গঠনিত দেখতে দেখতে
সে স্পষ্টই বুঝতে পারলে তার শিষ্টর আঁট কি বিকট
তীর বেননার আঘাতই না তার গুণর যেনেছে। বৃত্তে
পারলে লিপিধের আত্ম চিরমিনের মত তার দাব বৃত্ত
হয়ে মূর্তি পেয়ে গেছে আত্ম। মনে পড়ল ধর্ম্মাধ্যক্ষ
কথা,—‘আত্মা বাত্তে বাত্তে ক্রমে এতবড় হয়ে যায় যে
আর সে তার মেহের খোলসটার মধ্যে দিচ্ছেক আকড়ে
হায়েতে পারে না তখনই মেহের গলে আত্মার বহনরত্টা
হিঁটে যায় কোন এক রহস্যজনক উপায়ে !’ এ যেন
ঠিক তেমনিই একটা কিছু ঘটছে বলে সে স্পষ্টই

বৃত্তে পারলে। আত্মাহীন লিপিধের দেহটা তার
বৈদ্যুতিক তরল দাবক, যেন বৃত্ত পৃথিবীয়ে থাক করে
নিষ্কল, তাইই চোখর গুণরে ! কি ভীষণ কি বিকট
এ বৃত্তি !

হতাশার দারুন আঘাতে এলগারির বৃত্তি বৃত্তি যেন
সোপ পেয়ে গেল। তরল দাবক ভরা শিপিটা প্রাপ প
পক্ষিত সে আত্মা মেহের মেহের কেল দিয়ে ভেঁটে
কেলে। তাতেও যেন সে ওষধির ক্ষমতা হীনতার
অপরাধের বশেষ্ট শাস্তা দেওয়া হয়েচে বলে মনে করচে।
পারল না মনে বশেষ্ট দারুনা পেলে না। উঠে বৃত্তোর
খোড়ালীর আঘাতে শিপিণ কটগুনো পৃথিবীয়ে যেন
তাকে বৃত্তোর গলে মিশিয়ে দিতে চাইল।

কশাসের শিরগুনো তার প্রবল উত্তেজনার বৃত্ত
স্রোতে দক্ষিণ মতন মোটা মোটা হয়ে কুলে উঠে যেন
কেটে পড়তে উন্মত হয়ে পশ্-পশ্ করে তাকে বাতনা
দিতে লাগলো। কিছু না—আর তার করার কোন
কিছুই নেই আত্ম। বিভ্রান্তের গভীর জ্ঞান তার আত্ম
আর কোন উপকারই করতে পারবে না। তার দৃষ্টির
ইচ্ছা পক্ষি,—তাও যেন আত্ম নিবর্তিত প্রবল কণাঘাতে
ধর ধর কাঁপছে—এখনই হাত সে পক্ষি মূর্তি ত হয়ে
পড়বে। নিজে হাত সে ব্রাহ্মজের মতই নিষ্কর্ম্ম হয়ে
যাবে এখনি। আঃ ! ওঃ ! ওঃ ! ওঃ !

মনে হল তার আত্ম সে গতি গতিই বৃত্ত নিরুপার !
নিভার পশু ! মনে পড়ল তার উপাসনাপার্য
ভগবদ্-কিন্দাসকারী সোকেয়া পূর্ণাপর এই কথাই ভগতে
প্রচার করেছেন, যে তাঁদের বিশ্বাস ভগবানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী
বিরাট শক্তির সামনে অন্য কোন শক্তিই মাথা তুলে
থাকতে পারে না। তাঁর সে অসীম শক্তির সামনে অন্য
সবায়ের বাধাই লুটিয়ে পড়ে য়োয়।—পূজকেরা এই
বার্ণাই প্রচার করেন।—আত্মা, পূজা—প্রার্থনা
ভগবানের উপাসনা... এ সব করে দেখলে কি হয় ?
বাদি—বাদি তার কলে এই বাদি, সোড়ো, বরা দেখটা
আবার শ্বাস্তাবিক হুশ কিয়ে পার ? বাদি প্রাপ ভয়ে
ভগবানকে ডাকি, নত-কান্দু হয়ে কোঁকো কোঁকো তাঁর
কাছে প্রার্থনা জানাই,—তবে কি,—তবে কি ঐ বীভত
মড়া বা একদিন তাঁর সৌন্দর্যরী লিপিধ ছিল... আবার

কি তা দৃশ্য হইলকাল্পা সাত তীরে বৈকে উঠতে
পারে না ? প্রভেদ না আবার তার-লিপিও কিরে আসতে
তার-স্বাক্ষর !—কি বীভৎসই না দেখাচ্ছে ঐ
জীবিতা একদা !

স্বপ্নে হতভাগ্য লিপিখের দিক থেকে হৃদয়
কোণেই পিথাপরিবৃত্ত দিশের হাবিতে তার নিশি
পাতিত হানি ভরা চোখ দুটির ওপর এলগামির দৃষ্টি
পড়ল, তারপরই চোখ তার বেগে এসে দিশের
স্রা হৃদয়ানির কাছে, পরক্ষণেই সেখান থেকে তলার
দেখাটীর ওপর !—

‘তোমরা আমার কে মনে কর ?’

জ্বর, মল হতে লাগল ওদুগুণে বেনে আগুনের
জ্বলন !—সেই আগুনের অক্ষরগুণো, তার চোখের
শাখায়ে ঘের ঘেঁ ঘেঁ করে নেচে বেড়াতে লাগল ।
তার মনে হতে লাগল সবত আকাশবাতাস কি বেনে
একটা হৃদেব্যাৎ কোলাহলে ভরে উঠেছে,—আর সেই
দুলে কেউ মারা গেলে পিছায় যেমন ওতটা খণ্ডা
বাঁহান ধর, ঠিক বেনে তেরদীন একদয়ের বণ্টা-বানি
বোঝে থাকে ক্রমশত । এবার এলগামি অদ্ভুত করলে
লাগল, একটা আঁত বড় কুমোরের ঢাকার হতই, সবত
পৃথিবীটা তখন বন বন করে ছুরে চলছে, একা
সে :—তারই ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টাল সামলাচ্ছে
অসামত ।

স্বপ্নে, হতভাগ্য, হাতে হাত চেপে, হাবির দিশের
দিকে চেয়ে এবার এলগামি চোঁচরে উঠল,—‘আমার
লিপিখের-আম্বাজের ছবি ! ভসবান বা পথতান,
যেই কেন হুগা ছবি,—আমি তোমার হৃদয়ে বার
কোরবই । কোন বড়ই পরিমাণ নেই তোমার আমার
কাহ থেকে । তোমার সঙ্গে লড়াই করে ছিনিয়ে
আনবোই আমি আমার লিপিখকে । আমার প্রাণের
স্বপ্নশঙ্কলকে কোন অধিকারে ছুঁনি তাকে ছিনিয়ে
দিলে আমার বুক থেকে ? কে ছুঁনি ?—ভগবান ?
—হে বহাগিক !—গিভাই যদি ছুঁনি বিপনিবজা ভসবান
বা তাঁরই আদ্বজ হও তবে আমার তার ক্রমা দিচ্ছ
না কেন ? বল,—বল, যখন হৃদয় করে ছেঁকা না ?
মানুষকে জ্ঞান দেবার পরই দ্রব দিবে তাকে গিয়ে

নিষ্কৃত করে দিও না—এই কি তোমার জ্ঞানদায়ের
উপভুক্ত কাম নাকি ? মানুষকে সারাজীবন হৃদয়-
হৃদয়ে শীলনোভায় গিয়ে গিয়ে হেরে ফেললে ত’
তোমার ইন্দ্রিয়ের কোন প্রসঙ্গই হয় না ।’

তারপর লিপিখের আশ্রয় উদ্দেশ্য করে বলে—
‘আর লিপিখ । ওগো সত্যবাদী বাহা । একবার
এলে বলে যাও আমার, এ তোমার কেনবন্ত
সম্ভাষণ ? তুমিই বলেছিল, স্নেহেই মানুষের শ্রেষ্ঠ
বৃত্তি । তবে খেঁই স্নেহ, দমত অমর ভরা ভরা স্নেহ
তোমার দিবেও, কেন আমি, আমার বুকের মধ্যে বসে
স্বপ্নে পায়লন না ?—কেন তুমি আমার এই স্নেহ
ভরা হৃদয় বহুত্ব করে দিবে চলে গেলে
গেলে নিখাত ? কেন ?—কেন ?’

ইচ্ছা না থাকলেও আমার এলগামি লিপিখের
ঘাটের দিকে চেয়ে ফেলে,—সেখতে গেলে তার
বৈদ্যুতিক তরলতার তখনও তার মেছটার মতো প্রসারিত
হবে, সেটাকে পুড়িয়ে ছাড়াবার কথই ! উঃ ! ও
—ও—এ হৃদয় যে আর চোখে দেখা যায় না !—
বলতে-বলতে হাত দুটো ওপর দিকে তুলে, এলগামি
যেন কোন একটা কিছু টেনে নিতে চাইলে,—সেটাকে
সে তার বিচ্ছেদ, আর তার এই শোচনীয় পরাজয়ের
মাকথানে পরবার হস্ত তুলে ধরে ঢেকে দিতে পারে !

হৃদয়ে হৃদয় ঢেকে সে যেন বহুত্বের বেগমার গভীর
আত্মনায় করে উঠল—আজ আমার শোচনীয় পরাজয়
হুটেছে । প্রতিবর্ত হুটেছি আমি, আর হয়ে পড়েছি
কিন্দাত, আত, ভ্রাত । আর এ সেই আমি, দার জ্ঞান-
পতনের গীমা পরিণীমা ছিল না একদিন—সেই আমিই
আজ চূর্ণাচ্ছিন্ন হয়ে সোঁহি ভেঙে গেছি একেবারে ।
আজ যে আমার প্রাণ করে এক অদৃশ্য বিরাট পতন
কাছে পরাজয় জীবন, কে করে তা রূপমা করতে
চলিয়েছিল ?

এলগামি হৃদয় ঢেকে চূর্ণ করে বলে থাকতে থাকতে
হঠাৎ যেন কি একটা কিছু সেই হাত ঢাকা হৃদয়ে
মাঝে মাঝে আবিষ্কার করে লাগিয়ে উঠে বলতে লাগল—
গেল শোন জগৎবাদী, গেল শব্দেবের দেবতা আর হতেব
অভাগা মানুষ, আমার কথা হব গিয়ে গিয়ে—

আজ আমি এক মহাসভার আবিষ্কার করেছি !
আমি তার অন্তরে প্রমাণ পেয়েছি—প্রমাণ পেয়েছি যে
ভগবান বলে শতাই একজন আছেন দবার ওপরে !...
মহা-নাটিক-বৈদ্য আমার দিলিথের আত্মাতার সেই
ভগবান ! দারুণ শেখাচারী, দ্ব-সপদ—মহাপণ্ডিত,
অপরিচয় আর নির্বাক ন্যায় বিচারক তিনি !

হে বহান—হে বিরাট ! আজ আমি তোমার জেনেছি
বুকেছি—মেনেছি ! সত্যি আজ আমি তোমার দেখা
পেয়েছি ! আর এও বুকেছি যে, কুহাতিতুল্য আমাকেও
তুমি ইচ্ছা যাতেই রূপান্তর দিতে পার, কিন্তু যে নাথ,
নাথ আমার তুমিও করতে পার না ! কেন ? কারণ
জগতের প্রতি অনুপ্রাণিত হত আমিও যে তোমারই
অংশ প্রভু ! কিন্তু নাথ, আজ এ কি করলে ? তোমারই
যে কুহুতম এক অংশ আমি, তাইই সংসে তোমার মহান
পন্থি লড়াই চালালে ? তাতে এই হল যেখানে
আলোর ধীপ্তি ছিল তা ভরে সেল অন্ধকারে, প্রেমের
সিংহাসনে বসিয়ে গিলে অপরিতক ! আজ আর আমার
প্রাণে যে আশার কণিকাতুল অর্থাৎ হইল না প্রভু ?
তবু, তবু, বলি—প্রভু তোমারই ইচ্ছা কর তে পূর্ণ.
আমার জীবন নাহে !

এই মহাসভাই আজ আমি আবিষ্কার করলুম যে—

তুমি আজ অনল অনিলে, চিরন্তন নীলে.

ভুবর শিলশে গহনে

আজ বিটপী লতার, হলদের গার,

পশী তারকার তপনে—

আজ তাই আমি দতজানু হয়ে প্রাণের সমস্ত ভক্তি
আর স্রষ্টা ভরে হে বিরাট তোমার চরণে নতি জানিয়ে
বলছি—

“তুমি আহ !—তুমি আহ !”

১৩৮

জাগো কিরাহ ! আজ থেকে তোমার স্বয়ম্ভাবনের
নেত্র হয়ে করুণার বাতব জীবনের আদম্বিত !—ওঠো,—
জাগো !

নিজের বিহানার নিশ্চিত আরায়ে শূন্যে ফিরাহ গাঢ়
শূন্যে আচ্ছন্ন ছিল। হঠাৎ ঐ কথাগুলো তার কানের

কাছে গাথিত হতেই, সে ঝঙ্কিত করে বিহানার ওপর উঠে
বসে বললে—কে ? —কে কথা বললো ?

চারদিকে বার বার চোরে দেখেও কোথাও কাউকে
দেখতে পেলেন না। অতঃপর আছে তার কথাগুলো
সে এত স্পষ্টভাবে শুনিয়েছিল যে, তার তখন বলে হয়েছিল
কেউ যেন তার কানের কাছে বসে এসে কথাগুলো
বলে গেল।

কিন্তু যেসে কিরাহ নিজের মনে বলে উঠল—নাঃ !
এও দেখছি আমার আর একটা স্বপ্ন !—অর্থাৎ স্বপ্নের
স্বয়ম্ভাবনা নয়তো যেমত। তা না হলে যখন তখন
আমি দন্তের অন্তরে শূন্যের কক্ষরই না শুনি কেন ?

ভাবতে ভাবতে বিহানা ছেড়ে সে পোশাকি পুরে নিজে
দর ছেড়ে বেরিয়ে এলারামির ঘরের কোর স্তম্ভের খুঁট
সে ঘরের মধ্যে এমনভাবে ঢুকলো, যাতে ঘুমের কল্যাণিত
ঘুমটা না ভেঙে যায় ! ঘরে ঢুকে কিন্তু সে এলারামিকে
দেখতে পেলেন না। ভাল করে ঘরের চারদিকে চাফ
বুলিয়ে চাইতেই দেখতে পেলেন, রাতে শূন্যে কবীর
আগে সে ঘরটা যেমন করে গুহিবে রেখে গিছিল স্বয়ম্ভাবনাই
ঠিক সেই অবস্থাতেই আছে !

তবু কিন্তু মন তার বেশ নিশ্চিত হল না, কেননা
যেন একটা বিহানের ভাবই তার মনের মধ্যে জেলে
উঠতে লাগল। তার মনে হল ঘরের দর আসবাবপত্র
যেন তাকে বলছে এলারামি আর আসবে না সে ঘরে !

কিরাহ ঘরের একটা জানালা খুলে দিতেই সকালের
স্বিচ্ছ আলোর ঘরটা ভরে গেল। এবার তার নম্র পড়ল
এলারামির টেবিলে একটা বই খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে
—যেন কেউ বইখানা পড়তে পড়তে উঠে গলে গেছে.
সেটা হুড়ে না দেখেই ! হুঁকে পড়ে কিম্বদন্তি দেখলে
প্রাচীন বিপন্নীর হরকে বইখানার নাম লেখা রয়েছে—
‘স্বতন্ত্র-বহ্য’ !

কিরাহ হুঁকতে পারলে না কে এমন করে টেবিলে
বইখানা খুলে রেখে দিয়েছে। কাল রাতে এলারামি
—একর থেকে গলে যাবার পর সে নিজে দর জিনিস গোছ
গাছ করে রেখে শূন্যে গেছেন। কই তখন ত এ বইখানা
সে টেবিলের ওপর রেখেই ?—আর খোলা অবস্থাতে ত
নয়ই ! তবে বইখানা আলমারী থেকে কে বের করে

একটাবিদের ওপর খুলে রেখে দেন। এলোহা কি
হিঁরে আবার এখানে কিংবে এসেছিল? তাই হয়ে যোগ
ক। তা না হলে এ কই নিরে আর কারই বা কি কাজ?

করুণে পড়ে বইখানা যে জেগেতে লাগল। ঠাৎ কি
ছোট ছোট অক্ষরে কতাকাহি লাইনে লেখা বইখানা!
মামুল দিয়ে নিরে লাইন ঠিক জেগে কিতাব বইখানা
কিঁতে লাগল—

বহরের মধ্যে বহন্য বলে কোন কিছুই নেই। আবার
এই বইখানা বহন হয়ে যায়, অর্থাৎ পঞ্চভূতাত্ত্বিক জে
দেন কই পঞ্চভূতের হাফে তারের আপন আপন সমস্ত
নির্ণয়ে নিলিয়ে জে তখন তা থেকে এই কথাটাই স্পষ্ট
হোকা যায় যে সেই পঞ্চভূতে ভৌদী পরীকটার মধ্যে
ভৌদিন যে আত্মা নাম করছিলাম, বাঙতে বাঙতে তিনি
কতই বড় হয়ে গেছেন এখন যে সে পরীকটার মধ্যে আর
কিঁনি নিজেই কুঁলিয়ে হয়ে গাফতে পাগলেন বা।
সাজেই তখন তিনি সে জে ত্যাস করে মনজের উল্লেখে
ফাল করেন। আত্মা অবিদ্যাপী—তাঁই জগৎ-ভূত্বা নেই।
উদাহরণ যেন—একটা ঘানের মধ্যে বীজ আছে। সেটা
যেন পুঙ্খভূত্ব হয়ে পরিপক হয় অর্থাৎ বাঙতে বাঙতে
জগৎ জগৎ বাঙের পরমাণুর নিরে পৌঁছায় তখন কি জ?
না, তার ওপরে যোগাটা কেটে যায় কলে বীজটা সেই
যোগার ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ে যায়। বাঙলের
হলও ঠিক এইভাবে আর এই কারণেই হয়ে থাকে। এতে
জ্ঞানের কোন ভান নেই।...

বইটা পড়ে কিয়ালের হয়ে হল—কোনাপ্রকারে পুঙ্খই
যদি কিছু তবু মামুল তা মোটে কই?

ঠাৎ কিয়ালের হয়ে হল, হয়ে যেন আরও কেউ
এসেছে। সুই থেকে পুঙ্খতুলে চাইতেই দেখতে পেলেন,
উৎকর্ষিত খুলে কারোবা তার পাখে ধাঁকিয়ে গিয়েছে।

কিয়ালের মধ্যে তার হৃদিত্তি বিনিময় হজেই সে একটা
আয়ুলে নিজেই প্রীকটের ওপর জেগে গাফা খবে বললে—
চল! পোল কর বা। এলোহা কোফার?

ইয়ারার কিয়াল জাকে পুঙ্খিয়ে দিলে যে এলোহা
তখনও ওপরে গর থেকে গীতের মেলে আর্গেগ।

এ কথাই কখনা পেরে কারোবা একটা চোখে বলে
পড়ল। বললে—আমার জেগে কোন চান একটা জ

কিঁকরে? বড় ভয় করছে আমার। দায়ারাত খানি
পুঙ্খের জেগেছি। দেখলুম আমার কুঁলিন খালে হয়ে
যাওয়া জেলেটা আমার কোলের কাছে পুরে না, যা করে
জেকে জেকে আমার আলার করছে। আমার মত্বা শ্রাবী
যেন—যেন ঠিক কই আসের দিবের বড়ন আমার পুঙ্খ
হয়ে না, তুনি এদন পুঙ্খের বা কিছুই নিরাক। নিভায়
গিপ, তুনি। আ। তার সেই করকের বড় ঠাফা মরা
পুঙ্খের চুপ, চাওয়ার পর থেকে এখন গীত করছে আমার।
আঃ আমার পরীকটের অর্জিতমত্বা একলও যেন গীতে জে
হাচ্ছে। একি সব? হিঁ হিঁ। এদনের মাগে কি
আমি পুঙ্খ উঠতে পারি না। মন যেন আমার 'কু'
লাইয়ে, মনে হচ্ছে যেন বড় করকের একটা পুঙ্খাঙ্গ
আমার দিকে এগিয়ে আসছে। মনে হচ্ছে এই পুঙ্খ
সে আয়ুক্তকায় করলে। ওঃ! ভগবান জেগে ফর।—
বলে সে পুঙ্খাতে নিজেই পুঙ্খ চাকলে।

চোরা কারোবার এই সবকিছু চোখে কিয়াল যেন
কিঁলিত হয়ে উঠেচা কিংব পুঙ্খ উঠতে পাগলে না,
কি বলে তাকে লাগলো দেবে। কাজেই চুপ করেই
হইল সে।

কতকল পুঙ্খ থেকে বলে থাকবার পর কারোবা পুঙ্খ
থেকে হাত সরিয়ে আবার বলছে—সেবতারের খিত্ব
কাজ করা যায়। এখন আর তা হয় না, পুঙ্খ পাগলে
গেছে কি না। কিংব তা বলে অপরাধী বেকসুর
খালস পাখে না কি? না, তা হয় যোগহয়—না না।
সেবতারের জেগা লাফা বড় নিম্ন। আর আমার
ত হয়ে জ, আরও সেবতারের বৈদ্যাক ঠিক ভৌদিন
ভির্গিকই আছে। মিহত্বাকাল কিংবভেই মরা করতে
পাবেন না। একবা আমার আত্ম-জান-পরাণী বিনিময়ে
কতদিন পুঙ্খিয়েছি। পুঙ্খিওরি যে অসুখি অস।
কোনদিন সে মরা যারও যাবে না—পুঙ্খিয়েছি,
যে জেবতারের মধ্যে কলকা করে কেউ কোনদিন খিঁতে
পাখে মি, তুনিও পাগল না।—এই জেগে সেবতারের
করে হাত শীকার কর। তা না করলে 'অসুখি'
নির্ভর্য মারে একদিন তোমার ভেগে পড়তেই হবে।
এই জোয়ার বলে গাফত্ব বাঙ। এই গীত শীকারই
একবার নিম্নকালে ঘটনাও উপায়।

এই দরজা ঘরের দেওয়াল ঘড়িটার উইন্ড করে নীটা থেকে গেল। চোখে কিয়াদ ঘড়িটার দিকে একবার দেখে নিলে ইলারায় আরোবাকে জানিয়ে নিলে—নীটা থেকে গেল, বেলা অনেক হয়েছে।

নীটা বেছে গেল শূন্যে আরোবা বলে উঠল,—
“কোনদিন বুঝে জাভতে আরার সেরী হয় না। মনিবের ইচ্ছাপ্রতিভা ভাঙে আরার পাত্ৰ বুঝ থেকেও নিমেষের মধ্যে জাগিয়ে তোলে, কিন্তু আজ এ হল কি?—এত বেলা হল আজ এখনও সে পাক্তর কোন নির্দেশ এলো না কেন? যাই, সেরিসে। রসে আরোবা ঘর থেকে—ওপরে চলে গেল।

ভারপর বোধহয় পাঁচবিগিটও কাটে নি, পাগলের মতন দু' হাতে বুক চাপকাতে চাপকাতে আরোবা কড়ের নতুন এসে ঘরে ঢুকলো। কিয়াদের কাছে গিয়ে তার শ্রাস্তাসিক কর্ণস ঘরে কহিতে কহিতে বললে,—
“লিথিৎ...লিথিৎ নেই। চলে গেছে। আর...এলগামি... সে ঘরে পড়ে আছে।...চল...এল...”

১ ৩১ ১

কিয়াদ আরোবার কথামুখে, একেবারে হতবশত হয়ে চুপ করে গাঁড়িয়ে গেল। পরক্ষণেই এই সন্ধি করে গেলো সে। পাগলের মত উদ্ভ্রান্ত ভাবে গামনে থেকে আরোবাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে দৌড়ে ওপরে উঠে গেল। লিথিৎ ঘরের দোর আড়কে খোলাই ছিল,—বোধ হয় বাবার দরজা সেটা বন্ধ করার বেলায়ই জ্বলি আরোবার। কিয়াদ হুটে ঘরে মধ্যে ঢুকে, দু' হাতে পজাটা তুলে ঘরে আড় খিটীর বার লিথিৎ খাটের দিকে চেয়ে দেখিলে। বা সেখানে, ডাঙত সে বহুকে লাড়িয়ে পড়ল, মনে হল তার দর-পরীর বুক পড়াঘাতে পল্লু হয়ে গেছে।—আর নতুন চকনের পিকটুই বুকি নেই তার! তার মনে হতে লাগল, মারা মেয়ের শ্রাস্ত-উপনিয়াজ ভেতর দিয়ে একটা বিজ্ঞানিকর স্রোত যেন রিমকিম-রিমকিম করে ঘরে বাজছে, এক স্রোত বরা!—লিথিৎ মন্থারান খাট বিদ্যায় ওপর, পলক মাত্র নপ্তি বুলিয়েই সে বুকতে পাল্ল বুকি আরোবা তার কাছে গিয়ে বিজ্ঞান কৃদা বসেই বসাদী কথায় বলেছে সে।

সেখানে, মতি খাটের ওপর লিথিৎ সে মন্থর মেহ-প্রতিভা আর নেই।—এই সত্যটাই তার বিষাদ মনের ওপর প্রথম রেখাপাত করলে। ভারপর নতুন পড়ল এলবারির ওপর।—সেখানে গেল, খাটের পাশে হুটু, সেড়ে বসে এলগামি মাথাটা তার লিথিৎ বিদ্যায় ওপর রেখেছে, আর হাত বুটো হুড়িয়ে দিয়েছে, মাথার দৃশ্য দিলে, ওপর দিকে। মনে হচ্ছে যেন মন্থর ইচ্ছাপ্রতিভা এলগামি, এখন ঠিক শিপ্পর মতন খাট হয়ে নিখিৎ হয়ে বসে পড়েছে। অতঃপর, কতকটা শম্বিত করে পাত, কিয়াদ এগিয়ে এসে, এলগামিকে দু' হাতে হুড়িয়ে ঘরে তুলতে চেষ্টা করলে। নাহ! বন্ধ ভারী! সেই মন্থে কিয়াদের মনে হতে লাগল এলগামি সেটা মনে পড় হয়ে গেছে।—তাই বার বার মাথাভাঙে চেষ্টা করেও সে সেটাকে অল্প একটু নড়াতে পারলে না।

ব্যর্থকাম হয়ে কিয়াদ, বিদ্যায় ওপরটা সেখানেই সেখানে গেল, সেই মতি কোমল শয্যায়, লিথিৎ ঘোমানে শূন্যে থাকত সেইখানটার, তার মেয়ের যেন একটা ছাপ পড়ে গেছে। আর সেই ছাপটাকে স্পষ্ট করে দিয়েছে, অতি মন্থ চন্দ্রনী দিয়ে হুঁকা, মাঝা হুঁকর একটা ছাইয়ের মত কোন কিছুর স্পষ্ট রেখা। লিথিৎ সেই অতি মন্থর মেয়ের এই পরিচায় মেয়ে বেচারী কিয়াদের মনে, আরার মন্থন করে শোক উৎপন্ন উঠল! তার লিথিৎ। তার মন্থরী লিথিৎ।

কিয়াদের মনে হতে লাগল—“বা জানি, হাতের অঙ্ককারে কি মরা বিরোপাত নাটকেরই অভিনয় হয়ে গেছে এখানে—কতই না ভয়াবহ মন্থন, বেচারী লিথিৎ আর তার মেহর ডাইটিং অর্থেই ঘটে গেছে,— যাঃ কল লাড়িয়েছে এই।”

আবার একবার সে এলবারির সেটা তুলতে চেষ্টা করলে—কিন্তু না। তার একার দ্বারা এ মেহ মন্থন সম্ভব নয়। চেয়ে দেখলে সে এতকাল পরে, মন্থর গাঁড়িয়ে বুকি আরোবা, হাত-পা বেড়ে হা-হুতাপ করতে করতে চেয়েই জলে ডাসছে। সেখানে কিয়াদের মনে হুঁকি তার মাথায় বেবায় কথা। ইলারায় সে আরোবাকে

ভেঁকে এলয়ারির ফেটোর একদিকটা ধরে ডোলবার সাহায্য করতে বললে ।

প্রথমতঃ বুড়ি তাতে রাজী হল না শিউরে উঠে বললে—“আবার বকু ভাষ করে ।”

কিন্তু তবুও তাকে সাহায্য করতে বলায়, এবার বুড়ি কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এসে এলয়ারির পায়ের দিকটা ধরলে । কিন্তু তখন হুহুতে এলয়ারির বুকেটা জড়িয়ে ধরে অনেক কষ্টে তুলে তাকে একটা চোরায়ে ধসিয়ে বিশে । তারপর কিন্নরের ইলিগতে জারোবা এক গ্রাস ঠান্ডা জল নিয়ে এল কিন্নর এলয়ারির চোখে ধুয়ে সেই জল দিয়ে বার বার কাঁপটা দিয়ে তার জ্ঞান কোবার চেন্টা করতে লাগল । বহুকাল অবধি কিছু এলয়ারির দন্দা লাভের কোন লক্ষ্যই দেখা গেল না । কিন্নরের ভয় হতে লাগল জ্ঞান কি আর কি হবে না এলয়ারির ।

বার্ণভার ব্যাবুল হয়ে কিন্নর ভাবলে,—“হাদা আবার বারো বার নি ত ? ” “তাড়াতাড়ি সে এলয়ারির জামার বুকের যোতামুলসো বুকে কেসে তার বুকের ওপর কান পেতে শুনতে লাগল বুকের শব্দন । — “না বেঁচেই আছে এলয়ারি...ঐ ত কী প দক্ বক্ পক শোনা যাচ্ছে ।...ভয় ভগবান ! হাতে ঘাই ধটে বাতুল, হাদা যে বেঁচে আছে, এইটাই সব চেয়ে বড় কথা,— পুথো বিদ্য । এলয়ারি এ ব্যাটা সামলে উঠলে, হাতে প্রকৃত পক্ষে কি যে ঘটেছিল পর কথাই শুনতে পার । — এর পর আর হাদা কোন কথাই আবার কাছ থেকে সোন্দন রাখবে না নিশ্চয়ই ।” —কথাসুন্দো ভাবতে ভাবতে কিন্নর আবার নতুন উদ্যোগের চেষ্টা সন্ধানের চেষ্টা করতে সেগে গেল ।

তখনও জারোবা হাত পা হেঁকে শোকে পাগলের মত এক ঘেয়ে কাত্য করিতে করিতে লিঙ্গিখের পুন্ডা বাটের দিকে বার বার বাধা ভরা ব্যাবুল হুঁপিতে চাইছিল । বাধার বাধিন আর চারো ওপর হাইয়ের দেখা সেও দেখতে পোয়ছিল । আর শেটা দেখার পর থেকেই আবার একটা ভীল ভয় তার মনে জেগে উঠেছিল । আচ্ছ হ বহু ধরে যিনের পর নিম্নে পৌন্দ্রের দানী তার চোখে ওপর কৈশোর

যেহে দৌরনে এসে পৌঁছেছিল, আচ্ছ তার সেই লেহের অবশেষ আর ক হুঁটো ছাই ?... হা ভগবান ! এ কথা সে বিশ্বাস করে কি করে ? ভাবতে ভাবতে গভীর শোকে তার স্ববির সেহ ঠক্ ঠক্ করে কেঁপে উঠল ।

এমনি করে কতকাল কাঁবার পর ক্রমে যখন তার কথা বলবার শক্তি ফিরে এসেো তখন জারোবা বিচ্ছ বিচ্ছ করে বললে,—“ভগবান এবার লিঙ্গিখকে ঘিরে গেছেন —এতো যিনে তিনি এলয়ারির ওপর পুন্ডা শোয় তুলেছেন !...সেবতারা, কবেই বা কাকে দয়া দেখিয়েছেন ? —বা তামিহে নিছের চিরকালই তা নিষ্ঠুর হাতে ছিনিয়ে নেন গভী ! আবারের গ্রাস যে তাতে ভেঙে পুন্ডো হয়ে যায় তা তাঁরা কোন দিন বুকেও বুকেতে চান না !...এতদিনে...এতদিনে দাঁতাই সেবতারা শোয় তুলেছেন, এলয়ারির ওপর ।”

এমনি একাধ বনে কিন্নর ভাবের সেবা করে গলে ছিল যে জারোবার কথাসুন্দো তার কাণেই পৌঁছ নি । তার এ ঐকান্তিক সেবার ফলও কলসো এবার,— এতক্ষণে এলয়ারি চোখ চাইল, জেগে উঠল সে যেন । সেই চোখ তার দিকে কেউ কোন দিন পুথ্ হুঁপিতে চেয়ে দেখতে পারত না,—আচ্ছ কিছু চোখের আর সে দাঁষ্ট ছিল না বহু সে হুঁপিতে যেন অতিবিদ্যায় বলেই মনে হচ্ছিল । যেন চোখ চেয়ে থাকলেও দেখতে পাচ্ছিল না সে কিছুই ! আর সেই উদ্ভ্রান্ত চোখে কেঁপে কেঁপে উঠছিল ধর ধর করে হাতে এলয়ারি ।

কিন্নর তার একদানা হাত হু হাতে পর ধোয়ে নিয়ে যশে যশে শেটা পর পর করার চেষ্টা করছিল । এলয়ারি একবার বাধ চোখ তুলে তার সে উদ্যোগ লক্ষ্য করলে । তারপর বিদ্যায় হুঁপিতে থরর চারিদিক চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো । যেন বুকে উঠতে পারছিল না সে কোথায় রয়েছে, আর কেনই বা রয়েছে ? তারপর ধুধ তুলে সে কিন্নরের শব্দখানা ভাল করে দেখতে লাগল । লেগতে দেখতে করে তার হুঁপিতে একটা কোমলতা কুটে উঠল, বুধে তার কুটে উঠল পাখ ধুধ হাদি । জবু কিছু কোন কথা কইল না সে ।

লিঙ্গিখের পুন্ডা বাটখানা এলয়ারির চোখের সামনে থেকে আত্মক করে হাদবার কবেই কোন কিন্নর তার

একবারে সামনে এসে দাঁড়াল। সন্দের কণ্ঠে বলে উঠল,
—“এখন কতকটা শ্রুত বোল শুনে কি এলগামি?...
পথীরের আর কোথাও বাধা করতে কি তোমার? এখন
কষ্ট কিছু কবেছ?”

এবারেও এলগামি কোন কথা কইলে না। শ্রুত চেয়ে
চেয়ে কিরাজকে দেখতে লাগল। একবার ভ্রু কঁচকে কি
যেন বলে করতে চেষ্টা করলে সে কিছু বেশ বোকা
গেল, শেয়ে উঠল না। তখন কুণ্ঠিত স্বরে আভে আভে
কিরাজকে প্রশ্ন করলে,—“কিছু বলে কোর না তুমি
আমি তোমার নামটা বলে করতে পারছি না কিছুতেই!
বলে হচ্ছে...কোথা যেন আসে তোমার মেথেরি,—কিছু
কোথার? করে? এ ভয়ে না আগেকার কোন ভয়ে
তা কিছুতেই বলে করতে পারছি না!”

সোকের আবেগ যেন দলী পাকিয়ে কিরাজের বুক
ঠেলে গলার দিকে উঠে স্বর তার বুক করতে চাইলে;
কোর করেই সে সেটাকে দাবাতে চেষ্টা করতে লাগল।
এলগামির এট অবস্থা।—এখন সে নিজে শোকে হুচুমান
হয়ে পড়লে, বেচারাকে দাবাধে কে?

পাখি স্বরে কিরাজ বললে,—“আমি কিরাজ।
তোমার একান্ত অনুরাগ আদরের ছোট ভাই কিরাজ
আমি দাদা।...কিরাজের কথা তোমার বলে যেই?
চিনতে পারছ না দাদা আমার?—তুমি যে আমার ভাইন!
—আপা! আমন নিত্যকর্ম সব কিছুই যে তুমি দাদা!
...আমাকেও তুমি চিনতে পারলে না?” —বলতে
বলতে কিরাজ আর কোন বতেরি আপনাকে দাবাধাতে
পারলে না শোক যেন তার আবার নতুন করেই উৎসে
উঠলো।

সম্ভীর হুয়ে কিরাজের দিকে চেয়ে এলগামি বললে,
—“তুমি বেশ দলী মনে কিছু আমার তুমি বড় বেশী
দাড়িয়ে তুলছ। কোন দিন যদি আমি তোমার কোন
উপকার করে থাকি, তবে তা শ্রুত সন্দের কথা কিছু
তা বলে আমার অন্ত হুচুয়াত কোর না।” বলতে বলতে
এলগামির মাথান্না যেন তল্লা ঘোরে বৃষ্টির গুণর কঁকে
পড়ল।

এলগামির কথা শ্রুতে কিরাজ তার তার করে কেঁপে
কেন্দলে। ব্যাকুল স্বরে বলে উঠল সে,—“এলগামি,—

দাদা আমার! আজ কি তোমার বড় মেথেরি ছোট
ভাইটির কথা একবারেই ভুলে গেছ দাদা? কোন
ভাবনাট নেই আর তারিজনো তোমার?”

চোখ বুলে এলগামি মাথা তুলে বললে,—“ভাবনা
নেই!—না, না, তুমি ভুলে বৃদ্ধ, ভুলে বৃদ্ধ!...অনেক
ভাবনাট ভেবেছি আমি...কিছু দরতো...দরতো, তার
মধ্যে তোমার কথা তোমার ভাবনা ভাবি নি। কি
যেন আর বললে তোমার?...কিরাজ? আভহ? ভাবি
নিশি নামটি তোমার! কিছু এটাতো দাবার নামের
বতন নয়?...ও, হ্যাঁ—একজন কিরাজকে আমি জানতুম
বটে! সে ছিল...সে ছিল আমার ছোট ভাই!—অন্তত
তখন আমার ভাই বলে হত! কিছু তারপর...তারপর
জানতে পেয়ে ছিলুম আমি কে সে! কাছে এসো—
শোব—” বলে এলগামি স্বর দাবিরে, কিস, কিস করে
কিরাজের কাশে কাশে বললে,—“সে নামক ছিল না,—
আসলে ছিল সে মেথেরি! একটা তারার তার
হলুতুমি,—সেই তারার সপেই তার বেশী পরিচয় ছিল
আমার চেয়ে!”

কথাদলো শ্রুতে শ্রুতে আবার নতুন করে অশ্রুত
বান ডাকলো কিরাজের চোখে। চোখের জল ঢাকবার
জন্যে সে তাকাতাকি শ্রুত কীরিয়ে নিলে এলগামির দিক
থেকে। “শুটই সে বৃদ্ধতে পারলে এক দমরের মহাজানী,
অভিজ্ঞানী, দূর্বর্ষ এলগামির শ্রুতি আজ সম্পদে
ওলট-পালট হয়ে গেছে! হত তার এ হুচু বৈকল্য
কোন দিনই দাবাবে না আর! না জানি কতবড় মিথ্যুর
খাযাত আর তাকে এমন করে ভেতে গুঁকিয়ে
দিয়ে গেছে?

শ্রুত কীরিয়ে মেওরা দমেরি কিরাজের কাগ্না এলগামি
মেথতে সেলে। তখন সে নিজের একটা হাত কাঁপতে
কাঁপতে তুলে কিরাজের কাঁবের গুণর রেখে দান স্বরে
বললে,—“কিছু তুমি? কই আমি ভো তোমার বকি
নি। তবে তুমি কীর কে? না, না, কেঁপে না হুচু
কর। জসবান কর্ণাশর, সে কথা ভুলো না!”—
বলতে বলতে সে চোখ মেতে উঠে দাঁড়িয়ে ললদলীতে
দাদা দান সোদাদাদলোর দিকে তার বড় পড়ল,—
বলে বলে দাদা সেহটা তার কখ খর করে কাঁপতে

কোনদিন আমার ভার নইতে হবে না... সেটা যে আমার কত বড় ভুল পারণা ছিল, আজ তা আমি বেশ নুতনে পারছি।...তাই ত' তোমার এ সাহায্য...এতো সেবা, ভালুপাশে আম...চোখেও আজ, ভাল দেখতে পারছি না, আমি! সোলাপঙ্গলের পাশে তার যে তাঁর ছোয়াতম্বর'র মেহ, কুট্টে উঠেছিল, আমার নম্বর চোখ দিয়ে, তাই আমি দেখতে গেছলুম, তারই কলে চোখকুটো আমার কাপণ্য হয়ে গেছে। হানুদের চোখ সে অপর আহার ছোয়াতিঃ—গীণ্ডি সহ্য করতে পারবে কেন? "

"চ্যা, তাই হবে। আর তাছাড়া, তুমি বড় ক্লান্ত এখন,—এও একটা করণ হয়তো।—দুচার দিন জিরিয়ে, পরীয়ে একটু বল পেলো. চর ত পরীও তোমার চাপ্পা হবে উঠবে আমার! ও কি? ভাল করে আমার হয়ে. আমার ওপর তোমার পরীয়ে ভার লাও, তা না হলে পড়ে যাবে যে এখনি।"—বলে ফিরাক অতি দাবখানে সিঁড়ি দিয়ে তাকে বীচের নাবাতে লাগল।

এই ভাবে ধরে ধরে সে এলগ্যাবিকে নিয়ে নিতের তার বদলার ধরে নিয়ে এসো। ভিয়াহ আশা করছিল, এই ধর, তার নিভা কর্মের পরিচিতি, হরত এলগ্যাবির পূর্ব স্মৃতিতে কাগিয়ে তুলবে।

তা কিহু হল না।

হেন, কোন এক অজানা কারবার এলে পড়েছে সে, এখনি ভাবেই এলগ্যাবি ঘরের চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। চারিদিকে ভাল করে সেবে এলগ্যাবি বলে উঠল,—“এখানে আমার একা ফেলে রেখে তুমি যেন চলে যেয়ো না। আমি বড় দুর্বল, বড় নুতন হয়ে গেছি। তুমি হরত জান না, কত—কতো কাল গড়ে বেঁচে রবেছি আমি। হ্যাঁ অনেক অনেক বছর ধরে বেঁচে আছি আমি আর যেন সেয়ে উঠছি না। আর তা ছাড়া, চারিদিকে এ সব বা দেখছি, সবই আমার ঘটনা। এটা সেই পুরানো পৃথিবীই ত? —না, অন্য কোন গ্রহ? কিম্বা এ সবই হরত নয়? কে জানে।—আমি যেন কিহুই বন্ধে উঠতে পারছি না।"

আপনার
প্রিয়
আনংকারিক



দত্ত ব্রাহ্ম

১২৭/১এ, বোম্বাইয়ের স্ট্রীট

কালিকাতা-১২

ফোন- ৩৪-১২০২

“না এলগামি, এ সব সূচন নয়, পৃথিবীতেই রয়েছে তুমি।—সেখ না, জাগ্রত ভগবানের শ্রিত অশৌচীন্দ্রের মতন, সকালের সূর্য্যোদয়েই ঘরটা ভরে গেছে?”

“হ্যাঁ—হ্যাঁ। ঠিক বললে—তোমার কথাই ঠিক।” এলগামি উলটে উলটে উঠে বাহকে দেখে কিয়ত তাকে আবার বসিয়ে দিতে সেল।

এলগামি তাকে বাবা বিত্তে হাল্য করে বললে,—“না, না আমার উঠতে পাও—আমি ঐ জাগ্রত ভগবানের—জাগ্রত ভগবানের—জাগ্রত ভগবানের আশীর্বাদ ঐ সূর্য্যের আলোর স্থান করে পবিত্র হতে যাচ্ছি।—আমার বাবা সিও না”—আমার পবিত্র—শুদ্ধ হতে পাও।—

তাকে ধরে ধরে তুলে এনে, জানদার ঘরে রাখা হাট্টা চোরটোর কিয়ত শব্দানে বসিয়ে দিলে। খেলা জানালা দিয়ে সূর্য্যের রশ্মি এসে এলগামির সমস্ত দেহে ছড়িয়ে পড়ল। সত্যই যেন তখন সে সূর্য্যের আলোর স্থান করতে লাগলো।

একটা বন্ধু বন্ধুর প্রজাপতি এই সময় ঘরে এসে, এলগামির চার দিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সেই দিকে ত্রয়ে দেখতে দেখতে এলগামি যেন প্রজাপতিটার দৌলখ্যে মগ্ন হয়ে সেল। হুইকর বন্ধু করে, গভীর প্রজ্ঞা ভরে, সে বাইরের নীল আকাশের দিকে ত্রয়ে, বলে উঠল,—“তুমি আছ নাথ,—তুমি আছ। তা না হলে এত সূক্ষ্ম করে আর কে লক্ষ্য করবে?—আজ আমি বন্ধু কণ্ঠে বলছি—

“তুমি আছ নাথ।”

বলতে বলতে এলগামি চোরের ছেড়ে, সেই সূর্য্যের আলোর হাট্টা পেড়ে বন্ধে হুই বন্ধু কর, কপালে রাখলে চোখ বন্ধে। আর তার সেই বৃষ্টিত চোখ গুট্টা থেকে যেন চোরের দ্বারার অন্ধুরের গড়তে লাগল।

কিন্তু তার পামেই লক্ষ্যে কালকে ন্যাসিক এলগামির আজকের এই পারবতন দেখছিল বিশ্বের নির্বাক হয়ে।

ক্রমে এলগামির কপালে রাখা, বন্ধু কর, অলস হয়ে পড়ে বাহকে দেখে তাকাতাকি কিন্তা তার হাত গুটি ধরে চোরের ওপর ত্রয়ে দিলে। ততক্ষণে এলগামি

পাচ ঘুরে আছড় করে পড়ে গেল। ‘কিন্তা তার হাতের ওপর তুলে পড়া মাথাটা শব্দানে তুলে, পুতাতের মাঝখানে চোরের ওপর ত্রয়ে দিলে বৃষ্টিত হাতে, যেতের জন্য বিহ্বান হয়ে, তাকে পুইয়ে দিলে তাকে। এবার এলগামি শিশুর মতই নিভিত আদ্যে বিহ্বান হয়ে ঘুমুতে লাগল।

এলগামিকে সূর্য্য তাণে ঘুমুতে দেখে কিয়ত নিশান দেয় ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

যেন তখন তার মূর্ত্যবানর মেনে রমা হচ্ছিল। একদিন এলগামিই সংসার প্রতিপালন করত। কি করে করত, কোথা থেকে টাকা আনতো, কিয়ত তার কিছুই জানে না আজ কিন্তু তার যে অবস্থা হয়েছে, তাতে কিয়তকেই এখন থেকে সব চার বইতে চলে। কিন্তু কি করে যে সে কি করবে, তা ভেবে শেল না। যেন যেন সে শ্রীভগবানের নাম করতে লাগল। যেন হল তার, সকলের সকল চিন্তার চিন্তাবিন্দী এর একটা ব্যবস্থা করে জেনে নিচ্ছই।—

এই সময়, চিন্তার তার বাবা পড়ল, সদস্যদের সভা নাড়ার শব্দে। গিরে দোর ঘুমুতেই, টেলিগ্রাফ শিঙ তাকে একটা টেলিগ্রাম দিলে, সেই নিয়ে চলে সেল। দোর বন্ধু করে কিরে আসতে আসতে বাম বামার এলগামির বললে তার নামই সেবা রবেই দেখতে গেলে। জীবনে আজ প্রথম সে নিজের নামে টেলিগ্রাম শেরে, বিশ্বয়ে হতবুদ্ধি হয়ে সেল।—তাকে টেলিগ্রাম করেছে কে সে ত’ সম্পদে অশাণ্ডিত, তবে এমনটা হল কি করে?

কৌতুক ভরে বাম হিঁচকিতেই দেখলে শাইদ্রাস থেকে খ্যাত্যাক টেলিগ্রাম করেছেন,—

‘এলগামির বিবর সবই আমি জানি। তাকে নিয়ে তুমি এখানে চলে এসো; মঠেই থাকবে তোমরা দুজাই।’

কত সহজে ভগবান তার চিন্তাকাতর মনে পাচ করলেন, ভেবে সে ভক্তভরে হাটপেড়ে সেইখানে বলে পড়ে হুই বন্ধু কর কপালে ঠেকিয়ে বলে উঠল,—“দয়াল প্রভু! কে বলে তুমি নেই!—তুমি আছ, তুমি আছ, সত্যই তুমি আছ।”

খেয়ে মেয়ে কুঁহিতে নিতে বললেন খাদ্রনের উচ্চারণ ।
নেপালী হস্তের জাওয়া নিয়ে এসেছিলেন তাই খাজা
হচ্ছে । হালুয়া আর পুড়ী । কিন্তু ঘূর আর হল না ।
কি হািহ । ধরের জানালা দরজা দরজা বন্ধ করেও রেহাই
নেই । খেতে বিরক্ত হয়েই উঠে পড়ি । উচ্চকে বলি,
জল খাজা থাক সুখান্দুদের ওখানে ।

খাবার সময় বাজারের কাছেই দেখলার সেই মণির,
আদারার সখর থাকে বাইরে থেকেই দেখে এসেছিলাম ।
মণিরের দাবনে প্রকাশ্য ত্রিশূল । ত্রিশূলটা পড়ি
দেখবার হতো । এবার এই ত্রিশূলটা দেখাদেব দুজনের
সময় নিকপে করা হয়েছিল ।

হাতে নিজের হাতে ভাত হারা করে খাওয়াসেন
উচ্চারণ । নুতন ভরকারী ওনেহন বাজার হতে কিলে ।
বললেন, কেবল আদু থেকেই আসছেন এরপরও আদু
হাজা আর কিছুই পাবেন না । খেতে বিন । তাই বেশ
ভূমিতোষণই হল সেই হাতে ।

উত্তরকাশী হতে নবোদী সাত নাইল । এবং পথও
বেশ ভালো । তবে কবুলোত্তরীর পথে বেবল কুলের
স্বায়োহ দেখেছিলেন এঁরকে তার কিছুই নেই । বনের
সম্মুখ হাজা আর কোনো জ্ঞ নেই ।

পথ ভালো বলেই পৌঁছে দেখান বেলা নটটার নথো
নবোদী । মাঝে খবর্য এক জায়গায় পথ বেরানতির
কাছ হাঁকল । দেখানে অনেকটা নীচে দিয়ে বেনে
থেকে হল ।

নবোদীরেই আবার অনেক ঘাটী । বর খালি সেই
বকেই কংগালার যেটা ভাঁড়ার সেই ক্ষটাই পেদার
আমরা ।

তিতটার সময় আবার বেরুদার আবার নবোদী হতে ।
রখিয়া বলেন, দায়ফের বড় গুটি জাউগাড়ী । ভাকলর
বড়দের বাঙরা যায় ।

খাশকি নেই আর । উত্তর পায়ে রাখা এখন অনেক
কম । শব্দেই হঠিতে পারছে সে ।

হঠিতে হঠিতেই ঘোঁষ আদু পুরনো দিমের দাঁড়
সেই বোদালান্দ । উঠতে একটু ইচ্ছে হয়েছিল । কিন্তু
এত নীচে যে এখন হতে দেখানে শব্দা যায় না । বোধ
হয় নীচের গ্রামের লোকেরা গুটা ব্যবহার করে থাকে ।

একটা দোকানের শব্দেই আবার ঘোঁষ ভাঁড়ি
ভাঁড়ি ভাঁড়ি । আকাপটা যে রকম নেবলা হয়ে উঠছিল
তাতে ওখানে থেকে গেলোই ভালো ছিল । কিন্তু ওই
ভাঁড়ি দেখেই সুখান্দু, আর দাঁড়ন না । বললেন, চন্দ্র
এগোই । যা হবার হবে ।

কি আর হবে, না হব ভিজব একটু ।
খাঠিতে খটখট পথ হুসে জোরে জোরে পা
কেলে আরো খানিকটা এগিয়ে যাই । ঘোঁষ দাবনেই
আর একটা নুতন গুটি । লোকজন নেই । দোকানীও
ভাক জে । কোবার দাবনে আর এগিয়ে । বাজার আসে
গুটি নেই । সেও পড়ি হাইল । জল এসে বলে ।

কেনব হুটিয় দাওয়ায় পিয়ে উঠে বসেছে । বলছে—
এখানে থেকে গেলোই হয়—আকাশের অবস্থা ভালো
বনে হচ্ছে না ।

সুখান্দুও তাই হত । কিন্তু রখিয়া এসে সময়
উলটে ছিলেন । বললেন, এখুনিই কি থাকবে । চলো
এগিয়ে—না হয় ভিজলারই একটু ।

বেশ কথা । এগিয়ে চলো তাহলে—
কিন্তু নাইলদাবনেকও বাসিনি । জল দাবল ।
বেরুদার দরজা দেখে কেউ বর্ণাতি রাখিনি ।
তাই দৌড়তে শুরু, কংগ—দাবনে একটা উটকো ঘর
যেবে । আশেপাশে গাছপালা নেই যে তার নীচে
লুকাই । ওই উটকো ঘটাই এখন যা ভালো । এই
ঘটটা না থাকলে দন্দুদুই ভিজে যেতাম ।

কিন্তু ভারী ভালো লাগছে আকাশ জোড়া বৃষ্টি
দেখতে । পাহাড়ে পাহাড়ে বৃষ্টির দারা নেমেছে—
সব কিছু বেন কাপসা হয়ে গেছে ।

খানিককুড়ির মধ্যেই বৃষ্টি খেয়ে গেল । কিন্তু
আকাশ বেন নেবলা হয়ে রয়েছে তাতে বৃষ্টি আরো
দাববে । কিন্তু এই উটকো ঘরে ত' থাকা যায় না ।
তাই বোঝে সেই পিঙ্কল পথ হয়ে দাবনের
দিকে এসেই ।

এক কার্পাসও বাসিনি । আবার বেন কয়েক ফেটি
জল পড়ল । পানেই একটা দুরের দোকান । সেই
দোকানেই হুচ্ছুক করে ঢুকে পড়ি ।

দোকানী বলে, খাও আর বেতে পারবে না । নীচে

৪টি আরে ঐখানেই থাকে। চাল ভাল আটা দল পায়ে এখানে।

৪টি ঘোঁষ। ৪টি নর, আতাবল। এককালে হস্ত ৪টি ছিল। এখন আর লোক থাকে না। ঐখানেই রাত কাটানোর আশ্রয়।

আশ্রয়টির নাম কুলাতি।

৪া বেয়ে বিরহে আবার বের হবার আশ্রয়। তারপর বাইল ভিনেক পথ ছেঁটে এলাব রাস্তার। রাস্তার ঠিক নয়। কারন রাস্তার যে ৪টি সে ৪টি অনেক দীর্ঘ। আগের পথ ৪টির কাছ দিগে হলেও মৃতদ পথ দেখাই দেখে ওপর দিগে। সেই পথ দিগেই আরো বানিক এগিরে সেলাম। কিন্তু বানিক গিয়েই বাগা সেলাম। পুনরায়, এদিকে আর পথ নেই। মৃতদ পথ ভেঙার কাছ চলেছে।

রাস্তায় নেমে গেলেও হ'স্ত। কিন্তু সে পথও ওপরে কাছ হচ্ছে বলে বহু। তাই পানকতী পথে পানের একটা পাহাড় তিগিরে নামতে হল ভাটগুড়ী। কিন্তু ভাটগুড়ীতে থাকি না। লোকা বেরিয়ে বাই বাহানার দিকে।

পথ এমনিতেই গভীর। তারওপর বহু বস্ত পানরের চাবকা এসে প্রায় হ'মতি বেয়ে পড়ছে পথের ওপর থেকে বন্দোবস্তী বাবার দর দেখেছিলার স্যান ৪টির পথে। তবে ওত বহু নয়। আবার কোথাও কোথাও পানর তেটে সিঁড়ি দাঁড়ি বাপ কাটা হয়েছে। আবার ত ফেরি এই সিঁড়ির বাপ উঠতে নামতে আরো বেশী কষ্ট।

বন্দোবস্তার বহু বহু এসে পড়ি বহু বহু দাঁড়ি দাঁড়ি, যেখানে উক ছলের করণ। পদুম ওপরেই গভীর। কলার জল পথের ওপর দিগেই পড়িয়ে পড়ছে। রাস্তাটা জলে-কাবার পিচ্ছিল।

পদুম পেরিয়ে দাঁড়ি ওপরে সেলাম যেমিকে আপেকার পথ হ'ল। বন্দোবস্তাও ঐদিকেই। বন্দোবস্তার জ্বলেই ঘোঁষ আর একটা জলের কল। তবে উক নয়। ঠিক পাহাড়ের গা দিগে একেবারে পিচ্ছিল পড়ছে জল। তারপর সেই জল জ্বলেই গিরে পড়ছে।

কোলা হয়েছিল বলে ও বহু পড়ছিল দেখে আর ফেট গভীরেও জ্বল করতে এল না। তাই একা একাই

সেলাম সেখানে স্থান করতে। আবার বেরুতে সেবে তারাস্তাও মগে এল।

সেই উক ছলের ওপার পান দিগে ওপরে উঠি বেছালে গভীর। পরপর তিনটি জলের চৌবাচ্চা। আরো ওপর হতে উক জল এসে পড়ছে তাদের মধ্যে। পরপর তিনটি জলের হুণ্ডে বেয়েই স্থান করতে হয়। সেখান প্রথম বহুটি তত উক নয়, পেছেরটি বা একটু উক।

উক ছলের উৎস সেখানর জন্য আরো ওপরে উঠেছিল। সেখানকার হাঙ্গিরে পদুমারী বলসেন ওপরে একজন দাশ সম্ভারের দাশ; থাকেন—সেই আদবেন ওসি।

উক ছলের উৎসে কোথা কিনারা করতে পারণা না কিন্তু দাশরীকে সেখান। আরো বহু একক মগেছিলেন তাঁকে দিগে। আর তিনি এই পাহাড়ে কখনই বসেছিলেন। বসেছিলেন, রাস্তায় যে গহবাল পাহাড়ের কথা আছে, লক্ষ্য পড়ি সেলে পড়ে সেলে হুঁম্বা যে পাহাড় তুলে নিয়ে গেছিলেন সে এই পাহাড়। এ পাহাড়েই আছে সেই বৈশাখকলী হাতে বরা মানব প্রাণ পার। তাইত তিনি এ পাহাড় থেকে কোথা দীর্ঘ সেবে স্থান না। তা হল প্রায় আঠারে বছর এখানেই।

জিজ্ঞাস করি, তাহলে সেই বৈশাখকলী আপসি নিচর জেনে।

বলসেন, সে দিক আর 'গভীর' দাশা চোখে দেখা যায়। এই পাহাড়েই কত জড়িয়ে রয়েছে হীরা-পান্না—সেই জুঁবি চিনতে পারবে?

হীরা-পান্না জড়িয়ে বাক্য কিছুই আতব নয়—কাহ সেও দাশ। কিন্তু তিনি এমন দাশ কি।

তবে হীরা-পান্নার দোভ বেই আদার। ওমনিতে পথ চলতে দু'বের আদোষ পানর পানরে হীরা-পান্না যে জিকিমিকি ঘোঁষ তাইতেই মন ভরে উঠেছে।

পাহানার বন্দোবস্তা এমনিতেই বেশ বহু কিন্তু দলের সেবে বসেই হোক বা দামের পদুমার জ্বাই আর এখানে অসম্ভব ভীড়। এতবধু বন্দোবস্তাতেও তা লোক ধরে না। বহু বারাক্সা যেখানে যে পারছে জ্বল করে গিয়েছে। কোথাও পা কোঁস এমন উপায় নেই—প

কেলতে সেলই কারু বিহান্না বাড়াই ত কারু গা । তার
ওপর আনয়া আসার পর হতেই বিরক্তিরে দৃষ্টি আকর্ষিত
হয়েছে—তারো বিরক্ত নহেই । বরং সন্ধ্যার দিকেত চোপে
জল এল । জল কাদার সে আরো এক হৃৎকোপ । তবে
আনন্দের ততটা কষ্ট হয় নি—সুখানুভূতি আসে হতে
এসে একটা ঘর বন্দন করে রেখেছিলেন বলে ।

গানানবী হতে বেরিয়েই দেখিল আবার আশাপ হল
এক বাতালী জ্বরলোকের সঙ্গে যিনি সম্মুখ এসেছেন ।
সঙ্গে একজন প্রবচারা । এঁরা প্রায় আবারের সঙ্গে
সঙ্গেই ছিলেন কিন্তু আশাপ হলনি । আনই প্রব
আশাপ । ওঁদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হটিছিলেন ।
ঠান এক জায়গার এসে দেখি প্রকাণ্ড একটা ঘর ঘরে পথ
চেতে গেছে ।

তখন বাধ্য হয়েই আবার পেছনে ফিরতে হল । এবং
পাকমতী গণ্ডে নদী বরাবর ঘেঁষে গিয়ে নদীর ধার ধার দিগে
এগিয়ে এসে আবার গণ্ডে উঠে আসতে হল ।

কিন্তু এ কি পথ ! সোহাগিনাসের পরে নদীর চড়া
পেরিয়ে পাথর ভেঙে উঠিছিত উঠিছ । তখন কি জানি
আজ শূকর চড়াই । পাঁচ মাইল চড়াই ।

অনেকখানি এসে দেখি এক গাছতলায় দাঁড়িয়ে
রয়েছেন রবিয়া, নীলকান্ত ও বৈদ্যনাথ । যোরে উঠতে
বোধহয় কষ্ট হচ্ছিল তাঁদেরও । তাই একটু জিরিয়ে
নিচ্ছিলেন ।

তারপর একই সঙ্গে এলায় আনয়া শূকরিতে । কিন্তু
সেখানে রইলান না । বানিকটা জলযোগ করেই বেরিয়ে
সেলার কাদার দিকে । কিন্তু জল খেতে গিয়ে প্যাউর
কাছে যে জল দেখি পটান কোলে এখনি লাল করে রেখেছে
যে দুখেরে কার সাধ্য । কিন্তু একটু ওপরে উঠতেই
সেলার সিংহ মূখ হতে কণ্ঠস্বর জল করছে । সেই
জলই সেলাম ও ওয়াটার বটলে ভরে নিলাম ।

সেখানে দাঁড়িয়ে ডান দিকে অনেক বাড়ি ঘর সেলাম
কিন্তু অন্যান্য কাউকেই সেলাম না—কাউকে যে
জিজ্ঞাসা করব এমন একটি লোককেও না ।

শূকর হতে কাদার পথ বেশ হারান্নার আর বনোয়র ।
মাইল তিনেক পথ কিন্তু একটুও কষ্ট হল না । একটা
প্রকাণ্ড পায় সেলাম—কি জায়গা মোটা ওর পুঁজিটা ।

আর সেলাম নদী । নদীর এই এক মূখ । এমন পাত নদী
যে এগণ্ডে দেখব তা জাবিনি । এতটুকু পথ নহে ।
জলে স্রোত আছে কিনা আছে যোকা ঘর না—শুধু
তরতর করে বয়ে চলেছে । আর বাগিচা । যেমন পল্লার
সেখোই ঠিক ডেমনি । একেবারে সমতল নদীর
অবিস্রাব্য ।

কাদার বন এসে পৌঁছলান তখন বেলা প্রায় একটা ।
বিকেলতে আর বেরুচ্ছি না । তাহাড়া দৃষ্টিও
নাহল । সন্ধ্যার পরে মূল ধারে । ঘরের দ্বারে এখানে
শুধুই কঠি—চিনের হাউনি নহেই । তাই জল চুইয়ে
পড়ছে সবখানে । কম্বল পেতেছিলেন—সেলুসো পুঁজিরে
রেখেছি আর গুটিতে বাটিতে করে জল বরিহি । এখনি
করে কাটল হাত এগারটা অবধি ।

বালা হতে বেরিয়ে রবিয়া বলেন, আজ ছোট
চড়াই আছে—উত্তরবাটার চড়াই ।

দুনে বালি, ভরু জাল যে আজ বনে করিয়ে
ছিলেন । কাল যে শূকর ওত বড় চড়াই সেল তা
বলে সেননি, তাই টেরও সেলুম না যে একটা চড়াই
গিরিয়ে এলাম ।

কেশব বলে শূকরী—কি শূকরী । কিন্তু ওর নাম
শূকরী হওয়া উচিত ছিল ।

রবিয়া বলেন, তা নহ, শূকরী নামে শূকরো ।
দেখলে না কেমন নীরস ওই চড়াই । এলোপাখাড়ী
কালো কালো পাথরগুলো গার হয়ে আসতে হল ।

চলতে চলতে সেলাম নদীর বাঁ দিকে পাহাড়ের
একটা ঘল ঘেঁষে যে ভাবে বানিকটা নদীর জল
খাটকে একটা ছোট তালের দৃষ্টি করেছে । আরগাটি
যেমন হারান্নার, ডেমনি বনোয়র । আবারত সেই
অজোব সরোবরের কথা বনে পড়ছিল ।

এতদিন যে পথ ঘেঁটোছি তার বন্যে আজকের
পক্ষটাই সবটাইতে ভালো । ক্রমত উজ্জ্বলিত হয়ে
উঠেছে । হবারই কথা । দীর্ঘ দীর্ঘ গাঁড়ের হতে
দিয়ে সমতল পথ গেছে সামনের দিকে এগিয়ে—অনেকটা
কাখীরের সেই পল্লার এঁটনমুর হতো । তাই ভারী
ভালো লাগছে ।

হাঙ্গিলের 'সিনিক বিউটি'র কথা আগেই শুনিয়েছিলাম ।

এখন চোখেও দেখছি তাই। নদী পাড়ার ঘাট বর্ণনা, ভেসে যাওয়া যেন ও শাকাশের রঙে কাপড়ের এক টুকরো। আসের পক্ষ পুনর্বিচার পুনর্বিচার চীৎকারের পাড়ার বর বর। দূরে পাড়ার মাঝার বরবর গায়ে যেন ঘুরিয়ে রয়েছে—বনে হয় এখানে এলে যে কবি নয় সেও কবি হয়ে উঠবে।

কিন্তু এখন সুন্দর যে পরিবেশ তার মধ্যে ছোট ভূমিটা গ্রামাঞ্চল ভেদে বোঝা ও অপরিষ্কার। এক কথার হারিসের কলঙ্ক। পথের ওপর পড়িয়ে আসতে হলো। এষ্টাণ্টার দিকের হারিসের বড়ার হলো ও কাছার হল হল করা দৃশ্য যদি দেখে থাকেন তবেই কল্পনা করতে পারবেন এর পরিবেশ। বাতাসের ঠিক ভেদেই পূর্ণ। অথচ এই ভূমিটা পল্লীর ভেতর দিয়েই আসায়ে পথ।

কলকাতার কাছেই যেন এই তখন এসে কদা কেই বা ভাববে। ভাষাটা এটা ঠিক এখানকার বাসিন্দার নয়। বাবদা পুত্রই আছে। তিনত হতে পথ, নুন, চামর এসব নিয়ে আসে আর এখন হতে পথ চিপি এসব নিয়ে যায়। হাল ঘাঘ বড়রের পিঠে বরত হালসের। আসায়ে দেখে হালসকে আরো বোকা বালি কিন্তু এখিকের হালস মেটেই বোকা নয়—তাই এসে দারও বেশ। এটা দুটিকে খোলায় চামড়ার বনের হাল নিয়ে এখন সব পথে ঘাটারাত করে যে পথে বড়রোও বেতে পারে না। দেখলাম সেই চামড়ার বনে। বেলাঃ এখন হতে দূরে নয় তাই কাছেই তিনতের গিরাণা। তবু তিনতের প্রথম ব্যাকার পেতে এখন হতেও যিন নশেক সর লাগে।

পাঁচের জন্যই বোঝার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এটা থাকতে পারে না। কাপড় চোপড় তাই যেন যল্লা ভেদে ভেসে চলে। কাপড় ত কলসের। কিন্তু তবুও গায়ের ওপর কমা কালো কালো হলার ভেতর দিয়ে ওদের গায়ের রঙ দেখতে ভালোই লাগে এবং সুখটা একটু, ব্যাবড়া এবং নাকটা একটু গ্যাণ্টা। কিন্তু কেন জানি না ওদের একটু বয়ঃ হলেই শ্রী পুত্রের কলসের দূরে বালি রেখা কুটে উঠে। পুত্র এসেই বর পাড়ারালীরেও। বোঝার কঠিন পরিষ্কার করে কঠিন পাড়াকে থাকতে হয় তাই।

দুর্ভাগ্য বেরো তীর্থ বুনছিল, কাপড় বিজী করে এগ। খটখট তার পক্ষ উঠেছে। ছোট ছোট ব্যাড়া পুসো বিস্ময়ভরা চোখ নিয়ে অতিক্রম আছে আসায়ে দিকে। খাটির বনে গড়গড়ার তামাক টানছে ক্রম ভূমিটা বহু। অল্পত তার চোখের দুটি—সে দুটিতে যেন তার বিস্ময় যিনের কথা কুটে উঠেছে। সামনেই একটা হাঙ্গর। ওদের হাঙ্গর। দেখি থানা হঠাৎ নিশান উড়িয়ে দেখায়ে।

সুখাশু দুটি ব্যাকার হাঙ্গি দিয়েছিলেন। হাঙ্গি দেখলেই বনে হবে এদের মধ্যে যেন পাড়ারালী বকল দক্ষিণ হতেছে।

হারিসে বাকা হবে না তাই হারিস হাঙ্গি এগিয়ে সেলাম। আর সুখাশুদেরও পেছনে কেসে চলার সঙ্গে সেই বালালী কুজারী।

তারপর এক সম্বর হারিস হাঙ্গি এলাম। দুই হতেই দেখলাম হারিসের পল্লাতের হাঙ্গি। নামেরে শ্রীকৃষ্ণ পর্বত—যেখানে ভগ্নাঙ্ক ভঙ্গিয়া করে ছিলেন মোকানী বলে নদীর ওপারে এই যে গ্রামের হতো যেখানে ওখানেই গল্পোক্তারী পাড়ারের বাস। পাতের দমা ওখানেই পল্লাতার পুত্রো হয়। সুখা হঠাৎ ওখানেই সুখা হতে সাত মাইল দূরে কানাতাল পর্বত—যা দ্বাধার উঠলে বিশেষ এক কোণ হতে হানব দূরে দেখা যায়।

শব্দ পর্বত দেখবার ইচ্ছা থাকলেও এখানে তা নশক নয়। তাই এগিয়ে বাই জলার দিকে।

জলো জলোই। মোকানের কাছে বর বর করে তরল বেরেছে। কিন্তু দেখায়েও বারি না। জলো হয়ে মাইল দেড়েক পর বেলাখোটির পথ। সে পথও হাঙ্গি আসি। দুই এ পথেও কৈলাস হানব বাওয়া যায়—তবে পথ নাকি কঠিন। তারপর আরো তিন মাইল হেঁটে আসি যেখানে জাহবী ও ভাগিরথীর পল্লব জাহ পল্লা বা জাহবী প্রসন্ন গর্জন করতে করতে এখান এসে বিলিত হয়েছেন ভাগিরথীর সঙ্গে।

পুত্রদের পল্ল মনে পড়ে যায়। পুত্রের বসেছে জহুদুনি। পল্লা ভগ্নাঙ্কের পেছনে আসতে আসতে তার পুত্রের কুল বেলপাতা সব জাঙ্গিরে দিয়ে চললেন

হুনি যেহেতু সেহে সুপিত হয়ে এক গড়ুয়েই পাব করে
উল্লসেন সেই জন । যেখনি গুঁর্বনীত ব্যবহার তেখনি
কিঁদু পারি । পল্লার পাণ্ডা না হয় চল কিন্তু কি হয়ে
কিঁদু বসে? তপীরঘের সাদা-সাদায়া জহু'দুনি তাই
জানু কেটে পথ করে যিসেন পল্লার, নু'ব বিয়ে বার
কলসে পায়ে উজ্জ্বল হয়ে যান তাই । জহু'দুনি জানু
কেটে পল্লাকে বার করেছিলেন বলেই পল্লার আর এক
নাম হয়ে গেল কাহবী । পল্লার জহু'দুনির আশ্রম
ছিল এইখানে ।

কুল বেশপাতাত দূরে, জলের এখানে বা তোড়
তাতে নত বাতপকেও বোঝার ভাসিয়ে নিরে বেতে
পারে । পল্লাসে ঐ যে কল আছে, ইন্ডের উদ্যাত
জেল বিয়েছিল, মনে হল তা একটুও নিখোঁদ ।
প্রধান—হাত চল্লিশ পঞ্চাশ বীচে পড়ে রয়েছে লোহার
প্রকাণ্ড এক তাল—আর তারি বানিকহু'রে ভাঙা গুঁ'পানা
জেলি । ঐ তালটি আর কিছু নয়, জাহ্নবীর ওপরে যে
লোহার পল ছিল তারি বোটা ভারী Plank । কতখানি
পঙ্কির প্রয়োজন হয় ঐ কল Plank দুটোকে দু'বকে
বহুক্ষে লোহার তালে পলিত করিতে । আসের পুলের
একন আর কোনো চিহ্নই নাই—কিন্তু তার বীচ দিয়ে আর
একটি পুল তৈরী হয়েছে যেখান দিয়ে একন আমরা
পারে বার ।

পুলের ওপরে পাড়িয়ে ভাগিরথীর ধারে ধারে তৈরন
খট্টার যে চড়াই পথ উঠে যেহে ওপরে সে দিকে চলে
আছি । ওদিকে চাইলে কোমর অতি বড় সাহসীরও
কলকল না হয়ে উপায় নাই । অবশ্য ফেরি দু'ব গাঁও
ক—বার আড়াই মাইল । কিন্তু কিছু দিবে যদি এই
চড়াইকে অভ্যস্ত করিতে হয় ত পলতে হয় ভয়াবহ ।

কালার কাছে যে নদী সেখা এসেছিলার কে কলবে
এ সেই নদী? পাহাড়ের বুক চিরে পাথর কুচে কুচে
নেমেছেন এখানে ভাগিরথী । সেই পাথরগুলোর দিকেও
অবার চাওয়া হয় না । যাবে বাওয়া পুকুরো ফা
পুকুর হাড় পড়ে থাকতে যদি সেখা থাকেন ভাসাতে
তবেই এর কলনা করতে পারবেন । পাথরের হাড় ।
জলে সেখা-যেহে হলেই পাথরো এইরূপ । কিন্তু সেখানে
হবে কেমন সেন একটা কল হয়ে যায় ।

নদী থেকে দখল চোখ জিরিয়ে আবার ওপরে দিকে
চাই তখন দেখি বস্তুর চোখ দাব তক্তুর নিচেই কালো
ভারী ভারী পাথর । পরপর সলগর আবার সলগরওন ।
বহাশুনো নদীর দিকে বুক করে কুলে বসেছে । জামি
না কিশে ওয়ের হয়ে গিয়েছে । সেই সব ভাঙা কাটল-
বহা পাথরের চাঙা পাথর ত প্রতি বহুতেই হয়ে
ছিল এই বুকি প্রবল পঙ্ক'ন কর্তে কর্তে খাঁপয়ে
পঙ্কল বহীর বুকে—তারপর চুঁচিয়ে পুঁকিয়ে সেল বোম্বার
মিলালয় । অথচ—

অথচ এই সব পাথরের পা নিচেই আমায়ের পথ ।

ভয়ে ভয়ে আছি ও ব্রহ্মচারী সৌম্যকে পা বাড়াই ।
মনে মনে চিক করে সেই ওপরে বীচে কোনো দিকেই
চাইব না, কেবল যেখানে পা ফেলছি সেইখানেই দাঁড়ি
রাখব । তা নইলে বাধা ঘুরে নির্বাণ বীচে পড়ে যেতে
পারি । পাহাড়ের পায়ে কোনো গাছালাকো ফেরি
কোথাও আটকে যেতে পারি—তা হলে একবারে সেই
সংকীর্ণ পিরিসকেটে যেখানে ভাগিরথীর তল কুলে
কুলে উঠে ।

পট্টাও ভারী সংকীর্ণ । দু'পা ফেলবার পর আর
একটুও সাহস থাকে না তাই পাহাড়ের পা খেঁবে ঘাই ।
কিন্তু বতই ভাবি কোথা দিকে চাইব না ওতই নদীর
দিকে চোখ চলে যায় । বাধা কেমন কিম কিম করে । তখন
আবার চোখ বুকি । একখানে ত পেরিয়ে গিয়ে গকে
উঠি । হুটো গাখনে ওপর গাছের পুকুরো ভাল কেনে
তারি ওপর কুলে বালি হাড়িয়ে রেখেছে । মাঝখান হতে
কই করে ভাঙলেনই হয়েছিল আর কি ।

কিন্তু উঠিহত উঠছি । ভাগিরথী তলিয়ে যেতে
যেতে সেখা চোবের খাড়াপল পড়ে গেলেন । পট্টাও
যেন একটু প্রশত হল । তারপর কয়েকটা সিঁড়ির হতো
যাপ । ভাঙা ভাঙা । তারপর আরো বানিকহু'র আসছেই
পঙ্কল একটা বাকে এসে পল্লাব । বুকতে পাগলার
পাহাড়ের বাধার এসে গেছি । গলমেই সেলারু'র খ-
গিসক বীচক বংগ বিয়ে তৈরন খট্টার গতি ও খ-পালা
সেখা সেল ।

তৈরন খট্টাতে আর খানিই প্রবেশ এলাব । আছি ও
ব্রহ্মচারী । একখানা দরও মিলার । D. F. O. বাসল

৮ম শালায় অর্ধেক আত্ম বিজ্ঞানভূত। কিছু বর শোলা শেষে এবং বর কোনো বাবীতে না দেখে হুত মৃত করে চুকে পড়লেন এক সাধু, দম্পল। তবে D. F. O. সেই বেলতেই গঙ্গোত্তরীর দিকে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত দিকের বই একটা পাওয়া গেল। তাই ওই ঘরেই চলে এলাম আবার। আবার কি হবে করে সেই সাধুরাও একটু পরেই বেরিয়ে গেলেন গঙ্গোত্তরীর দিকে—সম্ভবতঃ আত্মকে পূর্ণিমা বলেই। তাই ও বর এসে উঠলেন ব্রজারীর শপের সেই বাঙালী ভদ্রলোক।

ভৈরব ঘাটীতে জলের বড় অভাব। সমস্তের পানীয় নাকি তাই। তিনের দালিতে করে জল এনেছে অনেক দূর হতে—সে জলও আবার পড়ছে টিপ টিপ করে। আবার জলই ছোটো না ভ'রানের। অবশ্য বানের আত্ম আর দরকার নেই। এখানে বা ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা বলেই বাইরেতে দরোহ—বরো ব্যাধিমান বোধ হয় কেউ এখানে থাকবে না। তাই দিকের হতেই দৌঁ দৌঁ করে কোন নভেই জায়গা গেল না তারা বরের দ্বারে কাঠ ও তিনের মধ্যে যে কাক রয়েছে তারি মধ্যে আত্মর নিচ্ছে। কনকনে বাতাসের তীর কণাযুক্ত হতে ত নিভেতে বাঁচতে হবে।

গঙ্গোত্তরীর পথের এই শেষ চটি। ইচ্ছে করলে অজ্ঞে বিকলেই গঙ্গোত্তরী চলে যেতে পারতাম কিছু কাল সকালে থাব বলেই দ্বিগ্ন করা ছিল তাই ভৈরব-ঘাটীতেই স্থায়ীবাণ করলাম। তবে বিকালটা আত্ম বন্দ কাটল না। ব্রজচরী কয়েকটি প্যামা সঙ্গীত পুনরিত আবারের বন্দ আনন্দ দিলেন।

রাত তখন দশটা। সবাই ঘুমিয়ে পড়লেও আত্মর চোখে ঘুম নেই। বাইরে বোধহয় বেরোয় পাতাই

সরকার করছে। বিকলে জামালা খুলে দেখেছিলাম জামালার গা-বেশা দেবদারু, বাঁধ, মনে পড়ে গিয়েছিল কালিদাসের সেই লাইনটা—

ভাগিরথী-বিন্দু-শিকরাসাং

বোতা মনু-কম্পিতদেবদারু :।

সেই হতে দেখছি কেবল বাইরেই নয় আবার মনেও করছে দেবদারু তেমনি হয় হয়। কিছু, ভূতাত্ত্বিক কুতূহলী ওত চীৎকার করছে কেন? সামনের ভৈরো মন্দিরে নীচেই ওকে দেখেছিলাম আত্ম বিকলে। গারে কাঁড় কাঁড়ি সোম। জামি না এরা কি খেয়ে এখানে অব মৌটা হয়।—তবে কি হিংস্র ব্যাপ্তের পক্ষ দেখেছে

উঠে বাইরে এলাম, আকাশে মেঘ বাকলেও পূর্ণিমা হান জ্যোৎস্না সম্বন্ধে দ্বিগ্নে আছে। কি অপরূপই ন দেখাচ্ছে সেই আলোর পাহাড় ও দেবদারু বন। ওপর হতেই দেখলাম কিছু অন্য কিছু দেখলাম না। শূন্য দেখলাম ভৈরো মন্দিরের লাল নিদানটা বাতাসে গুপ্ত করে উড়ছে।

ভৈরবঘাটী হতে গঙ্গোত্তরী হ'মাইল। পথও কিছ ব্যাপ্ত নয়। তাই দশটা তিনেকের মধ্যেই চলে আঁ গঙ্গোত্তরী। গলে আত্ম রবিয়া গঙ্গা তুলসী দেখালেন—কাঁড় কাঁড়ি পথের দু'দ্বারে 'অচ্ছন্ন। রবিয়া বলেন এ আর কোথাও হয় না। এ তুলসী কেবলমাত্র এখানেই হ বলে এর নাম গঙ্গা তুলসী।

৮ম শালায় দিকের পা বাড়াইয়ালাম রবিয়া বলেন হুল গারে একবার মন্দিরে যেতে হয়। চল, বাওয়া থাক।

বিল, চলুন। তারপর হুলগারে মন্দিরের সাহা গিয়ে দাঁড়াই।

আমি বলি না তুমি এখনি মাতাল হও
আমি বলি, তুমি মাড়িটা কামিয়ে মাও
নিখুঁত হাতে, পায়ের পাতায় যেন
না কোটে ঝোড়ার নাল।

আমি বলি না তুমি এখনি মাতাল হও।

যদি তুমি নিজেকে খুব ক্লান্ত মনে কর
নখে চুলে বা হাঁটুতে—
পিঁপড়ের দাগ, কিংবা পিঠের
শিরদাঁড়ে মাছের গন্ধ, অসহ্য
পরম বাল্মি, মম আর ধহুট্টাকার
তখন, ইচ্ছে করলে
তুমি অনায়াসে মাতাল হতে পার।

আমি বলি না
তুমি এখনি মাতাল হও
তুমি বাতালের নত টলতে টলতে
পা কেল
আমি বলি না, চুল নখ আর
দাঁতের ছায়ায় তুমি ক্লান্ত
হয়ে পর।

তুমি দাও আর না দাও
বুকের হাড়ে শিরহানটা গলিয়ে
হস্তির সিঁকের বা মখনলের
জেলির ডিল থেকে
উপচে পড়ুক আর না পড়ুক
পরম বোঁতা, মিষ্টি জল
আর পেরারার লাবেকী গন্ধ
তবু তুমি মাতাল হবে
আমি জানি তুমি মাতাল হবে।

আমি বলি না
সোরা আর গন্ধকের জলে
যিভংস নাড়িহুড়ি আর বেপারার দরভার
বাতিদানে, সাবানের কেনায়
আস্তাবলে, পক্ষীরাজের সিংহকেশরে অথবা
বুকের পকেটে পাখির শব্দ।

তুমি মাতাল কবিতার জন্যে
শান্তি বাধীনতার জন্যে ;
তুমি মাতাল হবে
কেলা রুটি আর সোনালী গম
শবুজ মটর দানা আর রূপালী জল
মাহ মাংস আর লবণের খাদ।

তুমি পশমের সূত কুণ্ডলীর মধ্যে
মাতাল হও
তুমি বাতালের পরম বালির মধ্যে
মাতাল হও।

আমি বলি
তুমি এখনি মাতাল হও।

এসার কোমল স্বপ্ন স্তম্ভের অবচেতনায়
বেঁচেছে হৃদয়ের ধর। অধোবাহ ধূ-ধূ মক্কুহ্মি
মিকটে, একটু দূরে যন্ত্রণার শ্রাবণের জলে
মনোহর টলোমলো ; আমি ভুজা নিয়ে বাঁচি। তুমি
তবুও অনেক দূরে সরে যাও। রক্তকণিকার
ইচ্ছার প্রবাহ বহে নিমিষেরে তীব্র কলকলে।

অশ্রুর শিখরে আমি বলে থাকি। প্রণয়ে চৈত্রেয়
মরুদাহ জ্বলে দিয়ে শূন্যে স্থতি তোমার হারায় ;
তবু আমি গান গাই, চোখ মেলে অদূরে ডাকাই
যেখানে পলাশ বনে সমাহিত বেদনার চিন্তা
দাউ দাউ ; (অনাহত যৌবনের চিরস্থনী সীতা
অগ্নি পরীক্ষায় বেমে মৃত্যুসীরা।) জ্ঞান কাপাই
নিবিড় অবাগাহনে, যন্ত্রণায় তুহিন ভারায়।

চিরল শব্দের রেণু কেন ছড়াও যে ফের।

বোঝি | চিরর ভাটাকুরতা

ঈশ্বর সদৃশ বৃদ্ধ সমাধিস্থ মন্দের উপর
দ্রোণাক চক্রহাসো অর্থবহ শব্দের ইঙ্গিত
ভক্তবৃন্দ করজোড়ে বলে আছে ; সূর্যের প্রথর
আলো কিংবা খরশি পবিত্রতা আনে শ্রুতিশ্রুতি।

হে ঈশ্বর, আলো দাও, অন্ধকার পৃথীর বাহিরে
কিরে বাবে সকলেই ; সকলেই কী অবোধ শিশু
ব্রহ্ম শিশু যেবপাল, নিম্পাপ কুলের সজ্জা শিরে ;
হে ঈশ্বর আলো দাও ; অন্তরালে হাসে কোন বীণ।

ঈশ্বরিত নক্ষত্র পটী, পৃথিবীর ধূলা বালি মাটি
কেবল ভজালমাত্র, অনায়াসে পরিপূর্ণ তুমি।
নেপথ্যে নন্দনসত্তা কেঁদে মরে ; ব্রহ্ম পরিপাটি
ঈশ্বরী পবিত্র প্রেম ; নেত্রপাতে অলৌকিক ক্রমা।

চৈতন্ত্যে আসক্তি নেই, ধৈর্য নেই আপেক্ষিক মিলে
সদ্যস্ত বৃদ্ধও জ্ঞানি, উদারুল মোচড়কর চিলে।

অভিনেতার আত্মভাবন | বেথ আকুল অবস্থা

আত্মপ্রকাশের ভক্ত বেরিয়ে আসতে হবে
মঞ্চে
শিল্পীত আলোর মধ্যে—

বাইরে সমস্যার আহ্বান,
মহানট, আর সময় নেই অপেক্ষার,
সময় নেই তেমন সাজবার ;
যখন সমুখে দৃষ্টি কেলোছে চতুর্দিক
সরে বেতে বেতে হাওড়ায় কাপছে পল্লী
আবৃত্তি কর : লয় এসেছে বিকাশের, বিকশিত কর
নিজেকে

এবার এক কঠিন পালার গুরু—
পাঠকর অতীত ও বর্তমান, ভবিষ্যৎকে টেনে আন
সামনে
যা করতে চাইছ এইতো তোমার করণীয়।

তুমি কি সম্মত নও প্রতিজ্ঞিত অভিনয়ে ?

রূপক, তুমিই সেই সব কর্মিষ্ট জীবনও মানুষদের,
সেই সব সৈনিক ও পণ্ডিতদের,
জীবনের জন্য নিরন্তর সংগ্রামী প্রত্যাহ যারা ভগৎ হু
তোমার আত্মপ্রকাশেই নতুন পৃথিবীর গুরু—
টুকুরো টুকুরো অল্পভাবে গড়া বোধির স্ক্রোমাল
পরিয়ে দিতে রূপদর্শীর কণ্ঠে— :
পরম সূত্রে জন্ম এই তোমার চরম সূত্র !

জ্যোতির্ময়, মক উজ্জ্বলিত কর নবীন পদক্ষেপে
বাঁকা চোখে দেখে নাও অম্পষ্ট, সব কটি নিমিষ :
গভীর মোহাক্ষর,
ছাড়িয়ে যেতে সনদ বকীর শৃঙ্খলে টান মেরে গর্জন ক
চাই না এই গোপনতা, রক্তাক্ত হক
পরীর

আমার ভক্ত অপেক্ষিত বিলম্বিত আগাহী।



নাটক থাবা এলধীর

॥ অশিষের দাম্পত্য ॥

কুতীর অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[হৃদয়ভরে মৃতদেহ বাড়ির পিছনে ফিক, বাবা একঘের গাছ দেখা দাঁড়িয়ে। তারার তিনটি ঘরের পিছনে লুকানো বেলে ছেলে বসে। একটু একটু বুধ বাড়ির কথিখা ডাঙারা কথা বলছেতে।]

বেলে। ও ভাই 'তলে—

বেলে। ভাতিজা'নি বল'ত, ভাতিজা'নি।

বেলে। কেন ?

বেলে। আনি নেই।

বেলে। নেই বললে কি আর বুড়ো ছাড়বে ?

বেলে। পাঠের পক্ষ পেলেই থাকবে খোঁড়লে দেই'সবে পড়।

বেলে। টিক পড়ে চিড়'চিড়, করে টেনে বের করলে।

বেলে। বইটির বেলে প'ত্যা বদলি'স ? তাৎপরে ?

বেলে। তারপরে ঠাঃ বুটো টান করে দিয়ে নাকের ডগা একটা কোলা লাগে কুলিয়ে দেবে।

বেলে। প্রাক্ গঃ—একবার অন্যকে ভাই করে দিয়েছিল রে—ওগাক্ গঃ—

বেলে। (কোঁপা দিয়ে) আবার কি করব ? ঐ ছায়া কলসরকে দূরত করতে ছুঁ'বি নিজে একবার এসে দেখ না বুড়ো বাবা !

বেলে। বা বলেছিল : বুড়ি'স, কিছু'স, থাকলে আরও বাবিকটা চেষ্টা করা যেত।

বেলে। আসে জানতুম বোবার পত্র নেই, এখন দেখছি ছায়া'র পত্র নেই।

বেলে। বাবার ছিল কিছু ; কিছু ; আর বুটো ভায়েক।

বেলে। তাহলে ভাই একেবারে পথে বসিয়ে দেওয়া গেছে।

বেলে। ভাইয়ের কাছে খড়ের দৈনা পেয়ে ডাঙা চক্কর।

বুধে গেছিলে চক্করভের হাজার গলে লড়তে।

বাবা মিলে ছিলুম এখন ভাবে ভাতিয়ে যে আর তব সইল না, একেবারে দর দৈনা মিলে পড়ল কাঁপিয়ে।

আর বাপ কোথা—বাবা চক্কর এখন বজ্র হয়ে পড়ে আছেন চক্করভের হাজার পারদে।

বেলে। লালা কলসরও এখন বউ ছেলে বেলে নিজে

হাজার হাজার খরছেন। সোনার মোড়র হাতে পেলে বাপের বুড়ি এল হাজারে প্রকাশ দীও হাবনার ;

অনেক ভিনিস পরে হবে বসে বসে নেই'স চলে ; এদিকে বাজার পড়ে গেল মরা—তখন নেই বাবা'স, ভিনিস নিজে ডুবলে'ন তো একেবারেই ডুবলেন,

আর বাবা'সি ভুলতে চল না।

বেলে। তাতে কি আর লাভ চল ? এ বোবেটের হাণ্ডার যে কিছুই নেই।

বেলে। আজ একুশ দিন তো পড়ে আছি এই ঘরের আড়ালে, ফিরে এ বাড়িতে চুকতে কেউ আর লাগল পাঞ্জিল ?

বেলে। কিছুতে না ডাঙা ; বরি তো বুড়োর হাতেই যাব।

বেলে। বা বলেছিল ! একবার বরতে গেলে চালাটা কি খাঁড়ানোই খাঁড়ানায়।

বেলে। আরে রে, চুপ্, চুপ্—বুড়ো শরতানের পাশে পক্ষ পাঞ্জিল বেন। (সকলেই বুধ লুকায়িল)।

[বুড়ো শরতানের প্রবেশ]

বুড়ো। বেলে। (বেলে নিঃশব্দ) দেখতে পেলেছি তোকে, বেরিয়ে আয়। (বেলে কান ধরিতে ধরিতে আঁকিয়া বুড়ো শরতানের পাশে বাজিল)। বেলে।

তোকেও দেখতে পেরেছি (হেসে নিশপে কান ধরিতে ধরিতে আসিয়া গড়িটল, সঙ্গে সঙ্গে কেসেও কান ধরিতে ধরিতে আসিয়া গড়িটল)। তিনটাত্তেই কান ছাড় (তথা কণ)। তোসের আর বলব না কিছু, তোরা অনেক করেছিলি।

নেলে। (উৎসাহিত হইয়া) আমরা অনেক রূরে নিরে এসেছিলাম।

হেসে। অত বড় হাবাকে রাজ্য পদ'ত করে দিয়েছিলুম—কেসে। রাজকন্যার সঙ্গে বে' পদ'ত ঘটিলে কিরোঁকলুম—বুড়ো। সর্বনাশের প্রায় বোল আনাই করে কেসেছিলি—ভালোই করেছিলি।

নেলে। (কাঁদিয়া গড়িয়া) কিছু পে ভালো তো আমাদের পদ পদ'ত কিছুই হইল না।

হেসে। (কাঁদিয়া) হাতে এসে আমাদের ভরা ডুবল গো!

কেসে। (কাঁদিয়া) হাবা নিজেও ডুবল, আমাদেরও ডুবিলে মারল গো! হাবামি দিয়েই একমর বলিলে দিল।

নেলে। অবন রাজবাড়ি যেতে এসে আমার এই সোহালে আত্মনা নিরেছে—

হেসে। রাণী বাবুতী আমার এসে ক'বাণী দেখে বলে গিড়িয়ে—

কেসে। বন্দী সেনাপতি দূর তাকিয়ে দিয়েছে—

বুড়ো। ঠিক আছে ঐখানেই ওকে যাব। পাশেই রয়েছে জুকোটিবর্তের হিংস্র রাজ্য, তার সঙ্গে এই রাজ্যের রাজ্যের সঙ্গে পড়ুতা চিক্কালের। তার জর জোঁগের সব চাণীসের আঁবি সৈন্য বাণিলে দেব। হলে হাড়িয়ে একবার ভরোবাল বরাতে পারলেই—(নেলে হেসে কেসে এক সঙ্গে না-সুন্দর হাবা নাড়িতে লাগিল; বুড়ো কেশিয়া গিয়া) পারব না? পারব পারব পারব—(নেলে ও হেসে দুই পাশ হইতে বুড়োর পারের হুলা লইল।) কি করব আনিব? (হেসে হেসে কেসে পাশে হাত দিয়া হুড়োর পারের কাছে বসিয়া গড়িল।) চাণীসের বাঁধ ভরোবাল বরাতে নাই পাতি—তবে সোনা হুড়াব—দু'হাতে সোনা হুড়াব—সোনা হাড়িয়ে হাড়িয়ে ধরে ধরে বিব হুড়াব—তারপর কুহুরের মত একটার

সেখানে আর একটাকে লেগিলে দেব; আঁবি শেষ দেবে তবে হাড়ব। আঁবি বুড়ো পরতান—বদি মানুসের সর্বনাশই না করত পারি তবে পৃথিবীতে ধুরে বেড়িয়ে আর কি লাভ হবে—? আঁবি তা হলে পাতালে সোঁপিয়ে যাব।

কেসে। আমরা আর এগিলে যাব না চাচা, তোমার পেছনে পেছনে আঁবি।

বুড়ো। (কেশের মাথার চাটি বাঁজিয়া) বা—তোরা ভাগ, আঁবি নিজে দেখে দেব। যে প্রজাতন্ত্র নিরে হলর রাজ্য বেচে ক'লে বেঁচেছে—তারের প্রত্যেককে আঁবি ওর পেছনে লেগিলে দিয়ে তবে ওর রাজ্য পড়ু ওকে জাহাঙ্গিরে পাঠাব।

পটক্ষেপ

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পদা উঠিতেই দেখা যায়। একটা বিড়টি হানের গোলা। তারার পাশে কয়েকটি বলে বোঝাই গান; কয়েকটি গলাতেও গান চাল দেখা যাইতেছে। অনেক চাণী উপস্থিত।]

জনৈক চাণী। কি গো বোড়ল, ঠিক বলছ তো! আমাদের রাজ্য আঁবি আগলে তো আমাদের হুম্মের সোলা দেখতে!

অপর চাণী। আমরা তাই দেখ কখন থেকে হার'পত্যেণ করে বলে আঁবি।

বোড়াল। আসবে আসবে—রাজ্য আঁবি ঠিক আসবে। অপর চাণী। না এসে সে আমাদের আর রাজ্য কি গো! অপর চাণী। আমরা এই বন্দী আর ভুগুড়'নি নিরে বলে আঁবি, রাজ্য এসে আমরা যে আঁবি নাচ গান করব।

[এক চাণী বলে বোঝাই করিয়া আর একজন হাম'ত করিয়া গান গাইয়া প্রবেশ করিল।]

২য় চাণী। (হাবার গান নামাইয়া গাঁবিয়া, হাথা হইতে বিড়া বাঁধা গানরা বানা বুলিয়া ভাঁজ করিয়া কানে কেশিয়া) শেজুম রাজ্য আমাদের পৃথিবীতে—একথা একপ বার হলক' করে বলেতেই হবে।

৩য়। নইলে কি আর বেশ করে এমন সোনার কল কলে!

৩৪। তাই তো আমরা যত্নের গোলা বাঁচিয়েছি। লাও
গো মোড়ল, খামাঙটা চমা করে করে লাও, ফেড
নশ বান আর এই গো তোমার খেদারী দাত পসারী।
মোড়ল। আসে রেখেছিল হান দাত নশ আর ভাল
কেন্দ নশ।

৩৫। হ্যাঁ গো মোড়ল। ও আর তোমাকে নিত্য
নিত্য শুনিয়ে দিতে হবে না, তোমার মনে মনে
হিসেব, এ শাখরের দান গো মোড়ল, ওতে আর ভুল
চুক নেই।

[মাথা কাপড়ের মত বড় গতি লইয়া বসে তাঁতীর
প্রবেশ।]

মোড়ল। তুই কি সব নিয়ে এলিবে বসে তাঁতী?
বসে। কাপড় শো মোড়ল, সাদা রঙিন ধুতি পাড়ি—
না চাও। জুই সব চমা করে লাও।

মোড়ল। তারপর?
বসে। তার যখন কাপড় লাগবে তাকে কাপড় দিও—

আমার যখন বান লাগবে আমাকে বান দিও। যদি
মাথা আসিও নি—খালি মাথার চারও নি। যতটা
পারি বান নিয়ে চলে যাব।

মোড়ল। (এক কোণে দ্বিত বংশীবদনের প্রতি) তুই
বানাব করে অত কি নিয়ে এগেছিস বংশীবদন?

বংশীবদন। (বিশেষে ভাচার দাম হইতে বিভিন্ন
রকমের কাটাগি, কোবাল, কুড়াল, বজা, লাঙ্গলের
কম্বা প্রভৃতি একটা একটা করিয়া জুগিয়া রাখিতে
রাখিতে) আমাকে তো আর মাঠে গিয়ে অপ কুড়াতে
দেবে না মোড়ল, ঐ হাতুড়ীটা হাতে নিয়ে বসিয়ে
হিসেব হাসরের আসনের সামনে। এই সব জমা
করে বিলুন, কিছু ধান ধাও—কাপড় ধাও—নিয়ে
বাড়ি ফিরি।

[সহসা মেগাফো ঘুন্ডের বাক্সা বাজিয়া উঠিল, সকলেই
ক্ষতিক হইয়া এখিক ওখিক তাকাইতে লাগিল। ঘুন্ডের
বাক্সা বাক্সাইতে বাক্সাইতে এককল সৈন্যের প্রবেশ,
ভাচার শিল্পে প্রবেশ করিল সামরিক শোবাক পরিহিত
অনেক লোক। লোকটি সামরিক কালার আলোইয়া
আগিয়া বলিল—চোপ, অগ্নি বাক্সা—বানাইয়া
বাক্সা, লাল বাক্সা—

মোড়ল। তোমারা কে গেল যাব?
সামরিক। পত্রিকের দরকার নেই তার সম্বন্ধ নেই—
সৈন্য চাই সৈন্য—সব লোককে সৈন্য হতে হবে।
মোড়ল। সে কি কথা।

সামরিক। সেইটাই কথা। আমি আগছি হলংর রাজ্যের
কাছ থেকে। রাজ্য হতে বিশ্র, আমাকে বিশ্র পাঠিয়ে।
চার দিকে বড় বিশ্র, ভীষণ বিশ্র (সহসা বাজিয়া
সৈন্যদের ইঙ্গিত করিল—ভাচার সঙ্গে সঙ্গে বাক্সা
বাক্সাইয়া কুচকাওয়াজ আরম্ভ করিল)—চোপ—
(সহসা পূর্বের ন্যাশ সব আগের বাজিয়া গেল)।
পাশেই রয়েছে চকোটিবত' রাজ্য—তার রাজ্য
ন্যাশ—বক্সোলোপ, সে শুনতে পেয়েছে এ রাজ্যে
সৈন্য নেই, সেনাপতি নেই—যেহে আসছে সে স্বত্বের
বেগে—সে সব ভদ্রাণিয়ে দেবে—শুভ্রিয়ে দেবে—সব
রাজ্য বশল করে দেবে—সে ঐ আসছে—ঐ আসছে—
মোড়ল। আগছে আসুক না—

সামরিক। (সঙ্গেসে) আগছে আসুক না—বান হুর্শের
দল। রাজ্য চলরের মাথা ঘুরে গেছে—রাজ্য
অসহ্য! আমার সাহায্য নিচ্ছেন। অনেক রাজ্য
জয়ের অভিজ্ঞতা আমার—সে সব এখন বলব না—
দরকার নেই—সমস নেই—রাজ্য আমাকে আসে
নিচ্ছে সৈন্য সংগ্রহ করতে—অনেক সৈন্য চাই—
নশে বলে সৈন্য চাই। হাতুড়ি কাছে লাঠল—সুঝোরে
চাক—ভাঁতীর মাতু—সব ছেড়ে—সব ছেড়ে এখন
(সৈন্যদের প্রতি আবার ইঙ্গিত—ভাচার আবার
বাক্সা বাক্সাইয়া কুচকাওয়াজ আরম্ভ করিল—
ইঙ্গিতে আবার ভাচার বাজিয়া গেল) এখন সব
ছেড়ে সৈন্য হতে হবে; এই সব বড় গতি শোবাক
পুরুতে হবে—মাথার দাল পাগড়ি বসিতে হবে—
আর বাসে বাসে বেতন মিলবে হুয়াত করে।

অনেক চান্দী। আমাদের রাজ্য তোমাকে পাঠিতে যাবে
কেন, সে তো আমাদের ডেকেই কথা কর দো।
রাজ্য তো আর এক্ষুনি এখানে আসবে আমাদের
গোলা সেগতে।

সামরিক। সমস নেই—রাজার সমস নেই,—আমার সঙ্গে
সব কথা হয়েছে—অনেক কথা হয়েছে—ওই আসছে

—এসে পড়েছে চক্কোটিবড়ের রাজা চক্কোটিবড়

—সে পশু রক্ত চাও—রক্ত চাও—বান্ধনের রক্ত চাও—

অপহরণ। তাই তো মোড়ল, এমি কাত্ত—তবে
আমাদের কি হবে!

[একটি চাণীকে নিম্নবিন্যাসে ট্রান্সিটে ট্রান্সিটে
বইজন সৈন্যের প্রবেশ, পিছনে চাণী বউর প্রবেশ।

চাণী বউ। খবরদার বলছি, খবরদার, অমন করে পায়ে
হাত মেখে না বলছি।

মোড়ল। ব্যাপার কি রে বউ?

চাণী বউ। ব্যাপার কি করে বুঝব? হুঁজুনে মিলে
নাড়িতে বসে কাঠের চাণ্ডা করছি, তেনারা এসে
হাফির—‘আমরা কোচাই’! রাজার হুকুম সকলকে
দেখাই হতে হতে হবে। যত্নের মান্নকে বলছে কি না,
‘আমাদের মোট বইতে হবে।’ কার আমরা খাট
পড়ি গো যে মোট বইতে যাব? নিষেধ মোট হাড়া
কারের মোট আমরা মাথার বই না। ও—বড়
আমরা দেখাই রে।

সামরিক। চাপ—

চাণী বউ। বেশ অত চাপ লাগ করে কথা কইবে না।
কারের হারিও না বাগাইও না, জুঁম অত চাপ লাগ
করে কথা কইবার কে রে?

সামরিক। এ বোহাটা সেফটোর চুনের খোঁপা দরে
ছিড় ছিড় করে উঠে নিয়ে যাও—

চাণী বউ। (কোমরে কাশড় জুড়াইয়া ও সামরিকের
বিকে আগাইয়া) খোঁপা ধরে টানবে? হ্যাঁ গা, জুঁম
বুঝি হারের পেটে কী ও নি? শোনো, কখনো জুঁমের
হুকুম পূরানোর কথা শোনো নি কোনো দিন?
আমরা সেফের জাত, বা—কখনো চাণী অমন; বা হুজুনে
সে তেনারনী, কপালে যে বনম আছে ওখান থেকে
আগুন করে। তারি চিহ্ন আমাদের কপালের
এই লাগ সিঁদুরের ফোঁটা; যেসেই এই তেনমন,
এ আগুন জ্বলার দেখো।

মোড়ল। ঠিক বলেছিল বউ, ঠিক বলেছিল—আমাদের
হরের মেয়ের মত বলেছিল। তোমারা এসে যাও
গান্দু ও ডলাই ফেলে—আমরা কেউ তোমার সৈন্য
হতে যাব নি।

বললে। (একদলে আগাইয়া আসিয়া) আমরা কেউ
যাব নি।

সামরিক। কেউ সৈন্য হবে না? তবে বলতে চল—
হুজুনে গলে বাগা হয়ে বলতে দে, রাজার হুকুম
আমাদের—চাপ ও আদেশ বলতে চল; যে যে সৈন্য
হতে আগ্রহি করবে—এই তগোহালে তার তার
মাথাকাটা যাবে।

জৈনিক চাণী। মাথাকাটা?

সামরিক। হ্যাঁ হ্যাঁ, মাথাকাটা।

অপহরণ। আমারা রাজা এমন আদেশ দিতেই
পারে না।

সামরিক। পারে পারে—আমাকে বিধেছে—

[অতঃকিন্তু চাণীর সঙ্গে রাজার চলধরের প্রবেশ]

এই যে—এই যে রাজা বিকেই এসে গেছেন—

মোড়ল। এই যে রাজা—জুঁম আমাদের সব সৈন্য হতে
বলছে?

হলধর। আমি—হ্যাঁ—

সামরিক। হ্যাঁ হ্যাঁ—এই যে রাজা বিজয় হুকুম কলছেন—
জুঁম সৈন্য হতে আমের বিধেছেন—বড় যে বিপদ
—রাজা বিপদ—বন প্রাণ সব বিপদ—

মোড়ল। জুঁম আমাদের বিধেছে, যে যে সৈন্য না হতে
চাইবে তার হাতে মাথা কাটবে?

সামরিক। বিধেছেন—বিধেছেন—এই আমার কাছে
বিধেছেন—মিসের শ্রাব্যে সেননি—রাজা রক্তের জন
—বন-প্রাণ রক্তের জন্য বিধেছেন।

মোড়ল। জুঁম না বলেছিলে, আমরা কাকে কোদাচি
হাজুতি হাড়া আর কোনো অস্ত্র বর না?

হলধর—হ্যাঁ হ্যাঁ—বলেছি বলেছি—

সামরিক। সে পাণ্ডুর কালে—এবে বিপদের কাল
জীবন বিপদ—

মোড়ল। (বাগা নিয়া) জুঁম একটু বাগো বাগু, আমর
রাজার কথা শুনতে চাই। বল রাজা—

হলধর। হ্যাঁ—চাইতো—তাইতো—

মোড়ল। তবে আমার আমার পাণ্ডিত্য বোধে তরোয়াক
নিয়ে সৈন্য হব কেন?

হলধর। (বিব্রতভাবে) তাইতো, তবে আমি এমন আদেশ

কেন দিল্লি। আমাকে—আমাকে যে অনেক
বুঝিয়েছে এই যে তুমি সেনাপতি অনেক বুঝিয়েছে
—কতক বেগে বুঝিয়েছে—এত বুঝিয়েছে যে আমি
আগ বুঝার দর্য পাইনি—

মোড়ল। তাই বল রাজা। আমাকেও ঠিক তেমন
করবেই বোঝাচ্ছিল—কিছু, রাজা সৈন্য, আমায় কেউ
হর্নিং।

হলধর। বেশতো, তোমরা যা হবে না—তা এগাভো
কখনো হবে না।

মোড়ল। তবে এই ব্যাপ্ত আমাদের বাবা কাতো—
হলধর। (হার্গিয়া) রাজ্যবৃদ্ধ লোকের বাবা আমি
এক কাতক কি করে?

কটক চাখী। (সোজায়ে) এইতো রাজা আমাদের রাজার
বত কথা বলেছেগো, কেউ সৈন্য না হলে কে কার
বাবা কাতবে?

সার্বিক। কিছু রাজা তুমি আসে নিজে—আমার
কাছে আসে নিজে—

হলধর। এখন কততে পারছি—আমার দ্বি নি—তুমি
আমার বের করে নিজে।

সার্বিক। (অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে) আমি সেবে যে
রাজা—সেবে যে—তুমি কত বড় হাবা রাজা—
কত বড় হাবা তোমার প্রজা—।

[প্রস্থান]

সকল চাখী সম্মত। জ্ঞান আমাদের চাখা রাজার জ্ঞান।
পটিকা।

তৃতীয় দৃশ্য

[পদ্য উল্লেখ্য। ভিতরে একখানি ফাগোড়ার
অধিশিখা ও ঘোঁরা দেখা গাইবে। বর পোড়ার সঙ্গে
কোলাহল শোনা গাইবে। নেপথ্যে একজন সৈন্যের
জয়ধ্বনি শোনা গাইবে 'জয় চক্রেচাটীপত্রে'র রাজা
চক্রেচাটীপত্রে জয়, জয় রাজা চক্রেচাটীপত্রে জয়,
জয় রাজা চক্রেচাটীপত্রে জয়।' দুইজন
সহ-সেনাপতি প্রবেশ।]

১ম সহ-সেনাপতি। কমা করবেন আমাকে, এমন ঘুড়ে
আমি অভ্যস্ত নই, আমি চোখে করে চললুম। কোথাও

কোনো সৈন্য নেই, সেনাপতি নেই, পদ্য নেই—
কোনো ব্যাধ নেই। চাখীরা মাঠে চাখ করছে,
তাতীরা ঘরে ততি বুনছে, কান্দাখালে কান্দা
এসে লোহা পিঠে—আর ভায় নাকখানে গিরে
আমরা কতকগুলো সৈন্য নিয়ে কাঁপিয়ে পড়ছি,
লুটপাট করছি, বরাতি ডাঙ্গিয়ে দিচ্ছি—এমন
বুড়ে করতে আমি কোনো দিন অভ্যস্ত নই।

২য়। এমন ঘুড়ে কেন এখন আরম্ভ করলেন মহাশয়
চক্রেচাটীপত্রে আমিও তো তা ভেবে পাচ্ছি না।

১ম। আরম্ভ করলেন আমাদের ঐ বোহুদ সেনাপতির
প্ররোচনার পড়ে, একথা আমাকে বলতেই হচ্ছে।
কোনো বৈকে তিনি মহা উড়ে এসে জুড়ে বসলেন
কিছুই বুঝতে পারলুম না। কি জানি জানেন
তিনি কিছুই বুঝতে পারছি না। মহাশয় কেন
দুইদিকে বিমূর্ত হয়ে গেলেন? আমায়ও কেন যে
তার চোখে চোখে তারিকের তার বিচ্ছেদ টু পথটি
করতে পারছি না কিছুই বুঝছি নে। ঐ নিরীহের
ঘর পোড়ার পদ্য, ব্যাধীর আগ পিণ্ডের ব্যাধবান,—
এ ব্যাধ আমার কিছুতেই ভাল লাগছে না, আমার
পালাতে ইচ্ছে করছে।

২য়। ভাল আমারও লাগছে না, আপনি এখন বুঝ কুটে
বললেন তখন কথাটা আমিও বলে ফেললাম।
[‘জয় রাজা চক্রেচাটীপত্রে জয়’ বলিতে বলিতে
কৌড়াইরা দুইজন সৈন্যের প্রবেশ। আসিয়া উভয়েই
সহ-সেনাপতিদ্বয়কে অভিবাদন করিল]

১ম সৈন্য। রাজা বন্দী, রাজা বন্দী—

২য় সহ-সেনাপতি। কোন্ রাজা?

১ম। এ সৈন্যের রাজা—হাবা রাজ্যের হাবা রাজা—
সত্য হাবা রাজা।

২য়। আমরা প্রবেশ গিরে আরম্ভ করেছিলাম রাজদুরী;
দুই কাঁচা—সেখানে কেউ নেই। প্রধান সেনাপতি
এসে আমাদের নিয়ে গেলেন বড়ের হাউনি সেওয়া
হাউনি সেওয়ার একটা প্রকাণ্ড ঘরে—সেখানে গিরে
চাখীর বেগে লুকিয়েছিলেন এসেদের রাজা।
প্রধানমন্ত্রী তাঁকে বন্দী করে হিচ্, হিচ্ করে টেনে
নিরে এসেছেন শিবিরে।

১৫। কিন্তু এখন যে এক নোলান বিশেষ মেধা দিয়েছে।

জাহাঙ্গীর হাজা বলে। যে লখ গ্রামে মে-লখ বিহে
 হাজাকে নিয়ে আসা হরোহ সম্ভবনাও হেরে পুত্র
 সব পৌষ পৌষ হাজাহে : তারা বলে, আবার
 হাজাহ সপে আমরাও সব বন্দী : জাহাঙ্গীর সিংহ
 ফেরানো থাকে বা : জাহাঙ্গীর বিহে তাজা করে
 খোলে তারা সব কির করে ধাঁড়িয়ে থাকে।

২য় সৈন্য : শিবিরের চারদিকে লোকে লোকারণ্য
হবে দেখে : ভাট ভো প্রধানমন্ত্রী আশ্বিনায়ে
'ডাকহুঁন'।

১৪ সন-সেনাপতি। তদাধরা বাও-আধরা আশক্তি।
(সৈন্যবাহিনীর প্রধান)। অসভা দাসদাস আমায় এট
বড়-চলান একবার কোথায় আসি।

[ପ୍ରାଚୀନର ବିଶିଷ୍ଟ ଯାତ୍ରା ଡେଭାସର ଶ୍ରଦ୍ଧା ।]

[সাত আট বছরের একটি 'হু-ল'ক' বোম্বিতে ডামিয়ে
এক পলিচার প্রবেশ]

প্রোটা : এ আবার দাত্তস্বাক্ষর নয়, স্বাক্ষর, আবার নয়
 দাত্ত নয় দাত্ত, স্বাক্ষর স্বাক্ষর আমি তোকে দেব
 করতে পেরেছি তাকেই নয় পেরেছি। নয় চান
 স্বাক্ষর নয় দাত্ত। অতীত-কাল, চারদিক থেকে
 অতীতের দাত্ত, দাত্ত, দাত্ত দেব করে দিতেছিল
 আবার স্বাক্ষরকে দেবে। আরেই দাত্ত কোথায়
 দেব দেব—এই—

(ਲਗਭਗ ੧੦੦ ਓ ੧੦੦ ਟਾਈਮ ਹਫ਼ਤੇ)

মাঃ আবার আবাবার বেটী, তিনি আবার সেয়েন
লক্ষীর ঘট-পট আবারে : ওরে অলক্ষীতে সব
ভালিয়ে ছিল, কি হবে ভোর লক্ষীর ঘট-পট
দিয়ে ? বাবা, শাকটীটা পুড়ে গেছে রে—কত বড়
তোকা পড়ছে রে, পুড়ে বহিস্য নি যে আবাবার
বেটী এই আবার ভাগ্য। আবার বিষ্ণুর ঠোল
কোনা পুড়ের মাঠে পড়ে, যে তার ইতিহাস-পুস্তক
রক্ষা করবে গো। (কপালের রক্ত নাচে চাপিতে
চাপিতে একটি বৃদ্ধের জ্বল) ও বা গো মা—
একি রক্ত—একি রক্ত। তখনই বাগ্ন কলস্য়,
কাছ বেই ও আগুন শোকা বাড়ির কাছে থেকে,
কে কার কথা শোনে গো—এমন কি হবে গো—

কৃত। চাঁচাস নে বলাই; সময় ঘাটি আন, তারপরে
কোমরের গামছাটা খুলে ধুব করে এঁটে বেঁধে দে।

[বউটি সোফাটোয় বসি আনিতে গেল, আবার ভবে
অভ্যাসভাড়া হলো সোফাটোয় কিরিয়া আসিল ।

বউ। ওয়া—ওয়া—অসুস্থলো দেখছি এদিকেই
আসছে—

শেঠা। ওঁ—আসছে? ভাটতো ভাটতো—তবে
—তবে,—এখন কি উপায় হবে? ও যানিক,
আবার কাগজের দীপ্ত আব (খটিল হেন্দেটিক)
চাকরার চেষ্টা। তব্বা সবাই এককোণে ভড়োঃভড়ো
ঠাই।)

[কতিপয় সৈন্যসহ মহা-সেনাপতিস্বরূপ প্রধান
সেনাপতির প্রবেশ]

প্রশ্ন সেবাশ্রিত। হঠাৎকৈ চক্কোকাটীঘরের কাছে
প্রতিভা করতিল্লব, একমাস কালের মধ্যে এ-রাত্র্য
তাকে জ্ব করে দেবে। যেখাি সম্ভাব্যকালও লগল
না। দ্রাক্ষকে দৃষ্টি করে রেখেছি শিবিরে
লোকজন সব বিধে আছে শিবিরটা। শুধু সেইখোঁজ,
সরস্ব না—তা গতি গতি পোতাক্ষেরের গলা
কোটে ফেললেই ব্যক্তি সব পাগিয়ে বঠবে। (সচ-
সেবাশ্রিতের প্রশ্ন) কি হে সচ-সেবাশ্রিতের,
যেখানে তো, অপর পক্ষের সৈন্য সেবাশ্রিত কি,
না থাকলেও কেন বড় বাধিয়ে দেওয়া যায়।
কোথাও কোন সাধ না পেয়ে আপনারা ভুক্ত
পেছলেন, যুগে পেছলেন;—হাঃ হাঃ হাঃ—এখন
যেখানে কেন বড় বেধে গেছে? আসনের
নিখার আকাশ লাল হয়ে উঠেছে, নানবের আত-
ন্যে বাতাস ভরা হয়ে উঠেছে, লুপ্তির বায়ুপথে
খিঁচি বাওয়া চলছে। বেয়েমানুষ নিয়ে ক্ষুধি-
লগ্নে—হাঃ হাঃ হাঃ—আর কি চাই, মেঘকার বৃ-
ষে গেছে। আপনারা নতুন ব্যক্তিভে আগুন লগান
—আমি বুঝে বুঝে যেখাি—হাঃ হাঃ হাঃ—(প্রধান)

[গ্রানের যোড়লের গ্রহণ]

শ্রীচাঁদ। (বোতলকে দেখিয়া) ও বাবা বোতল, ইচ্ছা
কর আবারে পছন্দ কর, নহে আপনো হাতল পো—
ইচ্ছা কর।

ঝোড়ল। তাই তো, ব্যাপারটা যে কিছুই বুঝতে পারছিলাম। এই তো সেনাপতির রথের, এই তো সেনাপতির লক্ষ্যও রথের—বলি তোমরা ব্যাপারটা কি আশঙ্ক করেন কিছুই যে বুঝতে পারছি নি।

১৭ সহ-সেনাপতি। কেন ব্যাপারটা তোমাদের দেখতে পাচ্ছ না? আবার ব্যাকবো কিসের?

ঝোড়ল। তোমরা সব সময় অমন গারমুখো হয়ে কথা বলছ কেন? তোমরাও তো মানব।

১৮ সহ-সেনা। কে বললে মানব? আমরা জানোয়ার।

ঝোড়ল। তা হলেও বাঘ বাই বল না কেন বাঘ, ভিতরে ভিতরে মানব না চলে নিজেদের কেউ আর জানোয়ার বলে না। তুমি মানব, মানুষের মত হুটো কথা বল দেখি। তোমরা বাবা কি চাও?

১৯ সহ-সেনা। কিছু চাই না।

ঝোড়ল। ঠাণ্ডা বাবা আবার হালের কথা বললে। একটা ঠাণ্ডা বাঘ কথা কও না। কিছু না চাইলে তোমরা এখন করে আমাদের ঘোড়ার দান গোড়ালের গোড়—বা কিছু, সর্বশ্রম লুটপাট নিছক কেন? ঠাণ্ডা বাঘ বলছি বাবা, তোমাদের দেখে কি তোমরা ভালো খেতে পরতে পাও না—? অভাব পড়ছে?

সহ-সেনা। আচ্ছা বুঝকিলে পড়া পেছ তো এই গায়ে পড়া বুড়োকে নিয়ে।

ঝোড়ল। বুঝছি বাবা, লজ্জা পাচ্ছ। তা তোমাদের অভাব পড়ে থাকে তো তোমরা লুটপাট করছ কেন? আমাদের রাজাকে বন্দী না করে সে সব কথা বলছ না কেন? লুটপাটের না চর বাসে বুঝি, কিন্তু সাদা ঘর বাড়ি মোচাল-বরাই সব জালিয়ে নষ্ট করছ কেন? তাতে যে আমাদেরও ক্ষতি, তোমাদেরও ক্ষতি। তোমাদের বেশে যদি ভোত-করা চাল-সোণ বেশি না থাকে তো কিছু লোক আমাদের বেশে চলে এসে না, আমরা জালিয়া-করি চাল-সোণ সব দেব। আমাদের সঙ্গে যাচো পেচো বাও হাও—লুটপাট করছ কেন? অঙ্গদবাণি করছ কেন?

২০ সহ-সেনা। (হেসে দিয়া) আর তোমাকে উপদেশ দিতে হবে না। (সিপাহীকে প্রতি) না তে দেখ,

আমার আর এত দূর কিছুতেই ভাল লাগবে না। তোমাদের হালের টেকে প্রধান সেনাপতির সঙ্গে বলে দিচ্ছি, আমি দেশের দিকে চলেছি। সৈন্যপন। (একসঙ্গে) আমরাও আর কত দূর—কিছুতেই সরব না।

২১ সৈন্য। আমি আচ্ছা বেশে পালান।

২২ সৈন্য। আমি বাবা ভোত-করি চাল-সোণ বেশে এখানে থেকে দাব।

২৩ সৈন্য। আহিও ভাই।

ঝোড়ল। তোমরা বাবা আমার সঙ্গেই এসে না, চল না একবার আমাদের রাজাকে ছাড়িয়ে আমি, তারপরে তোমাদের সব বাবদা করে দেব।

[প্রধান সেনাপতির প্রবেশ]

প্রধান সেনা। হাঃ হাঃ হাঃ—বেশ জরুরে। দূর থেকে ডাকিয়ে ডাকিয়ে দেশদূর, ওপাড়ারও আগুন কলচে, বেশ জলছে। ওকি, আসন্নরা এখানেই দাঁড়িয়ে আছেন? এ পাহার যে আরও কত বরফাতি রয়েছে।

২৪ সহ-সেনা। (দৃঢ়কণ্ঠে) আমি আর দূর করব না সেনাপতি, এমনভর দূরে আমি হার যেনে গেছি।

প্রধান সেনা। ওঁয়া?

২৫ সহ-সেনা। আমিও করব না,—আমিও এমনভর দূরে অভাব নই।

সৈন্যপন। (একসঙ্গে) আমরাও করব না।

প্রধান সেনা। সাবধান! দূর করব না। আমার দূরের উপরে।

সৈন্যপন। হ্যাঁ, দূরের উপরে।

প্রধান সেনা। তার দণ্ড হাতে হাতে (তরবারি দ্বিত্বাধিত করিল, সঙ্গে সঙ্গে সহ-সেনাপতিও ও সৈন্যপন তরবারি সহ একযোগে প্রত্যাক্রম করিল।) ওঁয়া—এতদূর! (উদ্ভ্রান্ত হত) দাঁড়াও—সৈন্য তৈরী করে নিছক—অসংখ্য সৈন্য তৈরী করব বড় চাই বড়—যত বড় তত সৈন্য—বড় চাই—একমুঠো বড়।

ঝোড়ল। বড় তোমাকে কেউ দেব না বাবা, আবার তুমি যত আগুন লাগাবার ব্যস্তিতে আর—

প্রধান সেনাপতি। (উদ্ভ্রান্ত হত) যত আগুন নব,

থরে আগুন নহ,- এত বড় আশুপর্বা-বড় বড় ভড়
সৈন্য-সৈন্য চাই সৈন্য-বড় চাই বড়-!

মোড়ল। সোহাই বাবা চক্ষুসেবকের তুই-

প্রধান সেনাপতি। (চিৎকার; দিবা) আবার সেই বাবা
চক্ষুসেবক-ওঃ কলে সেলাম -

বেগে প্রস্থান।]

মোড়ল। পালিয়েছে দো পালিয়েছে-এল আসে
আমাদের রাত্তাকে ছাড়িয়ে আসি।

বেশখে কোলাহল। জয় আমাদের বাবা রাজ্যের বাবা
হাছা-জয় আমাদের বাবা হাছা।

মোড়ল। ঐ ঐ. তবে বুঝি সবাই বিলে আমাদের
রাত্তাকে ছাড়িয়ে এসেছে-জয় আমাদের বাবা
রাজ্যের-জয় আমাদের বাবা রাজ্যের।

পটক্ষেপ

চতুর্থ দৃশ্য

আশা পথ

[পর্যকট্যাদী রাজু; তাহার বউ-এর খোঁপা ধরিয়া
টানিতে টানিতে প্রবেশ করিল।]

বউ। মেরে কেলসে গো-মেরে কেলসে, কে আছ গো
হুকা কর -

রাজু। আসে তোকে মেরে কেলসে নি, তারপরে কথা।

বেশখে। ও রাজু, কতিন কি কতিন কি -

[বলিতে বলিতে করেকজন চাষীর প্রবেশ]

১ম। (রাজুর হাত হইতে বউকে ছাড়াইয়া দিয়া)
হি হি হি রাজু, পনের ঘরো তুই এ করহিন কি?
তুই আমাদের পামেন হান্,ভ, ভোঁকে আমরা কত
পয়া হান্য করি-এই সভাল বেদার তুই পথে বসে
বউকে ঘরে ঘারহিন? হি হি হি-কি কাত
বল দেখি -

রাজু। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে এক ভায়সার বদমা
পড়িয়া) কাত কি জিজ্ঞেস কর ঐ লক্ষ্মীছাড়া বউকে।
(বউ এক পাশে গিয়া বসে আসি দিয়া কোঁপাইয়া
কাঁধিতে লাগিল।)

২য়। কি ব্যাপার আমরা তো কিছই বুঝতে
পারছি না।

রাজু। বুঝবে ব্যাপার? (উঠিয়া গিয়া বউয়ের আঁচ
ধরিয়া টান দিতে অনেকগুলি সোনার মোহ
ছড়াইয়া পড়িল।

১ম। এই রে, বুঝেছি, বউ বুঝি নবর চাঁদের বাড়ি চৈত
করতে যায়? এ যে নবর চাঁদের সোনার মোহর সেগে
পাচ্ছি।

রাজু। আর নি কাজে, আঁচ সকাল থেকে আর
উঠেছে, হাঠের কাজে তিনি যাবেন নি, যাবেন না
চাঁদের বাড়ি চৈতরী করতে।

৩য়। কাজে আর নি এখনো, তবে এত সোনার মোহ
পেল কি করে?

রাজু। কপাল পুড়েছে হাছা, ঐ নবর চাঁদের সোনা
কপাল পুড়েছে। আমার সেই লালী ভেড়া
দেখেই দালা?

৩য়। হ্যাঁ হ্যাঁ-অনন ভেড়া তো ভরাটে বেই, সে
স্তোর দানের লালী-

রাজু। লক্ষী ছাড়া বউ আমাকে লুণ্ঠিয়ে নেটো
নবর চাঁদকে দেখে দিতে বিক্রী করবে বলে সোপা।
এই মোহর নিয়েছে, তাই এই সোনার মোহর (ব
আরও কোঁপাইয়া কাঁধিয়া উঠিল)। ভাগ্যিস, আ
টের পেয়েছিলুম, তাই লালীকে আমার নি
পারে নি।

৩য়। তাই তো রাজু, এত সোনার পাণ ঢুকে সে
আমাদের ঘরে ঘরে? নবর চাঁদ শেজার বাড়ি কর
নার করে ঘরে ঘরে ঢুকিয়ে দিল এত পাণ? ও
কাঁদিস্ যে বউ পাণ করেছে-আজ আর হাঠে গি
কাজ বেই, বাড়ি যা। (বউয়ের কাঁধিতে কাঁদিয়ে
প্রস্থান)।

৪র্থ। দেখ কোথেকে এত সোনা দানা নিয়ে জুট
এসে এই নবর চাঁদ বল তো? সাজ সোখাক কণি
দাঙি কথা বার্তা-সবটাতেই কেমন গিচ্ছি জু
যায়। কোন্ দেশের কোন্ নবর চাঁদ এসে আমাকে
বুঝেই হ্যাঁ পোঁক পোঁকিয়ে বলে পড়ল!

১ম। আমাদের দেশটাতেই যেন কি অসম্ভব চু
পেল। এই তো পেল কি সব বড় বিদ্যাধি
কাজ-আমাদের হাছা হলেন বন্দী, কত লুটপা

নানানারি আর সব জানানো । সে চাপানো মিতে বেশ, রাজাকে আমরা কিসে পেলান : আবাস কোথেকে চুইল এসে এই বংচ্যাক্তর আসল ? দেউ বলালে কিনা, ষ্টি পান্ডর লিখে বানিয়ে দেব এক আকাশ-কোঁড়া বাড়ি—চালতে লাগল দু'হাতে সোনার মোহর—

[এক হাতে দিমারেটে, অন্য হাতে হুঁসাল দিয়া কপাল নুহিতে নুহিতে নবর চাঁদের প্রবেশ ।]

নবর চাঁদ । বেশ বেশ, এই যে তোরা আজ বরাই সকাল সকাল কাজে বেরিয়ে পড়েছিল । বেশ বেশ । আজ আর কেউ রাতে ঘাটে নঃ—আজ ঐ দক্ষিণ দিকে ছুঁলো গম্বুজ দুটো দ্বিত করতই হবে । একবার হয়ে যাক, ততপরে ডাকিয়ে ডাকিয়ে দেখি, ঐ গম্বুজ দুটো বিশ্রুপ করে তোদের পনথ্যাক্ষকে নুঁচিয়ে যাবে ।

দেখ বাবা নবর চাঁদ, একটা কথা তোমাকে পণ্ড করে বসে দিচ্ছি : ঐ দর গম্বুজ-দুপুজে আমাদের কাজ নেই, আমরা নাঠে গাছি, ও কাজের জন্য তুমি আর কখনো আমাদের ডাকবেই না ।

নবর চাঁদ । কেন, সোনার নুহি কার্জিত পড়েছে ? আরও চাই ? না ? এই বর, আগাম সোনা—হাতে হাতে—। আজ থেকে আর দিনে পচিপচি নঃ—দশ-দশ করে ।

(২৪ চান্দীর হাতে অনেকগুলি সোনার মোহর দিতেই সে সেগুলি হুঁকিয়া ফেলিয়া দিল ।)

২৪ । আর নঃ এই পাণ, একবার হুঁতে সেগম্বুজ-দুপুজু দেখেছি । নোতুন নোতুন দেখতে চক্-চক্ করছিল, বেজোও পয়সা করতে চেয়েছিল, ছোদেবেয়োও খেলতে চেয়েছিল, তাই সোজা সোজা তোমার কাছে দু'টার দি- ভিড়েছিলুম ।

নবর । এমন বাড়িটা তবে আদখানা হয়ে পড়ে থাকবে ?

২৪ । বল তো সে আদখানাও সবাই গিয়ে ভেঙে দিয়ে আসি ।

নবর । সে বাড়ি আরম্ভ করেছি এবাড়ি দেখেছিল, কেউ বাবার আছে ?

২৪ । আমরা বাবা দেখবার জন্যে বাড়ি তৈরী করি না, বাড়ি তৈরী করি থাকবার জন্যে । আমাদের

বাড়ি-ঘরে আমরা নঃ আদখেই থাকি, তোমার ঐ ইষ্টপাথরে তৈরী আকাশ-কুটো-করা শেল্লার বাড়ি দিয়ে আমরা কি করব ?

নবর । তোরা কি মানুষের মত বাল করিল ?

২৪ । (কোঁপরা উঠিয়া) কষ্ট-নিষ্ঠির কথা কম বলবে নবর চাঁদ—

২৪ । থাক্, থাক্, হাচ্, তবে আমাদের কাজ নেই, আমরা নাঠে চলি ।

[চান্দীর প্রস্থান]

নবর । এয়া—চলে গেল ? সত্যি দর চলে গেল ? আমার সোনা হুঁকে ফেলে দিয়ে চলে গেল ? দেখে নেব, দর নামাকে আরি দেখে নেব । সোনা দিলে দর সেন কিনে নেব, রাজার মাথা অর্পণ কিনে নেব । কত সোনা চাই ? কত সোনা । কিন্তু, তাই তো, বাটাচারা এখন আর যে সোনাচ বাবার পর্যন্ত দিতে চাইতে না । কাল বিকেলে ভাল খাবার পাই নি কিছু, আর শাপা সকাল যে কোনো খাবারই পাচ্ছি না । বাটাচারা না খাটতে হারবে নাকি আমাদের ।

(একটি বোরগ হাতে করি : একটি চান্দীর প্রবেশ)

এই কোথার চলেছিল, যে বুরগীটা হাতে নিয়ে সে বুরগীটা আমার হুে ।

চান্দী । কেন, বুরগীটা তোমাকে দিতে যাব কেন ?

নবর । দিবি কি ভেট দিবি না বরগাতি দিবি ? নবর গার দিবে কিনব, কটা সোনার মোহর চাই ?

চান্দী । সোনা দিয়ে আমার বুরগী বেঁচি না ।

নবর । তবে বুরগী নির্কে কোথার চলেছিল ?

চান্দী । চলছি ঘাটে ।

নবর । (চোঁকিয়া গিয়া) হাটে বেচেতে গাচ্ছিল, তবে যে বলি সোনার দিবি যে ?

চান্দী । সোনার দেব কেন, সোনা কি সোকে খাব ? সব হয়েছে একটু মাফকলাই ভাল খাব ; এবার ভাল জামাতে পারি দি, তাই ভেবেছি বুরগীটা দিয়ে হুঁসেই ভাল নিয়ে আসব ।

নবর । সে বরাহ আমাকে, তোর পকেট ভরতি সোনা দেব ।

চাখী। পকেট আবার কি বন্ধু গো ?

নব্ব। সে সে বন্ধিহ—কাল লন্ডার ভাল খেতে
পাইনি—আজ সকালে কিছু পাইনি।

চাখী। তুমি খেতে পাওনি ? বল কি ? তুমি
খাটতে শিঙতে পার না ?

নব্ব। আর কি মাথা-মোড়া-বোব ? না কুলি-বন্ধুর
চাখা ? খাটতে ধর কোন ধুগে ?

চাখী। না খাটলে খেতে পাবে কি করে ?

নব্ব। (এক ঘুট্টা মোহর চাখীর গায়ে ছুঁড়িয়া ধারিয়া)
খেতে পাব এই দিবে।

চাখী। ধ্যানা না পালসা। [প্রস্থান]

নব্ব। সেখনি নোতুন ধুমো উঠছে, পাবে না খাটলে
খেতে দেব না। উঃ—অসহ্য—অসহ্য। পুষ্কোর
ঘাটাটা না বাইবেই যাবের না কি ? সেখি ঐ বৃড়ী
মাথায় কি নিয়ে যাচ্ছে। ও বৃড়ী—ও বৃড়ী—

(এক বৃড়ীর প্রবেশ)

পুটলীতে কি নিয়ে যাচ্ছিস, বৃড়ী ?

বৃড়ী। আত্তা গো।

নব্ব। কিসের আত্তা ?

বৃড়ী। (নিচুঁচুঁয়া উঠিয়া) এ কি আর বোড়ার আত্তা
গো, হাঁদ-আর মুরগীর আত্তা।

নব্ব। কোথায় চলছিস ?

বৃড়ী। অতো কথায় দরকারটা কি বাপু ! চলছি
কলুবাড়ি, আত্তা কটা দিবে একসের সরষের তেল
আনব।

নব্ব। আত্তা আমাকে দিবে না।

বৃড়ী। কেন, ডোনার ঘরে যানি আছে না কি ?
তেল হয় ?

নব্ব। যানি দিবে কি করব ? এই নে—(কয়েকটা
মোহর হাতে দিল), সে এনারে আত্তা দে।

বৃড়ী। হাতে এগুনো কি দিলে দে ?

নব্ব। সোনার মোহর।

বৃড়ী। কি বললে ? একটু চৌচিরে বল, কানে একটু
কম শুন।

নব্ব। (চৌচুঁচুঁয়া) সোনার মোহর।

বৃড়ী। এতে তেল হয় নাকি ?

নব্ব। (চৌচুঁচুঁয়া) ডোনার মাথা হয়—

বৃড়ী। (মোহর কটা ছুঁড়িয়া কোলিয়া দিয়া) বুকে
মানুষের লেপে নল করতে নেমেছে ?

[প্রস্থান]

নব্ব। এ তো বড় ক্যাসায়েই পড়া গেল দেখছি, শো
কি না ঘেয়ে বহন ?

পট পরিবর্তন

পক্ষর হুন্স

[হলধরের ঘরের বাইরে একটা দিক। বন্ধু শোনা
পাইতে বসিয়াছে, কয়েকজনকে দেখা পাইতেছে
মহামায়া সকলকে খাবার দিতেছে। হলধর তত্ত্বাবধান
করিতেছে।]

হলধর। (মহামায়ার প্রতি) আজ কিছু সকলকে শে
ভরে কীর দিবি মহামায়া, আজ সবাই পতিত ক'
থেকে পড়া কুড়ল মেরে মেরে একগ্রাশ পাও
ঘুড়ো তুলেছে। (মহামায়া ইঙ্গিতে বুঝাই
আজ কীর দিবে না।) কীর দিবি নি ? কি দিবি
(মহামায়া ইঙ্গিতে সেবাইল দই-কলা) আজ।
দই-কলা ? তা বেশ বেশ—

সেখণ্ডে—নাহা, ওগো নাহা—

হলধর। কে—কে— ?

[একটু দূরে নংগাঁদের প্রবেশ]

নব্ব। (হলধরের প্রতি) বোমারি নাপ করবে আর
একটু বিশেষ দরকারে ডোনার ব্যাডির যোগ্যে চা
পড়ছি।

হলধর। তা দরকার হলে পড়বে বই কি। দরকার
কি শো আগে তাই বল।

নব্ব। (ক্রুদ্ধভাবে) নাহা, ডোনার ঠাকো আনি আ
তিন দিন পাই নি।

হলধর। পাও নি ? তিন দিন ? কেন কেন ?

নব্ব। কেউ খাবার কাছে কিছু খাবার বি
কাবে না।

হলধর। (হাসিয়া) এ দেখে খাবার ভো কেউ করে
কাছে বিক্রি করেনা।

নব্ব। তবে ভুলসোক আমরা খাব কি করে ?

হলবর। (হাসিয়া) কিসে বাবে কেন, দাঁতে খেটে' বাও ;
শেইটেই এখানকার রীতি।

নধর। উঃ, ঐ এক কথা—ঐ এক কথা ; পুনে পুনে
কান কাদাশালা হয়ে পোঁদ (বদিয়া পড়িল)।

হলবর। ওঃ, তোমার খুব কিসে পেয়েছে, আসে তুমি
চারটে খেতে নাও, তারপরে তোমার সঙ্গে কথা
কথা বলব। বেলার একশেষ করে পাতা পড়ে
আমার এখানে : এই যে সেখানে পাজ, এয়া সবাই
আমার সঙ্গে হাঠে কাছ করে। বসে পড়, একদিকে
তুমিও বসে পড়, আসে চারটি খেতে নাও।
(নবজাদ প্রবর্তা-বানিকটা ইভক্ত করিয়া গেল
একশাণের একখানা আসনে বসিয়াই পড়িল।
দায়াসের খাওয়া ছইতেছে তাহারের মধ্যে কেহ
কেহ পাতা তুলিয়া চলিয়া যাইতেছে, অপরে আবার
নিমন্ত্রণ পাতা পাড়িয়া বসিয়া পড়িতেছে।) বেশ
শেঁটটি ভরে আসে চারটি খেতে নাও, তারপরে
তোমার সঙ্গে অনেক কথা হবে। তুমি খাও, আমি
একটু কাছে ভিতরে থাকি, একখনি আবার
আসি। (ভিতরে প্রবেশ)

[মহামায়া নবজাদকে নিমন্ত্রণ পাতা পাড়িয়া লইতে
ইঙ্গিত করিল, নবজাদ বসিলা না ; তাহার খাইতেছে
তাহারের মধ্যে একজন লোক বসিল, 'বিদ্যি ঠাকরুণ
তোমাকে পাতা শেড়ে নিতে বলছে।' নবজাদ
তখানি বিকৃতভাবে বসিয়া রহিল। মহামায়ার সন্দেহ
হইল, সে আগাইয়া আসিয়া নবজাদের দিকে তাকাইয়া
নিরীক্স করিতে লাগিল, তাহার পরে সে নবজাদকে
হাত দেখাইবার জন্য ইঙ্গিত করিল ; নবজাদ বসিতে
পারিল না ; পূর্বের সেই লোকটি আবার বসিল,
'বিদ্যি ঠাকরুণ তোমার হাত দেখতে চাচ্ছেন গো,
হাত না দেখে তিনি খেতে দেবেন না'। নবজাদ
অত্যন্ত অনমানিত বোধ করিল, তাহার ভগ্নিতে সেই
বিগত প্রকাশ পাইল ও তাহার পরে সে হাত
দেখাইল। হাত দেখিয়া মহামায়ার অত্যন্ত বিরক্তি
প্রকাশ করিল, নবজাদকে 'ও' 'এ' 'এ'—বসিয়া আসন
লইয়া উঠিয়া গিয়া এককোণে বসিয়া থাকিবার জন্য
বার বার ইঙ্গিত করিতে লাগিল। নবজাদ হাত

নাড়িয়া আপাত্ত খানাইতে লাগিল। বসিয়াই তাহাতে
আরও কেঁপিয়া গেল। উৎকণ্ঠিতভাবে নবজাদকে
উঠিয়া দাঁড়িবার জন্য আদেশ করিতে লাগিল। তখন
পূর্বোক্ত লোকটি বসিয়া উঠিল, 'তুমি বসি খেতে
বাওনা।']

নবজাদ। খেতে খেতে বাব কোন্ মধ্যে ? আমি
কি বলদ না পাহা ?

লোকটি। তা আর তোমাকে বলতে হবে না, বিদ্যি-
ঠাকরুণ হাত দেখে ঠিক বসিতে শেখেন। তোমাকে
বাব, উঠে যেতে হবে, ঐ কোণে গিয়ে পাত
পেড়ে বসে থাকতে হবে, সকলের খাওয়া হয়ে
গিয়ে যদি কিছু বাকি থাকে তবেই তুমি পাবে।

নধর। (চিৎকার করিয়া উঠিয়া) কেন, আমি কি
সুতর না বেডাল ?

[চিৎকার শুনিয়া হলবরের প্রবেশ।]

হলবর। ও কি, কি হল ?

নধর। খেতে ছেড়ে আমাকে এইভাবে অপমান ?

হলবর। কে বলল অপমান ?

নধর। করল তোমার ঐ বোবা বোন।

লোকটি। নিষ্ঠাকরুণ হাত দেখে চিনতে পেরেছেন
সো, একেবারে-নরম ভুল-ভুলে সো, জন্মে কখনও
কাছে হাত যেন নি। আবার মূখে বলছেন
সো—আমি কি বলদ না পাহা। বিদ্যিঠাকরুণ
এখন-কিছুতেই খেতে দেবেন নি, বসে থাকতে
হবে ঐ কোণে, একেবারে শেবে যদি কিছু দেবে।
হলবর। শেখ, এ-খাপায়ে আবার বোনের কথাই শেখ
কথা, এর উপরে আর আমাদের কারোর কোনো
কিছু বলবার নেই। আর আমাদের এখানকার
নিয়মও হল তাই।

নধর। এ নিয়ম একলব হাথা-বুদ্ধবুদ নিয়ম।

হলবর। (হাসিয়া) আমরা এদেশের দব যে তাই।

তোমার বড় বড় বড় বাবা—ভাল ভাল দেখতে
বাবা—ভাবা যে আমাদের হাথা বুদ্ধবুদ বসে, তাতে
আমরা একটুও রাগ করি না। জান না, আমি যে
হাবার সোণের হাথা হাথা।

নধর। এই যে তোমার শেখ নিয়ম যে দব লোককেই

গায়ে বাটতে হবে, এখনতর দিগর আদম্বকের দেশ
হাড়া আর কোথাও হতে পারে না; পরম নিবেদ্য
হাড়া আর কাগের মাথার এমন সব উত্তর কথা
আমতেই পারে না। মানব কি পুণ্ড হাত দিয়েই
কাজ করে? জানি পুণী বুদ্ধিমান মানব যারা।
তারা কি দিয়ে কাজ করে?

হলদর। বুদ্ধের হল আমরা তা জানব কি করে।
আমরা তো বুদ্ধেরা হাত পা বাড়ি পিঠ—এই সব
দিয়েই কাজ করি।

নর। সেই জমোই তো দিন দিন আরও এমন সোফে
বুদ্ধ হয়ে উঠে। আমি তোমাদের একটা মোড়ুন
মিনিস শিখিয়ে দেব, শিখিয়ে দেব কি করে মাথা
দিয়ে কাজ করতে হয়। তখন সবাই বুদ্ধতে পারবে,
মাথা দিয়ে কাজ করা হাত দিয়ে কাজ করার থেকে
কত বড় জিনিস।

হলদর। (বিশ্মিতভাবে) তাই তো : তবে তো
আমাদের যে বুদ্ধ, হল হর দেটা একবারে
অকারণে নর!

নর। মাথা দিয়ে কাজ করা অত সোজা নয় সো বাবা।
তাতে অনেক হিম্মত লাগে। আমার হাতে রান
সেই হাত পড় নর—তার জন্য আমাকে খেতে দেবে
না; আমার মাথার মধ্যে যে দিন রাত কত বুদ্ধি
পাক ঘেঁষে ঘরেছে তা তোমরা বুদ্ধের চাঁড়ি
জান কিছ?

হলদর। কি করে আমরা জানব?

নর। (বিকৃত স্বরে) কি করে আমরা জানব! তবে না
কেনে—নুনে অমন বোকা বোকা বিবর করতে বাও
কেন? এই মাথা দিয়ে এত বুদ্ধি বের করতে হয়,
এত কাজ করতে হয় যে মাথা মাঝে মাঝে কেটে
চৌচির হয়ে যেতে চায়!

হলদর। (বিশ্মিতভাবে আনিকলন নরটারের মাথাটার
দিকে তাকাটয়া) মাথাটা যদি কেটেই যেতে চায়
তবে ঐ সব এত মাথা দিয়ে কাজের মধ্যে যাক কেন
মাথা? আনিকটা আমাদের মধ্যে ভিত্তে পড় না।
আমাদের হাত পা বাড়ি পিঠ তো কখনো অমন
করে একবারে কেটে যেতে চায় না। এ কাজ

যখন অনেক মোহা উদয় এ বিকে একটা একটা
ভিত্তে তোমাদের আপাত কি?

নর। আপাত কি? আপাত কিছুই নেই, 'আপাত'
পুণ্ড এইখানে, আমরা মাথাগুলো মাঝেমাঝে
যদি মাথার কাজ যেতে হাতের-কাঁচ ঘেঁষে রাই
তবে তোমাদের মত রান বুদ্ধদের উপার হবে
কি? সেই জানতেই তো দিবারিণ যারও
হয়লায়। আমি যদি মল্যটাতে বাটিতে বাটিয়ে
এমন করে কাটিয়ে না কিছু—তবে তোমরা যে
অন্যকাল ওমনি হাফারি পড়ে' তোল-কুতকুত
হয়ে পড়ে থাকতে। তোমাদের জাননা না থাকলে
আমাদের আর জাননা ছিল কি।

হলদর। (বিশ্মিতভাবে) তোমাদের কথাগুলো কি
সুন্দর হচ্ছে বড়ো—কি সুন্দর জামো ভালো!
তুমি আমাদের কিছু শিখিয়ে দাও—কি করে মাথা
বাটিয়ে কাজ করতে হয়।

নর। এই হাফার দেলে তিন দিন যেতেই পেলান না—
কি করে আর দেখবি?

হলদর। খেতে তোমরা খামরা তো—অনেক ভাল ভাল
খাবার দেব—কতখানেক ভীষা এই দেব—নারকেলের
গোল গোল নাড়ু দেব, কিছু এ বেলায় দেব না,
ও বেলায় দেব। এ বেলায় আমি সকলকে ডাকি,
সকলের সামনে তুমি একটি বার দেখিয়ে দাও, মাথা
দিয়ে কি করে কাজ করতে হয়, আর সে কাজ কত
বড়। তখন আর তোমাকে ভাল ভাল খাবার দিতে
কাগের কোনো আপাত থাকবে না। তার আগে
তোমাকে ভাল খাবার দিলে সবাই জানবে, কাজ
নিয়েই, কাজের আইন ভেঙে দিল। এ বেলা
মহামাফকে বলে করে একটা কিছু তোমাকে খাবার
দিচ্ছি। আহা, আমাদের জন্য মাথা বাটিয়ে বাটিয়ে
তোমার মাক বুদ্ধ পুঁকিয়ে গেছে, তোমার মস্তো পড়ে বলে
গেছে, একটা কিছু; খেয়ে একবার চাট্টা হয়ে নাও।

নর। কিছু খাব না, কিছু খাবো না, মাথার কাজ
করা করে তাদের পেটে না খেলে কিছু হয় না—
এ সব আমি দেখিয়ে দেব—দেখিয়ে দেব।

পটক্ষেপ।

দৃশ্যাবলি

[একটি বন্ধু তাকার সম্মুখে অনেক নগনারী বসে
হইয়াছে ।]

তবৈক মহিলা । (শাব্যের দৃশ্যের প্রতি) এ হুতু, কি
সেখাতে নিয়ে এলি ? কতজন হাঁড়িতে আছি, কই
কাউকে তো দেখতে পারছি নি ।

হুতু । আরে একটু দূরত্ব করো বাগি, এই যে রাজা
নিয়ে এলেন আর কি ।

মহিলা । কাকে গো ?

হুতু । নতুন বড়ো মানুষ এসেছে বাগী : এখন আর
পা-পাতরের বাটুনি বাটতে চলে না —

মহিলা । আ নও, গা-গাঙরে বাটব নি তো কি
করে বাটব ?

হুতু । আগারে বলে বলে খালি মাথা বাটতে কাজ
করতে হবে ।

মহিলা । দূর পোড়াকুংবো, নব্বা করবার আর ডাংগা
পাস্ নি ।

হুতু । ঠিক বলছি বাগী, ঠিক বলছি , একটু লাঁড়াও
সেখাতে পারে দাবি ।

পানের ১৫ সোকা । বলি ও হুতু, বলে বলে মাথা
বাটিয়ে হটিতে আবার ভুলে যাব না তো ?

হুতু । হটিবে কেন গো ? তখন তো খালি পাড়ি
যোড়ার চক্রে গো (হাসি)

২২ সোকা । পাব কোথায় ?

হুতু । মাথা বাটালে হু'হাতে সোনা আসবে, তাই
দিয়ে দত্ত ইচ্ছে পাড়ি যোড়া কিনবে । ওই যে
রাজা এস—রাজা এস —

[নবরত্নবিক্রে লইয়া দলবরের প্রবেশ ।]

দলবর । (নবরত্নবিকে) দবাই বাতে তোমাকে দেখতে
পার তোমার কথা ভাঙ্গো করে শুনতে পার তার
জানো এই উঁচু বন্ধ করোহি । তুমি হাদা ঐ বন্ধ
দিয়ে ঠা । (ভিক্টর প্রতি) এতে বেতে
পথ দাও—

[ভিক্টর হুই ভাগ হইয়া আরো পথ করিয়া দিল । নবর
দলবরে এদিক ওদিক চাহিয়া দিয়া বকের গিন্নন দিয়া
বকের উপরে উঠিল । উঠিতেই ভিক্টর ভিতর দিয়া

কেস কেস বদিয়া উঠিল, 'হুতু, হুতু' । নবরত্ন
খানিকজন গম্ভীরভাবে লিটাইয়া গেল ।]

নবর । (গম্ভীর স্বরে) ভুল মহিলা এবং ভুল মহোদয়গণ—
তবৈক সোকা । (শাব্যের অপর প্রতি) সে আবার
কাজ গো ? আবারের মধ্যে সে সব কেউ আছে নাকি ?
অপর । (নবরত্নের প্রতি) থাকে আমরা তখন কেউ
নই ; আমরা গাণী বন্ধ, কামার কুমোর, হুতোর
ভাণী —

নবর । (বিরক্তভাবে) বলছি বলছি —। যাক যে আমরা
এখানে দলবর হইছি সেটা আপনাদের মন্তব্য একটা
ভুল ভাংবার জন্যে ।

তবৈক । (অপর প্রতি) সোকাটা বলে কিছু বেশ—।

অপর । সেখতেও কিছু বেশ দৃশ্যের, তখন নবর
তুলতুলে চেহারা —

অপর । জামাটা কাপড়টা কেমন শাধা স্বচ্ছ, হাওগার
কেমন ফুৎফুৎ উড়ছে ।

নবর । আপনাদের সে ভুল এই যে, পায়ে বাটাটাই
চক্ষে দল চেয়ে পক্ষ জিনিস । আমাকে অত্যন্ত দৃশ্যের
সঙ্গে বলতে চাচ্ছে, এটা আপনাদের চরম আহাম্মুক ।
তবৈক । (দলবরের প্রতি) ও রাজা, কই এ সব বলার তো
কথা ছিল না ।

অপর । আমরা মাথার কাজের কথা শুনতে চাই ।

অপর । শুন শুনতে চাই নে, সেখতে চাই ।

নবর । আপনারা দৃশ্যের বস্তু অবৈধ হবেন না ; বৈধ

গরণ করুন । মাথার কাজের কথা আসছি আস্তে
আস্তে । আগে অন্য অনেক কথা বলবার আছে ।

দলবর । (ভিক্টর সোকাবনের প্রতি) দেখা যাচ্ছে মাথার
কাজের কথা আসতে এর অনেক সেরী আছে ;
আমি অনেক কাজ কেলে এগেছি, আমি একটু
যাচ্ছি ; এখন মাথার কাজ দেখাতে আরম্ভ করবে
তখন আমাকে ডাকবে চাই ।

শাব্যসলোক । অবশ্য অবশ্য (দলবরের প্রবেশে) ।
নবর । হাত পা দিয়ে কাজ করা অনেক সহজ জিনিস,
শুনতেও তা পারে ।

তবৈক সোকা । আপনি আমার সঙ্গে যাঠে গিয়ে
আমার হাল থানা একদিন একটু পরে দেখুন না ।

নবর। অনেক সন্তান অনেক সন্তান—

অপর। একবার মক থেকে নেবে অসুখ দাদা, আমার
চাউনি বাটাগিটা একবার পরে দেখবেন চলুন।

অপর। আমার তাঁত খানিতেও নং একটা টান দিবে
যাবেন দাদা।

অপর। আমার মনের চালখানাও একবার একটু
পরে দেখবেন।

নবর। ওদ কাড় আমি—একবারে মনের উপর
শল্ট করে বসে দিচ্ছি—কিন্তু, মনে করবেন না
ওদ কাড় আমি একেবারে দ্বন্দ্ব করি। ওদ
কাড়ের জন্য বিদ্যা আমারকে দৃষ্টি করেবনি—
করেছেন আপনাদের।

পরপর। (স্বামীর ভাবে) এঁরে কি সব কথা বলচে—
কি সব কথা বলচে।

ভৈক। আপনাকে বিদ্যা যে কাড়ের জন্যে দৃষ্টি
করেছেন সেই কাড়ই একটা দেখিবে কিনা না বলাই।
অত লম্বা লম্বা কথার আবারে বলায় কি ?

নবর। আমার কাড় মাঝে কাড়, তার জন্যে দাঁট-
মাঠ তলে কাণখানায়, মনী-মালায় বসে-মালায়
ঘুরে বেড়াতে হয় না। ঐ যে আকাশ-চন্দ্র
অট্টালিকা আমি আপনাদের লেপে আরম্ভ করেছি
তারই—তারই একটি সূর্য্য সূর্য্যমুখিত তলে বসে
আমি মাঝে কাড় কর। দিনের বেলাতেও কক
কক করে বিকলী বাতি জ্বলবে, মাঝে ওদরে
বন বন করে বিকলী পাখা ঘুরবে, তার নীচে
আমি মরম পলিওয়ালা চেয়ারে বসে বসে—

ভৈক। কোথায় বাস্তব মাথা এসে যাবে যে, মস্তে
চড়াই পাবেন না, শুধু কি উপায় হবে ?

নবর। বড় বড় ভাকার ডাকব, কড়া কড়া ওবুং বাব।

অপর। তাতে তো অনেক পরমা-কড়ির প্রকার দাদা—
নবর। কিন্তু, গ্রাহ্য করি করি না! নং তাতে পরমা

দৃষ্টি—আর দিনে-রাতিয়ে বড় বড় ভাকার ডাকব
কড়া কড়া ওবুং বাব।

অপর। বসে বসে থিয়ে বসে হয়ে যাবে যে—

অপর। হাতে ধর হয়ে না যে—

অপর। হকের চাপ দাদা—অসম্ভব হকের চাপ।

নবর। কিন্তু, গ্রাহ্য করি না আমি—কিন্তু, গ্রাহ্য করি না :
যেমন করে হোক এটা গ্রাহ্যটা থাকিবে থাকিবে
আপনাদের। আমারে মানব করে তুলতেই হবে—
আপনাদের পদ, পদ, পদ—(মাথাটা এদিক ওদিক
চুলিতে লাগিল।)

ভৈক। ওকি রে, মাথাটা তুলছে কেন রে ?

অপর। মাথা নড়ছে ? মাথা নড়ছে ? তবে এখন
বোধ হয় মাথা দিয়ে কাড় আরম্ভ করবে।

অপর। তবে হাককে ডাকি, হাককে ডাকি—
(সেয়ে প্রস্থান।)

অপর। ও দাদা, মাথা দিয়ে কাড় করলে কিন্তু বাকি
দৃষ্টিয়ে যেনে, নীচে বকুং-সকুং, মানস
আমরা কিছুই বুঝে না।

নবর। (চুলিতে চুলিতে) মাঝে কাড় করে করে—
(ঝড়ট মরে) দিন রাত কত বৃষ্টি ফেলিয়ে
যে এটা মাথাটা—তাই করে করে এটা টাকা—এটা
টাকা—(নং রাত দিয়ে পকেট হাতে তুলিয়া তুলিয়া
সোনার মোহর নীচে ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল।)

ভৈক। এ সব পুরনো হয়ে গেছে—এ সব হে
আপনি কিছ; কিন হয়ে এগেলে অনেক ছড়িয়েছেন।

অপর। মোতুন কিছ; দেখান—মোতুন।

নবর। (অত্যন্ত উত্তেজিত অথ আড়ম্বারে) ব
পালারা—এই মাথা-মাথাই হয়ে থাক-তোকে
আর বিহু, করা সেল না—(এদিক ওদিক
চুলিয়া মাথা বার বার হকের টোকা বাইয়ে
লাগিল।)

ভৈক। (উত্তেজিতভাবে) ওরে দাদা দাদা মাথা
কাড় আরম্ভ করেছে রে, মাঝে কাড়—মাথা
কাড়—

অপর। ওরে আমারে হাকা কোথায় রে—হাকা—
হাকা—

[চল্লিশের চূড় প্রবেশ]

নবর। কি রে কি চল রে—

ভৈক। মাঝে কাড়—মাঝে কাড়—

নবর। (হকের দিকে ডাকাটায়) তাই তো মাথাটা
দিয়ে যে কক, কক করে আঘাত করছে—না না—

আমায় তো দরত না—বার বার তোঁকা খাচ্ছে—
অলসডর ঢ়লছে—! তাই তো, তাই তো,—
লোকটা তিনদিন খাল নি—খাবার ঘোণাড করুতে
পারে নি—লোকটা হয়েই থাকে না কি।

ভট্টক। দেখ রাজা, দেখ রাজা—লোকটা ওরকম করছে
কেন?

হলধর। তাইতো, পড়ে মরে যাবে, বয়েষ হরো—উপরে
উঠে লোকটাকে দর দর—জল আনো—খাবার
আনো—

(হলধর ও আরও কয়েকজন এসিক চাইতে সৈনিক
চাইতে মকে উঠিতে আগাইয়া গেল : ইহার মধ্যে
মহরচাঁদ হকের উপরে পড়িয়া গেল ।)

সেন গেল—লোকটা হয়েই গেল—বরো বরো—
জল জল—।

(হলধর ও আরও তিন-চারিজন হকের উপরে উঠিয়া
গেল কিন্তু গিয়া দেখে হকের উপরে কোন লোক
নাই। হলধর ও অন্যান্য কয়েকজনে অত্যন্ত ভীত
ও নিশ্চিতভাৱে পরস্পর পরস্পরের দিকে হু-
গা গিয়া চাউরি করিতে লাগিল ।)

ভট্টক। (নিঃ হইতে) কি হল—তোমরা দরলে ওরকম
করছ কেন?

হলধর। তাইতো—লোকটায় কি হল—কোথায়
গেল—!

মকম অপর। তাইতো বিলম্বটা কি হল—কিছুই তো
বুঝতে পারছি না!

ভট্টক। (নিঃ হইতে) তোমরা কি কল্যাণ করছ

আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না, বুঝিয়ে বল—
বুঝিয়ে বল—

মক হইতে একজন। লোকটা এখানে নেই!

নিঃ দরলে। ওঁই নেই—নেই! কি ব্যাপার কি
হলো—ও রাজা কি হল? আমরা যে কিছুই বুঝতে
পারছি না।

হলধর। (দলটা উত্ত হাসি হাসিয়া উঠিল) হো: হো:
হো: হো: হো: হো:—

মকম ভট্টক। ওকি রাজা, তুমি এমন করে হাসছ কেন—,
হাসছ কেন—

হলধর। হো: হো: হো: হো:—হো: হো: হো:—

নিঃ ভট্টক। আমাদের রাজার কি হল—রাজার
কি হল!

হলধর। আমি সব বুঝতে পেরেছি—হো: হো: হো:—
নাচ হইতে অনেক একসঙ্গে। কি বুঝে—সাম্রাজ্যের
বুঝিয়ে বল—সোমাই রাজা বুঝিয়ে বল—

হলধর। মহরচাঁদ নর হে—মহরচাঁদ নর—

অনেকে। তবে তবে?

হলধর। সেই বুড়ো পরতান—

অনেকে। কোন পরতান—কোন পরতান?

হলধর। ঐ যে বুড়োবুড়োয় যথেষ্ট পুসিদি নি? সেই
যে পেছনে লাগে পরতান—হান্ধের পেছনে লাগে—
নৈলের পেছনে লাগে—সব উত্তর দিতে চান—দেই
পরতান—! হো: হো: হো: -না যেতে না যেতে
মরে পাতালে সেই শ্রেয় দেখে যো—। আপন দেখে!
ভব নাই—আমাদের আর ভর নাই—হো: হো: হো:।

জার্মান বাণীক

নীটপে ছিলেন ডাঃ হার্মের মানসমজান এবং বিসম্মতের কনিষ্ঠ ভাই। ইংরেজ অভিব্যক্তিবাদী এবং জার্মান জাতীয়তাবাদীর কাছে কণী হলেও তিনি তাদের বাস

শক্তি উপাসক ক্রুজেরিক নীটপে

ইন্টিগর যোষাল

O

দরশা সমাধান করতে অসমর্থ, একমাত্র 'রক্ত এবং সৌর' অর্থায়ন হুত্ব এবং অস্ত্র জা করতে পারে। বন্দ ইয়োহোপ ১৯১৩তম এবং বিখ্যা আদর্শবাদের মূল ভূমিকা বিস্তারিত তখন করে

করতে হাতেনামি। উত্তমপণের বিরূপ করে নিজের প্রজাতন্ত্রে জন পরিচোষ করাই ছিল তাঁর স্বভাব। জীবন যদি হুত্ব হয় এবং হুত্ব জা হয়ে যেতে থাকেই যদি শ্রেষ্ঠতার লক্ষ্য হয়, তাহলে শক্তিই একমাত্র পন্থ এবং পূর্ণতা একমাত্র সোপ হতে পারি। বা টিকে থাকে এবং জা হয় তা ভালো এবং বা পরাজিত এবং অকৃতকার্য হয় তা মন্দ।

যা সাহসের সচিত্র বৃন্দান ধর্মতত্ত্ব প্রজাতন্ত্রে করেছিল। তারা তত্ত্ব-শাস্ত্রের দ্বারা অনুসারে সেই ধর্মের নীতি শিক্ষা বিবরণ সৌজন্য এবং পরামর্শপূর্ণতা বর্জন করতে সাহসী হন। বৃন্দান ধর্ম সম্প্রদায়-বিশেষের অন্তর্গত না হলেও তারা বৃন্দান ছিল। নীটপের সিদ্ধান্ত এই।

নীটপে বলেছিলেন, জীবন যদি হুত্ব হয়, তাহলে সেই হুত্ব জরাজীর্ণ করতে বলে সংজ্ঞাবাদের চেয়ে শক্তির, বিনয়ের চেয়ে গর্বের, পরামর্শপূর্ণতার চেয়ে হুতিক্রিয়তা আবশ্যিক, তাহলে সারা এবং পশ্চাত্তম প্রাকৃতিক নিবাসন ও উত্তর্ন বতবাদের মূল কঠোরতায় করে। তাহলে অভিব্যক্তির চরম লক্ষ্য সাব্যস্ত হানুৎ নয়। তার চরম লক্ষ্য অভিব্যবন। একদা অসমর্থ ও বিভেদ হুত্ব করবার একমাত্র উপায় দ্বারা নীতি নয়, শক্তি। শক্তির একনিষ্ঠ পুণ্যরী নীটপে স্বয়ং ঘোষণাছিলেন যে শক্তিই কনিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মানুস—গড়ে তুলতে পারে।

একদা নীটপের মতে পূর্বসূরিসিহে বিসম্মত ছিলেন আদর্শ মহাপুংসব। বিসম্মত ছিলেন জীবনের প্রত্যেক বস্তুনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা দ্বন্দ্বের সম্পূর্ণ অবস্থিত। তিনি জার্মান জাতির যোগ্য করেছিলেন যে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পরামর্শপূর্ণতার স্থান নেই। জনসামগ্রী বক্তা এবং পাকপনামা বা ভোট—আধুনিক হুসের

মাসের মধ্যেই পূর্বপ আশ্রয়কে তার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিলেন, অল্পকালের মধ্যেই নেপলিয়নিক বীরবলে বহু হুত্বের স্রোতের মোহ ভেঙে দিয়েছিলেন এবং অসংখ্য হুত্ব হুত্ব হাওয়া পতন্য বিচ্ছিন্ন জার্মানিকে একটি শক্তিশালী বৃহৎ সাম্রাজ্যে সকল শক্তি সাধনার জলন্ত হুত্ব। বংশগতির জার্মানীর নিপোদ্রয়ন, তার ক্রমবর্ধমান সামরিক শক্তি এবং জলপায়ের বাণীক ভিত্তি অনুসন্ধানের প্রয়োজন ছিল। বৃন্দানবর্ষ এই নীতি সমর্থন করে না। জার্মানীর বতবাদের এর সমর্থন আছে। একটু পুস্টাহন থাকলে শক্তিবাদের সমর্থনের বাণীকতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। নীটপে এই পুস্টাহনিকতা ছিল। তিনি শক্তিবাদের প্রকৃতি হতে উঠলেন।

নীটপের জন্ম পুণ্যোচিত বংশে। তাঁর বাতপিতৃকুল পূর্বসূরীকালে ধর্মবাহক। বৃন্দান ধর্মের এই বিদ্রোহী সন্তান ১৮৪৪ সালের ১৫ই অক্টোবর প্রুশিয়ার অন্তর্গত হকেন নামক স্থানে প্রথম সূর্যের আলো ধর্মান করেন। এই দিন প্রুশিয়ার রাজা ওয়র্গ ফেডেরিক উইলহেল্মের দ্বারা ভিবি ছিল। রাজপরিবারের পূর্বপনক নীটপের পিতা রাজভক্তি প্রকাশের চিহ্ন স্বরূপ আদর্শের সহিত রাজার নামানুসারে পুত্রের নামকরণ করেন। নীটপে তত্ত্বাবহা করে বলেছিলেন, এই দিন সারা রাজ্যের লোক আবার জন্মদিন পালন করে। এই বিষয়ে আমি ভাগ্যবান। শৈশবে পিতার হুত্বের পর পরিবারের ধর্মতীর্ন মূল্যোৎসাহের হাতে তাঁর শিক্ষার ভার পড়ে। তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ সূর্যবোহ ও ধার্মিক বালক হতে ওঠেন। পাকার যে সব হুত্ব হলে পাখীর হানা ও বাগানের ফল চুরি করতে, বিখ্যা কথা বলত তিনি তাদের পছন্দ করতেন না।

শিক্ষকরা তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'বাবা পুণ্ডোরিত'। তিনি নিরীক্ষণ দৃষ্টিতে ভ্যালোবাগডেন বলে একজন মহাপাঠী তাকে নব্বয়ের বৈশিষ্ট্য বুঝে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি বাইবেল পাঠে নিবিষ্ট থাকতেন। এমন ভাবাবস্থা হিঁসে বাইবেল পাঠ করে অপরকে চোখাভেন যে তারা চোখের জল সন্দেহ করতে পারতো না।

পারিবারিকের প্রভাৱে এবং শিক্ষাসূত্রে তিনি কৈশোরে দ্রুত বেরভীরা, নিরীহ ও কোমল ছিলেন, অত্যাচারে বঞ্চিত হলে তিনিই পিতামহদের আরাধ্য ঈশ্বরে বিশ্বাস লাগিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর হানে একটি নতুন স্বেভাত্ম প্রতীতিত হয়েছিলেন। এই নতুন স্বেভাত্ম নারী অভিব্যক্তি। সেই স্বেভাত্ম অবশেষে তাঁর জীবনের অংশিত্বকাল অতিবাহিত হয়েছিল।

কিন্তু ঈশ্বর-ভক্তি ছিল তাঁর জীবনের জীবন। ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল তাঁর বক্তব্যের অবিচ্ছেদ্যের সঙ্গে জড়িত। বংশের ঐতিহ্যগত বেরবিশ্বাস তাঁর জন্মের গভীরে পিন্ড পেড়ে বসেছিল। বঙ্গপ্রবাস করে তাকে উৎপাদিত করলেন। তাঁর কাছে এমন জীবন পূন্য এবং অকল্পিত হয়ে উঠল। তাঁর বঙ্গপ্রবাস জীবন তাঁর মূর্তি চল ভোগবিলাসের স্রোতের তানে। বন্য এবং লাইপ-জিমে কলেজের ল্যাবোরারীর সঙ্গে তিনি ব্যাপান এবং নারী সমাজে উন্নত হয়ে উঠলেন। কিন্তু অশপকাল পরে তাঁর মোহ কেটে গেল। তিনি আত্মশিক্ষা করে গেলেন।

১৮৬৬ সালে এতদিন স্নেহকরে সোপেন-জার্স World as will and idea নামে বিখ্যাত পুস্তকখানি তাঁর হাতে পড়ল। এই পুস্তক তাঁর চোখের লাবনে একটি নতুন জগতের দরজা উন্মুক্ত করেছিল এর প্রতি পৃষ্ঠায় যেন বর্ণনের মতো জীবন, পৃথিবী এবং তাঁর প্রকৃতি প্রতিকলিত হয়েছিল। এই গ্রন্থের ত্যাস বৈরাগ্য এবং আত্মদর্শনের শিক্ষা তিনি উপলব্ধি করলেন। সোপেন-জার্সের বর্ণনের ধর্মবোধ তাঁর চিন্তাধারার উপর যে বৈরাগ্য করেছিল তা কখনও বুঝে যায় নি।

জেন্সি কন্যার কলে তিনি টেনা স্ট্রেনিচে যোগ দিতে বাধ্য হন। অশপকাল থেকে পতনের কলে আঘাত পান। এ জন্য সৈনিকের কাছ ত্যাস করেন। বঙ্গসেবতার কাছে

বিশ্বাস নিয়ে তিনি বিলাতেবীর বন্ধিত্রে প্রবেশ করেন। পশ্চিম বঙ্গের বঙ্গের তিনি পি. এইচ. ডি, উপাধি নিয়ে বেঙ্গল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীনকাল ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। শিক্ষা মন্ত্রণের নিযুক্ত নিয়োগ কক্ষ থেকে তিনি বিদ্যামহোদয় বক্তৃতিবক্ত কাব্যবঙ্গীর প্রদর্শন করে আর প্রচলিত লাভ করতে থাকেন। বিবাহ শিক্ষকের বহু কাব্য তাঁর মনে অসংখ্য সৃষ্টি করেছিল। এর চেয়ে চিকিৎসকের কর্মব্যস্ত চকল জীবন তার বেশি অভিজ্ঞত ছিল। তিনি বলেছিলেন দলীতহীন জীবন একটা ভুল।

১৮৯৯ সালে দুর্বিখ্যাত দুর্বিখ্যাত বিদ্যাৎ ওয়াশবনারে আমন্ত্রণে তিনি তাঁর কাছে যান। তাঁর প্রভাবে বৃদ্ধ হয়ে ওয়াশবনারকে আধুনিক যুগের ইক্সলান বলে প্রচার করার উদ্দেশ্যে তিনি গ্রীক নাটক লন্ডনে পুস্তক রচনা করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানীর যুদ্ধ আরম্ভ হল। তিনি মাতৃভূমির ডাক অগ্রসর করতে পারলেন না। তখন এঁদের আত্মা তাঁর জ্বর অধিকার করেছিল। কাব্য নাটক লিখি ও লগ্নীতের প্রভাবে কবি হন ভরপুর। স্নেহের এই বিশেষের সময় তিনি বলেছিলেন, জাতি, রাষ্ট্রের জন্ম মৃত্যু আছে। জাতি, রাষ্ট্র অধিকাংশ মানুষের অকল্পিত মূল্য ও বংশের জোলের কারণ। তবু এই রাষ্ট্র হাতে হাতে যে আপন ফেলে দেয় তাতে তারা পুড়ে বেরে। তার আত্মানে তারা আত্মবিশ্বাস হয়ে বঙ্গভ্রমের বঙ্গভ্রমের কাল দিয়ে পড়ে। তখন তাদের জ্বর অশ্রু সাহস ও বীর্যে পূর্ণ হয়ে উঠে। যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যাঙার গায়ে ফ্রান্স-কোর্টে তিনি পুনর্লেন একজন অধ্যাপকের। সৈন্যের অবস্থার ককর্ষ হানি। স্নেহলেন দগরের ভিত্তর নিয়ে তাদের আত্মবিশ্বাস হারা। তিনি বলেছেন, এই মৃত্যু আবার মনে যে তাদের সৃষ্টি করেছিল, যে অশ্রুভক্তি জাগিয়ে তুলেছিল তারই ভিতর থেকে উঠে হয়েছিল আবার দার্শনিক বক্তব্যের বীর। এই মৃত্যু তাঁর মানসভূমির দার উন্মোচন করে দিল। এই ছিল তাঁর জীবনচিন্তার মূল, তাঁর দার্শনিক ভিত্তি। তিনি বলেছেন, এই গ্রন্থে তাঁর উপলব্ধি বঙ্গল যে জড়িত যুদ্ধে বিন্দুত পাদপত্র করে কোন মনে যেতে পাকা জীবনের বহন এবং স্রোতের স্রোতের কাছ।

মতো বাটের ঘরে চাই প্রাপণ হুই, চাই শক্তি অর্জন
চাই স্বাধীন শক্তির পূর্ণ অবিকার ও বিকাশ।

হুই শক্তির অগতির জন্য তিনি লৈলিতের কাছে
অনুগ্রহক বিবেচিত হলেন। হুইকেলের অমানুষিক
বর্ধকতার দ্বারা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁর
স্বভাবাত্মীয় হ্রস্ব হুইয়ের মহিমাকীর্তনে উজ্জলিত হয়ে
উঠেছিল। হুই'র সেই ও ভয় স্বাক্ষা নিয়ে তিনি পূর্বে
প্রভাববর্তন করলেন।

১৮৭২ খৃস্টাব্দে 'বিরোগার নাটকের' রচনা এবং
সম্পাদকের আত্মা' নামে তাঁর একমাত্র সম্পূর্ণ পুস্তকখানি
প্রকাশিত হল। ভাব্যভাববৈষম্যের লেখা হলেও পুস্তকখানির
ভাব সীতবংশী প্রদানসুখবিশিষ্ট। তিনি বলেছেন,
গ্রীক পিলস হুইট ফেভার পড়া করেছে। প্রথম
ডাইনোমিসিয়াস বা ব্যাকাস্। ইনি ধর্ম ও আনন্দের
মৃত্যুসীত ও নাটকের ফেভা। ইনি অসমসাহসিকতার
কাহ্নে' আত্মহারা। দুঃখভোগে অটল। ভাবে ও
পাবেশে ভয়গ্রহ। বিতীয় অ্যাপোলো। ইনি
ছিলেন শান্তি, সৌন্দর্য ও নভীর বাস্তবস্বভাব
দৃষ্টান্ত ও পার্শ্বমিত সন্ত-ইয়েরে'র, ভাবব'
চিহ্নাঙ্গন এবং মহাকাব্যের ফেভা। গ্রীক পিলসের
পত্রাকার্তা, ভয় পরিণতি আদর্শে'র গ্রীক সাগনে,
ডাইনোমিসিয়ারে অন্যত পুত্ৰশোভিত শক্তির সঙ্গে
অ্যাপোলোর প্রকাশিত সৌন্দর্যের মিলনে। নাটকে
ডাইনোমিসিয়াস বিরুদ্ধে কোরন্স। অ্যাপোলো
জুগিয়েছেন সলাস। ডাইনোমিসিয়ারে অবশুত্ব অব'
জ্ঞানাকৃতি বদলেভার সোমাকে সন্তুষ্ট উপাসকের
শোভাযাত্রা থেকে উদ্ধৃত হয়েছিল কোরন্স। আর ভাব-
দ্বন্দ্ব শক্তিভক্তার স্বনামগী উপাঙ্গ হিসেবে পরে বহুত্ব
হয়েছিল সলাস। পিলসের মাধ্যমে দুঃখবায়ের বিরুদ্ধে
গ্রীক নাটকের অক্লান্ত প্রকৃতি। গ্রীকরা জানত, জীবন
অস্বাভাব্য ও দুঃস্বর। তাদের কাছে জীবন দুঃস্বর ও
আনন্দবর্ধ হলে না। হিডাস্ সিলেনুস (Silenus)-কে
জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মানুষের সের্ত অবস্থা কি ?
বিলম্ব উত্তর দিয়েছিলেন, মানুষের জীবন অশুক।
তার অনিবার্জ দুঃখিনী এবং দুঃখ। তার কথা না শোনাই
জানো। দুঃখবানো-প্রকৃতিভব। কিন্তু তা বনন সন্ত

নয়, ভবন' অঙ্গ বরেন হুইয়াই কাব্য। গ্রীকরা জীবন
দুঃখকে মোক্ষমোহতারি বা হিঁসুনের মত গ্রহণ করত।
তারা ভাব্যভো জীবন দুঃস্বর (এবং তারা বিবেচ্যত
নাটকের মাধ্যমে জীবনের দুঃখান্বন করেছিল। তাদের
বিরোগার নাটকের শোভনীয় পরিণতি অদ্বার্য নিরুপেক্ষ
হ্রস্ব পরিণতি করে তাদের ঘনে আনন্দ দান করেছিল।
এ জন্য গ্রীক ট্রাজিডি শাস্ত্রিক পিলসদৃষ্টি। এ জন্য গ্রীক-
সক্রেটিস ইতিহাসের দুঃখ গ্রীসের সৌন্দর্যের দুঃখ।

সক্রেটিসের পর বিচার শক্তি ও তত্ত্বজ্ঞানাদি গ্রীক
সক্রেটিস দুঃখের পার্শ্বমিত কাহ্নার দ্বারা রচনা করেছিল।
পিলসের স্থানে বিজ্ঞান, সহজাত আবেগের স্থানে-বিচার-
শক্তি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলদ্বার কৌশলের স্থানে তর্কের
কলহে লেখা দিয়েছিল। সক্রেটিসের প্রভাবে ব্যাঘাঘবীর
মেটো হয়ে উঠলেন সৌন্দর্য'ভক্ত, নাট্যকার মেটো হয়ে
উঠলেন ভাষিক, ভা'বেবের পত্র, করির বিব'লন মত
বিষাভা, জ্ঞানের পুন্সার। জেপিক অ্যাপোলোর মন্দিরে
লেখা হল, আনন্দকে জান। কোন ক্রমে বাস্তবায়িত
করে যা। বিচার শক্তি একমাত্র গুণ, এই ভাষ মত
সক্রেটিস্ এবং তাঁর পিণ্ড প্রচার করলেন। মেটোর পিলস
আইস্টটল মধ্য পহার দুঃখ মীতি ব্যাঘা করলেন।
শৈশবকালে জাতি দৃষ্টি করে পূরণ কথা, কাগদনিক
কাহ্নী ও কাব্য। বাহ'ভো রচনা করে হুই'র ও ব্যাঘ।
হুই'রই গ্রীক হোমর এবং ইতিহাসের ভব দিয়েছিল,
বাহ'ভো জন্ দিয়েছিল ইউরিপিডিসের মতো ইচ্ছারিক
নাট্যকারে'র। জেপিক অ্যাপোলো মন্দির থেকে যোগদা
করা হল যে সক্রেটিস গ্রীসের দর্শনশোকা সের্ত জানী।
তাঁর পর বিতীয় জানী ইউরিপিডিস্। এইভাবে গ্রীসের
বীহুদের অবদান হয়েছিল। ডাইনোমিসিয়ারে পিলস-
কলার হুই'র বটেছিল।

গ্রীসে ডাইনোমিসিয়ারে দুঃখ লেন হলও জীবন'মীতে
তাঁর পূনঃপ্রবর্তন ঘটতে পারে। শূন্য ভক্ত' এবং
কাগদনিক আকর্ষণের উদ্দেশ্যে কলেন কাগট। সোলেম-
দ্বন্দ্ব পিতার সহজাত আবেগের প্রবৃত্ততা এবং চিত্তার
শোভনীয়তা দৃষ্টি হল। বিতীয় ইতিহাসের মতো
ওগামার আনন্দ, সম্পীত এবং নাটকের মিলন ঘটালেন।

যে প্রকৃত শক্তিবলে এবং লেন ভাবে দুঃখের হুই'র

বিষয়ে—গড়া নিজেই জীবনে নতুন ভাবের সূত্র। বইয়ে চিত্রিতসেন, অত্যাশ্চর্য্য অন্ত্যায়সমী মানুসের অসামান্য প্রাণে শাক্য জাগরণে জন্মেছিলেন, তেমন ভাবে জামান জাতির শিশু ও জীবনে, সঙ্গীতে ও গৃহে নতুন বল সঞ্চার করতে হবে। যুদ্ধের পূর্বে-কর্ত্তের অধিকৃত থেকে বীর যুদ্ধের অন্ত্যায়ন ঘটবে। স্বরস্বতের লায়লাহ থেকে অমানুষিক গীতিক-লগ্নের বীরের অন্ত্যায়ন হবে। নব-সঙ্গীতের যুদ্ধের বিয়োগান্ত নাটকের পুনঃস্থ হবে।

পর্বতপীঠে কয়েকটি প্রবন্ধে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর ভাবিতভাবে আক্রমণ চালিয়েছিলেন। তিনি এসেছিলেন, উগ্র-ভাষীভাবাপী ভাবশক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের গাণনিকের বিরোধ প্রকৃত ম্যাবীন নেতা গাণনিকের মানস গঠনের অন্তরায়। এখানে মেটো এবং সোপেনহাইজের মতো গাণনিকের স্থান হয় না। অতিব্যক্তিবাদের শিক্ষা অনুসারে নীতিশাস্ত্র এবং ধর্মশাস্ত্রকে পুনর্গঠন করতে হবে। সাধা গাণনিক অংশের উন্নতিসাধন জীবনের কার্য নয়। কারণ ব্যক্তিগত ভাবে সাধারণ মানব অপদার্থ। জীবনের উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত দৃষ্টি, উচ্চতর ব্যক্তিত্বের ক্ষুদ্র ও উৎকর্ষসাধন।

তখন বয়স ১৮৭২ সালে নীতিগত সত্য ও মন সম্পর্কে ভেঙে পড়ে। আসন্ন যুদ্ধের সম্মুখীন হয়ে তিনি পৃথকভাবে তাঁর ভয়কে বলেছিলেন, আমাকে কথা নাও যে আমার যুদ্ধের পর আমার বহুদ্রা ছাড়া যেন কতগুলো কোঁচুলী সাধারণ মানব আমার পর্বতপীঠের পাশে না থাকে। যখন আমি আত্মরক্ষার অক্ষম, তখন যেন কোন পুরোহিত বা অন্য কোন ব্যক্তি আমার স্মৃতিস্থানে কতগুলো বিখ্যাত কথা না বলে। অধুনা মনুষ্যে আমি কবিরে যেনে যেতে চাই। তিনি আরোহণ হয়ে উঠলেন। তাঁর ঐগোষ্ঠিত অত্যাশ্চর্য্যকিরা স্থগিত রাখা হল। যুদ্ধের ভিতর ভালো, অশুভের ভিতর শূন্য। অবলম্বের ভিতর মঙ্গল দেখা দেয়। আরোহণলাভের পর তাঁর কবির গতি কিয়ে গেল। একটি নতুন জীবন ধর্ম আয়-প্রকাশ করল। স্মারকের প্রতি আকর্ষণ, আলো, জীবন চারিদিকে সঞ্চারিত এবং নতুন উপভোগের বাসনা তাঁর হয়ে উঠল। যুদ্ধের অবসার কালিবা বৈরাগ্য মূলে গেল। জীবন রক্ষণের যুদ্ধে জয়ী হয়ে মন ও মস্তিষ্ক জিত

যুদ্ধজয়ের বায়ু এবং সৌন্দর্য্য ভোগের তৃপ্তা প্রবল হয়ে উঠল। প্রতিভুল অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার উপযোগী পুরুষ গড়ে উঠল।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত অবসর সুবিধার সাহায্যে তিনি এক বৎসর শাহিতে বাস করতে লাগলেন। এমন কি এই উগ্রাধিক গাণনিক হঠাৎ স্রেমে আকৃষ্ট হলেন কিছু প্রশংসনীয় জয় কর করতে ব্যর্থ হয়ে সংশ্লিষ্ট নীতিবাক্য রচনা করে নারী জাতির বিরুদ্ধে বিবোধপার করতে লাগলেন।

যশোদালায় অস্থির হয়ে তিনি নিজের বাসে বিতর্ক হয়ে উঠলেন। তিনি বলেছিলেন, মানুসের মধ্যে বাস করা হয়নি, কারণ তৃষ্ণাভাব অবলম্বন করে বাস করিনি। তিনি অশ্লীল পর্বতের উপর আত্ম নিবেশ। সুর্বে, শিশুরের বিরাগ্য স্থান তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনার প্রেক্ষা দিয়েছিল। অশ্লীল ভাবে তাঁর জয় কামার কামার হয়ে উঠল। তিনি একজন নতুন পুরুষ সন্ধান শেলেন—এই নাম জোয়াইয়ার। একটি নতুন দেবতা আবিষ্কার করলেন—এই নাম অতিমানব। একটি নতুন ধর্মের সাক্ষ্য শেলেন—এই নাম অন্ত পুনরাবর্তন। 'গীতি সূত্র রসে' তাঁর জয় পূর্ণ হয়ে উঠল। নবতাবের অনুপ্রেরণার গাণনিক ভক্ত কব্যাদুর্গামহমিত্ত হয়ে উঠল। তার Thus Spake Zarathustra নামক গ্রন্থনি উনবিংশ পতাবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। এই বিখ্যাত অসামান্য গ্রন্থের প্রথম অংশ অত্যন্ত বিলম্বে প্রকাশ হয়। সাত জনক এর বলে প্রকাশক এর দ্বিতীয় অংশ প্রকাশে রাজী হইনি অসত্য্য গ্রন্থকার প্রাণের ব্যর্থতার নিষেধ বহন করেছিলেন। রাজ চঞ্জিগ বানি বই বিক্রম হয়। সাত বানি বিনামূল্যে বিতরণ করা হল। রাজ একজন পুরুষের প্রাণি সন্ধান দিয়েছিল। কোন লোক বই বানির প্রকাশ্য করে নি। স্বতঃশাসিত মানস সন্ধানের হত্যার গ্রন্থকারের মনে বিশৃঙ্খল বেদনা সঞ্চার করিয়েছিল।

বিশে বর্ষীয় যুদ্ধে জায়াশুদ্ধির গান ভুল হল। তিনি পর্বতের উপর থেকে নেমে এলেন। ইরানের পবিত্র মোহাম্মদীয়ের মতো সমবেত জনতার ভিতর ধর্মপ্রচার করতে লাগলেন। জনতা তাঁর কথার কান দিল না। তারা হুটে গেল পাশে বড়ির কোলা কোলায়। ব্যক্তিগত

পক্ষ থেকে নিতে পড়ে যাবে গেল। সেবে ভাবাচ্ছিল। জীতে গিয়ে তার মৃতদেহ কাঁপে উপর জুলে নিয়ে চলতে চলতে বললেন, বিশপকে তুমি জীবনের পেয়া করে দিয়েছিলে। আমি স্বহস্তে তোমার পোষ দি। তিনি প্রচার করলেন, বিশপের মধ্যে জীবনধারণ কর। ভিন্দুবিসের পাশে নগর পতন কর। অমান্য সম্রাটের উপর পাণ্ডি দাও। বৃদ্ধের ভিতর বাস কর। অবিশ্বাস করতে ভুলো না।

একজন বৃদ্ধ সাধুর সঙ্গে জায়াবৃদ্ধীর দেখা হল। সাধু তাকে ঈশ্বরের কথা বললেন। তাঁর কথা শুনে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বিশ্বাসে তিনি নিজের মনে বললেন, ঈশ্বরের মৃত্যু হয়েছে, এই কথা কি বৃদ্ধ সাধু অসত্যে পোষে নি। এও কি সম্ভব?

প্রকৃত পক্ষে অনেক আগে কেবলমাত্র ঈশ্বর নয়, সকল দেবতার মৃত্যু হয়েছে। যে দিন ঈশ্বর বলেছিলেন, এক ঈশ্বর ছাড়া বিস্তার ঈশ্বর নেই, আমি ছাড়া আর কোন দেবতার পূজা করিবে না, সেই দিন তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। সে মৃত্যু আনন্দের মঙ্গলের। বৃদ্ধ ঈশ্বর-পরায়ণ ঈশ্বরের আত্মবিশ্বাসে হয়েছিল। যারা পরলোকে আবার কথা শোনার ভয়ের কথার বিশ্বাস করিবে না। কেমনে যোক, না কেমনে যোক তারা বিশ্বাসযোগ্য করে। এক সময়ে যারা ঈশ্বর-বিদ্বেষী থাকে, তারা পরে আবার বন্ধুর হলাহল পান করে জীবনের দুঃখ ভুলে যেতে চায়।

জায়াবৃদ্ধী বলেছেন, যিনি ভালো এবং মন্দ সৃষ্টি করলেন তাকে প্রথমে নৈতিক মূলকে চরমায় করে ফেলতে হবে। চরম অবদল চরম মঙ্গলের অংশ। অবিশ্বাসীদের মধ্যে তিনি নিজেকে বর্ণাশ্রেণীকৃত বলছেন। সে লজ্জা সৃষ্টিবর্ধী। মানব লজ্জা নয়, লজ্জা বাঙার দেহ। এই তার মতঃ। যারা বাঁচতে জানাও চেয়ে মরতে জানে আমি তাদের ভালোবাসি। যার বৃদ্ধা করে, আমি তাদের ভালোবাসি। কারণ তারাই প্রজাতি। একদিন পৃথিবী অতি মানবের অধিকারে আসবে বলে তারা পৃথিবীর কাছে আত্মদান দেয় আমি তাদের ভালোবাসি। লজ্জা কিং করায় এবং উচ্চতম আশ্রয় বীজ বংশ করায় উপলব্ধি নয় উপলব্ধি হয়েছে।

প্রতিবেশীকে, ভালোবাসার চেয়ে বৃদ্ধের মানব-ভালোবাসা মনঃস্থ।

জায়াবৃদ্ধী পরা কথ্য ঐ নীতির বৃদ্ধাধিনি সৃষ্টি। তাঁর জীবন-বৈ। তাঁর পরবর্তী পুস্তকসৃষ্টি তাঁর মতবাদের ভাব্য স্বরূপ। তাঁর মতে বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধ প্রকারে—প্রত্নবীতি এবং বৃদ্ধ বীতি। প্রাণিক্য বৃদ্ধের মানব, বিশেষতঃ রোমানরা যে বীতি অনুসারী জীবন এবং চরিত্র গঠন করেছিল তার নাম প্রত্নবীতি এই বীতির বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধাধিনি বৈশিষ্ট্য এবং বীর্য অধিষ্ঠার, বিশেষতঃ ইহুদীদের রাজনৈতিক পরাধীনতা বৃদ্ধের বৃদ্ধ বীতির নাম বৃদ্ধ বীতি। বি পরাধীনতার সত্য। মানবতা অসহায় অসহায় মান। বীতির কবলে বিশপ ও শৌখের প্রতি ভালোবাসা স্থানে দেখা দেয় নিরাপত্তা ও পাণ্ডি ভোগের তাঁ আকাঙ্ক্ষা শৌখের স্থানে চরুতা, কঠোরতার স্থানে প্রবর্তনার স্থানে অনুকরণপ্রিয়তা, শ্রমের স্থানে বিবেক বোধ। মন্যমানবের প্রাকৃতিক সৃষ্টি। আভিভাষ্য যে রোমান চরিত্রের আর বিবেকজ্ঞান ইহুদী চরিত্রে বৈশিষ্ট্য। বৃদ্ধ প্রকৃত বৃদ্ধাধিনি গণতান্ত্রিক ভাবসৃষ্টি। আমোস (Amos) থেকে বিন্দু বৃদ্ধ পদ বৃদ্ধ মানব পৃথিবী এবং ইশ্রীমদাদ্যাকে পরবর্তন করছেন, বাইবেলকে নৈতিক উৎসবের প্রা বলে গণ্য করেছেন।

নৈতিকতার উচ্চতম মূল্যায়ন আত্মতা বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধে। তাঁর কোলে সকল মানবের সমান সকল মানবের সমান অধিকার। তাঁর শিক্ষা থেকে জন্মেছে পদত উপযোগ এবং সমাজতন্ত্র। পরা এবং ভ্যাপের বী কীর্তন অধিকারের শেষ স্তর। পক্ষের সমান সৃষ্টি বৈ পরা বৃদ্ধাধিনি উৎসাহক একটা মানসিক বাসন। রোপা দেখতে যাওয়ার ভিতর দিয়ে তার অসহায় অক আমায়ের শ্রেষ্ঠতা জানের আশ্রয় হয়ে।

এই বর্ণের নৈতিকতার শিল্পে ক্ষমতা লাগে সোপান ইচ্ছার ইঙ্গিত আছে। পরিত্যক্ত অধিকার ক ইচ্ছা প্রেম। পূর্ণাঙ্গ সমগ্র। বিবাহ প্রত্ন বিনয় পক্ষ-অধিকারের আবেগ। এই বৃদ্ধাধিনি ইচ্ছাভেদে বিচার এবং শীতি ভুলে যায়।

পত্নীমান পুত্রের ইচ্ছার ওপর ব্যক্তিগত প্রলেশ দিতে চেষ্টা করেন না। তিনি শোভাসম্পন্ন হলেন, কঠোর, আদি তরুণ। 'পতিত চন্দ্র' চোরা বিচার তার বহু-নিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর বিচার ছাড়াই না। তার আস্থা সহজ ব্যক্তিগত ওপর। জগৎ ব্যক্তির ভীতভাৱ লোককে ভীতিল করে তোলে। পত্নীমানের নিজস্ব কঠোর, জ্ঞান ও শাসন করবার সহজ প্রকল্পের নিদর্শন পথ হ'ল হলেন, সত্যের বৈরাগ্য এবং বিরুদ্ধের উত্তর হ'ল। সহজ প্রেরণার পথ নাম হলেন তার পতি চালিত হয় অস্তরের দিকে।

দীর্ঘদিনের মধ্যে হয় বিবাহিততা সেই, পত্নীমানেই আছে। লক্ষ্য মানুষকে উন্নত করার চেষ্টায় চলে পত্নীমান পুত্রদের উন্নয়ন আশায়ের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তার লক্ষ্য মানবজাতি নয়, অভিজ্ঞান। দৃষ্টিগত লক্ষ্য মানব জন্মজন্মের উন্নতির জন্য পাকি অধ্যয়ন করেন না। কারণ মানব জাতির উন্নতি হয় না। মানবজাতি কম্পনা যায়। পান্য পান্য ব্যক্তি মানবের বিরাট বর্ষাকতম্পন মানবজাতি খানে অভ্যস্ত হয়। প্রাকৃতিক বিবর্তন অভিজ্ঞান দৃষ্টি করে না। মানবিক নিদর্শন, দৃষ্টান্তমতে অভ্যস্তি এবং বহু শিক্ষা অভিজ্ঞানকে বাঁচিয়ে রাখে। প্রেমের পথ হয়ে উন্নত মানবের পক্ষে অপ্রিয়্যাকাকে বিবাহ করা এবং প্রতিজ্ঞাবান ব্যক্তির পক্ষে চলে বহুজিকে জ্ঞান ধান করা অসম্ভব। প্রেমের সঙ্গে দৃষ্টান্তের সম্পর্ক নেই। প্রেমের পথ ব্যক্তি বিবাহিত ক্রিয়ে অক্ষ। প্রবৃত্তিমতে চালিত ব্যক্তিকে বিবাহ করতে চেষ্টা উচিত নয়। যে ঘটনা সমগ্র জীবনের উপর এক গভীর প্রভাব বিচার করে তা প্রেম-কোষ নয়। মোহন, প্রেমিক প্রেমিকানের মধ্যে জ্ঞান বিন্দুয়ের পথ আইনের দ্বারা অধীন করা উচিত। প্রেমের পুত্রের প্রেমের পুত্রের পুত্রের বিবাহ করতে সক্ষম হতে। প্রেম উন্নতের জন্য। বিবাহের উদ্দেশ্যে দান্য চাইতারা' করা নয়। কেবলমাত্র পুত্রের উপস্থান বা বংশবৃদ্ধি বিবাহের লক্ষ্য নয়। বিবাহ পবিত্র বস্তু। এই লক্ষ্য জন্মের পথ প্রাপ্ত করা। উপস্থিত সত্যের জ্ঞান দিয়ে নিজেকে উন্নত করে উন্নত বিবাহের বহু উদ্দেশ্য।

সংজ্ঞা হওয়া সহজ, অসম্ভব। প্রতিজ্ঞা আভি-জ্ঞাত্যে উন্নত করতে পারে না। প্রত্যেক দৃষ্টান্ত চাই।

তা হওয়া চাই কর্তার শিক্ষা বাবদ। যে শিক্ষা বাবদ আশায় জোড়ের চলে দীর্ঘ প্রবণ করতে। দীর্ঘের দৃশ্য জোড় করতে আশে পান ও আশা করতে শিক্ষা দেয়, যাতে মানবের জৈবিক ও বৈজ্ঞিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি হয় না, যাতে অভিজ্ঞতার ও শাসনিতা থাকে না—যে মানব মানবকে প্রাণ বলে হারিয়ে শেখায়, —এক কথায় যৌনিক-বাবদার ফের হন দৃষ্টি এবং প্রবৃত্তি দৃষ্টিতে সত্য ও দৃষ্ট থাকে, সেই শিক্ষাই অভিজ্ঞানব গঠনের উপযোগী।

অভিজ্ঞানব বিশদ এবং দৃষ্ট জ্ঞানোপস্থান। দৃষ্ট এই জ্ঞানো। বিশদ ও ভালো। গাধারণ মানবের দৃষ্টান্ত হতো দৃষ্টান্ত আদর্শ। দৃষ্ট ব্যক্তির দৃষ্ট সহজতম জ্ঞানিয়ে দেয়। বিশদজ্ঞানব ভিতরই দৃষ্টির আবির্ভাব। কদমী বিশদের আলোকনের ভিতর বেশোদিতের অভ্যাস। বর্ষাকোষের বিশদজ্ঞানব ভিতর বহু পত্নীমানী মানবের জ্ঞান।

কর পাকি দৃষ্টিগত এবং গণ' অভিজ্ঞানব দৃষ্টি করে। কিন্তু এই দৃষ্টান্তের দৃষ্টান্ত হওয়া চাই। অভিজ্ঞানব গঠন আশায়ের চেষ্টার লক্ষ্য এবং পতিপ্রবের পুত্রকার। তার দৃষ্টান্তে মানব জীবনকে ভালোভাবে এবং উন্নতর জীবন দাতার প্রেরণা পায়। আশায়ের বক্তা হতে হবে। বইলে বক্তাকে দান্য করতে হবে অথবা তার জ্ঞান হতে হবে। ইয়োয়েনের লক্ষ লক্ষ মানব যোগ্যপাঠের উদ্দেশ্যসিদ্ধি করা তার দৃশ্য দিয়ে দান্যদ্বয় বক্তা বরণ করেছিল। এই দৃশ্য কি দৃষ্ট। এরপর কথা ভেবে জ্ঞানদৃষ্টা আশয় পান।

অভিজ্ঞানবের আবির্ভাব অভিজ্ঞানব বসে। পত্নীমান দান্যক পান্য পান্যদায়। অবিলম্বে পত্নীমানের উদ্দেশ্য হওয়া হয়কার। এর প্রবণ উপায় দৃষ্টান্ত বর্ষের উপস্থান। বিশদদৃষ্টের দান্যক পত্নীমানের প্রাপ্ত। দৃষ্টান্ত বর্ষের ইয়োয়েন বিজ্ঞানের সঙ্গে অভিজ্ঞানব সম্ভারের তিষ্ঠোভাব দৃষ্টেছিল। তিষ্ঠিনিক জ্ঞানব বীর যোদ্ধার দীর্ঘতর দান্যই ছিল না। দান্যবিক বক্তা ছিল না। বক্তা অধিদ্রব্যোগ দৃষ্টান্ত অজ্ঞাতার তার থিয়েকে দান্যই না। তার বিজ্ঞানী উন্নতর বক্তা লোকের থেকে কিয়ে আসতো। পত্নীমান' কালের জ্ঞানী। জ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান ইয়োয়েন এবং জ্ঞানমান পান্য সম্ভারের উন্নতদৃষ্ট।

ক্যাথলিক ধর্ম নারীমূলভ শূন্যের প্রশংসা, ধর্ম-
 স্খোলের আদর্শ এবং বিকৃষ্ট জাতির দলে রক্ষিত্রপ
 ধর্মবিশিষ্ট টিটিনিক জাতির স্বভাবের অবদার বর্ণিতেরিল।
 প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম মহা ও ওয়াসনারের নীতিবাসী।
 জার্মানদের ভীত দৃষ্টিকে ভেতাই করে দিয়েছে। আধুনিক
 যুগের জার্মানরা সংস্কৃতির পরম পক্ষ। জার্মান
 রাতে বৈশাখিগমনের পুরাত্ন। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্বের
 কল প্রদান করেছিল। অবশেষে ১৯ বছরের মধ্যেও তাদের
 চরিত্রে করানী বা ইংরেজের চেয়ে বেশি পদার্থোচিত
 গুল আছে। করানী বিশ্বের আঙ্গুলে অস্তিত্বভার
 পক্ষে হাই হয়ে গেল। দলে দলে সংস্কৃতি বিলুপ্ত
 হয়ে গেল।

গণিতের শাসন সংস্থা শক্তিশালী। এখানে
পাল্লীমেণ্টারী শাসন ব্যবস্থার মানসিক সৌন্দর্য্য বেই।
বহুকাল থেকে যে মানসিক শক্তি এখানে সঞ্চিত হয়ে
আসছে তা একদিন বহনশক্তি প্রবল স্রোতধারায় মতো
সমগ্র ইরোগোগেপের উপরে প্রভুত্ব স্থাপন করতে পারে।
ইতালির উদ্যানে মনুষ্যত্বটি সর্বলোকা শক্তিশালী।
ইতালির অতি দারাবা যাকিন ভিতর যে পুরুষোচিত
আচরণ এবং আভিহাস্যেতা সর্ব পরিশুদ্ধ তা আর কোন
জাতির দেখা পাব না।

ইংরেজরাই দর্শনশাস্ত্র বিকৃষ্ট করিত। তারা ই
পদতত্ত্বের মর্শচিকার ভ্রান্তি আদর্শান করে কদাচিৎ
মন বিকৃত করে দিতেছে। হোকাবদার, বংটান পর-
বাস্তব নারী ইংরেজ এবং পদতত্ত্বী এক পদার্থতত্ত্ব।
যেহে হোকাবদার আর মাহিময়ার সংখ্যাবিদ্যা, যেখানে
ঐতিহাসিকতার পলাকাকাটি চলে, সেখানেই উপযোগবাদ
এবং জীবনবৃত্তে উপত্যক দাঁড়ির প্রকাশ হয়, সেখানেই
অভিজাত দস্তাবেজে সর্বাধি রচিত হয়। এবং সে যেহেই
প্রাচীন কালের গ্রীকদের অনুকরণে পদতত্ত্ব আবিষ্কৃত
এবং প্রচারিত হয়। আধুনিক ভগ্নত্রে পদতত্ত্ব ইংলণ্ডের
দান। বস্তুপী ইয়োপো ইংল্যান্ডের পদতত্ত্বের মাত
যেহে বিচার পাও তত্ত্ব ভাসো।

কাজ বা কণ্য রাষ্ট্রিক ব্যবহার দ্বারা উন্নীতকরণ বা
গণতন্ত্র। গণতন্ত্রে অংশগ্রহণের বৃদ্ধি অবশ্যইই কাজ
করে। বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক নির্ভরতা থাকে না।

নিষ্কট ব্যক্তি পড়া পাবে। উৎকৃষ্ট ব্যক্তি ব্যাধি পাবে
হয়। কুৎসিত দেহের নেকড়ে বাঘকে ব্যাধি করে। ভোগী
সাধারণ লোক স্বাভাবিক হস্তের কাউন্টার বন্ধন-মুদ্র
স্বাধীনচেতা ব্যক্তিকে ব্যাধি করে। ভিত্তি নির্বাচনে
অনিশ্চয়তা এবং অদৃশ্যের লক্ষ্য করতে পারেন না
এইগুলি ক্ষেত্রে অভ্যাসের হস্তের পক্ষে অনুকূল নয়
যে জ্যোতির গুণী ও স্ট্রেট মানবসঙ্গী অবজ্ঞাত, অস্বাভাবিক
অব্যবহৃত এবং অপর্যাপ্ত থাকে, সে জ্যোতি কখনো যথেষ্ট
হতে পারে না। দেখানো স্ট্রেট ব্যক্তি আদর্শ জ্ঞান
সংখ্যাসমূহ, সৌকর্য হস্তের হস্তো লোক আদর্শ হা
কায়। যে জ্যোতির মধ্যে দুর্ভিক্ষ-বিভক্তি লম্বা দূর তা
দুর্ভিক্ষ অব্যবহৃত। মানবের মধ্যে প্রভেদ থাকে না
সব মানবই লম্বা। মানব হস্তের হস্তো বৈচিত্র্য
প্রভেদসমূহ, এক ধরনের। এমন কি শ্রী পুরুষের প্রভেদ
থাকে না। পদতাত্ত্বিক সমাজে পুরুষ হল নারী, না
হয় পুরুষ।

জিমোকেসী এবং যুটান দেশের আনবার'র সমানাবিকারবাদ। পুত্রদের পুত্রবধূর কন্য হলে না পুত্র হতে চেষ্টা করে। "আদম'র হ্যাঁ কুমারী" ইত্যে বহুসংখ্য নারীর মৃত্যু কণ্ঠ। এই নারী গণিক এসে হাটিয়ে ফেলেছে। নারীর আঁচ সে পুত্র' পরগৌরব নে পুত্রবধূ ও নারীর যথোপযথ্য অসম্ভব। তাদের জিৎ অন্ত কালের। কন্য হ্যাঁ পাতি হয় না। ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কাছে পরাধীন স্বীকার না করলে না দামন হয় না। একজনের প্রত্ন স্বীকারের পর পা আসে। নারীর সমান অধিকার স্বীকার বিপজ্জনক কারণ তাতে সে সঙ্কট হয় না। পুত্র যদি দাতব্য পুত্রবধূ হয় তাহলে নারী প্রকৃত ভিত্তে তার অধীন স্বীকার করে। নারীকে চরম সার্বভূমতা এবং পুত্র' বাতুড়ে। একজন প্রবল গণে' হারণ করা হ্যাঁ না সব কিছু দুর্বল'র। পুত্রবধূ নারীর একটা উপায় যা তার একমাত্র লক্ষ্য দখল। নারী পুত্রবধূের বিশেষ জীভার বদ্ধ। পুত্রবধূ বড় শিকার করবে' এবং ম' বোঝা প্রদান করবে। এ হ্যাঁ আঁচ যা কিছু নিবৃত্তি আদম' নারী আদম' পুত্রবধূের উপরে। আদম' দুর্বল'র বসেই দুর্বল'।

যখন পুরুষ রমণীর প্রশংসাধীন হয়, তখন সে তাকে গার সর্বস্ব দিতে চায়। বিবাহের পর স্বামীর রক্ষা হলে গার ভিতর আসে পরিস্রবের প্রতি শ্রদ্ধাভাবকে মনে রাখা। যখন পুরুষ স্বীকৃতির সামগ্রিক মূল্য সন্দেহ করে, তখন তার পক্ষে পরিবার পালন, অর্থ পাঠান, শ্রমপূর্ণের নিয়ন্ত্রণ এবং সামাজিক পরিস্রবের ক্ষতি সম্ভব হয় না।

পুরুষনারীর সমানিতকারবার থেকে সমাজতন্ত্রবাদ হতে নিয়ন্ত্রণবাদের উৎপত্তি। ডিমোক্রসী এসের সকলের দিক। সাম্য সম্ভব নয়। আনন্ড সকলে একত্র ভোগ হতে চাই না। সমাজতন্ত্র ঠিক প্রকৃতির বিরুদ্ধে। মূল ব্যক্তি জাতি বা প্রেমীর পরাধীন ক্রমবিকাশের মূল্য। অন্যায় শোষণই স্বীকৃত। স্বয়ং মনুষ্য ক্ষুদ্র-লোককে ভক্ষণ করে। সমাজতন্ত্র হিংসামূলক। একের স্পৃহা উপর অপরকে ভাঙে বসালেই সমাজতন্ত্র।

বিশ্বদর্শী ব্যক্তির পূজা এবং তার প্রতি হিংসা সর্বত্র পতাকার সংকীর্ণতার পরিচয়। বিশ্বদর্শী ব্যক্তিত্ব ও বীরাঙ্গা নিয়ন্ত্রণের দাস। তাদের

পক্ষে নতুন চিন্তা নিষিদ্ধ বস্তু। উপচিন্তার আনন্দ তাদের নাগালের বাইরে। তারা সুখানন্দবোধে অস্থিরচিত্ত। বিশালীতার বৃদ্ধিহীন। তাদের বিগাট সৌর দীর্ঘায়িত হওয়া সম্ভবে পরিপূর্ণ। তাতে বাসস্থানের সমন্বিততা সরল সহজ হৌকবের শ্রদ্ধা নেই। সেখানে ইন্দ্রিয়ভোগ স্বরের স্বয়ং উৎসব আয়োজন। তাতে স্বাধীনতা তৃপ্তি আছে। নন শক্তিস্বীকৃত ও পূর্ণ হতে পারে। বৃদ্ধিমান ব্যক্তির সঙ্গতি উদ্দেশ্য সাধনের উপায় দায়। অন্যের পক্ষে সম্পত্তি স্বীকৃতির চরম ও শেষ বস্তু। অর্থোপার্জনীয় জন্য তারা উন্নত হয়ে ওঠে। বর্তমানে জাতিসংঘ একমাত্র ঐশ্বর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সাগরের মতো ছুটছে। তারা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করছে। তারা মানুষকে শিকারের জন্তুতে পরিণত করছে। পৃথগপৃথক প্রত্যয়লা করার জন্য তারা আত্মগোপন করে থাকে। অসম্মান্য হওয়া ক্রম বর্তমান মতো বর্ধিত মূল্যে বিক্রয় করছে। তারা যোগ্য বাছারের জন্য চিন্তা করে। এই ধরনের কান্দ সমাজবিরোধী। ব্যবসায় ব্যক্তিগত অধিকার বা স্বাধীনতা দোপ করে জাতি ও সমাজকে একা করা প্রয়োজন।



আধুনিকতম সৌন্দর্য প্রসাধনী

প্যাঙ্কি

অপরূপায় ও লাবণ্য ব্রকার



FOR: PANKY COSMETIC CO. Dpt: P. Sankar & Co. Calcutta-7

যে সেনাপতির অধীনে সৈনিকরা যুদ্ধ করে সে যৌবন লাভের বৈশাখ মৃত্যু বরণ করে, তিনি লাভের জন্য তিলে তিলে মনুষ্য হত্যাকারী ব্যবসায়ীদের তরে বধ। বৈদ্যোদয়ন করাই ছিলেন না। তিনি মানুষ্যের উপকারী ছিলেন। সুবিশ্বাস্যে তোলে যে ব্যক্তি মূর্খ ও দুশীল হয়ে গেছে, তার পক্ষে যুদ্ধ আত্মবিস্ময়কর ঐশ্বর্য। শক্তি মানুষ্যের সহজ বুদ্ধিদানকে মূর্খ করে দেয়। যুদ্ধের উদ্বেগনা তাদের মনল করে তোলে। যুদ্ধ এবং সামরিক কার্য পিতৃভয়ের মূর্খতার অঙ্গাঙ্গিক প্রতিবেশক। যুদ্ধে এবং পরিশেষে করে অবিজ্ঞা সমাজের অংশভবনের লক্ষ্য। এইরূপ অবস্থায় সে সমাজ ভিত্তিক্রমী এবং বৈশ্য শাসনের উপস্থাপক হয়। আদামী পশাণ মনুষ্যের মধ্যে ইয়োয়োরোপের কলহ-পরাণক কাতিগুণি অর্থায় ভিত্তিক্রমীশক্তি সিন্ধের হাজার হাজার মর্যাদা বুদ্ধে লিপ্ত হয়ে। হঠাৎ না এই পশাণময়ী ইয়োয়োরোপে উল্লস মনোমহাক্কর করে। ঐক্যবদ্ধ ইয়োয়োরোপ উচ্চতর অভিজ্ঞতায় শাসনের উদয় করে। ইয়োয়োরোপে বন্ধা পায়।

বিশ্বকালের শাসনকার্য থেকে মৃত্যু হওয়া একটি রাজনৈতিক সমস্যা। অভিজ্ঞতায় বংশে ক্ষমতা এবং রাজনীতিশাস্ত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মনুষ্যবৃত্তি ও মনুষ্যবৃত্তি অঙ্গাঙ্গিক সংকীর্ণতা বশিকের ব্যাক না। উচ্চতর মানুষ্যের শাসন করার অধিকার নির্ধারিত। সাধারণ মানুষ্যের শাসন করার অধিকার নেই। সে স্বস্থানে মূর্খ। উচ্চ সভ্যতা পিতৃভয়ের মতো সাধারণ মানুষ্যের প্রকৃত ভিত্তি উপর প্রতিষ্ঠিত। মর্যাদায় ও মর্যাদায় কতকগুলি ব্যক্তি নেতৃত্ব করে। আর কতগুলি মনুষ্য তাদের অনুসরণ করে। আদম সমাজে উপাসক কর্মচারী ও শাসকদ্বয়ী থাকে। শাসন করার অধিকার একমাত্র মানবিকের। এই বিষয়ে প্রোটের মত অসত্য। তাঁদের একাধারে মার্কিত বুদ্ধি সাহসী শক্তিশালী বিদ্যান এবং মনুষ্য সেনাপতি হতে হবে।

অভিজ্ঞতায় শাসনকার্য একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় পাঠিত হবে। জ্ঞানের বংশবধরা উচ্চাধিকারমন্ডলে তাদের কবতার অধিকারী হবে। মাঝে মাঝে তাদের ভিতর মনুষ্য বন্ধ আসন্ন করিতে হবে। একমাত্র এই

কাতিগুণের এক পশুশাসন কাতিগুণের উচ্চতর মানব কল্পিত মর্যাদা হবে। তখন আমরা দেখাওঁ কিয়তোয় শোপেনহাফের সৈনিকের এবং হাইনরিক হডো প্রকৃত ইয়োয়োরোপীয় হতে পারবে। তখন একটি মনুষ্য ইয়োয়োরোপের অঙ্গাঙ্গিক কীলক।

মানবিক নীটপের প্রতিভা উচ্চাধারী। তাঁর জিহ্বা ও ভাবনা অধিশক্ত ভাবার আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর ভাষা সহজ স্পষ্ট ও ভীষণ। সমস্তকৃত্য লিখিত হয়ে লক্ষ্য করে তিনি বলেছিলেন, যে ব্যক্তি লিখিত শক্তি বহির্ভূত কিছু, মূর্খতা করতে গিয়ে ভীষণ হয়ে যায়। তাঁকে ভাসোয়াসি। চিন্তার দলিলিখা অবস্থায় তাঁর চেহারা মত করে ফেলে। শেলার মতো he was a Child Crying in the night and Crying for the fight তিনি সমস্তের বিরুদ্ধে অন্য মরণ করেছিলেন। তাঁর মনের ভাবমন্ডল নষ্ট হয়ে ফেল। সমস্যাগুলি যুগে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ভীষণ বড়। প্রতিক্রিয়া অবশ্যভাব্য। ক্রমে তাঁর আত্মপ্রকাশ ভীষণ হা উঠেছিল। তিনি জ্ঞানময় এবং বৈদ্যবৃত্তিকে আক্রমণ করতে ছাড়েন নি। তিনি লিখেছিলেন, জ্ঞানবৃত্তি মনোমিত্তিকতার দ্বারা হয়। কিন্তু তিনি নিজের লেখাটাই মনোমিত্তিক করতে পারেন নি। 'বাস্তব জ্ঞানের মনোমিত্তিক হারিয়েছে ও মনোবিকসনের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল তিনি বলেছেন, আমি বেশ জানি মনুষ্য ভীষণতর মনে একমাত্র মানুষ্যই আছে। মানুষ্য এতো বৈদ্যবৃত্তি কল যে সে হারিয়ে উচ্চতর কল্পিত বাস্তব হয়েছিল। ব্যাধি এ কীমান বুদ্ধিশক্তি তার 'বাস্তব জ্ঞানের বৈদ্যবৃত্তিক কার্য' মনুষ্য চক্ষু মনুষ্য মন এবং বৈদ্যবৃত্তি মনুষ্য মনুষ্য পরিচয় উপস্থাপনা উনিংল পত্তাশক্তি অন্যতর প্রোট চিত্তাধার ক্রোমেরিক নীটপে ১০০০ বর্ষব্যপে মনুষ্য কোলে লাগে পড়লেন। তাঁর মতো আর কেউ ব্রাউ প্রজন্মের এয়ে উচ্চ মনুষ্য দেখে নি। মনুষ্যের পূর্বে তিনি লিখেছিলেন আমার মনুষ্য একমাত্র আসন্ন। ভাব্যী কালের মানব আমাকে ঠিকভাবে বুঝতে পারবে।

কিন্তু নীটপে কোন দিনই সম্ভাবিত হয়নি এ সম্ভাবনা নেই। হঠাৎকাল তার সহজ আশা বাক্য ক তাঁকে এ পর্যন্ত প্রতিজ্ঞাশীল বলেই চিহ্নিত করেছেন।

আজব ছানিয়া

শ্রীজ্ঞানপাপী

সোম্বর ব্যাপারে ব্রিটেন মহাক্ষতা করিলে ।

সোম্বর মকা গয়া ।

○

তুর্কী টেলে জরদীয়া লেকারি করিয়াছেন ।

লীমাক্টন 'জহ' ।

○

পার্সিদের পাত বার্মিংহাম শান্তমনের পার্সিড চটকাইল ।

তুর্কি !

○

আলবেনিয়ার দখিত সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কচ্ছেদ
করিয়াছে ।

মুসোলিনিয়ার পর আলবেনিয়া ।

একে একে নিশ্চয়ে সেউটি ।

○

গ্রীসের পর আজব যোব চীনের বিদ্যা করিয়াছে ।

আশি বছর বয়সে যোবের পো দাবাদক হবেন ।

○

গ্রীসের বিশেষ আনন্দে গ্রীসেওঁড় ভারত
আসিতেছেন ।

তামিল ভূটে জঙ্গ তুট ।

ভারত:মার্কিন সহযোগিতার মোক্ষ দাওয়াই ।

○

গ্রীসের, গ্রীষ্মী অনিল সেনাকে অনিল মেজর হইতে
বলিয়ারিলেন ।

পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ, তিনি ডাক্তাকে বন্ধক-কন্যা
হইতে চাহেন নাই ।

—তবে !

অন্যান্য বৃদ্ধাশ্রমাবীরা পশ্চিম ভারতীয় সেনাপতি
বলিয়ারিলেন কিন্তু, আইকম্যানের পাণ্ডি হইয়াছে ।

কাহারও শাক ভোটে না ভাই বলিয়া কি অন্যান্য
তিনি বাইয়েন না ।

ভারত সরকারত গ্রী ও গ্রীষ্মী গ্যাপারিন শূক্রে
হাইবার অভিল্যে ব্যক্ত করিয়াছেন ।

শূক্রে কেন ? বর্জ্জিতমার শূক্রে চপুই বর্জ্জিত ।

○

কলোয় ব্যাপারে ব্রিটেন ও মার্কিনের মধ্যে মতভেদ
সেবা বিয়াছে ।

কলোয় রঙ্গ বকে নতুন বাটকের শূক বহর ।

○

"কাম্বীর সমস্যার সমাধান হইলেই ভারতের সহিত
বৃদ্ধ প্রতিরক্ষা গতিয়া তুলিব ।"—আমরু খার নিবেদন ।

আর একবার দ্যাখিলেই...

‘এই চিঠি

তোমার হাতে
পৌঁছাবার আগেই
আর এক জগতে
পৌঁছে যাব আমি।
যতদূর মনে হয়
তোমার কাছে এই
আমার প্রথম চিঠি
—প্রথম ও শেষ
চিঠি। কেন জানি
না, বাবা! আগে
তোমার কথাই
আমার মনে



আন্তরিকতা করার
আগে বেছে বেছে
জানাকেই কেন
শেষ চিঠি শেষে
গেল, আর কেনই
বা আমার হাত
কবল, তা আজও
আমার কাছে
রহস্য রহস্যে
থিয়েছে।

ঐশ বোকাই
চিঠিপত্র! নানা
লোকেই নানা

পড়ল। আমার সব কথা, শেষ কথা জানিয়ে যাচ্ছি
তোমাকেই।

আমাকে সবাই ভাল ছেলে বলে ধানো। জুলে
কলেজের পরীক্ষায় প্রথম স্থান আমার জুটই বাঁধা ছিল,
এই সকলের ধারণা। পত্রীর স্বজ্ঞাত অভিযানক বলে
ছেলেটা সমীহ করত। কিন্তু এই মাতৃহত্যার জীবনে এত
কথা ছিল তা নিশ্চয়ই কেই ভাবতে পারে নি। আমি
নিজেও ভ্রমভ্রাম না। আজ চিঠি লিখতে গিয়ে আমি
অবাক হয়ে যাচ্ছি এ বিচিত্র ঘটনার সমাধার জীবনে
ঘটেছে শেষে।

আমার বয়স বখন আট, আমার বাবা লকৌয়েত এক
বাইকোকে নিয়ে উষাও হয়ে যান। আজও তাঁর বয়স
পাইনি। আমার মা—

কিরে আমার চিঠি হাতে করে বলে বইলি? কেসে
ধেনা বাপু। যা ঘরে ঢুকলেন। পুরানো লোহাণ'লা
বাইরে থাকিয়ে আছে। চিঠিপত্রগুলো কেসে 'হিরে ঐ পুরানো
ট্রান্ডো' ওকে 'হিরে' আর। কিছু পরমা পাওয়া যাবে।
কতদিন ধরে যে বই জুড়ে আছে।

কাড়াও হিচ্ছি। সন্তোষের চিঠিতে চোখ রেখে জবাব
দিলাম। সন্তোষের প্রকৃতি ছিল চাপা ধরনের। পোষ্ট
ব্রাঙ্কেটে ক্রাশে আলাপ। বসিষ্ঠতা হয় নি। তবু,
মিশন বোর এক পাঁচতলা বাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে

হাতে লেখা চিঠি। হাতভাঙে হাতভাঙে উঠে এল ধর
টুড়িঘের দিল। 'তাতে গোটা' গোটা অক্ষরে এক লাইন—
'টাকাটা অনেকদিন ধরে পড়ে আছে, তাড়াতাড়ি 'হিরে
হিও আমি'। তিনটাকা ছ'আনা। কোনদিন তা
দেওয়া যায় নি। 'অমির কোথায় খেন কাঁছিল। ট্রেন
জুয়টনার সে মাঝা বাহ। 'তারপর ধর টুড়িগুতে
তাল: পড়ল

'শম্মা তুমি খুব ভাল, আর আমি ভীষণ বাবাণ' খুব
বাবাণ। শম্মা, শম্মা, শম্মা।' বাম্বিহীন চিঠি।
হাতের লেখা চিনতে লাগলাম না। চিঠির শেষের বিকে
তাক্যতে হল। মিতা। কে এই মিতা? কোথায়
আলাপ হয়েছিল? অতীত-চারণের তিরিক রেখা কপালে
ফুটে উঠল।

চিঠিতে ট্রাকানা নেই। তারিখ লেখা আছে এই
নভেম্বর। লেখোঁথেনে শুধু শম্মা। 'তোমাদের গুণেন
থেকে চলে আসার পর বাসি তোমারই কথা মনে পড়ছে
শম্মা। শম্মা বলে, আমি আগের জুলনার পত্রীর হয়ে
গিয়েছি। ক্রাসে বলে ক্রাকবোর্ডের উপর চোখ থাকে, ঘন
চলে যায় অনেক দূরে। 'দ্বিতীয় বিচ্ছেদ ঐ বাগাটা আমি
কোনকিমে জুলতে পারব না' শম্মা।'

এইবার মনে পড়েছে। মিতা ঘোঁষির ঘোম। ঘোঁষি
দ্বিতীতে আসার পর পরীচের পতি লাগে। নিচ্ছে

বোনবৎ স্বাভাৱ্য কৰাৱাৰ অন্য বৌদ্ধ তাকে পূজাৰ ছুটিতে
দাশতে লিখেছিলেন। মিতা তখন চান্দ টেনে পড়ে।
আমি নি, এ, পৰীক্ষাৰ অন্ত তৈৰি হ'লি। কয়েকদিন
বুধ হৈ চৈল। ছুটি পথে ও কিয়ে গিয়েছিল।

নৱে শতপ, এই চিত্তিৰ অৰ্থাৎ আমি লিখেছিলাম,
'মিতা' অ'ন'ৰ ছে-ট বোন নেই। তপস্বান তোমাকে হিথে
তাৰ জ্ঞান মিটিয়েছেন। তোমার কৃপা হোক, এ
জানাত সৰ্ব্বপণের কামনা।' তাৎপৰ্য মিতা আৰ কৈন
চিত্তিৰে নি। দু'তিন বছৰ পৰে ওৰে বিয়েৰ স্বৰ বৌদ্ধি
কাজ বেকেই পাই।

'কাজু তুমি বুধ পতাপ, আৰাৰ চিত্তি হাত নঃ কেন।
আম'ৰ হানু নঃ।' জীকাৰাৰা অক্ষর। লগা তখন
কলা: কয়েকো বাজালোহে। জাইৰি লবে গিহতে
লিখেছে, জাইৰি নমুনা। হাসি পেল। এখন সেই
ইচ্ছানীৰই মেয়ে লেখে, 'মেজ হানু তুমি কবে আসবে।
তোমার সঙ্গে আছি।'

অনেক চিত্তি জনেক স্মৃতি। এম, এ, কাসের
সহপাঠিনী আমিবা লিখেছিল, 'চাৰুজি কুজাৰা চান্দ
মুচি কিয়ে প্রায় তখনহে। নন চকল করা অচুত রাত।
মনে হুঃএমি হাতে লেনী বন্দেছিল, Ob to whom!
এই বোহৰোৱা রাত আমি উপহার বিলান, তুমি একটা
বন্ধ হাসি কিয়ে তা গ্রহণ কৰো।'

এমি ত কথা কন বলত জনিমা, কিন্তু চিত্তিতে কথার
কৃপাৰুৰি হুজাত। পৰবেৰ ছুটিতে কলকাতায় গিয়েছিল।
হু'পাতায় ৭৭ বায়োটা চিত্তি লিখেছিল, প্রত্যেকটা চিত্তি
হু'পাতায়। ও কিয়ে এলে ঠাণ্ডা কৰে বন্দেছিলাম,
তোমায় কি সব কিছুই বিলাস কৰা? একেবারে ঠিক
হু'পাতা, হুঃএক লাইন এৰিক ওকি হতে নেই।'

অনিয়া লগাব কিয়েছিল, হু পাতায় কবে তোমার
কাছে নিজেৰে প্রকাশ করতে পারি নি। শেষ কথা
বলার পর একটা কথা বলাও বাধ্যবাধি হত। আর
জানইত বাধ্যবাধি আমি পছন্দ কৰি না।

বাধ্যবাধি সত্যিই সে পছন্দ কৰে নি। পৰীক্ষা পাস
কৰে কব্বের হাসকে সাহায্য চাকৰি দিয়ে তাকে ডাক
কিয়েছিলাম আৰাৰ পাশে বাঁকাৱাৰ অন্ত। সে লগাব
কিয়েছিল, বাঁকিয়ে আমি স্থা কৰি। আৰ সাধৰ বাতা

সক্কেৰ বে বাঁকিয়েৰ পৰ বেচে নেহ—লগাব আগে বাঁকাৱাৰ
কমতা নিয়ে লগাব লিহনে বে বাঁকিয়ে বাৰ তাকে আমি
স্থা কৰি সব চেয়ে বেনী।

কলাৰলিগ নিয়ে তমিমা চলে গিয়েছিল অজ্ঞাতঃ।
এবে থেকে এক লাইনের একটা চিত্তি লিখেছিল, 'বিহাট
বিশে নিজেকে বাড়াই করতে চলাম।' হু'পাতায় অত
কথা কৰে গিয়ে এক লাইনে শেষ হয়ে গেল।

'লগু তাই, তোমার কাছে আমি বস কথা বলতে
পারি এমন আর কারো কাছে পারি না। তোমার একটা
মন্ত বন্ধ জ্ঞান এই যে, তুমি কোন বেনী কোনাও কন।
তুমি চলে আৰ্শ্ব প্রোক্তা। এত কথা বলি অচত তোমার
বৈষ্ণুচিতি ঘটে না।'

কল্পপাতিৰ ঐ এক অচুত টাম ছিল। কোন সপ্তাহে
আমি বাঁকিয়ে না কিলেই পতাকাৰত। 'তোমার আলাদা
প্রত্যেক লগা সপ্তাহ কাটলাম। কত লোক এস, কিন্তু
যে এলে সব চেয়ে বেনী খুশী হতাই, সে এল না। তুমি
জান না কী ভাৱণ বাহাত তুমি আৰাৰ কিয়েছ।'

আৰাৰ অতি বন্দি বন্ধুর দিবি কল্পপাতি। তাইএত
বন্ধুৰে লগে বেগামেনা কৰতে ভালবাসতেন তিনি। কোন
জানি না আমি ছিলাম তাঁর অন্তঃ প্রিয়।

কল্পপাতিৰ জীৱনৰ সমস্ত কাহিনী আমি জানতাম।
বাকে ভালবেসেছিলেন তাকে বিয়ে কৰতে প্যারে নি,
জাতে মেলেনি বলে। বেবে কাত মিলিয়ে বিয়ে হয়েছিল
কিন্তু মনের মিল হয় নি। বিয়েৰ দু'বছরেও মধ্য কাপড়ে
কেহোমি চলে আন্ত লগিয়েছিলেন কল্পপাতি।

'জান লগু, ও এমইই হীনমনা যে, তোমার আৰাৰ
লক্ষ্যৰ্কে লক্ষ্যৰে চোখে বেখে। পতঙ্গপাতিৰ কাছে আমি
নঃ স্বীকার কৰব না। কেউ যদি ইতর মন নিয়ে
আমাকেৰে গায়ে কালি ছিটাতো আসে সে কালি তার
মুখেই পড়বে, কি বল লগু তাই।'

বেৰ চিত্তিতে কল্পপাতি লিখেছিলেন, 'তুমি আমাকে
এত ছোট চিত্তি লেখ কেন? এত দূৰ থেকে তোমাকে
পাৰাৰ একমাত্র উপায় এই চিত্তি, নিজেকে হিতে কাৰ্প্য
কৰ কেন?'

এ চিত্তিৰ লগাব আৰ বেগুতা হয় নি। তাৰ কয়েক-
দিন পরেই কল্পপাতিৰ আন্তঃজাতীয় স্বৰ আসে।

চিঠির শেষেই। এক কোম থেকে বেগোল লাগ
রিখে বাধা এক ডাড়া চিঠি। পুশ মেহতা আবার
ব্রাদারের ট্রাঙ্গে লগ্নাট্রী ছিল। চমৎকার ইংরাজী
লিখতে পারত সে। টানা টানা কাল চেখে ছিল শুধু
আকর্ষণী শক্তি। ঠাট্টা করে বলতাম, জুনি আমার উভার
আইড ভারলিং। সাথেলের প্রাকটিকাল ট্রাঙ্গে ও ছিল
আমার পাঠসংগ্রহ, টেমিস কোর্টে জুটি, 'ভেনেটে বিস্তৃত
হলের বক্তা আর ট্রান্স পালারবার একমাত্র সার্থী।

পুশ ডাক্তারী পড়ার শুরু চলে যায় লকোতে। প্রায়
দু'বছর ধরে চিঠির আদান প্রদান চলেছিল। সব ভাষা
ছিল খালাস।

লিখেছিলাম, 'তোমার মত আমার বলনের কোর
বাকলে মত কথা জানতে পারতাম।'

তখনো ও লিখেছিল, 'মনের কথা জানাবার শুরু
করার হয় মনের কোর, কলমের দ্বারা। মনের কোরই
তোমার মেই। জুনি ভীষণ।'

বাক্য হাতে লেখা পোষ্টকার্ড। চিঠি লেখা তার
কাছে ভীষণই ব্যাপার ছিল। অক্লির কাছে যাবে
নাকি ঠিকো বাইরে যেতে হয়। তিন চার মাস তার কোন
বক্য পাওয়া যেত না। হাজার বিয়ের তারিখ ত্রিক
কয়েক জানিয়ে আমি চিঠি দিয়েছিলাম। তারই উত্তরে
দোহাট থেকে বাবা লিখেছিলেন, 'বোকার বিয়ে ৮ই মার্চ
হচ্ছে কেনে খুশী হলাম। আমি লাকম্পার্নের তিন অর্থঃ
১০ই মার্চ গিল্লী পৌঁছাব। আপা করি তোমার লগ্নাই ভাল
আছিল।'

বাবা আজ জীবিত নেই। সারা জীবনে কয়েকটি
মাত্র পোষ্টকার্ড লিখেছিলেন। তার মধ্যে একটি 'হি'ডি
কেন্দ্র করে।

কেন্দ্র করে 'হি'ডি'র সখী হালের চিঠি। বিবাহের
একমাত্র সন্তান। বিলেতে গিয়েছিল ইন্ডিয়ানারিং
পড়তে, আর কিরল মা। বিলেতে থাকার আগে লিখেছিল
'মা আমার চিরদুঃখিনী। মার সুখে হাসি কোটানই
আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।' লেখানে গিয়ে
কয়েকটা চিঠি লিখেছিল। লিখেছিল, 'বিলেত যেমটা
মাসিক কিন্তু এখানে ঘেরেরা পরীলোকের। প্রলোভনের
অন্ত নেই, সাবধান না হলেই কোন অসুখেরে তলিরে
যেতে হবে। আমার খালি মনে পড়ে যাবের কথা কী

অবীর আগ্রহেই না তিনি ভিন ভ্রমকে। এই চিঠাই
আমার বাক্যকণ্ঠ, লক্ষ্য।'

কিছু শেষ পর্যন্ত এই বাক্য কণ্ঠ পরীলোক হাতে থেকে
সমীচক বাক্য কণ্ঠে পারেনি। তখনই বিয়ে করে
সে লসার পেতেছে। বেশে আর কেবে নি।

আর চিঠি 'হি'ডি'। কী হাত চিঠি? যে লিখেছিল,
'আমি আদর্শ মা হতে চাই লক্ষ্য। তুমি জুনি কর্তৃত্ব
হবে, কিন্তু আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল 'তাই।'

মা সে হয়েছিল, কিন্তু আদর্শ মা হবার অস্ত্র বাঁচেরে
পারেনি। সন্তানের জন্ম হইলেই আর এক অগন্ত সে
চলে যায়।

বেতিরে এল সামসুলের চিঠি। 'হিন্দু ও মুসলমানের
মধ্যে তফাৎ কোথায় জানিস? মুসলমান ধর্মের প্রতি
হল উন্নয়ন, আর ত্রেকের সঙ্গীর্ষতা। আমরা যখন
লব বরকা খুলে সবাইকে ভাই বলে ত্রাক বিয়েছি তখন
তোমরা লব বরকা বন্ধ করে লবার থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন
করে রেখেছিল। আর এই তাই 'বিত্রেকের সঙ্গী
ত্রেকে এনেছিল। তাই লক্ষ্য আর লবার পারল্য। যে
আমরা এলে হিন্দুগণের খালিক হয়েছিলাম।'

আরও অনেক কথা লিখেছিল সামসুল। বংগোয়ার
চূর্ণাপুত্রার আমরা 'লগ্নাট অগ্নো'র মঞ্চ কইন ত্রি
করেছিলাম। সামসুলের লুকর চোখের কণা ও মাত্র
হয়েছিল। কিন্তু পুত্র কহিট্টে কয়েকজন ব্রহ্মের আপন
বাক্য শেষ পর্যন্ত ত্রেক বাহ লগ্নো হয়। রাগে কো
লক্ষ্য সামসুল আমার আট পাতা চিঠি লিখেছিল। 'ব
অভিনেতা আমি হই। তোমার মানে, হিন্দুগণের উন্নয়ন
যে ভারীকালের একজন লেট মুসলমান অভিনেতা
প্রথম অভিনয় হেথতে পেল না।'

লক্ষ্য অভিনেতা সামসুল হয়েছ।
শ্রেষ্ঠ মঞ্চ অভিনেতা সে।

'কিহে চুল করে বলে আছিল যে চিঠিগুণাকেল
না টাঙাত ত্রি নি না, একিকে লোহাওল্য চলে পেল
মার কথার চমক ত্রাকল।

'মা, মা থাক।'
'তাহলে জুই এই চিঠির বোকা লকে কেবে নিয়ে যা
ললাম, মা, জুনি যখন টাঙাতা রেবে 'লি'ড কোথায়
একপাশে।

মেরিলিবোন ক্রিকেট

ক্রানের প্রতিদ্বন্দ্বীতা আত্ম
মান্যের জন্যে ক্রিকেট
মাঠে ছড়িয়ে থেকে ভারতীয়
কৃতিত্বাঙ্গীনের মনোর
অত্যাশঙ্কিত হয়েছেন।
ভারতের বিখ্যাত সত্যজিত
আম্বানী ১৯৬৮ সালে

উদ্বোধন করেছেন। প্রত্যেক দেশের চ্যাম্পিয়ন
সীমাবদ্ধ।

যদি এসেছেন ভারতের ক্রিকেট বিজ্ঞান গণিতের
প্রাচীনতম সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত প্রতিষ্ঠিত।
সে নবীন প্রতিষ্ঠিত নবীন কাজ। সেই নবীন নিয়ে
নানা চিন্তা করতে করতে মনে এসে গেল পঞ্চাশ বছর
আগেকার এক কাহিনী। যে কাহিনীর ঐতিহাসিক
অর্থিক আছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতের আর্থ-
প্রকাশের, প্রাথমিক স্বাক্ষর। সেইসঙ্গে এমনি এক
এম. সি. সি. দল ভারত পরিচালনা করেছিল। এবং
সেই সর্বপ্রথম।

মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব বা সংক্ষেপে এম সি সি
আদল পরিচালনা করেছিল ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।
এই সংস্থাটি বিশ্ব ক্রিকেটের ভাষা নিয়ন্ত্রণে পছন্দত।
কারণ ক্রিকেটে ইংরেজেরই অবদান। তাই আন্তর্জাতিক
ক্রিকেটে নিয়ন্ত্রণে ইংরেজী সংস্থা এম সি সি ক্রিকেট
বিসিটি। অন্য দল স্পেনের নাম নিয়ে গিয়েছিল স্পেন
কিছু ইংল্যান্ডের ব্যাটাই দল গিয়েছিল আর এম সি সি
নামে। বেশ কয়েকবার ক্রিকেটে খেলা পরিচালিত ও
নিয়ন্ত্রিত হয় এম সি সি দল হাতে পড়া আইন কানুনের
বিশেষে।

পঞ্চাশ বছর আগে আমায়ের মেনে যখন এম সি সি
দল পঞ্চাশ বছরে তখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারত
বা ব্যক্তি নি। কমনওয়েলথ ক্রিকেট মনো ভারতের
বহিষ্কার হয়ে, নিয়ন্ত্রক সংস্থা ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল-
বোর্ড তখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তবুও আন্তর্জাতিক
ক্রিকেটে মেরিলিবোন ক্রিকেট এবং ভারতে অবস্থানকারী
ইংরেজের আন্তর্জাতিক তখন ভারতের মাঠে মাঠে

খেলাধুলা

নাইজেরা নাইজেরা উত্তর

অজ্ঞান বন্ধ

দৃষ্টি ক্ষেত্র না। তাঁরা নিজেদেরও বোঝে নিজেদের,
চেনেন না। কি করেই বা চিনেন? বিশেষী
প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কতিপাথরে ব্যাটাই
না বলে কি কেউ তাঁর কৌশলের নজর চিনতে পারেন?
তাঁর আগে অবশ্য 'গণিত' আবিষ্কার হয়েছিল।
কিন্তু সেপের মাঠে নব বিশেষে। তবে ভারতীয় 'গণিত'
এক ভাষার নবীন হয়ে ইংল্যান্ডের নবীন।
তাঁর সে নবীন সর্বজনপ্রিয়। কারণ ইংল্যান্ডের মাঠে
মাঠে সেপে সেপের খেলা দলীয় সর্বজনপ্রিয়
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে 'গণিত' সর্বকালের অন্যতম
খেলোয়াড় পরিচালিত হয়েছেন। 'গণিত'কে ইংল্যান্ড না
বলে 'গণিত'কে ইংল্যান্ড না বলাই ভাল। তাঁর
কৃতিত্বের ভাষাভাষে গেল ভারতের পক্ষে দৃষ্টিভঙ্গির
হতো হাত বাড়তে হয়।

এক বছর ১৯২৫-২৬ সালে ক্রিকেটে ভারত গুণা
ভারতীয়ের কোনো পরিচয়ই ছিল না। এমন সময়
ভারতে এসে পড়লো এম সি সি দল ইংল্যান্ডের আর্থিক
আর্থিক গণিতগণ্যের নেতৃত্বে। ইংল্যান্ডের ক্রিকেটের
প্রথম পুরুষ গিলিসপাই হ্যাডা সফরকারী সেই পনের
সঙ্গ ছিলেন ইংল্যান্ডের ভারী আর্থিক বহুভাষা,
টেস্ট খেলোয়াড় অ্যান্ড গ্যান্ডার, জে পিয়ার্স,
অ্যান্ড টিল এবং অন্যান্য বিভিন্ন ক্রিকেট বোর্ডের
মহান টেট।

মহান টেট—আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ইংল্যান্ডের এক
অবিস্মরণীয় অধ্যায়। জ্যাকবাসদরল আমায়ের তাঁর
ক্রমে উত্তর-পশ্চিমের বিভিন্ন ক্রিকেট বোর্ডের কোনো
মেনে কোনো কালে আবিষ্কৃত হয় নি। এই টেট
আর জে পিয়ার্সের মিলি আগের হয়েই আর্থিক

বিভিন্ন ভারত ক্রিকেট
খেলা চলছে।

যদিও খেলেন তখন
ভারতের অবস্থা সন্তোষ
অনুভব। বর্ষের কোনো
ভারতের প্রতিষ্ঠা হয়ে
গতি গতি নাইয়ের
কল্যাণের কেউ ভারতের দিকে

টেটে নকিল আকিতাকে মানিয়ে কীরেয়েন নাচ ভিগিল
গালে। ভারতে এসেও তাঁরা নিখারি, আশুপটিল,
নারীতের স্বযোগিতার ধারণীত প্রতিপত্তকে কোনায়া
করে রাখেনে প্রশ্ন সটে।

তাইই ক'রে করাচীতে সম্মিলিত করাচী একাধন
এক ইন্সটিটু ও ১৮৮ রাণে চারলো, লাগোরে উত্তর
ভারত একাদশ এক ইংল ও ১৩২ রাণে, আত্মবীকে
সম্মিলিত রাহুলতানা মধ্যভারত একাধন এক ইংল

ও ১৩৭। আত্মবীতে তাঁরা
এখনই ভবনর মূর্তি ধরে
কেন্দ্রনে যে সম্মিলিত
রাহুলতানা মধ্যভারত এক
মিতী ইংল ১৮৮-৮৯
বেশী রাণ করেই লাগলো
না। টেট পিয়ারি পিলি-
গানের নামেই যেন
ভারতবীর্ষের তটস্থ অবস্থা।

কলিল পরের বেলা
বেলাইয়ে সম্মিলিত হিন্দু
মলের মলে। বেলাইবদা
হিন্দু জিমখানা মাঠে।
বেলাই ও পরহলীর
চাকার পিছনে কীডান-
রাগী মাঠে ভীত করেয়েন।

সবায়েরই লক্ষ্য এম সি সি
টেট পিলিস্যান পিয়ারি,
ম্যাডারি প্রশ্ন নাম করা
বেলাই। তাঁদের আশা
পুড়িয়ে এম সি সি আল' লেকরী করলেন,
ম্যাডারি ও টেট করলেন অবশিত করে। দেখতে
দেখতে এম সি সি মোট রাণ উঠলো ১৩০।

দর্শকরা বন্দী হলেন তাঁদের প্রত্যাশা পূর্ণ হয়ে
যেবে। ভবনর হিন্দু মলের ব্যাটিং। ইংলিশের
মুদ্রভেদে প্রশ্ন মূর্তন, পরহলী ও ম্যাডারি কীরে সেলেন
বদাকরে ১০ ও ১৪ রাণ করে।

এতোক্ষণ পর্যন্ত দর্শকের অবাক করে তোলায় কিছুই

ঘটে নি। এম সি সি মোলোমডের তাঁদের মনো
অক্ষর রেখেয়েন। পরহলী হিন্দু মলের উইকেট
পততে মূর্তন করে দিচ্ছে। দর্শকরা যা ভেবেছিল
তাই ঘটে চলেছে।

হিন্দু ভারতীয় ভারতীয় চাকার মাঠে গেল একোটে
পিয়ারি মূর্তি। এবার মাঠে নামলেন হিন্দু মলের
চার মলের মোলোমড—সি কে মাইডু। চাকার তাঁ
তাঁর, মাঝার ইংলিশ, মাঠে মূর্তি আত্মবীর্ষ



দিল্লি নাচর একটি
বের বাক্য ক্রিকেট ব্যাট
কতো ছোটই না দেখাচ্ছে।

বিরাট পূর্ণ মাইড
আচরণে পূর্ণর প্রতিভা
ও প্রতিভা। মনোমুগ্ধ
না কোল মূর্তি, না
তলাত উইকেটে এসে এক
বার চারপাশে চোখ মেলে
দেখে নিলেন। যেন একা
বিকল্প ভারতে। স্বতঃ
অন্যভাবে চাইনি মই
কিছু সেট দেখতেই কা
গামিল হলো। দাঁড়িয়ে
এলেন, দেখলেন, জ
করলেন।

বেলাই মূর্তিতেই হারিয়ে
গেল মাইডু বাক্য, মনো
মূর্তি বাসি। বিকল্পে মূর্তি
বের মূর্তিগণে ভেবে

উঠলো এক উচ্চ পূর্ণর বেলাইরা ভল্লমী। টেট
পিয়ারি, আশুপটিল, নারীতের স্বযোগিতা মূর্তি ভীত
বাড়িয়ে বিভার তাচ্ছিল্যে ব্যাট মূর্তিতে লাগলেন। মূর্তি
ছোর কল, মারও যেন তাতেই জোরে। দেখতে
দেখতে হিন্দু জিমখানা মাঠে যেন মারের আত্মবীর্ষ
মূর্তিতে লাগলো। আর সেই মলে বের মলে
গানের বদ্য।

মাইডুর হাতের ব্যাট মূর্তি মলে মলে কা

হিটলে হিটলে রাষ্ট্রের স্ট্যানার রাইরে। বলের গতি
কখনো উৎসাহী কখনো বা নাটী ঘেঁষা। 'বাট'
'হুত' 'পদ' 'ডাউট' ক্রিকেটের যে ভাবে ঘাটো রকম
নাগের হাঁপ করে একে একে সবাই বোঁবের পড়লো
নাইডুর চাপে জোঁব। সেখেন লক্ষ্যের মেজাজ উঠলো
ওজা পড়ল। সেই সঙ্গে এম সি সির খেলোয়াড়েরা
যেন অথাক মানসেন।

তার মানসো বিশ্বপ্রের্তা মিডিয়াম ফাউ বোলার
নরিন টেটের জাফ। বিস্টক, কেকে নিয়ে তার
বোলিংকে এমন অস্ত্রভার ভাব দেখাতে আগে কেউ
কোনো দিন সাহস পান নি। ইংলন্ডের টেট বোলার
জর্জ গিয়ারি, আর্নল্ড ও তাঁদের আর আর সতীর্থ
নাইডুর ব্যাটের প্রচণ্ড আক্রমণে কেমন বেন গুহ হয়ে
গেলেন। নটকীয় উদ্ধারের সামনে পড়ে তাঁদের যেন
বা কৃষ্ণার ঘোড়ি পদার্থ নেই।

দুরো একশ বিনিতি হয়ে বল পিচিয়ে নাইড, এখন
হয়ে কাঁচি দিলেন তখন তার ব্যক্তিগত রান শেঁষিতে
১৫০ এর মত। আর সেই রানের ভিত্তিতেই কিছু দলের
রান সংযোগ উঠলো ৫৫০ এতে। অর্থাৎ এম সি সির
মোট রানের দ্বন্দ্ব কল্যাণকাহি। একশ বিনিতি উইকেটে
যেক নাইড, নেগেয়েন তেরোটি বাউন্ডারী আর ওভার
বাউন্ডারী গুলে গুলে এগারোটি। প্রথম প্রেশার
ক্রিকেটে তার আগে আর কোনো ব্যাটসম্যানই এক
ইনিংসে এগারোটি ওভার বাউন্ডারী করতে পারেন নি।
তাই সেদিনের অখ্যাত নাইডুর কতিপয়ে বিশ্ব ক্রিকেটে
ওভার-সিউন্ডারী নামের এক নতুন রেকর্ড স্থাপি হয়ে
ইলো। সে রেকর্ড এখন অম্লান। উত্তরকালে সে
রেকর্ড কেউই ভাঙতে পারেন নি। শূন্য শেরেয়েন
ইংলন্ডের বাসেট (১৯০৫) এবং অস্ট্রেলিয়ার রিচি বেনড
একদিনের জুয়ে স্পর্শ করতে।

দুর্ভিক্ষের রান দেখতে ভালবাসেন। আরও ভাল
বাসেন ওভার বাউন্ডারী বর্ষা মাসের তাসের গুলো
কুড়তে। নাইডুর সেদিন বখারগতি দর্শকের উজ্জ্বল ও
জায়েগের অল্যা উপহার পেয়েছিলেন। কিন্তু সে কথা
বাক্য। তার চেয়ে বড় কথা এই যে উজ্জ্বল সি কে নাইডুর

সেই একদিনের বেনুরোনা জলদীয়ার ভারতীয়
খেলোয়াড়দের মনে সাহস এনে দিতে পেরেছিল। তাঁরা
জানসেন সেই নাইডুর যে নরিন টেটের বলেও পোনা
ঘাষ। খেলোয়াড়ের পরিচর স্বাধতে পারলে নরিন টেট ও
তার আর আর সতীর্থদের বল পিচিয়ে হাফুও বানানো
ঘাষ। আর এম সি সির খেলোয়াড়রা ত নাইডুর
যে তাঁদের দরুতা ও সামর্থ্যকে চ্যালেঞ্জ জানাবার মতো
অখ্যাত ভারতীয়দেরও আছে।

কদিন পর বোম্বাইয়ের মধ্যে এম সি সির দল আরও
প্রামাণ্য হলিল হাতে নাতে পেলেন। এবারের খেলা
এম সি সি ও দর্ভাভারতীয় একাদশের মধ্যে। ফোলালের
ক্রিকেট মহলে ভারতের আনন্দানিক স্বর্গদা ছিল না
বলেই এই খেলাটি টেটব্যাডের স্বীকৃতি পাব নি।
নইলে একালে টেট খেলা বলতে আমরা বা নাইড,
১৯২৫-২৬ সালে এম সি সির বনাম দর্ভাভারতীয় একাদশের
খেলাও ছিল তাই।

সেই খেলার নাইডুর দলটাকে শিকা ও সাহস পেয়ে
এম সি সির মোট রানকে (৩৬২) ভিত্তিতে দর্ভাভারতীয়
একাদশ করলে ৪০৭ রান। এবার নাইডুর না পারলেও
অধ্যাপক দেওর ১২ বি বাউন্ডারীর সাহায্যে ব্যক্তিগত
ভাবে রান জুলসেন ১৭৮। তারপর দ্বিতীয় ইনিংসে
শ্বনামবধ্য ভারতীয় ফাউ বোলার রামজী থকন দূরত
স্বাক্ষর হানলেন তখন নিবেয়ে এম সি সির ব্যয় হয়ে
অবস্থা। পাঁচ পাঁচটি সেরা উইকেট বিলম্বন করে কোনো
গতিতে সয় কাচিয়ে এম সি সি যে সে খেলার রান
বটালো।

খেলা অস্বাভাবিকতাইলো বটে ভেবে সেই নাইডুরেই
ভারতীয় ক্রিকেটের আনন্দানিক প্রতীকতার শাকা দরক
ভেরী হয়ে সেন। নাইডুর, দেওর, ওয়াশির আলি,
রামজী প্রমুখের পরিচর নিয়ে এম সি সির দলে বিশেষ
ফোলা কদিনের মধ্যেই ভারতীয় ক্রিকেটকে ফোলা হলো
স্বাক্ষরগতিক অনুমোদন ও স্বীকৃতি। সেই স্বীকৃতির
খোরে ভারত এখনও টেট খেলে চলছে। দেশ বিদেশে
সকল করছে নাইডুর বর্ষা। এম সি সির একদিনে সফরত
সেই স্বীকৃতির মধ্যে।

নভেম্বর মাসে পূর্ব ঘরোয়া
ব্রহ্মপুত্র নদবর্তী উপত্যকা
খিড়ী পাহাড়। কলিকাতার
পূর্ব ঘর পাক' নদীর মধ্যদিয়ে
ব্রহ্মপুত্র নদবর্তী পাহাড়
উৎসবে। এই উৎসবের বৈচিত্র্য,
বলিষ্ঠতা ও সুসংগঠিত মানবের

ব্রহ্ম জগৎ

ব্রহ্ম মেলা

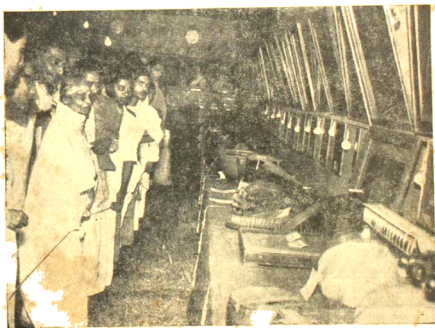
প্রবন্ধ

আচরণ। এই বন ঘন
চাপি উৎসবে তাঁরা নীরব
নইলেন। কিন্তু, তাঁদের
নীরবতা ও অসংযোজিত
উৎসবের বিশ্বাস অসংযোজিত
বা বিশুদ্ধ অনুভবের হ্রাস
হট্টনি। এবং সেই জন্যই

শরমে দীর্ঘকাল থাকবে। কয়েকদিন আগে পর্যন্ত
অনেকের মনে সংশয় ছিল এই আর্থিক অনটনের দিনে
উৎসবের স্বাধীনতা, ভাব ছিল এর বিপরীতে।
কিন্তু আজ উৎসবের স্বাধীন পটভূমির পরে একথা
দৃষ্ট করে বলা যায় যেখানে উল্লসিতা, শক্তি ও
সাধারণ মানব একত্র, একই সূত্রে বাঁধা সেখানে
পূর্ণতা আসনি থেকে গড়ে উঠবে, এবং দলিত মানব
দুঃখের পেরিয়ে দলিত মানব করে কল কল করে
আসবে। যেন গাই কলিকাতার একটি শ্রমিকদের

বোম্বের কলিকাতার তথাকথিত বিশেষ জাতীয়তাবাদী
কয়েকটি পত্রিকা পেশপর্শ্ব বিবরণী প্রচারে বাধ্য হন।

এই নভেম্বর থেকে ১০ই নভেম্বর পর্যন্ত মেলা
হবেছিল। মেলা জিনিসটার প্রতি ব্রহ্মপুত্রের ছিল
আন্তরিক সম্মতি। সাধারণের মেলাবেশ, তাদের চিত্রা-
ভাবনার বিবিধের 'প্রকৃতি' পছন্দ মেলা। আর এই
মেলায় যাতে শ্রমিকদের মানব যোগ তৈরি থাকেন,
ব্রহ্মপুত্র উপলব্ধি করতে পারেন সেই জন্যে চল্লিশ-
মুদ্রাও ছিল কন। বন ঘিরে হাত দু' টাকা। এই



ব্রহ্ম মেলায় একটি প্রধান আর্থিক বাধ্যতায় ও চল্লিশকল্লীর প্রতিষ্ঠার প্রদর্শনী।

দিক, যিহে মাধ্যমে বেলার উদ্বোধনকার অভিনয়সম্মান বা
কানিয়ে পাৰি না।

এই রূপ দিন হতে বেলায় এসে ভারতের বিভিন্ন
প্রদেশের এবং বিদেশের বিশৃঙ্খল জনসমাগমে আর বার বার
হয়েছে সত্যি—“বিশ্বভ্রমণ আমারে চাছিল কে আমার
অঙ্গুর।” বিভিন্ন অঙ্গোচ্চারণ কত বিভিন্ন ভাষাভাষী।



বেলার অঙ্গোচ্চারণত সৌম্যজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয়
ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ডেবী নীলকোতা।

হাস্যের মূল ভাব-বিনিময়ের অন্তরঙ্গতার স্বীকৃতি-
বাণীই যেন সার্থক হল:

“কত অভ্যাসে জানাইল তুমি
কত ঘরে গিলে গুটি
দরকে করিলে নিচুই বুক,
সবকে করিলে ভাই।”

প্রায় বিশ একর কবির উপর বেলা। সঙ্গীতের
তৌরসার আর বেলার অভ্যাসে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের
জন্যে ভিন্ন ভিন্ন বক। বেলাকে সার্থক রূপে জানে যোজন-
পদ্য, এ ছাড়া বিভিন্ন দেশের প্যাঁতলিনে। “অন
বেশল মিউজিক কনকারসের শিল্পটি অনেকের দৃষ্টি
আকর্ষণ করেছিল। দেশায়ে ভারতের দলীত-নাচকর,
প্রতিকৃতি ও বিভিন্ন নাট্যরচকের সন্বেশ হয়েছিল।
এ ছাড়া আর একটি অকর্ষণ ছিল চিত্রের মাধ্যমে
স্বীকৃতির স্বীকৃতি। রঙীন আলোক-দৃশ্যের কোয়ারাটি
এক অঙ্গুর” হারকতার দৃষ্টি করেছিল।

বেলার উদ্বোধন করেন কবি-কন্যা শ্রীমতী বীণা
দেবী। তিনি রকে স্বয়ং-নৃত্যকারী নৃত্যর শিখাটি
কানিয়ে গিলেন। রেকর্ডে কবি-বর্ণের আনুটি
ভেসে এল

“হে মোর চিত্র পদ্যভীর্ষে
হাসরে ধীরে।

এই ভারতের মহানবন
দায়র ভীরে।”

শ্রীমতী বীণা দেবী বলেন: “বিশ্ববাসী একই
পৃথিবীর একমাত্র থেকে অপর প্রান্ত পৃথিবী তার
শান্তির ও বৈরাগ্য অমৃতবাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছে।
আমাদের এই পাণ্ডি উৎসব বহি বিশ্বের আত্মিক
নর-নারীর হয়ে অপর এক-একটি পাত্রে, তবে
কবির নৃত্যবর্ণিকা পাণ্ডি উৎসব সার্থক হয়েছে।
উৎসবকে অভিনয়সম্মান বিদেশের সমস্ত প্রতিনিধি-
বন্দ।

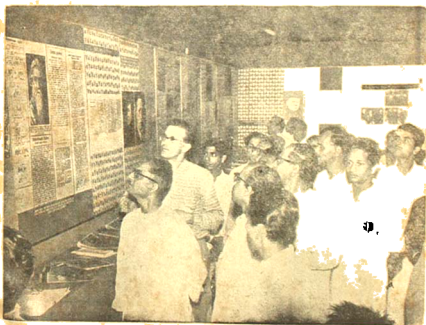
বিশ্ববিদ্যালয় অনুষ্ঠানে স্বীকৃতির সন্তোষ
নটক, নৃত্যনাট্য ও গল্প-উপন্যাসের নাট্যরূপ

পরিবেশিত হয়েছে। এই অবস্থানে কেবল নাম বাংলায়, শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেননি, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শিল্পীরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন। সুদূর কিউবা থেকে প্রেস্টেইনসেন বহু মেসের প্রেষ্ঠ ব্যাসেরিয়া। অবস্থানে সুদূর সুয়ডাল-বিভাগ করেছিলেন তোকোরোভার্কির প্রেষ্ঠ। আর পল গেরার্ডের টেপ প্রেকর্মে পান। সঙ্গীতে পল শিল্পী এবং ১৮টি সংস্থা অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ প্রেক্ষিত ছিল পুঙ্খ নাক, বাজা, সুশারেরা আর কবি সঙ্কলন। কবি সঙ্কলন তিন দিন হয়। দু'দিন সকালে এবং শেষ দুই বিকালে। বাংলা এবং ভারতের চরিত্রের প্রদেশের কবিতা সঙ্কলনে অংশগ্রহণ করেন। কবি সঙ্কলনে প্রোভাসের সংখ্যা নিত্য অগ্রভূমি নর। "কবিতা" কতক আয়োজিত কবিতা কেন্দ্রি উল্লেখ-যোগ্য। এখানে বিভিন্ন কবির প্রকাশিত কবিতার এই প্রকাশিত প্রেষ্ঠ। প্রবীণ ও নবীন কবিতা বাংলায় আয়োজনের জন্যে এখানে বিলম্ব করেন।

"গল্প" কতক আয়োজিত নাট্য-আন্দোলনের উপা-শিল্পীও বহু গাথার মতন।

সুনির্বাচিত বিজ্ঞানবীর উপর আন্দোলনাচারে প্রেষ্ঠ অবসরগ্রহণ হয়েছিল। এই সব আন্দোলনাচারে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অধ্যাপক হলেন, অধ্যাপক সত্যেন্দ্র বসু, ডাঃ বীরেন্দ্র পূত্র আচার্য আলোচনিক, এম. এ. জায়ে, পণ্ডিত সুকুমার দাস, শ্রীমতী অরুণা অঙ্গিক আলী, ইথোনেগিয়া, জাপান, সেবানন, তোকোরোভার্কি, পোলাভ, মোভিসেই ইউনিয়ন, বুলগেরিয়া, পণ্ডিত্যিক জার্মান প্রকৃতি, মেসের পণ্ডিতগণ।

শেষ দিনের অবস্থানে অবশেষ শেষ গান তীর বিখ্যাত "প্যারে ভব ভবি" গানটি। সুজিতা মিহের কণ্ঠে "ভব মনে রেখ" গানটি হাজার হাজার নির্বাক মানুশের মনে অঙ্গিগমিতে প্রেরণিত হয়েছিল—"ভব মনে রেখো বহি ভবের ঘরে চলে।" গীতটি মনে থাকবে



স্বদেশি বৈদেশি ভারত-মোভিসেই প্রকৃতি গণিতের মণ্ডলে প্রকাশের একাংশ।

। কলকাতা

সময়টির উদ্দেশ্য হয় তাই এই কাহিনীর বিস্তারিত।
 ছবিটিতে দুটি ছোটো স্টেশন একত্রে সমাবেশ ঘটানো
 হয়েছে। একটি বাড়িবাগান ও অপরটি বাড়ি।

পূর্বে ভারতীয় ছবি 'প্রতিভা'। পরিচালনা করেছেন
 নিমিত্তিত্ব ছবিটি। চরিত্রে রূপ দিয়েছেন—গিলদা
 বাউল, ব্যাট্টা হিন্দুজেন্দু, এ্যাঙ্কেল কাউন্সিল, বর্ড
 উলস প্রভৃতি। ছবিটি একটি কৃত্রিম। তাই
 করুন কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে ছবিটিতে। তবে
 মিলনাত্মক পরিচয়টির জন্য পুনরাবৃত্তি পাবে।

পূর্বে ভারতীয় আরও একটি ছবি 'প্রফেশনাল'।
 পরিচালনা করেছেন—বনরাজ উলস। চরিত্রে আছেন
 উলস, এ্যাঙ্কেল, বর্ড, গিলদা, বর্ড, হিন্দুজেন্দু, ব্যাট্টা ও
 দিলি টেম্পেলস। ১৯৬০ সালে রেকর্ডার, উলস, এই
 কাহিনীটি রচনা করেন। কাহিনীটি গীতা দাশ
 নাকালের অভিনয়ের 'বর্ড' হিন্দুজেন্দু প্রফেশনাল
 মামলার। ভারতীয় এই নবীণ দিক ব্যক্তিগত পরিচয়
 প্রত্যেক বলে মনে করেন। কিন্তু, বর্ডের তার জন্মের
 ব্যক্তি মনে মনে মনে। তারা তাঁকে প্রজাতি হিসাবে
 দেখেন। চাকুরী দেখেন। তিনি নিজে চরিত্রে দেখেন
 অন্যান্য ইচ্ছার মতো।

পরিচয়টির ছবিটি পরিচালনা করেছেন এম. এম.
 ইউসুফ। ছবিটি চরিত্রে রূপ দিয়েছেন—গান্ধী দাশ।
 এছাড়া মল্লিকানা, বর্ড প্রভৃতি। ছবিটি



প্রেম ফার্মে আলি আকবর বাঁ সাংবাদিকদের মধ্যে
 আলোচনার মতো।

কটো: বর্ড পড়া



মোভিসে মতকার অন্যান্য বাসোনিয়ান, বর্ড, বর্ড
 মপাতে হীন মত দিয়েছেন।

'দেখুন'। দুইজন বান্ধবীর অপর ভালবাসা ও আত্ম-
 ত্যাসের কাহিনী। পরিচালক ইউসুফ কাহিনীকে
 আলফ' মপারভাবে রূপ দিয়েছেন।

কামোভা সফরে ওস্তাদ আলি আকবর বাঁ
 গত ১লা ডিসেম্বর সাংবাদিকদের 'জক' বৈঠকে ওস্তাদ
 আলি আকবর বাঁ তাঁর সাংবাদিক কামোভা সফরে



শ্রী বাবোরিকার পুরীত টেন বেকড'শ্মাজেন।
কটো : বিশ্ব শতাব্দী

অভিনয় ও কাব্যাদির এক বিবৃতি দেন। কাব্যের
কাটিন কাটিন্দার ধারণা তিন ও প্রণয়ত তবলা
নাদক শ্রীরাগদ্বয়-বিশ্ব প্রায় দুই হাজারটি এক সময়
কেনে। ১ হাজার তিন-বিশ্ব, শিব, বোরক, ও
নাকিগ্রমে-কিন্দার এই চারটি বিবাহবিয়োগে দলীতের
অধীশক ও হাজারের মধ্যে ভারতীয় গল্পগীতী তাদ
নামক ইত্যাদি দলীয় কাণ্ডোনা করেছেন ও তাকি
বিশ্বের। 'আর কক' ১৫ দিন বিভিন্ন সামাজিক
অধ্যয়ন ভারতীয় গল্প দলীত পরিবেশ করে সকলকে
চলকত করেছেন।

প্রত্যেক ও পাকাত্য দলীতকলার মধ্যে যে ছিল ও
সকল আকর্ষণীয় ছিল কাব্যের বিষয়। ও
সময়ে বিভিন্ন ইটিনজারগীতী ও উত্তর-উত্তর
এক বিবৃতি টেন বেকড'শ্মাজেন নামের কাব্যের
কোনোই ছিল।

কিন্দারিকাল আকর বাকের কাল্যান-কাল টেল-
ভিন-বোলে-কাল-কাল। কাল্যান এই সমগ্র
টেল-ভিন-বোলে ভারতীয় গল্প দলীতের পরিবেশ
করা ছিল।

পাকাত্যিকদের মধ্যে আলাউদ্দাউল প্রিয় কালান
যে এই দলীয় সকলের মন-বুকে আশাশ্রিত এক ইয়াং কলে
পাকাত্যাবাসীদের মন থেকে ভারতীয় দলীত দলীয়
জন্ম: আগ্রহীল হোক।

বিদ্যার্জনে কোরা-কোবের শততম উৎসব

দিল্লি থিয়েটার গ্রুপের "সপাতের" অদ্যে
লাকসোর পর বিদ্যার্জ-রঙ্গকে তাদের তৃতীয় নাট্য
অবদান কোরা-কোব এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সূচনা করেছে।
অভিযগের বিপ্লবী নাটক কোরা-কোব গত ২২শে
অক্টোবর শততম-রজনীতে পদাৰ্পণ করে বাংলার বীর
বিপ্লবীর যোগ্য মর্যাদা রক্ষা করেছে। এই শততম
রজনীর স্মারক উৎসব হিসেবে গত ১৫ই নভেম্বর বিদ্যার্জ
রঙ্গক্ষেত্রে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল।
এই উৎসবে সেই অভিযগের দুই বিশিষ্ট নেতা শ্রীযুক্ত
ভূপতি বঙ্গমদার ও শ্রীযুক্ত গণেশ ঘোষ যথাক্রমে
সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করার কথা ছিল।
কিন্তু, অনিবার্য কারণে শ্রীগণেশ ঘোষ উপস্থিত হতে
পারেন নি। সভাপতি তাঁর এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন
হেলেন থিয়েটার গ্রুপ নবীন ও প্রাচীরের মধ্যে একটা
সংযোগ রাখার চেষ্টা করে। এ জন্য তারা
বাংলাদেশের পাত্র। কোরা-কোব নাটকটির পোশাক-বিক
কিছ, পরিবর্তন করে এই অনুষ্ঠানে উপহার দেওয়া হয়।

একটি নাটক প্রতিযোগিতা

বাগবাচার সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির সমিতির আমোদ-
প্রমোদ বিভাগ এবছর একটি একাধিক নাটক প্রতিযোগিতা
আয়োজন করেন। এই প্রতিযোগিতায় নিম্নলিখিত ৯টি
বাটিক মনোনীত হয় এবং ১০শে, ২১শে ও ২২শে অক্টোবর,
এই তিনদিনে বাগবাচার পুজামণ্ডপে অভিনীত হয়।

এই নাটকগুলির মধ্যে "জা" প্রথম স্থান অধিকার
করে। নাটকটি নিম্নোক্ত প্রথম স্থান অধিকার করার
যোগ্য। জা এবং তাঁর স্মারীর অবদান অভিনয় দর্শকদের
মোহিত করে। "কাল-মোরন" নাটকটিরও সংলাপ
শুন্দর। অমোজ্যোতি মনোযোগার্থী নিম্নোক্তের একজন
সভাব্যবহার নাট্যকার। দিল্লির ভূমিকায় শ্রীসুখীর
বোল, কবীর ভূমিকায় শ্রীদিল্লি চট্টোপাধ্যায় এবং
রাজীবের ভূমিকায় প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দর অভিনয়
করেন।